

# সূচীপত্র

---

# সূচীপত্র

বিষয় লেখক

শারদীয়

# বিংশ শতাব্দী

মহালয়ার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবে

[illegible]র

## রাশির বাজার

[illegible] উপন্যাস

অবধূতের

## অদেখা আখর

সম্পূর্ণ উপন্যাস

## গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শিবরাম চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, আশা দেবী, নীলকণ্ঠ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুকুমার সেনগুপ্ত, মানস বক্সী, মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী, অরুণ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

## প্রবন্ধে

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, ডাঃ সুকুমার সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, মুজাফ্ফর আহমদ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য।

## কবিতায়

বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, [illegible] মিত্র, [illegible] বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, বীরেন চক্রবর্তী, [illegible] মিত্র, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

এ ছাড়া [illegible] চিত্র [illegible] বিজ্ঞান [illegible] [illegible] ও অন্যান্য বহু বিষয়। বিস্তৃত [illegible] পরে ঘোষিত হবে।

**মাত্র আড়াই টাকা**

মাত্র আড়াই টাকা দামে চার শত পৃষ্ঠার সর্ববৃহৎ শারদীয় সংখ্যা

[illegible]

[illegible]চন্দ্র ঘোষের

## রক্তগোলাপ

সর্বাধুনিক কাব্য সংকলন।

[illegible]

[illegible]

আড়াই টাকা।

শ্রীঅরুণ চক্রবর্তীর উপন্যাস

## মহানগর

এই সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

[illegible] টাকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষের হাসামুখর নতুন নাটিকা 'কন্যাকা'র একটি দৃশ্য

চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ **কন্যাকা** ॥ আড়াই টাকা

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী । ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। ফোন ৫৫-৪৯২৫



# দেশ

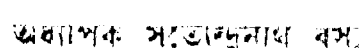

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 23rd August, 1958

[illegible] বর্ষ [illegible] সংখ্যা ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার [illegible] ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ


## সাময়িক প্রসঙ্গ

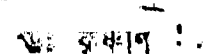
### "জাতীয় অধ্যাপক পদ"

ভারত সরকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ কৃষ্ণণকে "জাতীয় অধ্যাপক" পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে এই পদ


অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

দেওয়া হইয়াছে। তিনি বিখ্যাত ডাঃ রমণ। "জাতীয় অধ্যাপকগণ" ভারত সরকার হইতে মাসিক বৃত্তি পাইবেন এবং তাঁহারা স্বনির্বাচিত যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া গবেষণা কার্য করিয়া যাইবেন। ভারত সরকারের এই নীতিকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। অধ্যাপক বসুর মত প্রতিভাবান ব্যক্তির মেধা ও মনীষার প্রশাসনিক কাজে অপব্যয় ঘটিলে সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধ্যাপনার কাজ হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন, এখন নিজের প্রতিভাকে তিনি যথোচিত নিয়োগ করিতে পারিবেন। ইহার চেয়ে কাম্য আর কি [illegible]

[illegible]


ডাঃ কৃষ্ণাণ

### পণ্ডিতের সম্মান

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষার কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে ভারত সরকার বিশেষ বৃত্তি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রী[illegible] ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক ডাঃ [illegible] এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। [illegible]

### গুণীর সম্মান

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি [illegible] যাঁহারা [illegible] হইয়াছেন, এমন কয়েকজন [illegible] করিয়াছেন। [illegible] শ্রী[illegible] রায়চৌধুরী ও শ্রী[illegible] ইন্দিরা দেবী [illegible] সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

### শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি এই বৎসরের স্কুল ফাইনাল এবং হাই [illegible] পরীক্ষায় [illegible] প্রথম স্থান এবং [illegible] পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর [illegible] প্রাপ্ত ছাত্র [illegible] প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আমরা প্রশংসা

করিতেছি ও সেই সঙ্গে কামনা করিতেছি, ছাত্রছাত্রীগণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

## দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই। ভারত সরকারের সঙ্কল্প যে, কালক্রমে এই অঞ্চলটি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের উদ্বাস্তুগণের স্থায়ী বাসভূমি হইবে ঠিক। এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে বিপক্ষে এ পর্যন্ত বিপুল বাগ্‌বার হইয়াছে। বিপক্ষীয়গণের প্রধান যুক্তি, অঞ্চল মনুষ্য বাসের অযোগ্য। স্বপক্ষীয়গণের প্রধান যুক্তি, চেষ্টা করিলে ক্রমে ইহা বাসযোগ্য হইয়া উঠিবে। এহেন অবস্থায় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহতাবের একটি উক্তি, দণ্ডকারণ্যের বাসযোগ্যতার অনুকূলে গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কেবল উদ্বাস্তুগণ নয়, ভারতের যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ প্রবল, সেখানকার লোকেরও তথায় যাওয়া উচিত। শ্রী মহতাবের মনে কি আছে, জানি না, খুব সম্ভব তিনি চান যে, উড়িষ্যা-বাসীদেরও এক অংশ দণ্ডকারণ্যে গিয়া বসবাস করুক। সংবাদপত্র মারফত জানিতে পারিয়াছি যে, কেরলের মুখ্য-মন্ত্রী ঘনসন্নিবিষ্ট কেরল সম্বন্ধেও এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এসব যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, দণ্ডকারণ্যের অযোগ্যতা যেমন মুখে-মুখে শোনা যায় তেমন নয়। নতুবা তাঁহারা এই অঞ্চল সম্বন্ধে এরূপ আশা পোষণ করেন কিভাবে? আমরা কোন প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখিতেছি না। কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে পুনরায় চিন্তার অবকাশ ঘটিয়াছে। এখন পশ্চিম-বঙ্গের উদ্বাস্তুগণ যদি তথায় না যান, আর কালক্রমে ঐ অঞ্চল ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের সমৃদ্ধ বাসভূমি হইয়া ওঠে, তবে বিশেষ আক্ষেপের বিষয় হইবে। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দকে বিষয়টি পুনরায় চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

## বিহারে অহিন্দীভাষী

বিহার বিশ্ববিদ্যালয় অ-হিন্দীভাষী ছাত্রগণ সম্বন্ধে বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়া যে সার্কুলার জারী করিয়াছেন, ইতিমধ্যেই বাংলা দেশ হইতে তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা একাধিক ব্যক্তিগত পত্র পাইয়াছি। তন্মধ্যে একখানি এখানে মুদ্রিত হইল। পত্রখানির লেখক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। তিনি পেশাদার রাজনীতিক বা বেকার নেতা নন, সাহিত্যসেবী। তাঁহার পক্ষে বিষয়টি উদার দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই ইহার মূল্য অত্যন্ত বেশী।

সম্পাদক, 'দেশ' মান্যবরেষু—

সম্প্রতি বিহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, আগামী পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে হিন্দী ভাষায় (বা বিকল্পে ইংরেজী ভাষায়) পরীক্ষা দিতে হইবে। যখন তাহারা ভর্তি হইয়াছিল তখন তাহাদের বলা হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের মাতৃভাষাতেই পড়াশোনা করিতে এবং পরীক্ষা দিতে পারিবে। তদনুসারেই তাহারা বই কিনিয়াছে এবং পড়া-শোনা করিয়াছে, হঠাৎ তাহাদের মাথায় এই অসংগত সার্কুলার-বজ্র হানিবার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। বাংলা এবং উর্দু ভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা বড়ই বিপন্ন হইয়াছে।

সম্প্রতি ভাষা-সমস্যা লইয়া নেতারা যখন আলোচনা করিয়াছিলেন তখন আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলাম যে, স্বাধীন ভারতের সর্বত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষিত হইবে এবং নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই তাহারা শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এই উদার নীতির মস্তকে পদাঘাত করিলেন কোন সাহসে?

ব্যক্তিগতভাবে এবং বাঙালী ও উর্দু ভাষী-দের পক্ষ হইতে আমি এই অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। আশা করি, আপনি এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য বাঙালীগণ আমার প্রতিবাদের সমর্থন করিয়া উক্ত সার্কুলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন। আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর।

এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় বিহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি সার্কুলার আমাদের চোখে পড়িল। ইহাতে রেজিস্ট্রার বলিতেছেন যে, অ-হিন্দীভাষী পরীক্ষার্থিগণ ১৯৫৯ সালে মাতৃভাষায় না ইংরাজীতে উত্তর লিখিতে পারিবে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের পরে কি হইবে, তাহার উল্লেখ নাই। তবে কি বুঝিব যে, ১৯৫৯ সালের পরে এ সুযোগ আর অ-হিন্দীভাষী ছাত্রগণ পাইবে না? আসল অন্যায়টা এখানেই। সরকারী ভাষা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইতেছে (পার্লামেন্টের কমিটির কাজ চলিতেছে) তাহার একটি বিশেষ অঙ্গ হইতেছে, সংখ্যালঘুদের মনে ভাষাগত সৌহার্দ্য সৃষ্টি। দেখা যাইতেছে যে, বিহার বিশ্ব-বিদ্যালয় হয় আলোচনার ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ, নয় তাহার মর্ম গ্রহণে অপারগ। দুটির কোনটিই একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে গৌরবের কথা নয়। আশা করি, বিহার বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত বিষয়টি পুনরায় তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

## সীমান্তে হাঙ্গামা

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সীমান্তে বেশ কিছুদিন হইল পাকিস্থানী ফৌজ হাঙ্গামা করিতেছে। গরু চুরি, ধান কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় নাগরিক হত্যা প্রভৃতি নানারকম দুষ্কার্য করিয়া চলিয়াছে পাকিস্থানী ফৌজ। পূর্ব-পাকিস্থানের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের ভারত সীমানায় এই যে গুলিচালনা, ইহার উদ্দেশ্য কি? প্রথম উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ অভাব-অভিযোগ হইতে পূর্ব-পাকিস্থানীগণের দৃষ্টি অন্যত্র আকর্ষণ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধারণ নির্বাচনের দিন পিছাইয়া দেওয়া। তৃতীয় উদ্দেশ্য পূর্ব-পাকি-স্থানের মনে এই বোধ জন্মাইয়া দেওয়া যে, পশ্চিম পাকিস্থানই তাহাদের রক্ষক। এ যেন এক ঢিলে অনেক পাখি মারা। এক ঢিলে অনেক পাখি মারিতে গেলে দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত কোন পাখিই মরিল না।

## স্বাধীনতা দিবসে আচার্য বিনোবা ভাবে

ধুলিয়া (বোম্বাই), ১৭ই আগষ্ট—আচার্য বিনোবা ভাবে এখানে বলেন যে, গণতন্ত্রকে নবভাবে রূপায়িত করিয়া ইহাকে ভারতীয় জীবনধারার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক জন-সভায় তিনি বলেন, ভারতে বর্তমানে যে গণতন্ত্র চলিতেছে, উহা ইউরোপ হইতে ধার করা। এদেশে যদি সাফল্যের সহিত উহাকে প্রয়োগ করিতে হয়, তবে উহার দোষত্রুটিগুলি বাহির করিতে হইবে।

আচার্য ভাবে এই প্রসঙ্গে ভারতে বিভিন্ন পার্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি কেহ কাহারও দোষত্রুটি সংশোধন করিতে পারিতেছে না। কারণ সকলেই ক্ষমতা অধিকারের পশ্চাতে ছুটিতেছে।

গুজরাটে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়ী করেন।

তিনি বলেন, কোন কোন রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য দলের অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদের লইয়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন। কিন্তু ইহা গণতন্ত্রবিরোধী। ইহা দ্বারা গণতন্ত্রকে অলক্ষ্যে আঘাত করা হয়।




**শ্রীকৌটিল্য**

যে দ্রুতগতিতে অনগ্রসর অর্থনীতি বিষয়ে গত কিছুকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা হয়েছে, ঠিক ততটা দ্রুততার সঙ্গে এ বিষয়ের কয়েকটি মূলগত ধারণা এবং সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা এগোয় নি। অনেক বুদ্ধি-বিচার দিয়ে গড়ে তোলা অর্থনীতিক মডেলেও সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, ঐ মূলগত ধারণাগুলি সম্বন্ধে পাঠকের ধোঁয়াটে অনুভূতিতে অর্থনীতিবিদ্‌দের আপত্তি নেই। এবং এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় যে, অর্থনীতিবিদ্‌রা নিজেরাই এসব প্রসঙ্গে কতকগুলি অদ্ভুত সমস্যার জট খুলে একটা মোটামুটি সংজ্ঞা কিংবা ধারণার শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে পারছেন না। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যেমন ভৌগোলিক এবং অন্যান্য অনেক অবস্থান নির্বিশেষে একটা মৌল গুণগত ঐক্য আছে (যার ফলে তাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য সংজ্ঞা সৃষ্টি করার পথে সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম) অনগ্রসর দেশগুলির ক্ষেত্রে তেমন ঐক্যের কিছুটা অভাব।

যে ধরনের সমস্যার কথা বলছি, অনগ্রসর অর্থনীতির সংজ্ঞার সমস্যা তার মধ্যে একটি। অনগ্রসরতা কাকে বলব? ইংলণ্ড কেন অনগ্রসর নয়, আর ভারতবর্ষ কেন অনগ্রসর? সাধারণ বুদ্ধি-প্রসূত প্রাথমিক উত্তর নিশ্চয়ই এই যে, ইংলণ্ডের লোকেরা গড়পড়তা ভারতবর্ষের লোকের চেয়ে বেশি খেতে-পরতে, উপভোগ করতে পায়। ঠিক কথা। কিন্তু, যেমন, অস্ট্রেলিয়ার লোকেরাও তো ভারতবর্ষের লোকের চেয়ে গড়পড়তা ভালো খাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া কি তবে ভারতবর্ষের চেয়ে অর্থনীতিক দিক দিয়ে বেশি উন্নত? অর্থনীতিবিদ্ বলবেন: সুস্পষ্ট নয়।

এখন কথা হচ্ছে, অনগ্রসরতার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হলে একটা কিছু পরিবর্তনযোগ্য (variable) বিষয়ের ভিত্তিতে এগোতে হবে। অর্থাৎ, অর্থনীতিক উত্থান-

পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়টিরও উত্থান-পতনের কার্যকারণ সামঞ্জস্য থাকবে। বিষয়টি নিজে অর্থনীতিক পরিবর্তনের কারণও হতে পারে, ফলও হতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত কার্য-কারণ সম্বন্ধযুক্ত অসংখ্য পরিবর্তনযোগ্য বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে আমরা উপযুক্ত মনে করব সেটাই আমাদের নতুন সমস্যা দাঁড়াবে। এ বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, এবং অধিকাংশের বক্তব্যের মধ্যেই আংশিক অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। যেমন, একদল বলেছেন, মাথাপিছু জাতীয় আয় দিয়ে সংজ্ঞা বিচার করতে। কেউ বলেছেন যে, উৎপাদন-কৌশলই হচ্ছে অর্থনীতিক প্রগতির মূল কথা; সুতরাং উৎপাদন-কৌশলের প্রেক্ষিতেই সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। এরকম আরো মতামত আছে (দ্রষ্টব্য: Income and Wealth, তৃতীয় খণ্ডে ড্যানিয়েল ক্রীমারের প্রবন্ধ)।

সমস্যাটির গভীরে গেলে দেখা যাবে যে, উপরের পরিবর্তনযোগ্য বিষয়গুলি অনগ্রসর অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ হলেও সংজ্ঞা-বিচারের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। যেমন, শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয়ের কথা আলোচনা করলেই আমাদের যা বুঝবার তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়ার মাথা-পিছু আয় ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি, তথাচ অস্ট্রেলিয়াকে ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি অগ্রসর বলতে গিয়ে যে-কোনো দায়িত্বশীল অর্থনীতিবিদ্ই সংশয়ে ভ্রূ সংকুচিত করবেন। কারণ, যেহেতু অনগ্রসর অর্থ-নীতির আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে অগ্রসরতার পরিবেশ (conditions) নির্ধারণ করা, সেহেতু আমাদের দায়িত্ব এমন একটি পরিবর্তনসাপেক্ষ বিষয়ের ভিত্তিতে সমস্যাটির আলোচনা করা যার মধ্যে আর্থিক বৃদ্ধির (growth) প্রত্যক্ষ কার্য-কারণ সম্পর্কটি নিহিত আছে। অনগ্রসর অর্থ-নীতি বিষয়ে স্থিতিশীল বিশ্লেষণ (static analysis) পদ্ধতি সম্পূর্ণ অর্থ-হীন। অর্থাৎ, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যদিও স্থিতিশীল বিচারে অস্ট্রেলিয়াকে ভারত-বর্ষের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর মনে হয়, তথাপি বৃদ্ধি-প্রযুক্ত (growth-oriented) বিশ্লেষণে একেবারে অন্য সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। আবার একথাও আমরা জানি যে, বৃদ্ধি-প্রযুক্ত অর্থনীতির অন্য নাম হচ্ছে শিল্পোন্নয়ন-ভিত্তিক অর্থনীতি। কথান্তরে, আমাদের সুচিন্তিত উপলব্ধি এই যে, পৃথিবীতে সব দেশকেই তার অর্থ-নীতিক বিবর্তনের কোনো না কোনো পর্যায়ে অনিবার্য কারণে শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে, এবং সেই পর্যায়ে শিল্পায়ন ব্যতিরেকে তার বৃদ্ধি অসম্ভব হবে। অনগ্রসর অর্থনীতির আলোচনায় তাই শিল্পায়নের প্রয়োজন একটি প্রধান স্বীকার্য (hypothesis)।

এখন, অস্ট্রেলিয়ার শিল্পায়নের গতি এবং আয়তন ভারতবর্ষের তুলনায় সামান্য। তার খাদ্যদ্রব্যে মাংস, পনির, মাখন, চীজ ইত্যাদি প্রাণিজ দ্রব্যের বিপুল আধিক্য। এসব দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য স্পষ্টতই উল্লেখ-যোগ্য স্তরে শিল্পায়নের প্রয়োজন হয় না অথবা এখনো হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার অন্য প্রধান সম্পদ বনজ ও কৃষিজ দ্রব্য সম্বন্ধেও এই একই কথা। হয়তো জনসংখ্যার স্বল্পতাই ওদেশে এই সহজ প্রাক্-শিল্পায়ন অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখেছে। কিন্তু সে যাই হোক, উপরোক্ত ইঙ্গিতের সূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় আয়ের প্রকৃতির (content) তুলনা করলেই শেষোক্ত দেশের অর্থনীতিক বিবর্তনের স্তরটিকে ধরা যাবে। সহজেই বোঝা যাবে যে, দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ, শিল্পায়নের মানদণ্ডে ভারতবর্ষের স্থান অস্ট্রেলিয়ার ঊর্ধ্বে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্রীমার বলেছেন যে, উৎপাদন-কৌশল, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি সবই গৌণ নিরূপক (indicator); শিল্পোন্নয়নের স্তর বা গতিকে এরা বিশেষভাবে দেখতে সাহায্য করে না। তিনি তাঁর নির্ণেয় অনন্য নিরূপকটিকে অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন মাথাপিছু জাতীয় পুঁজির মধ্যে। কারণ গোড়ায় গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজির স্বল্পতাই অনগ্রসরতার মূল কারণ, এবং যেহেতু স্পষ্টতই আর্থিক বৃদ্ধি হচ্ছে শ্রম এবং পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ ফসল, সেহেতু তথাকথিত কোনো প্রমাণ অগ্রসর (শিল্পোন্নত) দেশের তুলনায় যদি অন্য কোনো দেশের মাথাপিছু জাতীয় পুঁজির পরিমাণ কম হয় তবে ক্রীমারের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেই দেশকে আমরা অনগ্রসর বলব।

# মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রতিকারের পথ

**যোগনাথ মুখোপাধ্যায়**

লেবানন ও জর্ডনে পশ্চিমী সৈন্যবাহিনীর অবতরণ এবং তার প্রতিবাদে তুরস্ক ও ইরান সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ হঠাৎ এমনই এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে যুদ্ধভীত পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষেরই আশংকা হয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুঝি শুরু হয়ে গেল। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেফ যখন পশ্চিমী শক্তিজোটকে স্পষ্ট ভাষায় শাসিয়ে বললেন, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের সৈন্যবাহিনী পশ্চিম এশিয়ার সকল এলাকা থেকে প্রত্যাহৃত না হয় এবং শীর্ষ সম্মেলন ডেকে সকল সমস্যার সুসমাধান না করা হয় তা হলে রাশিয়া চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে, তখন সকলেরই মনে হয়েছিল যে, আর কোন কারণে না হলেও শুধুমাত্র নিজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যেই রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

কিন্তু যুদ্ধ হল না। সকলের সব আশংকা ও অনুমান মিথ্যা করে দিয়ে লেবানন-সংকট লেবাননের মধ্যেই সীমিত থেকে গেল। একটি মানুষেরও মৃত্যু হল না পশ্চিমী শক্তিগুলির গুলীতে বা রাশিয়াও নামল না যুদ্ধে, তার নিজের দাবি ও ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্যে। ইরাকের বিদ্রোহের সফল পরিসমাপ্তি ঘটার পরেই প্রেসিডেণ্ট নাসের দৌড়লেন রাশিয়ায় মঃ ক্রুশ্চেফকে অনুরোধ জানাতে যে এমন কোন কাজ তাঁরা যেন না করেন, যার ফলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ওদিকে ইরাকের সদ্যগঠিত প্রজাতন্ত্রী সরকারের নেতৃবৃন্দও বিপ্লবের অব্যবহিত পরে জানিয়ে দিলেন রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিজোটের সকলকে যে ইরাক যুদ্ধ চায় না, চায় পূব পশ্চিম সকলের মৈত্রী। এমনকি যে বাগদাদ চুক্তিকে কমিউনিস্ট শক্তিজোট তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ঘৃণ্য চক্রান্ত বলে মনে করে, সেই বাগদাদ চুক্তির সংগেও ইরাকের নতুন সরকার সরাসরি সম্পর্ক ছেদ করলেন না। অর্থাৎ নাসের এবং ইরাকের নয়া নেতৃত্ব একরকম স্পষ্টভাষাতেই জানিয়ে দিলেন রাশিয়াকে যে তার বন্ধুত্ব তাঁদের কাছে অতীব কাম্য হলেও তাঁরা চান না যে কোন পক্ষের হঠকারিতার ফলে এমন কিছু ঘটুক যার ফলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সোজা কথায়, ইরাকের বিদ্রোহের পূর্ণ সাফল্যে আরবের মুক্তি ও ঐক্য আন্দোলন যেটুকু সাফল্যলাভ করেছে, তা হঠাৎ দুই দানবের লড়াই বেঁধে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক, এটা আরবের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের একেবারেই অভিপ্রেত নয়। এই কারণেই পশ্চিমী শক্তিজোটের কার্যকলাপে রাশিয়ার স্বার্থ ও সম্মান যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাকে আরব জাতিগুলির সমর্থনের অভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়েছে। আর পশ্চিমী শক্তিজোটও আরব নেতৃবৃন্দের মনোভাব ঠিকমত বুঝতে পেরে তাদের সংগে আপোসে আসতে দেরি করেনি। ইরাকের নতুন সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগত রাষ্ট্রগুলি এবং লেবানন ও জর্ডনেও তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে, যাতে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরেও তাদের স্বার্থ সেখানে অনেকখানি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। আরব দুনিয়া ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে এইভাবে একটা কার্যকরী মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা প্রবল হওয়াতে বর্তমানে শীর্ষ সম্মেলন আহূত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দকে এত দ্রুত নীতির পরিবর্তন ঘটাতে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। এর ফলে অন্য কোন লাভ যদি নাও হয়ে থাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন সম্ভাবনা যে বহু পরিমাণে লুপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যিকথা বলতে কি, জাগ্রত জনগণের দাবি স্বীকার করে নেওয়ার মত মনের উদারতা যদি বৃটেন বা আমেরিকার পুঁজিবাদী সরকারগুলির থাকত তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এই

জাতীয় সংকটের সম্মুখীন তাদের কখনোই হতে হত না। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মরুকল্প দেশগুলিকে অর্থনৈতিক স্বার্থ এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে যে একমাত্র নিজেদের স্বার্থে ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েই তারা পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত হতে পারে। ত্রিশ বছর আগের আরব দেশগুলির সঙ্গে আজকের আরব দেশগুলির কোন তুলনাই চলতে পারে না। কুয়েটের মত একটি ক্ষুদ্র শেখশাহীরও বর্তমানে তৈল শিল্প থেকে রাজস্ব আদায় হয় বছরে প্রায় দেড় শ' কোটি টাকা। সৌদী আরবেরও তৈল রাজস্ব ঐ একই পরিমাণ। ১৯৫৫ সালের হিসাবে দেখা গেছে যে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসিক্ত আরব রাজ্যগুলি তৈল কোম্পানীগুলির কাছ থেকে খাজনা ও সেলামী বাবদ পেয়েছে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড, যা আমাদের ভারত সরকারের স্বাভাবিক বছরের সমগ্র রাজস্বের চেয়েও পরিমাণে বেশী। অথচ ভারতে যেখানে লোক বাস করে ৩৭ কোটি, পশ্চিম এশিয়ার আরব রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা সেখানে মাত্র দু' কোটি। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যদি জনগণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যয় করা হত তাহলে আজ আরব দেশগুলির সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য যে উন্নতির কোন সীমায় পৌঁছাত তা আমরা ভাবতেও পারি না। পশ্চিমী তৈল কোম্পানীগুলি এই অঞ্চল থেকে প্রতি বছর যে মুনাফা লুঠে করে নিয়ে যায় তার পরিমাণও প্রায় সাড়ে আট শ' কোটি টাকা। সুতরাং অধঃপতিত আরব জাতির কল্যাণ সাধনের নিঃস্বার্থ ব্রত নিয়ে বিদেশী বণিকরা মরুভূমির বুকে এসে বাসা বাঁধেন নি সে কথা ঠিক। কিন্তু তারা যদি আজ প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে, সংখ্যাতীত বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে ও প্রায় ত্রিশ বছরকাল চেষ্টা করে এই বিরাট দৈত্যাকৃতি শিল্পটিকে না গড়ে তুলতেন তাহলে পশ্চিম এশিয়ার প্রাণরস পেট্রোল যে আজও মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকত, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে অর্থনৈতিক কারণে পশ্চিম এশিয়ায় আরব ও পশ্চিমী স্বার্থ অভিন্ন।

তাই হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় আজকের মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির দিকে তাকালে। আরব দেশগুলির প্রায় সকল মানুষ আজ সক্রোধে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় পশ্চিমী শক্তিগুলির দিকে, আর যে রাশিয়ার সঙ্গে তাদের নেই কোন স্বার্থ বা অর্থনৈতিক বাদের সম্পর্ক, সেই রাশিয়াই হয়েছে তাদের প্রিয় বন্ধু। কিন্তু একটু তলিয়ে এবং আরব জাতির প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি বজায় রেখে যদি আমরা আজকের অবস্থার বিচার করি তাহলে দেখতে পাব যে এর মধ্যে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই এবং আরব দেশের সাধারণ মানুষ যে পশ্চিমী শক্তিগুলি ও তাদের স্বার্থবাহী স্বদেশী শাসক ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে অস্ত্রধারণ করেছে তাতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রগুলির শাসকবর্গ প্রতি বছর বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলির কাছ থেকে পেয়ে থাকেন, তার একটা ক্ষুদ্র অংশও যদি তাঁরা প্রজাদের হিত সাধনে ব্যয় করতেন, তাহলে আজ এমন অবস্থা কখনও সৃষ্ট হতে পারত না। নানা উপায়ে ট্যাক্স করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রিয় হয়েও ভারত সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেন এক বছরে, তারচেয়েও বেশি টাকা এই জনবিরল রাষ্ট্রগুলির রাজারা প্রতিবছর বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলির কাছ থেকে পান শুধুমাত্র সেলামী ও খাজনা বাবদ। এছাড়াও

আছে তাঁদের অন্য আয়ের উৎস। যেমন সৌদী আরবের রাজা প্রতি বছর তৈল রাজস্ব পান দশ কোটি পাউণ্ড, যা তাঁর সমগ্র রাজস্বের অর্ধেক অংশ মাত্র। বিভিন্ন খাতে সৌদী আরবের রাজতন্ত্রী সরকারের বাৎসরিক আয় প্রায় তিন শত কোটি টাকা, আর সে রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা মাত্র ৬৫ লক্ষ। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যদি তিনি সত্যিই প্রজাপালনে ব্যয় করতেন তাহলে সৌদী আরবের প্রত্যেকটি মানুষের আজ সুখ ঐশ্বর্যের কোন সীমা পরিসীমা থাকত না। পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র শেখশাহী কুয়েটের লোকসংখ্যা এক লক্ষ মাত্র, কিন্তু বাৎসরিক তৈল রাজস্ব পায় সে প্রায় দেড় শত কোটি টাকা। কুয়েটের রাজা ও অভিজাত শ্রেণী যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে এই টাকা দিয়ে ঐ রাজ্যটিকে এতদিনে তাঁরা সোনায় মুড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি সে সকল দেশের? সৌদী আরব, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, দেখা যাবে, যেমন দেশের মরুভূমির মতই সেখানকার দারিদ্র্য নিষ্করুণ নিষ্ঠুর। সেখানকার আমীর ওমরাহ আর শেখের দল ব্যয় করে লক্ষ কোটি মুদ্রা, তাদের প্রতি-নিশ্বাসের প্রমোদে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন কাটে অনাহারে, নিরাশ্রয়ে, উদ্বাস্তু যাযাবরের মত। সুতরাং এই দুর্নীতি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি দেশের সাধারণ মানুষ যদি বিরূপ হয় এবং বিদ্রোহ করে তাদের উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আর এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডের কমনওয়েলথ সরকার মিত্রতা স্থাপন করে তাহলে তাদের প্রতিও যে আরবের সাধারণ মানুষ বিরূপ হবে না কোন যুক্তি আছে? মধ্যপ্রাচ্যে খুন, জখম প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এ কারণে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তারা অনেক সময়েই ঐ অঞ্চল সম্পর্কে অনেক তাচ্ছিল্যকর উক্তি করে থাকেন। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন তাঁরা, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ব্যবস্থার উৎখাতের কোন উপায় নেই যেখানে, সেখানে হিংসার পথ ছাড়া আর কোন পথই মুক্তিকামী মানুষের সম্মুখে খোলা থাকে না।

আরব জাতি যে চিরকাল ঘুমিয়ে থাকবে না, একথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জানা ছিল। তাই নিজেদের বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তারা সমগ্র আরব এলাকাকে খণ্ডবিখণ্ড করে প্রত্যেকটি এলাকায় বসিয়ে দিলেন এক একজন প্রতিক্রিয়াশীল নৃপতিকে। নামে রাজা হলেও আসলে যাঁরা হলেন বিদেশী বণিকগোষ্ঠী ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সামরিক অর্থনীতিক ও কূটনীতিক স্বার্থের তল্পিবাহক। সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা ছিল যে, এই নৃপতিদের জোরেই তারা চিরকাল প্রভুত্ব করতে পারবে সমগ্র আরব জাতির ওপর আর নির্বিবাদে শোষণ করতে পারবে তাদের প্রাণরস তৈল সম্পদকে। তাই জাগ্রত আরব জাতির শত দাবিদাওয়া তুচ্ছ করে তারা বারবার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। জনতার সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রু ঐ দেশীয় নৃপতিদের আর মনে করেছে শুধু তরবারীর জোরেই তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বিক্ষুব্ধ গণসমুদ্রের উত্তাল ঢেউকে। কিন্তু সে যে বড় ভুল ধারণা তা এতদিন পরে কঠিন আঘাত খেয়ে বুঝতে আরম্ভ করেছে তারা। তাসের ঘরের মত এখন একটির পর একটি করে ভেঙে পড়ছে আরবের ঠুনকো রাজশক্তিগুলি, আর দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে আরবের মুক্তি ও ঐক্য আন্দোলন। আর মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিতান্ত অসহায়ের মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সেই গণস্রোতের দুর্নিবার অগ্রগতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল তৈলস্বার্থ ও সামরিক প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে তাদের সঙ্গে আরও সংযুক্ত হল রণনীতি। সে কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পাশ্চাত্য শক্তিজোটের মধ্যপ্রাচ্য নীতি হল

আরও প্রতিক্রিয়াশীল ও ষড়যন্ত্রমূলক। রাশিয়ার সম্ভাব্য অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্যে তারা আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকার শাসকগোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হ'ল MEDO, বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন রুশ-বিরোধী শক্তিসংঘ, যার সংগে আরব জনতার রইল না কোন সম্পর্ক। পশ্চিমী শক্তিবর্গ একবারও ভাবল না একথা যে যাদের সংগে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তারা আরব সাগরের বুকে ভাসমান কয়েকটা কচুরিপানা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়া যদি সত্যিই কোনদিন আক্রমণ করে মধ্যপ্রাচ্য, তাহলে তার প্রথম চোটেই কোথায় উড়ে যাবে এই সব ক্ষুদে নৃপতির দল, আর সেদিন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে আসবে আরবের সাধারণ মানুষ। [illegible] প্রকৃত শক্তি কারা এ সম্বন্ধে যদি সাম্রাজ্যবাদীরা সচেতন হ'ত তাহলে কখনোই তারা জনতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জনতার শত্রুর সংগে হাত মিলিয়ে নিজেদের ওপর একটা সমগ্র জাতির অভিশাপ ডেকে আনত না।

ধর্মনিরপেক্ষ আরব জাতীয়তাবাদের সংগে রাশিয়ার কমিউনিজমের চেয়ে অনেক বেশি নিকট সম্পর্ক পশ্চিমী গণতন্ত্রের। ধর্মপ্রাণ গণনেতা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সমবেত হয়ে আমেরিকার সাধারণ মানুষ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে অর্জন করেছে তাদের স্বাধীনতা। তাতে আমেরিকা নিপাতে যায়নি বা মাতৃরাষ্ট্র ইংলণ্ডেরও সর্বনাশ হয়নি তাতে। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে আজ। স্বাধীন শক্তিশালী আমেরিকা আজ ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় সহায়। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এই প্রসংগে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইতালী খণ্ড ছিন্ন হয়ে বিভক্ত ছিল প্রায় কুড়িটি রাজ্যে। তখন সেই ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলি ছিল ইউরোপের ক্ষমতালোভী বৃহৎ শক্তিগুলির কুচক্রের লীলা কেন্দ্র। কিন্তু ম্যাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডি প্রমুখ আদর্শবাদী দুর্জয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ঐ খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মানুষ যখন সংখ্যাতীত বাধা অতিক্রম করে বৃহৎ ইতালী গড়ে তুলল, তখন সেই ইতালী হ'ল গণতান্ত্রিক বিশ্বের অন্যতম স্তম্ভ। ইউরোপের ঘন ঘন শান্তিভঙ্গের দুঃস্বপ্ন দূর হ'ল তাতে। এমন উজ্জ্বল সব দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আজ যদি ইংলণ্ড বা আমেরিকার রাষ্ট্রনেতারা মনে করেন যে আরব জগত ঐক্যবদ্ধ হ'লে সমূহ ক্ষতি হবে তাদের, তবে তার চেয়ে অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক মনোভাব আর কি হ'তে পারে? এর জন্যে তৈল ব্যবসায়ে কিছুটা স্বার্থ তাদের ত্যাগ করতে হবে সে কথা ঠিক, কিন্তু সেটুকু ত্যাগ যদি আজ তারা স্বেচ্ছায় না করে, তাহলে একদিন নিতান্ত নিরুপায়ের মত সবকিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হবে তাদের।

সুতরাং আরব জাতির ঐক্য ও সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন আজ পশ্চিমী শক্তিবর্গকে নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই মেনে নিতে হবে। এর পর আসে সমগ্র আরব রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতির প্রশ্ন। আরব জাতির মত এমন দুর্দশাগ্রস্ত মানব গোষ্ঠী পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এত ঐশ্বর্য তাদের, অথচ শুধুমাত্র সহানুভূতির অভাবে তারা আজ দিন কাটায় সর্বহারা যাযাবরের মত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দৈন্যে সারা দেশ আজ পঙ্গু তাদের। এ অবস্থা থেকে যতদিন না তাদের উদ্ধার করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কোনমতেই এটা আশা করা যেতে পারে না যে তারা তাদের নিজেদের দেশের হৃদয়হীন শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাত সম্প্রদায়কে বা বিদেশী বণিকদের আপনজন বলে ভাবতে পারবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গকে মনে রাখতে হবে যে বিপর্যয়ের শুরু সেই দিন থেকে হয়েছে যেদিন ইজিপ্ট জানল যে তার আসোয়ান বাঁধ বাঁধার প্রতিশ্রুত অর্থ আমেরিকা তাকে দেবে না। সবকটি আরব রাজ্যকে সম্মিলিত করে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদ থেকে উপার্জিত অর্থের একটি অংশ যদি পশ্চিমী শক্তিবর্গ আজ আরব জাতির বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ব্যয় করে, তাহলে সেই সবল সমৃদ্ধ সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র হবে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বন্ধু।

তৃতীয়ত, আরব রাজ্যে শ্বেতাংগ সমাজকে থাকতে হবে ব্যবসায়ী হিসাবে আরব রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হিসাবে নয়। তাদের স্বভাবে, আচরণে এমন হ'তে হবে যাতে আরবের প্রত্যেকটি মানুষ বোঝে যে আরব ও পশ্চিমের মধ্যে কোন স্বার্থের বিরোধিতা নেই। বরঞ্চ তাদের পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর গড়ে উঠবে তাদের সমৃদ্ধি।

আর সর্বশেষে, পশ্চিমী শক্তিবর্গকে অকারণ রুশভীতি ত্যাগ করতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যে আজকের পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধানো অত সহজ কাজ নয়। এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে রাশিয়া যদি আক্রান্ত না হয় কোন পক্ষ থেকে, তাহলে কিছুতেই সে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না কারও বিরুদ্ধে। সুতরাং মিথ্যে ঐ বাগদাদ চুক্তি জাতীয় কতকগুলো অর্থহীন চুক্তির পেছনে অকারণে অর্থব্যয় না করে তাদের উচিত আজ সেই টাকা দিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ সুশিক্ষিত আরব প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা। এর ফলে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যে তার ভিত্তি হবে সুদৃঢ় আর তা পূর্ণ সমর্থন পাবে ভারত প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের আজ এই সব সত্য বুঝে নিয়ে কাজে এগোতে হবে যে ইতিহাসের চাকাকে পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা চাক বা না চাক, আরব জাতি ঐক্যবদ্ধ হবেই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেমন সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ম্যাৎসিনির আদর্শে ও কাভুরের পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইতালী বা বিসমার্কের সুনিপুণ পরিচালনায় সংঘবদ্ধ হয়েছে শতধা বিভক্ত জার্মানী, ঠিক তেমনি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক ধর্মরাজ্যপাশে আবদ্ধ হবে সমগ্র আরব। আর সেই ঐক্যের অনিবার্য ফল হ'ল সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যদি আরব দুনিয়ার সেই দুর্নিবার অগ্রগতির সহযাত্রী হ'তে পারে তবে টিঁকবে তারা সেখানে। আর যদি তা না পারে, তবে সব খুইয়ে বিদায় নিতেই হবে তাদের, আরব রাজ্য থেকে।




১৯

দাদা আর মনি আগেই আমাদের সেই পুরনো স্কুল ছেড়ে সিটি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, এবার সুরমামাসী আর দিদি একসঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে বেথুন কলেজে ভর্তি হল। সেই সঙ্গে টুনী আর আমিও বেথুন স্কুলে পড়তে এলাম। অনেক বড় স্কুল, তার মস্ত ভারি ঘোড়ায়-টানা বাসগুলো গুম্ গুম্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে, মোটা মোটা থামওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে হিংসা করে অন্যান্য স্কুলের ছেলেরা ছড়া বানায়—

"বেথুন কলেজ
হ্যাজ নো নলেজ
বড়া বড়া থাম
কুছ নেই কাম!"

আমাদের কিন্তু সেই পুরনো স্কুলের দিকে ছোটবেলা থেকে চেনা সেইসব টিচার ও বন্ধুদের দিকেই মন টানত। তবে এখানকার একজন মাস্টার মশাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে। তিনি বেশ ভালই পড়াতেন, কিন্তু একেবারে মাথা পাগলা মানুষ। ক্লাসে কোন মেয়ে আস্তে আস্তে লিখলে খিঁচিয়ে উঠতেন "কাছিম ডা" (অর্থাৎ কাছিমের মতই আস্তে চলে)। আহ্লাদী মেয়েকে বলতেন, 'কার্তিক চন্দর!' আর ন্যাকা মেয়েকে সরু গলায় আধ-আধ স্বরে বলতেন, 'আম ছাগলের মাংছো দিয়ে অছ-গোল্লার অছ দিয়ে উঁতি কাও!' কখন যে কিসে ক্ষেপে উঠতেন, তার ঠিক নেই, আবার একটুতেই গলে জল হয়ে যেতেন। ভারি নরম ছিল মনটা। একদিন সামান্য কারণে রেগে আমাকে আর আরো দুটি মেয়েকে নিয়ে নীচের ক্লাসে বসিয়ে দিলেন। খানিক পরে রাগ আপনিই পড়ে গেল, তখন একগাল হেসে ডাকতে এলেন—'চল মা, ক্লাসে চল।' অন্য দুজন মেয়ে উঠে চলে গেল, আমি কিন্তু হাঁড়িমুখ করে বললাম, 'আমি যাব না তো! আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি এখানেই থাকব।' তখন কত সাধ্যসাধনা—'লক্ষ্মী মা, সোনা মা, রাগ করিস না', 'দেখ মা, কু-পুত্র যদি বা হয়, কু-মাতা কখনো নয়'। মা আর ফিরেও তাকায় না। হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহজনক শব্দে চেয়ে দেখি সত্যি সত্যি ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, দু চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কি আর করি? তখন উঠতেই হল।

দাদাদেরও একজন 'পাগলা মাস্টার' ছিলেন। উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল আর 'গহন দাড়ি বন্ধন ঘেরা'। সেই দাড়ি থেকে আরশোলা বার করে ক্লাসের টেবিলে ছাড়তেন। চেহারাটা বিভীষণ হলেও মানুষটি ছিলেন ছেলে মানুষের মত। তাঁর অনেক মজার গল্প দাদার কাছে শুনতাম।

একদিন তিনি ক্লাসে একজন দুষ্টু ছেলেকে মারতে গেলেন, ছেলেটা অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। মাস্টার মশাইও পিছনে তাড়া করলেন। স্কুল বাড়িতে দুটো সিঁড়ি। রোগা ছেলেটা তরতর করে এ সিঁড়ি দিয়ে চারতলা থেকে একতলায় নামছে, আর ও সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে চারতলায় উঠছে। পিছনে দুমদুম করে ঝড়ের মত আসছেন মাস্টার মশাই। হৈ হৈ কি, দুধারে থেকে সব ছেলেরা বেরিয়ে হাঁ করে দেখছে। খানিক পরে হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটার ঝুঁটি ধরে যখন ক্লাসে নিয়ে এলেন, বেহায়া ছেলেটা একগাল হেসে সগর্বে বলল, 'আমি আপনি ধরা দিয়েছি, স্যার আমাকে ধরতে পারেন নি।' মাস্টার মশাইও তখন হেসে ফেলে ছাত্রকে ছেড়ে দিলেন।

আরেকদিন হলঘরে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে, মাস্টার মশাই দেখতে পেলেন একটি ছেলে যেন ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আর কোলের উপর কিছু রেখে মাথা নিচু করে কি যেন করছে।' 'নিশ্চয় টুকছে!' ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললেন, 'তোর কোলে কিরে?' ছেলেটি চট করে জিনিসটা পকেটে পুরে বলল, 'কই, কিছু না তো?' পকেটে হাত দিতেই ঠিক কাগজের মত খড়খড় করে উঠল। মাস্টার মশাই যত বলেন, 'পকেটে কি আছে, দেখি?' ছেলে ততই প্রাণপণে পকেট চেপে ধরে বলে 'কিছু না স্যার, সত্যি বলছি কিছু না।' ততক্ষণে ঘরশুদ্ধ লোক হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। খানিক ধস্তাধস্তির পর জোর করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা টেনে বার করে তিনি বিজয়ী বীরের মত সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সবাই চেয়ে দেখল, তাঁর হাতে ছোট্ট একটি শালপাতার ঠোঙ্গা, তার থেকে টপ-টপ করে রস ঝরে তাঁর কনুই অবধি গড়াচ্ছে। টিফিন খেতে খেতে ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল, বেচারা রসগোল্লার মায়া ত্যাগ করতে না পেরে ঠোঙ্গাশুদ্ধ নিয়ে এসে লিখবার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে সেটা খাচ্ছিল।

দাদার আর মনির নতুন স্কুলে অনেক বন্ধু জুটে গেল। দু জনেই পড়াশোনায় ভাল আর শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই প্রিয় ছিল। ছোটবেলা থেকেই দাদা যেমন আমাদের খেলাধুলো সব কিছুরই পাণ্ডা ছিল, তেমনি বন্ধুবান্ধব আর সহপাঠিদের মধ্যেও সে সর্দার হল। সর্দারি করা মোটেই তার স্বভাব ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যার জন্য সকলেই তাকে বেশ মানত। দলের সকলে নিজে থেকেই যেন তাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। তাকে সবাই ভালবাসত, প্রাণখুলে তার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত, কিন্তু তার সামনে দুষ্টুমি করতে কেউ সাহস পেত না। বড়রাও তার কথার বেশ মূল্য দিতেন।

দাদাদের স্কুলে একজন টিচার ছিলেন। খুব ভাল তবে একটু কড়া 'পিউরিট্যান' গোছের মানুষ। সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। একদিন ক্লাসে তিনি ছেলেদের বায়োস্কোপ দেখার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে অনেক কথা বললেন, তারপর দাদাকে এবিষয়ে তার মতামত বলতে বললেন। দাদা উঠে বলল যে, তারও মনে হয় বায়োস্কোপ বেশী দেখলে কিম্বা বাজে বাজে ছবি দেখলে অনিষ্ট হয়। তবে ভাল ছবিও অনেক আছে, সেগুলি মাঝে মাঝে দেখলে তাতে বরং উপকারই হয়। শিক্ষক মশাই যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন যে, দাদা বায়োস্কোপ দেখার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই বলবে। ক্লাসের পরে দাদা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, আপনি কি কখনও বায়োস্কোপ দেখেছেন?' তিনি বললেন, 'না, আমি ওসব দেখি না।' দাদা বলল, 'আমি আপনাকে একটা ভাল ছবি দেখাতে চাই, আমার সঙ্গে যাবেন কি?' খানিক ইতস্তত করে, তিনি রাজি হলেন। তারপর দাদা তাঁকে একটা ভাল ছবি (যতদূর মনে পড়ে 'লে মিজারেবল') দেখিয়ে আনল। সেই ছবি দেখে তিনি দাদাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার মস্ত একটা ভুল ভাঙ্গিয়ে

দিলে। বারোস্কোপের ছবি যে এত ভাল হয়, সে ধারণাই আমার ছিল না।'

আমাদের একজন আত্মীয় মাঝে মাঝে দেশ থেকে এসে আমাদের বাড়িতে থাকতেন। ডিস্‌পেপটিক মানুষ, মেজাজ ভারি চটা। আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁর থেকে একটু দূরেই থাকতাম, সহজে কাছে ঘেঁষতাম না। একবার তিনি দেশে ফিরবার সময়ে একটা মাগুর মাছ নিয়ে যাচ্ছেন, পথে মাছের ঝোল ভাত খাবেন। চাকরকে দিয়ে একটা ছোট্ট টিনের মধ্যে মাছটাকে বেশ করে কর্ক স্ক্রুর মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাচ্ছেন।

দাদা দেখতে পেয়ে বলল, 'অতটুকু টিনের মধ্যে মাছটা কি করে আঁটবে? একটা বড় টিন নিলে হত না?'

তিনি ধমকিয়ে উঠলেন, 'আবার কত বড় টিন নিব? এতখানি রাস্তা, এতবার ওঠা-নামা, কম হেংগাম!'

'তা বলে অতখানি রাস্তা ওটাকে টর্চার করতে করতে নিয়ে যাবেন?'

আর যায় কোথায়! ভীষণ রেগে চিৎকার করতে আরম্ভ করলেন, 'নিজেরা মাছ মেরে খাও না? আমার বেলায় যে বড় বলতে এসেছ?'

দাদার কিন্তু ধীরভাবে ঐ এক কথা— 'মেরেই তো খাবেন, কিন্তু অমন করে টর্চার করবেন না।' শেষ পর্যন্ত তিনি বড় একটা টিন নিলেন, তবে দাদা সেখান থেকে নড়ল।

ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত খৃষ্টান মিশনারী-দের একখানা কাগজ দাদা নিত। একবার সেই কাগজে শিক্ষিত মেয়েদের অত্যন্ত অভদ্রভাবে নিন্দা করে একজন ছাত্রের লেখা একখানা চিঠি বেরল। সকালে সেটা পড়েই দাদা কাগজখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রথমে কাগজের আপিসে গিয়ে পত্র লেখকের ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতে গেল; সে ছেলে স্বীকার করল যে, সে যা লিখেছে, সমস্তই মিথ্যা কথা। কারো উপর রাগ করে সে ঐরকম লিখেছিল এবং সমস্ত কথা প্রত্যাহার করে, ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি তখনই লিখে দিল। সেই চিঠি নিয়ে দাদা সম্পাদক পাদ্রী সাহেবের কাছে গেল, তাঁকে কাগজ-খানা দেখিয়ে বলল, 'আপনাদের কাগজে এরকম লেখা বেরোন বড়ই দুঃখের এবং লজ্জার কথা।' সাহেব ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন যে, তিনি ক' দিন কলকাতায় ছিলেন না, তাতেই এরকম হতে পেরেছে। তিনি দেখলে কখনই এরকম অভদ্র চিঠি ছাপতে দিতেন না, এখনই তিনি এর প্রতি-বিধান করবেন। (পর দিনই ঐ কাগজে সেই লোকটির ক্ষমা চেয়ে লেখা চিঠিটা ছাপা হয়েছিল, তার সংগে সম্পাদকও ত্রুটি স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন)।

এত ঘুরে, রোদে তেতে পুড়ে অনেক বেলায় যখন দাদা বাড়ি ফিরল, দাদামশাই (নবদ্বীপচন্দ্র দাস) সব শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হ্যাঁ, দ্বারিক গাঙ্গুলীর উপযুক্ত নাতি বটে!'

ফটোগ্রাফির শখ এসময়ে দাদার খুব হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর ফটো তুলে ও মজার ছবি এঁকে বিলাতে 'বয়েজ ওন পেপার', 'চামস' প্রভৃতি ছেলেদের কাগজে পাঠাত আর কত পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পেত। আমাদের কতরকমের ছবি দাদা তুলত, পাড়ায় কতগুলি বৌ-মানুষ ছিলেন, যাঁদের ফটো তোলাবার ভারি সাধ, কিন্তু দোকানে গিয়ে ছবি তোলাতে পারেন না, দাদা তাঁদের সকলের ছবি তুলে দিয়েছিল।

গান ও কবিতার নকল বা প্যারডি করতেও দাদা খুব ভালবাসত। স্কুলের প্রাইজের জন্য আমরা গান শিখছিলাম। রবীন্দ্রনাথের গানে বর্ষার বর্ণনা হচ্ছে—

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজনে মোহিছে  
স্থলে জলে, নভতলে, বনে উপবনে, নদী-নদ  
গিরি গুহা পারাবারে  
আষাঢ়ে, নব আনন্দ উৎসব নব  
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীর, নীল  
অম্বরে ডম্বরু বাজে  
যেন রে প্রলয়ংকরী শংকরী নাচে  
করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে  
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে  
অম্বর তলে

দাদা ঠিক সেই সুরে সেই ছন্দে বর্ষার গান বাঁধল—

বৃষ্টি বেগভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে  
ছাতা কাঁধে, জুতা-হাতে, নোংরা খোলা কালো  
হাঁটু জল ঠেলি চলে যতলোকে  
রাস্তাতে চলা দুষ্কর মুস্কিল বড়  
অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল  
বিচ্ছিরি রাস্তা  
ধরণী মহা-দুর্দম কর্দমরাস্তা  
যাওয়া দুষ্কর মুস্কিল রে স্কুলে  
সর্দি জ্বর বৃদ্ধি বড় নিত্যিলোকে বদ্যি ডেকে  
তিক্ত বড়ি গেলে

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# অ শ্ব ত্থ

মনীশ ঘটক

এই ত যুগের হাওয়া। যে মাছটা বাড়ছে পুকুরে
নির্বিচারে ছোট বড় সবায়েরে মুখে দেয় পুরে।
হোক্ না সে ছেলেপুলে, হোক্ না সে আত্মীয়স্বজন,
পারে না নিজেরে খেতে, এই দুঃখে মরে সর্বক্ষণ।

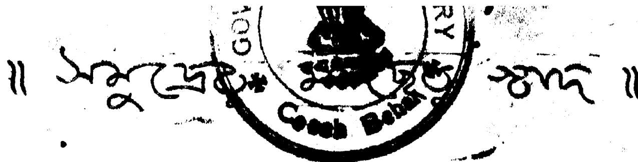
হাজার মাইল দূরে তুমি আছ ঘরবাড়ি বেঁধে।
লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত, দু পাঁচটা ভালো মন্দ রেঁধে
গিন্নী ডাকছেন খেতে; এলে তুমি, বসলে আসনে।
হুস্ করে উড়ে গেলে। মরে গেলে অণু বিস্ফোরণে।
যে লোকটা সুইচ্ টেপে তাকে তুমি আদৌ দেখনি,
তার নামে কটু কথা লেখে নি যে তোমার লেখনি,
মোদ্দা তুমি যে আছো, হয়ত নেইক তার জানা,
—তবু দেখ, তারি হাতে জারি হল মৃত্যু পরোয়ানা।

কোথাও মশলা দ্বীপে রোজ তেজপাতার ছাওয়ায়
দুচারটে ছেলেমেয়ে হয়ত প্রেম করেই বেড়ায়।
লবঙ্গের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে এ ওরে পরায়,
হয়' ত এ ওর ঠোঁটে কখনো বা চুমোটাই খায়।
এলাচের কুঁড়ি ঝরে' ওদের মাথার চুলগুলো
রেণুমাখা হয়ে গেলে, ঝেড়ে ফেলে। ফাঁপা ফুলো ফুলো
উস্ক খুস্ক মাথা দেখে ওরা খায় হেসে লুটোপুটি,—
বাস্। আর নেই। শূন্যে চেয়ে থাকে চাঁদের ভ্রূকুটি।

সৃষ্টির সংক্রান্তি নেই। লগ্ন নেই। রাতে কিম্বা দিনে
আফ্রিকায় তিব্বতে মালয়ে অথবা মহাচীনে,
নরনারী সব ভুলে সঙ্গোপনে নব জন্ম রচে
সুমধুর রমণের রসে মেতে, সুস্থ অসংকোচে।
কি করে জানবে তারা কয়েক যোজন দূর থেকে
ক্লীব করে দেবে কেউ পুরুষের জননেন্দ্রিয়কে?
কী করে জানবে তারা কেন যে কোলের মাঝে মেয়ে
হঠাৎ হিজড়ে হয়ে ঠাণ্ডা বোকা চোখে আছে চেয়ে?

গালভরা গল্প ফেঁদে বিজ্ঞানীরা মিথ্যা সাজায়,
দুনিয়া পুরনো হল। চলো যদি চাঁদে যাওয়া যায়।

পৃথিবীও একদিন অনেক তপস্যা করে পাওয়া,
দোষ কি মেয়াদ তার দুদিন বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া?
বিজ্ঞানীরা কতো বলে। মানুষ আগেতে ছিল মাছ,
হালচালে মনে হয় গেল বুঝি কৌলিক ছোঁয়াচ॥



**সুরেশচন্দ্র সাহা**

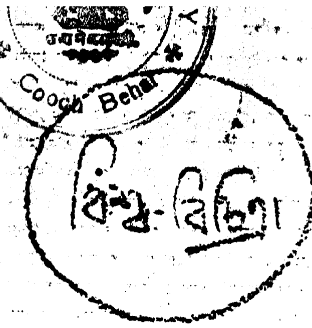
ছোটবেলা থেকেই আমরা মাছ খেয়ে আসছি। ভাত খাব অথচ মাছ নেই—একথা যেন বাংলাদেশে ভাবাই যায় না। যত রকমারি মাছই থাক না কেন, ছোটবেলা থেকে এই কথা বুঝতে শিখেছি, গঙ্গার ইলিশ, কাওরাইদের গলদা চিংড়ি, ধলেশ্বরীর রাঙাচক্ষু রুই, পদ্মার ইলশা—এর যেন তুলনা নেই মৎস্যজগতে। কেউ বা আবার ভেটকী, তপসে আর পাবদা মাছের বদলে রাজ্যখণ্ড ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। এমনি বিচিত্র স্বাদের রকমারি মাছের উৎস কোথায় কেই বা মাথা ঘামায় তা নিয়ে। বিলেঝিলে নদীপুকুরে মাছ থাকে, জেলেরা তাই ধরে আমাদের দিয়ে বিনিময়ে পয়সা নিয়ে যায়। আমাদের অনেকের ধারণা ত ঐ পর্যন্ত।

এক রন্ধনপটীয়সী বন্ধুপত্নীর সাথে কথা হচ্ছিল সমুদ্রের মাছ নিয়ে। সমুদ্রে আবার মাছ—মহিলার চোখে মুখে সদা তাজমহল-দেখা বিস্ময়। তার ধারণা, খুব বড় বড় হাঙর, তিমি আর নাম-না-জানা অজস্র জলচারী জীবই বুঝি থাকে সাগরে। সমুদ্রের মাছ যে মাছই, তারও যে এক নিজস্ব স্বাদ আছে, আকারে ও আয়তনে আছে সুদর্শন ও মনোলোভন মৎস্যরূপ—নানা ফিরিস্তি দিয়ে বোঝাতে হল সমুদ্রের মাছের স্বাদ-না-পাওয়া সেই বন্ধুপত্নীকে। কিছুটা বিশ্বাসের ভাব এলেও সাগরজলের মাছের স্বাদ পুরোপুরি কবুল করতে তিনি নারাজ; বোঝাতে চাইলেন সমুদ্রের মাছ নামে যার অবিদগ্ধ সর্বভুক সমাজে চল্ সেটা আসলে হাঙর জাতীয় জীবের ক্ষুদ্র সংস্করণ। অন্যের অভিজ্ঞতার জের টেনে আনলেন তর্কপরায়ণা সমুদ্রমৎস্যবিরোধিনী। কোথায় নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছিলেন তাঁর বোন কয়েকদিন আগে। আপ্যায়নে আর ভোজ্য বিতরণে কার্পণ্য ছিল না গৃহ-স্বামিনীর। রকমারি মাছের রকমারি রান্নারও ছিল অঢেল আয়োজন। আর সেই সঙ্গে ছিল সমুদ্রের পমফ্রেট মাছের এক মুখ-রোচক 'পদ'। কে জানত গৃহস্বামীর বাজার-করা শখের পমফ্রেট ভোজন-বিলাসিনীর ঘটাবে বিপদ। বাড়িতে এসেই নাকি বেদম পেটের বেদনায় অস্থির হয়ে-ছিলেন তিনি। সেইদিন থেকে তাঁর আর ক্রমে ক্রমে তাঁর দিদিদের ধারণা, সমুদ্রের মাছ-ফাছ বাজে কথা; সবই হাঙর না হলেও হাঙর জাতীয় জীবই বটে—বস্তুবিশেষের এপিঠ আর ওপিঠের মত। নেহাত ভাল মানুষদের ঠকাবার জন্য আর খাকাত বাজারে সমুদ্রের জীবকে মাছ বলে চালাবার জন্যই নাকি ব্যবসায়ীদের এই অন্যায়রকম কারসাজি! নিজের যুক্তির সমর্থনে বোনের গল্প বললেও কৌতুকবোধ করলুম মনে মনে। বুঝিয়ে বললুম, পেটব্যথার মুখ্য কারণ হয়ত রাস্তার আলুকাবলি, সিনেমা হলের পটাটো চিপস, নয়ত অশক্ত শরীরে গুরুপাকের অতি গুরুতর ভোজন। হাঙরও যে অখাদ্য নয়, অভিজাত খাদ্যতালিকায় হাঙরের বিশেষ উপকরণের যে বিশিষ্ট মান আছে সে বিষয়ে এক ছোটখাট বক্তৃতা দিতে হল সেদিন। হেসে বললুম—গিয়ে দেখুন না চীনে-রেস্তোরাঁয়—হাঙরের ডানার সুপ এন্তার বিক্রী হচ্ছে; এক প্লেট আট টাকা মাত্র। একজন অত্যাধুনিক মাদ্রাজীকে একটা দুসেরী পোনা মাছ অথবা দুসেরী হাঙর নিয়ে যদি বলি, কোনটা চাই; তাহলে মাছটা ফেলে হাঙরটাই বেছে নেবে মৎস্যাশী মদ্রবাসী। শুনে বললেন—তাই নাকি! আচ্ছা, কি করে রাঁধতে হয় সমুদ্রের মাছ? নিশ্চয়ই নুন লাগে না সমুদ্রের মাছ রাঁধতে। বন্ধুপত্নীর বুদ্ধির বহর দেখে হেসে ফেললুম। নোনাজলের মাছ—সুতরাং রান্নায় আরও নুন দিয়ে রন্ধনপটুতার অপনাম ঘটাবার দায়িত্ব নিতে পারেন না রন্ধনপারদর্শিনী। বাংলার কবি তপসে মাছ নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সরস বর্ণনা করেছেন রূপেলা তপসে মাছের। কবির কালে ভাবা যায়নি ডেনমার্ক থেকে ট্রলার আর জাপান থেকে জেলে এনে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার কথা। তবু হলপ করে বলতে পারি, সমুদ্রের মাছের স্বাদ একবার পেলে হয়ত নিশ্চয়ই তার কাব্যায়ন হত কবির কোন এক সমুদ্রমীনসংহিতায়!

সমুদ্রের মাছও নদীর আর পাঁচরকম মাছের মত স্বাদু এবং রসনাতৃপ্তিকর। সমুদ্রের ভেটকীর কালিয়া, পমফ্রেটের তেল-ঝোল বা সর্ষে-বাটা, ভোলা মাছের ঝাল, স্যামন মাছের চপ, ম্যাকরেলের কাঁচা ঝাল, পারশে গুরজালীর ঝোল, ফুলা আর ফ্যাসার ভাজা, চাঁদা মাছের টক একবার খেলে মনে হবে, কেন আগে থেকে খেতে আরম্ভ করিনি সমুদ্রের মাছ। সমুদ্রের চিংড়ি মাছ কেটে আন্দাজমত নুন-লঙ্কা-হলুদবাটা আর কাঁচা তেল মেখে মুখবন্ধ কৌটায় মৃদু আঁচে ফুটন্ত কড়ায় পনের মিনিট বসিয়ে রাখলে যে চীজ তৈরী হয় তার স্বাদের তুলনা দেখি না। লঘুপাকে অতি মোলায়েম এই 'চিংড়ি-ভাতে' অতিথি আপ্যায়নে এক যুগান্তকারী উপাদান। সমুদ্রের পমফ্রেট মাছের সুঁটকী কার না ভাল লাগে! (নাক সিটকোবেন না, আমি সাধারণ সুঁটকীভক্ত নই।) সর্ষেবাটায় ইলিশমাছ যদি মুক্তবী আলী খাদ্যজগতে অন্যতম কুতুবমিনার বলে করেন, শুকনো পমফ্রেট, পেঁয়াজ আর বেগুনের 'সুঁটকী' ভোজরাজ্যের পিরামিড

—মনুষ্যগোষ্ঠীর মানুষের অনাস্বাদিত বিস্ময়।

সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন মিঠাজলের মাছ প্রায় বাতিল, সমুদ্রের অতুলনীয় সম্পদ তুলে এনে মৎস্যালালসা মেটানো হচ্ছে বহুযুগ ধরে, আমরা তখন চিন্তা করছি, সমুদ্রের মাছ না-জানি কেমন খেতে। সারা ইংল্যাণ্ডে গোটাবছরে প্রায় তিরিশ হাজার মণ মিঠা-জলের মাছ আমদানী হয়। আর একমাত্র গ্রীমসবী বন্দরেই প্রতি ভোর রাতে জাহাজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ হাজার মণ সমুদ্রের মাছ নামানো হয়। সুতরাং গ্রীমসবী, এবারডীন, হাল, ফ্লিটউড, ইয়ারমাউথ, লণ্ডন ইত্যাদি বন্দর মিলে প্রতিদিনে অথবা প্রতি বছরে কি বিপুল পরিমাণ সমুদ্রের মাছ খালাস হয় তা' সহজেই অনুমেয়। যদি স্বাদই না থাকে তবে এই অপরিমেয় মৎস্যরাশি যায় কোথায়? অবশ্য আমাদের দেশেও একবার স্বাদ পেলে সমুদ্রের মাছের আদরও নদীর মাছকে ছাড়িয়ে যাবে—অল্পনদীর দেশ পশ্চিম বাংলায় সে সম্ভাবনা ত প্রবল। তখন হয়ত গঙ্গার ইলিশ পদ্মার ইলিশের মত লোকে তুলনা করতে শিখবে কোন্ সাগরের মাছের বেশী স্বাদ। এ পর্যন্ত দেখা গেছে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ধরা ভেটকী পূর্বাঞ্চলীয় ভেটকীর চাইতে খেতে অনেক ভাল। গভীর জলের মাছ ধরতে আর খেতে জাপানীরা ত খুবই অগ্রসর—গোটা মৎস্যশিল্পের পরিধির বিবেচনায় অনেক দেশকেই পেছনে ফেলে গেছে। তবু নানা সাগর জলের নানা মাছের স্বাদ অনুযায়ী আদরের মাত্রাও কম বেশী হয় জাপানে। জাপান সাগরের দক্ষিণাঞ্চলের লাল-রঙা ব্রীম মাছ জাপানীরা অনেক বেশী পছন্দ করে উত্তরাঞ্চলে ধরা ব্রীমের চাইতে।




যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়কী শহরের আদালত লেস্টার জে স্কানিভার কেন পনের বার মামলার শুনানী স্থগিত রাখিয়েছে জানতে চাওয়ায় স্কানিভারের উকীল জানায় যে, তার মক্কেল বিভিন্ন দফায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়েছে, এপেনডিসাইটিস কাটাতে হয়েছে তাকে, মূত্রাশয়ের পীড়ার জন্য হাসপাতালে থাকতে হয়েছে, পা মচকে আহত হয়েছে এবং একটা শস্যগোলার চালা থেকে লাফাতে গিয়ে আহত হয়েছে।

*

আলজেরিয়ার ফিলিপভিলে এক সন্ত্রাসবাদী একটা রেস্তোরাঁয় চল্লিশজন ফরাসী সৈন্যকে দেখে একটা বোমা ছুঁড়তে সেটা এক সৈনিকের সুপের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় তার সলতেটা নিভে অকেজো হয়ে যায়।

• • •

'সুরেলা বালুকা' সম্পর্কে বর্তমানে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। ই আর ইআরহাম "কুরিয়ারে" এ বিষয়ে কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ থেকে জানা যায়, বিখ্যাত পর্যটক বার্টাম টমাস ও এ এইচ সেণ্টজন ফিলবী আরব দেশের 'ফাঁকা অঞ্চল' অতিক্রম করবার সময় সুরেলা বালুকার সন্ধান পেয়ে চমকিত হয়েছিলেন। 'ফাঁকা অঞ্চল' অর্থে বোঝায় আরবের দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তৃত মরুভূমি যা রুব' অল কাওআলি বলেও পরিচিত। টমাস ও তাঁর দল মরুর মাঝ দিয়ে বালুকাস্তূপে ধড়ফড় করে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খুব উঁচু পর্দার গুণগুণানির অনুরূপ সঙ্গীতের সুর নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। ও'র দলের এক যাদু সঙ্গী প্রায় দু'শ ফিট উঁচু একটা খাড়া বালুকা পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "শুনুন ঐ বালির পাহাড়ের নিনাদ। টমাস দেখেন, বালির একটা স্বচ্ছ ঝাড় বাতাসমুখো ঢালু অংশের ওপর ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। আর একবার টমাস অনুরূপ চমকে উঠেছিলেন তাঁর উট এক জায়গায় বালির ওপর দিয়ে চলার সময় ওর পায়ের নীচ থেকে অদ্ভুত একটা সুর বেরিয়ে আসতে। সুরটির অস্তিত্ব ছিল মিনিট দুই এবং যেমন আরম্ভ হয়েছিল তেমনি অতি আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। ওখানকার আদিবাসীদের একজন ওটাকে পাতালের সপ্তমস্তরের ব্যাপার বলে অভিহিত করে ওদের মতে, ওটা নাকি বালুকাস্তূপের আত্মার মুখর প্রকাশ।

ফিলবীরও একবার অনুরূপ বালুকা সঙ্গীত শোনার অভিজ্ঞতা হয়। তিনিও টমাসের মতো মরুর গভীরে এবং বেলা দুপুরে ঐ সুর শোনেন। সেদিন তাঁবুতে বিশ্রাম করার সময় একটা গভীর, সুরেলা, গম্ভীর শব্দ শোনেন। বাইরে চেয়ে দেখেন, তাঁবুকে বেড় দেওয়া খাড়া বালুকা স্তূপের ঢালু দিক দিয়ে তার দলেরই সাদান নামে একজন ওঠবার সময় অমন সুর বাজছে। ফিলবীর বর্ণনাঃ "অকস্মাৎ বিশাল রঙ্গভূমিতে সাইরেন বা বিমানের ইঞ্জিনের গুণগুণানি গমগম করতে লাগলো—কিন্তু বেশ সুরেলা, মনোরম, বিস্ময়কর গভীর ছন্দোময়......। বালুকণার ঐক্যতান বোঝবার আদর্শ অবস্থা ছিল তখন এবং প্রথম অংশটি যথেষ্ট সময় পর্যন্ত স্থায়ীও ছিল—সম্ভবত মিনিট চারেক—যাতে বিস্ময় কাটিয়ে আমার পক্ষে খুঁটিনাটি টুকে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কুয়ো নিয়ে যারা কাজ করছিল তারা সেই সঙ্গীতের সঙ্গে পাল্লা দিতে জিনদের উদ্দেশে কিছু কম সুরেলা গলায় খেউড় গাইতে লাগলো। কারণ, ওদের ধারণা, জিন অর্থাৎ মরু-ভূতরাই এই ব্যাপারের জন্য দায়ী। বুঝতে পারলুম, এই ব্যাপারের জন্য দায়ী বালির টিলার ঢালুর ওপর উপবিষ্ট সাদান—বোঝাই গেল, ওর পায়ের নীচ থেকে বালি গড়িয়ে আসতে আসতেই ঐ সঙ্গীতের সৃষ্টি হচ্ছে।"

ফিলবী সাদানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেখেন যে, ঢালু দিয়ে বালুকারাশি গড়িয়ে দিয়ে তিনিও অনুরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারছেন। শব্দটা আরম্ভতে খরখরে এবং ক্রমশ বাড়তে বাড়তে সুরেলা গমগমে শব্দে পরিণত হয়ে তেমনি আবার ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়। ফিলবী সুরময় বালুকারাশির মধ্যে একটি বোতল ঠেলে দিয়ে তারপর সেটা উঠিয়ে নিতেই গ্রামোফোন বাজানো রেকর্ডের মতো শোনায়। আর একবার তিনি বালুকারাশি গড়িয়ে ঢালুর মাঝামাঝি আসতে তিনি তার মধ্যে বসে পড়েন, এবং তাঁর মনে হয়েছিল যেন তাঁর নীচে বিরাট অর্গান গমগম করছে।

সুরেলা বালুকার বিষয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা মাত্র এই শতাব্দীতেই জানতে পেরেছেন কিন্তু চীনারা প্রায় হাজার বছর ধরে জানে। ওদেশের এক লেখক কানসু প্রদেশে নবম শতাব্দীতে এইসব বালিয়াড়ির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'শব্দমুখর বালুকা পাহাড়' বলে যার উচ্চতা স্থানে স্থানে ছিল পাঁচশ ফিট এবং অদ্ভুত গুণ ছিল। চূড়োটা একটা উচ্চতা পর্যন্ত উঁচু সরু হয়ে যেতো এবং তার মাঝে রহস্যজনকভাবে একটা গর্ত হয়ে থাকতো যা বালিতে ভর্তি হতে পারতো না। লেখক বলেন, গ্রীষ্ম চরমে উঠলে এই বালুকা পাহাড় আপনা থেকেই ধ্বনির সৃষ্টি করতো, কিন্তু মানুষ বা ঘোড়া ঐ স্থলে মাড়িয়ে গেলে শব্দের রেশ বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছতো। ঐ শব্দ উত্থাপনের একটি প্রথার কথাও বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ বছরের পঞ্চম মাসের পঞ্চমীর দিনে 'তুয়ানওয়া" বা ড্রাগন উৎসবের দিনে শহরের স্ত্রী পুরুষ ঐসব পাহাড়ের একটা উঁচু জায়গা পর্যন্ত উঠে দল বেঁধে গড়িয়ে পড়ে যার ফলে বজ্রপাতের মতো ভীষণ গড়ানে শব্দের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরদিন দেখা যায়, পাহাড়টি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনার বুয়েন্স

• •



মরুর বুকে বালির স্তূপ আর এখান থেকে বিচিত্র সুরেলা শব্দ উত্থিত হয়

আয়ার্স থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাবার সময় এমে ফেলিক্স শিফলি পেরুভিয়ার উপকূলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ই আর ইআরহাম তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। শিফলি এক রাত্রে একটা বালির পাহাড়ের ওপর ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু কয়েকবার ঢাকের শব্দ বা অনেকটা নদীর ওপর দিয়ে মোটর-লঞ্চ চলার শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। কিছু দেখতে না পেয়ে তিনি আবার ঘুমোতে যান। পরদিন সকালে দেখেন, তিনি একটা জেন্তিনার, বা রেড ইণ্ডিয়ানরা যাকে কবরস্থান বলে, তারই কাছে শুয়েছিলেন। একজন রেড ইণ্ডিয়ান প্রশ্ন করে, তিনি 'মাচাং' শুনেছেন কিনা। কথাটা শিফলির কাছে চীনা বলে মনে হয়, তাই তিনি তার মানে জিজ্ঞেস করেন। ওরা শিফলিকে বুঝিয়ে দেয় যে, বালির পাহাড়টা ভুতুড়ে এবং প্রতিরাত্রে জেন্তিনার থেকে মৃত ব্যক্তিরা উঠে ঢাকের তালে নাচতে থাকে। ওরা এমন সব ভয়াবহ ভুতুড়ে গল্প ওঁকে শোনায় যে, উনি যে বেঁচে আছেন সেইটেই ওঁর কাছে ভাগ্যের বিষয় মনে হয়। পরে শিফলি শোনেন যে, পর্যটক ব্যারন ফন হামবোল্ডট ও রায়মণ্ডির মতে ঐ পাহাড়ে রাতে যে শব্দ শোনা যায় সেটা হচ্ছে তাপ পরিবর্তনের সঙ্গে ভূগর্ভে প্রবাহিত জলস্রোতের জন্য। আর একটি প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে, সমুদ্রের হাওয়া কোন একটি দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে পাহাড়ের ধারে এসে লাগার ফলে এই অদ্ভুত শব্দ হয়।

ইয়ারহাম বলেন, সুরমুখর বালুকা কেবলমাত্র মরুভূমিতেই নয়, সমুদ্রতীরেও তা পাওয়া যায়। ষাট বছর আগে সি ক্যারুস উইলসন বৃটেনের স্টাডল্যাণ্ড উপসাগরের ডরসেট তীরে প্রথম এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উত্তর ওয়েলসের তীরেও অনুরূপ বালুকার সন্ধান পাওয়া যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুজন পর্যবেক্ষক কেবলমাত্র আতলান্তিকের তীরেই চুয়াত্তরটি স্থান পেয়েছেন যেখানে সুরেলা বালুকা পাওয়া যায়।

তীরের বালুকার 'গান' একটু ভিন্ন রকমের, অনেকটা শিষ দেওয়ার মতো। আর এ বেনল্ড তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, শব্দটা সৃষ্টি হয় জল সরে যাওয়া বালির ওপরের সদ্য শুকনো স্তরে দ্রুত কোন আঘাত লাগলে। হাতের চেটোটা খুব দ্রুত চালিয়ে দিলে বা একটা পেনসিলের অগ্রভাগ দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করলে এরকম শিষ শোনা যায়। তীর থেকে বালি সরিয়ে নিলে তার সুর সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। বেনল্ড বলেন, তীরের বালুকার শিষ দেওয়া আর মরুভূমির নিস্তব্ধতাকে উচ্চকিত করে তোলার শব্দ একেবারে আলাদা। তিনি বলেন: "লোকালয় থেকে তিনশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম মিসরের মরুভূমিতে তিনি শুনেছেন। দুবার নিস্তব্ধ রাত্রে এ ব্যাপার ঘটে, হঠাৎ—হাওয়াকে স্পন্দিত করে তোলা এতো জোর গমগম শব্দ ভেসে এলো যে, গলা ফাটিয়ে তবে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছিল। অল্পক্ষণেই অন্য সুরগুলোও সেই প্রথম সঙ্গীত স্পন্দনে যোগদান করলে এবং তার মধ্যে একটা বিলম্বিত তালও স্পষ্টভাবে পাওয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে এই অদ্ভুত ঐকতান বেজে চললো। স্থানীয় কাহিনী এটাকে রূপকথায় বেঁধে নিয়েছে; কখনো কখনো বাত্রিহীন ধ্বংসের পথে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া কুহকিনীর গান বলেও অভিহিত হয়; কেউ বলে বালুকায় ঢাকা পড়ে যাওয়া কোন মঠের ঘণ্টার ধ্বনি......"

মরু বালুকা স্তূপ যে শব্দ নিঃসৃত করে তা নানালোকের মতে নানারকমের। কেউ বলে জাহাজের সাইরেনের মতো, কেউ বলে অর্গানের যুক্ত তন্ত্রীর স্পন্দনের মতো, ঢাকের বাজনার মতো, ট্রম্বোনের মতো বা বিরাট একটা হার্পের বাজনার মতো। কোন কোন ক্ষেত্রে কোমল স্বরটা পাওয়া যায় না; অন্যদের মতে, বালুকা যখন 'গাইতে' থাকে তখন তার ওপরে দাঁড়ালে মনে হয় যেন একটা বিরাট তারের যন্ত্রের ওপর দিয়ে ছড়টা ধীরে ধীরে টানা হচ্ছে।

মরুর বালুকা আর তীরের বালুকা নিয়ে পরীক্ষা করে দুয়ের পার্থক্য হওয়ার কারণ কিছু বুঝবার উপায় নেই। বালুকাস্তূপের কণাতে কোন বৈশিষ্ট্যও নেই। নিঃস্বর বালুকণার চেয়ে সুরেলা বালির দানা আকারেও আলাদা নয়; এবং যদিও পরিষ্কার বালিতে সুর ওঠে ভালো, বেনল্ড মরু অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ময়লা বালিরও 'গান' শুনেছেন।

পদার্থবিদরা সাধারণত একমত যে, শব্দ উত্থিত হয় বালুকণার পরস্পরের ঘর্ষণে। কিন্তু স্বর কিসে ওঠে সে কলকব্জা এখনও ব্যাখ্যাত হয়নি। আরো বিশ্লেষণ হলে হয়তো সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।

*

সম্প্রতি কানাডার উইনিপেগ শহরের দৈনিক পত্র উইনিপেগ ফ্রি প্রেস স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদিত পুরুষদের অহমে বড়ো ঘা দিয়ে দেয় সামনের পাতায় একটা হেডিং দিয়ে যে: "শতকরা আটচল্লিশ জন স্ত্রীর জীবন দুর্বিষহ।"

কাগজখানি স্বামীর সংস্রব থেকে আলাদা স্থানীয় স্ত্রীদের কাছ থেকে জানতে চায় যে, নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে আবার তারা তাদের স্বামীদের ফিরেফিরতি বিয়ে করতে রাজি আছে কিনা। এই প্রশ্নেরই জবাবে শতকরা আটচল্লিশ জানায় 'কিছুতেই নয়!' এদের দৃঢ়তার প্রধান প্রধান কারণগুলি হচ্ছে, গুরুত্ব অনুযায়ী: স্বার্থপরতা, মতবিরোধ, আর্থিক ব্যাপারে গোলযোগ, বিশ্রী স্বভাব, অবিশ্বস্ততা, ছোটদের পালন করার ঝক্কি, শাশুড়ী-ঝঞ্ঝাট। একজন মহিলা আরো খুব সোজা কথায় বলেন, "ওকে আমার সহ্য হয় না, ব্যাস।"

এর আগে স্বামীদের মতামত চাওয়ায় শতকরা সত্তর জন জানায়, তারা তাদের স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করতে রাজি। এখন ওদের এই মাত্র আশা যদি তাদের স্ত্রীরা সেই বাস্তববিচারি মহিলার মতে একমত হয়, যিনি লিখেছেন, "বিয়ের পর ওকে বদলাতে চেষ্টা করে যখন বিফল হই, তখন ধরে নিলুম আমি একজন পুরুষ মানুষকে বিয়ে করেছি এবং সেই ভেবে আমি সুখী হইচি।"

# অকাল সন্ধ্যা



রঞ্জিত সেন

বন্ধ চোখের মধ্যে ঘন অন্ধকার পাতলা হয়ে এল; তার মানে জানালা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে ভোরের আলো এসে পড়েছে: নরম, গোলাপী আলোর কয়েকটি কণা; আরও আলো আসবে ঘরে; চোখের মধ্যে আলো-অন্ধকারের মিশ্রণ বাতাসহীন, বস্তুহীন এক কারাগারের মত,—তেমনি যে-এক কারাগার থেকে ছাড়পত্র পেয়ে একদিন সে এ পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিল, আবার যেখান থেকে একদিন মুক্তিনামা নিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে।

শুধু এই অনুভূতি নিয়েই তার দিনের শেষ হয়, আবার নূতন দিন শুরু করে। অত্র—আপাতত চোখ খুলবার কোনো প্রয়োজন নেই; ছোট ঘরটায় এমন কোনো জিনিস নেই যার প্রতি নূতন বিস্ময় বা আগ্রহ নিয়ে তাকাবার তার ইচ্ছে হয়েছে কোনোদিন। আরও খানিকক্ষণ স্বচ্ছন্দে চোখ বুজে থাকতে পারে সে; চোখ খুলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করবার মত কিছু নেই তার, কোনো দিনও ছিল না। তা ছাড়া রমেশবাবু ঢুকেছেন স্নানের ঘরে, এক ঘণ্টা ততক্ষণ নিশ্চিন্ত; অবশ্য স্নানের ঘর খালি থাকলেও সামান্যতম ব্যস্ততারও কোনো কারণ ঘটত না, ব্যস্ত বা ক্ষিপ্র হবার মত কোনো পরিবর্তন তার গত সতেরো বছর জীবনে একটি দিনের জন্যেও হয়নি।

চোখ বুজে পড়ে রইল সে বিছানায়; দুটো জানালা দিয়েই ঘরে আলো আসতে লাগল। ছ বছর বয়সে মা বলেছিল, 'খবরদার! বিনু, পেয়ারা গাছে তুমি উঠবে না!'

'ওরা যে সবাই উঠছে মা!'

'উঠুক, তুমি পড়ে যাবে গাছ থেকে।'

অন্য ছেলেরা গাছে উঠে পেয়ারা পেড়েছে, পা ঝুলিয়ে বসে পেয়ারা খেয়েছে; সে দাঁড়িয়ে থেকেছে গাছ-তলায়; 'এই নে বিনু!' মুখ তুলবার আগেই তার মাথায় এসে লেগেছে গোটা কয়েক কাঁচা পেয়ারা, একটা কপালে।

কপালটা ফুলে উঠেছিল।

আরও কয়েক বছর পরে: 'মা, আমি সাঁতার শিখব? ওরা সবাই কেমন দীঘিতে স্নান করছে।'

'খবরদার না। তুমি ডুবে যাবে।'

ঝড় উঠল একদিন, আকাশে কালো মেঘের দৌড়; পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা ছুটল আম-বাগানে; মা তার জামা চেপে ধরল; 'না, তুমি যাবে না, গাছের ডাল ভেঙে পড়বে মাথায়, বৃষ্টি শুরু হবে এখুনি, ভিজে যাবে, নিমোনিয়া হবে।'

পুজোর ছুটিতে বাবা এলেন।

'বাবা, আমায় কলকাতা নিয়ে যাবে?'

'কলকাতায়?' ভবতোষবাবু ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, যেন এক বিরাট ঠাট্টা, 'কলকাতা গিয়ে কি হবে?'

'সেখানে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে; আর দু' বছর পরেই ত ম্যাট্রিক পাশ করব।'

'গ্রামের স্কুল কি দোষ করল? এখান থেকেই আমি পাশ করেছি, শহুরে ছেলেদের চাইতে কিছু কি কম শিখেছি।'

কম শিখেছে কি না তার উত্তর বিনোদ কেমন করে দেবে?

'মা-কেও নিয়ে চল না।'

হয়ত কোথায় একটা নাড়া দিয়েছিল বিনোদ, মনে মনে হয়ত তেমন কোনো সম্ভাবনার কথা ভবতোষবাবু অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন, 'এখানে তোমার ভাল লাগছে না কি? এমন সুন্দর আকাশ, দীঘির জল, গাছে গাছে ফল, ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ—না, এখানেই থাক, তোমরা; সেখানে রমেশের একটা ঘরে থাকি, তোমরা গেলে—' মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি বিনোদ সেখানে নেই।

চৌধুরী-বাড়িতে যাত্রা শুরু হয়ে গেল, বাজনা শোনা যাচ্ছে। 'বাবা, আমি যাব যাত্রা শুনতে?'

'না, রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।'

প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে বিনোদবিহারী যাত্রার কলরব শুনেছে।

গ্রামের স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করল সে; জীবনের প্রধান দুটি ঘটনা সেবারেই ঘটেছিল; মালতী আসত তার মা-র কাছে কাঁথায় ফুল তোলা শিখতে; সে-ই যা তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলত। তার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল, মালতী ঢুকল ঘরে। 'কি পড়ছ?'

'পলাশীর যুদ্ধ!'

'শোনাবে আমায়?'

'এস!' বিনোদ উঠে বসল, বিছানার প্রান্তটা দেখিয়ে দিল।

মালতী বসল পা ঝুলিয়ে।

বার বার গলা পরিষ্কার করতে লাগল বিনোদ; এত কাছে মালতী বসেনি কোনো দিন, এত সুন্দরী কোনো দিন মনে হয়নি তাকে; ওর চুলের গন্ধে নিশ্বাস তার ভারি হয়ে এল; কেমন যেন কাঁপছে বুকের মধ্যে!

'মালতী!'

মুখ তুলে তাকাল মালতী, মিটি মিটি হাসছিল সে।

আকাশে কালো মেঘ ছিল না, জানালা দিয়ে চোরা-বাতাসের আনাগোনা ছিল না, এমন কি বাইরে গাছের পাতায় কোনো মর্মর পর্যন্ত শোনা যায়নি; তবু কেমন করে জানি বিনোদ কাঁপা-গলায় বলে ফেলল, 'তোমাকে একটু ছোঁব?'

নিস্তব্ধ দুপুরে, একটা চিল হঠাৎ কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। 'শুধু ঐ-টুকুতেই খুশী?' বলল মালতী; উঠে এল সে বিনোদের গায়ের কাছে; বলল, 'এই নাও!' মুখটা নামিয়ে আনল সে।

মালতী চলে গেছে কিছুক্ষণ, কিন্তু তখনও তার সমস্ত রক্তে রিমঝিম মন্দিরা বাজছে। তাকে যেন নিশায় পেল; সন্ধ্যার পর দীঘির পাড় ঘুরে মালতীদের বাড়ির দিকে রওনা হল সে; কাছেই বাড়ি, কিন্তু সোজা-পথে যেতে তার সাহস হল না, বাঁশ-ঝাড়ের মাঝখানে সরু পায়ে-চলা পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল সে, আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই মালতীদের ঘরের চাল দেখা যাবে; তবু এগিয়ে যেতে পারল না; ঘন অন্ধকার, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, মুখ তুলে তাকাল, আকাশে অসংখ্য তারা কাঁপছে; আর—কাঁপতে লাগল বিনোদবিহারী।

পথটুকু পেরিয়ে এল সে কোনো রকমে; জানালা দিয়ে লণ্ঠনের মৃদু আলো এসে পড়েছে বাইরে লেবু আর জবা গাছের শাখায়; মালতীর মা নেই, বাবা হোমিও-প্যাথী ডাক্তার; এই সময়টা ডিস্‌পেন্‌-সারীতে থাকেন।

বাতাবী গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল বিনোদ; যাবে, নিশ্চয় যাবে সে মালতীর কাছে; জানে—মালতী এখন রান্না করছে। অন্ধকারে পায়ের শব্দে হৃৎপিণ্ড আঁচড়ে উঠল, অত বড় লম্বা লোকটাকে কেউই ভুল করতে পারে না; দিনেশদা ঢুকল বাড়ির মধ্যে, নিশ্চয় মালতীর বাবার খোঁজে এসেছে।

অপেক্ষা করতে লাগল সে, হঠাৎ অসহ্য ক্লান্তিতে তার সমস্ত শরীরটা ভেঙে পড়ল; কিন্তু তবু সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল; সে জানে, মালতীর কাছে বলবার তার কিছু নেই, এমন কি চাইবারও হয়ত কিছু নেই; যদি—

গলার শব্দ শুনল সে; কথার শব্দ!

আবার কাঁপুনি দেখা দিল শরীরে। পায়ের নিচে শুকনো পাতার অতি-মৃদু খসখসানি। জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভিতর থেকে জানালাটা বন্ধ করে দিল কেউ।

দুটো পাল্লার ফাঁকে চোখ রাখল সে, হ্যারিকেনের পলতেটা নামানো! ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট অন্ধকার।

জীবনে এমন আঘাত আর কোনো দিন পায়নি সে, এমন লাঞ্ছিত বোধ করেনি কখনও; তবু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না বিনোদ।

দীঘির পাড়ে গিয়ে বসল সে; ঠাণ্ডা, জোলো হাওয়া আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কের কুয়াশা দূর করতে লাগল। মালতী পারে এমন কাজ করতে?

তবু ঈর্ষা নেই তার মনে; তবু ঘৃণা করতে শেখেনি সে।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ তার বাবার মৃত্যু-সংবাদ। রমেশবাবুই টেলিগ্রাম করে খবরটা জানিয়ে-ছেন। পরে চিঠি এল; অফিসে কাজ করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান; আর জ্ঞান হয়নি, একটি কথাও বেরোয়নি মুখ থেকে। তিনি লিখেছিলেন, বিনোদ তার মা-কে নিয়ে কলকাতা আসতে পারে; চেষ্টা করলে তার বাবার অফিসে একটা চাকরিও মিলতে পারে হয়ত; খরচের কোনো ভাবনা নেই।

কলকাতা সে যায়নি, গ্রামের মাইনর স্কুলে হঠাৎ একটা চাকরি জুটে গেল। বাবার মৃত্যু-শোকটা তার মা কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না; বছর ঘুরতেই তিনি শয্যা নিলেন; আর উঠলেন না।

অনেক সংকোচ আর দ্বিধা অতিক্রম করে সে একদিন নৌকায় চেপে বসল, তারপর ট্রেন।

রমেশবাবু তাকে দেখে খুশী হলেন। বিপত্নীক, নিঃসন্তান এই রমেশবাবুর একান্ত অন্তরঙ্গতা তাকে সম্পূর্ণ বিহ্বল করে দিয়েছিল।

তারপরে সতেরো বছর কেটে গেছে।

বিনোদবিহারী চোখ খুলে উঠে বসল; আর একটা নূতন দিন, সারা ঘরে নরম রোদ, কিন্তু কোনোই সাড়া জাগল না তার মনে, কোনো উৎসাহ নয়! বেড-কভার একটা আছে, হয়ত কোনো একদিন ব্যবহৃত হয়েছে, আপাতত ট্রাঙ্কের উপর তাল পাকিয়ে পড়ে আছে—আরও কয়েকটা ময়লা জামা কাপড়ের সঙ্গে। বিছানার চাদর বদলানো হয়নি অনেকদিন, পায়ের কাছে ময়লা দাগটা আরও কালো হয়ে উঠেছে, তেল-চিটে বালিশের ওয়াড়টা থেকে, যেদিন সে টের পেল, গন্ধ উঠছে—সেদিন ছুঁড়ে মারল তক্তপোশের নিচে, সে আজ বছর-খানেক হল।

দেয়ালে ঝুলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখল, গালে হাত বুলাল, দাড়িটা কামানো দরকার, কিন্তু কোনো উৎসাহ পেল না; তাছাড়া, ব্লেডটা ভোঁতা হয়ে গেছে, আর কেনা হয়নি; থাক, কাল হবে। বন্দির-হাটের গামছা আর মন্মথ কেমিক্যালের দাঁত মাজবার পাউডার সংগ্রহ করে সে স্নানের ঘরে ঢুকল; ব্রাসটা যখন ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠল—সেদিনই ছুঁড়ে মেরেছিল জানালার বাইরে, তারপর আর নূতন কেনা হয়ে ওঠেনি; দাঁতে তার এমন কিছু একটা ফাঁক নেই, আঙুল দিয়ে বেশ দাঁত মাজা চলে যাচ্ছে।

বাকি কাজ সেরে সে চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়াল, স্নানের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ, তবু সে কোনো দিন কাপড় খুলে রেখে স্নান করতে পারেনি।

আঠারো বছর আগে বাতাবী লেবু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এক অন্ধকার রাত্রে যে শারীরিক আর মানসিক ব্যথা সে অনুভব করেছিল—সে-অনুভূতি আর কখনও জাগেনি তার দেহে, তার স্নায়ুতে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এল সে। ততক্ষণে রমেশবাবুর প্রৌঢ়া দাসী দু'টুকরো মাখন-লাগানো রুটি আর এক কাপ দুধ রেখে গেছে গোল টুলটার উপরে। এই চলে আসছে কয়েক বছর ধরে, কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, কোনো পরিবর্তনের কথা তার মনেও হয় না। জানালার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে রুটি দুখানি শেষ করে ফেলল; দুধের খালি পেয়ালা রাখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল; একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়ে পা দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলি সে সরিয়ে দিল দেওয়ালের পাশে। ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বারান্দার দিকে। ঠিক দশটায় ভাত দিয়ে যাবে; অনেক অভ্যাসের মত খাওয়াটাও শুধু একটা অভ্যাস, তার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই, আবেগ নেই; এমন কি বোধ হয় গ্রন্থিক্ষরণও নেই—বিচার দূরে থাক। খাওয়া শেষ করেই গেঞ্জিটা গায়ে ঢুকিয়ে তার উপর নীল শার্ট; ফিতে-বাঁধা জুতো; সুরেশ সরকার বাই লেন থেকে গোপালনগর রোড, ট্রাম রাস্তা; আলিপুর আদালতের গাছতলা পেরিয়ে লাল দালানের পিছন দিকের ঘরের কোণায় নকলনবিশ বিনোদবিহারী চক্রবর্তীর টেবিল। ঠিক এগারোটার সময় কলমটা তুলে নেয়, কোনো দিকে তাকায় না, চারিদিকের গল্প, আলোচনা, তর্কের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যে মন যায় না তার; অফিসের সবাই তাকে মেনে নিয়েছে; নীল শার্ট-পরা, ফিতে-বাঁধা জুতো, নিরিবিলি লোকটার উপর কারুরই আর সামান্যতম কৌতূহল নেই।

সেদিনও তেমনি ঠিক পাঁচটার সময় দোয়াতদানীতে কলমটা রেখে উঠে পড়ল বিনোদবিহারী; ট্রাম রাস্তা, গোপালনগর রোড, সুরেশ সরকার বাই লেন, ছোট এক-তলা বাড়ি; শুভ্রকেশ রমেশবাবু বারান্দায় বেতের আরাম কেদারায় বসে আকাশ দেখছেন, আকাশে মেঘ জমছে; দৃষ্টি তাঁর শূন্য নয়, পরিচ্ছন্ন মুখে তাঁর অপূর্ব আবেশ ঘনিয়ে এসেছে, বুকের উপর উপুড়-করা খোলা বই, পায়ের কাছে সাদা বিড়াল, চোখ বুজে মাছের স্বপ্ন দেখছে।

'বিনোদ এলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সারাদিন বেশ গরম গেছে, কি বল?'

'হুঁ।'

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, মেঘ করে এল।'

বিনোদ জবাব দিল না, মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে; পশ্চিমদিকে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘরে গিয়ে জামা গেঞ্জি খুলে ফেলল সে, নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলে জুতোজোড়া সরিয়ে দিল পা দিয়ে, স্নানের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসবার সময় রমেশবাবু ডাকলেন, 'শোন!'

বিনোদ কাছে এল, বিড়ালটা একবার মাত্র চোখ খুলে তাকাল।

'আমার দেরাজে চুরুট আছে দাও ত!' রমেশবাবু এমনি ছোটখাটো ফরমাস করেন তাকে, গলার স্বরে হৃদ্যতা প্রকাশ পায়, দৃষ্টিতে স্নেহ; সহজ কথায় বিনোদকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনতে চান।

বিনোদ রমেশবাবুর ঘরে ঢুকল; চেস্ট অফ ড্রয়ারের প্রথম দেরাজটা খুলে জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করল, চুরুট পাওয়া গেল না, দেরাজটা সামনের দিকে আরও খানিকটা টেনে আনল; ছোট একটা রিভলবার চকচক করে উঠল; হাতটা সরিয়ে আনল সে; ঠাণ্ডা, ইস্পাতের জিনিসটার দিকে সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

দরজার দিকে তাকিয়ে রিভলবারটা হাতে তুলে নিল বিনোদ, আয়নার সামনে হাতটা তুলে ধরল, ট্রিগারের উপর আঙুল রাখল, তাকাল আয়নার দিকে; আর সে শূন্য-দৃষ্টি নয়; মুখে তার অদ্ভুত আশ্চর্য এক হাসি ফুটে উঠেছে; স্নায়ুগুলি প্রখর, উদ্গ্রীব।

শরীরের কোনো পেশীতে আর বিন্দুমাত্র আলস্য নেই; কোমরের কাছে কাপড়ের নিচে রিভলবারটা ঢুকিয়ে নিল সে, কোমরে

ধুতির প্রান্তটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। ডান দিকের দেরাজেই চুরুট পেল সে।

'নিন!' বিনোদ হাসল।

রমেশবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন, এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর। 'ধন্যবাদ!' বললেন তিনি।

'ধন্যবাদের কি আছে?' নির্ভুল উচ্চারণ আর নিখুঁত ভঙ্গিতে বলল বিনোদ।

সাবাস! ভাবলেন রমেশবাবু; বললেন, 'বৃষ্টি ত নামল দেখছি! আজ খিচুড়ি হোক, তার সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা! কি বল হে?'

'বেশ ত! বলেন ত বাজারে যাই, নিয়ে আসি একটা চ্যাটালো গঙ্গার ইলিশ, আর—'

কড়কড় বাজ ডাকল; বিনোদ তার বক্তব্য শেষ করতে পারল না, 'ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল তার, রক্তের বান ডাকল সমস্ত শিরায়, সে উন্মত্ত শব্দ সে যেন কান পেতে শুনতে পেল!

'না, তুমি আর যাবে কেন? নন্দর মা-ই যাবে'খন; তুমি বিশ্রাম কর।'

বিনোদ তার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল, জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে, জানালার বাইরে নিম গাছটার শাখায় ঝড়ের মাতন শুরু হয়ে গেছে। দেয়ালে-ঝুলানো পুরোনো আয়নাটা গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল, রিভলবারটা নিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে, নলটা কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগারে আঙুলে রাখল; হো হো করে হেসে উঠল; বাঁ দিকে বুকের উপর নলটা টিপে ধরল, ইস্পাতের ঠাণ্ডা স্পর্শে সমস্ত শরীরটা তার বার বার শিহরিত হতে লাগল; আবার বাজ ডাকল প্রচণ্ড শব্দে, কিন্তু একটুও চমকালো না সে; আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, নিম গাছের শাখায় একটি ক্লান্ত কাক উড়ে এসে বসল, দুটো গরাদের মাঝখান দিয়ে তাক করল সে, বাজ ডাকল, বিনোদবিহারী গুলি ছুঁড়ল, সেই মুহূর্তে, যেন গুলির শব্দটা কেউ বুঝতে না পারে।

মাটিতে শুকনো পাতার উপর কাকটা কয়েকবার কেঁপে স্থির হয়ে রইল, লাল রক্তে ভিজে উঠল মাটি। অকাল-সন্ধ্যার আগে যে চকিত আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে—ঘরে বাইরে সেই আলোর আভা, এমনি ক্ষণেই জীবনের দেনা-পাওনার আমন্ত্রণ; ঘৃণা ভালবাসা, বিদ্রূপ, প্রশংসা, আকাঙ্ক্ষা আর নিবৃত্তির হিসাব নিকাশ। বিনোদবিহারীর ঠোঁটে বাঁকা হাসি; বৃষ্টি এল; তার চোখে মদির স্বপ্নের আকুলতা; রিভলবারটি হাতে নিয়ে দরজার বাইরে গলা বাড়াল সে, চওড়া বারান্দা, দেয়ালের কাছে কেদারা টেনে এনে আকাশ দেখছেন রমেশবাবু, তন্ময় হয়ে, তাঁরও চোখে অন্য এক স্বপ্ন!

আর কোনো শব্দ নেই, শুধু বৃষ্টির শব্দ! তার সঙ্গে বিদ্যুৎ আর কড়কড় আওয়াজ; দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে এল বিনোদ, পাঁচ গজেরও ব্যবধান নেই মাঝখানে, রমেশবাবুর পায়ের কাছে বিড়ালটা চোখ মিটমিট করছে! বিদ্যুৎ চমকাল, রিভলবারটা তাক করল বিনোদ, বাজ ডাকল, বিড়ালটা ভয় পেয়ে লাফ মারল, ট্রিগার টিপল সে।

দুটি মুহূর্ত!

রমেশবাবুর সাদা ফতুয়া রক্তে ভিজে উঠল, মাথাটা তাঁর ঢলে পড়ল প্রায় কাঁধের উপর।

'তারপর?' থানার বড়বাবু স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আবার কি?' চেয়ারের পিঠে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠল বিনোদ, 'আমার কাজ আমি শেষ করে ফেলেছি, এবারে আপনারা যা হয় করুন!' আঁচড়ানো চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিল সে, দাড়িটাও পরিষ্কার কামানো, গায়ে একটা পরিষ্কার শার্ট।

'এর জন্যে আপনার ফাঁসি হবে, তা জানেন?' বড়বাবু সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

'তা জানি বৈ কি! কিন্তু কি অদ্ভুত রোমাঞ্চ বলুন! এ আমার কাজ, আমার খুন; উদ্দেশ্যহীন খুনের কথা শুনেছেন কখনও? কোনো নালিশ নেই, বিদ্বেষ নেই, স্বার্থ নেই, ঘৃণা নেই, রাগ নেই; জজ, জুরি, উকিল, খবরের কাগজ, পাঠক—সবাইকে আশ্চর্য করে দেবার মত কাজ; তাছাড়া, নিদারুণ একঘেঁয়ে অসহ্য জীবন থেকে আমারও খানিকটা মুক্তি দরকার, স্বীকার করেন ত?'

থানার বড়বাবু তখনও চোখ ফিরাতে পারেননি, চোখের পলক পড়ছে না তাঁর, মনের মধ্যে বিশ্লেষণ চলছে, সমস্ত ছবিটা বার বার পরিষ্কার করে বুঝবার চেষ্টা করছেন তিনি। বাইরে তখনও বিরামহীন বৃষ্টি, ঘড়ি দেখলেন, পৌনে সাত।

'তবে লোকটি বড় ভাল ছিলেন', বলল বিনোদবিহারী, 'হয়ত জীবনে কোনো অন্যায় করেননি; কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি, একেবারে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু, বাদলার দিনে আকাশের রং দেখতে দেখতে মৃত্যু, এমন মরণ আপনিও চাইবেন। তাছাড়া, ও'র মৃত্যুতে এ-পৃথিবীতে কারুরই কোনো ক্ষতি হবে না, দুঃখ করবার একটি লোকও নেই', থামল বিনোদ, পরে যোগ করে দিল, 'শুধু আমি ছাড়া; আমারও কেউ নেই খোঁজ করবার, শোক করবার; দিন, একটা সিগারেট দিন!'

বড়বাবু প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

অনভ্যস্ত হাতে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল বিনোদ, কয়েকবার কাশল।

'রিভলবারটা দিন।' বড়বাবু হাত বাড়ালেন।

পকেট থেকে অস্ত্রটা বার করে এগিয়ে দিল বিনোদ; নলটা নাকের কাছে তুলে শ‍ুঁকে দেখলেন বড়বাবু, পরিষ্কার বারুদের গন্ধ!

'চলুন!' চেয়ারে ঠেলা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন বড়বাবু, রিভলবারটা ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে।

বিনোদও দাঁড়াল ছাইদানীতে সিগারেটটা নিবিয়ে দিয়ে।

ভদ্রলোক যখন একবারে বিনোদের পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখল তখনও সে বিন্দুমাত্র চমকালো না; 'আপনি কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের সংগে—' বড়বাবু হাসলেন।

বিনোদ তাকাল, হাসল, 'না, কোনোদিন নয়।'

'আসুন!' বড়বাবু বর্ষাতিটা চাপিয়ে নিলেন গায়ে।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় পৌঁছাবার আগে বিনোদ একেবারে ভিজে গেল, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তার কপাল গাল স্পর্শ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল তার শার্টের কলারে; অদ্ভুত, আশ্চর্য এক শিহরণ তার রক্তে দোল দিয়ে গেল।

বারান্দায় পা দিয়ে বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্ধকার কেন?'

বিনোদ পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল।

বারান্দার শেষ প্রান্তে আরাম কেদারায় রমেশবাবু তেমনি নিস্পন্দের মত পড়ে আছেন, কেদারার পাশে মাটিতে কয়েক ফোঁটা রক্ত। বড়বাবু এগিয়ে এলেন, ভাল ক'রে তাকালেন তিনি তীক্ষ্ণ, অভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে; রমেশবাবুর বুকের উপর খোলা বই, বইয়ের উপর রক্তাক্ত একটা সাদা বিড়াল। দু' আঙুলে বিড়ালটাকে উঠিয়ে তিনি বাতির আলোয় পরীক্ষা করলেন, বুলেটের আঘাতে বিড়ালটার শরীর ছিদ্র হয়ে গেছে; মাটিতে নামিয়ে রাখলেন বিড়ালটা, আস্তে আস্তে বইটা তুলে নিলেন,—ঠিক যেমনটি ছিল,—তেমনিভাবে। খান পঞ্চাশ পাতা ছিদ্র হয়ে বুলেটটা তখনও আটকে ছিল মলাটের উপর। রমেশবাবুর দিকে তাকালেন তিনি, বুলেটটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেলে চাইলেন রমেশবাবু, সোজা হয়ে বসলেন, একটু হেসে বললেন, 'কি আশ্চর্য দেখুন! সন্ধ্যেবেলাই কিনা ঘুমিয়ে পড়েছি, আপনি —আপনাকে ত চিনতে পারলাম না, বসুন! এই যে বিনু, ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এস ত! দেখে মনে হচ্ছে আপনি পুলিসের লোক।'

'হ্যাঁ, আমি থানা থেকে আসছি; না, চেয়ারের দরকার নেই, আপনাদের পাশের বাড়ি চুরি হয়েছে, এনকোয়ারী করতে এসেছিলাম; যা জানবার এ'র কাছেই জেনে নিয়েছি!' বড়বাবু বিনোদকে দেখিয়ে দিলেন।

'আমি বসে বসে আকাশ দেখছিলাম, হঠাৎ বাজ ডাকাল, বিদ্যুতের একটা শিখা ছিটকে এল গায়ের উপর, বিড়ালটাও সে-সময় ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে এল, বিড়ালটা কোথায়? এক মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম, হয়ত শক, তারপর এক আবেশ ঘনিয়ে এল, বিড়ালটা? একি আমার জামায় রক্ত কেন?'

বিনোদ এগিয়ে আসছিল সামনে, বড়বাবু হাত দিয়ে বাধা দিলেন। 'বিড়ালটা মারা গেছে।'

রমেশবাবু মাটিতে তাকালেন!

'আচ্ছা, নমস্কার!'

বড়বাবু পিছন ফিরলেন।

গাড়িতে উঠবার আগে বিনোদ তাঁকে ধরে ফেলল, আস্তে আস্তে তাঁর বাহু থেকে বিনোদের হাত নামিয়ে দিয়ে বড়বাবু বললেন, 'ঘরে যান।'

গাড়ি চলে গেল জল ছিটিয়ে।

বিনোদবিহারী তেমনি দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

অন্ধকার, বৃষ্টি আর উন্মত্ত বাতাসের দাপাদাপি।

# হলকর্ষণ উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ

**বিমলচন্দ্র সিংহ**

কবিদের মন কাব্যলোকে বিচরণ করে, পৃথিবীর ছোঁওয়া কাটিয়ে ঊর্ধ্বলোকে তাঁদের বিচরণ, তাঁদের প্রভাতরবি দ্যুতি বসুধাতল হতে উদিত হয় না, একথা সাধারণত সত্য। কিন্তু যে মহাকবি আমাদের মধ্যে সম্প্রতিকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই মহাকবির অন্যতম দুর্লভ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁর মন নন্দনলোকে বিচরণ করলেও সে মনের স্পর্শ ছিল মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে। সেইজন্য তাঁর কর্মস্থলে গেলে দেখা যায় একদিকে শান্তিনিকেতন, অন্যদিকে শ্রীনিকেতন। একধারে চিত্তের সাধনা অন্যদিকে কর্মের সাধনা প্রসারিত। কবি তাঁর বহু রচনায় বলেছেন স্বরাজ সাধনার যেমন একটি রাজনৈতিক রূপ আছে, তেমনি তার আরও একটি রূপ আছে। আমরা স্বাধীনতা চাই শুধু এই কথা বললেই হবে না, আমরা স্বাধীনতার কি রূপ চাই, তার একটি অখণ্ড মূর্তি, ছোট হলেও, জায়গায় জায়গায় প্রত্যক্ষ স্থাপন করতে হবে। উপমা দিয়ে তিনি এই কথাই বলেছিলেন, যে লোকটা বলে কলম পেলে তবে সাহিত্য রচনা করব, তার ঝোঁকটা কলমেরই উপর, সাহিত্যের উপর নয়। তেমনি আগে স্বরাজ পাব, তারপর স্বরাজ সাধনা করব একথা বললে স্বরাজ সাধনায় মস্ত একটা ফাঁকি থেকে যায়। তাছাড়া কবি বহু সময় খুব স্পষ্টভাষায় বার বার বলেছেন, আমরা যে ইংরেজের অধীন হয়েছিলাম তাতে ইংরেজের শৌর্যবীর্য কৃতিত্ব থাক বা না-ই থাক, আমাদের দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। ইংরেজ সাম্রাজ্য সেই দুর্বলতারই ফল মাত্র। অবুদ্ধি এবং অবিদ্যা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, চিত্তবৃত্তির সংস্কারমুক্ত স্বারাজ্যে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। চরকা প্রসঙ্গে তিনি এই কথাই বলেছিলেন, সুতো কাটলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা, আগে চরকাও চলেছে, তাঁতও চলেছে, তবু আমাদের দেশে দুর্দশার অন্ত ছিল না। সুতরাং আগে জানতে হবে কোন্‌টা আগুন আর কোন্‌টা ছাই। সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় না হয়ে আমরা খোঁচাখুঁচি করলে হয়তো ছাই উড়বে, আগুনও নিভবে না। আসল কথা, স্বাধীনতার জন্য চাই স্বাধীন দেশের স্বাধীন যুগের মানুষ। তা না হলে স্বাধীনতার ধারা এই পঙ্কিল আবর্তে রুদ্ধ হয়ে যাবে। কবি এই কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই কেবল শান্তিনিকেতন স্থাপনা করে নিশ্চিন্ত থাকেন নি, তার পাশে পাশে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীনিকেতন। মানুষ গড়বার কেন্দ্র। সংস্কারমুক্ত চিত্তের উদার অনুশীলনের সমবায়িক কেন্দ্র।

যতদিন স্বাধীনতা অর্জিত হয় নি, ততদিন রাজনৈতিক সংগ্রামের আবর্তে এই কথাগুলির গভীর তাৎপর্য ও প্রয়োজনের দিকে আমাদের তেমন নজর পড়ে নি, একথা সত্য; কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর যখন দেখি, নানাবিধ মঙ্গল কর্মধারা ঈর্ষা-দ্বেষ-কলহের মধ্যে অপব্যয়িত হয়ে যায়, তখন খুব তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতেই হয়, মানুষ না গড়ে স্বরাজ সাধনার চেষ্টা কতখানি অসম্ভব। কাজেই আজ কবির সেই দিক্‌নির্দেশ আমরা স্মরণ করি; স্মরণ করি শাশ্বতকালের সেই বাণী, যা আমাদের কবির কণ্ঠে পুনর্বার উচ্চারিত হয়েছিল, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তাঁর এই মানুষ গড়বার কেন্দ্রস্থানটিকে, কামনা করি এই আদর্শের ধারা বহুদিকে প্রসারিত হোক।

আজ সেই বহুবিধ কর্মচেষ্টার অন্যতম চেষ্টা হল এই হলকর্ষণ উৎসব। আজ বর্ষার মেঘ আকাশ জুড়ে, শ্রাবণের শেষ হলেও শেষ বর্ষণ দেখা দেয় নি। উত্তপ্তদহনে ধরণী পিপাসার্তা পড়েছিল, মেঘ অমৃতবারির বার্তা নিয়ে তার কাছে পৌঁছেছে। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কেও আমরা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিস্তারিত করে দিয়েছি। কৃষিপ্রধান দেশের মানুষ আমরা, পর্জন্য তাই আমাদের কাছে শুধু ঋতুবদল নয়, সে আমাদের অন্নের সূচনা করে, প্রাণেরও সূচনা করে।

এমন এক সময় ছিল, যে-সময় প্রকৃতি ছিল মানুষের কাছে ভয়াল অকরুণ। যে যুগে সে ঘর বাঁধতে জানত না, কৃষিকাজ শেখেনি, জন্তু শিকার করে জীবনধারণ করতে হত, গুহায় বসবাস করতে হত, সেই আরণ্যক যুগে প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তার দ্বন্দ্ব, প্রকৃতির সঙ্গে সে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয় নি। রোদে-বৃষ্টিতে তার কষ্ট হ'ত, বজ্রবিদ্যুতে তার প্রাণ শঙ্কিত হয়ে উঠত। কিন্তু ক্রমে এই দ্বন্দ্ব কেটে গেল, মানুষ পৃথিবী ও প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হল, পৃথিবীর প্রাণরসে মানুষ পুষ্ট হল। তাই কবি বলেছেন, "পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্র-স্নানের পর জীবধাত্রী রূপে ধারণ করলেন, তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র, সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচর-রূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক, নৈমিষ, খাণ্ডব ইত্যাদি বড় বড় সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল......তখন অরণ্য মানুষের পথরোধ করে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল একদিকে আশ্রয়, অন্যদিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে, তারা অগত্যা ছোট সীমানায় ছোট ছোট দল বেঁধে বাস করেছে।......তারপর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহার্যের পরিমাণ ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতার শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের 'পরে।......বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার একটা

বড় যুগ। সেইদিন সখ্য-ধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।"

ইতিহাসের আবর্তনে দেখা যায়, এই সখ্য-ধর্ম কালক্রমে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা হতে বিচ্যুত হয়েছে। বহু জন-সমবায় ছাড়া কৃষির কাজ হয় না, তাই এক সময় দেখা গিয়েছিল লোকবলের প্রয়োজনে বলদর্পিত গোষ্ঠী দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তাদের ক্রীতদাস বানিয়েছে। পৃথিবীর খুব বড় বড় সভ্যতা, গ্রীসীয় সভ্যতা, রোমক সভ্যতাও এই দোষ হতে মুক্ত ছিল না। এই সংঘাত এককালে ভারতবর্ষেও প্রবল হয়ে উঠেছিল কবি লিখেছেন, "অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্য-বাধা অপসারিত করিয়া পশু-সম্পদের স্থলে কৃষি-সম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন।...... কৃষি-বিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল।

---

একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রম-বাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে প্রপনীত হইত, গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল......ভারতবর্ষেও আরণ্যক-দের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষি ব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য-অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা, নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা।" (ইতিহাস, ২৭) পরে এর সমাধানের অন্যরকম চেষ্টা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু সে কথা থাক্।

পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে একালে দেখা যায়, এককালে কৃষির ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে যে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ, ইতিহাস নতুন সমাজব্যবস্থায় সেই সখ্যবন্ধনে খর আঘাত হেনেছে। সেই সখ্যবন্ধনের পরিবর্তে এসেছে স্বার্থের দারুণ সংঘাত, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। অন্ন ফললো, কিন্তু সে অন্ন মুখে উঠল না। কবি লিখেছেন, "কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথায়ও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠল।...... মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ, মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেনেছে আপনার করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা—সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিতকলা।" (হলকর্ষণ; প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৬)।

আমাদের এই বাঙলাদেশ শিল্পে অগ্রসর, কিন্তু তবু বাঙলা কৃষিপ্রধান। স্থানে স্থানে এই বাঙলার আকাশ যন্ত্রের ধূমে কলঙ্কিত, কিন্তু তাছাড়া এই আকাশ এখনও জীব-ধাত্রীরূপেই পল্লীবাঙলায় বিরাজমান। আমাদের দুর্ভাগ্য কেন জানি না, কিছুকাল হতে জীবধাত্রী ধরিত্রীও আমাদের উপর যেন বিরূপ হয়েছেন। বহুকালকার সঞ্চিত লোভ ধরিত্রীর অঙ্গে আঘাত করে বিনষ্ট করেছে অরণ্যসম্পদ, তার নদীর খাতে খাতে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে না, সময় সময় দেখা যাচ্ছে অতিবর্ষণ ও বন্যা। তার চেয়েও বড় সর্বনাশের কথা, যে সখ্যবন্ধনে উদার প্রীতির মধ্যে কৃষি-সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তার চিহ্নমাত্রও নেই। এক-দিকে আছে ধরিত্রীকে দোহনকারী অমিত-ব্যয়ী সন্তানের অনাচার, অন্যদিকে আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবল অর্থের সম্পর্ক, প্রাণের নয়। তাতে হয়তো মৌল-ধনিক যন্ত্রবিদ্যা চলতে পারে, কিন্তু সুষম কৃষি নয়। এরই ফলে আজ গ্রাম হয়েছে পঙ্কিল আবর্তের কেন্দ্র, মন হয়েছে সঙ্কুচিত, সমাজ দুর্লঙ্ঘ্য শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত, ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা দাঁড়িয়েছে প্রবল হয়ে।

তাই আজ সবাইকে উদার আহ্বান করি চিত্তের ক্ষেত্রে। লোভ দ্বেষ খর্ব হোক, হিংসা দূরে যাক, মানুষে মানুষে ঘটুক আনন্দিত প্রাণের মিলন, ঘটুক পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, স্থাপিত হোক্ আবার পৃথিবীর সঙ্গে সখ্যবন্ধন। দেখা দিক্ নতুন যুগ। অবসান ঘটুক এই অন্নক্লিষ্ট উপবাসী দিনের। আমাদের অন্ন পুনরায় বহু হোক্, আমাদের যেন কোথায়ও অন্ন ভিক্ষা করতে না হয়। ধরিত্রী পুনরায় দেখা দিন জীবধাত্রীরূপে। হৃষ্ট হোক মানুষের হৃদয়, পুষ্ট হোক্ তাদের প্রাণরস, বায়ু মধুক্ষরণ করুক, নদী মধুক্ষরণ করুক, ওষধিরা বনস্পতিরা মধুময় হোক্, গোসম্পদ মধু হোক্। সূর্য প্রচণ্ড তাপে জীবনকে সন্তপ্ত না করে প্রাণরসের কারণ হোক্। আহ্বান করি সকলকে কবির মন্ত্রে—

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেম আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়,
আজ হতে না রইল ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগনপারের
আমার ঘরের রুদ্ধদ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কী ভুল ভুলেছিলাম আহা
সব চেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন
কাছেকে আজ পেলাম কাছে
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।



মনোজ বসু

# আমার ফাঁসি হল

৪

উঠলাম গিয়ে গোলাবাড়ি—যা থাকে কপালে! চাবি খুঁজে পেতে দয়ালহরির একটা বেলাও দেরি হল না। ঘর চমৎকার—ডিসটেম্পার করা দেয়াল, মানুষ যাই হোক, মাখন মিত্তিরের রুচি আছে। জংলি গাঁয়ের পোড়োবাড়ির ভিতর একটুকু ইন্দ্রপুরী বানিয়ে গেছে। নতুন বাসা খুব পছন্দ আমার। দুয়োর আঁটলেই নিঃশঙ্ক। এক ঐ ও'রা থাকলেন, লোহার দুর্গ বানিয়েও যাঁদের রোখা যায় না। বেশ তো, মিলে মিশে থাকা যাক সকলে—একলা প্রাণী আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে এক প্রান্তে একটি ঘরে থাকতে দিন। দেখা হলে আরজি জানাব। অনুরোধ অন্যায্য নয়, অতএব মঞ্জুর হবে আশা করতে পারি।

কিন্তু দেখাই পেলাম না কারো। মিথ্যে বলব না—প্রথম দুটো-একটা রাত ভয়-ভয় করত, তারপরে ভুলেই গেলাম। যত আজগুবি রটনা। ডাক্তারের কথা ঠিক—মাতাল মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম। অপরাধী অনুশোচনার বশে কী সব দেখেছে। মাখন মিত্তির পালাল, বাড়ির বদনাম সেই থেকে অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ল। আমার পক্ষে ভাল, নয়তো কি এমন ঘরবাড়ি খালি পড়ে থাকত কবে আমি এসে অধিষ্ঠান করব সেই অপেক্ষায়?

সামনের গোলঘরে সাহেবকর্তার বৈঠকখানা ছিল বোধ হয়। আমার শোওয়াবসা সমস্ত সেখানে। দারোগা পুরোপুরি প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। কনস্টেবল পাহারা দিতে আসে। এক ঘুমের পরও জানলা দিয়ে দেখেছি, লোকটা ফটকের চাতালের উপর বসে আছে। মাস দুয়েক কেটে গেল, আছি বেশ আরামে। গোড়ার দিকে হরিশ ঘরের ভিতর মেজেয় বিছানা করে শুতো, এখন কড়াকড়ি নেই দরদালানে শোয়েও শুতে পারে। শোয়ও তাই। বিছানায় বসেই বিড়ি ধরাতে পারে, ঘন ঘন বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসবার প্রয়োজন হয় না। জানি না মাখন মিত্তির সত্যি কিছু দেখেছিল কি না। তা-ও যদি হয়, একদিনে তাঁরা বাস উঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র সরে পড়েছেন। কোন সন্দেহ নেই।

বন্দুকের লাইসেন্স হল। বড় দারোগাই কালেক্টরির নিলাম থেকে একটা দোনলা রাইফেল সস্তার মধ্যে সংগ্রহ করে দিলেন। বন্দুক দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে সেইদিন সন্ধ্যার আড্ডায় তাঁকে বললাম, আর কেন, কনস্টেবল সরিয়ে দিন এবার। বেচারিকে মিছামিছি রাত জাগিয়ে আমায় শাপমন্যির ভাগী করছেন।

বড় দারোগা বললেন, শাপমন্যি কেন দেবে, ও-লোকের চাকরিই এই। পাহারা দেওয়া। আপনার এখানে না হলে অন্য কোথাও দেবে।

পাহারা দেবে তো জেগে থাকতে যাবে কেন? মাইনেও দেন ঘুমিয়ে পাহারার মতো। আপনাদের খাতিরের মানুষ, আমার বাসায় জেগে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। আর মনে মনে সারা রাত্তির গালি দেয় আমায়। কোন দরকার নেই, দেখা গেল তো এতদিন। ঝানু লোক মাখন মিত্তির—নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে গালগল্প চালিয়ে গেছে।

কনস্টেবল যথোচিত খুশি নিয়ে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। দয়ালহরিও নির্ভয়। এদিককার ছায়া মাড়াতেন না—গোলবাড়ির সামনে পড়তে হবে সেজন্য, শুনেছি, ও'র বাড়ির পিছন দিককার শুঁড়িপথ দিয়ে চলাচল করে এসেছেন এ যাবৎ। এখন দিনে রাতে এই পথে আনাগোনা। বাড়ির সামনে এসে অন্তত পক্ষে একবার 'হুজুর' বলে ডাক দিয়ে আপ্যায়ন করে যান। নজরে পড়লে ঢুকে পড়েন ফটকের ভিতর।

ভাল লাগছে তো হুজুর? কোন রকম অসুবিধা হলে গোলামের কানে যেন পৌঁছয়। উই যে খোড়ো চাল দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ওঠা-বসার ঘর আমার। জোরে হাঁক দিলেই শুনতে পাব। ঘরের পিছনে চণ্ডীমণ্ডপ।—নাটমণ্ডপটা পড়ে গেছে। তারপরে পাঁচিল, ভিতর বাড়ির আরম্ভ হল। পুরা দশ বিঘের উপর অন্দরমহল। এলাহি ব্যাপার। একদিন কিন্তু হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে হবে। বড় বউ আজকেও বলছিল।

যাবো বই কি! আপনাদের গ্রাম—আপনার পাড়ার মধ্যে, বলতে গেলে, আপনারই আশ্রয়ে আছি। নবাবি হালে রয়েছি—আপনি চাবি খুলে বিলি-বন্দোবস্ত করে দিলেন, তবে তো! যেদিন সুবিধা, আপনি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

সে সুবিধা আজও হয়ে ওঠেনি। অবস্থা বুঝি। এককালে হয়তো সচ্ছলতা ছিল, মেজাজখানা আছে, নিয়ে গিয়ে খুব ধুমধাড়াক্কা করার ইচ্ছা, কিন্তু সঙ্গতিতে কুলিয়ে ওঠে না। আমিও উচ্চবাচ

দেখতে পেলাম, তখন অনেকটা দূর এগিয়ে পড়েছে। পিছন থেকে দেখছি। হরিশ থাকলে নিজ থেকে হয়তো বলত, হাড়গিলে বলেন হুজুর, ঐ দেখুন, মেয়েটা কি মন্দ? যদি অবশ্য দয়ালহরির সেই শহুরে মেয়ে হয়।

হরিশ যখন বেরুল তৎক্ষণে মাঠ পার হয়ে সে বাড়ি ঢুকে পড়েছে। ও-কথা কিছু হল না। আমি বললাম দেখ হরিশ, গাঁ সুদ্ধ জুটেপুটে আমাদের পুকুরের সব জল তুলে নিয়ে যাবার মতলব করেছে।

হরিশ বলে, আর দিনকতক যাক, দেখতে পাবেন পুকুরপাড়ে মেলা বসে গেছে। গাঁয়ের যত পুকুর-ডোবা শুকিয়ে তলার মাটি ফেটে চৌচির হবে। তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে বুধহাটা সুজনপুরের মানুষ কলসী কলসী জল বাঁকে বয়ে নিয়ে যাবে।

হোড় মশায়ের বাড়ি থেকেও জল নিয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে কলসী বেরুতে কোনদিন দেখিনি।

হরিশ আশ্চর্য হল: বোশেখ না পড়তেই ওদের পুকুর শুকোল? আরও তো আস্ত কাল পড়ে আছে। এরকম হয় না কখনো।

(ক্রমশ)

# বিদেশী-পুত্র ফেলিক্স কেরী

**সোমেন বসু**

মহৎ পিতার যোগ্য সন্তান প্রায়ই হয় না। বিরাট হিমালয়ের মত একটি মানুষের পিছনে পিছনে আসে খণ্ড ক্ষুদ্র মালভূমির মত অযোগ্য উত্তরাধিকারী। কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটে যে, পিতার গৌরবোজ্জ্বল সুদীর্ঘ জীবন সর্বাধিক গৌরবান্বিত পুত্রের জীবন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তেমনি ঘটেছিল শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়াম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবনে। উইলিয়াম কেরীকে মনে না রেখে উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন বিনামূল্যে জবরদখলের আসন নয়। সুদীর্ঘ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম তাঁকে যে আসনের অধিকার দিয়েছে তার মূল্য ক্ষণস্থায়ী নয়। তাঁরই পিছনে আর এক কীর্তিমান পুরুষ সাঁইত্রিশ বছরের জীবন নিয়ে লুকিয়ে আছেন। বাংলা রচনার ক্ষেত্রে যিনি পিতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, ভাষাতত্ত্বের অধিকার যাঁর ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, পিতার বহু কাজের যিনি ছিলেন একাগ্রচিত্ত সহচর সেই ফেলিক্স কেরীকে আজ আমরা ভুলেছি। শুধু সাহিত্যসাধনা নয়; রাজনৈতিক কাজে, ব্যক্তিগত চিত্তবিক্ষেপের ফলে, ফেলিক্স কেরী একদিন পূর্ববাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, বর্মার বনে প্রান্তরে, পার্বত্য অঞ্চলে উদভ্রান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দুঃসাহসী কল্পনাপ্রবণ চিত্ত তাঁর, শুধু যীশুখৃষ্টের নাম প্রচার করেই খুশী হয়নি। ভিতরে একটা পাগলা ঝোরার ক্ষেপামী ছিল আর ছিল উদাসীন নিরাসক্ত বাউলের মন। ভোগে ক্লান্তি ছিল না কিন্তু ভোগসুখ ত্যাগ করতেও দ্বিধা ছিল না মুহূর্তেয়।

১৭৯৩ সালে যখন উইলিয়াম কেরী ভারতবর্ষে মিশনের কাজ নিয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে বেরুলেন, সঙ্গে তাঁর ছ বছরের ছেলে ফেলিক্স। উইলিয়াম কেরীর স্ত্রী ডরোথি ইচ্ছে করেই বালক ফেলিক্সকে পিতার সঙ্গে পাঠালেন—সেই সূত্র অবলম্বন করে তাঁর যাত্রা ত্বরান্বিত হবে বোধহয় এই আশায়। ১১ই নভেম্বর কেরী এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। ছ বছরের ফেলিক্স জাহাজ থেকে এসে নামল বাংলার শ্যামল প্রান্তরে। বাংলাদেশই তার দেশ হয়ে গেল চিরকালের মত। সমুদ্রপারের ইংলণ্ড আর কোনদিনই ফেলিক্স কেরীকে ফিরে পেল না।

বাংলাদেশে প্রথম দিন থেকেই ফেলিক্সের গুরুগিরির ভার পড়ল রাম রাম বসুর উপর। উইলিয়াম কেরীর একান্ত সাধ ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সংস্কৃতে পণ্ডিত হবে। বাংলার অক্সফোর্ড নদীয়ায় একথা কাজ করবার ইচ্ছা ছিল উইলিয়াম কেরীর। সুতরাং ফেলিক্স সংস্কৃত শিখবে এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

বাংলায় এসে প্রথম কিছুকাল কেরীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হল। মিসেস কেরী ইতিমধ্যেই চলে এসেছেন স্বামীর কাছে। সেই অবস্থায় মিসেস কেরী আর ফেলিক্স দারুণ রোগে আক্রান্ত হলেন। যখন কেরী গেলেন সুন্দরবনে তখন ফেলিক্স অপেক্ষাকৃত সুস্থ। পিতার সঙ্গে ডিঙগী করে নদী পার হচ্ছেন আর নিজেদের একটি কুটির বানাবার জন্যে জঙ্গল পরিষ্কার করছেন। মালদহে পৌঁছে ফেলিক্স পরিষ্কার বাংলা বলছেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী এসে পৌঁছলেন শ্রীরামপুরে। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ড মার্শম্যান ইত্যাদি সেখানে জড়ো হয়েছেন। নতুন উৎসাহে তাঁদের কাজ শুরু হল। ছাপাখানাও কেনা হল। ছাপাখানার কাজ জানতেন ওয়ার্ড সাহেব, তাঁর সঙ্গে জুটে গেলেন ফেলিক্স।

আচারে ব্যবহারে ভদ্র হলেও বৈষ্ণবীয় বিনয় ফেলিক্সের খুব ছিল না। প্রকৃত কিছুটা দুরন্তই বলা চলে। ওয়ার্ড সাহেব সামলে নিয়ে চললেন।

২০শে অক্টোবর তাঁর জন্মদিনে ফেলিক্স তাঁর প্রথম প্রার্থনা করলেন জীবনের, প্রথম প্রার্থনাসভায় ভাষণ দিলেন বলা যেতে পারে। ওয়ার্ড সাহেব তো মুগ্ধ! মার্শমান সাহেবের মনে হল 'From being a tiger he was transformed into a lamb'—তারপর শ্রীরামপুরের পথে পথে সেই বালক-প্রচারকের কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল, প্রভু যীশুর আনন্দবার্তা বহন করে তার অভিভাষণ মুগ্ধ করল সকলকে।

১৮০০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর।

গঙ্গার কূলে সবাই এসে দাঁড়ালেন, বহু

২৩ মে টীকা দেবার সরঞ্জাম, প্রেস এবং নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে ফেলিক্স রেংগুন থেকে আভায় যাত্রা করলেন।

কী বুকভরা আশা নিয়ে ফেলিক্স চলেছেন—কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত আশা। ভবিষ্যতের কি উজ্জ্বল ছবি তাঁর চোখের সামনে। কিন্তু কে জানত আকাশ কালো হয়ে আসছে, শ্রাবণের মেঘ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। পূর্বভারতের সীমানা পার হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে ইরাবতী, তরংগবিক্ষুব্ধ তার সর্বনাশা মূর্তি।

সেই ঝড়ো ঘূর্ণি হাওয়া নিমেষে তার চূড়ান্ত রসিকতার খেলা খেলে গেল।

বিস্ময়বিমূঢ় কেরী নিজেকে খুঁজে পেলেন ইরাবতীর তরংগভংগের মধ্যে।

প্রাণপণে চেষ্টা করছেন স্ত্রী আর ছেলে-দের বাঁচাবার জন্যে। উন্মত্ত ঢেউয়ের সংগে নির্বাচন সংগ্রাম চলল কিছুক্ষণ। অবশ হয়ে এল সর্বাংগ, শিথিল হয়ে এল অংগ-প্রত্যংগ। ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে গেলেন ফেলিক্স কেরী।

কিন্তু সে তো মুহূর্তের দুর্বলতা—সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ফেলিক্স ভেসে উঠলেন। মনে হল ঐ তো অদূরেই ভাসছে তাঁর একটি শিশু। মনের ভিতর আবার আশার আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও ফেলিক্স ধরতে পারলেন না। নিরুপায় কেরী তখন তীরের দিকে ফিরলেন। ঘাটের মাঝিমাল্লারা তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। ভগ্ন হৃদয়, ব্যর্থ আশা ফেলিক্সের মনের অবস্থা ধরা রইল উইলিয়াম কেরীকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে। কি বেদনা তাঁর, কি বুকভরা হাহাকার—"আমার দুঃখ আমার সব সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যা কিছু ছিল সবই গেছে। যাক্ গে সেসব। কিন্তু আমার একান্ত ভাল-বাসার যারা, আমার স্ত্রী আমার সন্তানদের মৃত্যু আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। কি যে বলবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।" এ আঘাত উইলিয়াম কেরীর উপরেও প্রচণ্ডভাবে এসে লাগল। তাঁর অন্য সন্তান জ্যাবেজকে লিখছেন—"এই নিদারুণ দুঃখের সংবাদে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছি, নির্বাক হয়ে গেছি......নীরবে ফেলিক্সের জন্যে দুঃখ জানাচ্ছি আমি।"

সেই নিদারুণ দুর্যোগে বর্মী ভাষায় লেখা 'ম্যাথুর' উপদেশাবলী ভেসে গেল, বর্মী ভাষায় যে অভিধান ফেলিক্স লিখে-ছিলেন তাও ইরাবতীর গর্ভে আশ্রয় পেল।

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ফেলিক্স কেরী পৌঁছলেন বর্মী দরবারে। সহৃদয়তার সংগে রাজা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অর্থনৈতিক সকল ক্ষতি পূরণ করে দিলেন।

সেই বছরের শেষে ফেলিক্স কলকাতায় এলেন। এবার মিশনের কাজে নয়, বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনার তাড়ায় নয়, বর্মী সরকারের রাজদূত হয়ে। মিশনের কাজ ছেড়ে দিলেন তিনি। কলকাতায় এসে বেশ আড়ম্বরের সংগেই বাস করতে লাগলেন। মাথার উপর সোনার হাতল দেওয়া লাল সিল্কের জমকালো ছাতা, সোনার তলোয়ার সংগে, পঞ্চাশজন বর্মী সহচর নিয়ে ফেলিক্স কেরী ঘুরে বেড়ান। বেশ মেজাজে থাকেন। কাজের কোন দায়িত্ব নেই, কারণ এত সব আয়োজন সত্ত্বেও কোন একটা চিঠিপত্রঘটিত গোলমালের জন্য রাজদূত বলে তাঁকে স্বীকার করল না ইংরেজ গভর্নমেণ্ট।

সাত মাস ধরে এই রাজকীয় চালে তিনি রইলেন কলকাতায়। ধারদেনা হল অনেক। ইরাবতী তাঁর জীবন থেকে অনেক মাশুল আদায় করল।

মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেল। নিজের জীবনে কোন কিছু শাসন বা আকর্ষণ মানার মত মনের অবস্থা তাঁর নয়। লোকনিন্দায় তিনি নির্বিকার, পারি-পার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন। ঝড় সইতে হল উইলিয়াম কেরীকে। পুত্রের দুর্ভাগ্যে তিনি যত দুঃখিত, তার ভগবানের পথ ছেড়ে সরে যাওয়ায় ততোধিক দুঃখিত।

লিখছেন এক চিঠিতে—'ভগবানের পথ থেকে ফেলিক্সের এই সরে যাওয়া হৃদয় ভেঙে দিয়েছে আমার।'

দেহে মনে আরও জীর্ণ আরও দুর্বল হয়ে ফেলিক্সকে ফিরে যেতে হল বর্মায়। এবারে আর সেই শান্ত সহৃদয় পরিবেশ নেই। সেই সাদর অভ্যর্থনা নেই। রাজার ক্ষিপ্ত মনোভাবের কথা শুনে ফেলিক্স পলাতক হলেন।

তারপর তিন বছর বর্মা ও আসামের বনে জংগলে পাহাড়ে প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ফেলিক্স কেরী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দুঃসাহসী কল্পনাবিলাসী মন তাঁর। গাছপালা চেনার আনন্দে নানা উদ্ভিদতত্ত্বের সন্ধান করলেন, নানা পাহাড়ীভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেন, এক পার্বত্য রাজার সেনাপতি হয়ে লড়াইও করলেন। ঘুরলেন কাছাড়, চল্লেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার মহারাজা তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে দরবারে রাখতে চাইলেন। মন বসল না সেখানেও। এই বিশৃংখল, অনভ্যস্ত, ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা পিতা উইলিয়াম কেরীর চিঠি।

অবশেষে ১৮১৮ সালে চট্টগ্রামে ওয়ার্ড তাঁকে ধরে ফেরত পাঠালেন শ্রীরামপুরে। খেয়ালী জীবনের দিশেহারা দিনগুলির অবসান ঘটিয়ে পিতার আশ্রয়ে ফিরে এলেন তিনি। প্রত্যাগত পুত্রকে ফিরে পেয়েই কেরী খুশী হলেন। সে যে ফিরবে কোনদিন এই ভরসাই প্রায় ছিল না। মার্শম্যান বলছেনঃ "....for several years he was entirely lost to the cause. He wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel."

নূতন উৎসাহে কেরী কাজে লাগলেন। শ্রীরামপুর মিশনের নতুন লাইব্রেরী নতুন মিউজিয়াম তৈরী হতে লাগল। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন চির-বিশ্বস্ত ফেলিক্স। প্রেসের কাজ তাঁর জানা, নানা ভাষায় তাঁর নিপুণতা, বহু বিষয়ে তাঁর কৌতূহল "the completest Bengali linguist amongst India's Europeans".

বাঁধনহীন জীবনের বিশৃংখলা কাটিয়ে তিনি যেদিন তাঁর পিতার আশ্রয়ে ফিরে এলেন সেদিনও কিন্তু তাঁর চরিত্রের মহত্ব একটুও কমেনি। খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর সেই পুরনো একাগ্রতা না থাকলেও কর্তব্যে তাঁর নিষ্ঠা, সাহিত্যের কাজে তাঁর সাধনা, পিতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ফেলিক্সের শেষ জীবন গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিল। মাত্র চার বছর বেঁচেছিলেন ফেলিক্স। তারই মধ্যে লেখেন 'দিগ্‌দর্শন' পত্রের জন্যে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ, হিন্দুস্থানের ইতিহাস, এবং ইংরাজী এনসাইক্লোপীডিয়ার অনুসরণে 'বিদ্যাহারাবলী'। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলছেন, "যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কি প্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনান্তর তন্য অন্য ইউরোপজাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহাদিগের জ্ঞানবর্ধনার্থে এবং অংগবংগকলিংগাদি দেশেতে ইউরোপীয় ভাবদায়বৈদশিল্পবিদ্যাদি বর্দ্ধনার্থে তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।" এ ছাড়া ইংলণ্ডের ইতিহাস ও বিনিয়নের পিলগ্রিমস প্রগ্রেসের অনুবাদও ছাপা হয়েছিল।

১৮২২-এর ১০ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ডাক্তারদের পরামর্শমত তাঁকে চীনে পাঠান যায়নি। সকল সীমা পার হয়ে যাবার ডাক এসেছিল।

শ্রীরামপুরে ফিরে নিজেকে বলতেন 'প্রিজনার অব হোপ্'। কি আশার ছলনা তাঁকে ভুলিয়েছিল তাই বর্মা-আসাম-ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল থেকে গংগাতীরের শান্ত শ্রীরামপুরের শ্যামলিমার মধ্যে তিনি ফিরে এসেছিলেন। মাত্র সাঁইত্রিশ তখন তাঁর বয়স। কি এক অদ্ভুত খেপামিভরা পাগল জীবন তাঁর—অশান্ত, অপরিতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ।

যোগ্য সহকর্মী পুত্রকে হারিয়ে উইলিয়াম কেরীর অন্তর কি বেদনায় ভরে উঠেছিল তা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

১৮২৩ সালে লেখা তাঁর এক চিঠিতে লিখছেন—

"The death of Felix was and still is much felt by me."

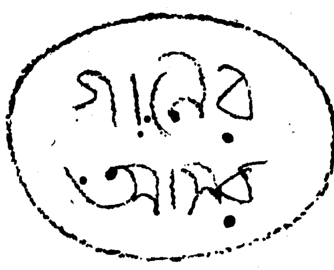
বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার পুরোধা, বিশ্বকোষ রচয়িতা ফেলিক্স কেরী আজ পিতার কৃতিত্বের অন্তরালে চাপা পড়ে গেছেন।

সাত বছর বয়সে এ-দেশে এসেছিলেন, জীবনের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিরিশটি বছর আরও কাটালেন। বাংলা দেশ আর বাংলা ভাষা তাঁর নিজের হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে সাগরপারের বিদেশী সে কথা ভুলে তাঁকে আমাদের নিকটাত্মীয় মনে করবার সাহস তিনিই দিয়েছেন।








**শার্ঙ্গদেব**

কয়েক শত বৎসর ধরে ভারতীয় সংগীত যেভাবে চলে আসছে, তাতে কম্পোজার বা সংগীতস্রষ্টার সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত, সে নিয়ে একটা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনেকের মতে আমাদের সংগীতের প্রকৃতি এরকম যে যাঁরা রাগসংগীতের বিভিন্ন বিন্যাসকে আশ্রয় করে নানা বৈচিত্র্যে সংগীত সম্পাদন করেন, তাঁরাই কম্পোজার, কেননা আমাদের সংগীতের প্রয়োগ-শিল্প এমনই যে, এই রীতিই হচ্ছে সুরকার নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ রীতি। এইভাবে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের মতকে অস্বীকার করবার হেতু নেই; কেননা এই প্রকার বিন্যাসও একটা সৃষ্টি, সেখানেও সুরকারের স্বকীয়ত্ব ফুটে উঠছে, কিন্তু একেই যদি সংগীতস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ মান বলে ধরি, তাহলে আমার মনে হয় কম্পোজার বা সংগীত-স্রষ্টার মহত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় না। পারিপাট্য এবং বাহার যেরকমই হোক না কেন, আসলে পোষাকের পরিকল্পনাটাই হচ্ছে বড়। সেইরকম যে বস্তুর উপর রাগ পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার মূল্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বেহাগে যখন ধ্রুপদ গাওয়া হচ্ছে, তখন যে শিল্পী বেহাগকে রূপায়িত করছেন, তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু এই যে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ একটি সুরের আকৃতি সংগঠিত হল, এইটিই হচ্ছে কম্পোজিশন। ধ্রুপদের রূপটি যিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন সত্যিকারের কম্পোজার। রাগ-রূপায়ণকে শ্রেষ্ঠ কম্পোজিশন বলে সে যুগে গৌরব করা যেত, যে যুগে জাতিগায়ন থেকে রাগগায়নের পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠেছে। তখনই ছিল এই পরিকল্পনাটি একটি নতুন বস্তু এবং রাগ-সংগীতের অভ্যুদয়ে আক্ষিপ্তিকা নামক গীত হচ্ছে একটি শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্প বা কম্পোজিশন। তেমনি আরও পূর্ব যুগের মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা প্রভৃতি গীতি, যাদের আশ্রয় করে অষ্টাদশ জাতি প্রাধান্যলাভ করেছিল, তারাই হচ্ছে মূল কম্পোজিশন। কয়েকশত বৎসর ধরে রাগসংগীতের যে বিচিত্র বিন্যাস বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক রূপায়িত হচ্ছে, তাতে শিল্পীদের চাতুর্য এবং কৃতিত্ব আছে বৈকি; কিন্তু নতুন বস্তুর সংগঠন তো কিছু হয়নি। এই কারণেই রাগ-রূপায়ণকে এযুগে একটা বিশিষ্ট কম্পোজিশন বললে কথাটা সার্থক-ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। যিনি যাই বলুন, আসলে রাগ পরিকল্পনা স্বরগুলির বিচিত্র বিন্যাস ছাড়া কিছুই নয়। সাতটি স্বরের প্রস্তার সংখ্যা ৫০৪০ পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া ষাড়ব এবং ঔড়বের প্রস্তার সংখ্যাও যথাক্রমে ৭২০ এবং ১২০। অতএব কেবলমাত্র রাগগায়নের বৈচিত্র্যকেই যদি শ্রেষ্ঠ কম্পোজিশন বলে ধরা যায়, তাহলে অল্পায়াসেই কম্পোজারের গৌরব অর্জন করা যেতে পারে এবং অধিকাংশ শিল্পীকে সেভাবেই গৌরবান্বিত করা হয়েছে। এযুগে একজন শিল্পী আসরে বসে ঘোষণা করলেন—"এটি একটি নতুন রাগ, এর নাম রঙ্গতরঙ্গিণী—এর আরোহী অমুক, অবরোহী অমুক এবং বিশিষ্ট বিন্যাস অমুক। বাস্—প্রচুর হাততালির মধ্যে নতুন সৃষ্টি সমর্থন লাভ করল। এটাও একটা কম্পোজিশন বটে, কিন্তু সার্থকতার দিক থেকে তার মূল্য খুব বেশি নয়। দ্বিপদবিশিষ্ট মনুষ্য নামক জীব হওয়া এক বস্তু, আর মানুষ বলে পরিচিত হওয়া আর এক বস্তু।

রাগসংগীতের সার্থকতা যেমন অনেক, তেমনি ব্যর্থতাও বড় কম নয়। প্রয়োগ সীমিত হলে রাগগায়ন উত্তম বস্তু; কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তা ক্লান্তিকর হয়ে থাকে এবং আজও রাগগায়নের দিক থেকে এই বে-আন্দাজি ব্যাপার নিরন্তর ঘটে চলেছে। এক সময় রাগগায়নের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু ক্রমে লোকে স্বর-বিস্তার এবং কয়েকটি রূপ-বন্ধের সমষ্টিগত প্রচারে ক্লান্তি বোধ করতে লাগল এবং এরই ফলে দেশী সংগীতের অপরাপর পদ্ধতিগুলি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে সংগীতের পুরোভাগে এসে পড়তে লাগল। সেসব গান পদাশ্রিত, তাদের বিশেষ রূপ এবং বিশেষ সংগঠন আছে। শেষ পর্যন্ত শিল্পীদের বাধ্য হয়েই দেশী সংগীতের মাধ্যমে রাগকে বিকশিত করতে হয়েছে। এরই এক একটি রূপ এক একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বা কম্পোজিশন। রাগের বিস্তার বা বিন্যাসকেই যদি কম্পোজিশনের একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরা যায়, তাহলে দেশী সংগীতের এতটা উন্নতি হল কেন? লোকে তো রাগগায়নকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারতো? তাহলে আলাপই হোতো শ্রেষ্ঠ কম্পোজিশন। কিন্তু তা স্বীকৃত হয়নি। এ একটা টেকনিক একটা রূপবন্ধ মাত্র—একটা সম্পূর্ণ সৃষ্টি নয়। তেমনি রাগের বিচিত্র বিন্যাসকেও আর্টের বৈচিত্র্য বলব; হয়তো সেটা কম্পোজিশন ইন দি প্রসেস অব একজিকিউশন (জনৈক পত্রলেখক এটি আমার গোচর করেছেন), কিন্তু একটা অখণ্ড বস্তুর সৃষ্টি তো নয়। এই বৈচিত্র্যকে শোভনভাবে প্রকাশ করবার জন্য ধ্রুপদের মত একটা উত্তম কাঠামোর প্রয়োজন হয়।





কম্পোজিশনের দিক থেকে ধ্রুপদ সবচেয়ে সার্থক কেননা তার একটা আকৃতিগত সম্পূর্ণতা আছে। খেয়াল এবং ঠুংরি রাগবিস্তারের দিক থেকে সুবিধাজনক হলেও কম্পোজিশনের দিক দিয়ে বড় নয়, কেননা সেই পূর্ণতার মর্যাদা তাদের দেওয়া যায় না। এই কারণেই খেয়াল এবং ঠুংরি প্রায়ই বিস্তারের আতিশয্যে ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে।

কম্পোজিশন শব্দটাই একটা আকৃতি বা বস্তুসত্তার নির্দেশ করে। রাগগায়ন উপলক্ষে যে কম্পোজিশন আমাদের মনে আসে, সে হচ্ছে স্বরসমূহের আলংকারিক সন্নিবেশ। এ কম্পোজিশন কেবলমাত্র স্বরগত। একে আমরা পরম্পরাবিশিষ্ট স্বরসন্দর্ভ বলে স্বীকার করতে পারি; কিন্তু গীত বলতে কম্পোজিশনের যে রূপ বোঝায়, তাই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ রূপ—উক্ত অলংকার নয়। কেবলমাত্র স্বর-বিন্যাস মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না বলে পদ, তাল, মান বিভিন্ন কলি প্রভৃতির সংযোগে বিবিধ সাংগীতিক বস্তুর পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এই সংগঠনকেই বলে প্রবন্ধ। রাগগায়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বরাভ্যাসেই নানারকম বৈচিত্র্য প্রদর্শন করা যায়; কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ পরিকল্পনায় আরও বহু বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং রাগবিস্তার সম্পর্কে এক্‌জিকিউশন দ্বারাই কম্পোজিশনের কাজ হচ্ছে বলে ওস্তাদপন্থীরা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন, কিন্তু এ কম্পোজিশন গায়ন-চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। গত দুশো বছর ধরে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির ভিতর দিয়েই এই বিন্যাস চলে এসেছে এবং কোন রূপের বিকাশ রাগ-শিল্পীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অপর-দিকে কম্পোজিশনের গৌরব যাঁরা অর্জন করেছেন, তাঁরা প্রধানত কবি, সাহিত্যিক। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, নৃত্যনাট্য চিত্রাংগদা, চণ্ডালিকা এবং শ্যামা এযুগের শ্রেষ্ঠ কম্পোজিশন।

অতএব কম্পোজিশন বলতে যে সংগীত-সৃষ্টি বোঝায়, তা আজই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন সে একটা ফর্ম বা থিম্‌ নিয়ে সংগঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে এ যুগের সার্থক কম্পোজার বলব। সে যুগে সার্থক সংগীত সৃষ্টি করতে পেয়েছিলেন বলে কবি জয়দেব সগর্বে বলেছিলেন—"যদি গন্ধর্বকলায় নৈপুণ্য দেখতে চাও, তাহলে তা আমার গীতগোবিন্দ স্মরণ কর।" এযুগে কোন ওস্তাদের এমন কথা বলবার সাহস নেই; কেননা তাঁরা সবাই "পারফরমার"। শেখা বা বাঁধা জিনিসের যাঁরা আবৃত্তি করেন, তাঁদের কেউ কম্পোজার বলে না, তাঁদের বড় জোর চতুর শিল্পী বলা যায়।

# বেলোয়ারী

## প্রবোধকুমার সান্যাল

### আঠার

সিধু এমন বর্বরোচিত আক্রমণ করে এল, অথচ তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া হল না এটা একটা আশ্চর্য। যে-কোন লোক শুনলে বলবে, এটা সিধুর অপরাধ, জঘন্য বর্বরতা—কিন্তু তার এই অপরাধ আজ পুলিসের কাছে গোপন রাখা হল।

সত্য বলতে কি, পুলিসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করার জন্যই সিধু অমন করে নরেশবাবুর আপিসে দাঁড়িয়ে রইল। আজ তার ধরা পড়ার দরকার ছিল। জেল হাজত সে দেখে এসেছে, সেখানে অশান্তি নেই। সেখানে শৃঙ্খলার সঙ্গে মিলিয়ে থাকতে পারলে খারাপ লাগে না। আগে লোকে জেল-এ যাবার নামে একটু আড়ষ্ট হত, এখন জেল-এ যেতে পারলে অনেকে খুশি হয়। সিধু দেখে এসেছে, ওখানে সশ্রম কারাদণ্ড মানে দিব্য আরামে কিছু কিছু কাজকর্মে নিযুক্ত থাকা। ওখানে স্বাধীনতা নেই বটে, কিন্তু মুক্তির আনন্দ আছে। জেল-এ গিয়ে ঢুকতে পারলে এবার সিধু খুশী হয়।

ভীরকাঠিতে তার নাম ছিল, সে গুণ্ডা। ঠাকুরদি চিরকাল তাকে বলে এসেছে সে বদরাগী। তার মাত্রাবোধ নেই, কাণ্ডজ্ঞান নেই।

সিধু এক পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরল। নরেশবাবুর প্রতি তার চাপা আক্রোশটাকে সে আজ সংবরণ করতে পারল না, এজন্য তার মনে একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া ছিল। হাত দুখানাকে নোংরা মনে হচ্ছে। গা ঘিন-ঘিন করছে আগাগোড়া। বিশ্বাস হয়ত কেউ করবে না, সে গিয়েছিল নরেশবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে। গিয়েছিল তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু সে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে নরেশবাবুর ওপর, এটা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অনুশোচনায় এবং আত্ম-গ্লানিতে সিধু যেন পথের মাঝখানে কিলবিল করতে লাগল।

দু একটা দোকান দেখে সে থমকে দাঁড়াল, কিন্তু আহারে তার রুচি ছিল না। মুখ ফেরাল সে অন্যদিকে। এলোমেলো সে হাঁটতে লাগল পথের যান-বাহন বাঁচিয়ে। ক্লান্ত শরীরে সে ঘুরল কতক্ষণ। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে সে এসে পৌঁছল একটি বাড়ির দরজায়, যেখানে সেই ছাপরা জেলার চাকর ভজুয়া চাকরি করে। উঁকি দিয়ে ভিতরে একবারটি সে দেখল, ভিতরে কি যেন গণ্ডগোল চলছে। সিধু সেইখানে দাঁড়িয়ে ভজুয়ার নাম ধরে ডাকল।

বার দুই ডাকাডাকির পর ভজুয়া বাইরে এল একটু যেন উত্তেজনা নিয়ে। কিন্তু সিধুকে দেখে প্রথমটা সে ঠিক চিনতে পারেনি। তারপর ঠাহর করে দেখে বললে, কি রে তুই যে?

সিধু বললে, এলুম তোর কাছে। শোন—?

ভজুয়া বাইরে এল রাস্তায় এবং নিজের মনেই বকতে বকতে বললে, মনিব শালা হামার তলব থেকে এ মাহিনায় চারঠো রুপিয়া কেটে লিচ্ছে, বুঝলি সিধু?

সিধু বললে, কেন, কেটে নিচ্ছে কেন?

শালা বোলে কিনা হামি ওদের সোব সিসাকে বর্তন ভাঙিয়ে ফেলেছি। মাইরি, সোব বর্তন হামি ভাঙেনি।

সিধু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কাঁচের বাসন ত ভাঙবার জন্যেই জন্মায় রে, তাই বলে তোর মাইনে কাটবে?

ভজুয়া বললে, বোলত ভাই, সাচ বোলত? শহর-বাজারের বাড়িওলারা হারামি আছে, বুঝলি সিধু? হামার রুপিয়া না দিলে হামি দেখে লেব শালাকে।

সিধু বললে, কি করবি?

ওর ঘরসে চাউল লিয়ে বাজারে বেচিয়ে আসব! দুঠো ধোতি সাবাড় করে দেব!

না না, ওসব করতে নেই, ভজুয়া। আয়, আমি তোকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি।—সিধু ভজুয়ার পিঠে হাত রেখে কিছুদূর এগিয়ে চলল।

ভজুয়া একটু অবাক হয়ে বললে, তুই রুপিয়া দিবি, পাবি কোথায়? তুই ত' সেই কয়েদখানায় ঘুসেছিলি রে!

সিধু তার পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে বললে, এবার আমার একটা কাজ করে দে তুই?

কি বোল?—এতক্ষণে ভজুয়ার মুখে হাসি ফুটল।

দয়ালের ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দে। সে ওখান থেকে উঠে এই পাড়াতেই কোথায় এসে আছে। তুইত জানিস সব।

টাকা পেয়ে ভজুয়া অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললে, তোর দিল আছে, সিধু হামি আগেই জানতুম। চল হামি দেখিয়ে দিয়ে আসি।

কিছুদূর গিয়ে ভজুয়া একবারটি থমকে দাঁড়াল। তারপর গলাটা নামিয়ে বললে, শোন সিধু, দোয়াল এ সময়ে তার ডেরায় থাকে না, জানিসত? মনিবের ঘরে রান্না সেরে এক ঘড়ির জন্যে আসে তিনমাসির ঘরে।

সিধু প্রশ্ন করল, কেন?

হেসে চোখ টিপল ভজুয়া। বললে, জানিসনে? তিনমাসির বহিনের একঠো লেড়কি আছে, তার কাছে আসে। এখনি তুই দোয়ালকে পাবি। চল—

দোকান বাজারের আলোর সারির ভিতর দিয়ে এসে হঠাৎ ভজুয়া একটা কানাগলির মধ্যে ঢুকল। তারপর এগিয়ে একটি চালা-

ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে দেখিয়ে বললে, হ্যাঁ, এই তিনুমাসির ঘর। ওই দ্যাখ সিধু, মেয়েটা বসে রয়েছে বিছানায়। এবার হামি আসি, ভাই।

ভজুয়া বিদায় নিল। সিধু অবলীলাক্রমে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ভিতরটা কেরোসিনের আলো জ্বালা, সে-আলোয় উঠোনের নোংরা ঠিক ঠাহর হয় না। কিন্তু খোলা দরজার দিকে তিনুমাসির বাঁকা চোখ ছিল সজাগ। ওধারের একটা ঘরের পাশ থেকে সে বলে উঠল, ওমা, দেখো, সন্ধ্যেবেলা দরজাটা দেওয়া হয়নি! উটকো লোক এসে ঢুকছে। কে গা বাছা? না, মা, এ বাড়ি নয়। এখানে বাছা ওসব কারবার নেই। চারদিকে গোয়েন্দা ঘুরছে আজকাল...চেনাজানা লোক ছাড়া এদিকে কেউ আসে না। তুমি যাও বাছা, আমি দরজা দিই।

সিধু খুশী হয়ে বললে, তিনুমাসি, আমি সিধু।

কে?—চমকে উঠল তিনুমাসি। বললে, তুই কি করতে এলি এখানে? আমার ঘরে আবার পুলিস এনে কেন ঢোকাও, বাছা?

বলতে বলতে তিনুমাসি এগিয়ে এল। সিধু বললে, তিনুমাসি, ভয় পেয়ো না। তোমার দেনা শোধ করতে এলুম।

তিনুমাসি অত সহজে মুগ্ধ হবার মানুষ নয়। সে বললে, দেনা আবার কি? টাকা নিলে কবে যে, দেনা শোধ? মতলবটা কি বল দিকি? ওরে, অ বিনি, আলোটা একবার ধরত?

একটি পাউডার-মাখা নোংরা চেহারার মেয়ে কেরোসিনের কুপি নিয়ে ভয়ে-ভয়ে বেরিয়ে এল। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, ওমা, এ আবার কে গো? কি জন্যে এসেছে, মাসি?

সিধু হাসিমুখে বললে, কোন মতলব নেই গো তিনুমাসি, এমনি এলুম। তুমি আমার চাকরি করে দিয়েছিলে, মনে আছে?

সিধুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করে তিনুমাসি বললে, হ্যাঁ, আছে! তেমনি মাথা ফাটাফাটি করে বেরিয়েও এসেছে সেখান থেকে!

সিধু আবার একটু হাসল। বললে, চাকরি দিয়ে সেদিন বড্ড উপকার করেছিলে, তিনুমাসি। মনে করেছিলুম তোমাদের একদিন খাওয়াব। তা আর হয়ে ওঠেনি।—এই বলে সে পকেট থেকে টাকা বার করে সেই কেরোসিনের আলোয় পঁচিশটি টাকা গুণে তিনুমাসির হাতে দিল। পুনরায় বললে, এই টাকা তোমার বামুনদিদি পাঠিয়েছে। এতে তোমরা ভালমন্দ একদিন খেয়ো।

তিনুমাসির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, তোর বামুনদিদির নজর আছে ত! আহা, তা হবেন না? ভদ্দরলোকের মেয়ে যে! ঘরে গিয়ে দুদণ্ড বোস, বাছা! অ বিনি, ওকে নিয়ে যা, একটু আদর যত্ন করিস।

বিনি হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল—তোমার এক কথা, মাসি! আদর-যত্ন কাকে না করি? এই বলে সে একবার সিধুর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসল। পুনরায় বললে, অ মাসি, দয়াল ঠাকুর এলে বাইরে দাঁড়াতে বলো।

না, হবে না—তিনুমাসি তেতে উঠল, দয়াল এলে ঘরে নিসনে। পাঁচ টাকা মাসোহারায় রোজ-রোজ ঘরে ঢোকা হবে না। এলে বলিস।

বিনি বললে, দাঁড়াও একটু, তা হলে; বাইরের জানলা দুটো আগে বন্ধ করে দিই।—এই বলে সে ঘরে ঢুকল।

তিনুমাসি টাকাটা নিয়ে অন্ধকার ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

বিছানার পাশের জানলা দুটো বন্ধ করে কাপড়খানা ছেড়ে বিনি এল নবাগতকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। কিন্তু এধার ওধারে নিরীক্ষণ করে দেখল, সিধু কোথাও নেই। সে ডাক দিল মাসিকে। তিনুমাসি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কি হলরে?

লোকটা চলে গেছে, মাসি।

যাবে আবার কোথায়? পান-বিড়ি কিনে এখুনি এসে ঢুকবে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা হয়ে গেল সিধু এল না। বিনি চুপ করে একখানে দাঁড়িয়েছিল। এবার বললে, দেখছ না মাসি, বেনোজল! থাকবার জন্যে আসেনি!

তিনুমাসি শুধু বললে, যাক না কেন, ভালই হল। টাকাও এল, গা-গতরও বাঁচল। বলি শোন বিনি, দয়াল এলে টাকার কথাটা যেন বলিসনে!

বিনি কিন্তু অতটা খুশি হয়নি। বললে, মরুকগে! জানলা বন্ধই সার হল। যাই খুলে দিইগে।

বিনি বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিধুর কিছুমাত্র চিত্তবিকার হয়নি। দেনা-শোধের কাজটা তার হয়ে গেছে, এতেই সে খুশি। তার কাছে তিনুমাসি অথবা বিনি, কেউ প্রধান নয়, কেউ সত্যও নয়। সত্য হল তার কৃতজ্ঞতাবোধ। সিধু যে কেবল খুশী হয়ে চলে গেল, তাই নয়, তার অনেক বাঁধনের মধ্যে একটি যেন কাটল। কোথাও কেউ তার কোনও উপকার করেছে, সিধু তাকে খুঁজছে মনে মনে। কেউ তাকে কখনও ভাল কথা বলেছে, সিধু ভোলেনি। ক্লান্ত শরীর ভেঙে পড়লেও মন তার সজাগ। ঘাটের ধারে সেই ঝি-চাকরের

জটলার মধ্যে একদা সে আনন্দ পেত, তাদের জন্য ওর মনে ঔৎসুক্য রয়েছে। রাজ-বাড়িতে ওর যে দুজন সহকর্মী সব্জির খামারে কাজ করত, তাদের যদি উপার্জন বেড়ে যায়, সিধু এখন থেকেই খুশি।

মস্ত একটা কোনও পরিণাম যেন তার জন্য কোথাও প্রতীক্ষা করছে, তারই জন্য সিধুর যেন সব আয়োজন। সকল কাজ তাকে দ্রুত সারতে হবে, সমস্ত ঋণ শোধ করে তাকে যেতে হবে। সেই পরিণামটি কি, সিধুর জানা নেই। সেটা ভাগ্যের পরিবর্তন কিনা, জন্মান্তর কিনা, সেটার জন্য কোথাও কোন আয়োজন আছে কিনা, কিছুই সিধুর কল্পনায় আসে না। কিন্তু সব কাজ একে একে সেরে তাকে বসতে হবে মস্ত এক লক্ষ্য নিয়ে। চোখ বুজে কোথাও একখানে তাকে বসতে হবে। সেই যোগের আসনে বসে তাকে দেখতে হবে বিশ্ব-সংসার। মানুষকে দেখবে সে চোখ বুজে, নিজেরই জীবনটাকে ভাল করে দেখবে। কিন্তু তার আগে এখনও অনেক ধাপ বাকি, অনেক বাঁধনের থেকে অনেক মোহমুক্তি বাকি।

নগরের বৃহত্তর পরিধির বিপুল জনতার মাঝখানে এবার সিধু এসে দাঁড়াল। দেখল, কলকাতায় অন্নের অভাব নেই, ক্ষুধা যদি সত্য হয়। পয়সা আছে ছড়ান, কিন্তু কুড়িয়ে নেবার কৌশল জানা দরকার। কাজ একটা জুটে যাবার মধ্যেও ওই কথাটা থাকে। কাজ হেঁটে আসে কাজের লোকেরই কাছে। সিধু এটা জেনেছিল বিগত বছর খানেকের মধ্যেই। নীচের দিকে নেমে যাও, অজস্র কাজ। একদা নরেশবাবু ভাল কথা বলেছিলেন, দুনিয়ার কাজ তোমাকে ডাকছে, সাড়া দেবে কিনা তাই বলো। নতুন নগর বসছে, তুমি ডাক শুনতে পাবে—যদি কান পেতে থাকো। মাটি কাটো, ঝাড়ু দাও, ঘর বানাবার কাজে লাগো, জাহাজ ঘাটায় এসে দাঁড়াও, কারখানায় ঢোকো, কাঁধে মাল তোল। সিধু এগুলো জানত। অভিমান নেই বলেই তার কাজের অভাব নেই। প্রকৃত ক্ষুধাই হল, ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রকৃত পথ।

ক্ষয় ও ক্ষতির ইতিহাসটা নেহাৎ সামান্য নয়, কিন্তু ওটা পিছনে পড়ে থাক। সিধু চোখ চেয়ে দেখল, হয়ত অনেকগুলো দিন তার নষ্ট হয়ে গেছে। অলস দুই বাহু কাজের অভাবে অবাধ্য হচ্ছে। এতটুকু তার ইচ্ছা ছিল না নরেশবাবুকে সে আক্রমণ করে। মন্দকে আঘাত করতে নেই, সে আরও হিংস্র ও কুটিল হয়—ঠাকুরদা একথা বলত। সহ্য করো, উদার হও, মহৎকে তুলে ধরো—অন্যায়ের মন ফিরবে। তোমার হাতে একাজ কেউ দেয়নি, পৃথিবীর সব মন্দ লোককে তুমি ভাল করে তুলবে—ঠাকুরদা তাকে ধমক দিয়ে বোঝাত।

জাহাজঘাটায় গিয়ে মাল খালাসীর কাজ নিয়েছিল সিধু। কিন্তু সে কয়েক দিনের জন্য। জ্বর ছাড়ে না, খাওয়ায় রুচি কম, মাথা গোঁজবার জায়গা পেল জুয়ার আড্ডায়, তার ওপর মেয়ে মানুষের উৎপাত বাড়ল, সুতরাং শান্তি পাওয়া গেল না সে-কাজে। সেখান থেকে ছেড়ে এসে সিধু এক সাবানের দোকানে কাজ নিল। দশ সের সাবান বেচলে এক টাকা, তিরিশ সের না বেচলে কজি থাকবে না। দোকানের বাইরে সিধু অনেক সাবানই বেচল প্রতিদিন, কিন্তু রুগ্ন দেহ নিয়ে হিসাব মেলাতে পারল না। অতএব পকেট থেকে কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে একদিন সে বেরিয়ে এল। তারপর গিয়ে ঢুকল এক মোটর গাড়ির মেরামতি দোকানে,—সেখানে ফাইফরমাশের কাজ। দিনের বেলা চা আন, খাবার আন, তম্বিরতদারকি করো, কথায় কথায় হেড মিস্ত্রির মুখখিস্তি শোন। রাত্রে মদ এনে দাও লুকিয়ে—কেননা 'দোকান' বন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েমানুষের খবর আন—ওটাও কাজের অঙ্গ। ওটা সিধুর ধাতে নেই, সুতরাং দৈনিক সাতসিকার কাজটা গেল। এর পর হঠাৎ একটা ভদ্র কাজ জুটল। নতুন একটা বাঁশের গোলা বসছে, তার জন্য গোলপাতার চালাঘর একটা বানানো হচ্ছে। এটা সিধুর জানা কাজ। সিধু কাজটাও ধরল, গুনগুনিয়ে গানও ধরল। ঘরামির কাজে তার হাত পাকা। বাঁকারি চাঁচা, খাম বসান, বাঁশ বাঁধা, দড়ির ফাঁস টানা,—এসব কাজের জন্য তা'র হাত দুখানা তৈরী। কিন্তু আজকে আর ঠাকুরদা নেই যে, গরম গরম বেগুনী আর আলুর বড়া নিয়ে চালার তলায় এসে দাঁড়াবে হাসি-মুখে। সেদিনের কথা মনে ক'রে যদি কান্না পায় তবে আজ একাই কাঁদো। কিন্তু সিধু খুশী মুখে গুনগুনিয়ে গান ধরে। রাজ-বাড়ির বধূবেশে ঠাকুরদা আবির্ভূত হয় চোখের সামনে। ঘরামির পক্ষে এই মানসমূর্তিই তা'র জীবনের সার্থকতা। সিধু বাঁশের গলার কাছে দড়ির ফাঁস টেনে দেয় মনের আনন্দে।

ওটা দিন দশেকের কাজ মাত্র। অতঃপর পাওনাগণ্ডা নিয়ে সিধু ছুটি পেল একদিন। শ্রমিক পল্লীর হোটেলে ব'সে সে অখাদ্য খাওয়া খেল, এবং গায়ে জ্বর অনুভব ক'রে সে ট্রাম কোম্পানীর গুমটিতে গিয়ে মেঝের উপরে গা ঢেলে দিল। বৃষ্টি এল তার পায়ের দিকে।

ঘুম ভাঙল, তখন রাত্রি। ঘুমিয়ে ছিল, কিম্বা সে নিরুদ্দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল বলা কঠিন। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, জোর আছে পায়ে। একটা সিদ্ধান্ত খুঁজে পেলেই তার শক্তি বেড়ে ওঠে। সে হাঁটতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু তবু এ-শক্তি তার নিজের নয়। বসে থাকলে হাত বাড়ায় না কেউ, এগিয়ে চললে তবে একজন এসে হাত ধরে। সেই হাত রণরঙ্গিণীর,—ভিতরে তার বজ্রের কাঠিন্য, উপরে কমনীয় মধুর পেলবতা।. সেই হাতে বেলোয়ারীর বালা!

ঘণ্টাখানেক ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে এসে সে পৌঁছল টালিগঞ্জের সেই বস্তিপল্লীর অন্ধগলিতে। পাশে ছুতোরের আড্ডায় কাজ

বন্ধ হয়ে গেছে। সৈরিন্ধ্রীদের ঘরে হারমোনিয়ম বাজছে, বোধ হয় নতুন লোক এসেছে। সিধু কয়েক পা এগিয়ে কড়া নাড়ল।

খুট্ করে দরজা খুলে লাবণ্য এসে দাঁড়াল। সে যেন জরুরী কারণের জন্য সন্ধ্যার পর থেকে প্রস্তুত হয়েই থাকে। কিন্তু আবছায়া অন্ধকারে সহসা সিধুকে চিনতে না পেরে আঁতকে উঠে লাবণ্য দরজাটা আবার বন্ধ করবার চেষ্টা পেল। সিধু বললে, লাবণ্যদিদি, আমি সিধু।

সিধু!—থমকে দাঁড়াল লাবণ্য, ঠাহর করে দেখে সবিস্ময়ে বলে, সিধু? এ চেহারা কেমন ক'রে হল? অরুণা ছেড়ে দিয়েছে বুঝি?

সিধু একটু হেসে বললে, না, তা নয়। ঠাকুরদি টাকা পাঠিয়েছে তোমাদের জন্যে।

টাকা! কিসের টাকা?

সিধু বললে, দু তিন মাস সে তোমাদের এখানে ছিল, তোমাদের কত খরচপত্র হয়েছে! শ' দুই টাকা তাই পাঠিয়ে দিল।—বলতে বলতে সে পকেট থেকে টাকার গোছাটা বার করল।

জলজলে চক্ষে সেদিকে লাবণ্য একবার তাকাল, কিন্তু তখনই পিছন দিকে এক ছায়ামূর্তির পদসঞ্চার অনুভব ক'রে লাবণ্য যেন গর্জে উঠল, তোমাকে না মানা করেছি 'মা, সব সময়ে আমার পিছু নিয়ো না?

মামীমা কি যেন বিরক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ ক'রে সেখান থেকে স'রে গেলেন। লাবণ্য মায়ের পথের দিকে একবার তাকিয়ে খপ ক'রে অন্ধকারে সিধুর একখানা হাত ধরল। বললে, ভেতরে এসো সিধু।

হাতখানা সিধু ছাড়িয়ে নিল, এবং লাবণ্যের সেই হাতে নোটের গোছাটা তুলে দিয়ে বললে, আজ আর ভেতরে নাই গেলুম, লাবণ্যদিদি!

আকস্মিক অর্থলাভেরই উত্তেজনায় লাবণ্য বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, এটা প্রত্যক্ষ। সে বললে, না, তা হবে না। আজ আমার কাছে তুমি থাকবে। নিজের হাতে তোমাকে যত্ন করব, খাওয়াব, শোওয়াব।

সিধু একটু অবাক হয়ে তার প্রায় সমবয়সী এই ব্রাহ্মণকন্যার দিকে তাকাল। কিন্তু তার উত্তরে লাবণ্য ঈষৎ অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। অতঃপর ললিত জড়িত কণ্ঠে বললে, সিধু, বিশ্বাস কর, অরুণার জন্যেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে সাহস হয়নি। কিন্তু প্রথম দিনেই তোমার চওড়া বুকের ছাতি দেখে আমার বুকেও কাঁপন ধরেছিল! আজ তোমার এই নিঃস্বার্থ টাকার ঋণ আমি শোধ করব। এসো—

এ টাকা তোমাদের পাওনা, লাবণ্যদিদি!

কাঁধের আঁচলটা ইচ্ছাপূর্বক খসিয়ে লাবণ্য বললে, বেশ, পাওনাই নিলুম। কিন্তু আজ রাত্রে আমার কাছে থাক, তোমার সব পাওনা মিটিয়ে নিয়ে কাল ভোরে চলে যেয়ো? টাকা দিয়ে শুধু মুখে তুমি চলে যাবে, সে হবে না।

নতমুখে সিধু বললে, আমি নোংরা, বরং আর একদিন আসব।

লাবণ্য শুধু জিদ ধরল না, সিধুর হাতখানাও আবার ধরল। বললে, না, সে হবে না, আজই এসো। কেউ জানতে চাইবে না, কেউ কিছু মনেও করবে না। নিজের হাতে তোমাকে চান করাব। সমস্ত রাত জেগে নিজের হাতে তোমার কপালের সব দুঃখ মুছে নেব, সিধু। এসো—

লাবণ্য তাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে একখানে বসাল। ওরই মধ্যে একটু সাড়া পড়ে গেল বৈকি। মামীমা গিয়ে রান্নাঘর খুললেন, মরা উনুনের আঁচে নতুন কয়লা ঢাললেন। স্নানের জন্য গরম জল চাই, চা-জলখাবার —এসব অবিলম্বে চাই। লাবণ্য সব করবে নিজের হাতে। সিধুর কাপড়-জামায় সে সাবান দেবে, এবং নিজের একখানা শাড়ি আজকের মতো জড়িয়ে দেবে ওর কোমরে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে স্নানাহার সমস্ত সেরে লাবণ্য ওকে নিয়ে দরজা দেবে,—মোটে রাত আর কতটুকু,—দেখতে দেখতেই যাবে ফুরিয়ে।

লাবণ্য ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছিল। সিধু নেতিয়ে পড়েছে চৌকিখানার ধারে। বুঝতে পারা যাচ্ছে জ্বর গায়ে সারাদিনই উপবাস চলছে,—তার ওপর এই পথ হাঁটা। লাবণ্য চা ও জলখাবার বানাতে বসে গেল। এর পরে গরম জল। তারপরে রান্না চড়বে। মামীমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রান্নার কাজকর্মে। তাঁর কৌতূহল চাপা রয়েছে। সমস্তটার মধ্যে পয়সার গন্ধ আছে বৈকি, নইলে লাবণ্য এমন অভ্যর্থনা জানায় না ওই ইতিজাতের ছেলেটাকে!

আধঘণ্টার মধ্যেই চা, ডিমভাজা আর আলুর চপ দুই হাতে নিয়ে লাবণ্য যখন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল,—সিধু তখন সে-ঘরে নেই। এদিক-ওদিক-সেদিক লাবণ্য একবার তাকাল। খোঁজবার চেষ্টা করল না, কাঁদল না, হাত থেকে প্লেটও পড়ল না,—শুধু সে স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়াল। বাঘিনী তার জীবনে প্রথম পুরুষ জন্তুকে চিনে বা'র করেছিল, সেজন্য এই প্রথম তার শরীরের সকল অন্ত্রতন্ত্র, শিরা-উপশিরা, মেদমজ্জা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত ইন্দ্রিয়—তাদের রক্তরস নিয়ে লালাসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

নিবিড় আত্মগ্লানিতে লাবণ্যের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল এবং যে-নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে তার পড়ল—সেটা চিররুক্ষ মরুভূমির তপ্ত হাওয়ার হাহাকারের মতো।

অনেকদূর চলে গিয়েছিল সিধু। হাঁটিতে হাঁটিতে এক সময় পিছন ফিরে সে তাকাল। ভালবাসা যদি সত্য হয়, কাম্য বস্তু মেলে বৈকি। লাবণ্যদিদি টাকা ভালবাসে। ইচ্ছার জোরেই সে টাকা পেয়েছে।

বৃষ্টি এসেছিল ঝমঝমিয়ে। মস্ত বাজারটার কোণে বিস্তৃত গাড়িবারান্দার নীচে সিধু সে-রাত্রির মতো জায়গা নিল। অনেক রাত হয়েছে। দোকানদানি সব বন্ধ। শেষ ট্রামখানাও কিছুক্ষণ আগে ডিপোয় ফিরে গেছে। নির্জন প্রশস্ত পথে হু হু করে বইছে জলো হাওয়া। ওরই মধ্যে একখানা বড়রকমের বন্ধ দোকানের রোয়াক ঘেঁষে সিধু টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তি ছিল অপরিসীম, শরীরের মধ্যে রোগের বিকার ছিল প্রবল। এক সময় দুই চোখে তার ঘুম এল জড়িয়ে। আশপাশে দুচারটে দেহ পড়ে রয়েছে,—আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া দেহ। ওদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ কোনটা বোঝবার জো নেই।

এক সময় আচমকা সিধুর ঘুম ভাঙলো। পাশ ফিরে দেখল, বছর ছয়েকের একটা মেয়ে পাশে বসা। সিধু হাসিমুখে প্রশ্ন করল, পকেটে হাত দিচ্ছিস কেন রে?

মেয়েটা বললে, দাওনা চারটে পয়সা! কিচ্ছু খাইনি সারাদিন।

বটে! পয়সা দিলে খাবি কি? সব দোকান যে বন্ধ রে?

দাওনা তুমি—মা চাইছে।

সিধু মাথা তুলে একটা মেয়েছেলেকে দেখল, ছায়ান্ধকারে কিছু ঠাহর করা গেল না। তখন সে বললে, কাল সকালে খাবার কিনে দেব, এখন শুয়ে থাকগে।

স্ত্রীলোকটি বাঁকাকণ্ঠে ওধার থেকে বললে, রাত্তিরে মেয়েটা তবে খাবে কি?

তোর মাথা!—ব'লে সিধ্ন পাশ ফিরে চোখ বুজল।

ঘণ্টা দুই পরে পায়ের উপর হাতের স্পর্শ পেয়ে সিধ্ন চমকে উঠল। মাথা তুলে দেখল, সেই স্ত্রীলোকটি পায়ের দিকে এগিয়ে শুয়েছে এবং ছোট মেয়েটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বিরক্ত হয়ে সে প্রশ্ন করল, পায়ে হাত দিচ্ছিস কেন রে? নাম কি তোর?

দুলি!

একটু সরে শো'—নৈলে পায়ের ধাক্কা খাবি।

দুলি বললে, ও, লাথি মারবে বুঝি? অমনি মারলেই হল! কে তোমার ধার ধারে গা? নাই দিলে ভিক্ষে!

সিধ্ন বললে, গায়ে পড়ে ঝগড়া কচ্ছিস কেন? তোর মরদ কোথায়?

মরদ আবার কি? যে যখন থাকে। কপালে আগুন!

অত রাত্রে বিতর্ক বাধাতে সিধ্ন প্রস্তুত ছিল না। সে কেবল বললে, যা, সরে গিয়ে শো। সকালে যা হয় দেব।

সিধ্ন আবার শুলো এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার ঘুম এল।

মেয়েটা কিন্তু নড়ল না, সেইখানেই ঠায় জেগে বসে রইল। এক সময় আবার সিধুর পায়ে হাত দিয়ে বললে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাঁদছ কেন গা?

সিধ্ন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে দুলি সিধুর গায়ে একটু ঠেলা দিল। বললে, ওমা, অসাড়ে বমি করছে দ্যাখ! মদ খেয়েছ বুঝি?

সিধ্ন এবার বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। রাত থমথম করছে। চোখ রগড়ে এবার দুলিকে দেখল,—বয়স অল্প, কিন্তু একখানা কঙ্কাল। মুখ বিকৃত ক'রে সিধ্ন বললে, বমি করেছি তা তোর কি?

দুলি বললে, রক্ত পড়েছে কত দেখছ না? আমার মাসির ঘর আছে, যাবে? রক্ত দেখে সত্যিই তার ভয় হয়েছিল।

না, থাম্ মাগি, ঘর আর দেখাসনে।—এই ব'লে সিধ্ন পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বা'র করে একখানা তার থেকে নিয়ে দুলির দিকে ছুঁড়ে দিল। পুনরায় বললে, মেয়েটা ঘুমিয়েছে দেখছি। কাল সকালে ওকে খাবার কিনে দিস।

সিধ্ন উঠে পড়ে হাঁটতে আরম্ভ করে দিল। নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে দুলি একবার হতবুদ্ধির মতো সিধুর দিকে তাকাল, তারপর খপ্ করে সেই ঘুমন্ত মেয়েটাকে তুলে নিয়ে সিধুর পিছু পিছু চলল।

নানা পথ দিয়ে এ'কে বেঁকে নানাদিক ঘুরে অবশেষে সিধ্ন শ্মশানঘাটায় এসে পৌঁছল। সাঁ সাঁ করছে গভীর রাত। শেষ চিতাগ্নি থেকে ভিজা কাঠের ধোঁয়া উঠছে একদিকে। শ্মশানের চর দু'চারজন এখানে ওখানে ঘুরছে। অনেকদিন পরে সিধ্ন আবার তার পরিচিত জায়গায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে এমন একটা নিরিবিলি কোণ খুঁজছিল যেখানে পরম শান্তিতে সে দু'চারদিন চোখ বুজে পড়ে থাকতে পারে। লক্ষ্য ক'রে দেখল, তার পরিচিত সেই ছায়াচ্ছন্ন আস্তানাটা দখল করে রয়েছে অন্য লোক।

দেখতে দেখতে হঠাৎ সৃষ্টি যেন রসাতলে চলল। গ্রহটা ছিটকে গিয়ে মাথা ঠুকল অন্য উপগ্রহে। উপরের মহাশূন্যটা সহসা পায়ের নীচে নেমে কোথায় যেন অতল অকূলে তলিয়ে যাচ্ছে। শ্মশানঘাটাটা ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল। সিধ্ন বসে পড়ে বমি করল এবং সেখানেই কাত হল। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গীর্ণ হচ্ছে যেন রক্তিম তরল অগ্নিস্রাব।

সিধ্ন বোধ হয় চেতনা হারাল, কারণ গা তার পুড়ে যাচ্ছিল জ্বরে। তবে আশ্বাসের কথা এই, সামনেই ধিকিধিকি চিতার আগুন জ্বলছে। অন্তিম ঘনিয়ে এলেও তাকে নিয়ে সমস্যা কিছু নেই।

শ্মশানের সেই ছায়ান্ধকারে এক প্রেতিনী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে এসে সিধুর কাছে দাঁড়াল। কাছাকাছি কেউ নেই, কেউ দেখছে না এদিকে। প্রেতিনী উবু হয়ে বসল, সিধুর জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কি যেন নাড়াচাড়া করল, তারপর হাতের মুঠো আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু অন্ধকারে কিছুদূরে বসে একজন লক্ষ্য করছিল অনেকক্ষণ থেকে। সন্দেহক্রমে সে এবার কাছে এগিয়ে এল। লোকটা সংসারহারা সাধুর মতো। হেঁট হয়ে বসে রোগীর গা ঠেলে ডাকল, সিধু, ও সিধু?

অর্ধচেতন নিমীলিত চোখে সিধ্ন সাড়া দিল, কে?

আমি সুরেন। এ কি হয়েছে তোমার?

কই, কিছু না! বেশ আছি।

সমস্ত ব্যাপার দেখে সুরেনবাবু আর্তনাদ করে বললেন, তুমি কি মরতে চাও? বেঘোরে মরবে কি জন্যে, সিধু?

অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে সিধ্ন চুপিচুপি বললে, কই না, মরতে চাইব কেন?

পিছনদিকে একবার তাকিয়ে সুরেনবাবু বললেন, একটা মেয়েছেলে তোমার পকেট হাতড়ে কি যেন নিয়ে গেল! টাকাকড়ি ছিল কিছু?

সিধ্ন ক্ষীণ হাসি হাসল। শুধু বললে, যাকগে।

কিন্তু অমানিশার তৃতীয় প্রহরে এত বড় রোগীর জন্য কিছুই করা যায় না। সুরেনবাবু নিরুপায় কণ্ঠে এবার বললেন, তোমাকে দেখবার কি কেউ ছিল না? তিনি গেলেন কোথায়?—তোমার সেই ঠাকুরদি?

সিধ্ন জবাব দেবার চেষ্টা পেল, কিন্তু পারল না।

সুরেনবাবু সিধুকে ভাল করে শোওয়ালেন। জল এনে মুখে দিলেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তিনি ত ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার 'তিনি' কে হন, সিধু?

সিধুর কণ্ঠে কেবল একটি শব্দ স্ফুরিত হল,—মনিব!

(ক্রমশ)




### সম্প্রদায় প্রবর্তক

বিগত চার'শ বৎসরের উত্তর ভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্তগত ধারা আলোচনা করার সময়ে একটা অদ্ভুত কথা আমাদের মনকে মাঝে মাঝে অভিভূত করে'। যথা—তানসেন অসাধারণ প্রতিভাশালী গায়ক ছিলেন অথচ তাঁর গানের তুলনামূলক সমালোচনা করার যোগ্য প্রমাণ বা মাপকাঠি নেই আমাদের হাতে। তানসেন 'বনগাঁয়ে শিয়াল-রাজা' ছিলেন এমন আপত্তি বা সন্দেহের হেতু নেই। অতএব তানসেনকে অদ্ভুত ভাগ্যশালী ব্যক্তি মনে করা ছাড়া উপায় নেই। গত পাঁচ'শ বৎসরে কমপক্ষে পাঁচ শ' কৃতকর্মা গায়ক হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এ'দের ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, গজল, দাদরা প্রভৃতি সব রকম গানের শিল্পীরা শ্রোতাদের মনোহরণ করে গিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই, যশ-খ্যাতিও লাভ করে থাকবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তানসেনের নাম এখনও পর্যন্ত সকলের উঁচুতে রয়েছে। তানসেনের যশোভাগ্যেরও বুঝি তুলনা নেই!

কিন্তু যশ বা ভাগ্যের এমন কোনও নিজস্ব শক্তি নেই, যা দিয়ে শিল্প জগতে বা সংগীত জগতে শিল্প প্রতিভা বা শিল্প স্রষ্টার নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে। যে নাম কিছু কালের জন্য প্রচার কৌশল দিয়ে বড় করে রাখা যায়, সে নামও অবলুপ্ত হয়ে যায় কালের নিরপেক্ষ নির্মম সমালোচনার মানদণ্ডে। সেরকমের নামে চিত্র বা মর্মর প্রতিমূর্তি থেকে গেলেও সেই চিত্র বা মূর্তি কালক্রমে মাত্র কৌতূহলেরই বিষয় হয়ে পড়ে। কৌতূহলও বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায় নামনামী থেকে চিত্র-মূর্তির শিল্পকারের দিকে। সকলের শেষে মহেঞ্জোদাড়োর মতো পরিণাম!

যশ বা ভাগ্য থেকেও বড় হল কীর্তি। তানসেনের কীর্তি অক্ষয় আছে বলেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর যশোভাগ্যের মূল্যমান নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু তাঁর কর্ম ও কীর্তির মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে, গত চারশ বৎসরের সমালোচনা দৃষ্টিতে। তানসেনের বংশেই বিশিষ্ট সমালোচকবৃন্দ আবির্ভূত হয়েছেন। ক্রমশ সমালোচক শিষ্যবর্গও দেখা দিয়েছেন যুগে যুগে। এখনও সমালোচনা স্তব্ধ হয়নি বলেই তানসেন এখনও জীবিত রয়েছেন। যশ বা ভাগ্য সমালোচনার বিষয় নয়। একমাত্র কীর্তিই হল যুগে যুগে সমালোচনার বিষয়। আশ্চর্য এই যে, তানসেনের কোনও আধুনিক বংশধর এখন তানসেনের কীর্তির সমালোচনা করেন না। শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ এবং বিশেষজ্ঞ শ্রোতারাই এখন কীর্তি সমালোচনার কর্তব্য গ্রহণ করেছেন। কারণ তানসেনের কীর্তি এখন সর্ব হৃদয়জনের মানসিক সম্পত্তি হয়ে পড়েছে। এই হল শিল্প-প্রতিভার চরম কাম্য ফল, শিল্পকীর্তির চরম অবদান।

তানসেন কয়েকটি অভিনব রাগ রচনা করেছিলেন, অর্থাৎ ধ্রুবপদ গানের স্থায়ী সঞ্চারী দিয়ে সেই অভিনব রাগগুলিকে এমনভাবে মূর্ত করেছিলেন যে, তাদের গঠন-ভঙ্গি ও সৌন্দর্য আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যথা—মিয়াঁ কি কানড়া বা দরবারী কানড়া, মিয়াঁকি টোড়ি, মিয়াঁকি মল্লার, মিয়াঁকি সারেঙ্গ, মিয়াঁকি জয়-জয়ন্তী নূতন রকমের স্বরবিন্যাস করে নূতন রাগ-রূপ রচনা করা কঠিন নয়। বেশী কথা কি—একটি পিয়ানো বোর্ডের ওপরে একটি নেংটে ইঁদুর যদি প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য লাফ-ঝাঁপ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে সপ্তাহে সম্ভব পক্ষে সাতটি করে নূতন রাগ রচনা করে ফেলতে পারে! তবে তানসেনের রাগরূপ রচনা আর নেংটে ইঁদুরের রাগ-রূপ রচনায় কিছু পার্থক্য আছে! পার্থক্য আছে বলেই সমালোচকেরা তানসেনের প্রতিভা ও কীর্তির প্রসংশা করেন, নেংটে ইঁদুরের রহস্য-চাপল্যের দিকে ফিরেও দেখেন না। আমি সাক্ষাৎ নেংটে ইঁদুরের কীর্তি প্রত্যক্ষ করেছি বলেই একথা বলছি। ইচ্ছা আছে 'ভুতুড়ে পিয়ানো' নামে একটা রোমাঞ্চকর গল্প লিখব। কিন্তু সেকথা থাক।

তানসেনের বহু পূর্ব কাল থেকেই বহু রাগ রচিত হয়েছে। রচনাকারীর নাম পাওয়া যায় না। বহু রাগ বিলুপ্তও হয়ে গিয়েছে। তানসেনের কিছু পূর্বে গুণী গায়কেরা কিছু কিছু অভিনব রাগে ধ্রুবপদ গান রচনার প্রয়াস করেছিলেন। তানসেনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে ধ্রুবপদ গায়ক, তন্ত্রকার ও খেয়াল শিল্পীরা অনেক অভিনব রাগকে রূপায়িত করার প্রয়াস করে এসেছেন। এ সকলের মধ্যে রচনাকারীর নামযুক্ত রাগনাম অতি অল্প। যথা—হরিদাসী মল্লার, জাজ মল্লার, ধোঁধিকি মল্লার, রামদাসী মল্লার, চুজ্জুকি মল্লার, সুরদাসী মল্লার, মীরাবাঈকি মল্লার, হোসেনী কানড়া, নায়কি কানড়া। এ সমস্ত হল 'নামী' রাগ; অন্য সমস্তই বেনামী রাগ। নামী হক বা বেনামী হক, প্রথম কথা এই যে, কোন কোন রাগে কতগুলি ভাল ধ্রুবপদ হয়েছে বা প্রচলিত রয়েছে দেখা উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, নামী বা

যেনামী রাগের ভাল ধ্রুবপদের মধ্যে তানসেনের রচিত গান আর অন্যদের রচিত গানের সংখ্যাগত তুলনা কি রকম দাঁড়ায়।

তুলনা করলেই দেখা যাবে, তানসেনের কীর্তি অপর সকলের থেকে বড়। যথা হরিদাসী মল্লার ও হরিদাসী-সারঙ্গের রচয়িতা মাত্র দু'টি অভিনব রাগ রচনা করেছেন; ঐ দুই রাগে বড় জোর দু'খানি ধ্রুবপদ রচনা করেছেন এবং অন্যান্য রাগে সেই রচনাকর্তা কতগুলি ধ্রুবপদ রচনা করেছেন তার কোনও নির্ভরযোগ্য নিদর্শন, ইতিবৃত্ত বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই রকম বিচারে দেখা যায়, জাজু, ধোঁদি, রামদাস, ছজ্জু, সুরদাস প্রভৃতি রচয়িতাগণ প্রত্যেকে পরস্পরের তুল্য-কীর্তি। কিন্তু—তানসেন স্বয়ং কমপক্ষে সত্তরটি ধ্রুবপদ গান রচনা করেছেন, এবং কমপক্ষে পঞ্চাশটি বিভিন্ন রাগে গান বেঁধে প্রকাশ্যভাবে গান করিছেন। ইতিবৃত্তকারদের কথায় আস্থা রেখে বলা যায়—পূর্বপ্রচলিত ও অভিনব এক'শ আট রাগে কমপক্ষে এক'শ আটটি "সেনী" ধ্রুবপদ বা ঘরের গোপনীয় ধ্রুবপদ গান তানসেন রচনা করে দিয়েছিলেন তাঁর ছেলেদের উপকারের উদ্দেশ্যে। যেরকম দিক দিয়েই বিচার করা যাক্, রচয়িতা হিসাবে তানসেনের নিকট-তুল্য অপর কোনও গুণীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য বৈজু-বাওরার নামে, গোপাল নায়কের নামে ও পরবর্তীকালে শ্রীআনন্দ-কিশোরজীর নামে কিছুসংখ্যক ধ্রুবপদ পাওয়া যায়। তবুও সকলের সম্মিলিত সংখ্যাও তানসেন-রচিত ধ্রুবপদের সংখ্যার নিকটে যায় না। এ সকলের সঙ্গে বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ গুণী যদু ভট্টের রচিত ধ্রুবপদ গানের সংখ্যা যোগ করলে তানসেন-রচিত ধ্রুবপদের সংখ্যার কিছু নিকটে পৌঁছান যায়।

স্বীকার করা যাক—একক তানসেনের রচিত ধ্রুবপদের সংখ্যা থেকে অপর সকলের সম্মিলিত রচনা-সংখ্যা অধিকতর। তাহলেও আমার মনে হয়, তানসেনকে আমি "অভ্যুদয়-কেশরী" বলে বিশেষিত করে অতিরঞ্জিত কিছু মন্তব্য করিনি। কারণ, তানসেন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন, সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছেন, এবং নিজের ঘরের ও অপরাপর বাইরের ঘরের শত শত সংগীত-পিপাসুকে গান ও রাগের প্রতি উন্মুখ করে গিয়েছেন। অধিকন্তু — অপরাপর ধ্রুবপদ-রচয়িতাদের দৃষ্টিতে তানসেন ও তাঁর রচনা যে আদর্শ ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অপরাপর ধ্রুবপদ-রচয়িতা গুণীরা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেননি তার প্রধান কারণ তানসেনীয় ধ্রুবপদ ও আলাপের সম্প্রদায়ই আদর্শ ও উৎকৃষ্ট বলে এঁরা যুগের পর যুগ স্বীকার করে এসেছেন এবং অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন দেখা দেয়নি এ পর্যন্ত।

বলাই বাহুল্য—সম্প্রদায় অর্থ "ঘরানা" নয়, বা দল বা গোষ্ঠীও নয়। সম্প্রদায় অর্থ ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের, বা শিল্প-বিজ্ঞানের বা দার্শনিক বিজ্ঞানের সমষ্টি-রূপ, ধারা-প্রবাহ বা ঐতিহ্য।

সুপ্রাচীনকালে উত্তর-ভারতে নারদ নন্দিকেশ্বর ও ভরত বিশিষ্ট ও বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেছিলেন বলেই সহস্র সহস্র বৎসর পরেও তাঁদের নাম স্মরণীয় রয়েছে। এঁরা সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে খ্যাত। নারদ গান্ধর্ব-সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন; অর্থাৎ গীত-বাদ্য ও নৃত্যের বিশিষ্ট একরকমের ধারার প্রবর্তক ছিলেন নারদ। নন্দিকেশ্বরই সর্বপ্রথমে স্বর-সপ্তককে ব্যবহারযোগ্য দ্বাদশ-স্বর মূর্ছনায় রূপায়িত করে "রাগ"-বিজ্ঞান পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন; অর্থাৎ আজ আমরা যে বারো সুরের বিন্যাস আশ্রয় করে রাগ-রূপের চর্চা করছি, সেই "বারো-সুর" বিন্যাসের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক ছিলেন নন্দিকেশ্বর। নারদীয় গান্ধর্বে ছিল সাত-সুর ও বাইস-শ্রুতি। নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় "সাত-সুর বাইস্-শ্রুতি" ব্যবহার ত্যাগ করে বারোটি সুর গ্রহণ করেছিলেন তত্ত্ব ও ব্যবহার দুই দিক দিয়ে। মহামুনি ভরত নাট্য-সম্প্রদায় ও অঙ্গহার-নৃত্ত সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন; কাব্য-নাট্যগত অলংকার-শাস্ত্রের অবিনাশী ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন; এবং "বাদিত্র" অর্থ সম্মিলিত যন্ত্রবাদন সংগীতের (যাকে আমরা অর্কেস্ট্রা বলতে অভ্যস্ত) ব্যবহারিক বিজ্ঞান-পদ্ধতি প্রবর্তিত করেছিলেন। সমগ্রত বা বিভিন্নভাবে সেই নারদ-নন্দিকেশ্বর-ভরতের সাম্প্রদায়িক ধারা অনুসরণ ও অনুগমন করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাস্ত্রকারেরা যার যেমন দৃষ্টিশক্তি তাই দিয়ে বহু গ্রন্থ বা ব্যাখ্যা-শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। মধ্যযুগ পর্যন্ত কালে নারদ-নন্দিকেশ্বর-ভরতের অতিরিক্ত কোনও চতুর্থ সম্প্রদায়-প্রবর্তক স্বীকৃত হতে দেখিনে। অপরাপর যে সকল নাম পাওয়া যায়, যথা মতঙ্গ, কশ্যপ, যাষ্টিক, শার্দুল প্রভৃতি ব্যাখ্যাকর্তা, তাঁরা সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলে গণ্য হননি, কিন্তু বিশিষ্ট মতের ধারক বা ব্যাখ্যাকর্তা বলে সমাদৃত হয়েছিলেন। 'মত' অর্থ মূলে সম্প্রদায়ের শাখাগত মত-বিবেক।

যুগে যুগে শিল্প-বিজ্ঞান ও ব্যবহারের ভিন্নমুখী প্রয়োজন ও উন্নতি যখন যখন কাম্য বলে মনে হয়েছে তখন তখনই অভ্যুদয় দেখা দিয়েছে; তরঙ্গ-ন্যায়ে। অভ্যুদয়ের মহতী প্রেরণার বশে আবির্ভূত হয়েছেন সম্প্রদায় প্রবর্তক। সম্প্রদায়-প্রবর্তক কখনও দেশ-কাল-প্রয়োজনের নিরপেক্ষ হয়ে দেখা দেননি। সম্প্রদায়-প্রবর্তক অথবা প্রতিভা কখনও সৃষ্টি-ছাড়া উদ্ভট মহামানবরূপে দেখা দেন না।

এরকমের দৃষ্টি দিয়ে তানসেনকে সম্প্রদায়-প্রবর্তক মহাপুরুষ মনে করতে আপত্তি নেই। মধ্যযুগে নন্দিকেশ্বর প্রবর্তিত রাগ-বিজ্ঞান সম্প্রদায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষীণ-ধারায় গম্যমান ছিল। "সংগীত-রত্নাকর" প্রণয়নের যুগে ভারত-পারসিক রাগ-বিবেক উদ্ভূত হয়েছিল। খৃঃ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ

শতাব্দীর কালে একটি সম্মিলিত ধ্রুবপদ-গান ও রাগালাপের ধারা দোষ-ত্রুটি সমেত পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই দুটি শিল্প-প্রচেষ্টার প্রেরণায় তত্ত্ব ও ব্যবহারের দিকে উন্নতি বা উৎকর্ষের প্রয়োজন-বোধ দেখা দিয়েছিল। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে তানসেন আবির্ভূত হলেন। তাঁর হৃদয়ে কিভাবে কেমন করে প্রেরণা-অনুপ্রেরণা দেখা দিল কেউ বলতে পারে না। কিন্তু—ফলিতভাবে কর্ম দেখা দিল ধ্রুবপদ গানের রূপে, ধ্রুবপদ বিদ্যার অনুশীলনায়, এবং রাগ-বিদ্যার অভিনব অনুশীলনার রূপে। পূর্ব-প্রচলিত লোকায়ত বা এম্পিরিক্যাল রূপ ও পদ্ধতিকে গ্রহণ করে তানসেন স্বকীয় বুদ্ধি দিয়ে ঠাট্-পরিভাষা মার্জিত করেছিলেন, রাগ-বিদ্যাকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, রাগ-রূপের আদর্শ তৈরী করে দিয়েছিলেন ধ্রুবপদ-গানের ফ্রেমে-বাঁধা, ছবির মতো করে। এরকমে অদ্ভুত কার্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ তখন ছিল না; থাকলে তাঁর নামও থাকত।

সম্প্রদায় শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করছি, সেনী ঘরের গুণী ও শিষ্যবর্গ সেই অর্থেই "তালিম-কানুন" ব্যবহার করেছেন। এই শব্দ দুটি ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব এবং ওস্তাদ করামৎউল্লা খাঁ সাহেব (সরোদ-বাদক) বহুল ব্যবহার করতেন। তাঁদের মুখের বুলিই ছিল "সেনী ঘরাণার তালিম-কানুন।" সেনী ঘরাণা অর্থাৎ তানসেনের বংশজ গুণীবৃন্দ এবং এঁদের বংশাতিরিক্ত শিষ্যবৃন্দ। তালিম-কানুন অর্থ নিয়মানুগ বিদ্যা ও অভ্যাস। বিনা নিয়মে বিদ্যা হয় না, বিনা অভ্যাসে বিদ্যা সুরক্ষিত থাকতে পারে না। সুতরাং নিয়ম ও অভ্যাসে, অর্থাৎ কানুন ও তালিম দিয়ে বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। বিদ্যা ও নিয়ম গঠন-রচনার যোগ্য বুদ্ধিমান পুরুষ বিদ্যা ও নিয়ম উদ্ভাবিত করেন; যে কোনও শিল্পকার বিদ্যা ও নিয়ম গঠন-রচনা করতে পারেন না। একমাত্র তানসেন সেনীঘরের তালিম-কানুন প্রবর্তিত করে দিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত সেই তালিম-কানুন পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন দেখা দেয়নি, এই হল ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব প্রমুখ গুণীদের কথা। বস্তুত, পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন হয়েছে কিনা, একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যিনি তালিম-এবং যিনি বর্তমান বিষয়ের বস্তুগত রূপও জানেন। যেহেতু জগৎ পরিবর্তনশীল, অতএব নিয়ম-বিদ্যা সব কিছুই পরিবর্তনশীল, অতএব তানসেন প্রবর্তিত নিয়ম এযুগে চলতেই পারে না, ইত্যাদি রকমের ঘুড়ি-ওড়ান যুক্তিশাস্ত্র সেকালের গুণীরা মানতেন না। ঘুড়ি-ওড়ান যুক্তি অর্থাৎ যেদিকে হাওয়া সেইদিকে ঘুড়ি; যেদিকে লোক-রুচি সেইদিকেই গুণীরা শিল্পের ঘুড়ি ওড়াবেন, লোক-রুচিকে তোষণ করার জন্য।

অভ্যুদয়-কেশরী মিয়াঁ তানসেন মাত্র প্রতিভার কারণে খ্যাত-যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু খ্যাতি বা যশ দিয়ে সম্প্রদায়-বিদ্যা নির্মাণ করা যায় না। গীত বাদ্য বা নৃত্যের প্রতিভা দেখা দিলেই যে সেই প্রতিভার সাহায্যে সম্প্রদায়-বিদ্যা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও নেই। মিয়াঁ তানসেন মেধা ও ব্যবহারিক বুদ্ধির বলেই ধ্রুবপদ ও রাগালাপের সম্প্রদায়-বিদ্যা সৃষ্টি করেছিলেন ও পরিমার্জিত করেছিলেন। এবং অভ্যুদয়-কেশরী তানসেন সেই বিদ্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তানসেন নিজ সন্তানদের ক্ষমতা বুঝে সেই বিদ্যা দান করে গিয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ শিল্প-বিদ্যার ক্ষেত্রে নিজ সন্তানই যোগ্য শিষ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিষ্যই সন্তানের স্থান গ্রহণ করে গুরুদত্ত বিদ্যা-সম্পদের যথার্থ উত্তরাধিকার লাভ করে। তানসেন জগৎকে বিদ্যা-দান না করে সন্তান-জামাতাকে বিদ্যা-দান করেছিলেন, এমন কথা বললে তানসেনের অপবাদ হয় না। কারণ,—সঙ্গীতের সম্প্রদায়-বিদ্যা মূলে শিল্প-বিদ্যা। শিল্প-বিদ্যায় সন্তানের স্থান সর্বোচ্চে থাকে।

তানসেন প্রবর্তিত সম্প্রদায়-বিদ্যার সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা সকলের দৃষ্টি বা সমালোচনার অধিকারে আসা উচিত এরকম আশা করা অন্যায়। তবে, সেই বিদ্যার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অথচ সুপ্রচলিত একটি অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গানের পদ-সজ্জার মধ্যে "স্থায়ী-অন্তরা", ও "সঞ্চারি-ভোগ-আভোগ" বিভাগ করার পদ্ধতি মূলে তানসেনেরই পরিকল্পনা-পদ্ধতিরূপে দেখা দিয়েছিল। তানসেনের মৃত্যুর পর তিন শ বৎসর অতিবাহিত হতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের যাবতীয় গীত-কার জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে তানসেনের তৈরী ছক বা নক্সা-বন্দ দিয়ে গীত রচনা করে এসেছেন। একালে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, রজনী সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এবং অসংখ্য নাট্য-গীতিকার ঐ ছক ত্যাগ করতে পারেন নি অথবা—ছকের ক্রম-পর্যায়কে বিপর্যস্ত করতে পারেন নি! যাঁরা "আর্ট-ফর-আর্টস্ সেক্" বুলি কপচে কারুশিল্পের রচনার উচ্ছৃঙ্খলতা দোষকে বা অশিক্ষিত-পটু ব্যবহারকে ঢাকতে চেষ্টা করেন, যাঁরা অক্ষমতা-জনিত বিকারকে শিল্পীর স্বাধীনতা মতবাদ দিয়ে আপামর-সাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, তাঁরা তানসেন-প্রবর্তিত ছকের অদ্ভুত প্রসারের কথাটা ভেবে দেখতে পারেন।

ক্রমশ

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু নাকি নির্দেশ দিয়াছেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজভবনে যে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হইবে না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"যদ্দুর মনে পড়ে, গেল বছরে এই অনুষ্ঠানে "পান-ভাজা" পরিবেশন করা হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম, এবারে "চুন-চচ্চড়ি" গোছের কোন নতুন-রান্নার খবর পাবো"!

• • •

বোম্বাই সরকারের এক বিবৃতিতে জানা গেল যে, খাদ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ভাত বা চাউলের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে



তাহা একদিনের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইবে।—"তাহলে ভাত থেকে প্রস্তুত 'সে-দ্রব্যটির' কী হবে, একদিনের জন্য বিধিনিষেধ উঠে যাবে কি"—জড়িতকণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করলেন।

• • •

"নবদ্বীপে খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ" —একটি সংবাদ। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"খাদ্যের ব্যাপারে শান্তিপুরে যখন ডুবু ডুবু তখন নদে ভেসে যাবেই"!

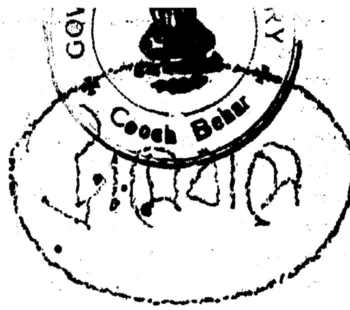
• • •

কয়েকজন পত্রপ্রেরক জানাইয়াছেন—গত দুই মাস যাবৎ চাউলের বাজার দর ২৮, হইতে ৩০, টাকায় উঠিয়াছে। বর্তমান সরকার গ্রামীণ উন্নয়নে সচেষ্ট। কিন্তু কাহার জন্য এ উন্নয়ন? তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বিশুখুড়ো বলিলেন—"জানি, কিন্তু বলব না"!!

• • •

অন্য এক পত্রপ্রেরক প্রশ্ন করিয়াছেন—ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল বলা হয়। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল কে, ছাত্র না অভিভাবক। প্রসঙ্গত তিনি পৌরপিতাদের মেছোহাটা মার্কা সভার উল্লেখ করেন।—"কিন্তু পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ—এ কি বেয়াড়া প্রশ্ন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •




"বিশ্ব কোন্ পথে"—একটি সম্পাদকীয় প্রশ্ন।—"উত্তর অতি সহজ—কেওড়াতলা বা নিমতলার পথে"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

অভিযোগে প্রকাশ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবেদীর অনির্বাণ অগ্নিশিখাবাহী যন্ত্রটি কে বা কাহারা ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে।—"এসব কুল-কুলাঙ্গারদের ধিক্কার দেবার ভাষা নেই, সুতরাং আমরা নিতান্ত অসহায় হয়েই শুধু স্মরণ করছি—ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি, হয়ত বাতি জ্বলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না"।

• • •

মেদিনীপুরে "বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির"টি নাকি অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।—"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন ব্যক্তি খুব নিন্দে করেন। কথাটা তাঁর কানে তোলায় তিনি নাকি বলেছিলেন—কিন্তু আমি তো তাঁর কোন উপকার করিনি। এক্ষেত্রেও তাঁর উপকারের কথা স্মরণ করেই হয়ত স্মৃতি-মন্দিরটিকে এই অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসনের অবসানের সম্ভাবনা, নতুন মন্ত্রিসভা অচিরেই প্রদেশের



শাসনরজ্জু গ্রহণ করিবেন। শ্যামলাল বলিল,—"কিন্তু দড়ি নিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অন্য মন্ত্রিসভা হয়ত কলসী নিয়ে এসে হাজির হবেন"!!

• • •

সীমান্তে যখন-তখন গুলীবর্ষণ প্রসঙ্গে সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন—পাকিস্তানী হস্ত কণ্ডূয়ন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না।—"হবে কী করে; এতো সাধারণ চুলকানি নয়, সাংঘাতিক দাদ, কণ্ডু-দাবানল ছাড়া আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতে ছুটির দিনের সংখ্যা খুব বেশী।—"অন্যান্য প্রদেশের কথা জানিনে। বাংলার দিক থেকে বলতে পারি, বেশী ছুটি আমরা চাইনে। তবে পুজো নয়, নিরঞ্জনের ভূত-নাচে আর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিনে ছুটি হলে আমাদের আর বলার কিছু নেই"—বল্লেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীরামপুর অঞ্চলে এক প্রাচীন মন্দিরে নাকি একটি সাত ফণাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড গোক্ষুর সাপ দেখা দিয়াছে। অনেকেই সেই সাপ দেখিতে যাইতেছেন। শ্যামলাল বলিল, —"এ আর এমন কি তাঁরা দেখলেন, সাপের পাঁচ পা তো তাঁরা দেখেন নি"!

• • •

আলিপুর চিড়িয়াখানায় মৃত একটি জিরাফের ফটো তুলিয়াছিলেন এই অপরাধে নাকি ফটোগ্রাফারকে ধরিয়া মারধর করা হয় ও অনেকক্ষণ আটক করিয়া রাখা হয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাই তো বলি, চিড়িয়াখানায় গেলে শুধু জানোয়ার নয়, জা-নর ("রূপদর্শী" ক্ষমা করবেন) থেকেও সাবধান থাকা দরকার"!!

• • •

সংবাদে শুনিলাম, সম্প্রতি একটি বানরবাহী মার্কিন বেলুন শূন্যলোকে প্রেরণ করা হইয়াছে।—"অতঃপর বা-নরবাহী বেলুন কবে আকাশে উঠবে সেই কথাই ভাবছি"—বল্লে আমাদের শ্যামলাল।

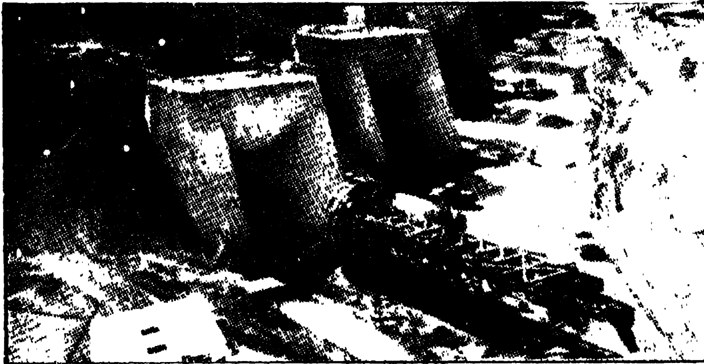
• • •

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম, বন্দী স্বামীদের মুক্তির দাবীতে একদল মহিলা কোন এক বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করেন। স্বামীরা সবাই সৈনিক। সরকার-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁদের কারাদণ্ড হয়।—"স্ত্রীদের সর্ব-স্বত্ব-সংরক্ষিত কারাগারে না থেকে কেন তাঁরা সরকারী কারাগারে থাকবেন এই হয়ত মহিলাদের বিক্ষোভের কারণ। স্বামীদের পক্ষে রাম আর রাবণের কারাগার দুই-ই অবশ্য সমান"—বল্লেন বিশুখুড়ো।




চক্রদত্ত

আজকের দিনে বাঁধ পরিকল্পনা এক জগতব্যাপী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই নদীর জল বেঁধে অন্য কাজে লাগানর ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক জায়গায় বাঁধ তৈরীর জন্য মাটির তলা ফুঁড়ে জল চলাচলের রাস্তা তৈরী করতে হয় এবং এসব ক্ষেত্রে মাটির নীচে দিয়ে টানেল কাটতে হয়। আগের দিনের মত ডিনামাইটের সাহায্যে টানেল তৈরী না করে আজকাল নতুন ব্যবস্থানুযায়ী টানেল তৈরী করলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে যায়। আগে যেখানে ঘণ্টায় এক কিংবা দুই ফুট টানেল



টানেল কাটার নতুন যন্ত্র



যন্ত্রটির সামনের দিক

কাটা যেতো, এখন নতুন যন্ত্র দিয়ে সেখানে এক ঘণ্টায় ছয় থেকে আট ফুট টানেল তৈরী হয়। এই যন্ত্র দিয়ে ছয়টি বিশ ফুট চওড়া এবং ৩৫০০ ফুট লম্বা বন্যা নিরোধকারী যন্ত্র তৈরী হয়েছে।

*

রাশিয়াতে যে নতুন হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনটির সেদিন উদ্বোধন হলো সেটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাওয়ার স্টেশন। ভলগা নদীর ধারে এটি প্রথম শুরু হয়েছিল সাত বছর আগে। ১৯৫০ সালে এখান থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছিল আর এই কয় বছরের মধ্যেই কয়েক কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছে। বর্তমানে এই পাওয়ার স্টেশনটি বিশটি টারবো জেনারেটরের সাহায্যে চলছে। সমস্ত পাওয়ার হাউসের যন্ত্রপাতিগুলি চালু রাখার জন্য মাত্র চারজন ইঞ্জিনীয়ার দরকার। এখন এই পাওয়ার স্টেশনটি থেকে ২১০০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী করা যাবে। এই স্টেশন থেকে ৫৬০ মাইল দূর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। পাওয়ার স্টেশনটি তৈরী করার জন্য ৫৮০ জন কর্মীর সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল সোভিয়েট য়ুনিয়ন থেকে, তাদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

*

গ্রামোফোন, রেডিও এবং রেডিওগ্রাম ইত্যাদি যুগে ছাড়িয়ে এখন আমরা প্রায় টেলিভিশনের যুগে এসে পড়েছি। আমেরিকায় আজকাল টেলিভিশনের সাহায্যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এতদিন কলেজেই চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্যবস্থা স্কুলে এবং আরও নানারকম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও বিশেষ কার্যকরী হয়। এদেশে এখন খুব কম করলে বিভিন্ন কলেজের বিভিন্নরকম কোর্সের পড়াশোনা গত পাঁচ বছর ধরে টেলিভিশনের সাহায্যে পড়ানো হচ্ছে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হয়েছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া পদ্ধতির প্রবর্তক বলা যায়। ক্লিভল্যান্ড য়ুনিভার্সিটিতে টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার একটি বিভিন্ন অংশ তৈরী হয়ে গেছে এবং এই অংশের নাম টেলিকোর্স দেওয়া হয়েছে। যদিও স্নাতক ছাত্রদের পড়ানোর জন্য টেলিভিশন পদ্ধতির প্রচলন হয়নি কিন্তু ডাক্তারি, ওকালতি এবং কমার্সের পড়াশোনা টেলিভিশনের সাহায্যে করার ব্যবস্থা করেছেন।

*

জিওফিসিক্যাল ইয়ারের বাৎসরিক কর্মতালিকার মধ্যে বিষুব মণ্ডলের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের খোঁজ রাখা অন্যতম কাজ। এই কারণে ভূ-তত্ত্ববিদ্ য়ুগেন্ডা বেলজিয়ম-কঙ্গো সীমানায় রুয়েঞ্জরী পর্বতে অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তারা একটি ১৭০০০ ফুট উঁচু হিমবাহতে পৌঁছান। তারা লক্ষ্য করে দেখেন যে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রুয়েঞ্জরী পর্বতমালার তুষার অনেক গলে গেছে এবং হিমবাহর চূড়ার তুষার যেরকম গলা উচিত তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি গলছে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, এই পাহাড়ের বরফগুলি আল্পাইন বা সুমেরু প্রদেশের বরফের চেয়ে অনেক কঠিন। ঐসব বৈজ্ঞানিকের মতে বিষুব রেখার নিকটবর্তী বলে অত্যধিক গরমের জন্য এদের ওপরে একটা শক্ত কোষ তৈরী হয়। এই বরফগুলির মধ্যে গর্ত করার জন্য নিজেদের দেশ থেকে অনেকরকম যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে বরফের মধ্যে গর্ত করে তথাকার আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করার উপযোগী নানারকম জিনিসপত্র পুঁতে রেখে এসেছেন এবং ছয় মাস অন্তর গিয়ে ঐ জিনিসপত্রের দ্বারা বুঝে নেবেন যে, কী অনুপাতে বরফ গলে এবং তাপমাত্রা কী আন্দাজে বাড়ে ও কমে।

*

রাশিয়ার কুমেরু অভিযাত্রী বৈজ্ঞানিকগণ ঐ স্থানে পৃথিবীর সর্বনিম্ন তাপ পরিলক্ষণ করেছেন। সেই তাপমাত্রা ৮৪·৩° সেণ্টিগ্রেড অথবা ১১৯·৭° ডিগ্রী ফারেনহাইট। এর আগে ৮৩° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বা ১১৭·৪° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা এখানে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

## আত্মস্মৃতি

জী... ...পাতা—সরলা দেবী। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড। কলকাতা ৯। দাম ৪ টাকা।

"জীবনের ঝরাপাতা" সরলা দেবীর জীবন কথা। লেখিকা বলেছেন, "ঝরা হলেও মরা হয়নি সে পাতাগুলি, মানব প্রাণের সংস্পর্শে চির প্রাণবন্ত হয়ে আছে।...যাঁদের সংযোগে মূল্যহীন জীবনের মূল্য, এ-জীবন কাহিনীর পর্বে পর্বে তাঁরাই আছেন ফুটে।" বস্তুত গ্রন্থটি সম্পর্কে সার কথা এই ক'টি ছত্রেই পরিস্ফুট।

সরলা দেবীর জীবন অবশ্য মূল্যহীন নয়। ঠাকুর পরিবারের খ্যাতনামা মহিলাদের তিনি অন্যতম এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। অন্তত সে-যুগে, যখন স্বদেশী জীবনের জোয়ার এই অন্তঃপুরবাসিনীর ঘরকে 'বাহির' করেছিল। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ গোরাদের বিরুদ্ধে মোহন বাগানের খেলা জিতের খবর দিয়ে যে লিখেছিলেন "আমরা জানি এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন সরলা দেবী—বাঙলার একটি নন্দিনী" প্রকৃতই তা যথার্থ। খেলার খবর বলে নয়—জীবনের সব খেলাতেই বাঙালী জিতলে যিনি খুশী হতেন তিনি সরলা দেবী। সম্ভবত সরলা দেবীর স্বাদেশিকতা বোধ এবং স্বজাতি প্রীতি তাঁর গুণাবলীর শীর্ষে স্থান পেতে পারে। একদা কোনো বড় ব্যারিস্টার লাটের সরলা দেবীর মুখে 'বন্দে মাতরম' গান শুনে তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, তিনি বাঙলার লাট হলে সরলা দেবীর বিরুদ্ধে externment order জারী করতেন, কেননা তাহলে "বাঙলায় গিয়ে বাঙালী-দের মাতিয়ে তুলতে" উনি পারতেন না। বলা বাহুল্য সেকালে সরলা দেবী বাঙালীকে মাতিয়ে ছিলেন—তাঁর গানে, কর্মে, বীরাষ্টমী ব্রত পালনে, স্ত্রীমণ্ডল গঠনে এবং আরও অসংখ্য জাতীয়তামূলক কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে।

সরলা দেবীর সকল প্রেরণার মূলও স্বাদেশিকতা। সংগীতের ক্ষেত্রে বা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মূলত এই বোধ দ্বারা তিনি পরি-চালিত ছিলেন। "হিন্দুস্থান রিভিয়ু" মারফত রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করে লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতাদের প্রশংসা অর্জন অথবা 'ভারতী' সম্পাদনকালে নানাবিধ রচনা ও প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য। সাহিত্য এবং সংগীতের ক্ষেত্রেও সরলা দেবী উল্লেখ্য হয়ে থাকবেন।

"জীবনের ঝরাপাতা"র অপর উল্লেখযোগ্য গুণ সরলা দেবীর জীবন কথার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের সুন্দর সংযত চিত্র, বাঙলা ও ভারতের তদকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের খণ্ড অথচ তাৎপর্য-পূর্ণ পরিচয়।




সরলা দেবীর জীবন কাহিনীর যে পর্ব (বিবাহোত্তর জীবন কথা সংক্ষিপ্তভাবে যোগেশ-চন্দ্র বাগল লিখিত) তিনি নিজে আমাদের দিয়ে গেছেন, আশা করি সে-কাহিনী সকল বাঙালী পাঠক সাগ্রহে পড়বেন। এ কাহিনী একটি মানুষের মাত্র নয়, একটি যুগের—বাঙলার অত্যন্ত গৌরবময় পর্বের। ২২৬।৫৮

## স্মৃতিকথা

**রবীন্দ্রস্মৃতি**—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—৩৷৷৹ আনা।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখো-পাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যদের অন্যতম। প্রবীণ বয়সে তিনি রবীন্দ্র স্মৃতিকথা লিখেছেন শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে। নিজেই তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা বা তাঁর রচনার বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে সকলের সামনে ধরছি অতীত দিনের কথা......রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন পূর্ব গগনে অপরূপ আলোর আভাস জাগিয়ে মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছে......" (পৃঃ ১২)। সৌরীন্দ্র-মোহনের স্মৃতি কথায় এই সারল্য পাঠকের ভাল লাগে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, সৌরীন্দ্রমোহন নিজে যখন এক প্রকার বালক এবং রবীন্দ্রনাথ কাব্য গগনের মধ্যাহ্নে তখন থেকে কবির সঙ্গে এই নাবালক সাহিত্যিকের আলাপের সূত্রপাত। কবি জীবনের আকর্ষণীয় প্রভাবের বাইরে অবশ্য আর তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও ঘনিষ্ট পরিচয়ের সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর স্মৃতি কথায় অতি সরল ও সরসভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এই সৌভাগ্যের কাহিনী।

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রবিদ্বেষ, সবুজপত্র, বিচিত্রা আসর ও পরবর্তীকাল—প্রধানত এই যুগের কথাই "রবীন্দ্রস্মৃতিতে" পাওয়া যায়। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের পাশে পাশে মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও লেখক যথা-সম্ভব রেখে গেছেন তাঁর গ্রন্থে।

যদিচ সৌরীন্দ্রমোহন বলেছেন, রবীন্দ্র সাহিত্যের অথবা জীবনের বিশ্লেষণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়—তথাপি এই গ্রন্থে রবীন্দ্র জীবন বা সাহিত্যের বিশ্লেষণ বাদ পড়েনি। এবং বলা ভাল, খুঁটিনাটিভাবে এ-ধরনের কোনো আলোচনায় না গিয়ে লেখক সাধারণ ভাবে তাঁর মতামত যা ব্যক্ত করেছেন পাঠকের তা ভাল লাগবে।

রবীন্দ্রস্মৃতি কথার মধ্যে সে যুগের একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর পরিচয়ও এসে গেছে, যেমন ভারতী বা সবুজপত্রের কথায়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুন্দর চারিত্রিক রেখা-চিত্রও সৌরীন্দ্রমোহন সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। যেমন আদালত ভীতি। ৭১।৫৮

## ছোট গল্প

**অন্তরঙ্গ**—প্রফুল্ল রায়। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

হেমিংওয়ের ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-র পদ্মা নদীর মাঝিও

না। তবুও পদ্মা-মেঘনা পারের জীবনকে কেন্দ্র করেই লেখা ছোট গল্পের সমষ্টি এই অন্তরঙ্গ। হেমিংওয়ের মনোবিশ্লেষণ এতে নেই, মানিকবাবুর মত নেই সমাজসচেতন দৃষ্টি নিয়ে সমস্যার সমালোচনার ইঙ্গিত। আছে শুধু, গুটি কয়েক মিষ্টি মধুর কাহিনী। পদ্মা-মেঘনার সাথে যাদের কতকালের মহব্বৎ সেই রসুল, আইনুদ্দি, ফজলদের জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার অন্তরঙ্গ ইতিকথা। বই-খানি পড়তে পড়তে মনে হয় এর বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীরা যেন আমাদের কত পরিচিত! রবীন্দ্রনাথ সাবধান করেছিলেন, "সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি, ভালো নয় নকল সে সৌখীন মজদুরী।" আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সম্বন্ধে শুধু একথাই বলা যায়, সে ফাঁকি তিনি দেননি। যেসব অখ্যাত জনের নির্বাক মনের মৌন মুখে তিনি ভাষা দিয়েছেন তাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না বইখানি পড়ে। সেই দিক থেকে তাঁর রচনা সার্থক। ভাবসম্পদের ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে এই গল্পগুলোকে অনায়াসেই পল্লীমনের একান্ত নিজস্ব সম্পদ ময়মনসিংহ গীতিকাগুলোর সাথে সমপর্যায়-ভুক্ত করা যেতে পারে। ৫৯৫।৫৭

## নাট্য-সাহিত্য

**মরা হাতী লাখ টাকা**—মন্মথ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা-৬। মূল্য—এক টাকা।

একদিকে 'কারাগার', 'মীরকাশিম', 'রাজ-নর্তকী' প্রভৃতির নাট্যকার, অন্যদিকে 'মহুয়া', 'পথে বিপথে', 'চাষীর প্রেম' প্রভৃতি রচয়িতা প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের এক নূতন সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য নাটকখানিতে। মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারী ছাপোষা লোক এককড়ি বসুর লটারীতে লাখ টাকা লাভের সংবাদকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র চরিত্রপ্রবাহের সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন, তাদের কাউকেই আমাদের অপরিচিত বলে মনে হয় না। আর সেইসব অতিপরিচিত চরিত্রের অতিসাধারণ দুর্বলতাগুলোকে ভিত্তি করেই অনাবিল হাসির স্রোত বইয়ে দিয়েছেন নাট্যকার আগাগোড়া নাটকখানিতে। সেই হাসি সুড়সুড়ি দিয়ে নয়, সে হাসি আনন্দের প্রাণখোলা অভিব্যক্তি। রচনাশৈলীর মুন্সিয়ানা বইখানিকে শুধু সুখ-পাঠ্যই করেনি, মঞ্চে সার্থক অভিনয়োপযোগীও করেছে—সে কথা বলাই বাহুল্য। ৬৯৮।৫৭

**মৌ-চোর**—সলিল সেন। ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আঠারভাটি বাদা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, কাঠুরে, পেতেল, মৌলী আর অজস্র ভূমিহীন মজুর—যারা অন্নদাস, সুন্দর সুখী ঘর বাঁধবার আশায় প্রাণ হাতে করে যারা এগিয়ে যায় বাঘ-সাপ-লুটপাটের দেশে, নিরমনিষ্যির জঙ্গলে কাঠ, গোলপাতা আর মধুর সন্ধানে, মন্ত্র-তন্ত্র-তুকতাকের সাথে ভরসা যাদের কব্জির জোর আর বন্দুকের পাটা, সেই ধর্মদাস, গোরাচাঁদ, রতন, বংশীদের দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ, ভালোবাসার এক সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার আলোচ্য নাটকখানিতে। ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য এই মানবিক আবেদনে পূর্ণ নাটকটির দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনুভূতির তীব্রতা, আর প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রত্যক্ষতার গুণে নাটকখানি হয়েছে মর্মস্পর্শী। শুধু মঞ্চের সার্থকতাই নয়, বই-খানির সাহিত্যিক সার্থকতাও অনস্বীকার্য। ৪১৩।৫৭

**খুশীর দেশে**—রবিদাস সাহা রায়। দিশারী, কলিকাতা-৬। মূল্য—এক টাকা।

বদিবুড়োর টোটকা, হিংসুটে, তারার দেশে, দুষ্টু মামা, খুশীর দেশে, জ্যান্ত ভোজ এবং জননী—ছোটদের জন্য লেখা এই সাতটি ছোট ছোট নাটিকা রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। এর প্রায় সবগুলো নাটিকাই বেতারে অভিনীত হয়েছে এবং সেগুলোই পরিবর্তিত আকারে স্থান পেয়েছে 'খুশীর দেশে'। নাটিকাগুলো পড়তে শুধু ছোটদের নয় বড়োদেরও ভালো লাগবে। কিন্তু প্রয়োগ-বিজ্ঞান বা আঙ্গিকের দিক থেকে মঞ্চে এর কোন কোনটির অভিনয় কতটুকু সার্থক হবে বলা কঠিন, যদিও সেই উদ্দেশ্যেই বইখানির সম্পাদনা। কারণ যে আবহসঙ্গীত নাটিকাগুলোকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে অনিবার্য প্রয়োজন, মঞ্চে তার সার্থক প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। তা ছাড়া, যে কথোপকথন শুধু শুনতে বা পড়তে ভালোই লাগে, মঞ্চে তা-ই নাটকের গতিকে করবে ব্যাহত। অবশ্য, কাহিনী-বিন্যাসে নাট্যকার যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে একথা বলা যায়, মঞ্চের দিকে চোখ রেখে যদি তিনি ভবিষ্যতে এজাতীয় নাটিকা রচনা করেন, তা শিশু নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করবে। ৬৪৫।৫৭

**ঠাকুরবাড়ী**—চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা। ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা-১২। মূল্য—দেড় টাকা।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা প্রতিভার যে দীপ-মালা সাজিয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ সাহিত্য গড়ে উঠলেও, তাকে ভিত্তি করে নাট্যাকারে বাংলার নবজাগরণের আলেখ্য অঙ্কন খুব বেশী হয়নি। 'বিদ্যাসাগর' ও 'শ্রীমধু-সূদনের' লেখক 'বনফুল'ই এ বিষয়ে পথিকৃৎ। সেই পথ অনুসরণ করেই আরও দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা। যে পরিবার পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও বৃদ্ধি তারই কাহিনী নাট্যাকারে তিনি গ্রথিত করেছেন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। শুধু যে ঠাকুরবাড়ীর বিচিত্র পরিবেশের একটি সুন্দর ও যথাযথ ছবিই তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাই নয়, নাটকীয় আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে। নাটকের এক বৃহৎ অংশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুষ্ঠু অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং সেদিক থেকেও নাট্যকারের প্রচেষ্টা হয়েছে সার্থক ও উপভোগ্য। ৩৯০।৫৭

**নচিকেতা**—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—প্রকাশনী, ১৯, বলদিয়া পাড়া রোড, কলিকাতা ৬। দাম—২্।

মৃত্যু ও নচিকেতার কাহিনী আমরা জানি। এই নাটকে নচিকেতার মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের পুরাণ কথাটুকু উপলক্ষ্য মাত্র। চিরপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী মনে রেখে এ-গ্রন্থ পড়লে কিন্তু ভুল হবে, কারণ, লেখক মূল তত্ত্বটুকুকেই আশ্রয় করেছেন, আসল ঘটনা এগিয়েছে, তাঁর নিজস্ব কল্পনার আশ্রয়ে। বলতে পারি, নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীকে রূপকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তা হলেও পৌরাণিক পটভূমিকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। যার ফলে সমগ্র নাট্যকাব্যটির দেহে একটি উজ্জ্বল জীবনসত্তা প্রবাহিত হতে পেরেছে।

নচিকেতা মৃত্যুকে দর্শন করে তাঁকে জানতে চেয়েছিলো, কিন্তু বর্তমান নাটকের নায়ক অতটুকুতেই তৃপ্ত নয়। সে মৃত্যুকে জয় করেই ক্ষান্ত হতে চায় না, সেই জয়ের মন্ত্র বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সে প্রতিটি মানুষের কানে-কানে। ব্যবহারিক জীবন তাতে বাধা দেবেই, কিন্তু মহান আত্মা সকল বাধার অতীত। তাই নচিকেতার অমৃত সন্ধান সার্থক। রূপক কাহিনী, সুতরাং কোনো কোনো পাঠক হয়তো এর মধ্যে বর্তমান কালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইঙ্গিত পেতে পারেন। পেলে ক্ষতি নেই, না পেলেও নাটকের মহিমা ক্ষুন্ন হবে না।

নচিকেতার শেষ অভিযান অপার্থিব, কিন্তু অসত্য নয়। নাট্যকার তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। ভগবান বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বাধীন ভারতবর্ষ আশা করি এ নাটকের যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে।

বলা বাহুল্য, দর্শনতত্ত্ব প্রধান নাটক মঞ্চের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী নয়। তা ছাড়া, ভাষার গাম্ভীর্য রক্ষা করাও সাধারণ অভিনেতার পক্ষে কঠিন। কিংবা বলা যায়, এ নাটক মঞ্চস্থ করতে হলে অসাধারণ ক্ষমতাবান অভিনেতৃমণ্ডলীর প্রয়োজন হবে। সেই যাই হোক, সাহিত্য মূল্যে কিন্তু 'নচিকেতা' উচ্চ আসনের অধিকারী। ১৬৮।৫৮

## ভ্রমণ কাহিনী

**ইংরেজের দেশে**—কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৪।

মধ্যপ্রাচ্য এবং য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে লেখক ইংরেজের দেশ খাস ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁচেছেন। ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড, বিশেষ করে লণ্ডনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা-ই প্রকাশ করেছেন এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে। সদা-প্রফুল্ল মেজাজ সমস্ত গ্রন্থটিতে তিনি ছড়িয়ে দিয়ে সেই দূর দেশকে পাঠকের কাছে একেবারে ঘরোয়া করে দিয়েছেন। ইংলণ্ডে বহু ভারতীয়ের বাস, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুমারেশ ঘোষ বিশেষ করে সেই বিদেশী ভারতবাসীদের চরিত্রগুলোকেই যেন ধরতে চেষ্টা করেছেন। তাতে চিরাচরিত প্রথায় লেখা ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে এ রচনার মূল পার্থক্যটা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য যাদের দেশ দেখে এ গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন, তাদের সম্বন্ধেও লেখক নীরব থাকেন নি। এবং এখানেও নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বড় ঘরের ইংরেজদের কথা এখানে নেই; সমস্ত কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে কেবল মধ্যবিত্তের দল। তাঁদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারে, চলনে-বলনে, সমষ্টিগত ভাবে দেশের রূপটিকে লেখক সুন্দর করেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

রচনা ভঙ্গিটিও অভিনব। পরিহাস-তরল একটি হাসি খুশি মেজাজ যেন আগাগোড়া ছড়িয়ে রয়েছে। তাতে পাঠক-লেখক একাত্ম হয়ে উঠতে সুযোগ পায় সহজেই। কিন্তু একটি কথা, সাধারণ উচ্ছ্বাস বা আবেগের প্রশ্রয় বেশী না দিলেও পরিহাসপ্রবণতা কখনো কখনো যে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি, এ-কথা জোর করে বলা যায় না। তবে পাঠকভেদে রুচিভেদ অবশ্যই মানতে হবে। ৩৩০।৫৮

## অনুবাদ-সাহিত্য

**এ লেডিজ ম্যান**—মোপাসাঁ। অনুবাদক—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৬।

ফরাসী কথাসাহিত্যিক গী দ্য মোপাসাঁ বাঙালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তাঁর রচনা সারাপৃথিবীর গৌরব সম্পদ। মানব-চিত্তের তীক্ষ্ণ নিপুণ বিশ্লেষণ, সমাজকে শ্লেষ বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত করার অপূর্ব ভঙ্গী আর ইঙ্গিত—তাঁর রচনার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেখানে কোথাও নেই এতটুকু লুকোচুরি, আবার কোথাও নেই এতটুকু অত্যুক্তি। দীনদুঃখীর অভাব দারিদ্র্য আর ধনী শৌখীন সমাজের বিলাসব্যসন আর দুর্নীতি—দুই-ই সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য সাধনায়। আলোচ্য গ্রন্থখানিও তার ব্যতিক্রম নয়।

গ্রামের এক হোটেলওয়ালার ছেলে জর্জ দুরয়-র জীবনকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র কাহিনী মোপাসাঁ পরিবেশন করেছেন, তার চারদিকে ভিড় করে আসা নরনারীদের মনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তাতে তৎকালীন ফরাসী সমাজের ঘুণে-ধরা ছবি আমাদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। উপন্যাস বর্ণিত নরনারীদের মনের বিচিত্র লীলাভঙ্গীর অপূর্ব বিশ্লেষণ পড়তে পড়তে মনে হয় তারা সব-দেশের সর্বকালের শাশ্বত জীব। আর সেখানেই লেখকের চরম কৃতিত্ব।

অনুবাদের ভাষা বইখানির রসগ্রহণে সহায়ক হয়েছে। ২৪২।৫৮

**ইভান ইভানোভিচ**—আন্তনিনা কপতায়েভা। অনুবাদক—শেফালী নন্দী। পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। মূল্য—চার টাকা।

ইভান ইভানোভিচ একজন বিখ্যাত রুশ শল্যবিদ। আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। একনিষ্ঠ সমাজসেবী। স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা গভীর ও ঐকান্তিক। আর তাঁর স্ত্রী ওলগা, সুন্দরী, নম্রস্বভাবা। সন্তান বাৎসল্যে স্নেহময়ী জননী। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসাও গভীর ও একনিষ্ঠ। একটি সুন্দর সুখী ঘর বাঁধবার স্বপ্ন নিয়েই মস্কো থেকে সে ছুটে গিয়েছিল উত্তরে চাজমা সোনার খনির অঞ্চলে—তার ছোট্ট মেয়ে লেনার চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়ার শোককে ভুলতে চেয়েছিল স্বামীর বুকে মাথা লুটিয়ে। অথচ তার সেই আশা সফল হলো না, গড়ে উঠল না তাদের প্রীতি ভালোবাসা ভরা সুন্দর মধুর পারিবারিক জীবন। পরিবর্তে ওলগার সঙ্গে গড়ে উঠল তরুণ ইঞ্জিনীয়ার তাবরোভের বন্ধুত্ব। কিন্তু কেন ইভান ওলগার মত স্ত্রী পেয়েও সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারলো না, যে ওলগাকে সে এত গভীর ভাবে ভালোবাসত, তার সঙ্গে অন্যের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে কেন সে দিল—সেই চিরন্তন সমস্যাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানি। নায়ক ইভানের ভাবনা দেশকালের সীমা পেরিয়ে আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগায়—"কি সামান্য সামান্য ঘটনাই না মানুষের জীবনে বিচ্ছেদ

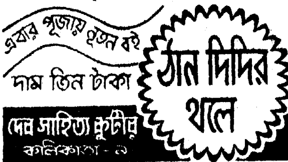
সৃষ্টি করতে পারে? আমি করেছি কি? কি করে ওর পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি?"

লেখিকা দেখিয়েছেন, এই এত বড় ফাটল ধরে গেল, তার কারণ সম্বন্ধে ইভান বা ওলগা কেউই সচেতন নয়, আর সেটাই সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি। ওলগা যদিও একজন সাধারণ নারী তবু বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নেবার ইচ্ছায় সে পথ খুঁজে মরছে, শুধু গৃহ আর পরিবারবদ্ধ জীবনে সে তৃপ্তি পায় না। অথচ কোন পেশাটা তার সবচেয়ে উপযুক্ত, কোনটা তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় তা তাকে বলে দেবার কেউ নেই। তার স্বামী নিজের বিরাট কাজে এমনি ডুবে আছে যে শুধু মাত্র অনুকম্পার দৃষ্টিতেই তাকায় সে তার দিকে। আর সেই ভুলের জন্যই শেষ পর্যন্ত ঘটল তাদের জীবনের তিক্ত, বেদনাদায়ক বিপর্যয়। ডাবরোভের সাথে ওলগার বন্ধুত্ব যে অত নিবিড় হয়ে গড়ে উঠল তার কারণ, সেই তাকে সাহায্য করেছে, দেরীতে হলেও শেষ পর্যন্ত, তার নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে। তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা গড়ে উঠল তার ভিত্তি তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্ব।

অনুবাদের ভাষা সুন্দর ও সাবলীল। বইখানি পড়তে পড়তে সময় সময় বইখানি যে অনুবাদ তা ভুলে যেতে হয়। ইভান ইভানোভিচকে বাঙালী পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্য অনুবাদিকা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

২৯৯।৫৮








## বিবিধ

**পলাশীর প্রান্তরে**—হরিদাস মজুমদার। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী। ৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। দাম—১.৫০

পলাশী-প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দীর্ঘ দিনের মতো অন্তর্হিত হয়েছিলো। কিন্তু এ-পরাজয় অতর্কিতে ঘটেনি। এর পেছনে ছিলো বাংলাদেশের জনকয়েক বিশ্বাসঘাতকের বহুদিনের প্রস্তুতি। সে-কাহিনীকেই লেখক সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। ভাষার সরসতা রচনাভঙ্গি ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে একটি সুখপাঠ্য কাহিনীর রূপ নিয়েছে। ছেলেমেয়েদের এ-বই ভালো লাগবেই।

২২২।৫৮

**সৃষ্টি সভ্যতা**—শ্রীঅবনীচন্দ্র গুহ। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। দাম—২.৫০

সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবীর ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। সভ্যতা কেমন করে গড়ে উঠলো, তারপর তার বিকাশ ও পরিণতি কোথায় এনে পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীকে লেখক তা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মুখ্যত ছোটদের জন্য লেখা হলেও এ-গ্রন্থ সকলের জন্যই। অজস্র ছবি দিয়ে বইটিকে বুঝবার সুবিধা করে দিয়েছেন প্রকাশক। বাংলা ভাষায় এ-ধরনের বই যত বেশী প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

২২৩।৫৮

**আবিষ্কারের কাহিনী**—দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী। বিদ্যাভারতী, ৩, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই বইয়ের জন্য বিশেষ একটি প্রশংসাপত্র লিখেছেন। তিনি বলেছেন, 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচারের কাজে তিনি (দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী) আমায় বরাবরই সাহায্য করে এসেছেন। সহজ ও সরল ভাষায় ছোট ছোট প্রবন্ধগুলি গল্পের মতই সুপাঠ্য।'

কথাগুলি যথার্থ। দেবীপ্রসাদ কিশোর পাঠককে কোথাও ক্লান্ত করেননি, আবার গুরু-সমস্যাকে তরল করেও পৌঁছে দেননি। বৈজ্ঞানিকদের জীবনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই আবিষ্কারের কাহিনীগুলি বলেছেন বলে কাহিনীগুলি সরল ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি ছবি এই বইয়ের যথাযথ কৃতিত্ব রক্ষা করেছে। দেবীপ্রসাদের কাছে আমাদের আশা রইল।

(৮৮।৫৭)

**সিদ্ধ-পুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা**—শ্রীসুশীলকুমার শীল। জেনারেল লাইব্রেরী, ১১৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাধকদের অন্যতম সিদ্ধ পুরুষ তারাপীঠের বামাক্ষেপা। ধর্ম-বিপর্যয়ের ঘোর দুর্দিনে, তারাপীঠে যে মহামানব শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ মন্ত্রে পরাধীন দেশের প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন—তাঁহারই বিচিত্র জীবনের পটভূমিকায় কাহিনী রচনা।

তারাপীঠে জাগ্রত তারাদেবীর প্রত্যক্ষ লীলা-রহস্যের ভেতর—মহামায়ার কৃপালব্ধ একনিষ্ঠ ভক্তের অলৌকিক জীবন-তপস্যায় মধুর অমৃত কথায় বইটি সমৃদ্ধ। বামাক্ষেপা সম্বন্ধে অনেক অপ্রকাশিত সমর্থনযোগ্য ঘটনা এবং ক্ষ্যাপার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী পুস্তকের ভিতর স্থান পাইয়াছে। ভক্ত ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের কাছে বইখানি যথাযোগ্য সমাদর পাবে বলেই বিশ্বাস।

৩৩৬।৫৬

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে—

**পারুল পারুল পারুলটি**—শ্রীঅমিতাভ সেন।

**ক্যাকির মমতা**—নিরঞ্জন ঘোষাল।

**সনাতন-ধর্ম ও মানব জীবন**—স্বামী যোগানন্দ।

ধ্রুমার্ণ ও করুণার বিবরণ—ক্যাথেরীণ ম্যানেন্স বিরচিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

**অনুগামিনী**—বনফুল।

**ধ্যান ও বন্যাক**—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

**তামসী**—জরাসন্ধ।

**অন্তরতমা**—বারীন্দ্রনাথ দাস।

**বল্মীক**—নারায়ণ সান্যাল।

**সত্তু বদ্যির গল্প।**

**কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**—সনজীদা খাতুন।

**নজরুলকে যেমন দেখেছি**—সামসুন নাহার মাহমুদ।

**বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা**—নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত।

**ডালি**—শ্রীজলধর বিশ্বাস।

**আমি দেখিয়াছি পৃথিবীরে পৃথিবী, আরও বড়**—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী।

**পরিভাষা কোষ**—সুপ্রকাশ রায়।

**যমুনা কী তীর**—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য।

**ছন্দা**—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**আমরা দুজনা**—অবনীনাথ রায়।

**সোনার মায়া**—কিশোরলাল মশরুওয়ালা লিখিত রঞ্জনকুমার দত্ত অনূদিত।

**অন্তরালে**—ভবেশ দত্ত।

**হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু**—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

**ছায়া মানবী**—ভবানী মুখোপাধ্যায়।

**সুধাসঙ্কেত**—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

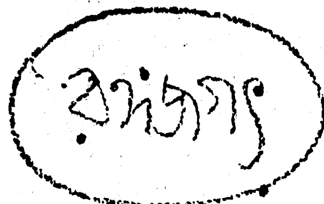
**ব্রহ্মবিদ্ গুরু শ্রীশ্রীভূপতিনাথ সান্নিধানে**—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী।

**সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস**—লেনিন।

**প্রাচীন কবিওয়ালার গান**—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল।

**তিন চরিত্র**—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

**নিরন্ত নির্ঝর**—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়।



**চন্দ্রশেখর**

### শিল্পীর সাফল্য

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এ বছরে নার্গিস ভারতবর্ষের মান রাখলেন কারলভি ভেরির উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন করে। "মাদার ইণ্ডিয়া" ছবির মুখ্য ভূমিকায় তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ অভিনয়ের জন্যে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। এতে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দ ও গৌরব বোধ করবেন।

নার্গিসের এই সম্মান আরো একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় শিল্পী মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হননি। নার্গিসই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নামকরা শিল্পীদের সংগে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করলেন।

মুখ্য ভূমিকায় না হলেও আরো দুজন ভারতীয় শিল্পী এই ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য পেয়েছিলেন। বছর চারেক আগে বেবি নাজ কান ফেস্টিভ্যালে "বুট পালিশ" ছবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ কিশোর শিল্পী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার পরের বছরেই ম্যানিলা ফেস্টিভ্যালে "পথের পাঁচালী"র ইন্দিরঠাকুরণ স্বর্গতা চুনীবালা শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এই গেল বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় শিল্পীদের সাফল্যের ফিরিস্তি।

চলচ্চিত্র উৎসবের আওতার বাইরেও আজ ভারতীয় অভিনয় কুশলীদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। অগ্রদূতের স্থান অধিকার করেছেন আই এস জোহর, যিনি একাধারে নট, নাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক। বিলেতের মার্শম প্রোডাকসন্স প্রযোজিত ইংরেজী ছবি "হ্যারি ব্ল্যাকে" নায়ক স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জারের অধীনস্থ ভারতীয় শিকারীর ভূমিকায় জোহর অভিনয় করেছেন। ছবিখানি সম্প্রতি লণ্ডনে মুক্তি পেয়েছে। ওদেশের সমালোচকরা জোহরের অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। "রেনল্ডস্ নিউজে"র অভিমত এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য: "মহীশূরের জংগলে তোলা চোখ-জুড়ানো পটভূমিকায় স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার, বারবারা রাশ ও এণ্টনি স্টীলকে মনে হয় যেন চীনে মাটির পুতুল—এককালে যাদের রং ছিল চোখ-ঝলসানো, কিন্তু বর্তমানে আর দশটা টুকিটাকির সংগে তাকের ওপর সাজিয়ে রাখার দরুণ ঈষৎ ধুলি-মলিন হয়েছে যাদের জৌলুস। মানব চরিত্রগুলির মধ্যে বাপুর ভূমিকায় একমাত্র আই এস জোহরের অভিনয়েই প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়।"

"ডেলি হেরাল্ড" মন্তব্য করেছেন—মিঃ জোহরের অভিনয় "হ্যারি ব্ল্যাক"কে অবশ্য দ্রষ্টব্য ছবির পর্যায়ে ফেলেছে।

"নিউজ ক্রনিকল্" লিখেছেন—এই ভারতীয় অভিনেতাটি তার কথা-বলার ধরন ও মুখভংগীর সাহায্যে দর্শককে হাসাতেও পারে, আবার কাঁদাতেও পারে।

"ডেলি মেলে"র মতে—আই এস জোহরের অভিনয় মন থেকে মুছে ফেলা যায় না, স্মৃতিপটে তার রেশ জেগে থাকে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তাঁর রসাভিনয়।

এমনিধারা আরো অনেক আছে। বিলেতী ফিল্মে জোহরের এই অভিনয় সাফল্যে এদেশের প্রত্যেক শিল্পীই গৌরব অনুভব করবেন।







**সত্যজিৎ সম্বন্ধে**

গত মংগলবার প্যান-আমেরিকান বিমান-যোগে প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় নিউ ইয়র্কের পথে যাত্রা করেছেন। লণ্ডনে দিন দুই থেকে তিনি '২৪শে আগস্ট নাগাদ নিউ ইয়র্ক পৌঁছবেন।

বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির নামে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে নিউ ইয়র্কের কাছে বেরমণ্ট শহরে একটি সংস্থা স্থাপন করেছেন। সেখানে এই মাসের শেষে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। তাঁদেরই নিমন্ত্রণে শ্রী রায় আমেরিকায় গেছেন। তিনি এই সেমিনারের উদ্বোধন করবেন এবং সেখানে "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" প্রদর্শিত হবে।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 'পথের পাঁচালী'র প্রদর্শন শুরু হবে। তার প্রথম প্রদর্শনীতেও উপস্থিত থাকবার জন্য শ্রী রায় আমন্ত্রিত হয়েছেন। তার আগেই তিনি হলিউড ও যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি দ্রষ্টব্য জায়গা ঘুরে আসবেন। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

সত্যজিৎ রায় যাবার আগেই তাঁর নতুন ছবি অপুর সংসারের শুটিং আরম্ভ করে গেছেন। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত'র শেষার্ধ অবলম্বনে 'অপুর সংসার' গঠিত হচ্ছে। 'পথের পাঁচালী'তে যে-কাহিনীর শুরু, 'অপুর সংসারে' তার শেষ। মাঝে আছে 'অপরাজিত'। প্রথম দুটি ছবি সারা পৃথিবীর চিত্রজগতে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই গল্পেরই শেষ দেখবার জন্যে সকল দেশের দর্শক উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

অপুর ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন, এ খবর আগেই সবাই জেনেছেন। অপুর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে সত্যজিৎ রায় আর একটি নতুন মুখের সন্ধান করছিলেন। এই মর্মে বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল এবং তার ফলে প্রায় হাজার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রী রায় শর্মিলা ঠাকুরকে ঐ ভূমিকার জন্য মনোনীত করেছেন। শর্মিলা সুবিখ্যাত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী ও 'কাবুলিওয়ালা'-খ্যাত টিংকুর বড় বোন।

অপুর বন্ধু প্রণব এবং অপুর শিশুপুত্র কাজলের চরিত্র রূপায়ণেও আরো দুজন নতুন শিল্পীকে দেখা যাবে। যথাক্রমে তাদের নাম স্বপন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান আলোক। অপর্ণার বাপ-মায়ের ভূমিকায় ধীরেন মজুমদার ও শেফালিকা (পুতুল) নির্বাচিত হয়েছেন।

'অপুর সংসারে'র প্রথম দৃশ্য গৃহীত হয় ১০ই আগস্ট কলকাতার উপকণ্ঠে একটি ওষুধের কারখানায়। অপু সেখানে গেছল চাকরির সন্ধানে।

সত্যজিৎ রায়ের পূর্ববর্তী ছবিগুলিতে যে কলাকুশলীরা কাজ করেছিলেন, এ-ছবিতেও তাঁরাই আছেন। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র মতই রবিশংকর এর আবহ সংগীত রচনা করবেন।

**শোক সংবাদ**

চিত্র পরিবেশক ও এইচ এন সি প্রোডাকসন্সের প্রাণস্বরূপ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নেই। "ইন্দ্রাণী"র শুটিং চলছিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। গত মংগলবার তারই তত্ত্বাবধান করে সুকুমারবাবু বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যা আটটায়। বাড়ি ফিরেই তাঁর বুকের কষ্ট শুরু হয়। বছর দেড়েক আগে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু-



সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন ভোগেন সুকুমারবাবু। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার এসে উপস্থিত হন। ঔষধ-পত্র পড়ে যথানিয়মেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আধ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে ও অগণিত আত্মীয় ও বন্ধুদের শোকসাগরে ভাসিয়ে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে তিনি পরলোকে প্রয়াণ করেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ছাত্রাবস্থায় সুকুমারবাবু কারাবরণ করেন। তারপর শুরু হয় তাঁর সাংবাদিক জীবন। "খেয়ালী" ও "ভ্যারাইটিজ" তদানীন্তন বিখ্যাত এই দুই সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। "সিনেমা টাইমস্" নামে ইংরেজীতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও তিনি কিছুদিন চালিয়েছিলেন। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ এসোসিয়েশানের কার্য-নির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন তিনি।

এর পর তিনি চিত্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরেই চিত্র-পরিবেশন ও চিত্র-নির্মাণ এই দুই ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে "মন্ত্রশক্তি", "কঙ্কাবতীর ঘাট", "একটি রাত" ও "পৃথিবী আমারে চায়"-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

* * *

বাংলার ফিল্ম-শিল্প আর একজন প্রবীণ পরিচালককে হারালো। গত সপ্তাহে দ্বারভাঙগায় তাঁর কন্যার গৃহে খ্যাতনামা পরিচালক ফণী বর্মা ৬১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৯২৭ সালে নির্বাক ছবির অভিনেতা হিসাবে তিনি ফিল্মশিল্পে যোগ দেন। নির্বাক "দেব-দাসে"র নাম-ভূমিকায় তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। তারপর কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করে তিনি পরিচালনার কাজে ব্রতী হন। তার আগে তিনি শিল্পী-পরিচালক চারু



**অগ্রদূত চিত্রের "লালুভুলু"র একটি দৃশ্যে কমলা মুখোপাধ্যায় ও কাজল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্ধ কিশোর বেশী শ্রীমান পরেশ।**

রায়ের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। "কৃষ্ণ সুদামা" পরিচালক ফণী বর্মার প্রথম ছবি। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক ছবির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ যশ অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে "প্রভাস মিলন", "দেবযানী", "নিমাই সন্ন্যাস", "প্রহ্লাদ", "জয়দেব ও "হরিশচন্দ্র"র নাম উল্লেখযোগ্য। "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি।

# চিত্রালোচনা

"সাধক বামাক্ষ্যাপা" এমন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনীচিত্র যাঁর নাম পরমহংসদেব ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়। ছবির পর্দায় এইটাই এ হপ্তার নতুন আকর্ষণ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাহিনী অবলম্বনে এবং যতদূর সম্ভব ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান এই জীবনী চিত্রটি তুলেছেন। নাম-ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুলনীয় অভিনয় এর অন্যতম আকর্ষণ। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন মলিনা, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীমান জ্যোতি নামক একজন বালক-অভিনেতাও সুন্দর অভিনয় করেছে এতে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন নারায়ণ ঘোষ এবং অনিল বাগচী এর গানে সুর দিয়েছেন ও আবহ সংগীত রচনা করেছেন।

*

অগ্রদূত পরিচালিত "বাবলা" একদা দেশে ও বিদেশে সম্মানলাভ করেছিল তার মানবীয় আবেদনের জন্যে। সেই শাশ্বত রসের পসরা নিয়ে আসছে অগ্রদূত চিত্রের নিজস্ব অবদান "লালু ভুলু"। লালু আর ভুলু—পিতৃমাতৃহীন, আশ্রয়হারা দুটি কিশোর। একজন পঙ্গু আর একজন অন্ধ। অথচ তাদের বুকে দুরন্ত আশা—তারা মানুষ হবে। সংসারের কাছে তাদের দাবী, তাদের যোগ্য স্থান তারা আদায় করবে। সম্বলের মধ্যে তাদের পরস্পরের অতুলনীয় বন্ধুত্ব। তাদের জীবনযুদ্ধের ছবি এই "লালু ভুলু"। এই দুই কিশোরের ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রীমান সুখেন ও শ্রীমান পরেশকে। শেষোক্ত একজন নবাগত কিশোর শিল্পী। বড়দের মধ্যে আছেন শোভা সেন, কাজল চ্যাটার্জী, কমলা মুখার্জী, গঙ্গাপদ বসু, শিশির বটব্যাল, অজিত ব্যানার্জী প্রভৃতি। ছবিখানি দ্রুত সমাপ্তির পথে।



সাধক বামাক্ষ্যাপাবেশী গুরুদাস

*

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের দ্বিতীয় ছবি "ভ্রান্তি"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান ১৬ই আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী মহরৎ দৃশ্যে ক্যামেরার সম্মুখীন হন। ছবি বিশ্বাসকে এর অন্যতম প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে। অনন্ত সিং ও প্রফুল্ল চক্রবর্তী যথাক্রমে এর প্রযোজক ও পরিচালক। গল্পটি লিখেছেন সুকু সেন।

* * *

গেল হপ্তায় আরো দুখানি নতুন ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে। ১১ই আগস্ট রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে দেবী চিত্রণের প্রথম ছবি "অজানা"র শুভারম্ভ হয়েছে। বীরেশ্বর বসু এর পরিচালক। তিনিই এর কাহিনী ও চিত্রনাট্যও লিখেছেন। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রোগ্রেসিভ এণ্টারপ্রাইজার্সের "নদের নিমাই" ছবির। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে এখানি তোলা হবে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এর গল্পাংশ লিখেছেন। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীবিমল রায় ছবির জগতে যিনি ছোট বিমল রায় নামে পরিচিত।

* * * *

চিত্রাভিনেত্রী মঞ্জু দে কিছুকালের মত এদেশের চিত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছেন। উদ্দেশ্য—ছবিতে অভিনয় করা নয়—উচ্চতর শিক্ষা লাভ। অনেকেই হয়তো জানেন না যে শ্রীমতী দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট এবং এম-এ ক্লাসের পড়ার ছেদ টেনে তিনি "৪২" ছবিতে প্রথম চিত্রাবতরণ করেন। তারপর অনেক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন, খ্যাতিও পেয়েছেন প্রচুর। তবুও তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা

কমে নি। ছবির জগতে এরকম দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

### রাজকমলের "মৌসী"

রাজকমল কলামন্দিরের "মৌসী" গতানুগতিক হিন্দী ছবির পর্যায়ে পড়ে না। এর কাহিনীতে নতুনত্বের আমেজ আছে এবং বেশ কয়েকটি সুপরিকল্পিত চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় এর মধ্যে। কিন্তু এর বাঁধুনী এতই আলগা যে ছবিটি মনের ওপর কোন স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না।

এক সন্তানহীনা নারী ও তাঁর একটি পালিতা মেয়েকে ঘিরে এর গল্প। মেয়েটিকে সবাই পাগল বলে জানে, কিন্তু তার পালিকা মা—যাঁকে সবাই "মৌসী" বলে ডাকে—সেই পাগলিনীকে আপন স্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রাখেন। সবাইকে বলেন, ও পাগলী নয়, খেয়ালী।

তা ও পাগলী কি খেয়ালী সে-বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মেয়েটি নিজের আচার-ব্যবহারে অন্য সকলকে প্রায় পাগল করে ছাড়ে। পাগলামির নামে যা দৌরাত্ম্য সে করে তা অন্যের পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকর।

কিন্তু মৌসীর তার প্রতি সহানুভূতির অন্ত নেই। মেয়েটিকে তিনি সবসময় আড়াল করে রাখেন।

তারপর একদিন মৌসীর অসুখ হ'লো। শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হ'লো তাঁকে। মাসখানেক সেই হাসপাতালে থাকতে হ'লো মৌসীকে। হাসপাতালে মৌসী সবসময়ে ঐ মেয়েটির কথাই ভাবেন। দূরে গ্রামের বাড়িতে আছে মেয়েটি, একটা বিশেষ কারণে মৌসীর ধারণা হ'লো যে মেয়েটি আর নেই।

যথাসময়ে মৌসী সুস্থ হ'য়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, মেয়েটি ভালো আছে, চমৎকার আছে। যে-ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হ'লে মৌসী খুব খুশি হতেন, ঠিক-ঠিক সেই ছেলেটির সঙ্গেই তার বিয়েও হয়েছে। না, তারপর আর কিছু নেই।

'মৌসী'র কাহিনী অমার্জনীয়রূপে দুর্বল। এই কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে কোনো সার্থক চিত্ররচনা সম্ভব নয়। তরুণ পরিচালক প্রভাতকুমার তা করতে পারেনও নি।

'মৌসী'র টেকনিক্যাল কাজ প্রশংসনীয়। চমৎকার এর ফটোগ্রাফি ও রেকর্ডিং, 'মৌসী'র সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বসন্ত দেশাই। সঙ্গীতাংশ উপভোগ্য। কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের উপভোগ্যতা অধিকতর।

অভিনয়াংশও উল্লেখযোগ্য। মৌসী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সু গুপ্ত। তাঁর অভিনয় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হয়েছে। পাগলী মেয়েটির ভূমিকায় অসাধারণ



পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আয়োজিত স্বাধীনতা সপ্তাহ উৎসবে মণিমেলা অভিনীত একাঙ্ক নাটিকা "মায়া- ময়ূরে"র একটি দৃশ্য।

কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নবাগতা বন্দনা। এই নতুন তারকা যথার্থই বন্দনার যোগ্য। মৌসীর স্বামীর ভূমিকায় বাবুরাও পেন্ধারকরকে অনেকদিন বাদে তাঁর খ্যাতির উপযুক্ত অভিনয় করতে দেখা গেল। বৈদ্যের ছোট্ট চরিত্রে কেশবরাও দাতের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ভূমিকাগুলির অভিনয়ে কিন্তু উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশেষ করে রেশমা ও রঞ্জনা শকেলার আড়ষ্ট অভিব্যক্তি ছবিখানির পক্ষে রীতিমত রসহানিকর।

## বিবিধ সংবাদ

গত ২০শে আগস্ট থেকে তাসকেণ্টে একটি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে এশিয়া ও আফ্রিকা এই দুই মহাদেশের চিত্র প্রদর্শিত হবে। ভারতের পক্ষ থেকে এ-ভি-এম প্রোডাকসন্সের "ভাবী" এই উৎসবে দেখানো হবে বলে জানা গেল। ওদিকে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত "দো আঁখে বারা হাত" ছবিখানি সান ফ্রান্সিসকো ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্যে মনোনীত হয়েছে। ২৯শে অক্টোবর থেকে ১৯ই নভেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

* * * *

শিল্পী ও সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিকীর শিল্পীরা আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০—৩০ মিঃ নিউ এম্পায়ারে তাঁদের ৩য় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। বালকৃষ্ণ মেননের তত্ত্বাবধানে এর নৃত্য পরিচালনা করছেন রাধাকৃষ্ণণ এবং আবহসঙ্গীত পরিচালনা করছেন নীরোদবরণ।

• •

কারলভি ভেরির আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একসঙ্গে দুটি ছবিকে এ বছরকার শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে। একটি রাশিয়াতে তোলা 'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন', অপরটি জাপানী 'স্টেপ ব্রাদার্স'। মিখেল শোলোখভের একটি বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে তিনটি ছবি তোলা হয়েছে। সোভিয়েট ছবিটি তাদেরই একটি। সার্জি গেরাসিমভ এর পরিচালক।

# আপনার সৌন্দর্যই আপনার যৌতুক

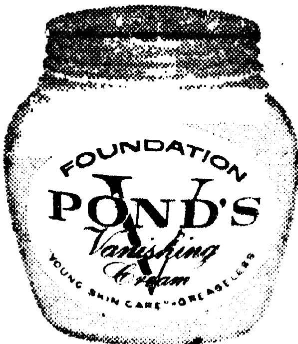
**পণ্ডস** ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহার করুন—

## আপনার মুখশ্রী মসৃণ, কোমল ও সুন্দর থাকবে!

হাল্‌কা ও তুষার-শুভ্র পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় সৌন্দর্য রক্ষা করবে—মুখশ্রী পরিষ্কার ও লাবণ্যময় রাখবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। এই নিখুঁত, তৈলহীন ক্রীম মাখার পর পাউডার লাগালে তা বহুক্ষণ পর্যন্ত ভালোভাবে লেগে থাকে।

**এই ক্রীম মুখশ্রী পরিষ্কার রাখার পক্ষে চমৎকার**

রোজ রাতে আপনার মুখে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম ভালো ক'রে মাখুন। এতে ত্বকের ময়লা সম্পূর্ণ দূর হবে এবং মুখশ্রী রুক্ষ ও কর্কশ হতে দেবেনা। পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার মুখের কমনীয়তা অটুট থাকবে।






**বিনামূল্যে পুস্তিকা**

আমাদের বিনামূল্যের পুস্তিকা 'লাভ্‌লিয়ার উইথ পণ্ডস' চেয়ে পাঠান ... এতে প্রসাধন ও সৌন্দর্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা আছে। পোঃ বক্স ১৬১২, ডিপার্টমেণ্ট ২৩ ডি, বোম্বাই ঠিকানায় লিখুন—সঙ্গে ২৫ নয়া পয়সার ডাকটিকিট দেবেন।

P 0662 চীজ্‌ব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)



এস আর প্রোডাকসন্সের "মর্মবাণী"র একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। ছবিখানি বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

জাপানী ছবিটি পরিচালনা করেছেন মিজোজি ইয়োকি। যুদ্ধের বর্বরতাকে মর্মন্তুদভাবে এর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

* * *

আরো একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারকদের মতে যতগুলি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে 'পথের পাঁচালী'ই শ্রেষ্ঠ। এছাড়া একটি রুশীয় ও একটি ফরাসী ছবিকে—'ডন কিয়োটি' ও 'পোত দ্য লিলা'—সম্মানসূচক উল্লেখে ভূষিত করা হয়েছে। এই উৎসবে ২৮টি দেশ থেকে তিনশোর ওপর ফিল্ম এসেছিল। তাদের মধ্য থেকে বাছা-বাছা একশোখানি ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়। উৎসব চলেছিল দু সপ্তাহ ধরে এবং তাতে ২০,০০০ দর্শকের সমাবেশ হয়।

* * *

গত শনিবার বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতার অন্তর্গত নাটকাভিনয়ের পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু আমেরিকায় নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। শ্রী বসু সম্প্রতি আমেরিকা সফর করে ফিরেছেন। এই শনিবার (২৪শে আগস্ট) সুপ্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাশিয়ার নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। তারাশঙ্কর বাবুও সম্প্রতি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন।

* * *

শিয়ালদহ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের ছোটদের বিভাগ 'ছোটদের মহল' নামে নব পরিকল্পনায় গত '১৯ই আগস্ট, ছোটদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধিত হয়। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' নৃত্য সহযোগে গীত হয়। এছাড়া ছোটদের আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, কথক-নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত এই অনুষ্ঠানের সর্বাংগীণ সাফল্য সূচিত করে। ছোটদের মহলের পরিচালক বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই সাফল্যের জন্যে ধন্যবাদার্হ।

*

হাওড়া যুবসভার উদ্যোগে ৫ই অক্টোবর থেকে আট দিনব্যাপী একটি নাট্য-সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথম পাঁচ দিন একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরের তিন দিন পূর্ণাংগ নাটকের অভিনয় হবে। একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় অপেশাদার দলগুলি যোগ দিতে পারবেন। যোগ দেবার শেষ তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর। অন্যান্য বিবরণের জন্যে যুবসভা কার্যালয়ে (২২, নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া) খোঁজ নিতে হবে।

*

গীতমাল্য নামে একটি সংগীত ও নৃত্যশিক্ষার কেন্দ্র উদ্বোধিত হয় দক্ষিণ কলিকাতার হেশাম রোড গত ১৫ই আগস্ট। বহু সংগীতরসিক শ্রোতা ও শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।



বি আর ফিল্মসের "সাধনা" ছবিতে বৈজয়ন্তীমালাকে একটি সংঘাতপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে।




পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং আই এফ এ-র যুগ্ম প্রচেষ্টায় আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১—০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করে পরলোকগত রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর নামাঙ্কিত স্মৃতি-শীল্ড লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হিসাবে খেলাটির আয়োজন করা হলেও খেলা অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পরের দিন। এতে অবশ্য ক্ষতি বৃদ্ধির কোন কারণ নেই। নামমাত্র প্রবেশ দক্ষিণা নিয়ে প্রধানত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে একটি খেলা দেখিয়ে আনন্দ দেওয়াই এই খেলা আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাতে স্বাধীনতা দিবসে খেলা অনুষ্ঠিত না হয়ে পরের দিন খেলার ব্যবস্থা হলে এমন কিছু এসে যায় না। তবে ছাত্রদের ছুটির দিনই খেলার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর কোন কোন দল এই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারও একটা নীতি থাকা দরকার।

গত বছর স্বাধীনতা দিবসের প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং। এভাবে খেয়ালখুশিমত দুটি দল নির্বাচন না করে লীগ চ্যাম্পিয়ন ও লীগ রানার্স দলের মধ্যে খেলার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। কিম্বা একদিকে থাকবে লীগ চ্যাম্পিয়ন, অপরদিকে থাকবে অন্য সমস্ত ক্লাবের খেলোয়াড় নিয়ে গড়া অবশিষ্ট দল। সবচেয়ে ভাল হয় সমস্ত ক্লাবের খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে বাছাই করে দুটি প্রতিনিধিমূলক দল গঠন করলে। কারণ, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হিসাবে যে খেলার ব্যবস্থা এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর স্মৃতি যার সংগে বিজড়িত সেই খেলায় সমস্ত ক্লাবই অংশ গ্রহণ করতে উৎসুক। কিন্তু সমস্ত ক্লাবের অংশ গ্রহণ তো সম্ভব নয়। তাই যতদূর এক অধিজন প্রতিনিধি নিয়ে প্রতিনিধিমূলক দল গড়াই বাঞ্ছনীয়। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের নামে এভাবে দুটি প্রতিনিধিমূলক দল গড়ে খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তা না করে এ ভাবে খেয়াল খুশিমত দল নির্বাচন করে স্বাধীনতা দিবসের খেলার ব্যবস্থা করা স্বাধীনতা দিবসের ক্রীড়ানুষ্ঠানের অংগহানি করা বলেই আমরা মনে করি। আশা করি, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি-ও আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষ কথাটা ভেবে দেখবেন।

* * *

মোহনবাগান ক্লাবের খ্যাতনামা লেফ্‌ট

**একলব্য**

ইন্ চুণী গোস্বামী এবার বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন। চুণীকে এ সম্মান দিয়েছেন অতীত দিনের সেই সব দিকপাল খেলোয়াড়, ফুটবল খেলা এবং খেলোয়াড় সম্পর্কে যাদের অভিমত সর্বশ্রেষ্ঠ অভিমত বলে সর্বজন স্বীকৃত। অতীত দিনের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত 'ভেটারেন্স ক্লাবের' বিচারে চুণী গোস্বামী এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন।



চুণী গোস্বামী

বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে চুণীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লীগ চ্যাম্পিয়ন ইষ্টার্ণ রেল দলের যশস্বী রাইট আউট প্রদীপ ব্যানার্জী। কিন্তু মাঠের মধ্যে প্রদীপের অখেলোয়াড়সুলভ আচার-ব্যবহার তাঁর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কারণ, খেলার নৈপুণ্যেই খেলোয়াড় বা 'স্পোর্টসম্যানে'র একমাত্র গুণ নয়। স্পোর্টসম্যান কথাটির অর্থ—খুবই ব্যাপক। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেতে হলে খেলার গুণের সংগে তার আচার-ব্যবহার, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, বিনয় প্রভৃতি গুণাবলীও সমভাবে বিচার্য। বস্তুত খেলোয়াড়ের ক্রীড়াদক্ষতার সংগে তার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব, মাঠের মধ্যে ও মাঠের বাইরে তার আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলীর নিরিখেই ভেটারেন্স ক্লাব প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচন করে আসছেন। এই গুণের জন্যই গতবার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছিলেন ইষ্টার্ণ রেলের লেফ্‌ট হাফব্যাক নিখিল নন্দী, এবার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন মোহনবাগানের লেফ্‌ট ইন চুণী গোস্বামী।

* * *

সত্যই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী না হলে কোন খেলোয়াড়েরই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পাওয়া উচিত নয়, তা তিনি যত বড়ই প্রতিভাবান খেলোয়াড় হন না কেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি দেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়, অ্যাথলীট, মুষ্টিযোদ্ধা বা সাঁতারুই যথেষ্ট। দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেক একা কি চেকোশ্লোভাকিয়ার কম সুনাম বাড়িয়েছেন? এ এফ ডা'সিলভা একাই কি বিশ্ব অলিম্পিকে দু' দুবারে ব্রেজিলের পতাকা উড়ান নি? ধ্যানচাঁদ, রণজিৎ সিং কি বিশ্বক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল করেননি—ভারতের সুনাম? বিশ্বক্রীড়া আসরে খেলোয়াড় ও দলের জয়লাভের সংগে দেশেরও সুনাম বেড়ে যায়, খেলোয়াড়ের সুনাম বেড়ে যায়, খেলোয়াড়ের আগে আগে চলে তার দেশের পরিচয় পতাকা। কিন্তু খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েও যদি কেউ আদর্শচ্যুত হন, যদি কারো আচার-ব্যবহার তীব্র সমালোচনার কারণ হয়, তবে তার দুর্নামের সংগে সংগে দেশের উপরও এসে পড়ে কলংকের বোঝা। ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেও সোভিয়েট রাশিয়া হাতেনাতে এর প্রমাণ পেয়েছে। ডিসকাস ছোড়ায় অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীনাপনোমারেভা লণ্ডনের একটি দোকান থেকে কয়েকটি লাল টুপি চুরি করায় দু' বছর আগে লণ্ডনে আয়োজিত অ্যাংলো-রাশিয়ান অ্যাথলেটিক স্পোর্টস বাতিল হয়ে গেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার উপর পড়েছে দুরপনেয় কলংকের বোঝা। সম্ভবত এই জনাই সোভিয়েট রাশিয়া নীতিবর্জিত খেলোয়াড়দের চরিত্র সংশোধনের জন্য সম্প্রতি কড়া ব্যবস্থা 'স্পোর্টস মাস্টার' বা ওই ধরনের কোন 'স্পোর্টস মাস্টার' বা ওই ধরণের কোন উপাধিতে খেলোয়াড়দের ভূষিত করবার সময় তাদের ক্রীড়াদক্ষতা ছাড়া নৈতিক চরিত্র এবং খেলোয়াড়োচিত মনোভাবও সমভাবে পরীক্ষা করে দেখছেন।

শুধু সোভিয়েট রাশিয়া কেন, সমস্ত দেশেই ক্রীড়াবিদদের নৈতিক চরিত্র এবং আচার ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। গুরুত্ব আরোপ করা হয় না শুধু ভারতে, বিশেষ করে এই কলকাতায়। এখানে খেলোয়াড় রেফারীকে তাড়া করলেও তাকে শুধু সতর্ক করেই ছেড়ে দেওয়া হয়। মাঠ থেকে বের হবার আদেশপ্রাপ্ত খেলোয়াড় মাঠ থেকে বের না হলেও তার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয় অত্যন্ত লঘু শাস্তির ব্যবস্থা। যাকে তিরস্কার না বলে পুরস্কার বলাই উচিত। অতি সাধারণ ধরনের খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা।

আর যদি খেলোয়াড় একটু জনপ্রিয় হন, কিম্বা তার পেছনে জনপ্রিয় ক্লাবের সমর্থন থাকে, তবে তো তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই যেখানে বিচারের রীতি—সেখানকার খেলোয়াড়দের আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হওয়া খুবই কষ্টকর। যাই হক, এখানকার খেলাধুলোর পরিচালক সংস্থা খেলোয়াড়দের নৈতিক চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ না করলেও ভেটারেন্স ক্লাব যে এই বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন, এটা খুবই সুখের এবং আশার কথা।

• • •

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যশস্বী কয়েকজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে অ-খেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য সম্প্রতি যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

সবচেয়ে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়েছে আধুনিককালে রাশিয়ান শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সন্ধানী সেণ্টার ফরোয়ার্ড এডওয়ার্ড স্ট্রেলৎসফকে। অবশ্য এ শাস্তি রাশিয়ার ফুটবল সংস্থা তাকে দেননি। দিয়েছেন রাশিয়ান আদালত। পানোন্মত্ত অবস্থায় একজন তরুণীর শ্লীলতাহানি করায় স্ট্রেলৎসফ রুশ আদালতের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ১২ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার ফুটবল সংস্থা অবশ্য

স্ট্রেলৎসফ

স্ট্রেলৎসফকে এই অপরাধের জন্য আগেই 'সাসপেণ্ড' করেছিলেন। কিন্তু সুইডেনে 'জুলেস রিমেট কাপ' বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মুখে খেলার সময় স্ট্রেলৎসফের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাকে রাশিয়ার জাতীয় দলে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়।। বলা বাহুল্য, স্ট্রেলৎসফ এই সময়ে আদালতের বিচারাধীন আসামী ছিলেন। বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই স্ট্রেলৎসফকে আদালতে হাজির করা হয় এবং তিনি ১২ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

স্ট্রেলৎসফকে কেন্দ্র করে রুশ ক্রীড়া-মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই স্ট্রেলৎসফের নৈতিক চরিত্রের অবনতির জন্য ফুটবল কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেছেন। বলা হয়েছে, চরিত্র সংশোধনের জন্য যথাসময়ে তাকে সাবধান করা হয়নি। অধিকন্তু ভ্রষ্ট-চরিত্র এই খেলোয়াড়টির স্বরূপ জেনেও রুশ ক্রীড়া সংস্থা জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে



মার্ভিন রোজ

একে সোভিয়েট দলে স্থান দিয়ে ঘোর অন্যায় করেছেন। স্ট্রেলৎসফ প্রসঙ্গে 'প্রাভদায়' কড়া মন্তব্য করে বলা হয়েছে, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী না হলে ভবিষ্যতে যেন কোন খেলোয়াড়কে জাতীয় দলে স্থান দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার না দেওয়া হয়।

বুয়েনোস এয়ারসের খবরে প্রকাশ, অখেলোয়াড়জনোচিত আচরণ এবং দলের শৃঙ্খলা না মানার জন্য সম্প্রতি আর্জেণ্টিনার ফুটবল এসোসিয়েশন তাদের ৪ জন কৃতবিদ খেলোয়াড়কে গুরুতর শাস্তি দিয়েছেন। এদের নাম হচ্ছে—জোস সানাফিলিপো, নরবার্টো জারেট, রবার্টো মেণ্ডিজ ও ফ্রেডিকো ভায়রো। এরা তিন বছরের জন্য কোন আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ : ইটালীর মিলান শহরে আর্জেণ্টিনা দলের অনুশীলনের সময় জারেট ও মেণ্ডিজ অনুশীলনে অংশ গ্রহণ করেননি, এমন কি হোটেলেও এদের খুঁজে পাওয়া যায়নি, সানাফিলিপো কর্ণপাত করেননি দলের 'কোচের' কথায়—আর চতুর্থ খেলোয়াড় ভায়রো একজন সহ খেলোয়াড়ের সঙ্গে অযথা ঝগড়া করেছেন।।

আর্জেণ্টিনার খেলোয়াড়দের উপরোক্ত অপরাধের জন্য তিন বছর সাসপেণ্ড করা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কড়া শাস্তির আওতায় পড়ে, কিন্তু অন্যান্য দেশ দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করে এই শাস্তি থেকে তারও প্রমাণ মেলে।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস এসোসিয়েশন সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান ন্যাটা খেলোয়াড় মার্ভিন রোজকে সাময়িকভাবে 'সসপেণ্ড', করেছেন বলে সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে। রোজের 'সাসপেনশনের' কথা আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে রোজ কোন অ্যামেচার টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

অস্ট্রেলিয়ার অপর খ্যাতিমান খেলোয়াড় মল এণ্ডারসনের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ ছিল। কিন্তু নিয়মবহির্ভূত ভাবে অর্থ গ্রহণের যথার্থতা প্রমাণিত না হওয়ায় এর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।

২৮ বছর বয়স্ক ন্যাটা খেলোয়াড় মার্ভিন রোজ বিশ্বের একজন কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড়। বিশেষ করে ডাবলসের খেলায় ইনি সিদ্ধহস্ত। অস্ট্রেলিয়ার টেনিস ক্রম-পর্যায় রোজের স্থান চতুর্থ। ১৯৫১ সাল থেকে রোজ নিয়মিত ভাবে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে আসছেন। ১৯৫৪ সালে রেক্স হার্টউইসের সঙ্গে খেলে ইনি উইম্বলডনের ডাবলসও জয় করেছেন। এ বছর রোজ খুবই ভাল খেলছেন। ইটালী এবং ফরাসীর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন এবং উইম্বলডনের সেমি ফাইন্যালে পরাজিত হয়েছেন বিজয়ী অ্যাসলে কুপারের কাছে। এ হেন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেও অস্ট্রেলিয়ান টেনিস অ্যাসোসিয়েশন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেননি। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় মার্ভিন রোজের 'সাসপেনশনের' ঘটনা তার আর এক উদাহরণ।

• • •

গত সপ্তাহে ইস্টার্ন রেল দলের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করতে পারিনি। এই কথাগুলি হচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছাড়া আর কোন ভারতীয় ক্লাবই এ পর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়নি। এই বছরই রেল দল সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে প্রধান তিনটি ক্লাবের একচেটিয়া অধিকারে বাধা সৃষ্টি করেছে। স্বীকার করতে বাধা নেই এজন্য প্রধান তিনটি ক্লাবের একশ্রেণীর উগ্র সমর্থক রেল দলের সাফল্যকে খুব ভাল চোখে দেখতে পারছেন না। রেল দলের

কৃতিত্বকে নানাভাবে লঘু করবারও চেষ্টা চলছে।

কিন্তু রেল দলের লীগ বিজয় যে সত্যই কৃতিত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমত রেল দল একটি অফিস ক্লাব। সমস্ত খেলোয়াড়ই ইস্টার্ন রেলের কর্মী। ক্লাবে বাইরের কোন খেলোয়াড় নেই। দ্বিতীয়ত সমস্ত বাঙালী খেলোয়াড় নিয়েই রেল টীম চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরবজনক সম্মানের অধিকারী হয়েছে। কি মোহন-বাগান, কি ইস্টবেঙ্গল, কি মহমেডান স্পোর্টিং—কোন ক্লাবই আজ পর্যন্ত শুধু বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে লীগ বিজয়ী হতে পারেনি। বাঙালী বলে আমার লেখার মধ্যে কেউ প্রাদেশিকতার গন্ধ আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝতে কষ্ট হবে না যে, এর মধ্যে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন নেই। কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার জন্য আজ আমরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভারতের শহর গ্রাম, আর পাকিস্থানের আনাচ কানাচ থেকে খেলোয়াড় আমদানী করছি। কিন্তু আমাদের রপ্তানির কোঠা শূন্য। আজ যদি বাঙলার খেলোয়াড়দের অর্থের বিনিময়ে ভারতের অন্যান্য ফুটবল কেন্দ্রে খেলতে দেখতাম তাহলে বলবার বিশেষ কিছু থাকতো না। কিন্তু কই, একজন বাঙালী খেলোয়াড়কেও তো অন্য রাজ্যের সাদর আমন্ত্রণ পেতে দেখি না। ভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের প্রতি আমার কণামাত্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষা নেই। ভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়রা কার্যব্যপদেশে বাঙলায় থেকে বাঙলার মাঠে খেলুন এ তো সুখের কথা। কিন্তু শুধু খেলার মরসুমে মরসুমী ফুলের মত বাঙলার মাঠে উদয় হবেন আর পকেট ভারী করে মরসুম শেষে সরে পড়বেন এতেই আমার আপত্তি। শুধু টাকার প্রশ্নই নয়। এর কুফল দ্বিমুখী। বহিরাগত খেলোয়াড়দের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের ফলে বাঙলার খেলোয়াড়রা খেলাধুলার স্থান থেকে ক্রমে পিছিয়ে পড়ছেন, আর চাকরী বাকরী লাভের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে গভীর অন্তরায়। আমাদের দেশে খেলার মাধ্যমে চাকরীলাভের প্রশ্নও তো একটা বড় প্রশ্ন। শুধু খেলার ক্ষেত্রেই নয় চাকরী বাকরীর ক্ষেত্রেও বাঙালী যুবক ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে। তাই প্রধানত খেলার দৌলতে চাকরী পেয়ে আজ যারা লীগ জয়ের গৌরবজনক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে তাঁদের সাফল্যে আনন্দ করবার কারণ আছে বৈ কি! রেল টীম আজ বাঙালী খেলোয়াড়দের নিয়ে লীগ বিজয়ী হয়েছে। আমরা অনায়াসেই আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে আরও কয়েকজন বাঙালী খেলোয়াড়ের রেলে চাকরী লাভের পথ প্রশস্ত হবে।

* * *

খেলার দিক দিয়েও, রেল দলের খেলোয়াড়রা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। নিখিল নন্দী এবং প্রদীপ ব্যানার্জী ছাড়া রেল টীমে খ্যাতনামা খেলোয়াড় বেশী নেই। এদিক দিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্ট-বেঙ্গল, মোহনবাগান ও রাজস্থান ক্লাব বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ। অন্যান্য ক্লাবের তুলনায় ইস্টার্ন রেলের খেলোয়াড়রা বয়সেও তরুণ—অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু তা সত্বেও ১৫টি ক্লাবের তীব্রতম সংগ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সে কারণ আর কিছুই নয়—রেল খেলোয়াড়দের পারস্পরিক সোগযোগ-পূর্ণ ক্রীড়াধারা। ইংরেজীতে যাকে বলে 'টীমওয়ার্ক'। দলকে তিন ব্যাক প্রথার খেলায় ঢেলে সেজে এই টীমওয়ার্ক তৈরী করার পেছনেও একজনের অনলস প্রচেষ্টা এবং সদাজাগ্রত তৎপরতা কম উল্লেখযোগ্য নয়। ইনি হচ্ছেন ইস্টার্ন রেল স্পোর্টস্ ক্লাবের প্রধান পরিচালক এবং ফুটবল কোচ টি সোম।

রেল দলের কৃতিত্বকে খাটো করবার ব্যাপারে যারা কু-কথায় পঞ্চমুখ তারা অবশ্য রেল দলের সৌভাগ্যের দোহাই পাড়ছেন, রেফারীর সহায়তার কথা উল্লেখ করতেও কসুর করছেন না। কিন্তু এদের স্মরণ রাখা উচিত অদৃষ্ট ও পুরস্কার—দুইয়ের কিছুটা সহায়তা না থাকলে কোন বড় সাফল্য অর্জন করা যায় না। এমনও দেখা গেছে একটি খেলায় এক দল সারাক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করে আক্রমণ চালিয়ে গেল, কোন গোল করতে পারল না। অপর দল শুধু একটি আক্রমণধারার মধ্যে একটি গোল করে খেলায় বিজয়ী হল। এখানে

ভাগ্য কিছুটা আছে বৈকি! এই যে মোহন-বাগান ক্লাব এবার প্রথমবারের খেলায় ইস্ট-বেংগল ক্লাবকে ১—০ গোলে এবং ফিরতি খেলায় ২—০ গোলে পরাজিত করেছে। এই তিনটি গোলের ক্ষেত্রেই তো ইস্ট-বেংগল গোলরক্ষক এস শেঠের ত্রুটি আছে। যত ভাল শটই হ'ক ২৫।৩০ গজ দূরের শটে শেঠের মত গোলরক্ষকের পরাজিত হওয়া উচিত হয়নি। এখানেই ভাগ্যের প্রশ্ন। আবার রেল দলের সঙ্গে খেলাতেই মোহনবাগান ক্লাব পেনাল্টি কিক হতে গোল করতে পারেনি। ফলে সারা লীগে এই একটিমাত্র খেলায় মোহনবাগানকে শুধু পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়নি—এজন্য লীগও হারাতে হয়েছে। এখানেই দুর্ভাগ্যের প্রশ্ন। তাই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অনেক সময় পাশাপাশি চলে। ২৮টি খেলায় এক-দলের শুধু সৌভাগ্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এ কোনদিন হয় না হবেও না। কয়েকটি খেলায় রেল দলের দুর্ভাগ্যেরও তো পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত রেল দলের সঙ্গে ইস্টবেংগল ক্লাবের প্রথমবারের খেলার কথা বলা যেতে পারে। মাঠের বহু নিরপেক্ষ দর্শকের অভিমতে রেল দলের আইনসিদ্ধ গোলটি রেফারী নাকচ করে না দিলে রেলকে এ খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হত না। তাই রেফারীর ভুলচুক ও ত্রুটিবিচ্যুতিতে রেল দল যদি কোন সুযোগ পেয়েও থাকে আবার রেফারীর সেই ভুলচুকের জন্য তাঁদের ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং বিজয়ীর কৃতিত্বে সন্দিহান হয়ে তাঁদের অদৃষ্টের দোহাই পাড়া বিজ্ঞজনোচিত কার্য নয়। যে টীম গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী দুর্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দু'দুবার পরাজিত করেছে, শক্তিশালী মোহনবাগান ক্লাবের অপরাজিত থাকার গৌরব নষ্ট করেছে উপর্যুপরি বিজয়ী হয়েছে শেষের ১০টি খেলায় সে টীমের কৃতিত্বকে খাটো করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা।

শেষমুখে রেল দলকে যে পরিমাণ মানসিক উদ্বেগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে তার তুলনা বিরল। একটি পয়েণ্ট হাতছাড়া হলেই তাঁদের লীগ হাত-ছাড়া হবার আশংকা। এই অবস্থায় উপর্যুপরি ১০টি খেলায় জয়লাভ করা কম কথা নয়। সত্য বটে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির ফলেই শেষদিকে রেলের খেলার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া গেছে, একটি খেলায় প্রথম গোল খেয়ে তাঁরা পিছিয়েও পড়েছে। কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে শেষদিকে সব খেলাতেই লাভ করেছে পুরো পয়েণ্ট। আর মোহন-বাগান ক্লাবের চেয়ে মাত্র এক পয়েণ্ট বেশী পেয়ে লাভ করেছে লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ।

রেল দলের এ বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ আরও কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য। কলকাতা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত রেললাইন ইস্টার্ন বেংগল স্টেট রেলওয়ে সৃষ্টির কয়েক বছর আগে পাতা হলেও ১৮৫৮ সাল থেকেই ইস্টার্ন বেংগল স্টেট রেলের সৃষ্টি। সুতরাং এবার তাঁদের শতবর্ষ পূর্তির উৎসব। তাছাড়া এই রেলেরই ফুটবল টীম একে একে ই বি এস আর, ই বি আর, বি এণ্ড এ আর ও রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব নাম পরিগ্রহ করে এবার ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব এই নতুন নাম গ্রহণ করেছে। এ বছর হকি লীগের খেলাতেও দ্বিতীয় ডিভিসনের রানার্স হয়ে রেল দল অর্জন করেছে আগামীবার প্রথম ডিভিসনে খেলবার অধিকার।

শিয়ালদার রেল টীম অতীতে বহু কীর্তিমান ফুটবল খেলোয়াড়ের সাহায্য লাভ করেছে। সামাদ, গ্যালরেথ, শরৎ সিংহ, মোনা দত্ত, ডি' সিলভা, রোজারিও, কার্ভো, ফণি মিত্র, টি সোম প্রমুখ খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি, পাখী সেন, নীধু মজুমদার, মোহিনী ব্যানার্জি, এস নন্দী, বিমল কর, মেওয়ালাল প্রভৃতি খেলোয়াড়রা পারেননি যে সম্মান লাভ করতে বেশীরভাগ তরুণ ও অল্পখ্যাত বাঙালী খেলোয়াড়দের নিয়ে রেলদলের সেই সম্মান লাভ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। গর্বেরও বিষয়।




## দেশী সংবাদ

১২ই আগস্ট—রবিবার সম্বলপুর হইতে ১৪ মাইল দূরে মাদ্রা বাধের নিকট নৌকা ডুবির ফলে ১৪ জন লোকের সলিল সমাধি হইয়াছে। নদীর অপর পার হইতে শ্রমিকদিগকে নৌকা করিয়া আনিবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

১৩ই আগস্ট—গতকল্য আমেদাবাদে পুলিসের গুলী বর্ষণের ফলে আহতদের প্রতি "দুঃখ ও সমবেদনা" এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আজ লোকসভায় কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য ব্যতীত বিরোধী দলের সকল সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

কেরলের কম্যুনিষ্ট সরকার বিড়লার সহিত চুক্তি করিয়া গুরুতর ভুল করিয়াছেন। গত শুক্রবার কলিকাতায় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কম্যুনিষ্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু উক্ত মন্তব্য করেন।

১৪ই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ "ভারতকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার স্বপ্ন যথাসম্ভব শীঘ্র সফল করিয়া তোলার জন্য" সমস্ত প্রকার বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

শ্রী পি সি মজুমদার আই এ এস (অবসর প্রাপ্ত) কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী শনিবার তাঁহার কার্যভার গ্রহণের সম্ভাবনা আছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য লোকসভায় বলেন যে, স্বর্ণের জন্য অঙ্গীকারপত্র চালু করিয়া সরকার দেশের স্বর্ণের গুপ্ত সঞ্চয় কাজে লাগাইবার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

১৫ই আগস্ট—অদ্য স্বাধীনতা দিবসে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু লালকেল্লা দুর্গপ্রাকার হইতে ঘোষণা করেন যে, "কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত" সমস্ত দেশবাসীকেই ভারতের একতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রবহির্ভূত সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধ শক্তিকে দমন করিতে হইবে।

১৬ই আগস্ট—গতকল্য দ্বিপ্রহর হইতে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় এলেকার অন্তর্ভুক্ত মদনপুর চা-বাগান, মহীশাসন, পাথারিয়া, বড়পুঞ্জী ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রবল গুলী বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীও পাকিস্তানী গুলীর পাল্টা জবাব দেয়।

মহাগুজরাট জনতা পরিষদের সভাপতি শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক এম পি আজ ঘোষণা করেন যে, জনসমাবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া আগামীকাল সকালে কংগ্রেস ভবনের নিকট সত্যাগ্রহ করার জন্য তিনি এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব করিবেন।

১৭ই আগস্ট—অদ্য অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে পাকিস্তান পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান-ত্রিপুরা সীমান্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের যাতায়াত এবং বাণিজ্য সম্পর্কে যে চুক্তি বলবৎ আছে তাহা লঙ্ঘন করিয়া একপক্ষকাল পূর্বে পাকিস্তান এক তরফা ব্যবস্থা হিসাবে এই সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বাংলা তথা ভারতের কৃতী রাইফেল চালক ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি মস্কাতে আন্তর্জাতিক শুটিং ইউনিয়নের আইনকানুন উপসমিতিতে এশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিবার জন্য ১৫ই আগস্ট দিল্লী হইতে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১৮ই আগস্ট—রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, বর্তমান বর্ষের ১লা অক্টোবর হইতে রেলযোগে মাল ও পার্শেল প্রেরণের নূতন মাশুলের হার বলবৎ হইবে। রেল মাশুলের হার সংশোধন করার ফলে জনসাধারণের কিছুটা সুবিধা হইবে।

ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী পুলিস ও সৈন্যগণের হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এবং অবিলম্বে ভারতের মাটি হইতে তাহাদের অপসারণ দাবী করিয়া অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিস অভিমুখে এক বিক্ষোভ-যাত্রা পরিচালিত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১২ই আগস্ট—পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিলং-শ্রীহট্ট রোডের উপর—শ্রীহট্ট (পূর্ব পাকিস্তান) এবং খাসী জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যে সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ গত ৭ই আগস্ট ত্রিপুরার সহিত তাঁহাদের সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

১৩ই আগস্ট—পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য অদ্য নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার পরিষদের এই জরুরী অধিবেশনে পশ্চিম এশিয়া সমস্যা সমাধান সম্পর্কে তাঁহার ছয় দফা পরিকল্পনা পেশ করেন।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআন্দ্রে গ্রোমিকো অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরূপে শান্তি রক্ষায় প্রতিশ্রুত থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই শান্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।

১৪ই আগস্ট—পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেণ্টারী সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। আজ প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ালিশন দলের নেতারা পৃথক পৃথকভাবে গবর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৫ই আগস্ট—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীআর্থার লাল অদ্য রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান মাসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীজর্জ পিকেটের নিকট কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে একপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

১৬ই আগস্ট—লণ্ডনের কূটনৈতিক মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং বৃটেন সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়া সমস্যা সমাধান সম্পর্কে চুক্তি করিতে পারেন।

অদ্য করাচীতে সরকারীসূত্রে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নূন সীমান্তে গুলী চালনার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছেন।

১৭ই আগস্ট—কেপ ক্যানাভেরাল (ফ্লোরিডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকা অদ্যই চন্দ্রলোকের দিকে এক রকেট প্রেরণ করে, কিন্তু যাত্রার অব্যবহিত পরেই উহা উড়ন্ত অবস্থায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে অভিযান চালাইবার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে।

১৮ই আগস্ট—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে বিতর্ককালে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীআর্থার লাল পশ্চিম এশিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী প্রেরণের বিরোধিতা করিয়া বলেন, লেবানন ও জর্ডানে আমেরিকান ও বৃটিশ সেনা প্রেরণের দ্বারা যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনাদল প্রেরণ করিয়া তাহা বাড়াইয়া তোলা ছাড়া আর কোন লাভ হইবে না।

সম্পাদক **শ্রীঅশোককুমার সরকার** সহকারী সম্পাদক **শ্রীসাগরময় ঘোষ**

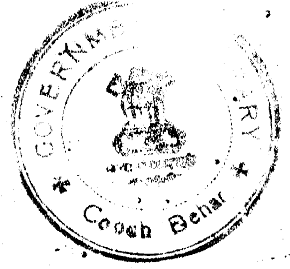
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষান্মাসিক ১১, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীমাখন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


Cooch Behar

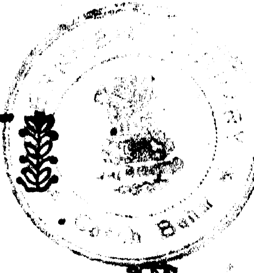
# সূচীপত্র

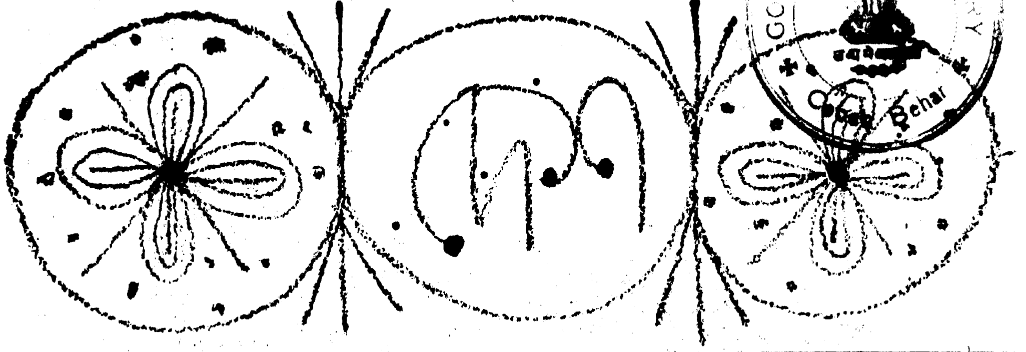
| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সাময়িক প্রসঙ্গ— | ... | ২৯৭ |
| সমকালীন সমালোচনার ধারা | —শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৯৯ |
| জোলিও কুরী | —শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় | ৩০৫ |
| আলোচনা— | ... | ৩১০ |
| মোহম্মদশল | —শ্রীকিরণকুমার রায় | ৩১৫ |

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| দিন লিপি (কবিতা) | শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য | ৩২০ |
| কেবল কবিতা ছাড়া (কবিতা) | শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য | ৩২০ |
| আমার ফাঁসি হল | শ্রীমনোজ বসু | ৩২১ |
| মির্ঝা তানসেন | শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল | ৩২৮ |
| বেলোয়ারী | শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল | ৩৩১ |
| ছেলেবেলার দিনগুলি | শ্রীপূণ্যলতা চক্রবর্তী | ৩৩৯ |

# সূচীপত্র






DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 30th August, 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৪৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## কবিগুরু ও নেতাজীর স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইবার দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরে, অবশেষে মহাজাতি সদন নির্মাণ সম্পূর্ণ হইল—আশা করি, এই ভবনটিকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল কর্মোদ্যোগ প্রবর্তনের কথা আছে, তাহা আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইবে না।

এই ভবন উদ্বোধনের বিবরণ প্রকাশ করিতে গিয়া অনেকেই লিখিয়াছেন—কবিগুরু ও নেতাজীর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। শুধু ভবন নির্মাণে কি সে স্বপ্ন সফল হইবে? যে আদর্শ লইয়া সুভাষচন্দ্র এই ভবনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সাময়িকতাও কিছু ছিল, কিন্তু মূলে কথাটা ছিল তাহার ঊর্ধ্বে—

"যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি"। 'স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন' সফল হইয়াছে, 'নূতন সমাজ'-এর সাধনায় সিদ্ধির দিন এখনও সম্মুখে।

ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাংলা জাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেছি, তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংশয়মুক্ত উদার আতিথ্য মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী




সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্ম-নিবেদন এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান।"

ভেদবুদ্ধির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে কবি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন—

"বাংলার যে জাগ্রত হৃদয়-মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারত-বর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক, এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে।"

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা সত্য হউক, বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন এক হউক, "এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক," "সেই সঙ্গে একথা যোগ করা হোক, বাঙালীর বাহু ভারতকে বল দিক, বাঙালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক; ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালী স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণে নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।"

দুর্ভাগ্যবশত একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্বাধীনতা-লাভের পরেও "বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা"কে সত্য ও সার্থক করিবার পথে বাহির হইতে বাধা এমন দুস্তর হইয়া ক্রমান্বয়ে অবিরত দেখা দিতেছে যে, স্বৈরবুদ্ধিকে তাহাতেই জাগাইয়া দিতেছে, বাঙালীর স্বভাবেই নয়; তবু বাঙালীকে মঙ্গলবুদ্ধি ভারতের ঐক্য-বোধ জাগাইয়া রাখিতে হইবে, আপন অধিকার ও গৌরব রক্ষায় অতন্দ্র থাকিয়াও।

## অন্তত ছয় মাস!

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের সাম্প্রতিক এক সুপারিশে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আভ্যন্তর অবস্থার যে চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, ছাত্রসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে উদ্বেগ বোধ করিবেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই বৎসরে ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাসের বেশী পড়াশুনার কাজ চলে না। অতঃপর সুপারিশ করা হইয়াছে যে, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহা ছাড়াও বৎসরে পুরা ১৮০ দিন অর্থাৎ ছয় মাস যাহাতে শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে!

বৎসরে মাত্র ১২০ দিন! সংবাদটা শোকাবহ, তবে বিস্ময়কর নয়। এবং যে সব কারণে আজ এই মর্মান্তিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার দায়িত্বও বোধহয় বিশেষ কোনও এক পক্ষের উপরে চাপাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। দায়িত্ব

সকলেরই। জানি যে, এমন ছাত্রের সংখ্যাই আজকাল বেশী, অধ্যয়নের পরিবর্তে অন্য একাধিক বিষয়কে যাহারা তপস্যার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। জানি যে, এমন অধ্যাপকের সংখ্যা আজকাল কম নয়, 'অধ্যাপনাকে যাঁহারা একটা ব্রত বলিয়া মনে করেন না।' বস্তুত অন্য ব্যাপারে সুবিধা হয় নাই বলিয়াই যাঁহারা অধ্যাপকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও আমরা জানি যে, অভিভাবক-সমাজও এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। দশটার সময় ভাত খাইয়া, পায়ে স্যাণ্ডেল গলাইয়া, একখানা চটি-খাতামাত্র সম্বল করিয়া যে-ছেলে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল, সে যে আসলে কোথায় গেল, কলেজে, না সিনেমায়, না ময়দানের মিছিলে, তাহার একটা খোঁজ পর্যন্ত তাঁহারা রাখেন না। আগেই বলিয়াছি, পাপ কাহারও একার নহে। এ আমার এ তোমার পাপ। এবং সময়ে সতর্ক না হইলে ইহার পরিণামও যে একদিন সমবেতভাবে সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, বৎসরে অন্তত ছয় মাস কাল যাহাতে লেখাপড়া চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এমন কিছু কঠোর সুপারিশ নয়। কিন্তু আশঙ্কা করি, সর্বপক্ষের সহযোগ না থাকিলে এই কোমল সুপারিশও শেষ অবধি কার্যকর হইবে না।

## মধ্যবিত্তের সমস্যা

যাহাদের বিত্তের বালাই নাই, ভদ্রতা করিয়া এদেশে তাহাদের বলে মধ্যবিত্ত। বিত্ত নাই কিন্তু সমস্যা আছে। অন্নের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা; সমস্যা চিকিৎসা-ব্যবস্থার, মাথা গুজিবার বাসার। প্রথম চিন্তাটাই, বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা "চমৎকারা।" গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ইত্যাদি কোন তন্ত্র নয়, পারত্রিক মোক্ষের মন্ত্রও নয়, নিছক প্রাণধারণের প্রশ্নটাই আজ সবচেয়ে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কতখানি দুরূহ, তাহা "আনন্দবাজার পত্রিকায়" সম্প্রতি প্রকাশিত দুইটি আলোচনায় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তথ্যগুলি বিশেষ নূতন নয়, কৃতিত্বটা প্রধানত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়। প্রাকযুদ্ধকাল হইতে স্বাধীনতা লাভের সাল; এবং উত্তর-স্বাধীনতা কালের এই এগার বৎসর জুড়িয়া দেখিলাম, জনসংখ্যা হইতে শুরু করিয়া বাড়িয়াছে অনেক কিছুই, কিন্তু পণ্যমূল্যের ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা শুধু 'বাড়' নয়, বাড়াবাড়ি।

কোন দার্শনিক বলিয়াছেন, মানুষ এক নদীতে দুইবার স্নান করে না, কেননা স্রোত বহিয়া যায়। কি শহরে, কি মফঃস্বলে আজ তেমনই এক দরে কেহই দুইবার জিনিস কেনে না—পণ্যমূল্য স্রোতের মতই চঞ্চল। তবে স্রোত নিম্নগামী, মূল্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী, তফাৎ এই। ও-মাসে চাউলের দর যদি ছিল দশ আনা, এ-মাসে তবে বার আনা। আগামী মাসে হয়ত টাকাটাই পুরিয়া যাইবে। আটা-ময়দা, তেল, মাছ, জ্বালানী কাঠ সব কিছুর দামই এক অলক্ষ্য শৃঙ্গের অভিযানে চলিয়াছে। পথটা মহা-প্রস্থানের, কিন্তু মহা-প্রস্থান কাহার? মধ্যবিত্তের পক্ষে দুঃসাধ্য ক্রমে অসম্ভবে গিয়া ঠেকিতেছে।

শুধু দর-বৃদ্ধিতে অবশ্য আশঙ্কার কিছু থাকিত না, যদি আয়ও বাড়িত। মূল্যের উন্নতির একটা প্রামাণিক হিসাব প্রকাশ করিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ভালই করিয়াছেন; সেই সঙ্গে যদি মাথা-পিছু আয় এবং চাকুরির সংখ্যা কত বাড়িয়াছে, তাহার হিসাবও দিতেন তবে আর্থিক পরিস্থিতির চিত্রটি সম্পূর্ণ হইত। কেননা, অর্থনীতি বলে, মূল্য আর চাকুরীর হারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

## বীরপূজা

মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক।" বস্তুত অতীতের মহৎ স্মৃতি অনেকাংশে আজ দীপ্তিহীন বর্তমানে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী, ভবিষ্যতের বিপুল আশাও স্তিমিত। অতীতের স্মৃতি শুধু গর্ব করিবার জন্য নয়, "গভীর ঘুমের আয়োজন" করিবার জন্য নয়, আমাদের উত্তরাধিকার স্মরণ করিয়া বর্তমানের নৈরাশ্যের অন্ধকারে তাহাকে প্রদীপের ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য।

এই ভাষাই, এই বৎসরে বিপিনচন্দ্র পাল ও জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব (নভেম্বর ৭ ও ৩০, ১৯৫৮) যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়, সেজন্য আমরা আগ্রহান্বিত। বিপিনচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও বিচিত্র শক্তি প্রধানত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে মতবিরোধ তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রধান ধারা হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল, ফলে তাঁহাকে নানারূপ দুঃখই পাইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপস করেন নাই। যে-সকল বিষয় লইয়া মতবিরোধ হইয়াছিল, কালের পটভূমিকায় আজ তাহা আলোচনা করিলে হয়ত দেখা যাইবে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার কথাই দূরদৃষ্টিসঞ্জাত। ইতিহাসের প্রয়োজনেও সেকথা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দ যে বিপিনচন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম প্রবক্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে সে কথাটা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখিবার সময় এই শতবার্ষিক অনুষ্ঠান। গোড়ার দিকের যে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী-দের রবীন্দ্রনাথ "আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, বিপিনচন্দ্র তাহাদের কথা স্মরণ করিয়াই ১৯০২ সালে সেকালের কংগ্রেসকে "begging institution" ভিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন—"ভিক্ষাকে আমরা নূতন নাম দিয়াছি আন্দোলন, এজিটেশন।" বিপিনচন্দ্র বলিলেন, এজিটেশনে কিছু হইবে না, চাই আত্ম-শক্তির চর্চা, আত্মত্যাগ। বিপিনচন্দ্র এই শতাব্দীর গোড়াতেই পরজাতীয়ের শাসন হইতে সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন; আর সেই মুক্তিলাভের পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন Passive Resistance।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া দেশ ও সাহিত্য তাঁহার মনীষার যোগ্য নিদর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তবু বাংলা মনন-সাহিত্যে তাঁহার যে দান আছে তাহা তুচ্ছ নহে। সমকালীন লোকনায়কদের চরিত্র-বিশ্লেষণ, বাংলার নবযুগের গতি-প্রকৃতি ও কর্ণধারদের সম্বন্ধে আলোচনা, বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার রচনা শ্রদ্ধার সহিত অবধানের যোগ্য; এই সকল বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থও আছে। তাঁহার বাংলা আত্মজীবনী এবং স্থায়ী মূল্যবান অনেক রচনা সাময়িক-পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে এই সকল গ্রন্থ ও রচনা সুলভে প্রচারের সুযোগ রাষ্ট্রশক্তি করিয়া দিবেন আশা করি; স্বভাবতই শতবার্ষিক সমিতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

## দানবীর প্রমথনাথ রায়

পরিণতবয়সে ভাগ্যকুলের কুমার প্রমথনাথ রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রসাদ বহুজনের মধ্যে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া তিনি ভোগ করিয়াছেন। লোকহিতকর কর্মে তাঁহার বহু দানের মধ্যে সর্বপ্রধান, ৫৫ লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট গঠন, ইহার সাহায্যে বহু প্রতিষ্ঠান উপকৃত হইতেছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

# সমকালীন সমালোচনার ধারা

**চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

বইয়ের সংখ্যা যখন কম ছিল, তখন সমালোচকের প্রয়োজন বড় একটা ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল, আর এদিকে পাঠকদের অবসর সংকীর্ণ হতে লাগল যন্ত্রযুগের প্রভাবে। শুধু উপন্যাস পড়তেই যার আগ্রহ তার পক্ষেও সবগুলি উপন্যাস পড়া সম্ভব নয়। এত সময় নেই। ভালো-মন্দ সর্বকিছু পড়া যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেগুলি ভালো, যেগুলি আমার রুচির সঙ্গে মিলবে বলে আশা করি, শুধু সেগুলিই পড়ব। এই নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্য সমালোচকদের প্রয়োজন হল।

সাহিত্যের তাত্ত্বিক সমালোচনা অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যে ছিল; কিন্তু সাহিত্য সমালোচনাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। বর্তমান শতকে সমালোচনা সাহিত্য নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পেরেছে। বিশেষ করে এটা সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যে। সেখানে এখন একদল লেখক সাহিত্য সমালোচনাকে জীবিকার্জনের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু সমালোচনার বই লিখে খ্যাতি লাভ করাও এখন সম্ভব হয়েছে। আই এ রিচার্ডস্ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী শতকেও অনেকে সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তখন সাধারণত কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখকরা তাঁদের অন্য রচনার সঙ্গে কিছু কিছু সাহিত্য সমালোচনাও লিখেছেন। সেন্টস্‌বারির মতো দু'চারজন ব্যতিক্রম যে না ছিলেন এমন নয়। তবে এখনকার মতো সমালোচনা সাহিত্য যে পৃথক মর্যাদা লাভ করেনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমালোচনা সাহিত্য বলতে আমরা এখানে একটি বিশেষ বইয়ের পরিচিতি এবং সাহিত্যের আদর্শ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—এই দু'টি শাখাকেই বুঝব।

বিংশ শতাব্দীতে সমালোচনা সাহিত্যের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রধান কারণ দু'টি। সাহিত্য এখন পুরোপুরি ব্যবসায়ের পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকের মতামতের উপরে এই পণ্য বিক্রি বিশেষরূপে নির্ভরশীল। যে ব্যবসায় কয়েক কোটি টাকা খাটছে সমালোচকদের তার উপর প্রভাব আছে বলেই তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান শতকের মতো সাহিত্যের বহুমুখীনতা এবং জটিলতা পূর্বে কখনো ছিল না। বিগত শতাব্দীর সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্ ও বাস্তবতা—এই দু'টি প্রধান ধারা ছিল বলতে পারি। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে কোন্ ধারাটি যে প্রধান তা নির্দেশ করা যায় না। বাস্তবতা, নিও রোমান্টিসিজম, অস্তিত্ববাদ, ইম্‌প্রেশানিজম, সুররিয়ালিজম, মার্কসবাদ ইত্যাদি অসংখ্য ধারা ও উপধারা পাশাপাশি রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি সাহিত্যগোষ্ঠী। ঐসব গোষ্ঠীর চিন্তা ও আদর্শ সাধারণ পাঠকের পক্ষে সাহায্য ব্যতীত উপলব্ধি করা কঠিন

'নাভানা'র বই

মানুষের মনের এবং জটিল ব্যক্তিত্বের পাওয়া যায়। যে সাহিত্য মানুষের নর ছবি প্রতিফলিত করবে সেখানে । বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কমপ্লেক্স, ক, আদিরূপ প্রভৃতি সমকালীন ত্যের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাচীন সাহিত্যেও কথা আছে। ঈডিপাস কমপ্লেক্সের সুবিদিত। ফ্রয়েড তাঁর পূর্ববর্তী কদের রচনা থেকে বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ছেন।

র্কসবাদী সমালোচকরা সাহিত্যে শ্রেণী মের কথা না দেখলে ক্ষুব্ধ হন। মনোনী সমালোচকরা যে সাহিত্যে মানুষের ক ও মানসিক পূর্ণ স্বাধীনতার কথা না হয় তাকে আক্রমণ করেন। নৈতিক বায়ুগ্রস্ত সমাজের অনুশাসনের ফলে দের সহজ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাও দমন করতে হয়। পরিণামে জীবন চ ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে। কামনার স্বাভাবিক স্ফূর্তি ব্যাহত হলে ষের কি অবস্থা হয় সাহিত্যের মাধ্যমে দেখানো কর্তব্য বলে মনোবিজ্ঞানী লোচকরা বিশ্বাস করেন। তাহলে নীতিথোর দাসত্ব ক্রমশ শিথিল হবার আশা ।

বদমিত বাসনার গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানী লোচকদের নিকটে আর একটি কারণে বেশী। ফ্রয়েডের মতো তাঁরাও বিশ্বাস র যে, নিরুদ্ধ কামনা সঞ্জাত ব্যর্থতা ও গা মানুষের স্নায়ু বিকৃত করে। শিল্পী সাহিত্যিকরা স্নায়ুরোগী। তাঁদের যে মিত আকাঙ্ক্ষা সহজভাবে জীবনে তা লাভ করে না, সৃষ্টির জগতে তাকে দিতে পারলে কিছুটা তৃপ্তি লাভ যেতে পারে। যাঁর বেদনা ও ব্যর্থতা যত , যাঁর আকাঙ্ক্ষার জটিলতা যত গভীর, সৃষ্টির মানও তত উঁচু। ফ্রয়েড বলেন শিল্পীর অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা শিল্পের মধ্য দিয়ে বিকল্প সার্থকতা লাভ । একমাত্র শিল্পীদের স্নায়ুবিকারই টর প্রেরণা হিসাবে সমাজের পক্ষে লকর। মনোবিজ্ঞানী সমালোচকরা






শিল্পীর মন বিশ্লেষণ করে সৃষ্টির রীতি ও পদ্ধতি উপলব্ধি করতে পারেন। টমাস মান ফ্রয়েডের এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচনায় যতগুলি শিল্পী ও সাহিত্যিক চরিত্র দেখতে পাই তারা সকলেই স্নায়ুবিকারগ্রস্ত।

শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদে যেসব সমালোচক বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড ডেল, ওয়াল্‌ডো ফ্র্যাঙ্ক, হার্বার্ট রীড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডেল তাঁর "লাভ ইন দি মেশিন এজ" নামক গ্রন্থে ফ্রয়েডের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। হার্বার্ট রীড মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় মতবাদ—এই উভয়ের প্রতিই অনুরক্ত। তিনি "আর্ট অ্যান্ড সোসাইটি" নামক তাঁর বইয়ে শিল্প সৃষ্টির ধারাকে ফ্রয়েডের মতবাদ অনুসারেই ব্যাখ্যা করেছেন।

**নব মানবতাবাদ**

নব মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী একটি সমালোচক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে আমেরিকায়। সাহিত্যে ক্লাসিকাল যুগের ডিসিপ্লিনের পুনঃপ্রবর্তন এঁদের কাম্য। এই ডিসিপ্লিন রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক—এই উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক। সাহিত্যে বাস্তববাদ, রোমাণ্টিকতা এবং মনোবিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা এই গোষ্ঠীর, সমালোচকরা বরদাস্ত করতে পারেন না। বিংশ শতাব্দীর জীবনে যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে তার প্রতিবাদে এঁরা মানবতার আদর্শে সমৃদ্ধ ক্লাসিকাল যুগের পরিবেশে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ। জীবনে ও সাহিত্যে ধর্ম যদি প্রেরণার উৎস হয় তাহলে সকল উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে সমাজ ও নীতি শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। সমকালীন সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে প্রাধান্য দেখা দিয়েছে মানবতাবাদী সমালোচক গোষ্ঠী তার বিরোধী।

সাহিত্য সমালোচনায় 'নিউ হিউম্যানিজম'-এর প্রবর্তন করেছেন পল এলমার মোর্ ও আর্ভিং ব্যাবিট। দুজনেই পণ্ডিত ব্যক্তি; সুতরাং তাঁদের সমালোচনায় রীতি বাস্তব জীবনের দাবিকে অনেকাংশে উপেক্ষা করে পুঁথিগত হয়ে পড়েছে। মোর্ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেছেন এবং ভারতীয় আদর্শ তাঁর মতবাদকে কিছু পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে। আমেরিকার বাহিরে সাহিত্য বিচারে 'নিউ হিউম্যানিজম'-এর আদর্শ বিশেষ প্রচার লাভ করেনি।

**আত্মমুখীন সমালোচনা**

আত্মমুখীন বা ইম্‌প্রেশানিস্‌টিক সমালোচনায় শিল্প বা সাহিত্যকর্মকে পৃথকভাবে বিচার করা হয় না। একটি বই বা ছবি সমালোচকের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাই আত্ম-

-মুখীন সমালোচনার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মূল বইয়ের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ স্থাপন না করিয়ে বই নিজের মনের উপরে যে ছাপ ফেলে সমালোচক তার সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেন। আত্মমুখীন সমালোচনার মূল কথাটি সংক্ষেপে সুন্দর-ভাবে বলেছেন আনাতোল ফ্রান্স:

"The good critic is the one who tells the adventures of his soul among masterpieces."

ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমালোচনা বলেই কোনো বিশেষ রীতি বা আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন নেই। নিজের ভালোলাগা কি মন্দ-লাগার কথাটি পাঠকের নিকট পেঁছে দেওয়াই সমালোচকের কাজ। এ ধরনের সমালোচনায় যেমন অবাধ স্বাধীনতা আছে, তেমনি দায়িত্বের পরিমাণও রয়েছে যথেষ্ট। সমালোচকের ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি, বিচারবুদ্ধি, সহানুভূতি এবং প্রকাশের ক্ষমতার উপরে সমালোচনার সার্থকতা নির্ভর করে। একটি রীতি অনুসরণ করে কিংবা আদর্শ সামনে রেখে সমালোচনা করা এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ।

ব্যক্তিমুখীন সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি। তথাপি এ জাতীয় সমালোচনার বিকাশ ঘটেছে অনেক পরে। তার কারণও আছে। সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমালোচনার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। যে-সব সমালোচক এবং লেখক কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত নন তাঁদের অধিকাংশই এ ধরনের সমালোচনা লিখতে পছন্দ করেন।

ব্যক্তিমুখীন সমালোচনাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন ফরাসী লেখক জুল লেমেৎর্। পরে বহু সমালোচক ব্যক্তিমুখীন সমালোচনাকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করে-ছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমালোচক ইতালীর বেনেদেত্তো ক্রোচে। তিনি সমালোচকের রসাস্বাদন ও বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিমুখীন ছিলেন না। কারণ সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল এবং তিনি ইম্প্রেশানিস্টিক সমালোচক।

### পুস্তক পরিচয়

সংবাদপত্রে এবং জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকায় পুস্তক-পরিচয় প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একে সমালোচনা বলা যায় না। এ যেন অনেকটা আর পাঁচটা সংবাদের মতো একটি নবপ্রকাশিত পুস্তকের খবর পরিবেশন করা। লেখকের পরিচিতি, বইয়ের বিষয়বস্তু এবং ছবি, ছাপা ও বাঁধাই সম্বন্ধে পাঠকদের সংবাদ জানানোই এ ধরনের তথাকথিত সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য। সংবাদপত্র ও জনপ্রিয় সাময়িক পত্রের প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে পুস্তক-পরিচয়ের

চাহিদা বেড়েছে। সকল প্রকার সংবাদের মতো সাহিত্যের সংবাদও পাঠকরা পেতে চায়। পুস্তক-ব্যবসায় প্রসার লাভ করবার ফলে বিজ্ঞাপনদাতা ব্যবসায়ীদের দাবি উঠেছে সাহিত্য সম্বন্ধে কাগজে আলোচনা থাকা চাই,—না হলে বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ কী?

এই ব্যস্ততার যুগে পাঁচ-দশ মিনিটে কাগজ পড়া শেষ করতে হয়। গম্ভীর ও গভীর সমালোচনা পড়বার মতো সময় নেই। সাধারণ পাঠক বইটি সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় পেলেই সন্তুষ্ট। এই প্রয়োজনের তাগিদে পাশ্চাত্ত্যে একদল প্রফেশনাল পুস্তক-পরিচয় লেখকের সৃষ্টি হয়েছে। যত্ন করে এ'রা বই পড়েন না, বইয়ের দোষ-গুণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিমতও প্রকাশ করেন না; এ'রা ভদ্র ও সংযত ভাষায় পুস্তকের পরিচয় দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুর সমালোচনা—যে সমালোচনা কীটসের অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে কারো কারো ধারণা—এখন আর নেই। এখনকার পুস্তক-পরিচয় লেখক তাঁর কাগজের এবং প্রকাশকের স্বার্থ মনে রেখে পরিচিতি লেখেন।

এই ধরনের পরিচিতিতে মাঝে মাঝে ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়। কারণ লেখক সম্পূর্ণ বই প্রায়ই পড়েন না; প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি এবং সূচীপত্র দেখে বই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচনা করেন। এর ফলে কৌতুকজনক ভুল ঘটবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের দেশে যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে পুস্তক পরিচয় লেখেন তাঁরা তো এ ভুল করেনই, পাশ্চাত্ত্যেও এরূপ ভুল পরিচিতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইচ ডব্লু ফাউলার সঙ্কলিত 'এ ডিক্শনারি অব মডার্ন ইংলিশ ইউসেজ' গত তিরিশ বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। এই সংকলনে হেনরির ভাই এফ জি ফাউলারেরও সহায়তা ছিল। কিন্তু কাজ শেষ না হতেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক, বইয়ের নামপত্রে দু' ভাইয়ের নামই ছিল। এক বিলাতি কাগজের সমালোচক ভাবলেন, দুই 'ফাউলার' যখন, তখন নিশ্চয়ই এ'রা স্বামী-স্ত্রী। তিনি লিখলেন, স্ত্রী যে অংশ সংকলন করেছেন সে অংশ অপেক্ষাকৃত ভালো। এই মন্তব্যের সবটাই সমালোচকের আবিষ্কার।

পুস্তক-পরিচিতির প্রভাবের ফলে প্রকৃত সমালোচনার মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা যত কমছে ততই সাধারণ পাঠকের মনে ধারণা হচ্ছে যে, পুস্তক পরিচয়ই সমালোচনা।

## নতুন সমালোচনা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে সমালোচনা সাধারণত গোষ্ঠীর সংকীর্ণ আদর্শকোণ থেকে, কখনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিংবা ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। এরূপ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি বইয়ের যথার্থ এবং সামগ্রিক বিচার সম্ভব নয় বলে এক দল সাহিত্য-রসিকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে একটি সমালোচক গোষ্ঠী গড়ে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ'দের প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়ছে। এ'দের সমালোচনার পদ্ধতিকেই 'নিউ ক্রিটিসিজম' বা নতুন সমালোচনা বলা হয়।

এই সমালোচনার পদ্ধতির নাম সার্থক। কেননা, প্রচলিত সমালোচনা রীতি সাহিত্য-রস আস্বাদনের পরিপন্থী বলে নতুন সমালোচনার সমর্থকরা মনে করেন। একটি বইকে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসাবে বিচার করতে হবে। তার সঙ্গে লেখকের জীবন, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা ভ্রমাত্মক। তাহলে শিল্পকর্মের সামনে অনাবশ্যক আড়াল এসে উপলব্ধির পথে ব্যাঘাত জন্মাবে। বইটির শিল্পসত্তাই তো সমালোচকের একমাত্র বিচার্য! বিচারের এই পথ ত্যাগ করলে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। টলস্টয় শেক্সপীয়রের 'লীয়ার' নাটক শিল্পকর্ম হিসাবে উপেক্ষা করেছেন, কারণ এর মধ্যে কোনো নৈতিক আদর্শ পরিস্ফুট হয়নি। একজন মার্কসবাদী সমালোচক শ্রেণী সংগ্রামের কথা নেই বলে হেরমান হেসের 'সিদ্ধার্থের' মধ্যে কোনো সার্থকতা দেখতে পাননি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা টেনে তাঁর রচনার অপব্যাখ্যা তো হামেশাই হয়ে থাকে। এই জন্যই 'নতুন সমালোচনার' সমর্থকরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসাবে বইয়ের বিচার করতে চান। সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে এ'রা মোটামুটিরূপে 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর নীতিকে গ্রহণ করেছেন।

নতুন সমালোচনার সমর্থকরা মনে করেন যে সমালোচকের কর্তব্য শুধু অপরের সৃষ্ট সাহিত্যের ব্যাখ্যা নয়; সমালোচকও মৌলিক শিল্পী। প্রকৃত সমালোচকের রচনা রসোত্তীর্ণ হবে এবং সাহিত্যে স্থান লাভ করবে। প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূন নয়। রসোত্তীর্ণ কাব্য ও সমালোচনা সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য।

সাহিত্য সমালোচনার বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ বিচারের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানদণ্ড ছিল নৈতিক আদর্শ। পুস্তকের বিষয়বস্তু সেই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করলে লেখককে ক্ষমা করা হত না। ক্রমশ রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির যুগোপযোগী আদর্শ সমালোচকের বিচারকে প্রভাবান্বিত করেছে। 'নতুন সমালোচনা' সমালোচনা সাহিত্য বিবর্তনের এখন পর্যন্ত শেষ ধাপ। এই রীতি গ্রন্থের শিল্প সত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছে বলেই আঙ্গিক বিচারের উপরে জোর দিতে হয়। ভাবের সৌন্দর্যের প্রতিফলন অঙ্গসৌষ্ঠবে। সুতরাং কোনো বইকে শিল্পকর্ম হিসাবে দেখতে হলে আঙ্গিকের বিচার অত্যাবশ্যক। এই সমালোচক গোষ্ঠী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দেন। সমালোচকের খেয়াল অনুসারে সমালোচনা হবে এটাও তাঁরা চান না। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যেরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, সাহিত্যের আলোচনায়ও তেমনি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা উচিত।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও শব্দার্থশাস্ত্রজ্ঞ আইভর আর্মস্ট্রং রিচার্ডস 'নতুন সমালোচনার' আদর্শকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখে। 'প্রিন্সিপলস্ অব লিটারারি ক্রিটিসিজম', 'সায়েন্স অ্যান্ড পোয়েট্রি', 'প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম', 'দি ফিলসফি অব রেটরিক', 'হাউ টু রীড এ পেজ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। অপরের সহযোগিতায় লিখিত 'দি ফাউন্ডেশনস অব ঈসথেটিকস' এবং 'দি মীনিং অব মীনিং' এই দুটির নামও সুপরিচিত। এলিয়ট, অডেন, স্পেন্ডার, এডিথ সিটওয়েল, অ্যালেন টেট প্রভৃতি লেখকরা 'নতুন সমালোচনার' আদর্শে বিশ্বাসী।

আমরা সমালোচনার প্রধান প্রধান ধারাগুলির পরিচয় দিয়েছি। সম্প্রতি দুটি নতুন ধারার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা। তুলনামূলক সাহিত্যপাঠের আদর্শ নতুন নয়; গ্যেটে এই আদর্শের প্রবর্তক। যুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের প্রচলন হওয়ায় বিশ্বসাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনাও ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে একটি ভাবের বিকাশ কিভাবে হয়েছে, বিভিন্ন যুগের প্রতিচ্ছবি কোন দেশের সাহিত্যে কিভাবে ফুটেছে—তুলনামূলক সমালোচনায় তারই উপর জোর দেওয়া হয়। লেখকের সঙ্গে লেখকের, বইয়ের সঙ্গে বইয়ের তুলনা উদ্দেশ্য নয়।

আর একটি হল নৃ-বিজ্ঞানীদের সাহিত্যের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা। তাঁরা সাহিত্যকে পৃথকভাবে বিচার না করে মানুষের সমগ্র সংস্কৃতির শাখা হিসাবে দেখেন। সভ্যতার কোন স্তরে কি ধরনের সাহিত্য রচিত হয় তার বিশ্লেষণ করে এ'রা মানুষের সামগ্রিক প্রগতির ইতিহাস রচনা করেন। ক্রোয়েবারের configurations of culture growth বইটির নাম এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

# জোলিও কুরী

**অশোক মুখোপাধ্যায়**



**অধ্যাপক জোলিও কুরী**
জন্ম ১৯০০ খৃষ্টাব্দ
মৃত্যু ১৯৫৮ ,,

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস। মানব-ইতিহাসের একটি দুঃস্বপ্ন। জাপানের দুটি বৃহৎ শিল্পনগরী হিরোসিমা এবং নাগাসাকি আণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই প্রথম মানুষ প্রত্যক্ষ করল পরমাণু-শক্তির ভয়াবহতা। অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায় "যুদ্ধের নামে, মারাত্মক শত্রু বিনাশের নামে এবং বিশেষ করে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে লক্ষাধিক নিরপরাধ নাগরিকের জীবনান্তের মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। চেঙ্গীস ও তাইমুরও বোধ হয় সেদিন তাদের কবরের ভিতর নড়েচড়ে উঠেছিল।"

কিন্তু এর প্রায় চল্লিশ বছর আগেই একজন বিজ্ঞানী পরমাণু-শক্তির ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্বন্ধে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—

"একথা পূর্বচিন্তন করা আজ মোটেই দুরূহ নয় যে, অসাধু হাতে পড়ে রেডিয়াম একদিন অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়া... । এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগছে যে, প্রকৃতির গোপন রহস্যগুলির উন্মোচন সত্যি সত্যি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হচ্ছে কিনা এবং তাদের যথাযথরূপে ব্যবহারের জন্য মানুষ যথেষ্টরূপে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে কিনা, অথবা এইসব জ্ঞানার্জন তার পক্ষে শুধু ক্ষতিকর হয়েই দেখা দেবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রেডিয়ামেরই অন্যতম আবিষ্কর্তা স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরী—মাদাম কুরীর স্বামী।

আমরা তাঁর আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। পরমাণু-শক্তি বন্দী হয়েছে দানবদেরই হাতে। তাই পৃথিবীর বুকে আজ মানুষের অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন। সব থেকে দুঃখের কথা বহু ক্ষমতালিপ্সু বিজ্ঞানসেবী পর্যন্ত রাষ্ট্রনায়কদের প্ররোচিত করেছেন তেজোষ্ক্রিয় মারণাস্ত্র নির্মাণে। বিজ্ঞানের সুমহান ঐতিহ্যকে যাঁরা এইভাবে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের মনস্তুষ্টিবিধানে মসীচিহ্নিত করেছেন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁদের লজ্জার সঙ্গেই স্মরণ করবে।

তবু এরই মধ্যে কতকগুলো নাম শাশ্বত-কালের জন্য ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁরা স্বার্থান্বেষীর হাতে ক্রীড়নক না হয়ে বিজ্ঞানকে চেয়েছেন বৃহত্তর মানব-জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে। সদ্য-পরলোকগত অধ্যাপক ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর স্থান অনিবার্যভাবেই থাকবে এঁদের সকলের পুরোভাগে। যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর আমৃত্যু সাধনা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। ফার্মি, উইগনার, টেলার, শিলার্ড প্রভৃতি তাঁর সহকর্মীরা যখন বিজ্ঞানের স্বাধীনতা সংকোচের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আন্দোলন করেছেন শাসকগোষ্ঠির অনুরাগ-আকর্ষণের প্রত্যাশায়, একমাত্র জোলিও কুরীই তখন প্রবলভাবে তার বিরোধিতা



**জোলিও কুরীর স্ত্রী : ডক্টর আইরিন কুরী**
জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ
মৃত্যু ১৯৫৬ ,,

করেছেন। এর জন্য নানারকমে দেশে-বিদেশে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে তাঁকে। তবু ব্যক্তিগত স্বার্থের যূপকাঠে মানুষের কল্যাণকে বলি দিতে তিনি স্বীকৃত হননি।

ফ্রান্সের এক দরিদ্র পরিবারে ফ্রেডারিক জোলিওর জন্ম হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। শৈশবে আর্থিক অনটন এবং পাঠ-বিরাগ-হেতু উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। মাদাম কুরীর গবেষণাগারে সামান্য কাজে নিযুক্ত হন তিনি। এখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি মাদাম কুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর কন্যা আইরিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯২৬ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর ফ্রেডারিক জোলিও স্বেচ্ছায় ফ্রেডারিক জোলিও কুরী নাম গ্রহণ করলেন। আইরিন হলেন আইরিন কুরী জোলিও। মাদাম কুরী এবং পিয়ের কুরীর মত এই নূতন কুরী দম্পতিও বিজ্ঞানচর্চাকে করলেন জীবনের ব্রত এবং যুগান্তকারী আবিষ্কারে স্তম্ভিত করে দিলেন সারা পৃথিবীকে।

বিজ্ঞানক্ষেত্রে জোলিও কুরীর প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান হল কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয়ার আবিষ্কার। এরই অন্যতম ফল হিসেবে পরমাণুর কেন্দ্রকে পাওয়া গেল নিউট্রনের সন্ধান। নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর গঠন বিষয়ে বিজ্ঞান আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে আর একটু পেছন থেকে যাত্রা করলে সম্ভবত জোলিও কুরীর গবেষণার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ড্যালটন তাঁর সুবিখ্যাত পরমাণুবাদ (ড্যাল্‌টনস অ্যাটমিক থিওরি) প্রণয়ন করেন। এই শতক শেষ হবার আগেই প্রধানত ক্রুক্‌স, টম্‌সন, মিলিকান প্রভৃতির চেষ্টায় জানা গেল পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর কণিকা ইলেকট্রনের অস্তিত্বের কথা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকারেল আবিষ্কার করলেন য়ুরেনিয়ামের তেজষ্ক্রিয়তা। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন, এই ধাতু থেকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে প্রতিনিয়ত এক অজ্ঞাত রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

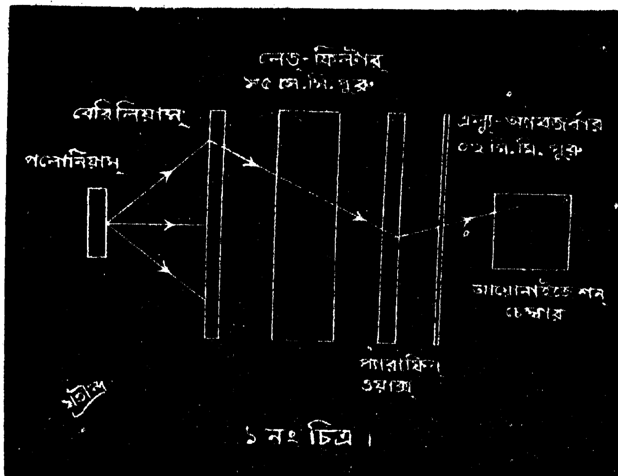
১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ। পিয়ের কুরী এবং তাঁর স্ত্রী মেরী কুরী এমন এক পদার্থের সন্ধান পেলেন যার তেজষ্ক্রিয়তা য়ুরেনিয়াম অপেক্ষা বহুগুণে বেশি। এই পদার্থটির নামকরণ হল রেডিয়াম এবং তারই থেকে উদ্ভব হল 'রেডিও অ্যাক্‌টিভিটি' শব্দটির।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। আইনস্টাইন বস্তু এবং শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড নিউক্লিয়াস বা পরমাণু-কেন্দ্রকের ধারণা গড়ে তুললেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্রকের বিদারণ (বম্‌বার্ডমেণ্ট) করতে সমর্থ হলেন। লঘু পরমাণুর কেন্দ্রককে আল্‌ফা কণা দ্বারা আঘাত করা হল। কেন্দ্রক বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং মুক্ত হল প্রোটন কণিকা।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দ। ড্যানিস-বিজ্ঞানী নীল-বোর পরমাণুর নিউক্লিয়ার গঠন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন। কেন্দ্রকের চারদিকে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন মহল—এটি তাঁরই আবিষ্কার।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। বোথে এবং বেকার পরমাণুর কৃত্রিম ভাঙনের উপর এক ঝলক নূতন আলোক নিক্ষেপ করলেন। তেজষ্ক্রিয় পলোনিয়াম থেকে যে আলফা কণা নির্গত



১ নং চিত্র।

হয়, তাই কাজে লাগানো হল। তাঁরা দেখলেন, বোরণ বা বেরিলিয়ামের মত হাল্কা ধাতুর কেন্দ্রককে যদি এই আল্‌ফা কণা দ্বারা আঘাত করা যায়, তাহলে এক অত্যন্ত শক্তিশালী রশ্মির আবির্ভাব ঘটে। গাইগার-কাউণ্টারের সাহায্যে তাঁরা প্রমাণ করলেন, এই রশ্মির ভেদনক্ষমতা (পেনিট্রেটিং ক্যাপাসিটি) পূর্বোক্ত রশ্মি অপেক্ষা অনেক বেশি।

এই রশ্মি সম্বন্ধে গভীরতর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন জোলিও এবং আইরিন কুরী। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁরা একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করলেন। বিভিন্ন পদার্থ এই রশ্মির তীব্রতাকে কতটা মন্দীভূত করে দিতে পারে, তাঁরা তখন সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন (১নং চিত্র)। দেখা গেল প্যারাফিন ওয়াক্সএর ওপর এই রশ্মি ফেললে প্রচুর পরিমাণ প্রোটন কণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় মুক্ত প্রোটন সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল, এই অজ্ঞাত রশ্মি সম্ভবত গামা রশ্মি। কিন্তু ডক্টর জেম্‌স চ্যাড্‌উইকের পরীক্ষায় এই ভ্রান্তি দূর হল। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই রশ্মি হল বিশেষ এক ধরনের নিস্তড়িৎ কণিকার প্রবাহ। এই নিস্তড়িৎ কণিকাকেই অভিহিত করা হল নিউট্রন বলে।

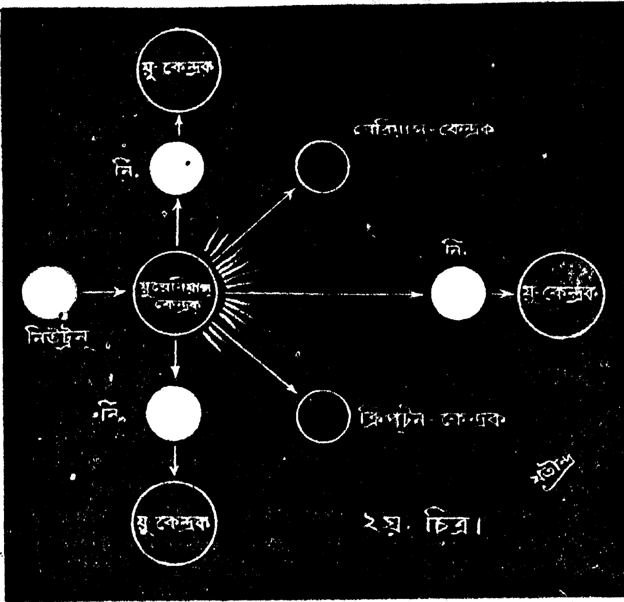
নিউট্রনের আবিষ্কার পরমাণু-বিজ্ঞানের এক বিরাট কীর্তি সন্দেহ নেই। কেননা, পরমাণুর কৃত্রিম ভাঙনের কাজ এতে বহুগুণে ত্বরান্বিত হয়েছে। নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। সুতরাং কেন্দ্রক এদের উপর কোন বৈদ্যুতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ফলে তারা বিন্দুমাত্র বাধা না পেয়ে অনেক অল্পায়াসে কেন্দ্রককে গিয়ে সোজাসুজি আঘাত করতে পারে।

নিউট্রন চ্যাড্‌উইক কর্তৃক আবিষ্কৃত হলেও এর জন্য জোলিও এবং আইরিন কুরীর কৃতিত্বও কম নয়। কারণ এ বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণা করেছিলেন তাঁরাই এবং চ্যাড্‌উইক তাঁদেরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে সাফল্যলাভ করেছিলেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে জোলিও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল প্রাইজ পেলেন। কয়েকটি কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয় ধাতু উৎপন্ন করার জন্য রসায়ন শাখায় তাঁরা পুরস্কৃত হলেন। একই পরিবার মোট তিনবার এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়ে কুরী পরিবার নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঐতিহ্যের সৃষ্টি করল।

জোলিও কুরীর সবচেয়ে বড় কীর্তি সম্ভবত চেন্‌-রিয়্যাক্‌শন বা অবিরাম-পারস্পরিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার। আজ আমাদের সামনে পারমাণবিক শক্তির যে বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত (অবশ্য কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হলে) তা কখনোই সম্ভব হত না, যদি না এই আবিষ্কারটি হত। এই প্রসঙ্গে চেন-রিয়্যাক্‌শনের যথার্থ প্রকৃতি নিয়ে দু-এক কথা বলা যেতে পারে।

য়ুরেনিয়াম-২৩৫-এর কথাই ধরা যাক। মনে করি একটি নিউট্রন গিয়ে আঘাত করল কোন য়ুরেনিয়াম কেন্দ্রকের ওপর




২য়. চিত্র।

(২নং চিত্র)। আঘাতের ফলে কেন্দ্রকটি দ্বিধ্বস্ত হল দুভাগে। এক ভাগ হল লঘু বেরিয়াম কেন্দ্রক, অন্যভাগ ক্রিপ্টন কেন্দ্রক। সঙ্গে বিপুল শক্তির উৎসারণ তো হলই, উপরন্তু মুক্তি পেল য়ুরেনিয়াম কেন্দ্রকে আবদ্ধ থাকা তিনটি নূতন নিউট্রন। এই সদ্যোমুক্ত নিউট্রন তিনটি এখন শুরু করবে কেন্দ্রকের বম্‌বার্ডমেণ্ট বা বিদারণ। এই প্রক্রিয়ায়ও আবার বহির্গত হবে নতুনতর কতগুলো নিউট্রন।

এমনি করে মুক্তিপ্রাপ্ত নিউট্রনের সংখ্যা এবং কেন্দ্রকের ভাঙন বেড়ে চলবে সম-গতিতে। আর প্রতিবারই কেন্দ্রকের বস্তুকণার কিয়দংশ ক্ষয়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তুল্য-পরিমাণ তেজশক্তিতে।

পদার্থের মধ্যে যদি কোনক্রমে একবার চেন-রিয়্যাক্‌শন বা অবিরাম প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া যায়, তাহলে বস্তুকণার শক্তিতে রূপান্তর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বেড়ে চলবে। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাষায় "কড়ায় সামান্য একটু তেল দিয়ে ইলিশ মাছ ছেড়ে দিলে আর তেল দিতে হয় না, মাছের সেই মাছ ভাজা হয়। এখানেও প্রথম বাইরে থেকে কিছু নিউট্রন দিয়ে কাজটা শুরু করে দাও, তারপর নিউট্রন জম্মাতে থাকবে, সেই নিউট্রনই কাজ করবে, নতুন বার নিউট্রন জুগিয়ে যেতে হবে না।"

চেন-রিয়্যাকশনের আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের হাতে যেন পরমাণু-শক্তি আয়ত্তীকরণের চাবিকাঠি এনে দিল। কলসীতে বন্ধ দৈত্যের মত পরমাণু কেন্দ্রকের কারাগারেও যে আত্মগোপন করে আছে অপরিসীম শক্তি—তা বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন অনেককাল আগেই। অপেক্ষা ছিল শুধু তাকে মুক্তি দেবার। জোলিও কুরীর আবিষ্কার যেন রুদ্ধদ্বার খুলে দিল।

পরমাণু-বিজ্ঞানে জোলিও কুরীর এই আবিষ্কার কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করে বুঝবার জন্য নিচে একটি চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি। ইউ এস অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গর্ডন ডীন তাঁর 'রিপোর্ট অন দি অ্যাটম' গ্রন্থে মূল চিঠিটি প্রকাশ করেছেন। এই চিঠিটা মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন লিখেছিলেন, আমেরিকার তৎকালীন কর্ণধার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে। রুজভেল্ট যেন অবিলম্বে আমেরিকায় পারমাণবিক গবেষণার আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন, সে অনুরোধ জানিয়ে

চিঠিটা লিখিত। ভাষান্তরণ না করে চিঠিটা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

Albert Einstein
Old Grove Road
Nassau Point
Peconic, Long Island
August 2nd, 1939

F. D. Roosevelt,
President of the United States
White House
Washington, D. C.

Sir,

Some recent work by E. Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element of Uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future......

In the course of the last four months it has been made probable through the work of 'Joliot in France' as well as Fermi and Szilard in America that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of Uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium like elements would be generated......

......The new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable—though much less certain—that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed....

Yours very truly,
A. Einstein

আমরা জানি রুজভেল্ট এ প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে দেরী করেন নি। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, আইনস্টাইনের চিঠির প্রথম অংশের প্রতি তাঁর ততটা দৃষ্টি পড়ে নি, যতটা পড়েছিল শেষ অংশের প্রতি—অর্থাৎ বোমা তৈরীর দিকে। অথচ যার আবিষ্কারের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এই মারণাস্ত্র তৈরীর কাজ শুরু হল, তিনি নিজে বলেছেন—

সভ্যতার প্রত্যূষে মানুষের সমস্ত কর্ম-শক্তি ব্যয় হত অন্যকে ধ্বংস করার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে। কিন্তু আমরা কি এখন এমন একটা যুগে বাস করছি না যখন মানুষের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত প্রতি-বেশীর কল্যাণসাধনে?

আত্মভোলা বিজ্ঞানীরা সাধারণত গবেষণা-গারের নিভৃতে নিজেদের লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন। কিন্তু জোলিও কুরী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। অধ্যাপনা এবং গবেষণার সংগে সংগে জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংগে বরাবর সংযোগ রেখে চলেছেন তিনি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স নাৎসি-কবলিত হলে প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যে নাৎসিরা যাতে উপকৃত হতে না পারে, সেজন্য চেন-রিয়্যাকশনের ফরমুলা এবং কিছু পরিমাণ 'ভারি-জল', যা তখন তাঁর হাতে ছিল, তিনি গোপনে ইংল্যাণ্ডে রেখে আসেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ থেকেই তিনি সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানত তাঁরই পরামর্শ এবং সংগঠন-কুশলতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের Commissariat a l' Energie Atomique বা পরমাণু গবেষণা কমিশন। কিন্তু তাঁর সমালোচনামূলক নির্ভীক মত-বাদের জন্য ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি এর প্রধান পরিচালকের পদ থেকে অপসারিত হন। তবু তিনি শাসক-শক্তির কাছে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বকে বিক্রয় করেন নি।

একজন বিরাট বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি চির-অমর হয়ে তো থাকবেনই; সেই সংগে একজন পরম মানবদরদী হিসেবেও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে।




**পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্য**

মহাশয়,

গত ২৭শে বৈশাখের (বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত জনাব গোলাম সাকলায়েন সাহেবের 'পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্য' শীর্ষক, প্রবন্ধের প্রতিবাদে 'দেশে'র আলোচনা-বিভাগে প্রকাশিত জনাব আমীর খসরুর পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পত্রটি প্রকাশ করে আপনি যে সাংবাদিক সুলভ সততার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

গোলাম সাকলায়েনের প্রবন্ধটি একটু খতিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবি আব্দুল কাদির, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের নানা রচনা থেকে বহু বাক্য ও অনুচ্ছেদ বেপরোয়াভাবে আহরণ ক'রে এবং কোথাও সামান্য পরিবর্তন ক'রে জনাব সাকলায়েন তাঁর প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেছেন।

১৩৬১ সালের মাঘ (১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী) সংখ্যা 'মাহে-নও' পত্রিকায় "পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা" শিরোনামে জনাব আব্দুল কাদিরের একটি বেতার-কথিকা (Radio-talk) মুদ্রিত হয়; তাতে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে রচিত পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনাটি এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, তার ইংরেজী অনুবাদ ঢাকার দৈনিক PAKISTAN OBSERVER, সাপ্তাহিক EAST PAK INFORMATION এবং করাচীর দৈনিক DAWN প্রকাশ করেন। ১৯১৯ সালে সৈয়দ এমদাদ আলীর 'ডালি' কাব্য প্রকাশিত হলে 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকা উচ্চ প্রশংসা করে; তাঁর পরিণত বয়সের ভূমিকা সম্বন্ধে আব্দুল কাদিরের উক্ত আলোচনায় বলা হয়—

"সৈয়দ এমদাদ আলীর 'আওরঙ্গজীব-আলমগীর' কবিতাটি বাঙালী মুসলমানকে নিজেদের স্বতন্ত্র তাহজীব-তমদ্দুন সম্বন্ধে নূতনভাবে সচেতন ক'রে তোলে। ইদানীং তিনি 'কায়েদে আজম স্মরণে', 'আমরা মুসলমান' যে-সব কবিতা লিখেছেন তাতেও তাঁর এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দীপ্তিমান।"

এই কথাগুলো সংক্ষিপ্ত ক'রে গোলাম সাকলায়েন আপনার কাগজে লিখেছেন—

"সৈয়দ এমদাদ আলীর রচনায় সমাজ-সচেতন কবি-মানস সুপরিস্ফুট। 'কায়েদে আজম স্মরণে', 'আমরা মুসলমান' প্রভৃতি কবিতা কবির এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ে দীপ্যমান।......"

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য গোলাম মোস্তফা সম্বন্ধে আব্দুল কাদির বলেন—

"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর গীতিগ্রন্থ 'তারানা-ই-পাকিস্তান'। ১৯৪৯ সালে তাঁর কাব্য-সংকলন 'বুলবুলিস্তান' প্রকাশিত হয়, তাতে বিভাগোত্তর যুগে রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোও স্থান পেয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি যে-সকল কবিতা রচনা করেছেন তন্মধ্যে 'মরুদুলাল' সর্বোত্তম। বর্তমানে তিনি অমিল-মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'বনি-আদম' নামে এক 'লিরিক-এপিক' রচনায় নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁর সকল রচনায় একটি বিশেষ আদর্শবাদের প্রতি প্রবণতা স্পষ্ট লক্ষণীয়। তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য : মুসলিম জীবনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন।......" (৩৯ পৃঃ)

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী' নামে এক মোটা গদ্য পুস্তক লিখেছিলেন; তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'মরুদুলাল'। অধুনা এই নামে 'মাহে-নও'এ তিনি একটি ক্ষুদ্র কবিতাও প্রকাশ করেছেন। 'মরু-দুলাল' তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। বর্তমানে তিনি মিল্টনের PARADISE LOST-এর বিষয়বস্তু নিয়ে একটি বড় কাব্য রচনায় নিরত আছেন; তা আজও সমাপ্ত বা প্রকাশিত হয়নি। এ-সব তথ্য যথাযথ অনুধাবন না ক'রেই আব্দুল কাদিরের কথা-গুলো কেটে-ছেঁটে গোলাম সাকলায়েন তা আপনার কাগজের পাতে পরিবেশন করেছেন এভাবে—

"উত্তর-স্বাধীন পাকিস্তানে গোলাম মোস্তফা লিখেছেন 'বুলবুলিস্তান', 'তারানা-ই-পাকিস্তান' ও 'মরুদুলাল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। 'বনি আদম' কবির এক অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রন্থখানি 'লিরিক-এপিক'। সব রচনার মধ্যে মুসলিম জীবনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের কথাই মূর্ত হয়েছে বিশেষভাবে।..." (২০১ পৃঃ)

জনাব সাকলায়েন তাঁর প্রবন্ধটিতে যেখানেই এক-আধটু অদল-বদল করতে গেছেন সেখানেই এরূপ ভ্রমাত্মক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তবে অনেক স্থানেই তিনি শুধু দু' একটি শব্দ বা বাক্যাংশ ছেঁটে দিয়ে এবং অনুচ্ছেদ-গুলো ওলট-পালট ক'রে নিয়ে তাঁর লেখাটি তৈরী করছেন। নিম্নে কিছুটা নমুনা দিচ্ছি। আব্দুল কাদিরের প্রবন্ধে আছে—

"শাহাদাৎ হোসেনের সুনির্বাচিত শব্দযোজনা ও ক্লাসিকধর্মী রচনা-শৈলী এ প্রদেশের তরুণ

কবিদের সম্মুখে এক আদর্শ বিশেষ। কাজী আকরম হোসেন 'আমরা বাঙালী' লিখে নাম করেছিলেন; কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 'মসনভী রুমী' ও 'সাদীর কালাম' এ দুটি অনুবাদ কাব্য ছাড়া তাঁর কোনো মৌলিক রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এ পর্যায়েরই লেখক মীজানুর রহমান; তাঁর 'জিন্দা মুসলমান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাশেম সে-যুগে তাঁর 'কথিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'কথা' ও 'কাহিনী'র সার্থক অনুসরণ করেছিলেন; তাঁর ইদানীন্তন কবিতা 'ইকবাল', 'ইকরা' প্রভৃতি বেশ প্রাণবন্ত।......

"কাজী কাদের নওয়াজের শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তাঁর বিভাগোত্তর যুগের রচনায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চটুল ছন্দ ও প্রাঞ্জল ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন। তাঁর 'গুণ্ডায়ে-উমিদ', 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রভৃতি কবিতা সুখপাঠ্য।......অধুনা নানা কারণে অনেকের রচনা-শক্তি যেন কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান হয়ে এসেছে। আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ শক্তিমান কবিদের মধ্যেও কেমন যেন একটু ভাটার টান লেগেছে।......পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি (আহসান হাবীব) অধিকতর দক্ষতা দেখিয়েছেন ব্যঙ্গ রচনায়। তাঁর 'হক নাম-ভরসা', 'ধন্যবাদ', 'একরার-নামা', 'সন্ধিপত্র' তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। ফররুখ আহমদ আজো নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা নিয়ে আত্মমগ্ন। তাঁর 'সিরাজাম-মুনীরা' দেশ-বিভাগের পর বেরিয়েছে; কিন্তু 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'আজাদ করো পাকিস্তান'-এর মত এরও কবিতাগুলো প্রাক-পাকিস্তান যুগে রচিত। 'অনুস্বার বিসর্গ'-এর পর তিনি রচনা করেছেন 'নসীহত-নামা' ও তসবীর-নামা'। দ্বিভাষী পুঁথিতে যে আদর্শ নিহিত রয়েছে, তিনি তার পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। সৈয়দ আলী আহসানও ইদানীং এক নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন। 'সংকেত', 'সংবাদ', 'প্রার্থনা', 'কাব্যলোক' প্রভৃতি পদ্যে তিনি গদ্যভঙ্গী প্রবর্তনের প্রয়াস পেয়েছেন। আবুল হোসেন বিভাগোত্তর যুগে ইকবাল থেকে অনুবাদে হাত পাকাচ্ছেন। অবশ্য 'মেহেদীর জন্যে', 'মধ্যপ্রাচ্য', 'আমার সোনার দেশ' প্রভৃতি গদ্য-কবিতায় এখনও তাঁর শক্তির ঝলক দেখা যায়। কিন্তু আশঙ্কা হয়, আঙ্গিকের প্রতি অত্যধিক সচেতনতা তাঁর এই শক্তিকে ক্রমে ক'রে তুলবে বন্ধ্যা।......হিন্দু কবিদের মধ্যে প্রবীণ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য থেকে নবীন নীলরতন দাশ, মনোমোহন বর্মণ, প্রজেশকুমার রায়, সুবোধকুমার রায় প্রভৃতি পর্যন্ত অনেকেই লেখনী চালনা করছেন। দেশের মাটির সঙ্গে নিবিড়তর নাড়ীর যোগ অনুভব করলে এঁরাও যে সার্থক সৃষ্টিতে সফলকাম হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।......"

গোলাম সাকলায়েন উপরোক্ত কথাগুলো তাঁর প্রবন্ধে সাজিয়েছেন এভাবে—

"শাহাদাৎ হোসেনের রচনা-শৈলী একান্তভাবে ক্লাসিক। তাঁর রচনা তরুণদের আদর্শ বিশেষ।..... কাজী কাদের নওয়াজ শ্রেষ্ঠ কবি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন বিভাগোত্তর যুগে রচনায়। সত্যেন-দত্তীয় চটুল ছন্দ তিনি আয়ত্ত করেছেন। 'গুণ্ডায়ে-উমিদ' ও 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রভৃতি তাঁর সুখপাঠ্য কবিতা বিভাগোত্তর যুগে কাজী আকরম হোসেন 'মসনভী রুমী' ও 'সাদীর কালাম' দুটি অনুবাদ কাব্য মাত্র রচনা করেছেন। কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেননি তিনি। এই পর্যায়ের কবি মীজানুর রহমান। 'জিন্দা মুসলমান' কাব্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাশিমের 'কথিকা' বিভাগোত্তর যুগের কাব্য। এটি লিখিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী'-র অনুকরণে। ইদানীং তিনি 'ইকবাল', 'ইকরা' প্রভৃতি প্রাণবন্ত কবিতা রচনা করেছেন।......আবুল হোসেনের 'কাশ্মিরী মেয়ে', 'আমার সোনার দেশ', 'মধ্যপ্রাচ্য', 'মেহেদীর জন্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভাগোত্তর যুগে তিনি ইকবাল থেকে বঙ্গানুবাদে হাত পাকাচ্ছেন। অনেকে বলেন, কবিতার আঙ্গিকের প্রতি অত্যন্ত সচেতনতাবশত তাঁর প্রতিভা যেন বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হতে চলেছে।...... শক্তিমান কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব ও আলী আহসানের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, কবিতা রচনায় তাঁদের যেন ভাটা পড়েছে। আলী আহসান কবিতায় গদ্যভঙ্গী প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করছেন; 'কাব্যলোক', 'প্রার্থনা', 'সংকেত', 'সংবাদ' প্রভৃতিতে এই ভঙ্গী লক্ষণীয়। আহসান হাবীব সম্প্রতি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন ব্যঙ্গ-রচনার ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে 'হক নাম

'ভরসা', 'একমার নামা' 'সন্ধিপত্র' কবিতাগুলি স্মরণীয়। ফররুখ আহমদ নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষায় এখনও আত্মমগ্ন। 'সাত সাগরের মাঝি'-র কবি বিভাগোত্তর কালে লিখেছেন 'সিরাজাম-মুনিরা', 'অনুস্বার-বিসর্গ', 'নসীহৎ-নামা' ও 'তসবীর-নামা'। দোভাষী পুঁথির আদর্শ তিনি সাহিত্যে পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী।......হিন্দু কবিদের মধ্যে প্রবীণ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নবীন প্রজেশকুমার রায়, মনোমোহন বর্মণ, নীলরতন দাশ, সুবোধ রায় প্রভৃতি বাস্তবিকই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা সবাই মাটির সঙ্গে নাড়ির যোগ অনুভব করেছেন।......"

আপনার বিরক্তির ভয়ে আর উধৃতি দিলাম না। কিন্তু আপনাদের এটুকু জানা দরকার যে, ঢাকার কাগজে যে লেখকেরা বিশেষ পাত্তা পান না, প্রধানত তাঁরাই চোরাই-মালের সওদা নিয়ে বাজার খোঁজেন কলকাতায়। এই Plagiarist-দের উৎসাহ দান উচিত কি না, তা আপনারাই ভেবে দেখবেন। ইতি—

গোলাম কাসেম

ঢাকা।

২

জনাব,

১৩৬৫ সালের 'দেশ'-এর সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত জনাব গোলাম সাকলায়েনের 'পূর্ব পাকিস্থানের সাম্প্রতিক সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি ও তারই উপর গত ১৭ই শ্রাবণে প্রকাশিত ঢাকার জনৈক আমীর খসরুর আলোচনাটি সবিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করলাম। গোলাম সাকলায়েন সাহেবের প্রবন্ধটি যে সর্বাংগ সুন্দর হয়নি, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উক্ত প্রবন্ধটির দোষ-ত্রুটি নিয়ে এখানের সাহিত্যিক মহলে ও পত্র-পত্রিকায়ও নানা বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু যে দোষে এই প্রবন্ধটি দুষ্ট, সে-ই একই দোষে আমীর খসরুর আলোচনাটিও দুষ্ট এবং এতে তিনি যে বিশিষ্ট ও সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছেন, তার নজীর বিরল নয়। সুকুমার সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় আলোচনা সমালোচনা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। তিনি এখানকার কয়েকজন প্রভাবশালী কবি-সাহিত্যিকের রচনা সম্পর্কে যে ধরণের বল্গাহারা মন্তব্য করেছেন, তার ভেতর তাঁর বালসুলভ চপলতা ও অজ্ঞানতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এখানকার সমসাময়িক সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকর্মের সাথে যে তিনি পরিচিত নন, তাও তাঁর আলোচনায় বেশ বুঝা যায়। তিনি 'ইসলামী সাহিত্য ধারার'(!) অস্তিত্ব আবিষ্কার করে এই ধারার লেখকদের সম্পর্কে বলেছেন:

'ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে এঁরা সরে গেছেন সাধারণ মানুষের জীবন থেকে—যেখানে মানুষ হাসে, কাঁদে, গায়।......পূর্ব বাঙলার সাধারণ মনের সাথে এঁদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন। যে ভাষার জন্য এ-দেশের তরুণেরা অক্লেশে বুকে নিয়েছে স্পর্ধিত বুলেট,......সেই অমর ভাষা আন্দোলনের ভূমিকায় এঁদের সাহিত্য অবদান একেবারেই শূন্য।'—ইত্যাদি

আমাদের জিজ্ঞাসা, আমীর খসরু নামধারী ভদ্রলোক পূর্ব পাকিস্থানে 'ইসলামী সাহিত্য' এবং সেই সাহিত্যের ধারা কোথায় দেখতে পেলেন? 'ইসলামী সাহিত্য' নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব পূর্ব পাকিস্থানে আছে বলে ত আমাদের জানা নেই। আমরা জানি 'পাক-বাংলা সাহিত্যে' দুইটি ধারাই বর্তমান। এই দুইটি ধারা এবং তার লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। এই ধারা দুইটির একটি হলো—'জাতীয় ঐতিহ্যপন্থী' ধারা, অপরটি হলো—'সম্মোহিত' ধারা। এখানে আমি এই দুইটি ধারার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করতে চাই। 'জাতীয় ঐতিহ্যপন্থী' ধারার লেখকগণ যেমন তাঁদের রচনা কত মহান ঐতিহ্যকে বাদ দিতে পারেননি, তেমনি ঐতিহ্য-মহিমা প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা এ-দেশের আবহাওয়া, ধুলোমাটি, মানুষ ও মানুষের বিচিত্র জীবনধারা, দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনোটাই বাদ দেননি। (তাঁদের ঐতিহ্যের শিক্ষা এমনই যে, বাদ দিতে চাইলেও তাঁরা পারেন না।) এঁদের রচনায় আছে একটা স্বকীয় সত্তার সবল ঘোষণা, আছে অতীত ও বর্তমানের সন্তোষজনক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য স্থায়ী সুখী-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রশংসনীয় উদ্যম।

পক্ষান্তরে, জাতীয় ঐতিহ্য বিমুখ, সত্তাহীন, অন্ধ অনুকারকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে 'সম্মোহিত দল'। দেশ ও জনগণের সাথে এঁদের কোনই সম্পর্ক নেই। এঁরা ছিন্ন মূল। সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ব্যাকরণ। শুধু প্রেম, ফুল, পাখি, স্তন আর 'শ্বেত কপোত'—এঁদের রচনার মূল উপজীব্য; পরের রচনা আত্মস্থ করেই এঁদের সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ। এই 'সম্মোহিত দলটি' আবার বিদেশের, বিজাতীয় ভাবধারার সম্মোহনে সম্মোহিত হয়ে কয়েকটি শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত। সাহিত্য ও ভাবজগতে এঁরা ইতস্ততঃ বিচরণশীল।

গোলাম সাকলায়েন সাহেবের প্রবন্ধে যাঁদের নাম উল্লেখিত হয়নি বা উল্লিখিত হলেও যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দেওয়া হয়নি বলে, আমীর খসরু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের কেউ উল্লেখিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। এঁদের কেউ তিনটির অধিক গল্প লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাও আবার গল্পত্রয়ে এঁদের তিন রকমের মানসিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। প্রথমটিতে পাওয়া যাবে কষ্ট কল্পনা ও অন্ধ অনুকরণের সাথে সাথে হাল্কা ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা; দ্বিতীয়টিতে বিকৃত যৌনরোগীর যন্ত্রণাকাতর গোঙানী ও তৃতীয়টিতে রাশিয়ার তথাকথিত সাম্যবাদের নির্লজ্জ প্রপাগাণ্ডা এবং চৌর্যবৃত্তি।

পরিশেষে নিয়মিত পাঠক বলেই, 'দেশ' সম্পাদক সাহেবের কাছে একটি অনুরোধ না জানিয়ে পারছিনে। বাংলাভাষী এলাকায় 'দেশ'-এর বিশেষ একটি মর্যাদা আছে; তার গৌরবময় একটা অতীতও রয়েছে, তাই ভালভাবে ওয়াকিবহাল না হয়ে পূর্ব পাকিস্থানী কোনো বিতর্কমূলক রচনা পত্রস্থ করে, 'দেশ'এর গৌরব ও মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না করেন।—আবদুল্লা ইউসুফ, রমনা, ঢাকা




বৃষ্টির ঢল নেমেছে বাইরে। সোঁ সোঁ গর্জন করে বাতাস ফুঁসছে। মাঝে মাঝে কড়কড় বিদ্যুতের চমক অন্ধকারের বুক চিরে ভূতুড়ে অট্টহাসির মত ঝিলিক দিচ্ছে। সারাদিন ধরে সমানে চলেছে দুর্যোগ। কলকাতায়। কবে যে বিরাম হবে, কে জানে।

ঘরের মধ্যে একরাশ ভেজা কাপড় ছড়িয়ে দিয়েছে আনন্দিনী। কয়েকটা ছেঁড়া শাড়ি, একটা লুঙি, ছোটদের ইজের গেঞ্জি শার্ট, গোটাকয়েক সেমিজ সায়া আর একটা বড় কাঁথা। চলতে ফিরতে মাথায় লাগে। লাগুক। ভেজা কাপড়ের জঞ্জাল এঘরে ছিল বলেই ডলির কাঁদতে আর লজ্জা করে না। নিজেকে ছেড়ে দিতে পেরেছে স্বাভাবিক-ভাবে। কান্না যেন মুক্তি। যেন ঘুম। ডলি কাঁদতে পারছে এই ভেজা কাপড়ের ভিড়ে।

ডলি কাঁদছে। ত্রিশ বছরের অবরুদ্ধ বেদনা বৃষ্টির ঝমঝম ধারার সঙ্গে মিশে গেছে। তবু ডলির কান্না শুধু ডলির। বাইরের ক্ষ্যাপা বৃষ্টি আর বেপরোয়া বাতাসের আস্ফালন বাইরেই পড়ে আছে। ডলির মনে আসে নি।

একদিন নয়, দুদিন নয়। দিনের পর দিন নিঃশব্দে সহ্য করেছে ডলি। কাঁদে নি। কখনো ঠোঁটের নিচে ঠোঁট চেপে ভাগ্যকে ধিক্কার দেয় নি। নিজের মুখ দেখেছে আয়নায়, নিজের চেহারা দেখেছে আড্ডাবাজ ছেলেদের কুৎসিত ইঙ্গিতে। তাই আশা করেনি কখনো। পাড়ায় যখন কোন সন্ধ্যায় শানাই বেজেছে, আলো জ্বলেছে, নতুন বর এসেছে, জানালা বন্ধ করে রেখেছে সে সারা রাত। যেন মা শুনতে না পায়, বাবা দেখতে না পায়। যা হবার নয়, তার জন্য যেন ওরা মন খারাপ না করে।

তবু বাবা আশা ছাড়েন নি। ডলির বিয়ের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ঘটকালির অফিসে টাকা জমা রেখেছেন। সব মেয়েই কি সুন্দর? তবু সবারই তো বিয়ে হয়। কে আর বসে থাকে। রাস্তায় যে দুহাত পেতে ভিক্ষে মাগে, তারও কি বিয়ে হয় না? বাচ্চা হয় না? আসলে কপালের লেখা মত বিয়ে হয়। আগেও না, পরেও না। কিন্তু তাই বলে কি চেষ্টা করতে হবে না? হবে। গা হাত এলিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন?

পাত্রের খবরও নিয়ে এসেছেন বাবা। চৌকস পাত্র। পাশ করা, চাকরি করা। ডলি দূর থেকে শোনে। ঠিক বিশ্বাস হয় না। একদিন পাত্রপক্ষ দেখতেও আসে। সেদিন বিশ্বাস না করে আর উপায় নেই। ভীরু পায়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয় বাবার পেছনে। আড়ষ্ট জিভ নড়ে না, গলার স্বর সরে না, তবু জবাব দিতে হয় প্রশ্নের। আবোল তাবোল প্রশ্নের।

দুদিন কি চারদিন পর দুঃসংবাদ আসে। মেয়ে পছন্দ হয়নি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ডলি। পছন্দ হলেই যেন একটা অঘটন ঘটতো। অস্বাভাবিক হতো। তবু নিস্তার নেই ডলির। নতুন আলাপ আসে। আরেক সন্ধ্যায় আবার গিয়ে দাঁড়াতে হয় কৌতূহল-জ্বলা চোখের সামনে। কখনো সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়া পায়। পাত্রপক্ষের কর্তা বলেন, 'তুমি এবার যেতে পারো মা।' কখনো পরীক্ষা দিতে হয় নানা খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসার। চুল কতটা লম্বা, ঠিক মতো হাঁটতে পারে তো অথবা হাতের লেখা কেমন, কতটা সেদ্ধ করলে মাংসের কালিয়া ঠিকমত রান্না হয় ইত্যাদি।

পছন্দ না হবার খবরটাও আসে নানা-ভাবে। কেউ কিছুটা রাগতস্বরে বলেন, এমন মেয়ে দেখাতে আনাটাই অন্যায়। কেউ বলেন, আমার ছেলে বি এ পাশ, সরকারী চাকরি করে। তার জন্য কি এই পাত্রী, আরে রামঃ রামঃ! কেউ গম্ভীর চালে হাঁকেন, একুশ ভরি সোনা আর নগদ পাঁচটি হাজার টাকা দেন তো ভেবে দেখতে পারি। কেউ জবাবই দেন না। বাড়িতে দেখা করতে গেলে বলে পাঠান, দেখা করার দরকার নেই।

মা গজর গজর করে, মুখপোড়ী মরলেই বাঁচি। ডলি শুনেও শোনে না। তবু আশ্চর্য, বাবা নিরাশ হন না। অফিস থেকে ফিরেই একটা কালো রুটি আর এক কাপ

চা খেয়ে বেরিয়ে যান। ফেরেন অনেক রাত করে। মা গজগজ করে, যম এতো লোককে নেয়, মুখপুড়ীকে নেয় না কেন? বাবা খেতে বসে রাগ করেন। আদ্দেক খাওয়া ফেলে থালা টান মেরে সরিয়ে রেখে উঠে যান। বলেন, আমার লক্ষ্মী মেয়েকে যে মুখপুড়ী বলে তার মুখে ঝাঁটা মারি। হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মা জবাব দেয়। আরো শক্ত, আরো নির্দয় জবাব দেয় বাবা। কিন্তু একদিন ভালো খবর আনে ঘটক। মা চুপচাপ থাকে, কিছুক্ষণ। তারপর নিজে গিয়েই বাবাকে নানা প্রশ্ন করে। আগ্রহে মার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে। দুহাত জোড় করে বারবার কপালে ঠেকায়। তারপর মহাকালীর সিঁদুর লেপটানো ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'মাগো, এবার যেন অপছন্দ করে ফিরে না যায়। তুমি দেখো। তোমার এত দয়া, আমাদের এতটুকু দয়া তুমি করতে পারো না?'

সবচেয়ে উৎসাহ বাবার। এবার যে প্রস্তাব এসেছে, ভেবে দেখলে প্রস্তাবটা মন্দ কি। বরের একটু বয়েস হয়েছে মানলাম। চারটে ছেলেমেয়ে আছে আগের পক্ষের। তবু পাত্র হিসেবে খারাপ কিসের? মাইনর ইস্কুলের হেডপণ্ডিত, নিয়মিত বাঁধা মাইনে। খাওয়া পরার ভাবনা নেই।

সকাল থেকেই বাবা ব্যস্ত। ঘরের আবর্জনা পরিষ্কার করে টেবিলের ওপর নতুন খবরের কাগজ বিছিয়ে বসবার জায়গাটা একটু গোছগাছ করান। পাশের বাড়ি থেকে দুটো চেয়ার চেয়ে আনেন। মাথায় বেশি করে তেল মেখে চান করেন। তারপর সিঁথি চওড়া করে চুল আঁচড়ান। আনন্দিনী হাসে। বলে, 'ঢং দেখে আর বাঁচি না। মেয়ের বিয়ে না যেন নিজের দ্বিতীয় পক্ষ।'

বাবা বলেন, 'মা লক্ষ্মীর বিয়েতে আমার থেকে বেশি আনন্দ কার?' আনন্দিনী জবাব দেয় না। রান্নাঘরে গিয়ে ক্ষীরের সন্দেশ বানাতে বসে। আনন্দিনী একটু বেশি মোটা। নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। আগুনের তাপে হাঁফিয়ে ওঠে। তাই বাচ্চা ভাইগুলোকে খাইয়ে মাকে গিয়ে সাহায্য করতে হয় ডলিকে। ছাঁচের উপর ক্ষীরের পিণ্ড বসিয়ে আঙুল দিয়ে টান টান করে ছড়িয়ে দিতে হয় সন্দেশগুলি।

দুপুর শেষ না হতেই ট্রাংক থেকে বার করতে হয় মার বিয়ের শাড়িটা। এক-আধটু রিপু করার দরকার। গরম জলের বাটি নিয়ে শাড়িটা একটু ইস্ত্রি করে না নিলে কোঁচকানোর দাগগুলো ওঠে না। মা তাড়া দেয়, 'যা যা, চান করে নে।' চান করে নিতে হয় বিকেল হবার আগেই।

কনে দেখা আলো যখন পুবের দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ে, আসে পাত্রপক্ষের দল। বাবাই নিয়ে আসেন। ডলি প্লেটে সাজিয়ে নেয় কয়েকটা লুচি, একটা দুটো সন্দেশ আর ঠান্ডা হালুয়া। তারপর চায়ের বাটি নিয়ে দাঁড়ায় নতমুখে কম্পিত বুকে। তখন মুখের সাদা চুনের মত পাউডারের প্রলেপ ভিজে গেছে ঘামে। চোখের তারায় করুণ মিনতির সঙ্গে মিশেছে একটু জলের ছাট। প্রশ্নের জবাব দিতে জড়িয়ে যায় গলা। উৎকণ্ঠায় সারা দেহ কাঁপে।

না। তা কান্না নয়। কান্না তখনও নয়, যখন পাত্রপক্ষের জবাব মেলে, বিয়ে এখানে সম্ভব নয়। আরো সুন্দরী পাত্রী চাই।

অল্প বয়সে ডলি নীতিশিক্ষায় পড়েছিল, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া ও আতুরকে আতুর বলতে নেই। তাহ'লে তাদের মনে দুঃখ দেওয়া হয়। কথাটা ডলির মন থেকে মুছে যায় নি কখনো। কত পড়াই ভুলেছে, কিন্তু বালিকা বয়সের এ পাঠ কখনো ভোলে নি। তার মনে হতো, তাহ'লে কুশ্রী লোককেও কুশ্রী বলতে নেই। তাদের মনেও তো আঘাত লাগে।

কিন্তু এটুকু দয়া তাকে কেউ করে নি। কেউ না। কোনদিন না। সে যে সুন্দর নয়, কুশ্রী, খুব কুশ্রী সবাই সরবে তা জানিয়ে দেয়। আয়নার সামনে দাঁড়াতে এখন তার লজ্জা করে। কিন্তু একদিন করতো না। অল্পবয়সে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো সে নিজেকে। অনেকক্ষণ ধরে। হাসতো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতো। দেখতো তীক্ষ্ম চোখে সূক্ষ্ম বিচারে। চোখ নাক কপাল ভ্রূ গাল কান ঠোঁট। দেখতো গলা। দেখতো বুকের ভাঁজ। চোখ খুব ছোট নয়, তবে ট্যারা। সে নিজে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না, কোনদিকে সে তাকিয়ে আছে। যদি খাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, দূরে দাঁড়িয়ে

ছোটভাই লালু ভাবে সে বুঝি তার দিকে তাকিয়ে আছে। নাকটা বেমানানভাবে লম্বা আর উঁচু আর ডগাটা থালার মত মোটা হয়ে ঢালের মত থেবড়ে গেল। গাল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে অনেকখানি। ডোবার গর্তের মত মনে হয়। ঠোঁট দুটি ভয়ানক পুরু, আর ঘন লাল চামড়ার উপর কালো কালো দাগ। গলাটা সরু। একটা পাকানো দড়ির মত মনে হয়। সবচেয়ে প্রথমে যা নজরে পড়ে, তা তার গায়ের রঙ। রান্না শেষে কড়াইয়ের তলার মত আবলুস কালো। তাতে সজীবতা বা উজ্জ্বলতার কোন লক্ষণ নেই। নিষ্প্রাণ চামড়ার ওপর অনুজ্জ্বল ঘোর কালি বর্ণ। ডলিকে দেখলে মায়া জাগে আর মোহ একেবারে কেটে যায়।

অথচ অন্য বোনেরা তার মত দেখতে হয় নি। ভাইরাও ঠিক তার মত নয়। সে ঠিক বাবার মত হয়েছে দেখতে। হুবহু এক। ছোট দুটি বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আটকায় নি। একটির দুটি বাচ্চা, আরেকটি সন্তানহীনা। বোনদের দুঃখ দুরকমের। যে মা হয়েছে, সে বাচ্চাদের নিয়ে সব সময় জ্বালাতন হয়ে থাকে। দুষ্টুমিতে পাকা দুটি বাচ্চা। যে সন্তানহীনা, তার দুঃখ, ঈশ্বর তাকে বাঁজা করে পাঠাল কেন?

ডলির কোন দুঃখ নেই। তার কুশ্রী চেহারার জন্যও না, সাধ অপূরণের জন্যও না। আসলে সে নিজের চেহারা জানে এবং কোন সাধ নেই তার। শুধু দুঃখ বাবাকে সে শান্তি দিতে পারছে না। দিনরাত দুশ্চিন্তা নিয়ে আছেন বাবা। অন্য দুটি মেয়ের যাহোক, যেমন করে হোক, বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী সংসার নিয়ে বেশ আছে তারা। শুধু বিয়ে হলো না ডলির। সবচেয়ে বড় সন্তানের, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়া মেয়ের।

অথচ বিয়ের জন্য কখনো সাধ জাগে নি ডলির। সে জানে, খুব ভালো করেই জানে, কোন পুরুষের কাঙ্ক্ষিতা সে কখনো হতে পারবে না। তার সে যোগ্যতা নেই।

সেদিনের কথা সে ভোলে নি। মার জ্বর হয়েছিল বলে রান্নাঘরের সব দায় পড়েছিল তার ওপর। ছোট ভাইদের চান করিয়ে সে ইস্কুলে যাচ্ছিল একটু দেরি করে। অনেকদিন আগের কথা। তখন সে সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। তখনো নিজের সম্পর্কে এমন নির্দয় ঔদাসীন্য জাগে নি তার।

পাড়ার মেয়েরা ইস্কুলে চলে গিয়েছিল আগেই। সে একা দ্রুতগতিতে হাঁটছিল। একগাদা বই বুকের ওপর চেপে সে ছিল অনামনস্ক। মনের মধ্যে একটা ভয় কাঁপছিল ক্লাসে ঢুকতে পারবে কি না।

গলিটা পেরোতেই একটা রেস্তোরাঁ থেকে কয়েকটা বকাটে ছোকরা শিস দিয়ে ওঠলো। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বেকার কতকগুলো ছেলে। যারা নিত্য সকালে বিকেলে এখানে জমায়েৎ হয়ে গুলতানি মারে আর ইস্কুল কলেজের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা ছোড়া হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো, 'অপ্সরা যায় গো, যায় যায় যায়—' একটা কলহাস্য উঠলো, কে একজন অট্টহাস্য করে গলা খাঁকারি দিল।

কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল ডলি। তার চোখের কোণে শিশির বিন্দুর মত এক ফোঁটা জল জমে ওঠলো। আর একটু এগোতেই একটা দোকান থেকে কে চীৎকার করে উঠলো, মা কালী।

রোজ তাকে এ শুনতে হয়। রোজ এ সব অপমানের বিস্ফোরণ মাড়িয়ে যেতে হয়। কিছু মনে করলে চলে না।

ইস্কুলে যখন পৌঁছলো তখন সে রীতিমত হাঁফাচ্ছে। প্রায় কুড়ি মিনিট লেট। রমাদি হয়তো ঢুকতে দেবেন ক্লাসে, কিন্তু চমৎকার ক্লাসটি উপভোগ করতে পারবে না। আর আজ বেশিক্ষণ দেখা যাবে না রমাদিকে। এও তার একটা মস্ত দুঃখ।

রমাদি বড় ঘরের মেয়ে। চেহারায় চরিত্রে বনেদী আভিজাত্যের নির্ভুল ছাপ। দামী শাড়ি পরে আসেন রোজ। প্রতিদিন ভারী সুন্দর সেজে আসেন। তিনি নাকি শখ করে মাস্টারী নিয়েছেন। নইলে চাকরি করবার তার দরকার কি। ডলি ভাবে, ভাগ্যিস রমাদি চাকরি করছেন, নতুবা তাকে কেমন করে দেখতে পেত সে। এত সুন্দর যে কোন মানুষ হতে পারে, রমাদিকে না দেখলে জানা যায় না। যেমন ফুলের মত গায়ের রং, তেমনি পটে আঁকা দেবীর মত নিখুঁত চেহারা। আঙুলগুলি যেন চাঁপা কলি, হাত দুটি যেন নরম পেলব সোনা দিয়ে তৈরী। রেশমি শাড়ির নিচে সাটিনের সায়ার তলায় দুটি পা যেন মাখনের মত। নখগুলিতে গাঢ় কিউটেক্সের ছাপ। ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক। চোখে ভ্রু পেন্সিলের কালো বলয়। মুক্তোর মত দাঁতের ঘোমটা খুলে তিনি যখন হাসেন, এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যায়।

রমাদি পড়াচ্ছিলেন বাংলা গদ্য। ক্লাশে ঢুকবার আগেই মিষ্টি স্বরের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছিল ডলি। তাড়াতাড়ি ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েছিল। রমাদি একবার তাকিয়ে দেখে একটু হেসে বলেছিলেন, তোমার নামটা প্রেজেণ্ট করে নিও ডলি। তারপর আবার আগেকার কথা টেনে বলতে শুরু করেছিলেন, বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার পার্থক্য। মনযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করছিল ডলি।

হঠাৎ একটা গোলমাল উঠলো বেঞ্চিতে। মেয়েগুলো ঠেলতে ঠেলতে ডলিকে একেবারে দাঁড় করিয়ে দেবার জোগাড়।

রমাদি সেদিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার?

ডলির ঠিক পাশের মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, বড় গন্ধ রমাদি।

সংগে সংগে আরো দু তিনজন দাঁড়িয়ে গেল, ও চান করে না রমাদি। বড় নোংরা রমাদি। ভীষণ গন্ধ ওর শাড়িতে, রমাদি।

সুন্দর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো রমাদির। ভ্রূ কুঞ্চিত হলো খানিকটা। জিগ্যেস করলেন, 'কার?'

সকলে সমস্বরে বলল, 'ডলির রমাদি। ওর পাশে বসতে আমাদের ঘেন্না করে।'

কানদুটো জ্বালা করছে ডলির। সমস্ত শিরাপ্রবাহে মৃত্যুর মত লজ্জা আছাড় খেয়ে মরছে। মাটির সংগে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে ডলির।

একটি মেয়ে আবার বল্লে, ও সারা শীতটায় চান করে না রমাদি। গায়ে নোংরা গন্ধ।

রমাদি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন ডলির কাছে। ততক্ষণে অঝোর ধারায় জল নেমেছে তার চোখে। ঠোঁট দুটো বিকৃত হয়ে একটা কষ্টের নিদারুণ ভঙ্গি করে রয়েছে।

ডলির পিঠে হাত রাখলেন রমাদি। বললেন, 'কাঁদে না ডলি। কাঁদতে নেই। ওদের অন্যায় তুমি ক্ষমা করো।'

তারপর সরে গেলেন টেবিলের কাছে। বললেন, 'ছি ছি। তোমরা বড় হয়েছ, অনেক কিছু বোঝ। একটি নিরপরাধ দুঃখী মেয়েকে তোমারা এমনভাবে অপমান করতে পার, আমি ভাবতে পারি না। মানুষকে ভালোবাসতে পারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। সেই শিক্ষাই তোমাদের হয় নি।'

সারা ক্লাস চুপ করে রইলো। রমাদি বললেন, 'আমি আজ আর ক্লাস নেব না। তোমরা নিজেদের অন্যায়টা বুঝতে শেখ।'

তারপর ডলির কাছে এসে নিজের শাড়ি দিয়ে চোখের জল মুছে দিলেন। পিঠে হাত রেখে ডান হাতে তার চিবুক নেড়ে বললেন, 'ডলি, কাঁদতে নেই। জীবনে অনেক অন্যায়, অনেক ব্যর্থতার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তখন কাঁদলে চলে না, বুকে সাহস নিয়ে এগোতে হয়। নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে হয়। লক্ষ্মীটি কেঁদো না।'

ডলি কাঁদে নি তারপর। তার কুশ্রী চেহারা নিয়ে কত ব্যংগ কত অপমান শুনেছে, কাঁদে নি। মনে করেছে রমাদির কথা। অত সুন্দরী রমাদি, মানুষ যত সুন্দর হতে পারে তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর, সেই রমাদি তো ডলিকে ঘৃণা করেন নি, স্নেহ করেছেন। বুকে মাথা টেনে রেখে সাহস জুগিয়েছেন। এই সাধারণ লোকগুলোর কথায় কি এসে যায়।

বাইরে বেরোলেই ব্যংগ-বিদ্রূপটা শুনতে হয় বেশি। বাড়িতে তবু ভুলে থাকা যায়। বাড়িতে নিত্যচেনায় রূপের পরিচয়টা অন্ধ, সেখানে সম্পর্কটাই বড়। বাড়ির মেয়ে সে, ভাইবোনদের দিদি। এখানে তার কুশ্রী চেহারা আর কারোর চোখে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, তার এখন বিয়ে হওয়া দরকার, বিয়ে হতে পারছে না। বাবা হয়তো একথাও ভাবেন না, তিনি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেন।

তাই বাড়ির বাইরে বেশি বেরোয় না ডলি। বেরোতে চায় না। তবু মাঝে মাঝে বেরোতেই হয়। পঞ্চান্ন বছর পেরোতেই অফিস থেকে চাকরি গেছে বাবার। কনিষ্ঠ কেরানীর চাকরি। তবু নিশ্চিত আয় ছিল, ছিল নিয়মবাঁধা পথে দিনগুলোর অস্ত যাওয়া। মাসের প্রথমে যে টাকাগুলো আসতো, তাতে সব অভাব হয়তো মিটতো না, মিটতো না ধার-দেনার সবগুলো হাঁ-মুখ। তবু কিছুটা নিশ্চিতি ছিল, কেননা তখন মাসের শেষ ছিল, মাসের প্রথম দিন আসতো ঘুরে ঘুরে।

সেই নিশ্চিতি গেছে। যে সঞ্চিত অর্থ পাওয়া গেছে অফিস থেকে, তাও বুঝি ফুরোয় ফুরোয়। তাই ডলিকেও চেষ্টা করতে হচ্ছে একটা চাকরির, হোক ইস্কুলে বা হোক কোন অফিসে। ম্যাট্রিকটা তো পাশ করা আছে।

ইণ্টারভিউর ডাক আসে মাঝে মাঝে। কখনো বা বাবার সংগে তদ্বির তদারকি করতে যেতে হয়। কিন্তু যাওয়ার আগে তার মন কাঁপে। ভয়ে। বেদনায়। গরীবের মেয়ে বলে যে করুণা প্রত্যাশা করা যেত, চেহারা দেখে সেই দয়ার বাষ্প উড়ে যাবে। নির্ঘাত ফিরতে হবে ব্যর্থতার নিরাশা নিয়ে। ডলির সে ভয় সত্যি। কতবার কত জায়গায় গেল ডলি। সব জায়গায় শুনতে হয়েছে এক কথাই 'খুব দুঃখিত, কিছু করতে পারলাম না।'

কিছু করতে পারলো না ডলি। না চাকরি, না বিয়ে। সংসারের জরাজীর্ণ দীনতার চেহারা দেখে সে আরো আর্ত হয়। বাবাকে সে কোন সাহায্য করতে পারলো না। অথচ কত মেয়েই তো করে। চাকরি। নিদেনপক্ষে বিয়ে করেও যদি দুর্ভাবনা ঘোচাতে পারত। মাঝে মাঝে তার মরে যেতে ইচ্ছে করে। তবু জুড়োক দুশ্চিন্তা।

বাবার মুখের দিকে তাকানো যায় না। কেমন অদ্ভুত ক্লান্ত মুখ হয়ে গেছে তাঁর। কেমন ভয়াবহ। সব সময়ই রাগ করে আছেন তিনি। সবার উপর। আর মুখে নির্দয় কথা, অশ্লীল কথা, মর্মঘাতী কথার ঝড়। ডলি তো বুঝতে পারে, এ কেন হলো, কেমন করে হলো। অথচ তার কিছু করার উপায় নেই। নেই কোন সামর্থ্য।

তবু ভাইগুলো যদি একটু বড় হতো, এতো দুঃখ থাকতো না। ওরা চাকরি করতে পারতো। চাকরি না পেলে মুটেগিরি করতে পারতো, পান-বিড়ির দোকান দিতে পারতো রাস্তার মোড়ে। দারিদ্র্য এমনভাবে পিষে মারতে পারতো না তাদের। কিন্তু ভাই দুটি জন্মেছে সবার পরে। এখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ।

একদিন বাবা একটি লোককে নিয়ে এলেন বাড়িতে। লোকটি শীর্ণ, পাকাটি চেহারা। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং। এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখ ঘোলাটে লাল। কেমন যেন ভয় করে দেখলে।

বাবা খাতির করে বসালেন লোকটাকে। বললেন, 'ইনি এখন থেকে থাকবেন আমাদের বাড়িতে। পেয়িং গেস্ট।'

ডলি রান্নাঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, এক কাপ চা খেয়ে লোকটি চলে গেল। বলে গেল, পরের দিন মালপত্র নিয়ে আসবে।

আনন্দিনী গজগজ করতে লাগলো। 'কেন থাকবে আমাদের বাড়িতে। একটা সোমত্ত মেয়ে আছে না, আইবুড়ী মেয়ে। যদি কেলেংকারি বাধে?'

একটা ধমক দিলেন বাবা। 'ভদ্রলোক এখানে থাকবেন, খাবেন, আর মাসে ষাট টাকা ধরে দেবেন। বুঝতে তো হয় না, কত কষ্ট করে গেলাবার জন্য টাকা জোগাড় করতে হয়। ষাট টাকা পেলে কতখানি সাহায্য হয়, তার তুমি কি বুঝবে।'

মা চুপ করে থাকে। টাকার অনেক মাহাত্ম্য।

বাড়ির ছোট ঘরটা লোকটির জন্য পরিষ্কার করা হলো। জল দিয়ে মুছে ভালো করে ঝাঁট দিল ডলি। দেয়ালে যেখানে তেল লেগে লেগে কালো হয়ে গিয়েছিল, ঘসে ঘসে সাফ করে রাখল।

পরের দিন সকালে মুটের মাথায় মাল-পত্র চাপিয়ে লোকটা এসে হাজির। একটা তক্তপোশ আর একটা চেয়ারও এনেছে সঙ্গে। আর আছে একটা মাটির গড়গড়া।

ছোট ভাই লালু হেসে বললে, 'দেখেছ দিদি, লোকটা শৌখিন কম নয়। রুপোলী তার বাঁধা গড়গড়াও আছে।'

ডলি হাসলো।

লোকটার বয়স হয়েছে। হয়তো বাবার থেকে বেশি ছোট নয়। কিন্তু কেমনভাবে তাকায় লোকটা। যেন গিলে খাবে। হাড় মাস সব।

ষাট টাকা দিয়ে যেন কিনে রেখেছে লোকটা বাড়ির সব কয়টা মানুষকে। সময়ে অসময়ে হাঁক দেয়, 'লালু।'

ওঘর থেকে জবাব যায়, 'কি বলছেন?'

'তামাক বানা।'

'পারবো না।' বলে লালু। কিন্তু বাবা চোখ রাঙায়। 'পারবি না কেন? কি করছিস বসে বসে? বাবার হোটেলে খাওয়া খুব মাগনা, না?'

যেতে হয় লালুকে। তামাক বানাতে হয়। পান বিড়ি কিনে আনতে হয়। গরমের দিনে ঘামাচি মেরে দিতে হয় লোকটার।

শুধু তাই নয়। ডলিকেও চায়ের জল চড়াতে হয় সময়ে অসময়ে। কখনো বা নিজেকেই গিয়ে দিয়ে আসতে হয়। অসভ্য লোকটাকে দেখলে তার গা ঘিনঘিন করে। তবু বাবার মেজাজের কথা ভেবে সে আপত্তি করতে পারে না।

দুপুরে আর রাত্রে বাবার সঙ্গে খেতে বসে লোকটা। তারিফ করে রান্নার, চেয়েও নেয় খানিকটা ডাল কি ঝোল। চোখটাকে নাচিয়ে বলে, 'ডলি খুব চমৎকার রান্না করে রাজেনবাবু।'

বাবা বলেন, 'সেলাইও খুব ভালো জানে। আর লেখাপড়ার কথা তো আগেই বলেছি, ম্যাট্রিক পাশ।'

এক পলকে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে ডলি। কিন্তু বাবার মুখ দেখা যায় না। মুখ নিচু করে একমনে খেয়ে চলেছেন।

ডলি শুনেছে, লোকটা কাছাকাছি একটা মোটর সারাই কারখানায় চাকরি করে। ঠিক মিস্ত্রীর চাকরি নয়। হয়তো বা সুপার-ভাইজার। কামাই যে মন্দ করে না, সেটা সে বুঝিয়ে দিয়েছে কদিনের মধ্যেই। বাবাকে ষাট টাকার উপরেও কিছু কিছু ধারকর্জ দিয়েছে। ঘরে বৌ নেই, আত্মীয় স্বজনও হয়তো নেই কেউ। ভূতুড়ে রকম একা লোকটা। এখানে এসেছে মরতে।

তবু মাঝে মাঝে ভালো লাগে ডলির। কেমন লোভী চেহারা তার। কি যেন চায় সে। কিসের যেন ইংগিত তার চোখের তারায়।

কি চায় সে? কেউ তো এমন চোখে তাকায় নি তার দিকে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে না ডলি। রোগাটে হাতটা অজান্তে উঠে আসে বিশীর্ণ বুকের উপর। থমথম অন্ধকার চেপে থাকে মনে। চোখ বন্ধ করে যেন জোনাকির আলো দেখতে পায়। লোকটার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। সে চোখ দিয়ে লোকটা চায় কি? শিউরে ওঠে ডলি। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র পুলকের শিহরণ বয়ে যায় হৃদপিণ্ডে।

না না। কি আছে ডলির। কি আছে। নিজের চেহারা মনের পটে ভেসে ওঠে তার। রোগা শীর্ণকায় একটা মেয়ে। পোড়া কাঠের মত চেহারা। কোথায়ও সজীবতার চিহ্ন নেই, কোথায়ও নেই একফোঁটা রসের স্ফীতি। পাঁজর গোনা যায়, হাতের শিরা-গুলি দেখা যায়। গাল ভেঙেচুরে চৌচির। ক্ষেতচষা জমির মত বুক।

আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসে শরীর। পরম নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়ে ডলি। সারা রাতে একটাও স্বপ্ন দেখে না।

কদিনের মধ্যেই লোকটার আরেকটা দিকও জানা যায়। রাত্রে যখন ফেরে, চোখ টগবগে লাল। কেমন অদ্ভুত দেখায় তখন লোকটাকে। চোখগুলি আগের থেকে অনেক বেশি জ্বলজ্বল করতে থাকে। বিশ্রী বিদ-ঘুটে একটা গন্ধ বেরোয় তার শরীর থেকে। গন্ধে গা বমি-বমি করে ডলির। তবু দূরে সরে থাকতে পারে না। কাছে গিয়ে এগিয়ে দিতে হয় ভাতের থালা। ডাল দিতে হয়, ঝোল দিতে হয়। কখনো বা লোকটা মাটির ভাঁড়ে করে আনে দোকানের মাংস। কিছুটা নিজে নেয়, কিছুটা ঢেলে দেয় বাবার পাতে।

বাবা বলেন, 'না না, আপনি খান। আপনার এ সময় খাওয়া দরকার।'

লোকটা হাসে। বলে, 'খেয়েছি অনেক। আপনি নিন। কিছুটা ডলিও নেবে'খন।'

ডলি রাগ করে। কেন নেবে সে। তার কি দরকার পড়েছে। আদিখ্যেতা। তবু একটু বেশিই ভাত ঢেলে দেয় তার থালে।

থাক। খেয়ে মরুক। হয়তো ভাতে টান পড়বে ডলির নিজের বেলায়। হোক গে। বেশি করে জল খেয়ে নিলেই হবে।

একদিন সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়ে রাতও প্রায় দুপুর। লোকটা আসে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাবা খেয়ে নিয়েছেন। মা-ও শুয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে চারদিক। রাস্তার মোড়ের হালুই-করের দোকানও বুঝি প্রায় নীরব হয়ে এলো।

একটা টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় ডলি বাবার ছেঁড়া ধুতিটা রিপু করতে বসলো। তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কখন আসবে লোকটা, দরজা খুলে দিতে হবে। ভাত বেড়ে দিতে হবে। তারপর তার নিজের খাওয়া।

মাঝখানে বাবা একবার জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, 'এখনও এলোনারে?'

মাথা না তুলেই ডলি জবাব দিয়েছিল, 'না।'

মা গজরগজর করছিল। 'এমন বে-আক্কেলে লোককে কেন থাকতে দেওয়া হয় বাড়িতে। কি দরকার। টাকা দেয়। এমন টাকার মাথায়—'

রাগে মা খুব খারাপ কথা বলে। বাবা শুধু একবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'থাম।' ভয়ে চুপ করে যায় মা। দাঁতের ধারে সুতো কেটে হাঁটুর উপর ধুতিটা টান করে ফেলে রিপুটা দেখে ডলি। তারপর হাই তোলে। ভাবে, লোকটা থাক, না থাক, তার কি বয়ে গেছে। সে এবার খেয়ে নেবে।

সদর দরজায় আস্তে আস্তে কে টোকা মারে। একটুক্ষণ কান পেতে থাকে ডলি। আবার টক্ টক্ টক্।

এসেছেন লাটসাহেব। দু হাত পাশে ছড়িয়ে দিয়ে, বুকটাকে সোজা করে শরীরটাকে টান করে ডলি। তারপর উঠে দাঁড়ায়।

দরজা খুলে লোকটার দিকে না তাকিয়েই সে দরজাটা বন্ধ করতে যায়। লোকটার পেছনে আর একটা মানুষ। কিছুটা অবাক হয়ে সে তাকায়। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। কিন্তু বোঝা যায়, পেছনের লোকটা একটা মেয়েমানুষ।

লোকটা বলে, 'তুমি যাও ডলি, আমি দরজা বন্ধ করছি। আমি খাবো না, খেয়ে এসেছি।'

ডলি সরে আসে। বারান্দার অন্ধকারে একটু দাঁড়ায়। দেখে লোকটার পেছনে একটা মেয়ে। ফিকে রঙের ব্লাউজ আর জংলী প্যাটার্নের রঙীন শাড়ি। লোকটা তার ঘরে ঢোকে। মেয়েটাও। দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

কি ব্যাপার? হঠাৎ বিয়ে করলো নাকি লোকটা। কিন্তু এমন গোপনে? আর এত ত্রাস কেন লোকটার, মেয়েটার?

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না ডলি। রান্নাঘরে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। আজ আর ভালো লাগছে না, ঘরটা কাল খুব সকালে ধুয়ে নিলেই হবে।

বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে শিকল তুলে অন্ধকারে একটু দাঁড়ায় ডলি। আকাশে অমাবস্যার তারা। ডোরা কাটা কালিমা, মাটির পৃথিবী নীরব। দূরে কোথায় একটা পাগলা কুকুর ঘেউ ঘেউ চীৎকার করছে।

দাঁড়িয়ে থাকে সে অন্যমনস্কভাবে। কি আশ্চর্য রাত্রি। এখন প্রখর আলোর দিনকে মনে হয় স্বপ্ন। অথবা এই রাতটাই বুঝি স্বপ্ন। এই ভুতুড়ে রাত, এই অন্ধকার থমথমে রাত, এই সর্বকিছু ঢেকে দেওয়ার মত। তার কুশ্রী রূপও বুঝি ঢাকা পড়ে গেছে এই রাত্রে।

একটু এগিয়ে যায় ডলি। কৌতূহল জাগে লোকটা সম্পর্কে। কি ব্যাপার। এক-বার ঘরের মধ্যে তাকায়। না, বাবা মা ভাইরা সব অঘোরে ঘুমুচ্ছে। লোকটার ঘরটাও ভেতর থেকে বন্ধ।

আস্তে আস্তে সরে গেল ডলি। চুপিসাড়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। ফুটোটায় চোখ রেখে দেখবে নাকি ঘরের ভেতর। লজ্জা হল। না থাক গে।

তবু একটা দুর্দমনীয় কৌতূহল টেনে নিয়ে গেল তাকে। ঘরের মধ্যে তখনও দুটি মানুষ জেগে। তাদের কথার রেশ শোনা যাচ্ছে। লোকটার গলাই শোনা যাচ্ছে বেশি। মেয়েটা শুধু হুঁ হাঁ করছে।

ফুটোটায় চোখ রাখলো ডলি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখ সরিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে এলো ঘরে। যেন হাজার বাতি ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে চোখে। এসে ঝুপ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ছটফট করতে লাগলো। দু হাত দিয়ে জোর করে চেপে রাখলো বুক। বুঝি ফেটে পড়বে হৃৎপিণ্ড।

আস্তে আস্তে জ্বলুনি কমতে লাগলো। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত পিটুনি থেমে এলো। হাতটা লুটিয়ে পড়লো বুকে। এক ফোঁটা মেদের চিহ্ন নেই কোথাও।

মেয়েমানুষে করে যদি পাঠিয়েছিলে, হা ঈশ্বর, মেয়েমানুষের শ্রী কেন দিলে না? একবার প্রায় ককিয়ে উঠলো ডলি। দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো বালিশে।

পরের দিন ঘুম ভাঙলো বেলায়। সূর্য তখন উঠে গেছে আকাশে। উনোনের ছাই ফেলতে গিয়ে একবার উঁকি দিল সে ছোট ঘরটায়। ঘরটা খোলা। কেউ নেই ঘরে। না মেয়েটা, না লোকটা।

লোকটা এলো খানিক বাদে। সঙ্গে নিয়ে এলো কিছু সিঙাড়া আর জিলিপি।

রাখলো রান্নাঘরের দাওয়ায়। আনন্দিনীকে বলল, 'বৌদি, বাচ্চাদের দেবেন।'

ডলি তাকিয়ে দেখলো লোকটাকে। দুঃসাহসের অন্ত নেই লোকটার। এখন খাতির করার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে।

লোকটাও তাকালো ডলির দিকে। হাসলো। চোখে চোখে কি যেন বলতে চাইল। মিনতি করলো। চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে রইলো ডলি।

কদিন কাটলো চুপচাপ।

কেউ কিছু জানলো না। ডলিও কিছু বলল না। লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে তৃপ্তির হাসি উঁকি মারলো বারবার।

কদিন পর একদিন আড়ালে পেয়ে লোকটা বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না ডলি। পদ্ম কিছুতেই ছাড়লো না, সঙ্গে এলো। এবার সে পালিয়েছে অন্য লোকের সঙ্গে। আর ওরকম হবে না কখনো।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ ডলি বলে ফেললো, 'বিয়ে করলেই পারেন।'

হাসলো লোকটা। 'আমাকে বিয়ে করবে কে? বুড়ো হয়ে গেছি না? চুল পেকে গেছে। যারা আসে তারা শুধু টাকার লোভে আসে।'

ডলি চলে এলো নিঃশব্দে। লোকটার মনেও একটা বেদনা আছে। বুঝি তাই ছাইপাঁশ গিলে ভুলে থাকতে চায়। লোকটার কেউ নেই। ভালোবাসা পায়নি লোকটা। বুড়ো হয়ে গেছে। হয়তো তাই ফূর্তি নিয়ে থেকে দূর করে রাখতে চায় মনের ব্যথা।

পরের দিন ঠিক সন্ধ্যায় ফিরে এসেছে লোকটা। বাবা নেই বাড়িতে, ভাইরা খেলার মাঠে। আনন্দিনী একা শুয়ে আছে পেটের যন্ত্রণায়।

একটা হ্যারিকেন জেলে সে লোকটার ঘরে দিয়ে এলো। লোকটা তখন মাটিতে বিছিয়ে রেখেছে কয়েকটা লম্বা মুখের বোতল। বিশ্রী বিদঘুটে গন্ধ। আজ বুঝি আবার খাবে ওই সব ছাইভস্ম।

লোকটা ডাকলো, 'ডলি!'

তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। চোখের তারায় নাচন। কেমন ফূর্তি ফূর্তি চেহারা। ডলি প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এলো ওঘর থেকে।

একটু পর নামলো বৃষ্টি। ঘন বর্ষার মুষলধার। বিদ্যুৎ চমকে যেতে লাগলো বারবার। বাতাসে লাগলো বেপরোয়া দাপট। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অন্ধকারে ভয় থমথম হয়ে উঠলো।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাবা ও ভাইরা এলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল তারা। কাঁথার তলায় গা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো আরাম ক'রে। মা আজ কিছু খাবে না। কিন্তু লোকটা?

ছোট ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল ডলি। আকাশে একটা চকিত বিদ্যুৎ অট্টহাসি দিয়ে উঠলো।

'আপনি খাবেন না?'

'হাঃ হাঃ!' হাসলো লোকটা। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। অঝোর ধারায়। ডাকলো লোকটা, 'এসো ঘরে।'

ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ডলি। 'খাবেন না?'

আবার হেসে উঠলো লোকটা। 'না, আজ আর কিছু খাবো না। খাবার নিয়ে এসেছি বাইরে থেকে। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।'

'না।'

চলে এলো ডলি। রান্নাঘরের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তার বুক দুরু-দুরু কাঁপছে। ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মুখ। শরীর বেতসলতার মত দুলছে।

অনেকক্ষণ বুঝি কেটে গেল। লোকটা ওঘরে গান ধরেছে। হিন্দী সিনেমার গা-ঘিনঘিন করা গান।

তাড়াতাড়ি বাসনপত্র মেজে, ঘর ধুয়ে চলে এলো সে। বাইরে তখন ঝড়ের দাপট বেড়েছে। হাওয়ার আস্ফালন হুমকি দিয়ে ছুটেছে। আর সমানে চলেছে বিদ্যুতের কড় কড় কড়াৎ অট্টহাসি।

কি বিচিত্র রাত। ভয় জাগে মনে। তবু কেমন একটা অদ্ভুত আবেশ জড়িয়ে থাকে হৃদয়ের কাছাকাছি। ভীতির মধ্যে কেমন যেন নেশার ঘোর লাগে।

সে বিছানার কাছে গিয়েও উঠে চলে এলো। এসে দাঁড়ালো বারান্দার কোণে। চারদিক অন্ধকার। অনবরত বৃষ্টির ঝমঝম একগুঁয়ে শব্দ।

ছোট ঘরটার সামনে একবার উঁকি দিল ডলি। লোকটা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে গান গাইছে।

একটা বুঝি ছায়া পড়লো ঘরে। লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'আমি।'

লোকটা খানিকটা এগিয়ে এলো কাছে। হেসে বললে, 'ডলি তুমি?'

জবাব দিতে পারলো না ডলি। কেঁপে উঠলো সে। একটু ছুঁলেই বুঝি এলিয়ে পড়বে তার শরীর। ভেঙে তছনছ হবে পেষণে।

লোকটা আরো কাছে সরে এলো। এত কাছে বুঝি ডলির বুকের ঢিপ ঢিপ শুনতে পাবে সে। অনাস্বাদিত উত্তেজনায় শিউরে উঠলো ডলি।

লোকটা বলল, 'পদ্ম আবার ফিরে এসেছে ডলি। বলেছে আজ রাতে আসবে। আহা, তুমি যদি আর একটু ইয়ে হতে, তাহলে কি আর আমি—তোমাকে নিয়েই থাকতাম এখানে। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

লোকটা তাকালো ডলির দিকে। ঘোলাটে চোখে।

হাজার সাপ হঠাৎ যেন ছোবল দিয়েছে ডলিকে। সে ছুটে এলো তার বিছানায়। মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। এঘরে আনন্দিনী ছড়িয়ে দিয়েছে কয়েকটা ছেঁড়া কাপড়, সায়া, ব্লাউজ। ভেজা কাপড়ের জঞ্জাল চারদিকে। দু চোখ বেয়ে নেমে এলো বাঁধভাঙা জলের রাশি। বালিশে মুখ রেখে সে সশব্দে কাঁদতে লাগলো।

বাইরে আকাশের অঝোর কান্না কবে যে থামবে, কে জানে।

# দি ন লি পি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

**বাইশে শ্রাবণ**

বলেছিলে, তুমি গাছ দিয়ে গেছ ফল।
সে-কথা যে করিনি সম্বল
কেন জানো? আলোর আহার
গাছের মতন নয় আমার কখনো।
যেখানেই থাকো তুমি, শোনো,
আমি পান করে প্রীত গাঢ় অন্ধকার।

**তেইশে শ্রাবণ**

চাইনে আমি ত মুক্তি এ মায়াবী অন্ধকার হ'তে।
পারো যদি এসো তুমি, আলোকের স্রোতে
ভাসাও আমারে
ভাদ্রের বন্যায়।
যদি পারাপারে
লোভ থাকে, এখন সে লোভ যে অন্যায়
জানি মনে-মনে
বাকি আছে এখানেই বহু কাজ, অতি সন্তর্পণে
সেরে যেতে হবে
অকূলের অনন্ত সৌরভে॥

# কেবল কবিতা ছাড়া

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

সাড়ে তিন হাত শরীরের সীমায়
অসীম সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে
মনের সংজ্ঞা খুঁজে পাই না।
আমার মনের জলে ডাঙায়
আছে আশার অজেয় উচ্চতা
আর অমেয় ভালবাসার হ্রদ,
রাগের দাবাগ্নির ফণা
আর ঘৃণার সংকীর্ণ গিরিপথ,
এবং ঊর্ধ্বে কবিতার অনুভূতি
ডানা-মেলা পাখির স্পর্ধায়
স্পুটনিকের জন্মের আগেই
যে গেছে চন্দ্রতারায় ছড়িয়ে।

একটি পাখি উড়ছে নিঃশব্দে
কবিমনের অদৃশ্য পাখি।
রোমাঞ্চকর রাতের অভিযানে
চাঁদ ছাড়িয়ে বুধে ঢুকতে গিয়ে
পৃথিবীকে তাকিয়ে দেখছে।
কণ্ঠে যার কবিতার আরোহণের কাকলি,
তার মহাধমনীর বাঁকা মৃণালে
হৃৎপিণ্ডের রক্তপদ্মে
নতুন ঊষার অবরোহণের জন্য
শূন্যে সে উড়ে গেছে
মানুষের ঘুমের লগ্নে
পাথরের শহরকে ডিঙিয়ে

হয়ত আমার মৃত্যুর পরে
গঙ্গার কূলে শ্মশানে দাঁড়িয়ে
কোনো শরতের ক্লান্তিহর বাতাসে
চিতার একমুঠো ছাই হাতে
আমার উত্তরাধিকারী সন্তান
বিষন্ন একবার ভাবতে পারে:
যার করোটির ছাই এখনো উষ্ণ
সেই অপরিণামদর্শী জন্মদাতা
বৃথাই ঘুমকে রোজ হত্যা করে
এই দালানময় কলকাতায়
কেবল কবিতার ছলনা ছাড়া
আর তো কিছুই রেখে যাননি।

# আমার ফাঁসি হল

## মনোজ বসু

৫

হোড়ের পুকুরের জল এবারে তাড়াতাড়ি শুকানোর কারণ আমারই ইচ্ছাশক্তি কিনা জানিনে। সকালে এক কলসী নিয়ে গেছে, এবেলাও এলো। ছুটির দিন বলে ছোট দারোগা দুপুরে একহাত বসবার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মাথা ধরেছে বলে যাইনি। বেলা পড়ে গেছে, একটা চেয়ার টেনে এনে বসেছি আমতলায়। দেখে ফেললাম মুখোমুখি একেবারে। আরও মেয়ে-বউরা জল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এক নজরে মালুম হল, এ মেয়ে আমাদের কলকাতার বটে! কলসী কাঁখের উপর ধরবার কায়দাটুকুও শিখে নিতে পারেনি—অর্ধেক জল ছলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঠের আলপথে যাবার সময় পা হড়কে কলসী শুদ্ধ নিচে গড়িয়ে না পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পেল, সাব-রেজিস্ট্রার হাকিম গোলবাড়ির আমতলায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্য মেয়ে-বউ যেমন করে—কেউ হাত তুলে ঘোমটা বাড়িয়ে দেয়, কেউ-বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোন লজ্জাবতী মাঠ-পগার পেরিয়ে সজারুর মতন চোঁচা ছুটে পালায় (সজারু বলছি যেহেতু পায়ের তোড়ায় ঝুনঝুন আওয়াজ ওঠে দৌড়ানোর সময়)। আর এ মেয়ে আমার দিকে একবার নজর তুলে দেখে, যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

এর পরে পিটুনি দিই না কি করি বলুন ত হরিশটাকে? এই মেয়ের বলেছিল চেহারা সুবিধের নয়। এবং রঙ চাপা। অর্থাৎ সাদা কথায় যার অর্থ হল কালো। আপনারা বলবেন, ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছিল ওর মুখে—সময়টাকে কন্যাসুন্দর বেলা বলে—কালো মেয়ে সময়ের গুণে ফর্শা দেখেছি। বেশ তো, বাড়ির পুকুর যখন শুকিয়ে গেছে—এবং গোলবাড়ির পুকুরে দেদার জল, জল নিতে কতবার আসতে হবে, কত দিন দেখব। রোজ কিছু আর ডুবন্ত বেলা থাকবে না।

বেশি দেরি হল না, ঘণ্টা দশ-বারো পরেই। বিষম গুমট, হাওয়া একেবারে নেই। সবগুলো জানালা খোলা, তবু ঘুম হয় না রাত্রে। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। খুব ভোরবেলা। চাঁদ আছে আকাশে। জ্যোৎস্না আর ভোরের আলোয় মিলে মিশে গেছে। বিছানার উপর আধঘুমে পড়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পাই, আমতলায় সেই মেয়ে। কাল যেখানটায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখেছিলাম, ঠিক সেইখান থেকে দালানের দিকে মুখ করে আমায় দেখছে। ঘুম-জড়ানো আমার চোখে আজকে আরও চমৎকার লাগল। স্বপ্নের মেয়ে বলে মনে হয়। এক নজরে দেখছিল এতক্ষণ—যেইমাত্র পাশ ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে উধাও। পাখি যেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, দরজা খুলে চলে এলাম বাইরে। কোথায়! এত ভোরে কেন এসেছিল, কে জানে?

হরিশ এলে ঘটনা বললাম। ধরা-ছোঁওয়া না পায়, তেমনিভাবে সামাল দিয়ে বলছি, ভোররাত্রে আমতলায় কাকে যেন দেখলাম। কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। চোর-চোর কিনা, কে জানে?

হরিশ হাসেঃ সবে এই শুরু। জষ্ঠি-মাসটা পড়তে দিন, মানুষ আমতলায় রাতদিন চরে বেড়াবে। এই দেখে আসছি হুজুর, আম কুড়োবার সময় ভূতের ভয় থাকে না। বাগান এদ্দিন বেওয়ারিশ পড়ে ছিল—যেমন খুশি গাছে উঠে পাড়ত, তলায় কুড়াত। কানাইবাঁশি গাছের আম এগুতে পেকে যায়, সে খবর অবধি জেনে বসে আছে। পাকে বোশেখের গোড়ায়, এই চোত মাসে তার টনক লেগেছে। আমিও আমিও আছি। ঐ গাছের যত আম, কাঁচা-ডাঁসা সমস্ত আজ মুড়িয়ে পাড়ব। তখন কী লোভে আসে দেখি।

ব্যস্ত হয়ে বলি, উঁহু, অমন কাজও নয় হরিশ। একটি আম পাড়বিনে। যেমন আছে তেমনি থাকুক। চিরকাল দশজনে খেয়ে আসছে—দরকার নেই লোপমালা কুড়োবার। পেকে দুটো চারটে করে তলায় পড়বে, দেশের মানুষ কুড়িয়ে খাবে। সেই ভাল।

তাই ঠিক, আমের লোভেই এসেছিল। চলল এখন এই ব্যাপার। জল নিয়ে যায় ঐ অতটা দূরের ঘাট থেকে। আম পড়ে একেবারে উঠানের উপর। অতএব উঠানেই আসতে হবে আম কুড়াতে! এখন এই কানাইবাঁশি—একে একে তারপর সব গাছের আম পেকে যাবে। বিকালবেলা ঝড় উঠবে

কালবৈশাখীর, ফলন্ত ডাল আছাড়িপিছাড়ি খাবে। টুপটাপ শিলাবৃষ্টির মতো পড়বে আম। আর জলে ভিজে ওরা সব তলায় তলায় ছুটোছুটি করবে। চলল এই এখন।

বউদি'র চিঠি পেয়েছি দিনচারেক আগেঃ ছুটি নিয়ে এসো। সকলে মিলে তাহলে ক'দিন দেশে কাটিয়ে আসা যায়। খুব নাকি আম হয়েছে এবারে। আমাদের হাঁড়ির-বাড়ি গোপালে-ধোবা বোম্বাই-র ডাল ভেঙে পড়ার দাখিল।

যাই কি না যাই—চিঠি পাওয়ার পর থেকে দোমনা ছিলাম। আজকে জবাব চলে গেলঃ যাবার তো ইচ্ছে হয়েছিল বউদি, কিন্তু ছুটি ছিল না। নতুন এক উপর-ওয়ালা এসেছে, বড় বেয়াড়া। যাবার উপায় নেই।

হরিশকে আম পাড়তে মানা করে দিয়েছি। আম পেকে টুকটুক করছে—করুক না। পাখিতে ঠুকরে ঠুকরে খায়—ক'টা আর খাবে? বছরের এই একটা-দুটো মাস বই নয়, সকলকে খেতে দিতে হয়। কোনদিন তুই গাছে চড়তে যাবিনে হরিশ। সারাদিন সারারাত্রি টুপটাপ করে তলায় পড়ছে তো পড়ুক। পড়ে থাকুক অমনি,

যার খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোর আমার জন্যেও দু-চারটে ওর ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনবি। কিন্তু বেশি নয়, খবরদার! ঘরে এনে গাদা করবিনে। দশজনে ভাগাভাগি করে খেয়েই সুখ।

জল নেবার সময় দয়ালহরির মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখি। কলসী নিয়ে ধীরে ধীরে আসে, কলসী ভরে নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে যায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখি। গোল-বাড়ির হাতার মধ্যেও পেয়েছি দিন পাঁচ-সাত। আমতলায়, কিন্তু আম কুড়াচ্ছে না। এখানে ভিন্ন ভাব, লুকোচুরি খেলার ধরন। চোখাচোখি হতেই সরে চলে যায়। পাড়াগাঁ জায়গা—নিন্দে রটতে কতক্ষণ! দয়ালহরির বাড়ি থেকেও বোধ করি সমঝে দিয়েছেঃ শহুরে রকমসকম বিরাটগড়ে চলবে না। তবু আসে লুকিয়েচুরিয়ে, এসে দেখে যায়। শুনেছে নিশ্চয়, শহর থেকে ছিটকে-পড়া আর একজন আছে তারই মতো। দুজনে ভিন্ন জাতের আমরা, অন্য সকলের থেকে আলাদা। সেই টানে চলে আসে।

একদিন অফিস থেকে ফিরছি। দয়ালহরিও চলেছেন, সংগে চারজন ভদ্রলোক।

আপনাকে ক'দিন দেখতে পাইনি হোড়-মশায়। অফিসেও তো আসছেন না।

দয়ালহরি বললেন, এই এঁদের ওখানে গিয়েছিলাম। সাত-আট ক্রোশ দূর ষষ্ঠী-পুকুর, কাছেপিঠে নয়। লাবণ্যর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

দয়ালহরির মেয়ের নাম পাওয়া গেল লাবণ্য। নাম বেশ মানান করে রেখেছেন। না জেনেও আমি বোধ হয় আন্দাজে বলতে পারতাম এই নাম। লাবণ্য, লাবণ্য। কিন্তু দয়ালহরির কি রকম কাণ্ড, কোন সব মানুষ বাড়ি নিয়ে তুলছেন মেয়ে দেখানোর জন্য! এরা মাথার চুল খুলে দিয়ে মাপবে, হাঁটিয়ে দেখবে, ইঁচড়ের ডালনা কোন্ প্রক্রিয়ায় রান্না হয় প্রশ্ন করবে। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মাঠের ধারে এসে পড়েছি। জুতো খুলে ফুঃ ফুঃ করে ধুলো ঝেড়ে তারা হাতে করে নিচ্ছে এবারে আলের উপর উঠবে বলে। খানিকটা পিছিয়ে পড়ছে সেজন্য। জুতো পরার অভ্যাস বেশি আছে বলে মনে হয় না। জুতো পায়ে এমনিই বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল, খুলে নিয়ে বাঁচল।

বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে হোড় মশায়?

দূরবর্তী কুটুম্বদের দিকে এক নজর তাকিয়ে ভ্রূভংগ করে দয়ালহরি বল্লেন, কোথায় কি! সবে তো মেয়ে দেখা—মেয়ে পছন্দ হবে, দেনাপাওনার আস্কারা হবে। লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। গয়নায় মোটামুটি আমি গা সাজিয়ে দেবো। সাবেকি জিনিস কিছু ঘরে আছে, নতুন করে গড়াতে হবে না। কিন্তু নগদ খাঁই হলে পেরে উঠব না। কত ধানে কত চাল—হুজুরের সমস্তই জানা। পাবো কোথায়?

গায়ে-পড়া হয়ে পরামর্শ ছাড়িঃ নগদ চাইল না বলেই অমনি কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। মেয়ে ফেলনা নয়, বিচার-বিবেচনা করবেন। পাত্র কি রকম শুনি?

এক মুখ হেসে গদগদ হয়ে দয়ালহরি ঘাড় নাড়লেনঃ সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। পাত্র ভালো বলেই তো মরি এমন ছুটোছুটি করে। লেখাপড়া জানে, ম্যাট্রিক পাশ। প্রাইমারী ইস্কুলের পণ্ডিত হয়েছে। সরকারী চাকরি—বয়স বাড়লে মাইনে কোন না ষাট-সত্তরে দাঁড়াবে। ঘরের খেয়ে মাস অন্তে অতগুলো টাকা—কোনরকম ঝামেলা নেই, এক পা নড়ে বসতে হবে না। লেগে যায় তো জষ্ঠির শেষাশেষি দিন ঠিক করে ফেলব। শুভস্য শীঘ্রং, কি বলেন?

গলা আরও নামিয়ে বলতে লাগলেনঃ এর বেশি কোথায় পাচ্ছি? লাটসাহেব কে আমার জামাই হয়ে ছাদনাতলায় বসবে? মেয়ে যদি অপ্সরী-কিন্নরী হত কিম্বা বস্তা ভরে টাকা ঢালতে পারতাম, তবে না হয় কথা ছিল। কি বলেন?

বারম্বার আমায় সালিশ মানেন, মনে যা-ই থাক ঘাড় না নেড়ে উপায় কি? কুটুম্বর দল এসে পড়েছে, নিতান্ত কানা-চোখ এবং অর্থপিশাচ না হলে অমন মেয়ে ছেড়ে যাবে না সুনিশ্চিত। এক পাড়ার মধ্যে থাকি, এবাড়ি-ওবাড়ি, দিনরাত দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, বাড়ি থেকে রাঁধা তরকারি পাঠিয়ে খাতির দেখানো হয়, শুনতে পাই তার দু-একখানা মেয়ের নিজের হাতের। অথচ বিয়েথাওয়ার মতন এতবড় ব্যাপারে আগেভাগে একটি মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলে না?

পাড়াগাঁ জায়গায় কুটুম্বরা রাত্রিবেলা কখনো চলে যাচ্ছে না, জোর খাওয়া-দাওয়া আজ দয়ালহরির বাড়ি। এবং ঘরে বসে আমিও ভাগ পাব। হরিশ হাসতে হাসতে সেই কথা তুলল। হেসে বসে, আজ কিছু রাঁধতে হবে না। দুটো চাল ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে। তা-ও লাগবে না হয়তো, হোড় মশায় লুচিটুচি পাঠাবে।

আমি আগুন হয়ে উঠি: দিন-কে-দিন কী হ্যাংলামি বাড়ছে তোর। তার মানে সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে উঠতে চাস। বেশ তাই, আজকে তোর রাঁধতে হবে না। বাড়ি চলে যা। আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে খাব।

মেজাজ দেখে হরিশ অবাক। এমন অনেক দিন হয়েছে, দয়ালহরি হাট করে বড় ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন—আমিই বলেছি, দেরি করে উনুনে ধরাবি হরিশ। ভাতটা গরম গরম চাই। অমন ইলিশের ঝোলের সংগে গরম ভাত ছাড়া জমবে না। আমার ঐ ভাব জেনেই তো হরিশ বলল, তার কি দোষ?

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। ভাত-তরকারি ষোলআনা রান্না করে খাইয়ে দিয়ে হরিশ অনেকক্ষণ চলে গেছে। রাত দুপুর হল। দয়ালহরি খোঁজ নিলেন না তো আমার। হরিশের সংগে বাড়ির মধ্যে কি কথাবার্তা

হয়েছে, তিনি তা জানবেন কি করে? অনেকবার রাস্তা অবধি বেরিয়ে এসে হোড়-বাড়ির দিকে তাকিয়েছি। কুটুম্ব আসার দিন বাইরের ঘরে বেশিক্ষণ ধরে আলো জ্বলবার কথা—তা-ও তো কিছু মনে হচ্ছে না।

পরদিন রেজেস্ট্রি অফিসে যথাস্থানে দয়ালহরিকে দেখলাম। ঘাড় হেঁট করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। জুতোর শব্দে ঘাড় তুললেন একবার। অপ্রসন্ন বলেই মনে হল। অফিসের মধ্যে, হাকিম আমি, ঘরোয়া কথা-বার্তা চলে না। বিকালে বাসায় ফিরছি, তখন দেখি পিছু পিছু আসছেন। আমারও উদ্বেগ আকণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। প্রশ্ন করলাম, খবর কি হোড় মশায়? পাকা কথাবার্তা হয়ে গেল?

বারুদে আগুনের ফুলকি পড়ল যেন।

বলবেন না, বলবেন না। ছোটলোক, পাজির পা ঝাড়া। তিন তিনটে দিন আমার সকল কাজকর্ম বন্ধ। গুরুঠাকুরের মতো তোয়াজ করে বাড়ি ডেকে আনলাম। এলো তা-ও একটি দুটি নয়, পুরো এক গণ্ডা। নৌকোভাড়ায় সাড়ে পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। পান-বিড়ি মুহুর্মুহু এনে ধরছি মুখের কাছে। তা খেয়েদেয়ে মুখের উপর কিনা বলে, মেয়ে ভাল নয়। কদ্দুর কি পুষিয়ে দেবেন, সেই কথাবার্তা আগে।

বলেন কি! কোন সাহেব-বিবির দেশের লোক—ঐ মেয়ের নিন্দে করে?

দয়ালহরি বললেন, সে ধরিনে। নজর সকলের সমান হয় না। হাটে লাউ-বেগুন কিনতে গিয়েও লোকের কত রকম বাছা-বাছি, কত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাই বলে কটকট করে মুখের উপর বলবে, এক হাজার এক টাকা নগদ চাই এ মেয়ের সঙ্গে। আধলা পয়সা কম হবে না।

আচ্ছা অভদ্র তো!

পাড়াগাঁয়ের গাছমুখ্যু—মেয়ে আমার কলকাতায় মানুষ, লেখাপড়া জানে, তার কদর ওরা কি বোঝে? হাজার টাকা! আমার বসে হাজারটা পয়সা একসঙ্গে জোটাতে কালঘাম ছুটে যায়! সে যাক গে, না পোষায় না করলি। কিন্তু দরাদরি আড়ালে হলেই হত। কি বলব হুজুর, মায়ের দু-চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

অশ্রুমুখী অপমানিতা মেয়েটিকে যেন চোখের উপর দেখছি। মনে মনে তবু আনন্দ। ঝড় ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা কেটে গেছে যেমন করেই হোক।

দয়ালহরি বললেন, আমিও ছাড়িনি হুজুর। রাগের মাথায় রাজভাষাই বেরিয়ে গেল: গেট আউট, এক্ষুনি বেরোও। রাত্তিরবেলা, উড়োকালে সাপখোপের ভয়—তা মগজে রক্ত চড়ে গেল কেমন। হাট থেকে এক ঝুড়ি গলদা-চিংড়ি কিনেছিলাম, সকালবেলা পচা মাছগুলো আদাড়ে ফেলে দিলাম। রাতে রাঁধাবাড়া হয়নি, বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এর পরে একরকম চুপচাপ চলেছি। ভাবছি। দয়ালহরির জানবার কথা নয়—আমি তো দেখে নিয়েছি মেয়েকে। মেয়ে খারাপ বলে কোন্ বিবেচনায়। ভুল হল তবে নাকি আমার, অন্য কাউকে দেখেছি? কিন্তু হোড়-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জল নিয়ে ফের সেখানেই ঢোকে। ঐ বয়সের অন্য কেউ নেই, সে খবর নিয়েছি হরিশের কাছে। তবু এ প্রসঙ্গ তুলতে পারিনে। গ্রামের মধ্যে হাকিম মানুষ—আমার অফিসের এক ভেণ্ডারের মেয়ের সম্পর্কে আগ্রহ দেখানো চলে কেমন করে?

দয়ালহরিকে বললাম, আপনার বাড়ির রান্না কতই খেয়েছি, আমার এখানে খেয়ে যান আজকে। হরিশকে আপনি দিয়েছেন, কি রকম করছে একটা দিন পরখ করে যাওয়াও তো উচিত। একেবারে খেয়েদেয়ে যাবেন এখান থেকে, আসুন ততক্ষণ গল্প-সল্প করা যাক। হরিশ বরঞ্চ এক ছুটে আপনার বাড়ি খবর দিয়ে আসুক।

দয়ালহরির বড় সংকোচ। সেটা বুঝতে পারি—আমি এজলাসের চেয়ারে বসা হাকিম, ওঁর আসন রোয়াকের উপরের মাদুর। বড্ড না-না করছেন। তখন আমি হাত ধরে ফেললাম: রোজ মিষ্টিমিঠাই খেয়ে একদিন নিম-উচ্ছে খেতে হয়। দেহের পক্ষে ভাল। আসুন, আসুন। হরিশের রান্না তা হলে নিমের মতন অত কটু হবে না।

অগুন্তি ঘর গোলবাড়িতে। মাথন মিস্তির তার চার-পাঁচটা মনের মতো করে মেরামত করিয়েছিল। আমি সামনের গোল-ঘরটা মাত্র নিয়েছি। শোওয়া-বসা সমস্ত সেখানে। ঘর বেশি নিলে সাফসাফাই রাখবার

হাঙ্গামা। আর হরিশ লম্বা দরদালানের এক পাশে ইট দিয়ে উনুন গেঁথে নিয়েছে। আগে তার শোবার ঘরও ছিল ওখানে, ইদানীং শুধুমাত্র রান্নাঘর। সন্ধ্যার পরে রাঁধতে রাঁধতে ঘরের ভিতর সে আমার মুখ দেখতে পায়। এঘরে ওঘরে কথা-বার্তাও চলে। আজকে গোলঘরের খাটের উপরে দয়ালহরির সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছি। প্রবোধ দিচ্ছি তাঁকেঃ ভাববেন না, মেয়ের বিয়ে আটকে থাকবে না। বরঞ্চ ভালই হল অভদ্র লোকগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে।

দয়ালহরি অবাক করে দিলেনঃ ছেদ তা বলে একেবারে হয়ে যায়নি, ঝুলেছে এখনো। ঐ তো অত কথা-কথান্তর। তা ওরা গায়ে মাখে নি। ওদের লোক কাছারি এসে দেখা করে বলে গেল, সাত-শ অবধি নামতে রাজি আছে। বাড়ির লোকজন অতি ছ্যাঁচড়া, তবে হুজুরে পাত্রটি অতি লোভনীয়। কি বলেন? কিন্তু সাত-শই বা কোথায় পাচ্ছি? বললাম, দেখি ভেবে। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকতে মেজাজ দেখাতে নেই। কাল ভুল করেছিলাম, আজ অনেকটা শুধরে নিয়েছি।

হতে হতে দয়ালহরির সংসারের কথা। এবং সেই থেকে লাবণ্যর কথা। আহা, জন্ম থেকে কী কষ্টটা পাচ্ছে! কষ্ট আঁতুড় থেকেই। আঁতুড়ঘরে আগুন লেগে যায়। মেয়েটাকে যা-ই হোক উদ্ধার করা গেল, মেয়ের মার সর্বাঙ্গ পুড়ল। অনেক কষ্টে বিস্তর চিকিৎসাপত্তোর করে প্রাণ বেঁচেছে। কিন্তু শুধুমাত্র আগুনে পোড়া নয়—হাঁপানি, পেটেবাত অম্লশূলে আরও বিশখানা রোগ বড় বউয়ের। শরীরটা ব্যাধির কারখানা বিশেষ। দশ-পাঁচটা মাইনের ঝি-চাকর নেই, সংসারের কাজকর্ম সমস্ত করতে হয় এই অবস্থার মধ্যে। কষ্ট দেখে মেয়ের দিদিমা নাতনিকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, লাবণ্য যা হোক এক রকম ছিল, বুড়ি অন্তে আবার দুঃখের দশা। ঠেলাগুঁতো লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটানো। হতভাগী মেয়ে শ্বশুরবাড়ি একটু সুখশান্তি পায়, সেইজন্য এদেশ সেদেশ সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দেখবেন তো হুজুর। মেয়ে কলকাতায় বড় হয়েছে, কলকাতার কোন পাত্র পাওয়া যেত! কিন্তু এই ধাপধাড়া জায়গাতেই নগদ সাত-শ হেঁকে বসে থাকে, কলকাতার ল্যাজে হাত দিতে যাবেন বা কোন সাহসে?

দু-পাঁচ কথার পরে আবার বলেন, ভুলবেন না হুজুর। নগদ পণ দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের পুরনো ঘর, গয়নাগাঁটি কিছু বেরোবে। ওর মামা থাকতে কলকাতার সম্বন্ধ কয়েকটা এসেছিল, দেখেও গিয়েছিল ওদের চাঁপাতলার বাসায় এসে। তিনি ঘটক লাগিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল খারাপ, মামাটিও টপ করে মরে গেলেন।

ফোঁস করে দয়ালহরি নিশ্বাস ছাড়লেন। চাঁপাতলার নাম আমি তো বউদির চিঠিতে পেয়েছি। ডানাশূন্য পরী সেখানে দেখে এসেছেন। হতে পারে এই লাবণ্য। ধরেই নিচ্ছি আমি তাই।

ধারা শ্রাবণ, তারপরে পচা ভাদ্র। ভাদ্রমাসটা বড় খারাপ। টিপটিপে বৃষ্টি, পথে ঘাটে প্যাচপেচে কাদা, পাট-পচানি জলের গন্ধে সর্বক্ষণ নাকে কাপড় দিতে হবে। তার উপরে মশা। মশার ঠেলায় তাসের আড্ডা পুরোপুরি বন্ধ। হেন বীর কে আছে, সন্ধ্যার পরে মশারির বাইরে বসে থাকবে! ডাক্তারবাবুরও নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই, এই দুটো তিনটে মাসের লোভে পড়ে থাকেন সারা বৎসর। প্রতি বাড়িতেই রোজ একটা দুটো করে শয্যা নিচ্ছে। শীত করে জ্বর আসে, হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপুনি লাগে। লেপ-কাঁথা, কম্বল, সতরঞ্চি, মাদুর, মশারি বাড়িতে যতকিছু আছে সমস্ত গায়ে চাপিয়ে শীত কাটে না, গলা দিয়ে উঁহু হু হু গান বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া। একেবারে খাঁটি বস্তু—তার প্রধান লক্ষণ গান বেরুবে জ্বর আসবার মুখটায়।

দেখতে দেখতে এমন অবস্থা, মানুষের মুখ দেখতে পাইনে। দলিল রেজেস্ট্রি বাবদে কালেভদ্রে একজন দু-জন আসে। এক ঘটি জল এগিয়ে দেবার সুস্থ মানুষ পাওয়া দায়, জমিজমা খরিদ-বিক্রির পুলক আপাতত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে কুইনাইন ধরেছি। গোড়ায় এক বড়ি সকালবেলা, এখন সকাল-দুপুর-রাত্রি তিনবার করে চালাচ্ছি। ভাত বন্ধ করে শুধুমাত্র চা-কুইনাইনে পেট ভরাব কিনা ভাবছি। তবু রক্ষা হল না, জ্বরে ধরল। প্রকোপ বড্ড বেশি। নতুন মানুষ, এ রোগে প্রথম এই পড়লাম—সেইজন্যে। অথবা ম্যালেরিয়ার যেন বোধজ্ঞান আছে, চোখ পাকিয়ে আমার টুঁটি চেপে ধরেছেঃ কুইনাইনে যে রুখতে গিয়েছিলি বড়? ঠেকাক কুইনাইনে। কাঁপতে কাঁপতে চৈতন্য হারাবার গতিক। কাঁপুনি থেমে শেষটা আগুন ছোটে গা দিয়ে। এ সমস্ত পরে শুনেছি হরিশের কাছে, আমার বোঝবার শক্তি ছিল না। দয়ালহরিও বলেছেন। উনি প্রায়ই আসতেন। এ জায়গার মানুষ ভুগে ভুগে জ্বরের ধারা বুঝে ফেলেছে, গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। চিকিৎসা আবার কি—পনের বিশদিন ভুগে আপনি খাড়া হয়ে উঠবে। জ্বর বেশি হলে মাথায় জল ঢালুন, জ্বর কমলে কুইনাইন-মিকশ্চার খান।

এছাড়া কিছু করণীয় নেই। আমায় ডাক্তারবাবু রোজ এসে দেখে যেতেন। বাড়াবাড়ির মুখে হরিশ রাত্রিবেলাও থাকত। মুখের কাছে জলের গেলাসটি এগিয়ে ধরা, বমি সাফ-সাফাই করা, ক্ষিধে পেলে নারিকেল-পাতা জেবলে তাড়াতাড়ি এক ঝিনুক বার্লি জলে ফুটিয়ে আনা—একজন কেউ না হলে এত সমস্ত করে কে? সকলের পরামর্শে হরিশ বউকে বাপের বাড়ি রেখে এসেছিল কয়েকটা দিন।

বেহুঁশ হয়ে প্রলাপ বকতাম। এমন কি, থানার বড়বাবু ছোটবাবু দেখতে এসে দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, নৌকো পাঠিয়ে সদর থেকে বড় ডাক্তার আনার প্রস্তাব হল। কলকাতায় দাদাকে লেখার কথাও হচ্ছিল। ঠিকানা কোথায় পাওয়া যায়?

দয়ালহরি বললেন, আমি জানি। অসুখে পড়বার পর যত চিঠিপত্র আসে, আমিই এনে দিই। একলা প্রাণী পড়ে আছেন, বয়সে ছেলেমানুষ। দায়ে বেদায়ে লাগতে পারে, তাই ভেবে সেরেস্তায় ঠিকানাটা টুকে রেখে দিয়েছি।

এ সমস্ত হরিশ আমায় পরে বলেছে। কিন্তু অতদূর আবশ্যক হল না। সেই রাত্তেই ঘাম দিয়ে জবর রেমিশন হল। জবর এলো আবার পরদিন, কিন্তু প্রকোপ বেশি নেই। এইবারে কমতির দিকে চলল, ম্যালেরিয়ার রীতি এই।

আর ক'দিন পরে দয়ালহরিই বললেন, হুজুরের দাদার কাছে কিন্তু জানানো হয়নি।

ভাল হয়ে যাচ্ছি, আমিই জানিয়ে দেবো ক'দিন পরে। খুব বুদ্ধির কাজ করছেন। খবর পেয়েই তো হুড়মুড় করে এসে পড়তেন, কোথায় থাকতেন, কি হত—

দয়ালহরি বললেন, আমরা এত জনে আছি, থাকবার জায়গার কি অভাব হত, পথে পড়ে থাকতেন? সেটা কিছু নয়। ভাবনা হল, ও'রাও যদি জবরে পড়ে যান। পড়তেনও ঠিক। নতুন মানুষ পেলে ধরবেই। আপনার বেলা যা হল—এত কুইনাইন খেয়েও পারলেন রুখতে?

ভালই হয়েছে। দাদা-বউদিকে আর কিছু জানাচ্ছিনে। যাচ্ছি তো সামনের পুজোয়—তখন গিয়ে বলব। বলতে হবে না, চেহারা দেখে টের পাবেন। ছুটি নিয়ে দশ-পনেরটা দিন বেশি কাটিয়ে শরীরটা মেরামত করে ফিরব। জবর তাড়িয়ে ডাক্তারবাবু অবশেষে অন্নপথ্য দিলেন। আর দশ জনের চেয়ে ভোগান্তি কিছু বেশি হল এই যা।

শুনবেন তবে? অবাক হবেন না, অন্ন-পথ্যের দিন আমার খুব খারাপ লাগছিল। ও'রা যাকে বলেন বেহুঁশ হওয়া, সে অবস্থা আসবে না তবে আর? মজায় থাকতাম জবরের যখন বাড়াবাড়ি হত। অতিরিক্ত কুইনাইন খেয়ে কানে তালা লাগে—হলপ করে বলছি, আমার সে বস্তু নয়—অনেক-গুলো ক্ষীণ মধুস্বর বাজত কানে। তার-যন্ত্রের অতি মিহি সুরের বাজনা। অভিনব ঘরকন্না ছড়ানো যেন চারিদিকে—ব্যস্তসমস্ত এক দঙ্গল নরনারী। ফুটফুটে বললে কিছুই হল না, উজ্জবল দিনের আলোর মতো তাদের চেহারা। এই গোলঘরের ভিতর দিয়ে কতবার আনাগোনা—কিন্তু আমি জলজ্যান্ত মানুষটা খাটের উপর পড়ে আছি, মেজের উপরে আরও একজন হরিশ—কিছু ওরা দেখতে পায় না, কানেও শোনে না। এত চলাফেরা করছে, পা কখনো পড়ে না শক্ত ভূমির উপর, ক্ষীণতম শব্দ নেই। আমার গায়ের উপর দিয়ে আড়াআড়ি খাট পার হয়ে দেয়াল ভেদ করে কেমন স্বচ্ছন্দে চলে গেল, কোন-কিছু বাধে না কোথাও। অবাক হয়ে মজা দেখি, ইচ্ছে করে আমি ঐ কায়দাটা পেতাম! এবং বিশ্বাস হচ্ছে, চেষ্টা করলে ঠিক পারব আমি, কঠিন কিছু নয়। অমনি হালকা আমিও হয়ে যেতে পারি।

এমনি সময় হরিশ হঠাৎ রসভঙ্গ করেঃ কি দেখেন হুজুর, অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে? অষুধ খান। জল এনেছি কুলকুচো করে নিন আগে। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কি হয়ে গেল শ্লেটের লেখা জলে ধুয়ে ফেলার মতো। কিংবা সিনেমার রীল ছিঁড়ে গিয়ে সাদা পর্দা মাঝখানে বেরিয়ে পড়ে যেমন। সেই অবস্থায় হাতে তোমার যদি শক্তি থাকত, ঠিক আমি মেরে বসতাম হরিশকে। লাঠি তুলতে পারলে এক বাড়িতে মাথা ফাটাতাম। তারপর সম্বিৎ ফিরে আসে: তাইতো, অসুখে ভুগছি আমি। কলকাতা থেকে অনেক দূরে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি। দাদা-বউদি কাছে নেই, টুনুও নেই। জ্বালাযন্ত্রণে হঠাৎ বুঝি কোন রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, আমায় যেন খাটো করে সামান্য সংসারে ফিরিয়ে আনল।

একদিন দয়ালহরির মেয়েকেও দেখলাম যেন ঐ ফরসা মানুষের জনতার ভিতরে। কি নিয়ে লাবণ্যকে তাড়া করেছে সমবয়সী ক'জন। একপিঠ চুল উড়ছে ছুটোছুটিতে, সদ্য স্নান করে এলো বুঝি? এইরেঃ, ধরে ফেলল লাবণ্যকে, শাস্তিটা কি দেয় না জানি! হাসি—তুবড়িবাজির মতো ঘরময় হাসির ফুলকি। আর কথা। উঁহু, কথা বলে না ওরা, গান গায়। সত্যি লাবণ্য না অন্য কেউ? মাথায় গোলমাল লেগে যায় আমার। ঠিক করে কিছু ভাবতে পারিনে। যা হবার হোকগে। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলাম।

আরও একদিন। লাবণ্য আজ একা। বড় গম্ভীর, চোখ ছলছল করছে। আহা, আঁধার মুখেও এমন খাসা! কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই ঘরের ভিতর। পেয়েছেও যেন—ছোট্ট ছোট্ট জিনিস, খুঁটে খুঁটে বাঁ-হাতের মুঠোয় রাখল। কিন্তু আমি এই এত বড় মানুষটা কিছুতে নজরে পড়িনে। হাত উঁচু করে তুলেছি, চেঁচাচ্ছিও বোধহয়। কিছু না, দেয়াল পার হয়ে

আমবাগানের দিকে ভেসে ভেসে বেরিয়ে গেল।

এমনি কত! এখন ভুলে গেছি। আরোগ্য হয়ে অন্নপথ্য পেলাম—তারপর থেকে ভেবে ভেবেও আর মনে পড়ে না। শুধু ঘুম আসবার মুখটায়—যতক্ষণ ঘুম না এ'টে আসে—কত সব জায়গার ভাসা ভাসা চেহারা দেখতে পাই। জ্বর বন্ধ হলেও উঠতে পারিনি অনেকদিন। ঢে'কিতে চি'ড়ে কোটা দেখেছেন, আমার যেন তেমনি করে গড়ের মধ্যে ফেলে আষ্টেপিষ্টে কুটে রেখে গেল।

হাকিম বিহনে রেজেস্ট্রি অফিসের কাজ বন্ধ ছিল কয়েকটা দিন। তারপরে সদর থেকে একজন এসে পড়ল। আমার চেয়েও বয়স কম। আপাতত এক মাসের জন্য এসেছে, আমি ভাল হয়ে উঠলেই চলে যাবে। ছোট দারোগার সঙ্গে কি রকমের শালা-ভগ্নি-পতির সম্পর্ক—অতএব বাসার সমস্যা নেই, থানার কোয়ার্টারে এসে উঠেছে। প্রায়ই আমায় দেখতে আসে। বলে, খাড়া হয়ে উঠুন দাদা, আর তো পেরে উঠিনে—দম বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন করে থাকেন আপনারা বলতে পারিনে।

পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছে। আর আমার আজ এমনি গতিক, ঠেঙানি দিলেও নড়ছিনে বিরাটগড় থেকে। কেমন সব উল্টোপাল্টা আমার কাছে, অন্য দশজনের সঙ্গে মিলছে না। জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকতাম, সেই ঘোর কেটে যাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে এখন রীতিমত। ডাক্তারবাবু, দয়ালহরি এবং দারোগারা যত্ন করে তাড়াতাড়ি জ্বর ছাড়িয়ে দিলেন। তিনসপ্তে ওরা, আমার অত সুখ সহ্য হচ্ছিল না।

চাপরাশি হরিশকে অফিসের সময়টা হাজিরা দিতে হয়। ফাঁকা দুপুর। অসুখের মধ্যেও দুপুরে ছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিলাম না। তখনই আরো ঘর ভরে যেত জনতায়। একটা ভিন্ন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল যেন। সে জায়গা আলাদা কোথাও নয়, আমাদের এই সংসারেই ব্যাপ্ত রয়েছে। এর চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিস্তীর্ণ। শুয়ে শুয়ে দেখছি, পি'পড়ের সারি চৌকাঠের পাশে বাসা গড়েছে। খাদ্যের কণিকা বয়ে বয়ে এনে রাখছে। দুর্ভেদ্য নিরাপদ আশ্রয় ওদের। কিন্তু আমার কাছে? জুতোর তলার লহমার মধ্যে পিষে ফেলতে পারি সমস্ত। উপমাটা লাগসই হল না কিন্তু। পি'পড়ে ঐ তো নজরে আসছে। আনব প্রাণী, মাইক্রোব, ইন্দ্রিয়-সীমানার বাইরে যাদের বসবাস—অবাধে তাদের উপর দিয়ে বিচরণ করে বেড়াই, বুঝতে পারিনে। ঠিক তেমনি সম্পর্ক যেন আমাদের এবং সেই তাদের মধ্যে। রোগের বিছানায় হঠাৎ তৃতীয় নেত্র যেন খুলে গিয়েছিল, সেই ক'দিনে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

ক্রমশ




### সম্প্রদায় প্রবর্তক

তানসেনের পুত্র-দৌহিত্র বংশের গুণীরা একমত হয়ে একটি ধারণা রক্ষা করে এসেছেন এবং বিশেষজ্ঞ ইতিবৃত্তকারেরা সেই ধারণা সমর্থন করে এসেছেন; যথা—তানসেন স্বয়ং সেনী ঘরের ধ্রুবপদ বিদ্যা ও রাগবিদ্যার মূলমন্ত্র উদ্‌ভাবিত করেছিলেন। অর্থাৎ—এতাবৎকাল পর্যন্ত তানসেন বংশের অন্য কোনও গুণী এ বিষয়ে কিছুমাত্র দাবীদাওয়া করেননি।

অধিকন্তু—বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তানসেন ঐ দুই বিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বলেই তানসেনের দৌহিত্র বংশজ প্রসিদ্ধ গুণী উন্নততর ধামার-গান প্রবর্তিত করতে পেরেছিলেন এবং তানসেনীয় রাগ-বিদ্যার ভিত্তির উপরে অভিনব খেয়াল-গানের সৌধ রচনা করেছিলেন।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা ও প্রামাণিক বিবরণ লাভ করার বিষয়ে আমি দুজন পরমশ্রদ্ধাস্পদ ইতিবৃত্তকারের অনুগ্রহ ও সাহায্য পেয়েছিলাম। যথা সংক্ষেপে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে সহৃদয় পাঠকের সম্মুখে নিবেদন করব।

গুরুজী শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের আশ্রয়ে কিছু গান ও রাগ শিক্ষা করার সময়ে রাগ-গঠন ও উৎপত্তি ব্যাপার আয়ত্ত করার জন্য প্রবল আগ্রহ হয়েছিল। খাঁ সাহবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করায় তিনি বললেন, তাঁদের ঘরাণার সর্বসাকল্যে আঠার ঠাট কায়েম আছে। এবং আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করার প্রথম ধাপেই তিনি সেই ঠাটগুলির নাম করে গেলেন ও আমাকে শিখিয়ে দিলেন। পরে, তিনি যখন মজবুত কণ্ঠে বললেন—ইমন ঠাট আর কল্যাণ ঠাট, এরা দুটি পৃথক ঠাট, তখন আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল!

যাই হ'ক—ক্রমে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাঁর পূর্বপুরুষ সঙ্গীতধুরন্ধর ছুজ্জ খাঁর আমল থেকে আঠার ঠাট চলে এসেছে। ছুজ্জ খাঁ নিজে তৈরী করেছিলেন? অথবা, অন্যের নিকট পেয়েছিলেন?

খাঁ সাহেব বললেন—ছুজ্জ খাঁ সদারঙ্গজীর শিষ্য হয়েছিলেন। সদারঙ্গজীই ছুজ্জে খাঁকে ঠাট-বিদ্যা দান করেছিলেন। আসল কথা, তানসেন ইল্‌মদার লোক ছিলেন। তিনিই ঐ আঠার ঠাটের বন্দোবস্ত কায়েম করে দিয়েছিলেন। তানসেনের বেটা-বেটীর বংশে ঐ বিদ্যা চলে এসেছিল।

সদারঙ্গজী ও অন্য গুণীরা ঐ আঠার ঠাটের বিদ্যা দিয়ে ধ্রুবপদ, ধামার, খেয়াল ও আলাপ মাজা-ঘষা করেছেন। ইত্যাদি।

পরে, অনুমান ইং ১৯২০-২১ সালে "সঙ্গীত সুদর্শন" গ্রন্থের প্রণেতা (স্বর্গীয়) সুদর্শন শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলাপ ঘটেছিল কাশীধামে। এর পূর্বেই ঐ গ্রন্থখানি পড়েছিলাম। এমন বাস্তব ও শ্রুতি-স্মৃতির বিচিত্র জীবন-কথা আমি আর ত' পড়িনি! তবে, রচনার কঠিনতার কারণে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট মনে হয়েছিল। তাছাড়া, তিনি কিছু কথা যেন গোপন করেছেন কিছু বা আভাসে বলেছেন এমন সন্দেহও হয়েছিল। যথা—শাস্ত্রীজী তাঁর গ্রন্থে ঠাট প্রসঙ্গে দশটি ঠাটের হিসাব দিয়ে বলেছেন এই দশটি ঠাট "ইত্যাদি অনেক ঠাট"। শাস্ত্রীজী সাক্ষাৎ অমৃতসেনজীর শিষ্য। তিনি 'ইত্যাদি' বলে সংক্ষেপ করলেন? অথবা গোপন করলেন!

কাশীধামে গুরুদেব শ্যামলালজীর সাক্ষাতেই শাস্ত্রীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল; বারবার, অনেকদিন ধরে। শাস্ত্রীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম "ইত্যাদি অনেক ঠাট" বক্তব্যের তাৎপর্য কি?

শাস্ত্রীজী খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করলেন, "ইত্যাদি অনেক ঠাট" অর্থ—সর্বসাকল্যে আঠার ঠাট। তিনি কিছু কিছু ব্যাপার গোপন করেছেন সত্য। তবে, গোপন করার হেতুও আছে!

জিজ্ঞাসা করলাম—বিদ্যা গোপনের হেতু কি! বিশেষ সঙ্গীত-বিদ্যা ত বিষ-বিদ্যার মতো মারাত্মক কিছু নয়!

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—খুব সত্য। কিন্তু আমরা সেকালের দৃষ্টান্তে পালিত। সম্প্রদায় বিদ্যা গুরু দিতে পারেন শিষ্যকে, সতীর্থ লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থে প্রচার করলে—সম্প্রদায়-বিদ্যা অসাম্প্রদায়িক আধারে চলে গিয়ে বিড়ম্বনা করে। অসাম্প্রদায়িক জন সম্প্রদায় রহস্য বুঝতে পারে না, অর্থাৎ পুঁথিগত সংবাদ বুঝতে পারে না। ফলে, অনেক কিছু মনঃকল্পনা করে ফেলে। সেই কল্পনাগুলিই পরিণামে বিড়ম্বনা করে। তাছাড়া,—এমন প্রবঞ্চক লোকও দেখা যাচ্ছে, যারা সেনী ঘরাণার শিষ্য না হয়েও প্রচার করছে তারা সেনী ঘরাণার শিষ্য; অর্থের লোভে, যশের লোভে। সেরকম লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—সেনী ঘরে কত-সংখ্যার ঠাট আছে, তখন তারা মনগড়া জবাব দেয়! হয়ত' বলে দশ ঠাট, অথবা বার ঠাট! যাঁরা সেনী ঘরের শিষ্য তাঁরা তখনই বুঝে নেন—লোকটা ধাপ্পাবাজ। যাই হ'ক,—আপনি শ্যামলালজী ও বদল খাঁ সাহেবের শিষ্য। শেষবেশ, সেনী ঘরেরই শিষ্য, যা খবর রাখি। আপনি কীরকম খবর পেয়েছেন বলুন!

আমি যখন আঠারো ঠাট ও নামগুলি বললাম, তখন তিনি খুব খুশী হয়ে নিজ থেকেই আঠারোটি নাম উচ্চারণ করে গেলেন হিন্দীভাষার পদের ছন্দে! যাই হ'ক শাস্ত্রীজীর মনোভাবটি বুঝতে পারলাম। আরও বুঝলাম, ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের স্মৃতি-বিভ্রম হয়নি। ইং ১৯১৪ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত প্রায় একটানা সূত্রে ঐ প্রবীণ পুরুষের সঙ্গ-লাভ করার সৌভাগ্য ঘটেছিল। কখনও বা স্বেচ্ছায় কৃপা ক'রে, কখন বা প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে, তিনি আমার জিজ্ঞাসা-বাতিকে নাস্তিকের প্রায় সমস্ত দুশ্চিন্তাই নিরসন ক'রে দিয়েছিলেন।

গত তিনশ' বৎসরে সেনীঘরের গুণীরা রাগ-আলাপ করে এসেছেন, ধ্রুবপদ ও খেয়াল গান চর্চা করেছেন, যন্ত্র গৎও বাজিয়ে এসেছেন, অথচ,—সেনীঘরের বিশিষ্ট ঠাট ও তার রহস্য বাইরে প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় হয়নি একথা যতো বা সত্য, ততো বা আশ্চর্য! এর কারণ, প্রথমত, বিদ্যাকে নিজ ঘরের গোপনীয় সম্পত্তি মনে করে রক্ষা করা; দ্বিতীয় এবং আনুষঙ্গিক কারণ হ'ল, বিদ্যাটি কূটরূপেই রক্ষিত এবং—শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান বা জিজ্ঞাসার অভাব। যাই হ'ক, মাত্র একশ' কুড়ি বৎসর হ'ল,—সেনীঘরের অতিরিক্ত গুণী ও বিদ্বান সমালোচকেরা অভিনব দু' একরকম ঠাট তৈয়ারী করে পরীক্ষা ও ব্যবহার-সিদ্ধ করেছেন। খুব ভাল কথা। তবে এখন পর্যন্ত কিছু সমস্যা এঁরা মীমাংসা করতে পারেন নি, যার মধ্যে সকলের চেয়ে আশ্চর্য হ'ল,—ইমন রাগে শুদ্ধ মধ্যম নেই, কল্যাণ রাগেও শুদ্ধ মধ্যম নেই—অথচ ইমন-কল্যাণে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার করা প্রচলিত হয়ে আছে। তানসেনী ঠাট-পদ্ধতিতে এটা সমস্যাই নয়; যা বদল

খাঁ সাহেব ও শ্যামলালজী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

তুলনামূলক সমালোচনা সম্প্রতি উদ্দেশ্য নয়। মাত্র এই কথাই বলতে পারি—ইং ১৯১৪ থেকে এ পর্যন্ত কালের মধ্যে আমি যত কিছু প্রচারিত অপ্রচলিত ও সম্ভব রাগের হদিস ও হিসাব আলোচনা করে দেখেছি, তা সবগুলই তানসেনী আঠার ঠাটের কানুন-তালিমের মধ্যে বেঁধে ফেলা যায়। এর মধ্যে একটিমাত্র গোঁজা-মিল নেই; এটা-হয়—ওটা-হয় রকমের সংকল্প-বিকল্প নেই; এবং উদ্ভট অযুক্তি-সিদ্ধ কিছু মীমাংসাও নেই। সেই আঠার-ঠাটের পদ্ধতির মধ্যে অতি-ব্যাপ্তি দোষ নেই, কৃত্রিম অঙ্গ-বিভাগ নেই, সিদ্ধান্ত ও ব্যবহারে বিরোধ নেই।

সর্বপ্রথমে ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ সাহেব (সরোদবাদক) কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মাত্র ঠাট তৈরী করে দিয়েই তানসেন রাগ-বিদ্যা শেষ করে দেন নি; তিনি রাগের জান-মকান-ডৌল নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। পরে, বদল খাঁ সাহেবই ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ ও ব্যবহার-নিষ্পত্তি নিঃশেষে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এরও পরে, যখন ওস্তাদ ফিদাহুসেন খাঁ সাহেবের (রামপুর-কানবাজী সরোদশিল্পী) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনিও ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, মিয়াঁ তানসেনই এ সকল কানুন-তালিমের প্রথম ও শেষ প্রবর্তক, তখন আমার সকল সন্দেহ মিটে গিয়েছিল।

মাত্র ইতিহাসের দিক্‌দর্শনী লক্ষ্য করে বলা যায়—জান্-মকান্-ডৌল নামে পরিভাষা তানসেনের পূর্ব থেকেই ব্যবহারিকভাবে অর্থাৎ লোকায়ত মতে প্রচলিত ছিল; অন্তত ধ্রুবপদ ও বীণার শিল্পীদের মুখে মুখে। ঐ শব্দগুলি এবং আরও কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ দেখা দিয়েছিল ভারত-পারসিক সংস্কৃতি-সহযোগিতার কালে। অনুমান হয়, তানসেনই ঐ সকল শব্দ ও অর্থকে শিথিল ও অনিয়ত ব্যবহার থেকে উদ্ধার করে, দৃঢ় ও নিয়মিত প্রয়োগের অর্থাৎ রাগ-ব্যাকরণের অধিকারে প্রবর্তিত করেছিলেন। এরকম অনুমান ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

শিথিল ও অনিয়ত বিদ্যা-ভূমির মার্জনা-সংস্কার করে নিয়মনিষ্ঠ বিদ্যা-পদ্ধতি আবিষ্কার করার কার্য অসাধারণ বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির অপেক্ষা করে। "গণ-ভোট" দিয়ে এরকম কার্য সম্ভব নয়।

জান-মকান্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ-গুলির সর্বপ্রথম উদ্ভবের সময়ে "ঠাট্", (থাট্ নয়) শব্দটিও ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠাট্ অর্থাৎ স্বর-সন্দোহ বা স্বরের বিশিষ্ট বিন্যাস-ব্যবস্থা। বীণা বা সেতারের পর্দা (বা ঠাট) সরিয়ে নড়িয়ে রাগালাপের উপযোগী করাই ঠাট্ শব্দের আদিম অর্থ। কণ্ঠে সুরের উদ্ভব বা সজ্জা-প্রণালী চোখে দেখা যায় না; সুরের সজ্জাই নেই কণ্ঠে! কিন্তু বীণা বা সেতারে সুর-সজ্জা সর্বজন-প্রত্যক্ষ। অতএব—আমরা মনে করতে বাধ্য, ঠাট্ বা সুর-সজ্জার ধারণা যন্ত্রশিল্পীদের মস্তিষ্কেই প্রথম ও পরিষ্কারভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। বস্তুত, মহামুনি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে যাকে "চতুরশীতি (চোরাশি) মূর্চ্ছনা" অভিহিত করা হয়েছে 'ঠাট্' শব্দটি সেই মূর্চ্ছনাকেই সূচিত করে; কিন্তু অন্যরকমের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।

মিয়াঁ তানসেনের অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, দূরদৃষ্টিও ছিল। তাঁর ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবেই যদি রাগ, সেনী-ধ্রুবপদ ও আলাপ সম্বন্ধে মুগ্ধ-বোধ (ফুল-প্রুফ্) তালিম কানুন তৈরী করে গিয়ে থাকেন তাহলেও ত তাঁকে অদূরদর্শী বলা যায় না। ছেলেদের জন্য ভেবে কাজটা ভালই করেছিলেন। লোকে আম-কাঠালের চারা লাগায় পরে ভাল ফল দেবে মনে করে'। এই হ'ল সাধারণ দূরদৃষ্টি। কিন্তু আম-কাঠালের বড় গাছ ফলের অতিরিক্ত ছায়াও সৃষ্টি করে; ছায়ারও ভাল-মন্দ আছে। বিচক্ষণ লোকে ফলের অতিরিক্ত ছায়ার ভাল-মন্দ দিকটা ভেবে গাছের চারা লাগায়। তানসেন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি-প্রসূত কর্মপদ্ধতি ছেলেদের জন্য ফল প্রসব করে এসেছে; অধিকন্তু—উত্তর ভারতের অসংখ্য রাগ-প্রিয় শ্রোতাদের ও শিক্ষার্থীদের জন্য ছায়াও সৃষ্টি করেছে। ছেলেদের কথা ভেবে তানসেন নিশ্চয়ই জানতেন—প্রতিভা জন্মায় শতের কোঠায় একটি; আর সাধারণের জন্ম হয় একের কোঠায় তিনটি করে। এই একের কোঠায় তিন-তিনটি করে বেঁচে থাকলে তবে তিন-চার পুরুষে হয়ত একটি প্রতিভা জন্মাবে। সুতরাং এই তিন-তিনটি করে সাধারণের জন্য ব্যবস্থাই কাম্য; প্রতিভা বা অসাধারণের জন্য আমানতী ব্যবস্থা

পিছনের কোনও বন্ধন আপনাকে টানছে না, এই যা।

মৃদুস্বরে অরুণা বললে, একথা অবিশ্যি সত্যিই বলেছেন। এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে যে আমার খুব আপত্তি আছে তা নয়, তবে থাকাটা বড় অস্বাভাবিক। এইতেই আমার অস্বস্তি।

সামন্ত অতিশয় উৎসাহিত হলেন, কিন্তু তিনি সচতুর ব্যক্তি, কণ্ঠস্বরে সংযম হারালেন না। বললেন, এটাকে স্বাভাবিক করে নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব, অরুণা দেবী?

ফস করে অরুণা প্রশ্ন করলে, কেমন করে?

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ডাক্তার সামন্ত। বললেন, আপনার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত ঘটলে কি না সম্ভব বলুন?

শান্তকণ্ঠে অরুণা বললে, একদিকে অভিরুচি নেই, অন্যদিকে অধিকার নেই—স্থায়ীভাবে থাকাটার কথা কেমন করে ওঠে?

আলোচনাটা ভিন্নগতি নিচ্ছে;—ডাক্তার

ঈষৎ সতর্ক হলেন। পরে বললেন, গৌতম বুদ্ধের দরুণ সেই গল্পটা আপনার মনে আছে নিশ্চয়। ব্যাধের তীরে হাঁস আহত হয়ে গৌতমের কোলে এসে পড়ল। তিনি সেবা করে হাঁসটাকে বাঁচালেন। বাঁচালেন বলেই হাঁসের ওপর তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রইল। আপনিও এখানে সেই অধিকার নিন্? আপনার জন্যে এরা নতুন জীবন লাভ করেছে, এইটিই কি আপনার স্বাভাবিক অধিকার নয়?

অরুণা চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। সামন্তর কথাগুলোই হয়ত মনে মনে একবারটি ওজন করে নিল। পরে বললে, দিদির খবর পেয়ে ভারি দুঃখিত হলুম। দুদিন ধরে ওঁকে দেখতে না পেয়ে আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু এইভাবে এই পরিবার কতকাল ধরে যে চলবে, কে জানে। মাঝ থেকে কিন্তু আমি পড়লুম বিপদে। এক পা যখন তোলবার চেষ্টা পাচ্ছি আরেক পা তখন গভীর কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। এর থেকে ছুটি পাওয়াও কঠিন, ছুটি চাওয়াও কঠিন।

একথা একশ'বার—ডাক্তার বললেন, সমস্তটার মধ্যে আনন্দ পাওয়া দরকার, আনন্দই সবটাকে সুন্দর করে তোলে। নৈলে সবটাই বিরক্তি। কর্তব্যই বলুন, দায়িত্বই বলুন—ওসব বাজে। আপনি কলের পুতুল নন্ এইটিই প্রধান কথা। আর কিছু নয়, এই বিরাট বাগানবাড়ির সবখানে আপনার জন্যে যদি সব সময় আনন্দের আয়োজন থাকে, তবেই হয়ত আপনার মন ভাল থাকতে পারে। অসুবিধার কথা এই, এ পরিবারকে সবাই চেনে, সকলেই শ্রদ্ধা করে। এ'দের তিনশ' বছরের আভিজাত্য আজও একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাই ভয় করে। নৈলে বাইরে থেকে অনেক লোক এ বাড়িতে আনা যেত, আনন্দের হাট বসে যেত। কিন্তু নানাবিধ রটনার ভয়ে সেটি হবার উপায় নেই। আপনি যদি থাকেন এবং এ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেন, তবে আপনার হাত দিয়েই হয়ত ভবিষ্যতে এর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

অরুণা চুপ করে কথাগুলো কান পেতে শুনছিল। এই বিশাল অট্টালিকা, এর বিশালতর বাগান-বাগিচা, এর বিভিন্ন বিচিত্র মহল, এর ধনদৌলত, জড়োয়া-জহরৎ—চারিদিক থেকে তার দিকে যেন সাদর অভ্যর্থনার শত সহস্র বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে ফাঁকি অথবা কুটিলতা নেই, এর মধ্যে এমন কিছু নেই যেটা শেষ অবধি কোনও ভয়ানক চক্রান্তের দ্বারা তার টুঁটি টিপে ধরবে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভবিষ্যতে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি তার হাত দিয়ে বিস্তারলাভ করবে, তারই দ্বারা এ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির ওপর সর্বাংগীণ নিয়ন্ত্রণাধিকার তারই কাছে এসে পৌঁছবে। এর মধ্যে লোভ জড়ানো আছে অনেক, কিন্তু সৌভাগ্য তার চেয়েও বেশি। এ বাড়িতে ভবিষ্যৎকালের জন্য শিশু একটিও নেই, ক্রমবর্ধমান শক্তিও কোথাও মাথা তুলছে না, স্ত্রীলোকের সংখ্যা একমাত্র নিঃসন্তান হৈমবতী ছাড়া আর কেউ নেই। পুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুব্রত, এবং এবাড়ির পুরুষ মাত্রই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীক্। এ ব্যাধি কবেকার, কেউ জানে না। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, চার-পাঁচ পুরুষ, কিন্তু তারও কতকাল আগে কোন্ পুরুষের রক্তধারার ভিতর দিয়ে এই ব্যাধি চলে এসেছে, কারো জানা নেই। হৈমবতী এবাড়িতে এসেছিলেন এক গরীব অচেনা পরিবার থেকে, অসামান্য রূপের জন্যই তাঁকে আনা হয়। কিন্তু এ বাড়ির পুরুষের স্পর্শের থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ বিষ নাকি তাঁর রক্তেও সঞ্চালিত হয়ে যায়!

আচ্ছা, ডাক্তারবাবু—অরুণা ঢোক গিলে প্রশ্ন করল, এবাড়ির কর্তা গিন্নি বড়ছেলে—যাঁরা বছরের পর বছর ধরে ঘরে বন্ধ রয়েছেন, তাঁদের সেরে ওঠবার কি কোনও আশা নেই

ডাক্তার জবাব দিলেন, না। তবে কম আর বেশি—এইমাত্র।

আপনি ওদের কী চিকিৎসা করেন?

করিনে ত! আমি কেবল আগলাই ওদের—এ ছাড়া কিছু নয়। কথাটা কি জানেন, মেরে ফেলা যায় না! আইনে আটকায়। গারদে পাঠাইনে, কারণ নিজের বাড়িতে থাকাই ওদের পক্ষে সম্মান। আরেকটা অসুবিধে, পাগলদের মৃত্যু হয় না সহজে, ওদের পরমায়ু অনির্দিষ্ট। বুড়োর বয়স তিয়াত্তর, বুড়ির প্রায় সত্তর—দেখে মনে হচ্ছে ওরা এখনও জ্বালাবে অনেককাল!

অরুণা বললে, আপনার কাজ কি তবে ওদের মৃত্যুর দিন গোনা?

না—সামন্ত বললেন, আমি আছি হৈমবতী আর সুব্রতর জন্যে। হৈমবতীর রক্তের থেকে বীজ সরাতে চাইছি, চেষ্টাও করছি অনেকদিন ধরে, পারব কিনা জানিনে। কিন্তু আশা করছি সুব্রতর ব্যাপারটায়। জানেন ত, মানুষের দেহের ভিতরটা হল অরণ্যের মত। হাজার হাজার শিরা উপশিরার জটাজটিলতা, ডাক্তারেরা তার মধ্যে পথ হারায়। আগাগোড়া রহস্য, কোনটার গভীর সন্ধান কারও জানা নেই। কোন্‌টার শেকড় কার সংগে অতলতলে গিয়ে মেলানো আছে আমরা কতটুকু জানি? ওষুধ দিই আমরা আন্দাজে, যদি লেগে যায়। সুব্রতর এতটা উন্নতি হয়েছে কেমন করে, কিছুই আমি জানতে পারিনি। হৈমবতী হঠাৎ কেন কাপড় ফেলে দৌড় দেন্ তাও আমার অজ্ঞাত। দূষিত রক্ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বংশ পরম্পরায় মস্তিষ্কের বিকার কেন চলে

আসছে—এটি দুর্বোধ্য। অনেকে এর নির্ভুল বিশ্লেষণ করে দেয়, হুবহু অঙ্ক মিলিয়ে দেয়—কিন্তু সারিয়ে তোলবার মন্ত্রটা কারো জানা নেই। ওটা সম্পূর্ণ মানুষের হাতের বাইরে রয়েছে আজও। তবে একজন ডাক্তার সেদিন বলছিলেন, আণবিক শক্তি ভবিষ্যতে দুটো জিনিস আনতে পারে। একটি হল, মানুষের পরমায়ু বাড়িয়ে দেওয়া; অন্যটি সর্বপ্রকার ব্যাধিকে রক্ত ও মজ্জা থেকে সরিয়ে দেওয়া। পাগল নাকি আর দুনিয়ায় থাকবে না। সে যাই হোক, আমার সমস্ত আশা এখন সুব্রতর ওপর। ছেলেটা কেবল সহজ আর অ-সহজের সীমারেখায় পা ফেলে চলছে। দাগে-দাগে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু উৎপাত বেড়েছে এই, জ্ঞানে-অজ্ঞানে জটিল-ভাবে মেলানো। ওর মস্তিষ্ক থেকে হঠাৎ ঢেউ ওঠে, কিন্তু বিচার-বিবেচনার সঙ্গে তার কতটুকু যোগ—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। যেটা চাইছে, সেটা কি সত্যিই চাওয়া? যেটা বলছে সেটা ঠিক কি ওর বক্তব্য? যেটা করছে, সেটা কি ইচ্ছে থেকেই করছে? সমস্ত গতিবিধি আর কাজের সঙ্গে ওর মনের কতটুকু যোগাযোগ ঘটছে, কে বলতে পারে?

অরুণা জিজ্ঞাসা করল, এমন কতকাল চলবে?

কে জানে! সামন্ত বললেন, দেখা যাচ্ছে অনির্দিষ্টকাল! এরকম লক্ষণ ওদেরও এক-দিন ছিল, ওদের দেখেও একদিন ডাক্তাররা আশা করত। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন সে-আশা সার্থক হয়নি। এই বংশ ছিল একদিন বিরাট বনস্পতির মতন। এরা নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়ান। বড় বড় দার্শনিক, কবি মনীষী, সমাজপতি, লোকশিক্ষক—এদের বংশে জন্মেছিল, যাদের প্রতিভার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু এই শাখাটা বেঁকেচুরে কেমন করে যেন শুকিয়ে গেল। আজ ঈশ্বরের আশীর্বাদে যদি সুব্রত মাথা তুলে সুস্থ হয়ে ওঠে, তবেই সব দিক বাঁচে। আর কিছু নয়, ওকে শুধু স্নেহে লালন করা, ভালবাসা দিয়ে শাসন করা, ওর আনন্দে নিজেকে মেলানো, ওর খেয়াল-খুশির সঙ্গে নিজেকে জড়ানো। সুব্রত হল কবি, শিল্পী, বিলেতে গিয়ে বছর পাঁচেক লেখাপড়াও করেছে, ভদ্র সংযত ছেলে, একটু অভিমানী, অত্যন্ত পরোপকারী, চমৎকার স্বাস্থ্যশ্রী,—কিন্তু দেখা যাচ্ছে কালসাপে ওকেও ছোবল মেরেছে! সুব্রত আজ সব চেয়ে বেশি আপনার বাধ্য, কেন জানেন? আপনার কাছে ও বেশি করে নিজেকে জানিয়েছে এবং আপনি সব চেয়ে বেশি করে ওকে চিনতে পেরেছেন, এই ধারণা থেকেই ওর আনন্দের জন্ম হয়েছে। ও যদি মানুষের মতন হয়ে বাঁচে, আপনার জন্যেই বাঁচবে। —কে?

ডাক্তার সহসা যেন চমকে উঠলেন। পর্দার একটুখানি ফাঁক দিয়ে একটি জলজলে বড় চোখ এতক্ষণ যেন দপদপ করছিল।

কে?—অরুণা এগিয়ে এসে পর্দা সরাল। সুব্রত হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তোমার সম্বন্ধে এখানে কঠোর সমালোচনা হচ্ছিল, সুব্রত।

সুব্রত বললে, বিশ্বাস করিনে। আচ্ছা, অরুণা দেবী, ডাক্তারবাবুর সুখ্যাতিতে আপনিও কি বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার বললেন, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না ভেতরে আসবে?

অনুমতি না পেলে ভিতরে ঢুকব কেন?

অরুণা হাসল। বললে, এসো ভেতরে।

সুব্রত ভিতরে এসে একখানা লাল মখমল মোড়া আরাম-কেদারায় বসল। অরুণা বললে, সুখ্যাতি শুনেছিলে আড়াল থেকে, এবার যদি সামনে বসে নিন্দে শোন? মাথা বিগড়ে যাবে?

সুব্রত হাসল। তার নধর আয়ত চোখে যৌবনের সজীবতা যেন ঝলমল করছে। রেশমী পাঞ্জাবিটির ওপর আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তারই আভা পড়ছে তার নরম ঝাঁপা-ঝাঁপা চুলের গোছায় গোছায়। দীর্ঘ তার দেহ একহারা, কিন্তু সেই দেহের এমন সঠাম সামঞ্জস্য কচিৎ চোখে পড়ে। ওষ্ঠা-ধরের তারুণ্য ভাবটি আজও তার রক্তিমাভা হারায়নি। সুব্রতের মিষ্ট হাসির ভিতর দিয়ে মুক্তাবিনিন্দিত দাঁতগুলি দেখলে যে কোন সাধারণ মেয়ের হৃৎপিণ্ডে কাঁপন ধরে যেত।

ডাক্তার বললেন, এ কি কথা সুব্রত, তুমি অরুণা দেবীকে সকলের সামনে বলবে আপনি, আর আড়ালে গিয়ে নাম ধরে ডাকবে, এ কেমন হল?

সুব্রত বললে, বাঃ এই ত দরকার! সকলের সামনে ও'কে শ্রদ্ধা না জানালে আমি যে ছোট হয়ে যাব! আড়ালে ডাকব নাম ধরে, সেই আমাদের নিজস্ব জগৎ।

অরুণা হাসিমুখে দুজনকে লক্ষ্য কর-ছিল। সামন্ত এবার একটু উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, তোমাদের নিজস্ব জগৎ সম্বন্ধে আরেকটু বিস্তৃত বর্ণনা করত' ভাই?

অরুণা বললে, আপনি বুঝি ওকে এবার সামনে বসিয়ে আজেবাজে কতকগুলো কথা বলাবেন?

ডাক্তার বললেন, না, তা নয় অরুণাদেবী। কবির কথার হয়ত দাম কম। কিন্তু তার সকল কথাই যে সুন্দর! কবি যে নিরঙ্কুশ! তুমি বলে' যাও সুব্রত, আমার দিকে ছাড়া আর কোনদিকে তাকিয়ো না!

সুব্রত আর অরুণা দুজনেই হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে সুব্রত বললে, সেদিন আমার কাব্য বর্ণনার ফলে কি অঘটন ঘটে যেত তা জানেন?

কি রকম? কি ব্যাপার?—উৎসুক হয়ে উঠলেন সামন্ত।

আপনি ত সেদিন বৌদিকে নিয়ে ব্যস্ত, আর আমি ব্যস্ত অরুণা দেবীকে নিয়ে!

তুমি কি প্রকার ব্যস্ত?

সুব্রত বললে, ও'কে আমি মনের মতন করে গড়ে তুলব, এই নিয়ে ব্যস্ত?

ডাক্তার বললেন, উনি কি একতাল কাদা-মাটি যে, তুমি ও'কে গড়বে?

বাঃ আমার মনের সঙ্গে মেলাব না ও'কে? —আমার কল্পনার সঙ্গে না মেলাতে পারলে ও'কে জানব কেমন করে?

ও, হ্যাঁ, তা কথাটা ঠিকই বটে। ডাক্তার বললেন, তারপর? অঘটনটা কি প্রকার ঘটত সেদিন শুনি?

সুব্রত কৌতুকবশে তাকাল অরুণার দিকে, কিন্তু সহসা তার মনে হল, অরুণা যেন হারিয়ে গেছে এঘর থেকে, কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোনও কথা তার কানে উঠছে না। সুব্রত মুখ ফিরিয়ে শান্ত কণ্ঠে এবার বললে, উনি সেদিন হঠাৎ বাগান পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন ফটকের দিকে—বেরিয়ে যাবার পথ সেদিন উনি খুঁজে পেয়েছিলেন।

অরুণা এবার মুখ ফেরাল। হেসে বললে, ঘটনাটা সত্যি, না এটা তোমার আন্দাজ, সুব্রত?

আন্দাজও বলতে পারেন।—সুব্রত বললে, তবে ভারি মজা সেদিন দেখাল আমাদের কাকাতুয়াটা! এমন ডাক হঠাৎ ডাকতে লাগল যে, উনি আবার ছুটতে ছুটতে ফিরলেন ফুলবাগানের দিকে।

ডাক্তারের কপালের রেখায় এবার যেন চিন্তার ছায়া দেখা দিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আর নয় ভাই, এবার আমি উঠি। হ্যাঁ, যা বলতে এসেছিলুম অরুণা দেবী, আপনার সেই চাকরটির খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আপনি যদি আর কোনও ঠিকানা দেন, আবার খোঁজ করতে বলব। আচ্ছা, দেশের বাড়িতে সে চলে যায়নি ত?

অরুণা জবাব দিল, না।

সে আপনি কেমন করে বুঝলেন?

আমাকে না বলে সে কলকাতা ছেড়ে যাবে না।

ডাক্তার বললেন, তবে কি কোথাও গিয়ে সিধু অসুস্থ হয়ে পড়েছে?

অসুস্থ!—ঢোক গিলে অরুণা বললে, না, তার অসুখ কখনো করে না! অসুখ হলে আমারই কাছে সে ফিরে আসত। কিন্তু আমার কাছে আর কোনও ঠিকানা নেই।

ডাক্তার বললেন, হুঁ। আমার মনে হয় আপনার ভাববার কিছু নেই। নিশ্চয় একদিন সে ফিরে আসবে।

অরুণা মলিন হাসা করে বললে, নিজের থেকে সে আর ফিরবে না, ডাক্তারবাবু। ফিরবার ইচ্ছে থাকলে নিজের পুরনো জামা-কাপড় আর ছেঁড়া জুতো পরে সে যেত না।

হ্যাঁ, তা বটে। —আচ্ছা, আমি দেখি আর একবার। ঘাড় নাড়তে নাড়তে ডাক্তার সামন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং সুব্রতও উঠে সে-রাত্রের মতো অরুণাকে নমস্কার জানিয়ে ডাক্তারের অনুসরণ করল।

অনেকদূর গিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সামন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে গিয়ে থমকে একবার তিনি দাঁড়ালেন। বললেন, এতদিন পরে আজ অরুণার সঙ্গে কথা বলে সত্যিই উৎসাহ পেলুম। তুমি আর তোমার বৌদি যে ও'কে এ বাড়িতে এনে বসাবার চেষ্টা পেয়েছ, সে-চেষ্টা তোমাদের সার্থক হয়েছে।

সুব্রত বললে, ডাক্তারবাবু, আপনি কি ভাবছেন উনি এখানে থেকে যেতে রাজি হবেন?

নিশ্চয়ই। তার একটা বড় প্রমাণ এই—যা এর আগেও কয়েকবার হয়েছে—উনি ঘুমের ওষুধ খেতে আরম্ভ করেছেন। এই জিনিসই তোমার বৌদি খেয়ে পড়ে থাকেন ডাক্তার আবার পা বাড়িয়ে নামছিলেন কিন্তু থামলেন। পুনরায় বললেন, তুমি যদি একটু সতর্ক হয়ে চল, উনি সুস্থ থাকবেন কিন্তু মুশকিল কি জান, ও'র বোধ হয় কো

একটা কাহিনী আছে পিছনে, যেটাকে তোমরা বল পাস্ট, সেটা ও'র মন থেকে এখনও সরেনি। সে যাই হোক, তোমাকে সতর্ক করছি; কেননা তুমি ত জান, কতগুলো দুর্ঘটনা এ বাড়িতে ঘটে গেছে! গভর্নমেণ্ট এই ফ্যামিলিকে খুবই শ্রদ্ধা করে, তা নইলে পুলিসের হাতে অনেক বেগ পেতে হত। আর কিছু না হোক, এমন ভদ্র আর গম্ভীর প্রকৃতি শিক্ষিত মেয়ে এ বাড়িতে কোনদিন আসেনি। উনি যদি তোমাদের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন, তবে তোমাদের সৌভাগ্য।

এসব গুরুগম্ভীর আলোচনা সুব্রতর কাছে বোধ্য নয়। হয়ত বা এসব ব্যাপার তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও হচ্ছে না। পিছনে পিছনে এসেছে সে অন্য কাজে। এবার সবিনয়ে বললে, ডাক্তারবাবু, শুনুন—

মুখ ফিরালেন সামন্ত। সুব্রত বললে, গ্রেট ইস্টানের্র পার্টিতে যে নেমন্তন্ন এসেছে, সেটা কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন?

কেমন করে করব? তোমার বৌদি যে আবার বন্ধ হলেন? তোমার কি ইচ্ছে?

সুব্রত বললে, আমার খুব ইচ্ছে যে যাই।

কেন?

অরুণা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। বাইরে যাইনি অনেকদিন।

সামন্ত কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন,

বাইরে গেলে সেবারের মতন যদি তোমার শরীর খারাপ হয়?

সুব্রত বললে, আমি ত এখন বেশ ভাল আছি, ডাক্তারবাবু?

অরুণা দেবী কোন্ পরিচয় নিয়ে যাবেন সেখানে?

সগৌরবে সুব্রত বললে, আমাদের পরিবারে উনি সকলের চেয়ে উঁচু আসনে জায়গা পেয়েছেন, এই পরিচয়ে?

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু সম্পর্কটা? সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কৌতূহলটা?

সুব্রত চুপ করে গেল। ডাক্তার নেমে যাবার সময় বললেন, আচ্ছা দেখি, দু-চার দিন এখনও সময় আছে। তোমার বৌদির লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, শিগগিরই তাঁকে বার করতে পারব। ওঁকে সঙ্গে না নিলে তোমাদের ফ্যামিলির সম্বন্ধে নানা কথা রটবে!

—

রঙহীন কাঠের পুতুলটিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ঠিক সামনে। বাইরে থেকে আলো এসে পড়েছে পুতুলটির ওপর—বর্ণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ওটা মেয়ে-পুতুল। ওর চক্ষুতারকা নড়ে না, নিঃশ্বাসও পড়ে না।

সেই অতি নিভৃত স্টুডিয়োর ঘরটিতে বসে সুব্রত ছবি আঁকার কাজে তন্ময় হয়েছিল। মোহিনী এক নারীর সহাস্থিতির সঙ্গে পুরুষের মনে যে মাদকতার আবেশ জড়িয়ে যায়, সুব্রতর স্তব্ধ মনোযোগের মধ্যে তার কিছুমাত্র আভাস নেই। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অরুণা চুপ করে বসেছিল। উভয়ের মাঝখানে যেন নিঃসীম মহাশূন্যলোক, একটি গ্রহ থেকে অন্যটির হয়তবা কোটি কোটি মাইল ব্যবধান।

মুখ ফিরাল সুব্রত একবার, তারপর পুনরায় কাগজের উপর মনোনিবেশ করল। সমস্যার জটিলতা এই, সুব্রতর মস্তিষ্কের কতখানি অংশ সুস্থ, কতটুকু আলো-আঁধারে মিলানো! ভয় এই, তার ক্ষণমার্জ, ক্ষণ-চটুলতা। ভরসা এই, সে স্বভাব সংযত। বিড়ম্বনা এই, বাধা সে মানে না। আনন্দ এই, তার শ্রদ্ধা ও আরাধনা অকৃপণ।

কথা বললে আগে অরুণা,—বার বার ছবি এঁকে তোমার কি লাভ হচ্ছে, সুব্রত?

লাভ! চেয়ার ছেড়ে উঠল সুব্রত, হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, না না, আঁচল টেনে না, ঢাকা দিয়ো না হাতে, ছবির সর্বনাশ হয়ে যাবে! ভাগ্যের আশীর্বাদ এনেছ তুমি, তোমার আশ্চর্য যৌবন আমার জীবনে অক্ষয় হোক, মহাশ্বেতা!

হাসি পেয়ে গেল অরুণার,—এ নাম আবার মাথায় এল কেন?

তুমি বিদ্যা, তাই নির্মল তুমি!—হ্যাঁ, লাভ,—লাভ আছে বৈকি। ছবি তোমার অনন্ত যৌবনের প্রতিফলন, সত্তার ব্যঞ্জনা,—আর আমার আনন্দের অভিব্যক্তি।

স্বাস্থ্যশ্রীর সঙ্গে প্রাণের উত্তাপে সুব্রত ঝলমল করছিল। ভাবনার কথা এই, সুব্রতর একটি গালের উপর অংশে রংয়ের ছোপ দেখা যাচ্ছিল। ওটা দেখলে অস্বস্তি বোধ হয়। অরুণা সেইদিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা সুব্রত, অন্য কেউ থাকলে কই তোমার মুখে এত কথা ফোটে না ত?

সুব্রত বললে, সেখানে যে অন্যের চক্ষু জেগে থাকে। তৃতীয় মানুষ মানেই ত সমাজ! তোমার জীবনে তুমি ত সমাজকে স্বীকার করনি! আর আমি? মানুষ কাছে এলে পাখী আর ডাকে না, জান ত?

কাছে এল সুব্রত, খুবই কাছে এল। দুই হাত বাড়িয়ে অরুণার মাথাটি একটু বাঁকালো, চোখ ফিরিয়ে দিল বিশেষ একদিকে।

ও কি হচ্ছে, সুব্রত? জলজ্যান্ত মানুষটাকে নিয়ে তুমি বড্ড বেশি পুতুলখেলা করছ!—অরুণা একটু অভিযোগ জানাল।

হাঁ, এবার ঠিক হয়েছে!—সুব্রত গিয়ে আবার নিজের জায়গায় বসল। তারপর কিছুক্ষণ পরে অরুণার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দের হাসি হাসল। বললে, শুনতে পাচ্ছ কি বলছি?

অরুণা মুখ ফিরাল। ভ্রূভঙ্গিতে তার বিরক্তি প্রকাশ পেল এবার। সুব্রত বললে, শোন মহাশ্বেতা, গঙ্গাজল স্পর্শ করলে পুণ্য, কিন্তু সেই ছোঁয়ায় গঙ্গা কি অপবিত্র হয়?

এবার আমি উঠি সুব্রত!

কিন্তু অরুণার আগেই সুব্রত উঠে দাঁড়াল। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললে, শোন—রক্ত পড়ছে ঝরঝরিয়ে! উঠে যাবে তুমি?

সবিস্ময়ে অরুণা বললে, রক্ত! কোথায়?

রক্ত ঝরছে আমার বুকের মধ্যে। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলেছি তোমার জন্যে। সেই রক্ত অঞ্জলি ভরে দেব তোমার পায়ে,—সেই আমার কবিতা! আরেকটু বসো।

নিরুপায় অরুণা আবার বসে রইল। কিছুই করবার নেই। ছেলেটা সহজ থাকলে ঝগড়া করা যেত, ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে চলে যাওয়া চলত। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনা এখানে বাধ্য হয়ে চেপে রাখতে হচ্ছে। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা পরে সুব্রত আবার মুখ তুলল। চাহনিটা যেন তার নির্বিকার। এবার শান্ত কণ্ঠে সে বললে, জান মহাশ্বেতা, একটু রং বুলিয়ে দেব মেঘে, একটু গন্ধ এনে দেব একটি ফুলে, একটু হাসি মিশিয়ে দেব দুঃখের জীবনে!

অরুণা তার দিকে তাকাল।

সুব্রত বললে, মানহারা মানুষ কাঁদছে কোথায় শুনতে পাও? বুক ভাঙলো কোথায় ভালবাসায় জানতে চাও? আছে কি কোন জীবন যেটা পরিপূর্ণ শতদল? দেখেছ কোথাও একটি মানুষকে, একটিমাত্র লক্ষ্যের জন্যে তিলে তিলে প্রাণ দিচ্ছে?

মহৎ হৃদয়ের বীভৎস পরিণাম দেখেছ দাঁড়িয়ে? বেদনার আগুনে হাসিমুখে জ্বলে পুড়ে মরছে, দেখেছ তেমন মানুষকে, অরুণা?

অরুণার চোখ দুটো কেঁপে উঠল। মৃদু গলায় সে বললে, কার কথা বলছ সুব্রত? আমি কি চিনি তাকে?

সুব্রত বললে, কোন একজনের কথা নয়, অরুণা,—এ অনেকের কথা। আমার অসুবিধে কি জান, আমি গুছিয়ে বলতে পারিনে। এসব কথা, সাধারণ মানুষের, যারা অজানা, মূল্য যারা কোথাও পায় না। যাদের জন্যে কাঁদবার কেউ নেই!

অরুণা এবার চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। বললে, তুমি ত' আঁকছিলে ছবি, হঠাৎ কাব্যের কথা এনে ফেললে কেন?

ছবি!—সুব্রত বললে, ছবি আমি আঁকিনি অনেকদিন। এই দ্যাখো!—এই ব'লে একখানা কাগজ সে তুলে ধরল—তাতে সুন্দর হাতের অক্ষরে কবিতা লেখা—ঘটির ওপর ছবি আঁকা হচ্ছে বলে এতক্ষণ অরুণার ধারণা ছিল।

অরুণা এবার বললে, ছবি আঁকনি, তাহলে এতক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে কী দেখছিলে?

কবিতা!—হাসিমুখে সুব্রত বললে, তোমার বসার ভঙ্গিতে কাব্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। পেলব বাহুর নাড়ায় পেয়ে গেলুম ছন্দ। ওই তোমার সর্বনাশা যৌবনের মধ্যে পেয়ে গেলুম বেদনার আভাস। দুঃখের নিবিড় ছায়াটুকু দেখতে পেলুম তোমার কপোলে। আমার ভাষা স্ফুরিত হল তোমার ওই টসটসে রাঙা ঠোঁটে। কবিতা আমার সার্থক হল, মহাশ্বেতা! তোমার সুন্দর ওই দেহের স্তবকে-স্তবকে এক একটি রক্তাক্ত কবিতা ক্ষণে ক্ষণে যে মাথা কুটছে! উঠ

দাঁড়াও, চেয়ে দেখ তুমি আপন সর্বাঙ্গে। কণ্ঠমূলে, গ্রীবায়, বাহুতে, কটিমেখলায়, শ্রোণীতটে, জঙ্ঘায়, নাভিলোকে, বক্ষের স্বর্ণঘটে—বাণীর বিহ্বলতা সর্বত্র মূর্ছিত রয়েছে মধুমক্ষিকার মতো। তুমি সংস্কৃত কাব্যের বিদুষী,—তুমি জান, অরুণা—তোমার পায়ের শব্দে আমার বুকের মধ্যে কত শত গোলাপের কুঁড়ি ফুটেছে!

সুব্রতর দুই চোখে জল নেমে এল। অরুণা লক্ষ করে দেখল, তার দুই গালে এবার ঘন রংয়ের ছোপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কপালের চুলের ভিতর দিয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে এসেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এরকম অবস্থা আর কয়েক মিনিট চলতে থাকলে তাকে আয়ত্তে রাখা কঠিন হবে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, ব্যাধির লক্ষণগুলি বিশেষ প্রকট হয়েছে।

অরুণা উঠে পড়ল। বললে, কবি, ভারি চমৎকার কাটল সকালটা। কিন্তু আর নয়, চলো এবার বাগানে বেরিয়ে পড়ি। দেখতে পাচ্ছ, পূর্বদিকে আবার বোধ হয় মেঘ করে এল। এসো—

চল।

অরুণা আগেভাগে গিয়ে দরজা খুলে বেরল। এসে দাঁড়াল সেই বৃহৎ শ্বেতমর্মরময় কক্ষে। পাথরের মূর্তিগুলি তেমনি আনম্র দাঁড়িয়ে। চারিদিকের বহুমূল্য আসবাবের থেকে বর্ণচ্ছটা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। পায়ের নীচে পালিশ করা পাথরের মেঝেতে আপন দেহ মুকুরের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে। হেঁট হয়ে তাকালে লজ্জায় গায়ে কাঁটা দেয়।



দুজনে বেরিয়ে এল বাগানে মধুর হাওয়ায়। মধ্যাহ্নের কিছু বিলম্ব রয়েছে। প্রাসাদচূড়ার উপরে মেঘ ঘনিয়েছে, অন্যদিকে উদার নীলকান্ত আকাশ রৌদ্রদীপ্ত। ওরা দুজনে চলল বাগান পেরিয়ে দীঘির ধার দিয়ে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়—যেমন ওরা নিত্যদিন ঘুরে বেড়ায়। সুব্রতর ব্যাধির পক্ষে এটা নাকি কাজে লাগে।

বনবাগানের ভিতর দিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ওরা হাঁটল। বাইরের হাওয়ায় এলে সুব্রত অনেকটা জুড়িয়ে যায়। লোকসমাজে এসে পৌঁছলে সে যেন কুমারীসুলভ সলজ্জ কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়। তখন ওর হাসিটি যেন লাজুক, কথাগুলি নম্র এবং প্রত্যেকটি আচরণে সৌজন্য প্রকাশ পায়। ওকে নিয়ে কৌতুক পরিহাস করলে কেবল মধুর স্নিগ্ধ হাস্যে তার জবাব দেয়।

মধ্যাহ্ন সমাগত। অরুণা বললে, অনেক হয়েছে, আর নয় সুব্রত, চল এবার ফিরি। হাওয়া লেগে মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, না আরও কাব্য করবে?

হাসিমুখে সুব্রত বললে, আর না, চল।

ডাক্তার সামন্তকে দেখা গেল। তিনি এক মহল থেকে বেরিয়ে অন্য মহলে যাচ্ছিলেন। দুজনকে অদূরে দেখে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালেন। সহাস্যে বললেন, একটা সুসংবাদ দিয়ে যাই। বৌদিদিকে খুলে দেওয়া হয়েছে।

অরুণা উল্লসিত হয়ে বললে, হয়েছে? বাঁচলুম! ভারি আনন্দ হচ্ছে শুনে।

সামন্ত বললেন, এবার উনি এত তাড়াতাড়ি বেরোবেন ভাবিনি। তবু আপনাকে বলি, ডাক্তারের হাতে কিছু নেই! সমস্তটা আগাগোড়া অন্ধকার! আমি শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি।

উৎসাহিত হয়ে সুব্রত বললে, তাহলে এবার গ্রেট্ ইস্টার্নের পার্টির নেমন্তন্নটা আমরা নিতে পারি ত?

হাঁ, তা অবিশ্যি পারা যায়, বৌদিদিকেও নিয়ে যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু এসব পার্টিতে যাবার উৎসাহ আমার নিজের বিশেষ নেই ভাই। তবে তুমি এবাড়ির কর্তা, তোমার অনুরোধ মানব বৈকি। আপনার অভিমত কি, অরুণা দেবী?

অরুণা হাসল। বললে, বাড়ির কর্তার কোন ইচ্ছায় বাধা দেব, এ ত' আপনি আমাকে শিখিয়ে দেননি?

ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। সুব্রত বললে, আপনার উৎসাহ নেই কেন, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, একটা কারণ তোমাকে সেদিন বলেছি অরুণা দেবীর সম্বন্ধে। তবে বৌদিদি যখন সঙ্গে যাবেন তখন সেটা মানিয়েও যাবে। দ্বিতীয় কারণ, এসব নেমন্তন্ন হল মূলত রাজনীতিক। একজনকে অভ্যর্থনা করার নাম করে পার্টির প্রচারকার্য করা। কিন্তু তুমি ত জান, আমরা কোনও প্রকার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই,—আমাদের বদনাম হল এই, আমরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক!

অরুণা বললে, না গেলেই বা ক্ষতি কি?

সুব্রত বললে, না, ক্ষতি কিছু নয়। তবে আমার খুব ইচ্ছে সবাই মিলে বন্ধুবান্ধব মহলে একটু ঘুরে আসি। অরুণা দেবীও একটু আনন্দ পাবেন!

অলক্ষ্যে অরুণার দিকে একবার তাকিয়ে ডাক্তার হাসিমুখে বললেন, বেশ, আজই ওদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি,—টেলিফোনে ওরা আমাকে খুবই পীড়াপীড়ি করছিল। আমরা গেলে নাকি ওদের সম্মান বাড়বে অনেক।

নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার সামন্ত চলে গেলেন তাঁর নিজের পথে। সুব্রত খুশিমুখে একবার তাকাল অরুণার দিকে। অরুণা বললে, আমি তোমাদের সঙ্গে নাই গেলুম, সুব্রত? পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বলবে, তোমরাই বিব্রত হবে।

তুমি যাবে না?—মুখের একটা শব্দ করে' সুব্রত বললে, তাহলে আমার উৎসাহটাই মিথ্যে! তুমি যাবে সঙ্গে, সেইটেই ত' সকলের বড় আনন্দ!

অরুণা চুপ করে গেল। মৌন সম্মতি লাভ করে এবার সুব্রত ওকে ছেড়ে হাসিখুশি মুখে নিজের মহলের দিকে অগ্রসর হল।

অরুণা পা বাড়াতেই আচমকা সমগ্র প্রাসাদ বিদারণ ক'রে কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সেই কাকাতুয়াটা। অরুণা এক পা পিছিয়ে গেল। কাকাতুয়াটা আজও তাকে চেনেনি। অতঃপর অরুণা উঠান পেরিয়ে নির্জন বারান্দায় পা তুলে অগ্রসর হতেই সভয়ে সামনের দিকে চেয়ে দেখল, হৈমবতী তারই দিকে দুহাত তুলে উন্মত্তের মতো দৌড়ে আসছেন। তাঁর কোমর থেকে কাপড় খুলে মেঝের উপর লুটোচ্ছে। মুখে তাঁর এক গাল হাসি। এটা রান্নামহলের প্রান্তভাগ, এখনই হয়ত ঠাকুর-চাকরের মধ্যে কেউ একজন ছুটে আসবে এবং হৈমবতীর সম্মান বিপন্ন হবে।

অরুণা ছুটে গিয়ে হৈমবতীকে জাপটে ধরল এবং মেঝের থেকে সমস্ত আঁচলটা তুলে নিয়ে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, দিদি, আমার সঙ্গে চলুন—আসুন এইদিকে......

চল ভাই, তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম।—হৈমবতী আহ্লাদিত হয়ে বললেন, দেখেছ ত, আমি আর কাপড় ফেলে দিচ্ছিনে! ডাক্তার বলে গেলেন, আমি ভাল হয়ে গেছি! কি জান ভাই, কাপড়খানা ঠিক গোছাতে পাচ্ছিনে!

অরুণা বললে, দাঁড়ান দিদি, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)




॥ ২০ ॥

একবার জন্মদিনে আমি সুন্দর একটা খেলার টি-সেট উপহার পেলাম। বেশ কফি-পেয়ালার মত বড় বড় পেয়ালাগুলো, তাই দিয়ে ছোট ছোট ভাইবোনদের একটা পার্টি দেবার ইচ্ছা হল। মা বললেন, ছোট্ট ছোট্ট খাবার তৈরী করে দেবেন আর দাদা তাড়াতাড়ি একটা মজার ছবি এঁকে তার ব্লক করিয়ে গোলাপী কার্ডে ছাপিয়ে সুন্দর নিমন্ত্রণের চিঠি বানিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, বাবার লেখা "কেনারাম ও বেচারাম" বলে একটা হাসির নাটক মুকুল পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ভাইদের নিয়ে সেটা অভিনয় করে সবাইকে খুব আনন্দ দেওয়া হ'ল। খুব জমল আমাদের পার্টিটা। সেই থেকে ভাইবোনদের জন্মদিনের উৎসবগুলো দাদার হাসির গান ও অভিনয়ে জমকালো হয়ে উঠল।

আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে অভিনয়ের জোগান দিতাম। পুরনো জামা-কাপড়-পর্দা থেকে জোড়া-তাড়া গোঁজা মিল দিয়ে পোশাক বানিয়ে দিতাম, নিজেদের মাথার চুল কেটে গোঁফ-টিকি বানিয়ে দিতাম। সকলের উৎসাহ দেখে মা কিছু টাকা দিলেন, তাই দিয়ে দাড়ি গোঁফ পরচুলা ইত্যাদি কেনা হ'ল।

দাদার বেঁটেবামন সাজা, সে এক দেখবার মত জিনিস ছিল! দু' হাত লম্বা বেঁটে-বামন টেবলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত মাথায় বিরাট পাগড়ি, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা বিশাল দাড়ি, চোখে কালো চশমা। চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক, সুপুষ্ট লম্বা দুই হাত। আর ক্ষুদে হাফ-প্যান্ট পরা, বেবী শু ও মোজা পরা, ছোট্ট বেঁটে বেঁটে দুটি পা। যেমনি অদ্ভুত মজার তার চেহারা, তেমনি মজার তার হেঁড়েগলায় বক্তৃতা আর তীক্ষ্ণ চাঁচা-সুরে গান। দেখে-শুনে সকলে হেসে গড়াগড়ি যেত।

প্রকাণ্ড দাড়িটা কেনা হবার পরে একদিন ভারি মজা হয়েছিল। দাদা তখন বেশ লম্বা হয়েছে। সেই দাড়ি লাগিয়ে, চোখে কালো চশমা এঁটে, চোগাচাপকান পাগড়ি পরে তার চেহারাটা বেশ জাঁদরেল দেখাল। সেই পোশাকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। ছেলেবেলার বন্ধু, তার সবই তো জানা আছে। কাজেই তার হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অনেক কিছু খবরই গণনা করে বলে দিয়ে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিল! তারপর যখন নিজের পরিচয় ফাঁস করল, তখন বন্ধুর ভারি মজা। সে বললে, "চল তোকে মার কাছে নিয়ে যাই। মার ভারি হাত দেখানোর বাতিক।" মাকে গিয়ে বলল, "মা, পাঞ্জাব থেকে একজন জ্যোতিষী এসেছেন, মস্ত পণ্ডিত লোক। বিলাত, আমেরিকা, সব ঘুরে এসেছেন, আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা। তাঁকে হাত দেখাবে?" মা তো খুব রাজি।

গম্ভীর সৌম্যমূর্তি জ্যোতিষী ঘরের মাঝখানে বসে আছেন, বাড়ির লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসেছে। একে একে সকলের হাত দেখে তিনি এমন সব কথা বলে দিচ্ছেন যে সকলে অবাক হয়ে যাচ্ছে (সবই তো তাঁর জানা আছে)। জ্যোতিষীর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বন্ধুর মায়ের এমনই ভক্তি হ'ল যে হঠাৎ তিনি জ্যোতিষীর পায়ে ঢিপ্ করে এক প্রণাম করে ফেললেন। মায়ের বয়সী ভদ্রমহিলা, তিনি পায়ে মাথা ঠেকাতেই তো "গণকঠাকুর" মহা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে প্রণাম করল আর বন্ধু একটানে তার পাগড়ি, আরেক টানে দাড়ি খুলে ফেলে হেসে বলল, "এঃ—কাকে প্রণাম করলে, মা?" প্রথমে সকলেই কেমন বোকা বনে গেল, তারপর যা হাসির ধুম! ততক্ষণে দাদা সোজা বাড়িতে পিট্টান দিয়েছে।

এতদিন ছোটদের জন্য যেসব নাটক ও গল্প বইয়ে কিম্বা পত্রিকায় বেরত, তাই নিয়েই অভিনয় হত। এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল। সব প্রথমে হল, "রামধন বধ" নামে ছোট্ট একটা নাটক। র‍্যাম্‌সুডেন্ (রামধন) সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে। "নেটিভ্ নিগার্" দেখলেই সে নাক সিঁট্কায়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই চেঁচায়—"বন্দে মাতরম্"! আর সে রেগে তেড়ে মারতে আসে, বিদ্ঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিস ডাকে। এহেন "সাহেব" কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হল তারই গল্প। যেমন মজার অভিনয়, তেমনি মজার গান। বিষয়টাও বেশ সময়োপযোগী হয়েছিল, সবাই খুব খুশী হ'ল।

সে সময়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট বাংলা দেশকে দুই ভাগ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে খুব আন্দোলন শুরু হয়েছে। এতদিন দেশের কথা নিয়ে কিছু মাথা ঘামাই নি। মনে পড়ে, বছর চার পাঁচ আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারযুদ্ধ হয়েছিল। আমরা তখন মনে প্রাণে ইংরেজ ভক্ত, ইংরাজের জয় শুনলেই খুশী হই। একদিন কাগজে একটা যুদ্ধে ইংরেজরা খুব জিতেছে দেখে আমি উৎসাহের সঙ্গে খবরটা সবাইকে শোনাচ্ছি, দাদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "নিজেরা মার খেয়ে মাটিতে পড়ে আছিস, আবার অন্যের মার খাওয়া দেখে হাসছিস?" ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম!

এবার কিন্তু দেশের প্রতি টানটা মনে মনে বুঝতে পারলাম। দেশের সমস্ত লোকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে জোর করে দেশটাকে দুই ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, এতে দেশের লোকের মনে খুব একটা আঘাত লাগল। চারদিকে তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনা। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে স্বদেশী গান কীর্তন, "বন্দে মাতরম্", "সোনার বাংলা", "এবারে তোর মরা গাঙে

দাঁড়াও, চেয়ে দেখ তুমি আপন সর্বাঙ্গে। কণ্ঠমূলে, গ্রীবায়, বাহুতে, কটিমেখলায়, শ্রোণীতটে, জঙ্ঘায়, নাভিলোকে, বক্ষের স্বর্ণঘটে—বাণীর বিহ্বলতা সর্বত্র মূর্ছিত রয়েছে মধুমক্ষিকার মতো। তুমি সংস্কৃত কাব্যের বিদুষী,—তুমি জান, অরুণা—তোমার পায়ের শব্দে আমার বুকের মধ্যে কত শত গোলাপের কুঁড়ি ফুটেছে!

সুব্রতর দুই চোখে জল নেমে এল। অরুণা লক্ষ করে দেখল, তার দুই গালে এবার ঘন রংয়ের ছোপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কপালের চুলের ভিতর দিয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে এসেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এরকম অবস্থা আর কয়েক মিনিট চলতে থাকলে তাকে আয়ত্তে রাখা কঠিন হবে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, ব্যাধির লক্ষণগুলি বিশেষ প্রকট হয়েছে।

অরুণা উঠে পড়ল। বললে, কবি, ভারি চমৎকার কাটল সকালটা। কিন্তু আর নয়, চলো এবার বাগানে বেরিয়ে পড়ি। দেখতে পাচ্ছ, পূর্বদিকে আবার বোধ হয় মেঘ ক'রে এল। এসো—

চল।

অরুণা আগেভাগে গিয়ে দরজা খুলে বেরল। এসে দাঁড়াল সেই বৃহৎ শ্বেত-মর্মরময় কক্ষে। পাথরের মূর্তিগুলি তেমনি আনন্দে দাঁড়িয়ে। চারিদিকের বহুমূল্য আসবাবের থেকে বর্ণচ্ছটা উচ্ছলিত হচ্ছে। পায়ের নীচে পালিশ করা পাথরের মেঝেতে আপন দেহ মুকুরের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে। হেঁট হয়ে তাকালে লজ্জায় গায়ে কাঁটা দেয়।



দুজনে বেরিয়ে এল বাগানে মধুর হাওয়ায়। মধ্যাহ্নের কিছু বিলম্ব রয়েছে। প্রাসাদচূড়ার উপরে মেঘ ঘনিয়েছে, অন্যদিকে উদার নীলকান্ত আকাশ রৌদ্রদীপ্ত। ওরা দুজনে চলল বাগান পেরিয়ে দীঘির ধার দিয়ে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়—যেমন ওরা নিত্যদিন ঘুরে বেড়ায়। সুব্রতর ব্যাধির পক্ষে এটা নাকি কাজে লাগে।

বনবাগানের ভিতর দিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ওরা হাঁটল। বাইরের হাওয়ায় এলে সুব্রত অনেকটা জুড়িয়ে যায়। লোকসমাজে এসে পৌঁছলে সে যেন কুমারীসুলভ সলজ্জ কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়। তখন ওর হাসিটি যেন লাজুক, কথাগুলি নম্র এবং প্রত্যেকটি আচরণে সৌজন্য প্রকাশ পায়। ওকে নিয়ে কৌতুক পরিহাস করলে কেবল মধুর স্নিগ্ধ হাস্যে তার জবাব দেয়।

মধ্যাহ্ন সমাগত। অরুণা বললে, অনেক হয়েছে, আর নয় সুব্রত, চল এবার ফিরি। হাওয়া লেগে মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, না আরও কাব্য করবে?

হাসিমুখে সুব্রত বললে, আর না, চল।

ডাক্তার সামন্তকে দেখা গেল। তিনি এক মহল থেকে বেরিয়ে অন্য মহলে যাচ্ছিলেন। দুজনকে অদূরে দেখে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালেন। সহাস্যে বললেন, একটা সুসংবাদ দিয়ে যাই। বৌদিদিকে খুলে দেওয়া হয়েছে।

অরুণা উল্লসিত হয়ে বললে, হয়েছে? বাঁচলুম! ভারি আনন্দ হচ্ছে শুনে।

সামন্ত বললেন, এবার উনি এত তাড়াতাড়ি বেরোবেন ভাবিনি। তবু আপনাকে বলি, ডাক্তারের হাতে কিচ্ছু নেই! সমস্তটা আগাগোড়া অন্ধকার! আমি শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি।

উৎসাহিত হয়ে সুব্রত বললে, তাহলে এবার গ্রেট্ ইস্টার্নের পার্টির নেমন্তন্নটা আমরা নিতে পারি ত?

হ্যাঁ, তা অবিশ্যি পারা যায়, বৌদিদিকেও নিয়ে যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু এসব পার্টিতে যাবার উৎসাহ আমার নিজের বিশেষ নেই ভাই। তবে তুমি এবাড়ির কর্তা, তোমার অনুরোধ মানব বৈকি। আপনার অভিমত কি, অরুণা দেবী?

অরুণা হাসল। বললে, বাড়ির কর্তার কোন ইচ্ছায় বাধা দেব, এ ত' আপনি আমাকে শিখিয়ে দেননি?

ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। সুব্রত বললে, আপনার উৎসাহ নেই কেন, ডাক্তার-বাবু?

ডাক্তার বললেন, একটা কারণ তোমাকে সেদিন বলেছি অরুণা দেবীর সম্বন্ধে। তবে বৌদিদি যখন সঙ্গে যাবেন তখন সেটা মানিয়েও যাবে। দ্বিতীয় কারণ, এসব নেমন্তন্ন হল মূলত রাজনৈতিক। একজনকে অভ্যর্থনা করার নাম করে পার্টির প্রচারকার্য করা। কিন্তু তুমি ত জান, আমরা কোনও প্রকার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই,—আমাদের বদনাম হল এই, আমরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক!

অরুণা বললে, না গেলেই বা ক্ষতি কি?

সুব্রত বললে, না, ক্ষতি কিছু নয়। তবে আমার খুব ইচ্ছে সবাই মিলে বন্ধুবান্ধব মহলে একটু ঘুরে আসি। অরুণা দেবীও একটু আনন্দ পাবেন!

অলক্ষ্যে অরুণার দিকে একবার তাকিয়ে ডাক্তার হাসিমুখে বললেন, বেশ, আজই ওদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি,—টেলিফোনে ওরা আমাকে খুবই পীড়াপীড়ি করছিল। আমরা গেলে নাকি ওদের সম্মান বাড়বে অনেক।

নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার সামন্ত চলে গেলেন তাঁর নিজের পথে। সুব্রত খুশি মুখে একবার তাকাল অরুণার দিকে। অরুণা বললে, আমি তোমাদের সঙ্গে নাই গেলুম, সুব্রত? পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বলবে, তোমরাই বিব্রত হবে।

তুমি যাবে না?—মুখের একটা শব্দ করে' সুব্রত বললে, তাহলে আমার উৎসাহটাই মিথ্যে! তুমি যাবে সঙ্গে, সেইটেই ত' সকলের বড় আনন্দ!

অরুণা চুপ করে গেল। মৌন সম্মতি লাভ করে এবার সুব্রত ওকে ছেড়ে হাসিখুশি মুখে নিজের মহলের দিকে অগ্রসর হল।

অরুণা পা বাড়াতেই আচমকা সমগ্র প্রাসাদ বিদারণ ক'রে কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সেই কাকাতুয়াটা। অরুণা এক পা পিছিয়ে গেল। কাকাতুয়াটা আজও তাকে চেনেনি। অতঃপর অরুণা উঠান পেরিয়ে নির্জন বারান্দায় পা তুলে অগ্রসর হতেই সভয়ে সামনের দিকে চেয়ে দেখল, হৈমবতী তারই দিকে দুহাত তুলে উন্মত্তের মতো দৌড়ে আসছেন। তাঁর কোমর থেকে কাপড় খুলে মেঝের উপর লুটোচ্ছে। মুখে তাঁর এক গাল হাসি। এটা রান্নামহলের প্রান্তভাগ, এখনই হয়ত ঠাকুর-চাকরের মধ্যে কেউ একজন ছুটে আসবে এবং হৈমবতীর সম্মান বিপন্ন হবে।

অরুণা ছুটে গিয়ে হৈমবতীকে জাপটে ধরল এবং মেঝের থেকে সমস্ত আঁচলটা তুলে নিয়ে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, দিদি, আমার সঙ্গে চলুন—আসুন এইদিকে......

চল ভাই, তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম।—হৈমবতী আহ্লাদিত হয়ে বললেন, দেখছ ত, আমি আর কাপড় ফেলে দিচ্ছিনে! ডাক্তার বলে গেলেন, আমি ভাল হয়ে গেছি! কি জান ভাই, কাপড়খানা ঠিক গোছাতে পাচ্ছিনে!

অরুণা বললে, দাঁড়ান দিদি, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# ছেলেবেলার দিনগুলি

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

॥ ২০ ॥

একবার জন্মদিনে আমি সুন্দর একটা খেলার টি-সেট উপহার পেলাম। বেশ কফি-পেয়ালার মত বড় বড় পেয়ালাগুলো, তাই দিয়ে ছোট ছোট ভাইবোনদের একটা পার্টি দেবার ইচ্ছা হল। মা বললেন, ছোট্ট ছোট্ট খাবার তৈরী করে দেবেন আর দাদা তাড়াতাড়ি একটা মজার ছবি এঁকে তার ব্লক করিয়ে গোলাপী কার্ডে ছাপিয়ে সুন্দর নিমন্ত্রণের চিঠি বানিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, বাবার লেখা "কেনারাম ও বেচারাম" বলে একটা হাসির নাটক মুকুল পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ভাইদের নিয়ে সেটা অভিনয় করে সবাইকে খুব আনন্দ দেওয়া হ'ল। খুব জমল আমাদের পার্টিটা। সেই থেকে ভাইবোনদের জন্মদিনের উৎসবগুলো দাদার হাসির গান ও অভিনয়ে জমকালো হয়ে উঠল।

আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে অভিনয়ের জোগান দিতাম। পুরনো জামা-কাপড়-পর্দা থেকে জোড়া-তাড়া গোঁজা মিল দিয়ে পোশাক বানিয়ে দিতাম, নিজেদের মাথার চুল কেটে গোঁফ-টিকি বানিয়ে দিতাম। সকলের উৎসাহ দেখে মা কিছু টাকা দিলেন, তাই দিয়ে দাড়ি গোঁফ পরচুলা ইত্যাদি কেনা হ'ল।

দাদার বেঁটেবামন সাজা, সে এক দেখবার মত জিনিস ছিল! দু হাত লম্বা বেঁটে-বামন টেবলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত মাথায় বিরাট পাগড়ি, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা বিশাল দাড়ি, চোখে কালো চশমা। চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক, সুপুষ্ট লম্বা দুই হাত। আর ক্ষুদে হাফ-প্যান্ট পরা, বেবী শু ও মোজা পরা, ছোট্ট বেঁটে বেঁটে দুটি পা। যেমনি অদ্ভুত মজার তার চেহারা, তেমনি মজার তার হেঁড়েগলায় বক্তৃতা আর তীক্ষ্ণ চাঁচা-সুরে গান। দেখে-শুনে সকলে হেসে গড়াগড়ি যেত।

প্রকাণ্ড দাড়িটা কেনা হবার পরে একদিন ভারি মজা হয়েছিল। দাদা তখন বেশ লম্বা হয়েছে। সেই দাড়ি লাগিয়ে, চোখে কালো চশমা এঁটে, চোগাচাপকান পাগ্‌ড়ি পরে তার চেহারাটা বেশ জাঁদ্‌রেল দেখাল। সেই পোশাকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। ছেলেবেলার বন্ধু, তার সবই তো জানা আছে। কাজেই তার হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অনেক কিছু খবরই গণনা করে বলে দিয়ে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিল! তারপর যখন নিজের পরিচয় ফাঁস করল, তখন বন্ধুর ভারি মজা। সে বললে, "চল তোকে মার কাছে নিয়ে যাই। মার ভারি হাত দেখানোর বাতিক।" মাকে গিয়ে বলল, "মা, পাঞ্জাব থেকে একজন জ্যোতিষী এসেছেন, মস্ত পণ্ডিত লোক। বিলাত, আমেরিকা, সব ঘুরে এসেছেন, আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা। তাঁকে হাত দেখাবে?" মা তো খুব রাজি।

গম্ভীর সৌম্যমূর্তি জ্যোতিষী ঘরের মাঝখানে বসে আছেন, বাড়ির লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসেছে। একে একে সকলের হাত দেখে তিনি এমন সব কথা বলে দিচ্ছেন যে সকলে অবাক হয়ে যাচ্ছে (সবই তো তার জানা আছে)। জ্যোতিষীর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বন্ধুর মায়ের এমনই ভক্তি হ'ল যে হঠাৎ তিনি জ্যোতিষীর পায়ে ঢিপ্ করে এক প্রণাম করে ফেললেন। মায়ের বয়সী ভদ্রমহিলা, তিনি পায়ে মাথা ঠেকাতেই তো "গণকঠাকুর" মহা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে প্রণাম করল আর বন্ধু একটানে তার পাগড়ি, আরেক টানে দাড়ি খুলে ফেলে হেসে বলল, "এঃ—কাকে প্রণাম করলে, মা?" প্রথমে সকলেই কেমন বোকা বনে গেল, তারপর যা হাসির ধুম! ততক্ষণে দাদা সোজা বাড়িতে পিট্টান দিয়েছে।

এতদিন ছোটদের জন্য যেসব নাটক ও গল্প বইয়ে কিম্বা পত্রিকায় বেরত, তাই নিয়েই অভিনয় হত। এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল। সব প্রথমে হল, "রামধন বধ" নামে ছোট্ট একটা নাটক। র‍্যাম্‌স্‌ডেন্‌ (রামধন) সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে। "নেটিভ্ নিগার্" দেখলেই সে নাক সিঁট্‌কায়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই চেঁচায়—"বন্দে মাতরম্"! আর সে রেগে তেড়ে মারতে আসে, বিদ্‌ঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিস ডাকে। এহেন "সাহেব" কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হল তারই গল্প। যেমন মজার অভিনয়, তেমনি মজার গান। বিষয়টাও বেশ সময়োপযোগী হয়েছিল, সবাই খুব খুশী হ'ল।

সে সময়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট বাংলা দেশকে দুই ভাগ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে খুব আন্দোলন শুরু হয়েছে। এতদিন দেশের কথা নিয়ে কিছু মাথা ঘামাই নি। মনে পড়ে, বছর চার পাঁচ আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারযুদ্ধ হয়েছিল। আমরা তখন মনে প্রাণে ইংরেজ ভক্ত, ইংরাজের জয় শুনলেই খুশী হই। একদিন কাগজে একটা যুদ্ধে ইংরেজরা খুব জিতেছে দেখে আমি উৎসাহের সঙ্গে খবরটা সবাইকে শোনাচ্ছি, দাদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "নিজেরা মার খেয়ে মাটিতে পড়ে আছিস, আবার অন্যের মার খাওয়া দেখে হাসছিস?" ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম!

এবার কিন্তু দেশের প্রতি টানটা মনে মনে বুঝতে পারলাম। দেশের সমস্ত লোকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে জোর করে দেশটাকে দুই ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, এতে দেশের লোকের মনে খুব একটা আঘাত লাগল। চারদিকে তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনা। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে স্বদেশী গান কীর্তন, "বন্দে মাতরম্", "সোনার বাংলা", "এবারে তোর মরা গাঙে

বান এসেছে" ইত্যাদি গান ঘরে ঘরে সকলের মুখে। বড় বড় সভায় দেশ-নেতাদের বক্তৃতা, খবরের কাগজে ঐ একই বিষয়ে আলোচনা, লোকের মুখে ঐ একই কথা।

৩০শে আশ্বিন। বাংলা দেশকে দুই ভাগ করা হল। সেদিন সারা দেশ জুড়ে হল "রাখী-বন্ধন"। সকাল হ'তে না হ'তে দলে দলে লোক গান গাইতে গাইতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন ঘরে-ঘরে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরস্পরের হাতে একতা ও মিলনের চিহ্ন রঙিন সুতোর "রাখী" বেঁধে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, গভর্নমেণ্ট জোর করে আমাদের দুই ভাগ করলেও আমরা কিছুতেই ভিন্ন হব না, মনে প্রাণে এক থাকব। "বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!"

বিকালে চারদিক থেকে দলে দলে গান করতে করতে সকলে সার্কুলার রোডে বিরাট এক জনসভায় এসে মিলল। দেশটাকে দু'ই খণ্ড করলেও বাঙালী জাতিটা কিছুতেই দুই ভাগ হবে না, তার চিহ্ন-স্বরূপ "অখণ্ড-বঙ্গ-ভবন" তৈয়ারী করা হবে, সেই সভায় তার "ভিত্তিস্থাপন" হ'ল। ঠিক তার পাশেই আমাদের সেই পুরনো স্কুলের নতুন বাড়ি হয়েছে, আমরা এবং আরো অনেক মেয়েরা স্কুলবাড়ির বারান্দা ও ছাতে বসে সভা দেখলাম। এত অসংখ্য লোক, এমন বিরাট গম্ভীর সভা, আমরা আগে কখনও দেখিনি।

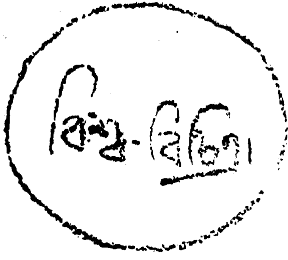
গভর্নমেণ্টের এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে দেশের লোক স্থির করল যে, এবার থেকে কেউ বিদেশী জিনিস পারতপক্ষে কিনবে না। দেশী জিনিস যতই মোটা বা খারাপ হোক না কেন, সাধ্যমত তাই ব্যবহার করবে। তাতে একদিকে যেমন দেশী শিল্পের ক্রমে উন্নতি হবে, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার বিলাতী জিনিস যে আমাদের দেশে বিক্রি হয়ে লাভের টাকাটা বিদেশে চলে যায়, সেটাও বন্ধ হবে। দেখতে দেখতে "স্বদেশী-আন্দোলন" দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে সমিতি গড়ে উঠল, তারা দেশী জিনিসের দোকান করল, তাদের স্বেচ্ছা-সেবকরা নিজেরা মোট মাথায় নিয়ে, গান গেয়ে ফেরি করতে লাগল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—যতই মোটা হোক না কেন, লোকে আগ্রহ করে তাই কিনতে লাগল। ছেলেরা বিলাতী জিনিসের দোকানের সামনে "পিকেটিং" করে, কাউকে বিলাতী জিনিস কিনতে বা বিলাতী কাপড় পরতে দেখলে তার পিছনে লাগে, অতি-উৎসাহের চোটে দোকান থেকে বিলাতী জিনিস টেনে রাস্তায় ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিলাতী জিনিস বিক্রি একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম।

আমরাও সমস্ত শৌখিন বিদেশী জিনিস ছেড়ে দিয়ে মোটা দেশী জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে মণিরই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। মণি ছিল ভারি গোছালো পরিষ্কার, তার পছন্দটাও চমৎকার। সে-ই আমাদের যত টুকিটাকি জিনিস বেছে বেছে সুন্দর দেখে কিনে এনে দিত। ছেলেবেলা থেকেই মণি ছিল ভারি পিট্‌পিটে। ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় নাহলে পরবে না, বাড়িতে সাবান-কাচা কাপড় পরাতে গেলে নালিশ করত, "দেখ না, আমাকে বাসি-কাপড় পরাচ্ছে!" পাশের বাড়ির একটি মেয়ে খেলতে এসেছিল, মণি তাকে দেখেই শিউরে উঠল "না-না-না—ওর সঙ্গে খেলবো না—ঐ দেখ, ওর নাক দিয়ে শিকনী পড়ছে!" (বেচারার নাকে মস্ত একটা মুক্তোর নোলক দুলছিল।) সেই মণি, এখন কোথায় দেশী সুতোর মোটা কাপড়, হাতে তৈরী তুলোট কাগজ, ট্যারা-ব্যাঁকা পেয়ালা পিরিচ, খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতো। দেশী জিনিস প্রথম প্রথম পাওয়াই মুশকিল হত, যা-ও বা পাওয়া যেত, তাও অত্যন্ত মোটা, অসুন্দর। দাদা তাই ঠাট্টা করে গান লিখেছিল "দেশী-পাগলার দল"। তার মধ্যে দেশী জিনিসের বর্ণনা ছিল, "দেখতে খারাপ, টিঁকবে কম, দামটা একটু বেশী!" ঠাট্টা করলেও, দাদাও হাসিমুখে ঐ সব মোটা জিনিস ব্যবহার করত। একদিকে যেমন হাসির গান লিখেছিল, তেমনি আবার সুন্দর গম্ভীর স্বদেশী গানও লিখেছিল—"ঢুটিল কি আজ ঘুমের ঘোর?"

এরপরে দাদা একে একে কতগুলো হাসির নাটক লিখল— "ঝালা-পালা", "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" ইত্যাদি। সেগুলো অভিনয় করবার জন্য ভাই-বন্ধুদের মধ্যে যাদের অভিনয়ের উৎসাহ আছে তাদের নিয়ে "ননসেন্স ক্লাব" বলে একটা দল গড়ল। ননসেন্স ক্লাব থেকে "সাড়ে বত্রিশ ভাজা" নামে একটা হাতে-লেখা কাগজও বেরল। এখন যেমন রাস্তায় রাস্তায় নানান সুরে শোনা যায় "চানাচুর গরম!" আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম "সাড়ে ব-ত্রি-শ ভা-জা!" বত্রিশ রকমের ভাজাভুজি এবং মশলা নাকি তার মধ্যে থাকত, তার উপরে আধখানা ভাজা লঙ্কা বসানো, তাই "সাড়ে-বত্রিশ!" কাগজের সম্পাদক দাদা মলাট ও মজার মজার ছবিগুলো সব দাদার আঁকা, অধিকাংশ লেখাও দাদারই। অন্যদের লেখাও থাকত, হাসির কথা ছাড়া গম্ভীর বিষয়ে লেখাও থাকত। কিন্তু দাদার লেখাই ছিল তার প্রাণ। বিশেষ করে "পঞ্চ-তিক্ত পাচন" নামে সম্পাদকের পাঁচ-মিশালী আলোচনার পাতাটি বড়রাও আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন; "পঞ্চ-তিক্ত" নাম হ'লেও সেটা কিন্তু মোটেই তিতো ছিল না, বরং খুব মুখরোচক ছিল। দাদার ঠাট্টার বিশেষত্বই এই ছিল যে, তাতে কেউ আঘাত পেত না, কারো প্রতি "খোঁচা" থাকত না, থাকত শুধু মজা, শুধু সহজ নির্মল আনন্দ।

ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝানো যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেকআপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথায়, সুরে ভাবে-ভঙ্গীতেই তাদের অভিনয়ের বাহাদুরি ফুটে উঠত। দাদা নাটক লিখত, অভিনয় শেখাত, আর প্রধান "পার্ট"টা সাধারণত সে নিজেই নিত। "প্রধান" মানে সবচেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট! হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না! অন্য অভি-নেতাদের মধ্যেও অনেকেরই হাসাবার ক্ষমতা খুব ছিল। অভিনয় করতে ওরা নিজেরা যেমন আমোদ পেত, তেমনি সবাইকে আমোদে মাতিয়ে তুলত। চারদিকে উচ্ছ্বসিত হাসির স্রোত বইয়ে দিতো। ছোট বড় সকলেই সমানে সে আনন্দ উপভোগ করত, ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় দেখবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকত। এমনি করে ননসেন্স ক্লাব বেশ জমে উঠল। ততদিনে আমরাও তো আর "ছোট" রইলাম না, স্কুলের পড়া শেষ করে, একে একে কলেজের দরজায় পৌঁছলাম। সুতরাং ছেলেবেলার গল্প আমার এই খানেই ফুরাল।

কিন্তু, ফুরিয়ে তো যায়নি! তারপরে আরো অর্দ্ধ-শতাব্দী কেটে গিয়েছে। যাঁদের কোলে জন্ম নিলাম, যাঁদের স্নেহের ছায়ায় বড় হলাম যারা ছিল ছেলেবেলার খেলাধূলো, হাসিকান্না, আশা-উদ্যমের নিত্যসাথী তাঁদের মধ্যে কতজনে আজ কত দূরে চলে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সকলের স্মৃতি নিয়ে, মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ছেলেবেলার সেই মধুর আনন্দময় দিনগুলি। সমাপ্ত




আফ্রিকায় জোহান্সবার্গের রাস্তা দিয়ে একটি মেয়েকে একা যেতে দেখে এক নিগ্রো তার হাতব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়েই ছুটে দিয়ে ভেবেছিল: মেয়ে তো! ওকে আর ধরতে পারবে না। কিন্তু বিশ বছর বয়েসের জুলি ফ্লোরেসকে লোকটি চিনতে পারেনি। ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে দেখেই জুলি লোকটির পিছনে দৌড়ে ওকে ধরে ফেলে কাঁচি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। পুলিস এসে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু ওর এমন চোট লেগেছিল যে, হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছিল। চোরটা জানতো না যে, জুলি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতমা সেরা দৌড়বাজ।

*

ছ'হাজার মাইল দূরত্ব হলেও সম্প্রতি দুজন লোকের মাথায় একই রকমের বুদ্ধি খেলে যেতে দেখা যায় – এবং দুজনের সমস্যাও ছিল একই, স্ত্রীর খপ্পর থেকে খানিকটা রেহাই পেয়ে থাকা।

টোরকোয়েতে এক ব্যক্তি তার বাড়ির কাছের থানায় গিয়ে উপস্থিত পুলিস অফিসার দুজনের কাছে জানতে চায় কি করলে সে লক-আপে আটক হতে পারে।

অফিসার দুজন একটু জিজ্ঞাসু ভাব দেখাতেই লোকটি ডান হাত দিয়ে ওদের একজনকে এবং বাঁ-হাত দিয়ে অপরজনকে কষে থাপ্পড় কষিয়ে দিল। মারপিটের অপরাধে লোকটির জরিমানা হতে সে বলে, স্ত্রীর ভয় সরে থাকার জন্যেই সে লক-আপে থাকতে চেয়েছিল।

কেপটাউনের এক স্বামী একটা ফাঁড়িতে গিয়ে বলে: "দেখুন, আমার একটু ঘুমের দরকার। খানিকক্ষণের জন্যে আমার খিটখিটে বৌয়ের হাত থেকে বাঁচতে আমাকে লক-আপে রাখুন।" লোকটিকে জানানো হয় যে, একটা কোন অপরাধ না করলে কাউকে লক-আপে ভর্তি করা যায় না। "তাহলে আমাকে একটা অপরাধ করতে হয়, মা!" বলেই লোকটি টেবিল থেকে কালির দোয়াতটা নিয়ে সার্জেণ্টের দিকে ছুঁড়ে দিলে।

মুখ-চোখে কালিঝরা অবস্থাতেই সার্জেণ্ট লোকটিকে ধরে লক-আপে ভরে দিলে। লক-আপে গিয়ে লোকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। পরদিন ঐ অপরাধের জন্যে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হলো এবং আরো প্রায় পঁচিশ টাকা দিতে হলো সার্জেণ্টের পোশাক থেকে কালি তোলার খরচ বাবদ। তারপর আদালত থেকে ছাড়া পেয়েই লোকটি তাকে লক-আপে রেখে সহায়তা করার জন্যে সার্জেণ্টকে নিয়ে গেল লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে।

*

ছোটরা ট্রেন, ট্রাম বা বাসে চড়লে টিকিট-খানি নেবার বড় আগ্রহ দেখায়। কণ্ডাক্টার টিকিট দিতে গেলেই ছোটরা আগে হাত বাড়ায় সেটি দখল করার জন্যে। ছোটদের এই আনন্দটা যাতে অব্যাহত থাকে, সুইডেনে তার একটা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ওখানকার স্টেট রেলওয়ে ছ'বছরের কম বয়সদের জন্যে বিশেষ টিকিট প্রবর্তন করেছে। ঐ ছোট বয়সের ছেলে-মেয়েদের ভাড়া লাগে না, কাজেই ওদের টিকিটেরও দরকার হয় না, কিন্তু হাতে একখানা টিকিট পেলে ওরা বুঝবে যে, ওদের অবহেলা করা হয় না।

তাই রেলওয়ে থেকে ওদের জন্যে সাতটা বিভিন্ন রকমের টিকিট বিলির ব্যবস্থা



১৯৫৪ থেকে গুয়াটেমালার একদল উৎসাহী যুবক আমাটিটলন হ্রদে মাছ ধরার উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে রত হয়। পরের বছর এপ্রিল মাসে ম্যানফ্রেট টৌপকে নামক এক যুবক হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জলের নীচে কতকগুলি মূর্তি আবিষ্কার করে। পরে, বিশেষজ্ঞরা এ-খবর পেয়ে সেই হ্রদে দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার আরো নিদর্শনের খোঁজে উৎসাহিত হন। প্রায় চারশো নানা মাপের মুখ, ধুনচি ও অন্যান্য পাত্র তোলা হয় যা খৃষ্টপূর্ব একহাজার থেকে দু'শো সন আগেকার বলে অনুমিত হয়। এ সম্পর্কে যে কাহিনী শোনা যায় তা হচ্ছে হ্রদের উষ্ণ ধোঁয়ারা তখনকার অধিবাসীদের সম্ভবত ভীত করে থাকবে যে ওখানে অপদেবতার আধিপত্য আছে এবং সেই কারণেই অপ-দেবতাদের তুষ্ট করার জন্যেই হ্রদের জলে ঐসব পাত্র উৎসর্গ করা হয়ে থাকবে। ওপরের ছবিখানি ঐরকমই একটি পাত্র এবং এর গায়ে মানুষের মাথার সঙ্গে একটি খুলিও থাকায় অপদেবতার পুজায় মানুষকেও উৎসর্গ করা হতো বলে মনে করা যায়।

হয়েছে; প্রত্যেকখানিতে এক একটা ছবি আর ছড়া থাকে। গার্ডের কাছে চাইলেই টিকিট পাওয়া যায়। ছোটদের খুসী করার এমন ব্যবস্থা সুইডেনেই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম হলো—আমাদের দেশেও হতে বাধা কিসের?

*

আতর ও সুগন্ধী ব্যবসায়ীদের প্রখর ঘ্রাণশক্তি না থাকলে চলে না। আমাদের দেশে অবশ্য এটাকে একটা বিশেষ বিদ্যে বলে কম ক্ষেত্রেই ধরা হয়, তবে ইওরোপ ও আমেরিকায় নাসিকার ক্ষমতার ওপর বেশ দর পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের এক বৃহৎ সুগন্ধী-প্রস্তুতকারকের এক কর্মচারী কিছুকাল পূর্বে প্রায় সওয়া তিন লক্ষ টাকায় তার নাসিকাটির বীমা করতে চেয়েছিল। তার মতে তার নাসিকার দরুণই সে বড় একটা কাজ করতে পারছে। তার কাজ প্রতিদিন চার ঘণ্টা শত শত প্রকারের সুগন্ধীর ঘ্রাণ গ্রহণ করা। ঘ্রাণশক্তি তার এতো প্রখর যে, পাশের ঘরে কেউ চা খেলে সে চায়ে চিনি দেওয়া হয়েছে কিনা বলে দিতে পারে।

হলিউডের অভিনেতা জিমি ডুরাণ্টের জনপ্রিয়তা তো তার নাকের জন্যেই, আর তাই ওটা বীমা করাও রয়েছে প্রায় সাড়ে ছ লক্ষ টাকায়। কিছুকাল পূর্বে এক ফরাসী অভিনেত্রীর নাকও সংবাদে এসে গিয়েছিল। নাকটা ঈষৎ বাঁকা এবং সেই-জন্যেই তার এতো জনপ্রিয়তা হয় যে, সেটা বহু টাকায় বীমা করা ছিল।

একদিন একটা গাড়ির ধাক্কায় আহত হওয়ার ফলে ওর জ্ঞান ফিরে আসার আগেই নাসিকায় অস্ত্রোপচার করে ফেলা হয়। সম্পূর্ণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই শল্য-চিকিৎসক অজ্ঞান রোগিণীর বাঁকা নাকের বদলে সোজা নাক বসিয়ে দেয়। এতেই সেই অভিনেত্রীর বৈশিষ্ট্য চলে যায় এবং বীমা প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিতে হয়।

নাসিকার কেরামতী দেখিয়ে অনেকে অনেক রকমের কাজ করে। বিলেতে এক গ্যাস কোম্পানী এক নিগ্রোকে রেখেছে যার কাজ হচ্ছে কোন পাইপ ফুটো হলো কিনা শুঁকে বলে দেওয়া। জার্মানী থেকে বেলজিয়ামগামী ট্রেনে একজন লোককে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছে বেআইনী আবগারী দ্রব্যের গন্ধ নেবার জন্যে।

তাছাড়া গোয়েন্দাদের ঘ্রাণশক্তি অপরাধী ধরার কাজেও কম নিয়োজিত হয় না। সম্প্রতি বিলেতে এক মূল্যবান পাথরের ডাকাতি ব্যাপারে এক গোয়েন্দা সন্দেহভাজনদের মধ্যে থেকে আসল অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হয়, কারণ যে ঘরে ডাকাতি হয়, সে ঘরের সেণ্টের গন্ধ ঐ লোকটির গায়ে পাওয়া গিয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে ডাবলিনের এক হোটেলের একটি কামরায় চুরি হয় এবং চুরির সময় চোর দুষ্প্রাপ্য আতরের একটি শিশি উল্টে ফেলে। পরে হোটেলের গোয়েন্দা একজন অভ্যাগতের কাছ থেকে একটা সিগারেট নেবার সময় সেই গন্ধটি উক্ত অভ্যাগতের হাতে পায়। তার তখন সন্দেহ হয় এবং চোর ধরা পড়ে। একবার এক ব্যক্তি দক্ষিণ ফ্রান্সে ট্রেনে চলার সময় একদল চোর কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়। চোররা তার টাকাকড়ি ভাগ করে সরে পড়ে। ওদের মধ্যে একজন চুরির সময় একটা সুগন্ধীর বোতল বাড়িতে নিয়ে তার ঘরটি সুগন্ধে আমোদিত করে তোলে। এক বিচক্ষণ গোয়েন্দা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে গিয়ে অপহৃত সুগন্ধীর বোতলের কথা তার মনে পড়তেই খুনী ধরা পড়ে যায়। আর একবার এক ব্যবসায়ী খুন হয় এবং তার মৃতদেহের পাশে নস্যি-ভর্তি একটা কৌটা পাওয়া যায় দুটো আঙুলের ছাপ সমেত। এই সামান্য সূত্র ধরেই গোয়েন্দা নিহত ব্যক্তির এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এবং প্রশ্নোত্তরকালে গোয়েন্দাদের একজন নস্যির গন্ধ পায়। তৎক্ষণাৎ সে সন্দেহভাজন ব্যক্তির পকেট তল্লাস করে এবং সেই নস্যির কৌটায় যেমন ছিল ঠিক তেমনি নস্যির গুঁড়ো পেয়ে যায়।

*

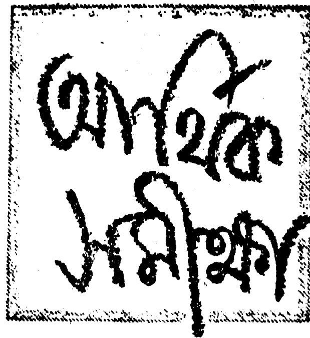
সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে একটি চালের দানার ওপর দুশো অক্ষরে 'পঞ্চ-শীল'-এর সূত্রগুলি লিখে এক শিল্পী পাঠিয়েছিল। চালের গায়ে দেশবরেণ্য নেতাদের প্রতিকৃতি আঁকাও দেখা গিয়েছে। কিন্তু আলপিনের মাথার ওপরে একটা প্রতিকৃতি আঁকা আরো অবাক হবার মতো ব্যাপার অবশ্যই। সেটা সম্ভব করেছিল এক ইতালীয় শিল্পী এবং তার তুলি হয়েছিল একটি কেশ। ঐ শিল্পীই চারটি পিনের মাথায় প্রাকৃতিক শোভাও এঁকেছে। শিল্প-বিশারদরা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখে বলেছেন, ছবিগুলি অত্যদ্ভুত।

খুদে বস্তুর ওপর শিল্পকৃতিত্বের ওপর মাঝে মাঝে খুব ঝোঁক দেখা যায়। বিলেতের এক ব্যক্তি একটিমাত্র পাথরের ওপর একশ' চব্বিশটি বিভিন্ন মুখ এঁকেছিল এবং পরে প্রায় সাড়ে ছ হাজার টাকা দাম পেয়েও বিক্রী করতে চায়নি। নিউ ইংলণ্ডের সালেমের মিউজিয়ামে একটা চেরি পাথর আছে, তাতে বারোটি রূপোর চামচ রাখা। পাথরটা সাধারণ আকৃতির এবং চামচগুলি এতো খুদে যে, ওদের ওপরের কারুকার্য দেখতে শক্তিশালী ম্যাগ-নিফাইং গ্লাসের দরকার হয়।

তিউরিনের এক অলংকার প্রস্তুতকারক একবার ছুটিতে বেরিয়ে একটি মুক্তা কুড়িয়ে পায়। পরের এক সপ্তাহ ধরে সেটিকে সে একটি খুদে নৌকো করে তোলে। তারপর পেটা সোনার ওপরে হীরে বসানো একটা পাল তৈরী করে এবং একটা চুণি বসিয়ে হেড লাইট তৈরী করে নেয়। হালের জন্য একটা পান্না বসানো হয় এবং তৈরী সেই নৌকাটি হাতির দাঁতের একটা টুকরোর ওপর বসিয়ে নেয়। সব মিলিয়ে ওজন হয় আধ আউন্সেরও কম এবং সেটি বিক্রী হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

এই ধরনের লোকদের বলা হয় 'খুদে বাতিক'। এক ব্যক্তি একটি ইলেকট্রিক মোটর তৈরী করেছিল যার ওজন দাঁড়িয়েছিল এক কাঁচ্চারও কম।

এক মহিলা একটি মিউজিক্যাল-বক্স তৈরী করেছিল এতো ছোট যে, সেটিকে একটা ডাক-টিকিটের ওপর রাখা যেতো। বিলেতে দাবী করা হয় যে, হ্যাম্পশায়ারের যে ব্যক্তি একখণ্ড রূপোর তিন-পেনীর ওপর এগারো বার 'প্রভুর উপাসনা' লিখেছিল, পৃথিবীর মধ্যে খুদে লেখার সেইটিই নাকি রেকর্ড।




**শ্রীকৌটিল্য**

ইতিপূর্বের এক সপ্তাহের আলোচনায় খুব সংক্ষেপে বলেছিলাম যে, আমাদের পরিকল্পনায় সবচেয়ে গোড়ার কাজে ফাঁক পড়ে গেছে। বলেছিলাম প্রথম পরিকল্পনার শেষে প্রাকৃতিক সৌজন্যে যে খাদ্য-উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছিল, পরিকল্পনা-কারীরা তাকেই ভূমি-সমস্যার সমাধানের সূচক বলে ভ্রম করেছেন। আরো উল্লেখ করেছিলাম যে, পরিকল্পনায় জনসাধারণের সহযোগিতার মন্ত্র লুকোনো আছে ভূমি সম্পর্কের সুবিবেচিত সংস্কার সাধনের মধ্যে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনের কথা স্বভাবতই মনে রেখে-ছিলাম। আন্তর্জাতিক কৃষি অর্থনীতিবিদ্ সম্মেলনের প্রাক্কালে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি-দপ্তর থেকে প্রাসঙ্গিক আলোচনার অনুরোধ পেয়ে পূর্বের সচেতনতাই আরো দৃঢ় হল, যদিচ বর্তমান সংখ্যার আলোচনায় আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন হয়ে উঠবে না।

আন্তর্জাতিক কৃষি অর্থনীতিবিদ্ সম্মেলন এ বছর, আমাদের সৌভাগ্যে মহীশূরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একথা আশা করলে খুব অযৌক্তিক হবে না যে, সম্মেলনে ভারতীয় কৃষিসমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তত্ত্ব পরিবেশিত হবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতি। বলতে গেলে বেসরকারী স্তরে কৃষি অর্থনীতির গবেষণা ইত্যাদির ব্যাপারে এদেশে এই সমিতিই একমাত্র ভরসাস্থল।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে এই সমিতির জন্ম এবং তখন থেকে এর ১৮টি বাৎসরিক সম্মেলন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অবশ্য এ পর্যন্ত অসংখ্য মৌলিক গবেষণা-মূলক কাজ হয়ে থাকলেও সমিতির পক্ষে উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আশা করা যায়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রসাদে এদেশে কৃষি অর্থনীতির আলোচনা ও গবেষণার পরিধি বাড়বে এবং সমিতির কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হবে। সমিতির তরফ থেকে প্রকাশিত ভারতীয় কৃষি অর্থ-নীতির ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির মানও হয়তো অতঃপর উন্নত হবে। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি কারণ এটা প্রয়োজনীয়। কৃষি অর্থনীতিবিদদের নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সভাপতি লিওনার্ড কে এলম-হার্স্ট সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য: "যদি সমস্ত এশিয়াতে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির মত জিনিস থাকত, তাহলে আমাদের সম্মেলন আরো অনেক সুষ্ঠু-ভাবে প্রতিনিধিত্ব হত।"

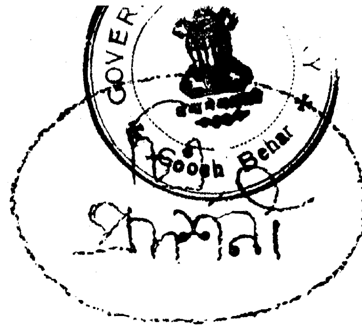
খুব সম্প্রতি সমিতির প্রচেষ্টায় গুজরাট, বোম্বাই, সুরাট, বরোদা প্রভৃতি রাজ্য এবং জেলায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে কয়েকটি ভূমি সমস্যার উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়েছে এবং এগুলি পরিকল্পনা কমিশনের গবেষণা-কার্যসূচী কমিটির কাছে পেশ করাও হয়েছে। সমিতির সেমিনারে কিছুকাল আগে "ভারতের কৃষি কাঠামোর আঞ্চলিক তারতম্যের তাৎপর্য" নিয়ে একটি আলোচনা হয়েছে। এ বছর "সমবায় কৃষিকার্য" সম্পর্কেও একটি গবেষণামূলক সেমিনার হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখ্য কাজের মধ্যে সমিতির চেষ্টায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে কৃষি অর্থনীতির একটি শ্রেণী খোলা হয়েছে। আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সময় নানারকম গবেষণামূলক প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্তও সমিতির তরফ থেকে গৃহীত হয়েছে। এসব খুবই সুখী ঘটনা, কিন্তু কাজ আরো এগোনো দরকার।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু সম্মেলন ব্যাপারটি একেবারেই সাময়িক। তাই এই উল্লেখ-যোগ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে, কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি এই দেশে যার পক্ষে নেওয়া স্বাভাবিক সেই ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতি সম্বন্ধে এতটা বিস্তৃত বিবরণ লিখছি। সমিতিকে সবচেয়ে আগে বুঝে নিতে হবে দেশের ভূমি-সমস্যার মূল দিকগুলি। কৃষি-উৎপাদন, বিশেষত খাদ্য, ক্রমশ বাড়াতে হবে এটা আমাদের উদ্দেশ্য। এর জন্য একদিকে চাই বাস্তবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, আর্থিক সংস্থান ইত্যাদির উন্নতি: অপরদিকে, প্রয়োজন এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে কৃষকের মানসতার পরিবর্তন

হয়ে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তার সক্রিয় সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্ত হতে থাকে। এর জন্য দরকার প্রথম, ভূমি সম্পর্কের উন্নতি; দ্বিতীয়, উপযুক্ত মূল্যনীতি (প্রাইস পলিসি), যাতে করে শিল্প এবং কৃষির আয়ের শোচনীয় ব্যবধানটি সংকীর্ণ হতে পারে। উৎপাদনের জন্য বাস্তবিক ব্যবস্থা, যথা সমবায় অর্থ সমিতির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, কিংবা সরকারী সহকারিতায় নিম্নমূল্যে সার এবং সেচ ব্যবস্থার সুযোগ, এসব খুব গভীরের প্রশ্ন নয়। কিন্তু ভূমি সম্পর্কের ব্যাপারে এটা বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষ সে রকম এক অসুবিধাজনক দেশ যেখানে উন্নতিশীল ধনতন্ত্র তার নিজের অন্তরায় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে স্পষ্ট বিরোধিতা করতে পারছে না, কারণ কৃষি এবং শিল্পে একই ব্যক্তি-অথবা-গোষ্ঠী-স্বার্থ একই সঙ্গে বেঁচে আছে। আবার কৃষি আর শিল্পের মাঝখানে বিরাট ব্যবসা ক্ষেত্র (ট্রেড)। চাষী এবং সাধারণ মানুষের আয়ের অবনতির সঙ্গে ব্যবসায়ীর মুনাফা বৃদ্ধির সোজাসুজি সম্পর্ক। এই মুনাফাখোরদের সমস্যার কথা ভাবতে গিয়ে বিকল্প উপায় হিসেবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসার (স্টেট ট্রেডিং) কথাও বিচার করতে হবে, সমবায় ব্যবসার বিফলতার কারণও অনুসন্ধান করতে হবে। মোট কথা, চাষীর আয় যে কোন উপায়েই হোক বাড়াতে এবং নিরাপদ রাখতে হবে। এ জন্য তার অবশ্য ব্যবহার্য দ্রব্যগুলির জন্য সরকার একটি নির্দিষ্ট নিম্ন-হার বাজারের সৃষ্টি করতে পারেন।

ভূমি সম্পর্কে প্রশ্নের সূত্রে এদেশে অনেকদিন ধরে জমি অধিকারের উচ্চতম পরিমাণ (সিলিং) বিষয়ে বাদানুবাদ চলেছে। এই উচ্চতম পরিমাণ বিতর্কে এ পক্ষে ও পক্ষে দুয়েতেই কিছু কিছু যুক্তি হয়তো আছে, কিন্তু মোটের উপর স্বপক্ষেই বেশি যুক্তি। অন্তত জমির সুষ্ঠু পুনর্বণ্টনের দিক থেকে একথা নিশ্চিন্তেই বলা চলে। উপরন্তু, যেমন, ড্যানিয়েল থর্নার দেখিয়েছেন যে, বড়ো আয়তনের ভূমির অধিকারের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় উৎপাদনের বিশেষ কোন উন্নতি আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। এর প্রধান কারণ বিরাট জমিগুলি একজনের অধিকারে থাকলেও চাষের সময়ে অনেকগুলি ছোট ছোট টুকরো হয়ে চাষী অথবা ভাগচাষীর ব্যবহারে নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ জমির মালিক উৎপাদনের ব্যাপারে প্রায় পরোক্ষে থাকেন। থর্নার আরো বলেছেন যে, যেহেতু ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত অনেক জমির মালিক আছেন যাঁরা নিজেরা চাষের সঙ্গে যুক্ত নন, সেহেতু শুধু-মাত্র ভূমির পুনর্বণ্টন হলেই যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এমন আশা করা কঠিন। কারণ পুনর্বণ্টনের ফসল পেতে হলে জমির মালিককে অবশ্যই নিজে চাষ করতে হবে। কাজেই জমির উচ্চতম পরিমাণ অধিকারের বিতর্কের কোনো অর্থই থাকবে না যদি না জমির অধিকার এবং জমির বাস্তবিক চাষের মধ্যে বর্তমান বিভেদটি দূর হয়। এই বিভেদ দূর করতে পারলেই কালক্রমে সম্পত্তি অধিকারের পরিমাণ কমে আসবে এবং চাষীর আয় বেড়ে যাবে (দ্রষ্টব্যঃ ড্যানিয়েল থর্নার, দি এগ্রেরিয়ান প্রসপেক্ট ইন ইণ্ডিয়া)।

তাই বলছিলাম, মাথা-ভারী অনেক চিন্তাই করা হয়েছে। ভূমি সমস্যার মূলে না যাবার জন্য কোন দিকেই অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হচ্ছে না এটা বেশ দেখা যাচ্ছে। অবিলম্বে তাই ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির মতো দায়িত্বপূর্ণ সংস্থার পক্ষে নানাপ্রকার মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু করা দরকার। পরিসংখ্যান এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূঢ় সত্যকে যদি তাঁরা উদ্ঘাটিত করতে পারেন তবেই ভারত সরকারকেও তাঁর উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনে সাহায্য ও চালিত করা সম্ভব হবে। আশা করছি আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এই উপলব্ধিই দৃঢ়তর হবে।




এ সপ্তাহে মারোওয়াড়ী ছাত্রসংঘের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আর্টিস্ট্রী হাউসে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এ-প্রদর্শনীতে আছে আলোকচিত্র, চিত্রকলা এবং কারুশিল্প।

কোটা, বুন্দি, উদয়পুর, কিষাণগড়, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্রধারার নিদর্শন এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। অনেক ছবি এমন আছে, যা ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী শিল্পীদের আঁকা। সবচেয়ে প্রাচীন মনে হয়, শ্রীপুরুষোত্তমলাল মেনারিয়ার সংগ্রহ বিভিন্ন রাগরাগিণীর চিত্ররূপগুলি। শ্রীপুরুষোত্তমলাল মেনারিয়ার মতে এর থেকে প্রাচীন রাগরাগিণীর চিত্র ভারতবর্ষে আর নেই। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ধোলামারু এবং মধুমালতী প্রভৃতি উপাখ্যানের চিত্ররূপগুলিও বেশ পুরাতন মনে হয়। প্রাচীন রাজস্থানী চিত্রকলা বিভাগে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন শ্রীরামগোপাল বিজয়ভার্জিয়ার সংগ্রহ পাবুজীর ফড়। বীর পাবুজী বিবাহ করতে চলেছেন, পথে বেধে উঠলো তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু পাবুজী শত্রুদের বিনষ্ট করে বিজয়গর্বে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করে ফিরলেন। এটি একটি রাজস্থানী চলতি 'ব্যালে'। উপাখ্যানটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে একেবারে খাঁটি রাজস্থানী লোকশিল্প স্টাইলে একটি কাপড়ের ওপরে। ছবিটি কত প্রাচীন, সেকথা সঠিক বলা না গেলেও বোঝা যায় যথেষ্ট পুরাতন। বুন্দি ঢঙের রাগরাগিণীর চিত্ররূপগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীনরেন্দ্রসিং সিংঘীর সংগ্রহের 'একটি শিকারের দৃশ্য' 'রাধাকৃষ্ণ', 'মহারাজ অভয়সিংজীর প্রতিকৃতি', 'তুলসীদাস' প্রভৃতি ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-প্রদর্শনীতে 'যোগদানকারী' সমকালীন মারোওয়াড়ী শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শ্রীইন্দ্র দুগারের নাম। ইনি ছবি পেশ করেছেন সবশুদ্ধ চোদ্দটি। জলের কাজ এবং তেলের কাজ। কয়েকটি ছবি নতুন। এঁর তৈলমাধ্যম ব্যবহার লক্ষণীয়। মাধ্যম পাশ্চাত্ত্য হলেও ছবিগুলিতে পাশ্চাত্ত্য মেজাজ কোথাও প্রকাশ পায় না। কেবলমাত্র দৃষ্ট রূপের বাইরেটাই যে ইনি হুবহু প্রকাশ করেছেন, তা নয় বটে, কিন্তু নিছক কাল্পনিক রূপও এগুলিকে বলা চলে না। কিন্তু প্রাচীন রাজস্থানী আর্টে কল্পনাটাই সবচেয়ে বড়। সেকালের শিল্পীরা চোখের সামনে কোনও জিনিস না রেখেই কল্পনায় বর্ণিত করে গেছেন বিষয়বস্তুগুলি। সেকালে ফর্মের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ছিল, তাই বিশেষ তফাত পাওয়া যায় না বিভিন্ন শিল্পীর রচনার মধ্যে। এবং বাঁধা ফরমুলায় ফেলে কল্পনা করাটাও সোজা হত তাঁদের পক্ষে। একালে সেটি হবার জো নেই। রসিকজন


প্রাচীন রাজস্থানী চিত্র

খোঁজেন প্রত্যেক শিল্পীর স্বকীয়তা। কোনও বিশেষ আর্টের পুনরাবৃত্তি বা কোনও বিশেষ শিল্পীর প্রভাব যদি থাকে ছবিতে তাহলেই তিনি আর রসোত্তীর্ণ বলে সে ছবিকে গ্রহণ করতে পারেন না। সেকালের আর্টের ভিত্তিতেই একালের আর্টের প্রতিষ্ঠা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়, সেকালকে একালের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলে না। একথা অবনীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন এবং কিছুদিন আগে মেক্সিকোর অন্যতম শিল্পী সিকিরস-ও বলে গেছেন, সেকালের ভিত্তির ওপর একালের আর্টের যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবেই হবে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন আর্ট রিভাইভ করার মধ্যে সত্যিকার কোনও সার্থকতা নেই। আমার মনে হয়, শ্রী দুগার উগ্র প্রাচীনপন্থী নন, তাই তাঁর রচনার মধ্যে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। তৈলমাধ্যম ব্যবহারও এর একটি প্রমাণ। 'পিচোলা লেক', 'ফেস্টিভ্যাল ডান্স' 'ফ্রেন্ডস', 'বার্ডস আই ভিউ, উদয়পুর' এবং 'মর্নিং মেলডী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী ইন্দ্র দুগারের সংগ্রহের মধ্যে তাঁর পিতা প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীহীরাচাঁদ দুগারের 'ম্যারেজ সিন' ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর সব সমকালীন শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য কাজ শ্রীরামগোপাল বিজয়ভার্জিয়ার 'জহরব্রত' এবং 'দীপক রাগ', শ্রীভুরসিং শিখাওয়াতের 'অন দি ফায়ার সাইড' এবং শ্রীগোবর্ধন যোশীর 'ভীল লাইফ'। এঁরা কেউই 'মডার্নিস্ট' নন। মারোওয়াড়ী শিল্পীদের মধ্যে 'আধুনিক' আর্টের রেওয়াজ কি এখনও চালু হয়নি, না এ-প্রদর্শনীতে বাদ দেওয়া হয়েছে সে ধরনের ছবি, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আলোকচিত্র বিভাগে সবশুদ্ধ ১১১টি ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রশংসা করবার মত অনেক ছবি আছে। এ বিভাগের স্বতন্ত্র-ভাবে সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে তা সম্ভব নয়।

প্রদর্শনীটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য। খোলা আছে আগামী ৩০শে আগস্ট অবধি। প্রবেশমূল্য নেই।

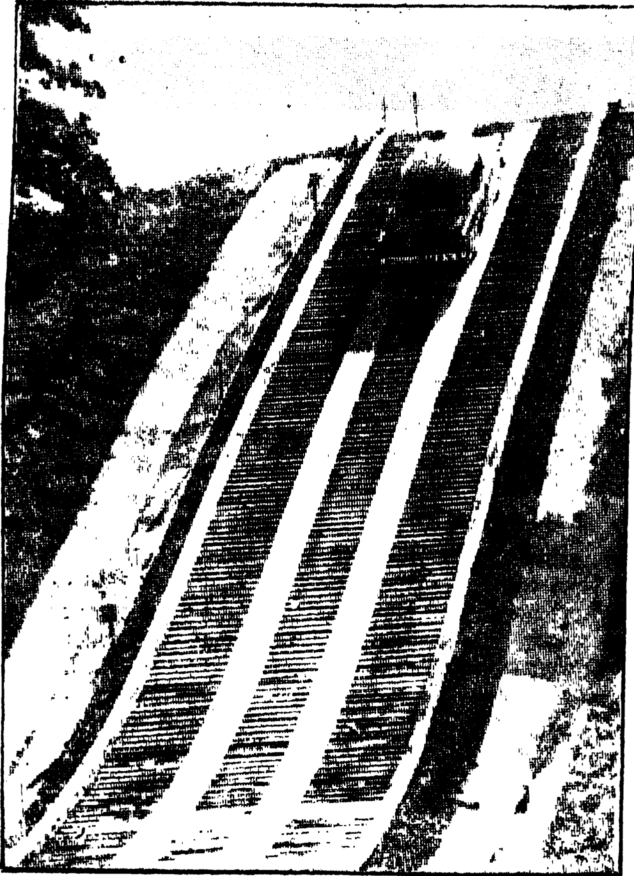
—চিত্রগ্রীব


পিচোলা হ্রদ —ইন্দ্র দুগার




চক্রদত্ত

—বুইক কোম্পানী একরকম মোটরগাড়ি তৈরী করেছেন; এগুলো বেশ খাড়াই পাহাড়ের ওপর অনায়াসে উঠে যেতে পারে। পরীক্ষার জন্য একটা কৃত্রিম খাড়াই ভূমির ওপর দিয়ে গাড়িটা চালান হচ্ছে। এটা ১০০ ফুটের ৬০ ফুট খাড়াই। এরকম খাড়াই জায়গায় কোনও মানুষকেও যদি উঠতে হয় তাহলে সর্বোচ্চ স্থান থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়ি ধরে ধরে উঠতে হয়। সাধারণ একটা খাড়াই পাহাড় বলতে ১০০ ফুটের মধ্যে ৩১ থেকে ৪৫ ফুট স্থান খাড়াই বোঝায় সেক্ষেত্রে এই কৃত্রিম খাড়াই রাস্তাটি বেশ অস্বাভাবিক রকম খাড়াই। এই গাড়িতে ৩০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন লাগান আছে এবং একটি নতুন রকম ব্রেক লাগান আছে।



নতুন রকম বুইক গাড়ি খাড়াই রাস্তায় অনায়াসে চলছে

*

সমুদ্র কিংবা নদীর পাড়ে বসে বসে বালির ঘর তৈরী করার নেশা প্রায় সব শিশুর মধ্যেই থাকে এবং সে ঘর যখন অকারণেই বার বার ধসে যায় তখন সব শিশুর মনেই বিরক্তি জাগে। আজকের দিনে কিন্তু কিছুমাত্র বিরক্তি উৎপাদন না করেই শিশুর পিতারাই বালির ঘর তথা বালির বাড়ি তৈরী করছেন। অবশ্য নির্ভেজাল বালির ঘর হয় না। বালির সঙ্গে কিছুটা চূণ মিশিয়ে যে বস্তু তৈরী হয় তাকে সিলিকালসাইট বলা হয় এবং এই সিলিক্যালসাইট আজকাল বাড়ি তৈরীর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সিলিক্যালসাইট যে কোনও ধাতুর চেয়ে শক্ত এবং শক্তিসম্পন্ন। সম্প্রতি রাশিয়ায় সিলিক্যালসাইট দিয়ে বাড়ি তৈরী আরম্ভ হয়ে গেছে এবং এর জন্য সিলিক্যালসাইট তৈরীর বড় বড় কারখানাও বসেছে।

*

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ তাদের বিশ বছরের পড়াশোনা ও সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে হারানো মহাদেশ অ্যাটলান্টিস সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন। পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এতদিন পর্যন্ত অ্যাটলান্টিস মহাদেশের অস্তিত্বকে একটি পৌরাণিক তথ্য ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেন নি। সম্প্রতি ডাঃ লেভ-নেভ নামক একজন বৈজ্ঞানিক এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, অ্যাটলান্টিস জিব্রাল্টারের নিকটবর্তী একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ বিশেষ ছিল। প্রমাণ হিসাবে বলেন—গ্রীক দার্শনিক প্লেটো চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত তাঁর পুঁথিপত্রের মধ্যে উল্লিখিত স্থানের সমুদ্র তলদেশের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে ঐ ধরনের দ্বীপের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এসব অবশ্যই বৈজ্ঞানিক তথ্য। পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা অন্য গল্প শুনি—হাজার হাজার বছর আগে ভগবান এই দ্বীপের অধিবাসীদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত দ্বীপটি সমুদ্রে বিলীন করে দেন।”

*

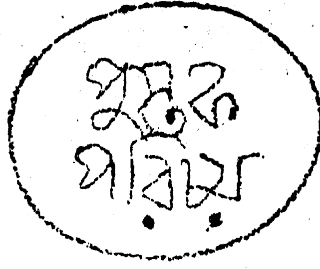
“কথায় বলে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা”—আজকালকার চিকিৎসা জগতের অ্যান্টি-বায়োটিক চক্র ভেদ করতে পারলে কথাটা ভালোভাবে বোঝা যায়। বেশী অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ দেহে প্রয়োগ করার দরুণ অ্যান্টিবায়োটিকের শক্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেহে বেড়ে যায়, ফলে পরে আর ঐ ওষুধ কোনও কাজে লাগে না। সম্প্রতি “ক্যানামাইসিন” নামে একটি নতুন রকম ওষুধ বার হয়েছে। নিউইয়র্কের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স কথাটি ঘোষণা করেন। জাপানী “ডাঃ হাথাও উথেজোওয়ার” গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই ক্যানামাইসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের শক্তি নিরোধকারী যে শক্তি দেহে তৈরী হয়, বিশেষত পেনিসিলিনজাত ওষুধ থেকে যে নিরোধকারী ক্ষমতা জন্মায় “ক্যানামাইসিন” তাই নষ্ট করতে পারে। অবশ্য বিশেষ গুণে ছাড়াও ক্যানামাইসিন আরও উপকারে লাগে। আনথ্রাক্স, যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি এবং পেটের কোনও বীজাণুজাত রোগ হলে ঐ রোগ-বীজাণু নষ্ট করতে সাহায্য করে।

## প্রাচীন সাহিত্য

**বৈষ্ণব-পদাবলী**—শ্রীসুকুমার সেন সঙ্কলিত। সাহিত্য আকাদেমি, নিউদিল্লী। দু টাকা।

বাংলা তথা সর্বভারতীয় কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণবপদাবলীর স্থান যে প্রথম সারিতে একথা বলা যায়। বৈষ্ণব-পদাবলী গোড়া থেকেই গান, রাগরাগিণীকে আশ্রয় করে তার বিস্তার কিন্তু তবু তার গঠনের মধ্যে নীতিসুলভ সংক্ষিপ্ত ও শিথিল আকৃতির বদলে সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার মত প্রগাঢ় সংহতি ও স্বসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়।






আধুনিক যুগরুচির প্রভাবে তার তত্ত্বের দিকটা অনেক পরিমাণে বিবর্ণ হয়ে এলেও রসের ক্ষেত্রে সে এখনো অগ্রগণ্য। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কৃত একশ আটটি পদের এই সংকলন গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত—আধুনিককালে, পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত হয়ে একটি সুমুদ্রিত ও সম্পাদিত বৈষ্ণব-পদাবলী গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম প্রকাশিত হল। দ্বিতীয়ত—বৈষ্ণবীয় পঞ্চমনোভাবের দিক থেকে বিভক্ত করে তিনি পদগুলিকে সংগ্রহ করেননি, বিন্যাস চিত্রানুসারী। প্রেমের বিচিত্র লীলাকে চিত্রল প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তিনি চয়ন করেছেন। তাছাড়া এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিশেষ কবির শ্রেষ্ঠত্বের দিক বিবেচনা করে তাঁদের প্রাধান্য দেননি, বহু অখ্যাত কবিরও সার্থক রচনাকে সাগ্রহে স্থান দিয়েছেন। তাই এমন বিচিত্র বিষয়ী সংকলনগ্রন্থ লোভনীয় হয়ে উঠেছে। নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞভূমিকাটি এবং প্রকাশকের 'পরিচায়িকা'টি এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে। ৩০৫।৫৮

## কবিতা

**ছেঁড়াতার**—সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা মেলা, ২ এইচ, গোপালচন্দ্র বসু লেন, কলিকাতা—২। একটাকা।

**মধুর দিনের গল্প**—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। একটাকা।

**একটি প্রসন্ন সুর**—শান্তশীল দাশ, তুলি-কলম, ৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা।

**অরুন্ধতী**—অংশুপতি দাসগুপ্ত। তুলি-কলম, ৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দেড় টাকা।

এই কাব্য গ্রন্থগুচ্ছের মধ্যে 'ছেঁড়া তার' একটু স্বতন্ত্র ধরনের, চরিত্র লক্ষণে উগ্র আধুনিকতার চিহ্ন বিদ্যমান। গদ্য কবিতা, নক্সা পদ্য কবিতা সবই এর মধ্যে রয়েছে, আর রয়েছে লেখকের অপরিশ্রান্ত কলা-কৌশল। অবশ্য কলা নৈপুণ্যের চেয়ে কৌশল নৈপুণ্যেই কবিতাগুলির জন্ম এবং প্রমাণিত যে শুধু মাত্র ভঙ্গিকে সম্বল করে বুদ্ধির প্রাখর্য প্রকাশ পায় না, তার জন্য সম্যক মননের প্রয়োজন। ছেঁড়াতারের কবিকল্পনা উদভ্রান্ত; শব্দপ্রয়োগে বাচালতার চিহ্ন এবং মূল্যবোধের অভাব স্পষ্ট, ভঙ্গি শ্লথ। এ জাতীয় কাব্য রচনায় কবির অনেক বেশি প্রযত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

তুলনায় 'মধুর দিনের গল্প' সহজ সুরের কবিতা, প্রসাধন ছটা তার মধ্যে অনুপস্থিত, লেখনি চাতুর্য আদৌ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি কবি-হৃদয় অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছোট ছোট সুখ দুঃখের স্মৃতিকে অবলম্বন করে তাঁর কবিতা অনেকটা লঘুভাবে প্রকাশ পেলেও, কথারীতিকে মেনে নিতে গিয়ে ইংরেজী শব্দকে নির্বিচারে গ্রহণ করলেও আনন্দগোপালের আনন্দ বেদনা আমাদের মনকে অস্পৃশ্য রাখে না। একটি

প্রণয় সুর ঈষৎ বৈরাগ্যের ছোঁয়া-লাগা গীতিলপটি চতুর্দশপদীর গ্রন্থমূর্তি। ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং সম্বোধনে কবিতাগুলির জন্ম, কিন্তু সহজ প্রসন্নতা পাঠককে আকর্ষণ করে। পাণ্ডুলিপিক মুদ্রণে যথেষ্ট গোলমাল রয়েছে।

'অরুন্ধতী'র কবি কাব্যকলার দিক থেকে আগাধুনিক। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বটে, শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও, তিনি গতানুগতিক। কোনো কোনো কবিতার ছন্দ ও স্তবক নির্মিত ভাবসাদৃশ্য যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়।

[৬৩৯।৫৭, ২৪৯।৫৮, ৩০৮।৫৮]

## উপন্যাস

**প্রাণগঙ্গা**—অবিনাশ সাহা। প্রকাশক—প্রকাশ মহল, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৫ ।

নদী মাতৃক বাংলাদেশ। কিন্তু আধুনিক কালের উপন্যাস বাছলে দেখা যাবে তার অধিকাংশই শহর কেন্দ্রিক। আসল নদীর দেশটাই জাতীয় জীবন থেকে দূরে সরে গেছে বলেই এমনটি ঘটছে কি না জানি না, কিন্তু এ-কথা সত্য যে আধুনিককালের কচিৎ কোন লেখক নদী আর নদীর পারের মানুষগুলোকে খুঁজে বেড়াতে চান। সুতরাং পূর্ব বাংলার নদীর চরে গড়ে ওঠা একটা মানব সমাজকে নিয়ে অবিনাশ সাহা যে কাহিনী রচনা করেছেন তা বহু অতৃপ্ত পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

সুদীর্ঘ উপন্যাস। অবধারিতভাবেই আনাগোনা করেছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু এতো বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে সহজভাবে এগিয়ে চলার অসাধারণ ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত লেখকের আয়ত্ত হয়নি। চরিত্র-পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে তাই তাঁকে এমন অনেক ঘটনাকেই আশ্রয় করতে হয়েছে, যার অধিকাংশই অনাবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, লেখক এত বড় বিস্তৃতির মধ্যে না গিয়ে যদি আপন অভিজ্ঞতার গণ্ডীটুকুতেই আবদ্ধ থাকতেন তবে হয়তো উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠতে পারতো।

৮৩।৫৮





## সাধক-জীবনী

**প্রেমের ঠাকুর** (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাতত্ত্ব) প্রথম খণ্ড ॥ শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু, বামদেব সংঘ, ৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর, কলিকাতা—৩৬।

রামকৃষ্ণ পরমাত্মার স্বরূপ, ফলে তাঁহার কথা সমস্ত কিছুই অলিখিত আছে। অনেকেই হৃদয়ের আবেগ দিয়া রামকৃষ্ণ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সুশীলবাবু একজন একথা স্বগর্বে বলা যায়।

এই পুস্তকে সেই সর্বভোলা মানুষটির সকল কথাই আছে, ইহার সহিত সুশীলবাবুর ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান মিশিয়া এক অনবদ্য প্রবন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিশেষত—ব্রাহ্মণী (ভৈরবী) কথা প্রসঙ্গে অর্থাৎ (২৩ অধ্যায়) সুশীলবাবু, তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে আমাদের অনেক যুক্তি দিয়াছেন, যাহা এভাবং এত সুন্দরভাবে অন্য কেহ দিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

২৬৩/৫৮

**আমাদের শ্রীমা** ॥ শ্রীসনাতনশেখর ভদ্র ॥ প্রবর্তক পাবলিশার্স—বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। ১ম সংস্করণ, মূল্য—২ ।

আলোচ্য পুস্তক শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা। লেখকের ভাষা সুন্দর এবং বলিবার ভঙ্গীও অসাধারণ। গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় তাঁহার অপূর্ব ছবিটি ফুটিয়াছে।

লেখক, প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন, "আজ স্বাধীন ভারতের এমন এক মহীয়সী মহিলা" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমাকে স্বাধীন ভারতের কেন বলা হইল বুঝিলাম না শুধু ভারত বলিলেই চলিত। এবং 'জন্মভূমির মহিমা' প্রসঙ্গে "বঙ্গদেশে আটাশটি জেলা, তার মধ্যে বাঁকুড়াও একটি।" একথা কবেকার বঙ্গ—তা বলা উচিত ছিল।

৩৮৬/৫৭

**তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান**—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক—শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ২ টাকা। প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতি দেশীয় সকলেই শ্রদ্ধাবান। তাঁহার লেখায় আমরা যেমন অন্তর্দৃষ্টি পাই অন্যত্র কোথাও এইরূপ দেখা যায় না। বিশেষত আলোচ্য জপ সম্পর্কে যে গভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে, তাহাতে যাঁহারা জপাৎ সিদ্ধি একথা মানিয়া থাকেন তাঁহাদের মনকে দৃঢ় বিশ্বাস দান করিবে।

ইহা ব্যতীত লাট, মহারাজের চরিত্রকে তিনি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, প্রথম প্রথম রামলালের প্রতি সমীহ, ক্রমে তাহা কিরূপ আশ্চর্যভাবে অন্তর্নিহিত হইল। তাহার সত্যনিষ্ঠা, অল্প বয়স হইতে ব্যক্তিত্ববোধ এ সকল কথা তিনি বর্তমানবৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ৬৯৩।৫৬

**জাতীয় আন্দোলনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ॥** কালিদাস মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—নারায়ণ গুপ্ত। দুর্গা মন্দির (গোলবাজার), খড়্গপুর, মেদিনীপুর। ১৩৬৫। মূল্য—।৵০।

আলোচ্য পুস্তিকাকে কালিদাসবাবুর নোটস বলা যাইতে পারে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অন্বেষীদের অনেক জ্ঞান দিবে। মনে হয় কালিদাসবাবু নিজে এ বিষয়ে বিশদভাবে গবেষণা করিলে আমাদের গর্বের কথা হইবে।

## বিবিধ

Ideal Family **Planning — Abul Hasnat, Standard Publishers, Calcutta—12. Price Rs. 2.50 np.**

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৎসরে প্রায় ১০,০০০,০০০ করে বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই পরিমাণে বাড়েনি কাজের সুযোগ, বাড়েনি খাদ্য সরবরাহ। তাই সেই লোক-বল আশীর্বাদ না হয়ে অনেক সময়ই দেখা দেয় অভিশাপ রূপে। অনেক মধ্যবিত্ত ঘরেই নবাগত সন্তান অবাঞ্ছিত বলে অনাদৃত হয়ে থাকে, মানবশিশু পায়না তার উপযুক্ত সমাদর। অথচ আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বহু শিক্ষিত নরনারীর কাছেই জন্মবৃত্তান্তের ইতিবৃত্ত থাকে রহস্যাবৃত, জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটা সম্বন্ধে থাকে শুধুই কৌতূহল আর কিছুটা বা তার সঙ্গে অহেতুক ভয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই ইতিবৃত্তের রহস্যভেদে, কৌতূহল মেটাতে আর ভয় দূর করতে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে। বহুদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লেখক জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে অতি সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন এবং প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশেও প্রয়াস পেয়েছেন। আর তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব, এই আলোচনা করতে গিয়ে কোথাও তিনি সংযম হারাননি, তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কোথাও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি, জিজ্ঞাসিৎসু সকলেই বইখানা পড়ে লাভবান হবেন, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ২৬৭।৫৮

**সাহিত্য পত্রিকা**—মুহম্মদ অবদুল হাই সম্পাদিত। প্রকাশক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙলা বিভাগ। রমনা : ঢাকা। দাম : দু টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র এটি দ্বিতীয় সংখ্যা।

'সাহিত্য পত্রিকা'র এই সংখ্যাটি হাতে পেয়ে একটি কথা প্রথমেই মনে পড়ে, পূর্ব এবং পশ্চিম—দুই বাঙলার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধান থাকলেও সাংস্কৃতিক ঐক্য অক্ষুন্ন।

এই সংখ্যায় পাঁচটি প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছে। আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্‌র 'বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বাকাবলী', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'কানুপার কালনির্ণয়', মুহম্মদ আবদুল হাইর 'বাঙলার ব্যঞ্জন ধ্বনি', আহমদ শরীফের 'আলাউল বিরচিত তোহফা', এবং আনিসুজ্জামানের 'গ্রন্থপরিচয়।'

প্রত্যেক প্রবন্ধে নিষ্ঠা, শ্রম এবং সততার স্বাক্ষর রয়েছে। বিশেষ করে 'বাঙলার ব্যঞ্জনধ্বনি'—এই আলোচনাটি অপূর্ব। phonetic নিয়ে এমন বিজ্ঞানসম্মত একনিষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত এই বোধ হয় প্রথম। রচনাটি আধুনিক ইউরোপীয় ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বক্তব্য, মধ্য যুগের ও প্রাচীন সাহিত্য যেমন, তেমনি আধুনিক সাহিত্যের ঋদ্ধি ও পুষ্টির জন্য সুস্থ এবং বলিষ্ঠ আলোচনার দ্বার 'সাহিত্য পত্রিকা'য় অবারিত হোক। 'সাহিত্য পত্রিকা'র মত serious পত্রিকার প্রয়োজন সকল সাহিত্যে। 'সাহিত্য পত্রিকা'কে আমরা অভিনন্দন জানাই।

The Dictionary of Philosophy. Edited by D. D. Runes. Jaico Publishing House, Mahatma Gandhi Road, Bombay Price Rs. 3-75.

দর্শনের ছাত্র অথবা দর্শন-গ্রন্থের শৌখিন পাঠকের পক্ষে এই পুস্তকটি বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রয়োজনের সময় সহজে ইহার দ্বারা কাজ চলে। বস্তুত "রেফারেন্স" পুস্তক হিসাবে দর্শনের এই ক্ষুদ্র অভিধানখানি সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই রাখিতে পারেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ও বিভিন্ন দর্শনের পরিচয় ব্যতীতও দর্শনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিশেষার্থক শব্দ ও শব্দার্থ ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকটি সম্পর্কে একমাত্র যৌক্তিক আপত্তি এই যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছাপার হরফে এই ধরনের জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি যেভাবে পরিবেশিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকের সম্ভবত সহজে আর পাতা খুলিয়া রেফারেন্স দেখার ধৈর্য থাকিবে না। অথবা একটি আতস-কাচ রাখিতে হইবে। ৪৮।৫৪




চন্দ্রশেখর

## চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয়করণ

প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই স্বাধীনতা পরম ঐশ্বর্য। একজন মানুষের জীবন থেকে আংশিকভাবে কিম্বা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা হরণ ক'রে নিলে তাকে ঠিক সেই পরিমাণে খর্ব করা হয়, বঞ্চিত করা হয়। স্বাধীনতার ঐশ্বর্যকে সার্থকভাবে ব্যবহার ক'রেই মানুষ বিকশিত হয়।

একজন মানুষকে স্বাধীনতা দিলেই যে সে তাকে গ্রহণ ক'রে ব্যবহার করতে পারবে এমন কোনো কথা নেই। আবার, ঐশ্বর্যকে ব্যবহার করবার বিধিও মানুষে-মানুষে বিভিন্ন। সংসারে অধিকাংশ মানুষই যেহেতু স্বল্পকামী, অতএব তাদের পক্ষে অপরিমিত ঐশ্বর্য নিষ্ফল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামান্য স্বাধীনতা পেলেই, তাই তারা তুষ্ট।

কিন্তু মানবসংসারে যারা স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা কখনোই অল্পে সন্তুষ্ট নন। তাদের জন্যে প্রয়োজন উদার উন্মুক্তি। অন্যনির্দেশিত তৈলমসৃণ পথযাত্রায় তাদের তৃপ্তি নেই, তৃপ্তি হ'তে পারে না।

কথাটাকে এখন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যেতে পারে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র এখন পর্যন্ত স্বাধীন। রাষ্ট্রের কোনো তর্জনীতাড়নায় চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় না।

সম্প্রতি চলচ্চিত্রের জাতীয়করণ বিষয়ে দু-একটি উচ্চারণ শোনা গেছে। মানবীয় কণ্ঠনিঃসৃত সেই উচ্চারণের প্রতি বধির হ'য়েই থাকবার কোনো অর্থ হয় না।

কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পের যদি সত্যি সত্যি জাতীয়করণ ঘটে, তার ফল কি খুব উপাদেয় হবে?

সাময়িকভাবে অবশ্য তাতে রাষ্ট্র উপকৃত হ'তে পারে। কোন অর্থে? অর্থের অর্থে। এই শিল্পের লভ্যাংশ রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে যাবে। সেই অর্থ, রাষ্ট্রের মধ্যবর্তিতায়, জনগণের দুর্গতিমোচনের কাজে ব্যবহৃত হবে।

জনগণের রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণকামী হবে, তাতে সকলেরই পূর্ণ সম্মতি বর্তমান। কিন্তু এই কল্যাণই যথার্থ কল্যাণ কি না, সেটা বিচারসাপেক্ষ।

চলচ্চিত্রশিল্পের যদি সত্যি-সত্যি জাতীয়করণ ঘটে, তাহলে চলচ্চিত্রের কী দশা হবে?

# সিনেমা জগৎ

পঞ্চম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা ] ● [ ভাদ্র : ১৮৮০ শকাব্দ

॥ সূচীপত্র ॥



৭০ খানি ছবি যা অন্য কোন পত্রিকায়
এমন কি 'উল্টোরথে'ও দেখতে পাবেন না

॥ এবারের প্রচ্ছদপট ॥

হরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি প্রযোজিত 'ইন্দ্রাণী' ছবির নায়ক-নায়িকা
উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

২২৬ পৃষ্ঠার বই—দাম এক টাকা ও সেল ট্যাক্স



সিনেমা জগৎ : ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

আর কি, চলচ্চিত্রে তখন আর সৃষ্টির আনন্দ থাকবে না, থাকবে আদেশ পালনের নিয়মানুবর্তিতা। আর, সকলেই জানেন, আইনকানুনে ইত্যাদি দ্বারা শৃঙ্খলা আনা যায়, কিন্তু সৃষ্টিতে প্রাণসঞ্চার করা যায় না। চলচ্চিত্রশিল্পে যে-সমস্ত যোগ্য স্রষ্টা নিজেই নিজের প্রভু, জাতীয়করণ দ্বারা তাঁরা এ-ক্ষেত্রে স্বাধীনতাহীন হবেন, দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হবেন, হ'য়ে উঠবেন রাষ্ট্রের হাতে যন্ত্রস্বরূপ। দাস কিম্বা যন্ত্র, আর যাই পারুক, সৃষ্টিকর্ম পারে না। নির্ভুল নিয়মে চলচ্চিত্র, সেই ব্যবস্থায়, শিল্পের বদলে জ্যামিতি হ'য়ে উঠতে বাধ্য।

রাষ্ট্রও কি সেই ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত লাভবান হবে? না। রসধারাকে শুষ্ক ক'রে দিয়ে যে-কল্যাণ তা অভিশাপেরই নামান্তর। প্রাণকে খর্ব ক'রে দেহকে সমৃদ্ধ করলে পশুত্বের স্তব করা হয়। প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে পশুত্বের জয়গান কোনো সভ্য রাষ্ট্রেরই কৃত্য হ'তে পারে না।

**সজ্জনের বক্তব্য**

চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণের জন্যে সরকারের কাছে আবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে চিত্রাভিনেতা সজ্জন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন গত ১৫ই আগস্ট থেকে। চলচ্চিত্র-শিল্পের জাতীয়করণ যাদের কাম্য এমন পাঁচ-হাজার নাগরিকের স্বাক্ষর-সংগ্রহের কাজ সজ্জন ইতিমধ্যেই আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এই আবেদনপত্র যথাসময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে।

চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণের সমর্থনে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সজ্জন বলেছেন যে, চিত্র-প্রযোজকেরা ভারতবর্ষে জনকল্যাণ-রাষ্ট্র-গঠনে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজ-সেবী বিরোধিতায় সচেষ্ট। সজ্জন আরো বলেছেন যে, উপদেশবিতরণে, শিক্ষাদানে ও লোকরঞ্জনে চলচ্চিত্রের শক্তি অপরিমেয়; কিন্তু যৌনতত্ত্ব, অপরাধতত্ত্ব, ও অন্যান্য অসামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে উদ্দেশ্যহীন চিত্রনির্মাণ দ্বারা প্রযোজকেরা এই শক্তির অপব্যবহার করছেন।

সজ্জন বলেছেন আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারারক্ষী চলচ্চিত্র কদাচিৎ নির্মিত হয়। অর্থলোলুপ পরিবেশক ও প্রদর্শকের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করবার জন্যেই নির্মিত হয় অধিকাংশ চলচ্চিত্র।

সজ্জন বলেছেন যে, এই শিল্পের জাতীয়করণ ঘটলে শিল্পসম্মত ও সুরুচিপূর্ণ চিত্র নির্মিত হবে, এবং চলচ্চিত্রক্ষেত্রে বিস্তর অসাধুতার অবসান হবে।

সজ্জন আরো বলেছেন চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণ হওয়ার পরে চিত্র-প্রযোজনার পন্থা নির্ধারণের ভার ন্যস্ত হবে একটি সংসদের উপর, যে-সংসদে অধিষ্ঠিত থাকবেন কয়েকজন অগ্রগণ্য শিল্পী, লেখক, কবি, ঐতিহাসিক, সমালোচক, পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ।

সজ্জনের প্রথম অভিযোগটি মারাত্মক। তিনি চিত্র-প্রযোজকদের জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের শত্রুর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে জনকল্যাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে চিত্রনির্মাণ না করলেই একজন প্রযোজক জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের শত্রু, তার অপবাদে অভিযুক্ত হবেন? জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে কোনো প্রযোজকেরই কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি চিত্র-প্রযোজনায় ব্রতী হবেন। প্রযোজকের কাজ স্বাধীনশিল্প-সম্মত চিত্র-প্রযোজনা, জনকল্যাণ রাষ্ট্রের বন্দনাগান চিত্র-প্রযোজক হিসেবে অবশ্যই তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ নয়।



প্রভাত প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি "বিচারক" -এর একটি আবেগপূর্ণ দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায় ও উত্তমকুমার

যৌনতত্ত্ব ও অপরাধতত্ত্বের প্রতিও, দেখা যাচ্ছে, সজ্জন খড়্গহস্ত। ঐ দুই তত্ত্বকেই তিনি অসামাজিক বিষয়বস্তুর অমর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু যৌনতত্ত্ব, অপরাধতত্ত্ব এবং—এমন কি, তথাকথিত অসামাজিক বিষয়বস্তু নিয়েও সার্থক চিত্ররচনা সম্ভব—এই সত্যটি সজ্জন বিস্মৃত হয়েছেন। কেউ ভুল বুঝবেন না। যৌনতত্ত্ব, অপরাধতত্ত্ব কিংবা অন্যান্য অসামাজিক বিষয়বস্তুকে যারা—শিল্পসৃষ্টির সহায়ক হিসেবে নয়, নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণে ব্যবহার করেন—তারা, কিংবা বলি, তাদের সেই অপকর্ম অবশ্যই নিন্দনীয়।

পরিশেষে বক্তব্য, এই শিল্পের জাতীয়-করণের জন্যে সজ্জনের আগ্রহ অহেতুক, অন্তঃসারশূন্য। জাতীয়করণ ঘটলেই কি, সজ্জনের আশা পূর্ণ ক'রে শিল্পসম্মত ও সুরুচিপূর্ণ চিত্র নির্মিত হবে, চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রের বিস্তর অসাধুতার অবসান হবে?

জাতীয়করণকারক অসাধুতার অবসান ঘটেনি, অন্যান্য উপযুক্ত ক্ষেত্র থেকে এমন দৃষ্টান্ত বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত হলো না। এখানে কেবলমাত্র এই সত্যটুকুর উল্লেখই যথেষ্ট যে, চলচ্চিত্র একটি শিল্প এবং জাতীয়করণের ফলে আইনকানুনের যে-রুদ্ধ-শ্বাস পরিবেশ রচিত হয় তাতে কোনো শিল্পই আশানুরূপ বিকশিত হ'তে পারে না। চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিস্তর অভিযোগ আছে, একথা সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য এই যে, সে-সমস্ত অভিযোগের প্রতিকারের পথ এই শিল্পের জাতীয়করণ নয়।

## চিত্রালোচনা

দুখানি নতুন হিন্দী ছবি এ হপ্তায় মুক্তি পাচ্ছে—বাঙলা একখানিও না।

ফিল্মিস্তান উপহার দিচ্ছেন "হাম ভী কুছ কম নহী", যার শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন সুমিত্রা দেবী, অমিতা ও রঞ্জন। রমণলাল দেশাই এর পরিচালক এবং এস ডি বাতিসের সুরে ছবিখানি সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় হিন্দী ছবিটির নাম "সাহারা"—তসবিরস্তানের নিবেদন। একটি ঘরোয়া


















কাহিনীর নায়িকা হিসেবে মীনাকুমারীকে এতে দেখা যাবে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন লেখরাজ ভকরী, সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার।

• • • •

সেপ্টেম্বরে যেসব বাঙলা ছবি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে, তাদের পুরোভাগে রয়েছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসাঘর," ন্যাশনাল ফিল্মসের গেভাকলারে তোলা "শিকার" এবং সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তিম নিবেদন "ইন্দ্রাণী"। স্বর্গত সতীশ দাশগুপ্তের শেষ ছবি "লীলা-কঙ্ক"ও এই মরসুমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নবারুণ চিত্রের "সূর্যতোরণ", বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের "মরুতীর্থ হিংলাজ", হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে", বি পি প্রোডাকসন্সের "মাহুত বন্ধু রে" প্রভৃতি তৈরী ও সমাপ্ত-প্রায় ছবিগুলিও পুজোবকাশের আগে-পরে দেখা যেতে পারে।

এগুলি ছাড়া, সিসিল বি দ্য মিলের যুগান্তকারী ইংরেজী ছবি "টেন কম্যান্ড-মেণ্টস্" এবং বিমল রায়ের নবতম হিন্দী অবদান "মধুমতী" দর্শকদের আনন্দবর্ধন করতে পুজোর আগেই আসছে। "টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস্" বোম্বাইয়ের একটি সিনেমায় একাদিক্রমে বত্রিশ সপ্তাহ প্রদর্শিত হয়ে এদেশে ইংরেজী ছবির প্রদর্শনক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিমল রায়ের "মধুমতী" সম্বন্ধেও দর্শকদের প্রত্যাশা প্রচুর। ছবিখানি তিন বছর ধরে তোলা হয়েছে এবং এর শ্রেষ্ঠাংশে দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা অপূর্ব অভিনয় করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

• • •

"লুকোচুরি"র সাফল্যের পর কিশোরকুমার বাঙলা দর্শকদের উপহার দেবেন "পাগলা-বাবু"। কিশোর ফিল্মসের এই দ্বিতীয় চিত্রটির মহরৎ গত সোমবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। মহরৎ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলেও, "লুকো-চুরি"র মতই এ ছবিখানিও মুখ্যত বোম্বাইয়ের স্টুডিওতে তোলা হবে। "লুকোচুরি"র সমস্ত কলাকুশলী এর সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। কমল মজুমদার "পাগলা-বাবু"র কাহিনীকার ও পরিচালক, হেমন্তকুমার এর সুরকার, ছবি তুলবেন অজয় দাশগুপ্ত এবং নামভূমিকায়—বলতে হবে কি?—স্বয়ং কিশোরকুমারই চিত্রাবতরণ করবেন।

• • • •

কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য এবার পরিচালকরূপে দেখা দেবেন। কে কে প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রচেষ্টা "সংঘাত" তাঁর রচিত গল্প অবলম্বনে এবং তাঁরই পরিচালনায় গৃহীত হবে। ছবিখানির

শুভ মহরৎ গত ২২শে আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঐদিনই আরো একটি নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে। ছবিখানির নাম "ত্রিপুষ্কর"—মাধবী চিত্রমের দ্বিতীয় অর্ঘ্য। এর কাহিনী রচনা করেছেন সুবাহু।

গত ১৫ই আগস্ট থেকে জেসি ফিল্মসের "সৃষ্টি ও স্রষ্টা"র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে। বিশু সরকার এর গল্প লিখেছেন এবং পরিচালনাও করছেন।

### সাধক জীবনী

বীরভূমের তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা সাধক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁরই জীবনকথা অবলম্বন করে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র চিত্র-কাহিনী গড়ে উঠেছে।

বাল্যকাল থেকেই বামা ভক্ত। তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভক্ত। মন্দিরের তারা-দেবীকে বামা কেবলমাত্র প্রতিমা বলে জানে না, তাঁকে সে 'মা' বলে জানে। বামার কাছে তারা দেবী 'বড় মা'। নিজের মাকে বলে, 'ছোট-মা'।

মায়ের দেখা পাওয়া যাবে কবে! সেজন্যে বামার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বামা বড়ো হলো, তার ব্যাকুলতাও বাড়লো। একজন সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিলো বামা। তার মনস্কামনা পূর্ণ হলো—মায়ের দেখা পেয়ে ধন্য হলো সে।

কালক্রমে মস্ত সাধক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়লো বামার। লোকে তাঁকে বলে—বামা-ক্ষ্যাপা। একদা যারা বামাকে ভণ্ড বলেছে, তারাও শেষ পর্যন্ত এই সাধকের পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়লো।

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান (প্রাইভেট) লিঃ নিবেদন করেছেন, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র, পরিচালনা করেছেন নারায়ণ ঘোষ। অনেক অলৌকিক ঘটনা 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'য় সন্নিবেশিত হয়েছে। বামা-ক্ষ্যাপার জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাদের অন্তরঙ্গতা নেই, এই ছবি দেখে তাদের পক্ষে সাধক বামাক্ষ্যাপার পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। কেবলমাত্র অলৌকিক শক্তির বলেই যে একজন মানুষ সাধক ব'লে চিহ্নিত হন না, এই সত্যটির প্রতি মনে হয়, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যথাযোগ্য দৃষ্টি-পাত করেন নি।

চিত্রটির প্রথমার্ধের গতি আশানুরূপ নয়। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধ অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। সংলাপ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

সাধক বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর অভিনয় করেছেন তিনি। বামাক্ষ্যাপার দীক্ষাদাতা একজন সন্ন্যাসীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস তাঁর নৈপুণ্যের ছাপ রেখেছেন। বামাক্ষ্যাপার মায়ের ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়ও চরিত্রোচিত। অন্যান্য ভূমিকাভিনয় মানানসই। বালক বামাবেশী নবাগত কিশোর অভিনেতা শ্রীমান জ্যোতি তার সহজ ও অনাড়ম্বর অভিনয়ের গুণে সবারই প্রশংসা পাবে।

চিত্রগ্রহণ করেছেন সন্তোষ গুহ রায়, শব্দগ্রহণ করেছেন মণি বসু ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। টেকনিক্যাল কাজ নিন্দনীয় হয়নি।

সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচি। সর্বসমেত আটখানি কণ্ঠসংগীত আছে 'সাধক বামাক্ষ্যাপায়'। সব গানই সুগীত; কয়েকখানা বিশেষভাবে তৃপ্তিকর। যন্ত্রসংগীতের মধ্যবর্তিতায়ও সংগীত-পরিচালক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

## বিবিধ সংবাদ

গত সোমবার থেকে ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অধিবেশন শুরু

কাহিনীর নায়িকা হিসেবে মীনাকুমারীকে এতে দেখা যাবে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন লেখরাজ ভকরী, সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার।

• • • •

সেপ্টেম্বরে যেসব বাঙলা ছবি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে, তাদের পুরোভাগে রয়েছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসাঘর," ন্যাশনাল ফিল্মসের গেভাকলারে তোলা "শিকার" এবং সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তিম নিবেদন "ইন্দ্রাণী"। স্বর্গত সতীশ দাশগুপ্তের শেষ ছবি "লীলা-কঙ্ক"ও এই মরসুমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নবারুণ চিত্রের "সূর্যতোরণ", বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের "মরুতীর্থ হিংলাজ", হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে", বি পি প্রোডাকসন্সের "মাহুত বন্ধু রে" প্রভৃতি তৈরী ও সমাপ্ত-প্রায় ছবিগুলিও পূজাবকাশের আগে-পরে দেখা যেতে পারে।

এগুলি ছাড়া, সিসিল বি দ্য মিলের যুগান্তকারী ইংরেজী ছবি "টেন কম্যাণ্ড-মেণ্টস্" এবং বিমল রায়ের নবতম হিন্দী অবদান "মধুমতী" দর্শকদের আনন্দবর্ধন করতে পুজোর আগেই আসছে। "টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস্" বোম্বাইয়ের একটি সিনেমায় একাদিক্রমে বত্রিশ সপ্তাহ প্রদর্শিত হয়ে এদেশে ইংরেজী ছবির প্রদর্শনক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিমল রায়ের "মধুমতী" সম্বন্ধেও দর্শকদের প্রত্যাশা প্রচুর। ছবিখানি তিন বছর ধরে তোলা হয়েছে এবং এর শ্রেষ্ঠাংশে দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা অপূর্ব অভিনয় করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

• • •

"লুকোচুরি"র সাফল্যের পর কিশোরকুমার বাঙলা দর্শকদের উপহার দেবেন "পাগলা-বাবু"। কিশোর ফিল্মসের এই দ্বিতীয় চিত্রটির মহরৎ গত সোমবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। মহরৎ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলেও, "লুকো-চুরি"র মতই এ ছবিখানিও মুখ্যত বোম্বাইয়ের স্টুডিওতে তোলা হবে। "লুকোচুরি"র সমস্ত কলাকুশলী এর সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। কমল মজুমদার "পাগলা-বাবু"র কাহিনীকার ও পরিচালক, হেমন্তকুমার এর সুরকার, ছবি তুলবেন অলক দাশগুপ্ত এবং নামভূমিকায়—বলতে হবে কি?—স্বয়ং কিশোরকুমারই চিত্রাবতরণ করবেন।

• • • •

কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য এবার পরিচালকরূপে দেখা দেবেন। কে কে প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রচেষ্টা "সংঘাত" তাঁর রচিত গল্প অবলম্বনে এবং তাঁরই পরিচালনায় গৃহীত হবে। ছবিখানির

শুভ মহরৎ গত ২২শে আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঐদিনই আরো একটি নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে। ছবিখানির নাম "ত্রিপুঙ্কর"—মাধবী চিত্রমের দ্বিতীয় অর্ঘ। এর কাহিনী রচনা করেছেন সুবোহু।

গত ১৫ই আগস্ট থেকে জেসি ফিল্মসের "সৃষ্টি ও স্রষ্টা"র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে। বিশু সরকার এর গল্প লিখেছেন এবং পরিচালনাও করছেন।

### সাধক জীবনী

বীরভূমের তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা সাধক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁরই জীবনকথা অবলম্বন করে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র চিত্র-কাহিনী গড়ে উঠেছে।

বাল্যকাল থেকেই বামা ভক্ত। তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভক্ত। মন্দিরের তারা-দেবীকে বামা কেবলমাত্র প্রতিমা বলে জানে না, তাঁকে সে 'মা' বলে জানে। বামার কাছে তারা দেবী 'বড় মা'। নিজের মাকে বলে, 'ছোট-মা'।

মায়ের দেখা পাওয়া যাবে কবে! সেজন্যে বামার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বামা বড়ো হলো, তার ব্যাকুলতাও বাড়লো। একজন সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিলো বামা। তার মনস্কামনা পূর্ণ হলো—মায়ের দেখা পেয়ে ধন্য হলো সে।

কালক্রমে মস্ত সাধক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়লো বামার। লোকে তাঁকে বলে—বামা-ক্ষ্যাপা। একদা যারা বামাকে ভণ্ড বলেছে, তারাও শেষ পর্যন্ত এই সাধকের পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়লো।

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান (প্রাইভেট) লিঃ নিবেদন করেছেন, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র, পরিচালনা করেছেন নারায়ণ ঘোষ। অনেক অলৌকিক ঘটনা 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'য় সন্নিবেশিত হয়েছে। বামা-ক্ষ্যাপার জীবনকাহিনীর সংগে যাদের অন্তরংগতা নেই, এই ছবি দেখে তাদের পক্ষে সাধক বামাক্ষ্যাপার পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। কেবলমাত্র অলৌকিক শক্তির বলেই যে একজন মানুষ সাধক ব'লে চিহ্নিত হন না, এই সত্যটির প্রতি মনে হয়, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যথাযোগ্য দৃষ্টি-পাত করেন নি।

চিত্রটির প্রথমার্ধের গতি আশানুরূপ নয়। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধ অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। সংলাপ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

সাধক বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর অভিনয় করেছেন তিনি। বামাক্ষ্যাপার দীক্ষাদাতা একজন সন্ন্যাসীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস তাঁর নৈপুণ্যের ছাপ রেখেছেন। বামাক্ষ্যাপার মায়ের ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়ও চরিত্রোচিত। অন্যান্য ভূমিকাভিনয় মানানসই। বালক বামাবেশী নবাগত কিশোর অভিনেতা শ্রীমান জ্যোতি তার সহজ ও অনাড়ম্বর অভিনয়ের গুণে সবারই প্রশংসা পাবে।

চিত্রগ্রহণ করেছেন সন্তোষ গুহ রায়, শব্দগ্রহণ করেছেন মণি বসু ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। টেকনিক্যাল কাজ নিন্দনীয় হয়নি।

সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচি। সর্বসমেত আটখানি কণ্ঠসংগীত আছে 'সাধক বামাক্ষ্যাপায়'। সব গানই সংগীত; কয়েকখানা বিশেষভাবে তৃপ্তিকর। যন্ত্রসংগীতের মধ্যবর্তিতায়ও সংগীত-পরিচালক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

## বিবিধ সংবাদ

গত সোমবার থেকে ভেনিসের আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অধিবেশন শুরু

হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ১২৫খানি বাছা-বাছা ছবি এই উৎসবে প্রতিযোগিতা করতে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে ১৪খানি সেরা ছবি উৎসবের শ্রেষ্ঠ সম্মান Grand Prix-এর জন্যে প্রতিযোগিতা করবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া আরো ৬খানি ছবি





ইংরেজি ছবি "হ্যারি ব্ল্যাকে"র একটি পার্শ্ব চরিত্রে প্রখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা আই এস জোহর

নির্বাচিত হয়েছে উল্লিখিত ১৪খানির সঙ্গে অন্যান্য পুরস্কারের জন্যে প্রতিযোগিতা করতে।

এল বি ফিল্মস্ ইণ্টার-ন্যাশন্যালের বাংলা ছবি "অযান্ত্রিক" শেষোক্ত ৬খানির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

* * *

কিশোর ফিল্মসের "লুকোচুরি"র রজত-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় গত সপ্তাহে। সেই উপলক্ষে ছবির প্রযোজক ও প্রধান অভিনেতা কিশোরকুমার, পরিচালক কমল মজুমদার, সহ-অভিনেত্রী অনীতা গুহ এবং ইউনিটের অন্যান্য কলাকুশলী কলকাতায় আসেন। গত রবিবার সকালে শ্রী চিত্রগৃহে "লুকোচুরি"র একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উপস্থিত ছিলেন। প্রযোজক কিশোরকুমার ও পরিবেশক দীপচাঁদ কাঁকোড়িয়ার তরফ থেকে রাজ্যপালের হাতে একখানি পাঁচ-হাজার টাকার চেক দেওয়া হয় তাঁর বন্যা-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে। একটি ছোট অথচ মনোজ্ঞ বক্তৃতায় শ্রীমতী নাইডু সমাজ-সেবায় চিত্রশিল্পের এই অকুণ্ঠ দানের জন্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

### বিদেশের নাট্য-আন্দোলন

বিশ্বরূপার উদ্যোগে গত ৯ই আগস্ট হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু এবং গত ২৩শে আগস্ট প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে দুটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতার অন্তর্গত অভিনয়ের প্রাক্কালে।

শ্রী বসু বলেন, আমেরিকার চলচ্চিত্র আজ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুললেও, ওদেশে নাট্যকলার সমাদর কিছুমাত্র কমে নি—বরং বেড়েই চলেছে। জনসাধারণের নাট্য-প্রীতিকে জীইয়ে রেখেছে আমেরিকার পেশাদারী ও শৌখীন নাট্যসংস্থাগুলি। নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে হচ্ছে পেশাদারী থিয়েটারের কেন্দ্রস্থল। লোকরঞ্জন এখানকার নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও তাদের অভিনয়ের মান খুব উন্নত। ব্রডওয়ের কোন নাট্যশালায় অভিনয় করবার সুযোগ পাওয়া যে কোন শিল্পীর পক্ষে ভাগ্যের কথা। ব্রডওয়ের বাইরে যেসব পেশাদারী সম্প্রদায় নিয়মিত অভিনয় করে, তারা নানারকমের নাটক পরিবেশন করে জনসাধারণের নাট্য-বোধকে মার্জিত করে তোলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নাট্যপ্রচেষ্টা। নাটক ও অভিনয় নিয়ে এত বিভিন্ন ধারায় তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে যে, আগামী-কালের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা যেমন সারাদিনের কর্ম অন্তে ঘরে ফিরি, ওদেশের খেটে-খাওয়া মানুষ যায় থিয়েটারে। তাই সেখানে দর্শকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। ফ্রান্স ব্যালে-নৃত্যের জন্মস্থান হলেও তার অধিনায়কত্ব করছে আজ রাশিয়া। সমগ্র রাশিয়াতে নাট্যমঞ্চের সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। নাটক, ব্যালে, পুতুল-নাচ ইত্যাদির আলাদা আলাদা প্রেক্ষাগৃহ আছে। কলাকৌশলের উৎকর্ষ সত্ত্বেও রাশিয়ার পুতুল-নাচ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুশী করতে পারে নি। "সবই আছে—আলো, সংগীত, দৃশ্যপট, কথাবার্তা—কিন্তু সবই কেমন যেন প্রাণহীন, রসহীন, সার্কাসের কসরতের মত"—বক্তা বলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে "আন্না কারেনিনা"র অভিনয় দেখে তিনি আবার অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, বর্তমান যৌন-সমস্যাপ্রপীড়িত ইউরোপের মধ্যে বোধ করি ঐ একটি দেশ, যেখানকার নাটক এখনও যৌন-সমস্যাসঙ্কুল হয়নি।

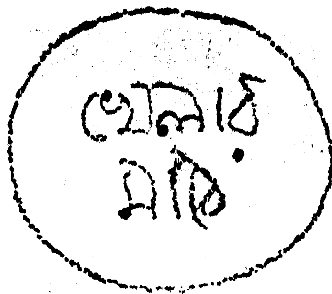
৩০শে আগস্ট থেকে প্রতি শনিবার অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিটে বিশ্বরূপায় ড্রামা সেমিনারের অধিবেশন বসবে। যেসব বক্তা এতে অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য অধ্যাপক অজিত ঘোষ, শ্রীপঙ্কজ দত্ত প্রভৃতি।

কলকাতার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য এবং বর্তমানে পাকিস্থানের সাঁতারু ব্রজেন দাশের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের খবর গত সপ্তাহের খেলাধুলোর খবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় খবর। ব্রজেন দাশের এই অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য পাকিস্থান নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারে। ভারতেরও গর্ব অনুভব করার কারণ আছে। শুধু পাকিস্থান আর ভারতের কথাই বা বলি কেন? পূর্ব-এশিয়ার মধ্যে ব্রজেন দাশই একমাত্র সাঁতারু যিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৮৭৫ সালে ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সর্বপ্রথম ভয়াবহ ও দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে খেলাধুলোর ইতিহাসে যেমন অমর হয়ে আছেন—আমেরিকান তরুণী গ্রেট্রুড ইডার্লি মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে যেমন সাঁতারের পূজারীদের মধ্যে হয়েছেন স্মরণীয়া ও বরণীয়া, তেমন পূর্ব বাংলার সাঁতারু ব্রজেন দাশ প্রথম প্রচেষ্টাতেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দুরূহ সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে পাকিস্থান, ভারত তথা পূর্ব-এশিয়ার সাঁতার ক্ষেত্রে এক অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দুরূহ সাঁতার প্রতিযোগিতায় ব্রজেন দাশ শুধু সাফল্যই অর্জন করেননি। পুরুষ সাঁতারুদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং পুরুষ ও মহিলা সমেত মোট ৩০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন গতবারের প্রথম স্থান অধিকারিণী মার্কিন তরুণী মিসেস গ্রেটা এণ্ডারসন। বলা বাহুল্য, মিসেস এণ্ডারসন ও ব্রজেন দাশ উভয়েই পাঁচশ পাউণ্ড করে পুরস্কার পাবেন। এক সহস্র গিনি মূল্যের 'বার্টলিন ট্রফি' এ বছরও থাকবে মিসেস এণ্ডারসনের অধিকারে। গ্রেটা এণ্ডারসন আগামীবারও প্রথম স্থান অধিকার করলে বার্টলিন ট্রফি তার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

* * *

ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের বিপদসংকুল সাঁতার প্রতিযোগিতায় একজন মহিলার পক্ষে উপর্যুপরি দুবার প্রথম স্থান অধিকার করা খুবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই। চ্যানেল অতিক্রম করতে গতবার গ্রেটা এণ্ডারসনের সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট। আর এবার ঠিক ১১ ঘণ্টায় গ্রেটা চ্যানেল অতিক্রম করে মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। মাত্র ১০ মিনিটের জন্য এণ্ডারসন বিশ্ব রেকর্ডকে ম্লান করতে পারেননি। ১৯৫০ সালে মিশরের সাঁতারু হাসান আব্দেল রহিম মাত্র ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে




**একলব্য**

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে যে বিশ্ব রেকর্ড করে রেখেছেন, তা আজও অম্লান আছে। গত বছর ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটে চ্যানেল অতিক্রম করে গ্রেটা এণ্ডারসন ইংলণ্ডের মিস ব্রেণ্ডা ফিসারের রেকর্ড



সন্তরণবীর ব্রজেন দাশ

(১২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট) ভাংগবার সংকল্প করেছিলেন। এবার তার সে সংকল্প পূর্ণ হয়েছে। কে জানে, আগামীবার মিসেস এণ্ডারসন আব্দেল রহিমের বিশ্ব রেকর্ডও ভেংগে দেবেন কিনা।

ডেনমার্কের সাঁতারপটিয়সী গ্রেটা এণ্ডারসন কয়েক বছর আগে আমেরিকার এক শরীর শিক্ষাবিদের সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এখন আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। ইনি ক্যালিফোর্নিয়ার লং-বীচের অধিবাসিনী। বয়স ৩১ বছর। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে গ্রেটা এণ্ডারসন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং প্রধানত গ্রেটার কৃতিত্বেই ডেনমার্কের মহিলা রিলে টীম ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। লণ্ডন অলিম্পিকে গ্রেটা এণ্ডারসন ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলেরও অন্যতমা প্রতিযোগিনী ছিলেন। কিন্তু ২০০ মিটার অতিক্রম করার পর শ্রমকাতরতায় গ্রেটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ফলে সাহায্যকারীর সহায়তায় তাকে জল থেকে তোলা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, কুমারী জীবনে যে তরুণী ৪০০ মিটার সাঁতার কাটতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, বিবাহিত জীবনে সেই তরুণীই তরংগ-সংকুল ও ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতারে পর পর দুইবার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, মহিলা সাঁতারু হিসাবে প্রতিষ্ঠাও করেছেন নতুন রেকর্ড।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে ব্রজেন দাশের সময় লেগেছে ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও মিসেস এণ্ডারসনের উপকূলে পৌছনর ৩ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট পরে ব্রজেন দাশ ডোভার উপকূলের মাটি স্পর্শ করেছেন। ডোভার উপকূলের কাছাকাছি আসবার পর প্রবল স্রোতের টানে ব্রজেন দাশকে বার বার পিছিয়ে যেতে হয়। জল-স্রোতের তীব্র গতির সংগে দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন সংগ্রাম করে ব্রজেন শেষ পর্যন্ত ডোভার উপকূলের মাটি স্পর্শ করেন। ৫জন মহিলা সমেত বিশ্বের ৩০জন প্রতিযোগী এবারকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে মাত্র ৪জন প্রতিযোগী গন্তব্য স্থানে পৌছুতে সক্ষম হয়েছেন। বাকি ২৬জন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছুবার আগেই জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হন। গতবার ২৬জন প্রতিযোগীর মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন মাত্র দুজন প্রতিযোগী—আমেরিকার মিসেস গ্রেটা এণ্ডারসন, আর ইংলণ্ডের বেনেথ রে।

* * *

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সত্যই এক দুরূহ ব্যাপার। ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে অপর পার ইংলণ্ডের ডোভার উপকূলে পর্যন্ত আড়াআড়ি পথে চ্যানেলের দূরত্ব একুশ বাইশ মাইলের মত। কিন্তু প্রবল স্রোতের টানে আঁকাবাঁকাভাবে চ্যানেল অতিক্রম করতে প্রায় ৪০ মাইল পথ সাঁতার

কেটে পার হতে হয়। শুধু স্রোতের টান আর পথের দুরত্বই সাফল্যের পথের প্রধান অন্তরায় নয়। ইংলিশ চ্যানেলের বরফগলা ঠান্ডা জলে বেশীক্ষণ থাকা যেমন অসম্ভব, তেমন এর দুরন্ত স্রোত আর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সাঁতার কাটাও অসাধ্য সাধনের নামান্তর। এছাড়া ইংলিশ চ্যানেল হচ্ছে জানা অ-জানা অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল। এর মধ্যে 'জেলী ফিসের' অত্যাচারই বেশী। সাঁতারুদের গায়ের 'গ্রীজের' লোভে জেলী ফিস প্রায় সব সময় দুলের মত সাঁতারুদের গায়ে লেগে থাকে। চ্যানেলের লবণাক্ত জলও কম অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যদিও লবণাক্ত জল থেকে চোখকে রক্ষার করবার জন্য সাঁতারুরা আটসাট করে 'গগলস' পরে থাকেন, তবুও অনেকক্ষণ ধরে জলে থাকবার ফলে 'গগলসের' আশপাশ দিয়ে লোনা জল চোখে ঢুকে সাঁতারুদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাঁতারুদের আর এক মহা ভাবনার বিষয়। কখন যে ঝড় উঠে চ্যানেলের বুকে প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি করবে, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। স্রোতের টান আবার দ্বিমুখী। একটি স্রোত আসে উত্তরদিকের নর্থ পোল থেকে, যাকে বলা হয় 'ল্যাব্রাডর কারেণ্ট'। আর একটি স্রোত আসে দক্ষিণ দিকের গালফ অব মেক্সিকো থেকে। একে বলা হয় গালফ স্ট্রীম। ল্যাব্রাডর কারেণ্টের জল একেবারেই হিমশীতল। এত শীতল যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। ইংলিশ চ্যানেলের ঠান্ডা জল সম্পর্কে চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতার টেকনিক্যাল অ্যাড-ভাইসার স্যাম রকেট বলেছেন—'তুমি শীত-প্রধান দেশ থেকেই আস আর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশ থেকেই আস, ইংলিশ চ্যানেলের জল তোমার হাড় দংশন করবেই।' অবশ্য গালফ স্ট্রীমে ল্যাব্রাডর কারেণ্টের মত হাড় কাঁপানো শীত নেই, একটু উষ্ণ। তবু অসহনীয়। দুই দিক থেকে প্রবাহিত দুই রকমের স্রোতের টানা পোড়েনের মধ্যে সাঁতারুরা খেই হারাতেও বাধ্য। এতরকমের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ৪০ মাইল পথ সাঁতার কেটে পার হওয়া সত্যই অসাধ্য সাধনের সামিল। জীবন মৃত্যুকে যারা পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করেন; দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, আর দুস্তর পারাবারকে মনে করেন তুচ্ছ, যাদের মনে আছে অসাধ্য সাধনের অদম্য উৎসাহ, তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব।



ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতারে উপর্যুপরি দু'বছরের বিজয়িনী গ্রেটা এন্ডারসন

• • •

আজ ইংলিশ চ্যানেল অভিযানে ব্রজেন দাশের সাফল্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ব্যারিস্টার মিহির সেনের ব্যর্থতার প্রশ্ন এসে পড়ে। মিহির সেন তিনবার চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হয়েছেন। গতবার সাড়ে ১৪ ঘণ্টা জলে থেকেও তিনি ডোভার উপকূলের মাটি স্পর্শ করতে পারেননি। গতবার ভারতের আর একটি ছেলেও চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করেছিল। এর নাম হিমাদ্রি রায়। হিমাদ্রি রায় চন্দননগরের অধিবাসী এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কর্মী। কিন্তু অল্প সময় জলে থেকেই হিমাদ্রি রায় প্রচণ্ড শীতে কাতর হয়ে জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হয়।

স্বীকার করতে বাধা নেই মিহির সেনের অসাফল্যই আজ ব্রজেন দাশের সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলেছে। কারণ মিহির সেনই এই উপ-মহাদেশের প্রথম সাঁতারু যিনি চ্যানেল অতিক্রমের প্রথম প্রচেষ্টা করেছেন, আর অন্য সাঁতারুদের মনে জুগিয়েছেন অসাধ্য সাধনের প্রেরণা।

২৭ বছর বয়স্ক যুবক ব্রজেন দাশ নদীমাতৃক এই বাঙলা দেশেরই ছেলে। ঢাকার অধিবাসী এবং মেঘনা পদ্মার আবহাওয়ায় লালিত পালিত। শিশুকাল থেকেই ব্রজেনের সাঁতারের প্রতি গভীর আসক্তি ছিল। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ দেশ বিভাগের পূর্বে সন্তরণ কৌশল দেখাবার জন্য ঢাকায় গেলে ব্রজেন দাশ শ্রীঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং সাঁতারের উন্নত কলা কৌশল শিখবার জন্য কলকাতায় এসে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে ভর্তি হন। এখানে তিনি প্রফুল্ল ঘোষ এবং এস পি গোস্বামীর কাছে সাঁতারের কলাকৌশল শিখতে আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই স্বল্প পাল্লা ও দূরপাল্লার সাঁতারে পটু হয়ে ওঠেন। এই সময় ব্রজেন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করলেই প্রধানত স্বল্প পাল্লার সাঁতারু হিসাবেই ব্রজেনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বাঙলার ১০০ মিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় বহুবার তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারতের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতাতেও ব্রজেন একবার বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্প্রতি কয়েক বছর তিনি আদি বাসস্থান ঢাকায় বাস করছেন। তবে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সদস্য পদ এখনো ত্যাগ করেননি। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভ্য।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দুর্বার বাসনা নিয়ে কিছুকাল ধরে ব্রজেন মেঘনা ও পদ্মার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সাঁতার অভ্যাস করছিলেন। চার পাঁচ মাস আগে ব্রজেন পদ্মা ও মেঘনার বুকে নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ মাইল সাঁতার কেটে পার হবার এক প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ৪২ মাইল পথ সাঁতার কাটবার পর তিনি জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হন। পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁ এই সময় এই অসম সাহসী যুবককে অভিনন্দন জানান এবং ব্রজেনের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য এক ধনভাণ্ডারের আয়োজন করেন। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও ব্রজেন আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। তাই ব্রজেনের সাফল্যে পাকিস্থানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমানের গর্ব করবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব পাকিস্থানে দুই মাস কাল গবর্নরের শাসন বলবৎ থাকবার পর আবার আতাউর রহমান মন্ত্রিত্বের গদি দখল করেছেন এবং ব্রজেন দাশের চ্যানেল অতিক্রমের সংবাদে আনন্দিত হয়ে স্কুল, কলেজ ও সরকারী অফিস আদালত আধ দিনের জন্য ছুটি দিয়েছেন। খেলাধূলোকে পাকিস্থান কি-ভাবে গ্রহণ করেছে, এই ছোট ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

• • •

ব্রজেন দাশের ইংলিশ চ্যানেল অভিযানে পাকিস্থান সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। এই প্রসঙ্গে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের আর একজন খ্যাতনামা সাঁতারু ডাঃ বিমল চন্দ্রের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। দূরপাল্লার সাঁতারু ডাঃ বিমল চন্দ্রও এবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের নিশ্চেষ্টতার ফলে তার

আশা পূর্ণ হয়নি। ডাঃ চন্দ্র চ্যানেল অভিযানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে ভারতের শিক্ষাদপ্তর এবং শিক্ষা-দপ্তরের অধীন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টসের কাছে আবেদন করেন। অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল ডাঃ চন্দ্রকে রাজ্য সরকারের সংগে এই বিষয়ে পত্রালাপ করতে পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কাছেও আবেদন করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্তও তার কোন উত্তর আসেনি। ইতিপূর্বে চ্যানেল অতিক্রম করবার জন্য মিহির সেনকে ভারত সরকারের তরফ থেকে অর্থ সাহায্য করা হলেও ভারতের অলিম্পিক-সাঁতারু ডাঃ বিমল চন্দ্রকে হয় অযোগ্য মনে করা হয়েছে, না হয় তাঁর প্রতি করা হয়েছে বিমাতাসুলভ ব্যবহার।

লণ্ডন যাত্রার আগে ব্রজেন দাশ কলকাতায় এসে তাঁর ট্রেনার কোচ এবং ক্রীড়াক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। এই সময় খেলাধূলা ক্ষেত্রের এক প্রধান পরিচালক, যিনি অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের এক প্রধান স্তম্ভ, তিনি ব্রজেনকে যে কথা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করবার মত। তিনি বলেছিলেন—"উৎসাহী যুবক, আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করতে চাই না, কিন্তু মনে রেখ কলকাতার হেদুয়ায় এবং পূর্ব বাঙলার নদীনালায় সাঁতার কাটা এক কথা, আর ইংলিশ চ্যানেলের হিম-শীতল জল ও উত্তাল তরংগের মধ্যে সাঁতার কাটা ভিন্ন কথা। ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার কাটা যে কি ভীষণ ব্যাপার, তা ভারতের একমাত্র মিহির সেনই জানে।"

ক্রীড়া-পরিচালক প্রথমে অবশ্য বলেছেন, 'আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করতে চাই না,' কিন্তু পরে যা বলেছেন, তা কি নিরুৎসাহের নামান্তর নয়? বলতে দ্বিধা নেই, এই পরিচালকদের নিয়েই অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল। সুতরাং ডাঃ বিমল চন্দ্রের আবেদনে সাড়া না দেওয়াই এ'দের পক্ষে স্বাভাবিক। চ্যানেল অভিযানে গেলে বিমল চন্দ্র সাফল্য অর্জন করতে পারতেন, একথা অবশ্য জোর করে বলা যায় না। তবে ডাঃ চন্দ্র ব্রজেন দাসের সমগোত্রীয় সাঁতারু, বিশেষ করে দূরপাল্লার সাঁতারে অধিকতর সুনামের অধিকারী। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেলে ডাঃ চন্দ্রও হয়তো ব্রজেন দাশের মত সাফল্য অর্জন করতে পারতেন।

• • •

প্রচার এবং প্রোপাগাণ্ডার মূল্য অনেকখানি। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। ১৯৫৪ সালের মে মাসের ৬ তারিখে অক্সফোর্ডের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ৩ মিনিট ৫৯·৪ সেকেণ্ড সময়ে এক মাইল দৌড়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে ইংলণ্ডের দৌড়বীর রজার ব্যানিস্টার অ্যাথলেটিক



মাইল দৌড়ে বিস্ময়কর রেকর্ডের অধিকারী হার্বার্ট ইলিয়ট

বিশ্বে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান দৌড়বীর হার্বার্ট ইলিয়ট আগস্টের ৬ তারিখে ডাবলিনের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মাত্র ৩ মিনিট ৫৪·৫ সেকেণ্ড এক মাইল পথ দৌড়ে সে সাড়া জাগাতে পেরেছেন কি? এখানেই প্রোপাগাণ্ডার মূল্য। ৪ মিনিটের কম সময়ে ব্যানিস্টার মাইল পথ অতিক্রম করায় ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ব্যানিস্টারের কৃতিত্বকে অসাধ্য-সাধনের সংগে তুলনা করেছিল। ব্রিটিশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মুখপাত্র 'ওয়ার্লড স্পোর্টস' লিখেছিল—'ব্যানিস্টার ব্রিংগস্ গ্লোরী টু ইংলণ্ড। আরও কত-ভাবে প্রোপাগাণ্ডা করা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। বলা হয়েছিল ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ অতিক্রম করা অ্যাথলেটিক কোচ এবং দেহ বিজ্ঞানী চিকিৎসকরা অসম্ভব বলেই মনে করতেন। তাদের সুচিন্তিত অভিমত ছিল রক্তমাংসে গড়া কোন মানুষের পক্ষে ৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ দৌড়ান সম্ভব নয়। ১৯৪৫ সালে সুইডেনের বিশ্বখ্যাত অ্যাথলীট গুন্দার হেগ ৪ মিনিট ১·৪ সেকেণ্ড সময়ে মাইল-দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করবার ৯ বছর পরে অবশ্য রজার ব্যানিস্টার ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। কিন্তু তারপর বিশ্বের পঁচিশ ত্রিশজন দৌড়বীর ব্যানিস্টারের রেকর্ড ম্লান করেও ব্যানিস্টারের সম্মান অর্জন করতে পারেননি। সর্বশেষে অস্ট্রেলিয়ার হার্ব ইলিয়ট যে সময়ে মাইল পথ অতিক্রম করেছেন, তা অ্যাথলেটিক বিশ্বকে সত্যই বিস্ময়ে হতবাক করে তুলেছে। রেকর্ড ভাংগা-গড়ার খেলায় আজ বিশ্বের সর্বত্রই অ্যাথলীটদের মধ্যে চলছে জোর প্রস্তুতি। মানুষের অপরিমেয় শক্তি ও তার নিরলস সাধনা বিশ্ব রেকর্ডকে ক্রমেই হ্রস্ব করে আনছে। কে জানে এর শেষ কোথায়?

## দেশী সংবাদ

১৯শে আগস্ট—অদ্য অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। উনিশ বছর আগে ঠিক এমনই এক অপরাহ্নে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, আজ সেনাবাহিনী দিল্লীর জল সরবরাহ ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিতেছে। শ্রী নেহরু বলেন, জল যাহাতে দূষিত না হইয়া পড়ে, সেজন্য আমি অন্যান্য সদস্যদের সহিত সমান উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি।

২০শে আগস্ট—শিলং-এর খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট শহরে এবং শ্রীহট্ট জেলার অন্যান্য মহকুমা শহরে প্রত্যহ যথেচ্ছাভাবে হিন্দুদিগকে গ্রেপ্তার করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশ, এ যাবৎ দুই শতাধিক হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি বিধানকল্পে কতগুলি সর্ত পূরণ সাপেক্ষে অধ্যাপকবৃন্দের বেতনের হার প্রবর্তন করিবার যে পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে করা হইয়াছিল, তাহা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

২১শে আগস্ট—কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ অদ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর সহিত কেরলের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কেরলের পরিস্থিতি সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের বক্তব্য জানান।

অদ্য লোকসভায় শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ও অপরাপর সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, আসাম পুলিস এক নাগার বাড়ি হইতে কতকগুলি কাগজ ও দলিলপত্র হস্তগত করার ফলে বিদ্রোহী নাগাদের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের সহায়তা লাভের চেষ্টা ধরা পড়িয়াছে।

২২শে আগস্ট—নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, শিয়ালদহ স্টেশনের পুনর্বিন্যাসে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে এবং তার ফলে পূর্ব রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ শিয়ালদহ ডিভিশনে কতকগুলি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

২৩শে আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি রোধকল্পে সরকার আংশিক রেশন ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত করিতেছেন, এই মর্মে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য সাংবাদিকগণের নিকট এক বিবৃতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন দপ্তরের ৮০০০ কর্মচারী আজ ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা হইবে প্রায় ১৫০০।




উক্ত পর্যায়ের বৈঠকে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও ঐ সকল শিবিরে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নীরব থাকায় পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মীরা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

২৪শে আগস্ট—অদ্য কলিকাতার স্থলশুল্ক বিভাগের গোয়েন্দা কর্মচারিগণ উত্তর কলিকাতার একটি গহনার দোকানে এবং সার্কাস এভিনিউয়ে ঐ গহনার দোকানের মালিকের বাড়িতে হানা দিয়া বিদেশী সোনার বিনিময়ে ভারতীয় নোট পাকিস্তানে বেআইনীভাবে পাচার করিবার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতের কোন কোন অংশে এনকেফেলাইটিস মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। কলিকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাওয়া গেলেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক আছে।

২৫শে আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্বাচিত হন বলিয়া অদ্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। শ্রী রায় কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি অপেক্ষা ১০,৫২০টি ভোট বেশী পাইয়াছেন। এই উপনির্বাচনে তৃতীয় প্রার্থী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভুঞার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১৯শে আগস্ট—ওয়াশিংটনে মার্কিন নৌবাহিনী হইতে ঘোষণা করা হয় যে, সিংগাপুরে মার্কিন জাহাজ ও নৌসেনা মোতায়েন করা হইয়াছে এবং পশ্চিম এশিয়ার সংকটের ফলে পাছে কোন মিত্র রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেইজন্য আপাততঃ উহারা সিংগাপুরেই থাকিবে।

ওনা এর আমাকার এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক সাহায্য পর্যালোচনা কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে মার্কিন সরকার কর্তৃক আরোপিত সর্তাবলীর ফলে পাকিস্তানে মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যের উপকারিতা 'অনেকাংশে' হ্রাস পাইয়াছে।

২০শে আগস্ট—ঢাকা হইতে প্রাপ্ত পি টি আই'র সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি নদীতেই জল বৃদ্ধি পাইতেছে। বারশাল জেলার অধিকাংশ নদীতেই গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ ইঞ্চিরও বেশী জলস্ফীতি ঘটিয়াছে। চাঁদপুরের নিকটে পদ্মা ও মেঘনা উভয় নদীতেই গত ২৪ ঘণ্টায় জল বাড়িয়াছে প্রায় দেড় ফুট।

২১শে আগস্ট—পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ রাখার চুক্তি যদি শেষ পর্যন্ত সম্পাদিত হয়, তবে তাহা যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আণবিক বিশেষজ্ঞবৃন্দ তাঁহাদের ৫১ দিনব্যাপী বৈঠকের উপরোক্ত সর্বসম্মত সুপারিশ জানাইয়া চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

২২শে আগস্ট—পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৮ই আগস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল, গত রাতে আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর তাহা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য ঘোষণা করেন যে, আগামী অক্টোবর হইতে কয়েকটি সর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবে।

২৩শে আগস্ট—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্য চীনকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয় যে, কুয়েময় এবং মাৎসু দ্বীপ দখলের কোন চেষ্টা যেন না করা হয়। এ ধরনের চেষ্টার ফলে উক্ত অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট হইতে পারে।

২৪শে আগস্ট—চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে কিছু দূরে অবস্থিত জাতীয়তাবাদী চীনাদের অধিকারভুক্ত কুয়েময় দ্বীপের উপর কম্যুনিস্ট চীনের গোলন্দাজবাহিনী প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কম্যুনিস্ট চীনের বিমানগুলি দ্বীপের উপর হানা দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর অদ্য প্রাদেশিক আইন সভায় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্টির নেতা শ্রীআতাউর রহমান খাঁকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা আগামীকাল প্রাতে শপথ গ্রহণ করিবেন।

২৫শে আগস্ট—অদ্য পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন নৌবহরকে সতর্ক থাকিতে বলা হইয়াছে। ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষ ফরমোজা প্রণালীতে কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক তৎপরতার বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর কম্যুনিস্টদের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফরমোজাকে রক্ষার দায়িত্ব লইয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষান্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


ERNMENT L
Cooch Beha



# SACHITRA KALPATARU

(AN ILLUSTRATED CULTURAL MONTHLY IN ENGLISH & BENGALI)



# আর মাত্র সাত দিন !

সচিত্র কল্পতরুর ২, টাকা মূল্যের লোভনীয় শারদীয়া সংখ্যাখানি সডাক মাত্র ১৷৹ টাকায় পেতে হলে এখুনি নাম ঠিকানা সহ মনি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠান। পত্রিকা ব্যবসায়ীরাও ৭ দিন অর্থাৎ ১৩।৯।৫৮ তারিখ-এর মধ্যে টাকা পাঠিয়ে কম পক্ষে ১৫ কপির অর্ডার বুক করলে শতকরা ৫০, টাকা কমিশান পাবেন। ভিঃ পিঃর জন্য অনুরোধ করবেন না।

### এতে থাকছে

১। বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী কথাসাহিত্যিক শ্রীআনন্দের উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'
এ উপন্যাস মহাঋষী টলষ্টয়ের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস "WAR & PEACE"-এর মামুলী বাংলা অনুবাদ নয়। শ্রীআনন্দের এ-কাহিনী কোন একটি নির্দিষ্ট War-field-এ সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাংলার দুঃখজর্জরিত প্রতিটি গৃহকোণে এ-war'এর সন্ধান মেলে। এ-war'এর কোন Peace নেই,—এ-war চিরন্তন! তাই রতনপুরের গরীব বামুন রতন ভট্টাচার্য অন্নযুদ্ধে একদিন জয়ী হয়েও, জীবনের শেষ দিনেও শান্তি কী, তা' বুঝতে পারেন নি; বুঝতে পারে নি তাঁর একমাত্র পলাতকা কন্যা কৃষ্ণাও! উপবাসী বাপ-মা-ভাইকে অন্নবস্ত্র দিয়ে বাঁচাতে গিয়ে একটি সামান্য চাকুরীর জন্যে চালিয়েছিল অন্তর্যুদ্ধ। নারীর বহুমূল্য নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে সে যুদ্ধে কৃষ্ণাও একদিন বিজয়িনী হয়েও, 'শান্তি' শব্দটা তার কাছে পাহাড়ী কুয়াশারই মত থেকে গেল। আর সেই কুয়াশাতেই ঘুরে ঘুরে নায়ক মণিলাল পেলো একনিষ্ঠ প্রেমিকা সবিতার সংস্পর্শ, পেলো R. T. O'র বড় সাহেব মিঃ স্যানিয়ালের মধুর ব্যবহার, পেলো আমেরিকান সৈনিক উইলকীর বন্ধুত্ব. মোট কথা জীবন যুদ্ধে সবকিছুই সে পেলো, পেলোনা শুধু Peace! তাই শেষদিন মণিলালের মুখ থেকে সখেদে শ্রীআনন্দ বলিয়েছেন, "সত্য বলতে কি, সাধনার অদৃশ্য ভগবানেরও দেখা হয়তো মেলে, কিন্তু শান্তি? হাঃ, হাঃ, হাঃ, এই একটা শব্দ যার শুধু সৃষ্টিই হয়েছে অথচ জীবনভোর এর অস্তিত্বের কোন উপলব্ধিই মেলে না!" যেখানে পুস্তকাকারে উপন্যাসখানির পাতা হতে চলেছে প্রায় ৪০০, সেখানে এই অল্প পরিসর জায়গায় কাহিনীর পূর্ণাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। এ-উপন্যাস পরের মুখে নয়, নিজের চোখে পড়ে নিয়ে অন্তরে উপলব্ধি করার মতই একটি সংঘাতপূর্ণ অমর কাহিনী।

২। সুনীল সাহা অনূদিত সামারসেট্ মমএর বহুপঠিত—"The Facts of Life"এর কাহিনী;

৩। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সচিত্র কথোপকথন;

৪। এ ছাড়া ১০টি মনভোলান ছোট গল্প;

৫। ২০।৩০টি মধুর কবিতা;

৬। ৪টি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ; ৭। অনেকগুলো পিত্তিজ্বলা কার্টুন; ৮। চাবুক (সাহিত্য সমালোচনা); ৯। জেনে রাখুন, জানাবেন না (রসিক প্রশ্নের রসিক উত্তর) ইত্যাদি অনেক কিছু। রচনার ছবিগুলিতে প্রাণ দিচ্ছেন তরুণ শিল্পী শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

### এতে থাকছে না

ক। ছি-ছি-ছিনেমার ছি-ছি-ছবি, ক্ষণিকের উত্তেজনায় যে-ছবি রুচিবিকৃত পাঠকপাঠিকার সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারে; কিন্তু থাকছে এমন ছবি যে ছবি মা-বাপ-ভাই-বোন সকলে একসঙ্গে গৃহদেওয়ালে টাঙিয়ে উপভোগ করতে পারবেন;

### এতে থাকছে না

খ। B-খ্যাত লেখকলেখিকাদের নামের নামাবলী, যে নামগুলির পেছনে সরল নিরীহ, পাঠকপাঠিকাদের অন্ধ মোহ থাকা সম্ভব; •কিন্তু থাকছে A-খ্যাত লেখকলেখিকাদের B-খ্যাত রচনাবলী, বহুকষ্টোপার্জিত পয়সার বিনিময়ে যা পড়ে সত্যিই আপনি খুসী হবেন।

তাই

# রুচিশীল যে কোন সাহিত্য-পাঠকপাঠিকাদের জন্যই সচিত্র কল্পতরুর এই শারদীয়া সংখ্যাখানি !

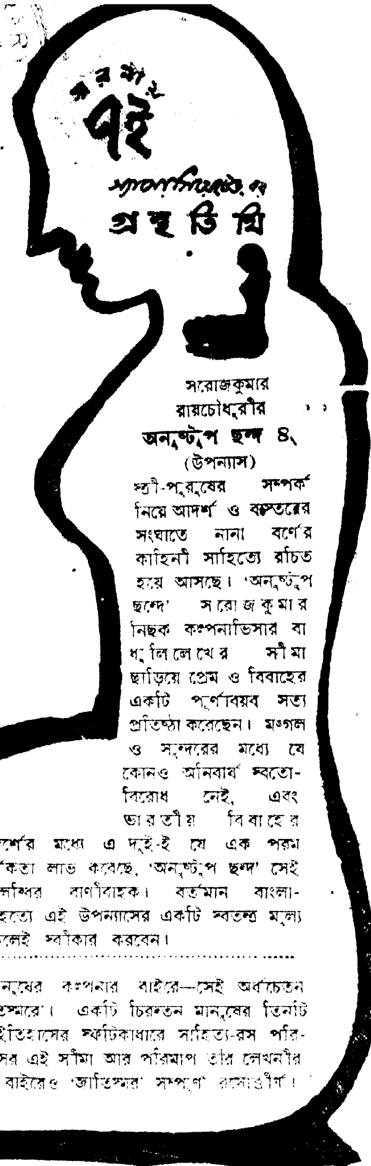
বিঃ দ্রঃ—যাঁদের প্রেস নেই, তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। অন্যান্য শারদীয়া সংখ্যার ছাপার কার্যও গ্রহণ করা হচ্ছে। সচিত্র কল্পতরুর নিজস্ব ব্লক ও ডিজাইন বিভাগে বাইরের অর্ডারও গ্রহণ করা হয়। টাকা-কড়ি চিঠিপত্রাদি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানাঃ—

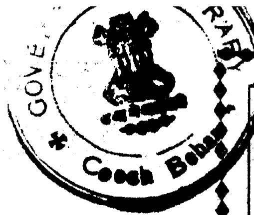
সচিত্র কল্পতরু, ২০বি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা—৬



# সূচীপত্র







# সূচীপত্র

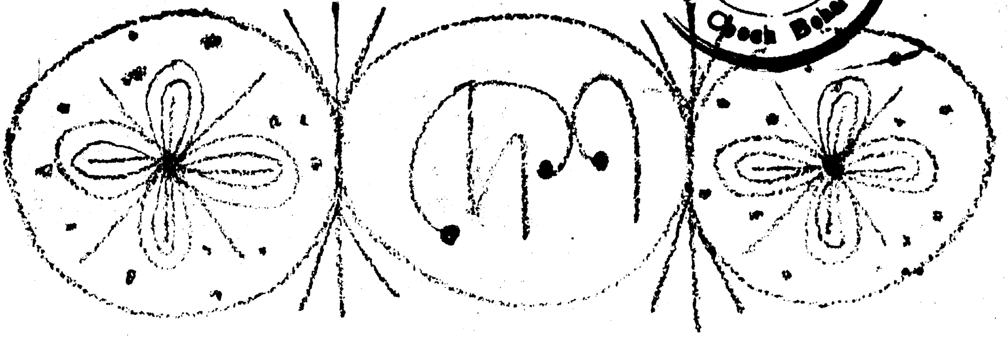



# সূচীপত্র



প্রচ্ছদ—জে নাথ (বোম্বাই)






DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 6th September, 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৪৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ




## ভবানীপুর নির্বাচন

ভবানীপুরে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের চোখ খুলিয়া দিবে ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কোন কোন মহলে পরাজয়ের গ্লানি ব্যাখ্যায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝাইয়াছেন যে, বর্তমান নির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থকগণের সংখ্যা কমে নাই। (বস্তুতঃ এই কথাটাও সত্য নয়। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় ১৩॥ হাজার ভোট পাইয়াছিল, এবারে প্রায় ১২॥ হাজার ভোট পাইয়াছে, কাজেই হাজার ভোট কমিয়াছে) কিন্তু ধরিয়াই যদি লওয়া যায় যে, কংগ্রেসের ভোটসংখ্যা সমান আছে, তবু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, প্রতিপক্ষের সমর্থন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট, কি যথার্থ স্বতন্ত্রপ্রার্থী সে তর্ক নিষ্ফল। তিনি কংগ্রেসবিরোধী। এবং সেই হিসাবেই লোক তাঁহাকে বিপুলভাবে সমর্থন জানাইয়াছেন। অতএব কংগ্রেসী মহলের 'সব ঠিক হ্যায়' মনোভাব নিতান্ত ভ্রান্ত ও কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক। কংগ্রেসের বিপদ এখানেই। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গ্রামাঞ্চলে বিপুল জনসমর্থন সত্ত্বেও কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে কংগ্রেসের সমর্থন ক্রমশ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাইতেছে। প্রথমত এই নিদারুণ সত্যটা কংগ্রেসের লজ্জার সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত ইহার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে কংগ্রেস সংস্থাকে। নতুবা আগামী সাধারণ নির্বাচনে এক [illegible] পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। বৃহত্তর কলিকাতায় অ-কংগ্রেসের সমর্থন সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিয়া নূতনতর এক সমস্যার সৃষ্টি করিবে। সমস্যাবহুল পশ্চিমবঙ্গ আর একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইবে। ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইবে। কংগ্রেসীমহল 'সব ঠিক হ্যায়' নীতি পরিত্যাগ করিয়া চোখ মেলিয়া প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে চেষ্টা করুন।

## ছাত্র ভর্তিতে 'ডোনেশান'

বাংলাদেশের কোন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের নামে গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে। এই সব কলেজে নাকি "ডোনেশান" লইয়া ছাত্র ভর্তি করা হয়। কোন একটি বেসরকারী কলেজ ১৯৫৬-৫৭ সালে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা "ডোনেশান" বাবদ সংগ্রহ করেন, আর "এইভাবে গ্রহণীয় ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৭জনকেই ডোনারদের মনোনীত হিসাবে ভর্তি করা হইয়াছে।" আরও প্রকাশ যে, এইসব ছাত্রের মধ্যে সিংহল, মালয় প্রভৃতি দেশের ছাত্রও আছে। এখন এ অভিযোগ নূতন নয়। কয়েক বৎসর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে কোন সদস্য এই অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সংবিধানীয় উদারতার ফাঁকে বিষয়টা চাপা পড়িয়া যায়। শুধু তাই নয়, কোন কোন মহল হইতে সমর্থন ওঠে, ধনীব্যক্তি যদি "ডোনেশান" দিতে চায় তবে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? সরকার যখন অর্থের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না, তখন কলেজকেই উদামী হইতে হয়। এই-এইজাতীয় কুযুক্তির প্যাঁচ ছাড়িয়া দিলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ধনীর পুত্রগণ কাঞ্চনকৌলিন্যের দাবীতে প্রাপ্যশূন্য ফল আদায় করিয়া লইতেছে। যোগ্যতার প্রশ্নই ওঠে না। কোন না কোন ধনীসন্তানের ভর্তির মানগত যোগ্যতা থাকিলে গায়ে পড়িয়া "ডোনেশান" দিবে এমন নির্বোধ কেহ নাই। কাজেই এ "ডোনেশান" আর কিছুই নয়, অযোগ্য তরাইবার সুবর্ণময় কৌশল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিকার আশা করা বাতুলতা। অথচ এই শ্রেণীর "ডোনেশানের" আইনগত জোর যাচাই হওয়া অবশ্যক। সাধারণের হিতকামী কোন ব্যক্তির হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সেখানেই বিচার হইয়া যাক, ব্যাপারটা "ডোনেশান", না নামান্তরে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার। আরও একটি কথা—এই উদ্যমশীল বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলির নাম সাধারণে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। অভিযোগকারিগণের নাম ঢাকিয়া রাখিবার দুর্বলতার হেতু বুঝিতে পারি না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে যে, এদেশে কোন কোম্পানীর বা ব্যবসায়ীর জাল, ভেজাল প্রভৃতি দায়ে দণ্ড হইলে নামটা বড় প্রকাশিত হয় না। এক্ষেত্রেও "ডোনেশানে"র ব্যাপার আছে নাকি?

## ট্রাম ধর্মঘট ও ভাড়া বৃদ্ধি

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম ধর্মঘটের মীমাংসা সম্বন্ধে কোম্পানীর বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। সে বক্তব্যের নির্গলিতার্থ দুটি বিষয়।

প্রথম: তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতে সমস্ত বিষয়টি বিচারার্থে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার সিদ্ধান্ত কোম্পানী মানিতে প্রস্তুত বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

দ্বিতীয়, ট্রামের ভাড়া এক নয়া পয়সা বাড়াইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত পোদ্দার জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার ট্রামের ভাড়া সুলভতম। ইহার অনুকূলে তিনি নজির উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি জানান যে, কলিকাতায় যেখানে ট্রামের পাঁচ মাইলের ভাড়া ১২ নয়া পয়সা, সেখানে বোম্বাই ও মাদ্রাজের ১৯ নয়া পয়সা, দিল্লীতে ২০ নয়া পয়সা এবং কেরলে ২১ নয়া পয়সা।

এখন এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিবার আগে ট্রাম ধর্মঘট সম্পর্কিত সকল পক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, তাঁহাদের আচরণে সাধারণের সহিষ্ণুতা প্রায় লোপ পাইবার মুখে। লাভের আশায় বা লোভের বশে স্বর্ণ-ডিম্বপ্রসূ হাঁসটিকে তাঁহারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে স্বর্ণডিম্ব-প্রসূ হাঁস সাধারণের সহিষ্ণুতা। এবারের ট্রাম ধর্মঘট সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সংবাদপত্রে পত্র লেখকগণের অনেকেই শহরে ট্রাম তুলিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ট্রাম পথের যতটা অংশ জুড়িয়া রাখে, তাহার মন্থরগতি, বিনা নোটিশে যখন তখন ধর্মঘট—সমস্তই সাকুল্য ট্রামের ব্যবস্থা রহিত করিবার অনুকূল। তার উপরে ট্রাম বন্ধ থাকায় এই কয়দিনে পথে হতাহতের সংখ্যাও কমিয়াছে। ট্রাম কোম্পানী ও ট্রাম শ্রমিক সংস্থাগুলি সকলেই ট্রাম-যাত্রী জনসাধারণের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া নিজ স্বার্থ শিকার করিতে উদ্যত। লোকে তাই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ট্রামযাত্রিগণের ইউনিয়ন থাকিলে ভোটে যে সিদ্ধান্ত হইত তাহাতে কোম্পানী বা শ্রমিক সংস্থাগুলির আশান্বিত হইবার কথা নয়। তাঁহাদের সৌভাগ্য যে ট্রাম-যাত্রিগণের তেমন কোন ইউনিয়ন নাই।

এখন এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়া বাড়াইবার বিষয়টি বিবেচ্য। কিছু-কাল আগে দে কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে ট্রামের ভাড়া বাড়াইবার কথা যখন উঠিয়াছিল, তখন প্রত্যেক রাজনৈতিক দল আপত্তি জনাইয়াছিল। এবারেও রাজনৈতিক দলগুলি ও অন্যান্য প্রতিনিধি-মূলক সংস্থা, যেমন কলিকাতা কর্পোরেশন, ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করেন তবে নিতান্ত অবিবেচনার কাজ করিবেন এবং অনিবার্যভাবে গণ-বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইবেন। কোম্পানীর ক্ষতি নাই। লাভের অংক তাহার, গণপ্রতিকূলতা সরকারের। লাগে তাক না লাগে তুক। সেবারে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির শোচনীয় ইতিহাস এ পর্যন্ত কেহ ভোলে নাই, আশা করি সরকারের মনে আছে।

হয়তো সূক্ষ্ম হিসাব করিলে ভাড়া-বৃদ্ধির অনুকূলে অর্থনৈতিক যুক্তি পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক বড়ে যেখানে সোজা পথে চলে, রাজনৈতিক ঘোড়া সেখানে অভাবিতভাবে একেবারে আড়াই ঘর চলে। সেই চালের হিসাব করিয়া অগ্রসর হইতে হয় সরকারকে। সে হিসাব না করিলে যাহা হয়, তাহা গত ভাড়াবৃদ্ধির সময়ে হইয়াছিল। নানা কারণে, তন্মধ্যে আর্থিক, রাজনৈতিক সমস্তই আছে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর, বিশেষ কলিকাতা-বাসীর মন অত্যন্ত উত্তেজিত, এমন সময়ে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধিটা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শেষ কাঠিখানার মতো মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করিবে এবং তাহার দায় সরকারকেই পোহাইতে হইবে কোম্পানীকে নয়। এমন অবস্থায় ট্রাম ভাড়াবৃদ্ধির সুপারিশ করা সরকারের পক্ষে কখনোই উচিত হইবে না।

**বিজ্ঞপ্তি**

খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর নূতন উপন্যাস

**সমুদ্র হৃদয়**

আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

**—সম্পাদক 'দেশ'**

## আর্থিক দুর্গতি ও সংস্কৃতি

বাঙালী সমাজের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে কিছুদিন হইল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছে। প্রবন্ধ, আলোচনা ও সভা-সমিতিতে বিষয়টির পর্যালোচনা চলিতেছে। ইহাকে অন্ধকারে আলো বলিতে হইবে। ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর আর্থিক সাচ্ছল্য তাহাকে নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। আজ সেই আর্থিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িবার মত—এরূপ অবস্থায় তাহার সংস্কৃতির বিনাশ ও বিকার অবশ্যাম্ভাবী। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূলে সামাজিক উদ্বৃত্ত শক্তি। আজ বাঙালীর সেই উদ্বৃত্ত শক্তির পুঁজি ফুরাইতে বসিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, দুর্গতের সংস্কৃতি সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই।

## একটি জ্ঞাতব্য তথ্য

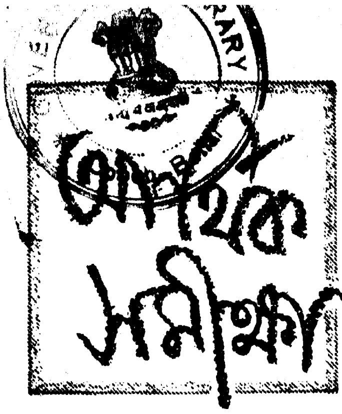
কলিকাতা শহরের পানের দোকান-গুলির মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইটি অবাঙালীর হাতে। এসব দোকানের মাসিক আয় তিনশত হইতে চারশত টাকা। কোন কোন দোকানের আয় মাসিক হাজার টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে রাজ্য সরকার এই তথ্য সংগ্রহ করেন। আর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভাপতি শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় একটি সভাস্থলে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

বাঙালীর আজ বড় আর্থিক দুঃসময়। ব্যক্তিগত আর্থিক দুঃসময়ের আশঙ্কায় প্রাতঃস্মরণী বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি আলু বেচিয়া খাইবেন। আজ কি আমরা পান বেচিয়া খাইবার কথা চিন্তা করিতে পারি না?

## আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

শিয়ালদহ স্টেশনে যে-সব উদ্বাস্তু দীর্ঘকাল ছিলেন, তন্মধ্যে ৫১৪ জন গত শুক্রবার জাহাজযোগে আন্দামান দ্বীপে যাত্রা করিয়াছেন। ইহা সুসংবাদ। সংবাদে প্রকাশ যে, সরকার তাঁহাদের প্রাথমিক সাহায্য দান করিয়াছেন এবং আগামী এক বৎসর তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যয়-নির্বাহ করিবেন। ইতিমধ্যে সরকারী সাহায্যে ও স্বকীয় উদ্যমে তাঁহারা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবেন ইহাই প্রত্যাশা। আমরা আশা করি যে, সরকার গতানু-গতিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সত্যকার দরদ দিয়া উদ্বাস্তুগণকে তথায় পুনর্বাসনে সাহায্য করিবেন। উদ্বাস্তুগণ তথায় সুখী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলে পুনর্বাসন কাজের দুরূহতা অনেক কমিয়া আসিবে।




**শ্রীকৌটিল্য**

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এরকম একটা ধারণা অনেক দিন যাবত প্রচলিত আছে যে, অর্থনীতিক অগ্রসরতার সংগে সংগে কৃষি থেকে শিল্পে এবং কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্র থেকে ক্রমে অপর এক তৃতীয় গোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষেত্রে (tertiary production sector) উৎপাদনের গুরুত্ব বেড়ে চলতে থাকে। কৃষি এবং শিল্পের প্রত্যক্ষ উৎপাদনের আওতার বাইরে যা কিছু আছে, তার সবই এই তৃতীয় গোষ্ঠীতে পড়ছে। অর্থাৎ তৃতীয় গোষ্ঠী হচ্ছে কৃষি ও শিল্পের সংগে পরোক্ষভাবে সংশিলষ্ট অথবা সম্পূর্ণ (heterogeneous) সমষ্টি।

উপরের জনপ্রিয় ধারণাটির জন্য মুখ্যত দায়ি কলিন ক্লার্ক। তিনি তাঁর Conditions of Economic Progress নামে বিখ্যাত বইয়ে শিল্পোন্নত অথবা শিল্প-অগ্রসরমান অনেক দেশের উল্লেখ করে উপরের তথ্যপ্রযুক্ত ধারণাটিকে প্রচার করেছেন। এই ধারণাটির একটি সরল আবেদন আছে সন্দেহ নেই এবং সম্ভবত এই আবেদনের জন্যই অর্থনীতিবিদরা কিছুকাল আগে পর্যন্ত এর প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো বাছ-বিচার করেননি। এই ধারণার দুটো দিক আছে : (১) তৃতীয় গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের অর্থ এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীর তুলনায় এতে কর্ম সংস্থানের পরিমাণ বেশি হওয়া সম্ভবপর। এবং (২) প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীর তুলনায় এতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। ক্লার্কের আলোচনায় এই দুই দিকের কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই যে, শিল্প-অগ্রসরমান দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীতে কর্ম নিয়োগের পরিমাণ এবং মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ দুই-ই পাশাপাশি বেড়ে চলবে।

এখন ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে যে-সব দেশ তাদের প্রাক-ধনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে যথাসময়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে, তাদের সম্বন্ধে ক্লার্কের অভিজ্ঞতাগুলি প্রাসংগিক। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য যে, কোনো দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীতে কর্ম নিয়োগের আপেক্ষিক প্রসার হলেই ধরে নিতে হবে, সেই দেশের অর্থনীতিক উন্নতি হচ্ছে। এর থেকে সংগে সংগেই এই অনুসিদ্ধান্তও বেরিয়ে আসে

যে, পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় উন্নয়নের উপায় হিসেবে আমরা কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্র থেকে তৃতীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কর্মক্ষম লোকদের চালান দিতে থাকব।

বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য উপরোক্ত অনুসিদ্ধান্তের ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। একথা বলে নেওয়া দরকার যে, আধুনিক কালে আলোচিত অনগ্রসর অর্থনীতির শিল্পোন্নয়নের সমস্যার সঙ্গে অতীতের স্বাভাবিকভাবে শিল্পায়নভিত্তিক অর্থনীতিগুলির উন্নতির গুণগত প্রভেদ নানা রকমের। বর্তমান কালের অনগ্রসর অর্থনীতিগুলির দুঃস্থতার মূল এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গুণগত প্রভেদ সম্বন্ধে দিন দিন আমাদের সচেতন করছে। দুশো বছর আগে ভারতবর্ষে ইতিহাসের নিয়মে যে শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল, তার বিপর্যস্ত কাঠামোতে আজ ফের শিল্পায়নের অবতারণা সম্পূর্ণ নতুন সমস্যাকে ভিত্তি করে দেখা দিয়েছে। তাই আজকের ভারতবর্ষে পরিকল্পনা করতে গিয়ে ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লব থেকে শেখা নীতিগুলি যাঁরাই সরাসরি প্রয়োগ করতে চেষ্টা পেয়েছেন, তাঁরাই প্রায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। অন্য কথায় বলা যায়, অনগ্রসর ভারতবর্ষের অনেক পরিস্থিতির সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলির অনুরূপ পরিস্থিতির আকৃতিগত মিল থাকলেও প্রকৃতিগত অমিল থাকা সম্ভব। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষের অর্থনীতিক দুঃস্থতার সম্পূর্ণ পর্যায়েই দেখা গেছে যে, তার তৃতীয় গোষ্ঠীতে কর্ম সংস্থানের দিক দিয়ে প্রচুর গুরুত্ব থেকেছে। ভারতবর্ষ অনগ্রসর, অথচ তার তৃতীয় গোষ্ঠীতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বিপুল—ক্লার্কের সিদ্ধান্তে এই ব্যতিক্রম কেন? এই ব্যতিক্রম আসলে এই গভীর সত্যটিকেই উদ্ঘাটিত করে যে অনগ্রসর অর্থনীতিতে কর্ম সংস্থানের আপেক্ষিক বিপুলতা উৎপাদনের আপেক্ষিক বিপুলতাকে অনিবার্যভাবে সূচিত করে না। ভারতবর্ষের তৃতীয় গোষ্ঠী তাই মোটের উপর দারিদ্র্য-প্রণোদিত, প্রাচুর্য-সূচীতে নয় (দ্রষ্টব্য: ডাঃ ভবতোষ দত্তের The Economics of Industrialisation)। সামান্যতম পুঁজি সহযোগে অথবা সম্পূর্ণ পুঁজিহীন অবস্থায় সহজে শ্রম নিয়োগের সুযোগ এই গোষ্ঠীতেই বেশি। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, এই গোষ্ঠীতে শ্রম-পুঁজির অনুপাত সর্বক্ষেত্রেই খুব উঁচু হতে বাধ্য। তবে অনগ্রসর দেশে যেসব পেশায় (occupation) এই অনুপাতের মান বেশি, সেগুলিই বেশি বেড়েছে দেখা যায়।

সুতরাং ভারতবর্ষের পরিকল্পনার শুরুতে কেউ যদি মনে করেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে নিযুক্ত লোকদের ক্রমশ তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত নানারকম পেশায় সরিয়ে আনতে পারলে অর্থনীতিক উন্নতি হবে, তবে সে ধারণা মারাত্মক। প্রকৃত ধনতান্ত্রিক দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীটি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর (অর্থাৎ শিল্পের) প্রয়োজন-প্রসূত। এর অর্থ এই যে, ওরকম দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীর ক্রিয়াগুলি না থাকলে শিল্পায়নের গতি রুদ্ধ হয়ে আসবে। কিন্তু ভারতবর্ষে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ক্রিয়াগুলির জন্ম বৃত্তান্তই অন্য। শিল্পের পরিপন্থী পরিবেশ থেকে তাদের জন্ম এবং শিল্পের পরিপন্থী হয়েই তাদের অস্তিত্ব। তাই এই গোষ্ঠীতে বিবেচনাহীনভাবে শ্রমিকের নিয়োগ বাড়াতে আরম্ভ করলে পরিস্থিতি আরো অবাঞ্ছিত হতে থাকবে। তার উপর আর এক কথা: ক্লার্কের সংজ্ঞা অনুসারে তৃতীয় গোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই। একদিকে শাসন কর্মে কিংবা শিক্ষণ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, অপরদিকে গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য পর্যন্ত এই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আবার একই উৎপাদন শাখার (যেমন পরিবহন) মধ্যেও নানা রকমের পেশা থাকছে, যার কোন কোনটি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হলেও অন্য অনেকগুলিই অত্যন্ত দারিদ্র্যসূচিত। তৃতীয় গোষ্ঠী বলতে তাই একটি অত্যন্ত ধোঁয়াটে এবং প্রায় অর্থহীন অসবর্ণ গোষ্ঠী বোঝানো হয়। এই কারণেই ক্লার্কের তৃতীয় গোষ্ঠী শুধু সংজ্ঞা বা ধারণাগত দিক দিয়েই নয়, বিশেষত অনগ্রসর অর্থনীতিতে চালনাগত (operational) দিক দিয়েও অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিকর। উপরন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্প্রতি আরো সমালোচনার কারণ দেখা যাচ্ছে এই জন্য যে, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইজিপ্ট প্রভৃতি অসদৃশ দেশগুলিতে কোথাও নিঃসন্দেহে বলা যাচ্ছে না যে, তৃতীয় গোষ্ঠীর উৎপাদনে ফলপ্রসূতা বেশি। কেউ কেউ অবশ্য ফলপ্রসূতা বলতে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতাই (labour absorption capacity) বোঝেন; কিন্তু বিশেষত অনগ্রসর দেশে বৃদ্ধি-প্রযুক্ত (grouth-oriented) বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা নির্বিশেষে কর্ম সংস্থানের চিন্তা অর্থনীতিক দৃষ্টিতে যুক্তিহীন। তাই, যদিও এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে পেশাগত পুনর্গঠনের (occupational reorganisation) একান্ত প্রয়োজন, তথাপি সে পুনর্গঠনে ক্লার্কের তৃতীয় গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। অন্য কথায়, পরিকল্পনার প্রয়োজনে যেসব পেশার যৌক্তিকতা আছে, সেগুলিই বেঁচে থাকবে এবং উৎপাদনের সার্থকতার দিকে দৃষ্টি রেখেই সর্বদা কর্ম সংস্থানের পরিমাণ স্থির করা হবে—এটাই অর্থনীতিক যুক্তি। কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্য কল্পনা করে সেই গোষ্ঠীতে নির্বিচারে কর্মী নিয়োগের ক্লার্ক-প্রস্তাবিত পন্থাটি অন্তত ভারতবর্ষের পরিকল্পনার অনুকূল নয়।

## ॥ পূর্ব এশিয়ায় সঙ্কট ॥

**যোগনাথ মুখোপাধ্যায়**

ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তনের মত কল্পনাতীত দ্রুতগতিতে আর একবার বিশ্বরাজনীতির পটপরিবর্তন ঘটে গেল। পশ্চিম এশিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকারাশির বিক্ষুব্ধ ঝড় শান্ত হতে না হতেই যুদ্ধসন্ত্রস্ত পৃথিবীর সম্মুখে আরও ভয়াল ভয়ংকর রূপ নিয়ে এগিয়ে এল পূর্ব এশিয়ার অশান্ত প্রশান্ত মহাসাগর। লেবানন ও জর্ডনের চেয়েও এখন বিশ্বশান্তির বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে কেময় ও ফরমোসা। বিশ্ববাসীর আশংকা, বুঝি কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপের জন্যেই একটা প্রলয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

আর এ আশংকা একেবারেই অমূলক নয়। কারণ একথা আজ সন্দেহাতীত সত্যে পরিণত হয়েছে যে রাশিয়া ও আমেরিকা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ এমন এক চরম অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে একটি যুদ্ধোপযোগী উপলক্ষের সৃষ্টি হলেই তারা একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। উভয় রাষ্ট্রেরই বিজ্ঞানাগারে নিত্যনতুন এমন সব বিপুল শক্তিসম্পন্ন মারণাস্ত্রের উদ্ভব হচ্ছে যে তাতে উভয়েই সকল সময় শংকিত হচ্ছে এই কথা ভেবে যে আর বেশি দেরী করলে অপরপক্ষ হয়ত এমন প্রচণ্ড শক্তির এক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে ফেলবে, যার বিরুদ্ধে তার সর্বশেষ মারণাস্ত্রও অকেজো হয়ে যাবে। সুতরাং বৃহৎ শক্তিদুটির কেউই আর এখন অপরকে বেশি বাড়তে দিতে রাজী নয়। দুজনেরই সিদ্ধান্ত এখন, উপযুক্ত সুযোগ পেলেই কঠিন আঘাত হানতে হবে বিপক্ষকে।

এইরকম মনোভাব যখন কোন রাষ্ট্রকে পেয়ে বসে, তখন তার পক্ষে সুযোগ পাওয়া বা প্রয়োজনমত সুযোগ তৈরী করে নেওয়া একেবারেই শক্ত হয় না। যেমন হয়নি জার্মানীর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে। অস্ট্রিয়ার যুবরাজের জীবনের খেসারত দিতে সবাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে সারা পৃথিবীকে বা ক্ষুদ্র নগরী ডানজিগের অধিকারের মীমাংসা করতে গিয়ে ওলট পালট হয়েছে সারা পৃথিবী। সুতরাং আজ যদি লেবানন বা কেময়ের প্রশ্নে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাতে অবাক হবে না কেউ।

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠবে এই প্রসঙ্গে যে, হঠাৎ কী এমন হ'ল যার জন্যে দশ বছরের পুরানো ও প্রায় চার বছরকাল একেবারে ধামাচাপা দেওয়া ফরমোসা সমস্যাটিকে হঠাৎ এই সময়ে লোকায়ত্ত চীন সরকার এত জরুরী করে তুললেন? লেবানন ও জর্ডনের সমস্যাতেই যখন বিশ্ববাসী অতিষ্ঠ, ঠিক সেই সময় কেন তাঁরা কেময়, আময় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত বন্দরগুলিকে চিয়াংকাইশেকের কবলমুক্ত করার কথা চিন্তা করলেন? অল্পকথায় এই প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, এশিয়ার পূর্বপ্রান্তের সংকট তার পশ্চিম প্রান্তের সংকটেরই অনিবার্য পরিণতি।



**আরবের মুক্তি সংগ্রামে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল রাশিয়া। কিন্তু নানা কথা চিন্তা করে আরব দুনিয়ার নয়া নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে সে সাহায্য। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রান্তে দাঁড়িয়েও নিতান্ত**

নিরুপায়ের মত সহ্য করতে হয়েছে তাকে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব। কিন্তু এ আঘাত ও অপমান রাশিয়ার মত প্রচণ্ড-শক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে মুখ বুজে সহ্য করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই অনতিবিলম্বে বর্তমান রাশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা মঃ ক্রুশ্চেভ দৌড়লেন পিকিংয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিশোধ যাতে দূরে প্রাচ্যে নেওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করতে। চীনের মুক্তি সংগ্রাম যদি প্রতিহত হয় মার্কিনী আক্রমণে, তাহলে চীন ডাকবে তাকে সাহায্য করতে, আর সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাশিয়া এগিয়ে আসবে তার সমগ্র শক্তি নিয়ে। এভাবে যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হবে তাতে রাশিয়ারই হবে নৈতিক জয়; কারণ সে যুদ্ধে আমেরিকা হবে আক্রমণকারী, আর রাশিয়া সে আক্রমণের প্রতিরোধক।

তাই হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠেছে ফরমোসার সংকট। সংবাদে প্রকাশ, প্রতিদিনই এখন কয়েক ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গোলা বর্ষিত হচ্ছে কেময়, আময়, মাৎসু প্রভৃতি বন্দরগুলিতে, আর পিকিং বেতার থেকে সমানে আহ্বান জানানো হচ্ছে তাদের কাছে, বৃথা শক্তিক্ষয় না করে আত্মসমর্পণ করতে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে যদি কমিউনিস্ট অভিযান অল্পায়াসেই সফল হয় তাহলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফরমোসা হবে তাদের আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্য।

কিন্তু মার্কিনী শক্তির চরণাশ্রিত, হৃত-বীর্য চিয়াং এতটুকুও বিচলিত হন নি এই হঠাৎ আক্রমণে। সদম্ভে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর সদর দফতর থেকে যে, অনতি-বিলম্বেই চীনের কমিউনিস্ট সরকার বুঝতে পারবেন যে, এই আক্রমণের ফল কি। আর শুধু হুমকি দিয়েই বসে থাকেন নি তিনি। ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন মার্কিনী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শলাপরামর্শ, আর আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠিয়ে মিত্রজনোচিত কাজ করতে। সে আহ্বানে সাড়াও দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। বলেছেন তিনি, জাতীয়তাবাদী 'চীনকে' তাঁরা কখনও প্রয়োজনীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। সীংম্যান রীও জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর বন্ধু চিয়াংকে, 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

সুতরাং, আপাতত ঘটনাটা এইভাবে অগ্রসর হবে বলে মনে হয়।—চীন সরকার তাঁদের উপকূলবর্তী দ্বীপগুলিকে মূল শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ব্যাপক অভিযান শুরু করলে ফরমোসার কুও-মিংটাং সরকার যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ ক'রে বাধা দেবে তাদের। তারপর যখন তার শক্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সসৈন্যে এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতির হবে রূপ পরিবর্তন। যে মুহূর্তে আমেরিকা চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণে প্রয়াসী হবে, সেই মুহূর্তেই এগিয়ে আসবে রাশিয়া আক্রান্ত চীনকে রক্ষা করতে। সুতরাং তখনই শুরু হবে বিশ্বযুদ্ধ, যার এক পক্ষের নেতা হবে আক্রমণকারী আমেরিকা, আর অপরপক্ষের নেতা হবে সেই আক্রমণ প্রতিরোধকারী রাশিয়া। রাশিয়ার পক্ষে এর চেয়ে আদর্শ অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। রাশিয়া বরাবরই চেয়েছে আক্রান্ত বা আক্রান্তের বন্ধুরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। তার সেই ইচ্ছাই পূরণ হবে এই সংঘাতে।

তাহলে কি এই সংঘাত অনিবার্য? গণ-





তন্ত্রী ও শান্তিকামী দেশগুলির কি কিছুই করণীয় নেই এক্ষেত্রে? এমন কি কোন সমাধান আজ তুলে ধরা যেতে পারে না পৃথিবীর এই বৃহৎ শক্তিগুলির সম্মুখে, যা গ্রহণে বাধ্য হবে তারা, বিশ্ব জনমতের কথা চিন্তা করে? অথচ যে সমাধানে কারুরই হবে না স্বার্থ ও সম্মানের সমূহ ক্ষতি? সে সমাধানের কথা চিন্তা করতে হলে আগে জানতে হবে ফরমোসা সংকটের প্রকৃত রূপটি কি।

পিকিং সরকারের ফরমোসা অভিযানকে যদি শুধুমাত্র চীনের মুক্তিসংগ্রামের একটি অবিচ্ছিন্ন অধ্যায় বলে মনে করা হয়, তাহলে বর্তমান সমস্যার বিশ্লেষণে একটা মস্ত ভুল করা হবে। কারণ বৈদেশিক অধিকারের কথাটাই যদি এক্ষেত্রে বড় হত তাহলে চীনের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত অন্য দুটি বৈদেশিক অধিকার, বৃটিশ অধিকৃত হংকং ও পর্তুগাজ অধিকৃত মাকাও সম্পর্কেও পিকিং সরকারের এই একই মনোভাব প্রকাশ পেত। কিন্তু এই অধিকারগুলি সম্পর্কে তারা একেবারেই নীরব। সুতরাং দুটি ক্ষুদ্রতর বৈদেশিক শক্তিকে এইভাবে প্রশ্রয় দিয়ে ফরমোসা দখলের জন্যে যখন পিকিং সরকারকে আমরা একটা প্রবল বৈদেশিক শক্তির সম্মুখীন হয়ে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে দেখি, তখনই একথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদটাই এক্ষেত্রে বড় কথা নয়।

হংকং বা মাকাও সম্পর্কে চীন সরকারের যা মনোভাব, ফরমোসার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হ'ত না, যদি না এই ক্ষুদ্র দ্বীপের নির্বাসিত শাসকটি মার্কিন অস্ত্রের জোরে নিজেকে মহাচীনের সার্বভৌম শাসক বলে ঘোষণা করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত এবং ক্ষমতামত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পক্ষপুটে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি এই ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দিত। আজ যদি পিকিং-চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মানিত সদস্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করত তাহলে বৈদেশিক অধিকার সম্পর্কে চীনের অনুসৃত নীতির কোনই ব্যতিক্রম হ'ত না ফরমোসার ক্ষেত্রে। কিন্তু শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদ্ভুত খেয়ালের জন্যেই আজ পর্যন্ত চীনের পক্ষে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি, আর তারই ফলে সম্ভব হয়নি তার পক্ষে ফরমোসাকে উপেক্ষা করে একটি শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। সুতরাং পূর্ব এশিয়ার ঘূর্ণায়মান সংকটের অবসান ঘটাতে হলে অনতিবিলম্বেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কমিউনিস্ট চীনের রাষ্ট্রমর্যাদা স্বীকার করে নিতে হবে। ষাট কোটি নরনারী অধ্যুষিত একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্রকে বিক্ষুব্ধ রেখে স্থায়ী বিশ্বশান্তি কিছুতেই আশা করা যেতে পারে না, একথা আমেরিকাকে আজ অবশ্যই বুঝতে হবে।

চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করলে একটি আশু বিপর্যয়ের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পাবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফরমোসার কি হবে? সে কি মূল চীনের সংগে সংযুক্ত হবে, না সিন্দবাদের বুড়োর মত চিয়াং কাইশেক আগের মতই চেপে থাকবে তার ঘাড়ের ওপর? না নতুন কোন সমাধানের কথা ভাবতে হবে আজ পৃথিবীর মানুষকে? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে আমাদের অল্প করেও জানতে হবে ফরমোসার ইতিহাস ও ভূগোলের কথা।

ফরমোসা যখন চীনের অধিকারভুক্ত ছিল, তখন কোরিয়া, মংগোলিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিও মহাচীনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হ'ত। এবং ফরমোসা হাতছাড়া হওয়ার অনেক বছর পরে চীনকে হারাতে হয়েছে কোরিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলিকে। কিন্তু তবুও এইসকল অঞ্চলকে চীন আজ নতুন করে তার রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার কথা চিন্তা করে না। তার কারণ, এমন কোন যুক্তির জোর নেই চীনের, যার ভিত্তিতে এই দাবী সে পেশ করতে পারে বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজের দরবারে, এবং ফরমোসা দাবী করাও নিশ্চয়ই সম্ভব হত না তার পক্ষে যদি না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কায়রোয় অনুষ্ঠিত বৃহৎ শক্তি সম্মেলনে চিয়াং কাইশেক বৃটেন ও আমেরিকাকে দিয়ে এই কথাটুকু স্বীকার করিয়ে নিতে পারতেন যে, ফরমোসা চীনেরই অংশ এবং যুদ্ধশেষে ঐ অঞ্চলটুকু চীন ফেরত পাবে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাপান ঐ দ্বীপটি অধিকার করে এবং পরের বছর সিমনোসেকীর চুক্তিতে চীনের মাঞ্চু সম্রাট জাপানের সেই অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। তারপর ফরমোসা হয়ে যায় জাপানের অংশ। ঐ দ্বীপটির ফরমোসা নাম দিয়েছিল স্পেন; জাপান সে নাম পরিবর্তিত করে তার নতুন করে নাম দেয় তাইওয়ান এবং প্রায় ষাট বছরের চেষ্টায় তাকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করে একটি জাপানী প্রদেশে। এখনও পর্যন্ত সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা জাপানী ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরা-

জয়ের পর কায়রো চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে চীন আবার ফিরে পায় ঐ দ্বীপটি। কিন্তু চিয়াং কাইশেক রাজ্যহারা হয়ে ঐ দ্বীপটিতে আশ্রয় নেওয়ার আগে পর্যন্ত জাপান প্রবর্তিত কোন ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়নি সেখানে। আজও মূল চীনের সঙ্গে ঐ দ্বীপটি সম্পর্কচ্যুত।

তবুও আজ, ফরমোসাকে কেন্দ্র করেই শুরু হতে চলেছে চীন-মার্কিন বিরোধ। এই বিরোধের মূল কথা হ'ল ফরমোসা চীনের অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পিকিং-চীন উভয়েই আজ এ প্রশ্নে একমত যে ফরমোসা চীনের অংশ। এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ঐকমতই ফরমোসা সংকটকে করে তুলেছে জটিল ও মারাত্মক। কেন, সেটা বলছি।

চীনের দাবি অনুসারে ফরমোসা চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব জনসমর্থনপুষ্ট চীনের মূল ভূখণ্ডের সরকারের পূর্ণ নৈতিক ও আইনগত অধিকার আছে ফরমোসাকে তার শাসনাধীনে আনয়ন করার। এবং যারা চীনের এই ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে, বা বাধা দেবে তার মুক্তি আন্দোলনে, তারা চীনের শত্রু। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য হ'ল, যেহেতু ফরমোসা চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যেহেতু তা এখনও পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হয়নি, সেই হেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে চীনের গৃহযুদ্ধেরও এখনো [illegible] নিষ্পত্তি হয়নি। অতএব যে চিয়াং কাইশেকের সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁরা ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, এবং যুদ্ধের শেষে গঠন করেছেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, সেই চিয়াং কাইশেককে তাঁরা গৃহযুদ্ধের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হওয়ার আগে কোনমতেই বর্জন করতে পারেন না। চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ফরমোসা যতদিন পর্যন্ত চিয়াং-এর অধিকারে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের অনুসৃত নীতির কোন পরিবর্তন হবে না।

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে মার্কিনী যুক্তির মধ্যে মতলব থাকলেও তা অসত্য নয়। কারণ গৃহযুদ্ধকালে একটি পক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত অপর পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে সেই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকা থেকে বিতাড়িত করতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে কোন পক্ষই দাবী করতে পারে না। আর গৃহযুদ্ধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য হল সরকার পক্ষকেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে মনে করা এবং বিদ্রোহী-পক্ষের সঙ্গে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করা। উদাহরণ স্বরূপে এখানে স্পেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩৭।৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন ফ্যাসীবাদী জার্মানী ও ইতালী ছাড়া কেউই তাঁকে সমর্থন করে নি। ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলির সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে যতদিন পর্যন্ত স্পেনের গণতন্ত্রী সরকার টিঁকে থাকতে পেরেছিলেন স্পেনের মূল ভূখণ্ডে, ততদিন বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা কেউই সে সরকারকে অস্বীকার করে জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহী সরকারকে স্পেনের সরকার বলে স্বীকৃতি জানায় নি। এমনকি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করার পরেও প্রায় কুড়ি বছর বাদে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরকার স্পেনের প্রতিনিধিমূলক সরকার বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

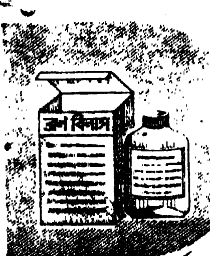
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, বৃটেন, আমেরিকা ও চিয়াং কাইশেকের মধ্যে সম্পাদিত যুদ্ধকালীন কায়রো চুক্তির ভিত্তিতে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফরমোসা সংকটের সমাধানের চেষ্টা করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন সমাধান হবে না। পরন্তু সমস্যা ক্রমেই জটিল ও মারাত্মক হয়ে উঠবে এবং উভয় পক্ষের জেদের ফলে হয়ত শেষপর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধই অনিবার্য হয়ে পড়বে। সুতরাং আজকে নতুন করে এ সমস্যার সমাধানের পথ চিন্তা করতে হবে।

সে পথ হল গণভোটের পথ। গণভোট ছাড়া আর অন্য কোন উপায়েই আজ বিনা রক্তপাতে ফরমোসা সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থেকে চীনের বর্তমান প্রতিনিধিদের দূর করে দিয়ে সেখানে যদি চীনের কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা হয় এবং ফরমোসার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যদি ফরমোসার সাতাত্তর লক্ষ অধিবাসীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাই হবে বর্তমান মুহূর্তে চীন ও ফরমোসা সংকটের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ সমাধান।

ষাট বছরের অধিককাল চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ফরমোসার কোন সম্পর্ক নেই। তার আগেও যে ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল তাদের মধ্যে, তাও বার বার ছিন্ন হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কঠিন আঘাতে। কোনদিনই চীন ফরমোসায় শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে পারে নি। আর সাংস্কৃতিক দানও তার সেখানে সামান্য। অর্ধ শতাব্দীকাল জাপানের অধীনে থাকার ফলে বর্তমানে ফরমোসার ওপর চীনের চেয়ে জাপানের সাংস্কৃতিক প্রভাব অনেক বেশি। তাছাড়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাসও করে প্রায় পাঁচ লক্ষ জাপানী। এ ছাড়াও সেখানে আছে কয়েক লক্ষ মালয়ী ও আদিম অধিবাসী। এতগুলি মানুষের ভাগ্য শুধুমাত্র তিনব্যক্তি স্বাক্ষরিত একটি যুদ্ধকালীন চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত না করে যদি তাদের নিজেদের হাতেই নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাই হবে প্রকৃত ও গণতন্ত্র সম্মত সমাধান। ফরমোসার অধিবাসীরাই স্থির করুক তারা চীনের সঙ্গে যোগদান করবে, না সিংহল বা নিউজিল্যাণ্ডের মত একটি স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্ররূপে অবস্থান করবে।

সুতরাং পূর্ব এশিয়ার প্রলয়সম্ভব সংকটের আশু সমাধানের জন্যে আজ যুদ্ধবিরোধী গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে দাবী ওঠার দরকার—কমিউনিস্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য করা হোক, এবং গণভোটের মাধ্যমে ফরমোসার ভাগ্য নির্ধারিত হোক। আর সে গণভোট গৃহীত হোক ভারত, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন প্রমুখ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির তত্ত্বাবধানে।








আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্ত বেলা, পাতা ছিঁড়ে বিকালের আলোর ছিনিমিনি তার মুখমণ্ডলে, অধিকন্তু পাতার সবুজতা; এতে করে তার মনের অধৈর্যতা আরও যেন বেশী করে প্রকাশ পায়। সে ক্ষুৎ-পিপাসা কাতর না, অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল।

গাড়ি আসে, কোচোয়ান পা দিয়ে পাটায় আওয়াজ করে, ছিপটি ঘুরায় এবং হাঁকে "আনবোনা' আমবোনা' 'গড়শিনলা' ই ওঃ।" অথবা সাইকেল কিম্বা গরুর গাড়ি, কভু বা কল্যাণময়ী সাঁওতাল রমণীরা—তারা নালিশ-করা-সুরে কথা কয়, তাদের দেহ বড় গড়বড় করে। কখনও বা মামলার ফিকির আঁটে কতিপয়, একজনের পায়ে বুট জুতো, সে মাথার উপর হাতের হুংকা খেলিয়ে বললে, "লিলুলিতো শালা, উয়া জমি ডিহি আমি এাকো গরাসে খাই লুবে হে! দেখ বটে" থেমে "সন তের শ চৌদ্দ" গলার স্বর নেমে ছিল না দূরে গিয়েছিল। আর কচিৎ, ছোকরারা ফিসফিস করে কথা কয়, নিশ্চয় স্বদেশীর কথা।

মামলা সূত্রে কোর্ট, কোর্টের ঘণ্টা দূরে থেকে শুনলে জ্যোতি ত্বরিতে ফাঁকা মাঠে পৌঁছে যায়, বড় অসহায় বোধ করে। এখন সে পিরানের মধ্যে হাত গলিয়ে পৈতেটা টেনে কাঁধে তুললে। হাপ-প্যাণ্টটা ঢাউস। এর একটা ঠ্যাঙের মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত শরীর গলে যেতে পারে। বাবুই দড়ি একটা ছিল, এখন নেই; সুতরাং সে কাপড় যেমত গিঁট দেয় তেমন তেমন গিঁট দিয়েছিল। ছোটার সময় অবশ্য তাকে প্যাণ্ট ধরেই ছুটতে হয়।

ক্রমাগত সে তিক্ত হয়ে ওঠে, অন্নপূর্ণা কেন যে এখন আসছে না? এর জন্য তার রাগ; সে-কারণে তার অভিমান। এই রাস্তায় তাকে ফিরতেই হবে, তখন জ্যোতি তাকে দেখে নেবেই; তার মন বড় তছনছ হয়ে আছে। সে সাহস করে একবার রাস্তায় উঠল, এখন গাছের পাশে ফিরে আসছিল।

"কে বটে জ্যোতি লয়?"

জ্যোতি কোন এক সামগ্রী চুরি করতে গিয়েই হাত সরিয়ে নিলে—এমনই তার স্বর, তথাপি বিপিন গুপ্ত মশাইকে দেখে হাসবার চেষ্টা করার থেকে মাথা বেশী নাড়াল। বিপিন গুপ্ত কাঁধের থেকে ছাতাটা নামিয়ে শান্ত চোখ দুটিকে তীক্ষ্ণ করে বললেন, "প্যাণ্টালুন বিলেতী লয়?"

অসহায়ভাবে মুখটি আন্দোলিত করে জ্যোতি উত্তর করলে, "জানি না, একজনা দিইছে বটে।"

"আহা হা! বাবা কেমনরে" বিপিন গুপ্ত এ-প্রশ্নে জ্যোতির উত্তরটা মুছে দিয়েছিলেন। তাঁর নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল। "তুই আর তুয়ার দিদি একবার আসিস কথা ফয়সলা আছে বটে," বলেই আবার হাঁটতে লাগলেন। ছাতাটি পুনর্বার ঘাড়ে, খোলার কথা হতে পারে—মনে নেই। তাঁর ক্যাম-বিশের জুতো জোড়ার দিকে জ্যোতি শ্রদ্ধার সংগে চেয়েছিল। জুতো জোড়া পাঁচ খানায় ধুলোলাল, সে একবার প্যাণ্টালুনের দিকে দেখেই মুখ তুলেছিল। স্বদেশীদের উপর তার কিছু ভাল ধারণা থাকার নয়, বিপিন গুপ্ত স্বদেশী নিশ্চয়ই হলেও তার কথা আলাদা। এ-কারণে নয়, যে তিনি তাদের মাসে চার টাকা বন্ধু-ভাণ্ডার থেকে সাহায্য করেন। যেহেতু তিনি সত্যই সবাইকে ভালবাসেন। বড়লোকদের ভালবাসবার কোন সুযোগ নেই, তা না হলে তাও তিনি বাসতেন। বিপিন গুপ্তই একমাত্র লোক যিনি সত্যই চন্দ্রসূর্য উঠার রহস্য অবগত ছিলেন। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু, জ্যোতির স্বদেশীতার উপর রাগ ছিল। কেননা, স্বদেশীতাই তাদের কাল।

জ্যোতি রাস্তার দিকে চাইল, একবার মনে হয়েছিল, তাকে যদি অন্নপূর্ণা দেখতে পেয়ে অন্য পথে চলে গিয়ে থাকে? মনে মনে সে সময়ের হিসেব নিলে, ভ্রূ কুঁচকালে; দৃঢ় হল যে, এ-সময়ের মধ্যে অন্নপূর্ণা খুব বেশী হলে দুর্গাবাড়ি পর্যন্ত। এবং দুর্গা-বাড়ি থেকে তাকে ঠাওর করা সম্ভব নয়। হিসেব সত্ত্বেও সে দোমনা হয়েছিল। অব-শেষে এরূপ মনস্থ করে যে, "আর চারটে সাইকেল নাঃ সাইকেল বড় ঝটঝট আসে, বাক? উঁহু গরুর গাড়ি যদি চারটে আসে।"

দ্বিতীয় গরুর গাড়িখানি—মুখোমুখি ঘোড়ার গাড়ির দাপটে—রাস্তার অল্প ঢালে নেমে গেল, এখন স্পষ্টই দৃশ্যমান কশ্চিৎ-বালিকা রাস্তা ছেড়ে নীচে শালগাছতলে স্থির। একটি অতি সাধারণ খবরের কাগজের প্যাকেট অত্যন্ত সাবধানে বুকের কাছে ধরা; ভয়ে তার খোঁপা খসে, এবার দেখা গেল রয়ে রয়ে খসে পড়ছে। রাস্তা স্বাভাবিক দেখে মেয়েটি নিশ্বাস ফেলে স্বস্তির হাসি হেসেছিল।

গরুর গাড়ি যখন ঢালে নামে, জ্যোতি জিব দিয়ে তখন "আ-র-র-র" শব্দ করলেও, স্থান ত্যাগ করেনি, সে ডাল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মাত্র। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মেয়েটি ব্যতিব্যস্ত, এ-কারণে যে, সে হাতের প্যাকেটটি কোথায় রেখে চুল গোছ করবে? দাঁত দিয়ে ধরবে না বগলদাবায়

রাখবে? ছোট অস্থিরতার নিষ্পত্তি করেই, গাছের গঁড়ির কাছে মোটা শিকড়ের উপর সন্তর্পণে রেখে অযত্নের চিল-পিঙ্গল চুল-গুলিকে সহজেই জুত করে, কাপড়ে মুদু মুদু নিয়মমত ঠিক দিয়েছিল।

সে যে অন্নপূর্ণা একথা বুঝতে জ্যোতির ভুল হয়নি, অন্নপূর্ণার রক্তগৌর মুখমন্ডল বিকালের চাঁপা আলোয় কঠিন। সে ভীরু চাহনিতে কি যেন-বা ঢাকবার চেষ্টায় চঞ্চল, কাপড়ে কোনো ছেঁড়া অংশ নিশ্চিত। জ্যোতির কি যেন মনে পড়ে গেল, দেহ তার দ্রুত নিশ্বাসে ধড়ফড়, তবু তারই মধ্যে সে হাপ-প্যাণ্টের যেখানে ছেঁড়া সেখানে হাত দিয়ে অনুভব করেছিল, এবং মুহূর্তের জন্য অন্নপূর্ণার উপর তার মায়া হয়। তথাপি সে আপনার চোয়াল নাড়িয়ে মনকে দৃঢ় করলে। অন্নপূর্ণা প্যাকেটটা ভুলে না-লাগা ধুলো খুব আদরে ঝেড়ে ফেললে। আবার্ধি পথে। তার মুখে পরিতৃপ্ত আহারের খুশী, নিশ্চিন্ত ঘুমের সুস্থতা বর্তমান। জ্যোতি এতদ্দৃষ্টে ঘৃণায় টান হয়ে হয়ে উঠল।

অন্নপূর্ণার চলার মধ্যে কেমন যেমন পালানো পালানো ভাব, যদিচ এ-ভাব যুবতীজনোচিত হলেও এ-ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য নয়। এক একবার সে বেশী করে নিশ্বাস নেয়, অবশ্য এর জন্য তার গতির কোন হেরফের নেই। সে খানিকটা এসে চকিতে দেখল, পাশের আতা গাছটি হিঁড়ে ছিঁড়ে গেল, এবং কে একজনা অতর্কিতে ঝটিতি তাকে ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে গিয়েই ফিরে ফিরতি তার সামনে উদয় হল। অন্ন-পূর্ণা থমকে থেমে প্রথমে এক পা এবং পরে আর-একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, প্যাকেটটা কখন যে মাতৃ-বাগ্রতায় বুকে আঁকড়ে ধরেছিল, তা তার জানা ছিল না। ফলে সে সহজ নিশ্বাস নেয়। অবশ্য এ সময়ে তার আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয় ধাঁধিয়ে উঠে শান্ত স্থির। "কি" এ-কথাটাকে যেন মুখখানি উঁচিয়ে টেনে টেনে গলার গহ্বর থেকে বার করে আনল। পুনর্বার খোলাখুলিভাবে বললে 'কি'। এরপরই যথেষ্ট নরম করে সাধারণ করে বলেছিল "কি রে?"

"কি রে? ভাবছ বটে আমি কি কিছু জানি না," জ্যোতির গলা আরও রুক্ষ আরও অসংযত হয়েছিল, বললে "বাণ্ডিলে কি বটে শুনি?"

অন্নপূর্ণা সাহস ফিরে পেলে, তখনও অবশ্য জ্যোতিকে মনে হয়েছিল দুর্বৃত্ত আর পাঁচটা পুরুষ চরিত্র যেমত হয়। ইতি-মধ্যে রাস্তাটা একবার খতিয়ে দেখে উত্তর করলে, "ভাল হচ্ছে না জোতে রাস্তা ছাড় বলছি..." বলেই আর সময় অপব্যয় না করে জ্যোতির পাশ কাটিয়ে সে চলতে শুরু করল।

জ্যোতি সেইভাবে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, "লজ্জা করে না" বলেই একটি গাড়িকে রাস্তা ছেড়ে আর-এক ধার দিয়ে যেতে যেতে শত গঞ্জনা দিতে লাগল, যথা "ধাড়ি মেয়ে" ইত্যাদি।

"ঝেঁটিয়ে...জ্যোতি বেশী চালাকি..." বলে অন্নপূর্ণা রাস্তার নজর নিলে।

"তোকে বুনু বলতে সরমে মরি, আসছে জন্মে যেন পাথর হই...ছি ছি ধিক গো... লুকিয়ে ছিট কেনা হয়..." বলে নিজের গাল থাবড়াতে লাগল।

"পোড়ার মুখো...এতে ছিট আছে কে বললে?"

"নাই যদি, তবে খুল না কেনে দেখি হে তুমার শ্বশুর কি দিলে বটে?"

অন্নপূর্ণা সত্যিই ধরা পড়ে গেল, এতে তার রাগ হয়, এতে তার চোখে জল, ক্রোধ-বশে মিথ্যা বললে, "আমায় কুন্ড়ুদিদি দিইছে" বলেই সে চলতে শুরু করল।

"কষ্ট হবে গো দিদি কষ্ট হবে, ধ্যা মিছাই বলা তুয়ার ঠোঁটে আটকায় না, হায় নাই চামার রুইদাস, বাবার একটা ওষুধ বদ্দি নাই...আর তুমি—"

"বেশ করব বাঁদর, চল না ঘরকে... মাকে..."

অন্নপূর্ণার বাক্যে গাত্রদাহ ছিল। জ্যোতি ভীত মূঢ়, কোনক্রমে সে সকল কিছুর দিকে চেয়েছিল। রুক্ষসত্যাদি অন্নপূর্ণার একপ্রকার অবজ্ঞার কথা শুনল। ছেলেমানুষটির পৌরুষকে নয়, কোনো ব্যক্তির প্রতি ভাল-বাসাকে তুচ্ছ করা হল। যে-ভালবাসার বলে এত দুঃস্থ হয়েও সে দাম্ভিক। সে, বালকেরা ক্ষোভ রাগবশে যেমত খুঁখুঁ শব্দ করে সেইরূপ, শব্দ করতে করতে নিমেষেই রাস্তা পার হয়ে অন্নপূর্ণার দিকে গেল।

ভাইবোনে সদর রাস্তায় অনাত্মীয় হয়ে উঠল। এই সময় জ্যোতি তার প্যাণ্ট এক

হাতে সামলাচ্ছিল, অন্য হাতটি প্যাকেট ছিনিয়ে নেবার জন্য ব্যগ্র এবং অন্নপূর্ণা বারবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে যুঝবার চেষ্টা করেছিল। চাঁটি মারছিল, চিমটি কাটছিল এবং অল্পকাল পরে নিজেই প্যাকেটটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছিল।

কাঁকরে রাস্তার এতাবৎ থরথর ভাঙা, ছেঁড়া রুক্ষ আওয়াজ চুপ! জ্যোতি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনেলে। ক্ষণেক বাণ্ডিলটার দিকে চেয়ে, অনাবার দিদির প্রতি ভীত-ভাবে চাইলে। দিদি আপনার হাত মুঠো করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কাঁদছিল, শব্দ-হীন কান্না নিমের থেকেও তিক্ত, শাপের থেকেও ভয়ংকর। জ্যোতি প্যাণ্ট পরবার সুযোগ পেলে নিজের গোঁয়ার্তুমি বুঝে তার ঘাড় হেঁট হল, ঠোঁট কাঁপল। সে হয়ত বলেছিল "আমি রগড় করছিলাম বটে", এর কিছু পরে বলেছিল "দিদি বাবার জন্য আমার বুক ফাটে গো তাই"। কখন যে তার দৃষ্টি থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত সরে গিয়েছে তা সে টের পায়নি। মুখ তুলতেই দেখল, বেশ দূরে অন্নপূর্ণা, নিশ্চয়ই চোখে তার কাপড়। জ্যোতি বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে ধূলো ঝেড়ে দৌড়ল। অন্নপূর্ণা ভাইএর ডাক শুনে দাঁড়ায়নি, গতি কথঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়েছিল মাত্র। জ্যোতি যারপরনাই গলা রুদ্ধ করে মিনতি করছিল।

মানুষে চলতে চলতেই এরূপ যে আছড়াতে পারে, জ্যোতি তা কখনও দেখেনি। সে হাঁ করে স্থির থাকে, কখনও বা পা মাটিতে ঘষে উপায় ঠাওর করে আবার দৌড়ায়। কখনও চলন্ত গাড়ীর-পাশ অনায়াসে কাটিয়ে বলে, "হেই গো, এখনি চাপা খেতাম গো তুয়ার মনে মায়ামমতার খোরাক নাই, ঘর করবি কেমনে লো, আমি সাত জন্ম যেন আটকুড়া হই, মাইরী আমি কখন ভাবি নাই তুই এমন বদলাবি...বাবা অন্ত পরাণ ছিল তুয়ার..."

অন্নপূর্ণা ভাইএর কোন কথা বোধ হয় শোনেনি। অন্নপূর্ণা প্যাকেটটাও নেয়নি। এখন তারা দুজনেই একটি রোগা গলিতে। জ্যোতি বললে "দিদি লিবিত লে, না হলে" —বলে, একটি কারুকার্য করা কাঠের থাম দেওয়া রকের উপর প্যাকেটটা রাখতে গিয়েই চমকে উঠে একীভূত হয়েছিল। প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ আসে। অন্নপূর্ণা ঘুরে দাঁড়ায়; তার দেহ ছুটবার পূর্ব মুহূর্তে। এখন দুজনেই মুখোমুখী। জ্যোতির দেহে ছুটে যাবার ব্যগ্রতা, অদ্ভুত, ঈষৎ বাঁকা।

গোলমাল উত্তরোত্তর মুখ খারাপ করে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান হো হো শব্দ। "লে লে মার শালা ঢ্যামনা...কে ক্ষেপা পাগলাকে খাপান দে।" রকওয়ালা বাড়ির পিছনে বাজার। গলি ঘুরে গেছে। জ্যোতি নিশ্চিত যে, পুলিসের হাঙ্গামা এ নয়, ফলে তার চোখ ফেটে জল, হাঁপছাড়া স্বরে বলে উঠল, "দিদি, বাবা!" উচ্চারণ করতে মুখ তার দুমড়ে ত্যাওড় হয়ে গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণার হাত দুটি উঠেছিল, ত্রস্ত বিভ্রান্ত অন্নপূর্ণা জ্যোতির সঙ্গে গলা মিলিয়ে একই নিশ্বাসে বলেছিল "বাবা"।

গোলমাল বাজার খোলা থেকেই আসে, সুতরাং জ্যোতি ছুটল, দিদির গায় অল্প ধাক্কা লেগেছিল। রাস্তা থেকে সে একটা পাথর কুড়াতে গিয়ে পারল না, অন্য একটা পারল; অন্নপূর্ণা এইটুকু মাত্র দেখেছিল, তার গালের পাশে হাতটির আঙুলগুলি কৃষ্ণগ্রন্থ, মহা আক্ষেপে মাথাটি কেঁপে উঠল। কান্না যাকে ত্যাগ করে গেছে, তার আর বুঝ দেবার কি রইল! সে ত্বরিতে রকের উপর থেকে প্যাকেটটা ছোঁ মেরে নিয়ে ছুটল অন্যপথে, তার চোখে জল।

সে অনতিদূরে বন্ধ দরজার চৌকাটে উঠে দাঁড়াল। দরজার পাশে কাঠে হাত দুটি ধরে নিজেকে আটকে রেখেছিল। এক

হাতে প্যাকেট। তার সুন্দর মঙ্গলকারী দেহ ভর পাতার মতই দুলছিল।

গোলমান ধাঁধিয়ে গমক দিয়ে উঠে। যে লোক এই মুহূর্তে ছিল এখানে, পরক্ষণেই সরে গিয়ে অন্যত্রে। মুখে চোখে বিকট বিলাতী অট্টহাস্য, পার্শ্বস্থিত দোকানসমূহের দড়িতে ঝুলান হুঁকো পাখা, সাজি ঠেকা শত শত সামগ্রী দুলে নড়ে ত্রাহি ত্রাহি; দোকানিরা দোকান সামলাতে ব্যস্ত, কেউ সামগ্রী কুড়ায়, কেউ বা ষাঁড় রুখতে তৎপর। জ্যোতির শিবনেত্রদ্বয়ে মেঘ ডেকে উঠল, সে বুঝতে পেরেছিল তার প্যাণ্ট আলগা হচ্ছে, এবং সময়ক্ষেপ না করে কুড়িয়ে পাথরটি ছুঁড়ে মারলে। ভিড় হে হে করে সরে গেল। পাথরটি যে তাদেরই উদ্দেশে ছোঁড়া এ কথা বুঝবার সময় ছিল না। কে একজন কোমর বাঁধতে বাঁধতে বললে, "বড় লিয়ে মার ননু"

ভিড় সরে যাওয়ার কারণে দেখা গেল, জ্যোতি দেখলে, কে একজন তার বাপের গায়ে এক থাবরী জল ছুঁড়ে দিলে। যে-লোকটি তখনও তার বাবাকে দেওয়াল ঠেসা করে মারছিল, তার চোখে মুখে জল পড়ল, জলসিক্ত মুখ মুছতে মুছতে সে বললে, "দুর অ শালা...শালা"। জ্যোতি এক হাতে প্যাণ্টটা টানতে টানতে এসে তার ভিখারী হাতে লোকটিকে ঘুঁষি মারতে উদ্যত হল, লোকটি সরে গেল। সেই ঘুঁষি পড়ল তার বাবার পিঠে। বাবার পিঠটা দুমড়ে গেল, বললে "মার মার...ওঃ ওঃ—মন বিষয় চেয়েছিলে।" জ্যোতি সজল নেত্রে দেখল, তাঁর পিঠের জলগুলো থুরে থুরে করে গড়িয়ে এল।

শিবনাথের মুখ দেওয়ালের দিকে ছিল, হাত দুটি প্রাচীন বন্দীদের কড়া-আটকান হাতের মত ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, তার কিছু পাশে বর্ষা-পানির ভাঙ্গা নল সেখানে একটি বাচ্চা অশ্বত্থ। জ্যোতি দুর্ধর্ষ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলে, সেই লোকটি নাল মাখান হাসি হেসে বলছিল, "লে লে খোঁকা মার শালা ক্ষেপা ঢ্যামনাকে আশি সিক্কা"—বলে নিজের কব্জিতে একটু আরাম দিতে দিতে, তুখড় মাগী-মচকান চোখে চারিদিকে চাইতে লাগল। লোকটি নির্ঘাত মফস্বলের, তাই যদি নয়, তাহলে কি জ্যোতিকে এইভাবে কুৎসিত উৎসাহ দেয়। কারণ অন্যেরা এখন সমবেদনা জানাচ্ছিল।

শিবনাথের পিঠে, জ্যোতির ঘুঁষি যেখানে পড়েছিল, সেখানে লোকে যাতে না বুঝতে পারে এমনভাবে জ্যোতি হাত বুলাতে লাগল। এবং সেই সঙ্গে সামনের লোকটিকে বললে "শালা জুতিয়ে," বলেই ঝপ্ করে একটা ঘুঁষি মারতে গেল। লোকটি 'আরে' বলে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি ছুঁড়ল। জ্যোতি অন্য লোকেদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তার মুখ ফুলে গেল, সে আস্তে আস্তে উঠে লোকটিকে এমনভাবে কাবু করলে যে সকলে লোক অবাক। এ লোকটি পরিত্রাহি চীৎকার করে "গেলাম গেলাম গো"। বাজারে লোকরা হাঁ হাঁ করে এসে ছাড়িয়ে দিলে। কাবু হওয়া লোকটি মাটিতে বসে পড়ে কেমন যেন করতে লাগল। হয়ত মনস্থ করেছিল, এবার থেকে ল্যাঙগটা পরবেই।

জ্যোতির মনে কোন বীরত্বের ছায়া পড়েনি, কারণ শিবনাথ এখনও একইভাবে দণ্ডায়মান। কাল্পনিক চাবুকের আঘাতে তার পিঠ বেঁকে চমকে দুমড়ে উঠেছে। এবং সেই সঙ্গে করুণ আর্তনাদ। নিপীড়িত কণ্ঠে শিবনাথ অনেক কথাই বলেছিল, যথা "ওঃ টুপীভোর ইংরাজ, আজ তুমি বিরাট মহীরূহ...দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে(?) ভূমে, নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ, তুমি অস্তাচলে......"

জ্যোতি বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময়, যেমন তেমন করে আশপাশের উৎসুক রগড়প্রিয় ইতর-জনমণ্ডলীকে দেখছিল। ইতর শ্রেণীর ছেলেরা জঘন্যতম অভিনয় দেখিয়ে হি হি করে উঠছে। জ্যোতির আর রাগ করবার মত ক্ষমতা ছিল না। সে ক্ষোভে অপমানে শতচ্ছিন্ন, পিরানের হাতায় চোখ মুছবার কালে হঠাৎ পাখা ঝাপটান আওয়াজ শোনে। কে যেন কথা বলে।

"হাঃ রে ঘরকে কেউ নাই আগল দিবার গো, শিকল আঁটন দাও"ঃ এ-গলার স্বরে গভীর আন্তরিকতা নিহিত ছিল; জ্যোতি পিরানের হাতা থেকে চোখ তুলে কাকে যেন দেখল, এখন তার নিজের দৃষ্টিতে ঘোরহেতু সম্মুখের সকল কিছুই আবছায়া। ইদানীং স্পষ্ট, একটি বালক মাত্র। যার পায়ের বেড়ী থেকে শিকল উঠেছে হাতে; হাতের কড়ার শিকলে মস্ত কাঠ। সাদা সাদা দাঁতগুলি বার করে এতেক কথা সেই বলছিল; আর পুনঃ পুনঃ আপনার শিকলটি দেখাতে লাগল। কিন্তু সে হাসছিল। এ-ছেলেটি রামপ্রাণ ঢালির ছেলে ফেলা। ঠিক যেমন পুরাতন কাঠে কোঁদা দাসমূর্তি।

সাপের শব্দ মনে হয় শিকলের মধ্যে আশ্রয় করে আছে, রোমহর্ষে জ্যোতির কাঁধে ভাঙন খেলে গেল। অবশ্য এ-সময় শিবনাথ তার দাড়ি ধরে আদর করতে করতে অতি স্নেহময় নিষ্ঠাবান কণ্ঠে বলেছিল, "মাই ডিয়ার সন, ডিয়ার সন, ওঁ তত্ত্বমসি তৎ"

বাজারের লোকেরা এখন পাগলের মুখ থেকে কিছু আপ্ত বাক্য শুনতে চায়। কে একজনা শিবনাথকে অনুকরণ করে বলছিল, "মাই সন মাই সন—ইয়া বটে ইংরাজি মনে লয়"; ইত্যাকার অজস্র মন্তব্য আরও।

জ্যোতি ছেলেটিকে যেন সহ্য করতে পারছিল না। ছেলেমানুষ বড় ভয় পেয়েছিল। সে ডাকল, "বাবা!"

এখানকার খুচরো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় রাস্তা ক্রমে ঢালু হয়ে গিয়েছে এবং দূরে জ্যোতি আপনার বাপকে সামলাতে সামলাতে নিয়ে যায়। শিবনাথের মুখে অজস্র উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরবিভঙ্গ।

জ্যোতি এ-রাস্তায় যেতে সত্যই ভয় পাচ্ছিল, এ-কারণে যে এখান থেকে পাড়া আরম্ভ, এবং শিশুরা যে কিরূপ নিষ্ঠুর তা সে জানে। রাস্তায় নামবার পূর্বে সে দেখলে, বেশ ভিড়; কি যেন একটা হচ্ছে আত্মারামবাবুর বাড়ির সামনে। কোন উপায়ে যদি পার হওয়া যায়। কিন্তু রাস্তায় পা দেওয়া মাত্রই শুরু হয়ে গেল। "হেই পাগলা মাথা আগলা"। জ্যোতির কাছে এই ব্যাপারটি অত্যধিক মনকষ্টের। সে যে কি করবে তা ভেবেই পায় না, অথচ শিবনাথের মুখে ষোল আনা ন্যাকা ন্যাকা হাসি, যদিচ দাড়ি থাকার দরুণ অতশত মনে হয় না। জ্যোতি কাউকে তাড়া দিলে, কাউকে গাল; এক-দলকে যেই সে একটি পাথর তুলে তেড়ে গেছে অমনি দেখলে বিপিন গুপ্ত মশাই একটি বড় মত ছেলেকে ধরছেন। শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, ছিঃ। এরপর একটু দম নিয়ে বলেছিলেন, "ধর যদি তোমার বাবা হত"। কথাটা বিপিন গুপ্তর মত লোকের পক্ষে একটু নিষ্ঠুর হয়েছিল।

এ কথায় জ্যোতির কষ্ট হল, দেখলে, ছেলেটি তার বোতামের দিকে চেয়ে আছে, তাঁর গলার স্বর এক প্রকারের, এ-স্বরে মানুষকে বড় পুরাতন করে দেয়। বিপিন-বাবু ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে কোনমতে জ্যোতির কাছ বরাবর এসে 'আবার' বলেই একটা দুঃখবাচক শব্দ করে মাথা নীচু করে রইলেন। অল্পস্বরে বললেন, "লোকে অনেক কথা বলে তাই তখন তোমাকে বলেছিলাম আসতে; আজ এখানে গোলমাল, কাল সেখানে ঈশ্বরবৃত্তির কোটা ছিনায়; বলে শিকল দিন" শিকল কথাটা তাঁকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। অনেক পথচারী তাকে নমস্কার করেছিল, তিনি অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়েছিলেন, ইতিমধ্যে সজোরে একটি নিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, "আমার বটে ঘাড় ঘাড়কে চেন দেখলে বেগোড় করে তা আবার শিকল, এম-এ পাশ সে-লোক কত উজিয়ে পাগল হবে গো...চেন শিকল!" বলে থেমে মুখের ইশারায় কাউকে দেখিয়ে বললেন, "দেখ না বড় কষ্ট লাগে"। যাকে তিনি দেখিয়েছিলেন, সে রামপ্রাণ ঢালির ছেলে ফেলারাম। একথা সত্য যে, জ্যোতি তাকে দেখেছিল।

আত্মারাম মাড়োয়ারীর আজ ব্রত উদ্‌-যাপন। পাখি ছাড়া হচ্ছিল। ফেলারাম পাখি উড়া দেখে অতীব আনন্দে নাচে। আর হাতের কাঠের গুঁতো খাবার ভয়ে অনেকেই আশে পাশে ছিল না। মাঝে একবার সে তার বাঁ পা দিয়ে শিকলে লাথি মেরেছিল কাঠে মেরেছিল। তবু সে নাচছিল।

আত্মারামবাবু এখানে উপস্থিত, ঠিক কাঁটার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, মুখে তাঁর অনর্গল শ্লোকধারা। তাঁর পায়ের কাছে বেনারসী পাখমারা। ছেঁড়া জুতোর মত মুখটা, সকল সময়ই আড়াল করে, এটা তাদের মুদ্রাদোষ! এখন সে আঁঠার লতার ঢাউস ঝুড়িটার মধ্যে হাত দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে কিছু নিশ্চয়ই খুঁজছিল। সহসা বলে উঠল, "আকাশ পাবি গো; ডর কিরে, আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরাণ"। এবং অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে একটি পাখি বার করে আনল। একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছুভাগ, বনের কিছুভাগ দিয়ে গড়া, নীলকণ্ঠ পাখি! অনেকেই পাখি দেখে নমস্কার করেছিল! বেনারসী পাখিটিকে আত্মারামবাবুর কাছে এগিয়ে দিলে।

পাশের একজনা গঙ্গাজল ছিটালে, আত্মারাম তখন একটি অমোঘ-চাতুর্য খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কোনোরকমে ডানা দুটি হাতে চেপে একটা দোলা দিয়ে উড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে জয় রাম জয় রাম ধ্বনি উৎসারিত হল; নীলকণ্ঠ এদিক সেদিক করেই ক্রমাগত বিমানচারী হয়ে গেল। আত্মারামের হাত দুটি জোড় হবার পূর্বে থমকে ছিল, ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে সে নিশ্চয় বলছিল "হা রামা তুমি আমায় মুক্তি দিও।" বেনারসী পাখমারা তার আহত আঙুল চুষছিল আর দেখছিল। কাবুলিওয়ালা নিজের মালা ফিরাতে ফিরাতে আকাশের দিকে চেয়েছিল।

আশ্চর্য যে এসময় ফুলকারি বৃষ্টি হয়। লোকে বৃষ্টির জল হেতু চোখ বন্ধ করে আনন্দে বলেছিল "পুষ্পবৃষ্টি"। ফেলারাম নাচছিল। জ্যোতির দৃষ্টি নিবদ্ধ, তার মনে হয়, আকাশ বড় আপনার জন! সত্যই নীল নয়! বললে, "জেঠামশাই আকাশে রাত্তির হয় না—না?" ভাগ্যে একথা খুব অনচ্চ কণ্ঠে বলেছিল তা না হলে সে বড় লজ্জিত হত। সে এবার তার বাবাকে দেখল, এখনও তার দৃষ্টি আকাশে, মুখে শুধু "ওঁ তত্ত্বমসি তৎ"।

বিপিন গুপ্ত বললেন, "ওরে বাড়ি চ..." তারপর ঘাড়ে ছাতা তুলে চলতে চলতে বললেন "তুয়ার..." বলে একটু গলা পরিষ্কার করে বললেন, "বুঝলি ওদের নজর একটু আঁক আগলে রাখতে গো। ...আমি যাই রে।"

"ওদের" কথাটা জ্যোতিকে যেন হারিয়ে

দিলে, আজকের জেতাটা বৃথা হয়ে গেল। ওদের বলতে দুজন, মা আর দিদি। সে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে কি যেন ভাবল, যার কথা সে ভাবতে সাহস করলে না। সে গম্ভীর হয়েছিল!

রইল অন্নপূর্ণা! ইদানীং অন্নপূর্ণা শিবনাথের বিপদ দেখলেই অন্তর্হিত হয়। অথচ এই দিদি, বাবার জন্য কত জপতপ করলে, তারা ভাইবোনে কত সন্ন্যাসী অবধূত করলে। আজও সকল কথা স্পষ্টই মনে আছে। সকাল বেলা, দিদি ঘরে ঘরে চুল বাঁধছিল আয়নায়, এমত সময় শিবনাথ একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। আয়না খান্ খান্ হল। আয়না ভাঙ্গার শব্দ সৃষ্টিছাড়া, আকাশ বিচালিত হয় ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায়। দিদি 'মাগো' বলে বসে পড়েছিল, চারিদিকে টুকরো টুকরো আয়না, এক সেখানে একাকার। শিবনাথ যে পলকের মধ্যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তা জ্যোতি বুঝে পেলে না! সে এমন কি বাজারের সাবেক "সাধের বুলবুল" পাগলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হ্যা গো আমার বাবাকে দেখেছ?" পাগলা উত্তর করেছিল "আমার সাধের বুলবুল—আমার সাধের বোলবোয়ুলে"



অবশেষে ডেপুটির বাড়ির মেহেদীর বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে জ্যোতি দিদিকে ডেকেছে। বন্দুকধারী বুটের আওয়াজ উঠল; মোটা গলায় হাঁক এল—"কে তুমি?"

জ্যোতি বুঝেছিল খোদ্ ডেপুটি, ডেপুটির প্রতি তার অতীব ঘৃণা ছিল, কারণ তার একটি ছোট কথাবার্তা মনে ছিল: তখন সন্ধ্যা, মা আর দিদি ঘরে বসে, দিদি বললে "বড় ভয় করে?"...উত্তরে তার মা বললে, "মনকে পাপ আনিসনি, ডেপুটি বাপের বয়সী বটে আদর করে বটে আদর করে...মনকে পাপ আনিস না", এ কথার পরই তার মা হেমাঙ্গিনী জ্যোতিকে দেখেই অন্নপূর্ণার গা টিপে দিয়েছিল, তবু একটি ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর এল, "ভয় করে বড়?" এ গলা অন্নপূর্ণার। জ্যোতি বুঝেছিল, "ডেপুটি ভাল লোক নয়।"...এখন জ্যোতি মেহেদির বেড়ার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, "আমি অন্নপূর্ণার ভাই...আমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।" তার মুখের সামনে বেয়নেট ছিল!

অবজ্ঞার হাসি হেসে—"অন্নপূর্ণা কি করবে? পাওয়া যাচ্ছে না যাবে"—ডেপুটি বলেছিল! জ্যোতি এই উত্তরে নিখোঁজ, মনে হল সে বড় ধরনের কোন মিথ্যা বলেছে, সুতরাং সে দোষী! কার যেন 'অন্নপূর্ণা' 'অন্নপূর্ণা' ডাকে হারমোনিয়াম বন্ধ হল, অন্নপূর্ণা এসে ভাইকে দেখে মাথা নীচু করেছিল। ডেপুটি মুখ দিয়ে ইশারা করাতে সে, সুরকি বিছান পথটি যেন তারের, তারই উপর দিয়ে কোনক্রমে জ্যোতির কাছে এসে দাঁড়াল রূঢ় গলায় প্রশ্ন করলে "এখানে কি?" জ্যোতির উত্তর শুনে বারান্দার দিকে চাইল, আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে অপরাধীর মত কি যেন বললে, তার চোখে জল ছিল! ডেপুটি তাকে কাছে টেনে অযথা আদর করতে করতে অভয় দিতে লাগলেন। এ দৃশ্যটি জ্যোতির বড় কষ্ট লেগেছিল, সে মাথা নীচু করেছিল।

অন্নপূর্ণা ছাড়া পেয়ে এসে বড় কর্মতৎপর। জ্যোতি চোরা চাহনিতে লক্ষ্য করলে যে, তার গলা উঠছে নামছে, সে নিশ্চয়ই সহজ হতে চাইছিল। জ্যোতি বললে, "চ একবার বাড়ি ঘুরে যাই।" অন্নপূর্ণা একাই বাড়িতে গিয়ে কিছু পরে ফিরে এসেছিল। তার মুখখানি বিশ্রী সাদাটে। জ্যোতি অবাক, যদিও সে জানে তা ব্রণর জন্যই শাঁখের গুঁড়ো! তথাপি সে বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল যারা খারাপ তাদেরই মুখে ব্রণ হয়। অন্নপূর্ণার মুখে দুরেকটা ব্রণ ছিল। সে, জ্যোতি রুক্ষ হতে গিয়ে পরক্ষণেই বড় কষ্ট অনুভব করলে। বললে, "দিদি বাবা আয়না ভেঙেছে বলে তুই রাগ করেছিস দিদি।"

"পাগল" বলেই অন্নপূর্ণা জিব কেটেছিল।

আজও মনে পড়ে। রাস্তায় বিধুদিদির সঙ্গে দেখা, টান করে ঘাড় তুলে খোঁপা বাঁধা, অন্নপূর্ণাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বললে, "ধন্যি মেয়ে বাবা, একবারটি দেখা নাই লো" বলে একটা বাড়ির সামনে টেনে নিয়ে গেল। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে গলি মত এবং তারই শেষে উঠান। গলিতে দাঁড়িয়ে অন্নপূর্ণাকে বললে, "হরিদিদি তোকে কতদিন দেখতে চেয়েছে।" দুজনেই চুপ হয়ে গেল। ভয়ংকর বাণবিদ্ধ গোঙানি শোনা যায়, বিধুদিদি আঙুল দিয়ে সেইদিকে দেখালে, অনেক মেয়েছেলে কারও মুখে মৃদু হাসি। বিধুদিদি বললে, "এখন ব্যথা উঠেছে হয় হয় বটে"। অন্নপূর্ণা যেমন বা কোন নিকৃষ্ট গন্ধে অস্থির, সে বোকার মত বলেছিল, "কেনে? ইস্ কেনে গো?"

"দূঃ ন্যাকা, বিয়োবে বটে, তাই নাট খাইছে...মাইরি আমায় যেন ঠাকুর করেন, ঠাকুর করেন (ছোট নমস্কারান্তে) ছেলে পিলে পেটে ধরতে না হয়" বলে বিধুদিদি মৃদু হেসেছিল। ই বোকার কথায় অন্নপূর্ণা যেন চোর হয়ে গেল। বিধু আবার শুরু করলে, "দেখবি 'খন সব ভুলে যাবে, কিম্বা চারআনি গয়নার ছলে বলবেক আমার ভাল লাগে না, যেই পাবে অমনি ওয়াক ন্যাকার পা ছড়িয়ে পাত-খেলো চিবুবে; মা তুই বলে, সোয়ামী বড় শত্তুর—ছেলে কোন ছার—সেকুল কাঁটা দিলে টপকে আসে, দেখ না কেনে ঘনাদার বৌ মাগী আজ তারিখ পর্যন্তক খালি পেটে......"

বিধুদিদির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নুয়ে আসছিল। কতখানি সে জানে। অন্নপূর্ণা কেন যে এ সকল কথা শুনেছিল তা সে জানিত, কান এখানে থাকলেও চোখে দেখেছিল, আবর্তিত গোঙানির মধ্যে সে যেন বা শুকনো পাতা; শব্দ আপনার স্বরূপে দেখাল, পৃথিবীতে যে এত যন্ত্রণা গোঙানি আছে তা অন্নপূর্ণা ... দেখেনি। পুনর্বার বিধুদিদির কণ্ঠস্বর কানে এল "তুই ছেলে হওয়া দেখেছিস?" (অন্নপূর্ণা অন্যমনা, তবু মাথা নেড়েছিল)। "ওমা সে কি লো চ না শিখে রাখ"

"না ভাই......বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না"

"ওমা সে কি ও ইঃ দেখ্ বলিস কি লো"

অন্নপূর্ণা সদরের কাছে আসতেই জ্যোতি কাঁচুমাচু হয়ে "কি হইছে গো...... দিদি" জিজ্ঞাসা করল। অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করলে না, কিছুটা পথ এসে আবার প্রশ্ন করেছিল জ্যোতি।

"ছেইলা হ'বে বটে...মা হওয়া কি পাপ!"

"মনে লয় ভাদ্দর মাস গোঙাইছে গো, নদীতে" বলেই নিজেকেই ধাক্কা দিয়ে জ্যোতি বললে, "ইঃ ই শালা কিসের গোঙানি গো, শুনেছিস!...তবে শালা বুঝি শুয়োর ফুঁড়ে" বলেই কানে আঙুল দিয়ে চলতে লাগল। অন্নপূর্ণাও কানে আঙুল দিতে বাধ্য

হয়েছিল। এবং জ্যোতি বললে "মা হওয়া পাপ! কি গোঙানি বল! আমি, আমার মার জন্যে বড় কষ্ট হয়, যখন বড় হব না...তখন মাকে একটা বেনারসী কিনে দেবো...দিদি কেনে বলত আমার ভাঙা দরজা দেখলে কষ্ট হয়, সবার জন্যে...বাবা ভাল হলে আমি সন্ন্যাসী হব...তুইও ত বলেছিলিস সন্ন্যাসী হবি...শুয়োর এখনও গোঙাইচ্ছে?..." বলেই কাকে যেন দেখে হুড় হুড় করে নদীর পাড় নেমেই শুয়ে পড়ে বললে, "দিদি লুকো গো, বগলা দা বগলা দা"

সংগে সংগে অন্নপূর্ণা গাছের পাশে লুকোল। কিছুক্ষণ পরে বললে, "ওপাশে চলে গেছে, উঠ...তুই এত ডর করিস কেনে?"

"ভারী শয়তান গো...ডেপুটির মত পাজী বটে" বলেই অপ্রস্তুত। অন্নপূর্ণা যেন শুনেও শুনতে পায়নি সে তাড়াতাড়ি বলেছিল, "তুই খুঁজতে এসেছিস না গাল-গপ্প করতে...।" এরপর দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ভাই বোন বাপকে তন্ন তন্ন করে নদীর ধার খুঁজেছে। কভুবা দূর টিলার উপরে ভেড়িয়ালকে দেখে ছুটেছে, কখনও নদী-তীরের অর্ধভুক্ত শবকে শকুনির ফাঁক দিয়ে দেখেছে। অবশেষে সন্ধ্যাগত। অন্নপূর্ণা নদীজলে পা মেলে কাঁদছিল, জ্যোতি ও-পারে গেছে, এমতকালে গীতধ্বনি শুনে তার দেহখানি সোজা হয়ে উঠল। নদী-পথে গীতপ্রবাহ বড় রকমারিভাবে আসে, তবুও সে বালি মুঠো করে দৃঢ় বিশ্বাসে বললে 'বাবা' হাতের বালি ছুঁড়ে ডাকলে "জ্যোতি হি ই রে"। অন্নপূর্ণার ডাক কিছু কিছু বাহত হয়েছিল একারণে যে, গঙ্গাভি-মুখী পরে সকল নদী পার হয়, উপরন্তু রাখালের তির তির শব্দে। ঠিক এ সময় অন্য পার থেকে আওয়াজ হয়েছিল 'দিদ্‌ই' অন্নপূর্ণা দেখলে, ছেলেমানুষটি শিথিলে জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দোনামোনা করছে।

জ্যোতি অন্নপূর্ণা দ্রুতপায়ে ছুটল; দুটি বুড়ী যাদের কাপড় এখনও ভেজা পায়ের কাছে কলস জড়সড় হয়েছিল; এরা প্রশ্ন করলে, বুড়ী দুজন ভীত উত্তর দিলে "আমরা কাঙাল বটে", পুনর্বার মুখ চাওয়া-চায়ী করে বললে "আমরা মাড়খাগী কটা-কপালে রাঁড়ী—বাবাই গান শুনালেক...উঠেন গেল..."

নদীমধ্যে চর, খাড়া কালো কালো পাথর। দুজনে সেখানে গিয়ে ডাকলে "বাবা"। অন্নপূর্ণা পাথরের পাশ দিয়ে উঁকি মেরেই নিশ্চল খোঁপা তার খসে গেল। সে চুল দিয়েই মুখ ঢাকবার চেষ্টা করেছিল, জ্যোতি ত্রাসে পিছু হেটে গেল। তারা পাথরের পাশ দিয়ে দেখে, যে কে-একজনা আপাদমস্তকাবৃত করে শুয়ে আছে এবং মাথায় নরকপাল। ভাইবোন একটু সাহস সঞ্চয় করে যখন খানিকটা পালাতে পেরেছে, তখন বিকট হাসির শব্দ শুনা গেল। এবং পরক্ষণেই সুললিত কণ্ঠে গান এল, "আমি যারে তত্ত্ব করি" এ গীত শুনে অন্নপূর্ণা হেসে বললে, "বাবা রে চ—"

"দিদি আমার ভয় করছে তুই..."

"হারামাজাদা...বাবা না" অন্নপূর্ণা জ্যোতিকে জলের উপর দিয়ে বালির উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার মুখে 'তারা তারা' নাম, কখন বা 'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ'। জ্যোতিও বার বার রামকৃষ্ণ নাম করেছিল।

গীত তখনও থামেনি, রামপ্রসাদের গানের অনাহত মুহূর্তে সকল, তাঁর গানের অমরতা নদীপথে ভ্রমণ করে ফেরে। নর-কপালের পিছন থেকে একটি হাত বালি বা পাতা দিয়ে অর্ঘ্য দান করে এবং শিব কেবলমাত্র, ওঁ তৎত্বমসি তৎ" ধ্বনি পৃথিবীকে মুহূর্তের জন্য সুখকর করেছিল। অন্ন-পূর্ণাই সাহস করে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝাঁকানি দিয়েছিল। নরকপাল মাথায় করে শিবনাথ উঠে বললে "যাঃস শালা! শালী এখনও দাঁড়িয়ে দেখছিস, হতে হেতেল

দিয়ে, মায়ার বন্ধন কাট"। এখন তার হাতে নরকপাল আর একপাশে জ্যোতি অন্যপাশে অন্নপূর্ণা। এবং পিছনে সন্ধ্যার তন্দ্রার মায়ার অংগে নদীর পরিপ্রেক্ষিত।

এসকল কথা জ্যোতির স্পষ্টই মনে আছে, সেই অন্নপূর্ণা আজ কি অদ্ভুত বদলে গেছে; বদলে গেছে। বদলে গেছে সেই কালীপদর সংগে হাঙগামার পর থেকে। সে নিজে কালীপদর লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে, তার বাপের অবস্থা কাহিল, ইত্যবসরে ঘূরন্ত বাতাসের মত ত্বরিতে অন্নপূর্ণা এসে কালীপদকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে কালীপদর হাতের মধ্যে দ্লান গেল, তবু অল্পবয়সী মেয়েটির কিলমারা থামেনি, অন্যপক্ষে কালীপদ হিহি করে হেসে, তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি অন্নপূর্ণার ফরসা কাঁধে (যেহেতু সেমিজ সেখানে ছিন্ন) ঘষে কিছু উৎফুল্ল করবার চেষ্টা করেছিল। অন্নপূর্ণা! বেচারী অন্নপূর্ণা, মর্মান্তিক চীৎকার করে উঠল।

এরপর থেকে অন্নপূর্ণা কোনদিন আসেনি, পৃথিবী তার একাগ্রতাকে কোন সূত্রে কেড়ে নিয়েছে। জ্যোতি একমাত্র একা, বিরাট অবাধ্যতাকে, শিবনাথকে ভালবাসার জন্য বসে, এক এক সময় তার বড় ভয় করে। তীব্র বৈরাগ্যের নিশ্বাস তার দেহ মোচড় দিয়ে উঠে, নিজের সমস্ত বীরত্ব প্রায়শ নোংরামীর সম্মুখীন হয়ে থাকে, তার জন্য তার দুঃখ বোধ নেই। কোথাও একটা গর্ব ছিল, যার ফলে অদ্যাও সে দূরাগত বনগন্ধ পেয়েছিল।

শিবনাথের খোলা-কোঁচার বস্ত্রখণ্ড তার হাতের উপর দিয়ে আলুলায়িত; মুখে ঘন দাড়ি, চক্ষুদ্বয় আরক্ত। অনৈসর্গিক স্তব্ধতা সারা অংগের লাবণ্য হয়ে আছে; দেখলে সত্যই ভুল হয় ভক্তি হয়। জ্যোতি কোনপ্রকারে বাবার দিকে আড়ে চাইল এবং পরক্ষণেই আকাশের দিকে চেয়েছিল। সেখানে কোন এক স্মৃতি হাততালি দিয়ে উঠে। কিছু পূর্বের বেনারসী পাখমারাকে মনে পড়ল, ওজনের কাঁটার কথা মনে পড়ল, আর মনে হল, উড্ডীয়মান নীলকণ্ঠের কথা। উজ্জ্বল, সুন্দর বাবু, নীলরঙফের ক্রমাগতই শূন্যতায় পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে, আশ্চর্য! দূর দূর যায়। এই দৃশ্যের সবটুকুই সে বাপের জন্য উৎসর্গ করে দিতে পারে।

জ্যোতির হাতের মধ্যেই শিবনাথের হাত ছিল, ফলে সে বুঝতে পেরেছিল যে বাপের হাতে উষ্ণতা; স্বাভাবিকভাবে যে-উষ্ণতা থাকে, তা এখন নেই। ভোরের শীতলতা বর্তমান! এমত অনুভবে সে সাহসী হয়ে বলে ফেললে "তুমি এমন কর কেনে গো... তুমি বুঝ না তুমাকে লোকে হেনস্তা করলে আমাদের...আমার বড় বড় কষ্ট হয়" জ্যোতি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, তার কণ্ঠ আড়ষ্ট মেঘময়।

শিবনাথ অতর্কিতে থেমেই, যোগীর মত এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, এতক্ষণ বাদে কিজানি কি মনে হল, এইটুকু বোঝা গেল, সে আর যেন বা মাথা স্থির রাখতে পারল না। জ্যোতির হাতটি কসে ধরেই বললে "শাল্লা...র ছেলে" জঘন্য গালমন্দের বাকলি দিয়েই জ্যোতিকে ধরে মার! হয়ত জ্যোতির শান্ত প্রশ্ন তার কাছে নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল। প্রহারের সময় তার মুখে অন্য কথা "আঁকে লব্বই পাওয়া হারামজাদা...কাঁড়া চরা গা" শিবনাথ যখন সত্যিই পিতা, সেই স্মৃতি এ-কথার মধ্যে ছিল। জ্যোতিকে শিবনাথ এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে খানিক দূরে গিয়ে একবার দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে কি যেন ভাবলে।

জ্যোতি অদ্ভুতভাবে গাছের গুঁড়িতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। শিবনাথ তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "জ্যোতে আয় তোকে গান শেখাই...আগে একটা বিড়ি খাওয়া মাইরী..."

জ্যোতি আস্তে আস্তে মুখখানি নাড়িয়ে না বললে।

"তবে শালা কারু কাছ থেকে মেংগে লিয়ে আয়—"

জ্যোতি হাতের তালু দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ডাকলে "বাবা"

এই ডাকের মধ্যে যে ব্যাকুলতা ছিল, তা শিবনাথের দেহকে ওতঃপ্রোতভাবে নাড়া দিয়েছিল, তথাপি সে আধা-হুঙকার দিয়ে বলে উঠল "লে লে শালা, আবার বাবা, একটা বিড়ি যুগাবার ক্ষমতা নাই, লে চন্দনী লিয়ে আসবি" বলেই শিবনাথ অন্যদিকে চাইল। সেদিকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা ব্যাপ্ত।

দূরে মুঠো মুঠো পাহাড়, অতীব দূরে অরণ্যরেখা, প্রান্তরের শূন্যতাই নিশ্চয়ই অনাদিকাল। শিবনাথ ছোট একটি পাথরের উপর পা রেখে চুপ, আস্তে আস্তে বলেছিল, "বেশ হাওয়া দিচ্ছে না রে আঃ!...... জ্যোতি"

জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে বাবাকে দেখেছিল, শিবনাথ সম্বন্ধে তার যে ধ্যান ধারণা ছিল, সে কথাই মনে হয়, শিবনাথ পাগল নয়! জ্ঞানীরা এমন হয়, বালকবৎ উন্মাদবৎ জড়বৎ পৈশাচিকও বটে। যেহেতু প্রত্যহ তার বাবা, ভোরবেলা ওঁ তত্ত্বমসি তৎ বলে, যখন মধুর কণ্ঠে "কে জানে মন কালী কেমন" অথবা "মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলের না মা—রামপ্রসাদ বলে দুঃখ পেয়েছি —ঘোলে মিলে ঘুলবে না"। জ্যোতি এ গানের দুঃখ বোঝে, রহস্য জগতের বাস্তবতা তার মনে শিবনাথ এনে দিয়েছে। সুতরাং জ্যোতি এখন দৌড়ে এসে বাপের ডান হাতটিতে মুখ ঘষতে ঘষতে পুনঃ পুনঃ বলেছিল "বাবা বাবা"। তার ধারণা ছিল বাবাকে ঠিক ডাকতে পারলেই আবার সে ফিরে আসবে, শান্ত হবে। এই সংগে তার মনে হয়েছিল দিদি মা এরা যদি থাকত।

শিবনাথ বললে "রিমিয়েণ্ট...গ্রাণ্ড... ফাঁকা নারে—! তোর ভাল লাগে?"

"হা, বাবা।"

"কেনে বটে ভাল লাগে?"

"তোমার ভাল লাগে যে।"

"ওরে বাগড়ী মুল্লকের ছুঁচো..."

এ কথায় জ্যোতি বাপকে জড়িয়ে ধরে মুখ উঁচু করে একই বিশ্বাসে দেখছিল। হঠাৎ শিবনাথ তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল। জ্যোতি যে এতবড় ভার কেমন করে বইবে কে জানে! শিবনাথের পিছনে কুকুর ছুটছে, জ্যোতিও আর দাঁড়াতে পারল না।

**(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)**




# মিয়াঁ তানসেন

অমিয়নাথ সান্যাল

### তানসেন-নৌবাত খাঁ ইতিবৃত্ত

মিয়াঁ তানসেন দিল্লীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোন এক সময়ে তাঁর কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে নৌবাত খাঁ নামে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বীণ-কারের বিবাহ হয়েছিল। ইতিবৃত্তকারেরা এই ঘটনা শ্রুতি-স্মৃতিতে ধারণ করে এসেছেন তার প্রধান কারণ এই যে—মিয়াঁ তানসেনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁরা শোনেননি। গৌণ কারণ হল—এরকম গান্ধর্ব বিবাহের ফলও ফলেছিল বিচিত্ররূপে ও সুদূর-প্রসারী হয়ে। তানসেনের পুত্র-দৌহিত্র বংশের মধ্যে নানারকমের সম্বন্ধে অনেক বিবাহের ইতিকথা আছে। কিন্তু সে সকল বিবাহ ঘটনা এর মতো ফল প্রসব করেনি।

গল্প কথা এই যে, উক্ত নৌবাত খাঁ প্রথমে হিন্দু ছিলেন ও শ্রীহরিদাস স্বামীজীর নিকট বীণাবাদন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে মিয়াঁ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন ও নৌবাত খাঁ নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু, তানসেনের পুত্রবংশীয় বিশেষজ্ঞ ইতি-বৃত্তকারেরা অন্য রকমের কথা বলেছেন। তানসেনের ছেলেরা বেঁচে থাকার কালেই বিবাহ ঘটেছিল; তানসেনের পুত্রবংশের ইতিবৃত্তকারেরা উক্ত নৌবাত খাঁ বীণকারের চরিত্র এমন কি দেহগত রূপ ও আকার সম্বন্ধেও বিবৃত করেছেন। তা সত্ত্বেও, এঁরা বলেননি যে, নৌবাত খাঁ পূর্বে হিন্দু ছিলেন অথবা শ্রীহরিদাস স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন, যার প্রকারান্তরে অর্থ হল মিয়াঁ তানসেন ও নৌবাত খাঁ পরস্পর গুরুভাই ছিলেন। প্রকৃত ঘটনা গল্প-কথানুযায়ী হলে পুত্রবংশের গুণীরা কখনই সেই সত্য গোপন করতেন না, কারণ গোপন করার কারণই ছিল না। ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব ও ওস্তাদ করামতউল্লা খাঁ সাহেবের মুখে সর্বপ্রথম ইতিবৃত্তগত ঘটনা শুনেছিলাম।

পরে যখন "সঙ্গীত-সুদর্শন" গ্রন্থ পড়লাম, তখন আমার মনে কিছু তর্ক-সন্দেহ হল। গ্রন্থকার শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রী তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণীদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্তকার। তাঁর কথা অব-হেলা করা যায় না।

যখন শাস্ত্রীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ঘটেছিল তার মধ্যে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে এই নৌবাত খাঁর প্রসঙ্গ এবং রেবাধিপতি রাজারামের প্রসঙ্গও উঠেছিল। গ্রন্থে শাস্ত্রীজী লিখেছেন "ঐ সময়ে লৌকিক জনগণের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যা বিষয়ে (এক শ্রীহরিদাস স্বামী ছাড়া) অন্য কেউ তানসেন থেকে বড় ছিল না, এমন কথা অবিবাদ-সিদ্ধ।" অন্য কথা এই যে—"তানসেনজীর জামাতা নৌবাত্ খাঁজী বীণাবাদনে শ্রীহরি-দাস স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন, ইনি (নৌবাত্ খাঁ) বীণায় অতিশয় প্রবীণ ছিলেন, শরীরে বলিষ্ঠ ছিলেন," ইত্যাদি। আমি যখন শাস্ত্রীজীকে ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব ও ওস্তাদ করামতউল্লা খাঁ সাহেবের মৌখিক মন্তব্য বললাম, তখন শাস্ত্রীজী সমস্ত কথা শুনে বললেন—তাঁর বক্তব্যের ঢং হল সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের লেখকদের অনুবর্তী। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা প্রথমে সুচিন্তিত নিজ মত বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, পরে ইচ্ছামত অন্য রকমের লোক-মত ও উদাহরণ করেন "ইতিকেচন" অথবা "কেচন বদন্তি" বলে। আমার বক্তব্য ভাল করে পড়লেই দেখবেন আমি আগে লিখেছি, "কোই কহতে হৈ" ইত্যাদি (তানসেন জীবনী প্রসঙ্গে)। এবং নৌবাত্ খাঁ প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছি,—তার আদিতেও "এয়সা তর্ক হোতা হৈ" "প্রতীত হোতা হৈ" "কিছু লোগোঁসে শুনাভি হৈ" ইত্যাদি। এ রকম সমস্ত কথাই তর্কস্থল মাত্র; এর মধ্যে সিদ্ধান্ত বা ইতিবৃত্তের নিশ্চয়তা নেই। আর,—আমি যে "অবিবাদ-সিদ্ধ" শব্দ ব্যবহার করেছি, তার অর্থ এই যে, বিবাদ করলে এর সিদ্ধি নেই, বিবাদ বা তর্ক না করে এ রকম কথা গ্রহণ করতে হয়। "অবিবাদ-সিদ্ধ" শব্দটিকে "লৌকিক জনোসে'র"র সঙ্গে অন্বয় করতে হবে; না হলে, বাক্য নিরর্থক হয়ে পড়ে। আমার লেখা যে বুঝল সে বুঝল; যে বুঝতে পারে না, তার জন্য আমি নিজ লেখার টীকা-ব্যাখ্যা করব না। তা আমার লেখার আদর হক ,চাই, অনাদর হক।"

শাস্ত্রীজীর বক্তব্যের শিষ্টতা ও কৌশল বুঝতে পারলাম। ইতিবৃত্তকার যে ক্ষেত্রে কোনও ঘটনার মৌলিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রে তাঁরা মৌন অবলম্বন করেন। যথা—রাজারাম প্রসঙ্গে "রিওয়াঁ" নামে স্থানের সম্বন্ধে শাস্ত্রীজী বিশেষ কিছু লেখেননি; অর্থাৎ ঐ স্থানটি মধ্য প্রদেশের 'রেওয়া' অথবা, গোয়ালিয়রের পশ্চিমে গুর্জর-রাজপুতানার সীমান্তবর্তী "রিওয়াঁ" এ বিষয়ে শাস্ত্রীজী সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারেননি বলে—ও রকম তর্কই তোলেননি। ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব, করামতউল্লা খাঁ সাহেব এবং বিশ্বনাথজী কিন্তু "রেওয়াঁ" বলতে নিশ্চিত রকমে পশ্চিমাঞ্চল দেশের রাজ্যই সিদ্ধান্ত করেছিলেন; মধ্য প্রদেশের 'রেওয়া' নয়।

নৌবাত্ খাঁর পূর্ববৃত্তান্ত প্রসঙ্গে শাস্ত্রীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—লোকমত পক্ষে তানসেনজী শ্রীহরিদাস স্বামীজীর শিষ্য বুঝলাম; নৌবত্ খাঁও শ্রীহরিদাস স্বামীজীর শিষ্য বুঝলাম। কিন্তু, যে অনন্যসাধারণ স্বামীজী একাধারে তানসেন ও নৌবত্ খাঁর গুণীদের গুরুদেব—সেই স্বামীজীর আশ্রমে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গুণী ও নবিশেরা আগ্রহ প্রকাশ করেন না কেন? এবং তানসেনের কবরের চারিদিকেই বা জমায়েত হন কেন?

শাস্ত্রীজী চরম উত্তর দিলেন—লোকমত অনেক ক্ষেত্রে লাঠির মত হয়ে পড়ে। এমনই ত আমার নিন্দা আছে আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে মুসলমানের ঘরে শিষ্য হয়েছি। এখন আমার মৃত্যুর দিন নিকট! আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই। বুদ্ধিমান পাঠক আমার লেখা থেকে লোকমত ও বিশেষজ্ঞের মতের পার্থক্য উদ্ধার করে নেবেন।

শাস্ত্রীজীর সঙ্গে আলাপ করার পর থেকে আমি বুদ্ধিমান পাঠক হতে চেষ্টা করেছি; এইমাত্র। সফল হয়েছি কি না জানি না। তবে আধুনিক শিক্ষিত গল্পকার ও ইতিবৃত্তকারদের লেখা পড়ে মনে হয়—সফল নাই বা হলাম! উপন্যাস পড়তে যেটুকু বুদ্ধি লাগে, সেইটুকু বুদ্ধি খাটালেই যথেষ্ট!

যাই হক—শ্রীহরিদাস স্বামীজী তানসেন ও নৌবাত খাঁ (বদল খাঁ সাহেব 'নৌবাত' ব্যবহার করতেন) প্রসঙ্গে আমার যা ধারণা তা স্পষ্ট বলতে পারি।

নৌবাত খাঁ পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন। ইনি শ্রীহরিদাস স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন না। স্বামীজী বৈষ্ণব মহাপুরুষ ও লোক-বিশ্রুত ছিলেন। তাঁর আশ্রমে অসংখ্য লোক যাতায়াত করত। নৌবাত খাঁ সেই আশ্রমে যেতেন, মনে করতে আপত্তি নেই। স্বামীজীর আশ্রমটি ধ্রুবগানের বা বীণাবাদনের বা নৃত্যের আখড়া ছিল এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। গুণী ও নবিশেরা যে স্বামীজীর আশ্রমে না গিয়ে তানসেনের কবরের চারিদিকে ভিড় করেন তার একমাত্র কারণ—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গুণীবিশেষজ্ঞেরা ইতিবৃত্তগত সত্যের প্রতি পক্ষপাতী; এঁদের শ্রদ্ধা ও সত্য-পক্ষপাতিত্বের কাছে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সমাজভেদ বা ব্যক্তিভেদ নাই। যথার্থ সঙ্গীতের অনুশীলন এইভাবেই শিল্পী হৃদয়কে উদার করে।

নৌবাত খাঁ সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

ইনি রাজপুতানা অঞ্চলের খাণ্ডারী-ধ্রুবপদ গায়কের সন্তান। বীণা-শিল্পীদের মধ্যে ইনি অগ্রণী ছিলেন বলে বাদশাহ আকবর ও বীরবল এঁকে দিল্লীতে নিয়ে এসে দরবারী গুণীদের মধ্যে আসন দান করেছিলেন। ইনি দেখতে স্থূলকায় ছিলেন, খেতেও পারতেন বেশী। কখন কখন উত্তেজনার কারণে ইনি বীণ বাজাতে দাঁড়িয়ে উঠতেন। বীণাতে জবরদস্ত ঠোক বাজিয়ে ইনি একবার আকবরের খাস বৈঠকের মোমবাতির আলো প্রায় নিভিয়ে দিয়েছিলেন। এঁর বীণ বাদনের ঢং কিছু ফৌজদারী রকমের ছিল। এঁর ঘরে থেকেই "খাণ্ডারিক-বাঢ়ত্" নামে রাগ-বিস্তার পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছিল।

দরবারে মিয়াঁ তানসেনের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দেখে ইনি কিছু ঈর্ষাগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে, তানসেন একটা দরবারী প্রথা প্রবর্তিত করলেন, যথা—সকলের আগে ধ্রুবপদ গায়ক গান করবেন ও পরে বীণকার বীণায় আলাপ করবেন, যা পূর্বে ছিল না—তখন থেকে খাস বৈঠকে বা মজলিসে তানসেন ও নৌবাত খাঁর মধ্যে অল্পস্বল্প বচসা হত।

একদিন খাস বৈঠকে তানসেন ও নৌবাত খাঁর মধ্যে সাঙ্গীতিক লড়াই হয়েছিল। নিয়ম যথা—একবার তানসেন গান ও তান-বাট করবেন এবং পরক্ষণেই নৌবাত খাঁ বীণায় ঐ তান-বাটের জবাবী-তান পুরো করে বাজিয়ে দেখাবেন। অর্থাৎ, তানসেন একটা তান-বাট আরম্ভ করে হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ করে দেবেন আর নৌবাত খাঁ সেই তানের বাকিটুকু বীণায় হাসিল করবেন। এবং অন্যবারে নৌবাত খাঁ তান-বাট করতে করতে মাঝপথে ছেড়ে দেবেন ও তানসেন সেই তান-বাটের বাকি অংশ গলায় হাসিল করে দেখাবেন! যিনি পারবেন না তাঁর হার। মধ্যস্থ ছিলেন বীরবলজী। নৌবাত খাঁ বার বার তিনবার হেরে গিয়ে এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তলবার খুলে তানসেনের মাথায় লাগিয়ে দিলেন এক চোট!

তানসেনের মাথায় মজবুত পাগড়ি আঁটা ছিল বলেই তানসেন রক্ষা পেলেন। নৌবাত খাঁ কয়েদ হলেন, বিচার হল, প্রাণদণ্ডের আদেশ হল, জল্লাদেরা নৌবাত খাঁকে নিয়েও গেল। কিন্তু, বীরবলের কারসাজিতে জল্লাদেরা নৌবাত খাঁকে ছেড়ে দিয়ে গোপনে বীরবলের বাড়িতে নৌবাতকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। বাদশাহকে খবর দেওয়া হল

নৌবাত খাঁকে ইহজগৎ থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন পরে আকবরের ও তানসেনের মুখে অনুতাপ ও খেদের কথা শুনে বীরবল বাড়ি থেকে নৌবাত খাঁকে বার করে নিয়ে এসে আকবর ও তানসেনের সামনে পেশ করলেন। নূতন করে বিচার হল—যথা নৌবাত খাঁর জুড়ি নেই, ওঁকে পালন করতেই হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে তলবার না চলে তার জন্য হুকুম হল—তানসেনের মেয়ের সঙ্গে নৌবাত খাঁর বিবাহ দেওয়া হক। হুকুম পালনে দেরী হল না। সব ভাল যার শেষ ভাল!

এই কাহিনীর গূঢ় মহিমাটি লুকিয়ে আছে পাগড়ির মধ্যে। দুঃখের কথা আকবর বীরবল তানসেন বা নৌবাত খাঁ কেউ সেই চেরা পাগড়িটি রক্ষা করেননি। অবশ্য ইতিহাস বা অতীত সম্বন্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই; ইতিহাস ও অতীতের ঔচিত্যানৌচিত্য দোষ নেই। যাই হক—যদি পাগড়ি না থাকত, তানসেন মারা যেতেন, নৌবাত খাঁও ছিন্নশির হতেন। ফলে সরস্বতীর সঙ্গে নৌবাত খাঁর বিবাহ ঘটত না। এবং পিতৃহীনা সরস্বতী কার ঘরে গিয়ে কি রকমের দৌহিত্রবংশের জন্ম দিতেন কিছুই বলা যায় না! সুতরাং আমরা মনে করতে পারি, তানসেনের পাগড়িই অলক্ষ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দৌহিত্রবংশকে রক্ষা করেছিল। আপসোসের কথা, ইতিবৃত্তকার বা গল্পকার ঐ অর্ধকীর্তিত পাগড়ির মাহাত্ম্য বুঝতে পারেননি। গুরুজীর বৈঠকে ঐ পাগড়ির গল্প শোনার পর যখন আমি ঐ পাগড়ির মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করলাম, তখন তসুলালজী হেসেই ফেললেন; খুব অন্যায় কথা! কিন্তু, ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব শ্মশ্রুধবনত মুখে কানে ও নাকের ডগায় হাত ছুঁয়ে বললেন—সাবাস পাঁচুবাবু! জিতা রহো! বদল খাঁ সাহেবের প্রশংসার মর্ম বুঝলাম। নৌবাত খাঁ-সরস্বতীর মিলনের ফলেই ত সদারংজী প্রভৃতি হয়েছিলেন। এবং বদল খাঁর পূর্বপুরুষ জংগে খাঁ ত সদারংগজীরই শিষ্য হয়েছিলেন। তানসেনের ও নৌবাত খাঁর অকালমৃত্যু ঘটলে সদারংগজী ত জন্ম নিতেন না। তা হলে বদল খাঁ সাহেবের পূর্বপুরুষ জংগে খাঁ কি করতেন, কার শাগরেদ হতেন কিছুই কল্পনা করা যেত না!

ইতিবৃত্তকারেরা বলেন—তানসেন খুশী হয়ে তাঁর জামাই নৌবাত খাঁকে সেনী-পদ্ধতিসম্মত রাগ-বিদ্যা ও আলাপ-শৈলী শিক্ষা দিয়েছিলেন। আলাপ-শৈলীর শিক্ষাদান সার্থক হয়েছিল কি না, তার প্রমাণও বিচার হবে গত তিন শ বৎসরের মধ্যে—উত্তর ভারতে বীণা, রবাব, সেতার, সরোদ, সুরশৃংগার, সুরবাহার ও সারংগীর শিল্পীদের মধ্যে গুণে ও সংখ্যায় মিয়াঁ তানসেনের ঘরানায় কতো গুণী তৈরী হয়েছেন এবং তানসেনের ঘরের বাইরে অন্যান্য ঘরানায় কতো গুণী তৈরী হয়েছেন—মাত্র এই ব্যাপার অনুসন্ধান করার উপরে।

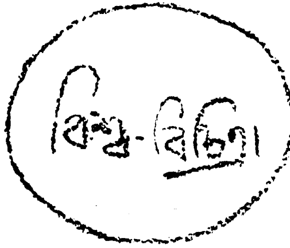
তানসেন যে বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধতর আলাপ-শৈলী প্রবর্তন করেছিলেন তার মূলগত কিছু ব্যাপার আলোচনার যোগ্য বলে মনে হয়েছে। কারণ, সেই ব্যাপারের সঙ্গে "সাথ্-সংগত" ও "বীণা-গত" নামে বাদন-পর্যায় জড়ীভূত হয়ে আছে।

(ক্রমশ)

সিংগাপুরের চীনা পল্লীতে একটা সরু গলি সাগো লেন। বাইরে কাগজের তৈরী লণ্ঠন, পতাকা, ঝালর, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি ঝোলানো পাশাপাশি দুটো বাড়ি। ভিতর থেকে ভেসে আসা বাঁশির কর্কশ শব্দ এবং কানে তালা লাগানো ঝাঁঝর আর ঢোলের বাদ্যি। বাজিয়েদের বলে মাছ-জন্তু দল। প্রাচীন তাও ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী এরা এসেছে ওদের মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধু বা আত্মীয়দের প্রতি শেষ সম্মান জ্ঞাপন করতে।

বংশপরম্পরায় সিংগাপুরের দরিদ্র চীনারা তাদের মুমূর্ষু ও অক্ষম আত্মীয়দের শেষ দিনগুলি কাটাবার জন্যে এই ধরণের, স্বত্বাধিকারীরা যাকে বলে 'মুমূর্ষু গৃহ' তবে সিংগাপুরের লোকের কাছে যেগুলি 'মরণ ঘর' বলে পরিচিত সেখানে পাঠিয়ে দেয়। মাসে পৌণে ষোল টাকা মতো খরচ দিলে সাগো লেনের ঐ বাড়ি দুটিতে প্রতি মুমূর্ষুর জন্য একটি বিছানা পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়কের কাজ বাইরে থেকে মুমূর্ষুদের খাবার এলো কিনা দেখা, ডাক্তার ডেকে আনা (যার প্রধান কাজ মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদান করা) এবং অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করে দেওয়া।

তাই লান কুনের (সংকটতম মুহূর্তকল্প সংঘ) কোন সভ্য মারা যেতে থাকলে রোস্ট করা শূকর মাংসের ভোজ তার সামনে রক্ষা করা হয় এবং তাওই পুরোহিতরা প্রার্থনা করতে থাকে যাতে তার স্বর্গে স্থানান্তর ঘটে। মেয়েরা রূপোলি কাগজের টুকরো মুড়ে দেয় যার দাম সাড়ে সাত আনায় এক হাজার হলেও স্বর্গে নাকি তার দাম হাজার হাজার টাকা। গড়ে পরলোকযাত্রীরা ঐরকম দশহাজার রৌপ্য মুদ্রা, একটা রিক্সা,



একটা মাঝারি বাড়ি পায়—সবই কাগজের তৈরী। অবস্থা যাদের ভাল, অর্থাৎ বিরাট অন্ত্যেষ্টির জন্যে হাজার দেড়েক মতো টাকা খরচ করতে যে পারে সে পায়, অবশ্য কাগজেরই তৈরী, সৌখিন মোটরগাড়ি, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, চারটি ভৃত্য, সমুদ্রগামী একটি বিলাসোচ্ছল জাহাজ, এমন কি একটি জেটচালিত বিমানও। তাওদের বিশ্বাস কাগজের, সামগ্রীগুলো পুড়ে পরবর্তী লোকে সেগুলি আসল হয়ে যায়।

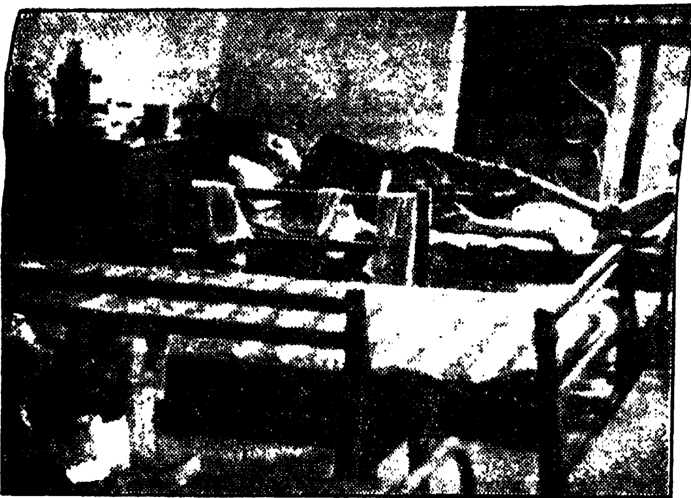
বহু বছর পূর্বে সিংগাপুরের এক উৎসাহী চীনা দেখে মুমূর্ষু গৃহের খরচ বহন করতে অক্ষম দরিদ্রের মুমূর্ষুদের শেষের কটাদিন ফুটপাতে ফেলে রাখতে হয়। আরো সে লক্ষ্য করে যে চীনারা বৃদ্ধ হলে হাসপাতালে যেতে চায় না। শবযাত্রায় যারা বাজনা বাজিয়ে যায়, লণ্ঠন ও পতাকা বয়ে নিয়ে যায় এবং পেশাদার শোকযাত্রী যারা, যাদের শোকযাত্রার মাত্রা অনুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় তাদের সকলের কাছ থেকেও "মুমূর্ষু গৃহে"র মালিকরা কমিশন নেয়।

কাগজের সামগ্রী আগুনে পোড়ালে তা থেকে পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড ঘটবার সম্ভাবনা আছে এই বিবেচনায় সিংগাপুরের পৌর পরিষদ সম্প্রতি ঠিক করেছে 'মুমূর্ষু গৃহ'-গুলিকে শহরের মাঝ থেকে সরিয়ে ফেলার। কিন্তু এই নির্দেশ কাজে পরিণত করতে গিয়ে আর এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত একটি জমি এক কবর খানার এতো কাছাকাছি হয়ে পড়ে যে পেশাদার শববাহীদের পেশা বন্ধ হবার উপক্রম। অপর একটি নির্বাচিত জমির ক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু নাগরিকরা অনুযোগ তোলে এই বলে যে, 'মুমূর্ষু গৃহ' প্রতিষ্ঠিত হলে (সুতরাং সেইসংগে মৃত ও অনন্ত্যেষ্টিকৃত মৃতদের বিশ্রামবিহীন ভূতগুলোর আগমন ঘটলে) কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভৃত্যেরা আর কেউ ও-তল্লাটের কোন বাড়িতে কাজ করতে চাইবে না।

*

তিরিশ বছর আগে আমেরিকার সংবাদপত্র-প্রকাশক উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ্ হার্স্ট স্পেনে সেণ্ট বার্নার্ড অফ সাক্রামেনিয়ার মঠটি প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকায় কিনে নেন। হার্স্ট মঠটি টুকরো টুকরো করে খুলে জাহাজে করে নিউইয়র্কে পাঠাবার জন্য বলে দেন। মঠটি তখন সাতশো চোদ্দ বছরের পুরনো এবং প্রত্যেকটি টুকরো খড় দিয়ে মুড়ে কাঠের বাক্সে ভর্তি করতে হয় আর প্রতিটি বাক্সে নম্বর দিয়ে দিতে হয় যাতে নয়নাভিরাম রাজ্যের ফ্লোরিডাতে হার্স্ট মনোনীত স্থলে পর পর টুকরোগুলি সাজিয়ে মঠটি আবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। হার্স্ট মঠটির প্রতি আকৃষ্ট হন এর ওপর রোমান ও প্রাচীন জর্মান স্থাপত্যশিল্পের দুর্লভ সমন্বয় দেখে; এবং যদিও কিয়দংশে মঠটি অবহেলিত হয়েছিল, তাহলেও হার্স্টের ধারণা হয়েছিল যে টাকার দিক থেকে এর মূল্য তো আছেই, তাছাড়া এক শ্রেণীর লোক যা যুক্তরাষ্ট্রের উপেক্ষিত দিক বলে মনে করে সেদিকেও এদিয়ে কিছু হতে পারবে।

হাজার কতক বাক্সে টুকরো টুকরো অবস্থায় মঠটি জাহাজে যুক্তরাষ্ট্র রওনা হয়ে যায় এবং যথাসময়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছাবামাত্র নিয়মমাফিক কোয়ারাণ্টিনে রাখা হয়। বাক্সের খড়ে একটা সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু পাওয়া যেতে সমস্ত বাক্সগুলি খুলে নতুন করে প্যাকিং করার আদেশ দেওয়া হয়। নতুন করে প্যাকিং সমাপ্ত হতে তিনটি বছর সময় এবং হার্স্টের আরো প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লেগে যায়। ইতিমধ্যে বাজার মন্দা হয়ে পড়ায় হার্স্টের এই মঠের ওপর অনুরাগও চলে যায় এবং ওটি নিউ ইয়র্ক বন্দরের মালগুদামে পড়ে থাকে যদ্দিন.



সিংগাপুরে দরিদ্র মৃতকল্প তাও ধর্মীয়দের "অন্তিম বাস"

না ১৯৫১-তে হার্স্টের মৃত্যুর পর সিনসিনাটির দুজন ভূসম্পত্তি ব্যবসায়ী ওটিকে কিনে নেয়।

ওরা মঠটিকে ফ্লোরিডার এভারগ্লেস বন্দরে পাঠিয়ে দেয়। বাক্সগুলো জেটিতে নামিয়ে রোদে দিয়ে দেখা যায় যে, পঁচিশ বছর আগে দ্বিতীয়বার প্যাকিং যারা করেছিল তারা নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে টুকরোগুলো যার যে বাক্সে রাখা গ্রাহ্য করেনি। তবে সৌভাগ্যবশত স্বর্গত হার্স্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহু অংশের ছবি তুলে রেখে গিয়েছিলেন। সেই ছবি দেখে দেখে পাথরের চাপড়াগুলো দশ একর জমির ওপর বিছিয়ে ফেলা হয় এবং তারপর রাজমিস্ত্রীরা কাজ আরম্ভ করে। উনিশ মাস এবং আরো প্রায় সাড়ে একাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হবার পর টুকরোগুলো ঠিক মতো বসানো হয়। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়েছে মঠটি এক বিশ একর জমির ওপর খাড়া করা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ভ্রমণবিলাসীদের বেশ ভীড় হতে আরম্ভ করেছে।

*

সামুদ্রিক জীবদের মধ্যে উপবাস বিষয়ে অক্টোপাসের ক্ষমতাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী। প্রমাণ আছে যে কোন কোন অক্টোপাস সাড়ে চার মাস পর্যন্ত অভুক্ত থাকে। খাওয়া ওরা ছেড়ে দেয় ডিমে তা দেবার সময়, যদিও সম্পূর্ণ উপবাস অতিশয় অস্বাভাবিক। সাধারণ অক্টোপাসদের তা দেবার সময় লাগে চার থেকে সাত সপ্তাহ। সবশুদ্ধ দুলক্ষও ডিম পাড়তে হয়, অবশ্য সাধারণত সংখ্যা এর চেয়ে কমই হয়। ডিম পাড়ার রেকর্ডও অক্টোপাসের নয়। একপ্রকার সামুদ্রিক শামুক আছে যাদের মিনিটে একচল্লিশ হাজার ডিম পাড়তে দেখা গিয়েছে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে ঐ জাতীয় শামুক গড়ে চার মাসে সাতচল্লিশ কোটি আশি লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে।

বহুরূপীর চেয়ে দেহের বর্ণ পরিবর্তন ক্ষমতা অক্টোপাসের বেশী। অন্যান্য জীবের অনুরূপ অক্টোপাস রঙ বদলায় পেশীর সঞ্চালনে। রঙ আসে বিভিন্ন রঞ্জক-কোষ থেকে যেগুলি স্ফীত ও সংকুচিত হয়ে অক্টোপাসের চেহারা বদল করে দেয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ বদল করে—লাল, বাদামি, কমলা, ধূসর থেকে প্রায় শ্বেত বর্ণ। কখনো কখনো অক্টোপাসের দেহের দুদিক দু রঙের হয়ে থাকে। একজন পরিদর্শক একবার এক একোয়ারিয়ামে একটি অক্টোপাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ওর একদিক শাদা হয়ে যায় এবং অপরদিকটা বাদামি থেকে যায়। কারণ হয়তো ভয়ের প্রতিক্রিয়া—হয়তো যে ওকে দেখছে তার জন্যে ভয়। অক্টোপাস বেশী ভয় পেলে কালি বিচ্ছুরিত করে। কখনো কখনো ওটা সাধারণ ধোঁয়ার পর্দা যার আড়ালে ও পালাবার চেষ্টা করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ কালি জলে পড়ে এক নকল অক্টোপাস এঁকে দেয়।

অক্টোপাস বড়ো বড়ো মাছ, বাইন, তিমি ও সীলের খাদ্য। সমুদ্রধারের অনেক জায়গার অধিবাসী মানুষও অক্টোপাস খায়। বৃটেনেও অনেকের কাছে অতি মুখরোচক খাদ্য এবং লন্ডনের পিকাডিলীতে মুখরোচক খাদ্যের দোকানে শুকনো অক্টোপাস ঝুলতে দেখা যায়।

জীববিদ্যাবিদদের কাছে অক্টোপাসের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমন্ডল বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। অধ্যাপক জে জেড ইয়ংয়ের মতে অক্টোপাস যথেষ্ট জটিল বিষয় স্মরণে রাখায় সক্ষম। মস্তিষ্কের যে অংশের সাহায্যে এরা তা সম্পন্ন করে সে অংশ পরীক্ষা করে আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে মূল্যবান আভাস পাওয়া গিয়েছে।

ভিক্টর হুগোর 'টয়লার্স অফ দি সী' জাতীয় গ্রন্থাদি পড়লে অক্টোপাসকে মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক মনে হয়। কিন্তু ওসবের অনেকখানিই কল্পিত।

*

প্রায় সব দেশেতেই বৈজ্ঞানিকরাই একটা জিনিস আবিষ্কার করে বা গড়ে তোলে এবং পরে জনসাধারণকে তার সুবিধে ভোগ করতে দেয়। যেমন চাষ ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভূত হলে বৈজ্ঞানিকরা সেটা চাষীদের জানিয়ে দেয়। জাপানে কিন্তু ঠিক তার উল্টো ব্যাপার। ওদেশে চাষীরা একটা কিছু আগে করে বসে, তার পর বৈজ্ঞানিকরা বসে চাষীদের পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন করতে। জাপানের চাষী এবং জীবজন্তুপালকরা শত শত বছর ধরে মাছ, ফল-ফুলে এবং মোরগ-মুরগী ইত্যাদির অজস্র রকম বের করেছে যা বৈজ্ঞানিকদের বহু বছর খেটে বুঝতে হয়েছে কি করে কি সম্ভব হতে পেরেছে। বর্তমানে জাপানী বৈজ্ঞানিকরা পড়েছে ওনাগা ডোরি নামে একজাতীয় মোরগের লম্বা লেজ নিয়ে। ওনাগা-ডোরির লেজ বছরে তিন ফুট পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে এক এক ক্ষেত্রে পঁচিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রধানত প্রদর্শনীর জন্যেই অতো লম্বা লেজ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ওনাগা-ডোরি মোরগকে রাখা হয় তার প্রতিপালকের ঘরে মাচা খাটিয়ে। বাইরে ছেড়ে দিলে ওদের লেজ জড়িয়ে পালক ভেঙে যাবার ভয় আছে।

*

জার্মানীর হানোভারে এক চীনা হোটেলে কয়েকটি বিশেষ প্রকারের রান্নার জন্য বিশেষ ধরনের পাত্রের প্রয়োজন হয়। স্বত্বাধিকারী অনেক খোঁজাখুঁজি করে ওখানে কোথাও সে ধরনের পাত্র না পেয়ে সুদূর হংকংয়ে এক রপ্তানি ব্যবসায়ীকে সেই পাত্র পাঠিয়ে দেবার জন্যে লিখে দেয়। পাত্রগুলি এসে পড়ার পর সেগুলিকে জাহাজঘাটি থেকে প্রচুর শুল্ক দিয়ে খালাস করে বাড়িতে নিয়ে আসতে বেশ বেগ পেতে হলো। কিন্তু প্যাকিং খুলে তার চোখ কপালে উঠলো। অতো কষ্ট করে এবং খরচ করে আনানো ছটি পাত্রের প্রত্যেকটিতে ছাপ রয়েছে 'জার্মানীতে প্রস্তুত'।

## ভাষা

বিষ্ণু দে

ভয় নেই, মনে রেখো আশা,
মমতায় ব্যাপ্ত করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে তনু শালবন,
তিতিরের ডাক শোনো ঘুঘুর কূজন
হাঁসের ঝাপট আর ময়ূরের নাচ,
এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা।

এখনই কি ভয়? রেখো আশা,
প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন,
খামারে খামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন,
পরবের দিনে রাতে মাঠে ঘরে নাচ,
এখানেই ভিৎ গড়ে ভাষা।

ভয় কেন করি? আছে আশা,
সততায় স্থির করো মন,
স্থির লক্ষ্য চলেছে পিস্টন্,
লেদের আবর্তে গড়ো নানা আয়োজন
ক্রেণের বাহুতে দেখ বিশ্বব্যাপী নাচ,
সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতাল ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণন
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র -স্বনন,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।

## সকাল বেলার জলখাবার

জাক্ প্রেভর

সে কফি ঢাল্‌ল
কফির পেয়ালায়
সে কফির সঙ্গে
দুধ মেশাল
সে চিনি ঢাল্‌ল
দুধ-মেশান কফির পেয়ালায়
ছোট্ট চামচ দিয়ে
সে নাড়ল তার কফি
সে দুধ-মেশান কফি খেল
এবং সে পেয়ালা রাখল
আমার সাথে একটিও কথা না বলে
সে সিগারেট ধরাল
সিগারেটের ধোঁয়ায়
সে কুণ্ডলি পাকাল
সিগারেটের ছাই
সে ফেলল ছাইদানিতে
আমার সঙ্গে একটিও কথা না বলে
আমার দিকে একটিবারও না তাকিয়ে
সে উঠে দাঁড়াল
মাথায় চড়াল টুপি
চড়াল বর্ষাতি তার দেহে
কারণ তখন বৃষ্টি পড়ছিল
তারপর সে গেল চলে
বৃষ্টির রাস্তা দিয়ে
একটিও কথা না বলে
একটিবারও আমার দিকে না তাকিয়ে
তারপর আমি আমার মাথা রাখলাম
আমারই হাতের উপর
এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

অনুবাদক : দিলীপ মালাকার

## স্মৃতিগন্ধা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি এখন চাঁদের স্বপ্নে লীনঃ
মাটির সেতারে বসন্ত-মর্মর।
চোখের আকাশে স্মৃতির সোনালি দিন;
রাত্রি এখন চাঁদের স্বপ্নে লীন।
হরিণ হাওয়ায় তোমারই কণ্ঠস্বর,
বুকে সাগরের ভালবাসা সীমাহীন;
রাত্রি এখন চাঁদের স্বপ্নে লীনঃ
মাটির সেতারে বসন্ত-মর্মর।




## "কোণার্কের মৃত্যু"

॥ ১ ॥

**মহাশয়,**—আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার বিগত ১৬ই আগস্ট সংখ্যায় শ্রীবিষ্ণু দে মহাশয়ের 'কোণার্কের মৃত্যু' নামে প্রবন্ধটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর লেখা পড়ে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি, ভেবেছিলাম নিশ্চয় কোন তথ্য-বহুল প্রবন্ধ লিখে থাকবেন। কিন্তু পড়ে দেখলাম গত জুন মাসে তিনি যখন কোণার্ক গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার ডাক বাংলোর অবস্থানকারী কোনও এক সাময়িক পরিদর্শন-কারী অফিসারের সঙ্গে তার ওখায় স্থান পাওয়া নিয়ে মতান্তর হয়। তাতে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নামে এমন কতকগুলি বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যাকে মোটেই সুচিন্তিত বলা যায় না। তাঁর লেখা পড়ে অনেকেরই ধারণা হবে যে ওখানকার অফিসাররা বুঝি স্থায়ীভাবে ডাক বাংলোয় অবস্থান করেন আর সত্যই বুঝি সূর্য মন্দিরের অপূর্ব শিল্প নিদর্শনকে ধ্বংস করার জন্যই তাঁরা ওখানে আছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ওখানে পৃথক অফিস ও বাসস্থান আছে, তবুও সাময়িক পরিদর্শনকারী কেউ এলে তাঁর ইচ্ছামত ওখানেও থাকতে পারেন। তখন যিনি ওখানে গিয়েছিলেন, তিনি আট দিনের বেশী থাকেননি। এবং বহু আগে থেকেই তিনি তার জন্য উড়িষ্যা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। কারণ শান্তিপূর্ণ ভাবে না থাকতে পারলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। অপর দিকে দে মশাই অনুমতি না নিয়ে তাঁর স্নানের ঘর ব্যবহার করতে বা বারান্দায় অবস্থান করতে চেয়েছিলেন, যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। দৈনিক যত লোক ওখানে যান প্রত্যেককে যদি ঐভাবে বাধিত করতে হয় তবে তো কাজই চালান যায় না। যাই হোক দে মহাশয়ের মত লোকের পক্ষে এইরূপ তুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণে অযথা বিভাগকে ঐভাবে দোষারোপ করাটা কি ভাল হয়েছে? ফলে তিনি ওখানকার স্থায়ী অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন—"কোণার্কে বহুবার গেছি বেশ কয়েক দশক ধরে পর পর"—কিন্তু তাঁর অভিযোগগুলির কোনটাই তার প্রমাণ দেয় না। মন্দিরের চতুষ্পার্শে অবস্থিত দেওয়ালটিকে তিনি আধুনিক বলে মনে করলেন কি করে! একটু স্থির হয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতেন যে, 'চৌবাচ্চা মার্কা' পাঁচিলটা আজকের নয়, ওটা ঐ ৮০০ বছর আগেরই কোন এক 'বোকার' কীর্তি। এখন কেবল ওর মাথাটা এঁটে সংরক্ষণ করা হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে। স্থাপত্যের সামান্য জ্ঞান থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অতদূরে অবস্থিত পাঁচিল দিয়ে মন্দিরের ভিত্তি সুদৃঢ় করার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। অভিযোগ করেছেন 'মন্দিরের যে দিকটা বেশ ক্ষয়ে গিয়েছিল সেদিকের সব পাথর ফেলে দিয়ে, ন্যাড়া পাথর দিয়ে ভরাট করা হয়েছে'—ফেলে কিছুই দেওয়া হয়নি, কালের কঠোর হস্তক্ষেপে অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল, প্রায় ৫০০ বছর আগে। লর্ড কার্জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐভাবেই তাকে রক্ষা করা গেছে, নচেৎ ঐ সৌন্দর্যের কিছুই আজ আর অবশিষ্ট থাকত কিনা সন্দেহ।

মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার সময় অনেক বিক্ষিপ্ত মূর্তি ও কারুকার্যখচিত পাথর পাওয়া গেছে যার সবগুলোকেই মিউজিয়মে রাখা সম্ভব হয়নি, আশেপাশে জমা করে রাখা হয়েছে—সুবিধা মত নতুন মিউজিয়মে পরে তা রাখার ব্যবস্থা করা হবে। সেগুলোকে কেউ যাতে ওখান থেকে অপসারণ না করতে পারে, তারও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। মূর্তিগুলো ওখানে পড়ে থাকলেও আশু কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, থাকলে তো দেওয়ালের গায়ে লাগান মূর্তিগুলোরও তাই হতো।

সবচেয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন নাট-মন্দিরের সিঁড়ির ব্যাপারে। সিঁড়িগুলোর নির্মাতা স্বয়ং রাজা নরসিংহ দেব। ওগুলোর প্রয়োজন অপ্রয়োজন তিনিই ভাল জানতেন। যথার্থই কতগুলো মূর্তি চাপা পড়ে রয়েছে সিঁড়ির পেছনে তার জন্য 'বড়কর্তা'দের দোষী করলে কি ঠিক হবে? জগমোহনের প্রত্যেক দিকের দরজায় চমৎকার কাজ করা যে সবুজ মুগুনী পাথর লাগান আছে, তার মধ্যে দক্ষিণ দিকের গুলো সবই খসে পড়েছিল। উপস্থিত তার মধ্যে একটি সরিয়ে এনে এক গাছতলায় রাখা হয়েছে, যথাসময়ে সেটিকে—নতুন মিউজিয়ম তৈরী হলেই—সোজা করে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারবে।

আর একটি কথা—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কোনও মূর্তি বা সাধারণ একখানি পাথরকেও তার স্বস্থান থেকে সরায় না বা ফেলে দেয় না—এটাই হল প্রত্নতাত্ত্বিক নীতি ও নিষ্ঠা। সমালোচনা সব সময়ই কাম্য, কিন্তু তা গঠনমূলক হওয়া উচিত। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ 'গজনবী মামুদি' চালে কেবল ধ্বংসই করে যাচ্ছে লিখেছেন—কিন্তু তাঁর জানা নেই যে, এই সংস্কার কাজের জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিজের খেয়াল ও খুশী মত কিছুই করার উপায় নেই। বিশিষ্ট কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গঠিত একটি 'এক্সপার্ট' কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী এঁরা কাজ করেন। কমিটির সভ্যরা প্রায় অনেকেই বিদেশে উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত। এর মধ্যে আছেন—(১) শ্রীবিশ্বনাথ দাশ, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, উড়িষ্যা, (২) শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী শিল্পী, অধ্যক্ষ, গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট, মাদ্রাজ, (৩) শ্রী সি এম মাস্টার, স্থাপত্যশিল্পী, বোম্বাই, (৪) ডাঃ জে এন রায় Hony. Prof. Royal Inst. of Science, Bombay, কেমিস্ট, টি সি ফ্যাক্টরী, বোম্বাই; (৫) অধ্যক্ষ, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, দিল্লী; (৬) ডাঃ এম এস কৃষ্ণন, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, ভূতত্ত্ব বিভাগ; (৭) চিফ ইঞ্জিনিয়ার, উড়িষ্যা। উত্তেজনার বশে তিনি যে দিকে চোখ ফিরিয়েছেন, তাই খারাপ দেখেছেন। ড্রিলিং ও গ্রাউটিং মেশিনগুলিও তাঁর কোপ-দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কান ঝালাপালা শব্দই কেবল হচ্ছে কাজ কিছুই হচ্ছে না, একথার উত্তরে বলতে হয় যে, কি হচ্ছে, না হচ্ছে, তা বিশেষজ্ঞ ছাড়া অত সহজে অনুমান করা সম্ভব নাকি? কাজেই এ-বিষয়ে মন্তব্য করা হাস্যকর ছাড়া আর কি?

সরকারী প্রচেষ্টা হয়তো তাঁর মনোমত হয়নি, তা বলে একে কালাপাহাড়ী প্রচেষ্টা বলায় কোনও অর্থ হয় কি? অবনীন্দ্রনাথের যৌবনের হাটে, লেখকের লেখনীর সুতীব্র আঘাত আজ বার্ধক্যের কাল্পনিক ছায়া যে বেশ ভয়াল রূপ ধারণ করেছে তা সন্দেহ নেই। কবি-মনের কাছে হয়তো মেশিনের ঘর্ঘর আওয়াজ সুখশ্রাব্য হয়নি, আমরা তার জন্য দুঃখিত, কিন্তু তা বলে যদি তিনি মনে করেন যে, অস্তমিত সূর্য দেখে তিনি ফিরে এসেছেন তা হলে ভুলই করেছেন। কোনরূপ প্রাকৃতিক প্রলয় না ঘটলে আরও বহু শতাব্দী ধরে লোকেরা এই সৌন্দর্য সমানভাবেই উপভোগ করতে পারবেন, সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়েই তার সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতি—নিবেদক,

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা।

### লেখকের উত্তর

**মহাশয়,**—রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই'।

ডাক্তার বা কম্পাউন্ডার-রা যদি বলেন, রোগী মরেনি, বরং ভালোভালো দাওয়াইযোগে বেঁচে উঠছে, তাহলে আত্মীয়স্বজনরা খুশীই হবেন। এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ চট্টো-

পাধ্যায়ের আশ্বাস সত্য হোক, তিনিই কোণার্কের ত্রাণকর্তা হোন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উল্টিয়ে রাখা সব মূর্তি তিনি পরে ঠিক করে রাখবেন জেনে সান্ত্বনা পেলুম।

বাংলোর ব্যবহার বিষয়ে তিনি ক্রুদ্ধ বক্রোক্তিময় দীর্ঘ তথ্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে মন্তব্য বাহুল্য। আর আমি কোণার্কে গেছি কিনা, সে বিষয়ে তর্ক করব কার সঙ্গে? পাঁচিলটি কিন্তু ৮০০ বছর আগে কে করল তা তিনি জানাননি। প্রথম নরসিংহ কি? তাঁর তারিখ ১২৩৮—১২৬৪। নাকি তিনি দশম শতাব্দীর পুরন্দর কেশরীর কথা ভাবছেন? অথচ এ পাঁচিলটি ক' বছর আগে দেখা যেত না, সে কথা সত্য। 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে' এ কেমন চেষ্টা?

আমি অবশ্য ৮০০ বছর আগে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতো কোণার্কে যাইনি। তবে তিরিশ-বছর ধরে যতবার গেছি, কোনোবারই ঐ স্থূল ও উচ্চকায় পাঁচিল দেখিনি।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবার ৫০০ বছর আগের কথা বলেছেন। প্রমাণ? আর ৫০০ বছর আগে নষ্ট হওয়ার পরেই কার্জনের চেষ্টা?





নরসিংহদেব এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যুগের মধ্যে কোনো তথ্যই কেউ সংগ্রহ করেননি একথা মানা কঠিন। আবুল ফজল, রাজেন্দ্রলাল, ফার্গুসন, মনোমোহন গাঙ্গুলী, গুরুদাস সরকারের বই, রাখাল দাস বা নির্মল বসুর লেখায় কিছু খবরাখবর তো পাওয়া যায়। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কুমারস্বামীও ফোটো-সমেত কোণার্ক বিষয়ে লেখা ছাপান। জনস্টন হফম্যানের তোলা সেকালের ফোটো আমরা দেখেছি, যেমন দেখেছি সুনীল জানা, পৃথ্বীশ নিয়োগী, সুধাংশু চৌধুরী, জন আরউইন, এনটোঁব ডেনি প্রভৃতির তোলা শত শত ফোটো। সব তথ্যই বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের জ্ঞানানুসারে বা মনোমতোভাবে সংগ্রহ করব কেন?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সব চেয়ে বিকৃত তথ্য'-র কথা বলে শেষ করি। তিনি আগের কালের ফোটো দেখলেও বুঝতে পারবেন, অন্তত পারা উচিত, যে নরসিংহদেব পরলোকগত বলেই তাঁর ঘাড়ে সব দোষ চালান ঠিক নয়। ঐ রকম সিঁড়ি সম্প্রতিক, আগে যা সিঁড়ি ছিল, তা মিতব্যয়ী, সোজাসুজি, স্বল্পকায়। এখন হয়েছে আড়াআড়ি, জায়গা জুড়ে, মূর্তি ঢেকে দিয়ে। দিল্লীর 'লিংক' পত্রিকায় এ বিষয়ে ছবি ছাপা হয়েছে।

বাকি তথ্য বিচক্ষণ দর্শক-পাঠক নিজেই বিচার করতে পারবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত ব্যাজ বক্রোক্তি এ ক্ষেত্রে অবান্তর। অবশ্য বাংলা রচনা-শিক্ষার প্রসার হলে আমরা বাংলা লেখকেরা খুশীই হই। ইতি—বিনীত

**বিষ্ণু দে।**

॥ ২ ॥

**মহাশয়,**—আপনাদের বিগত ১৬ই আগস্ট-এর সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে মহাশয়ের 'কোণার্কের মৃত্যু' নামে প্রবন্ধটি পাঠ করে অবাক হয়েছি। অবাক হয়েছি এই কারণে যে, এই ধরণের হতাশাব্যঞ্জক প্রবন্ধ আমরা তাঁর কাছে আশা করিনি। প্রকৃতপক্ষে বহুবার কোণার্ক ভ্রমণের ফলস্বরূপ তিনি কি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই প্রশ্ন উঠে—অন্তত যাঁরা একবারও কোণার্ক পরিদর্শন করেছেন, তাঁদের মনে। তাঁর প্রবন্ধে যে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাঁদের মনে বেশ খোঁচা দেবে, যাঁরা কোণার্ক কখনও গেছেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে বুজতে পারছি, তিনি সম্ভবত জুন মাসে কোণার্ক গিয়েছিলেন—ঠিক ঐ সময়ে আমাদের ওখানে যাবার সৌভাগ্য হয়। কোন এক অফিসারের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মতভেদ হয় তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছেন, "......যদিও ঘটনা থেকে মেরামতি কাজের রকমটা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।"—এও কি সম্ভব? আমরা ওখানের এক স্থায়ী অফিসারের সঙ্গে দেখা করি তিনি আমাদের যত্নসহকারে সব দেখিয়ে দেন এবং আমাদের চা-পানে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেন। তাঁর বাসাটা কিন্তু ডাক বাংলোয় নয়। আমরা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হই। যাক্ ব্যক্তিগত কথা—ড্রিলিং ও গ্রাউটিং মেশিনটাও ঐ সময়ে কাজ করতে দেখেছি—আমাদের কিন্তু মনে হয়নি কাজ হচ্ছে না। কাজ যখন হবে তখন শব্দটা হওয়াই স্বাভাবিক। আর একটা ভুল হয়েছে, মানুষ আর যন্ত্রের তফাত হল সেই জায়গায় যেখানে ঐ মেশিনটা কাজের ভান করে থাকতে পারেনি। আমাদের সংগ্রহ করা তথ্য নীচে দিলাম যদি কারো বা তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি হয়।

(১) পাঁচিলটা আজকের নয়, ওটাকে তোলা বা বাড়ানো হচ্ছে না—যতদূর জেনেছি ওটাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ওর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

(২) মন্দিরের 'নেড়া পাথর দিয়ে ভরাট করা' অংশটা আমাদেরও নজরে আসে, কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, প্রায় ৫০০ বছর আগে ওটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত লর্ড কার্জন ওটাকে ঐভাবে সংরক্ষণ করেন—তা না হলে কি হত বলা শক্ত।

(৩) নাটমন্দিরের সিঁড়িগুলো কি তিনি এইবার প্রথম দেখলেন? ঠিক স্পষ্ট হয়নি। যাই হোক, ওটা কিন্তু রাজা নরসিংহ নিজেই তৈরি করেছিলেন। ওর মধ্যেও প্রাচীনত্ব বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। কিছু মূর্তি চাপা পড়ে গেছে এটা ঠিকই, কিন্তু খ্যাতি, অখ্যাতি সব তাঁরই প্রাপ্য।

(৪) পাঁচিলের বাইরে তো কোন মূর্তি আমাদের চোখে পড়েনি, জানি না তিনি কিভাবে কোথায় ঐগুলো দেখেছেন।

(৫) "......কিছু লোক এ আমদানি রপ্তানির নিষেধাজ্ঞার দিনেও ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জন করুন।" ব্যাপারটা বড় অস্পষ্ট—সত্যিই কি কিছু তাঁর চোখে পড়েছিল?

অকারণে প্রবন্ধটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—যদি কিছু বিবরণ থাকত আর কিছু ঐতিহাসিক সত্য, তাহলে এটা খুবই সুখপাঠ্য হত। ইতি—শ্রীচন্দ্রকুমার নাথ, আকড়া, কৃষ্ণনগর।

### লেখকের উত্তর

**দেশ সম্পাদক মহাশয়,**—শ্রীচন্দ্রবাবুর চিঠি পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু কি লিখব? চন্দ্রকুমার নাথ মহাশয় যে পাঁচ দফা তথ্য সাপ্লাই করতে গেছেন, সেগুলি এত বেশি ব্যক্তিগত স্বকপোল থেকে কল্পিত যে, তার জবাব দেওয়া বাহুল্য। আশা করি যে, তাঁর সব ভুল অজ্ঞতা-প্রসূত নয়, আশা করি কিছু অন্তত অসতর্ক-মনস্কতায়। কিন্তু

(১) পাঁচিলটা সাম্প্রতিক, কারণ কয়েক বছর আগে অবধি ছিল না, এবং দেখে অর্বাচীন বলেই মনে হয়।

(২) চন্দ্রকুমারবাবু দীর্ঘায়ু ব্যক্তি, তাই ৫০০ বছর আগে তিনি জানতে পারেন যে, ওটা (কিটা? কোনটা?) নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কথাটা কিন্তু উঠেছিল যে, ক্রমান্বয়ে এই ভাবে বাতিল করে মেরামত চলবে না, আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে প্রাচীন কাজকেই মেরামতের সাহায্যে রক্ষা করা? কিন্তু আবুল ফজল তাহলে কোণার্ক বর্ণনা করলেন কি করে?

(৩) চন্দ্রকুমারবাবু নাটমন্দিরের সিঁড়িগুলি দেখেছেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা নরসিংহদেবের সময় থেকে। আমি তখন দেখিনি। কিন্তু তিনি পাঠ্যপুস্তকের ছবিতেও দেখতে পাবেন যে, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের আগের সিঁড়ি ছিল পরিমিত লম্বালম্বি ধাপের, এখন হয়েছে চওড়া মূর্তিসারি-ঢাকা আড়াআড়ি (মজুমদার রায়-চৌধুরী দত্ত এডভানসড হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া)

(৪ ও ৫) অবান্তর। বলাই বাহুল্য পাঁচিলের বাইরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভাঙা মূর্তি ফেলা ছিল।

সর্বোপরি চন্দ্রকুমারবাবু যেন না ভাবেন যে, আমরা এবারেও কোণার্কে চা-পান করিনি, দুবার করেছি, সকালে ও বিকালে। কিন্তু আমরা তিরিশ বছর ধরে কোনোবারই চা-খাবার নিমন্ত্রণ পেতে চাইনি। ইতি—বিনীত বিষ্ণু দে

২৪-৮-৫৮




মনোজ বসু

# আমার ফাঁসি হল

৬

এখন ভিন্ন অবস্থা। নিঃসঙ্গ। তারা তো বাতাসের মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার রক্তমাংসের স্থূল চেহারাও কেউ আসছে না। মানুষ কাজে কর্মে ব্যস্ত, কাজ ফেলে কে রোগীর কাছে বসে থাকবে? একলা প্রাণী পড়ে থাকি, ঘরের মধ্যে। মা-বাবা কবে চলে গেছেন, তাঁদের কথা ভাবি। ছোটবেলা থেকে যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারাও সব মনে আসে। পিছন ফিরে সেই বয়সটায় চক্কোর দিয়ে বেড়াই। কতজনে নেই তাদের মধ্যে! আরও যত বয়স হবে, মরা বন্ধুদের সংখ্যা বাড়বে ততই। আজকে কোথায় তারা সব—ভাবতে গিয়ে থই পাইনে।

যত মরা মানুষের কথা ভাবি। দলে ভারী তারাই, জ্যান্ত আর কজন? মরছে তো আজ থেকে নয়—সৃষ্টি-সংসারের শুরু যখন, সেই থেকে। আদমের আমল থেকে। উঃ, কী ভিড় সেই মরা রাজ্যে! ভাগ্যিস খেতে হয় না ওদের, বায়ুভূত বলে জায়গাও লাগে না। নইলে তো লড়ালড়ি বেধে যেত। আর একটি আমিও ভিড় বাড়াচ্ছিলাম সেখানে। অনেকখানি এগিয়ে থমকে দাঁড়াই। ডাক্তারবাবু বলেন, একদিন বড় ক্রাইসিস—ভয় হয়েছিল তাঁর। টেম্পারেচার হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। বেহুঁশ। নাড়ির বেগ মণিবন্ধে নয়, বাহু অবধি উঠছে। তারপরে সামলে নিলাম। এমনি অসুখ-বিসুখের সময় মায়ের কোলের ভিতর বাঁকা হয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম সেকালে—রোগ হওয়াটা সত্যি বড় আরামের ছিল। আজকে ধরুন, সেই মা মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ালেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কিংবা এসে গেল প্রভাস—ছেলেবেলার আমার সর্বক্ষণের সাথী। ঠিক দুপুরবেলা মগডাল থেকে পড়ে গেল, সন্ধ্যা হতে না হতে মাদুরে মুড়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে শ্মশানঘাটে নিয়ে পোড়াল। সেই প্রভাস যদি এতকাল পরে খবরাখবর নিতে চলে আসে এই ঘরের মধ্যে? অথবা ঝিকমিকে এক কিশোরী—কি নাম তার? মায়া বোধ হয়। ভোজ খাচ্ছিলাম উঠানে সামিয়ানার নিচে। কাজের বাড়ি অনেক আত্মীয়কুটুম্ব এসেছে, তাদেরই কেউ হবে মেয়েটি। বাংলা-ঘরে বাঁশের খুঁটির পেলা—সেই একটা খুঁটির গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াদাওয়া দেখছিল। উঠতি বয়স তখন আমার, ঠিক একখানি প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে এমনিধারা মনে হল। সে রাতে ঘুম হয়নি অনেকক্ষণ, শয্যায় এপাশ ওপাশ করি। মায়া এসে বসুক আমার কাছে, দুটো কথা বলে যাক। তারপরে শুনেছিলাম, নদীতে চান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল মায়াকে। ঘাটের জলে খানিকটা রক্ত, আর কোন চিহ্ন মেলেনি। না রে ভাই, কাজ নেই—বলছি, কাজ নেই তাদের কারো ফিরে আসবার। চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে গেছে তো সেই পরিচ্ছেদ আবার কেন?

বরঞ্চ দয়ালহরির মেয়ের এসে দেখে যাওয়া উচিত। বিদেশ-বিভূঁয়ে একলা পড়ে আছি—কলকাতায় মানুষ হয়ে সৌজন্যবোধ কেন থাকবে না? বাড়ির ব্যবধান তো মাঠের এপার আর ওপার। আম কুড়োবার সময় ভোররাত্রে উঠে আসা যায়, আর নিরালা দুপুরে দরজায় দাঁড়িয়ে একটিবার চোখের দেখা চলে না?

ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠি। বিছানায় পড়ে থাকতে পারিনে। বাইরে যাবো, চৌকাঠ পার হয়ে যাইনি কতদিন! কিন্তু পা টলমল করে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। জানলার চাতালে তাড়াতাড়ি বসে পড়তে হয়। গরাদে আঁকড়ে থাকি দু-হাতে প্রাণপণে। মাথা ঘুরে পড়ে না যাই। গোলবাড়ির পুকুরে জল নিতে আসে না বোধহয় আজকাল। বর্ষার পরে হোড় মশায়ের বাড়ির পুকুরই জলে টইটম্বুর, দূরের জল বয়ে

নেবার কি গরজ? আরও বিপদ, ওদের বেড়ার জিওলগাছে পাতা গজিয়েছে—সবুজ পাতার বোঝায় বাইরে-বাড়ি ঢেকে গিয়েছে একেবারে। সারাক্ষণ নজর মেলেও কিছু দেখতে পাইনে।

অফিসের ফিরতি পথে দয়ালহরি খবরবাদ নিতে আসেন। চিঠিপত্র থাকলে দিয়ে যান। আগে রোজই আসতেন, এখন দুটো একটা দিন ফাঁক যায়।

কেমন আছেন?

একটু ভালো। ক্ষিধেটা খুব হয়েছে।

তবে তো পনের আনা সেরে গেছে। ক্ষিধে বেড়েছে, আর ভাবনা নেই।

দেহ যত দুর্বল হোক, মাথা আমার ষোল আনা সুস্থ। শুকনো মুখে বলি, ভাবনা বরঞ্চ বেড়েই গেছে। ক্ষিধে পায় একটা দুটোর সময়। কি খাই কি খাই অবস্থা। যম-ক্ষিধে যাকে বলে।

হরিশ অনেক আগে ফিরেছে। বাসন ধুচ্ছিল রোয়াকে বসে। সেখান থেকে হাঁ-হাঁ করে ওঠেঃ অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবেন না হুজুর। এত বড় ভোগান্তি গেল। ক্ষিধে পায় তো খাবেন। টিনের বিস্কুট রয়েছে।

কথা কেড়ে নিয়ে দয়ালহরি বলেন, কমলানেবু আনিসনে কেন রে? আজকাল বারো মাস পাওয়া যায়। তোরা না পারিস, আমায় বলবি। সদর থেকে আনিয়ে দেবো। কত মানুষ খায়, হুজুরের নাম করে বলে দিলেই এনে দেবে।

আমি বললাম, কী ভয়ানক ক্ষিধে—নেবু-বিস্কুটে তার কি হবে? মালসাখানেক বার্লি-সাবু গিলতে পারলে তবে বোধহয় সে আগুন ঠাণ্ডা হত।

হরিশ বলে, তাই হবে। আমায় আগে বলেননি। কাল থেকে বার্লি ফুটিয়ে ঢাকা দিয়ে যাবো।

হেসে বলি, তবেই হয়েছে। মিছে কষ্ট তোকে করতে হবে না। ঠাণ্ডা বার্লি খাইয়ে দেখিসনি এর আগে? বমি হয়ে যায়। এক গুণ খেলে তিন গুণ বেরিয়ে আসে। গরম গরম হলে তবে গিয়ে পেটে ভর থাকে।

হরিশ নিরুপায়ের মতো মুখ করে থাকে। দয়ালহরির দিকে আমি সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়েছি। কথা তো ছুঁড়ে দিলাম, কি রকম ফলাফল হয় দেখি। কিছু না, কিছু না। ঝানু লোক—তাঁর যে এ ব্যাপারে কিছু করণীয় থাকতে পারে, কোনক্রমে তা মনে আসছে না। ইচ্ছে হলে তিনিই বার্লি সেবনের ব্যবস্থা করতে পারেন। হরিশকে দিয়ে কৌটো কৌটো বার্লি আমি হোড়বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, জলে ফুটিয়ে দুপুরবেলা বাটিখানেক করে ওঁরা পাঠাবেন। ঝি-চাকর রাখবার অবস্থা দয়ালহরির নয়। সে আমি জানি। এবং এ-ও জানি, লাবণ্যের জন্মের সময় বড়বউ অগ্নিদগ্ধ হলেন, পা দুটো একেবারে পঙ্গু সেই থেকে। দুহাতে ভর দিয়ে ব্যাঙের মতন থপ থপ করে বাড়ির মধ্যে কোন গতিকে বেড়ান। মাঠ ভেঙে বার্লি দিয়ে যাবার তাগত বড়বউয়ের নেই। কিন্তু তালগাছের মতন মেয়েটা আছে কি করতে? স্ফূর্তি করে আম কুড়িয়ে বেড়াতে পারে, রোগী মানুষের ক্ষিদের সময় এক বাটি বার্লি দিয়ে যেতে পারবে না? কিন্তু ভাবছে কে এতসব? আমার কথা কানেই গেল না তো দয়ালহরির।

বরঞ্চ হরিশ বেশ চিন্তিত। পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় বলল, একটা কথা ভাবছি হুজুর। আমার পিসশাশুড়ি বেওয়া মানুষ আছেন, দায় জানালে তিনি এসে দু-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পারেন। থাকবেন আমার বাড়ি, দুপুরবেলাটা এসে পথ্যি রেঁধে দেবেন। কি অন্য যদি কোন দরকার লাগে। রবিবারের আর দুটো দিন—এই দুটো দিন থাকুন কষ্ট করে বিস্কুট চিবিয়ে, রবিবারে গিয়ে তাঁকে এনে ফেলব।

হরিশ অফিসে গেল। তারপরে আমি একা। খাতা-কলম নিয়ে বসলাম অনেকদিন পরে। দু-চার ছত্র এসে যায় যদি। দূর! বই পড়তে গেলাম। পাতাখানেক পড়ে মনে হল, চোখ দিয়ে পড়ছি শুধু, কি ছাইভস্ম পড়লাম মনে ঢোকে না। চিঠি ফেঁদে বসলাম একখানা। খানিকটা টুনুকেঃ অনেক খেলনা কিনেছি তোমার জন্য। এক

গাদা। পুজোর সময় নিয়ে যাবো। বউদিকে লিখলাম: চারিদিকে জ্বরজারি। সে যে কী অবস্থা, কলকাতায় বসে তার কোন আন্দাজ পাবে না। কিন্তু কুইনাইনের কল্যাণে আমি ঠিক আছি। কেবল কান ভোঁ-ভোঁ করে। সে ভারি মজা। ঝিঁঝি ডাকছে কোথায় অনেক দূরে। অথবা কার বাড়ি বিয়ে হচ্ছে যেন, সানাই বাজছে, আওয়াজটা বড্ড মিহি। বউদি, নিখরচায় ভাল সানাই শুনবে তো কুইনাইন ধরো......

অনেকটা লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মাথা দপ-দপ করছে, শীত লাগছে। এই রেঃ, জ্বর আসে বুঝি! এই অবস্থায় লেখার খাটুনি খেটে জ্বরটা আমিই আবার নিয়ে এলাম ডেকে। ডাক্তারবাবু শুনলে খাপ্পা হবেন। চাদর মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে পড়লাম। ঘুমোই। ঘুমিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাব।

কতক্ষণ পড়ে আছি বলতে পারিনে। আঙুলে রগ টিপে আছি, কষ্ট আরও বেড়েছে। তখন মনে হল, অডিকলোনে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কপালে পটি দিই। অডি-কলোন দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, উঠে নিয়ে আসি। মুখের চাদর সরিয়ে দেখি—

সে ছবি কোনদিন ভুলব না। এত কাছা-কাছি কখনো পাইনি, এমন ভাল করে আর দেখিনি। আমার শিয়রের পাশে এসে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ধবধব করছে ফরসা রং। দুধের মতো—উঁহু, জ্যোৎস্নার মতো। জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ আমেজ মাখানো। আমার সামনে দয়ালহরি চুপচাপ মুখ বুঁজে ছিলেন, বাড়ি গিয়ে ঠিক গল্প করেছেন আমার অসহায় অবস্থার কথা। মেয়ের কি মন হল—বার্লি নেই তো খালি হাতে চলে এসেছে। কে চায় বার্লি খেতে—বার্লি তো আমার পেটেই দাঁড়ায় না, ওয়াক করে বমি করে ফেলি। আর ঐ কানা লোকগুলোর কথা ভাবছি—এক কানা হলেন দয়ালহরি, আর কানা ষষ্ঠীপুকুরের বাঁদর-চতুষ্টয়, যারা মেয়ে দেখতে এসেছিল। হরিশও কানা। নয়তো এই মেয়ের চেহারা নিয়ে কথা বলে! আচ্ছা, রোগাতুর দৃষ্টি বলেই কি আজকে আমার এত সুন্দর লাগে?

তাকিয়ে পড়তে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, কষ্ট হচ্ছে?

না, না——বেশ তো আছি।

মিথ্যাও নয়, জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দরদ জানাবার পর? এতক্ষণের আহা-উহু চক্ষের পলকে গানের মতন সুরেলা হয়ে উঠছে।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না!

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায়: আজকে যাচ্ছি। আবার দেখা যাবে—কেমন?

হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ বুঝলাম। হরিশ এসে পড়েছে। রাস্তায় দূরে তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পালাল।

মুখ কালো করে হরিশকে বলি, এত সকাল সকাল?

নতুন হুজুরকে বললাম আপনার কথা। বার্লি রেঁধে দেবো। বলতেই তিনি ছুটি দিয়ে দিলেন।

কে খাচ্ছে তোর বার্লি? হয়েছে কি আমার? আমার কথা কি জন্যে বলতে গেলি তাঁর কাছে?

রাগ দেখে হরিশ হকচকিয়ে যায়।

ছুতো করে পালিয়ে আসা। সরকারের মাইনে খাস না যে যখন তখন চলে এলেই হল?

হরিশ আস্তে আস্তে বলে, রোজ তো নয়। এই আজ হল, আর কালকের দিনটা। পরশু তো পিসিমাকে নিয়ে আসছি।

কাউকে আনতে হবে না তোর। ঐ এক মতলব হয়েছে। জানিস যে, বার্লি খেতে পারিনে, বমি হয়। রোগা শরীরে বমি করতে করতে চোখ উলটে পড়ব। সেইটে না ঘটিয়ে ছাড়বিনে।

হরিশ সরে গেল। লাবণ্য কথা রেখেছে। সেই থেকে রোজ দুপুরে চলে আসে। কথাবার্তা অতি সামান্য, কোনদিন একেবারেই নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। তা-ও সামান্যক্ষণ—দু-পাঁচ মিনিট। ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল, হপ্তা দুয়েকের মধ্যে একেবারে নিরাময়। গ্রাম অঞ্চলে সাধু-ফকিরেরা ঝাড়ফুঁক দিয়ে ব্যাধি সারায়। ডাক্তারবাবু যত অষুধই দিন, আমি জানি, দু-চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে লাবণ্যই আমার জ্বর সারিয়ে দিল।

জ্বর বন্ধ হবার পরে কালে-ভাদ্রে কদাচিৎ দেখা পাই। শরৎকালে নতুন হিম পড়ছে। দুটো একটা মাস এখন খুব সামাল হয়ে

থাকতে হবে, ডাক্তারবাবু পই পই করে বলেন। ঠাণ্ডা লাগানো বিষের মতো শরীরের পক্ষে! এবং শীতকালে আবার যদি জ্বরে পড়েন, যত অষুধই খান, জ্বের চলবে ফাগুন-চৈত্র অবধি।

বললেন, স্থানপরিবর্তনে উপকার হয়। আর কোথাও সুবিধা না পান, পুজোর সময়টা কলকাতায় থেকে আসুন, তাতেই কাজ হবে। আমি কিন্তু আগে ভাগে উল্টোরকম লিখে দিয়েছিঃ বনেদি গ্রাম, দশ-বারোখানা প্রতিমা উঠবে, এখন থেকে সোরগোল পড়ে গেছে। গ্রামের বাসিন্দা যে যেখানে থাকে সকলে এই সময় এসে পড়েছে। সারা গ্রাম এক হয়ে গেছে উৎসবের আনন্দে। সব বাড়ি নিমন্ত্রণ—যে কোন এক জায়গায় খেয়ে নিলেই হল। এই কাণ্ড চলল এখন শ্যামা-পুজো অবধি। চাঁদা তুলে প্যাণ্ডেলের সার্বজনীন পুজো আর কানে তালা-ধরানো মাইকের অট্টরোলের মধ্যে এই বিরাটগড়ের দুর্গোৎসব তোমার ধারণায় আসবে না বউদি। গ্রাম শুদ্ধ মিলে ধরাধরি করছে, কিছুতে এখন আমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে দেবে না। শীতকালে বড়দিনের সময় নিশ্চয় যাব, ঐ সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে। ছুটি অনেক জমেছে।

দয়ালহরি গল্প করেছিলেন সেকালের বিরাটগড়ের—পুজোর সময় গাঁয়ের যেরকম বাহার খুলত। তাই হুবহু লিখে দিলাম চিঠিতে। সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পুজোর সময় এবারে ঢাকের বাড়িটাও পড়ে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি এখন নড়তে পারব না। দাদা-বউদিকে ধাপ্পা দিচ্ছি—সে না-হয় হল—ভাবতে অবাক লাগে, টুনুমণিকে অবধি ভুলতে বসেছি।

ডাক্তারবাবুর কাছে সাফাই গাইঃ শরীরের এমন দশা, এক পা নড়তে মাথা ঘোরে। নৌকো-ট্রেনের অত ধকল সয়ে কলকাতা অবধি আমার পৌঁছনো ঘটবে না, পথে কোনখানে পড়ে মরব।

পুজোর মুখে নতুন সাব-রেজিস্ট্রার চলে গেলেন। একরকম পালিয়ে যাওয়া। বিরাটগড় ছেড়ে বাঁচলেন যেন ভদ্রলোক। ছুটির পরে আমায় অফিস করতে হচ্ছে। বেশি খাটি না, বেলাবেলি বাসায় ফিরে আসি। ডাক্তারবাবুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করি, ঠাণ্ডা লেগে আবার যদি অসুখে পড়ি নির্ঘাৎ মারা যাব এবারে।

সন্ধ্যা হতে না-হতে দুয়োর ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি। কিছু গানের চর্চা ছিল, সে তো জানেন। গলার সুরের জন্য তারিফ পেয়েছি এক বয়সে। সময় কাটানোর জন্য একটুআধটু গানও শুরু করেছি। এক অভাবিত সুবিধা হয়ে গেল। দয়াল-হরি শুনেছেন বুঝি একদিন—বললেন, খালি গলায় কেন হুজুর? লাবণ্যর হারমোনিয়াম আছে, ও গাইতে চায় না। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, বলেন তো সেইটে আনিয়ে দিই।

নিজেই ঠিক বয়ে আনতেন। কিন্তু আমি চটে যাই বলে হরিশকে নিয়ে গেলেন। হারমোনিয়াম এসে পড়ল। বাজারের ফঙ্গবেনে বস্তু নয়। দেখে আমি অবাক। কলকাতায় মল্লিকদের বাড়ি এমনি বস্তু দেখেছিলাম। তাঁরা বনেদি গৃহস্থ, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক তিন-চার পুরুষ ধরে। ও'দেরই কে বিলেত থেকে আনিয়ে-

ছিলেন। ঠিক এই বস্তু কিনা, বলবার মতো জ্ঞান নেই। কিন্তু চেহারাটা এমনি।

এ জিনিস কোথায় পেলেন হোড়মশায়?

ভাল জিনিস? কি জানি, আমি বুঝিনে। লাবণ্যর দিদিমার কাণ্ড। তাঁর শখ ছিল অনেক। নাতনিকে গান-বাজনা শিখিয়ে হাল ফ্যাশানের বানাবেন। শহুরে ছেলে দেখে বিয়ে দেবেন। মরে গেলেন তিনি। মরবার সংগে সংগে ফ্যাশান মাথায় উঠে গেল। তাই ভাবলাম, অব্যবহারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে—মেয়ের কিছু হল না তো গুণীজনের কিছু কাজে আসুক।

নাড়াচাড়া করে দেখে বলি, এর তো অনেক দাম।

দয়ালহরি একটু থতমত খেলেন মনে হল। অবহেলার ভাবে বললেন, দাম না হাতী! দাম হলে কি জোটানো যেত! আমায় যারা জামাই করেছিল, বুঝতেই পারেন, তারা রাজা রাজবল্লভ নয়। শাশুড়ি পেয়েছিলেন কোথায় সস্তায়। ওঁদের চাঁপাতলার বাসার কাছেই হল চোরাবাজার। সস্তায় অনেক জিনিস পাওয়া যায়। দাম-টামের কথা জানিনে, আমায় কেউ কিছু বলেনি।

বাজিয়ে দেখছি। কী করে রেখেছে জিনিসটা! বেলোর চামড়া আরশুলোয় কাটা। কেশোরুগীর মতো ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরোয়। রীডগুলো যেন বুড়ো মানুষের নড়া দাঁত—সাবধানে টিপতে হবে, নয়তো খুলে পড়ে যেতে পারে। তা হোক, তবু লাবণ্যর জিনিস। অনেক দাম আমার কাছে।

আপনার মেয়ে গান টান শিখেছে কিছু?

উঁহু, একেবারে নয়। শাশুড়ি ঠাকরুন বেঁচে থাকলে কি হত বলা যায় না। ভাগ্যেস শেখেনি। একটুআধটু লেখাপড়া জানে বলে ষষ্ঠীপুকুরের ওরা কাঁইকুই করছিলঃ কলম পিশতে হবে না মশায়, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানতে জানে কিনা তাই বলুন। গানের কথা শুনলে রক্ষে ছিল? বলত, বাইজি বউ ঘরে নেবে—একশ-এক টাকা নগদ ধরে দিতে হবে খুঁতে ঢাকবার জন্য। জানেন না হুজুর আমাদের নচ্ছার পাড়াগাঁয়ের গতিক।

আওয়াজ যেমনই হোক, লাবণ্যের হারমোনিয়াম। চাঁপার কলির মতো আঙুল ঘুরে বেড়িয়েছে রীডের উপর দিয়ে, বাঁ-হাতে আলসে লাবণ্য বেলো টেনেছে। বিরাটগড়ের ভারি সব সমঝদার মানুষ কিনা! এই বাজনার সংগে আমার গান খাসা মিলবে।

ডাক্তারের সব কথা কে কবে মেনে চলতে পারে? সন্ধ্যার পর বাসা থেকে না বেরুলেই হল। দুয়োর-জানলা এখন খুলে দিই—গলাও খুব দরাজ হয়েছে, গাঁ-গাঁ করে গীত অভ্যাস করি। গানে নাকি বনের পশু বশ মানে। হয়তো তাই। কিন্তু যেসব মানুষ শহরে থেকে এসেছে, তারা কদাপি নয়। বনের পশুর বেশি বেয়াড়া শহরে-থাকা মানুষ।

মরীয়া হয়ে একদিন চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথাঃ গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল, একটিবার এক লহমার জন্যে তবু দেখা মেলে না। অসুখের সময় রোজ আসা হত। তবে তো অসুখই ভাল। রোজ আমি দরজা-জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগাই, ভাগ্যবশে আবার যদি অসুখ করে। আবার তবে আসবে একজন।

চিঠি তো লেখা হল—পাঠানো যায় এখন কেমন করে? কার হাত দিয়ে? হরিশকে দিয়ে হবে না। হাকিমের কাণ্ড দেখে মনে মনে সে কি ভাববে? এহেন রসালো ব্যাপারের ভাগ নতুন বিয়ের বউকে না দিয়ে

পারবে না। তার অর্থ, গ্রামময় জানাজানি। পড়তে লিখতে শিখে বেটা বিপদ ঘটিয়েছে।

হোড়মশায়ের জিওল গাছে আবার পাতা ঝরতে শুরু হয়েছে। দূরে থেকে হাড়গিলে দেবীর কখনোসখনো দর্শন মেলে। বারান্দায় বসে সকালের রোদ পোহাচ্ছি। হরিশ ওদিকে রান্নার কাজে ব্যস্ত। রাস্তা দিয়ে এক রাখাল ছোঁড়া ছাগলের পাল নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডাকলাম, এই, শুনে যা একটা কথা—

সিকি হাতে দিয়ে বললাম, পানের বরোজে টাটকা তোলা পান পাওয়া যায় এখন সকালবেলা। দু-আনার পান কিনে দিয়ে যা তো তাড়াতাড়ি। বাকি দু-আনা তুই নিয়ে নিবি।

মোটা মুনাফা পেয়ে ছোঁড়ার মুখে হাসি ধরে না। সিকি মুঠোয় পুরে চলে যাচ্ছে—

আর দেখ, উই যে দেখতে পাচ্ছিস—

অধীর হয়ে সে বলে, পানের বরোজ আমি জানি।

গাঁয়ের মানুষ তোরা আবার কোনটা না জানিস? বাইরে থেকে এসে আমরাই বরঞ্চ কিছু জানলাম না। হোড়মশায়ের বেগুন-ক্ষেতে একজন ঐ বেগুন তুলে তুলে বেড়াচ্ছে —দেখতে পাচ্ছিস তো—ওকে এই কাগজটা দিবি। কি বলে, শুনে আসবি। তার কাছ থেকে।

ছোঁড়া চলল। ছাগলগুলো পথের এদিকে সেদিকে ঘাস খুঁটে খাচ্ছে। আছি একনজরে তাকিয়ে ওদিকে। অজানা মেয়ের নামে প্রথম এই চিঠি—সত্যি বলছি, আর কখনো এমন কর্ম করিনি। চিঠি পাঠানোর পর বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে, না জানি কি ঘটে! ঐ তরফের আগ্রহ দেখে তবে তো আমি লিখেছি চিঠি। ক্ষণ পরে দেখলাম, রাখাল ছোঁড়া দৌড়চ্ছে। আলের পথে নয়, আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এলো। দম নিতে পারে না।

খবর কি রে?

পান দিল না। বরোজ থেকে বিক্রি হয় না। হাটে গিয়ে কিনতে হবে।

আর সেই কাগজ?

গোখরো সাপের মতন ফোঁস করে উঠল বাবু। কাঁটাসুদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারল আমার দিকে।

মেয়েলোকের ভয়ে মরীয়া হয়ে ছুটেছিস? কী রকম বেটাছেলে রে তুই?

এমন কথার উপর কোন বেটাছেলের না লজ্জা হয়! হলই বা বয়সে ছোট। বলে, মেয়েলোকের ভয় কেন হবে বাবু? বুড়োও দেখি 'কি—কি হয়েছে' করে ক্ষেতের দিকে আসছে। তখন আমি সরে পড়লাম।

উদ্বেগ, আবার দয়ালহরিকে বলেটলে দেয় নাকি? পুরো সিকিটাই বখশিস হিসাবে দিয়ে বিদায় করলাম—গোখরো-সাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। সারাদিন মনে নানারকম তোলাপাড়া করেছি। আফিস থেকে ফিরে দেখি, ঘরের মেঝেয় একখানা আঁটা খাম। জানলা দিয়ে কেউ ফেলে গেছে। রাখাল ছোঁড়ার উপর বেগুন ছুঁড়তে দিয়েছিল, আমার উপরে চিঠি ছুঁড়েছে।

অতি সংক্ষিপ্ত, দু-ছত্রের চিঠি। লিখেছে, কোনওদিন কোনখানে যাইনি আমি। মিথ্যে কথা লিখে চিঠি পাঠানোর হেতু কি?

এসো নি তুমি—মিথ্যে কথা? তাই তবে মেনে নিলাম। আমারই চোখের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। হাত-খানেক দূরে থেকেও চোখের ভুল। কাগজের উপর তাই আবার লিখে জানিয়েছি। বেশ!

দুদিন পরে আবার তেমনি এক চিঠি পড়লঃ আগের চিঠি অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। একশ-পাঁচ জ্বর শুনে গিয়ে-ছিলাম একদিন। একটা দিন মাত্র, মিনিট খানেকের জন্য। বাইরে থেকে এক নজর উঁকি দিয়ে আসি। রোজ যেতাম, এমন কথা কি জন্য তবে লেখা হয়? ছোট্ট এক ব্যাপার নিয়ে চিঠি চালাচালিরই বা কি দরকার?

আবার ক'দিন পরে পুনশ্চ চিঠিঃ না হয় গেয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশী মানুষ একলা রোগে ছটফট করছেন, কানে শুনে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে এসেছি, ঘরের ভিতর যাইনি তো! বাবার কানে না ওঠে, দোহাই আপনার। গল্প করতে করতে বলে বসবেন না। আপনার চিঠি যখন এনে দিল, বাবা এমনিই খানিকটা দেখে ফেলেছেন। আজে-বাজে কথা বলে আমি চাপা দিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়ছি—চোখ তুলে দেখি, লেখিকাই অদূরে ঘনপক্ষ্ম ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মুচকি মুচকি। (ক্রমশঃ)

কিছুক্ষণ থেকেই একটা মাছি ঘুরে ঘুরে উড়ছে বাসের মধ্যে। বাসের দরজা জানালাগুলো বন্ধ। ক্লান্ত পাখার ওপর ভর করে শব্দহীন বিরামহীন হয়ে উড়ে চলেছে মাছিটা। কখন যেন মাছিটাকে হারিয়ে ফেলে, আবার খুঁজে পেল জেনীঃ মাছিটা তার স্বামীর নিশ্চল বাহুর ওপর এসে বসেছে।

আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন শীতের হাওয়ায়। জানালার ওপর আঁচড় কেটে যাচ্ছে বালি-ভরা দমকা বাতাস। মাছিটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে। শীতের অস্পষ্ট ভোরে নড়বড়ে দেহ আর অ্যাকসেলের তরঙ্গ তুলে হেলে দুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে বাসটা। জেনী চোখ তুলে ধরলো তার স্বামী মার্সেলের দিকে। তার অপ্রশস্ত কপালের ওপর ছড়িয়ে আছে রুপোলী কেশগুচ্ছ। শ্লথ মুখমণ্ডলের মাঝখানে উঁচিয়ে আছে চওড়া নাকটা। সে যেন এক শৃঙ্গ-লাঙ্গুলেময়, বিমর্ষ অরণ্যচারী দেবতা।

রাস্তার অজস্র গহ্বরের চোট খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে গাড়িটা। প্রতি ধাক্কার সঙ্গে জেনীর দেহ ছুঁয়ে যাচ্ছে তার স্বামীকে। মার্সেল বসে আছে, বিরাট নিষ্ক্রিয় শূন্যতার প্রতীক যেন। ছোট্ট ক্যানভাসের একটা সুটকেস শক্ত করে ধরে আছে। ওই ছোট্ট মাছিটির বাধাময় আনাগোনা তার চোখে পড়েনি।

গাড়ির চারিদিকের কঙ্করময় কুয়াশাকে ঘনীভূত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে শীতের হাওয়া। কোনো অদৃশ্য হাত যেন মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে অযুত বালির কণা। কুয়াশার দেয়াল ভেঙ্গে পথ করে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। চলন্ত ধূলিধূসর প্রান্তরের মাঝখানে ভেসে ভেসে আসছে ক্ষণিক উজ্জ্বলতা। যেন ধাতব পদার্থ দিয়ে গড়া রুগ্ন বর্ণহীন কটি তালগাছ একবার দৃষ্টিপথে ভেসে এসে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'কী অদ্ভুত দেশ!' নিঃশব্দতাকে আহত করে মার্সেল বলে উঠলো।

বাস ভর্তি আরব মানুষ। তাদের শরীর ঢাকা রয়েছে আলখাল্লায় আর মুখ ঢাকা পড়েছে নিদ্রা-ভানে। কেউ কেউ সিটের ওপর পা গুটিয়ে বসেছে। চলন্ত গাড়ির দোলায় দুলে দুলে উঠছে তারা। জেনী এদের দিকে তাকিয়েছিল। তার মনে হল, দুর্বিষহ এদের বৈরাগ্যময় নীরবতা। সেও যেন কত কাল ধরে এইসব মূক প্রহরীদের সঙ্গে কোন দূর দিগন্তে চলেছে। অথচ এই ঘণ্টা দুই আগেই ভোরের অস্পষ্টতার মাঝখানে, রেল স্টেশন পেছনে ফেলে, যাত্রা শুরু করেছে জেনীরা। পাথরে ভরা, জন-মানবহীন মালভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। মনে হচ্ছে, রক্তাক্ত দিক-চক্রবাল পর্যন্ত এক শূন্য সরলতায় বিস্তৃত হয়ে আছে তাদের পথ।





কখন যে প্রশস্ত প্রান্তরকে মুছে দিয়ে নেমে এসেছে উত্তুরে হাওয়া! আর কিছু দেখবার নেই জেনে নিয়ে, তারা যেন আস্তে আস্তে, এক নিদ্রাহীন রাত্রির নীরবতায় অন্ধকারের ভেতর এগিয়ে চলেছে। সে অন্ধকার মুখর। জেনী ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে জিব দিয়ে; বালি বের করে নিচ্ছে চোখের।

'জেনী'—

মার্সেল-এর গলার আওয়াজে চমকে উঠলো জেনী। তারপর হাসলো। যেন তার মত দীর্ঘ আর সবল মানুষটার এই কোমল নামটি সত্যিই হাস্যকর।

'দেখোতো, আমার কাপড় জামার নমুনায় ভরা বাক্সটা কোথায়?

নুয়ে, পা বেঁকিয়ে নিয়ে সিটের নীচে বাক্স খুঁজতে খুঁজতে মনে হল জেনীর— যেন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। অথচ একদিন স্কুলে কসরতের পুরস্কার পেয়েছিল ও......। কতদিন আগে সে......! পঁচিশ বছর......। মনে হলো যেন গতকালই......পঁচিশ বছর নয়......। এই গতকালই যেন সে বিয়ে আর স্বাধীন জীবনের মাঝখানে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দোদুল্যমান অবস্থায় দুলেছিল। আর একলা বড়ো হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা......! কিন্তু আজ আর সে একা নয়......। আইন পড়ুয়া মার্সেলকেই গ্রহণ করে নিয়েছিল ও।......অবশ্য তার স্বামীর উন্মুখ ধারালো হাসি আর কোঠর-ঠেলে-বেরিয়ে-আসা অন্ধকার মাখানো চোখ জোড়ার প্রেমে পড়েনি জেনী কোনদিনই...। তবু মার্সেলকে ভালো লেগেছিল তার। অধ্যবসায়ী, দৃঢ়চিত্ত এই লোকটির ভালো-বাসা পেতে ভালোই লাগতো তার। আর তার নিঃসঙ্গ একাকিত্বের অবসান ঘটিয়েছে এই মানুষটিই।

হঠাৎ মনে হল জেনীর তাদের গাড়ির ভেতরের অনাহত নিঃশব্দতার মাঝখানে এক-জোড়া চোখ তাকেই দেখছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলো সে। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর পোশাক পরা একটা সৈনিক। সাহারায় পড়ে আছে। তার রোদে ঝলসানো মুখের চূড়ায় একটা কোরা কাপড়ের টুপী। শেয়ালের মত লম্বা আর ছুঁচোলো মুখ। তার নির্নিমেষ দৃষ্টির মধ্যে এক গভীর অনুমোদনহীন ভ্রূকুটি জ্বলে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিল জেনী। সামনের হাওয়া আর কুয়াশার বুকে চোখ মেলে তেমনি বসে আছে তার স্বামী।

নিজের কোটের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসতে বসতে জেনী ভাবছিল এই সৈনিকটির মুখটা, যেন শুকনো বালি আর পাথরে

গড়া মুখ। সামনে শীর্ণ রোদে-পোড়া আরব মানুষের দল কেমন করে যেন খুলে ছড়িয়ে বসে আছে। শুধু তারই মনে হচ্ছে, করাত দিয়ে চিরে নেওয়া দুই কাঠের টুকরোর মাঝখানে কাজলার মত বসে আছে তারা দুজন। আবার ভালো করে কোটটা টেনে নিল সে হাঁটুর ওপর। ভাবলো, আমি তো মোটাসোটা নই। মনে পড়ল, নিজের দীর্ঘ, সুগঠিত আর আকাঙ্ক্ষিত শরীরকে দেখেছে সে বহু মানুষের দৃষ্টির মধ্যে। তার পর্যাপ্ত শরীরের উত্তাপময়, আমন্ত্রণভরা পটভূমিকায় একটি অকৃত্রিম দৃষ্টি-উজ্জ্বল শিশু মুখের কথা ভেসে উঠলো মনে।

এই সফরের ব্যাপারে কল্পনার যে জাল জেনী বুনেছিল তাও সত্য হয়ে ওঠেনি। মার্সেল যে তাকে নিয়ে ব্যবসার প্রসারের জন্য বেরুতে চায়, তা জানতে পেরে, বাধা দিয়েছিল জেনী। বারবার মনে হয়েছিল সমুদ্রের উপকূলে হারিয়ে যাওয়া যৌবনের দিনগুলির কথা। তবুও শ্রমবিমুখ স্বামীর দিনগুলি কেটে গেছে ঔপনিবেশিক অর্ধ-য়ুরোপীয় শহরের খিলানের ছায়ায় মুগ্ধ একটি ছোট্ট দোকানঘরে, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নানা পশরার মাঝখানে। আরবী পরদা আর আসবাবপত্রে সাজানো তাদের দোকানে ছোট্ট ঘরের মাঝখানে, আধবোজানো খড়খড়ির আধো আলোছায়ার মধ্যে কেটে গেছে সন্তানহীন জীবন। ধীরে ধীরে আকাশ আর সমুদ্র আর অভিযান—ইতিহাস হয়ে গেছে। অর্থ ছাড়া যেন অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ভুলে গিয়েছে মার্সেল। দরাজ-হাতে দিয়েছে সে জেনীকে, তবুও জেনীর মনে হয়েছে বারবার, কেমন করে ভরে দেবে সে জীবনের মৌলিক দাবীগুলিকে। গ্রীষ্মের দিনগুলি ভরে উঠেছে বন্ধশ্বাস ক্লান্তির সুমিষ্ট কঠিন অনুভূতিতে। দোকানের কেনাবেচা আর হিসেবের মাঝখানে কেটে গেছে কতদিন। তারপর জেনীর ভবিষ্যতের সংস্থান করে রেখে যাওয়ার জন্য তার পণ্য-সম্ভার নিয়ে বেরিয়েছেন মার্সেল। দক্ষিণের উচ্চতর মালভূমির দেশে। কোন সাব-দালালের সহায়তা না নিয়ে সে নিজেই পৌঁছে দিতে চায় তার পণ্য আরব ধনিকদের কাছে। এই সফরে আসতে চায়নি জেনী। তবুও আজ তারা চলেছে এগিয়ে। তার ভয় ছিল। গরম হাওয়া আর মাছির পঙ্গপাল আর জঘন্য হোটেলের বুকে থেকে ভেসে আসা মৌরীর গন্ধকে সত্যিই ভয় করত সে। ভাবতে পারেনি, এই শীত, শাণিত বাতাস আর মেরুদেশের নিঃশ্বাসে ভরা মালভূমির বুকে খুঁজে পাবে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে থাকা পাথর আর কঙ্করাকীর্ণ পৃথিবীর সন্ধান। জেনী স্বপ্ন দেখেছিল নরম বালির সাম্রাজ্য আর তালবনের। আজ দেখতে পেল, মরুভূমির এক ভিন্ন রূপ। শুধু পাথর আর পাথর, চারিদিকে ছড়ানো। আকাশ আবৃত শীততীক্ষ্ণ পাথরের ধূলি-কণায়। পৃথিবীর বুকে পাথরের সমুদ্রের মাঝখানে শুধু শুকনো ঘাস গুঁজে রেখে গেছে কেউ।

কখন যেন বাসটা থেমে গেল। যন্ত্রপাতি কী যেন বিগড়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য মুখ ঢেকে নিল আরব যাত্রীর দল। বাইরের দিকে চোখ পড়লো জেনীর। গাড়ির চারিদিকে সর্বাঙ্গ ঢাকা নিশ্চল মানুষের দল। তাদের অবগুণ্ঠনের নীচে শূন্য থেকে নেমে-আসা নিস্তব্ধতায় ভরা দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে এই মেষপালকের দল গাড়িটার দিকে। গাড়ির ভেতর অখণ্ড নিস্তব্ধতা। যাত্রীর দল মাথা নুইয়ে নিয়ে শুনছে মালভূমির বুকের ওপর ভেসে যাওয়া শেকল-ছেঁড়া বাতাসের শব্দ। এবার গাড়ির চালক দরজা

দিয়ে বাতাসকে বন্ধ করে এসে বসলো। গাড়ি আবার চলছে। রুক্ষ মেষপালকদের নিশ্চল ভিড় থেকে একটা হাত বাতাসে উঠে তারপর কুয়াশার আড়ালে চলে গেল।

চোখের পর্দায় কান্তিময় ঘুমের স্রোত নেমে আসছিল জেনীর। হঠাৎ দেখল তার সামনে একটা লজেন্সের কৌটো বাড়িয়ে ধরেছে সেই সৈনিক। হাসছে সে। একটা লজেন্স তুলে নিল জেনী। ধন্যবাদ দিল। পকেটের মধ্যে কৌটোটা পুরে সৈনিকটি মুখের হাসি গিলে নিল। চোখও ফিরিয়ে নিল। মার্সেলের দিকে লক্ষ্য করে দেখল জেনী, সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে বাসটা। নিষ্প্রাণ ক্লান্ত হয়ে বসে আছে যাত্রীর দল।

আস্তে আস্তে গাড়িটা ঢুকছে মাটির কুঁড়েঘরের মাঝে পথ কেটে কেটে একটা মরুবাগিচার ভেতর। একদল ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে লাটিমের মত চরকি খাচ্ছে বাসটার চারদিকে। তেমনই বয়ে চলেছে হাওয়া। শুধু দেয়ালগুলোই যা আড়াল করে রেখেছে বালির অত্যাচার। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, চেঁচামেচির মাঝখানে, ব্রেকের কর্কশ শব্দ তুলে, থেমে দাঁড়াল গাড়িটা পোড়ামাটিতে গড়া খিলানের ছায়ায়। গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল জেনী। টালমাটাল করছে তার শরীরটা। কতক্ষণ ধরে যেন বাস থেকে জিনিসপত্তরও নামাচ্ছে মার্সেল! হঠাৎ চোখে পড়লো তার, ঘেঁষা-ঘেঁষির ঘরের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা হলদে মিনার। আর বাঁ দিকে চোখ মেলতেই দেখলো, মরুদ্যানের প্রথম তালবন। তার ইচ্ছে হল, চলে যায় সে ওই দিকে। তীক্ষ্ণ হিমহাওয়ায় ভরা দুপুরে কেমন করে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীরটা! কোথায় মার্সেল? এগিয়ে আসছে সেই সৈনিক। অভিবাদন করলো না, হাসলো না, তার দিকে না তাকিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। আস্তে আস্তে, মার্সেলকে পেছনে রেখে, হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেল জেনী। রাস্তার ওপর দিকের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল হোটেলের লোক। প্রায় অনাবৃত, বালির কলঙ্কে পূর্ণ ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল জেনী। মনে হল, চুনকাম করা দেয়ালগুলো থেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র শীত। কোথায় রাখবে হাতের ব্যাগটাকে, কোথায় রাখবে নিজেকে দিশে করে উঠতে পারলো না। হয়ত তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে অথবা শুয়ে। সঠিক কিছু বুঝতে না পেরে, হাতের মুঠোয় ব্যাগটা তেমনি করে ধরে রেখেই ছাদের কাছাকাছি একটা ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে আকাশের একটুখানির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেনী। অনেকক্ষণ ধরে। প্রতীক্ষমানা হয়ে। অথচ কিসের প্রতীক্ষায় জানতে পারলো না। সে শুধু অনুভব করলো তার নিঃসঙ্গতাকে, আর ধারালো হিমবায়ুকে। আর অনুভব করলো অন্তরের কেন্দ্রস্থলে জেগে ওঠা এক গুরুভারকে। বাইরে রাস্তার দিকে ভেসে এলো মার্সেলের উচ্চ কলরব। কিন্তু সে কলরব অগ্রাহ্য করে স্বপ্ন দেখতে লাগলো জেনী। জানালার ভেতর দিয়ে ভেসে-আসা এক নদীর কলরোল আর তালবনের বুকে ঘূর্ণি দিয়ে ওঠা হাওয়ার শব্দকে যেন অন্তরঙ্গ করে জেনে নিল সে। কখন যেন হাওয়ার রনরনি ফেঁপে ফুলে উঠলো আর নদীর ছলছল শব্দ তরঙ্গের রুদ্ধশ্বাসে মুখর হয়ে উঠলো। কল্পনার চোখে দেখতে পেল জেনী, প্রাচীরের ওপাশে সমুন্নত নমনীয় তালবন ঝড়ের বুকে মুখ খুলে দিয়েছে ধীরে ধীরে। আর এইসব তরঙ্গ তার ক্লান্ত চোখ-গুলোকে আবার শ্রান্তিতে ভরে দিল। তার মাংসল পা দুটি জড়িয়ে ধীরে ধীরে শীত উঠেছিল, শীতের সে-অনুভূতির মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল জেনী; ভারী হয়ে, নুয়ে, নিজের দুটি হাত এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিয়ে।

স্বপ্ন দেখলো জেনী অনেক সমুন্নত আর নমনীয় তালবনের...তার কথা ভাবল...। আর স্বপ্ন দেখলো সে নিজেই একদিন যা ছিল...সেই কিশোরীটির কথা...।

তাড়াতাড়ি রুটি আর মাংস আর কফি দিয়ে আহার পর্ব শেষ করে ওরা বেরিয়ে এল। অনেক দরাদরির পর একটা আরব ছোকরা ঠিকে করেছে মার্সেল। ওর ট্রাংকটা বয়ে নিয়ে যাবে।

ধুলোয় ভর্তি গাছের সারির মাঝখানে ওদের পথ এগিয়ে গিয়েছে চৌকের দিকে। ট্রাংকের পেছনে পেছনে চলেছে জেনী। তাদের জন্য পথ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে গম্ভীর উদাসীন আরবের দল। মাটির কেল্লার ফটকের ভেতর দিয়ে, পার্ক খিলান আর দোকান পেছনে ফেলে আস্তে আস্তে এক বুড়ো আরবের দোকানে এসে দাঁড়ালো তারা। পুদিনার গন্ধেভরা চায়ের ঘ্রাণ ভেসে এলো। দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকল জেনী। আনুষ্ঠানিক চায়ের আসরের আভিজাত্যময় উদাসীনতার উচ্চতা থেকে নেমে এল না বুড়ো আরব বণিক। আত্ম-নির্ভরতাবিহীন নারীর মত দুর্বল হাসি হেসে, কপাল থেকে কম্পিত স্বেদ বিন্দু মুছে নিয়ে, পশরা বাক্সবন্দী করে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল তারা। মার্সেল বলে উঠলো, 'এরা যেন নিজেদের সর্বশক্তিমান ভগবান বলে মনে করে......কিন্তু এদেরও তো ব্যবসা করতে হয়......দিনকাল যা হয়ে উঠছে জেনী।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল জেনী। হাওয়ার মাতামাতি কখন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুকে কয়েকটা গহ্বর। অকরুণ হিমসিক্ত উজ্জ্বলতা ভেসে আসছে সেখান থেকে। বাগিচা পেছনে ফেলে রেখে সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। দুই ধারে দেয়ালের গায়ে ঝরে যাওয়া শীতের গোলাপ। রাস্তার ওপর কয়েকটা পোকায় কাটা বেদানা। মহল্লার বাতাস আচ্ছন্ন করে আছে ধুলো আর কফির গন্ধ, কাঠের ধোঁয়া, পাথর আর ছাগলের গন্ধ। জেনী বুঝতে পারলো, হেঁটে হেঁটে ভারী হয়ে উঠেছে তার পা দুটো। অথচ তার স্বামী যে খুশী হয়ে উঠছে, বুঝতে ভুল হল না তার। বুড়ো আরব বণিকের দোকান না হোক, আর পাঁচটা দোকানে ভালো কারবারই করা গেছে। মার্সেল তাকে ডাকছে আদরের নাম ধরে। যন্ত্রের মত উত্তর দিয়ে চলেছে জেনী তার স্বামীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথোপকথনের মাঝখানে।

আর একটা রাস্তা দিয়ে শহরের মাঝখানে পার্কের ভেতর এসে দাঁড়ালো দলটি। মার্সেল হাত তুলে দেখাল কেমন অভিজাত অহংকারের সঙ্গে একটা আরব এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। উদাসীন, ভ্রুক্ষেপ-হীন। সোজা চলে চলে আসছে লোকটা তাদের দিকে। রাস্তার ওপর পড়ে-থাকা ট্রাংকটা যেন তার দেখবার কথা নয়। তাড়া-তাড়ি হাতলটা ধরে বাক্সটা সরিয়ে নিল মার্সেল। লোকটা তেমনি গর্বিত পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে গেল। জেনী তাকিয়ে দেখল মার্সেলের ফনাভাঙ্গা মুখের দিকে। শুনল মার্সেল বলছে 'এরা ভেবেছে যা খুশি তাই করতে পারে আজকাল।' জেনী উত্তর দিল না। আরবটার নির্বোধ হঠকারিতার প্রতি গভীর ঘৃণা জেগে উঠেছে তার মনে। হঠাৎ যেন আনন্দহীন হয়ে গেল সব কিছু। ইচ্ছে করলো তার, ছুটে পালিয়ে যায় সে। মনে এল তার পিছনে ফেলে-আসা ফ্ল্যাটটার স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, হোটেলের ম্যানেজার বলেছিল, কেল্লার ছাদে দাঁড়িয়ে মরুভূমির দৃশ্য দেখবার কথা। ক্লান্তির অজুহাত তুলে ধরলো মার্সেল। তারপর জেনীর অনুনয় ভরা মুখের ওপর কী দেখে বলল, 'বেশ চলো।'......হোটেলে বাক্সটা রেখে আসতে চলে গেল মার্সেল।

হোটেলের সামনে রাস্তায় অগণিত পুরুষের ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করলো জেনী এই জনতার মধ্যে একটিও নারী নেই। অথচ কেউ তারদিকে মুখ তুলে তাকালো না। তাকে না দেখেও শীর্ণ রোদেপোড়া কতকগুলো মুখ চোখ তুলে ধরলো জেনীর দিকে। তার মনে হল, এরা সবাই এক ছাঁচের। বাসের সহযাত্রী ফরাসী সৈনিকটি, অহংকারী আরব লোকটা। একই রকম কৌশলী আর গর্বিত মুখ তুলে ধরেছে তারা, তাকে না দেখেও। ক্লান্তিতে-ব্যথিত পায়ের ওপর ভর-দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে চলে গেল তারা। জেনীর বুকের ভেতর জেগে উঠল অতল অস্বচ্ছন্দতা। এই সমস্তর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে চাইলো সে।......কেন আমি এখানে......কেন......? কেন......? তারপর দেখল মার্সেল এগিয়ে আসছে তার দিকে।

নিশ্চল, স্বচ্ছ নীলিমায় ভরা আকাশের নীচে, অপরাহ্ণের শেষ প্রহরে, কেল্লার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে চলেছে তারা। সিঁড়ির মাঝখানে একটা আরব ডেকেছে তাদের ঘুরিয়ে দেখাবে কেল্লাটা। অথচ এর প্রয়োজন যে নেই তা যেন আগে থেকেই স্থির করে জেনে নিয়ে জেনী তেমনি ভাবেই চলতে লাগল, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এসে দাঁড়ালো তীক্ষ্ণ রসহীনতায় ভরা প্রশস্ত আলোকের স্তরে। শুষ্কতা আর বৈচিত্র্যে কম্পমান ধরণীর তরঙ্গ ভেসে এলো মরূদ্যান থেকে। চারিদিকে বাতাসের আন্দোলন তাদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে দীর্ঘায়ত হয়ে উঠলো। পদধ্বনির আঘাত আলোক স্ফটিকের বুক হতে অজস্র বৃত্তাকার শব্দ-তরঙ্গ জাগিয়ে তুলে ছড়িয়ে দিল সমস্ত পৃথিবীতে। ছাদের ওপর এসে, তালবনের পিছনে প্রসারিত দিকচক্রবালের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। জেনীর মনে হল যেন সমগ্র ক্রন্দন আলোড়িত করে বেজে উঠলো একটি সংক্ষিপ্ত সুচল আর্তনাদ। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি ভরে দিল সমস্ত প্রসরকে—ধীরে ধীরে। তারপর সহসা জীবনহীন হয়ে তার নীরবতার সম্মুখে ফেলে রেখে গেল এক অন্তহীন বিস্তৃতি।

তাকালো সে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি সুসম্পূর্ণ বক্র রেখার অনুসরণ করে। বাধা পেল না। তার নীচে আরব শহরের গা

ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা ঘরগুলির ছাদের ওপরে অজস্র লংকার লোহিত ঐশ্বর্য। কেউ কোথাও নেই। শুধু ওই ঘরগুলোর হৃদয় থেকে ভেসে এলো কফি ভেজে নেবার সুগন্ধ আর অবোধ্য উচ্চ পদধ্বনি। দূরে, মাটির দেয়াল দিয়ে বিস্তৃত অসমবাহু চতুর্ভুজের মধ্যে বিরাজমান তালবন। হাওয়ার কানাকানি সেই অরণ্যের শিখরে। আরো দূরে দিগন্ত বিস্তৃত ভূভাগের ওপর গৈরিক ধূসর প্রাণহীন পাথরের সাম্রাজ্য। মরূদ্যানের পশ্চিমে মজে-যাওয়া নদীর পাড় দিয়ে ঘেরা তালবন। অজস্র কালো তাঁবুর সারি সেখানে। সেই শিবিরের চারদিকে আপাত ক্ষুদ্রকায় উটের দল। ধূসর যবনিকার ওপরে বিচিত্র এক হিজিবিজির মত। সন্ধান করতে হবে এই সাংকেতিকতার কেন্দ্রে নিহিত গূঢ় অর্থের। ......মরুভূমির ঊর্ধ্বদেশে শুধু নিঃশব্দতা। প্রসরের মত বিশাল।

আলসের ওপর তার সমস্ত শরীর ভর দিয়ে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জেনী। তার সামনে আস্তে আস্তে যে শূন্যতা খুলে যাচ্ছে তা থেকে নিজেকে ছিন্ন করে সে নিতে পারেনি। নিজের এই অক্ষমতা নিয়ে জেনী দাঁড়িয়ে আছে। অথচ পাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে মার্সেল। ফিরে যেতে চায় সে। কী দেখবার আছে এখানে! তবুও দিগন্ত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারলো না জেনী। দূরে, দক্ষিণে যেখান আকাশ আর পৃথিবী এক শুভ্র রেখায় মিলেছে—সেই দূরে। তার মনে হল এমন কিছু প্রতীক্ষা করে আছে যার কথা সে জেনে নিত পারলো শুধু এই মুহূর্তে। গড়িয়ে-যাওয়া অপরাহ্ণের আলো শিথিল স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে। দানাদানা বাঁধা সূর্যের স্রোত তরল হয়ে উঠছে কেমন করে। আর সেই সঙ্গে, ঘটনাচক্রের আবর্তনে এইখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নারীর জীবনে সময় আর অভ্যাস আর ক্লান্তির জটিলতায় পাকানো জটের বন্ধন আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল। যাযাবরদের শিবিরের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল জেনী। কারা যে সেখানে থাকে এর আগে জেনী দেখেনি। সেই অন্ধকার শিবিরের অরণ্যে কোন আলোড়ন নেই। তবুও যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে অবহিত ছিল না, এক মুহূর্ত আগে—এখন তাদেরই চিন্তায় ভরে উঠলো তার মন। গৃহহীন বিশ্ব বন্ধনহীন এক মুঠো জীবনের উল্লাস ঘুরে চলেছে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বুকে। আরো দূরে, দৃষ্টির বাইরে, হাজার হাজার মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগেরও ওদিকে প্রথম তটিনীর জলধারায় সিক্ত অরণ্যমালার বুক পর্যন্ত ঘুরে চলেছে তারা। সময়ের উপক্রমণিকা থেকেই হাড় বেরুনো, শুকনো পৃথিবীর সীমাহীনতার মাঝখানে শুধু কয়েকটি মানুষ শ্রান্তিহীন যাত্রীর মত। জীবন তাদের অসচ্ছল তবুও এক বিচিত্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তারা। নিঃস্ব তবুও বশ্যতাহীন।

কেন যে এই চিন্তার স্রোত তার মনকে এক বিরাট স্বাদু বিষণ্ণতায় ভরে দিয়েছে, আর ঘুমে ভরে আসছে চোখ দুটো জেনী বুঝতে পারলো না। শুধু মনে হল, এই সাম্রাজ্যের শাশ্বত প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল সে: তবু এ আর তার হবে না—বুঝি কোনদিনই না......অথবা হয়তো তা সম্ভব এই গোধূলি মুহূর্তেই......। যখন সে আবার চোখ মেলল, দেখল, সহসা নিশ্চল আকাশের দিকে......কম্প্রহীন আলোক-তরঙ্গকে......। আর আরব শহরের কেন্দ্র-স্থল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা শব্দের সহসা বিরতিতে তার মনে হল, যেন অকস্মাৎ গতিহীন হয়ে গেল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড......; যেন এই মুহূর্তের পরে আর জরা নেই আর মৃত্যু নেই......যেন নির্ব্যক্তিময় হয়ে যাবে জীবন......সর্বদেশে......শুধু হয়তো তার হৃদয়ে নয় যেখানে একই সুরে তাল রেখে কেঁদে চলেছে কেউ বেদনায়......বিস্ময়ে...।

গতিশীল হয়ে উঠল আলোকতরঙ্গ। স্বচ্ছ উত্তাপহীন সূর্য নেমে গেল পশ্চিমের গহ্বরে। জেগে উঠলো গোলাপী জোয়ার সেখানে। পূর্বাচলে আকৃতি নিতে থাকা ধূসর তরঙ্গ প্রান্তরের ওপর দিয়ে ভেসে চলার আয়োজনে মগ্ন হল। রাত্রির প্রথম কুকুর ডেকে উঠল। দূর থেকে ভেসে আসা তার ডাক মাথা তুলে দাঁড়ালো শীতের বাতাসে।

তার শরীর শীতে কে'পে কে'পে উঠছে বুঝতে পারলো জেনী। তোমার বোকামির জন্য ঠান্ডা লেগে মরতে হবে, ভৎর্সনা করে উঠলো মার্সেল। এক ভয়ংকর আর আকস্মিক ক্লান্তিতে নুয়ে, নিজের শরীরের ক্রম-দুঃসহ গুরুভারকে টেনে হি'চড়ে নিরুত্তেজ হয়ে চলে এলো জেনী যেন আর এক জগতে, যেখানে তার মনে হচ্ছিল কেন সে এতো লম্বা আর মোটা? কেন এতো বেশী সাদা তার গায়ের চামড়া? সেই পৃথিবীর ওপর দিয়ে নীরবে হাঁটতে পারবে শুধু একটি শিশু......সেই কিশোরীটি...... শুকনো সেই লোকটা আর প্রচ্ছন্ন শৃগাল। ......কি করবে সে এর পর......। নিজেকে ঘুমের পথে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীইবা করতে পারবে সে......।

নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে এলো জেনী হোটেলের মধ্যে, নিজের ঘরে। শীতে আর ক্লান্তিতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে মার্সেল। জেনীর মনে হল তার বুঝি জ্বর হয়েছে। বিছানায় এলো সে। আর্তনাদ করে উঠছে পালংকটা। মার্সেল কখন যেন আলো বন্ধ করে এসে শুয়েছে। হয়তো সে ঘুমচ্ছে। তাকেও ঘুমোতে হবে। জানালার ফাঁক দিয়ে শহরের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। ধীরে বহমান জনস্রোতের স্বর ভর করে এগিয়ে আসছে পুরোনো বিচিত্র গানের সুর। তাকে ঘুমোতেই হবে। তবুও গুনে চলেছে সে অজস্র কালো তাঁবু। তার চোখের যবনিকায় তৃণ আহরণ করে চলেছে উটের দল; বিরাট একাকিত্ব কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে তার অন্তস্তলে। কেন এসেছি আমি এখানে......? কেন......? আর এই প্রশ্নের খেই ধরে কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো জেনী।

একটু পরে তার ঘুম ভেঙে গেল। চরম নিস্তব্ধতা তার চারিদিকে। শুধু শব্দহীন রাত্রির বুক বিদ্ধ করে জেগে উঠছে কুকুরের কর্কশ আর্তনাদ শহরের সীমান্তের দিকে। শীতে কে'পে উঠলো জেনী। ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এলো স্বামীর কাছে উষ্ণতার সন্ধানে। ঘুমের ফিকে আচ্ছন্নতায় ভেসে চলল সে। ডুবে গেল না। মার্সেল-এর শরীরকে নিরাপদ বন্দর মনে করে তাকে আঁকড়ে শুয়ে থাকল জেনী। কথা বলে চলল, কিন্তু শব্দতরঙ্গ ভেসে এলো না তার মুখ থেকে। কথা বলে চলল সেঃ বুঝতে পারলো না কি বলছে। শুধু জেনে নিল স্বামীর উত্তাপকে। শুধু এইটুকুই......বিশ বছর ধরে শুধু এই টুকুই......। সন্তানহীন সঙ্গীহীন জীবন কেটে গেছে তার শুধু এইটুকু জেনে; যে তারও প্রয়োজন আছে। হয়তো মার্সেল তাকে ভালোবাসে না। হয়তো ঘৃণায় জড়ানো ভালোবাসার রূপ এমন গম্ভীর নয়......যেমন তার মুখটা......। কেমন তার মুখটা......? অন্ধকারে ভালোবেসে এসেছে, শুধু একে অপরকে অনুভব করে......। আছে আরো কোন ভালোবাসা এই অন্ধকারের প্রেম ছাড়া ......। তবুও মার্সেলের কাছে তার প্রয়োজনকে প্রয়োজনীয় জেনে আর শুধু এই জানা নিয়েই বে'চে এসেছে সে। কত-দিন আর রাত......প্রতিটি রাতে......যখন ওই মানুষটা বড়ো হয়ে যেতে অথবা মরতে চায় না......আর তার মুখে জেগে ওঠে সেই অভিব্যক্তি, (যা কখনো কখনো দেখেছে অন্য লোকের মুখে......) যা দেখে তার মনে হয়েছে এই অভিব্যক্তি হল সেই সমস্ত উন্মাদের যারা জ্ঞানের মুখোশের নীচে লুকিয়ে থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ না এক উন্মত্ততা তাদের গ্রাস করছে। তারপর তারা ছু'ড়ে ফেলে দেয় নিজেদের কোনও এক নারীর শরীরের দিকে। সেখানে ওরা ওদের কামনাহীন জীবনের সেই সব ভয়াবহতা খবর দিতে পারে, যে ভয়াবহতার রূপ রাত্রি আর শূন্যতা তাদের চোখের সামনে নগ্ন করে তুলে ধরে। জেনীর মনে হল, মার্সেল সরে যেতে চাইছে তার স্পর্শের জাল থেকে। সে তাকে ভালোবাসে না। শুধু ভয় করে সে ততটুকু যতটুকু জেনী নয়। হয়তো আলাদা হওয়া উচিত ছিল আগেই। কিন্তু সঙ্গীহীন রাত কাটাতে পারে কে? হয়তো শুধু কয়েকজন......প্রবাসী আর হতভাগ্য মানুষের দল......যারা প্রতিরাত্রে মৃত্যুর সঙ্গে শয্যাবিলাস করে......। মনে মনে অনেকবার ডাকল জেনী তার স্বামীর প্রিয় নাম ধরে মনে হল, যেন ফু'পিয়ে উঠছে মার্সেল। বারবার ডাকলো জেনী। সেও তো চায় তার স্বামীকে। তার শক্তিকে, খামখেয়ালীপনাকে। আর মৃত্যুকেও তার ভয়......(যদি এই ভীতি জয় করতে পারে, হয়তো সুখী হতে পারবো......) না-না-না। সরে এল জেনী তার স্বামীর কাছ থেকে। কিছুই জয় করা হয়ে উঠবে না......কোন সুখ কোনদিনই আসবে না, মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করবার আগেই মরে যেতে হবে তাকে। জেনী আবিষ্কার করলো, কুড়ি বছর ধরে টেনে নিয়ে চলা এক বোঝার নীচে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম চলছে আজ। যে যা চাক্-না-চাক্, তার মুক্তি চাই।

উঠে বসলো জেনী। শুনতে পেল, অদূরে কিসের আহ্বান। অথচ রাত্রির সীমান্ত থেকে ভেসে এলো মরুদ্যানের শ্রান্ত

অপরাজিত কুকুরের ডাক। ঘুম ভেঙেগ ওঠা মৃদু হাওয়ায় শুনতে পেল সে তাল-বনের বাতাসে ভেসে ভেসে উঠেছে নম্র জলস্রোত। ভেসে এসেছে এই বাতাস দক্ষিণ থেকে, যেখানে অপরিবর্তিত আকাশের নীচে মরুভূমি আর রাত্রির বিবাহ বাসর......জীবন গতিহীন হয়ে গেছে যেখানে......যেখানে নেই জরামৃত্যুর অভিজ্ঞতা।......কখন যেন শুকিয়ে গেল হাওয়ার জলস্রোত। নিশ্চয় করে জানতে পারলো না জেনী সত্যিই কী সে কিছু শুনেছিল মূক আহ্বান ছাড়া......। যার ডাকে সে সাড়া দিতে পারতো অথবা স্তব্ধতায় ভরে দিতে পারতো যাকে......। মনে হল যদি আজই এর ডাকে সাড়া না দিই তবে কোনদিনই হয়তো এর মর্ম জানা হয়ে উঠবে না।......এখনই সাড়া দিতে হবে ......এখনই......আর কোন সন্দেহ নেই এতে.........

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেনী। দ্বিধা দ্বন্দ্বের নিস্তব্ধতায় মগন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর রাত্রির বুকে পা বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

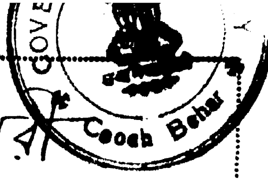
তালবন আর ঘরবাড়ির মাথায় জড়ানো রয়েছে কালো আকাশের বুক দিয়ে বোনা অজস্র তারকার মালা। জনহীন পথের ওপর দ্রুতপদে ছুটে চলেছে জেনী। সূর্যের সঙ্গে সংগ্রাম শেষ করে, এখন রাত্রির বুককে আক্রমণ করেছে হিমহাওয়া। তুষারতীক্ষ্ম বাতাসে যেন জ্বলে উঠছে জেনীর ফুসফুস। এগিয়ে চলল ও কেল্লার দিকে। রাস্তার মাথায় আলোর ঝলকানি আর আলখাল্লার পাখার ঝাপট। তিনটে লাল আলো তার পেছনে মুখ উঁচু করে আবার ডুবে গেল। আপ্রাণ চেষ্টায়, হাঁপাতে হাঁপাতে, শীতে কেঁপে কেঁপে ছাদের ওপর এসে দাঁড়ালো জেনী। তারপর রাত্রির বিরাট বিস্তারের বুকে চোখ খুলে গেল তার।

জেনীকে নীরবতাকে আহত করলো না কিছুই—না নিশ্বাসপ্রশ্বাস না অন্য কোন শব্দ; শুধু হিমের নীরব আঘাতের ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে জেগে উঠে কখন যেন বালির কণায় রূপান্তরিত হয়ে গেল পাথরের রাশি। একটু পরে মনে হল তার আকাশ আবর্তন করে চলেছে ধীর গতিতে। রুক্ষ শীতরাত্রের অসীমিত কন্দরে জেগে উঠছে শত সহস্র নক্ষত্রমালা, ক্রমাগতই। নক্ষত্র-পুঞ্জের জ্যোতিষ্মান তুহীন লতারা মুক্তি পেয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তের অভিযাত্রী হয়েছে। তার চিন্তাকে সিক্ত করে দিল কম্প্রমান আলোকধারা। মনে হল, সেও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে এই গতির সংগে সংগতি রেখে। এই মৃদুগতি যেন তার হৃদয়ের সংকেত......তার হৃদয়ে......যেখানে হিমহাওয়া আর কামনার মাঝখানে চলেছে এক প্রতিযোগিতা। তার সামনে একটি একটি করে নক্ষত্র ঝরে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মরুভূমির পাথরের সমুদ্রে, আর এই ঝরে ঝরে পড়া নক্ষত্রের আলোয় এক একটি করে পাপড়ি মেলে ধরছে সে। সজোরে শ্বাস টেনে নিল জেনী; ভুলে গেল শীতের কথা, অপরের দুঃসহ ভার আর জীবনের অসারতা আর উন্মত্ততার কথা। এতদিন ধরে ভয়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে সে লক্ষ্যহীন উন্মত্ততায়, আজ তার অবসান হল। সংগে সংগে যেন খুঁজে পেল সে মূলের সন্ধান। তার স্পন্দন-হীন দেহলতায় আলোড়িত হয়ে উঠলো সূর্যমুখীন উদ্ভিদ-রস। আলসের ওপর পেট চেপে রেখে চলমান ক্রন্দসীর চোখে চোখ মেলালো সে, অশান্ত পাখার শব্দে মোড়া তার হৃদয়ে কবে নেমে আসবে শান্তি, কবে হবে নিবিড় নিস্তব্ধতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা—সেই প্রতীক্ষায়। আকাশগংগার শেষ নক্ষত্র-গুলি তাদের পাপড়ি ফেলে ফেলে দিয়ে গেল মরু-দিগন্তের নিম্নস্তরে। তারপর ভেসে এলো প্রশান্তির বন্যা। নিশীথ নীর আর্দ্র করে দিল এই নারীটিকে এক অসহনীয় কোমলতায়। ম্লান হয়ে গেল তার হিমানুভূতি। তার অস্তিত্বের প্রচ্ছন্ন কেন্দ্র থেকে জেগে উঠে, তরংগের পর তরংগে তাকে ভাসিয়ে ভরিয়ে দিল এই রাত্রির জল তার সত্তাকে, এক কাতর বিলাপে। পরমুহূর্তে সমগ্র আকাশ উত্তাপহীন পৃথিবীর বুকে শুয়ে থাকা এই মেয়েটির ওপরে পরিব্যাপ্ত হয়ে দাঁড়াল।

ঘরে ফিরে এসে দেখল জেনী তার স্বামী তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। বিছানায় ঢুকছে সে, যেন ফুঁপিয়ে উঠলো মার্সেল; উঠে বসলো। কত কিছু সে বলতে লাগল, জেনী কিছুই বুঝলো না। উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ঝলসানো আলো জ্বেলে দিল মার্সেল। ঘরের কোণে গিয়ে বোতল থেকে খানিকটা সোডা চুমুক দিয়ে নিল। তারপর বিছানার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার আগে তাকিয়ে থাকল জেনীর দিকে—অবুঝের মত। কাঁদছে জেনী ...নিজেকে আর যেন সামলাতে না পেরে অজস্র কান্নায় ভরে উঠেছে সে......আর বলছে......কিছুই নয়, এ কিছুই নয়......।

অনুবাদক : সুধীন্দ্র মজুমদার

ALBERT CAMUS-র The Adulterous Woman গল্পের অনুবাদ




# বেলোয়ারী

## প্রবোধকুমার সান্যাল

—২০—

**প্রাসাদের** অন্দরমহলে ঢোকবার পথে দুখানা বহুমূল্যে মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে। দুখানা গাড়ির সামনে চকচকে পোশাকপরা দুজন ড্রাইভার এবং দুজন বন্দুকধারী সেপাই অপেক্ষা করছে। দূর থেকে এগিয়ে এলেন ডাক্তার সামন্ত—সুসজ্জিত সাহেবী পোশাকে। বড় দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল রংবেরংয়ের ঘাঘরা-পরা একটি নেপালী যুবতী। কানে তার দুল, হাতে মোটা সোনার বালা, গলায় সোনার হাঁসুলী এবং পায়ে নতুন নাগরা। এটি মিসেস চৌধুরীর নিজস্ব পরিচারিকা। ডাক্তারকে দেখে মেয়েটি হাসিমুখে নমস্কার করল। সেপাই ও ড্রাইভাররা কুর্নিশ জানাল।

অদূরবর্তী প্রকাণ্ড ফোয়ারা থেকে একটি যন্ত্রযোগে জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে বিকীরিত হচ্ছে। তারই কাছাকাছি দুটি দুগ্ধ-শুভ্র ময়ূর-ময়ূরী ঘোরাফেরা করছিল। রাত্রে এই ফোয়ারার ভিতরে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে বিচিত্র রামধনুর সৃষ্টি করা হয়।

ওখান থেকে চোখ সরালে দেখা যায়, কিছুদূরে কালপাথরের এক বৃহৎ এথিনিয় পুরুষমূর্তি—তার কোলের কাছে একটি নগ্ন শিশু-বালক—তার পিঠের দিকে পাখীর মতো দুটি পাখা। এই মূর্তির নীচের দিকটা হল কবুতরখানা। পাড়ের ভিতরে বাঁধা ক্ষুদ্র দুটি জলাশয় এবং তাদেরকে ঘিরে রয়েছে শানবাঁধান সমতল,—বহু পায়রা এসে সেখানে দানা খুটছে। নির্জন ও বিশাল প্রাসাদপুরীর বাইরের দিকে এসে দাঁড়ালে তবে এইসব প্রাণী-সমাজের দিকে চোখ পড়ে,—কিছু জীবন-চাঞ্চল্য দেখা যায়।

বেলা অপরাহ্নের শেষ দিক, আকাশের একটা অংশ কালো মেঘে ছেয়ে আসছে। ডাক্তার সামন্ত একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর এগিয়ে গেলেন প্রবেশ-পথের দিকে এবং সেখানে টেলিফোনের যন্ত্র তুলে ডাকলেন। তিনতলায় আম্মল-বাই ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল। নীচের থেকে ডাক্তার বললেন, অরুণা মেমসাব আর ছোটকুমারীকে শিগগির ডাকো। আম্মল টেলিফোনটি রেখে দৌড়ে গেল একটি কক্ষে, পর্দার বাইরে থেকে সাড়া দিল এবং তখনই বেরিয়ে এল সুব্রত সুন্দর সুসজ্জিত বাঙালীর পোশাকে। বাহান্ন ইঞ্চি কোঁচানো কাঁচি ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মর্মর মেঝের উপর, মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ গরদের পাঞ্জাবী চুড়িবোতাম লাগান, হীরের বোতামের ছড়া বুকে। হাতের আংটিগুলো আর পায়ে গ্রীসিয়ান স্লিপার ঝলমল করছে। কক্ষ থেকে বেরিয়ে সুব্রত বললে, খবর দাও এখনি নামছি—তখনই ছুটে চলে গেল আম্মলবাই।

সুব্রত আবার এল ভিতরে। চন্দ্রালোকিত সজ্জাকক্ষ, চারটি দেওয়ালের নীচে চারখানা সুবৃহৎ আপাদমস্তক মুকুর—সেখানে কথায় কথায় প্রতিফলিত হচ্ছে ইন্দ্রসভার রঙ্গমঞ্চ। সজ্জা এখনও সুব্রতর মনঃপূত হয়নি। হীরকের কুণ্ডল আর কণককেয়ূর কই? বৈদুর্যমণির মালা নৈলে চলবে কেন? হীরক-কঙ্কণের মিহিধ্বনি যদি হাতনাড়ার মধ্যে না শোনা যায়, কবিতায় সুর পৌঁছবে কেমন করে? সোনার কলস দুটির উপর মণিমুক্তালহরীর সঙ্গে রক্তপ্রবালের চিহ্ন যদি না পড়ে, তবে সন্ধ্যার আলোকিত কলকাতার হৃৎকম্প হবে কেমন করে? আঁখিপল্লবের নীচে সূক্ষ্ম মেঘকজ্জলতা না থাকলে কেমন করে মোহমদির হবে এই প্রথম শরৎ-রাত্রি? ললিত অধরে রক্তরাগ না থাকলে কবির প্রাণমূলে থর থর কম্পন কেমন করে জাগবে?—সুব্রত আনন্দিত চক্ষে তাকাল সেই বৃহৎ মুকুরে প্রতিফলিত দেহবল্লরীর দিকে। অম্বরের মিহিজালের উপর সোনার ফুলগুলি যেন সন্ধ্যার তারকা-খচিত আকাশের প্রতীক। শিথিল কবরীর সঙ্গে শুভ্র যূথিমাল্যের বন্ধন যদি না থাকে,—পথচারী পুরুষের গলায় মৃত্যুর ফাঁস জড়িয়ে যাবে কেমন করে?

সুব্রত সেই মালা বেঁধে দিল নিজের হাতে।

নীচে অধীর আগ্রহে ডাক্তার সামন্ত অপেক্ষা করছিলেন। বার বার তাকাচ্ছিলেন হাতঘড়ির দিকে। মোটরে উঠে বসেছেন সুন্দরী ও সুবেশা বধূরাণী হৈমবতী—সামনে উঠে বসেছে নেপালী আয়া হাসি-মুখে। তার বাঁদিকে বসেছে বন্দুকধারী সেপাই, ডানপাশে রাজবাড়ির সজ্জায় সুর মিলিয়ে ড্রাইভার। এমন সময় হাসিমুখে নেমে এল সুব্রত এবং অপরূপ সজ্জা-লাবণ্যে শ্রীমতী অরুণা। সুব্রত একবার সগৌরবে তাকাল অরুণার দিকে এবং দরজার বাইরে পা বাড়াবার ঠিক আগে নির্জন একটি

কোণের পাশে থমকে দাঁড়িয়ে সে হেঁট হয়ে একহাত বাড়িয়ে অরুণার পা স্পর্শ করল—সেই পায়ে সাচ্চা-জরির কাজ করা হরিৎ-বর্ণের নাগরা।

অরুণা একবার ঈষৎ বিস্ময়ে তাকাল সুব্রতর দিকে। সুব্রত হাসিমুখে বললে, সৌন্দর্যের সকল পুজো আমার ওইখানে, মহাশ্বেতা।

বাইরে এসে অরুণা গিয়ে উঠল হৈমবতীর গাড়িতে এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসে বললে, কি সুন্দর আপনাকে মানিয়েছে দিদি?

হৈমবতী হাসিমুখে বললেন, ডাক্তারের শাসনে আমাকে এই বুড়ো বয়সে সাজসজ্জা করতে হল। কিন্তু দেখেছ ভাই, সুব্রতর হাত কি পাকা! চমৎকার করে তোমাকে সাজিয়েছে। এই রূপকে তুমি আমাদের কাছে চেপে রাখতে চাও, অরুণা?

অরুণা অতিশয় কুণ্ঠিত ও জড়োসড়ো হয়ে বললে, দিদি, আমি নিরুপায়। সুব্রত একেবারেই নাবালক। পাছে ওর কিছু হয়, এই ভয়ে ওর আবদার মেনে নিই।

দ্বিতীয় গাড়িখানায় উঠে বসল সুব্রত, এবং ডাক্তার উঠে গিয়ে তার পাশে বসলেন। সামনে বসেছে তিনজন। সুব্রতর নিজস্ব চাপরাসী, সশস্ত্র সেপাই এবং ড্রাইভার। ডাক্তার মুখ বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন। মেয়েদের গাড়ি আগে চলল, পিছনে পিছনে সুব্রতর গাড়ি।

পথটা ঘুরেছে। বাগান পেরিয়ে, দ্বিতীয় একখানা অট্টালিকার তলা দিয়ে সেই পথ চলে গেছে। তারপর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে গিয়ে মোটর দুখানা বেরিয়ে এল সিংহ-দরজার ভিতর দিয়ে। অরুণা একটু উৎসুক হয়ে এই সুবৃহৎ বাগানবাড়ির নক্সাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করল, কিন্তু গাড়ির দ্রুতগতির জন্য সবটাই গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল। কেবল তার চোখে পড়ল, ফটক পার হবার ঠিক আগে দুটো প্রকাণ্ড আলসেশিয়ান্ কুকুর তাদের গাড়ি দুখানাকে লক্ষ্য করে পা তুলে বোধ করি সমাদর জানাল। অরুণার ভয় হল ওদের দেখে।

বিস্তৃত নির্জন পথ দিয়ে গাড়ি দুখানা দ্রুতগতিতে ছুটল। সন্ধ্যার আলো সবে-মাত্র জ্বলেছে। ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার,—অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। একটা পুল ধরে গাড়ি উপর দিকে উঠল, তারপর পুল ছাড়িয়ে অনেকটা পথ নীচের দিকে গিয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক জনসমাগমের মধ্যে গাড়ি এসে পৌঁছে গতি তার শ্লথ হল। অরুণার মুখ-চোখের উপর থেকে যেন ধীরে ধীরে এবার মলিন মেঘচ্ছায়াটা সরে যাচ্ছিল। এবার তার চোখে পড়ছে জীবন্ত চলন্ত মানুষ। অন্ধকার জগতের কোথাও যেন এতকাল সে নির্বাসনে ছিল। সে কতকাল মনে নেই। হয়ত এক যুগ, হয়ত বা সেটা গত-জন্ম। ঘনতমসা থেকে সে যেন এল জ্যোতির্লোকে। সামনে তার হাসি-কান্না-ভরা সেই প্রাচীন পৃথিবী—যেটি কর্মময়, প্রাণময় ও জীবন-চাঞ্চল্যে ভরা। মৃত্যুর মুখগহ্বর থেকে সে বেরিয়ে এল জীবনের পথে। কিন্তু আবার তাকে ফিরতে হবে ওই মৃত্যুরই মধ্যে, ওই অন্ধকার নির্বাসনে, ওই জনপ্রাণীশূন্য প্রাসাদের কারাগারে,—ওই ভয়াবহ রাজসম্পদের চক্রান্তের মধ্যে। সুতরাং এই মুক্তি তার ক্ষণস্থায়ী। পথের দিকে বারম্বার তাকাচ্ছিল অরুণা। চোখ দুটো তার খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটিমাত্র চেনা মুখের সন্ধানে। সমস্ত অচেনার মধ্যে একান্তভাবে যে চেনা! অনাদরে আর উপেক্ষায় যে মুখখানা হয়ত চিরদিনের জন্য জনতার বৃহদারণ্যে হারিয়ে গেল!

মাঠের ভিতর দিয়ে হু হু শব্দে মোটর দুখানা চলেছে। গাড়িতে শব্দ নেই, ঝাঁকুনি নেই,—মধুর স্নিগ্ধ হাওয়া লাগছে মুখে-চোখে। এ যেন শূন্যে ভেসে যাওয়া, যেন তলিয়ে যাওয়া অতল পাথারে, যেন হারিয়ে যাওয়া জন্মান্তরের অন্ধকারে। অরুণা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

অল্পকাল মাত্র। হয়ত বা আধ ঘণ্টাও নয়। দেখতে দেখতে দুখানা মোটর এসে ডানদিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে এক জায়গায় থামল—এইটি নাকি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ধার। দুজন তকমা আঁটা সেপাই এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। সবটাই যেন যন্ত্রবৎ। গাড়ি থেকে আগে নামল দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী, তারপরে নেপালী আয়া,

তার সংগে চাপরাসী। ডাক্তারের সংগে নেমে এল সুব্রত। তারপর নামলেন হৈমবতী এবং তাঁর সংগে অরুণা। মেয়েরা এবার চলল পিছনে পিছনে। ভিতরে গিয়ে কার্ড দেখালেন ডাক্তার এবং তখনই একজন লোক এগিয়ে এসে তাঁদেরকে সংগে নিয়ে লিফটের দিকে নিয়ে গেল। আয়া-সমেত পাঁচজনে গিয়ে লিফটের ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকল। একটা বোতাম টিপতেই ঘরখানা উপর দিকে উঠতে লাগল। টাল খেয়ে গেল অরুণা। আবার থামল, আবার সে টাল খেল। বোঝা গেল না এটা দোতলা কিংবা তিনতলা। এ যেন এক নতুন জগৎ। এখানে ওখানে সাহেব-সুবো। মেমসাহেবরা পুরুষের সংগে আনাগোনা করছে হাত ধরে জড়িয়ে। নানা অলিগলি গেছে নানা দিকে।

পথ দেখিয়ে আনল একটি লোক। মস্ত এক হল-এর সামনে ওরা এগিয়ে চলল। সেই হল-এর দেওয়ালে লাল শালুর ওপর বড় বড় বাঙলা অক্ষরের লেখাটা দূরের থেকে পড়া যায়ঃ স্বাগতম্।

নেপালী আয়াকে বাইরে বসিয়ে রাখা হল। হল-এর মধ্যে প্রবেশ করল সর্বাগ্রে সুব্রত, তার পিছনে হৈমবতী ও অরুণা, সকলের পিছনে ডাক্তার সামন্ত। ভিতরে মস্ত বড় এক জনসভার অধিবেশন বসেছিল, কিন্তু তার চেহারাটা ভিন্ন রকমের। জনসভা অথবা জলযোগের আসর বলা কঠিন। বহু নরনারীর সমাগম হয়েছে। সুব্রতর দলটিকে দেখে কে একজন লাউড-স্পীকারে চাপা কণ্ঠে ঘোষণা করল, বিজয়নগরের কুমার সুব্রত চৌধুরী! তৎক্ষণাৎ একটা গুঞ্জন ও চাপা কলকণ্ঠ শুরু হয়ে গেল। জন দুই ভদ্রলোক করযোড়ে এগিয়ে এসে আনত বিনয়ে সুব্রতর দলকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, আপনাদের উপস্থিতিতে আজকের সম্বর্ধনা-সভা ধন্য হয়েছে। আসতে আজ্ঞা হোক। এবার যদি অনুমতি করেন, তবে কাজ আরম্ভ হতে পারে।

সুব্রত স্মিতমুখে সম্মতি জানাল। ওরই মধ্যে বোধ করি বক্তৃতা দেবার জন্য কক্ষটির প্রান্তে একটি ছোটখাট মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। তারই প্রায় কাছাকাছি কয়েকটি মখমলের গদি-আঁটা চেয়ারে ও'রা চারজনে গিয়ে বসলেন। মাঝখানে বসলেন হৈমবতী আর অরুণা। অরুণার পাশে সুব্রত, হৈমবতীর পাশে ডাক্তার। লাউড্-স্পীকারে ঘোষণা করা হল, আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি, এই সম্বর্ধনা-সভায় কুমার সুব্রতনারায়ণ চৌধুরীর সংগে অনুগ্রহ করে এসেছেন বধূরাণী হৈমবতী দেবী, কাব্য-ভারতী শ্রীযুক্তা অরুণাকণা শাস্ত্রী এবং কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বৈশ্বানর সামন্ত। তাঁরা আজ আমাদের প্রধান অতিথি। তাঁদের অনুমতিক্রমে আজকের মংগলাচরণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে।

এতক্ষণ অবধি জলযোগের নানাবিধ উপকরণগুলি ওয়েটাররা পরিবেষণ করছিল। এবার তারা একপাশে সরে দাঁড়াল। এবার লাউড্-স্পীকারে পুনরায় চাপাকণ্ঠে বলা হল, প্রথমে মংগলাচরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ!

অরুণা তাকিয়ে দেখল, বিশু ভট্টাচার্য মশায় জনতার ভিতর থেকে এগিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করলেন। অতঃপর চোখে একটি চশমা দিয়ে তিনি যখন অতি সুন্দর উচ্চারণসহকারে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন, তখন পুনরায় ঘোষণা করা হলঃ আজ যাঁর জন্য এই সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছে, সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় কিষাণ সঙ্ঘ দলের প্রতিষ্ঠাতা লোকসেবক শ্রীযুক্ত নরেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে মঞ্চের উপরে সাদর আহ্বান জানাই।

মাথায়, কপালে ও হাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নরেশচন্দ্র মঞ্চের দিকে যখন অগ্রসর হলেন, চারিদিক থেকে তখন করতালিধ্বনি উঠল। সেই ফাঁকে সুব্রত চুপি চুপি অরুণার কানে কানে সগৌরবে বললে, তুমি জান অরুণা, নরেশবাবু ডাক্তার সামন্তর বিশেষ বন্ধু। আমাকেও নরেশবাবু চেনেন! চাষী-মজুরের জন্যে ও'র মতো স্বার্থত্যাগ আর কেউ করেনি। দেশের এত বড় বন্ধু এযুগে আর কেউ নেই।

অরুণা চুপ করে চেয়ে রইল নরেশচন্দ্রের দিকে।

নরেশচন্দ্র মঞ্চের উপর উঠে আচার্যদেবের পদধূলি নিয়ে পাশের চেয়ারে বসলেন। তখন পুনরায় ঘোষণা করা হলঃ বন্ধুগণ, একটি শোচনীয় ঘটনার কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করি। সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচনে নরেশচন্দ্রের অবশ্যম্ভাবী সাফল্য লাভ ঘটবে, হৃদয়ংগম করে প্রতিপক্ষ দল তাঁদের ভাড়াটে গুণ্ডাদল লাগিয়ে একদিন অতর্কিতে কিষাণ সংঘের কার্যালয়ে হানা দিয়ে নরেশচন্দ্রকে আক্রমণ করেন। আহত অবস্থায় নরেশচন্দ্রকে মাসাধিককাল হাসপাতালে থাকতে হয়। তাঁকে দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন, তিনি আজও নিরাময় হননি!

চারিদিক থেকে 'শেম শেম' ধ্বনি শোনা গেল।

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন নরেশচন্দ্র

ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা, জনকল্যাণের আদর্শ, তাঁর নির্ভীক চিন্তাধারা, দেশহিতৈষণা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি কিষাণ-মজদুরের কল্যাণের জন্য তাঁর সেবাপরায়ণতা—তাঁকে দেশের হৃদয়মন্দিরে গৌরবের আসন দান করেছে। তাঁর এই জয়লাভে বিশেষ করে চাষী ও মজুর সম্প্রদায় গৌরবান্বিত হয়েছে। আজ আপনাদের সকলের সম্মতি-ক্রমে নরেশচন্দ্রকে 'শ্রমিক-বন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হচ্ছে।

মঙ্গলাচরণের মন্ত্রপাঠ অতঃপর সমাপ্ত করে একটি পাত্র থেকে ধান-দূর্বা-চন্দন নিয়ে নরেশচন্দ্রের মাথার ব্যাণ্ডেজের ওপর ছুঁইয়ে আচার্য তাঁকে সংস্কৃত মন্ত্রে আশীর্বাদ করলেন।

অতঃপর ঘোষণায় আবার শোনা গেলঃ বন্ধুগণ একটি কথা নিবেদন করি। নরেশ-চন্দ্রের সাফল্যলাভের সংবাদে দেশের জন-সাধারণ বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিদিন শত শত চিঠিপত্র, তারবার্তা, অভিনন্দন ও আশীর্বাদ এসে পৌঁছচ্ছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলি এখানে উপস্থাপিত করা গেল না। কিন্তু দেশের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি, তাঁদের নিকট থেকে আমরা নরেশচন্দ্রের প্রতি উচ্ছ্বসিত অগণিত মানপত্র পেয়েছি, তাদের ভিতর থেকে মাত্র কয়েক-খানি পাঠ করে আপনাদের আনন্দবর্ধন করা হবে। প্রথমেই বাঙলার ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তরুণ নেতা শ্রীযুক্ত রণেন মুখোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করবেন।

একটি ছিপছিপে যুবক সবিনয়ে এগিয়ে এসে একখানি ছাপা কাগজ পড়তে আরম্ভ করে দিল। ওতে নরেশচন্দ্রের আগাগোড়া প্রশস্তি। হেঁট হয়ে সুব্রতর দিকে গলাটা একটু বাড়িয়ে সামন্ত চুপি চুপি সহাস্যে বললেন, এটি হল নরেশের ভাগ্নে। এবারেও আই-এ ফেল করেছে!

সুব্রত মুগ্ধচক্ষে চেয়ে আগাগোড়া শুনছিল। কথাটা কেবল অরুণাই শুনল। সিধুদা সম্ভবত এই ছেলেটির কথাই এক-দিন বলেছিল।

মানপত্রখানি কিছু দীর্ঘ, পড়তে সময় লাগল। যাই হোক, পরবর্তী ঘোষণায় শোনা গেলঃ এর পর পাঠ করবেন উৎকল প্রদেশের অবিসম্বাদী শ্রমিক-নেতা শ্রীশ্রীঠাকুর দয়াল মহাপাত্র মহাশয়।

পিছন থেকে দেখতে দেখতে দয়াল ঠাকুর একখানা কাগজ হাতে নিয়ে মঞ্চের কাছে এগিয়ে এল এবং ধুতি-চাদর সামলিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়াল। তারপর সহসা মুখ থেকে পানের গুটুলি বার করে মেঝের কার্পেটের উপর ফেলে অবিমিশ্র ওড়িয়া ভাষায় মানপত্র পাঠ শুরু করল। সেই পাঠ শেষ হবার পর সেই সুবৃহৎ কক্ষ হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হল।

এবার ঘোষণা করা হল, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, দানবীর ও কর্মবীর শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ মহাশয় তাঁর অভিনন্দন-বাণী পাঠ করবেন। বলতে বলতেই দাশরথি ঘোষ এগিয়ে এসে নরেশচন্দ্রের পাশে দাঁড়ালেন এবং সর্বাগ্রে দু-একটি মিষ্টকথা বলে তাঁর সংক্ষিপ্ত মানপত্রটি পাঠ করে গেলেন।

মঞ্চের উপরে শান্ত স্তব্ধ মূর্তিতে বিশু ভট্টাচার্য মহাশয় বসেছিলেন। অরুণার মনে হল এক আধবার তিনি এদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। নরেশচন্দ্রের মাথায় ও কপালে ফেট্টি বাঁধা, সেজন্য একটিমাত্র চক্ষু তাঁর খোলা ছিল। সেই চক্ষুটি দিয়ে তিনি বার কয়েক নিস্পৃহভাবে কাব্যভারতী শ্রীযুক্তা অরুণাকণা শাস্ত্রীকে নিরীক্ষণ করে ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়েছেন এবং অলক্ষ্যে তাঁর অক্ষত বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে টেবলের উপরকার ফুলদানিটি এমনভাবে ইঞ্চি দুই সরিয়ে রেখেছেন, যাতে অরুণার অপলক দৃষ্টি তাঁর উপর আর না পড়ে। এবার হৈমবতী অরুণার দিকে ফিরে একটু হাসলেন। বললেন, সবাই মিলে একটা লোকের সুখ্যাতি করলে তার চেহারা খুব কাহিল হয়, না অরুণা? দেখেছ, আমাদের ঠাকুরমশাই একেবারে ঋষির মতন বসে আছেন।

এর পর ঘোষণা করা হল, এবার নব-নগরের জমিদার বর্তমানে ভবানীপুরে নিবাসী রাজা দীপনারায়ণের সুযোগ্য পুত্র কুমার নির্মল রায় তাঁর বাণী পাঠ করবেন।

পিছনের থেকে একটি ছোট টেবলের আসর ছেড়ে নির্মল রায় সামনে এসে দাঁড়ালেন, হাতে তাঁর ছোট একটি কাগজ। প্রথমে তিনি একটা হাই তুললেন, পরে ঈষৎ কর্কশ কণ্ঠেই পড়তে লাগলেন।

অরুণা যখন দয়ালের ঘরে থাকত, সেই সময় কোন এক রাত্রে এই ব্যক্তি গলির মুখে মোটর থামিয়ে মদমত্ত অবস্থায় অরুণার ঘরে ঢোকেন এবং তরপর তিরস্কৃত হয়ে বেরিয়ে আসেন।

নির্মল রায়ের পর লাউড্-স্পীকারে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলা হলঃ বন্ধুগণ, বিশেষ আনন্দের সঙ্গে এবার ঘোষণা করছি, আমাদের আজকের এই সম্বর্ধনা-সভায় তথা এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে বাঙলার মহিলা সমাজ পিছিয়ে থাকেন নি। একথা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মহিলা শিল্পকেন্দ্র 'মহিলা মহল'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা বরদা-মণি দাসী ও তাঁর কর্মসচিব শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ তাঁদের অভিনন্দনপত্র পাঠ করবেন। তাঁদের পর যাঁর নাম করব তিনি বাঙলার নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ্য নেত্রী এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের প্রাক্তন জমিদার জীবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কন্যা চির-কৌমার্যব্রতধারিণী রাজকুমারী শ্রীমতী লাবণ্যমঞ্জুরী রায়। এঁরা একে একে এসে নরেশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করবেন।

হৈমবতী একটু উসখুস করছিলেন। এবার হেসে বললেন নাঃ এ বড় অন্যায়। সবাই মিলে সুখ্যাতি করে একটা লোকের

মাথা বিগড়ে দেবে দেখছি। বড্ড খারাপ লাগছে। ভাল্ লাগছে না।

ডাক্তার হৈমবতীর কানে কানে বললেন, একটু আস্তে কথা বলুন, ওরা শুনতে পাবে।

শুনলে ভালই হয়। —হৈমবতী হেসে উঠলেন।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে হৈমবতীর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফেরালেন।

দাশরথি ঘোষের শাশুড়ী একটি কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে ভুল বাঙলা ভাষায় দুকথা বলে গেলেন। তাঁর পরে এলেন দাশরথির স্ত্রী বৌগিন্নী কুমুদিনী ঘোষ। তিনি নরেশচন্দ্রের চরিত্র-নীতির নিষ্ঠা নিয়ে সুদীর্ঘ অভিনন্দন পাঠ করে গেলেন। তারপরে এল লাবণ্য। পলকের জন্য অরুণার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে অতি ক্ষীণকণ্ঠে কয়েকটা ইংরেজী শব্দ বাঙলা ভাষার সংগে জুড়ে দিয়ে যা সে বলে চলল, তার প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু দুর্বোধ্য বলেই তার মূল্য বেশি। সুতরাং রাজকুমারী লাবণ্যমঞ্জরীর উদ্দেশে সমবেত করতালিধ্বনিতে সমগ্র হলটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এর পর এলেন চাষী ও মজুর সমবায় আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত নিখিল গুপ্ত মহাশয়। তিনিও সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তবে তাঁর একখানি পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। দুটি লাঠির সাহায্যে একখানি মাত্র পা অবলম্বন করে তাঁকে সামনে এসে দাঁড়াতে হল। তাঁর নাকটি ভাঙা, সামনে কয়েকটি দাঁত নেই এবং উপরের ঠোঁটটি দ্বিধাবিভক্ত। অরুণা একদিন মাত্র ওঁকে দেখেছিল। ইনিই দাশরথি ঘোষের স্ত্রী বৌগিন্নির ঘরে দুপুরবেলা প্রায় রোজই আসতেন এবং সিধুর আক্রমণের ফলেই এঁর শরীরের এই অবস্থা ঘটে।

হৈমবতী একটু নড়াচড়া করছিলেন। ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে অরুণা হেঁট হয়ে সামন্তকে ডেকে বললে, ডাক্তারবাবু, দিদির শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই! এদিকে কত দেরি?

এই যে, আর বিশেষ দেরি নেই মনে হচ্ছে!—ডাক্তার একবারটি নিরীক্ষণ করলেন হৈমবতীকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি বোধ করি সচেতনই ছিলেন।

লাউড্-স্পীকারে আবার আওয়াজ উঠল: বন্ধুগণ, এবার একটি বিশেষ ঘোষণা আছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার বৈশ্বানর সামন্ত মহাশয় পূর্বাহ্নে আমাদের জানিয়েছেন, আজ আমাদের প্রধান অতিথি চারজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বধূরাণী হৈমবতী দেবী অসুস্থ শরীর নিয়েই এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন এবং বিজয়নগরের কনিষ্ঠ কুমার সুব্রতনারায়ণও কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। কিন্তু আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে এই সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, কুমার সুব্রতনারায়ণের ভাবী বধূরাণী শ্রীমতী অরুণাকণা শাস্ত্রী, কাব্য-ভারতী, এই সম্বর্ধনা সভায় সামান্য দু-একটি কথা বলে আমাদের আয়োজনকে সার্থক করে তুলুন।

চকিত বিস্ময়ে সুব্রতর মুখ-চোখ এবং কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে যেন একটা অপ্রত্যাশিত বজ্রপাতের বিস্ময়! অরুণা শান্তচক্ষে অলক্ষ্যে একবার তাকাল সুব্রতর দিকে। একবার দেখে নিল ডাক্তারকে, তিনি নতমুখ। এটি স্পষ্ট, এ চক্রান্ত তাঁরই। অরুণা পলকের মধ্যে লক্ষ্য করল, বিশু ভট্টাচার্য মহাশয় অধোবদন। সমগ্র সভাস্থল একেবারে নিস্তব্ধ। রুদ্ধ ঔৎসুক্যে যেন চারিদিকে সকলে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে।

উঠে দাঁড়াল অরুণা এবং মঞ্চের দিকে পা বাড়াল। বাঁদিকে ফিরে আগে সে আচার্য বিশ্বনাথের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর গলা নামিয়ে বললে, ক্ষমা করুন ঠাকুরমশাই, না জেনে নরককুণ্ডে এসে পড়েছি। আপনি হলেন এখানে এক বিন্দু পুণ্য। বাইরে গিয়ে আপনার পায়ের ধুলো নেব, এখানে নয়।

বিশু ভটচার্যি বললেন, তোমার জন্যে একটি বিশেষ খবর আছে মা। পরে বলছি।

মঞ্চের উপরে সন্তর্পণে উঠে অরুণা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল কিয়ৎক্ষণ। বিশাল সভাকক্ষের আমন্ত্রিত জনসাধারণ তার দিকে উদ্গ্রীব চক্ষু মেলে রয়েছে। দূরে দেখা গেল, চাঁদামণি দয়ালের কানে কি যেন বললে। বরদামণি বললেন, বৌগিন্নীর কানে। নিখিল গুপ্ত মুখ নিয়ে গেল রণেনের কানের কাছে। নির্মল রায় গলা উঁচু করে তাকাল। শুধু লাবণ্যমঞ্জরী রায় স্তব্ধ বিমূঢ় হতবুদ্ধির মতো পিসতুতো ভগ্নী অরুণার দিকে দপ দপ করে চেয়ে রইল।

শান্ত গম্ভীর ও স্বাভাবিক কণ্ঠে অরুণা উচ্চারণ করল, সমবেত সুধীগণ, দু-একটি কথা আপনাদের সমক্ষে বলবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। আজকের এই সভার যিনি নায়ক এবং যাঁকে সম্বর্ধনা করা হচ্ছে, তাঁর সংগে আমার পরিচয় নেই এবং তাঁকে আমি চিনিনে। তিনি 'শ্রমিক-বন্ধু' কিনা, এটি তিনি যদি অনুভব করেন, আমরা সুখী হব। তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ মিষ্ট-বাক্য এবং বিশেষণ উচ্চারণ করা হয়েছে। আমার কামনা হল এই, তিনি যেন এই প্রকার সমাদর লাভের যোগ্য হন।

অরুণা থামল এবং সভার উদ্দেশে নমস্কার জানাল। হীরককুণ্ডল ও কণক-কেয়ূরের সংগে জড়োয়া জহরতের অলংকার এবং নীলাম্বরীর সোনার ফুল উগ্র বিদ্যুতালোকে ঝলমল করে উঠল।

সভাস্থলে তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির শব্দে বৃহৎ কক্ষটি যেন বিদীর্ণ হচ্ছিল। এইপ্রকার স্বতঃউৎসারিত অভিনন্দন একটি রাজনীতিক জীবনের পক্ষে আশাতীত সাফল্য ও সৌভাগ্য। আনন্দে ও আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আনত বিনয়ে অরুণাকে নমস্কার জানালেন। কিন্তু অরুণা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না এবং মঞ্চ থেকে নামবার সময় সে

আচার্যকে ডেকে নামিয়ে নিয়ে এল। উৎসুক জনতা তার প্রত্যেকটি আচরণ লক্ষ্য করছিল। অরুণা এগিয়ে এসে একবার সভয়ে হৈমবতীকে নিরীক্ষণ করল, তারপর ব্যস্ত-ভাবে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, সুব্রত, ডাক্তার-বাবু—চলুন, এইবেলা বেরিয়ে পড়ি। দেখছেন না—?

মঞ্চের উপর থেকে নরেশচন্দ্র মূঢ়ের মতো একচক্ষে অরুণার এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অরুণা সাদরে হৈমবতীকে তুলে নিয়ে আগে আগে চলল এবং সঙ্গে সঙ্গে চললেন বিশু ভটচার্য, ডাক্তার ও সুব্রত। তাঁদেরকে সম্মান দেখানর জন্য সভাস্থ নরনারী উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। শুধু লাবণ্য অতিশয় আগ্রহে অরুণার দিকে ওই ফাঁকে এগিয়ে এসে কি যেন বলবার চেষ্টা পেল, কিন্তু অরুণার সাজসজ্জা ও গাম্ভীর্য দেখে কথা বলতে তার সাহস হল না।

বাইরে এসেই অত্যন্ত বিসদৃশ আওয়াজ করে হৈমবতী হেসে গড়িয়ে পড়লেন এবং পলকের মধ্যে ডাক্তার, সুব্রত ও নেপালী আয়া তাঁকে ধরে ফেললেন। ডাক্তার বললেন,

শিগগির গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোল। ওঁকে না আনলেই ভাল হ'ত।

এক ফাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে অরুণা ঠাকুর-মশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল। ঠাকুরমশাই বললেন, আমাকে এরা জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে, মা। আমি ওদের কারোকে চিনিনে। শুনেছি এই নরেশবাবুটি নাকি মহাধুরন্ধর ব্যক্তি। যাই হোক, শাপে বর হল, তোমাদের দেখা পেলুম। তোমাদের গাড়িতে একটু জায়গা হবে মা? বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আজ আবার জন্মাষ্টমী কিনা!

অরুণা বললে, বিশেষ খবরের কথা তখন কি বলছিলেন, ঠাকুরমশাই?

ও, হ্যাঁ—তোমার সেই চাকরটির কথা বলছিলুম মা। তার খবরটি খুব ভাল নয়। কিন্তু এত ছুটোছুটির মধ্যে ত বলা যায় না? এই যে, হ্যাঁ চল মা—

অধীর কণ্ঠে অরুণা বললে, আপনি কেমন করে তার খোঁজ পেলেন? কোথায় সে? কি হয়েছে তার?

তুমি বড্ড ব্যস্ত হয়েছ মা। এখন শুনে কাজ নেই। চলো, আগে গাড়িতে গিয়ে উঠি।

ঠাকুরমশাই অরুণার সঙ্গে লিফ্‌টএ করে নীচে নেমে এলেন। নীচে হৈমবতীকে নিয়ে ততক্ষণে ছোটখাট একটা হৈ-চৈ লেগেছে। জনচারেক চাপরাশীর সাহায্য নিয়ে অবাধ্য অস্থির এবং অসংযত হৈমবতীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে তিনি নিজের শাড়ীর আঁচলটি নিজেই ছিঁড়েছেন। লোকজনের জটলায় এখানে এক মুহূর্তও আর থাকা চলে না।

বাইরে প্রবল বজ্রনাদের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। পথঘাট একপ্রকার অগম্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু হৈমবতীর জন্য আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই। রাত আটটা বেজে গেছে। সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই মোটর দুখানা এগিয়ে এসে গ্রেট ইস্টার্নের গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়াল। সশস্ত্র সিপাই দুজন, সুব্রত এবং চাপরাসীকে নিয়ে এক-খানা গাড়িতে উঠলেন ডাক্তার এবং অন্য-খানায় অরুণা, আয়া, হৈমবতী ও ভটচার্য মশায় গিয়ে উঠলেন। ওইটুকুর মধ্যেই সকলের পোশাক-পরিচ্ছদ ভিজে গেল।

কোনওপ্রকার দুঃসংবাদ শোনার আগে অরুণার মুখের চেহারায় যেন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ঠাকুরমশায় শান্ত-ভাবে বসে রয়েছেন ড্রাইভারের পাশে। তিনি এঁদের সকলের পরিচিত। এঁরা তাঁর আদি যজমান। এঁদের সব তিনি জানেন এবং এই অভিজাত পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি অনেককাল থেকে জড়িত।

বন্ধ গাড়ি দুখানা ছুটে চলল জন্মাষ্টমীর রাত্রের সেই সর্বপ্লাবী বৃষ্টির ভিতর দিয়ে। পথ নির্জন, কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে গাড়ির উপরে। পিছনে পিছনে আসছে সুব্রতর মোটর। সহসা সেই গাড়ির মধ্যেই হৈমবতী ঝড়ের মতো হেসে উঠলেন এবং বুঝবার আগেই অতর্কিতে তাঁর নেপালী আয়াকে হঠাৎ ডিঙিয়ে অরুণাকে আক্রমণ করলেন। হিংস্র জন্তু যেমন জীবন্ত শিকারকে প্রথম সাংঘাতিক হিংসায় আক্রমণ করে, এও তাই। ভটচার্য মশায় পিছন দিকে একবার তাকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন এবং নেপালী আয়ার শরীরে প্রচুর শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই আকস্মিক হিংস্রতাকে সে তেমন আয়ত্তে আনতে পারল না। গাড়ির মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে গেল। সেই অন্ধকার বন্ধ মোটরের ভিতরে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই অরুণার ঠিক কি দশা হল জানতে পারা গেল না। কিন্তু তার সোনার ফুলবসান গরদের শাড়ীটি বোধ হয় ছিঁড়ল, প্রবালখচিত জড়োয়ার মালা বোধ হয় ছিন্নভিন্ন হল, নখের আঁচড়ে কান ও কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এল, কণ্ঠের কাছে নখের আঁচড় লাগল। কিন্তু সে শান্ত হয়ে রইল শুধু ঠাকুরমশাইয়ের দিকে চেয়ে।

খিদিরপুর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল সোজা, কিন্তু ভটচার্য মশায় বললেন, না না ড্রাইভার সায়েব, আমাকে আগে নামিয়ে দাও।

তিনি কুলগুরু, তাঁর কথা অমান্য করার সাহস নেই কারও। সুতরাং ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে হল বাঁদিকে। বৃষ্টির জন্য পথে জনমানব, এমন কি একটি যানবাহনও চলছে না, তাই রক্ষা। দ্রুতগতি মোটর দুখানা আলিপুরের পাশ কাটিয়ে পুল ছাড়িয়ে কালীঘাটে এসে পৌঁছল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গলির মধ্যে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়াল।

আশপাশে কেউ ছিল না। কোন বাড়ির দরজা জানলা খোলা নেই। সেই বৃষ্টির সাপটের মধ্যে ভটচার্য মশায় নামলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত অরুণাও এ দরজা দিয়ে নেমে পড়ল।

পাশের গাড়ি থেকে ডাক্তার ও সুব্রত নেমে এল। ডাক্তার বললেন, এ কি, আপনি যে নামলেন, অরুণা দেবী? উঠে পড়ুন, বড্ড বৃষ্টি!

এখানে আমার কাজ আছে, ডাক্তারবাবু?

ও, কাজ আছে! কিন্তু আপনি যে নামবেন এখানে, আগে বলেননি ত? আচ্ছা, —তা হলে সুব্রত থাক্ এখানে? একখানা গাড়ি আপনার জন্যে রইল? পরে কিন্তু নিশ্চয়ই যাবেন? —ডাক্তার তাড়াতাড়ি এসে উঠলেন হৈমবতীর মোটরে। অরুণার বৃষ্টি-ভেজা শারীরিক অবস্থাটা অন্ধকারে তিনি লক্ষ্য করেননি। এবার গলা বাড়িয়ে সুব্রতকে কি যেন একটা কথা বলে দিলেন।

সশস্ত্র দেহরক্ষী রইল একজন সুব্রতর সঙ্গে। হৈমবতীর গাড়ি নিয়ে ডাক্তার আর কিছুই না বলে চলে গেলেন। ভটচার্য মশাইয়ের পিছনে পিছনে অরুণা আর সুব্রত এসে দাঁড়াল। ভিতর থেকে একজন সেবিকা এসে সুব্রতকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ঠাকুরমশাই এসে নিজের ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই অরুণা ছুটে গিয়ে এবার কাতরোক্তি করে উঠল, ঠাকুরমশাই, খবরটা এবার বলুন!

ফিরে দাঁড়ালেন আচার্য। বললেন, এ বৃষ্টি না থামলে কোথায় যাবে, মা?

অস্থির হয়ে অরুণা বললে, সিধু কোথায়? কি হয়েছে তার?

আচার্য বললেন, ছেলেটার বাঁচবার আশা আর নেই, মা। দিন চারেক আগে সুরেন বলে একটি লোক এসে তোমার সেই তোরঙ্গটি নিয়ে গেছে। সিধুই পাঠিয়েছিল। ওতে নাকি তোমার জিনিসপত্র কিছু আছে। সে ওটি মাথার কাছে রেখে মরতে চায়! সুরেনের কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, সিধু এ-কদিনের মধ্যে মারাই গিয়েছে। কঠিন অসুখ কিনা, —ওসব অসুখ সারে না। আমার এখানে তাকে এনে রাখতে চাইলুম, কিন্তু কিছুতেই সে রাজি হয়নি। যাই হোক, এমন চাকর তুমি আর পাবে না, মা।

আর্তনাদ করল অরুণা, কোথায় সে?

ওই সেই শ্মশানের একটি কোণেই সে পড়েছিল এতদিন!

পাশের একটা চেনা দরজা দিয়ে অরুণা তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল। ঠাকুরমশাই হন্তদন্ত হয়ে পিছু পিছু গেলেন। বললেন, ছি মা, ছি, এমন কাজ করো না। ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে! তোমার লোকনিন্দে হবে, মা। মান খোওয়া যাবে। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে একটা জেলে-কৈবর্তের ছেলের জন্যে অমন করে ছুটো না, মা। শোনো—

একজন পরিচারিকা দৌড়ে গেল, দিদি—দিদি—শুনুন—?

কিন্তু পিছন ফিরে কিছু শোনবার সময় অরুণার ছিল না। সেই মুষলধারার বৃষ্টির ভিতর দিয়ে দুরন্ত বায়ুর ঝাপটা সইতে সইতে জনহীন পথ পেরিয়ে অরুণা ছুটল শ্মশানের দিকে। মুশকিল এই, পরিচ্ছদটা তার বাধা। সর্বালঙ্কারভূষিতা সুবেশা অরুণা সে-বাধাও আজ মানতে চাইল না। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, এবং তার চেয়েও অশোভন—সেই সিক্ত মিহি রেশমী শাড়ি যেন ফাঁসের মতো তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। আশেপাশের এই পাড়াপল্লী এবং কোন কোন দোকানদারও তার বিশেষ চেনা। একমাত্র আশ্বাসের কথা এই, পথেঘাটে বাজারে বা পাড়ায় জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। বায়ু ও বৃষ্টির প্রচণ্ড ঝাপটায় জনহীন পথ দুস্তর হয়ে উঠেছিল।

চার পাঁচ মিনিট সময়টা দীর্ঘকাল সন্দেহ নেই। কিন্তু নানা অলিগলি পথে ছুটতে অরুণার সময় লাগল। ওরই মধ্যে এক সময়ে তার গায়ের অলঙ্কারাদি থেকে কি যেন ঠুনঠুনিয়ে পিছন-পথে পড়ে গেল। অবশেষে এক সময় অন্ধ বৃষ্টির ভিতর দিয়ে সে এসে পৌঁছল শ্মশানে এবং সোজা গিয়ে দাঁড়াল সেইখানে,—যেখানে তাদের অনেকদিনের অনেক কাহিনী জড়িত।

অন্ধকারে বসে রয়েছেন সুরেনবাবু চুপ করে হাত গুটিয়ে। তাঁর পাশেই একটি নিশ্চল দেহ পড়ে রয়েছে মুড়ি দিয়ে,—নিশ্চয়ই সিধুর। মাথার কাছে রয়েছে তোরঙ্গটা,—ওটা সিধুর মনিবের সম্পত্তি।

সুরেনবাবু একমনে বোধ করি অসীম নৈরাশ্য নিয়ে নিঃশব্দে বৃষ্টি ধরবার অপেক্ষায় বসেছিলেন—এদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। প্রেতিনী শান্তভাবে সেদিকে এগিয়ে গেল।

কে?—মুখ ফেরালেন সুরেনবাবু।

আমি! —অরুণা জবাব দিল।

শ্মশানের ঝাপসা. আলোয় চট করে সুরেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। ঠাহর করে দেখলেন একটি যুবতী মেয়ে। কপালের চুল বেয়ে রংমাখা মুখের ওপর জল গড়াচ্ছে, গাল বেয়ে কানের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা, পিছনের এলোখোঁপায় ভিজে ফুলের মালা ঝুলছে, কালিমাখা দু চক্ষু, ভিজা রেশমী শাড়িতে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা নেই। প্রেতিনী নয়, পাগলিনী!

ও, আপনি! —সুরেনবাবু চেপে নিঃশ্বাস ফেললেন।

পলক মাত্র,—তারপরেই ছুটে গিয়ে অরুণা সিধুর দেহটার পাশে বসল। কিন্তু সাহস হল না ছুঁতে, মুখ তুলে বললে, নেই?

সুরেনবাবু বললেন, না, ভাল নেই!

অরুণা সস্নেহে সিধুর মুখের উপর থেকে কাপড় সরাল। অস্পষ্টস্বরে সিধু বললে, কে?

অরুণা ব্যস্ত হয়ে বললে, সুরেনবাবু, আপনি আর দাঁড়াবেন না। একখানা গাড়ি শিগগির ডেকে আনুন—আমি একে তুলে নিয়ে যাব।—যান ভাই, হোক বৃষ্টি, শিগগির দৌড়ে যান—

সুরেনবাবু দ্রুতপদে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে চলে গেলেন।

তোরঙ্গটা খরহস্তে খুলে পুরনো একখানা শাড়ি আর একটি জামা অরুণা বার করে নিল। টান মেরে ফেলল ফুলের মালা আর জড়োয়া অলংকার, টান দিয়ে খুলল পরনের শাড়ি আর জামা, কানের দুল আর হীরের আংটি, আর সেই কেয়ূর। তারপর মুখ চোখ ভিজা শাড়িতে ঘষে পরিষ্কার করে মুছল এবং সেই শাড়িখানাতেই সবগুলো একত্র করে পুঁটলি বাঁধল। অতঃপর কাছে বসে হেঁট হয়ে বললে, চিনতে পারনি, সিধুদা! কাপড় চোপড়ে তোমার এত রক্ত কেন? —শিউরে উঠল অরুণা।

সিধু ঈষৎ হাসল। মৃদুকণ্ঠে বললে, এত বৃষ্টি......ভিজে এলে?

ডুকরে ফুঁপিয়ে উঠল অরুণা, সিধুদা, এবার ফিরে চল—

কোথায়?

তোমার দেশে—তোমার মাটিতে—

সিধু একটু থেমে বললে, সে-মাটি ত আর নেই, ঠাকুরদি?

আছে! আছে! —অরুণা কেঁদে উঠল সিধুর মুখের ওপর মুখ রেখে এবং দু হাত দিয়ে সিধুকে জড়িয়ে ধরে বললে, সে-মাটি চিরদিনই তোমার আছে! তুমি যে চাষী, তুমি যে চিরকাল ধরে মানুষের মুখে অন্ন যুগিয়ে এসেছ! তোমার মাটি কেউ কেড়ে নেবে না, সিধুদা!

সিধু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে ধীরে ধীরে বললে, আমি কি বাঁচব?

আমি তোমাকে বাঁচাব, সিধুদা। —অরুণা আর্তকণ্ঠে আবার কেঁদে উঠল,—বেলোয়ারীর এই বালা তোমারই জন্যে হাতে রেখেছি,—এই হাতেই তোমাকে বাঁচাব!

জন্মাষ্টমীর বর্ষা তেমনই অবিশ্রান্ত চলছে, শ্মশানও যেন ভেসে যাচ্ছে। কয়েকটা মৃতদেহ জলে-কাদায় ভাসছে,—তাদের লোকজন হয়ত কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। থেকে থেকে প্রবল বজ্রনাদ আর বিদ্যুৎ ঝলসিয়ে উঠছিল।

হঠাৎ অরুণার চোখে পড়ল অদূরে অন্ধকারে এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি অস্পষ্টভাবে সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে। অরুণা আতঙ্কিত হয়ে সিধুকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রইল। সত্যই কি তবে মৃত্যু এসেছে এগিয়ে? ভয় হল অরুণার!

ছায়ামূর্তি কাছে এসে দাঁড়াল। চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি তুলে অরুণা তাকাল সভয়ে। সুব্রত এগিয়ে এসে বললে, আশ্চর্য তুমি, তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি, মহাশ্বেতা!

অরুণা উঠে দাঁড়াল।, বললে, এবার আমাকে মুক্তি দাও, সুব্রত।

বাইরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়েই সুব্রত বললে, আমিও ছুটি নিচ্ছি, অরুণা। পাগলের সংসারে গিয়ে দিন তোমার দুঃখেই কেটেছে, চোখে দেখেছি। কিন্তু আমাকে তুমি বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে, এটি ইতিহাসে রইল। আমাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করে যাও।

অরুণা সেই অলংকারাদির পুঁটলিটি এনে সুব্রতর হাতে দিয়ে বললে, কিছু মনে করো না, সুব্রত। এটা ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে দিও। বলো, কোনো কিছুতে অরুণার লোভ নেই!

পিছন দিকে দেহরক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত তার মহাশ্বেতাকে আনত বিনয় নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

কিছুক্ষণ পরেই এসে পড়লেন সুরেনবাবু। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর জল ঝরছে। বললেন, মোটর কিংবা ঘোড়ার গাড়ি কিছু পাওয়া গেল না। দুখানা রিকশা কোনমতে নিয়ে এলুম।

অরুণা বললে, বেশ, ওতেই হবে।

না, না, আপনি পারবেন না। আপনি বরং তোরঙ্গটা নিন—আমি সিধুকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি—

অরুণা বললে, সুরেনবাবু, আমার শক্তি ওরই জন্যে—তোরঙ্গটা আপনি নিন। ওর শরীরে ত আর কিছু নেই! ওকে আমিই নিতে পারব।

সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তোরঙ্গটা তুলে নিয়ে চললেন। অরুণা কোমরে কাপড় বাঁধল তারপর সেই শ্মশান থেকে সিধুকে তুলে নিয়ে সে সুরেনবাবুর পিছু পিছু চলল।

•

পরবর্তী তিন মাসের ইতিহাস কিছু দুঃখদায়ক। কলকাতায় যারা এসেছিল নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে,—তিনটি প্রধান বস্তুর দ্বারা সেই অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে হল। কপালের ঘাম, চোখের জল আর পায়ে কাঁটা ফুটে যাওয়ার রক্ত। অন্ন পাওয়া যায়নি সময়মতো, আশ্রয়ের প্রশ্নে মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে হাসপাতালের আউট-ডোরের রোঁয়াক,—সেখানে তন্দ্রার ঘোরে তাড়াও খেতে হয়েছে। শ্মশান থেকে একদিন যাকে মুমূর্ষু অবস্থায় তুলে আনা হয়েছিল তাকে পুনরায় অন্য চেহারায় শ্মশানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা,—এ প্রশ্নটা একমাস যাবৎ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক পথচারী অনেকবার দেখে গিয়েছে, হাসপাতালের সামনে ফুটপাথের একটি বিশেষ রোয়াকে বসে মাঝে মাঝে একটি জোয়ান মেয়েছেলে চোখের জল ফেলে। বয়স কত ঠিক ঠাহর করা যায় না, তবে অকালবার্ধক্য বলে কারো কারো সন্দেহ হয়। তার ওপর এক পা ধুলো, রুক্ষ চুলের জট কালিমা-পড়া মুখ, পরনে আধময়লা পুরনো শাড়ি। এ মেয়ে নাকি

একদা দেশের বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পাবার জন্য গ্রাম ছেড়ে এসেছিল। বুদ্ধি ও বিবেচনার হয়ত অভাব ছিল, তাই আস্বাদটা হয়েছে কিছু কটু। আজ মুখে হাসি থাকলে ওর সঙ্গে অনেকেই হাসত, কিন্তু যখন কাঁদতে বসল,—তখন সে একা। কলকাতার মন কান্নায় ভোলে না!

রক্তপিত্ত এবং পিত্তজ্বরের ব্যামো সারিয়ে সিধু যেদিন হাসি-হাসি মুখে হাসপাতাল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল,—অরুণাও তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। কিন্তু সেই হাসি দেখে সিধুর হাসি মিলিয়ে গেল। অবসাদে আনত, উপবাসে ক্ষীণকণ্ঠ, অনাদরে ধূলিধূসর,—সেই হাসিতে অশ্রুর সজলতা ছিল। সিধু তাড়াতাড়ি এসে অরুণাকে ধরল। বললে, চল।

ফুটপাথের পাশে তোরংগটা পড়ে ছিল। সিধু একখানা রিকশা ডাকল।

কথা নেই দুজনের মধ্যে। কথা ত রয়েছে বিশ্ব জুড়ে। সে-কথা অনন্ত। প্রতি ধূলি-কণায়, বায়ুর প্রত্যেকটি ঝলকে—আদি অন্তহীন কথায় পরিপূর্ণ। ওদের দুজনের মধ্যে আর কোন কথা নাই হল!

আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল সুরেনবাবু আসবেন স্টেশনে। বিস্ময়ের কথা, সুরেন-বাবুর পরনে আজ সন্ন্যাসের সজ্জা, মাথাটি মুণ্ডিত। তিনিই আগে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন, এসেছি অনেকক্ষণ। মায়া-বদ্ধ জীব, তাই শেষ দেখা দেখে না গেলে মন কেমন করত।

সিধু ও অরুণা প্রণাম করল তাঁকে। মুখ তুলে অরুণা বোধ হয় বলতে গিয়েছিল, বড় দুঃখের দিনের নিঃস্বার্থ বন্ধু তুমি—!

কিন্তু বলতে গিয়ে চোখে জল এসে দাঁড়াল,—অরুণা চুপ করে গেল।

সুরেনবাবু বললেন, থাক থাক, আমি সন্ন্যাস নিয়েছি বোন, হয়ত তুমিই তার উপলক্ষ্য। সন্ন্যাসীর পক্ষে সুখ্যাতিও শুনতে নেই। চল, এবার গাড়ি ছাড়বে।

গাড়িতে ওরা গিয়ে উঠল। ট্রেন ছাড়ার সময় হাসিমুখে সিধু গলা বাড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বললে, বড় দুঃখ রইল বড়দা, আপনার হাতের আগুন পেলুম না।

দূরের থেকে হাত তুলে সুরেনবাবু আশীর্বাদ জানালেন।

সেদিন রাতে গিয়ে ওরা গ্রামের স্টেশনে পৌঁছেছিল। কিন্ত এত রাতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পেরিয়ে তীবকাঠিতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। স্টেশনেই রাত কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে স্নানাদি সেরে ওরা একখানা গরুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অগ্রহায়ণ মাসের আকাশ, রাঙা রৌদ্রে সবেমাত্র উদ্ভাসিত হচ্ছিল। শীতের টান ধরেছে হাওয়ায়। পাখির কাকলি চলছে গাছে গাছে। নিঃঝুম গ্রামের পথ দিয়ে হেলেদুলে গাড়ি চলল। বিন্টু বোরেগীদের ঘর ছাড়াল, বারুইদের বরজ পেরিয়ে গেল, গাজনতলার হাট পেরোল,—তারপর দেখা গেল, কারা যেন নতুন বাঁধ দিয়েছে নদীর ধারে—আগে এটা ছিল না। পাকা ঘর উঠেছে খান দুই, এখানে ওখানে কয়েকটা করোগেটের চালা। একটু চকিত হল সিধু,—ডাক দিল অরুণাকে। কিন্তু চেয়ে দেখল, পরম নিশ্চিন্তে ও পরম নির্ভরতায় তারই কোলের কাছে অকাতরে অরুণা ঘুমিয়ে পড়েছে। সিধু একবার চেয়ে দেখল,—দেখল অপলক চোখে, দেখল যেন জন্ম-জন্মান্তরের একাগ্র একান্ত চাহনি দিয়ে। দুই চোখে তার জল এসে পৌঁছল। সে ধীরে ধীরে চাদরখানা নিয়ে সযত্নে অরুণার গায়ের উপর টেনে দিল।

তীরকাঠিতে ওরা এসে পৌঁছল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। সেই দরিদ্র গ্রাম আর নেই,—মানুষের অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবার প্রাণসম্পদ এসে পৌঁছেছে। মাঠে মাঠে পরিপূর্ণ শস্য পেকেছে। অনেকগুলি করোগেটের চালা উঠেছে এখানে ওখানে। পরিচ্ছন্ন কাপড়জামা পরে কতকগুলি অপরিচিত মুখ ঘোরাফেরা করছে। পথের ধারেই দেখা যাচ্ছে নতুন একটা বৃহৎ হাটতলা। সিধু উল্লসিত বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে একবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির এবং তাদের ঘর-গুলির চেহারা ফিরে গেছে। প্রথমটা অরুণা যেন ঠিক চিনতে পারেনি। গাড়ি থেকে নামতেই পুরুতমশাই সহাস্যে এগিয়ে এলেন। হাতজোড় করে বললেন, আপনার চিঠি আমরা ঠিক সময়েই পেয়েছি, গুরুমা। আপনি আসছেন শুনে সবাই নাচছে। আপনি যে-ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি আছি।

হাসিমুখে অরুণা ফুলবাগান পেরিয়ে উঠে এল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দেখতে দেখতে গ্রামের বহু মেয়েপুরুষ এসে জড়ো হয়ে প্রণামের হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসে নমস্কার জানালেন। এঁরা সবাই সরকারী লোক, গ্রাম গঠনের কাজে লেগেছেন। অতঃপর এলেন বয়োবৃদ্ধ মুখুজ্যেমশাই।

বড়দাদু, আমি ফিরে এসেছি। —বলতে বলতে ছুটে এল অরুণা।

এসো মা, এসো। গ্রামের আলো আবার জ্বলল।

অরুণা গিয়ে মুখুজ্যেমশায়ের পায়ের ধুলো নিল। বৃদ্ধ বললেন, গ্রামও নতুন হচ্ছে, নতুন মানুষও আসছে। কিন্তু তুমি আর তোমার সিদ্ধেশ্বরী তেমনি অবিচল থাকো, এই আমার আনন্দ। মৃত্যুর আগে এটি দেখতে পেলুম,—আমার আশীর্বাদ জানাই।

অরুণা বললে, মন্দিরে আর নয় বড়দাদু। ওটার সংগে দাদামশায়ের নামই জড়িয়ে থাকুক, আমি ওর কেউ নই।

সে কি, মা?

হ্যাঁ, বড়দাদু—গুরুকন্যা বলে আর কেউ না আমাকে ডাকে। আমি গ্রামের সকলের কন্যা,—এই আমার পরিচয় হোক। মন্দির আমি ছেড়ে দিলুম।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, ভেবেচিন্তে কথা বল, মা!

অরুণা একটু হাসল। বললে, ঠিকই বলছি বড়দাদু, আমি ভুল করেছিলুম কলকাতায় গিয়ে। এই গ্রামেই আমি থাকব। গ্রামের সকল কাজেই আমরা দুজন নামব। সেই আমাদের সকলের বড় পরিচয়।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, দুজন! তুমি আর কে?

আমি আর আমার স্বামী! —অরুণা বললে, আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন, বড়দাদু—আমি আমার স্বামীর খোঁজেই কলকাতায় গিয়েছিলুম। স্বামীকে নিয়েই ফিরে এসেছি। —এই বলে সে মন্দিরে গিয়ে ঢুকল।

ছুটতে ছুটতে এল দুলে পণ্ডিত আর বুড়িমাসি, এল যমুনি-মাসি আর মধু মোড়ল। সবাই এসে ভিড় বাড়াল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে অরুণা ডাকল সিধুকে। তারপর দুজনে গিয়ে মুখুজ্যে-মশায়ের সামনে দাঁড়াল। অরুণা বললে আমার মাথায় সিঁদুর দিয়ে আশীর্বাদ করুন, বড়দাদু। এই আমার স্বামী!

কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ বললেন, তুমি যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যা, মা? সিধু যে ছোট জাত, জেলে-কৈবর্ত,—ওর হাতের জল পর্যন্ত চলে না যে!

অরুণা হাসিমুখে বললে, যার হাতের অন্ন খেয়ে আমরা সবাই মানুষ, তার হাতের জল খেলে জাত যাবে না, বড়দাদু!

চারিদিকে জনসমাজ রুদ্ধকণ্ঠ। এই মৌনতার মধ্যে হয়ত বৃহত্তর কোন একটা মানুষের সমাজের সম্মতি ছিল। বৃদ্ধ থরথরিয়ে কেঁপে চারিদিকে একবার শিথিল দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর অরুণার হাত থেকে দেবী সিদ্ধেশ্বরীর সিঁদুর নিয়ে অরুণারই সিঁথিতে তুলে দিলেন। দুজনে তাঁকে প্রণাম করল।

আকণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে রইল তীরকাঠির জন-সমাজ।

পরদিন খবর পাওয়া গেল, গতরাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তীরকাঠির প্রবীণতম জননেতা শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেছেন।—

—সমাপ্ত—




চক্রদত্ত

খেলাধ্বলোর মানের উন্নতি সব দেশেই করবার চেষ্টা করে। এর জন্য অনেক সময় বিদেশ থেকে অথবা ঐ দেশের ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য নেওয়া হয়। আমেরিকায় বেস বল ওদের জাতীয় খেলা। এই খেলা শিক্ষা দেবার বিভিন্ন উপায় বার করা হচ্ছে। বর্তমানের ছবিতে দেখা যাবে বেস বলের বল কি রকম ধরতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য একটা ৬ ফ্বট রবারের হাতের অংশ তৈরী করা হয়েছে। এতে আঙ্গ্বলগ্বলো প্রয়োজন অন্বযায়ী খোলা এবং বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা আছে। হাতের নিচেই একটা তিন ফ্বট



বল ধরার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া

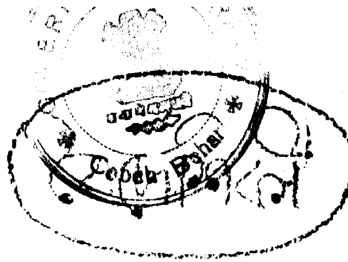
বল রাখা আছে। শিক্ষক বল ধরার রকম রকম উপায় মাঠের মাঝখানে বসে দেখাচ্ছেন —আর দ্বরে বসে শিক্ষার্থীরা তা লক্ষ্য করছেন।

*

এ বছর প্রায় ৫০০ টন কয়লা রাশিয়ার খনিগ্বলি থেকে পাওয়া যাবে। সমগ্র প্থিবীতে উৎপন্ন কয়লার মধ্যে রাশিয়ায় উৎপন্ন কয়লাই চারভাগের একভাগ পরিমাণ এবং আশা করা হচ্ছে যে, বছরে বছরে এই উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ব্দ্ধি পাবে। রাশিয়ার সমগ্র কয়লার পরিমাণ ৯০০০,০০০ টন এবং সমগ্র প্থিবীর কয়লা সম্পদের একশত ভাগের মধ্যে যাট ভাগ এদেশেই পাওয়া যায়। প্থিবীর অন্যান্য দেশে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণের তুলনায় রাশিয়ায় যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় তাতে এদিক থেকে রাশিয়াকে প্রথম স্থানেই দেওয়া যায়। রাশিয়ার কয়লাখনিগ্বলির মধ্যে সাইবিরিয়ার কয়লাখনিই সবচেয়ে বড়। আন্দাজ করা হয় যে, এখানে ঠিক ভূপ্ষ্ঠের ওপরেই কয়লা আছে। এই অঞ্চলে অনেকগ্বলি পাওয়ার স্টেশন তৈরী করা দরকার এবং এই পাওয়ার স্টেশনগ্বলি হাইড্রোইলেকট্রিক চালিত না হয়ে সাধারণ জ্বালানি বস্তুর দ্বারাই চালিত হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এইভাবে কয়লাউত্তোলনে এবং কিলোওয়াট ঘণ্টায় যা খরচ পড়বে তা হাইড্রোইলেকট্রিক চালিত পাওয়ারের খরচের চেয়ে অনেক কম। পরিকল্পনান্বযায়ী ১৯৬৫ সালের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার এই অঞ্চলে প্রচুর নতুন খনি তৈরী করা হবে। এইসব খনির কয়লাভেঙ্গন পদ্ধতি সর্বতোভাবে যান্ত্রিক এক স্বয়ংক্রিয় হবে। এখানের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও লোকের প্রয়োজন হবে না। অনেকগ্বলি স্বয়ংক্রিয় খনি ইতিমধ্যেই "থারাকাণ্ডা" ও "ডোনেট"-এ তৈরী হয়েছে। এখানে কোনও লোকের সাহায্য ছাড়াই কয়লা তোলা হয়। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় কয়লাখাদের অভ্যন্তরে কাজ করার জন্য আর কোনও কুলি মজ্বরের দরকার হবে না; এখানে সবকিছ্ব স্বতঃই হয়ে যাবে।

*

দ্বজন চৈনিক বৈজ্ঞানিক মহাশ্বন্যে ভ্রমণের ব্যাপারে প্রচুর স্বনাম অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম লেফটেনাণ্ট চু এন লী। তিনি রকেট বিশেষজ্ঞ। চু এন লীর মতে মান্বষের পক্ষে এই প্থিবী থেকে একটা রকেটের সাহায্যে চাঁদে পেঁছান খ্বব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং তিনি আশা করেন যে, এইভাবে মান্বষ অদ্বর ভবিষ্যতে একদিন চাঁদে পেঁছাতে পারবে। অপর বৈজ্ঞানিকটির নাম জর্জ ল্বড উইক। ইনি "ম্যাগনেটিক মেমরি" নামে একটি অতি অদ্ভুত ধরনের টেপরেকর্ডার তৈরী করেছিলেন। এই টেপরেকর্ডারে "এক্সপ্লোরার থ্রি"তে বসিয়ে কসমিক রশ্মির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। চু এন লীকে চৈনিক সরকার আমেরিকাতে টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিল। সেখান থেকে ১৯৩৮ সালে ডিগ্রি নেওয়ার পর আমেরিকাতেই রকেট সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা করতে লেগে যান। আজ তিনি আমেরিকার রকেটম্যানদের মধ্যে একজন অগ্রণী। শ্বধ্ব তাই নয়, আজ তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার "সেনম ল্যাবরেটরীর" অধ্যক্ষ। এখানে তিনি তিনটি বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। "অ্যাসট্রো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি", "প্রপালশন" এবং মহাশ্বন্যে ভ্রমণকারী যান বাহন তৈরীর বস্তু নিয়ে গবেষণা চলছে। ল্যুড উইক ছয় বছর আমেরিকার বিমানবাহিনীতে কাজ করার পর ১৯৫৬ সালে আওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রোনিক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পাশ করেন, তারপরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ এলেন এর কাছে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। ডাঃ এলেন যখন আমেরিকার "আর্থ স্যাটেলাইট" সম্বন্ধীয় গবেষণ সংস্থার একটি বিশিষ্ট পদ লাভ করেন তখন তিনি লেড উইককে কসমিক রের তথ্য সংগ্রহকারী যন্ত্রপাতি নির্মাণে সাহায্যের জন্য নিয়োগ করেন, কারণ এইসব যন্ত্রপাতি ছোট্ট স্যাটেলাইটে বসানর উপযোগী করা দরকার। লেড্ব উইকের তৈরী এই যন্ত্রগ্বলি এক নম্বর এক্সপ্লোরার এবং তিন নম্বর এক্সপ্লোরারে বসিয়ে দেখা গেছে যে, এগ্বলো অদ্ভুত রকম কার্যকরী।



বেশ কয়েক সপ্তাহ "বৈদেশিকী" লেখা হয়নি। তার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলী নিয়ে "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি" খবরের কাগজের পাতায় এক একদিন এমন রূপ নিয়েছে যে, লোকের মনে হয়েছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুঝি লেগে গেল—"শীর্ষ সম্মেলন" ছাড়া তা রোধ করার আর উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত (অথবা এখন পর্যন্ত) "শীর্ষ সম্মেলনও" হয়নি, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও লাগেনি। আসলে যুদ্ধ নিরোধ সম্বন্ধে রাজনৈতিকদের ব্যবস্থাপত্রগুলি আদৌ বিশ্বাস্য নয়। অমুকটা করলে যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা দূর হবে—এই ধরনের মতামতের কী মূল্য তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যারা যুদ্ধ বাধাবার মালিক তারা যদি সত্যই জানত যে, কখন কিসে যুদ্ধ লাগবে অথবা কী করে তা আটকানো যায় তবে অনেক যুদ্ধই লাগত না। যুদ্ধ চাই না, যারা বলে—অনেক সময়ে তারা সে-কথা "আন্তরিকতার" সঙ্গেই বলে, কারণ বিনাযুদ্ধে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকলে যুদ্ধ কোন পাগলে চায়? ("শীর্ষে" যাঁরা বসে আছেন তাঁদের কথাবার্তা এবং আচরণে অনেক সময় সন্দেহের উদ্রেক হলেও তাঁদের পাগল মনে করা যায় না।) কিন্তু মুশকিল এই যে যুদ্ধ চাই না কিন্তু এমন জিনিস চাই যা যুদ্ধ ছাড়া লাভ করা যায় না অথবা যা যুদ্ধের দ্বারাও কোনোদিন স্থায়িভাবে লাভ করা যায় না কিন্তু যা চাইলে যুদ্ধের কারণ জন্মাতে ও জমতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলায় ঠেকানোর চেষ্টা হয়নি একথা বলা চলে না। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি লাগে তবে সেটাও ঠেকানোর চেষ্টার অভাবের দরুণই লাগবে তা নয়। আসলে কিসে যুদ্ধ ঠেকানো যায় সেইটেই কর্তারা জানেন না অথবা সে-পথে যেতে হলে যে-কাজ করতে হবে তা করার ইচ্ছা বা সাধ্য তাঁদের নেই। সুতরাং স্ব স্ব অভীষ্ট লাভের পথকেই যুদ্ধ নিবারণের পথ বলে প্রচার করে "শান্তিপ্রিয়তার" প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা হয়। দুই পক্ষের "শান্তিপ্রিয়তার" টানাটানিতে দড়ি কোনদিন ছিঁড়বে কেউ বলতে পারে না, বোধ হয় দড়ি যাঁরা টানছেন তাঁরা সবচেয়ে কম বলতে পারেন। আর "বৈদেশিকীর" লেখকের মতো যাদের কর্ম কেবল ফোড়ন কাটা তাদেরও মাঝে মাঝে একটু আত্মপরীক্ষার সুযোগ নেওয়া উচিত। পাঠকগণ ভেবে দেখবেন, যদি "অনিবার্য কারণ বশত" এই ক' সপ্তাহ "বৈদেশিকীর" লেখা বন্ধ না থাকত তবে কি ছাপার অক্ষরে এমন অনেক কথা লেখা হয়ে থাকত না যা আজকে উল্টে দেখলে "বৈদেশিকী"র লেখকের জাগতিক জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা সম্বন্ধে কোনো কোনো বিষয়ে একটু আধটু সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত? স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু "শীর্ষ সম্মেলনে"র জন্য কীরকম উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন তা সকলেই জানেন। "শীর্ষ সম্মেলনে"র খাতিরে লাল কেল্লার প্রাকারে তাঁর অতিপ্রিয় ১৫ই আগস্টের অনুষ্ঠানটি থেকে অনুপস্থিত থাকার জন্যও তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। যে-কেরালার অবস্থার সম্বন্ধে সাতদিন পরে দিল্লীতে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কলকাতায় প্রেস কনফারেন্সে তার উপর তিনি বিশেষ কোনো গুরুত্বই দেননি। মনে হয়, "শীর্ষ সম্মেলন" ও বিশ্বপরিস্থিতির চিন্তায় ভারতবর্ষের ব্যাপারগুলি তখন তিনি তাদের ঠিক আয়তনে দেখতে পারছিলেন না। "শীর্ষ সম্মেলনে"র দশ হাজার মাইলের মধ্যেও "বৈদেশিকী"র লেখকের এগুবার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং খ্রুশ্চেভ-আইক-ম্যাকমিলানের চিঠির ঘূর্ণিপাকে পড়ে বিভ্রান্ত হবার ভয় তার ছিল না কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে একটু আধটু এলোমেলো কথাবার্তা নিশ্চয়ই বেরিয়ে যেত। পণ্ডিতের মতো দু পাঁচটা এমন কথা নিশ্চয়ই লেখা হত যা আজকে পড়লে কৌতুক বোধ হত। বাস্তবিকপক্ষে "সমসাময়িক" পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার যতটা পরিচয় পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায় পর্যবেক্ষকের মন ও তার উপর সেই ঘটনার প্রভাবের। অনেক সময়ে সেই সাক্ষ্য ঘটনার পরিচয় হিসাবে নগণ্য, এমন কি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকরও হতে পারে তবে সমসাময়িকদের ভুল বুঝাও ঘটনার ফলের অন্তর্গত এবং পর্যবেক্ষক যদি গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন তবে তাঁর ভুল বুঝারও গুরুত্ব সমধিক হয়ে থাকে। যাই হোক, দু মাস পরে আবার "বৈদেশিকী" লিখতে আরম্ভ করে পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলী সম্বন্ধে কীরকম মনে হচ্ছে জানেন—যেন বাড়িতে কারো একটা খুব বড়ো অসুখ বিসুখ করেছিল কিন্তু বিদেশে থাকাতে খবর পাইনি, ফিরে এসে দেখছি রোগী বেঁচে গেছে, আগে খবর পেলে আকুপাকুর অন্ত থাকত না, কত কী লিখতাম কে জানে।

* * *

কিন্তু নিষ্কৃতি নেই। পশ্চিম একটু ঠাণ্ডার দিকে তো পূবের হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। চীনের কম্যুনিস্ট সরকার কুয়েময় দ্বীপের উপর কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করেছেন। যদি আমেরিকা বাধা না দেয় তবে কুয়েময় দখল করে নেওয়া চীনের পক্ষে কিছুই নয়। আমেরিকা ফরমোজার নিকট বিরাট শক্তি সমাবেশ করছে। ফরমোজা ও চিয়াং কাইশেককে রক্ষার "দায়িত্ব" আমেরিকা ত্যাগ করতে এখনো প্রস্তুত হয়নি বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু কুয়েময়কে কম্যুনিস্ট চীনের হাত থেকে বাঁচানো সেই "দায়িত্বের" অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে আমেরিকার পিকিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বার আগ্রহ নাও হতে পারে। তাছাড়া, লেবাননে মার্কিন এবং জর্ডানে বৃটিশ সৈন্য অবতরণের পরে ও পক্ষের (কম্যুনিস্ট পক্ষের) হিসাবেও কিছু জমা পড়া উচিত নয় কি?

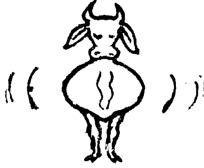
* * * *

ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা মিঃ স্ট্রাইডমের মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর পদ শূন্য হয়। সে স্থলে যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়েছেন বর্ণবিদ্বেষে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীরও বাড়া। শ্বেত ও অশ্বেতদের মধ্যে চিরস্থায়ী বেড়াগুলো শ্বেতদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার নীতির তিনি সবচেয়ে গোঁড়া সমর্থক। এঁর নামের (Dr Verwoerd) উচ্চারণটা এখনো জেনে নিতে পারিনি।

৩।৯।৫৮

---

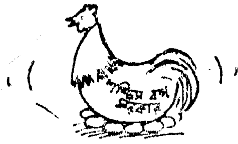
**এ**কটি সংবাদে শুনিলাম বৃটিশ বিজ্ঞানীরা নাকি কলের গাভী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গাভী সাধারণ গাভীর চাইতে বেশি দুধ দেয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সংবাদটা একেবারে নূতন নয়। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম কামধেনু বহু



আগেই তৈরি করেছিলেন, জাবনা না পেয়েও সে বরাবর দুধ দিয়ে গেছে; কপালে গাভীটি বাঁচল না এই যা দুঃখ"।

• • •

**প**শ্চিমবঙ্গ সরকার অধিক ডিম্ব উৎপাদনের কথা চিন্তা করিতেছেন। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"কেউ কেউ বলছেন এই ডিম্ব না কি হবে হাঁস-মুরগীর,



আবার কেউ কেউ বলছেন অশ্বডিম্ব; আমরা কোনটা সঠিক খবর এখনো বুঝতে পারছিনে"!!

• • •

**খা**দ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার ছাগলের চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—এই সংবাদটাও প্রসঙ্গত মনে পড়িয়া গেল। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে খাদ্য-সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা জানিনে, তবে একথা সত্যি যে অতঃপর বৃষচ্ছাগসাদা ঘৃত সুলভ হবেই"।

• • •

**আ**মাদেরই "আনন্দবাজারে" "মাছের মা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"মাছের মা-দের কথা এতদিন ভাবিনি। চারিদিকের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে মাছের গর্ভধারিণী এখন আর নেই; আর থাকলেও মাছের বাবা বিবাগী হয়েছেন"!!

• • •

**মা**থাভাঙায় চাউলের মণ ৫৫৲"—একটি সংবাদ-শিরোনামা। —"অন্যান্য স্থানের চালের দরটাও বাজ পড়বার মতোই গেরস্থের মাথায় পড়েছে, মাথা না ভাঙলেও বেঠিক যে হয়েছে তা হলফ করেই বলা যায়"—বলে শ্যামলাল।



• • •

**জ**নৈক পত্রপ্রেরক সর্পাঘাতের চিকিৎসার সন্ধান দিয়াছেন। —"এতে নিঃসন্দেহে জনসাধারণ উপকৃত হবেন। কিন্তু শিরে সর্পাঘাত হলে কোথায় তাগা বাঁধা যায় সে সন্ধান এখনো কেউ দিতে পারেন নি"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

**এ**কটি রুটিতে কিছু পরিমাণ গুড় মাখাইয়া একটা হাঁড়িতে ভিজাইয়া রাখিলে সেই রুটি সাতদিন পর, ডবল হইয়া যায়। সেই রুটি খাইলে যে-কোন রোগ সারে। সংবাদে বলা হইয়াছে রোগ সারিবার পর অন্য রোগীকে রুটিটি দিতে হইবে অথবা হাঁড়িটির মুখ বন্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। সংবাদটা



আসিয়াছে হাওড়া অঞ্চল হইতে। —"সবকিছুই বুঝলাম, শুধু নেপালবাবা কবে হাওড়া এলেন তা-ই বুঝলাম না"—বলে শ্যামলাল।

• • •

**এ**কটি সংবাদে শুনিলাম চন্দ্রলোকে গমনের ব্যয় ৪৭০ কোটি টাকা। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু গোলকধামের চন্দ্রলোকে আমরা শুধু কড়ি চিৎ ক'রে ক'বার গেছি আর ক'বার ফিরে এসেছি! কড়ির মূল্যে না হলেও অন্তত একটি "জনতা এক্সপ্রেসের" ব্যবস্থা না করে দিলে জনগণের আর কী লাভ"।

• • •

**মা**ও সে তুং বিগত দুই বৎসরের মধ্যে চার বার চীনের ইয়াংসি নদী সাঁতার কাটিয়া পার হইয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"নূতন কোন নদী পারাপারের মহড়া চলছে কিনা তা অবশ্য ঠিক বোঝা গেল না"।

• • •

**কো**ন এক পৌরসভার রাজস্ব কমিটির চেয়ারম্যান নগরশুল্ক সংক্রান্ত বিধি অমান্য করায় তাঁরই নিজের স্ত্রীকে ৫০১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা জরিমানা করিয়াছেন। সংবাদে জানা গেল এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকের স্ত্রী আদালতে আপীল করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"নেহাত ঘরোয়া ব্যাপার, কী আর বলব; শুধু মনে পড়ছে—রাজা হয়ে কেন হ'লে হায় বিধাতা"!!

• • •

**দি**ল্লীতে নাকি একটি "অহিংসা বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের পরিকল্পনা চলিতেছে। —"খুবই ভালো কথা। কিন্তু কোন কোন দেশের বিদেশী ছাত্রদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা সেখানে না থাকলে কাজের কাজ কোন কিছু হবে বলে মনে হয় না।"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

**রা**শিয়ার সংবাদে শুনিলাম সেখানে মৌমাছির সাহায্যে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা শুধু মধুর উৎপাদনের কথাই জানতাম। তবে মনে হচ্ছে এই তুলোতে বোনার চেয়ে কানে গোঁজার কাজই হয়ত বেশি হবে—বলা তো যায় না"!!

• • •

'**জ**নৈক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ছাড়া পাওয়ার সুবিধার জন্য একটি পিয়নের কাজ লইবার জন্য দরখাস্ত পেশ করিয়াছে—এই সংবাদটি দিয়াছেন বোম্বাইর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চ্যবন। শ্যামলাল বলিল—"শ্রী চ্যবন হয়ত জানেন না, বর্তমানে চ্যবনপ্রাশ এমনি করেই হয়"!!!

• • •

**প**শ্চিম পাক বিধানসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া মিয়া মমতাজ দৌলতানা বলিয়াছেন যে, ভারতের কোন-কিছু ভালো নয় এ কথা সব সময় ভাবিতে হইবে। প্রসঙ্গত তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁর নিজের ভগ্নী ভারত হইতে একটি ভালো বেনারসী শাড়ি লইয়া আসিলে তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে তাঁর সঙ্কোচ হইবে। —"শোভান আল্লা। কিন্তু ভারত সীমান্তের গরু-বাছুর, ক্ষেতের ধান, গাছের ফল, পুকুরের মাছ এসব হারাম বলে প্রচার করলে বরং ফয়দা হবে—বেনারসী ক' জনেই বা কেনে"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।




## রসরচনা

**বিচিত্র সংলাপ**—প্রমথনাথ বিশী, নর্দার্ন বুক ক্লাব, ৬৭-বি, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

'নামে কি প্রয়োজন, বস্তুটা দেখিলেই চলিবে। এগুলি আর কিছুই নয়, আইডিয়া বা ভাবের বাহন।' এই উক্তিতে লেখক আলোচ্য গ্রন্থের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন। ঐতিহ্যের চিহ্নিত ধারাকে নূতন দৃষ্টিকোণে দেখে উপস্থাপিত করার মধ্যে 'স্টান্টের' যে আকস্মিক চাতুর্য থাকে, এ গ্রন্থে তা নেই। তার কারণ লেখকের বিন্যাসনৈপুণ্য।

পঁচিশটি সংলাপ-রচনায় শ্রীযুক্ত বিশী মহাশয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সর্বকালীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দ্বৈত কথোপকথনের যে শব্দচিত্র এঁকেছেন, তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। Landorএর 'Imaginary Conversations'এর রূপাদর্শ এখানে অনুসৃত হয়েছে, যদিও ল্যান্ডরের ক্লাসিক মানসিকতা এখানে নেই। লেখকের মনের ঝোঁক রস-রচনা ও তত্ত্ব প্রবন্ধের মিলনী ঐক্য। সংলাপগুলি তাই সুতীক্ষ্ণ ও সুভাষিত, সরস ও সারদর্শী। এই জাতীয় রচনায় যে সংযম প্রয়োজন, তা প্রমথনাথের মধ্যে সুপ্রচুর। তাই কোথায় শব্দাড়ম্বর নেই, আছে ভাবসম্পদের অনায়াস উন্মোচন।

এই শ্রেণীর রচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রমথনাথ আমাদের যে আশ্বাস দিলেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। (৩৪৭।৫৮)

**হট্টমালার দেশে**—প্রভাতকুমার গোস্বামী। গণসাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৯। মূল্য—দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি ব্যঙ্গরচনা। কিংবদন্তীর সুবিখ্যাত রাজা হবুচন্দ্র আর তার সুযোগ্য মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে কেন্দ্র করে দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অজস্র গলদকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন লেখক এই বইখানিতে। লাল-ফিতার দীর্ঘসূত্রতা, পরিকল্পনার অসারতা, অতি সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে বাক্যাড়ম্বরে তাকে ফাঁপিয়ে অসামান্য প্রমাণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অর্থের অপচয় আর তাকে ঢাকবার জন্য প্রচার মাহাত্ম্য, বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্ভট পরিকল্পনা, প্রভাবশালীর দাপটে শুভেচ্ছা বিসর্জনের করুণ ইতিকথা—কিছুই এড়িয়ে যায়নি তাঁর দৃষ্টি থেকে। কিন্তু তিনি সেইসব বিস্তৃত কিংবা সুগভীর সমস্যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়াস পাননি, শুধু সেগুলোর ত্রুটি ও অসংগতিগুলো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করে দেখিয়েছেন। বইখানিতে কাহিনীর বিস্তারের মধ্যে রস নেই, সেই রস বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে রচনার বিচ্ছিন্ন অংশে। আর সেই রস স্নিগ্ধমধুর নয়, সেই রস অম্ল ও কষায়। (২৫০।৫৮)

## শিশু-সাহিত্য

**রূপকথার ঝাঁপি**—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২.২৫ নয়া পয়সা।

সাতটি সুন্দর সুখপাঠ্য কাহিনীর সংকলন। 'কামারের মেয়ে' বা 'না-দাদ আর না-ছাড়ি' ধরনের গল্পগুলি পড়ে রোমাঞ্চ হলো আর সৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হতে হলো। অধুনা গোয়েন্দা গল্পের যে দুঃসহ প্রকোপ চলেছে, তা থেকে মুক্তির আনন্দে পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন, সন্দেহ নেই। অনাবিল, সহজাত, রসোজ্জ্বল এই কথা-কাহিনীগুলি পড়লে বোঝা যায় যে, দক্ষিণারঞ্জনের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি বরং নতুন খাতে প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহনের কাছে শিশু-সাহিত্যের স্মরণীয় বহু সংযোজন আশা করি এবং তাঁকে প্রাপ্তিস্বত্রে অভিনন্দন জানাই। (৩৩৭।৫৮)

**মধ্য রাতের সূর্য**—হরপ্রসাদ মিত্র। অঞ্জনা প্রকাশনী, ১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—এক টাকা।

কবি-প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদের পক্ষেই এরকম একটি রমণীয় কাহিনী রচনা করা সম্ভব হয়েছে। ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা মিলেছে

ঘটনার স্বাভাবিক উন্মোচনের সংগে। সব মিলিয়ে একটি প্রসন্ন আবহাওয়া। হরপ্রসাদ মিত্রের কাছে এই শ্রেণীর আরো রচনা আশা করা অন্যায় হবে না। সম্প্রতি কিশোর-সাহিত্যে কথা-সাহিত্যের অংশ লজ্জিত, লাঞ্ছিত। আলোচ্য বইয়ের লেখককে কিশোর পাঠকের দিকে তাঁর রচনার একটি দিক সর্বদা খুলে রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 'মধ্য রাতের সূর্য' এই অনুরোধ জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়েছে।

(৩১১।৫৮)

**মায়ের বাঁশি**—বিমল ঘোষ (মৌমাছি)। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। সাড়ে চার টাকা।

কিশোর সাহিত্য বলে উল্লেখ করলেও আলোচ্য গ্রন্থের আবেদনের সর্বব্যাপিতা অনস্বীকার্য। লেখক শিশু মনস্তত্ত্বের মর্ম-মূলে প্রবেশ করে একটি অপূর্ব জগৎ উদ্ঘাটিত করেছেন। মিঠু চরিত্রটি এক কথায় অবিস্মর্তব্য। তার সংগে টমের হার্দ্য সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে লেখক একটি অখিল সংবেদন-লোক রচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থে লেখক তাঁর একটি বক্তব্য শিল্পসম্মত চাতুর্যে ও মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন। শিশুমন এবং মায়ের মন যে একই চেতনায় আশ্রিত—এই কথাটি কাহিনীর মধ্যে তিনি অসীম শক্তির সংগে অন্তর্গত করে দিয়েছেন এবং তা শুধু তত্ত্বের গাণিতিক উপস্থাপনায় নয়, বাৎসল্য রসের রুচিরার মধ্য দিয়ে সংবেদনায়। ইংরেজী সাহিত্যে এইরকম 'থীসী' দুর্লভ না হলেও বাংলা সাহিত্যে এর ঐতিহ্য এখনো গভীর নয়। 'মায়ের বাঁশি' পড়ে সেই আশা হলো যে, অখণ্ড জীবজগতের প্রাণ চেতনা বাংলা কিশোর-সাহিত্যের মধ্যস্থতায় অগ্রসর হতে থাকবে। মনে পড়লো প্রাকসূরী অবনীন্দ্র-নাথের কথা এবং মনে হলো যে বাংলা সাহিত্যে এর ক্রমোন্মোচন বাধা পাবে না। 'মৌমাছি'কে এরকম একটি অপূর্ব গ্রন্থ উপহার পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(৩৬১।৫৮)





## উপন্যাস

**রামগড়**—অনুরূপা দেবী। গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

একটি বহু পরিচিত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ। ট্র্যাজিডির সংগে অতীত-জগৎ যুক্ত করার কাজে অনুরূপা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সেই অগ্রসৃতি অভিনন্দিত হবার যোগ্যতা রাখে।

'ঐতিহাসিক উপন্যাসের চক্ষে না দেখিলে এর ঐতিহাসিক ত্রুটি মার্জনীয় হইতে পারিবে ভরসা করিতেছি' গ্রন্থকর্ত্রীর এই উক্তি শুধু স্বরচিত গ্রন্থের সমর্থনপ্রসূত নয়, রোমান্স রঞ্জিত অতীতের প্রতি তাঁর প্রবণতা সূচিত করে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তাঁর সারার্থবাহী উক্তি 'বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষিত রামগড়ের পুনর্মুদ্রণ এতদিন সম্ভব-পর হয় নাই, সে ত্রুটি আমার বা এই পুস্তকের নহে'—এই বক্তব্যে তাঁর যে আত্মসচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে, তা যথার্থ। 'রামগড়ে' তিনি একটি অবিস্মরণীয় রোমান্সের ক্ষেত্র বিস্তার করেছেন এবং পাঠকমাত্রই সে জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন।

ভাষার গরিমা এবং ঘটনার স্বাভাবিক সংস্থাপনা 'রামগড়' উপন্যাসকে একটি চিত্তহারী শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। (৩৫৮।৫৮)

## স্মৃতিকথা

**আমার কথা।** কথক—ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ। অনুলেখক—শুভময় ঘোষ। গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা-১২। মূল্য—দেড় টাকা।

রত্নাসাগর গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ গ্রন্থ ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁর আমার কথা। বইখানি গ্রন্থ-মালার পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এই বই আল্লাউদ্দীন খাঁর পূর্ণাংগ জীবনী নয়, তাঁর শিল্পকর্মের আলোচনাও নয়। ১৯২৫ সালে বিশ্বভারতীর দ্বিজেন্দ্র অধ্যাপক হিসাবে

আল্লাউদ্দীন খাঁ সাহেব যখন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় আশ্রমবাসীদের তিনি নিজের মুখে তাঁর জীবনের যে গল্প বলেছেন, তাঁর নিজের জবানীতে তাঁর সেই জীবনীই পাঠককে উপহার দিয়েছেন অনুলেখক।

বইখানিতে এই সংগীতগুরুর জীবনের মূল সত্যটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, আর প্রকাশ পেয়েছে সেই সঙ্গে তাঁর সংগীত-সাধনার ইতিবৃত্ত, যা অনেকেরই ছিল অগোচর। সংগীতগুরুর এই জীবনসাধনার পরিচয় সকলের সামনে উপস্থিত করার জন্য অনুলেখক রসিকজন মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। ৪৪১।৫৭

## বিদেশী সাহিত্য

Twenty-Three Tales—Leo Tolstoy. Jaico Publishing House. Price 2.50.

টলস্টয়ের তেইশটি গল্পের এই সংকলনটিতে পাঠক সবিশেষ প্রীত হইবেন। গল্প সংকলনটির গ্রন্থনে কতকগুলি নীতি গৃহীত হইয়াছে দেখিলাম। শিশুদের জন্য লিখিত গল্প, জনপ্রিয় অথবা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত কাহিনী, রূপকথা, লোক-কাহিনী, অনুবাদ ইত্যাদি শাখার ২৩টি গল্প সংগৃহীত হওয়ায় সাধারণ পাঠকের সম্ভবত সুবিধাই হইবে। মোটামুটিভাবে শিল্পী টলস্টয়ের ও আদর্শবাদী টলস্টয়ের পরিচয় পাইতে পাঠককে গ্রন্থটি সাহায্য করিবে।

What Men Live by, Where Love Is God is, How much Land does a man need. The Coffee house of Surat, Three questions, The bear Hunt—

প্রভৃতি টলস্টয়ের বিখ্যাত গল্পগুলি এই গ্রন্থে আছে। ৫৬।৫৮

## বিবিধ

**আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙলার স্থান**—সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। শরৎ পুস্তকালয়। ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। দাম ৩·৫০ নয়া পয়সা।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙলার স্থান"—একটি সময়োপযোগী এবং মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদে হিন্দী সাহিত্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালী লেখকদের প্রভাব অতি সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। লেখক অনুমান অথবা কল্পনা বলে যাহা খুসি লেখেন নাই—তাঁহার বক্তব্য বিস্তৃত প্রমাণ দ্বারা সুগঠিত।

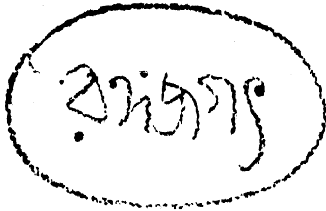
বাংলার অভ্যুদয় ও হিন্দী সাহিত্যের আধুনিকতা, হিন্দীর প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় বাঙালী, হিন্দী সাময়িকপত্রে বাঙালী, আধুনিক হিন্দী নাটক এবং আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব—মোট এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে একটি সুন্দর এবং যথাসম্ভব উপযোগী আলোচনা যে সফল হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শেষ দুইটি পরিচ্ছেদের প্রতি বাঙালী পাঠক ও লেখকদের আকর্ষণ স্বভাবতই বেশি হইবে।

**মহাপূজা ও মহাতাপস (প্রথম প্রবাহ)**—শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, ঋতম্ভরা, ত্রিবেণী হুগলী। মূল্য ২৷৷০। ১৩৬৪।

আলোচ্য পুস্তক ষড়ৈশ্বর্যময়ী কৈবল্যদায়িনী শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজার সুন্দর বর্ণনা। লেখক তাহার জলদ গম্ভীর ভাষায় যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করিবেন তাহা সন্দেহ নাই। ইহা মুগ্ধ পাঠককে ভক্তিদান করিবে।

শুধু মাত্র একটি কথা বলা যায়, যে দশ মহাবিদ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে যেমন লেখক তত্ত্বগত-স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার রূপ বর্ণনা করা একান্ত উচিত ছিল। কারণ দশ মহাবিদ্যার চিত্র যাহা আমরা পাই তাহা লোকে জানে, তাহার সহিত আদত রূপের কত যে ভেদ তাহা পাঠক সাধারণ বুঝিয়া লইত। ৩০৭।৫৮




### চন্দ্রশেখর

**বাঙলা নাটকের গতি ও প্রকৃতি**

গত ৩০শে আগস্ট বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গিরিশ নাটক সেমিনারের উদ্বোধন হয়। ঐ উদ্বোধনী সভায় গিরিশ নাট্য প্রতি-যোগিতার অন্যতম বিচারক অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ বর্তমান বিশ্বনাট্য সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা নাটকের গতি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বর্তমান শতাব্দীর নাট্যধারার প্রথম পর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইবসেন, শেকভ, স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি নাট্য-কারের প্রভাবই দেখা যায়। অপেশাদারী নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাতও বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে দেখা যায়। ১৯২০ সালের পরে নাটকে সমাজ ও অর্থচেতনা বড় হয়ে উঠলো এবং নাটক অনেক স্থানেই প্রচারধর্মী হয়ে উঠলো। বাস্তবধর্মী নাটকের পাশে কাব্যনাটকের ধারাও বর্তমান কালে দেখা যায়। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার নাট্য আন্দোলন প্রবল-ভাবেই অগ্রসর হতে থাকে। সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্বেও বিশ্ব নাট্য সাহিত্য বর্তমানে বিশেষ সমৃদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে।

বাঙলা নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ঘোষ বলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকেই নাটকের আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটক গীতিধর্মিতা সত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় আবেগ পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং তাঁর মানবিকতা মন্মথ রায়ের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকটের রূপ আমরা পেলাম তারাশংকর, মনোজ বসু ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের মধ্যে। ভারত স্বাধীন হবার পর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, মন্বন্তর ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিল। এই সব সমস্যা নিয়েই তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, সলিল সেন প্রভৃতি বাস্তবধর্মী নাটক লেখেন।

পরিশেষে অধ্যাপক ঘোষ বলেন যে, শ্রেণী ও মতদ্বন্দ্বকে ব্যক্তিহৃদয়ের দ্বন্দ্বে পরিণত

করতে পারলেই নাটক রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। সেজন্য নাটককে বুদ্ধি ও তত্ত্বের স্তর থেকে আবেগের স্তরে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তবেই তা দর্শকদের আনন্দ দান করতে পারবে।

## চিত্রালোচনা

বাংলা ছবির নির্মাতারা পাল-পার্বণ দেখে নতুন ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করেন সাধারণত। এবারে কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। জন্মাষ্টমীর শুভ লগ্নে যে সপ্তাহের শুরু, বাংলা ছবির দিক দিয়ে তা একেবারে নিষ্ফলা। কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণের ফলে এমনটা ঘটেছে কিনা সেবিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আবার একই সপ্তাহে এক সঙ্গে দু'তিনখানা নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পাওয়ার উদাহরণ বিরল নয়। পুজোর মুখে ঐ ধরনের ঘটনা নতুন করে ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার লাগাম যাদের হাতে, তাঁদের সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না এই ধরনের বেহিসেবী কাজে।

এ সপ্তাহে নতুন হিন্দী ছবির সংখ্যা দুই—নাগিনা ফিল্মসের "পোস্ট বক্স ৯৯৯" এবং দীনেশ ফিল্মসের "রাজ প্রতিজ্ঞা।" একখানি সামাজিক ও অপরটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে গঠিত।

"পোস্ট বক্স ৯৯৯"-এর প্রযোজক ও পরিচালক রবীন্দ্র দাভে রহস্যচিত্রের নির্মাতা হিসাবে হিন্দী ছবির রাজ্যে নাম করেছেন। এ ছবিতেও তিনি তাঁর সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুনীল দত্ত ও শকিলা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন পূর্ণিমা, লীলা চীটনিস, কৃষ্ণকান্ত, মির্জা মুসারফ, মনোরমা, তিওয়ারী ও অমরনাথ। কল্যাণজী বীরজী সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

পাতিব্রত্য ও দেশপ্রেমের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে, তখন কোনটিকে ফেলে কোনটির ডাকে সাড়া দেবে ভারতের নারী? এমনি এক নারীকে কেন্দ্র করে "রাজ প্রতিজ্ঞা"র কাহিনী। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিরূপা রায়। তাঁর সঙ্গে যারা ছবিতে অংশ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জয়রাজ, বি এম ব্যাস, সুন্দর, সবিতা, রমেশ সিংহ এবং অরুণ। যশোবন্ত ঝাবেরী ও সম্মথবাবু যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

আসছে হপ্তায় বিমল রায়ের নবতম হিন্দী ছবি "মধুমতী"র সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুক্তি। ছবিখানি এর প্রযোজক

পরিচালকের সৃজনধর্মী প্রতিভার অন্যতম বাহক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। দিলীপ-কুমার ও বৈজয়ন্তীমালা এর মুখ্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন। কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে এর অধিকাংশ বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। সলিল চৌধুরীর সুর ও বৈজয়ন্তীমালার নাচ এই ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

• • •

এ ভি এম স্টুডিওজ ও অরুন্ধতী মুখার্জী কম্বাইন এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এরই পতাকাতলে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রযোজক জীবনে প্রবেশ করছেন। এ'দের প্রথম ছবি "আকাশ পাতাল" বাংলায় তোলা হবে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় এর গল্পলেখক ও পরিচালক। নায়িকার অংশ নেবেন অরুন্ধতী নিজেই। অন্যান্য ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, দুর্গা খোটে, পান্ডারী বাই, জহর রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা সেন, চন্দ্রা দেবী প্রভৃতি।

• • •

নতুন বাংলা ছবিগুলির মধ্যে রায়কৃষ্ণ ফিল্মসের "সেবা" ও অভিনয় ভারতীর "গানের হাউস"'র শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। "সেবা"র পরিচালনা করছেন ভোলা আঢ্য। ভূমিকালিপিতে আছেন অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, মলয়া সরকার, কমলা মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। "গানের হাউস"'র মুখ্যাংশে অভিনয় করছেন রেণুকা রায়, অঞ্জলি দাস, কবিতা রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর রায় প্রভৃতি। পরিচালকের নাম রমেন মুখোপাধ্যায়।

**• ঘর যারে নাহি দিল ঠাঁই**

একটি সরল, সৎ, সুন্দরী তরুণীর দুর্ভাগ্যকে কেন্দ্র করে 'সাহারা'র চিত্র-কাহিনী গড়ে উঠেছে। 'সাহারা'র নায়িকার নাম লীলা। পিতৃমাতৃহীন এই অনাথিনীর দিন কাটে কাকার সংসারে। কাকা, কাকিমা এবং একটি খুড়তুতো বোন মিলে লীলার কাকার সংসার। সেখানে লীলা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। কাকা ভালোমানুষ। কিন্তু কাকিমাটি, শাদা বাঙলায়, দজ্জাল।

যাই হোক ভাগ্যচক্রে লীলার বিয়ে হ'য়ে গেলো মস্ত এক ধনী পরিবারে। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই ঘটলো লীলার জীবনের চূড়ান্ত দুর্ঘটনা।

লীলার ননদ তরুণী; তার একজন প্রেমিক ছিলো। উৎসবের রাত্রে একান্তে বসে ওরা দুজন প্রেমচর্চায় মগ্ন, এমন সময় অকুস্থলে লীলার দাদার প্রবেশ। প্রেমিক সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিলো, আর মেয়েটি তার দাদাকে বোঝালো যে এই পলাতক প্রেমিক বৌদির—মানে লীলার—প্রণয়াসক্ত। লীলার স্বামী লীলার কোনো কথাই শুনলো না, প্রাণের দুঃখে অনেক কটু কাটব্য করলো লীলাকে।

কিন্তু লীলার শ্বশুরমশাই লীলার কাছে এসে বললেন যে, লীলার পবিত্রতায় তিনি কোনো সন্দেহ করেন না। আসল ঘটনা তিনি জানেন। কিন্তু পারিবারিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে তিনি লীলার কাছে প্রার্থনা করলেন—লীলা যেন এখান থেকে চলে যায়।

তাই হলো। লীলা চলে গেলো কাকিমার কাছে। কিন্তু দজ্জাল কাকিমা তাকে আশ্রয় দিলেন না, তাড়িয়ে দিলেন।

তারপর লীলা পড়লো গমন সিং আর তার স্ত্রী স্বরূপবাঈয়ের খপ্পরে। ওরা দু-জনেই সাংঘাতিক চরিত্রের মানুষ। অন্ধ-আতুরের ব্যবসা ওদের। অর্থাৎ, নানারকম ভিক্ষুকের দল আছে ওদের অধীনে। তারাই ওদের অর্থোপার্জনের উপায়।

চোখে ওষুধ দেবার ছল করে ওরা লীলাকে অন্ধ করে দিলো। রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে সে ভিক্ষে করে। এমনিভাবে দিন যায়।

তারপর একটি বালকের আগমন ঘটলো। কোত্থেকে এলো সে? গমন সিং কিনেছে বালকটিকে। কেন? ওকে ভিক্ষুক বানাবে।

কিন্তু এই বালকটিকে নিয়েই বিভ্রাটের সূত্রপাত হলো, অবশ্য পরে। লীলার সঙ্গে ছেলেটির একটি স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। লীলাকে 'মা' বলে ডাকতে লাগলো সে।

ওদিকে লীলার স্বামী উত্তাদিনে আসল ঘটনা জানতে পেরেছে, জানতে পেরেছে যে লীলা পবিত্র। উত্তেজনার বশে সকল অঘটনের মূলে নিজের বোনকে খুন করলো লীলার স্বামী। মেয়ের শোক সহ্য করতে না পেরে লীলার শ্বশুরও আত্মঘাতী হলেন। লীলার স্বামী লীলাকে খুঁজতে খুঁজতে একদিন এলো গমন সিংয়ের বস্তিতে। কিন্তু লীলা তখন বস্তিতে ছিলো না; গমন সিং আর স্বরূপ বাঈয়ের ষড়যন্ত্রে পুনরায় লীলার স্বামী ভুল করলো, ভুল বুঝলো লীলাকে। লীলার সঙ্গে দেখা না করেই লীলার স্বামী চলে গেলো।

তারপর ঘনিয়ে এলো লীলার দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটার লগ্ন।

লীলার পালিতপুত্র, দেখা গেলো, লীলারই খুড়তুতো বোনের ছেলে। ঘটনার জট খোলবার সঙ্গে সঙ্গে বালকটি পিতৃ-গৃহে গেলো। এরপর লীলার স্বামীর সব ভুল ভাঙতে দেরী হল না। সে নিজে এসে লীলাকে সাদরে নিয়ে গেলো।

* * *

কুলদীপ শেহ্‌গালের কাহিনীসূত্র অব-লম্বন করে তসভিরিস্তান নিবেদিত 'সাহারা'র চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন স্বয়ং পরিচালক লেখরাজ ভাখরি। 'সাহারা'র আখ্যানভাগ অত্যন্ত দুর্বল। পরিবেশনের ধারাও অতিনাটকীয়। তবে চিত্রনাট্যকার 'সাহারা'য় শেষপর্যন্ত দর্শকের কৌতূহল অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন—এইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব।

ছবিখানির টেকনিক্যাল কাজ সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। 'সাহারা'র ডিরেক্টর অফ ফোটোগ্রাফি রণবোধ ঠাকুর, অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান রামনয়াক; শব্দযন্ত্রী মোহন দধীচ ও কৌশিক। সম্পাদক লক্ষ্মণদাস ও আপন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন।

অভিনয়ে প্রথমেই লীলার ভূমিকায় মীনাকুমারীর নাম করতে হয়। এই প্রতিভা-ময়ী অভিনেত্রী যথার্থই অনবদ্য অভিনয় করেছেন 'সাহারা'য়। এখানে মীনাকুমারীর প্রতিটি মুহূর্তের অভিনয় এমন জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী হয়েছে যে তাঁর অভিনয়কে কখনো অভিনয় বলেই মনে হয় না।

নায়িকার পালিত পুত্রের ভূমিকায় ডেইজি ইরাণীর অভিনয়ও যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি উপভোগ্য। স্বরূপ বাঈয়ের ভূমিকায় কুলদীপ কাউরের অভিনয়, একটু অতি-নাটকীয়তা সত্ত্বেও, প্রশংসনীয়। অন্যান্য অভিনয় চলনসই।

'সাহারা'র সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্তকুমার। কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত—এই উভয় ক্ষেত্রেই সংগীত-পরিচালক হেমন্তকুমারের পূর্ব খ্যাতির মর্যাদা সুরক্ষিত হয়ে রইলো।

পরিশেষে কিন্তু একটি প্রশ্ন জেগে থাকে 'সাহারা' সম্বন্ধে। সেন্সররা একদা আপত্তি তুলতেন যদি খুনী বা অন্য কোন অপরাধীর শাস্তির উল্লেখ না থাকত ছবিতে। 'সাহারা'য় দেখা গেল নায়িকার স্বামী নিজের বোনকে খুন করেও পুলিসের কবলে পড়ল না, বরং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে তার সুখেরই ইঙ্গিত রয়েছে ছবির শেষে। সম্প্রতি কি সেন্সরদের আইনকানুনের পরিবর্তন ঘটেছে? ছবি যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের স্বার্থেই ব্যাপারটা জানা দরকার।

## বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণ ভারতের উটকামণ্ড অঞ্চলে কাঁচা ফিল্মের কারখানা স্থাপনের যে জল্পনা-কল্পনা চলছিল তা অবশেষে ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। পূর্ব জার্মানীর আগ্‌ফা কোম্পানীর সহযোগিতায় এই কারখানা চালু করা হবে, খরচ পড়বে প্রায় আট কোটী টাকা। এর জন্যে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে তা যোগাবেন আগ্‌ফা কোম্পানী।

*

অক্টোবর মাসে দিল্লীতে "ভারত ১৯৫৮" নাম দিয়ে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, ভারতীয় ফিল্ম শিল্পের তরফ থেকে তাতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইন্ডিয়া। ভারত গভর্নমেন্টের ফিল্মস্ ডিভিসানও এঁদের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে স্টল নেবেন।

*

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর এম পি স্টুডিওতে সিনে ইন্ডিয়ার প্রথম প্রচেষ্টা "মৌসুমী"র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

*

ফরাসী রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জাক শেরে আগামী সোমবার কলকাতায় আসছেন। তিনি এখানে পাঁচদিন থাকবেন এবং ফরাসী নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেবেন। যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনতে চান, থিয়েটার সেণ্টারে (৩১এ চক্রবেড়িয়া রোড) তাঁরা সমস্ত খোঁজ-খবর পাবেন।

### রবিশঙ্করের সেতার বাদ্য

প্রতীচোর সংগীত রসিকরা পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার বাদনের মধ্যে এক নূতন রসলোকের সন্ধান পেয়েছেন। তাই ওদেশ থেকে তাঁর বার বার ডাক আসছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের নানান দেশের

নিমন্ত্রণে তিনি আবার পশ্চিমে যাত্রা করছেন এই মাসের শেষে।

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে রবিশংকর কলকাতায় একদিন বাজাতে স্বীকৃত হয়েছেন তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুদের অনুরোধে। একদিনের আসর, অথচ শ্রোতার সংখ্যা হাজার হাজার। তাই স্থির হয়েছে বিরাট একটি মণ্ডপ নির্মাণ করে সেইখানে বাজনার ব্যবস্থা করা হবে। ৪৮নং গড়িয়া-হাটা রোডস্থিত সিংহী পার্কে এই মণ্ডপ নির্মিত হবে। আসর বসবে রবিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। প্রবেশমূল্য যাতে যথাসম্ভব কম রাখা যায় উদ্যোক্তারা সেদিকে নজর রাখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

### বিশ্ব-চলচ্চিত্র সম্মেলন

এডিনবরায় দ্বাদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে সেখানে একটি বিশ্ব-চলচ্চিত্র সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র-নির্মাণকারী সকল দেশের প্রতিনিধিরা সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সেখানে আহূত হয়েছেন প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার, পরিবেশক, প্রদর্শক এবং সমালোচক।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বর্তমান যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা নতুন প্রথা-পদ্ধতির ফলে চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি এখন দ্রুতছন্দে পরিবর্তনশীল। বর্তমান যুগ চলচ্চিত্রের প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এই প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্যোক্তারা আনন্দিত। তাঁরা মনে করেন, এসব চলচ্চিত্রের পক্ষে নতুন প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষার উৎসস্বরূপ।

এডিনবরার এই চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্দেশ্য এই ধরনের অন্যান্য উৎসব থেকে একটু স্বতন্ত্র। এখানে প্রতিযোগিতামূলক কোন পুরস্কার দেওয়া হয় না। এই উৎসব সম্মানিত করে বর্তমান যুগের ভাষাকার চলচ্চিত্রকে, মৌলিকতা ও সার্থক কল্পনায় যেসব চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে, সেইসব চলচ্চিত্রের প্রতি পৃথিবীর চলচ্চিত্রামোদী জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করাও এই বার্ষিক উৎসবের উদ্দেশ্য। চলচ্চিত্রের বর্তমান গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণও উৎসবের কার্যতালিকার অন্তর্গত।

উদ্যোক্তাদের ধারণা, এডিনবরার এবারকার এই উৎসব ঔজ্জ্বল্যে এডিনবরার পূর্ববর্তী সমস্ত চিত্রোৎসবকে ম্লান করে দেবে।

চলচ্চিত্র-শিল্পে ফরাসী দেশের মহৎ অবদানকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এবারকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তৃতীয় সপ্তাহে উদ্‌যাপিত হবে 'ফরাসী চলচ্চিত্র সপ্তাহ।' এতদুপলক্ষে আমন্ত্রিত হবেন কয়েকজন বিশিষ্ট ফরাসী পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা ও চিত্রনাট্যকার এবং প্রদর্শিত হবে কয়েকটি সাম্প্রতিক ফরাসী চলচ্চিত্র।




**একলব্য**

দক্ষিণ চীনের একটি ফুটবল টীম প্রদর্শনী খেলার জন্য কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেও ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের কাছ থেকে খেলা অনুষ্ঠানের অনুমতি না পাবার ফলে এখানে তাদের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। চাইনিজ দলের খেলার কথা ছিল বোম্বাইতে এবং কলকাতায়। কিন্তু কোন জায়গাতেই তাদের খেলার ব্যবস্থা হয়নি। সুতরাং চাইনিজ খেলোয়াড়দের অহেতুক গাঁটের পয়সা খরচ হয়েছে আর কলকাতায় এসে অনভিপ্রেত অতিথির মত কাল যাপন করে তাদের বর্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়েছে। ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে ঘটনাটি অভিনব। আজ পর্যন্ত কোন বিদেশী ফুটবল টীম এইভাবে না-খেলার মনোকষ্ট নিয়ে ভারত থেকে ফিরে গেছে বলে আমাদের জানা নেই।

হংকং ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ভারতের ফুটবল সংস্থাও চীন দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হংকং ফুটবল এসোসিয়েশন এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, একাধিকবার হংকং ফুটবল সংস্থা ভারতীয় ফুটবল দলকে আতিথ্য দিয়ে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেছে। অথচ সেই হংকং দল ভারত থেকে না খেলে ফিরে গেল! কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? হংকং দলের খেলার ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমতি না দেবার নিশ্চয়ই কোন সংগত কারণ আছে। ভারতে বিদেশী টীমের খেলার ব্যবস্থা করে ঘাটতি বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করা নিশ্চয়ই ভারত সরকারের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্নই কি এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে? খবরে প্রকাশ, চাইনিজ খেলোয়াড়দের ভারতে আসার 'ছাড়পত্রের' 'গোলমালই' এই খেলার ব্যবস্থায় অন্তরায় সৃষ্টির প্রধান কারণ। হংকং থেকে সফরের ব্যবস্থা হলেও দলটি হংকং থেকে ভারতীয় 'ভিসা' সংগ্রহ করেনি। সংগ্রহ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ম্যাডাগাস্কারের ভারতীয় দূতাবাস থেকে। কারণ দলটি প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যা সংগ্রহ করেছে, তাও 'ভিসা' নয়— ট্রানজিট পারমিট। অর্থাৎ এর বলে ভারতে অবস্থান করা যায় না, ভারতের মধ্য দিয়ে অন্য দেশে যাওয়া যায় মাত্র। এছাড়া আরও আছে। চাইনিজ দলের সমস্ত খেলোয়াড় হংকংয়ের (ব্রিটিশ উপনিবেশ) অধিবাসী নয়। এশিয়ান গেমে হংকং দলের পক্ষে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তাদের কয়েকজন খেলোয়াড় আছে আবার ফরমোজার (জাতীয়তাবাদী চীন) পক্ষে যারা এশিয়ান গেমে অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল, তাদের অনেকে আছে। ঘটনাচক্রে এবং খেলার প্রয়োজনে আজ এরা একতাবদ্ধ হয়ে ফুটবল সফরে বেরিয়েছে। কিন্তু ফরমোজার সঙ্গে ভারতের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তাই এই ধরনের অবাঞ্ছিত সংমিশ্রণকে প্রশ্রয় দেবার ক্ষেত্রেও হয়তো কিছুটা অসুবিধা আছে। কিন্তু সে অসুবিধার কথাও বিবেচনা করা হয়নি। যারা ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছে, ভারতে অবস্থানের তাদের যদি আইনসংগত 'ভিসা' না থাকে, তবে তাদের খেলার ব্যবস্থা করা যায় কিভাবে?

ভারতের জনসাধারণ বা ভারত সরকার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কোনদিন রাজনৈতিক মতবাদের প্রশ্রয় দেয়নি। তাই চাইনিজ খেলোয়াড়রা ভারতে অবস্থানের আইনসংগত 'ভিসার' অধিকারী হলে নিশ্চয়ই এখানে তাদের খেলার ব্যবস্থা হত। বিশেষ করে পঞ্চশীলের প্রবর্তক এবং অতিথিপরায়ণ ভারত সরকারের খেলার আয়োজনে অনুমতি না দেবার কোনই কারণ ছিল না।

আজকের এই অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীই বিশেষভাবে দায়ী। প্রকাশ, বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে এবং তাদের অনুমতি ব্যতিরেকেই ফুটবল কর্তৃপক্ষ হংকং ফুটবল এসোসিয়েশনের সঙ্গে এই প্রদর্শনী খেলার কথাবার্তা চালিয়েছেন। খেলার ব্যবস্থা এবং দেনা-পাওনাও ঠিক করে ফেলেছেন। ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের অনুমতি পাবার পর খেলার ব্যবস্থা করলে আজ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হত না।

যাই হক, অযথা পয়সা খরচ এবং



রুশ-মার্কিন অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ডেকাথলনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুই দেশের দুই বিশ্বখ্যাত অ্যাথলীট আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট রাফের জনসন ৮৩০২ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান এবং রাশিয়ার কুজনেৎসফ ৭৮৯৭ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

অহেতুক হয়রানির জন্য হংকং ফুটবল এসোসিয়েশন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ করবে বলে হুমকি দেখিয়েছে। তাই ব্যাপারটা আরও কিছুদূরে গড়াতে পারে, কিম্বা এখানেই এর উপর যবনিকা পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে বৈদেশিক দলের এই ধরনের খেলার আয়োজন করে আর যেন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করা না হয়।

* * *

শুধু ভারত কেন, খেলাধুলোর যারা প্রকৃত পূজারী, তারা কোনদিন খেলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদকে বড় করে দেখে না। এই যে বিশ্বব্যাপী ঠান্ডা লড়াইয়ে দুই শিবিরে বিভক্ত দুই প্রধান রাষ্ট্র আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া। এরাও কি খেলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদকে বড় করে দেখেছে? কিছুদিন আগের কথা। লেবাননে আমেরিকার সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে একদিকে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে আরম্ভ হয়েছে বাদ প্রতিবাদ এবং অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগের লড়াই, অপরদিকে রাশিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্রে চলেছে মার্কিন ও রুশ অ্যাথলীটদের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপের পাল্লা। খেলাধুলোর পবিত্র ক্ষেত্র শুধু পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদকেই অস্বীকার করেনি, বর্ণ-বৈষম্যও অস্বীকার করেছে—অস্বীকার করেছে উচ্চ নীচ এবং ধনী নির্ধনীর প্রভেদ।

রুশ-মার্কিন অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় আমরা দেখেছি বিশ্বের দুই কীর্তিমান সর্ববিশারদ অ্যাথলীট রাফের জনসন ও ভ্যাসিলি কুজনেৎসফ গলাগলি করে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাফের জনসন আমেরিকার কালো চামড়ার নিগ্রো অ্যাথলীট, ডেকাথলনের বিশ্বখ্যাত চ্যাম্পিয়ন, আর ভ্যাসিলি কুজনেৎসফ সোভিয়েট রাশিয়ার ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন। ক্রীড়াক্ষেত্রে এরা দেশের পার্থক্য ভুলেছেন, সাদা-কালোর পার্থক্য ভুলেছেন—ভুলেছেন রাজনৈতিক মতবাদ।

সমস্ত দেশই ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনৈতিক মতবাদের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে চায়—শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া। দক্ষিণ আফ্রিকার উৎকট বর্ণবিদ্বেষ আজ ক্রীড়াক্ষেত্রকে কলুষিত করে তুলেছে। ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে কোনদিন বর্ণবিদ্বেষ দেখা যায়নি, রাজনৈতিক মতবাদও প্রাধান্য পায়নি। তাই ভারত সরকার যখন চাইনিজ দলের প্রদর্শনী খেলার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছেন, তখন বুঝতে হবে, এর পেছনে নিশ্চয়ই আরও কোন গূঢ় কারণ বিদ্যমান।

* * *

ইংলণ্ড ও নিউজিল্যান্ডের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার ফলে ইংলণ্ড পাঁচটি টেস্ট খেলায় বিজয়ী হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে বলছি এই জন্য যে, উপর্যুপরি চারটি টেস্ট খেলার বিজয়ী ইংলণ্ডের পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও জয়লাভের সমস্ত সুযোগ ছিল। কিন্তু বৃষ্টির ফলে পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা মাত্র দুই দিন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংলণ্ড জয়লাভ করতে পারেনি।

যত শক্তিহীন দলই হোক কোন দলের বিরুদ্ধে পরপর পাঁচটি টেস্ট খেলার জয়লাভ করা সত্যই এক দুর্লভ সম্মান। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কোন দেশই এ সম্মান লাভ করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া একবার নয়, দুবার লাভ করেছে এই দুর্লভ সম্মান। ১৯২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ১৯৩১-৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাঁচটি টেস্টে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

ইংলণ্ডের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক পিটার মে, যিনি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডকে ১৪টি টেস্ট খেলায় বিজয়ীর সম্মান এনে দিয়ে আগেই নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছেন, শেষ টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণের ফলে তার টেস্ট খেলায় অধিনায়কত্ব করবার রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক উডফুলের রেকর্ডকে স্পর্শ করেছে। উডফুল ২৫টি টেস্ট খেলায় নিজ দেশের অধিনায়কত্ব করেছিলেন, পিটার মেও ২৫টি খেলার অধিনায়কত্ব করেছেন।

'কেনিংটন ওভ্যাল' মাঠে ইংলণ্ড ও নিউজিল্যান্ডের পঞ্চম টেস্ট খেলাটি আরম্ভ হয় আগস্টের ২১ তারিখে আর খেলার উপর যবনিকা পড়ে আগস্টের ২৬ তারিখে। প্রথম দিনের খেলায় নিউজিল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংস ১৬১ রানে শেষ হবার পর ইংলণ্ড কোন উইকেট না হারিয়ে ৩০ রান তোলে। পরের দিন বৃষ্টির জন্য মাত্র ১০ মিনিট খেলা হয়, কিন্তু আর একটি রানও যোগ হয় না। বৃষ্টির জন্য তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন খেলা একেবারেই বন্ধ থাকে। পঞ্চম দিন ইংলণ্ড দল দ্রুত রান তোলার জন্য পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করে এবং ৯ উইকেটে ২১৯ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলা শেষ হতে পৌনে তিন ঘণ্টা বাকি এবং ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে নিউজিল্যান্ডের ৫৮ রানের প্রয়োজন। নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়রা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং আরম্ভ করেন এবং ৩ উইকেটে তাদের ৯১ রান উঠলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে। ফলে শেষ খেলাটির ফলাফল থাকে অমীমাংসিত।

পঞ্চম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড—

**নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস—১৬১** (এ মইয়ির নট আউট ৪১, জে রিড ২৭, এ ম্যাকগিবসন ২৬, এল মিলার ২৫; ট্রুম্যান ৪ রানে ২ উইঃ, লক ১৯ রানে ২ উইঃ, বেলী ৩২ রানে ২ উইকেট)।

**ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—**(৯ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ২১৯ (ট্রুম্যান নট আউট ৩৯, সি এ মিল্টন ৩৬, পি রিচার্ডসন ২৮, টনি লক ২৫; ম্যাকগিবসন ৬৫ রানে ৪ উইকেট ও রিড ১১ রানে ২ উইকেট)।

**নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস—**(৩ উইঃ) ৯১ (জন রিড নট আউট ৫১, বার্ট সাটক্লিফ নট আউট ১৮)।

(খেলা অমীমাংসিত)

* * *

কলকাতার প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব এবার আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতাতেও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। সম্প্রতি খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় এরা সাউথ ইস্টার্ন রেলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে লাভ করেছে আন্তঃ রেল ফুটবলের বিজয়ীর পুরস্কার 'রেনী কাপ'। আন্তঃ রেল ফুটবলে বিজয়ীর সম্মান লাভ অবশ্য ইস্টার্ন রেলের কোন নতুন সম্মান নয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার তারা রেনী কাপ ঘরে তুলেছে। তবু এবারের জয়লাভের ফলে রেল দলের চ্যাম্পিয়নসিপ লাভের কৃতিত্ব অধিকতর উজ্জ্বল হয়েছে।

গত ১০ বছর ধরে খড়্গপুরে আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালিত হয়ে আসছে। ফলে সাউথ ইস্টার্ন রেলের শিল্পনগরী খড়্গপুর বাংলার এক প্রধান ফুটবল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখানকার 'সেরা' ফুটবল স্টেডিয়ামকে সত্যিই বাংলার অন্যতম সেরা স্টেডিয়াম বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। 'সেরা' স্টেডিয়াম অর্থাৎ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন স্টেডিয়াম। পাঁচটি শব্দের প্রত্যেকটির ইংরাজি আদ্যাক্ষর নিয়ে নামকরণ করা হয়েছে এস ই আর এ এ স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের চমৎকার পরিবেশ। এখানে ১৮ হাজার দর্শকের বসবার মত ব্যবস্থা আছে।

আন্তঃ রেল ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই খড়্গপুরের রেলনগরীতে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জাগে। এবারের উৎসাহ উদ্দীপনা বোধ হয় আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি দিনই খেলা দেখবার জন্য দর্শক সমাগমে স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরে গেছে। ফাইন্যাল খেলার দিন স্টেডিয়ামে তিল ধারণের জায়গা ছিল না বললেও অত্যুক্তি

হয় না। খেলা আরম্ভের বহু আগে দর্শক-দের ভীড়ের ফলে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। বহু সহস্র হতাশ দর্শককে খেলা না দেখে ফিরে যেতে হয়। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র আন্তঃ রেল ফুটবল ফাইন্যাল খেলার ধারা বিবরণী খড়্গপুর থেকে প্রচারের আয়োজন করেছিলেন। বহু দর্শক এই বিবরণী শুনেই সন্তুষ্ট হয়।

আন্তঃ রেল ফুটবলে এবার যোগ দিয়ে-ছিল ১৪টি রেল দল। অবশ্য সাউথ ইস্টার্ন ও সেণ্ট্রাল রেলের দুটি করে দল নিয়েই ১৪ সংখ্যা পূর্ণ হয়। কয়েকগুলি খেলার উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। ইস্টার্ন রেল ও সাউথ ইস্টার্ন রেলের ফাইন্যাল খেলাটিও হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ক্লডিয়াস, ভারাদু ও মেওয়ালালের মত তিনজন পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সাউথ ইস্টার্ন রেল দল প্রশংসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে।

ভারতের খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল সংস্থাগুলির দান কম নয়। কর্মীদের উৎসাহ ও আনন্দ দেবার জন্য এবং খেলা-ধুলোকে অধিকতর জনপ্রিয় করবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছেন। খড়্গপুরে আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বিভিন্ন রেল সংস্থার কর্ণধারেরা উপস্থিত ছিলেন। ওয়েস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম কে কাউল, সাউথ ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি পি সাহানী, ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরূপলাল সিং ও চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী কে রামচন্দ্রনকে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে দেখা গেছে এবং খেলার শেষে এঁরা খেলাধুলার ক্ষেত্রে রেল কর্মীদের আরও সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খড়্গপুরের অনুকরণে চিত্তরঞ্জনে আর একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। আশা করি, ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ ভারতের প্রধান প্রধান রেল কেন্দ্রে এই ধরনের আরও স্টেডিয়াম নির্মাণ করে রেল কর্মীদের খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা করে দেবেন।

নীচে আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

**প্রথম রাউণ্ড**

ইস্টার্ন রেল (১) সাউথ ইস্টার্ন গোল্ড (০)
চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ (৩) সেণ্ট্রাল বি (২)
সাউথ ইস্টার্ন—মেরুন (২) রেলওয়ে বোর্ড (০)
নর্দার্ন রেল (২) নর্থ ইস্টার্ন (০)
ওয়েস্টার্ন রেল (১) পোর্ট কমিশনার্স রেল (০)
সেণ্ট্রাল—ব্লু (১) (২) নর্থ ইস্ট ফ্রণ্টিয়ার (১) (০)

**কোয়ার্টার ফাইন্যাল**

ইস্টার্ন রেল (৩) সেণ্ট্রাল ব্লু (২)
পেরাম্বুর কোচ ফ্যাক্টরী (২) চিত্তরঞ্জন (১)
সাউথ ইস্টার্ন—মেরুন (৩) ওয়েস্টার্ন (২)
নর্দার্ন রেলওয়ে (৩) সাদার্ন রেল (১)

**সেমি ফাইন্যাল**

ইস্টার্ন রেল (৩) নর্দার্ন রেল (০)
সাউথ ইস্টার্ন—মেরুন (১) পেরাম্বুর কোচ ফ্যাক্টরী (০)

**সেমি ফাইন্যালে পরাজিত দলের খেলা**

পেরাম্বুর কোচ ফ্যাক্টরী (৫) নর্দার্ন রেল (০)

**ফাইন্যাল**

ইস্টার্ন রেল (২) সাউথ ইস্টার্ন—মেরুন (০)

**পূর্ববর্তী বিজয়ী রেল দল**—১৯২৮—ই বি আর; ১৯২৯—জি পি আই; ১৯৩০—ই বি আর; ১৯৩১—ই আই আর; ১৯৩২—১৯৪৫—খেলা হয়নি; ১৯৪৬—বি এন আর; ১৯৪৭—১৯৪৮—খেলা হয়নি; ১৯৪৯—জি আই পি; ১৯৫০—জি আই পি ও ই আই আর (যুগ্ম বিজয়ী); ১৯৫১—সাদার্ন রেল; ১৯৫২—ই আই আর; ১৯৫৩—সেণ্ট্রাল রেল ও ইস্টার্ন রেল (যুগ্ম বিজয়ী); ১৯৫৪—ইস্টার্ন রেল রেড ও ইস্টার্ন রেল ব্লু (যুগ্ম বিজয়ী); ১৯৫৫—সাদার্ন রেল; ১৯৫৬—ওয়েস্টার্ন রেল; ১৯৫৭—ইন্টি-গ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী—পেরাম্বুর ও সাদার্ন রেল (যুগ্ম বিজয়ী)।

• • • • •

সম্প্রতি বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত ও মজুমদার কাপ বা আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতি-যোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ২৪ পরগণা জেলা দল ১—০ গোলে পশ্চিমবঙ্গে নবাগত পুরুলিয়া জেলা দলকে পরাজিত করে পঞ্চমবার ও মজুমদার স্মৃতি কাপ লাভ করেছে।

বিভিন্ন জেলার ফুটবল খেলার মান উন্নয়ন, কলিকাতার ফুটবল খেলা বিকেন্দ্রী-করণ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে আই এফ এ-র পরিচালনায় ১৯৪৭ সাল থেকে আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়। এরিয়ান ক্লাবের পরলোকগত পরি-চালক এবং বাঙলা ফুটবলের অন্যতম শিক্ষা-গুরু দুঃখীরাম মজুমদারের (উমেশ) স্মৃতি রক্ষার জন্য এরিয়ান ক্লাব আই এফ এ-র হাতে আন্তঃ জেলা ফুটবলের পুরস্কার হিসাবে একটি কাপ দান করে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এক এক বছর এক একটি জেলার আই এফ এ-র তত্ত্বাবধানেই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়ে এসেছে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস ফেডারেশন আই এফ এ-র কাছ থেকে আন্তঃ জেলা ফুট-বলের পরিচালনাভার গ্রহণ করবার পর প্রতিযোগিতা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ১৫টি জেলা দল অংশ গ্রহণ করে। একটি জেলা হিসাবে পৃথক সত্তার অধিকারী এবং গতবারের বিজয়ী কুলটি দল নাম প্রেরণ করেও শেষ-পর্যন্ত বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা করবার অধিকার পায়নি। আন্তঃ জেলা ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ায় এবার অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া পড়ে যায়। প্রতিদিনই মাঠে দেখা যায় বিপুল জনসমাগম। ২৪ পরগণা ও পুরুলিয়ার ফাইনাল খেলার দিন গান্ধী ময়দানে প্রায় ১৫ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল। স্থানাভাবের জন্য বহু দর্শককে হতাশ হয়েও ফিরে যেতে হয়েছে। নীচে আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার ফলাফল এবং আগের বিজয়ী জেলার নামের তালিকা দেওয়া হল :—

**প্রথম রাউণ্ড**

জলপাইগুড়ি (৩) : বাঁকুড়া (১)
মুর্শিদাবাদ (১) : হাওড়া (০)
মালদহ (৩) : বর্ধমান (১)
হুগলী (৩) : নদীয়া (০)
পঃ দিনাজপুর (২) : বীরভূম (০)
২৪ পরগণা (০)(৩) : মেদিনীপুর (০)(০)
কুচবিহার (১) : চন্দননগর (০)

**দ্বিতীয় রাউণ্ড**

পুরুলিয়া (৩) : জলপাইগুড়ি (১)
মুর্শিদাবাদ (০)(১) : মালদহ (০)(০)
পঃ দিনাজপুর (১) : হুগলী (০)
২৪ পরগণা (০)(১) : কুচবিহার (০)(০)

**সেমি ফাইন্যাল**

পুরুলিয়া (১)(১) : মুর্শিদাবাদ (১)(০)
২৪ পরগণা (২) : পঃ দিনাজপুর (০)

**ফাইন্যাল**

২৪ পরগণা (১) : পুরুলিয়া (০)

**পূর্ববর্তী বিজয়ী জেলা :**—১৯৪৭—২৪ পরগণা; ১৯৪৮—চন্দননগর; ১৯৪৯—২৪ পরগণা; ১৯৫০—হুগলী; ১৯৫১—নদীয়া; ১৯৫২—২৪ পরগণা; ১৯৫৩—হাওড়া; ১৯৫৪—হাওড়া; ১৯৫৫—২৪ পরগ–
১৯৫৬—চন্দননগর; ১৯৫৭—কুল–




## দেশী সংবাদ

**২৫শে আগস্ট**—আজ রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত বিতর্কের সূচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান অস্ত্র মজুত ব্যবস্থা ও ভারতের বিরুদ্ধে 'ঘৃণার অভিযানে' উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া "ইহা কুফলপ্রসূ হইতে পারে" বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন চলাচলের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে উক্ত স্টেশন ইয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী করিবার জন্য সাময়িকভাবে ১২টি আপ ও ডাউন লোকাল ট্রেন আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত পুনর্বিন্যাসের কাজ নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**২৭শে আগস্ট**—নিখিল ভারত বন্দর ও ডক শ্রমিক ফেডারেশন চৌধুরী কমিটির সুপারিশগুলি পুরোপুরি কার্যে পরিণত করার দাবী জানাইলেও বুধবার লোকসভায় চৌধুরী কমিটির রিপোর্টের উপর বিতর্কের উত্তরে যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রী শ্রী এস কে পাটিল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গবর্নমেন্ট কমিটির সুপারিশ পুরোপুরি কার্যে পরিণত করিবেন না।

**২৮শে আগস্ট**—পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ডোনেশনের নামে মোটা টাকা লইয়া ছাত্র ভর্তির যে অভিযোগ কয়েক বৎসর পূর্বে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত আরও খাদ্যশস্য প্রেরণ করিবেন এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির কাজ যাহাতে আরও ভাল হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে 'ট্রাম বাস ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে নীতিবিগর্হিত ও অন্যায়' এই মর্মে মন্তব্য করিয়া রাজ্য সরকারকে ঐ সুপারিশ গ্রহণ না করিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

**২৯শে আগস্ট**—কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘটের অষ্টাদশ দিবসে অদ্য কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ধর্মঘটজনিত বর্তমান অচলাবস্থার ফয়সালা করিতে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সালিশী মানিয়া লইতে কোম্পানী প্রস্তুত আছেন।

**৩০শে আগস্ট**—আজ রেলওয়ে মন্ত্রণালয় রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে এক সরকারী পর্যালোচনায় বলিয়াছেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতবর্ষে যাত্রী ট্রেন ৩০বার সংঘর্ষের মুখে পড়িয়াছে এবং ২০১ বার লাইনচ্যুত হইয়াছে। এইসব ট্রেন দুর্ঘটনার শতকরা ৪৯টির জন্য রেলকর্মচারীদের কর্তব্যকর্মে গাফিলতি দায়ী।

ভারত সরকার রপ্তানির ক্ষেত্র বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে দুই শতেরও অধিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিয়াছেন এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঐ সমুদয়ের উপর ন্যূনতম বিধিনিষেধ রাখিয়াছেন।

**৩১শে আগস্ট**—সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হইবে।

অদ্য হাওড়া-বর্ধমান রুটে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিতে গিয়া বর্ধমান স্টেশনের অদূরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জানান যে, শিয়ালদহ সেকশন বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু করার ব্যাপারে রেলওয়ে বোর্ড কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের নিকট হইতে 'সবুজ সংকেত' পাইয়াছে।

**১লা সেপ্টেম্বর**—অদ্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, খাদ্য সমস্যা জাতীয় সমস্যা, দলীয় ভিত্তিতে উহা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত হইবে না। খাদ্য সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সকল রাজনীতিক দলকে সহযোগিতার জন্য শ্রীনেহরু আহ্বান জানান।

## বিদেশী সংবাদ

**২৬শে আগস্ট**—পশ্চিম জার্মান সংবাদ সংস্থা জানাইতেছেন, বর্তমানে ওয়াশিংটনে যে আন্তর্জাতিক আলোচনা চলিতেছে, উহার ফলে ভারত বৈদেশিক মুদ্রায় বেশ বড় রকমের সাহায্য পাইতে পারে। ভারতকে ঋণ হিসাবে ১০০ কোটি ডলার দেওয়া সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে পঃ জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, বৃটেন ও বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ আলাপ আলোচনা করিতেছেন।

**২৭শে আগস্ট**—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে দায়িত্ব রহিয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহা এড়াইয়া যাইবে না। তবে কুয়েময় এবং মাৎসু দ্বীপগুলির উপর চীন যদি সামরিক অভিযান চালায়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, সেই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে তিনি অস্বীকৃত হন।

**২৮শে আগস্ট**—আজ ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের এক সংবাদে বলা হইয়াছে, পিকিং রেডিয়োর এক সংবাদে জানা যায় যে, চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে কুয়েময় দ্বীপস্থ কুয়োমিন্টাং সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ দ্বীপে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর অবতরণ আসন্ন।

মস্কো বেতার অদ্য রাত্রে ঘোষণা করিয়াছে যে, পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সামরিক তৎপরতার ফলে একটা আসন্ন যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে।

**২৯শে আগস্ট**—পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, সুনির্দিষ্টভাবে ইহা স্থির হইয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' আজ জানাইয়াছে যে, রাশিয়া দুইটি কুকুর সমন্বিত একটি 'রকেট' শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া ২৭৯ মাইল উচ্চ হইতে কুকুর দুইটিকে পৃথিবীতে পূর্ব নির্ধারিত এক স্থানে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

**৩০শে আগস্ট**—অদ্য করাচীতে পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে উভয় দেশের প্রতিনিধি দলের বৈঠকে ভারতের কমনওয়েলথ সচিব শ্রী এম জে দেশাই এবং পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব শ্রী এম এস বেইগ সীমান্তে গুলিবর্ষণের ঘটনায় উভয় দেশের বন্দীদের বিনিময় সম্পর্কে 'নীতিগতভাবে' একমত হইয়াছেন।

**৩১শে আগস্ট**—ফরমোজা প্রণালীতে এবং এই দ্বীপের চতুর্দিকস্থ অঞ্চল জুড়িয়া আজ মার্কিন রণপোত বহরের এক বিরাট সমাবেশ চলিতেছে—এদিকে কম্যুনিস্টরা উপকূল সন্নিহিত কুওমিন্টাং অধিকৃত দ্বীপসমূহের উপর ইতস্ততঃ গোলাবর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সরকারী মহল হইতে বলা হয় যে, মানব ইতিহাসের বৃহত্তম আক্রমণ শক্তির সমাবেশ' করা হইতেছে।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, বিজ্ঞানীরা এমন একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা শ্রুতি লেখনের দ্বারা যে কোন বিষয় যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিবে।

**১লা সেপ্টেম্বর**—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন আজ জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সেক্রেটারী পর্যায়ে করাচীতে যে সম্মেলন চলিতেছে, তাহা 'প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।'

সম্পাদক **শ্রীঅশোককুমার সরকার** সহকারী সম্পাদক **শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : **আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।**

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এবারে পুজোর জলসা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে

# সলিল চৌধুরীর

**প্রান্তরের গান (২্) ও ঘুম ভাঙ্গার গানের (১৸০) সুরে সুরে।**

শুধু গানই নয় নাটক বাছাই করুন। **দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের** বিভিন্ন স্বাদের সাতটি নাটিকার সংকলন **"একাংক সপ্তক"** (৩্) থেকে। অন্যান্য বিচিত্রধর্মী নাটকও আছে। যেমন **সুনীল দত্তের "ত্রিনয়নের"** (১্) তিনটি নাটিকা, **হরিপদ মাস্টার** (১৷৷০) ও **জতুগৃহ** (১৷৷০)। যাত্রাধর্মী নাটকও আছে। **বীরু মুখোপাধ্যায়ের "রাহুমুক্ত"** (২্)। **অন্নদামোহন বাগচীর** ছটি একাংক নাটিকার সংকলন **"ঊষার আলো"** (১৷৷০), **সঞ্জীব সরকারের "জয়ের পথে"** (১৷৷০)।

**এতক্ষণ তো বড়দের নাটকের কথাই হলো। এবার আসুন ছোটদের নাটকে**

# 'ছোটদের রঙমহল'

একসঙ্গে বাইশটি ছোটদের প্রিয় লেখকদের রচিত নাটকের এক অনবদ্য সংকলন। রবীন্দ্রনাথ, যোগীন সরকার, সুকুমার রায়, নজরুল, অন্নদাশঙ্কর, স্বপনবুড়ো, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ইন্দিরা দেবী ও সুকান্তের মত লেখকদের নাটক এই সংকলনে রয়েছে। **সম্পাদনা করেছেন সুনীল দত্ত ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার।** দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা। ছোটদের আর একখানি নাটক **অংকুর** (১৷৷০)। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অভিনয়কালে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে এই নাটকটি।

**॥ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ॥**

॥ ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ ।

---

শারদীয় সংখ্যা

# সচিত্র তোমার জীবন

(১লা অক্টোবর প্রকাশিত হবে। দাম ২·২৫ নঃ পঃ)

**দুটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস**

**দশটি সুখপাঠ্য গল্প**

॥ লিখেছেন ॥

**নরেন্দ্রনাথ মিত্র**

**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**

**অমরেন্দ্র ঘোষ**

**বাণী রায়**

**বিমল সাহা**

এ ছাড়া সুন্দরমের চিত্র-চাঞ্চল্যকর স্টুডিও রিপোর্ট, পত্রের জবাবে ঃ চিত্রা রায়ের আকর্ষণবহুল 'বন্ধে থেকে' এবং অন্যান্য বিভাগ। পুজোর শ্রেষ্ঠ গান সহ সঙ্গীত বিভাগ।

**৭০ খানা রঙিন ছবি, প্রচুর কার্টুন, তিন রঙা মন-মাতানো প্রচ্ছদপট।**

**সিনেমা ও ফিচার ধরণের যে কোন শারদীয় সংখ্যার চেয়ে প্রত্যেকবারের মতনই এবারেও শারদীয় সংখ্যাও হবে অতুলনীয়।**

ঃ বিস্তারিত জানতে হলে সংযোগ করুন ঃ

**সচিত্র তোমার জীবন**

**২নং চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলি ১২**

---

# হাওড়া বার্তা

পূজাসংখ্যার জন্য গল্প, কবিতা প্রবন্ধ পাঠান।

সম্পাদক,

**হাওড়া বার্তা**

পোঃ সালিখা, হাওড়া।

(সি ১৮৭০)

---

**নতুন বই**

চাণক্য সেন-এর

# ধীরে বহে নীল

বিপ্লবোত্তর মিশরকে কেন্দ্র করে পশ্চিম এশিয়া সমস্যার একমাত্র তথ্যানুগ গ্রন্থ।

**সচিত্র—সাত টাকা**

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

# জলকন্যার নীড়

সমুদ্রে বিচরণকারী নরনারীর বিচিত্র জীবন-লীলাকে অবলম্বন করে লেখকের সর্বাধুনিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। **তিন টাকা**

**আমাদের অন্যান্য বই**

বালির প্রাসাদ (উপন্যাস) ৪·০০
পুলকেশ দে সরকার

তিমিরাভিসার (উপন্যাস) ৫·০০
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অবগুণ্ঠন (উপন্যাস) ২·৫০
বিমল কর

দুই সখী (গল্প-গ্রন্থ) ২·০০
বিনয় চৌধুরী

নতুন বাসর (গল্প গ্রন্থ) ২·৫০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মন্থন (উপন্যাস) ৩·০০
অমরেন্দ্র ঘোষ

ধন্বন্তরির দিনলিপি (রম্যরচনা) ধন্বন্তরি ২·০০

অনুবাদ

রেজর্স এজ—সমারসেট মম্ ৬·০০

পেট্রিয়ট—পার্ল বাক্ ৪·৫০

প্রিয়তমেষু—স্টিফান জাইগ ২·০০

থ্যাংক ইউ জীভস—পি, জি, ওডহাউস ৪·০০

ক্যারি অন জীভস—পি, জি, ওডহাউস ৩·৫০

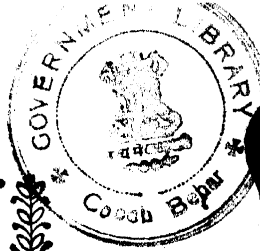
সান্তা লুসিয়া—জন গলসওয়ার্দি ৩·০০

পরকীয়া—চেখভ ২·০০

**নবভারতী**

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২

(সি ১৮৭৬)




# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

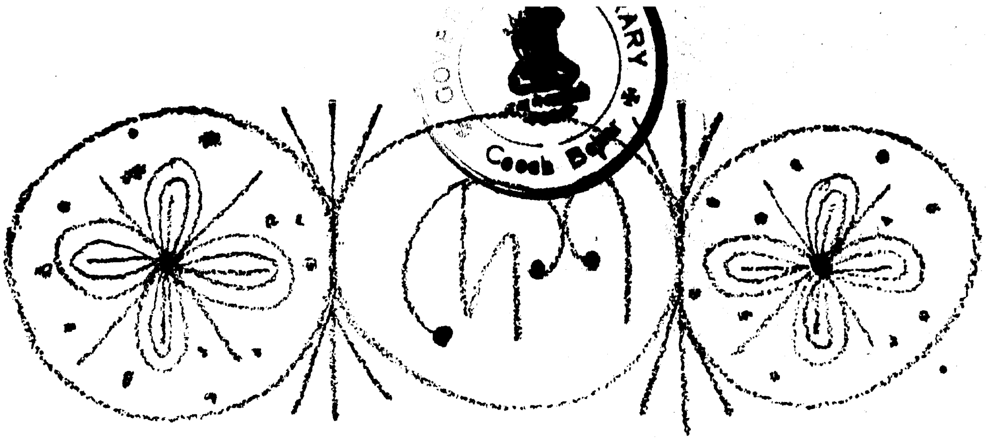
| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|



ঠিক মনের মতন
পেনমাস্টার কালি
PEN MASTER INK
PENMASTER INK
সহজ ধারা ঝরঝরে লেখা
পেন মাস্টার ইঙ্ক কোং•কলিকাতা-৬



# সূচীপত্র




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 13th September 1958,

২৫ বর্ষ ॥ ৪৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ




## শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ৫ই সেপ্টেম্বর সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সহকর্মিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হন। এই উপলক্ষ্যে আমরাও তাঁহাকে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন ও নিরাময় কামনা করিতেছি।

আমাদের দেশে আদর্শ শাসকের যে মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে কর্মীর সহিত দার্শনিক ও আদর্শবাদীর মিশল আছে। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এ শ্রেণীর লোক সংসারে বিরল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণকে সেই প্রাচীন আদর্শের প্রতিভূ বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে ঠিক তাঁহার মতো ব্যক্তি আজ আর কেহ আছেন কিনা জানি না।

## খাদ্যাভাব ও সরকারী নীতি

ঈশপের গল্পে এক জ্যোতির্বিদের কাহিনী আছে। লোকটা রাত্রিবেলায় আকাশের দিকে চাহিয়া গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইত, পায়ের মাটির দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। এই ভাবে চলিতে চলিতে একদিন একটি কূপের মধ্যে পড়িয়া মারা গেল সেই আকাশমুখী হতভাগ্য জ্যোতির্বিদ। কাহিনীটির অন্তর্নিহিত নীতি এই যে পায়ের কাছের বস্তুকে অবহেলা করিয়া দূরের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইলে এমনি ঘটিয়া থাকে। লোকটির দৃষ্টি যদি মাটির দিকে থাকিত তবে ঐ কূপটায় পড়িয়া মরিত না, আর শুধু তাই নয়, কূপের জলে প্রতিবিম্বিত গ্রহনক্ষত্রও দেখিতে পাইত।

এই কাহিনীটি ভারত সরকারের কৃষিনীতি স্মরণ করাইয়া দেয়। রাতারাতি দেশটাকে যন্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ করিয়া মার্কিন মুল্লুক বা রুশ মুল্লুক করিয়া তুলিব আর দেশের চাষবাসের দিকে শিথিল মনোযোগ—ইহা কি সেই জ্যোতির্বিদের আকাশমুখী দৃষ্টি নয়? পায়ের কাছের মাটিকে অবহেলা নয়? এরূপ না করিয়া ভারত সরকারের দৃষ্টি যদি সামান্য পরিমাণেও চাষের ক্ষেতের দিকে থাকিত তবে প্রতি বৎসর ঘাটতি চাউল ও গম বিদেশ হইতে আনিতে হইত না, উহার মূল্য দিতে গিয়া বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ঘটিত না, আর বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইত না। কৃষিনীতির দিকে কিঞ্চিৎ মনোযোগে এ সমস্তর সুরাহা হইতে পাইত। ভারত সরকার তাহা করেন নাই, ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎরূপে সরল পন্থাটা গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্যাভাব হইবা মাত্র রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাত পাতেন আর তখন কেন্দ্রীয় সরকার ধামা হাতে পাড়াপড়শীর বাড়িতে ছুটিয়া যান। "আমরা গ্রহনক্ষত্রের তত্ত্বতদারক করিতেছি, চাষবাসের মতো সামান্য কাজের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি নাই, আমাদের খাদ্য দাও, তাহাতে তোমাদের ইহলোকের ও পরলোকের সুকৃতি।" এই কথা প্রতিবছর আমাদের বলিতে হইতেছে। কি লজ্জার বিষয়। যাইহোক এখন ভারত সরকারের তথা নেহরুর দৃষ্টি বিষয়টির গুরুত্ব দেখিতে পাইয়াছে। নেহরু নিজে এখন অগ্রণী হইয়া দুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(১) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কৃষিদপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া দলনিরপেক্ষ একটি কমিটি গঠন করিয়া কৃষিনীতি তাহার উপরে ছাড়িয়া দিবেন।

নেহরু বিশ্বাস করেন, এ দুটি গৃহীত ও কার্যকর হইলে শতকরা দশভাগ খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হইবে—আর তাহাতে ঘাটতি পূরণ হইয়া যায়। আমরাও অবিশ্বাস করি না—কেবল আবশ্যক কয়েকটি 'যদিকে' অপসারণ। 'যদি' কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি কার্যকর হয়, 'যদি' সরকারী কর্মচারীবৃন্দের কর্তব্যে শৈথিল্য দূরীভূত হয়, 'যদি' কৃষকদের ঔদাসীন্য ও অধিকতর পরিশ্রমের অনিচ্ছা দূরীভূত হয় আর সর্বোপরি 'যদি' অন্যান্য রাজনৈতিকদল সত্য-সত্যই সহযোগিতা করে—তবে শতকরা দশভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি না হইবে কেন বলিতে পারি না। কিন্তু পথের 'যদি'গুলি মারাত্মক বিশেষ শেষের 'যদিটি'। ইতিমধ্যেই আচার্য কৃপালনীর সমর্থন রীতিমত উৎসাহজনক। কিন্তু তাই সকলেই আচার্য কৃপালনী হইলে দেশের রাজনীতির মূর্তি অন্যরূপ

হইত। আশা করিব যে বামপন্থী ও অন্যান্য দলগুলি আন্দোলনাত্মক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সরকারের আহ্বানে সাড়া দিবেন—ক্ষুধা দলীয় রাজনীতির তালিকাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

## অন্নের পরে বস্ত্র

শারদীয়া পূজার কয়েকটি অপরিহার্য লক্ষণের একটি এই যে, ঠিক পূজার আগে বাজারে বস্ত্রাভাব ঘটিয়া একটা সংকট দেখা দিবে—আর ব্যবসায়ীগণ সেই সুযোগে অতিরিক্ত মুনাফা করিয়া পূজার পার্বণী লুটিবে। এবছর ইতিমধ্যেই শালীমার রেল গুদামে কাপড়ের গাঁট জমিতে শুরু করিয়াছে, ব্যবসায়িগণ খালাস করিতেছে না। অবস্থা নাকি গত বছরের চেয়ে সংকটজনক হইয়াছে, এখনও তো পূজার ছয় সপ্তাহ বিলম্ব। সরকারের অনুরোধে ও পরামর্শে যদি ব্যবসায়িগণ কর্ণপাত না করে, তবে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত সরকারের। সেরূপ ক্ষমতা সরকারের হাতে নাই—ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

## খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই উচ্চ আশা পোষণ করেন না। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা আদৌ নৈরাশ্যজনক নয়। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৮ লক্ষ লোক খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্পে নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে ১১ লক্ষ খাদি শিল্পে ২ লক্ষ অম্বর চরখায় আর ৫ লক্ষ অন্যান্য শিল্পে। ১৯৫৩ সালে খাদি প্রস্তুত হইয়াছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার আর ১৯৫৮ সালে প্রস্তুত হইয়াছে ১০ কোটি টাকার উপরে। ১৯৫৮ সালে ১০ কোটি টাকার বেশি খাদি বিক্রয় হইয়াছে।

অর্থনীতিকগণ হয় তো হিসাব করিয়া দেখাইবেন যে এ আয় সমগ্র দেশের পক্ষে কিছুই নয় এবং বলিবেন যে, "ভালো হতো আরো ভালো হলে।" কিন্তু আমাদের মত এই যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেছি না বলিয়া ঘরের দীপকে অবহেলা করা উচিত নয়। দেশের সামগ্রিক আয় বাড়িবার দুর্লভ আশায় গৃহশিল্প ও গ্রামশিল্পকে অবজ্ঞা করা নির্বোধের কাজ। দরিদ্র দেশ সামান্য দুটি পয়সার সংস্থানকেও উপেক্ষা করিতে পারে না। দুটি পয়সা সামান্য কিন্তু যাহার মাত্র একটি পয়সা আছে তাহার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ঐ দুটি পয়সাকে। ইহাই সর্বোদয়ের দৃষ্টি।

## কেরলীয় হুঙ্কার

লোকসভায় কেরল সম্বন্ধে শ্রীঅশোক মেহতা যে মুলতুবী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, স্পীকার তাহা না-মঞ্জুর করিয়া দিলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কেরলে জনগণের নিরাপত্তাবোধের অভাব বাড়িলে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইবে। অন্য দিকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ধেবর কেরল ভ্রমণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিতার্থ হইতেছে যে, কেরলে জনগণ সত্যই নিরাপত্তাবোধের অভাব অনুভব করিতেছে।

কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির তথা কেরলের কম্যুনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণের আচরণ ও উক্তি। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ও একসুরে বলিয়াছেন যে, কেরলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নাই এবং কেরল মন্ত্রিসভা কেরলের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কেরলের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করেন নাই। দ্বিতীয়ত, সংবিধান বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমস্ত অঙ্গ রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।

কিন্তু সবচেয়ে যাহা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি, তথা কেরল সরকারের উক্তি। তাঁহারা যে-ভাষায় যে-সুরে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিরোধের সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেন হাঙ্গেরী সরকারের ভাষা ও সুরের প্রতিধ্বনি। হাঙ্গেরীতে রুশ সৈন্যগণ কর্তৃক নির্দোষ জনগণ নিহত হইলে তদন্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রসংঘ। তখন হাঙ্গেরীয় সরকার প্রায় কেরলীয় ভাষাতে ও সুরে তাহা অগ্রাহ্য করেন। হাঙ্গেরীর এ-রকম উক্তির অর্থ বুঝি, কিন্তু ভাবিতেছি কেরলের মন্ত্রিসভার কি হইল? তাঁহাদের কি বিশ্বাস কেরল একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র? খোদ ভারত সরকারের সম্বন্ধে যাঁহাদের এরূপ মনোভাব, কেরলের নিরীহ জনগণ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। তবে ইহাও আমরা বলিতে চাই যে ভারত সরকার কর্তৃক কেরল মন্ত্রিসভার অপসারণ বা রাষ্ট্রশক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই উচিত হইবে না। কেরলের জনগণকেই কর্তব্য নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক—সে সুযোগ অপরের গ্রহণ করা উচিত নয়।

## "ভুল মানচিত্র"

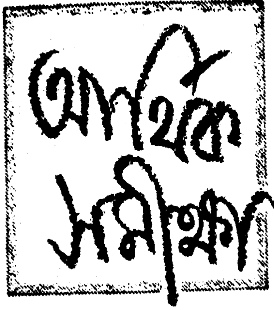
লোকসভায় নেহরু জানাইয়াছেন যে, "চায়না পিক্টোরিয়াল" নামে চীনা কম্যুনিস্ট সরকারের মুখপত্রের জুলাই মাসের সংস্করণে চীনের যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারত সরকার ইহার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর পাইয়াছেন যে, এই মানচিত্রখানি চিয়াং কাইশেকের আমলে প্রস্তুত, বর্তমান সরকার এখনও সংশোধন করিবার অবকাশ পান নাই।

ইতিপূর্বে কয়েক বছর আগে ঠিক অনুরূপ বিষয়ে ভারত সরকার অনুরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন। সে আজ ৫।৭ বৎসরের কথা। তারপরে এই গুরুতর ভ্রমের সংশোধন হইল না; শুধু তাই নয়, পুনরায় সেই ভুল মানচিত্র প্রকাশিত হইল। ইহা সত্যই দুঃখের। আমরা বলিতেছি না যে, চীন সরকারের মনে কোনও অভিসন্ধি আছে। কিন্তু জগতে দুষ্ট লোকের অভাব নাই, তাহারা সেইরূপ ভাবিতেও পারে।

## বিনোবাজীর উক্তি

"কী অদ্ভুত হৃদয়হীন যুক্তি! Survival of the fittest' বাঁচবার অধিকার একমাত্র তারই—যে ক্ষমতাশালী, আসুরিক বলে বলীয়ান, শঠতা আর চাতুর্য দিয়ে অন্যের গ্রাস ছিনিয়ে নেবার শক্তি যার আছে। অথচ এই যুক্তিবাদীদেরই আবার ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত বুদ্ধি। সৈন্যবাহিনীতে দেখুন, যত সমস্ত তাজা নওজোয়ানদের ধরে ধরে মৃত্যুর মুখে চালান করে দিচ্ছেন। আর অবসর দিচ্ছেন সকল কাজ থেকে কাদের? পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে— যে নিয়ত মহাকালের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে—দরজায় বসে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এরই জন্য—আজ হাইড্রোজেন বম, য়্যাটম বমেও কুলোচ্ছে না। তারও চেয়ে বেশী কোন ভীষণতর সংহারক-আবিষ্কারের চেষ্টায় রয়েছে মানুষ। সব কিছুর মূলে এই ভয়াবহ মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যা মানুষ জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলেছে। এই মনোবৃত্তির ফলেই দিকে দিকে বিদ্বেষ আর 'অসুয়ার এত জয়ধ্বনি।'




**শ্রীকৌটিল্য**

**সা**ধারণত বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আমরা পরিমাণগত দিক দিয়েই আলোচনা করে থাকি। বেকারের মোট পরিমাণ কিংবা শতকরা হার কতটা কমছে-বাড়ছে, অথবা আগামী পাঁচ বছরে কত কমবে-বাড়বে, এবং সে সব কমা-বাড়ার অর্থনৈতিক ফলাফল কী হতে পারে, এসব বিষয়ের আলোচনাতেই আমরা মোটামুটি সন্তুষ্ট থেকেছি। কিন্তু পরিকল্পনার বাস্তবিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে এটা ক্রমশই উপলব্ধ হচ্ছে যে, উপরোক্ত মোট পরিমাণটিকে অসংখ্য গুণগত শ্রেণীতে বা স্তরে ভাগ করে না বিচার করলে কোনো কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করাই কঠিন। এই গুণগত শ্রেণী বিচার পদ্ধতি নানা-রকমের হতে পারে এবং তার প্রত্যেকটিই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, দেশের মোট বেকারকে শহর এবং গ্রামাঞ্চল অনুযায়ী, কিংবা কুশলী (skilled) এবং অকুশলী (unskilled) পেশা অনুযায়ী, কিংবা প্রথম গোষ্ঠী (কৃষি), দ্বিতীয় গোষ্ঠী (শিল্প) এবং তৃতীয় গোষ্ঠী (অন্যান্য) অনুযায়ী, কিংবা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র অনু-যায়ী, অথবা অন্য অনেক ভিত্তিতে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান আলো-চনায় আমাদের বক্তব্য এই যে, এ ধরনের বড় বড় বিভাগে কিংবা গোষ্ঠীতে ভাগ করবার পরেও আরো মৌল একটি সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়, যার ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে পেশাগত ভারসাম্য (occupational balance) কিছুতেই আনা যায় না।

এখন, এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুরকমের পেশা আছে যারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সম্পর্কহীন (non-competing)। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনতার কারণ হয়তো নানা-রকম; সামাজিক মর্যাদা, বেতনের পরিমাণ, পেশার বিশিষ্ট কুশলতা, স্থানীয় কিংবা পারিবারিক পেশাগত ঐতিহ্য ও দক্ষতা ইত্যাদি নানা কারণে এক স্তরের পেশায় নিযুক্ত লোকেরা অন্য স্তরের পেশায় যেতে সহজে রাজি হবে না। তাই তাত্ত্বিক অর্থবিজ্ঞানে কর্মীদের সম্বন্ধে পেশা থেকে পেশায় কিংবা স্থান থেকে স্থানান্তরে অবাধ সচলতার (mobility) যে সরল স্বীকার (assumption) প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন থাকে, ফলিত অর্থ-বিজ্ঞানে সে স্বীকারকে যথেষ্ট কার্যকরী মনে করা যেতে পারে না। এই বিশ্লেষণ থেকে তাহলে আরো একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, দেশে কর্মসংস্থানের অবস্থা যদি মোটের উপর দশ গুণ উন্নত করা যায় তবে নিশ্চয়ই সব রকমের পেশাপ্রার্থীর নিয়োগও সরাসরি দশ গুণ বেড়ে যাবে না। হয়তো অনেক পেশায় খুব সামান্যই নতুন কর্ম-সংস্থান সম্ভব হবে। অবশ্য যুদ্ধের সময় পূর্ণনিয়োগ (full employment) প্রায়শই সম্ভবপর হয়। তার এক কারণ এই যে, সে সময় সাধারণ কর্মোদ্যম এত অভাবনীয় দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে যায় যে, প্রায় সব ধরনের পেশাতেই কর্মসংস্থানের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আর

এক কারণ, যুদ্ধের আবহাওয়া পেশাগত অচলতার (immobility) স্বাভাবিক তীব্রতাকে অনেক কমায়, এবং নানারকমের লোককে তাদের স্বাভাবিকভাবে পছন্দসই পেশা থেকে আকর্ষণ করে এনে যুদ্ধের কাজে লাগায়। কাজেই পেশাগত ভারসাম্যের সমস্যাটি মুখ্যত শান্তিময় অবস্থাকালীন সমস্যা।

এই সমস্যা প্রায় সব দেশেই কম-বেশি দেখা যায়, কিন্তু অনগ্রসর অঞ্চলে এর তীব্রতা অনেক বেশি। এর কারণ দুটো। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সম্প্রতিকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও পরিমাণ বেশ কম, এবং সে সব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে তার হ্রাসপ্রাপ্তির সমস্যাই সবাইকে বেশি ভাবিত করছে। ফলে যে-কোনো পেশাতেই ভারতবর্ষের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার সে সব দেশে অনেক কম। দ্বিতীয়ত, এর আগের সপ্তাহের আলোচনায় বলেছিলাম যে, অগ্রসর অঞ্চলে তৃতীয় গোষ্ঠীর পেশাগুলি প্রধানত শিল্পের প্রয়োজন-প্রসূত। অর্থাৎ, তৃতীয় গোষ্ঠীর বিরাট উৎপাদন ক্ষেত্রে সবরকমের পেশাতেই স্বাভাবিকভাবে চাহিদা ও যোগানের একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকে। অনগ্রসর অঞ্চলের তৃতীয় গোষ্ঠীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে দেখিয়েছিলাম যে, এতে কর্মীর জন্য অর্থনৈতিক চাহিদা সামান্য, অথচ যোগান প্রচুর, যার ফলে এই গোষ্ঠীর উৎপাদনে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় খুবই কম থেকে গেছে।

সুতরাং, অনগ্রসর অর্থনৈতিক অঞ্চলে পেশাগত ভারসাম্য আনবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হচ্ছে দেশের সমগ্র শ্রমশক্তিকে (manpower) কয়েকটি বড়ো বড়ো বিভাগে (যথা, শহর ও গ্রামাঞ্চল) ভাগ করা। দ্বিতীয় ধাপ, এই বিভাগগুলিকে আবার উৎপাদন শাখায় (যথা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, ইত্যাদি) ভাগ করা। প্রত্যেকটি উৎপাদন শাখার বিভিন্ন পেশাগুলির তালিকা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হচ্ছে তৃতীয় ধাপ। এইবার আমাদের প্রথমেই তথ্য সংগ্রহ করা দরকার যে, এই প্রত্যেক পেশায় গত কয়েক বছর থেকে আজ পর্যন্ত কী হারে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বা কমেছে এবং বর্তমানে এই প্রত্যেক পেশায় মোট প্রার্থীর পরিমাণই বা কত। এ থেকে পরিকল্পনার পর্যায়ে প্রত্যেক বছর কী হারে প্রত্যেক পেশায় কর্মসংস্থানের অবস্থা (conditions) তৈরী করতে হবে সেটাও জানা যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও আবার দুটো গুরুতর সমস্যা।

প্রথম, আমাদের দেশে (যেখানে অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থা অনেক ভালো) মোট বেকারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র নিয়োগ বিনিময় (এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ) ব্যবস্থায় নাম লেখায়। উপরন্তু, এই নামগুলি প্রধানত শহর অঞ্চলের বেকারদের; গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ বিনিময় ব্যবস্থা প্রায় অবর্তমান। দ্বিতীয়, আমাদের দেশে বিশেষত তৃতীয় গোষ্ঠীর পেশাগুলিকে পরিকল্পনার উপযোগিতার প্রেক্ষিতে একেবারে নতুন করে সাজাতে হবে। এতকাল ধরে আজ পর্যন্ত এই পেশাগুলি যেভাবে চলে আসছে, তাকে বজায় রাখতে হবে এমন কোন যুক্তি নেই। বরং হয়তো অনেক নতুন পেশাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং অনেক বর্তমান পেশাকে ভেঙে ফেলতে হবে। অর্থাৎ পেশা পুনর্গঠনে সব কিছুই শিল্পায়ন-ভিত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজন বুঝে করতে হবে।

সুতরাং যদিও বর্তমান মুহূর্তের পেশা-কাঠামো (অকুপেশনাল স্ট্রাকচার) সম্বন্ধে আমাদের তথ্যমূলক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, তথাপি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন অর্থনৈতিক যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি পেশায় শ্রমশক্তির চাহিদা-যোগান সমীকরণ বজায় থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পেশার এই চাহিদা-যোগান সমীকরণ ক্রমশ একটি ঊর্ধ্বগামী ভারসাম্য পথে (আপ-ওয়ার্ড মুভিং ইকুইলিব্রিয়াম পাথ) অগ্রসর হতে থাকে। একথা সত্যি যে, প্রত্যেক পেশায় শ্রমশক্তির চাহিদা ও তার যোগান পৃথক পৃথক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সেজন্য প্রত্যেক স্তরে চাহিদা-যোগান সমীকরণের উপরোক্ত পন্থা অনুসরণ করা কার্যত খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিককালে শ্রমশক্তি বাজেট (ম্যান-পাওয়ার বাজেটিং) শুরু হয়েছে এবং এতে পরিকল্পনার কাজে সুবিধেও হচ্ছে। ভারতবর্ষে শ্রমশক্তি বাজেট করবার পথে অন্যান্য বড় সমস্যাও অবশ্য আছে। সম্পূর্ণ বেকারের পাশাপাশি এদেশে অব-নিযুক্ত (আণ্ডার এমপ্লয়েড) বা প্রচ্ছন্ন বেকারের (ডিসগাইসড আনএমপ্লয়েড) পরিমাণ বিপুল। এই শেষোক্ত দলের বর্তমান পেশাগত কাঠামোর এবং পেশা-পছন্দের (জব প্রেফারেন্স) কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনো নানা কারণে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। শহর এবং বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃততর নিয়োগ বিনিময়ের মাধ্যমে বেকারদের সম্বন্ধে এবং পৃথকভাবে অব-নিযুক্ত লোকদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা এদেশে শ্রমশক্তি বাজেটের কাজ সহজ হতে পারে। এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বর্তমান আলোচনার সূত্রে আমরা এদেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ, বিশেষত ভারত সরকারের শ্রম ও নিয়োগ দপ্তরের কাছে এবং ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে প্রতিষ্ঠানের কর্ম নিয়োগ গবেষণা বিভাগের (এমপ্লয়মেণ্ট স্টাডি সেক্সন) কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

**ভ্রম সংশোধন (দেশ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)**

প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষ লাইন:—"অর্থাৎ তৃতীয় গোষ্ঠী হচ্ছে......পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অথবা সম্পূর্ণ সংযোগহীন ক্রিয়াসমূহের এক অসবর্ণ (heterogeneous) সমষ্টি।"




### সম্প্রদায়-প্রবর্তক

প্রথমে রাজারাম পরে বাদশাহ্ আকবর তানসেনের শিষ্য হয়েছিলেন একথা ইতিবৃত্তকারেরা বলেছেন। রাজা ও সম্রাট ব্যক্তিকে খোশ-পোশাকী শিষ্যরূপে লাভ করা সাধারণ ভাগ্যের কথা নয়। অবশ্য এ রকমের শিষ্য শিষ্যবৃদ্ধি করেন না; কদাচিৎ বিদ্যালাভ বা অভ্যাস করেন। এঁরা তানসেনের যশোভাগ্যের ও অর্থভাগ্যের উপলক্ষ হয়েছিলেন।

তানসেনের পুত্র-কন্যাই ছিল তানসেনের হাত-গড়া শিষ্য। যখন নৌবাত্ খাঁ তানসেন-দুহিতা সরস্বতীকে বিবাহ করলেন, তখন তানসেন একটি তৈরী শিষ্যও লাভ করলেন। এই ঘটনাই সম্প্রদায়-প্রবর্তক মিয়া তানসেনের পক্ষে চূড়ান্ত ভাগ্যরূপে দেখা দিল। তানসেনের পুত্র-কন্যার মতোই নৌবাত্ খাঁ ধ্রুবপদ বিদ্যা ও রাগবিদ্যা লাভ করেছিলেন। অধিকন্তু তানসেন যখন ধ্রুবপদ গান করতেন তখন নৌবাত্ খাঁ সেই গানের সংগে বীণায় সংগত করতেন। এই রকম করে তানসেন সর্বপ্রথম 'সাথ-সংগত' নামে তরকীব্ অর্থাৎ বিধিবদ্ধ বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। তানসেনের পূর্বে কোনও ধ্রুবপদ গায়ক ও বীণকার এরকম পরস্পর সহযোগিতার কল্পনা করেন নি।

নৌবাত্ খাঁর বাদন-শৈলী ছিল যাকে ইতিবৃত্তকার বলেছেন খাণ্ডার-গোত্রের। অর্থাৎ দ্রুতলয়ে ও জবরদস্ত গমক-ঠোক্ দিয়ে রাগরূপের অদ্ভুত সঞ্চরমান তেজ ও বীর্য প্রকাশ করার শৈলীই ছিল নৌবাত্ খাঁর নিজস্ব শৈলী। মাধুর্যের দিকে ততটা লক্ষ্য ছিল না, যতটা ছিল রাগের বিস্ময়কর নিতুই-নব হাব-ভাবের দিকে। তানসেনের শিষ্য হওয়ার ফলে ও তানসেনের সংগে সংগত করতে করতে নৌবাত্ খাঁর বাদন-শৈলী অপেক্ষাকৃত মনোরম ও উন্নততর হয়েছিল এমন কথা অনুমান করা যায়। কারণ সুর বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন, গানের সংগে সংগত করে বাজনার হাত যেমন মধুর হয়, একক বাজনার অভ্যাস থেকে সে রকম হয় না।

একথাও অনুমান করা যায়—নৌবাত্ খাঁর মতো গুণীর সহযোগিতার কারণে সেনী ঘরের রাগরূপগুলিও সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর হয়েছিল। বিশেষ এই যে তানসেনের ছেলেরা তানসেনের মতো সুন্দর গান করতে পারতেন না। ফলে—রাগবিদ্যার ও রাগ-রূপায়নের দিকেই তাঁরা একাগ্রচিত্ত হয়েছিলেন। নৌবাত্ খাঁর সাথ-সংগত তানসেনের ছেলেদের পক্ষে উৎকৃষ্ট সহায় হয়েছিল সন্দেহ নাই। ছেলে ও জামাই দুই পক্ষেই মনে করা যায় কণ্ঠে ধ্রুবপদ ও আলাপ এবং বীণায় সংগত ও আলাপের সম্মিলিত অনুশীলনার ফলে গান ও আলাপের সমস্ত দোষ-ত্রুটি অপসারিত হয়েছিল।

শেষ কথা—সাথ-সংগতের তানসেনীয় প্রথার ফলে বীণকার মৃদংগশিল্পীর মধ্যে নূতন করে ও ভাল করে সম্বন্ধ ঘটে গেল।

ইতিবৃত্তকারদের কথায় আস্থা করে বলা যায়—মিয়াঁ তানসেনই ধ্রুবপদ বীণা ও মৃদংগপুরিকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়ে গেলেন। আদিম ও সর্বোৎকৃষ্ট সাথ-সংগত বলতে কণ্ঠে ধ্রুবপদ, বীণায় সুর-লীলা ও মৃদঙ্গের ছন্দোলহরী—এই তিনটির একীভূত প্রকাশ-মহিমাই ছিল! মিয়াঁ তানসেনই এই পরিকল্পনার মূলে ঋষি ছিলেন।

সাথ-সংগতের পরবর্তী ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়—মিঁয়া তানসেনের পরিকল্পনা সংগীতের দুর্যোগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তানসেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুত্র-বংশ প্রথমে গোয়ালিয়রে পরে পশ্চিমে রাজপুতানা অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন। নৌবাত্ খাঁ সপুত্র-পরিবারে চলে গেলেন উত্তরে রামপুরে। তানসেনের পুত্রদের সংগে জামাতা নৌবাত্ খাঁর সংগ-বিচ্যুতির ফলে পুত্রবর্গেরই বেশী ক্ষতি হয়েছিল। তবুও সগোত্রে বিবাহ ছিল বলে পুত্র-দৌহিত্র বংশের মধ্যে সাংগীতিক যোগসূত্র থেকে গেল। পুত্রগণ অতিরিক্ত হয়ে নিজেদের "সেনী" বিদ্যা গোপন রাখার দিকে মন

দিলেন, যার ফলে বহিরাগত অন্য গুণী বীণকার এ'দের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে প্রবেশ লাভ করেনি। গত্যন্তর হয়েই তানসেনের পুত্র বংশের গুণীরা নিজেদের স্কন্ধে বীণা তুলতে আরম্ভ করলেন এবং সেনী ঘরের "সপ্তাঙ্গ" পদ্ধতি অনুশীলন করতে থাকলেন। এর মধ্যে সাথ্-সংগত স্থান লাভ করেনি।

অন্যদিকে দৌহিত্র গোষ্ঠীতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি; বরং বৃদ্ধিই হয়েছিল। নৌবাত্ খাঁ ও দৌহিত্রকুল অভিনব পরিবেশের মধ্যে সেনী ঘরের অতিরিক্ত অপরাপর ধ্রুবপদ গুণীদের সঙ্গে মিলন রাখলেন। এবং নিভৃতে ও একমাত্র মৃদঙ্গবাদকের সঙ্গে সংগত করে—সাথ্-সংগতের তরকীবকায়দা পাকা করে ফেলেছিলেন। সেই সময় থেকে সাথ্-সংগত হয়ে গেল ধ্রুবপদ গানের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বীণকার ও মৃদঙ্গ-শিল্পীর সুর পরিকল্পনা।

এখনকার সাথ-সংগত নামেই প্রচলিত আছে। মিয়াঁ তানসেনের নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা সাথ-সংগত সৃষ্টি করেছিল; সেই প্রজ্ঞারই খাতিরে নামটা আছে। মহাপ্রাজ্ঞ তানসেন কবরের গভীরে শায়িত আছেন। মাটি জিনিসটা নন-কণ্ডাক্টর! বোধ হয় সেই কারণেই আধুনিক যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত দানব-ধ্বনি ও লাউড-স্পীকারের উৎকট সাথ-সংগত শব্দায়ন তাঁর শ্রবণকে উৎপীড়িত করতে পারছে না! আমরা ত' গিয়েইছি; এখন কবরস্থ তানসেন বাঁচলে হয়! কারণ সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে কোনও সন্দিগ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক কবর খুঁড়ে দেখতে চাইবেন—অস্থি-কঙ্কাল আছে কি না, কার অস্থি-কঙ্কাল ও কতদিনের প্রোথিত অস্থি-কঙ্কাল! সেই শুভ লগ্নেই হবে তান-সেনের চরম মৃত্যু! আমাদের ভারতে মহাপুরুষের ঐতিহাসিক মৃত্যুটা মৃত্যুই নয়; তাকে তিরোভাব বলে। যেদিন সেই মহাপুরুষের কীর্তি ও অবদানের বিলুপ্তি ঘটে, সেই দিনই তাঁর মৃত্যু!

ইতিবৃত্তকারেরা বলেন — সাথ্-সংগত্ দৌহিত্রবংশে রূপান্তর গ্রহণ করল, কিন্তু নামটা অপরিবর্তিত থেকে গেল। পুত্রবংশের গুণীরা সাথ্-সংগত্ ব্যাপারকে "সেনী-গৎ" বা বীণা-গতে রূপান্তরিত করেছিলেন, নামান্তরও করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন—সেনী ধ্রুবপদের মতো সেনী গৎও মিয়াঁ তানসেনের কীর্তি! যাই হ'ক, তান-সেনের পুত্রবংশের গুণীরা যে বীণায় গৎ (গৎ-তোড়া নয়) বাজাতেন এবং সেই গৎ চেহারায় ও মেজাজে অন্যান্য গৎ-তোড়া থেকে পৃথক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি নিজে শুনে একথা বলতে পারছি। সেতার বা সরোদে বীণা-গৎ'এর চেহারা নকল করা সম্ভব, কিন্তু মেজাজ্ নকল করা অসম্ভব। যেমন গানের তেমন বাজনারও মেজাজ্ আছে, গৎ-এরও মেজাজ আছে। মসিৎখানি ('মসীয়ৎখানি'র অপভ্রংশ) গৎ, সেনী-গৎ ও ফিরোজখানি গৎ মন দিয়ে ও ভাল গুণীর হাতে বার বার শুনলে ওদের মেজাজের পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। অধিকন্তু বাঁশ দিয়ে তৈরী বীণার ধ্বনি-চরিত্র (বা টিম্বার) আর কাঠ-দিয়ে তৈরী করা বীণার ধ্বনিগত চরিত্রের স্পষ্ট ভেদ আছে। এ সমস্ত সুক্ষ্ম পার্থক্য মিলে হয় মেজাজের বৈশিষ্ট্য।

ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব স্বীকার করেননি তানসেনই বীণা-গৎ'এর প্রবর্তক; কারণ তাঁর শ্রুতিতে এর বিরুদ্ধ-পক্ষীয় প্রমাণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু

বীণা-গৎ যে "সেনী"-ধ্রুবপদের সন্তান একথা তিনি স্বীকার করতেন। তানসেনের মৃত্যুর পরে পুত্রবংশের দ্বিতীয় পর্যায়ে সেনী-ধ্রুবপদের মতি-গতি, হাব-ভাব অনুকরণে বীণার গৎ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ঠিক যে কারণে সেনী-ধ্রুবপদ গোপন ও অপ্রচারিত থেকে গিয়েছিল, সেই কারণে বীণা-গৎও গোষ্ঠীগত গোপন সম্পত্তি মতো থেকে গিয়েছিল।

দিল্লীতে প্রতিষ্ঠার কালে বাদশাহ আকবর ও মিয়াঁ তানসেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ উদ্ভূত হয়েছিল। এ বিষয়ে একটি গল্পও আছে। ইতিবৃত্তকারেরা এই গল্পকে সরাসরি বর্জন করেননি।

বাদশাহ আকবর মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধারণ করে আর অন্তরঙ্গ বন্ধু সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেড়াতেন। আকবরের কানে সাধক শ্রীহরিদাস স্বামীজীর মহৎ চরিত্রের কথা পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। আকবর স্বভাবেই গুণগ্রাহক ছিলেন এবং সর্বপ্রকার ভক্ত উপাসক সম্প্রদায়ের আন্তরিক সাম্য-বাণীর প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল একথা তাঁর শত্রুরাও বলত। বিশেষ এই যে তানসেন দিল্লী-গোয়ালিয়র যাতায়াতকালে মাঝ পথে সাধকাবতার শ্রীহরিদাস স্বামীজীর আশ্রমে গিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন এবং স্বামীজীর রচিত ভজন-পদ ধ্রুবপদে গঠিত করে দরবারে ও খাস বৈঠকে গান করতেন। সভাজন সকলেই জানতেন, মিয়াঁ তানসেনের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ কৃপা আছে, আর তানসেনও স্বামীজীর ভক্ত ছিলেন, কারণ তানসেন অপরের রচিত পদের মধ্যে স্বামীজী রচিত পদগুলিই গান করতে বেশী ভালবাসতেন। তানসেনের মুখেই স্বামীজীর চরিত্র-কথা শুনে আকবর স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করলেন।

তানসেন ও ছদ্মবেশী আকবর বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হতেই কুটীরের মধ্যে থেকে স্বামীজী বাদশাহ আর তানসেনের নাম করে ডেকে ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন। ছদ্মবেশ ব্যর্থ হয়েছে বুঝে বাদশাহ বিস্মিত হলেন; স্বামীজীর নিরতিশয় মধুর বচন শুনে বাদশাহ মুগ্ধ হলেন। দু'খানি আসনে দু'জনে উপবেশন করে তাঁদের প্রার্থনা জানালেন, যথা তাঁরা স্বামীজীর মুখে স্বামীজীর রচিত পদ-গান শুনতে ইচ্ছা করেন। স্বামীজী তখনি গান আরম্ভ করলেন, যদিও কোনও পাখাওজ বা ঢোলকের সঙ্গত ছিল না। সম্বল মাত্র হাতের দোতারা। বাদশাহ আকবর সেই গান শুনে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। আকবর ক্ষণকালের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি একজন শুদ্ধসত্ত্ব বৈরাগ্যবান সাধকের কুটীরে ব'সে আছেন। ভাল গান বাজনা শুনলেই ইনাম দেওয়ার অভ্যাস ছিল ব'লে বাদশাহ আকবর রাজসিক গর্বের বশে নিজের আঙুলের হীরার আংটি খুলে নিয়ে স্বামীজীর সামনে রাখলেন। পাশের ঘরে "বাঁকে-বিহারীজী" শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্বয়ং বিরাজমান এবং যদি কিছু প্রণামী দিতে হয় ত' তাঁরই উদ্দেশে করে দেওয়া উচিত, এই শিষ্টাচারও আকবর জানতেন না।

স্বামীজী আংটি উঠিয়ে নিয়ে দরজার মধ্যে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরের উঠানে, ধূলো-বালির মধ্যে! আকবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, অপমানিত বোধ করলেন স্বামীজীর আচরণ দেখে। কী আর করেন, সহ্য করলেন।

আকবরের মুখের ভাব দেখে স্বামীজী তানসেনকে বললেন—যাও বেটা, আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে এস। তানসেন বাইরে গিয়ে দেখলেন, স্তূপীকৃত আংটি পড়ে আছে, আর সবগুলিই অবিকল বাদশাহের আংটির মতো! তানসেন বললেন—প্রভু, আমি ত' বাদশাহের আংটি চিনতে পারলাম না!

স্বামীজী আবার বললেন—দ' হাতের অঞ্জলিতে যা ধরে, তাই নিয়ে এসে এখানে বাদশাহের সামনে রাখো। তানসেন তাই করলেন।

স্বামীজী আকবরকে বললেন—নিজের আংটি চিনে উঠিয়ে নাও। বাদশাহ বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলেন! প্রত্যেক আংটিই ত' তার আংটি যেন!

তখন স্বামীজী একটি আংটি তুলে নিলেন। অমনি আর সব আংটি অদৃশ্য হয়ে গেল! স্বামীজী সেই আংটি বাদশাহকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—এই তোমার আংটি ফিরিয়ে নাও। এতে বিহারীজীর আশ্রমের রজ (ধূলো) লেগেছে, ভালই হয়েছে। অগণিত ভক্তের পায়ের ধূলোর দু' এক কণা লেগেছে বলে এখন এই আংটি পবিত্র হয়ে গেল। একে তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে আমি ছ'ুড়ে ফেলে দেইনি। দেখছিলাম, আংটির গায়ে রজ ধরে কিনা! দেখছি ধরেছে, ভালই হয়েছে। তোমরা দু'জন প্রাণে বেঁচে গেলে। তোমরা ডাকাতের নজর এড়াতে পারনি। তারা তোমাদের অনুসরণ করে তোমাদের বধ করবার সুযোগ খ'ুজছিল; এমন সময়ে তোমরা বিহারীজীর এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে। ডাকাতেরা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তোমরা ফিরে যাও, ভয় নেই।

আকবর ও তানসেন ফিরে এলেন। পথে দেখলেন, জংগল-রাস্তার ধারে কয়েকজন তাগড়া লোক ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

দিল্লীতে ফিরে এসে বাদশাহ তানসেনকে বললেন—আচ্ছা, তুমিও ত' স্বামীজীর ঐ পদ গান কর। কিন্তু—অত মধুর হয় না কেন!

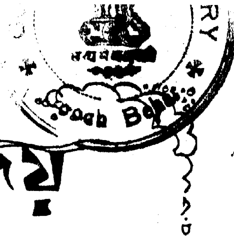
তানসেন বলেছিলেন—বাদশাহ! আমি গান করি আপনাকে খুশী করার জন্য। আপনি ত' হিন্দুস্থানের মালিক। আর স্বামীজী গান করেন পরমেশ্বরকে খুশী করার জন্য। পরমেশ্বর হলেন সারা দুনিয়ার মালিক!

তানসেনের নামের মতো তানসেনের এই উত্তরও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এই কাহিনীর পক্ষে উৎকৃষ্ট দু'জন ইতিবৃত্তকার বিশেষজ্ঞ পেয়েছিলাম; ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব, আর চন্দন চোবেজী। বদল খাঁ সাহেবের বিবৃতি ছিল কিছু সংক্ষিপ্ত; তবুও দুধ মরে যেন ক্ষীর! আর চোবেজীর বিবৃতি ছিল যেন মথুরার দুধের পাকে অপূর্ব মালাইয়ের মতো।

যাই হ'ক, দু'জনেই অলৌকিক স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অলৌকিকত্বের আরোপ ছিল সিদ্ধ শ্রীহরিদাস স্বামীজীর উপরে; তানসেনের উপরে নয়। তানসেনের সম্বন্ধে কোনও অলৌকিকত্বই এ'রা বিশ্বাস করতেন না; যথা—তানসেনের গানে আগুন জ্বলে উঠল, তানসেনের কন্যা সরস্বতীর গানে বর্ষণ নেমে এসে আগুন নিভিয়ে দিল; বিলাস খাঁর গান শুনে মৃত তানসেনের হাত ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে বিলাস খাঁকে আশীর্বাদ জানাল, ইত্যাদি রকমের কথা। ভারতে ও অন্যত্র সাধু সাধক ভক্ত মহাত্মা ব্যক্তিদের কোনও কোনও কর্মে ঈশ্বরানুগৃহীত অলৌকিক সিদ্ধির বিকাশ ঘটেছে ও ঘটে, একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বিশিষ্ট সাধনা তপস্যার অভাবে এবং প্রতিকূল জীবন-ভূমির মধ্যে যে কোনও লোক অলৌকিক সিদ্ধি প্রকাশ করতে পারে, এমন কথা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা নয়। অন্তত তানসেনীয় ইতিবৃত্তকারেরা বলেন না যে, বিশিষ্ট শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে তানসেন কোনও সময়ে সাধনা-তপস্যা করেছিলেন।

তানসেন অনন্যসাধারণ সংগীত-প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। সর্বকালের সর্ব-প্রতিভা সম্প্রদায়-প্রবর্তক হয়নি। কিন্তু তানসেন প্রতিভার অধিকন্তু সম্প্রদায়-প্রবর্তকও হয়েছিলেন। (ক্রমশ)



# সমুদ্র হৃদয়

**প্রতিভা বসু**

১

গ্রীষ্মের লম্বা দুপুরটি উদাস আলস্যে গড়িয়ে গড়িয়ে এতোক্ষণে এসে মধ্যাহ্নে পৌঁছুলো। এখানেই সূর্যের প্রচণ্ড যৌবন দাবদাহ পরিপূর্ণ হয়ে বিকীর্ণ হলো পৃথিবীতে। অনেকখানি সময় যেন ঝলসে গেল সেই অসহ্য উত্তপ্ত ক্ষুধিত যৌবনস্রোতে। তারপরেই ঝিমিয়ে এলো রোদ, শুধু যাবার আগের যাই-যাই বেলাটি গভীর মমতায় থমকে রইলো অনেকক্ষণ; হীরের দ্যুতির মতো প্রখর সাদা রং সূর্যাস্তের আবিরে রঙিন হয়ে উঠলো।

সিংহমুখ ফটক থেকে আসান ম্যান্সন পর্যন্ত সিকি মাইল জুড়ে সোজা টানা বাঁধানো রাস্তাটির দু' পাশের কৃষ্ণচূড়ার মাথায় হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠলো দপ করে। ম্যান্সনের মিনে-করা গোল গম্বুজের লাল নীল হলদে সবুজ কাচে সেই আগুন প্রতিভাত হ'য়ে চোখে ধাঁধা লাগালো। পুল-বাগিচার কৃত্রিম পাহাড় আর ঝরনার জলে স্নানরত অপূর্ব সুন্দরী নগ্নরমণীর মার্বেল মূর্তিটি সূর্যাস্তের লালে লাল হয়ে মনে হ'লো লজ্জা পেয়েছে।

বাঁধানো রাস্তা থেকে প্রশস্ত সবুজ লনের বুক চিরে রক্তের মতো টুকটুকে সুরকি ঢালা যে অন্য রাস্তাটি ডানদিকে এলিয়ে, বাঁদিকে বেঁকে সাপের গতিতে এসে নতুন হল ঘর সবুজ-মহলে ঠেকেছে সেখানকার সোনালী লতা-কাটা পেতলের কাজ-করা বর্মা টিকের বিশাল দরজাটি এবার খুলে গেল আস্তে আস্তে। জানালা থেকে চন্দনগন্ধী খসখসগুলো উঠে গেল উপরে, বন্ধ খড়খড়ি দু' পাশে সরে গিয়ে দেখা গেল পদ্মকাটা নকশী গ্রীলের বাহার; তার ফাঁক দিয়ে হলের ভেতরকার দুধের মতো সাদা মারবেল মেঝেতে আর রঙিন কার্পেটে একটি চিকরি কাটা আলোর বুনোট নকশা কেটেছে। পড়ন্ত রোদ্দুরের মিঠে ঝলক। পলকের জন্য চোখ তুলে সেই আলপনার দিকে তাকালো সুলেখা।

আশ্চর্য! বেলা তাহ'লে গেল? সুদীর্ঘ আয়ুর কৃপণ কবল থেকে আর একটি দিন তবে খসলো? আশ্চর্য! আশ্চর্য! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে সুলেখার জীবনে যে, দিনগুলো তবু অবসান হয়। ফিরে ফিরে রাত আসে, ঘন অন্ধকার কালো রাত। আর সেই কালো রাত ফিকে হ'য়ে ঘনিয়ে আসে আবার সূর্যের আলো। আবার দিন। আবার রাত। একটু হাসলো সে। ঠোঁটের কোণে অনেকক্ষণ ধরে লেগে রইলো সেই হাসি।

এইমাত্র স্নান ক'রে এসেছে। কালো কুচকুচে পাথরের দেড়শো পিলারের উপর বসানো দেড়তলা সমান উঁচু হালকা চেহারার এই সবুজ মহলের বাথরুমটি অতিশয় শৌখিন। তিন সিঁড়ি নেমে বিশাল চৌবাচ্চা, প্রায় একটি ছোটোখাটো পুকুরের মতোই গভীর। তীরে তীরে চওড়া চত্বর। উপরে কাচের ঘর দিয়ে রোদ্দুরের ঝিলিক লেগে চকচক করে। মাটির নীচ দিয়ে সুকৌশলে জল নিকাশের নালী আছে; দু' বেলাই ছেড়ে দেয়া হয় সে-জল, স্নানের আগে আবার ভরে ওঠে। গোলাপ-গন্ধ সল্টের সেই টলটলে জলে অবগাহনে এখন শরীর শীতল। ঘরের মধ্যে ভাসমান তার মৃদু সৌরভ বাতাসে মদির।

মস্ত হলের ঠিক মাঝখানটিতে ঘাস-রং নরম পুরু পারস্য গালিচার উপর লাল টুকটুকে মখমল মোড়া গোল আর নিচু একটি আসনে বসে আছে সে; মুখ নিচু

ক'রে। পাশে জালিকাটা সোনার ঝালিতে চুল বাঁধার সরঞ্জাম। রুপোর ঝুমকো ঝোলানো সিল্কের ফিতে, ঢাকাই কাজ-করা ঘুণ্টি দেয়া সোনার কাঁটা, সোনার চিরুনি, কদম ফুল আর বকুল ফুলের নকশায় রুপোর ছিটকাঁটা, বেণী জড়াবার সোনালী পাত। জয়পুরী মিনে করা ছোট্টো বাটিতে সুগন্ধ তেল আছে পাশে। সুলেখার ঘন চুলে এ বাড়ির খাস বাঁদী জবেদান্নেসা আস্তে আস্তে নরম হাতে আঙুল ঘষে বুলিয়ে দিচ্ছে সেই তেল। সোনা বাঁধানো চিরুনির মসৃণ হাড়ের নরম দাঁত দিয়ে ধীরে ধীরে আঁচড়ে দিচ্ছে সেই ঘনকৃষ্ণ চুলের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। শেষে বত্রিশ গুচ্ছির বেণী পাকিয়ে তার তলায় ঝুলিয়ে দিলো রুপোর ঘুণ্টি। কালো বেণীর ফাঁকে ফাঁকে বকুল ফুল আর কদম ফুলের নকশার ছিটকাঁটাগুলো গেঁথে দিলো কৌশলে। আজ খোঁপা না, আজ অমনি চওড়া চ্যাটালো বেণী লুটিয়ে আসবে পিঠের উপর। আজ আগুন রংয়ের শাড়ি পরানো হবে সুলেখাকে। তার উপরে এই কালো আকাশের মতো বেণী অসংখ্য তারকা নিয়ে জ্বলতে থাকবে চোখ ধাঁধিয়ে।



চুল বাঁধায় নাম আছে জবেদান্নেসার। এ কাজে সে বহুকাল ধ'রে হাত পাকিয়েছে। চুল বাঁধার জন্য তার ডাক পড়েছে ঘরে ঘরে। অল্পবয়সী বৌ-ঝিরা কে কার আগে মাথা দেবে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে তাই নিয়ে। সেসব কথা মনে পড়ে গেল আজ। সুলেখার মাথার সামনেটা ঠিক ক'রে দিতে দিতে তার ভাবলেশহীন নিষ্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা জবেদার চোখে যেন অতীত ঘনিয়ে এলো। নরম গলায় বললো, 'আমার চুল বাঁধা তোমার পছন্দ হয় না?'

সুলেখার স্থির চোখের পল্লবে ছোট্ট একটি কম্পন উঠলো শুধু, জবাব দিলো না।

'আমিও তোমার মতো বয়সেই এ বাড়িতে এসেছিলাম। আমি তোমার মনের কথা বুঝি।'

সুলেখা ঢোক গিললো।

'ভারি সুন্দর চুল তোমার। পুরুষেরা মেয়েদের চুল ভালোবাসে।'

অপরপক্ষ যতোই নীরব থাকুক না কেন, কথা না বলে পারে না জবেদা, 'তোমার এই চুলের অরণ্যেই পথ হারিয়েছে সে।'

সুলেখা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণ কামড়ে ধরলো জোরে, নরম ঠোঁটে ছোট্টো একটু মাংসখণ্ড উঁচু হয়ে উঠলো তৎক্ষণাৎ।

এরপরে ডাবের জলে মুখ ধুইয়ে, চন্দন মাখিয়ে, সেই চন্দন সিল্কের টুকরোয় আবার মুছে দিয়ে, স্নেহ পদার্থ বুলিয়ে দামী পাউডারের প্রলেপে উজ্জ্বল করা হ'লো দেহের রং। সাহের বানু রুপোর থালায় বসন ভূষণ সাজিয়ে নিয়ে এলো কাছে। হাতে লাল পাথরের চুড়ি, কানে চুনী পান্নার ঝুমকো, গলায় তিন লহরী প্রবালের মালা পরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে তাকিয়ে দেখলো জবেদান্নেসা, তারপর সেই গয়নার সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ি ব্লাউজ বাছা হ'লো।

সুলতানের আসবার সময় হয়েছে। আর দেরি না। অন্ধকার নামবার আগেই তেত্রিশটা ঝাড়-বাতির ফোকরে ফোকরে অগুনতি মোম জ্বালিয়ে দেয়া হবে মাথার উপর। কাটগ্লাসের তীক্ষ্ণ কোণাচে কোণ-গুলোতে তীব্র জ্যোতি প্রতিভাত হয়ে ঝলসে দেবে ঘর। বেশীক্ষণ নয়, মাত্র দু' ঘণ্টা জ্বলবে এই চর্বির বাতি, তারপরেই নিবিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক স্যুইচ টেপা হবে ঘরে।

এই দু'ঘণ্টা সুলতানের। সারাদিনে রাত্রে মাত্র এ দু'ঘণ্টাই তিনি কাটান এখানে, এঘরে। মোমের আলো তার পরম প্রিয়, সুলেখাকে তিনি সেই আলোতেই দেখেন, দেখতে ভালবাসেন। আজ এক মাস ধ'রে তাই দেখছেন।

ঘরের ঐ প্রান্তে দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে মস্ত হাস্নুহানার ঝাড়ে আবডাল-করা জানালার কাছে মকরমুখ রুপোর পায়ার প্রায় এক বুক উঁচু মেহেগনি খাট। খাটের চারধারে এক বিঘত উঁচু কাশ্মীরী কাজ করা আখরোট কাঠের কার্নিশ, মাথার কাছে চূড়োর মতো জাফরি-কাটা জালি। লম্বা বাজুগুলোতে রক্তবর্ণ লাক্ষার প্রলেপ, তার ভেতরে সোনার জলের সরু রেখায় আঙুরলতা আঁকা। সিল্ক সাটিনের ধবধবে মসৃণ বালিশে চাদরে গদিতে একরাশি ফুলের মতো নিভাঁজ বিছানা। খাটের এদিকে পূবে প্রান্ত ঘেঁষে, যে দিকটায় দরজা দিয়ে ঢোকে, সেখানকার জানালার তলায় মোটা নরম গালিচার উপর কোণাচে ক'রে ছোটখাটো বসবার আয়োজন, বিলিতী প্রথায়। একটি ডবল স্প্রীংয়ের তিন খণ্ড নিচু নিচু মখমল মোড়া সেট। খাটের পায়ের দিকে রঙিন কাঠের কাজ করা পাঁচ ধাপ সিঁড়ি। খাটে ওঠার সোপান। কাঁচা আম-রংয়ের চার দেয়ালে, বড় বড় খড়-খড়ির ফাঁকে ফাঁকে চারটি ফ্রেসকো ছবি। মোগল দরবারের দৃশ্য। কোণে কোণে উঁচু তিনপায়া চৌকো পাথরের টেবিলের উপর বেঁটে পাম গাছ। পশ্চিম প্রান্তে ড্রেসিং টেবিলের আট ফুট লম্বা বেলজিয়ান আয়না কোণাচে করে বসানো, পাশে ঠিক সেই আকৃতিরই দু'পাটে দু'খানা আয়নাযুক্ত কাপড়ের আলমারি। আয়নাগুলো এমন-ভাবে স্থাপিত, যাতে একজন মানুষ তার সমস্ত অবয়ব সামনে পিছনে দু'দিকেই পরিপূর্ণভাবে দেখতে পারে। বাঁহাতে মস্ত জানালা ঘেঁষে মার্বেল পাথরের ছোট্ট লেখার টেবিল, গদি-আঁটা চেয়ার, তলায় কার্পেটহীন ঠাণ্ডা মেঝে।

এইমাত্র এক গুচ্ছ টাটকা গোলাপ রেখে গেছে ফুলদানিতে, মিষ্টি গন্ধ। ঝাড়গুলো জেলে দেবার আগে, প্রসাধন শেষ হলে, সুলেখা এখানে এসে দাঁড়ালো পিছন ফিরে। যতদূর চোখ যায় ধু ধু মাঠ নবাববাড়ির, কার্পেটের মতো সবুজ ছাঁটা ঘাস। মাঝে মাঝে শৌখিন ফুলের কেয়ারি। লাল-নীল সবুজ হলুদে। যত রং পৃথিবীতে সম্ভব সব রংয়ের ফুল ওরা ফুটিয়েছে যত্ন করে। হোস্‌পাইপে জল ঢেলে এই মাত্র শীতল করা হয়েছে মাঠের তপ্ত বুক। সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে মাটি থেকে। সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে, ডোববার আগে জানালা গলিয়ে খানিকটা কাঁচা লাল রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে গেলো সুলেখার টেবিলে, চেয়ারে, সাদা মারবেল মেঝেতে। তাকিয়ে দেখতে দেখতে চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো সুলেখার।

ইশ! কী লাল! আগুন? না রক্ত? কী? যেন ভয় পেয়ে শিহরিত আবেগে দু'হাতের পাতায় মুখ ঢাকলো। সিঁদুর রঙ শাড়ির উপর কালো বেণী—সোনার চুমকি নিয়ে ঝক ঝক করে উঠলো। ঝক ঝক করে উঠলো কানের সাচ্চা-চুনী-পান্না, সারা শরীর কম্পিত, সুলেখা দেয়ালের ঠেসানে ন্যস্ত করলো নিজেকে, তারপর হাঁপাতে লাগলো রৌদ্রদগ্ধ কুকুরের মতো।

জাবদাম্নেসা ছুটে এসে ধরে ফেললো তাকে, ঈষৎ ভর্ৎসনা মেশানো গলায় বললো, 'হয়েছে কী বলতো? আজ সকাল থেকেই অমন করছো কেন? হাত নামাও মুখ থেকে, এসো, ঠাণ্ডা হয়ে বসবে এসো।'

ঘরের মাঝামাঝি হেঁটে এলো সুলেখাকে নিয়ে। একটু চুপ করে থেকে বললো—'এবার আমি যাই, কেমন?'

রুদ্ধস্বরে সুলেখা বললো, 'যাও।'

'তুমি শান্ত মনে খাটে এসে বোসো।'

'বসবো।'

'তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'তবে কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'মুখ গোমড়া করে আছ কেন?'

'কই—না—'

'একটু হাসতে পারো না?'

সুলেখার হাসিই পেলো।

যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে জবেদা বললো—'তোমার বরাত ভাল।'

সুলেখার চোখের কোলে টোল খেলো, মাথা নেড়ে বললো, 'তাইতো।'

'দ্যাখো বাছা, যতোই কাঁদো আর যতোই গর্জাও, মনে মনে জেনো, এ শুধু সুলতানের নেক-নজর নয়, এর নাম প্রণয়। প্রেম। তোমার উপর তাঁর লোভের চেয়ে প্রেম বেশী, প্রেমে আসক্ত তিনি।'

'হু।'

'এই প্রেমই জীবন। প্রেমই প্রাণ। প্রেমই একমাত্র সত্য।'

'হু'।

'প্রেম মানুষকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে দেয়। যার হৃদয়ে সেই প্রেম জাগে সে-ও ধন্য, যার জন্য জাগে সে-ও ধন্য। চায় সবাই, পায় ক'জন?''

'হু।'

'তুমি পেয়েছ। নাও। মন-খারাপ করে থেকো না।'

'না'

'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘেই খায়। সেই মনকে তুমি পোষ মানাতে চেষ্টা করো। সেই মনকে তুমি বলো—আর কেন দাপাদাপি, ঝড়-ঝাপটা যা হবার তাতো হয়েছে, এখন ভেবে নাও না এ ঘরই তোমার, এ ঘরই তুমি আপন করে নাও। অসম্মান তো নেই।'

'তাই ভাবছি।' এখানে সত্যি হাসি ফুটলো সুলেখার মুখে। সে হাসি যেমন কঠিন, তেমনি কুটিল।

'শোনো ছেড়াকি' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে চোখ তেরচা করলো জবেদান্নেসা। 'বেইমানি করো না। বেইমানি করে লাভ হবে না। নিজেই জ্বলবে। ভাল করে ভেবে দেখো, সুলতান ইচ্ছে করলে তোমাকে আজ কী না করতে পারেন। সবই তাঁর মর্জি।'

সুলেখা অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

'আর তা ছাড়া সে যদি তোমাকে সেদিন না নিয়ে আসতেন এখানে, তাহলে কী হ'ত?'

'কী হ'ত?' বড় বড় সুর্মা আঁকা কাজল কালো দুটি চোখ সুলেখা জিজ্ঞাসায় স্থির করলো বাঁদীর মুখের উপর।'

না, খুব সুন্দরী নয় সে। ওই চোখ দুটোই শুধু দেখবার। তা নইলে সাধারণ। রং শ্যামল, মুখশ্রীও তেমন কিছু উল্লেখ-যোগ্য নয়। ছিপছিপে। আঁটোসাঁটো। স্বাস্থ্যের জলুস আছে। আর আছে সতেজ আর সহজ একটি ভঙ্গি। তার চেয়ে এই বাঁদী গতযৌবনা হয়েও অনেক বেশী সুন্দরী। রূপসী। তিল ফুল নাসা, কঠিন চিবুক, মৎস্যাকৃতি চোখ, লম্বা দোহারা গড়ন, টকটকে গায়ের রং। আঁটো, রঙিন সেহাতি ব্লাউজে, পেঁচিয়ে শক্ত করে পরা রঙিন শাড়িতে, এক হাত কাচের চুড়িতে, মেহেদী-রাঙা নখে প্রায় যুবতী দেখায়। মুক্তোর মতো সুন্দর সুসংবদ্ধ সাদা দাঁত দেখিয়ে যখন হাসে, তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় সুলেখা। শোনা যায় সুলতানের বাবার কীর্তি ইনি। অল্পবয়সেই পত্নী-বিয়োগ হয়েছিল, তারপর আর বিবাহ করেন নি। এর জন্যই হয়তো দরকার হয়নি। একবার শিকারে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে কোন গরীব প্রজার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেবা-যত্ন-জল-ফল সব কিছুকেই ভাল লাগার সংগে এটিকেও মনে ধরে গিয়েছিল।

গল্পটা সাহেববানুর। সবুজ মহলের কনিষ্ঠতম বাঁদী। জবেদার সহকারী। চতুর চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে করতে খসখসে গলায় বলেছিল সে। চোখে-মুখে আক্রোশের তরঙ্গ তুলে বলেছিল, 'ও কি সোজা মানুষ ভাবছো তুমি? ওর কেবল মুখ মিষ্টি, মিছরির পানা। দিলটা গরলে ভরা। কর্তা সাহেব একটু পেয়ার করতেন বইলা দিন দুনিয়া চোখে দেখতো না। অত ফষ্টিনষ্টি করলে সব পুরুষেরই মন টলে। আরে বাপু, তোর কথা আর কে না জানে? মতি মিঞার মাইয়া তুই, বাপের আছিলোটা কী? ছনের ছাউনির তলায় ঘাড় গুইজা থাকতি আর হেউঁলি পাতার মাদুর বানাইয়া হাটে হাটে বিক্রী করতি। বাপ অইলো কিষাণ, অথচ না ছিল জমি, না ছিল হাল। না কি হাল-চাষের হিম্মৎই আছিলো মতি মিঞার? বুকের মধ্যে তো কয়েকটা পাঁজরা আর হাড্ডির উপর একটা চামড়া। বারটা মাস খালি খকর খকর, আর হাঁপির টান। জানি না? সব জানি। মাইয়া তো এক গাওয়েরই? হু, সেকথা যদি কও তো আমার বাপরে দ্যাখো। বয়স অইলে হইবে কী, সাত ব্যাটার শক্তি

একটা শরীলে। তারপর তোমার গিয়া হাস বলো, মোরগ বলো, গাই গরু, জমা জমি— কী না করাছিলো। আর আমার বিয়াও দিছিলো ভালো ঘরে—'

খুট্‌ করে আওয়াজ হয় কোথায়, চমকে থেমে যায় সাহেরবানু। তার সতর্ক দৃষ্টি ঘরের আনাচে-কানাচে ফিরতে থাকে, হাতের কাজ দ্রুত হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে কপাল চাপড়ে বলে, 'নসিব, নসিব। সকলই নসিবের খেলা দিদি, আর খোদাতাল্লার চাতুরী। নইলে এই দেহেও কম রূপ আছিলো না। সেই নচ্ছারটা তো তাতেই মজলো। ঐ তোমার গিয়া গোলাবাড়ির নায়েবটার কথা কইতাছি।'

কোথায় গোলাবাড়ি আর কোথায় তার নায়েব জানবার কথা নয় সুলেখার, তবু সে শোনে, শুনতেই হয়। বলছে বলুক, বারণ করবার ইচ্ছেটুকুও কাজ করে না মনের মধ্যে। চুপচাপ শ্রোতা পেয়ে সাহস বেড়ে যায় সাহেরবানুর। কাজকর্ম ফেলে মুখের কাছে এগিয়ে আসে সে, দুই চোখে রাগ ফুটিয়ে বলে, 'তখন কতো ভাল ভাল কথা, কতো রঙ্গ, কতো রস। রসিদ কামে বাইর অইল কি বজ্জাতটা আইয়া উপস্থিত। কয় কিনা, তোমার মতন মাইয়া কি রসিদের যোগ্য? ও অইলো একটা চাষা। আমার লগে চলো, একেবারে পাটের বিবি কইরা থমু, পা-ওখানা মাটিতে লামাইলে বুক পাইতা দিমু। পোলাপান আছিলাম, ভুললাম। আর ভুলাইয়া ভালাইয়া শেষে কী দশাই করলো হারহাবাতের পুত। রসিদ ওদিকে তালাক দিতে চায় না, কত কাণ্ড কইরা তালাকনামা আদায় কইরা আইসা দেখি, ওমা! কোথায় ওড়না গায়ে সারা চোখে বেহেস্তের হুরী হইয়া দিন কাটামু, তা তো নয়ই—দুই মাস যাইতে না যাইতেই কয় কিনা অত শুইয়া-বইসা সাইজা-গুইজা দিন কাটাইলেই চলবো না। ক্ষেতখামার আছে, উঠানে ধান-পান আইছে, এইসব দেখতে অইবো, শুনতে অইবো, কুটতে অইবো, ভানতে অইবো—শুনছো কথা? তার উপরে জনমজুর খাটছে কত, তাদের ভাত সিদ্ধ করতে অইবো না? ধুত্তোরি তোর ধান-ভানা, ঢেঁকি কোটা আর পাতিল পাতিল পান্থা আর গরম। অত খানা খিদমৎ আমার দ্বারা অইবো না। এক কথায় দুই কথায় শেষে ঝগড়া, তারপর মারামারি। আর তারপর তো দেখছোই। এই পুরীতে আইয়া পৌঁছাইছি। না, বেইমানি করুম না, আছি ভালোই।' সুলেখার নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায় সাহেরবানু, 'বুড়া নাসের আলির বিবি যেইবার তিনদিনের ওলাওঠায় কবর লইলো, আমিও আইসা বহাল অইলাম। এই বাড়ির খাইয়া-পইরাই তো নাসের আলি মানুষ অইছে, দুই চার ফোঁটা রক্তও গায়ে আছে এইখানকার, মিথ্যা কমু না, মানুষটা ভালোই আছিলো। বুড়া অইলেও অশক্ত আছিলো না। রাখছিলো সুখেই। ঐ যে দূরে হাইলাকান্দির গম্বুজ দেখা যায়, ঐখানে আছিলাম, মাইজা বিবির দাসী আছিলাম আগে, জবেদার তখন দিনের মতো দিল। কী দেমাক। এদিকে তাকাইলে ফাইটা যায়, ওদিকে তাকাইলে ফাইটা যায়। আরে বাপু এটা কেন বোঝছ না যে, দাসী দাসীই। আমিও দাসী তুইও দাসী। তুই না হয় সুলতানের বাপের দাসী, আর আমি না হয়—।'

দাসী ঠিকই। জবেদা এখানকার খাস দাসী। কিন্তু প্রতাপে তার রাণীর দখল। সাহেরবানু যাই বলুক, জবেদার সঙ্গে তার কোন দিক থেকেই কোন তুলনা হয় না। না চরিত্রে, না চেহারায়। সুলতানের বাবা একে বিবাহের মর্যাদা দেন নি বটে, কিন্তু নিজের মাতৃহীন সন্তানকে সঁপে দিয়ে মাতৃত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন। ছ'বছর বয়স থেকে এই সুলতানকে জবেদা নিজের বুকের ক্ষুধিত মাতৃত্বের সমস্ত স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছে। সুলতানের বিপত্নীক পিতার প্রীতিও একদিনের তরে এতটুকু অবিশ্বস্ত হয়নি সে। গরীবের ঘর থেকে এলেও মনের কোনখানে দারিদ্র্য ছিল না, সুলতানের পিতার প্রণয়ের অযোগ্য ছিল না। আকতার সাহের সম্মান করতেন তাকে, সুখে রাখতেন। সেই সুখভোগের জন্য সে-ও কৃতজ্ঞ ছিল। ছেলে মানুষ করার দাসী হিসেবেই এসেছিল, আকতার আমেদ জবেদার দরিদ্র পিতাকে তার মেয়ের বিনিময়ে পাকা কোঠা করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রচুর টাকাও ইনাম দিয়েছিলেন। বলতে গেলে মতি মিঞা নবাবের কাছে বিক্রীই করেছিল মেয়েকে। কিন্তু আকতার সাহের জুলুমবাজ ছিলেন না, লোভী ছিলেন না— বরং ধর্মভীরু মানুষ বলেই খ্যাতি ছিল তাঁর। জবেদাকে দেখে যতই মজুন, জোর-জবরদস্তি কখনোই করতেন না, যদি মতি মিঞার অমত থাকতো। প্রকৃতপক্ষে মতি মিঞাই টাকার লোভে ঠেলে পাঠিয়ে দিল মেয়েকে। ক্রীতদাসী বললেই বা ভুল হয় কী? কাজেই কুড়ি বছরের জবেদারেশার বুকের কলিজা তখন যার জন্যই ছিঁড়ে থাক না কেন, সমস্ত বেদনাকে নিঃশব্দে মেনে নিয়ে এদের ভাল ব্যবহারের বিনিময়ে, বাপকে বড়লোক করে দেবার কৃতজ্ঞতায় বিকিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। শুধু একবার, একবার সমস্ত অন্তরীতন্ত্রী কাঁপিয়ে প্রচণ্ড কান্নায় ডুকরে উঠেছিল রাত্রির অন্ধকারে দেয়ালে মাথা ঠুকে। নবাববাড়ির দু'মাইল জোড়া ঘেরাও করা সাড়ে সাত ফুট দেয়াল ডিঙিয়ে যেদিন সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু-খবরটা এসে পৌঁছেছিলো এখানে, সেদিন আত্মসম্বরণ করতে পারে নি সে। সাহাবুদ্দীন তার চাচাতো ভাই, তার আশৈশবের বুকভরা বুক জোড়া মন-প্রাণ-দেহ-মনের একমাত্র অধিকারী। সাহাবুদ্দীন আত্মহত্যা করেছিল। তার জন্যই করেছিল। জবেদার বিচ্ছেদ সইতে পারে নি সে। এই কথা লিখে রেখে গিয়েছিল চিঠিতে।

কিন্তু সেসব কবেকার কথা। কোন অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। জোয়ান ছিল না, না থাকুক, তবু আকতার আমেদকে ভালবেসেছে বৈকি, গভীরভাবেই ভালবেসেছে। অসুখের সময় মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে, খোদার কাছে জীবন ভিক্ষা করেছে, মারা গেলে কতদিন কেটে গেছে কেঁদে কেঁদে। শিশু সুলতানকে মানুষ দিয়ে সব কথা ভুলতে পেরেছে সে। এ-ই সাহেরবানুর খবর। সাহেরবানু অবশ্য অন্যভাবে বলেছে, শুনতে শুনতে অন্তরের দরদ দিয়ে এভাবে গ্রহণ করেছে সুলেখা।

(ক্রমশ)

# কানি বোষ্টুমীর গঙ্গাযাত্রা



বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ডেথ সার্টিফিকেটখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখল মদন। মদন মালাকার। যাত্রা শুরু হতে যা কিছু দেরি হচ্ছিল তা এরই জন্য। ওদিকে বাঁধাছাদা করা, খাটিয়ার দুপাশে দুটো লম্বা বাঁশ বেঁধে নেওয়া, শব দেহের উপর একখানা সাদা চাদর বিছিয়ে দেওয়া, তার উপর ফুল ছড়িয়ে দেওয়া, হাড়ি সরা মায় একজোড়া গামছা কেনা থেকে শুরু করে টুকটাক এটা সেটা গোছগাছ করার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেবল মদন ভাবছিল, শব বয়ে নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্রখানা পেলে হয়, তাও যখন পাওয়া গেল, আর কি! "এবার হরিবোল দেরে ভোলা!" মদন নিজেই হরিধ্বনি দিয়ে উঠল, "বলহরি..."। ভোলা-বিল্টুরা এতক্ষণ বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, যেন হঠাৎ তীক্ষ্ন আলপিনের খোঁচা খেয়ে কোঁৎ করে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হরিবোল।

"এই নরসিং কাঁধটা লাগা না রে বাপু, বাঁস মড়া আর কতক্ষণ পাহাড়া দিবি? নে নে ধর ধর।" মদনের গলাটা যেন ভারী হয়ে বুজে এল।

ভোলা-বিল্টুদের কাছেও যেন আজ মদনের দুর্বলতার ঝাঁজটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। ষাট বছর বয়সের কাঠিনো-মাজা মুখটা যেন বড় করুণ মনে হচ্ছে সবার কাছে। অভিজ্ঞতার স্তর জমা চোখের ডিম দুটোর স্বাভাবিক লালচে রংটা যেন আজ বড় বেশী অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ওরা এক ঝটকায় খাটিয়াটা কাঁধে তুলল।

বোধহয় ওদের সকলেই কানির চেয়েও মদনের কথাই ভাবছিল বেশী করে। মাগ মরলেও কেউ অমন ঢং দেখাতে পারে কিনা সন্দেহ। আর এতো কানি বোষ্টুমীর মরা। সাতকুলে কেই বা আছে ওর মুখে আগুন দেওয়ার মতো। সেই কানি যাবে গঙ্গায়। ভালো পিরীত করেছিলি বাবা! রাসু কাঁধের উপর খাটিয়ার বাঁশটা আয়েস করে রাখতে রাখতে বলে, "ও মদনদা, গঙ্গা অব্দি গেলে কিন্তু আর এক পাইট ছাড়তে হবে।"

মদন বলে, "সে হবেখ'ন। আর একটা ডাক দে দেখি প্রাণ খুলে, বলহরি......"

......সবাই খাটিয়া সমেত লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হরিবোল।

রাত্রিটা সেই থেকে যেন ঝিম ধরে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে যেন শক্ত হয়ে রয়েছে। একটুও বাতাস নেই।

গো-হাটার এদিকটায় দিনের বেলাতেই লোক আসে না, তায় এখন তো রাত দুপুর। যারা এসেছিল কানির মরা দেহটা দেখতে তারা অনেক আগেই উঃ আঃ করে বিদেয় নিয়েছে; এবার যা ভালো বুঝবার মদনাই বুঝবে। সবাই জানে তেলটা নুনটা মাঝে মাঝে মদনই দিয়ে যেত কানিকে। মদনের সাথেই যা কিছু সম্পর্ক ছিল কানির। আর সবাই তো আলগা আলাপেরই লোক।

গো-হাটার মাঠ ডিঙিয়ে শবদেহটা এগিয়ে চলল।

বলহরি......

হরিবোল।

কানিটা দিন কয় থেকেই মরবে মরবে করছিল, আজ সত্যি সত্যি মরল। চুষে খাওয়া আমের মতো চামড়া সার হয়ে গিয়েছিল কানি বোষ্টুমী। ঝুনো হাড়গুলো নিয়ে নড়তে বসতে মটমট করে শব্দ হতো। এক চোখ কানা, যেন মাছের আঁশের মতো সাদা একটা চলটা উঠে গিয়েছিল চোখ থেকে। আর একটা চোখ ছিল ভালোই, তবে বয়সের ধুলো ঠাসা, ঝাপসা।

এককালে নাকি ঐ দুটো চোখই দপ দপ করে জ্বলত। ঠোঁট দুটো ছিল কমলা লেবুর কোয়ার মতো, কসে-ভেজা। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি ছিল খানিক তামাটে,

খানিক কান্না। কণ্ঠোলো নাকটা নাচিয়ে বকম বকম করে কথা বলত কানি।

গানগলা ফুলিয়ে পেখম ধরতো ময়ূরের মতো। লক্কা পায়রার মতো লাট খেয়ে ঢলে পড়ত গায়।

কানির এই সুখের দিন, সে কি আর আজকের কথা। রাসুরা সেই সব কথা গল্পের মতো শোনে। মদন বলে, "কানি বোষ্টুমী তখন বিবির হাটে নামডাক নিয়ে বহাল তবিয়তেই আছে। গান গায়ঃ 'আমি প্রাণসজনী রাধের বোষ্টুমী, ক্ষ্যাপাকে বলব এবার করে যেন কমিশনারী…।' মরা মানুষও সেই গান শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠত, তায় আমরা তো তিরানব্বুই বাইশের ছোকরা। মজে গেলাম কানি বোষ্টুমীর রসে। কানির তখন তিরিশ হয়েছে কি হয় নি।

তখন কাজ করতাম ওলাবাবুর কাঠ গোলায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটুনির খাটনি করাত টানি। সন্ধ্যের পর পাকাড়ে আর মাটির খুরিতে মাল ঢেলে নিয়ে বসি। এখন, আজকালকার মতো এখানে দোকান ছিল না। জোটিলার, গো-হাটার পারে পাতে [illegible] গাছটার তলায় বসতে সবাই উদোম হয়ে। [illegible] দোকান। তাদের গলেই [illegible] আর নাই [illegible] [illegible] অার একটা সেই তৈরি করতেই পারে না।"

রাসুরা অবাক হয়ে শোনে সেই গল্প। মদন খদ্দের থাকে না দোকানে মদন হাঁড়িয়ে হাঁড়িয়ে শোনায় কানির কীর্তিকলাপের কথা। খদ্দের এলেই গল্প থেমে যায়।

খদ্দেরও হরেক রকম। সেই ঘটো থেকে শুরু করে মিঠাই হাক লো বাবু।

"বড়বাবু, আজ একটা [illegible] নেই!"

"নারে মদনা, ওটি মালিক আমাকে। ও ছাই না পেলেও পারি না!"

"ছি ছি ছি!" মদন চিত্ত কাটে, "এই নরসিং, থেকে কোথাকার, বাবুকে দেখছেন দিন দিন দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিস কি রে হারামজাদা, টুলটা মুছে বসতে দে বাবুকে।"

কোথায় হচ্ছিল কানি বোষ্টুমির গল্প, না বড়বাবুকে নিয়ে পড়তে হল। এমনিই হয় রোজ। কখনো হুটোপাটি করে একগাদা খদ্দের এসে এমন তাণ্ডব জুড়ে দেয়, সামাল দিতে মদনা গুণ্ডাকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। আবার কখনো সামসুম করে দোকানটা লোকের অভাবে। কুকু করে ডাক দিলে যেন দশটা কুকু হয়ে ফেরে।

রোজই এমনি একঘেয়েমি।

আঠা চটচটে টেবিল। অন্ধকার ঠাসা বাঁশের চাঁচের বেড়া দেওয়া মদনের দোকান ঘর। থাক থাক সাজানো মদের বোতল। স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝের উপর বিড়ির টুকরো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, শাল-পাতা এলোমেলো ছড়ানো। একটা বোঁট্‌কা গন্ধ। সন্ধ্যা হবার আগেই দুটো ডে-লাইট জ্বালিয়ে দেয় মদন। একটা ঘরের ভেতর আর একটা বাইরে ঠিক সাইন বোর্ডটার পাশে। অনেক দূর থেকেই আলোটা নজরে আসে সবার। দীপালি পোকার মতো ফুর ফুর করে খদ্দের জুটে যায় মেলাই। পাশেই বিবির হাট। তবে তেমন হাট আর নেই। শোনা যায় নীলচাষের সাহেবরা নাকি এর পত্তন করেছিল। সে কি আর আজকের কথা। মদনও জানে না, কতদিন আগেকার ঘটনা হতে পারে!

বলহরি

হরিবোল।

সাত বছর বয়সে কানি বোষ্টুমীর মালা বদল হলো এক কেত্তন গাইয়ের সাথে। কিন্তু কপালের লেখা, কে আর মুছবে বলো! সাপে কাটল লোকটাকে। কাল সাপের বিষ সারা দেহে বিষিয়ে দিয়ে লোকটা যখন কানিকে বিধবা করে রেখে গেল তখন ওর বয়েস চোদ্দ কি পনের। চোদ্দ পনের বছরের বোষ্টুমী, তিলক কেটে একতারা বাজিয়ে কেত্তন গাইতে। চলছিল মন্দ না। কিন্তু কি করে যে বোষ্টুমী ছিটকে এসে আটকে পড়ল এ বিবিরহাটের অন্ধকার খুপরিগুলোর মধ্যে সে খবর কেউ জানে না। এমন কি মদনও না। মদনকেও সে কথা বলে নি কানি। জিজ্ঞেস করলে গলে হাসে আর বাজিয়ে কোন ভাবে এড়িয়ে যায় কানি। বলত না কিছুতেই।

সেই কানি বোষ্টুমী। গো-হাটার এক কোণে কুঁড়ে বাঁধি পড়ে আছে। মদন সর-কারাই একবার সম্বল হয়েছিল ওর শেষ দিন কটার। তবু, মদনই মাঝে মাঝে খোঁজ খবরটা নিয়ে যায়। কখনো সখনো বা বোতলটা লুকিয়ে দিয়ে যায় কানিকে। কানি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করতো মদনকে।

গো-হাটার পথ দিয়ে যেতে যেতে কেউ কেউ শুনতো শুয়েছে কানি বিড় বিড় করছে, 'কোথা কানি কেষ্ট নাম নিচ্ছে বেলা গেল ও কালিয়ে কৃষ্ণ এল না, আমার মালা হলো জপমালা উপায় হলো না।'

হয়ত তখন কেউ হেসে ফোড়ন কেটে উঠত, 'দিদি ও কানি আজ যে গান ধরেছ গো!'

ক্ষ্যাপাটে কুকুরের মতো কানি খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে, "ধর ধর! দিল্লী থাপটার বেটাকে বাগে নেয় না গো! ওয়াক থুঃ ওয়াক থুঃ!" কানি এক চাপ থুতু ছেটায় মেঝেতে। আর কোনও প্রত্যুত্তর না এলে আবার গায়, 'ও কালিয়ে কৃষ্ণ এল না।'

"এসেছি গো কানি।"

কানি খানিকক্ষণ কান খাড়া করে শোনে। যেন গলার শব্দটা লক্ষ্য করে শান্ত হয়ে যায়। তারপর একপাটি কালো দাঁত মেলে ধরে হেসে বলে, "মদনা নাকি রে?"

"হুঁ, এলাম দেখা করতে।"

"বেশ করেছিস, ভালো করেছিস।"

মদন দেখে সারা ঘরখানা ভ্যাপসা ভেজা ভেজা। বাঁশের বেড়ার গায় শুকনো কর্দের ঝালর, মেঝেতে গর্ত গর্ত। এক কোণে জড় করা একখানা চট আর একটা বালিশ, আর গোটা কয়েক শিশি কৌটো। একটা ময়ূরের পালকের ভাঙা পাখা। খানকয়েক নারকেলের মালা। একটা বুক শুকনো মাটির প্রদীপ।

মদন বলল, "কি করছো গো মাসী?"

কানি দাঁত পাটি মেলে ধরে হাসল। মুখের কুচকালো চামড়ায় একটা টোল খেয়ে গেল। মদনের মনে হ'ল কানি যেন এমনভাবে হাসে নি কোনদিন। না, বিবির হাটের সদরে দাঁড়িয়ে থেকে যে চটুল হাসিটা হাসত কানি তার সাথে এ যেন আকাশ পাতাল তফাত। মদনের মনে হ'ল কানি যেন কত কথা বলতে চাইছে এই হাসিটার মধ্য দিয়ে।

"কি গো, হাসছ যে বড়?"

কানির মুখটা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে কানি বলে, "দ্যাখ মদন, আমার অনেকদিনের সাধ......বলব?"

"আহা হা বল না কেন? কি লোক কান্না জুড়েছে দেখ দেখি!"

সত্যি যেন কানি নাকি কান্নার সুরে গলাটা শাণিয়ে নেয়, তারপর আবার বলে, "আমি মরে গেলে একটা কজ্জ করবি মদন? আমায় গঙ্গায় নে যাবি?"

মদন হঠাৎ হো হো করে হেসে ফেটে পড়ে। মনে মনে বলে কানি বোষ্টুমীর গঙ্গা পাওয়ার সাধ! গ্রামের শ্মশানে লোভ নেই কানির। পাঁচক্রোশ পথ ডিঙিয়ে তারক ডোমের শ্মশানে যাওয়ার আশা। তিনকাল যে কেবল পাপ ঘেঁটেই মরল, গঙ্গা কিনা তার সকল পাপ বইবে! সংকারই হয় কি না হয়, কানি ভাবছে তারক ডোমের শ্মশানের কথা। কিন্তু মদন মুখে বলে না কিছুই। কেমন মায়া মায়া হয় কানির বাষ্প ছাওয়া চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে। বলে, "এই কথা! তা এখুনি কি আর মরতে বসেছ তুমি"

"না রে মরব! আমার মন বলছে শীগগির মরব দেখিস! একদিন এসে হয়ত দেখবি মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছি ঘরে।"

"তাই যদি হয়, তবে তোমাকেও কাঁধে বয়ে ড্যাং ড্যাং করে নাচাতে নাচাতে গঙ্গা অবধি নিয়েই ফেলব, বলে রাখলাম। হলো তো!"

কানি আর কথা বলে না। বলবার আর কিই বা আছে! মদন দেখে কানির চোখ দুটো তির তির করে কাঁপছে।

এ ঘটনা ঘটেছিল আশ্চর্যভাবে দিন কয়েক আগেই। আজ সত্যি সত্যি কানিটা মরল। মরল না যেন, মরে বাঁচল। মদন সংবাদ পেয়ে ছুটে এল দেখতে। দেখল। বাঁকা চোয়ালটা না ছুঁয়েও ওর মনে হল ভীষণ ঠান্ডা আর শক্ত। ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। মাথার চুলগুলো যেন যাত্রাদলের পরচুলার মতো পাটভাঙা, রুক্ষ। হাত পায়ের আঙুলগুলো শুকনো কুলের মতো, শিটানো। চোখ দুটো মরা মাছের চোখের মতো ডেলা পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

মদন ছুটল হরদয়াল ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার নেই। না থাক, সার্টিফিকেট একটা জোগাড় হলেই। মদন ফিরল তার দোকানে। দোকান থেকে ছোকরাগুলোকে বার করল বুঝিয়ে শুনিয়ে। এক পাইট গিলিয়ে। তারপর তালা লটকিয়ে দোকান বন্ধ করে দিল। ভোলা বেরুল সার্টিফিকেটের ধান্দায় আর মদন ব্যস্ত রইল এদিক নিয়ে।......তারপর এই শবযাত্রা।

বলহরি......

হরিবোল।

সেই কানি বোষ্টুমী আজ সত্যি সত্যি মরল। যতবার মন থেকে কানির কথা মুছে টুছে সাফসুফ হতে চেষ্টা করল মদন ততই তার মনে হতে লাগল যেন সে কানির কথাই তোলপাড় করে ভাবছে। খাটিয়াটা দুলছে। আর মদনের মনে হতে লাগল, খাটিয়ায় শায়িত কানিটা ড্যাব ড্যাব করে করুণ দৃষ্টি মেলে মদনকেই যেন দেখছে। যেন মদনের আপাদ-অঙ্গ শীতল জিভটা মেলে চাটতে চাইছে। কি বিশ্রী সব কথা ভাবছে মদন। মদনের বুকের ভিতরটা কেমন যেন ঝাঁকি দিয়ে উঠল।

ভালয় ভালয় এখন গঙ্গা অবধি পৌছুতে পারলে হয়।

বাতাস নেই। মই না দেওয়া মাটির ডেলাগুলোর উপর লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে সবাই। ঐ তো আমসি সার চেহারা কানির কিন্তু ওজনখানা কি!

রাসু বলল, "মরলে মানুষের ওজন বাড়ে।"

নরসিং সায় দিল, "পাপ পুণ্যরা ভর করে থাকে কিনা তাই—"

মদন চেঁচিয়ে উঠল, যেন ভয়টাকে আড়াল করে রাখবার জন্যই চেঁচিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে উঠল, "বলহরি......"

আবার সবাই খাটিয়াটা শূন্যে আছড়ে ফেলে নিখুঁতভাবে তাল ঠুকল, হরিবোল। চিৎকারটা বাতাসের উপর পাক খেতে লাগল।

নলহাটির চক পর্যন্ত এগোতে এগোতে

বার তিনেক খাটিয়া নামাতে হ'ল সবাইকে। কাঁধ বদলাবদলি করতে হ'ল। নতুনভাবে দম নিয়ে ছুটতে হল আবার। এখান থেকে এখনো ক্রোশটাক পথ। রাতটা যেন আরো জমাট বেঁধে যাচ্ছে। রোদে পোড়া মাটির ডেলা থেকে ভ্যাপসা সোঁদা সোঁদা গন্ধ ঘুলিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। দূরের গ্রামগুলো যেন ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে বসে জবুথবু হয়ে ঘুমুচ্ছে। আকাশে হীরে চুমকি বসানো তারাগুলি যেন পিট পিট করে তাকাচ্ছে, শবযাত্রা দেখছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, কে চলেছে গো?

কানি চলেছে। কানিকে চেন না? কানি বোষ্টুমী! 'আমার নাম কানি বোষ্টুমী, কড়ে রাঁড়ি নেইক স্বামী।'

কোথাকার কি, কানির গাওয়া গানের কলি দুটোই মনে পড়ে গেল মদনের, কড়ে রাঁড়ি নেইক স্বামী।

গান গাইবার সময় কি সুন্দর চনমনে অংগভংগই না করত কানি। হলদেঘাটার জমিদার হলধর চৌধুরীকে কানি ডাকত চৌধুরী বাবা। বেশ পটিয়ে পাটিয়ে কানের মাকড়ি, নাকের ফুল, গলার বিছা বাগিয়ে নিয়েছিল কানি। সব গেছে। দিন যখন পড়তে শুরু করল চারদিক থেকে হুড়মুড়িয়ে বিপদের ঝড় নামল যেন। স্বাস্থ্য ভাঙল, সাকরেদ-নাগরেরাও এক এক করে ছাড়তে লাগল কানিকে। পোকায় কাটা জর্জেটখানা শেষ পর্যন্ত ঘরমোছা ন্যাকড়া হলো। কানির চোখের কোণে কালি পড়ল। হাত-পায়ের গাটে গাটে জং ধরল। কানি নামের সার্থকতা এতদিন পরে যেন প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু মদনা, মদন মালাকার আরেক জাতির লোক। দিল আছে মদনের বলতে হবে! মদনই একটা আস্তানা করে দিল কানিকে গো-হাটার পাশে।

রাসুরা ভাবে, তাই কি! কানি বোষ্টুমীর ঘরের মেঝে খুঁড়লে কম করেও মণ খানেক কি চোলাই মাল বেরুবে না! মদনা গুণ্ডাকে রামা শ্যামা না চিনতে পারে, রাসুরা শত হলেও ওর দোকানের কর্মচারী বইতো নয়। কয়েকটি ফুল হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে খাটিয়া থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর একটু হলে মদনের পায়ের নিচেই পড়ে যাচ্ছিল। মদন লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এই বিল্টু, অতো ঝাঁকাচ্ছিস কেনরে হারামজাদা?"

বিল্টু বিড় বিড় করে উঠল, "কাঁধ ধরে গেল বইতে বইতে, বলে কিনা ঝাঁকাচ্ছিস কেন? দেব চিত করে ফেলে!"

ভোলা কি যেন রসিকতা করল। হেসে উঠল সকলে। মদন একবার আড় চোখে সবাইকে দেখল। আজ আর গালি গালাজ বকতে ইচ্ছে নেই মদনের। অন্যদিন হলে হয়ত দুচার ঘা বসিয়েই দিত মদন। কিন্তু আজ মনটা এমনিতেই ভার! তার উপর শত হলেও শবযাত্রা তো!

কানি চলেছে। এক অন্ধকার সমুদ্র থেকে উঠে এসে যেন আর এক অন্ধকার সমুদ্রের দিকে দুলতে দুলতে চলেছে। চলার তালে তালে খাটিয়াটা উঠছে, নামছে। মচ মচ করে শব্দ উঠছে খাটিয়ার। খাটিয়ার শব্দ নয়, রাতটা যেন কানির দুঃখে কোঁকাচ্ছে।

পায়ের নিচ থেকে সরু আলের মাটি ধসে ধসে যাচ্ছে। পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে সবার। কপালে ঘামের দানায় আঠা আঠা হয়ে উঠছে। অন্ধকার যেমনি ঘন, তেমনি ঝিঁঝির বিরামহীন চিৎকার। দুটো চারটে জোনাকি পোকা জামায় কাপড়ে এসে আটকে যাচ্ছে। কানিকে ঢাকা দেওয়া চাদরের উপর বসছে। আবার ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ভাসছে।

কানির যখন দিন ছিল ওর সাকরেদ ছিল কত! বিশু ড্রাইভার, এনায়েত, হরি ঘটক আরো কত! বিবির হাটের টিনের ছাউনী দেওয়া খুপরিগুলোর মধ্যে প্রদীপ জ্বলতো, আর নিশাচরের মতো হাটের এককোণ থেকে ও কোণ অবধি ঘুরে ঘুরে বেড়াত এই লোকগুলো। এনায়েত সেবার সেই যে যুদ্ধে নাম লেখালো আর ফেরে নি। বেঁচেই আছে কিনা কে জানে! হরিঘটক অক্কা পেল মায়ের দয়ায়। বিশু ড্রাইভার আজকাল লরী চালায় নাথু সামন্তর। কলকাতা অবধি লরী নিয়ে যায় আবার ফিরে আসে। কানির হাতের পুতুল ছিল এরা এককালে। কানির দিন পড়ল, এক এক করে সবাই বেপাত্তা, হাওয়া।

এমনিই হয়। মদন কিন্তু ছাড়তে পারল না কানিকে। যেন কানির শেষটা দেখবার জন্য মদনই সাক্ষী রয়ে গেল। কানিকে গঙ্গা অবধি টেনে নিয়ে যাবার জন্য, কই মদন ছাড়া আর কেউ তো এলো না! হরিবোল, হরিবোল।

কানির চোখ জোড়া আর একবার মনের মধ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করল মদন। এ কি! এ যে মরা মাছের চোখের মতই ঘোলা পাকানো চোখ দুটো ভেসে উঠছে বারে বারে! বীভৎস!

কানির শক্ত দেহটা যেন খাটিয়ার উপর একটু একটু করে দুলছে, চাদরখানার ভাঁজে ভাঁজে যন্ত্রণাগুলি যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

বলহরি .....

হরিবোল।

আবার খাটিয়াটা নামাতে হল। সামনে হোগলার বন। ভর বোশেখেও জল থই থই কাদা জমে থাকে। সাপ খোপেদের আস্তানা। দিনের আলোতেই গা ছমছম করে একা গেলে, তায় এখন তো রাত দুপুর। কাঁধের উপর মরা। অবশ্য খাটিয়া নামাতে হল অন্য কারণে। কানি মোটেই বড় বেশী দুলছিল যেন। শক্ত করে বাঁধন না দিলে হয়ত উল্টেই পড়বে মনে হচ্ছে।

হোগলা বনের মধ্যে কি কিসের খসখস শব্দ হচ্ছে। মাঝে মাঝে ব্যাঙ ডেকে উঠছে। ঝিঁঝিঁদের একটানা সুরের সঙ্গে তালে তাল মেলাচ্ছে।

খাটিয়া নামিয়ে অনেকক্ষণ পর ওদের সবাই হাত পা ছড়িয়ে জিরোতে বসল। বিড়ি ধরাল। বাইরের অন্ধকারে জোনাকি-বিড়িদের যেন একটি ফাঁকে ফাঁকে জ্বালানোর মতো মনে হচ্ছে।

নবীন বিড়িতে শেষটান দিয়ে কিছু ভাঙা তোবড়ানো গালকে আরো খানিকটা মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। তারপর ধোঁয়াটা আমিরী ঢঙে ছাড়তে ছাড়তে উচ্চারণ করল, আঃ!

হঠাৎ ভারী গলায় বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল ভোলা, সাপ সাপ!

চমকে উঠে শুকনো চামড়ার মতো টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সবাই। কিন্তু ভোলাই আবার হাসিটা ভাঙল হি হি করে হেসে উঠে, "কেমন ভড়কে দিয়েছিলাম বল দিকি!"

"ধুস্ শালা!" মদন ধমকে উঠল ভোলাকে, "ভূত কোথাকার!

হোগলা বনটা পেরুলেই গঙ্গা। তারই গায় আদ্যাকালীর মহাশ্মশান। রাত বিরেতে শ্মশান যাত্রী আসলে তারক ডোম বাতি ধরে অভ্যর্থনা করে। আর গোটা কয়েক নেড়ি কুকুর ল্যা ল্যা করে এগিয়ে এসে যাত্রীদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়।

হোগলা বন থেকে শেয়াল বেরিয়ে এসে কখনো সখনো শ্মশানের শুকনো হাড় শোঁকে।

খাটিয়ার কানির দেহটা বোধহয় এতক্ষণে জমে বরফের চাকার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। মদন ধীরে ধীরে সাদা চাদরখানা কানির দেহের উপর থেকে সরাল। অন্ধকারের মধ্যে ভালো নজরে আসছে না। তবু মদন যেন দেখল, কানির সমস্ত মুখ জুড়ে কী এক বীভৎস ঘৃণা দলা পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে। হাতের আঙুলগুলো দুমড়ে কুঁকড়ে কি যেন আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে নিজের হাতটা কানির হাতের উপর রাখল মদন, আ ঠিক সেই সময় ওর মনে হল বিশ্রী একটা কটু গন্ধ যেন ওর নাকের উপর আছড়ে এসে পড়ল।

বিদ্যুৎ স্পর্শ করার মতো মদন একটা লাফ দিয়ে উঠল।

"কি করছ গো মদনদা, মাল টাল আছে নাকি?" নরসিং ভোলা এগিয়ে এসে খাটিয়ার কাছে ঝুঁকে পড়ল।

মদন ফিস ফিস করে বলল, "দেশলাইটা জ্বালা দেখি!"

রাসু দেশলাই জ্বালাল। আশ্চর্য, খয়েরী রংয়ের নিভ নিভু এক চিলতে আলোর মধ্যে সবাই দেখল, কানির বাঁ হাতের চেটো থেকে এক খাবলা মাংস উঠে এসেছে, আর সেই মাংসের উপর একটা মদের টিনের ঢাকনা খুলে গিয়ে সমস্ত মদটা চুইয়ে চুইয়ে সারা রাস্তা পড়তে পড়তে এসেছে। কাঠিটা নিভে গেল।

আবার জ্বালালো রাসু। আবার একটু ফিকে আলো। সেই কুষ্ঠ রোগীর ঘায়ের মতো একখানা হাত। কানি বোষ্টমীর হাত। একটা মদের টিন ঢাকনা খোলা। শূন্য।

"তাইতো বলি, এতো ওজন লাগে কেন?" নরসিং বীভৎস ভাবে মুখ টিপে টিপে হাসছে। মাংসের দোকানের সামনে কতকগুলো কুকুর যেভাবে জিভ মেলে হাঁপায় নরসিং যেন ঠিক সেইভাবেই হাঁপাচ্ছে।

মদন ঝাঁপিয়ে পড়ল খাটিয়ার উপর। এক ঝটকায় কানির দেহটা পাঁজা কোলে করে তুলল। শক্ত এক চাপ পাথর যেন।

রাসু আবার দেশলাই জ্বালালো। সারা খাটিয়া জোড়া আরো খান কয়েক মুখবন্ধ মদের টিন। টিনগুলোর মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সবাই। নাঃ আরগুলি ঠিকই আছে।

রাসু বললো, "একটা টিন মাটি করলে তো মদনদা। আমাদের দিলে খেতুম।"

রাসুও মদনকে খুশি করার জন্য এক-গাল লোভাতুর হাসি হাসল।

মদন আবার কানিকে শুইয়ে দিল টিন-গুলোর ওপর। ফাঁক ফাঁক কাপড় গুঁজে দিল। যেন শব্দ না হয়।

তারপর সাদা চাদরখানা আবার বিছিয়ে দিলো কানি বোষ্টুমীর আপাদমস্তকে।

বুকটা যেন দুড়দুড় করে কাঁপছে। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে মদনের। আবগারী পুলিসের নজর এড়িয়ে মদ চোলাই এই প্রথম নয় মদনের, তবু। তবু মদনের বুকের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় হচ্ছে যেন। একবার মনে হ'ল, টিনগুলো আজ সাথে করে না আনলেই হতো! বার চোদ্দ টিন মদ না টাকাই বা হবে! কানির মৃত দেহটার কাছে নিজেকে যেন ফাঁসির আসামীর মতো মনে হ'ল মদনের। ইচ্ছে হ'ল মদের টিন-গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হোগলা বনের মধ্যে।

না, তাও পারল না মদন।

মুহূর্তের মধ্যে সারা দেহে দর দর করে ঘাম ছুটতে আরম্ভ করল মদনের। পায়ের মাংসপেশীতে যেন খিঁচ ধরে বসল। পায়ের নিচে মাটি আছে কি নেই এই অনুভূতিও যেন হারিয়ে ফেলছে মদন। নাকের উপর একটা জোনাকি লেপ্টে বসেছে। হাতটা তুলে জোনাকিটা তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও যেন মদন হারিয়ে ফেলেছে।

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মদন। ভোলা-বিষ্টুরা আবার বিড়ি ধরিয়েছে। ফস ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে। ফ্যাকাসে আলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে খাটিয়ার উপর। আবার নিভে যাচ্ছে।

হঠাৎ আলোয় ধাঁধায় অন্ধকারটা যেন আরো প্রকট হয়ে উঠছে। মদনও তার ভারী ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা বিড়ি চেপে ধরল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বিড়িটা হয়ত এখনই পড়ে যাবে ঠোঁট থেকে। না পড়ল না। মদন বিড়িটা ধরিয়েই ফেলল।

আবার যেন ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে মদন। তন্দ্রাটা যেন পালিয়ে যাচ্ছে। আঃ! "ভালয় ভালয় এখন গঙ্গা অবদি পৌঁছুতে পারলে হয়। আর দেরি করিসনেরে ভোলা, নেমে হরিধ্বনি দে—" মদন আবার হাঁটতে শুরু করল।

ভোলা চেঁচিয়ে উঠল, বল হরি...

এক ঝটকায় খাটিয়াটা কাঁধে তুলতে তুলতে সবাই চেঁচিয়ে প্রত্যুত্তর করল, হরি বোল।

হোগলা বনের পাশ দিয়ে দুলে দুলে এগিয়ে চলল কানি বোষ্টুমী।




## রৌদ্র থেকে ছায়ায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

রৌদ্র থেকে ফিরে আসি ছায়ার গভীরে, অন্ধকারে।
করুণ রঙিন পথে বেলা পড়ে আসে, দিন যায়,
অচেনা দোকানী ব'সে বিকেলের রোদ্দুর পোহায়
একেলা; এ-পথে আমি কখনো হাঁটিনি, কোনোদিন।

এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে কে-তোমরা? সঙ্গীহীন
অচেনা পথের ডাক কানে-কানে কে শোনালে তুমি?
কে-তুমি জ্বালাও এই দিনান্তের ক্লান্ত বনভূমি
গোপন বিষাদে, তীব্র যন্ত্রণার সুরে বারেবারে।

কে-তোমরা? কে-তুমি? তুমি চৈত্রের কঠিন সেই ঝড়
অরণ্যে ছড়াও মৃত্যু, বীতপত্র বিশুষ্ক মর্মর!
স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা কেড়ে আনন্দের মুহূর্তগুলিকে
স্মৃতির সঞ্চয় করো দুঃখময় স্বরলিপি লিখে।

কে তুমি? তোমাকে চিনি। তুমি দর্পণের মুগ্ধমায়া,
অতীতে আমারই ছিলে, ভবিষ্যৎ বর্তমান ছায়া॥

## যখন আমরা হাসতাম

রাজলক্ষ্মী দেবী

আনন্দ্য, তোমায় আমি যখন ভালোবাসতাম,
সামান্য সব কথা নিয়ে আমরা তখন হাসতাম।
আমরা তখন হাসতাম কোনো কথা না নিয়ে
আমরা তখন হাসতাম কোনো কথা বানিয়ে।
আমরা তখন হাসতাম আকাশ খুশি-নীল ব'লে,
আমরা তখন হাসতাম সকাল ঝিলিমিল ব'লে,
রোদের চূড়ায় চড়তাম, মেঘের গুঁতোয় ঝরতাম,
হাওয়ার মধ্যে মুখ লুকিয়ে হাহাহিহি করতাম।

অনিন্দ্য,—কী ক'রে গেলো সে সব দিন ফুরিয়ে?
হাসির সেই চপল পাখি কখন দিলে উড়িয়ে?
যখন আদিগন্ত সুখ মুঠোর ভেতর ধরতাম,
হাসির পরে হাসি সাজিয়ে তাসের ঘর গড়তাম,
যখন আমরা হাসতাম আকাশ খুশি-নীল ব'লে,
যখন আমরা হাসতাম সকাল ঝিলিমিল ব'লে,
যখন আমরা হাসতাম হৃদয়-ভরা আশা নিয়ে,
যখন আমরা হাসতাম হৃদয়ে ভালোবাসা নিয়ে!

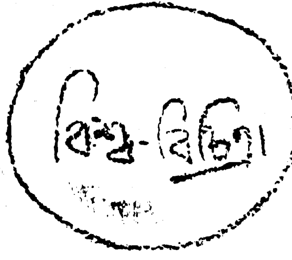
জীবন বীমা তো সাধারণ কথা, অন্য বহু বিষয়ে বীমা করার বহু অদ্ভুদ কাহিনী শোনা যায়। সম্প্রতি বিলেতে এক মহিলা মানুষের তৈরী উপগ্রহের আঘাতে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনায় তার ফ্ল্যাটটি বীমা করেছে। কর্নওয়ালের এক ভদ্রলোকের ভুতের ভয় এতো ছিল যে ভূত যাতে দেখতে না হয় তারই ওপর একটা বীমা করে বসে। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর একত্রে তিনটি সন্তান প্রসবের ওপর বীমা করে। তার স্ত্রী ছিল তার মায়ের এক সংগে তিনটি সন্তান প্রসবিতের একটি এবং ওদের বংশ পরম্পরায় এক সংগে তিনটি সন্তান প্রসবিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী মাত্র একটি সন্তান প্রসব করে তার প্রিমিয়াম দেওয়া ব্যর্থ করে দেয়।

এক কোরাস মেয়ে মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে দাঁত ভাঙায় লণ্ডনের এক থিয়েটার প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা কোরাসের সব মেয়ের দাঁতের ওপর বীমা করে নেয়।

ব্রিস্টলের এক ভদ্রলোক মাত্র এক ঘণ্টার জন্য প্রায় সওয়া সাত লাখ টাকার জীবন-বীমা করে। ন'শ চুয়াল্লিশজন বীমাকারি পলিসিটিতে স্বাক্ষর করে এবং তার বন্ধুরা মিলে প্রিমিয়াম দেয় সেই একটি ঘণ্টার জন্যে যে সময়ে তারা ভদ্রলোকের পঞ্চাশতম জন্ম-দিবসে রাত একটা থেকে দুটো পর্যন্ত তাকে ভোজে আপ্যায়িত করার সিদ্ধান্ত করে।

একই জাহাজে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পথে এক মহিলা ধর্মপ্রচারকের বাগ্মীতা ও ভাবা-বেগের প্রভাবে দীক্ষিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার ওপর এক আমেরিকান ভদ্রলোক বীমা করে।

সূর্য গ্রহণের ছবি তোলায় কোন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ওপর। একবার একদল বৈজ্ঞানিক এরই ওপর প্রায় সাড়ে




সাতাশ হাজার টাকার বীমা করে। কিন্তু বীমার টাকা আর তাদের পেতে হয়নি, কারণ আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার ছিল এবং তারা চমৎকার কতকগুলি ছবি তোলায় সক্ষম হয়।

এক বেতার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান তাদের এক বিশেষজ্ঞের মস্তিষ্ক প্রায় সাড়ে চোদ্দ লক্ষ টাকায় বীমা করে। এক অভিনেতা বীমা করে তিরিশ বছর বয়সের আগে টাক না পড়ার ওপর। অভিনেতাটিকে মোটা প্রিমিয়ম দিতে হতো কারণ তার বাবা ও ঠাকুর্দার উভয়েরই ঐ বয়সে পোঁছবার পূর্বেই টাক পড়ে গিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের এক সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ ইউরোপ যাত্রার ফলে তার গন্ধ-বিচার ক্ষমতা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ওপর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বীমা করেছিল। বছর তিরিশ আগে এক চিত্র পরিবেশক লণ্ডনে প্রদর্শিত তাদের এক ছবি দেখে হাসতে হাসতে কারুর মৃত্যুর ওপর বীমা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি কতকগুলি ভীতিমূলক কাহিনীর ছবির প্রদর্শকরাও দর্শকদের জীবন বীমা করার ব্যবস্থা করে।

*

টাকা মানুষের জীবনে নানা অদ্ভুত রকমের প্রকৃতি এনে দেয়, বিশেষ করে বড়ো নীচ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। সম্প্রতি লণ্ডনের এক বিচারপতি এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিবাহকালীন উপহার সামগ্রী বন্ধক দেওয়ায় লোকটিকে তিনি 'বিস্ময়কর রকমের নীচ প্রকৃতির' বলে অভিহিত করেন। লোকটি জিনিসগুলি বন্ধক দিয়ে প্রাপ্ত প্রায় ছ'হাজার টাকা নিজের নামে ব্যাংকে জমা করে নেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জুয়াড়ী এবং পার্লামেণ্ট সদস্য জন আইওয়েস তাস খেলে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গ্রাহ্য করতেন না, কিন্তু বাড়ি ফিরতে গাড়িওয়ালার সংগে প্রচণ্ডভাবে দরকষাকষি না করে ছাড়তেন না অথচ তখনকার দিনে ভাড়া ছিল মাত্র দশ আনা।

হ্যারোর এক পাগলা কঞ্জুষ ড্যানিয়েল ড্যান্সারের কাহিনীও অদ্ভুত। প্রায় ষাট লক্ষ টাকার সম্পত্তির সে উত্তরাধিকারি হয়। কিন্তু এত নীচ ছিল যে, স্নান করতো সে মাত্র রবিবারে—সাবান বাঁচাতে। কুকুরের খাদ্য মাংস খেতো এবং মেজেতে শুতো। লোকটা নীচতাকে একটা চাতুর্যকলাতে পরিণত করে তুলেছিল। হ্যারোর রাস্তা ছেঁকে বেড়াতো জঞ্জাল সংগ্রহ করতে এবং সেগুলো সে তার তিরিশ-কামরা প্রাসাদে জমা করে রাখতো। অধিকাংশ ঘরই সিলিং পর্যন্ত জঞ্জালে ঠাসা থাকতো। তারপর ওর সংগে ওর তিন ভাই ও এক বোনের ঝগড়া হয় এবং ওরা চলে যায় কারণ, ড্যানিয়েল বলে ওরা ওর সংগে নীচ ব্যবহার করেছে। এর কিছুদিন পর তার বোনটি মারা যায়। অন্ত্যেষ্টির সময় ড্যানিয়েল পঞ্চাশ বছর আগেকার ফ্যাশনের একটা ওয়েস্টকোট পরে এবং এক অন্ত্যেষ্টিব্যবস্থাপকের কাছ থেকে একটা ঘোড়া ধার নিয়ে উপস্থিত হয়। তাই দেখে হ্যারোর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আমোদের চোটে ঘোড়াটি লাফিয়ে ওঠে এবং ড্যানিয়েলকে পিঠ থেকে একেবারে কবরের মধ্যে ফেলে দেয়। অন্ত্যেষ্টি কার্য একেবারে যা তা হয়ে দাঁড়ায়। পরে ড্যানিয়েল অন্ত্যেষ্টি-ব্যবস্থাপকের প্রাপ্য দিতে নারাজ হয়। এই নিয়ে মামলা আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষের অর্থ-সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে অন্ত্যেষ্টি-ব্যবস্থাপক মামলা তুলে আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেবার আবেদন জানায়। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে কঞ্জুষপ্রবর মামলা বাঁচিয়ে রোজগারের উপায় করে নেয়।

এক দোকানদার চার আনা ঠকিয়েছে এই বলে সে এক মামলা রুজু করে দেয়। হাইকোর্টে তিন দিন মামলা চলে। প্রতি দিন ড্যানিয়েল পনের মাইল হেঁটে যাতায়াত করে। মামলায় সে হেরে যায় এবং খরচ বাবদ পাঁচ টাকা দেবার আদেশ হয় ওর ওপর। ড্যানিয়েল টাকাটা দিতে সময় প্রার্থনা করে।

*



টাঙ্গানিকায় ওল্ডুভাই গর্জে প্রাপ্ত প্রাচীনকালের বেবুনের চোয়ালের অংশ (বাঁদিকে)। মধ্যে বর্তমান গেরিলার এবং ডাইনে বর্তমান বেবুনের চোয়াল

থাইল্যাণ্ডের সবচেয়ে সেরা দৈনিক পত্রিকাখানির সম্পাদনা করেন ডারেল বেরিগান নামে এক আমেরিকান। নির্বাসিত সাংবাদিক বেরিগান বহুকাল ব্যাংককের অধিবাসী। কাগজখানি গত বছর ওর হাতে আসে বড়ো মজার উপায়ে। বেরিগান একটা প্রবন্ধ লিখে তাতে অভিযোগ করে যে থাইল্যাণ্ডের পুলিসের বড় কর্তা জেনারেল ফাও শ্রীআনন্দ নিজেই সবচেয়ে বড়ো বে-আইনি আফিমের কারবারি। সেখাটা জেনারেল ফাওয়ের কিন্তু মনে লাগে। ওদেশের যুক্তিতে জেনারেল ফাও মনে করলেন যে যে-ব্যক্তি ঐ বিবরণটি সংগ্রহ করতে দেশের ব্যবসাদার, গণিকা, ট্যাক্সি-চালক, মাঝি প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতাতে পারে, তার মতো লোকই সম্পাদক হবার যোগ্য। জেনারেল ফাও তার সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা 'ওয়ার্লড' সম্পাদনা করার জন্য বেরিগানকে নিযুক্ত করেন। কাগজ ছাপা হয় ইংরাজীতে কারণ ইংরাজীই ওখানকার শিক্ষিতদের এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ক্ষমতাবানদেরও দ্বিতীয় ভাষা।

১৯৫৭ সালে ফাওকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চলে যাবার আগে 'ওয়ার্লড' চালিয়ে চালিয়ে তারপর একদিন নিজেই সব শেয়ার কিনে স্বত্বাধিকারী হতে পারার অবস্থায় যাতে আসতে পারে ফাও সে পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা বেরিগানের জন্য করে যান। আজ বেরিগানের এমন মর্যাদা যে রাজনীতিকরা খোলাখুলিভাবে ওকে টেলিফোন করে কোন বিষয়ে মতামত নেয়—সরকারী লোকেরা রাজনীতিক সমস্যা বিষয়ে ওর সঙ্গে পরামর্শ করে—দেশের এবং বিদেশের। অধিকন্তু বেরিগান তার বুদ্ধি ও রসজ্ঞানের জোরে 'ওয়ার্লড'কে ঐ অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট 'রত্নে' পরিণত করে তুলেছে।

থাইল্যাণ্ডে ইংরাজীতে কাগজ প্রকাশ করতে বেরিগানকে প্রায় সবই নিজের কাঁধে বইতে হত। তেতাল্লিশজন ওদেশীয় কম্পোজিটরকে প্রত্যেকটি কথা হাতে কম্পোজ করাতে হয় এবং ওরা ইংরাজী বলতে পারে না বলে কখনো কখনো 'ওয়ার্লড'কে যাতে টাইপে সাজিয়ে তোলে। কাগজের প্রধান কর্ম-কর্তা একজন প্রাক্তন ট্যাক্সী ড্রাইভার, সেরা ফটোগ্রাফার ছিল বেরিগানের বাড়ির চাকর, আর সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে রিপোর্টারদের অধিকাংশই আবার ইংরাজী লিখতে পারে না। একটা কোন ঘটনার বিবরণ আনার পর বেরিগানকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়ে লিখতে হয়।

বেরিগান বলে "এইভাবে যে কাগজ চালানো যায়, কেউ বিশ্বাসই করবে না। তবে কাজ করে আমি খুব খুসী।" বেরিগান অন্ততঃ এতে সন্তুষ্ট যে 'ওয়ার্লড' নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং শীঘ্রই নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছে যেখানে দুটো মনো-টাইপ যন্ত্র পাচ্ছে।

সংবাদ সরবরাহকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুণ পৃথিবীর বড়ো বড়ো যতো সংবাদ-সরবরাহক এবং সংবাদ ভাষ্যকার ও পরি-স্থিতি-সমালোচক আছে তাদের অনেকেরই সংবাদ ও লেখা বেরিগান তার সাড়ে তিন হাজার পাঠককে নিয়মিত সরবরাহ করে যায়। কাগজে কোন সম্পাদকীয় থাকে না, বেরিগান বলেঃ "আমরা খবরটা দিয়ে দিই, তারপর চতুর পাঠক নিজেরাই তাদের মতা-মত ঠিক করে নিক।"

*

যা কিছুই হোক কেবলই টাকা, আর টাকা। চুরি-ডাকাতি হোক, বেতন বৃদ্ধির দাবী হোক, আয়কর নিয়ে কথা হোক, আর পাঁচশালা পরিকল্পনা হোক, সবেরই মূলে কথা টাকা। সব কথার সেরা এই টাকার বিষয়ে কতকগুলো মজার কথাও শোনা যায়ঃ

ক্লনডাইক ও কালিফোর্নিয়ায় সোনার খোঁজের আমলে এক টিপ সোনার গুঁড়োর বিনিময়ে গ্লাস দুই পানীয় পাওয়া যেত। বারের মালিকরা তাই বেছে বেছে বেশ চওড়া টিপওয়ালা লোককে সহকারী নিযুক্ত করে রাখতো।

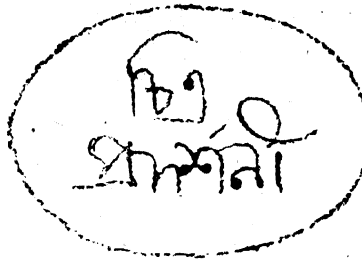
মুদ্রার ওপরে প্রথম মুখ বেরিয়েছিল আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের।

যুক্তরাষ্ট্রের একটা হিসেব হচ্ছে যতো মুদ্রা বাজারে চালু রয়েছে, তা যদি সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রত্যেকের পকেটে সওয়া শ' টাকা থাকবে।

এক বিখ্যাত অপেরা-গায়ক ব্যাংকের কাউণ্টারে নতুন লোক দেখলেই নিজের পরিচয় দিত 'রিগোলেত্তো" থেকে অন্তরার অংশ গেয়ে শুনিয়ে।

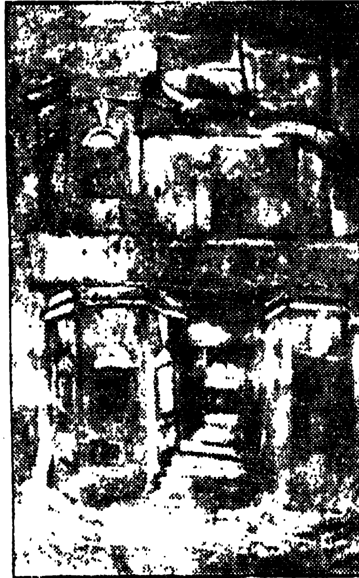
সমগ্র পৃথিবীতে প'য়ত্রিশ হাজার রকম মুদ্রা প্রচলিত আছে। নিউগিনিতে এখনও কুকুরের দাঁত মুদ্রারূপে প্রচলিত। কেউ কেউ শামুক ব্যবহার করে। রোমানরা মুদ্রার বদলে গৃহপালিত পশু ব্যবহার করতো। ককেশাসের কোন কোন অঞ্চলে এখনও দেনা-পাওনা গাভী দিয়ে সম্পন্ন হয়।

এক সময়ে বৃটেনের সকল কাউণ্টিতেই টাঁকশাল থাকতো এবং প্রত্যেক ব্যারন, বিশপ এবং অধিকাংশ মঠ তাঁদের নিজেদের মুদ্রা চালু করতো।



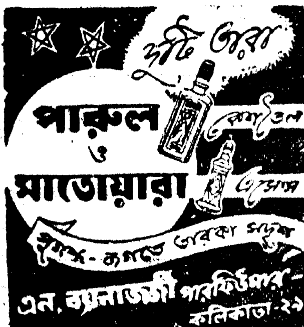

৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম-এ (১ নম্বর সদর স্ট্রীট) শ্রীমতী নীরা সেনের চিত্র-প্রদর্শনী চলছে। ইনি গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর প্রাক্তন ছাত্রী। এক সময় আর্টিস্টস সার্কল-এর সভ্যা ছিলেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সেণ্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌টস-এর কোর্স শেষ করে দেশে ফিরেছেন। এখানে প্রদর্শন করেছেন পেইণ্টিং, ড্রইং, স্কেচ এবং লিথোগ্রাফ। সবসুদ্ধ ৪৯টি নিদর্শন।

শ্রীমতী সেনের চিত্রকলা আধুনিক হলেও নন-অবজেক্‌টিভ নয়। চিত্রের উপাদানগুলি সংস্থিত করেছেন খুশীমত এবং অল্পবিস্তর বিকৃতিকরণও রয়েছে আকারে। বর্ণিকা প্রাকৃত নয়। এই উপায়ে শিল্পী সাদৃশ্য সত্য উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, শিল্পীর মন তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আদর্শের অনুযায়ী করে গড়ে তোলে। এইখানেই শিল্পের সব সত্য ও অসত্য অত্যুক্তির মূল বলা যেতে পারে। কিন্তু মাতীস্ত বা পিকাশো বা ব্রাক-এর মন যে আদর্শের চিত্র কল্পনা করে সেই আদর্শ যদি অন্য কোনও শিল্পী অনুগমন করে বলেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, তখন আর সে শিল্পীর রচনাকে রসোত্তীর্ণ বলা চলে না। বিদেশ ফেরতা যে কজন শিল্পীর চিত্রকলা আমরা এর আগে দেখেছি তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ছবি বিভিন্ন প্রখ্যাত আর্টিস্ট-এর ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গির পুনরাবৃত্তি। শ্রীমতী সেনের চিত্রকলায় কোনও বিশেষ শিল্পীর ব্যক্তিগত আর্টের ছাপ না থাকলেও স্পষ্টই মনে হয়, এ আর্ট বিদেশ থেকে আমদানী করা। আমাদের দেশ আলোকপ্রধান দেশ, সুতরাং আমরা যদি পাশ্চাত্য শিল্পীর দেখাদেখি ওদেশের আর্টের বর্ণিকা প্রয়োগ করি তাহলে সে আর্ট হবে নিশ্চয় কষ্টকল্পিত। আর্ট স্বতস্ফূর্ত না হলে কখনই রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। পাকা আর্টিস্টের কথা হল, 'সব জিনিসই জানা উচিত; দেশ বিদেশের আর্ট শেখো কিন্তু কাজের সময় তা সরিয়ে রাখো'। শ্রীমতী সেন শিখে এসেছেন পাশ্চাত্ত্য আর্ট, খুব ভালো কথা, কিন্তু এদেশে এসে তিনি যে আর্ট সৃষ্টি করছেন তা দেখে যেন মনে না হয় যে, সেটা বিদেশী আর্ট। শিল্পীর প্রতিভাও আছে এবং শক্তিও আছে সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা তাঁর কাছ থেকে সত্যই রসোত্তীর্ণ আর্ট দেখতে পাব আশা করি।



নীরা সেন অংকিত একটি চিত্র






গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে'র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ঈশ্বরীপ্রসাদ, মুকুল দে, দুর্গাশংকর, ও সি গাঙ্গুলী, স্বামী উজ্জামা, ভেঙ্কটাপ্পা এবং ক্ষিতীন মজুমদারের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন উক্ত সোসাইটির কর্তৃপক্ষ। ছবিগুলি কস্তুরভাই লালভাই, পি এন ঠাকুর, পি এম ঠাকুর, শচীন ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী ঠাকুরের সংগ্রহ। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী ছবি ছিল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ পথিকৃৎ শিল্পীদের চিত্রকলার বিশ্লেষণ এই স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে সম্ভব নয় এবং এঁদের চিত্রকলার বিশ্লেষণ এবং প্রশংসা একাধিকবার আমরা প্রকাশ করেছি সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি থেকে আমরা বিরত রইলাম।

যাই হোক, আমার কাছে গগনেন্দ্রনাথের সাদা কালোর সামঞ্জস্যে রচিত জাপানী বা চীনা ছবির অনুরূপ ছবিগুলি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। এ রচনাগুলির প্রথা প্রকরণ জাপানী বা চীনা হলেও এগুলি গগনেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের রসে পূর্ণ হয়ে সত্যই বিশিষ্ট। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাজের নমুনা আমরা এ প্রদর্শনীতে দেখতে পাইনি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবি একমাত্র 'আদেন ভেসেল'। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, ঈশ্বরী প্রসাদ এবং সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এঁরাই সে যুগে স্বদেশী আঙ্গিকের ওপরে দেশের নতুন আর্টের উদ্ভাবনার আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে পাশ্চাত্ত্য আর্ট, তারপর কাঙড়া তারপর মুঘল কলম, তারপর জাপানের আর্টের প্রভাব—এইভাবে ঘটেছিল এদেশের শিল্পের বিবর্তন। এঁরাই তখন বিদেশী আর্টের প্রভাবমুক্ত হয়ে অজন্তার আঙ্গিকের ওপর খাঁটি দেশী আর্ট গড়ে তুলতে লেগে গিয়েছিলেন। এঁদের বিষয়বস্তু তাই বেশীর ভাগ ছবিতেই হিন্দু পুরাণকথা। এঁদের যে সব রচনা এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নন্দলাল বসুর 'গ্রীফ অব উমা', 'কৃষ্ণ এবং অর্জুন', 'গোকুলব্রত', 'দি ওসান'; অসিত হালদারের 'দি বাউল', 'রাসলীলা'; ঈশ্বরী প্রসাদের 'গঙ্গাবতরণ'; সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর 'গায়ত্রী', 'ড্রীম অব কুশ' এবং 'নৌকা যাত্রা'। এ ছাড়া দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর 'দি মিউজিক লেসন', স্বামী উজ্জামার 'ফাইণ্ডিং অব নুরজেহান' এবং ভেঙ্কটাপ্পার 'গোচারণ'।

মনোজ বসু

# আমার ফাঁসি হল

৭

জিজ্ঞাসা করলাম, এত খেলানো হচ্ছে কেন?

মজা—

চিঠিতে যা লিখেছি, মুখেও এসে পড়ে আবার তাই: বাসায় যতক্ষণ থাকি, একা একা বড্ড কষ্ট হয়। অসুখই ভাল ছিল আমার।

হেসে হেসে এক আশ্চর্য চাউনি চেয়ে সে বলে, অসুখ তো এখনই। বারোমেসে যাপ্য ব্যাধি। জ্বরের ঐ ক'টা দিনই ভাল হয়ে গিয়েছিলেন কপালক্রমে।

খিলখিল করে হেসে উঠল। আজব কথা বলে, হেঁয়ালির ভাষা। বলে, রংমহলে রূপের খেলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়েছেন তার একটুখানি। কয়েকটা দিনে সামান্য একটু দেখেছেন। আর ডাক্তারে বলে কি না, ভুল দেখছে, প্রলাপ বকছে।

আপনাদের কাছে আবোলতাবোল, কিন্তু আমার মনের সঙ্গে লাবণ্যর কথা অদ্ভুত রকম মিলে যায়। জানল কি করে? এ মেয়েরও অসুখ করেছিল—আমার মতন অমনি সব দেখেছে? অসুখেবিসুখে চেতনা স্তিমিত হয়ে যায়—আরে দূর, কী বলে বসলাম! একেবারে উল্টো। নবচেতনা জাগে সেই সময়, প্রখর দৃষ্টি খুলে যায়। রংমহল বলছে লাবণ্য—ভারি উজ্জ্বল সেই মহলের রং, বড় স্নিগ্ধ। বাসিন্দাদের হালকা চলাফেরা, এতটুকু আওয়াজ হয় না। মজার সংসার ওদের। হাসি আর আনন্দ। সেই কয়েকটা দিনে আমি আঁচ পেয়ে গেছি। তারপরেই পর্দা পড়ে গেল।

শুধু একটু চোখের দেখায় সুখ হয় না লাবণ্য। রংমহলে ঢুকতে পারি কি করে সেইটি বলো।

সাহস থাকলেই পারা যায়। আধ মিনিটও লাগে না। ভীরুরা পেরে উঠে না।

হেঁয়ালির মতন জবাব দিয়ে রহস্যভরা চোখে চেয়ে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে। কি বলল, কিছুই মাথায় ঢোকে না। দেখি, পথের উপরে হরিশ। আর কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে সময় নেই। আমি আগে চলে আসি, তারপর সেরেস্তাদারবাবু কাগজপত্র গুছিয়ে বেরোন। হরিশ অফিসঘরের দরজা বন্ধ করে হাটখোলাটা ঘুরে সংসারের এটা-সেটা সওদা করে আসে। আজকে বোধ হয় হাটখোলায় দরকার ছিল না।

বলে দিলাম, আবার আসবেন কিন্তু। কাল। ভুলে যাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে লাবণ্য ঘাড় নাড়ল। তারপরে আমতলা দিয়ে পাঁচিলের বাইরে কোন্‌দিকে চলে গেল, আর দেখলাম না। বাড়ি ফিরল না এখন, তবে তো ফাঁকা মাঠের উপর আলপথে বাবলাবনের পাশে পাশে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেতাম।

পরের দিন বেশি সকাল করে ফিরলাম। লাবণ্যও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

কথা রেখেছেন তবে? এসেছি এই কত তাড়াতাড়ি দেখুন। কাজকর্ম সব চুকোয় গেল। হরিশ হতভাগার জন্যে। আজ ওকে বলে এসেছি, সেরেস্তাদারের সঙ্গে পাঁচটা অবধি থাকবে। এক মিনিট আগে অফিস ছাড়বে না। ততক্ষণ আমরা নিরিবিলি। আচ্ছা, আমি সকাল সকাল বেরুই শরীর খারাপের ছুতো করে। আপনি কি বলে বাড়ি থেকে বেরোন? আগে তো বিকালে জলের কলসি কাঁখে আসতেন, এখন কোন অজুহাত?

লাবণ্য অন্য কথা বলে, আপনি-আপনি করেন কেন আমায়? চেহারা দেখে কি মনে হয়, খুব ভারিক্কি হয়ে গেছি আমি? আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি?

সে কি কথা, বুড়ো হতে যাবেন কেন?—হেসে উঠে আবার বলি, বুড়ো আপনি কোনদিন হবেন না।

লাবণ্যও হেসে হেসে বলছে, কণ্ঠস্বরে তবু কেমন উদ্বেগের আভাস: বলুন, বলুন না। আমায় দেখে বয়স বেশি মনে হয়? মুখের উপর জাল জাল দাগ? দেখুন—নজর করে দেখে তবে বলবেন।

বুঝতে পারছি, খুঁতখুঁতে মেয়ে বা অমনি-কিছু বলে থাকবে বাড়ির কেউ। মেয়ের মনে সেই অভিমান ঘুরছে। আমায় বলছে 'তুমি' বলে ডাকতে। লাবণ্য এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে—স্বর্গ আজ আমার হাতের মুঠোয়।

বেশ, 'তুমি' বললেই যদি ঐসব বাজে কথা বন্ধ হয়, তবে তাই। তুমি, তুমি, তুমি। তুমি লাবণ্য—তোমার মতন দুনিয়ায় কেউ নেই। রোজই আসবে তুমি। একবার নয়, একশ' বার এসো, হাজার বার এসো।

ভারি মজা চলল এর পরে দিনকতক। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে আসে। বাড়িতে অর্ধেক-পঙ্গু মা, দয়ালহরি তো বেশি সময় বাইরে বাইরে, আর আছে ছোট ভাইবোন কয়েকটি। সঠিক জানি না। কলকাতার মেয়ের পক্ষে ওদের ধোঁকা দিয়ে চলে আসা কিছু নয়। কিন্তু কেমন করে টের পায় যে, ঠিক এই সময়টা চুপচাপ আছি আমি?

শরীর খারাপের অজুহাত আর বেশিদিন চালানো যাচ্ছে না। কাজকর্ম জমে পাহাড় প্রমাণ হচ্ছে। এ জায়গার মানুষগুলো সর্বংসহা, তাই রক্ষা। কিন্তু

সহিষ্ণুতার শেষ আছে। কোন একদিন সদরে বেনামি চিঠি যেতে পারে। অথবা কলকাতার কোনও খবরের কাগজে।

সন্ধ্যাটাই ভাল। হরিশকে সকাল সকাল সরিয়ে দিইঃ একেবারে সেরে নিয়েছি হরিশ, আর তোকে অত খাটতে হবে না। দু-খানা রুটি সে'কে রেখে বাড়ি চলে যাস। দুধ আছে, দুধ-চিনি আর রুটি দিয়ে খাসা পথ্য হবে আমার। সোমত্ত বউ অত রাত্রি একলা ঘরে থাকবে, সেটা ভাল নয়। ঘোর না হতেই বাড়ি চলে যাবি। আমার কি, পড়া-শুনো আছে, গানবাজনা আছে—একলা আমি থাকব ভালো।

কিন্তু হরিশের পাকামি আছে। আদর্শ প্রভুভক্তি—শুধু দুধ-রুটি তার মনঃপূত নয়। দু-একখানা তরকারি রান্না করে সামনে বসে খাওয়ানোর জন্য গড়িমসি করে। শেষটা একদিন আচ্ছা করে কড়কে দিইঃ এমন নাছোড়বান্দা কেন রে? বলেছি, তরকারি লাগবে না রুটির সঙ্গে—এক রাশ খাইয়ে বদহজম ঘটিয়ে আবার বুঝি রোগ ডেকে আনবি?

বকুনির ভয়ে হরিশ সেই থেকে বেলাবেলি সরে পড়ে। আমার সঙ্গীত-সাধনা শুরু হয়ে যায়। একদিন এমন হল, হরিশকে সরিয়ে দিয়ে হারমোনিয়মের রীডে আঙুল ছুঁইয়ে সবে একবার সা-রে-গা-মা তুলেছি—

রীডের উপরের আঙুল তুলে কলকণ্ঠে বলে উঠি, দেখেছি গো, দেখতে পেয়েছি। আবার কোন্ লুকোচুরি খেলা? আমার চোখে লুকিয়ে থাকবে, এত ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এসো—খাটের উপর ভাল হয়ে বসে গান শুনতে হবে।

দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল—আরে সর্বনাশ, আলাদা একজন। লাবণ্য তো নয়, ঝিকমিকে লাবণ্য ফুড়ুৎ করে কোন্ দিকে পালিয়েছে। কুৎসিত চেহারা, একটা চোখের সাদা ঢেলা বেরিয়ে এসেছে। ভূতের বাড়ি বলে গোলবাড়ির বদনাম—কোন্ অন্ধিসন্ধি থেকে প্রেতিনী বেরিয়ে এলো এতদিনে। চে'চামেচি করে একখানা কাণ্ড ঘটাবার কথা —এ জায়গার হাকিম বলেই কোনক্রমে সামলে নিয়েছি।

কে আপনি?

হকচকিয়ে যায় সে। মুখে জবাব আসে না।

আপনি কে? কি নাম আপনার?

লাবণ্য—

কণ্ঠস্বর কাঁপছে। জোচ্চুরি বলেই এমনি। মতলব করে লুকিয়ে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। ঐ যে বললাম 'দেখতে পেয়েছি'—অমনি ভেবেছে, ওকেই দেখেছি আমি। বোকা বনে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ে গেল।

ধমক দিয়ে বলি, লাবণ্য! লাবণ্যকে চিনিনে যেন আমি! ধাপ্পা দেওয়ার জায়গা পেলেন না? এক চোখ পিটপিট করে উনি লাবণ্য হতে এসেছেন।

সেই একটা চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কানা মেয়েটার চোখ নিয়ে খোঁটা দিলাম, এক বিন্দু লজ্জা হল না আমার। একটুকু মায়া নেই। পাংশুমুখে সে বলে, আর চে'চাবেন না। রক্ষে করুন। গান হচ্ছিল, তাই একটু দাঁড়িয়েছিলাম। অন্যায় হয়েছে। চলে যাচ্ছি আমি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল। মাটি করে দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চলে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছিঃ চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন। পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি। জানতে চাই সমস্ত কথা। কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

ফরফর করে চলে গেল জবাব না দিয়ে। ঝুপসি ঝুপসি গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল। রাত্রিবেলা যুবতী মেয়ের পিছন ছুটব, এটা হতে পারে না। বিশেষ করে হাকিম যখন আমি। যা ভাবছি, যদি সত্যি চর হয়েই এসে থাকে, আরও আমার অখ্যাতি রটবে। কাজ নেই গণ্ডগোলে।

আমার লাবণ্য এলো আর একটু পরে। গুম হয়ে ভাবছি তখন। নিঃশব্দ পায়ে এসেছে। ডাকে নি, কিছু না। হাসছে মৃদু মৃদু। ঘাড় তুলে হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলাম।

এক কাণ্ড হয়েছে, জান লাবণ্য? কে-এক মেয়ে এসেছিল স্পাই হয়ে। আমাদের কথা গাঁয়ে বোধ হয় কানাঘুষো হচ্ছে। চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছিল, আমি ধরে ফেললাম।

লাবণ্য চোখ বড় বড় করে বলে, তাই নাকি?

আবার নাম বলে কিনা লাবণ্য।

লাবণ্য বলে, হতেও পারে।

কি হতে পারে? কানা-চোখ ঝাঁঝরা-মুখ হতকুচ্ছিৎ সে হবে লাবণ্য?

আশ্চর্য হয়ে তার মুখে তাকাই। দু-চোখে চাপা হাসি তার। এক বর্ণ আমার কথা বিশ্বাস করেনি। তা হলে বিচলিত হত। বললাম, সত্যি বলছি। মনে হয়, এই গাঁয়ের কেউ। এসেছিল আমরা কি কথাবার্তা বলি শুনে যাবার জন্য।

লাবণ্য ফিক করে হেসে বলে, তা কেন? তোমায় দেখে ঢুকে পড়ল কথাবার্তা বলবার জন্য। নিশ্চয় বলছি তাই।

কাছ ঘে'ষে এসে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁগো, কি সব কথাবার্তা হল? মিষ্টি মিষ্টি ভালবাসার কথা?

কী বলছ তুমি লাবণ্য, ছিঃ। ভালবাসা যেন হাটের মাল। যেখানে সেখানে ছাড়লেই হল!

পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কথা উপভোগ করছে। কী রকম ক্ষুধিতের মতন তাকিয়ে আছে, আরও বুঝি বেশি করে শুনতে চায়। বললাম, ভালবাসার কথা তোমারই জন্য শুধু। দুনিয়ার অন্য কোন মেয়ের শোনবার নয়।

অনিন্দ্য মুখখানি আমার দিকে তুলে ধরে সে বলল, কেন, আমি কী?

এক ফালি জ্যোৎস্না এসে দাঁড়িয়েছ তুমি আমার লাবণ্য। আর কালো-কটকটে সেই মেয়ে—যেন কাদার ঢিবি।

এমন খোশামুদি কথার উপরেও লাবণ্য ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। হাসি কিন্তু মুখে—হাসি ভিন্ন মুখে বুঝি অন্য ছায়া পড়ে না।

এ কি, হিংসে হল তোমার? ভারি মজা তো!

লাবণ্য বলে, বড় হিংসে আমার। আর ভয়। ঐ যা বললে তুমি—কাদা হলে ছানতে পারো, গড়তে পারো, গায়ে লেপটে নিতে পারো। জ্যোৎস্নার তো কেবল ভেসে ভেসে বেড়ানো—ধরা-ছোঁওয়া যায় না, আপন করে আটকানো যায় না, শুধুই কেবল পদ্য লেখা। দেখ, তুমি ভুল দেখনি—সত্যি আমি এসেছিলাম, ঐ মেয়েটা ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালাম। কি তুমি বলবে, আড়ি পেতে শুনছিলাম ভয়ে ভয়ে। নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম।

আর মোটে দাঁড়ায় না। হাসুক আর যা-ই করুক, ভয় পেয়ে গেছে মনে মনে। ভয়েরই কথা। এত আসা-যাওয়া দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায়—লোকের নজরে পড়েছে; হাতেনাতে ধরবার জন্য মেয়েটা এসেছিল। পাড়ারই মেয়ে খুব সম্ভব, লাবণ্যের জানা-শোনার মধ্যে। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি—খবর চাউর করে দেবে আক্রোশ-বশে। কলঙ্ক মুখে মুখে আগুনের মতো ছড়াবে। কী গঞ্জনা, পাড়াগাঁয়ের সমাজে! আমারই ভুল, কবিতা লিখে আর আজেবাজে গল্প করে এতদিন চলতে দেওয়া। আর নয়।

পরদিন দয়ালহরিকে বাসায় ডেকে—যা থাকে কপালে—কথাটা পেড়ে ফেললামঃ আপনার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিলাম।

...মি অযোগ্য হয়তো। যদি অনুগ্রহ করে ...এনে, দাদাই অভিভাবক আমার, কলকাতার ঠিকানা আপনার জানা আছে। আমার মত আছে জানলে তাঁদের দিক দিয়ে খুব সম্ভব আপত্তি হবে না। কিছুদিন থেকে ভাবছি কথাটা। যদি আপনি প্রস্তাবে রাজি থাকেন—

দয়ালহরি বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। কিছু যেন বুঝতে পারছেন না। তারপরে হাউ হাউ করে এক গাদা কথা বলে চলেছেন। কান্না না আনন্দ বুঝতে পারিনে।

আপনি—তুমি বাবা পায়ে ঠাঁই দেবে লাবণ্যকে? আঁতুড়ঘর থেকেই ঠেলাগুঁতো খেয়ে মানুষ, জনমদুখিনীর এতবড় ভাগ্য! একা ওর ভাগ্য নয়, আমাদের বংশ ধরে সকলের।

কেল্লা ফতে, আবার কি! পৌষমাসটা কাটিয়ে দিয়ে মাঘের গোড়ার দিকে লাবণ্য দেবী, তুমি একেবারে আমার! এই গোলঘরের ভিতরেই বাসর আমাদের। গান শোনাব পাশে বসিয়ে ভোর-রাত্রি অবধি।

কাদা আর জ্যোৎস্নার একটা কথা হল না—তা কাদারই মতন যদি হাতে ছানি আর গায়ের উপর লেপ্‌টে রাখি, কে কি বলতে পারবে তখন?

সন্ধ্যার মুখে অফিস থেকে ফিরে আমাদের কথাবার্তা। হরিশ চা করে দিল, চা ইত্যাদি খেয়ে মাঠের আল ধরে দয়ালহরি দ্রুতপায়ে বাড়ি চললেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আমি। অনতিপরেই আবার দেখতে পাই, বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। চঞ্চল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, চুপচাপ বসে হুঁকো টানবার অবস্থা নেই। বাড়ির মধ্যে খবরটা দিয়ে গ্রাম টহল দিতে বেরুলেন। ও'র স্বভাব টের পেয়েছি এতদিনে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিরাটগড়ের আপামর-সাধারণ সমস্ত ব্যাপার জেনে যাবে। কত সোমত্ত মেয়ের মা-বাপের হিংসায় ঘুম হবে না। যে মেয়েটা ওৎ পেতে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারও। আমিও চাচ্ছি ঠিক তাই। লাবণ্য ও আমাকে নিয়ে কথাবার্তা যদি কিছু উঠে থাকে, এবার সকলে খোলাখুলি জানুক, লাবণ্য আসে আমারই কাছে এবং এর পরে কায়েমি হ'য়ে থেকে যাবে। শুধু পাঁজিতে ভাল একটা শুভদিনের অপেক্ষা।

না, ঠিক উল্টো। এলেন দয়ালহরি আমারই কাছে। এই চলে গেলেন, একটু পরে আবার ফিরে এসেছেন। বললেন, খবরদার, খবরদার। কথাটা পাঁচ কান না হয়ে যায় বাবাজি। সেইটে সমঝে দিতে এলাম। আশীর্বাদ হয়ে যাক, তারপরে। পরম ছ্যাঁচড়া জায়গা—কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। ভাংচি দেবে, ঘোঁট পাকাবে। আশীর্বাদ হয়ে গেলে তারপরে এই কলা। পোষমাস পড়বার আগেই আশীর্বাদ সারতে হবে। পাঁজি দেখলাম, আঠাশে মোটামুটি দিন আছে। ঐদিন।

দাদাকে তো জানিয়ে দিতে হবে।

আমি লিখব না, তুমি লেখো। আগ বাড়িয়ে আমায় লেখাটা ভাল হবে না। ভাববেন, আমিই তোমায় ভজিয়েছি। ঐ আঠাশের আগে আসতে লেখো। বরের আশীর্বাদ, কনের আশীর্বাদ একদিনে। দোসরা মাঘ বিয়ে। বলছিলাম তুই বড়-বউকে। পোড়কপালি, শতেকখোয়ারি বলে মেয়েকে গালি দাও, কপালখানা কি করে এসেছে দেখ এইবার। আকাশের চাঁদ গরিবের উঠোনে বর হয়ে এসে দাঁড়াবে।

দয়ালহরি চলে গেলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। বাপের মতন দাদা, বড্ড রাশভারি। সেজন্য সোজাসুজি তাঁকে না জানিয়ে বউদিকে লিখলাম। উল্লাসে আজকে আর থই পাচ্ছিনে, সে মনোভাব চিঠির লেখাতেও ঝকমক করছেঃ বউদি ভাই, তোমার চাঁপাতলার পাখনা-কাটা পরী বিরাটগড়ে এসে লুকিয়েছে। চাঁপাতলার ঠিকানাটা দাওজি, তাহলে মিলিয়ে নিতাম। তবু নিশ্চয় সেই, সন্দেহ করা চলে না। এমন রূপ আর এমনি স্বভাবের মেয়ে খুঁজে বের করতে পারে, সে চোখ আমার বউদিরই শুধু আছে। মেয়ের ঘরবাড়ি এখানে, কলকাতায় মামার বাড়ি থাকত, তুমি সেই সময় দেখে এসেছ। তোমার ইচ্ছা শিরোধার্য করলাম বউদি, মেয়ের বাপের কাছে রাজি হয়ে এসেছি। অঘ্রাণে মলমাস, বিয়ে মাঘের আগে নয়। তবু এ'রা আশীর্বাদটা সেরে রাখতে চান। মেয়ের বাপ নয়তো ভরসা রাখতে পারেন না। আবার মুশকিল, ষষ্ঠীপুকুর বলে এক লক্ষ্মীছাড়া জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসে মজুত আছে, সাতশ'টি টাকায় আটকে রয়েছে। কনেপক্ষ যদি কোন বরপক্ষ ছাড়বে না। হঠাৎ যদি কোন পক্ষের সুমতি হয়ে যায়, তোমার বউদি, তখন তো কপাল চাপড়ানো। সেই হেতু সত্বর হওয়ার দরকার। মেয়ের বাপ আঠাশে পাকা দেখতে চান। বিয়ে দোসরা মাঘ। তার আগে দাদার এসে মেয়ে দেখে কথাবার্তা বলার দরকার। আমার চোখে ভুল হতে পারে, দাদা না এলে কিছুই হচ্ছে না।

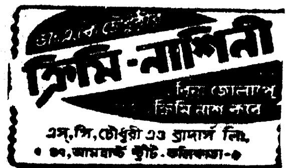
বউদি'র জবাব এলোঃ তোমার দেখায় ভুল হবে কেন ভাই? তুমি রাজি তো আমরা সকলে রাজি। টুনুকে বললাম, রাজি হয় সে কোমর অবধি মাথা কাত করে আনল। কাকিমার জন্য লাফাচ্ছে। তোমার দাদার এখন যাওয়া মুশকিল, ও'র মনিবের ইনকামট্যাক্সের মামলা চলছে। জানো তো, মনিব কি রকম নির্ভর করে ও'র উপর—দুটো একটা দিনের জন্যও ছাড়তে পারবে না। দরকারও নেই, উনি বলছেন। বিয়ের যখন দেরি আছে, তার আগে সুযোগ মতো গিয়ে কনে আশীর্বাদ করে আসবেন।

আবার লিখেছেন, চাঁপাতলার যে মেয়ের কথা তোমায় লিখেছিলাম, তার বিয়ে হয়ে গেছে। চাঁপাতলা কি একটুখানি জায়গা, মেয়ে কি একটা সেখানে? মেয়েটার চুল দেখলাম কটা মতন—আমারও তাই শেষটা তেমন ইচ্ছা ছিল না......

মন্ত্রগুপ্তি বটে! উভয় শক্তিই ধরেন দয়ালহরি—কথা ছড়াতে যেমন ওস্তাদ, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাকতেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে এত বড় ব্যাপার, এত সমস্ত তোড়জোড়, অথচ কাকপক্ষীতে জানতে পারেনি। আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন সাতাশ তারিখে দয়ালহরি মুখ খুললেন। যত্রতত্র নয়—সন্ধ্যাবেলা থানায় আমাদের আড্ডা বসেছে, সেইখানে গিয়ে বললেন। কন্যার পিতা হিসাবে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন ও'দের। আমার নিবেদন, শুভ পাকাদেখা আগামীকাল, আপনারা উপস্থিত অনুপস্থিত সবান্ধবে পদধূলি দেবেন, পান-তামাক খাবেন, পাত্র আশীর্বাদ করবেন—

সকলে হৈ-হৈ করে ওঠেনঃ পাত্র কে





হোতমশায়? সমস্ত ঠিকঠাক করে ফেলেছেন, আমরা কই ঘুণাক্ষরে জানিনে।

দয়ালহরি একগাল হেসে আমায় দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধতা, এ-ওর মুখে তাকায়। বড় দারোগা বললেন, ডুবে ডুবে জল খান মশায়। পাত্র হলেন শেষটা আপনি?

দয়ালহরি বললেন, আমি কিছু জানিনে। হুজুর নিজে উপযাচক হয়ে—আরে দূর, হুজুর বলি কেন, অভ্যাস বশে এসে যায়—বাবাজি নিজে থেকে প্রস্তাব করলেন। ভাল ঘরের ছেলে, ভাল সহবৎ—কতরকম বিনয় করে বললেন। আমি তবু বললাম, বড়ভাই মাথার উপরে, তাঁকে সমস্ত জানানো তো উচিত। তা ভাইয়ের মত এসে গেছে। তিনিও মহাশয় লোক— আসতে পারছেন না, কিন্তু খুশি হয়ে মত দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, কনে চোখে দেখেছেন ভায়া?

হেসে ঘাড় নাড়িঃ দেখেছি বই কি! কাছাকাছি তো বাড়ি।

দয়ালহরি বলেন, ও'র বারান্দা থেকে আমাদের উঠোন দেখা যায়। সর্বদাই দেখছেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভালো হোক আপনার। সুখী হোন।

তারপরে একটা সমস্যা উঠল, আশীর্বাদ কোন্ জায়গায় হতে পারে? বরের বাড়ি কন্যাপক্ষ আসেন, এই হল রীতি। কিন্তু আর যেখানে হোক, গোলবাড়িতে শুভকাজ কদাপি নয়। ডাক্তারবাবু শিউরে ওঠেন, দয়ালহরিরও ঘোরতর আপত্তি। অলক্ষুণে বাড়ি—বিয়ে হতে হতে হল না, কনে মরে পড়ে রইল। একলা কনে নয়, তার মা-বাপ যত আত্মীয়-স্বজন। মরে পচে গন্ধ হয়ে গেল। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রইল ঘরের মেজেয়। আর ও-বাড়িতে শঙ্খ বাজবে না, উলু দেবে না কেউ কোনদিন।

দয়ালহরি বলেন, ধানদুর্বা মাথায় দিতে হাত কেঁপে যাবে আমার আশীর্বাদ উচ্চারণ করতে গলা শুকোবে। সে কী কাণ্ড—এখনো সব চোখের উপর ভাসে।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, বয়সে আমি অনেক বড়, জাতেও কায়েত। কলমির ঝাড়ের মতন আমরা কায়েতজাত—টেনে দেখুন, একটা না একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে। কন্যাদায় উদ্ধার করছেন, মহৎ প্রাণ আপনার, ঠাকুর মঙ্গল করবেন। আপনার দাদা যখন আসতে পারলেন না, আপাতত আমায় তাঁর জায়গা নিতে দিন। আমি বরকর্তা, আমার বাসায় এসে কন্যাপক্ষ আশীর্বাদ করবেন।

এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। সুভাহিবুক যোগ পাঁচটা-বত্রিশ থেকে। আশীর্বাদ ঐ সময়। ডাক্তারবাবু বললেন, এই তবে পাকা রইল। পাঁচটা নাগাত আপনি চলে যাবেন। চন্দন-টন্দন মেখে, গিলে-করা পাঞ্জাবি, ফুল-কোঁচা ধুতি পরে বর সাজতে হবে। মেয়েরা নেই, বেটা-ছেলেদের করতে হবে সমস্ত। সময় থাকতে আগেভাগে যাবেন। বড়বাবু, ছোটবাবু, আপনারাও যাবেন কিন্তু বরের সঙ্গে। আমরাই সকলে মিলে রীত রক্ষা করব।

দয়ালহরি করজোড়ে বলেন, আজ্ঞে না। ও'রা আমার বড় হিতৈষী, সর্বদা দুষ্টিমুখ দেন—ও'রা কনেপক্ষ। আমরা একদল হয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।

ডাক্তারবাবু কৃত্রিম কোপে বলেন, আর আমরা কেবল ক্ষতিই করে বেড়াই, হিত কারো কথনো করিনে?

দয়ালহরি হাত কচলে হে'-হে' করেন।

তবে আমিই বা কনেপক্ষ না হবো কেন? বর সেজেগুজে আমার বাইরের ঘরে বসে থাকবে, আমি হোড়মশায়দের সঙ্গে আসব।

বড় দারোগা হেসে বললেন, তা যদি বলেন বরই নিজেই তো সকলের বড় হিতৈষী। হোড়মশায়ের মুরুব্বি উনি। আশীর্বাদ করার জন্য ওঁরই বরঞ্চ দলের আগে আগে আসা উচিত।

হাসাহাসি চলল খানিকটা। ছোট দারোগা বললেন ,তবে খুলেই বলি। আপনার উপর খুব খানিকটা রাগ ছিল স্যার। সেই একদিন খেলা নিয়ে হোড়মশায়ের সঙ্গে বকাবকি হল, আপনি তাই নিয়ে অকারণে ফরফর করে চলে গেলেন। খেলা বন্ধ করে দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিন বছর অন্তে খত-হ্যাণ্ডনোট তামাদি হয়, কিন্তু দারোগা আর কেউটে সাপের রাগ ইহজন্মে তামাদি হয় না। কিন্তু তাই হয়ে গেল আজকে। উদার পুরুষ বটে আপনি। গরিবের কন্যাদায়ে লোকে দশ-বিশ টাকার সাহায্য করে, কিন্তু যেচে গিয়ে এভাবে কেউ দায় উদ্ধার করে না। বয়সে আপনি ছোট, নয়তো পায়ের ধুলো নিতাম এই দশজনের মাঝখানে।

লজ্জায় এর পরে স্থানত্যাগ করা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু যাই বা কোথায়? সর্বত্র এই কথা, সবাই ধন্য ধন্য করে। কেউ মুখে বলে স্পষ্ট করে, কারো বা চেয়ে দেখার মধ্যে টের পাওয়া যায়। দলিল রেজেস্ট্রির জন্য যারা দূর-দূরান্তর থেকে আসে তারাও সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। বিরাটগড়ে এসে লাভ অফুরন্ত হল। লাবণ্য, তোমায় পেলাম আর এই অঞ্চল-ভরা সুখ্যাতি।

আশীর্বাদ যথারীতি হয়ে গেল। একটা আংটি দিয়েছেন। আকারে ছোট, মাঝের আঙুলে যায় না, কড়ে-আঙুলে অনেক কষ্টে ঢোকানো গেল। দয়ালহরি লজ্জা পেয়ে বলেন, গোপন কিছু নেই—ঘরে ছিল, তাই দিয়েছি। বাবাজির আঙুলের মাপে নতুন গড়িয়ে দেবো তার সময় ছিল না। আর বলতে কি, ট্যাঁকও ফাঁকা। তবে পুরানো হলেও ভাল জিনিস। ডাক্তারবাবু তো জিনিস চেনেন, আংটির পাথরখানা দেখুন না।

আমার হাত টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। মণিরত্ন চেনেন তিনি সত্যি—এক বয়সে নাকি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, বইটই অনেক পড়া আছে। ঠাহর করে দেখে বললেন, তাই তো হে, বৈদূর্য-মণি। এ জিনিস কোথায় পেলে বলো দিকি? খাঁটি কথা বলো।

দয়ালহরি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, পুরানো ঘর আমাদের। কর্তাদের আমলে বিস্তর ছিল। গেছে সব। এক-আধ গুঁড়ো এমনি তলানি পড়ে আছে। তা সকলের মুকাবেলা বলছি। গয়নাও দেবো আমি দু-পাঁচখানা। নতুন নয়, তবে সাচ্চা মাল। গা সাজিয়ে দেবো।

কথা শুনে ডাক্তারবাবু ভ্রূকুটি করলেন। ফিসফিস করে আমায় বলেন, বড্ডোদিআমা দেখাচ্ছে। নবাব খাঞ্জে-খাঁর নাতি! আমি যেন কিছু জানিনে! গরিবের দায় উদ্ধার করছেন, ভাল কথা। তা বলে ধাপ্পায় ভুলবেন না ভায়া। আংটিটা সত্যি ভালো, দামি জিনিস। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, এমন-কিছু সেকেলে নয়। হয়তো বা চোরাই মাল। তাছাড়া, পাবে কোথায়? ও মানুষ সব পারে। বাজে ভাঁওতা আমি সহ্য করতে পারিনে।

মনটা খারাপ হল। দয়ালহরির বিপক্ষে আগেও শুনেছি। কিন্তু আজ থেকে সম্পর্ক আলাদা। লাবণ্যের বাবা—আমার অতি আপন জন। ডাক্তারবাবু এমন করে না বললেও পারতেন আজকের দিনটায়।

ক্রমশ

# প্রবাসের জার্নাল

শিবনারায়ণ রায়



## ইংরেজ চরিত্র : ভাবনার খসড়া

—১—

বিলেতে এসেছিলাম শীতের অবসানে, প্রথম ফুল ফোটার ঋতুতে। দুর্লভ ঘোমটাখসানো প্রহরে লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। তারপর গ্রীষ্মের অজুহাতে লণ্ডন আপনাকে আবার কুয়াশার বোরখায় ঘিরে নিল। রোদছুট আকাশে ধোঁয়া-আর-বৃষ্টিতে জ্যাবড়ানো আমন্ত্রণ-লিপির হরফ আর পড়া যায় না। কেন্সিংটন্ গার্ডেন্স-এর মধ্যে লণ্ডন মিউজিয়মের উঠোনে যে ক্যামেলিয়া কুঞ্জ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম সেখানে এখন একটিও ফুল নেই। মাসদুই কণ্টিনেণ্টে কাটিয়ে আবার যখন লণ্ডনে ফিরে এলাম তখন হেমন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। টেমসের ক্লান্ত নিস্তরংগ ঘোলাটে জল, স্ট্র্যাণ্ডের চ্যাটচেটে শড়ক, কালো ছাতির আড়ালে বর্ষাতিমোড়া স্ত্রী-পুরুষদের নীরব নিয়মানুবর্তী আসা-যাওয়া, ওয়েস্টমিনস্টার আর সেণ্টপলস-এর ঐতিহ্যবাহী ভ্যাপসা ভৌতিক গন্ধ, মেট্রোর সুড়ংগপথে বৈদ্যুতিক ট্রেনগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়—মনটা রোদবৃষ্টি ঝড়ের দেশের জন্যে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক একদিন যখন দমবন্ধ লাগে বিকেলে চলে যাই হ্যাম্পস্টেডের প্রান্তরে। বরাত ভালো হলে কখনো কখনো ঝরাপাতার ফ্রিঞ্জের আড়ালে ক্বচিৎ সূর্যাস্তের সোনা দেখা যায়।

তারপর বিলেতে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। এবার সাদাম্পটন্ বন্দর থেকে ফরাসী জাহাজে নিউইয়র্কের দিকে রওনা হব। এদেশে এসে পর্যন্ত যেসব টুকিটাকি অভিজ্ঞতা, আলাপ-আলোচনা কিংবা ব্যক্তি-চরিত্রের আভাস মনে দাগ ফেলেছে, তার কিছু কিছু অবসর মত এই জার্নালে লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। এটা অপেক্ষাকৃত সহজকাজ, ভাষার মাধ্যমে একধরনের ফটোগ্রাফী। আমার ক্যামেরার লেন্স কতটা জোরালো জানিনা (একাজে আমি নিতান্তই অ্যামেচার), কিন্তু অ্যালবামের নেশা আছে।

আমি যদি লাতিন কবি হোরেসের শিষ্য হতাম, তাহলে এখানেই ছেদটানা সমীচীন ঠেকত। কিন্তু আমি বাঙালী, জন্মসূত্রে কিছুটা রোমাণ্টিক, এবং ফলে যা-সামর্থ্যের-বাইরে তার মোহ এড়ানো আমার পক্ষে শক্ত। অতএব সদুত্তরের কোন আশা না থাকলেও একটা প্রশ্ন ক্রমাগতই মনে খোঁচা মারছেঃ টুকিটাকি অনেক কিছু দেখলাম, কাঁচাহাতে তার কিছু ছবিও তুলেছি, কিন্তু এর মধ্যে ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে কোন সাধারণ সূত্র ধরা পড়ল কি? ইংরেজ জাতি কিম্বা ইংরেজী সভ্যতার যা বৈশিষ্ট্য তার কি কোন কিছু হদিশ মিলল? এই দুঃসাহসী প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমার মনে যে উত্তর ধীরে ধীরে আকার নিয়েছে এদেশ ছাড়ার আগে তারই একটা খসড়া এই জার্নালের পাতায় লিখে রাখা যাক।

প্রশ্নটা কিন্তু তাব'লে প্লেটোনিক নয়। যে-মানুষদের নিয়ে একটা জাতি, যাদের ভাবনা কল্পনা আচার ব্যবহার নিয়ে একটা সভ্যতা, তাদের ছাড়িয়ে ছাপিয়ে তাদের অতিরিক্ত কোন কাল্পনিক নিত্য রূপকে জাতি বা সভ্যতা বলে খাড়া করার যে প্রবণতা প্রায়ই চোখে পড়ে তাকে আমার চিরদিনই অযৌক্তিক এবং ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে। এই প্রবণতা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এর প্রভাবে কাল্পনিক "জাতীয় স্বার্থে"র হাড়ি-কাঠে ব্যক্তির বিবেককে বলি দেওয়া হয়। এরি মোহে বৈচিত্র্যকে মুছে, প্রশ্নশীলতার গলা চেপে, সৃষ্টি প্রেরণার উৎসকে শুকিয়ে ফেলে গড্ডলতার ঐক্যকে সভ্যতা বলে মানুষ ভুল করে। জাতি বা সভ্যতা সম্বন্ধে এই ধরনের কল্পনা এক ধারে যেমন ব্যক্তিত্ব-বিলোপী, অন্যধারে তেমনি বিশ্বমানবিক ঐক্যের পরিপন্থী।

কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তি-অতিক্রান্ত সামষ্টিক সত্তার কল্পনাকে বাদ দিয়েও জাতি বা সভ্যতা বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়ত অসম্ভব নয়। প্রতি ব্যক্তিই অনন্য এবং পরিবর্তনশীল; তা না হলে মানুষের অসম্পূর্ণ বহুবাচনিক ইতিহাস সূচনার আগেই নির্গুণ নিরবয়ব বৈদান্তিক ব্রহ্মে লয় পেত। কিন্তু ব্যক্তির স্বকীয়তা যেমন সত্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল তার চাইতে কম সত্য নয়; এবং ব্যক্তির দেহে-মনে যেমন নিয়তই পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সেই পরিবর্তন প্রকাশ পায় ব্যক্তিজীবনের ঐক্যকে আশ্রয় করে। ব্যক্তিজীবনের এই ঐক্যের প্রধান স্বাক্ষর তার স্মৃতি; আর মানুষে মানুষে মিলের প্রধান প্রকাশ হল ভাষা।

একই ভৌগলিক পরিবেশের মধ্যে যদি কিছু মানুষ বেশ কিছুকাল একসঙ্গে বাস করে, তাহলে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে নানা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইসব সম্পর্ক একধারে পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, অন্যধারে এদের আরেক নিয়ামক হল ঐ পরিবেশে যারা বাস করে সেই মানুষদের বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদ। প্রয়োজনের চাপে পরিবেশের মধ্যে নতুন নতুন সামর্থ্যের সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হতে থাকে। আর এই আবিষ্কারের ফলে প্রয়োজনের সংখ্যা বাড়ে, তাদের চরিত্রের নানা রদবদল ঘটে। ফলে সম্পর্কগুলোও ক্রমে ক্রমে পাল্টায়। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক পাল্টালেও একেবারে সম্পর্কহীন ব্যক্তি-জীবন বোধহয় অকল্পনীয়। এইসব সম্পর্ক

আকার পায় প্রতিষ্ঠানে-অনুষ্ঠানে, আচার ব্যবহারে, নীতিনিষেধ এবং আইনকানুনে, ভাবপ্রকাশ এবং ভাববিনিময়ের স্বীকৃত রীতিতে। মোটামুটিভাবে বলা চলে এইসব সম্পর্কের সমষ্টিগত নাম সমাজ; স্মৃতির সাহায্যে ভাষা এবং অভ্যাসের মারফৎ পুরুষ থেকে পুরুষে এই সম্পর্ক-কাঠামোর উত্তরণ হল ঐতিহ্য; এবং এই সমাজ ও ঐতিহ্যের সচেতনতাই সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ।*

এখন মানুষ যে পরিবেশকে তার প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগাতে পারে, অন্য জীব-জন্তুর মত পরিবেশের দ্বারাই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে পরিবেশের মধ্যে নতুন নতুন সামর্থ্য আবিষ্কার করে নিজের চেষ্টায় পরিবেশের রূপান্তর ঘটায়—মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান উৎস তার মস্তিষ্ক। জন্মসূত্রে মানুষ অন্যজীবের চাইতে অনেক বেশী সামর্থ্যসম্পন্ন মস্তিষ্কের মালিক। মানুষের সৃষ্টিশীলতার ভিত্তি তার মগজ, এবং জন্মসূত্রে বিকৃতমস্তিষ্কদের বাদ দিলে মানুষমাত্রই যেহেতু অন্যজীবের চাইতে অনেক বেশী সামর্থ্যসম্পন্ন মস্তিষ্ক নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় সে কারণে প্রতি মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিশীলতার সম্ভাবনা বর্তমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা কারণে সব মানুষের মগজ সমানভাবে অথবা একইভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে না। এইসব কারণের অনেক-গুলোই এখনো আমাদের অজানা। তবু কারণের আলোচনা বাদ দিলে একথা অভিজ্ঞতাসম্মত যে, প্রতি সমাজেই কিছু ব্যক্তি দেখা যায় মস্তিষ্কের বিকাশ যাদের মধ্যে সাধারণের চাইতে বেশী পূর্ণতা লাভ করেছে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের বলা যায় ঐ সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা ইন্-টেলেকচুয়্যালস। কোনো সমাজ বা সভ্যতা যত বেশী পরিণতি লাভ করে ততই সেখানে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এবং কার্যকলাপ বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এরা একধারে পরিবেশের উপাদান এবং ব্যবহার পর্যালো-চনা করে বিভিন্ন প্রকৃতি বিজ্ঞান গড়ে তোলে; অন্যধারে সেই জ্ঞানের সাহায্যে নানা যন্ত্র এবং প্রয়োগপদ্ধতির উদ্ভাবন করে পরিবেশের প্রচ্ছন্ন সামর্থ্যকে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগানোর পথ খুলে দেয়। এরা নিজেদের মন এবং প্রতি-বেশীদের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে একধারে নানা মানববিজ্ঞান গড়ে তোলে, অন্যধারে সেই জ্ঞানের জোরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার বিষয়ে কর্তব্য-অকর্তব্যের নানা বিধান দেয়। এদের অনুশীলনের ফলে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের ভাষায় পরিণতি পায়, বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার উপাদান যুক্তির দ্বারা পরি-মার্জিত এবং সাধারণ সূত্রে সমন্বিত হয়। এরা নানা সচেতন প্রক্রিয়াপদ্ধতির মারফৎ এক যুগের অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকার পরের যুগের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়। যে ভৌগলিক পরিবেশে এদের বাস, সেখানকার অধিবাসীদের জঙ্গম বহুবাচনিকতার মধ্যে এরা একটা আদর্শগত ঐক্য এবং স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আনে। আর যেহেতু এরা সেই সমাজের সবচাইতে প্রকাশ-ক্ষম সদস্য, সেকারণে এদের কল্পিত আদর্শ কালক্রমে ঐ সমাজের সাধারণ মানুষদের চরিত্রে সংক্রমিত হয়, তাদের ভাবনা-ব্যবহারের ওপরে গভীর প্রভাব ফেলে। কোন ভৌগলিক পরিবেশের অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে যে জীবন-আদর্শের দ্বারা পরিচালিত সেটিই হল ঐ সভ্যতাকে বুঝবার মূলসূত্র, এবং জাতীয়চরিত্র বলে যদি কোন কিছু থাকে, তবে এই সাধারণ-স্বীকৃত জীবনাদর্শের বিশ্লেষণের মধ্যেই বোধহয় তার হদিশ মেলা সম্ভব।

বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত জীবনাদর্শ সমাজসভ্যতায় ঐক্য এবং স্থায়িত্ব আনলেও এই ঐক্য বা স্থায়িত্ব সবসময়েই আপেক্ষিক, অসম্পূর্ণ এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ। জ্ঞানের বিকাশ আর অবস্থার উন্নতির ফলে সমাজের আদর্শ পাল্টায়। দ্বিতীয়ত, একটা বিশেষ আদর্শের মধ্যে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু আর নিজের ভাবনা-কামনার সার্থ-কতার প্রতিশ্রুতি খুঁজে পায় না, এবং

* ঐতিহ্য ইংরেজী "ট্র্যাডিশন" কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ। এবং যে লাতিন ধাতু থেকে এই কথাটির উদ্ভব, তার অর্থ হল একের হাত থেকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া।

তাদের সেই বিক্ষোভ-অতৃপ্তি প্রবল হয়ে উঠলে প্রচলিত আদর্শে ভাঙন ধরে এবং কখনো কখনো তা বিপ্লবের আকার নেয়। তাছাড়া সমাজের সম্প্রসারণের ফলে একটি বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের আদর্শের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের আদর্শের পরিচয় ও সংঘাত ঘটে, এবং তার ফলে নতুন আদর্শ এবং সমাজ-সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। সবচাইতে বড় কথা, মানুষের বুদ্ধি শুধু আদর্শের কল্পনা করে না, সে আদর্শকে যুক্তি এবং নতুন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পদে পদে যাচাই করারও সামর্থ্য রাখে। একধারে সংশ্লেষণ এবং সংগঠন আর অন্যধারে প্রশ্নশীলতা এবং বিশ্লেষণ—মানুষের বুদ্ধি দুধারেই সক্রিয় হতে পারে। ফলে কোন সভ্যতা বা সমাজ আদর্শ এবং অভ্যাসের ঐক্য অর্জন করলেও জ্যামিতিক অপরিবর্তনের ব্রহ্মলোকে আশ্রয় পায় না।

তবে আশ্রয় জোটাবার চেষ্টা চলে। বেশীরভাগ মানুষই অভ্যাস এবং বিশ্বাসের নিশ্চয়তা চায়, চায় পদে পদে বিচার করে পথ বাছবার যে ব্যক্তিগত দায়িত্ব তাকে এড়াতে। মগজ নিয়ে জন্মালেও মগজকে বিকশিত করার সুযোগ সুবিধে আর এযাবৎ কটা মানুষই-বা পেয়েছে? ফলে মানুষের চরিত্রে জাড্যের লক্ষণ বড় কম প্রবল নয়। বুদ্ধিজীবীরা বিশ্লেষণ করে যে আপেক্ষিক সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে পৌঁছন, বাকী মানুষ তাকে অভ্যাসে পর্যবসিত করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অনেক আধুনিক মনোবিজ্ঞানী সাধারণ মানুষের এই প্রবণতাকে 'স্বাধীনতায় ভয়' বা 'ফিয়ার অব্ ফ্রীডম্' আখ্যা দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরাও অনেকসময়ে সাধারণ মানুষের এই দায়িত্ববিমুখতা এবং প্রশ্নভীতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের পরিকল্পিত আদর্শ এবং বিধিনিষেধকে চিরন্তন ও প্রশ্নাতীত বলে খাড়া করে থাকেন। ফলে সমাজে তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি কায়েম করার সুবিধে হয়। কেউ সে আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে তাকে জাতিদ্রোহী, পাষণ্ড, অধার্মিক বা হেরোটিক্ বলে দমন করার চেষ্টা চলে। মানুষদের বোঝানো হয় যে, ব্যক্তিদের বহুবাচনিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে সমাজের কোন সমষ্টিগত সত্তা আছে; এই সত্তা স্বতঃসিদ্ধ, সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়; এই সত্তারই অপর নাম জাতি বা সভ্যতা, এবং এই সামষ্টিক সত্তার ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলার মধ্যেই নাকি ব্যক্তির সার্থকতা। যে দেশে বা সমাজে এই চেষ্টা সফল হয়, সেখানে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ, এবং ফলে সে সমাজ নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে এনে ক্রমে স্থবির হয়ে পড়ে।

সুতরাং কোন সভ্যতা বা জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে ভাবতে গেলে গোড়াতেই বোধহয় অন্তত দুটো কথা মনে রাখা দরকার। ব্যক্তি এবং তার পরিবেশকে বাদ দিয়ে জাতির কোন অস্তিত্ব নেই; ব্যক্তিদের ভাবনা, কামনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-অনুষ্ঠান এ-সবই জাতীয় চরিত্র বা সভ্যতার উপাদান; এবং সভ্যতা বা জাতীয় চরিত্রের সংগঠনে যেমন আদর্শগত ঐক্য এবং স্থায়িত্বের প্রয়োজন আছে, তেমনি তার বিকাশের অপরিহার্য উৎস হল ব্যক্তির স্বকীয়তা, আদর্শের সংঘাত এবং সমন্বয়, সামান্য লক্ষণের প্রাতিস্বিক ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি মানুষের সঙ্গে পরিচয় বা অল্প কিছু সময়ের ঘটনাবলীর ওপরে নির্ভর করে কোনও সভ্যতা বা জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা চলে না। তার জন্যে সে সভ্যতার ইতিহাস এবং সংগঠন বিষয়ে ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ পশ্চিমে পা দেবার আগে অন্তত বিশবছর ধরে সাধারণভাবে ইউরোপ এবং বিশেষভাবে ব্রিটেনের ইতিহাস অনুশীলন করার সুযোগ না ঘটলে মাত্র কয়েকমাসের ঘোরাফেরার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ইংরেজ চরিত্র বা ইংরেজি সভ্যতা সম্বন্ধে কোন ধারণা খাড়া করার স্পর্ধা আমার অন্তত কখনই হত না। যা লেখার চেষ্টা করছি তাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ একটা খসড়ামাত্র। এর যদি কোন দাম থাকে তা শুধু এই যে সম্ভাব্য উত্তরের একটা খসড়া সামনে থাকলে মূল প্রশ্নটা নিয়ে আরো ভাবনা এবং বিচার আলোচনা হয়ত সহজতর হতে পারে।

(ক্রমশ)

# কোন শৈলাবাস থেকে

মিতা,

এত কাণ্ড, এত তোড়জোড়ের পর সত্যিই পৌঁছলাম। উনি যে শেষ পর্য্যন্ত ছুটি পেলেন এই আমার ভাগ্যি। ছুটির এই কটা দিন কি ভাবে কাটাবো তাই নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা করেছি কিন্তু এখানে মন বসছেনা। ১৫ বছর আগে এসেছিলাম তারপর এই, কিন্তু কত বদলে গেছে। আমরা যে নির্জন জায়গাগুলিতে বসে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত দেখতাম, সারাদিন কাটাতাম, সে সব জায়গাগুলি এখন লোকে লোকারণ্য। অনেক জায়গায় জঙ্গল কেটে ফোয়ারা তৈরী হয়েছে, বেঞ্চ বসানো হয়েছে কিন্তু আগের সে সরল সৌন্দর্য্য আর নেই। এখন রাস্তাঘাট, হোটেল, বাংলো সব লোকে লোকে ছয়লাপ। যাই হোক আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। বিনু হীরু ভাল। ওরা কবে মিতা মাসীর কাছে যাবে, ভালমন্দ খাবে তারই দিন গুনছে। কর্ত্তা এখানেও বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার চেষ্টা করছেন। চিঠি লিখো।

কমু

তোমার কোথায় ব্যাথা লাগছে বুঝতে পারছি। তুমিই সত্যিই রোম্যান্টিক। পরিবর্ত্তনকে মেনে নেওয়াই ভাল। ১৫ বছর আগে আমরা যা দেখেছিলাম আজ তা না থাকাই তো স্বাভাবিক। মানুষের জীবনে এই ১৫ বছরে কত পরিবর্ত্তন এসেছে ভাব তো! বর্ত্তমানের মধ্যেও আনন্দের খোরাক অনেক পাবে যদি মনটাকে খোলা রাখ। তারপর দেখবে ১৫ বছর পরে এই দিনটির কথা কত মনে হবে।

মিতা

মিতা,

তুমি একেবারে মাষ্টারনী। প্রানের দুঃখের কথা তোমায় বললাম কোথায় একটু আহা উহু করবে না সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ। কিন্তু একটা জৈবীক সমস্যার সমাধান করে দাও তো। তোমার মনে আছে এখানে হোটেলে খাবার দাবার কেমন ভাল ছিল। সেই আশাতেই তো আমি রান্নাবান্নার জিনিষ না নিয়ে এলাম—ভাবলাম একটা দিন সত্যিই ছুটি পাব। কিন্তু মাগো! কি অবস্থা হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম আগুনের মত। হোটেলের খাবার দাবার যে কি ঘি দিয়ে রাঁধে জানিনা, কিন্তু একেবারে ভাল লাগেনা। খাঁটি ঘি পাওয়া দুস্কর আর পাওয়া গেলেও বড্ড দাম। কিন্তু রান্না আমাকে সুরু করতেই হবে—তানাহলে থাকতে হবে না খেয়ে।

কমু

কমু,

একটা কথা আছে ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তোমারও সেই অবস্থা। আমি তোমার সঙ্গে একমত। ছুটিতে খাওয়া দাওয়াই যদি না

DL. 447A-X52 BO




# তাহাদের কথা

## কমল কুমার মজুমদার

২

**অসম্ভব** মিল দেখা যাবে, এই বাড়িটির সংগে এবং ছোট ছেলের আঁকা ছবির সংগে। 'খাপরার চালের বাড়ি, পাঁচিলেই সদর দরজা, তারপর উঠান, শেষে উঁচু রক। সবকিছু এখন অস্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির একটু অস্বস্তি হয়েছিল, তবুও সে নিজেকে যত্ন করে, রোজগারী দর্পে যে-ক্ষণে সদর দরজায় পদার্পণ করেছে, অমনি তার মা—হেমাঙ্গিনী তার কানটি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রকের কাছে ঠেলে দিলেন। জ্যোতি ঘাড় দিয়ে কানটিকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। পরক্ষণেই চেয়ে দেখলে, রকে সেই প্যাকেটটি এবং আর কিছু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অন্নপূর্ণা বসে। সর্বত্রই দিব্য অন্ধকার, ওপাশে শিবনাথ উবু হয়ে বসে। ইতিমধ্যে হেমাঙ্গিনীর গলা শুনে তার অন্তরাত্মা কম্পিত হয়ে উঠল। "এতেক আস্পর্ধা নচ্ছার, রাস্তায় ধরে ওকে শাসান! হারামজাদা...কেরে আমার এঁটেল মাটির রামচন্দর—ঝেঁটাই তুয়ার চটকা তামাদি করি দাবো... পিতৃভক্তি, ওহো পিতৃভক্তি যদি দেখাবি ত লখাই মালের দলে নাম লিখ গা", হেমাঙ্গিনীর গলা অনেক দূর যায়। অনতিদূরস্থ গৃহস্থ বাড়িতে গীত সাধনা "যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে" ছাপিয়ে গিয়েছিল সে-গলা।

জ্যোতি মার দিকে একবার চাইবার চেষ্টা করে। হেমাঙ্গিনী সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে; তার বর্ণচ্ছটা ভরা সন্ধ্যায় চোখে পড়ে। অন্যদিকে অন্নপূর্ণা নির্লজ্জ। কেউ আজকের বিবরণ জানবার কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেনি, শিবনাথের সেই শান্ত মুহূর্তে, যা দেখে জ্যোতির মনে হয়েছিল সে একা সে-বিবরণও নয়। যদি মা দিদি থাকত, বাবাকে "এসো" বলে ডাকত, তাহলে নিশ্চিত শিবনাথ ফিরে আসত। কিন্তু এরা সবাই আর-এক রকমের, কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। হেমাঙ্গিনীর গালির আর অন্ত নাই।" জ্যোতি, ভাগ্যে এখন অন্ধকার, কোনরূপে আত্মসম্মানটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমত সময় বিন্দি পিসিমা এলেন, বিন্দি পিসিমা পাশের বাড়ি নবীন মোক্তারের বোন। হাতে তার লণ্ঠন, এসেই বললেন, "হে গা বৌ ভরা সঞ্ঝেবেলা, ছড়া গঙ্গাজল নাই, সন্ধ্যা নাই ছেলেটাকে দুষছ কেনে বৌ...?"

হেমাঙ্গিনী বিন্দুবাসিনীকে দেখলেই অতিমাত্রায় রুক্ষ কৃষ্ণকায়া হয়ে যেতেন। মনে হত, সে যেন বা অত্যধিক বৃদ্ধা, কেননা বিন্দু পিসিমার ডাগর রূপ ছিল, সৌন্দর্য ছিল অঢেল। এ-কারণে তাঁর নিজেরই ছিল ত্রস্ত লজ্জা, কেননা তিনি বালবিধবা। হেমাঙ্গিনী তার স্বভাব অনুযায়ী উত্তর দিলে, "এঠেনকে তুলা পেঁজা হইছি, স্বগ্গে গিয়ে সন্ধে দুবো... তুমাকে আর......তুমি এলে কেনে......?" হেমাঙ্গিনী অনেকবারেই তাঁকে ছোট করেছে, কতবার আঙুল মটকে অভিসম্পাত করেছে কিন্তু বিন্দুবাসিনী মরেন নি, তাঁর ভিতরে যে মনটি ছিল তা'ও মারা যায়নি।

"বৌ ক্ষেপা হইছ...তুমার কি আটকল নাই!"

"লাও লাও ঢেল হইছে, আটকল? আমার আটকল শিখরভূমে", আরও তিক্ত মন্তব্য কিছু খুঁজে না পেয়ে বললে, "যি দিনকে শাঁখা ভাঙব, সিন্দুর গঙ্গা করব এ ঠেন উয়ার নামে বেনা গাছ পুঁতব..."

ছিঃ ছিঃ করে উঠে বিন্দুবাসিনী কানে, হাতে লণ্ঠন সত্ত্বেও, আঙুল কোনোমতে দিয়েছিলেন, ফলে মাথা আড় হয়েছিল। তারপর হাত নামাতে গিয়ে আড় চোখে শিবনাথকে দেখলেন। শিবনাথের দাঁতে চাপা বিড়ি, দুই হাতের তর্জনী বঁড়শীর মত করে আটকান। অদ্ভুত একটা স্বরে সে ক্রমাগতই বলছিল, "লেগে যা শালা লেগে যা যা...নারদ নারদ।"

"ছিঃ গো তুমি বামুন লয়, কি কথা বল

গোঃ! পুনি উঠ না কেনে বাতি বাতি জবলা লো..."

"তুমি সাউকিড়ি কর না ঠাকুর ঝি... আমার আবার সংগে...ঝ্যাঁটা...। পুনি ত আর তেমন নাই, ডাগর সোমত্ত বটে, বলে কলসী থাকলে বিটিছানার সাজে আগড় পড়ে, তাই বলে কি কাজখাটালীতে কলস বুকে করে যাবে গো?...এত আর ধানভানা লয় যে গতর শুধু বড়ঠাকুর দেখলেক, মা মরা ভাগ্না দেখলেক আজ কাঠবিলাসী দেখল'। পাঁচ দশ চোখ সেখানকে ঘুরে..." পরক্ষণেই গলায় মোচড় দিয়ে একটি অপূর্ব স্বর বার করলে, "একোটা ব্লাউজের কাপড় কিনছে, এতদিন ত উয়ার কাঁমিজ কেটে চললো!" বলে রাস্তার সকল কথার উল্লেখ করে বললে, "যেমনি বাপ, ছেলে কত হবে, পুনিকে পরিত্ত গঞ্জনা করে, না বাপের ওষুধ বাঁদ নাই...টনকলড়া ক্ষেপা দল মাগেও ভাল হয় না..."

"হা ছেলেমানুষ বটে...যাদ শুন গো, একটা ভাল শিকড় পেয়েছি। বেটে—আমসীকি..."

"ওসব আমরা পারবনি...সারা জীবন আমায় ছেঁকা দিলে...আবার..."

"আহা বৌ কেনেক দাও কেনে গো, জ্যোতে ছোঁড়া আছে, মানুষটা কি এমন হয়ে থাকবে, সাড়াসিদ্ধি করনে ভাল হয়ে উঠুক, মরেও সুখ..." বলে শিবনাথের দিকে চাইতেই সে খোল আনা ভুঁড়ি ঘুরান বাবুর মত গান ধরলে "এমন ধনী কে শহরে আমার পাখী রাখলে ধরে—মিছে হিয়ায় দিলে যন্ত্রণা"। মিশ্র পুরবী চোখ নাচিয়ে গলা কসরৎ করে শিবনাথ গাইতে লাগল।

"বলি নাই টনক-নড়া: লাও দেখ, কি লটরা ডাইবজাত, সাধে কি লোকে..."

"আঃ বৌ তোমার দিব্যি! থাক থাক মাথার ঠিক নাই...।"

"ঠিক নাই...দেখ ভাল হচ্ছে না...কাণ্ড-জ্ঞান নাই দিদি না তুমার..."

"দিদি না..." শিবনাথ মুখ বিকৃত করে উত্তর দিলে। "চুপ কর দিনডাকাবী...বাত..."

"ফের ফের মুখ আঁবটে করুনি বলছি ...না হলে চেলা কাঠ"। সুন্দরী হেমাঙ্গিনী এখনও সুন্দর। একথার সংগে সংগে বিন্দুবাসিনী হেমাঙ্গিনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, "সব্বনাশ, তোমার সোয়ামী যে গো..."

হেমাঙ্গিনী তাঁর হাতখানি খানিক সরিয়ে মহা আক্রোশে বললে, "অমন সোয়ামীর মুখে..."। ইত্যাকার উত্তর বিন্দুবাসিনীর হাতটা অনেকখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মুখখানি বিস্ময়ে অসম্ভব হাঁ হয়েছিল, মাথা আন্দোলিত করে সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন, "পা খসে যাবে পা খসে যাবে"।

'যাক্ পা খসে...' বলে সিঁড়িতে সজোরে একটি পদাঘাত করে উঠে গেল। বিন্দু-বাসিনী মুখখানি উঁচু করে তাকে দেখবার চেষ্টা করে বিড়বিড় করে বললেন, "বৌ তোমার বুকে না উপই টাঙ্ক? শুধু কি চোনা ভরা গো। হায় হায়।" বলে কন্ট চেপে জ্যোতির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, "ক্ষেপা উয়ার কম্মফল, এক ছটাক ছেংড়ার সাধ্য কি তাকে রাখে তাকে...একটু যদি সোহাগ সাঙাতি দেখাতে...বললে বড় দোষ হবে...যে..." তাঁর গলা শুনলে মনে হবে যেন ভোর হচ্ছে।

জ্যোতি বুকে হেলান দিয়ে একমনে লণ্ঠনের দিকে চেয়েছিল। শুধু মনে হল,

যেমত প্রায়ই হয়, বিন্দি পিসিমা যদি আমার মা হত। সে কোনরকমে সংযত অটকান দৃষ্টি ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্দি পিসিমাকে দেখলে। তিনি তখনও সেইভাবে বসে, সত্যিই তিনি বাবাকে বড় ভালবাসেন। মনে হয় আপন বোন। যেদিন শিবনাথ প্রথম আর এক রূপে দেখা দিল...আজও সে-কথা জ্যোতির কাছে ছবি হয়ে আছে।

আজও যে কথা জ্যোতির মনে আছে, সে কথা এই যে.. তদানীন্তনকালে, চিঠির মাথায় "দুর্গাশরণং", "গড্ ইজ গুড"-এর পরিবর্তে "বন্দেমাতরম" এল। পর্দানশীনতা সর্ব অর্থে ছিঁড়ে শতচ্ছিন্ন। মহাজনরা কেউ বললেন না যে, মেয়েরা ঘরে থাকবে না সত্য, কিন্তু ঘর মেয়েদের বুকে থাকবে! এই সময় শিবনাথ স্বদেশ বাৎসল্যের জন্য চাকরি হারাল, মাস্টারী পেল এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলেছিল। হেমাঙ্গিনী সুযোগ পায়, তার মনে বলও ছিল, কেননা সে জানত, শিবনাথ দুর্বল অর্থাৎ আমরা যাকে বলি ভদ্রলোক। শিবনাথ মুখ ফুটে স্ত্রীকে কোনদিন কিছু বলেনি, একদা সকালে ঘরের মধ্যে হো হো করে উঠে ক্রমাগত শিশি বোতল এটা সেটা ভাঙলে, তারপর মাছের মতন লাফ দিয়ে পড়ল উঠানে। মনে হয়, এটা ইচ্ছাকৃত। অন্নপূর্ণা ও জ্যোতি এ ব্যাপারে হতচকিত, জ্যোতি খানিক উঠে, অন্নপূর্ণা এক পা বাড়িয়ে পাথর, শুধু হেমাঙ্গিনী হাতে তকলী, একবার আড় করে দেখে, উর্ধ্বাঙ্গগত হস্তের তুলোর দিকে মনঃসংযোগ করল।.. বিন্দুবাসিনী ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে তখন নেতা ছিল, বলেছিলেন, "বৌ তার থেকে উয়ার গলায় পা দেনা"। হেমাঙ্গিনী ভীত হয়েও শক্ত হয়েছিল। বিন্দু পিসিমা চোখের নিমেষে নেতা ফেলে, কুয়োর নিকটে রক্ষিত বালতিতে হাতের চানকা মেরে এসে শিবনাথকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। কোনরূপে শিবনাথকে রকে তোলা হয়, অন্নপূর্ণা শিবনাথের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলি মুছে যখন টিনচার আয়োডিন দেয়, তখন শিবনাথ বুকফাটা চীৎকার করে উঠেছিল, তার বাথায় বিন্দু পিসিমার মুখখানি গামছা-নিঙড়ানর মত হয়ে গেল। একবার তিনি শুধু কঠিনভাবে হেমাঙ্গিনীকে ডেকেছিলেন—"বৌ!"

এই ডাকটির মধ্যে অনেক গঞ্জনা ছিল, হেমাঙ্গিনীর চেতনা নড়ে উঠেই স্থির, বললে, "লাও লাও কোর্ট কলম দেখতে হবে না ঠাকুরঝি, তোমার বুককে যদি এতেক ফোঁড়া কাটছে...তাহলে তুমি কেন না তাকে নিয়ে ফিটকারির ছানা কেটে... স্যাঙা কর না?" হেমাঙ্গিনীর চোখ তুলোর দিকে, ফলে দেখা গেল যে, তার গলাটি উঠল নামল। হেমাঙ্গিনীর কথায় অন্নপূর্ণা পর্যন্ত জিব কেটেছিল।...এসব কথা জ্যোতির খুব মনে আছে। সমস্ত ভালবাসা এসে জমেছিল ছেলেমানুষের হাতে, যেমন এইটুকু পৃথিবীর নিয়ম।

...এতক্ষণ বাদে বিন্দি পিসিমা বললেন, "বৌ, তুমি ত আর কোনদিনই...তোমাকে বলা দরকার সবাই বললুম, জ্যোতি ঘৃত-কুমারীর পাতা চিনিস ত?"—

"থাক্ থাক্ আর ওষুধে শিকড়ে কাজ নেই—সে ত এমনি ভূমির বশ..." হেমাঙ্গিনীর এখনও বিলক্ষণ রাগ ছিল! একদার দুর্বল শিবনাথ, আজ পাগলামীর মধ্যে ভয়ংকর, ইতর এবং শত্রু! সুস্থ অবস্থায় যা সম্ভব হয়নি এখন তা হয়েছে।

জ্যোতি, বিন্দি পিসিমার দেওয়া মোড়কটার দিকে চাইল; ওদিকে ভারী শিল নোড়ার দিকেও তার নজর পড়েছিল। তারই কিছু কাছেই হেমাঙ্গিনী দণ্ডায়মানা। সে যেন কালো আকাশের বজ্রের মত সুদৃঢ়! অনেকদিন আগেকার কথা, একদিন ঠিক

এমনিভাবেই হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে এক পা দিয়ে নোড়াটা ঘোরাচ্ছিল; আর কেমন কেমন কথা, নিম্নে, নিকটে, উঠানে, স্বদেশী বামনদাসের সঙ্গে কইছিল। আজও সেই নোড়ার শব্দটা মেঘডাকার শব্দের মধ্যে ছিল। কি ভয়ংকর হয়েই না আছে! অন্নপূর্ণা মা'র হয়ে শিল নোড়াকে প্রণাম করেছিল, কারণ বাবার খাদ্য ওতে প্রস্তুত হয়, বাবার জুতোয় অসাবধানে পা লাগলে এরা নমস্কার করে। পাপ যাতে না হয়। হেমাঙ্গিনী শুধু বলেছিল, "যা যা ওসব আজকাল কেউ মানে না, ধুয়ে নিলেই হবে।"

বিন্দি পিসিমা উঠানে নেমে লণ্ঠনটাকে একটু যখন ঠিক করতে যাচ্ছিলেন তখন হেমাঙ্গিনী বললে, "ওসব শিকড় বাখড়ে কাজ নয়, আগর নিগড় চাই—।"

একথার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি ঘুরতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, শুনলে মা বলছে, "তুই পর্নি, ভুবন কামারের কাছে গিয়েছিলি... শিকলের কি করলে...?"

"বৌ ছিঃ ছিঃ লোকটা যে শুনাবেক গো..."

না মা'র না মেয়ের মনে কিছু, রিনি কাটলে। অন্নপূর্ণা তার কাপড়ে পায়ের গাঁট ঢাকতে ঢাকতে উত্তর করলে "বললে.... ও কড়া হবে না" বলে সে ঝটিতি জ্যোতিকে দেখে নিয়েছিল।

"কেনে? সে যে তার পায়ের মাপ নিয়ে গেল?"

"বললে আমাদের এখানে কড়া আটকাবার সাট নাই, বললে দুটো মিনারের তোলা দিবে ...শিকল পাক দিয়ে..."

এ হেন কথাবার্তায় জ্যোতি পড়ে যাচ্ছিল, বিন্দুবাসিনী শুধুমাত্র কঠিন হয়েছিলেন, তারপর তাঁকে আর দেখা গেল না। জ্যোতি রাগে লজ্জায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছিল। হেমাঙ্গিনী এখনও থামেনি, বললে, "কালই যেন শিকল নিগড় আসে, তারপর দেখি কত বড় বজ্জাত তুমি... বলবি ভুবন বেদাস্তীকে...একোটা টাকা বেশী লায় নিবে উপোসী যাব...কাল যেন..."

জ্যোতি তবু সাহস করে বলেছিল "শিকল!"

"শিকল হ্যাঁ হ্যাঁ"। এই উত্তরে শিকলের ওজন-আওয়াজ দুই ছিল।

জ্যোতি পুত্রমাত্র, যার মধ্যে স্বপ্নের রঙ আর ক্ষয়িষ্ণুতা দুই দুমড়াবে সে এতাবৎ সন্তানমাত্র—খাদাই। আপনকার উষ্ণতা দিয়ে যে সমস্ত মমতা এনেছে, আজ হঠাৎ সে একাই বড় নিঃসঙ্গ। তার অন্তরে অর্গলহীন দরজা ঝড়ো হাওয়ায় আছাড় খায়! দূরে দরজার অবকাশ দিয়ে দৃশ্যমান শূন্যতা। যে-জ্যোতি নিঃশঙ্কচিত্তে রাস্তার যে কোন গোলমালেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, এখানে সে কীটানুকীট, এই দৃঢ় সংকল্পের সম্মুখে সে নির্জীব। ছোট মুঠোটা থুতনিতে আঘাত করতে করতে সে ভেবেছিল বিন্দিপিসিমার কথা 'সোহাগ সাঙাত' ভালবাসা! একবার জ্যোতির মনে হল বিপিন গুপ্তকে খবর দেয় কিন্তু তিনি ত কলকাতায় চলে গেছেন তবে আর ত কেউ নেই যে, তার বাপকে শিকল পরানর বিরুদ্ধে যাবে। তার এমন সাহসও নেই যে, বাবাকে নিয়ে কোথায় পালিয়ে যায়, কেন না দু তিনবারই এমন হয়েছে যে, শিবনাথ চোর চোর বলে চীৎকার তুলে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে, আর জ্যোতি মার খেয়েছে!

ব্লাউজের মধ্যে মাহিনার খুচরো টাকা কয়েকটি ঝিলিপ ঝিলিপ আওয়াজ করে ছেলেমানুষ অন্নপূর্ণাকে পুরুষোচিত মর্ম বেদনা দিয়েছিল। তবু এইটুকু খুশী ছিল, কুর্তির ভাজ হয়ত খেতে হবে না। এ খুশীর কোন জোর নেই, বাড়ির সদর পার হতেই 'ঝিলিপ' করে শব্দ হল, এই শব্দে তার কেমন যেন লজ্জা হয়েছিল। দেখলে, হেমাঙ্গিনী জলের বালতিটা মাজছে, তার পরনে শতছিন্ন গামছা। অন্নপূর্ণা গম্ভীর, গভীরভাবে তাকে দেখলে। মনে হল, হেমাঙ্গিনী স্ত্রীলোক। অন্য পক্ষে হেমাঙ্গিনী ছবিলা হাসি হেসে বললে, "পেয়েছিস?" এ সময় তার পুরো মুখখানি দেখা গেলঃ বাবুয়ানা পাতাকাটা, নাকে একটি ফেরোজা, কানের থুপি লাল রেশমী হয়ে আছে, গায়ের রঙ যেমন বা উলুধ্বনি করে উঠে।

অন্নপূর্ণা মায়ের প্রশ্নে কেবলমাত্র সুন্দর মুখখানি একবার এপাশ একবার ওপাশ করেছিল। আর মনে মনে ভেবেছিল, মায়ের কুৎসিত হওয়ারই ভাল। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল এ কারণে যে অন্নপূর্ণার মনে যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ছিল, সেটাই যেন বা সহসা প্রতিভাত হল! একবার সে বাপের ঘরের দিকে চাইল, জানলার দিকে মুখ করে শিবনাথ দাঁড়িয়ে। সে আর কিছু ভাবতে চাইল না।

ঘরে এসে যখন টাকাগুলো হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে রেখেছে, প্রণাম করবে বলে, তখন হেমাঙ্গিনী বললে, "উঁহু, আমি প্রদীপটা জ্বেলেদি আগে ঠাকুর প্রণাম কর, প্রথম মাইনে!" অন্নপূর্ণার একবার মনে হল, ঘরের স্বল্পান্ধকারে এই পালা শেষ হলে ভাল হত। আলো জ্বলল। অন্নপূর্ণা গভীরভাবেই গোপীবল্লভকে প্রণাম করে উঠতেই তার মা বললে, "ওঁকে এখান থেকে প্রণাম কর।"

অন্নপূর্ণা টিপটিপ করে মাটিতেই শিবনাথের উদ্দেশে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখা গেল তার চোখে জল স্রোত। হেমাঙ্গিনীর চোখে পড়েনি, এবার তার পায়ের কাছে টাকাগুলি রেখে যখন প্রণাম করছে, তখন অদ্ভুত এক উষ্ণতা অনুভবে

হেমাঙ্গিনী পা সরিয়ে নিয়ে বললে, কিলো কানদছিস কেনে!"

অন্নপূর্ণা আর থাকতে পারলে হেমাঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরে বললে, "মা ই টাকায় শিকল কিনো না গো...আম পাপ লাগবে মা" বলে বোকার মতই বলে "জ্যোতির টাকা পেলে..."

হেমাঙ্গিনী যে চোখে তার স্বামীর দিে চায়, সেই চোখে চেয়ে বললে "ও এখ আমার তোমার!" বলে টাকাগুলি ছুঁে ফেলে দিল।

অন্নপূর্ণা কিভাবে মাকে যে বুঝাবে, স্থির করতে পারলে না। সে বসে প অনুতাপের আবেগে বলেছিল, "মা গো গো, বুকে বড় বিল্লী-আঁচড়ায়...বাবা শিব পরবে কেমনে সইব?"

হেমাঙ্গিনী অন্নপূর্ণার একটি কথ শুনবার প্রয়োজন বোধ করেননি, দেওয়া মাথা ঠুকে বলছিল, "আমার কেন ম হয় না।" অন্নপূর্ণার গলা থামল, ত তার কণ্ঠ শোনা গেল, "তুয়া ছুঁড়ির পর টেঁওয়ায়, সে ছোঁড়ার পরাণ আছে, ভাগ্য খাগী—বিন্দুদাসীর পরাণ উঠলে এলো হয় আর আমার মরণ নাই" বলে দেওয়া পুনঃ পুনঃ মাথা কুটতে লাগল। সত্যই ত লেগেছিল। হেমাঙ্গিনী কাঁদছিল।

এসময় নোটগুলি সন্ধে-হাওয়া উড় হয়ে এদিক সেদিকে সরে সরে যায় ক দুটি ক্রন্দনরত স্ত্রীলোক এবং মাথা ম প্রদীপ চড়্চড় করে উঠে। শুধু পা ঘর থেকে শুদ্ধ স্বরে গানের পদ ভে আসছিল। অন্নপূর্ণা মাকে বুঝাবার জ বললে, "মাগো বড় বুকে আঁচড়ায়..."

একথায় হেমাঙ্গিনীর কান্নার দ সত্যই বাধ মানল না, সে বললে, "ত কি ভাবিসলা যে, আমার বুকে চোনা, ল নিত্যি নিত্যি মানুষটা রাস্তায় মার খ আর আমি মাগি..." সহসা প্রদীপের চ শব্দে হেমাঙ্গিনীর গলা স্তিমিত প্রদীপে বোধ করি জল ছিল, সে কারণে শব্দ। "লোকটাকে সকলে চিনাক, মারু মুখে বলব শিকল দিব না লাগতের স অঙ্গে লাগবে ফোঁড়া কাটব না; শি দুবো না...বেশ আজ দুটো টাকা... আমি ভিক্ষে করে..." ভাঙা ভাঙা শোনা গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণার মন সায় দিতে চায়নি, দি হেমাঙ্গিনী যখন পুরাতন কথা তুলে ব "যেমন কপাল ভেঙে দিয়েছিল ে তেমন যদি প্রাণেই অঘটন হয়, তুইত যাস না, একা ছোঁড়ার..."

অন্নপূর্ণার চোখের জল এই মু শুকিয়ে গেল, তবু সংস্কার... মাইমার টাকায় বাবার শিকল কেনা একথা মনে মনে ভাবতেই চাইছিল না। কষ্ট হচ্ছিল। হেমাঙ্গিনী একটার একটা শিবনাথের অপদস্থের কথা উ

করলে, অন্নপূর্ণা প্রদীপের দিকে অন্যমনে চেয়ে শুনতে লাগল! হেমাঙ্গিনীর স্বর তাকে যেমন বা নিঙড়ে মুচড়ে দিলে। সে এক ফাঁকে বুঝলে শিকল ছাড়া গত্যন্তর নেই; টাকাগুলো কুড়িয়ে মার হাতে দিয়ে বললে, "ঠিক আছে আমি ভূষণ বেদান্তীর কাছে যাই"।

অন্নপূর্ণা বাহিরে বারান্দায় এসে শুনল, তার বাবার সুললিত কণ্ঠে গান "এবার আমি ভাল ভেবেছি...যে দেশে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।" অন্নপূর্ণা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কিছুকাল নির্জীব হয়ে থেকে বাবাকে ক্ষীণ মাত্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল "বাবা তুমি কি সত্যিই পাগল?"

শিবনাথ মৃদু মৃদু মাথা দুলিয়ে বোধ হয় সায় দিয়েছিল।

ভাটিতে ছোট একটা হাঁড়ি, ও-পাশে বৌ আপন শিশু স্তন্যদান করতে করতে হাপরের শিকলে মৃদু টান দিচ্ছিল। নেহাই-এর এপাশে ছোট চৌকিতে ভূষণ বেদান্তী! অন্নপূর্ণা যে এসময় আসবে, তা সে জানত, তথাপি প্রস্তুত ছিল না। বৌকে বললে, "আঃ গে হিঃ আকালের অপরা গো তুই... বটে, বামুনদিদি এল...তু যার হাতকে দুটো চাল ফুটাতে দু দু বেল পাশ।" স্বামীর কথার উত্তরে বৌটি জোর জোর হাপর টানতে লাগল। ভূষণ বেদান্তী ব্যস্ত হয়ে বললে, "খাড়াও কেনে গো বঞ সো, মাগী দুটা ভাত ফুটাইছে...বঁসো গো"।

"না-না বসব না, ভূষণ তুমি ঝটপট লাও..."

"লে তুয়ার হাঁড়ি সরা" বলে নিজেই হাঁড়ি সরিয়ে কিছু কয়লা দিয়ে ভাটির মুখে শিক দিয়ে ডাই করতে করতে বললে, "আঃ তুমার ভাই আসছিল গো"। বলে খুব রগড় করা চোখে বললে, "বলে ভূষণ বেদান্তী, তুমি যদি এক বাপের বেটা হও, তবে শিকল করবে না, যদি কর ত বিপিন গুপ্তকে...আরে হঁ...আমি বললাম কি... আমি বিলাতি জিনিস বিয়োই না ঠাকুর। শুধু মস্করা করে বললাম বটে...। তুমি বলেছ কাউকে বলতে না। আমি জাত কামার, চোরে কামারে সাখেত (সাক্ষাৎ) নাই সিঁদ-কাটি তৈরী হয়।...আমি শিকল করি না ঠাকুর! উ বলে, দেখ হে বেদান্তী যদি কর ত আমি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দুবো। যাই বলা আমি ধুলো তুলে তিন তিন থুৎকুড়ি কেটে যাই তার দিকে চাই...দেখি... পলাইয়ে—।" কথা শেষ করে হেসে গড়িয়ে পড়ল ভূষণ বেদান্তী। এরপর অন্নপূর্ণার গম্ভীর মুখখানি দেখে বললে, "ক্ষেইলা মানুষ বটে...আর দু দণ্ড গোড় আলতা গরম হোক পান দুবো...না হলে কড়া মজবুত হবেক না দিদি..." বলে ভূষণ বেদান্তী শিকলটিকে টেনে নিয়ে ভাটির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে দিতে লাগল।

শিকলের শব্দে অন্নপূর্ণার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, তার গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল; সে কিছু একটা বলা দরকার বলেই বলেছিল, "মজবুত করার মানে খুব কড়া করার দরকার নাই, বেশী কড়াতে লাগবে, ভূষণ"।

ভূষণ বেদান্তী অন্নপূর্ণার কথা শেষ করতে দিল না, অট্টহাস্য করে উঠে বললে "হেহে বামুনদিদি গো, বেদান্তে বলছে, তুমি বিটিছানা ছেইলে মানুষ...তুমার দেখি মরা মাগের চূড়ি ছিনানয় বুক ফাটা গো. বাবু শিকলে মিছরি দুবার ঘর নাই... বেদান্ত কি বলে! বলে, নরম আর কড়া সোনা আর লোহা শিকল, শ্বশুরে বেটা শিকলই।" যে কোনসূত্রে কিছু সৎ কথা বলতে পারলেই ভূষণ বেদান্তী প্রীত হয়। অন্নপূর্ণা অবাক হয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল। ভূষণ তার কথার বাক্যে সায় সমর্থন না পেয়ে তার বৌকে বললে, "বুঝলি ক্ষেপি এসব বেদান্তের কলম।

বৌটি হাপর শিকলে টান দিতে দিতে বললে, "তা বটে শিকল দিবে কেনে গো ঘরকে..."

ভূষণ কথাটাকে শেষ করতে দিলে না, হা হা করে বলল, "ক্ষেপি ছ্যাঁকা দুবো তুয়াকে। আমি শুধাই তুই লবেল পড়িস নাকি গো, নাঃ। শিকলে বান্ধবেক না তুয়ার অঞ্চলে বান্ধবেক। উয়ার দশা লাগছে রে... উয়ার কথা ধরো না দিদি, বলে থাকলে সে শিয়ালের সঙ্গে ঘর বান্ধত...লে টান..."

ভাটির আলোতে অন্নপূর্ণার মুখে জোনাকি খেলে, তার হাত ঘামছিল...শিকল লাল্‌ভ হয়ে আসছে ক্রমশ। পিছনে কাকে যেন সে অপরাধীর মতই অনুভব করে। কানে বহু দূরাগত শব্দ। এই সময় কিছু-দূরের ঝোপে অল্প আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠেছিল, ফলে হাত থেকে তার টাকা দুটি খসে মাটিতে পড়ে গেল।

ভূষণ বেদান্তী আর কিছু তত্ত্ব কথা বলতে গিয়ে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকাল বললে, "কি গো..." বলে টাকা দুটি কুড়িয়ে তাকে দিতে গেল।

"কি-সের শব্দ বটে, টাকা থাক তোমার" এইটুকু কথা বলতে পেরে অন্নপূর্ণা যেন বেঁচে গিয়েছিল এবং সে নিজেই মন্তব্য করলে 'শিয়াল বোধ হয়।"

ভূষণ ওপাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দুই সাঁড়াশী দিয়ে শিকলকে যুক্ত করে তুলে ধরছে, অন্নপূর্ণা অস্ফুট স্বরে আঃ' বলেই সরে গিয়েছিল।

আর একজন ঠিক এই সময় নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকারগ্রস্ত। সে জ্যোতি। যার আওয়াজ কিছু পূর্বে অন্নপূর্ণা পেয়েছিল। জ্যোতি দেখল, লালাভ

শিকলটা তুলে কামার যত্ন করতে চাইছে। দূর থেকে এই লাল নরমুণ্ড মালার মত বস্তুটা তার কাছে ভয়ংকর বিষাক্ত। সে খুঃ খুঃ শব্দ করে উঠেছিল। জ্যোতি সাহসে নির্ভর করে এখানে আসেনি, ভয়ই তাকে এখানে এনেছিল। ভূষণ বেদান্তী বোধ হয় রহস্য করেই একটি ছড়া কাটলে, "লাগ হাত যশ বাপের ছেলে, দুগ্গা দুগ্গা নাম পেলে, তড়কা ভাংগা আগুন ভ্যাঙা ত্রিভুবন হইবে বাপ বলে স্যাঙা। দুগ্গা দুগ্গা লাও" বলে শীতল জলের মধ্যে শিকলটি ডুবিয়ে দিলে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত প্রলয়ের ধ্বনি উত্থিত হল। এই আওয়াজে ঝঞ্ঝার স্মৃতি ছিল।

অন্নপূর্ণার দেহখানি ভয়ে ত্রাসে মুচড়ে দুমড়ে নৈনেত্তর। অন্তরে যা কিছু সুবাস ছিল, সে সকল ম্লান, সে যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেল।

জলের দ্রুত বাষ্প উত্থিত হয়, পাঁশুটে ধোঁয়া মহা আক্রোশে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত, বিভ্রান্ত অন্নপূর্ণা। তবু এই সুযোগে, নিজেকে প্রকাশ করবার পথ পেয়েছিল। বাপের জন্য যে বেদনা তাকে ক্রমাগত ধিক্কার দিয়েছে, একটি ছোট করাঘাতে তার খানিক হয়ত উপশম হত। সে দু' হাতে খুঁটি ধরে থেকেও আরও ভাল করে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। মুখখানি তার কিছুটা খুঁটির অন্ধকারে ছিল।

ভূষণ কামার "হুই" বলে কোলের ছেলেটির সংগে রংগ করতে করতে গাইলে "মন ওই শিকলে মাকে বাঁন্ধস...শিশুর মনের শিকল দিয়ে...কোনটা শিকল লয় ক্ষেপি, ই খোলটা (দেহ) শিকল লয়? অবিদ্যে মায়ায়...তুমি ঠাকরুণ একটু খাড়াও" বলে জল থেকে শিকল টানতে লাগল। জলসিক্ত শিকলটা ক্রমাগত, নিষ্ঠুর শব্দকরতঃ জল থেকে বার হতে লাগল। অন্নপূর্ণা পুনঃ পুনঃ শিউরে উঠে বিকলাংগ হয়ে গেছে। ভূষণ বেদান্তী তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে শিকলের রঙ পরীক্ষা করতে করতে বললে, "ইঃ শা বানালাম ঠাকরুণ ই তোমার জাহাজ বান্ধবেক...মত্ত আঁতংগ (মাতংগ) বাধবেক।" সংগে সংগে শ্যামা সংগীতও শোনা গেল এবং বললে, "ব্যস ইবার শুধু কাঠে গেঁথেন দুবো ব্যস"।

জ্যোতি ঝোপের মধ্যে ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠছিল, এক হাতে লাঠি অন্য হাতে পাঞ্জা। মদন পাঞ্জাটি তাকে দিতে বাধ্য হয়েছে, একারণে যে মদনের কাছে জ্যোতি সাহায্য চাইতে গিয়েছিল, মদন নানান দুঃসাহসের কথা বলার পর বললে, "না ভাই যাব না বাবা বকবে"। নিশ্চয়ই সে ভূষণ বেদান্তীর নামে ভয় পেয়েছিল। কেন না ভূষণ বেদান্তী ভূতের ওঝা এবং বাণ মারণ উচ্চাটনে সিদ্ধ, তার গলায় বিড়ালের তাঁতে বাদরের অস্থি বাঁধা। মদন বললে, "একমাত্র বগলাদাই ওকে জব্দ করতে পারবে।" ফলে জ্যোতিকে বগলাদার কাছেই যেতে হল। বগলাদা জ্যোতিকে দেখে হন্যে হয়ে উঠল। এই দুঃখের সময় এমন জঘন্য ব্যবহার বগলাদা করবে, তা সে ভেবে পারেনি, বগলাদা একবার করে দূরে যায় এবং নিজের বাইসেপ ট্রাইসেপ দেখায়; এবং ক্ষণে ক্ষণে হুংকার দিয়ে উঠে "ন্যায়াত্মা বলহীনেন লভ্য, তোর ভাবনা কি আমি আছি" বলে কাছে এসে আদর করে।...ছেলেমানুষ জ্যোতি বলে উঠেছিল "কি হচ্ছে বগলাদা, আমি আমি"। জ্যোতির আপত্তি-সূচক কথায় বগলাদা বললে, "ও শালা, তবে যাও শালা আমি যাব না"—।

জ্যোতি একা। নিসিন্দের ঝোপের মধ্যে থেকে স্পষ্টই সবকিছু দেখা যায়। কখন যে ঠিক ভূষণকে সে আক্রমণ করবে, তা সে ভেবেই পাচ্ছিল না, পা তার মাটির সংগে জুড়ে আছে, হাতের ঘাম প্যাণ্টে অনবরত মুছেছে, কিন্তু কোন প্রকারেই ছুটে যেতে আর পারছে না। এখন সে দেখতে পেলে, ভূষণ তলাকার ঠোঁট দিয়ে গোঁপগুলিকে অদ্ভুতভাবে টানছে, ফ্লপ ফ্লপ শব্দ করে, আর ভালভাবে শিকলটিকে পরীক্ষা করছে। এবার শিকল রেখে, গোঁফ পাট করে একটা গুঁড়ি সরিয়ে আনতে ব্যস্ত হল।

অন্নপূর্ণা অস্বস্তিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। তার দেহে যেন অতি প্রাচীন একটি মাকড়সা ঘুরে ফিরে। অধীরতায় সে মাটিতে পা ঘষছিল। তার মুখের কাছে ভৌতিক একটি আয়না বার বার খাড়া হয়ে উঠছে। লোহার ঠাণ্ডা হওয়ার মেঘমন্দ্র আওয়াজ এখনও তার দেহে কম্পিত। এমত সময় শিয়ালের চীৎকার শোনা গেল। অন্নপূর্ণার কাছে স্থানটি মুহূর্তেই বীভৎস হয়ে উঠল, চকিতে সে পিছনদিকে চাইল, মৃত্যুতিক্ত অন্ধকার এখানে সেখানে! দেখলে, কে একজন হাহা শব্দ করে ছুটে আসছে। অন্নপূর্ণা পলকের জন্য স্থির হয়ে এক পা সরে গেল।

বেচারী জ্যোতি বোকার মত লাঠিটা উঁচু করেই ছুটে আসছিল। একথা তার মনে উঠেনি যে, কামারশালের চাল অতীব নীচু, ফলে তার লাঠি আটকে যাবে। সুতরাং তার লাঠি চালে আটকে গেল।

ভূষণ বেদান্তী দ্রুত দৌড়ের শব্দ শুনেই, ক্ষণেকের জন্য চেয়ে দেখে, বাঁ হাতের সাঁড়াশী শক্ত করে ধরে এবং নিমেষেই ডান হাতে কিছু ধুলো তুলে থুৎকুড়ি কেটেই ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললে, "হোংরীং...হোং-রীং"। শব্দে মুখ বিড় বিড় করছে, চোখ তার ক্রমাগত স্ফীত হচ্ছে, এসময় ভূষণ তার গলালগ্নী মালার হাড় চুম্বন করত বললে "আই গো"।

ভূষণের বৌ তটস্থ, সে কোনমতে বসা-অবস্থায় পা উঠিয়ে কোলের ছেলেটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সে অবাক হয়ে দেখল, জ্যোতি টাল খেলে, লাট খেলে, লাঠি পড়ে গেল। দু এক পাক ঘুরে মাটিতে পড়ে, আঃ আঃ শব্দ করে মাটিতে চক্র দিতে লাগল। মুখে গাঁজলা, অন্নপূর্ণা বিস্ময়ে হতবাক। এমত সময়, ভূষণ হাপর শিকলে দু একটা টান মেরে বললে, "লে লে ক্ষেপিমাগী হাপর টান।" বলে সে ছুটে বাইরে এল। ক্ষেপি সত্বর ছেলেটিকে পাশে শুইয়ে, ঝপঝপ হাপর টানতে লাগল। অন্য হাতে ল্যাম্প ধরা। হাপরের আগুনের শিখায় দেখা যায়, বার বার অস্পষ্ট হয় যে, জ্যোতি ভৌতিকভাবে মাটিতে চাকার মত ঘুরছে। হাতের পাঞ্জায় খর খর শব্দ হয়। ক্ষেপি বললে, "বুধ হয় বাপকে পারণভাবে গো ছেইস্যা"।

"থাম থাম ক্ষেপি, সবংশে নিধন হব, বামুন মারলুম গো" বলে দৌড় দিয়ে খানিক জল নিয়ে এসে জ্যোতিকে প্রদক্ষিণ করে ছিটোতে লাগল। অন্নপূর্ণা সম্বিত ফিরে পেয়ে ভাইকে ধরতে এসেছিল, কিন্তু ভূষণ বললে, "এখন ছুঁও না।"

জ্যোতির মুখে এখন গোঙানির আওয়াজ মুখময় ধুলো। মুখ পা ছেড়ে গেলে, চোখ খুলতে পারছে না, কেন না চোখে অজস্র ধুলো। ক্রমাগত জলের ঝাপটায়, অনেকটা যখন সুস্থ, তখন সে দৈহিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। অথচ সেইকালে মুখে তার বীরত্ব ছিল "শালা শালা আমি দেখে লুব।" অন্নপূর্ণা কাপড়ের খুঁপি করে মুখের ভাপ দিয়ে চোখে সেঁক দিতে ব্যস্ত। ভূষণ জ্যোতির কথা বললে, "ঠাকুর তুমি জুনাতো মেরো গো, আমি তোমার ...খাঁই গো...। ঠাকুরুণ আমি পৌঁছাই দিব গো..." বলে সে তাড়াতাড়ি শেষ কাজটুকু সেরে ফেলতে লাগল, মুখে সর্বক্ষণ "হায় হায়"।

"দিদি দিদি আমি তোদের আর দেখতে পাব না...বাবাকে...

"আহা বাবা অন্ত পেরাণ গো" ক্ষেপি এ সময় অগোছাল কাপড় টেনে বলেছিল।

"দিদি বাবার জন্যে শিকল..."

"না...না...তুই চুপ কর জ্যোতি..."

রাস্তায় অনেকবার জ্যোতি থেমেছে, কিসের শব্দে সে থেমেছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে। অদৃশ্য বস্তুর উদ্দেশ্যে আঙুল নির্দেশ করে বলেছে..."দিদি...কিসের শব্দ গো?"

"ও কিছু নয়।" বলে পরম স্নেহে জ্যোতিকে সামলে নিয়ে অন্নপূর্ণা চলেছে। ভূষণ পাশেই ছিল, সে মাথায় কিশল কাট নিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। সে ইশারায় অন্নপূর্ণাকে কিছু বলেছিল ফলে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, অন্নপূর্ণা জ্যোতিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, এক হাতে ভাইএর হাত অন্য হাতে তারই কাঁধ, জ্যোতি বললে, "দিদি আমার বুক ছুঁয়ে বল যে শিকল আনছিস না?"

অন্নপূর্ণা পরম যত্নে, কাপড়ে খুঁপিতে মুখের ভাপ দিয়ে বললে "বুক ছুঁতে নেই ...খুব কষ্ট হচ্ছে নারে...।"

"আমার কিন্তু বড় ভয় করছে দিদি"

বাড়িতে পৌঁছে, যখন জ্যোতির চোখে অন্নপূর্ণা গোলাপ জল দিচ্ছিল এমত সময় জ্যোতি কিসের আওয়াজ পেয়ে উঠে বসল "কে এল দিদি...?" অন্নপূর্ণা সত্বর তাকে শোয়াবার চেষ্টা করে বললে, "কোথায় আবার!" এই সময় ফিস ফিস করে পুনর্বার কথার আওয়াজ, এবং আলো এবং অন্ধকার জ্যোতিকে কেমন উতলা করে তুলেছিল। বেচারীর দেখবার কোন উপায় নেই। এবার লোহার শব্দ হল, জ্যোতি শিউরে উঠে অন্নপূর্ণাকে জড়িয়ে ধরতেই মধুর কণ্ঠে অন্নপূর্ণা প্রশ্নের আগেই বললে "কুয়ার কড়ায় বোধহয় বালতি লাগল নবীন জেঠাদের বাড়ি।" বাড়ি যেন ভৌতিক হয়ে উঠেছে, এমন কি এ ঘরে অন্নপূর্ণাও ঘামছিল। তবুও হয়ত ইচ্ছে হচ্ছিল ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠতে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, কে যেন ডিঙিগ মেরে চলে গেল। দরজার শব্দ, খিল দেওয়া সকল কিছুই বীভৎস হয়ে উঠেছিল। জ্যোতি বললে, 'দিদি বাবা কোথায় গো...?' বলে তক্তাপোশের উপরে বাপের পা খুঁজতে লাগল। 'আমার বিছানা সরিয়ে দে... দিদি...!' সুতরাং বিছানা সরল হয়, এবং জ্যোতি শিবনাথের পা দুটি একত্র করে ধরে শুয়ে রইল। অন্নপূর্ণা এ ব্যাপার লক্ষ্য করল।

ভোর হয়, গাছের পাতা অযথা কাঁপে, পাখির উড়ায় শূন্যতা উদ্‌ব্যস্ত। কখন যে তার হস্তদ্বয় শিবনাথের পা ছেড়ে দিয়েছে তা সে জানবে কেমন করে, তার বিছানাও সরে গিয়েছিল। সে উপুড় হয়ে ঘুমায়। কি এক দুঃস্বপ্ন সূচক শব্দে তার ঘুম ব্যাহত হয়, সে তেলচিটে বালিশ থেকে মুখ তুলে চাইতে চেষ্টা করলে, যেমতভাবে কুকুর ছানারা চাইতে চেষ্টা করে। এখন সেই চাপা গলার স্বর "লাগা তাড়াতাড়ি আর যেন মেপা...হ্যাঁ হ্যাঁ...ঠিক ঠিক দে।" কট করে শব্দ হল। "লে লে ঝট পট্... হ্যাঁ হ্যাঁ পায়ে দেখিস।" জ্যোতি জোর করে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে, দেখলে দিদি তখন বাপের পায়ে শিকলের বাঁধন দিয়ে তালা লাগাতে ব্যস্ত, নিশ্চয় তার হাতে ঘাম হচ্ছিল তাই সে মুছে বারবার। তার মুখটা কর্মপটুত্বে বিকৃত, জিব বার হয়ে আছে।

পিছন থেকে ভূষণ বাপকে পাঁজড়া বাধন দিয়ে অনবরত মুখ দিয়ে বীভৎস শব্দ করতঃ গোঁফ মুখ দিয়ে টানছে। অন্যপাশে মা...আর এক পাশে বিন্দু পিসিমা বাবাকে জব্দ করে রেখেছে।

জ্যোতি চোখ বড় করবার চেষ্টা করলে, এ দৃশ্য সে বুঝে নিতে পারেনি, শেষে বিন্দু পিসিমা এদের সঙ্গে ; সে যেন কাঁদতে গিয়ে বিকট চেঁচিয়ে উঠল, কেমন করে উঠে দাঁড়াতে হয় সে ভুলেছিল। অন্নপূর্ণা এখন তালা লাগাল, শব্দ হল, সকলেই "হাঃ" করে নিশ্বাস ফেললে, শিবনাথের দেহ ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, তখনই জ্যোতি "বাবা" বলে লাফ দিয়ে উঠল। অন্নপূর্ণাকে ধ্যা করে একটি ঘুঁষি মারতেই , ওর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এবং জ্যোতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, "বাবা"

শিবনাথ বললে, "জ্যোতি মারিসনি" বলে লোহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করতঃ বলেছিল..."খুব ঠাণ্ডারে খুব ঠাণ্ডা।"



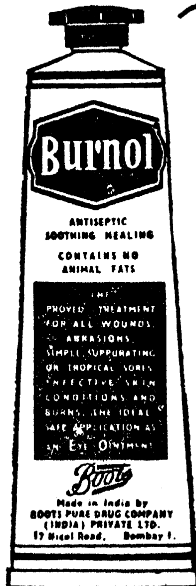




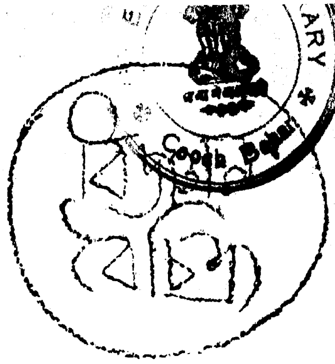








পুকুরে যাঁরা মাছের চাষ করেন তাঁদের অনেক রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ এবং ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় মাছ তাড়ান। সাধারণ অবস্থায় জাল টেনে অবশ্য কিছু পরিমাণ মাছ তোলা গেলেও এই ধরনের সমস্ত মাছ তাড়ান সম্ভব নয়। অথচ পুকুরের জল নিকাশ করাও ব্যয়সাধ্য। দেখে গেছে যে, যদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহ'লে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। 'ডেরিস' (Derris) গাছের শিকড়েতে 'রোটিনন' (rotenone) বলে একপ্রকার রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায়। এই রোটিনন যদি জলের সঙ্গে মেশান যায় তাহলে পুকুরের মাছ মরে যায়। মাছেরা জল থেকে ফুলকার (gills) সাহায্যে তরল অক্সিজেন তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নেয়। এই ফুলকা খুব নরম, সেইজন্য রোটিনন এই নরম ফুলকাটার খুব সহজেই ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে মাছেরা আর সহজ অবস্থায় জল থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে না। কিছুক্ষণ রোটিননওয়ালা জলে থাকার পর মাছেরা অক্সিজেনের অভাবে জলের ওপরে এসে খাবি খেতে আরম্ভ করে। আর বেশী সময় জলে থাকলে সমস্ত মাছ মরে যায়। রোটিননের পরিমাণের ওপর মাছেদের মরার সময় নির্ভর করে। কম পরিমাণ হলে জলের ওপর অনেকক্ষণ ধরে খাবি খেতে থাকবে। আর পরিমাণ বেশী হলে মাছগুলি তাড়াতাড়ি মারা পড়ে। এটা ঠিক যে, পুকুরে একবার রোটিনন মেশালে সেই পুকুরের সমস্ত মাছের ওপর এটা কাজ করবে। তবে সমস্ত মাছ যখন জলের ওপর ভেসে উঠবে তখন জাল টেনে মাছগুলো তুলে এনে রাক্ষুসে মাছ এবং প্রয়োজনীয় মাছ, যেমন পোনা ইত্যাদি, আলাদা করা দরকার। আলাদা করার পর প্রয়োজনীয় মাছগুলো যদি কাছে কোন পুকুরে অথবা কোন বড় জলের পাত্রে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুক্ষণ বাদে আবার সেগুলো সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। বিভিন্ন জাতের মাছের জন্য রোটিননের মাপও আলাদা আলাদা হয়। আমাদের পুকুরে সাধারণত আমরা শাল, শোল, ল্যাঠা, সিং, কৈ ও কুচে জাতীয় রাক্ষুসে মাছ খুব বেশী পাই। এদের মারবার জন্য ৩ থেকে ৫ ভাগ রোটিনন এক লক্ষ ভাগ জলের সঙ্গে মেশাতে হয়। মাছের রকম, জলের গভীরতা এবং পুকুরের মাপের ওপর কতটা রোটিনন ব্যবহার করতে হবে তার হিসাব করা দরকার। যে সমস্ত মাছ রোটিননের সাহায্যে মারা হয়েছে, সেই মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার কোন বাধা নেই। কারণ রোটিনন শুধুমাত্র ফুলকার ওপর কাজ করে, মাছের শরীরের মাংসের কোন অপকার করে না।



**চক্রদত্ত**

বড় বড় রাসায়নিক কোম্পানী এই ডেরিসের গুঁড়ো বিক্রয় করে।

*

রেল লাইনের ধারে যাদের বাড়ি তাদের ছোট ছেলেপিলেদের জন্য সব সময় সজাগ থাকতে হয়। সুযোগ পেলেই ছোটরা রেল



রেল লাইনের ধারে অর্ধেক গম্বুজ আকৃতির প্রাচীর

লাইনের ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ওয়াশিংটন শহরের রেল লাইনের ধারে, সামনের দিকে ঝোঁকান অর্ধেক গম্বুজের মত প্রাচীর দেওয়া হয়েছে। এতে করে ছেলেরা শুধু যে রেল লাইনের ধারে যেতে পারবে না তা নয়—এই প্রাচীর টপকে কিছু রেলের দিকে ছুঁড়তেও পারবে না।

*

একজন সুইস্ বৈজ্ঞানিক ইটালীর এক কয়লার খনি থেকে একটি পুরাকালের ফসিল কঙ্কাল পেয়েছেন। তাঁর মতে এই কঙ্কালটি খুব কম করলেও ১০ কোটি বৎসর আগেকার কোন আদিম মানুষের। বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোকের মত হচ্ছে, ৬০ থেকে ৭০ কোটি বৎসর আগেকার বানরই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। তিনি এই কয়লার খনি থেকে প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রস্তরীভূত কঙ্কালের টুকরো সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁর আগেকার সব সংগ্রহের ওপর নির্ভর করেই এই নতুন তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। এখন এই সম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়ার পর তিনি তাঁর মতবাদকে আরো দৃঢ় করে প্রকাশ করতে পারবেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, পুরাকালে এই অঞ্চল খুব ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল আর এর মধ্যে এই মানুষের মত দেখতে বাঁদর জাতীয় জন্তু বাস করত। কঙ্কালটি লম্বায় মাত্র ৪ ফিট। একদিন রাত্রে দুজন কুলী কয়লা কাটতে কাটতে এটা দেখতে পায়। এই স্থানটি প্রায় ৬০০ ফিট গভীর। সমস্ত কঙ্কালটি কয়লার স্তরের ভেতর বুক সাঁতার দেবার ভঙ্গীতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকটি বলেন যে, এই জাতের মানুষেদের 'ওরিওপিথিকাস' বলা হত এবং এদের 'মিওসিন' যুগে পাওয়া যেত।

*

ভারতবর্ষের চারটি "ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজি'র দ্বিতীয়টি সম্প্রতি বম্বেতে খোলা হয়েছে। এর জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। এছাড়া, Unesco সাজ-সরঞ্জাম এবং ভারতের বাইরে শিক্ষার জন্য ১২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে সম্মত হয়েছে। ২০ জন ভারতীয় শিক্ষককে রাশিয়াতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, ১৩ জন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ আমেরিকা এবং রাশিয়া থেকে এই ইন্‌স্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন। বম্বেতে পোঁচাই লেকের কাছে এই ইন্‌স্টিটিউটের জন্য ৫০০ একর জমি ঠিক করা হয়েছে। এখানে ১৫০০ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং ৫০০ গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে। শিক্ষনীয় বিষয়—ইঞ্জিনীয়ারিং, সয়েল এণ্ড ওয়াটার কন্‌সারভেশন, রেফ্রিজারেশন, মেসিন টুল, পাওয়ার প্ল্যাণ্ট, সেলুউলজ এণ্ড পেপার টেকনলজি।

**কে**ন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় রাজ্যসমূহে খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।—"ঠিক্ কাজই করেছেন। এ দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরও নয়, দায়িত্ব শুধু অন্নাভাবে যার পিত্ত পড়ছে তারই" মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

**শ্রী**নেহরু স্বীকার করিয়াছেন যে, খাদ্য দপ্তরের অযোগ্যতাই খাদ্যসংকটের হেতু। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নেহরুজী মুখ্যমন্ত্রীদের স্বহস্তে খাদ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।—"দপ্তর স্বহস্তে না নিয়ে বরং হালের খুঁটি নিজের হাতে নিলে খানিকটা কাজ হতো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

**শ্র**মমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ট্রামকর্মীদের দাবী স্বীকার করা উচিত। তিনি এই কথাও বলিয়াছেন যে, ট্রাম কোম্পানীর আর্থিক সঙ্গতি কতটা আছে তাহাও বিবেচনা করা কর্তব্য।—"চমৎকার। মাছ ধরা হলো। জলেও নামতে হলো না। তবে বিবৃতিটা আরো জুতসই হতো যদি তিনি একথাটাও বলে রাখতেন যে, যাত্রীরা আর কতদিন







এইভাবে চলতে পারবে এটা ভেবে দেখাও পরম কর্তব্য"—বলিলেন জনৈক যাত্রী।

• • •

**পৌ**র প্রতিষ্ঠানের এক সভায় ট্রাম কোম্পানীর মুখপাত্র নাকি বলিয়াছেন যে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাঁদের হাতে রাস্তা মেরামতের ভার তাঁরা লইতে পারিতেছেন না।—"আহা বেচারী, ঠনঠনে কালীতলা, মদনমোহনতলা আর কালীঘাটের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যা হোক দু' একটা পয়সা তবু আসছিল, সে-ও আজ ক'টা দিন বন্ধ, পয়সা কোত্থেকেই বা আসবে"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**এ**কটি সংবাদে শুনিলাম, শতকরা ৯৫ জন কলিকাতার পানওয়ালা নাকি অবাঙ্গালী।—"উপায় কী; আমরা চিরকাল—একখান কথা কও বা না কও পান খেয়ে যাও ব'লেই বঁধুকে ডেকেছি, পান সেজে বিক্রী করতে শিখিনি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

**এ**কটি সংবাদ-শিরোনামা—"ফিজো ঢাকায় নেই"। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আছেন; হয়ত ঢাকা প'ড়ে"।

• • •

**মা**লিক ফিরোজ খাঁ নুন নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি দিল্লী যাইতেছেন শান্তি স্থাপনের চেষ্টায়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু অনেকে যে বলছেন তিনি দিল্লী যাচ্ছেন লাড্ডু কেনার চেষ্টায়;—একথা কি তবে মিথ্যে"!!

• • •

**শ্রী**অনন্তশয়নম্ বলিয়াছেন যে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে লোকসভায় কেবল প্রশ্ন না তুলিয়া সদস্যগণের উচিত তা কার্যে পরিণত করা। সংবাদদাতা জানাইতেছেন—এই কথায় সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।—"কিন্তু সদস্যদের রসজ্ঞান থাকলে বলতে পারতেন,—আমরা যা বলি তা-ই করো, যা করি তা করো না"—বলেন কোন এক সহযাত্রী।

• • •

**ব**র্তমানে ম্যালেরিয়া যদিও হ্রাস হইয়াছে তবুও এক সংবাদে শুনিলাম, মশক-কুলের প্রতিরোধ শক্তি নাকি আট গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।—"কিন্তু কামানের সংখ্যাও তো যথেষ্ট বেড়েছে। সুতরাং খুব আতঙ্কিত হবার কোন কারণ আছে ব'লে তো মনে হয় না"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**প্র**জাতন্ত্রী চীনের মানচিত্রে শুনিলাম ভূটান প্রভৃতি ভারতের কিছু কিছু অংশ নাকি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এটা অনেকটা নিজের পাতে ঝোল টানার মতো,—ভূ—টান"!!

• • • •

**বৃ**টেনে বর্ণবৈষম্য নিয়া সংঘাতের সংবাদে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন।—"কিন্তু আমরা হইনি। বর্ণচোরা আমের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় আমাদের আছে। তাছাড়া, "ভারতীয় আর সারমেয়-র প্রবেশ নিষেধের" বিজ্ঞপ্তিও খুব বেশিদিনের কথা নয়"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

**জ**নৈক পত্রপ্রেরক মা দুর্গার অষ্টাদশভুজা, ষোড়শভুজা ও দশভুজা রূপের তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।—"কিন্তু মা যে করে থেকে এবং কী কারণে দ্বিভুজা হয়ে তারকাকৃতি ধারণ করেছেন সে কথাটা তিনি বলেননি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

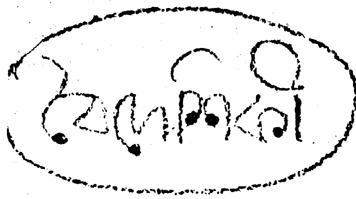
**বৃ**টিশ বিজ্ঞানীরা নাকি একটি "যান্ত্রিক অনুবাদক" আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই যন্ত্রে যে-কোন ভাষার অনুবাদ চলিবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্ব বহু আগেই স্বীকৃতি লাভ করেছে—যথা, "বাল-ডাকিনী", "বাস, থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন"—এসব যান্ত্রিক অনুবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ"!!

• • •

**অ**ন্য একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রসঙ্গে শুনিলাম যে আপাত দৃষ্টিতে মৃত প্রতীয়মান হইলেও অনেক ক্ষেত্রে জীবনের সম্ভাবনা বর্তমান থাকে—ইহা লইয়া বিস্ময়কর গবেষণা চলিতেছে—"কিন্তু বিস্ময়ের এতে কী যে আছে তা তো জানিনে; মৃত মনে হলেও জীবনের স্পন্দন নিয়ে কত হাজার মানুষকে তো নিত্য, তিরিশ দিন ঘোরাফেরা করতে দেখছি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**এ**কটি সংবাদে জানা গেল, রাশিয়া নাকি একটি কৃত্রিম সাগর সৃষ্টি করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"আমেরিকা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে কাটতে—"মারের সাগর দেবো পাড়ি"—গান ধরেছে কিনা সে সংবাদ অবশ্য এখনো পাইনি"!!




এই প্রবন্ধ ছাপা হয়ে বেরুবার আগেই পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফিরোজ খান নুন দিল্লীতে এসে পণ্ডিত নেহরুর সংগে কথাবার্তা কয়ে করাচীতে ফিরে যাবেন। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী সীমান্ত নিয়ে বিবাদগুলি মাত্র দুই প্রধান-মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হবে। সীমান্ত নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ, সশস্ত্র হানা, লুঠতরাজ, গোলাগুলী বর্ষণ, অল্পাধিক প্রাণনাশ চলেই আসছে। এক একটা ব্যাপার এক এক সময়ে এমন আকার ধারণ করে যে, ভয় হয় বুঝি বড়োগোছের যুদ্ধই না লেগে যায়। এই অবস্থা উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই বিপজ্জনক, বিশেষ করে এই কারণে যে পাকিস্থানে এরকম দল উপদল আছে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন যাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। সুতরাং এই রকম অশান্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা কখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে এবং তাতে পাকিস্থানী পুলিশ ও সৈন্য জড়িয়ে পড়ে কী ঘটিয়ে ফেলবে, তা বলা যায় না। এই কারণে সীমান্ত নিয়ে বাদ-বিসম্বাদগুলির মীমাংসা হওয়া অত্যাবশ্যক। এই নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং দুই পক্ষের কর্ম-চারীদের মধ্যে নানা পর্যায়ে অনেক কনফারেন্স হয়ে গেছে কিন্তু জের কিছুতেই মেটে না। কারণ মূল পট-ভূমিকার পরিবর্তন নেই। মনোমালিন্যের আবহাওয়ার যদি কিছু পরিবর্তন না হয়, তবে বিবাদের আগাছা অনবরতই গজাতে থাকবে। সেগুলিতে আবার আবহাওয়া আরো দূষিত করবে।

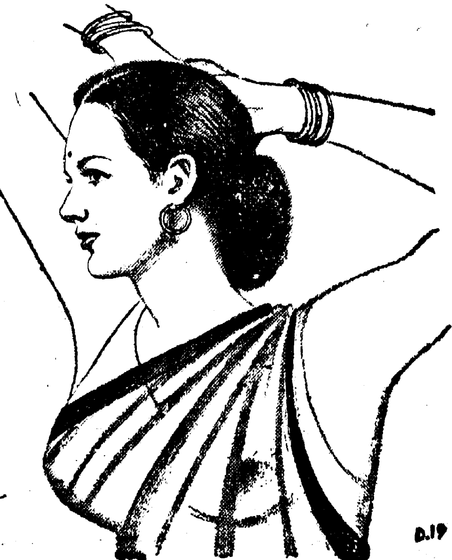
সীমান্তের বিবাদ বলতে এখানে অবশ্য আসাম-পূর্ব পাকিস্থান সীমান্তে সংঘর্ষের মতো ঘটনাদির কথাই ধরা হচ্ছে। কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মতদ্বৈধ ও বিবাদের অন্য যে-বড়ো বিষয়গুলি আছে, সেগুলিকেও মূলত সীমান্ত সম্পর্কিত বলা যায়। কাশ্মীরের বাসরা, এমন কি খালের জল নিয়ে যে বিবাদ, তারও তো গোড়ায় গেলে দেশ বিভাগজনিত সীমানার প্রশ্নেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেই জন্য সমস্যাগুলিকে এক একটা আলাদা আলাদা করে মেটাবার চেষ্টা না করেও যেমন উপায় নেই, তেমনি সে চেষ্টা মানসিক পটভূমিকার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষে তেমন কার্যকরী হয় না বলে অন্য সমস্যাগুলিতো যেমন-কে-তেমন থেকেই যায়, যে-সমস্যায় হাত লাগানো হয়, সেটারও আসলে সমাধান হয় না— বড়ো জোর ধামাচাপা দেওয়ার মতো হয়। অথচ মীমাংসার কথা বলার সুযোগ, তা সে যতটুকু ক্ষেত্র নিয়েই হোক, কখনো ছাড়া উচিত হতে পারে না। বলা বাহুল্য, প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে যখন সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা ঘটে, তখন তার প্রভাব উভয় রাষ্ট্রের মানসিক আবহাওয়ার পটভূমিকার উপর নিশ্চয়ই কিছুটা পড়বে। কিন্তু এখানে মুশকিল হচ্ছে এই যে, ভারতের বিরুদ্ধে একটা মারমুখী মনোভাব জীইয়ে রাখার চেষ্টা পাকিস্থানের একাধিক দলের প্রায় একমাত্র কর্ম হয়ে উঠেছে। ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনই তার উদ্দেশ্য, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধের কথা চিন্তা

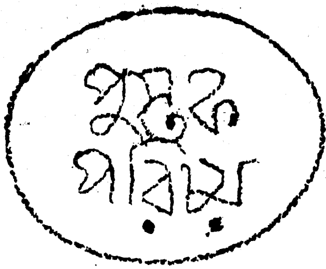
করা যায় না। মিঃ নুনের এই ধরনের দুটি একটি উক্তিতেই পাকিস্থানের কয়েক জন বিশিষ্ট নেতা যেরকম উগ্রভাব ধারণ করেছেন, তাতেই বুঝা যায় যে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটানো কীরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতীতে মিঃ নুনের নিজের অনেক উক্তিও হয়ত কারো কারো মনে পড়বে, ভবিষ্যতেও তাঁর নিজের রাজনৈতিক অবস্থান্তর হলে মিঃ নুনের সুর বদলাবে কিনা এ প্রশ্নও হয়ত কারো কারো মনে উদয় হবে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্থানের একাধিক দল ও উপদলের নেতারা চান না যে, পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ নুনের সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনা সফল হয়। বুঝা যাচ্ছে যে, যে-কোনো মীমাংসার কথাই হোক তাই ভারতের কাছে পাকিস্থানের 'আত্মসমর্পণ' বলে রব তোলা হবে। শুধু তাই নয়, কোনোরকম শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টাকেই ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের ভঙ্গিমাত্রকেই পাকিস্থানের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে ঘোষিত হবে। প্রত্যেক দেশেই কিছু উগ্রচণ্ডী লোক থাকে যাদের দায়িত্ব জ্ঞানের বালাই নেই, কিন্তু রাষ্ট্রের নীতির উপর তাদের কথার বিশেষ কোনো প্রভাব থাকে না কিম্বা লোক মতেরও কোনো বৃহৎ অংশ তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। ইংরেজিতে তাদের 'lunatic fringe' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পাকিস্থানে যাঁরা উপরোক্ত ধরনের কথাবার্তা বলছেন, তাঁরা তো সেরকম নন, তাঁরা রাজনৈতিক দলপতি বলে স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে একাধিক প্রাক্তন পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী আছেন এবং ভবিষ্যতে প্রধান-মন্ত্রী হবেন বলে আশা রাখেন এমন ব্যক্তিরা আছেন। একমাত্র ভরসার কথা এই যে, এ'রা যা বলছেন হয়ত নিজেরাও তা বিশ্বাস করেন না। ভারত-পাকিস্থান সম্বন্ধের বিষয়ে মিঃ নুন, মিঃ সুরাবর্দী, মিঃ মহম্মদ আলি অথবা মিঃ দৌলাতানার মধ্যে দৃষ্টি-ভংগীর কোনো মৌলিক প্রভেদ আছে বলে বিশ্বাস হয় না। যাঁর যখন যেমন রাজনৈতিক অবস্থা, সেই অনুসারে তিনি তখন তেমন কথা বলেন।

মিঃ নুনের কোনোরকম সাফল্য, তাতে যদি পাকিস্থানের মংগলও হয়, তাও মিঃ সুরাবর্দী প্রভৃতির সহ্য হবে না, কারণ সকলেরই দৃষ্টি এখন আগামী সাধারণ নির্বাচনের উপর। মিঃ নুনের কোনো কার্যের সাফল্য রিপাবলিকান পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করবে এই আশংকার দরুণ আওয়ামী লীগ এবং মুসলিম লীগ মিঃ নুনের দিল্লী আগমন এবং শ্রীনেহরুর সংগে তাঁর আলোচনা যাতে বিফল হয়, সেই চেষ্টাই করছে। যে-কোনো মীমাংসার কথা হোক, তা পাকিস্থানের জনমতের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হবে। এই অবস্থায় নেহরু-নুন আলোচনা থেকে কোনো কায়েমী মীমাংসা আশা করা বোধ হয় যায় না। যতদিন পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা ঝুলে আছে, ততদিন পাকিস্থানী সরকারের কাছ থেকে কোনো সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য নীতি গ্রহণ ও পালনের প্রত্যাশা কম। সকল দলই সাধারণ নির্বাচনে কিসে সুবিধা হতে পারে, সেই চিন্তা করছে এবং যে যত পারে ভোটের আশায় পুরাতন মোহ এবং কুসংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করে যাচ্ছে। শুভ বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টির কদর, যা কোনো সময়েই খুব বেশি নয়, বর্তমান অবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের জন্য উদ্যোগী পাকি-স্থানের রাজনৈতিক বাজারে তা আরো কম হওয়াই স্বাভাবিক। এই দিক দিয়ে নেহরু-নুন আলোচনার পক্ষে বর্তমান সময়কে খুব সুসময় বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলির স্থায়ী মীমাংসার চেষ্টা সার্থক হবার আশা কম। তবে পাকিস্থানের দলপতিরা যদি সত্যই সাধারণ নির্বাচনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, তাহলে তার আগে পর্যন্ত গোলমাল আরো পাকুক বা অশান্তি বাড়ুক, এটা তাঁরা হয়ত চান না, কারণ তাহলে নির্বাচনই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সুরাবর্দী, মহম্মদ আলি বা দৌলাতানা সাহেব যাই বলুন, আপাতত ভারতের সংগে গোলমাল বাড়ানো তাঁদেরও হয়ত মনোগত অভিপ্রেত নয়, কিন্তু নিজে-দের দলগত রাজনৈতিক স্বার্থে এটাও তারা চান না যে, রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্বে চালিত গবর্নমেন্টের মারফৎ ভারত-পাকিস্থান সম্বন্ধের এমন কিছু উন্নতি হয়, যেটা পাকিস্থানের জনসাধারণ অনুভব করতে পারে। অতএব আপাতত কোনো সমস্যাই মিটবে না, তবে কিছু ধামাচাপা কিছু রাশটানা হবে বলে আশা করা যায়।

৯।৯।৫৮








## কবিতা

**'অমিল থেকে মিলে'**—মণীন্দ্র রায়, প্রকাশক—এম সি সরকার এণ্ড সন্স (প্রা) লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১·৫০ নঃ পঃ।

কবিতার বই-এর নাম নেহাৎ তুচ্ছ জিনিস নয়। কারণ কবিতা লেখায় যাঁর সততা আছে, বই-এর নামকরণে শঠতা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়। সত্যি কথা স্বীকার করলে কবিমাত্রকেই নাম খোঁজবার দুর্ভাবনায় কবিতার বই বার করবার আগে কয়েকটি উদ্বিগ্ন দিন বোধহয় কাটাতে হয়। কোনো একটি বিশেষ কবিতার শিরোনামা মলাটে পর্যন্ত চালিয়ে দিয়ে এ-দায় অনেক সময়ে উদ্ধার করা যায় বটে, কিন্তু কখনো কখনো সেটা উদ্ধার না এড়ানো এ-সন্দেহও মন থেকে যেতে চায় না। কারণ কবিতার বই-এর নাম শুধু ত একটা নিরর্থক বাহুল্য বিলাস নয়, এই নামের মধ্যে নিজের জ্ঞাতসারে বা অগোচরে কবির অনেকখানি পরিচয় নিহিত থাকতে বাধ্য। সে-নাম কবির নিজস্ব কাব্য-সত্তার ইসারায় দ্যুতিমানও হতে পারে আবার কৃত্রিম চাতুরীতে কলঙ্কিতও।

ইদানীং নামকরা কবিদের যে-কটি কবিতার বই বেরিয়েছে তাদের নামকরণের ভেতর দিয়ে কবিদের যথার্থ প্রকৃতি ও পরিণতির একটা আভাস পাওয়া যায় কি না কৌতূহলী পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বিশেষ কোন উদাহরণ না দিয়ে এইটুকু বোধ হয় বলা যায় যে তথাকথিত কোন কোন উন্নাসিক কবি নিজের বই-এর নামের মধ্যেই নিরুপায়ভাবে ধরা পড়ে গেছেন। বিলিতি বদহজম দেশী উদ্গারে ঢাকবার চেষ্টা হাস্যকর হয়েছে মাত্র।

শ্রীমণীন্দ্র রায়ের নতুন প্রকাশিত কবিতার বই 'অমিল থেকে মিলের' আলোচনা করতে বসে নাম সম্বন্ধে এত কথা বলার অর্থ স্পষ্টই এই যে, বর্তমান বইটির নামের মধ্যে শুধু এই গ্রন্থের কবিতাগুলির নয়, মণীন্দ্র রায়ের কবি-সত্তার বিবর্তনেরও অনেকখানি ইঙ্গিত বর্তমান।

স্থূল অর্থে না ধরলে, এক হিসেবে সব সার্থক কবিরই ক্রমপরিণতি অমিল থেকে মিলে। সে মিল কবিতার অন্তস্থ বস্তু যে নয় তা বলাই বাহুল্য। সে মিল একদিকে যেমন অকৃত্রিম শিল্প চাতুর্যের সঙ্গে অনুভূতির তীক্ষ্ণ দীপ্ত সারল্যের, বিশিষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে বিরল ব্যঞ্জনার আর একদিকে তেমনি বোধির গভীরতায় সমস্ত আপাত বিপরীতের দুর্লভ সামঞ্জস্যের।

মণীন্দ্র রায়ের একটি সপ্তম কবিতার বই। ঠিক অমিল থেকে শুরু না করলেও আজকের এই মিলে পৌঁছোতে তাঁকে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ পার হতে হয়েছে। সে পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার মত প্রলোভনও বড় কম ছিল না। নিজস্ব ধ্বনির চেয়ে বিদেশী প্রতিধ্বনি যখন কাব্যের আসর দখল করবার চক্রান্ত চালাচ্ছে মণীন্দ্র রায় প্রায় সেই যুগেই কবিতার সাধন শুরু করেছেন। হুজুগের হাওয়ায় নগদা খ্যাতির লোভ কিন্তু তাঁকে নকল-নবিশদের কপচানো বুলির দাঁড়ে টানতে পারেনি। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী আরো কয়েকজন সুস্থ সাধকের মত অবজ্ঞা অনাদরের নিঃসঙ্গ মরু তিনি দৃঢ়পদে অতিক্রম করে এসেছেন শুধু সেই অবিচল কবি-চিত্তের সততায় যা তাঁকে আজকের এই আশ্চর্য সংকল্প ও উপলব্ধির গভীরতায় পেঁাছে দিয়েছে,—

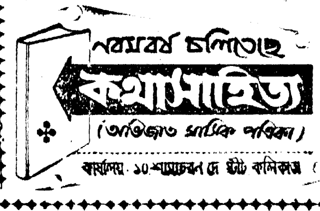
"না, আমি হাওয়ার হাতে টিনের মোরগ যে
আনন্দে ঘুরে ঘুরে নাচে মানমন্দিরের
চূড়ায়, কখনো চাইনি তা।

* * *

কেননা জীবন এক ধৈর্যময় গবেষণাগার—
বিশাল কয়লার খাদে হীরা রেখে যে বলে!
বেছে নে!
যা কিছু হয়েছে হবে, সে কি জল-পড়ে
পাতা নড়ে এতো সোজা! বীজের খোলস
ভাঙতে চায় কেন তবে বাঁকায় পিঠের ধনু?"

প্রত্যেক যুগ ও দেশ তার সমকালীন কবিদের কাছে, শুধু দেশী কি বিদেশী অলংকার শাস্ত্রের মনভোলান উদাহরণ, কি সাময়িক উত্তেজনার সুরা বা ঘুমপাড়ানী সুরের চেয়ে আরো বেশী কিছু চায়। সেই বেশী কিছুর কোন নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট বায়না বা ফর্দ নেই। তা হয়ত শুধু গহন নিবিড় বোধের এমন এক সৌষ্ঠবময় রহস্য-সংকেত দুরন্ত বিক্ষুব্ধ সময়-স্রোতের





তরঙ্গ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে যা ছন্দের গূঢ় সংগীত ধরিয়ে দেয়। যুগের এ দাবী মেটাবার মত কবি চিরকালই দুর্লভ। বর্তমানে যে কয়েকজন মাত্র কবির মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি দেখে আমরা মুগ্ধ, মণীন্দ্র রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন অগ্রণী।

'অমিল থেকে মিলে'-র যে কবিতায় নমুনাটি পূর্বে উধৃত হয়েছে, সেটিতে শুধু মণীন্দ্র রায়ের কবিসত্তারই পরিচয় নেই, আছে তাঁর কারুকর্মের ও স্বাতন্ত্র্যের। অস্খলিত গাঢ়বন্ধ তাঁর বাক্‌বিন্যাস। যত অসামান্য দীপ্তি তাঁর কাব্য-চেতনায় তত কুশল কারুকাজ তাঁর তক্ষণ-তীক্ষ্ণ ভাষায়। মাত্র সাতচল্লিশ পাতার বইটির প্রতি কবিতায় কাব্য-রসিকদের জন্যে অজস্র বিস্ময়-মাধুর্য ছড়ানো। সে বিস্ময়-মাধুর্য বাংলা কাব্যের ধারাবাহিকতা থেকেই উদ্ভূত, এ কথাটিও সগর্বে ঘোষণা করবার মত।

৪২৪।৫৮ —প্রেমেন্দ্র মিত্র

## উপন্যাস

**রূপসাগর—সুবোধ ঘোষ।** প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৪·৫০ নয়া পয়সা।

লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে, সুবোধ ঘোষ উপন্যাস রচনায় একটি বিশেষ রীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছেন। এ রীতিকে অনুসরণ করে আর কেউ এখনও অবশ্য এগিয়ে আসেননি, কিন্তু তাঁর নিজের উপন্যাসগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্তভাবেই আসা যায় যে, তিনি নিজে কৃতকার্য হয়েছেন। সুবোধ ঘোষ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থক শিল্পী এবং ছোটগল্প রচনায় হাত দিয়েই তিনি পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রচলিত পথটি তাঁর পথ নয়। তাই আধুনিককালের সাহিত্য আলোচনায় তাঁকে নবতর পথের পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকার করে নিতে কারো মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি। উপন্যাস-রচনার ব্যাপারেও যে তিনি অই একই কারণে, প্রচলিত ধারায় এগুবেন না তা সহজেই অনুমেয়। রূপসাগর উপন্যাসটি তাঁর সেই নতুন রচনাভঙ্গির একটি সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু এ গ্রন্থটির আলোচনার আগে লেখকের নতুনত্বের সন্ধানটুকু নেওয়া প্রয়োজন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ উপন্যাসটি পাঠকের কাছে একটি নবতর বিস্ময় বলে ধরা দেবে।

সুবোধ ঘোষ প্রথমত ছোট গল্প লেখক, অন্তত আজও পর্যন্ত দেশের অগণিত পাঠক-সমাজের কাছে এই তাঁর প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে আধুনিক-কালে সাধারণভাবে দেখা গেছে, প্রথম দিকে ছোট গল্প রচনায় অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েও উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন — তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অন্তত প্রসিদ্ধ লেখক। এই ব্যর্থতার কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু মনোযোগী পাঠকের কাছে এই প্রধান কারণটি নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে যে, সেসব ক্ষেত্রে লেখকেরা বৃহত্তর পটভূমিতে তাঁদের কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেলেও ছোট গল্প রচনায় অভ্যস্ত রীতিটিকে ছাড়তে পারেননি, যার ফলে সম্পূর্ণ-ভাবে একটি উপন্যাস শেষ হওয়ার আগে বহুবারই যেন শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁদের অধিকাংশ উপন্যাসের একটি অবধারিত পরিণতি নেই। সোজা কথায়, সার্থক গল্পকার হয়েও তাঁরা পরিণত ঔপন্যাসিক নন্।

এই অসংলগ্নতার হাত থেকে বাঁচবার পথ বোধ হয় এ-দুটিই। হয় ছোটগল্প রচনার পদ্ধতিটিকেই সার্থক কৌশলে উপন্যাস সৃষ্টির কাজেও প্রয়োগ করতে হবে, নয়তো বিস্তৃততর পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কল্পনা ও রচনাশক্তিকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতায় পৌঁছে দেবার অসামান্য ক্ষমতাকে আয়ত্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য, কোনো পথই সহজ নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যে-কয়টি স্বল্প সংখ্যক উপন্যাস চির-কালের বলে স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের রচনা-কারেরা দ্বিতীয় পন্থাটিকে গ্রহণ করলেও ফ্লবেয়ার টুর্গেনিভের মতো শক্তিধর লেখকেরা প্রথম পন্থাটিকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষই প্রথম যিনি উপন্যাসরচনা করতে বসে নিজের ক্ষমতাকে সচেতনভাবে স্বীকার করে নিয়ে প্রথম পথটিকে বেছে নিয়েছেন। এবং তিনি যে ব্যর্থ হননি অন্তত রূপসাগর তার একটি নিদর্শন। কিন্তু তা প্রমাণ করার আগে সংক্ষেপে কাহিনীটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

একদিনের হঠাৎ দেখা, কিন্তু পত্রবিনিময়ে প্রেম প্রগাঢ় হলো শিক্ষিতা তরুণী নিরাজিতা আর কালিকা মাইনসের ম্যানেজার নিশীথ রায়ের মধ্যে। বিয়ের দিন উড়ো চিঠির মারফৎ নিরাজিতার বাবা জানতে পারলেন ছেলের চরিত্র ভালো নয় এবং বাড়ির ফটকে তালা ঝুলিয়ে সরে পড়লেন তাঁরা সবাই। বিয়ে করতে এসে নিশীথ কিন্তু শূন্য-হাতে ফিরে গেলো না, দৈব ঘটনার মতো বিয়ে হয়ে গেলো তার পাশের বাড়ির মেয়ে প্রতিভার সঙ্গে ইতিপূর্বে যার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিলো স্বয়ং পাত্র বিভূতি, নিশীথেরই বন্ধু, মেয়ের চরিত্রে প্রাক্তন কোনো ত্রুটি আছে বলে। মন জেনেশুনে নিশীথ এবং প্রতিভা উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করে নিলো সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। রেসকোর্সে মদ্যপ ধীরেনের স্ত্রী সুনয়না ইতিপূর্বে নিশীথের জীবনে লেগে ছিলো রাহুর মতো, সে সংবাদের আভাস দিয়ে বিভূতিই চিঠি লিখেছিলো নিরাজিতার বাবাকে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিলো সুনয়না, কিন্তু কলকাতার বাগবাজারী স্থিতধী প্রতিভার শান্ত বিশ্বাসে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো সে, ফিরে পেলো স্বামীকে—নিশীথের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সুখের বাসা বাঁধলো স্বামীর ভালো-বাসায়। আর প্রসিদ্ধ চরিত্রবান বিভূতিকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলো নিরাজিতা, সেই সঙ্গে তার কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে-ছিলো যে, বিভূতির চরিত্রের কোনো ভিত্তি নেই। তাই একদিন নিরাজিতা এসে ক্ষমা চাইলো নিশীথের কাছে—বিভূতিও।

সুবোধ ঘোষের একাধিক ছোটগল্পের নাম করা যায় যেখানে চরিত্র সংখ্যা এর চেয়ে কম নয়, ঘটনাবিন্যাসে জটিলতাও বেশী। তথাপি এ কাহিনীকে তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করলেন কেন? গল্প রচনায় তাঁর মতো আশ্চর্য সংযম বেশী লেখকের নেই। সুতরাং এমনটা বিশ্বাস করা যায় যে রূপসাগরের কাহিনীটিকে ইচ্ছে করলেই তিনি একটি সার্থক ছোটগল্পের আকারে রূপ দিতে পারতেন। পারতেন যে সে প্রমাণ আছে 'আত্মজা' আর 'সুজাতায়'। ছোটগল্প আত্মজা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সুজাতার উপন্যাসরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়নি। আসল কথা, সাহিত্যকর্ম হিসেবে ছোট-গল্প বা উপন্যাস রচনার মধ্যে সুবোধ ঘোষ কোনো ব্যবধানকে আমল দিতে রাজী নন। তাই অনেকের মতো যে কোনো একটি গল্পকে বড় করে উপন্যাস বলে চালাতে তাঁর বাধে, এবং

সেইজন্যই তাঁর বিশেষ রচনা একটি বিশেষ রূপেই প্রকাশ পায়। ছোটগল্প হতে পারতো তথাপি রূপসাগর সুন্দর সার্থক উপন্যাস হতে পেরেছে এইজন্যে যে, এখানে প্রতিটি চরিত্র প্রতিটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘটনাগুলোর মতো চরিত্রগুলোও একে-অন্যের সংগে জড়িয়ে মিশিয়ে এগিয়ে চলতে গিয়ে পায়ে-পায়ে আটকে যায়নি। ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকটি মানুষ তার সহজ স্বচ্ছতায় পাঠকের চোখের সামনে ফুটে উঠতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, ছোটগল্পের সিদ্ধহস্ত লেখকের পক্ষেই এমন দৃঢ়সম্বন্ধ কাহিনীকে খণ্ড খণ্ড ছবির মধ্য দিয়ে একটি সুপরিণত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এমনকি একথাও বোধ হয় বলা চলে যে, উপন্যাস রচনার প্রচলিত ধারায় গা ভাসিয়ে দিলে এ উপন্যাস হয়তো কাহিনীর দৃঢ়তা হারাতো, বৈচিত্র্য হারাতো চরিত্রগুলো।

আরও অনেক বেশী চরিত্রের আনাগোনা, ঘটনাবিন্যাসের প্রয়োজন আরও বেশী যে উপন্যাসে, প্রশ্ন উঠতে পারে, সেখানেও কি এ পদ্ধতি লেখককে সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে! তার উত্তরে এখন পর্যন্ত আশা রেখে বলা যায়, তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। অন্তত সুবোধ ঘোষ যে তাতেও সার্থকতার প্রান্ত স্পর্শ করতে পেরেছেন, 'শ্রেয়সী'ই তার একটি প্রমাণ।

আধুনিককালের উপন্যাসকারেরা, সকলেই অমিত শক্তিধর নন অথচ, ছোট গল্প লেখক হিসেবে তাঁদের অনেকেই আজ খ্যাতিমান। সুতরাং রূপসাগরে উপন্যাস রচনায় যে পদ্ধতি লেখক অবলম্বন করেছেন, তাঁরা যদি এ পদ্ধতিকে আরও সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তবে আর যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নৌকো কূলে ভিড়াতে পারবেন। ৬১৩।৫৮

## বিবিধ

**ফুটবলের কলাকৌশল**—সাভিন ও সুশকভ: রথীন্দ্র সরকার ও অরুণাচল বসু অনূদিত। প্রকাশক—প্রোমোটার্স পাবলিশার্স, ৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

ইদানীং বাংলা ভাষায় কিছু কিছু খেলার বই প্রকাশিত হলেও এখনো বাংলা ভাষায় ক্রীড়াপুস্তকের যথেষ্ট অভাব আছে। তাই খেলাধুলা বিষয়ে বাংলা ভাষায় বই লেখার সমস্ত উদ্যমই প্রশংসনীয়।

আলোচ্য পুস্তক 'ফুটবলের কলাকৌশল' অবশ্য শ্রীরথীন্দ্র সরকার ও শ্রীঅরুণাচল বসুর মৌলিক রচনা নয়। রুশ ক্রীড়াবিদ সাভিন ও সুশকভ লিখিত পুস্তকের বাংলা অনুবাদ। বইখানিতে ডায়গ্রাম সহযোগে ফুটবল খেলার ট্রেনিং, খেলার কলাকৌশল, তত্ত্বগত শিক্ষা এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে ফুটবল খেলার আইনকানুন।

স্বনামধন্য ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল বইখানির ভূমিকায় লিখেছেন—'এদেশে এ ধরনের পুস্তক অনেক দিন আগেই লেখা উচিত ছিল। কেন না, এখন আর এদেশে ভগবানদত্ত খেলোয়াড় নেই, খেলা শিখেই এখন যখন খেলোয়াড় হতে হবে, তখন কোন ভাল বই না থাকলে খেলা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা দুই-ই শক্ত। তাই আজকের দিনে রাশিয়ান ফুটবল শিক্ষার বইয়ের বাংলা অনুবাদ খুবই সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় হয়েছে।

গোষ্ঠবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, তবে বই-খানি লেখা হয়েছে রুশ খেলোয়াড়দের দৈহিক ক্ষমতা এবং রাশিয়ার প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে অনুশীলন পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে।

বইখানির ছাপায় কিছু কিছু ভুল আছে। বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট রুচিকর। ৩০৪।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

Gandhiji — Hiren Mukherjee.
The Paradox of Freedom—Dhirendra Nath Sen.
আবরণের আড়ালে—প্রবোধচন্দ্র রায়।
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা—অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য।
উঁচু নীচু—শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র লাহিড়ী।
মৌন নূপুর—সুশীল ঘোষ।
চয়নী—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।
আলোকিত সমন্বয়—আলোক সরকার।
এ কালের চোখে—অচিন্ত্যেশ ঘোষ।
কলিতীর্থ কালীঘাট—অবধূত।
জলপায়রা—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
ত্রিনয়ন—সুনীল দত্ত।
পল্লী বোধন—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য।
পল্লী বোধনে অন্ন সমস্যা—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎস্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য।

# রঙ্গজগৎ

## চন্দ্রশেখর

### বাংলা নাটকের সমস্যা

নাটক জীবনাশ্রয়ী না হলে সার্থকতা লাভ করে না। বিভাগোত্তর যুগের বাংলা নাটক এই সার্থকতার পথে পা বাড়িয়েছে। পূর্ববর্তী যুগে সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রোমাণ্টিক নাটক রচনার ধারা। আজ বাংলা নাটক রচনার একশো বছর



"মধুমতী"র নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা

অতিক্রান্ত হবার পরও দেখা যাচ্ছে যে, একখানিও সার্থক বাংলা নাটক রচিত হয়নি।

উপরের অভিমত প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য গত শনিবার বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত বক্তৃতামালায় নিজের ভাষণ দিতে গিয়ে। বক্তার এই মত যদি নির্বিচারে মেনে নিতে হয় তাহলে সার্থক নাটক-রচয়িতাদের ফর্দ থেকে শুধু যে বাংলার দীনবন্ধু, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির নাম কাটা যাবে তাই নয়, অমন যে মহাকবি কালিদাস এবং কালজয়ী উইলিয়াম সেক্সপীয়র তাঁরাও কল্কে পাবেন না এযুগে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, ইতিহাস, পুরাণ কিংবা রোমান্স (রোমান্সের সঙ্গে যেন আধুনিক জীবনের কোন যোগ নেই!) যাই হোক না কেন, তাদের ভিতর দিয়ে জাতির প্রত্যক্ষ জীবনের রূপায়ণ সার্থক হতে পারেনি। বিভাগোত্তর যুগের বাংলা



অরোরার মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি "জলসাঘরে"র একটি দৃশ্যে পদ্মা দেবী ও ছবি বিশ্বাস।

নাটকে বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের ছায়া পড়তে শুরু করেছে, সুতরাং বাংলা নাটক এখন তার সার্থক বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়েছে—একথা আরো বলেছেন ভট্টাচার্য মহাশয়।

তাঁর বক্তৃতার শেষাংশে এই কথাগুলি আছে: "বাঙালী চরিত্রের একটি শাশ্বত রূপ আছে। তাহার পরিবার-ভিত্তিক জীবনের মধ্যেই তাহার সার্থক প্রকাশ হইয়া থাকে। পারিবারিক জীবনের মধ্যে নারীর একটি বিশেষ স্থান আছে। নারীর এই স্থানটি সার্থকভাবে নির্দেশ করিতে না পারিলে পারিবারিক জীবনের রূপায়ণ সার্থক হইতে পারে না। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজকে অনুকরণ করিবার পরিবর্তে বাঙালীর সার্থক জীবনবোধ হইতে যদি বাংলা নাটক রচিত হয় তবেই ইহার সার্থকতা দেখা যাইতে পারে।"

আমাদের মনে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—এই ধরনের বক্তৃতায় বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা "সার্থকতা" লাভ করতে পারবে কি?

# চিত্রালোচনা

বিমল রায় প্রোডাকসন্সের "মধুমতী" এ হপ্তার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ঋত্বিক ঘটকের লেখা একটি প্রণয়মধুর কাহিনীর ওপর ছবিখানির ভিত্তি। হিন্দী চিত্র জগতের দুজন সেরা শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে এই ছবিতে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দিলীপ-কুমার ও বৈজয়ন্তীমালা অপূর্ব অভিনয় করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রাণ, জনি ওয়াকার ও জয়ন্ত অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন। কুমায়ুন পর্বতমালার প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে অধিকাংশ বহি-দৃশ্য তোলা হয়েছে, ফলে দৃশ্য সৌন্দর্যে ছবিখানি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বিমল রায় এর প্রযোজক এবং পরিচালক। শৈলেন্দ্র রচিত গানে সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

* * *

এ হপ্তার দ্বিতীয় ছবি—এবং এখানিও হিন্দী—হরিশ পরিচালিত "দো মস্তানে"। শেখ মুখতার, মতিলাল, গীতাবালী, নিগার সুলতানা, বেগম পারা, শাম্মী, মুকরী, কানহাইয়ালাল ও জনি ওয়াকারকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সুর সৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার।

* * *

নতুন বাংলা ছবির আসর এ হপ্তাতেও শূন্য। কিশোরকুমারের "লুকোচুরি" এখনও লোক টানছে। "নাগিনী কন্যার কাহিনী" ও "ডাক্তারবাবু" পুরোন হয়নি আজও। "বামাক্ষ্যাপা" ধর্মপ্রাণ দর্শকদের আকর্ষণ করছে। এরাই বাংলা ছবির চাতকদের তৃষ্ণা খানিকটা মেটাচ্ছে। কিন্তু নতুনের জন্যে (ফিল্ম ষ্টার নূতনের জন্যে নয়) যাদের চিত্ত পিপাসিত, তারা কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। আকাশের দিকেই বটে! শোনা যাচ্ছে, সত্যজিৎ রায় নিউ-ইয়র্ক থেকে না ফিরলে "জলসাঘরে"র দ্বার উদ্ঘাটিত হবে না এবং সত্যজিৎ রায় আকাশ পথেই ফিরবেন। জোর গুজব, ধর্মঘটের মেঘ না কাটলে (বিশেষ করে ট্রাম ধর্মঘটের) "শিকারে"র মরসুম শুরু হবে না। সুতরাং চিত্রপ্রিয়রা যে আকাশমুখী হয়ে থাকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

* * *

আরো দুটি নতুন ছবির মহরৎ অনু-

ষ্ঠিত হয়েছে গত শুক্রবার জন্মাষ্টমীর শুভ লগ্নে। নবগঠিত মালা প্রোডাকসন্স তাঁদের যাত্রা শুরু করলেন "অযাচিত" নিয়ে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দিলীপ বসুর পরিচালনায় ছবিখানি তোলা হবে। এর বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, কমল মিত্র, অনুপকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতিকে।

* * *

দ্বিতীয় ছবিখানির নাম "সোনার খনি"। জলি পিকচার্স এর নির্মাতা, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অমলকুমার বন্দোপাধ্যায়। ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে মনোজ বসুর সভাপতিত্বে এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়।

* * *

এতদিন প্রযোজক সত্য রায়ের কার্যক্ষেত্র ছিল বোম্বাইতে। সেখানে তিনি "তাজ ঔর তলোয়ার", "মহারাণী" ও "মেহফিল" এই তিনখানি হিন্দী ছবি নির্মাণ করেন। এবার তিনি কলকাতায় একখানি বাংলা ছবি তুলবেন বলে মনস্থ করেছেন। ছবিখানির নাম রাখা হয়েছে "গান বাজনা" এবং গান ও বাজনাই হবে এর প্রধান আকর্ষণ। হিন্দী চিত্রজগতের উঠতি তারকা রূপমালা "গান বাজনা"র নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন। ছবিখানিতে সুর দেবেন বোম্বাই-খ্যাত সন্দীপ্ত ভট্টাচার্য।

* * *

এইচ এন সি প্রোডাকসন্সের "ইন্দ্রাণী" অক্টোবরের গোড়াতেই মুক্তি পাবে। বিবাহের আগে ও পরে এক তরুণ-তরুণীর জীবনবৈচিত্র্য নিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করেছেন, তাকেই রূপ দিয়েছেন সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার এই ছবির মুখ্য ভূমিকাদুটিতে। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, নমিতা সিংহ, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ, চন্দ্রাবতী, জীবেন বসু প্রভৃতি। নীরেন লাহিড়ী ছবিখানির পরিচালক।

* * *

পূর্ব সীমান্তের নাগা উপজাতির যন্ত্রণা, বাসনা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা প্রফুল্ল রায়ের "পূর্ব পার্বতী" উপন্যাসখানির চিত্র স্বত্ব কিনেছেন বি পি ফিল্মস। ভূপেন হাজারিকার পরিচালনায় গল্পটি চিত্রায়িত হবে।

### একটি জাপানী ছবি

জাপানের কনসালেট জেনারেল ও কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির যুগ্ম-উদ্যোগে "বিরুমা নো তত্তেগোতো" নামক একটি সুন্দর জাপানী ছবি গত রবিবার রক্সি সিনেমায় প্রদর্শিত হয়। ছবিখানি গত বছরে সেলজ্‌নিক্‌ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে এডিনবরার চলচ্চিত্র উৎসবে।

যে শিল্পসৌন্দর্য ও মানবীয় আবেদনের জন্যে জাপানী ছবি আজ সারা জগতে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে তারই এক নতুনতর প্রকাশ পাওয়া যায় "বিরুমা নো তত্তেগোতো'র মধ্যে। বাংলায় তর্জমা করলে নামটির মানে দাঁড়ায় "ব্রহ্মদেশের বীণা"। হার্প জাতীয় একটি তারের বাদ্যযন্ত্রকে ঘিরে মানবীয় আবেদনে ভরা একটি করুণ কাহিনী চমৎকার রূপ পেয়েছে এর মধ্যে।

বিগত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে জাপানী





সেনাবাহিনীর বিক্ষিপ্ত দলগুলি যখন পার্বত্য পথে বর্মা থেকে থাইল্যাণ্ডের দিকে হটতে শুরু করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটির কাহিনী। এমনি একটি দলের আগে আগে চলে জাপানী সৈনিক মিজুসিমা বর্মীর ছদ্মবেশে। হাতে তার একটি হার্প, তারই সাঙ্কেতিক সুরে সে দলের অন্য সকলকে জানিয়ে দেয় পথ নিষ্কণ্টক কিনা।

এমনি চলার পথেই একদিন যুদ্ধ শেষ হয়। জাপানী সেনাদল ইংরেজদের যুদ্ধ-বন্দী শিবিরে ধরা দেয়। এক দুর্গম পর্বত-শিখরে আর একটি দল কিন্তু ধরা দিতে অস্বীকার করে। বৃথা রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে মিজুসিমাকে পাঠান হয় তাদের কাছে। মিজুসিমার দৌত্য ব্যর্থ হয়। ইংরেজের কামান নিশ্চিহ্ন করে দেয় সমস্ত দলটিকে। মিজুসিমাও আহত হয়। এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সেবায় সে প্রাণ ফিরে পায়। ফেরার পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জাপানী মৃতদেহের স্তূপ দেখে মিজুসিমার ভাবান্তর ঘটে। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ শেয়াল ও শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে—এ দৃশ্য মিজুসিমাকে বিচলিত করে। সে স্থির করে, যতদিন না সে এইসব হাজার হাজার মৃতদেহের যথোচিত সংকার করতে পারবে, ততদিন সে জাপানে ফিরবে না। এই কাজই হবে তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

এদিকে বন্দীশিবিরে তার দলের বন্ধুরা মিজুসিমার ফেরবার প্রতীক্ষায় থাকে। মিজুসিমার দেখাও তারা পায় কিন্তু পরনে তার ভিক্ষুর পীতবাস। একটি কথাও সে বলে না। বন্ধুদের উৎকণ্ঠা তাতে বাড়ে বই কমে না। কেউ বলে, মিজুসিমা আর বেঁচে নেই, ও অন্যলোক। কিন্তু দলের বেশীর ভাগই মনে করে, এই ভিক্ষুই মিজুসিমা। অথচ মিজুসিমা নিজে থেকে ধরা না দিলে তাদের বিশ্বাসের মূল্য কি?

তারপর বন্দী-বিনিময় ব্যবস্থায় জাপানী-দের দেশে ফেরবার দিন এগিয়ে আসে। বন্ধুদের মন আশা-নিরাশায় দুলতে থাকে—মিজুসিমা কি ফিরবে, না ফিরবে না?

বন্ধুরা গান ধরে—যে গান মিজুসিমার প্রিয়—বাড়ির গান, দেশের গান, প্রিয়জনের গান। বন্দীশালার বেড়ার বাইরে মিজু-সিমার হার্প বেজে ওঠে—ঐ গানের সুরে সুর মিলিয়ে। বর্মী ভিক্ষুর বেশধারী যে তাদের মিজুসিমা, তা বুঝতে কারুর বাকী থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মিজুসিমার হার্পে বিদায়ের সুর ধ্বনিত হয়। আকাশ, বাতাস, বন্ধুদের মন হঠাৎ ভারি হয়ে ওঠে চিরবিচ্ছেদের বেদনায়।

মিজুসিমা একটি চিঠিতে তার সব কথা লিখে জানায় তার বন্ধুদের। সে লেখে, মানুষের এই দুঃখ, হিংসার এই উন্মত্ততা, পৃথিবী জুড়ে বার বার এই রক্তস্রোতের প্লাবন—কেন এবং কিজন্যে, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে সে বুঝেছে, তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যাকে কর্তব্য বলে বুঝেছে, তারই সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত, সেই ব্রতই সে নিয়েছে।

• • •

এত সহজভাবে গল্পটিকে ছবির পর্দায় বলা হয়েছে যে, তা সহজেই মনকে স্পর্শ করে। অভিনয়েও আতিশয্যকে পরিহার করা হয়েছে সযত্নে। ফলে কোন চরিত্রকে বা কোন নাটকীয় পরিস্থিতিকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। নরনারীর প্রেম বা ঐ জাতীয় কোন পরিচিত ফরমুলার সাহায্য না নিয়েও এই ছবিতে যে মানবীয় আবেগের সৃষ্টি করা হয়েছে তা এর নির্মাতাদের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক।

যুদ্ধের ছবি ইয়োরোপ—আমেরিকায় বিস্তর তোলা হয়েছে। সে সব ছবি নিজের দেশের শৌর্যবীর্যের কাহিনীতে ভরপুর। জাপানই বোধহয় একমাত্র দেশ যে নিজের পরাজয়ের ওপর ভিত্তি করে এমনিধারা শিল্প সৃষ্টি করতে পেরেছে।

"বিরুমা নো তত্তেগোতো" তুলেছেন টোকিওর নিক্কাটসু মোশন পিকচার করপোরেশন। পরিচালনা করেছেন কোন্

হিচকাওয়া। মিজুসিমার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শোজি ইয়াসুই। ছবিখানি প্রায় পুরোপুরি "আউটডোরে" গৃহীত। আলোকচিত্র ও অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন।

### অসার রহস্য

যে-জাতীয় হিন্দী ছবির প্রতি রুচিশীল দর্শকের বিতৃষ্ণার অবধি নেই, "পোস্ট বক্স ৯৯৯" তারই অন্যতম উদাহরণ। যুক্তিহীন, সংগতিশূন্য ও নিষ্ফল কল্পনার উপাদানে 'পোস্ট বক্স ৯৯৯' ভরা।

কাহিনীর নায়িকার নাম নীলিমা, নায়কের নাম বিকাশ। অবশ্যই এদের প্রেম হয়েছে, কিন্তু আসল রহস্য অন্যত্র।

একটি মেয়েকে খুনের দায়ে মোহন নামের একটি ছেলে ধরা পড়েছে, মোহনের মায়ের আন্তরিক বিশ্বাস যে, মোহন খুন করেনি।

মোহনের মায়ের সংগে নীলিমার আলাপ হ'লো, শুধু আলাপ কেন, নীলিমাদের বাড়িতেই নিয়ে আসা হ'লো মহিলাকে। তারপর হত্যারহস্য সমাধানে বিকাশের আবির্ভাব। বিকাশ খবরের কাগজের রিপোর্টার। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সে একাধারে গোয়েন্দা, ঐন্দ্রজালিক ও প্রেমিক।

শেষ পর্যন্ত বিকাশের বুদ্ধিবলে(!!!) আবিষ্কৃত হ'লো যে, মোহন খুনী নয়। মোহন মুক্তি পেলো। আরো একটা কৃতিত্বের কাজ করলো বিকাশ। মোহনের প্রেয়সীকে সে শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার করে এনে দিলো। সত্যিকার খুনীর কয়েদ হ'লো।

বিকাশ আর নীলিমা? এরকম উদ্ভট হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকার যে-রকম পরিণতি হয়, ওদেরও তাই হ'লো। মিলন।

নাগীনা ফিল্মস নিবেদিত 'পোস্ট বক্স ৯৯৯'এর আখ্যাবস্তুর দুর্বলতা অমার্জনীয়। বস্তুত, এই কাহিনীর ভিত্তিতে কোনো চলচ্চিত্রই সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হ'তে পারে না। রহস্য কোথাও দানা বাঁধেনি। রহস্যের সমাধানও হাস্যকর। প্রায় সমস্ত চরিত্রগুলিই এমন দুর্বল কল্পনার সাক্ষী যে, তারা কখনো কোনো জীবন্ত চরিত্রতুল্য ব্যবহার করেনি। পরিবর্তে, কখনো ভাঁড়ামি করেছে, কখনো ন্যাকামি।

পরিচালনায় রবীন্দ্র দাভে কোনো উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। সংগীত-পরিচালক কল্যাণজী বীরজী বরং গতানুগতিক হ'লেও মোটামুটিরকম তৃপ্তিকর সংগীতের ব্যবস্থা করেছেন। ছবিটির টেকনিক্যাল দিক নিন্দনীয় নয়।

বিকাশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুনীল দত্ত। কোনো-কোনো দৃশ্যে নৈপুণ্যের ছাপ থাকলেও অধিকাংশ দৃশ্যেই তাঁর অভিনয় প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠেনি।

নীলিমার ভূমিকায় শাকিলার অভিনয় সে তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে।

মোহনের মায়ের ভূমিকায় লীলা চিট্‌নীশের অভিনয়ও অতি সুন্দর। 'পোস্ট বক্স ৯৯৯'-এ লীলা চিট্‌নীশের অভিনয় উল্লেখনে মুক্তাস্বরূপ। অন্যান্য অভিনয় চলনসই।

'পোস্ট বক্স ৯৯৯'এর গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান লিখেছেন পি এল সন্তোষী। ছবি তুলেছেন এম ডব্লিউ মুকাদম ও প্রতাপ দাভে। সংগীত পরিচালনা করেছেন খুসলকর।

•



# বিবিধ সংবাদ

"দি রিকসাম্যান" নামক একখানি জাপানী ছবি এবার ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ সম্মান (গোল্ডেন লায়ন অফ সেণ্ট মার্ক) লাভ করেছে। গত বছর সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিল। জাপানী ছবিটির পরিচালকের নাম হিরোসি ইনাগাকি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে অ্যালেক গিনেস্ ও সোফিয়া লোরেন নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে "দি হর্সেস মাউথ" ও "ব্ল্যাক অর্কিডে" তাঁদের অভিনয়ের জন্যে। পরিচালনার জন্যে ফরাসী পরিচালক লুই মাল ও ইতালীয়ান পরিচালক ফ্রান্সেসকো রোজি যৌথভাবে সম্মানিত হয়েছেন। ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রিটিকদের পুরস্কার পেয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার ছবি "দি উলভ্‌স লেয়ার।" গত বছর ঐ পুরস্কারটিও "অপরাজিত" পেয়েছিল।

• • •

হিন্দী ফিল্মের প্রখ্যাত শিল্পী ইয়াকুব ৫৪ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৯২৩ সালে শারদা ফিল্ম কোম্পানীতে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। কৌতুক-চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর নাট্যপ্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে। জেমন্‌বাই প্রযোজিত "চেসাসে হুক"এর ছিলেন নায়ক। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ফিল্মগুলির মধ্যে "অলী হিলাল," "আওরৎ," "রোটি" ও "অব দিল্লী দূর নহী" বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর স্ত্রী ও একটি দত্তকপুত্র বর্তমান।

### ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজনের প্রচেষ্টায় 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। সোসাইটির সভ্যসংখ্যা সময়ে কখনোই ষাট ছাড়িয়ে যায়নি।

সোসাইটির মূল লক্ষ্য শিক্ষার মাধ্যম ও শিল্পরূপে চলচ্চিত্রের প্রসার, শিল্পরসে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে চলচ্চিত্রক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এবং জনসাধারণের রসগ্রহণ শক্তির মান উন্নয়ন।

সোসাইটির উদ্যোগে দেশী ও বিদেশী নানারকম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হ'তো, চলচ্চিত্র-বিষয়ক আলোচনা হ'তো। কিন্তু নতুন সেন্সর-ব্যবস্থার ফলে বিদেশী ছবির আমদানীতে ভাঁটা পড়লো। সোসাইটির একাধিক সভ্য (উদাহরণ হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য) চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদান করলেন। সোসাইটি এক-রকম বন্ধ হয়ে গেলো ১৯৫২ সালে।

কিন্তু এই সোসাইটির চিন্তাধারার অভিব্যক্তি দেখা গেলো সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি'তে।

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে পুনর্জীবিত হ'লো 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। এক বছরের মধ্যে সোসাইটির সভ্যসংখ্যা আড়াইশো ছাড়িয়ে গেলো।

১৯৫৬ সাল থেকে এযাবৎ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ছেচল্লিশটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হয়েছে, বক্তৃতা হয়েছে।

বর্তমানে এই সোসাইটির সভাপতি—অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত; সহ-সভাপতি—সত্যজিৎ রায় ও হিরণকুমার সান্যাল; যুগ্ম-কার্যাধ্যক্ষ—রাম হালদার ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ—এস বি মেটা।

### থিয়েটার ইউনিটের 'উঁচু-নীচু'

গত ১৬ই আগস্ট থিয়েটার ইউনিটের সভ্যরা সমারসেট মম-এর 'শেপী' নাটকের বাঙলা রূপান্তর 'উঁচু-নীচু' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। সেলুনের এক নাপিত তাঁর লটারিলব্ধ টাকা দেশের দরিদ্রজন এবং মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত তাদের সেবাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় চতুর্দিক থেকে যেভাবে বাধা পেতে থাকে এবং ব্যর্থতার মধ্যে তাকে যেভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয় সেই কাহিনী নিয়ে এই নাটক।

ব্যঙ্গাত্মক, বিয়োগান্ত এই নাটকের করুণ রস শিল্পীরা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেন। মুখ্য চরিত্রে নাট্যপরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় যেমন নিখুঁত, তেমনই মর্মস্পর্শী। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় সাধনা রায়চৌধুরী, পাপড়ি মুখোপাধ্যায়, যোগমায়া পোদ্দার ও সমরকুমারের অভিনয় প্রশংসনীয়। মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জা সুষ্ঠু; আঙ্গিকের অন্যান্য দিকের কাজ অনিন্দ্য।

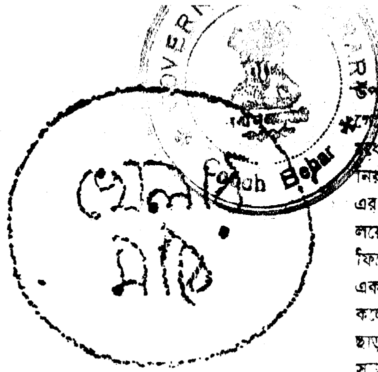
## ছাত্র-খেলোয়াড় না খেলোয়াড়-ছাত্র

একজন ছাত্র-খেলোয়াড়ের উপর দুই কলেজের অধিকার দাবী এবং তথাকথিত 'এজমালী' ছাত্রের ইলিয়ট শীল্ডের খেলায় একটি কলেজের পক্ষে অংশ গ্রহণের ফলে সম্প্রতি খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এবং খেলাধুলোয় আগ্রহী কলেজ মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টির উপর যবনিকা পড়েছে। চাঞ্চল্যও কমে এসেছে। কিন্তু এই খেলার ব্যাপার নিয়ে দুই কলেজের কর্তৃপক্ষ এবং আই এফ এর কর্মকর্তারা যে 'খেলা' দেখিয়েছেন, তার যথেষ্ট সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

বিষয়টি যদিও সম্পূর্ণভাবে খেলাধুলোর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবুও এই ঘটনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আছে এবং এই ঘটনা খেলাধুলোর ব্যাপারে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

বিষয়টির সূচনা হয় আই এফ এ পরিচালিত আন্তঃকলেজ নক্‌আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ইলিয়ট শীল্ডের একটি খেলাকে কেন্দ্র করে। বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী কলেজ ছিল খেলাটির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল। খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজ ৩—২ গোলে বঙ্গবাসী কলেজকে পরাজিত করে। কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজ এই যুক্তি দেখিয়ে আই এফ এ-র কাছে এক প্রতিবাদ পেশ করে যে, যেহেতু বালকৃষ্ণ মিশ্র অর্থাৎ ফুটবল খেলোয়াড় বালু, যিনি এই খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছেন, তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের আইন-সঙ্গত ছাত্র নন, চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র, সেই হেতু বিদ্যাসাগর কলেজকে প্রতি-যোগিতা থেকে নাকচ করে বঙ্গবাসী কলেজকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হোক।

আই এফ এ-র প্রতিযোগিতা কমিটি বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিবাদ পত্র গ্রহণের পর বিদ্যাসাগর কলেজের পক্ষে বালুর খেলার যোগ্যতা আছে কি না এবং প্রতিবাদের সমর্থনে বঙ্গবাসী কলেজেরই বা কি সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তা পেশ করবার জন্য দুই কলেজের উপর নির্দেশ দেন। দুই কলেজ থেকেই প্রমাণপত্র পেশ করা হয়। বিদ্যাসাগর কলেজ বালুর কলেজে ভর্তি হবার প্রমাণপত্র এবং সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট' দাখিল করেন। কারণ বালু সগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছেন। অন্য প্রদেশের কোন কলেজে ভর্তির জন্য এই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের অবশ্য প্রয়োজন। বঙ্গবাসী কলেজের তরফ থেকে পেশ করা হয় চারু-চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের এক পত্র—যাতে লেখা থাকে বালকৃষ্ণ মিশ্র অর্থাৎ বালু চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র। গত বছর তিনি




একলব্য

এই কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং এখনো 'ছাড়পত্র' গ্রহণ করেননি। প্রতিযোগিতা কমিটি মহাসমস্যায় পড়েন। চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ বলছেন বালু তাদের ছাত্র, আবার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ বলছেন বালু তাদের ছাত্র; উপরন্তু মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটও দেখাচ্ছেন। আবার বালু বলছেন, এক বিদ্যাসাগর কলেজ ছাড়া তিনি আর কোন কলেজের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেননি। কার কথা সত্য? কলেজের অধ্যক্ষ অসত্য কথা লিখবেন, এমন তো হতে পারে না। বালু দুই কলেজে ভর্তি হয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে একথা উপলব্ধি করা গেলেও বিচারের জন্য তথ্যানুসন্ধান আরম্ভ হয়। তথ্যানুসন্ধানের সুযোগও ছিল যথেষ্ট। কারণ আই এফ এর সহ-সভাপতি এবং পশ্চিম বাঙলার প্রাক্তন শিক্ষা-অধিকার ডাঃ পরিমল রায় ছিলেন প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতি।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, বালু গত বছর চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছেন, দেরীতে ভর্তি হবার জন্য তার লেট ফি-ও যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা পড়েছে। তবে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট কলেজে জমা পড়েনি। কলেজে মাইনেও কিছু জমা পড়েনি। খেলোয়াড় হিসাবে মাইনে মকুব করা হয়েছে কিন্তু ইংরাজী ক্লাসের হাজিরা খাতার মাত্র ৭ দিনের উপস্থিতির নজির ছাড়া অন্য ক্লাসে উপস্থিতির কোন প্রমাণ নেই। অপরদিকে দেখা যায়, বালু এই বছর বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং যথারীতি আজমীর থেকে মাইগ্রেশন সার্টি-ফিকেট এনে কলেজে জমা দিয়েছেন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, বালু গত বছর ইলিয়ট শীল্ডের খেলায় চারুচন্দ্র কলেজের পক্ষে বিদ্যাসাগর কলেজের বিরুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

এখন উপায়? বালু তবে কোন্ কলেজের ছাত্র? বিদ্যাসাগরের না চারুচন্দ্রের? বিদ্যাসাগর কলেজ বলছেন, বালু চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হলেও তিনি যখন মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দাখিল করেননি তখন ভর্তি হবার তিন মাস পরে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপর চারুচন্দ্রের ছাত্রের অধিকার নাকচ হয়ে গেছে। অপর পক্ষ বলছেন, তিন মাসের মধ্যে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দাখিল করবার নিয়ম থাকলেও সাধারণত কোনো কলেজই এর জন্য পীড়াপীড়ি করে না. বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষার সময়ই মাইগ্রেশন সার্টি-ফিকেটের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, বালু যখন এক কলেজে ভর্তি হয়েছেন তখন সেই কলেজের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট বা ছাড়পত্র ছাড়া অন্য কলেজে তাঁর ভর্তিও অসিদ্ধ। সুতরাং বালুর উপর চারুচন্দ্রের অধিকার নাকচ হয়নি।

বলা বাহুল্য, প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতি এবং প্রাক্তন শিক্ষা-অধিকার ডাঃ পরিমল রায় শেষোক্ত যুক্তি সমর্থন করেন। ফলে অপরাধী খেলোয়াড় বালু দুই কলেজে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লঙ্ঘন এবং অসত্য উক্তি করায় প্রতিযোগিতা কমিটি বালুকে এই বছরের জন্য সাসপেণ্ড করে খেলাটি পুনরনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কলেজের তরফ থেকে প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর কাছে প্রতি-বাদ করা হয়। ফলে বিষয়টি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। এখানে বলা প্রয়োজন, বালু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খ্যাতনামা ফুটবল ও হকি খেলোয়াড়। এই কারণের জন্যই হোক কিংবা এর সঙ্গে আর কিছু কারণই থাক, প্রতিযোগিতা কমিটি বালুকে এই বছরের জন্য সাসপেণ্ড করার আগেই ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব নিয়মানুবর্তিতার অভাবের জন্য বালুকে এক বছরের জন্য সাসপেণ্ড করেছেন এবং বালুর উপর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই দণ্ডাজ্ঞা এখনো বলবৎ আছে। যাই হ'ক, ইলিয়ট শীল্ডে বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী কলেজের খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজের পক্ষে বালুর অংশ গ্রহণের ব্যাপার নিয়ে আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম দিনের সভায় তর্কের ঝড় ওঠে—আইনের চুলচেরা বিচারে সদস্যরা হয়ে ওঠেন গলদ-ঘর্ম। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা তর্ক বিতর্কের মধ্যে অতিবাহিত হলেও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। হবেই বা কি করে? সমস্যা কি

একটা। আই এফ এর গঠনতন্ত্রের নিয়মকানুনে দেখা যায়, চলতি বছরের ভর্তির নিরিখেই ইলিয়ট শীল্ডে ছাত্র-খেলোয়াড়ের খেলার যোগ্যতা বিচার করা হবে। আবার আই এফ এ থেকেই খেলার যে তালিকা বিলি করা হয়েছে তাতে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের আইনই ইলিয়ট শীল্ডের খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন এই পরস্পরবিরোধী আইনের কোন্‌টি গ্রহণীয়? অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্নই বিচারের মূলসূত্র হিসাবে ধরা হয়। সে প্রশ্নটি হচ্ছে বাল্লুর বিদ্যাসাগর কলেজে খেলার যোগ্যতা আছে কিনা? অতঃপর আইনবিশারদের অভিমতে প্রয়োজন হয়—প্রয়োজন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অভিমতের।

আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর দ্বিতীয় দিনের সভায় প্রবল উত্তেজনা। অধিকাংশ সদস্যই পরস্পরবিরোধী অভিমতে দুই শিবিরভুক্ত। ভোটযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে আইন বিশারদের অভিমত পেশ করা হয়। অভিমত দিয়েছেন আই এফ এ-র আইনবিশারদ সভাপতি ব্যারিস্টার শ্রীনীরেন দে। তিনি সভায় উপস্থিত নেই। জরুরী প্রয়োজনে ইংলণ্ড যাত্রার আগে অভিমত দিয়ে গেছেন। শ্রীনীরেন দের অভিমতঃ 'বাল্লুর বিদ্যাসাগর কলেজে খেলার পক্ষে কোন বাধা নেই'। এরপর উপস্থিত করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অভিমত। তিনি যা লিখেছেন তার অর্থ বাল্লু বিদ্যাসাগর কলেজের আইনসম্মত ছাত্র নন। আবার দুই বিশেষজ্ঞের পরস্পরবিরোধী অভিমত। শেষ পর্যন্ত পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের ভোটে ব্যাপারটির মীমাংসা হয়। অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে খেলার ফলাফলকে বহাল রেখে বিদ্যাসাগর কলেজকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়—বাল্লুর উপর থেকে দণ্ডাজ্ঞা উঠে যায়। প্রতিযোগিতা কমিটির কোন সিদ্ধান্তই বহাল থাকে না।

* * * *

আই এফ এ-র সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে প্রতিযোগিতা কমিটির কোন সিদ্ধান্ত পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা এইভাবে উল্টে গেছে বলে আমাদের মনে পড়ে না। প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্য আর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য অভিন্ন নয়। পরিচালকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে নিয়েই প্রতিযোগিতা কমিটি। আই এফ এ-র ভিন্ন ভিন্ন কাজের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্তে যদি কোন ভুল থাকে এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সেই ভুল উদ্ঘাটিত হয়, তবে বিষয়টি প্রতিযোগিতা কমিটির দ্বারা পুনর্বিবেচনা করানোই যুক্তিসংগত। কিন্তু তা না করে তাদের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি নাকচ করে দেবার অর্থ প্রকারান্তরে প্রতিযোগিতা কমিটির উপর অনাস্থা প্রকাশ করা। বোধ করি, এইজন্যই প্রতিযোগিতা কমিটির এক প্রবীণ সদস্য পদত্যাগ করে আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর কার্যের প্রতিবাদ করেছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের পক্ষে বাল্লুর খেলার ব্যাপারে আই এফ এ-র এক প্রভাবশালী ব্যক্তির অদৃশ্য হস্ত যে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত এইজন্যই বেশীর ভাগ সদস্য শালীনতা বিসর্জন দিয়ে প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত নাকচ করেছেন।

কিন্তু প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত নাকচ করার জন্য আমি তেমন চিন্তিত নই, যেমন চিন্তিত খেলাধুলোর ব্যাপারে ছাত্রের এবং ছাত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজগুলির অসাধু পন্থা অবলম্বনের জন্য।

এই ব্যাপারে যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, খেলার ব্যাপারে কেউই কম অসাধু উপায় অবলম্বন করেননি। না বিদ্যাসাগর কলেজ, না চারুচন্দ্র কলেজ, না খেলোয়াড় বাল্লু। তারপর আই এফ এ-র সভাপতি ব্যারিস্টার শ্রীনীরেন দে যে অভিমত দিয়েছেন তার মধ্যেও কিছু ফাঁক আছে। আইনজ্ঞ সভাপতি শ্রীনীরেন দে সুকৌশলে বাল্লু বিদ্যাসাগর কলেজের আইনসম্মত ছাত্র কিনা এই কথাটি এড়িয়ে গেছেন। কাগজপত্র দেখে বলেছেন, বিদ্যাসাগর কলেজে বাল্লুর খেলার অধিকার আছে। অর্থ করলে অবশ্য এক কথাই দাঁড়ায়। বাল্লু যদি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র না হন তবে সেই কলেজে তাঁর খেলার অধিকার থাকবে কিভাবে? কিন্তু এর সংগে আর একটি প্রশ্নও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলে তাকে কতগুলি নিয়মকানুন অবশ্য মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে একটি নিয়ম, এক কলেজে ভর্তি হলে সেই কলেজের ছাড়পত্র ছাড়া অন্য কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না। বাল্লু নিশ্চয়ই এ নিয়ম পালন করেননি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন অনুযায়ী বাল্লু বিদ্যাসাগর কলেজের আইনসম্মত ছাত্র কিনা, এটা আইনঘটিত প্রশ্ন। কোন আইনবিশারদের একতরফা অভিমত এখানে গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়। আর একজন আইনবিশারদ এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। এই বিষয়ে আই এফ এ-র সভাপতির অভিমত গ্রহণ না করে যিনি আই এফ এ-র সংগে সংশ্লিষ্ট নন এই ধরনের একজন আইনবিশারদের অভিমত গ্রহণ করা উচিত ছিল।

এখন খেলোয়াড় বাল্লু এবং দুইটি কলেজের আচরণের কথা আলোচনা করা যাক।

বাল্লুর অপরাধ একটি নয়, একাধিক। প্রথমত, তিনি চারুচন্দ্র কলেজে গতবার ভর্তি হয়েও মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দাখিল করেননি। দ্বিতীয়ত, ছাড়পত্র ব্যতিরেকে এই বছর বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়েছেন। বিদ্যাসাগর কলেজ ছাড়া অন্য কোন কলেজের পক্ষে খেলেননি এই অসত্য উক্তি বাল্লুর তৃতীয় অপরাধ। এ সমস্ত অপরাধই তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা কমিটি বাল্লুকে 'সাসপেণ্ড' করবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

চারুচন্দ্র কলেজে বাল্লুর ভর্তি হবার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, শুধু খেলার জন্যই তিনি এই কলেজের ছাত্র হবার 'ভান' করেছিলেন বা ছাত্র সেজেছিলেন। এক্ষেত্রে ছাত্র হবার জন্য তাঁর নিজের আগ্রহের চেয়ে কলেজের খেলাধুলো বিভাগের কর্মকর্তাদেরই বেশী আগ্রহ থাকা সম্ভব। তাছাড়া, ভর্তি হবার ব্যাপারে একটি বিষয়ে মস্ত এক গরমিল আছে। আই এফ এ দপ্তরের কাগজপত্র অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, গত বছর ইলিয়ট শীল্ডে বিদ্যাসাগর ও চারুচন্দ্র কলেজের খেলায় বাল্লু চারুচন্দ্রের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই খেলার তারিখ ছিল ১৯শে আগস্ট। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আই এফ এ-র কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বলেছেন, বাল্লু গত বছর ২১শে আগস্ট চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হবার আগেই তিনি চারুচন্দ্র কলেজের পক্ষে ইলিয়ট শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের এভাবে বাল্লুকে খেলান কোন মতেই উচিত হয়নি, যদিও পরে বাল্লু তাদের কলেজের ছাত্র হয়েছেন।

এইবার বিদ্যাসাগর কলেজে বাল্লুর ভর্তি হবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

যে খেলোয়াড় গত বছর বিদ্যাসাগর কলেজের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে সেই খেলোয়াড়কেই বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত হয়নি। অবশ্য বাল্লু যে গত বছর চারুচন্দ্র কলেজের পক্ষে খেলেছেন এবং চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিলেন একথা বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্র-ভর্তির যারা কর্মকর্তা তাঁদের জানা না-ও থাকতে পারে। আবার একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, কিছু না জেনে শুনেই তাঁরা বাল্লুকে ভর্তি করেছেন। কারণ বাল্লুর সংগে আর অন্যান্য ছাত্রের সংগে পার্থক্য আছে। বাল্লু ইস্টবেংগল ক্লাবের একজন খ্যাতনামা ফুটবল ও হকি খেলোয়াড়। ছাত্র মহলে খুবই পরিচিত; সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু জানা থাকাই স্বাভাবিক, বিশেষ করে গতবার তিনি যখন ইলিয়ট শীল্ডে বিদ্যাসাগর কলেজের বিরুদ্ধেই খেলেছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের খেলাধুলো বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের সবকিছু জানা না থাকলেও কোন কোন ছাত্র, যাঁরা গতবার বাল্লুর

বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই কথাটা জানা আছে। আর তাঁরাও যদি গত বছরের কথা ভুলে যেয়ে থাকেন তবে এবার বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিবাদের পর নিশ্চয়ই তাঁদের অতীত ঘটনা মনে পড়েছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু কই তাঁরা তো বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেননি। অবশ্য আইনের ফ্যাকড়া তুলে বিদ্যাসাগর কলেজ বলতে পারেন, গত বছর বাসু যখন তাঁদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তখন তিনি চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হননি। কিন্তু আই এফ এ-এর কাছে রেজিস্ট্রারের পত্র যাবার আগে বিদ্যাসাগর কলেজের একথা জানা ছিল না তাছাড়া, চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হবার পরও বাসু অনেক খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সে কথাও বিদ্যাসাগর কলেজের অজানা থাকবার কথা নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই গোলমেলে ব্যাপারে বাসু একাই অন্যায় এবং অসাধু উপায় অবলম্বন করেননি। দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের নির্মল আনন্দ দেওয়াই বিভিন্ন কলেজে খেলাধুলো বিভাগ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। নামকরা খেলোয়াড়দের কলেজে ভর্তি করে দলকে শক্তিশালী করতে হবে, আর বিভিন্ন 'ট্রফি' সংগ্রহ করে কলেজ রুমের শোভা বাড়িয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ইতিপূর্বে খেলোয়াড়দের ছাত্র হিসাবে ভর্তি করবার ব্যাপারে বিভিন্ন কলেজের অসাধু উপায় অবলম্বনের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ-ও দেখা গেছে যে, যে খেলোয়াড় স্কুলের চৌকাঠ পার হননি তিনিও কলেজের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আবার বই খাতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অথচ বছরের পর বছর কলেজের রেজিস্টারে নাম আছে এমন ছাত্র-খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়-ছাত্রেরও অভাব নেই।

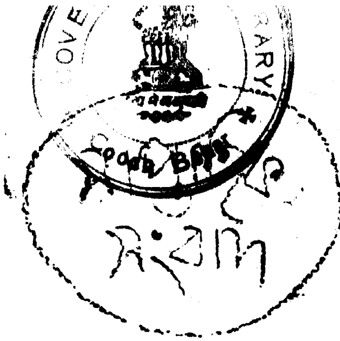
খেলার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের অসাধু উপায় অবলম্বন শুধু নিন্দনীয় নয়—শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চ আদর্শের পরিপন্থী। এর মধ্যে অনেক সময় ঘটনা-চক্রে অধ্যক্ষদের জড়িয়ে পড়তে হয়। দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা নিয়ে নিন্দা-ভাজনও হতে হয় বহুক্ষেত্রে।

আরও একটি কথা। খেলাধুলা পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি বিভাগ আছে। যার নাম ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড। আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি কলেজ এই স্পোর্টস বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। অথচ খেলার জন্য এরা আই এফ এ-র দ্বারস্থই বা হবেন কেন, আর আই এফ এ সদস্যদের বিচারপ্রার্থী হয়ে কোন সময় আসামীর, কোন সময় ফরিয়াদীর ভূমিকাই বা গ্রহণ করবেন কেন? এর সঙ্গে মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত আছে, জড়িত আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদের মর্যাদা। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পত্রের কানাকড়ি মূল্য না দিয়ে সেই পত্রকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলতে পারে, কলেজের অধ্যক্ষের পত্রকে অবহেলা করতে পারে, তাদের কাছে অধ্যক্ষগণ আর কতকাল বিচারপ্রার্থী হয়ে বসে থাকবেন?

আই এফ এ কর্তৃপক্ষ বাসুকে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র হিসাবে স্বীকার করলেও সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভায় বিদ্যাসাগর কলেজে বাসুর ভর্তির বিষয় অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং আপাতত ব্যাপারটির উপর যবনিকা পড়লেও বিষয়টি আরও অনেদূর গড়াতে পারে। কলেজ-ছাত্রদের খেলাধুলার ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বনও অসম্ভব নয়।

যে পন্থাই অবলম্বন করা হ'ক, সিণ্ডিকেট সদস্যদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন কলেজে খেলোয়াড় ভর্তির ব্যাপারে কোনো কলেজ যাতে অসাধু উপায় অবলম্বন না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। আর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন খেলোয়াড়কে ছাত্র করতে বেশী চেষ্টা না করে, ছাত্রকে খেলোয়াড় করতে বেশী যত্নবান হন।

[আই এফ এ-র নিকট পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করে উপরোক্ত বিষয় লেখা হয়েছে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু বক্তব্য থাকলে সম্পাদককে জানাতে পারেন]




## দেশী সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর—কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অদ্য কোচবিহারের মহকুমা শহর দিনহাটায় মারাত্মক ধরনের দাংগাহাংগামার সৃষ্টি হয় এবং দাংগাহাংগামাকারীদের দমনকল্পে পুলিসকে পাঁচ রাউণ্ড গুলী চালাইতে হয়। মহকুমা শাসক এইদিন সন্ধ্যা ৬টা হইতে ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু বলবৎ করেন। ১৪৪ ধারাও জারী করা হইয়াছে। দাংগার ফলে ২ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত হয়।

বিদ্রোহী নাগা নেতা শ্রী ফিজো গোপনে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বৈদেশিক প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাতের জন্য ঢাকায় গিয়াছেন। শুধু একবারই নহে, কয়েকবারই শ্রী ফিজো পূর্ব পাকিস্তান রাজধানী ঢাকায় গিয়াছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পাকিস্তানের সহিত নাগা বিদ্রোহীদের অনেকদিন ধরিয়াই যোগাযোগ আছে।

৩রা সেপ্টেম্বর—কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের নিকট লিখিত এক পত্রে পুনরায় জানান হইয়াছে যে, তাঁহারা ট্রাম-কর্মীদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কিত সমগ্র বিষয়টির মীমাংসার জন্য শিল্প বিরোধ আইন অনুযায়ী ট্রাইবুনালে প্রেরণ করিতে সম্মত আছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে ২০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসিত করিবার চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—জানা গিয়াছে যে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পনাগুলিকে যেভাবে রূপায়িত করা হইতেছে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কৃষি দপ্তরের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার জন্য সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন।

৫ই সেপ্টেম্বর—দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু খাদ্য সমস্যা সমাধানে সকল দলের নেতাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভের চেষ্টায় সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে এক সর্বদল নেতৃসম্মেলন আহ্বান করিবেন।

শ্রীহট্ট জেলার ১২টি থানা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাইবার এবং পাকিস্তানের গুলীবর্ষণের পর সীমান্তের গুরুতর অবস্থা সম্পর্কে শ্রী নেহরুকে ওয়াকিবহাল করাইবার জন্য করিমগঞ্জের জনসাধারণের পক্ষ হইতে কংগ্রেস এম এল এ শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস ও পি এস পি নেতা শ্রীরথীন্দ্রনাথ সেন আজ নয়াদিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ স্কুল ফাইন্যালের প্রচলিত পরীক্ষা-রীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিবার এক পরিকল্পনা এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। উক্ত পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে পর্ষদ ইতোমধ্যেই প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষাগত গুণাগুণের রেকর্ড লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে 'কিউমিউলেটিব রেকর্ড কার্ড' সংরক্ষণের রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন।

৭ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গে কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি রোধের এবং অবিলম্বে কলেজী শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যার সমাধানকল্পে একটি ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন আহ্বানের দাবীতে আজ (সোমবার) অপরাহ্ণ হইতে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু হইতেছে। ইহা ছাড়া উক্ত কমিটির আহ্বানে আজ রাজ্যের সর্বত্র কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট পালিত হইবে এবং তাহাদের দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৮ই সেপ্টেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, সরকার দেশের খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর লোকসভার সকল দলের এক ঘরোয়া বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কলিকাতার বৃহত্তম ৭টি বেসরকারী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অদ্য তাহাদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্লাশে যোগদান করিতে বিরত থাকে এবং বেতন বৃদ্ধি রদ করিতে সরকারের উপর চাপ দিবার জন্য সরকারী দপ্তরখানা অভিমুখে অভিযান করে।

## বিদেশী সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর—কুওমিণ্টাং সরকারী মহল হইতে আজ বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদী চীন অধিকৃত কয়েকটি রক্ষী দ্বীপের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট চীন এখন নৌবহর সাজাইতেছে এবং সে আক্রমণও আসন্ন।

"মানব কল্যাণে আণবিক শক্তির ব্যবহার" সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা অদ্য আণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা চালান। ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও কানাডায় আণবিক শক্তির ব্যবহারের যে আয়োজন চলিতেছে, সে সম্পর্কেও সমবেত পাঁচ হাজার বিজ্ঞানীকে জানানো হয়।

৩রা সেপ্টেম্বর—পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে সীমান্ত-বিরোধে ধৃত বন্দীদের এই মাসের ৯ই তারিখে মুক্তিদান সম্পর্কে ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলন আজ শেষ হইয়াছে।

লণ্ডনের বর্ণবিদ্বেষ জর্জরিত নটিংহিল এলাকায় গত রাত্রিতে জনতা বিভিন্নরূপ ধ্বনি করিয়া রাজপথ পরিক্রমায় বাহির হয়। গত তিন রাত্রি যাবত এখানে শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণাংগদের মধ্যে যে গুরুতর দাংগাহাংগামা চলিতেছে, উহার পিছনে ফ্যাসিস্টদের প্ররোচনা রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—শ্রী এইচ এস সুরাবর্দী যদি বর্তমান পশ্চিম সমর্থক নীতি অক্ষুণ্ণ রাখেন তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া পত্র পাইবার পর সরকার আওয়ামী লীগ নায়কের জন্য একজন সশস্ত্র দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৃটিশ সরকার ভারতকে ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রায় চার কোটি ষ্টার্লিং আর্থিক সাহায্য করিবেন বলিয়া আজ ঘোষণা করিয়াছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, লেবাননের অন্যতম বিরোধী দলনেতা শ্রীরসিদ কারামী নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ফুয়াদ সেহাবের অধীনে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন।

৫ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদায় আজ বলা হইয়াছে যে, চীন সাধারণতন্ত্রের "সীমান্ত বা উহার এলাকার ভিতর" যদি কিছু ঘটে, তবে রাশিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

৬ই সেপ্টেম্বর—চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন লাই আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ফরমোজা প্রণালী হইতে উত্তেজনার ভাব হ্রাস ও দূর করার জন্য মার্কিন সরকারের নেতৃবৃন্দের সহিত একত্রে বসিয়া আলোচনা করিতে চীন সরকার এখনো রাজি আছেন।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং নূতন এক আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা হয়ত ভবিষ্যতে বিকীরণ আক্রান্ত মানুষের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী সম্মেলনে অদ্য এক প্রবন্ধ পেশ করিয়া এই আবিষ্কারের সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর—চীনের আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ না করার জন্য বিদেশী জাহাজসমূহের প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মার্কিন ৭ম নৌবহরের জাহাজসমূহ অদ্য অবরুদ্ধ কুয়েময় দ্বীপে সরবরাহ জাহাজ সকল পৌঁছাইয়া দিবার কাজে সহায়তা করায় প্রজাতন্ত্রী চীনা সরকার অদ্য মার্কিন সরকারের প্রতি "কঠোর" সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—অদ্য পিকিং বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, প্রজাতন্ত্রী চীনের দক্ষিণ চীন সাগরীয় নৌবহর ফরমোজা প্রণালীতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। নৌ কর্তৃপক্ষ সৈন্যগণকে যুগপৎ জলে স্থলে যুদ্ধ চালনা শিক্ষা দিতেছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার — সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

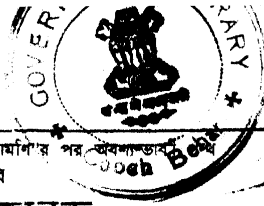
প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।




"পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" ও "পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি"র পর অবশ্যম্ভাবী গ্রন্থ

অ চি ন্ত্য কু মা রে র

# বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রথম খণ্ড । দাম : পাঁচ টাকা

---

অন্নদাশঙ্করের রায়ের নতুন গল্পগ্রন্থ

## রূপের দায়

কথাশিল্পী হিসেবে অন্নদাশঙ্কর চিরদিনই সংস্কারবর্জিত জীবনশিল্পের প্রবক্তা। তাঁর কাহিনীর মেরুদণ্ডে যেমন উন্নত বিবেক-বুদ্ধির আশ্চর্য ঋজুতা, শিল্পরূপের সূক্ষ্ম দীপ্তিতেও তেমনি অনায়াস শ্রেষ্ঠতা। 'রূপের দায়' গ্রন্থের সাতটি গল্পেই এই শ্রেষ্ঠতা সুপ্রমাণিত। দাম : ৩·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের নতুন গল্পগ্রন্থ

## চন্দ্রমল্লিকা

'চন্দ্রমল্লিকা' গ্রন্থের গল্পগুলির পটভূমি হয়তো অসাধারণ নয়, কিন্তু অন্তরঙ্গতায় হৃদয়-সংলগ্ন। বিষয়ের আকর্ষণ যেমন বিচিত্র বিপুল, বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে যেমন নির্ভার নিপুণতা, শিল্পবিন্যাসেও তেমনি সহজ সুষমা। সংকলিত প্রতি গল্পই উজ্জ্বল ও উপভোগ্য। দাম : ২·৫০

---

সুধীরচন্দ্র সরকার-কৃত
**পৌরাণিক অভিধান** ... ৭·০০

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলিত
**বিজ্ঞান-ভারতী** ... ৪·৭৫

মৈত্রেয়ী দেবী
**ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ** ... ২·৫০

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
**রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা** ... ২·০০

বুদ্ধদেব বসু
**যে-আঁধার আলোর অধিক** (কবিতা) ২·৫০
**কালিদাসের মেঘদূত** ৫·৫০
**শেষ পাণ্ডুলিপি** (উপন্যাস) ৩·২৫
**বারোমাসের ছড়া** (কবিতা) ৩·০০

বিষ্ণু দে
**আলেখ্য** (কবিতা) ২·৫০

মণীন্দ্র রায়
**অমিল থেকে মিলে** (কবিতা) ১·৫০

ডাঃ হরিশ্চন্দ্র সিংহ
**ভগবৎ প্রসঙ্গ** ... ৩·৫০

দীপক চৌধুরী
**রোয়াক** (উপন্যাস) ... ৩·৫০
**এই গ্রহের ক্রন্দন** ( ,, ) ... ৬·০০
**কুমারী কন্যা** ( " ) ... ৩·৫০

প্রতিভা বসু
**মধ্যরাতের তারা** (উপন্যাস) ... ৩·২৫

সলিল সেন
**দূরভাষিণী** (নাটক) ... ২·০০

**এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড**, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

---

== **মিত্র-ঘোষের সশ্রদ্ধ গ্রন্থ-নিবেদন** ==

**রাজশেখর বসুর**
চিন্তাসমৃদ্ধ নবতম গ্রন্থ

## চ ল চ্চি ন্তা ৩৲

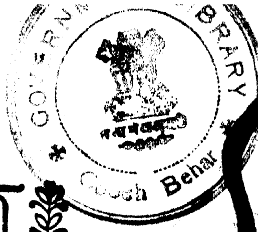
**প্রমথনাথ বিশীর**
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি

## কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷

**প্রবোধকুমার সান্যালের**
নবতম ও শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস

## বে লো য়া রী ৬৷৷

**মিত্র ও ঘোষ** : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২




# সূচীপত্র

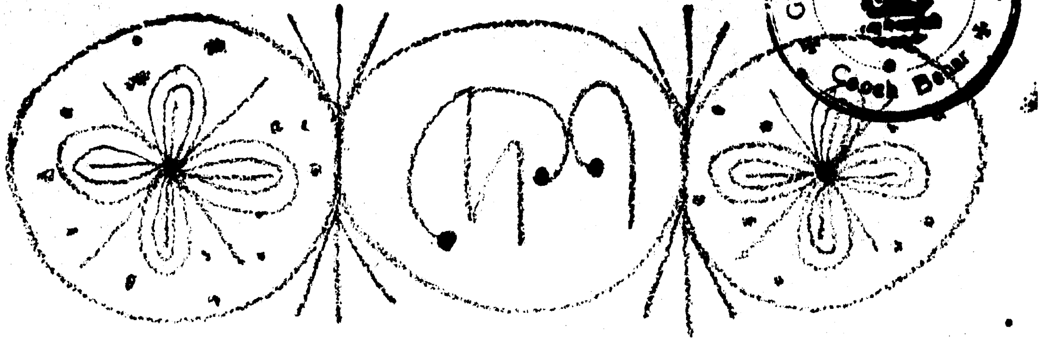
| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

(সি ১৬৭২)




# সূচীপত্র

# সূচীপত্র




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 20th September, 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৪৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ




## বিশ্বভারতীর উপাচার্য

বিশ্বভারতী সংসদ (সিণ্ডিকেট) উপাচার্য পদের জন্য যে-তিনটি নাম প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এমন একটি নামকে অগ্রবর্তিতা প্রদান করা হইয়াছে যাহা আমাদের শুধু বিস্মিতই করে নাই, বিরক্তির উদ্রেকও করিয়াছে। শুনিয়াছি ব্যক্তিটি একজন অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী। ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোনো গুণপনার পরিচয় ভারতবর্ষ দূরের কথা, বাংলা দেশে খুব কম লোকেই জানে, এমনকি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও জানে কিনা সন্দেহ। যে ব্যক্তিকে ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪১ সাল (রবীন্দ্রনাথের তিরোধানকাল) পর্যন্ত শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর ত্রিসীমানা মাড়াইতে দেখা যায় নাই আজ হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া সিণ্ডিকেটের এই নর্তনকুর্দনের পিছনে কোনো গভীর রহস্য আছে বলিয়া আমরা সন্দেহ করিতেছি। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বিশ্বভারতীর ন্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিপ্রতিষ্ঠানের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইবার কোনো যোগ্যতাই যাঁহার নাই তিনি এই নামক্রমের অগ্রবর্তিতায় আসিলেন কোন দুঃসাহসে। তাছাড়া ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং শান্তিনিকেতনের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ উপাচার্যপদে বৃত হইবেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম এই তালিকা হইতে বাদ পড়িল কোন চক্রান্তে? বিশ্বভারতী আজ শান্তিনিকেতন আশ্রমিকদের সম্পত্তি নহে, সমগ্র দেশবাসীর সম্পত্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থানুকূল্যেই ইহা পরিচালিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ যে-আদর্শ লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সরকারী হস্তক্ষেপে সে-আদর্শ যাহাতে কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইহার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু বেদনার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদারতার সুযোগ লইয়া ক্ষমতালিপ্সু কোনো এক গোষ্ঠী আত্মকর্তৃত্বের অপব্যবহার ঘটাইতে শুরু করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইহার প্রশ্রয় দিতে পারেন না, দেশবাসীও ইহা কখনই সহ্য করিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, কিছুদিন হইল ঘরে ও বাহিরে বিশ্বভারতীর বড় অপযশ রটিয়াছে। এহেন দুঃসময়ে যোগ্যতর নামের প্রস্তাব সকলকেই আশান্বিত করিত, তাহার অভাবে সকলকেই হতাশ করিয়াছে। সাধারণের অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে সাধারণের মতামত বিচার করিয়া চলিতে হয়। আমরা নিজেদের বিশ্বভারতীর বান্ধব বলিয়া মনে করি—তাই সমস্ত ব্যাপারটা অনেকদিন হইতে আমাদের বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

## ছাত্র আন্দোলন

কলিকাতার কয়েকটি কলেজে বেতনবৃদ্ধি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্রসমাজের একাংশে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা বেতনবৃদ্ধি সমর্থন করি নাই, কেন করি নাই তাহা পূর্বে সবিস্তারে বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া ছাত্র আন্দোলনের বর্তমান রূপটিকেও আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। বেতনবৃদ্ধি উচিত কি অনুচিত তাহা হিসাবঘটিত বিষয়, আর সে হিসাবটা বিশেষ জটিল। সমস্ত বিষয়টার বিচার গাণিতিক মানদণ্ডে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহার বদলে এই Emotional approach বা হৃদয়াবেগের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহা মীমাংসাকর নয়, বৃথা উত্তেজনাকর। বৃথা উত্তেজনা সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর, ছাত্রদের পক্ষে তো বটেই। আজ দুই generation বা প্রথমকাল ধরিয়া প্রত্যেক বিষয়ে Emotional approach চলিয়া আসিতেছে বাংলাদেশে। বাঙালীর বর্তমান দুরবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। এখন এহেন দৃষ্টি বর্জন করিবার সময় আসিয়াছে অথচ দেখিতেছি সেই দৃষ্টিটাই বরণীয় অনেকের কাছে। যেখানে ধীরমস্তিষ্কে বিচারের আবশ্যক সেখানে বিক্ষোভ দেখিলে ব্যাপারটা অহেতুক মনে না হইয়া যায় না। আমরা আশা করি যে, ছাত্রসমাজ বিক্ষোভের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিচার ও বিবেচনার পন্থা গ্রহণ করিবেন। ছাত্রসমাজ নিজেদের আস্থাভাজন নেতাদের উপরে ভারার্পণ করিতে পারেন। তাঁহারা ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিরূপে সরকার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আলাপ আলোচন আরম্ভ করিলে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি।

## প্রজা-সমাজতন্ত্রীদলের সুবিবেচনা

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সংগ্রব

পরিত্যাগ করিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গঠনাত্মক ও কার্যকর পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মনোভাব আনন্দের ও আশার কারণ। কংগ্রেস ব্যতিরেকে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলটিই যথার্থ গণতান্ত্রিক দল। পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব খুব অধিক না হইলেও কোন কোন অঙ্গ-রাজ্যে বেশ প্রবল, সমগ্র দেশে তাঁহাদের প্রভাব ও কণ্ঠ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আগামী নির্বাচনের ফলে তাঁহারা কোন কোন রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া অনেকেই আশা করেন।

খাদ্যাভাব দেশে আছে, নানাকারণে এই অভাব ঘটিয়াছে, একটি প্রধান কারণ, গত দুই বছরের বন্যা ও অজন্মা। সরকারী সুব্যবস্থার অভাব খাদ্যাভাবকে যথা-সম্ভব তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। এখন, ইহার প্রতিকারের উপায় কি? কোন ব্যাপক সমস্যার সহজ সমাধানে আমাদের বিশ্বাস নাই। দেখিতে পাইতেছি যে, কম্যুনিস্ট দল সেই সহজ সমাধানের পথটাই বাছিয়া লইয়াছেন, সহজ ও চটকদার। বিক্ষোভাত্মক আন্দোলনে এ সমস্যা সমাধান হইবার নয়। তবে কেন তাঁহারা এ পথ গ্রহণ করিলেন? ইহা স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক চাল, খাদ্যবিবর্ধন নয়, জনপ্রিয়তা অর্জন ইহার লক্ষ্য।

এখন সেই সহজ ও চটকদার পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল দুঃসাহসের ও সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন। এই পন্থাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে, সুলভ জনপ্রিয়তা চরম সিদ্ধির পথ নয়।

## বিনোবাজীর জন্মদিন

গত ১১ই সেপ্টেম্বর আচার্য বিনোবা ভাবে ৬৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবদসমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও তাঁহার সেবাব্রতের সাফল্য কামনা করিতেছি।

সাত বৎসর আগে তিনি যখন ভূদান প্রার্থনা করিয়া পদযাত্রা শুরু করিয়াছিলেন, তখন তাহা অবিশ্বাস ও উপহাসের সীমান্তের কাছে ছিল। কিন্তু গত সাত বৎসর সময়ে তাঁহার সংকল্প ও সেবা দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকের মতে তিনি মহাত্মাজীর আরব্ধ কার্যের জের টানিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে চালিত হইতেছেন। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা বিভক্ত ও বিভ্রান্ত পৃথিবীতে আচার্যজীর নির্দিষ্ট পন্থা মানুষকে যথার্থ দিগ্দর্শন দান করিতে সক্ষম বলিয়া সত্যই আমরা বিশ্বাস করি। সেইজন্যই পাঠককে মাঝে মাঝে বিনোবাজীর উক্তি উপহার দিয়া থাকি—আজও একটি উক্তি উপহার দিলাম। তাঁহার স্বচ্ছ সরল ভাষায় মহাত্মাজীর বাণীরই যেন প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

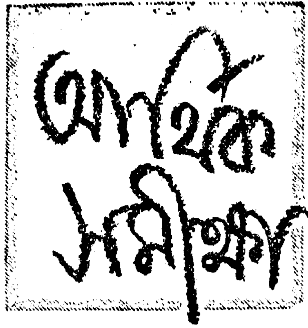
বিনোবাজীর উক্তিঃ—

"আজকের সরকারী ব্যবস্থার সাহায্যে যে শিক্ষা বিভাগ গড়ে তোলা হয়েছে, সেই শিক্ষক নিরীক্ষকদের কাজই হবে—এই শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। দশ বছরের শাসন-অভিজ্ঞতার পর সরকার ঠিক করেছেন যে, দেশে 'নঈ তালিমের' (বুনিয়াদী শিক্ষা) প্রসারণ করা হবে। আমাকে জানানো হয়েছে যে —আমার লেখা 'শিক্ষা-বিচার' আরও অন্যান্য কয়েকটি আধ্যাত্মিক-বই আপনাদের (শিক্ষকদের) দেওয়া হয়েছে। সরকার নিজেই নিজের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা করছেন দেখা যাচ্ছে! তাইতেই এজাতীয় সাহিত্যের প্রচার করা হচ্ছে। তাতো হবেই। এ যে পণ্ডিত নেহরুর গভর্নমেন্ট। সত্য এ আমাদের গৌরবের কথা যে, এমন একজন লোকের হাতে আজকের শাসনভার রয়েছে—হুকুম চালানো যার আদৌ স্বভাব নয়। তার কোন শাসক-সত্তাই নেই। আর কেউ কারোর ওপরেই প্রভুত্ব না চালাক, এই তার কাম্য। অর্থাৎ অনেকটা সেই প্লেটোর ভাষায় বলতে গেলে 'ফিলসফার কিং'কেই আপনারা প্রধান মন্ত্রী বানিয়েছেন। অন্য কোন সরকার হলে আমায় কেউ ঢুকতেই দিত না! জেনে শুনে কে আর এমন লোককে স্থান দেয়—যে 'শাসনমুক্ত সমাজ' স্থাপনায় কোমর বেঁধে লেগে গেছে। কিন্তু শাসননীতির উচ্ছেদ বা হ্রাস হোক—নেহরু সরকারেরও তাই ই ইচ্ছা। যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন—তিনি যথার্থই বিকেন্দ্রিত, শাসনবিহীন সমাজ রচনার উদ্যোক্তা। আর তাই আমি এই উন্মুক্তসভায় মুক্তকণ্ঠে বলতে পারছি, আপনারা অর্থ নিন সরকার থেকে—আর কাজ করুন আমার।"

## উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব

সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে চিন্তা করিতেছেন, বাগবিতণ্ডা ও তর্কযুক্তির অভাব হইতেছে না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত যে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার একটি প্রধান কারণ তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এ বিষয় ১০ই আগস্ট তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার শহর সংস্করণে প্রকাশিত একখানি সুলিখিত, সুচিন্তিত পত্র উদ্ধার করিয়া দিতেছি। পত্রলেখক "নগর পিতার" দৃষ্টান্তের সঙ্গে "দেশ ভ্রাতা" বিধান সভার মাননীয়গণেরও উল্লেখ করিতে পারিতেন। যেখানে "পিতা" ও "ভ্রাতা" এইরূপ, "সন্তানগণ" অন্য রূপ হইবে আশা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

"মহাশয়,—আজিকার দিনে বাঙ্গলার সমগ্র ছাত্র সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া চিত্রিত করা ও ইহা লইয়া তাহাদের প্রতি উপদেশ বর্ষণ করায় নেতৃস্থানীয়গণের একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ছাত্রদের একাংশ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু কাহার দোষে? গত ১৭ই শ্রাবণ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশ্বের তৃতীয় শ্রেষ্ঠনগরী কলিকাতার মহাপৌরসভার অধিবেশনের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে ধারণা হয়, ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য প্রধানত দায়ী তাহাদের অভিভাবকগণের ও দেশের নেতৃস্থানীয়গণের একাংশ। কলিকাতা মহাপৌরসভার সদস্যগণ সকলেই 'শিক্ষিত', সামাজিক পদমর্যাদায় উন্নত, নগরীর নেতৃস্থানীয় এবং ছাত্রের পিতা বা অভিভাবক। ইংরাজীতে ইঁহাদের 'City Fathers' অর্থাৎ "নগর-পিতা" বলা হয়। এই পিতৃত্বের গৌরব বিস্মৃত হইয়া ইঁহারা যখন সভাকক্ষে বসিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার লজ্জাকর প্রদর্শনী খোলেন, তখন কি তাঁহারা বারেক চিন্তা করেন না যে, তাঁহারা এই মহাপৌরসভার ঐতিহ্যের অবমাননা করিতেছেন? তাঁহারা নিজেদের সন্তানসন্ততিগণের ও দেশের ছাত্রগণের চারিত্রিক অবনতির পথ প্রদর্শন করিতেছেন? তাঁহাদের এই "মেছোহাটার" অভিনয়ের বিবরণী সংবাদপত্রের মাধ্যমে বহির্ভারতে যখন প্রচারিত হয় তখন তত্রত্য অধিবাসিগণ বাংলা ও ভারত সম্বন্ধে কি ধারণা করেন? শীল, সংযম, মনন, রুচি, আচরণের শুচিতা, স্থিতপ্রজ্ঞা যখন সমাজের নেতৃস্থানীয় অভিভাবকগোষ্ঠীর নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে, তখন কি ছাত্রদের মধ্যে এই গুণগুলি আশা করা যায়? ইতি—শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গুপ্তিপাড়া।"




**শ্রীকৌটিল্য**

শ্রম-শক্তি বাজেট সম্বন্ধে গতবারের আলোচনায় যেসব দরকারী কথা বাদ পড়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে স্ত্রী-শ্রমিক নিয়োগ সমস্যার গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে পরিকল্পনাকারীর সচেতনতা। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যার তারতম্য ক্রমশ অনেক কমে আসা সত্ত্বেও স্ত্রী-শ্রমিকদের শ্রম ও নিয়োগের ছক (প্যাটার্ন) সম্বন্ধে এখনো সর্বত্রই পৃথক আলোচনার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। স্ত্রীপুরুষের সমাজজীবনে বাস্তবিক পরিস্থিতির এত রকমের সমতা স্থাপনের পরেও যখন স্ত্রীলোকের দৈহিক প্রকৃতি ইত্যাদি অপরিবর্তনযোগ্য ব্যাপার ছাড়াও অন্যান্য পরিবর্তন সাপেক্ষ মানসতার সম্পূর্ণিক পরিবর্তন ওসব দেশে এতদিনেও হয়ে ওঠেনি, তখন স্ত্রী-শ্রমের বিশিষ্ট সমস্যা অনগ্রসর দেশের শ্রম-বাজেটে যে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে, এটা সহজেই অনুমান করা সম্ভব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত স্ত্রী-শ্রমের চাহিদা ও যোগানের বিশিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে খুব গভীরভাবে আলোচনা হয়নি। এই প্রসঙ্গে মূল সত্য-গুলি আগে বলে নিচ্ছি। প্রথমত, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে স্ত্রীলোকের চাকরি সম্বন্ধে সামাজিক দৃষ্টি অনেক ব্যাপ্ত এবং স্ত্রীলোকের রোজগারের উপর কোন পরিবার সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও সেটা বিশেষ অস্বাভাবিক কিংবা অবাঞ্ছিত মনে করা হয় না। দ্বিতীয়ত, আলোচ্য দেশ-গুলিতে সাধারণভাবে শ্রম-শক্তির ঘাটতি অথবা ঘাটতির ভয় দেখা যাচ্ছে। সেজন্য পুরুষ-কর্মীর অভাবকে স্ত্রী-কর্মী দ্বারা পূরণ করবার স্বাভাবিক তাগিদ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, ওসব দেশে স্ত্রী-শ্রমের জন্য বাস্তবিক এবং নির্বিশেষ (অ্যাবসোলিউট) চাহিদা আছে। কিন্তু আমাদের মতো অনুন্নত দেশে স্ত্রীলোকের জন্য কর্ম-সংস্থানের চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে উৎস পাচ্ছে। একথা সত্য যে, আমাদের দেশেরও একটা ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডিতে—যেখানে কৌশলপূর্ণ (স্কিল্‌ড) কিংবা গুরুদায়িত্ব-সম্পন্ন কাজের জন্য মেয়েরাও পুরুষের সমান দক্ষতা বা শিক্ষা অর্জন করেছে—স্ত্রী-শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুন্নত অর্থনীতিক পরিবেশঘটিত কোন বিশিষ্ট সমস্যা নেই। কিন্তু বিশেষত গত দশ বছর ধরে এদেশে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের একটা প্রধান দিক স্ত্রী-শ্রম নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। অন্য কথায়, অধিকাংশ উদ্বাস্তু কিংবা অন্য ধরনের মধ্যবিত্ত পরিবারকেই তার কর্মক্ষম স্ত্রী-সভ্যদের উপার্জন ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে। এদেশে অবশ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা অন্তত ৭৫ বছর আগেই জীবিকা উপার্জনের জন্য চাকরি করতে

শুরু করেছিলেন (স্টেট্স্ম্যান ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ দ্রষ্টব্য)। তথাপি উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টির আগে অথবা সম্প্রতি-কালের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের শোচনীয় আর্থিক অবনতির আগে স্ত্রীলোকের নিয়োগ বিষয়ে জাতীয় স্তরে কোন চিন্তার গভীর কারণ ঘটেনি। এ ছাড়াও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে পরিবারের আর্থিক সংস্থানের জন্য স্ত্রী-শ্রমিকের অবদান আরো অনেক বেশি। এ'রা আবার প্রায়শই অব-নিযুক্ত (under employed)। এ'দের জন্য গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে নিয়োগ অবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনার দরকার। সুতরাং নানাদিক দিয়েই অনগ্রসর অর্থনীতিতে শ্রম-বাজেট প্রস্তুতের সময় আলাদাভাবে স্ত্রীলোক নিয়োগের গুণগত সমস্যাগুলি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে হিসেব রাখবার যুক্তি সহজেই উপলব্ধিযোগ্য।

আগেই বলেছি ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক নিয়োগের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনো ভালো রিপোর্ট কিংবা আলোচনা দেখা যায়নি। ১৯৪৫-এ এম্প্লয়মেণ্ট সার্ভিস চালু হবার পর প্রাক্তন স্ত্রী-কর্মীদের নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। দেশ বিভাগের পর স্বাভাবিক কারণে এই প্রতিষ্ঠানে নাম লেখানর হার বেড়ে গিয়ে ১৯৫৪ সালের শেষে ৩৩০০০০ জন স্ত্রীলোক দাঁড়ায়। একই সময়ে এ'দের মধ্যে ১২০০০০ জনের জন্য চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়। পরবর্তীকালে নিয়োগ ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য স্ত্রী-শ্রমের যোগান আরো অনেক দ্রুত হারে বেড়েছে। ১৯৫৩ সালে যেখানে মাসে ৪২৫৬ জন স্ত্রীলোক নাম লেখাতেন, ১৯৫৭ সালে সেখানে তাঁদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৮৫৬৩। ফলে ১৯৫৩ সালে যেখানে নিয়োগ বিনিময় ব্যবস্থার (employment exchange) মারফত নাম-লেখানো মেয়েদের ২৩% কর্ম-সংস্থানের আশা রাখতেন, ১৯৫৭ সালে সেখানে তাঁদের মাত্র ১১% অনুরূপ আশা রাখতে পেরেছেন।

খুব সম্প্রতি ভারতবর্ষের স্ত্রী-নিয়োগ সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যানমূলক পর্যবেক্ষণ (survey) হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯০১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সময়কে নেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে মোটামুটি-ভাবে স্ত্রী নিয়োগের মোট সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে, যদিও দেশের মোট স্ত্রী-সংখ্যার অনুপাত হিসেবে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের পরিমাণ কমেছে। গত দশ-পনেরো বছর যাবৎ স্ত্রী-সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধির ফল ছাড়াও অন্য অনেক কারণে এই অনুপাতের পতন ঘটে থাকতে পারে। বৃটেনে কোন কোন সময় স্ত্রী নিয়োগের এই অনুপাত কমে

যাওয়ার কারণ হিসেবে আপেক্ষিক বার্ধক্য এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতিকে দেখান হয়েছে। খুব অনুল্লেখ্য স্তরে এদেশেও এই কারণগুলির প্রয়োগ-যোগ্যতা থাকা সম্ভব। কিন্তু এর সাহায্যে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা চলে না। আসলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক কারণে স্ত্রী নিয়োগের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। খনি-শিল্পে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মজুরির আবশ্যিক সমতার আইন এই শিল্পে স্ত্রী নিয়োগের অনুপাত কমিয়েছে। অন্য কতকগুলি উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্র-প্রযুক্তির (mechanisation) ফলে স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপযুক্ত অনেক কাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ ধরনের কাজ এবং দিনের বিশেষ বিশেষ অংশে কাজে নিযুক্ত থাকা আইনত মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কিছুটা স্ত্রী-নিয়োগের অবনতি হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য চটকলে স্ত্রী-নিয়োগের সাম্প্রতিক অবনতি সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা উপযুক্ত নয় বলে এ প্রসঙ্গে আরো অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

যদিও অবশ্য সাধারণভাবে স্ত্রী-নিয়োগের অনুপাতের নিম্নগতি হয়েছে তথাপি কোন কোন শিল্পে কিছুটা উন্নতিও লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে তামাক এবং রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্প উল্লেখযোগ্য। চিনাবাদাম সংক্রান্ত শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের ৮১%-এর চেয়েও বেশি স্ত্রীলোক। আরো কিছু কিছু শিল্পও প্রধানত স্ত্রী-শ্রমিকদের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশলাইয়ের কারখানায়, ইঁট তৈরীর কাজে, চাল ছাটাই ইত্যাদির কাজে স্ত্রী-শ্রমের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য রিপোর্টের দৃষ্টান্তে স্ত্রী-শ্রম সম্বন্ধে ক্রমশ অধিকতর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারী ও বেসরকারী উভয় স্তরেই উপলব্ধ হবে এটা আশা করা উচিত। স্ত্রী-শ্রমিকদের সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে সবরকমের তথ্য সংগ্রহ মূল্যবান কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি এই তথ্য সমষ্টিকে শ্রম-বাজেটের বিশিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহার করা না যায় তবে এর উদ্দেশ্য অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অর্থ-নীতিক অঞ্চলে (Sector), বিভিন্ন শিল্পে এবং বিভিন্ন পেশায় স্ত্রী-শ্রমের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে পেশা-পছন্দ (job preference) বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করা শ্রম-বাজেট তৈরীর পথে প্রথম এবং প্রধান ধাপ।




### রাগ-বিদ্যা

মিয়াঁ তানসেন কত রকম রাগ গান করতেন ও আলাপ করতেন, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সমাচার ছিল পুত্র-বংশীয় গুণী বিশেষজ্ঞদের অধিকারে; যদিও ব্যাপারটি সাধারণের প্রকাশগোচর ছিল না, অন্তত তিন-চার পুরুষের মধ্যে। সেই তিন-চার পুরুষের মধ্যে, অনুমান হয় পুত্র-দৌহিত্র বংশের ছেলেমেয়েদের বিবাহের ফলে দৌহিত্রবংশের গুণীরাও আইনত ঐ সকল লাভ করেছিলেন। তবুও এ সমস্ত খবর বাইরে প্রচারিত হয়নি; অন্তত সদারঙ্গজীর আবির্ভাবের পূর্বে নয়। ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের বিবৃতি বিশ্বাস করে মনে করতে বাধ্য হয়েছি—ছঙ্গে খাঁ সদারঙ্গজীর শিষ্য হয়ে, বিশেষ করে আলাপ-বিদ্যার শিষ্য হয়ে সেই সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তানসেনের বক্তের বাইরে ঐ প্রথম শিষ্য রাগবিদ্যার অধিকারী হয়েছিলেন। ছঙ্গে খাঁর পুত্র বংশানুক্রমে বদল খাঁ সাহেবের কাকা এবং পরে বদল খাঁ সাহেব ঐ বিদ্যার সমাচার লাভ করেছিলেন। পশ্চিমা শাখার আধুনিক ধুরন্ধর মৃত অমৃতসেনজী (জন্ম ইং ১৮১৩, মৃত্যু ১৮৯৩ সাল) জানতেন বদল খাঁর পূর্ব-পুরুষেরা সেনী রাগবিদ্যার গূঢ় সমাচার লাভ করেছিলেন। অমৃতসেনজী বদল খাঁকে ও শ্যামলালজীকে ভালবাসতেন ও খাতিরও করতেন ঐ কারণে যদিও বদল খাঁ সাহেব তাঁর থেকে অনেক ছোট ছিলেন। অধিকন্তু—পণ্ডিত স্বর্গীয় সুদর্শন শাস্ত্রী অমৃত-সেনজীর সাক্ষাৎ শিষ্য হয়েছিলেন এবং সেনী ঘরে সংরক্ষিত রাগ-রূপের সমাচার লাভ করেছিলেন। এই দুই ধারায় তান-সেনীয় রাগ-সমাচার বাইরে প্রকাশ লাভ করেছিল। অবশ্য, রামপুর নিবাসী ওস্তাদ ফিদা হুসেন খাঁ (সরোদ-বাদক) রাগবিদ্যা পেয়েছিলেন, এ কথা তাঁর নিজ মুখে শুনেছি এবং বদল খাঁ সাহেবের মুখেও শুনেছি। কিন্তু ইনি ঐ বিদ্যা কোনও শিষ্যকে দিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি।

আশ্চর্য কথা, তানসেনের পুত্র-দৌহিত্র-বংশের কোনও গুণী এ পর্যন্ত কোনও গ্রন্থ লিখে রাগ-বিদ্যার সমাচার প্রকাশ করেননি! অথচ উত্তর ভারতে তানসেনের অতিরিক্ত ঘরে বা গোষ্ঠীতে কতো মজার মজার রাগ-ভেদ, নামভেদ ও মতভেদ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে আসছে তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য! ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ সাহেবকে এই নাম-রূপ ভেদ প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি—ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব বলতেন, কোয়েলের বুলি সর্বত্র একই রকম, কিন্তু মণ্ডুকদের বুলি হাজার রকমের!

তানসেনের সময়ে উত্তর ভারতের গায়ক-বাদকের মধ্যে যত রকম রাগ প্রচলিত ছিল, তানসেন সেই সমস্ত রাগই গান করতেন বা চর্চা করতেন, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নেই। বরং পশ্চিমা শাখার ইতিবৃত্তধারক বলেন, কম-বেশী একশ' আট রকমের রাগ তানসেনীয় ধ্রুবপদ ও সেনী রাগবিদ্যার নিয়ম-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পশ্চিমা শাখার বিশেষজ্ঞ ইতিবৃত্ত-কারেরা যা বলেন তার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। পুত্রবংশের গুণীদের, বিশেষত বীণা রস-বীণ সেতার বাদ্যশিল্পীদের মধ্যে এমন প্রচুর রাগ-রূপ ছিল এবং এখনও আছে, যা তানসেনের কাল থেকে এ পর্যন্ত কালে নাম-রূপে পরিবর্তন লাভ করেনি। ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, পুত্রবংশীয় গুণীরা পশ্চিম দেশের অপেক্ষাকৃত শান্ত নিভৃত পরি-বেশের মধ্যে তানসেন পরিকল্পিত নিয়ম-পদ্ধতি দিয়ে 'সেনী' ধ্রুবপদ আলাপ ও গৎ-এর বাহনে তানসেনীয় রাগ-রূপগুলির ঐকান্তিক চর্চা করতে পেরেছিলেন। বীণা-গৎ ছিল এই সেনী-শাখার বিশিষ্ট ঐতিহ্য। রাগবিদ্যার নিয়ম-পদ্ধতি অবহেলা করে একমাত্র খেয়াল বা খাম-খেয়ালীর বশে তাঁরা অভিনব রাগ-রূপ তৈরী করতে প্রয়াসী হননি। কারণ, সাধারণ মাইফেল বা সঙ্গীত-দংগলে নিজের প্রাধান্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নূতন একটা কিছু করে দেখাতে হবে, এরকম মনোভাব তাঁদের ছিল না; এখনও নেই।

সার কথা—আঠার ঠাট্ এবং জানু-মকানু-ডৌলের নিগড়ে মিয়াঁ তানসেন যে শতাধিক রাগ-রূপ নির্বাচিত করে বেঁধে দিয়েছিলেন, পুত্র বংশের গুণীদের মধ্যে সেই নাম-রূপ-নিশানার রাগগুলিই গত তিনশ' বৎসরে প্রচলিত ও অপরিবর্তিত রয়েছে; এবং অভিনবের উদ্ভব হয়নি। দৌহিত্রবংশের গুণীদের পক্ষেও ঐ একই

কথা বলা যায়; তবে,—পরিস্থিতির প্রভাবে এ'রা বাইরে থেকে অভিনব রাগ-রূপ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, নতুন ধ্রুবপদ রচনা করেছিলেন, খেয়াল রচনা করেছিলেন, ধামার রচনা করেছিলেন, এমন কি ঠুমরীও রচনা করেছিলেন; যার প্রমাণ আছে। যাই হ'ক —পুত্র-দৌহিত্র বংশের মূলে রাগ-বিদ্যা-পরিভাষায় মতভেদ হয়নি এপর্যন্ত। সব কোকিলের বুলিই একরকম।

ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের সঙ্গে প্রাচীন রাগ-রূপের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—রাগ-রূপ একটু আধটু বদলে গেলে ক্ষতি কি? তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—কিছুমাত্র ক্ষতি নেই! তবে নামটাও বদলান উচিত। রূপ বদলে দেওয়ার খেয়াল আছে অথচ নাম বদলে দেওয়ার হিক্‌মত্-হিম্মৎ নেই,—এত' বিলকুল ওয়াহিয়াদ! আরে ভাই! তোমরা যে এক 'বিভাস' নামকে তিন ঠাটের ঘাস খাওয়াচ্ছ,—এটা কি লজ্জার কথা নয়! যদি রূপ বদলে দেও ত' নামও বদলে দেও। আমার এত বয়স হয়ে গেল, এত দেখলাম আর এতই শুনলাম। কিন্তু এমন অদ্ভুত বোকামি ত' দেখলাম না, যা তোমরা বলছ আর চালু করছ! কাশ্মীরে সেব (আপেল্ ফল) হয়, বাংলা দেশে আমরূদ (পেয়ারা) হয়। সেব আর আমরূদে আকাশ-পাতাল ফারাক। তবে কি বলতে হবে—সেব্ হ'ল কাশ্মিরী ঠাটের আমরূদ! না কি আমরূদ্ হল বাংলা ঠাটের সেব্! লাহল-ওয়ালাকুবত্! আমাদের বাপ-দাদারা কখনও এরকম খাম-খেয়ালীর প্রশ্রয় দেন নি। তানসেনজীর বেটা-বেটীর ঘরে কখনও এরকম ফসাদি বাত পয়দা হয়নি!

কথাটি গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়েছিল —কল্যাণরাগের ধ্রুবপদ 'হিরণ জটিত রতন' নামে গানের সুরে আর ভূপালী রাগের ধ্রুবপদ "বাণী চারোঁকে বেওহার" নামে গানের সুরের উপর। মিয়া তানসেনের পুত্র-বংশে জন্মগ্রহণ করার দাবী নিয়ে একজন "খাঁ" সাহেব "স র গ প ধ" দিয়ে শুদ্ধ কল্যাণ, আবার "স র গ প ধ ন" দিয়ে শুদ্ধ কল্যাণ, এবং তৃতীয়বার—"স র গ ম প ধ ন' দিয়ে সেই শুদ্ধ কল্যাণ তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে গিয়েছেন এবং শিষ্যরাও বিভিন্নত স্বীকার করে নিয়েছেন! আবার—"বাণী চারোঁকে বেওহার" গানের সঞ্চারিতে "স র গ ম প ধ ন" সরগম্ থাকা সত্ত্বেও গানটি ভূপালী বলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং নির্বিবাদে চালু হয়েছে! এই হ'ল "ফসাদি বাত্" অর্থাৎ ফ্যাসাদ্। বদল খাঁ সাহেবের কথা হ'ল—মিয়াঁ তানসেনের ঘরে এরকম ফ্যাসাদ্ সৃষ্টি হয়নি। মিয়াঁ তানসেন বোকা ছিলেন না; তাঁর বেটা-বেটির ঘরে গুণীরাও বোকা ছিলেন না। তবে—এই গুণীরা দায়ে পড়ে বোকাদের চরিয়েছিলেন, কারণ—বোকারা চরে খেতে চায়! ঠিক এই একই কথা ওস্তাদ্ ফিদা হুসেন খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছি জয়জয়ন্তী রাগ প্রসঙ্গে আর ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছি ইমন আর বেলাবল ঠাট প্রসঙ্গে।

আমরা ধরে নিতে পারি—মিয়াঁ তানসেন তাঁর জামাই নৌবাত্ খাঁকে বোকা চরাননি। দৌহিত্র বংশের গুণীরা নিজেদের মধ্যে 'সেনী' বিদ্যাপদ্ধতির অনুগত ছিলেন। কিন্তু—নবাবমন্য শিষ্যদের মন রাখার জন্য তাঁরা হাতের সুতো ঢিলে করে দিয়েছিলেন। যার ফলে—আধুনিক কালে পঞ্চম ঠাটের বসন্ত, পূরবীঠাটের বসন্ত, মারবা ঠাটের বসন্ত—অর্থাৎ একই নামে তিনটি বিভিন্ন রাগ—ভারতীয় সাংগীতিক-সংস্কৃতির বাহনে স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রচলিত মতের তামাশা ও হাল-চাল দেখে একজন ধ্রুবপদ গায়ক চরম রসিকতা করে গিয়েছেন। "মআরিফ্-উন্-নগমাত" নামে উৎকৃষ্ট স্বরলিপি গ্রন্থে (প্রথম

সংস্করণ ইং ১৯২৪ সাল, লখ্‌নউ কেসরী-দাস সেঠ সুপারিনটেন্ডেন্ট কর্তৃক নবল-কিশোর প্রেসে মুদ্রিত; দ্বিতীয় ভাগ) সংগ্রাহক জনাব মৃত মুহম্মদ্ নবাব আলী খাঁ স্বয়ং গায়ক মুম্মে খাঁর নিকট প্রাপ্ত একটি বসন্ত রাগের হোরীর অবিকল উত্তম স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। এই বসন্ত রাগটি টোড়ি ঠাটের সন্তান! নবাব আলী



খাঁ সাহেব রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নেই! এর পরে, কেউ যদি ভৈরবী ঠাটে ইমন রাগ তৈরী করে গান বাঁধেন, তাহ'লে আধুনিক কেতাবী সংস্কৃতির পক্ষ থেকে কেউ কিছু আপত্তি করতে পারবেন না। নবাব আলী খাঁ সাহেব আমার গুরুদেব শ্যামলালজীর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, এবং স্বর্গীয় গণপত রাও ভাইয়া সাহেবের শিষ্য হয়েছিলেন; ঠুমরী গানের বিদ্যায়। তিনি কত দুঃখে ঠুমরীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং কিরকমের রসিকতা করে ঐ টোড়ি ঠাটের বসন্তটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, একথা তাঁর আধুনিক জীবনী-লেখকেরা বুঝতেই পারেন নি।

তানসেনের সমকালে এমন বহু গুণী ছিলেন, যাঁরা বাঁধা-ধরা ধ্রুবপদ গান করতেন এবং কিছু অনিয়তভাবে আলাপও করতেন। কোনও অভিনব রাগ রচনা করার উচ্চাভিলাষ থাকলে, সেই গায়ক বা বাদককে সকলের আগে একটি ধ্রুবপদ গান বেঁধে সেই রাগকে রূপায়িত করতে হ'ত। সেই রূপটি বিশেষজ্ঞ শ্রোতাদের মনোরঞ্জক হ'লে তবে সেই অভিনব রাগটি মনজুর হ'ত এবং গায়ক বা বাদকের খ্যাতিও হ'ত। ইতিবৃত্তকারেরা বলেন, মিয়াঁ তানসেন ও বীরবল মিলে ঐ প্রথাটি উদ্ভাবিত করেছিলেন, আকবরের দরবারে মজালসের পক্ষে। সব গুণীর মনে নূতন কিছু রাগ-রচনা করার সাধ আহ্লাদ জাগে। অথচ প্রত্যেক গুণীর প্রত্যেক অভিনব-রাগের চেষ্টা সফল ও সুন্দর হবে এমন কিছু নিয়মও নেই। এবং আলাপ আরম্ভ করলে কতক্ষণে শেষ হবে, এ বিষয়েও কোনও হদিস নেই; বিশেষ করে অনিয়তভাবে আলাপকারীর পক্ষে। প্রত্যেকেই যদি নূতন রাগ জাহির করার উদ্দেশ্যে দরবারে বসে আগেই "তোম তায় নোম্" আরম্ভ করেন তাহ'লে দরবারের আয়ু রক্ষা হয় না। এই হেতু ঐ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ—ধ্রুবপদ গানটি আগে জমুক; গানটি তৃপ্তিদায়ক হ'লে সেই ভরসায় শ্রোতারা আলাপ শুনতে পারেন। এর অন্য একটি সুফলও ফলেছিল। সমস্ত ধ্রুবপদ গায়কই যে নিজস্ব ধ্রুবপদ রচনা করতে পারতেন এমন মনে করা যায় না। ফলে যাঁরা ধ্রুবপদ বিদ্যা জানতেন না, তাঁদের পক্ষে নূতন রাগের রূপটি ধ্রুবপদে জাহির করা অসম্ভব ছিল। অথচ আলাপ করবার সুযোগ পেলেই তাঁরা তৎক্ষণাৎ "তোম্ তায় নোম" শুরু করতেন। অভিনব রাগ সৃষ্টি করার বা জাহির করার বা জাহির করে শ্রোতাদের উৎপীড়ন করার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; অন্ততঃ দরবারী মাইফেলে।

এই রকম করে তানসেন রাগ-বিদ্যা ও ধ্রুবপদ-বিদ্যার গাঁঠ-ছড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। মিয়াঁ তানসেন নিশ্চয় জানতেন তাঁর ছেলেরা তাঁর মত' প্রতিভাবান নয়। এদের হিতের জন্যই মিয়াঁ তানসেন রাগ-বিদ্যার দু'কুড়ি সাতের খেলা বজায় রাখার যোগ্য তালিম-কানুন করে দিয়েছিলেন। দু'কুড়ি-সাতের নিয়ম দিয়ে এরা গান-রাগের হোমানল জ্বালিয়ে রাখতে পারবে। বুদ্ধি ও অনুভব থাকলে নূতন রাগ ও ধ্রুবপদ গানও দু' চারখানি তৈরী করতে পারবে। তার উপরে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা থাকলে ত' কথাই নেই! হোমানলের শিখায় প্রতিভার আলো দেখা দেবে, সমস্ত ধূম তখন অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

এ রকম কথা খুবই ভাল; খুবই সত্য। অন্ততঃ সদারঙ্গজীর কীর্তি স্মরণ করার যোগ্য। সর্ব সম্প্রদায়ের পক্ষেই একথা খাটে। কিন্তু গোলমাল আরম্ভ হয়, কাঁচা কাঠে হোম করলে। আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই বেশী হয়।

তানসেনের প্রকল্পিত ঠাট-রাগ-মকান-জান-ডৌল নামে পদ্ধতি পরিভাষাই ছিল একমাত্র গুরুমুখী বিদ্যা যা দিয়ে কাঁচা কাঠকে শুখিয়ে পোড় খাইয়ে পাকা করা হ'ত। প্রতিভার উদয় হ'ক, না হ'ক, আগুনটা জ্বলত দাউ-দাউ করে', ধোঁয়াও কম হ'ত। পণ্ডিত স্বর্গীয় সুদর্শন শাস্ত্রীর রচিত "সংগীত সুদর্শন" গ্রন্থের পাঠ থেকে সুধী পাঠক বুঝতে পারবেন কি রকম পোড় খাইয়ে কি রকম কাঠ তৈরী করা হ'ত হোমের জন্য।

যথার্থই,—গত তিনশ' বৎসর থেকে তানসেন বংশের গুণীরাই প্রধান ভাবে রাগ-বিদ্যার পুট-পাক করে এসেছেন। ইতিবৃত্তকারদের বিবরণ থেকে বলা যায়—গড়ে প্রতি একশ' বৎসরে এই বংশ থেকে পাঁচজন করে অনন্যসাধারণ গুণী উদিত হয়েছেন; ধ্রুবপদে বা বীণায় বা সেতারে বা রবাবে। তানসেনীয় বংশের গুণীরা বংশের বা রক্তের বাইরে কত সংখ্যক গান-বাদন শিল্পী তৈরী করেছেন এবং এই বাহিরাগত ধারার মধ্যে কি পরিমাণে অনন্যসাধারণ শিল্পী তৈরী হয়েছেন—এর হিসাব এখনও করা হয়নি।

তানসেনীয় রাগ-বিদ্যা একান্তই বাস্তব ও ব্যবহারিক দৃষ্টি দিয়ে তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে দার্শনিক কচকচি বা কূটতত্ত্ব একেবারেই নেই। অলৌকিক রহস্যের অবতারণার যোগ্য ভূমি বা রান্-ওয়ে কিছু-মাত্র নেই। এবং ইং সতের, আঠার, উনিশ ও বিশ শতাব্দীর মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীত-শাস্ত্র রচিত হয়েছে, তাদের অধিকৃত বিষয়-প্রকরণের সঙ্গে তানসেনীয় রাগ-বিদ্যার লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।

তানসেন বংশের গুণী ও শিষ্যরা তানসেনের অন্তরঙ্গ জীবন ও অবদানকেই শাস্ত্র মনে করে এসেছেন। নূতন করে শাস্ত্র লিখবার প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁরা।

(ক্রমশঃ)

# প্রবাসের জার্নাল

**শিবনারায়ণ রায়**

॥ ২ ॥

**কো**ন জাতি বা সভ্যতার সামান্যলক্ষণ বিষয়ে জানবার একটা স্বীকৃত রীতি হোল সেই সভ্যতার অন্তর্গত নয় অথচ তার সঙ্গে পরিচিত অন্য কোন জাতির মানুষদের মনে সে সভ্যতা কি প্রতিচ্ছবি ফেলেছে তার খোঁজ নেওয়া। দূর থেকে প্রতিটি গাছের আলাদা খুঁটিনাটি চোখে পড়ে না, কিন্তু অরণ্যের চেহারাটা ত ধরা পড়ে। অধ্যাত্মমুখীনতা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, একথাটা কি পশ্চিমী পণ্ডিতদের আবিষ্কার নয়? আমরা ভারতীয়রা যারা রুজিরোজগারের ধান্দায় ব্যস্ত, পূর্বপুরুষদের নির্দায়িত্ব প্রজনন-প্রক্রিয়ার প্রাচুর্যে বিপর্যস্ত, তাদের পক্ষে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব হত, যদি না সে খবরের খোঁজ দেওয়া থাকত ভুরি ভুরি বিলেতী কেতাবে? অথবা এশিয়া-ইউরোপের মানুষদের ধারণার আরশিতে নিজেদের মুখ না দেখলে মার্কিনী সভ্যতার প্রাচুর্য-পারিপাট্য, বয়ঃপ্রাপ্তিতে অনিচ্ছুক, নিষ্পাপ, দাক্ষিণ্যপ্রবণ আত্মম্ভরিতা বিষয়ে কজন মার্কিনী স্ত্রী-পুরুষের সচেতন হবার সম্ভাবনা ছিল? ফরাসীরা যে ঝুঁকিঝামেলা এড়িয়ে মাতব্বরী করতে ভারী ওস্তাদ, এ খবরটা প্রতিবেশী জার্মানদের চাইতে কে ভাল জানে? এবং জার্মানদের মন পর্যন্ত যে উদ্দী আঁটা, হিটলারের অভ্যুদয়ের ঢের আগেই সে বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল ফ্রান্সে আর ইতালীতে।

অবশ্য বিদেশী মনে অপর দেশ সম্বন্ধে এই যে সাধারণ ধারণা, তা কিছু আর পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। জ্ঞানের স্বল্পতার ফলে যা জটিল তার অতিরিক্ত সরলীকরণের ভয় ত আছেই (ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য কিম্বা কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে যার পরিচয় আছে সে কি শুধু বেদান্ত-দর্শন অথবা স্মৃতিশাস্ত্রকে হিন্দুমনের প্রধান প্রতিনিধি ভাবতে পারে?) তা ছাড়া একদেশ এবং অন্য দেশের মধ্যে সংঘাত, রেষারেষি, ঈর্ষা কিম্বা ভয়ের সম্পর্ক থাকার কারণে পারস্পরিক ধারণায় সত্যের বিকৃতি ঘটা খুবই সম্ভব। আর তা যে হামেশাই ঘটে থাকে, ঘটছে, জাতীয়তা-বাদের ইতিহাস এবং সমাজ বিশ্লেষণের সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁদেরই সেটা জানার কথা। তবু সরলীকরণ এবং বিকারের পেছনে যে কিছুটা সত্য থাকে না তা নয়; একটু বিচার করে তাকে বার করতে হয়।

এখন ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের মনে মোটামুটি যে সব সংস্কার আছে, সেগুলো ভারতীয়দের অজানা নয়। জন বুলের স্বীপবদ্ধ আন্তর্জাতিক ঠাট্টা-মস্করার অক্ষয় উৎস; তা ছাড়া ইংরেজ রক্ষণশীল, হিসেবী, বেনের জাত, তার অনুভূতি ভোঁতা এবং কল্পনার দৌড় খাটো; যুক্তিনিষ্ঠ না হওয়ার ফলে তার ভাবনাচিন্তায়, আদর্শে আচরণে গোঁজামিলের অন্ত নেই—এসব কথা ছেলেবয়েস থেকে শুনে আসছি। কথাগুলো প্রধানত আইরিশ, ফরাসী ও জার্মানদের রচনা এবং রটনা। এবং যদিও উক্ত সমালোচকরা নিজেদের দেশে সামাজিক বা রাজনৈতিক তাপমাত্রা একটু বেশী ওপরে চড়লেই পালিয়ে এসে বিলেতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন এবং যদিও উক্ত সমালোচনার পেছনে

ঈর্ষার ক্রিয়া একটু বেশীভাবেই স্পষ্ট, তবু বিলেতী সভ্যতার সঙ্গে বিশ বছরের পরোক্ষ জানাশোনা এবং কয়েক মাসের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে একথা স্বীকার না করে পারব না যে, এসব অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। এমন কি এটাও আমার মনে হয়েছে যে, এই সব ধারণাগুলোকে খানিকটা যাচাই করে নিলে এদের মধ্যেই হয়ত ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ মিলতে পারে।

কিন্তু সে নির্দেশ আমার চোখে যেভাবে দেখা দিয়েছে ইংরেজী সভ্যতার অনেক সমালোচকই সম্ভবত তার সঙ্গে একমত হবেন না। আমার ধারণায় ইংরেজ চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : তার চিন্তা মুখ্যত অবরোহী নয়, আরোহী; তত্ত্ববিলাসী নয়, তথ্যসন্ধানী; সত্তার চাইতে অস্তিত্ব বিষয়ে তার আগ্রহ সর্বাধিক; নিত্য, শাশ্বত, 'বিমূর্ত' কল্পনার চাইতে স্থান-কালপাত্রে নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষে তার বেশী আস্থা। ইংরেজ অভিজ্ঞতাবাদী এবং বস্তুনিষ্ঠ; অপরোক্ষানুভূতির নামে প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতায় ব্রহ্মজ্ঞান আরোপে তার একান্ত অনীহা; দর্শন-প্রতিশ্রুত ঐক্যের আকর্ষণ যত প্রবল হোক, সাধারণ বুদ্ধিতে প্রতিভাত বহুবাচনিকতাকে স্রেফ কল্পনার জোরে উড়িয়ে দিতে সে নিতান্ত গররাজী। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে এটাই ইংরেজ-চরিত্রের একটি প্রধান সামান্য এবং বিশিষ্ট লক্ষণ।

কথাটা কিছু বিশদ করা যেতে পারে। এক ধরনের মন আছে (আমরা ভারতীয়রা এর অনুশীলনে প্রায় অদ্বিতীয়) যা জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে প্রথমেই কতগুলো প্রত্যয় খাড়া করে নিয়ে তারপর সব অভিজ্ঞতাকে তারি সূত্রে ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত। এ প্রত্যয়গুলো যদিও অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ থেকেই উদ্ভূত, তবু এ ধরনের মন সচরাচর সে কথা স্মরণে রাখে না। অভিজ্ঞতানির্ভর ধারণামাত্রই পরিবর্তন এবং পরিশোধন সাপেক্ষ, নতুন অভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে তাদের পদে পদে যাচাই করার প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু কোন প্রত্যয় বা প্রত্যয় সমষ্টিকে যদি গোড়াগুড়িই স্বতঃসিদ্ধ, অপরিবর্তনীয় এবং প্রমাণোধ্র্ব বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে বারবার প্রশ্ন এবং যাচাইএর ঝামেলা থাকে না। নতুন কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মোলাকাতের ফলে যখন অভ্যস্ত প্রত্যয়ে চিড় খাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন এই ধরনের মন, হয় সে অভিজ্ঞতাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চায়, আর নয়ত কল্পনার সাহায্যে সেই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার চেহারাটাকেই পালটে নিয়ে অভ্যস্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই মনোভাবের মোটামুটি ফল অনুমান করা কঠিন নয়। প্রথমত এর ফলে জ্ঞান গণ্ডিবদ্ধ হয়; জ্ঞানের যা প্রধান উৎস সেই প্রশ্নশীলতা শীর্ণ হয়ে আসে; জীবন এবং জগতের বিচিত্র তথ্যাবলীর অনুসন্ধানে মন পরাঙ্মুখ হয়ে ওঠে; নতুন তথ্যের অভাবে জ্ঞানের বিকাশ স্তব্ধ এবং মননক্রিয়া বাগ্‌বৈখরীতে পর্যবসিত হয়; তথ্যভীরু কল্পনা প্রমাণের দায়িত্বহীন তাত্ত্বিকতায় আশ্রয় খোঁজে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের দারিদ্র্য এবং জিজ্ঞাসার শীর্ণতার ফলে জীবনে স্থবিরতা আসে; পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানোর বদলে পরিবেশের দ্বারাই মানুষ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে; অবস্থার উন্নয়নের সম্ভাবনা কমে আসে; সৃষ্টিশীলতার সামর্থ্য ক্ষীণতর হয়; আত্মনিগ্রহে মানুষ পরমার্থ খোঁজে। তৃতীয়ত, প্রত্যয়কে প্রমাণোধ্র্ব ধরে নেওয়ার ফলে মন প্রশ্নের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, সব রকম জিজ্ঞাসাকে জোর খাটিয়ে দমন করতে চায় এবং সেই অসহিষ্ণু প্রত্যয়ের সমর্থনে সমাজে কোনো না কোনো ধরনের রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এ অবস্থায় কোন ব্যাপক রূপান্তর ঘটাতে হলে জবরদস্তির পাল্টা জবরদস্তি এবং বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায় আর সহজে চোখে পড়ে না।

বস্তুনিষ্ঠ, অভিজ্ঞতাবাদী, তথ্যান্বেষী বা আরোহী মনের ক্রিয়া এর ঠিক উল্টো। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তুলনা-বিশ্লেষণ করে সাধারণ সূত্রে তাদের সান্নিবিষ্ট না করা পর্যন্ত জ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী মন সূত্র কল্পনা করার সময়েই মেনে নেয় যে, অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি সূক্ষ্মতর হলে অথবা অভিজ্ঞতার পরিধির প্রসার ঘটলে সে সূত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এমন কি পরিত্যাগ প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিশেষ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা সেও অবশ্যই করে থাকে। কিন্তু যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণের পর যদি দেখা যায় যে, সে অভিজ্ঞতাকে পূর্ব-সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহলে নতুন অভিজ্ঞতাকে অস্বস্তিকর বলে অগ্রাহ্য না করে সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারের দায়িত্ব সে মেনে নেয়। আজগুবি কল্পনার সাহায্যে নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকা দিয়ে সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান হিসেবে উপস্থিত করায় ঐতিহ্যে বস্তুনিষ্ঠ মন আস্থাহীন। তার কাছে অস্তিত্বই হল আদি এবং একমাত্র সত্য, তার সত্তা হল সেই অস্তিত্বকে বোঝবার জন্য বুদ্ধির প্রয়োগজাত প্রতীকী সামান্য কল্পনামাত্র। আরোহী বুদ্ধি একধারে অস্তিত্বের বিচিত্র উপাদানের নিত্যনূতন আবিষ্কারে ব্যাপৃত; অন্যধারে সেই সব উপাদানের সংশ্লেষ বিশ্লেষের উপায়-পদ্ধতির উন্নতি সাধন তার ব্রত। নিজের ধারণার অসম্পূর্ণতা এবং পরিবর্তনগ্রাহ্যতা বিষয়ে সচেতন থাকার ফলে সমালোচনা, বিকল্পপ্রত্যয় অথবা প্রতিবাদী জিজ্ঞাসাকে এ মন শুধু সহ্য করে না, আন্তরিকতাকেই স্বাগত করে। ফলে জ্ঞান ধীরে ধীরে বিবর্ধমান এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে; আগন্তুক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মোকাবিলা ঘটলে বুদ্ধি বিব্রত বা সন্ত্রস্তবোধ করে না; ব্যক্তি অথবা সমাজজীবনের রূপান্তরে বল-প্রয়োগ অথবা বিপ্লব শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়। এক ধারে জ্ঞানের সমৃদ্ধির ফলে যেমন পরিবেশের ওপর দখল বাড়ে এবং মানুষদের সাধারণ অবস্থার উন্নতি ঘটে, অন্যদিকে তেমনি সে জ্ঞান প্রশ্নবিমুখ না হওয়ার ফলে সমাজ তার নিজের গণ্ডীর বাইরে থেকে পুষ্টি আহরণে অপারগ হয় না এবং তার নিজের গণ্ডির ভেতরকার মানুষদের বহুমুখী জিজ্ঞাসাকে স্বভাবতই প্রশ্রয় দেয়।

আমার ধারণা, ইংরেজী সভ্যতায় এবং ইংরেজ চরিত্রে উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকৃতির

মনোভাব যত ব্যাপক এবং দৃঢ়মূল এমনটি সম্ভবত আর কোন আধুনিক সভ্যতা বা জাতির মধ্যে দেখা যাবে না। কিভাবে, কত দিনে এই মনোভাব ও-দেশে মানুষদের মধ্যে গড়ে উঠেছে বলা শক্ত। ব্রিটেনের ইতিহাসের আদিপর্বে অর্থাৎ কেল্টিক যুগ থেকে শুরু করে নর্মান যুগ পর্যন্ত এর চিহ্ন ত বড় একটা চোখে পড়ে না। এর কিছু যেন প্রথম আভাস মেলে চসারের কবিতায়। কিন্তু এর পোষণ, বর্ধন এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপরে এর ব্যাপক প্রভাবের জন্যে আমাদের আসতে হবে টিউডর যুগের শেষ অধ্যায়ে এবং স্টুয়ার্ট যুগে। অনেক দিনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে যে রেনেসাঁসের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের চিৎস্ফূর্তি ঘটেছিল, ইংলণ্ডে তা দেরিতে স্পষ্টতা পেলেও সে দেশের ইতিহাসেই তা বোধ হয় সবচাইতে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এর কারণ নির্ণয় করা কঠিন, তবে দু-একটা সম্ভাব্য সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। জলের ঘের বিলেতকে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও বিলেতের ইতিহাসে পশ্চিম ইউরোপের দুই প্রধান ধারা এসে মিশেছে : দক্ষিণ থেকে লাতিন আর উত্তর থেকে টিউটনিক। হয়ত বা এই দুই বিরোধী ধারার সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা ইংরেজ চরিত্রে বিকল্পবিষয়ে সহিষ্ণুতা এবং পরিবর্তনসহ স্থিতি-স্থাপকতা এনে দেওয়ায় খানিকটা সাহায্য করে থাকবে। দ্বিতীয়ত, বিলেতে নর্মান যুগ থেকেই রাজশক্তি অভিজাত সম্প্রদায়কে দমন করার প্রয়োজনে প্রজাশক্তির সমর্থন লাভে চেষ্টিত এবং তার ফলে একধারে যেমন রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে এদেশে ধীরে ধীরে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে, অন্যধারে সেই ঐক্যের ভিত্তি হয়েছে ক্রমশ সম্প্রসারণশীল গণতান্ত্রিক সংগঠন। অর্থাৎ বিলেতে জাতীয়তাকেই ব্যক্তির অধিকারের স্বীকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত; সমষ্টিগত ঐক্যের নামে ব্যক্তিদের বহুবাচনিক অস্তিত্বের বিলোপ সে দেশে কোনোদিনই জাতীয় আদর্শ বলে গৃহীত হয়নি। তৃতীয়ত, চতুর্দশ শতক থেকেই বিলেতের আর্থিক ব্যবস্থায় কৃষির চাইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরে বেশী ঝোঁক দেওয়া শুরু হয় এবং সতেরো-আঠারো শতকের মধ্যেই এই ঝোঁকের নিহিত নির্দেশগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। এই ঝোঁক না থাকলে বিলেতেই প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটা সম্ভব হত না এবং শিল্পবিপ্লবের ফলেই না আজ ব্রিটেনের শতকরা আশিভাগ লোক শহরে বাস করে। বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামনির্ভর সভ্যতায় জিজ্ঞাসার ক্রিয়া কম, জ্ঞানের বিকাশ গণ্ডিবদ্ধ, কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে শাশ্বত বলে বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি প্রবল, বিভিন্ন বিকল্প প্রত্যয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্ভাবনা অল্প। অন্যধারে নাগর সভ্যতার প্রবণতা অভিজ্ঞতাবাদের দিকে, তথ্যানুসন্ধান তার পক্ষে অপরিহার্য। বস্তুনিষ্ঠার বনিয়াদ ছাড়া উদ্বৃত্ত বাড়ানো অসম্ভব; ব্যক্তির উদ্ভাবনাশক্তি এবং আত্মনির্ভরতা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কিম্বা যন্ত্র-শিল্পের উদ্ভব অকল্পনীয়। এবং শহরের বৈশিষ্ট্যই হল যে, সেখানে দূর দূর দেশের মানুষ বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা-ভাবনা-অভ্যাসের প্রতিনিধি হিসেবে নিত্যনিয়ত আনাগোনা করে। তা ছাড়া গণতন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শহরের সম্প্রসারণের ফলে ঐ ধরনের সমাজে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিজের পৃষ্ঠপোষণা এবং সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে আর মুখ্যত চার্চ বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান কিংবা অভিজাতগোষ্ঠীর ওপরে নির্ভর করতে হয় না। মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানকে ডিঙিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবার তারা সুযোগ পায়; ধর্মীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা-ভাষ্যের বদলে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সমস্যা নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রবণতা তাদের মধ্যে প্রবলতর হয়ে ওঠে; কায়েমী স্বার্থ বা সংস্কারের মন না জুগিয়ে তারা নানা সম্ভাবনার সন্ধান করে এবং প্রয়োগের দ্বারা প্রত্যয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়। বুদ্ধিজীবীদের এই মনোভাব ক্রমে সমাজের অন্যান্য স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে তারই আদলে জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে। আমার ধারণা, টিউডর-স্টুয়ার্টের যুগ-সন্ধিক্ষণ থেকে গত সাড়ে তিন শত বছরের মধ্যে ইংরেজের যে জাতীয় চরিত্র আকার লাভ করেছে, তার আদলটির সব চাইতে নির্ভরযোগ্য সন্ধান মিলবে ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের সাধনার ইতিহাসে—বেকন থেকে শুরু করে হবস-লক্-হিউম-অ্যাডম্ স্মিথ-বেথাম-মিল (পিতা এবং পুত্র) মারফত এ শতকে বার্টাণ্ড রাসেলে যার ধারাবাহিক বিবর্তন।

---

সাতশ পৃষ্ঠার
পূজাসংখ্যা উল্টোরথের
তিনটি উপন্যাস

# তারাশঙ্করের

দেড়শ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ উপন্যাস

**জবানবন্দী**

পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হবে 'জবানবন্দী'র দাম খুব কম করে হবে
সাড়ে তিন টাকা

•

# বনফুলের

দেড়শ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ উপন্যাস

**জলতরঙ্গ**

পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হবে 'জলতরঙ্গের' দাম খুব কম করে হবে
সাড়ে তিন টাকা

•

# মনোজ বসুর

একশ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ উপন্যাস

**বনের মধ্যে ঘর**

পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হবে 'বনের মধ্যে ঘর'-এর দাম খুব কম করে হবে
আড়াই টাকা

পূজাসংখ্যা উল্টোরথের
দাম সাড়ে তিন টাকা

পূজাসংখ্যা উল্টোরথের
সাহিত্যিক পরিচিতিতে
আছেন
**সমরেশ বসু**

প্রেমেন্দ্র - নরেন্দ্র - বিমল মিত্রের
গল্প ছাড়াও
**আরও তিনটি গল্পের**
বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহের দেশে
দেখুন

গ্রামোফোন কোং-এর রেকর্ডিং-অধিকর্তা
**পি, কে, সেনের**
সঙ্গে উল্টোরথ প্রতিনিধির
সাক্ষাৎকার




## সে মেয়েটি?

মণীশ ঘটক

কলকাতায় মেঘ ডাকে; মেঘনার কালো জল কাঁপে,
অশান্ত ঢেউয়ের ফৌজ ওঠে নামে বীর পদদাপে।
গওনা, ঘাসির নৌকো তালে তালে কোমর দোলায়,
মাঝিমাল্লা নিরুদ্বেগ। হুঁকো টানে। ভাটিয়ালি গায়।
মাঝিমাল্লা নিরুদ্বেগ। হুঁকো টানে। ভাটিয়ালি গায়।

ঝিয়ারিরা জলে নেমে নিঃসঙ্কোচে করে জলকেলি,
ঘোমটাবতীরা হাসে জিভ কেটে একচোখ মেলি।
শাউড়ী ননদের দল অনর্গল পরচর্চা রত,
তারি ফাঁকে আড়ি পাতে কলির কানাই হেথা হোথা।

পুষ্টবুক কোনমতে রাঙা গামছায় ঢেকেচুকে
সে মেয়েটি ডুব দেয়। ভেসে ফের ওঠে সকৌতুকে
জলে ভুরভুরি কেটে। কুলকুঁচিতে রামধনু রচে,
ফুলো গালে কালো জলে আবীর ছড়ায় গোছে গোছে।

ঢল নামে। পাড় ভাঙে। স্বপ্ন ভাঙে। মেঘনা মেঙ্গায়,
কলকাতায় মেঘ ডাকে। সে মেয়েটি? সেও চলে যায়॥

## মহাসমুদ্র

দিব্যা রায়

ফোর্ডগাড়ির আগ বরাবর নয়া সড়ক।
স্টীমরোলার আর বোলডার
আর কোলটার।
কী জোরে চলছে ফোর্ডগাড়িটা।
আগ বরাবর নয়া সড়ক,
আর ধোঁওয়ায় ধোঁওয়ায় অন্ধকার পেছনের পথ,
অনেকদূরে ফেলে আসা
সেই অনেক পেছনের পথ।
পীচ কোলটারে গুঁড়িয়ে চেপ্টে যায় সে পথ,
গুঁড়িয়ে যায় পোক মাকড় ফড়িং প্রজাপতি,
আর ছত্রিশগরীয় কুলি কামিনদের
পথের পাশে সদ্যোজাত নবজাতকের দল।
এক জন্তের দীর্ঘনিশ্বাস
তৈলাতুর করে তোলে
মহাসমুদ্রের ঊন কোটি বাতাস।
জন্তু ও যন্ত্র
পিষ্ট, রুদ্ধশ্বাস, বেসামাল হয়
সে নিশ্বাসের তোড়ে।

নাগালের বাইরে ওপরে,
আকাশ নীল
বাতাসের আনাগোনা বিরামহীন;
চাঁদ তারা ফুল পাতার খই ফুটছে
আতপ্ত গগন কটাহে।
—মহাসমুদ্রের পূজারতির আয়োজন;
মহাসমুদ্রম্ গচ্ছামি॥

## রেখা

নবনীতা দেব

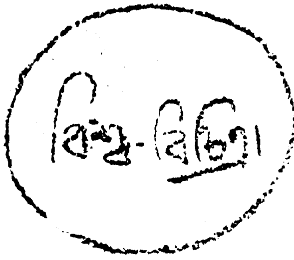
একান্ত স্বপ্নের সুর, স্মৃতি—
শঙ্খসাদা, অথচ গোপন
কৃষ্ণাচতুর্দশী হোক তিথি
রবীন্দ্রসঙ্গীত হল মন।

সমুদ্রে বলিষ্ঠ বাহু মেপে
তেপান্তরে সুডোল চিবুক
সরীসৃপ প্রতিজ্ঞারা এসে
পুষ্পে ঢাকে নিরভিন্ন বুক।

ঘটনাবিস্তারে অভিনব
হৃদয়ে তো সেই চিরন্তন
ধারাতে অমৃতসম্ভব
পূর্ণ কোনো নিভৃত মরণ।

কিছুকাল পূর্বে ইংলন্ডের চ্যাডওয়েল হিথ স্টেশনে একটা ট্রেন আসতেই ভয়ে ড্রাইভারের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। দেখলে এক মহিলা সোজা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে লাইনের ওপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। প্রাণপণে সে ব্রেক কষলে বটে, কিন্তু ঘষড়ে ঘষড়ে ট্রেন থামতে থামতে ইঞ্জিনসমেত আটটি বগি পার হয়ে গেল। রেলকর্মীরা ছুটে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে মহিলা তখনও জীবিত! ট্রেনের নীচে থেকে তাকে বের করে ত্বরিতে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং তার আতঙ্কটা দূরে হয়ে যেতে কেন আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিল প্রশ্ন করায় মহিলা উত্তর দেয়, "আত্মহত্যা করতে চাইনি তো! অন্যমনস্ক হয়ে শুধু প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পড়েছিলাম।"

অন্যমনস্কতাকে কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ বলা চলে না, কারণ পৃথিবীর বহু নামকরা পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও বেশ অন্যমনস্ক দেখা যায়।




অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী যার "স্টাডি অফ হিস্টরী" লিখতে তিরিশ বছর লেগেছিল তার মাথা তথ্যে এমন ভরা যে, ছোটখাট ব্যাপারে তার কোন খেয়ালই থাকে না। সম্প্রতি এক মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণে তিনি এক স্যুটের জ্যাকেটের সঙ্গে অপর এক স্যুটের ট্রাউজার পরে হাজির হন।

বছর কতক আগে আইন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক খুশলাল শাহ লন্ডনে গিয়েছিলেন একটা গোলটেবিল বৈঠকের জট খুলে দেবার জন্য। ভারতে প্রত্যাবর্তনের দিন সকালে তিনি বাথরুমে গিয়ে তারপর জলের কলটা বন্ধ না করেই বেরিয়ে আসেন। কদিন পর নীচের তলার ভাড়াটে তার কার্পেট এবং কতকগুলো দামী দামী সাজ নষ্ট হতে দেখে ক্ষেপে আগুন। এই অন্যমনস্কতার জন্যে অধ্যাপককে প্রায় দেড় হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন ১৮৭১ সনের খৃষ্টমাস দিবসে মিস মেরী স্টিলওয়েলকে বিবাহ করেন। বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রাতঃভোজ অন্তে এডিসন পরবর্তী উৎসবাদি থেকে রেহাই পাবার জন্যে, "মিনিট কয়েকের জন্যে একটা দরকারী কাজ সেরে আসছি" বলে সরে পড়েন। সেখানে তিনি হাজির হন তাঁর লেবরেটরীতে। তার 'নিতবর' যখন খবর নিতে সেখানে আসে, তখন মধ্যরাত্রি। "বাড়ি চল টম," ওর বন্ধু অনুরোধ করলে, "ভুলে গেছ নাকি আজ সকালে তুমি বিয়ে করেছ, আর মেরী তোমার অপেক্ষায় বসে রয়েছে?"

"ঠিক বলেছ তুমি", এডিসনের দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "বটেই তো, আজ সকালেই তো আমি বিয়ে করেছি!"

অন্যমনস্কতা সময় সময় ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে। একবার জে এম ব্যারী এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাতিদানের কাছে গিয়ে একটা কাগজ কুড়িয়ে আগুনে জ্বালিয়ে পাইপ ধরালেন। "সর্বনাশ!" তার বন্ধু অবাক, "ওটা যে একটা চেক?" চেকখানা ছিল হাজার দেড়েক টাকার।

*

চোখের পাতা মিটমিট না করে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? অজ্ঞাতসারে চোখ যে মিটমিট করে, সেটা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না বলা যায়। তবে বছর কুড়ি আগে মেরীয়ান কার্টিস নামে নিউইয়র্কের একটি মেয়ে বাজি রেখে চব্বিশ ঘণ্টা একবারও চোখের পাতা না ফেলে প্রায় দু'হাজার টাকা জেতে। মিটমিটনি কত দ্রুত হয়, সে সম্পর্কে এক অনুসন্ধিৎসুর তথ্য হচ্ছে এক সেকেণ্ডের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ সময়। কিন্তু, সেই অনুসন্ধিৎসু বলেন, 'আমি যদি হঠাৎ চোখের ওপর আলো স্ফুরিত করি, তাহলে এক-পঞ্চমাংশ ভাগ সেকেণ্ডেই পাতা পড়ে যাবে।'

চোখ মিটমিট করাটা দরকারি। ওটা হচ্ছে চোখের তারা পরিষ্কার, আর্দ্র এবং আরামে রাখার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। সুতরাং মাঝে মাঝে চোখের পাতা ফেলাটা একান্তই দরকার।

কতক লোক অন্যান্যদের চেয়ে ঘন ঘন চোখ মিটমিট করে। স্নায়ু-দুর্বল ব্যক্তি



খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে বা তারও দশ বছর আগে আমেরিকার প্রাচীনতম উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির ওলমেক (Olmec) সংস্কৃতির নিদর্শন অনেকগুলি 'মূর্তি' মেক্সিকোর লা ভেন্টা জংগলে ১৯৪২ সালে তেতাল্লিশটি ঢিবির মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে সাতাশটি মেক্সিকোর টাবাস্কো রাজ্যের ভিলাহারমোসাতে স্থানান্তরিত হয়। মেক্সিকোর কবি কার্লোস পেলিচার লা ভেন্টা থেকে সমগ্র নৃতাত্ত্বিক অঞ্চলটাই তুলে নিয়ে ভিলহারমোসাতে বসিয়েছেন পনের একর জমির ওপরে। মূর্তিগুলির সর্বোচ্চটির ওজন ছ' টন। ওপরের মুখটি উচ্চতায় দশ ফিট।

দিনে ষোল ঘণ্টা জাগরণকালের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার বার চোখ মিটমিট করে। এইটে পড়তে পড়তেই পাঠক-পাঠিকা অনেকবারই চোখের পাতা মিটমিট করেছেন, কিন্তু মিটমিটানি এতো দ্রুত হয় যে, তার দরুণ পড়তে কোনরকম বাধা ঘটে না।

যাদের চোখ বেশী মিটমিট করে, তারা কিন্তু আমেরিকার এলাবামা রাজ্যের ক্যালকো উপনগরটিতে যেন কোনদিন গিয়ে না পড়ে। কারণ, এখানে একটা আইন আছে যে, কোন ব্যক্তি সাধারণ্যে চোখ মিটমিট করতে পারবে না।

*

দীর্ঘ ধৈর্যের অনেক রকমের অদ্ভুত প্রতিযোগিতার কথা শোনাও যায়, দেখাও যায়। এক সময়ে কলকাতায় সাঁতারুদের কদিন ধরে সাঁতার কাটার রেকর্ড সৃষ্টি করার খুব ঝোঁক ছিল। সাইকেলে দু-তিন দিন ধরে চড়ে থাকা এখনও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিছুদিন আগে এক সাধু পৃথিবীর শান্তি মানসে জপ করার জন্যে দিল্লীতে যমুনার তীরে পাঁচ ফিট গভীর এক গর্তে নিজেকে প্রোথিত করেন। দশদিন পর মাটি তুলে তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় বের করা হয়।

আইরিশ গণতন্ত্রের ডাক বিভাগের একান্ন বছর বয়সের এক কর্মী তাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে ছদিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট করে। এটা অবশ্য ভারতের পক্ষে কোন রেকর্ডই নয়, কারণ এই সেদিনও বীমা-কর্মীরা কলকাতাতেই আরো অনেক বেশীদিন অনশন ধর্মঘট করে।

আধ ক্রাউন বাজি জিততে অক্সফোর্ডের তিনটি ছাত্র অক্সফোর্ডের কাফে দ্য পারি থেকে লণ্ডনের কাফে দ্য পারিতে হেঁটে উপস্থিত হয়। এই পঞ্চান্ন মাইল দূরত্ব ওরা বিশ ঘণ্টার কম সময়ে অতিক্রম করে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর তিনটি ছাত্রকে পরাজিত করে।

আইলওয়ার্থ টিচার ট্রেনিং কলেজের কতক ছাত্র সম্প্রতি পাঁচদিন পাঁচ রাত্রি একটানা বক বক করে বকবকানিতে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করে।

গ্যারেন এডওয়ার্ডস নামে ইতিহাসের এক ছাত্র বুঝতে পারে যে, তার মনে যা আছে তা বলতে বার ঘণ্টা সময় লেগে যাবে।

নাচের ক্ষেত্রেও ধৈর্যের উদ্ভট সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গত বছর লণ্ডনের সোহো অঞ্চলের এক নৈশ-প্রমোদাগারে এক নর্তকী চব্বিশ ঘণ্টা অবিরাম নাচ চালিয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথের কুমারী হারিম রাডম্যান খালি পায়ে চার ঘণ্টা পা-[illegible] পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ায়ে নাচ থামায়।

১৯২২ সনে ক্যাটফোর্ডের এলবার্ট কেম্প অবিরাম দেড়শ ঘণ্টা পিয়ানো বাজিয়ে পৃথিবীর রেকর্ড দাবী করেন। ছটি বিনিদ্র দিন কাটাবার পর তিনি বেশ নতুন উৎসাহে নাচবার এবং স্যাম্পেন পান করবার অবস্থা নিয়েই ক্ষান্ত হন। তিনি বলেন, "আর কেউ হয়তো আরো বেশীক্ষণ বাজানো দাবী করতে পারে, কিন্তু তারা বাজিয়েছে এক এক হাতে এবং কেউ কেউ খাবার জন্যে থেমেছে।"

সম্প্রতি কেম্প জানান যে, তিনি নতুন কৃতিত্বের জন্য গোপনে একটা অভ্যাস করছেন—একসঙ্গে পিয়ানো এবং বেহালা বাজানো।

রাস্তায় চলা বা চালানোর অনেক রেকর্ডই আছে, তবে ইম্পিরিয়াল কলেজের অঙ্কের শিক্ষক ডাঃ স্ট্যানলী রেইমসের মতো ধৈর্যের অদ্ভুত কৃতিত্ব বোধ হয় কমই আছে। পঁয়ত্রিশ বছরের ডাঃ রেইমস্ নিউ ক্যাসল থেকে দুশ আশি মাইল হেঁটে লণ্ডনে যান চর্ম-সংস্থার উন্নত চামড়া পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

২

'কী হতো!' সুলেখার প্রশ্নের জবাবে চোখে একটু আবেশ ফোটালো জাবেদান্নেসা। একটু হাসলো। মুখের দিকে চোখ স্থির করে বললো 'কী না হতো বাছা? আল্লার মর্জিতে এই মেয়ে-দেহ নিয়ে জন্মেছ। পাপ—পাপ এই দেহ। অনেক পাপ না করলে এই খোলসে আত্মা ঢোকে না। এই দেহের যন্ত্রণায় কতো মেয়ের জীবন জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, আর তুমি!'

'দেহ?'

একুশ বছরের মেয়ে পঞ্চান্ন বছরের দাসীর মুখে এই দেহের উচ্চারণ শুনে আবার শিহরিত হয়ে মুখ ঢাকলো।

'দেহই তো!' দুই চোখে কতদিনের কতো বেদনা ঘনিয়ে আনলো জবেদা. 'তাছাড়া আর কি বলো? এই দেহেরই লোভ। দেহেরই মোহ। পুরুষপতঙ্গ তাইতেই জ্বলে আর জ্বালায়।'

সুলেখা তেমনি মুখ ঢেকে রইলো।

দু'হাত উপরে তুলে সর্পিল ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙলো জবেদা; চুপ করে থেকে বললো: 'সময় হয়েছে, আমি যাই। যাই?'

মিষ্টি গলা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে কম্পিত গলায় সুলেখা বললো 'যাও।'

'শোনো, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, অনেক মাঠ ঘাট বন-বাদাড় ডিঙিয়ে তবে জীবন এখানে এসে ঠাঁই পেয়েছে. আমার কথা শোনো তুমি। বুনোপনা কোরো না। পুরুষের মন, জলের মতন। আজ স্রোত এইখানে, কাল ঐখানে। যতোক্ষণ জোয়ার আছে খোদার নামে ডুব দাও।'

যেন বই পড়ছে। জবেদার কথা-শুনতে শুনতে সুলেখার তাই মনে হলো। সর্বদাই তাই মনে হয়। জবেদান্নেসার কথাবর্তা এই ধরনেরই।

যেতে গিয়েও জবেদান্নেসা ফিরে দাঁড়ালো. কাছে এলো, তারপর, সহসা দুই হাতের আলিঙ্গনে বুকের কাছে টেনে এনে নরম গলায় বললো, 'ধরা দাও। আর তো গতি নেই কোনো।' তারপর আস্তে আস্তে বোধ হয় গেল লম্বা হলঘর পার হয়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সব ভুলে এই অযাচিত স্নেহে অভিভূত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুলেখা। তারপরই হঠাৎ দৌড়ে ছুটে এলো এদিকে. বাথরুমের দরজার কাছে। রুদ্ধ আক্রোশে টেনে ছিঁড়ে তছনছ করে ফেললো সাজ-পোশাক প্রসাধন সব। খুলে ফেললো যত্নে বাঁধা চুল. শাড়িটা খুলে লাথি দিয়ে ঠেলে দিল ঐ কোণে. পটাপট ছিঁড়ে ফেললো ব্রোকেট ব্লাউজের দামী বোতাম, ছুটে ঢুকে গেল বাথরুমে, ঝাঁপিয়ে পড়লো চৌবাচ্চায়, ধুয়ে মুছে ঘষে যেন সব ক্লেদ মুছে ফেলতে চাইলো শরীর থেকে। তারপর সেই শাড়ি ব্লাউজ, সেই আটপৌরে আধ-ময়লা কালো পাড় তাঁতের শাড়ি আর নীল ভয়েলের হাতে এমব্রয়ডারী করা সস্তা ব্লাউজ, যা পরে সে ঢুকেছিলো এইখানে, এই বাড়িতে, এই মহাশ্মশানে, সেই সব পরে বেরিয়ে এলো

হাঁপাতে হাঁপাতে। মুখের রং, চোখের সুর্মা ধুয়ে মুছে একাকার। গয়নাগুলো ছিটকে রইলো এখানে ওখানে সেখানে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যেন অসহায়ের মতো ঝুলে রইলো মুখে বুকে পিঠ কোমর ছাপিয়ে। একটা সদ্য-ধরা-পড়া বুনো জন্তুর মতো সারা ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগলো অস্থিরবেগে।

অল্প পরেই বিরাট-পাল্লা-দরজার গাঢ় নাবিক-নীল পরদাটাতে একটু দোলা লাগলো। একটা বয়ে যাওয়া বাতাসের নরম ঢেউ। সেদিকে তাকিয়ে সুলেখার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠল, জিব দিয়ে ঠোঁট চাটলো, চোখটা বড়ো দেখালো, নিস্তেজ হয়ে খাটের বাজুটা ধরে ধুঁকতে লাগলো মুমূর্ষু রোগীর মতো।

নীলের উপর প্রথমে চারটি গোলাপী আঙুলের লালচে ছাপ, তারপরই ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন সুলতান সাহেব। কাজি সুলতান আমেদ। নওয়াব আমির আলী সাহেবের নাতি, নওয়াব আকতার আমেদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। শুধু নামে না, সুলতানের মতোই তাঁর হাবভাব চেহারা চলন বলন। নড়াচড়ার ভঙ্গি দৃঢ় এবং ধীর। হাঁটবার ভঙ্গি সিংহের মতো। দ্রুত লয়ের গান নয়, মালকোষ রাগের গাম্ভীর্যে মন্থর। গলার আওয়াজ মখমলের মতো গম্ভীর আর নরম। তিনি যখন আসেন, যেন আসেন না, আবির্ভূত হন। সুলেখার সঙ্গে সারাদিনে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, এই তাঁর দেখা করবার নির্দিষ্ট সময়। দিনের সমস্ত সময়টাকে তিনি গড়িয়ে যেতে দেন অপেক্ষার আলাপে, তারপর আসল গানটা শুরু করেন এখানে। সূর্যাস্ত আর সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে। দিন আর রাত্রির মিলনাকাঙ্ক্ষার ক্ষোটিতম ভগ্নাংশের মধ্যেই বিকশিত হন তিনি।

এই সময়টুকু তাঁর। একান্তভাবে তাঁর। এই সময়ে কোনো কাজ তিনি রাখেন না, হাজার পিছু ডাক তিনি শোনেন না। এই সময়ে হাজার প্রয়োজনেও তাঁকে ডাকবার অনুমতি নেই কারো।

ক্ষয়ে ক্ষয়েও পিতা পিতামহর যা কিছু পেয়েছেন সুলতান সাহেব তা-ও কিছু কম নয়। এই শহরটি বর্ধিষ্ণু। এখানে শিক্ষা সংস্কৃতির অভাব নেই, ভদ্র ব্যক্তিরও অভাব নেই। বড়ো বড়ো স্কুল আছে, কলেজ আছে, আছে আপিস আদালত। আপিস আদালতের বড়ো বড়ো বাবুরা আছেন, উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার আছেন, সাহেব সুবো, ব্যবসায়ী, হিন্দু, মুসলমান, মারোয়াড়ী সব আছে। আর আছে শহরের প্রান্ত ঘেঁষে শুকিয়ে যাওয়া নদী। নদীর ধারে কামান বসানো আছে একটি, নবাবী গৌরবের শেষ ভগ্নাংশ। লোকেরা দেখতে আসে বাইরে থেকে, কামানটি ঘিরে নানা ঐতিহাসিক গল্প রচনা করে, তারপর ভক্তি-ভরে পুজো দিয়ে চলে যায়।

শহরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে নবাবদের বিশাল ঐশ্বর্যের অগণিত স্মৃতি। নদীর ধার ঘেঁষে ইসলামবাজারের বিরাট কাশ্মিরী ফটকের ভেতরে দু' মাইল জোড়া বাজার আর বস্তি আছে। তা ছাড়া নবাবকালিন,

বংশীপুর, সর্দারপাড়া, হনুমানি দালাস ইত্যাদির একচ্ছত্র মালিক এই সুলতান আমেদ। গোড়ার মাঠের পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে বিরাট নবাব-বাড়িটি এখনো বিদেশী লোকের বিস্ময় উদ্রেক করে দাঁড়িয়ে আছে তার পুরাকালের ভাস্কর্য দেহে নিয়ে। এখানকার গুলবাগিচা, জলপ্রপাত, গরমকালে শীতল থাকবার জন্য চিকন পাটির বাড়ি, পাথর বসানো ময়ূর সিংহাসন, বিচারসভা, সবই দেখবার যোগ্য। আসান মঞ্জিলের কারুকার্য দেখে কতো লোক এখনো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে থেকে কেউ এই শহরে বেড়াতে এলে গেটপাস যোগাড় করে নবাব-বাড়ি দেখতে আসে। বলতে গেলে নওয়াব সুলতান আমেদ এই জেলার প্রভু, শহরের অর্ধেক অধিবাসী তাঁর অঙ্গুলি হেলনের দাস। এইসব কর্তৃত্ব নিয়ে সমস্ত দিন তিনি ব্যস্ত, ব্যাকুল, অস্থির। শুধু এই সময়-টুকুতে তিনি কারো নন, শুধু নিজের। এই তাঁর অবকাশ।

তিনি যখন আসেন, তাঁর সুগন্ধিজলে স্নাত সুদীর্ঘ শরীরের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা লম্বা রেশম গাত্রবাস থেকে অদ্ভুত একটি মৃদু আর মধুর সৌরভ ভাসতে থাকে ঘরের মধ্যে। গাঢ় সবুজ কচি পাতায় ঘেরা তক্ষুনি-ছেঁড়া একটি রক্ত গোলাপ থাকে তাঁর বাঁ হাতের তিনটি আঙুলের ফাঁকে। এসেই জালিকাটা আখরোট কাঠের গোল টেবিলের উপর সেটি আস্তে শুইয়ে দেন। মাঝে মাঝে তোলেন, শোঁকেন, আবার রেখে দেন, তারপর যাবার সময় ফেলে যান সেটি। আরো একটা জিনিস ফেলে যান। অভিনব উপায়ে গাঁথা ছোট্ট একটি বকুল ফুলের মোটা মালা। যতোক্ষণ থাকেন, হাতের মণিবন্ধে বালার মত জড়িয়ে রাখেন, যখন চলে যান পড়ে থাকে গোলাপটির পাশে। তাঁর গন্ধর্বের মতো অস্বাভাবিক সুন্দর চেহারায় থাকে গভীর ক্লান্তির পরে মধুর অবসাদের একটি সূক্ষ্ম শিথিলতা। বড়ো বড়ো কালো দুই চোখে আত্মসমর্পণের নম্রতা। পাশে মোমের হলদেটে আলোর তলায় যখন এসে তিনি নরম সোফার নরম আরামে রাজকীয় ভঙ্গিতে শরীরটাকে ঈষৎ এলিয়ে দিয়ে বসেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে নরপিশাচ ভাবতে অবাক লাগে। এমন কি কখনো কখনো সন্দেহ পর্যন্ত হয় যে, এই লোকই সেই লোক কি না যাঁর সীমাহীন নিষ্ঠুরতায়, অধৈর্যহীন কুচক্রে কতোবার এই শহর রক্তবন্যায় ভাসলো, কতো সংসার ধ্বংস হয়ে গেল, কতো প্রাণ বলি হলো, আর কতো মেয়ের পবিত্র জীবন ন[illegible] [illegible] [illegible]মাত্ত [illegible]।

**কমলাপুরের বাড়ি**

খুব ছেলেবেলাকার একটা ধূ ধূ স্মৃতি আজ মনে পড়ছে সুলেখার। মুছে যাওয়া ছবি, তবু মোছে নি, একটি বালক স্পষ্ট হয়ে উঠে আসছে সেই ছবিতে। বৃদ্ধ নওয়াব আমির আলী সাহেবের সংগে মাঝে মাঝেই যে বালক রঙিন জামা গায়ে দিয়ে, লাল টুকটুকে জরির নাগরা পায়ে প'রে বেড়াতে আসতো তাদের বাড়ি। টানা টানা স্বপ্নের মতো দুই চোখ তুলে সে তাকাতো; তার কুচকুচে কালো পশমের মতো লম্বা চুলের গুচ্ছ কপাল বেয়ে চোখের পলক ছুঁয়ে নুয়ে আসতো। শুধু সেই বালকটিই নয়, বৃদ্ধ নওয়াব আমির আলী সাহেবকেও আজ মনে পড়ছে সুলেখার। কোন ক্রিয়াকর্ম উৎসব হলেই নওয়াব সাহেব নিজে ফিটন হাঁকিয়ে তাদের কমলাপুরের বাড়ির দরজায় এসে থামতেন। রাস্তায় ভিড় জমে যেতো তাঁকে দেখবার জন্য। দাদু ছুটে যেতেন গেটের কাছে, একটু নামবার জন্য অনুরোধ করতেন। গাড়ি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল নামতো, ফুল নামতো, নামতো হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি, ঝি-চাকরেরা বয়ে নিয়ে যেতো। নওয়াব সাহেবের ভাতিজা মেহের আলী থাকতো সংগে, ফর্সা আর রোগা একটি ছেলে। তার হাতে গোলাপী রং মখমলের থলি-ভর্তি টাকা থাকতো, তা থেকে প্রত্যেক ঝি-চাকরকে দশটা করে রুপোর টাকা বখশিস দেওয়া হতো। নওয়াব সাহেব কখনো নামতেন কখনো নামতেন না। পুরনো চাকর গোবিন্দদা ঐখানেই ছুটে যেতো রুপোর হুঁকোয় মিষ্টি তামাক ভ'রে নিয়ে, গাড়িতে বসেই নওয়াব সাহেব লম্বা নলটা মুখে ছোঁওয়াতেন। বুড়ি দাই, সদুর মা

কাচের প্লেটে ফল-মিষ্টি নিয়ে গিয়ে খাবার জন্য সাধাসাধি করতো বালকটিকে, লজ্জায় সে নওয়াব সাহেবের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতো, কিছুতেই খেতো না। নওয়াব সাহেব হাসতেন, আর বলতেন, 'ভারি শরম, খানাপিনা নিয়ে ভাইয়ার আমার বহুৎ শরম আছে।'

যে উৎসব উপলক্ষেই তিনি আসুন না কেন, তাঁর আসাটাই সেদিনকার মতো বড় উৎসব হয়ে উঠতো। সুলেখার বাবা এসে দাঁড়াতেন লাজুক মুখে। সুলেখার জ্যাঠা-মশায় এসে দাঁড়াতেন, চাকরবাকর, আমলা-ফয়লা ছেলেপুলে সব এসে ঘিরে দাঁড়াতো। বাড়ির ভেতরে ফিস ফিস উঠতো 'নবাব সাহেব। নবাব সাহেব।' উঁকিঝুঁকির ধুম লেগে যেত। ভালো ফ্রক গায়ে দিয়ে, বাবার গা ঘেঁষে সুলেখাও এসে দাঁড়াতো বৈকি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো অপলকে তাকিয়ে থাকতো, ভীষণ ভালো লাগতো সেই বৃদ্ধ আর তাঁর নাতিকে। বইয়ের পাতায় দেখা কোন ছবির কথা মনে পড়ে যেত। হাত বাড়িয়ে নবাব সাহেব তাকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিতেন, দেবদূতের মতো সাদা আর লম্বা রেশমী-কোমল সুগন্ধ দাড়িভরা গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করতেন। পাশে বসে থাকা বালকটির চোখ টল টল করতো খুশীতে। কথা না বললেও দুটি শিশুর মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যেতো।

সব ভুলে যাওয়া দিন, ভুলে থাকা ছবি। একটি ছোট্টো মেয়ের অবোধ হৃদয়ের আঁকিবুঁকি। কালের প্রলেপে কবি-মনের সেই দাগ কখন যে মুছে গিয়েছিল, তা পর্যন্ত মনে নেই। বড় হতে হতে আরো কতো দাগ রেখা ফেললো; কতো দাগ নিশ্চিহ্ন হলো, তাই কি মনে আছে? তবু কী আশ্চর্য—! এখানে আসার পর থেকে এই লোকটার মুখের দিকে চোখ পড়লেই হৃদয়ের কোন গভীর স্তর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে সেই ছবি, সেই সব দিন। ভুলে যাওয়া, ভুলে থাকা সেই বালকের অস্পষ্ট মুখ। সুলেখা স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে মনে মিল খোঁজে। মিল! এর সংগে তার মিল!

অবশ্য বড় হতে হতে কিসের সংগেই-বা কি মিল সে খুঁজে পেয়েছে? শুধু চলার রাস্তাটা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। কাঁটা বিঁধেছে পায়ে, কাঁকর ফুটেছে। কেবলি একটার পর একটা ঘটে-যাওয়া ঘটনা মাত্র। দাদুর মৃত্যুটাও কি সেই ঘটনারই একটা তুচ্ছ অংশ মাত্র নয়? তা ছাড়া আর কী! স্পষ্ট মনে আছে ছ'ফিট লম্বা মস্ত মানুষটিকে। গায়ের রং কালো, দেহ বলিষ্ঠ, মুখশ্রী অতি-সুন্দর। অন্তত সুলেখার চোখে। হৃদয় যত কোমল, ততো দরাজ। এই ঐশ্বর্য নিয়ে নওয়াবগঞ্জের বিখ্যাত উকিল ভুবনমোহন তালুকদার একদিন তো চোখ বুজলেন! রাতদিন যিনি মাথার জোরে হয়কে নয় করছেন, মৃত্যুর সংগে পারলেন কি পাঞ্জা কষতে? সুলেখা তখন কতটুকু? মনে পড়ে না। দাদুর হাঁটুর একটু উপরে তার মাথা, কোকিল কালোপাড়ের নম্বরী ধুতির পরিপাটি কোঁচার খুঁটটা ধরে সে দাদুর মুখের দিকে তাকাতো।

প্রত্যেকদিন বিকেলে নদীর ধারে হাঁটতে যেতেন তিনি। তাদের কমলাপুরের বাড়ি থেকে নদীর ধার বড় কম রাস্তা নয়। গোড়ার মাঠ পার হয়ে রেললাইন পার হয়ে, নবাব-কান্দি ইসলাম বাজারের মধ্য দিয়ে তবে নদীর ঘাটে পৌঁছানো যেতো। আব্দার করে মাঝে মাঝে সে-ও যেতো দাদুর সংগে, যেদিন দাদু ঘোড়ার গাড়ি নিতেন। সুলেখা কি অত হাঁটতে পারে? আর ঘোড়ার গাড়ি নেয়া মানেই সব্বাইকে নেয়া। না, সে বেড়ানো ভাল লাগতো না সুলেখার। তার গাড়ি ইচ্ছে করতো না, সব্বাইর সংগ ইচ্ছে করতো না, ইচ্ছে করতো দাদুর আঙুল ধরে হেঁটে হেঁটে সারা শহর পেরিয়ে নদীর ধারে যেতে। শুধু কামানটার কাছেই নয়,

নদীর ঘাটের নৌকো-বাঁধা ঢালু পাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করতো তার। বিকেলের ঠাণ্ডা জলে কুল কুল শব্দ উঠতো বাতাসে, নৌকোগুলো হাঁসের হাঁটার মতো একটু একটু দুলতো বাঁধা অবস্থায়, ইচ্ছে করতো সারাক্ষণ সেখানে বসে থাকতে। সে ইচ্ছে পূরণ করা শক্ত ছিল। তারই না হয় একটা দাদু, কিন্তু দাদুর তো আরো নাতি-নাতনী আছে? ভালবাসা আছে? কর্তব্য আছে? তবু সে জানে দাদু তাকেই ভালবাসতেন বেশী, এই একচোখোমিতে বাড়ির আর সবাই থম থম করলে দাদু বলতেন, 'আহা, ও তো সবচেয়ে ছোট। আর সুপ্রকাশের কি দশটা না পাঁচটা? এই তো সবে একটা মেয়ে।' আর সেই অছিলায় আদরের মাত্রাটা অনেক সময়ই ছাড়িয়ে যেত। তাই বলে দাদু গাড়িভাড়া করে নদীর ঘাটে বেড়াতে গেলে অন্য নাতি নাতনী ফেলে শুধু তাকে নিয়েই যাবেন এ কখনো হয়? অন্যদের প্রতি তাঁর উগ্র না হোক, স্বাভাবিক টানটা তো নিশ্চয়ই আছে? শুধু মাঝে মাঝে যখন জ্যাঠাইমা বাপের বাড়ি যেতেন তখন এক আধদিন এই সাধ পূরণ হতো তার। তখন সে দাদুর ধুতির লম্বা কোঁচা ধরে সভয়ে জলের ধারে যেতো। ঝাপটা বাতাসে ফ্রকটা পালের মতো ফুলে উঠতো, চুলগুলো নাকে মুখে এসে সুড়সুড়ি দিত, বুক ভরে যেতো সোঁদা গন্ধে।

জ্যেঠাইমার মতো মা কোনোদিন বাপের বাড়ি যেতেন না। মার মা মারা গিয়েছিলেন সুলেখার জন্মের আগে, মার বাবাও মারা গিয়েছিলেন সে যখন মাত্র তিন বছরের শিশু। মা-ই দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই ভাইয়ের বাড়ি যাবারও কোনো প্রশ্ন ছিলো না। কেবল দাদামশায়ের সুরী লেনের বাড়িটায় মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন এক কাকিমার কাছে। বাড়িটা উত্তরাধিকারসূত্রে মা-ই পেয়েছিলেন, মা-ই তাঁর এই কাকাকে অন্য বাড়িতে ভাড়া না গুণে এই বাড়িতে এসে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তবু তো বাড়িটাতে একটা বাপের বাড়ির লোক থাকবে? শৈশবের শত স্মৃতিবিজড়িত ঘরগুলোতে নিঃস্ব পরেরা ঘুরে বেড়াবে না? মারও একটা যাবার জায়গা হবে। সেই কাকা কাকিমাকে মনে আছে সুলেখার। মার বাবার দূর সম্পর্কের ভাই, শিক্ষিত, মার্জিত চমৎকার ভদ্রলোক। সুলেখার মার সঙ্গে ঠিক নিজের কাকার মতোই ব্যবহার করতেন, জামাইকে যথারীতি আদর আপ্যায়ন করতেন, আর নাতনীকে, মানে তাকে বৌ বলে ডেকে দারুণ জ্বালাতেন। ভদ্রলোকের বয়স কম ছিলো, বাবার চেয়ে সামান্য বড়ো, সম্পর্ক মধুর, প্রায় বন্ধু ছিলেন জামাই আর খুড়শ্বশুর।

মার কোনো বাপের বাড়ি না থাকায়, জন্মাবধি একদিনও সুলেখাকে ঠাকুমা দাদুকে ছেড়ে কোথাও যেতে হয়নি। জ্যাঠাইমা যখন সব ছেলেমেয়ে নিয়ে তিন চার মাস করে বাপের বাড়ি থাকতেন গিয়ে, সে তখন দাদু ঠাকুমার শূন্য কোল দখল করে একলা একেশ্বরী। তাই হয়তো সকলের চেয়ে বেশী নিবিড় হয়ে উঠেছিলো দাদু নাতনীর সম্বন্ধটা। কে জানে। একদিন সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বসলেন দাদু। রোজের মতো সুলেখাও তার ঠাকুমার তৈরী মস্ত ন্যাকড়ার পুতুল মেয়েটাকে নিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুম পাড়াতে বসলো। বাড়িটা একেবারে নির্জন ছিলো সেদিন, শুধু সে নিজে, ঠাকুমা আর মা। জ্যাঠামশায় দেশে গিয়েছিলেন দাদুর সৎ ভাই আর ভাইপোদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করতে। জ্যাঠামশায় বিষয়ী লোক। দাদুর মতোও নন, বাবার মতোও নন। দাদু উকিল হলে হবে কী, বিবেক তাঁর সোজা, পেশাটা যাই হোক মানুষটি সোনা। কোনো লোভ ছিল না তাঁর, এক জীবনে বিত্ত তিনি কম করেননি কিন্তু তাই বলে আসক্তি ছিলো না। বাবাও ঠিক তেমনিই ছিলেন। উদাস মানুষ, একটু লাজুক, স্বল্প ভাষী শান্তিপ্রিয়। জ্যাঠামশায়ের স্বভাব আবার তেমনি উগ্র আর স্বার্থপর। কোথায় ভাগে একরত্তি কম পড়লো এই চিন্তাতেই তিনি অধীর। কদিন থেকেই দেশে গিয়ে সম্পত্তি বণ্টন করবেন এই তালে ছিলেন। সম্পত্তির মধ্যে অবিশ্যি একখানা ভাঙা পাকা দালান, কিছু বাসন আর কিছু কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি। কোথা থেকে শুনে এসেছেন অভাবে পড়ে ও'রা নাকি (দাদুর সৎভাইয়ের তিনি অধীর। কদিন থেকেই দেশে গিয়ে যাবে কোথায়, অমনি জ্যাঠামশায়ের বুকটা ফেটে গেল। চাদর কাঁধে ছুটলেন তিনি ফয়সালা করতে।

ভ্রূকুটি করে দাদু বললেন, 'এসব আমি পছন্দ করি না। তোমার কাকা অভাবগ্রস্ত, তার ছেলেরাও কেউ তেমন উপযুক্ত হয়নি, তাদের সঙ্গে সামান্য কয়েকটা ইঁট আর কাঠ নিয়ে ভাগাভাগি করতে যাওয়া অত্যন্ত গর্হিত।' ঠাকুমার মুখের কাছে আস্ফালন করে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট স্বরে জ্যাঠামশায় বললেন, 'ভাগাভাগি না করাটাই গর্হিত। এই কাকা আর কাকার মা-ই একদিন বাপকে বার করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে।' একথাটা অবিশ্যি দাদু শুনতে পেলেন না, বারান্দায় বসেছিলেন তিনি। ঠাকুমা বললেন, 'সে কোন জম্মেকার কথা। ওরকম ঝগড়াঝাঁটি অনেকই হয়। তাই বলে তোর ঠাকুমাকে কি তোর বাবা কোনোদিন অসম্মান করেছেন। বুড়ো হয়ে তো এই ছেলের হাতেই গেলেন। এই সৎ ছেলেই সংসারটা টানলো। আজই না হয় ছেলে তিনটা টুকটাক কিছু করছে, কিন্তু ঠাকুর-

পো তো একেবারে ঘরধরা মানুষ। সারাটা জীবন শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল।' বাবা ছিলেন ঘরে, কাজের থেকে মুখ তুলে বললেন,



'শ্যাম আর রাখুর অবস্থা নিতান্ত খারাপ যা একটু মেজদাই ভালো আছেন। ওদের সঙ্গে আর কী নিয়ে তুমি ঝগড়া করবে। সে ভারি লজ্জার।' 'নে নে থাম, বেশী ইয়ে দেখাস নে।' চটে উঠলেন জ্যাঠামশায়।

ঠাকুমা বললেন, 'থামব কেন? দুটো কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি আর কয়েকটা ঘটি বাটি টেনে এনে তোর কী মোক্ষ লাভ হবে শুনি? ভগবানের ইচ্ছায় তোদের কি কিছু কম আছে?'

জ্যাঠামশায় বললেন, 'দ্যাখো মা, কম বেশীর কথা নয়, ন্যায্য পাওনার কথা। সম্পত্তি আমার ঠাকুর্দার, ওদেরো যতোটুকু, আমাদেরো তার চেয়ে এক চুল কম নয়। ভাগের একটা খড়কুটোও আমি ছাড়বো না।' এই বলে তিনি রাগে গরগর করতে করতে নদীর ঘাটে গিয়ে গহনার নৌকোয় চড়ে বসলেন। আর জ্যাঠামশায় যাবার পরের দিনই বাবার একটা চাকরির চিঠি এলো কলকাতা থেকে। ঠাকুমা কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে শুভযাত্রা করালেন ছেলেকে। জ্যাঠাইমা অনেক আগেই শরীর খারাপ বলে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। পিসি দুজনও যার যার শ্বশুরবাড়ি ছিলেন। সুতরাং সেই সন্ধ্যায় যেদিন আহ্নিক করতে করতে হঠাৎ কেমন করে উঠলেন দাদু, নিজের সন্তানরা কেউ ছিলো না বাড়িতে। সুলেখা কাছে বসেছিলো' বলে প্রথমটায় সুলেখাই টের পেয়ে আঁতকে উঠেছিলো। মৃত্যু কী, কেমন বস্তু, মৃত্যু নামে আদৌ কোনো অস্তিত্ব জগৎ সংসারে বিরাজমান কিনা এটা একটা ছ' সাত বছরের নতুন মানুষের জানবার বিষয় নয়। তবু সে কেঁদে উঠেছিলো জোরে। কী ভেবে কেঁদেছিলো, কেন কেঁদেছিলো এখন আর মনে পড়ে না তেমন করে। কিন্তু তার স্মৃতিটা জ্বলন্ত রেখায় আঁকা হয়ে আছে বুকের মধ্যে।

তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়েই মা আর ঠাকুমা দৌড়ে এসেছিলেন। এসেই তাঁদের অভিজ্ঞ মন নিয়ে বুঝে ফেলেছিলেন ব্যাপারটা। ঠাকুমা আছাড় খেয়ে পড়লেন, মা ডুকরে উঠলেন শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে। দাদুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলো সুলেখা, থেকে থেকে কেঁপে উঠছিলেন দাদু। পরে শুনেছে, এটাই মৃত্যুর আগের শেষ পরোয়ানা। চোখ দুটো এতো বড়ো হয়ে বেরিয়ে আসছিলো। যেন কী বলতে চেয়েছিলেন, পারেন নি। প্রদীপ জ্বলছিলো ঘরে, তার স্বল্পালোকে কোলের পুতুলটাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সুলেখা তাকিয়ে বলেছিলো 'আজ তুমি কতো পুজো করবে দাদু?' দাদু জবাব দেন নি। দিতে পারেন নি, দাদুর দেহ এলিয়ে পড়ছিলো আস্তে আস্তে। সুলেখার বুকটা যেন হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে বন্ধ হয়ে যাবার মতো হলো। চমকে উঠলো একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার অনুভূতিতে। তখনো হেঁচকি টানেন নি দাদু, শুধু ঘুমের মতো ঝিমিয়ে যাচ্ছিলেন, হালকা হয়ে যাচ্ছিলেন। ভয়ে সারা শরীরে হিম বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন ভয় কে জানে। মনে হলো সে দেখতে পাচ্ছে না বটে তবু যেন কেউ এসেছে ঘরে, যেন কার উপস্থিতিতে থমথম করছে ঘরটা। কে? কে এসেছে? সামনে, পিছনে, পাশে —কোথায়! কোথায়! চারদিক তাকিয়ে ভয়ার্ত বিকৃত গলায় কেঁদে উঠলো সে। তার অবোধ মন তাকে বলে দিলো, আর রক্ষা নেই। সে এসে গেছে। এই অস্তিত্বহীন অদৃশ্য মানুষই এখন দাদুর কাছে একমাত্র সত্য। এই রকমই হয়। এমনি করেই নিতে আসে সবাইকে। দাদুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো সে, তার ছোট্ট শরীরের উপর ঢলে পড়লো দাদুর মৃতদেহ। (ক্রমশ)

নেহেরু-নুন যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ সীমানা-বিরোধের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলাবলি করিতেছেন—অতীতেও বৈঠক কম হয় নাই, যুক্ত ইস্তাহারও অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কাজের কাজ কোন কিছুই হয় নাই। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সাহিত্য-বাসরে কোলকাতার বেতার-কর্তৃপক্ষ এসেই বলেন—গল্পের দুর্পিঠ"।

• • •

নেহেরু-নুন আলোচনা প্রসঙ্গেই প্রকাশিত সংবাদে জানা গেল—নুন সাহেবকে তাঁর দিল্লী আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি নাকি জবাবে জানাইয়াছেন যে, জলখাবারের মতো উদ্দেশ্য সিদ্ধি পাঁচ মিনিটের ব্যাপার নয়, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। —"অর্থাৎ




খাই-খাই মেটানো চাই, শুধু মিষ্টিমুখে চলে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন না—বলিয়াছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ। —"আমরা সম্পূর্ণ একমত' কেন্দ্রীয় সরকারই তো হলেন পাচক, রাজ্য সরকার তো জোগাড়ে মাত্র"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

• • •

লোকসভার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীহুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন যে, মহীশূরে কেন্দ্রীয় ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে অল্প চর্বিযুক্ত চীনাবাদাম গুঁড়া ও কয়েকপ্রকার জলের সহিত প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ ও ভিটামিন যোগ করিয়া "ভারতীয় সর্বার্থসাধক খাদ্য" নামে একটি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। শ্যামলাল ব্যাপারটি বুঝাইয়া বলিল—"এটি হলো ভারতেই আবিষ্কৃত পাকা হত্তুকীর আধুনিক সংস্করণ"!!

• • •

এই প্রসঙ্গেই আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—'সর্বার্থসাধক না হলেও আমাদের অধুনা আবিষ্কৃত হাওড়ার ডবল রুটিও বড় কম যান না; এতে রোগ




সারে আবার খাদ্য-সমস্যারও সমাধান হয়। সত্যি কী বিচিত্র এই দেশ"!

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম কাগজের অভাবে নাকি মুদ্রণশিল্পে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। —"আগে শুনতাম—থালা-ভরা আছে মিঠাই, দোয়াত আছে, কালি নাই—এখন কালি, দোয়াত, কাগজ তো নেই-ই, এই সঙ্গে থালা-ভরা মিঠাইও দুর্লভ। পেট আর মাথার এমন হরিমটর আর কোনদিন দেখা যায় নি, আমরা আছি বেশ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

বাঙলার ট্রায়াল সন্তরণের পরিসমাপ্তি"—একটি সংবাদ শিরোনামা। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"ট্রায়াল সাঁতারে আর বাঙলার চলবে না। চারিদিকে অথৈ জল। এবারে ফাইন্যাল সাঁতারের সময় এসেছে; এই সঙ্গে ফিরে এসেছে সেই পুরনো জিজ্ঞাসা—কত কাল পরে.........দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে"—সহযাত্রীর কণ্ঠ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

• • • •

ট্রাম কোম্পানীর ডাইরেক্টার মিঃ ওয়েব যেদিন কলিকাতা আসিলেন, সেদিন সবাই ভাবিল এইবারে যা হোক একটা



কিছু সুরাহা হইবেই। কিন্তু তিনি আসিয়া ব্যাগ হইতে খুলিলেন সেই পুরাতন কাসুন্দির বোতল; বলিলেন—ভাড়া বৃদ্ধি না করিলে কর্মীদের দাবী মেটান সম্ভব নয়। খুড়ো—বলিলেন—"পর্বতের মুষিক প্রসবের কথা শুনেছিলাম; ওয়েবের মুখে শুনলাম কবুওয়েব"!!

এই প্রসঙ্গে এক সংবাদে শুনিলাম, ওয়েব সাহেব নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ট্রাম কোম্পানীটি ক্রয় করিয়া লইতে বলিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সবিনয়ে সতর্ক করে দেবো—পাষাণ না দেখে যেন তাঁরা কেনাকাটায় রাজী না হন"।

• • •

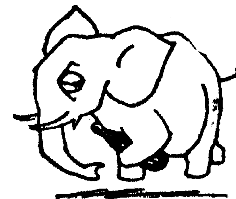
পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ কমিশনার জানাইয়াছেন যে, জলসরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় হরিণঘাটায় দুগ্ধ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"জলের অভাব হলে সংরক্ষণে না হোক, দুগ্ধ সরবরাহেও সঙ্কট দেখা দেয়, হরিণঘাটায় না হলেও খাটাল-ঘাটায়"!!

• • •

নেহেরুজীকে নাকি প্রশ্ন করা হইয়াছিল তিনি কাহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারীর পদে মনোনীত করিবেন। তিনি প্রশ্নটির সুনিশ্চিত উত্তর দেন নাই। —"খুব ভালো করেছেন। জবাব না দেওয়ায় রামা, শ্যামা, আপনি, আমি—সবারই চান্স হয়ে রইল"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • • •

আসামে বন্যহস্তীরা নাকি গ্রামের মদের দোকানে ঢুকিয়া মদ খাইয়া যাইতেছে। —"মদমত্ত করী তবে শুধু



কথার কথা নয়"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম, রাশিয়া ১০০ শত কোটি ডিগ্রী তাপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। —"সংবাদটি শুনে কোথায়, কার মাথার তাপ কত ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পরিসংখ্যান নিশ্চয়ই নেওয়া হয়নি"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, সেখানে একটি সাপ নাকি একটি চারতলা বাড়ি দখল করিয়া আছে। কিছুতেই সাপটিকে তাড়ানো যাইতেছে না। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"অনেক দ্বিপদ ভাড়াটে হয়ে বাড়ি ঢুকে দ্বিজিহ্বে পরিণত হয় এবং পরে তারা পঞ্চপদ প্রাপ্ত হয়; বিশ্বাস না হয়, বাড়িওয়ালাদের জিজ্ঞেস করুন"!!

# আপনার সৌন্দর্যই আপনার যৌতুক

## পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহার করুন—

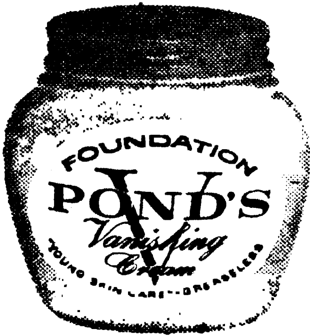
## আপনার মুখশ্রী মসৃণ, কোমল ও সুন্দর থাকবে!

হাল্‌কা ও তুষার-শুভ্র পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় সৌন্দর্য রক্ষা করবে—মুখশ্রী পরিষ্কার ও লাবণ্যময় রাখবে! পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। এই নিখুঁত, তৈলহীন ক্রীম মাখার পর পাউডার লাগালে তা বহুক্ষণ পর্যন্ত ভালোভাবে লেগে থাকে।

**এই ক্রীম মুখশ্রী পরিষ্কার রাখার পক্ষে চমৎকার**

রোজ রাতে আপনার মুখে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম ভালো ক'রে মাখুন। এতে ত্বকের ময়লা সম্পূর্ণ দূর হবে এবং মুখশ্রী রুক্ষ ও কর্কশ হতে দেবেনা। পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার মুখের কমনীয়তা অটুট থাকবে।






**বিনামূল্যে পুস্তিকা**

আমাদের বিনামূল্যের পুস্তিকা 'লাভ্‌লিয়ার **উইথ** পণ্ডস' চেয়ে পাঠান ... এতে প্রসাধন ও সৌন্দর্যরক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা আছে। পোঃ বক্স ১৬১২, ডিপার্টমেণ্ট ২৩ ভি, বোম্বাই ঠিকানায় লিখুন—**সঙ্গে** ২৫ নয়া পয়সার ডাকটিকিট দেবেন।

P 6682. চীজ্‌ব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)




## মনোজ বসু

# আমার ফাঁসি হল

৮

কাজকর্ম চুকিয়ে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা। শীতটা বড্ড কম আজকে। ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে। বড় দারোগা বলছিলেন, আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। অ্যাটমবোমার কাণ্ড। অঘ্রাণে বসন্তকাল পড়ে গেল। বসন্তেরও ধুন্দুমার লাগবে। এইবার ডাক্তারবাবুর মজা।

বারান্দায় উঠে একটুখানি দাঁড়াই। কী আশ্চর্য জ্যোৎস্না! দিনমানের মতন চারিদিক দেখা যায়। দিনমানটাই যেন মোলায়েম হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি হয়েছে। অতদূরে জোড়বাড়ির চালের মটকা অবধি স্পষ্ট দেখছি।

শোন শোন ও লাবণ্য, আমতলায় কেন? আমের ডালে বোলই ধরেনি এখনো—কিসের লোভে ঘুরছ? কাছে এসো—কি হল এতক্ষণ ধরে, খবর শুনবে না? খবরের জন্যে ঘুরঘুর করছ, সে কি বুঝিনে? লজ্জা কিসের, এসো।

ফটকের গরাদ ধরে বাইরে দাঁড়াল, ভিতরে আসে না। কথা যা বলছে, তার দুনো হাসি। আর চোখ-মুখ নাচানো তারও দুনো। বলছে, দেখ, গাঁয়ের এবাড়ি-ওবাড়ি বিয়ে, তার মধ্যে মজা কোথায়? এই বাড়ি থেকে বর হয়ে চুপি চুপি বেরুবে, সে আমার ভাল লাগে না। ঘাটের উপরে বড় বড় পানসি এসে লাগবে—বরের নৌকো, বরযাত্রীদের নৌকো, পুরুত আর প্রবীণেরা আলাদা নৌকোয়, আগে-পিছে বাজনাদারের নৌকো। ঘাটে নেমে তোলপাড়। ঢোল কাঁসি শানাই বাজে। সোঁ-সোঁ করে হাউই ওঠে আকাশে, আকাশে উঠে তারা কাটে। চরকি-বাজি ঘোরে বোঁ-বোঁ করে—আগুনের সুদর্শনচক্র। গাঁয়ের যত মানুষ ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের কনে আমিও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছি সকলের নজর এড়িয়ে। ভারি ভাল লাগে। এমনি সমস্ত জাঁকজমকের বিয়ে পছন্দ আমার।

কথা তো নয়, মনের খুশীর উপচে-পড়া আবোল-তাবোল। হেসে উঠলাম, বেশ তো, এসো না, ভিতরে চলে এসো। যুক্তি করি দুজনে, কিরকম হলে ভাল হয়।

উঁহু, এমনি আমার কত নিন্দে! এইমাত্র এক কাণ্ড হয়ে গেল, জানো। আমি চুল বাঁধছি। মা এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল। এই মারে তো মারে। কী করে জানল রে তোকে? না জানলে চাঁদের মতন বর আপনি এসে ধরা দেয়? বল্ হতভাগা মেয়ে, সত্যি কথা বল্। গোলবাড়ির পুকুরে জল আনতে গিয়ে সেই সময় বুঝি যেতিস লুকিয়ে লুকিয়ে? ভাবসাব করেছিস?

চুলের মুঠি ধরে মা তো গালি দিচ্ছে, আর হাসিতে ফেটে পড়ছেঃ ধন্যি কলিকালের মেয়ে রে বাবা, তোদের খুরে দণ্ডবৎ। পছন্দের বর নিজে ধরে নিয়ে এলো, অন্য কাউকে কিছু করতে হল না। তোর [illegible] হল, দিব্যি হল, সোনার পালঙ্কে রাজরাজেশ্বরী হয়ে বোসোগে মা আমার। মায়ের চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক সব আসতে লাগল। লজ্জা, লজ্জা! আমি তখন দে ছুট—

দয়ালহরির সংসারের কী বর্ণনা দিয়েছিলেন, আর লাবণ্যের মুখে আহা-মরি এ কোন্ ছবি! দয়ালহরি হেন মানুষ সব পারেন—ঐ যা বললেন ডাক্তারবাবু। পাছে কোন দাবি-দাওয়া করে বসি, ইনিয়েবিনিয়ে অত দুর্দশা শোনালেন। খুব সম্ভব তাই। বাড়ির এই হাসখুটে মেয়েটা আর কৌতুকি মা—মায়ের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে মেয়ে পালিয়ে এসেছে। ছুটে এসেছে কিনা—বুক উঠছে নামছে, আর মুখের উপর ভুবনমোহন হাসি।

ক্ষেপে গেলাম যেন। ধরে ফেলব, আর এখন ভয় কিসের? ঐ খাটের উপর বসে বিয়ের যুক্তি-পরামর্শ হবে আমাদের। হাঁকডাক করে তারপরে গান শোনাব। মোমের মতন কোমল নিটোল পা দুটি ঝুলিয়ে দিয়ে বসে থাকবে লাবণ্য। কী আর হবে, লোকে বলবে বেহায়া বর, বেহায়া বউ। আমাদের বয়ে গেল।

কিন্তু কথা শোনার মেয়ে কিনা লাবণ্য! পালাচ্ছে, আমিও পিছনে ছুটি। ভয়-সংকোচ গিয়ে একমুহূর্তে হঠাৎ বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে খানিকটা দূরে গিয়ে। খিলখিল হাসিঃ ধরুন দিকি কত

ক্ষমতা। সে আর পারতে হয় না। ধরুন, ধরুন—

ছুটতে ছুটতে কাছে চলে এসেছি। ধরি এইবার। ডানদিকে খানিকটা অমনি সরে চলে যায়। থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। হেসে হেসে ভেঙে পড়ছে—ভারি স্ফূর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে। হাসির দমকে দমকে জ্যোৎস্নার দরিয়ায় যেন ঢেউ দিয়েছে। পাঁকাল মাছের মতন লাবণ্য তার ভিতরে পিছলে পিছলে পালায়।

আচ্ছা এইবারে। ধরো। চু-উ-উ—

ছেলেরা কপাটিখেলায় সময় দম ধরে যেমন ছোটে। এই ক'মাসে অনেক শিখেছে দেখি শহুরে মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের খেলাধুলো রপ্ত করেছে, খেলাচ্ছে আমায় নিয়ে। নিঃসীম স্তব্ধতা—তার মধ্যে উড়ছে ভ্রমর গুঞ্জনধ্বনি করে। সোনার ভ্রমর।

পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছি, তখন মালুম হল মাঠে নেমে পড়েছি। ধান কাটা হয়ে গেছে, তার গোড়াগুলো উঁচিয়ে রয়েছে শূলের মতো। মাটি যেন পাথর। লাবণ্য কিন্তু অবহেলায় ছুটছে তার উপর দিয়ে। তার পায়ে লাগে না। ছুটছে, কিংবা উড়ছে। শাড়িতে ঢাকা পা যেন লঘু দুটি পাখনা—

মাটির গায়ে গায়ে পাখনা দুটি উড়ছে। জ্যোৎস্নায় ঝিলিক ফুটছে। মাঠের মধ্যে উঁচু টিলায় বাবলাবন, পাখির কিচিরমিচির সেখানে। কে হঠাৎ ডেকে ওঠে, মুংলি—। মুংলি গরুর নাম। মুংলি-ই-ই-ই—। এদিকে সেদিকে গরু চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা এখনো, গোয়ালে যায়নি। পোষা গাইগরু কে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

থেমে যাই, মানুষ আছে তবে তো মাঠে। রাত্রিবেলা সোমত্ত মেয়ের পিছু ছুটেছি, হোক না ভাবী বউ, কেউ দেখলে তাড়া করে আসবে। চিনে ফেলে তখন ভাববে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে হাকিমের। কী সর্বনাশ! থেমে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে পড়ে কাতর হয়ে বলছি, হার মানছি ও লাবণ্য, ধরা দাও এবারে। ধরা দাও।

লাবণ্যও দেখি থেমেছে। হাসছে মিটি-মিটি। পাগলই করবে আমায়, ভাল থাকতে দেবে না। আচমকা ছুট দিয়ে গিয়ে ধরি এইবারে। দু-হাত বাড়িয়েছি, টেনে নেবো বুকের মধ্যে—

হঠাৎ সে আর্তনাদ করে ওঠেঃ হাতে কি তোমার? দেখি, দেখি। আমার সেই আংটি। আমার আংটি কে তোমায় দিল?

হতবুদ্ধি হয়ে বলি, ছোড়মশায় দিয়েছেন আশীর্বাদে।

আমার আঙুল থেকে টেনে খুলে নিয়েছিল। চামড়ার এক পর্দা উঠে গেল, একটু তবু মায়া নেই। জানোয়ার। টাকা ওদের সব। হাতটা সরিয়ে নেবো, আমারও তখন সে ক্ষমতা নেই।

মুখ-চোখ তার কী রকম হয়ে উঠল। আমার ভয় করে। মাথামুণ্ডু নেই, এসব কি বলছে? পাগল নাকি? ঠাণ্ডা করবার অভিপ্রায়ে বলি, আমি আর তুমি কি আলাদা? অমন করে বোলো না লক্ষ্মী। আমার কষ্ট হয়। আংটি আমার হাতে ছোট হয়েছেই তোমার ঠিক হবে। এসো পরিয়ে দিই।

ডুকরে কেঁদে উঠল এবারেঃ আমায় পরানো যায় না। সেই যা তুমি বলো কবিত্ব করে—আমি শুধু জ্যোৎস্নাই। শুধুই চোখে দেখবার। ধরতে পারবে না। জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারবে না। ঘরে আমার ঠাঁই নেই—দিন-রাত ভেসে ভেসে বেড়ানো, নেশা ধরিয়ে দেওয়া তোমাদের চোখে, আর কান পেতে ভালবাসার কথা শোনা। বুকে আমি কোনদিন জায়গা পাবো না।

কী যেন হয়ে গেল পলকের মধ্যে। হাত বাড়িয়েছিলাম, হাতের নাগালে এলো না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনার অবস্থা আমার নেই। ধনুকের তীর যেমন সাঁ করে চলে যায়, তেমনি সরে পড়ল কোথায় পলকের মধ্যে।

কোথায়, কোথায়? বাবলাবনে শাড়ি-পরা কে একজন। ঐখানে গিয়ে কাঁদছে। না, কাঁদছে না এখন, একটা গাইগরুর গলায় হাত বুলোচ্ছে। আমি পিছনে, টের পায়নি। পিছন থেকে হাত জড়িয়ে ধরিঃ কি হয়েছে বলো। কত আর খেলাবে আমায়? আংটি তোমার বাবাই তো দিলেন, নিও যাও তুমি সে আংটি। ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ঝটিতি মুখ ফেরাল। কোথা লাবণ্য— সেই জন, চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। ভাবছি, চোখ খারাপ হয়ে গেল নাকি আমার? রূপের অলক্ষ্য রশ্মিতে সারা মাঠ হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেড়াল আমায়। ঐ কতটুকু দূর থেকে ছুটে চলে এলো—বাবলাতলায় হাত ধরে ফেলতেই ভিন্ন একজন। আলতো রূপ ছোঁয়া পেয়ে যেন ঝুরঝুরিয়ে ঝরে গেল কেয়ার পরাগের মতন। জোনাকি যেন আলোক ঢেকে ফেলে লহমার মধ্যে কিলবিলে পোকা হয়ে গেল।

হাত ছেড়ে দিলাম, কিংবা ঝাঁকি মেরে সে-ই ছাড়িয়ে নিল। দু-হাত কোমরে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কী ভয়ংকর! প্রেমিনী ভেবেছিলাম একদিন, তবু তো সামনাসামনি এই চেহারা দেখিনি। এক চোখে আগুনের হেকা, কানা চোখের উল্টানো ঢেলাটা বুলেটের মতন তাক করে আছে। কথা বেরুতে চায় না, ঠোঁট কাঁপে কয়েকবার। তারপর বলে, আপনার ঐ কথা আমিই তো জিজ্ঞাসা করব। আর কত খেলাবেন বলুন দিকি?

হতভম্ব হয়ে বলি, আমি কি করলাম?

বাসায় ডেকে পাঠিয়ে কুকুরের মতো দূর-দূর করে তাড়ালেন। বাবার কাছে যেচে বিয়ের কথা পাড়লেন, তারপরে। এখন আবার আশীর্বাদের আংটি ফেরত দিচ্ছেন।

আমি কবে বাসায় ডাকলাম আপনাকে?

এমনি নয়, চিঠি লিখে। রাখাল ছোঁড়ার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এখন তো কিছুই মনে পড়বে না!

কী সর্বনাশ, আপনাকে দিয়েছিল সে চিঠি?

আমার নামের চিঠি—লাবণ্য নাম লেখা। আমায় ছাড়া কাকে দেবে? মিথ্যে বলে পার পাবেন না। রেখে দিয়েছি সে চিঠি, ফেলিনি। একলা অসুখে পড়ে আছেন, খবর শুনে কি রকমটা হল—বাইরে থেকে ক'দিন উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম। ভিতরেও যাইনি। সেই বড় দোষ হল? দোষ কিসের সে কি বুঝিনে—কুচ্ছিৎ চেহারা, তার উপরে গরিব।

কণ্ঠস্বরে সকল তিক্ততা ঢেলে দিয়ে উৎকট হাসি হাসলঃ যা ভেবেছেন, হবে না। আংটি যখন একবার পরে ফেলেছেন আর রেহাই নেই। দশের মুকাবেলা পরেছেন, বড় বড় সব সাক্ষি। আমি ঠেকাতে গিয়ে-গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন। বাবাকে নয়, মায়ের কাছে কেঁদে গিয়ে পড়লামঃ বিয়ে দিও না তোমরা—ঐ আরশুলা-হাকিমের সঙ্গে তো কিছুতে নয়। ও লোকের চেয়ে মুখ্যুসুখ্যু চাষাভুষো অনেক ভাল। মা যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল। বাবা শুনে রাগের বশে গুমগুম করে পিঠে কিল। ঠাণ্ডা মাথায় পরে আমিও ভাবলাম, গরিবের মানমর্যাদা কিসের? বাবার ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। এ সংসার থেকে বিদেয় হয়ে যেতে হবে। যেতেই হবে যেখানে হোক। মরবার হলে তো কলকাতায় খাসা গঙ্গা ছিল, এখানকার নোনা গাঙে ডুবতে যাবো কেন? কলকাতায় মামার বাড়ির ছাত ছিল, লাফ দিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত—এখানে গরুর দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলোঝুলি করবার মানে হয় না। মরতে যখন পারিনে, হোক বিয়ে—দেখাই যাক। আপনি বিদ্বান মানুষ, দেখতে ভাল,

দেবেন, না হয় লাথিঝাঁটা খাওয়াবেন সেই সঙ্গে। সে আমার খুব অভ্যাস আছে। অপমান করে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলেন বলেই এত বড় লাভ হাতছাড়া করা যায় না।

এক গাদা কথা বলে পিছন ঘুরে গরুর পিঠে থাবড়া দিল। গরু তাড়িয়ে বাড়ির দিকে চলল। পাথর হয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সারারাত্রি ছটফট করেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। ঐ মেয়ে যদি লাবণ্য, কাকে নিয়ে মেতে ছিলাম এতদিন? কার পিছনে ছুটোছুটি করেছি? ষড়যন্ত্র একটা। সেই আশ্চর্য রূপসী দয়ালহরির চেনাজানা কেউ, হয়তো বা দয়ালহরির মেয়ের সখি। চালাকি করে আমায় ফাঁদে ফেলেছে। পাড়াগাঁয়ে এমন ঘটনা নতুন নয়—ফরসা মেয়ে দেখিয়ে সাত পাকের সময়টা কালো মেয়ে কনে-পিঁড়ির উপর বসিয়ে আনে। এদের পদ্ধতি কিছু নতুন, কালটা আধুনিক বলেই। এখনকার পাত্র চোখের দেখা দেখেই পুলকিত হয়ে বরাসনে বসে না। কথাবার্তা বলে কিছু ভাবসাব জমাতে চায়। লাবণ্য সেজে সেই কাজ করে দিল। তারপরে আমাকে দায়-উদ্ধারক উদারপ্রাণ বানিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অশ্লমধুর চাউর করে ভালো ভালো সাক্ষি রেখে আশীর্বাদ অবাধ চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। হিসাবপত্র করে ছকে ফেলে কাজ হাসিল করা—পিছনে বড় মাথা কাজ করেছে। সুন্দরী শয়তানীকে আর একটিবার হাতের কাছে পাওয়া যায় না? ছেড়ে কথা বলব না তখন।

ঘুম নেই। চোখ বুজে শুই আর উঠে উঠে বসি। বিছানা ছেড়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াই কখনো বা নিশি-পাওয়ার মতন। সে অবস্থা বুঝবেন না আপনারা—বুঝতে না হয় যেন কখনো। হঠাৎ যেন কান্না আসে কানে। একবার মনে হল, আমার বুকের ভিতরে কান্না ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমিই ঠিক কেঁদে উঠেছি। এমন কি, চোখে হাত বুলিয়ে দেখি ভিজে-ভিজে কিনা। কিংবা কত বছর আগে এক রাত্রে এই বিয়েবাড়িতে যে তুমুল কান্নার রোল উঠেছিল, পোড়োবাড়ির গোপন কোন কক্ষে আটক হয়ে আছে, তার বুঝি একটুখানি কে ছেড়ে দিল। আজ সন্ধ্যায় ধবধবে মেয়েটা পাগলের মতো হয়ে গিয়ে হঠাৎ যেমন ডুকরে কেঁদে উঠল—স্পষ্ট নয়, কান পাতলে সেইরকম যেন শুনতে পাচ্ছি। নিস্তব্ধ রাতে কান পেতে অনেক দূরের ঝিল্লিধ্বনি শোনার মতো।

এদিক-ওদিক দেখছি। ঘরের ভিতর কিছু নয়, জানলা খুলে দিয়ে বাইরের পানে তাকাই। রাত্রি শেষ। জ্যোৎস্না ডুবে গেছে, আমতলায় নিবিড় অন্ধকার। কিছু

দেখা যায় না। কুঁজোর জল মাথায় থাবড়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুম—ঘুম—ঘুম!

সকালবেলা মাঠ পার হয়ে হোড়বাড়ি ছুটেছি। এত কাছে থাকি, দয়ালহরি প্রথম দিন থেকেই এমন খাতিরের মানুষ, রাঁধা ব্যঞ্জন পিঠা-পায়স অবিরত বওয়াবয়ি হয়েছে —কিন্তু আমি আজ প্রথম এই বাড়ি। দয়ালহরি আয়োজন করে একদিন বাড়িতে আহ্বান করবেন—মনের সংকল্পটা মাঝে মাঝে ব্যক্ত করেন—অতএব আহ্বানের অপেক্ষাতেই আসতে পারিনি এত কাল। সেই রাজসূয় কাণ্ডই সত্যি সত্যি হতে চলল, পাল্কি চড়িয়ে জামাই করে বাড়ি নিয়ে আসছেন। সেইটের যদি কোনপ্রকারে মার্জনা হয়। সর্বনাশের মুখে আঁকুপাকু করে মানুষ, যা মাথায় আসে করে বসে। আমার ঠিক সেই গতিক।

বাইরের এদিকটায় জনমানব নেই। ঘুম থেকে ওঠেনি কেউ, না কি ব্যাপার? সুপোরির পাতার বেড়া দিয়ে ভিতর অংশ আলাদা করা। সেদিকে মুখ বাড়িয়েছি... একটানা আওয়াজ কিসের? ক্ষণে ক্ষণে তীব্র তীক্ষ্ম ভয়ানক হয়ে ওঠে, আবার কমে যায়, একেবারে থামে না। আওয়াজ ঘরের ভিতর থেকে আসছে।

সহসা পুরুষের গর্জনঃ সারারাত্তির গেল, সকালবেলাতেও এখন হাপর চালাবি? বাইরে যা, রান্নাঘরে চলে যা বলছি।

তাই বটে, কামারশালে হাপর চালানোর মতন কতকটা। ভরর-ভরর ভস-ভস, ভস-ভস ভরর-ভরর। বাইরের বাতাস প্রাণপণে কুড়িয়ে এনে দেহে ঢোকাচ্ছে, দেহের ভিতর থেকে বাতাসের শেষ কণিকা বের করে দিচ্ছে। সমস্ত জীবনসত্তার একটিমাত্র কাজ শুধু এই। নিদারুণ শ্রমে ফুসফুসটা সজোরে হাহাকার করে ওঠে এক একবার যেন।

এত করে বলছি, কানে যায় না বুঝি? রাতের মধ্যে দুটো চোখ এক করতে দিলিনে। এবারে রেহাই দে একটু। তোর দুটো পায়ে পড়ি, চলে যা বেরিয়ে।

আওয়াজের ক্ষণিক বিরতি দিয়ে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠেঃ তুমি যাও যে চুলোয় খুশী। আমি পারব না। সাত লঙ্কা নড়ে বেড়াবার অত ক্ষমতা নেই আমার।

হায় ভগবান, হায় ভগবান! না নড়বি তো ন্যাকড়া গুঁজে দে মুখের ভিতরে। আওয়াজ না বেরোয়।

তুমি কানের ভিতরে ন্যাকড়া গোঁজ। গুঁজে দিয়ে যম-ঘুম ঘুমোওগে।

পিছিয়ে বাইরের দিকে চলে এসেছি ইতিমধ্যে। এক পক্ষ দয়ালহরি। বরাবর তাঁর মিনমিনে কণ্ঠ শুনি, নিজের ঘরে সিংহনাদ ছাড়ছেন। বিপরীতে নিশ্চয় বড়-বউ—যাঁর হাতের রান্না বিস্তর খেয়েছি এবং লোকের কাছে যাঁর কথা উঠলে দয়ালহরি গদগদ হয়ে ওঠেন। ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ির দাম্পত্যালাপ কান পেতে কেমন করে শুনি? পিছিয়ে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছি।

ফিরে যাব কিনা, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবছি। ইতিমধ্যে আরও সব কথাবার্তা হয়ে থাকবে, দূর বলে সম্যক কানে আসেনি। হঠাৎ শুনি, গুম-গুম-গুম আচ্ছারকম পিটুনি। আলাপের এতদূর পরিণতি ভাবতে পারিনি। ঘাড় নিচু করে হেঁ-হেঁ করে-বেড়ানো মানুষ দয়ালহরি বাড়ির মধ্যে এমন বীরপুরুষ, না দেখলে প্রত্যয় হয় না।

বড়বউয়ের আর্তনাদঃ ওরে বাবা, মরে গেলাম—

মরিসনে তো! না মরে চিরটাকাল জ্বালালি এমনভাবে। কত জন্মের শত্রু। বাড়ি তো অর্ধেক গিয়ে আছে। আমি যাবো। একটা একটা করে সবাইকে খেয়ে তারপরে নিজে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি তুই। মড়া ফেলাবার তখন লোক থাকবে না, শিয়াল-কুকুরে টেনে টেনে খাবে। তাই তোর কপালে আছে।

কথার ফাঁকে ঢিবঢাব দু-চারটে করে পড়ছে। আর বড়বউ মরি-বাঁচি চেঁচাচ্ছেনঃ গেছিরে, মেরে ফেলল রে খুনে ডাকাত। আধ-মরা মানুষ বলেও দয়াধর্ম নেই। ওরে, পাড়ার সব মরে গেল নাকি? কেউ একবার থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসে না? হাতকড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাক।

পাড়ার মানুষ কি, বাড়ির মেয়েই তো নির্বিকার। লাবণ্য বেরিয়েছে। বাইরে-বাড়ি কোন কাজে আসছিল। আমায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এলো।

চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন, ভিতরে আসুন। মাকে মারছেন বাবা। এইবারে বেরুবেন। আচ্ছা, আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনি যাবেন না।

দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে ধীরে সুস্থে সেই ঘরে ঢুকল। আজব কাণ্ড। মাকে ঠেঙানোর কথা কেমন সহজভাবে বলে। যেন সকালবেলার নিত্যক্রিয়া—মুখ ধোওয়া, উঠানে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, উঠানের উনুনে ফ্যানসা ভাত চাপানো—এইসবের আগেকার একটা ব্যাপার। গাছ থেকে পাতা পড়ার মতো এই ব্যাপারে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। আমার আসার খবর বলেছে গিয়ে লাবণ্য। মুহূর্তে চারিদিক ঠাণ্ডা। জোড়ে বেরিয়ে এলেন—দয়ালহরি পিছনে বড়বউ।

গাছপেত্নী বলে নাম আছে একটা। চোখে না-ই দেখি, ছেলেবয়সের রূপকথা এবং পটুয়াদের ছবিতে তার চেহারাটা পেয়েছি। কিন্তু জ্যান্ত মানুষের কাছে কোথায় লাগে। নমুনা এই বড়বউ। লম্বা লাঠির মাথায় একটা বড় গ্লোব বসানো—এতেই বর্ণনা হয়ে গেল। বিশাল মাথাটা পাল্লার একদিকে

এবং বাকি সমস্ত দেহ অন্য দিকে—ওজনে সমান দাঁড়াবে। দাঁড়িপাল্লায় না তুলেই স্বচ্ছন্দে বলা যায়। অবাক হতে হয়, ঐ বৃহৎ গোলক কাঠির মতো দেহ বয়ে বেড়াচ্ছে কি করে?

বড়বউ আমায় দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: দেখ, মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান দেখ একবার। পর-অপরের মতন দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়েছে। ঘরে যাও বাবা, খাটের উপরে বোসো গিয়ে। এতকাল শহরে কাটিয়ে এসেও মেয়ের জ্ঞান-বুদ্ধি হল না।

মধুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর—আহা-হা, অন্তর শীতল করে দেয়। মা ছোট্ট বয়সে গেছেন, তাঁর কথা জানিনে। আমার বউদি কিন্তু এমন মিষ্টি সুরে বলতে পারেন না। দয়ালহরির কথায় কথায় বড়বউর গল্প ফাঁদেন। শুনে শুনে এক বাৎসল্য-ভরা মা-জননীর ছবি পেতাম। শুধু এই গলা শুনেই মনে হচ্ছে, অন্তত এই ব্যাপারে দয়ালহরি মিথ্যে বলেন নি। মুখে যে কথাগুলো বললেন, আশ্চর্যভাবে আমার মনের ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কথা শুনতে হবে কিন্তু চোখ বুজে। চোখ মেলে দেখলে বিতৃষ্ণা আসবে। কী উৎকট চেণ্টাই না

হচ্ছে কথাগুলো কণ্ঠদেশ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করবার। চোখ বড় হয়ে কোটরের তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, গলার শিরা-উপশিরা দড়ির মতন টান-টান হয়ে ওঠে। কথার চাপে হয়তো বা শ্বাস আটকে শিরা ছিঁড়ে ধপাস করে ভুঁয়ে পড়ে যাবেন। কি জন্যে এত কথা বলতে যান উনি—শুয়ে পড়ে থাকুন না, উঠে আসবার কি দরকার?

উঠে আসাই শুধু নয়, দ্রুত উঠানে নামলেন। রান্নাঘর মুখো যাচ্ছেন। কত কষ্টের যে যাওয়া! বসে বসে দু-হাতে ভর দিয়ে থপথপিয়ে যাচ্ছেন ব্যাঙের মতো। ভাবী জামাই বাড়িতে পেয়ে গেছেন, রান্নাঘরের কাজ দেখাবেন কিঞ্চিৎ। কত পাঠিয়েছেন এযাবৎ—খাদ্য বললে হবে না, এক একটি নিপুণ শিল্পকর্ম। খাওয়ার আগে হাতে ধরে দেখতে হয়। আজকেও বুঝি সেই কর্মে চললেন। বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে, বিশুষ্ক এই হাড় ক'খানার উপর কেমন করে দয়ালহরির হাত উঠল। কাল থেকে সম্পর্ক পালটেছে—শ্বশুর-জামাই আমরা। এবং এর্সোঁছও দরবার করতে। কিছুই সে সব মনে রইল না—পদ-প্রতিপত্তির জোরে এতদিন ধমকে এসেছি, সেই ধমকই মুখে এসে গেল।

কী রকম মানুষ আপনি ঘোড়দশায়—ছি-ছি! অসুখে-বিসুখে এই তো সিকিখানা হয়ে আছেন। মায়াদয়ার কথা থাকুক, ওসবের ধার ধারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হিসাবি মানুষ তো আপনি—মারাতে গিয়ে আপনার হাতেই তো বেশি লাগে।

বড়বউ রান্নাঘরের ছাঁচতলা থেকে ফিরে দাঁড়ালেন। দয়ালহরির জবাবে আগেই বলে উঠলেন, ও কিছু নয় বাবা। কোন্ সংসারে না আছে। দুটো মোটে কলসি গায়ে গায়ে রাখলে ঘা-গুঁতো লাগে। এ তবু দু-জন মানুষে পঁচিশ বছর ঘরসংসার করছি। কিছু না, কিছু না। একটু জলটল না খেয়ে তুমি কিন্তু চলে যেও না বাবা।

দয়ালহরি হকচাকিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠলেন: তোমারই বা আক্কেল কেমন বাবাজি? হুট করে অন্দরে ঢুকে পড়লে। দু-একবার কাশতে হয়, কিংবা সাড়া নিতে হয়—বাড়ি আছেন নাকি? তুমি অবশ্য আপন মানুষ—দেখেছ, দেখছ। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। তবে আমার কথাটাও শোন, দু-পক্ষের বিচার হোক। আগুনের তাতে বসে একগাদা রান্নাবান্না করবে—খোশামোদ করেছি, মাথার দিব্যি দিয়েছি—এত রাঁধবে, নিজে যদি তার থেকে কণিকা মুখে দেয়! বারোজনকে খাইয়ে দেবে—বললে বিশ্বাস করবে না, বাড়তি হলে পথের মানুষ ডেকে ডেকে খাওয়াবে। ভাল রান্না হয়েছে, মুখে একবার বলল—তাতেই কৃতার্থ। আর আমি খেটে-খুটে বাড়ির উঠানে পা দিয়ে দেখব শুকনো কাঠ একখানা। কাঠ যাই হোক বাঁশবনে চুপচাপ পড়ে থাকে, এ কাঠ ফ্যাসফ্যাস করে কামারের জাঁতা টেনে মরছে দিনরাত। দেখে আর প্রাণে জল থাকে না।

অতিশয় বেজার মুখে হুঁকোদান থেকে হুঁকো টেনে দাওয়ার ধারে গিয়ে ছড়ছড় করে বাসি জল ফেলে দিলেন। খোলের ফুটোর মুখে গাড়ুর নল লাগিয়ে নতুন জল পুরছিলেন। কথার জের চলেছে: পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার। দিন নেই, রাত নেই। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই। কত সয় বলো মানুষের? বাড়িতে দাঁড়াতে পারিনে। তোমরা দেখ, আপিস হয়ে গেলেও বুড়ো বাড়ি যায় না, থানায় যাচ্ছে, এখানে ওখানে ফাঁপোরদালালি করে বেড়াচ্ছে। বাড়ি আসব কোন্ আনন্দে বলো, বাড়িতে আমার কিসের টান? যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ ভাল। সারাদিন খেটেখুটে রাত্তিরে দু-দণ্ড জোরাদিতে ঘুমোব, সে উপায় নেই। কতক্ষণ ভাল লাগে? কদিন মানুষের ধৈর্য থাকে? এক আধ দিন নয়, পঁচিশ পঁচিশটা বছর। মাথা খারাপ হয় কিনা, তুমিই বলো। সময় সময় সত্যি ইচ্ছে করে মারতে মারতে ওকে একেবারে মেরে ফেলে দিই। আমি মরে গেলে ও যে ভিক্ষে করে খাবে, ভগবান সে উপায় রাখে নি।

বলতে বলতে গলা যেন ধরে এলো। কলকে নিয়ে গম্ভীর মনোযোগে তামাক সাজতে বসলেন।

বড়বউ ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে তারস্বরে হাঁপাচ্ছেন। হাতের কাজও চলছে, কড়াইয়ে ভাজাভুজির আওয়াজ।

ইতস্তত করে অবশেষে আসল কথা বলে ফেললাম, দেখুন, ষষ্ঠীপুকুরে একবারটি খবর পাঠালে হয়।

দয়ালহরি ঘাড় তুলে তাকালেন: কেন?

কাতর হয়ে বলি, সাত শ' টাকার জন্যে সম্বন্ধটা আটকে রয়েছে, সে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দয়ালহরি ভ্রূকুটি করলেন: সাত সকালে বাসি হাতে, বাসি মুখে এই তুমি বলতে এসেছ? সেদিন যে খুব ধানাইপানাই করলে—অযোগ্য পাত্র তুমি, অনুগ্রহ করতে বলছিলে। কি হে, মনে পড়ছে না?

মাথা চুলকাই। জবাবেরই বা কি আছে আমার?

অনুগ্রহ চেয়েছিলে, তা সেই অনুগ্রহ-ই করলাম। প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছি। যোগ্য অযোগ্যের বিচার করলাম না। নতুন আবার কি হল?

আগের সে দয়ালহরি নেই। কথাবার্তা চালচলন আলাদা। আমার সেদিনের কথা-গুলো তাক করে করে ছুঁড়ছেন। নিরুপায়ে

মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আজ নাকি আমার জীবন-মরণ সমস্যা। আমতা-আমতা করে তাই বলতে হয়, ষষ্ঠীপুকুরের ওঁরা আগে এসেছিলেন তো। কথাবার্তাও এগিয়েছিল—

দেমাক করে ভেঙে দিয়ে গেল। এবারে পস্তাবে। সেই তুলনায় কত ভাল পাত্র পেয়ে গেছি, হিসাব করে দেখুক। ভাবছি, বরের খুড়ো সেই লম্বা-টেরিওয়ালা লোকটাকেই বিয়ের নেমন্তন্ন পাঠাবো। মনের দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে বেটা টেকো হয়ে যাবে।

রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসছেন। তখন মরিয়া হয়ে বলি, পণের সেই সাত শ' টাকা আমি দিয়ে দেবো। আরও পাঁচ শ' না হয় এদিক-সেদিক খরচের বাবদ—

দয়ালহরি গম্ভীর হয়ে গেছেন। বললেন, কন্যা দান করতে পারি তোমায়। প্রস্তাব করেছিলে, রাজি হয়ে গেছি। কিন্তু ভিক্ষে নিতে যাবো কেন? তোমারই বা সাহস হল কি করে ভিক্ষা দিতে চাওয়ার? এমন আস্পর্ধা ভাল নয়।

লাবণ্য এই সময় লোহার হাতায় আগুন এনে বাপের কলকেয় দিল। তাকাল আমার দিকে। চোখে হাসি উপছে পড়ছে। ভারি যেন মজা!

ধীরেসুস্থে কলকে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে গোটাকয়েক সুখ-টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দয়ালহরি বললেন, বাবাজী, বনেদি ঘর আমাদের। অবস্থা পড়ে গেছে, কিন্তু ভিক্ষের টাকায় মেয়ের বিয়ে দেবো না। আমার বাড়ির উপর বসে এতবড় কথা বললে—অন্য কেউ হলে কান ধরে বের করে দিতাম। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, জামাই মানুষ তুমি—ঠিক ঠিক জবাবটাও দিতে পারছিনে। যাকগে, বাজে কথায় কাজ নেই। ষষ্ঠীপুকুরের চেয়ে বেশি পছন্দ তোমায়। তোমাকেই কন্যা-সম্প্রদান করব। সেই জোগাড়ে লেগে যাও।

রায় দিয়ে তামাক টানতে টানতে উঠে পড়লেন। বোঝা গেল সমস্ত। নাগপাশে জড়িয়ে গেছি। একটা একটা করে দিন কেটে যায়। দয়ালহরি একবার করে উদ্যোগ-আয়োজনের খবর শুনিয়ে যান। আজকে ঢুলির বায়না হল। গাঁয়ের কি হাল হয়েছে—সারা বিরাটগড় চুঁড়ে সামিয়ানা মিলল না, সদর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। নয়তো ধুতি-শাড়ির আচ্ছাদন দিয়ে কাজ চালানো ছাড়া উপায় নেই। দুর্যু গোয়ালা দইয়ের দাম হাঁকছে পঁয়তাল্লিশ টাকা মণ। এই সেদিন অবধি দশ টাকার দই ভোজের পাতে খেয়ে লোকে বাহবা-বাহবা করেছে। সেই জায়গায় পঁচিশ টাকা বললাম তো গোয়ালা কি বলে জানো বাবাজি? হবে না কেন পঁচিশ টাকায়? কিন্তু দুধ হবে না—জল। জল জমিয়ে দেবো। সে ক্ষমতা রাখে দুর্যোধন। বাবুমশায়, তেমন তেমন ঢাকবার জিনিস পেলে গোটা পুকুর জমিয়ে দই বানাতে পারি।

এমন সব মজার কথায় হাসবার অবস্থা নেই আমার। দয়ালহরি বললেন, ছোটবাবু মাঝে পড়ে শেষটা পঁয়ত্রিশে রফা করে দিলেন। মানুষ কি রকম ত্যাঁদোড় হয়েছে দেখ, দারোগার কথাতেও দর কমাতে চায় না। দারোগা ধমক দিলে আগে মাংনা দিয়ে যেতো। তবে আমার হল নমো-নমো করে কাজ সারা। মাল নিচ্ছি মোটমাট পনের সের, কত আর ঠকাবি বল?

মতলব করে এসে শুনিয়ে যান কিনা, জানি না। শুনি, আর কাঠ হয়ে যাই। শুভদিন এগিয়ে আসছে। আর এর পরেই তো আমার ফাঁসিকাঠে চড়বার দিন এগুতে লাগল। ফাঁসির আগে কিন্তু এমন হয়নি। বিয়ের চেয়ে ফাঁসির ধকল অনেক কম।

(ক্রমশ)

# 'বাঘা যতীন' সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা

**ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরো উদ্যমে চলছে। একে একে অনেক শক্তিই তখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে বৃটিশ রাজ-শক্তি! জার্মানী তখন এগিয়েই চলেছে! বিশেষত "এমডেন" তখন সমুদ্রের মধ্যে তার লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিয়েছে। কখনও তাকে এখানে, কখন ওখানে, কখন ভারতের উপকূলে, কখনও মাদ্রাজের কাছে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাদ্রাজের উপকূলে ত' একটা উপক্রমই হয়ে গেল। পুরীর সৈকতে সে এসে পড়ল বলে এমনই গুজব খুব জোর চলেছে। বালেশ্বরের উপকূলে চাঁদিপুরে সরকারের Proof Dept. সেখানে গোলাগুলি সব পরীক্ষা করে তবে পাশ্ করা হয় ব্যবহারের জন্য। সেখানে সেই Dept. ও উপকূল রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিলিটারী সেখানে সজাগ পাহারা দিচ্ছে। সর্বদাই আশংকা "এমডেন" সেখানে গোলাবর্ষণ করে সব ধ্বংস করে দেবে। বালেশ্বরের একজন রাজকর্মচারী ত' ভয়ে কাছারিতে আসতেন না—নিজ আবাস হতে রাজকার্য পরিচালনা করতেন—পাছে বাহিরে এলে তাঁর উপর গোলাবর্ষণ হয়ে যায়। তখন ভিতরে ভিতরে এমনই একটা ত্রাসের বিভীষিকা চলছে। তার উপর আর এক খবর ছিল যে, বাংলার বিপ্লবীরাও খুব তৎপর হয়ে উঠেছে—কাছে পিঠে তাদের আস্তানা আছে ও প্রতি-মুহূর্তেই তারা জার্মানীদের সংগে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে। কারণে অকারণে শহরের মধ্যে পুলিস ফোর্স ও মিলিটারী কুচকাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে—এই সন্ত্রাসবাদীদের উপর খরদৃষ্টি রাখবার জন্য বোধ হয়।

সে সময় বালেশ্বর শহরের বড় রাস্তার উপর বাজারে একটা দোকান যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত সেটার নাম ছিল "The Universal Emporium". মুখ্যত সেটা সাইকেলএর দোকান হলেও তার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি মনিহারী জিনিসও থাকত।

৯ই সেপ্টেম্বর সকালে শহরবাসী আশ্চর্য হয়ে দেখলে যে, রাতে পুলিস সে দোকান ঘেরাও করেছে ও দু'একজনকে আটকে রেখেছে। কানাঘুষা এখন অনেকটা সত্য হয়েই প্রকাশ পেল যে, এ দোকানটি বিপ্লবীদের শহরের একটা আস্তানা! পুলিস সেটা জানত—আজ এমন একটা কিছু ঘটেছে (যেটা তখন পর্যন্ত অপ্রকাশ্য



ছিল) যার জন্য অকস্মাৎ এই ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী।

সেটা প্রকাশ হতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। বেলা ১২টা আন্দাজ একজন আহতকে নিয়ে চৌকিদার ও কনস্টেবল হাসপাতালে উপস্থিত হ'ল। ওই অঞ্চলের থানার দারোগা একে পাঠিয়েছেন। সংগে injury report form. আহতজন গুলীবিদ্ধ হয়েছে। তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজন হলে ভর্তি করতে হবে—পুলিস প্রহরায় থাকবে ও অবিলম্বে report পাঠাবার জন্য দারোগা সাহেব অনুরোধ করেছেন।

যেমন সব দেশেই হয়ে থাকে, কুতূহলী জনতা হাসপাতালে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু পুলিস তাদের বাধা করে দিয়ে—গেটে প্রহরী মোতায়েন করে দিলে। আহতকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, গুলী বুকের বাম ভাগে উপর দিকে লেগে clavicleএর নিচে দিয়ে পরিষ্কার পিছন দিকে বের হয়ে গেছে। দেহের মধ্যে গুলী নেই। রক্তমোক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। নাড়ীর অবস্থা ভালো। অবস্থা কিছু সংগীন নয়। তাকে চিকিৎসার পরে পুলিস প্রহরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হ'ল। প্রসংগত বলে রাখি, ৮।১০ দিন বাদে এই লোকটি হাসপাতাল হতে নিরাময় হয়ে চলে যায়।

কিন্তু এই লোকটিকে কে বা কাহারা গুলী করল? এ সংবাদ পেতে মোটেই বিলম্ব হ'ল না। চৌকিদার ও কনস্টেবল যারা এসেছিল তারা অযাচিতভাবেই যে বিবরণ জানিয়ে দিলে তাতে জানা গেল যে, তাদের গ্রামে পাঁচজন অর্ধনগ্ন চেহারার লোক ভোরের দিকে এসে হাজির হয়, তারা বোধ হয় জার্মান, তাদের হাতে ৪।৫টা বন্দুক, একজনের বাড়িতে লুকোবার চেষ্টা করতে ধরা পড়ে যায়, তারপর হল্লা করে ওদের ধরে ফেলবার চেষ্টা করতে ওরা গুলী করে গ্রামের প্রধানের ভাইকে প্রায় খুন করে ফেলে। এরপর চৌকিদার ছুটে চলে যায় থানায়। দারোগাবাবু খবর পেয়ে যখন এসে হাজির হলেন তখন তারা নদী পার হয়ে ওপারের জংগলে ঢুকে গেছে। দারোগাবাবু গামছা পরে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে দেখে এসেছেন, সেই জার্মানরা ওপারে "কোঁঠি" লুকিয়ে আছে। এখন এই আহত লোকটিকে দারোগাবাবু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন ও সেই সংগে এস পি সাহেবকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, যেন তিনি Magistrate সাহেব, Proof Dept.এর সাহেবদের নিয়ে ও সেই সংগে পুলিস ও সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হন ও এই "গুণ্ডা জার্মানদের" জব্দ করে দেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সংবাদ এসে গেল, যেন আমরা হাসপাতালে কয়েকটি আহতকে ভর্তি ও চিকিৎসা করবার জন্য প্রস্তুত থাকি—যে কোন মুহূর্তে তারা এসে পড়তে পারে। আমরা প্রতিমুহূর্তেই এই রকম সংবাদের প্রত্যাশা করছিলাম। যদি

...য়া গভীর জঙ্গলে না ঢ়ুকে গিয়ে থাকে, ...া নিজেদের না লুকোতে পেরে থাকে তাহলে নিশ্চয় একটা সংঘর্ষ বাধবে, আর বিপ্লবীরা যখন সশস্ত্র তখন একটা ভালো রকমের বোঝাপড়াই হবে!

আজ থেকে দীর্ঘ ৪৩ বৎসর আগের কথা। তখন বালেশ্বর শহরে না ছিল টেলিফোন, না ছিল wireless, না ছিল ইলেকট্রিক আলো বাতির কোন বন্দোবস্ত। দ্রুত যানের মধ্যে মাত্র ২।১খানি মোটরকার। অতএব বিদ্যুৎগতিতে সংবাদ নিয়ে আসবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম বৃশ-সাইকেল আরোহীদের মারফত।

* * *

এই সময়ের মধ্যে প্রকৃতিরও আবহাওয়া অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। সমস্ত দিন আকাশ ছিল মেঘাবৃত, কখনও কখনও অল্প ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর হতে দুর্যোগ শুরু হয়ে গেল। আকাশের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত চিরে চিরে বিদ্যুৎ চমক, ঘন ঘন বজ্রনাদ ও দেখতে দেখতে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। অন্ধকার নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠল। এ যেন মূর্তিমান মহা-অমংগল নিজেকে কৃষ্ণাবাসে ঢেকে সর্বকিছুই বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলল!

প্রায় রাত্রি ১০।১১টার সময় দূরের ঘন অন্ধকার ভেদ করে তীব্র হেড লাইট জ্বলে উঠল—আশে পাশে হ্যাজাকের আলো। অতিথিরা এসে উপস্থিত, আমাদের গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রসেশনের সম্মুখে মোটরে ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ কিল্‌বি, এস পি মিঃ খোদাবক্স ও প্রুফ ডিপার্টমেণ্টের Rutherford সাহেব—তার পরে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী তাদের চারিদিক হতে ঘিরে এগিয়ে আসতে লাগল।

হাসপাতালের সম্মুখের ঘেরা বারান্দায় খাটগুলি নামান হলে চারিদিক হতে পুলিস তাদের ঘিরে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল। বিনা এস পি-র নির্দেশে এই নিরন্ধ্র ব্যূহে কারোও প্রবেশের অনুমতি নেই।

সেই অনুমতি মিললে ঢুকে প্রথমে যাকে দেখলাম, তিনি রক্তাপ্লুত দেহে নিস্তব্ধ ও নিশ্চল! অর্থাৎ তিনি ইহজগতের সবকিছু জন্মভূমির পাদপদ্মে সমর্পণ করে চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন! মহাযোগী চিরধ্যানমগ্ন। ইনি চিত্তপ্রিয়!

দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মনোরঞ্জন ও নীরেন। বনশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তারা যেন বিশ্রাম করছে। দেহে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন কিছু নেই—আছে অল্পবিস্তর জখমের দাগ।

৪র্থ ব্যক্তি যতীশ পাল। বুকের দক্ষিণ দিক বিদীর্ণ করে গুলী বের হয়ে গেছে। সমস্ত অঙ্গ রক্তাপ্লুত। অর্ধ অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে।

পঞ্চমজন, ভীষণভাবে আহত। সমস্ত দেহ রক্তধারায় ভেসে যাচ্ছে, কোথাও বা কিছু শুকিয়ে গেছে, কোথাও বা তরল—গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘনশ্মশ্রু ও গুম্ফে সমস্ত মুখমণ্ডল ভরতি হয়ে রয়েছে, সেখানেও রক্ত—গড়িয়ে যাচ্ছে। অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল বাবরীর আকারে কাঁধ পর্যন্ত লুটোপুটি খাচ্ছে—রক্তধারা ঝরে পড়ছে। ঊর্ধ্ব অঙ্গ অবারিত। পরনে অপরিসর—কটিবাস। তলপেটে ও নাভির ধারে—বুলেটের ক্ষত। টাট্‌কা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কটিবাস রক্তে ভিজে গিয়েছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে ও ক্ষণে ক্ষণে রক্তবমি হয়ে যাচ্ছে। এক নিমেষেই বুঝতে পারা যায়, এ আঘাত অতি সাংঘাতিক ও যবনিকা পড়তে বেশী দেরি হবে না। নিকটে যেতে যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দাদা আপনি আমাকে চেনেন না—কিন্তু নাম নিশ্চয়ই জানেন, আমি বাঘা যতীন"। অতি কষ্টে হাটু তুলে সেখানে গভীর পুরাতন ক্ষত দেখিয়ে বললেন, "এই সেই বাঘের ঘায়ের চিহ্ন—আমার মাথার দাম এখন ৫০০০্। চুলোয় যাক্ সে সব—আমার বড় তৃষ্ণা—এখন একটু জল দিন্"

• • •

যথাসম্ভব শীঘ্র সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। চিত্তপ্রিয়ের দেহ চলে গেল—শবব্যবচ্ছেদ গৃহে। যতীশ, মনোরঞ্জন ও নীরেন—প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে উপযুক্ত হেফাজতে military guardএর তত্ত্বাবধানে রইল। আপাতত মনোরঞ্জন ও নীরেন এইখানেই থাকবে—কাল তারা হাজতে চলে যাবে—কেননা, ওদের আঘাত এমন কিছু সাংঘাতিক নয়।

যতীন্দ্রনাথকে অপারেশন রুমে স্থানান্তরিত করা হ'ল—অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করার জন্য। সেইখানে—তার বিছানার ব্যবস্থা করা হ'ল।

মিঃ কিল্‌বি আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেলেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, ভদ্রলোক এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না। ছুটে এসে বললেন, ডাক্তার—এত বমি করছে, ওকে sweet drink দিলে কেমন হয়? তার পরেই চাপরাসীকে lemonade আনতে বল্লেন।—লেমনেড এলো। কিন্তু সে খেয়েও বমি তেমনই হতে রইল।

ততক্ষণে একটা injection দিয়ে drip saline শুরু হ'ল। (তখনকার দিনে intravenus glucose, বা blood, কিংবা plazma transfusion শুরু হয়নি) রোগী যেন একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল। কিল্‌বি সাহেব ফের এসে বল্লেন, ডাক্তার operationএর আগে এর ত' dying declaration নিতে হবে? তার কি ব্যবস্থা করেছ? উত্তরে জানালাম যে, S D Oকে লিখে পাঠিয়েছি। কিন্তু তাতে ত' দেরি হয়ে যাবে—সাহেব তুমি নেবে?"

"নিশ্চয়—কিন্তু তার আগে জেনে নাও যে, ও dying declaration দেবে কিনা?"

কিল্‌বি সাহেবের পরিচয় দিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, উনি dying declaration দেবেন কিনা?

কিল্‌বি সাহেবের পরিচয় পেয়ে মনে হ'ল বেশ একটু খুশী হয়ে উঠলেন, বল্লেন "নিশ্চয়—, এ সাহেব বড় ভাল লোক ডাক্তার

জের পিওনের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য রে কামড়ানর পর সেই ছেলের ঘা থেকে চুষে তাকে বাঁচিয়েছিল। শীগগির স্থা করে দাও, আমি জবানবন্দী দেব।"

সাহেব এগিয়ে আসতেই শুরু করলেন, ood morning Mr. Kilby. Had I d known that you were in the rty, I would have never aimed ots at you I know you are a ry kind hearted man, you saved life of your peong son, while u were District Magistrate at dnapur.

সাহেব হাঁ না কিছুই না ব'লে চুপ করে শুনে যেতে লাগল—

I am Jatindranath Mukherjee—the Tiger Jyotin—the price of whose head is Rs 5000| or there about now. Are you sure about my identity? Here is the scar mark on my knee—The one who is dead is Chitta-priya Roy. The one with bullet wound on the chest is Jyotish Pal, and the other two are Monoranjan and Niren. I am responsible for all what have been done at Bengal till now. They are mere boys and they are all innocent. They are mere tools in my hands. I have great faith in the British Raj, and I know you will do justice, and not punish the innocent. Please see that they are acquitted."

থেকে থেকে দম নিয়ে কষ্ট করেই এই কথাগুলো বলা হ'ল, কিন্তু যখন নিরপরাধদের ছেড়ে দেবার কথা উঠল, তখন সমস্ত বলার মধ্যেই এমন একটা কাকুতি ও ব্যাকুলতা ভেসে উঠল যেন কোন অনুগ্রহ প্রার্থীর আবেগভরা আবেদন শুনছি।

কিল্‌বি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে তোমরা কি করছে?"

উত্তরে বল্লেন, "তোমরা ত' সবই জানো। নতুন কথা কি বলব? এখন যা বলতে চাইছি তাই শোন—মনোরঞ্জন ও নীরেন যখন আত্মসমর্পণ করছিল—তখন তাদের গুলীভরা পিস্তল দুটো তোমাদের দুজন লোককে দিয়েছিল। তোমাদের লোকেরা এই নতুন ধরনের পিস্তলের গুলী ছোঁড়বার কায়দা না জানায় মনোরঞ্জনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ছোঁড়বার কৌশল জেনে নিতে চাইলে। সাহেব ওরা যদি সত্যকারের বিপ্লবী হ'ত তাহ'লে কি এই সুযোগ ছেড়ে দিত? আকাশে গুলী না ছুড়ে, ছুড়ে দিত তোমার লোকেদের বুকের উপর—নিশানা ভুল হ'ত না। তা যখন তারা করেনি তখন বোঝো সাহেব, তারা কত শিশু।—ওরা নিরপরাধ, ওদের যেন ক্ষমা করা হয় এইটুকু তুমি দেখো। প্রতিশ্রুতি দাও সাহেব" এই বলে সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সাহেব সে হাত না নিয়ে বল্লে—"আচ্ছা আচ্ছা সে হবে—এখন বল ত' তোমরা ওখানে কতজন ছিলে, কি করতে?"

মুখ ঘুরিয়ে যতীন্দ্রনাথ বল্লেন, "তুমি আমায় প্রতিশ্রুতি দিলে না—আমি আর কিছুই বলব না।"

সাহেব ক্ষুণ্ন হয়ে মুখ ভারি করে উঠে গেল—বলে গেল, সকালে আসবে!

* * *

Drip saline চলেছে। আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিকিৎসাও চল্‌ছে—অস্ত্রোপচারের সব ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাকে ডেকে পাঠালেন—গেলে—বল্‌তে শুরু করলেন:—

"জানো ডাক্তার, এই চারদিন ও তিন রাত্রি আমরা কি কষ্ট পেয়েছি? এই ক' রাত্রি ও ক' দিন কুকুর বেড়ালের মত এরা আমাদের তাড়িয়ে ফিরেছে। আমাদের সেই জংগলের আস্তানায় আমাদের কাজ ছিল—গুলী ছোঁড়া অভ্যাস করান। নতুন নতুন লোক আসত—গভীর জংগলে targetting করত ও শেখা হলে চলে যেত। এইবার আমরা মাত্র পাঁচজন ছিলাম। যেই সংবাদ পেয়েছি পুলিস আমাদের সন্ধান পেয়েছে, ধরতে আসছে, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে যেটুকু না নিলে নয় তাই নিয়ে রওনা হয়ে পড়েছি। পড়ে

রইল আমাদের হোমিওপ্যাথির ডাক্তারখানা—পড়ে রইল আমাদের ছোট্ট দোকান।"

কিছু রক্ত বমি হয়ে গেল একটা প্রবল কাসি এসে। হেসে বল্লেন, "আশ্চর্য, এখনও দেহে রক্ত আছে? সান্ত্বনার মধ্যে এই যে, মায়ের পূজোয় এই রক্ত-অঞ্জলি দিয়ে গেলাম। এ কোনও দিনই বৃথা হবে না।"

"জানো ডাক্তার, জংগলের মধ্য দিয়ে রাত্রের ঘোর অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা যে কি করে পথ চলেছি—তার কোনও ধারণাই তোমরা করতে পারবে না। সে দুঃখ কষ্ট অবর্ণনীয়। এইরকমভাবে চলতে চলতে আমরা গিয়ে Soro স্টেশনের কাছে পৌঁছে দেখলাম যে, ওই বৃষ্টির মধ্যেও স্টেশনে পুলিস ভরা। আলোয় আলোময় করে রেখেছে—সেখান দিয়ে সরে পড়বার কোনও সম্ভাবনাই নেই। হতাশ হয়ে আবার মাঠে নেমে এলাম কিন্তু এই রাতে যাব কোন্-দিকে? বাকি রাতটুকু সেই পাটের ক্ষেতে আত্মগোপন করে রইলাম। আহারের মধ্যে জুটল পাটপাতা ও পানীয়ের মধ্যে আলের জল।"

থামতে বল্লেও তিনি মানলেন না, বলে চললেন, "রাতের অন্ধকারে আবার পথ চলা শুরু হল—সেই জল সেই কাদা—সেই পদে পদে বাধা। এমনই করে যখন বালেশ্বর স্টেশনে পৌঁছলাম তখন সেই সতর্কতা। সেই পুলিসের পাহারা, সেই সমস্ত স্টেশন আলোয় আলোময়—। দুচারজন পুলিস অফিসার ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সতর্কতা।

"ফিরে আসতে হ'ল—যাবার কোনও উপায় নেই। ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। তারপর এমনই করে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলেছি দুদিন কিন্তু বেরিয়ে যাবার কোনও সুযোগ মিলছে না। তারপর স্থির করলাম, এদিক দিয়ে হলো না, ময়ূরভঞ্জের দিকে চলে যাই যদি ওদিক দিয়ে পালাবার কোনও রাস্তা পেয়ে যাই!"

এমন সময় সংবাদ এলো, কলিকাতা থেকে টেগার্ট সাহেব এসেছেন ও আমার সংগে দেখা করতে চাচ্ছেন। নার্সের জিম্মায় ও'কে রেখে আমি বাইরে এসে ও'দের সংগে দেখা করলাম। বেরিয়ে দেখলাম যে, হাসপাতালের চেহারা একেবারে বদলে গেছে—চতুর্দিকে পুলিস ও মিলিটারীতে ভরে গেছে। যেন হাসপাতাল নবকলেবর ধারণ করেছে।

টেগার্ট সাহেবেরা তিন চারজন ছিলেন, যতদূর মনে হয়, Denham, Ryland ও আরও দু' একজন ছিলেন। ওরা যতীন্দ্র-নাথের সংগে দেখা করা সম্ভব হবে কিনা জানতে চাইলেন, ও হওয়া সম্ভব জেনে ওয়ার্ডে দেখতে এলেন। যতীন্দ্রনাথ Tegart সাহেবের সংগে বেশ রসিকতা করেই বল্লেন—"Good morning Mr. Tegart—দেখা হল ভালই হল। চিত্তপ্রিয় ত' চলে গেছে—আমিও চল্লাম। যে বাকি তিনজন রইল এরা কিন্তু নিরপরাধ—দেখো যেন এদের শাস্তি না হয়।" টেগার্ট বল্লেন, "মুখার্জি, তোমার জন্য কি করতে পারি বল?

হেসে বল্লেন: "Thank. All fiinished Good bye."

ওরা চলে যেতে বল্লেন—"দেখলে, আমার বন্ধুদের দেখলে?—কি গভীর ভালবাসা! জীবন্ত ধরতে পেরেছে বলে বড় আনন্দে এসেছিল কিন্তু নিরানন্দ হয়ে ফিরে গেল। ওরা শত্রুপক্ষ, কিন্তু বীরের জাত ডাক্তার এটা ভুলো না।"

আবার শুরু করলেন, "একটুকু বাকি আছে ডাক্তার সেটুকু সেরে নেই—। ময়ূর-ভঞ্জে যেতে গিয়ে সকালে এসে যে গ্রামে পৌঁছলাম সেটা একটা ছোট্ট নদীর ধারে। এমন অনেক সময় হয়েছে ডাক্তার যখন পুলিসের তাড়া থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা মা জননীদের আশ্রয় খুঁজেছি ও পেয়েছি এবং আত্মরক্ষা করতে পেরেছি কিন্তু এখানে তা হল না। আমাদের দেখে গ্রামবাসীরা আমাদের ঘিরে ফেল্লে। পথ চলাই মুশকিল হল। তারপর আমাদের একটা বড় ভুল হয়ে গেল। ওদের ভয় দেখাতে গিয়ে আমরা যে গুলী ছুঁড়লাম দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে একজন গ্রামবাসী আহত হয়ে গেল। সে গ্রামের চৌকিদার কাছের থানা থেকে নিয়ে এল দারোগাবাবুকে ও কনস্টেবলদের। আমরা তাই দেখেই—এধারে থাকা আর সুবিধার নয় বুঝে নদী পার হয়ে চলে গেলাম ওধারের জংগলে—এধারে ওরা হট্টগোল করতে রইল।

"কতদূর যে ক্লান্ত হয়েছিলাম তা বুঝতেই পারছ—তার উপর অনিচ্ছায় একটা গুলী ছুঁড়ে এই যে অবথা খুনোখুনির মধ্যে পড়ে গেলাম এইজন্যও যথেষ্ট মন খারাপ হয়ে গেল। জানতে পারছি, এখন এখানে থামলে এই আমাদের হয়ত শেষ থামা হবে, কিন্তু ছায়ায় ঢাকা এক টিলার কাছে এসে আমরা সেইখানেই যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। এতটুকু সামর্থ্য নেই যে, আর আগে যাই।

"কখন যে চোখের পাতা মুদে এসেছে জানি না। বন্দুকের আওয়াজে ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো আবছায়ায় দেখলাম যে, আমরা চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত হয়েছি।

"ঘুম ভাঙতে দেখে ওরা আমাদের জানান দিলে যে, আমাদের আর পরিত্রাণ নেই। যদি আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহ'লে কোনও কথা নেই, তা যদি না করি তাহ'লে জীবিত বা মৃত ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

"বুঝতে পারলাম, এবার আমাদের সত্যকারের জীবন-মরণের রণ শুরু হয়ে গিয়েছে। নিষ্ক্রমণের পথ নেই—চতুর্দিক হতে আমাদের বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র রণ। চোখে চোখে আমাদের পরামর্শ হয়ে গেল।

সগর্জনে আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র ওদের challangeএর জবাব দিলে। শুরু হয়ে গেল আমাদের রণ, মরি কিংবা মারি! দূরে দেখতে পাচ্ছি আবছা আলোয় সাদা হ্যাট, পরা লোকেদের। এই ত' এরাই ত' আমাদের শত্রু! আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র হতে মুহুর্মুহু গুলীবর্ষণ শুরু হ'ল। মনে হল যেন দু একটা হ্যাট স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে চলে গেল কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ওরা আমাদের ঠকিয়েছে। বাঁশের ডগায় হ্যাটগুলো রেখে ওরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে।—ওদেরও গুলী এসে আমাদের মধ্যে পড়ছে!—বিরামহীনভাবে গুলী বিনিময় চলছে। আমাদের পিস্তল, ওদের ভারি ডবল ব্যারেল বন্দুক! উন্মাদনায় আমরা মেতে উঠেছি—রক্তে রক্তে সে কি উন্মাদনা! লোকলোচনের অন্তরালে কোন একটা অখ্যাত নামা জঙ্গল আজ সহিদের যুদ্ধক্ষেত্র হবার পুণ্য অর্জন করতে চলেছে!

"কিন্তু প্রথমে প্রাণ দিল চিত্তপ্রিয়। লুটিয়ে পড়ল দেহটা, কিন্তু মাথা তার গাছের শিকড়ে উঁচু হয়ে আটকে রইল। শির উঁচু রেখেই সে সাধনচিত্তধামে চলে গেল।"

কয়েক মিনিট যতীন্দ্রনাথ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন, কিন্তু আমার চোখের সামনে কি অপরূপ দৃশ্যই আমি দেখলাম। এই মৃত্যুপথযাত্রীর এতটুকু ভয় নেই, বিহ্বলতা নেই—রণপরাজয়ে এতটুকু মনে দুঃখ বা গ্লানি নেই—সে সবের ঊর্ধে তিনি চলে গিয়েছেন—হয়ত তিনি দেখছেন যে, মায়ের শৃঙ্খল মোচন হয়ে গিয়েছে—আর সেই মহান অপরূপ দৃশ্যের অনিন্দ্য মহিমার ছটায় তিনি মুগ্ধ ও আত্মবিস্মরিত!

আবার শুরু করলেন, "এবার আমার পালা ডাক্তার। আজ আমাদের জীবন দেবার শুভ সুযোগ এসেছে! শুরু হল আবার গুলী বিনিময়—সম্মুখে পিছনে দক্ষিণে বাঁয়ে চারিদিক হতে আসছে গুলী। ওই ওরা এগিয়ে আসছে—ওদের মধ্যে কেউ আহত হচ্ছে না—আমরাই শুধু আহত হচ্ছি—ওই আমাদের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে—ওই জীবন মরণের সেতু ভেঙে আসছে।

তারপর অজ্ঞান হয়ে গেছি। কতক্ষণে জ্ঞান হ'ল জানি না। কিন্তু যে দৃশ্য দেখলাম, তা যদি না দেখতে হ'ত। দেখলাম, যতীশ আহত হয়ে পড়ে আছে, মনোরঞ্জন ও নীরেন দু হাত তুলে আত্মসমর্পণ করছে। এ দৃশ্য দেখবার জন্য কি ভগবান আমার জ্ঞান ফিরে দিলেন? তারপর ভরা পিস্তলের গুলীগুলো সাহেবদের বুকে না ছুঁড়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল—তখন চেঁচিয়ে বলতে গেলাম, ওরে মূর্খ, ওরে হতভাগারা, এ তোরা কি করলি? এত বড় সৌভাগ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করলি? কিন্তু কোনও কথাই মুখ দিয়ে বা'র হ'ল না—বা'র হ'ল শুধু হু হু করে তাজা রক্ত!" দুই চোখ দিয়ে অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। এবার আস্তে আস্তে ক্ষীণস্বরে বল্লেন, "ভুল সকলেরই হয়—আমাদেরও কিছু ভুল হয়ে গেল তাই এবারকার মতন হেরে গেলাম। কিন্তু মা আমাদের এটুকু ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন। জানো ডাক্তার, আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চয় আসবে—পরাধীনতার শেকল ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে।"

* * *

অস্ত্রোপচার হল। যা হবে বলে জানা ছিল তা হ'ল। শত চেষ্টায় সে অমূল্য জীবনকে ধরে রাখা গেল না।

হাসিমুখে বীর মৃত্যুকে বরণ করে চলে গেছেন। দেশের মুক্তির জন্য এই বিরাট আত্মত্যাগের এমন প্রাণবন্ত দৃশ্য ক'টা লোক দেখতে পায়? আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এ দৃশ্য দেখতে পেয়েছি—মুগ্ধ হয়েছি। শুধু কি আমরাই মুগ্ধ হয়ছি—বিপক্ষ-পক্ষ যখন এত বড় বীরের মৃত্যু-সংবাদ শুনল—তখন তাদেরও চোখ শুষ্ক ছিল না। আমাদের সঙ্গে তারাও চোখের জল দিয়ে এ'দের জন্য শ্রদ্ধা জানিয়েছে—মহাতর্পণ করেছে।

আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে—প্রার্থনা করি, কামনা করি, তাঁদের আত্মা যেন শান্তি পেয়ে থাকে। বড় অশান্ত মন নিয়ে তাঁরা চলে গেছেন।




ইচ্ছে থাকলেই নাকি উপায় হয়। ঝগড়ুরাম কাহারের ইচ্ছেও ছিল, উপায়ও হলো। অনেকদিন ধরেই ইচ্ছেটাকে সে মনের মধ্যে পোষাপাখির মতো আদর দিয়ে পুষে এসেছে এবং ইচ্ছেটি, শুধু একটি 'বঙ্গালিন্' বিয়ে করার। বাঙালী মেয়ে দেখলেই সে সম্ভ্রম আর সংকোচের দৃষ্টি তুলে এমনভাবে তাকাতো যে, সে যেন স্বর্গের হুরী-পরীদের দেখছে। কিন্তু, এসব মেয়ে বিয়ে করার কথা সে কোনদিনই ভাবতো না। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবে কেন? তবু ইচ্ছেটা দিনরাত তাকে খোঁচা দিতো।

প্রথম পক্ষের বৌ, মরে গেছে কবে। আজকাল, তারই কথা মাঝে মাঝে ভাবতে হয় তাকে। মরে যাবার পরে, মনে হচ্ছে, কি ভালো মেয়ে ছিল সে। জানকী। কাজে-কর্মে, সেবায়-শুশ্রুষায়, আচারে-ব্যবহারে তাকে কাহারের মেয়ে বলে মনেই হতো না। কিন্তু হ'লে কি হবে! ঝগড়ু কি কোনদিনই তা'র সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে! জানকীর না হয় রূপ ছিল না, কিন্তু পার্বতীর তো আছে। পার্বতী তো 'বঙ্গালিন্'! আগের বৌটি থাকতে কিছু করতে হতো না তাকে। আর এখন? এখন তাকে রান্নাবান্নাও করতে হয় মাঝে মাঝে। পার্বতীর খুশী হলো তো, রাঁধলো, না, হয় পায়ের উপর পা দিয়ে বসলো, পাটরানীর মতো সেজেগুজে।

দিন চালানোর জন্য ছোলা-মটর আর 'বর্‌রা' 'ধস্‌কা' ভেজে, ঝুড়িতে নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরতে হয় তা'কে। পাবর্তী যদি এ-সবও তৈরী করে দিতো! আগের বৌ জানকী এ সবই করতো। আজকাল, ঝগড়ুই কলাই ভিজিয়ে, কলাই বেটে 'কড়ুয়া' তেলে ভেজে বড়া তৈরী করে: চাল বেটে 'ধুস্‌কা' তৈরী করে। পথ-চলতি লোকে তা'র দাওয়ায় বসে গরমাগরম ভাজা খেয়ে তারিফ্ করে যায়। বাকী যা থাকে, তাই নিয়ে সে ফিরি করে বেড়ায়।

এ সবই সহ্য করতে পারে ঝগড়ু। কিন্তু আচ্ছা বঙ্গালিন্ জোটালো সে: ঝগড়ুর সঙ্গেও তা'র ঝগড়া। পাড়ার মধ্যে তো এমন কেউ নেই, যা'র সঙ্গে তা'র ঝগড়া হয়নি। চুপ করে, হজম করতে হয় তা'কে। মাঝে মাঝে, মাথা গরম হয়ে গেলে, পার্বতীয়াকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বা'র করে দেবার ইচ্ছেও আজকাল হচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেও সব ক্ষেত্রে কি উপায় হয় নাকি! পার্বতী তার নেশা। মাতালের মতো ভালোবাসা ঝগড়ুর। 'দুৎতেরি' ব'লে মাঝে মাঝে নেশার অভ্যাস ছাড়তে চাইলেও ছাড়া যায় না।

যদি বোঝা যেতো পার্বতীকে: ঝগড়ু যদি বুঝতে পারতো! কোন কোন সময় এমন আদরের সুরে কথা বলে পার্বতী, ঝগড়ু একেবারে বিগলিত হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই হয়তো, তুচ্ছ কোনও কারণে, ঝগড়ুরামের মা-বাপ তুলে গালাগালি দেয় পার্বতী। আগে, প্রতিবাদ করতো সে, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

কোন কোনদিন, গভীর প্রেমাকুল চোখ তুলে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় ঝগড়ুরাম, পার্বতীর দিকে এমনভাবে তাকায়,, এমনভাবে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় তা'র দেহে-মনে সর্বত্র, পার্বতীরও করুণা হয়: কিন্তু, পার্বতীর মেজাজ যদি ঠিক না থাকে, তা'হলে চেঁচিয়ে উঠবে সে। তা'র ত্রিশ বছরের সামর্থ্য শরীর রি-রি করে উঠবে, রাগে না ঘৃণায়, কে জানে! বলবে, 'আ মরণ, গিলবেক নাকি হাম্‌কে: চখ দুটো বাছুরছ্যানার মতন করছিস কেনে: আমি কি তর গাই বটে! খোট্টা থালভরা কুথাকার—'

ঝগড়ু তখন হয়তো আত্মস্থ হয়েছে। বলবে, আস্তে আস্তে বলবে, গলার স্বর নীচু করে বলবে: 'তুম্‌কো হম্ বহুৎ পেয়ার করতা, লেকিন্ তুম হম্‌কো—'

'বাস্ বাস্, আর পিয়ার দখাতে নাই হবেক ড্যাম্‌রা-চোখা: ঢের হ'য়েছে। ইদিকে পরনের শাড়িটা যে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলছে, চোখে দেখতে পাইস্ না? পোকা পড়েছে নাকি চোখে?'

পরে, ঝগড়ু তা'কে ভালো শাড়িই কিনে দিয়েছে।

কিছুদিন মন-মেজাজ ভালোই গেছে। ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প-গুজবে ছড়িয়ে দিয়েছে পার্বতী। আর ঝগড়ু স্বর্গের চাঁদ হাতে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছে।

একদিন তো রীতিমতো অবাক্ হয়ে গেছে ঝগড়ু, পার্বতীর কথা শুনে। •

'দে, আমাকে ছাড়্, বড়া ভাজবো আমি—'

পার্বতী, তা'র স্থূলে কোমরে শাড়ির আঁচল জড়ায়।

কথা শুনে, ঝগড়ু প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। তবু, খুশী হলো সে। পার্বতীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো একবার। তারপর গলায় সোহাগ ঢেলে বললো, 'তুম্ নহী সকোগে। এত্না তক্লিফ্ কর্না বেকার হ্যায় বহুরিয়া! জব্ তক্ ঝগড়ু জীন্দা হ্যয়—'। আচম্কা থেমে গেল ঝগড়ুরাম। দেখ্লো, উদ্যতফণা নাগিনীর মতো পার্বতী ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বাস ছাড়ছে। এরপরেই ছোবল পড়বে ঝগড়ুর বুকের উপর।

'ক্যা হুয়া বহু—!'

মুখ ভেংচে উঠ্লো পার্বতী। 'বহু! তোর বিয়ে-করা বহু আমি? যখন তখন যে বহুরিয়া বলে পোকাধরা দাঁতগুলো বার করিস বড়! ফের যদি উ সব কথা বলবি তো গরম তেল লিয়ে দিব ঢাল্যে তোর মুখে, হ্যাঁ। চিনিস নাই আমাকে তুই।'

ঝগড়ু আর কিছু বলবার আগেই পার্বতী তা'র হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল ছান্তাটা। প্রতিবাদ ক'রে লাভ নেই জেনে, ঝগড়ু আর দ্বিরুক্তি করেনি।

তেল পুড়েছে। হপ্তাখানেকের পোড়া, কালো তেল; পুড়ে পুড়ে চিট্কালো হয়ে গেছে। কয়েকটা কাঁচা বড়া নিয়ে সেই তেলের মধ্যে ছেড়ে দিল পার্বতী। কল্কল্ করে মধুর একটি শব্দ শুনতে পেলো সে, তারপর মুগ্ধ চোখ দিয়ে দেখতে লাগলো, বড়াগুলো কেমন ক'রে লাল হয়ে যাচ্ছে ফুটন্ত তেলের মধ্যে। বড়াগুলো এবারে তুলে ফেলা দরকার, কিন্তু পার্বতীর সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভিড় জমে গেল আবার।

পার্বতী বড়া তৈরী করছে নিজের হাতে। ভিড় তো জমবেই।

হরবংশ নোয়া দাড়ি কামিয়ে ফিরছিল, ক্ষুরবাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে। চার পয়সার 'বর্‌রা' কিনে সেইখানেই বসে গেল খেতে।

তারপর এক কামড় দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল। 'আরে, রাম রাম রাম, একদম তিতা হো গিয়া, বর্‌রা। একদম বর্বাদ্।'

চোখ কট্মট্ করে তাকালো পার্বতী।

আর কিছু বলতে হয়নি। পার্বতীকে হরবংশ নাপিত ভালো করেই চেনে। ঝগড়ুর দিকে তাকিয়ে, ভ্রূকুটি করে উঠে গেল সে।

খুব ব্যথা পেলো ঝগড়ু।

কিন্তু পার্বতী তো আর খোট্টা মুলুকের মেয়ে নয়। বুকটা ফুলে উঠলো ঝগড়ুর। বড়া পুড়িয়েছে ভালোই করেছে। সে কি তাকে বড়া ভাজবার জন্য এনেছে না কি? মনে মনেই বললোঃ বংগাল মুলুকমে লড়্কী লোক খানা হি পকাতা নহী। খালি ঘুমতা, ফিরতা, বেশ বনাতা। সাজা বাজা কেশ, তবু বংলাদেশ!

এসব কথা পার্বতীকে খুলে বলা যাবে না। শুনলেই হয়তো চটে লাল হয়ে যাবে, বর্‌রার মতোই কল্কল্ করে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত তেলের মধ্যে। তাছাড়া, পার্বতীকে ভালোবেসে সে এখানে এনেছে, নাই-বা হলো সাদী-করা বহু। একসঙ্গে আছে এতদিন ধরে, তাই বা বিয়ের চেয়ে কম কিসে!

পার্বতীর মুখ খুলেছে। নাপিতকে পালাতে দেখে, তা'র রাগটা বেড়েছে আরো বেশী। আপন মনেই বকতে শুরু করলো সে। 'খালভরা নাপিত, আমাকে বড়া ভাজতে শিখাবি তুই। তোর বাপের জনমে খায়েছিস্ বড়া ক'নদিন!'.....তারপর, ঝগড়ুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই বইলো সব। নাই করব ই সব কাজ। লে।'

ঝনাৎ ক'রে ছান্তাটাকে ফুটন্ত তেলের ভেতরে ফেলে দিয়ে রাগে ফর্ফর্ করতে করতে উঠে গেল সেখান থেকে। কিছুটা তেল ছিটকে পড়লো উনুনের আশেপাশে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ঝগড়ু। 'এইসান্ জনানাকে গোড় লাগি বাবা!'

আবার বড়া ভাজতে বসলো সে।

ও'র বড়া খেয়ে তারিফ করে যায় সবাই। জগদীশলাল উকিল সাহেবের বাড়িতে তা'র বাঁধা বরাদ্দ। উপর বাজারের প্রত্যেকটি মহল্লাতেই তা'র বাঁধা খদ্দেরও ঢের।

তেলের মধ্যে, বড়াগুলোকে উল্টেপাল্টে শক্ত করতে লাগলো ঝগড়ু। তারপর, পাশের ঝুড়িতে তুলে তুলে রাখতে লাগলো।

কাছারিতে লোক জমছে। ডিভিশনাল কোর্ট। দশটা বেজে গেছে বোধ হয়। ঝগড়ুর দাওয়া থেকেই গোটা কাছারিটা নজরে পড়ে। বড় বড় গাছের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে ঘরগুলি। একটু পরেই মেলা বসে যাবে গাছের তলায় তলায়। পান-বিড়ির দোকান, শাক-সব্জির হাট, জামা-কাপড়ের 'মার্কিট' সবকিছু মিলে গম্গম্ করবে

জায়গাটা। কোথাও নিলামওয়ালা হাঁকডাক দেবেঃ এক রুপিয়া, এক রুপিয়া! আট রুপিয়াকে মাল, এক রুপিয়া। আউর কোই হ্যায় বাবু! দো রুপিয়া—দো রুপিয়া—।

গাছের তলায় ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুক আর বাঁদর-নাচ দেখাবে, 'মদারী' আর ছোকরা উকিলের দল পান চিবুতে চিবুতে মক্কেল খুঁজতে ছুটবে এধার থেকে ওধার।

রাস্তার উপর দিয়ে, ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ মল বাজিয়ে, ঘাঘরা-পরা একটি মেয়ে চলেছে কাছারির দিকে। বাবরি চুল-ওয়ালা একটি ছোকরা, ঢোলক ঘাড়ে তার সাথে হাঁটছে। বড়ার গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়ালো দুজনে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি কথাবার্তা হলো, তারপর মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে চটুল চাউনি হেনে বললো, 'এ ভৈয়া, বড়া খিলাওগে?'

মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালো ঝগড়ু। বিশ-বাইশের বেশী বয়েস হবে না। বলল, 'হাঁ হাঁ আও, বৈট যাও।' ঝগড়ু বসবার জায়গা দেখিয়ে দেয়। তারপর বাছা বাছা তাজা কয়েকটা বড়া একটা ঠোঙায় ক'রে মেয়েটির হাতে দিয়ে দেয়।

বড়া খেতে খেতে বাবরি চুলওয়ালা ছোকরার কানের গোড়ায় কি যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো মেয়েটা, তারপর খিলখিল্ ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়লো একেবারে। হাসি শুনে পার্বতী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। চৌকাঠ ধরে গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলো মেয়েটিকে। অস্বাভাবিক রূপে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘাঘরা-পরা মেয়েটি তাকে দেখতে পেলে কি ভাবতো কে জানে। পার্বতী যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে চোখ পড়েনি তার।

'ক্যা বাত হ্যায়?' ঝগড়ু হঠাৎ মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো, তার হাসি শুনে।

ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে আবার মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি আর আরাম ক'রে, বড়া খেতে লাগলো।

'এ ভৈয়া?'

ঝগড়ু তাকালো তার দিকে, বড়াগুলোকে ওলোটপালট করতে করতে।

'ক্যা বাত হ্যায়?'

'তুমহারি জবু নহী হ্যায়? তুম্ অপনে বড়া পকাতে হো।'

ছোকরাটি মিট্‌মিট্ ক'রে হাসছে আর বড়া খাচ্ছে।

ঝগড়ু আবার চোখ তুলে তাকালো। জবাব দিল না।

'লেকিন্ বহুৎ আচ্ছা পকাতে হো তুম্। একদম্ মেহরারু ঐসা—(একেবারে মেয়ের মতো)। আউর দো আনেকা দে দো ভৈয়া।' বলেই, আবার সেই হাসি।

পার্বতী তেমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। নিথর হয়ে ভাবছে।

রাস্তা দিয়ে লোকজন এগিয়ে চলেছে। ঠুন্‌ঠুন্ ঠিংঠিং ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা দৌড়চ্ছে। একটা মোটরগাড়ি হর্ন বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল। ভুতুয়া তালাও থেকে পচা জলের গন্ধ বেরুচ্ছে। পাশের মন্দিরে কেউ ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কোর্টের হৈ-হল্লা বাড়ছে ক্রমশ। একটু পরেই এই মেয়েটা ঘাঘরা ঘুরিয়ে নাচবে, ছোকরাটা ঢোলক বাজাবে গাছতলায়। ভিড় জমবে। চোখের তীর ছুঁড়ে মেয়েটা পয়সা আদায় করবে।... মেয়েটা নাচছে। পার্বতীর চোখের পর্দায় ছায়াছবি দেখা দিল। মেয়েটা নাচছে, ছোকরাটা ঢোলক বাজাচ্ছে। ছোকরাটা গান গাইতে ও জানে। পার্বতী অবাক্ হলো। গাইছেই তোঃ—

কাঁথ বিনা মুহেমা মলিন ভেল সখীয়া হে
কাঁথ বিনা আঁখিয়া ঝমরি গেল;
আরে—না-আ-আ

পার্বতী কোথায় শুনেছিল এ গান? কবে শুনেছিল......!

ঝগরু বড়া ভাজছে। পার্বতী জানে না। মেয়েটা বড়া খাচ্ছে। পার্বতী জানে না। ছেলেটা মিট্‌মিট্ করে হাসছে। পার্বতী জানে না। পার্বতী পাষাণ হয়ে গেছে।

ঝালদার মেলায় ঝগড়ু গেছলো বড়া বিক্রি করতে।

দু' বছর আগের কথা।

সেই মেলাতেই ঝগড়ুর সঙ্গে পার্বতীর দেখা। বড়া খেতে এসেই আলাপ। এক-কালে, সিনি শহরের নামকরা 'নাচনী' ছিল পার্বতী। রঙীন ঘাঘরা পরে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, ঢোলের আর নাগড়ার তালে তালে কোমর দুলিয়ে নাচতো।

একটানা পনেরো বছর ধরে, শুধু নেচে বেড়ানো, জীবনকে বোধ হয় ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। তবু, না নেচে, চুপ করে থাকাই আরো বেশী পীড়াদায়ক।

ঝালদার মেলায়, নাচতে নাচতে সেদিন ক্লান্ত হয়ে পড়লো পার্বতী। রসিক ছোকরা-দের অশ্লীল গানও তাকে উত্তেজিত করতে পারলো না। নাগরা বাজছে: গিড়ি গিড়ি গিড়িদ্দুম। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজছে; উরুরুরু গিড়াম গিড়াম্ তাং: টিং টিং করে তাল রাখছে মন্দিরা। কিন্তু পার্বতীর হঠাৎ মনে হলো তার পা দুটো লোহার মতো ভারি হয়ে গেছে; কোমরে ব্যথার প্রলেপ। ঝুমুর গানের কলিতে মধু ফুরিয়েছে।

পার্বতীর কাছে ভিড় জমেনি।

ওদিকে নতুন একজন কমবয়সী নাচনী এসেছে বলরামপুর থেকে। ওখানেই ভিড়টা বেশী। ছোকরাদের আঙুলের ডগায় রাখা পয়সাকে চুমু দিয়ে তুলে নিচ্ছে নাচতে নাচতে। চোখের চাউনিতে মাতাল করে দিচ্ছে সবাইকে।

পার্বতী লক্ষ্য করছে। ভিড় ওদিকে; এদিকে নয়।

এক সময় নাচের আসর ভেঙেছে। মেলা চলবে তিনদিন ধরে। কাল আবার নাচ হবে। কাল বোধ হয় একটি লোকও আসবে না পার্বতীর নাচ দেখতে।

পার্বতী হাঁপিয়ে পড়েছে।

পনেরো বছর বয়স থেকে নাচতে নাচতে আজকে মনে হচ্ছে এসব দুর্বিষহ। এ'র মধ্যে মালিক জুটেছে ঢের; হাতবদলী হয়েছে বহুবার। খেলার পুতুলের মতো তাকে নিয়ে খেলেছে কত লোক। ভেড়ুয়ার দল তা'র পিছনে ঘুরঘুর করেছে কতোদিন; আর আজ তা'র নাচ দেখে নাক সিঁটকে সরে যাচ্ছে সবাই। পেছন থেকে মন্তব্য করে যাচ্ছেঃ 'দু পয়সার খেলাঃ ধুমসী মাগীর নাচনকুঁদন ঝাইলদা টাঁড়ের মেলা'

এই ঝালদার মেলাতেই বড়া ভেজে বিক্রি করছিল ঝগড়ুরামঃ লে লো ভৈরা গরমা-গরম। কয়েকজন লোক কিছুদূরে বসেছিল মদের বোতল নিয়ে। বড়া ভাজা কিনে 'চাট' করছিল।

বড়া ভাজার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেল পার্বতী।

ঝগড়ুকে বলল, 'কত করে লিছ হে? দাও দেখি চার পইসার বড়া, খাঁয়ে দেখি।'

বেশ খাতির ক'রে বড়া খাওয়ালো ঝগড়ু। বসতে বললো পার্বতীকে।

বড়া চিবুতে চিবুতে চোখ বন্ধ করলো সে। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা। এখনো রাত কিছুটা আছে মনে হচ্ছে। কোথায় ঘুমুবে পার্বতী?

চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, ঠিক তার শরীরের মতো, পায়ের মতো। তন্দ্রাবিষ্ট পার্বতী ভাবছে বোধ হয়। নাচতে তাকে হবেই। বিদ্রূপকে ভ্রূকুটি করেই নাচতে হবে; না হয় ভাত জুটবে না পেটে। সে কারুর বৌ নয়, ঘরণী নয়, মেয়ে নয়, মা-ও নয়। সে নাচনী।

বড়া ভাজতে ভাজতে, পার্বতীর মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল ঝগড়ু। বহুৎ খুবসুরত বঙ্গালিন্।

'আউর খাওগে?'

প্রায় চমকে ওঠে পার্বতী। চোখের পাতা থেকে ঘুমের সীসে ছিটকে পড়ে কিছুদূরে। আড়মোড়া ভাঙে সে। তারপর মুচকি হেসে বলে, 'আর পইসা নাই হে। বিনা পইসায় দিবে ত দাও।'

ঝগড়ু কৃতার্থ হয়ে, বিগলিত হয়ে, পার্বতীর পাতে বিনা পয়সার চারখানা বড়া তুলে দেয়।

'কুথায় ঘর তুমার গো?'

মুখ প্রফুল্ল ক'রে, বুক ফুলিয়ে জবাব দেয় ঝগড়ুঃ 'রাঁচি শহরমে।'

'আঁ রাঁচি-এ? শহরে?'

'হাঁ বড়া শহর। যাওগে তুম্।' নেহাত কথার কথাই বলে ঝগড়ু।

পার্বতীর পা দুটো লোহার মতো ভারি; চোখের পাতায় ঘুমের আঠা। বললো, 'যাবো, হামকে লিয়ে যাবে তুমি!'

মেলার গা ঘেঁষে ন্যাড়া পাহাড়টা, অন্ধকারের মধ্যে আর একখণ্ড অন্ধকার। অন্ধকার-সমুদ্রে মাথাতোলা ঢেউ। ছোট লাইন দিয়ে একটা মালগাড়ি চলে গেল। অসংখ্য তারা জ্বলছে আকাশে। কিন্তু লোকটার ঘরে বহু বিটি নাই তো? পার্বতী ঘুমিয়ে পড়লো। সেইখানেই। জেগে উঠে দেখলো, ঝগড়ু তাকে ডাকছে, 'চলো যাওগে হমারে সাথ্?'

কতোদিন হলো? দু বছর? এক বছর? তিন বছর? হিসেব রাখেনি পার্বতী। বাবরি চুলওয়ালা ছোকরা তা'র বাইজী বৌকে নিয়ে চলে গেছে কাছারিতে। তাতে পার্বতীর কি? কিন্তু তারপর থেকে সেই-যে মুখ ভার করে থাকলো, সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হলো—তবুও তার [illegible] হলো না।'

ঝগড়ুও ঘাটাতে সাহস করেনি। তবুও খাওয়া-দাওয়ার শেষে শুতে যাবার সময়

ঝগড়ু ভয়ে ভয়ে বল্‌লো, 'মন-মিজাজ্ ভারি কাহে তুমহারা? ক্যা কসুর হুয়া?'

কি দোষ করেছে ঝগড়ু?

পাশে আর একটা খাটিয়াতে শুয়ে পার্বতী নির্বাক।

হ্যারিকেনটা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে এক কোণে। পথঘাট নির্জন হয়ে গেছে। শুধু লছমন ধোবীর গাধাগুলো খট্ খট্ করে ছুটোছুটি করছে হাঁক ছেড়ে।

কিছুক্ষণ পরেই নাক ডাকালো ঝগড়ু।

কতো রাত হয়েছে কে জানে। ধড়মড় করে উঠে বসলো ঝগড়ু। 'ক্যা হুয়া?'

পার্বতী তাকে সজোরে নাড়া দিয়ে, তারই খাটিয়ার ওপর বসে আছে।

হ্যারিকেনের স্বল্পালোকে মুখ দেখা যাচ্ছে না পার্বতীর। শুধু, কানের গোড়ার দিকটা নজরে পড়ছে।

ঝগড়ু বিস্মিত। কি চায় পার্বতী?

গভীর আদরের সংগে পার্বতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে।

পার্বতী কথা বল্‌লো, 'হামার একটা কথা শুনবে? ঢোলকটা বাজাবে একটিবার?—' অনুরোধে প্রায় ভেঙে পড়লো সে।

পার্বতীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না ঝগড়ু। পার্বতী পাগল হলো নাকি?

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় ঢোলক বাজিয়ে গান গাইতো ঝগড়ু। পার্বতী আসার পর থেকে তা' তোলা আছে। ঢোলক শুনলেই ক্ষেপে উঠতো পার্বতী। বলতো, 'খবরদার, ঢোলক বাজাতে পাবি না তুই। উয়ার সাথে আমার বাদ হ'য়ে গেলছে। উয়াকে আমি চখে নাই দেখবো। উ আমার সতীন বটে। আমার গোটা জীবনটা বরবাদ্ হ'য়েছে উয়ার লেগে। খবরদার, বলছি।'

ঝগড়ু আর ঢোলক বাজায় নি। গলা-ও বন্ধ।

অবাক হয়ে জবাব দিল ঝগড়ু: 'ইত্‌না রাত মে—'

ছোট্ট মেয়েটির মতো আবদার পার্বতীর। 'আমি শুনবো তুমার বাজনা। আমি আজ লাচবো গো। আমার লাচবার মন হ'য়েছে। তুমি বাজাও।'

ঝগড়ু উঠে বসলো। কিন্তু—

'শুনছ নাই, উয়ারা কাছারিতে লাচ করছে, গান করছে! লিয়ে আইস তুমার ঢোলক। আমি লাচ্‌বো। মু-পড়ীকে দেখাই দিব, লাচ কাকে বলে।' পার্বতী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ক্রমশ। ঝগড়ুকে ধরে নাড়া দিতে থাকে।

ঝগড়ু পাথর হয়ে গেছে।

কিন্তু ঝগড়ু জানে, পাথর হলে চলবে না। তা'হলে এক্ষুনি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে গালাগালি দেবে মেয়েটা।

'কালা হয়েছ নাকি? বহেরা হয়েছ?'

ঝগড়ু গিয়ে আলোটা উসকে দিল।

হৈ হৈ ক'রে উঠলো পার্বতী। 'থাক্, থাক্, উ যেমন আছে তেমন-ই থাকুক; আলোতে লাচ্‌বো নাকি? লাজ নাই আমার?'

পার্বতীর লজ্জা আছে। আলোটা একবারে নিবিয়ে দিল ঝগড়ু। তারপর ঢোলকটা এনে, আস্তে আস্তে বাজাতে লাগলো: চাক্লাইকে চাক্‌ধুম, চাক্লাইকে চাক্‌ধুম—।

পার্বতী নাচছে। বুঝতে পারছে ঝগড়ু। শুধু মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

ঢোলক বাজাতে বাজাতেই চোখ বন্ধ করলো ঝগড়ু। ঘুমের দূতেরা আবার যাওয়াআসা করছে চোখে। কতোক্ষণ নাচবে পার্বতী কে জানে।

লছমন ধোবীর গাধাগুলো খট্ খট্ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে।

চম্‌কে উঠ্‌লো ঝগড়ু। কাঠের ঢোলকটা চুরমার হয়ে গেছে। এবং গাধার মতোই চেঁচাচ্ছে, পার্বতী।

ঝগড়ু ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

আবার কি হলো? ঢোলক ভাঙলো কেন পার্বতী।

পার্বতী তখন গালাগালি শুরু করেছে। —'খালভরা খোট্টা। তুই কি জানিস ঢোল বাজনার? বাপের জনমেও শুনি নাই এমন ধারা ঢোল-বাজনা আমি। ইয়াতে কি লাচ হয়রে নির্বংশ্যা। তোর বাজনদারিয়ার মুখে ঝাড়ু।'

ঝগড়ুর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। হাতের আঙুলগুলো লোহার মতো শক্ত হয়ে গেল। নাক থেকে গরম নিশ্বাস বেরুতে লাগলো। সারা দেহে আগুন জ্বলে গেল। চোখ দুটো মোষের চোখের মতো বড় বড় হয়ে গেল।—পার্বতীর গলার দিকে তা'র হাত দুটো বাঘের মতো লাফিয়ে পড়তে গিয়ে, হঠাৎ থেমে গেল।

পার্বতী অন্ধকারে মুখ গুঁজে, গুমরে গুমরে, ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। অন্ধকার ভেসে যাচ্ছে, কান্নার প্রবাহে। কত যুগের কান্না যে পার্বতী পুষে রেখেছিল; কে জানে! আজ বাঁধ ভেঙে গেছে।

সেই স্রোতে ঝগড়ুরাম ভেসে গেল।

তা'র মনে হলো, কুটোর মত অসহায় সে। ঝিম্‌ঝিম্ করছে মাথা। আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে যেন।

পার্বতী কাঁদছে। ঝগড়ুর কাছে আসা অবধি এই তার প্রথম কান্না। ঝগড়ু আলো জ্বালালো না।

# কালা-ধলা

**অরুণ বাগচী**

লিঞ্চ হিম্‌। লিঞ্চ দ্যাট নিগার।" ইংলণ্ডের কোনো শহরে ইংরেজের মুখ থেকে এমন কুৎসিত কথা বেরুবে তা ভাবাই যায় না। অথচ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, লণ্ডনের 'নটিংহিল' অঞ্চলে একথা আমি একবার নয়, দুবার নয়—শুনেছি অসংখ্যবার। গত সোমবার সন্ধ্যায় এই বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য ছিল অল্পবয়সী এক কৃষ্ণকায় ছাত্র। প্রাণরক্ষার জন্য সে দৌড়ে পালাচ্ছিল। তার পেছনে তাড়া করে আসছিল একদল গুণ্ডা। হাত ছাড়িয়ে পালাবার আগে তারা সে বেচারাকে লাথি মেরেছে, পা মুচড়ে দিয়েছে। এক সব্জী-ওয়ালার দোকানে দৌড়ে ঢুকে পড়তেই সব্জী বিক্রেতার স্ত্রী দরজায় খিল তুলে দিলে। বহুক্ষণ বাদে পুলিস এসে উদ্ধার করল তাকে।

……শিকার হাতছাড়া হওয়াতে সবাই বিরক্ত। লাল শার্ট পরা এক ছোকরা আমাকে বল্লে—"আমি ব্যাটার পা আচ্ছাসে মুচড়ে দিয়েছি। পুলিস এসে ঝামেলা না বাধালে ওটাকে আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলতাম।"……চলে আসছি। একজন চেঁচিয়ে বল্লে, "খাতাকলম নিয়ে কাল আবার আসিস। এর পরের পরিচ্ছেদের মালমশলা পাবি।"

উপরোক্ত বর্ণনা আমার নয়। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার পত্র। অল্প কথায় এই জঘন্য ঘটনার যথাযথ ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরের দিন আমি হেঁটে গেছি ঐ রাস্তায় এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখেছি টেডীবয়ের জটলা। গুমোট গরমে পাৎলা জ্যাকেট চাপিয়ে তারা পায়চারী করছে। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কৌতূহলী মানুষের মুখ উঁকি দিচ্ছে। কখন 'খেলা' শুরু হয় তার আশায়। একটা নিগ্রোকেও দেখলাম না কাছাকাছি। সবাই বাড়ির ভেতর ঢুকে বসে আছে চুপ করে। এই অঞ্চলে পোর্টো-বেলো রোড ধরে যেতে যেতে কতবার চমকে উঠেছি প্রাণখোলা হাসির শব্দে। সেই হাসির অনুঝংকার, কালো রঙের মাঝে সাদা দাঁতের চমক কতবার আমার মনের ভার লঘু করেছে। সেদিন মনে হল, সে যেন গত শতকের স্মৃতি। লণ্ডনের ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে যে সহজ হাওয়া হঠাৎ পথ ভুলে এসে পড়েছিল, আচমকা তার অস্তিত্ব এক দুঃস্বপ্নের মাঝে অন্তর্হিত হয়েছে।

নটিংহ্যাম এবং নটিংহিলের কালা-ধলার দ্বন্দ্ব আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জেনেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অল্পবয়সীরা—সাধারণত যাদের কাছ থেকে ঔদার্য আশা করা যায়, তারাই এই গণ্ড-গোলের হোতা। পুলিস যাদের ধরে চালান দিয়েছে তাদের বয়েস প্রায় সবারই পঁচিশের নীচে। বারো তের বছরের ছেলেমেয়েরাও দল বেঁধে হুল্লোড়ে বেরিয়েছে। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে খিস্তি খেউড় জুড়েছে। বিলি করেছে ফ্যাসিস্ত ইস্তাহার। গান ধরেছে, 'লেট আস হ্যাভ এ লিটল রক'। (গভর্নর ফবাসের খুশি হবার কথা!) জিজ্ঞেস করেছে 'টাইমসে'র সংবাদদাতাকে—তুমি কি আমাদের দলে, না কেল্লেসের?

মনে রাখা দরকার, এদেশে অল্পবয়সীদের ভেতর অপরাধপ্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের গবেষক লেসলি উইলকিন-সনের হিসেবে ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে যারা জন্মেছে, অপরাধপ্রবণতা তুলনামূলকভাবে তাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী। এই সমস্যা নিয়ে এদেশ বিশেষজ্ঞেরা খুবই মাথা ঘামাচ্ছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা অল্পবয়সে প্রচুর কাঁচাটাকার আস্বাদ, এই সমস্ত নানাকারণে এদেশের যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ ইংরেজ সমাজের বাঁধা সড়ক থেকে সরে আসছে। বেডফোর্ড কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মেরী স্টকসের মতে এরা আসলে Lazy youngmen—'angry youngmen' নয়। আলস্য এদের মনের সীমানা ক্রমেই সংকীর্ণ করে আনছে।

গোলমালের একটা কারণ বলা হয়েছে যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তজ্জনিত অসূয়া। কালো মানুষের পাশে কটারঙ তরুণীকে দেখে ইংরেজ যুবকের বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে হতাশ প্রেমিকের ঝকঝকে গাড়ি, চকচকে পোশাক বিদেশী



নাটিংহিলের এই নিগ্রো মেয়েটি 'ধলা'র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়েছিল

আকর্ষণ অনেক মেয়ের কাছে দুর্নিবার। ফলে প্রেম এবং বিয়ে। তামাটে রঙ ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে মা-বাবার মন নিশ্চয়ই ভরে। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীর চোখ প্রসন্ন হয় না। সব বিয়ে সুখেরও হয় না। অন্যক্ষেত্রে সহজ সমাধান বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ। এক্ষেত্রে জটিলতা। নিগ্রোর ঘরণীকে ঘরে আনতে সাদামানুষের প্রবল বিতৃষ্ণা। কোনো দেশ থেকে দলে দলে যখন লোক বিদেশে যায় তখন সেই দলে কিছু অবাঞ্ছিতের অস্তিত্ব স্বাভাবিক। এদেশাগত কিছু





ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান তাদের স্ত্রীদের অর্জিত অর্থে জীবন কাটায়। ক্ষেত্রবিশেষে সেই উপার্জনের সূত্র হল দুনিয়ার 'আদিমতম পেশা'। নটিংহ্যামে প্রথম যখন গোলমাল বাধে তখন এক রেস্তোরাঁর মালিক বলেছিলেন: এ ঝগড়াটার মূল কারণ হল এই, কিছু কালো লোক স্ত্রীর টাকায় সংসার চালায়। এইসব টেডীবয়রাও চায় ঠিক সেইভাবে অলস জীবন কাটাতে। তা যখন সম্ভব হয় না, তখনই কলহ। আজ সাদা-কালোয় লড়াই। কিন্তু টেডীবয়দের এক দলের সঙ্গে অন্য দলের ঝগড়া—সে তো চিরন্তন ব্যাপার।'

এছাড়াও, বলা হচ্ছে, বাসযোগ্য বাড়ির সংখ্যাল্পতা, চাকরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা—এ সমস্তই এর পেছনে রয়েছে। কিন্তু আসলে 'এহ বাহ্য'। যথার্থ কারণ সন্ধান করতে হলে আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

দু বছর এদেশে বাস করে এ ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে যে, বর্ণবৈষম্যের হাত থেকে ইংলণ্ড মুক্ত নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বার বার স্বীকার করব, বর্ণ-বিদ্বেষের চৌহদ্দী খুব ছোট। ব্যাপকভাবে ইংরেজরা এ ব্যাধিতে ভোগে না। রাস্তাঘাটে 'এই কালোকুত্তা' 'এই কেলে' ইত্যাদি মধুর সম্বোধন যে একেবারে শোনা যায় না তা নয়। তবে সাধারণ ইংরেজ সাধারণত ভদ্র সংযত ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত। সহনশীলতাও তাদের খুব বেশী। কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষ না থাকুক বর্ণসচেতনতা তাদের যথেষ্ট। আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গুমোর তাদের মজ্জাগত। ফলে মুরুব্বিয়ানার সুর তাদের কথাবার্তায় অত্যন্ত প্রকট। পিঠ চাপড়ানো তাদের সহজে আসে। এই পৃষ্ঠ-পোষকতা পরম বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু একটা সীমানা পর্যন্ত তা বিপজ্জনক নয়। সে সীমা অতিক্রম করলেই পৃষ্ঠপোষকরা পৃষ্ঠপীড়ক হয়ে দাঁড়ায়। তরুণদের দোষ দিয়ে কী হবে? জন্ম থেকেই তারা শুনেছে 'কেলে ব্যাটারা' কিছু নয়। অসভ্য বর্বর। রাস্তাঘাট বানিয়ে, রেল বসিয়ে, পাদ্রী পাঠিয়ে শ্বেতপ্রভুরা কালোদের কতকটা মনুষ্যপদবাচ্য করেছে। সেই কালোরা যখন তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে চায়, তখন তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

একথাও ভুলি কেমন করে, আজ ইংলণ্ড জুড়ে একটা হিংসার চর্চা হচ্ছে। টেলিভিশন সেট খুলুন। ছোটদের আসরে গুড়ুমগাড়ুম গুলী চলেছে। কাউবয় ফিল্ম। কিংবা ডেভিক্রকেট জাতীয় কেউ রেডইণ্ডিয়ান-নিধন করছে। কাগজ খুলুন। তাতে কোলাম জুড়ে হত্যাহাহাকার। গুণ্ডামি বা নারীঘটিত অপকীর্তির বর্ণনা। সিনেমায় যান—সেখানে অধিকাংশই যুদ্ধের ছবি। নয়তো খুন-জখম-গুণ্ডামির কিংবা

সব 'হরর' মার্কা ছবি। 'ভ্যাম্পায়ার', 'আবার ফ্র্যাংকেনস্টাইন' ইত্যাদি ইত্যাদি। পিকাডিলী সার্কাসের মোড়ে দশ মানুষ লম্বা ছবি। কাউণ্ট ড্রাকুলা-বেশী স্যা ডোনাল্ড উলফিট (হায় সেক্‌স্‌পীয়র!), মুখ থেকে তাঁর রক্তের ধারা বইছে। রাত্রি-বেলা সে ছবি আবার 'নীয়নোজ্জ্বল' হয়ে ওঠে। কাগজেপত্রে অনবরত প্রচার হচ্ছে—ক্রুশ্চেভ অমুক ছুরিটা ধার দিচ্ছে, মাও-সে-তুঙের এই ফন্দী, নাসেরের ঐ মতলব। কেবল ভয়ের চলচ্ছবি। কেবল তিক্ততার সঞ্চার। এরই পাশাপাশি রাখুন ফ্যাসিবাদী অসওয়াল্ড মোসলের অনুচরদের ইস্তাহার "কেন্সিংটনের অধিবাসীরা, সচেতন হও। কিপ্‌ ব্রিটেন হোয়াইট।" তারপর পড়ুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আবেদন, 'Queen's peace' অব্যাহত রাখবার জন্য! হাসি পায় না, দুঃখ হয়।

আমার নাইজিরীয় বন্ধু মার্শাল আইন পাশ করে দেশে ফেরার সময় তার ল্যাণ্ড-লেডী বল্লেঃ আশা করি আমাদের কথা মনে থাকবে। মার্শাল বলেছিল, 'থাকবে। এই চার সাড়ে চার বছর তুমি আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছ, বিশ্বাস কর, কখনও তা ভুলতে পারব না।' সে বাড়ির ইংরেজ ভাড়াটেরা ভাড়া দিত ঘর প্রতি পঁচিশ শিলিং। মার্শাল দিত পঁয়তাল্লিশ শিলিং। কলঘর যে-ই নোংরা করুক, বাড়িতে যে-ই গোলমাল করুক, সদর দরজা বন্ধ করতে যার-ই আওয়াজ হোক, আলো নেভাতে যে-ই ভুলুক, কৈফিয়ৎ দিতে হত জে জে মার্শালকে। আমি কতবার বলেছি, ও বাড়ি ছেড়ে দাও। মার্শাল বলত, 'ওহে নোজি পার্কার, এ অরণ্যে সব বাড়িউলীই নরখাদক। আমায় বুড়ী তবু আজো চোর বলেনি, বলেনি তার ছোট মেয়েকে ব্রেকফাস্ট বানাতে চাই।'

বাড়ি খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেখেছি—'কালোদের জন্য নয়, দুঃখিত।' মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়া বিরল ঘটনা নয়। ইংরেজের লেখাতেই দেখেছি দোকানে নিগ্রো গৃহিণীদের ওজনে ফাঁকি দেবার চেষ্টা খুবই হয়। তা নিয়ে প্রতিবাদ করলে সোজা উত্তরঃ তোমাদের ছোট মন। অন্য দোকান দেখ।

হাসপাতালে এবং হেলথ সার্ভিসে পক্ষ-পাতশূন্য ব্যবহারের প্রশংসা সবাই করেন। ইস্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা মোটামুটি মিলেমিশেই থাকে। যদিও খুব কম শ্বেতাঙ্গ মা-বাবাই ছেলের কালো বন্ধুদের বাড়িতে ডাকেন। ডাকলে সম্ভবত বর্ণসচেতনতার হাত থেকে দুপক্ষই অব্যাহতি পেত। দু' বছরের নিগ্রো মেয়ে লুইসাকে কল ঘরে গিয়ে কাঁদতে হত না—এত সাবান মাখছি, তবু কালো রঙ যাচ্ছে না।

সাম্প্রতিক গোলমালের ব্যাপারে এদেশের কাগজগুলোর অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা। নামকরা ছোট বড় সব কাগজেই এই ঘৃণ্য ঘটনার নিন্দে করা হয়েছে। (যদিও সব কাগজে সব সময় মূলে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়নি)। এমন কি, 'ডেইলি এক্সপ্রেস'—ভারত ও নেহরু-বিদ্বেষে যারা তুলনাহীন, তারাও প্রবলভাবে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। ঐ কাগজেই কামিংসের আঁকা কার্টুন দেখেছি, একদল গুণ্ডা ছোরাছুরি নিয়ে এক নিগ্রোকে তাড়া করেছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে ডারুইনের বই হাতে দুই শিম্পাঞ্জী। বলছে, কী লজ্জা। এরাই নাকি আমাদের উত্তরপুরুষ!

প্রতিকারের পন্থা চিন্তা করছেন অনেকে। নটিংহ্যামের দুজন এম পি—টোরী দলের জে জে কর্ডো এবং শ্রমিক দলের জেমস হ্যারিসন—মত দিয়েছেন, ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বা কমনওয়েলথ নাগরিকদের অবারিতভাবে আর ঢুকতে দেওয়া সংগত হবে না। এর প্রতিবাদ করে 'টাইম্‌সে' চিঠি লেখেন ফাদার হাড্‌ল্‌স্টন। তিনি বলেন, এর ফলে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। একপেশে পক্ষপাতদুষ্ট বিচার হবে যা খৃষ্টধর্মসম্মত নয়। লর্ড সল্সবেরীও পদাঘাত করেন 'টাইম্‌স্‌' সম্পাদককে। তিনি মনে করেন, হাড্‌ল্‌স্টনের [illegible] গ্রহণের অযোগ্য।

নটিংহ্যামের দুই পার্লিয়ামেণ্টের [illegible] পরামর্শ অনেকেরই মনে ধরেছে। বর্ণ[illegible]





বা বিদ্বেষের যারা প্রবল বিরোধী তাদেরও কারো কারো। যদিও এর ফলে সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আগন্তুক ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। ১৯৫৬ সালে যত এসেছিল, এবছর তার অর্ধেকও আসেনি। এবং আগের তুলনায় দলে মেয়েদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। সুতরাং অভিবাসন বা যৌন-নিরোধনের যুক্তি খুব গ্রাহ্য নয়। এছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে, সমস্যা অশিক্ষিত নিগ্রোকে নিয়ে নয়, সমস্যা সাদা মানুষের গোঁড়ামীর জন্য! আনুরিন বেভানের কাগজ 'ট্রিবিউনে'র মতে "বাড়ি কেনা, চাকরী বাগানো, শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে ভাব, এসব আসলে নিগ্রোদের বড় অপরাধ নয়। ঘৃণার বেসাতি যারা করে, তাদের চোখে নিগ্রোদের সবচেয়ে বড়দোষ হল যে, তারা নিগ্রো। নিগ্রোরা এদেশে আসে, তার কারণ কয়েক শতাব্দী ইংরেজ শাসনের পরও আজ জ্যামেইকার মত জায়গায় অপরিসীম দারিদ্র্য। তারা বাড়ি কেনে, কারণ বাড়ি-ওলারা তাদের সহজে ঘরভাড়া দিতে চায় না। যে চাকরী পায়, তাই তাদের নিতে হয়, কারণ সেক্ষেত্রেও সমান অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত।"

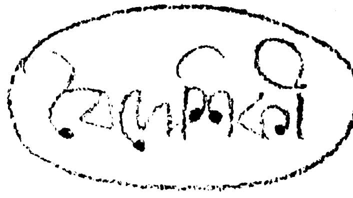
যাই হোক একটা বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত। এই নষ্টামীর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। অপরাধীদের এমন সাজা দিতে হবে যেন হাঙ্গামাকারীরা দমে যায়। কিছুতেই শান্তি ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের ইস্তাহারেও একথা বলা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভায় তীব্র নিন্দে করা হয়েছে এই বর্ণবিদ্বেষের। কোনো কোনো কাগজে এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, স্বয়ং রানীর একটা আবেদন করা উচিত যাতে শান্তি বজায় থাকে।

কেউ কেউ অনুমান করেন, গোলমালের পেছনে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু কুচক্রী লোকের টাকা কাজ করেছে। অন্তত মোসলের ফাসিস্ত অনুচরেরা এবং তাদের দল 'ইউনিয়ন মুভমেণ্ট' যে খুব তৎপর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গোলমালটা সম্ভবত তাদেরই পরিকল্পিত। সুতরাং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইস্টএণ্ডে গিয়ে মোসলের সাঙ্গোপাঙ্গোরা সমানে যে ইহুদী নির্যাতন চালিয়েছিল তা অনেকেই ভোলেননি। তাই তাদের দাবী এ বিষ ছড়িয়ে পড়ার আগেই এ আন্দোলনের(!) বিনষ্টি চাই। 'ডেইলি মিরারে' ভিকির কার্টুনঃ দেয়ালের সামনে ছোরা হাতে টেডীবয়। পেছনে হিটলারের ছায়া। 'Hooligan Age' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'টাইমস্' লিখছে—

"এই অনভিপ্রেত ঘটনার মাধ্যমে একটা ভালো কাজ হতে পারে যদি জনসাধারণ বোঝেন যে, ইংলণ্ডেও 'ঝটিকা বাহিনীর মনোবৃত্তি' আজ সক্রিয়। ছোট এক দুর্বৃত্তদলের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্য মানুষের ঘৃণার দ্বারা এবং কঠোর আইনশৃঙ্খলার সাহায্যে তাকে ঐ সীমানাতেই আটকে দিতে হবে।"

দুঃখ হয় এই কারণে যে, ইংলণ্ডকে ঘিরে আমাদের এক মধুর স্বপ্নে এবার ফাটল ধরল। একটা বিশ্বাস ছিন্নমূল হল। দুদিন আগেও লণ্ডন পরিব্রাজক আমার দুই বন্ধুকে নিয়ে যেসব রাস্তায় নির্ভাবনায় ঘুরে বেরিয়েছি, আজ সন্ধ্যার পর সেখানে যেতে আমার চিন্তা হবে। পাছে আমাকে কেন্দ্র করে একটা ঝামেলা শুরু হয়। আক্রমণটা এখন পর্যন্ত নিগ্রোদের ওপরেই হয়েছে। কিন্তু ছড়াতে কতক্ষণ! কিছু ভারতীয়-পাকিস্তানীর এখনও ধারণা 'কালার্ড' বলতে তাদের বোঝায় না। আশঙ্কা হয়, এই অহমিকা এবং ভ্রান্তি হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই কঠিন আঘাতে দূর হবে।

এই দুর্ঘটনার ফলে উদারপন্থী ইংরেজের লজ্জা যতখানি, চরমপন্থী আমেরিকান বা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গর আনন্দ-তৃপ্তি তার দ্বিগুণ। 'দূর থেকে নৈতিক উপদেশ দাও। এবার বোঝ' গোছের মনোভাব। তারা ভাবছে, এইবার ইংরেজের লেজও কাটা গেল। লেজ খসিয়েই আমরা মর্কট থেকে মানুষ হয়েছি। সেটা প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু ইংরেজকে ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে, সভ্যমানুষের দাবী তার কোন ভিত্তিতে! মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর পক্ষেই লেজ কাটা পড়া মর্মান্তিক হবে। কিছু বর্বর মানুষের মুখবিকারে আশা করি ইংরেজ চরিত্রের নানা গুণ ঢাকা পড়বে না।




কুয়েময় ও মাৎস্ দ্বীপ সম্পর্কে পিকিং সরকার এবং মার্কিন সরকার কতদূর এগুতে বা পেছুতে রাজী আছেন, তার উপর সুদূর প্রাচ্যের, এমনকি, সারা পৃথিবীর শান্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, একথা যদি মানতে হয়, তবে সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার না হলেও যে খুবই কুয়াশাচ্ছন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ পিকিং ও ওয়াশিংটনের মতলব এখনো পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে না। কুয়েময় ও মাৎসু চিয়াং কাইশেকের হাতে রয়েছে, এটা চীন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসহ্য বোধ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি এই ব্যাপারটাকে বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে: তার জন্য বিভিন্ন পক্ষের দায়িত্বের তুলনা বিচার মানুষ আবশ্যক বোধ করবে না। ফরমোজায় কুওমিণ্টাংএর দখল বজায় রাখার জন্য আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রস্তুত, একথা বরাবরই পরিষ্কার আছে। কিন্তু ফরমোজার 'নিরাপত্তার' জন্য কুয়েময় ও মাৎসু দখলে রাখা মার্কিন সরকার অপরিহার্য বলে মনে করেন কিনা, সে প্রশ্ন ওয়াশিংটন ধোঁয়াটে করে রেখে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চীন উপকূলে উপদ্রব করার জন্যই কুয়েময় ও মাৎসুতে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদের প্রয়োজন। চিয়াং কাইশেক কর্তৃক চীন পুনর্দখলের সম্ভাবনা আছে এরূপ ধারণা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভিতরেও কারো বোধহয় এখন নেই। সুতরাং চীনের কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে দরাদরির ব্যাপারে মাত্র আমেরিকার কাছে কুয়েময়ের কিছু মূল্য থাকতে পারে। এজন্য ওয়ারসয়ে চীন ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে আবার আলোচনা আরম্ভ হওয়া যখন স্থির হোল তখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে কুয়েময় ও মাৎসুর ব্যাপারটা মিটে যাবে—কুয়েময় থেকে কুমিনটাং-এর সৈন্য সরিয়ে আনা হবে এই আশ্বাস পেলে গোলাবর্ষণের দ্বারা কুয়েময় অবরোধের প্রচেষ্টা পিকিং সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হবে। কুয়েময়, মাৎসু এমন কি ফরমোজা সম্বন্ধেও পিকিং সরকারের দাবী পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, কেবল সেই দাবী পূরণের জন্য বলপ্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে—এই মার্কিন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে

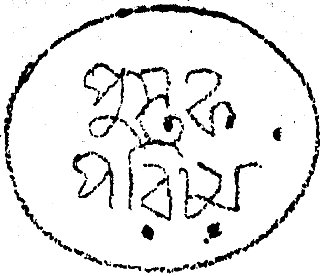
আলোচনার প্রস্তাব স্বভাবতই আশার উদ্রেক করেছিল। কিন্তু তারপর উভয়পক্ষের উক্তি এবং ঘটনা পরম্পরায় সে আশা অনেকটা স্তিমিত হয়েছে। ওয়ারসতে চীন ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে সত্য, কিন্তু অকুস্থলের পরিস্থিতি কিছুমাত্র আশাপ্রদ নয়। দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকা এটা প্রমাণিত হতে দিতে চায় না যে কম্যুনিস্ট গোলাবর্ষণের ঠেলায় কুয়োমিণ্টাং সৈন্য কুয়েময় ছেড়ে আসতে বাধ্য হবে। চিয়াং কাইশেককে আমেরিকা যা বলবে তিনি তাই শুনবেন এরূপ মনে করা যে ভুল তাও বুঝা যাচ্ছে। একদিকে ওয়ারসতে আলোচনা চলবে এবং অন্যদিকে কুয়েময় নিয়ে সামরিক সংঘর্ষ চলতে থাকবে এরূপ অবস্থা হলে মীমাংসার আশা করা যায় না। কিন্তু আবার কোনো পরিষ্কার আশ্বাস না পেলে পিকিং সরকার যে কুয়েময় ও মাতসুর উপর থেকে বর্তমান গোলাবর্ষণের চাপ এবং অবরোধ প্রচেষ্টা প্রত্যাহার করতে সহজে রাজী হবেন তা মনে হয় না। কারণ, অবিলম্বে কুয়েময় দখল করার আশা জাগিয়ে সরকার সারা চীনে আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই কুয়েময়ের উপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়। সেইজন্য কুয়েময় ও মাৎসু থেকে কুমিনটাংয়ের বহিষ্কার সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে গোলাবর্ষণ বন্ধ করলে চীনা সরকারের মুখরক্ষা কীভাবে হবে? অথচ গোলাবর্ষণ চললে মার্কিন ও চীনের মধ্যে সাক্ষাৎ সামরিক সংঘর্ষ বেধে যাওয়া একরকম অনিবার্য হয়ে উঠবে। কারণ কুমিনটাং সৈন্যদের কুয়েময়ে টিকে থাকতে হলে গোলাবর্ষণের অবরোধ ভেদ করে সরবরাহ আনার ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। তা করা মার্কিন নৌ ও বিমানবহরের সাক্ষাৎ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং এক পক্ষের অবরোধ রক্ষা এবং অন্যপক্ষের অবরোধ ভাঙবার প্রচেষ্টার মধ্যে মার্কিন সৈন্য, রণতরী এবং বিমানের উপর চৈনিক আঘাত এসে পড়বেই এবং তার 'সমুচিত উত্তর' দিতে আমেরিকা অগ্রসর হলে চীন-মার্কিন যুদ্ধ লেগে যাবে। চীনের উপর আক্রমণ হলে সোভিয়েট রাশিয়া সেটাকে নিজের উপর আক্রমণ বলে মনে করবে, মস্কোর এই সতর্কবাণী আমেরিকায় কেউ কেউ ধাপ্পা বলে মনে করছে কিন্তু সেরূপ মনে করা বিপজ্জনক। পক্ষান্তরে কুয়েময় এবং মাতসু দ্বীপ কুমিনটাং-এর দখলে রাখার জন্য আমেরিকা চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলে তাকে একলা চলতে হবে—আমেরিকা এবং বৃটেন এবং অন্য মিত্রদেশের লোকমতের এই হুঁশিয়ারীর উপর বেশি আস্থা স্থাপন করাও নিরাপদ নয়। কারণ পিকিং সরকারের পক্ষেও ভুল হবে যদি তাঁরা আমেরিকার মিত্রদের মধ্যে মার্কিন নীতির সমালোচনা শুনে মনে করবেন যে আমেরিকার হুমকি ধাপ্পা মাত্র, বৃটিশ এবং অন্য মিত্র দেশের মত সে উপেক্ষা করতে পারবে না সুতরাং চীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ সে এড়িয়ে চলতে বাধ্য হবে। সুয়েজের ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার না যাওয়া আর আমেরিকা কোনো বড়ো যুদ্ধে লিপ্ত হলে—যার সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম শক্তিদ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট— তার সঙ্গে তার মিত্রদের যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্ন এক পর্যায়ে পড়ে না। যতক্ষণ কুয়েময় ও মাতসু চিয়াংকাইশেকের দখলে রাখা নিয়ে কথা, ততক্ষণ ইংরেজরা বলতে পারে, 'ওতে আমরা নেই', কিন্তু বড়ো যুদ্ধ যদি সত্যই বাধে তবে পূর্বভূমিকাই বদলে যাবে, তখন আমেরিকা থেকে বৃটেন আলাদা থাকতে পারবে না। সুতরাং বৃটেন আমেরিকাকে ধমক দিয়ে বা পৃথক থাকার ভয় দেখিয়ে কিছু করতে পারবে না। আমেরিকা ও চীন যেভাবে চলেছে তাতে স্বেচ্ছায় অথবা একে অপরের কথা শুনে বলপ্রয়োগের নীতি ত্যাগ করবে, এ আশা কমে যাচ্ছে কারণ তাতে কোন না কোন পক্ষের প্রেস্টিজের হানি হবে। এ অবস্থায় সংকট উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায় বোধহয় ইউনোকে কাজে লাগিয়ে হতে পারে। সুয়েজের ব্যাপারে এবং পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংকটেও শেষপর্যন্ত ইউনোর মারফতই যা হোক একটা মীমাংসা অথবা ধামা-চাপার ব্যবস্থা হয়েছে। এক্ষেত্রেও অবিলম্বে সেইরকম একটা চেষ্টা হওয়া দরকার। ওয়ারসতে চীন ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তা থেকে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

১৬-৯-৫৮

কবির শেষ ক'টি কথায় মূল্য আছে : গভীর ধ্যানের নিষ্ঠা নেই বলেই রঙিন শব্দের ঝঙ্কারে তারা নিজেদের ভোলায়। এবং ভোলায় ধ্যানের বস্তুকেও। মজা সেইখানে।

মাত্র কয়দিনের বিলাস, স্বল্পস্থায়ী অংশীদারির অছিলায় কাছে আসার পুলক, মুহূর্তের দ্বিধা-বিভ্রম, দু'দিনের ঝকমকে কবিতা—কিছুই রইল না জ্বলে-ওঠা জীবনে। মৌসুমীর এই অর্থ বর্ণ ধরা পড়েছে মৌসুমী এই রচনায়। শিল্পীর অবসর-ক্ষণে খেয়াল-খুশিতে লেখা হালকা কিন্তু সংযত, অনুভূতিময় অথচ ভাবনা-বিশিষ্ট এই সূক্ষ্ম-মিষ্ট কাহিনীটি তার নাম-সার্থকতা দেখাতে পেরেছে।

(৩৩৫।৫৮)




## উপন্যাস

**মৌসুমী**—প্রেমেন্দ্র মিত্র, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম তিন টাকা।

একটি মেয়ের জীবনে একটি বিশেষ পর্ব নিয়ে এ উপন্যাস রচিত হয়েছে। সেই বিশেষ পর্বে বিশেষ ধরনের ফুল ফোটে, হয়তো বেশি দিন সে ফুল থাকে না। রঙের বাহারটুকু ঋতু-নির্ভর, তারপর ঝরে যায়। কিন্তু ঐ সীমিত পরমায়ুর যে সৌন্দর্য, মৌসুমী হলেও তার একটা চরিত্র আছে, দামও আছে। সে সৌন্দর্য ক্ষণিক, কিন্তু যতটুকু মধু তাতে থাকা দরকার এবং যা না থাকলে কোনও ফুলই ফুল নয়, সেই স্বল্প তরল মধু এর প্রধান স্ত্রী-চরিত্র তাপসীর মধ্যে রয়েছে। সে মধু গাঢ় হতে পেল না, কিন্তু প্রকৃতির বিজ্ঞাপন মধুপকে নিমন্ত্রণ ও আকর্ষণ করেই থাকে। এই কারণেই বোধ হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম দৃশ্য উন্মোচন করলেন ভোরের প্লাটফর্মে, যেখানে এক সৌম্য চেহারায় বেখাপ্পা একটা দুঃশীলতার ইঙ্গিত চোখের দৃষ্টিতে মেশান। ট্রেনের কামরায় অস্পষ্ট দিবাস্বপ্নের একটু রোমান্স, পৌরুষের একটা করুণ প্রহসন সেই মৌসুমী বিজ্ঞাপনের অর্থ খুলে দেয়।

আজকের তাপসী কি বদলেছে? নিজেকে খোলা চোখে দেখবার সাহস না হয় এখন এসেছে, পুরাতন সংকোচ ও আড়ষ্টতা কেটেছে আর্থিক স্বাধীনতা ও সচ্ছলতা অর্জন করবার পরে। প্রার্থী কল্যাণকে অনুগ্রহ করবার অধিকার আজ না হয় করায়ত্ত। কিন্তু সত্তার কি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে? ব্যর্থতা, হতাশা বা নৈর্ব্যক্তিক বেদনার কুয়াশা কি আত্ম-প্রতিষ্ঠার মৌসুমী দীপ্তিতে একেবারে সরে গেছে? এইটেই তাপসীর প্রশ্ন, লেখকেরও। এবং তা বোঝাতে হলে একটি কাহিনীর প্রয়োজন। শৈশবের ও কৈশোরের প্রিয়-অপ্রিয় স্মৃতির ঝরোকা দিয়ে অস্পষ্ট অতীতকে আবার ফুটিয়ে দেখতে হয়, বর্তমানের ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশের সঙ্গে তার নীরব হিসাবকে খতিয়ে দেখতে হয়। তাই বাবা-মা'র পারস্পরিক সম্বন্ধ, প্রাণপ্রচুর রহস্যময় রবিমামার অবিস্মরণীয় স্নেহ-স্মৃতিকে রূপ দিতে হয়, নিয়ে আসতে হয় বর্তমানের ফলকে। হয়তো টেঁকে না। কিন্তু খণ্ড খণ্ড অতীতের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য-দারিদ্র্যের এক একটি ধাপ পেরিয়ে পৌঁছুতে হয় বর্তমানের দরজায়। কত গাঢ় বাস্তব, কত মধুর বিলাস, কত ভীরুতা, কত বল-সঞ্চয় মিলে-মিশে তার জীবনের পাপড়িতে আজ এই রঙ ধরিয়েছে। এ উপন্যাস সেই প্রস্তুতি ও পরীক্ষার কাহিনী। তারই জন্য প্রয়োজন হয়েছে নমিতার ও কল্যাণের। স্বপ্ন-ভঙ্গে নৈরাশ্যই স্বাভাবিক। তবু ব্যর্থ

**বনভূমি ঃ বিমল কর ঃ ত্রিবেণী প্রকাশন ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২। তিন টাকা।**

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে বিমল করের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। হয়তো বলা যায় কল্লোল পরবর্তী লেখকদের মধ্যে এ বিষয়ে তিনি সর্বাপেক্ষা সচেতন। বাহিরের চেয়ে অভ্যন্তর, ঘটনার চেয়ে চরিত্র—তাঁর সাহিত্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাই তাঁর রচনার গতি মন্থর, বিন্যাস সংযত এবং ভাষা চিন্ময়।

নব কলেবরে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলেও 'বনভূমি' উপন্যাস হিসেবে বিমল করের প্রথম প্রচেষ্টা। একই ধরনের আইডিয়া নানা চরিত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে লেখক টুকরো টুকরো পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন ও শেষ অবধি মানুষের মনের বিচিত্র গতিভঙ্গির দিকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি রেখেছেন। এই দৃষ্টিই এ উপন্যাসে প্রধান। জীবন এখানে খণ্ডিত—কাহিনী এপিসোডিক।

মধ্যপ্রদেশের এক নির্জন পল্লী অঞ্চলের কোলিয়ারীকে কেন্দ্র করে উঠেছে ছোট এক রেল স্টেশন বারবয়া। স্টেশন মাস্টার প্রৌঢ় হেমন্তবাবু। পদ্ম তার তরুণী স্ত্রী। সূর্যশংকর কোলিয়ারীর ম্যানেজার। হীরা এখানকার এক রূপসী পানওয়ালী। হীরার সংগপ্রার্থী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পিটার রেলের গার্ড। এদের মধ্যে বাইরে থেকে এসে পড়ল সূর্যশংকরের স্ত্রী বনলতা। সংগে নিয়ে এল অমরকে।

সূর্যশংকরের চরিত্র বন্য, রূঢ় স্খল। আধুনিক সভ্য সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে সমাজের দিকে ভীত চকিত দৃষ্টি সজাগ রেখে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে সে রাজি নয়। তার ব্যক্তিত্ব আশ্চর্য কঠিন এবং অনেক পরিমাণে রূঢ়। অন্তরে বাইরে সূর্যশংকর এক। এই কারণে আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমাজের নরনারীর থেকে সে ভিন্ন আর তাই হয়তো সেই সমাজের বনলতার সংগে মানিয়ে থাকা কিংবা তাকে সুখী করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ওদিকে যুবক অমরের সংগে ঘনিষ্ঠতা হয় পদ্মর। সে নিঃসন্তান। রুগ্ন বৃদ্ধ স্বামীর কাছে অপরিতৃপ্তিতে পদ্ম যেন শুকিয়ে যেতে চায়—ব্যর্থ হতে চলে তার জীবন যৌবন। কিন্তু অমরের সংগে তার ঘনিষ্ঠ হবার প্রচেষ্টায়, মনে হয়, এই বিশেষ লোকটির জন্য নয়, উদ্গত যৌবনের স্পর্শ পাবার জন্যেই সে যেন বসেছিল। তাই অতি অল্প সময়ে সে প্রায় যেচেই নিজেকে সমর্পণ করে অমরের কাছে যৌবনের চরিতার্থ কামনা মিটিয়ে নেবার জন্যে। আরও দুটি চরিত্র হল কুসুম ও সুধাকর। সূর্যশংকরকে স্বামী হিসেবে ফিরে পেতে বনলতার দুর্বলতা যেমন তার ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে, অমরের যৌবনকে উপভোগ করবার প্রবল বাসনা যেমন পদ্মর কাছে জীবনের রূপ পাল্টে দিয়েছে তেমন করেই সুধাকরের সংগ কামনায় কুসুমের আকুলতা তার ভগবদ্ভক্তির চেয়ে জীবনকেই বড় করে তুলেছে। আর একটি চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের নিপুণ বিশ্লেষণ লেখকের পরিণত চিন্তার আশ্চর্য প্রমাণ দেয়। স্বাভাবিক হলেও বিশেষত্বমণ্ডিত চরিত্র হল পানওয়ালী হীরা।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁক প্রবল হলেও বিমল করের প্রধান গুণ হল পরিবেশ ফুটিয়ে তোলবার অদ্ভুত নৈপুণ্য। লেখকের 'অ্যাটমস্ফেয়ারে' নিশ্বাস নিতে নিতে প্রাণের উচ্ছল বেগ পাঠকমাত্রেই অনুভব করেন।

৬৩৩।৫৭

## অভিধান

**পৌরাণিক অভিধান—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৭্।**

অনেকদিন আগে অধ্যাপক উইলসন একবার হিন্দু-পৌরাণিক অভিধান সম্পাদনার কথা ভেবেছিলেন। তারপর মহীশূরের শিক্ষাধিকর্তা গ্যারেট সাহেবের সম্পাদনায় একখানি ইংরেজী বই বেরিয়েছিল; তার নাম "Classical Dictionary of India"। ইংরেজী ভাষায় আমাদের দেশের পুরাণ কথার নানা-প্রসঙ্গ সংকলনের প্রয়াস হিসেবে অধ্যাপক জন ডাউসন-এর "A classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature" বইখানি এদিক থেকে বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু বিদেশে এই ধরনের অভিধান সংকলনের অনেক রকম অসুবিধার কথা মানতেই হয়। ডাউসন লিখেছিলেন,

"Hindu mythology is so extensive, and the authorities are often so at variance, with each other, that I cannot but feel diffident of the success of my labours."

শক্তিধর অভিধান-প্রণেতা শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের 'পৌরাণিক অভিধান'-এর প্রথম দিকে যে 'প্রমাণ-পঞ্জী'টি ছাপা হয়েছে, তাতে ডাউসন-এর বইখানির নাম তো আছেই, তাছাড়া কোলম্যান, কীথ, ম্যাকডোনেল, মুর, টাউনি, উইলসন মেকেঞ্জি, টমাস, কানিংহাম, ম্যাক্স্-মুলার, ওয়েবার, ব্লুমফিল্ড ইত্যাদি আরো অনেক বিদেশী আলোচকের নামাবলী জায়গা পেয়েছে। এঁরা ছাড়া বাংলা জীবনীকোষ, বিশ্বকোষ, শব্দকোষ ইত্যাদি প্রণেতা আরো বহু নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি 'প্রস্তাবনা'য় জানিয়েছেন যে, ইংরেজী পৌরাণিক অভিধানের আদর্শ মনে রেখেই তিনি তাঁর এ বইখানি লিখেছেন বটে, তবে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর দিকেই তিনি প্রধানত মনোযোগী; এবং "এই পুস্তকের নাম 'পৌরাণিক অভিধান' রাখা হলেও কেউ যেন মনে না করেন এতে 'কেবল অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের কথাই আছে।" তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের প্রাচীন

ধর্মগ্রন্থে, মহাকাব্যে, পুরাণে, বেদে ও অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থে যে বিরাট সমাবেশ পাওয়া যায়, তারই একটা সুসংবদ্ধ সংগ্রহ-গ্রন্থ এই বইকে বলা যেতে পারে।"

বইখানির প্রতি পৃষ্ঠায় দু' কলমে, ছোটো হরপে ছাপা বিবিধ পুরাণ-প্রসঙ্গের বিশদ পরিচিতি পাওয়া গেল। বাংলার সাহিত্য-সাধকের পক্ষে তো বটেই, তাছাড়া ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ ও বিশেষ অনুসন্ধিৎসু সর্বশ্রেণীর পাঠকের পক্ষে বইখানি অপরিহার্য বললে অত্যুক্তি হবে না। ইংরেজীতে বিশেষ শ্রেণীর একখানি পৌরাণিক অভিধানের (Dictionary of non-classical mythology) ভূমিকায় দেখেছিলাম সম্পাদক ভারতীয় পুরাণ কথার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সত্রে এই বলে খেদ প্রকাশ করেছিলেন যে, একালে ভারতীয় পুরাণ প্রসঙ্গের চর্চা কমে এসেছে! সাহিত্যের ক্ষেত্রে কথাটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বাংলায় মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের যুগে পুরাণ প্রসঙ্গের যে রকম প্রাচুর্য দেখা গেছে, রবীন্দ্র-নাথের তিরোধান থেকে অদ্যাবধি এই ষোল-সতেরো বছরের মধ্যে একালের সৃজনধর্মী বাংলা কাব্যে এখন আর পুরাণ কথার সেই জোয়ারের টান নেই। দু'চারজন কবি চেষ্টা করে সেসব নমুনা যে কিছু কিছু না দেখিয়েছেন, তা নয়। কিন্তু আগেকার প্রাচুর্যও নেই, প্রেরণাও নেই।

শ্রীযুক্ত সরকারের এই বইখানি আমাদের একালের সৃজনধর্মী সাহিত্যের সমৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল একটি বড়ো ঘটনা বলেই মনে করি। বড়ো আয়তনের কোষগ্রন্থের মধ্যে আলোচনার বিস্তার ঘটানো সম্ভব বটে, কিন্তু যে-কালের যে রকম মর্জি সে-কালের পক্ষে সেই রকম অভিধানই বেশি স্বীকার্য। শ'পাঁচেক পৃষ্ঠার একখণ্ড মাত্র অভিধান সেদিক থেকে আধুনিকও বটে, প্রয়োজনীয়ও, সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'-এর সঙ্গে সুধীরবাবুর এই 'পৌরাণিক অভিধান' বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই বিশেষ সমাদরণীয়। ছোটো হরপে ছাপা হলেও, ছাপার গুণে বইটি আদ্যন্ত অনায়াসপাঠ্য এবং মাঝে-মাঝে যেসব ছবি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও সুন্দর হয়েছে।

৪৩৭।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

**বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি**—শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী।

**ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য**—মোহিত পুরকায়স্থ।

**পলাশীর যুদ্ধ**—নবীনচন্দ্র সেন।

**দাদা ঠাকুর**—নলিনীকান্ত সরকার।

**বধূ মানেই মধু**—শ্রীঅবনী সাহা।

**খড়ির লিখন**—সুকন্যা।

**মেঘ মেদুর**—মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়।

**উজ্জ্বল সবুজ**—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

**জল তরঙ্গ**—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা।

**কবির লড়াই**—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।

**নই ফসল**—ছেদীলাল গুপ্ত।

Growth of Middle Class in Bengal. —Durgaprasad Bhattacharya.

Acharya Sankara—Hemanta Kumar Sen.

**শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার অমৃত বাণী**—ডাঃ খগেন্দ্র-মোহন দাস।

**আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন**—বি. বিশ্বনাথম্।

**এরা দুজন**—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

**ছোটদের বিধানচন্দ্র**—শ্রীনিশাপতি মাঝি ও শ্রীরবিদাস সাহা রায়।

**চিন্তা-কনা দৃষ্টি নিমেষ**—শ্রীঅরবিন্দ।

**বেদান্তের প্রস্থানত্রয়**—সুরেশচন্দ্র সিংহ রায়।

**পল্লব**—শীতাংশুনাথ গুপ্ত।

**সোবিয়েতের দেশে দেশে**—মনোজ বসু।

**তলস্তয়ের গল্প কথা**—লোভ নিকলায়েভিচ তলস্তয়, অনুবাদক শ্রীমতী মঞ্জরী চক্রবর্তী।

**তোমাদের চারিদিকে ২য় ভাগ**—ইলিন ও সেগাল অনুবাদক শ্রীমতী তরুণা বসু।

**নিকলো কন্তির ভারত-ভ্রমণ**—অনুবাদক শ্রীগিরীন চক্রবর্তী।

**সুন্দরী কাশ্মীর**—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়।

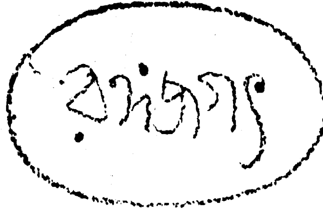
**মহুয়া মিলন**—ধীরাজ ভট্টাচার্য।

**শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

**বিনা চশমায় ক্ষীণ দৃষ্টির প্রতিকার**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

**সত্য মিথ্যা**—গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**ছবি-আঁকা**—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।




**চন্দ্রশেখর**

### ভবিষ্যতের ভূমিকা

গত শনিবার থেকে থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক একাংক নাটক প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে এবং সবশুদ্ধ পঁয়ত্রিশখানি মৌলিক একাংক নাটক এতে অভিনীত হবে। একাংক নাটক লেখবার ও অভিনয় করবার দিকে নাট্যোৎসাহীদের আগ্রহ কি পরিমাণে বেড়েছে এ থেকে তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যায়।

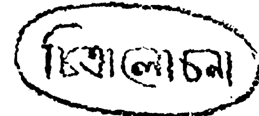
বাঙলা ভাষায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রম্য রচনা ভূরি ভূরি লেখা হচ্ছে, শুধু নাট্যকারের অভাব—এমনিধারা একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অথচ থিয়েটার সেণ্টারের আসরে এতগুলি নাট্যকারের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সৌখীন নাট্যসংস্থাগুলির যে নাট্য প্রতিযোগিতা গত কয়েক মাস ধরে চলছে তাতেও নতুন নতুন নাট্যকারের নাম দেখছি। তবুও বাঙলায় নাট্যকার নেই এ ধুয়ো কেন?

হয়তো উৎকর্ষের বিচারে এঁদের অধিকাংশের রচনাই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে না। সেটা আলাদা কথা। বাঙলাদেশে নাট্যকার নেই একথা কিন্তু নির্বিচারে মেনে নেওয়া চলবে না।

এইসব প্রতিযোগিতার জন্যে যাঁরা নাটক লিখছেন তাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবাই সচেতন নন সম্ভবত তাঁদের রচনা ছাপার অক্ষরে বেরুচ্ছে না বলে। দু'একজনের বেলায় অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যেমন থিয়েটার সেণ্টারের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত একাংক নাটকের একটি সংকলন গত বছর প্রকাশিত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির মধ্যেই অধিকাংশ নাটকের পরমায়ু নিঃশেষিত হয়। এর কারণও আছে। পেশাদারী থিয়েটারে অভিনীত না হলে কোন নাটকেরই চাহিদা সৃষ্টি হয় না পাঠক মহলে। তাই ছাপার অক্ষরে—বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায়—নাটকের এত অভাব। নাট্যকার নেই বলে নয়, শুধু চাহিদা নেই বলেই বাঙলা নাটক ছেপে বেরোয় না। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হয়েও যে নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে তার উদাহরণ পাওয়া যায় তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায় প্রভৃতির একাধিক নাটকে।

একাংক নাটক ছোট গল্পের মত, ছোট বলেই লেখা সহজ নয়। তবুও এতগুলি লেখক এগিয়ে এসেছেন একাংক নাটক লিখতে—এটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। এর মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ। তাই এইসব নাট্য-আগন্তুকদের আমরা স্বাগত জানাই।






এবার নিয়ে পর পর চার হপ্তা একখানিও বাঙলা ছবি মুক্তি পায়নি। এও এক রকমের রেকর্ড বলা যায়, কারণ গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন ঘটনা আর ঘটেছে বলে মনে পড়ছে না। মাসে যেখানে অন্তত চারখানি নতুন ছবি মুক্তি পাবার কথা, সেখানে একখানিও মুক্তি পেলো না—এটা আর যাই হোক, সুলক্ষণ নয়। তবে আসছে হপ্তায় "শিকারী"র দেখা পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস পাওয়া গেছে। তার পরের হপ্তায় "জলসা ঘর" এবং সেই সঙ্গে হয়তো "ইন্দ্রাণী" ও "নীলাকণ্ঠ" দু-এক হপ্তা আগু-পিছু আত্মপ্রকাশ করবে। "মরুতীর্থ হিংলাজ" ও "সূর্য-তোরণ"—পুজোর আগেই যাদের মুক্তি নির্ধারিত হয়েছিল—আপাতত পুজোর উৎসব-তালিকা থেকে দেওয়ালীর আনন্দ-সূচীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে এ



বি আর চোপ্‌রা প্রযোজিত হিন্দী ছবি 'সাধনা'র একটি ঘরোয়া দৃশ্যে মা ও ছেলের ভূমিকায় লীলা চিটনিস্‌ ও সুনীল দত্ত





ব্যবস্থারও যে অদল-বদল হবে না, তা জোর করে বলা যায় না।

• • •

গত কয়েক সপ্তাহের মতন এ হপ্তাতেও দু'খানি নতুন হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে—"ঘর সংসার" ও "মাতোয়ালা"।

পুষ্প পিকচার্সের "ঘর সংসার" এম জি দাভের একটি ঘরোয়া কাহিনী অবলম্বনে তোলা হয়েছে। এর প্রধান নারী-চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঘরে-বাইরে যাঁর খ্যাতির দ্যুতি ছড়িয়ে আছে—নার্গিস। তাঁর সহ-শিল্পীদের মধ্যে বলরাজ সাহানী, রাজেন্দ্রকুমার, কুমকুম, শম্মী ও জনি ওয়াকারের নাম উল্লেখযোগ্য। পরিচালনা করেছেন ভি এম ব্যাস এবং গানে সুর দিয়েছেন রবি।

দেবর ফিল্মসের "মাতোয়ালা" একটি তামিল ছবির হিন্দী সংস্করণ। মাদ্রাজে তৈরী অধিকাংশ হিন্দী ছবির মতই দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি-কাটাকাটি এবং সেই সঙ্গে নাচ-গান ও রঙ্গকৌতুকে ছবিখানি ঠাসা। অভিনয়াংশে আছেন—রঞ্জন, অঞ্জলি দেবী, ই ভি সরোজা, পি এস বীরাপ্পা, এম কে রাধা প্রমুখ দক্ষিণের নামকরা শিল্পীরা।

• • •

যে ক'টি বাঙলা ছবি নির্মাণরত অবস্থায় রয়েছে তাদের মধ্যে কে জি প্রোডাকসন্সের "দেড়শো খোকার কাণ্ড" একটি নতুনতর গল্প পরিবেশনের দাবী নিয়ে আসছে। হেমেন রায়ের লেখা এই ছোটদের উপন্যাসটি কিশোর জীবনের উদ্দীপনায় ভরা। তাকেই ছবির পর্দায় রূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন কুশলী সম্পাদক-পরিচালক কমল গাঙ্গুলী। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এর শুটিং এগিয়ে চলেছে। তিলক, সজল, শঙ্কর, চন্দন প্রভৃতি বহু

কিশোর শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, অনুপ-কুমার ও তরুণকুমার এই ছবিতে। নচিকেতা ঘোষ সংগীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

• • •

গণ-চিত্রম্-এর "প্রবেশ নিষেধ" পূজার পরেই মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। সুশীল ঘোষ ছবিখানি পরিচালনা করছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, নমিতা সিংহ, অমর মল্লিক, মিতা চট্টোপাধ্যায় সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও নবাগত কুশল চৌধুরীকে এর মুখ্য চরিত্রগুলিতে দেখা যাবে।

• • •

দেবকী বসুর পরিচালনায় অমর মল্লিক প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য "সাগর সংগমে"র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ছবিখানির সম্পাদনা চলছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই আবেগময় কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে ভারতী দেবী অপূর্ব অভিনয় করেছেন বলে প্রকাশ।

**মধুগন্ধে ভরা**

বিমল রায়ের ছবি সম্বন্ধে চিত্রপ্রিয়দের প্রত্যাশা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তার নতুন ছবি "মধুমতী"তে সে প্রত্যাশা অনেকাংশে সফল হয়েছে।

"মধুমতী"র চিত্র কাহিনী দুই জন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত। এজন্মের একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর গত জন্মের প্রেমোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে।

স্ত্রীর টেলিগ্রাম পেয়ে দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলো, কিন্তু পথের মধ্যেই তাকে থামতে হলো। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মোটরগাড়ি আর যেতে পারে না।

দেবেন্দ্রর সঙ্গে ছিলো তার একজন বন্ধু। ওরা দুজনে তখন দুর্যোগের রাত্রে একটু আশ্রয়ের জন্য অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

আশ্রয় মিললো একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত প্রাসাদপুরীতে। আশ্চর্য, দেবেন্দ্রর কেবলই মনে হতে লাগলো, এই অট্টালিকায় সে আগেও এসেছে, এই অট্টালিকা তার পরিচিত। কিন্তু কবে এসেছিলো? কবে?

দেবেন্দ্রর মনে হলো, এখানেই সে একটি কক্ষে একখানা ছবি এঁকেছিলো। অসীম কৌতূহলে দেবেন্দ্র সেই কক্ষে গিয়ে দেখলো, তারই হাতে-আঁকা সেই ছবিখানা এখনো যথাস্থানে আছে।

কবে এখানে এসেছিলো দেবেন্দ্র? কবে?

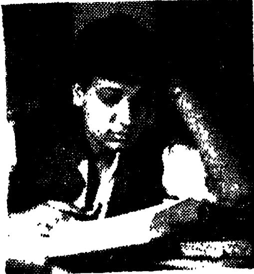
উন্মোচিত হলো জটিল রহস্যের গ্রন্থি। দেবেন্দ্রর মনে পড়লো, সে এখানে এসেছিলো গতজন্মে। হ্যাঁ, এজন্মে নয়, গত-

জন্মে। তখন তার নাম ছিলো আনন্দ।

রাজা উগ্রনারায়ণের টিম্বার এস্টেটে চাকরি নিয়ে এখানে এসেছিলো আনন্দ। এবং এখানে এসে একটি মনোহারিণী মেয়ের প্রেমে পড়েছিলো আনন্দ। বলা বাহুল্য, মেয়েটিও ভালোবেসেছিলো আনন্দকে। মেয়েটির নাম মধুমতী।

মধুমতী আর আনন্দ। আনন্দ আর মধুমতী। ওদের প্রেম বিবাহে পরিণত হওয়ার মুখেই চূড়ান্ত দুর্ঘটনা ঘটে গেলো ওদের জীবনে। সেই দুর্ঘটনার ঘটক স্বয়ং রাজা উগ্রনারায়ণ। রাজা উগ্রনারায়ণ কদর্য চরিত্রের লোক।

মধুমতীর বাবা কাজে বাইরে গেছে; আনন্দকেও রাজা একটা কাজের অছিলায়



সারদাময়ী পিকচার্সের 'কৈফিয়ৎ' চিত্রের নায়ক আশীষকুমার

দূরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মধুমতীর কাছে রাজার একজন অনুচর খবর পাঠালো যে, পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আনন্দ এখন আশংকাজনক অবস্থায় রাজপ্রাসাদে আছে; সেই অবস্থায়ই আনন্দ মধুমতীকে ডাকছে নাম ধরে।

খবর পেয়ে মধুমতী আর স্থির থাকতে পারলো না। সে ছুটতে ছুটতে গেলো রাজপ্রাসাদে। এবং পড়লো গিয়ে রাজা উগ্রনারায়ণের খপ্পরে।

এদিকে কাজ সেরে আনন্দ ফিরে এসে মধুমতীর বাড়িতে গিয়েছে. কিন্তু মধুমতী তো সেখানে নেই। মধুমতী কোথায়?

খোঁজ-খবর নিয়ে আনন্দ এলো রাজা উগ্রনারায়ণের কাছে. কিন্তু মধুমতীকে আনন্দ পেলো না। উল্টে, রাজা উগ্রনারায়ণের ভৃত্যদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হলো আনন্দ।

শেষপর্যন্ত অলৌকিক উপায়ে জানা গেলো যে মধুমতীর মৃত্যু হয়েছে। আপন বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে রাজা উগ্রনারায়ণ মধুমতীকে স্পর্শ করতে পারে নি. রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছে মধুমতী। মৃত্যুর পরেও মধুমতীর ছায়াশরীরের দেখা পেলো প্রেমিক আনন্দ। সেই ছায়াশরীরের অনুসরণ করে আনন্দও আত্মঘাতী হলো।

গতজন্মের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। কিন্তু গতজন্মের এই বিচ্ছেদই 'মধুমতী'তে শেষ সত্য হয়ে থাকেনি। এ-জন্মে দেখা গেল ওদের মিলন হয়েছে, ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়েছে, একটি সন্তানও হয়েছে ওদের। একজন্মের কামনা অন্যজন্মে সার্থক হয়েছে।

* * *

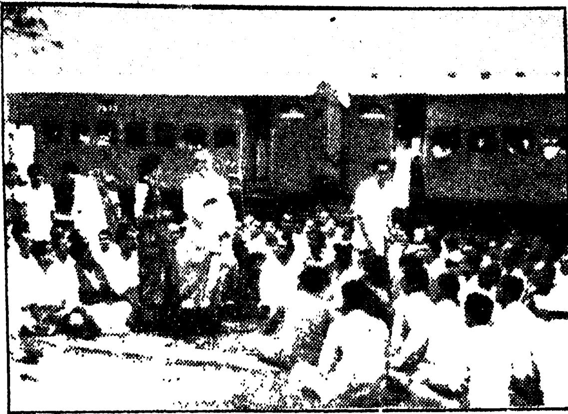
বিমল রায় প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'মধুমতী'র কাহিনী গতানুগতিক না হলেও বিশেষত্ববর্জিত। কাহিনী রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। কাহিনী অলৌকিক বলে আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা শিল্পজগতে অলৌকিক কাহিনীরও স্থান



আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্সের 'অগ্নি-সম্ভবা'র প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়

আছে। আবার, কাহিনী অলৌকিক হলেই তার চিত্ররূপ সমাদৃত হওয়ার যোগ্য হয় না, কেননা অলৌকিক কাহিনী শিল্পের অর্থে বিশ্বাসযোগ্য হলো কি না, সেটাই সর্বাগ্রে বিচার্য।

বলতে বাধা নেই, সর্বত্র শিল্পের অর্থে 'মধুমতী' বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। হিন্দী ছবিতে সচরাচর বাস্তবের নামে যে-সব উদ্ভট কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, আলোচ্য 'মধুমতী'তে অলৌকিকের নামে অনেকাংশে সেই কল্পনারই প্রভুত্ব দেখা গেলো।



মরুভূমির মাঝে ছোট্ট একটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিপিনবাবু গান ধরেছেন—"ও আমার দেশের মাটী"। ভারত ভ্রমণে শ্রান্ত যাত্রীদের চোখে সহসা ঘরের স্বপ্ন নেমে আসে। এটি এস এন ফিল্ম ইউনিটের "যাত্রী"র একটি দৃশ্য



'মধুমতী' অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ। গল্পকে অচল রেখে নাচগানের সংযোজন রুচিশীল দর্শকের সহিষ্ণুতাকে বিপন্ন করে।

কিন্তু একাধিক ত্রুটি সত্ত্বেও পরিচালক বিমল রায়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রায়-অন্তহীন দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কাহিনীর একটি আকর্ষণ তিনি আদ্যন্ত বজায় রেখেছেন। ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় তিনি কয়েকটি দৃশ্যে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রাজা উগ্রনারায়ণ ঘোড়া ছুটিয়ে অনুসরণ করছেন মধুমতীকে, ছুটে পালাচ্ছে মধুমতী, ছুটে পালাচ্ছে হরিণেরা। মধুমতী আর হরিণেরা! চমৎকার। রাজা উগ্রনারায়ণ এসে দাঁড়ালেন মধুমতী আর আনন্দের কাছাকাছি, একদল পাখির আর্ত চিৎকারে আকাশ মুখর হয়ে উঠলো। মধুমতী আর আনন্দের প্রেম বিকশিত হয়ে উঠলো, তার প্রতিতুলনা দেখা গেলো প্রকৃতির বিচিত্ররূপে উদ্ভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃশ্যে। রাজা উগ্রনারায়ণের কামনা অনুসরণ করছে অসহায় মধুমতীকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে, একটা কুকুর কেঁদে উঠলো। এ সমস্তই পরিচালকের সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

আনন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দিলীপকুমার। অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং একান্তভাবে বিশ্বাসযোগ্য তাঁর অভিনয়। মধুমতীকে হারানোর পর আনন্দের বেদনা-টুকু বিশেষ করে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মধুমতীর ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন বৈজয়ন্তীমালা। হাস্যলাস্যময়ী প্রাণচঞ্চল পাহাড়ী তরুণীর ভূমিকায় তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন। রাজা উগ্রনারায়ণের ভূমিকায় প্রাণের অভিনয়ও সম্পূর্ণ চরিত্রো-চিত হয়েছে; এই অভিজাত ভিলেনের ভূমিকা তাঁর অভিনয়গুণে প্রাণবন্ত হয়ে



ন্যাশন্যাল ফিল্মসের গেভাকলার রঞ্জিত "শিকারে"র একটি নাটকীয় মুহূর্তে উত্তমকুমার ও কমলা মুখোপাধ্যায়

উঠেছে। আনন্দের ভৃত্য চরণের ভূমিকায় জ্ঞান ওয়াকার প্রত্যাশিত হাস্যরসাশ্রিত অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। জয়ন্ত ও তিয়োরীর অভিনয় তারপরই উল্লেখযোগ্য।

'মধুমতী'র ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি দিলীপ গুপ্ত এবং শিল্পনির্দেশক মণিলাল সোনাভাই। এঁদের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, সার্থক শিল্পনির্দেশনা ও চিত্রগ্রহণ 'মধুমতী'কে অপরিসীমরূপে সমৃদ্ধ করেছে।

পরিশেষে, সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরীকে অভিনন্দন জানাই। কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্রসংগীত—এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি মর্মস্পর্শী সুর-সংযোজন করেছেন। সলিল চৌধুরী পরিচালিত সংগীত 'মধুমতী'র ঐশ্বর্যস্বরূপ।

## বিবিধ সংবাদ

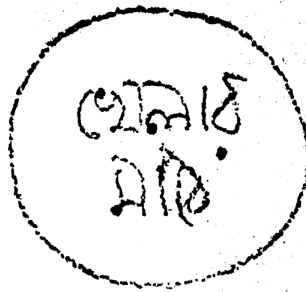
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'অযান্ত্রিক' কোন পুরস্কার লাভ না করলেও, ছবিখানি ওদেশের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ২৯শে আগস্ট উৎসবের একটি বিশেষ বিভাগে 'অযান্ত্রিক' দেখানো হয়। ছবিখানি শুধু যে সমালোচকেরই সম্বর্ধনাই লাভ করে তাই নয়, ভেনিস ফেস্টিভ্যালের কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন 'অযান্ত্রিক'কে তাঁদের সংরক্ষণাগারে স্থান দিতে। ১৯৩২ সালে ইউরোপের এই প্রাচীনতম চলচ্চিত্র উৎসবের পত্তন থেকে যত উল্লেখযোগ্য ছবি এখানে দেখান হয়েছে তার একটি করে কপি সংরক্ষিত আছে এই ফিল্ম ভাণ্ডারে। মহৎ সৃষ্টির শোভাযাত্রায় 'অযান্ত্রিকে'র এই অন্তর্ভুক্তিতে রসিক দর্শকমাত্রেই খুশী হবেন।

* * * *

রাশিয়ার তাশকেন্দ্রেও সম্প্রতি যে আফ্রো-এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে এই দুই মহাদেশের বাইশটি রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল। স্থির হয়েছে আসছে বছর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে হয় ভারতবর্ষে নয়তো মিশরে। প্রতি বছরই যাতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেবিষয়ে যোগদানকারী বাইশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাঁদের সহর্ষ সম্মতি জানিয়েছেন।

* * *

বোম্বাইয়ের রাজকমল কলামন্দির সম্প্রতি তাঁদের স্টুডিওতে একটি নাট্য বিভাগ খুলেছেন। এই বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে রঙ্গমন্দির। রঙ্গমন্দিরে আপাতত মারাঠী নাটকের অভিনয় হবে প্রবীণ অভিনেতা বাবুরাও পেণ্ডারকরের অধিনায়কতায়। উদ্দেশ্য নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী গড়ে তোলা। ভারতীয় ফিল্ম জগতে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম।




**একলব্য**

**দক্ষিণ চীন ফুটবল টীম নামে অভিহিত** যে দলটি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আমন্ত্রণে বোম্বাই ও কলকাতায় প্রদর্শনী ফুটবল খেলার জন্য এদেশে এসেছিল এবং ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের অনুমতির অভাবে না খেলেই ফিরে গেছে, রেংগুনেও তাদের খেলার ব্যবস্থা হয়নি। রেংগুনেও এদের তিনটি খেলায় অংশ গ্রহণের কথা ছিল।

ভারতে অবস্থানের আইনসংগত 'ভিসার' অভাবই ছিল চাইনিজ দলের খেলার ব্যবস্থায় ভারত সরকারের অনুমতি না দেবার প্রধান কারণ। বার্মিজ সরকারও তাদের রেংগুনে অবস্থানের 'ভিসার' মধ্যে খুঁত আবিষ্কার করেছেন। রেংগুনস্থিত প্রজাতন্ত্র চীনের দূতাবাস থেকে খেলোয়াড়দের ফটোসহ প্রমাণপত্র দাখিলের ফলে আরও আবিষ্কৃত হয়েছে দলের ১৭জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯ জনই ফরমোজার অধিবাসী। এশিয়ান গেমে জাতীয়তাবাদী চীনের পক্ষে এরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আর দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের সাম্প্রতিক প্রদর্শনী খেলার সময় উড়িয়েছিলেন কুয়োমিণ্টাং সরকারের জাতীয় পতাকা। কুয়োমিণ্টাং সরকারের সংগে ভারত বা ব্রহ্ম কোন দেশেরই কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। ফরমোজার খেলোয়াড়দের অবাঞ্ছিত এবং আইনবির্গহিত অনুপ্রবেশও কোন দেশের কাম্য নয়। সুতরাং ভারত এবং ব্রহ্ম সরকার এদের খেলার ব্যবস্থার অনুমতি না দিয়ে ভালই করেছেন। ফরমোজার খেলোয়াড়দের আসল রূপ প্রকাশ পাবার পর ব্রহ্ম সরকার ৯জন খেলোয়াড়কে অনতিবিলম্বে দেশ পরিত্যাগের নির্দেশ দিতেও কসুর করেননি।

এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হংকং (বৃটিশ উপনিবেশ) ও ফরমোজার (জাতীয়তাবাদী চীন) খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত এই চাইনিজ ফুটবল দলের খেলার অভিলাষ ভারত সফরের পেছনে আরও কিছু গূঢ় রহস্য নিহিত ছিল। অন্য কথা বাদ দিয়েও বলা যেতে পারে, ভারতে প্রদর্শনী খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ এরা দেশে নিয়ে যেতেন কিভাবে? বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের তো কোনই ব্যবস্থা ছিল না। চাইনিজ খেলোয়াড়রা অবশ্য মুখে বলেছিলেন এখান থেকে কোন টাকা পয়সা তারা সংগে করে নিয়ে যেতে চান না। সবাই কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সেটাও কি সম্ভব হত? ১৯জন লোক ৩৫।৪০ হাজার টাকার জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বিমানে সফর করবেন একথা কে বিশ্বাস করবে? সুতরাং খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ এদের এখানকার কোন চরের নিকটই জমা দিতে হত, আর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের আইনকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে সে টাকা অন্য উপায়ে পাচার হত এদের হাতে।

* * *

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে ভারতের এখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'। এ অবস্থায় খেলার প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় করা উচিত কিনা, এ কথাটা ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত। অতীতে খেলার জন্য ভারত কম বৈদেশিক মুদ্রা অপব্যয় করেনি। এবং এখনো করবার চেষ্টা হচ্ছে।

এই যে আমাদের শীত কালের ক্রিকেট অতিথি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীম। এরাই কি ভারত থেকে কম টাকা নিয়ে যাবে? দেনা পাওনা নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের এখানকার খরচখরচা বাদে নগদ দিতে হবে প্রায় ১০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং অর্থাৎ প্রায় এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আজ আমাদের জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত। দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ইস্পাত নেই, সংবাদপত্র ছাপার কাগজ নেই, নেই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় আরও বহু রকমের জিনিস। সংবাদপত্রে দেখছি গ্যালভানাইজড স্টীল তারের অভাবে দমদম ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে সাত শত কর্মী হয়েছে বেকার। এক্স-রে প্লেটের অভাবে হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগের উপর নোটিশ ঝুলেছে—"অন্য নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত আজ থেকে এক্স-রে বিভাগ বন্ধ"। ইস্পাতের অভাবে কলকারখানায় বহু শ্রমিক ছাটাইয়ের মুখে এসে পড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে কলকারখানায় বহু শ্রমিক ছাটাইয়ের বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্যই বিদেশ থেকে আমরা এইসব জিনিসপত্র আমদানী করতে পারছি না। আর এই বিপর্যয়ের মধ্যে খেলার জন্য আমরা এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা অপব্যয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

খেলার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। বিদেশী দলের ভারত সফরেরও প্রয়োজন আছে। এর ফলে শুধু দুই দেশের সম্পর্কই মধুর হয় না, খেলার মানও উন্নত হয়। ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ অভাব অনটনের মধ্যেও খেলা থেকে লাভ করে নির্মল

আনন্দ। তাই বিদেশী দলের ভারত সফরের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু সবাই একথাও স্বীকার করবে, এ প্রয়োজন জাতীয় প্রয়োজনের উপরে নয়। জাতীয় জীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন আপাতত এ প্রয়োজন বন্ধ থাক।

আশা করি, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকার কথাটা ভেবে দেখবেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং এ ব্যবস্থা রদ করার পরামর্শ দেওয়াকে অনেকে বাতুলতা বলে মনে করবেন। বাস্তবিক পক্ষে এখন আর এ সফর বাতিল করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এর পরই ১৯৫৯-৬০ সালের শীত কালে আছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীমের ভারত সফরের ব্যবস্থা। তারও তোড়জোড় চলছে। কিন্তু এই সফরের ব্যবস্থা করে আরও কিছু বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় যুক্তি-যুক্ত হবে কিনা, একথাটা ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত।

* * *

বিশ্ববন্দিত ক্রিকেট খেলোয়াড় চার্লি ম্যাকার্টনির মৃত্যু সংবাদে ক্রিকেট খেলোয়াড় তথা ক্রিকেট ক্রীড়ামোদী মাত্রেই দুঃখিত হয়েছেন। ম্যাকার্টনি অবশ্য পরিণত বয়সেই পরলোকগমন করেছেন। তবুও ম্যাকার্টনির মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সশরীরে অবস্থানের সংবাদ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পক্ষে আশার কথা, প্রেরণার কথা।

চার্লি ম্যাকার্টনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান চৌখস ক্রিকেট খেলোয়াড়। ক্রিকেট মহলে তিনি 'গবর্নর জেনারেল অব ক্রিকেট' নামে অভিহিত ছিলেন। এই নাম কেন তাকে দেওয়া হয়েছিল, আমার জানা নেই। তবে একজন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের কাছে এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন—'একটি দেশ শাসন করবার জন্য গবর্নর জেনারেলের যেমন বিচক্ষণ ও কূট বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় তীক্ষ্ন দৃষ্টির তেমন ক্রিকেট খেলার জন্যও বিচক্ষণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ন দৃষ্টির প্রয়োজন। ক্রিকেট খেলায় চার্লি ম্যাকার্টনি ছিলেন বিচক্ষন বুদ্ধি ও তীক্ষ্ন দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাকে 'গবর্নর জেনারেল অব ক্রিকেট' নামে অভিহিত করা হয়েছিল।'

অস্ট্রেলিয়ায় এপর্যন্ত যেসব সুনিপুণ খেলোয়াড় জন্মগ্রহণ করেছেন, ম্যাকার্টনি ছিলেন তাদের অন্যতম। এর ব্যাটিং করবার যেমন মনোরম ভঙ্গি ছিল, তেমন ছিল স্পিন বোলিংয়ের অসাধারণ দক্ষতা। টেস্ট খেলায় তিনি সবশুদ্ধ ২১৩২ রান করে গেছেন। এর মধ্যে শুধু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই করছেন ১৬৪০ রান।

* * *

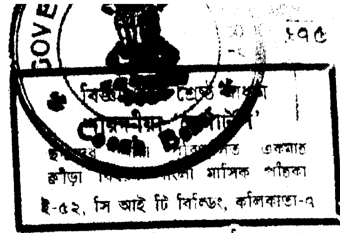
ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেন এবারও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেননি। ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেলের বুকে ইংলণ্ড থেকে অপর পার ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হবার একক প্রচেষ্টায় গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তিনি 'সেণ্ট মার্গারেট বে' থেকে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা অবিরামভাবে সাঁতার কাটা সত্ত্বেও ফ্রান্স উপকূলের মাটি স্পর্শ করতে পারেননি। ফ্রান্স উপকূলে পৌঁছুতে ২ মাইল বাকি থাকতে প্রতিকূল অবস্থার জন্য তিনি জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হন।

৩৭ বছর বয়স্ক ভারতীয় ব্যারিস্টার মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের এটা ছিল চতুর্থ প্রচেষ্টা। এর আগে আরও তিনবার চ্যানেল অতিক্রম করবার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। মিহির সেনের এবারকার ব্যর্থতার জন্য কেউ তার দুর্ভাগ্যকে দায়ী করছেন, কেউ বলছেন তিনি সাঁতারু নন। সাঁতারু হলে ১৮ ঘণ্টা জলে থেকেও তিনি চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেন না? কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়, আবার সত্যিও নয়। যে ব্যক্তি ইংলিশ চ্যানেলের বরফগলা ঠাণ্ডা জলে ১৮ ঘণ্টা সাঁতার কাটতে পারেন, তিনি সাঁতারু নন, একথা স্বীকার করি কি করে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য, মিহির সেন দ্রুতগতি-সম্পন্ন এবং দক্ষ সাঁতারু নন। জলে ভেসে থাকবার মত কষ্টসহিষ্ণু মন্থর সাঁতারু। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে, চ্যানেল অতিক্রমের ক্ষেত্রে ভাগ্য তার সহায়ক হয়নি। ব্রজেন দাশ প্রথম চেষ্টাতেই ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন, আর মিহির সেন গতবার সাড়ে ১৪ ঘণ্টা আর এবার ১৮ ঘণ্টা জলে থেকেও চ্যানেল অতিক্রম করতে পারলেন না। মন্থর গতি সাঁতারু হলেও তার ক্ষেত্রে অদৃষ্টের কিছুটা পরিহাস আছে বৈকি?

যাই হক, মিহির সেন কৃতার্থ হতে না পারলেও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রচেষ্টায় এদেশের সাঁতারুদের মধ্যে তিনিই যে পথ প্রদর্শক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই উপ-মহাদেশের সাঁতারুদের মধ্যে তিনিই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার প্রেরণা জুগিয়েছেন। পাকিস্থানের সাঁতারু ব্রজেন দাশ আজ সাফল্য অর্জন করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্থানের আরও সাঁতারু হয়তো সাফল্য অর্জন করবেন। মিহির সেনও হয়তো একদিন চ্যানেল অতি-ক্রম করবেন। কিন্তু চ্যানেল অতিক্রম করতে না পারলেও এ দেশের সকল সাফল্য-মণ্ডিত সাঁতারুর নামের সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় মিহির সেনেরও নাম লেখা থাকবে সন্দেহ নেই।

* * *

প্রশান্তকুমার মল্লিক নাম এক ভদ্রলোক




(সি ১৯২২)

লণ্ডন থেকে একখানা পত্র লিখেছেন। পত্রখানা নীচে প্রকাশ করছি।

লণ্ডন,

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮

'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

প্রসিদ্ধ সাঁতারু শ্রীব্রজেন দাশ ও ডাঃ বিমল চন্দ্র প্রসঙ্গে 'একলব্য' গত ৩০শে আগস্ট তারিখের দেশ পত্রিকায় যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা পড়লে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দুর্নীতির প্রভাবে ভারতের খেলাধুলোর ক্ষেত্র আজ কতদূর বিপন্ন। জাতির মঙ্গলের জন্য অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করে 'দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাদের বহুবার উপকৃত করেছেন। তাদের ধন্যবাদ দিয়ে এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য জানাতে চাই।

আমার মনে হয়, যাদের স্বৈরাচারে জাতির স্বাস্থ্য কলুষিত, শুধু তাদের কুকীর্তির বিবরণটুকু প্রকাশ করে দিলেই সাংবাদিকের কর্তব্য সমাধা হয় না। কারণ এই বিবরণে এমন কিছু লেখা হয়নি, যার থেকে আমরা এইসব তথাকথিত কর্মকর্তাদের চিনে নিতে পারি। "এই সময় খেলাধুলো ক্ষেত্রের এক প্রধান পরিচালক, যিনি অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের এক প্রধান স্তম্ভ"—এই কথাটুকু শুধু লেখা হয়েছে।

এই প্রধান পরিচালক ও প্রধান স্তম্ভটি যে কে, তা জানাবার দায়িত্ব 'একলব্য' সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। 'প্রধান'দের ভয়ে অথবা সৎ সাহসের অভাবে যদি এদের পরিচয় প্রকাশ করতে 'একলব্য' কুণ্ঠিত হন, তবে তার তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। নমস্কারান্তে ইতি।

বিনীত,

শ্রীপ্রশান্তকুমার মল্লিক,

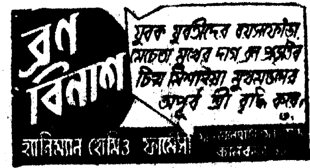
২৪ নেপিয়ার এভিনিউ,

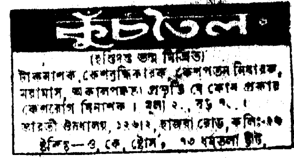
লণ্ডন, এস ডবলিউ—৬

শ্রীপ্রশান্তকুমার মল্লিককে উপরোক্ত পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে চাই, ব্রজেন দাশের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রচেষ্টায় অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের যে প্রধান পরিচালক ব্রজেন দাশকে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা ছিল তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে স্পোর্টস কাউন্সিলের কোনো সম্পর্ক নেই। থাকবেই বা কি করে? কারণ ব্রজেন দাশ পাকিস্থানের নাগরিক। পাকিস্থান সরকারই তার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আমি উল্লেখ করেছিলাম ডাঃ বিমল চন্দ্রর ব্যাপারে। ভারতের দপ্তরের অধীন 'অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টসের' কাছে ডাঃ চন্দ্র সাহায্য ও অনুমতি চেয়েছিলেন। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস এই সম্পর্কে ডাঃ চন্দ্রকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করতে উপদেশ দেন। সেই অনুসারে রাজ্য সরকারের কাছেও আবেদন করা হয়, কিন্তু তার কোনই উত্তর আসে না।

অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের যে প্রধান পরিচালক সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে, তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ডাঃ চন্দ্রকেও নিরুৎসাহ করতেন, তবেও কি তার নাম প্রকাশ করতে পারতাম? এখানে ভয় বা সৎ সাহসের অভাবের প্রশ্ন নেই। সুকৌশলে তার নাম এড়িয়ে যাবারও প্রশ্ন নেই। আছে শালীনতার প্রশ্ন। কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাম প্রকাশ করা শালীনতা বিরুদ্ধ।



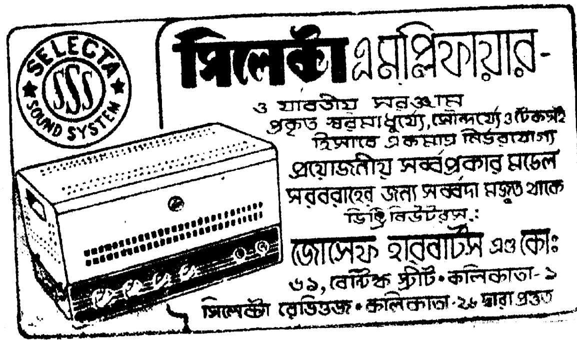















## দেশী সংবাদ

৯ই সেপ্টেম্বর—অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে উভয় দেশের সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর বাস ভবনে দুই ঘণ্টা ৪০ মিনিট এই আলোচনা চলে।

১০ই সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ অপরাহ্নে জানান যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীফিরোজ খাঁ নুনের সহিত তাঁহার আলোচনা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। অদ্য উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রিদ্বয়ের বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীরেজিনল্ড ওয়েব ট্রামের উভয় শ্রেণীর সমস্ত টিকিটের উপর এক নয়া পয়সা করিয়া ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে ঐ দিন ঐ মর্মে এক নোটিশ প্রচার করা হইয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর—ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে তাঁহাদের দুই দিনব্যাপী বৈঠকে অধিকাংশ বিষয়ে একটা সর্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা পূর্বতন কোচবিহার রাজ্যের পাকিস্তানভুক্ত ছিটমহলগুলি এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানের ছিটমহলগুলি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নাগরিক স্বাস্থ্য কমিটির উদ্যোগে ১৯৫৭ সালের জুলাই হইতে ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ চালান হয়, তাহাতে জানা যায় যে, তাহাদের শতকরা ৬০জনই অপুষ্টি অথবা কোন-না-কোনরূপে স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে।

১২ই সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, তাঁহার ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীফিরোজ খাঁ নুনের মধ্যে সম্মেলনের ফলাফল মোটের উপর সন্তোষজনকই হইয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের দাবী সপ্তাহের শেষদিন কলিকাতা ময়দানে বিপুল সংখ্যক সরকারী কর্মচারীর এক সমাবেশ হয় এবং বিভিন্ন দাবীসম্বলিত ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া রাজপথে একটি মিছিল পরিচালিত হয়। ঐ দাবীগুলির মধ্যে বিকল্পে চাকুরি না দিয়া ছাটাই বন্ধ, পে-কমিশন নিয়োগ ও ২০ টাকা অন্তর্বর্তিকালীন ভাতা, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ প্রভৃতি দাবীও ছিল।

১৪ই সেপ্টেম্বর—গতকল্য রাত্রি হইতে অদ্য অপরাহ্ন পর্যন্ত প্রচণ্ড জল ঝড়ের দাপটে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী নানা স্থানে বহু বাড়ি ধসিয়া পড়ে, গাছপালা সমূলে উৎপাটিত হয় এবং যানবাহন চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার কাকদ্বীপ অঞ্চলে এবং মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে অদ্য হইতে খাদ্য সংকট সমাধানকল্পে সরকার কর্তৃক অবিলম্বে কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীতে কলিকাতায় ১৪৪ ধারার বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হয়। ৫ জন এম-এল-এ সহ ৫০৫ জনকে ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে এই দিন গ্রেপ্তার করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ভারত সরকারের আমদানী নীতির ফলে অদ্য দমদমস্থিত ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের কেবল নির্মাণ কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহাতে নিযুক্ত প্রায় ৭০০ কর্মী বেকার হইয়াছেন। ইহা ইস্পাতের অভাবে বন্ধ হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

৯ই সেপ্টেম্বর—চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাই অদ্য পিকিংয়ে এক বক্তৃতায় বলেন, উপযুক্ত সময়ে এবং সর্বপ্রকার উপযুক্ত পন্থায় নিজ এলাকা মুক্ত করার অনস্বীকার্য অধিকার চীনা জনগণের রহিয়াছে। এব্যাপারে তাহারা বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ সহ্য করিবেন না।

আজ পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীআমজাদ আলী এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে যে হারে ব্যয় করা হইতেছে, উহা যদি রোধ করা না হয় এবং ঋণ করার প্রবণতা যদি হ্রাস না পায়, তবে পাকিস্থান শীঘ্রই দেউলিয়া হইয়া পড়িবে।

১০ই সেপ্টেম্বর—কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সহায়তায় রোগ নির্ণয় ও রোগের চিকিৎসায় এমন কি ক্যান্সার রোগেও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কাহিনী অদ্য আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী সম্মেলনে প্রধান স্থান গ্রহণ করে।

রাশিয়া হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রক্রিয়া হইতে ১শত কোটি ডিগ্রি তাপ, যাহা সূর্যের মধ্যস্থানের তাপ হইতে প্রায় ৬৫ গুণ বেশী সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইলে বিপুল বিস্ময় ও আগ্রহের সঞ্চার হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর—অদ্য লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সম্পর্কে ৩১শে অক্টোবর হইতে নিউইয়র্কের পরিবর্তে জেনেভায় আলাপ আলোচনা আরম্ভ করা হইবে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন যে প্রস্তাব করিয়াছে, বৃটিশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্নমেণ্ট সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

১২ই সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার গতকল্য রাত্রে পূর্ব এশিয়ার সমস্যা সম্পর্কে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক টেলিভিশন বক্তৃতায় বলেন, "চীনা কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে" কোনরূপ তোষণনীতির অনুসরণ করা হইবে না।

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, ভারতীয় রেলপথ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, তাহা পূরণে সহায়তা করিবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক অদ্য ভারতবর্ষকে সাড়ে আট কোটি ডলার ঋণ হিসাবে দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—চীন যাহাতে ফরমোজা এলাকায় বল প্রয়োগ নীতি বর্জন করিয়া শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার পথে আগাইয়া আসে, তজ্জন্য চীনের স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করিতে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য রাশিয়াকে অনুরোধ জানান।

অদ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা খান আবদুল গফ্ফর খানকে কোয়েটাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া পাকিস্থান রেডিও ঘোষণা করিয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—জাতীয়তাবাদী চীন কর্তৃক কুয়েময়ের অবরোধ আজ ভঙ্গ হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী চীনের একটি জাহাজ অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইয়া এই অবরোধ ভঙ্গ করে। জাহাজটি তীরে পৌঁছায় এবং উহা হইতে গোলাবারুদ খালাস করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম এ কিজিলবাস অদ্য বলেন, খালের জল সম্পর্কে মুসলিম লীগ ১৯৪৮ সালে ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি করিয়াছিল, উহা অর্থহীন এবং পাকিস্থানের নদী সংক্রান্ত অধিকারে যদি ভারত হস্তক্ষেপ করিতে চায়, তবে উহাতে বাধা দেওয়া হইবে।

জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা মৌলানা ভাসানী আজ পাকিস্থানের শাসকদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, তাঁহারা যদি ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা দূর না করেন, তবে ইরাকের মত পাকিস্থানের জনসাধারণও একদিন তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'রেড ফ্ল্যাগ' প্রস্তাব করেন যে, পরোক্ষভাবে চীন বিপ্লবকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডালেসকে পদক দেওয়া উচিত। ঐ পত্রিকায় বলা হয় যে, শ্রীডালেসের "শত্রুতামূলক নীতি" চীনের জনসাধারণকে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

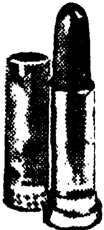
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সূচীপত্র











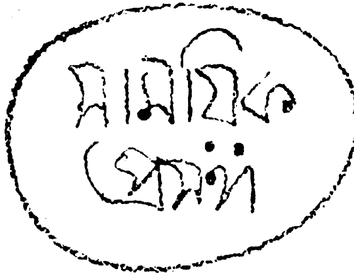


# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 27th Sept. 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ




## ট্রাম প্রসঙ্গে

আছে যে, সে-কথা এক রকম ভুলিতে বসিয়াছিলাম। ইংরাজি প্রবচনে বলে, অদর্শনেই বিস্মৃতি, আর এই অদর্শন তো দীর্ঘ দেড়মাস কালের। সকালের কাগজে অবশ্য এক পক্ষের দাবী-দাওয়া এবং অপরপক্ষের দিবার ইচ্ছা ইত্যাদির নানা হিসাব রোজই থাকিত। ঠিক অর্থবোধ হইত না, ব্যাপারটা যেন অস্তিত্বহীন বস্তু লইয়া সূক্ষ্ম বিতর্ক। শ্রমিক, মালিক ও সরকার, এই তিনপক্ষ মিলিয়া এক দার্শনিকসুলভ আলোচনায় মাতিয়াছেন: চতুর্থ পক্ষ, অর্থাৎ জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার বিবেচনা নস্যের মত উড়িয়া গিয়াছে।

পলাতক ট্রাম আবার ফিরিয়াছে, রাজপথে সেই পরিচিত ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। স্বস্তি পাইয়াছেন বাসের কর্মী, কাঁধ হইতে পরের বোঝা নামিয়াছে! প্রথাসম্মত ভাবে এবার সকলকে ধন্যবাদ, অর্থাৎ গোলে হরিবোল, দেওয়ার পালা। শ্রমিকেরা একতা ও শান্তিপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়াছেন। উত্তম। মালিকপক্ষও আপসে আগ্রহ দেখাইয়াছেন। সাধু। মোড়লের ভূমিকায় নামিয়া সরকারও অসফল হন নাই। চরম দুর্ভোগ যাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে, বিবাদে উপেক্ষিত সেই সাধারণ নাগরিকেরাও বোধ হয় খুশী হইয়াছেন। শুধু এই কারণে যে অচল অবস্থাটা, অন্তত আপাতত, ঘুচিয়াছে। কেননা, না-ও ত ঘুচিতে পারিত। কিংবা, দেড়মাস সময় তো কাটিয়াই গিয়াছিল, নানা টাল-বাহানা, আবদারে-ধমকে আরও দেড়মাস কাটিতে পারিত। এই ব্যাপারটাকে ঘিরিয়া একটা রাজনৈতিক দুর্যোগও ঘনাইতে পারিত—এই শহরে কিছুই অসম্ভব নয়। এখানে সহজে কিছু মেটে না, বৎসরের পর বৎসর জলের সমস্যা ঘোচে না, গ্যাসের অভাবে কারখানার কাজ বন্ধ থাকে, অরন্ধন বা বহু পথ নিষ্প্রদীপ হইলেও কাহাকেও তৎপর হইয়া উঠিতে দেখি না।

কর্মীরা এখন "কী পাইনি" তাহার হিসাব মিলাইবেন, কোম্পানী "কী দিইনি"-র। অবশ্য দেনা-পাওনার চূড়ান্ত হিসাব করিবার সময় এখনও আসে নাই, মূলে তদন্ত এখনও বাকী। যাঁহারা ভূমা চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের আপাতত অল্পে লইয়াই থাকিতে হইবে, যাহা গিয়াছে, অর্থাৎ ধর্মঘটকালীন বেতন, তাহা ত গিয়াছেই। এই দেড়মাসকাল অপর পক্ষের মধ্যেও আমরা এক প্রকার অস্থিরমতিত্বের লক্ষণ দেখিয়াছি, যাহা মহম্মদ তুঘলকি ব্যাধির সগোত্র। হঠাৎ কিছু ঠিক করিয়া হঠাৎ মত পালটানো ঠিক ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রমাণ নহে। এখন তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, কতটুকু বাঁচাইতে গিয়া তাঁহারা কতখানি লোকসান [illegible]। অবশ্য লোকসানটাও আসলে তাঁহাদের নহে, তাঁহারাও পরের ধনেই পোদ্দারি করেন। ক্ষয়-ক্ষতি এক জনেরই, সেই অবহেলিত নাগরিকের; বৎসরের শেষে তদন্তের রায় যদি ভাড়া-বৃদ্ধির অনুকূল হয়, তবে বোঝার উপর শাকের ভার সেই বহিবে।

## মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ!

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ভূমিকায় কিছুদিন হইল কম্যুনিস্ট পার্টি অবতীর্ণ হইয়াছেন ও প্রতিনিয়ত কিছু-সংখ্যক "সত্যাগ্রহী" নিয়মিত সময়ে পূর্ব-নির্দিষ্টভাবে "কারাবরণ" করিতেছেন। এই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য দুটি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, একটি আন্দোলনের নামেই প্রকাশ—মূল্যবৃদ্ধি (করা নয়, বন্ধ করা) ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ; অপরটি হইতেছে খাদ্যাভাব ও দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে সরকারকে সচেতন করা। এ দুটি ছাড়া আর যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে নিতান্ত গুপ্তভাবেই আছে (কি আর উদ্দেশ্য থাকিবে!) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগে বলি। ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক আগেই সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। এ বিষয়ে লোকসভায় যে-সব আলোচনা হইয়াছে কম্যুনিস্ট পার্টির তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়, যেহেতু লোকসভায় কম্যুনিস্ট সদস্যগণ সে-সব আলোচনায় যোগ দিয়াছেন। এবারে প্রথম উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে বলা যাক। লালদীঘিতে বা রাজভবনের কাছে বা মফস্বলের আদালতে নিয়মিতভাবে কতকগুলি লোক "কারাবরণ" করিলে কিভাবে যে খাদ্যমূল্য কমিবে বা দুর্ভিক্ষ প্রতিরুদ্ধ হইবে তাহা সহজবুদ্ধিতে আসে না। বরঞ্চ বুঝি এই যে 'বাঘ আসিয়াছে' হল্লায় [illegible] যেমন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেন, দুর্ভিক্ষ [illegible] পড়িয়াছে বা আসিয়া পড়িল হল্লা তেমনি চাষী ও

অন্যান্য শস্যবিক্রেতাগণের গোলা বন্ধ করিতে সাহায্য করিবে। অতি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী না হইয়াও বোঝা যায় যে, মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের একমাত্র প্রতিক্রিয়া মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ আহ্বান। আরও বুঝি যে, খুব সম্ভব এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। কম্যুনিস্ট পার্টিকে পরামর্শদানের যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে আশা করি কেরলের অভিজ্ঞতায় ইতিমধ্যেই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রপাগাণ্ডার তলোয়ার দুই দিকে ধারালো। এমন অস্ত্র অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যবহার করিতে হয়। সে সতর্কতার লক্ষণ তাঁহাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনে দেখিতে পাইতেছি না।

**প্রদেশ কংগ্রেস ও খাদ্যসমস্যা**

খাদ্যদ্রব্যের বর্তমান মহার্ঘ্যতা ও অনটনের প্রধান দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এ বিষয়ে অনেকের সঙ্গেই একমত। সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন ও যে কর্মসূচীর প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ইহাই সমর্থিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান খাদ্যনীতিকে প্রদেশ কংগ্রেস সমর্থন করিতে পারেন নাই, কিঞ্চিৎ তিক্ততার সঙ্গে সমালোচনা করিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনানুযায়ী সমস্যাটিকে যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন রাজ্য সরকারকে।

পরিকল্পনাটি উত্তম, যদি তাহা গৃহীত ও কার্যে পরিণত হয়। এখানেই আমাদের সন্দেহ। উত্তম পরিকল্পনার অভাব নাই সরকারী দপ্তরে, তবু সে অনুসারে কাজ হয় না কেন কিম্বা আশানুযায়ী ফল ফলে না কেন—ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্তব্য। আমাদের আশঙ্কা সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে কোথাও একটা বৃহৎ রন্ধ্র আছে, সে পথে সমস্ত শুভ সঙ্কল্প অতলে তলাইয়া যায়। এখন যখন শিরে সংক্রান্তি অবস্থা, আশা করি এবারে সে রন্ধ্র বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইবে।

**পরলোকে ডাঃ ভগবান দাস**

জ্ঞানতপস্বী পূতচরিত্র ঋষিপ্রতিম ডাঃ ভগবান দাস পরিণত বয়সে লোকান্তর প্রয়াণ করিয়াছেন। যে কয়জন প্রতিভাবান মনীষী ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার ধারক ও বাহক ডাঃ ভগবান দাস তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে-অভাব হইল তাহা দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকিবে। এই দুর্ভাগা দেশে যাহা যায় তাহার স্থান সহজে পূর্ণ হইতে চায় না। ডাঃ ভগবান দাস ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বে সুগভীর পণ্ডিত ছিলেন, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। তাঁহার তত্ত্বদর্শী মনীষার শ্রেষ্ঠ ফল Essential unity of Religions নামে অমর গ্রন্থ, যাহাতে তিনি যাবতীয় ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

**সমীচীন প্রস্তাব**

লোকসভার উত্তর-প্রত্যুত্তরে জানিতে পারা গেল যে, ভারত সরকার দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে কয়েকটি বক্তৃতাদানের জন্যে শীঘ্রই ভারতে আমন্ত্রণ করিবেন। আরও জানিতে পারা গেল যে, মধ্যপ্রদেশে "কালিদাস ভবন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে, যেখানে মহাকবির কাব্য ও সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে। আমরা দুটি প্রস্তাবকেই স্পৃহনীয় মনে করিয়া সমর্থন করিতেছি। যদি মনীষী রাসেল সত্যই এদেশে আসেন তবে আশা করি নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান তাঁহার উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বেতার ভাষণের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে জনসাধারণ এই বন্দনীয় মনীষীর বক্তৃতা ও কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়।

**নেহরুর ভুটান যাত্রা**

নেহরুর মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার সামান্য কথা ও সাধারণ কাজেরও দীর্ঘ ভাষ্য রচিত হয়। তাঁহার সাম্প্রতিক ভুটান যাত্রা সম্বন্ধেও ভাষ্যকারগণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন—দেশে ও বিদেশে লণ্ডনের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি হিমালয় সন্দর্শন করিবার মানসে নিশ্চয় এই কষ্টসাধ্য কাজে ব্রতী হন নাই। ঐ দুষ্প্রবেশ্য অঞ্চলে ভারতের তথা প্রতিবেশী প্রবল রাষ্ট্রের প্রভাব কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করাই নেহরুর উদ্দেশ্য।

টাইমস্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, এ দেশের কেহই ভাবেন নাই যে নেহরুর ভুটান যাত্রার উদ্দেশ্য নিছক অবসর বিনোদন।




### 'কোনার্কের মৃত্যু'

কবি বিষ্ণু দে বাঙলা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত ব্যক্তি। দেশ পত্রিকার ৪২ সংখ্যায় 'কোণার্কের মৃত্যু' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেশের পরবর্তী ৪৫ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীচন্দ্রকুমার নাথ তার প্রতিবাদ করেন এবং সেই প্রতিবাদের সঙ্গে কবির প্রত্যুত্তরও ছাপা হয়। এ ছাড়া দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'Link' পত্রিকায় ৩১শে আগস্ট তারিখে কবি লিখিত 'Archaeology Kills Konarak' নামক আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদের পরেও কবি যে দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতি দোষারোপ করেছেন সেই সম্পর্কে দু একটি তথ্য উপস্থাপিত করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথম 'চৌম্বাচ্ছা মার্কা' 'স্থূল ও উচ্চকায়' প্রাচীরটির কথা ধরা যাক। ১৯১০ সালে এক-জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার বিষণ স্বরূপের লিখিত 'Konarka' নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

'The compound has a length of 857 feet east and west, and a breadth of 540 feet. It is enclosed by a wall 14 feet high and 5 4" thick. The top is ended in a coping.'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিষণ স্বরূপ ১৯০৫ সালের পূর্বে কোণারকের মেরামতী কাজে নিযুক্ত ছিলেন (Konarka, P. 102); তার বই ১৯১০ সালে প্রকাশিত হলেও, বর্ণনা ১৯০৪—৫ মন্দিরের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই সময়ে তিনি চারদিকের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মেপেছিলেন। বলা বাহুল্য মন্দিরের ভিত্তি দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে একে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না; কারণ সেটা কার্যকরী হতে পারে না। যে সব জায়গা থেকে পাথর খসে গ্যাছে সেগুলির পুনরুদ্ধার হচ্ছে উষ্ণীষ (Coping) পর্যন্ত। শ্রী চট্টোপাধ্যায় পূর্বেই জানিয়েছেন যে প্রতিটি কাজ কোণারক টেম্পল কমিটির নির্দেশানুসারে হচ্ছে।

নাটমন্দিরের সিঁড়ির ব্যাপারেও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কোন কৃতিত্ব নেই; সে সিঁড়ি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা সরকারী মেরামতের পূর্বেই রচিত। এর প্রমাণ রয়েছে উপরোক্ত পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠায় 'It (i.e. the plinth of the Nata-mandir) forms a platform about 75 feet square leaving out the steps which are on all the four sides. On the west side, i.e. the side facing the temple, there are double steps leading from the sides.'

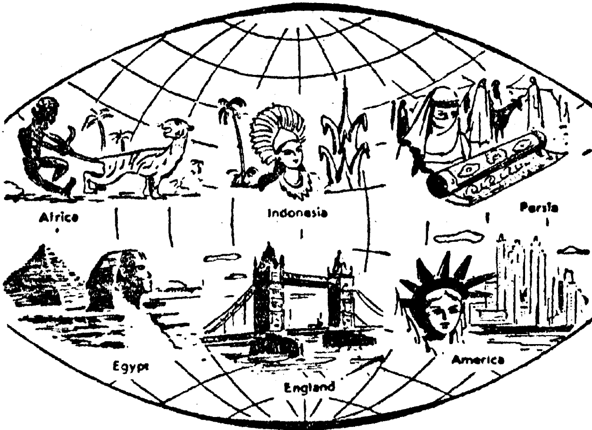
এই বইটির ৭ নম্বর প্লেট, মনোমোহন গাঙ্গুলীর Orissa and her Remains (1912) এর ২৪ সংখ্যাক প্লেট এবং এরও আগেকার Report of the Archaeological Survey of India for 1902-03 এর ৭ নম্বর প্লেটের (a) থেকে প্রমাণ হয় যে নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের সিঁড়ি সে সময়েও ঐ রকম ছিল, সম্প্রতি তাতে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। যে দুটি ছবি তিনি 'লিংক' পত্রিকায় একই জায়গার ছবি (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মারণাস্ত্র-ক্ষেপণের পূর্বে ও পরে) বলে ছাপিয়েছেন, আসলে সে দুটি নাটমন্দিরের দুই দিককার বর্তমান ছবি; উপরের ছবিটি দক্ষিণদিকের সিঁড়ির পূর্বভাগের আর তলেরটি পশ্চিমদিকের যেটিকে আড়াআড়ি জায়গা জুড়ে রচিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

দেবলা মিত্র। সুপারিনটেনডেণ্ট, আর্কিও-লজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, ইস্টার্ন সার্কেল।

#### লেখকের উত্তর

দেশ সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীযুক্তা দেবলা মিত্রের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। পাঁচিলের বিষয়ে শ্রীযুক্তা মিত্র এনজিনিঅর বিষণ স্বরূপের বইএর কথা বলেছেন। বইটি আমিও দেখেছিলুম, কোণার্ক বাংলোতেই এবং বহুকাল আগে। তখন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর নাম এবং কীর্তির কথা ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই ভালো ক'রে জানেন, তিনিও কোণার্কে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু তখন থেকে পরে বহুবার গেলেও ঐ পাঁচিলের











বাধা আমাদের কারো দৃষ্টিকে এবং বিরাট দূরত্বের বোধকে ব্যাহত করেনি। শুধু পদব্রজ নয়, গরুর গাড়িতে বা মোটরগাড়িতে গেলেও তখন তাই সোজা বালির হাহাকারের মধ্যে এই মানবরচিত সৌন্দর্যের সামনে গিয়ে পড়া যেত। এখন দৃষ্টি ব্যাহত হয়; রাস্তা উঁচু হয়েছে এবং পাঁচিলও, এখন একতলার সমান ও রাস্তার সমতল পাঁচিল থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। সৌন্দর্যবোধ ও ব্যয়বাহুল্য দুদিক থেকেই মনে হয় এই বর্তমান পাঁচিল অপ্রয়োজনীয়। অরবিন্দবাবু লিখেছিলেন যে, এই সংরক্ষণ করা হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে। শ্রীযুক্তা দেবলা মিত্র ঠিকই বলেছেন যে মন্দিরের ভিত্তি দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে একে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। বালির আক্রমণও এই অব্যবহারিক উদ্দেশ্যে পুনর্নির্মাণে আটকানো যায় না, কারণ মন্দির প্রাঙ্গণটি এই নতুন পাঁচিল এবং তার সমোচ্চ রাস্তা ইত্যাদির থেকে অনেক নীচে পড়ে গেছে। মনোমোহন গাঙ্গুলীও এ পাঁচিল দেখেন নি।

শ্রীযুক্তা মিত্র "লিংক" পত্রিকার দুটি ছবির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কয়েকজন কোণার্কভক্ত ও ফোটোগ্রাফিক বিশেষজ্ঞের চোখ ও যন্ত্রের বিভ্রম হয়ে থাকতে পারে, যদিচ তার প্রকাশের অসতর্ক দায়িত্ব অবশ্য আমারই। কিন্তু এ ত্রুটি স্বীকার ক'রেও প্রশ্ন ওঠে যে ঐ আড়াআড়ি সিঁড়িটি কি সত্যই খুব প্রাচীন? অন্যান্য প্রস্তরকার্য এবং অন্যান্য সিঁড়ির অবস্থার তুলনায় তাহলে এই সিঁড়িটি এত টাটকা কেন? যে রাজা ও শিল্পীরা নাটমন্দিরের ভাস্কর্যময় দেয়াল করলেন, তাঁরাই আবার কেন ঐ অবান্তর আড়া-আড়ি সিঁড়ি তুলে ভাস্কর্য কার্য আড়াল করবেন? পি ডবলিউ ডি বিষয়ে ফার্গুসনের কথা মনে পড়ে।

মনোমোহন গাঙ্গুলীর বই-এর উল্লেখ শ্রীযুক্তা মিত্র করেছেন। মনোমোহনবাবুর বই থেকে গৃহীত বীরেন্দ্র রায়ের বইতে কোণার্কের যে ভিত্তিনক্সা আছে, তাতে কিন্তু নাটমন্দিরের তিনদিকের সিঁড়ি দৃষ্ট হয়, আলোচ্য সিঁড়িটি নক্সায় চিহ্নিত নেই। তবে শ্রীযুক্তা মিত্র "লিংক" প্রসঙ্গে যে বলেছেন, ছবি দুটি দুইদিককার বর্তমান ছবি, সে কথা ঠিক নয়। দুটি ছবির মধ্যে বেশ কয়েক বছরের তফাত।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগই আমাদের অতীত সৌন্দর্য-কীর্তির রক্ষার বিষয়ে আমাদের সকলের ভরসা। শ্রীযুক্তা মিত্রের এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতো বিভাগীয় ব্যক্তিদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে আমরা আশ্বস্ত হলুম ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কারণ আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছে যে শিল্প বা প্রত্নতত্ত্বের দিকটা সংরক্ষণে বা পুনর্নির্মাণে কম বিবেচিত হয়েছে বা হচ্ছে। প্রাচীন শিল্পকার্য সংরক্ষণে মূল বিবেচ্য সংরক্ষণই, কালের ছাপ সুদ্ধ শিল্পকার্য রক্ষা করা, যতদূর সম্ভব সংযোজনা না ক'রে বা বিয়োগ না ক'রে। অনেক সময়েই দেখা যায় সংযোজনা বা বিয়োগান্ত নির্মাণের দিকে একটা মর্মান্তিক ঝোঁক। অথচ অন্যান্য দেশে ক্যাথিড্রাল বা অ্যাবি বা কাস্‌ল্‌ ভগ্নাবস্থাতেই কিন্তু স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার নীতি অনুসৃত। ঐতিহাসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে সেটাই সঙ্গত বটে।

নিছক সংরক্ষণের দিক থেকেও বোধ হয় সেটা সমীচীন, কারণ তাহলে কোণার্কের কালজীর্ণ বেলেপাথরের ভাস্কর্যের স্থানে ভাস্কর্যহীন

গ্রানিটিক ফেলস্‌পারের মতো ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্নভারবহ পাথরের চাঙড় লাগানোর বিষয়ে প্রবার ভাবতে হয়। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ ভারতীয় মন্দির-শিল্পের ক্ষেত্রে মূর্তি বা ভাস্কর্যই হচ্ছে, ডাঃ ক্রামরিশের ভাষায়,

the Highest Exponent of the Temple-body.

মূর্তিগুলি ইমারত সংস্কারের খাতিরে সরিয়ে ফেললে এই বিশেষ জাতীয় ইমারতগুলিই অর্থাৎ মন্দিরগুলিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ এই মূর্তিভাস্কর্যেই:—

light and darkness are no longer meted out as counterparts of measured volume, but the monument draws space into itself and makes it corporeal, for it looms dark where the relief is sunk in frame or recess. In return it gives out volume into unbounded vastness, with figures as ultimate and furthermost heralds of a boundless power to grow into definite shape. Potent mass has put forth, and upwards urge keeps stalwart, those gigantic figures of the roof of the Mandapa of Konarka, away from the building and yet one with them (Kalinga Temples, by Stella Kramrisch, Journal of ISOA)

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই প্রাণময় অর্গানিক সম্বন্ধটি, জ্ঞানের সঙ্গে শিল্পানন্দ ও প্রেম সর্বতোভাবে উপলব্ধিতে কোণার্কের মতো মন্দিরের সংরক্ষণ এখনও সার্থক হতে পারে। বিশেষ কোনো তথ্য নয়, এই সাধারণ বোধই আমার পক্ষে বিশেষজ্ঞদের ও শিল্পপ্রেমিক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যুক্তি ছিল। তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সুতরাং এখন আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

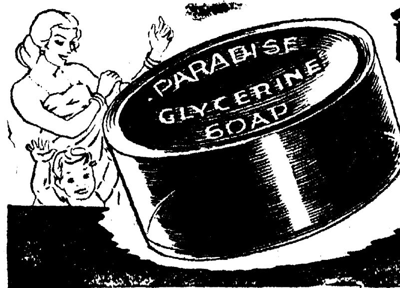
বিনীত
বিষ্ণু দে

### প্রবাসের জার্নাল

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

তেরোই সেপ্টেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনারায়ণ রায় লিখিত প্রবাসের জার্নালের ভূমিকা সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ মতবাদ পেশ করছি। দুঃখের কথা যে শ্রদ্ধেয় শিবনারায়ণবাবু প্রবাস-ফেরতা অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু লিপিভাষণ বহুদিন পরে আবার পাঠক মহলের সামনে উপস্থাপিত করছেন। বাবুই পাখি বাসা বেঁধে তাতে মাথা লুকিয়ে থাকে; শিবনারায়ণবাবু ভাষা ও স্মৃতির সাহায্যে যে আক্ষরিক বাসাটি গড়ে তুলতে চলেছেন তাতে অন্তর্নিহিত রয়েছে তাঁর স্বাধীন মতবাদটি। তিনি বলেছেন জাতির চরিত্র বিচার খাঁটি অর্থে প্লেটোনিক নয়। অর্থাৎ কোন জাতির চরিত্রবিকাশ সব সময়েই বৃহত্তর সার্থকতার চিহ্ন-বাছা। কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়াটা যেমন অর্থহীন তেমনি এই প্রবন্ধে বার বার ব্রহ্ম সম্বন্ধে কটাক্ষপাত (কতকটা ভ্রূকুঁচকানো ভঙ্গীতে) কেমন যেন মনে হয়। এইখানে এসে পড়ল তার 'সাহিত্য-চিন্তা' বইটির কথা। কেননা ঐ বইটিতেও তিনি বার বার মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশের কথাই বলেছেন। উল্লিখিত বইটির একটি প্রবন্ধে তিনি সক্রোধে জানিয়েছেন যে, আমাদের পিতামহেরা মিছামিছি আমাদের আত্মাপরমাত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু শিবনারায়ণ-





বাবু কি ভুলে গেলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ জাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল। শুধু জাজ্ঞবল্ক্যই বা বলি কেন। পত্নীসৌভাগ্যে ও সংসারসৌভাগ্যে বঞ্চিত ছিলেন না, তৎকালীন কোন ঋষি। প্রত্যক্ষভাবে সংসার ভোগ না করলেও কামিনীকাঞ্চনের আস্বাদনে কেউই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। অথচ শোনা যায় এরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞ। এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জীবনের সম্ভোক্তা। যেহেতু 'ব্রহ্ম' জিনিসটা মানুষের আত্মিক উজ্জীবনেরই একটা অবস্থা সেহেতু মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিরোধী তা নয়। হতে পারে না। সমস্ত কিছু স্বীকার করে নিয়েই মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয় সামগ্রিকভাবে। তা না হলে মানুষের জীবন-দর্শনে যে জিনিসটি গড়ে ওঠে তা হয়ে পড়ে মতবাদ। এবং বলা বাহুল্য আংশিক। জা পল সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদ এর প্রকৃষ্ট ও সেই সাথে নিকৃষ্ট উদাহরণ। কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। যুদ্ধের যুগান্তকারী অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যে দুজন সাহিত্যিক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের নাম সবাই জানেন। জা পল সার্ত্র ও তমাস মান। অথচ জা পল সার্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে একটা মতবাদ গড়ে তুললেন। অথচ তমাস মান একই যুদ্ধজনিত ভয়াবহতার আওতায় জন্মেও যে জিনিসটি গড়ে তুললেন তাতে মতবাদ নেই। অথচ ব্যক্তিসত্তার জাগরণ সম্বন্ধে তমাস মান যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই এই মহাকবির সাহিত্য হল সম্পূর্ণ। আর সার্ত্রীয় সাহিত্য হল মতবাদের মুখোশ পরা আংশিক। ইতি—বাসুদেব গুপ্ত, কলিকাতা-২৬।

### লেখকের উত্তর

চিঠিটির পুরো অর্থভেদ করতে পারিনি। যেটুকু বোধগম্য হয়েছে সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করছি।

পত্রলেখকের মতে "যেহেতু ব্রহ্ম জিনিসটা মানুষের আত্মিক উজ্জীবনের একটা অবস্থা সেই-হেতু....." ইত্যাদি। ব্রহ্মের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা পড়ে তাজ্জব বনেছি। আমার অনুমান, পত্রলেখক যার কথা বলছেন তা ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মাস্বাদ। কেউ যদি বলেন যে, ভূত দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন, তাহলে তাঁর ভয় পাওয়া বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি না, প্রশ্ন তুলি 'ভূত' দেখা সম্বন্ধে। তেমনি কেউ যদি দাবী করেন তিনি ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দ লাভ করেছেন, তাহলে তাঁর আনন্দ বিষয়ে সংশয়ী না হয়েও জিজ্ঞাসা না করে পারি না যে ব্রহ্মাস্বাদ একটা সম্ভবপর অভিজ্ঞতা কিনা।

কারণ যাঁরা ব্রহ্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের ধারণায় ব্রহ্ম মোটেই মানসিক অবস্থা বিশেষ নয়, সমস্ত অস্তিত্বই ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত। এবং এই সমগ্রতা নির্বিকার, নিরাকার, নির্গুণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এ ধারণাকে সত্য বলে মানলে স্থান এবং কাল, বস্তু এবং ব্যক্তি, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া, রূপ এবং পরিবর্তন—এ সবই অসত্য বলে স্বীকার করতে হয়। নিজেদের যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ বলে দাবী করেন, তাঁরা তাই এ সবকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। (আজ পর্যন্ত আমার মাথায় ঢোকেনি যে ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে মায়া এলো কোত্থেকে?) ব্যক্তি যদি মায়া হয়, তবে ব্যক্তিসত্তার আবার বিকাশ কি? নাকি বিনা ডিমেই অমলেট বানানো চলে? আর ব্যক্তি না থাকলে ব্রহ্মকে আস্বাদন করছে কে?

অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং স্থানকালপাত্রে সীমাবদ্ধ বিকাশশীল প্রাতিস্বিক মানুষ—এ দুই কল্পনা পরস্পর বিরোধী। ব্রহ্ম এবং ব্যক্তিকে মেলানো যায় ব্যক্তি ব্রহ্মে বিলীন হলে; কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যক্তি কথাটাই নিরর্থ। ব্রহ্মাস্বাদ সম্ভব নয়, কারণ ও-আস্বাদের সর্তই হোল ব্রহ্মের মধ্যে আস্বাদ-কর্তার বিলোপ।

তবে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে দাবী করেছেন বলে কোনো ব্যক্তি কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগ করতে পারবেন না, এমন কোন কথা নেই। নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবী করেন অথচ কালোবাজারে পয়সা লুটতে সংকোচ নেই, এমন ব্যক্তি কি এদেশে খুব দুর্লভ? পত্রলেখকের সারল্যে মুগ্ধ হতে পারি, কিন্তু যা 'শোনা যায়' তাই যে সত্যি, এমন শিশুসুলভ যুক্তিতে কি করে সায় দিই? যাজ্ঞবল্ক্যকে (বর্গীয় 'জ' নয়) জনক রাজা শুধোলেন, আপনি তত্ত্বালোচনা করতে চান না সহস্র ধেনু দক্ষিণা চান। বুদ্ধিমান ঋষি জবাব দিলেন, 'দুটোই চাই'। ঋষির বুদ্ধিকে তারিফ করি, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের দাবী আর বিত্তসঞ্চয়ের চেষ্টা, এ দুটোর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে, এটাও কি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার? যাজ্ঞবল্ক্য সে-কথা বুঝেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত তাই তাঁকে বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। পত্রলেখক আমায় যে বইটির উল্লেখ করেছেন, তাতে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম যে, ব্রহ্মজ্ঞ বলতে গিয়ে আমরা মানুষ, সমাজ এবং প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হয়েছি। এবং ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তির বিলোপকেই চরম আদর্শ ঠাওরানোর ফলে এদেশে জীবনের বহুমুখী বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে। আমার এ অভিযোগ প্রত্যাহার করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি আজও খুঁজে পাইনি।

পত্রলেখক 'মতবাদের' বিরোধিতা করে নিজেই 'কিঞ্চিৎ মতবাদ পেশ' করেছেন। মতবাদ এবং দার্শনিকতা এক জিনিস নয়। মতবাদে সব প্রশ্নের শেষ উত্তর গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়, সেকারণে মতবাদ মনের বিকাশের পথে বাধা-স্বরূপ। দার্শনিক বুদ্ধি উত্তরের মধ্যে প্রশ্নের বীজ বপন করে। আমার বক্তব্য প্রসঙ্গে সার্ত্র্ এবং টমাস মানের উদাহরণ একেবারেই অবান্তর। মান মহৎ সাহিত্যিক, কিন্তু কস্মিনকালেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দাবী করেননি। তাঁর চিন্তাতেও অস্বচ্ছতা, আত্মবিরোধ এবং ত্রুটির অভাব নেই। এ-প্রসঙ্গে পত্রলেখক গত সংখ্যা Quest পত্রিকায় ইগনাজিও সিলোনের মান-বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন। সার্ত্র্-এর লেখায় বিস্তর গলদ আছে, কিন্তু তার কারণ ব্রহ্মে অনাস্থা এ-যুক্তি একেবারেই হাস্যকর। লেখকের হয়ত ধারণা আমি সার্ত্রীয় দর্শনের সমর্থক। এটা যে ভুল ধারণা, আমার Explorators অথবা In Man's Own Image-এর পাতা ওল্টালেই তা তিনি বুঝতে পারবেন।

কোনো জাতির চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জাতির চরিত্র বলতে আমি কি বুঝি এ আলোচনা ধান ভানতে শিবের গীত কিনা, অন্য পাঠকদের ওপরে সে বিচারের ভার রইল।

পরিশেষে বেচারী বাবুই! 'আক্ষরিক বাসা'তে 'স্বাধীন মতবাদের' বদলে যাঁরা পরাধীন মতবাদ 'নিহিত' রাখেন, তাঁদের উপমা কোন পাখী?

শিবনারায়ণ রায়

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

৩

জীবনের প্রথম আঘাত। প্রথম চৈতন্য। মর্মান্তিক বেদনায় সুলেখা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বৈরাগ্য এসেছিলো জীবনে। কতোদিন পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে নি সে, কারো সঙ্গে খেলতে পারেনি, হাসতে পারেনি। কতোদিন খায়নি, কতোদিন ঘুমোয় নি। কতোদিন সেই অলৌকিক ভয়ের চেতনায় মাকে আঁকড়ে বাবাকে আঁকড়ে, মুখ ঢেকে রাত কাটিয়েছে। যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো উঁচু থেকে। মাথা ফেটে গেল, দেহ ছিঁড়ে গেল, বুক ভেঙে গেল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব অন্ত্রী তন্ত্রী, হৃৎপিণ্ড।

সুলেখা জানলো যারা আছে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, ভালোবাসছে, বকছে, তারা কেউ থাকবে না। তারা সব না থাকার জন্যই এসেছে সংসারে। ঠিক দাদুর মতো করেই একদিন চলে যাবে তারা। নিতান্ত অপরিচিতের মতো চলে যাবে। যাবার সময় একবার মুখ ফিরিয়েও দেখবে না, একটা বিদায় পর্যন্ত নেবে না। কারো সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ, আর কিছুতেই কিছু এসে যাবে না তার।

দাদু যে কী পরিমাণ হৃদয়হীনের মতো ব্যবহার করেছিলেন, কোনো তুলনা খুঁজে পায়নি সুলেখা। কতো অভিমান করলো, প্রাণপণ আর্তনাদে কতোবার ডাকলো, তবু দাদু ফিরে তাকালেন না, ছোটো হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে কত মুখ ঘষলো, জামাটাই শুধু ভিজে গেল চোখের জলে, এতোটুকু নড়লেন না দাদু। কেবল কতকগুলো লোক জোর করে তুলে দিলো তাকে, তারপর দাদুকে সাজিয়ে গুজিয়ে খাটে শুইয়ে, কাঁধে করে নিয়ে গেল কোথায়।

নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর।

খাট ধরে ঝুলে পড়েছিলো সে। শক্ত হাতে নামিয়ে দিলো একজন। আর তারপর! কী হলো তারপর। কিছুই হ'লো না, একটা ঝড় বয়ে গেল শুধু, আর এক পশলা বৃষ্টি। আবার হেসে উঠলো রোদ। আবার জীবনযাপনের তাগিদ, বেঁচে থাকার প্রয়াস। সংসারের চাকা তেমনি ঘুরতে লাগলো আপন বেগে।

টেলিগ্রাম পেয়ে বাবা ছুটে এলেন, জ্যাঠামশায় এলেন, জ্যাঠাইমা এলেন, এলেন পিসিরা, আরো যে কতো কেউ এলো শোক দেখাতে শোক জানাতে ইয়ত্তা নেই তার। বড়ো খাটটায়, যেখানে দাদু ঘুমুতেন, দাদুর বালিশে মাথা রেখে মড়ার মতো পড়ে রইলেন ঠাকুমা, দোতালার ছাদের উপর, ছোট্ট চিলকুঠির গায়ে ঠেসান দিয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলো সুলেখা, সুলেখার মা সুষমা দেবী, কপাল অব্দি ঘোমটা টেনে দিনরাত ব্যস্ত হয়ে রইলেন অতগুলো অভ্যাগতের পরিচর্যায়, জ্যাঠাইমা সময় অসময়ে লোক দেখলেই গলা ফাটিয়ে কান্নার রোল তুলতে লাগলেন, পিসিরা দুদিন বসে রইলেন ঠাকুমার মাথার কাছে। জ্যাঠামশায়

হিসাব নিকাশে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, জ্যাঠামশায়ের ছেলেমেয়েরা কে কোথায় রইলো কে জানে। বাবা নিজেকে নিজের ঘরে আবদ্ধ করলেন, হাতে একটি বই রইলো, মনটার খবর কেউ জানলো না।

যেন একটা উৎসব লেগেছে বাড়িতে। কেন এরা এসেছে? কী চায়? কী দরকার এদের। মনে মনে ভাবে সুলেখা। মনে মনে নির্জনতা খোঁজে। খাওয়া দাওয়া হাঁক ডাক, হাসি গল্প, কিছুরইতো অভাব নেই। বরং দাদু থাকতে যেটুকু আড়াল ছিলো সেটুকু ভেঙেছে। তবে কি এরা সেই সুখ-ভোগ করতেই এসেছে এখানে? দাদুর অভাবে যে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগছে, বিস্বাদ লাগছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে, তাকি ওরা একটুও বুঝতে পারছে না?

সারা সারা দুপুরে বসে বসে শুধু এই কথা ভাবে সুলেখা। নিঃঝুম রাত্তিরে, ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে শুনতে চোখের জলে তার বালিশ ভিজে যায়। মুখ চেপে সে ছোটো ছোটো ক'রে ডাকে 'দাদু। দাদু।' হঠাৎ একটা ভয়ংকর ভয়ে শরীরটা কাঠ হ'য়ে যায়।

এর পরেই কলকাতা চলে এসেছিলো সুলেখারা। সুলেখা নিজে, তার মা, তার বাবা। কলকাতার কোনো এক সওদাগরী আপিসে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন সুপ্রকাশবাবু।

ঠাকুমা ভীষণ কাঁদলেন আসবার সময়। আর ঠাকুমার জন্য সেও কাঁদলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সুপ্রকাশবাবু চেয়েছিলেন ঠাকুমাকে নিয়ে আসতে. ঠাকুমার সদ্য-শোকার্ত হৃদয় সায় দিল না ঐ বাড়ি ছেড়ে আসতে।

কাঁদলো একটু আধটু সকলেই। ভাই-বোনেরা দাঁড়িয়ে রইলো সজল নয়নে, জ্যাঠাইমা চোখ ঘষলেন, পিসিরা আদর করলো, আত্মীয় পরিজনরা ঘিরে দাঁড়ালো, জিনিসপত্র দেখে শুনে তুলে দিতে দিতে জ্যাঠামশায়ও মুখ ফিরিয়ে সকলের অলক্ষ্যে চোখ মুছে নিলেন একবার।

ছবি আসে, ছবি যায়। কে দেখায় কেউ জানে না। যে ছবি চলে যায় তারও যেমন কোনো পুনরাবৃত্তি নেই জীবনে, যে ছবি আসে তাও তেমনি অলংঘ্য, কোনো প্রতি-বন্ধক নেই তার। ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই সেখানে। একেবারে একনায়কত্বের অধীন, যদিও নাটকটি অলক্ষ্য অদৃশ্য; ভালো হোক মন্দ হোক তাই মাথা পেতে মেনে নিতে হবে তোমাকে। তা নৈলে সুলেখার এই জীবনের ছবিটাই কি ভাবতে পেরেছিলো সে, না নিতে চেয়েছিলো? মা কি তার বাবা সুপ্রকাশবাবুর মৃত্যুর ছবিটাই কেউ ভাবতে পেরেছিলো আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

ঠিক দাদুর মতো ক'রেই হঠাৎ একদিন মারা গেলেন তিনি, ঠিক দাদুর মতোই চুপে চুপে, স্বার্থপরের মতো, কারো কাছে বিদায় না নিয়ে, না দিয়ে।

সেদিন সুলেখার জন্মদিন ছিলো। বারো বছরের জন্মদিন। সারাদিন হৈ চৈ তাই নিয়ে। কলকাতা আসবার পরে দু'টি ভাই জন্মেছিলো সুলেখার। তিন ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে দরাজ হাতে জিনিসপত্র কিনলেন সেদিন। ফ্রক পরা সুলেখার শাড়ি হ'লো। তার সংগে মিলিয়ে ব্লাউস, পেটিকোট, আরো কতো কী। ভাইয়ের ধুতি হ'লো। দিদির জন্মদিনে কি তারা প্যান্ট পরবে? ছি! আর যিনি মা, তিনিই তো সব। তাঁর জন্য নতুন শাড়ি তো সর্বাগ্রে। আটার টাকা দিয়ে

লাল পাড় কাড়িয়াল শাড়ি কেনা হ'লো। মা তো লজ্জায় লাল। লজ্জায় অবশ্য তিনি সব সময়েই লাল। মুখ তুলে কথা বলতেও সাতবার দ্বিধা। কে কী মনে করবে, কার কী অসুবিধে হবে এই তাঁর সারাদিনের চিন্তা। নিজের জন্য মনে মনেও কিছু ভাবেন না তিনি। তাঁর আবার আলাদা অস্তিত্ব কী? সকলের সব মিটলেই তবে তো তাঁর নিজের কথা?

মার এই স্বভাব। এই স্বভাবের জন্য কষ্টও পেয়েছেন তিনি। বৌ-দশা তো কোনোদিন ঘোচেনি শ্বশুর বাড়িতে। নিঃশব্দে সকলের মন জুগিয়েছেন, সারাদিন খেটেছেন, সারাদিন তটস্থ হ'য়ে থেকেছেন কোথায় কার ডাক পড়লো। আত্মীয় স্বজন সবাই খাটিয়েছে তাঁকে, জ্যাঠাইমা বসে থেকেছেন পায়ে পা দিয়ে, ঠাকুমা অবশ্য মাঝে মাঝে রাগ করেছেন তাই নিয়ে, কিন্তু রাগ করলে কী হবে, মা নিজেই তো সব করেন সেধে যেচে। আর এইজন্যেই চাকরি হওয়ামাত্র বাবা মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে নিয়ে এলেন, রেখে এলেন না। তা নৈলে পারিবারিক কর্তব্যের দিক থেকে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী দাদুর মৃত্যুর পর অন্তত মাস দুয়েক ওখানে থাকা উচিত ছিলো মার। ঠাকুমা নিজেও সে ইচ্ছেই প্রকাশ করেছিলেন, বাবা চোখ বুজে পিঠ ফিরিয়ে এড়িয়ে গেছেন সব মন্তব্য। তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল, বড়ো ভীরু। আর বড়ো ভালো মানুষ। তিনি চাননি নিজের কাছ ছাড়া আর কোথাও রাখতে। সব সময় সস্নেহে আগলে রেখেছেন তাঁকে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া হ'লো। মাংস হ'লো পায়েস হ'লো, সুগন্ধি চালের পোলাও হ'লো। সবাই নতুন কাপড় পরে খেতে বসলো পরম আনন্দে। সুলেখার হাত দিয়ে সুলেখার মা একখানা জরির পাড় ধুতি কিনিয়ে এনে দিলেন স্বামীকে। মহা খুশি সুপ্রকাশবাবু। একেবারে সারাদিনের প্রোগ্রাম ক'রে ফেললেন খুশির চোটে। সিনেমার টিকিট কেটে আসলেন সকলের। বিকেলের শো'তে সিনেমা দেখে, রাত্তিরে কোনো রেস্তোরাঁয় খেয়ে তবে বাড়ি ফেরা।

অতিশয় একটি সুখের দিন। সবচেয়ে সুখের দিন। রাত ক'রে বাড়ি ফিরে সেই সুখের জাবর কাটতে লাগলো সবাই। বারোটা বাজলো তবু ঘুম নেই কারো চোখে। আলো নিবিয়ে শুয়ে-শুয়ে গল্প। এদিকে দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে সুপ্রকাশ-বাবু শুয়েছেন, পাশে সুলেখা। গল্প করবার লোভে সেদিন বাবার সঙ্গে শুয়েছে সে। উল্টো দিকের খাটে মা শুয়েছেন দুই ছেলে নিয়ে। বাবু আর ছোটু। দুই খাটে কথা বলাবলি চলছে। প্রথমে ঘন ঘন, তারপর ধীর লয়ে, তন্দ্রার ঝোঁকে ঝোঁকে। রাত্তিরের টুপ টাপ শিশিরের শব্দের মতো একটা কথার পৃষ্ঠে আর একটা কথা। তারপর কখন ঝিমিয়ে এসেছে, কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সুলেখার। আর ঘুম ভেঙেই একটা অশরীরী ভয়ে ঘাম ছুটে গেল। আবার। আবার এসেছে। আবার টের পেলো সুলেখা সেই অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বহীন






উপস্থিতি। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে কোনো দিকে ফাঁক নেই, কোনোদিকে পালাবার রাস্তা নেই। একটা সর্ষে পরিমাণ রন্ধ্র পর্যন্ত নেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার। অন্ধকার ঘরে একা জেগে শরীরের লোমগুলো তার খাড়া হ'য়ে উঠলো। দাদুর মৃত্যুদিনে অনভিজ্ঞ ছিলো সে, এখন তো সে সব জানে, সব বোঝে। এই অদৃশ্য শক্তির টান তো সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। ঠিক সেই অনুভূতি, সেই সন্ধ্যার সেই যন্ত্রণাময় চেতনা। কেঁপে উঠে ভয়ে দু' হাতে গলা জড়িয়ে ধরলো বাবার, বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো মুহূর্তে ছিটকে সরে এলো হাত। ঠাণ্ডা। ভীষণ ঠাণ্ডা। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। পৃথিবীতে সেই ঠাণ্ডার কোনো ব্যাখ্যা জানে না কেউ। হাতটা টন টন ক'রে উঠলো। বুকের হাড় পাঁজরা গুঁড়ো হ'য়ে গেল। অস্ফুটে বাবা বলে ডেকে উঠলো একবার, তারপর আর মনে নেই। বছর দুই আগে ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন, জ্ঞান হারাবার আগে যেন ঠাকুমাকে জানালায় দাঁড়িয়ে বাবাকে ছোটো ছেলের মতো কোলে তুলে নিতে দেখলেন।

আর তারপর! তারপর আবার নওয়াবগঞ্জ। আবার আর এক ছবি। শৈশবের স্মৃতিদের। আম জাম কাঁঠাল কলার বাগানের ছায়ায় দাদুর বাড়ির সবুজ শ্যাওলা। পুরোনো দিনের গন্ধ ছড়ানো, গন্ধ জড়ানো মমতা। নির্জন, নীরব। কলকাতার কোলাহলময় জীবনের পরে প্রায় নিষ্প্রাণ নির্জীব। তা হোক। এই ভালো। বাবা যেখানে নেই সেখানে কোলাহলের কোনো মানে হয় না। চোখ জবালা করে। সুলেখার জীবনের অত বড়ো একটা অংশ যেখানে খসে গেল সেখানে আবার কলরোল কিসের?

কলকাতা থেকে আসবার সময়ে যতো কষ্ট হ'য়েছিল, একের পর এক জিনিস-পত্রগুলো বিক্রী ক'রে ফেলতে দেখে যতো যন্ত্রণা হ'য়েছিলো নওয়াবগঞ্জের শান্ত পরিবেশে এসে তেমনি ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিলো মনটা। জ্যাঠামশায় ভালো ব্যবহার করেছিলেন, জ্যাঠাইমা আদর করেছিলেন, ভাইবোনেরা খুশি হ'য়েছিলো। শোকের আগুনটা প্রশমিত হ'য়েছিলো একটু।

ক্ষণিক। একেবারেই ক্ষণিক। তারপরেই সুলেখা টের পেলো পুরোনো দিনের সঙ্গে নতুন দিনের কোনো মিল নেই, পুরনো ছবি, পোকায় কেটেছে, নতুন ছবিতে রং নেই। দাদু ছিলেন দাদু নেই, ঠাকুমা ছিলেন ঠাকুমা নেই, এমন কি আজন্মের পুরোনো চাকর গোবিন্দদা পর্যন্ত নেই। ভুলু কুকুরটা বুড়ো হ'য়ে ঘেয়ো হ'য়ে গেছে, সবাই দূর-দূর করে, মতি গাড়োয়ানের ছোট ছেলেটা ঘাস কাটতে এসে গান করতো, খেলা করতো, পুকুরের জলে ভাঙা হাঁড়ির

টুকরো দিয়ে ব্যাং ভাসাতো, সে মরে গেছে। বুড়ো মালি বনমালীদা কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। তার কালো পাথরের মতো আটমাসের মোটা ছেলেটাকে কতো কোলে নিত সুলেখা।



আরো যে কতো কিছু ছিলো কতো কিছু নেই তার হিসেবও নেই। ছোট্টো সুলেখার যতো কিছু মনোমত ছিলো কিছুই তার অবশিষ্ট নেই এই বাড়িতে। এমন কি ঘরগুলো পর্যন্ত ওলোট পালোট করা হ'য়ে গেছে। পুবের বড়ো ঘরে, যে ঘরে দাদু ঠাকুমা থাকতেন, সেখানে এখন জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা থাকেন, কিন্তু দাদু ঠাকুমার মতো ক'রে সাজানো নেই সে ঘর। মস্ত একটা খাটে ঘুমুতেন তাঁরা, সে খাটটা নেই? পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর খাট, সুন্দর শয্যা। কতো ভালোবাসা, ভালো লাগার উজ্জ্বল প্রতীক। সে খাটে দাদু ঠাকুমার মাঝখানে শুয়ে কতোদিন ঘুমিয়েছে সুলেখা। কতো সুখস্বপ্ন দেখেছে। কতো গল্প শুনেছে ঠাকুমার মুখে, কতো গল্প বুনেছে মনে মনে। গরমের দিনে দাদু তাল পাতার পাখার বাতাসে ঠাণ্ডা রেখেছেন তাকে, শীতের দিনে বুকের উত্তাপে উষ্ণ রেখেছেন। ঠাকুমা পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গুন গুন করেছেন "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু, বৃথা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ সম হইনু—"

টান টান ক'রে বিছানা পাততেন ঠাকুমা। মা পেতে দিতে চাইতেন, ঠাকুমা দিতেন না। ওটা তার নিজের হাতে করা চাই। সুলেখা ছোটো ছোটো হাতে সাহায্য করতো, এদিকে ধরতো তো ওদিকে সরতো, ওদিকে ধরতো তো এদিকে সরতো। তার অপটু অক্ষম চেষ্টা দেখে ঠাকুমার কী হাসি। যেন এর চেয়ে আহ্লাদের কিছু আর নেই বিশ্ব সংসারে। আর খাটটা কী প্রকাণ্ড ছিলো! কী শক্ত আর কী বলিষ্ঠ! পায়া এতো মোটা যে দু' হাতে জড়ানো যেতো না। অনেক দিন চেষ্টা ক'রে দেখেছে সুলেখা। গোল গোল থাম ছিলো চারদিকে, তার ভেতর থেকে চারটে ডাণ্ডা কর্কস্ক্রুর মতো প্যাঁকিয়ে প্যাঁকিয়ে চারটে ছ ফুট লম্বা সৈনিকের মতো উঠে গেছে উপরে। সেখানে বুড়ো-নখের ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে মশারি টাঙাতেন ঠাকুমা। মাঝ রাত্তিরে উঠে আবার লণ্ঠন ভেতরে নিয়ে কোনো কোনোদিন মশা মারতেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দুই হাতে চটপট শব্দ হ'তো, সুলেখার ভালো লাগতো দেখতে। সেও উড়ন্ত মশাকে বাগে আনবার চেষ্টায় ছুটোছুটি করতো বিছানাময়, বালিশ টালিশ মাড়িয়ে একাকার। দাদু ছোট্ট সুলেখাকে কোলে ক'রে তুলে নিতেন খাটে, তা নইলে সে উঠতে পারতো না এতো উঁচু ছিলো খাটটা। খাটের তলায় একটা প্রমাণ-মানুষ বোধ হয় বসে থাকতে পারতো মাথা উঁচু করে। ভুরুক তামাক টানতে টানতে দাদু অরুণ বরণ কিরণমালার গল্প বলতেন, নয়তো সাত রাজার ধন এক মানিকের।

(ক্রমশ)




# শারদীয় বেতার জগৎ

**৭ই অক্টোবর ১৯৫৮**



### উপন্যাস ও নাটক

**নাগরিকা** (উপন্যাস) **:** তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরী। **অগ্নীশ্বর** (উপন্যাস) **: বনফুল।** **মাটির মেয়ে** (মারাঠি নাটক) **:** মামা ওয়ারেরকার

### ছোট গল্প ও রস-রচনা

**রবি-পুরাণ :** সৈয়দ মুজতবা আলী; **পরিচয় :** বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, **একটি ভুল :** সন্তোষকুমার ঘোষ; **একটি হাসির গল্প :** শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **অমৃতা তালুকদারের কাহিনী :** বাণী রায়, **মনে মনে : পরিবার :** লীলা মজুমদার; **রীণাবৌদি :** বেচু প্রামাণিক, **হারানো সুর :** সন্তোষকুমার দে, **গল্পের দুর্ভিক্ষ :** সুমথনাথ ঘোষ; প্রভাত দেবসরকার।

### বিভিন্ন ভারতীয় ছোট গল্প

**হাতীবাবা :** (তামিল) **:** উমাচন্দ্রন্, **দুষ্ট ও ভূত :** (হিন্দী) **:** দ্বিজেন্দ্রনাথ মিশ্র 'নির্গুণ'; **ঈদের পড়ন্ত মেলা :** (উর্দু) **:** আলি আব্বাস হুসেনী; **একটি গোধূলী :** (অসমীয়া) **:** বিচারপতি হলীরাম ডেকা; **প্রতিবেশী :** (তেলুগু) **:** টি, গোপীচাঁদ; **মাতৃ-হৃদয় :** (গুজরাতী) **:** গৌরীশংকর যোশী 'ধূমকেতু'।

**কবিতাবলী :** সুনীলকুমার নন্দী, অরুণকুমার সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, উমা রায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।

**বাংলা উপন্যাস বর্তমানে কোন পথে?** (আলোচনা) **:** বিভাস রায়চৌধুরী ও জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, **আজকের আফ্রিকা** (ভ্রমণ) **:** (১) হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (২) ডেসমণ্ড ডয়েগ; **চন্দন : সুগন্ধ ও মহামূল্য অরণ্য সম্পদ :** ডঃ এম, এন, রামস্বামী (প্রধান গবেষণাধীক্ষক, বন গবেষণাগার, ব্যাংগালোর); **গির বনের সিংহ :** এম, এ, উইণ্টার ব্লাইদ; **নূতন নাগা অঞ্চল :** আর, কে, রামধ্যানী, আই-সি-এস; **বর্তমান রুশীয় নাট্যকলা : মঞ্চে ও ছায়াচিত্রে :** তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; **আধুনিক বাংলা কাব্যের দুর্বোধ্যতা :** (আলোচনা) **:** ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু; **বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার যোগসেতু : সংস্কৃত :** কাকাসাহেব কালেলকার; **ভারতীয় নৃত্য : ভারতনাট্যম্ :** মৃণালিনী সরাভাই; **কথাকলি :** বালকৃষ্ণ মেনন; **সেনা বিভাগে অফিসারের চাকুরি :** জেনারেল কে, এম, কারিয়াপ্পা, **ছাড়পত্রবিহীন পর্যটক : বিদেশাগত পাখী :** ডক্টর সলিম আলি; **মিশর ও আরব জগতের নবজাগরণ :** ডক্টর রফিক জ্যাকোরিয়া; **মরক্কো : টিউনিসিয়া :** কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়; **সংগীত ও নৃত্যশিল্পীদের বার্ধক্যের সুবিধাদান :** বিচারপতি ডব্লু, এস, কৃষ্ণস্বামী নাইডু; **সিংকিয়াং-এ নবজীবনের পদক্ষেপ :** বেসিল ডেভিডসনের গ্রন্থ সমালোচনা **:** ভি, গ্রেনফেল, **সৌরাষ্ট্রের বিচিত্র হরিণ :** কে, এস, ধর্মকুমার সিংজী, **একটি পুলিশ খুনের মামলা :** কে, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়; **মার্কিন সংগীতজ্ঞের চোখে ভারতীয় সংগীত কলা :** রবার্ট ই, ব্রাউন; **বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা :** অধ্যাপক উইলিয়াম ডান্ডে; **পশ্চিমবংগে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ** (আলোচনা) **:** ভি, এস, রাও (পশ্চিমবংগের অরণ্যসমূহের কনজারভেটর জেনারেল) ও পি, কে, সেনগুপ্ত (পশ্চিমবংগ বন্যপ্রাণী বোর্ডের সদস্য); **যক্ষ্মামুক্ত ও বিকলাংগ পুনর্বাসনের ইতিহাসে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী :** অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়; **ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের ক্রমবিকাশ :** বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী; **শিল্পে রীতিসর্বস্বতা :** অসিতকুমার হালদার; **'আমার দেশ ও জনগণ' :** ঘানা (গোল্ডকোস্ট) রাষ্ট্রের ভারতস্থ হাই-কমিশনার মহামান্য জে, বি, এরজুয়া।

**ছোটদের জন্য—চাঁদমামা** (কবিতা) **:** সুখলতা রাও; **বোকাদা** (গল্প) **:** নরেন্দ্র দেব; **অদ্ভুত এক ভূতের গল্প :** আশাপূর্ণা দেবী।

**চারটি গান ও স্বরলিপি ॥** প্রচ্ছদপট **: মহিষাসুরমর্দিনী মহাদেবী শ্রীশ্রীদুর্গার** একটি বহুবর্ণ মুদ্রে রাজপুত চিত্র **(১৮শ শতক) ॥** রামের অভিষেক (বহুবর্ণ কাংড়াচিত্র **:** ১৮শ শতক) ॥ এতদ্ব্যতীত বেতার **শিল্পীদের** নির্বাচিত **ছবি** ও অন্যান্য চিত্রাবলী

**সাইজ রয়েল দুভাঁজ, সুদৃশ্য কাগজ ও ঝকঝকে মুদ্রণ : দাম ২৲ টাকা**



## সম্পাদক, বেতার জগৎ : অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা




### কীর্তিমান পুরুষ

যশ বা খ্যাতি অধিকাংশক্ষেত্রে ভাগ্য-সাপেক্ষ। ভাগ্যের মধ্যে প্রচার-ভাগ্যই বড়ো। মিয়াঁ তানসেন যশ-খ্যাতি লাভ করেছিলেন বললে বস্তুত—তাঁর ভাগ্যের কথাই বলা হ'ল। ভাগ্য জিনিসটা চমৎকার কিন্তু প্রশংসার মতো কিছু নেই এর মধ্যে।

ভাগ্যবান মাত্রই কীর্তিমান ও চির-স্মরণীয় এ কথাও গ্রাহ্য নয়। কীর্তির কথা উঠলেই আমরা জিজ্ঞাসা করব—সেই পুরুষটি ভবিষ্যকালের লোকদের কর্ম প্রেরণার যোগ্য কিছু আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন কি? কিছু শিখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন কি? কোনও অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার ও চালু করে গতানুগতিকের অনর্থক শ্রম লঘু করে দিয়ে যেতে পেরেছেন কি? যদি পেরে থাকেন, তাহলে তিনি কীর্তিমান পুরুষ সন্দেহ নেই: তার নাম যদি লুপ্তও হয়ে যায়, তাঁর কীর্তির ক্ষয় হয় না। আর যদি না পেরে থাকেন, তাহ'লে—যশোভাগ্যে সমুজ্জ্বল পুরুষ হয়েও তিনি কীর্তিহীন। এই ভাগ্যবান পুরুষের জীবনী লেখকেরা সোণার জলের হরফে তাঁর জীবনী রচনা করলেও ত' তিনি কীর্তিমান হবেন না! প্রকারান্তরে বলা যায়—প্রতিভাশালী অথচ কীর্তিহীন পুরুষ তাঁর নিজের প্রতিভা ভাঙিয়ে নিজের জন্য খ্যাতি যশ অর্জন করতে পেরেছেন; পারেন কেবল ভবিষ্য-কালের জন্য কিছু সুযোগসুবিধা করে দিতে!

সঙ্গীতের রাজত্বে যশস্বী পুরুষ ও কীর্তিমান পুরুষকে পৃথক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার প্রয়োজন হয়েছে। যশস্বী প্রতিভাবান পুরুষকে বিচার করা যায় না; তাঁর ভাগ্যকেই বিচার করতে হয়। কিন্তু কীর্তিমান পুরুষকে বিচার করা যায় তাঁর জ্ঞান ও কর্মের বা আদর্শের মাপ-কাঠি দিয়ে, তাঁর দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলাফল দিয়ে, এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণ-সাধনের বাস্তবসফলতা দিয়ে। কীর্তিমান পুরুষকে তুলনা করতে হ'লে, তাঁর সমকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা আগে চিন্তা করতে হয়।

উত্তরভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অন্ধকার দিয়ে ঘেরা মধ্য যুগের শেষ প্রান্তে তানসেন আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে সময়ে সঙ্গীত নাট্য ও নৃত্য বিষয়ে প্রাচীন আচার্যদের দৃষ্টি ও আদর্শ একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ব্যবহারিক জগৎ থেকে। সঙ্গীত, বীণা, আলাপ প্রভৃতির চারুশিল্পগত বিষয়-গুলি তখন শিক্ষিত কোষকার পণ্ডিত-বর্গের সংকলনের মধ্যে চলে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেছিল 'শুদ্রবর্গের' অধিকারে। ইং নবম-দশম শতাব্দীতে যাদবপ্রণীত 'বৈজয়ন্তী' কোষ এ বিষয়ে চরম প্রমাণ। গীত বাদ্য নৃত্য তখন সমজে ব্রাহ্মণাদি

উচ্চতর ব্যক্তিদের অনুশীলনের অযোগ্য গণ্য হয়েছিল।

তানসেনের কিছু পূর্বে অভ্যুদয় দেখা দিল ধ্রুবপদ ও বীণালাপের রথে চড়ে। সারথিবর্গ আবির্ভূত হয়েছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান গায়ক-বাদক নট-নটীদের অপেক্ষাকৃত প্রাণবন্ত ও উন্মুক্ত সমাজের মধ্যে থেকে। এদের পরস্পর মিলন ঘটেছিল ভারত-পারসিক সংগীতপ্রবাহের তটভূমিতে।

সাধারণে প্রচলিত গীতবাদ্য শিল্প সবে-মাত্র উন্নত ও কিছু মার্জিত হয়ে ধ্রুবপদ ও আলাপের মধ্যে দিয়ে আত্মতৃপ্তির পথ সন্ধান করে ফেলেছে, এমন সময়ের মধ্যে তানসেনের বাল্য অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান গোয়ালিয়রের সাংগীতিক আব-হাওয়ায় মাত্র ধ্রুবপদ ও রাগ-গানই ছিল, দেশওয়ালী বা ভজন বা চুটকি-নাটকি গীত-বাদ্য একেবারেই ছিল না,—এ রকম ধারণা একেবারেই অযৌক্তিক। তার মধ্যে থেকে, বালক তানসেন কি কারণে কেমন করে মার্জিত ধ্রুবপদ গান ও আলাপের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন,—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ পীর মহম্মদ গৌসের আখাড়ায় সমাগত গুণী গায়ক-বাদকদের প্রভাবই তানসেনের মনকে সাচ্চা সুর ও তালের উৎকৃষ্ট স্বাদ পাইয়ে দিয়েছিল। তানসেনের পিতৃকুল পেশাদার গায়ক-বাদক সৃষ্টি করেনি। যাই হক—সেখানকার ও তখনকার প্রচলিত লোক-গীতি ও লোক-বাদ্যের রূপগুলি তানসেনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কারণ, লোকগীতি লোকবাদ্য চিরকালই অতিনিবদ্ধ ও বৈচিত্র্যহীন। যার হৃদয় একবার সুর ও রাগের বিচিত্র সৌন্দর্য আস্বাদ করেছে, তার পক্ষে লোক-সংগীতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অসম্ভব।

ধ্রুবপদ ও আলাপের অনুশীলনা দিয়ে যে লোক-সংগীতের চেয়ে উন্নততর ও সুন্দরতর শিল্প গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ—ধ্রুবপদ ও আলাপের তদানীন্তন পরি-ভাষা। লোকসংগীতে পরিভাষার বালাই নেই। উন্নততর চারুশিল্প সর্বদেশে সর্বকালে সমীচীন পরিভাষাকে সম্ভব করে, সেই পারিভাষিক ভিত্তির উপরেই অভিনব সৃষ্টি রচনা করতে চেষ্টা করে। তানসেনের বাল্য-কালেই ধ্রুবপদ ও আলাপ শিল্পের জগতে উন্নতির তরঙ্গ আবির্ভূত হতে আরম্ভ করেছে। একেই আমি অভ্যুদয়ের যুগ বলেছি। তানসেনের সংগীত-পিপাসু হৃদয় সে সব তরঙ্গ-লীলা দেখে ভয় পায়নি। তান-সেন সেই তরঙ্গের মধ্যে অবগাঢ় হয়েছিলেন।

যৌবনকালের মধ্যেই তানসেন বুঝতে পেরেছিলেন—ধ্রুবপদ ও আলাপসংগীতের ক্রমাবির্ভূত নিয়ম-পদ্ধতির ঐতিহ্যই যেন অচলায়তনের সম্মান দাবী করতে আরম্ভ করেছে। এ যেন নূতন করে নূতন দিক দিয়ে নিবন্ধ আড়ষ্ট শিল্পের ভূত দেখা দিল। মিয়াঁ তানসেনের ধ্রুবপদ ও নকশবন্দি আলাপ পরিকল্পনাই সেই ভূতকে উন্নততর সংগীতের নন্দনবন থেকে দূর করে দিতে পেরেছিল। এই হল তানসেনের প্রথম কীর্তি।

মিয়াঁ তানসেনের দ্বিতীয় কীর্তি হল—শিক্ষণবিদ্যা ও পদ্ধতি সৃষ্টি করে তাঁর ছেলে-জামাইকে সেই বিদ্যা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করা। আজ আমরা যাকে 'টিচার্স-ট্রেনিং' বিদ্যা বলছি—মিয়াঁ তানসেন তখন-কার ধ্রুবপদ ও আলাপ সংগীতে সর্বপ্রথম 'টিচার্স ট্রেনিং' বিদ্যা তৈরী করে দিয়ে-ছিলেন। এর পূর্বে—এ জাতীয় শিক্ষণবিদ্যা ছিল না।

মিয়াঁ তানসেনের তৃতীয় ও চরম কীর্তি

হল তাঁর বংশের গুণী সন্তানেরা যুগ-পরম্পরায় যাতে করে উৎকৃষ্ট গান ও রাগের বীজ আহরণ করতে পারে ও সংরক্ষণ করতে পারে এমন বন্দোবস্ত ও বিদ্যাধারা সৃষ্টি করা। একেই রাগ-বিদ্যা বলে।

তানসেনের বংশে গুণীরা তানসেনীয় মূল-প্রেরণার আনুগত্য স্বীকার করে ব্যবহারিক বিদ্যাচর্চা করে এসেছেন। সত্য কথা বলতে, এরাই হলেন তানসেনের কীর্তিস্তম্ভ। এ'রা তানসেনের জীবনী লেখেননি! প্রচারের প্রয়োজন বোধ করেননি। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ দিয়ে এ'রা পরস্পর থেকে যতই বিশিষ্ট ও পৃথক হয়ে থাকুন,—এ'দের একনিষ্ঠ সংগীতচর্চা ও পরিশ্রম নির্বিশেষে মিলিত হয়ে গিয়েছিল তানসেনের কীর্তিকলাপের মধ্যে। এ'রা এ সব কথা জেনে শুনেই আত্মবলোপ করেছিলেন মহান পিতৃপুরুষ তানসেনের ধ্যানে। মিয়াঁ তানসেন কখনও শিষ্য বা সন্তানের কৃত 'ব্যাস-পূজা' গ্রহণ করেননি। মিয়াঁ তানসেনের বংশের গুণীরাও কখন ও রকম গুরুপূজা বা মানুষ-পূজার প্রশ্রয় দেননি।

এমন যশস্বী ও কীর্তিমান পুরুষপ্রবর তানসেন কি আত্মম্ভরী ছিলেন? অথবা আত্মভোলা ছিলেন? তাঁর হৃদয়ে গর্ববোধ ছিল না? ইত্যাদি রকমের প্রশ্ন আমাদের মনে উঠতে পারে।

এর উত্তরে বলা যায়—অহং বা অহমিকা অর্থাৎ—"আমি এটা করেছি, আমিই পারি, আর কেউ পারে না' রকমের আত্মবোধ না থাকলে উত্তম শিল্পী হওয়া যায় না, আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না। 'বাণী চারোকে বেওহার সুন লিজে গুণীজন' ইত্যাদি ধ্রুবপদে এবং অন্য অনেক ধ্রুবপদ রচনায় তানসেনের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম-গরিমা স্পষ্ট হয়েছে।

কিন্তু দিল্লীর মিয়াঁ তানসেন সকল গর্ব-অহংকারের উপরে উঠে গিয়ে আত্মসাক্ষাৎ করে বলতে পেরেছিলেন—

"নাদ ঈশ্বররূপী অমৃতরস,
জিতনা জাকো মিলে উতনাহি পীজিয়ে।"

অর্থাৎ নাদ বা শ্রবণমনোহর গীত-বাদ্যের চরম ধ্বনি, যা হৃদয়ে অনুরণিত হতে থাকে,—সেই ধ্বনি সর্বরসের উৎস স্বয়ং ভগবান থেকেই উচ্ছ্বলিত হয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে, মনুষ্যের কণ্ঠে, যন্ত্রীর আঙুলে, যন্ত্রের অবয়বে সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত হয়ে চলেছে। এমন সর্বদিক-প্রসারী অমৃতসর যখন যার ভাগ্যে যতটুকু অনুভবগ্রাহ্য হয়, সে তখনই ততটুকু পান করুক। অল্প পেয়েছি বলে অবহেলা করা উচিত নয়; হয়ত এইটুকুই শেষ-পাওয়া!

কথাটির প্রথমার্ধ যে-কোনও দার্শনিক পণ্ডিত রচনা করতে পারেন ও পেরেছেন। কিন্তু শেষার্ধ একমাত্র তিনিই রচনা করতে

পারেন, যিনি স্বীয় প্রতিভায় আত্মসাক্ষাৎ করে সর্বকালের শিল্পী ও শিল্পদ্রষ্টার হৃদয়ের না-পাওয়ার বেদনা অনুভব করেছেন। ধ্যানী তানসেন সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন—পরিপূর্ণভাবে রসাস্বাদ হল না বলে দুঃখ করো না, বৈরাগ্য গ্রহণ করো না। পরমেশ্বর অনন্ত, তাঁর রসধারাও অনন্ত। পূর্ণভাবে অনন্ত রস আস্বাদ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আত্মসাক্ষাৎ করে বেদনা ও আনন্দ দুইই অনুভব করে এমন কথা বলেছিলেন মিয়াঁ তানসেন! তিনি কি জানতেন না যে—তাঁর গান সর্বথা সর্বক্ষণ নির্দোষ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর হয়নি? তিনি কি অন্যের গানের দোষ-ত্রুটি দেখে বেদনা অনুভব করেননি? তিনি কি নিজের বার্ধক্য-জরা জনিত অপারগতা প্রত্যক্ষ করেননি? অবশ্যই এ সমস্ত অনুভব করেছিলেন। কে এমন শিল্পী আছেন যিনি করেন না! নিজের আত্মবেদনা দিয়ে তিনি পরের বেদনা বুঝেছিলেন, নিজের ক্ষণিক তৃপ্তি-বিন্দু দিয়ে পরের আত্মতৃপ্তিও বুঝেছিলেন।

মহানুভব তানসেন নিজ সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করে বলতে পেরেছিলেন—জিতনা জাকো মিলে উতনাহি পীজিয়ে। একমাত্র তানসেনের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই কি অনন্তরসবিগ্রহ ভগবান সমস্ত রস ঢেলে দিয়েছেন! অন্যের গানে, অন্য সুরে কি রস-সাক্ষাৎকার হয় না, হবে না! কখনই নয়। জগতের যাবতীয় গানে, যাবতীয় সুরের মধ্যে কম-বেশী গুণ-পরিমাণে সেই রসবস্তু প্রকীর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং অনন্ত ভবিষ্যতকালের মধ্যে সেই রস-ধারা কখন স্রোতবৎ, কখনও বা হ্রদবৎ কখন বিন্দু বিন্দু কখনও বা সমুদ্রের মতো রূপ ধরে অনুভবীজনের প্রতীতি গোচর হবে। যখন, আর যেরূপেই হক,—সংগীতরসপিপাসু যেন সমস্ত সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হয়ে সেই অপূর্ব পেয়বস্তুটি গ্রহণ করেন এই হল তানসেনের উপদেশের মর্মকথা।

কিন্তু তাই বলে আমরা মনে করতে পারিনে, তানসেন দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে কথাটি বলেছেন! সুর-বেসুর তাল-বেতালের প্রভেদ থাকবে না অথচ—রস-প্রতীতি হবে এমন কথা আর যেই বলুন তানসেন বলতে পারেন না। মানুষ বহু যুগযুগান্তরের পরীক্ষা-সাধনা করে সুর-বেসুর, তাল-বেতালের রহস্য আবিষ্কার করেছে। এ রকম শ্রেয়ঃ লাভের পরে কেউ যদি বলেন—সুর-বেসুর বা তাল-বেতাল বলতে কিছু ভেদ নেই, কতকগুলি শিল্পী ষড়যন্ত্র করেই ওরকম ভেদের সৃষ্টি করেছে, অতএব আমরা সমস্ত ভেদ তাচ্ছিল্য করেই সেই অমৃতরসের প্রত্যক্ষ করব—তা হলে, তানসেনের কথার কদর্থ করাই হবে। কথাটি বলতে বাধ্য হয়েছি এ কারণে যে, ভাববিহ্বল একদল সংগীত সমালোচক কথায় কথায় দার্শনিক কোনও বিন্দুকে পরিক্রমা করতে না করতেই কাব্যোচ্ছ্বাসের প্যারাবোলার রাস্তায় ছিটকে পড়ে অনন্ত ও অনির্বচনীয়ের সন্ধানে ছুটে চলেন। হয়ত তানসেনের ঐ সরল বচনটির সূত্র ধরে এ'রা প্যারাবোলার মোহে পড়ে যাবেন। নিজেরা মোহে পড়ুন আপত্তি নেই। কিন্তু সরলমতি পাঠককে সেই মোহের আবর্তে টেনে নিয়ে তানসেনের বাণী দিয়ে তানসেনের মর্মচ্ছেদ করা উচিত হয় না।

তানসেন আত্মভোলা ছিলেন না। ইতিবৃত্তকারদের কথা অনুসরণ করলে মনে হবে, তানসেনের বিলক্ষণ আত্ম-পর জ্ঞান ছিল; ব্যবহার-বুদ্ধি ও নীতিকুশলতাও ছিল বিলক্ষণ। সবচেয়ে বড় কথা যা আমার মনে হয়েছে,—তানসেন নির্জলা বাস্তববাদী শিল্পকার ছিলেন। তার প্রমাণ রয়েছে—সেনী-ধ্রুবপদ বিদ্যা ও রাগবিদ্যার পরিভাষা-প্রকরণের মধ্যে। ভাসা-ভাসা কবি-সুলভ কথা দিয়ে কোনও দেশে কোনও কালে শিল্পবিদ্যা বা শিল্প-বিজ্ঞান গড়ে ওঠেনি। সেনী বিদ্যার পরিভাষাগুলির একটিও বৃথা, অনর্থক, দ্ব্যর্থক বা কবি-কাকলি নয়। কাব্য-সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে তানসেন-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-পরিভাষার আলোচনা করা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে মাত্র। কীর্তিমান তানসেনের কীর্তিও অবাস্তব পরিকল্পনার ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠেনি এমন কথা অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যায়।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

# প্রবাসের জার্নাল

**শিবনারায়ণ রায়**

### ইংরেজচরিত্র : ভাবনার খসড়া

॥ ৩ ॥

যেভাবে এবং যে কারণ সমাবেশে তা গড়ে উঠে থাক না কেন ইংরেজ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখলে ইংরেজ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলোর মধ্যে নতুন তাৎপর্যের সন্ধান মেলে। গোঁজামিলের কথাটা ধরা যাক। এই গণতন্ত্রের দেশে রানীর খাতির দেখলে অবাক হতে হয়। রাজপরিবার লণ্ডনে আছে অথচ বাকিংহ্যাম প্রাসাদের ধারে প্রতীক্ষমান দর্শকের ভিড় নেই এ প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার।* হাউস অব লর্ডসএর ত' প্রায় কোনো ক্ষমতা নেই, অথচ আজও এখানে কোন রাজনৈতিক নেতার সর্বোচ্চ সম্মান হোল পীয়ার গোষ্ঠিতে উন্নীত হওয়া। দেশের শতকরা আশীভাগ লোক থাকে শহরে, অথচ কাণ্ট্রি বলতে সকলেই গদগদ। সকলেরই আকাঙখা একটু অবস্থা ভাল হোলেই কাণ্ট্রিতে একখানি ঘর বাঁধে। রোদ-ছুট, কুয়াশা-মোড়া নিজেদের দেশ নিয়ে এদের গর্বের অন্ত নেই, কিন্তু ছুটিছাটা পেলে জমানো পয়সা খরচ করতে ছোটে পারীতে কিম্বা মায়োরকায়, রোমে অথবা রাইনল্যাণ্ডে। ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে এত সচেতন বোধ হয় আর কোন দেশ নয়; অথচ হামাগুড়ির পাট চুকতে না চুকতেই এদেশের ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় নিয়মানুগত্য।

এই সব আপাতবিরোধে ইংরেজরা সচরাচর পীড়া বোধ করে না দেখে বহু বিদেশী ইংরেজকে সোজাসুজি ভণ্ড আখ্যা দিয়েছেন। [illegible] সোজা, কিন্তু মানুষকে বুঝতে হলে কিছুটা সহানুভূতি এবং অনেকটা অধ্যবসায় দরকার। অভিজ্ঞতাবাদী ইংরেজ লক্ষ্য করেছে যে মানুষের চরিত্রে বহু বিরোধ এবং বিস্তর অসংগতি বর্তমান; যদিচ বিকাশের প্রয়োজনে এসব বিরোধের মধ্যে সংগতি খোঁজা মানুষের ধর্ম, তবু কাল্পনিক সংগতির নামে প্রত্যক্ষ বিরোধকে অস্বীকার করার মধ্যে না সততা না কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় মেলে। ইংরেজের ভাবটা হল, ধৈর্য সহকারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এসব বিরোধের সমাধান চেষ্টা চলুক; অধীর হয়ে জোর জুলুম করে তাদের দমন করতে গেলে কোন স্থায়ী সুফল ফলবে না। যেমন ধরুন মানুষ সাম্য চায়, আবার তারি সঙ্গে পাঁচ-জনের চাইতে বড় হবার সাধ তার কম নয়। জবরদস্তি করে সাম্য আনতে গেলে যে কী ঘটতে পারে ফরাসী বিপ্লব এবং রুশ-বিপ্লবের পরের ইতিহাস তারি ট্র্যাজিক উদাহরণ। অপরপক্ষে সুপারম্যানতন্ত্রের পরিণতি ত দেখা গেল হিটলারী স্বৈরতন্ত্রে। ইংরেজ একধারে অভিজাতদের ক্ষমতা কমিয়ে এনে এবং অন্যধারে সর্বসাধারণের ক্ষমতা বাড়িয়ে ধীরে ধীরে সমাজ জীবনে সাম্যের প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। তারি সঙ্গে ক্ষমতাবিযুক্ত সম্মানের বিশদ ব্যবস্থা বজায় রেখে পাঁচজনের চাইতে বড় একজন হবার

---

* এদেশে সাধারণলোক যে কিদৃশ রাজভক্ত সম্প্রতি তার একটা নমুনা পরখ করা গেল। অ্যালট্রিংহ্যাম নামে জনৈক তরুণ কনজারভেটিব পীয়ার কিছুদিন আগে রানীকে কড়া সমালোচনা করে তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন। রানীর উচ্চারণ, পোশাক-আশাক, সাঙ্গপাঙ্গ-বাছাই—এসবের মধ্যে মার্জিত রুচি এবং যুগবোধের অভাব আছে—এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। লেখাটি নিয়ে ইংরেজী পত্রপত্রিকায় নানা তর্কবিতর্ক হয়, এবং বেতার মারফৎ তাঁর প্রতিপাদ্য দেশবাসীর সামনে পেশ করার জন্য লর্ড অ্যালট্রিংহ্যাম আমন্ত্রিত হন। বক্তৃতা শেষে তিনি শড়কে নেমেছেন হঠাৎ এক সমাজতন্ত্রী প্রৌঢ় মজুর এসে তাঁর গালে চড় কষিয়ে দেয়। "আমাদের রানীকে বেইজ্জত করে, এতবড় আস্পর্ধা?" অ্যালট্রিংহ্যাম্ অবশ্য চড় ফিরিয়ে দেননি, কিন্তু তাঁর মতও বদলাননি। মজাটা এই যে, রানীর সমালোচক হলেন রক্ষণশীল অভিজাত; আর তাঁর আধুনিক "নাইট শেভালিয়র"টি হলেন সমাজতন্ত্রী শ্রমিক।

জন্যে ব্যক্তির যে সাধ তারও যথাসাধ্য পূরণ করেছে। নিরবচ্ছিন্ন আদর্শের জ্যামিতিক ছকে মানুষকে পোরার চেষ্টা এক ক্রমওয়েলের শাসনের কয়েক বছর ছাড়া ইংরেজের ইতিহাসে বড় একটা নজরে পড়ে না।

তাছাড়া এই "গোঁজামিলের" স্বপক্ষে আরো একটা কথা আছে। জীবন এবং জগৎকে আমরা অভিজ্ঞতা মারফৎ জানি এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মধ্যে থেকেই আমাদের জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ সেহেতু জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাতে সম্পূর্ণতা আরোপ এক ধরনের স্পর্ধিত মূঢ়তা ছাড়া আর কি হতে পারে? একই অভিজ্ঞতা সমষ্টির সঙ্গে সব মানুষের পরিচয় ঘটে না; এবং একই ধরনের ঘটনা সমাবেশ বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন অর্থের নির্দেশ দিতে পারে। পরস্পরের ধারণার সঙ্গে জানা পরিচয় এবং তাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে থেকেই ব্যক্তির নিজের ধারণায় অধিকতর যাথার্থ্য এবং নির্ভর-যোগ্যতা আসা সম্ভব। তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবনা এবং ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা চাই; চাই বিভিন্ন মত জানার আগ্রহ এবং তাদের অস্তিত্বের প্রতি আন্তরিক সহনশীলতা। এই সহনশীলতার ফলে কখনো কখনো একই ব্যক্তির মনে হয়ত পরস্পর-থেকে-বিযুক্ত, এমন কি পরস্পর-বিরোধী ধারণাও প্রভাব ফেলতে পারে। এবং এটাকে গোঁজামিল বলা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু চেতনা যদি অভিজ্ঞতা-বিমুখ না হয়, এবং বুদ্ধি যদি সক্রিয় থাকে, তাহলে এই বৈচিত্র্য এবং বিরোধের মধ্যে থেকে প্রকৃষ্টতর ঐক্য বা সামঞ্জস্যের উদ্ভব আশা করা যায়। *অপরপক্ষে বিরোধ এবং বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে অভ্যাস এবং বিশ্বাসের যে ঐক্য তা বিকাশের সামর্থ্যে বঞ্চিত—সেই অন্ধ বিশ্বাসেরই ইংরেজী নাম ডগমা।*

ইংরেজ রক্ষণশীল জাত। রক্ষণশীলতা এদের মজ্জায়, সেখানে কনজারভেটিভ আর লেবারাইটে বিশেষ ফারাক নেই। এমন কি লিবরালরাও যা চান তা হল যাকে তাঁরা ইংরেজের প্রকৃত ঐতিহ্য মনে করেন তারই রক্ষণ এবং বর্ধন। স্টেটসম্যান কাগজের ভূতপূর্ব সম্পাদক স্টিফেন্স সাহেব বর্তমানে কেম্ব্রিজে কিংস কলেজের একজন "ফেলো"; তাঁর কাছে শুনেছি বিলেতে র‍্যাডিক্যাল এবং সমাজতন্ত্রী চিন্তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে "কিংস"-এর খ্যাতি বা অখ্যাতি নাকি অনেকদিনের। অথচ এই কিংস-এর ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা যা নিয়ে সব চাইতে গর্ব করেন সেটি হল এখানকার চ্যাপেল বা উপাসনা গৃহ। এখানকার বট্যানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক এবং মানবতন্ত্রী আন্দোলনের একজন নামজাদা সদস্য অধ্যাপক গীলমোরের কল্যাণে জেনেছি, পনেরো-শতকের মাঝামাঝি এ চ্যাপেলের গোড়াপত্তন করেছিলেন ষষ্ঠ হেনরী এবং তার প্রায় সত্তর বছর পরে এটিকে সম্পূর্ণ করান অষ্টম হেনরী। এর উপাদান হিসেবে বিভিন্ন রাজার আমলে বিভিন্ন জাতের পাথর ব্যবহৃত হয়েছে; এর স্থাপত্যে এসে মিশেছে গথিকের সঙ্গে রেনেসাঁসী রীতি। এর বিরাট বিরাট জানলা কাটিতে রঙিন কাচের ছবির সারি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ফলত কিংস কলেজের প্রাচীন

প্রার্থনা প্রাসাদটি যে কেম্ব্রিজের সম্পদ তা নিয়ে এখানকার পুরুতে মানবতন্ত্রীতে কোন মতভেদ নেই। তেমনি এখানে যেখানেই গেছি চোখে পড়েছে স্থানীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করার ব্যাপারে লোকেদের আগ্রহ যেমন আন্তরিক তাদের অধ্যবসায় তেমনি অপরিসীম।

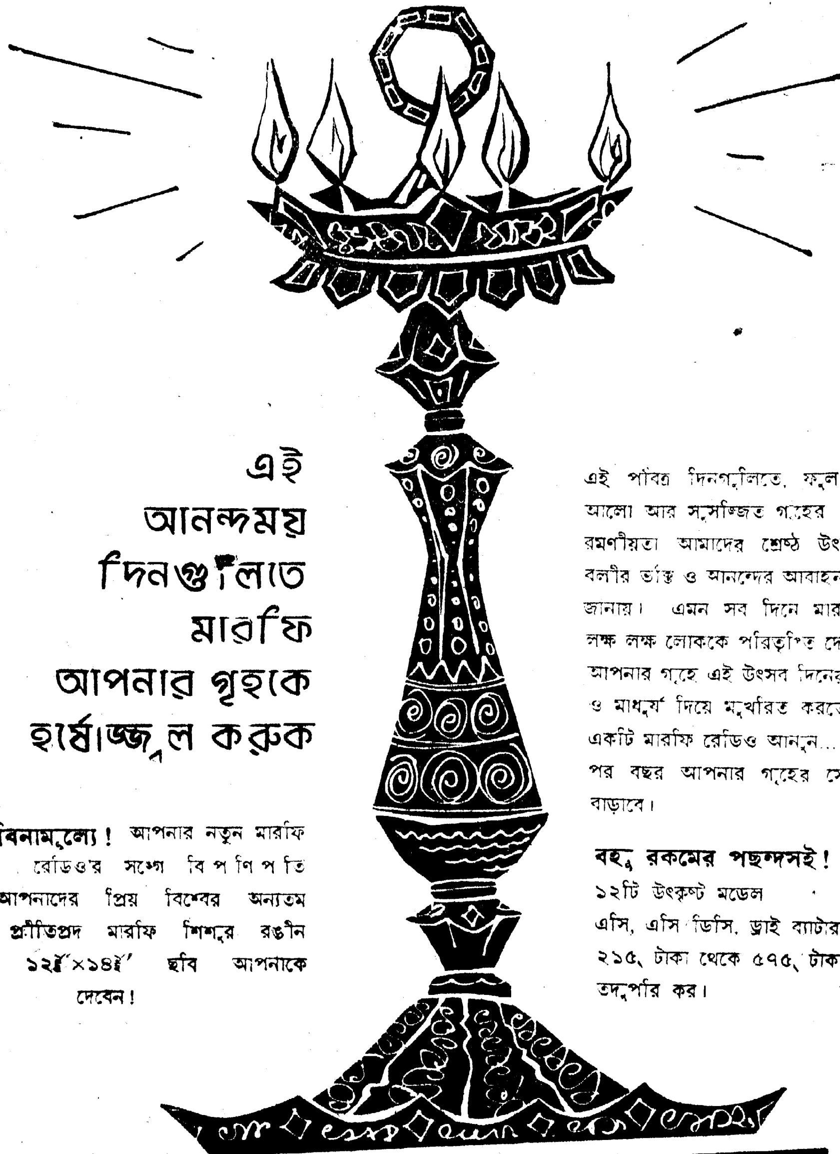
কিন্তু ইংরেজের রক্ষণশীলতার সঙ্গে আমাদের রক্ষণশীলতার মৌল প্রভেদ আছে। আমরা আমাদের অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই হয়ত আমাদের ভাবনাচিন্তা, আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা অতীতের দ্বারা আচ্ছন্ন। আমাদের না আছে বস্তুনিষ্ঠা না স্বাধীনচিন্তার সাহস; প্রকৃতির চাইতে রহস্যে আমাদের আগ্রহ বেশী, কালের চাইতে মহাকালে। ফলে আমরা না গড়েছি বিজ্ঞান, না লিখেছি ইতিহাস। ভুমার ভাঁওতায় ভূতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে একই অভ্যাসের চাকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরপাক খাচ্ছি। ইংরেজ অতীতকে অভিজ্ঞতার উপাদান-ভাণ্ডার হিসেবে গ্রহণ করেছে। লণ্ডন থেকে ঘণ্টা দেড়েকের পথ স্টোনহেন্জ-এ প্রায় চার

হাজার বছরের পুরোনো পাথরে মন্দির আর কবরখানা থেকে শুরু করে কেনসিংটন পার্কের মধ্যে মিউজিয়ামে চল্লিশপঞ্চাশ বছর আগেকার সাফ্রাজিস্ট আন্দোলনের ছবি কার্টুন—যেখানেই মানুষের স্বকীয়তার কোন স্বাক্ষর বর্তমান তাকেই সে নিজের এবং উত্তর পুরুষের জন্যে সংরক্ষণে উদ্যোগী। খৃষ্টধর্মকল্পিত শেষ বিচারের নোটিশ কোনদিনই পড়বে না, কিন্তু ইংরেজের এই বস্তুনিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ে আগ্রহ থাকার ফলে ডুমস্‌ডে বুকের বিবরণ থেকে আজ পর্যন্ত বিলেতী সমাজের ক্রমবিবর্তনের খুঁটিনাটি ইতিহাসে বড় একটা ছেদ চোখে পড়ে না। ফ্লবেয়রের সেই যে বিখ্যাত সাবধানবাণী, "ঈশ্বরের বাস খুঁটিনাটির ভেতরে" (le bon Dieu est dans le detail), সে বিষয়ে বিলেতের পুরুতরা পর্যন্ত অনেক আগে থেকেই ওয়াকিব। আর তাই আমাদের পুরুতদের মত শুধু ভক্তদের কানে কানে ফুসমন্তর দিয়ে অথবা তাদের দৈবী কেচ্ছাকাহিনী শুনিয়ে তারা পয়সা কামায়নি, সঙ্গে সঙ্গে গির্জার জাবদাখাতায় স্থানীয় জীবনের বিচিত্র ঘটনার বিবরণ লিপিবন্ধ করেছে, ভক্তদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ ভাবনাচিন্তার খোঁজখবর রেখেছে, এমন কি অনেক সময় তাদের অভাব অভিযোগ পূরনের আন্দোলনে পুরোধা হয়ে বিত্তবান সম্প্রদায় এবং রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত করেছে। অন্য অনেক দেশের মত বিলেতে চার্চ যে গণতন্ত্রের বিবর্তনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়নি, আজও যে ওদেশের শ্রমিক আন্দোলনে কিংবা সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হুঁকোকল্কে পায়, আমার অনুমান তার একটা প্রধান কারণ হল পার্থিব খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে ওদেশীয় ক্লার্জির আগ্রহ এবং হয়ত তারই ফলে জনজীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় তাদের উদ্যম।

ইংরেজ একধারে যেমন অতীতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে ইতিহাসের বিচিত্র উপাদানরাজী যাদুঘরে, গির্জায় এবং গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত করেছে, অন্য ধারে তেমনি অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে ক্রম-বাহের সম্পর্ক বিষয়ে মোটেই উদাসীন থাকেনি। ইংরেজ রক্ষণশীলতা প্রাক্তনকে

চিরন্তন বলে ভুল করেনি, অতীতকে রক্ষা করতে গিয়ে পদে পদে তাকে সমকালীন জ্ঞান এবং প্রয়োজনের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিয়েছে; তার যেটুকু বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে পারে অথবা ভবিষ্যৎ বিবর্তনে সাহায্য করতে পারে তাকে শুধু পুঁথির পাতায় বা যাদুঘরের কাচবাক্সে জমিয়ে না রেখে জীবনে গ্রহণ করেছে। অতীতকে মুছে ফেলে সাফশ্লেটে শুরু করার যে অহংকার, তাত শুধু শিশু কিংবা বর্বরজনেই শোভা পায়। অথবা বিপ্লবীকে। অপরপক্ষে অতীতের গণ্ডীর মধ্যেই যখন মানুষের বুদ্ধি খালি ঘুরপাক খেতে থাকে তখনই সে ভাতায় জরা সূচিত হয়। কৌতূহলী অভিজ্ঞতাবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে ইংরেজের ঐতিহ্যবোধ অভ্যাসাশ্রয়িতায় পর্যবসিত না হয়ে বিবর্তনের ধারক এবং প্রবর্ধক হতে পারল।

এবং এই ঐতিহ্যবোধের মধ্যে ইংরেজের হিসেবী বুদ্ধির পরিচয় বর্তমান। অতীতে মানুষ নানা পরীক্ষা এবং ভুলভ্রান্তির ভেতর দিয়ে নানা শিক্ষালাভ করেছে: তারই স্বাক্ষর তাদের ভাবনাচিন্তায়, রীতিনীতিতে, আচারব্যবহারে। অতীতের সেই সঞ্চয়ের অনেকটাই হয়ত আজ নির্মূল্য, এমনকি তার প্রতি আনুগত্য আজকের দিনে বিকাশের পথে বাধা হতে পারে। কিন্তু অতীতের সেই সব প্রচেষ্টা, ভুলভ্রান্তি এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে জ্ঞান আজকের দিনের প্রচেষ্টায় অধিকতর সার্থকতা অর্জনে নিশ্চয়ই সহায়ক। পূর্বপুরুষের সাধনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে উত্তরপুরুষের চেতনায় স্পষ্টতা, ব্যাপকতা এবং স্বীকরণের শক্তি বাড়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া অতীতের সব ফসলই কিছু আর খোসায় পর্যবসিত হয়ে বর্তমানে পৌঁছয় না; তার কমবেশী একটা অংশ আজও বীজবোনার কাজে লাগতে পারে। ফলে অতীতকে বর্তমানের কাজে না লাগানো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মূলধনের অপব্যয়; এবং হয়ত বেনের জাত বলেই অপব্যয়ে ইংরেজের অনীহা আন্তরিক। কিন্তু তা বলে হিসেবী বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনা বা সূক্ষ্ম অনুভূতির বিরোধ অবশ্যম্ভাবী নাও হতে পারে। কল্পনা বা অনুভূতি ছাড়া না যায় অতীতকে বোঝা, না সম্ভব বর্তমানের মধ্যে অতীতের স্বীকরণ। তবে হয়ত যে-কল্পনা স্বল্প অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্রের বালাইছুট আত্মসম্পূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্যে সমগ্র অস্তিত্বকে ধরার দাবী করে, তার সাধনায় ইংরেজ অসমর্থ। এবং যে অনুভূতি এত সূক্ষ্ম যে তা আছে কি না আছে বোঝার উপায় নেই, তার অনুশীলনের সার্থকতায় ইংরেজ সন্দেহবান। তাতে যদি কেউ ইংরেজকে মোটাবুদ্ধি বলে খারিজ করেন, তবে ইংরেজ নিতান্তই নাচার।



এই
আনন্দময়
দিনগুলিতে
মারফি
আপনার গৃহকে
হর্ষোজ্জ্বল করুক

**বিনামূল্যে!** আপনার নতুন মারফি রেডিও'র সঙ্গে বিপণিপতি আপনাদের প্রিয় বিশ্বের অন্যতম প্রীতিপ্রদ মারফি শিশুর রঙীন ১২½"×১৪½" ছবি আপনাকে দেবেন!

এই পবিত্র দিনগুলিতে, ফুল, আলো আর সুসজ্জিত গৃহের রমণীয়তা আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবাবলীর ভক্তি ও আনন্দের আবাহন জানায়। এমন সব দিনে মারফি লক্ষ লক্ষ লোককে পরিতৃপ্তি দেয়। আপনার গৃহে এই উৎসব দিনের সুর ও মাধুর্য দিয়ে মুখরিত করতে একটি মারফি রেডিও আনুন... বছরের পর বছর আপনার গৃহের সৌন্দর্য বাড়াবে।

**বহু রকমের পছন্দসই!**
১২টি উৎকৃষ্ট মডেল
এসি, এসি ডিসি, ড্রাই ব্যাটারী।
২১৫, টাকা থেকে ৫৭৫, টাকা পর্যন্ত তদুপরি কর।

murphy radio

MR/48

# আমার ফাঁসি হল

মনোজ বসু

১

একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ সেই শয়তানীকে পেয়ে গেলাম। সেই রূপসী, সাহসটা কি বুঝুন, একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। আগে যেমন আসা-যাওয়া করত।

ক্ষিপ্ত হয়ে বলি, তুমি সর্বনাশ করেছ। কি করেছি আমি, কোন্ শত্রুতা আমার সঙ্গে?

মেয়েটা তিলেক বিচলিত নয়। আগেকার চপলতা নেই। শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।

কে তুমি? দয়ালহরির সঙ্গে কি সম্পর্ক তোমার?

বিষাদে ম্লান দৃষ্টি তুলে সে বলল, কিছু না, কিছু না। দুনিয়ার কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

জোচ্চুরি করেছ আমার সঙ্গে। রূপের ফাঁদে ফেলে কুৎসিত মেয়েটা আমার কাঁধে গছিয়ে দিচ্ছ।

গালি যেন কানে যায় না। আগ্রহে বরঞ্চ স্তিমিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: রূপ আছে আমার? দেখতে পাও আমার রূপ? তোমার চোখে ভাল লাগে?

মাথা খারাপ নাকি মেয়েটার? কোন মুগ্ধ-জন কখনো বন্দনা জানায় নি, আয়নায় মুখ দেখে নি? জানেই না রূপ আছে কিনা তার?

সত্যি আমায় দেখতে ভাল? আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে আমারই জন্যে, লাবণ্য আসবে বলে নয়?

কী আশ্চর্য! কটকটে-কালো মৌচাকের মতো ঝাঁঝরা-মুখ তার জন্য পথ তাকাতে যাবো?

আমিও তাই ভাবতাম। তোমার মুখের ভাল ভাল কথা—সমস্ত আমার, একটি কথাও লাবণ্যর নয়। তবু কিন্তু ভয় ঘুচত না। একদিন তার পরখ করলাম। তুমি গান করছ। লাবণ্য এসেছিল, সরে গিয়ে আমি লাবণ্যর পথ করে দিলাম। আড়ি পেতে শুনেছি, কি কথা বলো তুমি তার সঙ্গে। দেখলাম, তাড়িয়ে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল, কত শান্তি যে পেলাম তখন!

যে মেয়ে আমায় নিয়ে এমন ব্যাকুল, তার উপরে কতক্ষণ রাগ থাকে? রাগ আমার জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। বললাম, অনেক লুকোচুরি হয়েছে। আর নয়। আজ আমি তোমার সমস্ত কথা শুনব। নয় তো ছেড়ে দেবো না।

কোন লোভে মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে:

ছাড়বে না? কি করবে তবে? ধরবে? ধরো না, ধরো আমায়—

রাত্রিবেলা আশ্চর্য রূপসী মেয়ে আমার ঘরের মধ্যে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে ধরতে বলছে। পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আমন্ত্রণ। আমিও কিছু সিদ্ধতাপস নই। ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছি। গায়ে কাঁটা দিয়েছে, কী অহস্য অবস্থা তখন; হাত কিন্তু ফিরে এলো—কিছুই নয়, শূন্য, একটা ছায়া। সে ছায়া কাছে থেকে স্পষ্ট দেখছি—দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ মাত্র নয়, ঘনতা আছে। থ্রি-ডাইমেনসন ছবির মতো। তবু কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। বিষণ্ণ কাতর মুখের আকূতি: ধরো গো, আমার যে বড় সাধ! ঐ লাবণ্যর গায়ে-গায়ে ছায়া হয়ে ঘুরেছি—যদি দুটো ভালবাসার কথা বলো, যদি একটু ছোঁয়া দাও, একবার যদি আলিঙ্গনে বাঁধো। লাবণ্যর তাই যত রূপ দেখতে। শঠ আমি, শাস্তি দেবে না? রাগ করে ক্ষেপে উঠে দু-হাতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নেবে না তোমার বুকের উপর? যেমন লাবণ্যকে নেবে ক'দিন পরে বিয়ের মন্ত্র ক'টা পড়ানো হয়ে যাবার পর?

বলতে বলতে হাউহাউ করে সে কেঁদে ওঠে।

আমিও তো অধীর হয়ে উঠেছি: চেয়ে দেখ। দেখ। নিতে পারছি কই তোমায়? হাতেই ঠেকছে না। আমি কি করব।

হাত তুললে না মোটে, ঠেকবে কিসে? মনে ভাবছ, খুব একটা চেষ্টাচরিত্র হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন হয়। বিছানার উপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এদেশ-সেদেশ ছুটোছুটি করো, অথচ এক পা-ও নড়ে বসছে না।

সে তো স্বপ্ন। এখন জেগে রয়েছি আমি।

জোরে ঘাড় নেড়ে সে বলে, না, স্বপ্ন দেখছ তুমি। আমরা জেগে—আমি আমার মা-বাপ আর বোনেরা। আরও কত। তুমি বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছ—আর জেনে বসে আছ, এটা করছি, সেটা করছি। ঘুম ভেঙে একদিন হেসে উঠবে, উঃ রে, কত সব কাণ্ড করেছি—স্বপ্নে হাকিম হয়েছিলাম, স্বপ্নে বিয়ে করেছি লাবণ্য নামে বিকটাকার এক কনে…

শুনতে শুনতে আমারও মনে হল তাই। ঘুমুচ্ছি নাকি আমি? চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেখি। কিন্তু ঘুম যদি হয়, চোখে হাত দিয়েই বা কি বুঝব? এ-ও আর এক স্বপ্ন—চোখে হাত বুলিয়ে এই ঘুম পরখ করা। ঘুম আর জাগরণে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেই সন্দেহ আজ অবধি মীমাংসায় পৌঁছনো গেল না। আমার এই কাহিনী দুই জীবনের দ্বন্দ্ব—ঘুমে আর জাগরণে কলহ। বসে বসে জীবন-কথা লিখছি—ঠিক জানি, আমার পিছন দিকে এই দুটো চোখের আড়ালে কিছুই নেই, একেবারে ফাঁকা। যেই চোখ ফেরালাম,

চকিতে ওদিকটা বানানো হয়ে গেল—অনাবশ্যক সামনেটা শূন্য তখন। সিনেমা-স্টুডিয়োর ছবি তোলার মতন কতকটা। বিশাল অট্টালিকা বটে, কিন্তু বানিয়েছে যতটুকু মাত্র ক্যামেরায় আসবে। দোতলার সিঁড়ির হয়তো চারটে ধাপ, ঘরের হয়তো দেড়খানা দেয়াল। বাকি আর কিছু নেই। ছবির দর্শক ভাবে গোটা বস্তুটাই রয়েছে।

এই আমার মনের গতিক। কতজনে পাগলও ভাবেন আমায়, হাসাহাসি করেন—মন্তব্য কদাচিৎ কানে এসে যায়। আমি একা-একা খলখল করে আরও জোরে হাসিঃ দেখ দেখ, পাগলা-গারদের লোকগুলো আমাকেই পাগল বলছে।

সেই মেয়েকে বললাম, হাত না উঠুক ছুঁতে না পারি, কান দুটো খোলা আছে। তোমার পরিচয় বলো, শুনতে পাব। নাম কি তোমার?

নাম? নামে কি চিনবে? চম্পা। আর আর দুই বোন আমার—যুঁই আর জবা। দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা কোরো, সে সব জানে।

নাম মনে পড়ল। বিশেষ করে পাশাপাশি তিনটে ফুলের নাম পেয়ে। সবিস্ময়ে প্রশ্ন

করি, সাহেব-কর্তার মেয়ে না তুমি?

ঘাড় নেড়ে চম্পা সায় দেয় ঃ এই গোল-বাড়ি আমাদের। এই যেখানটা তুমি রয়েছ।

এর মধ্যে ভিন্ন কথা নিয়ে আসে ঃ জবাটা বড় হিংসুটে। বলে কি জান? মেজের অত জুতো ঠকঠকিয়ে বেড়ায় কেন? অত দেমাক কিসের? ওকেও যেতে হবে। এমনি কত জনের ঘরবাড়ি জায়গাজমি জ্যান্তরা বারম্বার এসে দখল করেছে। জ্যান্ত মানে যেরকমটা ভাবছ, যখন তুমি। তারাও সব মরে গেছে, ও কি চিরকাল বাঁচবে?

তোমারই বিয়ে হচ্ছিল তো ওই বাড়িতে?

চম্পা বলে, তোমার ঠিক মাথার উপর দোতলার ঘর। তার উপরে ছাত। তার পাশে চিলেকোঠা। চুপি চুপি আমি চিলেকোঠার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বরের নৌকো গোল-বাড়ির ঘাটে লাগবে এইবার। কত বাজিবাজনা, কত মশাল! সেই আলোয় আগেভাগে আমার বর দেখে নেবো। সেই জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ও দুই মুখপোড়া জবা-যূঁই টের পেয়ে গেছে, তারাও দেখি পিছনে। নৌকো এসে গেল—দুটো-একটা নয়, অনেক। কিন্তু বর এলো না। মশাল নিয়ে ঘাটে বর এগুতে গিয়েছিল, সেই মশাল কেড়ে বাইরের সাঙ্গপাঙ্গদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। তোমার এই গোলঘরের লাগোয়া সিংদরজা—তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করেছে তো দমাদম কুড়ুল পড়ছে—তার উপর। শেষে দেখি টিন টিন কেরোসিন এনে ঢালছে, আগুন দেবে। আর ওদিকে আমগাছের মগডাল থেকে ছাতের উপর লাফিয়ে পড়ে আমাদের তিন বোনকে ক্যাচ-ক্যাচ ছোরা দিয়ে এ-ফোঁড়-ও-ফোঁড় করছে।

দেখি, হাসছে সেই চম্পা। শুনতে শুনতে আমার দম আটকে আসে, আর সে তখন হাসে মিটিমিটি। বলে, প্রথম তুমি এই বিরাটগড়ে এলে। রাত দুপুর হয়ে গেছে। গোলবাড়ির ঘাটে এক ডিঙি লাগল। ডিঙি থেকে তুমি নামছ। জবাটা বড্ড পাজি, সে বলছে কি জানো? সেদিন বর পৌঁছতে পারে নি—ঐ দেখ, তোর বর এসে গেল। আসছে এতকাল পরে। কী বখা মেয়ে, কলজেটা ছোরায় ফেড়ে দিয়েও তার ঠাট্টা-হাসি বধ করতে পারেনি। সেদিন তুমি এবাড়ি এলে না—অন্য বাসায় গিয়ে উঠলে। কিন্তু জবার কথা ঠিক হল—ঘুরে ফিরে আসতে হল সেই। মরা-বাড়িতে জীবন্ত লোকের বাসা।

আমার আজও সন্দেহ গেল না, সেই সময়টা আমি জেগে ছিলাম না স্বপ্ন দেখেছি? কিম্বা জাগরণ আর স্বপ্ন মুখোমুখি হয়ে এত সব কথাবার্তা বলে গেল?

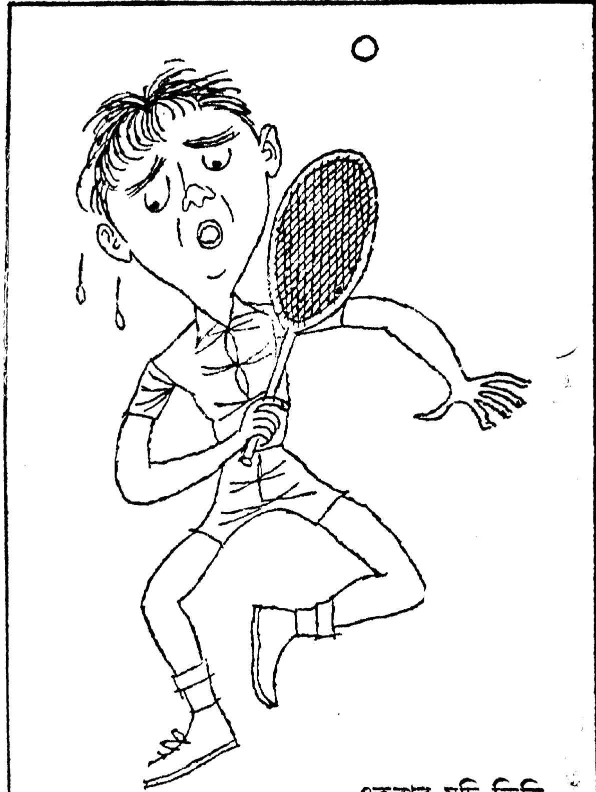
পরের দিন দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা করে নিঃসংশয় হই ঃ চম্পা জবা যূঁই—জানতেন এই নামের তিনটে মেয়ে?

নিস্পৃহ ভাবে তিনি বললেন, সাহেব-কর্তা বাড়ির মেয়েদের ফুল দিয়ে নাম রাখতেন। এমনিও ফুল ভালবাসতেন খুব। কর্তা গিন্নি দুজনেই। কাশ্মীরে ফুলের দেশে থাকতেন কি না!

নাম রেখেছিলেন এমনি-এমনি নয়। মেয়েগুলোও ছিল ঠিক ফুলের মতন।

দয়ালহরি তাকিয়ে বললেন ঃ তুমি দেখলে কোথা হে? গল্প শুনেছ—ডাক্তার-বাবুর কাছে। ও'র খুব যাতায়াত ছিল। কিন্তু বেশি রং ফলিয়ে বলেন, এই যা।

তারপরে যে জন্য আজ আমার কাছে এসেছেন ঃ কলকাতায় যাওয়ার ঠিকঠাক



করেছ, তা আমায় মুখের কথাটা বললে না কেন বাবাজি?

কী সর্বনাশ, কতগুলো চোখ দয়ালহরির? একটা ঠিক পিছন দিকে চুলের মধ্যে ঢাকা। মনে মনে ভাবলেও এ লোকের বোধ করি নজরে এসে যায়।

বলছেন, এ তল্লাটের লোকেও বিয়েথাওয়া করে থাকে। বিয়ের সওদা করতে কলকাতা যেতে হয় না। সদরে সব-কিছু পাওয়া যায়, বুঝলে?

কনের খোঁজে আমার বউদি সারা কলকাতা চুঁড়ে বেড়িয়েছেন। বিরাটগড়ের মেয়ে, চেপে পড়ে সমস্ত বরবাদ করে দিচ্ছে। কাঁচা বয়স আমার, কতকাল আরো বেঁচে থাকতে হবে! ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ব, ঠিক করেছিলাম পালাব। দয়ালহরির হা-হুতাশ পঁচিশ বছর ধরে চলছে। বড় বউ পঙ্গু হওয়ায় তাঁর তবু একটা সুবিধা, যত কিছু হাঙ্গামা বাড়ির ভিতরেই—বাইরে বেরুলে নির্ঝঞ্ঝাট। থাকেনও তাই বাইরে বাইরে। বড় বউ, তা ছাড়া, কলকাতার নয় বলে নবেলি বুলি নেই মুখে। মার খেয়ে ঝগড়া করে পরক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে উনুনে কড়াই চাপিয়ে দেন। কিন্তু লাবণ্য নামক শহুরে বস্তুটিকে ঘরের ভিতরে আটক রাখা চলবে না, য়-ফলার মতো পিছনে সেঁটে থাকবে অহরহ। এবং ট্যাঙস-ট্যাঙস কথা শোনাবেই। যতই ভাবি, অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। কাজ নেই আমার সরকারি চাকরিতে। চাকরি এবং বিরাটগড় ছেড়ে সরে পড়ি রে বাবা! তা দেখি, সমস্ত জানেন দয়ালহরি। ঘাটের নেপাল মাঝির খবর অবধি।

বলেন, পাঁচ টাকায় তুমি নেপাল মাঝির নৌকো ঠিক করেছ। বেটা জোচ্চোর, গরজ বুঝে ডবল হেঁকেছে। শুনে তো ছোটবাবু আগুন। দু-টাকা তুমি আবার আগাম দিয়েছ। থানায় নিয়ে গোটাকতক রদ্দা ঝেড়ে দিতে বেটা নাক-কান মলে টাকা ফেরত দিয়ে এলো।

পাঁচ টাকা হোক আর দশ টাকা হোক, আমার টাকা আমি দিয়েছি। ছোট দারোগা কোন আইনে নেপাল মাঝিকে মারধোর করে?

রাগে রাগে থানায় ছুটলাম। ছোটবাবু হেসে ঠাণ্ডা ভাবে বলেন, আইন পাশ হয় স্যার দিল্লির পার্লামেণ্টে, কলকাতার এসেম্বলিতে। বিরাটগড় দূরের জায়গা, পথেরও অনেক ধকল। সব আইন ঠিক মতো পৌঁছতে পারে না, তখন আমাদেরই আইন বানিয়ে নিতে হয়।

বড়বাবু কথাটা লুফে নিয়ে বলেন, এই কাজটা কিন্তু ষোল আনা আইনসম্মত। হোড় মশায়ের মেয়েকে ফুসলেছেন আপনি, নিজ হাতে চিঠি লিখে তাকে বাসায় এনেছেন। সে দলিল আমাদের হাতে আছে। উড়ে উড়ে মধু খাচ্ছিলেন, বেকায়দায় পড়ে শেষটা বিয়েয় রাজি হতে হল। এখন আবার অন্য মতলব ভাঁজছেন। ভদ্রলোকের জাতকুল নষ্ট করে অত সহজে রেহাই হয় না। ফৌজদারির কারণ ঘটে। সরকারি লোক বলে আপনার দায়িত্ব আরও বেশি। বুঝে দেখুন সমস্ত। আপনি বন্ধুলোক, আবার হোড় মহাশয়ও বিশেষ অনুগত আমাদের। কারও উপর অন্যায় জুলুম হয়, আমরা চাইনে।

দয়ালহরিও ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। তিনি বললেন, শুভকর্ম মাঘ মাসে হবার কথা, কিন্তু বাবাজির মতিগতি বুঝে অত দেরি করা ঠিক হবে না। ঠাকুর মশায় বিধান দিলেন কন্যা অরক্ষণীয়া হলে মল-মাস বলে আটকায় না। ক'টা দিন পরে

একত্রিশে অঘ্রাণ একটা মাঝারি গোছের দিন আছে। কি বলেন আপনারা?

সবাই এরা একজোট। পরিপাটি বন্দোবস্ত। জায়গাটাও এমন বেয়াড়া—চারিদিকে নদীখাল, নৌকো ছাড়া নড়বার জো নেই। সেই নৌকোর পথ মেরে দিয়ে বসে আছে। নেপাল মাঝির দুর্দশার পর কেউ আর আমার নৌকোয় তুলছে না। আবার কী আশ্চর্য, বাসার ঢুকবার মুখে দেখি লাবণ্য। হাতে গরুর দড়ি কুণ্ডলী করা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বলে, মুংলিটা কোন দিকে গেল, বড্ড জ্বালাতন করছে। শিঙে দড়ি দিয়ে গোয়ালে তুলতে পারলে যে বাঁচি।

হাসছে নাকি মিটিমিটি, কথাটা রূপক? আবছায়া সন্ধ্যায় ঠিক ধরতে পারিনে। আমরা দিকে তাকিয়ে থাকল। ধারালো দৃষ্টি ছোরার মতন এফোঁড়-ওফোঁড় করে। বলে, আপনি বুঝি পালাচ্ছিলেন? এতদিনে বাবাকে চিনলেন না? এ-গাঁয়ে আমার বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় না। ধরুন, এই গোলবাড়ির ব্যাপার—বিয়ের রাত্রে লঙ্কাকাণ্ড—বাবা বলেন, তিনি সব টের পেয়েছিলেন আগেভাগে। এই যাঃ, সব আপনাকে বলে ফেললাম। আমি আবার বাবার ঠিক উল্টো, পেটে কোন কথা থাকে না। বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, এইটে জেনে রাখুন। মিছে পাকছাট মারতে যাবেন না। আপনার কষ্ট, এদেরও হয়রানি। তার উপরে আপনার সেই চিঠি বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পাকা দলিল।

শুভার্থীর মতন বোঝাবার ভঙ্গিতে বলি, এমন বিয়েয় সুখী হবে কি তুমি?

ধক করে মেয়েটার চোখ জ্বলে উঠল যেনঃ সুখ কি পেয়েছি কখনো? বিধাতা-পুরুষের ভাণ্ডার দুটো—একদলের জন্য রূপগুণ আর সুখসম্পত্তি, অন্য দলের অশান্তি আর চোখের জল। সুখ আমি চাইনে, একটু যদি সোয়াস্তি পেতাম! না পেলেও ক্ষতি নেই। যা আছি, তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না। আর কিছু না হোক, জায়গাটা বদল হবে, নতুন নতুন মুখের গালি শোনা যাবে। ভালোয় ভালোয় কাটলে যে হয় এই ক'টা দিন।

ধীরে ধীরে বিজয়িনীর মতো পা ফেলে সে মাঠে নেমে গেল। গরুর খোঁজেই সম্ভবত। গাঙের পাড়ে দাঁড়িয়ে অনেক দিন জেলেদের মাছ-ধরা দেখি। বেউটি-জালে বড় মাছ পড়েছে—যত আফালি করুক, জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। জলে নেমে কানকো ঠেসে ধরবার আগে জেলেরা ধীরেসুস্থে এক ছিলিম তামাক খেয়ে নেয়। লাবণ্যর ঐ চলার ভঙ্গির সঙ্গে কেমন তার মিল আছে।

দু-দিন কি তিন দিন পরে। এজলাসে কাজ করছি, একটা দলিল এসে পড়ল হাতে। দয়ালহরি রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করেছেন। সোলেনামা। পড়ে স্তম্ভিত হই। পুকুর-বাগান-ভদ্রাসন কিছুই আর দয়ালহরির নেই। পুরানো দেনার দায়ে মহাজন বিক্রি করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও মামলা করে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। শেষ মামলাতেও হেরে গিয়ে মহাজনের হাতে-পায়ে ধরে এবারে এই আপোষ-রফা হচ্ছেঃ ভদ্রাসন হইতে উচ্ছেদ এক মাসকাল স্থগিত থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমি অথবা আমার ওয়ারিশগণ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিব। এতদর্থে সুস্থশরীরে সরল মনে অত্র সোলেনামা পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম।

বেজার মুখে—চাপা গলায় অবশ্য—দয়ালহরি বলছেন, মেয়ের বিয়ে আর ক'টা দিন পরে, ব্যাটা বলছে কিনা বিদেয় হও। আক্কেলটা বোঝ: বিয়ে কি তবে পথের উপর দাঁড়িয়ে হবে?

বললাম, এক মাস তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন?

হোড় মশায় তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তার মধ্যে শোধ করে দেবো। ব্যবস্থা ঘরেই রয়েছে। ক'খানা গয়না-বিক্রির ব্যাপার, কারো কাছে আমার হাত পাততে হবে না। যদি বলো দিয়ে দিইনি কেন এতদিন। চেষ্টা করে দেখছিলাম, যদি ঘুলিয়ে দেওয়া যায়।

প্রায় ফিসফিস করে বলেন, এখনো হাল ছাড়িনি একেবারে। বুঝলে না, সময় নিয়ে মাথার উপরেব কোপ কাঁধে নিয়ে আসা।

দাদা সেই দিন এসে পড়লেন কলকাতা থেকে। বাসায় ফিরে দেখলাম, বারান্দায় বসে আছেন। এসেছেন অনেকক্ষণ—থানা ঘুরে সবিস্তারে খবরাখবর নিয়ে এসেছেন। ওঁদের যে কী পরিপাটি বন্দোবস্ত, আরও ভালো করে মালুম হল। চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়। দয়ালহবি স্বহস্তে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি দাদা ফেলে দিলেন আমার সামনে। পড়তে গিয়ে কান গরম হয়ে ওঠে। আমার সম্বন্ধে যা লিখবার লিখুন, মেয়ের চরিত্র নিয়েও লিখেছেন বাপ হয়ে। আমার ফোসলানিতে মাঠ পার হয়ে সে আমার ঘরে যেতো। লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারিনে দাদার দিকে। কৈফিয়তের কিছু নেই—কথা তো খানিকটা সত্যিই। সকল দোষে দোষী আমি। চম্পার উপরে দোষ চাপাতে গেলে হাসবে সবাই, পাগল বলবে। এতদিন পরে এই লেখা গল্প পড়ে আমার মস্তিষ্ক সবন্ধে আপনারাই কতজনে কত কি ভাববেন। সে আমি জানি।

মরিয়া হয়ে বলি, বিয়ে কি হবেই দাদা?

না হবার উপায় রেখেছ? গোলমাল করলে ঘরে তালা বন্ধ করবে। বর, বরকর্তা দুজনকেই। থানা থেকে আচ্ছা রকম শাসানি দিল। কনে আশীর্বাদ সেরেই চলে যাবো ভেবেছিলাম। এখন যে ফাঁদে ফেলেছে, আবাদিকের মন্তোর পড়া শেষ না করে নড়তে দেবে না।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠলেনঃ কী দুর্বুদ্ধি হল, টুনুর মা এত করে মানা

করে, যেতে দিও না লক্ষ্মীছাড়া জায়গায়। আমি কিছুই কানে নিলাম না। ভায়ার ভবিষ্যৎ দেখছি আমি! সমস্ত ছারেখারে গেল। তোমার রুচি পর্যন্ত এন্দুরে নেমেছে। ভদ্র সমাজে বলার কথা নয়। গা ঘিনঘিন করছে। কলকাতায় ফিরে গংগায় একটা ডুব দিয়ে তবে সোয়াস্তি।

নিরুপায়। স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া কোন কিছু করণীয় নেই। মনের এক অদ্ভুত নিরুদ্বেগ অবস্থা। বিয়ের দিন এসে যাচ্ছে তো যাক। ফাঁসির দিন যেমন অপ্রতিরোধ্য রূপে আসে। ডাক্তার বাবুই একমাত্র সুহৃৎ আমার। এখনও ভিতরের গোলমালটা তাঁকে বলি নি। পরের কাছে বোকামি জাহির করে লাভ কি? কুরূপ-কুৎসিৎ জেনেশুনেই যেন বিয়ে করছি—মহাপ্রাণ বলে আরও তাই খাতির বেড়েছে ডাক্তারবাবুর কাছে। অবসর পেলেই তাঁর বাড়ি চলে যাই, ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে সেই আমলের গল্প শুনি। চম্পার কথা অনেক—অনেক করে শুনতে ইচ্ছা করে। (ক্রমশ)

---






**শাঙ্গর্দেব**

কনফারেন্সের সমারোহ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। দীপ এবার জ্বলবে; তবে—তার আগে সলতে পাকানো পর্ব আছে এবং এই পর্বটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা অনেকের জানা নেই। অতি সাবধানে সলতেটি পাকিয়ে তাকে উত্তমরূপে ঘৃতসিক্ত না করলে দীপ জ্বালাবার চেষ্টা বৃথা। যাঁরা প্রতি বছর এই প্রদীপটি জ্বালিয়ে আসছেন, তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কায়দা-কানুন তাঁরা জানেন। আর যাঁরা নতুন তাঁরা দেখে শেখেন—নতুন প্রণালীও আবিষ্কার করেন বৈকি। পুরোনো দল ভেঙে যারা নতুন দল গড়েন, তাঁদেরও অনেক উদ্যোগী হতে হয়। মাথা পরিষ্কার না হলে কলকাতার ওপর অন্তত একটা সম্মেলনের পরিচালনা করা যায় না।

শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার যাঁদের দিয়ে হবে, তাঁদের সঙ্গে আদিপর্বের বোঝাপড়া ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, এমন একটা কথা আছে বটে, কিন্তু সেটা কাকের বেলায় যেমন খাটে, কোকিলের বেলায় তেমন নয়। কোকিল অনেক চতুর প্রাণী—সে জানে কাকে দিয়ে তার ডিমটি ফুটিয়ে নেওয়া যাবে। সুতরাং শুধু ভাতেই কাজ হবে না, তেমন তেমন কোকিলের জন্য তেমন তেমন বসন্তের আবহাওয়া প্রস্তুত করা দরকার—তাতে হয়তো পঞ্চম পর্যন্ত সুর উঠতেও পারে। এই পর্বটি চুকলেই প্রচারের হাঙ্গামা। সম্মেলন যদি নতুন হয়, তবে একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকতেই হয়। এতে কিন্তু বেশি হাঙ্গামা নেই, কেননা সাংবাদিকগণ উদ্দেশ্য সাধু হলেই সন্তুষ্ট। চাই কি, ভর্দিশ্যর ভৌমিক মহাশয় যদি রিপোর্ট লেখেন, তবে কারুর পাথর-চাপা কপাল খুলেও যেতে পারে, আবার কারুর সাধে বাজও পড়তে পারে। দু-তিনখানা বই কনসাল্ট করে যে রিপোর্টটি তিনি খাড়া করবেন, তাতে রাগের ইতিবৃত্ত, বাদী, সম্বাদী, অলঙ্কার, গমক, মীড়, মূর্ছনা—এসব তো থাকবেই, তাছাড়া শিল্পীদের ঘরোয়ানার চমকপ্রদ বিবরণও মিলবে। এঁরই একটি সাংগীতিক স্তম্ভকে অবলম্বন করে ছোটু মিয়া উস্তাদ ছোটে খান বনে গেছেন এবং দুশো টাকা থেকে হাজার ছুঁই ছুঁই করছেন। অপরপক্ষে গোলাম রসুল খাঁ এঁরই রিপোর্টের মর্ম পরিজ্ঞাত হয়ে গোটা কাগজটা গুলি পাকিয়ে তাঁর পিকদানিতে যতটা পারেন ঠেসে ঠেসে গুঁজে দিয়েছিলেন। যাই হোক, প্রতি সাংবাদিক বৈঠকে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যে বিবরণী পেশ করেন তা প্রশংসনীয় এবং তাঁদের উদ্দেশ্য যে কেবলমাত্র সাংস্কৃতির কুতবমিনার তৈরি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, সেটাও বোঝাবার কার্পণ্য হয় না, তবে কপালদোষে কার্যক্ষেত্রে অন্যরকম ব্যাপার ঘটে যায়, যার জন্য ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অথ পটোত্তোলন।

আজকাল একজন সভাপতিতে কুলোয় না, তাঁর সঙ্গে একজন প্রধান অতিথি এবং আর একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি থাকা চাই, যিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। এই তিন-জনের কাউকে যে সংগীত সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে, এমন কোন কথা নেই এবং তাঁরা মুক্তকণ্ঠে সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা-বোধও করেন না। প্রতিপত্তি, খ্যাতি এবং অর্থ—এই তিনটিই হচ্ছে এই কার্যের যোগ্যতা; তবে হ্যাঁ, সংগীতজ্ঞদের বক্তৃতা কিছু কিছু থাকে বৈকি—কনফারেন্সের প্রেস্টিজ তো রাখতে হবে? কিন্তু সে বক্তৃতা শোনবার মত ধৈর্য খুব কম শ্রোতারই থাকে—সে সময়টা তাঁদের প্রেক্ষাগৃহের বাইরে চা-সেবন এবং ধূমপানের সময়। অনেক বক্তাকে তাঁদের বক্তৃতার সারমর্মটুকু লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়—সেটি আরো কাটছাঁট হয়ে খবরের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

সন্ধে সাতটায় যখন সম্মেলনের উদ্বোধন হবে, তখন দেখা যাবে সারি সারি হাল্কা চেয়ার উদ্বোধনের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ। অল্পসংখ্যক ভদ্রলোক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নিতান্ত বাধ্য হয়েই বসে থাকেন এবং কয়েকটি ছেলেমেয়ে এ চেয়ার থেকে ও চেয়ারে ছুটোছুটি করে খেলা করে। যথারীতি মাল্যদানের পর দুটি-তিনটি বক্তৃতা হয়, ছবিও ওঠে। পরের দিন সংবাদ-পত্রের বিশিষ্ট স্থানে সেই খবরটি প্রকাশিত হয়। এইরকম শূন্য গৃহে বক্তৃতা সম্পর্কে যদি আপনি হতাশ হয়ে কোন মন্তব্য করেন, তাহলে শুনতে পাবেন—"ও ঠিক আছে—কাগজে সব ঠিক বের করে দেব" এবং যিনি এই মন্তব্য করেন, তাঁর ছবিটিও নিতান্ত স্থানাভাব না হলে উক্ত উদ্বোধনী চিত্রের সঙ্গে ছাপ হয়েই যাবে। উদ্বোধন সম্পর্কে সবাই উদাসীন, কেননা যাঁদের ডেকে এনে এই অনুষ্ঠানটি সমাধা করা হয়, তাঁদের সম্বন্ধে কারুর কোন কৌতূহল থাকবার কথা নয়।

রাত দশটায় কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ ঝলমল করে ওঠে। সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ হবে। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে মনোরম পরিবেশ—বাইরে ভীড়, কলহ এবং মারামারির উপক্রম। "কি বলছেন মশাই টিকিট পাওয়া যাবে না—টিকিট শর্ট্ কিরি করলেন কখন? কাগজে এরকম অ্যানাউন্স করেন কেন?"

কাউন্টারের ভদ্রলোক বলছেন—"সে

আমরা কি জানি মশাই—একজিকিউটিভ কমিটির সংগে বোঝাপড়া করুন।”

“বোঝাপড়া আপনার সংগেই করতে হবে, আমরা পয়সা দিয়ে দেখতে এসেছি মশাই।”

“কি পয়সা দেখাচ্ছেন মশাই, পয়সা আমাদেরও আছে—বলছি টিকিট নেই।”—এই ধরনের রাগারাগির পালা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে, তারপরে অনিবার্য নিয়মে সবাইকেই ক্ষান্ত হতে হয়।

ওদিকে আসর জমবে রাত একটা নাগাদ, তার আগে অনেককে চান্স দেওয়া হয়। গুণীজনদের ঠেকিয়ে রাখতেই হবে, রাত দুটোর মধ্যেই তো আর আসর ফাঁকা হতে দেওয়া যায় না। পণ্ডিত হরিভক্ত শুক্ল জবর-গায়ে বসে আছেন, তাঁর প্রোগ্রামটা আগে শেষ করবার জন্য অনুরোধ করছেন, কিন্তু দুটোর আগে তাঁকে বসানো সম্ভব নয়। স্থানীয় শিল্পী ভবতোষ সরকার বৃদ্ধ হয়েছেন—গলা পড়ে এসেছে, তথাপি কিঞ্চিৎ খ্যাতি থাকায় ধরাধরি করে একটি প্রোগ্রাম আদায় করেছেন সামান্য পারিশ্রমিকে। এক কোণে দীনমুখে বসে আছেন কখন তাঁর ডাক আসবে। হয়তো যখন তিনি গাইতে বসবেন, তখন হারমোনিয়াম মিলবে না, তানপুরা বাজিয়ে পাওয়া যাবে না অথবা কোন তবলচিকেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। এমন কয়েকবার হয়েছে—তথাপি তাঁর আর উপায় নেই। দু-একজন পুরাতন প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র তাঁর সহায় থাকাতে তবু এইটুকুও তিনি এখন পর্যন্ত পাচ্ছেন। সংগীতজগতে প্রাচীনের ঠাঁই নেই। গলা এবং হাত যতক্ষণ পর্যন্ত সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের আদর, তারপরেই বিস্মৃতির অতলে।

একটা অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা হল—“আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, ভারতবিখ্যাত গায়ক অর্জুনপ্রসাদ সিংহ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করবার মত সময় করে উঠতে পারেন নি। অনিবার্য কারণে তাঁর পক্ষে আসা এখন সম্ভব নয়।” শ্রোতারা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে গেলেন। অর্জুনপ্রসাদের নামে বহু সিজন টিকিট বিক্রি হয়েছে। কিন্তু অনিবার্য কারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ চলে না। আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। কনফারেন্সের প্রচারসচিব কোন্ সংবাদের ওপর নির্ভর করে অর্জুনপ্রসাদের নাম ঘোষণা করেছিলেন সে খবর কেউ দিতে পারে না; কিন্তু এটা সত্য যে, আসলে অর্জুনপ্রসাদের সংগে এঁদের কোন চুক্তি হয় নি। এই ব্যাপারের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর দোষারোপ করবেন, অনেক ঝামেলাও হবে; কিন্তু সেটা মিটেও যাবে এই কর্তৃপক্ষেরই তৎপরতায়।

রাত একটার পর থেকে আপনারা শুনতে থাকবেন ভাল ভাল অনুষ্ঠান। ওদিকে চোখের ওপর ঘুমও জড়িয়ে আসবে। গায়ের র‍্যাপারটা ভাল করে টেনে দেবেন। অবাধ্য শীত হয়ত আপনার পা দুটোকে বিপর্যস্ত করবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি একটা স্বপ্নময় পরিস্থিতির মধ্যে ডুবে যাবেন। এই সময়েই জমে উঠবে আপনার সম্মেলনের নেশা। হয়তো চোখ আপনার তন্দ্রাচ্ছন্ন, ক্লান্ত ইন্দ্রিয় সব কিছু যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারছে না—তবু যা ভাল তার আবেদন আপনার কাছে পৌঁছোবে—গুণীজনের গুণপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আপনি পারবেন না।

কিন্তু এই স্বপ্ন আপনার ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাবে ভোররাত্তিরের সরোদ, সেতার আর তবলার দুর্দান্ত চপলতায়। সংগীতের অসংগতি এবং সংগতের অসংগত উন্মাদনার সংগে করতালির খর উল্লাসে আপনি বিহ্বল হবেন বৈ কি। আপনি হয়তো ভেবে উঠতে পারবেন না—সরস্বতীর বরপুত্রেরা হঠাৎ এমনি বেসামাল নৃত্যে মেতে ওঠেন কি করে? কিন্তু এরই জন্য বহু ব্যক্তি এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন—এই প্রচণ্ড ঝনঝনানি আর তবলার এলোপাথাড়ি চপেটাঘাতের সংগে নিজের হাততালিটুকু নিবেদন করবার আগ্রহে।

অবশেষে যখন শেষ হাততালি পড়বে, তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। দলে দলে শ্রোতারা উৎফুল্ল মুখে বেরিয়ে আসবার সময় বলবে—“উঃ কি বাজনাটাই বাজালে।” আপনি হয়তো দুঃখিতচিত্তে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবেন—“স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল মধুর-রাগিণী।” আপনি তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু মধুর-রাগিণীর পরিবর্তে যা বাজল, তা আপনার স্বপ্নকে ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

# কান্তকবি রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ

**সারদারঞ্জন পণ্ডিত**

আজ রবি ঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বললেন, 'আপনাকে পুজো করতে ইচ্ছে করে।' শুনে আমি লজ্জায় মরি। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেখানে আবার আমরা কে?"

হাসপাতালে বসে রোজনামচার খাতায় এই কথা কয়টি লিখেছেন বাংলার প্রিয় কবি কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কটেজ ওয়ার্ডে তিনি যখন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন।

রোগাক্রান্ত কবিকে প্রফুল্ল অবস্থায় হাসপাতালে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন দেখে কবিগুরুর কবিচিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিনি সেদিন ফিরে এসে লিখেছিলেন,—"রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি।"

রজনীকান্তের কণ্ঠনালিতে ক্যান্সার রোগের জন্যে অস্ত্রোপচার করা হয়। এতে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। তাই হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করার সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লেখনীর সাহায্যে তাঁকে মনের ভাব প্রকাশ করতে হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ যখন কান্তকবিকে দেখতে হাসপাতালে যান তখন বাকাহারা কবিকে লিখে সব কথার উত্তর দিতে হয়েছিল।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩১৭ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কটেজ ওয়ার্ডে মুমূর্ষু রজনীকান্তকে দেখতে যান। কবিগুরুর শুভাগমনে কান্তকবি রোগযন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

মৃত্যুপথযাত্রী কবির শেষ সাধ সেদিন যেন পূর্ণ হ'ল। কটেজ ওয়ার্ডের সেই ক্ষুদ্র ঘরটি থেকে সমস্ত বিষণ্ণতা মুছে গিয়ে সেদিন ভক্তি-যমুনা আর ভাব-গঙ্গার অপূর্ব সম্মিলন হল।

অশ্রুসজল চোখে কান্তকবি কবিগুরুকে লিখে জানালেন,—"আজ আমার যাত্রা সফল হইল! তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারি 'কণিকা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'অমৃতে'র সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার যাত্রা সফল হয়।"

রজনীকান্তের এই আবেগপ্রবণতা—এই



হাসপাতালে সাহিত্যসাধনারত রজনীকান্ত

ভাবমুগ্ধ ব্যাকুলতা দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়লেন। কবিগুরুর কথার উত্তরে রজনীকান্ত যা লিখেছিলেন রোজনামচা থেকে তা উদ্ধৃত করে দিলুম,—

"—এই Tracheotomy করে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্চি। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান মহাপুরুষ।

—"আমি যখন বুঝলাম যে, এই উৎকট ব্যথা Penal Code (দণ্ডবিধি) নয়, এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্চে, আমাকে কোলে নেবে বলে—তখন বুঝলাম প্রেম। তারপরে সব সচ্চি। একবার দেখতে বড় সাধ ছিল, নইলে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হতো। সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন—'শিবা মে পন্থানঃ সন্তু।'

"—আপনি আমাদের সাহিত্য-নায়ক, দার্শনিক; চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্যে হবে বলে দেখতে চেয়েছিলাম। নিজের তো পায়ের কাছে যাবার শক্তি নেই।

"—ভালবাসেন জানি, তাই এত কথা বললাম। কিছু মনে করবেন না।

"—কি শক্তি আপনার নেই? অর্থশক্তি? তার যে গৌরব, তা আমি এই যাবার রাস্তায় বেশ বুঝতে পাচ্চি। তার জন্যে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিবারাত্রি দেহপাত করচে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড় লোক।

"—আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতাম। আমি 'রাজার' অভিনয় করেছি। অমন কাব্য অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে।

"—'অমৃতে'র ছোট কবিতাগুলো কি পড়েছিলেন? আমার এই পীড়ার মধ্যে লেখা। কত অপরাধ হয়েছে। আপনার চরণে দিতে হাত কাঁপে।

"—আমাকে কিছু বললেন না। 'দয়াল' আমাকে বড় দয়া ক'রছে। আমার ছেলে-মেয়ের মুখে একটি গান শুনুন।"

এরপর রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিবালা ও পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাদের পিতার লেখা নিম্নলিখিত গানটি শুনিয়ে দ্য,—

বেলা যে ফুরায়ে যায় খেলা কি ভাঙে না হায়
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।
পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক-উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,—
তাও কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা কে হারায়
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।
আসিছে রাতি, কই রবি বাতি?
সাথীরা যে চলে যায় খেলা ফেলে চলে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।

গানটি শুনে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি লাভ করলেন। তাঁর কথার উত্তরে রজনীকান্ত আবার লিখলেন,—

"—আমি চার মাস হাসপাতালে।

"—আমি চলে গেলে যেন নিতান্ত দীন-হীন বলে একটু স্মৃতি থাকে,—এটা প্রার্থনা করবার দাবী কিছু রাখি না—কিন্তু ভিক্ষা ত নিজের দাবী কতটুকু তা বোঝে না।

"—আমার হিসাবে আমি একটু শান্তি পেলাম।

"—খুব মরে; আগে কষ্ট হতো, এখন আর বেশী কষ্ট হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার পর সেদিন বৈকালে রজনীকান্ত তাঁর বিখ্যাত গান—"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর" রচনা করেন ও বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। কান্ত-কবির লেখা ওই করুণ ও মর্মস্পর্শী সংগীত পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে যে ভাবের তরংগ ওঠে তা তাঁর লেখা চিঠি পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়। কবিগুরু ১৬ই আষাঢ় তারিখে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখে তাঁর মনের ভাব জানিয়ে দেন—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার-পূর্ব নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ

দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার "রাজা ও রাণী" নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,

—"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে। কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা সে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশীর ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য!

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার 'জীবন সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ পত্রে লিখেছিলেন, "আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।"

কবিগুরুর সে আশা আর পূর্ণ হয়নি। তিনি কলিকাতায় আসিবার পূর্বেই ২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার রাত্রি ৮॥টায় কান্তকবি রজনীকান্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কটেজ ওয়ার্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

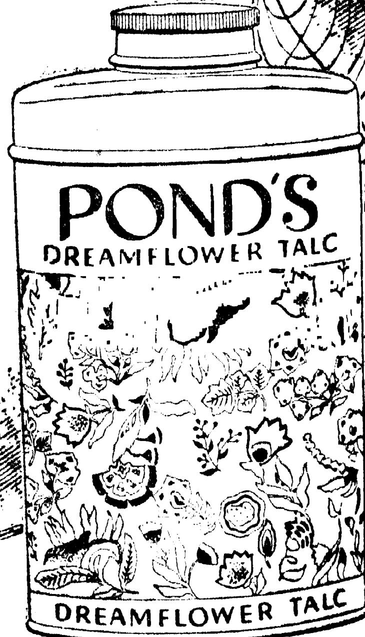
# পণ্ড্‌স

## ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক

## সারাদিন সতেজ ও সুরভিস্নিগ্ধ রাখবে

সুগন্ধভরা পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌কম পাউডার ব্যবহার করলে গা চটচট-করা দুঃসহ গরমের দিনেও শরীরটি স্নিগ্ধ ও সতেজ আর মন প্রফুল্ল থাকবে। এই হালকা পাউডার আপনার গায়ে ছড়িয়ে দিন, আর কত তাড়াতাড়ি ঘাম শুষে নেয়, সারাদিন আপনাকে কেমন ফুলের মত তাজা ও সুগন্ধে মাতিয়ে রাখে দেখুন। ঝরঝরে অনুভব করতে হ'লে সব সময় পণ্ড্‌স ট্যালকম্‌ পাউডার ব্যবহার করুন।

চীজব্রো - পণ্ড্‌স ইন্‌ক
(সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)




বিনামূল্যে পুস্তিকা : গাত্রবর্ণ ও সৌন্দর্যসাধন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যপূর্ণ আমাদের বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য পুস্তিকা 'লাভলিয়ার উইথ পণ্ডস' চেয়ে পাঠান। ২৫ নঃ পঃ মূল্যের ডাকটিকিট সহ এই ঠিকানায় লিখুন : পোঃ অঃ বক্স ১৬১২, ডিপার্টমেন্ট নং ২০টি, বোম্বাই।

P-6175.

# সুধন্য ও সেবারের বর্ষা



## চিত্ত সিংহ

উত্তর পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছে জোর। ঢল নামল নদীতে। স্রোতের টানে কাঠ-কুটো ভেসে এল। কেউ কেউ সে সুযোগে ধরল কিছু কিছু।

তা সবাই আশঙ্কা করেছিল এটুকুতে থামবে না। যা আশঙ্কা করেছিল, তাই-ই হল। ঢল নামার দু'দিনের দিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। নদীর জল কূল ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাঠে। মাঠ ভাসল, পথ ভাসল। গাঁ, হাট, বাজার সবই ভাসল। তবু ধারা-পাতের ক্ষান্তি নেই, দিন-রাত্তির লেগেই রইল। বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

সরকারী বড় সড়কটা এক রাত্রে গাঁয়ের লোকে মিলে কেটে দিলে। উত্তরের জল কমল কিছু, দক্ষিণে তখন জলে জলময়। পূর্ণিমার ভরা কোটালে জল আরও বাড়ল। গাঁগুলো যেন একেকটা দ্বীপ; আর নদী-কূলের ছাড়া ছাড়া ঝাঁকড়া গাছগুলো যেন সার সার পাহাড়ের চূড়ো।

কাম কাজ কিছু নেই। সুদিনে দিন-মজুরী করে সুধন্য। এমন জল থৈ থৈ বর্ষায় ঠায় বসে কাটাতে হয়। এবারেও নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। উঠোনে জল উঠে এসেছে। এখন কাজ কোন্ চুলোয়। দাওয়ায় বসে ফুড়ুক ফুড়ুক তামাক টানা ছাড়া সুধন্য আর কিছুই করবার মত দেখলে না।

পাড়ার জোয়ানদের কেউ কেউ পুকুর-ডুব দিয়ে ভেসে যাওয়া মাছ ধরার জন্যে তাক করছে সরকারী সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে, কেউ-বা উঁচু জমির অল্প জলে পলো হাতে ছুটোছুটি করছে মাছের লোভে, আর কেউ কেউ এ সুযোগে নৌকো ভাড়া করে ভিন গাঁয়ে স্বজনদের দেখতে যাচ্ছে।

সুধন্যর মাছের লোভ নেই, আর থাকলেই বা কি; বৃষ্টিভেজা এমন দিনে মাছধরা তার ধাতে আসে না। তার চাইতে তামাক টানা ঢের ভালো। আর আত্মীয়স্বজন? ওই এক বউ উমা, আর মেয়ে রঙী। অবশ্য মেয়ের রং মোটেই ফরসা নয়, সুধন্যর মতোই কালো। মেয়ের নাম রঙী দিয়েছে সুধন্য: তার মতে রঙের রাজা কালো।

চোখ মেলে যদ্দূর দৃষ্টি চলে, থৈ থৈ জল, আর জল দেখতে লাগল সুধন্য। এক সময়ে বউকেও ডাকলে। উমা রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলে—উঁ।

'শোন।

হাতের কাজ ফেলে উমা এল আঁচলে হাত মুছতে মুছতে। 'কি গো, কি বলছ?

'ওই দেখ—' দূরের দিকে হাত বাড়িয়ে চরণ বিলের মধ্যিখানের কোমর ডোবা বটগাছটাকে দেখিয়ে বললে—কেমন দেখাচ্ছে বল ত?

উমা ফিক্ করে হেসে ফেললে, 'মরণ! আমার ওদিকে মরার ফুরসুত নেই, উনুনে কড়া চাপিয়েছি, উনি গাছ দেখাচ্ছেন! তুমিই দেখো।'

মুখ ঘুরিয়ে উমা চলে গেল। যেতে যেতে ভাবলে, আহা! অভাবে পড়ে মজুর খাটছে গো, নইলে কবিয়াল হতে পারতো।

মেয়ে রঙী এতক্ষণ উনুনের পাশে বসে-ছিল। মাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরল। জিজ্ঞেস করলে, 'কি বাবা?'

'উই যে—' সুধন্য আঙুল দিয়ে দিক নির্দেশ করলে।

'দৈত্য! না বাবা?'

হুঁ।—মেয়ের মাথা নেড়ে চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিলে সুধন্য।

ভীষণ আদুরে মেয়ে। কাছছাড়া করতে চায় না এক পলকও। সুধন্যরও তাই। কাজ করতে করতে বার বার মনে পড়ে মেয়েটার কথা।

উমাকেও মনে পড়ে, ভিন গাঁয়ে কাজ করতে গেলে। মনে পড়ে যখন খেতে বসে। আর মনে পড়ে রাত্তিরে যখন একা একা কর্তাদের বার বাড়িতে শুয়ে থাকে; তখন।

জলে টান পড়তেই সুধন্য কাজ পেয়ে গেল। এ কাজ পেত না, হঠাৎ পেল। বাবুদের বাড়ির ছোট বউএর বাপের অসুখ। যাওয়ার সুবিধে আছে, তাই ছোট বউ বাপকে একবার দেখে আসবে। নৌকোর করে বউমাকে পৌঁছে দিতে হবে বাপের বাড়ি।

আসা-যাওয়া পুরো দিনের ধাক্কা। সুধন্য রাজী হয়ে গেল। দেড় টাকা মজুরি, আর একবেলা ভরপেট খাওয়া। কম কি?

সুধন্য ভোরে উঠেই চলে গেল।

বড় বাড়ির বড় চাল। বউমা এই বেরোল, এই বেরোল বলে ঝাড়া কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। তবু বউমা বেরোতে পারল না। এটা হয় ত ওটা হয় না, ওটা হয় ত আরেকটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। অতএব নাও নাও।

অবশেষে বউমা বেরোল। সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ: ছোটবাবু আর তাঁদের মেয়ে।

জলে টান পড়লেও বৃষ্টি থামেনি। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি কখনো আঝোরে, কখনো গুড়ি গুড়ি; লেগেই রইল। টোপর-মাথায় হালে বসল সুধন্য, আর বাবুদের রাখাল ছোড়া বংশী বসল দাঁড়ে।

ছই-এর নীচে বাখারির চাটাই-এর উপরে শতরঞ্চি পেতে ছোট বউদের জন্যে জায়গা করা হয়েছে। প্রথমে উঠল সুটকেস, তার পিছু পিছু ছোট বউ, ছোট বউয়ের মেয়ে। অবশেষে উঠলেন ছোটবাবু।

বড়বাবু হাঁক পাড়লেন, 'সাবধানে চালাস সুধন্য। বাদলার দিন, দেখে-শুনে, হুঁশিয়ার।'

গলুয়ে চেপে বসে দাঁড়ের ধাক্কায় নৌকোটাকে ঠেলে দিলে সুধন্য।

নৌকো গতি নিতেই মনে মনে ভাবলে সে, কদ্দিন থাকবে কে জানে। জল থাকতে থাকতে যদি ফেরে আরো একদিনের কাজ হবে। দেড় টাকা মজুরি, ভরপেট এক-বেলা ভাত।

পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা ঢলল।

বংশী কোন কাজের নয়। দাঁড় টানছে মড়ার মত। আলতো হাতে যেন মাছের তরকারিতে হাতা ডোবাচ্ছে। ধমক ধামকেও কাজ হলো না।

উত্তরের খাল আর পশ্চিমের খাল যেখানে নদীতে মিশেছে, সেখানে সে কি জলের তোড়। এ ধারা ও ধারা মিলে সৃষ্টি হয়েছে পাকের। যেন কুমোরের চাক। ঘুরছে আর ঘুরছে। পশ্চিম খালের মুখের বড় হিজল গাছটাকে ঘিরে যেখানে বেত-বন, বেত-বনের গা ঘেঁষে বড় কাঁটা মাদারের ধার দিয়ে নৌকো আনতে গিয়ে সে কি অবস্থা সুধন্যর। যেমন পাক, তেমনি টান। ডাইনে হালে চাপ দিয়েছে কি পলকে নৌকোর মাথা বাঁয়ে ঘুরে গেল। সুধন্য চীৎকার করে বংশীকে বললে—'দেখছিস কি, টান জোরে।'

আর টেনেছে! শেষ পর্যন্ত ছোটবাবুকে ছুটে গিয়ে দাঁড় ধরতে হল, বউ মেয়েকে ছেড়ে। এদিকে মেয়েটার সে কি কান্না। বউটিও তেমনি। খিড় বিড় করে কি যেন বকছে। কোথায় মেয়েকে সামলাবে তা না, ওদিকে উনিই বেসামাল।

সুধন্যর ততক্ষণে হাঁফ ধরেছে। আরেকটু হলেই হিজলের গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে নৌকো ডুবছিল আর কি, সুধন্য হাল ফেলে গাছের ডাল ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিলে যে, নৌকো পাশ কাটিয়ে পাকের বাইরে এসে গেল। নৌকো বাঁচল, ছোটবাবুরাও বাঁচল, কিন্তু সুধন্য পড়ে গেল জলে। ছোটবাবুও টাল সামলাতে না পেরে পড়ছিল আরেকটু হলে, বংশী পাশে ছিল তাই রক্ষে। ধরে ফেলল।

সুধন্য কয়েকবার ডুবে, শেষে সাঁতার

কেটে নৌকো ধরলে। জলে থাকতে তার মনে হয়েছিল এক্ষুনি বুঝি সব শেষ হয়ে যায় এমনি জলের টান। বংশী হাত ধরতেই সুধন্য আবার উঠে বসল হালে।

আগেই ভিজে গিয়েছিল বৃষ্টির ছাটে, এবার ভালো করে নেয়ে উঠল।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কাপড় বদলাবি সুধা?'

সুধন্য ঘাড় নাড়ল। 'এতে কিছু হয় না ছোটবাবু।'

ছোটবাবুও ভিজে গেছেন। বংশীকে দাঁড়ে বসিয়ে আবার ছই-এর তলায় এসে ঢুকলেন ছোটবাবু। ছোট বউ তৎক্ষণে সুটকেস থেকে তোয়ালে বের করে আচ্ছা করে মুছে দিলেন ছোটবাবুর মাথা।

সুধনার বেশ লাগল, ছোট বউএর মাথা মোছানো।

ছোটবাবুও ভিজে গেছেন। বংশীকে কোলে তুলে নিলেন।

মেয়েটা ভীষণ দুষ্টুমি করছে। ছোট-বউ ধমক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। ফাঁকে ফাঁকে ছোটবাবু আর ছোটবউ কথা বলছে টুকটাক। এক একটা কথা বলে, সাথে সাথে দুজনেই হাসে। সুধন্য আড়ে আড়ে দেখছিল এসব। এক সময়ে ছোটবাবু কি একটা কথা বললে যেন, ছোটবউ আঁচলে মুখ ঢেকে ধমক দিলে—আবার!

কথাটা শুনে সুধনার মনে পড়ল উমার কথা এবং মনে হল, কি আশ্চর্য! ছোট-বউ-এর ধমকের সুর আর উমার ধমকের টান একই রকম।

উমার মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। মুখের আদলে কোন মিল নেই, যেন চন্দন পাহাড়ের সাথে ছাগলের ধান খাওয়া, অথচ ধমকের ধাঁচটা এক।

মেয়েটা এক সময়ে বাপের কোল ছেড়ে হালের কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ দেখতে মেয়েটি, টুকটুকে লাল রঙ, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গোলগাল মুখখানা ভারি সুন্দর। যেন প্রতিমা। পরনে কুচিয়ে কুচিয়ে সেলাই করা জামা, পায়ে আবার আলতা দিয়েছে, কপালে দিয়েছে কালো কাজলের টিপ। চোখের দিকে নজর পড়তেই সুধনার অবাক লাগল।

কি সুন্দর এক জোড়া চোখ, ভুরুতে কাজলের টান, বেশ মানিয়েছে।

সুধন্য বললে, 'এই যে লক্ষ্মী মা, কি দেখছো?'

'জল'। মেয়েটা দু'হাত ছুঁড়ে জল দেখালে।

'উই দেখছো—' সুধন্য হাত তুলে দূরের কোমরডোবা একটা গাছ দেখালে।

উ মা গো, দৈত্যি।

বলার ভঙ্গীতে সুধনার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে পারলে না, মনে পড়ল রঙীর কথা। ভারি মিল।

সুধনার ইচ্ছে হল মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মনের মত আদর করে। কিন্তু কি ভেবে ভীষণ সংকুচিত হয়ে গেল।

মেয়েটা তৎক্ষণে আবার বাবার কোল আলো করে বসেছে। ছোটবাবু, ছোটবউ গা ঘেঁষাঘেঁষি বসে। সুধনার ইচ্ছে হচ্ছিল, সেও যদি উমাকে এভাবে পাশে বসিয়ে কোথাও যেতে পারতো! দূরে দেশে অথবা ভিনগাঁয়ে। অনেকক্ষণ সে-কথাই ভাবলে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল চিন্তা করতে করতে। দূরে কোথাও যাবার জায়গা নেই, এমন পোড়াকপাল তার।

ছোটবউ-এর বাপের বাড়ির ঘাটে নৌকো ভিড়ল। প্রথমে সুটকেস উঠল, পিছু পিছু ছোটবউ, তাদের মেয়ে, সবশেষে ছোটবাবু।

খেয়েদেয়ে আবার নৌকোয় চেপে বসল বংশী আর সুধনা। ফিরবার পথে প্রথম প্রথম দাঁড় টানতে ভারি বিশ্রী লাগছিল; মাঝপথে যখন উমা আর রঙীর কথা মনে পড়ল, তখন তার মনে হল তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে বাড়িতে। তারপর ঘরের বেড়ায় হেলান দিয়ে বসবে সুধনা, পাশে জোর করে বসাবে উমাকে, কারণ সুধনা জানে উমা কিছুতেই বসতে রাজী হবে না, তবু জোর করে বসাবে। রঙীকে কোলে নিয়ে চুলে বিলি কাটবে সুধনা, আর এমন একটি কথা বলবে যে, উমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে উঠবে—আবার!

সন্ধ্যে হবার একটু আগেই বাড়ি এসে ঢুকল সুধন্য। তখন ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়ে বুঝি।

মেয়েটা যেন বাপের আসা-পথ চেয়েই বসেছিল। দাওয়ায় পা দিতে না দিতেই গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল। বললে, 'উই যে, মাছ ধরবে।'

দাওয়ার এক পাশে একটা পলো, কত-গুলো সরু সরু বাঁশের কাঠি, আর দলা পাকানো একতাল মাটি।

সুধন্য উমাকে শুধোলে, 'কি হবে গো?'

মেয়েটার দিকে চেয়ে বললে উমা, 'মুখ-পুড়ীকে জিজ্ঞেস করো।'

উমার গলার স্বর ভালো ঠেকল না সুধন্যার কানে। বললে, 'হলো কি?'

উমা যা বললে, তা সংক্ষেপে এই:

দুপুরে কানুদের বাড়ি গিয়েছিল জল ঠেঙিয়ে। দেখেছে চিংড়ি মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা খাচ্ছে। তা মেয়ে তার হা-পিত্যেশ করে বসেছিল। কেউ ওকে খেতে বলেনি। ফিরে এসে বাড়ি তুলেছে মাথায়। কত করে বললুম, তা কার কথা কে শোনে।

উমা বুঝিয়েছে—ওরা তো মাছ কিনে এনেছে; তাই না মাছ এসেছে।

মেয়ে দুহাতে মাকে বুঝিয়েছে, কেনেনি, খুদ পলো দিয়ে মাছ ধরেছে।

মেয়েকে রেগে চড়চাপড় দিয়েছে, আর তাই দুপুরে ভাত মুখে দেয়নি এক-মুঠোও। সারাক্ষণ মাকে জ্বালাতন করে করে বাঁশের কাঠি তৈরী করিয়েছে; খুদ পুড়িয়ে গোবর আর মাটি মাখিয়ে তৈরী করে রেখেছে।

উমা বললে, 'মেয়ে ত নয়, পেত্নী ধরেছি পেটে। মাছ মাছ করে ছিঁড়ে খাচ্ছে।' সুধন্যার ক্লান্তির কথা ভেবেই মেয়ের চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গজ গজ করতে লাগলে, 'সারাদিন খেটে এল মানুষটা, এখন মাছ? মর। মর।'

ভালো করতে গিয়েই খারাপ হয়ে গেল। সুধন্য তড়াক করে পিঁড়ি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার জুড়ে দিল। 'তুই মারবার কে রে?'

উমাও ফোঁস করে উঠল সাথে সাথে।

'আদেখলেপনা খুউব ভালো, না?'

'খুউব ভালো।'

'তাহলে মরোগে বাপ-মেয়েতে।'

'কি? কি বললি ভর সন্ধ্যেয়?' —উমার চুলের মুঠি ধরে জোরে ঝাঁকুনিই দিয়ে দিলে সুধন্য। চড় কষাতে যাচ্ছিল, উমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর পারলে না।

ঝাঁকুনি খেয়েও উমা হুঁকো এনে দিলে তামাক সেজে। তামাক শেষ হতেই সুধন্য কাঠিগুলো আর খুদের ঢেলাটা নিয়ে উঠোনে নামল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। পূর্ণিমার পর ছ ছটা দিন কেটে গেছে। সুধন্য অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ তুলে আকাশ দেখার চেষ্টা করল। কিছুই দেখা গেল না। বড্ড কালো আকাশ। জবরজং মেঘ করেছে হয়তো।

ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল এক ঝলক। বেশ শীত শীত করছিল। গায়ে একটা কিছু জড়ালেই হতো, সাথে সাথে মনে হল একটু পরেই তো গা ডুবিয়ে মাছ ধরতে হবে, লাভ কি?

পিছল পথ। পা এখানে দিলে ওখানে চলে যাচ্ছে। দু চারবার আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল। খাইটা ডাইনে রেখে বেত-বনের অন্ধকারে অন্ধকারে মাদারের সারি-গুলোকে বাঁয়ে রেখে তেঁতুল তলা দিয়ে মাঠে নামল সুধন্য। অনেকদূরে পর্যন্ত থৈ থৈ জল।

বেশ কিছু জল ভেঙে একটু উঁচু জমিতে উঠল সুধন্য। এখানে কোমর জল। এক একটা কাঠি নিয়ে নাক বরাবর দক্ষিণে কাঠি পুঁতে খুদের দলা পাকিয়ে ছোট ছোট আলতো হাতে বসিয়ে দিলে কাঠির গোড়ায়।

কাঠি পুঁতে যখন ফিরল তখন আরো ঘন, গাঢ় হয়েছে অন্ধকার।

সুধন্যর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

ফিরে এসে আবার দাওয়ায় বসল সুধন্য। পলোটাকে নামিয়ে রাখল উঠোনে। হুঁকোতে টান দিতে দিতে ভাবলে, সারা দিনের ভাবনার কথা। মনে মনে হেসে ভাবলে—গরীবের আবার ছোটবাবুর মতো মেয়ে কোলে নিয়ে আদর করা!

সে ভাবলে, উমা যদি ওর বেয়াড়া ইচ্ছের কথা শুনতো, নিশ্চয়ই দাঁতে জিভ কেটে গালে হাত দিয়ে বলতো—মরণ! এ আবার কেমন শখ! আবার মনে হল, উমা হয়তো ও-কথা বলতোই না। বলতো—এ আর এমন কি! এসো বসি মেয়ে কোলে নিয়ে। এ চিন্তাও সুধন্যর মনে বেশিক্ষণ ঠাঁই পেল না, তার মনে হল, উমা হয়তো ভীষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। শেষে এক সময়ে ফিক্ করে হেসে ফেলতো।

পলো হাতে উঠে দাঁড়াল সুধন্য। উমা তখনো ডুলায় দড়ি বাঁধছে।

সুধন্য বললে, 'হলো? নইলে খুদে খেয়ে মাছ পালাবে।'

উমা তাড়াতাড়ি উঠে এসে সুধন্যর কোমরে ডুলার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'দেরি করো না কিন্তু।'

আশ্চর্য! উমা চুলের ঝাঁকুনি খেয়েও একটুও রাগ করেনি। সুধন্যর অবাক লাগল।

মেয়ে রঙী দাওয়ার খুঁটি ধরে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বড় বড় এনো বাবা।'

মেয়ের চুলগুলোকে এলো করে দিয়ে ও বললে, 'আনবো। এত বড়।' হাত দিয়ে মাছের আকার দেখালে।

আবার সেই অন্ধকার পথ। তেঁতুল তলা দিয়ে মাঠে নামতে নামতে বিড়-বিড় করে মতির-মার নাম নিলে। মতির-মার নাম নিলে খুদে মাছ আসে, এমন প্রচলন আছে এ অঞ্চলে।

জলে নামতে না নামতেই বৃষ্টি এল অঝোরে। হুড়মুড় করে বৃষ্টি। ফোঁটা ত নয়, যেন শর। গায়ে বিঁধছে।







প্রথম কাঠিটা ঠাওরই হলো না। এগোতে গিয়েই পায়ের চাপে ভেঙে গেল। —এই যা!

সুধন্যর মন খারাপ হয়ে গেল। শুরুতে একি অযাত্রা!

পরের কাঠি হাত চার পাঁচ দূরেই। ঠাওর করে এগিয়ে পরের কাঠিতে পলো চাপল সুধন্য। একটি বাচ্চা চিংড়ি। ভীষণ ছোট। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় এমন ছোট। অনেক কষ্টে সেটাকে ধরল সে। শুরুর মাছ, ডুলায় রাখতে রাখতে আরেকবার মতির মার নাম নিলে সে।

মাথার উপরে আকাশটাই যেন ভেঙে পড়বে। কোমর-জলে দাঁড়িয়েও সুধন্যর মনে হল সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। শীতে নয়, ভয়ে। আরো পাঁচটি কাঠি চাপল সে। দুটো বুড়ো-আঙুলে প্রমাণ চিংড়ি। মন কেমন খুশী খুশী হয়ে উঠল।

সে মনে মনে হিসেব করে দেখলে, আটচল্লিশটি কাঠি এখনো বাকি। কম করে আরো দশ বারোটি মাছ সে পাবেই।

আরেকটি কাঠি চাপল সুধন্য।

টুপ টুপ জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। শোঁ শোঁ বাতাস। জলে ঢেউ উঠছে। খৈ ফুটছে যেন ধারা-পাতের শব্দে। বেশ বড় রকমের একটা মাছ ধরল সুধন্য।

একটা বাজ পড়ল।

চমকে জলে মুখ লুকোল। মাথা তুলতেই কেমন সির-সির করে উঠল শরীরটা। বার কয় ভগবানের নাম নিল মনে মনে।

মাছটা ডুলায় রাখতে রাখতে ঠিক করল এ মাছটা আজই ভাজা করে রঙীকে দিতে হবে। বেশ বড় মাছ। হাত দিয়ে অনুভব করল মাছের শরীর। খুব খুশী হবে মেয়েটা।

আরেকটি কাঠিতে পলো চাপল।

কানে যেন তালা লাগল সুধন্যর। বাবা! কি বাজখাই বাজ। কোথায় পড়ছে কে জানে। হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার। আগুন যেন মাঠ চিরে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে, জলের উপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই হয়ে।

আকাশের দিকে তাকাল সুধন্য। ঘন মেঘ চিরে চিরে এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে, আঁকা-বাঁকা বিজুলী। গুম গুম, গম গম শব্দ হচ্ছে আকাশে।

পলোর তলায় হাত চালিয়ে দিল সুধন্য।

তারপরের বাজ যখন পড়লো, তখন—

উমা প্রথম বাজ পড়ার শব্দেই চমকে উঠেছিল উনুনের ধারে বসে। হঠাৎ খেয়াল হতেই বেরিয়ে এল দাওয়ায়। রঙী দাওয়ায় খুঁটি জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি কোলে করে ঘরে নিয়ে এল,

উমা। মনে মনে ভীষণ বকল মেয়েকে। অলক্ষীছাড়া মেয়ে, সোহাগে গা জ্বলে যায়!'

উমা বিড় বিড় করে বকতে বকতে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দিল। উনুনের ধারে আসার আগেই দ্বিতীয়বার বাজ পড়ল। কাঠে আগুন দিল উমা। বাতিটা হাতের আড়াল করে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। মনে মনে ঠাকুরের নাম জপলে বার বার।

বাইরে দৃষ্টি মেলে দেখবার চেষ্টা করলে উমা। কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! দক্ষিণের গাছগুলো দেখা যাচ্ছে না, এমন কি উঠানের কুমড়োর মাচাটাও নয়। শুধু তুলসী গাছটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। চারদিকে ভীষণ বিশ্রী অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, আর ডাকছে ঝিঁঝিঁ।

উত্তরের পুকুরঘাটের অশ্বত্থগাছে তক্ষক সাপটা ডেকে উঠল হঠাৎ। ঠোঁ-ও কো...ও ঠোঁ-ও কো...ও......

উমাও ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে মনে মনে বললে—ঝড় বাদলার রাতেও ক্ষান্তি নেই। সাথে সাথে মনে হল—আহা! ডাকবে না? ভয় পেয়ে ডাকছে হয়তো।

উমাও ভাবছিল। মানুষটা ঝড় জলে কোথায় কি করছে কে জানে? অন্ধকার কাঠি ঠাওর পাচ্ছে ত? না বাপু, যখন এত বৃষ্টি পড়ছে চলে এলেই পারতো। কি হবে মাছ দিয়ে? যদি ঠান্ডা লেগে জ্বরজারী হয়? আবার মনটাকে ঝেড়ে ফেলল—। গা কেমন ভার ভার ঠেকে উমার।

ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি। চাল বেয়ে ধারা গড়াচ্ছে মাটিতে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। যেন পৃথিবীটাকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে ফেলবে।

পিদিমটা হঠাৎ বাতাসে নিভে গেল।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল উমা। যদি এখন ফিরে আসে মানুষটা। যদি দেখে ঘর অন্ধকার, তখন ভাববে কি? তাকে দেশলাই খুঁজতে লাগল তাড়াতাড়ি। আরেকটা বাজ পড়ল, আকাশ ফাটানো। দাঁড়িয়ে ছিল উমা, বসে পড়ল। মাগো! এমন বাজও পড়ে।

দেশলাইএ হাত ঠেকল। দ্রুত বাতি জ্বালিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবলে—কে জানে কোথায় পড়ল এত বড় বাজটা।

—মানুষের উপর?

না, না। মানুষের উপর পড়বে কেন? তাদের ঘরসংসার আছে, বউ-ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের উপর পড়বে কেন? —উমা মনে মনে বললে।

—তাল গাছের উপর?

প্রথমে মন বললে—পড়ুক, গাছের উপরই পড়ুক। বাড়ির পেছনের পেঁপে গাছটার কথা খেয়াল হতেই মন সংকুচিত হয়ে গেল উমার। একটিমাত্র ফলন্ত গাছ সারা বাড়িতে। তার মন বললে—না, না। গাছের উপরই বা পড়বে কেন?

—তা হলে?

অনেক ভেবে উমার মনে পড়ল, যদি বাজ পড়ে, তবে পড়ুক দক্ষিণ-বিলের ঝাড় পুকুরের পাড়ের মরা তাল গাছটার উপর।

উমার মন খুশী হলো বাজ পড়বার একটা ক্ষেত্র খুঁজে পেয়ে। ভীষণ খুশী হল। এবং সাথে সাথে তার মনে হল—বড্ড দেরি করছে সে। এত দেরি হচ্ছে কেন? এত দেরি হবার ত কথা নয়?

উমা কুপিটাকে তুলে ধরে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করল। অন্ধকারের দেয়াল ডিঙোতে না পেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল তার। ভাবলে—ফিরে আসুক একবার লোকটা, তারপরে আর কোনোদিন যেতে দেবে না সে: কোনোদিনও না। এবং, আজ কেন যেতে দিল একথা ভাবতে ভাবতে উমা কুপি হাতেই বসে পড়ল দাওয়ার উপর। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে সে, ঠিক তেমনিভাবে বাঁশের খুঁটিটাকে জোরে আঁকড়ে ধরে, খুব জোরে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই উমার। এক সময়ে তার মনে হল মাথা ঘুরছে, দুলছে পৃথিবী, অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। তারপরে আর কিছুই জানে না উমা; সমস্ত কিছুই অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

মুক্ত-কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবী। উমার মত রাত্রিও মূর্চ্ছিত হয়ে গেল।




**চক্রদত্ত**

সম্প্রতি রাশিয়ায় কতকগুলি কৃত্রিম সমুদ্র তৈরী করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, সাইবেরিয়ার নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে শীঘ্রই আরও মানুষের তৈরী সমুদ্র সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এই জলাশয়ের নাম দেওয়া হবে—"ওব সাগর।" বৈজ্ঞানিকরা মনে করছেন যে, ওব সাগরের বাড়তি জল মধ্য এশিয়ার দিকে চালিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে পারবেন, ফলে ঐ স্থানের চল্লিশ কোটি হেকটর ভূমি ঐ জল দিয়ে উর্বরা হয়ে উঠবে। ঐ চল্লিশ কোটি হেকটর ভূমি, সমগ্র বৃটেন, বেলজিয়াম নেদারল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার সমপরিমাণ। মধ্য এশিয়ায় ওব সাগরের জলধারা প্রবাহিত করার জন্য এরা দুটি পরিকল্পনা করেছেন। অবশ্য ওব সমুদ্রের জল সেচের জন্য যে ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকরা করছেন সেটা ওব সমুদ্রের প্রয়োজনীয়তার প্রাথমিক ব্যবস্থা নয়। বস্তুত ঐ জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই প্রধান কাজ। এখান থেকে এত বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছিল যে, সমগ্র রাশিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে ১৯৫০ সালে যতটা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল প্রায় তারই সমান। এখন ওব সাগর থেকে ৯০০০০ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী করা হচ্ছে এবং সমস্ত বিদ্যুৎটাই ঐ দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কারণেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

*

প্রসব বেদনার কষ্ট হ্রাস করা শিবেরও অসাধ্য বলে এতদিন জানা ছিল, কিন্তু এখন দক্ষিণ জোহানসবার্গের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই কষ্ট লাঘব করার একটি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। প্রসূতিকে এক রকম প্লাস্টিক পোশাক পরান হয় এবং পোশাকটি এমন ভাবে তৈরী যে, প্রসূতির তলপেটে চাপের পরিবর্তন ঘটানর জন্যই প্রসূতির কষ্ট কম হয় এবং তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসবে সহায়তা করে। সাধারণত প্রসূতির তলপেটে যে ওষুধ মালিশ করে স্থানীয় স্নায়ুগুলি অবশ করা হয় সেই ওষুধের প্রয়োগ দেখেই বৈজ্ঞানিকগণ ঐ চাপের পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০০টি প্রসূতির ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ঐ পোশাকের দ্বারা শুধু যে প্রসূতির কষ্ট কমান সম্ভব হয় তা নয়, প্রসব বেদনা কম হওয়ার জন্য সদ্যজাত শিশুর ওপরও কম ধকল পড়ে।

*

"সোনার পাথর বাটি" কথাটা রসিকতা বৈ কিছু নয় কিন্তু "ইস্পাতের কাঁচ" কথাটার মধ্যে রসিকতার ছিটে ফোঁটাও নেই। সোভিয়েট রাশিয়ার "অ্যাকাডেমি অব কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার" একরকম প্লাস্টিকের বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। প্লাস্টিকগুলো ইস্পাতের মতই মজবুত হবে কিন্তু কাচের মত হাল্কা। সাধারণ ইস্পাতের ওজনের চেয়ে পাঁচ-ছয় গুণ হাল্কা হবে। একটি তিনতলা বাড়ির ওজন হবে মাত্র ৪৮ টন। এই ইস্পাত-কাঁচ দিয়ে একাধারে সুন্দর এবং মজবুদ মোটর বোট, মোটর গাড়ি (অবশ্যই ইঞ্জিন নয়) এবং অন্যান্য নানা ব্যবসায়ের জিনিসপত্র ও ঘরের আসবাবপত্র তৈরী করা হবে। বড় বড় প্লাস্টিকের চাদর তাড়াতাড়ি জুড়ে নিয়ে ঘরের দেওয়াল তৈরী হয়! সুতরাং অটোক্লোনের সাহায্যে এইরকম অনেকগুলি প্যানেল জুড়ে অনায়াসেই একটা বাড়ি তৈরী করা যাবে। শুধু দেওয়ালে নয়, ঘরের পার্টিশান, জানলা, কড়ি বরগা, এবং পাইপ এমন কি ঘরের আসবাবপত্র পর্যন্ত ইস্পাত-কাচ দিয়ে তৈরী করা যাবে। এখনকার সাধারণ বাড়ির ঢালাই করা ছাদওয়ালা বাড়ির চেয়ে এই প্লাস্টিক দিতে তৈরী বাড়ি কোনও অংশেই কম মজবুত হবে না।

*

যন্ত্রটি সত্যই চমকপ্রদ। এটির বৈজ্ঞানিক নাম 'ইলেকট্রোনিক কমপিউস্টার' আর সাধারণে বলেন—'ইলেকট্রোনিক ইতিহাসের বই।' এই যন্ত্র দিয়ে খৃষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর ইংরাজী, ফরাসী ইটালিয়ান, ডাচ, স্প্যানিশ, সুইডিশ, পর্তুগীজ, জর্মান এবং রাশিয়ান ইত্যাদি ভাষার যে কোনওটিতে অনায়াসে জানা যায়। এমন কি সর্বজাতির বোধগম্য একটা মধ্যবর্তী ভাষাতেও ঐ যন্ত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে সময়ের বা যে শতাব্দীর ঘটনা জানতে হবে সেটি একটি কার্ডে লিখে যন্ত্রটির মধ্যে ভরে দিলে এক সেকেণ্ডের তিনভাগের একভাগ মাত্র সময়ের মধ্যেই উত্তরটি টাইপে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে।

*

একটি বৃটিশ কোম্পানী এক নতুন ধরনের টাইপ রাইটিং যন্ত্রের ফিতে তৈরী করেছেন। এই ফিতা দিয়ে প্লাস্টিকের যে সব জিনিস পাঠাতে হয় সেই মালপত্রে কাগজে লেখা লেবেল এঁটে দিলে অনেক সময় জলে বা অত্যধিক হাত লাগায় ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের চাদরে টাইপকরা লেবেল আঁটলে আর সে

সম্ভাবনা থাকে না, যে কোনও সাধারণ টাইপরাইটিং যন্ত্রে এই ফিতে লাগান যাবে। এগুলো টাইপরাইটারের সাধারণ ফিতের মতই দেখতে। এমন কী সাধারণ ফিতে যে উপকরণে তৈরী এই ফিতেও সেই একই উপকরণে; শুধুমাত্র এই ফিতেগুলোকে এক নতুন রকম কালির দ্বারা সংপৃক্ত করা হয়।

*

মোটর দুর্ঘটনা, ট্রেন দুর্ঘটনা, বিমান দুর্ঘটনা ছাড়াও নৌকাডুবিতে বহু প্রাণ-হানির খবরও আমরা পেয়ে থাকি। বিশেষতঃ বর্ষাকালে এইরকম অপূরণীয় ক্ষতির কথা বেশী শোনা যায়। আজকাল একরকম নতুন ধরনের নৌকা তৈরী হয়েছে। সেগুলো কোনওমতেই ডুবে যাবে না। রবার ও প্লাস্টিকের সংমিশ্রণে যে পদার্থ তৈরী হবে তাই দিয়েই নৌকাটি তৈরী করা হবে। ঐ পদার্থ দিয়েই নৌকার কাঠামোটা তৈরী হবে এবং তার পর কাঠের তক্তা লাগিয়ে নৌকাটি সম্পূর্ণ করা হয়। নতুন পদার্থ দিয়ে কাঠামোটি তৈরী হওয়ার দরুণই নৌকাটির ভাসার ক্ষমতা বেশী হয়। বস্তুত কোনও কারণেই ডোবে না।

*

আমেরিকার কৃষি বিভাগ সম্প্রতি আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। এই কাগজগুলি লেখার কাজে ব্যবহারের উপযোগী নয় তবে মোড়কের জন্য বেশ কার্যকরী। এগুলো বেশ মজবুত এবং টেঁউখেলান। এই কাগজ দিয়ে এর মধ্যে ১২০০০ হাজার বাক্স তৈরী করা হয়েছে তার ঐ ১২০০০ বাক্সর মধ্যে বোতল এবং অন্যান্য ভারি ভারি পাত্র ভরে দিয়ে সেগুলি জাহাজে করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পাঠিয়ে তাদের দৃঢ়তা এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত এক রাস্তার পাহারাদার পুলিসদের সামনে দিয়ে বিকট গর্জন করে ক্রোম-আর-নীল রঙের একখানি গাড়ি বেরিয়ে গেল। পুলিসদের একজন বললে, 'অতো জোরে চালাচ্ছে, লোক না মেরে ছাড়বে না' বলেই তারা বেগে ছুটন্ত গাড়ির পিছু ধাওয়া করলে।

ক্রমে দেখা গেল ছ'খানি পুলিস গাড়ি নিউ ইয়র্কের ভীড় ভরা রাস্তা ধরে সেই ছুটন্ত গাড়ির পিছু নিয়েছে। পথ রোধ করার নানা নির্দেশ ছড়িয়ে পড়লো, অন্যান্য পুলিস-গাড়িকেও সতর্ক করে দেওয়া হলো।

তারপর পালানো গাড়িখানা হঠাৎ থামতে এমন ব্রেক কষলে যে তিনখানা পুলিস-গাড়ি ঘাড়ে ঘাড়ে ধাক্কা খেয়ে গেল। তারপর পুলিসদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি! ওরা দেখলে সামনের গাড়ি থেকে নেমে এলো, পুরুষ নয়, এক মধ্যবয়সী মহিলা। হেসে হেসে বল্লে আহত পুলিসদের, "কিছু মনে করো না তোমাদের দৌড় করালুম বলে। একটু রোমাঞ্চ উপভোগ করতে চেয়েছিলুম.."

পুরুষেরা হয়তো বলবে মেয়ে চালকদের ধরনই ঐরকম। কিন্তু মেয়েদের গাড়ি চালানোর কম দক্ষতার কোন পরিসংখ্যান জানা না থাকলেও আদালতের রেকর্ড থেকে দেখা যায় মেয়েরা বিশ্রী সংকটের মধ্যে যথেষ্ট পড়ে।

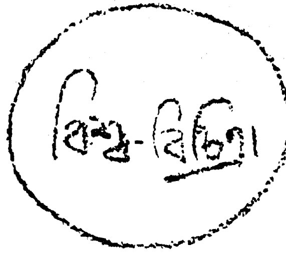
যেমন এডিথ ওলার্ডের ব্যাপার। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর অপরাধে ধৃতা হয়ে কলোরাডোর আদালতে এই কৈফিয়ৎ দেয়ঃ "ধীরভাবে ষাট মাইল গতিতে যেতে যেতে সামনের আয়নায় নিজের মুখটা চোখে পড়াতেই, হুজুর, আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল! আমার মেক-আপটা দেখি বিশ্রী হয়ে গিয়েছে!!"

তাই পিছনের গাড়িকে কোন আভাস না দিয়েই এডিথ চট করে ব্রেক কষে ঘ্যাচ করে গাড়ি থামায়। ফলে পিছনের গাড়িখানি ঘুরে একটা দোকানে ধাক্কা লাগায়। আর একখানি গাড়ি একটা ল্যাম্পপোস্টে লেগে দুমড়ে যায়। কিন্তু এডিথ তখনও এসব গ্রাহ্য না করে নাকে পাউডার ঘষতেই ব্যস্ত।

এডিথের ব্যাপারটা কিন্তু অদ্বিতীয়ম নয়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরের এক মহিলা গালে রুজ লাগাবার জন্যে স্টিয়ারিং তার ছেলের হাতে ছেড়ে দেয়। ছেলেটির বয়েস আট।

কেপ টাউনের পুলিস এক মহিলাকে ধরে যার গাড়িতে উইণ্ডস্ক্রীন, হর্ন, স্পিডোমিটার, ড্রাইভিং গিয়ার, আলো, ব্রেক কিছুই ছিল না। প্রশ্ন করতে মহিলা উত্তর দেয়ঃ "ওঃ, গাড়ির যা সব হাবিজাবি যন্ত্র!"

গত জানুয়ারিতে এক আটষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা মহিলা আমেরিকার সিটলের আদালতে




অভিযুক্তা হয় বিপজ্জনকভাবে চালাবার অপরাধে। পুলিস জানায় যে, মহিলা একটা দুর্ঘটনা থেকে পঁচাশি মাইল বেগে পালিয়ে যায়।

অপরাধ প্রমাণিত হতে মহিলা আদালতকে বলেঃ "মহিলা গাড়িচালকদের ওপর কোন সুবিচার নেই। ঐ পুলিসদের আমার চেয়েও জোরে গাড়ি চালাতে হয়েছে তবেই আমাকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু আমি হলুম গ্রেপ্তার আর ঐ পুরুষগুলো ছাড়া পেয়ে গেল।"

স্টুটগার্টের এক পুলিস দ্রুতগামী একখানি গাড়ির পিছু নিয়ে তার মহিলা চালককে কোণঠাসা করে কৈফিয়ৎ দাবী করতেই দড়াম করে উত্তর এলোঃ "দেখছিলুম পুলিস কতো তৎপর হতে পারে!"

মহিলা ড্রাইভারদের সম্পর্কে কড়া মন্তব্যের জন্য কুখ্যাত লস এঞ্জেলেসের এক বিচারপতি একটি 'মহিলা ড্রাইভার অনামিকা' সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কারুর গাড়ি চালাবার স্পৃহা হলে অপরাপর সভ্যাদের সে ফোন করবে এবং তারা ওকে তার স্পৃহা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

মহিলা ড্রাইভারদের সম্পর্কে একগাদা মামলা হাতে পড়তে টেকসাসের এক ম্যাজিস্ট্রেট তার গাড়ির সামনে একটা বোর্ড ঝুলিয়ে লিখে দেয়ঃ "বড়ো বেশী মহিলা বড়ো বেশী গাড়িতে বড়ো বেশী তাড়াতাড়ি বড়ো বেশী দিকে কুর্যাপ নিয়ে যায়।"

এক দিন পর ভদ্রলোক কাজে বের হতে কে একজন তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে। রাত্রে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়ে রঙ নিয়ে প্রতিটি "উওমেন" (মহিলা) কথা থেকে প্রথম দুটি অক্ষর মুছে দেয়।

আর এটি মেয়ে বেগে গাড়ি চালানোর জন্যে ধরা পড়ায় বলে গাড়িতে গোটা তিরিশ কুকুর বাচ্চা নিয়ে যেতেই যতো ঝামেলায় পড়ে সে।



ইরাকের জাগ্রোস পর্বতমালার কুর্দিশ মেষপালকরা শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে বাঁচতে শানিদর গুহাকে বহুকাল ধরেই কাজে লাগিয়েছে। তাদের ধারণায়ও আসেনি যে, গুহার মেজেটা জঞ্জালের একটা গভীর স্তূপ—যা প্রায় এক লক্ষ বছরের ধারাবাহিক জীবনের কাহিনী বহন করে এসেছে। আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ্‌রা গত বছর সেই জঞ্জাল ভেদ করে নিয়ানডারথল মানুষের অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার করেন। ছবির এই মূর্তিটি তাঁরা একটা পাথরের নিচে পান যার চাপেই তার মৃত্যু হয়। রেডিও-কার্বন বিশ্লেষণে দেখা যায়, লোকটি পঁয়তাল্লিশ হাজার বছর আগেকার যে সময়ে নিয়ানডারথল লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এর ডান হাতটা ক্ষয়ে মিলিয়ে গিয়েছে এবং কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা দেখে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, মানুষের শল্যবিদ্যার এইটেই প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত

কৈফিয়তের দিক থেকে ডিভনের একটি মেয়ের আর জুড়ী নেই বোধহয়। গ্রামের পুলিস ওকে ধরতে বলে: "এতো চাঁদের আলো থাকতে আমার স্পোর্টস-কারে আলোর দরকার হয় না।"

ট্রাফিক আলো টপকে যাবার অপরাধে লণ্ডনের এক মহিলাকে ধরতে বিরক্ত হয়ে সে বলেঃ "ট্রাফিক আলোর দিকেও দৃষ্টি রাখবো আবার রাস্তার দিকেও দেখবো? ঐ জন্যেই তো যতো দুর্ঘটনা ঘটে।"

*

ফটোগ্রাফাররা এবার হাঁচির ছবি তোলার কথা ভাবছেন। অতি দ্রুততার ছবি তোলায় সক্ষম ক্যামেরার সাহায্যে দেখা গিয়েছে, আমরা যখন হাঁচি, তখন জীবাণুপূর্ণ যেসব অণু ঠিকরে পড়ে, তা বের হয় মুখ থেকে, নাক থেকে নয় এবং তার বিস্ময়কর গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে দেড়শ ফিট।

হেঁচে উড়িয়ে দেবার কথা নয় যে, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতে হাঁচি অনেক সময়ে ব্যর্থ প্রণয়ের লক্ষণ প্রকাশ করে।

হাঁচতে হাঁচতে কত যে বিপদ ঘটে, তারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যক্তি এতো জোরে হেঁচেছিল যে, কাঁধের হাড় সরে যাওয়ায় তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। ডাক্তাররা তাকে এক নস্যক ইথার শোঁকায়, যার ফলে আবার তার এমন হাঁচি হয় যে, হাড়টা সেই চোটে তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার এক গণতন্ত্রের নতুন ডিজাইনের নোট তৈরী ব্যাপারে এক খোদাইকার পাঁচ মাস কাজ করে। একদিন তার হাঁচি হতে ডিজাইনটা গেল নষ্ট হয়ে, ফলে আবার তাকে নতুন করে কাজ আরম্ভ করতে হয়।

হাঁচির আরো অনেক কীর্তিই শোনা যায়। প্রচণ্ড এক 'হ্যাঁচ্চো' এক-যুদ্ধপ্রবীণ ব্যক্তির নাকের মধ্যে দিয়ে তার মাথায় বিশ বছর ধরে আটকে থাকা একটা বুলেট বের করে দেয়।

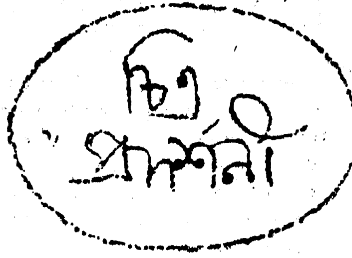
পর্তুগালের এক মহিলা তার ডাক্তারকে জানায় যে, জানলা দিয়ে ফুলের সামান্য রেণু উড়ে এলে বা দাড়ি কামাবার সময় সাবানের ফেনার নগণ্য এক টুকরো নাকে সেঁদলেই তার স্বামীকে সে হাঁচতে হাঁচতে শুয়ে পড়তে দেখে। মহিলা বলে যে, জামা বা টুপী ঝাড়বার সময় ধুলোর সামান্য কণাও ওকে আধ ঘণ্টা ধরে হাঁচিয়ে তোলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ও ধরনের হাঁচি অতি সুড়সুড়ে নাসার লক্ষণ। হাঁচি জীবাণু তাড়িয়ে দেয়।

আর হাঁচির রেকর্ড? এডিনবরার এক ব্যক্তি ১৯২৭ সনে একের পর এক ছ'শ নব্বুইবার হেঁচেছিল। ১৯৪৯ সনে এক স্কুলের ছাত্র ঘণ্টায় বারশ' বার হেঁচেছিল। কালিফোর্নিয়ার বেটি গ্রোস নামক এক মহিলা হাঁচিতে পৃথিবীর রেকর্ড করে রেখেছে। কানের ভেতর তীব্র একটা সাঁই, সাঁই শব্দ যতোবার পায়, ততোবারই দশ সেকেণ্ড ধরে তার হাঁচি হয়—এই ধরে দু লক্ষবার সে হেঁচেছে।

*

জর্মানীর ব্রেমেরহেভেনের সামরিক দন্ত-চিকিৎসক লেফটেন্যান্ট লেবার্ট ফিঙ্কেলের ককার-স্প্যানিয়েল ব্যাঞ্জোর একটা দুঃখু আছে, তবে একদিক থেকে ও কিন্তু অদ্বিতীয়।

দাঁতের যন্ত্রণায় ব্যাঞ্জোকে ভুগতে দেখে ডাঃ ফিঙ্কেল ওর দাঁতগুলো তুলে ফেলেন, কিন্তু হতভাগ্য ব্যাঞ্জোর খাওয়া এতো কষ্ট-সাধ্য হয় যা দেখে ডাঃ ফিঙ্কেলের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কুকুরের কৃত্রিম দাঁত তো হয় না, তাই ডাঃ ফিঙ্কেল কৃত্রিম মানুষের দাঁতই ওর মুখে লাগিয়ে দেন। দাঁত প'রে ব্যাঞ্জো বহুবার গলায় ঠেলে দেয়, শেষে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এখন দ্বিগুণ সময় ধরে আরাম করে চিবিয়ে খাচ্ছে। সে যাই হোক, একটা কিন্তু তার দুঃখু, আগের মতো হাড় চিবোনোর সুখ নেই আর!




সম্প্রতি 'স্টুডিওর' সভ্য-সভ্যাবৃন্দ একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। এ প্রদর্শনীর বিষয়-বস্তু 'কাশ্মীর'। কাশ্মীরের নিসর্গ, কাশ্মীরের বাড়িঘর, কাশ্মীরের অধিবাসী প্রভৃতি।

সতেরজন শিল্পীর প্রত্যেকের পাঁচটি করে ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন নীপা মৈত্র, সন্তোষকুমারী রোহৎগী, অমৃত মাথুর, চিত্রা দত্ত, মিণ্টু দত্ত, সুলেখা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলা সাহা,



দি হেড—সন্তোষকুমারী রোহৎগী

জিজাবাই দত্ত, শম্ভু শীল, সুদর্শন বেনেগল, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্যামল বসু, অমিয় দত্ত, বেণীমাধব লাহিড়ী, ফাল্গুনী দাশগুপ্ত, সত্যব্রত ভৌমিক এবং দিলিপকুমার দাশ-গুপ্ত।

প্রদর্শনীটি যথার্থই উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রীমতী নীপা মৈত্রের প্যাস্টেলের প্রতিকৃতিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিকৃতি রচনায় শ্রীমতী মৈত্রের দক্ষতা অনস্বীকার্য। রচনা-ভঙ্গী বলিষ্ঠ এবং সাবলীল। এঁর একক প্রদর্শনীতে কিছুদিন আগে যে কাজ দেখে-ছিলাম তা থেকে অনেক উন্নতি করেছেন বলে মনে হয়। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী রোহৎগীর কাজেও অনেক উন্নতি লক্ষ্য করলাম। ইনিও বেশ শক্তিশালী পোর্ট্রে-টিস্ট। এ প্রদর্শনীতে এঁর শ্রেষ্ঠ কাজ 'দি হেড'।

জলরঙের ছবিগুলির মধ্যে সত্যব্রত ভৌমিকের 'দি ব্রিজ, পাহালগাঁও' এবং 'স্নোজ সোনামার্গ', এই দুটি রচনার উল্লেখ সর্বাগ্রেই করতে হয়; সূক্ষ্ম রেখা এবং ওয়াশের কাজ মিলে যে মৃদু দোলায়মান ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে, এ দুটি ছবিতে তা একমাত্র চীনা আর্টেই লক্ষ্য করা যায়। বর্ণিকাও চীনা আর্টের কাছ ঘেঁষে গেছে। ছবিগুলি সত্যই লোভনীয়। শিল্পী প্রথা প্রকরণের যে কৌশল এবং প্রকৃতির মধ্য থেকে সৌন্দর্য চয়নের যে ক্ষমতা দেখিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

দিলীপকুমার দাশগুপ্ত এ দলের নেতৃস্থানীয় এবং সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি অভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত শিল্পী। এখানে প্রদর্শিত এঁর প্রতিটি রচনাই পরিণত স্পর্শে রসোত্তীর্ণ। বিশেষ করে 'হাবিব পীর', 'আমিরা কাদাল' এবং 'মকচুর্ণ' অনবদ্য।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা অমৃত মাথুরের 'কমসাস মডেল' এবং 'স্কারলেট ভেল', চিত্রা দত্তের 'বোটম্যান' এবং 'মুগলী', মিণ্টু দত্তের 'লাইট' এবং 'এ কোয়ায়েট ডে', সুলেখা চট্টোপাধ্যায়ের 'অ্যান অ্যাপ্রোচ', নির্মলা সাহার 'গ্রে মর্নিং, পাহালগাঁও', জিজাবাই দত্তের 'আগেনস্ট দি হিল', শম্ভু শীলের 'দি লিওক' এবং 'ল্যাণ্ডস্কেপ,' সুদর্শন বেনেগলের 'আণ্ডার দি পপলারস' এবং 'এ বিজী ডে', মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর 'পনী হায়ার পাহালগাঁও', 'অন দি ওয়ে টু আলাপাথার' এবং 'মিউলস', শ্যামল বসুর 'মেন স্ট্রীট পাহালগাঁও', অমিয় দত্তের 'ডোঙা' এবং 'য়েলো সাম' বেণীমাধব লাহিড়ীর 'দি টেণ্ট' এবং ফাল্গুনী দাশ-গুপ্তের 'পপলার্স' এবং 'স্নোজ'।

তবে জলরঙের ছবিগুলির মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। দু-একজন ব্যতীত প্রায় প্রত্যেকেরই প্রয়োগ-শৈলী একই ধরনের এবং প্রায় সকলের রচনাতেই একই প্রকৃতির বর্ণাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। জোরালো বর্ণ প্রয়োগ করতে সকলেই যেন একটু ইতস্তত করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে একটু-আধটু উগ্র বর্ণের প্রয়োগ থাকলে মনে হয় একঘেয়েমিটা কাটতো। নিপুণ কাজের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রথম ঘরের ছবিগুলি যেন একটু ক্লান্তিকর মনে হয় শুধু ঐ একই ধরনের বর্ণিকা নজরে পড়ে বলে। তৈল মাধ্যমের রচনা-গুলি অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয়, তার কারণ বর্ণের নিবিড়তা সেগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই সেগুলির তাৎপর্য পরিমিত নয়। ইঙ্গিত সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা বিষয়ের দিকে না থাকলেও কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়ে রচনাগুলিতে শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এ দলের শিল্পীরা 'যদ্দৃষ্টং-তল্লিখিতং' নীতির অনুসরণ করেন না বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা ভাবরাজ্যেও



মেইন স্ট্রীট পহলগাঁও—শ্যামল বসু

ডুব দেন না। কাজেই এঁদের আর্ট সহজেই দর্শকেরা উপভোগ করতে পারেন, অর্থাৎ এগুলি ইংরাজীতে যাকে বলা হয় কমিউনি-কেটিভ আর্ট।

'স্টুডিও' পরিচালিত গত গ্রুপ প্রদর্শনীর তুলনায় এ প্রদর্শনীটি সব দিক থেকেই উন্নত এবং উপভোগ্য, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই।



কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় খাদ্যশস্যের দাবী ক্রমাগত বাড়াইবার নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দুর্নীতির যুগে মানুষ নীতি-কথা ভুলে গেছে কিনা তাই; নইলে কে না জানে—আহার-নিদ্রা-ভয় যত বাড়াবে তত হয়"!!

*  *  *

হলুদ-ধনিয়া-জিরা মসলার মূল্যবৃদ্ধি লইয়া অনেকেই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।—"আমরা হইনি। ভাতে ভাত



রাঁধিতে মসলার যে কী প্রয়োজন তা তো জানিনে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*  *  *

বঙ্গীয় চিকিৎসক সমিতি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে "ঘুণধরা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।—"রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কী বা বলবার আছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এতদিন এই ঘুণধরা ব্যাধির খবর ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

*  *  *

একটি সংবাদে শুনিলাম—কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের যখন অধিবেশন চলিতেছিল তখন বাইরে নাকি প্রবল বারি-পাত হইতেছিল। হঠাৎ দেখা গেল, পৌর প্রতিষ্ঠান ভবনের ছাদ চোঁয়াইয়া জল পড়িতেছে। জনৈক কাউন্সিলার নাকি এদিকে পৌরপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। —"কিন্তু শিরে সর্পাঘাত হ'লে ফিতা-ই বা কী করতে পারে"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

*  *  *

পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, খালের জল সংক্রান্ত চুক্তির এখন আর কোন মূল্য নাই।




শ্যামলাল বলিল—"গাং পার হলে খেয়ানীকে অনেকেই শালা বলে"!!

*  *  *

জনৈক পত্রপ্রেরক মফঃস্বল শহরের রাস্তা ঘাটের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।—"ভদ্রলোক নিশ্চয়ই হালে কোলকাতা আসেন নি; এলে বুঝতে পারতেন, গোরাচাঁদের অবস্থা যখন এই, তখন কালাচাঁদের তো কথাই নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*  *  *

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোকের বাগানে একটি হংসাকৃতি পেঁপে ফলিয়াছে, সংবাদপত্রে তার ছবিও দেখিলাম।—"মাছ মাংস তরিতরকারি সব ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। অন্তত ঐতিহাসিক মূল্য সংরক্ষণের জন্য প্রকৃতি হয়ত বিকল্প ব্যবস্থার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন" —মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

*  *  *

জিঞ্জার গ্রুপ" নামে কংগ্রেসে একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা নাকি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে নূতন প্রাণ সঞ্চারের দাবী জানাইয়াছেন।—"ন্যায্য দাবী-ই বলব। কিন্তু জাহাজের মালিকরা কি "আদার" বেপারীর দাবীতে কান দেবেন"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

*  *  *

ষ্টিল ওয়ার্কার্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর রেসিডেণ্ট ডাইরেক্টার দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার অগ্রগতির উল্লেখ করিয়া নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, দুর্গাপুর অদূরে ভারতের "রূঢ়" পরিণত হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তা জানিনে। তবে চাকরি বণ্টনে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর সম্বন্ধে অনেক রূঢ় সত্য শুনেছি"!!

*  *  *

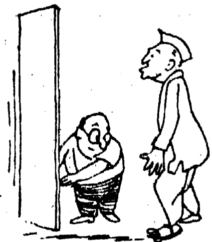
হরিণঘাটার দুধ শীল করা বোতল হইতে কিনিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।—"কিন্তু আমাদের পঞ্চশীল, কোন্‌টা দেখব"—প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

*  *  *

কোন একটি মার্কিন-প্রতিষ্ঠান নাকি মস্কোতে বস্ত্র ধৌত করিবার একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন।—"আশা করি, উদ্দেশ্য জনসাধারণের চোখের সামনে নোংরা জামা কাচার জন্যে নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*  *  *

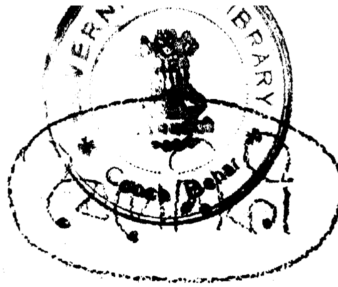
দিল্লীর অশোক হোটেলের কোন কর্মচারী নাকি ধুতিকুর্তা পরিহিত কোন ভদ্রলোককে ভোজন কক্ষে ঢুকিতে দেন নাই। —"সংশ্লিষ্ট উপমন্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলেছেন যে, এ ধরনের কোন বাধা-নিষেধ নেই। না থাকলেই ভালো; তবু বলব,



কর্মচারীটির কণ্ঠ্-লেংগটি মনোভাবের তদন্ত হওয়া দরকার"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

*  *  *

দিল্লীতে একটি ঝটিকা-নির্দেশক যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে।—"সাধারণের এতে নিঃসন্দেহে উপকার হবে। কিন্তু মুশকিল এই, আমাদের সব ঝড় আকাশ থেকে নাবে না। মাটির ঝড় যে আরো মারাত্মক; তার আগমনের সংকেত পাওয়া যায় কি এই যন্ত্রে"—জিজ্ঞাসা করেন বিশুখুড়ো।



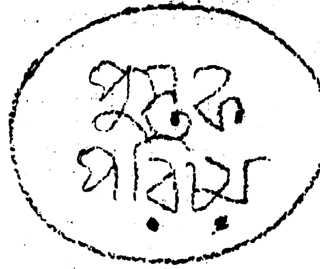
নেপাল ভারত থেকে পৃথক রাষ্ট্র বটে, কিন্তু কোনো ভারতীয়ের মন নেপালকে বিদেশ বলে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। বুদ্ধের জন্মস্থান যে দেশের অন্তর্গত, যে-দেশের রাজধানী পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারা চিহ্নিত, কোনো ভারতীয়ের পক্ষে সে-দেশকে বিদেশ বলে ভাবা কঠিন। সেইজন্য রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নেপাল গমনকে ঠিক বিদেশ যাত্রা বলে কারো মনে হয়নি, যেমন নেপালীদের ভারতবর্ষে দেখলে তাদের বিদেশী বলে কারো মনে হয় না। সেইজন্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের জাপান ও ব্রহ্মদেশ যাত্রাকে রাষ্ট্রপতির প্রথম বিদেশ গমন বলে ভারতীয়দের কাছে লাগছে।

এই জাপান দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণের আরম্ভ হওয়ার মধ্যে কী যেন একটা অন্তঃসলিলা ঐতিহাসিক ধারার ব্যঞ্জনা আছে। কোনো একটা বিশেষ নীতি অনুসরণ করে যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এটা ঘটনাপরম্পরায় ঘটে গেল এবং সেইজন্যই এটা আরো বেশি চিত্তাকর্ষক। কারণ বর্তমান শতাব্দীর অনতিকালপূর্ব থেকেই ভারত ও জাপানের মধ্যে একটা পারস্পরিক আকর্ষণের ধারা চলে এসেছে, যা কখনো সোজা কখনো বাঁকা পথ নিয়েছে, কিন্তু কখনো থামেনি। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপান কর্তৃক রাশিয়ার পরাজয় সারা এশিয়ায় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা বোধ হয় ভারতেই সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর জাপানী অভ্যুত্থানের প্রভাব সর্বজনবিদিত। য়ুরোপীয়েরা যে অজেয় নয়, য়ুরোপের অস্ত্র দ্বারা য়ুরোপকে পরাজিত করা যে অসম্ভব নয় জাপান তার প্রমাণ করে দিয়ে এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলির মনে যে বল সঞ্চার করেছিল, সেটা সত্যই অপরিমেয় ছিল। জাপানীদের বীর্য, কর্মশক্তি ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তের দ্বারাই বোধ হয় ভারতের সে-যুগের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত হতেন। আবার য়ুরোপের কাছ থেকে তার কুগুণগুলি, বিশেষ করে রাজ্যলিপ্সা এবং রণপ্রবণতা আহরণ করার আশঙ্কা জাপানের পক্ষে আছে এবং তার বিষময় ফল কী হতে পারে—এসব মনে করিয়ে দেবার মানুষও ভারতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানী কর্মপ্রতিভা এবং কৃষ্টির একজন সহৃদয় বোদ্ধা এবং জাপানের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন বলেই তিনি জাপানে গিয়ে জাপানীদের সতর্কবাণী শোনাতে দ্বিধাবোধ করেন নি, বন্ধুর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে বৃথা বাক্য বলেন নি, পরবর্তীকালের ইতিহাস তা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে, বহু বিষয় জাপানের দৃষ্টান্ত স্বদেশী যুগের ভারতবাসীদের মনের বল ও কর্মের প্রেরণা জুগিয়েছে। স্বদেশী যুগে শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করতে ভারত থেকে বহু যুবক জাপানে গেছেন।

জাতীয় সত্তা না হারিয়ে য়ুরোপীয় বিদ্যা কীভাবে আত্মসাৎ করা যায় তার কৌশল জাপানের মতো এশিয়ার আর কোনো দেশ বোধ হয় আয়ত্ত করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ অনুকরণ না করে নিজেদের অবস্থায় যে-ভাবে যতটুকু দরকার পাশ্চাত্য প্রণালী প্রয়োগে জাপানের মতো দক্ষ বোধ হয় আর কোনো জাতি নেই। ভারতে অনেক সমস্যা আছে যার সমাধানের ইঙ্গিত জাপানে পাওয়া যেতে পারে। যেমন ছোটো টুকরো টুকরো জমির চাষও অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল করে তোলা যায় তার প্রমাণ জাপানে পাওয়া যায়। বোধ হয় কৃষির ব্যাপারে জাপানী দৃষ্টান্তের প্রভাব এক সময়ে এখানে খুবই দেখা যাবে। একথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, জাপানী প্রথায় ধান চাষই বোধ হয় একমাত্র বিদেশী কায়দা যেটা আমাদের কৃষকগণ এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছায় নিতে আরম্ভ করেছে। স্বদেশী যুগের অনেক ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল জাপানী শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত—সে-সব প্রতিষ্ঠান এখনো জীবিত না থাকলেও তাহার সন্তান সন্ততি আছে। স্বদেশপ্রেমিক বিদ্যান্বেষী ছাড়া বৃটিশ রাজরোষের আওতার বাইরে আশ্রয়ের জন্যও অনেক স্বাধীনতার যোদ্ধা জাপানে যান এবং তার ফলে জাপান ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি প্রধান বৈদেশিক কেন্দ্র হয়ে উঠে। সেই পুরাতন ধারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্রের প্রতিভার সহযোগে যে-বিপুল আকার ধারণ করে এবং যুগান্তকারী ঐতিহাসিক দ্যোতনার বাহক হয় সে-কথা সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের "বিচারে" ভারতীয় জজ ডক্টর রাধাবিনোদ পাল অন্য জজদের সঙ্গে একমত না হয়ে যে পৃথক রায় দেন তার অসামান্য গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনো সকলে সচেতন নয়।

যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে জাপানকে অশেষ অপমান স্বীকার এবং দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। কোনো অপমান, কোনো দুঃখই কিন্তু জাপানের কর্মশক্তিকে চেপে রাখতে পারেনি। তাই পুনরভ্যুদয়ের আলোকে জাপান আবার ক্রমশ উদ্ভাসিত হচ্ছে। সেই আলোতে জাপানকে যখন দেখবেন তখন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের মনে প্রশংসার ভাব অবশ্যই জাগবে। এবং একথাও তাঁর নিশ্চয়ই মনে হবে যে, যুদ্ধ ভালো হোক আর মন্দ হোক, হারার আগে জাপান সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় য়ুরোপীয় প্রভুত্ব এবং ঔপনিবেশিক শাসনের জড় আলগা করে দিয়েছিল।

২৩।৯।৫৮




### ছোট গল্প

জলপায়রা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশনী। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৪ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন আবিষ্কারের নাম 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'। দীর্ঘকাল আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রর এই গল্পটি যখন কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো, মনে পড়ে একটি বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিলো সমস্ত বাংলাদেশের পাঠক মহলে। এর চেয়ে ভালো কাহিনী নিয়ে লেখক যে ইতিপূর্বে অন্য কোনো গল্প রচনা করতে পারেননি তা নয়, 'তেলেনাপোতা আবিষ্কারে' তিনি যে একটি নতুন রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করেছিলেন সেইটেই ছিলো সেদিন সকলের কাছে বড় বিস্ময়। কিংবা তাও সব না; কাহিনীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে, পটভূমির সঙ্গে এ গল্পের রচনভঙ্গিটি নতুন হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে যেতে পেরেছে, তা এতই সূক্ষ্ম যে প্রাথমিক চেষ্টার এতখানি সার্থকতা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিলো।

কিন্তু কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্রর পক্ষে এ ব্যাপার নতুন নয়। অন্তত বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা তাঁর রচনাভঙ্গির বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই প্রথমাবধি লক্ষ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যায় যে, আঙ্গিকের দিক থেকে হঠাৎ কোনো চমক আনার উৎসাহ নিয়ে তিনি গল্প রচনা করতে বসেন না, যদিও আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর চেতনা উদাসীন কখনই নয়। আসল কথা, প্রতিটি রচনায় বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী তার আঙ্গিক লেখকের কাছে নতুন চেহারায় ধরা দেয়। তা না হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছোট গল্প পাঠক সাধারণের কাছে এমন অসাধারণ বলে প্রতিপন্ন হতো না।

গল্প যত চমৎকারই হোক, বিষয়বস্তুতে কোনো চমক নেই। মানুষের দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত জীবনে আছে এক টুকরো হাসি, আছে এক ফোঁটা কান্না। সংযতবাক প্রেমেন্দ্র মিত্র দু-একটি কালির আঁচড়ে তারই নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এক একটি ছোট গল্পের মাধ্যমে। আর সে কান্না-হাসি ছড়িয়ে যায় পাঠকের হৃদয়-মনে অব্যক্ত আনন্দ বেদনা হয়ে। কী অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধ হলে শিল্পকর্মে এ প্রকাশ সম্ভব অন্তত লেখকরা তা বুঝতে পারবেন। বোধ হয় এইজন্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রর রচনা সংখ্যা খুব বেশী নয়। জলপায়রার গল্পগুলো মানুষের সেই দু' এক টুকরো আনন্দ বেদনারই ক্ষণকালের কাহিনী। শিল্পী অধর দাসের নীরব হাহাকার, বাসন্তীর বহু আকাঙ্ক্ষিত মনোবেদনা, বেকার জীবনে অবাধ্য অন্যায়ের প্রশ্রয়, চরিত্রবান শিক্ষক প্যারীবাবুর সাংসারিক পরাজয়, পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি নরেশ্বর সামন্তর সম্মানবোধ—এর কোনোটাই অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সব কয়টি গল্পের মধ্যে লেখকের যে অপরিসীম সমবেদনা, তার স্পর্শ পর্যন্ত যেন অনুভব করা যায়—নয়তো প্রতিটি গল্প পড়ার পর পাঠকের মন এমন উদাস হয়ে যাবে কেন। দম্ভ ও কৌতুকের আড়ালে জলপায়রা গল্পের বিষণ্ণ সুরটাই বা কেন শেষ পর্যন্ত পাঠককে অভিভূত করে রাখে! এর মধ্যে 'চিরদিনের ইতিহাস' এবং 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা' ভিন্ন চরিত্রের দুটি গল্প। প্রথমটি রূপক, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার করুণ পরিণতিটিকে কি লেখক কিছুমাত্র ভুলে বুঝেছেন? দ্বিতীয় গল্পটি নিতান্ত কৌতুক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখার ধরন। তথাপি গল্পটি যে আধুনিক জীবনের কম না হলেও তার একটি সার্থক কেরিকেচার তাতে আর সন্দেহ কি। আর 'পিস্তল' তো বাঙলাদেশের এক অবাঞ্ছিত দিনের মানুষের অমানুষিকতার কাহিনী।

এ গ্রন্থের গল্পগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘদিন আগের লেখা। কিন্তু আজও তাদের আবেদন বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও

সে রচনা পুরনো হয় না, তার সমালোচনা অনাবশ্যক। ৪১২।৫৮

## বিবিধ

**মেষ লগ্নের সব কোষ্ঠী বিচার**—বিমলাকান্ত লাহিড়ী। সূর্য জ্যোতিষালয়, বেহালা, কলিকাতা। মূল্য—চারি টাকা।

মহর্ষি পরাশরের হোরা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচার প্রণালী অনুসরণ করিয়া মেষ লগ্নের লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ১২টি রাশিতে এক একটি গ্রহ সংস্থান করিলে তাহার ফল কি হইবে তাহাই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়-বস্তু। একাধিক গ্রহ-সংযোগে ফলের কিরূপ তারতম্য হয় তাহার বিশদ বিবরণ বইখানিতে না থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত মধ্যে মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসরে কোন কোন গ্রহের জন্য কি কি বিশিষ্ট ফল হওয়া সম্ভব তাহাও গ্রন্থখানিতে দেওয়া হইয়াছে। বইখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রানুরাগী মাত্রেরই প্রয়োজনে লাগিবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য এগারটি লগ্নের সব কোষ্ঠী বিচারের যে ইচ্ছা লেখক নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ফলবতী হউক আমরা সেই কামনা করি। ২৪১।৫৭

**পরমাত্ম তত্ত্ব॥** জনৈক শিষ্য লিখিত॥ প্রকাশক—বিজয়কৃষ্ণ মাণিক, বামুনগাছিয়া, শালকিয়া, ধর্মতলা। মূল্য—১৷৹।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক তত্ত্বজ্ঞ। অল্পের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে সকল কিছু কথাই বুঝাইয়া বলিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার এ বিষয় সম্যক ধারণা বর্তমান।







এখানে এই কথা বলা দরকার যে, গ্রন্থ বিজ্ঞানের দিক দিয়া বইখানির পৃষ্ঠা পরিকল্পনা আরও সুষ্ঠু হওয়া উচিত ছিল। যথা প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে প্রকাশক মাত্রেরই সচেতন হওয়া উচিত। ৩০১।৫৮

**শ্রীউদ্ধব গীতা** (প্রথম খণ্ড)—শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। প্রকাশকঃ শ্রীশ্যামশেখর বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—আড়াই টাকা।

বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত উদ্ধব-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদই শ্রীউদ্ধবগীতা। ইহারই অন্বয়সহ ব্যাখ্যা, টীকাটিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ যিনি করেছেন সেই ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এ-যুগের উত্তম সাধকদের অন্যতম। দেহত্যাগের পূর্বে শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবকে উপদেশচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তা পরিবেশনের যিনি ভার নিয়েছেন তাঁর যোগ্যতা প্রশ্নের অতীত। স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন উপনিষদের ও গুরু-শিষ্য প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সরল আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিচ্ছন্নভাবে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলিও এইভাবে প্রকাশিত হয়ে ধর্মাশ্রয়ীদের পরম সম্পদস্বরূপ হয়ে উঠবে। ৬৫৪।৫৭

**জন্মনিয়ন্ত্রণ**—ডাঃ মদন রাণা। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। ২, টাকা।

ডাঃ মদন রাণা ইদানীং যৌন-বিজ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ হইতেই বিষয়টির উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট। প্রকৃতপক্ষে ১০টি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে এবং প্রয়োজনীয় চিত্র সন্নিবেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সহজবোধ্য যে আলোচনা লেখক করিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে বাধা নাই। সরকারীভাবে আজ যেক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এত প্রকার চেষ্টা—সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমান বিবাহিত ব্যক্তি অবশ্যই এই ধরনের দু একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারেন। বইটি স্বল্পমূল্য, কাজেই ইহার প্রচার যথেষ্টই হওয়া উচিত। আশা করি, এই ধরনের বাংলা গ্রন্থের শৈশবকাল উত্তীর্ণ এবং ভবিষ্যতে লেখকরা বিজ্ঞানের তথ্য সজ্জার সহিত কিছুটা সুখশ্রুতিকর শব্দসজ্জার প্রতি নজর দিবেন। ৭৭।৫৮

## প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে।

**বিশ্ব পরিক্রমা—১ম পর্ব**—ডক্টর মতিলাল দাশ।

**ইক্‌বাল**—মহম্মদ শহীদুল্লাহ।

**অনোখীলাল পথোটিয়া**—বিক্রমাদিত্য।

**ছুট**—জয়ন্ত চৌধুরী ও প্রশান্ত চৌধুরী।

**তাল নবমী**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**নীল রাত্রি**—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

**চৈত্রের পলাশ ও মায়াবতী মেঘ**—কুণাল মিত্র।

**রং বৃষ্টি**—দেবতোষ ঘটক।

**লণ্ডন-তীর্থে**—ডক্টর মতিলাল দাশ।

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম ও ২য় খণ্ড**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

# সর্বকালের বৃহত্তম আকর্ষণ

...শুধু ছবি নয়...... জীবনের প্রতিচ্ছবি!

# সাধনা

চিত্রাভিনয়ে..

বৈজয়ন্তীমালা

সুনীল দত্ত







লীলা চিটনীশ, মনমোহন কৃষ্ণ

ও রাধাকিষণ

কাহিনী...

প: মুখরাম শর্মা

সঙ্গীত... এন. দত্ত

গীতিকার... শাহীর

প্রযোজনা ও পরিচালনা

বি. আর. চোপরা





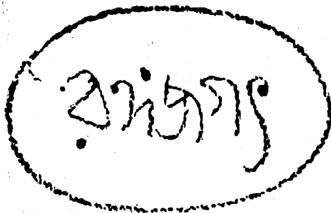


॥ একযোগে চলছে ॥

ওরিয়েন্ট (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) ঃ ইন্দিরা (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) ঃ লোটাস ঃ গ্রেস

ভবানী ঃ বঙ্গবাসী ঃ পিকাডিলি (সালকিয়া) ঃ রিজেন্ট (কাশীপুর) ঃ পি. সন (মেটিয়াবুরুজ) ঃ পার্ল (পাটনা)

॥ একটি ইষ্টার্ণ সার্কিট প্রাঃ লিঃ চিত্র-মুক্তি ॥




**চন্দ্রশেখর**

### অপরিণামদর্শী সরকারী নীতি

ছায়াছবি ভারতবর্ষের উঠতি শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান, অথচ পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে তার কোন নাম-গন্ধ নেই। যে-শিল্প থেকে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নানা কর বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা পায়, তার ভালমন্দ সম্বন্ধে এই উদাসীনতা, আর যাই হোক, দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয় না।

যে শিল্পের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর, বৈদেশিক মুদ্রা-সংরক্ষণের অজুহাতে এই সব অপরিহার্য দ্রব্যের আমদানী হ্রাস করা মানে—শুধু যে তার অগ্রগতি রোধ করা তা নয়—দেশের এই উঠতি শিল্পটিকে শুকিয়ে মারা। ঠিক এমনি ব্যাপারই ঘটতে চলেছে কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়দের অবিমৃষ্যকারিতায়।

কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণের ফলে ছবি-তৈরীর ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। যেভাবে প্রযোজকদের মধ্যে ফিল্মের কোটা বণ্টনের ব্যবস্থা হয়েছে, তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে তা। আজ তাই বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সম্পর্কিত নিয়মকানুন ঢেলে সাজতে হচ্ছে। বোম্বাইয়ের দু'জন প্রযোজক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশনব্রত সুরু করেছিলেন। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তা প্রত্যাহৃত হয়েছে। মাদ্রাজে সমগ্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল প্রযোজকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কলহের ফলে। বাংলার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল এইজন্য যে, তার চাহিদা যেমন একদিকে কম, তেমনি প্রযোজক সংস্থা ও আমদানী অধিকর্তার সম্মিলিত চেষ্টার অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে নি। নিয়ন্ত্রণের গোড়ার দিকে কোটার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়লেও, কোটা পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারছেন না এমন প্রযোজকদের দৃষ্টান্ত এখানে বিরল নয়।

সম্প্রতি এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সিনেমা-কার্বনের অভাবে। এই দ্রব্যটি ছবি দেখাবার জন্যে অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য প্রজেক্টার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি। অথচ এগুলির আমদানী যাতে




অব্যাহত থাকে সেবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই। নতুন ছবি তোলা না হলেও পুরোন ছবি দেখিয়ে সিনেমাগুলিকে হয়তো চালু রাখা যায়। কিন্তু সিনেমা-কার্বন যদি বাড়ন্ত হয় এবং চিত্রগৃহের যন্ত্রপাতি যদি বিকল হয়ে পড়ে তাহলে একটি প্রদর্শনীও যে অনুষ্ঠিত হবে না—লাল ফিতে নিয়ে যাঁদের কারবার এবুদ্ধি তাঁদের ঘটে আছে বলে মনে হয় না।

যে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্যে এত কড়াকড়ি, ফিল্মের মাধ্যমে তা যে বিদেশ থেকে উপার্জন করা যায়, এ সত্য স্বীকৃত হলেও সরকারীভাবে তার ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এমন পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে পুরস্কৃত ভারতীয় ছবি সংখ্যায় নিতান্ত কম হবে না। অথচ বিদেশের বাজারে সেগুলিকে চালু করবার দায় তাদের নির্মাতা ছাড়া যেন আর কারুর নয়!

একদিকে এমনিধারা ঔদাসীন্য, অন্যদিকে এই উঠতি শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে অপরিণামদর্শী সরকারী নীতি শুধু যে ফিল্ম-ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাই নয়, সম্পদ সৃষ্টির একটি প্রধান উৎসকে শুকিয়ে ফেলছে।

দেশের ধনবৃদ্ধির জন্যে দেশনেতা ও সরকারী মহল থেকে যখন তাগিদের অন্ত নেই, তখন দেশের এতবড় একটি শিল্প তাঁদেরই প্রবর্তিত নীতির ফলে এমনিভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়বে এটা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

### নাটক নিয়ে আলোচনা

বিশ্বরূপায় প্রতি শনিবার গিরিশ নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত যে আলোচনা সভার আয়োজন হয় তাতে গত দু হপ্তায় বক্তৃতা দেন দুজন সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী—ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাঃ ভট্টাচার্যের আলোচনার বিষয় ছিল—'নাট্য রচনা বিধি'। বক্তা এই বলে প্রথমেই আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের দশকেই নাট্যবিদ্যা শেখাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, আর আমাদের দেশের শিক্ষাধিনায়করা আজও এবিষয়ে উদাসীন। নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত একাডেমীর প্রতিষ্ঠায় নাট্যবিদ্যা শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে বটে, কিন্তু একাডেমীতে গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নাট্যবিদ্যা চর্চার পথ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হবে না—বক্তার মতে।

ডাঃ ভট্টাচার্য বলেন, নাট্যবিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের দেশে নাট্য-রচনা, পরিচালনা, সমালোচনা, অভিনয় দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া প্রায় সর্বত্রই অশিক্ষিতপটুদের আধিপত্য চলছে। শিল্পতত্ত্বের পরিপাটি পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা না থাকায় শিল্পের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা থাকে না। শিল্পের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল থাকায় অনেকেই মনে করেন বিনা উদ্দেশ্যেই শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব শিল্পসৃষ্টি করতে গেলে ন্যায়নীতির ধার ধারার কোন প্রয়োজন নেই, শিল্পীর পক্ষে শিক্ষাদীক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই।

বক্তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, জীবনবোধের সঙ্গে ন্যায়নীতিবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নীতিবোধ বাদ দিয়ে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির মূলে উদ্দেশ্য থাকবেই, সুতরাং নাট্য রচনার প্রথম কাজ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে নেওয়া।

* * *

ডাঃ ভট্টাচার্য এবিষয়ে আরো একটি বক্তৃতা দেবেন পরে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন এই বলে যে, বাংলা সাহিত্যে



বি আর ফিল্মসের "সাধনা" চিত্রের একটি দৃশ্যে নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা ও চরিত্রাভিনেতা রাধাকিষণ

অন্যান্য বিভাগের তুলনায় নাট্য সাহিত্য অপুষ্ট ও অনুন্নত। এই আপেক্ষিক অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, যে ভাবগত গভীর ঐক্যবোধ ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা অন্যান্য দেশে নাটকের পরিপূর্ণ বিকাশের মূলে ছিল, আমাদের দেশে তা স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বাঙালীর মনে যে ভাবের প্লাবন বয়ে গেছিল তা দেশকে পরাধীনতার পাশ থেকে মুক্ত করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাতেই নিঃশেষিত হয়েছে—জাতির মনে একটা স্থায়ী গৌরববোধ সঞ্চারিত করে নি। পৌরাণিক নাটকে আমাদের ভক্তি-বিহ্বলতা ও ভগবানের অহেতুক করুণার জন্যে উদগ্রীবতাই নাটকীয় রসের-পরিপন্থী হয়েছে। যখনই মানবীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘনীভূত হয়েছে, তখনই ভগবানের হস্তক্ষেপে, তাঁর ভক্তবৎসলতায়, সমস্ত জটিলতার গ্রন্থি এক নিমেষে উন্মোচিত হয়েছে—এই দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী পরিণতির স্তরে পৌঁছতে পারে নি।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশান্বিত হবার কারণ দেখা যাচ্ছে না। স্বাধীনতা লাভের পরেও কেন বৃহৎ ঐক্যবিধায়ক ভাবপ্রেরণা আমাদের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে নি। বরং আমাদের জীবনে সংশয় ও অনিশ্চয়তা, মতভেদের তীব্রতা আরো বেড়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় জীবনে স্থির আদর্শনিষ্ঠা ও সমন্বিত কর্মপ্রেরণা না থাকলে শ্রেষ্ঠ নাটকের আবির্ভাব সম্ভব নয়।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন, দর্শকের রুচিও কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে না—অনেকটা খামখেয়ালী ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে। নাট্যকার দর্শকের মনের কোন হদিস পান না, তাই তাদের মনোরঞ্জনের আগ্রহে তিনি দিশেহারা। তাঁর না আছে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও জীবন-পরিণতির অনিবার্যতায় আস্থা, না আছে দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে আত্মিক যোগ।

উপসংহারে তিনি বলেন, এখন আবার নূতন করে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক রচনা করতে হবে। ইতিহাস এখন দেশপ্রেম উদ্দীপনের উপায়মাত্র না হয়ে চরিত্রনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ হওয়া দরকার। কমেডি বা হাস্যরসোচ্ছল নাটকও এখন আর দেখা যায় না—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পর এর উৎসও শুকিয়ে গেছে। মোটকথা, ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নাটকের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হলে চাই লেখকের নাট্য-প্রতিভা, দর্শকমণ্ডলীর সুস্থ রুচির সমর্থন এবং রংগমঞ্চ পরিচালকের পরিবেশন কৌশল। এই তিনের সার্থক সমন্বয়েই নাটকের স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে—এমনি-ধারা আশা করা যায়।

### "মায়ামৃগে"র শত রজনী

গত মঙ্গলবার রঙমহলে "মায়ামৃগে"র শততম অভিনয় উপলক্ষে একটি সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত বলেন, কোন নাটকের শততম অভিনয় তার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। রাজনীতির বাষ্প মানুষের ভবিষ্যৎকে যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলুক না কেন, বিভিন্ন জাতি আজ পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে চাইছে তাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে। তাই কোন নাটকের অভিনয় যদি দর্শকদের মর্ম স্পর্শ করতে পারে, তাহলে তাতে আনন্দিত ও আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

শততম রজনীর উৎসব উপলক্ষে রঙমহলের কর্তৃপক্ষ নাট্যকার, পরিচালক,

সরকার, শিল্পী গোষ্ঠী ও অন্যান্য কর্মীদের যে পুরস্কার দেন, তা বিতরণ করেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। "মায়ামৃগে"র এই সাফল্যে তিনি সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কর্মীদের তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে শ্রী চৌধুরী বলেন, যদিও নাট্যামোদীর সংখ্যা আজ ক্রমবর্ধমান, তবুও কলকাতায় পাঁচটি পেশাদারী রংগমঞ্চের জায়গায় মাত্র তিনটি আজ টিকে আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে নাট্য-আন্দোলনের যাতে প্রসার ঘটে সে বিষয়ে সকলকে অবহিত হতে তিনি অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি শ্রী জে পি মিত্র ও ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষণের পর নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "মায়ামৃগ" নাটকের শততম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

## চিত্রালোচনা

ট্রাম ধর্মঘট অবসানের সংগে সংগেই বাংলা ছবির লাইন ক্লিয়ার। পুরোধা হয়ে এসেছে ন্যাশনাল ফিল্মসের বহুপ্রতীক্ষিত রঙীন ছবি 'শিকার'। রাসবিহারী লালের গল্প এবং মংগল চক্রবর্তীর পরিচালনা—এ দুয়ের যে যোগাযোগে 'তাসের ঘর' সাফল্য লাভ করেছিল, এ ছবিতেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। উপরন্তু এতে আছে গেভাকলারের বর্ণসমারোহ। শিল্পী সমাবেশও কম আকর্ষণীয় নয়। 'শিকারী'র প্রধান ভূমিকাগুলিতে রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, নমিতা সিংহ, ভারতী দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায় ও অমর মল্লিক। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার। গত বুধবার সন্ধ্যায় সুসংস্কৃত উত্তরা সিনেমায় একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবিখানির উদ্বোধন করেন বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রী আর আর দিবাকর।

* * *

বি আর ফিল্মসের নবতম নিবেদন 'সাধনা' এ হপ্তার আর একটি বড় আকর্ষণ। প্রযোজক-পরিচালক বি আর চোপরা 'এক হি রাস্তা' ও 'নয়া দৌড়' এই দুখানি ছবি নির্মাণ করে হিন্দী চিত্রজগতে নিজের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই নতুন ছবি সম্বন্ধে দর্শকদের প্রত্যাশা তাই সুপ্রচুর। ছবির গল্প লিখেছেন পণ্ডিত মুখরাম শর্মা। মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন বৈজয়ন্তীমালা ও সুনীল দত্ত, এবং বৈজয়ন্তী মালার মতে এইটেই তাঁর অভিনেত্রী জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। অন্যান্য চরিত্রে লীলা চীটনিশ, রাধাকিষণ, মনোমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতিকে দেখা যাবে। এন দত্তের রচিত সুর ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

* * *

এ হপ্তার দ্বিতীয় হিন্দী ছবি 'ডটার অফ সিন্দবাদ'। স্টারল্যান্ড প্রোডাকসন্স এর নির্মাতা। মারপিট হৈ-হল্লোড় ভরা ছবি এটি। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন নাদিরা, জয়রাজ, প্রাণ, কমল, তিওয়ারী ও মারুতি। ছবিটি রতিলালের পরিচালনায় গৃহীত হয়েছে এবং চিত্রগুপ্ত এতে সুর সংযোগ করেছেন।

* * *

বিভূতি মিত্র প্রযোজিত ও পরিচালিত হিন্দী ছবি 'ফাগুন' আসছে এ হপ্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। সোরাব মোদীর নতুন ছবি 'জেলার'ও পূজাবকাশের অন্যতম আকর্ষণ। এটি মিনার্ভা মুভিটোনের আগেকার একটি স্মরণীয় ছবির নবতর সংস্করণ। বাংলা ছবি 'লীলা কঙ্ক'ও পূজার অব্যবহিত আগে মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে। এটির পরিচালক সতীশ দাশগুপ্তের অন্তিম নিবেদন। এইচ পি প্রোডাকসন্সের ভক্তিমূলক চিত্র 'পুরীর মন্দির'ও পূজো-তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

* * *



রঙমহলে 'মায়ামৃগে'র শততম উৎসব রজনীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন রাজ্য বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপবিষ্ট অবস্থায় (বাঁদিক থেকে) শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রী জেপি মিত্র শ্রীশচীন সেনগুপ্ত ও ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে দেখা যাচ্ছে। বক্তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন সুরকার শ্রীঅনিল বাগচী

বাংলা ছবির অন্যতম জনক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি নামে যিনি সুবিখ্যাত) আবার ছবির আসরে ফিরে এসেছেন। গত রবিবার তাঁর নতুন চিত্রার্ঘ 'মন যারে চায়'-এর মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ধীরেনবাবুই এর প্রযোজক ও পরিচালক।

আর একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান রীতেন এণ্ড কোম্পানী। এঁরাও একটি নতুন ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' নামক একটি বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে ছবিখানি তোলা হবে। পরিচালনা করবেন অগ্রগামী পরিচালকগোষ্ঠী। গত বৃহস্পতিবার এম পি স্টুডিওতে এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বোম্বাইতে প্রাক্তন অভিনেত্রী লীলা দেশাই রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটি হিন্দী ছবিতে রূপান্তরিত করবার তোড়জোড় করছেন। গত সপ্তাহে কারদার স্টুডিওতে ছবিখানির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমতী দেশাই নিজেই ছবিখানি পরিচালনা করবেন। শিল্পীদের নাম এখনও ঘোষিত হয় নি।

* * *

সুধীরবন্ধু পরিচালিত 'নৃত্যের তালে তালে' ছবিখানি প্রায় অর্ধসমাপ্ত। বাংলা মাদ্রাজ ও বোম্বাই—এই তিনটি প্রধান কেন্দ্রের শিল্পীদের সমাবেশ হয়েছে এই বাংলা ছবিতে। নর্তক-অভিনেতা গোপীকিষণ এর মুখ্য-চরিত্রে অভিনয় করছেন। ভারতনাট্যনিপুণা সুকুমারী একাধিক নৃত্যদৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, সন্ধ্যা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালক সুধীরবন্ধু আসছে হপ্তায় মুসৌরি যাবেন এর বহির্দৃশ্য নেবার জন্যে।

### ঘরোয়া কাহিনীর ঘোরালো ছবি

একটি নিতান্ত গতানুগতিক কাহিনী 'ঘর-সংসারের' উপজীব্য। কাহিনী একটি পরিবারকে নিয়ে—যে-পরিবারের গৃহিণীর নাম উমা। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। উমার স্বামী কৈলাস ছা-পোষা মানুষ। একটি মাত্র মেয়ে ভারতী আর ছোটোভাই দীপক —এদের নিয়েই কৈলাসের সংসার।

স্বামীর আয়ে কুলোয় না বলে উমাও অবসর মতো ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজে কিছু-কিছু রোজগার করে। উমা অত্যন্ত সুগৃহিণী। এমন প্রখর দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাই সংসারটি সুশৃঙ্খল, মধুর।

দেবরের প্রতি উমার আচরণ আদর্শ ভ্রাতৃবধূসুলভ। দেবরের শিক্ষা-দীক্ষায় যাতে কোনো ঘাটতি না হয়, সেদিকে উমার দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক। দীপক লেখাপড়া শিখে যাচ্ছে।

দীপক একটি মেয়েকে ভালোবাসে, তার নাম জ্যোতি। জ্যোতি শুধু ধনীকন্যা নয়, দুর্দান্ত আধুনিকাও।

প্রেমের ধাক্কায় ঘটনাচক্রে দীপক পরীক্ষা দিতে পারলো না। এতে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। দীপকের প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার দশা।

কিন্তু না, শেষপর্যন্ত নিরুদ্দেশ হলো না দীপক। খানিক নয়নজলে ভাসলো। তারপর বৌদির দৌলতে পড়াশোনা চললো আবার নতুন উদ্যমে। অবশেষে, দীপক






আইন পাশ করে উকিল হ'লো, এবং বিয়ে করলো জ্যোতিকে।

এই বিয়ে নিয়েও এক কাণ্ড। বিয়ের আসরেই বড়ো ভাই কৈলাস এই মেয়ের সংগে বিয়ে প্রায় ভণ্ডুল করে দিচ্ছিলো। কিন্তু উমা সবদিক সামলে বিয়ে ভণ্ডুল হতে দিলো না।

কৈলাসের পাশের বাড়িতে একজন ভিলেন থাকে, সেই ভিলেনের মেয়েটিও বাপকা বেটি। মেয়েটির নাম মেনকা। মেনকার চক্রান্তে এদের পারিবারিক বিরোধ চরমে উঠলো। সর্বনেশে কাণ্ড, দেবর দীপক একদিন চড় মেরে বসলো মাতৃসম ভ্রাতৃবধূকে। একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেলো, দীপক যখন চড় মেরেছে তখন দীপকের গায়ে জ্বর।

তারপর কৈলাস, উমা আর ভরতীকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চললো।

কিন্তু, সব ভালো যার শেষ ভালো। জ্যোতির ভাইয়ের দৌলতে মেনকা আর তার বাপের আসল চরিত্র বেরিয়ে পড়লো। জানা গেলো, সব অঘটন ওদের দু-জনের জন্যেই ঘটেছে।

অতঃপর পারিবারিক মিলনে কাহিনীর সমাপ্তি।

* * *

পুষ্প-পিকচার্স নিবেদিত 'ঘর সংসারে'র কাহিনী শুধু মামুলি নয়, ছবির পর্দায় এর বিন্যাসের দুর্বলতাও অসীম। 'ঘর-সংসার' ছবিতে আদর্শ দেখানোর চেষ্টা আছে, কিন্তু 'ঘর সংসারে' আদর্শ ছবির পরিচয়টুকুও নেই বললেই চলে। উমা-কৈলাস দরিদ্র বলে কথিত, কিন্তু ওদের ঘর দেখে মনে হয় যে সেই দারিদ্র্য থিয়েট্রিার। দু-একটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য অবশ্য আবেগঘন হয়ে উঠেছে (উদাহরণ হিসেবে সেই দৃশ্যটির কথা ধরা যেতে পারে যেখানে দীপক উমাকে চড় মেরেছে এবং অকুস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছে কৈলাস), কিন্তু সামগ্রিক ব্যর্থতা তাতে অপ্রকট থাকেনি। অনর্থক হাহা-হোহো-ভালা মার্কা যে-সমস্ত দৃশ্যের জন্যে অধিকাংশ হিন্দীছবি অভিযুক্ত, 'ঘর-সংসারে' সে-সমস্ত দৃশ্যেরও অকৃপণ সমাবেশ আছে।

'ঘর-সংসারে'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এম জি দাভে, পরিচালনা করেছেন ভি এম ব্যাস। অকৃতিত্বের প্রতিযোগিতায় কে কাকে পরাস্ত করেছেন তা বলা শক্ত। এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ!

'ঘর-সংসারের' চিত্রশিল্পী পি আইজাক, শব্দযন্ত্রী আর জি পুশলকর, দেব এবং কৌশিক। টেকনিক্যাল কাজ চলনসই হয়েছে। শিল্প-নির্দেশক এ এ মজিদ বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

সংগীতাংশে নেপথ্য থেকে কণ্ঠদান করেছেন মহম্মদ রফি, মান্না দে ও আশা ভোঁসলে। কিন্তু সংগীত-পরিচালক রবি এমন বিশেষত্ববর্জিত সুর-যোজনা করেছেন যে উক্ত খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীরাও আসর জমাতে পারেন নি।

অভিনয়াংশ বরং উল্লেখযোগ্য।

উমার ভূমিকায় নার্গিসের অভিনয় অত্যন্ত মার্জিত। একটি নিষ্প্রাণ চরিত্র কেবল নার্গিসের অভিনয়গুণে অনেকখানি রক্তমাংসের উত্তাপ বিকীর্ণ করতে পেরেছে। কৈলাসের ভূমিকায় বলরাজ সাহানীও আশানুরূপ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। দীপক ও

জ্যোতির ভূমিকায় যথাক্রমে রাজেন্দ্রকুমার কুমকুমের অভিনয় সাধারণ স্তরের। জ্যোতির ভাইয়ের ভূমিকায় জানি ওয়াকার প্রত্যাশিত হাস্যরসমূলক অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকাভিনয় আশানুরূপ।

## বিবিধ সংবাদ

বেলজিয়ামের ফিল্ম লাইব্রেরী সম্প্রতি জগতের বারোখানি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের একটি তালিকা সংকলন করেছে। এই কাজে ছাব্বিশটি দেশের মোট ১১৭ জন ফিল্ম-ঐতিহাসিক যোগ দিয়েছিলেন। ১১৭ জনের মধ্যে একশো জন ভোট দিয়েছেন তেত্রিশ-বছর আগে তোলা রুশ নির্বাক ছবি 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'কে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে। এই ছবিখানি পরিচালনা করেই পরলোকগত সার্জ আইসেনস্টাইন সারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ চিত্রের এই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ড-রাশ' ও ভিটোরিও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিফ'। তাহলে দেখা যাচ্ছে এযুগ এখনও সে যুগকে অতিক্রম করতে পারে নি শিল্পোৎকর্ষের বিচারে।

* * *

শনিবার (২৭শে সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় একটি প্রীতি-অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ গিরিশচন্দ্রের একটি প্রতিকৃতি কলকাতার পৌরপ্রধানের হাতে অর্পণ করবেন। এই ছবিখানি গিরিশ স্মৃতি ভবনে রক্ষিত হবে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

* * *

বিশ্বরূপার আরো দুটি প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। 'বিশ্বরূপা মার্কারি' নাম দিয়ে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষায় একটি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এর কর্তৃপক্ষ। কেবলমাত্র নাট্যকলা সম্পর্কিত বিষয় এই পত্রে স্থান পাবে। এছাড়া আগামী ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনমাস ধরে প্রতি শনিবার বিভিন্ন নাট্য সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় একটি নাট্য-উৎসবের আয়োজন করা হবে বিশ্বরূপার উদ্যোগে। অন্যূন বারোখানি নাটক অভিনীত হবে এই উৎসবে।

* * *

গত শনিবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বংশী ভাণ্ডারীর তত্ত্বাবধানে ডেড্ লেটার অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যদের দ্বারা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের '৪৯ নম্বর মেস' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অভিনয়ে সনৎ লাহিড়ী, বংশী ভাণ্ডারী, সত্যজীবন মজুমদার, নির্মল ব্যানার্জী ও সত্যেন মুখার্জী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

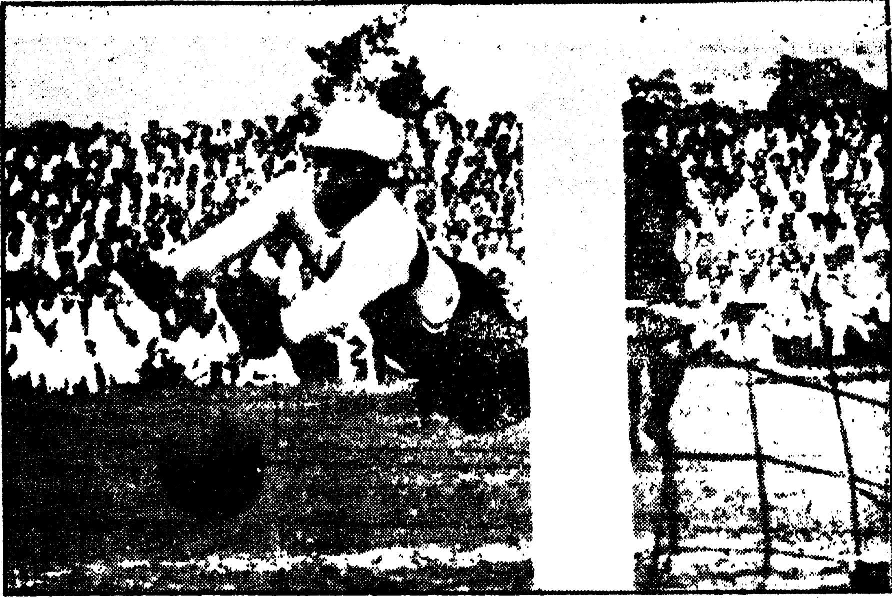
# খেলার মাঠে

একলব্য

মানুষের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের দুঃখ আছে, শোকতাপের দুঃখ আছে, আছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানারকমের দুঃখ-কষ্ট। এই দুঃখ-কষ্ট এবং ব্যথা বেদনার মধ্যেও মানুষ চায় আমোদ-প্রমোদে ভুলে থাকতে, আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে একটুখানি শান্তি পেতে। খেলাধুলো এই আমোদ প্রমোদের একটি প্রধান অঙ্গ। খেলাধুলোর মধ্যে আবার ফুটবলের স্থান সবার উপরে। ফুটবল খেলা সার্বজনীন আনন্দের সবচেয়ে বড় খোরাক। কিন্তু এই ফুটবল খেলা দেখবার জন্যও কি কষ্টের শেষ আছে?

স্টেডিয়ামবিহীন এই কলিকাতা মহানগরীতে ভাল খেলা দেখার সুযোগ পাওয়া এক মস্ত সৌভাগ্যের কথা। ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে একটু ভাল খেলা দেখতে হলে আপনাকে খেলার দু তিন ঘণ্টা আগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে লাইনে। ভাগ্য যদি আপনার ভাল থাকে তবে মাঠে প্রবেশাধিকার পেলেন, আর ভাগ্যদেবী আপনার প্রতি অপ্রসন্ন থাকলে ধাক্কাধক্কা সয়ে এবং পুলিশের ঘোড়ার তাড়া খেয়ে খেলা দেখার আশায় নিরাশ হয়ে আপনাকে ফিরে আসতে হল। এর পর চ্যারিটি খেলা হলে তো কথাই নেই। আকর্ষণীয় চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ দেখতে হলে দু তিন ঘণ্টা আগে মাঠে গেলে শুধু বিড়ম্বনা ভোগই সার হবে। যেতে হবে অনেক আগে বা খেলার আগের দিন। কোন কোন ক্ষেত্রে দুদিন আগেও দর্শকরা লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তারও প্রমাণ আছে। ক্লাব সভ্য হলে অবশ্য আপনার খেলা দেখার ভাবনা নেই, সঙ্গে সঙ্গে নেই দুর্ভাবনারও অন্ত। প্রথম ভাবনা অর্থের। ক্লাবের সদস্য থাকবার জন্য এমনিতেই বছরে আপনার ২৪।৫ টাকা করে গুনতে হচ্ছে। তারপর প্রতি চ্যারিটি খেলার জন্য দিতে হচ্ছে অতিরিক্ত দুই টাকা অথবা তিন টাকা করে। অবশ্য সভ্য গ্যালারী বা সাদা গ্যালারীর তিন টাকা মূল্যের টিকিট পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনি যদি মোহনবাগান অথবা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্য হন, তবে চারিটি 'চ্যারিটি' খেলার জন্য আপনার বরাদ্দ একখানা তিন টাকার টিকিট। বাকি তিনটি খেলার জন্য আপনি দু টাকার গ্রীণ গ্যালারীর একখানা করে টিকিট পাবার অধিকারী। এর জন্যও কি বিড়ম্বনা কম। টিকিট কেনবার সময় আপনাকে একবার লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, খেলা দেখার জন্য মাঠে ঢোকবার সময় আর একবার।

চ্যারিটি খেলারও কি বাঁধাধরা নিয়ম আছে? কর্তা ইচ্ছা কর্ম। ফুটবলের যারা কর্তা, তারা ইচ্ছা করলেই আপনার ক্লাব চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে বাধ্য। আগে চ্যারিটি ম্যাচের বাঁধাধরা নিয়ম ছিল। একটি ফুটবল মরসুমে পাঁচটির বেশী চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের আন্তর্জাতিক খেলা নিয়ে লীগের মধ্যে হত তিনটি চ্যারিটি খেলা, আর আই এফ শীল্ডে হত দুটি খেলা। এই পাঁচটির বেশী চ্যারিটি ম্যাচ খেলাবার কোনই উপায় ছিল না। ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের উপর



ইস্টবেংগল ও অন্ধ্র পুলিশ দলের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের সেমি ফাইন্যাল খেলায় অন্ধ্র পুলিশের গোলকিপার নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বিপজ্জনক বল রক্ষা করছেন।

চাপ পড়বে বলে পুলিশ কমিশনারও পাঁচটির বেশী চ্যারিটি ম্যাচ খেলাবার অনুমতি দিতেন না। আর এখন কর্তৃপক্ষ দরাজ হাতে চ্যারিটি ম্যাচের আয়োজন করছেন। পুলিশ কমিশনারও অবলীলাক্রমে অনুমতি দিচ্ছেন। এবারের কথাই ধরা যাক। এবারে শুধু লীগের খেলাতেই পাঁচটি চ্যারিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীল্ডের খেলায় তিনটি হয়ে গেছে, ফাইন্যাল খেলা এখনো বাকি। তাহলে এ বছর মোট চ্যারিটি ম্যাচের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৯টি। যদি আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা একদিনে নিষ্পত্তি না হয়, তবে চ্যারিটি ম্যাচের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

শুধু মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সভ্যদেরই এবার পাঁচ ছয়টি করে চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে হয়েছে এবং এর জন্য প্রতি সভ্যকে সভ্য চাঁদা ছাড়া অতিরিক্ত দিতে হয়েছে ১৫।১৬ টাকা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোন সভ্যের মুখেই প্রতিবাদ নেই। নিজ ক্লাবের খেলা দেখার জন্য এই অতিরিক্ত অর্থ খরচকে তারা যেন অদৃষ্টের বিধান বলে মেনে নিয়েছেন, যেমন সাধারণ ক্রীড়ামোদী মেনে নিয়েছেন স্টেডিয়ামবিহীন মহানগরীতে কষ্ট করে খেলা দেখার অদৃষ্টের বিধান। বোধ করি ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের এই নিশ্চেষ্টতা দেখেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায় স্টেডিয়াম ডিমাণ্ড কমিটির সদস্যদের কাছে বলেছিলেন এ শহরে স্টেডিয়ামের সত্যই প্রয়োজন আছে কিনা, তা জানবার জন্য 'গ্যালাপ পোলের' প্রয়োজন।

কলকাতার মত জনবহুল বিরাট শহরে স্টেডিয়ামের প্রয়োজন আছে কিনা এবং স্টেডিয়াম সম্পর্কে 'গ্যালাপ পোল' করলে তার ফল কি হবে, বিচক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সে কথাটা ভালভাবেই জানা আছে। তবুও তিনি 'গ্যালাপ পোলের' কথা বলেছেন সম্ভবত মুষ্টিমেয় ক্রীড়ামোদীর স্টেডিয়ামের দাবীকে ধামা চাপা দেবার জন্য এবং বর্তমানে ক্যালকাটা স্পোর্টস বিলকে কার্যকরী না করবার জন্য। কারণ স্পোর্টস বিলের মধ্যেই স্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। আর সাধারণ ক্রীড়ামোদীর

নিশ্চেষ্টতাই স্টেডিয়াম সম্পর্কে ডাঃ রায়কে 'গ্যালাপ পোল' করবার কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে যেখানকার ক্লাব সভ্যরা সীমাহীন চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থাকে মাথা পেতে মেনে নেয়, স্টেডিয়ামবিহীন মহানগরীতে বছর বছর খেলা দেখার দুঃখকষ্ট এবং বিড়ম্বনাকে অবলীলাক্রমে স্বীকার করে নেয়,, কোন প্রতিবাদ করে না, সেখানে স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে বৈকি!

কিন্তু এর আর একটি দিকও আছে। এবং সেই দিকটা দেখাবার জন্যই আমার এই আলোচনা। সে দিকটা হচ্ছে মানুষের সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে গেছে। দেশে খাদ্য নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে চলেছে। কিন্তু তাও আমরা এক রকম স্বীকার করে নিচ্ছি। এই যে শহরে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে আন্দোলনে জনসাধারণের আগ্রহ কোথায়? ৪২ দিন ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল তাতেও কি জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রতি-ক্রিয়া দেখা গেছে? সর্বত্রই একটা নিশ্চেষ্টতার ভাব। খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও আজ এই নিশ্চেষ্টতা। তাই চ্যারিটি খেলার বিরুদ্ধেও ক্লাব সভ্যদের প্রতিবাদ নেই, স্টেডিয়ামের দাবীতেও নেই—ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের সক্রিয় আন্দোলন।

* * * *

আরও একটি কথা। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে বিলাতী কোম্পানীর মনোবৃত্তির আর চ্যারিটি ম্যাচের আয়োজন সম্পর্কে দেশী কোম্পানী আই এফ এ-র মনোবৃত্তির মধ্যে যেন অনেকটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৮ সালে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানীর সংগে রাজ্য সরকারের নতুন চুক্তির সময় কোম্পানী বছর বছর কতটা অর্থ নিতে পারবেন তার একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অতিরিক্ত অর্থ জমা রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল রিজার্ভ ফাণ্ডে। আজ লাভ লোকসানের প্রশ্ন ছাড়াও কোম্পানী বলছেন ট্রাম যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন এবং তার জন্য ভাড়া বৃদ্ধি করাও একান্ত দরকার। ফুট-বলের কোম্পানী আই এফ এও বলছেন সাধারণকে 'দান' করার জন্য চ্যারিটি ম্যাচের প্রয়োজন। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের 'দানে'র উপর টিকে আছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে গৌরী সেনের টাকা 'দান' করবার অধিকার কে দিয়েছে? আর্তের সেবা বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে দানের জন্য খেলার ব্যবস্থা করা হলে খেলা থেকে সংগৃহীত পুরো অর্থই দান করা উচিত। চ্যারিটি থেকে সংগৃহীত অর্থের এক কানাকড়িও অন্য প্রয়োজনে ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই বছর বছর চ্যারিটি থেকে সংগৃহীত অর্থের একটা মোটা অংশই অন্য প্রয়োজনে খরচ হয়ে যায়। ধরে নেওয়া যেতে পারে এই 'প্রয়োজন' চ্যারিটি ম্যাচের আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। খেলার মাধ্যমে তথা-কথিত 'চ্যারিটির' নামে এভাবে অর্থ ... ব্যবসায়েরই নামান্তর। এ ব্যবসা ক ... দিন চলবে?

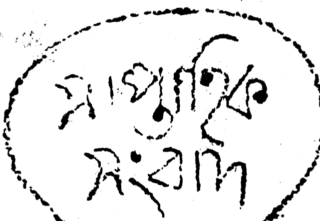
**ভ্রম সংশোধন**

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিজ্ঞাপনে জরাসন্ধ-রচিত **তামসী** উপন্যাসের পরিচয়-লিপিতে একটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে গেছে। **'তামসী'র** সদ্য-প্রকাশিত নূতন মুদ্রণ কোনো প্রকারেই পরিবর্তিত হয় নি—এটি সর্বাংশে পূর্ববর্তী মুদ্রণের অনুরূপ। এই নূতন মুদ্রণে মূল্যও বর্ধিত হয় নি—পূর্ববৎ পাঁচ টাকাই আছে।

চ্যারিটি খেলা থেকে এ বছর সংগৃহীত টাকার অঙ্ক প্রায় তিন লাখের কাছাকাছি পৌঁছুবে। আমরা আশা করি, এই টাকাটা পুরোপুরি যাতে চ্যারিটির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, পুলিশ কমিশনার সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কিম্বা এই অর্থ এবং খেলার প্রতি টিকিট পিছু দেয় সমুদয় অ্যামুউজ-মেণ্ট ট্যাক্সের অর্থ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য পৃথক করে রাখা যেতে পারে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, স্টেডিয়াম নির্মাণের বাধার ক্ষেত্রে অন্যান্য গৌণ কারণ বিদ্যমান থাকলেও অর্থের অভাবই মুখ্য কারণ। যখন থেকে স্টেডিয়ামের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, তখন থেকে এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করলে আজ স্টেডিয়ামের নির্মাণের অর্থের অভাব হত না।

সবশেষে আমি বলতে চাই, স্টেডিয়াম সম্পর্কে আই এফ এ এবং রাজ্য সরকার অনেক টাল বাহানা করেছেন। এ সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করতে আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ প্রধানত ছাত্রদের খেলাধূলার সুযোগ সুবিধার জন্য লেক অঞ্চলে ছোট আকারে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু ঐ স্টেডিয়ামের জন্য শহরের ফুটবল খেলা দেখার কোন সুরাহা হবে না। ফুটবলের জন্য একটি বড় আকারের স্টেডিয়ামের আশু প্রয়োজন। কলকাতা শহরকে নানাভাবে সুন্দর করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যতদিন শহরের বুকে স্টেডিয়ামের স্থান খালি থাকবে, ততদিন এ শহর প্রথম শ্রেণীর শহরের মর্যাদা পাবে না।

স্টেডিয়াম সম্পর্কে আরও একটি কথা বলতে চাই। কম্পোজিট স্টেডিয়াম নির্মাণের যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে। কম্পোজিট স্টেডিয়াম অর্থাৎ যেখানে প্রধানত ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা থাকবে এবং আরও থাকবে অন্যান্য খেলাধূলার সুযোগ সুবিধা। কিন্তু অন্যান্য খেলাধূলো এবং ক্রিকেটের জন্য কে স্টেডিয়ামের দাবী করেছে, আমার জানা নেই। ক্রিকেট খেলার জন্য যদি স্টেডিয়াম হয়, সুখের কথা। কিন্তু ক্রিকেটের প্রয়োজন ফুটবলের চেয়ে বেশী নয়। বছরে একটি কিম্বা দুই বছরে একটি ক্রিকেট খেলার জন্য স্টেডিয়ামের প্রয়োজনের চেয়ে প্রতি বছর অনেকগুলি খেলার জন্য ফুটবল স্টেডিয়ামের প্রয়োজন অনেক বেশী। শুধু ক্রিকেট খেলার জন্য ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব ইডেন উদ্যানে স্টেডিয়াম নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে একটি ব্লক সম্পূর্ণও করেছেন। অর্থের অভাব এবং সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আর এগুতে পারেননি। এন সি সির উপরই হক কিম্বা সি এ বির উপরই হক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের ভার ছেড়ে দিলে ক্ষতি কি? এরা স্টেডিয়াম খাড়া করতে পারেন, ভাল কথা। না পারেন তাতেও তেমন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু ফুটবল স্টেডিয়াম না করলে যথেষ্টই ক্ষতি আছে। ফুটবল ও ক্রিকেটের কম্পোজিট স্টেডিয়ামের বিতর্ক-মূলক প্রশ্নে সময় নষ্ট করে শুধু ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বিশ্বের প্রসিদ্ধ ক্রিকেট মাঠ ইডেন উদ্যানের উপর কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরী করার অহেতুক জিদ দেখানোও সংগত নয়। কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরীর জায়গার অভাব নেই। ময়দান এলাকায় রাজ-ভবনের ঠিক সম্মুখে বর্তমান মহমেডান স্পোর্টিং, তালতলা ও বঙ্গবাসী কলেজ মাঠের উপরে ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়েছেন বলে শুনেছি। কিন্তু এখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে আশার বাণী আজও কারো মুখ থেকে শুনিনি।




## দেশী সংবাদ

১৩ই সেপ্টেম্বর—অদ্য রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বিভিন্ন রাজ্যে অনুসৃত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের পক্ষে অকার্যকর খাদ্যনীতির তীব্র নিন্দা করেন। খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে শ্রী জৈন রাজ্যসমূহকে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, খাদ্যশস্যের জন্য যদি চাহিদা ক্রমাগতই বাড়িয়া যায়, তবে কেন্দ্র সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।

১৭ই সেপ্টেম্বর—পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ লোকসভায় বলেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনার ফলে ১৫০ কোটি টাকা টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে এবং এই টাকার মধ্যে ১৪০ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্যকে সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে।

পাটনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবলরাম সিং গত-... যখন আনুষ্ঠানিকভাবে পাটনা জেলা বোর্ডের ভার গ্রহণ করেন, তখন দেখা যায় যে, পাটনা জেলা বোর্ডের তহবিলে মাত্র ৮৫ নয়া পয়সা রহিয়াছে। সরকারীসূত্রে জানা গিয়াছে যে, জেলা বোর্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের তিন হইতে পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে ৪ লক্ষ টাকা জোগাড় করিতে হইবে।

কলেজের ছাত্র বেতন বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ অদ্য পক্ষকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, উন্নয়ন লেভী ইত্যাদি ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কয়েকটি বিষয়ে আশ্বাসলাভের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উক্ত মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় যুক্ত কমিটির পক্ষ হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, মেডিকেল অ্যাওয়ার্ড ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লণ্ডন বোর্ডের মঞ্জুরী ব্যতীত ট্রাম শ্রমিকদের ...তন দাবীগুলির বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করিতে ...ক্ষম হওয়ায় শ্রমিকদের পক্ষে ঐগুলি সম্পর্কে ...মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ট্রাম ধর্মঘট চালাইয়া ...য়া ছাড়া আর উপায় নাই।

...শে সেপ্টেম্বর—প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও প্রবল ব...তাণ্ডব মেদিনীপুর জেলার শহরে-জনপদে দার... আঘাত হানিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের দুর্দশা অ...য়। জেলা শহরের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় বহু বিপন্ন গ্রামে সাহায্যাদি প্রেরণ করা এখনও সম্ভব হইতেছে না।

ওরিএণ্টাল গ্যাস কোম্পানি পৌর প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস সরবরাহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলিকাতার ৮০০০ গ্যাসবাতি জ্বলিবে না। শুধু তাহাই নহে, মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশনের নিকটে হুগলী নদীর তলদেশের মাটি ক্ষয় হইতে থাকায় উক্ত পাম্পিং স্টেশনের অবস্থা 'বিপজ্জনক' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিলম্বে উহার রক্ষাব্যবস্থা না হইলে কলিকাতায় 'গঙ্গার জল' সরবরাহও যে কোন সময়ে বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মাসে যে খাদ্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের মুনাফা শিকার যাহাতে বন্ধ করা যায়, তাহার জন্য খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের উপর সরকারকে কড়া নজর রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি বিভিন্ন স্তরে খাদ্যশস্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিবার এবং খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সরকারী আদেশ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন।

কাম্বে হইতে আট মাইল উত্তরে লুনেজে খনিতে যে কূপে এই মাসের প্রথম সপ্তাহে তৈল পাওয়া গিয়াছিল, গতকল্য প্রত্যূষে উহা হইতে প্রবল বেগে ঈষৎ বাদামী রংয়ের তৈল নির্গত হইতে থাকে। তৈল এত দ্রুতবেগে নির্গত হয় যে, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চে উঠিয়া ছড়াইয়া পড়ে।

২১শে সেপ্টেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ভুটানের মহারাজার আমন্ত্রণক্রমে ছয় দিনের জন্য এখানে (পারো) উপস্থিত হইলে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন।

বারুইপুরের ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মিথ্যা রসিদ, জাল সহি ও টিপ-সহি, ভুয়া নাম প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া সরকারী অর্থ অপচয় এবং আত্মসাতের যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে পুলিসি তদন্ত শুরু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক শক্তিশালী পাকিস্থানী গুপ্তচরচক্র কর্মরত কিনা এবং এইরূপ রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের অন্তরালে জনকয়েক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ভারতীয় নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতা আছেন কিনা, এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক গোয়েন্দা অফিসার কলিকাতা হাওড়া ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তদন্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি গোপন রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল।

দীর্ঘ ৪২ দিন ট্রাম ধর্মঘট চলিবার পর গতকল্য সন্ধ্যায় ট্রাম কর্মীদের এক সাধারণ সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অদ্য (মঙ্গলবার) হইতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ট্রাম কোম্পানীর এজেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, বুধবার হইতে সকল রুটে পুরাদমে ট্রাম চলাচল শুরু হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

১৬ই সেপ্টেম্বর—ভারতবর্ষে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার যে অভাব ঘটিয়াছে, সেই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম জা... কার ভারতবর্ষকে আরও ৬ কোটি ডলার ঋণদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষকে আরও ৬ কোটি ডলার ঋণ দান করা হইবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজন ফস্টার ডালেস আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যদি ওয়ারসয় চীন-মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের আলোচনা ব্যর্থ হয়, তবে আমেরিকা ফরমোজা সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপন করিবেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—আলজিরিয়ার মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অদ্য কায়রোতে 'স্বাধীন আলজিরিয়া সরকার' গঠনের কথা ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইরাক ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র উহাকে স্বীকার করিয়া লয়।

গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআন্দ্রে গ্রোমিকো ফরমোজা হইতে মার্কিন সেনা অপসারণের দাবী জানান এবং 'যৌথ প্রচেষ্টায় আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যে কোন মুহূর্তে' চীনকে সাহায্য করিবেন বলিয়া পুনরায় প্রতিশ্রুতি দেন।

২০শে সেপ্টেম্বর—আজ পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় উত্তেজিত সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট মারামারি শুরু হইলে স্পীকার আপের জন্য সদস্যদের প্রহারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। স্পীকারের আসন মঞ্চের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলা হয় এবং জাতীয় পতাকা অপবিত্র করা হয়।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য শ্রীনিকিতা খুশ্চেভ কর্তৃক লিখিত 'গ্রহণের অযোগ্য' একখানি পত্র তাঁহার নিকট ফেরত পাঠাইয়াছেন। পত্রের ভাষা 'গালাগালিপূর্ণ' বলিয়া তিনি এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

২১শে সেপ্টেম্বর—অদ্য পূর্বপাকিস্তান বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভের নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে বিধানসভার তেরজন কর্মচারীকে গতকল্য সন্ধ্যায় বিধানসভাকক্ষের অভ্যন্তরে দাঙ্গাহাঙ্গামা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর—মস্কো বেতারে প্রকাশ, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রী খুশ্চেভ 'প্রাভদার' প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, ফ্রান্সে ফ্যাসিজম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং পশ্চিম জার্মানীর জঙ্গীবাদীদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষান্মাসিক ১১, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ প্রণীত

## ভগবৎ প্রসঙ্গ

'ভগবৎ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে "অবতার", "কর্মফল ও সমর্পণ-রহস্য", "শ্রীগুরু" ও "জন্ম-[illegible]" এই চারটি দুরূহ তত্ত্ব সরস গল্পের মাধ্যমে গুরুশিষ্যের কথোপকথনরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

দাম : ৩.৫০ টাকা

o o

**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

বিপ্রদাস (উপন্যাস) ... ৫.০০
পথের দাবী (উপন্যাস) ... ৬.০০
শ্রীকান্ত (নাটক) ... ... ২.০০
পরিণীতা (নাটক) ... ... ১.৫০

**রাজশেখর বসু**

রামায়ণ ৬.৫০ মহাভারত ১০.০০

**সুধীরচন্দ্র সরকার-কৃত**

পৌরাণিক অভিধান ... ... ৭.০০

**কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা ... ২.০০

"পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"
"পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসার[illegible]"
পর অবিশ[illegible] গ্রন্থ
অচিন্ত্যকুমারের

## বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রথম খণ্ড

দাম : পাঁচ টাকা

**পরশুরাম**

আনন্দীবাঈ ইত্যাদির গল্প ... ৩.০০
গড্ডলিকা ২.৫০ কৃষ্ণকলি ২.৫০
হনুমানের স্বপ্ন ২.৫০ কজ্জলী ২.৫০
গল্পকল্প ২.৫০ ধুস্তুরীমায়া ৩.০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ... ৩.০০

**অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র**

বনশ্রী (উপন্যাস) ... ৩.০০

**অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুন গল্পগ্রন্থ**

## রূপের দায়

কথাশিল্পী হিসেবে অন্নদাশঙ্কর চিরদিনই সংস্কারবর্জিত জীবনশিল্পের প্রবক্তা। তাঁর কাহিনীর মেরুদণ্ডে যেমন উন্নত বিবেক-বুদ্ধির আশ্চর্য ঋজুতা, শিল্প-রূপের সূক্ষ্ম দীপ্তিতেও তেমনি অনায়াস শ্রেষ্ঠতা। 'রূপের দায়' গ্রন্থের সাতটি গল্পেই এই শ্রেষ্ঠতা সুপ্রমাণিত। দাম : ৩.০০

o o

**বুদ্ধদেব বসু**

যে-আঁধার আলোর অধিক (কবিতা) ২.৫০
কালিদাসের মেঘদূত ... ৫.৫০
শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ... ৩.২৫

**দীপক চৌধুরী**

রোয়াক (উপন্যাস) ... ... ৩.৫০
এই গ্রহের ক্রন্দন (উপন্যাস) ... ৬.০০
কুমারী কন্যা (উপন্যাস) ... ৩.০০

**প্রতিভা বসু**

মধ্যরাতের তারা (উপন্যাস) ... ৩.২৫

**ভবানী মুখোপাধ্যায়**

চন্দ্রমল্লিকা ... ... ২.৫০

**এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড.** ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

---

প্রবোধকুমার সান্যালের
নবতম ও শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস

## বেলোয়ারী

প্রকাশিত হইয়াছে।
—সাড়ে ছ টাকা—

রাজশেখর বসু প্রণীত
নবতম প্রবন্ধগ্রন্থ

## চলচ্চিন্তা

—আড়াই টাকা—

আশাপূর্ণা দেবীর

## গল্প-পঞ্চাশৎ

শ্রেষ্ঠ ৫০টি নূতন [illegible]
শোভন সংস্করণ
—আট টাকা—

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত রাজসংস্করণের "পথের পাঁচালী"** কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
বৃহত্তম উপন্যাস

## অস্তি ভাগীরথী তীরে

প্রাচীন কলিকাতার পটভূমিকাতে ঐতিহাসিক রসের রোমাঞ্চকর উপন্যাস
—সাত টাকা—

**ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের ভূমিকা সংবলিত**
শোভন বসু অনূদিত
সিপাহী বিদ্রোহের প্রামাণ্য এক কাহিনী

## সিপাহী থেকে সুবাদার ৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর

## অগ্নিপরীক্ষা ৪র্থ সং

—সাড়ে তিন টাকা—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

## বেনামী বন্দর

—দুই টাকা—

নরেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

## অনমিতা ৪৲

**মিশ্ররাগ** ৩৷৷৹

সুমথনাথ ঘোষের

**অহল্যার স্বর্গ** ৩৲

## শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বিখ্যাত গ্রন্থের নূতন শোভন সংস্করণ

## স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ৩৲

**মিত্র ও ঘোষ** : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-এর
সর্বজনীন উপন্যাস
মায়ের বাঁশী ৪৷৹



# সূচীপত্র

অভিনয় করে আপনার শারদ-উৎসব সার্থক করে তুলুন

**অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি নাটক**

# ॥ আকাশ-বিহঙ্গী ॥

॥ মূল্য—দু'টাকা ॥

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভূতির ব্যঞ্জনায় 'আকাশ-বিহঙ্গী' নাটকটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। —যুগান্তর

অজিতবাবু অল্পকালেই তাঁর দক্ষতার স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শকুন্তলা রায়' যাঁরা পড়েছেন, 'আকাশ-বিহঙ্গী'তে তাঁরা স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় নাট্যকারের আঙ্গিককে আয়ত্ত করার দিশা খুঁজে পাবেন। সেই সঙ্গে বিদেশী সমাজের দুরূহ ও সুদূর সমস্যাকে ঘরোয়া করে তোলার বিস্ময়কর চাতুর্যও তাঁদের মুগ্ধ না করে পারবে না। 'আকাশ-বিহঙ্গী' নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

—স্বাধীনতা

# ॥ শকুন্তলা রায় ॥

**ইবসেনের 'হেডা গ্যাবলার' নাটকের সার্থক অনুসরণ**

॥ মূল্য তিন টাকা ॥

'শকুন্তলা রায়' সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তা একাধারে বাংলা ও নাটক হয়েছে। এমন স্বাভাবিক অথচ বিষম গুণের সমন্বয় বেশী বাংলা নাটকে ঘটে না।

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

# নির্বোধ ও সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

॥ মূল্য তিন টাকা ॥

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় নাটক রচনার যে নতুন পথটি বেছে নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা অভিনন্দনযোগ্য। বর্তমানে বাংলা নাটকের অভাবের দিনে সস্তা জনপ্রিয়তাই যখন নাটকের গুণাগুণের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে উঠছে, সেই সময় 'নির্বোধ'এর প্রকাশ আশাব্যঞ্জক।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

'নির্বোধ' নাটকটি রসানুভূতির উচ্চগ্রামে উন্নীত হয়েছে। লিখননৈপুণ্যও উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। চমৎকার সাবলীল সংলাপ। মার্জিত ভাষা। — শনিবারের চিঠি

# ॥ মালয় মায়ের ডাক ॥

লেসলে রিচার্ডসনের **'ফর আওয়ার মাদার মালয়া'** নাটকের অনুবাদ

॥ মূল্য তিন টাকা ॥

অনুবাদের সাফল্যও সম্ভবতঃ সেইখানে। ঝরঝরে অনুবাদে অনুবাদক পাঠককে একাত্ম করে তুলতে পেরেছেন সুদূর মালয়ের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে। ভাষার দিক থেকে এক নতুন পরীক্ষা করেছেন অনুবাদক............ —স্বাধীনতা

In the translation Ajit Babu has retained all the vividness and flavour of the original.—A. B. Patrika.

**সেনগুপ্ত বুক স্টল**, গভর্ণমেণ্ট স্টল নং ৩৬

(ছায়া সিনেমার বিপরীতে), আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬

**পুস্তকালয় :** ৫৮সি, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা—২৬

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের আগামী নাটক

# ॥ পোস্টমাস্টারের বউ ॥

**এ নাটকের জন্য অপেক্ষা করুন**

---

**ছোটদের জন্য কিনুন**

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার

ফেং শুয়ে-ফেং-এর

# চীনা গল্প

মূল্য—১·২৫ নঃ পঃ

সাময়িক পত্র পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—

**ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ** কলিকাতা-১২ এবং **ভ্যারাইটি সার্ভিস,** ১০৬বি আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ২০০৫)

---

**ছোটদের হাতে দেওয়ার মতো!**

## শারদীয় সংখ্যা

# আগামী

***সবচেয়ে বড় আকর্ষণ***

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কিশোর উপন্যাস

# মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

**কেবল বড়দেরই সেরা লেখক নন, ছোটদের মনের কোণেও কেমন সহজে আসন করে নিতে পারেন, তার প্রমাণ পেতে গেলে পড়তে হবে এই উপন্যাস**

এ ছাড়া থাকছে :

**প্রেমেন্দ্র মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ** গঙ্গোপাধ্যায়, সুখলতা রাও, **লীলা মজুমদার, শিবরাম চক্রবর্তী,** . **সুভাষ মুখোপাধ্যায়,** দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, **বিমলচন্দ্র ঘোষ, ইন্দিরা দেবী, আশা দেবী, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ** চট্টোপাধ্যায়, **সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার** প্রমুখের সুখপাঠ্য রচনা।

ভেতরে অজস্র ছবি, তিনরঙা প্রচ্ছদ।

দাম : কাগজের বাঁধাই : দু' টাকা

বোর্ড বাঁধাই : আড়াই টাকা

---

**বিশেষ ঘোষণা :**

১০ই অক্টোবরের মধ্যে চার টাকা পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হ'লে তাঁদের এই মূল্যবান সংখ্যাটি বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

---

আগামী

৫৯, পটুয়াটোলা লেন,

কলিকাতা-৯

# সূচীপত্র



# সূচীপত্র



প্রচ্ছদ—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

**ছোটদের গল্পের বই**

● **স্বাস্থ্যপরীর গল্প—**
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ ১·৫০
(ডি, পি, আই ও দিল্লীর শিক্ষা দপ্তর হইতে অনুমোদিত)

শ্রীসনৎকুমার ভট্টাচার্যের
○ **পরিবেশের রূপকথা—** ১·০০
● **যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ—** ১·৫০
● **পরমাকাঙ্ক্ষা** (ডিকেন্সের) ১·৫০

**এস কে পালিত এন্ড কোং**
৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

---

**মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত**
বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্যপাঠ্য দুইখানি অমর গ্রন্থ।

**কর্মযোগ** (নূতন সংস্করণ) —২৲
**প্রেম** (নূতন সংস্করণ)—২৲

বই দুইখানি নিজে পড়ুন ও প্রিয়জনদিগকে উপহার দিন।

সহজে হিন্দী শেখার জন্য একখানি অবশ্যপাঠ্য পুস্তক।

**সহজ রাষ্ট্রভাষা বোধ—**
**শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত**, এম, এ:
পরিচয় লিখিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ **শশিভূষণ দাশগুপ্ত**। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়সমূহের বাংলা ভাষাভাষী পরীক্ষার্থীদের ও সরকারী চাকুরিয়াদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

মূল্য—এক টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ।

পরিবেশক:

# বসু বুক ষ্টল

॥ ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥
॥ কলিকাতা—১২ ॥

---

## শারদীয়া

# গল্প-ভারতী

**সাহিত্য ক্ষেত্রে এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ পূর্বে কখনও সম্ভব হইয়াছে কি? সর্বশ্রেণীর, সর্বদলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যরথীদের অপূর্ব সমাবেশ।**

এই বিরাট গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা যাঁদের রচনা-স্পর্শে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁদের মধ্যে আছেন—

**প্রবন্ধ**—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, ডাঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ডাঃ সুকুমার সেন, ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীঅতুল বসু (শিল্পী), শ্রীগোপাল ভৌমিক, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

**গল্প**—পরশুরাম, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত, শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, বনফুল, শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীদেবেশ দাশ, শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রমথ বিশী, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, ভাস্কর, সম্বুদ্ধ, শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসুশীল রায়।

**শ্রীবুদ্ধদেব বসুর** একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস॥

**শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রতিভা বসু, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী**
ও বোধিসত্ত্ব মৈত্রের

**চারটি বড় গল্প**

**কাহিনী:—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**
**নাটিকা:—শ্রীমনোজ বসু**

অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মহা এশিয়ার সংস্কৃতি (সচিত্র সংযোজন)

এই বিরাট গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৮৲ টাকা। ডাকমাশুল ৭৫ নয়া পয়সা

**মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে। সত্বর অর্ডার দিন।**

ভারতের প্রতি শহরে ও গ্রামে যেখানে আমাদের এজেন্ট নাই, সেখানে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

**ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ** ২৭৯বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬

---

ফিয়োডোর ডস্টয়েভ্স্কির 'THE BROTHERS KARAMAZOV'এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

# কারামাজভ কাহিনী

অনুবাদ করেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — দাম ৬·৫০ টাকা। সচিত্র।

প্রমথনাথ বিশী
## অলৌকিক
সতেরটি অদ্ভুত গল্পের বিচিত্র সমাবেশ।
দাম ২·৫০ টাকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
## ঋতু সম্ভার
ছয়টি ঋতুকে কেন্দ্র করে লেখা ছটি গল্প।
দাম: ২·৫০ টাকা

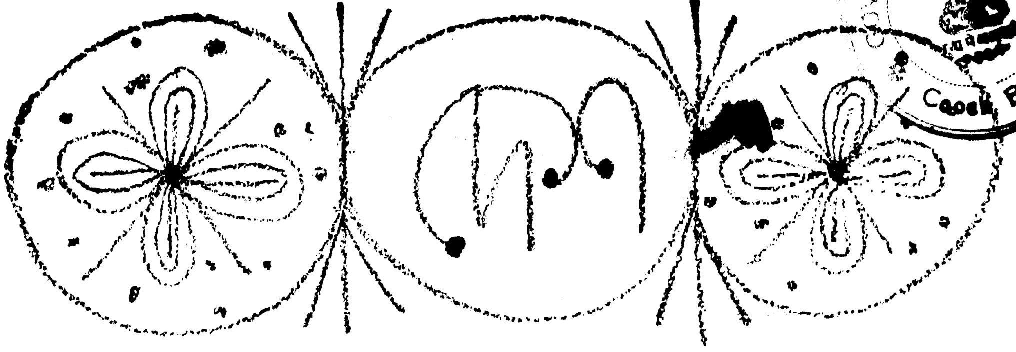
অন্যান্য প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

সুশীল রায়
**প্রণয়ী পঞ্চক**

বিশু মুখোপাধ্যায়
**রসকাব্য মালিকা**

নীহার রঞ্জন গুপ্ত
**অন্ধকারা**

**নতুন প্রকাশক**—১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 4th Oct. 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৪৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ




## গান্ধীমহিমা আবিষ্কার

মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে আর একবার শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় মহাপুরুষগণও দেশ ও কালের প্রভাবের অতীত নন। বস্তুতঃ মানবমহিমা দেশ ও কালের প্রভাব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিচার করিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, সভ্যতার সূচনা হইতে একই মহিমা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, দেশ ভেদে ও কাল ভেদে মহাপুরুষেরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধরিতেছেন, এ যেন অবিচ্ছিন্ন গঙ্গাপ্রবাহের কোথাও স্বচ্ছতা, কোথাও নীলাভা, আবার কোথাও বা ধবলিমা।

এই চিরপ্রবহমান মানব মহিমাই ভারতের মাটির গুণে, মানুষের গুণে, সাধনার গুণে এ যুগে গান্ধীমূর্তি ধরিয়াছে। তাঁহার সৃষ্টিতে ভারতের ও বর্তমান যুগের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, বাকি যা থাকিল সেটুকু তাঁহার নিজস্ব। এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ ছাপ রাখিয়াছে তাঁহার দেহে, পরিচ্ছদে, খাদ্যে ও আচরণে, এদেশের আবহমান-কালের সাধনা ছাপ রাখিয়াছে তাঁহার চরিত্রে, কর্মে ও বাক্যে। আবার "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"র বর্তমান যুগ ছাপ রাখিয়াছে তাঁহার সাধনার বিশেষ পন্থায়, যাহাকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন "অহিংসা" নামে গূঢ়ার্থবাচক শব্দটিতে। আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশে, বর্তমান যুগ ছাড়া আর কোন কালে গান্ধীচরিত্রের অনুরূপ সম্ভব হইত না।

মহাধীমান আইনস্টাইন বলিয়াছিলেন যে, চোখে না দেখিলে গান্ধীজিকে [illegible] বলিয়া মনে করিতেন তিনি। যন্ত্রময় যুগে গান্ধী কর্তৃক যন্ত্রের প্রাধান্য অস্বীকার তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। তেমনি যখন হিংসাটাই রাষ্ট্রধর্ম হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকাংশে ব্যক্তিধর্মও বটে, সেই সময়ে হিংসাকে সমূলে অস্বীকার করিয়া অহিংসার উপর মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পরবর্তী যুগসমূহকে বিস্মিত করিয়া দিবে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, গান্ধীর সমকালে না জন্মিলে, দূরবর্তী ভাবী-কালে জন্মিলে তাঁহার মহিমা সম্যক বুঝিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহার পূর্ণতর মূর্তি দেখিতে পাইতেন। একথা অতিশয় সত্য। প্রাদেশিকতা, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও সর্বোপরি রাজনীতি গান্ধীচরিত্রের যাথার্থ্য উপলব্ধিতে বাধা ঘটাইয়াছে। সমসাময়িক লোকে যে-গান্ধীকে জানে তিনি প্রকৃত মানুষটির সামান্য একটি অংশমাত্র। যথার্থ মানুষটিকে জানিবার জন্য সুদীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতের আবশ্যক। ব্যক্তি-গান্ধী যত দূরে গিয়া পড়িবেন, দীর্ঘতর পরিপ্রেক্ষিত লাভ করিয়া তত বড় হইয়া উঠিবেন। যথার্থ মহৎ দূরত্বের কালে গিয়া মহত্তর রূপ ধারণ করে। তারপরে "শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে" যতই তিনি তৎসাময়িকের ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকিবেন, ততই মহত্তর হইতে হইতে এক সময়ে লোকে দেখিবে,

"নিয়েছ আসন তব
সকল দিকের কেন্দ্র দেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া।"

এ যুগের আমাদের কাজ সেই সত্য ও চিরকালীন গান্ধীকে আবিষ্কার প্রচেষ্টা। সমসাময়িক রাজনীতির ঘষা কাচের মাধ্যম অনেকের চোখে গান্ধীকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিকৃত মাধ্যম দূর করিতে পারে কাল ও প্রচেষ্টা। কাল আমাদের হাতে নয়, প্রচেষ্টা বটে। সেই প্রচেষ্টাই এখন আমাদের কর্তব্য। গান্ধীযুগে জন্মিয়া তাঁহার মহিমার কথঞ্চিত যদি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই, তবে সে এক মহৎ সান্ত্বনা।

## দশমিক মাপ

রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিনা হাঙ্গামায় আমূল পরিবর্তন যদি ঘটে (ফ্রান্সে যাহা ঘটিল), তাহাকে বলি "রক্তপাতহীন বিপ্লব।" অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতে প্রায় নিঃশব্দে এবং নিতান্তই ধীরে ধীরে যাহা ঘটিতেছে, তাহাকে "অশ্রুপাতহীন বিপ্লব" বলিতে পারি। নূতন মুদ্রার পিছে পিছে আসিয়াছে মাপে ও ওজনে দশমিক পদ্ধতি। ঘটনাটাকে "অশ্রুপাত-হীন" বলিলাম এইজন্য যে, আমাদের সরকার সাবধানী পথিক, সাধারণের যাহাতে অসুবিধা না ঘটে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। রাতারাতি ডিক্রী জারী করিয়া উচ্ছেদের নীতি তাঁহাদের নহে। তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহাকে বরং অন্যতর ক্ষেত্রে সহাবস্থান নীতি প্রয়োগের অভিনব পরীক্ষা বলা যায়। পুরাতনকে হঠাৎ সরাইয়া নূতন আসে না, পুরাতন থাকিতে থাকিতেই আসে। নূপাতির

জীবদ্দশাতেই যুবরাজের অভিষেকের মত। তারপর নূতন ধীরে ধীরে গা-সহা হইয়া আসে, দ্বৈত শাসনের অবসানে পুরাতন বিনাযুদ্ধে সবটুকু মেদিনী নূতনকে ছাড়িয়া দিয়া বিদায় নেয়, তখন নূতনকেই পুরাপুরি মানিয়া নিতে লোকের আপত্তি থাকে না।

ভারতের নানা রাজ্যের নির্বাচিত কয়েকটি অঞ্চলে ১লা অক্টোবর পরিমাপে দশমিক নীতি প্রচলিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সর্বত্রই এই পদ্ধতি চালু হইবে—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দুই-তিন বৎসরের পূর্বে কায়েম হইবে না। ততদিন নূতন ও পুরাতন নিয়ম পাশাপাশি চলিবে; এবং নূতনকে এখনই গ্রহণের বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না। ব্যবসায়ীরা ও জনসাধারণ যখন ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিবেন, তখনই নূতন নিয়ম এক এবং অদ্বিতীয় হইবে।

তবু, অনেকে বলিবেন, ব্যাপারটা "একটা নতুন কিছু করার বাতিক।" আগের কাজ আগে না সারিয়া সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতিতেছেন। আমরা তাহা মনে করি না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত এই সীমিত পরিসরের সংস্কার প্রয়াসের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ইহার উদ্দেশ্য দুই। প্রথমত, বহির্বিশ্বের সহিত তাল রাখিয়া চলা, দ্বিতীয়ত, আসমুদ্র হিমাচল ভারতের ভাবজগতে যে ঐক্য, তাহাকে ব্যবহারিক জীবনে একীকরণের বন্ধনে দৃঢ়তর করা।

আমরা জানি, সের আর মণের হিসাব সনাতন। কিন্তু খেয়াল করি না যে, সেই সনাতনের চেহারা সর্বত্র এক নয়। বার রাজপুতের তের হাঁড়ির মত নানা রাজ্যে এমন কি, জেলায় জেলায় সের-মণের রকমারি রূপ। মণ আছে শতাধিক রকমের, আর সের কোথাও ষাট তোলায়, কোথাও আশি তোলায়, কোথাও-বা তাহারও বেশি। সরকার এই বস্তুকে এক করিতেছেন, এক সূত্রে সহস্রটি মণকে বাঁধিয়া দিতেছেন।

মেট্রিক পদ্ধতিটা বিদেশী বলিয়াও অনেকের সংশয় আছে। এ-ধারণাও ভুল। মেট্রিক শব্দটির মূলে যদিও আছে 'মীটার' (মেরু হইতে বিষুব রেখার কল্পিত দূরত্বের কোটিতম অংশ) এবং ফরাসী দেশেই ইহার উৎপত্তি, তবু পদ্ধতিটা আসলে দশমিক, গণিতে বিন্দুর খেলা ও শূন্যবাদ ভারতই পৃথিবীকে দিয়াছে। কয়েকটি শূন্য বসান বা বিন্দুকে এদিক-ওদিক সরান মাত্র—নিয়মটা একবার মায়স্ত হইয়া গেলে সওদাগরী আর সরকারী অফিসে বহু কেরানীর শ্রম এবং সময় বাঁচিবে, হিসাবে ভুলও বেশি হইবে না।

আর বাঁচিবে পাঠশালার শিশুরা। বুড়িকিয়া, সেরকিয়া, গণ্ডাকিয়া মুখস্থ করার দায় থাকিবে না। সাঙ্গ হইবে সর্দার-পড়ুয়াদের সুরে সুর মিলানর পালা। পুরাতন ধারাপাতের অনেক পাতাই বাতিল হইয়া যাইবে।

তবু, খেদ ছাড়া সুখ নাই। সেই সহজ-পাঠের আমলেও আমাদের মত দু-চার-জন সেকেলে লোকের হয়ত কদাচিৎ শুভঙ্করকে মনে পড়িবে, যিনি বহু পরিশ্রমে অনায়াস হিসাবের কয়েকটি সূত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 'মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?' কিংবা 'যত টাকা মণ, তত আনা আড়াই সের' ইত্যাদির কোন মূল্য থাকিবে না। 'বৈয়াকরণের সমাধির বিষয়ে ব্রাউনিংয়ের কবিতা আছে; আমাদের গণিতজ্ঞেরও বিস্মৃতির সলিল-সমাধি ঘটিতেছে, কিন্তু তাহা লইয়া কোন গাথা হয়ত রচিত হইবে না।

## শহীদ স্মৃতি প্রতিষ্ঠা

কয়েকদিন আগে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাজাতি সদনে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর ও শহীদগণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মহাজাতি সদন নেতাজী কর্তৃক পরিকল্পিত, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ভিত্তি প্রোথিত; এখন এই দুই বরণীয় পুরুষের স্মৃতির সহিত অন্যান্য স্মরণীয় পুরুষের স্মৃতি যুক্ত হইয়া মহাজাতি সদন সত্য সত্যই সমগ্র জাতির মহদাশ্রয়ে পরিণত হইল। এখানে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আমরা আশা করি, সাধারণের সহযোগিতায় পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়া মহাজাতি সদন সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিবে।

## গর্হিত আচরণ

অপসারিত উট্রাম মূর্তির স্থলে গান্ধীজীর যে মূর্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে, কয়েকদিন আগে জনকতক যুবক তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম যে, যুবকদের সঙ্গে নেতাজী প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের কোন যোগ নাই। কিন্তু এমন একটা কাজ কয়েকজন বাঙালী যুবক করিতে উদ্যত হইয়াছিল ভাবিয়া আমরা নিতান্ত আত্ম-গ্লানি অনুভব করিতেছি। দিনে দিনে আমাদের হইল কি? রাজনীতিতে কোন্ কাজ কর্তব্য কোন্ কাজ অকর্তব্য সে কাণ্ডজ্ঞানও কি অবশেষে আমাদের লোপ পাইল। দেখিতে পাইতেছি না, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও খাদ্য দলীয় রাজনীতির কর্মতালিকাভুক্ত হইয়াছে। অবশেষে গান্ধীজীও সেই তালিকাভুক্ত হইলেন। তিনি তো দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে, একা কংগ্রেসের সম্পত্তি তিনি নন। এমন কি এখন তাঁহাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে মনে করাই উচিত। এমন অবস্থায় এহেন গর্হিত কাজের নিন্দা করিবার মতো ভাষা আমাদের নাই। নেতাজী ও অন্যান্য বরণীয় মহাপুরুষগণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর্তব্য, সে দাবী উঠিয়াছে, তাহা পূরণ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হোক ইহা সকলেরই কাম্য, কিন্তু গান্ধীজীর মূর্তি ভঙ্গের চেষ্টা—না দেখিলে বিশ্বাস করিতে বাধিত। এ অসম্মান নেতাজীর বুকেও আঘাত করিবে—ইহা কি দুষ্কৃত-কারিগণ বুঝিতে পারে নাই? কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, সরকারী বিবেচনার অভাবের অজুহাত দেখাইয়া প্রকারান্তরে এই কার্যের সমর্থকেরও অভাব হয় না এই দুর্ভাগা দেশে।

## গৃহ নির্মাণ ঋণ

নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে সহজে বাড়ি তৈয়ারি করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়া থাকেন। এই পরিকল্পনা "লো ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীম" নামে পরিচিত। কিছুদিন আগে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, উচ্চতর আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বাড়ি তৈয়ারির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এক পরিকল্পনানুসারে ঋণ দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন—প্রস্তাবিত এই পরি-কল্পনার নাম "মিডল্ ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীম"। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হইলে 'উচ্চতর' আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার হইবে। বলা বাহুল্য, 'উচ্চতর' আয় হইতেও দৈনন্দিন খরচ করিয়া বাড়ি তৈয়ারির জন্য অর্থ সঞ্চয় আজকার দিনে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঋণ পাইবার পথ অযথা কণ্টকিত না হওয়া উচিত, আর সরকারী লালফিতার কল্যাণে পথটা জটিল হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। ঋণের টাকা মারা যাইবে না, আর প্রার্থী সত্যই চিহ্নিত আয়বিশিষ্ট—এইটুকু জানাই কি যথেষ্ট নয়? এত কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সরকারী দপ্তরখানায় একদল লোকের বুদ্ধি কম—অপর দলের বুদ্ধি বেশি—এই দুয়ের টানাটানিতে পড়িয়া সাধারণের দুর্ভোগ হইয়া থাকে—তাই সর্বজনবিজ্ঞাত এই কথাটি আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলাম।




টেবিলটিকে ঘিরে আমরা বসে ছিলাম। আমরা পাঁচজন। প্রথমে খুব হাসছিলাম। সবাই, খুব গল্প করছিলাম। তারপর শুরু হল ডোমিনো খেলা। তারপর তা-ও আর ভাল লাগল না। হাত গুটিয়ে নীরবে তখন বসে রইলাম।

আমাদের মধ্যে বড়দিই সবচাইতে বড়। তার বয়স এখন তের। আর সবচাইতে ছোট যে ভাইটি, সে এবার পাঁচ বছরে পড়েছে। কিন্তু বয়স এত অল্প হলে কী হয়, মনে মনে আমরা সবাই বুড়িয়ে গিয়েছিলাম। উদ্বেগে, আতঙ্কে।

বাইরে কারও পায়ের শব্দ শোনামাত্র আমরা দরজার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম। চক্ষু বিস্ফারিত, নীচের চোয়াল ঝুলে পড়েছে,—আমাদের সেই চেহারা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

"এ নিশ্চয়ই মা!"

কিন্তু না। এবারেও সেই পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল, আর বোকার মত এ ওর দিকে তাকালাম আমরা। চোখের আলো আমাদের মুছে এসেছে, কিন্তু মা এখনও আসেননি। মা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, তারপর ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কোথায় গিয়েছেন মা, আমরা জানি না। আমরা শুধু জানি, মা কিছু খাবার নিয়ে ফিরে আসবেন। খাবার যে তিনি আনবেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তার কারণ, বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। অথচ রাত্তিরের খাওয়া তখনও বাকী।

শিশুর বিশ্বাস বড় নিষ্ঠুর। সে জানে, সন্ধ্যা যখন হয়েছে, তখন কিছু একটা খাবার ব্যবস্থা হবেই। শিশুর বিশ্বাস বড় নির্মম। সে জানে, খাবার ব্যবস্থা হবেই। মা, আমাদের খাবার নিয়ে এস। যেখান থেকে পার, নিয়ে এস! মাটি খুঁড়েই হক, আর আকাশ থেকেই হক!

মা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, তখন তাঁকে বড় অসহায় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, তাঁর শরীর যেন আরও ছোট হয়ে গিয়েছে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, কপালে চিন্তার রেখা।

"বসে বসে একটু গল্প কর তোমরা, একটু বাদেই আমি খাবার নিয়ে ফিরে আসব। যাব আর আসব।"

আমরা ভাবলাম, মা হয়ত রুটির দোকানে

গেলেন। দোকানটা দূরে নয়, আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র শ তিনেক গজ। যেতে মিনিট দুয়েক, ফিরে আসতে মিনিট দুয়েক। দোকানে দাঁড়িয়ে মা যদি মিনিটখানেক কথাও বলেন কারও সঙ্গে, তাহলেও ত সব মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবার কথা নয়। আচ্ছা, সেখানে না হয় দশ মিনিটই লাগল। উনুনের পাশেই দেয়াল-ঘড়ি। তার বড় কাঁটাটা বড় আস্তে আস্তে ঘোরে। কিন্তু চেয়ে দেখি, পুরো এক চক্কর সে ঘুরে এসেছে।

"মা নিশ্চয়ই রুটির দোকানে যায়নি!" হানসাই প্রথমে কথা কইল।

"তাহলে বোধ হয় বড় দোকানটায় গিয়েছে!" ফ্রানসার গলা।

"কিন্তু তারা যদি কিছু না দেয়!" আমি বললাম।

শুনে সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে

তাকাল। যেন আমি ভারী অদ্ভুত একটা কথা বলেছি। যেন তার অর্থটা ওরা ধরতে পারছে না।

"যদি কিছু না দেয়! তার মানে?" হাসনার গলায় বিস্ময়।

"রাত্তিরে কিছু খাব না নাকি, বাঃ!" ফ্রানসা বলল।

বাইরে সন্ধ্যা। ঘরের মধ্যে রাত্রি নেমে এসেছে। বয়স আমাদের অল্প, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা একটু অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি। অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়েছি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই এক ঘণ্টায় আরও খানিকটা বুড়ো হয়েছি আমরা।

ভূতপ্রেতকে আমরা আর ভয় পাই না। ডাইনীকেও না। দিনকয়েক আগের কথা, আমি আর আমার ছোট বোন সেদিন মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। চেয়ে দেখি, আর পাঁচটা ক্ষেতের থেকে একটু দূরে একটা ক্ষেত; সেখানে কারা ফসল কেটে আঁটি বেঁধে সাজিয়ে রেখেছে। সবাই বলে, ওখানে নাকি ভূত আছে। আঁটিগুলির সামনে মরা একটা গুঁড়ি। দেখে মনে হচ্ছিল, কে যেন একটা চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে: জ্বলজ্বল করছে তার জামাকাপড়। ছোট বোনের হাতটাকে শক্ত করে ধরে আমি সেদিন মাঠটা পেরিয়ে গিয়েছিলাম।

আজ কিন্তু বড় ভয় করছিল। ভয় আমাদের হৃদয়ে: পরিবেশের চাপে আর নানা অভিজ্ঞতায় যে-হৃদয় ইতিমধ্যেই বুড়িয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল, দূর-দিগন্তে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দৈত্য। ধীরে ধীরে সে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে, আর ধীরে ধীরে আরও বড়, আরও বিশাল হয়ে উঠছে তার শরীর। বড় কালো, বড় ভয়ঙ্কর তার চেহারা। সমস্ত দিগন্ত যেন তার শরীরের পিছনে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, সে দৈত্য নয়, সে জীবন। জীবনের সেই বিকট চেহারা দেখে আমরা ভয় পেয়েছিলাম।

জলে ভরে গিয়েছে আমাদের চোখ, কিন্তু শব্দ করে কেউই আমরা কাঁদছি না। মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবার সব চুপ। মাঝে মাঝে আশা জেগে উঠছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় মর্মান্তিক সেই আশা। কত মর্মান্তিক,—জীবনের কাছে মার খেয়ে যে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে, একমাত্র সে-ই তা জানে।

"এর আর শেষ নেই! এইভাবেই আমাদের বসে থাকতে হবে! মা আসবে না! মা আমাদের খাবার নিয়ে আসবে না! সবাই আমরা মারা যাব!"

নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছিলাম আমরা। আর সেই নৈরাশ্যই আমাদের মনের মধ্যে বড় কুটিল, বড় ভয়ঙ্কর একটা অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলছিল। হঠাৎ যেন তিক্ত, হিংস্র

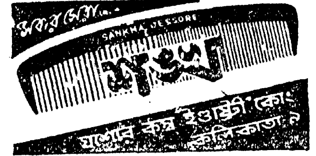
একটা ঘৃণায় ছেয়ে গেল আমার মন। মকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। একা আমি নই, আমরা সবাই। অন্ধকার সেই ঘরের মধ্যে টেবিলটিকে ঘিরে বসে ঘৃণার আগুনে আমরা জ্বলতে লাগলাম।

"মা কি পারে না! ইচ্ছে করলেই পারে! কাল রাত্রেও ত মা রুটি নিয়ে এসেছিল! আজ কেন পারবে না। কালকের চাইতে আজকে ত আমাদের খিদে কিছু কম পায়নি! কোথায় গিয়েছে মা, কে জানে! হয়ত কোথাও গিয়ে আড্ডা মারছে, হাসছে! আমাদের কথা হয়ত মনেও নেই! বলে গিয়েছিল, এক্ষুনি খাবার নিয়ে ফিরে আসবে। তারপর একটা ঘণ্টা কেটে গেল! এক ঘণ্টা কেন, দেড় ঘণ্টা! ইচ্ছে করেই দেরি করছে মা। বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আর নয়ত কারও বাড়িতে গিয়ে গল্প করছে। এ কি আর আমরা বুঝি না। নিজের খাওয়াটা সেরে নিয়েছে নিশ্চয়ই, তাই আর এখন ফিরে আসবার তাড়া নেই।"

এসব কথা অবশ্য আমরা মুখ ফুটে বলিনি। কিন্তু সেই নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে বসে কে কী ভাবছে, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম।

"ছোট বোনটি, তুমিও এই কথাই ভাবছ! ছোট ভাইটি, তোমারও এই কথা!" পরস্পরকে আমরা বুঝে নিয়েছিলাম, আমাদের মধ্যে আর তখন একটুও ভালবাসা ছিল না।















রাত ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও পরস্পরের চোখ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নীরব ভাষায় সে-চোখ বলছে, "ওহে বোন, তোমাকে আমি চিনি। কেন যে তুমি অমন চুপ করে বসে আছ, তা আমার অজানা নয়। নিজের পাপের কথা তুমি ভাবছ। যে পাপ তোমার আত্মাকে কখনও ছেড়ে যাবে না!"

"ওহে ভাই, তোমাকেও আমি চিনি। তুমি যে কী ভাবছ আমার সম্বন্ধে, আমি জানি। এইমাত্র তোমার মনের মধ্যে যে-সব কথা খেলে গেল, তাও আমার অজানা নয়! তোমার পাপও তোমাকে ছেড়ে যাবে না।"

বাইরে, আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে, হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠল। ভারী করুণ শোনাল তার চিৎকার। আর সেই ডাক শুনে আমরা যেন আরও দমে গেলাম।

"কুকুরটার খিদে পেয়েছে, তাই কাঁদছে!" দিদি বলল। দিদির কথা শুনে ছোট ভাইটা হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। তার কান্না আর ওই কুকুরটার আর্তনাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেল না।

"কাঁদিসনে!" চেঁচিয়ে ধমক দিল দিদি। কিন্তু বুঝতে পারলাম, তারও গলায় কান্না ঠেলে আসছে। টেবিলটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম।

বললাম, "আমি বরং রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই। দেখি মা আসে কি না। আর দেখেই বা লাভ কী। যখন তার খেয়াল হবে, তখন ফিরবে। তার আগে ত আর ফিরবে না।"

ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, দরজাটা খুলে গেল। দেখলাম, চৌকাঠে পা রেখে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের রেখাগুলি এত স্পষ্ট যে, মনে হল যেন, দিনের আলোয় তাঁকে দেখছি। সাদা ফ্যাকাশে তাঁর মুখখানি; এখন যেন তাঁকে আরও ছোট দেখাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। ভীরু চোখে আমাদের দিকে তিনি তাকালেন। কাঠগড়া থেকে আসামীরা হয়ত এই ভাবেই তাদের বিচারকের দিকে তাকায়।

"অনেকক্ষণ বুঝি বসে রয়েছ তোমরা?" শান্ত অনুনয়ের গলায় তিনি বললেন, "কী করব বল, এর আগে ত জোগাড় করতে পারলাম না।" ভাল করে তাকিয়ে দেখি, হাতের মুঠোয় একখণ্ড রুটি তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন। রুটির সোনালী হলুদ রঙের আস্তরণটাও আমাদের চোখে পড়ল।

মা গো, এখন আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার শরীরকেই সেদিন চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়েছি আমরা, তোমার রক্তই সেদিন পান করেছি! তাই ত এত শিগগির তুমি বিদায় নিলে! তাই ত আর আজ আমাদের হৃদয়ের কোনখানে কোন আনন্দ নেই, তাই ত আর কোনও কাজে এখন সুখের আস্বাদ খুঁজে পাই না।...

* একটি যুগোশ্লাভ গল্পের অনুবাদ

## দো স রা অ ক্ টো ব র

শান্তশীল দাশ

একটি দুটি মানুষ আজো তোমার কথা বলে,
একটি দুটি মানুষ আজো তোমার পথে চলেঃ
তার বেশি নয়, নয়—
তবু তোমার পথটি আছে নিত্য জ্যোতির্ময়।

পথ চলি না, সৌধ গড়ে তুলিঃ
নামাবলী অঙ্গে জড়াই; কাকাতুয়ার বুলি
দম-দেওয়া কল চলতে থাকে—
তা না হ'লে ভিখ্ মেলা যে দায়;

ঘটা করে ঘণ্টা কাঁসর সকালে সন্ধ্যায়
বাজাই তো ঠিক। জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি এলে
অনেক-ফুলে-ভরা সাজি সমাধিতে উজাড় করে ঢেলে
স্মরণ করি সাড়ম্বরে—কম কি কিছু করি?
মাটি থেকে তুলে তোমায় মন্দিরেতে ধরি।

সত্যি কথা বলিঃ
নেই আমাদের সেই সাধনা, তোমার পথে চলি।
আমার জীবন, আমার বাণী—বলার মত শক্তি কোথায় পাই;
পথ চলি না, কথার ফানুস শূন্যেতে ওড়াই।

তোমার সে পথ জ্বলছে তবু, জ্বলবেঃ
আসবে পথিক (কবে, কখন?) সে পথ ধরে চলবে।

## ধী ম হি

মণীশ ঘটক

সূচীভেদ্য অন্ধকার কোথায় পালালো?
সৌর নয়, চান্দ্র নয়, এ কেমন আলো?

ছোটো বড়ো অগণন গ্রহতারা কতো,
সবাই জ্বেলেছে দীপ যার ছিলো যতো;
অকম্পেয় মহাশূন্যে তারই জ্যোতিধারা
এ'কে যায় এক সাথে দ্যুতির ইশারা।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥ আলোর মালাতে
পৃথিবীও চায় প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাতে;
আপন মশাল হাতে, হয়ে সহচারী—
হতে নব সৃজনের পথের দিশারী।
এ-মাটির তুমি, আমি, সুপ্ত মৃত প্রাণ,
পলকে প্রদীপ্ত হয়। জানায় আহ্বান
—খোঁজো কোথা মর্ত্ত্যবুকে গুপ্ত দীপাধার!

জ্বলে দীপ, বাজে শঙ্খ, পালায় আঁধার॥

# শারদীয়া দেশ পত্রিকা






# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

৪

জ্যাঠাইমার বড়ো মেয়ে পুনিদি বললেন, 'বাব্বা, তুই আবার সেই বিকট আলিসান খাটটার কথা জিজ্ঞেস করছিস? জঘন্য একটা পদার্থ। মা ওটাকে কবে বেচে দিয়েছেন। এখন ওটাতে দয়াল ভুঁইমালি শুচ্ছে তার বৌ ছেলে নিয়ে।'

'বেচে দিয়েছেন।' দুই চোখে যেন মেঘ ঘনিয়ে এলো সুলেখার। পুনি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'বেঁচেছি। ঘরটা একেবারে জুড়ে ছিলো। কী পছন্দই ছিলো বাপু আগেকার দিনের লোকদের। মাগো। ওটা নাকি আবার দাদুর বিয়ের খাট ছিলো।'

হতাশায় ডুবে গেল সুলেখা। চোখ ছলছলে হয়ে উঠলো। দাদু ঠাকুমাকে তবে এ বাড়ি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ওরা?

তা দিয়েছেন। শুধু দাদু ঠাকুমাকে কেন, তার বাবাকেও। কয়েক দিনের মধ্যেই সুলেখা বুঝতে পারলো, সুপ্রকাশ তালুকদার নামক কোনো মানুষ কোনদিন যে জীবিত ছিলেন, এ বাড়িতে তাঁরও যে সমান দখল ছিলো, একথাটাই মানতে চাইছে না কেউ। মানলেই বিপদ। তিনি না থাকুন, তাঁর স্ত্রীতো আছেন। সন্তানরা তো আছে। সুলেখা ভালো করেই জানলো, সেই সুপ্রকাশ তালুকদারের অতীত অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ তাদের চারটি প্রাণীর বর্তমান অস্তিত্বটাও এবাড়িতে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত।

বাবার জন্য নতুন করে শোক উথলে উঠলো তার। সারাটা রাত সেদিন কাঁদলো সে। সারাটা দিন গুম হয়ে রইলো। তার বারো বছরের কিশোরী হৃদয় আবার অনুভব করলো, নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর এই পৃথিবী। আসলে সুখে থাকাটা আকস্মিক, দুঃখটাই সব।

বাড়িটা পুরোনো ধরনের। বুক সমান উঁচু প্লিনথ। একতলায়ই সব, দোতলায় মাত্র একখানা ঘর। ঘরখানা সামনের দিকে, পেছনে কার্নিশ তোলা বিরাট ছাদ। এক কোণে ছোট্ট একটি চিলকুঠিতে ঠাকুর ঘর। কোণের দিকে বড় বাঁধানো চৌবাচ্চা একটি, সারা বছরের ঘুঁটে কয়লা জমা থাকে। বর্ষার দিনে ঢাকা থাকে তক্তা দিয়ে।

দোতলার এই ঘরটা বলতে গেলে বাবার জন্যেই তৈরী করিয়েছিলেন দাদু। সারা বাড়ির গোলমাল থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে পড়াশুনো করতেন তিনি। চার ভাইবোনের মধ্যে বাবাই সবচেয়ে ছোটো, হয়তো বা ছোটো বলেই দাদুর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। অবিশ্যি প্রিয় হবার যোগ্যতাও ছিলো তাঁর। দাদুর সব সন্তানের সেরা সন্তান। বিদ্যায়, বিনয়ে, ভদ্রতায়, ভব্যতায় দশজনের একজন। এক ডাকে সবাই চিনতো তাঁকে, সবাই ভালো-বাসতো, শ্রদ্ধা করতো। দাদুর কতো গৌরব ছিলো তাতে। কতো আনন্দ ছিলো। বড়ো ছেলেকে দিয়ে যতো হতাশ হয়েছিলেন, সব হতাশ বাবা একাই সার্থক করেছিলেন।

স্কুল কলেজেও যেমন সম্মান বজায় রেখেছেন, চাকুরি ক্ষেত্রেও সেই সম্মান তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিলো। একজন সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের তুলনায় বেশ বড়ো চাকরিই তিনি করতেন। জীবনযাপনের ধারণা স্পষ্ট ছিল তাঁর। তিনি ভালোভাবে থাকতে জানতেন, ভালো পোষাক পরতেন, ভালো খেতেন। ছেলেমেয়েদের সেভাবেই মানুষ করছিলেন তিনি।

জ্যাঠামশায়ের শৈশব কেটেছিলো গ্রামে। ছাত্র অবস্থাতেই দাদু বিয়ে করেছিলেন, ওকালতি পাশ করবার আগেই জ্যাঠামশায়ের জন্ম। গ্রাম থেকে শহরে এসে ওকালতিতে বসবার পরের বছর বড়ো পিসি জন্মালেন। একটু পশার হতে হতে এলেন ছোটো পিসি। আর বাবা জন্মালেন বাসাবাড়ি করে ঠাকুমাকে শহরে নিয়ে আসবার পরে।

ততদিনে জ্যাঠামশায়ের বয়স দশ পেরিয়ে গেছে, পিসিরাও কিছু শিশু নয়। লেখা-পড়ায় একেবারে মন ছিলো না জ্যাঠা-মশায়ের. দেশের দশটা বছরতো রোদে ঘুরে ঘুড়ি উড়িয়ে এর ওর সঙ্গে খোঁচাখুঁচি করে পরের বাগানের ফল চুরি করে পরের পুকুরে মাছ ধরে কাটিয়েছেন, শহরের ধরাবাঁধা জীবনে এসেই মুশকিলে পড়ে গেলেন। দাদু ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন, মাস্টার রেখে দিলেন, আর জ্যাঠামশায় বছর বছর একই ক্লাসে থেকে বয়স বাড়াতে লাগলেন। তাই নিয়ে দাদু মাঝে মাঝে রেগে যেতেন, কান মলে দিলেন, খেলা-ধুলো বন্ধ করে দিতেন, তারপর আবার যেই কে সেই।

ঠাকুমার মনে ভীষণ দুর্বলতা ছিলো তাই নিয়ে। ছেলে যে তার ভালো না, বিদ্বান না, অনুপযুক্ত, সে বিষয়ে কথা উঠলেই হয় চটে উঠতেন, নয় কৈফিয়ৎ দিতেন। ছোটো ছেলে নিয়ে দাদুর তৃপ্তিতেও তাঁর যেন কোথায় আঘাত লাগতো। বলতেন, ছেলে-বেলাটা ওরকম গ্রামে পড়ে না থাকলে নিবুও কিছু খারাপ ছাত্র হতো না। নিবু মানে নিবারণ। জ্যাঠামশায়ের নাম। দাদু বলতেন, 'সেকথা ভেবেই শান্তি পাও মনে মনে।'

'ঠাট্টার কথা নয়—' ঠাকুমা গম্ভীর মুখ করে যে কোনো একটা কাজ নিয়ে বসতেন দেখতে, বোঝা যেতো, ছেড়ে কথা কইবেন না। হয়তো অসমাপ্ত কাঁথায় ফুলের ফোঁড় তুলতেন, নয়তো তালপাতার পাখায় পাড় বাঁধাতেন, কিম্বা সুপুরি কাটতেন। দাদু কোমর সমান উঁচু খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে, ভুরুক ভুরুক তামাক খেতে খেতে উদাস গলায় জবাব দিতেন 'আমারতো যতোদূর মনে পড়ে আমিও ঐ গ্রামেই শৈশব কাটিয়ে-ছিলাম। ওখানকার ইস্কুল থেকেই এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলাম—'

ঠাকুমার হাতের কাজ দ্রুত হয়ে উঠতো, তর্কের গলায় বলতেন 'ছিলোতো সৎ মা, লেখাপড়া না শিখলে বাপতো আর খেতে দিতো না।'

স্ত্রীর একথা শুনে দাদুর গোঁফের ফাঁকে হাসি উঁকি মারতো, অনেকক্ষণ তামাক টেনে আলগা করে বলতেন 'তা হলে দেখছি মা না থাকাটা একরকম মন্দ নয়, আর কিছু না হোক, ছেলেটাতো মানুষ হয়ে ওঠে?

'তাতো ঠিকই। তাতো ঠিকই।' ভারি মুখ আরো ভারি হয়ে উঠতো ঠাকুমার, 'আমি মরলেইতো তোমার সুবিধে হতো বেশী। তা আর জানিনে? কিন্তু যে ছেলেটি নিয়ে এতো গর্ব, সে ছেলেটিও আমারই। আমি না থাকলে সে জন্মাতো না, এটা যেন মনে রাখে একজন।

'তা ঠিক। তা ঠিক।' দাদু তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে নড়েচড়ে বসেছেন, 'সেটা একটা মস্ত ক্ষতি হতো বটে। তবে আমার মনে হয়', এই বলে চোখ ছোটো করে যেন দারুণ একটা আবিষ্কার করেছেন, এরকম মুখের ভাব নিয়ে বলতেন, 'আমার মনে হয় কি জানো? আমি বেঁচে থাকলেই এই ছেলের জন্ম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। তার কারণ, বুদ্ধিটাতে তো ওর মাতৃকুলের কোনো দান নেই, সেটা নেহাতই পৈত্রিক—'

বাস। আর বলতে হতো না। কাজ কর্ম ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুমা। বাপের বাড়ি যাবার জন্য ঝপাঝপ গুছিয়ে ফেলেন ট্রাংক বাক্স; নাকের জলে চোখের জলে অন্ধকার দেখলেন পৃথিবী।

'জানি জানি, কথায় বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে। বাপের মতো আর একটা কাঁচা মেয়েকে বিয়ে করতে না পেরে যে মনে বড়ো দাগা লেগেছে, তা আর বলতে হবে না। আগে বলোনি কেন? না হয় বিষ খেয়ে মরতাম, গাবগাছে গলায় দড়ি দিতাম।'

'সেটা কি ভালো হতো?' স্ত্রীর রাগ দেখে মুখ টিপে হাসতেন দাদু, 'পেত্নি টেত্নি হয়ে থাকলে শেষটায় আমার ঘাড়েই তো ভর করতে?'

আসলে দাদুর ভয়ানক ক্ষ্যাপানো স্বভাব ছিলো। একুশ বছর বয়সে একাদশী ঠাকুমাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি, তারপর থেকে সুখে দুঃখে মিলনে বিরহে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমে জড়ানো জীবন। এ ধরনের ঝগড়া তাদের চিরদিনের। সুলেখার কিন্তু ভালো লাগতো এই দাম্পত্য কলহ। অযোগ্য ছেলেকে নিয়ে মায়ের মনের এই অদ্ভুত রক্ষণবৃত্তিটাও তার মনকে আলোড়িত করতো। খুবই ছোটো ছিলো

সে তখন, প্রায় অবোধ, তবু মনে আছে দিনগুলো, ঘটনাগুলো। কেমন করে যেন আটকে গেছে স্মৃতির কোঠায়।

দাদু লাতাই পছন্দ করতেন না জ্যাঠামশায়কে। নেহাত সন্তানে বলেই যেটুকু মমতা, তার বাইরে আর কিছু ছিলো না। আসলে সেটাই ছিলো ঠাকুমার এতো ক্ষোভের কারণ। তাঁর মায়ের প্রাণ, তিনিতো ভালো বলে ভালোবাসেন না, ছেলে বলেই ভালবাসেন। স্বামীর এই অনাদর অবহেলা তাঁর প্রাণে দাগা দিতো।

জ্যাঠামশায়ও অবশ্য পছন্দ করতেন না দাদুকে। পারতপক্ষে দাদুর সঙ্গে মুখোমুখি হতেন না। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, দাদুর অমতেই হয়েছিলো। ঠাকুমা নিজে দেখে শুনে ঠিক করেছিলেন সব। বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের দয়ায় টাকারতো তোমার অভাব নেই? অমন মেরে ধরে লেখা-পড়া করিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করুক, দায়িত্ব জ্ঞান হবে।'

তাই হোক। দাদু আর কথা বলেননি। শরীরের রক্ত জলকরা অনেক অর্থ তিনি ঢেলেছিলেন ছেলের বিদ্যাশিক্ষার খাতে, এবার থামলেন। আর সেকালে কেই বা এতো মাথা ঘামিয়েছে পড়াশুনো নিয়ে। এণ্ট্রান্স পাশ করলে ঢের, বি এ পাশ করলে তো দেখতে আসতো। কেবল দাদুরই কেমন একটা লেখাপড়া লেখাপড়া বাই। তাই নিয়ে রাগ করতেন ঠাকুমা। অবশ্য নিজের স্বামী বিদ্বান বলে অহংকার তাঁর ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনাই ছিলো।

ছেলের বিষয়ে বিফল হয়ে শেষে দাদু মেয়েদের নিয়ে পড়লেন। ভর্তি করে দিলেন হাই স্কুলে, মাস্টার রেখে দিলেন ভালো দেখে, কিন্তু সে সাধও তাঁর মিটল না। চোদ্দো না পুরতেই ঠাকুমা বিয়ে দিয়ে দিলেন। এসবই সুলেখার জন্মের বহু আগের ঘটনা, এসব গল্প শুনেছে সে। কিছু ঠাকুমার কাছে, কিছু পিসিদের কাছে, কিছু জ্যাঠাইমার কাছে, কিছু মার কাছে। যে যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছে কথাগুলো, দল বেঁধে নিন্দে করেছে, আক্ষেপ করেছে, আবার শুধুমাত্র ঘটনা হিসেবেই বলেছে কেউ, আর সকলের সব বলা থেকে গল্পগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছে সুলেখা। সুলেখা যখন জন্মালো জ্যাঠামশায়ের চুলে তখন পাক ধরেছে, পাঁচ ছেলেমেয়ের বাপ, পিসিরা আধবয়সী, দাদু বৃদ্ধ হয়েছেন, আর ঠাকুরমার পাকা মাথায় রাঙা সিঁথি। সুলেখা যে বছর জন্মালো, ভুবন তালুকদারের সবচেয়ে সুসময় তখন। তাঁর পেশায় তখন তিনিই চরম। মা-বাবার কাছে কতোদিন সে সব গল্প শুনেছে। সেই বছরই মস্ত এক মামলায় জিতিয়ে দিয়ে নবাব আমির আলি সাহেবের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কমলাপুরের এই আম জাম কাঁঠাল কলার তিন বিঘা জোড়া বাগানটি উপহার পেলেন। সেই প্রথম নবাব আমির আলি তাদের বাড়িতে এলেন একদিন। তখন দাদু লক্ষ্মী বাজারে ভাড়া বাড়িতে ছিলেন।

এই বাগান প্রথমে নবাব সাহাবুদ্দিনের ছিলো। আমির আলি সাহেবের বাবা। এই সব গাছ তাঁর নিজের হাতে পোতা। পুকুরটিও তিনিই কাটিয়েছিলেন। ভেবে-ছিলেন, নির্জনে একটি শ্বেত পাথরের মসজিদ বানিয়ে অবসর সময়ে এসে ধর্ম চিন্তা করবেন, সংসারের জটিল আবর্ত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনে এই শান্তিতে গা ঢেলে দেবেন। শেষ পর্যন্ত কিছু ইট-পাটকেল গেঁথেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, ইটালিয়ান মারবেল পর্যন্ত আর পেঁছুতে পারেননি। পরপর কতকগুলো দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে মনের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিভে গিয়েছিলো। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উপযুক্ত পুত্র নবাব আমির আলি যখন অধিকারী হলেন এই বাগানের, তাঁর মনেও পিতার অসমাপ্ত ইচ্ছেটিকে রূপ দেবার একটা অস্ফুট বাসনা ছিলো। তিনিও পারেননি। নবাবদের অবস্থা পড়ে এসেছে তখন, কাজে হাত দিলেই টাকা। আর তারা হলো খাস নবাবের বংশধর, তাদের দিকই আলাদা। কোনো কিছুতেই তাঁরা টানাটানি ভালোবাসেন না, অতএব একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ বানাতে তার শিল্পচাতুর্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার হিসেবটি যতোবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন, ততোবার থমকাতে হলো। শেষে এইভাবে সদ্গতি করলেন তার। বুক সমান উঁচু ভিতটা ওদেরই তৈরী, কেবল দেয়াল তুলে ঘরগুলো দাদু করিয়ে নিলেন।

জ্যাঠামশায় লেখাপড়ায় অসফল হলেও বিষয় বুদ্ধিতে কিছু খাটো ছিলেন না। যতোদিন দাদু বেঁচে ছিলেন, ততদিন খাওয়া পরার ভাবনা ছিলো না কোনো, কোনো কর্ম না করেও ভালোই চলছিলো, কিন্তু দাদু মারা যাবার পরেই মুশকিলে পড়লেন একটু। তারপরেই ঘাট-বাঁধানো মরা পুকুরটাকে ঠিকঠাক করে মাছ ছেড়ে দিলেন, ফল ফলারির গাছগুলো ইজারা দিয়ে দিলেন মণ্ডলদের কাছে। কিছু বড়ো গাছ কেটে কাঠ বিক্রী করে দু পয়সা রোজ-গার হলো। পিছন দিকের জমিটা ফুল বাগান উপড়ে দিয়ে ক্ষেত করে দিলেন। জমি থেকেই তাঁর খাওয়া পরার সংস্থান হলো। বাবা চিঠি লিখে নিমগাছির

জমিদারী সেরেস্তায় একটা কাজও জুটিয়ে দিলেন জ্যাঠামশায়কে, হিসেবের কাজ। জ্যাঠামশায়ের বিবেক ততো প্রবল ছিলো না, কাজেই সে কাজে তাঁর মাইনের চেয়ে উপরি পাওনাই চার গুণ হলো। মোট কথা, বাবা লেখাপড়া শিখে এম এ পাশ করে দশটা পাঁচটা খেটে যা রোজগার করতে পারলেন, জ্যাঠামশায়ও ক্লাস নাইন অব্দি বিদ্যা বলে তার চেয়ে কিছু কম গেলেন না, বরং বেশীই হলো কিছু। কেন না জ্যাঠামশায়ের অধিক সন্তান, তাই বাবার কাছ থেকেও নিয়মিতভাবে নিতেন কিছু। উপরন্তু মার কাকা ততদিনে নবাবগঞ্জ ছেড়ে বদলি হয়ে কলকাতা চলে আসাতে মার বাবার সুরী লেনের বাড়িটার দেখাশুনোর ভারটাও জ্যাঠামশায়ের হাতে রইলো। ভাড়া দিয়ে দিলেন তিনি, কিন্তু সে ভাড়া পুরোপুরি কোনো দিনই মার হাতে পৌঁছতো না, প্রত্যেক মাসেই শোনা যেতো রিপেয়ারের খরচ বাবদ এতো টাকা লেগেছে, ততো টাকা গেছে।

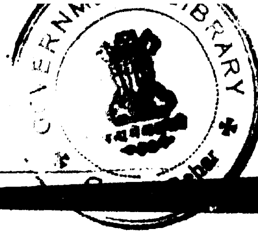
শেষে মা আর ও-টাকা নিতেন না, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের খরচ বাবদ রেখে দিতে বলতেন। তা ছাড়া ভাড়াটেও নাকি প্রায়ই থাকতো না। সুতরাং ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কটাই বা টাকা।

বাবা যতোদিন বেঁচে ছিলেন, বছরে একবার করে তাদের নিয়ে আসতেন এখানে। দশ বারো দিন কাটিয়ে চলে যেতেন। দাদার সঙ্গে বিরোধের প্রশ্ন ছিলো না কোনো। বরং জ্যাঠামশায় বাবাকে অতিরিক্ত যত্নই করতেন। বড়ো বড়ো মাছ নিয়ে আসতেন, দুধ নিয়ে আসতেন, আনতেন টাটকা শাক সব্জি ফল ফলারি। কটা দিন যেন ভোজ লেগে থাকতো। ফূর্তিও কম হতো না। বাবা সকলের টিকিট কেটে আনতেন, তারপর দল বেঁধে নবাবগঞ্জের নতুন সিনেমা হাউসে নিয়ে গিয়ে সায়লেণ্ট পিকচার দেখাতেন। কী রোমাঞ্চই না হতো। কোনো কোনো দিন আশে পাশে বেড়াতে নিয়ে যেতেন ঘোড়ার গাড়ি করে, নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে বেড়াতেন। আবেদের বিখ্যাত বিসকুটের দোকানো গিয়ে হরেক রকম বিস্কুট কিনতেন, গনিমিঞার পরোটার দোকান থেকে মাংস পরোটা। মুসলমানের দোকান বলে জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা নাক সিঁটকোতেন, সাত হাত দূরে সরে থাকতেন। বাবা জোর করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন, নিজে খেতেন, মাকে চোখ টিপে ইশারা করতেন, মা ভাসুর আর জায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতেন। সুতরাং হাঁড়ি ভর্তি প্রাণহরা, ক্ষীরমোহন আর অমৃতিও মন্দ আসতো না। জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশায় প্রাণভরে খেতেন আর মা লজ্জায় সারা হয়ে যেতেন হাঁ করে মুখে তুলতে। জ্যাঠাইমা

বাবার জন্য কতো ভালোমন্দ রান্না করতেন নিজের হাতে, মা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে ঘুর ঘুর করতেন বড়ো জায়ের পেছনে পেছনে। ভাসুরের যে মুহূর্তে যা দরকার সব কিছু ঠিক ঠাক করে খাড়া হয়ে থাকতেন একপায়ে। ছোটো বাচ্চাদের নাওয়াতেন, খাওয়াতেন, ঘুম পাড়াতেন, সারাদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে নিরলসভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের। জ্যাঠাইমা নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন এদের দৌরাত্ম্য থেকে।

আর সুলেখারা? সব ভাইবোনেরা মিলে কী হুটোপাটিটাই না করতো দিনরাত। দাদু ঠাকুমা না থাকার বিচ্ছেদ বেদনাটা প্রায় ভুলে যেতো।

কিন্তু সব ছবিই পাল্টে গেল বাবার মৃত্যুর পরে। তাইতো স্বাভাবিক। তাইতো যায়। (ক্রমশ)





# মাশুল / শান্তিকুমার মিত্র

ভয় ও ভক্তির, সংস্কার ও আশার সুযোগ নিয়ে যে পাগলবাবারা মানুষকে ধাঁওতা দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শিক্ষাভিমানী মন খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। ফলে রাষ্ট্রেরও টনক নড়ে, পুলিস আসে, পাইকারী জরিমানার হুকুম হয়, পাগলবাবারা আশ্রমসমেত নির্মূল হয়ে জেলে আশ্রয় পায়। কিন্তু তোমাদের সমাজেই রাজনীতি, সমাজসেবা সব কিছুর প্রতিভূ হয়ে রয়েছেন, এমন কোন নেতার বিরুদ্ধে যদি ঠিক ঐভাবেই খেলা করার অভিযোগ করি, তোমরা শিউরে উঠবে; তারপর আমার ওপর রেগে যাবে, বলবে-- পাগল, ও'র বিরুদ্ধে তোমার আক্রোশ আছে তাই—' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাসল লোকটি।

হ্যাঁ, লোকটিই, আজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শান-দেওয়া, চমক-লাগানো তরুণ সঞ্জয়ের সঙ্গে এই খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা, মলিনবেশ লোকটির কোন সাদৃশ্য নেই। আমার মতই সেদিন যারা সঞ্জয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করত, তার সহপাঠী হওয়ার জন্য গর্ববোধ করত, তারা আজ সঞ্জয়কে দেখলে হতাশ হবে। আমিও হতাশই হয়েছিলাম। কেবল কি হতাশা? কেমন বেদনা বোধও করেছিলাম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পুরাতন পরিচয়ের জের টানবার কোন আগ্রহ বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না এবং নীরা খানিকটা অহেতুক জেদ না করলে নতুন জায়গায় প্রথম দিনের আকস্মিক সাক্ষাৎ পরিচয়েই মেলামেশার ইতি ঘটত। কিন্তু নীরার মত ভিন্ন, ইউনিভার্সিটির অত ভাল ছেলে, লিখতে পারে, বলতে পারে, রাজনীতিও করত, ঐভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে, আর আমরা জেনেশুনেও কিছু করব না, তাই কি হয়?

কেন হয় না, তা অবশ্য আমার কিছুতেই বোধগম্য হল না। এমন কিছু শখ করে কলকাতা থেকে এই এত দূরে মফঃস্বল টাউনে আসিনি। অপরের ভাল করবার মিশনও কিছু নেই। নিতান্তই রুজি-রোজগারের ফেরে এসে পড়েছি। ছোট্ট কোয়ার্টার; অবশ্য সংসারও ছোট, আমি আর নীরা। কলকাতা থেকে দূরে আসতে হয়েছে বলে যেমন ক্ষোভ ছিল, তেমনি এখানে এসে ছোট্ট নিরালা কোয়ার্টারটি দেখে আনন্দও হয়েছিল খুব। নীরা আর আমার এক নতুন স্বর্গ গড়ে উঠবে, এই টালি-ছাওয়া কোয়ার্টারে আর কোয়ার্টারের অনুচ্চ পাঁচিল-ঘেরা খোলা-মেলা জায়গাটুকুর মধ্যে। এর মধ্যে তৃতীয় জনের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু নীরা সব ওলট-পালট করে দিল। ও কি আমার সাধ আর কল্পনা বুঝতে পারেনি? তা তো নয়। বাস্তবিকপক্ষে ওর মনের ভাললাগাকে মর্যাদা দেবার জন্যই একদিন এ-সব কথা ভাবতে আর ভাল-লাগাতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপর একদিন কখন আমার অজ্ঞাতসারেই ওর ভাললাগা আমার ভাল-লাগা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই ও যে আমার মনের সাধ আর প্রত্যাশা বুঝতে পারেনি, তা তো নয়। তাহলে কেন? কেন আকস্মিক দেখা হয়ে যাওয়ার জের টেনে তৃতীয়জনকে এভাবে পাকাপাকিভাবে আমন্ত্রণ করে আনা?

অস্বীকার করব না, এই প্রথম নীরার সম্বন্ধে একটা সন্দেহের কাঁটা যেন আমার গলার মধ্যে আটকে গিয়ে অস্বস্তি ঘটাচ্ছিল।

নীরা আজ আমার সহধর্মিণী; কিন্তু একদা সহপাঠিনী। সঞ্জয়ও সেই সময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। ছাত্রী হিসাবে নীরারও খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, নীরা যে আমার মধ্যে কী দেখে ভালবেসেছিল, আজও তার কোন কিনারা করে উঠতে পারিনি। নীরাকে বললে ও হাসত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় শেষে গার্হস্থ্য পর্যায়ে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে হাসি ছাড়াও ও আরো কিছু করত—আমার বুকে লজ্জারাঙা মুখটা লুকিয়ে ফেলত।

এই নীরাকেই ও লোকটি সম্বন্ধে অতি-মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখে কেমন সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমন কি একদিন ঠাট্টাচ্ছলে আমার সংশয় কিছুটা প্রকাশ করেও ফেললাম, কী ব্যাপার নীরু, দ্বারভাংগা বিল্ডিংএর সিঁড়িগুলো কি রঙিন হয়ে চোখের সামনে দুলে উঠছে? বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নে তোমাদের সেদিনের জোরালো বিতর্ক-সভা?

বিতর্ক-সভাটার একটা ইতিহাস আছে। তখনো সংসদে হিন্দু কোড বিল আসেনি। একটু-আধটু খসড়ার যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বিলটি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ করা সংগতও নয়। তবু সেই সময়ই নারীর অধিকার ও আইন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন এক বিতর্কসভার আয়োজন করে বসল। ক'দিন ধরে খুব প্রস্তুতি চলল। ছাত্রীরা স্থির করলেন, তাঁরা আইনের পক্ষে ডিফেণ্ড করবেন; তাঁদের নেত্রী হলেন শ্রীমতী নীরা বসু। আর আমরা সঞ্জয়কে সামনে রেখে কোমর বাঁধলাম, মেয়েদের আবার অধিকারের গ্যারাণ্টি কী, যোগ্যতাই মাপকাঠি হবে। অবশেষে সেই লড়াইয়ের দিনটি এল। শ্রীমতী নীরার সে কী ভাষণ! তীব্রতায়, তিক্ততায়, বক্তব্যের স্পষ্টতায় আমাদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। তাঁর সহপাঠিনী যাঁরা আগে বললেন, তাঁদের বক্তৃতায়ও হুল ছিল: তা আগে থেকেই জ্বালা ধরাচ্ছিল। শ্রীমতী নীরা তাঁর চরম শর নিক্ষেপ করলেন, পুরুষ জাতকে এক একটি পাষণ্ড আর স্বার্থপর বলে চিত্রিত করলেন। শ্রীমতী নীরা এমনি শান্ত স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু তাঁর সেদিনের বক্তৃতা শুনে বার বার মনে হচ্ছিল, তাঁর পুরুষ-বিদ্বেষ নিছক বিতর্কের খাতিরে নয়, তাই যদি হ'ত অত প্রত্যয় কোথায় তিনি পেলেন? সঞ্জয় কিন্তু বরাবরই চুপ করে শুনল। তারপর যখন সময় এল, সঞ্জয় উঠল: কোন বিদ্বেষ নয়, কোন তিক্ত মন্তব্য নয়, একান্ত শান্তভাবে যুক্তির পর যুক্তি বিস্তার করে বোঝাতে চেষ্টা করল, হিন্দু নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে সমাজ কোনদিনই বঞ্চিত করেনি; নারী যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় আপনিই পিছিয়ে পড়েছে। অমোঘ যুক্তি হয়তো নয়, কিন্তু তার বলবার দৃঢ় ভঙ্গী এবং বিশেষ করে তিক্ততার উত্তরে তিক্ততা সৃষ্টি করবার ক্ষীণ চেষ্টাও নয়, শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করল। উপসংহার করল সঞ্জয় নারীকে 'কল্যাণী'-রূপে সম্বোধন করে। জয় হল ছাত্রদের; হুল্লোড় করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শ্রীমতী নীরাকে দেখলাম, রাঙা মুখ, আরো রাঙা হয়ে উঠেছে। আমাদের অত হুল্লোড়ের মধ্যেও এগিয়ে এসে সঞ্জয়কে অভিনন্দন জানালেন। এই প্রথম নীরাকে আমার খুব ভাল লাগল। তারপর শ্রীমতী নীরা কেমন করে আমার শ্রীমতী হলেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

নতুন জায়গায় এসেই মনটা যে এমন তিক্ত হয়ে পড়বে, কে জানত? আমার উষ্মা নীরা লক্ষ্য করল, কিন্তু কিছু বলল না। দিন দিন কল্যাণহস্তের সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে কোয়ার্টারটিকে গুছিয়ে তুলতে লাগল। জানালায় দরজায় ফিকে সবুজ-রঙ পর্দা ঝুলল। এ রংটি আমার খুব ভাল লাগে। নীরা এ-পর্দার কাপড় কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিল, না এখান থেকে সংগ্রহ করল, জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু নিজেকে সংবরণ

করলাম। আমি দেখতে চাই, আমার আর কত ভাললাগাকে নীরা সম্মান দেয়। কিন্তু আবার নীরার নীরবতা আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আপাত-দৃষ্টিতে নীরার কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। নীরা যেন ক্রমশ বেশি করে স্নেহশীলা, প্রেমময়ী হয়ে উঠছে। আমার ছোট্ট ছোট্ট ভাললাগাকেও সযত্নে পুষ্ট করছে, লালন করছে। যতই সর্বত্র নীরার কল্যাণহস্তের স্পর্শ পাচ্ছি, আমার ছোট্ট কোয়ার্টারের শ্রী ফিরছে, ততই এক অদ্ভুত আক্রোশ বোধ করছি। সঞ্জয়ের উপস্থিতি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক চা-এর আসরে সঞ্জয় এসে হাজির হ'ত। টুকরো টুকরো কথা, এখানকার জল হাওয়া, কোথায় কোন্ জিনিস পাওয়া যায়, কী দেখবার আছে, অত্যন্ত সাধারণ কথার বিনিময়। আমি জানি, নীরার মন এমনি হাল্কা আলোচনায় কখনো সন্তুষ্ট হয় না। তবু যেন মনে হত এই বিশেষ ক্ষণের জন্য নীরার অত্যন্ত আগ্রহ রয়েছে। নীরা কোনদিনই খুব সাজসজ্জা জাঁকজমক পছন্দ করত না। সত্যি বলতে কী, নীরার সাদা শাড়ির রঙএর কিছু রদবদলও হয়নি। কিন্তু কী জানি কেন মনে হ'ত নীরা যেন অনেক যত্ন করে কপালে টিপটি এ'কেছে।

এক একদিন আলোচনা অসহ্য হয়ে উঠত; মনে হ'ত, নীরারও ভাল লাগছে না। রাজনীতির কথা তুলতাম, যা মন চায় দল-নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলমাত্রেরই তিক্ত সমালোচনা করতাম। বেশ বুঝতে পারতাম রাজনীতিকদের সমালোচনা করার নামে আমি সঞ্জয়কেই আক্রমণ করছি। তবু নিজেকে স্থির রাখতে পারতাম না। নীরা কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত। সঞ্জয় নিভে যেত, নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিত। বুঝতে পারতাম, বৈঠকের তাল কেটে গিয়েছে। এক অদ্ভুত আনন্দ হত। সঞ্জয় তারপর কখন ধীরে-ধীরে চলে যেত। নীরা চুপ করে বসে থাকত, তারপর এক সময় আমার খয়েরী রঙের সোয়েটারটা বুনতে শুরু করত।

এমনি একদিন, আমার মনে আগুন জ্বলছে, কারোর কোন ত্রুটি ধরতে পারছি না বলেই বোধ হয় এত তীব্র জ্বালা! সঞ্জয় তখন সবেমাত্র চা-এর আসর ছেড়ে চলে গিয়েছে। নীরাকে লক্ষ্য করে বলি, বদলির চেষ্টা করি, কী বল?

'কেন?' নীরা তার ভাষাময় চোখ তুলে তাকায়।

আমি সে-চাহনি সহ্য করতে পারি না। কেমন ভয় করে। সামনে রাখা একটা ইংরাজী ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বলি, 'কলকাতার কাছাকাছি থাকার অনেক সুবিধে; এসব জায়গায় কেমন একঘেয়ে লাগে।'

নীরা কই আপত্তি করে না তো? আমি যে ভেবেছিলাম, ও আপত্তি করবে, যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেবে। চাই কি, সঞ্জয়ের একদার প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা, নিপুণতারও উল্লেখ হতে পারে। কিন্তু নীরা সে-সব কিছুর ধার কাছ দিয়েও গেল না। আস্তে আস্তে বলল, বেশ তো, চেষ্টা কর।

আর, আর নীরা যেন হাসল।

হাসছ? আশ্চর্য হই।

নীরা সারা মুখটায় হাসি মাখিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, হাসছি।

আশ্চর্য! সঞ্জয় না তোমার বন্ধু?

'তাতে কী?' আমি জিজ্ঞাসু হয়ে তাকাই।

নীরার মুখে মুহূর্ত-আগের হাসি মিলিয়ে গিয়ে বেদনার, ব্যথার ছায়া ঘন হয়ে আসে। আস্তে-আস্তে বলে, কিছু নয়। তোমার বন্ধু, ও'র ওপর তোমারই সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক ছিল; অন্তত কৌতূহল। যাক গে, তুমি বদলির ব্যবস্থা কর।

নীরা চুপ করে।

আমার কী-যেন হয়ে যায়। কিছু ভাবতে পারছি না। এতদিন আমার সব দেখা কি ভুল? অস্থির হয়ে পড়ি, না-না নীরু, অমন চুপ করে করে গেলে চলবে না। কী বলতে চাও তুমি?

নীরা আবার হাসে। এ হাসি যেন আমার চেনা—সব ভয়-ভাঙানো হাসি। আমার মাথার কাছটিতে এসে দাঁড়ায়। তুমি আস্ত পাগল না গো, রাগ করিনি। লক্ষ্মীটি, বদলির খেয়াল ছাড়। তোমার বন্ধু সঞ্জয়, সঞ্জয়ের ব্যথা তোমার সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর। দেখছ না, উনি যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন, হিমশীতল পাথর। আমরা যদি সহানুভূতি দিয়ে, মমতা দিয়ে ও'র মনটাকে ছ'ুতে পারি, তাই কি চেষ্টা করা উচিত নয়?

নীরা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, তা ছাড়া—তা ছাড়া, একটা দুঃস্বপ্নের মত সঞ্জয়বাবু ঘুরবেন, আর আমরা নিজেদের নিয়েই মেতে থাকব, এ হয় না; তোমরা পার, আমরা পারি না। একটা প্রাণ ব্যর্থ হয়ে যাবে, সামনে থেকেও কিছু করব না, এ পারব না। দেখছ না, একটু-একটু করে জমাট বরফ গলছে।

অপরাধীর মত বলি, কিন্তু সেই বরফ-গলা স্রোত যদি তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়?

নীরা হাসে।

'না না নীরু, হাসি নয়। এরকম দুঃসাহসিক পরীক্ষা ক'রো না। তখন, তখন তুমি তাকে কী বলবে?'

'না গো, তোমার মত আমার ভয় নেই। আমার ভালবাসা নির্ভয়। ঠিক, তুমি যা বলছ, তা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমাকে ও'র ভাল লাগে, তা জানি।' নীরা একটু থামে, যেন কী ভাবে, আবার বলতে শুরু করে, 'কোথাও খুব বড় আঘাত পেয়ে ও'র সব চেতনা জড় হয়ে গিয়েছে। সেই জড়ত্ব দূর করবার জন্য ও'র মনে ভালবাসার ও ভাল লাগার ইচ্ছে জাগাতে হবে। এই ইচ্ছেটা যদি একবার জাগে, উনি বে'চে যাবেন। না, না, সে ভয় নেই; ও'র ভদ্র মন তখন আপনার পথ আপনি খ'ুজে নেবে। ভাললাগায় ও ভালবাসায় একটা প্রাণ সার্থক হবে। তোমার নীরুকে তুমি সাহায্য কর।'

নীরা এক সংগে অনেক কথা বলে চুপ করল। আমার নীরুকে কেমন মহিমময়ী দেখাচ্ছে। এ নীরু যেন আমার একার নয়, এ যেন মমতাময়ী চিরন্তনী নারী—দুঃসাহসিকা, অথচ প্রেমময়ী। আমার সব জ্বালা দূরে হয়ে গিয়েছে, 'বেশ, তুমি চেষ্টা কর।'

তবু মনে কোথায় যেন খচখচ করে; বড় দুঃসাহসিক পরীক্ষা।

এরপর থেকে ছক পালটে গেল। অফিসের কাজের চাপও খুব পড়েছে। বৈকালিক চা-এর আসরে প্রায়ই গরহাজির হই। আবার কোনদিন বা আকস্মিক এসে হাজির হই। সঞ্জয়ের সংগে ব্যবহারে সহজ হবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার আকস্মিক পরিবর্তন বলেই হক বা যে-কোন কারণেই হক সঞ্জয় তত সহজ হতে পারে না। তবু মোটের উপর আমাদের আসর বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। নীরাকে যত দেখি, তত চমক লাগে।

মনে পড়ে, 'আমার ভালবাসা নির্ভয়।' নীরা সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই আর। কিন্তু! হ্যাঁ, কিছুতেই সেই আশংকাটা মন থেকে দূর করতে পারি না, বড় দুঃসাহসিক পরীক্ষা। আর তখনই মনে হয়, সঞ্জয়ের সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই; সঞ্জয় একটা লোক মাত্র। অশোভন কিছু করি না, কিন্তু কেমন অস্বস্তি লাগে, মনটা তিক্ত হয়ে যায়। বুঝি, অহেতুক এ-তিক্ততা। নীরাও বোঝে, আর বোঝে বলেই আমার জন্য কষ্ট পায়। তা সত্ত্বেও সঞ্জয়কে 'এ লোকটার' অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে ইচ্ছে করে না।

এমনি এক চা-অন্তের আসর। সঞ্জয় মুখ খুলল, তোমরা কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না। অত প্রতিপত্তি, তার সম্বন্ধে এ রকম অভিযোগ করা! আমার নিজেরই কেমন মাঝে-মাঝে হাসি পায়; নিজেকেই সন্দেহ করি, আমি ভুল ভাবছি না তো। তাও যদি পারতাম! কিন্তু তা তো পারি না। রক্তের অক্ষরে যা লেখা হয়ে গিয়েছে, যার জন্য অশেষ মূল্য দিয়েছি তা তো ভুল করবার নয়, আর ভোলবারও নয়।

সঞ্জয় তারপর যা বলল, সে-এক উপাখ্যানেরই মত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। রাজনীতির আড়কাঠিরা টোপ ফেলে পাকড়াও করল। ভরা যৌবন, মনে উচ্ছাশা, অনেক কল্পনা, অনেক সাধ। কাজেই সঞ্জয় সহজেই ধরা দিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই মান্য নেতার দক্ষিণ হস্ত হয়ে দাঁড়াল। তখন তার সেইরকমই মনে হয়েছে; আর তাকে বোঝানও হয়েছে তেমনি করে। সঞ্জয় তখন একটা নতুন জগতের আস্বাদ পেয়েছে। কাজে, লেখায় সে সহকর্মীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। এই সময় সে জীবনের আর একটা নতুন দিকের আকর্ষণ অনুভব করল। রীণা আর সে, পরস্পর সহকর্মী; মান্য নেতার স্নেহভাজন দুজনেই। রীণা ও সঞ্জয়, সঞ্জয় ও রীণা; রাজনীতির বিবর্তনের সংগে-সংগে ওরাও দুজনে রূপে রসে রং-এ আবর্তিত হয়ে চলল। নেতার মুখে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের হাসি, কখনো-বা পরিহাসে, আমোদে তরল, স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

'যাবে নাকি? না, না, মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হবে না, দুজনেই যাবে। দেশের মাটি আর মানুষের পরিচয় অখণ্ড মন নিয়েই বুঝতে হয়।'

কখনো আরো স্পষ্ট—মান্য নেতা তাঁর জীবন-সায়াহ্নে ছোট্ট নিরালা কুটিরে রীণা-সঞ্জয়ের স্নেহাশ্রয়ে কাটাবার সংকল্প প্রকাশ করেন। আশায় আবেগে দুজনের মন কাঁপে। আকাশে বাতাসে রং-এর ছড়াছড়ি। রাজনীতির পুস্তিকা প্রচারপত্র






লিখতে গিয়েও সঞ্জয়ের মনে হয়, যেন নতুন কিছু সৃষ্টি করছে।

কিন্তু স্বপ্নের উপর স্বপ্নের স্তূপই জমে। সুদূরস্পর্শী বন্ধ্যা অনিশ্চয়তার কথা ভেবে চোখ এবং মন দুই-ই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। মান্য নেতা অন্ধ আবেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেন, দেশ দেখ, দেশ দেখ, অবকাশ তো পালাচ্ছে না। সঞ্জয় রীণার গৃহাকাঙ্ক্ষায় তিনি বিরক্ত। আবার বিরক্তি গোপন করতে চেষ্টারও তাঁর অন্ত নেই। নেতা যেখানে-সেখানে পরিচয় করিয়ে দেন, বড় ভাল ছেলে,, বড় ভাল মেয়ে।

তবু বিরক্তি আসে, বিস্বাদ লাগে।

সঞ্জয় ভাবতে শুরু করে, কোথায় চলেছি। নেতার অনুগত অনুগামী হয়ে দেশের মানুষ ও মাটির সঙ্গে কোন আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পেরেছি? এ-চলার সার্থকতা কী?

'দৌড়ের' প্রতিযোগিতায় চিন্তার কোন স্থান নেই। সঞ্জয় পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। নেতা রীণাকে এগিয়ে নিয়ে যান। নতুন কক্ষপথে নতুন আবর্তনে আত্মত্যাগের জন্য নতুন দল আসে। রীণা অন্ধ আবেগে মান্য নেতাকে তখনো অনুসরণ করে।

সঞ্জয়ের পরিচয় অবশ্যই হারিয়ে যায় না। মান্য নেতার স্নেহাশীর্বাদ তখনো ঝরে, তবে অন্য ভাষায়—আহা! ছেলেটি বড় ভাল ছিল, অত্যন্ত দক্ষ; কিন্তু কী যে মাথায় ঢুকল।

ধীরে-ধীরে সঞ্জয় রাজনীতির দৌড়ে বাতিল হয়ে যায়; আর তখনই সবিস্ময়ে সে দেখে তার বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে, নতুন করে কিছু সৃষ্টি করবার, কিছু আরম্ভ করবার উদ্যম নেই। তার দর হঠাৎ কমে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের সেরা ছেলে অন্ধ আবর্ত থেকে বেরিয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। রাজনীতির কক্ষপথে চেনা-জানা প্রতিষ্ঠা-বানদের কাছে যায়। সব জায়গায় এক উত্তর, তোমার ভাবনা কী? তুমি যাঁর স্নেহচ্ছায়ে—

'হ্যাঁ, এক অর্থে সত্যিই ভাবনা ছিল না, কেননা ততদিনে বাতিল হয়ে গিয়েছি।' সঞ্জয় বিষণ্ণ হাসি হাসে, 'রাজনীতি বড় নির্মম, সেখানে কোন ক্ষমা নেই; আদর্শবাদ নিছক একটা শ্লোগান।'

অকস্মাৎ ঘরের হাওয়ায় যেন দম বন্ধ হয়ে ওঠে, 'শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা তো আর চোখ দুটো বুঝি ছলছল করে। রাজ-নীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে সঞ্জয়। আমারও কেমন মায়া বোধ হয়।

নীরাই প্রথম কথা বলে, কিন্তু আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা?

সঞ্জয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সজাগ হয়ে ওঠে, 'শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা তো আর দিইনি, তা ছাড়া ওদিকের সঙ্গে যোগা-যোগও কমে গিয়েছিল।' সঞ্জয় হেসে ওঠে, 'যেটুকু বিদ্যাবত্তা, তাই ভাঙিয়েই তো চালাচ্ছি এখানে।'

এই কি চালানো? একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, আর গোটা দুই টিউশনি! আবার চুপচাপ। কারুর যেন কিছু বলবার নেই।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, রীণা? রীণা কি করল?

সঞ্জয়ের চোখ মুখ বেদনায় নীল হয়ে যায়, ধীরে-ধীরে বলে, নতুন কিছু নয়: অনিশ্চয়তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করে স্বাভাবিক মানুষের ধর্ম পালন করেছে।

নীরা সব দমবন্ধ ভাব অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়ায়। চলুন একটু ঘুরে আসি। আমার দিকে ফিরে বলে, তুমি যাবে নাকি? না,

অফিস ছুটবে আবার?

আমি বলি, তোমরা যাও, আমার একটু কাজ আছে।'

ওরা বেরিয়ে যায়। আজ এই প্রথম সঞ্জয়ের ওপর আমার কোন আক্রোশ হয় না।

এরপর প্রায়ই ওরা দুজনে বেড়াতে যায়। দু-একদিন আমিও যাবার চেষ্টা করি, যাইও। কিন্তু কেমন ভাল লাগে না, অস্বস্তি হয়। নীরু অনেক অনেক ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে, উচ্ছলতায়, আবেগে এ যেন নীরুর আর এক রূপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তীক্ষ্ণধী ছাত্রীকে নীরার মধ্যে খুঁজে পাই না। ভাল লাগে, আবার ভয়ও করে। নীরার মন্ত্র জপি, আমার ভালবাসা নির্ভয়। কিন্তু নীরু আজ আগুনের শিখা। এ-শিখা পতঙ্গকে আকর্ষণ করবে, আর শেষ পর্যন্ত—ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না।

এক-একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে নীরার ঘুমন্ত মুখটা দেখি। ও যেন অস্ফুট স্বরে কী বলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিরন্ধ্র অন্ধকারে রাত জাগি। কোনদিন-বা নীরার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, বুঝতে পারে, আমার চুলে ওর কোমল আঙুলে চালাতে-চালাতে বলে, কেন পাগলামি করছ গো? বেশ, এখান থেকে চলে যাই। সত্যি, রাগ করে বলছি না। চলো আর কোথাও যাই। তুমি কষ্ট পেলে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

আমি বলি, না আমার কষ্ট হচ্ছে না। আর যদি ভুল ভেবে কষ্টও পাই, তার জন্য তো তুমি রয়েছ। তুমি তোমার ভালবাসায় আমার সব কষ্ট দূরে করে দেবে। আমরা যখন নিজেদের মন জানি, তখন কেন পালাব?

নীরা আমার বুকে মুখ লুকোয়। অনেক আনন্দ, আর অনেক ভাললাগায় আমার মন ভরে যায়।

আবার দিন চলে মধুচ্ছন্দে। হাসিতে পরিহাসে কোয়ার্টার, কোয়ার্টার পেরিয়ে বাঁধের রাস্তা, মাঠের আল, আম পথে মেলাতলা ঝংকৃত হতে থাকে। একদিন নীরু ফেরে, যেন মূর্তিমতী আগুন, চুলে লাল শিমুল ফুল, শাড়ি ব্লাউজের রং লাল, কপালে লাল টিপ, সিঁথিতে সিঁদুরের দগদগে লাল দাগ। আমিই বিহ্বল হয়ে পড়ি।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, আজ কোন্ দিক থেকে?

নীরা একটু হেসে ভিতরের দিকে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরেই সঞ্জয় আসে। ওকে লক্ষ্য করি, আর আমার লক্ষ্য করা যাতে ওর দৃষ্টিতে না পড়ে, সেজন্যই কথা বলি, কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

'ওঃ, অনেকদূরে, সেই হাঁসখালির খালটা যেখানে কালভার্টটা তৈরী হচ্ছে, সেখান পর্যন্ত; ওখানের বনটা সাফাই হচ্ছে, সারাদিন কাজ হয়—' সঞ্জয় এ রকম উচ্ছ্বাসের সংগে ইদানীং, ইদানীংই বা কেন, কোনদিনই কথা বলত না। আমার সম্বন্ধেও আর ওর কুণ্ঠা বোধ নেই।

সঞ্জয় বলে, ওদিকটা যে অত ভাল জায়গা, জানতাম না। ধু-ধু মাঠ, আবার এক এক জায়গায় গাছগাছালির কী জমজমাট ভিড়! আকস্মিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বোধ হয় একটু লজ্জা বোধ করে সঞ্জয়; থেমে বলে, নীরুরও খুব ভাল লেগেছে।

নীরু! চমকে উঠি। নীরু বলে ডাকবার অধিকার সঞ্জয় কী করে পেল? আমার পৌরুষে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, আর আমি চরম আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হই।

নীরা ঠিক এই সময় এ-ঘরে আসে। শাদা শাড়ি, কপালে টিপ; কল্যাণী বধূর শান্ত মূর্তি নিয়ে ও এসে বসে, আর সঞ্জয়ের সব উচ্ছ্বাস ও আমার সব ক্রোধ ক্ষোভ অতিক্রম ও অগ্রাহ্য করেই বুঝি অনর্গল কথা বলে চলে। সঞ্জয় থেমে গিয়েছে, আপন উচ্ছ্বাসের জন্য যেন লজ্জা পাচ্ছে। আমিও বিহ্বল হয়ে পড়ি। কিন্তু তা মুহূর্তকালের জন্যই। তারপর একটা অসহ্য বেদনায় বুকটা টনটন করতে থাকে, সঞ্জয়কে দোষ দিয়ে কী হবে, নীরু যদি আগুন নিয়ে খেলা করে—। আমার মন চিৎকার করে বলতে চায়, নীরু, তুমি হয়তো নির্ভয়, কিন্তু তুমি ভুল করছ; ও পথ জ্যামিতিক পথ নয়; বিজ্ঞানের সূত্র ধরে সব কিছু চলে না।

বলতে পারি না। একবার নীরার দিকে, একবার সঞ্জয়ের দিকে তাকাই। সঞ্জয়ের মুখেচোখে লজ্জা, কিন্তু তা যেন অনেক ভাললাগায়, আর সেই অনেক ভালবাসা গোপন করার লজ্জায় রক্তরাঙা। নীরা? নীরাকে দেখি, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী, ঋজু, কিন্তু তীব্র জ্বালাময়ী। মনে-মনে বলি, তুমি বড় নির্মম, বড় নির্মম।

*অবশেষে সে সন্ধ্যের বৈঠকও শেষ হয়। সামনে অসহ রাত্রি; চিন্তা করতে গিয়েই শিউরে উঠি এবং শেষ পর্যন্ত অফিসের কাজের দোহাই দিয়ে এই প্রথম আমার কোয়ার্টারের বাইরে রাত কাটাই। বুঝি* এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই হত, তবু একটা তীব্র আক্রোশ আমাকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

নীরার শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার আর নীরার সম্পর্কে সে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে না। নীরা বুদ্ধিমতী, সব বুঝতে পারে, কিন্তু আর কিছু বলে না। ও বললেই বরং স্বস্তি পেতাম, অন্তত অভি-যোগ অনুযোগ করতে পারতাম। নীরাকে *ভালবাসি বলেই এ-দূরত্ব অসহ্য লাগে। নীরা দ্রুত বদলায়। বেশভূষায় চাকচিক্য নেই, সব সময় একটা মনমরা ভাব। বিকেলে বেড়াতে যাওয়াও ক্রমশ বিরল হয়ে আসতে থাকে।* চা-এর আসর বসে, ঠাটঠমক ঠিকই আছে, কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছে। সঞ্জয় আসে, যায়; কেমন যেন অস্থির। ব্যথায় আর বিস্ময়ের সঙ্গে ওর ভাবান্তর দেখি। ওর চোখে কী নিদারুণ ক্ষুধা! দু চোখ দিয়ে নীরাকে যেন লেহন করছে। কিন্তু নীরার কোন সাড়া নেই। আমার সঙ্গেও নীরা দূরত্ব রেখে চলে। আমি জানতে চাই, অনেক কিছু জানতে চাই। কিন্তু নীরাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

সাহস আমার কোনদিনই হত না, যদি না সেদিন নীরা হঠাৎ ওভাবে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করত। হ্যাঁ, আক্রমণই বৈকি। নীরা কখনো কটু কথা বলত না। তার শিক্ষা, তার রুচিই অন্যরকম। কিন্তু কী যে হয়ে গেল সেদিন! বেশ ক'দিন পর নীরা সঞ্জয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। অফিসের কাজের অনেক ফাইল-পত্র জমে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে বেরুবো ভেবেছিলাম, কিন্তু যেতে পারিনি। ফাইল ঘাঁটছি। সন্ধ্যে হয়-হয়। নীরা ঝড়ের বেগে এল। এ কী হয়েছে? নীরার মুখ ব্লটিং পেপারের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। চোখে যেন অসহ্য জ্বালা।

'কী হয়েছে? কী হয়েছে নীরু? ভয় পেয়েছ?' ব্যস্ত হয়ে পড়ি; উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে আমার গলা কাঁপে, আমিও ভয় পেয়ে যাই। নীরা আমার সামনের চেয়ারে বসে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। যেন তার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে। এ কী বিপর্যয়ের চেহারা? মনে হয়, আমার বুকে দিয়ে ওর ঐ ব্যথাভরা একান্ত ক্লান্ত মুখটাকে চেপে ধরি, আর আমার নীরুর সব কষ্ট, সব দুঃখ দূর করে দিই। কিন্তু সে-সব কিছু পারি না। একটা তীব্র দুশ্চিন্তায় বুক কাঁপে; বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকি, কী হয়েছে নীরু, আমায় বল, আমায় বল।

নীরা তার জ্বালাভরা, জ্বলন্ত চোখ তুলে তাকায়; তার দৃষ্টিতে কী নিদারুণ ঘৃণাই না ঝরে পড়তে থাকে, অস্ফুট উচ্চারণ শুনি, কাপুরুষ।

'কে, কে কাপুরুষ? কে কী করেছে?' এবার বিস্ময় বোধ করি।

নীরা আর স্থির থাকতে পারে না; ঋজু ব্যক্তিত্বশালিনী নারী কান্নায় ভেঙে পড়ে, দু হাত দিয়ে মুখ চাপা দেয়, আর কান্নায় গুমরে-গুমরে ওঠে, 'কে আবার? তুমি, তুমি, তুমি কাপুরুষ।'

তারপর সে কী বাধাহীন, দুকূল ছাপানো কান্না। *কী সান্ত্বনা দেব নীরাকে?* কী করে জিজ্ঞাসা করব, আমার কাপুরুষতা *কোথায় দেখলে? নীরবে বসে থাকি।* নীরার অভিযোগ শুনি, *'কাপুরুষ, যে নিজের স্ত্রীকে অপরের কামনা থেকে রক্ষা করতে পারে না, সে কাপুরুষ ছাড়া কী?'*

আমার যেন কিছু বোধগম্য হচ্ছে। নীরার অভিযোগের উত্তরে বলবার অনেক কিছু ছিল—তুমি তো কোন সতর্কতায় কান দাওনি। বলতে পারতাম, বললাম না। কেমন মায়া হল। অসহ্য কষ্ট পেয়েই না এভাবে ভেঙে পড়েছে। আস্তে-আস্তে ওর মাথায় হাত বুলোই। ও যেন এই স্পর্শটুকু পেয়ে আরো আকুল হয়ে ভেঙে পড়ে।

কিন্তু সব বর্ষণেরই ক্ষান্তি আছে। নীরা অনেকক্ষণ কাঁদবার পর বর্ষণস্নাত অপরাহ্ণবেলার মত ছলছল করে। আস্তে-আস্তে ওর চোখের ভীরু চাউনি দিয়ে আমার দিকে তাকায়, 'অন্য কোথাও চল, এখানে আর নয়।'

আকুতি ঝরে পড়ে ওর অনুরোধে। আমি আশ্বাস দিই, বেশ তো, যাব।

আমার নীরার মুখে মৃদু হাসি ফোটে। অনেকদিন পরে নীরা একান্তভাবে নির্ভর করে। নবপরিণীতা বধূর মত লজ্জায় রাঙামুখ। আমার সব ক্ষোভ, সব অনুযোগ নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। আমার সাম্রাজ্যকে আমি মনে-মনে বরণ করে ফিরিয়ে নিই।

এক সপ্তাহও নয়, তারই মধ্যে চেষ্টা করে বদলি হই। কলকাতার অনেক কাছাকাছি। নীরা ঝলমল করে। আমার স্বপ্ন বুঝি-বা এবার সার্থক হল! কিন্তু এক-একদিন হঠাৎ কোয়ার্টারে এসে দেখি, সব কাজের পাট পড়ে আছে। নীরা চুল বাঁধেনি। মুখচোখ অনেক কান্নার পর যেমন ফোলা-ফোলা দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে।

নীরার কষ্টের অংশীদার হবার চেষ্টা করি, কী হয়েছে গো? মন কেমন করছে? কলকাতায় যাবে?

নীরা কিশোরী বালিকার মত খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'মন কেমন করবে কেন! হ্যাঁ, করছিলই তো? একদিনও একটু কাজ কামাই করতে নেই।' অভিমানে স্ফীত ঠোঁট দুটো কাঁপে। 'সত্যি, আর হবে না দেখ'—নীরাকে সহজ করবার জন্য বলি। নীরা বিশ্বাস করে কিনা জানি না, বোধ হয় অবিশ্বাসই করে; তবু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বেশ বেশ, দেখা যাবে।

এইভাবে দিন কাটে। নতুন কোয়ার্টার পুরনো হয়ে যায়। স্বপ্ন আর সাধ দিয়ে নতুন কোয়ার্টারটিকে ভরাবার চেষ্টা করি। নীরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করে। অস্বাভাবিকভাবে নানান জিনিস আনবার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

আমার চাকুরী জীবনের প্রথম কোয়ার্টারের স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে। সঞ্জয়, দৈনন্দিন চায়ের আসর, সঞ্জয়কে সংগী করে বেড়াতে যাওয়া, সে-সব কথা মনে যে পড়ে না, তা নয়। তবে লক্ষ্য করে দেখেছি, নীরা সযত্নে সঞ্জয়ের নাম পরিহার করে চলেছে। আমিও সে-কথা তুলি না। বহুদিন ভেবেছি এবার নীরাকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তার পরীক্ষা ব্যর্থ হল? কিংবা কেনই বা সে তার পরীক্ষা ত্যাগ করল? সঞ্জয়, সঞ্জয় কি তার 'ভগ্ন মন নিয়ে নিজের পথ খুঁজে নিতে' পারল না? কিন্তু কেন যেন তা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। সেদিনের ইতিবৃত্ত অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। তবে এটুকু বুঝেছি, সঞ্জয়ের স্বপ্নভাঙা মন অত্যন্ত বেশি মূল্য দাবি করেছিল নীরার কাছে। ভালই হয়েছে। আজ সঞ্জয় নীরার জীবনে, আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ মৃত।

কিন্তু সত্যিই কি মৃত বললেই মৃত হয়? নীরা তার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা নিয়ে সেদিন যে-আগুন জ্বালিয়েছিল, সে-আগুন তার স্বধর্ম পালন করবার সুযোগ না পেলে বিকার আসবেই, আর তার প্রভাব আমাদের জীবনে পড়বেই।

নীরার পরীক্ষা সফল হয়নি, কিন্তু তার ব্যর্থতা আমাদের জীবনে এক অভিশাপ হানল। সেই নিদারুণ বেদনাময় ইতিহাস আমাদের সারা জীবনকে বিড়ম্বিত করবে, এর হাত থেকে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু এ-কথা প্রথমে জানতে পারিনি। নতুন কোয়ার্টারে আমার প্রথম উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আমার আর নীরার, নির্বিরোধ যৌথ জীবন আপন খাতে অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। উত্তেজনার প্রাবল্য না থাকুক, আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি নিবিড় করে নীরাকে আঁকড়ে ধরি। নীরাও অনায়াসে আমার উপর নির্ভর করে।

এরই মাঝে হঠাৎ একদিন আমার প্রথম চাকুরীস্থলের এক সহকর্মী এসে হাজির। সোল্লাসে তাকে স্বাগত জানাই। আরে এস, এস। নীরার সংগে তার আগেই পরিচয় ছিল। কাজেই ক' ঘণ্টার বিশ্রম্ভালাপ সহজেই জমে উঠল। এবং খুব স্বাভাবিক-ভাবেই পুরাতন জায়গার খুঁটিনাটি ভাল-লাগা, রদবদলের কথা উঠল। আমি বারবার আলোচনার ধারা পাল্টাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সহকর্মী যেন জেদ করেই আমার এ-জায়গার চেয়ে পুরনো জায়গার সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার সংকল্প করেছে। ফলে যা হবার তাই হল। কিন্তু সত্যিই কি কেবল তাই হল? ঠিক এ-আশংকা ত কোনদিন মুহূর্তের জন্যও করতে পারিনি; অনেক কিছু ভেবেছি, কিন্তু এ-কথা তো ভাবিনি।

সঞ্জয় পাগল হয়ে গিয়েছে।

সহকর্মী দুঃখ করে বলল, কী যে হল, মাস্টার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। এমনিতেই মাস্টার একটু গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এ যেন অন্য ধরনের। বেশভূষায় কোনদিনই নজর ছিল না; মাঝে ক' দিন তোমরা যখন ছিলে, একটু একটু শখ হয়েছিল যেন। সে-শখ যে কোনওদিন হয়েছিল, তা আর বোঝবার উপায় রইল না। স্কুলে কামাই, টিউশনিতে কামাই। আস্তে-আস্তে অপ্রকৃতিস্থ ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। এখন একেবারে উন্মাদ। সহকর্মী তার বক্তব্য শেষ করল। নীরার দিকে তাকাই। যেন কে তার মুখের সমস্ত রক্ত নিঙড়ে নিয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি; সহকর্মীকে উদ্দেশ করে বলি, মাপ কর ভাই, নীরার শরীরটা অসুস্থ, ওকে ভিতরে নিয়ে যাই।

সহকর্মী কুণ্ঠিত ও বিচলিত হয়ে পড়ে, তাই তো, তাই তো, না-না, ওকে ভিতরে নিয়ে যাও।

আমার আর তখন সহকর্মীর দিকে তাকাবার অবসর নেই। আমি নীরাকে দুহাতে ধরে দাঁড় করাই, আর আস্তে-আস্তে তাকে এ-ঘর থেকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই; চাদরটা ওর বুকে গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে মাথার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাইরে নিমগাছটার দিকে চেয়ে বসে থাকি। নীরা কাঁদুক; ও ভেঙে পড়ুক। কিন্তু কোথায় সেই একান্ত-চাওয়া চোখের জল? সেকেণ্ড যায়, মিনিট যায়, ঘণ্টা যায়, দুকূলপ্লাবী সে-ঢেউ জাগে না। ভাষাহীন চোখে নীরা চেয়ে থাকে। অনেকদিন পর আবার আমার বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

তবু দিন ঠিক চলে। কোয়ার্টারের সাজ-সজ্জায় নতুনত্ব আনে নীরা। সঞ্জয়ের নাম এ-কোয়ার্টারে ঐ একদিনই উচ্চারিত হয়েছিল, আর কখনও উল্লেখ হয় না।

কিন্তু, কিন্তু কখন নীরবে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

আমার চাকুরির উন্নতি হয়েছে। আমার অনেক সাধ পূরণের সে ইচ্ছে জানাই, কলকাকলি ভরা ঘর, আর সে-ঘরে তুমি—

নীরা স্তব্ধ হয়ে পড়ে, আর পরমুহূর্তেই তার অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, না, না, কখনো নয়, কখনো নয়।

আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ে। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। আমার পৌরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, দু হাত দিয়ে নীরাকে ধরে ঝাঁকানি দিই, কেন? কেন? কেন তুমি আমায় বঞ্চিত করবে?

নীরা আমার বুকে ভেঙে পড়ে, আর তার কান্নার মাঝখানেই আকুতি ঝরে পড়তে থাকে, আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর, আমি পারব না, পারব না।

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার জীবনে এ কী মর্মান্তিক অভিশাপ!

সেই অভিশাপ আজও বহন করছি। অভিশপ্ত জীবনের নিষ্ফলতা থেকে আমার কোনদিনই মুক্তি নেই। আমার প্রথম কোয়ার্টার, চাকুরী জীবনে সঞ্জয়ের পুনরাবির্ভাব, মান্য নেতার কূটনীতি, নীরার পরীক্ষা, সঞ্জয়ের চরম মূল্য দাবি, একে-একে সব ছায়াচিত্রের মত মনের পর্দায় ভেসে আসে। সঞ্জয় তার ভুলের মাশুল দিয়েছে, প্রথম জীবনে মান্য নেতার সাহচর্য পরবর্তীকালে নীরার কাছে অনেক প্রত্যাশার মাশুল দিয়েছে। নীরা, নীরা তার দুঃসাহসিক পরীক্ষার মূল্য দিল। কিন্তু আমি? আমার সান্ত্বনা কোথায়? আমি কোন্ ভুলের মাশুল গুনবো আজীবন?

**ট্রাম ধর্মঘটের** অবসান হইয়াছে। সংবাদে দেখিলাম কর্মীরা ফুলের মালা পরাইয়া ট্রাম গাড়ি ডিপো হইতে বাহির করিয়াছেন।—"কিন্তু যাঁদের হাড়িকাঠে ফেলার জন্য মালা পরিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কথা সংবাদে বলা হয়নি। আমে-দুধে আজ মিশে গেল। শুধু তারাই উদাত্ত খড়্গের আশংকায় কাল কাটাচ্ছেন যাদের ইচ্ছায় কখনো ঘাড়ে কোপ পড়ে না"—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশুখুড়োর।

* * *

**ইস্টবেংগল-মোহনবাগান** ফাইনাল খেলার পূর্বে সংবাদদাতা বলিয়াছেন—খেলার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায় যে, ভীড় অসম্ভব হইবে, টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইবে সব চেয়ে বেশী। শ্যামলাল বলিল,—"কিন্তু সংবাদদাতার পক্ষে সমস্ত অর্থের হিসেব করাও সম্ভব নয়; টিকিটে নম্বর দেওয়া থাকলেও সীটে কোন নম্বরের নির্দেশ এখন আর নেই। এখানে অর্থ, অনর্থমূ পর্যায়ে উঠেছে, সুতরাং...!!

* * *

**স্টেডিয়াম** না হলে খেলা চলবে না"—ধ্বনি করিয়া কেহ কেহ নাকি বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বিক্ষোভকারীদের পুরোভাগে খ্যাতনামা খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল ও অনিল দেকে দেখা গিয়েছে। এই প্রসংগে ট্রামে বসিয়া আলোচনা শুনিলাম—"এ সবের কোনও মানে হয়?"




আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"মানে হয় না এই জন্যে যে—বলতে গেলে এ সব কথা, উঠে পাগল ব'লে হেসে হেসে, ভাইরে, মানুষ নাই আর দেশে"—মুকুন্দ দাশের গানের কলিটি উদ্ধৃত করিয়া সহযাত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন।

* * *

**কলকাতা** রেফারী এসোসিয়েশনের টেলিফোনে অজস্র প্রশ্ন আসে জনসাধারণের পক্ষ হইতে—খেলার কী খবর,




গোল কে দিলে, কাল কি কি খেলা, চ্যারিটির টিকিট কি পাওয়া যাইবে?—"সবই খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। একমাত্র শেষ প্রশ্নটি অস্বাভাবিক এবং অবান্তর"—মন্তব্য করলেন অন্য এক সহযাত্রী

* * *

**কলিকাতায়** একটি মৎস্যাগার বা অ্যাকোরিয়াম স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।—"মাছের বাজারের যা-অবস্থা দেখছি, তাতে এরকম একটা কিছু হবে বলেই



অনুমান করেছিলাম। অতঃপর মৎস্যের কঙ্কাল দেখতে যাদুঘরে যেতে হলেও আশ্চর্য হব না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

**পশ্চিমবংগের** খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় দ্রব্যের "সিলিং প্রাইস" বাঁধিয়া দেওয়ার আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন—"শুধু সিলিং দিলেই তো হবে না; দেয়াল না বেঁধে দিলে কোন্ ফাঁকে কী হয়ে যেতে পারে বলাতো যায় না"!

* * *

**খাদ্যাভাব** সম্বন্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়া পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভকারীরা নাকি চোরাকারবারীদের প্রতিমূর্তিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"আমরা ট্রাই ক'রে দেখেছি, এই টেক্‌নিকে কোন কাজ হয় না। অগ্নি সংযোগের বদলে বরং কবর দিয়ে দেখতে পারেন"!!

* * *

**এক** সংবাদে শুনিলাম ১লা নবেম্বর হইতে ৭ই নবেম্বর পর্যন্ত সারা ভারত ব্যাপিয়া অগ্নিনিরোধ সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা হইতেছে।—"প্রকাশ থাকে এটা পেটের আগুন নয়"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিল শ্যামলাল।

* * *

**শুনিলাম** রবীন্দ্রনাথের গানের হিন্দী অনুবাদের ব্যবস্থা হইতেছে।—"আমরা এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এই সংগে সবিনয়ে নিবেদন জানাবো উদ্যোক্তারা যেন শিব গড়তে অন্য কিছু না গড়েন। কণ্ঠলেংগটি আর ফুটানিকা ডিব্বা ভুলতে পারিনি কি না তাই এই আশংকা"—বললেন বিশুখুড়ো।

* * *

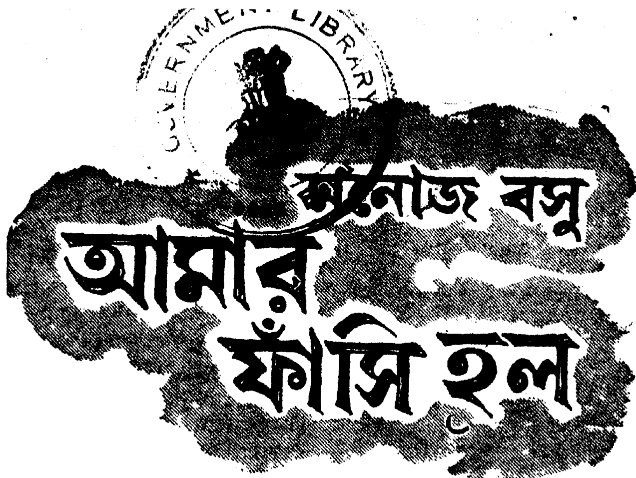
**উত্তর** প্রদেশের রাজাপাল শ্রী ভি ভি গিরি বলিয়াছেন যে, তাঁহার হাতে ক্ষমতা থাকিলে তিনি মন্ত্রিসভায় পুরুষের সমানসংখ্যক মহিলাও রাখিতেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"গিরিজীর এই মন্তব্যে পুরুষদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলতে পারব না, তবে মহিলারা মনে মনে নিশ্চয়ই মেরে গিরিধারী গোপাল ব'লে ভজন ধরেছেন!!

* * *

**এক** সংবাদে শুনিলাম ভারতকে নাকি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে।—"ভারত কি করবে বলতে পারিনে। বহুবার আন্তর্জাতিক খেলায় বড়ের চালে তাকে মাৎ হতে হয়েছে কিনা, সুতরাং দ্বিধা হয়ত স্বাভাবিক"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

**শল্য** চিকিৎসায় রাশ্যার একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম একটি বাচ্চা কুকুরের মুণ্ড নাকি অন্য জাতীয় একটি কুকুরের ঘাড়ে বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা সফল হইয়াছে।—"আমরা তো এ জাতীয় আবিষ্কারের কথা ভাবতেই পারিনে। আমরা উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতেই সফল হয়েছি মাত্র"—বলে আমাদের শ্যামলাল।




## ১০

তিন সোমত্ত মেয়ে— চম্পা জবা যুই। তোলা নামও একটা করে ছিল। লগ্নপত্রের সময় সেই নাম বেরুল। সংস্কৃত মন্ত্রের মতো কঠিন উচ্চারণ, কঠিন বানান। মানে নিশ্চয় খুব ভাল। মন্ত্রের মানে ভাল বই মন্দ হয় না, কিন্তু ঘরব্যাভারি চলে না। সেই সব সাধুনাম মনে নেই ডাক্তারবাবুর।

বিয়ে চম্পার। পাত্র সদরের সরকারি উকিলের ছেলে। মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুতে লড়াইয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। বিরাট আয়োজন। আর এ-বাড়ির সব ব্যাপারে যেমন, মাখন মিস্তির ষোলআনা কর্তা। লোকটা খাটতেও পারে অসুরের মতন। পানসি নিয়ে আজ শহরে ছুটল, কাল বা কলকাতায়। ভারে ভারে জিনিস আসছে। কত রকমের গয়না, কত কাপড়-চোপড়। উদ্যোগপর্বেই লোকের তাক লেগে যায়। গায়ে-হলুদে গাঁয়ের যত বউ-ঝি আসবে—খাওয়াদাওয়া তো আছেই—প্রতি এয়োস্ত্রীকে সোনা-বাঁধানো শাঁখা আর শাড়ি দেওয়া হবে। হিসাব করে সেসব আলাদা গোছানো হল। লোকে বলে, দেদার রয়েছে—দেবে না কেন? এত দিয়েও শেষ করতে পারছে কই?

আর ঐ মেয়ে তিনটে—বিশেষ করে বিয়ের কনে চম্পা। বিদেশ-বিভূঁয়ে ছিল বলে এই অঞ্চলের মতো নয়—লজ্জাসরম কম। ভাল ঘর-বরে যাচ্ছে, সে আনন্দ উপছে পড়ছে হাসিখুশিতে। তিন বোনে বাড়িময় কী কাণ্ড যে করে বেড়াত!

ডাক্তারবাবু বললেন, সাহেব-গিন্নির বাতের অসুখ এই সময়টা বেড়ে ওঠায় হামেশাই আমায় গোলবাড়ি আসতে হত। কী যে করে মেয়েগুলো! এ ওকে তাড়া করেছে, ছুটোছুটি, ধুপধাপ সিঁড়ি ভাঙছে, তার মধ্যে এক কলি গান গেয়ে উঠল বা হঠাৎ। খিড়কি-পুকুরে গা ধুতে গিয়ে এক প্রহর অবধি জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। সাহেব-গিন্নি ঝি পাঠিয়ে ডাকাডাকি করছেন, তা কেউ কানে নেবে না। বখশিসের ব্যাপার হলে সিকি-দুয়ানি এমন কি পুরো টাকাও ছুঁড়ছে কথায় কথায়। ফকির-বোষ্টমকে পয়সা দেয় না, চালের উপরে রুপোর টাকা। ম্যাজিক-বাক্সে ছবি দেখাতে এসেছে, দু-পয়সা করে নেয়। যত ছেলেপুলে ভিড় করেছে, তাদের দেখিয়ে চম্পা টাকা ফেলে দেয়: দেখিয়ে দাও সকলকে। লাগে তো আরো দেবো।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল হঠাৎ। উজ্জ্বল দিনমান মেঘে ঢেকে অন্ধকার হলে যেমনটা হয়। চতুর্দিকে দাঙ্গার খবর। সে যাই হোক, বিরাটগড়ে কিছু হবে না—সবাই পাড়া-প্রতিবেশী, এ জায়গায় ঝামেলার মানুষ কোথা? শুভকর্ম চুকে গেলে গাঁ-অঞ্চলে আর নয়, সবশুদ্ধ কলকাতায় গিয়ে

উঠবেন। জবা-যূঁইয়ের বিয়ে সেখানে। যাখন মিত্তির বাড়িও একটা ঠিকঠাক করেছে ইতিমধ্যে, কথাবার্তা বলে টাকা দিয়ে বায়না করে এসেছে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের মারফতে সেই কলকাতার খবর পাওয়া গেল। ভাগ্যিস যাওয়া হয়নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে যেটা সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে জানি, সেখানেই বেশি গোলমাল। দুনিয়ার পা রেখে চলা দায়। কলকাতায় ভাগ্যিস যাননি—কলকাতার ঠিক উল্টোদিকে সুন্দর-বনের জঙ্গলে যাওয়া বরঞ্চ ভালো। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মানুষের মতন হিংস্র নয়।

কলকাতায় হাওয়া এদিকেও যে ধেয়ে আসে। ঘূর্ণিঝড়—চারিদিক ওলটপালট হয়ে মানুষজন যে কোথায় ছিটকে পড়ে। মানুষ আজব জীব। আজকে গলায় গলায় ভাব, দশ মিনিটের অদর্শনে বুকের ভিতরে মোচড় মারে—সকালবেলা উঠে হয়তো দেখব, ছোরা উঁচিয়ে তেড়ে আসছে তারা পরস্পরের দিকে। হাবাগবা মানুষটি—যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়, হঠাৎ দেখতে পাই ফটাফট আওয়াজে হাল-আমলের বেঁটে বন্দুক ছুঁড়ে সে মানুষ ঘায়েল করছে। কোথায় পায় বন্দুক, বন্দুক চালাতে শিখলই বা কবে, খোদায় মালুম। মানুষকে বিশ্বাস নেই ভায়া। সাপ-বাঘ-কুমির সবাইকে বিশ্বাস করবেন—মানুষ কিছুতে নয়।

বিরাটগড়ে তখন থানা হয় নি। সদর থানার অধীনে এ জায়গা। অরাজক অবস্থা, কে কার খবর রাখে? খবর পেলেই বা কি; পুলিশেরও পৈত্রিক প্রাণের মায়া আছে। খবর গড়াতে গড়াতে দিন দশেক পরে কলকাতা পেঁছে গেল। রোমহর্ষক বলে খবরের কাগজে লেখালেখি চলল বেশ কিছুদিন। দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের টনক নড়ল অবশেষে। বন্দুক সহ পুলিশের একটা মাঝারি দল গ্রামের উপর আস্তানা গাড়ল। তখন সব ঠাণ্ডা। যারা নাটের গুরু, ধরা দেবার প্রত্যাশায় তারা চুপচাপ এতদিন বসে থাকে না, কোন মুলুকে সরে গিয়ে আবার কোন নতুন ফিকিরে আছে। কিন্তু কাজ দেখাতে হবে—ইটেভটে-শূন্য গোবেচারা গোটাকতক ধরে ধরে চালান দিল। সাহস পেয়ে পুরানো বাসিন্দাদের কতক কতক ফিরে আসছে। দয়ালহরি হোড়ও ফিরল। গোলমালের মুখে ঠিক সময়টিতে সরে পড়েছিল। আগে থেকে টের পেয়ে সড়াক করে পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেল। মুশকিল অথর্ব বড়বউকে নিয়ে। চেষ্টা করেছিল তাকে শুধু নৌকোয় তুলে নেবার। কিন্তু অত দূরে ব্যবস্থা করার ফুরসৎ হল না। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই নীতিতে একটি বেরিয়ে পড়ল তখন। আর কী আশ্চর্য, হোড়ের ঘরবাড়ি গোল-

বাড়ির এত কাছে, অথচ ওদিকটা কেউ উঁকি দিয়েও দেখে নি। ক'টা দিন বড় বউকে উপোস দিতে হয়েছিল, এইমাত্র। তা ছাড়া আর কিছু হয় নি। দয়ালহরি ফিরে এসে ঠিক ঠিক সমস্ত পেয়ে গেল।

তামাক এনে দিল এই সময়টা। ফড় ফড় করে গোটা দুই টান দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, অনেকেই কিন্তু ফিরল না। আজও আসেনি। খুব সম্ভব দুনিয়ার উপরেই নেই। মাখন মিস্তিরের কথা খুব হত সেই সময়। ও-রকম তালেবর লোক—পুলিশ অনেক খোঁজাখুঁজি করল। মিস্তিরকেও শেষ করে দিয়েছে, এই রকম তখন ধরে নেওয়া হল। আমি বললাম, হতে পারে না। কলির প্রহ্লাদ—ওকে কাটতে পারে এমন অস্ত্র আজও তৈরি হয়নি। তাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। আমার বরঞ্চ মনে হয়, গোলবাড়ির হাঙ্গামায় তার যোগসাজস ছিল। সাহেব-কর্তা প্রাণের দায়ে দু-হাতে টাকা ঢেলেছেন—তাঁরা বাঁচলে পরে কোনদিন কৈফিয়তের ভাগী হতে হবে, মরে গেলে মিস্তির তখন নিরঙ্কুশ। নইলে বুঝে দেখ, গোলবাড়ির ধিড়িঙ্গে আমগাছ—সেই গাছে চড়বে বলে অতদূর থেকে মই এনেছে নৌকোয় করে। দড়ি নিয়ে এসেছে, গাছের ডালে বেঁধে ঝুল খেয়ে ছাতের উপর পড়বে। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে প্লান করা। নয়তো গোলবাড়ি ঢুকে পড়া সহজ হত না। ক-মিনিটের মধ্যে তিন-চারটে ঘায়েল হয়েছিল সাহেব-কর্তার বন্দুকে। অদ্ভুত হাত ছিল তাঁর।

ডাক্তারবাবু চোখ বুঁজে হুঁকো টানতে লাগলেন। চুপচাপ। ধোঁয়ায় কুণ্ডলী হয়ে উঠল। শেষ টান টেনে হুঁকো নামিয়ে রেখে আবার বলতে লাগলেন, বিকেলবেলাটা হোড় মশায় আমায় এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, গোলবাড়ির ছাতে মরা পচছে এখনো। সেই তিন বোন—

সে কি?

ডালের নিচে বলেই শকুন পড়েনি, শকুনে দেখতে পায়নি। কিন্তু মড়ার একটা ব্যবস্থা করা ত চাই। চলুন।

কেন জানিনে, চিলেকোঠার পাশে কোণের দিকটায় কারো নজর পড়েনি। বাড়ির মধ্যে গেছেই বা ক'টা মানুষ! অতগুলো খুনের পর গ্রামের মানুষ ভয়ে কেউ ও-মুখো হত না। এমন কি, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েও কেউ হাঁটত না পারতপক্ষে। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকালেই বুক ধড়াস-ধড়াস করত। এতকাল হয়ে গেছে ভায়া, এখনো লোকের ষোলআনা ভয় ভাঙেনি।

মেয়ে তিনটে ডাক্তার-কাকা বলে ডাকত আমায়। আনন্দের প্রতিমা। হাসি ছাড়া মুখ দেখিনি। তাদের কথা শুনে থাকতে পারলাম না। ছাতের উপরে মোটা মোটা আমের ডাল ঝুঁকে এসে পড়েছে, সেই





ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পড়ে আছে তিন বোন। বারো-চোদ্দ দিন হয়ে গেছে, বিষম দুর্গন্ধ, মাছি ভনভন করছে। নাকে কাপড় দিয়ে কাছে যেতে হল। কি বলব ভায়া, আজও যেন চোখের উপর দেখতে পাই। আকাশ-মুখো মুখ—তিনজনের যেন আলাদা তিন চেহারা। চম্পা হাসছে। চাপ চাপ রক্ত জমে ছড়ানো চুলে জটা বেঁধেছে, বুকের কাপড়ের উপর জমাট কালো রক্ত—এতবার ছোরা মেরেছে, মুখের হাসি তবু মুছে দিতে পারেনি। আবার জবাটা ছিল ভারি চঞ্চল, দুড়দাড় ছুটে বেড়াত। দু-পাটি উলঙ্গ দাঁত, চোখ বোঁজা—মনে হল দাঁত বের করে আততায়ীদের ভেংচি কাটছিল মৃত্যুর সময়টায়। জবার গা ঘেঁষে যুঁই। বড্ড ভয়কাতুরে মেয়ে, দিনমানেও একলা ঘরে থাকতে পারত না, জবা খুব ক্ষেপাত তাই নিয়ে। আমরাও ঠাট্টা-তামাসা করতাম। আহা, বড্ড কেঁদেছিল মেয়েটা—চোখের পাতা ভিজে আছে বুঝি এখনো, কোঁচার খুঁটে জল মুছে দেওয়া যায়। তখন ঘোর হয়ে গেছে। আমি আর দয়ালহরি ছাতের কার্নিশের উপর দিয়ে একটা একটা করে নিচের আমতলায় ফেলে দিলাম। শব্দ করে পড়ল ভারী আসবাবপত্রের মতন। টানতে টানতে সেখান থেকে গাঙের খোলে। বিয়ে হয়ে বাজনা বাজিয়ে ঐ গাঙের উপর দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা, তা গাঙের জলে ফেলে দিলাম তাদের। মানুষ কোথায় পাই তখনকার সময়ে, এর বেশি আর কিছু করার ছিল না।

এক রোগী এসে পড়ায় ডাক্তারবাবুর গল্পের ছেদ পড়ল। বলবার আর কী-ই বা ছিল।

আমার বিয়ে হল। একরকম জিনিস আছে—দীপক-বাজি। সকলের অবস্থা সমান নয়, বাজি-বাজনা সব বিয়েয় হয় না। কিন্তু নিতান্ত অপারগ না হলে কয়েকটা দীপকের জোগাড় করবেই। বাজিকর লাগে না, নিজেরা জ্বালিয়ে ধরে শুভদৃষ্টির সময়টা। দিনমান হয়ে যায়। কড়া রোদের দিনমান নয়, অতি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোর মতো। আমি দাঁড়িয়েছি জলচৌকির উপর, মাথায় চাদর ঢেকে দিয়েছে। কনে পিঁড়িতে বসিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল সেই চাদরের নিচে। মাথার কাপড় সরিয়ে দিল। পাশ থেকে কে বলছে, চোখ খুলে ভাল করে দেখে নাও এই শুভক্ষণে। তবে তো সুখশান্তি হবে, দুজনের ভাব-সাব হবে। শি-ই-স-স করে দীপক জ্বলল দু-পাশে দুটো।

ডাক্তারবাবুর গলা শুনলাম, গা-ভরা গয়নার কথা বলছিলেন হোড় মশায়, সে সব কি হয়ে গেল? দু-গাছা শাঁখা পরিয়ে এমন ন্যাড়া কনে কেউ ছাদনাতলায় আনে?’

দাদা বললেন, এই ভাল হয়েছে খুব ভাল। ভাই আমার বিনি-গয়নায় পছন্দ করেছে। গয়নায় বেশী কি জৌলুষ বাড়বে?

আমি কিছু তাকিয়ে দেখিনি। লাবণ্য তাকিয়েছিল, পরে তার কাছে জানলাম। বাসরের মধ্যেই বলল, সে বুঝি ধৈর্য ধরতে পারছিল না। থরদৃষ্টিতে চেয়ে চাপা গলায় কানে কানে বলে, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজেছিলেন, চিরকাল পারবেন চোখ বুজে থাকতে

কথা সত্যি। আয়ুর মেয়াদ কতকাল আছে জানিনে—ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু বুজে অন্ধ হব, সমস্ত জীবন ধরে এরকম চলে না। দেখতেই হবে, না দেখে উপায় নেই। বিষম ভয় ধরিয়ে দিল লাবণ্য। আজকে এই বাসরের রাতটুকু কাটাতে হিমসিম খাচ্ছি, কত রকম বুদ্ধি খেলাচ্ছি। যত গরিবানার বিয়েই হোক, এবাড়ি-ওবাড়ির মেয়ে-বউ কয়েকটা এসেছে। পুলকে ডগমগ হয়ে বকছি, এমনিভাবে ফলাও করে গল্প জমিয়েছি তাদের সঙ্গে। গান গাইতে বলছি তাদের নিজেও গাইছি। একখানা দু-খানা করে অনেকগুলো গেয়ে ফেলেছি—কান্না না এসে গানই আসছে কেবল। মেয়েদের চোখে ঘুমের ঝিমুনি, বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ছাড়ছে কে? বরকেই বাসরের মেয়েরা খোশামোদ করে—আমি উল্টো তাদের বলছি, আর একটু থেকে যান, খুব ভাল একখানা গান হবে এইবার। গানও টেনে টেনে লম্বা করি। হাতঘড়ি দেখি, আর আগামী দিনের দিনমণির উদ্দেশে মনে মনে বলি, এই একটা দিন সূর্যিঠাকুর আগেভাগে উদয় হও, মেয়েরা উঠতে উঠতে পুবে ফরসা দিক। সৃষ্টি তাতে রসাতলে যাবে না।

এক সময় অবশেষে চলে গেল মেয়েরা। আমি অমনি হাই তুলছি। বড্ড ঘুমে ধরেছে, এক্ষুণি যেন গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ব। গা শিরশির করছে—ঐ বস্তু স্ত্রীর অধিকারে কখন চেপে এসে পড়ে এই একান্ত সান্নিধ্যের মওকায়। আরও মুশকিল, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ—বাসরের প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলবে, নেভানো অলক্ষণ। অন্ধকার অনেক ভালো, চেহারাটা স্পষ্টাস্পষ্টি চোখের উপরে না থাকায় আতঙ্ক কিছু কম থাকে, যৌবনের স্পর্শের অনুভূতি বীভৎসতা কিছু মোলায়েম করে দেয়। আলো থাকলে তা হয় না। আলোকিত বাসরে কোন কৌশলে সকাল অবধি কাটাব, ভেবে কোন দিশা পাইনে।

বড় একটা হাই তুলে উল্টো দিকে ফিরে ঘুমের ভান করি। লাবণ্য খলখল করে হেসে ওঠে। কবি মানুষ, কল্পনার দৌড় আপনাদের দশ জনের চেয়ে নিশ্চয় অনেক বেশি। কিন্তু মানুষীর অমন হাসি কল্পনার চোদ্দপুরুষের আন্দাজে আসে না। বলে,

মুখ ফিরিয়ে শুলেন, আমার মুখ দেখবেন না? আমি যদি এখন ওপাশে চলে যাই? কিম্বা জোর করে আপনার মুখ টেনে ফেরাই এদিকে? বসন্ত চোখের ঢেলা গেলেছে, কিন্তু হাত নড়লো করেনি।

বলে একেবারে গায়ের উপর এলো। বাঁ হাতখানা ফেলে দিল গায়ের উপর। কী ভারী, বিশমণি পাথর একখানা দড়াম করে যেন আছড়ে মারল। দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। স্ত্রীলোক এবং যুবতীও। আমার মনে হল, বোড়া সাপে পাকে পাকে বেড় দিয়েছে আমায়। দম আটকে মারবে।

আর কী উৎকট আওয়াজ এই সময়টা রান্নাঘরের দিকে! গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং, বর্ষারাতে ব্যাং ডাকে যেমন। একবার বা মনে হয়, ধুনুরিরা তুলো ধুনছে—টং টং, ঘ্যাস ঘ্যাস।

দয়ালহরির গলা পাই : আজকের রাতটা ক্ষমা দাও বড়-বউ। জামাই-মেয়ে ও-ঘরে। কাল থেকে আবার লেগো। আর যদি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পথে ঠাঁই নিতে হয়, তখন খুব কাজ দেবে। ডবল করে লেগে যেও তখন।

পথে ঠাঁই নেবার কথা হচ্ছে, তার মানে দেনার টাকা শোধ হবে না। এটা আমি সেই দিনই বুঝেছিলাম। পারলেও দেবেন না টাকা। ভাঁওতা দিয়ে একটা মাসের সময় নিলেন নতুন কোন মতলব খাটাবার জন্য।

ঘর-তক্তাপোশ আমাদের বাসরের জন্য ছেড়ে দিয়ে ও'রা আজকে রান্নাঘরে শুয়েছেন। শাশুড়ির গলার আওয়াজ সেই একদিন সকালবেলা শুনেছি—নিশুতি রাত্রে আজ আলাদা বস্তু, দিনমানের সঙ্গে একেবারে মেলে না। বোধ করি, ঘুমের আবেশ জুড়ে গিয়ে গলায় এহেন রকমারি সুর বেরুচ্ছে। পুরুষ-সিংহ বলি শ্বশুর মশায়কে, ঘরের মধ্যে এই কাণ্ড নিয়ে পঁচিশ বছরের হাজার হাজার রাত কাটিয়ে আসছেন।

বলছেন, মেয়েটার গতি হল, গলার বড় কাঁটাখানা নামল। এবারে তুমি কবে নামবে বলতে পার? বুড়ো হয়ে গেছি, আর এখন পেরে উঠছিনে।

শাশুড়ি টেনে টেনে বলেন, তুমি গলা টিপে ধরো। আমায় বাঁচাও। পোড়া যম-রাজের দয়াধর্ম নেই। ভালোটা-খেকো যম। কানা যম, চোখে দেখে না।

দয়ালহরি টিপ্পনী কাটেন: কালা যম, কানেও কিছু তো শুনতে পায় না।

জন্ম ধরে শ্বাস টানছি। দম বেরিয়ে যায় না রে একদিন! গণ্ডারের চামড়ার ফুসফুস, ফুটোফাটা হয় না। দাঙ্গায় কত গাঁ-ঘর উচ্ছন্ন হল, কত লোক মরল—একলা মানুষ আমি বাড়ি আগলে রইলাম, কোন হাড়-হাবাতে এগিয়ে এলো না।

দয়ালহরির পুনশ্চ রসিকতা : এসেছিল হয়তো। গলার বাজনা শুনে ভয় পেয়ে পালাল। কত রকমের সুর বেরোয়, নিজে তা বুঝতে পারো না বড়-বউ। বাইরের লোকে বোঝে। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। আজকে ঐ জামাই হতভাগা বুঝতে পারছে।

দাম্পত্য রসালাপ। পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার চলছে। জামাই মানুষ আমার পক্ষে শোনা অনুচিত। কিন্তু উত্তাল বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে গানের কথার মতো আপনি এসে কানে ঢুকছে। কি করি—চোখ বুজে পড়ে আছি, কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দিই নাকি?

হঠাৎ দয়ালহরি হাহাকার করে উঠলেন : ভুল হয়েছিল বড়-বউ। বড্ড ভুল করেছি সেই সময়টা পালিয়ে গিয়ে। তুমি বাতিল পঙ্গু মেয়েমানুষ একলা পড়ে আছ—জানে, টাকা-পয়সা মালপত্তর নিয়ে আমি চলে গেছি, হেলা করে সেইজন্যে এলো না। আমি থাকলে আসত, নির্ঘাত সাবাড় করত। ভাল হত, মুক্তি পেয়ে যেতাম।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যম ডাকছেন, দাঙ্গা-বাজদের ডেকে মুক্তি চাইছেন। অথচ কত সহজ মরা! বিধাতাপুরুষ বলে সত্যি যদি কেউ থাকেন—যেমন তিনি জ্বালাযন্ত্রণা দিয়েছেন, রেহাই পাবার উপায়ও দিয়েছেন অজস্র। এত সব কায়দা হাতের কাছে থাকতে মানুষ বাঁচতে যাবে কেন? মরার পরের অবস্থা জানা নেই বলেই ভয় পায় কাপুরুষের দল। লাবণ্যর সেদিনের কথাগুলোই ঘুরিয়ে বলা যায়, ভাল কিছু না পেলেও ক্ষতি নেই। বেঁচেবর্তে যে রকম আছি, তার চেয়ে তো খারাপ হতে পারে না! আর কিছু না হোক, জায়গাটা বদল হবে।

লাবণ্য দেখি খুকখুক করে হাসছে। আমার গায়ে খোঁচা দেয় : কি গো, ঘুমুলেন নাকি? বাহাদুরি ঘুমের! গর্ভধারিণী-মা হলেও আমি আঁৎকে আঁৎকে উঠি। বাবাও ঘুমোন না একসঙ্গে এতকাল ঘর করে। নতুন লোক আপনি যেন মরে ঘুমুচ্ছেন।

ক্রমশ




মনে পড়ছে অনেক দিন আগে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম, সাহেবদের রাজত্ব যখন শেষ হবে, তখন মোসাহেবের রাজত্ব শুরু হবে। এ কথার মানে এই নয় যে, সাহেবদের রাজত্বকালে মোসাহেব ছিল না। দুশ' বছর রাজত্ব করে ইংরেজ আর কিছু না করুক, দেশময় বহু মোসাহেব সৃষ্টি করেছিল। সাহেবরা রাজত্ব করত আর মোসাহেবরা কর্তৃত্ব করত। সমাজ বিজ্ঞানে একেই বলে মাধ্যাকর্ষণ নীতি—যেখানে হুজুর সেখানেই যোহুজুর। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে একটি অপরটিকে টেনে আনে। ইংরেজরাজ গিয়ে যখন কংগ্রেসরাজ হল, তখন বুঝলুম, যে গদিতে বসে সেই সাহেব হয়। ভুলে গিয়েছিলাম যে, মুসলমানদেরও আমরা সাহেব বলতুম, এখনও বলি। কংগ্রেসীরা যখন গদি এঁটে বসলেন, তখন তাঁরাও সাহেব হলেন। বলা বাহুল্য, যেখানে সাহেব, সেখানে মোসাহেব এসে জুটবেই। কি করে আমার এই দিব্যজ্ঞান হল, সেই কৌতুকের কথাটি বলছি। ১৯৪২-এর আন্দোলনে কয়েক মাস আমাকে কারাবাসে কাটাতে হয়েছিল। উক্ত কারাগারে (বাংলা দেশের বাইরে) কয়েকজন কংগ্রেসী হোমরা-চোমরাও আবদ্ধ ছিলেন। এঁদের সুখ-সুবিধার জন্যে জেল-কর্মচারীরা যে কি বিষম ব্যস্ত থাকত, দেখে অবাক লাগত। মুখের অনুগত বিগলিত ভাব দেখলে হাসি পেত। রাজনৈতিক বন্দীদের তখনকার দিনে রাজ-অতিথি বলা হত। দেখে মনে হয়েছে কথাটা নিতান্ত কৌতুক নয়। ১৯৪২-এর পূর্বেই অল্পকালের জন্যে কংগ্রেস কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল। রাজ-কর্মচারীরা বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়েছিল যে, এই সব জেল-কয়েদীরাই অনতিবিলম্বে তাদের প্রভু হয়ে বসবেন। সুতরাং জেলখানা থেকেই তারা ভাবী দেবতাদের পূজো দিতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ ঐখানেই শুরু হয়েছে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সাহেবিয়ানার মহড়া আর রাজ-কর্মচারীদের মোসাহেবিয়ানার।

এ-যুগের সবচেয়ে বড় ব্যবসা হল কালো-বাজার আর মোসাহেবিয়ানা। ঘুষ, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কালোবাজার নিতান্তই হালের আমদানী। মোসাহেবির ব্যবসা হালের না হলেও খুব প্রাচীন নয়। ইদানীং এ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম, ফলে সমাজ বিজ্ঞানের একটি দিক আমার চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বহু আদিম জীব—ভূপৃষ্ঠ থেকে লোপ পেয়েছে—আবার অনেক নতুন জীবের সৃষ্টিও হয়েছে। মোসাহেব নামক জীবটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। মনুষ্য সমাজের আদিতে একটিমাত্র নীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—সেটি হচ্ছে জোর যার মুলুক তার। সর্বোপরি একজন প্রভু আর সকলেই ভৃত্য। মধ্যবর্তী আর কোন শ্রেণীর স্থান ছিল না। সেই মূল নীতিটিই আজ পর্যন্ত সমাজে বলবৎ রয়েছে। এখনও সমাজে জোর যার মুলুক তার, তবে কিনা ঐ জোর কথাটার অর্থ কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। প্রথম যুগে জোর ছিল নিছক গায়ের জোর। বাহুবলে যে সবচেয়ে বলীয়ান, সেই হয়েছে মোড়ল, বাকী সবাই তার হুকুম-বরদার। পরবর্তী কালে এই মোড়লই হয়েছে রাজা, বাকী সব প্রজা। প্রজাদের উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। কেবলমাত্র গায়ের জোর জড়বুদ্ধির প্রমাণ। বহু যুগ লেগেছে এই নাবালক সমাজের সাবালক হতে। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে জোর কথাটার সংজ্ঞা বদলিয়েছে। সভ্য মানুষ জোর বলতে বুঝেছে বুদ্ধির জোর—বুদ্ধি যার মুলুক

তার। এইখানে মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের উদ্ভব অর্থাৎ রাজার বুদ্ধিতে আর কুলোল না, উজীরের প্রয়োজন হল। বুদ্ধির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা স্তর দেখা দিল। বুদ্ধিমন্তরা সকলেই আপন আপন গুণানুসারে সমাজে স্থান পেল। স্বীকার করতেই হবে, সে যুগে গুণের আদর ছিল। রাজ দরবারে শুধু যে উজীর নাজিরের স্থান হয়েছিল এমন নয়, রাজসভায় কবি না থাকলে, সংগীতকার না থাকলে রাজ-দরবারের মর্যাদাহানি হত। যে রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীর আদর ছিল না সে রাজ্যের কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না। রাজা-রাজড়া ছাড়াও সমাজে যাঁরা বিত্তবান বলে খ্যাতিলাভ করতে চাইতেন, তাঁরা সকলেই গুণীজনদের পৃষ্ঠপোষকতা করা কর্তব্য মনে করতেন, এমনকি, এই নিয়ে বিত্তশালীদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। এলিজা-বেথীয় যুগে দেখা গিয়েছে, শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে সে যুগের কবি এবং নাট্যকার সকলেই কোন-না-কোন অভিজাত লর্ডের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এসব কবিরা উক্ত অভিজাতবর্গের মোসাহেব ছিলেন না। গুণীজনের সমাদর করে রাজা এবং রাজ-পারিষদরাই বরং নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছেন। রেনেসাঁ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ইরাসমাসকে নিয়ে ইউরোপের একাধিক জনসভায় রীতিমত রেষারেষি বেঁধে গিয়েছিল—কে কার আগে তাঁর সমাদর করবে। উজ্জয়িনী রাজসভার নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের মোসাহেব ছিলেন না। এই সেদিনের কথা বলছি—ডক্টর জনসনকে কেউ মোসাহেব বলতে সাহস করবে না; তাঁরও পেট্রন ছিলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। পেট্রনের কর্তব্যে অবহেলা হয়েছিল বলে জনসন লর্ড চেস্টারফিল্ডকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। সমাজে সত্যিকারের গুণীজনের যে যথার্থ আদর ছিল, তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত জনসনের যুগেই আমরা দেখেছি। জনসন নিরতিশয় দরিদ্র নিঃসম্বল ব্যক্তি ছিলেন। এমন ব্যক্তিকেও কেবলমাত্র দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ইংলণ্ডেশ্বর বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সাদরে আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সর্বোত্তম ঘটনা বলে মনে করি। আমাদের এই তথা-কথিত গণতন্ত্রের দিনেও এমন ঘটনা ঘটতে দেখি না। বর্তমান শতাব্দীতে অর্ধনগ্ন ভারতীয় ফকির গান্ধীও বাকিংহাম প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই আমন্ত্রণ গান্ধীজীর গুণগ্রামের খাতিরে নয়, তাঁর পরাক্রমের খাতিরে। কারণ এই কৌপিনধারী ব্যক্তিটির প্রতাপে ভারতে ইংরেজ সিংহাসন টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল।

গুণগ্রাহিতার জন্যে যে অষ্টাদশ শতাব্দীকে আমি এইমাত্র প্রশংসা করেছি,

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এল শিল্প বিপ্লব। সমাজে সব ওলটপালট হয়ে গেল। কল-কারখানার দৌলতে রাতারাতি নতুন এক ধনিক সম্প্রদায় গজিয়ে উঠল। এরা হঠাৎ নবাবের দল। আত্মমর্যাদা এদের গড়ে উঠতে সময় লেগেছে, পরের মর্যাদা বুঝতেও বিলম্ব হয়েছে। সত্যিকারের গুণের আদর সমাজে কমে এল। গোড়ার দিকে যে বল বা জোরের কথা বলেছিলাম, এই আরেক দফা তার অর্থ বদল হল। আদিতে ছিল জোর যার মুলুক তার, পরে হল বুদ্ধি যার মুলুক তার ,আর এই শিল্প বিপ্লবের পর থেকে দেখা গেল, টাকা যার মুলুক তার। এই হঠাৎ-গজানো ভদ্দরলোকরা প্রথমটায় সমাজে কল্কে পায়নি, কেননা, এদের বংশ-মর্যাদা নেই। কিন্তু টাকা থাকলে মান-মর্যাদা সবই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। পয়সা দিয়ে এরা স্তাবক জোটাতে লাগল। অভাবের তাড়নায় অনেক মানুষকেই আত্ম-বিক্রয় করতে হয়। এই আত্মবিক্রেতার দলকেই বলে মোসাহেব। নারী যে কারণে দেহ বিক্রয় করে পুরুষ সে কারণেই মোসাহেবি করে। দুটো একই ব্যবসা, দুটোই উদরান্ন সংস্থানের জন্যে। দেহ বিক্রয়ের ব্যবসা আদিকাল থেকে চলে আসছে, কারণ নারী চিরকালই অসহায়। একালেই বরং সহায় শক্তি কিছু বেড়েছে। কাজেই সমাজ থেকে প্রস্টিটিউশন রহিত করবার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পুরুষের নিঃসম্বলতা দিনে দিনে বাড়ছে। নিজের পেটের দায়ে অপরের মন জুগিয়ে চলতে হয়। এজন্য মোসাহেবি সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করেছে।

ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মোসাহেব নামক জীবটি প্রধানত শিল্প বিপ্লবের বাই-প্রডাক্ট। আজকের দিনে মোসাহেবি বলতে আমরা যা বুঝি, ঠিক সে জিনিস পূর্ববর্তী সমাজে ছিল না। থাকলে আমাদের কাব্যে সাহিত্যে নাটকে এই জীবটির সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। সেক্সপীয়রের নাটকে বিদূষক আছে কিন্তু মোসাহেব কোথায়? বিদূষকরা মোসাহেব নয়; এরা প্রভুর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী। এ'দের মধ্যে কেউ বা রীতিমতো জ্ঞানী লোক। এ'রা প্রভুর চিত্তবিনোদন করেছেন, স্তাবকতা করেন নি। সেক্সপীয়রের একটি-মাত্র খ্যাতনামা চরিত্র ক্ষণেকের জন্যে মোসাহেবের ন্যায় ব্যবহার করেছে; অথচ সে ব্যক্তিটি মোসাহেব নয়। উষ্ণ মস্তিষ্ক হ্যামলেটের সঙ্গে কথোপকথনে বিভ্রান্ত পলোনিয়াসের মুখে মোসাহেবিয়ানার সুর লেগেছে:

Hamlet. Do you see yonder cloud that's almost in shape of a camel?

Polonius. By the mass, and 'tis like a camel, indeed.

Hamlet. Methinks it is like a weasel.

Polonius. It is backed like a weasel.

Hamlet. Or like a whale ?

Polonius. Very like a whale.

তথাপ বক্সব শেক্সপীয়ারের যুগে মোসাহেব জীবটি নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক মোসাহেব চরিত্র আছে বলে আমি মনে করি না। সমাজে যার অস্তিত্ব নেই সাহিত্যে তার অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়। সংস্কৃত নাটকে 'বিটঃ' বলে যে ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ আমরা পাই এবং যাকে মোসাহেব বলে কেউ কেউ ভুল করে থাকেন, ব্যক্তিটি গুণবান ব্যক্তি। গুণবান ব্যক্তি নিজগুণেই স্বপ্রতিষ্ঠ। তাকে মোসাহেবী করতে হয় না। অপদার্থ নির্গুণ ব্যক্তিরাই হাঁটু গেড়ে অপরের পায়ে ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বাৎস্যায়ন বিটঃ

চরিত্রের বর্ণনায় তাকে গুণবান আখ্যা তো দিয়েছেনই, উপরন্তু বলেছেন 'গোষ্ঠ্যাং চ বহুমতঃ' অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজে. তিনি বিশেষ সম্মানিত। বাৎস্যায়ন আরেকটি চরিত্রের উল্লেখ করেছেন,—তার নাম পীঠ-মর্দঃ। একেও ঠিক মোসাহেব শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। ইনিও গুণবান ব্যক্তি, শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত, কেননা তিনি 'কলাসু বিচক্ষণঃ'।

কালের বিবর্তনে কোনো কোনো শব্দের অধোগতি ঘটতে থাকে। কালের কালিমা লেগে কত কথার কৌলিন্য নষ্ট হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভাষা-বিজ্ঞানের সংগে সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃত যে 'বিটঃ' শব্দের কথা এইমাত্র উল্লেখ করেছি তা থেকেই পরবর্তী-কালে 'বিটকেল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। চলন্তিকা অভিধান মতে 'বিট' শব্দের আধুনিক অর্থ লম্পট। কি করে শব্দটির এমন দুর্গতি ঘটল তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়। বিট এবং পীঠমর্দ—এই দুই শ্রেণীর লোকই রসজ্ঞ এবং কলাবিদ ছিলেন। বাক্-নৈপুণ্যের জন্যে এঁদের খ্যাতি ছিল। বিশেষ করে রাজা এবং পারিষদবর্গ যখন বারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে প্রমোদ রজনী যাপন করতেন তখন এঁরাই রসালোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। বারাঙ্গনা সমাজে এদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল এ কথা বাৎস্যায়নও উল্লেখ করেছেন। এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এককালে যে ব্যক্তি রাজা-রাজড়াদের চিত্ত বিনোদনের সহচর ছিল কালক্রমে সেই ব্যক্তি প্রভুর সর্বপ্রকার কুকর্মের এবং লাম্পট্যের সহায়ক হয়েছিল। এই-ভাবেই শব্দার্থের বিকৃতি ঘটে। সদর্থবাচক শব্দ কদর্থবাচক হয়ে ওঠে। ইংরেজি sycophant শব্দটি স্তাবক বা মোসাহেব অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ কথাটি গ্রীক থেকে উৎপন্ন, মূল অর্থ ছিল গুপ্তচর। চোর ডাকাতের উপর নজর রাখা এদের কাজ ছিল। বেশ বোঝা যায় পরে এরা প্রভুর কাছে এর নামে ওর নামে লাগিয়েছে ভাঙিয়েছে এবং এইভাবেই কালক্রমে গুপ্তচর বৃত্তি মোসাহেবিতে পরিণত হয়েছে। এবার এই মোসাহেব কথাটিই দেখুন। এই শব্দটি এসেছে আরবী ভাষা থেকে। আরবী ভাষায় মুসাহেব কথার অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্তরঙ্গ বন্ধু কখনো মোসাহেবি করে না। মূল শব্দটি বরাবর সদর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি আরব দেশ থেকে পারশ্য হয়ে বহু রাজ্য অতিক্রম করে বাংলা দেশে এসে পৌঁছেছে। অবশেষে এখানে এসে ওর এই অধঃপতন ঘটল। হঠাৎ-নবাবের আমলে যেমন মোসাহেব দেখা দেয় তেমনি আবার একটা বনেদি আমল যখন মরণ দশায় পড়ে তখনও আবার মোসাহেব এসে জোটে। হুজুরকে যখন কেউ আর মানতে চায় না তখন ভাড়াটে জোহুজুরের প্রয়োজন তো হবেই। আমাদের বাদশাহী আমলের পতনদশায় বহু মোসাহেবের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতচন্দ্র এদের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন—

মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর।

উপরওয়ালার মন যুগিয়ে চলা সাধারণ মানুষের সহজাত ধর্ম। যে যুগ থেকে মানুষ সমাজ-বদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে বস-বাস করতে শিখেছে তখন থেকেই অপরের মন জুগিয়ে চলার প্রথা অল্পবিস্তর শুরু হয়েছে। তবে এ জিনিসটা তখন এতই সামান্য আকারে ছিল যে এই জাতীয় মানুষের জন্যে বিশেষ একটা আখ্যার প্রয়োজন হয়নি। সে যুগে মোটামুটি উদরান্নের সংস্থান সকলেরই ছিল, কাজেই পর-নির্ভরতার প্রয়োজন তেমন হয় নি। আজকে মোসাহেবি মনোবৃত্তি সমাজে যেমন সর্ব-ব্যাপী হয়েছে এমন আর কখনো দেখা যায় নি। আর্থিক দুর্গতি এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। এমনিতেই সমাজে নানা রকমের বিকৃতি দেখা দিয়েছে। গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে তার ফলে তলাকার যত আবর্জনা উপরে ভেসে উঠেছে। নির্গুণ মানুষে সমাজ ছেয়ে গিয়েছে। এখন এদেরই কর্তৃত্ব, গুণী মানুষ কোণঠাসা। অর্থনীতি শাস্ত্র বলে—bad money drives good money out of the market.

সমাজে এখন সেই গ্রেশাম নীতির ক্রিয়া চলছে। মেকি মানুষ খাঁটি মানুষকে ঝেঁটিয়ে দূর করেছে। এই নির্গুণ মনুষ্য-দের একমাত্র অস্ত্র মোসাহেবিয়ানা। একদা সমাজে শ্রেণী বিভাগ হয়েছিল গুণকর্ম বিভাগশঃ—সেই গুণকে পরবর্তীকালে আমরা জন্মগত জাতে পরিণত করেছি। যে ব্রাহ্মণকুমার আকাট মূর্খ হয়েও ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখেছে মোসাহেবি না করে তার উপায় কি? তার উদরান্নের সংস্থান কি করে হবে? আগে প্রত্যেক মানুষের কাছে সমাজ অনেকখানি দাবী করত। এখন সমাজের দাবী যৎসামান্য, কোনোমতে দৈনন্দিন কাজ চালানোর মতো কতগুলো মনুষ্য হলেই হল। সবচেয়ে যে ব্যাপক দাবী সেই দাবীটাই সমাজ ভুলে গিয়েছে। কাউকে বলছে না, তোমাকে সর্বাগ্রে মানুষ হতে হবে। শুধু বলছে, তোমাকে মাস্টার কিম্বা কেরানি, ডাক্তার কিম্বা আইনজীবী আর না হয়তো মন্ত্রী হতে হবে। জীবনকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে যে জীবিকার চেষ্টা তারই নাম মোসাহেবিয়ানা। দেশময় এরই নির্লজ্জ প্রকাশ দেখছি। আমা-দের কবি দুঃখ করে বলেছিলেন, বঙ্গমাতা তাঁর সাতকোটি সন্তানকে বাঙালী করেছেন, মানুষ করেন নি। আমি বলি বাঙালী হলেও তবু মনুষ্যকুলে স্থান পেত। এ যে একে-বারে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত হয়েছে। সাত কোটি সন্তান বাঙালীও হয়নি মানুষও হয়নি, হয়েছে মোসাহেব।




### তানসেন—অন্তিম সমাচার

মিয়াঁ তানসেনের দেহান্ত সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সমাচার অল্প অথচ স্পষ্ট। অবশ্য এ সম্বন্ধে একটি কাহিনীও আছে।

ইতিবৃত্তকারদের কথা থেকে অনুমান হয়, নিজের মৃত্যুকাল নিকটে এসেছে বুঝতে পেরে তানসেন দিল্লী থেকে গোয়ালিয়র অভিমুখে শেষ যাত্রা করেছিলেন। গোয়ালিয়রে এসে তানসেন তাঁর ছেলে-জামাইদের মুখে শেষ গান-বাজনা শুনে হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। গোয়ালিয়রে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

তানসেনের মৃত্যু ও সমাধি সমারোহ বা আন্দোলনের কারণ হয়নি। বাদশাহ আকবর যাঁর শিষ্য, তাঁর মৃত্যুতে শোকযাত্রায় আড়ম্বর হয়নি কথাটা আশ্চর্য। তবে হয়ত আকবরের মৃত্যুই পূর্বে ঘটেছিল। জাহাঙ্গীর সংগীত প্রিয় ছিলেন অথবা মিয়াঁ তানসেনকে বিশিষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এমন কথা ঐতিহাসিকেরা বলেন না।

কিন্তু গল্পকারকদের তৈরী করা কাহিনী এ থেকেও রংদার।

যথা তানসেন মধ্যপথে আগ্রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যে হেতু তানসেন পূর্বেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে, গোয়ালিয়রেই যেন তাঁর সমাধি রচনা করা হয়। অতএব তানসেনের মৃতদেহ আগ্রা থেকে গোয়ালিয়রে আনীত হল। সমাধি আসন্ন সময়ে বিলাস খাঁ কোথা থেকে ছুটে এসে আচ্ছাদিত শবের সম্মুখে হাজির হলেন। সমাগত কয়েকজন লোক প্রশ্ন তুললেন—দিল্লী থেকে যদি ডাক পড়ে, তাহলে তানসেনের কোন ছেলে প্রতিনিধিস্বরূপে দিল্লীতে যাবে এবং তানসেনের শূন্য গদীতে আসন গ্রহণ করবে? এবিষয়ে একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। তখন দু চার জন প্রৌঢ় মাতব্বর ব্যক্তি বললেন, তানসেনের ছেলেরা একে একে গান করবে তানসেনের মৃতদেহের সম্মুখে। যার গানের পর কিছু অলৌকিক সংকেত বা নির্দেশ দেখা দেবে, সেই ছেলেই তানসেনের যোগ্যতম প্রতিনিধি এবং সেই ছেলেই দিল্লীতে গিয়ে তানসেনের গদীতে সমাসীন হবে। তানসেনের ছেলেরা একে একে গান করে গেলেন। শেষে বিলাস খাঁ যখন গান করলেন, তখন সকলেই দেখল মৃত তানসেনের একখানি হাত শবাচ্ছাদন থেকে বার হয়ে অকস্মাৎ উর্ধ্বে উঠে গেল। তখন সকলেই বলে উঠল, বিলাস খাঁই তানসেনের যোগ্য পুত্র ও প্রতিনিধি, একথা আল্লাই জানিয়ে দিলেন মৃত তানসেনকে শ্রবণ শক্তি দিয়ে; বিচার শক্তি দিয়ে এবং কর্মশক্তি দিয়ে। এর পরে তানসেন আবার মৃত্যুর অধীন হলেন। পরে তানসেনের কবর দেওয়া হল। বিলাস খাঁ কিন্তু এর পরেই ফকিরী নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

এরকম গল্পের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য থাকেই। কিন্তু মিথ্যার ভেজাল পরীক্ষা না করে সেই সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব।

গল্পের মর্মস্থান হল মৃত তানসেনের পুনর্জীবন লাভ এবং হাত তুলে বিলাস খাঁর প্রতি আশীর্বাদ। এইখানেই গল্পটি অত্যন্ত কাঁচা। মৃতবৎ ব্যক্তিকে মৃত মনে করার মত ভুল জগতে আরও হয়েছে; এটা কিছু দোষ নয়। দোষ এই যে, সর্বশক্তিমান ভগবানের হস্তক্ষেপ টেনে এনে অঘটন ঘটান হল,

অথচ সেই অব্যর্থ হস্তক্ষেপ পরে ব্যর্থ বা নিষ্ফলও হল। যে উদ্দেশ্যে ভগবান তানসেনকে জীবন দিলেন ও বিলাস খাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করে ভবিষ্যতে দিল্লীর গদ্দীতে তাকে অধিকারী খাড়া করে দিয়ে গেলেন, সেই উদ্দেশ্যত সফল হল না। জাহাংগীর ত বিলাস খাঁকে ডেকে পাঠালেন না। তাহলে গল্পকার প্রকারান্তরে সর্বশক্তিমান ভগবানকে অক্ষমই প্রতিপন্ন করলেন।

জগতে সর্বত্রই বহু ভগবান বিশ্বাসী উপাসক সম্প্রদায় আছে। কিন্তু ভগবান কৃত 'মিরাকল' বা অঘটন-ঘটন কোথাও বা কখনও ব্যর্থ হয়েছে বা হতে পারে, এমন কথা কোনও ভক্তজনই স্বীকার করেন না। এই গল্পের ভগবান বিলাস খাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন; পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়! তানসেনের কোনও ছেলের জন্য দিল্লী থেকে নিমন্ত্রণ আসবে না, একথাও উক্ত গল্পের ভগবান জানতেন না। তাহলে গল্পকার বা গল্পকারেরা তাঁদের ভগবানের

অক্ষমতা ও অজ্ঞতা দুইই প্রকাশ করে ফেললেন।

তবুও এরকম কাঁচা গল্পে বিশ্বাস করার মতো লোকের অভাব হয়নি। বলাই বাহুল্য, মিথ্যা তানসেনের সম্বন্ধে এরকম আরও কয়েকটি কাঁচা গল্প চালু আছে, যার একমাত্র কারণ লোকে গল্প শুনে তৃপ্তি লাভ করে। কাঁচামিঠে আমও আছে, লোকেও খায়। হলোই বা কাঁচা। তবু ত' মিষ্ট! ভগবানের নাম থাকলেই মিষ্ট।

গল্পের অন্য দোষ হল—আগ্রায় তানসেনের মৃত্যু ঘটিয়ে পরে গোয়ালিয়রে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা। এটা একেবারেই অনর্থক শ্রম। বিশেষ এই যে, আগ্রা-গোয়ালিয়রের দূরত্ব জেনে এবং তদানীন্তন রাস্তা-ঘাট যান-বাহনের সম্ভব-অসম্ভব জেনে মৃত তানসেনের অবশ্যম্ভাবী দেহ পরিণামের কথাটাও গল্পকারের ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি গল্পকারের দোষ দিতে ইচ্ছা করিনে। মাত্র গল্পের দোষই দেখছি।

এখন গল্পের মধ্যে সম্ভব সত্যের দিকটা দেখা যাক। ইতিবৃত্তের সম্মান বজায় রেখে মনে করা যায়—মধ্যপথে আগ্রায় তানসেনের সংজ্ঞা লোপ হয়েছিল মাত্র; কিন্তু মৃত্যু হয়নি। গোয়ালিয়রে আনীত হওয়ার পরে তানসেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিলেন। সেই অবস্থার মধ্যে ছেলেরা গান করেছিলেন এবং সর্বশেষে বিলাস খাঁর গান করার পরে জীবিত তানসেন হাত তুলে শেষ আশীর্বাদ করে গেলেন। তানসেনের পুত্রবংশীয় ইতিবৃত্তকারদের সংক্ষিপ্ত বিবৃতির সঙ্গে এরকম সম্ভাবনার বিরোধ নেই।

প্রসঙ্গত, ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের মুখে তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় ইতিবৃত্তকারদের মধ্যে প্রচলিত অন্য একরকমের কথাও বলব। কারণ বদল খাঁ সাহেবের কথা একেবারে নস্যাৎ করা যায় না।

বদল খাঁ সাহেব পুত্রবংশীয় ইতিবৃত্ত স্বীকার করেও বলেছিলেন—তানসেনের মৃত্যুর পরে তানসেনের গদী নিয়ে যে কথা উঠেছিল, সেটা সত্য কথা। কিন্তু গদী অর্থে দিল্লীর দরবারে গদী নয়। এখানে ধর্মসম্প্রদায় মতে গদীই বুঝতে হবে।

পীর মহম্মদ গৌস বিশিষ্ট এক শ্রেণীর উপাসকের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। তানসেন পীর সাহেবের শিষ্যও হয়েছিলেন। তানসেনের জীবনে ধর্মনিষ্ঠ গূঢ় একটা দিক ছিল। পীর মহম্মদ গৌস যে বিশিষ্ট উপাসনা সম্প্রদায়ের অনুবর্তী ছিলেন, তানসেনও নিভৃতে সেই মতবাদ মেনে নিয়েছিলেন। এই মতে ধর্মজীবন ও সংগীতচর্চা বিরুদ্ধ মনে করা হত না। প্রকাশ্য মুসলমান ধর্মে সংগীত বর্জনীয় ছিল বলেই এমন সব শাখা সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে বিরোধ থেকে সমন্বয়ের কথাই বড়ো বলে মনে করা হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমান ধর্মের অধিকারে বহু উপাসক সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছিল। পূর্বে যে 'নওহার-বান' ধ্রুবপদের কথা বলা হয়েছে, সেই নওহার অর্থ তখনকার প্রচলিত নয়টি বিশিষ্ট মুসলমান উপাসক সম্প্রদায়। পীর নিজামুদ্দিন ঔলিয়া স্বনামধন্য সাম্প্রদায়িক পুরুষ ছিলেন এবং সংগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তানসেনের ধর্মজীবন মহম্মদ গৌসের নিকট দীক্ষা-শিক্ষার অনুগত হয়ে একান্তভাবে গড়ে উঠেছিল। তানসেনের ছেলেদের মধ্যে একমাত্র বিলাস খাঁ এই বিষয়ে পিতার অনুনীত ছিলেন এবং তানসেনের জামাই নৌবাত খাঁও বিলাস খাঁর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তানসেন বিলাস খাঁকেই সাম্প্রদায়িক গদীতে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। বিলাস খাঁর জীবনে ধর্মসাধনার ভাব এতই প্রবল ছিল যে, তিনি বিবাহ করেননি এবং তানসেনের মৃত্যুর পরে ফকিরী নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলেন।

তানসেনের প্রথম পক্ষের ছেলেরা তাঁদের পিতার ধর্মজীবন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না, কারণ তাঁরা বারো আনা রকমের হিন্দু সমাজের অনুগত আচারনিষ্ঠা পালন করতেন। তানসেনের ধর্মজীবনের গূঢ় সংস্কারের ধারা দৌহিত্র বংশের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। সাদরংজী এই ধারা পেয়েছিলেন। বদল খাঁ সাহেবের পিতৃপুরুষ ছংগে খাঁ সদারংজীর শিষ্য হয়েছিলেন বলে এই ধারার খবর রাখতেন এবং আন্তরিকভাবে কিছু প্রভাবও সংগ্রহ করেছিলেন।

ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছি বলেই এই কথা লিপিবদ্ধ করতে পারলাম।

বাস্তবিক জীবন প্রদীপের সলিতা একটি মাত্র সুতায় গাঁথা থাকে না। অনেক সুতো মিলিয়ে তার পাক। যতদিন প্রদীপ জ্বলে ততদিন পাকের খবরাখবর রাখা সম্ভব হয় না। কোন্ সুতোটি ভাল জ্বলছে, কোনটি কম জ্বলছে হিসাব করে বলা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। কিন্তু যখন ক্রমশ তেল ফুরিয়ে যায়, প্রদীপ নিস্তেজ হতে আরম্ভ করে, তখন হয়ত দেখা যায় দু' একটা সুতো নিঃশেষে জ্বলেনি বলেই দগ্ধাবশেষ রেখে গিয়েছে। সংগীত বিদগ্ধ গুণী তানসেনের জীবনে যতদিন সংগীতের সুতোটি জ্বলেছে, ঘর আলো করে রেখেছে, ততদিন তাঁর জীবনের অন্য সুতোর হিসাবের প্রয়োজন হয়নি। বার্ধক্যের আরম্ভে সংগীতের পাক নিঃশেষে জ্বলে যাওয়ার সময়ে তাঁর আত্মোপলব্ধ জীবনে অন্য এক রকমের পাক বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখন ত প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে।

মনে হয়, সেই একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বশেই তানসেন ইচ্ছা করেছিলেন গোয়ালিয়রেই তাঁর মৃত্যু হক, মুরশীদ পীর মহম্মদ গৌসের সমাধির নিকটেই তাঁর সমাধি হক। অশান্ত মানব হৃদয়ে চরম শান্তিলাভ আর হয় না; অন্তত, এক জীবনে ত নয়। সেই জন্যই মানুষ শেষ নিদ্রা এসেছে জেনেও স্বপ্ন-শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে। তানসেন ত মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিলেন না।

সমাপ্ত

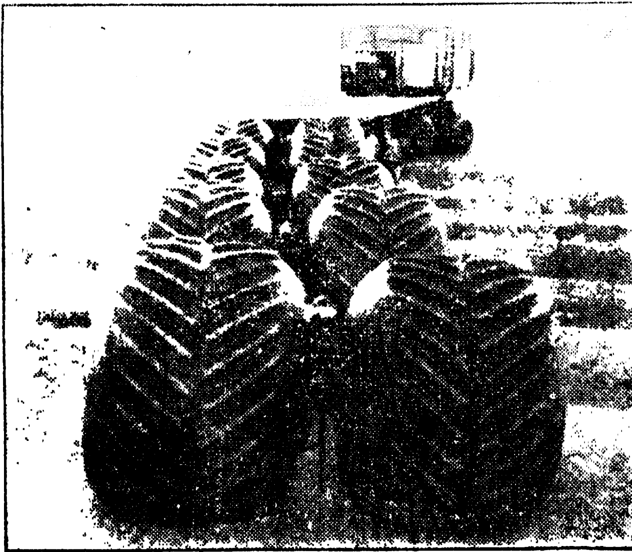



চক্রদত্ত

উক্রেনের এক কয়লার খনিতে কয়লা নলের সাহায্যে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কয়লাকে কিছুটা গুঁড়ো করে জলের সগে মিশিয়ে নিয়ে উচ্চ চাপে নলের সাহায্যে সোজাসুজি ফ্যাক্টরীতে পাঠান হচ্ছে। ১০০ ঘন মিটার কয়লা পাঠাবার জন্য ১৬০ ঘন মিটার জলের দরকার হবে। এই নতুন উপায়ে কয়লা পাঠানর ব্যবস্থায় খরচ এবং সময় কম লাগবে। তবে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে জল নেই সেখানে এ ব্যবস্থা কার্যকরী হবে না।

*

বালী, কাদা, বরফের ওপর দিয়ে তেল নিয়ে যাবার জন্য গুডইয়ার কোম্পানী এক নতুন ব্যবস্থা করেছেন। খুব বড় রবারের চাকার মত তৈলাধার তৈরী করে তার মধ্যে তেল ভরে নেওয়া হচ্ছে। এক একটি চাকায় প্রায় ৫০০ গ্যালন তেল ধরতে পারে। তারপর তেল ভরা চাকাগুলি একটার পর একটা লাগিয়ে শক্তিশালী মোটর ট্রাক্টরের সাহায্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চাকা-



তেল ভর্তি চাকাগুলো ট্রাক্টার দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

গুলিতে এক মিনিটে ১০০ গ্যালন তেল ভরার মত ব্যবস্থা করা আছে।

*

রাশিয়াতে 'ইনস্টিটিউট অব ফুয়েল মিনারেলে' শক্ত পেট্রল তৈরী করা হয়েছে। এই শক্ত পেট্রল দেখলে মনে হয়, যেন শাদা ইটের টুকরো। এই নতুন পেট্রল এখন সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় শক্ত জ্বালানী, যেমন কয়লা এবং কাঠের মত পাঠান যাবে। এছাড়া, একে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপেও শক্ত অবস্থায় রাখা যাবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, যদি নতুন পেট্রলকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা যায় তাহলে প্রয়োজনে একে জ্বালাতে কোনই অসুবিধা হবে না। শক্ত পেট্রলকে যখনই দরকার হবে—তরল করে সাধারণ পেট্রলের মত ব্যবহার করা যাবে। তরল করবার জন্য শক্ত পেট্রলের টুকরো একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে ঘোরাতে থাকলেই তার থেকে তরল পেট্রল বের হতে থাকবে।

*

ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা পাওয়া যায়। পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতির এই সম্পদের খবরাখবর রাখতেন। বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে তাঁরা ওষুধপত্র তৈরী করতেন। গ্রামের লোকেরা সেই সময় এই গাছগাছড়ার ওষুধের সাহায্যেই দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতেন। ক্রমশ গ্রাম ছেড়ে শহরে লোক বসবাস করার সংগে সংগে মানুষ এই বন-সম্পদের প্রতি কম লক্ষ্য দিতে লাগল। সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতবর্ষে চারটি বোটানিক্যাল রিসার্চ কেন্দ্র স্থাপন করছেন। এই চারটি কেন্দ্র পুণা, দেরাদুন, কোয়েম্বাটুর এবং শিলং-এ অবস্থিত। সমগ্র বন-সম্পদ ও ভেষজ পদার্থের খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং তাদের গুণাগুণ নির্ণয় করে তার থেকে কিরকম ওষুধ তৈরী করা যায় প্রভৃতি তথ্যের অনুসন্ধান করাই এই কেন্দ্রের কাজ হবে। রাজস্থান, কচ্ছ, বম্বে, সৌরাষ্ট্র, মহীশূর, কেরেলা এবং মধ্যপ্রদেশের ও মাদ্রাজের কিছু কিছু অংশ পুণার কেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র হবে। ৩৭০০০০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে পুণা কেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র হয়েছে। কেরেলার অংশে কুর্গ, কেনারা এবং পশ্চিম-ঘাট পর্বত পর্যন্ত নবসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। এরই মধ্যে পুণা-কেন্দ্রে ১০০০০০টি গাছের নমুনা সংগ্রহ করে সংরক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও এখানে অনেক জাতের গাছের বীজ ও ফল এবং গাছের ছাল প্রভৃতি মিউজিয়মে রাখা হয়েছে।

*

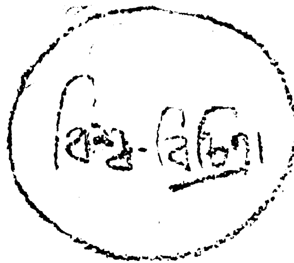
মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

দেশ পত্রিকা

গত ১৬।৮।৫৮ দেশ পত্রিকায় আমি রোদন্তি ফলের সাহায্যে যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের যে সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম সে সম্বন্ধে বহুজনের কাছ থেকে বহু পত্র পেয়েছি। তাঁহারা সকলেই ডাঃ কৃষ্ণমূর্তির ঠিকানা জানতে চান। খবরটি যেখান থেকে আমি সংগ্রহ করেছি সেখানে ডাঃ কৃষ্ণমূর্তির যে ঠিকানা দেওয়া আছে তাই আমি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাই। যাঁরা এই ঠিকানা সংগ্রহে ইচ্ছুক হবেন তাঁদের সুবিধা হবে। আমি ডাঃ কৃষ্ণমূর্তিকেও ব্যক্তিগত-ভাবে একটি চিঠি দিয়েছি। যদি তাঁর কাছ থেকে এ সম্বন্ধে আরও কোনও খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে ভবিষ্যতে তাও আমি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। নমস্কারান্তে—

চক্রদত্ত।

Dr. Krishna Murty. Clinical Research Centre for indigenous drugs. Dr. Ballabhai Nanavati Hospital Vile Parle, Bombay.




প্রায় অব্যর্থ মৃত্যুও মানুষের অদম্য চেষ্টার কাছে কিভাবে পরাভূত হয় তার একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে আমেরিকার লঙ আইল্যাণ্ডের এক গ্রাম ম্যানরভিলে। বেঞ্জামিন হুপার তার সব্জী ক্ষেতের জলের ব্যবস্থা করতে একটা টিউবওয়েল বসাবার জন্যে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। জলের নাগাল পেতেই বেঞ্জামিন তার সাত বছরের ছেলে বেনিকে গর্তের কাছ থেকে সরে থাকবার জন্যে সাবধান করে দিয়ে বাড়িতে যায় পাইপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি আনতে। কিন্তু বেনি বাপের সাবধানতা ভুলে গিয়ে তার এক সঙ্গীর সঙ্গে খেলতে খেলতে গর্তটা লাফিয়ে পার হতে গিয়ে পা ফসকে সেই বারো ইঞ্চি ব্যাস এবং একুশ ফিট গভীর গর্তের মধ্যে খাড়া অবস্থায় পড়ে যায়। সঙ্গীর চিৎকার শুনে বাবা বেঞ্জামিন আসতে না আসতেই ত্বরিতেই বেনি নিচে সেঁদিয়ে যায় সটান উর্ধবাহু হয়ে।

বেঞ্জামিন ছেলের কাছে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেয়, কিন্তু বেনি তা ধরতে অক্ষম হলো। ফায়ারব্রিগেড, পুলিস এবং স্বেচ্ছা-সেবকরা সাহায্যের জন্য চটপট হাজির হলো। গর্তের মধ্যে একটা অক্সিজেন নল নামিয়ে দেওয়া হলো। ফায়ারব্রিগেডের লোকে একটা আঙটা ঝুলিয়ে বেনির জ্যাকেটটা আঁকড়ে ওপরে টেনে তোলার চেষ্টা করলে; কিন্তু জ্যাকেটটা উল্টে মাথার ওপর তাঁবুর মতো খেলিয়ে যাওয়ার বেশী কিছু হলো না। গর্তের গা দিয়ে বালি ঝুরে ঝুরে পড়তে দেখে স্থানীয় কণ্ট্রাক্টর মাইকেল স্টাইরিজ ও যোশেফ গভারনেল উদ্ধার কাজে এগিয়ে এলেন। একটা ইলেকট্রিকের গাঁইথি এনে ওরা ঐ গর্তটার সমান্তরাল আর একটা গর্ত খুঁড়তে আরম্ভ করলেন।

প্রথম প্রথম বেনি তার বাবার ডাকে সাড়া দিচ্ছিল কিন্তু ক্রমেই ওর স্বর দুর্বল হতে আরম্ভ করে এবং তারপর আর তার কোন সাড়া নেই। ক্রমাগতই বালি ঝুরে ঝুরে পড়তে সার্চলাইটের আলোয় মাত্র একটা হাত দেখা যাচ্ছিল। ছেলেটির প্রাণ থাকার শেষ লক্ষণ দেখা গেল, দুর্ঘটনাটির প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর রাত এগারোটায় ওর হাতটা দুমড়ে পড়তে। আশা নিষ্প্রভ হয়ে আসছে তবুও উদ্ধার কাজ এগিয়ে চলছে। মাঝ রাতের পর ইলেকট্রিক গাঁইথি বন্ধ করতে হলো কারণ ওর ঝাঁকুনিতে বালি সরে যাচ্ছে। অগণিত স্বেচ্ছাসেবক তখন হাত গাঁইথি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে চললো। ইলেকট্রিক করাত এলো তক্তা কাটবার জন্যে, সেই তক্তা হেলে যাওয়া দেয়ালকে ঠেস দিয়ে রাখলো। ভোর তিনটে নাগাত সমান্তরাল গর্তটা একুশ ফিট খোঁড়া সম্পন্ন হলো।

তারপর আরম্ভ হলো সেই গর্ত থেকে চার ফিট দূরে ঘটনার গর্তে একটা টানেল কাটা। কিন্তু মাটি ধ্বসে ধ্বসে পড়ায় টানেলটা বুজে যেতে লাগলো এবং যতো সময় যায় ততোই আশা কমে যেতে থাকে।

তবুও খোঁড়া চললো অবিরামভাবে পর-দিন সারাদিন ধরে। কণ্ট্রাক্টাররা গর্তে বড়ো ফাঁদল পাইপ ভাগ ভাগ করে নামিয়ে টানেলের মধ্যে দিয়ে জ্যাকে চাড় দিয়ে বেনির গর্তের দিকে ঠেলে দেওয়াতে লাগলো। ইতি-মধ্যে ব্রুকলিন ন্যাশনাল লেবরেটরি থেকে বৃহদাকার ভ্যাকুম ক্লিনার এসে পড়লো। একটা বৃহৎ পাইপ ছেলেটিকে ঘিরে মাটি পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হলো এবং ভ্যাকুম ক্লিনারের সাহায্যে সমস্ত বালি শুষে বের করে নেওয়া হলো।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়, অর্থাৎ ঘটনার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর অ্যাস উডসন নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বেনির হাতটা ধরতে সক্ষম হল। অ্যাস ভেবেছিল বেনি জীবন্ত নেই, কিন্তু ওর কানে গোঙানির শব্দ এলো। অ্যাস বলে তার মনে হয়েছিল বালি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বেনিকে ও বুকে জড়িয়ে ধরে এবং অন্যান্য কর্মীরা উডসনের পা ধরে ওপরে টেনে তোলে। পৌনে আটটায় ছেলেটিকে টেনে তোলা হলো। "বেঁচে আছে!" অবিশ্বাস্য কথাটা ওর বাবা চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিলে। উপস্থিত ছ'শ জন লোক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো। বেনিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো এবং কদিনের মধ্যেই ও ভাল হয়ে উঠলো।

সেই গর্তের ধারে দিন রাত উপস্থিত ডাঃ যোশেফ এইচ ক্রিস বলেন, তার বিশ্বাস অক্সিজেনের নলটি যার শেষাগ্রভাগটি ছেলেটির মুখের এক ইঞ্চির মধ্যে গিয়ে পড়েছিল, এবং তাঁবুর মতো হয়ে পড়া ওর জ্যাকেট যা ওর মুখে বালি পড়া রুখে বেনিকে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ দিয়েছিল, এইতেই বেনি জীবন্ত থাকতে পেরেছিল।

*

আফ্রিকার বাণ্টুদের মধ্যে আধুনিক রীতির ডাক্তারি করা বড়ো দুরূহ কাজ। ওদের বিশ্বাস ধরানোই মুশকিল। ডাঃ এফ ডবলু এনকামো বলেন অদ্ভুত এবং দুরপনেয় কুসংস্কার ওদের আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। যেমন, একজন টি বি রোগীর বিশ্বাস যে একটা পাখী তার বুকের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। ডানা ঝটপট করলেই অস্বস্তির জন্য বুকের ভেতর যন্ত্রণা ও কাশি হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে পাখী বেরিয়ে গেলেই ওর অসুখ সেরে যাবে।



বহু শতাব্দী যাবৎ লুপ্ত থাকার পর প্রাচীন পুঁথি ও কিম্বদন্তী অনুসরণ করে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের রাজধানী পেলায় ভগ্ন প্রাসাদের দেওয়ালে খৃষ্টপূর্ব চারশত শতাব্দীতে মোজায়েকে নির্মিত ডায়োনাইসোসের মূর্তি। ছোট ছোট প্রাকৃতিক রঙে রঙীন পাথরকুচি বসিয়ে তৈরী। রেখাগুলো স্পষ্ট করার জন্যে সিসে পিটিয়ে বসানো হয়েছে

প্রধান ধারা প্রণালী আধুনিক আরোগ্য পদ্ধতির প্রয়োগ কঠিন করে তোলে।

পেলাগ্রা রোগাক্রান্তরা তাদের রোগের জন্য ভূতাজনকে দায়ী করে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের বিকার ঘটে ভেতরে ভেতরে একটা শাস্তির ফলস্বরূপ। সেই অন্ধযুগের এই বিশ্বাসের ফলে যে-খাদ্য গ্রহণ করলে ওদের রোগমুক্তি হয় তা ওরা করবে না। বস্তুতঃ খাওয়ার রীতিটা বান্টুরা যদি বদলায় তাহলে ওরা অনেক রকম রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু উপজাতিদের প্রথানুসারে কেবলমাত্র নারী ও শিশুদের সব্জী খাবার অধিকার। এইভাবে অত্যাবশ্যক ভিটামিন না পেয়ে পেয়ে পুরুষরা মারাত্মক ব্যাধির শিকার হয়ে থাকে। আবার খাদ্যের এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্যেই সম্ভবত বান্টু মেয়েরা কিন্তু খুব শক্ত এবং খাটিয়ে হয়।

*

রোমহর্ষক কিছু ছাড়া যেন যুক্তরাষ্ট্রের লোকের মাথায় খেলে না। আমেরিকার মিডল ওয়েস্টের এক শহরের রাস্তায় বিজ্ঞপ্তি-বোর্ডঃ "ঠিক ৪,০৭৪ জন লোক গত বছর এই রাজ্যে গ্যাসে মারা গিয়েছে। সাতাশ জন শ্বাস নিয়েছিল; ৪৭ জন জলন্ত দিয়াশলাই কাঠি ফেলে দিয়েছিল, আর ৪০০০ জন এতে ঝাঁপিয়ে (অর্থাৎ দ্রুত গাড়ি চালনা) পড়েছিল।

মোটরচালকদের অনেকেই বলবে বেশ ফলপ্রদ সতর্ক-বিজ্ঞপ্তি। আর এক বিজ্ঞপ্তি একটা টিলার ওপরে ঃ "আস্তে চালান, আর আমাদের শহর দেখুন। জোরে চলুন, আর আমাদের জেল দেখুন।"

ভয় দেখিয়ে সাবধানে চালানোয় প্রবৃত্ত করাই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাফিক কর্তাদের নীতি। এরিজোনার কোথাও মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ঘটনাস্থলে রাস্তার ওপরে একটা বড়ো কালো বৃত্ত এঁকে তার মাঝে একটা ক্রুশ এঁকে দেওয়া হয়। এই চিহ্ন সর্বক্ষণ তাজা রাখা হয় এবং কোন মোটরচালকেরই তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না।

প্রত্যেক রাজ্যেই দ্রুত-চালকদের সতর্ক করে দেবার নিজস্ব উপায় আছে। কলোরডোর এক ঢালু রাস্তায় একটা লাল রঙের তীর এঁকে সোজা লক্ষ্য টানা হয়েছে একটা খাদের দিকে যেখানে পঞ্চাশ বা ততোধিক গাড়ির চূর্ণ অংশ পড়ে রয়েছে, এতো নীচে যে খেলনার গাড়ির মতো দেখায়। সেই তীরটির নিচে লেখাঃ "গতি বাড়াও, আর সোজা ওদের পথ ধর।"

নিউ মেক্সিকোতে একটা বিজ্ঞপ্তিঃ "স্কুল অঞ্চল—কোন শিশুকে মেরে ফেলো না।" ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা বিরাট বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ঃ "দ্রুতগামীরাই প্রায় মৃত্যুপথগামী।"

*

হংসপুচ্ছ ছাঁটে চুলকাটা আর গা-সাপটানো টাইট প্যান্টের ভক্ত অল্পবয়সী গুন্ডাদের দমন করার জন্যে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার পুলিস সন্দেহজনক ছোকরাদের জুতো পরা অবস্থায় ট্রাউজার খুলতে বলে এবং যে না পারে তাকেই হাজতে পুরে দেয়।

*

তুরস্কের বন্দিরমাতে মৃত বলে কবরিত একশ আট বছরের হাজি মুস্তাফা অন্ত্যেষ্টির শেষ ক্ষণে কবর থেকে উঠে আতঙ্কে অজ্ঞান সাতজন আত্মীয়কে "আগে থাকতেই কবরে দিচ্ছে" বলে গাল দিতে দিতে কবরস্তান ছেড়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যায়।



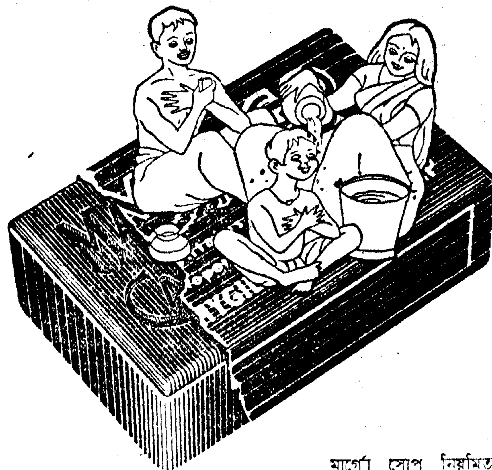

**শ্রীকৌটিল্য**

হুগলী জেলায় জিরাট স্টেশন থেকে নেমেই জিরাট গ্রামের শুরু। শুরু থেকেই আপনি রাস্তার দু'পাশে চায়ের দোকান, চুল-কাটার দোকান, মুদীখানা, পান-বিড়ির দোকান, সোনা-রুপোর দোকান, কামার-শালা, ছুতোর মিস্ত্রীর দোকানগুলো লক্ষ্য করুন। দোকানগুলোর অধিকাংশই উদ্বাস্তু-দের; সুতরাং দশ বছরের বেশি পুরোনো নয়। উদ্বাস্তু ছাড়া, গ্রামের আদি বাসিন্দাদের ভিতর থেকেও হয়তো চাষ-আবাদের কাজে পেট চলে না বলে কেউ কেউ তাঁদের পেশা পাল্টে ছোটখাটো দোকান পেতেছেন।

পনেরো বছর আগে যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একটু আশ্চর্য হবেন এই ভেবে যে, যে গ্রামে চাষ-আবাদের কাজ ছাড়া অন্য পেশা প্রায় অজ্ঞাত ছিল, সেখানে এত বড়ো পরিবর্তনের তাৎপর্য কী? উদ্বাস্তুরা বাইরে থেকে এসেছেন, অতএব তাঁদের অ-কৃষিমূলক (নন্-এগ্রিকালচারাল) পেশা পছন্দ সম্বন্ধে প্রথমে আশ্চর্য হবার বিশেষ কারণ নেই। কিন্তু যাঁদের পরিবার এতকাল কৃষি-নির্ভর ছিল, তাঁদের মধ্যেও ক্রমাগত পেশা পরিবর্তন হচ্ছে কেন? এটাই গোড়ার প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের আলোচনার প্রসঙ্গেই গ্রামের তাঁতী, মুদী, ধোপা, নাপিতের অর্থ-নীতিক পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করা সম্ভব হবে।

আমরা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছি যে, কৃষির উপর নির্ভর করে ন্যূনতম জীবনের মানও বজায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না বলেই এই পেশাগত রূপান্তর হচ্ছে। অর্থাৎ, কৃষি-পরিবারগুলো থেকে কিছু পরিমাণ লোককে সরিয়ে নিলেও উৎপাদন কমবে না এবং স্বভাবতই বাকি লোকদের মাথা-পিছু আয় (বা উৎপাদন) বেড়ে যাবে। অর্থনীতির ভাষায়, এই উদ্বৃত্ত লোকদের প্রান্তিক উৎপাদন (মার্জিনাল প্রোডিউস) শূন্য অথবা প্রায় নগণ্য। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ এই উপলব্ধি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, হয় কৃষি-অর্থনীতিতে পরগাছা হয়ে থাকতে হবে, নয়তো সেখান থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমকে সরিয়ে নিয়ে অ-কৃষিজ পেশায় নিযুক্ত করতে হবে। জিরাট গ্রামে গিয়ে আপনি অ-কৃষিজ পেশার যে সাম্প্রতিক বিপুলতা লক্ষ্য করবেন, তার মূল কারণ এইখান থেকে বোঝা যাবে। কিন্তু এই পেশা-পরিবর্তনের উৎস জানবার পরেই হয়তো আপনার ভ্রম হবে যে, অ-কৃষিজ পেশায় নিযুক্ত লোকদের আর্থিক [illegible] যথেষ্ট উঁচু। এ সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্য তাঁদের দোকানে ঢুকে কথা বলে দেখুন; দেখবেন, একটা অভিনব সমস্যার আঁচ আপনি পাবেন। দোকানদার বলবেন, তিনি সারাদিন বারো-তেরো ঘণ্টা দোকান খুলে যথারীতি বসে থাকেন; কিন্তু জিনিস বিক্রী হয় সামান্য। ফেরিওয়ালা জানাবে যে, সে





সারাদিন সওদা নিয়ে ডেকে বেড়ালেও তার রোজগারে তার পেট চলে না। তাই ফেরি করা তার প্রধান উপজীবিকা হলেও তাকে মাঝে মাঝে কৃষকের অধীনে দিন-মজুর হয়ে কাঁচা পয়সা ঘরে আনতে হয়। জিরাট বাজারে গিয়ে দেখবেন, স্বর্ণকার তাঁর একই ঘরের আর এক পাশে খুচরো কাপড় বিক্রীর ব্যবস্থা রেখেছেন। গোড়ায় নিশ্চয়ই আশা ছিল ঘরের এদিককার ব্যবসায় ভাটা চললেও ওদিকে দু'পয়সা আসবে। তাঁকে এখন জিজ্ঞেস করুন; তিনি নিশ্চয়ই বলবেন দু-দিকেই স্থায়ী ভাটা ছাড়া অন্য কিছু নেই।

তাহলে সর্বত্রই আপনি লক্ষ্য করবেন যে, যদিও প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী এ'রা কেউই বেকার নন, কার্যত এ'রাও এক রকমের বেকার। এই নতুন ধরনের বেকারদের আমরা অব-নিযুক্ত (আণ্ডার-এমপ্লয়েড) বলতে পারি এবং আপনি যদি জিরাট গ্রামের নিয়োগ পরিস্থিতির (এমপ্লয়মেণ্ট সিচুয়েসান) একটা ধারণা করতে চান, তবে এই অব-নিযুক্তদের হিসেব রাখা আপনার পক্ষে একান্ত দরকার। কারণ, যদি প্রথানুগ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বেকারদের বাদ দিয়ে গ্রামের বাকি শ্রম-শক্তিকে নিযুক্ত বলে অভিহিত করেন, তবে গ্রামের আর্থিক দুর্গতির আসল ছবিটি বিকৃত রূপে পাবে। এমন কি, আপনি হয়তো বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবেন যে, বেকারের সমস্যাই গ্রামে প্রায় নেই।

এতক্ষণ জিরাট গ্রামের কথা বলছিলাম, কারণ ছোট জায়গার পরিধির মধ্যে সমস্যার স্বরূপ অনেক সময় সহজতরভাবে উপলব্ধ হয়। বলার কথা হল যে, জিরাট গ্রাম পৃথিবীর সম্পূর্ণ অনগ্রসর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। অব-নিয়োগের সমস্যা ও অনগ্রসরতার সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে অন্যের কারণ ও ফল দুই-ই। অনগ্রসর অঞ্চলের এই ব্যাপক সমস্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে অর্থনীতিবিদরা আবিষ্কার করলেন যে, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশে বেকার সমস্যা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ওঠা-পড়ার (বুমস্ অ্যাণ্ড স্লাম্পস্) সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু অনগ্রসর অঞ্চলের আধা-বেকার সমস্যা উৎস পাচ্ছে পুঁজির নির্বিশেষ (অ্যাবসোলিউট) অভাবের মধ্যে। অর্থাৎ, অর্থনীতির ভাষায় প্রকৃত বেকার দূরে করতে হলে কার্যকরী চাহিদাকে (এফেক্‌টিভ ডিমাণ্ড) বাড়াতে হবে; আর অব-নিয়োগ দূর করতে হলে প্রধানত প্রয়োজন হবে পুঁজি-গঠনের (ক্যাপিটাল ফরমেসন) মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর সাধন। পুঁজি-গঠন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলেও এর উপর অবশ্য সম্পূর্ণ দায় চাপানো চলে না। বরং আরো সাধারণভাবে বলব যে, অনগ্রসর অঞ্চলে বিপুল শ্রম-শক্তির সঙ্গে সহযোগী উপাদান সামগ্রীর (কোঅপারেণ্ট ফ্যাক্টরস্) সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি হয় নি। কিন্তু যদিও যে কোন ধরনের সহযোগী উৎপাদকের স্বল্পতাই শ্রম-শক্তির অনিচ্ছুক অলসতার (ইনভোলাণ্টারী আয়ড্‌লনেস্) জন্য দায়ি হতে পারে, অব-নিয়োগের সমস্যা সচরাচর কৃষি-অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত শ্রমের রূপ নিয়েই দেখা দেয় এবং স্বভাবতই সমস্যার চেহারা দেখে তার কারণের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

জিরাট গ্রামের প্রসঙ্গ মনে রাখলে এ প্রশ্ন এবার নিশ্চয়ই উঠবেঃ কৃষি-অর্থনীতির উদ্বৃত্ত শ্রমের কারণ ও স্বরূপ তো বোঝা গেল, কিন্তু অকৃষিজ পেশাগুলোতে অব-নিয়োগের রহস্য কী? এর উত্তরে প্রথমে বুঝতে হবে যে, গ্রামের অকৃষিজ পেশাগুলোর আয় নির্ভর করছে একদিকে গ্রামের ভিতরের কৃষির আয় বা চাহিদার উপর এবং অন্যদিকে গ্রামের বাইরের শিল্পভিত্তিক অঞ্চলের আয় বা চাহিদার উপর। আপনি অবশ্যই জানেন যে, কৃষির মাথা-পিছু আয় (উৎপাদন) গত সত্তর বছর যাবৎ আমাদের দেশে ক্রমাগত নিম্নগামী হয়েছে (দ্রষ্টব্যঃ সাইমন কুজনেটস সম্পাদিত ইকনমিক গ্রোথ, ব্রেজিল, ইণ্ডিয়া, জাপান গ্রন্থে ড্যানিয়েল থর্নারের প্রবন্ধ)। অন্যদিকে শিল্পের প্রসার এখনো এদেশে এত সামান্যই হয়েছে যে, তার চাহিদা ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতি থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমকে টেনে নিতে পারে নি বা পারছে না; অথবা গ্রামে আপনি যেসব নতুন দোকান দেখেছেন, সেগুলোকেও যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট করতে পারছে না। এই প্রেক্ষিত থেকেই পূর্ববর্তী এক আলোচনায় বলেছিলাম যে, এদেশে কৃষি ও শিল্পের বাইরে অন্য সব পেশা প্রচুর পরিমাণে জন্ম নিচ্ছে বটে, কিন্তু এই জন্ম সমৃদ্ধিপ্রসূত নয়, অসীম দারিদ্র্য-সূচীত।

# প্রবাসের জার্নালে

**শিবনারায়ণ রায়**

চার

অতঃপর দ্বীপবুদ্ধি। দ্বীপে যারা বাস করে তাদের মেজাজও কিছুটা দ্বৈপায়নী হবে এটা প্রত্যাশিত। জলের ঘের বিলেত দেশকে অন্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং হয়ত সে কারণে ফরাসী বা জার্মানদের মত ইংরেজ চট করে বিদেশীদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে না।

এ যুক্তি কিন্তু ওয়েলশ বা আইরিশদের বেলায় সতি্য ঠেকে না—আমাদের হাউস-কীপার মিসেস মুনানকে দেখে বাংলা দেশের গিন্নীদের কথা মনে না পড়ে উপায় নেই। মিসেস মুনান আইরিশ, আমি পৈত্রিকসূত্রে বাঙ্গাল। সেবা সান্নিধ্য, যত্নভর্ৎসনা, চড়া গলায় অতি কথন এবং চাপা গলায় কেচ্ছা বিলোন—অপরিচয়ের বেড়া ডিঙ্গিয়ে অন্তরঙ্গতা অর্জনের টেকনিকে এই প্রৌঢ়া মহিলার পারদর্শিতা দেখে বারেবারে অবাক বনেছি।

কিন্তু ইংরেজের দ্বীপবুদ্ধি আর আমাদের কূপমণ্ডূকতা এক জিনিস নয়। প্রমাণ ইংরাজের ইতিহাস, প্রমাণ স্বয়ং লণ্ডন শহর। এদেশের ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, মিশনারী, পণ্ডিত ভাগ্যান্বেষীর দল যেমন পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ছড়িয়ে গেছে, তেমনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশের কিছু না কিছু মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে লণ্ডন শহরে। তাদের অনেকেই নানা কারণে আপন আপন দেশ থেকে বিতাড়িত; অনেকে বিপ্লববাদী, অনেকে নীল আকাশ আর রোদের সুখে অভ্যস্ত। অথচ নোতুন আশ্রয় বাস্তুতে গিয়ে তাদের প্রথমেই মনে হয়েছে, এই কুয়াশা-থমথমে, রক্ষণশীল, হিসেবী মানুষদের দেশের কথা। কারণ ইংরেজ যেমন নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নশীল, তেমনি অপরের স্বাতন্ত্র্যের প্রতিও সে শ্রদ্ধাবান। কারো পা মাড়িয়ে আলাপ জুড়তে সে পারে না; কিন্তু জাতীয় স্বার্থরক্ষার নামে কোনো আগন্তুকের ওপরে বিশেষ বিধিনিষেধের বোঝা চাপাতেও সে মোটামুটি অপারগ।

দ্বীপবুদ্ধি যে ইংরেজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার প্রতিবন্ধক হয়নি, লণ্ডনে একটু ঘোরাফেরা করলেই তা চোখে পড়ে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্র, ফ্লিট স্ট্রীটের জার্নালিস্ট, টিউব স্টেশনের লিফ্‌টম্যান, টিকিটচেকার, অফিসের কেরানী এবং কারখানার মজুর, বাসের কণ্ডাক্টর, ডাক পিওন, মায় পিকাডেলির বেশ্যা—সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশ কিছু বিদেশী বিদেশিনীর দেখা মিলবে। বইএর দোকানে, গ্রন্থাগারে বিদেশী বইএর তর্জমা একটা বড় অংশ জুড়েছে। কয়েকটা সিনেমা আছে সেখানে শুধু বিদেশী ফিল্ম দেখানো হয়। চিত্রশালা এবং প্রদর্শনীতে বিদেশীদের আঁকা ছবিই বেশী, অপেরা-কনসার্টের প্রোগ্রামে ত বিদেশীদেরই প্রায় একচেটিয়া দখল। বিলেত দেশে প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী বা সুরকার বড় একটা জন্মায়নি; কিন্তু সে অভাব এরা যতটা সম্ভব পূরন করতে চেয়েছে নানা দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর ছবি সংগ্রহ করে এবং তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, নানা দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করে এবং ব্যাপকভাবে কনসার্টের বন্দোবস্ত করে।

আপাতবিরোধ সত্ত্বেও দ্বৈপায়নী ঐতিহ্যবোধ এবং উন্মুক্ত আন্তর্জাতিকতা লণ্ডন শহরে কিভাবে মিলেমিশে আছে, তার সবচাইতে সার্থক উদাহরণ অবশ্য সোহো। হেন সভ্য জাতের কথা ভাবা শক্ত, রিজেন স্ট্রীট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট আর চেরিং ক্রসের মাঝখানে এই পাড়াটিতে যার কোন না কোন প্রতিনিধি এসে আস্তানা গাড়েনি। সোহো-স্কোয়ারের বেঞ্চে দু এক সন্ধ্যায় মাথায় রঙিন পালকের ঘের দেওয়া জন তিন রেড ইণ্ডিয়ানকে ইস্তক আড্ডা মারতে দেখছি। এ পাড়াতে নানা রকমারি দোকান অফিস থাকলেও (যেমন পুস্তক প্রকাশক এবং

ফিল্ম কোম্পানীর) এখানকার আসল আকর্ষণ নাইট ক্লাব এবং রেস্তোরাঁ। নানা দেশের বিচিত্র গঠনের সুন্দরীরা এখানে এসে চরিত্রবান ইংরেজ গেরস্থদের সুরত শাস্ত্রে বিদগ্ধ করে তোলার ভার নিয়েছেন, আর তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতায় এবং প্রতি-যোগিতায় দেশবিদেশের রন্ধনশিল্পীরা এখানে দোকান খুলে স্বাদবোধহীন ইংরেজকে রসনার অনুশীলনে অনু-প্রাণিত করেছেন। ইতালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ, অস্ট্রিয়ান এবং চীনে ত আছেই রুশ, মেক্সিকান, জাপানী ,মিশরীরও অভাব নেই। মায় নোয়াখালি চাটগাঁরও খোঁজ মিলতে পারে। অথচ এদের প্রধান খদ্দের ইংরেজ; এখানকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশও তাই; আর এখানকার পথেঘাটে বাড়িঘরে বিলেতী ইতিহাসের স্বাক্ষর ছড়ানো। কোনো গলির আড়ালে জর্জিয়ান যুগের অট্টালিকার কিছু অংশ আজও টিকে আছে। কোন বাড়িতে বা উইলিয়াম মরিসের প্রভাবের পরিচয়। শ্যাফ্‌টসবেরী অ্যাভিন্যুর ধারে গেরার্ড স্ট্রীটে বাস করতেন ড্রাইডেন—আর ঐ সড়কেই বিখ্যাত "টার্কস হেড"এ ডক্টর জনসনের আড্ডা বসত। সোহো স্কোয়ারের পাশে গ্রীক স্ট্রীট এখন গণিকাদের দখলে, কিন্তু ভাবলে এ রাস্তার সঙ্গে ডিকুইন্সির নাম সাহিত্যানুরাগীর মনে কি আজও জড়ানো নেই? আবার এই সোহো স্কোয়ারেরই অন্য ধারে ডীন স্ট্রীটে বসে কার্লমার্ক্স

সমাজ বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিলেন।

দ্বীপবুদ্ধির সংগে কূপমণ্ডূকতার অবশ্য যোগ না থাকলেও তার সংগে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক আছে। ইংরেজের স্বাজাত্যবোধ প্রবল; এবং যদিচ মেকিয়াভেলী-ই সম্ভবত আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা, তবু একথা সব পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, আধুনিক ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের সাধারণ স্বীকৃতি প্রথম ইংল্যাণ্ডেই ঘটেছিল। ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক হানস কোহন-এর ভাষায় জাতীয়তাবাদ সেই ধরনের মনোভাব যাতে ব্যক্তি অনুভব করে যে, তার চরম আনুগত্য হোল জাতীয় রাষ্ট্রের কাছে। ১ এই মনোভাব প্রবল হলে যে কী সর্বনাশ ঘটে আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে তার নজির অপ্রতুল নয়। রুডলফ রকার তাঁর "জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কৃতি" মহাগ্রন্থে এই মনোভাবের বীভৎস রূপটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ২ ইংরেজ এই মনোভাব থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত নয়, কিন্তু এ মনোভাবের যেটি সম্ভবত সবচাইতে ক্ষতিকর দিক—জাতির কাল্পনিক সমষ্টিগত সত্তার বেদীতে ব্যক্তির বলিদান—ইংরেজের ওপরে সেটির প্রভাব আধুনিক যে কোন জাতির তুলনায় সবচাইতে কম প্রবল। এর একটা কারণ হল বিলেতে জাতীয়তাবাদ গোড়া থেকেই ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। মিলটন-লক থেকে শুরু করে এতাবৎ বিলেতী সমাজচিন্তায় জাতীয় রাষ্ট্রকে ব্যক্তির বিকাশের অন্যতম যন্ত্র হিসেবেই কল্পনা করা হয়েছে। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা জার্মান ভাববাদীদের মত জাতির কাল্পনিক ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হওয়ার মধ্যে ব্যক্তির সার্থকতা খোঁজেনি; ইংরেজী ভাষায় ফিশটে কিম্বা হেগেলের মত কোন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রবাদী দার্শনিক দুর্লভ। বিলেতে জাতীয়তাবাদ লিবেরালিজমের দ্বারা অনেকটা পরিশোধিত। ঐ কারণটির কথা কোহন প্রমুখ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার ধারণা এর একটি দ্বিতীয় কারণ আছে সেটি গৌণ নয় এবং যেটির ওপরে অনেকে তেমন জোর দেন না। ইংরেজের অভিজ্ঞতাবাদী, বস্তুনিষ্ঠ, আরোহী বুদ্ধি বিমূর্ত সামান্য কল্পনা এবং বিশেষ শরীরী অস্তিত্বের মত ফারাক করতে অভ্যস্ত; বিশেষ থেকে সামান্যে আরোহণ করে বলেই সে বুদ্ধি সামান্যে বিশেষের গুণ আরোপে গররাজী। পশ্চিমী দর্শনে যাকে হাইপোস্ট্যাসিস বলে বিলেতী দর্শনচিন্তার ঐতিহ্য মোটামুটি তার প্রভাবমুক্ত। রুশোর "সাধারণ অভীপ্সা"তত্ত্ব (voloute general) ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী এবং স্পেনে ব্যাপক প্রভাব ফেললেও বিলেতের রাজনৈতিক চিন্তায় তাই প্রায় কোন ছাপ রাখতে পারেনি। রুশোকে গণতন্ত্রের দার্শনিক বলা হয় এবং কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু রুশোর "সাধারণ অভীপ্সা"তত্ত্বের মূল কথা হলো ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে লোপ করে কাল্পনিক সমষ্টি সত্তায় ব্যক্তিত্ব এবং ব্রহ্মত্ব আরোপ * এবং জাতীয়তাবাদের যা চরম অভিব্যক্তি সেই ফ্যাসিজম-এর এটাই প্রধান প্রত্যয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞতাবাদের ঐতিহ্য ইংরেজের মনে অথবা সমাজ সংগঠনে কোন ধরনের সমষ্টিবাদকে শেকড় গাড়তে দেয়নি।

---

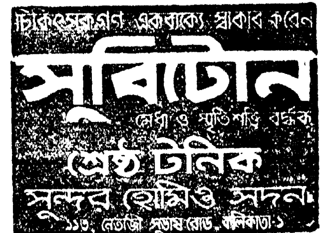
* Rousseau's common will was by no means that with of all which is formed by adding each individual with to the will of all other, by this means reaching an abstract concept of the social will .. Rousseau's idea springs from a religious fancy having its root in the concept of a political providence which, being endowed with the gifts of all-wisdom and complete perfection, can consequently never depart from the right way. Every personal protests against the rule of such a providence amounts to political blasphemy. This there grow from the idea of the common will a new tyranny .... In view of the unlimited completness of the power of a fictitious common will, any independence of thought became a crime; all reasons, as with Luther, 'the whore of the devil' ...." Rudolf Rocker, Nationalism and Culture,

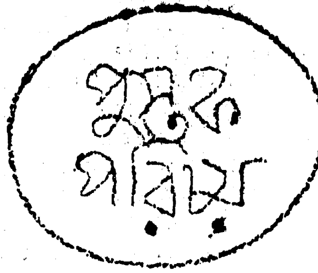
---

1. "Nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due to the Nation-State." Hans Kohn, Nationalism, its meaning and history; Van Vostrand ; P.-9.
2. Rndolf Rocker, Nationalism and Culture, translated by Ray E. Chase; Rocker Publications Committee, Los Angels.

এ বইটি শিক্ষিত স্বাজাত্যাভিমানী বাঙালী মাত্রের অবশ্য পাঠ্য।








## ছোট গল্প

**সামনে চড়াই**—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

**সন্দীপন পাঠশালা**—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থম, কলিকাতা-৬। মূল্য—প্রত্যেকটি দেড় টাকা।

ছোট গল্পের লেখক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলবার নেই।

তারাশংকরের "সন্দীপন পাঠশালা" বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। শিক্ষক জীবনের এই দরদমাখা কাহিনী বাঙালী পাঠকদের মন প্রথম দিন থেকেই আকৃষ্ট করেছে।

আর প্রেমেনবাবুর "সামনে চড়াইতে" যে ক'টি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে তার প্রত্যেকটি গল্পই এক অপূর্ব কারুসৌকর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। লেখকের পরিমিতিবোধ, বাক-সংহতি ও শিল্প-সৌকর্যের গুণে তারা পাঠকের মন হরণ করে অনায়াসেই। বইখানির শেষ গল্প 'কালবৈশাখী'তে যে ডায়লগ-নির্ভর একাঙ্কিকার পরীক্ষা লেখক করেছেন, বাংলা মঞ্চসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার মূল্য অনস্বীকার্য।



এই দুইখানি গ্রন্থকে গ্রন্থম সুলভ সংস্করণে বের করে বাংগালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ইংরেজীতে Penguin, Pelican, Pocket Book প্রভৃতি নামে প্রকাশিত স্বল্প-মূল্যের গ্রন্থ বহু থাকলেও বাংলায় গল্প উপন্যাস প্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা নতুন। আমরা এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

৩৩৯।৫৮, ৩৪০।৫৮

**তালনবমী**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দুই টাকা আট আনা।

দশটি ছোটদের জন্যে লেখা বিভিন্ন ধরনের গল্প নিয়ে তালনবমীর এই বর্তমান সংস্করণটি বেরিয়েছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য চরিত্রের যেটি প্রধান গুণ এবং বিচারবিকল্পে দোষ বলে স্বীকৃত এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে সেটি অতি স্পষ্টতই প্রকট। যে মুগ্ধতা ও কৈশোর বিস্ময়, অকপট সারল্য এবং মানবরস প্রকৃতিরসের সমপরিমাণ মিশ্রণ বিভূতিবাবুর প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত লেখা প্রতিটি রচনার মধ্যেই অল্প-বিস্তর উৎসারিত, তালনবমী তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। সেই কারণেই গল্পগুলি ঢিলেঢালা সহজ সুতোয় বাঁধা প্লটের ঘোরপ্যাঁচ নেই, বাচন-চাতুর্য নেই, ভাষার মধ্যেও রঙফলাবার চেষ্টা নেই। উপলব্ধির যথার্থ আনন্দ থেকে এদের উৎপত্তি, গতিও সহজ স্বচ্ছন্দ এবং ধারাবাহিক। স্নিগ্ধ সজল ছোট সুখ-দুঃখে ভরা বাঙালী জীবনের চারপাশে যেসব টুকরো করা গল্প ছড়ানো থাকে, যাতে নাটকীয় বিন্যাস নেই, চমকপ্রদ উপসংহার নেই, সেই সব গল্পের কণিকাকেই তালনবমীর অবিস্মরণীয় লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও বড়রাও সমান উপভোগ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। ৪৫৩।৫৮

**সতু বাদ্যর গল্প**—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

সতু বাদ্য একেবারে নবাগত লেখক নন এবং এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থও নয়। এই সংকলন গ্রন্থে তাঁর বারোটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে, যা তিনি সম্ভবত স্বল্পকালের মধ্যে লিখেছেন। গল্পগুলি পড়ে আমাদের এই কথাই মনে হল যে এই ছদ্মনামী লেখক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে খুব খাটো নন। জীবিকা ব্যপদেশে বহু চরিত্রের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছে, বহু নরনারীর ব্যক্তিগত উপাখ্যানের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছেন যারা সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে পড়ে না। বিচিত্র নরনারীর বিচিত্র কাহিনী চিত্রিত করাই সতু বাদ্যর গল্পকর্ম হলেও সেগুলির শৈল্পিক মণ্ডণের দিকে লেখকের উপযুক্ত মনোযোগ এবং দক্ষতা প্রকাশ পায়নি। ভাষার মধ্যে মধ্যে শৈথিল্য এবং অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের চেয়ে গল্প বলার দিকে লেখকের অধিক মনোযোগ ভবিষ্যতে আমরা আশা করবো।

৩৮২।৫৮

## উপন্যাস

**নিছক মানুষ**—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৯। মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নিছক মানুষ নিছকই গল্প। কোন মতবাদের প্রচার বা কোন সূক্ষ্ম মনোবিকলনের দুরূহ প্রচেষ্টা এতে নেই। শুধু আমাদের চারিপাশে যাদের রোজই দেখি তাদেরই কয়েকজনের কথা সহজভাবে বলা হয়েছে এই উপন্যাসখানিতে। লেখকের বলার ভঙ্গী মিষ্টি ও সুন্দর। তাঁর পুরোনো সুনাম এই বইখানির সহজ ভাষা ও আকর্ষণীয় সংলাপ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। উপন্যাসখানি পাঠকদের কাছে আদৃত হবে বলেই মনে করি। ২৫৯।৫৮

**যমুনা কী তীর**—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। বসুধারা প্রকাশনী, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

রাত চারটা। ময়দানে তখনো নীল কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে। পূব আকাশ হয়েছে ফিকে। এমন উপযুক্ত সময়, তবু রাগ যোগীয়ার সেতারী আলাপটা সহ্য হল না শিববাবুর। শুনতে পারলেন না। বেরিয়ে এলেন। বাড়ি ফিরে ডেকে পাঠালেন লেখিকাকে। বললেন—সময় হয়েছে, এবার লিখুন। রাগ যোগীয়ার সাথে বিজড়িত শিববাবুর বেদনামধুর স্মৃতিকাহিনীই আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

প্রায় তিরিশ বছর আগে কলকাতা, কাশী ও গয়ার গাইয়ে সমাজ আর সেই সমাজকে কেন্দ্র করে যাঁরা বাঁচতেন, সেইরকম কয়েকটি নরনারীকে কেন্দ্র করেই এর কাহিনী রচিত। এর নায়ক এক তরুণ ভবঘুরে গায়ক আনন্দ আর নায়িকা এক রূপসী যুবতী গায়িকা বাহার বাঈজী, যার মধ্যে ছিল সেই যৌবনের প্রসাদ, যা তাকে ও তার গানকে করে রেখেছিল প্রাণবন্ত। আর তাদের মাঝখানে রয়েছে শ্রীনটপুরের রাজকন্যা শিববাবুর ভগ্নী ইন্দুমতী, যার একান্ত অনুরোধেই আনন্দ মিশ্র বাজিয়েছিল তার একমাত্র গানের রেকর্ড, যোগিয়ার গাওয়া "মনে

রেখো সখা এ সুখের দিন"। এদের তিনজনের হৃদয়-সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই রোমান্টিক উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং লেখিকার নৈপুণ্যে এই সংঘাত অত্যন্ত সুন্দর ভাবেই ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসখানির সংগীতমুখর মজলিসী আবহাওয়া ও ভাষা মাধুর্যে এবং বিন্যাসগুণে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। যে যুগের ছবি তিনি এ'কেছেন তার সামাজিক পটভূমিকা ও সংগীত প্রীতির রূপটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি সার্থক হয়েছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

৩১০।৫৮

**রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত**—জনৈক উদাসীন প্রণীত। মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

প্রিয়দর্শী অশোকের সমকালীন একটি ধর্মমূলক উপন্যাস "রাজগৃহের চন্দ্রগুপ্ত" এবং ধম্মপদ ও জাতকের তেরোটি গল্পের বাংলা অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রত্যেকটির পিছনেই একটি সুন্দর নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই নীতির প্রচার কোথাও গল্পের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটায়নি। সে যুগের সামাজিক অবস্থার বিবরণও বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে গল্পগুলোর মধ্যে।

অনুবাদকের ভাষা সর্বত্র স্বচ্ছ না হলেও অনুবাদ মোটামুটিভাবে সুন্দরই হয়েছে।

৪৬৫।৫৭

## কবিতা

**আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন**—রি বিশ্বনাথম অনূদিত। গ্রন্থসাহিত্য ভবন, ১৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। এক টাকা।

ভাষা সমস্যা বর্তমান ভারতের একটি বড় সমস্যা, এত ভাষাভাষী অথচ এক ভূগোলে ও ইতিহাসে জায়গা পাওয়া, একই শাসনে অনুশাসনে শাসিত দেশ বিরল। সাহিত্যই যেহেতু যুগ ও জনজীবনের এবং মননের একমাত্র সাক্ষী সেহেতু বিভিন্ন ভাষায় নিয়ত সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলে দেশের মনোজীবন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মহাদেশের সাহিত্য যে পরিমাণে বাঙালীর চোখের সামনে অনুবাদের মাধ্যমে দেখা দিয়েছে, ঘরের পাশের প্রাদেশিক সাহিত্যাবলী সে তুলনায় কণামাত্র পরিচিত হয়নি। সম্প্রতি অনেকের এদিকে দৃষ্টি পড়েছে। শ্রীবিশ্বনাথম নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের গল্প এবং কবিতার অনুবাদ করে চলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বারোটি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা থেকে কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদের সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য না করেও একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে এই সংকলনটি বাঙালী কাব্যানুরাগীদের সুলভে কৌতূহল মেটাবে। অনুবাদককে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

৪৩১।৫৮

**চৈত্রের পলাশ ও মায়াবতী মেঘ**—কুশল মিত্র। গ্রন্থ জগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

একুশটি কবিতা সংকলিত এই কাব্যগ্রন্থটি সম্ভবত কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অনুবাদ কবিতা, সংলাপ কবিতা এবং গদ্য কবিতার পাশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট ছন্দ কবিতা রয়েছে,

যেগুলি চরিত্রের দিক থেকে প্রেমের কবিতা। কুন্দলবাবুর হাত মিষ্টি, ভাষায় সুর এবং আবেগ দুই-ই আছে কিন্তু তিনি যখনই কবিতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চৈতন্য প্রকাশ করতে গেছেন, কবিতাগুলি সেখানে সেখানে সোচ্চার পদ্যে পরিণত হয়েছে, কতকগুলি বাছাবাছি টাইপ শব্দে, বিদেশী উপমায়, কবিতার প্রবাহ খণ্ডিত হয়েছে, সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে। কবি হিসাবে তাঁর কাছে আমাদের আরও প্রত্যাশা ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ৪৫৫।৫৮

**পারলে পারলে পারলটি**—অমিতাভ সেন। অক্ষর, কলিকাতা-৬। একচল্লিশ নয়া পয়সা।

পারলে পারলে পারলটি সতেরোটি ছড়ার একটি ছোট্ট বই। কিন্তু আকারে বইখানি ছোট হলেও, ছড়াগুলো আমাদের ভাল লেগেছে। সেগুলো কবির উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন করছে। যাদের জন্য ছড়াগুলো লেখা, বইখানি তাদেরও ভালো লাগবে সে কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। বইখানির প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর। ৩৭৩।৫৮

**অংকুরের মুখ**—কৃতী সোম। প্রকাশক: তৃপ্তি সোম, ১২৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯। দাম এক টাকা।

এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটির লেখক বাংলা সাহিত্যে নবাগত। কিন্তু নবাগত হলেও আলোচ্য গ্রন্থের মাত্র কুড়িটি কবিতার মধ্য দিয়েই তিনি আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। কৃতী সোম রোমান্টিক কবি, কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে সেই দুরাবেয়ী আকুতিই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ-কলা যে সর্বত্র চিত্তাকর্ষক হয়েছে বা রসানুগ হয়েছে এমন নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে সব জড়িয়ে একটি কবিপ্রতিভার অংকুরের মুখ দেখা দিয়েছে। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে তিনি সৌন্দর্যময়, শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে সুরেলা। উত্তরকালীন একনিষ্ঠ সাধনার উপরে কবির প্রসিদ্ধি নির্ভর করছে; বিকাশ অথবা বিনাশ উভয়ই তাঁর নিজের হাতে। প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ সুখকর হয়নি। ৩২৯।৫৮

## সাহিত্য প্রসঙ্গ

**বাংলা সাহিত্যের পরিচয়**—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা-৬। গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা। দুই টাকা আট আনা।

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ যুগ নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থের অভাব নেই। অভাব নেই বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসের উপর গবেষণা-রত ছাত্রঅধ্যাপকদের জন্য লেখা বিরাটাকৃতি গ্রন্থেরও। কিন্তু যে অভাব সাধারণ পাঠক খুব বেশী বোধ করে, সে হচ্ছে গবেষণাগারের বাইরের জনসাধারণের জন্য লেখা এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশিত সহজবোধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থের। নন্দলাল সেনগুপ্তের "বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা" জাতীয় দুই একটি বইয়ের কথা বাদ দিলে এ জাতীয় বই আর নেই। সেদিক থেকে তারকবাবু এ বইখানি লিখে এবং রত্নসাগর গ্রন্থমালার প্রকাশকগণ এই বইখানি প্রকাশ করে সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কিন্তু গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অনাখানে। বই-খানিকে সহজবোধ্য করবার চেষ্টা থাকলেও লেখক বাংলা সাহিত্যের একটি তথ্যবহুল, প্রামাণ্য ও সংযত ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসের পটভূমিতে প্রাচীন বাংলা

সাহিত্যের এই বিচার বাংলা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যের সাথে সর্বসাধারণকে পরিচিত করতে সক্ষম হবে বলেই বিশ্বাস রাখি। আমরা বই-খানার বহুল প্রচার কামনা করি। ৩০০।৫৬

## শিকার কাহিনী

**বাঘের লুকোচুরি**—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ; ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দুই টাকা।

ছোটদের জন্যে লেখা ন'টি ছোট ছোট বাঘ-শিকারের কাহিনী একত্র করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক নিজে শিকারী, গল্পগুলো বেশ সরস এবং সহজ করে বলেছেন, তাঁর বর্ণনায় এবং আখ্যানে বিরোধ নেই; বাহুল্যবর্জিত কাহিনী-গুলি আই কোথাও বিলম্বিত ঘুর-পথে না গিয়ে সোজাসুজি শিকারে গিয়ে পড়ে। ব্যাঘ্র নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে গল্প শেষ হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় শিকারী প্রতিক্ষেত্রে যেখানে যেখানে সফলতা অর্জন করেছেন, অব্যর্থ লক্ষ্যে বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছেন সেই কথাই একের পর এক শুনতে থাকলে আমাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার আনন্দ মন্দীভূত হয়ে আসে। শুধু তাই নয়, আরণ্যক ব্যাঘ্রের চরিত্রটি যথাযথ প্রস্ফুটিত হয় না। সুতরাং শিকারীর সেই অধ্যবসায়ের কথা আমাদের কাছে বেশি চিত্তা-কর্ষক হতে পারে যার মধ্যে বাঘের সত্যকারের লুকোচুরি আছে, ভয়ংকর মূর্তিটি আছে এবং শিকারীর ভ্রান্তি, ব্যর্থতা এবং পরাজয় ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। আর একটি কথা, ছোটদের বইতে ইংরেজী শব্দের বদলে পরিচিত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে বোধকরি গল্পপাঠের পথ মসৃণতর হয়। যাই হোক, বাঘের লুকোচুরি যাদের জন্যে লেখা তাদের আনন্দ দেবে আশা করি। ৩৩৪।৫৮

## বিবিধ

**আমার বাংলা**—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ক্যালকাটা ইউথ ফোরাম, কলিকাতা। চার আনা।

বাংলা বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের পরি-প্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) থেকে শুরু করে আধুনিক তরুণ কবি পর্যন্ত বাংলা দেশ ও ভাষা সম্পর্কে কী গভীর অনুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, বাইশজন কবির এই সংকলনে (সম্পাদকের মনে হয়ত সম্পাদনকালে বাইশ কবির মঙ্গলকাব্যের কথা প্রভাব বিস্তার করে থাকবে) তারই একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক অভিনন্দনের দাবী রাখেন। ১৩৩।৫৮

**জন্মমাস বিচার**—শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব। জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়, ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

জাতকের জীবনে শুভাশুভ ঘটনা, উত্থান-পতন, স্বভাব বা প্রকৃতি, ভাগ্য, পরমায়ু ইত্যাদি ভারতীয় জ্যোতিষের মতে নির্ভরশীল জন্ম-কালীন গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানের উপর। আর তার বিচারে তাই প্রধান উপাদান জন্মপত্রিকা। কিন্তু জ্যোতিষার্ণব মহাশয় জন্মমাসকে ভিত্তি করেই ঐসব ফল বিচারে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে সূর্যের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রহের যোগ বা প্রেক্ষা এবং রবির উপর গ্রহগণের দৃষ্টিপাত হেতু কিছু কিছু তারতম্য হলেও এই জন্মমাস বিচার ফল প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে। তাঁর দাবীর সত্যতা কতখানি পাঠকরা বইখানি পড়ে তার ফলাফল নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই প্রমাণিত হবে। তাই সেই সম্পর্কে কোন মতই প্রকাশ না করে, শুধু এইটুকুই বলা যায়, বইখানি পড়তে তাঁদের ভালোই লাগবে। ২৭২।৫৮

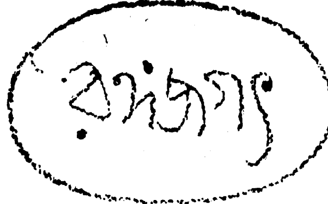
**বলরাম মন্দিরে স্পার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ**—স্বামী জীবানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বলরাম মন্দির। মূল্য বারো আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ গৃহী এবং ত্যাগী ভক্তদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বলরাম মন্দিরের ইতিবৃত্ত এই পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকে রামকৃষ্ণদেব বলরাম মন্দির এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভক্তমাত্রের নিকটই বইখানি আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

**এগারটি বাংলা নাট্য গ্রন্থের দৃশ্য নিদর্শন**—অমরেন্দ্রনাথ রায়।
**বিচিত্র চিত্র সংগ্রহ**—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।
**বিনোদিনী ফিল্ম কোম্পানী**—মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল।
**করবীর প্রেম**—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
**রসময় যার নাম**—শিবরাম চক্রবর্তী।
**চিড়িয়াখানায় দেখে এলাম**—শিপ্রা পুরকায়স্থ।
**শিকারী শশী**—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী।
**পান্থশালা**—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
**আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী**—শ্রীমতিলাল রায়।
**শব্দার্থতত্ত্ব**—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।
**মানব দেহের গঠন ও ক্রিয়া-কলাপ**—অধ্যাপক এ এন কাবানভ অনুবাদক ডাঃ সমর রায়চৌধুরী।
**সহজ রাষ্ট্র ভাষাবোধ**—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত।
**মহান ভারত ১ম ও ২য় পর্ব**—শ্রীভিক্ষু।
**মহাকালের পূজারী**—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।
**শতকিয়া**—সুবোধ ঘোষ।
**রোমের ইতিকথা**—অধ্যাপক অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়।




**চন্দ্রশেখর**

**শিকার—বনে না মনে?**

ন্যাশনাল ফিল্মসের 'শিকার' গেভাকলারে তৈরি দ্বিতীয় বাংলা ছবি। কিন্তু আরেক-দিকে 'শিকার' অদ্বিতীয়: আসামের আরণ্যক পরিবেশে একজন শিকারীকে নায়ক ক'রে খুব সম্ভব এই প্রথম একটি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হ'লো। এর দ্বারা বাংলা চলচ্চিত্রের ভৌগোলিক সীমানা প্রসারিত হ'লো বলা যায়।

কাহিনীর নায়ক অরিন্দম একজন শিকারী। সাধারণ থেকে একটু আলাদা ধরণের মানুষ সে। বিয়ের বন্ধনে ধরা দেয় নি,—এদিকে-সেদিকে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে অরিন্দম একদিন চ'লে এলো আসামে, তার বন্ধু রাজীবের কাছে। রাজীব তখন আসামের ডেপুটি ফরেস্ট অফিসার।

স্ত্রী, ছেলে আর একটি অবিবাহিত বোনকে নিয়ে রাজীবের সংসার। রাজীবের শ্যালিকা সুজাতা কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে সেখানে। সুজাতাই এই কাহিনীর নায়িকা।

অদূর অতীতে সুজাতার জীবনে একটা মস্ত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ফুলশয্যার রাতেই মোটর-দুর্ঘটনায় মারা গেছে সুজাতার স্বামী। সুজাতা বিধবা হয়ে চলে আসে পিত্রালয়ে। লেখাপড়ায় ডুবিয়ে দেয় নিজেকে। ডুবিয়ে দেয় দর্শনশাস্ত্রের গবেষণায়। প্রশ্নের উত্তর খোঁজে—মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি?

এই অবস্থায় সুজাতা বেড়াতে এসেছে আসামে, দিদির কাছে। এখানেই সে দর্শন-শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বালোচনার সঙ্গী পেয়েছে তরুণ সন্ন্যাসী দীপানন্দকে। দীপানন্দের পাণ্ডিত্য, আদর্শ ও সংযমের প্রতি সুজাতার বিপুল শ্রদ্ধা।

এখানে আরেকজন পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সুজাতার। তার নাম রজত চৌধুরী। ইনি আসামের বিরাট চা-বাগানের মালিক। রজত চৌধুরী ভোগী মানুষ এবং সে সুজাতাকে দেখে মুগ্ধ হ'লো। সুজাতাকে পাওয়ার জন্যে রজত চৌধুরী মহাশয় উঠে-পড়ে লাগলেন।

হেন কালে অরিন্দমের আবির্ভাব। অরিন্দমকে দেখেই অরিন্দমের প্রেমে পড়ে গেলো রজত চৌধুরীর বোন। কিন্তু অরিন্দম তাকে বিশেষ আমল দিল না।

সুজাতাকে অরিন্দম কারণে-অকারণে অপমান করে, আঘাত করে। ফলে সুজাতার কাছে অরিন্দম অসহ্য হয়ে উঠলো।

কিন্তু তারপর একদিন অরিন্দমের ইতিহাস জেনে সুজাতার মনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটলো। অরিন্দমের ইতিহাস কী? ইতিহাস আর কী, অরিন্দমের পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত। রাজীবের বাবা কুড়িয়ে পায় অরিন্দমকে, তিনিই মানুষ করেন অরিন্দমকে। পিতৃপরিচয়হীন ব'লে অরিন্দম সারাজীবন কেবল মানুষের অবজ্ঞা পেয়েছে।

রজত চৌধুরীর উদ্যোগে ও অনুরোধে একদিন সকলে একত্রিত হ'য়ে গভীর জঙ্গলে শিকার করতে গেলো। সেই জঙ্গলের মধ্যে সুজাতাকে প্রেম নিবেদন করলো তরুণ সন্ন্যাসী দীপানন্দ। সুজাতা আশ্চর্য হ'লো। (আশ্চর্য হবার কথা বৈকি, এ কি কথা শুনি আজ সন্ন্যাসীর মুখে!)

সন্ন্যাসীর পরে আছে রজত চৌধুরী। সুজাতাকে পাবার জন্যে সে করলো ষড়যন্ত্র। অরিন্দমকে গভীর জঙ্গলে শিকারে পাঠিয়ে রজত অরিন্দমকে হত্যা করবার আয়োজন করলো। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে জঙ্গলের মধ্যে আটক হ'লো অরিন্দম; আর এদিকে মদোন্মত্ত রজত চৌধুরী সুজাতার দিকে কামনার হাত বাড়ালো। সন্ন্যাসী এসে



সিসিল বি ডিমিলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি "দি টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস"-এর একটি দৃশ্যে মোজেস ও তাঁর স্ত্রী সেফোরার ভূমিকায় যথাক্রমে চার্লটন হেস্টন ও ইভন কার্লো।

শারীরিক বিক্রমে ধরাশায়ী করলো রজত চৌধুরীকে।

সুজাতা? মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস অস্তোন্মুখ। সুজাতা তখন জংগলের মধ্যে ছুটে গেলো।

এদিকে অরিন্দম ভাগ্যগুণে রজতের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ ক'রে তাঁবুতে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই অরিন্দম আবার জংগলের দিকে ছুটলো। কেন? সুজাতার খোঁজে।

ছুটতে ছুটতে এসে দেখলো সুজাতা একটা বাঘের মুখোমুখি প'ড়ে গেছে। বন্দুক ছুঁড়লো অরিন্দম। কিন্তু হায়, বন্দুক থেকে গুলী বেরোলো না। কেন? রজতের ষড়যন্ত্রের ফল। এখন অরিন্দম বাঘের সংগে (ওটা বাঘ না বাঘিনী?) যুদ্ধ করলো। ('বাঘের সংগে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি')। সেই যুদ্ধে আহত শক্তিতে অরিন্দম বাঘটাকে গায়ের জোরে বধ করলো। মূর্ছিতা সুজাতাকে কোলে করে হাঁটাপথ ধরতেই প্রেমবিহ্বলা নারী পরম আশ্বাসে দয়িতের বুকে মুখ লুকোল।

* * *

নাট্যরসের বিচারে "শিকারে"র কাহিনী রীতিমত দুর্বল। রাসবিহারী লাল লিখিত গল্পের মধ্যে ভণিতাটাই প্রধান, আর সব ব্যাপার যেন গৌণ। মৃত্যু, পরলোক, আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে অনেক ফাঁকা বুলি আছে, অথচ গল্পটি যে-পথে এগিয়েছে তার সংগে এই সব দার্শনিক তত্ত্বের কোন যোগই নেই। শিকার নিয়ে গল্প, কিন্তু শিকারের কোন দৃশ্যই দেখান হয় নি। হাতির পিঠে চড়ে জংগলের পথে অগ্রসর হওয়াকে যদি শিকারের দৃশ্য বলে ধরা হয়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। এমনিধারা অপরিপুষ্ট ছবিখানির নাটকীয় চেহারা।

"শিকারে"র মধ্যে অন্যান্য অবান্তর ব্যাপারও কম নেই। খামোখা এক গেরুয়াধারীকে শিকার পার্টিতে টেনে এনে এবং তাকে দিয়ে নায়িকার কাছে প্রেম নিবেদন করিয়ে লেখক গল্পের সৌকর্য বাড়াতে পারেন নি, উল্টে একটি সম্প্রদায়কে অনাবশ্যকভাবে হেয় করেছেন লোকের চোখে। নায়ক-নায়িকার পলায়নী-মনোবৃত্তির ও ব্যর্থতা বোধের একাধিক উল্লেখ আছে সংলাপের মধ্যে, কিন্তু তাদের আচারে-ব্যবহারে তার কোন পরিচয় নেই। ফলে বিষয়বস্তুর দিক থেকে নায়িকা বিধবা না হয়ে কুমারী থাকলেও কোন ক্ষতি হত না। অথচ ফুলশয্যার রাত্রে তাকে বিধবা করবার জন্যে অনেকখানি সেলুলয়েড অনর্থক অপব্যয় করতে হয়েছে। তাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবার খবরটিও খুব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দর্শকদের মনে পেঁছে দেওয়া হয় নি। ফলে নায়ক-নায়িকার নিবিড় আলিংগনে গল্পের মিলনান্তক পরিণতি দর্শকদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

ছবির বিন্যাসেও নূতনত্বের একান্ত অভাব। অধিকাংশ চরিত্রই মামুলি এবং অনেক দৃশ্যই কষ্টকল্পিত। নিরস্ত্র নায়কের সংগে বাঘের দ্বৈরথ যুদ্ধ ও তাতে বাঘের মৃত্যু এমনি ধারা অসম্ভব কষ্ট কল্পনার পরিচয় বহন করে। নায়কবেশী উত্তম-কুমারকে এর পর বাঘা-উত্তম নামে অভিহিত করলে কারুরই আপত্তি হওয়া উচিত নয়!

পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি গল্পের মৌলিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তাকে ছবির পর্দায় বেশ গতিশীল করে উপস্থাপিত করেছেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, হিংসা-ঔদার্য, হীনতা-বিশাল তার সংমিশ্রণে যে-অরণ্যভূমি নির্বাক হয়েও



এইচ এন সি প্রোডাকসন্সের "ইন্দ্রাণী" ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন।



মুখর, শিকারের মধ্যবর্তিতায় দর্শক সেই অরণ্যভূমির সংগে পরিচিত হন। পরিচালক এমন ভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে গেছেন যে, দর্শকের কৌতূহল ঝিমিয়ে পড়বার অবকাশ পায় না। সম্পাদনার নৈপুণ্য এ বিষয়ে পরিচালককে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

গেভাকলারে রঞ্জিত আলোকচিত্র মোটা-মুটি প্রশংসা পেলেও তা সর্বত্র সমান সুষ্ঠু নয়। বহির্দৃশ্যে প্রাকৃতিক শোভার অপ্রতুলতা ঘটে নি, কিন্তু বর্ণ সমারোহ সেই অনুপাতে সুসমঞ্জস হয় নি। রঙীন ছবিতে গাছের পাতায় সবুজের বিরলতা দর্শককে বিস্মিত করবে, যদিচ অন্তর্দৃশ্যগুলিতে এ ত্রুটী নেই বললেই চলে। শিল্পনির্দেশ ও অন্যান্য আঙ্গিকের কাজ যথাযথ।

অভিনয়ে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অভিনয় গুণে সুজাতা চরিত্রটি বেশ একটি মার্জিত রূপ নিয়েছে। অরিন্দম বেশী উত্তমকুমারকে ভালই লাগে। তবে ভাব প্রকাশে বৈচিত্র্যের সুযোগ নেই এ চরিত্রে। একই ভংগীতে (এবং একই রকমের শিকারীর পোশাকে) তিনি আগাগোড়া অভিনয় করে গেছেন এবং বিশেষ সফলতার সংগেই তা করেছেন।

পার্শ্ব চরিত্রগুলির মধ্যে সুজাতার ভগিনপতি ও দিদির ভূমিকায় অসিতবরণ ও ভারতী দেবীর অভিনয় প্রাণের স্পর্শে সমুজ্জ্বল। নমিতা সিংহ সেজেছেন অসিতবরণের কনিষ্ঠা ভগিনী এবং যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। রাজীব চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায় মার্কা-মারা ভিলেনের মত অভিনয় করেছেন। তাঁর তরলমতি বোনের ভূমিকায় কমলা মুখো-পাধ্যায়ের গায়ে-পড়া ভাবটি উপভোগ্য। একটি ছোট্ট ভূমিকায় অমর মল্লিকের কৌতুক-অভিনয় দর্শকদের হাসবার সুযোগ দিয়েছে। অন্যদিকে সন্ন্যাসী দীপানন্দের

ভূমিকায় নির্মলকুমারের অভিনয় একান্তভাবে নৈরাশ্যজনক।

হেমন্তকুমারের সুরসৃষ্টিতে বিশেষ কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁর নিজের গাওয়া গানখানি ছাড়া অন্য দুটি গান মনকে স্পর্শ করে না। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের আবহ সংগীত ছবির পরিবেশ অনুযায়ী।

'শিকারী'র কাহিনী লিখেছেন রাসবিহারী লাল; পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার মংগল চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী সুহৃদ ঘোষ, শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায় চৌধুরী ও প্রধান সম্পাদক বিশ্বনাথ নায়ক।

## চিত্রালোচনা

দু'খানি হিন্দী ছবি নিয়ে এ হপ্তার প্রমোদ অভিযান শুরু।

একটির নাম 'ফাগুন'—চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে পরিচালক বিভূতি মিত্রের প্রথম অবদান। একটি জিপসী মেয়ের সংগে এক জমিদার পুত্রের প্রেমকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী, লিখেছেন প্রণব রায়। প্রধান চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করেছেন মধুবালা, ভারতভূষণ, জীবন, কাম্মো, ধুমল, নিশি, বদরী প্রসাদ প্রভৃতি। মিত্র প্রোডাকসন্সের এই ছবিতে সুর যুগিয়েছেন ও পি নায়ার।

দ্বিতীয়খানি পৌরাণিক ছবি—নাম 'গৌরীশংকর'। উমা মহেশের অবিনশ্বর কাহিনী নতুন করে লিখেছেন পণ্ডিত মুখরাম শর্মা। রাজা নেনের পরিচালনায় ভাগ্যোদয় চিত্রের এই ছবিতে তা নতুন করে বলা হয়েছে। সুলোচনা, ত্রিলোক কাপুর, জীবন, মারুতি ও কমল কাপুর এর বিভিন্নাংশে চিত্রাবতরণ করেছেন। শিবরাম সুর সংযোগ করেছেন এই ছবিতে।

* * * *

আসছে হপ্তায় একসংগে তিনখানি নতুন বাংলা ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে—সত্যজিৎ রায়ের বহু-প্রতীক্ষিত "জলসা ঘর", সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত "ইন্দ্রাণী" ও অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত "পুরীর মন্দির"। ছবিগুলি একসংগে মুক্তি পেলেও বিভিন্ন রসের আস্বাদ দেবে চিত্রামোদীদের। তার পরের হপ্তায় আসছে পরিচালক সতীশ দাশগুপ্তের অন্তিম চিত্রার্ঘ্য "লীলা-কংক"। শোভনীয় হবে এবারকার পূজাবকাশ।

* * * *

সিনেমায় যেমন চিত্র-মুক্তির হিড়িক আসছে হপ্তা থেকে, তেমনি মহরতের হিড়িক পড়েছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর সিঁথির এম পি স্টুডিওতে। একসংগে তিনখানি ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ দিন—এম পি'র "কুহক" রাতেন এণ্ড কোম্পানীর "হেড মাস্টার" ও সানরাইজের "কিছুক্ষণ"।

"কুহক" পরিচালনা করবেন অগ্রদূত এবং এর প্রধানাংশে থাকবেন উত্তমকুমার। সমরেশ বসু গল্পটির লেখক।

"হেড মাস্টার" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা। "ডাক-হরকরা"-খ্যাত অগ্রগামী পরিচালক গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করবেন এবং যদিও তাঁরা এখনও পর্যন্ত তাঁদের পছন্দমত হেড মাস্টার খুঁজে পান নি, হেড মাস্টার দুহিতার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন নবাগতা রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনফুলের সুবিখ্যাত গল্প "কিছুক্ষণ"কে চিত্রায়িত করবেন লেখকের অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বহু খ্যাতিমান পরিচালকের সহকারী হিসেবে ইনি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা এবার কাজে

লাগাবেন নিজের পরিচালিত প্রথম ছবিতে। নায়িকার ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে।

• • •

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের দ্বিতীয় ছবি "জল-জঙ্গলে"র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে সম্প্রতি ৩৫ জনের একটি দল কলকাতায় ফিরেছেন। "জল-জঙ্গল" তুলতে গিয়ে এ'দের কাদামাটি মাখতে হয়েছে অনেক, উপরন্তু ঘূর্ণি বাত্যার মধ্যে পড়ে ঘুরপাক খাবার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করে এনেছেন এই দলটি। ভাগ্যক্রমে কারুর প্রাণহানি হয় নি আটখানি নৌকো ও তিনখানি স্টিমলঞ্চে দলটি বেরিয়েছিল নদীপথে ছবি তুলতে—এমন সময়ে অতর্কিতে তুফানের আবির্ভাব। প্রাণভয়ে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হন নি এ'রা—ঝড়ের ছবিও তুলে এনেছেন শুনছি। মনোজ বসুর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রকে রূপ দিচ্ছেন মঞ্জুলা

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অসীমকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, প্রেমাংশু বসু, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "অগ্নি সম্ভবা"র নিয়মিত শুটিং চলছে। সুশীল মজুমদার ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

* * *

এ হপ্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সিসিল বি ডিমিলের যুগান্তকারী ইংরেজী ছবি "দি টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস্"। বাইবেল বর্ণিত মোজেসের কাহিনী প্রাচীন মিশরের পটভূমিকায় অভূতপূর্ব সমারোহের সংগে চিত্রিত হয়েছে এর মধ্যে। ভিস্টাভিশন পদ্ধতিতে গৃহীত এই বিরাট রংগীন ছবিটি দেখাতে সময় লাগে প্রায় পৌনে চার ঘণ্টা। অথচ নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের ক্ষিপ্রগতিতে দর্শককে উদগ্রীব হয়ে থাকতে হয় সারা সময়টি। মঞ্চ ও পর্দার গুণী শিল্পীদের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এর ভূমিকালিপিতে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চার্লটন হেস্টন, ইউল ব্রাইনার, অ্যান ব্যাক্সটার, এডওয়ার্ড জি রবিনসন, ইভন ডি কার্লো, ডেব্রা প্যাজেট, জন ডেরেক, স্যার সেড্রিক হার্ডউইক, নিনা ফস্ ও মার্থা স্কটের নাম। ছবিখানি বোম্বাইতে একই চিত্রগৃহে একাদিক্রমে ৩২ সপ্তাহ প্রদর্শিত হয়ে এখানকার বিদেশী ছবির ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

### প্রবাসী বাঙালীর নাট্য প্রচেষ্টা

অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সংগীত-শিল্পের এই চারটি অংগের সাধনা করবার সংকল্প নিয়ে ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি নিউ দিল্লীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'চতুরঙ্গের' জন্ম।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে এঁদের প্রথম অবদান শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন', দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' এবং তৃতীয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশবছর আগে'। সব কটির অভিনয়ই সুধী সমাজের প্রশংসা লাভ করে।

সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অভিনয় করে চতুরঙ্গ বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন নিউ দিল্লীর নাট্যরসিক মহলে। এর প্রতীকধর্মী মঞ্চসজ্জা রাজধানীর অভিনয় প্রয়াসীদের এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফণুলকুমার সেন (শশী কবি), আশীষ মজুমদার (সব্যসাচী), দীপালী দাশগুপ্তা (ভারতী) ও ছবি সেনের (সুমিত্রা) নাম। পরিচালনার কৃতিত্ব সুবল পালের।

## বিবিধ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-শিল্পী সংঘ নামে সম্প্রতি সুরশিল্পীদের একটি প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। গান-বাজনার মাধ্যমে আজ বহু লোক জীবিকার সংস্থান করছেন। তাঁদের সংঘবদ্ধ করে তাঁদের অবস্থার উন্নতিবিধান করা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কর্মজীবনে শিল্পীদের নানাবিধ অবিচার-অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। এইসব অন্যায়ের যাতে সুষ্ঠু প্রতিকার হয়, তার জন্যে এই নবগঠিত সংঘ ইতিমধ্যেই একটি সুচিন্তিত কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরশিল্পী এই সংঘে যোগ দিয়েছেন। এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গীতিকার শৈলেন রায়। ২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীটে সংঘের কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

• • •

ভারত গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে আচার্য জগদীশচন্দ্রের যে জীবনী-চিত্র বর্তমানে তোলা হচ্ছে, তার পরিচালনা করছেন তপন সিংহ। তিনি গত সপ্তাহে লণ্ডন যাত্রা করেছেন, এই বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের চিত্র গ্রহণ করতে। নবাগত অভিনেতা দিলীপ রায় জগদীশচন্দ্রের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। অক্টোবরের শেষাশেষি ওদেশে ছবি তোলা শেষ করে ও'রা দেশে ফিরবেন।

• • •

বাঙলার কৃষক-জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে অগ্রগামীর "ডাক হরকরা" ইউরোপের নানা দেশে সমাদর লাভ করেছে। ডেনিস ও স্টকহোমে প্রদর্শিত হবার পর সোভিয়েট রাষ্ট্রে টেলিভিশনের মাধ্যমে ছবিখানি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের মোশন পিকচার অ্যাকাডেমি "ডাক হরকরা"র একটি প্রিণ্ট চেয়ে পাঠিয়েছে অ্যাকাডেমির সংরক্ষণাগারে রাখবার জন্যে। বিদেশে বাঙলা ছবির এই সমাদরে চিত্রানুরাগীমাত্রেই সন্তোষ লাভ করবেন।

• • •

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ গিরিশ স্মৃতিভবনে রক্ষণার্থে নাট্যগুরু গিরিশ-চন্দ্রের একটি তৈলচিত্র পৌরপ্রধান শ্রীত্রিগুণা সেনের হস্তে অর্পণ করেন। বিশ্বরূপার তরফ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার প্রস্তাব করেন যে, বাগবাজার স্ট্রীট ও যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ-এর মধ্যবর্তী নতুন রাস্তাটির (যার ওপর গিরিশ স্মৃতিভবন অবস্থিত) নাম গিরিশ এভিনিউ রাখা হোক। উপস্থিত সকলে হর্ষধ্বনিসহকারে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নাট্যমঞ্চের প্রতি ও নাট্যগুরুর প্রতি জাতির পবিত্র কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তৈলচিত্রটি উপহার দেওয়ার জন্যে পৌরপ্রধান শ্রীত্রিগুণা সেন বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

• • •

প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রাণী রেহ্‌মান সুদূর প্রাচ্য সফরের পূর্বে আগামী ৬ই ও

৭ই অক্টোবর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তাঁর নৃত্য প্রদর্শন করবেন। বহু প্রাচীন "ওরিসি" নৃত্য—যা প্রাচীনকালে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসীরা নাচতেন—কলকাতায় এই সর্বপ্রথম দেখান হবে। দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতির গৃহনির্মাণ তহবিলের সাহায্যার্থে এই দুটি নৃত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

• • •

আগামী ১২ই অক্টোবর আশুতোষ কলেজ হলে সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণীর শিক্ষায়তন বিভাগের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই উৎসবে সংগীত সম্পর্কিত একটি ভাষণ দেবেন এবং স্নাতকদের অভিজ্ঞান-পত্র ও কৃতিত্ব-পত্র বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষে শ্রীঅশোকতরু বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে, যাতে দক্ষিণীর পঞ্চাশজনের অধিক শিক্ষার্থী-শিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন।

• • •

ভারতে-তোলা ইংরেজী ছবি 'হ্যারি ব্ল্যাক' সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে দেখান হচ্ছে। ইংলণ্ডের মত আমেরিকাতেও ছবিখানির সমাদর হয়েছে, এবং আমেরিকার সমালোচকরাও আই এস জোহরের অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওদেশের তিনজন বিখ্যাত শিল্পীর (স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার, বারবারা রাশ ও এন্টনি স্টীল) বিপরীতে অভিনয় করেও জোহরের এই অসামান্য খ্যাতিতে ভারতবাসীমাত্রেই গৌরব বোধ করবেন।

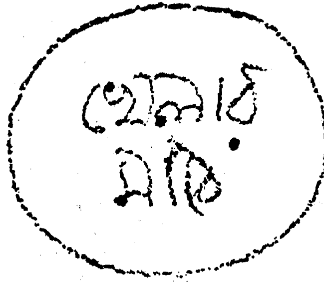
### নতুন বাংলা রেকর্ড

**"হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস"**

এন ৮২৭৮৭ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের দুখানি আধুনিক গান "ও আমার চন্দ্রমল্লিকা" ও "মন নয় মনে মোর"। এন ৮২৭৮৮—"সেই তুমি" ও "এতো গান নিয়ে এসেছি" আধুনিক গান দুটি গেয়েছেন শ্রীমতী বাণী ঘোষাল। এন ৮২৭৮৯—শ্রীমতী মঞ্জুলা গুহ ঠাকুরতার গাওয়া দুখানি রবীন্দ্র-সংগীত 'কী সুর বাজে" ও "কেন ধরে রাখা"। এন ৮২৭৯০—দুখানি আধুনিক গান "সন্ধ্যা লগনে স্বপনগগনে" ও "চাঁদ তুমি এতো আলো", গেয়েছেন সুবীর সেন। এন ৮২৭৯২—শ্রীমতী রমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দুখানি আধুনিক গান "ঐ চাঁদ আর তুমি আমি মিলে" এবং "তোমারেই আমি চিরদিন"। এন ৮২৭৯৩—শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জৌনপুরী ও দেশ রাগে গাওয়া উচ্চাঙ্গ সংগীত "তারি নূপুর" ও কে রে বাদল মেঘে"। এন ৮২৭৯৪—দুখানি পল্লী-গীতি "পাগল হইয়ে বন্ধু" ও 'ও পংখী উড়িয়া যাওরে" গেয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। এন ৮৭৫৫০—দক্ষিণামোহন ঠাকুর তাড়ং বীন্ এর মাধ্যমে বাগেশ্রী রাগে আলাপ এবং জোড় ও ঝালা বাজিয়েছেন। এন ৮৭৫৫২—ভি বালসরা হারমোনিয়ম ও ইউনিভক্স এর মাধ্যমে 'বন্ধু' বাণীচিত্রের দুখানি জনপ্রিয় গানের সুর বাজিয়েছেন।

**কলম্বিয়া**

জি ই ২৪৮৯৭—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুখানি আধুনিক গান "শেষের কবিতা মোর" ও "তন্দ্রাহারা রাত ঐ"। জি ই ২৪৮৯৮ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানি কীর্তন গান "সখি চিকণ কালা' ও "সই না কহ ওসব কথা'। জি ই ২৪৮৯৯ —"বনে যদি ফুটলো কুসুম" ও "পুষ্পবনে পুষ্প নাহি"—দুখানি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী পুরবী সরকার। জি ই ২৪৯০০—"কেন তুমি ডাকো আমায়" ও "আঁধারে প্রদীপ মোর" আধুনিক গান দুখানি—শ্রীমতী গায়ত্রী বসু। জি ই ২৪৯০১—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক দুখানি গান "শ্যামল মাটির" ও "বন ময়ূরী ডাকা"। জি ই ২৪৯০২—দুখানি অতুল প্রসাদী গান "ওরে বন তোর বিজনে" এবং "কে গো তুমি আসিলে অতিথি"—গেয়েছেন শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায় (চট্টোঃ)। জি ই ২৪৯০৪—"মা তোর কিসের এতো" ও "আমার অশ্রুমোতির মালা"—দুখানি শ্যামা-সংগীত—পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। জি ই ৩০৪০০ এবং জি ই ৩০৪০১—রেকর্ড দুটিতে "নাগিনী কন্যার কাহিনী" বাণীচিত্রের তিনখানি গান পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী গায়ত্রী বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।




**একলব্য**

পৃথিবীতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। অধ্যবসায়, অনুশীলন এবং ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে যে অসাধ্য সাধন করা যায়—দুর্জয়কে জয় করা যায়, তারই আর এক প্রমাণ পাওয়া গেছে বার বার ব্যর্থতার পর ভারতীয় ব্যারিস্টার মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাফল্য থেকে। মিহির সেন, যিনি ইতিপূর্বে তিন বছর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছেন—এ বছরও ব্যর্থকাম হয়েছেন দুইবার, তিনিই শেষ পর্যন্ত দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ভারত তথা এশিয়ার সাঁতারু হিসাবে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন।

ইংলণ্ডের ডোভার উপকূলের নিকটবর্তী 'সেক্সপীয়ার বে' থেকে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর মিহির সেন সাঁতার আরম্ভ করেন এবং ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেলের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে এবং হিমশীতল জলের বুকে ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সাঁতার কাটবার পর ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা অপর পারে ফ্রান্সের 'ক্যালে' উপকূলের মাটি স্পর্শ করেন।

মিহির সেনই প্রথম ভারতীয় সাঁতারু, যিনি ভারতবাসী হিসাবে সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করে এবং মিহির সেনই প্রথম ভারতীয় এবং দ্বিতীয় বাঙ্গালী সাঁতারু যিনি চ্যানেল অতিক্রমের বিপদসঙ্কুল সাঁতারে সাফল্যও অর্জন করেছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে পাকিস্থানের বাঙ্গালী সাঁতারু ব্রজেন দাশের চ্যানেল অতিক্রমের পর আর একজন বাঙ্গালী সাঁতারুর এই সাফল্যে বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব করবার কারণ আছে। কৃতিত্ব কারোই কম নয়। ব্রজেন দাশ প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল হয়েছেন, আর মিহির সেন বার বার ব্যর্থকাম হলেও চ্যানেল অতিক্রমের দুর্জয় সংকল্প এবং অটুট মনোবল শেষ পর্যন্ত তার সাফল্যের পথকে প্রশস্থ করে তুলেছে।

কিন্তু একদিক দিয়ে ব্রজেন দাশের চেয়ে মিহির সেনের কৃতিত্ব আরও বেশী এই কারণে যে, ব্রজেন দাশ সাঁতার কেটেছেন ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে ইংলণ্ডের ডোভার পর্যন্ত, আর মিহির সেন সাঁতার



**অটুট মনোবলসম্পন্ন সাঁতারু মিহির সেন**

কেটেছেন ইংলণ্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের ক্যালে পর্যন্ত। ইংলিশ চ্যানেলের বুকে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হবার চেয়ে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য। আর একটি কারণেও মিহির সেন অধিক কৃতিত্বের অধিকারী। সে কারণ হচ্ছে ব্রজেন দাশ প্রতিযোগিতা করেছিলেন মিঃ বিলি বাটলিন প্রযোজিত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় সমষ্টিগত ভাবে। আর মিহির সেনের প্রচেষ্টা ছিল একক। মিহির সেনের সাঁতারের শেষ দিকে চ্যানেলও রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল। সংবাদে প্রকাশ, মিহির সেন ফ্রান্সের কাছাকাছি পৌঁছুবার সময় চ্যানেলের ঢেউ ৯ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে এসে উপকূলে আঘাত করেছে। এর মাঝে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সাঁতার কেটে তিনি মাটি স্পর্শ করেছেন। এ ছাড়া ব্রজেন দাশের চেয়ে চ্যানেল অতিক্রম করতে মিহির সেনের সময়ও লেগেছে একটু কম। ব্রজেন দাশ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে। আর মিহির সেন অতিক্রম করেছেন ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে।

আরও একটি কারণেও মিহির সেনের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে চ্যানেল অতিক্রম করবার প্রথম প্রচেষ্টার আগে সাঁতারু হিসাবে মিহির সেনের নাম শোনা যায়নি। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য এই সময় তিনি ইংলণ্ডেই অবস্থান করছিলেন। কোন ভারতীয় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করছেন না দেখেই তাঁর মনে চ্যানেল অতিক্রমের সংকল্প জাগে। এর আগে কিছু কিছু সাঁতার কাটলেও সাঁতারু হিসাবে তার কোনই নাম ছিল না। কিন্তু ব্রজেন দাশ ভারতে এবং পাকিস্থানে দূরপাল্লা এবং স্বল্প-পাল্লার সাঁতারু হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর চ্যানেল অতিক্রমের অভিযানে যাত্রা করেন। যাইহোক আগেই বলেছি, কৃতিত্ব কারোই কম নয়। এবং দুইজন সন্তরণবীরই আমাদের অভিনন্দনের পাত্র।

আড়াআড়িভাবে ইংলিশ চ্যানেলের প্রস্থ একুশ মাইলেরও মত। কিন্তু জোয়ার-ভাটা স্রোতের টানে এই দূরত্ব অতিক্রম করবার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণ পথ সাঁতার কেটে পার হতে হয়। সোজা পথে একুশ মাইল মাইল বা তার দ্বিগুণ পথ সাঁতার কেটে পার হওয়া এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। দূর পাল্লার সাঁতারের ইতিহাসে একটানা বহু মাইল, এমন কি ২৯২ মাইলও সাঁতার কাটার নজীর আছে। কিন্তু আড়াআড়ি পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা আর একটানা নদীতে সাঁতার কাটার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ইংলিশ চ্যানেলের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে 'দেশে'র পাতায় (৩০শে আগষ্ট—৪৪ সংখ্যা) বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তবু সংক্ষেপে বলি। ইংলিশ চ্যানেলের হাড়-কাঁপানো হিমশীতল জলে সাঁতার কাটা খুবই কষ্টসাধ্য। তাছাড়া ইংলিশ চ্যানেল নানা রকমের সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল। জেলী ফিসের বৃশ্চিক দংশন, গ্রানাইটের আলিঙ্গন, জোয়ার ভাটার বিপরীতমুখী স্রোতের টান, কখনো বা উত্তাল তরঙ্গমালার প্রলয়-কাণ্ড, সব মিলিয়ে ইংলিশ চ্যানেলের ভয়াল মূর্তি সাঁতারুর পক্ষে আতঙ্ক সঞ্চারক। যাদের অসাধ্য সাধনের দুর্জয় বাসনা আছে, অজানাকে জানবার আগ্রহ আছে, আছে অ্যাডভেঞ্চারের উন্মাদনা নেশা, তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের অভিযানে অংশ গ্রহণ সম্ভব।



ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল সেণ্টার ফরোয়ার্ড ধনরাজের গোল করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

অবশ্য আধুনিককালে বহু সাঁতারুই চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। বহু মহিলাও পুরুষদের সঙ্গে সাঁতার কেটে বিজয়িনী হয়েছেন। কেউ কেউ উপর্যুপরি তিনবার এমন কি চারবারও চ্যানেল জয় করেছেন। যেমন মিশরের মারি হামাদ ও হাসান আব্দেল রহিম। আবার দুদিক থেকে চ্যানেল অতিক্রম করার নজীরও কম নেই। অর্থাৎ হাসান আব্দেল রহিম সমেত অনেকেই কেপ গ্রিজ নেজ থেকে ডোভার পর্যন্ত এবং ডোভার থেকে কেপ গ্রিজ নেজ পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হয়েছেন। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের বিশেষ করে মিশরের সাঁতারুরা ছাড়া ব্রজেন দাশের পূর্বে ভারত, পাকিস্থান তথা পূর্ব এশিয়ার কোন সাঁতারু চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেন নি। অন্যান্য দেশের বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব এবং কৃতিত্বও এতটুকু ম্লান হয়নি। চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারু এখনো দুর্লভ সম্মানের অধিকারী, তবে কৃতিত্ব এখনো অসাধ্য সাধনের কৃতিত্বের সামিল। তাই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে ব্রজেন দাশ ও মিহির সেনের সাফল্য ভারত, পাকিস্থান তথা সারা এশিয়াবাসীর চোখে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গৌরবময়।

• • •

আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার মীমাংসা না হলেও কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে যবনিকা পড়েছে। ময়দান এখন শান্ত। পয়লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ময়দানে কোনরকমের খেলাধুলোই অনুষ্ঠিত হবে না। ক্লাবের কাজকর্মও বন্ধ থাকবে। ময়দানের দখলী জমির উপর ক্লাবগুলির যাতে কোন কায়েমী স্বত্বস্বামিত্ব না জন্মায় তার জন্যই বছরে ১৫ দিন এইভাবে খেলাধুলো ও ক্লাবের কাজকর্ম বন্ধ রাখার পুরনো ব্যবস্থা। সুতরাং ময়দানপাড়া এখন শান্ত। খেলাধুলোর কোনই উন্মাদনা নেই। শহরের মধ্যেকার ছোট ছোট মাঠে এবং পার্কে পার্কে এখন চলবে ছোট ছোট খেলাধুলোর অনুষ্ঠান। মহাপূজোর হৈ-হুল্লোড়ের আগে এইসব খেলাধুলোই হবে ক্রীড়ারসিকদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপকরণ।

আই এফ এ শীল্ডের খেলা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বনেদী ফুটবল প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতার সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি, কবে হবে তার স্থিরতা নেই। ফাইন্যাল খেলা আর অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

শীল্ডের খেলা এবার ভালই জমেছিল। খেলায় কোন অপ্রীতিকর আবহাওয়া প্রত্যক্ষ



কলকাতার আকর্ষণীয় ফুটবল খেলায় টেলিগ্রাফ পোস্টের দর্শক



করা যায়নি। সমস্ত খেলাই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলার পরিচালনাও হয়েছে প্রশংসনীয়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কলকাতার রেফারীদের খেলা পরিচালনা সম্পর্কে সাধারণের ধারণা খুব উঁচু নয়। অনেকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আছে। কিন্তু শীল্ডের খেলা পরিচালনায় কারো বিরুদ্ধেই অভিযোগ শোনা যায়নি।

আই এফ এ শীল্ডে অংশগ্রহণকারী গোটা চল্লিশেক ক্লাবের মধ্যে কয়েকটি ক্লাবের খেলায় উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। দর্শক সমাগমে মাঠও কানায় কানায় ভরে গেছে বেশীর ভাগ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায়। অবশ্য শীল্ডের প্রথমদিকের খেলায় সাধারণ ধরনের ক্লাবগুলির ক্রীড়ামান সাধারণ পর্যায়ের উপরে ওঠেনি। কিন্তু বাইরের দলগুলির মধ্যে দেরাদুনের গুর্খা ব্রিগেড, অন্ধ্র পুলিস ও ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় ফুটবলের উন্নত কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করা গেছে। কলকাতার ক্লাবগুলির মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। সমস্ত বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টার্ন রেলের খেলায় অবশ্য আশানুরূপ ক্রীড়াচাতুর্য প্রত্যক্ষ করা যায়নি। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ভারতের পরম শক্তিশালী ফুটবল টীম অন্ধ্র পুলিসের কাছে রেল দলকে ৩—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। রেল দল অন্ধ্র পুলিসের কাছে শুধু পরাজয়ই স্বীকার করেনি। এদের কাছে রেল দলের খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে গেছে।

অন্ধ্র পুলিস গতবারের রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী হায়দরাবাদ পুলিসের নতুন নাম। হায়দরাবাদ রাজ্য দল গত দু' বছরে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান। দুই একজন খেলোয়াড়ের হেরফের ছাড়া হায়দরাবাদ দলের সঙ্গে অন্ধ্র পুলিসের কোন পার্থক্যও ছিল না। শক্তিশালী রাজস্থান ক্লাবকে ৩—০ গোলে এবং লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টার্ন রেলকে ৩—১ গোলে হারিয়ে অন্ধ্র পুলিসের খেলোয়াড়রা দর্শকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেমি-ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে অন্ধ্র দল মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। এইদিনের মাঠের অবস্থা ছিল শুকনো। শুকনো মাঠে খেলতে অভ্যস্ত অন্ধ্র পুলিস খেলোয়াড়দের পক্ষে খুবই অনুকূল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উন্নত ক্রীড়াধারাকে একেবারে নিষ্প্রভ করে দিয়ে ১—০ গোলে বিজয়ী হয়। এর আগে তৃতীয় রাউণ্ডে বোম্বের অপরাজিত এবং খ্যাতনামা ফুটবল টীম ওয়েস্টার্ন রেলকেও ৫—১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রশংসা অর্জন করে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে উয়াড়ী ক্লাবকে ৩—১ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে অন্ধ্র পুলিসকে ১—০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একদিক দিয়ে ফাইন্যালে ওঠে।

অপরদিক দিয়ে ফাইন্যালে ওঠে ইস্টবেঙ্গলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগান দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রথম পরাজিত করে ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবকে ২—০ গোলে। তৃতীয় রাউণ্ডে গুর্খা ব্রিগেডকে অতিরিক্ত সময়ে ৩—১ গোলে, কোয়ার্টার ফাইন্যালে জামসেদপুর স্পোর্টিংকে ২—১ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিংকে ১—০ গোলে। গুর্খা ব্রিগেডের সঙ্গে মোহনবাগানের তৃতীয় রাউণ্ডের খেলাটিই সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও দর্শনীয় হয়। দুই দলই চমৎকার ক্রীড়াধারার মধ্যে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ করে। মাঠ ভিজে থাকায় গুর্খা দলের কিছুটা অসুবিধা হয়। কারণ ভিজে মাঠে খেলতে এরা মোটেই অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুর্খা ব্রিগেডের খেলোয়াড়রা যে ক্রীড়াধারার পরিচয় দেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। খেলায় গুর্খা দলই প্রথম গোল করেছিল। মোহনবাগান গোলটি পরিশোধ করবার পর অতিরিক্ত সময়ের খেলা আরম্ভ হয়। অতিরিক্ত সময়ে গুর্খা ব্রিগেডের গোলে আরও দু'বার বল ঢোকে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে জামসেদপুর স্পোর্টিং মোহনবাগানের সঙ্গে মন্দ খেলেনি। কিন্তু সহজ

সুযোগ থেকে গোল করবার ব্যর্থতায় তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সেমি-ফাইন্যালে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাটিও হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। মোহনবাগান ১—০ গোলে মহমেডান দলকে পরাজিত করে বটে, কিন্তু বিজয়সূচক গোলটির ক্ষেত্রে মহমেডান গোলরক্ষকের অমার্জনীয় ত্রুটিই খেলায় হারজিতের প্রধান কার্যকারণ হয়।

শীল্ড খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং এবং কোলার গোল্ডফিল্ড দলের খেলার কথাও আলোচনার দাবী রাখে। এশিয়ান গেমে পাকিস্থানের জাতীয় ফুটবল দলের পাঁচজন খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দ্বিতীয় রাউণ্ডে এরিয়ান ক্লাবকে অতি সহজে ৪—০ গোলে এবং তৃতীয় রাউণ্ডে পাঞ্জাব ফুটবল দলকে ৪—১ গোলে পরাজিত করলেও কোয়ার্টার ফাইন্যালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। ৩—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। কোলার গোল্ডফিল্ড দলের প্রথম দিনের খেলাতেও কিছুটা নৈপুণ্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মুহুর্মুহু 'স্বর্ণ খনিতে' হানা দিয়ে ৬ বার তাদের রক্ষণব্যূহ বিপর্যস্ত করে। গোল্ডফিল্ড দল পরাজিত হয় ৬—০ গোলে।

যাই হক, আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলায় কলকাতার দুই জনপ্রিয় শক্তিশালী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে শহরের উত্তেজনা চরমে ওঠে। দীর্ঘ ৬ বছর পরে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং দর্শক-মাতানো এই দুইটি ক্লাব ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠেছে। সুতরাং স্টেডিয়ামবিহীন এই মহানগরীতে খেলা দেখার একখানা টিকিট সংগ্রহের আগ্রহে ক্রীড়ামোদীরা পাগল হয়ে ওঠেন। কিন্তু কোথায় টিকিট? মাঠে স্থান আছে মাত্র ১৭ হাজার দর্শকের। আর খেলা দেখার দাবী এক লাখ দর্শকের। কিন্তু খেলা তো বন্ধ থাকতে পারে না। ২৬শে সেপ্টেম্বর মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে ফাইন্যাল খেলার তারিখ ঠিক হ'ল। খেলার দু'দিন আগে ২৪শে সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে মাঠে আরম্ভ হল দর্শক সমাগম। খেলার দিন ময়দান এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হল। গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের পোস্টে, তারে বাদুর ঝোলার মত দর্শক ঝুলতে আরম্ভ করলো। দুর্ঘটনাও কিছু কিছু না হল, এমন নয়। গাছের ডাল ভাঙলো, কেউ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হল, কেউ বা ভিড়ের চাপে জ্ঞান হারালো।

খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ১৯ মিনিটের সময় গগনভেদী আনন্দরোলের মধ্যে একটি গোল করলো। কিন্তু আনন্দধ্বনি বিলীন হতে না হতে মোহনবাগানেরই 'আত্মঘাতী' গোলে গোলটি শোধ হয়ে গেল। আর কোন গোল হল না। খেলাও হল না দর্শকচোখের আনন্দদায়ক। খেলার শেষে আই এফ এর কর্মকর্তারা দুই ক্লাবকে আই এফ এ শীল্ডের যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করবার এক ফন্দি আঁটলেন। কিন্তু মোহন-বাগানের আপত্তিতে তা বানচাল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ৩০শে সেপ্টেম্বর আবার চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু মোহনবাগান আর 'চ্যারিটি' খেলতে নারাজ। ইস্টবেঙ্গল নারাজ সাধারণ ম্যাচ হিসাবে ফাইন্যাল খেলতে। পরস্পরবিরোধী দুই ক্লাবের বৈঠক বসিয়ে, মজলিস ডেকে আই এফ এ'র কর্তৃপক্ষ এর কোন সুরাহা করতে পারলেন না। সুতরাং ফাইন্যাল খেলাও আপাতত বন্ধ রইল। বলা বাহুল্য, যে কারণ ফাইনাল খেলার পুনরনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান প্রতি-বন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তা হচ্ছে 'স্টেডিয়ামের' অভাব। স্টেডিয়াম থাকলে যে কোনদিন যে কোনভাবে খেলার ব্যবস্থা করা যেত। অবশ্য এখনো যে খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না এ কথা স্বীকার করতে পারছি না। সবার আগ্রহ থাকলে অনায়াসেই খেলাটি হতে পারত। কিন্তু আগ্রহের অভাব। অভাব পারস্পরিক সহযোগিতার। তাই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বনেদী ফুটবল প্রতিযোগিতা এখনো অসম্পূর্ণ আছে। এ বছর সম্পূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়েও আছে গভীর সন্দেহ।

## দেশী সংবাদ

২৩শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর, আজ এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভুটানের অধিবাসি-গণকে বলেন যে, ভুটান সম্বন্ধে ভারতের একমাত্র ইচ্ছা, উহা স্বাধীন থাকিবে এবং স্বাধীনভাবেই নিজের উন্নতির পথ বাছিয়া লইবে।

২৪শে সেপ্টেম্বর—ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জাপান যাওয়ার পথে অদ্য সকাল বেলা নয়াদিল্লী হইতে ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছান। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পুষ্পস্তবক দিয়া রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান।

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী একটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীয় সংবিধানের ৩১(এ) ধারা অনুযায়ী উহার পরিচালনভার গ্রহণের কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে।

২৪শে সেপ্টেম্বর—পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অদ্য রাজ্যসভায় এই আভাষ দেন যে, পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির পরিমাণ সম্ভবত ২০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইবে।

এই বৎসর স্কুল ফাইনালের কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের অধিকাংশই কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কলিকাতার অধিকাংশ বড় বড় কলেজই তাহা-দের ভর্তি করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যে সকল ছাত্র কমার্স গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ছাড়া আর কোন ছাত্র কলা অথবা বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারে নাই।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অদ্য কলিকাতা কর্পো-রেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে খাজনা না দিবার অভিযোগে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অনাদায়ী খাজনার পরিমাণ হইতেছে ২৮৬২১৮ টাকা ২৫ নয়া পয়সা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের কাজ ক্রমশ কমিতে থাকিলেও ঐ দপ্তরের খাতে ব্যয় বিস্ময়করভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই দপ্তরে যখন প্রভূত কাজের চাপ ছিল, তখন এই দপ্তরের খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৫৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে সেই দপ্তর যখন গুটাইবার মুখে, তখন দেখা যাইতেছে যে, ঐ দপ্তরের খাতে ব্যয় করা হইয়াছে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

অদ্য ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত ভারত-মার্কিন চুক্তির সর্ত অনুযায়ী শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ত্রিশ লক্ষাধিক টন খাদ্যশস্য ভারতে আসিতে আরম্ভ করিবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে সরকারী খাদ্য-নীতির প্রতিবাদে যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য প্রত্যাহৃত হয়।




খাদ্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবার জন্য দেশরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি-সমূহে আগামী বৎসরের প্রারম্ভকাল হইতেই ট্রাক্টর নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা যায়।

২৮শে সেপ্টেম্বর—আজ প্রাতে শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্থলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যারিস্টার শ্রীতপনমোহন চ্যাটার্জি বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—অদ্য রাইটার্স বিল্ডিংএ সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ অক্ষম।

## বিদেশী সংবাদ

২৩শে সেপ্টেম্বর—জেনারেল ফাউদ চেহাব আজ লেবাননের নূতন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং শপথ গ্রহণের পর পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, লেবাননের মাটি হইতে বিদেশী সৈন্যের আশু অপসারণের জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন।

আজ অপরাহ্নে পূর্ব পাকিস্তানের বিধান সভার অধিবেশনকালে জোর হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। ফলে ডেপুটি স্পীকার শ্রীশাহেদ আলী ও বিরোধী দলের চারজন সদস্য আহত হন।

২৪শে সেপ্টেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রতি-নিধি গ্রহণের প্রশ্নটি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যে দাবী করা হইয়াছিল, সাধারণ পরিষদে কার্য-পরিচালনা কমিটি সেই দাবী অগ্রাহ্য করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। গতকল্য রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদে কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়।

কুয়োমিণ্টাং মহল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে প্রেরিত শতাধিক বিমান ফরমোজা প্রণালীর উপরে আকাশযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কুয়োমিণ্টাং কর্তৃপক্ষ দাবী করেন যে, তাঁহাদের জেট জঙ্গী বিমান-সমূহ ১১টি কম্যুনিস্ট বিমানকে বিধ্বস্ত করে এবং ৬টি বিমানের ক্ষতি সাধন করে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীশাহেদ আলী আজ বেলা একটার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর সভাকক্ষে হাঙ্গামার সময় তিনি আহত হইয়াছিলেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা স্টেশনের নিকটবর্তী গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা হেড কোয়ার্টার্সে এক ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উক্ত হাঙ্গামায় দশজন শ্রমিক নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অদ্য প্রাতঃকাল ১১ ঘটিকার সময় ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু সৈন্য-বাহিনীর জনৈক প্রতিনিধির সহিত এক চুক্তিতে দেশের সাধারণ শাসনভার সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল নে উইন-এর হস্তে অর্পণ করেন। বর্মা সৈন্যদল রেঙ্গুন শহরের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থান-সমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনালের সুপার কনস্টেলেশন বিমানে আজ টোকিও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সম্রাট হিরোহিতো, জাপানের প্রধান মন্ত্রী এবং সরকারী নেতৃবর্গ রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা করেন।

ভারতীয় বাহিনীর সাঁতারু মিহির সেন দ্বিতীয় এশিয়াবাসী ও প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি দোভার হইতে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ফ্রান্সের উপকূলে উপনীত হইয়াছেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা খাঁ আবদুল গফফর খাঁ বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের এক ইউনিট ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সংশোধিত না হইলে তিনি পাকিস্তানের আগামী নির্বাচন বর্জন করিবেন।

নির্ভরযোগ্য মহলের সংবাদে প্রকাশ, এই বৎসর অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নাগাদ লেবানন হইতে সকল মার্কিন সৈন্য অপসারিত হইবে। লেবাননে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীরবার্ট ম্যাকক্লিণ্টক লেবাননের প্রধান মন্ত্রী শ্রীরসিদ কারামীকে উপরোক্ত আশ্বাস দিয়াছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—ফরাসী শাসনাধীন বিদেশী এলাকার মধ্যে একমাত্র গিনিই (পঃ আফ্রিকা) জেনারেল দ গলের প্রস্তাবিত নূতন সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। ফ্রান্স অদ্য গিনিকে জানাইয়া দিয়াছে যে, এখন হইতে উহা আর ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত নহে।

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী শ্রী উ নু সশস্ত্র বাহিনী-সমূহের অধ্যক্ষ জেনারেল নে উইনকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মন্ত্রীরূপে নির্বাচনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আগামী ২৮শে অক্টোবর পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিলে অধিকাংশ সদস্যই উহা সমর্থন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৫০ নয়া পয়সা

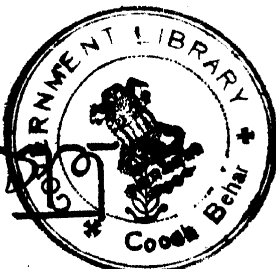
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

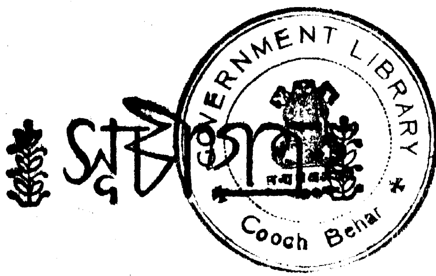
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(সি ২০৪০)

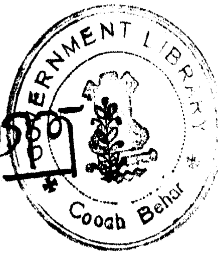



# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | | |


সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র




| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | | |

# দেশ



DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 11th October, 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৫০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৪ আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### আগমনী

সব অনুষ্ঠানেরই পূর্বাভাস থাকে। নাটকের যেমন প্রস্তাবনা, বিবাহের আগে যেমন অধিবাস, পূজার আগে তেমনই পূজার বাজার। বলিতে নাই, কিন্তু কেনা-বেচার ধূম দেখিয়া মনে হয় যেন পূজার জন্য বাজার নয়, বাজারের জন্যই পূজা। অর্চনার দিকটা, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় [illegible] গৌণ হইয়া গিয়াছে। [illegible] বলিয়াই দশভুজার পূজা বাঙলার নিজস্ব উৎসব বোধন হইতে বিসর্জন অবধি কয়েকটি তিথি পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্টে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। বার মাসে তের পার্বণের দেশে জাতীয় উৎসব একটিই : দুর্গোৎসব।

এ-কথাও স্বীকার করা ভাল, আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দটা একেবারে অবিমিশ্র নয়। দুশ্চিন্তার খাদ অনেকখানি, বিশেষ করিয়া ছা-পোষা সংসারীর কাছে। এবং দুশ্চিন্তাটা যে আজই জুটিয়াছে, এমন নয়। গত শতকেই বঙ্কিম সখেদে লিখিয়াছিলেন, "হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায়। তুমি এলে শুভঙ্করীর! বাড়ে আরো দায়। কেন এস, কেন যাও, কেন চাল কলা খাও, তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়" ইত্যাদি। সেই সুজলা সুফলা যুগেই যদি না কুলাইয়া থাকে, এখন তারও কুলায় না। দায়টাও বাঁধা বেতনের মধ্যবিত্তের পক্ষে শত গুণে বাড়িয়াছে। দায় প্রধানত প্রিয়পরিজনের সকলকে নূতন বসন যোগাইবার। প্রয়োজনের পরিচ্ছদ সংগ্রহই যখন দারুণ সমস্যা, তখন প্রথার দাবীটা দুর্বহ বোঝার আকারে দেখা দেয়। বাজারে [illegible] এবং [illegible] ছুটাছুটির কথা [illegible] লিখিয়াছেন অতিরিক্ত আনন্দটুকু সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়াই ক্রয় করিতে হয়। উপরি আয়ের সুবিধা আর কয়জনের আছে। দেবীর আগমন কোনবার নৌকায় কোনবার গজে বা চতুর্দোলায় কিন্তু ফলং প্রতিবৎসরই একঃ ঋণ।

আড়ম্বর এবং ঠাট বজায় রাখার দায় আবার গ্রামের চেয়ে শহরেই বেশি। শহরে পূজা মানে দোকানে দোকানে সাজসজ্জা, আগেই বলিয়াছি। আর বাজারের পরিশিষ্টটুকুই পূজা। সেই পূজারও অনেকখানিই সর্বজনীন মণ্ডপে লাউডস্পীকারে কয়েকটি হালকা গানের ভঙ্গস্বর রেকর্ড ফিরিয়া ফিরিয়া বাজান। সে জন্য চাঁদা। শখের নাট্যাভিনয়—সেই খাতে আবার বিশেষ চাঁদা। শুধু কান ঢাকিয়া প্রাণ পাওয়া যায় না, যাঁহারা সচ্ছল তাঁহারা বোধহয় প্রাণের দায়েই কলিকাতার বাহিরে গা-ঢাকা দিয়া ছুটি কাটান।

সে সাধ্য যাঁহাদের নাই, পূজার মণ্ডপে ঠেলাঠেলি আর ভিড় তাঁহাদের। প্রতিমা-দর্শনও পূজার উৎসবের একটা অঙ্গ। কালের প্রভাবে অবশ্য প্রতিমার রূপও বদলাইয়াছে। চালচিত্র নেই [illegible] দৈবী শ্রী-ও নাই। [illegible] না, তাঁহারা ত শুধু [illegible] রুচি বুঝিয়া কাজ করেন। চাহিদা যেমন, জোগানও তেমন। কয়েকটি প্রতিমার ভাস্কর্য এবং রূপ-কল্পনা এমনই কিম্ভূত যে তাহার মধ্যে সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যা মাতৃমূর্তি দেখিতে হইলে কমলাকান্তের মত সপ্তমীর দিন আফিঙ্গ চড়াইতে হয়।

আকাশের মেঘ শীর্ণপ্রায়; বাতাসে হিমের প্রথম নিঃশব্দ স্পর্শ; শেফালির রাশি [illegible] দেবীর পথ [illegible] করিয়া দিয়াছে, আয়োজনের ত্রুটি নাই। আগমনী গাহিতেই বসিয়াছিলাম, তবু ঠিক সুরটি যেন লাগিল না, মাঝে মাঝে বেসুরো হইয়া গেল।

### সফল সফর

রাষ্ট্রপতির জাপান পরিদর্শন স্মরণীয় ঘটনা, একাধিক কারণে। প্রথমত, প্রজাতন্ত্রের এই [illegible] বিদেশ যাত্রা। [illegible] তাঁহার [illegible] শরীর সহিবে কিনা, অনেকের মনে সেই সংশয়ও ছিল। জাপানে তিনি শুধু রাজনৈতিক [illegible] নন, জনসাধারণের [illegible] হইতেও যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা ও [illegible] পাইয়াছেন তাহাতে [illegible] সম্মানিত বোধ [illegible]। [illegible] এই [illegible] প্রাচীন [illegible] অন্তরঙ্গতার [illegible]। আধুনিক [illegible] প্রায় সব [illegible] দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে, এ প্রসঙ্গে [illegible] রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, [illegible] ও [illegible]—ইঁহাদের মধ্য দিয়াই জাপান এ কালের ভারতকে চিনিয়াছে। [illegible] পেলেন [illegible] উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য, রাষ্ট্রপতির মধ্যে

তাহার অন্তরের স্থৈর্য ও প্রশান্তি; জানিয়াছে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বটে, কিন্তু ধর্মপ্রাণ; আধ্যাত্মিক পথের ইঙ্গিত পাইয়াছে। আবার ঐহিক সমৃদ্ধি সম্পদ লাভের ঠিকানাও ভারতকে জাপানের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাপান ভারতকে আরও এক কোটি ডলার ঋণ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে—নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক বিচারেও এই সফরের সাফল্য সামান্য নহে।

## বিদেশ-সফর

অকপটে স্বীকার করিতেছি, ভারতের বিদেশী-মুদ্রা সঞ্চয় নীতির মহিমা আমরা অনেক সময়েই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অবশ্য এইটুকু বুঝি যে, দেশের বহিরঙ্গ উন্নতির যে সর্বাত্মক সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার জন্য কৃচ্ছ্রস্বীকারের প্রয়োজন বিলক্ষণ আছে। বিলাতে আমাদের সঞ্চিত পুঁজি যাহা ছিল ফুরাইয়া আসিল, কিন্তু অভাব মেটে নাই, মিটিবার লক্ষণও নাই। বিদেশীর দ্বারোপান্তে দাঁড়াইয়া তাই বারবার বলি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। আর চাওয়া মাত্র যদি পাওয়া যাইত, তবে নিশ্চিন্ত চিত্তে ভাবিতে পারিতাম, আমাদের ভাণ্ডার সবাকার ঘরে ঘরে ভরিয়া আছে। কিন্তু ঠিক ভরিয়া নাই, বহু প্রয়াসে যাহা মেলে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। অতএব ঋণং কৃত্বা যজ্ঞে ঘৃতাহুতিদানের যে পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য আরও কড়াকড়ি করিতে হইতেছে। আমদানী-নীতির কড়াকড়ি সেই কারণে।

বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের বিলাসকে আমরা ফাঁসি দিয়াছি। আপসোস থাকিত না, যদি সুফল মিলিত। সম্পূর্ণ ফলভোগের আশা অবশ্য আমরা মনেও রাখি নাই, জানি তালবৃক্ষ যে রোপণ করে, ফল সে পায় না। আমাদের আশঙ্কা ভবিষ্যৎ নিয়াই। যে বিদেশী মুদ্রা বাঁচাইবার জন্য এই প্রক্রমে আমাদের এই ত্যাগ স্বীকার, সেই মুদ্রা সত্যই বাঁচিতেছে কি? মাঝে মাঝে যে ফিরিস্তি বাহির হয়, তাহাতে মনে হয়, না। চৌবাচ্চার একটি ছিদ্রে ছিপি আঁটিয়াছি, কিন্তু অন্যটি লক্ষ্যই করি নাই। বিদেশে শখের বে-সরকারী ভ্রমণ আজ রহিতপ্রায়, কিন্তু সরকারী (অর্থাৎ জনসাধারণেরই) খরচে প্রায় পাঁচশত জন এই বৎসর ইতিমধ্যেই বিদেশ সফর করিয়াছেন, এবং এই বাবদ আমরা পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি। পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে চব্বিশটি প্রতিনিধি দল বিদেশে গিয়াছেন। শিল্প-বাণিজ্য দপ্তর হইতে উনিশটি, অর্থদপ্তর হইতে চৌদ্দটি, প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে তেরটি আর যানবাহন দপ্তর হইতে বারটি। নিশ্চয়ই এতগুলি দলের এই কয়মাসের মধ্যেই বিদেশযাত্রার গুরুত্বের কারণ ছিল, নতুবা সরকার পাঠাইতেন না। তবু একটুখানি সন্দেহ ঢুকিয়াই যায় যে, সরকার ঠিক আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাইতেছেন না।

## এক-চক্ষু

একটি ছোট খবর হয়ত অনেকের নজরে পড়ে নাই। রেভিনিউ স্ট্যাম্পের দাম বাড়িয়াছে। আগে ন্যূনতম মূল্য ছিল এক আনা, এখন দশ নয়া পয়সা। দশমিক মুদ্রা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক বিভাগের খামের দাম বাড়িয়াছিল, তাহা কয়জন মনে রাখিয়াছেন জানি না। সরকার-পরিচালিত স্টেট বাসের ভাড়ার হারও অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী আমলের চেয়ে বেশী। অন্যান্য বহু জিনিসের দামও তিলে তিলে বাড়ে, সেই কুশাঙ্কুর আমাদের পায়ে বিঁধিলেও আমরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠি না।

এই মনোভাবে যদি সামঞ্জস্য থাকিত, তবে বলিতে পারিতাম, আমরা তরোরিব সহিষ্ণু। সর্বত্র কিন্তু এই সামঞ্জস্য বোধের পরিচয় নাই। বহু আন্দোলনে ট্রামে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি ঠেকাইয়া রাখিয়াছি বলিয়া আমরা আত্মতৃপ্ত। অন্য দিকে কত বাড়িল, তাহার হিসাব রাখি না। ইংরাজী প্রবচনকে বাংলা করিয়া বলিতে পারি, কড়া-গণ্ডার ব্যাপারে আমাদের বড় কড়াকড়ি, কিন্তু টাকাটা উড়াইয়া দিতে বাধে না।

## দুষ্টের দমন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পুলিস সংস্থার কর্মকুশলতার যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাকে কীভাবে গ্রহণ করিব বুঝিতে পারিতেছি না। গত বৎসর ১৫৬২ জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা চালান হয়, ইহাদের মধ্যে ২৮৭ জন গেজেটেড অফিসার। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে চারিজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইয়াছে। মোট দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য হইয়াছে, পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। বিভাগীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী শাস্তি-প্রাপ্তদের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে যদি একজন শাস্তি পাইয়া থাকেন, গত বৎসর পাইয়াছেন তিনজন। পুলিশের পক্ষে কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই।

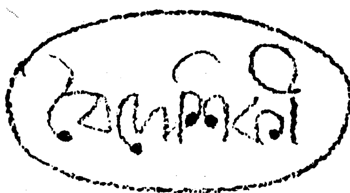
কিন্তু বাড়িয়াছে কোনটি—পুলিসের তৎপরতা, না কর্মচারীদের দুর্নীতি? যদি প্রথমটি হয়, তবে বলিব লক্ষণ শুভ। দ্বিতীয়টি বাড়িয়া থাকিলে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। অসদাচরণ, উৎকোচ গ্রহণ, অর্থ-আত্মসাৎ, প্রতারণা, জালিয়াতি, আমদানী রপ্তানির নিয়মভঙ্গ—কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনা হয় নাই, দেখিতেছি এমন অভিযোগ নাই। এবং অভিযুক্ত ও দণ্ডিতদের মধ্যে চুনো-পুঁটি ও রাঘব-বোয়াল দুইই আছে। এই প্রবণতা যদি বাড়িয়াই চলে, তবে শেষ অবধি তাগা বাঁধিবার জায়গাটুকুও খুঁজিয়া পাইব না। পুলিসের প্রশংসনীয় তৎপরতা সত্ত্বেও অস্বস্তি বোধ করিতেছি এই কারণেই।

## কৃষিকার্যের উন্নতি সম্বন্ধে বিনোবাজীর প্রস্তাব

(১) "প্রত্যেকের নিকট অন্ততঃ আধ বিঘা জমি এবং উহাতে একটি করিয়া কূপও থাকা উচিত। কূপ-বিহীন জমি শোভাহীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। কূপ সম্বন্ধে আমি একটি সূত্র তৈয়ার করিয়া দিয়াছি। যত বিবাহ তত কূপ, অর্থাৎ যত বিবাহ হইবে তত কূপ শ্বশুরের পক্ষ হইতে বরকে দেওয়া হইবে। তবে ভারতে কোটি কোটি কূপ নির্মিত হইয়া যাইবে এবং তাহাতে সমাজের খুবই উপকার হইবে। কূপ হইতেছে 'সরস্বতী' যাহার মধ্যে জল লুক্কায়িত রহিয়াছে।"

(২) "কূপ হইতেই ভাল পানীয় জল পাওয়া যায়। কূপ যত গভীর হইবে, জলও তত ভাল হইবে। এইজন্য এই গুপ্ত সরস্বতীর আবাহন করা উচিত। আপনারা এখানে প্রতি পাঁচ একর জমিতে যদি একটি করিয়া কূপ খনন করেন, তবে এই জিলায় কত কূপ নির্মিত হইয়া যাইবে। তখন এই নাগর জিলায় অকাল (দুর্ভিক্ষ) আসিবে কিরূপে, যদিও সব কিছুই ভগবানের হাতে। একবার নারদ যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনার রাজ্যের কৃষি তো দেবতার উপর নির্ভরশীল নয়? দেবতা অর্থাৎ বৃষ্টি। ইহার অর্থ আপনার রাজ্যে কূপ, বাঁধ ইত্যাদি আছে তো? অর্থাৎ নারদ-নীতি অনুসারে প্রত্যেক জমিতে কূপ খনন করিতে হইবে।"






কুয়েময় ও মাটস্ দ্বীপের উপর গোলা-বর্ষণ আপাতত সাতদিনের জন্য বন্ধ করা হোল বলে পিকিং সরকারের ঘোষণায় কেবল মার্শাল চিয়াং কাইশেক ছাড়া (অর্থাৎ যাঁর সৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ হোল কেবল তিনি ছাড়া) পৃথিবীর আর সকলেই আশ্বস্তবোধ করবেন। মার্শাল চিয়াং-এর দুশ্চিন্তার পিছনে যে-আশঙ্কা রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পিকিং সরকারের এই সিদ্ধান্ত একতরফা পশ্চাদপসরণ নয়, এর সঙ্গে মার্কিন সরকারের নীতি-পরিবর্তনের আভাস জড়িত আছে। সম্প্রতি মিঃ ডালেস যে-সব উক্তি করেছেন তাতে খুব স্পষ্ট করে না বলা হলেও তার নির্গলিতার্থ এই যে, চীন যদি কুয়েময় ও মাটস্ দখল করার জন্য বলপ্রয়োগের পন্থা ত্যাগ করে তবে উক্ত দ্বীপগুলি ন্যাশানালিস্ট চীন অর্থাৎ চিয়াং কাইশেকের দখলে রাখার জন্য আমেরিকা চীনের সঙ্গে লড়াই করতে প্রবৃত্ত হবে না। এ কথায় এই ইঙ্গিত করছে যে কোমিনটাং কুয়েময় ও মাটস্ ছেড়ে চলে আসবে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে মার্কিন সরকার মনে মনে প্রস্তুত হয়েছেন।

কিন্তু এর অর্থ বহুদূর প্রসারী। কুয়েময় ও মাটস্তে চিয়াং সরকারের মোট সৈন্য-বাহিনীর একতৃতীয়াংশ মজুত করা হয়েছে। কুয়েময় ও মাটস্ চীনভূখণ্ডের উপকূলের অতি নিকটবর্তী, ঐ দ্বীপগুলিকে চীনের অন্তর্গতই বলা যায়। এই কারণে চীনের "আইনসম্মত" কর্তা বলে দাবিকারী চিয়াং কাইশেকের পক্ষে এই দ্বীপগুলিকে দখলে রাখার একটা বড়ো প্রতীক-মূল্য আছে। তাছাড়া, চীন পুনর্দখল করার আশ্বাসে যদি এখনো কারো বিশ্বাস থেকে থাকে কুয়েময় ছেড়ে আসার পরে তার থাকবে না। এবং এটাও একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে আমেরিকা চিয়াং কাইশেককে চীনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে যুদ্ধ করতে

রাজী নয়। এটা মার্শাল চিয়াং কাইশেকের বর্তমান পদ ও প্রেস্টিজ দুয়ের পক্ষে মারাত্মক হবে। মার্কিন সরকারের পক্ষেও একেবারে এতটা স্বীকার করে নেওয়াও সহজ নয়। মার্কিন সরকার যদি নীতি-পরিবর্তন করে থাকেন তবে কোমিনটাং-এর পক্ষে সেই পরিবর্তন সুসহ করার জন্য তাকে অনেকটা আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়ে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের নিকট উপস্থিত করতে হবে।

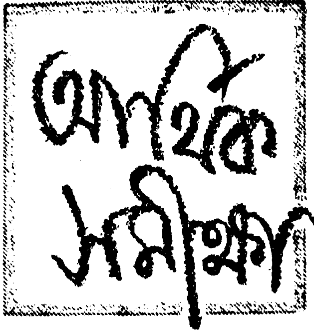
সেইজন্য পিকিং সরকারের ঘোষণায় ওয়াশিংটন এবং তাইপের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গরমিল দেখা যাচ্ছে। এমন কি মিঃ ডালেসের উক্তি এবং ফরমোজা অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের কথারও পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। গোলাবর্ষণ বন্ধ করার হেতু হিসাবে পিকিং সরকার মানবতার উল্লেখ করেছেন এবং তার সঙ্গে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, কুয়েময় ও মাটস্যুতে রসদ আনয়নকারী কোমিণ্টাং-এর জাহাজে মার্কিন নৌবাহিনীর রক্ষাধীনে আসতে পারবে না। গোলাবর্ষণ বন্ধ সম্পর্কে চীনা ঘোষণার পরে ওয়াশিংটনের সরকারী মহলের প্রথম উক্তিতে উপরোক্ত শর্ত সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু কোমিণ্টাং কর্তৃপক্ষ পিকিং কর্তৃক ঘোষণা-মাত্র ঐ শর্তকে নস্যাৎ করে বিবৃতি দিয়েছেন। ফরমোজা, মার্কিন রক্ষা-বাহিনীর কর্তৃপক্ষও বলেন যে, মার্কিন সপ্তম নৌবাহিনী রসদবাহী ন্যাশালিস্ট চীনা জাহাজের "কনভয়" কুয়েময় ও মাটস্যুতে পেঁছে দেওয়া বন্ধ করে নি। তবে এ-বিষয়ে মার্কিন সরকার চীন সরকারের শর্ত উপেক্ষা করে আপোসের সম্ভাবনা নির্মূল করে দেবেন, এরূপ মনে হয় না। কারণ মার্কিন সরকারের নীতি-পরিবর্তন অবশ্যই কিছু ঘটেছে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই মুখরক্ষার চিন্তা আছে। মানবতার দোহাই দিয়ে কুয়েময়ের উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ করে পিকিং সরকারের পক্ষে দেশবাসীর কাছে কিছুমাত্র "খাটো" হবার আশংকা নেই। কারণ ন্যাশালিস্ট চীনাদের সঙ্গে বিবাদ, গৃহবিবাদ, সেটা ধীরে সুস্থে চুকানো যেতে পারে। আত্মসম্মানের কথা আসে অন্য জাতির হস্তক্ষেপ হলে। সেই-জনাই এই শর্ত যে কুয়েময়তে ন্যাশানালিস্ট চীনাদের জন্য রসদ নিয়ে জাহাজ যেতে পারে সেটা মার্কিন রণতরীর রক্ষাধীনে হতে পারবে না।

মার্কিন সরকার যদি স্থির করে থাকেন যে, কুয়েময় ও মাটস্যুতে চিয়াং কাইশেকের কর্তৃত্ব জিইয়ে রাখার আর কোনো অর্থ নেই তবে পিকিং সরকারের গোলাবর্ষণ বন্ধের শর্ত মেনে নিতে কোনো বাধা নেই—কেবলমাত্র মার্শাল চিয়াং কাইশেক ছাড়া। কোমিণ্টাংকে যদি কুয়েময় ও মাটস্যুর দখল ছাড়তে হয় তবে কেবলমাত্র ফরমোজায় চিয়াং কাইশেকের কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে তখন তাঁর প্রতিনিধিকে দিয়ে ইউনাইটেড নেশনস্-এ চীনের প্রতিনিধিত্ব করানোর তামাশাটাও টিকিয়ে রাখা যাবে না। চিয়াং কাইশেকের অভিমানের মূল কিন্তু ঐখানেই। সুতরাং তিনি সহজে ছাড়তে চাইবেন না। ফরমোজাকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ধরে চিয়াং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হতে পারত, হয়ত হবেও। কিন্তু তার আগে মার্শাল চিয়াং বেশ কিছুটা বেগ দিতে পারেন এবং বোধহয় দেবেনও। পিকিং সরকার অবশ্য ফরমোজার উপর চীনের অধিকারের দাবি ছাড়বেন না কিন্তু কুয়েময় ও মাটস্যুর দখল এবং সেই ক্ষেত্রে ইউনাইটেড নেশনস্‌এ স্থান লাভ করতে পারলে ফরমোজার জন্য আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে বোধহয় পিকিং সরকারের আপত্তি হবে না। এখন দেখা যাক ওয়ারশতে এখন আলোচনা কতদূর এগোয়।

৭।১০।৫৮








শ্রীকৌটিল্য

অবনিয়োগের সমস্যার পরিচয় দিচ্ছিলাম। অবনিয়োগ সম্পূর্ণই অনগ্রসর অর্থনীতিক অঞ্চলের সমস্যা। অগ্রসর দেশে অনিচ্ছুক বেকারের কারণ সাময়িক চাহিদার পতন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই কার্যকরী চাহিদার উত্থান-পতনের চক্রাবর্তনের কথা কেইন্‌সের লেখা থেকে আমরা সবাই জেনেছি। তিনি নিজেই দেখিয়েছেন যে, কার্যকরী চাহিদার পতনকে রোধ করাতে হলে উপায় হচ্ছে কতকগুলি দীর্ঘস্থায়ী এবং কতকগুলি স্বল্পকাল-মেয়াদী চাহিদা-উত্তেজক (demand stimulating) পন্থা অবলম্বন করা।

পাঠ্য বইয়ে কেইন্‌স্ পড়ে অর্থনীতি-বিদরা অনেকেই অনগ্রসর দেশের সমস্যাটিকে ধরতে পারেন নি। তাই কেইন্‌সের অনিচ্ছুক বেকারের সংজ্ঞা অনুসরণ করে তাঁরা যখন দেখলেন যে তাতে যে-পরিমাণ বেকার লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সমস্যা তার চেয়েও অনেক ব্যাপক। অনেকে এর পর যখন সেই সংজ্ঞা ত্যাগ করে অবনিয়োগের সত্যটি আবিষ্কার করতে পারলেন, তখনও তাঁরা তার প্রতিষেধক হিসেবে কার্যকরী চাহিদাকে সঞ্জীবিত করবার কেইন্‌সীয় দাওয়াই ভুলতে শিখলেন না। ধীরে ধীরে ভুল ধরা পড়লো এবং এটা বোঝা গেল যে, প্রথমেই মনে রাখতে হবে অনগ্রসর অর্থনীতি মানে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতি। তার মানে এই যে, এহেন অর্থনীতিতে পুঁজি-গঠন (capital formation) প্রয়োজনীয় স্তরের অনেক নিচে। তা হলে অব-নিয়োগের দাওয়াই, সাধারণভাবে বলতে গেলে যথেষ্ট পুঁজি-গঠন তথা নিয়োগ।

যে অপর এক উল্লেখযোগ্য কথা এ থেকে বেরিয়ে আসছে, তা এই যে, অনগ্রসর অর্থনীতিতে নিয়োগের প্রকৃতি গতি-প্রযুক্ত (dynamic)। অর্থাৎ নিয়োগের স্তরের ক্রমোন্নতি পুঁজি-গঠনের স্তরের ক্রমবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। অগ্রসর দেশে যে কোনো সময়ের বেকার তাৎক্ষণিক জাতীয় পুঁজির ক্ষতি-বৃদ্ধি নির্ভর নয় বলে সেক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হয় প্রচলিত উপকরণ বা সম্পদের (resources) পরিধির মধ্যে নানারকম খাপ খাওয়ানোর (adjustment) ভিতর দিয়ে। অনগ্রসর অর্থনীতির নিয়োগ সমস্যার সমাধানের গতির এই যে অনিবার্য স্তরক্রম এর মধ্যেই গতি-প্রযুক্ত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা।

গতি-প্রযুক্তির চিন্তার মূলে আছে আর্থিক বৃদ্ধির ধারণা। তাই উৎপাদনের বা উৎপাদন ক্ষমতার কথাটাই প্রধান। অন্য কথায় কাকে ফলপ্রসূ কাজ বলব আর কাকে বলব না, সেটা জানা একান্ত দরকার। স্বভাবতই যে কাজ বাস্তবিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাকেই ফলপ্রসূ বলব এবং অন্য দিক দিয়ে যতই

আপত্তিকর হোক, অ্যাডাম স্মিথের কথা-মতো নর্তক কিংবা গায়কের অবদানকে ফলপ্রসূ বলব না। প্রসংগত, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে স্মিথের বহুকথিত ফলপ্রসূ ও নিস্ফল (productive and un-productive) কাজের যতই সার্থক সমালোচনা হোক না কেন, তাঁর কল্পিত মডেলে (যে মডেল বর্তমান কালের অনগ্রসর অর্থনৈতিক সমাজের সংগে প্রায় সম্পূর্ণ তুলনীয়) কাজের ফলপ্রসূতার সূচক হিসেবে তিনি যা ধরেছিলেন, তার যাথার্থ্য আমরা এখন বেশ বুঝতে পারব।

এই তো গেল অবনিয়োগ সমস্যার পরিচয় কথা। এর অনেক দিক আছে। যথা অনগ্রসর অর্থনীতিতে শুধু এক-রকমের অবনিয়োগ নেই; বিভিন্ন রকম অবনিয়োগের আলোচনা বারান্তরে করবার ইচ্ছা থাকল। এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের সূত্র ধরে তাদের পরিমাণ (measurement) এবং সংজ্ঞার সমস্যাও সংখ্যাতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদকে লক্ষ্য করতে হবে।

বর্তমান প্রসংগে অন্য দু-একটা কথা বরং বলে নিই। আমাদের এতকালের কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিতে পুঁজির অভাব নানা-কারণে বরাবরই চলে আসছিল। এদিকে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং ফলে মাথাপিছু উৎপাদন বা আয় কমছে। সবাই কৃষির উপর পড়ে আছে, অথচ প্রান্তিক আয় প্রায় শূন্য, পরিবারগুলি পরগাছাসংকুল হয়ে আছে। এই ব্যাপারটাই হচ্ছে এদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যার সমস্যা। অর্থাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যা কথাটার কোনো অর্থই থাকে না, যদি মাথাপিছু আয় এবং প্রান্তিক আয়ের কথা মনে না রাখি। শিল্পায়ন যথেষ্ট দ্রুত হলে ভারতবর্ষে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলে কোনো কথাই থাকবে না হয়তো। তাহলে কৃষির ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার প্রধান অংশটিকে খুঁজে পাচ্ছি। শিল্প এবং শিল্প-সংশ্লিষ্ট পেশা-গুলির দ্রুত স্বাভাবিক বৃদ্ধি এই উদ্বৃত্তকে টেনে নিতে পারে। পুঁজির নির্বিশেষ ঘাটতির জন্য এদেশের শিল্পায়ন দ্রুতগতি হতে পারছে না। এ অবস্থায় অর্থনীতিবিদরা কোথাও কোনো প্রচ্ছন্ন পুঁজির উৎস আছে কিনা, তাই ভেবে চলেছেন। এই রকম ভাবতে ভাবতেই র‍্যাগ্নার নুর্কসে এক ফন্দি বাতলেছেন। তিনি বলেছেন, উদ্বৃত্ত কৃষি-জনতাকে এনে নানারকম শিল্পকর্মে নিযুক্ত করে নাও। তাদের জন্যে দরকার খাদ্য। এক কাজ কর। কৃষিক্ষেত্রে পরগাছা হয়ে থেকে তারা যা খাচ্ছিল, তাই সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে তাদের দাও। কৃষিতে যারা থাকল তাদের জীবনের মান এই মুহূর্তে বাড়তে দিলাম না ঠিকই, কিন্তু যারা শিল্পের ক্ষেত্রে চলে এল, তাদের সাহায্যে দেশের শিল্পোৎপাদন ক্রমে বেড়ে চললে শিল্পক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধি আসবে (অর্থাৎ মাথাপিছু আয় বাড়বে) তার ফলে কৃষির উপর চাপ ক্রমেই কমে আসবে। আর শিল্পের প্রসারের সংগে সংগে কৃষিদ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়বে, মাথাপিছু কৃষি-আয় বাড়বে। নুর্কসে এই উপায়ের মধ্যে খাদ্যকে প্রচ্ছন্ন পুঁজির রূপে আবিষ্কার করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক উল্লেখযোগ্য পন্থার প্রস্তাব দিয়েছেন।




### বিবর্তনবাদের শতবার্ষিকী

॥ ১ ॥

**মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,**—গত ৯ই আগস্টের দেশ পত্রিকায় বিবর্তনবাদের শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে বিবর্তনবাদের ধারণার মৌলিকত্ব বিষয়ে শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, খৃস্টজন্মের আগে গ্রীক দার্শনিক এমপিডোক্লিস ও অ্যারিস্টটলের চিন্তার কথা। এর জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। কারণ মূলের তিনি মূল্য দিয়েছেন। ডারুইনের চিন্তাধারার অগ্রদূত হিসাবে লেখক যদি মহাকবি গ্যেটের 'উদ্ভিদের রূপান্তর' বিষয়ক বিবর্তনবাদকে স্বীকার করতেন, তা হলে প্রবন্ধটি আরও পূর্ণ হত। মহাকবি গ্যেটের উদ্ভিদের রূপান্তর আবিষ্ক্রিয়া বিবর্তনবাদের প্রথম স্বাক্ষর। তা ছাড়া বিবর্তনবাদকে প্রতিপাদ্য করেই গ্যেটে মানুষের ডান চোয়ালের হাড় আবিষ্কার করেন, যা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান। এ দুটি গ্যেটের মৌলিক দান। উদ্ভিদের রূপান্তর ও বিবর্তনবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানী Oken-এর নামও জড়িত। কারণ গ্যেটেও Oken বিজ্ঞানের এক সত্যকে ভিন্ন পথ ধরে গিয়েও অনুধাবন করেছিলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা। মহাকবি গ্যেটের বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মহাকবি নন, বিজ্ঞানীও বটে। লেখক প্রবন্ধটি পরিশ্রম করে লিখেছেন, সেই কারণে গ্যেটের নাম আশা করেছিলাম। বিবর্তনবাদে গ্যেটের নাম ডারুইনের অগ্রদূত হিসাবে উল্লেখ করা উচিত, নমস্কার, ইতি—শ্যামাদাস সেনগুপ্ত।

### লেখকের জবাব

**শ্রদ্ধাস্পদেষু,**—পত্রলেখক শ্যামাদাস সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার সামান্যতম মতান্তর নেই। মহাকবি গায়টের স্থান বিজ্ঞানী হিসেবেও অনুপেক্ষনীয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'জার্মান সোসাইটি অফ কোনিকসবার্গ'এর সভায় বক্তৃতা কালে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হেক্‌বহোজ যে উক্তি করেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "যে মননশক্তির বলে গ্যেটে প্রকৃতি এবং মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাবলী অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রাণোন্ময়তার সঙ্গে বিধৃত করতে পেরেছিলেন, সেই মননশক্তিই তাঁকে টেনে এনেছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানের দিকে। এখানেও তিনি অপরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেই তৃপ্ত হতে পারেননি, তাঁর সৃষ্টিশীল মনের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী আপন বৈশিষ্ট্য ভাস্বর এক স্বতন্ত্র পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কর্মশক্তিকে কেবল বর্ণনামূলক বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, নিয়োজিত করেছিলেন পরীক্ষামূলক গবেষণায়ও।"

বিবর্তনের ব্যাখ্যায় ডারুইনের পূর্বসূরী হিসেবে গায়টের উদ্ভিদের রূপান্তর এবং মানুষের চোয়ালের ঊর্ধ্ব হনু সংযোগ অস্থি' (Intermaxillary bone)'র আবিষ্কার সত্যি এক মূল্যবান অবদান। গায়টে উপলব্ধি করেছিলেন, বিভিন্ন প্রাণীর শারীর সংস্থানে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তা একেই মূল অবস্থা থেকে ক্রম-পরিবর্তনের ফল। এই পরিবর্তনের কারণ স্বভাব, জলবায়ু এবং খাদ্যের তারতম্য। গায়টের এই উপলব্ধির সূচনা হয় মানুষের চোয়ালে ঊর্ধ্ব হনু সংযোগ অস্থি'র চিহ্ন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই বিষয়ে তিনি ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমরা জানি, অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর ওপরের চোয়ালে দুটি করে হাড় থাকে। একটার নাম 'আপার জ বোন', অন্যটার নাম 'ইণ্টারম্যাক্সিলারী বোন'। কিন্তু মানুষের ওপরের চোয়ালে দ্বিতীয়টি অনুপস্থিত। গায়টে প্রমাণ করলেন, মানুষের ঊর্ধ্বহনু সংযোগ অস্থি না থাকলেও তার চোয়ালে এর অস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। সুতরাং কোন এক দূর-অতীতে সেও নিশ্চয় এই বিশেষ অস্থিটির অধিকারী ছিল। অন্যান্য পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের চোয়ালের গঠনের

এই যোগসূত্রের সন্ধানলাভ বিবর্তনতত্ত্বের পথকে অনেক মসৃণ করে দিয়েছে—একথা অনস্বীকার্য। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে (অথবা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে?) প্রকাশিত 'স্কেচ অফ এ জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন টু কম্প্যারেটিভ অ্যানাটমি' গ্রন্থে তিনি এই বিষয় আরও বিশদভাবে আলোচনা করেন। এ ছাড়া গায়টের বর্ণতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাও উল্লেখের দাবী রাখে।

গায়টের প্রসঙ্গ যখন তোলা হল, তখন আমার প্রবন্ধে অনুল্লেখিত আরও কয়েক জনের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এ'দের মধ্যে খৃষ্টপূর্বকালের অ্যানাক্জিমেনডার, ডেমোক্রিটাস, লুক্রেসিয়াস এবং খৃষ্টজন্মোত্তরকালের বাফন, ট্রেভিরেনাস, হেউর, ক্যাম্পার প্রভৃতি প্রধান। এর মধ্যে কয়েকজনের বিবর্তন বিষয়ক চিন্তাধারার পরিচয় খুব সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করব।

অ্যানাক্জিমেনডার॥ তিনি কল্পনা করেছিলেন, মানুষ অতীতে মাছের মত কোন এক পর্যায়ে ছিল। বহুকাল পরে ক্যাম্পারও অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন।

লুক্রেসিয়াস॥ জীবমাত্রই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত, এ ধারণা তাঁর ছিল। তাই লিখেছিলেন, 'পৃথিবীকে যে মা বলা হয়, তা সুসংগত। কারণ মাটি থেকেই সব কিছুর জন্ম।...যেসব প্রাণীর প্রকৃতি দত্ত আত্মরক্ষা-শক্তি নেই, অথবা যারা সেবার পরিবর্তে মানুষের কাছ থেকে আহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধে আদায় করে নেবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, তারা অন্যের শিকারে পরিণত হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়; যতদিন না সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাফন॥ বাফনের চিন্তাধারাকে একজন লেখক সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেছেন এই-ভাবে—

He had a special theory of heredity unlike Darwin's and a by no means narrow theory of evolu--tion in which he recognised the struggle for existence and the elimination of the unfit, the Influence of isolation and artificial selection....direct action of food and other surrounding influence......

বিবর্তনতত্ত্বের আলোচনায় শুধু ডারুইনের ওপর আলোকপাতই যথেষ্ট নয়, তাঁর পূর্বসূরীদের স্বীকৃতিদানও প্রয়োজনীয়, এবিষয়ে শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। অধ্যাপক আর্থার থমসনও লিখেছেন, 'যিনি বিবর্তনতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করছেন,...তাকে মনে রাখতে হবে আরও অনেকের কথা। যেমন ট্রেভিরেনাস..., জিওফ্রে সেণ্ট হিলারী..., গ্যয়টে..., ওকেন... এবং আরও অনেকে, যাঁদের কল্পনায় বিবর্তনতত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত না হলেও কুঁড়ি হয়ে ফুটে উঠেছিল।' তবু এ'দের আলোচনা আমার প্রবন্ধের আওতা থেকে দূরে রেখেছিলাম প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত আমার উপজীব্য বিষয় ছিল ডারুইনের বিবর্তনবাদ এবং সমসাময়িক কালের ওপর তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়ত রচনার পরিসর সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত করতে আমার অনিচ্ছা।

সবশেষে আর একটি কথা বলতে চাই। ডারুইনের তত্ত্ব প্রচারিত হবার পর তা কি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল সে দৃষ্টান্ত আমার প্রবন্ধে একটি দিয়েছি। কিন্তু সেখানে বিদ্বেষের উৎস ছিল ধর্মযাজকের অন্ধতা। অথচ অনেক গুণীজনও যে গোঁড়ামিবশত তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি, এও বাস্তব সত্য। সম্প্রতি স্যামুয়েল বাট্‌লারের একটি উক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। তাতে তিনি বিবর্তনবাদকে শ্লেষ করে লিখেছেন, 'বাফন চারা গাছ পুঁতলেন, ইরাজ্‌মাস্‌, ডারুইন এবং ল্যামার্ক তাতে জলসিঞ্চন করলেন, আর ডারুইন ফলটি পেকেছে বলে তা গাছ থেকে আহরণ করে সাদরে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করলেন।... ডারুইন একটি উপেক্ষিত বিশ্বাসের উত্তরাধিকার বহন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন একটি স্বীকৃত ভ্রান্তিতে।'

শ্যামাদাসবাবুর চিঠি এইসব আলোচনার সুযোগ টেনে আনল। সেজন্য তাঁকে আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই। নমস্কারান্তে অশোক মুখোপাধ্যায়।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

গত ৯ই আগস্টের 'দেশ' সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় লিখিত "বিবর্তনবাদের শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে" পড়ে বিশেষ প্রীত হলাম। ঠিক একশ বছর আগে Darwin সাহেবের বিশ্বপরিক্রমা ও "বিবর্তনবাদ" প্রচার পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

"সংকীর্ণতাকে ডারুইন কোনদিন প্রশ্রয় দেননি"—এই লাইনটি পড়ে ডারউইন সাহেবের জীবনের একটি ঘটনা এবং সেই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ম্যাক্স মুলারের মন্তব্য মনে পড়ে গেল। ডারউইন সাহেব তাঁর অপ্রচুর অভিজ্ঞতা থেকেই Tierra Del Fuegoর আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন,

"Viewing such men, one can hardly believe that they are fellow creatures and inhabitants of the same world"

ক্যাপ্টেন পার্কার স্নো তাঁর "Two Years Cruise off Tiérra Del Fuego" পুস্তকে ঐ জাতির সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ডারউইন-এর উক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। নিরহংকার ডারউইন Fuegian জাতির ভাষা ও সমাজ-ব্যবস্থাগত উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অবগত হয়ে ক্যাপ্টেনকে লেখেন,

"You saw so much more of the natives than I did that wherever we differ, you probably are in the right. I took a very erroneous view of the native & capabilities of the Fuegians"

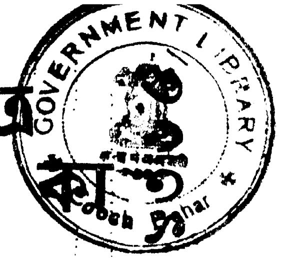
(Kent, Nov. 22, 1881).

ডারউইন-এর নিরহংকার সত্যদিদৃক্ষায় সমসাময়িক পণ্ডিতগণ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে যেতেন। ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে রয়াল ইনস্টিটিউট (লণ্ডন) প্রদত্ত এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ম্যাক্স মুলার উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন,

"That is what I call Darwinism-love of truth, not of self or system. It is the heart that makes the true man of science ,not the brain only."

ইতি—ভবদীয়
অরুণকুমার বিশ্বাস
কলিকাতা

# শারদীয়া  পত্রিকা




## প্রকাশিত হল

**রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী**

পরশুরামের অসামান্য সরস রচনা **চমৎকুমারী**

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রঙিন চিত্র ও স্কেচ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নজরুল-স্মৃতিকথা শিবরাম চক্রবর্তীর সাহিত্য-জীবনের আত্মস্মৃতি

**গল্প**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রমথনাথ বিশী
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বনফুল
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিমল কর
মনোজ বসু
রমাপদ চৌধুরী
সতীনাথ ভাদুড়ী
সন্তোষকুমার ঘোষ
সমরেশ বসু
সরলাবালা সরকার
সরোজকুমার রায় চৌধুরী
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সুশীল রায়
সৈয়দ মুজতবা আলী
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বিমল মিত্রের বড় গল্প **বেনারসী**

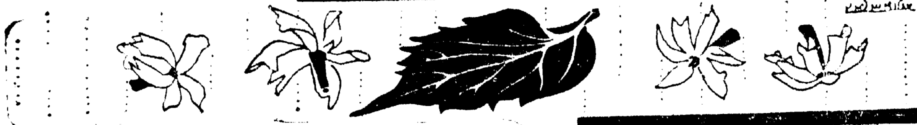
**কবিতা**

অজিত দত্ত, অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, আরতি দাস, উৎপলকুমার বসু, উমা দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পরিমলকুমার ঘোষ, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, মণীশ ঘটক, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র।

**প্রবন্ধ**

| | |
|---|---|
| **বাংলা মঞ্চের অভিনয়-ধারা** | অহীন্দ্র চৌধুরী |
| **শারদোৎসবের জন্মকথা** | ক্ষিতিমোহন সেন |
| **জার্মান সাহিত্যে ভারত** | চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| **ভারতের আদি-মানব ও তুষার যুগ** | ধরণী সেন |
| **বাংলা চিত্রের গতি-প্রকৃতি** | পঙ্কজ দত্ত |
| **বাঙালীর দেবী দুর্গা** | বঙ্কিমচন্দ্র সেন |
| **গণিতের দুঃখ** | বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় |
| **গায়ানার জঙ্গলে** | ব্রজমাধব ভট্টাচার্য |
| **বাংলা নাট্যধারার পথ নিরূপণ** | শম্ভু মিত্র |
| **বাংলা কমিউনিস্ট সাহিত্য সম্বন্ধে দু চারটি কথা** | শশিভূষণ দাশগুপ্ত |
| **ভারতীয় লোক-নৃত্য** | শান্তিদেব ঘোষ |
| **বিনোদবিহারীর চিত্রকল্প** | শুভময় ঘোষ |

মূল্য : তিন টাকা — সডাক ৩.৫৮ নয়া পয়সা, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১





# ঘটোৎকচ

## আনন্দকিশোর মুন্সী

মিঃ াজ কর্মকারের আসল নামটি যে শ্রীঘটোৎকচ কর্মকার আগে কখনও ভাবিনি। আমি ওকে মিঃ কর্মকার বলেই জানি; গত তিনটি বছর ধরে।

যেদিন ওকে প্রথম দেখি, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল লোকটা অতি দাম্ভিক এবং চালবাজ। ওর কথাবার্তা পোশাক এবং চলাফেরা সব কিছুর মধ্যেই ঐ উশ্ধত ভাবটি ফুটে উঠেছিল। আমার মোটেই তা ভাল লাগে নি।

এই ভাল না লাগার আরও একটি কারণ ছিল; সেটি অতি গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত।

আজ প্রায় বছর বারো হল, আমি একটি অধ্যাপকের গৃহ চিকিৎসক। যখনি কারু অসুখ বিসুখ হয় আমার সেখানে ডাক পড়ে। জরুরী কোন দরকার হলে যদি আমাকে দৈবাৎ কখনও পাওয়া না যায় তাহলে অবশ্য হাতের কাছে যে ডাক্তার থাকে তাকেই তাঁরা ডেকে দেখান। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমার বাড়িতে খবর দেওয়া থাকে, বাড়ি ফিরলেই যেন সোজা ওখানে যাই। কাজেই ঐ পরিবারের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা আমিই করে আসছি আজ বারো বছর ধরে।

এই অধ্যাপকের বাড়িতেই একদিন ঘটোৎকচের সংগে অর্থাৎ মিঃ কর্মকারের সংগে আমার পরিচয় হল। অধ্যাপকের দশ বছরের মেয়েটির সেদিন জ্বর এবং রক্ত-আমাশা। ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি।

মেয়েটিকে দেখে ব্যবস্থাদি দিয়ে যেই উঠব সে ভাবছি, এমনি সময়ে আমার চেয়েও কালো একটি লোক ঘরে ঢুকল। টিপ টপ সাহেবী পোশাক পরা। বছর চল্লিশ বয়েস।

অধ্যাপক পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনিই মিঃ কর্মকার, এনজিনিয়ার। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন।

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছি; হাতে ব্যাগ। ব্যাগটা টেবিলে রেখে হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। একটু হাসলামও।

কর্মকার কিন্তু হাসল না। শুধু বলল, গুড ইভনিং।

তারপর যা ঘটল তাইতেই আমি ওর ওপর চটে গেলাম। কর্মকার বার কয়েক আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল। মনে হল আমার পোশাক অর্থাৎ বুশ শার্ট প্যাণ্ট আর কাবুলী চটি দেখে ওর ঘৃণা হল। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞাভরে মুখ ঘুরিয়ে অধ্যাপকের সংগে আলাপ শুরু করল।

জিজ্ঞাসা করল, কি অসুখ?

অধ্যাপক বললেন ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ কোথাও সাপ দেখলে লোকে যেমন চমকে ওঠে, কর্মকারও তেমনি যেন লাফিয়ে উঠল। বলল, কি সর্বনাশ! ওতো সাংঘাতিক ইনফেকসাস। ঘরে লাইজল আছে? কিংবা ডেটল? একটা ছোট গামলার মধ্যে লাইজল কিংবা ডেটল জলে গুলে রেখে দিন। সব সময়ে তাতে হাত ডুবিয়ে নেবেন। স্টুলটা পরীক্ষা করানো হয়েছে? না যদি হয়ে থাকে বলুন আমি ফোন করে দিচ্ছি এক্ষুনি ল্যাবোরেটরী থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে।

অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তো ডাক্তারবাবু রয়েছেন। যা দরকার ইনিই সব করে দেবেন। আপনি চলুন, ওঘরে গিয়ে বসবেন। এক কাপ চা খান। কর্মকার নড়ল না। বলল, না না মেয়েটার এমন সাংঘাতিক অসুখ এখন চা খাব কি?

এই বলে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, এটা যে কিরকম কঠিন রোগ, কত বেশী ইনফেকসাস, এঁদের তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কি? খাবার জল ফুটিয়ে খেতে বলেছেন?

আমি ব্যাগটি হাতে তুলে বেরুবার মতলব করে শুধু বললাম, যা প্রয়োজন তা বলেছি বৈকি!

কর্মকার বলল এইরকম কঠিন অসুখে বড় একজন ফিজিসিয়ান না ডেকে আপনি নিজের ওপর কেন এই ঝুঁকি নিচ্ছেন?

লোকটার প্রতি ক্রমশ আমার রাগ হচ্ছিল। তবু হাসিমুখেই বললাম, চিকিৎসকের কাজই তো ঝুঁকি নেওয়া। না নিলে চলবে কেন? তবে আপনি যদি নিজে ঐ ঝুঁকি নিতে চান, বেশ তো নিন না।

তারপর কর্মকারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অধ্যাপককে বলেছিলাম আপনি ভয় পাবেন না। অষুধটা ঠিক মত খাইয়ে যান দু-ঘণ্টা অন্তর। দেখবেন কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবে।

মনে আছে অধ্যাপক সিঁড়ি দিয়ে সেদিন আমার সংগে নিচে নেমে এসেছিলেন; কর্মকারকে ঘরে বসিয়ে রেখে। বলেছিলেন, ঐ ভদ্রলোক অমনি কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু। যদি দরকার হয় আবার রাত্রে ডেকে পাঠাব। আসবেন কিন্তু দয়া করে।

সেই থেকে কর্মকারের ওপর আমি চটে-ছিলাম। লোকটা নাকি সেদিন অনেক চেষ্টা করেছিল বড় একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার এনে দেখাতে, কিন্তু অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রী রাজী হননি কিছুতেই।

অধ্যাপকের ফ্ল্যাটের পাশেই এই কর্মকারের ফ্ল্যাট। দরজার ওপর পেতলের নেম-প্লেটই দেখেছি এতদিন। কিন্তু ওর সংগে এই প্রথম পরিচয় হল।

ভাগ্যক্রমে সেবার মেয়েটা দু-একদিনের মধ্যেই সেরে উঠল। আমারও মান রক্ষা হল। কিন্তু কর্মকারের ওপর রাগ আমার গেল না।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। গভীর রাত্রে টেলিফোনের ক্রীং ক্রীং শব্দে আমার ঘুম ভেংগে গেল। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে বললাম, হ্যালো।

ওপার থেকে অধ্যাপকের ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, ডাক্তারবাবু শিগগির একবার আসুন। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের মিঃ কর্মকার হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একবার আসতে হবে এক্ষুনি দয়া করে।

কর্মকারের নাম শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আমার চিকিৎসা কি ওঁর পছন্দ হবে? ওঁর তো আবার বড় ডাক্তার চাই।

অধ্যাপক বললেন সেই ডাক্তার এখন কলকাতার বাইরে। তা ছাড়া টেলিফোন গাইড দেখে ফোন করে করে কাউকেই আর পাওয়া গেল না দেখে উনি আমাদের সাহায্য চেয়েছেন। তাই আপনাকে ডাকছি। আসুন

একটু দয়া করে। ভদ্রলোক সত্যি খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি কষ্ট?

অধ্যাপক বললেন, পেটে সাংঘাতিক ব্যথা। মনে হয় যেন শূল ব্যথা। কলিকটালিক কিছু হবে বোধহয়।

এত রাত্রে ব্যথায় অস্থির হয়ে কর্মকার যখন আমার মত ছোট ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে, মনে হল ব্যাপার নিশ্চয়ই সহজ নয়।

বললাম, ওঁর তো গাড়ি আছে। ওটা তাহলে পাঠিয়ে দিন। আমি ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিই।

অধ্যাপক বললেন, গাড়ি তো আছে কিন্তু ড্রাইভার নেই। সে আসবে কাল সকালে। আপনি একটা ট্যাক্সি নিয়েই চলে আসুন।

ট্যাক্সি নিয়ে যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত দুটো।

গড়িয়াহাট রোডের কাছে সাউথ-এণ্ড-পার্কে নতুন যে তিনতলা বাড়িটা হয়েছে তারই দোতলার একটি ফ্ল্যাটে এই অধ্যাপকের বাসা; পাশের ফ্ল্যাট কর্মকারের।

সমস্ত পাড়াটা তখন নিঝুম। কোনও ঘরে আলো নেই। শুধু এই বাড়িতে দুটি ফ্ল্যাটে ঘরে ঘরে আলো।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই অধ্যাপক দোতলার বারান্দা থেকে বললেন, এই যে আপনি এসে গেছেন। সোজা ওপরে উঠে আসুন।

দোতলায় উঠতেই দেখলাম, সিঁড়ির মুখে অধ্যাপক দাঁড়িয়ে। আমার ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, আসুন এই ঘরে।

অধ্যাপকের পিছু পিছু কর্মকারের ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। দুটি মাত্র ঘর। প্রথমটি বসবার। ভেতরটি শোবার। লাগাও বাথরুম। সাহেবী কায়দায় ঘর সাজানো কোথাও কোন আবর্জনা নেই। কোন কিছু অগোছালো নেই।

শোবার ঘরে কর্মকার খাটে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। উর্দি পরা একটা বেয়ারা ওর হাত পা টিপে দিচ্ছে। আমাকে দেখেই কর্মকার বলল, এই যে ডাক্তারবাবু! দয়া করে এক্ষুনি একটা পেথিডিন ইনজেকশন দিয়ে দিন। ড্রেসিং টেবিলের ঐ ড্রয়ারের ভেতর আছে। আমি আর পারছি না।

এই বলে কর্মকার গোঙাতে শুরু করল।

সেদিনকার ঐ উদ্ধত গর্বিত কর্মকারের আজ অসহায় এই অবস্থা দেখব, কখনও ভাবিনি।

ঘরদোর পরিপাটি করে সাজানো। ওর নিজেরও গায়ে ধবধবে পাটভাঙা স্লিপিং স্যুট। খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানার চাদর এবং বালিস। ঘরে গন্ধ দ্রব্যের মৃদু সুরভি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম ব্যথা আপনার মাঝে মাঝে হয় নাকি?

কর্মকার বলল, মাস কয়েক আগে একবার হয়েছিল। পেথিডিন নিয়ে কমে যায়।

সেই সময়েই একবাক্স পেথিডিন কেনা হয়েছিল, দেখুন ঐ ড্রয়ারে আছে।

বললাম, আগে আপনার পেটটা একবার দেখি তারপর ইনজেকসন দেব।

কর্মকারের তা পছন্দ হল না। বিরক্ত অপ্রসন্নমুখে স্লিপিং স্যুটের জামার বোতাম খুলে বলল, দেখুন। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমি আর সইতে পারছি না।

এই বলে খামোখা ওর বেয়ারাকে একটা ধমক দিল। বেচারা ওর পা টিপছিল খাটের পাশে মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে।

কর্মকার বলে উঠল, ভাগো হিঁয়াসে উল্লু কাঁহাকা। দেরাজমে 'সাঁইকা দাবাই নিকালো জলদি!

বুঝলাম, এই গালাগালি ছোঁড়া হল, আসলে আমারই প্রতি। ইনজেকশনের দেরী আর ওর সইছে না। বেচারা কষ্ট পাচ্ছে ঠিক, কিন্তু ওতো জানে না রুগী পরীক্ষা না করে কোন ডাক্তারই এসব ইনজেকশন দেয় না। দিতে পারে না।

তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে স্টেথোস্কোপ বার করে বুকে পেটে বসালাম। পেট দেখে নাড়ীতে হাত দিলাম। মনে হল, এটা যেন পিত্তশূল। গলব্লাডারের ব্যথা, কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়।

তারপর ব্লাডপ্রেসার দেখবার জন্য ওর জামার হাতাটা গোটাতে গিয়েই ওর নাম যে ঘটোৎকচ তা জেনে গেলাম! কনুই এর নিচে হাতের ওপর লাল এবং কালো রঙ দিয়ে লেখা একটা উল্কি। তাতে লেখা, শ্রীঘটোৎকচ কর্মকার।

পিত্তশূলের ব্যথা একবার খুব জোরে এসে কমে যায়। পরে আবার হয়। কিন্তু ওর ব্যথা দেখলাম কমে না। যতক্ষণ ওকে আমি পরীক্ষা করলাম ও সমানে গোঙাতে লাগল।

অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি দেখছি ইচ্ছে করেই আজ আমাকে ভোগাচ্ছেন। ইনজেকশন দেবেন না?

বললাম, এক্ষুনি দিচ্ছি।

এই বলে ব্যাগ থেকে ছোট সিরিঞ্জটা বার করে তাড়াতাড়ি স্টেরিলাইজ্‌ড করে নিলাম। আমাকে অন্য একটা আমপ্যুল ভেঙে সিরিঞ্জে ভরতে দেখে কর্মকার বলে উঠল, সেকি? আপনি পেথিডিন দেবেন না? ওটা কি দিচ্ছেন?

বললাম, আট্রোপিন দিচ্ছি এতেই আপনার ব্যথা কমে যাবে।

কর্মকার বলল, ডাঃ বটব্যাল কিন্তু সেবার পেথিডিন দিয়েছিলেন। জানেন তো তিনি কত বড় ডাক্তার। কত বড় স্পেশ্যালিস্ট।

বললাম, সেবার তিনি দিয়েছিলেন ঠিক। কিন্তু এবার দেখলে হয়ত দিতেন না। দেখুন না, এইতেই আপনার ব্যথা কমে যাবে।

কর্মকার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কিন্তু যদি না কমে?

বললাম, ব্যথা না কমিয়ে আমি উঠব না। এখন নিন তো দেখি তাড়াতাড়ি।

ইনজেকশন করে দিলাম। ব্যাগ থেকে একটা লারগ্যাকটিল বার করে বললাম, এক্ষুনি এটা খেয়ে ফেলুন।

কর্মকার অষুধ খেল। কিন্তু এ সবে কিছু হবে তা ওর বিশ্বাস হল না মিনিট পনেরো কুড়ি ধরে বকর বকর করে, ব্যথা মোটেই কিছু কমছে না বলে আফসোস করে অবশেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যাপক এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। ওকে ঘুমুতে দেখে ফিসফিস করে বললেন, চলুন আমরা ওঘরে যাই।

এ ঘরে এসে অধ্যাপক বললেন ভদ্রলোক একা থাকেন তার ওপর এই অসুখ। কোন ভয়টয় নেই তো?

বললাম, ভয়ের তো কিছু দেখছি না। তবে ও'কে একটু সাবধানে থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়া নিয়ম মত করতে হবে।

অধ্যাপক বললেন, সে কাল আপনি একবার এসে ও'কে সব বুঝিয়ে বলবেন। সকালেই আপনাকে ফোন করব।

পরদিন কর্মকার নিজেই টেলিফোন করল। বলল, নমস্কার স্যার। ব্যথা একদম নেই। চা খেতে পারি? কখন আসবেন?

দেখলাম একদিনেই কর্মকারের গলা বেশ নরম হয়েছে। বললাম, পাতলা করে চা খান। ঘণ্টা খানেক পরে আমি যাচ্ছি। গিয়ে দেখলাম, কর্মকার দাড়ি গোঁফ কামিয়ে স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে বসে আছে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে।

আমি ঢুকতেই উঠে এসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। হেসে বলল, বসুন। বলুন কি খাবেন? চা না কফি?

বললাম, এই মাত্র চা খেয়ে আসছি, কাজেই ওসব কিছুই এখন চলবে না।

কর্মকার শুনল না। কফির অর্ডার দিল।

তারপর বলল, এইবারে বলুন আমার কি রোগ এবং কি কি করতে হবে।

পরীক্ষা করে দেখলাম, ব্যথা এখন বিশেষ কিছুই নেই। কাজেই সে রকম কঠিন কোন অসুখ নয়।

বললাম, এটা তো গল ব্লাডার বলেই মনে হচ্ছে। কিছুদিন ওষুধ খান আর ভাজাভুজি খাওয়াটা বন্ধ রাখুন। পরে দরকার হলে এক্সরে করা যাবে।

কর্মকার বলল, বেশ আপনি যা বলবেন তাই হবে কিন্তু বড় একজন স্পেশ্যালিস্ট দেখিয়ে রাখা কি ভাল নয়?

বললাম, নিশ্চয়ই ভাল। কাকে দেখাতে চান?

কর্মকার বড় একজন প্রফেসরের নাম বলল। তক্ষুনি আমি রাজী হয়ে বললাম, খুবই ভাল হবে ও'কে দেখালে। আগে এই রকম একজন বড় ফিজিশিয়ান দেখান, তার পর একজন সার্জন।

কর্মকার খুশি হয়ে বলল, তাহলে আপনিই সব ব্যবস্থা করুন।

সেই থেকেই আমি কর্মকারের গৃহ

চিকিৎসক। যতবার যাই আটটি করে টাকা দর্শনী পাই। তাছাড়া ও বলেছে আমাকে ওর অফিসের ডাক্তার করে দেবে। কাজেই ওকে এখন আর তত খারাপ লাগে না।



একদিন কর্মকার বলল, ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করে। মাথার পেছনে ব্যথা হয়। হার্টএ কোন দোষ হল না তো? না কি ব্লাড প্রেসার?

পরীক্ষা করে কোন দোষ পেলাম না। তবু একটা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করিয়ে দিলাম। স্পেশালিস্ট দেখালাম।

অনেকদিন থেকেই বলব বলব ভাবছিলাম। সেদিন স্পষ্ট করেই বলে ফেললাম।

বললাম, আপনার এ অসুখ কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে সারবে না। এ সারাতে হলে আপনাকে বিয়ে করতে হবে। একা থাকলে চলবে না।

একটু হেসে কর্মকার বলল, বিয়ে করেই তো রোগে ধরেছে।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম সে কি? আপনি আবার বিয়ে করলেন কবে?

কর্মকার বলল, তিন বছর আগে। কোর্টশিপ করে তিন আইনে রেজিস্টারী করে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু টিকল না। ঝগড়া হয়ে শেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কি নিয়ে এই ঝগড়া শুনবেন?

এই বলে কর্মকার ওর সার্টের আস্তিন গুটিয়ে হাতের ওপর নাম লেখা উল্কিটা দেখাল।

বলল, আমার স্ত্রী এই উল্কিটি আর সইতে পারলেন না। অথচ দেখুন, আমি জাতে কর্মকার নামও তেমনি ঘটোৎকচ তাতে কিছু হল না কিন্তু উনি জেদ ধরলেন প্লাস্টিক সার্জারী করে এই উল্কিটি তুলে ফেলতে হবে। তিনি নিজে বামুনের মেয়ে। অনায়াসে বলে দিলেন, ঐ উল্কি দিয়ে আমার গায়ে নাকি দেগে দেওয়া হয়েছে আমি ছোট জাত, ছোট লোক। বাস, অমনি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বলুন আপনি, কিছু অন্যায় করেছি?

এ কথার আর কি জবাব দেব? বিচিত্র মানুষের মন। তার চেয়েও বিচিত্র তার স্বভাব।

বললাম, ছাড়াছাড়ি না হয় হয়েছে কিন্তু আবার মিলতে বাধা কি! এতো সামান্য ব্যাপার।

কর্মকার বলল, শুধু ছাড়াছাড়ি নয়। ডিভোর্স পর্যন্ত হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেছেন। ছ'মাস হল।

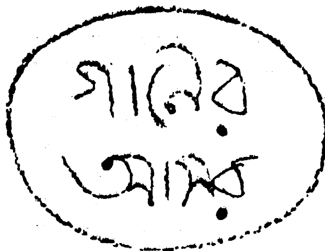
মনে পড়ল, ছ মাস আগেই কর্মকারের পেটে ব্যথা হয়েছিল, রাত্রে আমি প্রথম ওকে দেখতে এসেছিলাম।

বললাম, তাহলে তো ভালোই হয়েছে। ওসব ঝামেলা মিটে গেছে। এইবার আপনিও একটা বিয়ে করে ফেলুন।

কর্মকার বলল, ডিভোর্সের পরেই আমি বিয়ে করতে পারতাম দু বছর আগে। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, আমার স্ত্রী যতদিন বিয়ে না করেন আমি অপেক্ষা করব। ছ'মাস আগে ও'র বিয়ে হয়েছে, এইবার আমি ফ্রি। তাই ঠিক করেছি বিয়ে আমি করবই। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে বললাম, কি?

কর্মকার বলল, একজন প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে হাতের এই উল্কিটা আগে উঠিয়ে দিন।




**শাঙ্গর্দেব**

**রবীন্দ্রসংগীতে হিন্দী রূপায়ণ**

রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ভারতের সর্বত্র হওয়া প্রয়োজন কিন্তু এই পরিচয় সাধনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেটা কতখানি সমীচীন সে সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজকাল মাঝে মাঝে বেতার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে হিন্দীতে ভাষান্তরিত রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হয়ে থাকে—এই প্রয়াস মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সন্দেহ নেই কিন্তু এই হিন্দী রবীন্দ্রসংগীতে মূল রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিফলন সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে ঘটে কি না সন্দেহ। বরঞ্চ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, অনেক সময় এতে রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য আদৌ রক্ষিত হয় না। আমাদের মনে হয় বেতার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসংগীতের হিন্দী রূপায়ণে যতটা মগ্ন তার সংগীতরসের সংরক্ষণে ততটা মগ্ন নন। এদিকটা গভীরভাবে ভেবে দেখলে এই প্রচেষ্টায় তাঁরা হয়ত খুব উৎসাহিত হতেন না।

আমরা অন্তত দুটি বেতারানুষ্ঠান শুনেছি—যে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে হিন্দীতে ভাষান্তরিত করে মূল সুরটি রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবারই মনে হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের চেহারা অনেকখানি পালটে গেছে তার বৈশিষ্ট্য একটু নয় যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এই প্রয়াসের ফলে অন্যভাষাভাষীদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের সুর সম্বন্ধে একটা অসংগত ধারণার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কয়েকমাস পূর্বে যখন 'তাসের দেশ'-এর হিন্দী সংগীতরূপায়ণ শুনি তখন এ ধারণা আরো দৃঢ় হল যে, এভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য অন্যভাষায় রক্ষা করা সম্ভব নয়। 'তাসের দেশে'র অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করছি।

অনুবাদের ক্ষেত্র সাধারণতই সীমাবদ্ধ। এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় তর্জমা করবার সময় মূলরসটিকে যথাযথভাবে বজায় রাখা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার, যদিও নিপুণ প্রচেষ্টায় তর কিছুটা আস্বাদও বর্তমান থাকে কিন্তু, সংগীতে অপর একটি বস্তু এসে পড়ে যা মূল ভাষার সংগে এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে ভাষান্তরে সেই বস্তুর সেই লাবণ্য বিকশিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এই বিশ্বের সুবিপুল মানবসমাজে বিভিন্ন জাতি তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বাস করে এবং এই বৈশিষ্ট্য এত নিজস্ব যে এক জাতির পক্ষে অপর জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করা আদৌ সম্ভব নয়। সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যও ঠিক এইভাবেই ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সংগে এক বিশেষ সম্বন্ধে গ্রথিত। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে সংগীতিক রূপের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। 'তাসের দেশ'-এ রবীন্দ্রসংগীতের হিন্দীকরণে এই ব্যাপারটিই ঘটেছে এবং গানগুলি এত সাধারণ হয়ে গেছে যে তাদের রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চেনাই দায়।

●

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা গান বা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ গদ্যে করেছেন, কেননা ছন্দে অনুবাদের অসার্থকতা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। হয়তো এই অসার্থকতা উপলব্ধি করেই তিনি অপর ভারতীয় ভাষায় তাঁর গানের সুরকে আরোপ করবার পরিকল্পনা করেন নি। এমন একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার যে কেন বেতার কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে গেল বোঝা শক্ত, কেননা হিন্দী রবীন্দ্রসংগীতের অস্বাভাবিকতা সাধারণ শ্রোতার মনেও আলোড়ন তুলেছে। অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গ্রন্থন বা আখ্যানবস্তু হিন্দীতে রেখে গানগুলি বাংলায় হলেই ভাল হত এবং তাহলেই বোধহয় রবীন্দ্রসংগীতের আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠত।

কোনো বস্তুর হুবহু অনুকরণে কৃতিত্ব নেই কিন্তু তার প্রভাবে প্রতিভাবান রচয়িতা তাঁর স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি অপর একটি বস্তুর পরিকল্পনা করতে পারেন তবে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে এবং গৌরবও আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে হিন্দী বা বিভিন্ন ভাষার গান ভেঙে বহু গান রচনা করেছেন কিন্তু সেগুলিকে অনুকরণ বলে চিহ্নিত করার কোন সুযোগ তিনি রাখেন নি, কেননা তাঁর স্বকীয়তাও সেসব সৃষ্টিতে বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে। এইভাবে বাংলার বাইরে মূল রবীন্দ্রসংগীত যত ছড়িয়ে পড়বে ততই অন্যভাষাভাষীরা তার রস গ্রহণ করে তাঁদের নিজের সংগীতে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য কতখানি গ্রহণ করা যায় তার বিচার করবেন। আমরাও এইভাবেই ইংরেজী ভাষা থেকে অনেক কিছু আহরণ করেছি কিন্তু বাংলাভাষাকে ইংরেজী বানিয়ে তোলবার চেষ্টা করি নি। এতে প্রচারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়, কেননা যে বিষয়টি প্রচার করা হচ্ছে মূলের সংগেই তার সম্বন্ধ বিকৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীত বা অন্যভাষার আঞ্চলিক সংগীত বহু বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। ভাষা এবং সুরের সূক্ষ্ম সম্বন্ধ এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এর সংগে সমানভাবে জড়িত রয়েছে উচ্চারণগত সম্পর্ক। উচ্চারণের বা একটি শব্দের একটু এদিক ওদিক হলেই সুরের আবেদন নিষ্ফল হয়ে যাবে। এছাড়া ভাষাগত গাম্ভীর্য এবং লালিত্যও কোনক্রমেই উপেক্ষার বস্তু নয়। এইরকম নানা কারণেই এক ধরনের সংগীতকে আমরা সহজে অপর ভাষায় রূপায়িত করবার প্রয়াসে অগ্রণী হতে পারি না। এই বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যই অনেক সময় অনুবাদে সক্ষম হলেও আমরা সে চেষ্টা করি না। পূজা অর্চনায় আমরা সংস্কৃত মন্ত্রই রেখে দিয়েছি, কেননা সংস্কৃতভাষার গাম্ভীর্য অন্য ভাষায় আনা সম্ভব নয়। বাংলা বা হিন্দী গানে চলতি ইংরেজী গানের সুর দেওয়া নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে ঐ অস্বাভাবিকতার জন্য, কেননা এটা ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব রবীন্দ্রসংগীত এতটা ব্যর্থতা নিয়ে হিন্দীর মত একটা দুর্বল ভাষার আশ্রয়ে অক্ষম রূপে পরিগ্রহণ করবে এটা দেখলে আমরা তীব্র বেদনা বোধ করি। আমাদের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রসংগীতের সম্যক পরিচয় প্রদান করা—সে পরিচয় যদি মূল ভাষাকে বজায় রেখেই করা যায় তাহলে কোন অসুবিধার কারণ দেখি না। উত্তর ভারতে অন্তত যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের পক্ষে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান বোঝা যে কঠিন ব্যাপার তা আমাদের আদৌ মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের রচনাকে হিন্দীতে ভাষান্তরিত করা সম্বন্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই কেননা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য সে প্রচেষ্টা সব ভাষাতেই হয়ে থাকে; কিন্তু তার মধ্যে যখন সুরের প্রশ্ন ওঠে তখনই একটা বিরাট সমস্যা দেখা দেয় যার সমাধান বেতার কর্তৃপক্ষ যেভাবে করছেন সেভাবে হতে পারে না। এই প্রচেষ্টার পরিকল্পনাতেই বিরাট ভ্রান্তি রয়ে গেছে। এমনটা সম্ভব হলে সব ভাষাতেই সব রকম সংগীতের আয়োজন করা যেত; কিন্তু সুরগত বৈষম্য এবং বৈশিষ্ট্যের বাধা দুরতিক্রম্য। অপর ভাষাভাষীদের যদি রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে কৌতূহল থাকে তবে তাঁদের মাঝখানে মূল রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হওয়াই উচিত যাতে তাঁরা বাংলাভাষার নমনীয়তা, উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য এবং লালিত্যের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এর যে প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁদের ওপর পড়বে তা তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টিকে নূতন রূপে এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত করবার পক্ষে সহায়ক হবে।

# সমুদ্র হৃদয়

প্রতিভা বসু



৫

বিধবা হবার পরে মা অনিয়মে অত্যাচারে শরীরটাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলেছিলেন। যেন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এটাই তাঁর মস্ত লড়াই। খেতেন না, শুতেন না, যখন তখন স্নান করতেন, যখন তখন অস্থির আবেগে বুকটা মাটির মধ্যে পেতে রেখে ভেসে যেতেন চোখের জলে। বারো বছরের সুলেখা চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো সেই শোক। নিজের বুকটা থেমে থাকতো। কী করলে, কী বললে যে মার একটু শান্তি হবে, ভেবে পেতো না। জ্যাঠাইমাও সমানে হা-হুতোশ করতেন মার সঙ্গে, জ্যাঠামশায় মাথায় হাত দিয়ে ঝিমিয়ে বসে থাকতেন। যেন শোকে-দুঃখে কতোই কাতর। মা নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিলেন তাঁদের সেই সহানুভূতির কাছে, যত্নের কাছে। কিন্তু সুজাতার বালিকা হৃদয়ের অন্ধকারে ঠেলে ঠেলে কী যেন একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধতে থাকলো ক্রমাগত। জ্যাঠাইমা মাকে নিয়ে নিরালা হলেই সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সাবধানে তাকিয়ে থাকতো সেখানে গিয়ে, কী ভাবতো কী দেখতো নিজেও তা জানে না। শুধু জানতো এ কান্না এঁদের মেকি, এ আদরে এদের প্রাণ নেই কোন। আর তার সেই সন্দেহ যে, কতটা সত্য সেটা জানতে তার পুরো পাঁচটা বছর কেটে গেল. এই পাঁচটা বছর সুষমাদেবী মেয়ের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না সেকথা। যখন বললেন তখন আর উপায় ছিল না কোন। জ্যাঠামশায় চালাক মানুষ, জ্যাঠাইমা সংকীর্ণচেতা। দু'জনের স্বভাবের এই মিল হয়তো তাদের পক্ষে আশীর্বাদ হয়েছিল, কিন্তু সুলেখারা তলিয়ে গেল সংসার থেকে। সুপ্রকাশবাবুর সেখানকার যা এবং যতটুকু ছিল, সবটুকু শুষে নিলেন স্বামী-স্ত্রী। লাইফ ইন্সিওরের পলিসি থেকে গায়ের গয়নাগুলো পর্যন্ত। আর তারপরেই বদলে গেল হাওয়া। সুলেখা চকিত হয়ে লক্ষ্য করলো, জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমার মুখের মিষ্টি শুকিয়ে কাঠ। মার ভেজা চোখে ভয়ের ছায়া।

শোক-তাপ ভুলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে

উঠলেন। আর সুলেখা ভাবলো এই তো স্বাভাবিক, এতদিনে মুখোশটা তবু খসলো একরকম বাঁচা গেল। আশ্রিত আর আশ্রয়-দাতা, এরকম না হলে মানাবে কেন? তবু যে কেন ভেতরে ভেতরে তাপিত হয়ে ওঠে কে জানে! নিজের ছেলেমেয়েদের সংগে জ্যাঠাইমা যখন তাদের তিন ভাই-বোনকে নির্লজ্জের মতো তফাত করেন, রাগে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। খেতে বসে নিজেদের থালা থেকে ওদের থালায় চোখ তুলে তাকাতে পারে না। একটি মাছের টুকরোকে তিন টুকরো করে অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে জ্যাঠাইমা ভাগ করে দেন তাদের তিন ভাইবোনকে—কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানদের দু'খানা মাছ না হলে স্বাস্থ্য টেঁকে না। সুলেখা নিজের মাছের টুকরোটা সাপটে ফেলে দেয় থালা থেকে। আর কিছু নয়। অসম্মানের বেদনা। ঘেন্না করে ভাত খেতে।

বাবার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় নিজে গিয়েই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন তাদের। জ্যাঠাইমা তাঁর নিজের ঘরের পাশের বড় ঘরখানাতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুলেখা বলেছিল, 'আমরা আমাদের উপরের ঘরে থাকবো না জ্যাঠাইমা?' জ্যাঠাইমা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'এখন কি আর তোর মা আমার কাছে কাছে ছাড়া থাকতে পারে? না কি শোকার্ত মানুষটাকে আমিই অত-দূরে রাখতে পারি। কটা দিন যাক, একটু শান্ত হোক, তারপর না হয় যাস। আর হারাণের আবার পরীক্ষা সামনে, একা ঘরে নিরিবিলিতে পড়ছে পড়ুক এখন।' ব্যস্ত হয়ে মা বলেছিলেন, 'না না, ও ঘরে হারাণই থাকুক।'

বলেছিলেন বটে, কিন্তু সুলেখা জানে সেটা মার মনের কথা নয়। মার মন ও ঘরেই পড়ে আছে। ওটা যে বাবার ঘর। বাবার স্মৃতিতে ভরা। ও ঘরে বাবার ছাত্র-জীবন কেটেছে। নতুন বিবাহিত জীবন কেটেছে, নতুন পিতৃত্বের আস্বাদও তিনি ও ঘরে বাস করেই উপভোগ করেছেন। ও ঘরে মা বাবার বিয়ের খাট পাতা আছে, টেবিল আছে, থাকে থাকে বই সাজানো আছে দেয়াল-র‍্যাকে। সুপ্রকাশবাবু যত-দিন বেঁচেছিলেন, ওঘর ছাড়া অন্য ঘর কল্পনাও করেন নি তিনি। তাছাড়া নির্দিষ্ট ঘর এ বাড়িতে সকলেরই ছিল। যেমন বাবার ছিল, তেমনি জ্যাঠামশায়েরও ছিল, দাদুরও ছিল। বাবা যতবার বেড়াতে এসেছেন দোতালায় নিজের ঘরে এসেই উঠেছেন, মৃত্যুর পরে তাঁর ঘর আর সুলেখাদের রইলো না। তা হোক, অভিযোগ করবার ছিল না কিছু। দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা মস্ত ঘর। এ ঘরটাতেই আগে জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা থাকতেন।

এখন তাঁদের বড় দুই মেয়ে মণি-পুণিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গেছেন দাদুর ঘরে। জানালা ঘেঁষে তাদের দুই বোনের বিছানা, এদিকটায় তারা তিন ভাইবোন আর মা। হঠাৎ একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে সে অবাক হয়ে দেখলো, সে ঘরের বাস উঠেছে তাদের। উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল এতদিনে বুঝি স্বগৃহে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। লাফিয়ে উঠে গিয়েছিল দোতালায়। কিন্তু নামতে হলো। অনেক নিচেই নামতে হল। উত্তর কোণে তিনদিক বন্ধ ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট্ট একটি গুদোমঘরে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। দুটো তক্তপোশ পেতে দরজার চৌকাঠ থেকে শুধু এক হাত ফালি জায়গা বাকী ছিল সেই ঘরের। সেই জায়গাটুকুতেই মা মেয়ে মুখোমুখি হলো। একটু হাসলেন সুষমা দেবী—এই ভালো, বেশ একা এক কোণে, নির্জনে—'

সুলেখা মার মনের কথা বুঝলো, বুঝলো পাছে এ নিয়ে তার উদ্ধত অসভ্য মেয়ে কোন গোলমাল করে, কোন অশান্তি ডেকে আনে তাই এই স্তোকবাক্য। অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত ভয়। এই অহেতুক ভয়েই তিনি গেলেন। মার উপর রাগ করেই সুলেখা আর একটা কথাও বললো না। কী বলবে? তার কতটুকু শক্তি? কতটুকু অধিকার? কিন্তু ঘর বদলে দিয়েই জ্যাঠাইমা ক্ষান্ত দিলেন না, আসল ছবির যবনিকা উঠলো ঝি তুলে দেয়ার ব্যাপার নিয়ে। সেদিনও স্কুল থেকে ফিরেই ঘটনাটা দেখলো সুলেখা। বাসনমাজা ঝি সদুর-মার সঙ্গে বচসাটা শুনে গিয়েছিল, সদুর-মা জ্বর হয়ে কামাই করেছিল দুদিন, আর সে অসুস্থতার ছাপ তার চেহারাতেই প্রকট ছিল। রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, বসে-যাওয়া কালিপড়া চোখ। তাতে কী! জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করলেন না সে কথা। করলেও ক্ষমা করলেন না। বললেন, 'ওসব ঢং-ঢাং তোমাদের জানা আছে আমার। বাজে কথা রেখে দাও। সোজা কথা হচ্ছে আমার কাজ করতে হলে কামাই চলবে না।'

সদুর মার ক্ষীণ গলা প্রায় কান্নায় পর্যবসিত হলো—'দুদিন একেবারে বেহুঁশ জ্বর ছিল মা। মাথায় যে কী যন্ত্রণা—' জ্যাঠাইমা রূঢ় গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পরের দরজায় খেটে খাও, অত সোনা বাঁধানো মাথা থাকলে চলবে কেন? যাও, খাটপালঙেকেই শুয়ে থাকো গিয়ে।'

কিন্তু সেই যাও-টা যে এই যাও এটা সে কল্পনা করতে পারেনি। অধীনস্থ মানুষের উপর জ্যাঠাইমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে একটা বেদনাভরা মন নিয়ে সে স্কুলে গিয়েছিল। সদুর-মার জন্য যে বেদনা নিজের মার জন্য অবশ্যই তার চাইতে অনেক বেশী বেদনা অনুভব করলো, যখন বেলা চারটার পড়ন্ত রোদের তীব্র তাপে দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখলো, মা একটা ভিজা গামছা মাথায় চাপিয়ে স্তূপীকৃত বাসন নিয়ে মাজতে বসেছেন। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে মেয়ের রাগী মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

সুলেখা বললো, 'তুমি বাসন মাজছো যে!'

'তুই এসে গিয়েছিস?' ভীতসন্ত্রস্ত চোখে তিনি চারদিকে তাকালেন।

'ঝি নেই?'

'দেখলিই তো সকালবেলা কেমন ঝগড়া-ঝাঁটি করে চলে গেল।'

'চলে গেল না তুলে দিলেন?'

'তুলে আবার দিতে হয় নাকি আজকাল? যা মুখরা হয়েছে সব।'

মার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুলেখা, বললো, 'তাহলে বাসন মাজার কাজে এখন বুঝি তুমিই বহাল হলে?'

'আহা, এর আবার বহালের কী আছে। নিজেদের সংসারের কাজ নিজেরা করবো, তার মধ্যে—'

'এটা তো তোমার সংসার নয়।'

'কার তবে?'

'জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমার।'

'তাঁরা কি আমার পর?'

'আপন যে নয় তার প্রমাণ তো রাতদিনই পাচ্ছো।'

সুষমা দেবী হাত ধুয়ে, কাপড়ের আঁচলে হাত মুছলেন, 'চল খেতে দিয়ে নি।'

'এক ডালা মুড়ি দেবার জন্যে বেশী তোড়জোড় না করলেও চলবে। কিন্তু আমি ভাবছি লোকের তো একটা চক্ষুলজ্জাও থাকে। এতবড় সংসারের রান্নাবান্নার ভার চাপিয়েও জ্যাঠাইমার আশ মিটলো না, এতগুলো বাসন তোমাকে দিয়েই মাজতে বসালেন?'

'কী আজে-বাজে বকছিস। তোর স্বভাবই কেবল অশান্তি করা।'

'কী শান্তিতে আছ তুমি?'

'তর্ক করিস না।'

'তর্ক তো দূরের কথা, দরকার হলে এ নিয়ে আমি আজ ঝগড়া করবো। তোমার সংগেও করবো, ওদের সংগেও করবো।'

ভাঁড়ার ঘরে বসে জ্যাঠাইমা ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার ঠিক করছিলেন। স্কুল থেকে সকলের আগে আসে বাবু আর ছোটুন। ওরা পাড়ারই একটা ছোট স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তারপর আসে সুলেখা। সংগে সংগেই আর সব এসে পড়ে। সবাই থার্ড ট্রীপ গাড়িতে আসে বলে দেরি হয়। সুলেখাদের তিন ভাই-বোনের জন্য এক ডালা মুড়ি ধরে দেন জ্যাঠাইমা, কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানদের অনেক ঝামেলা আছে খাওয়াদাওয়া নিয়ে। বোধ হয় সব শুনেই বেরিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন, 'কী বলছিস?' সুষমা দেবী জড়োসড়ো হয়ে গেলেন,—'না, না, কিছু না।'

সুলেখা উদ্ধত হয়ে বললো, 'সদুর-মা চলে গেছে বলে কি এখন থেকে বাসনগুলো আমার মাকেই মাজতে হবে?'

সোজাসুজি প্রশ্নে একটু থমকে গেলেন জ্যাঠাইমা, তারপরেই গরম হয়ে বললেন,—'কেন, হাত ক্ষয়ে যাবে?'

'আর সকলের যদি যায়, আমার মারই বা যাবে না কেন?'

সুষমা দেবী জ্যাঠাইমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'ওর কথা আপনি নেবেন না দিদি।'

'থাম তুই', জ্যাঠাইমা ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। আস্পর্ধা দিয়ে দিয়ে তো মাথাটা তুই-ই খেয়েছিস। এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না।'

কী বলবে সুলেখা, মায়ের ভীত আর্ত কাতর চেহারার দিকে তাকিয়ে সমস্ত প্রতিবাদ তার থেমে যায়।

'রেখে দে বাসন, কাউকে মাজতে হবে না। কেউ যেন আর এ সংসারে তৃণটিও না নাড়ে। যদি ঘেন্না পিত্তি বলে কিছু থাকে, তা হ'লে যেন এ সংসারের অন্নও আর কেউ ধ্বংস না করে।'

ঝাপটা মেরে জ্যাঠাইমা আবার ভাঁড়ার ঘরের দরজায় পা দিয়েছিলেন, তক্ষুনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সকলেই খেটে খায়, পায়ের উপর পা রেখে বসে শুয়ে কারো

দিন চলে না। ভাত এতো সস্তা নয়।

ভাত। ভাত। ভাত। খাওয়া খাওয়া। খাওয়া। দিন রাত জ্যাঠাইমার মুখের এই খোঁটা শুনতে শুনতে শরীরে মনে যেন শলাকা বিদ্ধ হয় সুলেখার। ছুটে তার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। গলায় কাপড় বেঁধে ফাঁসি লাগাতে ইচ্ছে করে, কুয়োর জলে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে। রুদ্ধস্বরে সুষমা দেবী বললেন, 'তুই কি আমাকে রাস্তায় বার না ক'রে ছাড়বি না?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে আবার বাসন মাজতে বসলেন। আর মায়ের উপর রাগে আপাদ মস্তক জ্বলে গেল সুলেখার।

মার মেরুদণ্ড নেই। চিরদিন কেবল সকলের পায়ের তলায় কাদা হয়েই কাটালেন। সেদিন সুলেখার সত্যিই মরে যেতে ইচ্ছে করেছিলো। মায়ের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই এই বাসনা হ'য়েছিলো তার। মনে হয়েছিলো শুধু জ্যাঠাইমার অপমান অসম্মান আর অন্যায় নয়, পৃথিবীর সব দুঃখ নেমে আসুক মানুষটার ভাগ্যে, তবু যদি কোনোদিন চোখ তুলে থাকায়, খাড়া হ'য়ে দাঁড়ায়, মুখ ফুটে দু'টো প্রতিবাদের ভাষা শোনাতে পারে কাউকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সারাজীবনেও আর মার হয়ে কোনো কথা বলবে না সে। কারো হ'য়েই বলবে না, কিন্তু তার নিজের গায়ে যদি এককণা সর্ষে পরিমাণ অন্যায়ও ছিটকে এসে পড়ে, সে একেবারে দেখে নেবে এদের।

অবশ্য সেই প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারে নি। রাখা সম্ভব ছিলো না। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল হারাণদার সঙ্গে। দোতলার ঘর থেকে নাকি হারাণ জানালায় দাঁড়িয়ে আর কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে তার কাকিমাকেই সিগেরেট ধরাবার জন্য রান্নাঘরের দেশলাইটা আর এক গ্লাস জল উপরে দিয়ে আসতে বলেছিলো। নিবারণ বাবু খেতে বসেছিলেন, তাঁকে ভাত দিতে ব্যস্ত ছিলেন মা, হুকুমটা তখুনি তামিল করতে পারেন নি তিনি। মেজাজ বিগড়ে গেল হারাণদার। লম্ফ ঝম্পের সীমা রইলো না। উপর থেকেই সে চেঁচিয়ে গালাগালি ক'রে পাড়া মাত করলো। জ্যাঠাইমা বললেন, 'জানিস তো বাপু ওর রাগ বেশী, কেনই বা কথাটা শুনলি না।' বলতে না বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুলেখা, স্কুলে যাচ্ছিলো, এক রাশি বই ছিলো বগলে, বোর্ড বাঁধানো শক্ত ইংরাজী বইটা সে তৎক্ষণাৎ তাক ক'রে ছুঁড়ে মারলো উপর দিকে, শিক ছাড়া জানালায় অর্ধেক দেহ বার করা হারাণের ঠিক বুকের মাঝখানটিতে গিয়ে লাগলো সেই আঘাত। বইটা আবার ফিরে এলো নিচে। কুড়িয়ে নিতে নিতে সুলেখা বললো 'ফের আর একটা কথা যদি বলবে আমার মাকে, বঁটি দিয়ে কুপিয়ে দু' আধখানা ক'রে ফেলবো।'

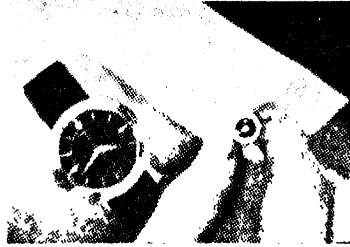
'ওরে, বাপরে, মারে কী ডাকাত মেয়ে রে', বলে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন জ্যাঠাইমা, স্কুলে যাওয়া স্থগিত রেখে দুই চোখ ভরা আগুন নিয়ে থমকে শক্ত হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালো সুলেখা। লাফিয়ে নেমে এসেছিল হারাণ, থেমে গেল সেদিকে তাকিয়ে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা দুর্দান্ত প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি, উদ্যত দণ্ড। একটা কথা আর সেদিন বললো না কেউ।

(ক্রমশ)

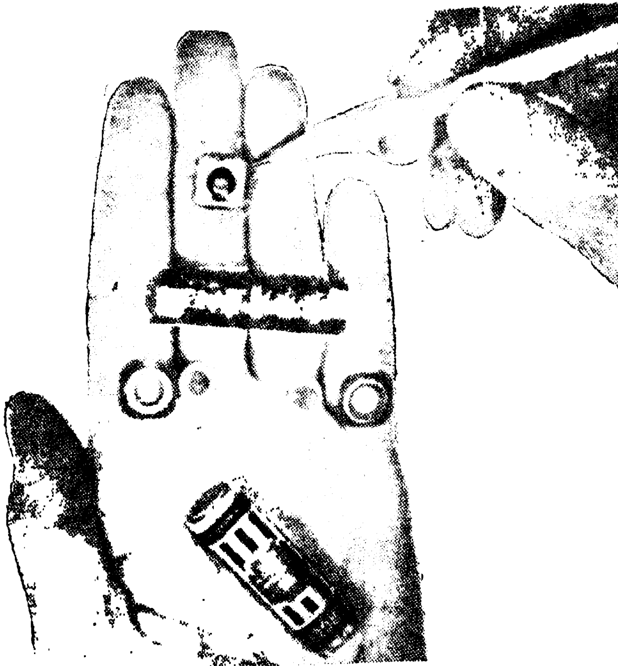



**চক্রদত্ত**

'হ্যামিলটন ওয়াচ কম্পানী' ১০ বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিদ্যুৎচালিত হাত ঘড়ি তৈরী করেছেন। এই ঘড়ির ভেতর যেখানে ঘড়ির মেনস্প্রিং থাকে সেখানে একটি ছোট শুকনো ব্যাটারী রেখে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাটারী খুবই শক্তিশালী হয়। একটা ব্যাটারীযুক্ত ঘড়ি স্বচ্ছন্দে দু-তিন বছর চলে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাটারী বদলাবার অথবা কোনরকম চার্জ করবার দরকার হয় না। দেখা গেছে যে এই ধরনের হাত ঘড়ি শতকরা ৯৯·৯৯৮ ভাগ সঠিক সময় দেয়। সমস্ত ব্যাটারীটা একটা ছোট বোতামের আকৃতি। কিছুদিন আগে 'সেনোটেন কর্পোরেশন' এক নতুন ধরনের বধির লোকদের শোনবার যন্ত্র বার করেছেন যেটিও এই ঘড়ির মত ক্ষুদে ব্যাটারী চালিত। সমস্ত যন্ত্রটি ঠিক মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের নখের আকৃতি। খুব সহজেই এটা কানের গর্তের মধ্যে ফিট করা যায়। একবার ফিট করবার পর সেটা আর কান থেকে খুলে পড়ে যাবার ভয় থাকে না, অথবা বাইরে থেকে সহজে বুঝতে পারা যায় না। যন্ত্রটির ওজন মাত্র ½ আউন্স। এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ ৪০০ গুণ পরিবর্ধিত হয়ে শোনা যাবে। এই দুটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রয়োজন হলে বিজ্ঞান সাধারণ টর্চ লাইটের ব্যাটারীর সাহায্যে কত প্রয়োজনীয় এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী করতে পারে। অবশ্য এই জিনিসগুলি এখন বাজারে বিক্রির জন্য উপস্থিত করা হয়নি।



**ব্যাটারী চালিত ঘড়ি এবং বোতামের আকৃতি ব্যাটারী**



**'ক্ষুদে ব্যাটারী খোলা অবস্থায় এবং সম্পূর্ণ অবস্থায় হাতের চেটোতে দেখা যাচ্ছে। একটি ব্যাটারী ২২½ ভোল্ট শক্তি বিশিষ্ট'**

'হুরেল ডিউবস' উড়োজাহাজ খুব সহজেই অল্প জায়গার মধ্যে ওঠানামা করতে পারে। আর এই ওঠবার নামবার জায়গা কংক্রীটের না হয়ে সাধারণ ঘাস হলেও কোন ক্ষতি নেই। ৬ টন মাল নিয়ে এই উড়োজাহাজ ১২০ থেকে ৩০০ মিটার স্থানের মধ্যে উঠতে এবং নামতে পারবে। এর দুটো ইঞ্জিনের একটা খারাপ হয়ে গেলেও এর ওঠা-নামার কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। আকাশে ছোট চক্রাকারেও ঘুরতে পারবে। ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটার গতিতে ডিউবস উড়তে পারে। বর্তমানে আফ্রিকা এবং আমেরিকার কয়েকটি স্থানে মালবহনকারী উড়ো জাহাজ হিসেবে 'হুরেল' ব্যবহার করা হচ্ছে। এই উড়ো জাহাজের বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা থাকার দরুণ যে সমস্ত দেশে রাস্তাঘাট খুব উন্নত ধরনের নয়, তারা মালবহন করবার জন্য এই উড়োজাহাজ কেনবার জন্য উড়োজাহাজ কোম্পানীকে অর্ডার দিচ্ছেন। ভারতবর্ষও ঐ সমস্ত দেশগুলির একটি। ভারতবর্ষে এর সাহায্যে মালবহন করা ছাড়াও জরীপের কাজে ব্যবহার করা হবে।

*

সম্প্রতি যে নতুন ধরনের প্যারাসুট তৈরী করা হয়েছে সেটি আকাশে নিজে নিজে খুলে যাবে এবং প্যারাসুটধারীর বসবার জন্য একটা আসনও বের হয়ে আসবে। বায়ুর চাপ প্যারাসুটের সঙ্গে লাগান একটি ক্যাপসুলের ওপর কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারাসুট আপনি আপনি খুলে যায়। সাধারণ প্যারাসুটে শূন্যে থাকাকালীন একটি দড়ি ধরে টানলে তবে প্যারাসুটটি খুলে যায়।

*

চীনে 'চেংগংহুন ইনস্টিটিউট অব এপলাইড কেমিস্ট্রি' সম্প্রতি শর গাছ থেকে কৃত্রিম সিল্ক তৈরী করছে। এই কৃত্রিম সিল্ক কাঠের মণ্ড থেকে এর আগে যে কৃত্রিম সিল্ক তৈরী করা হত তার অর্ধেক খরচে তৈরী করা যাবে। অবশ্য এর আগে চীনে আখের থেকে, পাইন গাছ থেকে তৈরী করার চেষ্টা হয়েছিল। চায়নায় যথেষ্ট পরিমাণে আখ, শর গাছ, পাইন পাওয়া যায় বলে আশা করা যাচ্ছে যে এদেশে এত বেশী কৃত্রিম সিল্ক তৈরী করা সম্ভব হবে যে সুতোর তৈরী কাপড়ের চেয়ে সস্তায় বাজারে বিক্রি করা যাবে।

•

ক্যালিফোর্নিয়ার খনি-বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, সমুদ্রের নীচে যে সব পাহাড় আছে সেগুলিতে ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, তামা, দস্তা, কোবল্ট ইত্যাদি খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকায় প্রতি বর্গমাইলে ১৫০০০০০ ডলার রোজগার করা সম্ভব হয়।

সাহারার তুয়ারেগ সম্প্রদায়ের এক অভিজাত ব্যক্তি একদা তার স্ত্রী অপর এক ব্যক্তির প্রণয়াসক্তা জানতে পেরে সেই লোকটির খোঁজে বের হয়। দুজনের দেখা হল, দুজনেই উটের পিঠে চড়ে। তলোয়ার বের করে ওরা পরস্পরকে তাড়া করলে। যে ব্যক্তি পত্নি তার তলোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাঁধ থেকে পেটে কাটা করে দাওদা ফাঁড়ে আরো এতো দূর গেল যে সেই আঘাতেই উটটিও মারা গেল।

ব্যাপারটা শুনতে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তবে তুয়ারেগদের মধ্যে বাস করে রবার্ট খ্রস্টোফার নামক এক ব্যক্তি বলেন, এটা মোটেই মিথ্যে নয়।

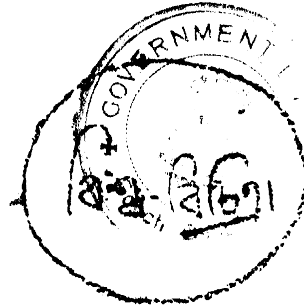
এই আততায়ীর কোন বিচার হলো না কারণ অভিজাত তুয়ারেগ হয়ে সে তার পবিত্র সম্মান রক্ষা করেছে মাত্র। তার স্ত্রীর সম্প্রদায় থেকে নির্বাসিতা হবার পর তার সামনে দুটি পথ খোলা—আত্মহত্যা আর নয়তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়া। এই একটি কারণ যে জন্যে তুয়ারেগদের মধ্যে ব্যাভিচারিণীর সংখ্যা অত্যন্ত দুর্লভ।

তুয়ারেগরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওদের মতে কোন মেয়ে তার স্বামী বা প্রণয়ীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফিরে আসার সময় জানতে পূর্ণিমার রাতে কাছাকাছি কবরস্থানে যায়, কোন আত্মীয়ের কবরের ওপর শুয়ে পড়ে, পাথরের ওপর কান পেতে দেয় এবং তাহলেই সেই মৃতের আত্মা তাকে তার প্রার্থীতের ফিরে আসার আনুমানিক সময় জানিয়ে দেবে।

খ্রস্টোফার বলেন যে, ওদেশে আধুনিক ডাক ও তার ব্যবস্থা নেই এবং শত শত বছর ধরে এই সংস্কার চলে আসছে। একবার খ্রস্টোফার ক্যাম্পের সামনে আগুন জেলে বসে কথা বলতে বলতে একটা কাঠি দিয়ে আগুন খোঁচাতে থাকেন। হঠাৎ দেখা গেল বাক্যালাপ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, অপর দিকের লোকটি এমনভাবে চাইতে লাগলো যেন হঠাৎ তাকে দানোয় পেয়েছে, আর এক ব্যক্তি এক ঝটকায় খ্রস্টোফারের হাত থেকে কাঠিটা ফেলে দিলে—কারণ, ওদের বিশ্বাস আগুন খোঁচালে উট দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

অনেকবার কাফেলায় যেতে যেতে খ্রস্টোফার দেখেছেন ওরা কোন কবর দেখলে অনেক তফাৎ রেখে চলে যাতে মৃতের শান্তির ব্যাঘাত না ঘটে। ওদের বিশ্বাস ব্যাঘাত ঘটালেই সেই মৃতের আত্মা কাফেলায় জুটে যাবে।

দুপুরের আগে দাড়ি কামানো এদের কাছে অমঙ্গলের লক্ষণ। এক আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ আর একটা আগুনে নিয়ে গেলে মরুভূমির বন্য জন্তুদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয় এবং ক্যাম্পে মৃত্যুকে ডেকে আনা হয়। উট দুধ দেবার সময় যদি




সরাসরি তার বাঁটে ফুঁ দেওয়া হয়, তাহলে উটটা দুধ দেওয়া বন্ধ করবে।

অধ্যাপক ক্রড ব্র্যাংগুয়েরেন' আট বৎসর মরুভূমিতে বাস করেন। তিনি খ্রস্টোফারকে নিয়ে যেখানে তুয়ারেগরা ফরাসীদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ করে এবং মৃত তুয়ারেগ সেনানীদের কবরস্থ না করে পাথরের স্তূপে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে সে জায়গাটা দেখতে যান। এই রকম একটা স্তূপের কাছে থেমে ক্রড খ্রস্টোফারকে পাথর সরিয়ে নিচের একটা কংকাল দেখার কথা বলেন। উদ্দেশ্য কি ধরনের অস্ত্র ওরা ব্যবহার করত তাই দেখা। ঠিক তখুনিই একটা ছোট পাখিকে ওরা ওপরে উড়তে দেখলেন।

"কি আশ্চর্য!" ক্রড বললেন বিস্ময়াভিভূত হয়ে, "এ ধরনের পাখি তো বসন্তের আগে এ অঞ্চলে আসবার কথা নয়।"

তার আট বছর মরুজীবনের মধ্যে এই প্রথম অসময়ে ঐ পাখি দেখলেন। এরপর ওরা পাথর সরানো আরম্ভ করতেই পাখিটা ওদের মাথার ওপর এমনভাবে উড়তে লাগলো যেন ঠোকরাবে; যেন সেই কবর থেকে ওদের হটিয়ে রাখতে চায়। ওরা ফিট কয়েক সরে যেতে পাখীটা ওদের মাথার ওপর ঘুরতে লাগলো; এবং ওরা সেই স্তূপের কাছে ফিরে আসতে পাখিটাও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো। তারপর ওরা সরানো পাথরগুলো বসিয়ে উটের পিঠে চড়ে বসতেই পাখিটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

খ্রস্টোফার ভাবলেন, ঐ পাথরেরই কোন খাঁজে পাখিটার বোধহয় বাসা, কিন্তু ক্রড জানালেন যে, "সেটা অসম্ভব। কারণ ওদের বাসা বাঁধার বহু দেরী, আর ওরা মাটিতেও বাসা বাঁধে না। দেখা যাক ব্যাপারটা তবে কবরটা যেন ঘাঁটা না হয়।"

ওরা খুঁটিয়ে দেখলেন পাথরের সেই স্তূপ কিন্তু বাসার কোন চিহ্নই পেলেন না, না পাখিটাও নয়।

*

রূপসী ইওলান্ডা স্প্যানের বহু স্তাবক ছিল, পুরুষ বন্ধু যারা উপঢৌকনে ছেয়ে ফেলত। জমকালো উদ্বোধন রজনী, ছবির প্রথম মুক্তি দিন, বল নাচের উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ওকে নিয়ে যেত। তারপর ইওলান্ডা দেশে গেল—মাটিতে একটা থুপারির মধ্যে।







**প্রত্যেক বছর মে মাসে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে কেপ কড দ্বীপে সবচেয়ে বড়ো বান আসার দিনে লক্ষ লক্ষ অশ্বক্ষুরাকৃতি কাঁকড়া ডাঙার দিকে আসে। এই কাঁকড়াকে 'জীবন্ত ফসিল' বলা হয় কারণ এদের আবির্ভাব কাল পক্ষী বা স্তন্যপায়ীদের চেয়েও বহু বহু প্রাচীন**

ইওলান্ডা বহু ভ্রমণ করেছে এবং পাঁচটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত। কিন্তু হ্যামশায়ারের গ্রামবাসীরা ওর অতীত না জেনেই ওর সংগে দেখা করতে যায় খবরের কাগজ বিছানো দশ ফিট লম্বা সাত ফিট চওড়া একখানি ঘরে।

ইওলান্ডার তখন রূপও গেছে। মুরগী খরগোস আর ছাগল পালন করে সংসার চালায়। সেই খুপরীতে ইওলান্ডা পাঁয়ত্রিশ বছর বেঁচেছিল—এবং কেন যে সে ঐভাবে জীবনযাপন করছিল সে রহস্য কিছুকাল পূর্বে ওর মৃত্যুর সংগেই কবরস্থ হয়ে যায়।

* * *

বার্মিংহামে এক বাইশ বছরের মেয়ে তার বাবার সংগে ঝগড়া করায় বাবা তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেয়। মেয়েটি বাড়ির ঠিক বাইরেই এক মোটরে আরামে তিনশ রাত কাটিয়ে দেয়। কাহিনীটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রথম বিবৃত হয় যখন মেয়েটি বাড়ি ফিরে যেতে সম্মত হয়।

*

বছর দুই আগে ইস্ট এশফোর্ডের বিধবা শ্রীমতী মর্লিকে হেলে পড়া এক সৈন্য-কুঠীর থেকে তুলে দিয়ে তাকে তিনটে বাড়ি ঠিক করে দেওয়া হয় থাকবার জন্যে। কিন্তু সবকটিই সে প্রত্যাখ্যান করে। জিনিসপত্র নিয়ে সে রাস্তার ধারে এক আস্তানা বেঁধে থাকতে আরম্ভ করে যে পর্যন্ত না স্বাস্থ্যের কারণে কর্তৃপক্ষ তাকে হঠিয়ে দেয়।

*

পৃথিবীর সব জাতের চোর-ডাকাত লুটেরাদের নানারকমের তুকতাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেখা যায়। ভারতে তো কথাই নেই। ব্রহ্মদেশের ডাকাতদের ধারণা সংগে বাঘের গোঁফ রাখলে অপরাজেয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। ফরাসী ডাকাতদের কুসংস্কার হচ্ছে কোন স্ত্রীলোকের দেহ আধখানা করে কেটে জলে ফেলে দিলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

চ্যানেল দ্বীপে প্রচলিত আছে যে কোন স্ত্রীলোকের দেহ যদি জলে ভেসে আসে তো তার সংগে যোগ দিতে একটা পুরুষেরও দেহ ভেসে আসবেই।

বৃটেনের দুর্বৃত্তেরা বুধবারে কাজে বের হয় না, আর যদি পূর্ণিমার রাত হয়। অনেক তুক হিসেবে পকেটে এক টুকরো কয়লা রেখে দেয়। একজন চোর বড় রকমের কাজে বের হবার আগে নিজের সৌভাগ্য কামনা করে নিজেরই ঠিকানায় একখানা চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দেয়।

*

কে বেশী সৎ?—নারী, না পুরুষ? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে মাস কতক আগে ফিনল্যান্ডে এক রাষ্ট্রব্যাপী অনুশীলন হয়। পরীক্ষার একটা অংশ ছিল দেশের দুশ বাহাত্তরটি দোকানে খদ্দেরদের পাওনার চেয়ে কিছু বেশী ভাঙানি ফেরৎ দেওয়া। দেবার সময় গুণে গুণে দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেক খরিদ্দার ভাল করেই দেখতে পায় তাকে কতো ভাঙানি ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেল পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে শতকে সাড়ে পাঁচ গুণ বেশী সৎ। পুরুষদের মধ্যে শতকে প্রায় একষট্টি জন দোকানদারের ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেয়; মেয়েদের মধ্যে শতকে প্রায় পঞ্চান্ন জন; বাকিরা মুখটি বুজে চলে যায়।

এই অনুশীলনটি করা হয় নাগরিকদের নৈতিক মান উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে।





মনোজ বসু

# আমার ফাঁসি হল

১১

পরের দিনটা কালরাত্রি। রাত্রিবেলা বর-বউয়ে দেখা হতে নেই। তবু যা হোক নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। মুনি-ঋষিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, ভেবে-চিন্তে এই কালরাত্রির বিধান দিয়ে গেছেন। অনেক ধকলের পর একটা রাত্রির সোয়াস্তি। খানিকটা সইয়ে নেওয়া। তারপর থেকে একনাগাড়ে চলল। এক, মরে বাঁচতে পারো, তা ছাড়া জীবন থাকতে রেহাই নেই।

বাসর থেকে বেরিয়ে ভোরবেলা মাঠ পার হয়ে গোলবাড়ি এলাম। ছুটে পালানোর মতন। মাথায় হাত দিয়ে ঝিম হয়ে আছি। হরিশ এসে দালানে খুটখাট করছে, টের পাচ্ছি সমস্ত। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। বোষ্টম গান ধরেছে বাইরের আম-তলায়। সকালে এসে মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে যায়। এই সব গ্রামের গান ভাল লাগে আমার। ওদের ডাকিয়ে এনে শুনি, পয়সা দিই।

মান করেছেন বিধুমুখী—।

আরও চোখ তুলে চেঁচিয়ে উঠিঃ চুপ, চুপ কর। নিকুচি করেছে তোর বিধুমুখীর।

হরিশ ছুটে এলো। গান থামিয়ে বুড়ো বোষ্টম দাঁত বের করে হাসছে ঃ আজকে সিকি দিলে হবে না বাবা। পুরো একটা টাকা।

বেরো, বেরিয়ে যা বলছি—

আপনারা নিদয় হলে বাঁচব কেমনে হুজুর?

বাঁচতে কে বলেছে? মর, মরে যা—

হরিশ দুঃখিত হয়ে বলে, শুভকর্ম বলেই এসেছে। ওরা পেয়ে থাকে। এখন চলে যাও বাবাঠাকুর, হুজুরের মন ঠিক নেই।

পুকুরঘাটের দিক থেকে দাদা উঠে এলেন। জামা-জুতো পরতে পরতে বলেন, আমি চাল। কাজকর্ম যা ছিল হয়ে গেছে, আজকে ওরা আটকাবে না।

ঘাড় নিচু করে থাকি। আমার এই দাদা—বাপের মতন অভিভাবক—কথাবার্তার কোন মুখ আছে তাঁর কাছে? বউদি কিম্বা টুনুর কোন কথা উঠল না। বউদিকে হয়তো জানতেই দেবেন না বিয়ের খবর। একা আমি পড়ে রইলাম। ফুলশয্যা বাকি এখনো। তারপরে বিরাটগড় ছাড়ো আর চাকরিই ছেড়ে দাও, বউ ঘাড়ে নিয়ে বেরুতে হবে। এমন বউ—ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেও জোঁকের মতন এঁটে থাকবে। চম্পার চালাকি, চম্পা আমার এই সর্বনাশ করল।

সেই দিন রাত্রিবেলা চম্পা এসে হি-হি করে হাসছে : গা সাজিয়ে গয়না দেবার কথা। দিয়েছে?

মিথ্যুক বুড়ো, জুয়োচোর—

আমার রাগটা খুব উপভোগ করে, গালিগুলো মেনে নেয়। প্রসন্নমুখে ঘাড় নাড়ে : সেকথা সত্যি। হোড় মশায় ভারি শয়তান। তবে নিজের মেয়েকে ফাঁকি দেবার মতলব ছিল না। কি করবে, ঝিকমিকে গয়না সব কটকটে কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরে-মুক্তো কাঁচ। হ্যাঁ গো, সত্যি—ম্যাজিকে হয়ে গেল।

হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির দমকে কথা বেরোয় না। বলে, দয়ালহরি ঘরের মেজের গয়নার বাক্স পুঁতে রেখেছিল। যে ঘরে তোমরা বাসর সাজিয়েছিলে, সেখানে—তক্তাপোশের তলায়। দুয়োরে খিল এঁটে তোমাদের বাসরের খন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলল। চন্দন কাঠের বাক্স নেড়েচেড়ে দেখে, আর কপাল থাবড়ায়।

হি-হি-হি। সেই নাচুনিটা যদি দেখতে!

হতবুদ্ধির মতন চেয়ে আছি দেখে চম্পা হাসি থামাল : চোরের উপর বাটপাড়ি গো! দয়ালহরির চেয়ে ঢের বেশি ঘোড়েল মাখন মিত্তির। ও'কে সে বেচতে পারে, কিনতেও পারে। গয়না আমার—মিত্তির কলকাতা থেকে বিয়ের গয়না গড়িয়ে আনল। বাবার কাছ থেকে পুরো দাম নিয়ে ঝুটো-জিনিস এনে দিল। জানে, বিয়ে হবে না। দাঙ্গার মাতব্বরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এসেছে, সময় মতন তারা এসে পড়বে। জানে, দু-পাঁচ দিনের ব্যাপার—তার মধ্যে গিল্টির গয়না কালো হবে না। তারপরে হাঙ্গামা যখন ঘটবে, পাথর ঠুকে গয়না যাচাইয়ের লোক পড়ে থাকবে না কেউ। জানে, আমায় মেরে ফেলবে, গয়না যার গায়ে পরবার কথা—

বলতে বলতে কে'দে উঠল। দশ বছরের পুরনো শোক উথলে ওঠে ছায়াময়ীর কণ্ঠে: মাথায় মারল লোহার বাড়ি, পিঠে মারল ছোরার কোপ। আমি কোন দোষ করিনি। আশি-নব্বুই হয়ে যায় কতজনের, চুল পাকে দাঁত পড়ে, তবু তারা বে'চে থাকে। আমি কেন বাঁচতে পারলাম না? পা বাড়িয়ে আমি কেন ছু'তে পারিনে মাটি? হাত বাড়িয়ে কেন ধরতে পারিনে তোমায়? বিয়ের কনে চুপিচুপি গিয়ে ছাতের আলসে ধরে দাঁড়িয়েছি......

পদ্ম যুই ও-দুটোও' তক্কে-তক্কে ছিল। নিঃসাড়ে কখন পাশে এসেছে। পদ্ম বলল, বর দেখছিস? ঐ দেখ—ঐ বোধ হয় বড় ছই-দেওয়া নৌকোটায়। নৌকোর বহর সাজিয়ে এসেছে বিয়ে করতে।

যুই বলল, আলো জ্বালেনি দাঙ্গার ভয়ে। মানুষের দঙ্গল নিয়ে এসেছে। পাটার উপরে বসে আছে ঐ সারি সারি।

পদ্ম বলল, ভয়ে পড়ে আনতে হয়। পুলিসও হতে পারে। কিম্বা হয়তো লেঠেল। বিশ-তিরিশ জন এসে পড়েও যাতে কায়দা করতে না পারে।

যুইয়ের মনটা বড় নরম। ভিজে-ভিজে গলায় বলল, কত আলো, কত বাজি-বাজনা হবে, সেখানে পুলিশ মোতায়েন রেখে আঁধারে আঁধারে দিদির বিয়ে—

পদ্ম বলল, হোক গে। এসে পড়েছে তবু ভালোয় ভালোয়। যা সব কাণ্ড চারদিকে।

নৌকো লাগল ঘাটে। যে ঘাটে তুমি এসে নামলে, মাঝি যেখান থেকে লণ্ঠন ধরে গাঁয়ে নিয়ে এলো। নৌকোর মাথা পাড়ে ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে, যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ল। পড়েই দৌড়চ্ছে আমাদের বাড়ির দিকে।

যুই বলল, দৌড়য় কেন বরযাত্রীরা?

পদ্ম বলল, বাড়ি ঢুকতে পারলে তবে সোয়াস্তি। যা কাণ্ড চারদিকে! হয়তো বা পথেই তাড়া খেয়েছে।

যুই কে'দে বলল, কবে যে আবার মানুষ ভাল হবে, সকলের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে আসবে!

ওদের আলো নেই দেখে মশাল নিয়ে আমাদের লোক বেরিয়েছে। এগিয়ে আনবে। মশাল কেড়ে নিয়ে রে-রে-রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ঘড়াং করে সিংদরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে দরজা নেই, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছিল। দমাদম কুড়ুল মারছে দরজায়। দুড়ুম-





দাড়াম বন্দুকের আওয়াজ। তিন বোন থরহরি কাঁপছি আমরা চিলেকোঠার দেয়াল ঘেঁষে—

আর এক মেয়ে সহসা যেন বাতাসে ভেসে এস চম্পার কাঁধে হাত বেড় দিয়ে এসে দাঁড়াল। বলে, মিথ্যে বলবি নে চম্পা। কাঁপছিলি তুই আর যূই। আমার বেশ লাগছিল। আলোর দুঃখ করেছিল যূই—বাজনাদারদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল, কত আলো হয়ে গেল লহমার মধ্যে। তোর বিয়ের মতন অত আলো কোন বিয়েয় হয় না রে চম্পা।

চম্পা বলে, এমনি সময় ধুপধাপ আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আমের ডাল থেকে মরদেরা ছাতের উপর পড়ছে। ডালে দড়ি বেঁধেছে, সেই দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে খেয়ে পড়ছে। পালব, নিচে যাব, সময় দিল না। মানুষ নই যেন আমরা, ক্যাচ-ক্যাচ করে কচু-কলাগাছের উপর যেন ছুরি মারছে। আলোর বড়াই তো করলি পদ্ম, বাসরের কথাটা বললি নে? বিয়ের বাসর ঐ ছাতের উপর, রক্তের সমুদ্দুর খেলছে। পদ্ম-যূইয়ের বড় সাধ ছিল বাসর জাগবার, তারা আমার পাশে পড়ে রইল।

পদ্ম মুখ ঘুরিয়ে জাঁক করে বলে, সে কি বরমশায়, তোমার ঐ এক রাত্তির বাসর জাগবার মতন? সকাল হলেই ফুরিয়ে গেল। কতদিন ধরে তিন বোনে পড়ে আছি বাসরে। মাছি ভনভন করে ঘায়ের জায়গায়, পোকা কিলবিল করে। তারপর একদিন দেখি, তোমার শ্বশুরমশায় নাকে কাপড় জড়িয়ে বাড়ি ঢুকছে। দুয়োর-জানলা ভেঙে ফেলেছে, পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বাড়ি ঢুকতে মুশকিল নেই। কাউকে এত্তেলা দিতে হয় না। একলা মানুষ চোরের মতন টিপিটিপি ঢুকে পড়ল। একেবারে দোতলায়।

চম্পা বলে, দোতলায় বাবার ঘরে দেয়ালের সঙ্গে আলমারি গাঁথা। চোরাআলমারি—নজর করে বোঝবার জো নেই। তার ভিতরে গয়নার বাক্স। মাখন মিত্তির জানত, কলকাতা থেকে গয়না কিনে এনে সে-ই নিজ হাতে রেখে দিয়েছিল। তার মতো আপন কে ছিল আমাদের? দয়ালহরি দোতলার ঘরে এসে সকলের আগে আলমারিটা খুলে ফেলল। তিলেক খোঁজাখুঁজি নেই, একেবারে যেন হিসাব-করা ব্যাপার।

পদ্ম বলে, আলমারির কথা কে তাকে বলল? চাবি কে দিল? বলতে পারো ওগো নতুন বর? আমাদের আপন মানুষ সেই মাখন মিত্তির। মাখনের কাজে কর্মে জোগাড় দিয়েছিল তোমার শ্বশুর—তার ঐ বখরা পেলো। এক বাক্স ঝুটো গয়না। হি-হি-হি—

হেসে হেসে ফেটে পড়ে পদ্ম। চম্পা বলছে, তারপরেও দেখি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করছে। চশমা পরে এসেছে সেদিন, একটা

শূচ অবধি চোখে এড়ায় না। দামি জিনিস-পত্র লুঠ হয়ে গেছে, পাবে আর কোন ছাই। ঐ যে তুমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে থাক, ওটা বউয়ের। সেইদিন নিয়ে গেল। তবু ভাল, ঘরের জিনিসটা ঘরে ফিরে এসেছে। আবার, তুমি বাজাচ্ছ।

পদ্ম বলে, ছাতে উঠে চিলেকোঠার পাশে আমাদের পেয়ে গেল শেষটা। হাঁটু ভেঙে পাশে বসে নিরিখ করে দেখে চম্পার কষ-পড়ানো ফোলা আঙুলে টিপে টিপে আংটি খুলে নিল। একটা কানপাশা আমার আগেই কোথা গেছে, এলো-খোঁপায় চাপা আছে আর একটা। ঠিক বের করেছে। খাসা জিনিস—শুধু একটা বলেই তোমার বউ কানে পরেনি। মুণ্ডু ঘুরিয়ে ধরে হে'চকা টানে কানের লতি ছি'ড়ে নিয়েছিল সেটা। ছায়ার লোক না হলে কানের ছে'ড়াটুকু দেখাতে পারতাম।

যে-প্রশ্ন কতদিন আমার মন তোলপাড় করছে সেই প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা করি, রাজ্যটা তোমাদের কি রকম বলো তো? সত্যি খবরটা দাও। যে যায়, গিয়ে তো একেবারে বোবা হয়ে পড়ে।

পদ্ম ঘাড় দুলিয়ে বলে, খাসা—চমৎকার! লোহার ডাণ্ডায় ব্যথা লাগে না। ছোরার ঘায়ে রক্ত পড়ে না। হালকা হয়ে ভেসে বেড়াই দিব্যি।

চম্পা কিন্তু হাহাকার করে ওঠেঃ না গো, কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমায়? মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস হয়ে ভেসে ভেসে আর পারিনে।

এসব হল রাতের কথা—কালরাত্রির ব্যাপার। সত্যি কিংবা মিথ্যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না। স্বপ্নে আর জাগরণে গোলমাল আমার। আমি বলব সত্যি, আপনারা বলবেন স্বপ্ন। তাইতো শুনতেই হবে কাহিনীর আগাগোড়া।

রাত গিয়ে দিনমান হয়। নতুন বউ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে এলো। শ্বশুরের বাড়ি নয়, বরের বাসা—মালিক সাহেবকর্তার গোলঘরে। তুখড় মেয়ে—এসেই কেমন এক লহমার মধ্যে জেনে বুঝে দখল করে নিল সমস্ত। ফুল-শয্যা হবে, হরিশকে নিয়ে নিজেই সব ব্যবস্থা করছে। খাট ঠেলে দিল ঘরের একপাশে, মেঝের উপরে বড় করে বিছানা। শহরের মতন পয়সা ফেলে এ জায়গায় ফুল মেলে না, হরিশকে পাঠাল ফুলের যোগাড়ে। বিরাজ বুড়ির ছাঁচতলায় দোমুখি ফুল ফুটে আছে, দুর্গাবাড়ির বাগান খুঁজলে গাঁদা মিলতে পারে, খানাখন্দে রাস্তার পগারে সাদা রাঙা দু-রকমের শাপলা পাওয়া যাবে। ওই হয়ে যাবে। নমো-নমো করে কাজ সারা। লোক বেশি আসছে না। এলেও মুশকিল। লাবণ্য বউ হয়ে বসল তো কে তাদের খাতির-যত্ন করে? হরিশের বউ আর পিসিকে আনবার কথা হয়েছিল, হরিশই বুঝি তুলেছিল কথাটা। আমিই চুপি চুপি মানা করে দিয়েছি—খবরদার, ঝামেলা বাড়াবি নে। টাকা-পয়সা নেই, ফুলশয্যায় সাকুল্যে পাঁচ টাকার নোট ছাড়ব একখানা, তার মধ্যেই সব। বিয়েতে শুধু এক মেয়েই দিয়েছে, তা-ও ষোলআনা অঙ্গপ্রত্যঙ্গওয়ালা নয়। খরচা এর বেশি আসে কোত্থেকে?

আমার কথা বুঝে হরিশ চুপ করে গিয়েছে। ওর কাছে এখনো প্রহেলিকা, কেন আমি ক্ষেপে গেলাম এই কন্যার জন্যে?

অনেকের কাছেই। কিন্তু আমার কি জবাব? সে জবাব কেউ মানবে না। উল্টে কেন শখ করে পাগল অপবাদ নিতে যাই?

ভেবেছিলাম, দশ-বারোটা মেয়ে আসবেন অন্ততপক্ষে। তা-ও নয়। পুরুষ হলে আসত, কিন্তু ফুলশয্যা মেয়েদের ব্যাপার। দু-একজন যাঁরা এসেছিলেন, সন্ধ্যা হতে না হতে এটা-ওটা বলে সরে পড়লেন। এত বছরেও গোলবাড়ির বিভীষিকা যায় নি। ভূতের ভয়—রাত্রি বেশি হলেই তো ভূত-পেত্নীর মচ্ছক লেগে যাবে বাড়ির অন্দরে। আমার ভয় আরও বেশি। মাত্র দুটো প্রাণী নিয়ে ফুলশয্যা। বাসরঘরে গানটান গেয়ে মেয়েদের আটকে রেখে তবু অনেকক্ষণ বেঁচেছিলাম, আজকে যে লাবণ্যের অবাধ রাজ্যপাট!

একটা টেবিল আছে ঘরের কোণে, অফিসের কিছু পুরানো ফাইল। অভিনিবেশ-সহকারে তাই নিয়ে পড়েছি— পাতা ওল্টাচ্ছি, পড়ছি, লিখছি এটা-সেটা। হঠাৎ কি-যেন বিষম ব্যাপার ঘটে গেছে—এই পড়া

ও লেখায় তিলেক ভুলচুক হলে কাল সকালে চাকরি চলে যাবে। কিন্তু ময়লা মেখে বসে থাকলেই যমরাজ কিছু রেহাই দেয় না। বুঝতে পারি আসা হচ্ছে ঘরের ভিতর এইবারে। পদশব্দ পাই। ফুল-শয্যার রাতে, মনে পড়েছে?—বক্ষ দুরু দুরু করেছিল আপনাদের। আমার ঠিক উল্টো, বুকের ধুকপুকুনিটা থেমে যাবার দাখিল। দরজা বন্ধ করল—আরে সর্বনাশ, বাইরের দরজা দালানের দরজা দুদিকেরই। দুটো পথই বন্ধ। আসে টেবিলের দিকে—শাড়ি দেখেছি আড়চোখে চেয়ে। ঘাড় নিচু করে গভীর মনোযোগে আমি কাজে নিবিষ্ট, টেরই পাচ্ছি না আসছে কিনা কেউ। কাছে—আরও কাছে। এই-বারে বুঝি দু-হাত আমার গলায় বেড় দিয়ে—আপনাদের শুনতে পাই, ভুজ-বল্লরী কাঁধের উপর এগিয়ে পড়ে—আমার প্রাণবায়ুটুকু বাহুর ফাঁসে শেষ করে গো এইবার! এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, হায় হায়, কেউ নেই আমার—ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা……

না, যত নির্দয় ভেবেছিলাম ততদূর নয়। হাতের বেষ্টন নয়। মালা ফেলে দিল ঝুপ করে গলায়—গাঁদাফুলের মালা। মালারচনা করে রেখেছে, জ্ঞানেও দেখি সব। সইয়ে সইয়ে দেখছে বোধ হয়, ফুলের মালা দিয়ে শুরু।

এরই মধ্যে মন শক্ত করে ফাইল ঠেলে দিলাম একপাশে। লেখার খাতা বন্ধ করেছি। মরার চাইতে মরার ভাবনায় অশান্তি বেশি। ঘাড় উঁচু করি বেপরোয়া-ভাবে। লাবণ্য সামনের চেয়ারটায় বসেছে।

হেসে উঠল হি-হি করেঃ সাহস হল তবে তাকাতে? বউয়ের রূপ দেখছেন—প্রেম জমে আসছে, উঁ? দেখুন, নয়ন ভরে দেখে নিন।

একটুখানি থেমে খুব খানিকটা হেসে নেয়।

পুরুষ মানুষ বটে! লড়াইয়ে গেলে কেউ-কেটা হতে পারতেন। আমার তো নিজেরই মুখ, তবু চেয়ে দেখতে ভরসা পাইনে। হাসাপাতাল থেকে বসন্ত সেরে এসে একটা দিন দেখেছিলাম। দেখে চেঁচিয়ে আয়না ছুঁড়ে ফেললাম। আর আয়না দেখিনে। আপনি তো বেশ এতক্ষণ চেয়ে আছেন, মুখ ফেরান না, থুতু ফেলেন না।

ইস, সারা মুখ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

যেন ভ্রমবশে বড় একটা গুণের কথা বাদ থেকে যাচ্ছে, এমনিভাবে লাবণ্য বলে, আর চোখ? বাঁ-চোখের মণি সাদা মার্বেলের মতো—দেখতে পাচ্ছেন না? ডান চোখে হাত-চাপা দিলে অন্ধকার দুনিয়া। যা-ই বলুন, এ বাহাদুরি বিধাতাপুরুষের নয়। জন্মের সময় তিনি এতদূর দেন নি। মা শীতলার কারুকর্ম—শিল কাটাই করে দিলেন। আপনি কলকাতার, আমি কলকাতার—উপমাটা বুঝবেন। শিল কাটাবে গো—বলে রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে, এক বাড়ি গিয়ে ঠুক ঠুক করে বাটালি ধরে শিল কাটতে বসে যায়, সেই ব্যাপার। বাঁ-চোখের ঠোক্করটা বেআন্দাজি পড়ে ঢেলা গলে গিয়ে নতুন এক বাহার খুলল।

চোখের পাতা বেশি করে মেলে উল্টানো ঢেলা বুঝি ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বাকি চোখটা বিঘূর্ণিত করে কেমন কেমন তাকাচ্ছে। এত কাছে সহ্য করতে পারিনে। বড্ড ঘুম পেয়েছে—এমনিভাবে হাই তুলে বিছানায় চলে যাই। লাবণ্যর কথা ছেদহীন চলেছেঃ মামী দু-চোখে দেখতে পারে না। চব্বিশ ঘণ্টা শত্রুতা করত। বসন্ত হয়ে ঘুঁটে-কয়লার অন্ধকার ঘরে পড়েছিলাম, জানি পাঁচ-সাতটা দিনের ভিতর নিমতলার গঙ্গায় গিয়ে ঠান্ডা হব। মামী তা হতে দিল না, হাসপাতালে পাঠাল। ডাক্তাররাও লাস-ঘরে চালান না করে সেরেসুরে গেটের বের করে দিল একদিন। গাড়ির টিকিট কিনে পাকাপাকি গাঁয়ে পাঠাবার সময় মামী প্রাণ ভরে আশীর্বাদ দিয়ে গেলঃ আকাশের যত তারা, পাতালের যত বালি, তত যেন পরমায়ু হয়। সকলের বড় শত্রুতা সেধে গেল। কিন্তু যা চেয়েছিল, হল কই? দুয়োরে দুয়োরে লাথি-ঝাঁটা না খেয়ে উল্টে আমার ভাল ঘর-বর হয়ে গেল। মামীকে এত করে লিখলাম বিয়েয় আসবার জন্য। চোখে দেখে গিয়ে খাণ্ডবদাহনে জ্বলবে, জীবনে আর সোয়াস্তি পাবে না। সকল শোধ তুলে নেবো ভেবেছিলাম তা সে এলোই না মোটে।

একটা চোখে তাকাতে তাকাতে লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠল। মামীকে না পেয়ে শোধ তুলে নেবার অন্য কোন উপায় পেয়েছে যেন। খাটের উপরের বালিশ এনে বিছানার মাথায় রাখল। এবারে তার বালিশটা নিয়ে এসে রেখে দিল আমার বালিশের গায়ে। দু-বালিশ পর পর রেখে হাত ঘষছে। ধুলো-ময়লা ঝাড়ছে, না আদর বুলাচ্ছে বালিশের গায়ে?

একটা কাজ করবে লাবণ্য? আমার একটা উপকার?

দেয়ালে টাঙানো বন্দুকটা নামিয়ে গুলি ভরলাম। লাবণ্য চুপচাপ দেখছে। আমিও তাকিয়ে দেখি তার দিকে এক একবার। কী ঘৃণা উপচে পড়ছে তার কুৎসিত মুখের চোখটা দিয়ে। আমার আমার বুকের উপর আঙুল রেখে বলি, এইবারে—এই খানটায় নল বসিয়ে ট্রিগার টিপে দাও।

ঘাড় নেড়ে লাবণ্য ঝেড়ে ফেলে দেয়ঃ আমি পারব না।

খাটনি কিছুই নয়। একটা আঙুলে চেপে দেওয়া একটুখানি।

এতই যদি সহজ হয়, আপনিই করুন সেটা। আমায় কেন?

অত বড় লম্বা নল। বুকে নল রাখলে ট্রিগার অবধি হাতই পৌঁছবে না। পিস্তল হলে হত।

বন্দুকেও হয়। কেন হবে না, কত জনে করে থাকে। নিজে মরতে হলে নলের মুখ বুকে রাখবেন না, থুতনির নিচে রাখবেন। বন্দুক খাড়া করে পা দিয়ে ট্রিগার টিপে দেবেন, ব্যস। কাগজে পড়েছি। কায়দা বলে দিলাম, দেখুন এইবারে চেষ্টা করে।

অত্যন্ত সহজভাবে লাবণ্য আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে একটু হেসে লাবণ্য বলে, আমি কেন করতে যাবো? আমার তো উল্টো স্বার্থ। আমার স্বামী হবার দায় থেকে পালাতে চাইছেন, সে সুবিধা আমি কেন করে দিতে যাবো বলুন।

বন্দুকের গুলি না ছেড়ে ঘুরন্ত চোখটা আমার দিকে তাক করেছে। শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্ত। ফুল-শয্যাতেও নাকি আলো জেলে রাখতে হয়। যে অলক্ষণ হয় হোকগে, প্রদীপ নিভিয়ে

দিলাম আমি ফু দিয়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি। অক্টোপাস আটখানা হাতের ভরে পিল পিল করে এগিয়ে আসে। কালো পাথরের মতো ভারী অন্ধকার চারিদিক দিয়ে চেপে এসে পড়ছে। টুনুর কথা ভাবছি। যে বাবা-মা ছোট্ট বয়সে মারা গেছেন তাঁদের কথা...

দীপ-নেভানো গোলঘরে, বিশ্বাস করুন, হঠাৎ যেন ভিন্ন লোকে চলে গেলাম। সেই যেমন অসুখের সময়টা হয়েছিল। তখন আভাস মাত্র পেয়েছিলাম, আজকে কে যেন ফটক খুলে দিয়ে অন্ধকারে আমার হাত ধরে টেনে টেনে গেল। এই গোলবাড়ি সরকারি চাকরি, বিয়ে-থাওয়া আজকের করাল ফুলশয্যায় লাবণ্যের দেহের শিকল—সমস্ত অবাস্তব। এতক্ষণের আতঙ্কের বোঝা তুলোর মতন লঘু হয়ে হয়ে গেল। মরণেও ঠিক এই রকম—ভুক্তভোগীর কথা শুনুন, পরলোকতাত্ত্বিকদের আন্দাজী গবেষণা নয়—ভবতো গতক্ষণ মরণ দেখছিলাম, সমস্ত ছায়া। ঠিক তেমনি। ছায়া হয়ে গেল লাবণ্য সহ আমার এই জীবনটা। হাসি পাচ্ছে, কী বোকা আমি—এতকাল এইসব সত্য ভেবে এসেছি!

দয়ালহরির সাড়া পাই: কই গো, ঘুমিয়ে পড়ছ তোমরা? দেরি হয়ে গেল। দুয়োর খোল।

লাবণ্য উঠে গিয়ে আলো জেলে দরজা খুলে দিল। শাশুড়ি ঠাকরুন বরকনের খাবার তৈরি করে পাঠিয়েছেন। মেয়ে তো উৎসব নিয়ে থাকবে, কে কি করে গোলবাড়িতে? পাঠিয়েছেন থালায় বাটিতে রকমারি তরকারি, লুচি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীর-পুরিয়া, গোপালভোগ—এ সমস্ত দয়ালহরি এনেছেন, আরও কত কি পিছনে হরিশের হাতে! এক দয়ালহরি এত জিনিস কি করে আনবেন, সন্ধ্যায় হরিশকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে-ও খেটেছে বড় বউর সঙ্গেসঙ্গে।

দয়ালহরি বললেন, বড় বউ দেরি করিয়ে দিল। ভোরবেলা থেকে আজ রান্নাঘরে। একটি বারও বেরোয় নি। টানটাও বড্ড বেড়েছে ক'দিন। তার উপরে এই। বলে, ক'পা হেঁটে গিয়ে মেয়ের একটু সংসার গুছিয়ে দেবো, চোখে মেয়ের সুখ দেখে আসব, কিছুই পোড়া কপালে হল না। ঘরে বসে গতরে খেটে শুধু দু-খানা তরকারি রেঁধে দিচ্ছি। ফুলশয্যায় মানুষ কত রকম তত্ত্ব-তালাস করে, আমরা তো কিছুই পেরে উঠলাম না—

কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি: মেয়ের গা সাজিয়ে গয়না দেবেন, বলেছিলেন—তার কি হল?

দয়ালহরি আকাশ থেকে পড়লেন: আমি?

জড়োয়া গয়না হীরে-মুক্তোয় গাঁথা। আপনারা তো পুরানো ঘর—গয়না গাদা হয়ে থাকে। ঘরের মধ্য মাটির নিচে পোঁতা থাকে। কী আশ্চর্য, এতজনকে ডেকে ডেকে শোনালেন, এখন যে কিছুই মনে পড়ছে না!

বাপের দিক হয়ে লাবণ্য বলে, গয়না তো গায়ে পরবার। তাতে কোন লাভটা হত শুনি? গয়নায় আমার ছেঁদা-ছেঁদা মুখ ভরাট হত? ঢাকা পড়ত কানা বাঁ-চোখটা?

হেসে উঠে বলি, খবর রাখি হোড়মশায়। গয়না সমস্ত কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরে-মুক্তো কাচ। ম্যাজিকে হয়ে গেল।

খিক খিক করে হাসতে লাগলাম, এই আমার মনে আছে। অমন কুৎসিৎ হাসি আমার মুখে বেরোয়, আগে কখনো জানতাম না। এখনো বিশ্বাস করিনে। আমার হাসিই নয় আদপে, অন্য কেউ নিশ্চয় হেসে উঠেছিল আমার মুখ দিয়ে।

সে হাসি দেখে ভয় পেলেন দয়ালহরি। করুণ কণ্ঠে বললেন, দেবো কোত্থেকে বাবা? মাখন মিত্তির বেইমানি করল। গ্রাস করল সমস্ত একাই। মেয়ের গয়না দেবো, মেয়ের বিয়ের খরচপত্র করব, বাড়ির দেনা শুধব—সমস্ত বরবাদ। ক'টা দিন পরে, জানো তো বাবা, ঘরবাড়ি ছেড়ে বড় বউ আর কাচ্চাবাচ্চার হাত ধরে পথে বেরুনো ছাড়া গতি নেই।

থামলেন একটু। তিক্ত হাসিতে সারা মুখ বীভৎস হয়ে গেল। বলছেন, মন্দ হবে না। সদরের একটা তেমাথা জায়গা দেখে রেখেছি। বড় বউয়ের হাত ধরে সেখানে নিয়ে বসিয়ে দেবো। খোঁড়া মেয়েমানুষ, চেহারাখানা ঐ, তার উপরে হাঁপানির টান—আপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলো ঘিরে থাকবে

চতুর্দিকে। ভিখারি সেজে বসতে হবে না—ভগবানই আপনা থেকে সব গুছিয়ে দিয়েছেন। তা ভেবে দেখলাম, ভালই হবে। শতেক হ্যাঁচড়ামি করে যা পাই, তার চেয়ে অনেক ভাল।

তার চেয়ে আরও ভাল আছে।

হতবুদ্ধি হয়ে দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেন। বললাম, মরে যান না কেন একেবারে। এক কাজ করুন, আমায় মেরে দিন—আমি বেঁচে যাই। আর এমন মহৎ কাজ বথা যাবে না। সদাশয় সরকার বাহাদুর পিঠ পিঠ আপনাকেও মেরে পরোপকারের পুরস্কার দেবেন।

না বাবাজি, না। ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

ভয় পাচ্ছেন? আপনার মেয়ে কিন্তু এমনধারা নয়। গুলি ভরলাম, দেখল সে চেয়ে চেয়ে। গুলি করতেও পারে, কিন্তু ভাবছে দিনে-রাত্রে তিলে তিলে মারার মজাটা বেশি।

হাতে বন্দুক দিলাম। বলি, টিপে দিন ঘোড়াটা।

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, উঁ?

দেখিয়ে দিতে হবে? আচ্ছা, দিন আমায়—

যন্ত্রচালিতের মতো বন্দুক ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে। তারপরে কি হল, কেমন করে হল, একেবারে ঝাপসা। শুধু একটিবার দেখেছিলাম, শ্বশুর মশায় গোল-ঘরের রক্তাক্ত মেজেয় গড়াচ্ছেন। বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

• • •

কত সহজ মৃত্যু! লহমার মধ্যে সমস্ত ঠাণ্ডা। কিন্তু আমায় নিয়ে বড্ড বেশি খেলাচ্ছে এরা। বিড়ালের যেমন ইঁদুর-শিকার। থাবার মধ্যে পেয়ে তারপরে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করতে দেয়। এক কামড়ে খেয়ে সুখ হয় না। ইঁদুর এদিক-ওদিক ছোটে, বেশি দূরে গেল তো মুখে করে কাছে নিয়ে এলো। আবার ছোটে, আবার ধরে। শেষ কামড় তো আছেই। কিম্বা ধরুন ছিপে মাছ খেলানো। খেলিয়ে নিয়ে শেষটা মোক্ষম টান। আমারও ঠিক তাই—ছোট-কোর্ট থেকে মেজো-কোর্টে। মেজো থেকে বড়য়। অগুন্তি সাক্ষিসাবুদ, হাকিম-উকিল, দুপক্ষের জেরা-সওয়াল, ভারী ভারী কেতাব খোলে কথায় কথায়—আর, আড়গড়ার মধ্যে সকলের থেকে আলাদা রাজাধিরাজ আমি। ক্ষণে ক্ষণে সকলে তাকায় আমার দিকে, আমায় ঘিরে যাবতীয় আয়োজন। আত্মগৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আবার লজ্জাও লাগে—নাঃ, বাড়াবাড়ি করছে সামান্য এতটুকু কাজের জন্য। খুন তো করেছি একটিমাত্র মানুষ—তা-ও দয়ালহরির হোড়, যে লোক মানুষ কিংবা জীবজন্তু তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আর যাঁরা এক সঙ্গে হাজার হাজার সাবাড় করছেন, তাঁদের তো কেউ ধর্মাধিকরণে নিয়ে এসে খাতির জমায় না! লড়াইয়ের ইয়োরোপ একটিবার দেখে আসুন। আমারও বন্ধুর মুখে শোনা অবশ্য। এ বাড়িতে তিন-শ মরেছে, ঐ মাঠে সাত-শ, এই শহরে চল্লিশ হাজার। মানুষ না ছারপোকা। ছারপোকাও এক একবারে অতগুলো করে মারা যায় না। সেই কাজ করে ফেলে চক্ষের পলকে। কিংবা স্বদেশেও দেখেছিলেন সেই দাঙ্গার সময়টা। কলা-মুলোর মতো কী রকম মানুষ কাটে। এক গোলা-বাড়িতেই কতগুলো গেল, হিসেব করুন। সেই বীরবর্গের তুলনায় নিতান্ত কীটস্য কীট—আমায় নিয়ে এ ধুমধাম কেন?

বউদি দেখা করতে এলেন বিকালবেলা। টুনুও আছে। রোজ আসছেন। দেখা-শুনোর নিয়মকানুন শিথিল করে দিয়েছে ক'দিন থেকে। খাতিরটা বড্ড বেড়েছে আমার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



# প্রবাসের জার্নাল

**শিবনারায়ণ রায়**

## পাঁচ

এসব ব্যাখ্যা বিবেচনা থেকে অবশ্য এ সিদ্ধান্ত মোটেই সংগত নয় যে, ইংরেজ চরিত্র নিশ্ছিদ্র, অথবা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার কিছু নেই। কয়েকটা প্রধান সমালোচনার উল্লেখ করি। ঐতিহ্য-বোধ সাধারণভাবে ইংরেজ সভ্যতাকে যেমন নিরর্থক অপচয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য বিকাশে অযৌক্তিক বিলম্বও ঘটিয়েছে। বিল অব রাইটস-এর পর ওদেশে প্রায় সোয়া দুশো বছর লাগল মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হতে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি এদেশে মেনে নেওয়া হয়েছে ১৮৭০ সালে, কিন্তু আজও ইংল্যাণ্ডে বেশীর ভাগ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা পাবলিক স্কুলেই পড়তে যায় এবং ইলেভন ক্লাসের বেড়া তুলে দেওয়া নিয়ে আপত্তির অন্ত নেই।* আবার বিশুদ্ধ যুক্তির চাইতে অভিজ্ঞতার ওপরে বেশী জোর দেওয়ায় ইংরেজের লাভ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু গোঁজামিলের দিকে চোখ ঠারার প্রবণতাও কি বাড়েনি? যে ইংরেজ নিজের দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা এবং সম্প্রসারণে অতন্দ্র, সেই ইংরেজই ত দিব্যি ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলনের দমনে উদ্যোগী। নিজেদের দেশে 'রক্তহীন বিপ্লবের' ঐতিহ্য নিয়ে এদের গর্বের সীমা নেই, অথচ এরাই ত বছরের পর বছর অন্য দেশে স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে, বাধা না হওয়া পর্যন্ত হিটলার মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোর গুণ্ডামিতে কোনো বাধা দেয়নি। এই দুই ব্যবহার যে পরস্পরবিরোধী, তা ভেবে কজন ইংরেজের রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে? আপাদমস্তক পোশাকমোড়া প্রৌঢ় ইংরেজকেই কি দেখা যায় না লণ্ডনের উইণ্ডমিল অথবা আরভিং থিয়েটারে পাঁচ ভাগের চার ভাগ উলঙ্গ তরুণীদের অঙ্গ-ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে প্রহর কাটাতে? হিসেবী ইংরেজ কথা দিলে কথা রাখে, সৌজন্যে তার ত্রুটি নেই; কিন্তু হিসেব-ভাসানো ভালোবাসার সঙ্গে পরিচয় তার কতখানি; জন ডান ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে দুনিয়াকে চুপ করতে বলেছিলেন; তিনি নাকি ভালবাসবেন। অথচ তাঁর কবিতায় শেষ পর্যন্ত কানুর বাঁশী বাজল কি? প্রেম কি ঢাকা পড়ল না চুলচেরা নিপুণ বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কাজকরা বোরখায়? প্রেমিক শেলীকে তাই না বাঁচতে হল নির্বাসন, প্রেমিক কীটসকে অকাল মৃত্যু। হিসেবী ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ বিদেশে প্রেমলীলা চুকিয়ে স্বদেশে বাকি দীর্ঘ জীবন কাটালেন আদর্শ সজ্জন হিসেবে। এই অলক্ষ্য হিসেবী বুদ্ধিরই কি প্রতীক নয় এলিয়টের 'প্রুফ্রক'? এর বিরুদ্ধেই কি অভিশাপ উচ্চারিত হয়নি ব্লেকের কাব্যে, লরেন্সের গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধে? অস্তিত্ববোধের যে গভীরতম আনন্দ এবং তীব্রতম যন্ত্রণা—প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাকে একজাতে ফেলা শক্ত, যার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে কেউ বলেছেন অলৌকিক কেউবা Uberzahliges Dasein (রিলকে—নবম এলেগি)—যার আস্বাদনের জন্যে আমরা কখনো পড়ি উপনিষদ, কখনো বোদলেয়ার অথবা রিলকে, কখনো শুনি বেটোফেনের সংগীত, কখনো দেখি রোঁদ্যার ভাস্কর্য কিংবা ভ্যান গগ্-এর ছবি, এক সেক্সপীয়ারকে বাদ দিলে

* মূল রচনার শেষে পাদটীকা দ্রষ্টব্য

(এবং হয়ত ব্লেক) ইংরেজের শিল্পসাধনার ইতিহাসে কোথায় বা তার আভাস মেলে?

এসব সমালোচনা ঈর্ষাজাত নয়; ইতি-পূর্বে আমার কোনো কোনো লেখাতে ইংরেজ চরিত্রের এসব গলদ নিয়ে আলোচনা করেছি। বিলেতে আজকাল 'ক্রুদ্ধ তরুণ দল' বা 'অ্যাংগ্রি ইয়ংমেন' বলে যাদের খ্যাতি বা অখ্যাতি তাদের বিক্ষোভও ত আসলে ইংরেজের এই আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন, গোঁজামিলে-তৃপ্ত, হিসেবী বুদ্ধির বিরুদ্ধে। এ'দের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র জন অসবোর্ন তাঁর পরপর দুটি নাটক—লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার এবং দি এনটার-টেনার-এ ইংরেজের হৃদয়হীন, আদর্শ-হীন, নিজেকে-চোখ-ঠারা সংস্কৃতিকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছেন। লরেন্স অলিভিয়ার-এর অভিনয়ের কল্যাণে তাঁর নাটক নিয়ে এদেশে খুব হৈচৈ পড়ে গেছে। এ দলের একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক কিংসলি অ্যামিস তাঁর 'লাকি জিম' চরিত্রে নিষ্ঠুর দক্ষতার সঙ্গে আত্মম্ভর ইংরেজ বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতার কাহিনী উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। এ'দের বিচারে ঐতিহ্যাশ্রয়ী অসাম্যের সঙ্গে পদে পদে রফা করে সাম্য আনার চেষ্টায় বিলেতের শ্রমিক দল এবং যুদ্ধোত্তর ওয়েলফেয়ার স্টেট সাম্যের আদর্শকে প্রায় নিরর্থ করে তুলেছে; তার ফলে শ্রমিক করতে শিখেছে মধ্য-বিত্তের অনুকরণ, বিবেকী হারিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সহজ প্রেরণা, এমন কি অত্যাচারিতের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করার আত্মিক সামর্থ্য। আর একজন লেখক রিচার্ড হোগার্ট (ইনি পূর্বোক্ত 'ক্রুদ্ধ তরুণদের' দলে পড়েন না) তাঁর 'দি ইউজেস অব লিটরেসী* বইতে অনেক তথ্যপ্রমাণ সহকারে অভিযোগ উপস্থিত করেছেন যে, তথাকথিত শিক্ষার প্রসারের ফলে বিলেতের শ্রমিকরা বৈদগ্ধের উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধতর ত হয়ইনি, বরং তাদের যে স্বকীয় প্রাণবান লোকসংস্কৃতি ছিল, তাও খোয়াতে বসেছে। অর্ধশিক্ষার সামর্থ্যে তারা মূল বই পড়ার দায়িত্ব এড়িয়ে বইয়ের সমালোচনা পড়ে সবজান্তা সাজে; চিন্তার উঁচু চূড়ায় ওঠার প্রস্তুতি তাদের নেই, অথচ ওপরচালাকির টানে জীবনের সঙ্গে তাদের সহজ সংযোগ দুর্বলতর হয়ে আসছে।

এসব অভিযোগকে আমি মোটেই স্বল্প মূল্য বা অবান্তর মনে করি না। তরুণ এবং/অথবা আদর্শবাদী ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই যে তাঁদের দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনযাত্রার কড়া সমালোচক, আমার জার্নালের টুকিটাকি নানা বিবরণ থেকে তা আন্দাজ করা নিশ্চয়ই শক্ত নয়। তবু সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করেও আমার ধারণা, ইংরেজ তার জাতীয় চরিত্র এবং সংস্কৃতি নিয়ে সংগত কারণেই গর্ববোধ করতে পারে। অভিজ্ঞতাবাদী ইংরেজ বৈচিত্র্যের স্বীকারের ওপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে; তার ব্যক্তিস্বাধীনতা বোধ যেমন প্রখর, তার নিয়মানুগতা তেমনি নিখাদ; নানা মতের প্রতিভার সহজ সহিষ্ণুতা থাকার ফলে কোনো উগ্র অসহিষ্ণু মতবাদ তাকে আকৃষ্ট করে না; পদে পদে ছোট বড় সংস্কারের (অর্থাৎ রিফর্মের) মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য এবং পরিবর্তনের বিকল্প দাবীকে সে মেলাতে চেয়েছে আর তাই বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের নির্বোধ অপচয় তার ইতিহাসে সবচাইতে কম। ফ্যাসিজম্‌ অথবা

* Richard Hoggart, The uses of Literacy. Chatto and Windus. 25s

কম্যুনিজম্ বিলেতে তাই শেকড় গাড়তে পারল না; জাতীয় ঐক্যের নামে সেখানে জার্মানীর মত 'হংসপাদিক রাষ্ট্র' খাড়া করতে হয়নি; ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্প্রসারণ অথবা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ইংরেজ বারবার রাষ্ট্র বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেনি। বিলেতে তাই ম্যাকার্থির মত মানুষদের ক্ষমতা-বিস্তার প্রায় অকল্পনীয়। বিলেতে চার্চ ধীরে ধীরে রফা করতে শিখেছে বিজ্ঞানের সঙ্গে, রাজা প্রজার সঙ্গে, অভিজাত সম্প্রদায় ব্যবসায়ী এবং শিল্প-পতিদের সঙ্গে, শেষোক্তরা শ্রমিকদের সঙ্গে। এখানে জনসমর্থন পাবার জন্যে লেবার পার্টি আর কনজারভেটিভ পার্টিতে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু নির্বাচনে যেই জিতুক আর যেই হারুক পরস্পরের সমালোচনা এবং অভিজ্ঞতা থেকে শেখবার আগ্রহ এবং সামর্থ্য দুই দলের মধ্যেই লক্ষণীয়। ফলে লেবার পার্টির অনেকেই আজ আর 'জাতীয়করণের' গোঁড়া সমর্থক নন; এবং কনজারভেটিবরা সোস্যাল সার্ভিসের অপরি-হার্যতা ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করছেন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে, দলে দলে, আদর্শে আদর্শে পার্থক্য আছে, সংঘাতও আছে, কিন্তু একের প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যকে একেবারে মুছে যেতে হয়নি। এই রফা করার বুদ্ধি থাকার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ গান্ধী-নেহরুর মত নেতাকে জেলে পুরেও তাঁদের সঙ্গে আপোস আলোচনার সূত্র বজায় রাখতে পেরেছিল। (নাটশী কিংবা কম্যু-নিস্ট অধিকৃত দেশগুলোয় গান্ধী-নেহরুর মত নেতাদের কি দশা হত কল্পনা করা কঠিন নয়)। এবং যদিও কোনো জাতীয়তা-বাদী ভারতীয়ের পক্ষে কথাটা ভারি পীড়াদায়ক, তবু সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক মাত্রেই বোধ হয় স্বীকার করবেন যে, আপোসে সাম্রাজ্যের দখল ত্যাগ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছে। ফলে ভারত থেকে তল্পিতল্পা গুটোলেও ভারতের শ্রদ্ধা এবং বন্ধুত্ব তারা হারায়নি। অপর পক্ষে এত বড় সাম্রাজ্য হারানো সত্ত্বেও বিলেতে না ঘটল রাষ্ট্র-বিপ্লব, না দেখা দিল কোনো ডিক্টেটর। এশিয়ার অন্যসব দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ গত দশ বছরের মধ্যে অনেক বেশি শান্তি এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে যে এত ব্যাপক এবং বহুমুখী রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে এই দেশেই যে প্রথম কম্যুনিস্টদের মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী দল আইনসংগত উপায়ে দেশের এক অংশে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে পারল— এ ব্যাপারে এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কৃতিত্ব যতখানি, ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দান হয়ত তার চাইতে কোন অংশে কম নয়। * এই শিক্ষা এবং

* কম্যুনিস্টদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসা আমি মোটেই শুভ লক্ষণ মনে করি না। কারণ কম্যুনিস্টদের সাফল্যের অর্থ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিনাশ। আমি এখানে জোর দিয়েছি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার ওপরে। এই পদ্ধতি কম্যুনিস্টদের চিন্তায় প্রভাব ফেলতে পারে; তার চাইতে বড় কথা এই পদ্ধতি মেনে চললে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কম্যুনিস্টদের হটিয়ে কোনো গণতন্ত্রীদল আবার ক্ষমতায় আসতে পারে।

ব্যবস্থায় বিস্তর রদবদল এবং উন্নতির প্রয়োজন আছে, অবকাশও আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেই উন্নতি বিধানের বিচিত্র সম্ভাবনাও আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষে যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষা এবং ব্যবস্থাকে গোড়া ঘেঁষে উচ্ছেদ করতে চান, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস তাঁদের চেষ্টা সফল হলে এদেশে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে হয়ত অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের, এক ভাষাভাষীর সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীর, উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের। কিন্তু এতো শুধু সর্বনাশের প্রথম অঙ্ক। গৃহযুদ্ধের শেষ অঙ্কে আমি শুধু দুই প্রধান যুধ্যমান শক্তির কথা ভাবতে পারি—একধারে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অন্যধারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃত্বে সব হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। এ দুই শক্তিই গণতন্ত্রবিরোধী এবং গৃহযুদ্ধে যে পক্ষই জয়ী হোক না কেন, তার অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি ভারতবর্ষে ডিক্টেটরশিপের প্রতিষ্ঠায়। সেই সর্বনাশের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার ব্যাপারে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় দায়িত্ব আছে।

বিলেত থেকে চলে যাবার আগে তাই একথাই আমার আমার মনে হল : দুশো বছর ধরে ইংরেজ আমাদের অনেকভাবে শোষণ করেছে, অনেক দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু তারই মূল্যস্বরূপে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু শিখেছি, লাভ করেছি, তাকে যদি আজ স্বাজাত্যের মূঢ়তায় অথবা বিপ্লববাদের অসহিষ্ণুতায় বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিই, তবে তার চাইতে আত্মঘাতী কাজ আর কিছু হতে পারে না।

পরিশেষে এই খসড়ার গোড়াতে যে সতর্কতার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটি আবার স্মরণ করি। জাতীয় চরিত্র নিত্য নয়, তা বদলাতে পারে, বদলায়। অভিজ্ঞতাজাত কোনো সামান্য সূত্রই স্বতঃসিদ্ধ নয়—তার ব্যতিক্রম সম্ভব। ব্যতিক্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সূত্র বদলাতে হয়।

জাতীয় চরিত্রে নিত্যতা আরোপ এবং ব্যতিক্রমের বিলোপ প্রচেষ্টা—এ দুই লক্ষণই সমাজ সভ্যতায় জরা সূচিত করে। ইংরেজের সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণার খসড়া আমি এখানে উপস্থিত করেছি, তাতে কতখানি যাথার্থ্য আছে তা বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু সে ধারণায় যতটুকুই সত্য থাক না কেন, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তার কমবেশি ব্যতিক্রম আমি লক্ষ্য করেছি, এবং এ জার্নালে সেই ব্যতিক্রমদের বিবরণ কম জায়গা জোড়েনি। বস্তুত, ব্যতিক্রমের মূল্যস্বীকার অভিজ্ঞতাবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; এবং যেহেতু অন্ততঃ আমার বিচারে এই স্বীকৃতি ইংরেজের জাতীয় চরিত্র এবং সভ্যতার একটি মূল লক্ষণ, সে কারণে ইংরেজের ভবিষ্যৎ বিকাশেও আমি গভীরভাবে আস্থাশীল।

মার্চের শেষে মাঝরাতে আকাশপথে এদেশে এসে পৌঁছেছিলাম। এখন সেপ্টেম্বরের এক মাঝরাতে মার্কিনগামী ফরাসী জাহাজ ইল্ দ ফ্রাঁসের ডেকে বসে আছি; দূরে সাদাম্পটন বন্দর ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল।

৭৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকা

* উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিলেতে জনশিক্ষা প্রসারে প্রধান উদ্যোগী ছিল চার্চ বা বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান। ১৮৩৩ সালে প্রথম শিক্ষা ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি অনুসারে এদেশের সর্বত্র চার্চ বা ব্যক্তিগত-উদ্যোগে-পরিচালিত স্কুল ছাড়াও সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে এখন এদেশে বেশীর ভাগ







স্কুলই সরকারী খরচায় চলে ঃ এক ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসেই এখন সরকারের রক্ষণাধীন স্কুলের সংখ্যা তিরিশ হাজারের ওপরে এবং তাদের ছাত্র সংখ্যা সাড়ে বাষট্টি লক্ষ (১৯৫৪ সালের হিসেবে।) এই স্কুলগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষের ওপরে ন্যস্ত—অর্থাৎ কাণ্টি কাউন্সিল, কাণ্টিবো কাউন্সিল এবং টাউন কাউন্সিলের ওপরে।

এদেশে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল মোটামুটি তিন ধরনের—। (১) কাণ্টি স্কুল ঃ এদের সমস্ত খরচা জোগায় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন কর্তৃপক্ষ। এদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার ভারও তাদের। সংখ্যায় এরাই সবচাইতে বেশী। (২) ভলাণ্টারী স্কুল ঃ এদের পুরো অথবা আংশিক খরচা সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হয়। বেশীরভাগেরই প্রতিষ্ঠাতা কোনো-না-কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়। এদের পরিচালনায় কতটা সরকারী হাত আর কতটা প্রতিষ্ঠাতাদের সেটা অনেকটা নির্ভর করে সরকারী সাহায্যের পরিমাণের ওপরে। (৩) ডাইরেক্ট গ্র্যাণ্টস্কুল ঃ এরা সরকারী কোষ থেকে কিছু সাহায্য পেলেও এদের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের কোন হাত নেই। এরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান· এদের আপন আপন পরিচালক কমিটি আছে, এদের সমস্ত কর্তৃত্বভার এই কমিটির হাতে। ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্-এর মোট স্কুলের মধ্যে সংখ্যায় শতকরা পনেরোটি হলো "স্বাধীন" স্কুল (এদের ছাত্রসংখ্যা মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা আটভাগ মাত্র); স্কট্‌ল্যাণ্ডে শতকরা ছ'ভাগ স্বাধীন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে "স্বাধীন" স্কুল সংখ্যায় খুবই কম।

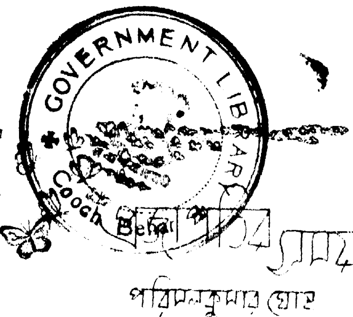





ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় "পাবলিক" স্কুল একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে। নামে পাবলিক না হলেও আসলে এরা একান্তভাবে "প্রাইভেট" স্কুল। এরা "স্বাধীন স্কুল"দের অন্তর্গত ঃ এদের পরিচালনায় সরকারের হাত নেই এবং এদের অনেকেই সরকারী সাহায্য পর্যন্ত নেয় না। (স্কটল্যাণ্ডে কিন্তু "পাবলিক" স্কুল বলতে সরকারী স্কুলই বোঝায়)। বিলেতে সরকারী সাহায্য-নির্ভর স্কুলগুলোয় ছাত্রদের কোন মাইনে লাগে না ঃ "পাবলিক" স্কুলে মাইনে লাগে এবং সে মাইনের হার বেশ চড়া। তাছাড়া বেশীর ভাগ পাবলিক স্কুলেই ছাত্রদের বোর্ডিং-এ থাকা বাধ্যতামূলক। ফলে যথেষ্ট পৈত্রিক পয়সা না থাকলে "পাবলিক" স্কুলে পড়া এক রকম অসম্ভব। অবশ্য পাবলিক স্কুলের সংখ্যা এদেশে খুবই কম এবং এদের বেশীর ভাগই বহুদিনের পুরোনো। (ক্যান্টারবেরীর কিংস-স্কুলের" পত্তন হয়েছিল নাকি অ্যালফ্রেডের আমলে, উইনচেস্টারের জন্মসাল ১৩৮২; ইটনের ১৪৪০)। পাবলিক স্কুলে ছাত্রের অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অন্য স্কুলের তুলনায় অনেক বেশী; শিক্ষার মানও অনেক উন্নত। ফলে এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে যারা মাতব্বর ব্যক্তি তাদের একটা খুব বড় অংশ পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। মোদ্দা, বিলেতের গণতান্ত্রিক সমাজ-সংস্কৃতিতে একটা বড় রকমের অসাম্যের ফল এবং কারণ এই 'পাবলিক স্কুল' প্রতিষ্ঠান।

"ইলেভ্‌ন্‌ প্লাস" ব্যাপারটারও বোধ হয় একটু ব্যাখ্যা দরকার। বিলেতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শেষ হয় এগারো বছর বয়েসে। কিন্তু তারপর আরো চার বছর বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯২৬ সালে হেনরী হ্যাডো সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে ঠিক হয় যে এগারো বছর বয়েসে ছাত্রদের একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং পরীক্ষার ফল অনুসারে ঠিক হবে ছাত্রেরা তারপর বাকীদের জন্যে সেকেণ্ডারী মডার্ন পাবে। এদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য বিবেচিত হবে তারা যাবে গ্রামারস্কুলে। তারপর বাকীদের জন্যে সেকেণ্ডারী মর্ডার্ন স্কুল বা সেকেণ্ডারী ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের ব্যবস্থা। একটা ছোট অংশের জন্যে সেকেণ্ডারী টেকনিক্যাল বা টেকনিক্যাল ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের বন্দোবস্ত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিলেতে বহু শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবক খুব আন্দোলন করছেন। তাঁদের যুক্তি হোল গ্রামার স্কুলগুলোর শিক্ষার মান সেকেণ্ডারী মতাদর্শগুলোর চাইতে উঁচু। এবং অল্পসংখ্যক ছাত্রকে প্রথম জাতের স্কুলে পড়বার বিশেষ সুবিধে দেওয়ার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাম্য টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। এগারো বছর বয়সের পরীক্ষা দিয়ে কোন ছাত্রের যোগ্যতা বিচার করা অর্থহীন। অথচ সেই পরীক্ষা দিয়েই ঠিক করা হচ্ছে কোনো ছেলে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা পাবে কিনা। তাছাড়া বিত্তবান ঘরের ছেলেরা শুরু থেকেই ভাল স্কুলে এবং ভালভাবে পড়ার সুবিধা পায়, ফলে এগারো বছরের পরীক্ষায় তারাই সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারে। অভাব অনটনের মধ্যে যে ছেলেরা বড় হয়, তাদের যোগ্যতা গড়ে উঠতে বেশী সময় লাগে। এই কারণে এঁরা ইলেভেন প্লাস ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। ব্যাপারটার এখনও কোন মীমাংসা হয়নি, কিন্তু কোন কোন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে ইলেভেন প্লাসের বেড়া তুলে দিয়ে দেখা হচ্ছে ফল কি দাঁড়ায়।






পরিমলকুমার ঘোষ

**উমাদির** চিঠি পেলাম। নিরুত্তাপ শোনাল কথাটা। অবশ্য পনর বছর তিন মাস তেরো দিন পরে সে দিনের সে উত্তাপ না থাকারই কথা। ঠিক পনর বছর তিন মাস তেরো দিন পরে। কেননা সেদিন আমার জন্মদিন ছিল। বাড়িতে বৌদির দাক্ষিণ্য থাকায় জন্মদিন নিয়ে মাথা ঘামাতো না কেউ। উমাদিই বলেছিল, ঘুর নয় রে, তোর জন্মদিনের উপহার। সেদিনটা আমার সত্যি জন্মদিন ছিল না জানতাম। কিন্তু সত্যি জন্মদিনটাও জানতাম না। তাই, সত্যি হোক মিথ্যে হোক উমাদির দেওয়া জন্ম-দিনটাই আমার সেই হয়ে ওঠার বয়সের ডায়েরীতে লেখা ছিল।

সে বয়সটাকে যেন আর চিনতে পারি না। কত অদ্ভুত কথায় বোঝাই ডায়েরীর পাতা-গুলো। এক পাতায় লেখা আছে, রমার চুল ধরে যা টেনেছি আজ লুকোচুরি খেলার সময়, দাদুর ঘরের তক্তার ওপর একেবারে শুইয়ে ফেলেছিলাম। ভাগ্যি রমা কাউকে বলেনি!

রমা বলেনি, কিন্তু, মনে আছে, উমাদি বলেছিল। রমা উমাদির ছোট বোন। আমা-দের সমবয়সী। আমরা—আমি, তোতন, মিন্টি, বিন্টি, রমা, রবি তেরো বারো এগারো-র আওতায়। উমাদি, শিউলিদি, ছোটপিসী, খোকনদা, দাদা উনিশ, বিশ একুশের ধাক্কায়। খোকনদা, দাদার কথা আলাদা। মোটা গলায় কথা বলে, মোটা মোটা বই নিয়ে হাঁটে, রাস্তায় আমাদের দেখলে ধমকায়, বাড়িতে ফিরেও চায় না। কাজেই ওদের নাগাল না পেলেও চলে। বাকী আমরা কজন, অর্থাৎ এ-বাড়ির আমি, তোতন মিন্টি বিন্টি শিউলিদি ছোটপিসী ও-র ও-বাড়ির রমা রবি উমাদি ইস্কুলের ছুটির দুপুরে সারা বাড়ি আমাদেরই দখলে। পুরনো আমলের শহরতলীর বাড়ি আমা-দের। সারা দুপুর ধরে আমরা লুকোচুরি খেলতাম একতলার উঠোনের আশেপাশে, দোতলার দালানে ছাদে। তিনতলার ছাদের সিঁড়িটা ভেঙে যাওয়ায় সেটা তখন নাগালের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু তেমনি দাদুর ঘরখানা হাতে এসেছে, দাদু মারা যাওয়ায়। ঠাকুমা সারাদিন কোথায় যে থাকে! ঘরখানা একেবারে মাড়ায়ই না। কাজেই ঠাকুমার যে ঘরে আমাদের ঢোকবারই সাহস হতো না সেখানে আমাদের মইমাড়ান চলছে। বড় বড় আলমারি বসান বিরাট একখানা তক্তা-পাতা; ঘরখানায় আমাদের লুকোবার ভারি সুবিধে হয়েছে। আমি তো সহজে খাটের তলাটা আর কাউকে ছাড়তাম না। সেই নিয়েই রমার সঙ্গে ঝগড়া।

রমা মেয়েটা মুখোমুখি ঝগড়া করত, কিন্তু বড়োদের কাছে নালিশ করত না। তবু উমাদি আমাকে তারপরদিন ধমকাল, অতবড় মেয়ের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না! ভারি দুষ্টু হয়েছিস তুই বিনু! আমার হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরে উমাদি ভয় দেখাল, তোর বউদি-কে বলে!

বউদি মানে, আমার মা। ছোট-পিসীর বউদি বলে মা উমাদিরও বউদি। আর রমা, রবির দিদি বলে উমাদি আমাদের দিদি। আমি ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, এতটুকু ছেলের গায়ে হাত দিতে তোমার লজ্জা করে না! বলেই দৌড়ে অন্য জায়গায় লুকোতে চলে গিয়েছিলাম। দাদুর ঘরে খাটের তলায় লুকোবার জন্য রমার চুল ধরে টানতে পারি কিন্তু উমাদির সঙ্গে তো আর জোর খাটাতে পারি না!

রমা যে চুল-টানবার কথা উমাদিকে বলেনি সে-কথা পরে একদিন জানতে পারলাম। একটা অঙ্ক নিয়ে রমা কাঁদ কাঁদ হয়ে এসে বলল, বিনু ভাই, এই অঙ্কটা

করে দে, না-হলে আজ ইস্কুলে নেহাত দুঃখ্যু আছে। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, পারব না। চুল ধরে টেনেছিলুম বলে অমনি ছিচ-কাঁদুনীর মত নালিশ করা হয়েছে। অংক টংক আমার করবার সময় নেই। এ-রকম সাফ জবাব পেয়ে রমা একেবারে সরস্বতীর দিব্যি টিব্যি করে বলল, উমাদিকে ও কিছুই বলেনি। আমার বেশ বিশ্বাস হল যে, রমা সত্যি কথা বলছে। বোর্ডের পরীক্ষায় ভাল-ভাবে পাশ করবার আশায় সরস্বতী পুজোর আগে একটা কুলও খায় না। সরস্বতীর দিব্যি করে ও নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলবে না। তাছাড়া তখন আমি বুঝতে পেরে গেছি উমাদি কী করে ও-কথা জেনেছে। নিশ্চয়ই উমাদি আমার ডায়েরী দেখেছে। উমাদির ভীষণ অভ্যাস আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা। আমাকে কম অপ্রস্তুতে ফেলেছে এই করে? খবরের কাগজ থেকে ছবি কেটে কেটে তৈরী-করা দেশনেতাদের অ্যালবামে সরোজিনী নাইডুর পাশে এক অভিনেত্রীর ছবির ওপর ঐ নামটা লিখে রেখেছিলাম সে-কথা বাড়ির কারো জানার কথা নয়। কিন্তু উমাদির উৎপাতে সে খবর বাড়ি জুড়ে পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় রাখেনি কিছুদিন। বেশ মুশকিলে রমার চুল-টানবার কথা উমাদি নিজেই আবিষ্কার করেছে।

কাজেই রমার অংকটা করে না দেবার কোন কারণ রইল না। অংকটা পেয়ে খুশী হয়ে চলে যাবার সময় ওকে চটাবার জন্য বললাম, গায়ে হাত দেবে না ছাই। চুল ধরেই বলে আমার তখন গা-কেমন করছে! অংকটা হাতে পাওয়ায় রমা উদারভাবে একটা অবিশ্বাসসূচক 'ইশ্' বলে ওর চমৎকার চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে চলে গেল।

সত্যিই ঘৃণা করবার মতো চুল নয় রমার। সুন্দর লম্বা আর কালো কুচকুচে এক ঢাল চুল ওর। আর নরম। কিন্তু অত ঘন আর নরম বলেই রমার চুলে হাত দিয়ে আমার কেমন অস্বস্তি লেগেছিল। ঐ-রকম অস্বস্তি লেগেছিল কদিন আগে একটা প্রজাপতি ধরে। প্রজাপতিটার নরম, মসৃণ ডানার ঝটপটানিতে হাতের তালু থেকে আমার সারা শরীরে কেমন একটা বিদ্যুৎ চমকের মত একটা তরঙ্গ খেলে গিয়েছিল। দোলনায় দোল খাওয়ার সময় ওপর দিকে উঠতে গেলে বুকে যেমন একটা চাপ লাগে তেমনি একটা চাপ বুকে, গলায় ঠেলে উঠেছিল। প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দিয়েই তবু শান্ত হতে পারিনি। বারবার জামায় হাত ঘষে তার ডানার স্পর্শটুকুও মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু প্রজাপতির ছোঁয়ায় এ-রকম অস্বস্তি তো আমার আগে ছিল না! আগে, যখন রানীবাঁধে মামার বাড়িতে ছিলাম,

তখন কত প্রজাপতি ধরেছি। ছোট ছোট পাহাড়, আর ছায়া-ছায়া ঝোপঝাপ ভর্তি রানীবাঁধে অজস্র প্রজাপতির ছোটাছুটি। আমরাও সারাদিন তাদের পিছনে। কত প্রজাপতি ধরেছি পাখায় সুতো বেঁধে উড়িয়েছি, ক্লান্ত হয়ে পড়লে গোলাপের পাপড়ি খসান-র মত অবহেলায় পাখাদুটো ছিঁড়ে ফেলেছি। কিন্তু, একটা কথা এখন মনে হয়, তখন যারা হয়ে উঠেছে—যেমন, রাণী মাসীমা, তার কাছে যারা আসত ভক্তিদি, হীরেনদা, বঙ্কুদা— তারা কেউ আমাদের খেলায় যোগ দিত না। ভুল হল, খেলায় তারা নামত না, কিন্তু খেলায় তারা খেলত। বঙ্কুদা আসত মাঝে মাঝে। বিরাট লম্বা চওড়া বঙ্কুদা রানীমাসীমাদেরই কোন সম্পর্কের দাদা। সে এলে আমরা শুকনো নদীর বালিতে বেড়াতে যেতাম। সারা পথ আমরা প্রজাপতি ধরতে ধরতে যেতাম। কেন না, সারা পথে যে যতগুলো কারে ধরতে পারত বেড়িয়ে ফেরবার সময় বঙ্কুদার কাছ থেকে সে ততগুলো করে নিখুঁতি পেত। বঙ্কুদা আমাদের প্রজাপতির খেলা খেলাত। রানীমাসী সঙ্গে থাকলে বঙ্কুদা আমাদের খেলা আরও জমাবার জন্য লোভ দেখাত। প্রজাপতি-পিছু এক একটা চকচকে বড় আনার পয়সা পাবার লোভে আমরা আশেপাশের বনবাদাড় চষে ফেলতাম। ছুটতে ছুটতে হয়তো সকলেই দূরে চলে যেতাম। একা বঙ্কুদা আর রানীমাসী নদীর বালিতে বসে থাকত। বঙ্কুদার এই খেলা। অনেক বলেও বঙ্কুদাকে আমাদের সঙ্গে খেলায় নামাতে পারতাম না। তবে বঙ্কুদা হীরেনদার মত নয়। হীরেনদা আবার আমাদের প্রজাপতি ধরতে দেখলেই তাড়া লাগত। জানালায় হয়ত রানীমাসী দাঁড়িয়ে। হয়ত নয়। সকালবেলা আমরা যখন বাড়ির সামনে খেলা করতাম, সূর্য যখন রাস্তার ধারের দলছুট শাল গাছটার নিচের ডাল ছুঁই ছুঁই করত, হীরেনদা যখন সাইকেলে করে তিন মাইল দূরের হাইস্কুলে অংক আর বিজ্ঞান পড়াতে যেত, তখন রানী-মাসীর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চুলে তেল মাখাবার সময়। তাই হীরেনদা রানীমাসীকে বলত, তুমি ওদের বারণ করতে পার না? রানীমাসী যেন বেপরোয়াভাবে বলত, আমার অত প্রজাপতির ওপর ভক্তি নেই। প্রজা-পতির ওপর ভক্তির জন্য হীরেনদা গম্ভীর মুখে সাইকেল চড়ে গেলে রানীমাসী স্নান করতে যেত।

ভক্তি তো ছিলই না রানীমাসীর, বরং ভয় ছিল। নদীর ধারে কাছের ঝোপঝাপ তোলপাড় করে আমরা একে একে পকেট ভর্তি, রুমাল ভর্তি করে ফিরতাম। কোন-দিন ফিরে দেখতাম আমি প্রথমে এসেছি। বিকেলের আলো চলে গেছে। দূরে থেকে বঙ্কুদার বিশাল চেহারা আর রানীমাসীর কালো পাড় শাদা শাড়ি একটু দেখা যেত। আমি পা টিপে টিপে পিছন থেকে গিয়ে বঙ্কুদার মাথার ওপর দিয়ে কোলের ওপর ডানাবাঁধা প্রজাপতিগুলো ফেলে দিতাম। সঙ্গে সঙ্গে রানীমাসী যেন ছিটকে সরে যেত। রানীমাসীর হাতের ঝটকায় দুটো একটা প্রজাপতি দূরে ছিটকে পড়ত। রানী-মাসী আমাকে বকত, ভারি অসভ্য ছেলে তুই বিনু। কিন্তু রানীমাসী রেগেছে বলে মনে হত না। মনে হত যেন ভয় পেয়েছে। বঙ্কুদার কোলের ওপর প্রজাপতিগুলোর দিকে চাইতও না রানীমাসী। উঠে দাঁড়িয়ে বলত, বাড়ি যাব।

কিন্তু উমাদির কথা বলছিলাম। উমাদির সঙ্গে রানীমাসীকে আমি প্রায়ই এমনি করে জড়িয়ে ফেলি। রানীমাসীকে আমি যে বয়সের দেখেছি, উমাদিকেও সেই বয়সের। কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট কারণ? তা নয়। আসলে, উমাদি আর রানীমাসী যেন একই রকম অদ্ভুতভাবে হারিয়ে গিয়ে-ছিল আমার জগৎ থেকে। একইরকমভাবে দুজনেই না-জেনে আমার হয়ে ওঠার ঐক-তানে আরও একটা সুর মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শুধু উমাদি আর রানীমাসী নয়। রানীবাঁধের প্রজাপতির স্রোতে যেমন মিশে থাকত কয়েকটি ফড়িং, চড়ুই আর শালিক,

তেমনি উমাদি, রানীমাসী, হীরেনদা, বঙ্কুদা, রমা, খোকনদা সবাই যেন একটা স্রোতে ভেসে চলেছিল আমার চারদিকে।

খোকনদা পড়ার টেবিল থেকে মাঝে মাঝে এক আধখানা বই আমার দিকে ছুঁড়ে মারত, এটা এখানে এল কি করে? তুলে নিয়ে দেখতাম হয় আমার ব্যাকরণকৌমুদী, না হয় পাটিগণিত, না হয় ঐ ধরনের একখানা মোটা বই যা খোকনদার কলেজের বইয়ের ভিড়ে বেমানান নয়। আমি ঠিক বুঝতাম উমাদির কাজ। আমার বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাশের খোকনদার টেবিলে ফেলে গেছে। আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করতাম, আমি কী করব! উমাদিকে বললে শোনে না। খোকনদা ধমক দিয়ে উঠত, থাক, আর কৈফিয়ত দিতে হবে না। নিজের বই গুছিয়ে রাখবি।

উমাদিকে বলতাম। হয়তো সেদিনই দুপুরে বা বিকেলে। উমাদি বলত, তাই নাকি! কোন্ বইখানা রে? বলে তাড়াতাড়ি সেই বইখানা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখত।

আমি হয়ত বলতাম, তুমি আমাকে রোজ রোজ বকুনি খাওয়াও। উমাদি জবাব দিত না। সারা বইখানা পাতা-ঝরঝরে করে দেখে টেবিলে নামিয়ে রাখত। তারপর বলত, আমি তো আর বকুনি খাচ্ছি না। আমায় কেউ কিছু বলে না রে। মনে হত না-বলার জন্য আত্মপ্রসাদ নয় কেমন যেন হতাশা বেজে উঠত উমাদির গলায়। রাগ করতে গিয়েও তাই ঠিক রাগ করতে পারতাম না। অন্য গল্প করার চেষ্টা করতাম। আর তখন আমার গল্প সব রানীবাঁধের।

এই সময় কোনদিন হয়ত খোকনদা এসে হাজির হল। আমি হয়ত তখন বলছি, জান উমাদি, অনেক দূর থেকে প্রজাপতিটা যখন উড়ে এসে কোন ফুলের ওপর বসে না তখন দুখানা পাখা এক হয়ে একটা ইয়টের মত দেখায়। 'ইয়ট' দেখেছ? কিন্তু উমাদি চট করে উঠে পড়ত। তারপর কথা না বলে চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। ফুল না-ফোটার সময় রানীবাঁধের প্রজাপতির উড়ে উড়ে বেড়ানর গল্প শেষ করতে না পেরে আমি খোকনদার দিকে তাকাতাম। খোকনদা যেন উমাদিকে দেখেনি। খোকন-দার সব সময় এমনি ভাব। বইপত্র ঘাঁটার জন্যও উমাদিকে একটা কথা খোকনদা বলবে না। পরে আমার ওপর ঝাঁঝ দেখাবে।

উমাদিকে কেউ কিছু বলত না বলে উমাদি যে আমার কাছে ফাঁক করত তা বাজে কথা। উমাদির মা তো বলতে কিছু বাকি রাখতেন না। এক সেকেলে মানুষ। প্রায়ই শুনতাম উমাদির মা উমাদিকে বকছেন, ধিঙ্গি মেয়ে, সিনেমার মেম উড়ে বেড়াচ্ছেন। এদিকে নেই রূপের ধাড়ি, ওদিকে মেয়ের দিকে তাকালে গলা দিয়ে জল নামে না।

উমাদির মার কথা শুনে আমার হাসি পেত। উমাদি নাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। উড়ে বেড়ানর কথায় আমার রানীবাঁধের প্রজাপতির স্রোতকে এত স্পষ্ট মনে পড়ত যে যথাসাধ্য, গোলগাল উমাদির উড়ে যাওয়ার কথায় হাসি চাপতে পারতাম না।

এই রকম ওড়ার কথা রানীমাসীর সম্বন্ধেও শুনেছি। রানীমাসীমাদের বাড়িতে থাকতেও। বড় হয়ে বড়দের চাপা গলার আলোচনার মধ্যেও। কিন্তু রানী-বাঁধে থাকার সময় বাড়ির ঝি-চাকরদের মধ্যে রানীমাসীর সম্বন্ধে যা শুনতাম, তা শুনে তখন কিছু ভাববার বয়স হয় নি। আর, বয়স হলেও, আর যাই হোক, অন্তত হাসি পেত না। রানীমাসী ফরশা টকটকে রঙ, দীর্ঘ একহারা চেহারা, ধবধবে সাদা কাল-পাড় শাড়ির উড়ন্ত আঁচল সব কিছু জড়িয়ে রানীমাসীর ওড়ার ছবি বেশ কল্পনা করা যেত।

রানী মাসীর সব সময় সাদা শাড়ি পরার কথা একদিন দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করেই জানতে পেরেছিলাম, ওর নাকি সব শেষ হয়ে গেছে। কি শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারতাম না তখন। ঝি সুখদা গজগজ করত, কি জিনিস শেষ হয়ে গেছে, তা রানী মাসীও নাকি বুঝতে পারে না। না হলে নাকি অমন উড়ত না সে।

রানী মাসীর ওড়ার কথায় ধাঁধা লাগত। উমাদির ওড়ার কথায় হাসি পেত, কিন্তু বুঝতে পারতাম যে, আমাদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ খেলা, এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছুটোছুটি, এগুলোকেই উমাদির মা ওড়া বলতে চান। কেননা, প্রায়ই দেখতাম তুমুল লুকোচুরি খেলার মধ্য থেকেও মায়ের ডাকে উমাদিকে চোরের মত চলে যেতে হত। শিউলিদি, ছোট পিসীর সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তেও জরুরী তলবে উমাদিকে গম্ভীর হয়ে উঠে যেতে দেখেছি।

অথচ ফাঁক পেলেই উমাদি আমাদের বাড়িতে হাজির। এই নিয়ে মা উমাদিকে একটু আধটু ননদিনী রায়বাঘিনী-টাঘিনী বলে ঠাট্টা করত। শিউলিদি, ছোট পিসীও ঠাট্টা করত বুঝতাম। তবে ওদের বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় কী যে বলত

বুঝতে পারতাম না। তবে, আমাদের বাড়ির সকলেই চাইত, উমাদি আসুক। এক খোকনদা চাইত না বলেই যেন মনে হত। অথচ খোকনদাকে মুখ ফুটে কোনদিন কিছু বলতেও শুনিনি।

বরং উমাদিকেই একদিন বলতে শুনলাম। শিউলিদির বিয়ের পরের দিনের কথা। সারা বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে বর কনে চলে যাওয়ার পর। গত কয়েকদিন ধরে সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে বাড়িটা যেন সেদিন দুপুরে একটা অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়েছে। এমনি চাপা নির্জনতা যে, আমার কেমন কান্না পেতে লাগল। আধঘুমন্ত স্তিমিত, বিমিত, তোতনের লুডো খেলার ডাক অগ্রাহ্য করে আমি পায়ে পায়ে তিনতলার ছাদে উঠে গেলাম। বিয়ে উপলক্ষ্যে ভাঙা সিঁড়িটার সংস্কার হয়েছে। ছাদের ওপর আরেকটা অস্থায়ী ছাদ উঠেছে। সারা ছাদে গত রাত্রের উৎসবের মলিন চিহ্ন ছড়ান। মনটা আরও খারাপ লাগল। আলসেয় ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে একবার ঘুমন্ত বাড়িটার দিকে তাকালাম, তারপর ছাদের দূর কোণটায় গিয়ে একগাদা গোটান শতরঞ্চির ওপর মাথার নিচে হাত দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে দু-একটা কাক-চড়ুইয়ের ওড়া দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল চাপা গলার কথার শব্দে। জলের ট্যাঙকটার আড়ালে শতরঞ্চির স্তূপের মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু গলার আওয়াজে বুঝলাম, উমাদি।

কাঁপা কাঁপা নিশ্বাসের স্বরে উমাদি বলে চলেছে, কেন? কেউ কিছু বলবে না কেন? আমার কী দোষ? দলে দলে লোক আসছে। সঙ সেজে হাজির হচ্ছে। বলব বলে তারা চলে যাচ্ছে। কিছুই বলছে না। না বলুক। কিন্তু তুমিও কিছু বলবে না?

আঃ, পথ ছাড়ো। দাঁতে দাঁত ঘষে কে যেন বলে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। খোকনদা! উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, খোকনদা বলছে, পথ ছাড়ো। এখনি কেউ এসে পড়বে।

পড়ুক এসে। উমাদির গলায় যেন রানী মাসী কথা বলে উঠল, তোমাকে বলতে হবে কেন তুমি আমার কথার জবাব দাও না, চিঠির জবাব দাও না। কেন?

জবাব খোকনদা দিল কিনা বুঝতে পারলাম না। একটা চাপা বিরক্তিসূচক আওয়াজ শুনলাম। তারপর জোরে জোরে শব্দ করে কেউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নিশ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর একটা শান্ত পদক্ষেপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুনলাম। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে আলসের ধারে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। রেলিং দুটো দুহাতে শক্ত করে ধরে উমাদি এক-পা এক-পা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। রানী বাঁধের নদীর বিকেলে রানী মাসী হঠাৎ 'বাড়ি যাবো' বলে উঠে দাঁড়ালে অনেক সময় বকফুলের বিশাল হাতের থাবা থেকে খসে পড়ে দু-একটা ডানা-ছেঁড়া প্রজাপতি যেমন থরো থরো কেঁপে বালির ওপর দিয়ে যাবার চেষ্টা করত, উমাদিকে যেন তেমনি অসহায় দেখাল। কিন্তু উমাদির চোখের দিকে চেয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। ঠিক রানী বাঁধে মনসা পূজার ভাসানের গাড়ির ছইতে যে অস্বাভাবিক মোটা সাপটা আঁকা হত, তার জ্বলজ্বলে চাউনি ফুটে উঠেছে ময়লারঙ মোটাসোটা উমাদির চোখে।

মনে পড়ল এ-চাউনি আমি আগেও দেখেছি। দেখেছি রানীবাঁধেই। কিন্তু তখন জুতসই উপমাও খুঁজিনি, আশঙ্কিতও হইনি। কেবল চেনা মানুষের অচেনা অভিব্যক্তিতে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। রানীমাসীমা যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে ঘরে ডেকে গল্প করতে করতে বাক্স গোছাচ্ছিল সেদিন আমি ভাবিনি যে, ভবিষ্যতে আমি সেদিনের কথা গল্প করব। বাক্স গোছাতে গোছাতে রানীমাসী এটা ওটা কথা বলছিল। হঠাৎ আমি একখানা বেনারসী শাড়ি দেখিয়ে বললাম এটা কার শাড়ি রানীমাসী? রানীমাসী বলল, আমার। আমার বিশ্বাস হল না। বললাম, দূর! তোমার শাড়ি তো

সব সাদা। রানীমাসী একটু হেসে বলল, আমার শাড়ি স-স-ব শাদা, না! দেখবি, একখানা বেনারসী পরব! আমি খেলা পেয়ে বললাম, দেখব।

রানীমাসী উঠে গিয়ে দরজাটায় টানা খিল লাগিয়ে এল। তারপর আমার অবাক চোখের সামনে আটপৌরে শাড়ি জামা বদলে একখানা লাল টুকটুকে বেনারসী আর সলমা-চুমকির কাজ করা ভেলভেটের ব্লাউজ পরল। একখানা একখানা করে সমস্ত তোলা গয়না পরল, এমনকি জমকাল টায়রাটা পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মুখে স্নো ঘষল, পাউডার ঘষল, চোখে কাজল দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে যেন একটা উজ্জ্বল, কাঁচঢাকা আলোর মত স্থির শিখায় জ্বলতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, ঠিক রানী-প্রজাপতির মত দেখাচ্ছে তোমায় রানী মাসী।

রানীমাসী দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, ওরা যে বলে সব শেষ হয়ে গেছে! চমকে রানীমাসীর মুখের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। চোখদুটো যেন মনসা ভাসানের পাঁড়ির ছবিতে আঁকা সেই সাপটার মত জ্বলছে, সমস্ত মুখ রাঙা, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। চাপা গলায়, তুই যা বিন্দু, বলে পিছন ফিরে ড্রেসিং টেবিলটা আঁকড়ে ধরে রানীমাসী যেন নিজের দিকে চেয়েই হাঁফাতে লাগল।

উমাদির নেমে যাওয়া পথটার দিকে দেখতে রানীমাসীর কথা ভাবছিলাম। এবার মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি বিকেলও শেষ হয়ে এসেছে। উমাদিকে দেখেই কিনা জানি না আমার নিজেরও একলা ছাদে কেমন অসহায় বলে মনে হল। আস্তে আস্তে ছাদ থেকে নেমে একেবারে বাইরের বাড়িতে আমাদের পড়ার ঘরে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম। সমস্ত শরীর এত অবসন্ন লাগছিল যে, আলো জ্বেলে বই টেনে না নিয়ে খানিকক্ষণ টেবিলের ওপর দুহাত ভাঁজ করে তার ওপর মাথাটা রেখে বসে রইলাম। কিন্তু তাতেও ভালো লাগল না। সারা শরীর কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট ব্যথা ব্যথা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ বুঝতে পারলাম জ্বর হয়েছে। খোকনদার বিছানা পাতাই ছিল ছোট তক্তাখানার ওপর। তার ওপর শুয়ে পড়লাম। চুপ চাপ শুয়ে শুয়ে আবোল তাবোল অনেক কিছু ভাবলাম। পরীক্ষা, নতুন জামাইবাবুর ব্যাকব্রাশকরা চুল, উমাদির চোখের চাউনি।...

তন্দ্রা ভেঙে গেল। সারা ঘর অন্ধকার। দরজাটা দিয়ে সামান্যও আলো আসার কথা, সেটাও আসছে না। দরজাটা কে বন্ধ করল? কেমন মনে হল বিছানার পাশে কেউ বসে আছে। তারই ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেছে। জ্বর-কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কে? গলার স্বর ফুটল না। যেটুকু ফুটল তাও বিকৃত। আমি নিজের গলা বলে চিনতে পারলাম না। হঠাৎ কে যেন আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সারা শরীরের ব্যথা আর আড়ষ্টতা নিয়ে আমি উঠে বসবার আগেই দুখানা বালাপরা হাত আমার দুহাতের তলা দিয়ে প্রসারিত হয়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। আমার জ্বরতপ্ত বুকের ওপর যেন আরও উত্তপ্ত কোন কোমল বুকের তীব্র ওঠাপড়া অনুভব করলাম। দুটি অস্থির উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ আমার ঠোঁটে, মুখে, চোখের পাতায় আগুন ছড়াতে লাগল। অন্ধকার ঘরে জ্বরের ঘোরে আমার মনে হল আমি যেন একা বিরাট কালো প্রজাপতির ক্লান্ত ক্ষুধার্ত পাখার মধ্যে বন্দী হয়েছি। ছটফট করে উঠলাম। রানীবাঁধের দিন আর নেই। প্রজাপতির স্পর্শ আমার শরীরে এখন অস্বস্তি আনে। সারা শরীরের প্রকাশহীন ভাষা আমার গলায় তীব্র আর্তনাদের স্বর আনল। আমি চীৎকার

করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাতরতার আর্তনাদ ফুটল অন্ধকারের প্রজাপতির গলায়। সমস্ত বাঁধন শিথিল করে মাতাল পায়ে কেউ মেঝে পেরোল। সশব্দে দরজার খিল খুলে পড়ল। এক নিমেষের জন্য বাইরের আলোয় খোলা দরজার মধ্যে একটি 'শিল্যুয়েট' ফুটল। তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে জ্বর আর জ্বালায় হাঁফাতে হাঁফাতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

সে জ্ঞান ভাল করে ফিরতে দিন তিনেক লেগেছিল মার মুখে পরে শুনেছিলাম ঐ তিন দিন তিন রাত্রি আমার জীবনের কোন আশা ছিল না। চতুর্থ দিন দুপুরে আমি বেশ সুস্থ বোধ করছিলাম। বিছানায় শুয়েই কান পেতে শুনলাম সারা বাড়িতে বিশেষ কোন সাড়াশব্দ নেই। একটু মাথাটা ফিরিয়ে দেখলাম নিচে মেঝেয় শুয়ে রাত-জাগার ক্লান্তিতে মা-ও খুব ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। এ রকম-ভাবে আমাকে সবাই একলা ফেলে রেখেছে! অথচ কথা বলতে ইচ্ছে করল না। তাই মা-কেও ডাকলাম না। দরজাটার দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, কেউ কি আসতে পারে না!

কিন্তু যে এল তাকে আশা করিনি। পা-টিপে টিপে বারান্দাটুকু পেরিয়ে যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে আমার বুকটা যেন লাফিয়ে উঠল, মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা তীব্র উষ্ণ স্রোত খেলে গেল। চোখদুটো শক্ত করে বন্ধ করে সমস্ত শরীর টান টান করে আমি শুয়ে রইলাম। মনে হল, আবার বুঝি আমার জ্ঞান হারিয়ে যাবে। বুঝতে পারলাম উমাদি আস্তে আস্তে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। চাপা গলায় ডাকল, বিনু, বিনু। আমি জবাব দিলাম না। শুধু জিভ কেন আমার সমস্ত শরীরেই সে শক্তি ছিল না। সমস্ত মনেও।

উমাদি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল। আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমায় মাপ করিস। ভুলে যাস। তারপর ভেজা ভেজা গলায় বলল, মনে রাখিস। বলে আমার হাতে একটা বইয়ের মত কি ধরিয়ে দিল। চমকে চোখ চেয়ে দেখলাম উমাদির মরক্কোচামড়া-বাঁধান চমৎকার ফটো অ্যালবামখানা—আমার অনেক লোভের জিনিস। উমাদির দিকে তাকালাম। আমার চোখে কী ছিল। উমাদির মনে কী ছিল ধরা গলায় সে বলে উঠল, কেন দিতে নেই? তারপর ম্লান হাসির ভান করল, ঘুষ নয় রে। তোর জন্মদিনে উপহার।

তারপর আমি কিছু বলতে পারার আগেই দ্রুতপায়ে ঘরের মেঝে পেরোল। বারান্দা পেরোল চোখে আঁচলচাপা দিয়ে টলমাটাল পায়ে। ঘরে আমি উমাদির জন্মদিনের

উপহার বুকে নিয়ে নতুন-পাওয়া চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখলাম যতদূর দেখা গেল।

তারপর উমাদিকে আর দেখিনি। সেই যে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল উমাদি তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি।

এই রকম করে হীরেনদাও একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। রানীমাসীর মৃতদেহের সংকার করে রানীবাঁধের শ্মশান থেকে ফেরার পথে শ্মশানযাত্রীরা নাকি হীরেনদাকে আর দেখতে পায়নি। অথচ সেই ভয়ংকর সকালটায় সারা বাড়ির মধ্যে শুধু হীরেনদারই মাথা ঠাণ্ডা ছিল।

আমরা তখন বছর খানেক হল রানীবাঁধ থেকে কলকাতায় চলে এসেছি। সে সব কথা আমার একটু বড় হয়ে রানীবাঁধে গিয়ে নানান আলোচনার মধ্যে শোনা। বেশির ভাগই সুখদার মুখে।

বুড়ি সুখদা তখন আরও বুড়িয়ে গেছে। কাজকর্ম বিশেষ কিছুই করে না। বাড়ির পিছন দিকে একখানা চালায় দিন রাত প্রায় শুয়েই থাকে। আর বক বক করে।

ওই ঘরেই নাকি সেদিন ভোর বেলা সুখদাই প্রথম রানীমাসীকে দেখেছিল। বলতে বলতে বুড়ি উত্তেজিত হয়ে উঠত, মেয়েকে তো বললে শুনত না! আমি তখনই জানি যার সব শেষ হয়ে গেছে তার অত বিবিপনা, অত রংগরস ভাল হয় না।

সব শেষ হয়েও যার শেষ হতে চায়নি তাকে যে নিজের হাতে সব শেষ করে দিতে হয় এই কথা শোনাতে শোনাতে বুড়ি সুখদা কেমন হয়ে যেত। ফিসফিস করে বলত, ঐ চালের বাতা থেকে গো, সোনার পিতিমেকে আমি দোল খেতে দেখলুম। এদানী কী রূপে হয়েছিল গো ছুঁড়ির! ফেটে পড়ছে রঙ, ফেটে পড়ছে গতর। হায় হায়! বুড়ি মাথা নাড়ত। জিভ দিয়ে শব্দ করত আক্ষেপের।

বলত, আমি কি আর ভাল করে দেখেছি? হাঁউমাউ করে গিয়ে ঐ বংকুর দরজা ঠেঙিয়েছি। আগের দিন সন্ধে বেলায় সে ছোঁড়া এসেছিল। ওমা, অতবড় জোয়ান মদ্দ! কোথায় এগিয়ে যাবে না শুনেই হাঁফাতে হাঁফাতে সেই যে বিছানায় পড়ল সারা সকাল আর সেখান থেকে নড়ল না।

সোনার টুকরো ছেলে ঐ মাস্টার। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল। আমরা সারা বাড়ির লোক যখন মাথার ঠিক পাচ্ছি না তখন ক্ষয়া, পাতলা একফোঁটা মানুষটা দড়ির ফাঁস কেটে মেয়েটাকে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর ডাক্তার আনল, পুলিশ ঠেকাল, শ্মশানে যাওয়ার তোড়জোড় করল—সব ঐ ছেলেমানুষের মত মাস্টার।

এত করেও তবু হীরেনদা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। রানীমাসীর দেহ চিতায় তুলে দেওয়া পর্যন্ত যে হীরেনদা মাথা খারাপ করেনি নিজে হাতে চিতায় আগুন দেওয়ার পর তার কী হল, শ্মশানের পিছন দিকের নদীর বালি ভেঙে ওপারে রেললাইনে উঠে দুপুরের এক্সপ্রেস ট্রেনটির তলায় মাথা পেতে দিয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া হীরেনদাকে খুঁজে তাই শ্মশানযাত্রীদের বেশি দূরে যেতে হয়নি। আমাদের নিষ্ঠুর কিশোর হাতে প্রজাপতির ধরা পড়া দেখতে পারত না হীরেনদা। কিন্তু সেই নাকি কঠিন মুঠিতে একটা ছিন্ন ভিন্ন মৃত প্রজাপতিকে আঁকড়ে ধরে মরেছিল। অবাক হইনি শুনে। রানীবাঁধের প্রজাপতির হাত থেকে একা হীরেনদাই বা রেহাই পাবে কি করে?

রানীমাসী আমার আড়ালে হারিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছিল সুখদার গল্পে প্রাণ পেয়ে। হীরেনদাও হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। রানীবাঁধের শ্মশানেই। সকালে যেখানে জ্বলেছিল রানীমাসীর চিতা, রাত্রি বেলা সেখানেই হীরেনদার।

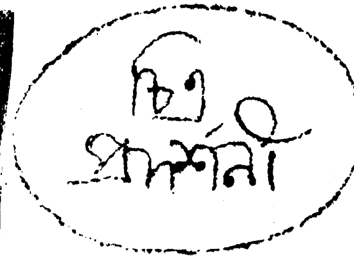
শুধু উমাদিই হারিয়ে গেছিল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। উমাদির বাবা বলতেন, বলো না, বলো না, তার নাম করো না। সে মরে গেছে। কিন্তু আমার মনে হত, মরে যাবার জন্যই যদি হারিয়ে যেত উমাদি তাহলে সে আবার ফিরে আসত। ইচ্ছে করত উমাদিকে ফিরিয়ে পেতে। উমাদিকে আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হতো। উমাদির হাতে উপহার-পাওয়া জন্মদিনের দ্বিজত্বে দুঃসাহসী হয়ে উমাদিকে আমার অনেক কথা শোনাবার ইচ্ছে হতো।

কিন্তু আজ এই পনের বছর তিন মাস তের দিন পরে যখন উমাদির চিঠি পেলাম তখন সেই সব ইচ্ছার আগুনে আদিম মানুষের হাতে-জ্বালা আগুনের অভিনবত্ব হারিয়েছে। তাই হৈ-চৈ না করে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লাম। সকলের খবর চাই উমাদির, আমার ঠিকানা কোথা থেকে পেল, দূর মধ্য-ভারতের কোন ক্যাথলিক কনভেণ্টে উমাদির কেমন করে দিন কাটে—অনেক কথা লিখেছে উমাদি। শেষকালে লিখেছে, আমার ওপর তোদের বড় ঘৃণা হয়েছিল নারে! তোদের দোষ দিই না। কিন্তু, একটা কথা তোর ভাষাতেই বলি ঃ প্রজাপতির সময় বড় ভীষণ রে! বড় তৃষ্ণা। চোখের তারায় পর্যন্ত টান ধরে যায়।

উমাদি খুঁচিয়ে তোলায় আমার প্রজাপতির স্রোতকে মনে পড়ল। মনে পড়ল অনাকাঙ্ক্ষিত, ক্লান্ত ডানার একটি প্রজাপতির ফুল ভেবে ভুল করে কুঁড়ির ওপর বসে মরমে মরে যাওয়ার গল্প। মনে পড়ল সেই আঘাতে কুঁড়িটার ফুটে ওঠার বেদনা।

এতদিনে উমাদির গল্পের একটা পরিণতি পেলাম। প্রজাপতির সময়ের যে তৃষ্ণা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে রানীমাসী তাকে বরণ করে শেষে মৃত্যুর কোলে ফুরিয়ে গিয়েছিল, উমাদি তাকে এড়াতে গিয়ে দেবতার পায়ে জুড়িয়ে গিয়েছে, আর আমি তাকে দুচোখে টেনে তবু দুহাতে ঠেকিয়ে রেখে আজও কুড়িয়ে চলেছি শস্য-হীন যন্ত্রণার ফসল।

---






গত ৪ঠা অক্টোবর থেকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম-এ শ্রীফণিভূষণের চারু ও কারু শিল্পের প্রদর্শনী চলছে। আগামী ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭-৩০ পর্যন্ত প্রতিদিন এই প্রদর্শনী খোলা থাকে।

ফণিভূষণ ভারতীয় চিত্রধারার পক্ষপাতী এবং ইনি সব সময়েই শিল্প রচনায় ভারতীয় আত্মা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে চলেছেন। ভারতীয় লোকশিল্পের আভাসই বেশী স্পষ্ট এঁর চিত্রকলায়। ভাস্কর্যে কিন্তু কিছুটা নব্যতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। নব্যতন্ত্র হলেও অভিব্যক্তিটা সংযত এবং সংগত বলেই আমার মনে হয় এবং এক্ষেত্রে ইনি পাশ্চাত্য আর্টকেই অনুগমন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য অথবা ভারতীয় লোকশিল্পের বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষ্য করা গেল না। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের লক্ষণ বলতে আমি বোঝাচ্ছি নর, ক্রূর, আসুর, বালা এবং কুমার এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্তির লক্ষণ। যাই হোক প্রতিটি মূর্তিই শিল্পীর সুরুচিবোধ এবং সুচিন্তার ফল। শিল্পী ছন্দের প্রতি বিশেষভাবে নজর রেখেছেন। 'স্নেক ডান্স', 'রেফুজী উওম্যান' এবং 'গ্যালপিং হর্স' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কিছুদিন শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ছিলেন তবে লোকশিল্প আয়ত্ত করেছেন একেবারে গ্রাম্য শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে। সেই কারণে শান্তি-নিকেতনের প্রভাব এঁর চিত্রকলায় নেই। এঁর স্বকীয় টেকনিক এবং গ্রাম্য আর্টের প্রভাব এ দুয়ে মিলে এক বিচিত্র শিল্প কলার সৃষ্টি হয়েছে। তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি স্বেচ্ছাকৃত হলেও মনে হয় শরীর-সংস্থান বিজ্ঞানে ইনি বিশেষ পারদর্শী নন। এবং অত্যন্ত বেশী মাত্রায় টেকনিক নিয়ে মাথা ঘামানোর ফলে শিল্পের আদর্শ মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'স্পিরিট অব ঝাঁসী', 'প্রিন্স অব ফুটপাথ' ক্যাচিং দি কাইট' 'চিল্ড্রেন'স পার্ক' এবং 'পুসিং ইজ এ জয়।' স্কেচের মধ্যে লক্ষণীয় 'লেডী উইথ ফ্লাওয়ার', 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' (৩৯) এবং 'বার্ড সেলার'।

কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর প্রিন্টস এবং স্পেন্সর কালেক-শনের কিউরেটর কার্ল কুপ স্টুরেন প্যাস কোম্পানীর তরফ থেকে ভারতে আসেন সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের কিছু ছবি সংগ্রহ করতে। ঐসব ছবি কাঁচের পাত্রের ওপর খোদাই করে তোলার উদ্দেশ্যে। ফণি-ভূষণের 'রিটার্নিং হোম' নামক একটি ছবি এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল এবং পরে



কলকাতার ইউ এস আই এস আয়োজিত 'এশিয়ান আর্টিস্টস ইন ক্রিস্টাল' প্রদর্শনীতে একটি ঘটাকৃতি কাচের পাত্রের গায় তার প্রতিলিপি দেখা গিয়েছিল। ফণিভূষণের আরও একবার এর আগে একক প্রদর্শনী কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং ইনি সম্প্রতি হিন্দি হাই স্কুলের হলে মুরাল চিত্রণ সম্পূর্ণ করেছেন।

( ২ )

গত সপ্তাহে শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্ত একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর চিত্রকলার আর্টিস্ট্রি হাউস-এ। ছবি ছিল সব-শুদ্ধ ৭১টি। সবই ভারতীয় চিত্রকলা। এঁর ওপর নন্দলাল বসুর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। যদিও এখনও টানটোন খুব পরিণত হয় নি তা হলেও কোনও কোনও 'ফিগার' নন্দ-বাবুর রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কাজ দেখে মনে হয় ইনি শিক্ষার্থী অবস্থা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে আত্মনিষ্ঠা বজায় থাকলে ভবিষ্যতে ইনি সার্থক এবং পরিণত রচনা করতে পারবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, একক প্রদর্শনী করার মত ভাল এবং মন্দ কোনোটিই এঁর তৈরী হয় নি এখনও।




## উপন্যাস

**কলিতীর্থ কালীঘাট**—অবধূত। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশক, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৪, টাকা।

আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবধূতই বোধ হয় একমাত্র লেখক যাঁর উপন্যাস মাত্র তিনমাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণে পা দেয়। এ ঘটনা লেখকের পক্ষে গৌরব আনে, যদি রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হয় তবে তা সাহিত্য ধারাকেও উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে। সুতরাং অবধূতের রচনার আসল চরিত্র কি এবং কিজন্য তিনি এত তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠতে পারলেন, তার সন্ধান নেওয়ার সময় এসেছে। পূর্বেকার কোনো রচনার উল্লেখ না করে, সাম্প্রতিক উপন্যাস কলিতীর্থ কালীঘাট থেকেই তার হদিস পাওয়া অসম্ভব নয়।

অন্ততঃ দশ বৎসর আগেও যাঁরা বাংলাদেশে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন, আজ দেখা যাচ্ছে তাঁদের অনেকেই স্তিমিত হয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে যাঁরা নতুন রচনা দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই উপন্যাসের বিস্তৃতিতে কাহিনী পরিচালনায় অক্ষম। এই অক্ষমতার পেছনে স্পষ্ট যে কারণটিকে উপলব্ধি করা যায়, তা হলো লেখকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। কেবলমাত্র রচনাশৈলীর কারুকার্য এবং দেশীবিদেশী গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি কখনও কোনো রচনাকে সার্থকতার মাহাত্ম্য দিতে পারে না। সাহিত্যই শুধু নয়, সকল শিল্পকর্মের পক্ষেই একথা সত্য। কলিতীর্থ কালীঘাট পাঠকের কাছে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। কলকাতাবাসীরাই কজন জানেন, কালীঘাট-মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন কত কাণ্ড ঘটছে। সেখানে একদিকে আছে কংসারি হালদারের মতো লোকের দৃঢ় ঋজু চরিত্র, আছে ফণীর মায়ের মতো সর্বংসহা রূপ, আবার অন্যদিকে আছে অনাচার, ব্যভিচার, মানসম্ভ্রম নিয়ে মানুষের কাড়াকাড়ি। বিভিন্ন চরিত্রের হট্টগোলের মধ্যে লেখক প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন—তাদের ব্যথা বেদনা আনন্দকে খুঁজে খুঁজে ফিরছেন। ফিনকিও তুচ্ছ নয় তুচ্ছ নয় চরিত্র সম্বন্ধে পরম নির্বিকার ছালো ধনাও। কিন্তু সবশেষে অবধূত এ কথাটি মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি যে, এ সমস্ত কিছুর পেছনে অবলীলায় কাজ করে চলেছে একটিমাত্র বস্তু—ধর্ম। ধর্মকে নিয়ে কি যে হতে পারে তা অবধূত একেবারে অর্গলমুক্ত করে দেখিয়েছেন।

কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে একটা ত্রুটি বোধ হয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে ঘটনার ধারা যেমন লেখকের বিশ্লেষণের পথ বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, শেষের দিকে সেই ধীর শান্ত গতি আর বজায় থাকেনি। ঘটনার ঘনঘটা সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। এবং তাদের দ্রুত ধাবনের ফলে উপন্যাসের পরিণতি অবশেষে অতি নাটকীয়তায় গিয়ে পৌঁচেছে। তবে রচনাভঙ্গির সাবলীলতাকে লেখক কখনও হারিয়ে ফেলেননি, সে কথা ঠিক; যার জন্য বইটি শেষ পর্যন্ত সুখপাঠ্য। ৪১১।৫৮

## অনুবাদ-সাহিত্য

**নগ্নদেবতা**—হাওয়ার্ড ফাস্ট। অনুবাদক—মিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়। রাইটার্স হাউস, ২১১, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। ৭৫ নয়া পয়সা।

'নগ্নদেবতা' হাওয়ার্ড ফাস্টের আত্ম-বিশ্লেষণাত্মক 'Naked God' নামক বইটির সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ।

এতদিন পর্যন্ত ফাস্ট ছিলেন পৃথিবীর কম্যুনিস্ট লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর বই স্টালিন প্রাইজ পেয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁর বইর গবেষণামূলক আলোচনা পর্যন্ত হয়েছে।

অথচ সেই হাওয়ার্ড ফাস্টই ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন (১৯৪৩ সাল থেকে তিনি ছিলেন পার্টির অনুরাগী সদস্য)। খ্রুশ্চেভ রিপোর্ট আর হাংগেরীর জনগণের জাতীয় অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত নিষ্পেষণের সংবাদ তাঁকে বলতে বাধ্য করেছে—"যে দেবতার আরাধনায় জীবনের সব-কিছু উৎসর্গ করেছি, আজ দেখলাম সেই দেবতা সম্পূর্ণ নগ্ন! বীভৎস!"

কেন তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন, তারই ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। স্বচ্ছ, নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে

কম্যুনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশ্লেষণও বইখানির অন্যতম মর্মবাণী। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"১৯২৫ সালে আমি একবার কোলকাতা গিয়েছিলাম। সেখানে একজন কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে আমার বিশেষভাবে আলাপ হয়।...ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেকগুলি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ......কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কথা, তিনি অন্যান্য যেসব সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন, তার একটিও সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। আজ ভাবলেও অবাক লাগে, ভারতবর্ষের মত এক বিশাল দেশের পার্টি নেতা কি করে ওধরনের সম্ভাবনার কথা অত জোর দিয়ে বলেছিলেন।" ৩৬২।৫৮





**তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন—অনুবাদ—পীযুষ দাশগুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা-১২।**

লিও তলস্তয় সম্পর্কে রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক লেলিনের বিভিন্ন সময়কার কয়েকটি লেখার বাংলা অনুবাদ স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে।

তলস্তয়ের মতবাদ যে কল্পনাবিলাসী সে কথা বলতে লেনিন কুণ্ঠিত হননি। কুণ্ঠিত হননি বলতে যে "সেই মতবাদের অন্তর্বস্তু নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীল।" কিন্তু সেই সঙ্গেই একজন মার্কসবাদী সমালোচক হিসাবে একথা বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি, "কিন্তু এর অর্থ কিছুতেই এই নয় যে, সেই মতবাদ সমাজতান্ত্রিক ছিল না, অথবা অগ্রসর শ্রেণীগুলোকে সচেতন করতে পারে এমন মূল্যবান সমালোচনামূলক উপাদান তাতে ছিল না।"

এই কথা স্বীকার করে নিয়েই রুশ বিপ্লবের প্রকৃতি ও প্রাণোদক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তলস্তয়ের রচনাবলীর বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছিলেন লেনিন, খুঁজে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন তলস্তয়-বাদের স্ববিরোধগুলোর কারণ কি, আর সেগুলি রুশ বিপ্লবের কোন কোন ত্রুটি ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি।

সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসবাদী দৃষ্টি-কোণের প্রয়োগ সম্বন্ধে যারা জানতে উৎসুক, তাদের বইখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ৭৫।৫৮

## পূজা বার্ষিকী

**অপরাজিতা**—দেব সাহিত্য কুটীর, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও দেবসাহিত্য কুটীর থেকে কিশোরদের জন্য ৪৮০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সেরা লেখকরাই এই সংকলনে আছেন: তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারাশংকর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশংকর, বনফুল প্রভৃতি। ২৪টি রঙিন চিত্র এই বৃহৎ বার্ষিকীর অন্যতম আকর্ষণ। পূজাবকাশের দিনগুলি শিশুদের কাছে আনন্দমধুর করে তুলতে এই ধরণের শিশু-সাহিত্যসম্ভারের তুলনা নেই।

**বার্ষিক শিশুসাথী**—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, ৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। ৩০০ পৃষ্ঠা, দাম চার টাকা।

এবারের বার্ষিক 'শিশু সাথী'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রবীণ ও নবীন লেখকদের রচনাসম্ভারের এক মনোজ্ঞ সংকলন; যাতে বাংলার শিশুসাহিত্যের সামগ্রিক রূপটি ফুটে উঠেছে। বিষয় নির্বাচনেও সম্পাদকের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়। এখনকার শিশুদের মন শুধুই রূপকথার কল্পনায় খুশী নয়, তারা আজকের দিনের পৃথিবী সম্বন্ধেও যে সমান কৌতূহলী, সম্পাদকের এই বাস্তববোধ এই সংকলনকে বিশিষ্টতা দান করেছে।'








**পূজা প্রায় আসিয়া পড়িল।** দোকানীরা **পরামর্শ** দিতেছেন ভিড়ের আগেই কেনাকাটা সারিয়া রাখুন।—"গিন্নিরাও এই সৎ পরামর্শই দিচ্ছেন। শুধু কেনাকাটার যাঁরা মালিক তাঁরাই পকেটের বদলে মাথায়



হাত দিয়ে ভাবছেন আর **বলছেন—যা দেবী** সর্বভূতেষু নিষ্ক্রিয় রূপেণ **সংস্থিতা**"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

**পূজা** প্রসঙ্গে কলিকাতা পুলিস **বিজ্ঞপ্তি** দিয়াছেন—স্বেচ্ছামূলক চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে (পাঁঠার **ইচ্ছায়** ঘাড়ে কোপ কখনই পড়ে না) মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে (এটা অনেকটা পরিবার-নিয়ন্ত্রণের মতো, গাল ভরিয়া বলা যায়, কান ভরিয়া শোনা যায়, তবু থাকিয়া যায় মস্তবড় একটা কিন্তু, সুতরাং), সংযতভাবে নিরঞ্জন শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতে হইবে ('সিদ্ধি' **লাভের পরও** যদি **সংযত**



হইয়াই চলিতে হয় তাহা হইলে বুঝিব সিদ্ধিদাতার কারবারেও **ভেজাল চলিতেছে**) —শ্যামলাল সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনি **কাটিয়া** আর শুনাইয়া গেল যে, বারোয়ারীতলা **কখনই** পাঠশালার উপযুক্ত স্থান নয়!

* * *

**ভারতের** রাষ্ট্রপতি জাপানকে গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।—"সৎ পরামর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সঙ্গে 'ফোঁস' করার পরামর্শটাও দিয়ে রাখলে ভালো হতো, নির্ভেজাল অহিংসায় সাপের **প্রায় মরণদশা হয়েছিল**"—**সহযাত্রী** পরমহংসদেব বর্ণিত সাপ আর নারদঋষির গল্পটি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

* * *

**টোকিওর** গবর্নর আমাদের রাষ্ট্রপতিকে নগরীর প্রতীকরূপী চাবি অর্পণ করিয়াছেন।—"আমরা এই সম্মানে **সত্যিই** গৌরবান্বিত। কিন্তু তবু সখেদে স্মরণ করছি—বিশ্ব হ'তে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

**গৃহনির্মাণ** পরিকল্পনার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক **সহযাত্রী মন্তব্য** করিলেন—"বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার!!"

* * *

**সংবাদে** শুনিলাম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ফরমোজা সংক্রান্ত ব্যাপারে চীনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার **সদিচ্ছা প্রকাশ** করিয়াছেন।—"অন্য সংবাদে শুনলাম কে নাকি কোথায় সখেদে বলছেন—'আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'—অর্থাৎ বৌ মান করেছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

**মাদ্রাজ বিধানসভার অধিবেশন** মুলতুবী **হওয়া সত্ত্বেও জনৈক কমিউনিস্ট** সদস্য নাকি সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে অসম্মত হন। সংবাদে **বলা হইয়াছে** তিনি অধিবেশন শেষ **হইবার** পরেও এক ঘণ্টা পর্যন্ত সভাকক্ষে একা একা **বসিয়াছিলেন**। আমাদের জনৈক **সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন**—"উড়ে তিনি না **এলেও, জুড়ে ঠিকই বসেছিলেন**!"

* * *

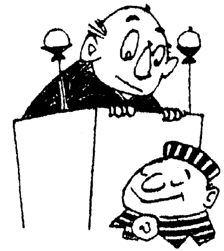
**মার্কিন** যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অরক্ষিত দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চলে দুই রাষ্ট্র কেমন করিয়া পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, তাঁহার কাহিনী পাঠ করিলাম—**'এবং বুঝলাম, যা বল আর তা বল**, ধর্মের কাহিনী ব্যক্তিবিশেষ কখনই শোনে না"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

**বর্মার প্রধানমন্ত্রী** উ নু পদত্যাগ করিয়া শাসনকার্য পরিচালনার ভার নি উইনের হস্তে অর্পণ **করিয়াছেন**।—"উইনের 'উইন' হয়ত অস্বাভাবিক নয়"—সংক্ষেপে মন্তব্য **করেন জনৈক সহযাত্রী**।

* * *

**একটি বৈদেশিক সংবাদে** শুনিলাম জনৈক **ফাঁসীর হুকুমপ্রাপ্ত** আসামীকে **বিবাহের** সুযোগ প্রদানের জন্য বিচারপতি ফাঁসীর তারিখ পিছাইয়া দিয়াছেন। বিশুখুড়ো **বলিলেন—"ভদ্রলোক** ভাগ্যবান; বিয়ে



করে সারাজীবন গলায় না হলেও হাতে-পায়ে ফাঁস পরে **বেঁচে** থাকার দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচে গেলেন"—বুড়ো বিশুখুড়ো কবে হইতে যে অত্যাধুনিক হইয়া উঠিলেন জানি না, **ছুৎমার্গ ছাড়া কী** আর বলিব!!

* * *

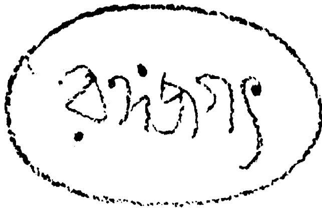
**রেডক্সের** সাহায্যে একটি অদ্ভুত ধাঁধার বাক্স প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। বাক্সটির মধ্যে যে কোন একটি মুদ্রা ফেলিয়া দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে নাকি বাজনা **বাজিতে** থাকিবে। **আবিষ্কর্তা মনে করেন এই** বাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া দাতা দান **করিবার জন্য** আগ্রহশীল হইবেন।—"**অবশ্য** বাদ্যটা যদি ঢাকের না হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

**আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের** নৌবহর হইতে **বলা হইয়াছে—ধোঁয়ায়** যে-কালি বায়ুমণ্ডলকে **মলিন করিয়া** তোলে তাহা বৃষ্টি সৃষ্টির কাজে **ব্যবহার করা** সম্ভব হইতে পারে।—"রান্নাঘরের **ধোঁয়ায়** গিন্নিদের (এ দেশীয় নিশ্চয়ই) চোখে যে বৃষ্টি নামে, **আশা করি এটা** সে **বৃষ্টি** নয়"—মন্তব্য করিলেন **জনৈক সহযাত্রী**।

* * *

**মস্কোতে** শুনিলাম বেতার নিয়ন্ত্রিত **ট্যাক্সি চালু করা** হইয়াছে। গাড়ি চলিবার সময় যাত্রীরা ট্যাক্সির বেতারযোগে ব্যক্তিগত টেলিফোনের **সঙ্গে** সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন! বিশুখুড়ো বলিলেন—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই। **কিন্তু এ ট্যাক্সি** ডাকলে থামে তো?"




**চন্দ্রশেখর**

**নারীত্বের সাধনা**

দেখে তৃপ্তি পাবার মত গ্রীব বি আর ফিল্মসের নবতম নিবেদন 'সাধনা'। 'এক হি রাস্তা' ও 'নয়া দৌড়'-এ প্রযোজক-পরিচালক বি আর চোপরা যে পারস্পর্য রুচি ও সামাজিক চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর এই নতুন ছবিতেও তার ধারা অব্যাহত আছে। প্রাণবন্ত অভিনয়, সঙ্গীত, আঙ্গিক এবং নাট্যরসসমৃদ্ধ কাহিনী—সব দিক দিয়েই চলতি হিন্দী ছবির বাজারে 'সাধনা' একটি সম্মানীয় ব্যতিক্রম।

মা ও ছেলেকে নিয়ে একটি স্বচ্ছল সংসার। ছেলে মোহন কলেজে পড়ায়—পঁচিশ বছরের আগে বিয়ে করবে না, এই তার পণ। কিন্তু মার ইচ্ছা, ছেলেকে সংসারী দেখে তবে মরবেন। এই নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে মান-অভিমানের পালা চলে।

একদিন মোহনের মা পা পিছলে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েন। মাথায় সাংঘাতিক আঘাত লাগে। বিকারের ঘোরেও তাঁর মুখে শোনা যায়—তাঁর ভাবী পুত্রবধূর কথা। মোহনের বৌকে না দেখে তিনি যেন শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না।

জীবন মোহনের প্রতিবেশী। ফন্দি-ফিকিরে অপরের মাথায় হাত বোলানো তার পেশা। সে মোহনকে পরামর্শ দেয় মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। তার জন্যে তাকে বিয়ের ফাঁসও গলায় পরতে হবে না। শুধু একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে মায়ের সামনে হাজির করতে পারলেই বৃদ্ধা শান্তিতে মরতে পারবেন।

কিন্তু কোন মেয়ে এ প্রস্তাবে রাজী হবে? জীবন মোহনকে বোঝায়, তার এক বিবাহযোগ্যা মামাতো বোন আছে। মামার টাঁক টাকার ওপর। তাঁকে কিছু কবলালেই তাঁর মেয়েকে কিছুক্ষণের জন্যে মোহনের মায়ের কাছে নিয়ে আসা শক্ত হবে না।

ভালমন্দ বিচার করবার মত মনের অবস্থা তখন মোহনের নয়। এত সহজে মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা যাবে—এ সুযোগ ছাড়তে কে রাজী হবে? টাকার প্রশ্ন সেখানে গৌণ। জীবনের মনস্কামনা পূর্ণ হতে দেরি লাগল না।

মোহনের সম্মতি পেয়ে জীবন সোজা গিয়ে উঠলো শহরের সেরা বাইজী চম্পার

মজলিসে। তারপর তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে নিজের মামাতো 'বো' সাজিয়ে মোহনদের বাড়িতে নিয়ে এল।

বধূবেশিনী চম্পার সুন্দর মুখখানি দেখে মোহনের মা ভাবী খুশী হলেন। ছেলে যে তাঁকে লুকিয়ে এমন একটি সুরূপা মেয়েকে পছন্দ করে রেখেছে তা ভেবে তিনি আরাম বোধ করলেন। নগদ দক্ষিণা ও মামাতো বোন সহ জীবন যথাসময়ে প্রস্থান করলো।

বিপদ বাঁধলো মোহনের মাকে নিয়ে। ওষুধের গুণেই হোক বা মনের আনন্দে, মৃত্যুপথযাত্রিণী ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বৌমাকে দেখতে তাঁর ইচ্ছা হয়। সুতরাং জীবনকে আবার তার মামাতো বোনকে কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ে আসতে হয় এবং মোহনের পুঁজি বেশ খানিকটা হাল্কা হয়ে যায় তার ফলে। কিন্তু মোহনের তাতে আপত্তি হয় না। চম্পাকে নিজের ভাবী স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করতেও যেন ভাল লাগে তার। অবশ্য মোহনদের বাড়িতে চম্পার নাম রজনী।

একদিন মোহনের মার খেয়াল হ'ল, ভাবী পুত্রবধূকে তিনি নিজের সঞ্চিত সমস্ত গয়না পরিয়ে দেখাবেন। পরের দিন নিজের বাড়ি থেকে সমস্ত গহনা পরে সেজে আসবে —এই অছিলায় রজনী ওরফে চম্পা গয়নার বাক্সটি হাতিয়ে চম্পট দিলো নিজের আস্তানায়। পরের বৌ সাজবার আর তার বয়েই গেছে!

সেদিন সন্ধ্যায় নাচের আসরে বাইজী চম্পা মোহনের মার গয়না পরে বধূবেশে দেখা দিল তার রূপ-পিয়াসীদের সামনে। ফল হ'ল উল্টো। নাচনেওয়ালীকে কুলবতীর বেশে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লে তারা—তাদের হাসির শ্লেষ কাঁটার মত বিঁধলো চম্পার বুকে। মোহনের মার গয়নাগুলো আগুনের হল্কা হয়ে তার সারা অঙ্গে ছ্যাঁকা দিতে লাগলো। বিলাসিনী চম্পা সেই আগুনে পুড়ে মরলো এবং তারই চিতাভস্ম গায়ে মেখে সাধিকা চম্পার যাত্রা শুরু হল।

প্রথমে মোহন জানলো চম্পার আসল পরিচয়। মোহনের মার কানেও খবরটা পৌঁছে দিল চম্পার পূর্বতন ওস্তাদ, চম্পার বাইজীবৃত্তি ত্যাগে যে বেকার হয়ে পড়েছে। মোহনের স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল, তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন মোহনের মা।

স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও কদচারীর প্রতি ঘৃণা কেমন করে সহানুভূতিতে পরিণত হয়ে গল্পটিকে মিলনান্তক করল, তাই নিয়ে 'সাধনা'র শেষাংশ।

*

চমৎকার বাঁধুনি গল্পটির চরিত্রের সংখ্যাও হিন্দী ছবির রেওয়াজ অনুসারে আশ্চর্যরকম কম। এই দুই ব্যাপারেই 'সাধনা'র গল্পলেখক ও চিত্রনাট্য রচয়িতা পণ্ডিত মুখরাম শর্মা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। সুপরিচালনার গুণে চরিত্রগুলি ও ঘটনাবলী অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত হয়েছে দর্শকদের সামনে। পরিচালক চোপরা কয়েকটি নাটকীয় পরিস্থিতিতে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন শিল্পীজনোচিত নিপুণতার সঙ্গে।

নায়িকা চম্পার ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা একাই একশো হয়ে ছবিখানিকে মাতিয়ে রেখেছেন। নাচে ও অভিনয়ে সমান দক্ষতা তাঁর, এবং এ ছবিতে তিনি তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। নায়কবেশী সুনীল দত্তকে বেশী কিছু করতে হয় নি, তবে যেটুকু করেছেন তা বেশ মানিয়ে গেছে। লীলা চীটনিসের সংবেদনশীল অভিনয়ের গুণে মায়ের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রাধাকিষণ ও মনোমোহন কৃষ্ণ যথাক্রমে জীবন ও ওস্তাদের ভূমিকায় যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন।

আঙ্গিকের দিক দিয়েও ছবিখানিতে একাধিক কুশলী হাতের ছাপ রয়েছে। গান-



এইচ পি প্রোডাকসন্সের পৌরাণিক চিত্রার্ঘ্য "পুরীর মন্দিরে"র একটি দৃশ্যে সখী-পরিবৃতা নায়িকার বেশে দীপ্তি রায়।

পল্লীর সংগীতে এবং এন দত্তের সুর স্থান-কালপাত্র অনুসারে সুপ্রযুক্ত।

**গল্পের গরু গাছে চড়ে**

যে দু'চারজন বাঙালী প্রযোজক ও পরিচালক বাংলার বাইরে ছবি তুলেও বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের মধ্যে আগে [illegible] দেবার মত ছবি দিয়ে [illegible] প্রোডাকসন্সের 'ফাগুন'। [illegible] অক্ষরে কাহিনী [illegible] অসম্বন্ধ [illegible]। কোন বাঙালী লেখকের [illegible] এমনিধারা [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] এরকম হাস্যকর রূপ দিতে পারেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অথচ পরিচালক বিভূতি মিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েই এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি করে বসেছেন প্রণব রায়ের লেখা গল্পের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে।

প্রথমে গল্পের কথা ধরা যাক। গল্পটির না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। একটা পরিত্যক্ত বিশাল বাড়িতে একজোড়া নায়ক-নায়িকা নিজেদের ছবি দেখে অবাক হলো। তাদের ছবি এখানে কেমন করে এলো? কিন্তু না, ও-ছবি তাদের নয়। ঐ বাড়ির একজন কর্মচারীর মুখে জানা গেলো যে এই ছবি যাদের তাদের একজন ছিলো এই বাড়িরই ছেলে, আরেকজন তার প্রেমিকা। চেহারার সাদৃশ্যটি দৈবাৎ।

যা হোক, সেই কর্মচারী তখন একটি লম্বা কাহিনী বর্ণনা করলো। সেই কাহিনীই 'ফাগুনের' সর্বস্ব। পঁচিশ বছর আগেকার কাহিনী।

খানদানি ঘরের এক নওজোয়ান প্রেমে পড়লো একটি যাযাবর মেয়ের। মেয়েটি কিন্তু আসলে যাযাবর নয়। জন্মের পরেই মেয়েটির মা মারা যায় এবং মেয়েটির বাবা গুরুর আদেশে মেয়েটিকে একটা কাঠের সিন্দুকে চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এক যাযাবর দলের সর্দার মেয়েটিকে লালন পালন করেন... ইত্যাদি, ইত্যাদি।) নিজেদের দলে মেয়েটির প্রেমাকাঙ্ক্ষী একজন ভিলেনও আছে। ওদিকে নওজোয়ানের খানদানী বাবাও ক্ষিপ্ত।

যুক্তিবুদ্ধিবর্জিত নাটক, কিন্তু বাঁধা খেল, জমে উঠলো। নাচগান মারপিট কোনো কিছুর অভাব রইলো না। নায়ককে একটা ঘরের মধ্যে বন্দী করে একসময় যাযাবরের দল ঘরে আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে দিলো। কিন্তু 'ফাগুনে'র নায়ক যে অ্যাসবেস্টসতুল্য,



এইচ এন সি প্রোডাকসন্সের এই দৃশ্যে দাবার চাল দিচ্ছেন সুচিত্রা সেন এবং উত্তমকুমার ও বাবুয়ার চাল দেখে মনে হচ্ছে যেন একচালেই কিস্তিমাৎ হয়ে গেছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে খেলা দেখছেন নমিতা সিংহ।

সে আগুনে পুড়বে? পাগল। মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো অবিলম্বে। নায়ক বেঁচে গেলো।

তারপর নায়িকাকে নিয়ে নায়ক আর ভিলেনের মল্লযুদ্ধ। না বললেও চলে, নায়কই জিতে গেলো শেষপর্যন্ত।

*

বিভূতি মিত্র প্রযোজিত 'ফাগুন' সম্পর্কে একটি মাত্র কথাই বলবার আছে। হায়, এই কড়াকড়ির দিনে ফিল্মের কী নিদারুণ অপচয়!

অভিনয়ের দিকেও দুর্দশার চূড়ান্ত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মনে হয় যেন যাত্রার আসরে নেমেছেন। নায়িকার অংশ-গ্রহণকারিণী মধুবালার অভিনয়ে 'ফাগুনে' মধুর কণামাত্র নেই। নায়কের ভূমিকায় ভারতভূষণ যে-অভিনয় করেছেন তাতে ভারত তো দূরের কথা, কোন দেশই তাঁকে ভূষণ বলে স্বীকার করবেন কিনা সন্দেহ।

দৃশ্যপট ইত্যাদিতে জাঁকজমকের চমক আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নৃত্যাদিতে কুরুচির খোলে আনা পরিচয় আছে।

'ফাগুনে'র সংগীত-পরিচালক ও পি নায়ার। যদিও সস্তাদরের হিন্দীছবিসুলভ সংগীত, কিন্তু সেইটুকুই যা-কিছু ভালো।

'ফাগুন'কে এককথায় গাঁজাখুরি বলতে পারতাম। কিন্তু না, তাতে গাঁজাখোরেরা ন্যায্যভাবে আপত্তি করতে পারে।

## চিত্রালোচনা

এখানকার ফিল্ম-মুক্তির নির্ঘণ্ট খানিকটা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মত। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি এদেশে স্বাভাবিক ঘটনা। তাই হপ্তার পর হপ্তা হয়তো একটিও নতুন ছবি মুক্তি পেল না, আবার একসঙ্গে একাধিক ছবির পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রতিযোগিতায় আসরে অবতরণ করাটা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

যেমন হয়েছে এই হপ্তায়। একসঙ্গে তিনখানি নতুন বাংলা ছবি গলাগলি করে

পূজোর আসর জাঁকিয়ে বসেছে—'জলসাঘর,' 'ইন্দ্রাণী' ও 'পুরীর মন্দির'। এদের সংগে এসেছে একটি হিন্দী ছবি—'চেন ও ক্রক'—ফাউ হিসেবে।

*   *   *

তারাশংকরের অনবদ্য রচনা 'জলসাঘর' সত্যজিৎ রায়ের নিপুণ হাতে ছবির পর্দায় কী রূপ নিয়েছে তা দেখবার জন্যে চিত্র-



সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসা ঘরে"র একটি নাটকীয় মুহূর্তে ছবি বিশ্বাস ও কালী সরকার।

রসিকদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস—বাংলা ছবির জগতে যিনি অনন্য। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন গংগাপদ বসু, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, পদ্মা দেবী ও পিনাকী সেনগুপ্ত। বিখ্যাত গায়িকা আখতারি বাঈ ফৈজাবাদী ও ওস্তাদ সলামৎ খাঁ-এর কণ্ঠসংগীত ও মিঞা বিসমিল্লা খাঁয়ের সানাই এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সংগীত পরিচালনা করেছেন—ছবির জগতে এও একটি অনন্যপূর্ব ঘটনা।

সুচিত্রা ও উত্তম, উত্তম ও সুচিত্রা—এই যাঁদের জপমালা, 'ইন্দ্রাণী' ছবি সম্বন্ধে তাঁদের সমস্ত আগ্রহ ঐ দুটি নামের ওপরই কেন্দ্রীভূত। তারকাদ্যুতির বাইরেও যাঁদের দৃষ্টি চলে, তাঁরা ছবির পর্দায় এই প্রথম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনীর সংগে পরিচয় লাভ করবার সুযোগ পাবেন। সুচিত্রা-উত্তম ছাড়াও ভূমিকালিপি কম আকর্ষণীয় নয়। কারণ ছবি বিশ্বাস পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, গংগাপদ বসু, নমিতা সিংহ, জীবেন বসু ও মাস্টার বাবুয়ার নামও তার মধ্যে রয়েছে। গৌরী-প্রসন্ন রচিত গানে সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। 'ইন্দ্রাণী'র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির যুগে যুগে ভক্তকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তার পিছনে যে চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত রয়েছে সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। মণি ঘোষ পরিচালিত 'পুরীর মন্দির'-এ তারই একটি নাট্যরসসমৃদ্ধ আলেখ্য পাওয়া যাবে। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অসীম-

কুমার, বাসবী নন্দী, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, দীপ্তি রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। কালীপদ সেন এতে সুর সংযোগ করেছেন।

গীতা বালী, সুরেশ, ইয়াকুব, শেখ মুখতার, মারুতি, ডেজি ইরাণী প্রভৃতিকে নিয়ে তোলা 'টেন ও'ক্লক' ছবিটি আর পাঁচটা হিন্দী ছবির মতই প্রণয়, রহস্য ও নাচগানে ভরা। তবে এর প্রধান আকর্ষণ রাম গাঙ্গুলীর সুরবৈচিত্র্য। ছবিটি পরিচালনা করেছেন যুগল কিশোর।

• • •

বংশী আশের পরিচালনায় স্বর-রূপার প্রথম নিবেদন 'শ্রীরাধার মান'-এর চিত্রগ্রহণ ইষ্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, নবকুমার, প্রবীরকুমার, পদ্মা দেবী, গীতা সিং, মিতা চট্টোপাধ্যায়, ভারতী রায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। কীর্তনকলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

## বিবিধ সংবাদ

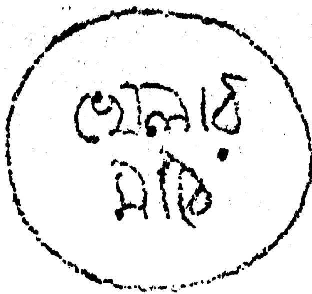
মাদ্রাজের সুবিখ্যাত প্রযোজক এ ভি মায়াপ্পন ও কলকাতার জনপ্রিয় ফিল্ম-পরিবেশক ভি এ পি আয়ার গত রবিবার একত্রে বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করেছেন। জাপানে নিয়মিতভাবে ভারতীয় ফিল্ম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেবিষয় যথাযোগ্য অনুসন্ধান করা তাঁদের বর্তমান সফরের প্রধান উদ্দেশ্য। এর দ্বারা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবার নতুন সুযোগ উপস্থিত হবে।

• • •

ভারতের বাইরে ভারতীয় ফিল্ম চালু করবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট একটি সংস্থা গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এর পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধিরা তো থাকবেনই, তাছাড়া ফিল্ম ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ার মনোনীত সদস্যরাও তাতে স্থান পাবেন বলে স্থির হয়েছে।

• • •

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কটি ফিল্ম সেন্সর বোর্ড আছে তারা বছরে গড়ে ৮০০ খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ও ডকুমেণ্টারী পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেয়। ভারতীয় ছবির প্রযোজকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেন্সর বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়ে থাকেন তাই একেবারে ছাড়পত্র দেওয়া হয় না এমন ছবির গড়পড়তা সংখ্যা তিনের বেশী নয়। প্রতি বছর গড়ে আপত্তিকর অংশ কাটা হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট। এবছরের প্রথম আটমাসে কিন্তু ছ'খানি ভারতীয় ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় নি। অনেকের অনুমান, ফিল্ম পরীক্ষার নিয়মকানুনে একটু কড়াকড়ি করা হয়েছে। বিদেশী ছবির আমদানী আগের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। ১৯৫৪ সালে ২২২ খানি বিদেশী ছবি সেন্সর বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছিল, তার মধ্যে সরাসরি বাতিল করা হয়েছিল ৪০ খানি। ১৯৫৭ সালে বিদেশী ছবির মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৯৩ তার মধ্যে ৫৬ খানিকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নি।




**একলব্য**

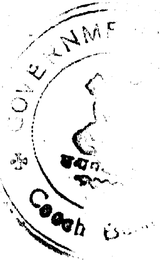
'ক্যালকাটা রেফারীজ এসোসিয়েশনের' রজত জয়ন্তী উৎসব সম্প্রতি শেষ হয়ে গেছে। রেফারী এসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে চারদিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোকমালা ও পত্রপুষ্পসম্ভারে ময়দানস্থ রেফারীদের তাবুগৃহকে করা হয়েছিল উৎসবের নবসাজে সজ্জিত। সুরসাধক আলীহোসেন ও তাঁর সম্প্রদায়ের দক্ষ শিল্পীদের সুমধুর সানাইয়ের সুরের মধ্যে জয়ন্তী উৎসবের কর্মসূচী আরম্ভ হয়। পরে আনুষ্ঠানিক মঙ্গলাচরণের পর এসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তোলন করেন এসোসিয়েশনের জয়ন্তী পতাকা। মার্চপাস্টের পর সভায় পতাকাকে অভিবাদন করেন। অপরাহ্নে চা-পান ও খেলাধুলোর বিষয়ে ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর পর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন ক্রীড়া-সাংবাদিক ও রেফারীদের মধ্যে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলোর প্রচারক ও ফুটবল খেলার পরিচালকদের এই প্রীতি খেলা দর্শকদের নির্মল আনন্দ দান করে। সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র প্রদর্শনীও দর্শকদের দান করে প্রচুর আনন্দ। তৃতীয় দিনের বৈকালিক অধিবেশনে পশ্চিমবাংলার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ব্যাণ্ড বাদ্যের ঐকতানে তাঁবু প্রাঙ্গণের পরিবেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ব্যাণ্ড বাদ্যের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জনপ্রিয় সংগীতের সুললিত সুর শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে তোলে। পরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান রশ্মিরেখার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনের মধ্যে ধীরে ধীরে এসোসিয়েশনের উড্ডীয়মান জয়ন্তী পতাকা অবনমিত করা হয়। সন্ধ্যায় পত্রপুষ্পশোভিত প্রাঙ্গণে আরম্ভ হয় আমোদ প্রমোদের বিচিত্রানুষ্ঠান। বহু শিল্পী চিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। হাসি কৌতুক ও গান বাজনার উচ্ছল আনন্দের মধ্যে তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। চতুর্থদিন আবার ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং সভাবা প্রতিনিধিবর্গের শহরের এক অভিজাত হোটেল কক্ষে নৈশ ভোজের আসরে মিলিত হন। খেলাধুলোর বহু কর্মকর্তা এবং শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ভোজসভায় উপস্থিত থেকে রেফারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এবং খেলা পরিচালনার উচ্চমানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ স্মারক পুস্তিকা এবং স্মারক প্রতীক সকলকে উপহার দেওয়া হয়। হোটেল কক্ষ থেকে জয়ন্তী উৎসবের কর্মকর্তারা গভীর রাতে আবার যাত্রা করেন জনবিরল ময়দানের দিকে। সেখানে তাবু-গৃহের দীপবর্তিকা ও আলোকমালা নিভিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রেফারী এসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী উৎসবের চারদিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের উপর যবনিকা পড়ে।

• • •

ক্যালকাটা রেফারীজ এসোসিয়েশন ফুটবল খেলার পরিচালক বা রেফারীদের একটি দলীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের সভ্য-সংখ্যা দুশোর বেশী নয়। এর মধ্যে আবার কর্মক্ষম বা 'অ্যাক্টিভ' রেফারীর সংখ্যা আরও কম। কিন্তু ফুটবল খেলার আইন বিশেষজ্ঞ এই অল্পসংখ্যক সভ্যের মিলিত প্রচেষ্টায় যে এসোসিয়েশন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কলকাতা তথা সারা ভারতে ফুটবল খেলার প্রসার, প্রচার এবং ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে সেই এসোসিয়েশনের দান নগণ্য নয় খেলার রেফারী বা পরিচালক ফুটবল খেলার অপরিহার্য অঙ্গ। ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ছায়ার সঙ্গে কায়ার যেমন সম্পর্ক। ফুটবলের সঙ্গে রেফারীর সম্পর্কও ঠিক তেমনি। ছায়া ছাড়া কায়া চলতে পারে না। ফুটবল খেলাও চলতে পারে না রেফারী ছাড়া। শুধু তাই নয়। রেফারীদের খেলা পরিচালনার উন্নত মান খেলোয়াড়ের মাধুর্য বৃদ্ধির সহায়ক এবং উন্নত ক্রীড়ামানের পরিপোষক। তাই ফুটবল খেলার উন্নতির ক্ষেত্রে রেফারীদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আর আছে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ক্ষেত্রে রেফারীদের বিরাট দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য রেফারীদের যে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হতে হয় তা হচ্ছে—চারিত্রিক দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি, সূক্ষ্মদর্শী দৃষ্টি এবং শারীরিক ক্ষমতা। একটি সাধারণ ধরনের ফুটবল খেলা পরিচালনা করতে একজন রেফারীকে সারা সময়ে যে পথ দৌড়তে হয় তার সামগ্রিক দূরত্ব পরিমাপ







করলে ৭।৮ মাইলের কম হয় না। আর দীর্ঘসময়ের গুরুত্বপূর্ণ খেলা পরিচালনার জন্য তো আরও বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন। সুতরাং রেফারীদের অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং শ্রমশীল হতে হয়। অন্যান্য গুণাবলী তার কর্তব্য সম্পাদনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই গুণাবলী একদিন দুইদিন বা এক বছর দুইবছরে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। এর জন্য অধ্যবসায় এবং কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রয়োজন নিয়মিতভাবে তত্বগত এবং ব্যবহারিক শিক্ষার। সুতরাং রেফারী হিসাবে সুনাম অর্জন করতে হলে কি পরিমাণ পরিশ্রম, কতখানি অধ্যবসায় এবং কতটা মানসিক স্থৈর্যের প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন আসে এই কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর ভাল রেফারী হয়ে আপনার লাভ কি? আর্থিক লাভ তো কিছুই নেই। সম্মানের প্রশ্ন? তাই বা আমাদের দেশে কোথায়? অন্যান্য দেশে রেফারীরা যে সম্মান পেয়ে থাকেন, আমাদের দেশের রেফারীদের সে সম্মান নেই। বরং এখনো আমাদের দেশে অনেকে রেফারীদের ক্রীড়াসমাজের অপাংক্তেয় ব্যক্তি বলেই মনে করে থাকেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে খেলা পরিচালনা করাও অধিকতর কষ্টসাধ্য। সম্প্রদায় এবং দলগত ভিত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখানকার দর্শক ও সমর্থকদের অভিমত পরস্পরবিরোধী। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানকার রেফারীদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়ে থাকে। রেফারীরা হয়ে পড়েন ক্লাব বিশেষের দুশমন, ক্লাব বিশেষের সুহৃদ। এ ছাড়া খেলার আইনকানুন সম্পর্কে দর্শক ও সমর্থকদের অজ্ঞতাও রেফারীদের সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক প্রধান অন্তরায়। যেখানকার দর্শক হাতে বল লাগলেই 'হ্যাণ্ডবল' 'হ্যাণ্ডবল' বলে চীৎকার আরম্ভ করে, থ্রো-ইনের সময় চীৎকার করে 'অবসাইড' 'অবসাইড' বলে, সেখানে খেলা পরিচালনা করে সুনাম অর্জনের আশা করা আকাশকুসুম কল্পনার সামিল। হাতে বল লাগলেই হ্যাণ্ডবল হয় না—হাত বলে লাগালে তবে হ্যাণ্ডবল হয়। দর্শকদের যদি এ-কথাটা জানা থাকে তবে অনেক গোলমাল থেকেই রেহাই পাওয়া যায়। কিম্বা থ্রো-ইনের সময় অবসাইডের নির্দেশ দেবার বিধান নেই এ সম্বন্ধে দর্শকরা ওয়াকিবহাল থাকলে রেফারীদের অহেতুক কটুকাটব্য শুনতে হয় না। কিন্তু আমাদের দর্শকসাধারণ এখনো ফুটবলের আইন কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেননি। ফলে স্বাভাবিক অবস্থা এবং সুস্থ পরিবেশের মধ্যে রেফারীদের খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রও হয়নি কুসুমাস্তীর্ণ এবং সমাজে তাদের প্রাপ্য সম্মান আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

অবশ্য খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে রেফারীরা সময়ে সময়ে ভুলচুক করেন না, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। মানুষ মাত্রেরই ভুলচুক আছে। এমন কি অলিম্পিক এবং বিশ্ব কাপের খেলাতেও রেফারীদের ভুলচুকের নজীরের অভাব নেই। আমাদের দেশের প্রতিকূল পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে রেফারীরা অনেক সময় মারাত্মক ভুল করেছেন, এ-কথাও স্বীকার্য। তবু বলি, আমাদের দেশের বিশেষ করে কলকাতার রেফারীদের খেলা পরিচালনার যোগ্যতা কোন দেশের রেফারীদের চেয়ে কম নয়। আজ দু'জন বাঙ্গালী রেফারীর (ডি ব্যানার্জী ও রবীন সরকার) নাম ফুটবল এসোসিয়েশনের রেফারীদের তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং ইংলণ্ডে এরা যোগ্যতার সঙ্গেই খেলা পরিচালনা করছেন। বিশ্ব কাপের খেলা পরিচালনার জন্য কলকাতার রেফারীদের ডাক পড়েছে। প্রখ্যাত রেফারী পি চক্রবর্তী গত বিশ্বকাপের খেলায় পিকিংয়ে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার খেলাটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে এসেছেন। এর আগে রেফারী অলোক রায় সুনাম অর্জন করেছেন এশিয়ান গেমের খেলা পরিচালনায়। তারও আগে ভারতের বাইরে ফুটবল খেলা পরিচালনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন পি গুপ্ত এবং পি মিশ্র। অবশ্য পি গুপ্ত, পি মিশ্র, জে চক্রবর্তী, সুশীল ঘোষ, অলোক রায়, নৃপেন সেন, পি চক্রবর্তী রমেন বাগচী এবং কলকাতার আরও অনেক রেফারীর সুষ্ঠুভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে খেলা পরিচালনার ভূরি ভূরি নজির আছে। বিদেশ থেকে সময়ে সময়ে যে সব টীম কলকাতায় খেলে গেছেন

তাঁরাও এইসব রেফারীদের খেলা পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি এঁদের প্রশংসা করে এঁদের কৃতিত্বকে খাটো করতে চাই না। কারণ রেফারীদের যে দায়িত্ব পালন করতে হয় স্পষ্ট হচ্ছে ধন্যবাদবর্হিভূত কর্তব্য। ইংরাজীতে যাকে বলে 'থ্যাংকলেস জব'। রেফারী হচ্ছে খেলার আইন কানুনের বিচারক। খেলার মাঠে তাঁর হাকিমের দায়িত্ব। হাকিম বা বিচারকের নির্ভুল বিচার হওয়াই স্বাভাবিক। এর জন্য আবার কৃতিত্ব কি কিন্তু একটু ভুল হলেই সর্বনাশ। পান থেকে চুন খসলেই তার অকৃতিত্ব। অনেকটা বিধবার একাদশীর মত করলে পুণ্য নেই: না করলে পাপ। রেফারীরাও সুষ্ঠুভাবে এবং যোগ্যতার সংগে খেলা পরিচালনা করলে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। একটু ভুল করলে আছে বহু রকমের তিরস্কার বা পুরস্কার। যথা দর্শক-সমর্থকদের কটূক্তি ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশী

কিন্তু আমরা ভুলে যাই রেফারীরাও মানুষ। তারাও ভুলচুক করতে বাধ্য। খেলোয়াড়েরা ভুলচুক করলে আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি কিন্তু রেফারীর ভুলচুককে ক্ষমা করতে আজও আমরা শিখিনি। ক্ষমা করা দূরের কথা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠি। আর তাঁরা মুখ বুজে বছরের পর বছর ফুটবলের সেবা করে যান। ক্রীড়ামোদীদের হাত থেকে সম্মানের পরিবর্তে লাভ করেন অনাদর ও অবজ্ঞা। কিসের পরিবর্তে? না ফুটবলকে ভালবাসার মাশুলের পরিবর্তে।

• • •

সবাই রেফারীদের মধ্যে আছে ফুটবল খেলাকে ভালবাসার এক উন্মাদ নেশা। না হলে অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কে বাঁশী নিয়ে আবার মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে আগ্রহী। কে-ই বা চায় রোজ রোজ দর্শকদের মধুর সম্ভাষণ শুনতে, আর বাপ-ঠাকুরদার অশরীরী আত্মাকে মাঠের মধ্যে টেনে আনতে? মাঠের উচ্ছৃংখল দর্শকের উন্মত্ততার মধ্যে এদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কোথায়? কোথায় বা এদের কর্তব্য সম্পাদনের পুরস্কার? তাই বলছিলাম ফুটবলের নেশাই এদের মূলধন। ফুটবলের নেশাতেই এরা পাগল। এখানে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন মুখ্য নয়। ফুটবল খেলাকে সেবা করবার জন্যই এরা রেফারীর ব্রত গ্রহণ করেছে। ফুটবলের প্রসার প্রচার এবং ক্রমোন্নতির জন্যই এরা ক্যালকাটা রেফারীজ এসোসিয়েশন গড়েছে।

আগে আই এফ এর অন্তর্ভুক্ত রেফারীজ বোর্ডই ফুটবল খেলার রেফারী নির্বাচন করতেন। কলিকাতার ফুটবল খেলায় ব্যবস্থাপনার ভার যখন ইংরাজের প্রাধান্যে প্রভাবান্বিত, তখন কয়েকজন উৎসাহী বাঙালী যুবকের উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা রেফারীজ এসোসিয়েশনের জন্ম হয়। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। ১৯৩২ সালে। আই এফ এর প্রাক্তন সভাপতি মিঃ এইচ এন নিকলস হন এর প্রথম সভাপতি এবং পরলোকগত রাখালদাস ব্যানার্জী হন প্রথম সম্পাদক। খেলার জনপ্রিয়তা এবং খেলার সংখ্যা বাড়বার সংগে সংগে পরীক্ষোত্তীর্ণ রেফারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কিন্তু রেফারীদের নিরাপত্তা-বোধের অভাব থাকে পুরোপুরিই বিদ্যমান। ১৯৫২ সালে সভাপতি শ্রীপংকজ গুপ্ত এবং সম্পাদক শ্রী সি বি চ্যাটার্জীর আন্তরিক চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে রেফারীদের আশ্রয়-স্থল এবং মিলনকেন্দ্র হিসাবে ময়দানের এক কোণে তাঁবুগৃহ রচিত হয়। সংগে সংগে সংলগ্ন জমির উপর হয় খেলাধূলোর আয়োজন। রেফারীজ এসোসিয়েশন লাভ করে ছোট্ট একটি ক্লাবের মর্যাদা। এখানে টেনিস খেলার ব্যবস্থা আছে, ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যবস্থা আছে, আছে অন্যান্য ইনডোর ও আউটডোর খেলার ব্যবস্থা। এসোসিয়েশনের তাঁবুগৃহ আজ শ্রান্ত ক্লান্ত রেফারীদের আশ্রয়স্থল, তাঁদের 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়'। তাঁবুর পিছন দিকে আছে স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল। এর কালো জলে অবগাহনের সংগে সংগে রেফারীদের মন থেকে দর্শকদের কটূক্তির কালিমা ধুয়ে মুছে যায়। আর শুভ্রস্নাত রেফারীরা তাঁবুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে খেলার আইনের চুলচেরা তর্ক-বিতর্কে মগ্ন হন।

ফুটবল মরসুমের গুমোট সন্ধ্যায় তাঁবু হয়ে উঠে মুখর ও প্রাণবন্ত। সেখানে নিত্য তর্কের ঝড় ওঠে। নিত্য বসে ফুটবলের মজলিসী আসর।

## দেশী সংবাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর—শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের জনৈক সরকারী কর্মচারীকে কেন্দ্র করিয়া গত কয়েক বৎসর যাবত তথায় যে মধুচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহার তদন্ত কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীকে সম্প্রতি বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার এক অপচেষ্টা হয় বলিয়া কোন কোন নির্ভরযোগ্য মহলে অভিযোগ শোনা যাইতেছে।

১লা অক্টোবর—আসন্ন শারদীয়া পূজা উপলক্ষে কলিকাতার পুলিস কর্তৃপক্ষ উৎসব প্রাঙ্গণগুলিতে কর্ণপটহবিদারী মাইক বাজান নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, পূজার কয়দিনে প্রতিদিন সকাল ৬টা হইতে ১০টা এবং সায়াহ্নে ৬টি হইতে রাত্রি ১০টা—এই সময়ের বাহিরে মাইক বাজান যাইবে না।

নেহরু-নূন চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে যে সকল পাকিস্থানী ছিটমহল ছিল, তাহা পশ্চিমবঙ্গ এবং রংপুর অঞ্চলে যে সকল ভারতীয় ছিটমহল ছিল তাহা পূর্ব পাকিস্থানে হস্তান্তরিত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এতৎসংক্রান্ত আলাপ আলোচনা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

২রা অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ১৭ দিনব্যাপী ভুটান সফরের পর তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমভিব্যাহারে আজ সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি হইতে বিমানযোগে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে বিমানঘাঁটিতে তাঁহাকে সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগনার অধীন ইছাপুরে অবস্থিত দুইটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে গত এক মাসের মধ্যে প্রায় ৩০০শত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই পাকিস্থানী নাগরিক।

৩রা অক্টোবর—গতকাল রাত্রি প্রায় ১০টার সময় বেলঘরিয়া টেক্সম্যাকো কারখানার সুপারভাইজার কাজকর্ম শেষ করিয়া যখন বাড়ি ফিরিতেছিলেন, সেই সময় কয়েকজন আততায়ী কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন বলিয়া প্রকাশ।

আদ্য ইম্ফলে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, নাগা বিদ্রোহীরা পুনরায় নাগা পাহাড় সংলগ্ন মণিপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর—অদ্য শ্রী এ কে সেনের সভাপতিত্বে গৃহমন্ত্রী সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এই সম্মেলনে শিল্প-শ্রমিকদের গৃহ-পরিকল্পনা সম্পর্কে মালিকদের বর্তমান মনোভাবের নিন্দা করিয়া প্রতি বৎসর মালিকদিগকে তাহাদের শ্রমিকদের জন্য একটি সংখ্যা গৃহনির্মাণ বাধ্যতামূলক করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন




শনিবার কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে কিন্তু যদি তাহারা না যাইতে চান, তাহা হইলে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসিগণ তথায় যাইবে।

৫ই অক্টোবর—স্বায়ত্তশাসনাধিকার সম্পন্ন মিকির পাহাড় জেলার বড়বিল এলাকা হইতে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদিগকে উচ্ছেদ করার জন্য হস্তী ও সশস্ত্র পুলিস নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উদ্বাস্তু উচ্ছেদের কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার পর শুক্রবার হইতে পুনরায় উহা শুরু হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ইতঃপূর্বে অনেক কাণ্ডই ঘটিয়াছে কিন্তু প্রসূতি বিভাগ হইতে নবজাত শিশু অপহৃত হইবার মত চাঞ্চল্যকর ঘটনা স্মরণকালের মধ্যে ঘটে নাই। গত শুক্রবার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ইডেন হাসপাতাল হইতে ১০ দিনের একটি ছেলে চুরি যায়। পরে পুলিসের তৎপরতা এবং দক্ষতার ফলে হাওড়া জেলার কোন গ্রাম হইতে নবজাতটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

৬ই অক্টোবর—রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সহিত পুনঃ পুনঃ যোগাযোগ করিয়া কোন প্রকার সমর্থনসূচক উত্তর পাওয়া না গেলেও কলিকাতা ও হাওড়ার কোন কোন ওয়াকিবহাল মহলে এরূপ জনরব সৃষ্টি হইয়াছে যে, বোটানিকাল গার্ডেনের মধুচক্রের নায়ক প্রাক্তন কিউরেটর পুলিসের কড়া দৃষ্টি এড়াইয়া কয়েকদিন পূর্বেই ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর—প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র অদ্য বিশেষ জোরের সহিত বলেন, জাতীয়তাবাদী চীনা বিমানবহর খাস চীনের আকাশে হানা দিতে আসিয়া মার্কিন 'সাইড উইণ্ডার' নামক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র উড়ন্ত বিমান হইতে উড়ন্ত বিমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

১লা অক্টোবর—রাজা হুসেন আজ এই মর্মে ঘোষণা করেন যে তিন হাজার বৃটিশ সৈন্য ২০শে অক্টোবর জর্ডন ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিবে। তিনি পার্লামেণ্টে তাঁহার সিংহাসন হইতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, প্রয়োজনীয় যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিতে পারিলেই অপসারণকার্য আরম্ভ হইবে।

২রা অক্টোবর—জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকারী ডাঃ মেরী স্টোপস অদ্য সারেতে তাঁহার স্বগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

৩রা অক্টোবর অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে বিতর্কের কালে পাকিস্থানের স্থায়ী প্রতিনিধি প্রিন্স আলী খান বলেন যে কাশ্মীর সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করা না হইলে শুধু সেই দেশ ও পাকিস্থানের জনগণ রাষ্ট্রপুঞ্জের উপরই আস্থা হারাইয়া ফেলিবে না, এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে সমগ্র উপমহাদেশ ও বিশ্বের শান্তি বিপন্ন হইবে।

৪ঠা অক্টোবর—ঠিক এক বৎসর পূর্বে যে সকল সোভিয়েট বিজ্ঞানী আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ তুলিয়া দিয়া সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহারা শূন্যলোক অভিযানের পরবর্তী বিস্ময়—অর্থাৎ মানব-আরোহী সহ মহাজাগতিক শূন্যলোকে পাড়ি দিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন।

করাচীর 'মর্নিং নিউজ' পত্রের ৬ই অক্টোবরের সংস্করণে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কালাতের শাসক পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মীর দুর্গ হইতে পাকিস্থানী পতাকা সরাইয়া দিয়া তাহাদের পৈতৃক পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন।

৫ই অক্টোবর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রী খ্রুশ্চেভ অদ্য প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, ফরমোজা এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে সোভিয়েট সরকার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাহার সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ফরমোজার বিভিন্ন শহর ও সামরিক ঘাঁটিসমূহ রক্ষার জন্য আমেরিকার নাইক হারকিউলিস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম চালানটি অদ্য তাইপেতে পৌঁছিয়াছে। এ সকল ক্ষেপণাস্ত্র স্থলভাগ হইতে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া মারা যায়।

৬ই অক্টোবর—পাকিস্থান সরকারের সৈন্যদল আজ পূর্বাহ্নে কালাতে তথাকার ভূতপূর্ব শাসক মীর আমেদ ইয়ার খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের পূর্বে খাঁর অনুগামীগণ ও একদল মারমুখী জনতার সহিত পাক সৈন্যদের গুলী বিনিময় হয়।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রী সরকার গতকল্য আমেরিকান মেনহল প্রসপেক্টিং কোম্পানী ও সিরিয়া-আরব অয়েল কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে সিরিয়ায় উহাদের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশজারী করিয়াছেন। ব্যাঙ্কে উভয় কোম্পানীর যে অর্থ গচ্ছিত ছিল তাহাও আটক করা হইয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# সূচীপত্র

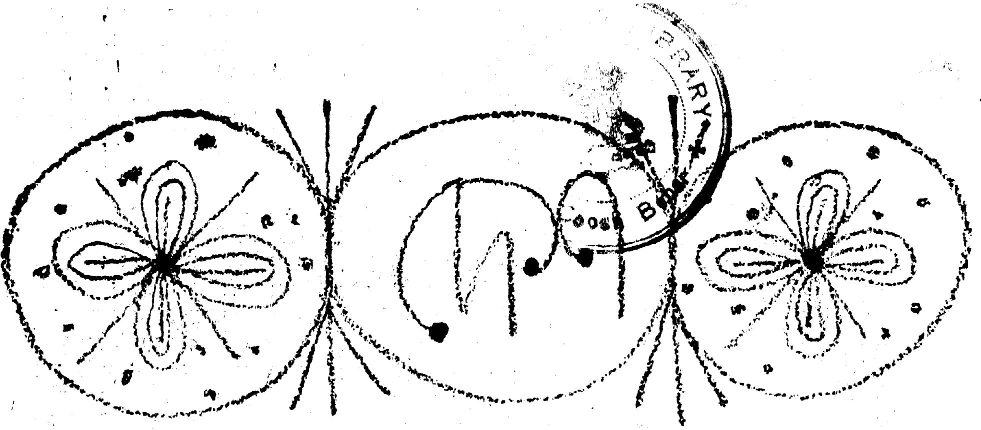
# সূচীপত্র






# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 18th October, 1958.

২৫ বর্ষ ॥ ৫১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১লা কার্তিক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ




## পুনর্বাসন

পরিকল্পনাটা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার সুরাহার জন্য, তবু যদি উদ্বাস্তুদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত না হইয়া থাকে, তাহার জন্য দায়ী প্রধানত সরকারী প্রচার-ব্যবস্থার ত্রুটি। আমরা বলি, ত্রুটি রহিয়াছে নামকরণের মধ্যেই, অঞ্চলটিকে অরণ্য বলিয়া প্রচারে যতখানি মহাকাব্য-প্রীতির পরিচয় আছে, ততখানি বাস্তব বুদ্ধি নাই। সাধারণে ইহাকে পুনর্বাসন কাহিনীর অরণ্যকাণ্ড বলিয়াই মনে করিবে। ভাবানুষঙ্গটা, বলাই বাহুল্য, বিশেষ সুখাবহ নহে। 'দণ্ড' শব্দাংশটিও কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু, অনেকেই ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ব্যবস্থাটাকে বনবাসের সামিল মনে করিতেছেন কিনা জানি না।

অথচ, যে-বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া এই পরিকল্পনা, আকারে তাহা পশ্চিমবঙ্গেরই সমতুল্য, খনিজ সম্পদে পূর্ণ, এবং ইহার শিল্প-সম্ভাবনা অপরিসীম। কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি বনজ সম্পদও প্রচুর। বিদ্যালয়, পণ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপনের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; শীঘ্রই এই অঞ্চলের অর্ধাংশ প্রায় সতের হাজার পরিবারের বসবাসের উপযুক্ত হইবে। যাহারা চাকুরির খোঁজে দিল্লী পাঞ্জাব পাড়ি দিতে ইতস্তত করে না, দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়া তাহাদের পক্ষে অসহনীয় হইবার কথা নয়। কেবল বসবাস নয়, এই অঞ্চলের ক্রমিক শিল্পোন্নতির সহিত অন্নবস্ত্র সমস্যারও সমাধান অবশ্যই হইবে।

এই আয়োজন কাহাদের জন্য? সরকারী তরফ হইতে কর্তৃপক্ষস্থানীয়েরা বারংবার বলিয়াছেন, প্রধানত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য। এই অঞ্চলে বসবাসের অগ্রাধিকার তাহাদেরই। একবার যাহারা দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, দ্বিতীয়বার তাহারা অন্যত্র যাইতে ইতস্তত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, অর্থনৈতিক অবস্থাটাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার যা চাপ, তাহাতে মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু মেলাই ভার, জীবিকার সংস্থান তো পরের কথা। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত, নূতন উপনিবেশ গড়িয়া তুলিবার এই সুযোগ আমরা গ্রহণ না করিলে অন্য-প্রদেশীয়রা করিবে। সুচাগ্র মেদিনীর জন্য প্রতিবেশী রাজ্যের নিকট দাবী জানাইয়াও অতীতে বিশেষ ফল পাই নাই, ভবিষ্যতে পাইব, এমন আশাও কম।

অন্য প্রদেশের জমিতে, জলে এবং বায়ুতে বাঙালীর সংস্কৃতি টিকিবে না, এই আশঙ্কাও অমূলক। উপনিবেশ-স্থাপনের ঐতিহাসিক নজীর অন্য সাক্ষ্যই দেয়। কুইবেকের লোক আজও ফরাসী বলে, সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরাজী-ভাষী। যূথবদ্ধ বাঙালীও ইচ্ছা থাকিলে ভিন্নতর ক্ষেত্রে তাহার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য শুধু রক্ষা করিতেই পারিবে না, বাঙালী সংস্কৃতির নূতন অধ্যায়ও রচনা করিতে পারিবে। একদা আমরা যদি 'হেলায় লঙ্কা জয়' করিয়া থাকি, তবে অরণ্যেও নগর এবং প্রদেশান্তরেও নব-বঙ্গ গড়িয়া তুলিতে পারিব।

**বিজ্ঞপ্তি**

**শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশ পত্রিকার দপ্তর এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। এই কারণে ২৫ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না। পরবর্তী সংখ্যা (২৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ১ নভেম্বর প্রকাশিত হইবে।**

**—সম্পাদক 'দেশ'**

## চন্দ্রাভিসার

চন্দ্রলোকে প্রাণী নাই, থাকিলেও তাহারা সম্ভবত বিস্মিত হইত না, বুঝিতেও পারিত না, ঠিক কি ব্যাপার ঘটিয়া গেল, মহাকাশে একটি উল্কা-বেগ জ্যোতির্লেখা দেখা দিয়াই মুছিয়া গেল, মাত্র এইটুকু তাহাদের চোখে ধরা পড়িত। এমন ঘটনা কতই ত ঘটে—মহাবিশ্বে এমন শত শত "তারকার অপমৃত্যু" ঘটে। দূর পৃথিবীর কথা, অন্তত আপাতত, তাহাদের অজানাই রহিয়া গেল।

সেই পৃথিবীর আশা-বাসনা-প্রয়াসের ধরনই স্বতন্ত্র। সেখানে পর্বত বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইতে চায়, তালগাছ এক-পায়ে দাঁড়াইয়া আকাশে উঁকি দেয়, তরু-শ্রেণী পাখা মেলিয়া সেই আকাশের কিনারা খুঁজিতে ছোটে। অনেক স্বপ্ন অবশ্য শূন্যেই মিলাইয়া যায়, তবু মনে মনে কোথাও হারাইয়া যাইতে তো মানা নাই।

আসলে এই স্বপ্ন পর্বত বা তরু-শ্রেণীরও নহে—মানুষের, যে মানুষ চির-

কাল চঞ্চল এবং সুদূরের পিয়াসী। বিশ্বামিত্র তপোবলে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু রক্ষা করিতে পারেন নাই, শূন্যে মূর্ছিত হইয়া মাটিতেই পড়িয়াছিলেন। সেই বিফলতা কিন্তু তাঁহার উত্তরপুরুষকে নিরুদ্যম করে নাই, বরং নূতন প্রেরণা দিয়াছে। কেননা, মানুষের প্রতিজ্ঞাই এই যে, সে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাকী কিছুই রাখিবে না, অসাফল্যের স্তরে স্তরে ভিত্তি গাঁথিয়া সাফল্যের সৌধ নির্মাণ করিবে।

মার্কিন রকেট "পাইওনীয়ার"ও, মহাকাশ হইতে অলক্ষ্যে পড়িয়া, সেই ভিত্তিমূলে নূতন একটি প্রস্তর হইয়া রহিল। তাহার চন্দ্রলোকাভিসার সার্থক হয় নাই, মাটির টানে সে আবার মাটিতে ফিরিয়াছে। তবু জ্ঞানযজ্ঞে তাহার এই আত্মাহুতি অবশ্যই ব্যর্থ নয়, মহাশূন্যের বহু তথ্য সে মানুষকে জানাইয়াছে, সেই তথ্যই হয়ত ভবিষ্যৎ সাফল্যের ইঙ্গিত দিবে। সেদিন নিশ্চয়ই দূরে নয়, যেদিন প্রমাণ হইবে, মাটির মায়া একেবারে কাটাইতে শুধু বিদেহী পরমাত্মাই পারে না, জড়বস্তুও পারে!

## অনুবাদের প্রতিবাদ

অনুবাদ সম্পর্কে বিচক্ষণদের বহু আপত্তি। বস্তুটি যদি মূলানুগ হয়, তবে ভাল বা সুপাঠ্য হয় না, আর সুপাঠ্য অনুবাদ মূলানুগ হয় না। আবার, মূলানুগ নয়, সুপাঠ্যও নয়, এমন অনুবাদও আছে, এবং পরিমাণে তাহাই বেশী।

তবু আপত্তি করিয়া লাভ নাই। অনুবাদ ছাড়া উপায়ও নাই। স্বদেশে রাজার পূজা, বিদ্বানের পূজা সর্বত্র, এমন একটি প্রাচীন কথা আছে বটে; কিন্তু সেকালে কি ব্যবস্থা ছিল জানি না, একালে অনুবাদ বিদ্বানের হইয়া দৌত্য করে তবে তিনি বিদেশে পূজা পান। কারণ, পৃথিবীতে ভাষা ভূয়সী। যাঁহারা রূপকার বা সুরকার, অসুবিধা তাঁহাদের কম—রঙ বা সুরের নিজস্ব এসপেরান্টো বা বিশ্ব-ভাষা আছে। কথাশিল্পীকে ভাষার সীমান্ত মানিতেই হয়। ও-পাশে যাইতে হইলে যে ছাড়পত্র অবশ্যই চাই, তাহার নাম অনুবাদ!

প্রধানত অনুবাদের ভিতর দিয়াই বহু বিশ্ব-মনীষার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে, এবং অনুবাদ ছিল বলিয়াই জগৎকবি-সভায় আমরা আমাদের কবিকে লইয়া গর্ব করিতে পারিয়াছি। অবশ্য প্রতীচ্যের নানা ভাষায় অনূদিত ভারতীয় গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্তই কম, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও বহু বিশিষ্ট রচনার অনুবাদ আজ পর্যন্ত ইংরেজিতেই হয় নাই। তবে এই কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য নূতন উদ্যম ও আগ্রহের প্রমাণ কিছুদিন যাবত পাইয়াছি। বিশ্বভারতীর সংকল্প তো ছিলই, সাহিত্য আকাদেমিও তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সূচনা অবশ্যই শুভ।

শুভ বলিয়াই সতর্কতার প্রয়োজন কিছু বেশী। যে-ছাড়পত্র লইয়া বিদেশে নিজেদের পরিচয় দিব, সেটি ভুয়া হইলে লজ্জা আমাদেরই। এ-বিষয়ে দায়িত্ব ঠিক কাহার জানি না, কিন্তু সম্প্রতি অনুবাদের এমন একটি দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে আসিয়াছে, যাহাতে আশঙ্কা হয়, যথোচিত সতর্কতা, অন্তত সর্বত্র, গ্রহণ করা হয় না। একটি ইংরাজি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব-পরিচয়"

> **বিজ্ঞপ্তি**
>
> খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের নূতন উপন্যাস 'মুখের রেখা' আগামী ১লা নভেম্বর হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক 'দেশ'

গ্রন্থের তর্জমার যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

বিজ্ঞানের বই বাংলা ভাষায় বেশী নাই, রবীন্দ্রনাথ যখন "বিশ্ব পরিচয়" লেখেন, তখন আরও ছিল না। সাধারণের জন্য সহজভাবে লিখিত, গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এইখানে, এবং বিষয়ের উপর অসামান্য দখল না থাকিলে দুরারোহ জ্ঞানের অঙ্গনের সহজ প্রবেশিকা রচনা সম্ভব নয়। পাণ্ডিত্যের যে আড়ম্বর দূরে রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ ছন্দ, শব্দতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সেই নৈপুণ্য এবং চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা তাঁহার শেষ বয়সের "বিশ্ব পরিচয়ে"ও দেখা গিয়াছে। অনুবাদ উপযুক্ত হইলে, যে প্রতীচ্য একদা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার গীতাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিল, অন্যতর ক্ষেত্রে সেই কবিরই প্রতিভার দৃষ্টান্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইতে পারিত।

কিন্তু অনুবাদের নমুনা যতটুকু পাইলাম, তাহাতে ইহা যোগ্য হয় নাই বলিলে কিছুই বলা হয় না। বইটি প্রকাশিত হইয়াছে লণ্ডনে, এবং অনুবাদকারিণীরূপে কোন ভারতীয় মহিলার নাম দেখিতে পাইতেছি। বইটির ভূমিকা লিখিয়াছেন মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড। ইংরাজী ভাষার অশুদ্ধ প্রয়োগের কথা না হয় আপাতত নাই-ই ধরিলাম (যদিও তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়, কেননা বিদেশী পাঠকের কাছে ভাষার অশুদ্ধির ফলে গ্রন্থের অমর্যাদা ঘটে), কিন্তু অণু, পরমাণু, অতি-পরমাণু প্রভৃতি প্রচলিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে অনুবাদ করিতে গিয়া লেখিকা অমার্জনীয় অনবধানতা দেখাইয়াছেন, ফলে রচনাটি বহুলাংশে দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট এবং অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। অনুবাদ-কারিণী এমন কি 'গ্রহ' এবং 'নক্ষত্র' শব্দ দুইটিরও স্বতন্ত্র অর্থ সম্পর্কে অবহিত নন। হার্শেল, মেঘনাদ সাহা ইত্যাদি নামের বানানেও নানারূপ হাস্যকর ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। এক স্থানে তত্ত্বতর বুঝাইতে গিয়া লেখিকা লিখিয়াছেন বৃহত্তর, অন্যত্র দশ কোটি মাত্র এক কোটিতে পরিণত হইয়াছে।

পত্রান্তরে অনুবাদটির আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক রূঢ় ভাষায় লেখিকাকে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন : ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে তিনি যেন সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক কোন প্রাথমিক পাঠ, বাংলা ও ইংরাজি ব্যাকরণ-গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি জানিবেন, "গ্রহ" এবং "নক্ষত্র" এক নহে; "অণু" এবং "পরমাণু"ও আলাদা বস্তু। বহু পরিচিত সহজ শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু অনুবাদ-কারিণীর ভবিষ্যৎ লইয়া বিশেষ ভাবিত নহি; "বিশ্ব পরিচয়" বিদেশে বিশ্বকবির যে পরিচয় বহন করিয়া যাইবে তাহা ভাবিয়াই বিমূঢ় বোধ করিতেছি। বিদেশী পাঠক ভাবিবে অপ্রচুর জ্ঞান লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনধিকার চর্চা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে এইভাবে উপহাস্য করিয়া তুলিবার অধিকার কাহারও নাই।

আগেই বলিয়াছি, দায়িত্ব কাহার, ঠিক জানি না, হয়ত বিশ্বভারতীর, হয়ত, অন্তত পরোক্ষভাবে, আকাদেমির। যাহারই হউক অবিলম্বে গ্রন্থটির প্রচার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। আমাদের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রায় টান পড়িয়াছে, আমরা সকলেই জানি। জানি না, অন্তত মনে রাখি না, বিদেশে উড়াইয়া দিবার মত খ্যাতির পুঁজিও আমাদের বিশেষ নাই।



পাকিস্তান সম্বন্ধে যে-আশঙ্কা অনেকের মনে ছিল এতদিনে সেটা বাস্তবে পরিণত হোল। সাময়িকভাবে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন স্থগিত করা পূর্বে হয়েছে, কিন্তু সেটা হয়েছে শাসনতান্ত্রিক বিধানেরই কোনো এক ধারা অনুযায়ী অন্য কোনো ধারার কার্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা। এবার গোটা শাসনতান্ত্রিক বিধান — কনস্টিটিউশনটাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ডিক্টেটরী আরম্ভ হল। একদিকে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলে কোন্ দলের ক'জন মন্ত্রী থাকবে তাই নিয়ে যখন বিবাদ চলছে এবং একদিনের মধ্যে দু'বার রদবদলের "রেকর্ড" সৃষ্টি হচ্ছিল তখন অন্যদিকে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা ও সেনাপতি আয়ুব খান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি বরখাস্ত করে সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারীর ঘোষণার সুবিধা তৈরী করছিলেন। কনস্টিটিউশন বাতিল করা বা জেনারেল আয়ুব খানকে মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে নিযুক্ত করে তাঁর হাতে সর্বক্ষমতা অর্পণ করা—এর কোনোটার সঙ্গেই আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। সবই জবরদস্তি এবং জবর দখলের ব্যাপার। মির্জা সাহেব এবং জেনারেল আয়ুব—দৃশ্যত এই দুজন এই নাটকের অভিনেতা, তার মধ্যে আসল নায়কের ভূমিকা বোধ হয় জেনারেল আয়ুবেরই। তবে এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, আয়ুব খানকে চালাবার সূত্র আর কারো হাতে আছে। তবে মোট কথা মিলিটারির হাতে সব ক্ষমতা গেল। আয়ুব স্থলসৈন্যবাহিনী বা আর্মির অধিনায়ক; নৌবাহিনী এবং বিমান বহরেরও পৃথক পৃথক অধিনায়ক আছে। এই তিন বিভাগের মধ্যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মত ও মনের মিল আছে কিনা এবং থাকলে সেটা কতদিন বজায় থাকবে সেটা অবশ্য ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য। আপাতত জেনারেল আয়ুব খানকেই পাকিস্তানের হর্তাকর্তা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—যতদিন আবার দৃশ্যপটের পরিবর্তন না হয়।

মিলিটারী ডিক্টেটরীর প্রবর্তকদের মতে তাঁরা পাকিস্তানকে সর্বনাশ থেকে রক্ষা করলেন। স্বার্থপর রাজনৈতিক দলগুলির বিবাদ ও রেষারেষির ফলে পাকিস্তান উচ্ছন্নে যাচ্ছিল, মিলিটারীর হাতে এসে বাঁচবে কারণ মিলিটারী কঠোর হস্তে দুর্নীতি নিবারণ করবে এবং সাধারণের অবস্থার উন্নতি যাতে হয় তার জন্য সচেষ্ট হবে। কালাবাজারী, সুদখোর, চোরাকারবারীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। লোকে আশা করছিল যে, ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচন হলে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে, সেটা তাদের ভুল। রাজনৈতিকরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি সব খারাপ হয়ে গেছে, সুতরাং সাধারণ নির্বাচন হলেই বা লাভ কী? সেই খারাপ লোক, খারাপ দল নিয়েই তো কারবার করতে হবে। ইস্কান্দার মির্জা সাহেব তো অনেক আগেই বুঝে নিয়েছেন যে, পাকিস্তানে মামুলি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চলবার নয়। মির্জা সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পাকিস্তানের দাওয়াই হচ্ছে "কনট্রোলড্ ডেমোক্রেসি"—নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিকতা। তার আয়োজন হচ্ছে

—সময় হলেই পরিবেশন করা হবে। ফ্রান্সে যেমন পুরানো শাসনতন্ত্র বাতিল এবং দ্য গল-রচিত নূতন শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের জন্য গণভোট নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানেও ঐ রকম কিছু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। (এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ফ্রান্সে দ্য গল কার্যত পুরাতন শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ-কারী হলেও শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় ভালটুকু অন্তত ত্যাগ করেননি, তাঁর কর্তৃত্ব গ্রহণের পর্বটাও পার্লামেণ্টের দ্বারাই অনুষ্ঠিত করিয়ে নিয়েছিলেন যদিও তার পিছনে এই ভয়ের চাপ ছিল যে, দ্য গলের হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ না করলে সৈন্যবাহিনী গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করবে। সম্প্রতি বর্মাতেও সৈন্যবাহিনীর নায়কের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু তার সংগেও পাকিস্তানের ঘটনা তুলনীয় নয়। বর্মায় প্রধানমন্ত্রী উ নু বিরোধী দলের নেতার সংগে পরামর্শ করে সৈন্যবাহিনীর নেতাকে সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং এই নিয়োগও পার্লা-মেণ্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।) কিন্তু ফ্রান্সে যেমন নূতন কন্‌স্টিটিউশন পেশ করার একটা সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, পাকিস্তানে সে সবের বালাই নেই। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে সবই অনিশ্চিত। ছ মাস পরে অথবা তিন মাস, এমন কি এক মাস পরে কী হবে তা কেউ বলতে পারে না। নূতন কর্তাদের ঘোষণায় এটা যেন ধরে নেওয়া হয়েছে যে, লোকেরা সামরিক শাসন সাগ্রহে বরণ করে নেবে, রাজনৈতিক দলগুলির উপর তারা এত বীতশ্রদ্ধ হয়েছে যে, দলগুলির বিলোপ সাধনে তারা আহ্লাদে আটখানা হবে। কিন্তু ডিক্টেটর মহোদয়দের যদি সত্যই এই বিশ্বাস থাকত তবে তাঁরা যে-সব হুকুম জারী করছেন সেগুলোকে অত ভীষণ উগ্র রূপ দেবার দরকার হত না। কেবল ঘুষ-খোর বা কালোবাজারীদের নয়, সর্বসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্য টের পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের উভয় অংশেই ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতাদেরও কালো-বাজারী, চোরাকারবারী বলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অবশ্য রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের সম্বন্ধে এরূপ কথা অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু খান আবদুল গফ্‌ফর খান বা মৌলানা ভাসানীর মতো লোককে ঐ রকম অপবাদ দিলে হাস্যাস্পদ হতে হবে। সুতরাং তাঁদের প্রতি রাজনৈতিক অপরাধ আরোপ করতেই হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনে কেবল এই প্রশ্ন জাগবে যে, বাদশা খান বা মৌলানা ভাসানীর মত লোককে যারা শত্রু বলে মনে করে তারা কি দরিদ্রের দুঃখ দূর করতে সত্যই আগ্রহশীল হতে পারে?

১৩।১০।৫৮




**শ্রীকৌটিল্য**

**স**ম্প্রতিকালে অনেক গ্রামেই যে জিনিসটা বেশ লক্ষ্য হচ্ছে তা এই যে, কৃষির কাজ ফেলে লোকেরা নানারকমের দোকান খুলে ব্যবসা করছে। শুধুমাত্র সওদা করা ছাড়া অন্য পেশা নিয়েও লোকেরা কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে আসছে। এমন গ্রাম খুব বিরল নয় যেখানে চাষের কাজ ছেড়ে মানুষ নাপিত কিংবা ছুতোর পর্যন্ত হয়েছে। পেশা-রূপান্তরের এই সাম্প্রতিক পরিস্থিতির গোড়ায় অবনিয়োগের ব্যাধির কাহিনী ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। একথাও বলেছি যে, এই রূপান্তর স্বাভাবিকভাবে শিল্প-অগ্রসরমান দেশের সঙ্গে তুল্য নয়, কারণ এদের জন্ম দারিদ্র্যের মধ্যে এবং এদের অবস্থিতিও দারিদ্র্য-বর্ধক। তাই কৃষি থেকে পালিয়ে এসেও আমাদের নতুন দোকানদার দিনে তেরো ঘণ্টা দোকান খুলে বসে থাকেন। খদ্দের না পাওয়াটাই অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে, এবং অগত্যা দোকানে দোকানে সারাদিন তাস খেলার হিড়িক।

এখন, এই পেশাগুলো সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। ছুতোরকে যদি জিজ্ঞেস করেন তার কাজের জন্য গ্রামের ভিতরে চাহিদা কেমন, সে বলবে যে, সাধারণ অবস্থায় চাহিদা খুবই সামান্য এবং প্রায় আকস্মিক। হয়তো সৌভাগ্যত গ্রামে একটি ইস্কুল খুলেছে বলে সম্প্রতি কিছু টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি তৈরী বা মেরামত করার কাজ জুটছে। এসব আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া দেখবেন, সে আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট। তা হচ্ছে এই যে, ফসল কাটার ঠিক পরে কয়েকদিন তার কাজের চাহিদাও কিছু বেড়ে যায়। ফসল কাটার পরে কৃষি-জনতার হাতে যে বিত্ত আসে তার সাহায্যে তারা ঘর-দরজার ভাংগাচোরা মেরামত করে কিংবা কখনো কখনো নতুন দু-চারটা দরজা-জানালাও তৈরী করায়। এখানে আমরা ছুতোরের উদাহরণ দিলাম; কিন্তু অন্যান্য পেশা সম্বন্ধেও এই ফসল কাটার পরের সাময়িক চাহিদার উন্নতির যোগাযোগ প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য। এমন কি, ক্রয়-ক্ষমতা হাতে আসবার পর লোকেরা তাদের চুল-দাড়ি কাটা সম্বন্ধেও একটু বেশিই সচেতন হয়। প্রসংগত একটা কথা মনে রাখতে হবে। ফসল-কাটার পরে কৃষি-জনতা তাদের বর্ধিত চাহিদা মেটাবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার সাহায্য নেয় না। প্রত্যেক গ্রামেই, উদাহরণস্বরূপ, কয়েকজন নাপিত থাকে যারা কৃষি পরিবারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান-চাউলের পরিবর্তে চুল কেটে দেয়, টাকার মধ্যস্থতার প্রশ্নই ওঠে না। তবে সাধারণত লেনদেনগুলো টাকা-পয়সা এবং ধান-চাউল এই দুয়ের মিশ্রণেই চলে।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের পেশাগুলোর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কৃষিক্ষেত্রের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে সারা বছরে চক্রাবর্তিত হয়। এর সংগে আরো যদি মনে রাখি যে, অকৃষিজ কোনো পেশার জন্যই গ্রামের ভিতরকার চাহিদা কখনো যথেষ্ট নয়, তবে অকৃষিজ পেশায় নিযুক্ত লোকদের বাস্তবিক দুর্গতির কথা ধারণা করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ছুতোর মিস্ত্রী যে ৩০।৪০ মাইল দূরের গ্রাম থেকে কলকাতায় কাজের অর্ডার পেলে এসে কাজ করে যায় না এমন নয়; কিন্তু কলকাতার লোকের তরফ থেকে এদের জন্য বিশেষ চাহিদা থাকা অস্বাভাবিক। তাঁতীর ব্যবসা অবশ্য প্রধানত গ্রামের বাইরের বাজারের সংগেই (যথা, হাওড়ার হাট) চলে। সাধারণত গ্রামের লোকেরা সস্তায় কলে-তৈরী শাড়ি-ধুতি কিনে পরে। বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া তাই গ্রামের জনসাধারণের সংগে তাঁতীর ব্যবসার সম্পর্ক কম। এর উপর, যেসব গ্রামে ভালো শাড়ি-ধুতি ছাড়া তৈরীই হয় না (যেমন, ধনেখালি), সেখানে এই সম্পর্কহীনতা শতকরা প্রায় একশ। রেল গাড়িতে করে কলকাতায় এসে সুতো কিনে নেওয়া এবং ফের সপ্তাহের বা মাসের তৈরী কাপড় এনে বাজারে বিক্রী করে যাওয়া গ্রাম্য তাঁতীর সামান্য ব্যবসার পক্ষে যে মোটেই অনুকূল অবস্থা নয়, এটা অনস্বীকার্য।

কাজেই আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারছি যে, যেহেতু গ্রামের চাহিদার উপর এই পেশাগুলোর স্বাচ্ছন্দ্যকে নির্ভর করানোর চেষ্টা এই মুহূর্তে বিরাট মূর্খতা, সরকারী স্তরে সেহেতু এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার যাতে চার পাশের শহরাঞ্চলকে গ্রামের জিনিস বা কাজকর্মের উপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। গ্রাম ও শহরের আর্থিক দ্বন্দ্ব সাম্প্রতিক ভারতীয় অর্থনীতির একটি সর্বপ্রধান সমস্যা। গ্রামের দারিদ্র্য সমগ্র অর্থনীতির দারিদ্র্যকেই ক্রমাগত পুষ্ট করে চলেছে। শহরের সংগে গ্রামের লেনদেনে শহর যে সর্বদাই প্রাধান্য পাচ্ছে এটা স্বল্প-মেয়াদী দৃষ্টিতে দেখার ফলে শহরের তরফ

থেকে জাতীয় সচেতনতা আসছে না। শহর ও গ্রামের দ্বন্দ্বের এই ঐতিহাসিক স্তর অন্য অনেক দেশেও যথারীতি দেখা গেছে এবং অনেক দুঃখ ভোগের পর তারা এই দ্বন্দ্ব অপসারণ করতে পেরেছে। ভারতবর্ষের পরিকল্পনায় এই দ্বন্দ্বের অপসারণের, তথা গ্রামীণ অর্থনীতিকে তার পূর্ণমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে বিশেষে নজর দিতে হবে। গ্রামের দারিদ্র্য-প্রসূত অকৃষিজ পেশাগুলিকে গ্রামের নিঃসহায় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে না রেখে অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শহরের চাহিদার সঙ্গে গ্রামের এই পেশাগুলোর যোগানের সংযোগ সাধিত হয়। সাধারণভাবে সব রকমের সুবিধা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে-তৈরী জিনিসের জন্য শহরের তরফ থেকে একটি বিশিষ্ট পছন্দ সৃষ্টি করাও সরকারের আশু কর্তব্য। কলকাতার অভিজাত পাড়ায় কিছু কিছু চমকপ্রদ দোকান খুলে কুটির-শিল্পের প্রদর্শনী করার মধ্যেই এ কর্তব্যের কিন্তু শেষ নয়।

# আজও তাঁরা অবহেলিত

কানাইলাল বসু

মুখে বলি চাষী-ভাই। কিন্তু সেই ভাইদের আজ সত্যিকারের কি অবস্থা ক'জন জানে? আজ দেশ গঠনের এত পরিকল্পনা, এত তোড়জোড়—তবু ভারতের চাষী যে আজও ভারতীয় অর্থনীতির পরিত্যক্ত সন্তান—আজও যে তারা অবহেলিত—ক'জন তার সন্ধান রাখে? যতই বিস্ময়কর হোক তবু তা বাস্তব, তবু তা কঠিন সত্য।

বৃটিশ আমলের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের চাষী ভারতের অর্থনীতির কাছ থেকে পেয়েছে অবহেলা, পেয়েছে উপেক্ষা, উপহাস আর অবজ্ঞা। সে গরিব। সে মূর্খ। চাষের প্রণালী তার মানধাতা আমলের সেই মামুলী। আজকের আধুনিক উন্নততর বৈজ্ঞানিক চাষের প্রণালীতে চাষ করা বা সে কাজের উপযুক্ত করবার জন্য ছেলেকে লেখা-পড়া শেখানোর মত জরুরী কাজটুকু করাও তার সাধ্যের বাইরে। আর্থিক সামর্থ্যের অভাব—তার মাথার চুলটুকুও বিকিয়ে আছে দেনার দায়ে। তার ঋণের বোঝার পিছনে রয়েছে একটা মস্ত কারণ—সে কারণ পৈতৃক। ভারতের চাষী তাই ঋণ মাথায় করে জন্ম নেয়—যতদিন বেঁচে থাকে ঋণের বোঝা বয়ে চলে—ঋণের বোঝা নিয়েই মরে—চাপিয়ে যায় ছেলের মাথায় দেনার পাহাড়। আজও ভারতীয় চাষীর সত্যিকারের রূপ এই। তারা প্রত্যেক পুরুষে একে অন্যের মাথায় একটু একটু করে দেনার বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। ঠাকুরদাদা দেনা রেখে মারা গেল—ছেলে তা শোধ করতে তো পারলোই না বরং বাড়ালো—নাতি তার মাত্রা আরও বাড়াল—এইভাবেই পুরুষানুক্রমে বেড়ে চলেছে ভারতের চাষীর ঋণের বোঝা। এইতো হ'ল আমাদের দেশের চাষী-ভাইয়ের সত্যিকারের ইতিকথা। এর উপর আছে বছর বছর হয় বন্যা নয়তো অজন্মা, আছে সামাজিক সংস্কার, লোক-লৌকিকতা। কাজেই দেনার মাত্রা কমে না বরং বেড়েই চলে। ভারতীয় অর্থনীতিতে আজ চাষী-ভাইরা সত্যিই অসহায়। এর অনেক কারণ আছে তবে তার মধ্যে একটা বড় কারণ হল যে, এই নিরক্ষর-দের হয়ে সত্যিকারের বলবার কেউ নেই। অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ের স্বার্থ বা সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে বলবার লোক আছে—যেমন ব্যবসায়ীদের চেম্বার অব কমার্স, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। কিন্তু চাষী-ভাইদের তা নেই। আর নেই বলেই ন্যায্য দাবী আদায়ের বা অসুবিধে দূর করবারও রাস্তা নেই ওদের। দাবী আদায়ের জন্য, অসুবিধে দূর করবার জন্য, দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সব ক্ষেত্রেই ধর্মঘট বা 'লক-আউট' যে খারাপ একথা বলা সংগত নয়। কিন্তু ভারতীয় চাষী এসবের সুযোগ পায় না কারণ তাদের এ রাস্তায় যাবার মত সংগঠন নেই। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল চাষী-ভাইদের নিয়ে নাচানাচি করে। কিন্তু সে চাষী-ভাইদের দরদের জন্য নয় বরং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরেই। কাজেই এদের হয়ে বলবার সত্যিকারের কেউ নেই। তাই সে মুখ বুজে থাকে—মুখ বুজে শত অসুবিধের মধ্যে আজীবন খেটে চলে।

অন্যান্য শিল্পের মত চাষবাসও একটা শিল্প। শুধু তাই নয়, ভারতে যত রকম শিল্প আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ এই চাষবাস শিল্প বা কৃষি। ভারতের মোট লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ লোক এই চাষবাস করেই জীবিকা অর্জন করে। আর ভারতের জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণের প্রায় অর্ধেক সংগৃহীত হয় এই চাষবাসের আয় থেকে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এতবড় একটা দেশব্যাপী শিল্পের আসল সংকট এখানেই। দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক সকলে মিলে জাতীয় আয়ের অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোজগার করছে। আর দেশের বাকী লোকসংখ্যা—মানে শতকরা তিরিশ ভাগ লোক মোট জাতীয় আয়ের বাকী অর্ধেক রোজগার করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের চাষী-ভাই মাথাপিছু গড়ে যা রোজগার করে—কৃষি ছাড়া দেশের অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত লোকে মাথাপিছু গড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী রোজগার করে—এই বেশীটা একটু আধটু নয়—বলতে গেলে ডবল। আরও একটা বিষয় এখানে বিবেচনা করবার আছে। ভারতে সামগ্রিকভাবে মাথা-পিছু গড় আয় খুবই কম—পৃথিবীর অন্যান্য

দেশের তুলনায়। অথচ এদেশের লোকসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ কৃষিজীবি—যাদের আয় দেশের অন্য লোকের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে, আমাদের চাষী-ভাইদের আয় কত কম!

আমরা অনেক সময় গর্ব করে বলি যে, ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিই হলো ভারতের কৃষি। কারণ খাবারের জন্য—অন্যান্য বড় বড় শিল্পে কাঁচা মালের জন্য আমাদের কৃষির ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে, সেই চাষী-ভাই—যার অভাবে চাষবাস অচল তার কি অবস্থা? কৃষিপ্রধান ভারত গড়ার কাজে আজ কার্যত কৃষকই উপেক্ষিত। ইস্পাত কারখানা হলে দেশের শিল্পের উন্নতি অবশ্যই হবে—জাতীয় আয় অবশ্যই বাড়বে—কিন্তু দেশের আসল ভিত্তি যে কৃষি তার কতটুকু উন্নতি হবে? চিন্তা করলে হয়তো দেখা যাবে চাষী-ভাইদের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে না বরং অবস্থা অবনতির দিকেই যাবে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গঠন আমাদের নীতি—সে নীতির সফল বাস্তব রূপায়ণ কি কৃষিকে বাদ দিয়ে সম্ভব?

ভারতে শিল্পোন্নতি অবশ্যই দরকার—কিন্তু সে দরকার মেটাতে গিয়ে কৃষি উপেক্ষিত হলে অদূর ভবিষ্যতে বিপর্যয় অনিবার্য। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই তার ইঙ্গিত পাচ্ছেন বলে মনে হয়। এখন দেখা যাক, ইঙ্গিতটা কি পাচ্ছেন? প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতি হল। কিন্তু তাতে আমাদের চাষী-ভাইদের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? সরকারী পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে, ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় একান্ন ভাগ এসেছে চাষী-ভাইদের কাছ থেকে, ১৯৫৩-৫৪ সালে এসেছে শতকরা আরও কম মানে পঞ্চাশ ভাগ, ১৯৫৪-৫৫ সালে এসেছে আরও কম—শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ, ১৯৫৫-৫৬ সালে এসেছে তার চেয়ে কম—শতকরা তেতাল্লিশ ভাগ। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এদেশে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাষী-ভাইদের অবস্থার কি হারে অবনতি হতে শুরু করেছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কৃষিজাত জিনিসের মোট দাম ছিল চার হাজার আট শ নব্বই কোটি টাকা। সেটা ১৯৫৫-৫৬ সালে কমে দাঁড়িয়েছে চার হাজার দু শ কুড়ি কোটি টাকা। এই সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় আয়কর কমিটি। গত বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ভারতে শস্য ভাল জন্মায়নি। ধানের ফলন প্রায় আড়াই কোটি টন কম হয়েছে। আর তার মানে আমাদের চাষী-ভাইদের রোজগার আরও একশ' ছিয়াশী কোটি টাকা কম হয়েছে। চলতি বছরে আউস ধান ভাল হয়নি—বর্ষার যা অনিয়ম, তাতে আমন ধান কি রকম হবে বলা কঠিন—কাজেই চাষীদের অবস্থা এবার আরও শোচনীয় হতে পারে।

এখন আসল কথা হচ্ছে—ভারতের সবচেয়ে বড় শিল্পকে বাঁচাবার উপায় কি? সেই শিল্পে নিয়োজিত কোটি কোটি চাষী-ভাইদের রক্ষা করার কি উপায়? উপায় আছে মাত্র একটি—আর সেটি হল এদেশের উপযোগী ও বাস্তব কৃষি পরিকল্পনা তৈরী ও সেটা কাজে লাগানো। প্রথম পরিকল্পনা শেষ হয়েছে—দ্বিতীয় পরিকল্পনাও প্রায় অর্ধেক শেষ হল—এখন দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য যা পরিকল্পনা করা হয়েছে আর যাই হোক, সেগুলো এদেশের পক্ষে উপযোগী হয়নি। প্রথম পরিকল্পনায় এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য প্রায় তিনশ চুয়ান্ন কোটি টাকা খরচ হয়েছে—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হবে আরও বেশী—প্রায় পাঁচশ' আটষট্টি কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে গরিব চাষীর জন্য এই মোটা টাকার কতটুকু খরচ হয়েছে? প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ খরচ হয়েছে মাত্র একশ' সাতানব্বই কোটি টাকা—আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হবে আরও কম—মাত্র একশ' সত্তর কোটি টাকা। ভারতের লোক-সংখ্যা প্রায় ছত্রিশ কোটি—তার মধ্যে চাষীর সংখ্যা পঁচিশ কোটিরও বেশী। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পঁচিশ কোটির উন্নতির জন্য খরচ হচ্ছে একশ' সত্তর কোটি—মানে মাথা-পিছু মাত্র সাত টাকারও একটু কম। এটা যে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর সেটা বলাই বাহুল্য। এর ওপর জমির পরিমাণ হিসেব করলে খরচের পরিমাণ আরও হয়তো কমে যাবে। ভারতের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ যে কৃষিশিল্প তার উন্নতির পক্ষে এই খরচ সত্যিই কি কোন সুরাহা করবে?

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য আজকের পরিকল্পনা যে সন্তোষজনক হয়নি ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তা আজ স্বীকার করছেন। ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধানে সরকারী ব্যর্থতার ব্যাপারেই প্রধানমন্ত্রী ঐ উক্তি করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারতের কৃষির উন্নতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যে আর নেই এতদিনে তিনি সেই তিক্ত শিক্ষা পেয়েছেন। এই থেকেই ভারতের অর্থনীতিতে এদেশের চাষবাস আর চাষী-ভাইদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বোঝা যায় না কি?




এ গল্পের গোড়াতেই গল্প বলার রীতি বিগর্হিত কয়েকটা কথা বলে নিতে হবে আমায়।

যে গল্প আজ বলব, সে গল্প বলবার গল্প নয়। সে গল্প শুনাবার গল্প নয়। সে গল্প বুঝবার গল্প নয়।

সে গল্প, বনস্পতির শাখায় শাখায় পাতা ধরা—পাতা বাড়া—পাতা ঝরার মত, ঝরা পাতার মর্মর-ধ্বনির মত, অলক্ত রাগের মত, সবুজের মত, ধূসরের মত এক ভালবাসার গল্প।

• • •

ফুলের সঙ্গে যে এমন ভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি তা। বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে, মাঝারি ধরনের একটা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে এমনি মাঝরাত্রে যে এমন ভাবে ফুলের মুখোমুখি হব, তা কল্পনাও করিনি। পশ্চিমের একটা শহরে খেলতে যাচ্ছিলাম। দলের সবাই আগে আগে চলে গেছে। দলছাড়া হয়ে পড়েছি নিতান্ত জরুরী কাজের তাগিদে। যাচ্ছি একা একা। এই স্টেশনে গাড়ি পালটে আবার ধরতে হয় রাত তিনটেয় নতুন গাড়ি। ওয়েটিংরুমের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গলা পর্যন্ত টানা চাদরে ডুব দিয়ে স্পোর্টস্ এণ্ড প্যাস্টাইমের পাতা ওলটাচ্ছিলাম। এমন সময় রাত একটার ট্রেন থেকে নেমে একটি দম্পতি যখন ওয়েটিংরুমে এসে ঢুকল, চেয়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করতাম না, যদি না শুনতাম বাংলা কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "সেই ভোর রাত্রে ট্রেন। বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়া যাবে। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে আমার।"

তাকালাম। আর তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। আর মনের কোন সূক্ষ্ম তারে যেন মৃদু একটি ঘা পড়ল। যেন চিনি। যেন বড় বেশী করে চেনা।

ভদ্রমহিলাও তাকিয়ে রইলেন। কয়েক পলক। অস্ফুটে উচ্চারিত হল,—"রুণ্দা!"

চিনেছি। এ নামে যে ডাকত, সে একজনই। "ফুল!"

ফুল আবার বলল, "রুণ্দা!"

সঙ্গের পুরুষটি অবাক নয়নে একবার তাকালেন আমার দিকে, একবার ফুলের দিকে। তারপর বললেন, "আপনারা চেনেন নাকি দুজন দুজনকে?"

ফুল বলল, "রুণ্দাদের বাড়িতে আমরা ভাড়াটে ছিলাম বরাবর। তিন বছর আগে পর্যন্ত।"

ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন একটু। একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "বেশ। বেশ। তবে আর কি! উনিত রইলেনই সজাগ। আমি একটু গড়িয়ে নি।" আর একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন তিনি।

একটা চেয়ার আমার ইজিচেয়ারের সামনা-সামনি টেনে আনল ফুল। বসল। চুপ করে রইল একটু। তারপর বলল, "কেমন আছ রুণ্দা?"

বললাম, "ভাল।"

"মাসীমা?"

"এক রকম।"

"মেসোমশাই?"

"তিনি মারা গেছেন।"

খবরটা অপ্রত্যাশিত ফুলের কাছে। একটু আহত হল। দুঃখ পেল একটু। কি যেন বলল। চুপ করে রইল খানিক। আবার যেন কি বলল। আমি ফুলের কথা শুনছিলাম না। আমি ফুলকে দেখছিলাম। এ কোন ফুল? এ ফুলকে আমি চিনতাম না। আমি যে ফুলকে জানতাম, সে ছিল কিশোরী। তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতাম। খুনসুটি করতাম। টান মেরে খোঁপা খুলে দিতাম। খেলে-পাওয়া কাপ মেডেল আলমারিতে সাজিয়ে রেখে উপরি পাওয়া ফুলের তোড়া ওর লোভ চকচকে চোখের ওপর ছুঁড়ে মারতাম। এ ফুল আর-এক ফুল। এর মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। এ ফুল সুন্দর। কপালের প্রান্ত পর্যন্ত টানা ঘোমটা, ছোট্ট সুছাঁদ কপালের সিঁদুরের টিপে ওকে বড় মানিয়েছে।

ফুল কি যেন বলছিল। আমি শুনছিলাম না। আমি ওর কপালের সিঁদুরের টিপটার দিকে তাকিয়েছিলাম। ঐ টিপটার একটা প্রতিবিম্ব আমার মনের মধ্যে যেন দীপশিখার মত জ্বলে উঠল। তার আলোয় যেন অনেকখানি অন্ধকার কেটে গেল। আমি সহসা বুঝলাম, আমি ওকে ভালবাসতাম। তখন আমি জানতাম না। অথচ ওকে আমি ভালবাসতাম। আমার সে ভালবাসা নিঃসাড়ে এসেছিল।

চুপিচুপি সন্তর্পণে এসেছিল। নিঃশব্দ পায়ে এসে মনের শান্তির পাটিতে গা এলিয়ে দিয়ে নিষ্পন্দে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি টের পাইনি। জানিনি। আমি জানতে পারিনি। বুঝতে পারিনি। বুঝিনি। আমার ভালবাসাকে আমি অনুভব করিনি। এখন ওর সিঁদুরের টিপ যেন সোনার কাঠির ছোঁয়ার মত আমার ভালবাসার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সে জাগল। জেগে উঠে জানল। চিনল।

আর আমার বুকের মধ্যে যেন একটা জ্বালা অনুভব করলাম। তীব্র। তীক্ষ্ন শাণিত অস্ত্রের আঘাতের মত। সে জ্বালাও ফুলের ঐ সিঁদুরের টিপ সঞ্জাত। সে জ্বালা হতাশার। আত্মধিক্কারের। অপর ইজিচেয়ারে সুখে শায়িত সুপ্তিমগ্ন মানুষটার দিকে তাকালাম। ভরন্ত পুরো সুখী একটা মানুষের মুখ। নিভাবনার নিবিড় শান্তিতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের তালে উঠন্ত পড়ন্ত বুক। সহসা লোকটার ওপর দারুণ ঈর্ষা হল আমার। সহসা লোকটাকে অযাচিত অনাহূত মনে হল। ফুলের মুখের দিকে তাকালাম। ফুল সুন্দর। ফুল অনন্যা। ফুল আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতর বেদনার সমুদ্র মথিত হয়ে উঠল।

ফুল ডাকল, "রুণুদা।"

"ফুল।"

"কি ভাবছ?"

"কিছু না ত।"

ফুল কোনো কথা কইল না। আমি শুধোলাম, "কোথায় যাচ্ছ ফুল?"

"ও'র চাকরির জায়গায়।"

চুপ করে রইলাম। কথা কইলাম না। অনেকক্ষণ। কেউ কোনো কথা কইলাম না। চুপ করে রইলাম। মাথার ওপর সিলিংফ্যানটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে অস্বাভাবিক শব্দ তুলে তার কক্ষ পরিক্রম করতে লাগল। আলোটাকে কেন্দ্র করে কয়েকটা রাতপোকা বার বার ঘুরপাক খেতে লাগল। আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে ফুল ডাকল, "রুণুদা।"

"বল।"

"চল বাইরে যাই।"

"কোথায়?"

"এ ঘরের বাইরে। এখানে বড় গুমোট।"

ফুলের মুখের দিকে তাকালাম। ফুলের কপালে সিঁদুরের টিপটা জ্বলজ্বল করছে। কয়েকটি চূর্ণ অলক ফ্যানের হাওয়ায় ইতস্তত উড়ছে। তবু ফুলের কপালে চন্দনের ফোঁটার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বললাম, "চল।"

দুজনে ওয়েটিংরুমের বাইরে এলাম। প্ল্যাটফর্মে পা রাখলাম। নিঃঝুম স্টেশন। নির্জন। দূরে দূরে কয়েকটা আলো। স্যাঁতসেঁতে আলোয় ভিজে ভিজে স্টেশন। চোখ টান টান মেলে দু' দিকেই তাকালাম। অনের দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল নিষ্পলক চোখ। দু' জোড়া সমান্তরাল ইস্পাত লাইন সামনেই। অনেক লাইনের জটিল অরণ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দুজোড়া লাইন সমান্তরাল হয়ে ছুটে চলে গেছে অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকার। ডাইনে। বাঁয়ে। স্টেশন ছাড়িয়ে সামনে। অন্ধকারের অকূল অতল নদীর মধ্যে জেলে ডিঙির মত ছোট্ট মিটমিটে স্টেশন। সে ডিঙিতে শুধু আমরা দুজন। আমি আর ফুল। ফুল আর আমি। আমার বুকের মধ্যে আর একটা নদী। সে নদীতে আর একখানা ডিঙি। আমার ভালবাসা।

বার দুয়েক পায়চারি করলাম প্ল্যাটফর্মের এমাথা-ওমাথা। আমার পাশে পাশে ফুল। আমি অস্থির। ফুল শান্ত। টুকটাক কথা বলছে। আমি শুনছিনা। না শুনে সায় দিয়ে যাচ্ছি। মাথা নাড়ছি। এক সময় দাঁড়ালাম। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্ত যেখানে ঢালু হয়ে গড়িয়ে নেমেছে নীচে। সামনেই রাত্রি। স্টেশনকে পেছনে রেখে রাত্রির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। দুজনেই। রাত্রি। কামনা দীপ্ত নায়কের মত আবিষ্ট বলিষ্ঠ। আমি চুপ। ফুল চুপ। দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ফুল ডাকল, "রুণুদা।"

"ফুল।"

সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফুল বল, "দেখেছ। ওখানে কি অন্ধকার।"

"দেখেছি।"

"চল আমরা ওখানে যাই।"

"চল।"

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দুজনেই সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেলাম। আমাদের চারপাশে অন্ধকার। মাথার ওপরে অন্ধকার। অন্ধকারের ওপরে আকাশ। তারা ছিটোনো আকাশ।

ফুল ডাকল, "রুণুদা।"

"ফুল।"

"আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"এই ত আমি।"

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। যেন সময়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলাম। অন্ধকারের মত সময়। অন্ধকারের মত অনড়। স্তব্ধ। সময়ের

২

.র পা রেখে রেখে অনেকখানি হেঁটে গেলাম।

ফুল ডাকল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ রুণুদা ?"

"খেলতে।"

"তোমার জীবনের সবটাই খেলা রুণুদা ?"

চমকে উঠলাম। দাঁড়ালাম। ফুল দাঁড়াল। অন্ধকারে অন্ধকারে ফুলের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম।

"কিসের কথা বলছ ফুল ?"

অন্ধকার। ফুলকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার। আমার পেছনে অন্ধকার। অন্ধকার যেন আমাকে ঠেলে ধরেছে। ফুলের পেছনে অন্ধকার। ফুল যেন অন্ধকারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনার মাঝখানে অন্ধকার। অন্ধকার যেন ফুলের কপালের সিঁদুরটুকু মুছে নিয়েছে। ফুলের আবছা মুখখানা যেন অন্ধকারের কুঁড়ি থেকে ফুলের মত ফুটে উঠেছে।

শুধোলাম, "কিসের কথা বলছ ফুল ?"

"আমাকে তোমার ফুল ছুঁড়ে দেবার কথা।"

থরথর করে কেঁপে উঠলাম। রাত্রি কেঁপে উঠল। অন্ধকার কেঁপে উঠল। সময় কেঁপে উঠল। ফিসফিস করে বললাম, "না। না ফুল। খেলা নয়। সবটাই খেলা নয়।"

ফুল হাসল। একটু শব্দ হল। নৈঃশব্দের কণ্ঠাভরণের মত হাসিটুকু ঝকমকিয়ে উঠল।

"আমরা যেদিন তোমাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম, সে দিনও তুমি যেন কোথায় খেলতে গিয়েছিলে রুণুদা।"

"হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তখন আমি বুঝিনি ফুল। বুঝতে পারিনি।"

"আমিও তোমাকে জানাইনি রুণুদা। জানতে দিইনি।"

"কেন জানাওনি ফুল ? কেন বুঝতে দাওনি ?"

"আমার ভয় ছিল রুণুদা।"

"কিসের ভয় ?"

"ভয় ছিল হয়ত—যাক রুণুদা। সে ভয় আর নেই আমার।"

ফুল চুপ করল। চুপ করে রইল। আমি চুপ করে রইলাম। দুজনে চুপ করে করে কথা কইলাম। সময়ের কানে কানে কইলাম। অন্ধকারের বুকের ওপর কান পেতে রইলাম। শুনলাম। দুজন দুজনের দিকে তাকালাম। কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না। অন্ধকারের বুকের ওপর কান পেতে দুজন দুজনকার কথা শুনলাম।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা কইলাম না। শুনলাম। শুনলাম না। সময়ের কানে কানে কথা কইলাম। নিজের কথা নিজেই শুনলাম। নিজের কানে কানে নিজে কথা কইলাম। অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরেছে। অন্ধকার আমাদের দুই গোলার্ধ থেকে টেনে এনে সময়ের বিষুব রেখার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার আমাদের এক করে দিয়েছে। আমি অন্ধকার হয়ে গেছি। ফুল অন্ধকার হয়ে গেছে। দুজনে মিলে সময় হয়ে গেছি। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সময় দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের সাথে মিলে মিশে দাঁড়িয়ে আছি। রাত্রির বুদবুদের মধ্যে অন্ধকার হয়ে গিয়ে নিস্পন্দগতি সময়ের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি। ফুল আর আমি আর অন্ধকার আর সময়, সব এক হয়ে গিয়ে তৃষ্ণার তৃপ্তির মত রাত্রির নিটোল বৃন্তে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছি। দূরে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের লাল চোখ অন্ধকারের চোখের মত, সময়ের চোখের মত, আমাদের ভালবাসার মত নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে আছে।

"ফুল।"

"রঞ্জুদা।"

"তুমি......তুমি আমাকে ভালবাসতে ফুল?"

চুপ করে রইলাম। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। মনকে দুর্ভোগ করে দু কানের দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখলাম। আকাশের বিন্দু বিন্দু তারাগুলো নিস্পন্দ হয়ে আছে। তারাগুলো অনেক দূরের দূরের স্টেশন হয়ে গেছে। ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের লাল চোখ রাত্রির চোখের মত নিষ্পলক হয়ে আছে। রাত্রি চমকে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি ফুলের উত্তর শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

"বাসতাম।"

সহসা একটা রাত-পোকা ঝিঁ ঝিঁ করে উঠল। যেন নিস্তব্ধতার হৃদ-স্পন্দন শুনতে পেলাম। মস্তিস্কের শূন্যে প্রান্তরে কার যেন পদধ্বনি। কে যেন আসে। কে যেন আসে।

ফিসফিস করে ডাকলাম, "ফুল।"

ফিসফিস করে ফুল উত্তর দিল, "রঞ্জুদা।"

ফিসফিস করে শুধোলাম, "তুমি আমাকে ভালবাস ফুল?"

ফুল চুপ করে রইল। উদগ্রীব হয়ে রইলাম। মনকে চৈতন্যের মূলে কেন্দ্রায়িত করলাম। আকাশের তারাগুলো অপলক হয়ে আছে। দূরের স্টেশনটা বিন্দুর মত তারার মত হয়ে গেছে। ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের লাল চোখ অন্ধকারের চোখের মত পলকহীন হয়ে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের উত্তর শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

"বাসি।"

রাত-পোকাটা ডাকছে। অন্ধকারের হৃদ-স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আমার বুকের মধ্যে যেন কার পায়ের একজোড়া নূপুর বাজছে। কে যেন এসেছে। কে যেন পা রেখেছে।

নিজেই শুনতে পেলাম না, অথচ ডাকলাম।

বুঝি ফুল নিজেই শুনতে পেল না, উত্তর দিল।

নিজেই শুনতে পেলাম না, অথচ শুধোলাম—"তুমি আমাকে ভালবাসবে ফুল?"

আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। ফুল বলবার জন্য চুপ করে রইল। আমি শুনবার জন্য চুপ করে রইলাম। আমার চেতনাকে দীপশিখার মত নিবন্ত নিষ্কম্প করে রাখলাম। আকাশ গম্বুজের মত চারদিকে নেমে এসেছে। আলোর ফোঁটার মত তারা। আলোর ফোঁটার মত স্টেশন। তারা আর স্টেশন মিশে গেছে। তারার ভিড়ে স্টেশন হারিয়ে গেছে। ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের লাল চোখ সময়ের চোখের মত অপলক হয়ে আছে। সময় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের উত্তর শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

"বাসব।"

রাত পোকার বাজনা বাজছেই। সময়ের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছেই। আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্ত স্রোতের কলগান শুনতে পাচ্ছি। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবহমান কূল-প্লাবী ভালবাসার নদীর জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছি। আমি কান পেতে রাখলাম। আমি কান পেতে পেতে সেই সুর শুনলাম। সেই সুর শুনতে শুনতে আমি সুর হয়ে গেলাম। ফুল সুর হয়ে গেল। সম্ভোগ-তৃপ্তা নায়িকার মত রাত্রি, রাত্রির মত অন্ধকার, অন্ধকারের মত সময় সব এক-সঙ্গে সুর হয়ে বেজে উঠল।

রাত্রি, নৈঃশব্দ্য, অন্ধকার সময় সুরের মত বাজতে লাগল। বাজতেই লাগল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়েই রইলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি আর ফুল সেই সুর শুনলাম। সুরের মত বাজলাম। অন্ধকারের মত সুর আকাশ থেকে নেমে এসে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ফুল ডাকল, "রঞ্জুদা"।

"ফুল।"

"চল ফিরে যাই।"

"চল।"

আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। অন্ধকারে ডুব সাঁতার কেটে কেটে, সময়ের ওপর পায়ের চিহ্ন এ'কে এ'কে আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম।

গাড়ি এল। ঝাঁকড়া চুল বলিষ্ঠ একটা উচ্ছৃংখল মাতালের মত বিবসনা অন্ধকারকে গড়াতে গড়াতে গাড়ি এসে স্টেশনে পেশছুল। নির্জন স্টেশনে সহসা একটু কলরব জেগে উঠল। প্লাটফর্মে শুয়ে থাকা দুটো কুলি দাঁড়িয়ে উঠে হাই তুলতে লাগল। একটা চা-ওলা ঘুমচোখে ট্রেনের জানালায় জানালায় একবার 'চা-গ্রাম' হে'কে গিয়ে যেন কোনো অবশ্য-কর্তব্য-সম্পন্ন করল। জন কয়েক লোক নামল। কুলি বাহিত হয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে চলে গেল। কেউ উঠল না। এ গাড়িতে শুধু আমি উঠব। একা। স্টেশন আবার ঝিমিয়ে এল। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নিস্তরঙ্গ পুকুরে কে যেন ঢিল ছুঁড়েছিল। পুকুরটা আবার স্তিমিত হয়ে এল। স্তিমিত হয়ে হয়ে নিঢেউ হল।

একটা কুলি আমার হোল্ড অল আর বেডিং গাড়ির কামরায় তুলে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল। কামরার দরজার সামনে আমি আর ফুল দাঁড়িয়ে রইলাম। চুপ করে। না তাকিয়ে। স্টেশনের শেড আর আলোর আওতা পেরিয়ে এসে আমার কামরা। কামরার মধ্যে তীক্ষ্ম আলো। বাইরে আধো অন্ধকার। গাড়ির আলো জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়েছে। অন্ধকারের সমান সমান ফাঁক রেখে রেখে সার সার আলো প্ল্যাটফর্মের ওপর লুটিয়ে আছে। একটা উর্মি-চপল সমুদ্র যেন কোনও মন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঢং ঢং করে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। নিস্তব্ধ নিঃঝুম মাঝরাত্রের স্টেশন সে আওয়াজে ভংগুর কাচ-পাত্রের মত খানখান হয়ে গেল। সে আওয়াজে আমার সমস্ত অস্তিত্ব ঝন ঝন করে বেজে উঠল। সে আওয়াজ স্টেশনের বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। সে আওয়াজ বিরাট একটা মন্ত্র ঘোষণায় গমগম করে উঠল। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। ফুল হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ফুলের হাত ধরলাম। ফুল আমার হাত ধরল। দু'জন দু'জনকার হাত ধরলাম।

শুধোলাম, "তুমি আমাকে ভুলবে না ত ফুল?"

আমার হাতধরা ফুলের হাতখানা বাঁশ পাতার মত কে'পে উঠল।

"ভুলব না রুণুদা।"

ইঞ্জিনের তীক্ষ্ম হুইস্‌ল বেজে উঠল।

আমার অন্তরের গোপন কান্নাটা চীৎকার করে উঠল। সে কান্না বাতাসকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে গেল। আমার লুকোনো কান্না আকাশের তারায় তারায় সঞ্চারিত হল।

শুধোলাম, "তুমি আমাকে মনে রাখবে ত ফুল?"

ফুলের হাতধরা আমার হাতখানা থির-থির করে কেঁপে উঠল।

"রাখব রুণুদা।"

গাড়ি দুলে উঠল। স্টেশন নড়ে উঠল। গাড়ি নড়ে উঠল। ভুবন দুলে উঠল। স্টেশন, আকাশ, পৃথিবী নড়ে উঠল। সময় দুলে উঠল। এখন ও ফুলের হাত ধরে আছি। এক হাতে ফুলের হাত ধরে আছি। আর-হাতে গাড়ির রড ধরেছি। গাড়ির সাথে সাথে এগোচ্ছি। ফুল আমার সাথে সাথে এগোচ্ছে।

দুজনকার হাতধরা দুজনকার হাত থরথর করে কেঁপে উঠল।

ফুলের হাতখানা খসে গেল। আমার হাত থেকে ফুলের হাতখানা খসে গেল। গাড়ির গতি বাড়ছে। ফুল দূরে সরে যাচ্ছে। পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে ফুলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফুল দূরে সরে যাচ্ছে। গাড়ির গতি বাড়ছে। সময়ের গতি বাড়ছে। ফুল পিছে রয়ে যাচ্ছে। গাড়ির আলোয় অন্ধকারে ফুলের মুখ জ্বলছে নিভছে। একটা জোনাকির মত জ্বলতে জ্বলতে নিভতে নিভতে ফুল দূরে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ঢেউএর শিখর ছুঁয়ে নেমে, ঢেউএর ভাঁজ থেকে উঠে, ঢেউএর শিখর ছুঁয়ে নেমে ফুল সময়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূরে থেকে দূরে-দূরে-দূরে চলে যাচ্ছে।

মুখের ওপর ঝাপটা মেরে হাওয়া বইছে। হুহু করে হাওয়া বইছে। হাওয়া দুর্বার হয়ে বইছে। হাওয়ার পাখনায় ভর দিয়ে সময় উড়ে চলেছে, হাওয়ার স্রোতের মত সময় দুর্মদ গতিতে বইছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পায়ের তলা দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে, দুপাশ দিয়ে সময় বয়ে চলেছে। মেল ট্রেনের মত মধ্যপথের দেরি যেন পথের মধ্যেই সে পুষিয়ে নেবে।

আমি দেখলাম। স্পষ্ট দেখলাম, সেই স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ফুলকে নিয়ে ছোট্ট স্টেশনটা কাগজের নৌকোর মত দুর্বার গতিতে ভেসে চলেছে। ভেসেই চলেছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, বাতাসের কানে কানে বললাম, সময়ের কানে কানে বললাম, কাতর করুণ কণ্ঠে যেন বললাম, ফুলকে নিয়ে যেও না।

হুহু করে বাতাস বইল। শুনল না। বইতে লাগল। হিহি করে সময় হাসল। থামল না। হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে ছুটে চলল।

আর তখন আমার বুকের মধ্যে একটা চিৎকার শায়ক-বেঁধা পাখির মত ডানা ঝাপটাতে লাগল। একটা উন্মাদ মাথা কুটে কুটে সারা হতে লাগল। শিকল বাঁধা মত্ত-মাতংগ অধীর অস্থির বৃংহনে মুখরিত হল। বুকের মধ্যে তীব্র তীক্ষ্ম একটা জ্বালা অনুভব করলাম। যন্ত্রণা।

বাতাস হুহু করে বইল। সময় হিহি করে হাসল। বাতাস হুহু করে বয়ে, সময় হিহি করে হেসে ফিসফিসিয়ে কানে কানে বলে গেলঃ জান না। তুমি জান না। তুমি ফুলের কোনো ঠিকানাই জান না......।

# সদারং সংগীত সম্মেলন



### "ভৈরব"

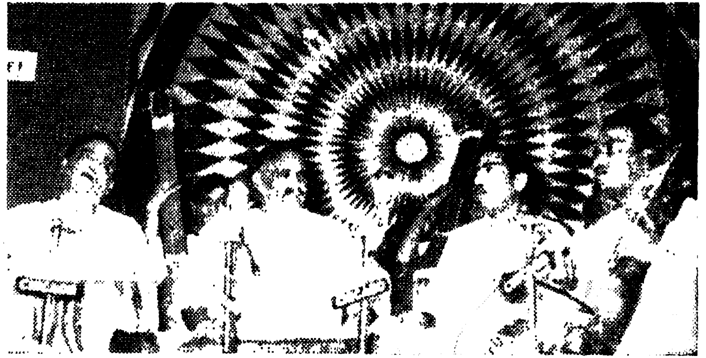
এ বছরের সদারং সংগীত সম্মেলন কলিকাতার হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে এক বিরাট মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাপর সংগীত সম্মেলনের সংগে এর পার্থক্য অনেক, কারণ প্রচলিত ধারা অনুযায়ী আসনের সংখ্যা এতে অনেক বেশি বৃদ্ধি করা যায়। ফলে অধিক সংখ্যক শ্রোতার স্থান সংকুলান সম্ভব এবং ফলে টিকিটের মূল্যও কমান চলে। কিন্তু অনুষ্ঠান অনেক সময়ে বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে যেন ঠিক জমে ওঠে না। সুরের প্রবাহ কেমন যেন খর্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, এ ধরনের মণ্ডপের প্রয়োগ সংগীত সম্মেলনের পক্ষে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দবীর খাঁর পূর্বাকল্যাণ রাগে ধ্রুপদ ও ধামার গানে। পাখোয়াজ সহযোগিতা করেন শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। সেনী ঘরানার মুখপাত্র হিসেবে দবীর খাঁর প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু তাঁর গানে গায়কির বিশেষ অভাব থাকাতে মুগ্ধ হতে পারিনি। শ্রোতৃবর্গের সমবেত অতৃপ্তি লক্ষ্য করেই বোধ হয় তিনি অল্পক্ষণের জন্য গান করেন।

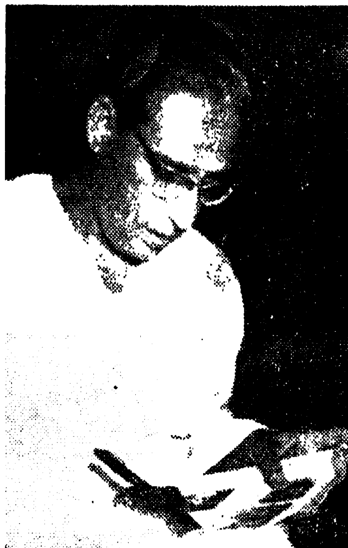
এর পর আসেন আব্দুল হালিম জাফর খাঁ। তিনি সেতারে সিংহেন্দ্রমধ্যম ও কাফি রাগ পরিবেশন করেন। প্রথম রাগটি দক্ষিণ ভারতীয় হলেও স্বরবিন্যাসের মধ্যে যন্ত্রসংগীতে ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু তাঁর আলাপের মধ্যে পারিপাট্য থাকলেও চমক বা প্রাণের অভাব লক্ষ্য করলাম। স্বর প্রয়োগের ক্ষীণ ধারা যেন রাগরূপায়ণের সম্পূর্ণ পরিপোষক নয়। আমার মনে হয়, তিনি উত্তর ভারতীয় কোনও রাগ নির্বাচন করলে ভালো করতেন। কারণ বন্দে আলী খাঁর ঘরানা যার বাদন পদ্ধতি তিনি মেহবুব খাঁর কাছে শিক্ষা করেছেন তার পূর্ণ রূপায়ণ দক্ষিণ ভারতীয় রাগে সম্ভব নয়। কাফি রাগের গৎ বাদনে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। অনেক যন্ত্রীর আজকাল দক্ষিণ ভারতীয় রাগের উপর আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তালিমের বাইরে কিছু বাজাতে গেলেই ঘরানার বৈশিষ্ট্য স্তিমিত হয়ে পড়বে। সেতার বাজনার সংগে তবলায় সহযোগিতা করতে গিয়ে পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ সর্বক্ষণ এত প্রাবল্যের অবতারণা করলেন যে, সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য শ্রোতার কানে ধরাই পড়ল না।

প্রথম আসরের বাজনার তুলনায় আব্দুল হালিম জাফর খাঁর নবম আসরের বাজনা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। শ্রীকানাই দত্ত তবলায় সহযোগিতা করেন। আব্দুল হালিম এ আসরে ঘরোয়া ও পাহাড়ি পরিবেশন করেন। সূক্ষ্ম কারুকার্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর বাজনায় আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে গুরু প্রকৃতির টোকা না হলে সেতার বাজনা তেমন জমে না। মীড় গমকের কাজের প্রতি তাঁর এখন অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ঘরোয়া বাদনে তাঁর যে দক্ষতা লক্ষ্য করা গেছে তা এ কাজ সমাধানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, কারণ পূরিয়া রাগের সংগে এ রাগটির যে পার্থক্য তা তিনি যথাযথভাবেই রক্ষা করে গেছেন। পাহাড়ি হাল্কা ধরনের রাগ, তাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথম আসরের তৃতীয় এবং সর্বশেষ শিল্পী শ্রীমতী মানিক বর্মা। তিনি স্বর্গীয় সুরেশবাবু মানের ছাত্রী এবং এ হিসেবে তিনি কিরানা গীতরীতির শিল্পী। পরবর্তিকালে অবশ্য তিনি অপরাপর সুরে গান শিখেছেন, কিন্তু তার ফলে কিরানার রসসম্পদ খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। প্রথম আসরে তাঁর মারু বেহাগের খেয়াল গানে আলাপের গভীরত্ব তেমন প্রকাশ পায়নি। তান পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত যেন তিনি বিভ্রান্তির অতলে ছিলেন। তান শুরু করার পর যেন আত্মচেতনা ফিরে আসে এবং তারপর তাঁর গানে বিমোহিত হওয়ার মত রসসম্পদ প্রকাশ পায়। এই আসরে তিনি একটি ঠুমরীও গেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও তানের প্রাচুর্য থাকাতে ঠুমরীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি নিজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।



কেরামত খাঁ, গোলাম আলী, মুনেওয়ার খাঁ, সাগীরুদ্দীন



ওস্তাদ আমীর খাঁ

শ্রীমতী মানিক বর্মা দ্বিতীয়বার গান করেন সপ্তম অধিবেশনে। সকালের এই আসরে তিনি যখন গান করতে বসলেন তখন ২০০ শ্রোতা ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী ইনরাৎ খাঁর যন্ত্রসংগীত শোনার পর প্রেক্ষাগৃহ প্রায় শূন্যই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতী বর্মার গানে কোনও বৈলক্ষণ দেখা যায়নি। প্রথম অনুষ্ঠান অপেক্ষা তিনি দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে ভাল গান করেছিলেন। তিনি গেয়েছিলেন মধুমতীর খেয়াল, ঠুমরী ও ভজন। দরদী মনের পরিচয় এবার প্রস্ফুটিত হয়েছিল আলাপে এবং বিচিত্র বোলবিস্তারে।



**কুমারী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে এক শিশু প্রতিভার সন্ধান পেলাম। নাম, আমজাদ আলী খাঁ; বয়স, বারো; পরিচয়, ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর পুত্র। পিতার সরোদ বাদনের কৃতিত্ব যে পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে তার পরিচয় পেলাম সরোদে গুর্জরী টোড়ি ও ভৈরবী বাদনে। আলাপ বা রাগের অন্তর্স্থিত ভাবধারা বিকাশের বয়স তাঁর হয়নি, কিন্তু টিপ্ এবং লয়ের কাজে অদ্ভুত দক্ষতা লক্ষ্য করলাম। তবলায় ছিলেন কেরামৎ খাঁ। তিনি নিজেও এই বালকের লয়ের দক্ষতা দেখে বাজনার তারিফ করছিলেন।

এ ধরনের শিশুপ্রতিভার সন্ধান পেলে আনন্দ হয় এইজন্য যে, আমাদের সংগীত এদের মাধ্যমেই বেঁচে থাকবে। কিন্তু সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে দেখেছি, শিশুপ্রতিভা নির্বাচনে তাঁরা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেন এবং সেইজন্য প্রতিভার বদলে প্রচার প্রচেষ্টাই বেশি প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীমতী কালিন্দী কেশকারের গৌড় সারং রাগের খেয়াল গানে পরিচ্ছন্ন গায়কির সন্ধান পাওয়া গেল। আলাপের বিশিষ্ট ভঙ্গি তিনি রে গা রে মা গা স্বরগুচ্ছকে আশ্রয় করে যথেষ্ট ধীরভাবে প্রকাশ করেন। পুনা ঘরানার শিল্পী হয়ে তাঁর এ রাগরূপ বর্ণনের দক্ষতা ভবিষ্যতে হয়তো তাঁকে আও উর্ধ্বে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর তানকর্তবের মধ্যে প্রাঞ্জলতার অভাব দেখলাম। তানগুলিকে শুধু সাপট্ পর্যায়ভুক্ত না রেখে যদি আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করবার দিকে তিনি মন দেন তাহলে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরও উন্নতি করতে পারবেন। খেয়াল গান করবার পর শ্রীমতী কেশকার "ঠুমক চলত রামচন্দ্র" এবং "নয়ননমে নন্দলাল" ভজন দুটি অতি সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন। এ দুখানি গানই তিনি স্বর্গীয় ডি ভি পালুশকরের কাছ থেকে সম্ভবত শিক্ষা করেছেন। কারণ গায়কির মধ্যে একইরকম ধারা লক্ষ্য করলাম।

দ্বিতীয় আসরের সর্বশেষ শিল্পী ইশ্তিয়াক আমেদ খাঁ। সরোদের আসরে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। ঘরানা সূত্রে সংগীত শিক্ষা করেই তিনি সংগীত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বনামধন্য সরোদী কেরামতুল্লা খাঁর তিনি সুযোগ্য পুত্র। কিন্তু অতি অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে ইশ্তিয়াক আমেদ পিতারই একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিষ্য সফিউল্লা খাঁর কাছে যন্ত্র-সংগীত শিক্ষা করেন। উক্ত আসরে তিনি যোগিয়া-কালেংড়া রাগে সরোদ বাজান। নি রে সা-র মাধ্যমে রাগরূপ বর্ণনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সত্যই সুন্দর মনে হয়েছিল। আলাপের গভীরত্ব তাঁর বাজনায় পাওয়া যায়। চমকের চাইতে শৃঙ্খলার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি এবং তা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন কেরামত খাঁ। সঙ্গতের যথাযোগ্য ধারার মধ্যেই তিনি নিজ কৃতিত্ব নিবদ্ধ রেখে-ছিলেন। ইশ্তিয়াক আমেদ সর্বশেষ একটি ভৈরবীর গৎ বাজিয়ে আসর শেষ করেন।

ইশ্তিয়াক আমেদ আবার সরোদ পরি-বেশন করেন চতুর্থ অধিবেশনে। এবারে তিনি দেশ রাগে আলাপ ও গৎ বাজান এবং তারপর মিশ্র কাফির একটি গৎ বাজিয়ে শেষ করেন। এ অধিবেশনের বাজনা প্রবল তবলা তরঙ্গের মধ্যে যেন ডুবে যায়। তবলা বাজান থেরকোয়ার এক শিষ্য প্রেমবল্লভ। সাথসঙ্গতের ধারা তিনি একেবারেই মেনে চলেননি। ফলে সরোদ বাজনার [illegible] শ্রোতারা তবলা লহড়াই শুনেছেন। মাইক্রোফোন যন্ত্রটিও যথাযথভাবে স্থাপন না করার দরুণ প্রবল তবলা ধ্বনির মধ্যে সরোদের সূক্ষ্ম কারুকার্য যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। অনুষ্ঠান পরিচালকদের উদাসীনতার জন্য এভাবে বহু সংগীতের যে অপমৃত্যু হয় তার নজীর পেলাম। আশা করি, সংগীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি নজর দেবেন।

তৃতীয় অধিবেশনের গোড়াতেই শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর কথক নৃত্য শেষ পর্যন্ত তবলা লহড়ায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবলায় ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ এবং সারেংগীতে সহযোগিতা করেছিলেন পণ্ডিত রামনাথ মিশ্র। অনেক সময় তবলার প্রবল স্রোতের সামনে নৃত্যশিল্পীকে স্তম্ভিত

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। মঞ্জুশ্রীর মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর আছে তবে লয়ের কাজে তাঁর আরো বেশী অনুশীলনের প্রয়োজন। কথক নাচের প্রকৃতিগত ছন্দ ও লয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিলে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব নয় এবং এই বিষয়টির প্রতি শিল্পীর অধিক নজর যথার্থই প্রয়োজন।

এরপর গৌড়মল্লার রাগে খেয়াল গান করেন শ্রীসচীন দাস। জোয়ারিদার গলার জন্য তাঁর সুখ্যাতি আছে এবং তার সংগে আগ্রা গায়কির কিছুটা অংশ সংযুক্ত হওয়াতে তাঁর গানের উপর অনেকের আস্থা আছে। কিন্তু কণ্ঠের পাল্লা তাঁর বিশেষ নেই, অল্প ব্যাপ্তির মধ্যে তিনি সংগীতের কাঠামো নিবদ্ধ রাখেন। পূর্ণ রসানুভূতির ক্ষেত্রে এ ধরনের সুরের অল্প বিস্তৃতি সব সময়ে বিশেষ কার্যকরী হয় বলে মনে হয় না। কিন্তু তবু তাঁর ঘন বিন্যাসযুক্ত রেগারেমাপা শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছে। তারপর তিনি দুটি ঠুংরী পরিবেশন করেন। প্রথম ঠুংরীটি পূর্বী প্রকৃতির এবং ভাবপ্রবণ। বোল—যাও মোরি বাইয়াঁ না মরোরো গিরিধারী। দ্বিতীয় ঠুংরীটি ছন্দ প্রধান। বোল—না মানুঙ্গি না মানুঙ্গি। সারগামের বৈচিত্র্য পরিবেশন করতে গিয়ে গায়ক অনেক সময় অভিনবত্বের অবতারণা করতে গেছেন, কিন্তু তা ভারতীয় সংগীতের অংগীভূত করা যায় কিনা সন্দেহ। এ ধরনের বাহ্যিক চটক ঠুংরী গানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে কিনা গায়ক বিবেচনা করে দেখবেন।

এবারে হাফিজ আলী খাঁর সরোদ বাজনা শুনে শ্রোতৃবর্গ তৃপ্ত হতে পারেন নি। এই অধিবেশনে তিনি এক একটি রাগ এত অল্প সময় বাজান যে, যন্ত্রসংগীতের পূর্ণ স্বাদ তা থেকে পাওয়া যায়নি। প্রথমে তিনি শুরু করলেন জয়েৎ কল্যাণ দিয়ে, তারপর একটু একটু বাজালেন গুনকেলী কল্যাণ, মিয়া মল্লার এবং সর্বশেষ পিলু। সামান্য গৎ বাজিয়েছেন মিয়া মল্লারে এবং পিলুতে। কোনটিতেই তাঁর পূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়নি, যদিও তাঁর টিপের মাধুর্য ঠিক আগের মতোই আছে। ঘন ঘন রাগ পরিবর্তনের ফলে শ্রোতার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

চতুর্থ আসরের সর্বশেষ শিল্পী আমীর খাঁ। ধ্যানগম্ভীর খেয়াল গান পরিবেশনে তাঁর প্রতিষ্ঠা বহুদিনের। বংশগত সংগীতের ধারা অব্যাহত রেখে নিজ কৃতিত্বের ভিত্তিতে তিনি তাকে আরও জাঁকিয়ে তুলেছেন, চমক দিয়ে নয়, গাম্ভীর্য দিয়ে। আত্মকেন্দ্রিক অবস্থার পরিবেশে সংগীত পরিবেশন তাঁর ক্ষেত্রে যতটা লক্ষ্য করা যায় ততটা আর কারও ক্ষেত্রে নয়। এই আসরে তিনি প্রথমে



রাগিণী ও পদ্মিনী

দরবারী কানাড়া ও পরে হংসধ্বনি রাগের খেয়াল পরিবেশন করেন। প্রথম রাগের আলাপে কোমল ধৈবতের আবর্তন যেন দূরের মেঘ গর্জনের সামিল। তারপর কোমল গান্ধারের আন্দোলন যেন তারই প্রতিধ্বনি। হংসধ্বনি সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয় রাগ। ঘরানাসূত্রে তিনি তা পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। তালিমের বহির্ভূত সংগীত পরিবেশনে পাণ্ডিত্য হয়তো জাহির হতে পারে, কিন্তু তার সংগে অন্তরের যোগ থাকে না।

পঞ্চম অধিবেশনের প্রথমে শ্রীমতী সোম তেওয়ারীর পূরিয়া-কল্যাণ রাগে খেয়াল গান শুনে স্কুলে সংগীত শিক্ষার কথা মনে হয়েছে—যেন কতক প্রাণহীন শুষ্ক স্বরের সমষ্টি। তারপর শ্রীমতী বন্দনা সেনের কথক নাচে লয়ের খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু ঘন ঘন মাইক্রোফোনে এসে ঘোষণা করার দিকে বেশি ঝোঁক থাকার জন্য নাচের "কন্টিনিউটি" ব্যাহত হয়েছে। এত বক্তব্য বিষয় নিয়ে নাচের অবতারণা না করে পৃথকভাবে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেই ভালো হত। তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

এই আসরের সর্বশেষ শিল্পী ছিলেন বড়ে গোলাম আলী খাঁ। মালকোষ রাগে তিনি খেয়াল গান করেন। গানের প্রথমে পৃথকভাবে আলাপের অবতারণা করা তিনি তেমন পছন্দ করেন না। সোজাসুজি বিলম্বিত গান শুরু করে তারই মধ্যে আলাপ, বিস্তার প্রয়োগ করা তিনি বেশি পছন্দ করেন। এইজন্য গানের প্রথম থেকেই ছন্দ ও সুরের একটা অংগাংগী সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এই আসরে তিনি ঝাপতাল, এক-তাল ও ত্রিতালের মাধ্যমে খেয়াল গান পরিবেশন করেন। মালকোষ রাগের সুমহান রূপ, গাম্ভীর্য ও সুরের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ ঝলকের মত তিনি যেভাবে সোম প্রয়োগ করেন তা তাঁর গায়কির প্রাণসম্পদ বলা যায়। মালকোষের পর আড়ানা রাগের মনোমুগ্ধকর গতিভংগী সকলকে মুগ্ধ করে। আশ্চর্যের বিষয়, এই আসরে তিনি মাত্র একটি ঠুংরী (পাঞ্জাবী অংগের) গেয়ে আসর সমাধান করেন,



বিলায়েৎ খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, ইমরাৎ খাঁ

সাধারণত যা হয় না। সারেঙ্গী ও তবলা সহযোগিতায় যথাক্রমে গোলাম সবীর খাঁ ও কেরামত খাঁ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বড়ে গোলাম আবার গান করেন শেষ আসরে। এবার তিনি গান চাঁদনী-কেদারা, দেশ ও সুরঠ এবং তাঁর জনপ্রিয় ঠুমরী "আয়েনা বালম"। সুরের তীক্ষ্ণতা এবং ঝলক যেন মনে হল ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। সোম প্রয়োগের সে অপরূপ ভঙ্গী যেন এসেও আসছে না। মনের অবস্থা ঠিক না থাকলে শিল্পীর এ ধরনের প্রাণহীন পরিবেশন একাধিকবার লক্ষ্য করেছি। বড়ে গোলাম আলীর ক্ষেত্রে হয়তো তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই দুই আসরেই পিতার সঙ্গে মুনওয়ার খাঁর গান যথেষ্ট পরিমার্জিত মনে হয়েছে। গত বৎসরের তুলনায় তাঁর উন্নতি বেশ অনুভব করা যায়।

সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্যের জনপ্রিয়তা যে কত তার সন্ধান পেলাম ষষ্ঠ অধিবেশনে। পদ্মিনী, রাগিনী ও সম্প্রদায় এ-অধিবেশনে বিভিন্ন পর্যায়ের নৃত্য পরিবেশন করেন। ত্রিবাঙ্কুরের এই নৃত্য সম্প্রদায় ইতিপূর্বে সারা ভারতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কলকাতার এই আসরে এত জনসমাগম হয়েছিল যে, শৃঙ্খলা রক্ষার কোনো চেষ্টাই কার্যকরী হয়নি। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের স্থান নির্দিষ্ট থাকলেও সেখানে অসাংবাদিকদের বসতে দেখেছি। নাচের মধ্যে বিচিত্র সমাবেশ ছিল, ভারতনাট্যম, কথাকলি এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য নৃত্য। "নাদম্ আদিনার" নৃত্যটির মধ্যে রসবস্তুর সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। শিবতাণ্ডব বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এ নৃত্যটি রূপায়িত করা হয়েছে। ভারতনাট্যম আঙ্গিকের মধ্যে একক ও সমবেত মুদ্রার মাধ্যমে বিষয়বস্তু পরিস্ফুট আকার ধারণ করে। গ্রাম্য নৃত্যের মধ্যে এক জেলে ও জেলেনির জীবনকে কেন্দ্র করে যে নৃত্যটি পরিবেশিত হয় তাতে আঙ্গিকের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী অতি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। সজীবতা ও নৃত্যপরিকল্পনার এ-দুটি নাচ দর্শকদের মনে আশা করি স্থায়ী স্থান লাভ করবে।

নৃত্যের পূর্বে শ্রীমতী জয়শ্রী সাহা সেতারে দেশ রাগে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, কিন্তু দ্রুত শ্রেণীর কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ বলা চলে। আলাপের গভীরত্ব ও অনুভূতির দিকে শিল্পীর এখন অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সপ্তম প্রাতঃকালীন অধিবেশনে বড়ে গোলাম আলী খাঁর পুত্র মুনওয়ার খাঁর তোড়ির খেয়াল গানে ও ভৈরবী ঠুমরী গানে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ব্যবহারিক পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পী যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

এর পর ইমারৎ খাঁ সেতার বাদনে প্রকৃত শিল্পীর পরিচয় দেন। শুদ্ধ সারং রাগের দুই মধ্যম তিনি অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করেন। লয়ের কাজে তিনি বহু নূতনত্বের সন্ধান দেন এবং তা যথাযথভাবে তবলার বোলে রূপায়িত করেন স্বনামধন্য কেরামত খাঁ। তিনি সর্বশেষ একটি পিলুর গৎ বাজান।

উপরোক্ত দুই শিল্পীর পূর্বে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বীণায় বাহাদুরী তোড়ি ও ভৈরবী পরিবেশন করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রী রায় চৌধুরীর স্থান অনস্বীকার্য, কিন্তু ব্যবহারিক কৃতিত্বের পর্যায়ে তাঁকে খুব উন্নত পর্যায়ে ধরা যায় না।

অষ্টম আসরের প্রথমে শ্রীমতী অনুরাধা গুহের কথক নৃত্য মামুলি। সুচারু ভঙ্গী থাকলেও কথকের সজীবতা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট নেই বলেই মনে হয়। এর পর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মালা-গৌরী রাগে খেয়াল ও একটি ভজন গান করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মনে করেছিলাম যে, গান হয়তো তেমন জমবে না। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখলাম ঠিক তার উল্টো। এখনও সুরের তীক্ষ্ণতা, খাদ ও চড়ার পরিব্যাপ্তি এবং তান ও খটকার প্রবল ধারা তাঁর সঙ্গীতকে অবিকৃত রেখেছে।

এ আসরের সর্বশেষ শিল্পী স্বনামধন্য বিলায়েৎ খাঁ। তিনি প্রথমে মিয়া মল্লার রাগে আলাপ করেন। দুই নিখাদের বলয়িত বিন্যাস তাঁর অঙ্গুলি স্পর্শে যেন সজীব হয়ে ওঠে। তারপর তিনি কানাড়া শ্রেণীর সুহা, সুঘরাই, আড়ানা ও সাহানার গৎ পরিবেশন করেন। এই বাজনায় গায়কির ধারা প্রকাশ পায় এবং এই বিষয়টির প্রতি বিলায়েৎ খাঁর দৃষ্টি সর্বাধিক। তন্ত্র অঙ্গের বাজনার চাইতে গায়কি অঙ্গের বাজনাই তাঁর ভালো লাগে এবং সেই পথেই তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছেন। সেতারে গতানুগতিক ধারার বদলে তিনি যে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন তার পিছনে সঙ্গীতের পূর্ণ অনুভূতি ও ব্যবহারিক পরিবেশন পদ্ধতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি তাঁর আছে বলেই একাজে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বিলায়েৎ খাঁ সর্বশেষ অধিবেশনে সেতারে যে অদ্ভুত দক্ষতা, মেজাজ ও আঙ্গিকের পরিচয় দেন তার তুলনা হয় না। এ আসরে তিনি প্রথমে জয়জয়ন্তী ও পরে শঙ্করা রাগ পরিবেশন করেন। দুই গান্ধারের অপূর্ব বিন্যাস জয়জয়ন্তীর প্রধান রসবস্তু, তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সা ধা নি রে যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফুটে ওঠে। শঙ্করায় তিনি শুধু গৎ বাজান এবং অদ্ভুত ধরনের তান ও হলকের অবতারণা করেন। উগ্র প্রকৃতির রাগের ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। খুব প্রবল আকারের প্রকাশ-ভঙ্গী না হলে শঙ্করা জমে না। বিলায়েৎ খাঁ এ বিষয়ে মনে হয় তাঁর পূর্বতন ক্ষমতাকেও অতিক্রম করে গেছেন। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি তারপর একটি পাঞ্জাবী অঙ্গের ঠুমরী ও ভাটিয়ালী পরিবেশন করেন।

# আজাদ আলজিরিয়া সরকার

**যোগনাথ মুখোপাধ্যায়**

ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তেই আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রামীরা আজাদ আলজিরিয়া সরকার গঠন করেছেন। যে গণভোটের প্রহসন করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আরও কিছুকাল আলজিরিয়াকে কুক্ষিগত করে রাখার ষড়যন্ত্র করেছেন, আজাদ আলজিরিয়া সরকার গঠনই হয়েছে তার সঠিক ও সময়োচিত প্রত্যুত্তর। সেইজন্যে গঠিত হওয়ার প্রায় সংগে সংগেই এই সরকারটি বিশ্বে বিভিন্ন কূটনৈতিক মহলে এমন আশাতীতভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে। ইরাক, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, মরক্কো, টিউনিস প্রমুখ আরব দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এই সরকারটিকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে সর্বউপায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং অবস্থা বিচারে মনে হয় যে, অনতিবিলম্বেই হয়ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার অনুগত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এই সরকারকে স্বীকার করে নেবে। কারণ ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট চীনের রাষ্ট্রপতি মাও সে তুঙ আজাদ আলজিরিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব আব্বাসকে স্বীকৃতিসূচক অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করে তাতে আশা প্রকাশ করেছেন, আলজিরিয়ার জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম নিত্য নূতন সাফল্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অচিরেই সমগ্র আলজিরিয়ার মুক্তিসাধনে সমর্থ হবে।

অপরপক্ষে বৃটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির সরকার প্রকাশ্যে এই নবগঠিত সরকারটিকে স্বীকৃতি জানাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতির আশা কারও কোন সময়েই ছিল না, সে কারণে তাদের প্রত্যাখ্যানেও বিস্মিত বা নিরাশ হয়নি কেউ। কিন্তু তবুও এই অস্বীকৃতির মধ্যে তারা এইটুকু অন্তত আশার কারণ খুঁজে পাবে যে, আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের আজাদী সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকে পশ্চিমী শক্তিজোট লঘু বা উপেক্ষণীয়, ব্যাপার বলে মনে করতে পারেনি। সুতরাং একথা ভাবলে ভুল করা হবে না যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রকাশ্য অস্বীকৃতি আলজিরিয়ার আজাদী সৈনিকদের আরও বেশি সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দেবে।

এই ত গেল অস্বীকারকারী পক্ষের পরোক্ষ সাহায্যের কথা। এখন ইতিহাস ও অন্তর্জাতিক আইনের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করে দেখা যাক, স্বীকৃতিদানকারী



আজাদ-আলজিরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফেরহাত আব্বাস

রাষ্ট্রগুলি অন্তর্জাতিক আইনের সীমারেখা লঙ্ঘন না করেও কিভাবে প্রকাশ্যে আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করতে পারে। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, আজাদ আলজিরিয়া সরকারের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তারা যদি এখন থেকে প্রকাশ্যে তাকে অর্থ অস্ত্র এমন কি 'স্বেচ্ছাসৈনিক' দিয়েও সাহায্য করে তাতে কোন রাষ্ট্রই আপত্তি করতে পারবে না। কারণ একটি সরকারের সংগে আর একটি সরকারের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃত সার্বভৌম অধিকারগুলির অন্যতম। এবং যখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক এলাকার ওপর সার্বভৌম অধিকার দাবী করে, তখন তার মধ্যে কোন সরকারটিকে অন্যান্য রাষ্ট্র সেই এলাকার প্রকৃত সরকার বলে স্বীকার করবে সেটাও অন্যান্য রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। যেমন ভারত চীনের সরকাররূপে স্বীকৃতি জানিয়েছে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট সরকারকে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি জানিয়েছে চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে গঠিত কুওমিংটাং সরকারকে। এবং উভয় সরকারের সংগেই সেই সরকারের স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্ররা নানা রকমে আর্থিক, বাণিজ্যিক এমনকি সামরিক চুক্তিতেও আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে কারও কোন আন্তর্জাতিক আইনগত আপত্তি থাকতে পারে না।

সম্প্রতিকালের আরও একটি ঘটনার উল্লেখ এই প্রসংগে করা যেতে পারে। সেটা হল ফরাসী সাম্রাজ্যের আর একটি প্রাক্তন উপনিবেশ ভিয়েৎনামের বিদ্রোহ। ডাঃ হো চি মীনের নেতৃত্বে সেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা যখন একটা পাল্টা সরকার গঠন করেন, তখন সোভিয়েট রাশিয়া সেই সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাকে নানাভাবে সাহায্য প্রেরণ করে। এতে ফ্রান্স একবারও এই বলে আপত্তি জানাতে পারেনি যে ভিয়েৎনামের অধিবাসীদের সংগে তার বিরোধ 'ঘরোয়া বিরোধ', অতএব রাশিয়া তার মধ্যে অনধিকারভাবে প্রবেশ করেছে।

এবার উল্লেখ করছি ফ্রান্সের নিজেরই রাষ্ট্রজীবনের একটি অতীত ঘটনা, যাকে আজও সে তার আন্তর্জাতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে দাবী করতে পারে। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার উপ-নিবেশিকরা যখন মাতৃরাষ্ট্র ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল আক্রমণে বিপর্যস্ত ও প্রায় পরাজিত উপনিবেশিকদের প্রতিষ্ঠিত সেই সরকারকে সর্বপ্রথম সরকার-রূপে স্বীকৃতি জানায় ফ্রান্স। আর শুধু স্বীকৃতি জানিয়েই সেদিন সে তার কর্তব্য শেষ করেনি। জর্জ ওয়াশিংটনের পাশে দাঁড়িয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে সে লা' ফায়েতের নেতৃত্বে প্রেরণ করে এক বিশাল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী। তাছাড়াও আটলাণ্টিক মহা-সাগরে ইংরাজদের সৈন্য ও রসদ বোঝাই জাহাজগুলিকে আটক করার জন্যে হল্যাণ্ডের সহযোগিতায় সে প্রেরণ করে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ফ্রান্স যদি সেদিন তার সমগ্র শক্তি নিয়ে আমেরিকার আজাদী সরকারের পাশে এসে না দাঁড়াত তা হলে কিছুতেই সফল হত না তাদের মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং আজ সেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আলজিরিয়ার লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের সমর্থনপুষ্ট আজাদ আলজিরিয়া সরকারকে কেউ যদি ফ্রান্স প্রদর্শিত পথেই সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করে, তাহলে কোন যুক্তি দেখিয়ে ফ্রান্স তার বিরোধিতা করবে?

অবশ্য তবুও ফ্রান্স বিরোধিতা করেছে, এবং তা সে করেছে এই যুক্তিতে যে এই জাতীয় আজাদী সরকার গঠনের সার্থকতা কেবল যুদ্ধকালেই থাকতে পারে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রান্স যখন শত্রু কবলিত হয় তখন তার বর্তমান ভাগ্য-নিয়ন্তাই শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখার জন্যে আলজিরিয়ায় বসে গঠন করে-ছিলেন 'ফ্রি ফ্রান্স' এবং সেই সরকারই তখন মিত্রপক্ষের সকল রাষ্ট্রের কাছে ফ্রান্সের সরকাররূপে স্বীকৃতিলাভ করে-ছিল। ঠিক এমনিভাবেই সেদিন হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির উদ্বাস্তু সরকার দীর্ঘকাল নির্বাসিত অবস্থায় বাস করেছিল গ্রেটবৃটেনে। যুদ্ধের সময় বিশেষ অবস্থার চাপে সাময়িকভাবে যে ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যেতে পারে, শান্তির সময় সে ব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থিত হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূখণ্ড বা জনসমাজের মত সরকারেরও সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

আন্তর্জাতিক আইনে একজন নিরপেক্ষ ছাত্র যদি অন্য কোন রাজনীতিক বা পারি-পার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা না করে এক্ষেত্রে ফ্রান্সের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ

করতে বসেন তাহলে তিনি তার মধ্যে নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য অনেক কথা খুঁজে পাবেন। তিনি বলবেন, যুদ্ধের সময় অস্ত্রশক্তিতে প্রবলতর শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে অনেক সময় অনেক রাষ্ট্রের সরকারকেই পিছু হঠতে হয় এবং প্রয়োজন হলে দেশত্যাগ করেও শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিঃ চার্চিল বলেছিলেন, যদি জার্মানীর বোমাবর্ষণের ফলে ইংলণ্ড চূর্ণবিচূর্ণও হয়ে যায় তবুও তাঁরা নিরস্ত হবেন না। দরকার হলে ইংলণ্ড ত্যাগ করেও তাঁরা ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবেন। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের এই সাময়িক বিচ্ছেদ অবশ্যই সমর্থিত হতে পারে। কিন্তু শান্তির সময় কোন সংস্থা যদি নিজেকে কোন রাষ্ট্রের সরকার বলে দাবী জানাতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে, তা সে সরকার কায়েমী সরকারই হোক, আর বিদ্রোহী প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারই হোক। সংক্ষেপে সে শর্তগুলি হল এই। —প্রথমতঃ আজাদী সরকারকে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সেই রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সেখানকার জনসাধারণের সহযোগিতায় সেখানে একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। তৃতীয়তঃ, কায়েমী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে আজাদী সরকারকে যুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় আন্তর্জাতিক আইন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আর চতুর্থতঃ, আজাদী সরকারের অধীন সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের ন্যায় অন্যায় প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তার দায়িত্বশীল পদের অধিকারীর নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

শান্তির সময় কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত আজাদী সরকারের যে উপরিউক্ত চারটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করার দরকার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তা না হলে এই জাতীয় আজাদী সরকার গঠন একটা নিত্য-দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। কোন রাষ্ট্রের আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উচ্ছেদযোগ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠনের প্রয়াস কোনমতেই সমর্থিত হতে পারে না। যেমন আজ যদি ইংলণ্ডপ্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় একটি আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে বসে, বা জার্মানীতে বসে কয়েকজন ইংরেজ গঠন করে 'ফ্রী বৃটিশ গভর্নমেণ্ট' তাহলে কেউই তাদের সমর্থন করবে না। সকল রাষ্ট্রই তাদের স্বীকৃতির দাবীর জবাবে এই কথা বলে যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনমত যদি সত্যিই তোমাদের পেছনে থাকে, তা হলে ত তার জোরে সামনের সাধারণ নির্বাচনেই তোমরা বর্তমান সরকারের উৎখাত ঘটাতে পারবে? তার জন্যে রাষ্ট্রের বাইরে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠনের কি প্রয়োজন? নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সকলপথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তবেই রাষ্ট্রের বাইরে বসে মুক্তি-সংগ্রামীরা আজাদী সরকার গঠন করতে পারেন, অন্যথায় নয়।

এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি আমরা আলজিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

করি তাহলেই আলজিরিয়ার আজাদী সরকার সম্পর্কিত ফরাসী শাসকবর্গের সকল যুক্তির অসারতা ধরা পড়ে যায়। কোন যুদ্ধ বর্তমানে হচ্ছে না সে কথা ঠিক। কিন্তু যে পরিস্থিতির জন্যে যুদ্ধকালে রাষ্ট্রের বাইরেও সরকার গঠন প্রচেষ্টা সমর্থিত হয়, সেই পরিস্থিতির সঙ্গে আলজিরিয়ার বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন পার্থক্য আছে কি? বিশ্বের সকল সভ্যরাষ্ট্রে প্রত্যেকটি নাগরিকের যে মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হয়ে থাকে তার একটিও বর্তমানে আলজিরিয়ার অধিবাসীদের নেই। সে দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে একজন অতি সাধারণ মানুষকেও সময় সময় ফরাসী সৈনিকের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হয়। বৈদেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরাও দীর্ঘকাল স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। কিন্তু আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের তুলনায় সে স্বাধীনতার সংগ্রাম মৃদু আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্ঘ গঠনের মৌলিক অধিকার থেকেও যারা বঞ্চিত তাদের কাছ থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, আলজিরিয়ার ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেই তারা গঠন করবে আজাদী সরকার? তা যদি সম্ভব হয় তাদের পক্ষে, তাহলে জেনারেল দ্য গল নিজে কেন পারেন নি তা? ফ্রান্স জার্মান-কবলিত হওয়ার পর তিনি কেন ফ্রান্স ত্যাগ করে আলজিরিয়ায় বসে গঠন করেছিলেন ফ্রান্সের তৎকালীন আজাদী সরকার? যে সন্ত্রাসের রাজত্ব আজ ফরাসী শাসকবর্গ আলজিরিয়ায় কায়েম করেছেন তাতে একথা বিশ্ববাসীর কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, আলজিরিয়ার অভ্যন্তরে বাস করে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালানো আজ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং যে আজাদী সরকার আজ কায়রোয় বসে আলজিরিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা গঠন করেছেন, তার সঙ্গে আলজিরিয়ার মূল ভূখণ্ডের কোন সংযোগ না থাকলেও, আলজিরিয়ার অভ্যন্তরস্থ লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং এইদিক থেকে বিচার করে আলজিরিয়ার মুক্তিকামী কোন রাষ্ট্র যদি এই আজাদী সরকারটিকে স্বীকৃতি জানায় তাহলে তার সেই কাজ সম্পূর্ণই সমর্থনযোগ্য হবে।

স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠবে যে, আজাদ আলজিরিয়া সরকারকে স্বীকৃতি জানানোর ব্যাপারে ভারতের নীতি কি হবে? এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে ভারত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে আজপর্যন্ত যে সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে, তাতে তার পক্ষে হঠাৎ ফ্রান্সের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার আজাদী সরকারকে স্বীকৃতি জানানো কঠিন কাজ হবে। কিন্তু তবুও মনে হয় যে, এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের বন্ধু হিসাবে ভারতের অনতিবিলম্বেই আলজিরিয়ার মুক্তি প্রচেষ্টাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানানো উচিত। যে বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করে ভারত আজ পশ্চিম এশিয়ার প্রত্যেকটি আরবরাষ্ট্রে এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে, উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। এতে হয়ত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ভারতের প্রতি ক্ষুন্ন হবে। কিন্তু তাদের মনোরঞ্জন করে ভারত যা লাভ করবে, তার চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান হবে আরব দুনিয়ার বন্ধুত্ব।

আরব জাতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের শেষ কথাটি লিখিত হয়ে গেছে। আজ হোক, আর দুদিন পরেই হোক, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবজাতি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক বিশাল আরব রাষ্ট্র গড়ে তুলবেই। প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, অমিতবীর্য সেই বিশাল রাষ্ট্রটির মৈত্রীর মূল্য যে কি অপরিসীম তা আলোচনা করে বোঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। নিতান্ত নির্বুদ্ধির মত আচরণ করে পাকিস্তান আজ আরব দুনিয়ার বন্ধুত্ব হারিয়ে বুঝতে পারছে, কি তারা হারিয়েছে। সে ভুল ভারতের শাসকবর্গ করবেন না, এ বিশ্বাস সকল ভারতবাসী খুব সঙ্গত কারণেই পোষণ করে থাকেন।

# সমুদ্রহৃদয়

## প্রতিভা বসু

৬

কী করবে, তার স্বভাবটাই এরকম। এসব সে সইতে পারে না। মার মতো সহ্যগুণে নেই তার। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত করতে পারে না। মেনে নিলেই যা চুকে যায়, তাতেও তার দেহের রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। তা যদি না হ'তো হয়তো জীবনের অনেক গ্লানি, অনেক দুঃখ, অনেক কটু কথা থেকে রেহাই পেতে পারতো সে। মা বলেন অশান্তিই সে ভালোবাসে, তাই অশান্তিকে ডেকে আনে এভাবে। হয়তো সত্য কথা। সেবার পুজোর কাপড় চোপড় নিয়েই কি কম হাঙ্গামা করলো সে? মার মতো চুপচাপ ঘাড় গুঁজে হাত পেতে নিলেই তো চুকে যেতো সব। পারলো কই? কয়েক গজ মার্কিন আর একখানা খাপি চুয়াল্লিশ বহরের থান হাতে নিয়ে জ্যাঠাইমাকে দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখেই লাল হ'য়ে গেল চোখ। সুষমা দেবী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, মেয়েকে আড়াল ক'রে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন নিঃশব্দে। সুলেখা জানে পুজোর কাপড়চোপড় মাত্র আজই আসেনি। এসেছে সাতদিন আগে, পনেরো দিন ধ'রে। এটা পছন্দ হ'য়েছে তো ওটা হয় নি, ওটা হ'য়েছে তো, সেটা ফেরত গেছে, একমাত্র জ্যাঠাইমার শাড়িই বদল হ'য়েছে চারবার। দিন তিনেক ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি হ'য়ে ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ বেরিয়েছেন জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা। লক্ষ্মী বস্ত্রালয়ে গিয়ে গাঁট ভর্তি কাপড় নিয়ে এসেছেন বাড়িতে বাছাই করতে। এরা সব দাদুর আমলের দোকানদার—খুশি হ'য়ে রাজ্যের কাপড় তুলে দিয়েছে গাড়িতে। জ্যাঠাইমার মেয়েরা সগর্বে সে সব কথা শুনিয়েছে সুলেখাকে, কে কী শাড়ি নেবে তার তালিকা শুনিয়েছে। নতুন পোশাকের আনন্দ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে ভাই-বোনেরা। বাবু ছোটুন হাঁ ক'রে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জ্যাঠাইমার ঘরের দরজায়। সুলেখা ধমকে নিয়ে এসেছে ঘরে।

জ্যাঠাইমার চার ছেলে তিন মেয়ে। বড়ো ছেলে হারাণ, আই এ ফেল করে বহুদিন যাবৎ চাকরির চেষ্টা ক'রে বিফল হ'য়ে এখন শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে। বয়স, চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশে পা দিয়েছে। জ্যাঠাইমার মনের গোপন বাসনা বেশ কিছু মোটা টাকা নগদ পেলে ছেলের বিয়ে দেন। তাই সতীশ ঘটকের নিত্য আনাগোনা। মেজো মেয়ে পূর্ণিদিও লেখাপড়ায় তথৈবচ। পিঠোপিঠি ভাইবোন, তেইশ পূর্ণ হ'তে চলেছে। কিন্তু দেখতে খুব ছোটো; বাচ্চা মেয়ের মতো। ক্লাস টেন অব্দি উঠে আর ডিঙোতে পারে নি। ইস্কুল ছেড়ে এখন সে-ও ঘরে বসেছে। জ্যাঠাইমা বলেন প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিচ্ছে। কয়েক বছর যাবতই বলে আসছেন কথাটা, কিন্তু দেওয়া আর হচ্ছে না। সেজো মেয়ে মণিদিও সুলেখার চাইতে বছর চারেকের বড়ো, কিন্তু পড়ে একই ক্লাশে, আর দেখতেও ঠিক পূর্ণিদির মতোই এইটুকু। জ্যাঠাইমা করগুনে হিসেব ক'রে বলেন, 'মণি আর লেখা তো একই বছরে জন্মেছে কেবল মাস কয়েকের এদিক ওদিক।' একথা শুনে সুষমাদেবী কাজ করতে করতে চোখ তুলে তাকান, তারপরেই আবার নামিয়ে নেন। অবশ্য অবিশ্বাসে করবার কিছু নেই। একমাত্র হারাণই এদের দেহের সকল মেদ শুষে নিয়ে একটা মস্ত কিছু হ'য়ে উঠেছে। চব্বিশ বছর বয়সেই তার শরীরে মাংসের পর্বত জমে উঠেছে। সুলেখা বাড়ন্ত গড়নের, মাথায়ও অনেকটা লম্বা সে। জ্যাঠা-জ্যাঠির অবহেলায় খুদ-কুঁড়ো খেয়েও সুস্থ, সতেজ। দেখতে পুর্ণির চেয়ে বড়ো ছাড়া ছোটো মনে হয় না। মেয়ের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় সুষমা দেবী কুণ্ঠিত হন। বোধ হয় মনে মনে ভাবেন, মণি পুর্ণির মতো ছোটো হ'য়ে থাকলে ক্ষতি ছিলো কী? মেয়ে বড়ো হ'লেই জ্বালা। প্রথম জ্বালাতো আরম্ভই হ'য়ে গেছে, ফ্রকে কী আর লজ্জা ঢাকছে তার? অথচ ঘরে ঘরে ওর মতো পনেরো ষোলো বছরের কতো মেয়ে দিব্যি বারো বছরের খুকি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাড়ি পরানো কি আজকাল সহজ কথা নাকি? দাম আছে না? সুলেখার ছোটো দুটি ভাই অবশ্য সে লজ্জা তাঁর ঢেকে দিয়েছে। তাদের দেহে কতকগুলো হাড় ছাড়া আর

কিছুই নেই। সুলেখা ছাতে নিয়ে গিয়ে দুই ভাইকে মুলার সাহেবের বই দেখে ব্যায়াম করায়। তাতে তাদের ঘর্মক্ষরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

মণিদির পরে জ্যাঠাইমার মেজ ছেলে বুলন। সে-ই ঠিক সুলেখার সমান। মাথায়ও বড়ো। আসলে জ্যাঠাইমার ছেলেরা সব বয়স মতোই বেড়ে ওঠে মেয়েরাই ছোটো। জ্যাঠাইমা বলেন, এই ভালো বাপু। মেয়েদের বাড় ভালোবাসি না আমি। অলক্ষীর মতো দেখায়। এখনই আমাকে এই রকম দেখছো, বয়সকালে আমিও ওদের মতোই ছয়ছোট্টো ছিলাম। বুলনের পরে মেয়ে দুটি অবশ্য বেশ মোটাসোটা। পুটি আর নাটু। একটির বয়স বারো। একটির দশ। তাতেও জ্যাঠাইমা অসুখী নন। লোক এলেই বলেন 'এই তো ঠাকুরপোর ছেলে দুটিতো পুটি নাটুরই সমান, বরং দু' চার মাসের বড়োই হবে, অথচ মনে হয় যেন শিলের তলার লংকা। ছোট্টোটি হয়ে দিব্যি ঘুরে

বেড়াচ্ছে। লোকে বলে, ছেলেমেয়ে ছেলে-মেয়েই ক'রেই আপনি গেলেন। তা তোমরাই বলো, কষ্ট না করলে কি আর কষ্ট মেলে? নিজের সুখ দুঃখ ভুলে দেহ-পাত ক'রে সন্তানদের দেখবো, তবেই না মা। আর তবেই না এমন স্বাস্থ্য হবে। তাইতো সুষমাকে বলি, জ্যাঠা তো প্রাণপাত ক'রে কতোই খাওয়াচ্ছে, কিন্তু তুই নিজে যদি যত্ন না নিস তবে কি কিছু হবে? শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে লাভই বা কী?' মার সামনেই বলেন এসব কথা। মা প্রতিবাদ করেন না। এমন কি মুখ ফুটে এই সত্য কথা কটাও বলতে পারেন না যে, পুণ্টি নাটুর চাইতে ওরা দু'জনেই অনেক ছোটো। ছোটুর এখনো ন' পোড়েনি, বাবুলের মাত্র সাত। বাবুলে জ্যাঠাইমার সব চেয়ে ছোটো ছেলে ঝুলনের সমান। এখনো যে ছেলে রাতদিন কাঁদে, রাত্তিরে ন্যাংটা হয়ে ঘুমোয়, দিনের বেলা ইচ্ছে হ'লেই বাপ মায়ের কোলে ওঠে। কিন্তু ছোট বলে এখনো যে ছেলেকে জ্যাঠাইমা অক্ষর পরিচয় করান নি।

রাগে বিদ্বেষে জ্বলতে থাকে সুলেখা। দুই ভুরু এক ক'রে আকাশের দিকে তাকায়। কেন তাকায়, কাকে খোঁজে, কী ভাবে কিছু জানে না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের উপর—'জ্যাঠাইমা এতো মিথ্যে কথা বলেন কেন?'

কেন বলেন তা কী ক'রে জানবেন সুষমাদেবী। মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় জবাব দেন 'বলুন না, কী হয় তাতে।'

রেগে যায় সুলেখা, 'বলে দিও, ওরকম যেন আর না বলেন।'

সুষমাদেবীর রক্ত তেমনি ঠাণ্ডা—'কী বলেন।'

'শুঁটকো মেয়েগুলোকে বলেন এই ভালো, মোটকা ছেলেগুলোকে বলেন এই ভালো। তাঁর নিজের যা সব ভালো। মণিদি কোন সুবাদে আমার সমান হয় শুনি? আর বুলনকে বলেন আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোটো। পুণ্টি নাটু কবে বাবু ছোটুর সমান হলো?'

'বয়েস নিয়ে দিদির ভুল হয়।' বিছানায় চাদর বিছোতে বিছোতে অথবা ঘর ঝাঁট দিতে দিতে উদাস গলায় জবাব দেন সুষমা-দেবী। চারদিক তাকিয়ে বলেন, 'এসব কথায় কান দিস কেন? তুই পড়তে বসেছিস পড়।'

'মা কি মানুষ না আর কিছু? মার প্রাণশক্তি কি বাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবে গেছে? ভেবে পায় না সুলেখা, কী করে এমন স্থির হ'য়ে থাকতে পারেন তিনি।

সুষমা দেবীর যতোটুকু অস্থিরতা, জীবনের যতোটুকু ঢেউ সব বোধহয় তার একমাত্র মেয়েকে কিছু শাসন করবার জন্যই সঞ্চিত আছে। সব সময়েই তাকে বোঝাচ্ছেন এটা করে না, ওটা করে না, এটা মানতে হয়, ওটা মানতে হয়, পরের সংসারে থাকতে গেলে সইতে হয়। আসল কথা চুপ ক'রে থাকতে হয় সব কিছুতে। জ্যাঠাইমার হাত থেকে কাপড়গুলো এনে তিনি বিছানার উপর রাখতে রাখতে আর এক পশলা উপদেশের শিলাবৃষ্টি করতে যাচ্ছিলেন, সুলেখা অবকাশ দিলো না, পলকে সেগুলো তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো, সোজা জ্যাঠাইমার ঘরে। দুপুরের খাওয়া দাওয়া মিটেছে, এবার ঘুমোবার পালা। পুজোর ছুটি হ'য়ে যাওয়ায় বেলা হয়েছে অনেক, জ্যাঠাইমা ক্লান্ত হয়েছেন। গুছিয়ে শুতে যাচ্ছিলেন, সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী এগুলো?' এগুলো তো তোদের।

'আমাদের লাগবে না।'

অবহিত হলেন জ্যাঠাইমা, চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন খুব বড়লোক হয়েছিস বুঝি!'

'বড়লোক হ'লে কি আর এসব কাপড় দিতেন?'

'কী দিতাম তবে? সোনার শাড়ি?'

'আপনারা নিজেরা কি সোনার শাড়ি নিয়েছেন?'

'আমাদের সঙ্গে তোদের কী?'

'আপনার বাড়ির চাকর ফটিক নিতাইর সঙ্গেই বা আমাদের কী?'

'তাদের কথা উঠছে কিসে?'

'না উঠলে কি কেউ তাদের সঙ্গে জোড়া মিলিয়ে নিজের ভাইয়ের স্ত্রীকে কাপড় কিনে দেন? না কি তাদের জামার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের জামা দেন।'

'ইস্। খুব যে তেজ দেখছি। এতো দাবী কিসের শুনি? তোর বাপ কি তোর জ্যাঠার কাছে জমিদারি রেখে গেছে?' 'বাবা না রাখুন—' মুখে মুখে সমানে উত্তর দিল সুলেখা 'দাদু তো রেখে গেছেন?'

'কী রেখে গেছেন?'

'কী না? এ বাড়িতে আমরা নিজেদের অধিকারেই থাকি, আর হিসেব করলে খাবার ভাবনাও জ্যাঠামশায়ের ভাগে পড়ে না। অত বড়ো পুকুরের অতগুলো মাছ যায় কোথায়? অতগুলো নারকেল, সুপুরি, আম—'

সুষমা দেবী এসে মুখ চেপে ধরলেন, 'ছি ছি ছি, এতোটুকু মেয়ের মুখে এমন শরিকানী কথা? এ সব কথা ওর মনে এলো কী ক'রে?' লজ্জায় দুঃখে মরে গেলেন তিনি। আর জ্যাঠাইমা রাগে একটা হুলো বেড়ালের মতো ফুলে উঠলেন। ঠাস করে চড় মারলেন একটা। সুলেখার স্বাস্থ্যপুষ্ট মসৃণ গালে চড়টা পাঁচ আঙুলের দাগ নিয়ে একটি স্পষ্ট ছবি হয়ে ফুটে উঠলো। কিন্তু তাতে তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হ'লো না। আত্মহারা হ'য়ে

সুলেখার পিঠভরা কালো চুলের গোছা টেনে ধরলেন দূরে থেকে, প্রচণ্ড জোরে একটা পাক দিয়ে প্রায় উপড়ে আনলেন মাংস। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, বেরো, বেরো বাড়ি থেকে, মামলা ক'রে তারপর ঢুকিস। দেখবো কোন্ সোদর এসে তোকে বাড়ির অংশ দের।'

চড় খাওয়া গালে, মুঠি ধরা চুলে, কম্পিত রক্তিম মুখে লোহার পুতুলের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুলেখা। মজা দেখতে ছুটে এলো সব। পণ্টু, নাটু, মণি, পুনি, ঝুলেন, বুলন সব। চাকররাও বাদ গেলো না। বাড়ির ছোটো বেড়াল ছানাটা পর্যন্ত তার নীল চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো।

এই জীবন। যতোদূর চোখ যায়, পিছন ফিরে তাকালে এই দেখতে পায় সুলেখা। পৃথিবীটা কুৎসিত, কদর্য নোংরা আর পঙ্কিল। এ সংসারে কিছু ভালো নয়। কেউ ভালো না। এইভাবে এই একইভাবে পুরো বাইশটা বছর কেটে গেছে তার। কটা দিন শান্তিতে ছিলে স্বস্তিতে ছিলো কর গুণে বলে দিতে পারে। কিন্তু তবু মরে যায়নি। না দে

না মনে। অহংকার এতোটুকু কমেনি। জাত সাপের কোমর ভেঙেছে তবু ফণা তুলতে ছাড়েনি। একদিকে মা যেমন সর্বদাই একটা ভীরু শশকের ত্রাস নিয়ে আছেন, আর একদিকে সে আছে বাঘের আক্রোশ নিয়ে, জ্বলন্ত আগুনের জ্বালা নিয়ে।

কিন্তু কেন এই জেদ! কী লাভ হয়েছে তাতে। দুঃখই বেড়েছে। বাবার মৃত্যুর পর এই যন্ত্রণা থেকে একদিনও জিরোতে পারেনি। তারপর শেষ পর্যন্ত এই নরকে এসে পৌঁছুতে হলো। তুলনা করলে এটার চেয়ে সেটাই কি ভালো ছিলো না। নাকি নরকের কোন স্তর ভেদ নেই। সব নরকই সমান কুৎসিত। কার থেকে কে ভালো? জ্যাঠাইমার সেই পুলিস ভ্রাতুষ্পুত্র, না এই পাষণ্ড-প্রধান সুলতান সাহেব। যদি এমন হতো—সেই লোকটাকে সে বিয়ে করতো জ্যাঠাইমার কথা মতো, তাহলে কি এর চেয়ে ভালো হতো কিছু? এই প্রবঞ্চক প্রতারক ধূর্ত প্রণয়ীর কবল থেকে সেই মূর্খ, বলদ, চরিত্রহীন স্বামীই কি শ্রেয় ছিলো? কী! কী! সবচেয়ে ভালো হ'তো না জন্মালে। মরে গেলে। এই ভবসংসারে কতটুকু তার মূল্য? কতটুকু সার্থকতা। সে দেখতে সুন্দর নয়, তার স্বভাব নম্র নয়, কাউকে সে ভালোবাসে না। তাকেও কেউ ভালোবাসে না। কেবল বড়ো হ'তে হ'তে অবিশ্রান্ত, আত্মসম্মানবোধে ঘা খেয়ে খেয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। যেটা অন্যায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়েছে। কিন্তু পাষাণ ভার কি এতোটুকু হেলেছে তাতে?

জ্যাঠামশয়ের সংসারে মা ছিলেন দাসী, আর তারা ছিলো তার সন্তান। প্রত্যেক দিনের ভার প্রত্যহ যন্ত্রণা দিয়েছে। এইতো অবস্থান। অসহ্য। অসহ্য। সবচেয়ে অসহ্য ছিলো লোক এলেই জ্যাঠাইমার কাঁদুনি। নিজের সখ সাধ বলে কি কিছু রেখেছি দিদি। পরার্থেই সব জলাঞ্জলি। তোমরাই বুঝে দেখো, আপন সংসার, দেওরের সংসার সব মিলিয়ে তো কম সম কিছু নয়? এতোটিকে খাইয়ে পরিয়ে আর কী থাকে? তারপর বুকে টোকা মেরে প্রায় চ্যালেঞ্জ ক'রছেন আর কেউ করুক তো আমার মতো, দেখবো কেমন বাপের বেটি। নিজের ছেলেমেয়েদের, সঙ্গে এতোটুকু তফাৎ করি না। বরং ওদের বাই নেই বলে ঘন দুধটুকু, বড়ো মাছের পেটিটুকু ওদের পাতেই ঢেলে দি। শুনতে শুনতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে সুলেখার। কিন্তু জ্যাঠাইমা সেখানেই থামেননি, মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, 'মা হয়ে নিজের মুখে বলা শোভা পায় না, ছেলেমেয়েরাই কি আমার কম ভালো? ডাল ভাত খেয়ে উঠে চলে যাবে, টু শব্দটি করবে না। মণি পুণি কি সাধে এতো রোগা? খায় কী বলো? কথায়ই বলে ভাগের মা গংগা পায় না। তার উপরে বিধবা মা, অল্প বয়স, ষাট খেতেটেতে একটু বেশীই ভালোবাসে। যেমন মাছ খায় না, দুধে ফলেতে আমার সেটুকু পুষিয়ে দিতে হয়। আর ঐ যে একখানা মেয়ে—বাব্‌বা—'

সুষমা দেবী চলতে ফিরতে দু' চারটে কথা কানে গেলেই সরে গেছেন তাড়াতাড়ি। এতো মিথ্যে শুনতে বোধহয় লজ্জা করেছে তাঁর। নিজের জন্য যতোটা কষ্ট হয়েছে, যিনি বলেছেন তাঁর জন্য বোধহয় বেশী যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কিন্তু জ্যাঠাইমার লজ্জা নেই। মেয়েতো নয় বিষ। কেউটে সাপের বাচ্চা। হতো আমার পেটের মেয়ে, গাল টিপে রক্ত বার করতুম, নুনজল খাইয়ে মেরে ফেলতুম, ধুতুরার বিচি বেটে খাওয়াতুম।' বলতে বলতে জ্যাঠাইমা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। মনের সমস্ত ইচ্ছে যেন রূপ নিয়েছে মুখের চেহারায়। মার মুখটা নীল হয়েছে শুনতে শুনতে।

তারপর বিয়ে। নিজের মেয়েদের কথা না ভেবে দেওরের মেয়ের কথাটাই ভাবলেন আগে। তা তো ভাববেনই। কর্তব্য আছে না? 'তোরাতো ভাবিস—' জা'য়ের কাছে বসলেন তিনি গা এলিয়ে 'আমি বুঝি কেবল নিজেরটাই দেখি তা নয়। বুঝিসনা তো পরের দায় ঘাড়ে থাকার কতো জ্বালা। বলবার বেলা তো লোকে ছেড়ে কথা কইবে না। বলবে বাপ না হয় না-ই ছিলো, জ্যাঠা জেঠিরও কি চোখ নেই গা? আর যা বাড়ন্ত গড়ন তোমার মেয়ের। তা পাত্রও তেমনি সুস্থ সমর্থ। কী বলিস?'

কী বলবেন। কবে কী বলেছেন মা যে এখনি কিছু বলতে হবে তাঁকে? নিঃশব্দে মাথা নেড়েছেন। বিশদ বিবরণ দিয়েছেন জ্যাঠাইমা 'পাত্র তোমার গিয়ে খুবই ভাল। ছোটো বেলায় পুলিশে ঢুকেছিলো এখন তো একেবারে পাকা চাকরী। এতোদিন যে কেন বিয়ে করেনি তাই ভাবে। তোর মেয়ের জন্যই বোধহয় হাত পা ধুয়ে বসেছিলো।' এটা জ্যাঠাইমার রসিকতা।

মা চুপ।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন তিনি! তা নৈলে বয়স তো গজেনের কিছু কম হয়নি। ধর গিয়ে আমার মেজ খুড়ির সেজবোনের যখন সাধ হ'লো নমুন্দিগ্রামে তখন দারুণ হৈ চৈ। কী? না, গায়ের মোড়ল রতননন্দীর এক ছেলে হয়েছে বাবা গজেশ্বরের দরজায় হত্যা দিয়ে। বটতলার বাবা গজেশ্বর সেখানে এক বিখ্যাত দেবতা। দারুণ জাগ্রত। নৈলে রতন নন্দীর বৌয়ের যে আবার ছেলে হবে ভাবতে পেরেছিলো কেউ? আমি তো সবই জানি? মেজ খুড়ির সেজ বোন আবার সম্পর্কে আমার মামী হয় কিনা? রতননন্দী হলো গিয়ে তাঁর জ্ঞাতি ভাসুর। সেই সুবাদে আমাদের কুটুম্ব। রতনদা বলে ডাকি। আমার বাপের বাড়ির সঙ্গে ভাবসাবও ছিলো যথেষ্ট। সর্বদাই আসা যাওয়া, দেখাশুনো। একেবারে লাগোয়া গ্রাম। আমার বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে এক লগির খোঁচায় নৌকো গিয়ে এঘাট থেকে ওঘাটে ভেড়ে। আমার তখন বিয়ে হয় নি, অবিশ্যি সেই বছরই হ'লো। রতনদা বললেন 'জানো তো, তোমার বৌদির আবার বুড়ো বয়সে এক ছেলে হয়েছে ঠাকুরের দয়ায়। ছ' মাসে পা দিল। তারিখ ফেলেছি, একটু লোকজন ডেকে দুটি দাঁতে ভাতে খাইয়ে দেবে। যখন এসেই পড়েছ, তখন আর ছাড়ছিনে। মেজ খুড়ি অবিশ্যি অনেক ধানাই পানাই করলেন। নিত্যি সম্বন্ধ আসছে তখন আমার। তাই বললেন পরের মেয়ে, বলে কয়ে নিয়ে এসেছি দু'দিনের জন্য, কে কবে আবার দেখতে আসবে কে জানে, শেষে ফসকালে দোষের ভাগী হবো। কার কথা কে শোনে। জোর ক'রে রেখে দিলেন। শেষে থাকলাম আর কি। কতো বাদ্যভাণ্ড, আলো, ফুল একেবারে ধুমধারাক্কা ব্যাপার! মুখেভাতে ছেলের নাম হ'লো গজেন্দ্রনাথ। বাবা গজেশ্বরের দোর ধরা ছেলে কিনা! এতোক্ষণে মার মৃদুগলার একটি আতঙ্কিত প্রশ্ন; 'লেখার তুলনায় বড়ো হ'য়ে যাবে না একটু?'

'না না, বড়ো কেন হবে? তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলেন জ্যাঠাইমা 'বছর কুড়ি তফাৎ হবে হয় তো।'

'কুড়ি-বছর!'

জ্যাঠাইমা মুখ ভার করলেন, 'তোদের বাপু কিছুতেই মন ওঠে না। কচি খোকাটি কোথায় পাবি শুনি? ছেলে সুন্দর হবে, বয়েস কম হবে, বংশ বড়ো হবে, তিন পাশ থাকবে, চাকরী ভালো করবে বাপের লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকবে—এতো যদি চাও তা হ'লে বাপু মেয়েকে চিরকুমারী ক'রে রাখতে হবে। ঘটটা বুঝে তো ফলটা দিবি না কী? মেয়ের দিকে তাকাবি তো? ঐ তো চেহারা, ঐ তো রং। আর নিজেদের অবস্থাটাও তো দেখবি?'

মা চুপ।

'আর তোমার মেয়ের বয়সও কিছু কম হয় নি। গজুর বয়েস যাই হোক, স্বাস্থ্য কী। একটা পঁচিশ বছরের ছেলেকে লুফতে পারে। কেবল চুলগুলোই যা টুপি পরে উঠে গেছে।

'বেশত, দু' একদিনের মধ্যেইতো আসবে, দেখবি কথা আমার ঠিক কি না।'

'আসবে।'

'শোনো কথা। না এলে মেয়ে দেখবে কেমন ক'রে?'

'ও।' মা হাতের কাজ ফেলে শিথিল ভঙ্গিতে জ্যাঠাইমার দিকে তাকালেন। চোখ টান করলেন জ্যাঠাইমা 'তোর যেন মন উঠছে না।'

'না, ভাবছিলাম লেখার পরীক্ষাটা—'

'ঐ তোদের পরীক্ষা। আরে বাপু মেয়ে মেয়েই। সে জজও হবে না, ব্যারিস্টারও হবে না, এগারো হাত শাড়ির কাছাও দিতে পারবে না। সেই বিয়েই করতে হবে, আর বছর বছর ছেলেও বিয়োতে হবে।' এর পরে মা একেবারে চুপ।

আর তারপরে কোনো এক দুপুরে এক কাঁদি মর্তমান কলা আর দুই হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে 'কই, পিসি কই গো' বলে হাঁক ছাড়লেন গজেন্দ্রনাথ। হাঁকের চোটে রবিবারের বিশ্রাম ছুটে গেল সকলের, সব গিয়ে হাজির হ'লো গেটের কাছে।

(ক্রমশ)

## মনোজ বসু

# আমার ফাঁসি হল

১২

কলকাতা থেকে এসে ছোট্ট এক বাসা নিয়ে আছেন ও'রা। শিক্ষানবিশি করতে এই জায়গায় প্রথম আমি আসি। বাসা দেখে যেতে পারলাম না, কিন্তু দীঘির পাড়ে জিমনাস্টিক মাঠের পাশে—জায়গাটা চিনতে পারছি। আর কি, ঝামেলা মিটে এলো এইবারে। কাল-পরশুর মধ্যে বাসা ছেড়ে আবার কলকাতায় গিয়ে উঠতে পারবে বউদি। পরশু নয়, বোধ হয় কালই। কাল আর দেখা করতে আমার দরকার হবে না। বাড়িওয়ালাকে বলে রেখেছে যে চলে যাবে?

বউদির দু-চোখ রাঙা। কে'দে কে'দে রাঙা করেছেন। আবার এখন চোখ ভরে গেল। মাথার কাপড় লম্বা করে টেনে দিলেন, সেকালে লজ্জাবতী বউরা যেমন করত। বউদির অবশ্য লজ্জা নয়, ভয়। আমার জন্যে ভয় কিছু আছে—কান্না দেখলে আকুল হয়ে পড়ব, এইরকম ভাবছেন। কিন্তু বেশি ভয় টুনুকে নিয়ে। সে ডুকরে কে'দে উঠবে, তারপর ফ'ুপিয়ে ফ'ুপিয়ে কাঁদবে সারাক্ষণ। তার এখন বোঝবার বুদ্ধি হয়েছে। কান্না দেখে প্রথম দিন সে কী কাণ্ড—টুনুকে থামানো যায় না, ছটফট করে কাটা কবুতরের মতো 'কাকামণি যাবো, কাকু তুমি এখানে কেন, বাইরে এসো। আমি কোলে উঠব।' বউদি চোখ মুছেছেন তাড়াতাড়ি। আমি বিষম আনন্দে হো-হো করে হাসছি। ছেলে কিছুতে ভোলে না। সেদিন থেকে বউদি টুনুর সামনে কিছুতে চোখের জল ফেলেন না। কী রকম মজা হয়েছে—যা-ই কিছু আমি বলি, কাঁদবার জো নেই। দৈবাৎ জল এসে গেলে চোখ ঢেকে ফেলতে হবে। টুনুর ডাগর চক্ষু-তারকা দুটো পাহারা দিয়ে ঘুরছে। আমার হাসি দেখে টুনু হাসে, কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তখনো সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সন্দেহ করে—মুখ আঁধার কিনা, চোখে জলের চিহ্ন কিনা।

কতদিন কাকামণি তোমার কাছে যাইনি বলো তো? কতদিন কাছে শুইনি, এক সঙ্গে বেড়াইনি—

তুমি বড় হয়েছ কিনা, ভারিক্কি হয়েছ। বড় হয়ে, এইতো দেখছি, তুমিও আগের মতন করে হাসতে পারো না টুনুমণি।

খিলখিল খিল-খিল উচ্ছল জলস্রোতের হাসি হাসত। বাঁধ পড়ে গেছে—ঝিরঝিরে একটু-একটু হাসি এখন। মনের দুঃখটা বলি তবে গোপনে—টুনুকে বুকে নিতে পারিনে, কাঁধে তুলতে পারিনে—সাদা রঙ-করা কঠিন গরাদ আমাদের মাঝে। আমার এখনকার অল্পমাত্র দুঃখ এই।

কত রকমের খাবার করে নিয়ে আসেন বউদি। বাড়ির বানানো, দোকানেরও একটা দুটো। মনে গে'থে রেখেছেন, কোন কোন বস্তু পছন্দ আমার—কোনটা তার মধ্যে খাওয়া হয়নি অনেকদিন। আইন হঠাৎ আজ বড্ড বেশি শিথিল। আর একটা ব্যাপার ঠাহর হল—পাশের দোতলা ওয়ার্ডে উপরের ঘরগুলো খালি করে ফেলেছে। বছরে বার-কয়েক ঘটে এমনি—দোতলার যত কয়েদি ভূতলে নামিয়ে দেয়। নিয়ম হল, ফাঁসির তারিখ আগে বলবে না। মাত্র আসামী জানবে ঘণ্টা কয়েক আগে। কিন্তু চোখ দুটো নিতান্তই অন্ধ না হলে জানতে কিছু আটকায় না। দোতলা থেকে ফাঁসির জায়গা দেখা যায়। দোতলা খালি করে দিল—তার মানে তুমি যে নিখরচায় জানলা দিয়ে মজা দেখবে, সেটা হবে না। অতএব অনুমান করা যায়, মজাটা জমবে আজকেই। রাত্রিবেলা

ক্ষেপে ক্ষেপে সব উদয় হবেন যথানিয়মে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে ইংরেজিতে বাংলায় ভাল করে সমঝে দিয়ে যাবেন, তোমার ফাঁসিতে ঝোলানো হবে যতক্ষণ না মৃত্যু হচ্ছে। মাইনে-করা ঠাকুরমশায় উত্তম উত্তম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ঈশ্বরের কথা শোনাবেন বলির পাঁঠার কানে পুরুতের মন্ত্র শোনাবার মতো। শেষরাত্রে এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে, স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরাবে। বলির পাঁঠাকেও হাড়িকাঠে দেবার আগে স্নান করানোর বিধি। ঐ দেখেই বোধহয় নিয়মটা করেছে। কী সমারোহ তারপরে! বন্দুক তুলে সারবন্দী গার্ড-অব-অনার, জহ্লাদ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলখানার কেষ্ট বিষ্ণু সবাই চলে এসেছে। এমন ব্যাপার কি যাকে তাকে দেখতে দেবে? দেখতে চাও, নিজে কিছু কাজ করে আদালতের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে চলে এসো ফাঁসি-সেলে। দু-চোখ ভরে দেখো তখন।

যাকগে, যাকগে। খাওয়াচ্ছেন আমায় বউদি। বাটি থেকে একটা একটা করে তুলে দিচ্ছেন হাতে। মালপো ক'খানা। মনে আছে বউদি, নতুন বউ এসে পাকপ্রণালী পড়ে তুমি মালপো বানিয়েছিলে? হাসিঠাট্টা করল সকলে, খাওয়ার মানুষ মেলে না। তুমি একেবারে ক্ষেপে গেলে—কতবার জিনিসপত্র নষ্ট করে এটা-ওটা যোগ করে পরিমাণ কম-বেশি করে শেষটা যে বস্তু উতরাল ভুবনে তার জুড়ি নেই। যা অজকে খাওয়াচ্ছ বউদি, এক মাস এর স্বাদ লেগে থাকবে মুখে।

দাদা আর লাবণ্য আসছে। দাদা, মনে হচ্ছে, পছন্দ করে ফেলেছেন লাবণ্যকে। গেট অবধি এসে দু-জনে আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেণ্ট কিনতে। ভাল হল। সেণ্টের শিশি সময় থাকতে যদি হাতে পৌঁছায়, আমার নতুন পোশাকটায় সেণ্ট মেখে কিছু বাবুয়ানা করা যাবে।

বউদি, জায়ের সাধ ছিল তোমার। সারা কলকাতা মেয়ে দেখে দেখে বেড়িয়েছ। দুই জায়ে সাধ মিটিয়ে সংসার করো এখন।

লাবণ্য বউদির পাশে এসে দাঁড়াল। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর টেনেছে। চুলে ঢাকা পড়ে গিয়ে পাছে আমার নজরে না আসে। অথবা পরে পরতে পাবে না—আক্রোশ ভরে বেশি করে পরে আমায় দেখাচ্ছে। বিরাটগড় থেকে এইখানে লাবণ্যকে আনিয়েছেন, সকলে এক বাসায় আছেন। যতদূর সাধ্য লাবণ্য আমার সঙ্গে শত্রুতা সেধেছে। পরিষ্কার মিছে কথা বলল, ঈশ্বরের নাম নিয়ে হলপ করে বলল, দয়ালহরিকে আমি মারিনি। কে মেরেছে তা সে জানে না। জানলা থেকে গুলি এসে বিঁধল। পাটোয়ারি লোক, টোনি'র ব্যবসায়, সম্পত্তি ও টাকাকড়ি ঠকানোর

ব্যাপারে কত লোকের আক্রোশ রয়েছে—কে মেরে ফেলেছে কে জানে? শরণার্থী হয়ে নিজে উপযাচক হয়ে আমি তাঁর মেয়ে নিয়েছি, হঠাৎ কি কারণ ঘটতে পারে ফুলশয্যার সময়ে শ্বশুরকে খুন করার? উকিলের ধমক খেয়েও লাবণ্য ভড়কে যায়নি একটুকু। সাংঘাতিক মেয়ে—বেঁচেবর্তে থাকে তো বাপকে ছাড়িয়ে যাবে ফেরেব্বাজিতে। ধমক খেয়ে আরও জোর দিয়ে বলল, হরিশ আর বাবা খাবার নিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে, আমি আসন পাতছি—ঠিক সেই সময় খোলা দরজার বাইরে দুম করে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার লুটিয়ে পড়লেন। বাবার খুন নিয়ে আমি মিথ্যে বলতে পারি?

বলছে; তার মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হেসে নিল একবার। কাঠগড়ায় আমার মাথার চুল অবধি খাড়া হয়ে ওঠে। কথার চেয়েও এ হাসির মানে প্রাঞ্জল। হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে তো সরে পড়তে দেবে না—তারই প্রাণপণ চেষ্টা। প্রায় সতী সাবিত্রী—যমের মুখ অবধি স্বামীকে তাড়া করে ফিরেছে। কী বিপদ দেখুন হতভাগা স্বামীর মরে গেছি, তা সত্ত্বেও বউ ঘাড়ের গলকম্বলের মতো ঝুলতে ঝুলতে চলল। নিজে তো অকর্মণ্য ভীতু! বিষ খায়নি জলে ঝাঁপ দেয়নি, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে নি, কিছুই করতে পারল না। আমি যে সাহস করে ঐ সব আদিম পন্থা না নিয়ে খবরের কাগজে নাম উঠিয়ে ধুম-ধাড়াক্কা করে চলে যাচ্ছি, শতেক রকমে তার ব্যাগড়া দিয়েছে। জজের মুখের উপর বুক চিতিয়ে বললাম, আইন দিয়ে দয়ামহারিকে কোন দিন তোমরা ছুঁতে পেতে না। যারা আইন করে তাদের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি রাখে সে। তোমাদের কাজটা আমি সোজা-সুজি সেরে দিলাম। হেন স্বীকারোক্তি পরেও আমার উকিল হাল ছাড়ে না। বলে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আসামীর। ডাক্তার দেখিয়ে পাগলা-গারদে রাখতে হবে। এই সব। কাণ্ড দেখুন দিকি!

টুনু হাত বাড়াল গরাদের ভিতর দিয়ে। তুলতুলে হাত মুঠোয় ভরে নিই। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় টুনুমনি—কিন্তু হবে কি করে? গরাদ গুলো রাক্ষসের দাঁত—সাদা সাদা লম্বা লম্বা দাঁত মেলে রাক্ষস হাঁ করে রয়েছে। বড্ড ভয়, তুমি সরে যাও। রাত হয়েছে—রাক্ষসেরা বাঘেরা ভূতেরা পুলিসরা সব এবারে রোঁদে বেরুবে। বাড়ি চলে যাও সকলে তোমরা।

বললে হয়তো বা ব্যবস্থা করে দিত। টুনুকে ভিতরে নিয়ে এসে, কিম্বা যেমন ভাবে হোক বুকে তুলতে দিত আমায় একবার। জেলার বড় ভাল লোক। ডাক্তারবাবু ভাল। সব মানুষই ভাল, বড্ড আপন আজকে। ভালবাসায় চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সব অপ্রীতি মুছে গেছে যেন রাতারাতি। হঠাৎ রাজাধিরাজ হয়ে গেছি। জল খাবো বলে হাত তুলে-ছিলাম, ছুটোছুটি করে ঝকঝকে সাদা ফেরোয় জল এনে দিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করেন, কি ইচ্ছে তোমার, কোন জিনিসটা চাই বলো। যার মুখে তাকাই, মনে হয় চোখ ছলছল করছে। কেন হে বাপু? সম্ভ্রম—বীরপুজো? তোমরা পারো না, আমি এই কেমন ড্যাং ড্যাং করে চলে যাচ্ছি? আর এক হতে পারে—বড় চাকরি নিয়ে চাকরিস্থলে চলেছি, কানে শুনে পরম শত্রুও যেমন ভালবাসায় গদগদ হয়ে ওঠে। চলে যাচ্ছি বলেই খাতির। যদি বলি, না ভাই, যাওয়াটা বাতিল হল শেষ অবধি, অর্থাৎ আমি দয়া-ভিক্ষা না চাওয়া সত্ত্বেও দিল্লী থেকে দয়ার টেলিগ্রাম এসে পড়ে, তখনই আবার সকলের নিজ-মূর্তি বেরিয়ে পড়বে। কুটুম্ববাড়ি শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, আপদবালাই বিদায় হয় না কেন? আবার জামাটা যে-ই সত্যি সত্যি গায়ে চড়িয়েছি, দেখতে পাবেন খাতির করে পান সেজে এনে মুখের কাছে ধরে। সেই ব্যাপার।

দিগন্তের অন্ধকারে ও'রা তিনজন টুনুর হাত ধরে চলে গেলেন। আর আসবেন না। কোনদিকে একটা মানুষ দেখতে

পাইনে ঐ পাষাণমূর্তির মতো নিশ্চল ওয়ার্ডটি ছাড়া। তাই বা কেন, মনের মধ্যে কত মানুষজনের আনাগোনা। দেখুন, মহাব্যোম স্পুটনিক ছাড়ুন আর যাই করুন, মনের শক্তির ধারেকাছেও যেতে পারছেন না। উপমা জুড়ে ভারিক্কি করে বসে থাকেন মনোরম—চক্ষের পলক ফেলতে যে সময় লাগে তার ভিতরে কোন রথ বলুন তো এমন ধারা বেড়াতে পারে ভূত-ভবিষ্যতের হাজার লক্ষ বছর পার হয়ে?

আমি যখন ছোট। ঐ টুনুর মতন, উঁহু, টুনুর চেয়ে বড়ই হব কিছু। বাড়ির আটক মানতে চাইনে কিছুতে। ছুটে ছুটে বাইরের উঠানে যাই, উঠান পেরিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়াই, তবুও কেউ না দেখলে ফটক পার হয়ে জাঙাল ছাড়িয়ে গুটগুট করে পা ফেলে বিলের ধারে চৌমাথা অবধি চলে যাই। একদিন বিলেও নেমেছিলাম, ভয় পেয়ে ফিরে চলে আসি। এখন, দেখুন, অজানা বলে একটুও ভয় নেই বয়সে বড় হয়েছি বলে।

সেকালে আমাদের গাঁয়ের এক সন্ধ্যা। গৃহস্থবাড়ির ঘরে ঘরে দীপ দেখাচ্ছে, শাঁখ বাজছে—আজকের এ রকম নিষ্কর্মা সন্ধ্যা নয়। মেঘ করেছে—আকাশের দিকে চেয়ে মাকে বারম্বার বলি, বাবা যখন আসবে? এত দেরি—আসে না কেন বাবা এখনো?

আচ্ছা, বাবাও ঠিক এই সময়ে মাকে তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, আর কত ঘুমোবে খোকা? জাগছে না কেন?]

মা প্রবোধ দিলেন, এক্ষনি এসে যাবে।

বৃষ্টি হবে ঝড় হবে, গাছপালা সব ভেঙে পড়বে—

তার আগেই বাবা তোমার পৌঁছে যাবে।

কেউ না দেখে—কেউ না টের পায়, এমনি এক নিরালা জায়গায় গিয়ে সেদিন বারম্বার আমি আকাশের কাছে মাথা কুটেছিলাম: নারায়ণ, কেষ্ট-রাধা, বাবা পাঁচপীর। হে মা শীতলা আমার বাবা যেন এক্ষুনি ফিরে আসে—মোটে দেরি না হয়। তোমাদের হরির লুঠ দেবো।

ছোট পিসি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় একটা সিকি হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিকিটা সরিয়ে রেখেছি লম্বা বিস্কুটের কৌটোয় কড়ে-পুতুলগুলোর নিচে। সেই সংগতির জোরেই যাবতীয় ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে খুশি করবার ভরসা রাখি।

আরও মেঘ জমেছে, ঝিলিক দিচ্ছে মেঘ চিরে চিরে। পাড়া ঘিরে গড়খাই—নারায়ণ-কোঠা একেবারে সেই গড়খাইয়ের উপর। এর উঠান ওর কানাচ দিয়ে যেতে হয়। কাঁসর-ঘণ্টা বাজে সেখানে। সেই দূরের গাঁয়ে সন্ধ্যাবেলা আজকেও ঠিক বাজছে। আসন্ন দুর্যোগে মাকে বলে বেরুনো যাবে না—তাই না বলেই টিপি-টিপি চলে যাই সেখানে।

চারিদিক থমথম করছে, হাওয়া নেই। ঠাকুরের শীতল-ভোগ হচ্ছে, ধূপ-গুগ্গুলের গন্ধে সহজভাবে দম নেওয়া দায়। এই সময়টা প্রায়ই আমি এসে সতৃষ্ণ চোখে পুজো দেখি। পুজো অন্তে প্রসাদ—অতএব ঠিক সময়টির আগে এসে পড়লে চুপচাপ শেষ অবধি দেখতেই হবে। আজ কিন্তু প্রসাদের লোভে নয়। বাবাকে এনে দাও ঠাকুর, বাবা যেন দেরি না করে! ঝড়-বাতাসে কিছু না হয় যেন আমার বাবার! ঠাকুর, রাগ না করো তো তোমার প্রসাদ অবধি দাঁড়িয়ে থাকতেও চাইনে। গাঙের ধারে চলে যাই, গাঙের ঘাটে বাবা এলো কি না দেখে আসি।

ঠাকুর-দেবতারা কী জীবন্ত ছিলেন সেই আমার ছোটবেলায়! ভারি এক দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম। কেউ জানে না—শুধু নারায়ণ ঠাকুর আর আমি। এক দৌড়ে গাঙ অবধি চলে গেলাম। রাত হয়ে গেছে, মেঘভরা আকাশের নিচে ঘনকালো অন্ধকার। মানুষ নেই কোনদিকে—অন্ধকার ফুঁড়ে নজর পৌঁছয় না, আছে কি নেই তাও কিছু ঠিক করে বলা যায় না। তার উপরে কবিরাজের ভিটের কসাড় বাঁশবাগান। দিনমানে দল বেঁধে যেতেও গা ছমছম করে। কবিরাজের নির্বংশ বাড়ির সেকালের তাঁরা সব বাঁশঝাড়ের দুর্নিরীক্ষ চূড়ায় চূড়ায় বিচরণ করেন। ছেলেমানুষ তো আমি—তখন খুব ভয় করতাম তাঁদের। আমায় পেলে তাঁদেরও যেন টনক নড়ে ওঠে, কটর-কটর-কট এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে আওয়াজ তুলে ভয় দেখান। হঠাৎ বা একটা বাঁশ নুইয়ে একেবারে মাথার কাছে নিয়ে আসেন। দিনদুপুরে এই অবস্থা—কিন্তু সেই রাত্রিবেলা বাবার ভাবনায় হুঁশজ্ঞান ছিল না একেবারে। ছুটতে ছুটতে গাঙের ঘাটে দাঁড়াই। গাঙের উপরে একটা নৌকো নেই। অশ্বত্থতলায় জলের মধ্যে ঝুরি নেমে গেছে, তার ভিতরে গোটা কয়েক ডিঙি। দুর্যোগ দেখে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে রয়েছে যেন।

এক মাঝি দেখতে পেয়ে বলে, বাড়ি যাও খোকা, একা-একা ঘুরছ কেন? এক্ষুনি বাতাস উঠবে।

আমার বাবা—

তোমার বাবা বুঝি নৌকোয়? তা কান্না কিসের? নৌকো কোনখানে বেঁধে রেখেছে—মেঘ কেটে গেলে ছাড়বে। তুমি ঘরে যাও, ঘরের লোক ভাবছে।

তখন চমক লাগে। মা ঠিক খোঁজাখুঁজি করছে। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এইবার। দৈত্যের একটা দল কোথায় বুঝি আটকানো ছিল—ছাড়া পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়েছে। বিষম দাপাদাপি লাগিয়েছে—আমাদের ঘরবাড়ি বাগবাগিচা লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

ভিজে কাপড়চোপড় ভিজে চুল ভিজে গা-হাত-পা, ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলাম। মা দেখতে পেলে তো রক্ষে থাকবে না—উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরে মা, রাঁধুনি-মাসির সঙ্গে কি বকাবকি করছে। আমি বাড়ি নেই, কিচ্ছু মা টের পায়নি। কাপড় ছেড়ে গায়ের জল মুছে দিব্যি আবার শান্ত ছেলে আমি,—সেই সময় মা এঘরে এলেন। দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলি, কখন আসবে বাবা—আর কতক্ষণ?

ঘুমোবো না, কিছুতে না—যতক্ষণ না বাবা ফিরে আসে। চোখ ড্যাবড্যাব করে আছি। আর ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ছি মনে মনে: আমার বাবার গায়ে ঝড়বৃষ্টি না লাগে, এক্ষুনি যেন বাড়ি আসে। এক্ষুনি—এই আমি জেগে থাকতে থাকতে।

কিন্তু ঘুমে চোখ ভেঙে আসে, ঠেকানো যায় না। কখন ঘুমিয়ে গেছি—রাত দুপুরে বাবা এসে আমায় নিয়ে শুয়েছে, আমি কিছু জানিনে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছি।

এবার কথা শুনলেন। কিন্তু আর একদিন ঠাকুরকে কত সাধ্যসাধনা করলাম, কানে নিলেন না তিনি, বাবা যেদিন মারা গেলেন। পাড়ার লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়েছে বিকাল থেকে। বাবার গলায় শ্লেষ্মা-আটকানো ঘড়ঘড় আওয়াজ। চোখ বুজে আছেন। পাখার হাওয়া করছেন বড় পিসিমা শিয়রে বসে। বুকে পুরানো ঘি মালিশ

করছেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশায়ের প্রিয় ছোট ভাই—এক একবার বিছানার ধারে আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে অমনি ছুটে বেরুচ্ছেন। এত কষ্ট চোখে দেখতে পারা যায় না। ছোট্ট আছি, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের সেই আসা এবং ছুটে যাওয়া স্পষ্ট মনে রয়েছে।

পাড়ার একজন এসে বলছেন, চিনতে পারো ও 'ছাড়লো'? কষ্ট হচ্ছে খুব? বাবা চোখ মেললেন একবার—সাদা কাচের মতো মণি। জবাব দেবার চেষ্টাও করলেন না। আবার আস্তে আস্তে চোখ বুজে এলো। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির আশেপাশে কালকাসুন্দির পাতা খুঁজে আসে যেমনি। অশ্বিনীর অনেক রকম মুষ্টিযোগ জানা আছে। বলে শ্বেত আকন্দের পাতার সেঁক দিলে উদ্বেগ কমবে। আরাম পাবেন। কাচের চৌখুপির ভিতর টেমি ভরে অশ্বিনী বেরুল, কোথায় শ্বেত আকন্দ আছে খুঁজে পেতে আনতে।

ধনঞ্জয় কবিরাজ বিকাল থেকে হাজির আছেন। সূচিকাভরণ প্রয়োগ হয়েছে তিনবার, ফল পাওয়া যায় না। ঘুমে আমি ঢুলে ঢুলে পড়ছি। এত মানুষ বাড়িতে, আঁধার মুখে চুপিসাড়ে এত সব কাজকর্ম চলেছে—জেগে থাকা আমারও দরকার। কিন্তু পারি কই? হাই উঠছে, বসে থাকতে পারিনে আর। পশ্চিমের দালানে শুয়ে পড়েছি। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ঘুমুচ্ছে অকাতরে। তাদের বাপের তো অসুখ নয়—তারা কেন ঘুমোবে না। আমার ঘুমানো অন্যায়।

সেই আর একদিনের মতো ঠাকুরের কাছে মনে মনে কান্নাকাটি করছিঃ বাবাকে ভাল করে দাও। রাতের মধ্যেই সেরে ওঠেন যেন, গলার ঐ টান না থাকে। ঘুম থেকে উঠে যেন দেখতে পাই, বাবার সব কষ্ট সেরে গেছে, বাবা হাসছেন।

কত রাত্রি জানি না, কে যেন আমায় টেনে তুলল বিছানা থেকে। খোলা বারান্ডায় বাবাকে বের করে এনেছে। অনেক মানুষ মিলে ভীষণ কণ্ঠে নাম শোনাচ্ছে বাবার কানের কাছে মাথা ঝুঁকে পড়ে। হরে-কৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে—হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। উঃ ঠাকুরের নাম কী ভয়ংকর সময় বিশেষে! কান্নার রোল চারিদিকে। মড়ার এদিকে সেদিকে গোটা দুই-তিন ক্ষীণ আলো, বাকি সব জায়গা অন্ধকারে থমথম করছে। কাঁদতে কাঁদতে বড়পিসিমাই বোধ হয় আমার কোলে করে বাবার পায়ের দিকে নিয়ে গেলেন। ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে জলে ভরতি করেছে। অন্তর্জলী। বলেন, পা দুটো ডুবিয়ে

দে ওর মধ্যে। আমার ইচ্ছা বাবার পায়ের দিকে যাবার নয়, মুখ দেখবার। যে মুখে কত আদরের কথা শুনেছি। সেই হাতখানা ছোঁব একটু, যে-হাত বাবা পিঠের উপরে বেড় দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতেন। হাউ হাউ করে কাঁদছি। সকলে কাঁদছে—পরম শত্রু এসে দাঁড়ালেও এই আসরে কাঁদতে হবে। জ্যাঠামশায়ের কাছে নিয়ে গেল, দু-হাতে টেনে নিয়ে তিনি বুকে চেপে ধরলেন। রাশভারি মানুষ, এমন ভাব কখনো আর দেখিনি ভেঙে পড়েছেন। বলছেন, কাঁদিসনে। আমি রয়েছি, সকলে রয়েছে। যে চলে গেল, আপদবালাই নিয়ে যাক সে চলে। বয়ে গেল।

আমারও খুব ভাল লাগছে। বাবা গিয়ে হঠাৎ খাতির বেড়েছে বাড়ি সুদ্ধ সকলের কাছে। কোলে কোলে ঘুরছি।

তার পরদিন দুপুরবেলা। বাসি মড়া রয়েছে পড়ে। চারপো দোষ পেয়েছে, প্রাচিত্তির না হওয়া পর্যন্ত মড়ায় কেউ কাঁধ দেবে না। সেই সব হতে হতে বেলা দুপুর। রীতকর্ম সমাধা করে শ্মশান-যাত্রার তোড়জোড় হচ্ছে। ছোট মানুষ আমায় যেতে দেবে না, দাদা যাচ্ছেন। মড়া কাঁধে তুলে হরিধ্বনি দিচ্ছে : বল হরি, হরিবোল! এই গা-কেঁপে-ওঠা ঈশ্বরের নাম কেন যে করে মানুষ!

দিদি আর আমি দক্ষিণের ঘরে দরজার উপর বসে বলাবলি করছি, বাবা আর আসবে না, কোনদিনও না। না দিদি?

দিদি নেই। কে কে নেই, আঙুলে গুণে দেখছি। মা বড়-পিসিমা ধনঞ্জয়-কবিরাজ অশ্বিনী জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা—বাবার মৃত্যু ঠেকাতে খুব যাঁরা ছুটোছুটি করে-ছিলেন, নিজেরাই এখন মরেছেন। আর ভাবতে গিয়ে থই পাওয়া যায় না। উঃ, কত মরেছে! ফাঁসি না হলে আরও কতজনের মরা দেখতাম! ছেলেবেলার সব চেয়ে বড় বন্ধু সেই যে প্রভাস গাছ থেকে পড়ে মরল—তার সঙ্গে চুক্তি ছিল যে আগে যাবে, যেমন করে হোক, খবরটা জানিয়ে দেবে ওদিককার। মরার পরে হতভাগা বেমালুম সব ভুলে মেরে দিল! গিয়ে যদি দেখা পাই, বোঝাপড়া সেই সময়। থাবড়া কষে দেবো পিঠে। না তারও উপায় নেই। পিঠে তো লাগবে না, আমার হাতই মোটে উঠবে না—চম্পা যার জন্যে হাহাকার করে। অতএব বেঁচে গেলি রে প্রভাস। তোদের বিস্মৃতির কারণটাও ধরেছি এতদিনে। আমাদের গাঁয়ের ক্ষুদি-নাপিতানী ছেলের যে ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে বিচার চেয়ে চেয়ে বেড়াত। দশ-দুয়োরে দাসীবৃত্তি চোঁড়বৃত্তি করে ছেলে মানুষ করল। লায়েক হয়ে ছেলে শহরে গেল রুজিরোজগারের ধান্দায়। আর আসে না, খবরবাদ দেয় না। ডাকিনী শহর জাদু করেছে ক্ষুদির ছেলে, দুঃখী মাকে যে ভুলে গেছে। প্রভাসেরও ঠিক তাই। স্বচ্ছন্দ লঘু আরাম পেয়ে কাঁটা-কাঁকরের ধরিত্রীর দিকে নিচু হয়ে তাকাতে মন চায় না।

সেই এক বয়সে বাবার জন্য ঠাকুরের কাছে দরবার করতাম—টুনুরও সেই বয়স—হয়তো সে-ও কান্নাকাটি করছে খোদাতালাহ ঈশ্বর-গড সকলের কাছে। কতই আজব কাণ্ড ঘটে দুনিয়ায়। ভাবনার পায়ে কেউ তো শিকল দেয়নি—ধরুন, তাই একটা হল। জেলখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল হঠাৎ এক ভূমিকম্পে। ইট-লোহা-রাবিশের স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ধরুন, জিমন্যাস্টিক মাঠের পাশে একতলা বাসার জানলায় গিয়ে ডাক দিলাম, ও টুনু, ঘুমুচ্ছ?

আমার পুরনো রসিকতা : ঘুমিয়ে থাক তো টুনুমনি, 'হাঁ' বলে জবাব দাও।......

জেল-ফটকের পেটা ঘড়ি ঢং করে একবার বাজে। লোহার গরাদে-ঘেরা আমার এই সর্বশেষ রাত্রি। বুদ্ধিমান বলে আমার নামডাক—ধরাধরির লোক না থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাকরি পেয়েছি, এই নিরিখে বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে। এত বছর ধরে গড়েতোলা সমস্ত বোধ-চেতনা ভোর রাত্রে নিভে যাবে সুইস টিপে ঘর অন্ধকার করার মতন। তারপর? আপনারা হাতড়ে বেড়ান সেই পরের ব্যাপারটা সঠিক

বোঝবার জন্য। কত পণ্ডিত কত রকম বলেন—বক্তা বক্তা কথার কচকাচি। সঠিক বার্তা আমিই শুধু জেনে বুঝে আছি। মহাব্যোমের কোন এক চলিষ্ণু জগতে গ্রহ-তারকার মতো ঘুরতে ঘুরতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই। তন্দ্রার ঘোরে এক ছোট্ট পৃথিবী, সেই পৃথিবীর মধ্যে ততোধিক ছোট্ট এক সংসারের কল্পনা। ক্ষণিকের ব্যাপার, জলের দাগের মতো এক লহমার ভিতর চিহ্ন মুছে যায় তার। মৃত্যুর উল্টো মানে—সুপ্তি থেকে পুনর্জাগরণ। মৃত্যুর ওপারে গিয়েই উদ্দাম হাসি হেসে উঠব—স্বপ্নের ভিতর কত খেলা খেলে এলাম, ভয়ে আৎকে উঠলাম কতবার! সংসার-সংসার খেলাটা যখন খেলছিলাম, নেহাৎ মন্দ লাগে নি কিন্তু।

এক ফালি আলো ফেলেছে কে যেন। বোঁজা চোখের পাতার উপর আলোর ঘা পড়ল। চোখ মেলে তাজ্জব। সত্যি বলছি, নিশ্চিত মৃত্যুর আগের কথা অপ্রত্যয় করবেন না অগুন্তি মানুষ আমার সেলের ভিতরে। মানুষের উপর মানুষ চেপে বসেছে। মরা মানুষ। এবং জ্যান্ত মানুষও—দূর-পিছনে যে বয়স ফেলে এসেছি, সেই বয়সটা আবার ফেরত নিয়ে জামার মতন গায়ে পরেছি।

গাঁয়ের বাড়ির দরদালানে কুলুঙ্গির ভিতরে বসে আছি আমি। লাল গামছা মাথায় দিয়ে বউ হয়ে আছি। মা বলছেন, মুখ দেখি আমাদের রাঙা-বউয়ের—ফেরাও দেখি মুখখানা। হাঁ করো দিকি বউ... ওমা, মা, আমসত্ব মুখের মধ্যে কেন বউয়ের? তাই এত লজ্জা!...

গুনগুন গুনগুনে গুঞ্জন উঠছে আমাদের সেকালের পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায়। ছেলেরা দুলে দুলে পড়া তৈরি করছে। দ্বারিক পণ্ডিত মশায় জলচৌকির উপর বসে বারান্ডার খুঁটি ঠেস দিয়ে অংক লিখে দিচ্ছেন আমার স্লেটে। স্লেট ধুতে গেছে ক'জন ঐ পুকুরঘাটে—কামিনীফুলতলায় ভাঙা রানার উপর উবু হয়ে বসে স্লেট মাজছে। পশ্চিম-আকাশে পড়ন্ত সূর্য—প্রভাসের বজ্জাতি, সূর্যের উল্টো দিকে মেলে ধরেছে স্লেট। নাড়ছে স্লেট—গোলাকার এক টুকরো রোদ নাচছে ঐ সঙ্গে।

দেখুন পণ্ডিত মশায়, আমি অংক কষছি—প্রভাস তা করতে দেবে না।

পণ্ডিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলছেন, কোথায় প্রভাস?

ঐ যে, দেখুন ঐ কামিনী ফুল-তলায়। রোদ ফেলছে আমার চোখে।...

হঠাৎ কে ফিসফিসিয়ে আমার কানের কাছে বলে,. ভয় করছে তোমার?

চমক লাগে। এতকাল পরে দরদ উথলে উঠল বুঝি প্রভাসের। এদিক-ওদিক খুঁজি সেই দ্বারিক পণ্ডিতের মতন। কাউকে দেখিনে।

আবার বলছে, ভয় কিসের? কোন ভয় নেই, এক সঙ্গে মিলে মিশে মজায় থাকা যাবে।

স্বর একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। প্রভাস নয়, বড় মানুষের ভারী গলা। প্রভাস তবে বড় হয়ে ভারিক্কি হয়েছে। কিন্তু বয়স তো ওদের হয় না। কত বছর আগেকার চম্পা বিয়ের কনে, আজও—বিয়ের রাত্রে ছাতের উপরে চুরি করে বর দেখার কৌতূহল একটুও বেমানান নয়। একটু বদলায় নি, একটা দিনও বয়স বাড়েনি তারপরে। প্রভাসেরও তাই। এ গলা অন্য কারো। তুমি কে?

স্পষ্ট গলায় এবার জবাব এলো, দিব্যি আছি, বড্ড স্ফূর্তিতে রয়েছি। সব ভার-বোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হালকা, মনও তাই। এত আরাম জীবনে পাইনি। এসো, চলে এসো, খাসা থাকবে। আমি মিথ্যে বলছি নে।

আর সন্দেহ নেই। দয়ালহরি। চোখে না দেখেও চিনতে পারি। প্রথম কথাতেই চেনা উচিত। চিরকালের মোসাহেবি মিন-মিনে গলা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—চিনে ফেলবার পরেও মনের দ্বিধা কাটতে চায় না।

রাগ করেন নি হোড় মশায়?

রাগ কিসের? গুলি করে বুক ছেঁদা করলে—আমায় তো বাঁচিয়ে দিলে বাবাজি।

দেখতে পাচ্ছি, ফাঁসি-সেলের সাদা গবাদের গা ঘেঁসে তিনি। জাল-জাল কাপড়ের উপর উল বুনে মেয়েরা ছবি তোলে, সেই রকম দেখাচ্ছে।

ব্যাধি আরোগ্য করে দিলে তুমি এক লহমায়। কী আরাম, কী আরাম! দলিল লিখি যতক্ষণ, সময় এক রকমে কেটে যায়। তারপরে এ বাড়ি ওবাড়ি এর-তার তোয়াজ করে বেড়ানো। এতখানি বয়সের মধ্যে সুখশান্তি একটা দিনের তরে হল না। সুখ চুলোয় যাক, নিজের বাড়িতে দু-দণ্ড চোখ বুজে সোয়াস্তি নেবো তার উপায় নেই। বাইরে বাইরে টহল দিয়ে ফিরি। লোকে নাক সিঁটকায়: বেটা খোশামুদে। শঠতঞ্চক বলে গালিগালাজ করে। কিন্তু বাপ-পিতামহ তালুকমুলুক রেখে যাননি। লেখা-পড়া শেখায় নি তোমার মতো। সুপারিশের জোর নেই। কি করে চালাই তবে? ভাল মানুষ হল বোকা মানুষ। বাহবা খুব মেলে, কিন্তু ভাত মেলে না।

কথা শুনে কষ্ট হয়। বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছিল, সেই জায়গাটা নজর করে দেখছি: সে সময়টা বড্ড লেগেছিল হোড়মশায়?

দয়ালহরি কানে নিলেন না। বলছেন, সবই যে পেটের ধান্দায় করতাম, তা নয়। শেষটা নেশা লেগে গেল। মানুষকে বোকা বানিয়ে দুটো পয়সা বের করে নেওয়া, এর হকের সম্পত্তি ওকে পাইয়ে দেওয়া, এর মধ্যে মজা আছে। বুদ্ধির প্যাঁচ-কষাকষি। এক রকমের রোগও বলতে পার। মনে পড়ছে বাবাজি, ছোটবেলা সাঁতার কাটতে গিয়ে গাঙের টানে ভেসে যাচ্ছিলাম। আমার মেজোখুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুললেন। এবারে তুমি তুললে। পাঁকের ভিতর থেকে টেনে তুলে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছ। ফাঁকায় দম নিয়ে বাঁচছি।

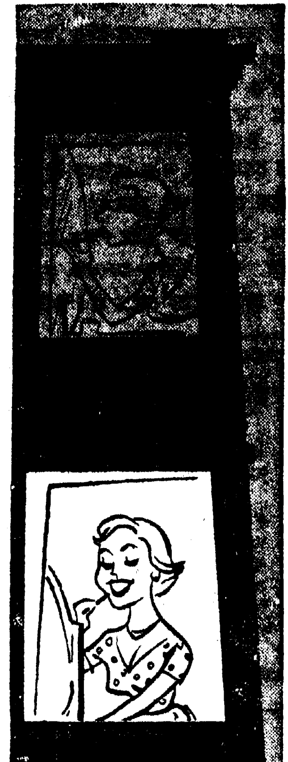
আপনার বোধ হয় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, যখন আমার গুলি গিয়ে বিঁধল?

কিছু না, কিছু না। এ ভারি মজা। ঠিক সময়টাতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, কোন রকম হুঁশ থাকে না। যন্ত্রণা যা কিছু গোড়ায় মরব-মরব একটা আতঙ্ক। মিথ্যে বলছি নে বাবাজি। মাটির উপরে যতক্ষণ পা ছিল সেদার মিথ্যে বলতাম। না বললে চলে না। এখন কি দায়? বড্ড উপকার করলে, তুমি আমার। কাপুরুষ আমি, সাহস হত না, তুমি সেটা করে দিলে। এই পুণ্যফলে দেখ, তোমারও ভাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর কতক্ষণ!

কতক্ষণ আর? আমারও মনে সেই প্রশ্ন। অধীর হয়ে পড়ছি। শুকতারা উঠবার সময় হল বোধ হয়। সময় হল বোধ হয়। কখন শুভাগমন হবে, সেলের চাবি হাতে নিয়ে? আমায় লটকে এত বড় উপকারটা করছে, আরো কতজনকে লটকাচ্ছে, তবে তো অনেক পুণ্য ওদের। পুণ্যের ফলে ওদের কেউ লটকে দেয় না কেন? ভয় করে হয়তো। পুণ্য তো পাহাড়প্রমাণ—আমার শত গুণ, সহস্র গুণ—ভয় করে, ফাঁসির দড়িতে অত পুণ্যের ভর সইবে না। ছিঁড়ে পড়বে।

ছিঁড়ে পড়লে সে নাকি বিষম ব্যাপার। আর ফাঁসি দেওয়া চলবে না আসামীকে—সে তখন মুক্ত। আইনে সঠিক কি বলে জানা নেই, দু-একদিন আগে মনে উঠলে জেলর বাবুকে জিজ্ঞাসা করা যেত। সে





যা-ই হোক, লোকের মধ্যে রটনা কিন্তু এই : বিধাতাপুরুষ নামক এক অদ্ভুতকর্মা স্থপতি আব্রহ্মস্তম্ভ জীবজগৎ গড়েছেন। তাঁর সঙ্গে একরকম বুঝসমঝ আছে বোধ হয় রাজপুরুষদের—ফাঁসির দড়িটা সড়াক করে নেমে যাবে, দড়ি ছিঁড়লে কিম্বা ফাঁস আটকে গেলে আর হবে না। পাঁঠাবলির মতন। এক ঝোপে কাটা পড়ল তো উত্তম। নতুবা বলি অসিদ্ধ—দেবতারে সে পাঁঠায় রুচি নেই। ছুঁড়ে ফেলে দাও সেই পাঁঠা।

কত সাবধান এই ভয়ে। আমার ওজন নিয়েছে। ফাঁসির দড়িতে ঐ ওজনের মাল টাঙিয়ে ছিঁড়ে পড়ে কিনা, পরখ করে দেখেছে আগেভাগে। দড়িতে চর্বি ও কলা মাখাচ্ছে বারম্বার—শুকিয়ে নিচ্ছে, আবার মাখাচ্ছে। টান দেওয়া মাত্রেই যাতে ফাঁস এঁটে যায়। তোড়জোড়ের অন্ত নেই। একখানা এই মোটা বই আছে ফাঁসি দেবার প্রণালী সম্বন্ধে। দুর্গোৎসব-প্রকরণ কোথায় লাগে তার কাছে! আইন-কর্তা কেমন সচ্ছন্দভাবে সবিস্তারে লিখে গেছেন—লিখবার সময় আশেপাশে নিশ্চয় ঘুরছিল তাঁর ভালবাসার মানুষেরা। হয়তো বা দড়িটা মনে মনে তাদের গলায় বসিয়ে অবস্থার আন্দাজ করে নিয়েছেন।

কী আশ্চর্য, সেই কাণ্ড ঘটল যে সত্যি সত্যি! আমার কপাল মন্দ—লাখের মধ্যে যা একটা শোনা যায় না।

আকাশে পুরানো সাক্ষি সেই পোহাতি তারা। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় কিলবিল করছে কালো কালো ছায়ামূর্তিরা ফাঁসিক্ষেত্র ভরে। আইনের যত পাহারাদার—হাজির সবাই। সেলের পিছন-দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে পৌঁচেছে মঞ্চ অবধি। কাঁদে নাকি এই সময় অনেক আসামী—অজ্ঞান হয়েও যায়। একবার এক পাড়াগাঁয়ের স্টিমারঘাটে দেখেছিলাম, একটা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে আর বাড়ি সুদ্ধ—হয়তো পাড়াসুদ্ধ মেয়ে লোক আর্তনাদ করছে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কি না যাচ্ছে লোকটা পেটের ধান্দায় অজানা শহরে। প্রায় সেই ব্যাপার।

ভূমি থেকে দেড়-মানুষ উঁচু হবে মঞ্চ। কিন্তু মনে হচ্ছে, অনেক—অনেক উঁচুতে আমি। প্লেনে চড়ে মেঘের ভিতর দিয়ে ধরণীর দিকে যেমন অবহেলার নজর পড়ে। আহা, জীবনের ব্যাধিতে ভুগছে মাটির গায়ে লেপটে-থাকা চারিদিককার এই সমস্ত লোক। যেটুকু দেখতে পায়, তা-ই ভাবে পরম বস্তু। চাপা হাসিতে আমার দম ফেটে যাবার জোগাড়।

দুটো খুঁটির মাথায় একটা মোটা কাঠ—হরাইজেণ্টাল-বার অবিকল। তার দু-দিকের দু-আংটায় দড়ি পরানো। একেবারে এক সঙ্গে দুজনকে ঝোলানো চলে। হয়েও থাকে তাই একাধিক আসামী মজুত থাকলে। মাইনে-করা জহ্লাদ নয়, ঠিকে চুক্তি—এক-একটা মানুষের জন্য এত করে পাবে। দুটো মানুষ একবারে ঝোলানোয় পাইকারি হারে রেট বোধকরি কিছু কমই হবে।

গটমট করে দাঁড়িয়েছি এসে মঞ্চের তক্তার উপর, দড়ি-ঝোলানা আংটার নিচে। তৈরি আমি, শুরু করো এবারে প্রক্রিয়া-গুলো। হাত দুটো বেঁধে দিল পিছনে—অবোধেরা ভেবেছে, ফাঁসির দড়ি আঁকড়ে ধরে আমি হয়তো যজ্ঞ পণ্ড করে দেবো। ঝোলানো টুপি মাথায়—চোখ-মুখ ঢেকে গেল। আমার এত বড় উৎসব চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেবে না। বিড়বিড় করে কানের কাছে মন্ত্র শুনিয়ে গেল—পুরুত নয়, জহ্লাদ।—বাবু, আইন দস্তুর হামাকে এই কাম করতে হচ্ছে। হামার কসুর লিবেন না।

সকল দায় আইন কর্তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে খালাস থাকল। বিনয়ের দিক দিয়ে লোকটা

বৈষ্ণব। বলা যায় না, ভূত হয়ে গিয়ে আমার কি রকম মতিগতি হবে। ঘাড় ভাঙতে হলে তাকে রেহাই দিয়ে অন্যদের যেন ঘাড় ভাঙি—মতলব হল এই। আমায় বলে কয়ে জহ্লাদ এবার হাতল ধরে দাঁড়িয়েছে। চোখ ঢেকে দিলেও কায়দা-কানুন শোনা আছে। দাঁড়িয়ে আছে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের হুকুমের অপেক্ষায়। মুখে তিনি কিছু বলবেন না, রুমাল নিয়ে হাত তুলে আছেন। মুঠো খুলে ছেড়ে দিলেন রুমাল—ব্যস!

ঘড়াং করে আওয়াজ। পায়ের নিচের তক্তা সরে গেল। মরে গিয়ে হাত পাঁচ-ছয় নিচুতে ঝুলতে থাকব—কিন্তু এ কি হল? কী আশ্চর্য ব্যাপার! পড়ে গেলাম পাত-কুয়ার মতন এক গর্তের তলায়। আছাড় খেয়ে বড্ড ব্যথা লাগল, কিন্তু মরে গেছি কই? হায়রে, প্রহ্লাদ হয়ে গেলাম; পাপ কলিযুগে মরণ নেই। জজ গম্ভীর মুখে রায় দিয়েছিল, তোমায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হবে যতক্ষণ না তুমি মারা যাও। রায় পড়েই এজলাস থেকে উঠে গেল, সেদিন আর অন্য কাজকর্ম হবে না। যে কলম দিয়ে রায় লিখেছে, সে কলমেও কাজ করবে না আর কখনো। কিন্তু হল না কিছুই, দাঁড় ছিঁড়ে পড়েছে। কোনখানে অসাবধানে রেখেছিল দাঁড়—ইঁদুরে কেটে দিয়েছে বোধ হয় চর্বি ও পাকাকলার লোভে। অত আইনের কচকচি, জজের অত আড়ম্বরের রায় ইঁদুরের দাঁতে বানচাল হল।

হৈ চৈ পড়ে গেছে। অন্ধকার গর্তের মধ্যে কানে আসছে প্রতিটি কথা। ভারী গলায় কে-একজন বলল, লোকটার বড় কপালজোর। যা কখনো হয় না, তাই ঘটল। চাকরি নিয়ে টান পড়বে আমাদের।

মণ্ডতলের ঘুলঘুলি খুলে ফেলল, যেখান থেকে মড়া বাইরে তুলে আনে ফাঁসির পর। ধরে নিতে হবে ফাঁসিই হয়ে গেছে আমার—শাস্তিভোগের পর এবারে ছাড়া পাবো। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছি। ক'জনে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলো। হাতের বাঁধন কাটল, চোখের ঢাকা খুলে দিল।

চলে যান, জেল থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাকে আটকে রাখা এখন বেআইনি।

ভোরের আলো ফুটছে চারিদিকে। জেলের ফটক খুলে দিল। আমায় দেখে মাথা নিচু করে সিপাহীরা।

রাস্তায় লোকজন কদাচিৎ দু-একটি। এখনো সব জেগে ওঠেনি। যখন শিক্ষানবিশ ছিলাম, জেলখানার সামনের এই পথে নদীর ধার অবধি কতদিন বেড়াতে গিয়েছি। আজকে কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। আট মাস পায়ে হাঁটিনি, অভ্যাস নেই। চেনা একজনের সঙ্গে দেখা, এক হোটেলে খেতাম, হনহন করে খুব ব্যস্তভাবে সে চলেছে, ট্রেন ধরবে বোধ হয়। মুখ ফিরিয়ে একটুকু হেসে চলে গেল। নিশ্চয় আমার খবর রাখে না। তা হলে আঁতকে উঠত, থমকে দাঁড়াত, ট্রেন ফেল হয়ে যেত আজ।

দীঘি। দীঘির পাড়ে জিমন্যাস্টিক ক্লাবের মাঠ। এত ভোরে মাটি মেখে কুস্তিতে লেগেছে কয় জোয়ান। মাঠের পাশে একতলা বাসা।

বউদি—দোর খোল বউদি, আমি এসেছি—

বউদি দরজা খুললেন। লাবণ্য পিছনটিতে। অবাক হয়ে থাকেন মুহূর্ত-কাল। কথা বেরোয় না। বলতে গিয়ে ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে। ঝরঝর করে কেঁদে ভাসালেন।

টুনুমণি কোথায়? ঘুমুচ্ছে? ঘুমিয়ে থাকো তো 'হ্যাঁ' বলে ওঠো—

গলা শুনে ডাকাত ছেলে জেগে গেছে। দৌড়চ্ছে। বড় বড় চুল উড়ছে দৌড়বার বেগে। দু-হাত বাড়িয়ে আসছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

কাকামণি, আমি জানতাম তুমি আসবে। ঠিক আসবে। ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি। চোখ মুছিয়ে ঠাকুর বললেন, আজকেই এসে পড়বে তুমি।

কতদিন টুনুকে কোলে তুলতে পাইনি! মরুভূমির উপর জল পড়লে যেমন হয়। আদরে আদরে অস্থির করছি। নাচাচ্ছি দু হাতে তুলে, কাঁধে করছি, বুকে চেপে ধরছি—

আরে, আরে, অত জোরে গলা ধোরো না টুনুমণি, লাগে—

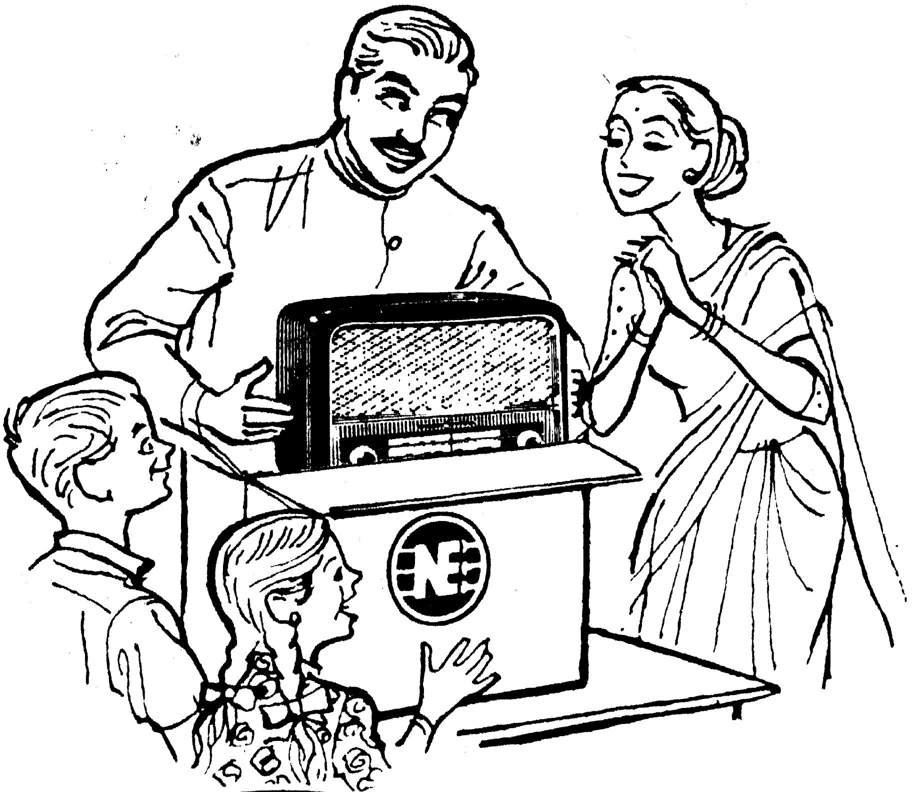
টুনুর বাহু নয়, ফাঁসির দাঁড়। স্বপ্ন একটুকু সময়ের। মনোরথে চড়ে ছুটে বেড়িয়ে এলাম এক পাক। দয়ালহরি ঠিক বলেছেন—এক মুহূর্ত, মুহূর্তের মধ্যে আর কিছু নেই।

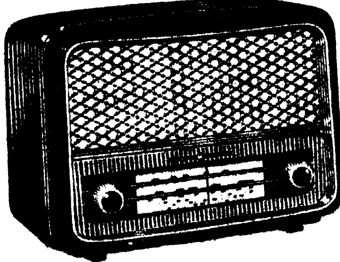
* * *

আমার মৃতদেহ ঘাড়-ধরে আধঘণ্টা ঝুললো আঁটোসাঁটো গর্তের ভিতরে। তারপরে টেনে বাইরে আনল। ফেলে রেখেছে। রক্তাক্ত চোখের ঢেলা বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে, জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে। কী বীভৎস! ঐ মুখে ক্রিম ঘষতাম, মাথার চুলে গন্ধ তেল মাখতাম, টেড়ি কাটতাম কত যত্নে! কাঁটা ফুটেছিল পায়ে, সারা রাত তার জন্য ছটফট করেছিলাম একদিন। থুঃ থুঃ—এত মমতা ঐ কদর্য দেহবস্তুটার উপর! রাজহংস নয়, পেখম-তোলা ময়ূর নয়—দুই ঠ্যাঙে চরে-বেড়ানো লম্বা ধিড়িঙ্গে এক মানুষের দেহ। হাড়ের ফ্রেমের গায়ে শিরা-উপশিরা আর মাংস—নিতান্ত কুদর্শন বলে উপরে একটা চামড়া। ময়লা তোষক ছেঁড়া কাঁথার উপরে চাদর ঢাকা দেয় যেমন। থুতু ফেলছি: থুঃ, থুঃ। থুতু পড়ে না মুখ দিয়ে। লাথি মারব ঐ কুৎসিত দেহটার উপর, পায়ের ধাক্কায় দৃষ্টির আড়ালে সরাব। ছুঁতে পারিনে, পায়ে স্পর্শ পাইনে। বায়ুভূত হয়ে গেছি।

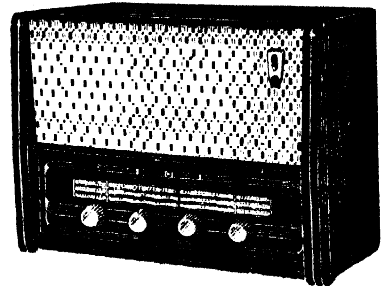
সমাপ্ত

# এবার উৎসব-দিনের উপহার—



মডেল ৭১৭ : মডেল ইউ-৭১৭ এসি/ডিসি : ৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড। মডেল বি-৭১৭ ড্রাই ব্যাটারি : ৪ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড। দাম ২৫০্



মডেল বি-৭২২ : ৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারীতে চলে। দাম ৩৩৫্

GRA 7050




চক্রদত্ত

একদা দোতলা বাস বেশ বিস্ময় জাগিয়েছিল। শহরে শহরে দোতলা ট্রামও দেখেছি আমরা। আজ দোতলা ট্রেনের কথাই একটু নতুন মনে হয়। জার্মানীতে ব্রেমেন থেকে হামবুর্গ পর্যন্ত দোতলা ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে। এই ট্রেনের একতলা দুতলা মিলিয়ে ২৫০ জন যাত্রীর অনায়াসে স্থান সংকুলান হয়। এগুলো তাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরা। সমস্ত গাড়িখানি ফ্লুরেসেণ্ট আলোয় উজ্জ্বল। কামরার মধ্যের দেওয়ালগুলি মনোমুগ্ধকর ওক কাঠ দিয়ে তৈরী। গাড়ির মধ্যে লাউডস্পীকারের এমন বন্দোবস্ত আছে যে, তাই দিয়ে বেতার অনুষ্ঠান শোনা যায়, তাছাড়া যে যে স্টেশনে গাড়ি পৌঁছায় সেটাও যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়।



দোতলা ট্রেন



দোতলা ট্রেনের দ্বিতলে বসে যাত্রিগণ ভ্রমণের আরও বেশি আনন্দ উপভোগ করছেন

*

খুব ছোটবেলায় কোনও পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম—

"উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার॥"

বাস্তবিকই যত বয়স বাড়ছে এই দুটি ছত্রের অর্থ যেন ততই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি। কী করে যে এই ক্ষুদ্রতম শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তা শুধু আমার নয়, অনেকেরই চিন্তার বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার ফলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এক নতুন ধরনের উই-ধ্বংসকারী পাউডার আবিষ্কার করেছেন। এই নিষ্ক্রিয় পাউডারের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের বিশোষণ-কারী কাদা মিশিয়ে যে পদার্থ হয় সেটিই উই-এর প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, এ পর্যন্ত পোকামাকড় ধ্বংসকারী যত ওষুধ আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে জোরাল ওষুধের থেকেও এটি বেশী শক্তিশালী। যেখানে উই-এর উপদ্রব দেখা যায় সেইখানে ওষুধটা ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ঐ ছড়ানো পাউডারের ওপর দিয়ে উইগুলো চলতে থাকলে তাদের গায়ে পাউডার মাখামাখি হয়ে যায় ফলে ঐ গুঁড়োর মধ্যে বিশোষণকারী ক্ষমতা থাকায় উইপোকাগুলির দেহ থেকে তৈল ও মোমজাতীয় পদার্থ শোষণ করে নিতে পারে। এর ফলে উই মাত্র এক থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। পাউডারগুলো যদি বেশ ভাল করে পিচকারী ধরনের জিনিস দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পাউডারগুলো ঐ স্থানে অনেকদিন স্থায়ী হয়।

*

ফ্রান্সে 'ব্লাড ব্যাঙ্কে'র মতই 'আই ব্যাঙ্ক' আছে। সেখানে যে কোন লোক তার চোখ প্রয়োজনে ব্যবহার করবার জন্য দান করতে পারবে। আজ পর্যন্ত এই আই ব্যাঙ্কে ৪০০০টি চোখ জমা হয়েছে। অবশ্য সবাই স্বেচ্ছায় এই চক্ষুদান করেছেন। এই চোখ থেকে 'করনিয়া' নিয়ে যাদের চোখ খারাপ তাদের লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে যে, প্রায় শতকরা ৫০টি চোখ ভালর দিকে যাচ্ছে। এই আই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য অন্ধ মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা। এই কারণে তারা অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসকদের প্রয়োজনে অথবা চক্ষু হাসপাতালে এখান থেকে চোখ সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করেছেন।

*

সম্প্রতি 'টেএও' (Tao) বলে এক নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিক তৈরী হয়েছে। এই টেএও পেনিসিলিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করে কারণ এটি রক্তে খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়। টেএও আসলে হচ্ছে 'ট্রাইএসিটিল-ওলিএণ্ডও-মাইসিন'। এটি মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে। এর গবেষণার জন্য পৃথিবীর বহু স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, সমুদ্রের তলদেশের মাটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে। 'ওলিএণ্ড' ওলিএণ্ডার নামক ঝোপ জাতীয় ফুলের শিকড় থেকে সংগ্রহ। গাছটির শিকড়ের কাছে মাটি সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে, এতে যথেষ্ট পরিমাণে ওলিএণ্ড পাওয়া যায়। টেএও পেনিসিলিনের বদলে কঠিন 'সিনটাইটিস', পেটের যে কোন রোগ এবং অন্যান্য বহু রোগে খুব উপকার করে। এই নতুন ওষুধ এখনও বাজারে ব্যবহারের জন্য ছাড়া হয়নি।

মনে না থাকাটা বা স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া অনেক সময় শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার মিসৌরীর এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান বাজার সরকার একদিন তাঁর টেলিফোন তুললেন ক' সপ্তাহ ধরে আলোচিত একটা জিনিসের অর্ডার দেবার জন্যে।

টেলিফোন তুলেই কিন্তু যাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছেন বা সে লোকটির দোকানের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। এই নাম মনে না পড়ায় রিসিভার রেখে দিয়ে তিনি অর্ডারটি দেবার যৌক্তিকতাটা আর একবার ভাবতে বসলেন। ভাবতে ভাবতে অনুধাবন করতে পারলেন যে, এতদিন তিনি ঐ কারবারটাতে ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু অপর লোকটির সংগে বন্ধুত্ব তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধিকে চেপে রেখেছিল। পরে এক সাংবাদিককে বললেন যে, তাঁর মুহূর্তের ঐ স্মৃতিভ্রংশ হওয়াতে তাঁর প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ টাকার লোকসান থেকে বেঁচে যায়।

স্মৃতিভ্রষ্টতা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হতেও দেখা যায়। অনেকে খুব একটা নগণ্য ব্যাপারেই স্মৃতি ফিরে পায়।

এক পিয়ানোবাদক তার নিজের পরিচয় ভুলে গিয়ে পরে তার অতি প্রিয় বেটোফেনের "মুনলাইট সোনাটা" শুনে স্মৃতি ফিরে পান।

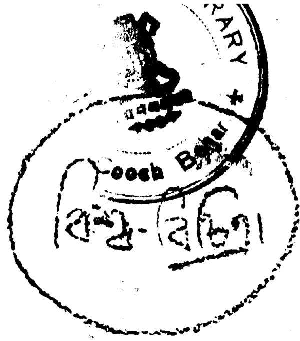
এক প্রাক্তন সৈনিকের স্মৃতি ফিরে আসে মাথায় গলফ খেলার বল লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বছর কয়েক আগে এক স্মৃতিভ্রষ্ট ব্যক্তি ইয়র্কশায়ারের থানায় উপস্থিত হন। সম্মোহিত হবার পর ডাক্তারকে তিনি জানান যে, তাঁর সংসারের সম্প্রতি খুব খারাপ যাচ্ছে এবং তাঁর আরো উদ্বেগ যে, তাঁর দোকানটিও ভাল চলছে না।

তারপর লোকটির মনে পড়লো যে, তিনি তাঁর বাগদত্তার ফটো পকেটে নিয়ে সাইকেলে চড়ে সমুদ্রতীরে গিয়েছিলেন যেখানে তাঁর প্রিয়ার সংগে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। তাঁর মনে পড়লো যে, তিনি মেয়েটির কোনভাবে দেখা পাবেন আশা করেছিলেন কিন্তু নিজেকে একলা দেখে তিনি পুলিসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিখ্যাত লোকেরও স্মৃতিভ্রষ্টতার বিচিত্র ঘটনা শোনা যায়। আইরীশ কবি জর্জ মুর একবার এক পার্টিতে যান যেখানে একটি মেয়ে তাঁরই রচিত একটি চমৎকার গান শোনায়।

মুর গানখানি শুনে খুব খুশী হয়ে গৃহস্বামীর দিকে ফিরে বললেন, "কি চমৎকার কথাগুলো। বলতে পারেন কে লিখেছে?"

গৃহস্বামী অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, "ঠাট্টা করছেন নাকি? ও তো আপনারই লেখা!" শুনে মুর তাঁর স্মৃতি-




ভ্রষ্টতায় এতোটা আঘাত পান যে, কেঁদে ফেলেন।

*

পাশ্চাত্যে সাত সংখ্যাটা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে লক্ষ লক্ষ লোক মনে করে। গ্রাম্য লোকে এবং গণৎকাররা কোন পরিবারের সপ্তম সন্তানের ভাগ্য ভাল হয় বলে মনে করে।

বিলেতের এক ধনী বিধবা তাঁর ব্যাংককে আড়াই শ প্রিমিয়াম বণ্ড কিনতে উপদেশ দিয়ে বললেন যে, বণ্ডের যেটির নম্বরে সাত সংখ্যাটি না থাকবে সেটি যেন বিক্রী করে দেওয়া হয়। ব্যাংককেও অগত্যা তাই করতে হলো যতোদিন না পর্যন্ত প্রত্যেকটি বণ্ডের নম্বর সাত সংখ্যাযুক্ত হয়।

বেশীর ভাগ লোক অবশ্য সংখ্যার ভাগ্যোদয় ক্ষমতা বিশ্বাস করে না। তবে সংখ্যা তত্ত্বের উদ্ভাবক হচ্ছেন গ্রীক পণ্ডিত পাইথোগোরাস। তাঁর মতে সংখ্যা হচ্ছে প্রতীক। প্রত্যেকটি সংখ্যা তার প্রভাব খাটায়। দুয়ের সংখ্যাটা বদ প্রভাবের প্রতীক বলে পরিগণিত হতো এবং দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিনটি অশুভ দিন বলে গ্রাহ্য করা হতো।

সংখ্যাতাত্ত্বিকদের মতে তিন শুভ সংখ্যা। আমাদের দেশে কিন্তু অশুভ বলা হয়, যেমন 'তিন শত্তুর', আবার 'বার বার তিনবার' বলে শুভনির্দেশও প্রকাশ করা হয়।

মারাত্মক বলে গণ্য করা হয় তের সংখ্যাটি। দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে বহুকাল ধরেই তের সংখ্যাটি ভয় ধরিয়ে রেখেছে। বহু হোটেল তের নম্বরটা পরিহার করে চলে: যে ঘরের পর পর সংখ্যা অনুযায়ী তের নম্বর হওয়া উচিত সেটাকে বারো-এ নম্বর দেওয়া হয়। অনেকে তের নম্বর বাড়ি



রূপকথার ড্রাগনের জীবন্ত রূপ—ইন্দোনেশিয়ার পূর্বদিকে কোমোদো, পাদার ও রিনচা দ্বীপ ও ফ্লোরেসের পশ্চিম উপকূলের শুকনো পার্বত্য অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম গিরগিটি জাতীয় এই জীবের বিচরণ স্থল। মদ্দাদের দৈর্ঘ্য হয় দশ ফিট পর্যন্ত এবং মাদীদের ছ ফিট। এরা অত্যন্ত অসামাজিক প্রকৃতির—বড়রা ছোটদের কেবলই হামলা করে। খুব শক্তিশালী দাঁত ওদের, এবং খাবার সময় শিকার যা ধরে তার বড় খানিকটা অংশ গিলে নিঃঝুম পড়ে থাকে হজম না হওয়া পর্যন্ত। লেজের ঝাপটা মেরে শিকারকে এরা কাবু করে। থাবায় বড় বড় ধারালো নখ থাকে। ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা কোমোদো ড্রাগন পেট পুরে খাদ্য নিয়ে ছায়ায় যাচ্ছে হজম করার জন্যে, আর অপরটি খাওয়ায় রত

বা ফ্ল্যাটে থাকতে চায় না।

উত্তরমেরু অভিযাত্রী নানসেনের কাছে কিন্তু তের নম্বরটা সৌভাগ্যের দ্যোতক ছিল। শেষ মেরু অভিযান থেকে তিনি ফিরে আসার পর তেরই ফেব্রুয়ারী এডিনবরায় তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয় জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা দিবসে।

তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, তেরই ডিসেম্বর তাঁর জাহাজ ফ্রামে তেরটি কুকুর শাবক জন্মায় জাহাজের তেরজনের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে।

*

ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার সিটিতে আগুনে ছেয়ে যাওয়া একটা জ্বলন্ত বাড়িতে একজনকে দেখা গেল, কিন্তু বাঁচবার জন্যে তার যেন চেষ্টা নেই। দারুণ লজ্জা তার!

ব্যাপারটা হলো পঞ্চাশ বছর বয়স্ক চার্লস ও'নীলের পোশাকে আগুন ধরতেই সেগুলো সে খুলে ফেলে দেয় কিন্তু তারপরই উলঙ্গ অবস্থায় বাইরে বের হতে তার লজ্জা।

ওর সমস্যার সমাধান করে দিলো এক পুলিস দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে বের করে নিরাপদ স্থানে এনে দিয়ে।

অনেককেই নানারকম লজ্জাকর পরিস্থিতির মধ্যে মাঝে মাঝে পড়তে হয়।

যেমন, লণ্ডনবাসিনী এক সুন্দরী একদিন সকালে বাথটাবে অবগাহন করে দিব্যি গান জুড়ে দিয়েছেন। হঠাৎ সাবানটা পিছলে তার বাথটাবের মাঝে পড়ে যেতে সেটি তুলতে যেতেই সুন্দরীর হাত আটকে গেল। বাড়িতে একা, সাহায্যের জন্য চীৎকার ছাড়া করবার কিছু নেই।

তার চীৎকার শুনে এবং বাথরুমের বন্ধ দরজা খুলতে অসমর্থ হয়ে এক প্রতিবেশী পুলিসে ফোন করে দেয়। এক খুবে জোয়ান চেহারার পুলিস এসে দরজা ভেঙে চোখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেয়ালের গা থেকে বাথটাবটা টেনে সরিয়ে সুন্দরীকে রক্ষা করলে।

এক আইরীশ নাবিক তার নবসজ্জিত গৃহে যাবার সময় চাবিটা নিতে ভুলে যায়। নতুন রঙ করা দরজা কি জানলা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে তার মন চাইল না, তাই চিমনীর ভিতর দিয়ে গলে যাবার মতলব করলে।

কিন্তু চিমনীটা যা সে মনে করেছিল তার চেয়েও সরু। ফলে দশ ফিট গিয়ে সে আটকে গেল। আর সেইভাবেই ওকে থাকতে হলো চৌদ্দ ঘণ্টা ধরে যতক্ষণ না প্রতিবেশীরা, দরজার সামনে খুলে রেখে আসা ওর কোটটা আর সেই সঙ্গে চাপা গোঙানী শুনে ওকে পা ধরে টেনে না বের করে আনলে।

*

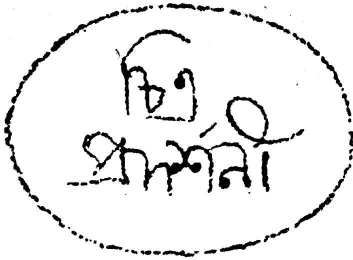
ভুল করে সহায়তা করতে যাওয়া, বিশেষ সে ব্যাপারে যদি কোন মেয়ে জড়িত থাকে তো সেটা বড়ো বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায়। বিলেতের এক প্রথিতযশা আধুনিক লেখক এক পার্টিতে গিয়ে মেঝেতে একখানা মেয়েদের রুমাল পড়ে থাকতে দেখেন। বিনীতভাবে ভদ্রলোক রুমালটি কুড়িয়ে তোলার জন্য ঝোঁকেন। কিন্তু তাঁর মুখের অবস্থাটা কি হলো আর বলা যায় না—যখন দেখলেন সেটা রুমাল নয়, পেটিকোট।

খামখেয়ালী বলতে চূড়ান্ত ছিলেন লেডি কার্ডিগান। তাঁর প্রিয় পোষ্য ছিল একটা ইতালীয় গ্রেহাউণ্ড।

ওর বাড়িতে অতিথিরা এলে সেই জানোয়ারটাকে খাবার টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে সোনার এবং রূপোর বাসনপত্র মাড়িয়ে যাতে খুশী মুখ ঢুকিয়ে দিতে দেখে সবাই অবাক হতো। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর প্রতি সম্মান রাখতে এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করতো না, বা কুকুরটাকে তাড়াবারও চেষ্টা করতো না।

একজন বিশিষ্ট অতিথির কিন্তু মনে জাগে যে, গ্রেহাউণ্ডটার কিছু কিছু টেবিলের কেতা জানা দরকার। তাই কুকুরটা টেবিলের নিচে এলেই অনুভব করে তিনি তাকে একটা লাথি কষিয়ে দেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে লাথিটা কুকুরের গায়ে না লেগে, লাগে গৃহকর্ত্রীর পায়ে। এর পর সেই মননীয় অতিথির সে রাত্রে আর খাবারই জুটলো না।



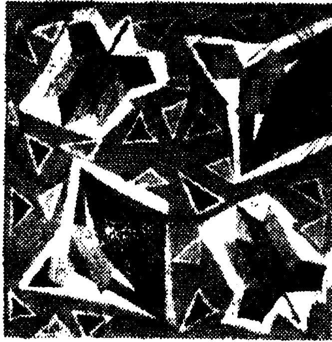

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ শ্রীমতী উমা দাসের চিত্র এবং কাপড়ের ওপর ছাপা নক্সার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীমতী দাসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়



দি ব্রাইড

জানলাম, ইনিই গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের সর্বপ্রথম মহিলা ছাত্রী। গভর্নমেণ্ট কলেজে এক বছরকাল শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে ১৯৫৪ সালে লণ্ডনে যান এবং সেখানে সেণ্ট্রাল স্কুল অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট-এ তৈল মাধ্যমে চিত্রণ এবং কাপড়ের ওপর নক্‌শা ছাপার নানান প্রথা প্রকরণ শিক্ষা করে দেশে ফিরেছেন।

কাজের উৎকর্ষ বিচার করলেও এবং কথাবার্তা থেকেও বোঝা যায় শিল্পীর টেক্সটাইল ডিজাইনিং-এর প্রতিই অনুরাগ অপেক্ষাকৃত বেশী। পেইণ্টিং প্রদর্শন করেছিলেন সবসুদ্ধ ২২টি; তার মধ্যে ছিল তেলের কাজ, জলের কাজ, লাইনো কাট, লিথোগ্রাফ এবং পেন্সিলের কাজ। স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে তৈল মাধ্যমেই। ছবিগুলির মধ্যে বিভিন্ন জাতের রচনা লক্ষ্য করলাম। সম্পূর্ণ সাদৃশ্য মেনে শিল্পী কিছু রচনা করেছেন, কিছু রচনা করেছেন ফর্মে পরিমিত অ্যাবস্ট্র্যাকশন প্রয়োগ করে, আবার কিছু রচনা করেছেন একেবারে প্রাচ্য



টেক্সটাইল ডিজাইন

ঢঙে। ভাবপ্রধান ছবি অপেক্ষা প্রতিকৃতি এবং আলংকারিক রচনাগুলির মধ্যে থেকেই শিল্পীর প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মতে 'মেমারিজ' এর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'এ স্কেচ অব দি নিউড', 'নিউড স্টাডী' 'অ্যাংগুইশ' প্রভৃতি রচনাগুলি থেকে শিল্পীর শারীর-স্থান বিষয়ে প্রায় নির্দোষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও রসের দিক থেকে এগুলি কিছুটা 'স্থূল'। 'দি মেডেন', 'দি ব্রাইড', 'দি মাদার' এবং 'সিস্টার্স'—এ কটি ছবিতে নবাতন্ত্র প্রয়োগ করে যে রস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন শিল্পী, তার আবেদন আমাদের কাছে খুব প্রবল বলে মনে হয়নি। প্রাচ্য ঢঙে রচিত 'দি সিংগার অ্যাণ্ড দি মিউজ' এবং 'ড্রীম ইউনিয়ন' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

'টেক্সটাইল ডিজাইন' বিভাগের বেশীরভাগ নক্সা ছাপা হয়েছে স্ক্রীন প্রিণ্টিং পদ্ধতিতে। কাপড়ের ওপর ব্লক পদ্ধতিতে ছাপার কাজ ভারতবর্ষে বহুদিন থেকে চলে আসছে, কিন্তু এ পদ্ধতির সম্ভাবনা সীমার দ্বারা পরিমিত। রেখা এবং ঢালা বর্ণের প্রয়োগ ছাড়া ব্লক প্রিণ্টিং-এ আর কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু স্ক্রীন পদ্ধতিতে লাইন, টোন, টেক্সচার সবই ছাপা সম্ভব। এমন কি কলমে টানা সূক্ষ্ম রেখা অথবা ড্রাইব্রাশের কাজও স্ক্রীন প্রিণ্টিং-এ সম্ভব হয়। স্ক্রীন পদ্ধতির এইসব সুবিধাগুলি জানাবার উদ্দেশ্যে নানারকম নিদর্শন এখানে সাজানো হয়েছিল।

ডিজাইনগুলি সত্যই চমৎকার। সত্যই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় দেখে যে, অত জটিল নক্‌শা কি করে ছাপা সম্ভব হল কাপড়ের ওপর। শিল্পী ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম থেকে কিছু অতি-প্রাচীন ভারতীয় 'টেক্সটাইল মোটিফ' নকল করে এনেছেন—সেগুলির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই সঙ্গে শ্রীমতী দাসের সহকারী শ্রী ঘোষের করা কিছু কাগজের ওপর স্ক্রীন প্রিণ্টিংএর নমুনাও সাজানো হয়েছিল। নমুনাগুলি সত্যই প্রশংসনীয়—বইয়ের মলাট, সিনেমা পোস্টার, গ্রীটিং কার্ড প্রভৃতি। শ্রী ঘোষ ব্লক প্রিণ্টিংএর নমুনাও কিছু কিছু প্রদর্শন করেছিলেন। ইনি যে বেশ পাকা কারিগর, সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় কথা ইনি বিদেশী কিছু ব্যবহার না করে নিজে হাতেই সব যন্ত্রপাতি তৈরী করে ছাপার কাজ করছেন এবং পদ্ধতিটি শিখেছেন নিজে নিজেই বইপত্র পড়ে। শুধু বাঁধা পদ্ধতি না অনুসরণ করে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণও করছেন অনেক রকম।




**পাকিস্তানে** সাধারণ শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। —"নেহাত ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের কী-ই বা বলবার আছে। তবে মনে হয় এ বোধ হয় ভালোই হলো।



খেলা-খেলা শাসনতন্ত্রের ছলা-কলার চেয়ে সামরিক আইনটা হয়ত লড়কে লেঙ্গের সঙ্গেই ভালো খাপ খায়"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

**পাকিস্তানের** ঘোষণায় অনেকগুলি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে একটি অপরাধ হইল শিশু-চুরি। শ্যামলাল বলিল—"মনে হয় শিশু পররাষ্ট্রের হলে এই দণ্ড মকুফ করা হবে"।

• • •

**সংবাদে** শুনিলাম সামরিক আইন জারীর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাতে নিষ্প্রদীপ মহড়া হইয়া গিয়াছে। নিষ্প্রদীপ মহড়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেকেই বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কথায় বলে এখান থেকে ছুঁড়লাম তীর, পড়ল গিয়ে কলাগাছে, হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা......এ অনেকটা তাই"।

• • •

**আসামে** বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহে শহরে বনের প্রাণীদের নাকি একটি মিছিল বাহির করা হইয়াছিল। —"এতদিন পরে শোভাযাত্রা কথাটার অর্থ উদ্ধার করা গেল"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ** নারায়ণ তাঁর সাম্প্রতিক **ভাষণে** বলিয়াছেন যে, আপাতত বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনা নাই। —"কিন্তু গৃহযুদ্ধ সমাসন্ন, বিশেষ করে এই পুজোর বাজারের মুখে। গিন্নীর ফরমাশমতো বাজার না হলে ব্যাপারটার যে শান্তিপূর্ণ রফা একটা কিছু হবে, তার



কোন সম্ভাবনাই নেই"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

**শ্রীজয়প্রকাশ** নারায়ণ অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন যে, গ্রাম বর্জন করিয়া শহরমুখীন অভিযান বর্জন করিতে হইবে। শ্যামলাল বলিল—"আশা করি তাঁর এই সতর্কবাণী গ্রামের লোক দিয়ে শহরের শোভাযাত্রা পরিচালনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য"!!

• • •

**গির** বনের একটি সিংহ নাকি প্রায় নিত্যই জুনাগড়ে তার এক প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। সংবাদে শুনিলাম, এই প্রণয় অভিযানে আসিয়া সিংহরাজ একদিন খাঁচায় বন্দী হন। —"বন্দী আমার প্রাণেশ্বর বলে প্রণয়িনী গর্জন করে উঠেছেন কি না তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**দিল্লীতে** "১৯৫৮ সালের ভারত" প্রদর্শনী চলিতেছে। দিল্লী-প্রত্যাগত আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"প্রদর্শনী দেখে এলাম। ভালো লাগেনি বলব না। কিন্তু শেয়ালদা স্টেশনে ভারতের যে চিত্র নিত্য তিরিশ দিন চোখে পড়ছে, তার কোন একটা মডেল দেখতে না পেয়ে মনে হলো ১৯৫৮ সালের ভারতের পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী বুঝি হয়নি"।

• • •

**অন্য** একটি বিশেষ সংবাদ মনে না করিয়া উপায় নাই। শুনিলাম মানমদে একটি নারীঘাতক অদ্ভুত জন্তুকে হত্যা করা হইয়াছে। সে নাকি শুধু নারীদের হত্যা করিয়া বেড়াইত। একদিন একটি মহিলাকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। জন্তুটি দেখিতে চিতাবাঘও নয়, বাঘ নয়। —বিশুখুড়ো বলিলেন—"তবে কি দেখতে অনেকটা স্বামীদের মতো"!!

• • •

**দেবীসূক্তে** যে মাতৃমূর্তির বর্ণনা দেওয়া আছে, কুমারটুলির হাজার হাজার মূর্তির মধ্যে নাকি তার কোন হদিসই পাওয়া যাইতেছে না। অনুসন্ধানে জানা গেল শিল্পীদের নাকি ফরমাশী মূর্তি নির্মাণে বাধ্য করা হয়, পেটের দায়ে তাঁরা তাই করেন। —"দুঃখ করে লাভ নেই। "মা যা হইয়াছেন"—সেই মূর্তিকেই প্রণাম করতে হয়"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**সম্প্রতি** আন্তর্জাতিক বধির দিবস পালন করা হইয়াছে। —"কিন্তু এটা রাজনৈতিক বধিরের অনুষ্ঠান নয়, তাঁরা কানে দিয়েছি তুলো নীতি পালন করেন, সুতরাং তাঁদের বধির শিবের অসাধ্য"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**কোন** এক ভারতীয় মহিলা নাকি লণ্ডনের মহিলাদের শাড়ী ধরাইবেন বলিয়া পণ করিয়াছেন। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"ক্রক-হরণ পালা যদি উত্তরে যায়, তাহলে পাছাপেড়ে শাড়ী থেকে শুরু করাই ভালো"।

• • •

**একটি** প্রশ্ন—আপনি কি জানেন যে, সবচেয়ে বেশী চাউল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয়? বিশুখুড়োর পাল্টা প্রশ্ন—"আপনি কি বলতে পারেন সংখ্যার অনুপাতে ভারতের অন্নহীনদের স্থান কোথায়, কোন্ স্তরে?"

• • • •

**একটি** সংবাদে জানা গেল রাশ্যা মহাজাগতিক শূন্যলোকে একটি গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছেন। এই গবেষণাগারে মানুষের বসবাসের সুবিধার কথা চিন্তা করা হইতেছে। —"আমরা এ সুবিধের কথা বহু আগেই চিন্তা করেছি এবং বায়ুভূত, নিরাশ্রয় এবং আকাশস্থ নিরালম্বদের উদ্দেশে নীর ও ক্ষীর দান করে বলেছি, ইদং নীরং ইদং ক্ষীরং স্নাত্বা পিত্বা সুখী ভব।"—এ মন্তব্যও বিশুখুড়োই করিলেন।




## স্মৃতিকথা

**স্মৃতিচিত্রণ—পরিমল গোস্বামী।** প্রজ্ঞা প্রকাশনী, পত্রিকা ভবন কলিকাতা-৩। মূল্য ছ' টাকা।

আত্মকথা স্মৃতিকথা জাতীয় লেখার একটা সময় আছে। বিশেষ বয়সের কিনারায় এসে মানুষ যখন থামে, তখন পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলে একটু ভাবতে ইচ্ছা হয়। পরিমল গোস্বামীর বইখানি আত্মকথা থেকে উৎসারিত হলেও আত্মকথন নয় এবং স্মৃতিচিত্র হিসেবেও ঠিক প্রথাগত নয়। সমাজ-জীবনের প্রতি যে মমত্ব ও দায়িত্ববোধ থাকলে স্বভাব-সংকোচ কাটিয়ে নিজের কথা লিখতে হয়, সেই চেতনায় এ গ্রন্থের জন্ম, বাজার-চাহিদার তাগিদে নয়। তীর্থভ্রমণ, বিদেশ গমন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক অজুহাতে যেসব গালগল্প উচ্ছ্বাস-বিজ্ঞপ্তি রচিত হয়ে থাকে, সে রকম বড় কোনও দাবি এর মধ্যে পাওয়া যাবে না। দাবি যা আছে, তা গুরুস্থানীয়ের কাছে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতার, প্রকৃতি-পরিবেশের কাছে অশোধ্য ঋণ স্বীকারের, বিচিত্র কৌতুক অভিজ্ঞতার জন্য অকপট বন্ধুপ্রীতির, শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে অনুভূতির, জ্ঞান-আলোচনার জন্য সাহিত্যগোষ্ঠীর আর জীবনকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা ও সুযোগের জন্য জীবনেরই দাবি।

জীবনের সত্য-মিথ্যা সব কিছুকে একত্র ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা যায় কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। জীবনের অর্থ কি, আদৌ কিছু আছে কিনা, তাতেও সংশয় আছে। সত্য পূর্ণ না আংশিক, সাপেক্ষ না নিরপেক্ষ, বাস্তব আধারের অতিরিক্ত তার অস্তিত্ব না কি বস্তুর মধ্যে তার খণ্ড ও বিচিত্র রূপটাই উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, এ বিষয়েও তর্কের অবকাশ আছে। এবং আছে বলেই লেখক এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন পর্ববিন্যাসে এবং সেই সব পর্বের মধ্যে পৃথক চিত্রবিন্যাসে, যাতে টুকরো টুকরোভাবে জীবনকে আস্বাদ করে অন্তত তার কিছুটা হিসেব পাওয়া যায়। আর এই আস্বাদ নেওয়ার ধরন ও হিসেব মেলানোর ভঙ্গি যে কত মনোরম ও নিপুণ নির্মল হাসিতে ভরা, তা বইখানি মন দিয়ে না পড়লে ধরা যাবে না। এই পরিকল্পনার ফলে স্মৃতিকথাটি চিত্রচরিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে।

মানস ও বস্তুসত্তা চিত্র ও চরিত্র নির্ভর বলেই লেখককে তথ্যনিষ্ঠ হতে হয়েছে এবং সে তথ্য সমাজ ও সাহিত্য-সংক্রান্ত। লেখক আছেন রঙ্গমঞ্চের এক পাশে কিংবা দর্শকদের সঙ্গেই, ফ্লাডলোক পাদপীঠের সামনে নয়। দৃশ্য ও ঘটনাকে আপন কথা বলে যেতে দেওয়া আর অপরাপর চরিত্রকে বাড়তে দেওয়া, নিজেকে কিছুটা নিপথ্যে রেখে মৃদু বিস্ময়-ব্যঙ্গের একটি ভাণ্ডার খুলে ধরা যে কত কঠিন, তা নিষ্ঠাবান লেখক ছাড়া আর কেউ জানে না। এই প্রাথমিক গুণগুলির জন্য পরিমলবাবুর স্মৃতিকথা একবারও ক্লান্তিকর মনে হয়নি। প্রথম থেকে চতুর্থ, তার পর শেষ পর্ব; এর ভেতর সবসুদ্ধ ষোলটি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায় তথ্যে ঠাসা, বর্ণনায় শৃংখলায় বিষয়বস্তুর সঙ্গতি রক্ষায় শুধু মনোহারী নয়, জীবন্ত। প্রথম দুটি পর্বে বাল্য-পরিবেশ, কিশোর ও তরুণ ছাত্রজীবন। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে কিছুটা কর্মজীবন, কিছুটা নিষ্কর্মা হাফ-বোহেমিয়ন খেয়াল-খুশির অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংবাদিক গোষ্ঠী ও বান্ধব-সমাজের কথা। লেখকের বন্ধুভাগ্য ভালো কিন্তু বন্ধুদের ভাগ্যও কিছু কম ভালো নয়। তবে প্রথম দুটি পর্বের বিস্তার কিছু বেশি, কারণ এখানে মানুষের ভিড় কম, অন্তর-বিবর্তনটাই আসল কথা। সে বিবর্তনের মূলে সূত্রটি পাওয়া যাবে গ্রাম-বাংলার প্রাকৃত পরিবেশে—পাবনা-ফরিদপুরের যে জলহাওয়ায় লেখকের শৈশব কৈশোর লালিত ও পুষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বড় দুটি চরিত্র, পিতা 'বিহারী-লাল গোস্বামী' এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন। পরবর্তী জীবনেও এঁদের প্রভাব মূর্ত, সুস্পষ্ট। পরিমলবাবুর যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা সংযম ও রুচিজ্ঞান, শিল্পানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি, তা এঁদের কাছ থেকেই পাওয়া।

তাঁর অশেষ কৃতিত্ব সাতবেড়ে আর রতনদিয়ার মানুষ ও নিসর্গ-বর্ণনায়,—মাত্র তিন পাতায় পদ্মার অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের অনায়াস-দক্ষ চিত্রণে। গ্রাম ও নদীর ঐ উপস্থিতি এত নিস্তব্ধভাবে তুলির আগায় ফুটে উঠেছে যে সেটা শারীর শূন্যতার মধ্য দিয়ে আপনার অকাট্য অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। চিত্রার্পিত প্রকৃতি এত জীবন্ত হয় কি করে এত কম আঁচড়ে, সেটা ভাবনার বস্তু। এই জন্যই স্মৃতিচিত্র 'স্মৃতিচিত্রণ' নামকরণের সার্থকতা পাই। দেবঋণ পিতৃঋণ ও নরঋণ—যা নিয়ে মানুষের প্রাণ ও সমাজজীবন—তা আত্মকথায় স্বীকৃতি দিয়ে চিহ্নিত করা এবং এতখানি সততা ও ভদ্রতার সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে ইতিহাসসম্মত ও শিল্পসম্মত সংহত দৃষ্টির প্রয়োজন, 'স্মৃতিচিত্রণ' সেই প্রয়োজন ও উত্তরণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, পরিমল রায়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে এইটেই বোধ হয় আসল বক্তব্য।

রয়াল সাইজ পাইকায় ছাপা সাড়ে তিনশো পাতার বইয়ে স্বর্গতা স্ত্রীর উল্লেখমাত্র দুটি জায়গায়। একবার তাঁর আগমন, আর একবার তাঁর প্রস্থান। কিন্তু কাব্যের উপেক্ষিতা হয়তো ভালো করেই জানতেন এই গূঢ়বাক্ নিগূঢ়রঙ্গ পুরুষের আশীতল হৃদয়কে। শুধু দুটি ত্রুটির উল্লেখ করতে চাই। বইতে লেখা নেই, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রই মিষ্টান্ন-লোলুপ কিনা। এবং ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিং-এর অতি নিকটেই যে গ্র্যাজুয়েট ব্রাদার্স-এ চার পয়সায় ভারি ও বড় এম্‌প্রেস গজা ও সুরভি ভাণ্ডারে ক্ষীরের লুচি সুলভ ছিল, তার উল্লেখ থাকলে ভালো হত। দ্বিতীয় কথা—শিয়ালদা-বৌবাজারের মোড়ে যে বিজ্ঞাপনটি বড় বড় হরফে লেখা থাকত সে যুগে, তা 'জার্মলীন' নয়, 'জারমলীন, জ্বরের যম'! সবচেয়ে বড় কথা, ঐ ওষুধের দোকান থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে গির্জের উলটো দিকে যে অপূর্ব স্বাদ কড়াইয়ের ডালে তৈরি বড় সাইজের রসে ভরা মচমচে বোঁদে পাওয়া যেত ১৯১২—১৮ সালে, তা কি কিশোর পরিমলের বুভুক্ষু নজরে পড়েনি?

৪৮৬।৫৮

---

## ছোটগল্প

**রসময় যার নাম**—শিবরাম চক্রবর্তী। শ্রী বাণী বুক হাউস, ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৫০।

দশটি গল্পের সমষ্টি এ বই শিবরামের সর্বশেষ গ্রন্থ। কথাটা অলক্ষুণে, কেন না লেখক বহাল-তবিয়তে আরও বই লিখুন, এ কামনা তাঁর সব পাঠকই করেন। তবে সদ্য প্রকাশিত এ বইটির পর আর কিছু বেরোয়নি এ পর্যন্ত। সে হিসেবে এখানি লেখকের সর্বাধুনিক রসিকতা এবং মারাত্মক রসিকতা। যে হেতু যথেষ্ট ভারি বয়সের পাঠকও পড়তে পড়তে হাসিতে ফেটে পড়বেন, এ আশংকা আছে। বিশেষ করে কাকার দল, যাঁরা ধীর-স্থির-গম্ভীর, আবার খেয়ালীও। সে সব কাকা যদি আবার কান-কাটা হন, তাহলে তো কথাই নেই। কেন যে কাকা বাঙালী থেকে কর্নাটী হয়ে গেলেন, শ্যামদেশের শ্বেতহস্তী কিনতে গিয়ে কর্ণচ্যুত হয়ে গেলেন, সে এক মহা সমারোহের ব্যাপার। শিবরামের ভাষায় কাকা হচ্ছেন শুড়ওলা বাবা। কিন্তু হাতির শুঁড় কাকার শুঁড়ের চেয়েও কতখানি জোরালো, তা জানতে হলে বইখানি পড়া দরকার। তার ওপর শুধু হাতির বাতিক নয়, ঘোড়ার রোগও আছে। বিশেষ করে কাকার দল কারা তাও জানা দরকার। 'না খেয়ে নেমন্তন্নে যেতে নেই' আর 'আজ নগদ কাল ধার'—এ দুটি টানা গল্প একসঙ্গে পড়লে ডিসপেপ্‌টিক লোকেরও ক্ষিধে পেয়ে যায়। ওদিকে 'আমার বাঘ শিকার' আর 'বাঙক লুঠ' গল্প দুটি চমৎকার। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগবে নাম-গল্পটি—'রসময় যার নাম'। এই রসময় ও তস্য বিচ্ছু ছেলে বিষময়ের নিদারুণ রসিকতার নমুনা দেখে বলতে হয়, তোমরা অশেষ গুণধাম। শিবরামের নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে লেখা এ বই উপহার দেবার মতো। (৬৬৩।৫৮)

**আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন**—অনুবাদ : বি বিশ্বনাথন। প্রকাশক—সাধন সরকার, অরবিন্দনগর, বেলঘরিয়া। দাম—১, টাকা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লেখা চৌদ্দটি গল্পের সংকলন বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য বলেই এ সংকলনের বাংলা সাহিত্য থেকে কোনো রচনাকে স্থান দেওয়া হয়নি। এ ধরনের প্রচেষ্টা নতুন। অনুবাদের মাধ্যমেই ভিন্নতর দেশ ও সমাজকে ভালোভাবে জানা যায়। সুতরাং এই স্বল্প পরিধিতে অনুবাদক অনেকগুলো প্রাদেশিক সাহিত্যের খানিকটা নিদর্শনও যে তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমরা ইওরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া এবং এশিয়া মহাদেশেরও সাহিত্য অনুবাদ করেছি প্রচুর, কিন্তু সে তুলনায় নিজের দেশেরই বিভিন্ন সাহিত্যের অনুবাদ কাজে তেমন মনোযোগ এখনও দিইনি। এটা খুব গৌরবের কথা নয়।

অনুমান করা উচিত, অনুবাদক বিভিন্ন সাহিত্য থেকেই উৎকৃষ্ট রচনা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু দু একটি গল্প পড়ে মনে হলো অনুবাদক যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করেননি। যে কোনো মহৎ শিল্পকে চিনে নেবার একমাত্র উপায় সে দেশের জনমানসের স্বীকৃতির সাহায্য নেওয়া। এ সংকলনের সবগুলো রচনা সে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয় না। তবে এ কথা বোধ হয় সত্য যে, প্রত্যেক লেখকই তাঁদের স্বভাষার রচনা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান। অনুবাদক হয়তো তাই রচনার চেয়ে রচয়িতারই সম্মান দিয়েছেন বেশী।

মাত্র একটি মাত্র গল্প পড়ে কোনো দেশের সাহিত্য বা সমাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই ধরনের আরও সংকলন প্রকাশের প্রয়োজন। এই বিশেষ গ্রন্থটি সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, ভাষা ও ভঙ্গিতে অনুবাদ সার্থক হয়েছে। বাঙালী পাঠকদের কাছে এ গ্রন্থ অবশ্যই সাহিত্যের মর্যাদা পাবে। (৪৩১।৫৭)

## কবিতা

**কাব্য-সঞ্চয়** ॥ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥ অভিজিৎ প্রকাশনী ॥ মূল্য পাঁচ টাকা ॥

এই সংকলন গ্রন্থে যে-কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলির রচনাকাল ১৯২০ থেকে ১৯৫৪। এই চৌত্রিশ বছরে বাংলা কবিতার পালাবদলের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। আর এই মোড় ফেরাবার দায়িত্ব যতদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তিনিই সযত্নে বহন করেছেন। রবীন্দ্রবিরোধিতা না করেও তাঁরই আশ্রয়ে যে-সমস্ত কবি নিজেদের সাধনাকে সিদ্ধির স্তরে উন্নীত করেছেন তাঁদের মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন অন্যতম। ১৯২০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত চৌত্রিশ বছরের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পরিবর্তন বিচিত্র এবং বহুধা। সাহিত্যক্ষেত্রেও এর ছোঁয়া লেগেছিল। কোন কবি এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছেন, কেউ বা পরিবর্তনকে স্বীকৃতি জানিয়েও পরিবর্তনটাকেই প্রধান বলে মনে করেননি। সাবিত্রীপ্রসন্নের রচনায় শেষোক্ত লক্ষণটিই মুখ্য। 'উৎসর্গে' কবি বলেছেন—

> দেবতা পূজার তরে তুলিতে কুসুম,
> গেয়েছিনু কিছু গান প্রেম-অনুরাগে
> দেখেছিনু মুগ্ধ চোখে ফুলের মরসুম।

সঞ্চয়ের পাতায় এই প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়েছেন সাবিত্রীপ্রসন্ন। মোট দশটি কাব্যগ্রন্থে সুরের বৈচিত্র্য আছে, বিভিন্ন ধরনের কবিতা আছে—কিন্তু সব কিছুর মূলে রয়েছে কবির 'প্রেম-অনুরাগ'। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় আছে 'দেবতা-পূজা'; এ-জন্যে কবির কবিতায় একটা সরল বিশ্বাস, আন্তরিকতা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ভারতবর্ষের জনগণের কাছে প্রকৃতির যে-সম্বন্ধ তা হচ্ছে ভাই-বোনের। স্নেহ এবং প্রীতিই সেখানে আনন্দ। বিস্ময়বোধের স্থান সেখানে নেই। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় এই প্রীতিবিহ্বলতা; প্রকৃতি ও মানব যে একই বৃন্তের দুটি ফুল সে-সম্বন্ধে কবির সন্দেহ নেই। অতীতের প্রতি ভালবাসা যদি রোমাণ্টিক কবির ধর্ম হয়, তবে এই সংকলন গ্রন্থে অনেকগুলি রোমাণ্টিক কবিতা পাঠক খুঁজে পাবেন। কিন্তু সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতাকে রোমাণ্টিক বলা বোধহয় সংগত নয়। তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি ভারতবর্ষীয়, ইউরোপীয় নয়। যে শান্তশ্রী প্রকৃতি কবিচিত্তের গহনে অনুরণন তুলতে পারত সে-প্রকৃতি স্বপ্ন প্রায়। তাই কবির কেগেছে 'পল্লী-ব্যথা'। বস্তুত সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় জগৎ ও জীবনের অপচয়ের দিকটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

> জল এগোয় না, তেষ্টা এগোয়,—সত্যি কথা
> অজানা স্বর্গ হারিয়ে পেলাম স্বর্গ হাতে।

এ-সব কবিতায় যে মৃদু ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে সে আসলে জীবনপ্রীতিরই অপর দিক। 'মডার্ন কবিতা' স্বর্গভ্রষ্ট মানবের মর্মন্তুদ আলেখ্য।

আক্ষেপ ও বেদনা কবির অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করেছে, শাণিত বাক্যবান নিক্ষেপে কবি এ-যুগের নগ্ন দিকটিকে তুলে ধরেছেন। পূর্বে কবি আক্ষেপ করেছেন। হতাশায় নুয়ে পড়েছেন কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কর্তব্যের তাড়না ছিল বলেই কবিতা-গুলি বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠেছে। বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলেই সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় ইশারা, ভঙ্গি, কৌশলের স্থান স্বল্প। কবিতাগুলির প্রাণকেন্দ্র কবির অনুভূতির অভ্রান্ততায়। উপমা-অনুপ্রাসে এ-কবিতা মনকে ভুলায় না,—বক্তব্যের জোরে এ-কবিতা স্বপ্রতিষ্ঠ।

কিছুসংখক কাহিনীকবিতা এ-সংকলনে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতার স্বাদ-বৈচিত্র্য কৌশলে, হঠাৎ চমকসৃষ্টিতে এবং উপমার মনোরম সন্নিবেশে। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় তা নেই। কিন্তু কেবল দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাকেও সাধারণভাবে উপস্থিত করার মধ্যে একটা চমৎকারিত্ব আছে। 'উৎসর্গে' কবি তাঁর নিজের সৃষ্টিকে তুচ্ছ বলে বিনয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করেও যে কবিতার কাশফুল ফোটান সম্ভব এ সব কবিতায় তার পরিচয় আছে। কবির কাহিনী-গুলির মধ্যে এমন একটা অনুভববেদ্য জ্যোতির্মণ্ডল আছে যা সহজেই মনকে লুট করে নেয়। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতা মননজাত নয়—ভাবাবেগসম্ভূত। তাতে কারুকর্মের বাহাদুরি নেই শৌখিন মজদুরির চেষ্টা নেই—আছে প্রাণাবেগ; নবনারীর সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ কথায় তা ভাস্বর।

সাবিত্রীপ্রসন্নের সব কবিতার বই এখন সহজলভ্য নয়। এই সংকলনটি সেদিক থেকে সময়োপযোগী। প্রকাশক অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। বিভূতি সেনগুপ্তের প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

৫০৮।৫৮

## শারদীয়া সংকলন

**আহরণী**—শিশুসাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর কর্তৃক সম্পাদিত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম চার টাকা।

শিশু-সাহিত্যিক শিশু-সাহিত্যানুরাগী এবং শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও শিশু-পত্রিকার সম্পাদকগণের মধ্যে সহযোগিতা শিশু-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করার উদ্দেশে ১৩৫১ সালে শিশু-সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়। এই কয় বছরে এই পরিষদ অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে—'ভুবনেশ্বরী পদক' প্রবর্তন, প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিককে একটি স্বর্ণখচিত পদক দিয়ে সম্মানিত করার ব্যবস্থা। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে এই পদক সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয় ১৩৫৮ সালে।

তাঁদের দ্বিতীয় বৃহৎ কাজ হল এই 'আহরণী' প্রকাশ। এ এক বিরাট গ্রন্থ। গল্পে প্রবন্ধে ছড়ায় কবিতায় এই বইটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক চিত্রও যুক্ত হয়েছে। শিশুদের জন্যেই এই গ্রন্থ, কিন্তু বড়দের কাছেও এ-বই কম লোভনীয় হবে বলে মনে হয় না।

প্রায় দেড়শত বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার অন্বেষণ করে এই সঙ্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে শিশু-সাহিত্যের, লেখক-লেখিকাদের রচনা আহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক লেখক-লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়ে বইটি আরও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। বহু লেখার কথাই উল্লেখ করার লোভ হচ্ছে, তার মধ্যে থেকে বাছাই করে কেবল একটি লেখার উল্লেখ করি—সেটি হচ্ছে "শিশু মাসিক পত্র"—বাংলা দেশে এ-পর্যন্ত যতগুলি এ ধরণের পত্রিকা বের হয়েছে, তার কালানু-ক্রমিক তালিকা সম্বলিত সুলিখিত প্রবন্ধটি।

কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারেও বইটিকে দুর্মূল্য না করায় প্রকাশক সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

**আবাহন**—সম্পাদক : সুধীন্দ্রকুমার পালিত। ১৮।১ দেওদার স্ট্রীট, কলিকাতা ১৯, মূল্য ১৷৷০

শারদীয়া আবাহন প্রবীণ ও তরুণ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প লেখকদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতা ও বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ এই সংখ্যার গৌরব বাড়িয়েছে।

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে :—

**Communist Front In Focus**
অবসন্ন—শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়।
কাচের জানলা—আদ্রীশ বর্ধন।
কালী কীর্তন—শ্রীগণপতি পাঠক।
ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।
নিজে কর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত।
মেঘনীল—অমিত রায়।
স্মৃতিচিত্রণ—পরিমল গোস্বামী।
প্রাণী ও প্রকৃতি—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
ছোটদের অশোক—অতুলানন্দ চক্রবর্তী।
বৃষ্টি যদি আসে—সমীর চৌধুরী।
**A CONCEPT OF PLANNED FREE PRESS—Shiva Chandra Jha.**
**STUDENT UNREST CAUSES AND CURE—Humayun Kabir.**
**PASSENGER TRANSPORT PROBLEM IN CALCUTTA—S. K. Bhattacharyya.**
**INDIA'S FIGHT FOR FREEDOM OR THE SWADESHI MOVEMENT (1905-1906)—Prof. Haridas Mukherjee and Prof. Uma Mukherjee.**
সাহিত্য রুচি—সরোজ আচার্য।
মেঘডম্বর—প্রশান্ত চৌধুরী।
শহীদ স্মৃতি।
ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা—ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
সাগরে হাওরে—শেফালি নন্দী।
নতুন ইয়োরোপ নতুন মানুষ—মনোজ বসু।
সাপের কথা—নরেন্দ্রনাথ রায়।
লাল জুতো ইত্যাদির গল্প—হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডারসেন, অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়—প্রবোধরঞ্জন গুহঠাকুরতা।
ইন্দোচীনের কথা—অজিতকুমার তারণ।
ঝুন-ঝুনে-ঝুনে মিষ্টি ছড়া—মৌমাছি।
শ্রীচৈতন্য-বিজয় বা নাম-মহিমা—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য।
ভারতীয় সমাজ শাস্ত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।




চন্দ্রশেখর

### দেশ দেশ নন্দিত করি

নিউইয়র্কে 'পথের পাঁচালি' প্রদর্শিত হচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই চিত্রজগতের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আনন্দের কথা, 'পথের পাঁচালি' সেখানকার চিত্রামোদী জনসাধারণ ও চিত্রসমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছে।

সেখানকার নানা পত্র-পত্রিকায় 'পথের পাঁচালি'র যে-সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার সারানুবাদ নীচে দেওয়া হলো।

'নিউইয়র্ক পোস্ট' বলেছেনঃ সমস্ত প্রত্যাশার অতীত, অবিস্মরণীয় ও বিশিষ্ট চিত্রের সংখ্যা সামান্য। 'পথের পাঁচালি' সেই জাতের একখানা ছবি। কাহিনীর অবলম্বন একটি দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালী পরিবার। একটি গ্রাম্য জীবনের নানা ঘটনা ছড়িয়ে আছে 'পথের পাঁচালি'তে। নানা-রকম ঘটনা—যেমন, ধারের টাকা শোধ দেওয়া হয়নি যথাসময়ে। একটি শিশু গাছ থেকে ফল চুরি করেছে, একটা গলার হার হারিয়ে গেছে, মা-বাবার ঝগড়া, ঝড়ের দৃশ্য, খানিকটা বদনাম, একটি অসুস্থ শিশু, টাকা রোজগারের জন্যে বাপ গ্রাম-ছাড়া হয়ে দূরে চলে গেলো।

অভিনয়ও হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর, এমন আশ্চর্য সুন্দর যে অভিনয়কে অভিনয় বলেই মনে হয় না যদিও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পেশাদার। কিন্তু এই চিত্রনির্মাতারা অ্যামেচার। এমন কি, 'পথের পাঁচালি' ছবির কাজ একসময় অর্ধপথে বন্ধ হয়ে ছিলো অর্থাভাবে। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়।

'পথের পাঁচালি'র গল্পটি এমন অনাড়ম্বর ও সর্বজনীন যে একে গল্প বলেই মনে হয় না। ভারতীয় ক্ষুদ্র গ্রামের মানুষের সকরুণ অস্তিত্বের ট্র্যাজেডির গভীর, উজ্জ্বল সত্য 'পথের পাঁচালি'তে উপস্থিত। বারংবার দর্শনযোগ্য এই চিত্র ঐশ্বর্যস্বরূপ। 'পথের পাঁচালি'র মধ্যবর্তিতায় পরিচালক সত্যজিৎ রায় বিশিষ্টরূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকদের শ্রেণীভুক্ত হলেন।

'স্ট্যাণ্ডার্ড রিভিউ' লিখেছেনঃ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি'র প্রেরণার উৎস ডি-সিকা, জাঁ রেনোয়া এবং রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি।

সাধারণভাবে দেখলে 'পথের পাঁচালি'র বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উপস্থিত করা যায়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি'তে সাধারণ কাহিনী শোনাতে বসেননি। তাঁর আপন দেশের অগণ্য মানুষের একটি জীবন-যাত্রার দিকে তিনি অন্তর্দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'পথের পাঁচালি'কে এই অর্থে ডকুমেণ্টারি চিত্র বলা যায়, কিন্তু 'ডকুমেণ্টারি চিত্র' বলতে সাধারণত যা বোঝায় 'পথের পাঁচালি' একেবারেই তা নয়। বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ ও সুন্দর 'পথের পাঁচালি' মানবসত্যের ডকুমেণ্টারি।

'হেরাল্ড ট্রিবিউন' বলেছেনঃ 'পথের পাঁচালি' এক অর্থে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অতলস্পর্শ জলাশয়তুল্য। মধুর কবিত্ব ও তিক্ত বাস্তবতার সংমিশ্রণে 'পথের পাঁচালি' অসাধারণ।

'নিউইয়র্ক টাইমস' লিখেছেনঃ 'পথের পাঁচালি' দেখলে প্রত্যয় হয় যে দারিদ্র্য সব-সময় ভালোবাসার প্রতিবন্ধক নয়, প্রত্যয় হয় যে অভাবনীয় অভাবের সংসারেও আনন্দ অপ্রাপ্য নয়। 'পথের পাঁচালি'র সার্থকতার মূলে আছে কয়েকটি সুঅভিনীত কিম্বা বলি সগৃহীত গার্হস্থ্য দৃশ্য। চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্রের কৃতিত্বের পরিমাণ উল্লেখ্য। রবিশংকরের সুন্দর সুর-সংযোজনা এই করুণ কাহিনীকে একটি বিষণ্ণমধুর রসে সার্থকভাবে আপ্লুত রেখেছে।



"পেট্রোল পাম্প" ছবির নায়িকা অনিতা গুহ। বলা বাহুল্য, এটি হিন্দী ছবি এবং বোম্বাইতে তোলা হচ্ছে।





## চিত্রালোচনা

পুজোর হপ্তায় চারখানি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে—একখানি বাংলা ও তিনখানি হিন্দী।

মৈমনসিং গীতিকায় যে প্রণয়কাহিনী অমর হয়ে আছে, তাকেই ভিত্তি করে শ্যামসুন্দর বাণীচিত্রের গীতিমুখর বাংলা ছবি 'লীলা-কঙ্ক' গঠিত হয়েছে। এর মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, সুনন্দা দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অনুপকুমার, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, নবকুমার ও নবাগতা তাপসী রায়। সুরে বৈচিত্র্য এনেছেন এর যুগ্ম সংগীত পরিচালক শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। 'লীলা-কঙ্ক' পরলোকগত পরিচালক সতীশ দাশগুপ্তের শেষ অবদান।

ইণ্ডিয়া সিনে পিকচার্সের হিন্দী ছবি 'জেলার' একটি নতুন ধরনের কাহিনী শোনাবে দর্শকদের। সোহরাব মোদী ছবিখানি পরিচালনা করেছেন এবং এর প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। তাঁর বিপরীতে নেমেছেন গীতা বালী ও কামিনী কৌশল এই দুই বিখ্যাত অভিনেত্রী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন অভি ভট্টাচার্য, ডেজি ইরানী, নানা পলসিকর, প্রতিমা দেবী, প্যারো প্রভৃতি। মদনমোহনের দেওয়া সুর এই ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

চন্দ্রা ফিল্মসের 'সোলবাঁ সাল' তরুণ সমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। দেব আনন্দ ও ওয়াহিদা রেহমান এই ছবির নায়ক-নায়িকা। বিপিন গুপ্ত, সুন্দর, কাম্মো, জগদেব, শীলা ভাজ প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। রাজ খোসলা এর পরিচালক। শচীন দেব বর্মনের সুরে 'সোলবাঁ সাল' সমৃদ্ধ।

নায়েগ্রা পিকচার্সের 'টেন ও'ক্লক' বা 'দশ বাজে' গেল হপ্তার বদলে এই হপ্তায় মুক্তি পাচ্ছে। এর ভূমিকালিপিতে আছেন গীতা বালী, সুরেশ, শেখ মুখতার, মির্জা মুশরফ, ইয়াকুব, মারুতি ও ডেজি ইরানী। যুগলকিশোর ছবিটি পরিচালনা করেছেন। রাম গাঙ্গুলী এর সংগীত পরিচালক।

• • •

পুজোর মরসুমে অনেকগুলি নতুন ছবির গোড়াপত্তন হয়েছে।

গত মহালয়ার দিন প্রার প্রোডাকসন কালীঘাট মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁদের প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'মধুমিতা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত করেন। বুদ্ধ স্মৃতি-পূত সারনাথ ছবিটির ঘটনাস্থল। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রমেন ঘোষ।

ঐদিনই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে জি বি প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'বিজয় বিরস'-এর মহরৎ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় এর কাহিনী লিখেছেন। ইউ সি এর পরিচালক।

সুপার আর্ট ফিল্মস্ নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান ১৪ই অক্টোবর থেকে তাঁদের হিন্দী ছবি 'পী কে পঠে পর'-এর শুটিং আরম্ভ করেছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ডি কে চ্যাটার্জি ছবিটি পরিচালনা করছেন।

১৫ই অক্টোবর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এন সি এ প্রোডাকসন্সের 'হাসপাতাল'-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমারকে এর মুখ্যাংশে দেখতে পাওয়া যাবে। এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন



শ্যামসুন্দর বাণীচিত্রের সদ্যোমুক্ত ছবি "লীলা-কঙ্ক"এর একটি ভয়-চকিত দৃশ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য ও জনৈক বালক-অভিনেতার সঙ্গে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

যথাক্রমে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়।

**ফরমুলার ফেরে উত্তম-সুচিত্রা**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কোনো রচনাকে অবলম্বন করে 'ইন্দ্রাণী'র আগে কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয় নি। সেদিক থেকে 'ইন্দ্রাণী' অবশ্যই আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে।

'ইন্দ্রাণী'র রচনাকাল সাম্প্রতিক নয়। ইন্দ্রাণীতে যে হৃদয়বেদনা প্রতিফলিত তা কোনোকালেই পুরোনো হবার নয়, কিন্তু ইন্দ্রাণীর বহিরঙ্গে যে-বাস্তব উপস্থিত বর্তমানকালে তার প্রভাব যৎসামান্য।

ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মণ কন্যা। তার বাবা রাজীবলোচন অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির এবং সনাতন হিন্দুধর্মে তাঁর বিপুল আস্থা। মফস্বল শহরের বাসিন্দা রাজীবলোচন মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার এই কর্মের পিছনে তাঁর অন্তরের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিলো না। লেখাপড়ায় ইন্দ্রাণীর অত্যধিক ঝোঁক, তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই মেয়ের উচ্চশিক্ষায় মত দিতে হয়েছিল তাঁকে।

একটি মেয়ের মারফত ইন্দ্রাণীর পরিচয় ঘটলো একটি অব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে। যুবকটির নাম সুদর্শন দত্ত। সেই পরিচয় ঘনিষ্টতর হতে হতে প্রেমে পরিণত হলো। তারপর ইন্দ্রাণী সাব্যস্ত করলো, সুদর্শনকে সে বিয়ে করবে।

কিন্তু হায়, এম এ-তে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হলেও সুদর্শন বেকার। ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করতে সুদর্শনের সাহস হয় না।

কিন্তু সাহস বটে ইন্দ্রাণীর। রাজীবলোচনকে ইন্দ্রাণী বিয়ের কথা জানালো, শুনে তো তিনি মহাক্ষিপ্ত। মেয়ের সঙ্গে রাজীবলোচন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন।

এদিকে সুদর্শন তার মাকে বলতেই পারেনি বিয়ের কথা।

শেষপর্যন্ত দুজনে রাঁচি চলে গেলো এবং সেখানে তাদের বিয়ে হলো। ফিরে এসে দুজনেই অনুভব করলো যে সুদর্শনের বাড়ির সকলে এই বিয়েতে প্রসন্ন হয়নি।

দুজনের পক্ষেই ক্রমে ক্রমে বাড়ির আবহাওয়া অসহ্য হয়ে উঠলো।

এইসময়ে দিনাজপুরের এক স্কুলে সহকারী হেডমিস্ট্রেসের কাজ পেয়ে গেলো ইন্দ্রাণী। আর ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দিনাজপুর চলে এলো সুদর্শন।

এখানে ইন্দ্রাণী ডুবে গেলো কাজে, কিন্তু সুদর্শনের কাজ কোথায়? না, তার কোনো কাজ নেই। সে অকর্মণ্য। সুদর্শনের সব গেছে, কিন্তু ভালোবাসা যায়নি। ইন্দ্রাণীর প্রতি এখনো তার অপার ভালোবাসা।

কিন্তু ইন্দ্রাণী? ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে এখনো কি সেই ভালোবাসা আছে? সেই ভালোবাসা কি তিল-তিল করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না? যাচ্ছে বৈকি।

ইন্দ্রাণীর অবজ্ঞা সুদর্শন সইতে পারলো না। সুদর্শন পালিয়ে এলো দিনাজপুর থেকে। চলে এলো কলকাতায়। সেখানে সুদর্শনের সঙ্গে পরিচয় হলো মাস্টারমশায়ের। মাস্টারমশায় একজন আদর্শবাদী বৃদ্ধ।

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে সুদর্শন চলে এলো শালবনীতে। কাজের মধ্যে ডুবে গেলো সুদর্শন। চাকরি নয়, আরেকরকম কাজ। আর এই কাজের ফলে সুদর্শনের নাম ছড়িয়ে পড়লো দিগ্বিদিকে। সুদর্শনের খ্যাতি ইন্দ্রাণীরও কানে গেলো।

কর্মী সুদর্শনের খ্যাতির খবর কানে যেতেই ইন্দ্রাণী চাকরি-টাকরি ছেড়ে দিয়ে ছুটে এলো শালবনীতে। কিন্তু হায়, পুরোনো অবজ্ঞার কথা ভেবে সুদর্শন তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করে দিলো।

ইন্দ্রাণীর ফিরে যাবার মুখেই ঘটলো দুর্ঘটনা। শালবনীতে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেলো। এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পরিশেষে ইন্দ্রাণী আর সুদর্শনের মিলন হয়ে গেলো।

• • •

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অব-

লম্বনে 'ইন্দ্রাণী' নিবেদন করেছেন এইচ এম সি প্রোডাকসন্স। 'ইন্দ্রাণী'র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা করেছেন নীরেন লাহিড়ী। চিত্রের প্রথমার্ধের গতি মোটের উপর প্রশংসনীয়। কিন্তু শেষার্ধে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যৌথভাবে যে-সমস্ত প্যাঁচ কষে দর্শকদের ঘায়েল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, সে-সমস্ত কৌশল বাবা আদমের আমলের। শালবনীকে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত আদর্শবাদ সংযোগশূন্য নিষ্ফলতার সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে, তাতে কাহিনী একবিন্দু এগোয়নি, পরন্তু এই অতিনাটকীয়তা রুচিশীল দর্শকমাত্রেরই পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেবলমাত্র শালবনীর কথাই বা বলি কেন? অসংগতি ও পরিচ্ছন্নতার অভাব 'ইন্দ্রাণী'র চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য। বেকার



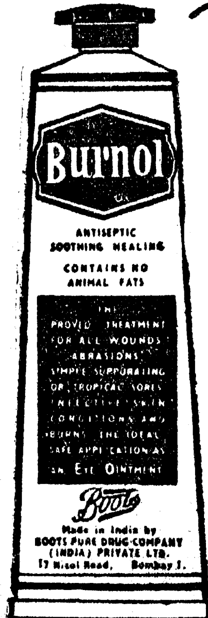










সুদর্শন প্রেমিকা ইন্দ্রাণীকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে, আর বেকার সুদর্শন নানাবিধ খাদ্যবস্তুর অর্ডার দিয়েছে। এক-জন বেকারের পক্ষে যদি ওরকম নবাবী অর্ডার দেওয়া হয় তাহলে আর বেকার হওয়ায় দুঃখ কি? বস্তুত ঐ অর্ডারের বহর দেখলে প্রত্যয় হয়, ঐ অর্ডার সুদর্শন দিচ্ছে না, স্বয়ং উত্তমকুমারই দিচ্ছেন।

কিন্তু 'ইন্দ্রাণী'র হিন্দীচিত্রসুলভ একটি গুণ আছে। একশ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে যা-যা আয়োজনের প্রয়োজন একমাত্র নৃত্য বাদে 'ইন্দ্রাণী'তে তার প্রায় সবটুকুই নির্লজ্জভাবে উপস্থিত 'ইন্দ্রাণী'তে সম্পূর্ণ অকারণে একখানা হিন্দী গান পর্যন্ত শোনানো হয়েছে।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন দুজনেই প্রত্যাশিত অভিনয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। তবে একই ধরনের চরিত্রে বারবার পরস্পরের জুটি হওয়ায় এ'দের অভিনয় একটু একঘেয়ে হয়ে পড়ছে। ছবির পর্দায় এ'দের দুজনকার জনপ্রিয়তা আজ অবিসম্বাদী। সেই জন-



প্রভাত প্রোডাকসানের "বিচারক" চিত্রের নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

প্রিয়তা আরো বাড়িয়ে তুলতে এই দুই কৃতী শিল্পীর জন্যে আজ নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে না—এটা পরিতাপের কথা।

মাস্টার মশায়ের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস এবং রাজীবলোচনের ভূমিকায় নেমেছেন পাহাড়ী সান্যাল। দুজনেই চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। কিন্তু একেবারে হতাশ করেছেন ইন্দ্রাণীর বান্ধবীর ভূমিকায় নমিতা সিংহ। অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ ও কৃত্রিমতাপূর্ণ তাঁর অভিনয়। উল্লেখের অবকাশ না থাকলেও অন্যান্য চরিত্রাভিনয় যথাযথ।

চলচ্চিত্রায়ণে ও শব্দানুলেখনে যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী ও দেবেশ ঘোষ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজও বেশ পরিচ্ছন্ন। সম্পাদক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট নির্মম, কিম্বা বলি নহৃদয় হননি বলে 'ইন্দ্রাণী'র অকৃতিত্বের জন্যে তাঁকেও অংশত দায়ী করি।



কুমারী জয়শ্রী সাহা। সেতারে এ'র দক্ষতা উল্লেখযোগ্য

সংগীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ। মোট সাতখানি গান আছে 'ইন্দ্রাণী'তে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গীত হলেও, গানগুলি সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে তৃপ্তিকর। গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত-কুমার, গীতা দত্ত (রায়) ও মহম্মদ রফী। সংগীত পরিচালক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

### হাওড়ায় নাটক সম্মেলন

হাওড়া যুব-সভা আয়োজিত নাটক সম্মেলন ৫ই থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। ৫ই, ১১ই এবং ১২ই অক্টোবর যথাক্রমে শিল্পী মহলের প্রযোজনায় গিরীশচন্দ্রের 'বিল্ব-মঙ্গল', যুব-সভার প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এবং রূপতীর্থের প্রযোজনায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। ৬ই থেকে ১০ই অক্টোবর



সমরেশ বসুর "গঙ্গা"কে ছবির পর্দায় রূপ দিচ্ছেন পরিচালক রাজেন তরফদার। এতে গামুলি পাঁচির ভূমিকায় উদীয়মানা চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়কে দেখা যাবে।

এই পাঁচদিনে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ৯৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত হন:—

পাণ্ডুলিপি: প্রথম ও দ্বিতীয়—'বাঁশী'র নাট্যকার সুধীন বসু ও 'লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট'-এর নাট্যকার কল্যাণ বসু। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী: পুবালী সংঘের সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নমিতা চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জাকার: সি এম ইসঃ ডিপার্টমেণ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালক সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। আলোক সম্পাতে প্রথম ও দ্বিতীয়: 'শিল্পী মহাদেব' অনন্ত মিত্র ও সি এম ইসঃ ডিপার্টমেণ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের কালী ভট্টাচার্য। সমষ্টিগত অভিনয়ে প্রথম ও দ্বিতীয়: 'মহাস ও মহুয়া' অভিনয়ের জন্য সি এম ইসঃ ডিপার্টমেণ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং 'অম্ল-মধুর' অভিনয়ের জন্য পুবালী সংঘ।

প্রথম ও শেষ অধিবেশনে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীতুলসী লাহিড়ী।

## নূতন রেকর্ড

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"

পি-১১৯৩৩—"কথা দিয়ে এলেনা" ও "ফুটালে ফুল" আধুনিক গান—গেয়েছেন কুমার শচীন দেববর্মণ। এন্ ৮২৭৯৫—দুখানি রবীন্দ্র সংগীত "সকালবেলার কুঁড়ি আমার" ও "মেঘের পরে মেঘ জমেছে"—গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র। এন্ ৮২৭৯৬—মান্না দের গান "এজীবনে শত বাধা" ও "আমি সাগরের বেলা" এন্ ৮২৭৯৭—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "এই নিরালা সাগর-বেলায়" ও "জীবনের এই যে মধুর"। এন্ ৮২৭৯৮—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান "ও রাজকন্যে" ও "চম্পা কলি"। এন্ ৮২৭৯৯—বাণী ঘোষালের গাওয়া "জল টলমল" ও অরুণ বরণ কিরণমালা। এন্ ৮২৮০০ কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের অতুল প্রসাদী গান "মোরা নাচি ফুলে ফুলে" ও "যখন তুমি গাওয়াও গান"। এন্ ৮২৮০১ আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া "বকুল গন্ধে বান" ও "ছোট্ট পাখী চন্দনা"—। এন্ ৮২৮০২ "দুর্গোৎসব" ও "দেওয়ালী"কে গানে রূপায়িত করেছেন অমর সিংহ। এন্ ৮২৮০৩ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান "ঐ দূর আলেয়ার" ও "তুমি যে আমার"। এন্ ৮২৮০৪ "চোখের নজর কম হ'লে" ও "কার মঞ্জীর বাজে" শ্যামল মিত্রের, গাওয়া দুখানি গান। এন্ ৮২৮০৫ ভানু বন্দোঃ ও তপতী ঘোষ অভিনীত কৌতুক নাটিকা "লেডী টাইপিষ্ট"। এন্ ৮২৮০৬ তালাত মামুদের কণ্ঠে আধুনিক গান "এলো কি নতুন" ও "সুন্দরতর তুমি"।

কলম্বিয়া

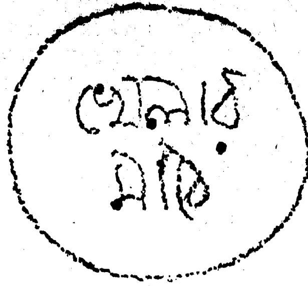
জীঈ ২৪৯০৫ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে আধুনিক ও রাগপ্রধান গান "তোমার ভালো" ও "চামেলী মেলনা আঁখি"। জীঈ ২৪৯০৬ "মরমী গো" ও "এই নদীতীরে" আধুনিক গান দুটি রূপায়িত করেছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। জীঈ ২৪৯০৭ পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শ্যামা-সংগীত। জীঈ ২৪৯০৮ গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে গান "যেন গোলাপ হায়" ও "আমরা সন্ধ্যা প্রদীপ"। জীঈ ২৪৯০৯ গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমূলক গান "দেহি দেবী দরশন" ও "দিলেনা দিন"। জীঈ ২৪৯১০ ইলা চক্রবর্তীর গাওয়া "এতো কাছে পেয়েছি" ও "ঐ কোকিল শোনায়"। জীঈ ২৪৯১১ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান "দুরন্ত ঘূর্ণির" ও "পথ হারাবো বলেই"। জীঈ ২৪৯১২ লতা মঙ্গেশকরের গান "ওপলাশ ও শিমুল" ও "প্রেম একবারই এসেছিল"। জীঈ ২৪৯১৩ আশা ভোঁসলের গাওয়া আধুনিক গান "তোমার মনের সুধা" ও "আমার জীবনে তুমি"। জীঈ ২৪৯১৪ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান "চাঁদ ভাবে" ও মেঘলা ভাংগা রোদ"। জীঈ ২৪৯১৫ গীতা দত্তের গাওয়া "ফুলের বনে লাগলো" ও "একটু চাওয়া আর একটু পাওয়া"। জীঈ ২৪৯১৬ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "সাতনরীহার" ও "চম্পা শোন শোন"।

কয়েকদিন আগে দিল্লীতে ন্যাশন্যাল স্পোর্টস ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সুইমিং পুলে ভারতের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতাও শেষ হয়ে গেল। কয়েকদিনের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত



১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে নতুন রেকর্ড সৃষ্টিকারী লাল্ বাজাজ

এই দুই সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভারতের সাঁতারুরা যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তা মনে রাখবার মত। অবশ্য আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে এর আগে অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাওয়া গেছে, রেকর্ডও সৃষ্টি হয়েছে বেশী। কিন্তু জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার যত বেশী রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে এর আগে আর




**একলব্য**

কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে এত বেশী রেকর্ড হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

সবসুদ্ধ এবার ১৩টি বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন জাতীয় রেকর্ড। এর মধ্যে পুরুষদের বিষয়ে রেকর্ডের সংখ্যা এগারো আর মহিলাদের বিষয়ে দুই। পুরুষদের ১৪টি বিষয়ের মধ্যে ১১টি বিষয়ে নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সাঁতারুদের উন্নত সাতার-মানের পরিচায়ক। কয়েকটি সাঁতারু আগের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। কেউ কেউ 'হিটে' নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করে আবার সেই রেকর্ডকে ম্লান করেছেন ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়। সুতরাং যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক এবারকার অনুষ্ঠানে ভারতীয় সাঁতারুদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন উঠতে পারে এত নৈপুণ্য সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সাঁতার ক্ষেত্রে আমাদের স্থান কোথায়? এর উত্তরে বলতে হয় কোথাও নয়। সত্যই আন্তর্জাতিক সাঁতার ক্ষেত্রে আমাদের কোন স্থান নেই। আমাদের জাতীয় রেকর্ডের সঙ্গে অলিম্পিক বা বিশ্ব রেকর্ডের কোন তুলনাই চলে না। অলিম্পিক বা বিশ্বমানের চেয়ে আমরা এখনো অনেক নীচুতে। আমাদের দেশের পুরুষ সাঁতারুদের রেকর্ড মহিলাদের অলিম্পিক বা বিশ্ব রেকর্ডকেও স্পর্শ করতে পারেনি। তবু বলি গত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে সাঁতারক্ষেত্রে আমরা প্রভূত উন্নতি করেছি।

বিশ্বমানের তুলনায় সাঁতারে আমাদের মান অনুল্লেখযোগ্য সত্য কথা। কিন্তু এক হকি খেলা ছাড়া খেলাধূলার কোন বিষয়েই-বা আমাদের মান উল্লেখযোগ্য? তবুও অন্যান্য খেলাধূলার উন্নতির জন্য আমরা নানাভাবে চেষ্টা করেছি কিন্তু সাঁতারের জন্য



২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে নতুন রেকর্ডের অধিকারী রূপচাঁদ

কি করেছি? সাঁতারের উন্নত কলাকৌশল শেখাবার জন্য আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে কোন 'কোচ' আনা হয়নি যদিও অন্যান্য খেলাধূলোর জন্য রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্যন্ত বহু বিদেশী 'কোচ' ভারত সফর করে গেছেন। দেশে সাঁতার শেখার 'পুলের' নিতান্ত অভাব। এক বোম্বাই, দিল্লী ও আর দুই এক জায়গায় ছাড়া আর কোথাও সাঁতার শেখার বিজ্ঞানসম্মত সুইমিং পুল নেই। সরকারের তরফ থেকে সাঁতার প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এত অসুবিধা সত্ত্বেও সাঁতারে আমরা যেটুকু উন্নতি করেছি তা অভাবনীয়। গত পাঁচ বছরে আমরা সাঁতারে কতখানি উন্নতি করেছি ইতোপূর্বে 'দেশের' পাতায় তার আলোচনা করা হয়েছে। এবারের অনুষ্ঠানে আমরা আর কতখানি এগিয়েছি তুলনামূলক রেকর্ডের খতিয়ান থেকে তা অনুমান করাও কষ্টসাধ্য হবে না।

অ্যাথলেটিক স্পোর্টস বা সাঁতারে এক, আধ বা সিকি সেকেণ্ড সময় উন্নত করতে যেখানে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় কঠিন সাধনার সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী সময় উন্নত করা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। এবারকার জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে।

* * *

এবারকার জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল সমেত ভারতের ১২টি রাজ্য যোগ দিয়েছিল এবং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী সাঁতারুর সংখ্যা ছিল দু'শর কিছু কম। অন্য কোনবার এত বেশী রাজ্য এবং এত বেশী সাঁতারু জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেনি। তাই দিল্লীতে এই সাঁতার উপলক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী তিনদিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

আগেই বলেছি পুরুষদের ১৪টি বিষয়ের মধ্যে ১১টি বিষয়ে এবার নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামরিক বিভাগের সাঁতারুরাই বেশী রেকর্ড করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তারা রেকর্ড করেছেন ছয়টি বিষয়ে। এর পরই বোম্বাইয়ের স্থান। বোম্বাইয়ের সাঁতারুদের রেকর্ডের সংখ্যা চার। আর বাকী একটি বিষয়ের রেকর্ড করেছেন বাঙলার উদীয়মান সাঁতারু অরুণ



১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড সৃষ্টিকারী সাঁতারু রাম সিং

সাহা। মহিলাদের বিভাগে অবশ্য বেশী রেকর্ড হয়নি। যে দুটি বিষয়ে রেকর্ড হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন বাঙলার মেয়েরা। সামরিক বিভাগের সাঁতারুরা, মোট ৯৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে। ৪৭ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে বোম্বাই রাজ্য দল। ১৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করায় বাঙলার স্থান হয়েছে তৃতীয়। তবে মেয়েদের প্রতিযোগিতায় বাঙলার স্থান সবার উপরে। বাঙলা ৪৫ বোম্বাই ১১ ও দিল্লী ৩ পয়েন্ট পেয়ে যথাক্রমে লাভ করেছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। বোম্বাই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে প্রধানত সাঁতার পটিয়সী ডলী নাজিরের একক কৃতিত্বেই বোম্বাই এতদিন মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে আসছিল। এবার প্রথমদিন বাঙলার দীর্ঘদেহী মহিলা সাঁতারু কল্যাণী বসুর কাছে ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে মা'র খাবার পর ডলী নাজির আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সাঁতারে নৈপুণ্য দেখাবার দিনও তাঁর অতীত হয়ে গেছে। ফলে বোম্বাইও বাঙলার অনেক পেছনে পড়েছে। বাঙলার মেয়েরা এবারকার জাতীয় সাঁতারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে সন্ধ্যা চন্দ্র ও কল্যাণী বসু যেভাবে অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে সন্ধ্যা চন্দ্র ডলী নাজিরের ভারতীয় রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। আর কল্যাণী বসু ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে দেখিয়েছেন অপূর্ব কৃতিত্ব। ২০০ মিটারের যখন শেষ ৫০ মিটার বাকী তখনও কল্যাণী বসু চতুর্থ স্থানে সাঁতার কাটছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ের

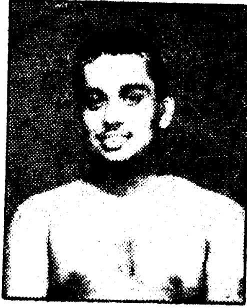


মেয়েদের ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে নতুন রেকর্ড করেছেন বাঙলার রিলে টীমের ৪ জন—সন্ধ্যা চন্দ্র, গীতা দে, কল্যাণী বসু ও অনুরাধা গুহঠাকুরতা

ফেণী মিস্ত্রিকে, পরে বাঙলার সন্ধ্যা চন্দ্রকে এবং শেষে ডলী নাজিরকে পেছনে ফেলে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন।

বাঙলা ও বোম্বাই দলের মধ্যে ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সতীব্র উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করা গেছে এর আগে জাতীয় ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার কোন খেলায় এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করা যায় না। উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং দর্শকদের আনন্দরোলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বাঙলা বোম্বাইকে পরাজিত করেছে ৬—৫ গোলে।

ভারতের অ্যাথলেটিক ক্ষেত্রে সামরিক প্রতিনিধিদের শ্রেষ্ঠত্ব বহুদিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত। সাঁতারেও তাঁরা কয়েক বছর ধরে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাম সিং, রূপচাঁদ, রাম দেও সিং প্রত্যেকেই এক একজন দক্ষ সাঁতারু। বোম্বাইয়ের এল বাজাজ এবং সুভাষ লাঠির নৈপুণ্যও এবার কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। বাঙলার অরুণ সাহার মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল নিশানা। একজন দক্ষ কোচের অধীনে এঁদের নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এঁদের পক্ষে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছন খুব কষ্টসাধ্য নয় বলেই মনে করি। আশা করি ভারতের সাঁতার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ কথাটা ভেবে দেখবেন।



১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে নতুন রেকর্ডের অধিকারী অরুণ সাহা

নীচে জাতীয় সাঁতারে যে যে বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হল।

### রেকর্ডের খতিয়ান

১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—এল বাজাজ (বোম্বাই) সময় ১ মিনিট ০·৩ সেকেণ্ড; আগের রেকর্ড—এস বাজাজ (বোম্বাই) ১ মিনিট ০·৪ সেকেণ্ড।

১৫০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—হাবিলদার রাম সিং (সার্ভিসেস) সময় ২০ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—হাবিলদার গঙ্গেশ্বর রায় (সার্ভিসেস) ২১ মিনিট ৪·৭ সেকেণ্ড।

১০০ **মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক**—লেঃ নায়ক রাম দেও সিং (সার্ভিসেস) সময় ১ মিনিট ১৮·৮ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—রঘুপৎ সিং (সার্ভিসেস) ১ মিনিট ২১·৩ সেকেণ্ড।

২০০ **মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক**—লেঃ নায়ক রামদেও সিং (সার্ভিসেস) সময়—২ মিনিট ৪১·৭ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—সামসের ●া (সার্ভিসেস) ৩ মিনিট ০৪ সেকেণ্ড।

১০০ **মিটার ব্যাক স্ট্রোক**—এল বাজাজ (বোম্বাই) সময়—১ মিনিট ১১·৮ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—এল বাজাজ (বোম্বাই) ১ মিনিট ১২·৪ সেকেণ্ড।

২০০ **মিটার ব্যাক স্ট্রোক**—রূপ চাঁদ (সার্ভিসেস), সময়—২ মিনিট ৪১·৩ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—এল বাজাজ (বোম্বাই) ২ মিনিট ৪২·৩ সেকেণ্ড।

১০০ **মিটার বাটার ফ্লাই স্ট্রোক**—অরুণ সাহা (বাঙলা), সময়—১ মিনিট ১২·৪ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—এস জি লাঠি (বোম্বাই) ১ মিনিট ১৪·৭ সেকেণ্ড।

২০০ **মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক**—এস জি লাঠি (বোম্বাই) সময় ২ মিনিট ৫২ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—এস জি লাঠি (বোম্বাই) ২ মিনিট ৫৫·৩ সেকেণ্ড।

৪×১০০ **মিটার রিলে**—বোম্বাই (মোনেকর, লাঠি, বিনি ও বাজাজ) সময় ৪ মিনিট ২৩·২ সেকেণ্ড।

৪×১০০ **মিটার মেডলে রিলে**—সার্ভিসেস, সময়—৪ মিনিট ৫২·৩ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—বোম্বাই ৫ মিনিট ১·৬ সেকেণ্ড।

৪×২০০ **মিটার রিলে**—সার্ভিসেস, সময় ১০ মিনিট ১০·৮ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—১০ মিনিট ১১·৪ সেকেণ্ড।

**মহিলাদের**

১০০ **মিটার ব্যাক স্ট্রোক**—কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (বাঙলা), সময়—১ মিনিট ২৯·৫ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—ডলি নাজির (বোম্বাই) ১ মিনিট ৩৫·৬ সেকেণ্ড।

৪×১০০ **মিটার রিলে**—বাঙলা (সন্ধ্যা চন্দ্র, অনুরাধা গুহঠাকুরতা, গীতা দে ও কল্যাণী বসু), সময়—৬ মিনিট ১৭·৭ সেকেণ্ড; **আগের রেকর্ড**—বাঙলা—৬ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড।




## দেশী সংবাদ

৭ই অক্টোবর—বারাকপুর ট্রাংক রোডের নিকটে এক জায়গায় কলিকাতা কর্পোরেশনের ৫০ ইঞ্চি ব্যাসাধের পলতা-টালা জলের পাইপ ফুটো হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল হায়দরাবাদে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় পরিবহন দপ্তর কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর পর্যন্ত একটি "জাতীয় মহাসড়ক" নির্মাণের জন পাঁচ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য এক শত মাইল।

৮ই অক্টোবর—দিল্লীর রাজনৈতিক মহল পাকিস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, কতিপয় সরকারী কর্মচারী রাজনীতিকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সেনাবাহিনীর সহায়তায় এই বিপ্লব ঘটাইয়াছেন।

আজ করাচী হইতে বোম্বাই-এ প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে, সরকারী মহল করাচীস্থিত বৈদেশিক সংবাদদাতাদের জানাইয়াছেন যে, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকিবে।

৯ই অক্টোবর—অদ্য রাত্রে করাচী হইতে নয়াদিল্লীতে আগত ব্যক্তিদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, মঙ্গলবার রাত্রিতে পাকিস্থানের সংবিধান বাতিল হইবার এবং সামরিক আইন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে শ্রীফিরোজ খাঁ নুন ও তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ কার্যত করাচীতে স্ব স্ব গৃহে অন্তরীণ আছেন।

কানাডার অর্থমন্ত্রী শ্রীডোনাল্ড ফ্লেমিং অদ্য নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব পূরণের উদ্দেশ্যে গম ক্রয়ের জন্য কানাডা ভারতবর্ষকে ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ দানের প্রস্তাব করিয়াছে।

১০ই অক্টোবর—অদ্য কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক সভায় বিরোধী পক্ষের জনৈক কাউন্সিলার এইরূপ অভিযোগ করেন যে, গত তিন বৎসর ধরিয়া গ্যাস কোম্পানী হইতে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী অফিসারদের কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র তাঁহাদের স্থলে এমন সব অবাঙ্গালীকে নিয়োগ করা হইতেছে, "যাহাদের গ্যাস সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই।"

১১ই অক্টোবর—জাপানের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কারী ব্যাঙ্ক অব টোকিওর প্রেসিডেণ্ট শ্রী এস হোরী আজ বোম্বেতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন যে, জাপান ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য সত্বর ভারতকে ৫ কোটি মার্কিন ডলারের সমমূল্যের ইয়েন নূতন ঋণ হিসাবে দিবে।

১২ই অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিকদের এক বিরাট সমাবেশে ৮০ মিনিটকাল বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্থানে সামরিক আইন জারী শুধু পাকিস্তান নহে, প্রতিবেশী বা দূরদেশী সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

১৩ই অক্টোবর—পশ্চিম জার্মানীর অর্থ-নৈতিক মন্ত্রী ডাঃ লুডউইক এরহার্ড আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সমাবেশে প্রকাশ করেন যে, ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে ৬৫ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যক, তজ্জন্য তাঁহার দেশ ৬ কোটি ডলার সাহায্য (ঋণ) দিবে।

কলিকাতায় এবার প্রায় পাঁচ শত সর্বজনীন দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইবে। পুলিস মহলে প্রাপ্ত হিসাব হইতে উহা জানা যায়। সর্বজনীন পূজা-উৎসব, যাহাতে নির্বিঘ্নে ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য কলিকাতা পুলিস কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক পূজা সংযোগসাধন কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

৭ই অক্টোবর—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন অদ্য একদিনে দুইবার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন। প্রথমবার তিনি ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দীর পরিচালিত আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিবর্গকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার তাঁহাদের বাদ দিয়া আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

৮ই অক্টোবর—পাকিস্থান মন্ত্রিমণ্ডলীতে গুরুতর সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা সমগ্র পাকিস্থানে সামরিক আইন জারী করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলিকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট সংবিধানও নাকচ করিয়াছেন এবং পাকিস্থান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খাঁকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

৯ই অক্টোবর—পাকিস্থানে মুখ্য সামরিক আইন আডমিনিস্ট্রেটর গতকল্য সামরিক প্রশাসন বিধান বলে এক আদেশ জারী করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে কেহই লুঠতরাজ বা ডাকাতিতে লিপ্ত হইবে, সরকারী বা জন-সাধারণের সম্পদ বিনষ্ট করিবে, চলতি আদেশ-সমূহ লঙ্ঘন করিয়া খাদ্যশস্য মজুত করিবে, শিশু চুরি করিবে বা সামরিক প্রশাসন-বিধিবলে প্রদত্ত অন্যান্য আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে সর্বোচ্চ দণ্ড হিসাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

১০ই অক্টোবর—পাকিস্থান সামরিক শাসনের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ছাত্ররা গত বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাকিস্থানে সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ। এই বিক্ষোভ নির্মমভাবে দমন করিয়া সমস্ত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১১ই অক্টোবর—পাকিস্থান বেতারের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানের সমস্ত ব্যাঙ্ককে সমস্ত রাজনৈতিক দলের অর্থ আটক বলিয়া গণ্য করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

মার্কিন বিমান বাহিনী অদ্য ২ লক্ষ ২১ হাজার মাইল দূরবর্তী চন্দ্রলোকের দিকে একটি রকেট প্রেরণ করিয়াছে। গ্রীনউইচ টাইম ১-৪৭ মিনিটে উহা পৃথিবী হইতে ৪৯ হাজার মাইল দূরে রহিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করিয়াছেন।

১২ই অক্টোবর—লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য পাক নিরাপত্তা আইনে পেশোয়ার জেলার চরসাদা তহশীলে অধুনালুপ্ত জাতীয় আওয়ামী লীগের নেতা খান আবদুল গফফর খানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পাক বেতারে প্রচারিত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, অদ্য নিরাপত্তা আইনে জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টের সংবাদে জানা যায় যে, তথায় দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। সৈন্যগণ ও সশস্ত্র পুলিস শহরে টহল দিয়া বেড়াইতেছে এবং জনসাধারণকে রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে নিষেধ করিতেছে।

মোম্বাসা (কেনিয়া) হইতে ৭০ মাইল উত্তরে জীবন্ত অবস্থায় একটি মারমেড বা মৎস্যকন্যা ধরা পড়িয়াছে। মারমেড একপ্রকার স্তন্যপায়ী সমুদ্রজীব। উহাদের মানুষের মত মুখ ও স্তন আছে।

১৩ই অক্টোবর—চন্দ্রলোক অভিমুখে প্রেরিত মার্কিন রকেট "পাইওনিয়ার" চন্দ্রলোকে না পৌঁছিয়াই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দ্রাভিমুখে এক-তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করার পর আজ উহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ঢাকার খবরে প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্থানের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস শ্রী এস এ এইচ এম ইসমাইলকে উক্ত পদ হইতে সরাইয়া তাঁহার স্থলে শ্রীঅনোয়ারুল হককে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার          সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

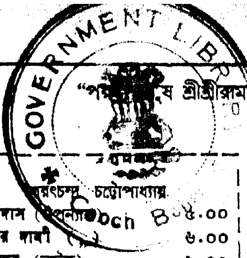
প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

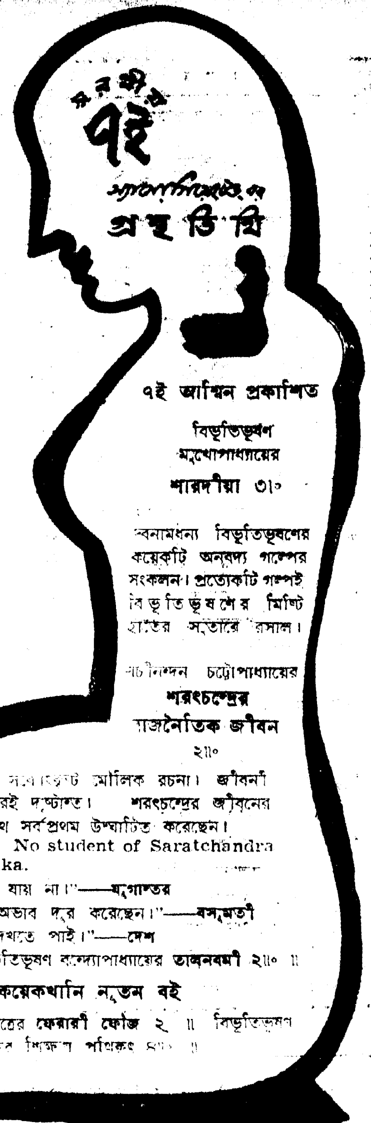
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


GOVERNMENT LIBR
Dbch 8



# সূচীপত্র



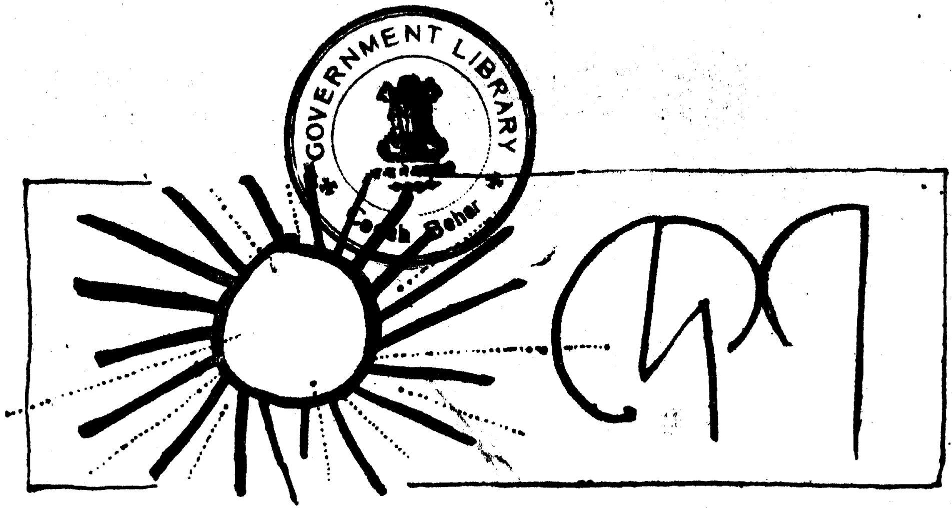


# সূচীপত্র

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


প্রচ্ছদ—শ্রীনন্দলাল বসু




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 1st November, 1958.

২৬ বর্ষ ॥ ১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৫ই কার্তিক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## আমাদের নববর্ষ

পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া "দেশ" পত্রিকা ছাব্বিশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের প্রীতি ও সহায়তা আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়, সেই পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক-বর্গকে আমরা আমাদের নববর্ষের সূচনায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

শতাব্দীর এক পাদকাল মহাকালের হিসাবে হয়ত ক্ষণমাত্র, কিন্তু জাতির জীবনে দীর্ঘ এবং এতখানি আয়ু বহু সাময়িক পত্রিকার পক্ষেই কাম্য। দুই যুগেরও অধিক পূর্বে যাঁহাদের কল্পনায় এই পত্রিকাটি অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের অনেকেই আজ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সম্পাদনা ও পরিচালনা পত্রিকা-টিকে যে বৈশিষ্ট্য এবং অনন্য চরিত্র দিয়াছিল, আমরা তাহারই অক্ষয় উত্তরা-ধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি এবং সাধ্যমত বাকী পথটুকু অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। সেদিনের ক্ষুদ্র অঙ্কুর আজ পল্লবিত, তাহার স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়া জনচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে।

এই দীর্ঘকাল আমাদের জাতীয় জীবনেও ঘটনাবহুল। পত্রিকাটির সূচনায় ছিল পায়ে পায়ে বিঘ্ন, শৃঙ্খলের বিড়ম্বনা; কথায় কথায় শাসকের রক্তচক্ষু, উদ্যত বজ্রমুষ্টি। বিদেশী রাজ-শক্তির হাতে কঠোরতম নিগ্রহেও আমরা দমি নাই, বাঁশী কোন দিন সঙ্গীতহারা হয় নাই। আমাদের আজিকার সগৌরব অস্তিত্বই সেদিনকার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তরণের প্রমাণপত্র। অন্তরে অকম্পিত প্রতিজ্ঞা-শিখা জ্বালিয়া দুঃসাহসী পায়ে আমরা কর্দম ও রুধির মথিত করিয়াছি, অন্তবিহীন পথ পার হইয়া পরশাসনের নিশাবসানে নূতন যুগের সূচনায় পৌঁছিয়াছি।

এই নব যুগের সূত্রপাতে "দেশ" আপনার জন্য নূতন একটি ভূমিকা বাছিয়া লইল। পরাধীনতার কালে রাজ-নীতির দাবীই ছিল বড়, নূতন পর্যায়ে যে সুরটি ধ্বনিত হইল, সেটি প্রধানত সাংস্কৃতিক। জাতির নবজাগরণ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার এই অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃতির প্রতিটি ধারার সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সাফল্যও যে নিতান্ত সামান্য অর্জন করি নাই, তাহার প্রমাণ এই পত্রিকাটির ক্রমোন্নতি, সর্বশ্রেণীর এবং রুচির পাঠকদের প্রগাঢ় প্রীতি। শিল্প ও সাহিত্য, রঙ-রেখা, সুর ও বাণী লইয়া যত সার্থক পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার চিহ্ন এ যুগের "দেশে"র পাতায় পাতায় মিলিবে। চিরন্তনের প্রবাহে ইদানীন্তনের ধারা মিশিয়াছে।

"দেশে"র যখন সূচনা, তখনও রবীন্দ্র-নাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী জীবিত। সেদিন যাঁহারা সাহিত্যের অঙ্গনে নবাগত, তাঁহাদের অনেকেই আজ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষে। ইঁহাদের প্রায় সকলের রচনাই পাঠকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার সৌভাগ্য "দেশে"র হইয়াছে। পরবর্তীকালের সাহিত্যকার-দেরও প্রতিষ্ঠালাভে "দেশ" তাহার সমস্ত শক্তিটুকু দিয়া সহায়তা করিয়াছে। আর, সেই সঙ্গে বহু অপরিচিতের নাম সাহিত্যের অঙ্গনে "দেশ"ই আনিয়াছে, আজও আনে। গত দুই দশকে বাংলা সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলির সহিত প্রথম পরিচয় পাঠকের "দেশে"র মধ্যস্থতায় ঘটে, ইহাও আমাদের বিশেষ গৌরব।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি: দীর্ঘতর পথ সম্মুখে প্রসারিত। বিগত কাল আমাদের গৌরব, আগামী কালের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। পঁচিশ বৎসরের অবসানে এই পত্রিকার জীবনে নূতন যে-অধ্যায় শুরু হইল সেই অধ্যায়ে বৈচিত্র্যের পত্রপুষ্পে তাহার সাজি ভরিয়া উঠুক, শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে যাহা কিছু সুন্দর, সত্য ও প্রাণবান তাহা একত্র গ্রথিত করিয়া পাঠকদের উপহার দিব, আমাদের ঐকান্তিক কামনা এই।

নব-বর্ষের সূচনায় আমরা নির্ভীক নিরপেক্ষতা, সংস্কারমুক্তি এবং নূতনের সন্ধানের সঙ্কল্প নূতন করিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই আরম্ভ শুভ হউক।

অনুরাগী পাঠক, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকবর্গকে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে প্রসঙ্গত দু'চার কথা নিবেদন করি।

গৌরচন্দ্রিকা পুজো প্রসঙ্গ দিয়েই করা ভাল। পুজো শেষ হয়েছে, এ-কথা যদি লিখি একটু খাপছাড়া শোনাবে, সম্ভবত সত্য কথা বলাও হবে না। কেননা, যা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হল দেবীর আবাহন, অর্চনা ও বিসর্জন, কিন্তু শারদোৎসবের প্রধান অঙ্গ মাত্র কয়টি শাস্ত্রীয় আচারই নয়। হলে এর আনন্দ এমন সর্বজনীন হত না। আমাদের এই জাতীয় উৎসবের প্রধান মূল্য সামাজিক। এই ঋতু প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে পুনর্মিলনের। প্রবাসী এই সময়ে ঘরে ফেরেন, আবার ছুটির সুযোগে অনেকে প্রবাসভ্রমণে যান। সেই ছুটি অনেকেরই ফুরিয়েছে, অনেকের আজও ফুরোয়নি। সংগীতের সুরের মত উৎসবেরও রেশ থাকে। সেই রেশের চিহ্ন দেখছি স্বর্ণোজ্জ্বল সকালের আকাশে, হিমকোমল বিকালের বাতাসে। এককথায় একে পুজো-পুজো ভাব বলতে পারি। বহু সর্বজনীন মণ্ডপে নৃত্য, অভিনয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পালা এখনও শেষ হয়নি।

পৌরাণিক কারণটুকু কবেই বিস্মৃত, শারোদৎসবের আসল আনন্দের খনি আছে প্রাকৃতিক পরিবেশে। গ্রীষ্মের সব তাপ, ধূলি আর মলিনতা বর্ষার ধারাজলে ধুয়ে ধুয়ে শরতের শুরুতে প্রকৃতি আবার স্নিগ্ধ হয়, শ্যামল হয়, নতুন হয়। নতুন হওয়ার বাসনা আসে মানুষের মনেও। নব-বস্ত্র সংগ্রহ আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যারা দূরে আছে তাদের স্মরণ করি, যারা কাছে, তাদের নিবিড়তর প্রীতি দিয়ে বাঁধি। শত্রু-মিত্র ভেদ রাখব না, বৎসরান্তে বিজয়ার সংকল্প এই।

এবার, বিশেষ করে কলকাতায়, অকাল-বোধন অকাল-বর্ষণে অভিষিক্ত হয়েছে। রাজপথে অবশ্য জনস্রোতের বিরাম ছিল না, সাজ-সজ্জা বা আলোক-মালার সমারোহেরও অঙ্গহানি ঘটেনি। নানা অঘটন, অস্বাচ্ছল্য সত্ত্বেও আমরা সাংবাৎসরিক হাসিটি মুখে ফুটিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছি রামগরুড়ের ছানাদের সঙ্গে আমাদের অন্তত গোত্রগত কোন মিল নেই।

• • •

পুজো প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে নতুন অর্ডিন্যান্সটির কথা মনে পড়ে গেল। সরকার সস্নেহে নবজাতকের যে নামকরণ করেছেন, তা থেকে অনুমান করি, তাঁদের

# প্রসঙ্গত

আশা, মুনাফালোভী কংসকুল এই নব-বাসুদেবের হাতে অচিরে ধ্বংস হবে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এক সপ্তাহের বেশী কেটে গেছে, এখনও আচরণ দেখে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি না এই শিশুটিকে দিয়ে সরকারের অভীষ্ঠ কতদূর পূর্ণ হবে, বা আদৌ হবে কিনা। এখনও এ নখদন্তহীন পিণ্ডাকৃতি, সম্ভবত সূতিকা কাল কাটেনি বলেই। মাঝে মাঝে হস্তপদাদি সঞ্চালন করে, চীৎকারও শোনা যায়, কিন্তু তার ফলে প্রবীণ-কঠিন ব্যবসাদারী প্রাণে হৃৎকম্প শুরু হবে বলে মনে হয় না।

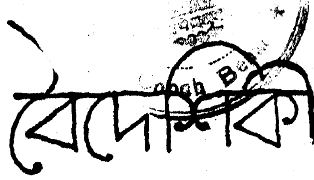
অথচ অর্ডিন্যান্সটি বহু প্রত্যাশিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে হয়ে উঠছে, প্রতিকারের দাবী উত্থিত হয়েছে নানা মহল থেকে, কিন্তু সরকারী তৎপরতার সূত্রটি অত্যন্তই দীর্ঘ, কারণে-অকারণে কাল হরণের পর তাঁরা অর্ডিন্যান্স জারী করলেন, পুজোর ছুটির মধ্যে, বিজয়ার দিনে, সম্ভবত পঞ্জিকায় শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে। সময় নির্বাচনে যেমন নাটকীয়তা স্পষ্ট প্রয়োগ ব্যবস্থায় তেমনই অযত্ন এবং অবহেলা। তৈল তণ্ডুল ইত্যাদির ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া নিষিদ্ধ হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূল্য তালিকা প্রকাশিত হল না, ফলে কি ক্রেতা, কি বিক্রেতা কেউই জানতে পারলেন না, অত্যন্তটা কোন সীমায় পৌঁছলে গর্হিত হয়। মুনাফাবাজী কাগজে কলমে বে-আইনী হল, কিন্তু মজুতদারীর সাজা নির্দিষ্ট হল না, এর সঙ্গে একমাত্র একচক্ষু হরিণের অন্য-মনস্কতা তুলনীয়। ফলে রোগীর পথ্য থেকে শিশুর খাদ্য ইত্যাদি বহু পণ্যই রাতারাতি সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে। মুনাফা সম্পর্কেও শাস্তির যে বিধি প্রচারিত হয়েছে, তা আমাদের মতে অকঠোর—গুরু পাপে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা। আরও বিস্ময় এইখানে যে, এই যৎসামান্য ব্যবস্থা-টুকুকেও কার্যকর করার পথে নানা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা এখনও নাকি সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোকেরই অভাব। ছোট তরফ অর্থাৎ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই অনুচ্চ গলায় বড় তরফকে দোষ দিয়ে বলতে শুরু করেছেন, যে খসড়াটি তাঁরা পেশ করেছিলেন, তার নলচেটি যদিও ঠিক আছে কিন্তু খোল শতচ্ছিদ্র হয়ে তাঁদের হাতে ফেরত এসেছে। বড় তরফ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার হয়ত এই অভিযোগের একটা জবাব দেবেন। কথা কাটাকাটির প্রহসনটা জমত ভাল, যদি বিষয়টি সামান্য হত, কিন্তু সমস্যাটা যাদের মুখের অন্নের, হাততালি দিয়ে বাহবা জানাতে তাদের হয়ত রুচি হবে না। এমন কি তারা নির্বাক হয়ে চিরকাল দর্শকের আসনে না-ও বসে থাকতে পারে, অব্যবস্থিত চিত্ত উভয় পক্ষ কথাটা স্মরণে রাখলে ভাল করবেন।

* * * *

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আসন্ন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজনের কথা উল্লেখ না করলে এবারের প্রসঙ্গ কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান সাধনার পথিকৃৎ হিসাবে জগদীশচন্দ্রের কীর্তি চিরস্মরণীয়। বর্তমান বাংলার যুব সমাজের কাছে এই পরম বিজ্ঞানীর জীবন ও সাধনার একটা দিক বিশেষ-ভাবে তুলে ধরবার প্রয়োজন আছে। সে-দিক তাঁর অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা ও বীর্য-বত্তার দিক। প্রথম জীবনে সাধনার পথে যে অপরিসীম প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে যেভাবে তিনি জয়ী হয়েছিলেন, তার বিবরণ এই উৎসব উপলক্ষে প্রচারিত হলে বর্তমানের এই নিরাশার অন্ধকারেও কেউ কেউ হয়ত আশার আলো দেখতে পাবেন।

শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে শুধু স্মরণই করব না সেই সঙ্গে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর অসাধারণ সাফল্যের মূল সূত্রও অনুসন্ধান করব।

জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ। প্রত্যক্ষভাবে যদিও তিনি কোন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবু প্রথম জীবন থেকেই তার সমস্ত কর্ম ও কল্পনার প্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁর অকৃত্রিম দেশানুরাগ। তিনি জানতেন এবং মানতেন যে, তাঁর যা কিছু চেষ্টা, যা কিছু সফলতা, তার মূলে রয়েছে, তাঁর অগণন স্বদেশবাসীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।"




**২৪শে অক্টোবর তারিখে প্রেসিডেণ্ট মির্জা** কর্তৃক পাকিস্তানে বারো জনের একটি মন্ত্রিমণ্ডলী 'ক্যাবিনেট' নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল আয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বারো জন মন্ত্রীর মধ্যে আটজন অসামরিক ব্যক্তি এবং তাঁরা কেউ প্রচলিত অর্থে রাজনীতিক অর্থাৎ পলিটিসিয়ান নন। যেসব বিভাগের ক্ষমতা বা প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি বা সরাসরি জনসাধারণ কর্তৃক অনুভূত হয়, সেগুলির মন্ত্রিপদে কিন্তু সামরিক ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হয়েছেন। নামে 'ক্যাবিনেট' হলেও এবং তাতে কয়েকজন অসামরিক ব্যক্তি নেওয়া হলেও এর দ্বারা কিন্তু মিলিটারির হাতে আসল ক্ষমতা থাকার ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি। কিন্তু এই 'ক্যাবিনেটের' পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হবার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। ২৭শে অক্টোবর তারিখে প্রেসিডেণ্ট মির্জারই গদি গেল। ঐ তারিখে জেনারেল মির্জা ঘোষণা করলেন যে, তিনি সরে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল আয়ুব খানকে সমর্পণ করেছেন। জেনারেল আয়ুবকে পাকিস্থানের যাবতীয় সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা পূর্বেই করা হয়েছিল। (৮ই অক্টোবর তারিখের ওলটপালটের পূর্বে জেনারেল আয়ুব খান স্থল বাহিনী অর্থাৎ Armyর সর্বোচ্চ কর্মচারী, Chief of staff ছিলেন। নৌ এবং বিমান বাহিনীর আলাদা আলাদা Chief of staff আছে। কিন্তু জেনারেল আয়ুব খান যখন চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হলেন, তখন তাঁকে একটা নূতন পদ দিয়ে যাবতীয় সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা Supreme Commander of the Armed Forces নিযুক্ত করা হয়।) এখন তিনি তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্টও হলেন। অর্থাৎ তিনি পাকিস্থানের এক এবং অদ্বিতীয় কর্তা হলেন।

জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার এই পদত্যাগ যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, তা বলাই বাহুল্য। এই অতিকায় ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তিটি নিতান্ত বেকায়দায় না পড়লে কখনো গদি ছাড়তেন না। নিজে পদত্যাগ করে সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল আয়ুব খানকে কেন দিলেন, তার যে দুটি কারণ তিনি তাঁর ঘোষণায় উল্লেখ করেছেন, তা থেকেই বুঝা যায়, তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল। জেনারেল মির্জা বলেছেন যে, গত তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এটা বুঝেছেন যে, ক্ষমতা পরিচালনায় যদি দ্বৈতকর্তৃত্বের আভাসমাত্র থাকে, তবে দেশকে দুর্গতি থেকে বাঁচাবার জন্য যে-গুরুদায়িত্ব নেওয়া হয়েছে তা পালনে বিঘ্ন উপস্থিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, জেনারেল মির্জা বলেছেন, দেশে বিদেশে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, সব সময়ে হয়ত তিনি এবং জেনারেল আয়ুব খান পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রেখে কাজ করতে পারবেন না—এই ধারণা যদি থেকে যায়, তবে সেটা "আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের" পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। (বলা বাহুল্য কর্তা যদি একজনমাত্র হয়, তবে দ্বৈতকর্তৃত্ব বা মতের অমিলের কোনো প্রশ্নই থাকে না।) অতএব জেনারেল মির্জা ঠিক করলেন যে, তিনি সরে দাঁড়িয়ে জেনারেল আয়ুব খানের কর্তৃত্ব একেবারে নিরঙ্কুশ করে দেবেন।

কনস্টিটুশন নাকচ করে দিয়ে যখন ডিক্টেটরী শাসন প্রবর্তন করা হয়, তখন জেনারেল মির্জা নিশ্চয়ই ভাবেন নি যে, তিনি একা অথবা জেনারেল আয়ুব খান একা সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তিনি হুকুম করবেন এবং আয়ুব খান তামিল করবেন—এইরকম ব্যবস্থা হতে পারলে সেটা তাঁর মনের মতো হয়ত হতো, কিন্তু সেরূপ তিনি নিশ্চয়ই আশা করেন নি। তেমনি জেনারেল মির্জার এমন চরিত্রও নয় যে তিনি আর একজনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য নিষ্কামভাবে অত কাণ্ড করবেন। সুতরাং যখন জেনারেল আয়ুব খানের যোগসাজসে তিনি কনস্টিটুশন নাকচ করে দিয়ে মার্শাল ল জারী করলেন, তখন তাঁর করায়ত্ত দ্বৈতকর্তৃত্বের কল্পনা নিশ্চয়ই অনুচিত বা অবাস্তব ছিল না। এই তিন সপ্তাহের মধ্যেই এমন কিছু ঘটেছে যাতে তার গদি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আসল ব্যাপার বোধ হয় এই যে, তিনি আয়ুব খানের সঙ্গে দ্বৈতকর্তৃত্ব ভোগ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কি আয়ুব খানই তাতে রাজী নন। জেনারেল মির্জা লোককে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—"এটা আমারই কৃত বিপ্লব।" আয়ুব খান সে দাবি মানেন নি। "ক্যু" অনুষ্ঠানের ব্যাপার করে কতখানি কেরামতি তার সত্য বিবরণ সহজে এবং শীঘ্র জানা যাবে না। তবে এটা ঠিক যে, মার্শাল ল জারী এবং জেনারেল আয়ুব খানের চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবার পরে আসল ক্ষমতা তাঁর হাতেই ক্রমশ এসে জমেছে। সামরিক শাসনব্যবস্থায় সামরিক বড়ো কর্তার হাতেই ক্ষমতা এসে দানা বাঁধবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জেনারেল মির্জা যখন সরে দাঁড়িয়ে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল আয়ুব খানকে দিতে প্রস্তুত হলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার হস্তান্তরটা নামেমাত্র হওয়া বাকী ছিল। তবে জেনারেল মির্জা যেরকম ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি তাতে নিজের প্রাধান্য রাখার জন্য তিনি চেষ্টা অবশ্যই করেছেন, তার ফলে জেনারেল আয়ুব খান ও তাঁর মধ্যে ঠোকাঠুকিও নিশ্চয়ই অল্পবিস্তর হয়ে থাকবে। কিন্তু জেনারেল মির্জার তখন করার কিছু ছিল না। সামরিক শক্তি আয়ুব খানের হাতে। মির্জা সাহেবের জনপ্রিয়তাও এমন কিছু নেই, যে তার জন্য আয়ুব খান ভয় পাবেন। আরো কিছুদিন এইভাবে চললে জেনারেল মির্জা হয়ত কল-কৌশল করে সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে নিজের

সমর্থক একটা দল গড়ে তুলে আয়ুব খানকে একটু দমিয়ে রাখতে পারতেন। হয়ত সেই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই আয়ুব খান এতো তাড়াতাড়ি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেল্লেন। একদিক দিয়ে অবশ্য যাকে "poetic justice" বলে তাই হলো। কারণ জেনারেল মির্জাকে না সরানো পর্যন্ত "পলিটিশিয়ান"দের দূর করার প্রোগ্রাম অসমাপ্ত থাকত। গত কয়েক বছর ধরে জেনারেল মির্জা তো কম পলিটিকস্ করেন নি। অবশ্য এই পলিটিশিয়ানদের বাদ দেওয়ার ধুয়াও একটা ফাঁকি। কারণ সেনাপতিরাই এখন পলিটিশিয়ানদের ভূমিকায় নামলেন। তাছাড়া সামরিক কর্তাদের সঙ্গে তলে তলে কোনো কোনো শ্রেণীর পলিটিশিয়ানদের যোগাযোগ স্থাপনের আয়োজন চলছে বলেও শোনা যায়। ২৮।১০।৫৮

# আর্থিক সমীক্ষা

**শ্রীকৌটিল্য**

**খা**নিকটা রুচি পরিবর্তনের তাগিদে এ সংখ্যায় অর্থনীতিক আলোচনার পটভূমি পরিবর্তন করছি। চীন অর্থ-নীতিতে কৃষি সমবায়ের একটি উল্লেখ্য দিক সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখছি।

চীন জাতির তীক্ষ্ন আপেক্ষিকতাবোধের এবং জাতীয় জীবনে সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার এক বিশিষ্ট পরিচয় মেলে তার কৃষি সমবায় ব্যবস্থায় বিস্তারিত 'মানে'র (norms) প্রচলনে। সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বর অনেক ক্ষেত্রে আপাত-দৃষ্টিতে সমগোত্রতা লক্ষ্য করে সেখানে ঢালাও নিয়ম চালু করতে গিয়ে কার্যত যে ক্ষতি হতে পারে চীন সমবায় ব্যবস্থায় 'মানে'র প্রচলনে তারই সম্ভাবনাকে রোধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গবিশেষের স্বভাব অনু-যায়ী তার 'মান' স্থিরীকরণের নীতি চীনের সমবায় উৎপাদন আন্দোলনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

এই 'মান'গুলি, প্রথমত, বিভিন্ন ধরনের কৃষিবিষয়ক এবং সংশ্লিষ্ট কাজের গুণ বিচারের জন্য, এবং দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের কাজের পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়: একই ধরনের কাজের মধ্যেও আবার ক্ষেত্রান্তর অনুযায়ী মূল্যায়নের সূক্ষ্ম অথচ যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তারতম্য বুঝবার উদ্দেশ্যে এই 'মান'গুলি বিশেষ উপযোগী। প্রায় সব দেশেই এটা দেখা গেছে যে, পারিশ্রমিক নির্ধারণের সঙ্গত কোনো পন্থা না থাকায় অনুপযুক্ত কর্মীদের প্রতি পারদর্শীদের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে উৎপাদন কমে যায় এবং সামাজিক সংহতিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

একটি বিশেষ জমিতে কিছু সংখ্যক ভারবাহী পশু ও যন্ত্রপাতি নিয়ে কোন বিশেষ জলবাতাসের মধ্যে কাজ করে একজন গড়পড়তা লোক দৈনিক যে উৎপাদন করে তার পরিমাণ এবং গুণকে সেই প্রসঙ্গে 'মান' বিবেচনা করা হয়। বলা বাহুল্য, যে সব উৎপাদনের উপর মান নির্ভর করে (যথা, জমির উৎপাদক শক্তি ও আয়তন, ভারবাহী পশুর এবং যন্ত্রের ক্ষমতা ও সংখ্যা, জলবাতাসের অবস্থা, ইত্যাদি) তাদের বিভিন্ন সম্ভাব্য যোগাযোগের (combi-nation) সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এক একটি সমবায়ে পাঁচ-ছয় শ' পৃথক পৃথক 'মান' একই সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। উসানে

একটি শাক-সব্জীর সমবায়ে (যেখানে ৪০ রকমের শাকসব্জীর উৎপাদন হয়) প্রায় ১০০০টি 'মান' আছে। গুণ বিচার এবং পারিশ্রমিক বিচারে কাজের সুবিধার জন্য 'মান'গুলিকে আবার অনেকগুলি যুক্তি-সঙ্গত শ্রেণীতে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১০ ঘণ্টা পরিশ্রমের ভিত্তিতে ১০ মজুরী এককে গড়পড়তা কাজের দিনকে ভাগ করা হয়েছে। স্থান, কাল এবং কাজের বিষয় অনুসারে উপরের কোন্ শ্রেণীতে কে কখন পড়বে তা ঠিক করা হয়। 'মানে'র ঊর্ধ্বে কাজ দেখাতে পারলে শ্রমিককে যথাযথ পুরস্কৃত করা হয়। শীত এবং গ্রীষ্মে কাজের দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য মনে রেখে 'মান'গুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী বদলে নেওয়া হয়। বর্ষাকালে আগাছা বেড়ে যায় বলে এর উপর নির্ভরশীল 'মান'গুলি নতুন করে বিবেচনা করা হয়। ঘোড়াকে শক্তিশালী, খচ্চরকে মাঝারি উপযুক্ত এবং গাধাকে দুর্বল পশু হিসেবে ধরে প্রাসঙ্গিক 'মান'গুলিকে বিজ্ঞানসম্মত করা হয়েছে।

'মান'গুলি স্থির করবার সময় সর্বজন-স্বীকৃত একদল সুদক্ষ কৃষকের সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞ মতামত জেনে নেওয়া হয়। কার্যনির্বাহক সমিতি এই মতামতগুলিকে বাস্তবিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করে এদের গ্রহণযোগ্যতা ঠিক করে। 'মান'গুলি যাতে বেশি উঁচু অথবা নিচু না হয়ে পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। 'মান' নিচু হলে শ্রমিকরা সহজেই তা অতিক্রম করে অবাঞ্ছিতভাবে পুরস্কৃত হতে থাকবে; আবার উঁচু হলে অনর্থক কর্ম-স্পৃহা নষ্ট হবে। কোন কোন সমবায়ে 'মান' প্রচলিত হতে বেশ দেরি হয়, কারণ ক্ষেত্র-বিশেষে আপাতবুদ্ধি অনুযায়ী 'মান' স্থির করতে গেলে যে তা খানিকটা যান্ত্রিক পদ্ধতিরই সামিল হয়ে পড়ে সে সম্বন্ধে চীন সমবায় সচেতন। এ ধরনের পরি-স্থিতিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে পৌঁছোন পর্যন্ত কতকগুলি বাঁধা অথচ ঈষৎ পরিবর্তনযোগ্য হার (rates) ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশ্য এরকম অবস্থা ক্ষতি-কর বলে যত শিগ্‌গির সম্ভব 'মান' ঠিক করে ফেলবার চেষ্টা হয়।

অন্যান্য সব উপযোগিতা ছাড়াও 'মানে'র সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিকের উপযুক্ততা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রত্যেকের পক্ষে সব-চেয়ে বাঞ্ছনীয় কাজের ভার বেছে দেওয়া সহজ হয়। তার ফলে শ্রমের অপচয় কিংবা অসামাজিক কর্মনিয়োগ অনেকটা কমে যায়। মোট কথা, চীন সমবায় কাজের পরিমাণ ও গুণকে এবং শ্রমিকের পারি-শ্রমিককে অত্যন্ত আপেক্ষিক বিষয়-নির্ভর বলে মনে করে, এবং মূল্যায়নের ব্যাপারে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের জন্য চেষ্টা এবং গলদ (trial-and-error) পদ্ধতি চালিয়ে যায়। ফলে একদিকে যেমন জন-সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা ও আত্মনির্ভরতা আসে, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে রেষা-রেষি কমায়, উৎপাদন বাড়ায় এবং অন্যান্য অর্থনীতিক অপচয় বন্ধ করে।

# গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেতারী বিলায়েৎ খাঁ সাহেব সম্প্রতি ইউরোপ পরিভ্রমণ করে ফিরেছেন। দিন কয়েক পূর্বে কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর একটি কথা আমাদের খুব ভাল লেগেছে এবং ওস্তাদসুলভ মনোবৃত্তির ঊর্ধে শিল্পী-সুলভ মহৎ চিন্তাধারার যে পরিচয় তিনি প্রদান করেছেন সেজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করি। তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকসঙ্গীতে বিচিত্র সুরের ঐশ্বর্য রয়েছে এবং সেগুলিকে যত্ন সহকারে রূপায়িত করা হচ্ছে শিল্পীদের কর্তব্য। শুধু রূপায়ণই যথেষ্ট নয় তাদের মর্ম উপলব্ধি করাও নিতান্ত প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করেছেন। এই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি বলেছেন আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা ছন্দমাধুর্যই পছন্দ করে বেশি। তাদের সেই আশা মিটবে যদি তারা আমাদের সংগীতের মূলধারার সঙ্গে পরিচিত হবার পর নানারকম লোক-সংগীতের সুর, কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতি যথার্থভাবে রূপায়িত করতে পারে। কোনো ওস্তাদের মুখ থেকে এমন উদার মতবাদ এ যুগেও প্রত্যাশা করিনি। সাধারণত ওস্তাদদের কাছে ওস্তাদি সংগীতের শৈলীই হচ্ছে বড়—যে সংগীতে কাব্য এবং মানবতার বিকাশ ঘটেছে তা তাঁদের কাছে মুখ্য নয়। তাঁদের কাছে এসব সংগীত নেহাৎ অবসর বিনোদনের উপকরণ মাত্র। অনেক সময় সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা রাগ-সংগীতের শেষে এক টুকরো ধুন বা প্রচলিত দু-একটি দেশী সংগীত পরি-বেশিত করেন। এই সীমিত দৃষ্টির প্রসার হওয়া আবশ্যক। শিল্পীমনের সবচেয়ে বড় ধর্ম হচ্ছে সর্বগ্রাহ্যতা। এই ব্যাপক দৃষ্টি এবং রসবোধ স্বল্পজ্ঞান বা অর্ধশিক্ষা থেকে লাভ করা যায় না মানসিক পূর্ণতা থেকে দৃষ্টির এই ব্যাপকতা এবং সার্থকতা লাভ করা যায়। একজন ওস্তাদের মুখ থেকেও যে স্পষ্টভাষায় সংগীতের এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে এটি বাস্তবিকই আশার কথা।

বিভিন্ন লোকসংগীতের সঙ্গে পরিচয় এবং তাদের স্থায়ী করে রাখা যে কত বড় প্রয়োজন সেটা আজ অনেকেই বুঝতে পারছেন না তাই লোকসংগীত আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা অনাদৃত। এই লোক-সংগীতগুলি লুপ্ত হয়ে আসবে এমন দিন খুব দূরে নয়। যে সভ্যতাকে আমরা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছি তা লোক-সংগীতের পৃষ্ঠপোষক নয়। যে নগর সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তাতে লোকসংগীতের শ্রীবৃদ্ধির কোন উপকরণ নেই। অতএব আর্ট এবং ইতিহাসের দিক থেকেও এই লোকসংগীতসমূহকে রক্ষা করা কর্তব্য। এই গুরুদায়িত্ব যাঁরা আর্টিস্ট, শিল্পী তাঁদের ওপরেই এসে পড়েছে। সুতরাং শিল্পীদের যাঁরা মুখপাত্র তাঁদের মুখ থেকে যখন আশার বাণী শুনি তখন নিরাশ অন্তঃকরণে অনেকখানি উৎসাহের সঞ্চার হয়।

বিলায়েতের একটি মন্তব্যের সঙ্গে কিন্তু আমি একমত নই—সেটি হচ্ছে আমাদের সংগীতের প্রকৃতি সম্বন্ধে। বিলায়েৎ বলছেন ভারতীয় সংগীত আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো ইংরেজি দৈনিকের ভাষায় তাঁর মতটি এইভাবে বিবৃত হয়েছে :—

The first (Indian) was based on the spiritual approach and the second was based on materialistic approach to sensivity and beauty.

এটি যে কেবলমাত্র বিলায়েতের নিজস্ব মত এমন নয় এটি আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এবং আজকাল অনেকেই পাশ্চাত্যদেশে এটি প্রচারও করেন। আমাদের সংগীতকে কোনদিক দিয়ে বিচার করে স্পিরিচুয়াল বলা হবে সেটা আমি আদৌ বুঝতে পারি না। যদি তার ভাবগাম্ভীর্যকে স্পিরিচুয়াল বলে নির্দেশ করি তাহলে বাক্, হ্যাণ্ডেল, বেইটোফেন, মোজার্ট প্রভৃতি রচয়িতার সংগীতকেই বা স্পিরিচুয়াল বলব না কেন? আসলে উভয় সংগীতকেই মেটিরিয়ালিস্টিক বলা উচিত, কেননা সংগীতের জন্মই সম্ভোগ প্রেরণা থেকে। আনন্দ পরিবেশনই ছিল সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সে আনন্দ সম্পূর্ণ মেটিরিয়ালিস্টিক। তবে সৌন্দর্যের একটা সূক্ষ্ম স্তর আছে যেখানে অনুভূতির আনন্দ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমগোত্রীয় হয়ে পড়ে। সেটা শিল্পের সর্বক্ষেত্রেই ঘটে থাকে—ভারতীয় সংগীতেই যে একমাত্র এতখানি সূক্ষ্মতা বর্তমান এটা সত্য নয়। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় সংগীতের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে মেটিরিয়া-লিস্টিক, কিন্তু বিকাশধারা স্বতন্ত্র। তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই সংগীতের মহান বিকাশ যেখানেই ঘটেছে সেখানেই আমাদের

অনুভূতি এক ধ্যানলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। অ্যাপ্রোচ বা উদ্দেশ্য মূলত একই—আমরা রাগের পরিকল্পনা করেছি ওরা নিয়েছে থীম। আমাদের বিকাশধারা এক রকম ওদের স্বতন্ত্র। টেকনিক এবং রূপায়নে অনেক তফাৎ কিন্তু আমাদের সংগীত স্পিরিচুয়াল আর ওদের মেটিরিয়ালিস্টিক এইভাবে বিচার করলে সেটা সংগত হয় না।

আমাদের সংগীতের গোড়ার কথা হচ্ছে নাদ। শাস্ত্রকার বলছেন নাদ দু রকম—আহত এবং অনাহত। অনাহত নাদের পরিচয় গুরুর উপদিষ্ট মার্গে সাধনা দ্বারা পাওয়া যায়; কিন্তু এই নাদ জনমনোহর নয়। আহত নাদ থেকেই সংগীতের উৎপত্তি হয়েছে কেননা এই নাদ জনমনোরঞ্জক। অতএব জনমনোরঞ্জনই হচ্ছে আমাদের সংগীতের মূল কথা এর মধ্যে স্পিরিচুয়াল অ্যাপ্রোচ এনে ফেলবার সুযোগ কোথায়?

আরো একটি উদাহরণ দিই। আমাদের বর্তমান সংগীত ভরতের মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভরত যে সংগীতকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন তা হচ্ছে নাট্যসংগীত। অর্থাৎ আমাদের সংগীত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে নাট্যসংগীত থেকে। নাটকে সংগীতের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে।

দেবরাজ ইন্দ্র একদা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—"এমন একটি ক্রীড়নিয়ক আমাদের চাই যা হবে দৃশ্য এবং শ্রব্য আর শূদ্র প্রভৃতি অন্ত্যজবর্ণ যাদের বেদে অধিকার নেই তারাও যেন এই সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত না হয়।" ব্রহ্মা ইন্দ্রের কথা রাখলেন, সৃষ্টি করলেন নাট্যবেদ। ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ ইন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন—"বাপু চিত্তাকর্ষক ইতিহাস দিয়ে আমি তো নাট্যবেদ প্রস্তুত করে দিলুম—এর অভিনয়ের ভার এখন তোমাদের নিতে হবে।" ইন্দ্র তখন ভরতমুনির শরণাপন্ন হলেন। মুনিবর তাঁর একশ' ছেলে নিয়ে নাটকের রূপদানে প্রবৃত্ত হলেন। নাটকে নানারকম বৃত্তি অর্থাৎ স্টাইলের প্রবর্তন করা হল, কিন্তু একটি অভাব দূর করা গেল না এবং সেটি মস্ত অভাব—সুকুমার শৃঙ্গার সম্পাদক কৈশিকী বৃত্তি যোজনা করবার কোন উপায় রাখা হয়নি। কৈশিকী বৃত্তির বর্ণনা অলংকার শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে দিচ্ছি ঃ—

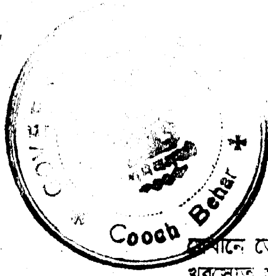
যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্য বিশেষ চিত্রা
স্ত্রীসংকুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা
কামোপভোগপ্রভবোপচারা
সা কৈশিকী চারুবিলাসযুক্তা।

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ব্রহ্মার নাট্যবেদ স্ত্রীবর্জিত। অতএব মুনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—"পিতামহ সবই তো করেছেন, কিন্তু কৈশিকী বৃত্তি না প্রয়োগ করলে তো চলে না। আর,—"অশক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রয়োক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।" স্ত্রীলোক ব্যতীত কেবলমাত্র পুরুষ কর্তৃক সাধুভাবে কোন প্রয়োগ সম্ভব নয়। ব্রহ্মা তখন একেবারে তেইশটি অপ্সরা সৃষ্টি করে ভরতের হাতে সমর্পণ করলেন। স্বাতি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নাটকের বাদ্যানুষ্ঠান পরিকল্পনা করলেন আর নারদ ভার নিলেন সংগীত পরিচালনার।

সুতরাং আমাদের সংগীতের ভিত্তি হচ্ছে ওই পূর্বোক্ত "কৈশিকী চারুবিলাসযুক্তা"। পরবর্তীকালে "রাগ" শব্দের অর্থে বলা হয়েছে—"রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"। এখানেও সেই মনোরঞ্জনেরই ব্যাপার। রাগ-রাগিণীর যে রূপ পরিকল্পিত হয়েছে সেখানেও যে তেমন একটা স্পিরিচুয়াল ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এমন নয়।

অতএব যে সংগীতের অ্যাপ্রোচ সম্পূর্ণ মেটিরিয়ালিস্টিক তাকে স্পিরিচুয়াল বললে সত্যের ব্যাতিক্রম হয় আর মেটিরিয়াল অ্যাপ্রোচ হলেও তার মূল্যে কিছু মাত্র কমে না।

অবশ্য বিলায়েৎ যা বলতে চেয়েছেন সেটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। মূলতঃ মেটিরিয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ হলেও বিষয়টা আর্ট এবং এর আবেদন নির্ভর করে বাদক বা গায়কের মনোভাব এবং ট্রিটমেন্টের ওপর। এ বস্তুধর্মিতা স্থলে বস্তুধর্মিতা নয় সুতরাং সেভাবে সংগীতকে কেউ বিচার করবেন না। আমি খালি এইটুকুই বলতে চাইছিলুম যে, যেদিক দিয়ে বিচার করে আমাদের সংগীতকে স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক স্তরে তোলা হয় সেইভাবে বিচার করলে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের মধ্যেও যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বস্তুত মহান সংগীতের এমন একটি লক্ষণ আছে যা উভয় ক্ষেত্রেই এক এবং আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রেই সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য নয়।




## ইশারা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যেখানে তোমার ছায়া
খরস্রোত জলে কাঁপতে গিয়ে
হার মেনে আচমক
ডাক ছেড়ে উড়ে যায়
তীরবেগে ফুলঝুরি পাখির মতন,
নিঃশব্দ জঙ্গল এসে পা টিপে পা টিপে
পেছনে ওত পেতে থাকে
একবার পিছলে পড় যদি,
সেখানে অতল থেকে
ঝকঝকে জলের বিদ্যুৎ
মাঝে মাঝে দেয় যদি রুপোলী ঝিলিক
জেনো সে ত মাছ নয়,
যে সব কল্পনা
কলমের ফাঁদে ধরতে গিয়ে
ফস্কে গেছে কৌতুকে পালিয়ে,
তারাই ইশারা করে কটাক্ষে বিলোল,
নেমে এসো
গাঢ় স্রোতে নেমেই দেখ না!

## চলতে চলতে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চলতে চলতে ফুরাবে পথ,
বলতে বলতে কথা,
মিলিয়ে আসবে, দিনের দীপ্ত আলো।
হৃদয়ে নামবে অন্ধকার,
অরণ্যে নীরবতা,
কালো কিংখাবে গম্ভীর, জমকালো।
ডাকবে ডাহুক নির্জন সেই প্রহরে।

তাতে ভয় নেই, আরও খানিকটা পরেই ত সেই ভীম তালাও,
পশ্চিমে গিয়ে দেখবি আবার নদী,
সাঁকো পার হয়ে মর্মর চড়াই, বাঁক নিলে সাতপোলি গাঁও,
আরও ক্রোশ দুই হাঁটতে পারিস যদি,
মাঝরাত্তিরে পৌঁছিয়ে যাবি শহরে।

চলতে চলতে ফুরাবে পথ।
কালো কিংখাবে ঢাকা পাহাড়
হয়ত পাহাড়, হয়ত পাহাড় নয়।
হয়ত হৃদয় পাঁচিল তুলেছে, চোখে নামে তাই অন্ধকার,
মনে নামে তাই কবন্ধ কালো ভয়।
যদিও জ্যোৎস্না নেমেছে লক্ষ লহরে।

চলতে চলতে ফুরাবে পথ,
বলতে বলতে কথা,
আকাশে মিলাবে দিনের দীপ্ত আলো।
হৃদয়ে না নামে অন্ধকার,
নীরন্ধ্র নীরবতা,—
অরণ্য হক গম্ভীর, জমকালো।
ভয় নেই, তুই পৌঁছিয়ে যাবি শহরে।

# আলোচনা

### বাঘা যতীনের শেষ কয়েক ঘণ্টা

দেশ পত্রিকার ২০শে সেপ্টেম্বরের ৪৭ সংখ্যায় বাঘা যতীন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ প্রবন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি ভ্রান্তিমূলক। বাঘা যতীনের দেহাবসানের অব্যবহিত পরে এক স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাঁহার অপর তিনজন সহকর্মীর বিচার হয়। সেই বিচারে আমাকে মনোরঞ্জন ও নীরেনের পক্ষ সমর্থন করিতে হইয়াছিল, সুতরাং বালেশ্বরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে ও মোকদ্দমায় আগত সাক্ষীর মুখ হইতে এবং মনোরঞ্জন ও নীরেনের নিকট হইতে বহু নিক প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। বালেশ্বরে যে 'সাইকেল এম্পোরিয়াম শপ' ছিল, তাহার নাম ছিল 'জেনারেল এম্পোরিয়াম' উক্ত এম্পোরিয়াম ম্যাজিস্ট্রেট কিলীর আদেশে এবং সাক্ষাতে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫তে সার্চ হয়। দীর্ঘক্ষণ সার্চ করিয়া প্রথমে কিছুই পাওয়া যায় নাই। ফিরিয়া আসিবার সময় কেবল একটি মাত্র স্লিপ কাগজ পাওয়া যায়, তাহাতে কেবলমাত্র 'কপ্তিপদা' শব্দটি লেখা ছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিলী ও কলিকাতা হইতে আগত টেগার্ট সাহেব ছয় তারিখ সন্ধ্যায় কপ্তিপদায় পৌঁছান ও সাত তারিখ সকালে ময়ূরভঞ্জ স্টেটের এস ডি ওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও খবর সংগ্রহ করিয়া যতীনদের সন্ধান এবং ধরিতে পারিলে গ্রেপ্তার করিতে যান, কিন্তু যতীন ও তাঁহার সহকর্মী চারজন সাহেবদের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের কুটীর, যাহা সেখানে সাধুবাবার আশ্রম বলিয়া পরিচিত ছিল, সেখান হইতে তাঁহাদের যাহা কিছু ছিল লইয়া পূর্বেই জঙ্গলের মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল বালেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন দিয়া ট্রেনযোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাঁহারা বালেশ্বর হইতে দক্ষিণ দিকে ২৪ মাইল দূরবর্তী সোরো গিয়াছিলেন ও সেখানে পাটপাতা ও আলের জল খাইয়া বালেশ্বর আসিয়াছিলেন, একথা আদৌ ঠিক নহে। ইতিমধ্যে কিলী সাহেব কপ্তিপদা ত্যাগ করিয়া বালেশ্বরে পলাতক ব্যক্তিদের ধরিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য চলিয়া আসেন ও বালেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে ও স্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরে উড়িষ্যার জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত বুড়াবালাম নদীর খেয়াঘাটে সতর্ক পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও চৌকিদার প্রভৃতি লোকেদের জানাইয়া দেন যে, পাঁচজন অজানা যুবক আসিলে তাহাদের আটকাইবে ও বালেশ্বরে খবর দিবে। ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে যতীন প্রভৃতি রেলওয়ে স্টেশনের ও খেয়াঘাটের ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইয়া রেল লাইনের পশ্চিম দিকে ধান জমির ভিতর দিয়া বুড়াবালাম নদীর ধারে আসে এবং কেহ পার করিতে রাজি না হওয়ায় একটি বালককে রাজি করাইয়া তাহার ক্ষুদ্র ডিঙিতে জিনিসপত্র রাখিয়া সাঁতরাইয়া পার হন। অপর পারে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করায় ও পথ না পাইয়া কোন লোকের নির্দেশে দমদমা নামক এক বাঁধের উপর দিয়া উত্তর দিকে ধাবমান হন। এই সময়ে বহুলোক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, পলাতকগণ তাহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা না থামিলে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহারা এক রাউন্ড ফায়ার করেন ও তাহাতে সুদাম বলিয়া একটি লোক আহত হয়, কিন্তু মরে নাই ও যতীনের দল জানিতে পারে নাই যে কোনও লোক গুলীবিদ্ধ হইয়াছে। এই লোকটি বালেশ্বর হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়া পরে নিরাময় হইয়াছিল, বোধহয় এই লোকটির কথা ডাক্তারবাবু উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বুড়াবালাম নদী পার হইবার পূর্বে কোন সংঘর্ষ হয় নাই, কোন লোক আহত হয় নাই, যাহা দেশ পত্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমশ গ্রামবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ও তাহারা ইহাদের পরিচয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করায় ও তাহাদের অগ্রসর হইতে মানা করায় মনোরঞ্জন একবার তাহাদের নিরস্ত করিবার জন্য (মারিয়া ফেলিবার জন্য নয়) গুলী ছোঁড়ে, এক ব্যক্তি অর্থাৎ রাজু মহান্তি গুলীবিদ্ধ হইয়া সেইখানে নিহত হয়। দ্রুত সংবাদ বালেশ্বরে পৌঁছাইলে ম্যাজিস্ট্রেট কিলী তাঁহার পুলিস-বাহিনীকে অস্ত্র সজ্জিত করিয়া তাহাদের ও প্রুফ ডিপার্টমেন্ট-এর সার্জেন্ট রাদারফোর্ড সাহেবকে লইয়া পলাতকদের ঘেরাও করিতে গেলেন ও দুই দলে বিভক্ত হইলেন এবং একটি দলের নেতা হইলেন মিঃ কিলী ও অপর দলের নেতা হইলেন মিঃ রাদারফোর্ড। ইতিমধ্যে পলাতকেরা চাষাখণ্ড গ্রামে দেশয়া নামধেয় পুষ্করিণীর পাড়ে একটি বড় উইঢিবির পিছনে স্থান লইয়াছিলেন। উভয়পক্ষের সম্মুখীন গুলীবর্ষণ হইল, কিন্তু কিছু ফল না হওয়ায় রাদারফোর্ড সাহেব হামাগুড়ি দিয়া সেই উইঢিবির পাশে গিয়া গুলী ছোঁড়েন। তাহাতে চিত্তপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন। যতীন দেহের দুই তিন স্থানে গুলী বিদ্ধ হইয়া বসিয়া পড়েন ও তাঁহার শরীর হইতে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ হয়। যতীশও একবার গুলীবিদ্ধ হইয়া আহত হইয়া পড়িয়া যান। ঐ স্থান হইতে তাঁহাদের বালেশ্বর হাসপাতালে সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টা পরে আনা হয়। তখন বালেশ্বর হাসপাতালে একজন মাত্র ডাক্তার অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন গাঙ্গুলী। তিনি নিশ্চয় যতীন মুখার্জি ও যতীশ পালকে লইয়া বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করা ডাক্তার বা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নিশ্চয় হয় নাই। যতীন সাংঘাতিকভাবে গুলীবিদ্ধ হইয়াছিলেন, দেহ হইতে ও মুখ দিয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দশ তারিখে হাসপাতালেই মারা যান। এই সময়ের মধ্যে এই মোকদ্দমায় তাঁহার কোন ডাইং ডিক্লেয়ারেশন বা তদ্রূপ স্টেটমেন্ট দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন একথাও প্রকাশ পায় নাই। এক্ষেত্রে যতীন ঘটনাবলী সম্বন্ধে দীর্ঘ ও বিস্তৃত বিবরণী সময় সময় নিজে উপযাচক হইয়া দিয়াছিলেন বা দিতে পারিয়াছিলেন, ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই আমার ও অনেকেরই মনে হয়। কিলী সাহেব যতীনের উপর সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, এমনকি কিলী সাহেব নিজের দেহ হইতে কোট খুলিয়া পরাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। সুতরাং যতীন যদি কিলী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া থাকেন, তাহা বীরোচিত। যতীন একজন বিশেষ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তিনি বৃটিশদের অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার হইতে তথা বৃটিশ দুঃশাসন হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি যদি বৃটিশরাজের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের ন্যায় বিচারের দোহাই দিয়া ও কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাদের নিকট তাঁহার সহকর্মীদের প্রাণভিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাঘা যতীনের উপর আমাদের তথা সর্বসাধারণের যে ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে ও যতীনবাবুর মর্যাদা নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। এখানে ইহা বলা অবান্তর হইবে না যে, মনোরঞ্জন ও নীরেনের সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিয়া ছিলাম, তাহারা নির্ভীক ও অসীম সাহসী দেশপ্রেমিক ছিল। এবং তাহারা অত্যন্ত আটলভাবে বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ছিল। নীরেন দাঁড়িকাঠে উঠিয়া ইংরাজদের অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে ও বৃটিশরাজের নিশ্চয় ধ্বংস হইবে বলিয়া যে অর্ধঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের পৌরুষত্ব বেশ পরিস্ফুট হয়। তবে একথা সত্য যে যতীন কিলী সাহেবকে বলিয়াছিলেন, বালেশ্বরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য তিনি দায়ী বালক দুটি নহে। বৃটিশ বিচারপতি তাহাকে ধরিয়া লইয়াছিলেন ইহা যতীনের চালাকি মাত্র।

ডাক্তারবাবুর লেখাটি সাহিত্যিকভাবে কৌতূহলী পাঠকদের বিশেষত যতীনবাবু সম্বন্ধে যাহারা কিছু জানেন না তাহাদের নিশ্চয় সুখপাঠ্য হইবে। কিন্তু বৃটিকর হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। ডাক্তারবাবু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল, তবে তাঁহার আমাকে স্মরণ আছে কিনা বলিতে পারি না। তিনি আমার সমসাময়িক। আমি তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিতে চাই—অনেক দিনের কথা হওয়ায় তিনি স্থানে স্থানে ভুলভ্রান্তি করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে ও যতীনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার কোন উদ্দেশ্য তাঁহার নিশ্চয় নাই, তবে যদি তাঁহার লেখায় বিপ্লবী নেতা যতীনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে ডাক্তারবাবু নিশ্চয় উচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশা করি।

আরও দেখা যাইতেছে রাজু মহান্তির মৃতদেহ নিশ্চয় প্রথমে হাসপাতালে আসিয়াছিল ও শবব্যবচ্ছেদাগারে গিয়াছিল, ডাক্তারবাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইয়াছেন।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, অ্যাডভোকেট, বালেশ্বর।

# পুষ্প



সৈয়দ মুজতবা আলী

রস কি?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা সরেস সংগীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিম্বা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্ট হয় কি প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিংগন করে যে সব রসের সৃষ্টি হয় তার সংগে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে-কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি,—শোনা কথা—বার্ট্রান্ড রাসেল্ নাকি বলেছেন গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতই! কিন্তু এ-সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কি সে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠক-গোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী——নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানান সই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপন করেন তাই সভয়ে এ কটি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলংকারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। তার প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকসহীন বিচার বিবেচনা, যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটা দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলঙ্কারিকের অনটন হয়নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দাণ্ডিন মম্মট ভামহ হেমচন্দ্র, অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্টু বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাসেল প্রশ্ন শোধান, রস কি, ওয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাসেলকে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাসেল রীতিমত হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলংকারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলংকার নিয়ে আলোচনা করেননি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেই রকম।

বাগদাদের শাহ-ইন্-শাহ, দীনদুনিয়ার মালিক খলীফা হারুন-অর্-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, খলীফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজ-কুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিনী', অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতাপাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক! এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। খলীফা হারুন-অর্-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ। কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ। হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বা ণী প্র কা শি ত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারলো না। সখীরাও বুঝতে পারেননি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাংগ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ

হাইনে বলছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলীফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্ব-ভাষা, এমন কি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেয়েছি, পেয়েছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেয়েছি।'

এ স্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী=কবি; ফুলের তোড়া=কবিতা; ফুলের রঙ পাতার বাহার=তুলনা অনুপ্রাস; খোজা=প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিবুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না); এবং খলীফা=সহৃদয় পাঠক!

---

# মুখের রেখা

## সন্তোষকুমার ঘোষ

(১)

না, নতুন কান্না নয়, পুরনো কান্নাটাই।

সৌরেশবাবু কলম থামিয়ে একবার শুনলেন। পুরনো কান্নাটাই। এখন আর তাকে কান্না বলে চেনা যায় না। ক্লান্ত, করুণ গানের মত লাগছে। যেন অনেক দূরে, অন্ধকারে, কয়েকটি সরু তারে দুর্বল হাতে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে, কেউ ছড় টানছে; টানছে, টানছে, টানছেই। থামছেও, ভয়ে ভয়ে। অসংখ্য ––– শ্রোতাদের মুখের দিকে চেয়ে জেনে নিতে চাইছে, কেমন হল। অশরীরী শ্রোতারা যেন মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'ভাল, ভাল, খুব ভাল।' উৎসাহ পেয়ে সে ছড় তুলে আবার টানল।

কিংবা, একটি স্বরের সুতোয় সে যন্ত্রণার কয়েকটি লাল পাপড়ি গেঁথে তুলছে।

কলম থামিয়ে সৌরেশবাবু যেন সেই যন্ত্রণার স্বরূপটা ধরতে চাইলেন। দৈহিক —একি শুধু দৈহিক যন্ত্রণা? একটি প্রাণকে পৃথিবীতে আনতে শারীরিক কষ্ট কি এত? কী জানি। সৌরেশবাবু ফের কলমটা তুললেন।

ভারী প্যাড, দামী কাগজ, নির্ঝর লেখনী। সৌরেশবাবুর লিখতে ভাল লাগছিল। তিনি এই লেখাটার নাম দিয়েছেন, 'দিনান্ত-লিপি।' আজ বিকালে ওরা যখন সতীকে কোণের ঘরে নিয়ে গেল, তখন বাড়ির আর সকলের মত সৌরেশবাবুও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। পিসিমাকে বলেছিলেন, "নার্স ডাকি? ডাক্তারকে খবর দিই?"

পিসিমা ওর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। সেই দৃষ্টিতে হয়ত কিছুটা কৌতুক মিশে-ছিল। —"না, তোকে কিছু করতে হবে না, তুই চুপ করে বসে থাক দেখি। বন্দোবস্ত যা করবার, আমি করছি।"

সৌরেশবাবু আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছেন ভিতর থেকে। এই ঘরটা তাঁর নিজস্ব; তাঁর রুচি দিয়ে সাজান। এখানে তিনি অবসর সময়ে বসে পড়াশুনা করেন। চেয়ারটাতে গা ঢেলে দিতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তিতিরপাখির মত স্মৃতি উড়ে আসে, তারা ও'র ভিতরটাকে ঠোকরায়, যন্ত্রণা দেয়। কখনও কখনও ওদের নরম পালকের ছোঁয়ায় সুড়সুড়িও লাগে, সুখাবেশে সৌরেশ-বাবুর চোখ বুজে আসে।

আজও, এই বিকালে, সতী যখন ওদিকের কোণের ঘরে ছটফট করছে, সৌরেশবাবু জানলেন, তাঁর কিছুই করবার নেই, কেননা সব ভার পিসিমাই নিয়েছেন, সেই পিসিমা, যাঁর পরনে ধবধবে সাদা থান, আর খুব চওড়া, অসম্ভব ফর্সা কপাল, বয়স আর বৈধব্য যাঁকে ব্যক্তিত্ব দিয়েছে; সেই পিসিমার কথায় আশ্বাস পেয়ে সৌরেশবাবু তাঁর ঘরে এসে স্মৃতিকে আবাহন করলেন, 'তিতির পাখির মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তোমরা আমরা মনের আঙিনা ছেয়ে ফেল, আমাকে খুঁটে খুঁটে খাও।' এল, ওরা একে একে, দলে দলে। আবার উড়ে গেলও। কেননা, সৌরেশবাবু মাঝে মাঝে নড়ে উঠছিলেন, যতবার সতীর গোঙানি কানে আসছিল, ততবার চমকে উঠছিলেন, আর ভয় পেয়ে তিতির পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। সতী যে ঘরে আছে, আর সৌরেশবাবু যেখানে, দুটির মাঝখানে যোজকের মত একটি সরু বারান্দা। সতী কষ্ট পাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, কখনও স্ফুট, কখনও অস্ফুট গলায় চীৎকার করে উঠছে, উৎকণ্ঠার আঁকশি বাড়িয়ে সেই শব্দের বিষ-ফলগুলি সৌরেশবাবু পেড়ে আনছেন।

কেন? তিনিও চেখে দেখবেন বলে? দায় তাঁরও অর্ধেক, তাই যন্ত্রণার ভাগ নেবেন? কিন্তু পিসিমা নিতে দেবেন না যে।

অগত্যা সৌরেশবাবুকে তাঁর লেখার খাতা খুলে বসতে হল। একবার কান খাড়া করে কী যেন শুনতে চেষ্টা করলেন সৌরেশ-বাবু, তারপর খসখস করে লিখে গেলেন।

"কখনও যদি জানতুম বয়সের দুপুরে পৌঁছেই নিজের কথা লিখতে ইচ্ছে হবে, তবে আগে থেকেই ডায়েরি-রাখা অভ্যাস করতুম। যা দেখেছি, যা ভেবেছি, সব তাতে লেখা থাকত। কলম হাতে নিয়ে নিজেকে এমন অসহায় মনে হত না।

"মন যদি সিন্দুক হত, সব স্মৃতি তাতে বন্দী থাকত। মাঝে মাঝে তাদের রোদে তুলে ধরতুম, নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিতুম পুরনো কালের। এখন দেখছি, আমার মন নেহাতই ছেঁড়া ঝুলি, কুড়িয়ে ফুড়িয়ে সেখানে যা থুয়েছি, তাই হারিয়েছি, অনেক খুদকুঁড়ো আর কানাকড়ির সঙ্গে অমূল্য মণিও গিয়েছে। যা অপ্রিয় তার বেশিটাই ভুলেছি, যা মধুর তারও অনেকটাই। মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন, কেন।

"তবু দু' একটা রয়ে গিয়েছে। ছোট-ছোট নুড়ি, জানিনে তার দাম কী। তারই কয়েকটা আজ এই মরা-আলো বিকালে মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কমবয়সী মেয়েরা যেমন কড়ি খেলে।

"এই খাতাটার নাম দিয়েছি "দিনান্ত-লিপি।" একবার ভেবেছিলুম নাম দেব 'এই বিকালে।' কিন্তু সেটা খুব হালকা হত। পরে ভেবে দেখলুম, নতুন নামটাই উপযুক্ত।

"নামকরণের সমস্যা গিয়েছে, কিন্তু আমার সংশয় যায়নি। একে কী রূপ দেব—কাহিনীর? কিন্তু আমার জীবন নিয়ে কি কাহিনী হয়? একালের ক'জনের জীবন নিয়েই বা হয়। চমক কই, রুদ্ধশ্বাস কী হয়-কী হয় কই, এ ত শুধুই স্রোতে ভাসা। এ-কালে বহু উপন্যাসই তাই নিরুপসংহার। প্রথম অধ্যায়ের নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে এখন কদাচ পরিণতিতে সন্ন্যাসী হয়ে ফিরতে দেখিনে। বিয়োগান্ত কাহিনীর কল্পনাও বদলেছে। শুধু মৃত্যু নয়, জীবন্মৃত্যু। যে-সে চিতা সাজালেই হবে না, জ্বালাতে হবে রাবণের চিতা, যা অহর্নিশ জ্বলে।

"সেই চিতা, ভেবে দেখেছি, মন। জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে। ছোট সুখ, ছোট তৃপ্তি, আশা-পূরণের ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যেও জ্বলে। যেন আরও লকলকে হয়ে ওঠে। আগুন জ্বলে শুকন পাতায়, মন রগে রগে রক্তের চলায়। আশাও জ্বলে, ভয়ে ভয়ে নিবে নিবে, পাতার আড়ালে জোনাকির মত। বাসনা?—জবাফুলের মত।"

আরও কী জ্বলে, সৌরেশবাবু কলম থামিয়ে ভাবলেন। ক্লিপের খাঁজে ভাবুক একটি ধারাল দাঁত, একটি খোঁজবাতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মনের ভিতরটা দেখলেন। মন-আগুনের জ্বালার কথা লেখা কি সহজ!

একবার সৌরেশবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, তাঁর আর সতীর ঘরের মধ্যে যেটা যোজক। এখন আর এখানে রৌদ্র নেই, কিন্তু খানিক আগেও ছিল, সেই স্মৃতিতেই বাঁধান শানটা যেন তেতে আছে। শখ করে লাগান লতাটি এখন পল্লবিত, ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে আধেক বারান্দায় ছাই-ছাই ছায়া রঙ দিয়ে আলপনা রচনা করেছে। এখন, ঠিক এখন, কোন শব্দ নেই, সতীর গোঙানিও শোনা যায় না। কী হল সতীর?

ভাবতেই সৌরেশ চমকে উঠলেন। সতীর কী হল। যে কষ্টটা এতক্ষণ ধরে ফণা তুলে ফুঁসছিল, সে হঠাৎ এমন নেতিয়ে পড়ল কেন। সতী, সতী কি তবে সব যন্ত্রণার পারে পৌঁছে গেল। একটি জন্মের মাধ্যম হওয়ার দায়িত্ব যে নিয়েছিল, সেই সত্যরক্ষা না করেই সে চলে যাবে? বিশ্বাস হয় না।

তবু লম্বা লম্বা পা ফেলে সৌরেশ বারান্দাটুকু পার হয়ে গেলেন। এই ভয়টা নিতান্তই স্নায়ুজ, তিনি জানেন, পরাস্ত বিচারশক্তির বুকের উপর দিয়ে সরীসৃপ দুর্বলতাটুকু হেঁটে যাচ্ছে, তবু থামাতে পারলেন না। ভেজান দরজাটা ঠেলে একেবারে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সতী শুয়ে আছে। তার বুক অবধি চাদরে ঢাকা, চুলগুলি খোলা; চোখ দুটি নিমীলিত, ছোট বুকটিতে ছোট ছোট ঢেউ তুলে সে ঘুমচ্ছে। শুধু তার ঠোঁটের কোণে কালো একটি দাগ, এই খানিক আগেই বুঝি যন্ত্রণায় দাঁত দিয়ে সেখানটা চেপে ধরেছিল, কেটে গিয়ে কাষের মত রক্তের একটি ধারা নেমেছে। সেই ধারাও বেশি দূর এগোতে পারেনি, চিবুকের কাছাকাছি এসে ক্লান্ত হয়ে সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

পিসিমা সতীর শিয়রে। ঝুঁকে পড়ে কী দেখছিলেন। ডাক্তার পাতলুনের পকেটে হাত রেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আর একটি নার্স, যে তার নিঃশব্দ জুতোর গোড়ালিতে তৎপরতাকে জুড়ে দিয়েছে, কড়কড়ে ইস্ত্রি শাদা কাপড়টা দিয়ে কটিতে নিপুণতাকে কষে বেঁধেছে, সে অবাক হয়ে চাইল। ডাক্তারের চোখে তিরস্কার। সৌরেশ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা এগিয়ে গিয়ে একখানি হাত রাখলেন সতীর পাণ্ডুর কপালে, শিউরে উঠলেন, এত হিম কেন।

"এত চুপ-চাপ হয়ে আছে কেন।" ফিসফিস করে নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্নটা যে একটু বোকার মত হল, সেটা সৌরেশবাবু তাঁর কণ্ঠস্বর নিজের কানে যেতেই টের পেলেন। কনুইয়ে হাসি লুকিয়ে নার্স জবাব দিল, "কষ্ট পাচ্ছিল, আমরাই তাই ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

পিসিমা বললেন, "তুই ঘরে যা খোকা। ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা ত রয়েছি।"

ভয় নেই। বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিজেই কথাটা আর একবার উচ্চারণ করলেন সৌরেশ, যেন ভয়-তাড়ানর ওটা জপমন্ত্র। খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে লাগল। এবার শীত বুঝি তাড়াতাড়ি পড়বে।

লেখার টেবিলে ফিরে এসে ফের খাতাটা খুললেন। কী লিখবেন। তাঁর আজ বিকালের এই যুক্তিহীন ভয়টার কথা? নিজের কথা? পারবেন না। কেননা, সব কথা লেখা যায় না। কনফেশ্যান লেখা, সৌরেশ মনে মনে বললেন, অন্ততঃ, এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদের ধাতে নেই। আমরা নিজেকে বড় বেশি লুকিয়ে রাখি, কুণ্ঠিত কিশোরী যেমন করে রাখে তার যৌবন-চিহ্ন; কিংবা তাকে লোকোত্তর তুষারশিখরে তুলে ধরি। সাধারণ নিয়মের আমি ব্যতিক্রম, এ-স্পর্ধা আমার নেই, সৌরেশ বললেন নিজেকে, সমাজের হুঁকো বন্ধ হওয়ার ভয় আমারও আছে।

সেই মুহূর্তে প্রবল একটা হাওয়ার ঝাপটায় জানালা-দরজা থরথর করে কেঁপে উঠল। কনকনে হাওয়া লাগল মুখেচোখে, সৌরেশবাবুর আশঙ্কা হল, দম বন্ধ হয়ে তিনি মরে যাবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন লেখারও বিষয় পেয়ে গেলেন—মৃত্যু-ভয়। পাশের ঘরে একটি জীবনের আবির্ভাব যখন আসন্ন, তখন সৌরেশবাবু দিনান্ত-লিপিতে তাঁর মৃত্যুভয়ের কথা লিখতে বসলেন, এই ঘটনাটার মধ্যে কোথায় একটা পরিহাসও আছে, সেটা তাঁর নিজের কাছেও ধরা পড়ল।

সৌরেশবাবু লিখলেন: মৃত্যুর সাধ আমার জীবনে বারবার এসেছে। প্রথম যখন এসেছে, তখন জানতাম না, জীবন কী। এখনই কি জানি? জীবন কি দৃষ্টি-শ্রুতি-স্বাদ-ঘ্রাণ-স্পর্শ? শুধু ইন্দ্রিয়বোধ? না। রক্ত-স্রোত, শিরার কাঁপন, হৃৎস্পন্দ? তাও না। জীবন শুধু সুখস্বপ্ন বা তৃপ্তির মৃগয়াও না। সব পাওয়াতেই কি তার সার্থকতা? হয়ত। কিন্তু, পাওয়ার সংজ্ঞা কই, সবের-ই বা ঠিকানা কী।

আমলকী গাছটির এক রাশ পাতা আমার লেখার প্যাডটির উপর ঝরে পড়ল। ফুঁ দিলুম, উড়ে গেল, দূরে নয়, টেবিলের পায়ার কাছে, বারান্দার কোণে কোণে অল্প-অল্প হাওয়ায় কাঁপতে থাকল। আনন্দের একটা রূপ দেখলুম, মৃত্যুরও। এই পাতা-গুলো ঝরেছে, মরেছে, কিন্তু ফুরোয়নি। এখনও হাওয়ায় কাঁপে, নাচে, উড়ে উড়ে বেড়ায়। নিরলম্ব, নিরাশ্রয়, নিবৃন্ত; কিন্তু নির্বৃত্ত নয়। প্রাণোত্তর একটি জীবনের স্বাদ পেয়েছে। কাল সকালেই ঝাঁট পড়বে, এরা জমা হবে আঁস্তাকুঁড়ে, শিশিরে ভিজবে, বর্ষায় পচবে, সার হয়ে মিশে যাবে মাটিতে, ফের দেখা দেবে উঠবে কচি-কচি পাতায়। নতুন জন্ম পাবে।

যে প্যাডের পাতায় আজ এত কথা লিখছি, কতদিন সেটা হাতে নিয়ে কত দিন জীবনের শেষ চিঠি লিখতে চেয়েছি। শুভ্র, মসৃণ, শূন্য পাতায় ধীরে ধীরে অক্ষর পড়েছে, 'আমার' এ-কাজের জন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।' তার পরে আর এগোয়নি। একটা পোকা উড়ে উড়ে আলোটার ঢাকনার উপরে বসেছে, তারও মৃত্যুর সাধ, সেই চপল প্রাণের বিন্দুটাকে প্রশ্ন করেছি, তুমি কী, প্রাণ কী লেখা চলে। উত্তর পাইনি। চৌকাঠের ওদিক থেকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে এসেছে, তার পিছনে আর একটা, সিমেন্টের মেঝে সাঁতরে সাঁতরে দরজার কোণের গর্তটায় ডুব দিয়েছে। আরও আছে নাকি। তাড়াতাড়ি পা দুটো টেনে চেয়ারে তুলে নিয়েছি, অসংগতিটা মনের কাছে ধরা পড়তেই হেসে উঠেছি। মৃত্যু-সংকল্প নিয়ে শেষ চিঠি যে লিখতে বসেছে, তারও মৃত্যু-ভয়!

এর পর আর মরা চলে না। পরদিনই মিস্ত্রী ডেকে দরজার কোণের গর্তটা বন্ধ করেছি।

এক সঙ্গে অনেকখানি লিখে ফেলে সৌরেশবাবু ক্লান্তিতে পিঠটা হেলিয়ে দিলেন। হিম-ঝাপসা মাঠের ওপারে নীলাভ গাছের সারি। ছোট টেবিলটা সরিয়ে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন। আলোর শেডটা কাঁপল। এবার তিনি বিস্তৃত হয়েছেন, তাঁর ছায়া পড়েছে গোটা বারান্দা জুড়ে। আর, দেয়ালের অত কাছাকাছি এসেছেন বলেই, অসংখ্য, প্রায় অলক্ষ্য ছোট-ছোট ছবি দেখতে পেলেন। এগুলো কে কবে কতদিন ধরে এঁকেছে কে জানে। একটা পেরেকের আঁচড়, একটু পানের রসের ছিটে, পেনসিলের শিষ-ঘষার দাগ—সব মিলে অদ্ভুত একটা আকৃতি নিয়েছে। সৌরেশবাবুর পরিচিত কোন কিছুর সঙ্গে তার মিল নেই।

যে শব্দটা ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটা আবার যেন জেগে উঠেছে। একটা তীব্র কর্কশ আওয়াজ শুনে সৌরেশ চকিত হয়ে উঠলেন, চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

আবার এসে দাঁড়ালেন সেই রুদ্ধ ঘরের দরজায়। এবার ঢুকতে পেলেন না। সেই নার্স কী কাজে নিজেই বাইরে আসছিল একেবারে তার মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

নার্স কথা বলল না, কিন্তু তার মুখের পেশি আর কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে এক নজর চেয়েই সৌরেশ ওর মনের কথা পড়তে পেলেন।—"কী, আবার কী", নার্স জিজ্ঞাসা করছে নিঃশব্দে।

সৌরেশ, নিজেকে যিনি এতকাল ধী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করে এসেছেন, মনে মনে স্বীকার করলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব আসলে এক তাল মোম বই কিছু না, সামান্য ভয়ের আঁচ লেগে তা গলে যায়।

বললেন, "নার্স, ওকি—ওকি খুব বেশি কাবু হয়ে পড়েছে?"

নার্স বলল, "না ত।"

"কষ্ট পাচ্ছে না?"

"পাচ্ছে। অন্য সব মেয়ের চেয়ে বেশি নয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

শেষ কথা কথাটা নার্স বলল জোর দিয়ে যেন ধমকের সুরে। সৌরেশ এক চমকিয়ে গেলেন। অথচ মেয়েটি তো অল্প বয়সে ছোট, বিদ্যায়, মাথায়। ব্যক্তি কি বড়? সৌরেন এক মুহূর্তে দে

...চার করে দেখলেন। ভিতর থেকে ...াহত পৌরুষ গর্জন করে বলল, 'না, এখনও নয়।' তবু সৌরেশ অনুভব করলেন, এখন, সময়ের এই খণ্ড অংশে এই ...য়েটি তাঁর তুলনায় সবলা। সে ...ধিকারে প্রতিষ্ঠিত। সে যা বলবে, তাই তাঁকে শুনতে হবে। সে যদি সৌরেনকে ঘরে ফিরে যেতে বলে, সৌরেশ, যদিও তিনিই গৃহস্বামী, যাবেন।

তবু পশ্চাদপসরণ করবার আগে শেষ গুলি ছোঁড়ার মত, সৌরেশ বললেন, "খুব বেশি চীৎকার করছে না কি?"

"ইঞ্জেকসন দিয়ে পেইনটা আমরাই বাড়িয়ে দিয়েছি", নার্স জবাব দিল, দাঁড়াল ভিতরে গিয়ে, ওটাই তার 'কোট', বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সৌরেশের মুখের ওপর দরজা ভেজিয়ে দিল।

(ক্রমশ)

# আধুনিক বাংলা ভাস্কর্য

প্রভাতকুমার দত্ত

বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধুনিক ভাস্কর্যের আলোচনায় একটি কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের ভাস্করেরা শিল্পগত আদর্শের শূন্যতার মধ্যে বাস করছেন। একথা খুবই সত্য। কারণ ধর্ম যতদিন ছিল আমাদের সমাজ-বন্ধনের মূল ভিত্তি ততদিন ভাস্কর্য-শিল্পীকে শিল্পগত আদর্শের শূন্যতার কথা মোটেই ভাবতে হয়নি। বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের হাজার দেড় হাজার বছরের ভারতীয় ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রেরণার ইতিহাস হচ্ছে সামগ্রিকভাবে ধর্মপ্রেরণার ইতিহাস। ধর্মই ছিল তখন সমাজের মূলশক্তি ও চালক। ধর্মভাবের দরুণ শিল্পী সমাজের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা থাকতেন। শিল্পীর পক্ষে আদর্শচ্যুত হবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। বিভিন্ন বিরোধী আদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে তখন শিল্পিসত্তা বিপর্যস্ত হত না। শিল্পীর তখন একটাই লক্ষ্য ছিল; তা হচ্ছে তাঁর কাজের গুণগত উৎকর্ষ বাড়ানো। কিন্তু আধুনিক কালে ভাস্করদের পায়ের তলায় একেবারে মাটি নেই অর্থাৎ তাঁরা নির্দিষ্ট কোন সুস্থ আদর্শকে তাঁদের জীবনের অঙ্গীভূত করে নিতে পারেন নি। পরিবর্তনশীলতার ও পরস্পরবিরোধিতার এই যুগে সাংস্কৃতিক আদর্শের কোন ঘনীভূত রূপ চোখে পড়ে না। শিল্পীরা আজ আদর্শচ্যুত। শিল্পীর সত্তা আজ আদর্শহীনতার মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত। কোন্ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাঁর শিল্প সাধনায় ইষ্টলাভ হবে, এ সম্পর্কে তিনি স্থিরনিশ্চয় নন। সমাজে তাঁর অনেকটা ভাসমান অবস্থা। এ পরিস্থিতিতে সত্যিকার বিরাট সৃষ্টি সম্ভব নয়।

সমাজ ও ব্যক্তির এই আদর্শহীনতার দরুণ ভাস্কর্যশিল্পী আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আগেকার সমাজে রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কৃষক পর্যন্ত সকলেই একই ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। যাঁদের হাতে পয়সা ছিল অর্থাৎ বিত্তবান রাজা-মহারাজা-শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় তাঁরা অকাতরে অর্থব্যয় করে ভাস্করদের বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিযুক্ত করতেন। শিল্পীকে তাঁর কাজের উপযোগী মাল-মশলা সংগ্রহের কথা ভাবতে হত না। রূপসৃষ্টির জন্যই তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োজিত করতেন। আর রূপ-কল্পনায় এই অপরিসীম একাগ্রতা ছিল বলেই ভুবনেশ্বর-কোনারক-খাজুরাহোর মত অপূর্ব ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আজকালকার ভাস্করদের কাছে রূপসৃষ্টির প্রশ্নটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। তাঁকে ভাবতে হয় তাঁর মাধ্যমের উপযোগী মাল-মশলা সংগ্রহের কথা। কারণ ভাস্কর এখন একা, তাঁর পিছনে আর সেই বিত্তবান পৃষ্ঠপোষক শ্রেণী নেই। যে অর্থে সে যুগে ভাস্কর্যের একটা সামাজিক মূল্য ছিল আজ তা অস্বীকৃত। ভাস্কর্য সৃষ্টি আজ আর সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। ভাস্কর এখন তাঁর নিজের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অথচ সম্পূর্ণ একার পক্ষে ভাস্কর্যের মত শিল্পমাধ্যমের ব্যয়সাধ্য মাল-মশলা সংগ্রহ করা সহজ কথা নয়। তা ছাড়া সামাজিক চাহিদা না থাকায় ভাস্কর্য-শিল্পীর কাজ যে সহজে বিক্রী হবে এমন সম্ভাবনাও কম।



গর্বিতা মা —প্রদোষ দাশগুপ্ত

ভাস্কর্য-শিল্পীর আরও কিছু অসুবিধা আছে। আধুনিক ভাস্করদের শিল্পগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন ভারতের অতীত ভাস্কর্যকলার যথাযথ অনুধাবন। এ কাজ প্রথমে সম্পন্ন করতে না পারলে শিল্পীর পক্ষে নবসৃষ্টির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, আধুনিক ভাস্করদের ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যসম্পদ অনুধাবন করার উপযুক্ত সুযোগ নেই। পাশ্চাত্ত্যের ভাস্কর্যসম্পদ অনুধাবনের ব্যাপারেও ঠিক একই কথা। আমাদের ভাস্কর্যশিল্পীরা বর্তমানে একটা উভয়সংকটের মধ্যে বাস করছেন। একদিকে তাঁরা সত্যিকার মহৎ সৃষ্টির উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বঞ্চিত; অপর দিকে তাঁদের এমন ভাস্কর্য-সৃষ্টি করতে হবে যা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্মান যেন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এই উভয়-সংকটের মধ্যে শিল্পীর পক্ষে এগুতে হলে অসীম ধৈর্য আর স্থিরচিত্ত সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিতে হবে। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন সংকট তো জীবনের সব ক্ষেত্রেই, মহৎ শিল্পসৃষ্টি করতে গেলে সংকটের সম্মুখীন হতে হবে এ আর নতুন কথা কি? কিন্তু প্রশ্ন হল, সংকটের রূপটা প্রকৃত উপলব্ধি না করে অনেকে আধুনিক ভাস্কর্যের উপর সহজেই বিরূপ মন্তব্য করে বসেন। এ ভুল যাতে না হয়, সেজন্য সংকটের আসল প্রকৃতি পরিষ্কার জানা দরকার।

সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমাদের শিল্পীরা কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে নেই। তাঁরা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তাঁদের সৃষ্টিক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ ব্যাপারে বাঙ্গালী ভাস্করদের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বর্তমানে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর,



মাথা অর্ধদাম —রামকিঙ্কর

তাঁদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। বাঙালী ভাস্করদের মধ্যে যাঁরা দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন প্রদোষ দাশগুপ্ত, রামকিংকর, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শঙ্খ চৌধুরী, চিন্তামণি কর ও সুনীল পাল। সমগ্রভাবে এই সমস্ত বাঙালী ভাস্করেরা আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যকলায় নতুন প্রাণসঞ্চার করেছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের আজ যতটুকু কদর তা প্রধানত এঁদের প্রচেষ্টার দরুণই সম্ভব হয়েছে। যাই হক, আমাদের ভাস্করেরা বর্তমান সংকটের মধ্যে নিজেদের কিভাবে মানিয়ে নিয়েছেন সেকথা জানতে হলে সাম্প্রতিক কালে ভাস্কর্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানা দরকার। আগেকার দিনে ভাস্কর্যের সঙ্গে স্থাপত্যের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। ভাস্কর্যের বিকাশ হয়েছিল স্থাপত্যকলাকে কেন্দ্র করে। স্থাপত্যকে বাদ দিয়ে ভাস্কর্যের কথা চিন্তাই করা যেত না। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে ভাস্কর্য ছিল মন্দির বা বিহার-চৈত্যের অঙ্গভূষণ। আর বড় বড় মন্দির-বিহারের শোভাবর্ধন করতে গেলে ভাস্কর্য-কাজগুলিকে বড় আকারে নির্মাণ করতে হত। মন্দির-স্থাপত্যের বিরাট ও উন্নত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিষ্ঠ ভাস্কর্য-কাজগুলির গাম্ভীর্য মিলে সমগ্র জিনিসটি অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হত। এই সৌন্দর্যময় রূপসৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে যুগের তীর্থযাত্রীদের হৃদয় ও মন আপনা হতেই ভক্তিনম্র শ্রদ্ধায় আনত হয়ে পড়ত। কিন্তু বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি স্থাপত্যবিহীন ভাস্কর্যের যুগ। এখনকার দিনে তো আর মন্দির বিহার নির্মাণের কোন রীতি নেই। এখনকার ভাস্কর্য আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। ফলে ভাস্কর-দের পক্ষে তাঁদের কাজগুলিকে বড় আকারে তৈরী করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই বর্তমান যুগে বড় ভাস্কর্যকাজের বদলে ছোট ভাস্কর্য কাজের প্রচলন বেশী। ভাস্করদের অপরিসর ছোট স্টুডিওতে বড় কিছুর পরিকল্পনা করাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া যতদিন দেব-দেবীর মূর্তি তৈরীর সামাজিক চাহিদা ছিল, ততদিন বড় ভাস্কর্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এখন দেব-দেবীর মূর্তির প্রয়োজন কমেছে। আর ভাস্কর্যকাজ দশজনের একত্র উপ-ভোগের বদলে একজনের উপভোগের বস্তু হওয়ায় সেগুলির আকার ক্রমশ ছোট হয়েছে। ছোট ভাস্কর্য তৈরী করলে পৃষ্ঠ-পোষকহীন ভাস্করকে মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য তেমন অসুবিধায় পড়তে হয় না। আর ভাস্কর্যের এই আকার পরিবর্তনের দরুণ আমরা লক্ষ্য করছি যে, আগে প্রধানত পাথরেরই মূর্তি হত, কিন্তু এখন কাঠ, কাঁচ, লোহার তার, প্লাস্টার ইত্যাদি নানা মাল-মশলার সাহায্যে ভাস্কর্য সৃষ্টি করা হচ্ছে।

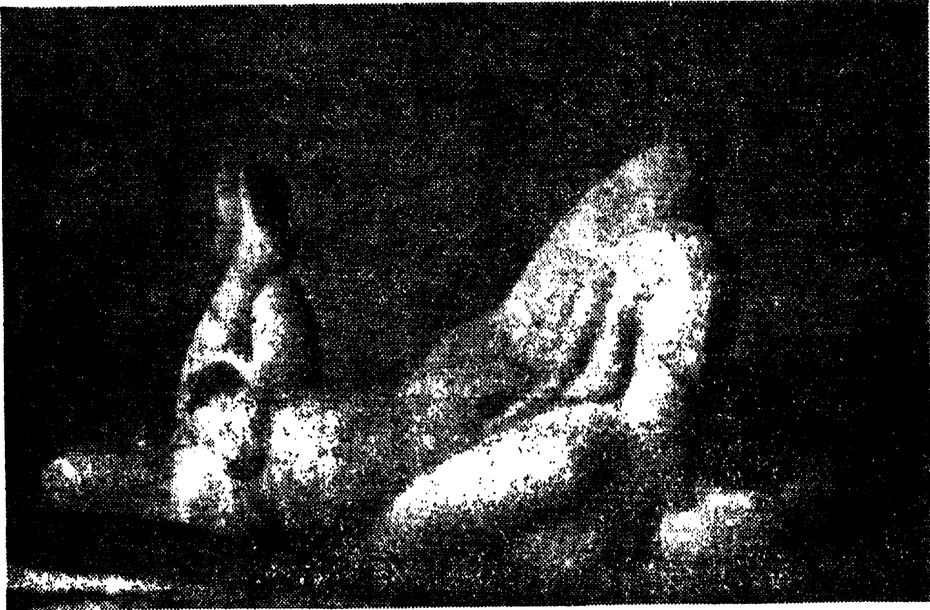
যতদিন কেবল দেবতাদের মূর্তি তৈরীর প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল, ততদিন শিল্পীর পক্ষে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবভঙ্গিকে রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আটপৌরে জীবনের যে কোন বিষয়বস্তুকে তিনি স্বেচ্ছায় রূপ দিতে পারতেন না। মানুষ ভগবানের মূর্তি গড়ত তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ, আশ্রয়, শক্তি ও সমৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই। আমাদের শিল্পীরা দেবতার মূর্তিতে, মানুষের মত আকারে, মানুষের যে অপরিমেয় ঐশ্বরিক শক্তি তাকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করে-ছিলেন। সুতরাং সেখানে ভাস্করকে একটা বিশেষ রীতি মেনে চলতে হয়েছে। আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত আমাদের ভাস্কর্য তথা শিল্পকলা ছিল heiratic। এবং heiratic শিল্পের শিল্পশাস্ত্র থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই শাস্ত্র অনুসারেই ভাস্করকে রূপ সৃষ্টি করতে হত। তাই তিনি খুঁটিনাটিতে না গিয়ে মোটামুটি সর্বজনীন ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন হচ্ছে সেকুলার (Secular) আর্টের যুগ। শিল্পশাস্ত্রের কোন বালাই এখন আর নেই। ভাস্কর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাবগত বিরাটত্বের কথা বর্তমানে না ভাবলেও চলে। কারণ আধুনিক ভাস্কর্যের পারমার্থিক সাধনায় সাহায্য করার যে ফাংশ্যানাল দিক তা তো নেই। শিল্পসম্মতরূপে ভাস্কর এখন যে কোন বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। ভাস্কর্যের আকার ছোট হওয়ায় দরুণ বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনাও অনেকটা সহজ হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে চিত্রকলা আর ভাস্কর্যকলার মধ্যে পার্থক্য বর্তমানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। চিত্রের মত ভাস্কর্য

একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু হয়ে ওঠায় এই পার্থক্য ক্ষীণ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অনেক সময় দেখা যায়, চিত্রশিল্পে শিল্পী কেবলমাত্র তাঁর এক বিশেষ 'মুড'কে রূপ দেওয়ার জন্য তুলি ব্যবহার করেছেন। ভাস্কর্যেও আজকাল এমন সৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে পরিস্ফুট কোন বিষয়বস্তু নেই, শিল্পী শুধু তাঁর মালমশলা সাজিয়ে এক নয়ন-সুখকর ভঙ্গীর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আধুনিক যুগে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে চরম বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে এইজন্য যে, ভাস্কর প্রত্যক্ষ বিষয়ে সন্তুষ্ট না থেকে অপ্রত্যক্ষ ভাবের জগতে চলে গেছেন। আজকাল শুধু বস্তুনিরপেক্ষ চিত্র সৃষ্টি হচ্ছে না, বস্তুনিরপেক্ষ ভাস্কর্যও সৃষ্টি হচ্ছে।

বাঙলাদেশের যে সমস্ত ভাস্করদের নাম আমরা আগে করেছি, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী শিল্পী হচ্ছেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তাঁর মত টেকনিকসিদ্ধ ভাস্কর বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি বহু ভাস্কর্যশিল্পীকে গড়ে তুলেছেন। দেবীপ্রসাদকে ঠিক সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পী বলা যায় না। কারণ তিনি সাম্প্রতিক ইউরোপীয় ভাস্কর্যের যে নতুন গতিধারা তাকে নিজের সৃষ্টিতে অঙ্গীভূত করেন নি। কেউ কেউ অবশ্য তাঁর ভাস্কর্যে, রোমাণ্টিক ভাবাবেগের দিক থেকে ফরাসী শিল্পী রোঁদা এবং



যখন শীত আসে —দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



—চিন্তামণি কর



**উপবিষ্ট মূর্তি** —**শংখ চৌধুরী**

মাটির কাছাকাছি মানুষের সচল ও বিষয়নিস্ট রূপায়ণের দিক থেকে মাইকেল এঞ্জেলোর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। সে যাই হোক, দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্যে নিখুঁত টেকনিকে বিষয়বস্তুর যে বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করি তা ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যকে বর্তমানকালেও অনেকটা সঞ্জীবিত রাখায় সাহায্য করেছে।

ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত দেবীপ্রসাদেরই ছাত্র। তার মধ্যে আমরা নানা ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করি। ভারতীয় ভাস্করের কাছে ভাস্কর্যে হাতেখড়ি হবার পর তিনি যান লণ্ডনের রয়াল একাডেমিতে। সেখানে তিনি প্রথাসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাস্কর্য রীতির পাট গ্রহণ করেন। অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান একাডেমিতে শিক্ষা নিলেও ফরাসী দেশ ও ইংলণ্ডের ভাস্কর্যের নূতন আন্দোলনের প্রভাব তাঁর উপর এসে[illegible]। তাঁর বিভিন্ন মূর্তির অবয়বের মণ্ডনরীতি যে হেনরি মূর প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের চর্চাও তিনি বিশেষভাবে করেছেন। আমাদের প্রাচীন পোড়ামাটির ভাস্কর্য বিশেষ করে বাঙলাদেশের ইঁটের তৈরী মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ভাস্কর্য কলা তাঁর শিল্পীচিত্তকে আকর্ষণ করেছে। প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্যে মূর্তির অবয়বের একটা স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হয়ত এই হতে পারে যে, তিনি প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যের একটা নতুন অর্থের সন্ধান করছেন। তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির পেছনে তীব্র মানসিক সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। অবয়বের স্বাভাবিক গড়নকে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভাঙছেন বলে হয়ত মনে হতে পারে তাঁর সৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ততা বলে কিছু নেই। কিন্তু তাঁর মূর্তির বিভিন্ন অংগের নম্রমণ্ডন ও রেখাগত ভংগী আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

রামকিংকর একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যাপক। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁর সৃষ্টির সংগে শান্তিনিকেতনের শিল্পধারার কোন সম্পর্ক নেই। বরং পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক ভাস্কর্যের যাঁরা মহারথী, তাঁদের প্রভাব রামকিংকরের উপর বেশী পড়েছে। অবশ্য যে অর্থে সাধারণত আধুনিক কথাটি ব্যবহার করা হয়, সে অর্থে রামকিংকর নিজেকে আধুনিক বলে মনে করেন না। তাঁর চিত্রের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ভাস্কর্যেও তিনি বিরাট আকারের সৃষ্টির পক্ষপাতী। শান্তিনিকেতনের প্রকাশ্য স্থানে তাঁর ভাস্কর্য কাজ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই সেই সমস্ত কাজের বিরাটত্বে বিস্মিত হবেন। নিছক ভংগীপ্রধান ভাস্কর্য সৃষ্টির দিকেই রামকিংকরের ঝোঁক। অনেক সময় তিনি মানুষের মূর্তির স্বাভাবিক গড়নকে প্রাধান্য না দিয়ে পাথর বা প্লাস্টারকে নয়নসুখকরভাবে সাজিয়ে বিষয়বস্তুর একটা ছন্দোময় ইংগিত দিয়েছেন। তাই যতই বস্তুনিরপেক্ষ হোক না কেন, রামকিংকরের প্রত্যেকটি কাজের একটি গীতিধর্মী রূপ আছে। এ সূত্রে পাঠককে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত তাঁর বিখ্যাত সাঁওতাল পরিবার ভাস্কর্য দুটির কথা স্মরণ করতে বলি।

চিন্তামণি কর বর্তমানে কলকাতার সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের তিনি ছাত্র ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানেই তিনি এক ওড়িয়া ভাস্করের কাছে পরম্পরাগত ভাস্কর্য-রীতির শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে ভাস্কর্যের পাঠ গ্রহণ করার জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন। লণ্ডনে চিন্তামণি কর হেনরী মূর প্রমুখ ভাস্করদের সাহচর্য লাভ করেন। প্যারিসের ভাস্কর্যের নতুন ধারার সংগেও তাঁর পরিচয় হয়। চিন্তামণি করের ভাস্কর্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাজে প্রাচ্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও পাশ্চাত্ত্যের ত্রৈমাত্রিক ঘনত্বের (Three Dimensional) চমৎকার মিলন হয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে তাঁর পোড়ামাটির সজীব কাজগুলি।

শান্তিনিকেতনের রামকিংকরের ছাত্র শংখ চৌধুরী আর একজন প্রতিভাবান বাঙালী ভাস্কর। তিনি বর্তমানে বরোদায় শিল্প-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। শংখ চৌধুরী ইউরোপে বহুদিন থেকে সেখানকার শিল্পরীতি চর্চা করেছেন। তাঁর মধ্যে এক সদাচঞ্চল ও সৃষ্টিধর্মী শিল্পীমনের পরিচয়



ইউরেকা —সুনীল পাল

পাওয়া যায়। ভাস্কর্যের মালমশলা হিসাবে তিনি নানা জিনিস ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর বেশীরভাগ ভাস্কর্যের গড়নভঙ্গী অদ্ভুত ধরনের। যেগুলি মূর্তিপ্রধান কাজ নয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই অদ্ভুতত্ব বিশেষভাবে প্রকট। এই কাজগুলি দেখে মনে হয় যেন ভাস্কর মাধুর্যময় কম্পোজিসনের ক্ষেত্র কতটা বৈচিত্র্য আনা যায়, তা দেখার জন্যই মূর্তির স্বাভাবিক গড়নকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভেঙেছেন। অবশ্য শঙ্খ চৌধুরীর এই ধরনের কম্পোজিশন। অ্যাবস্ট্রাক্ট হলেও তা আমাদের দৃষ্টিকে পীড়িত করে না। এগুলির মধ্যে অনেক সময় মূর্তিপ্রধান ভাস্কর্যের সম্পূর্ণ রূপের সাবলীলতা খুঁজে পাওয়া যায়। আশ্চর্য এই শঙ্খ চৌধুরী যে জিনিসেই হাত দিয়েছেন—কি পাথর, কি কাঠ, কি প্লাস্টার—সব কিছুকেই অদ্ভুতভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন। কম্পোজিশনের বৈচিত্র্যের জন্য বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক গড়নকে তিনি যথা ভেঙেছেন, নানা ধরনভঙ্গীর সৃষ্টি করেছেন তখন তার পেছনে একটা গভীর শিল্পগত তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই তাৎপর্যকে বুঝতে পারলে শঙ্খ চৌধুরীর কাজকে বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

সুনীল পাল বর্তমানে কলকাতার সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাঙলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে প্রতিমা শিল্পীদের অবদান একটা বড় স্থান জুড়ে আছে। ভাস্কর সুনীল পাল এই যে শিল্পধারা তারই শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। প্রথাগত ভারতীয় ভাস্কর্যকলায় তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। যে সাধনা আর নিষ্ঠা একদিন প্রাচীন ভারতীয় ভাস্করকে বিরাট সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল সেই নিষ্ঠা ও সাধনা সুনীল পালের মধ্যে উপস্থিত। ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে তাঁর রিলিফ প্যানেলগুলি লক্ষ্য করলেই সেকথা বোঝা যায়। আলোচ্য ভাস্করের মধ্যে আমরা পাশ্চাত্যের সর্বাধুনিক ভাস্কর্যের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখি না। বোধ হয় মূলে প্রতিমা-শিল্পের ঐতিহ্য থাকায় শিল্পী সুনীল পাল অ্যাবস্ট্রাক্ট রীতির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। আধুনিক বাঙালী ভাস্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাজের সঙ্গে তাঁর মিল সবচেয়ে বেশী খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা উপরে বাঙলার আধুনিক ভাস্কর্যে যাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয় ভাস্কর তাঁদের পরিচয় দিলাম। এঁদের কাজকে যথাযথ বোঝার চেষ্টা করলে মোটামুটিভাবে বাঙলার আধুনিক ভাস্কর্যকে জানা সম্পূর্ণ হয়। এঁরা ছাড়াও অবশ্য বাঙলাদেশে বহু প্রতিভাশালী ভাস্কর রয়েছেন। সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে আশার কথা এই বাঙলাদেশে বর্তমানে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে ভাস্কর্যের চর্চা করছেন এবং যুগ উপযোগী ভাস্কর্য সৃষ্টিরও চেষ্টা করছেন। এদিক থেকে বাঙলাদেশের ভাস্কর্যকলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলা যায়।

# বিশ্ব-বিচিত্রা

জন্তুদের মধ্যে কুকুরদের নিয়ে মামলাই হয় বেশী। ব্রুস নামে এক কুকুর নিজের পছন্দ খাটাতে গিয়ে তার মালিককে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করে রাত্রে তাকে আটকে না রাখার দায়ে। ব্রুসের রুচি ছিল একটু বেশ ভালভাবে থাকার এবং সেই কারণে ছাড়া পেলেই কোন না কোন বড় হোটেলে গিয়ে ধর্ণা দিত। এক পুলিস ওকে দেখে বাড়ির অন্দরে অন্দরে ঘোরা-ঘুরির অপরাধে ধরে নিয়ে যায়। মামলা অবশ্য ডিসমিস হয়ে যায় এবং ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেনঃ "কুকুরের অভিরুচি নিয়ে আমাদের তর্কবিতর্ক না করাই ভাল।"

আমেরিকার ডেনভারের এক রূপপ্রসাধন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী এক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের নামে প্রায় পৌনে ছ লক্ষ টাকার ক্ষতি-পূরণের এক মামলা আনেন তাঁর শিক্ষিত ফক্সটেরিয়ার টিপ্পির তাঁর প্রতি অনুরাগ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। কর্ত্রী অভিযোগে বলেন, উক্ত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান কোনক্রমে টিপ্পিকে যোগাড় করে "দি এম্পায়ার ভালজ" নামক ছবিতে তাকে নামায়।

অভিযোগকারিনীর উকিল বলেন যে, তাঁর মক্কেল নিঃসন্তানা মহিলা, স্বামীর কাছ থেকে আলাদা এবং পাঁচ বছর ধরে তাঁর যতো স্নেহ ওই কুকুরটার প্রতিই। নিজের ব্যবসা ছাড়া ঐ কুকুরটাই তাঁর সব এবং দু'বছর আগে কুকুরটি অদৃশ্য হয়ে যেতে মহিলার বুক ভেঙে যায়। সেই থেকেই তিনি মনমরা হয়ে আছেন।

বিলেতে ডারহামের শ্রীমতী লিলি সেমুর বিল নামক এক তোতাপাখীর ব্যাপারে মামলা এনেছিলেন অবশ্য তার ক্ষতিপূরণের দাবীটা অতো নয়। মামলাটা আনা হয়েছিল পাখীটির বিক্রেতার বিরুদ্ধে। বিক্রীর সময় মহিলাকে বলা হয় যে, বিল খুব বলিয়ে-কইয়ে এবং ভীষণ দিবিবাজ। শুনে মহিলা দেড়শ টাকা দিয়ে পাখীটি নিতে তাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তিন হপ্তার মধ্যে যদি পাখীটি কথা না বলে, তাহলে বদলে দেওয়া হবে। সান্ডারল্যান্ড কাউন্টি কোর্টের বিচারপতিকে মহিলা জানান যে, পাখীটি একদিনও একটিও কথা বলেনি। মামলার খরচসহ সওয়াশ টাকা ক্ষতিপূরণের রায় দিয়ে বিচারপতি মহিলাকে উদ্দেশ করে মন্তব্য করেনঃ "বোধ হয় আপনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলেই পাখীটি দিব্যি গালতে মুখ খোলেনি।"

জন্তুদের নিয়ে মাঝে মাঝে অদ্ভুত মামলার খবর শোনা যায়। দিনকতক আগে আমেরিকার এক মহিলা এক বিমান কোম্পানীর নামে মামলা আনেন এই কারণে যে, ওদের হাতে তার 'সদ্বংশজাত' পুডলটি মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য দুর্ভোগ লাভ করেছে। ব্ল্যাক স্টার নামক পুড্‌লটিকে লস এঞ্জেলসের এক প্রদর্শনী ফিরৎ বিমানে করে সানফ্রান্সিস্কোয় তাঁর গৃহে পৌঁছে দেবার কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে কুকুরির তার খাঁচার ডালাটি খুলে বেরিয়ে পাঁচদিন অজ্ঞাতবাস করে এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরে ধরা পড়ে যে, সেই অজ্ঞাতবাসকালে কুকুরি অসৎসংসর্গ লাভ করেছে। এই কারণেই বিমান কোম্পানীর নামে ক্ষতি-পূরণের মামলা।

কোন জন্তুকে কি বলা হল তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা থাকবার কথা নয়, তবে দুটি সদ্বংশজাত বিড়ালকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক মানহানির মামলা হয়। দুটি বিড়ালই নিউইয়র্কের এক জনপ্রিয় মঞ্চাভিনয়ে যোগদান করে এবং ওদের বংশমর্যাদার জন্য মালিকের গর্ব ছিল। তাই এক লেখক তাঁর বইয়ে বিড়াল দুটির মাকে অজ্ঞাতকুলশীলা বলে অভিহিত করায় ওদের মালিক মানহানির মামলা নিয়ে আসে—মামলায় অবশ্য তার হার হয়।

কোন জন্তুর নিজেই মামলা রুজু করার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখায় আমেরিকার টেলিভিসন-খ্যাত শিম্পাঞ্জী জে ফ্রেড মাগস্। একদিন লাল প্যান্ট এবং নীল শার্ট পরে মালিক সমভিব্যাহারে ফ্রেড নিউইয়র্ক সুপ্রীম কোর্টে এসে হাজির। তার উকিলরাও মুহুরীর হাতে তার অভিযোগ-পত্র পেশ করে দিলে।

ফ্রেড ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী ও অন্যান্যের নামে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে "তার খ্যাতি ও ব্যবসায়িক মূল্য খর্ব করার ষড়যন্ত্রের জন্য।"

অভিযোগে বলা হয় যে, প্রতিবাদীপক্ষ ওকে বর্ণনা করেছে "ছাড়া পেলেই কামড়াতে উদ্যত হয় এবং ওকে চরে বেড়াতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

*

অদ্ভুত ঘটনাচক্রের একটা দৃষ্টান্ত দিতে আমেরিকার মাসাচুসেটসে পিটস্‌ফিল্ডের পিটার পেরলেটের কথা উল্লেখ করা যায়। এক বছরের মধ্যে ভদ্রলোক তিনবার গাড়ি-দুর্ঘটনায় পড়েন। প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে নর্থ স্ট্রীটে; দ্বিতীয় দুর্ঘটনা সাউথ স্ট্রীটে এবং তৃতীয়টি ঘটে ওয়েস্ট স্ট্রীটে। শহরে একটা ইস্ট স্ট্রীটও আছে, কিন্তু তিনটে দুর্ঘটনার পর পিটার সে পথে আর ঘেঁষেননি।

*

হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার অনেক অদ্ভুত ঘটনার কথা শোনা যায়। আইল অফ ওয়াইটের পাথরের নুড়ি বিছানো সমুদ্রতীরে এক যুবক তার পোশাক খুলে সাঁতারে নামে। জল থেকে ফিরে তার পোশাকের মধ্যে জামার কলার-বোতামটা দেখতে পেলে না। একটা বিশেষ আকৃতির মনি-বসানো বোতামটা দু'ঘণ্টা ধরে খুঁজেও পেলে না। সেই রাত্রে বেশ একটা ঝড় হয়ে যায়। বিরাট ঢেউ তীরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তচনচ করে যায়।

ঐ ঘটনাটির দশ সপ্তাহ পরে যুবকের মা আইল অফ ওয়াইটে বেড়াতে যান। সমুদ্রতীরে তিনি রোদ পোয়াচ্ছেন, হঠাৎ পায়ের কাছে কি একটা চিকচিক করতে দেখেন—তাঁর ছেলের সেই বোতামটি।



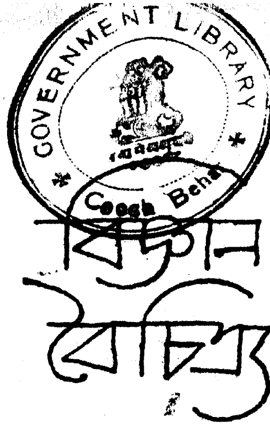
আধুনিক চীনে ব্যাপক পূর্তকার্যের ফলে প্রত্নতত্ত্ববীদদের পক্ষে অনেক কিছু নতুন করে জানবার প্রত্নত উপাদান পাবার সুবিধে হয়েছে। তাছাড়া প্রাদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিক কমিশনগুলিও বহু খননকার্যে ব্যাপৃত। এইভাবেই হোপাই প্রদেশের ওয়াং-টুতে হান রাজবংশীয়দের (খৃষ্টপূর্ব ২০৬ থেকে ২২০ খৃষ্টাব্দ) কবর খুঁড়ে পাওয়া যায়। ওয়াং-টুর কবর সম্পর্কে বলা যায় যে এই প্রথম একটি হানদের ইটের গাঁথুনি যা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এখানে মুরালের আকারে হান আমলের সর্বাধিক ছবির সমাবেশ পাওয়া যায়। ওপরের ছবিখানি একটি কার্নিসের গায়ে আঁকা একটি মুরালের একাংশ। ছবিখানি হচ্ছে 'পূর্ব শিখরে (শানতুংগের পবিত্র তাই পর্বত) বিচরণশীল শ্বেত খরগোস'

বৃটেনে স্টোক সেণ্ট জর্জের এক চাষী আঠারো বছর পর তার হারানো তহবিল ফিরে পেয়েছিল। বালক বয়সে স্কুলে যাবার পথে একটা লকেট ও কিছু মুদ্রা-সমেত তহবিলটি তার খোয়া যায়। সেই রাত্রে সে স্বপ্ন দেখে যে কোথাও মাটি খুঁড়তে যেন সে তার হারানো সামগ্রী খুঁজে পেয়েছে। আঠারো বছর পর রাস্তার ধারে একটা খানা পরিষ্কার করার সময় দ্বিতীয়-বার কোদাল বসাতেই তার হারানো থলিটি দেখতে পায়। থলির চামড়া পচে গিয়েছে, কিন্তু স্বপ্নে যেমন দেখেছিল, লকেট ও মুদ্রাগুলি ঠিক তেমনিই আছে।

সিডনীর (অস্ট্রেলিয়া) এক দম্পতি এক-দিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে রাস্তায় একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পায়। ওরা সত্তর টাকা সমেত ব্যাগটি মালিককে খোঁজ করে ফিরৎ দেয়। ব্যাগের মালিক খুসী হয়ে ওদের পনের টাকা বখশীস দেন এবং ওরা ঐ টাকায় একখানা লটারির টিকিট কেনে। সেই টিকিটে ওরা প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা পায় এবং এ টাকাটা আবার ওরা সেই মনিব্যাগের মালিকের সংগে ভাগাভাগি করে নেয়।

রোড্ দ্বীপে এক শ্রমিক একটা রাস্তায় মেন পাইপ বসাবার কাজে নিযুক্ত থাকাকালে তার সর্বস্ব জমানো টাকা, প্রায় একশ পঁচাত্তর, সমেত ব্যাগটি তার পকেট থেকে পড়ে হারিয়ে যায়। সে প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। মাস কতক আগে সেই শ্রমিক সেই একই রাস্তায় ইলেকট্রিক তার বসাবার কাজে নিযুক্ত থাকাকালে তার পাশের এক শ্রমিক হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেঃ "দেখ, কি পেয়েছি!" ওর কোদালে সেই হারানো মনিব্যাগ এবং তার ভিতরে টাকা-গুলো যথাযথ রয়েছে।

হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার অপ্রত্যাশিত পরিণতির দৃষ্টান্ত একটা পাওয়া যায় যুদ্ধের আগে ফিলাডেল-ফিয়ায়। ইব্বেটসন নামক এক ব্যক্তির অনুপস্থিতিকালে তার স্ত্রী পুরনো জিনিসপত্তর কতকগুলো বিক্রি করে দেয়। বাড়িতে ফিরে ইব্বেটসন রুষ্ট হয়, কারণ বিক্রীত মালপত্তরের সঙ্গে তার এক পরলোকগত ভ্রাতার একখানা ছবিও চলে গিয়েছে। ইব্বেটসন তাড়াতাড়ি সেই পুরণো সামগ্রী ক্রেতার কাছে উপস্থিত হয় এবং বিক্রীত সামগ্রী হাতড়াতে আরম্ভ করে। খুঁজতে খুঁজতে ফটোখানি সে পেলে—কিন্তু তার সংগে পেলে একতাড়া টিকিটমারা পুরণো খাম। ইব্বেটসন নিজে ডাকটিকিট সংগ্রহকারী বলে খামগুলি নিয়ে আসে। তার মধ্যে কতকগুলি টিকিট ছিল দুষ্প্রাপ্য এবং ইব্বেটসন সেগুলো বিক্রী করে পায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা।



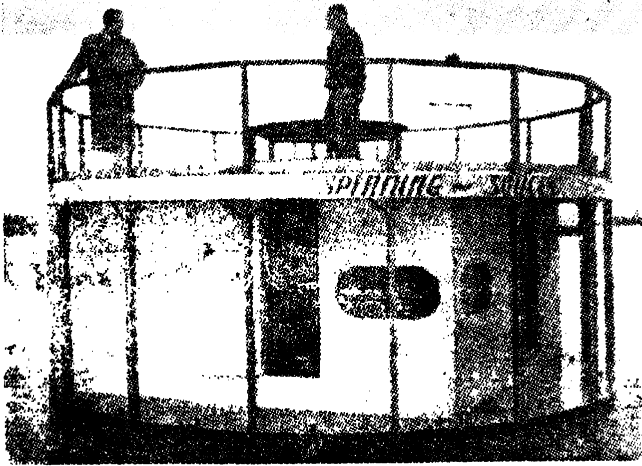

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্রদত্ত**

*ঠোঙায় ভ'রে জিনিসপত্র কিনে থলে ভ'রে বাড়ি এনে সব জিনিস বার করতে গিয়ে দেখা গেল—চালে ডালে, নুন, চিনিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ঠোঙাগুলির তলা ফেঁসে যাওয়ার জন্যই এই দুর্ভোগ।* "ক্রুপ্যাক" নামে যে নতুন ঠোঙা বার হয়েছে, সেগুলি সাধারণ ঠোঙার চেয়ে প্রায় বিশগুণ বেশী মজবুত। ক্রুপ্যাক ক্রাফ্‌ট কাগজ দিয়ে তৈরী করা হয়। ক্রাফ্‌ট কাগজগুলো সাধারণভাবে তৈরী করার সময় এদের আঁশগুলো যেভাবে জুড়ে দিয়ে ফেল্টের মত তৈরী হয়, ক্রুপ্যাকের ক্রাফ্‌ট কাগজ কিন্তু সেভাবে তৈরী হয় না। ক্রুপ্যাকের কাগজ তৈরীর সময় আঁশগুলো বোনার মত করে জড়িয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে ক্রাফ্‌ট পেপারে যেসব ঠোঙা তৈরী হয়, তার চেয়েও ক্রুপ্যাক প্রায় তিন-চার গুণ বেশী শক্ত।

*

বিল্‌ ফের নামক এক ভদ্রলোক গোল চাকার মত এক মোটরলঞ্চ তৈরী করেছেন।




**ঢাকার মত মোটরলঞ্চ**

এই নতুন ধরনের লঞ্চটি লাটুর মত ঘুরতে ঘুরতে জলে চলতে থাকবে। এতে ৭½ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন লাগান আছে। এটি ঘণ্টায় ৫ 'নট' করে যাবে। মিঃ ফের ছোট ছেলেদের আনন্দ দেবার জন্য এটিকে তৈরী করেছেন। লঞ্চটিতে বাস করবার জন্য কেবিন, রান্না করার আলাদা ব্যবস্থা ছাড়াও ইঞ্জিন-ঘরও আছে। ছাতের উপরে বসে খেলাধুলো গল্পগুজব করা যায়।

*

সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ারগণ ভূমধ্যস্থিত তেল ও গ্যাসের সন্ধানের জন্য একরকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রটির বিশেষভাবে নির্ভুল খবর সংগ্রহ করার ক্ষমতা আছে। মাটির কোন স্তরে তেল বা গ্যাস আছে এবং কি পরিমাণে আছে, তা এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই জানা যাবে। এমন কি মাটির নীচের তেল কোন্‌ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাও জানা সহজ হবে। শুধু যে বর্তমানের গতিবিধি জানা যাবে তা নয়, এ যন্ত্র দিয়ে ভবিষ্যতের পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত মাটির নীচের তেল বা গ্যাস কোন্‌ স্তরে থাকবে, কতখানি থাকবে এবং কিভাবে প্রবাহিত হবে, সে খবরও জানা যাবে।

*

নেভাল অর্ডিন্যান্স লেবরেটরীতে নতুন রকম ছোট্ট এক ব্যাটারী তৈরী করেছে। একটি ছোট রিস্টওয়াচের মাপের এই ব্যাটারীটি। এই ব্যাটারী দশ বছর পর্যন্ত চালু থাকবে এবং দশ বছরের পর আবার চার্জ করার দরকার হবে। ক্ষুদে ব্যাটারী আজকাল বহনোপযোগী ছোট রেডিও, বধির ব্যক্তির কানের যন্ত্র, এয়ারোপ্লেনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। এই ব্যাটারীর প্লেটের জন্য লেড্‌, লেড্‌ অক্সাইড এবং সিলভার পাউডার ব্যবহার করা হয়। এগুলির জন্যই এত শক্তিশালী ক্ষুদে ব্যাটারী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই একক ব্যাটারী থেকে ৯।১০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। যে কোনও একটি বড় টর্চলাইটের ব্যাটারী থেকে মাত্র ১½ ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। ব্যাটারীটি ওজনে মাত্র দেড় আউন্স। এই ব্যাটারী তৈরী করার খরচ মার্কারী ব্যাটারী তৈরী করার খরচের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, খরচ বেশী পড়লেও এর ক্ষুদ্র আকৃতি, বেশী ভোল্টেজ এবং বেশীদিনের স্থায়িত্ব ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ সুবিধা থাকার দরুণ মার্কারী ব্যাটারীর চেয়ে এগুলি বেশী সমাদৃত হয়।

*

আণবিক শক্তির সাহায্যে উড়ো জাহাজ, ডুবো জাহাজ, সমুদ্রগামী জাহাজ চালান যে অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এখন রেল গাড়ি এই আণবিক শক্তির সাহায্যে চালাবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এই আণবিক শক্তিচালিত রেল গাড়ি ৩০০০ থেকে ৪০০০ অশ্বশক্তি হবে। আর একবার এতে এই শক্তি পুরে নিলে সেটা এক বছর ধরে চলবে। তখন আর এতে কোন প্রকার জ্বালানী দিতে হবে না। সাধারণ ইঞ্জিনে যেগুলি গ্যাস চালিত, ডিজেল তেলে চালিত অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত, সেগুলিতে সব সময় যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানী, জল ইত্যাদি জোগাতে হয়। কিন্তু আণবিক শক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনে এসব কিছু চিন্তা করতে হবে না। অবশ্য প্রত্যেক ইঞ্জিনে আলাদাভাবে আণবিক শক্তির ব্যবস্থা না করে যদি এই শক্তির সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় তাহলে কাজের অনেক বেশী সুবিধা হবে।

আণবিক শক্তিচালিত রেল গাড়ীর সাহায্যে মাল আমদানী এবং রপ্তানীর খরচও কম হবে। কয়লার খনি থেকে ইঞ্জিন চালাবার জন্য কয়লা পাঠাবার চিন্তা করতে হবে না। কয়লার ধোঁয়া থেকে বড় বড় শহরগুলি রক্ষা পাবে।

*

আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী সম্মেলনের খবরে প্রকাশ যে, রাশিয়া হাইড্রোজেন পরমাণু প্রক্রিয়ার দ্বারা ১ শত কোটি ডিগ্রি তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করছে। এই তাপ সূর্যের মাঝখানের তাপের থেকে ৬৫ গুণ বেশী।



# প্রেম

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে যেন ছোট্ট একটি শ্যামল দ্বীপের উপর চুপচাপ একা ব'সেছিল লোকটি। চার বছর হল ক'লকাতায় এসেছি, সুদূর বিদেশ থেকে এসেছি দেশে, দেখে-দেখে চোখ এখনো ক্লান্ত হয় নি,—পথে যেতে আসতে কত লোকই ত চোখে পড়ে,—কতো বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন চেহারা—বিভিন্ন পোশাকের লোক! এক-এক সময় মনে হয়, নানান দেশের নানান ধরনের লোককে একটা গন্ডীর মধ্যে রেখে আমরা "বাঙালী" নাম দিয়েছি বটে,—কিন্তু, কে যে কোন্ বিচিত্র পথে কোন্ বিচিত্র রক্তধারার মধ্য দিয়ে এসে এদেশের ভাষায় আজ কথা বলছে, এদেশের বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে, তা' কে জানে? এর সঙ্গে ওর মিল নেই। এর মুখ লম্বা, ওর মুখ গোল, এ ফর্সা, ও কালো,—ওর মাথার চুল বড় বড়, ওর—কর্কশ—কোঁকড়ান। ওর চোখ টানাটানা,—ওর চোখ গোলাকার—ছোট্ট।

তিনদিক দিয়ে গর্জন তুলে ঘুরে-ঘুরে আসছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাস বৈকালের অফিস-ফেরা ক্লান্তমুখ যাত্রীদল বোঝাই ক'রে,—মাঝখানে ত্রিকোণাকার ছোট্ট একটুকরো শ্যামল মসৃণ ভূমিখণ্ড,—তার ওপর বসে ছিল সে, একটা ছেঁড়া খাঁকীর হাফপ্যাণ্ট পরা মাত্র, গায়ে কোনো জামা নেই। গায়ের রঙ হয়ত একদা ফর্সা ছিল,—রোদে পুড়ে-পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথার বড়-বড় অবিন্যস্ত চুল অযত্নে আর ধুলোয় লালচে দেখাচ্ছে। মুখ-ভর্তি দাড়ি,—তা-ও লালচে। ঘন কালো দুটি ভ্রূর নীচে দুটি অদ্ভুত চোখ,—সামনে নিবিষ্ট দৃষ্টি, কত লোক কত যান-কত কোলাহল,—সব ছাড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি যেন কোনো এক উধাও অসীম স্মৃতি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে!

পথ হাঁটতে হাঁটতে কেন যে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল লোকটির ওপরে, কেন যে অদূরে দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে দেখতে শুরু ক'রেছিলাম লোকটাকে,—কে জানে, ওকে দেখতে দেখতে আমার হঠাৎই মনে পড়ে গেল তাকে। এমনই দীঘল চেহারা—এমনি আজানুলম্বিত দুটি বাহু,—এমনি তামাটে দেহের বর্ণ,—এমনই অবিন্যস্ত লালচে মাথার চুল আর দাড়ি,—এমনি জ্বলজ্বল করা স্বপ্নিল নক্ষত্রের মত দুটি চোখ। এখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে,—সেই সেখানে—বিষুবরেখার দক্ষিণে—৪°৩৫' দক্ষিণ দ্রাঘিমারেখা এবং ৫৫°৪৬' পূর্ব অক্ষরেখার সুনীল সমুদ্র-মেখলাবেষ্টিত সুনির্জন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে—যা' একশ' ছাপ্পান্ন ফিট উঁচু একটা টিলার মতন, মাত্র আধমাইল যার বিস্তার—অসংখ্য নারিকেলকুঞ্জে যেখানে চারিদিক থেকে এসে লাগে অবাধ—অগাধ হু-হু হাওয়া!

এখানে একা—একেবারেই একা থাকে সে। চারখানা ছোট্ট ঘর-ওয়ালা একটা টালি-ছাওয়া পুরনো বাড়ি। বাড়ির বাইরে সব দেয়ালগুলিই লতাপাতায় ঢেকে আছে,—লাল টালির উপরে অসংখ্য সাপের মত নানান লতাপাতার কচি-কচি ডগাগুলি এসে মাথা নুইয়ে প'ড়েছে।

ঘরের সামনে খুব বড় একটা উঠোনের মত—ঝকঝকে-পরিষ্কার, একটা ঝরা পাতাও প'ড়ে থাকতে দেয় না সে। এই উঠানটাই একটু এগিয়ে নেমে এসেছে ধাপে-ধাপে একেবারে নিস্তরঙ্গ একটা জলাশয়ের ধারে, অনেকটা যায়গা জুড়ে এখানে নারিকেল রাশি—মাঝে মাঝে প্রহরীর মত প্রকাণ্ড উঁচু-উঁচু নারিকেল গাছ।

মরা নারিকেল গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে এখানেই চৌকোমতন একটা বালুকাময় যায়গাকে দেয়ালের মত কঠিন ক'রে ঘিরে রাখা হ'য়েছে। নারিকেলের গুঁড়ি চিরে-চিরে পাতলা কাঠের মত ক'রে ঘর তৈরী হয়েছে ছোট-ছোট,—আমাদের গাঁ অঞ্চলে হাঁসমুরগী যেমন ঘরে রাখে, তেমনি ঘর।

এই 'ঘর' আর ঘরের জীবগুলিকে নিয়েই ওর সংসার। ছোট থেকে বড় নানান আকারের চকচকে ধারাল দায়ের মত সব অস্ত্র,—একটা প্রকাণ্ড ক্ষয়ে-আসা পাথরের গায়ে শান দিতে দিতে বীভৎস হাসিতে এক এক সময় ফেটে পড়ে লোকটা। বেড়ার ধারের কাকে যেন লক্ষ্য ক'রে বলতে থাকে,—চোখ মিটমিট ক'রে চেয়ে আছিস কী!

এবার তোর পালা। নির্ঘাত তোকে এবার কাটব।

যাকে বলা হল, দীর্ঘদিন এই মানুষটার সাহচর্যে থেকে সে বোধ হয় এর ধরন-ধারন একটু-একটু বুঝতে আরম্ভ ক'রেছে। বালিতে শুয়ে-ব'সে থাকার ফলে সর্বাঙ্গে বালি লেগে ধূলি-ধূসরিত। অতিকায় শক্ত খোলের মধ্য থেকে চারটি পা বার ক'রে পোষা কুকুর বা বিড়ালের মত ব'সেছিল খানিকটা বালি খুঁড়ে, বালির মধ্যে। ওর কথায় সরু মুখটা একটু-একটু ক'রে বাইরে এনে, হলদে-আভা-যুক্ত দুই বিন্দু পোখরাজ মণির মত দুই চক্ষু একবার ওর দিকে ফিরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বালির ওপর সরু মাথাটা রাখল নামিয়ে।

ঐভাবে বালি খুঁড়ে বালির মধ্যেই প'ড়ে থাকে, ওর ঘর নেই। এই মানুষটিও যেমন লাল টালির ঘর থাকতেও তার ঘরে না থেকে ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া টেনে তার ওপরে প'ড়ে থাকে সারা দিনরাত ঐ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ার নীচে, তেমনি এর নারিকেল-তক্তার ঘর থাকা সত্ত্বেও সারা দিনরাত প'ড়ে থাকে বাইরে,—মানুষটির সঙ্গে তফাত এই,—ঝড়বৃষ্টিতে তাকে আশ্রয় নিতে হয় লাল টালির ঘরে,—একে নিতে হয় না, ঝড়বৃষ্টি-রোদ-ঠাণ্ডা সব চ'লে যায় ওর দেহের ঐ শক্ত খোলটার ওপর দিয়ে।

একটি আধটি দিন নয়, এক-এক ক'রে দশ-দশটি বৎসর তাদের দুজনের এমনি ক'রে কেটে গেছে!

হাতের চকচকে ধারাল দা-টা ফেলে দিয়ে হঠাৎই এক সময় উঠে দাঁড়াল লোকটি, বললে, থাক তুই একা। আমি একটু ঘুরে আসি। সারা সকালটা তোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ক'রে আমার চলবে নাকি?

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়াল সে, দীর্ঘদেহ-বলিষ্ঠ চেহারা—পরনে খাকী রঙের একটা হাফপ্যাণ্ট শুধু—আপন মনে মনে শিস্ দিতে দিতে তর-তর ক'রে উঠে গেল ওপরে,—নিজের বাড়ির ঝকঝকে উঠোনে,—কোথা থেকে উড়ে দুটো পাতা আর পাখির বাসার খড়কুটো প'ড়েছিল,—সেগুলি তুলে ফেলতে-ফেলতে—অদূরের ঝাঁকড়া-মাথা নিষ্ফলা জামগাছটাতে আশ্রয় নেওয়া 'চিক্‌চিক' করা চড়ুইয়ের মত পাখিগুলির উদ্দেশে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল সে। তারপর একটা বাঁকা নারকেল গাছের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথটি ধ'রে আরও ওপরে উঠে গেল।

ওপরে একেবারে কূর্মপৃষ্ঠের মত জলের উপর মাথা তুলে ওঠা পাহাড়টার মাথায়। অতিকায় কূর্মপৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের মতো এ'প্রান্ত থেকে ও'প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে আধমাইল জুড়ে'। যেদিকে দুচোখ যায়, জন নেই যান নেই—শুধু নারিকেল গাছের মেলা,—কিছু কিছু ঝাঁকড়া-মাথা জাম বা ঐ জাতীয় গাছ।

পর্বত-চূড়ার এক যায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে অদ্ভুত একটা পাথর দাঁড়িয়ে আছে,—মিশ কালো নয়, গাঢ় খয়েরী রঙের,—অন্ধকারে তাকালে মনে হয়—ঠিক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সরু—লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের একটা পাথর। তারই ঠিক পাশে—চৌকোণা একটা পাথর,—তিন কি সাড়ে তিন ফিট হবে দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে। আর আশ্চর্য, পাথরটা এমনভাবে রয়েছে যে, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে,—প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে ঐ কালো মসৃণ পাথরটার ওপরে,—সেই আলো ঠিকরে পড়ে—নীচে—তার উঠোনটির একপাশে—তার লাল টালির ঘরগুলির দাওয়ার ঠিক সামনে।

দাওয়ার সামনেকার সেই অদ্ভুত হলদে-হলদে আলোর রেখা দেখে তার ঘুম-ভাঙে,—আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় ওপরে, পাথরটার কাছে। আয়নার মতো ঝিলমিল করতে থাকে পাথরটা,—তখন ওকে জীবন্ত মনে হয়! তারপরে, ক্রমে ক্রমে প্রখর হতে থাকে সূর্যের আলো,—পাথরের ঝিলমিল ভাবটা কমতে-কমতে এক সময়ে একেবারে মিলিয়ে যায়। তখন সেই লম্বা—খাড়া পাথর আর এই চৌকো-পাথরটা,—দুটি মিলিয়ে মনে হয়, একটি মানুষ আয়না নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কার অভিশাপে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড়ের এই চূড়ায় ব'সে পশ্চিম দিগন্তে স্পষ্ট চোখে পড়ে — 'তমালতালিবনরাজিনীলা', — একটি রেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

ভিক্টোরিয়া শহর—এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে। আর পূর্ব দিগন্তে, চোখে পড়ে শ্যামলী মেয়ের কপালে কালো একটা টিপের মত,—'স্লিজেট দ্বীপ'—দুদিকেই লোকালয়। আরও চোখে পড়ে,—শান্ত, প্রসন্ন দিনে,—অসংখ্য শাদা বিন্দুর মত—পালতোলা মাছ-ধরা নৌকো। মানুষ। ওরা কি একবারও এসে ভিড়বে না এই ভূমিখণ্ডে?

ভিড়বে। প্রতিবারই ভেড়ে। মাস-খানেক ধ'রে এই নিস্তব্ধভূমি হয়ে ওঠে কোলাহল মুখরিত। সেই একটি মাস লোকটি ভীরুর মতো বাস করে ঘরের মধ্যে,—ওর নিজের কাজও থাকে বন্ধ। লোক-গুলি আসে নারকেল পাড়ার মরসুমে। এই ভূমিখণ্ড ইজারা নিয়েছেন যে বড়ো মানুষ, তারই ভাড়া-করা শ্রমিক হিসাবে মানুষগুলি আসে। কেউ-কেউ ওকে টেনে বার করতে চায় ঘর থেকে সন্ধ্যার উৎসব-মুহূর্তে।

—এই, কী নাম তোমার?

—কোন্ দেশের লোক?

ও' কোনো উত্তর দেয় না। প্রাণপণে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে,—ঐ কূর্মকুলের মত। ওরা হাসে, ছেড়ে দিয়ে অবশেষে চলে যায়। ফিরে গিয়ে রঙ ফলিয়ে নানান গালগল্প রটনা করে লোকটিকে নিয়ে। এমনি ক'রে ক'রে দশ দশটি বছর।

কিন্তু বছরের আর বাকী দশ মাস? আসে বই কী লোক। জোহার, জোনাথান আর বিশ্ব। আর ছোট্ট ক্ষীমলঞ্চটার জনকয়েক মাঝিমাল্লা। প্রকাণ্ড 'বার্জ'-টাকে লঞ্চের পাশে বেঁধে নিয়ে আসে ওরা,—সমুদ্রের যে খাড়িটি সরোবরের মতো ভিতরে ঢুকে এসেছে, মুখের কাছে প্রকাণ্ড একটা পাথর থাকায়, অশান্ত ঢেউগুলো তারই ওপরে গর্জে মরে, ভিতরে আসতে পারে না,—সেই খাড়ি দিয়ে পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসে ওরা। শুরু হয় হাঁক-ডাক। 'বার্জ' থেকে দড়ি বেঁধে ওপরে তার সেই নারিকেল-কাঠের দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে তোলা হয় চতুষ্পদ জলজ প্রাণীগুলিকে। আকারে খুব বড় নয়। বড়-বড় ঢিপির মত জড়ো করা হয় ওদের। দু'তিনদিনের মধ্যে একটি ধারালো খাঁড়া দিয়ে সব সে শেষ করে দেয়,—মাংসগুলি আলাদা আর খোলগুলি আলাদা ক'রে নিয়ে আবার ওরা ফিরে যায়। বিরাট ব্যবসা। এও ইজারাদারকে একটা লভ্যাংশ দান ক'রে। কিন্তু আর একটা যে ওদের গোপন ব্যবসা আছে, সেটা? অবশ্য খুব কমই দেখা দেয় সেই ঘটনা। বছর দশেকের মধ্যে গোটা দশেকের বেশী নয়। সবাইকে লুকিয়ে মোটা টাকার ব্যবসা নাকি। তখন ঐ লালটালির সর্বদক্ষিণের তালা-দেওয়া ঘরখানা কাজে লাগে। বাকী ঘরগুলিতে ত আসর জমায় জোনাথান-জোহাররা। সবাই শিসেলাস্ দ্বীপপুঞ্জের লোক, সবাই থাকে শহর ভিক্টোরিয়ায়, কিন্তু পরিচয় দেবার বেলায় বলে,—'আমি ইহুদী', 'আমি মিশরী', 'আমি ভারতীয়'। কিন্তু সে নিজে কী? ওরা ডাকে 'জো' ব'লে,—কী তার সত্যিকারের নাম? কোথা থেকে এসেছিল তার পূর্ব পুরুষ,—ইস্রায়েল, মিশর, না, ভারত?

উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে দেখতে পেয়েই তরতর ক'রে নেমে এল সে। এসে গেছে 'লঞ্চ'—অর্থাৎ জোনাথান-জোহার আর বিশ্ব, আর মাঝিমাল্লা। আর সেই 'বার্জ'। 'বার্জ' হচ্ছে মাল-বওয়া নৌকোর খোলের মত,—লঞ্চ টেনে নিয়ে আসে। শুরু হয় দড়ি দিয়ে বেঁধে তোলা সেই প্রাণীগুলিকে।

কাজে ব্যস্ত থাকতে-থাকতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ওর। লঞ্চের ভিতর থেকে প্রথমে এল বাক্স বিছানা, যেমন আসে। তারপরেই আশ্চর্য,—জোনাথান আর বিশ্বের পাহারায় একটি মেয়ে।

প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল জোহার,—এই জো, হচ্ছে কী? কাজ করো নিজের। কাজ চলতে থাকে। দড়ির ফাঁস বেঁধে ওদের শুধু ওঠানোই নয়, চকচকে ধারাল দা দিয়ে রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডগুলি বার ক'রে আনতে হয়।

দুদিন পরেই 'বার্জ' বোঝাই 'মাংস' আর 'খোল' নিয়ে চলে গেল ওরা। জোনাথান বললে,—মেয়েটাকে রেখে গেলাম। তিনদিন পরে ফিরব। সাবধান।

এতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। বলে,—ঠিক আছে।

এই ছোট্ট ভূমিখণ্ডে একা-একা কোথায় ঘুরবে মেয়ে? কোথায় পালাবে? একটি মেয়ে সেই বহু বছর আগে—মরীয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়েছিল সমুদ্রে। অতি কষ্টে যখন তাকে তোলা হয়,—ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সে তখন বিপর্যস্ত, জ্ঞানহারা।

জোনাথানের 'সাবধানতা' এইখানে। নইলে সবাই জানে, গুমরে গুমরে শুধু কাঁদিবে মেয়েগুলো, খেতেও চাইবে না,—আর নয়ত উন্মত্তের মত এক এক সময় জো-কে বলবে,—আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

মনে মনে হাসে 'জো'। কে কাকে ছাড়বে? বেঁধেই বা রেখেছে কে কাকে? এই ত আধ-মাইল পরিধির ছোট্ট জগৎ, এর মধ্যে সে নিজে আছে দশ বছর,—একটি দিন—একটি মুহূর্তের জন্যও বাইরে যায়নি, যেতে পারেনি।

এক-একদিন রুদ্ধ এক দুর্বার আক্রোশ জমে উঠত মনে। সেই যে প্রথম মেয়েটিকে এনেছিল ওরা, তার দিকে কেন যেন অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি সে, অবশ্য সেবারে জোনাথান ছিল এখানে,—তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে গেছে তাদের এই 'জো'কে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ—মেয়েগুলির বেলায় জোনাথান আর থাকেনি, তারই উপর দিয়ে গিয়েছিল সব ভার, ওকে তারা সর্বরকমে বিশ্বাসও করেছিল বোধ হয়। বিশ্বাসভংগ সে করেনি, অর্থাৎ সাহায্য সে করেনি মেয়েগুলিকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু বিশ্বাসের অর্থ যদি অন্য কিছু হয় ত, সেখানে সে চরম আঘাত হেনেছিল ঐ মেয়েগুলির বেলায়।

কে'দে-কে'দে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল মেয়েগুলি। এই ভূমিখণ্ডে পা দিয়েই ওরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, কী হবে ওদের অবস্থা! কেমন করে জোহার-জোনাথানদের খপ্পরে পড়ে মেয়েগুলি কে জানে, লঞ্চে আসবার সময় কোনো চাঞ্চল্য নেই,—এখানকার মাটিতে পা দিয়েই শুরু হয়,—কান্না আর কান্না।

ওরা তার পায়ে পড়ে যতো কাঁদত অসহায়ের মত,—তত পৈশাচিক দানবতায় উল্লসিত হয়ে উঠত ওর মন। শিশেলাস এরই মেয়ে ওরা,—কিন্তু জোনাথানদের হাতে পড়েছে, এরপর কোন্ দূরে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ওদের স্থিতি হবে কে জানে,—এই দুর্দিনের জন্য ওর আতিথ্যে আছে যখন, তখন সেই বা ছেড়ে দেবে কেন? নিরুদ্ধ, বঞ্চিত যৌবন যেন ক্ষুধিত বিষাক্ত কোনো সাপের মত ক্রুর হয়ে উঠত!

কিন্তু তারপর? পঞ্চম বৎসর থেকে শুরু হয়েছিল ওর ভাবান্তর। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অব নবম মেয়েটির বেলায়,—তার কোনো কৌতূহলই জাগেনি। টালি-ছাওয়া বাড়িটার দক্ষিণের ঘরটা খুলে দিয়েছে, ভাঁড়ার দেখিয়ে দিয়েছে, বাস, ঐ পর্যন্ত। চতুষ্পদ ও জলজ প্রাণীগুলির মতোই কোনো ভীরু প্রাণী যেন ওরা,—কান্নাকাটি ক'রেছে,—চকচকে ধারাল ছুরি দিয়ে হৃৎপিণ্ড বার করে আনার মুহূর্তে লম্বা মুখখানা যন্ত্রণায় বার ক'রে নিষ্প্রাণ পাথরের চোখের মত ওরা যেমন তাকায়, কে'দে কে'দে শেষ পর্যন্ত লঞ্চে ওঠবার মুহূর্তে ঠিক তেমনি চোখেই শেষবারের মত মেয়েগুলি তাকিয়ে গেছে তার দিকে।







সেই নারিকেল-তক্তা দিয়ে ঘেরা যায়গাটা। তেমনি বালি খুঁড়ে সর্বাংগে বালি মেখে শুয়ে আছে অতিকায় প্রাণীটা। 'জো' ধীরে ধীরে এসে ব'সে পড়ল তার অনতিদূরে, বললে,—জানিস, ওরা চলে গেল। দশ বছর ধরে এতগুলিকে কাটলাম, তোকে আর কাটা হলো না।

ময়াল সাপের মাথার মতো মাথাটা নুইয়ে রেখেছিল বালির ওপরে, ওর কথার উত্তরে মাথাটা একটু হেলালো, পোখরাজ মণির মতো দুটি চোখ যেন নীরব হাসির আভায় মুহূর্তের জন্য উঠল ঝিলমিল ক'রে।

—আচ্ছা?—প্রাণীটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল 'জো',—সবারই জুড়ি থাকে, তোর কোনো জুড়িও নেই রে?

মাথাটা সোজা করে চুপচাপ নিস্পৃহের মত পড়ে থাকে প্রাণীটা।

'জো' বলে,—দশ বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন থেকেই তোকে দেখছি। জবুথবু-বুড়ো। তাড়া করলাম, তুই পালাতে পারলি না! হতভাগা! তোকে সেইদিনই কাটতাম ঐ বিশ্ব এসে বাধা দিয়েছিল বলে তুই বে'চে গেলি। বললে,—ওটা বুড়ো, একে মারিস না। ও আবার এসব জানে-টানে কি না, তোকে ভাল করে উলটে-পালটে দেখে নিয়ে সেবারই ব'লেছিল,—এটা থুত্থুরে বুড়ো,—একশ'রও বেশী ব'য়েস। তা' হাঁরে, তোরা নাকি দেড়শ বছর পর্যন্ত বে'চে থাকিস!

যাকে প্রশ্ন করা হল, সে নির্বিকার। একটা নারিকেল-খোলে কিছু জল নিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে ওর গা পরিষ্কার করতে বসল 'জো'। ও একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে মুখটা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে,—শুধু পোখরাজ মণির মত দুটি চোখ আর মাথার অগ্রভাগটা রইল সামান্য একটু বেরিয়ে।

'জো' ওর গায়ের বালি পরিষ্কার করতে করতে বললে,—ইস! অমনি লজ্জায় মুখ লুকান হল! গা ধুইয়ে দিচ্ছি কি না! দেখ, আমাকে ওরা 'জো' বলে ডাকে, আমার নামধাম সব ওরা ভুলিয়ে দিয়েছে, আমি তোরও নাম ভোলাবো, তোকেও ডাকব 'জো' ব'লে, বুঝেছিস?

—'এই শোন? 'জো' জো'কে ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল,—'এ' মেয়েটা কাঁদে নারে।

আমাকে বললে,—বেশ স্বাস্থ্য ত তোমার, কত বয়স হল?

আমি ত মনে মনে হেসে বাঁচি না?

বয়স? বয়স আবার কী? তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ,—যা কিছু একটা ধ'রে নাও না। অবশ্য, মুখে কিছুই বলতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম তোর কাছে! ইস! কী বালি মেখেছিস।

ব'লে জোরে জোরে ওর গা-টা ঘষতে থাকে ন্যাকড়া দিয়ে, বলে,—তোকে রোজ কাটব বলি, তুই ত পালিয়েও যেতে পারিস চুপিচুপি সমুদ্রে। তোকে ত আর আমার মত এখানে কেউ লুকিয়ে রাখেনি! তোর মত অবস্থা হলে, আমি ঠিক শহরে চ'লে যেতাম, নৌকা বানিয়ে নিতাম। কিন্তু যাবো কোথায়? জোনাথান বলেছে,—দেখতে পেলেই আমাকে ধরবে। তাই আছি পড়ে, খাই-দাই আর মজা করে ঘুরে বেড়াই।

আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিল জো, হঠাৎ একটা মেয়েলী চীৎকারে রীতিমত চমকে উঠল সে।

দেখে, সেই মেয়েটি। কাল-পরশুর মত গাউন পরা নয়,—ভিক্টোরিয়ায় যে কয়েকঘর ভারতবাসী আছে, তাদের মেয়েদের মতো শাড়ি প'রেছে আজ, পাতলা হলদে-হলদে রঙের একটা শাড়ি। "প্রাণী-জো'র দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে "মানুষ জো"কে বলছে,—ওটা কী?

'জো' তাকিয়ে ছিল ওর দিকে অবাক হয়ে, কোনো কথা বলতে পারে নি।

মেয়েটি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তৎক্ষণে, বললে,—বাব্বাঃ! কী প্রকাণ্ড কচ্ছপ! ওটা তোমাকে কামড়ে দেয় না!

এবারেও উত্তর দেয় না জো,—অচেনা মানুষের সামনে সত্যিই তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে, সহজে কথা ফোটে না। জোরে জোরে সে ন্যাকড়া দিয়ে ঘসতে থাকে 'জো'র শক্ত পিঠ। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, তারপরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায় ছোট্ট ঘরগুলির দিকে, তক্তার ফাঁক দিয়ে বন্দী কূর্মকুলকে যতদূর লক্ষ্য করা যায়, দেখে এসে বলতে থাকে,—ওটার মতো বড় ত একটাও নেই, ওগুলো সব ছোট-ছোট। জুড়ি নেই ওর?

জলদগম্ভীর স্বরে এবার বলে ওঠে জো,—না।

তারপরেই উঠে দাঁড়ায়,—আস্তে আস্তে চলে আসে সীমানার বাইরে, তারপরে তরতর করে উঠে আসে ওপরে, নিজের ঘরের উঠোনে। ভাঁড়ার খোলা রয়েছে, জোনাথানদের দেওয়া খাদ্য-ভাণ্ডার। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার।

মেয়েটি তার পিছনে পিছনে এসে ব'সে প'ড়েছিল উঠোনেই—তার খাটিয়াটার উপরে।

—ওই, শোনো?

মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহারে ক্রমশই অবাক হ'চ্ছিল জো,—উনোনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এল সে, তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বললে,—কী?

সোজা ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটি, বললে—কতদিন আছ এখানে?

গর্জন ক'রে উঠল জো, বললে,—তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি, চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না বয়স, গায়ের রঙ ঠিক কালোও নয়, ফরসাও নয়, মুখখানা সুন্দর,—টিকোল নাক, টানা-টানা চোখে কালো দুটি চোখের তারা,—মাথায় চুল বব্ করা নয়, লম্বা—আর ঘন—পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। বেশ সপ্রতিভ, ঝকঝকে মুখের ভাব।

ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল নীরবে, তারপরে আপন মনেই বলে উঠল, কী লোক রে বাবা! কথা কইতে জানে না! খেঁকিয়েই আছে।

উনোনে হাঁড়ি বসিয়ে তার মুখে ঢাকা দিতে দিতে বোধ হয় কথাগুলি কানে গিয়েছিল জোর,—একটা অদ্ভুত অসহিষ্ণুতা আর অব্যক্ত জ্বালায় মনটা ভ'রে থাকলেও এগিয়ে এসে কথা বলতে পারল না সে,—তাড়াতাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে গেল নীচে।

ওর 'জো' তৎক্ষণে আবার কী ক'রে যেন বালি মেখেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর কাছেই নারকেল তক্তায় ঠেশ দিয়ে ব'সে পড়ল জো বালির ওপরে, বললে, —কে রে মেয়েটা! কাঁদেও না! বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বলবো নাকি?

ওর 'জো' তৎক্ষণে চারটি আঁশ-ওয়ালা 'পা' ছড়িয়ে মুখটা নামিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে, নিঃসাড়।

—কী রে, ঘুমুলি নাকি? ওর দিকে তাকিয়ে 'জো' বলে,—ঘুমো ব্যাটা। যতদিন মাংস জুটছে, কিছু বলছি না, মাংস ফুরলেই তোকে কাটব। তখন বুড়ো ব'লে মানব না।

—ও'বুড়ো নাকি?

চ'মকে মুখ তুলল 'জো'। মেয়েটা আবার কখন চুপচাপ নেমে এসেছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াল জো, তেমনি তীব্র কণ্ঠেই বললে,—তাতে তোমার কী?

—আমার আবার কী!—মেয়েটি বললে,—কিন্তু চলে এলে যে! আমি একা থাকব নাকি! কথা কইব কার সঙ্গে? আচ্ছা লোক রেখে গেছে খবরদারি করতে!

—করব না খবরদারি!—বলে দুম্‌দুম্ ক'রে পা ফেলে উপরে উঠে এল 'জো'। বলাবাহুল্য, পিছনে-পিছনে মেয়েটাও।

অবোক্ত নিদারুণ একটা ক্রোধের জ্বালায় যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে 'জো',—একটা অদ্ভুত অস্বস্তি! এ কী ধরনের মেয়ে এল এখানে! এ ত ঘরে ব'সে কাঁদেও না, ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়েও যায় না!

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল 'জো', মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুতীব্র কণ্ঠে ব'লে উঠল,—জানো না?

—কী!

জো উত্তেজিত, চাপা কণ্ঠে বললে,—কেন তোমাকে আনা হয়েছে!

—কেন?

জো রুদ্ধনিঃশ্বাসে বললে,—তিন দিন পরে ওরা ফিরে আসবে।

—জানি।

—জানো?—জো বললে,—কোথায় তোমায় নিয়ে যাবে, সেটা জানো?

—জানি। বিশ্ব আমাকে বলেছে। ইণ্ডিয়ায়।

চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো জো,—চুলোয়! তোমাকে ওরা দূরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে!

তবুও যেন ভয় পেল না মেয়েটি, ঠোঁট উল্‌টে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, কে কাকে বেচে, দেখা যাবে!

অবাক হ'য়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল 'জো'।

—কী! দেখছ কী!—লীলায়িত ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে,—তা' দেখ যত খুশি, কারণে-অকারণে অমন খেঁকিয়ে উঠ না বাপু।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড ক্রোধের বিদ্যুৎ জ্বলে উঠ্‌লো দেহে,—মুখ বিকৃত ক'রে উন্মত্ত পশুর মতো হঠাৎ-ই একটা বিকট চীৎকার করে উঠল 'জো',—তারপর লাফ দিয়ে একটা জন্তুর মতোই ছুটতে ছুটতে সে উঠে গেল আরও ওপরে, মানুষের পাথর হয়ে যাবার মতো সেই যে লম্বা পাথরটি দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশীর্ষে,—একেবারে দু' হাতে তাকে বেষ্টন ক'রে বসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

কিছুক্ষণ ধ'রে দম নেবার পর, তার মনে হল, তার পিছনে-পিছনে এখানেও উঠে আসে নি ত মেয়েটা?...না, তা আসে নি,—যে খাড়া উৎরাই—সহজে উঠে আসা সম্ভবও নয়! কথাটা মনে হ'তেই কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে জো, তারপরে সেই আয়নার মতো চৌকো পাথরটার মাথায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, তবুও মিষ্টি-মিষ্টি লাগে। রোদ্দুর আর হু হু হাওয়ার মধ্যেও যেন ঘুম জড়ানো আদরের ছোঁয়া। নীল আকাশের ওপর দিয়ে সাদা-সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়ে যাচ্ছে,—দেখতে দেখতে এক সময় পাশ ফিরে দিগন্তের দিকে তাকাতে গিয়েই অতর্কিত বিস্ময়ে মুখ তোলে জো। কালো একটা রেখার মত ক্রমশ ঘন হল সেই রেখা। বাড়তে লাগল সেই কালিমা। সাদা পাল-তোলা নৌকোরা সব ফিরে গেছে। আসছে ঝড়—বুক দুরু-দুরু-করা ঝঞ্ঝার স্বেচ্ছাচার!

নীচে নামতে গিয়েও চট্ করে নাম্‌তে পারল না জো। কাকে গিয়ে আগে সামলাবে? মেয়েটাকে? না, সেই বাক্সের ওপর হুমড়ি-খাওয়া বৃদ্ধ জীবনটাকে?

বলবে,—ভয় নেই, আমি আছি। বহু ঝড় কেটে গেছে এই দশ বছরে, কোনো ঝড়ই আমাকে টলাতে পারে নি, আজও পারবে না।

কিন্তু, মেয়েটার ওপর সে অমন ক'রে ক্ষেপে উঠল কেন, হঠাৎ? কেন হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে উঠল সে অমন করে? মেয়েটা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে। মনে-মনে হাসল 'জো'—ভয় পাইয়ে দেওয়াই ভালো। ভয় একটু পাক। এই নির্জন ভূমিখণ্ড,—এরও একটা ভয়ংকরী রূপ আছে! আজ দশ বছর প্রতিটি রাত্রি সে তা অনুভব করেছে মর্মে-মর্মে! দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—একা থাকা যে কী কঠিন এমনি ক'রে,—তা' যে না থেকেছে, সে বুঝতেই পারবে না!

ধীরে ধীরে এক পা এক পা ক'রে নেমে এল জো। তার খাটিয়ার ওপরে তেমনি করেই ব'সে আছে মেয়েটি। পায়ের শব্দে মুখ তুলল। তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে জো বললে,—ঝড় আসছে, ঘরে যাও।

মেয়েটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। পাহাড়ের চূড়াটার আড়ালে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে, যেটুকু আকাশ তার চোখে পড়ল তা নীল—ঘন নীল কালো মেঘের কোনো ছোঁয়াও নেই। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তেমনি চোখেই তার দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

জোর মনে হল,—এমনও হতে পারে, প্রচণ্ড ভয়ে ভিতরে-ভিতরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটি এবং সে বিহ্বলতা এত বেশী যে, কথাই ফুটছে না তার মুখে।

মুহূর্তের জন্য মমতায় স্নিগ্ধ হল মন, মেয়েটির কাছে এসে সে বললে, ভয় পেয়েছ, না? আমি অমন চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম বলে ক্ষমা করো। দশ বছর আছি, কেমন যেন হয়ে গেছি! পাগলের মত।

মেয়েটি মুখ তুলে তেমনিই তাকিয়েছিল, বললে,—একা একা এত বছর আছো—সংগী নেই—সাথী নেই—মাথার গোলমাল ত একটু হতেই পারে।

—কী!—মুহূর্তে রুখে দাঁড়ালো জো,—সত্যি সত্যিই আমি পাগল!

মেয়েটি একটু হাসল, বলল,—তোমার খুব কষ্ট, না?

মনে হল, তার বুকে চকচকে ধারাল দা দিয়েই আঘাত করল কে যেন! ক্ষিপ্তের মত হাত-পা শক্ত করে আবার ইচ্ছা হলো' তেমনি চীৎকার ক'রে ওঠে!—কিন্তু না, আতকষ্টে নিজেকে সামলে নিলো সে, তারপরে ছুটে চ'লে এল নীচে।

সেই বালমাথা বৃদ্ধ 'জো'। বললে,—মেয়েটা আমাকে পাগল করবে রে! এর চেয়ে ফাঁসীর কাঠে লট্‌কে মরাও ছিল ভালো!

বিড় বিড় করে আরও কী যেন সে বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল সে। কালো হয়ে গেছে আকাশটা, কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। আর হাওয়া? মনে হল এখুনি উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে!

ছুটতে ছুটতে এল ওপরে। মেয়েটি উঠোন ছেড়ে নিজেই গেছে দক্ষিণের ঘরে। কবাটটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

শুধু ঝড় নয়, জলও। ঝরঝর ঝমঝম—অশ্রান্ত বৃষ্টি। নীচে, বুড়ো জো-র ঘরটা খোলাই দেখে এসেছে, 'জো' আস্তে আস্তে নিজেই চলে যাবে, ওকে নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা এই মেয়েটিকে নিয়ে। জল নামবার আগেই মাংসের হাড়িটা ভিতরে নিয়ে এসেছিল জো, হয়েও গিয়েছিল রান্না। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। স্নান বোধ হয় ভোরেই সেরে নিয়েছে মেয়েটা। উঠোনের নীচে, বিপরীত দিকে,—প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের বুকেই পুকুরের মত হয়ে আছে, বৃষ্টির জলধারা থাকে তাতে। সেই জল বাল্‌তিতে উঠিয়ে স্নান, সেই জল ফুটিয়েই খাওয়া!

কোনক্রমে নিজের ঘরের কবাট খুলে—পাশের ঘরে গিয়ে ঘা দিল জো। বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। মেয়েটি দরজা খুলতেই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল সে। কয়েকটা বাসন, বড় একটা বাটিতে মাংস,—এই সব সে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে—দরজাটা বন্ধ করে দিলো পিছনে। বললে,—খাবার।

মেয়েটা একটা লাল লাল ফুল ছাপান ড্রেসিং গাউন পরেছে, বললে,—তোমার ভাঁড়ার থেকে খাবার ত নিয়েই এসেছিলাম। এই দেখ, কতো পাউরুটি, জ্যাম, জেলির শিশি। কুঁজো-ভর্তি জলও রাখাই ছিল। আর, তোমার রান্না ঐ মাংস নিয়ে যাও। খাব না।

—কেন!

—কচ্ছপের মাংস আমি খাই না।

—কেন?

—বাবা রে বাবা, অতো 'কেন'র উত্তর দিতে পারব না।

জো বললে,—ভাল মাংস। 'হক্‌স্‌বিল্‌'-কচ্ছপের মাংস বিষ,—সে মাংস আমি ফেলে দেই। এ হচ্ছে ভালো জাতের কাছিমের মাংস। খাবে না?

একটু হেসে মেয়েটি বললে,—না। আমি হিন্দু, তা' জানো? ভারতবর্ষে গুজরাট বলে একটা দেশ আছে, আমি সেই দেশের মেয়ে। বৈষ্ণব। আমাদের ওসব খেতে নেই।

হা ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল 'জো'। ওর সব কথা সে বুঝতেই পারল না। মেয়েটি বললে,—বসো না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি?

বলতে-না-বলতে, কী আশ্চর্য, মেয়েটি একেবারে ধ'রে ফেললে ওর হাত, একেবারে ডানহাতটা, যেটা দিয়ে ও কচ্ছপদের রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডগুলি বার ক'রে আনে। তারপরে বসিয়ে দিলে চেয়ারের ওপরে। নিজ বসল তার খাটে—বিছানার উপরে। বুদ্ধিমতী মেয়ে জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিয়েছে নিজেই। কুলুংগীতে জড়ো-করা অজস্র মোমবাতি, তার একটা জ্বালিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপরে।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসল, বললে,—ভাবছ, শিসেলাসের মেয়ে হয়ে আমি জানলাম কী করে? জেনেছি। আমারই এক পূর্বপুরুষকে জলদস্যুরা ধরে এনেছিল ঐ দ্বীপে। তিনি বিয়ে করছিলেন দ্বীপেরই এক মেয়েকে। সেই বংশেরই আমি মেয়ে, বংশ-পরম্পরায় আমরা শুনে আসছি আমরা কোথাকার। গুজরাট। বৈষ্ণব। হিংসে আমাদের করতে নেই।

—হিংসে!

—হ্যাঁ।— মেয়েটি বলল,— জীবজন্তু মারাটা আমাদের কাছে পাপ।

উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠল জো,—কিন্তু আমি ত গুজরাটের নই, আমার কাছে পাপ হবে কেন?

অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে মেয়েটি, বললে,—কে বলেছে তোমার পাপ! আমি আমার কথা বলছি।

মোমবাতির স্বল্পালোকেই মনে হল,—মেয়েটির দুটি চোখ যেন স্বপ্নিল হয়ে

উঠেছে, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে যেন বলতে শুরু করল,—ছোট থেকেই বাপ-মাকে হারিয়েছি। বাবার লেখা এক ডায়েরী-খানা ছাড়া পিতৃ সম্পত্তি কিছুই নেই। মানুষ হয়েছি এক কন্‌ভেণ্টের অনাথ-আশ্রমে। তা-ও বড় হয়ে একবার দুষ্টুমী করেছিলাম বলে, ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কী আর করি? লেখাপড়া ত হল না.—হোটেলে নাচ্‌বার কাজ নিলাম।

—নাচ্‌?

—হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে ঠোঁট টিপে হাসল মেয়েটি,—খাটো পোশাক পরে নানা রকমের নাচ। তখন মাংস-টাংস সবই খেতাম। অমন চম্‌কে উঠো না, চৈতন্য মানুষের একদিনেই আসে না। দিন যায়। একদিন বাক্স থেকে হঠাৎ-ই বার করলাম বাবার লেখা ডায়রীটা। প'ড়ে মনে হ'লো।—করেছি কী আমি? ঠিক ঐ সময়েই বিশ্বের সঙ্গে আলাপ।

—আমাদের বিশ্ব?

—হ্যাঁ, তোমাদেরি বিশ্ব।—মেয়েটি বললে,—ও বললে, ও ভারতীয়। আমাকে ভারতে নিয়ে যাবে। আমি ত লাফিয়ে উঠ্‌লাম। ও বললে,—চলো। আমিও বল্‌লাম,—চলো।...এলাম। ওদের দলটাকে জানতাম। মেয়ে চুরি ওদের যে ব্যবসা, এটা হোটেলের নাচিয়ে মেয়ে হয়ে আমি আর জানব না? অনেকের অনেক গোপন খবরই ত জানতাম!

দু' হাতে মাথা চেপে বসেছিল জো, হঠাৎ-ই বলে উঠল,—বড্ড ভুল করেছ!

—ভুল!—খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মেয়েটি,—না। করুক না আমাকে চুরি, নিয়ে যাক্‌ না যেখানে হক্‌,—আমি ত দেখতে চাই, কী আছে আমার জীবনের শেষ!

বলেই ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ মেয়েটি, তারপর বললে,—তোমার কথাও শুনেছি বিশ্বের কাছে। আমারি মত এক হোটেলের মেয়ের দিকে তুমি ঝুঁকেছিলে!

সোজা হয়ে ব'সে দুটি হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকাল 'জো'—আবেগে আর উত্তেজনায় কণ্ঠ ওর রুদ্ধ। কিন্তু সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য না করেই বলে উঠল মেয়েটি,—ঐ ব্যাপার নিয়ে হিংসেয় জ্বলে উঠে একটা মানুষকে তুমি মেরে ফেলেছিলে!

ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো 'জো' মেয়েটির ওপরে, ওর নরম পাখির মত গলাটা দুই হাতে টিপে ধরে বলতে লাগল,—আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না!

কয়েকমুহূর্ত ঐ ভাবে কাটিয়ে দিয়ে, শান্তভাবে ওর হাত দুটি গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললে,—খুব বীরত্ব! একটা মেয়ের গলা টিপে...আচ্ছা পুরুষ যা'হক!

—তুমি চুপ করবে কিনা!

মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ-ই ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেললে, বললে,—অমন ক'রে আচম্‌কা ধরে! আমি ত শেষই হয়ে যেতাম। সেটা কী ভালো হত!

—বেশ হত। কে আমার কী করত!

মেয়েটি বললে,—কিছুই না। যেমন তোমার বন্ধুরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছে এখানে, তুমি আর যেমন ভয়ে ফিরতে পারছ না ভিক্টোরিয়ায়,—তেমনি লুকিয়ে থাকতে হত না কোথাও। তবে, তোমার মনে-মনে খুব দুঃখ হ'ত। হ'ত না?

অসহ্য! মেয়েটা ওর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিতে চায়! তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে, দরজার খিল খুলে ও বাইরে বেরিয়ে গেল। অশান্ত ঝড়ের দাপাদাপি বাইরে। একটা বুড়ো জামগাছ বুঝি উপড়েই প'ড়ে গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে টুক্‌রো পাথরও ছিট্‌কে পড়ছে এদিক-ওদিক!...

সারাটা দিন এমনি ভয়ংকর ঝড়ের তাণ্ডব। ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে রইল 'জো'। মেয়েটি বাইরে এসেছিল কি না কে জানে। আর, সেই 'জো'? বৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল ত? না গেছে ত ব'য়ে গেছে! অতো অভিমানের ধার ধারে না সে। এবারে কারুর কথা সে শুনবে না, বুড়োটাকে সে কাট্‌বেই কাট্‌বে।

এল রাত। মেয়েটা ভয়-ডর পাবে না ত? পাক না, ভয়ডর পেয়ে কেঁদে ওঠাইত উচিত। ও কাঁদবে, আর বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে কিছুই শুনতে পাবে না জো, বেশ হবে!

রাতটাও কাটল। সকালে সামান্য একটু ধরেছিল বৃষ্টিটা। বাইরে এলো 'জো'। মেয়েটার ঘরের দরজা খোলা। স্নান করতে গেল নাকি? পাহাড়ী পুকুর জল পেয়ে এখন কানায়-কানায় ভর্তি। পা পিছ্‌লে মেয়েটা যদি গিয়ে তাতে পড়ে? সাঁতার জানে ত?...না জানুক, বয়েই গেল। ওরা আসবে,—মেয়েটা কই? জো বলবে,—শেষ। তোমাদের হাত ফস্‌কে পাখি পালিয়েছে...ওরা রেগে বলবে,—চল্‌ তোকে ভিক্টোরিয়া নিয়ে যাই। ও' যাবে না। এখানকার সব-কিছুর সঙ্গে তার মন মিলে গেছে, আর যাওয়া চলে না এ জায়গা ছেড়ে।

বৃষ্টিতে বহু ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। ঝোপে ঝাপে এধারে ওধারে খুশী হওয়া ঝর্ণাদের ঝর্‌ঝর্‌। যেন একটি নয়, বহু মেয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছে সারা পাহাড়টা জুড়ে। তরতর করে

নেমে এল নীচে। বুড়ো 'জো' ঘরে যায় নি, শক্ত খোলের নীচে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পার করে দিয়েছে সব ঝড়, বৃষ্টি, বিপর্যয়।

—শুনেছিস?

অনড়, অটল একটা প্রস্তর খণ্ড। সাড়ার লক্ষণও নেই।

মেয়েটা আমার এই ডান হাতটা ধ'রেছিল, জানিস্? কী রে? ও, ঘুমোচ্ছিস বুঝি? আচ্ছা, ঘুমো।

একটা ঝর্ণার জলে নিজেও স্নান সেরে নিল জো, তারপরে লম্বা প্যাণ্টটা আবার পরে নিয়ে কম্বল জড়িয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি কম্বল জড়িয়েই ওপরে উঠে এলো সে নিজের ঘরে। আশ্চর্য ঘটনা, তার নিজের খাটে—বিছানার ওপরে লাল একটা শাড়ি পরে বসে আছে মেয়েটি।

বললে,—কথা কইব বলে বসে আছি।

জো বললে,—পরশুই ত বিশ্ব আসছে।

—আসুক।

—চলেই ত যেতে হবে তোমাকে।

—যাব।—বলেই মেয়েটি আবার হাসে, বলে—না-ও ত যেতে পারি।

—সে উপায় নেই। ওদের চেন না।

মেয়েটি হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল, বললে—দেখ, সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কোথাও যাব না। এখানেই কাটিয়ে দেবো বাকী জীবন। এটাকেই বানিয়ে নেব আমার স্বপ্নের গুজরাট!

—কেন!

মেয়েটি বললে,—মানুষ ত অনেক দেখলাম। এবার নির্জনতাটাই ভালো ক'রে অনুভব ক'রে দেখি। থাকতে দেবে না আমাকে তুমি এখানে?

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে জো, বললে—কিন্তু ওরা দেবে কেন?

—ওদের সামলানোর ভার আমার ওপর। ভেব না, ওদের পোষ মানাতে হয় কী করে, তা আমি জানি। জানি না তোমাকে। তুমি খাঁটি পুরুষ,—মনের দিক থেকেও।

ওর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জো। কনভেণ্টে পড়া মেয়ে, কত কথা জানে, যার মানেও বোঝা যায় না সব সময়।

মেয়েটি বললে,—মানুষ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। থেকে যাই এখানে। তুমি যা বলবে করব। তবে, তোমার ঐ কাছিম-মারা আর চলবে না। কাজ যখন করতেই হবে, নারকেল-পাড়ার কাজ ধরো। সারা বছরের রুটির পয়সা ওতেই চলে আসবে। তারপরে দুটি-একটি খোকা-খুকু যদি আসে—

দুটি হাতে দুটি কান চেপে ধ'রে সবেগে সবেগে বাইরে চলে আসে জো সেই ঝরঝর-ঝমঝম-বৃষ্টিধারার মধ্যে।

—এই জো, শুনেছিস?

সে কিন্তু তেমনি অনড়, অবিচল। বায়ু টেনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুম্ভক ক'রে ওভাবে ওরা থাকতে পারে।

—এখনো ঘুমোচ্ছিস! সর্বনাশ হলো যে এদিকে! মেয়েটি কী বলে জানিস?

বৃদ্ধ প্রাণীটি নির্বিকার। তার পাশে কম্বলে মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভিজতেই থাকে জো, বিড়বিড় করে বলতে থাকে—তোকে আর কাটা হবে না। কাউকেই আর কাটতে পারব না। নারকেল-পাড়ার কাজ করতে হবে। তা' আমি খুব পারি। কিন্তু জোনাথানরা যদি রাজী না হয়? রাজী না হয়ত খুন করব ওদের!...কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল জো। না-না হিংসে করতে নেই। ঐ যে কাদের কথা বলল মেয়েটা—মাছমাংস খায় না, কাউকে হিংসেও করে না,—সেই জাতের মতো হবে সে।

পরদিনও অমনি ঝড়। বুড়ো জোকে কোনক্রমে হটিয়ে-হটিয়ে তার ঘরে উঠিয়ে রেখে এল জো। বললে,—ঘরে থাক্। আমিও ঘরে থাকব। মেয়েটা কী বলে জানিস? বলে, লোক তুমি ভালো। সঙ্গী নেই সাথী নেই—একা একা থাকতে থাকতে তোমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁরে, তোরও ত জুড়ি নেই, তোর মাথাটা আমার খারাপ হয়নি ত!

বলতে-বলতে নিজেই হেসে উঠ্ল জো, বললে—মাথা নেই, তার মাথাব্যথা। মাথা কই তোর? আছে ত দুটো জ্বলজ্বলে চোখ! আমারও আছে। মেয়েটি বলেছে,—আমার চোখদুটো নাকি সুন্দর!

পরদিন বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে থেমে গেল ঝড়। কিন্তু কোথায় জোনাথান-জোহার আর বিশ্ব? জো আবার নীচে এলো, বুড়োর ঘরটা খুলে ওকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে—থেমেছে বৃষ্টি। আর কেন? এবার একটু ঘুরে বেড়া?

বৃদ্ধ জো কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জায়গাটিতে এসে বসল মুখ বার ক'রে বালি সরিয়ে।

—মেয়েটা মরেছে জানিস! আমাকে ছাড়া থাকতে চাইছে না। বলছে,—কোথাও আমি যাব না। মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। তা বিয়ে করে ফেলি, কী বলিস? ঐ যে পাহাড়ের ওপরের লম্বা পাথরটা, ওর উপরে একটা পাথর চাপিয়ে 'ক্রশ' তৈরি করেছি। মেয়েটিকে বলেছি,—ঐ আমাদের গীর্জে। ওখানেই বিয়েটা হবে। ঐ বায়গাটার নাম কী দেবো, জানিস? গুজরাট। কী, অমন করে চাইছিস কেন? কথাটা মনে ধরছে না? না-না, তোকেও দেখব রে, সমান যত্ন করব। মেয়েটাকেও পাঠাব তোর কাছে। দুজনে মিলে যত্ন করব।

ঠিক এর পরদিনই এল ওরা। সেই লঞ্চ, সেই 'সাজ'। জো বললে,—আমি আর কাছিম কাটব না।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা।

বিশ্ব গিয়েছিল ওপরে, মেয়েটির কাছে। সে হাসতে-হাসতে নেমে এল ওদের কাছে, বললে,—ওহে, পাহাড়ের মাথায় চার্চ হ[illegible]। মেয়েটা বিয়ে করছে 'জো'কে।

জোনাথান আর জোহার হাসবে কি কাঁদবে, বুঝে পেল না। জোনাথানের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিশ্ব বললে,—মেয়েটি আজীবন থাকবে এখানে 'জো'র কাছে।

এতক্ষণে কলরব ক'রে উঠল ওরা,—তা কী ক'রে হবে?

—হোক্!—বিশ্ব বললে,—জো আমাদের অনেক করেছে। ওর জন্য এটুকু স্বার্থত্যাগ আমাদের করতেই হবে। জয় হোক 'জো'র।

অতি সহজেই মিটে গেল ব্যাপারটা। জো-কে বাদ দিয়ে ওরা নিজেরাই কাটতে

লাগল কাছিম। ওরা বললে,—ওর বিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা ফিরব।

জোনাথান বললে,—বুড়ো কাছিমটাকে কাট্‌তে হবে যে! ওর খোল না হলে ত বিয়ে হবে না। জানো না বুঝি? আমাদের শিসেলিয়ানদের এই নিয়ম। ঐ খোলে কিছু মসলা আর শাকপাতা জল দিয়ে ঢেলে সিদ্ধ করতে হয় উনুনে। সেই জল না মুখে দিলে বিয়ে সিদ্ধ নয়। ছোট কাছিমের খোলে চলবে না, চাই একেবারে ঐ বুড়োটার মত "টেসটিডো এলিফেনটিয়া'র খোল।

পাঁচ-ছটা দিন কেটে গেল নিষ্ক্রিয়ভাবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে আপন মনে কী যেন ক্রমাগত ভাবছে সে। জোনাথান ঠাট্টা করে বলে,—হবু বর পালায় কোথায়?

যে মাংস কাটতে জো-র লাগত একদিন, কি দু'দিন,—সে কাজে ওদের পাঁচ-ছদিনের বেশী লাগছে। হাত নিস্‌-পিস্ করে জো-র। অথচ, ওতে হাত দিলে ক্ষেপে যাবে গুজেরাটের মেয়ে।

সারারাত বিনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরবেলায় উঠে বসল জো। ওরা সবাই উঠোনে ঘুমে আচ্ছন্ন।—মেয়েটির ঘরের দরজাও বন্ধ। তাড়াতাড়ি ও নেমে এলো নীচে, বললে,—শুনেছিস? মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। নইলে, আমাকে বিয়ে করতে চায়? না-না, আমি তা' হতে দিতে পারি না। এখানে, দিনের পর দিন, একা থাকতে-থাকতে ও মরেই যাবে। আমি থাকি, আমার আর কোথাও স্থান নেই, তাই। কোথা থেকে এসেছিল আমার পূর্বপুরুষ, আরব কি মিশর, তা-ও জানি না। ওর বাবার ডায়রী থেকে ও ত জেনেছে, ও কোথাকার মেয়ে! ও চ'লেই যাক সেখানে।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে যেন মনে একটা মুক্তির হাওয়া এসে লাগে। সে আগের মত চক্‌চকে 'দা' দিয়ে আবার কাটতে আরম্ভ করে কাছিমগুলো,—রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ডগুলি বার করে আনতে থাকে দু'হাতে ক'রে!

—এ কী করছ!

হলদে শাড়ি প'রে তার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, বেদনার্ত দুটি চোখের দৃষ্টি, বললে,—বারণ করেছিলাম না!

হেসে উঠল জো,—শুনব কেন তোমার বারণ! তোমাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু এ আমি ছাড়তে পারব না!

ক্ষোভে-দুঃখে আরক্ত দেখায় মেয়েটির মুখ, দুটি চোখ যেন জ্বলতে থাকে, বলে,—এই তোমার মনের কথা! উঠে এসো বলছি।

—না। তুমি যাও।

—না! যেন অসহ্য রাগে কাঁপতে থাকে মেয়েটি, তারপর বলে,—আচ্ছা, বেশ, তাই হবে।

চ'লে যায় মেয়েটি ওর কাছ থেকে। চক্‌চকে ধারালো 'দা'টা ওর হাত থেকে কিন্তু পড়ে যায়। আর সে উঠিয়ে নেয় না সেই 'দা'টা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, নীচে নামে, এধারে-ওধারে উদাসীর মতো ঘরে-ঘরে কী যেন ভাবে সে, এক সময় অন্য ঘর পথে উঠে আসে সে পাহাড়ের মাথায়,—তার 'গীর্জে'র কাছে সে ব'সে থাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুটি চোখ আপনিই বুঝি ভরে আসে জলে!

কেটে যায় দুটি দিন এম্‌নি করে। বিশ্বের সঙ্গে মেয়েটি একান্তে কী আলাপ করে, কে জানে, জো থাকে ওদের থেকে পালিয়ে পালিয়ে।

দু'দিন পরে জোনাথানরা শুনতে পায় কথাটা। 'জো' নয়, 'বিশ্ব' মেয়েটিকে বিয়ে করছে। এখানেই, এই ভূমিখণ্ডেই। 'জো'র গীর্জেতেই হবে বিয়ে। শুনে ওরা ঠাট্টা করে জো-কে,—কীরে, ফসকে গেল! জো পশুর মতো আবার 'দা'টা হাতে তুলে নিয়ে বাকী কাছিমগুলিকে কাটতে শুরু করে। চীৎকার ক'রে ওঠে থেকে-থেকে, সেই আগেকার মতই বৃদ্ধ 'জো'কে বলে,—দেখছিস কী, এবার তোকে কাটব!

কথাটা সত্যিই হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। 'গীর্জে' থেকে বর-কনে নেমে এসে বসেছে ঘরে, জোনাথান-জোহাররা জামার গায়ে ফুল লাগিয়ে ঘোরাফেরা করছে। হাফ্‌প্যান্ট-পরা—খালি গা—হিংস্র জন্তুর মতই গুঁড়ি মেরে মেরে বুড়ো জো-র কাছে এসে বসল চক্‌চকে প্রকাণ্ড খাঁড়াটা নিয়ে। বললে,—ওরে, সত্যিই তোকে দরকার। তোর খোল না হলে নাকি বিয়ে হবে না! দে-দে তোর খোলটা!

বলতে-বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠ—কিন্তু, মুহূর্তের জন্য। তারপরেই, পশুর মত একটা হাঁক দিয়ে দু' হাত দিয়ে সজোরেই উল্টে ফেলল 'বুড়ো-জো'কে। তারপরে, চক্‌চকে ধারাল খাঁড়াটা দিয়ে ওর হৃদ্‌পিণ্ডটা চিরতে গিয়ে অতর্কিত বিস্ময়ে থমকে থেমে গেল জো। কাকে সে কাটবে? তাকে যে সে সত্যিই একদিন কাটতে পারবে, —এটা দেখবার আগে বৃদ্ধ নিজেই চলে গেছে সব কাটা-ছেঁড়ার বাইরে। বোধ হয় অভিমানে, এক দুঃসহ—অব্যক্ত-নিদারুণ অভিমানে।

হাতের খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জো, জোনাথানকে উদ্দেশ ক'রে কোনক্রমে বলে,—নিয়ে যাও এই খোলটা, দাও গিয়ে বিয়ে।

সে নিজে আর দাঁড়ায় না, তরতর ক'রে নেমে যায় নীচে, আরো নীচে। নিস্তরঙ্গ সরোবরটা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে।

ভিক্টোরিয়ায় জো-র একটা বিবর্ণ ছবি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে জো-র কাহিনী শেষ করল বিশ্ব, বললে,—সেই থেকে 'জো'কে আর কেউ কখন, কোথাও; দেখতে পায়নি।

আজও, জনসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের ওপরে এতক্ষণে-উঠে-দাঁড়ানো সেই লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল,—সত্যি কথা, ওদের সচরাচর দেখাও যায় না।

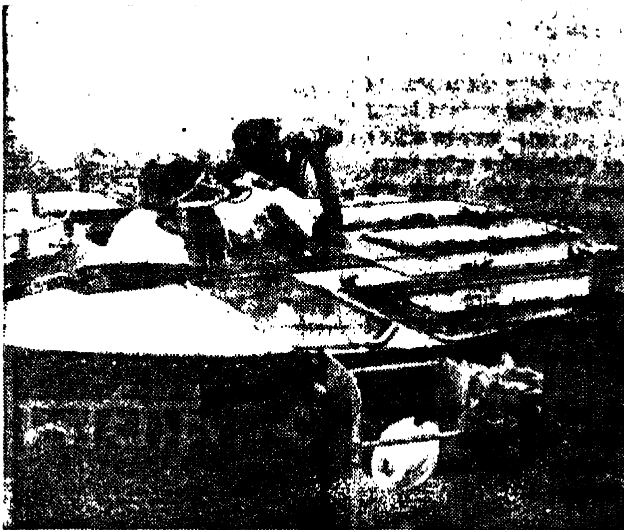
# গণ্ড-ভেরুণ্ড

সলিল ঘোষ

'স্টারবোর্ড টেন্—স্টেডি—মিড্শিপস্—পোর্ট টেন্', শান্তসমাহিত আরব সমুদ্রের ঘন নীল জলের উপর জাহাজের ব্রিজের এক কোণায় বসে শুনছি কমাণ্ডিং অফিসারের নির্দেশ. জাহাজের কাণ্ডারী নীচের তলায় কোয়ার্টার-মাস্টারকে। জাহাজ চলছে নির্দেশ অনুযায়ী এঁকে বেঁকে, কখনও জোরে কখনও ধীরে, বেশ গা ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১২ নটে। 'অ্যাকশন স্টেশনের' লাল-পতাকা সিগন্যালম্যানরা উড়িয়ে দিয়েছে মাস্তুলে, চারিদিকে থমথমে ভাব, নৌবাহিনীর কর্মব্যস্ত অফিসার ও নাবিকরা তটস্থ হয়ে আদেশ পালন করছে, ব্রিজ থেকে উচ্চতম অফিসারের। কামানদাগার মহড়া চলছে নকল শত্রুর বিরুদ্ধে। বিমান-বাহিনীর একটি ডাকোটা বিমান উড়ছে আকাশে বৃত্তাকারে, জাহাজটিকে কেন্দ্র করে। বিমানের সহিত কয়েক হাজার ফুট দূরে সুতোর দ্বারা যুক্ত একটি ড্রোগ (Drogue) লক্ষ্যভেদের নিশান। বিমান এবং নিশানটি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কড়া মেজাজের গানারী অফিসার একবার ব্রিজের পোর্টসাইড, একবার স্টারবোর্ড সাইড করছেন। মাইকে, সহকারী নাবিক মারফৎ আদেশ দিচ্ছেন জাহাজের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কামান-ঘাঁটিগুলিতে—৬" কামান, ৪" কামান, বোফোর্স কামানের গোলন্দাজ নাবিকদের—"গ্রীন দিপ—রেড্ ৪"—স্ট্যাণ্ডবাই ফর ঘাঁকিং গান্স্—এমি রাডার একো—রেড্ ৪" স্ট্যাণ্ড টু স্লিড।" যাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা আবার আদেশের পুনরাবৃত্তি করছে। নীচে, ইলেকট্রনিক ও 'রাডার যন্ত্রপাতির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অন্ধকার ঘরে বসে দুজন অফিসার ও কয়েকজন নাবিক রাডার ও অতি-আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দ্বারা নিশান ও জাহাজের গতিবিধির মাপ-জোক করছেন। টেলিফোনে ব্রিজে তাদের গণনার ফল জানাচ্ছেন। হাই-ফ্রিকুয়েন্সি রেডিও টেলিফোনে বিমান-চালকের সহিত কথা বলছেন,—"মাইক্ কিলো, হাউ লং ইট উইল টেক্ টু ৫০০০"। বেতার বিভাগের লোকেরা. জাহাজের নীচে বেতারকক্ষে বসে স্থলে নৌবাহিনীর দপ্তরের সহিত যোগাযোগ রাখছে। বেতারে যেসব খবরা-খবর, আবহাওয়া সংবাদ তারা পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠান হচ্ছে ব্রিজে। জাহাজের দুপাশে কামানগুলির 'ডিরেক্ট কণ্ট্রোল টাওয়ারে' বসে, নৌবাহিনীর দুজন অফিসার ও নাবিক একাগ্রচিত্তে কামানদাগার সব মাপজোক, আয়োজন করছেন। "কলিং বেলে"র মত একটি আওয়াজ করে কামান-দাগার আদেশ দিলেন গানারী অফিসার। গোলাবর্ষণ শুরু হল। কর্ণপটাহবিদারী সে ধ্বনি দূর-দিগন্তে সমুদ্রের নীল জলে মিশে গেল। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নিখুঁৎ সমন্বয়ে যেভাবে তা চলমান থাকে, ঠিক সেইভাবে. জাহাজের সর্বত্র নৌবাহিনীর নাবিকরা কাজ করে গেল। নেভীর খ্যাতি অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবশ্য সেদিন জাহাজে লক্ষ্য করিনি।

দুই মুণ্ডবিশিষ্ট পৌরাণিক ঈগলপাখি গণ্ডভেরুণ্ডের পক্ষপুটাশ্রিত হয়ে দেখ-ছিলাম সব কার্যকলাপ, ভাবছিলাম নৌবাহিনীতে পুরানো দিনগুলির কথা।

১৬ বছর আগে মহাযুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর এক-একটি ঘটনা যেন মিছিলের মত চলে যেতে লাগল চোখের সামনে দিয়ে। তুলনা আসছিল মনের মধ্যে, এখনকার ভারতীয় নৌবাহিনীর সহিত তখনকার দিনের কথা। ব্রিজের উপর সকলেই প্রখর রৌদ্রপীড়িত হলেও সমুদ্রের অশান্ত শীতল হাওয়া বিস্মৃত ঘটনাগুলিকে যেন জাগিয়ে দিল সুড়সুড়ি দিয়ে। অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। নেভীর সকলের কার্যকলাপ নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছি, কিন্তু তবুও আমি যেন এখানে নেই। ১৬ বছর আগে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যে দিয়ে মনসুনের মধ্যে চলেছি পশ্চিমের দিকে এই একই আরব সমুদ্র দিয়ে। শ্রাবণের অশান্ত ভীষণ সমুদ্রে আমাদের জাহাজ একেবারে নিঃসহায়। "সি সিকনেস্"-এও যে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে, চোখের সামনে প্রথমে তা দেখে বিচলিত হয়েছিলাম। পাহাড়ের দেশের মানুষ এক-দল গুর্খাসৈন্য চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে। তাদেরও এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা। চার পাঁচ-দিন কিছু খায়নি, শুধু বমি করেছে, জাহাজের ডেকে পড়ে আছে বেহুঁস হয়ে, সমুদ্রের ঢেউয়ের জল ডেক ভাসিয়ে তোড়ে বয়ে যাচ্ছে ওদের উপর দিয়ে, নড়াচড়ারও অবস্থা নেই। একদিন বিকেলে দুইটি সৈন্যকে প্রাণহীন অবস্থায় দেখা গেল। নাবিকরা সন্ধ্যাকালে গম্ভীর একটি অনুষ্ঠান করে, মৃতদেহের সঙ্গে ভার বেঁধে নামিয়ে দিল সৈন্য দুটিকে সমুদ্রে, আস্তে ধীরে। সন্ধ্যাবেলার সেই অনুষ্ঠান উদাস করে দিয়েছিল মনকে। দুজন মারা গেল চোখের সামনে, অথচ এতটুকু বিচলিত হল না কেউ, যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিশাল সমুদ্রের কোলে চিরতরে আশ্রয় পেল পাহাড়ের দেশের মানুষ দুটি, যাদের জীবন সমুদ্র থেকে চিরকালই বহুদূরে। ওই ত, চুলকাটার ফাঁকে সেলুন থেকে বেরিয়ে, জাহাজের সেই ইংরেজ নবসুন্দর ডেক্-এ দাঁড়িয়ে দিগন্তপানে চেয়ে. চিন্তাভাবনাহীন



"মহীশূর" জাহাজের "ডিরেক্ট কন্ট্রোল টাওয়ার" অফিসার ও নাবিকেরা লক্ষ্যভেদের মাপজোক করছে।

়িক হাসছে। ঠিক একইভাবে প্রত্যেক-র। একে দেখে তখন আমার মনে ছিল, বিধাতার একটি মুচকি হাসি। টবুকে টুকে রেখেছিলাম এই ইংরেজ পতের কথা।

ভারতীয় নৌবাহিনীর অধুনালব্ধ সর্ব-ৎ' ক্রুজার আই-এন-এস্‌ "মহীশূর"-এ দিন কাটালাম মহড়া দেখতে। বন্দর র ৫০ মাইল দূরে সমুদ্রে কামান দাগার ড়া চলছিল সেদিন। মহীশূরে জাহাজের তীকচিহ্ন "গন্ড-ভেরুন্ড", মহীশূর জ্যের কোর্ট-অব-আর্মস থেকে নেওয়া। ল শক্তির প্রতীকরূপে, দক্ষিণ ভারতের ীন ভাস্কর্যে বহুস্থানে গন্ড-ভেরুন্ডের র্ত খোদিত আছে। জাহাজের আদর্শ, নিষদের বাণীতে লেখা রয়েছে এই তীকফলকের নীচে—'মা বিভেতি কদাচন', দও ভীত হোয়ো না। ইংরাজ নেভীর লানি ক্লাসের', ৮৭০০ টনের এই ক্রুজার তে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় নৌ-হনীতে যোগ দেয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর গ-অফিসার কমান্ডিং, রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল মজিতেন্দু চক্রবর্তীর ফ্ল্যাগ এই জাহাজে ীয়মান। এর পূর্বে আই-এন-এস্‌ ী নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ্‌ ছিল। বেঁটে টা রিয়ার-এ্যাড্‌মিরাল চক্রবর্তী বাঘা-ডগ্‌'। তাঁর ত্রিশ বছরের নৌজীবনের রবময় কীর্তিকলাপ নেভীর লোকেদের ট প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। াজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে, রিয়ার-এ্যাডমিরাল বর্তী তাঁর অধীনে অফিসার ও নাবিকদের কিলাপ লক্ষ্য করছেন, জাঁদরেল এক চীর বায়নকুলার গলায় ঝুলিয়ে। পাশে ছেন, মহীশূরে জাহাজের কমান্ডিং ফসার ক্যাপটেন নন্দ। ইঞ্জিনরুমে টেলি-ফ আদেশ দিলেন, "স্লো এহেড্‌ পোর্ট ঞ্জন"। জাইরো-কম্পাস দেখে, কোয়ার্টার টার তখন ০৯০ কোর্সে হাল ধরে ড়িয়ে আছে।

ভারতীয় নেভীর বৃহত্তম জাহাজ ীশূর' ক্রুজার, ব্রিটিশ নেভীর পূর্বতন াইজেরিয়া" জাহাজ, ১৯৫৪ সালে ভারত কার ইংরেজদের নিকট থেকে ক্রয় করে। হাজটিকে বার্কেনহেড-এ সম্পূর্ণভাবে ধুনিককালের উপযোগী করে পুনর্গঠিত া হয়। প্রায় ৫ কোটি টাকা পড়ে এই হাজ সংগ্রহে। অতি আধুনিক ইলেক্‌-নক যন্ত্রপাতি সম্বলিত এবং জাহাজের য় ২০০ অফিসার ও ৬০০ নাবিক-র বসবাসের উন্নত ব্যবস্থাযুক্ত এই জাহাজ, ৌ-বাহিনীর অন্যান্য জাহাজের ঈর্ষার বস্তু ব। যতই আধুনিক করা হোক না কেন ই সব জাহাজ ভবিষ্যৎ যুদ্ধের উপযোগী া। বৃহৎশক্তিগুলির আধুনিক নৌ-হিনীর জাহাজের তুলনায় তুচ্ছ ও রানো। 'এখনকার যুদ্ধ জাহাজগুলিকে



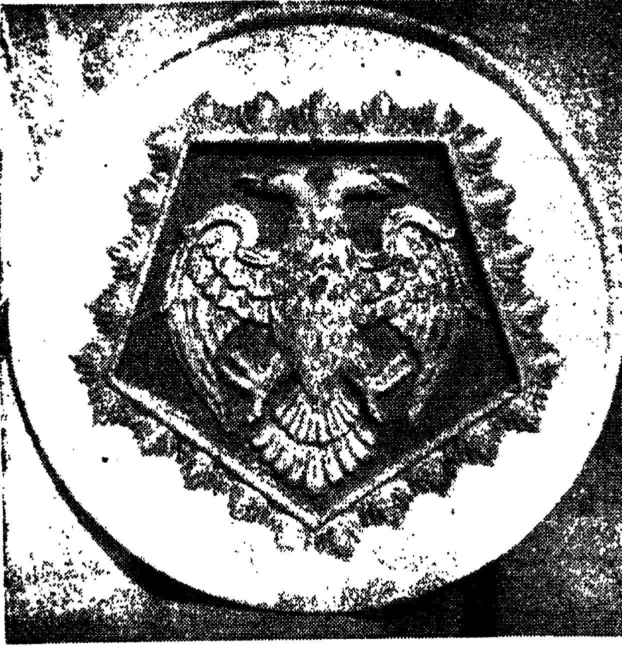
**"মহীশূর ক্রুজারের ব্রিজে দাঁড়িয়ে কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন নন্দ ও ফ্ল্যাগ অফিসার রিয়ার এ্যাডমিরাল চক্রবর্তী লক্ষ্যভেদের নিশানা দেখছেন।**

মিউজিয়ামে পাঠাতে হবে", রাশিয়ার প্রধান-মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের এই উক্তি কিছুটা সত্য। যুদ্ধের সময় ছোট ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে পরিহাসচ্ছলে বলা হত "মাছ-ধরার বাহিনী"। অত্যন্ত ছোট কয়েকটি জাহাজই ছিল ভারতের সম্বল, আধুনিককালের উপযোগীও নয়। স্বাধীনতার পর নৌ-বাহিনী দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজারযুক্ত হয়ে। নাবিকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এবং সেই উদ্দেশ্যে এগুলি কেনা সমর্থন করা যেতে পারে। তা নাহলে বহু-মূল্য এসব জাহাজ এযুগে অপ্রচলিত বলা চলে। সেইজন্যই ব্রিটিশ নেভীর পরিত্যক্ত, এ যুগে অচল এইসব যুদ্ধ জাহাজ মুদ্রা-সঙ্কটের দিনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে না কিনে, তার পরিবর্তে ভারত সরকার বাণিজ্য-নাবীর জাহাজ কিনলে অধিক লাভবান হতেন। ভারতীয় বেসরকারী বাণিজ্য-নাবী সংস্থাগুলির জাহাজ কেনার সামর্থ্য নেই। তারা সর্বদা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছে, সুবিধা আদায়ের জন্য। এই সব সংস্থাগুলি তেমন সুপরিচালিতও নয়। বলতে গেলে পারি-বারিক ব্যাপার। মোটা মাইনেতে আত্মীয়-স্বজন পোষণ করে। ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের দোহাই দিয়ে, নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য রাখার চেষ্টা করে এবং সর্ব-প্রকারে কোন প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলতে চায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যনাবীর জাহাজের বাজার অত্যন্ত মন্দা। জাহাজের দাম কমে গেছে। এমনকি একসঙ্গে পুরো দাম না দিয়েও এখন জাহাজ কেনা যায়।

এদেশের প্রয়োজনের ৯৫% মালপত্র বহনে এখনও বিদেশী বাণিজ্য-নাবী সংস্থাগুলির উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় ১০০।১৫০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে। যুদ্ধ যখন বাধবে, ভারতের হাজার হাজার মাইলের সমুদ্রতট রক্ষা করা কোনদিনও সম্ভব হবে না এখনকার ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত করা। যতই কেন না আমাদের নেতারা ভারতীয় প্রতিরক্ষার গুণগান করুন। এর চাইতে আমাদের দেশের তেলবহনকারী একটি "অয়েল-ট্যাঙ্কার বাহিনী" গঠন করলে আমরা প্রচুর লাভবান হতাম।

ভারতীয় নৌবাহিনীর ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং সে ইতিহাস পুরাতত্ত্বের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে আছে। খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হবার পূর্বেও ভারতীয় জাহাজ ব্যবসা বাণিজ্যে দেশদেশান্তরে যেত। এরক কথা এদেশের পুরানো পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া, জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভারতীয়রা অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত ধরনের কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ এদেশে তৈরী হত। পরবর্তিকালে নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে ভারত অনেক পিছিয়ে পড়লেও, এদেশের জাহাজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হত দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক অভিযানের জন্য। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ এদেশে নদীপথেও চলাচল করত।

বৌদ্ধযুগে সমুদ্রপথে বহু ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে জাপান, চীন ও বর্মাদেশে গিয়েছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলায়



"গণ্ড ভেরুণ্ড"
আই এন এস "মহীশূর" জাহাজের প্রতীক

জাহাজের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়, খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীর সাঁচীর ভাস্কর্যে। বম্বে শহরের নিকটে কানহেরী বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিতেও জাহাজ ডুবির কাহিনী খোদিত আছে। এছাড়া, অজন্তার দেয়াল-চিত্রেও জাহাজের ছবি অঙ্কিত আছে বহু স্থলে। এইসব জাহাজের যাত্রী বহন করার ক্ষমতার বিষয় একটি পালি লেখাতে পাওয়া যায়। সেখানে এক রাজা শ্রীবিজয়ের জাহাজ ৭০০ যাত্রী বহন করে সিংহল যাত্রা করেছিল বলে উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় সংস্কৃত "যুক্তি-কল্পতরু"তে। এখানে লেখক শুধু যে বিভিন্ন প্রকারের পাল তোলা জাহাজের বিষয় লিখেছেন তা নয়, এমনকি বিভিন্ন জাহাজের নির্মাণপ্রণালী এবং কোন্ জাতের কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে তাও লেখা আছে। আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন জাহাজকে তিনি শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যেমন "সামান্য" ও "বিশেষ"। প্রথমটি শুধু নদীপথে যাতায়াতের জন্য, দ্বিতীয়টি সমুদ্রপথের জন্য। নির্মাতাদের সতর্ক করে তিনি লিখেছেন যে—তক্তা জোড়া দেবার জন্য সমুদ্রযাত্রার জাহাজে কোনপ্রকার লৌহ অব্যবহার্য। কারণ লৌহ, সমুদ্রের নীচেকার চুম্বকপর্বতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জাহাজের গতিবিধি প্রভাবান্বিত করবে। এছাড়া, ঋগ্বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, সমুদ্রযাত্রার বহু বর্ণনা আছে।

মৌর্যযুগের পূর্ব থেকেই ভারতীয় জাহাজের বিস্তৃত গতিবিধি ছিল, রোম, মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও অন্যান্য দূর-প্রাচ্যের দেশে। রোমক রাজা অগস্টস্ ও নিরোর সময় ভারতীয় জাহাজের সমুদ্রযাত্রা চরমে উপনীত হয় এবং পেরিফাসের মতে ভারতীয় জাহাজ পূর্ব আফ্রিকা, পারস্য ও আরব দেশের বন্দরে সদাসর্বদা দেখা যেত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পরবর্তীকালে বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণ শুরু করে। ১৭৮০ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে কম করে ১৫টি জাহাজ কলকাতায় নির্মিত হয়। মোট ১৭,০০০ টনের। ১৮১১ সালে, ফরাসী এফ্ বাটাজার সাল্‌ভীনস্ তাঁর পুস্তক "লে হিন্দুস"এ ভারতীয় জাহাজ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"প্রাচীনকালে ভারতীয়রা জাহাজ নির্মাণে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিল। এখনকার হিন্দুরা এ বিষয় এখনও ইয়োরোপকে শেখাতে পারে। ভারতীয় জাহাজের নমুনা থেকে জাহাজ নির্মাণে যাবতীয় বিষয়ে আগ্রহী ইংরাজরা অনেক কিছু উন্নত ব্যবস্থা হিন্দুদের থেকে নিয়ে, নিজেদের জাহাজ নির্মাণে সাফল্যের সহিত কাজে লাগিয়েছে। ভারতীয় জাহাজ-গুলি সৌন্দর্যের সহিত ব্যবহারিক কার্য-কারিতার অপূর্ব সমন্বয় এবং সুদক্ষ হস্ত-শিল্প ও ধৈর্যের চরম নিদর্শন।" এই পটভূমিকা থেকেই আধুনিক ভারতীয় যুদ্ধ ও বাণিজ্য-নাবী গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, আমরা সে ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারিনি।

এখনকার ভারতীয় নৌবাহিনীর ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৬১৩ সাল থেকে। তখন "ইণ্ডিয়ান মেরিন" ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাহিনী এবং ১৭শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ও ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৭৩৫ সাল পর্যন্ত এই বাহিনীর সব জাহাজ সুরাটে নির্মিত হত, যদিও প্রধান কার্যালয় পূর্বেই বম্বেতে অপসারিত করা হয়। বম্বে শহরে এখনকার নৌবাহিনীর ডক্ ইয়ার্ড ওই কালেই স্থাপিত হয় এবং তখনই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডক্-ইয়ার্ড বলে পরিগণিত হয়। সেকালের বম্বেতে তৈরী সেগুন কাঠের জাহাজ, ইয়োরোপে নির্মিত জাহাজের তুলনায় অনেক উন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ইংলণ্ডের বাইরে, রয়্যাল নেভীর জন্য তখন একমাত্র বম্বেতেই জাহাজ তৈরী হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় "রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিন"এর সৈন্যবাহী জাহাজ পারস্য উপসাগর ও লোহিত সমুদ্রে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পর ১৯২৮ সালে এই বাহিনীকে পুরোপুরি একটি যুদ্ধ-বাহিনীতে পরিণত করা হয় এবং ছয় বছর বাদে ভারতের বিধান সভায় "নেভী ডিসিপ্লিন অ্যাক্ট" পাশ হয়। ইদানীং স্বাধীন ভারতের লোকসভায় এই আইনের পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে "রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভী" গঠিত হয় এবং এই নামেই স্বাধীনতা পর্যন্ত নৌবাহিনী পরিচিত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের ক্ষুদ্র নৌবাহিনী দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। ২০০০ অফিসার ও নাবিক নিয়ে গঠিত এই বাহিনী প্রায় ৩০,০০০ লোকের বাহিনীতে পরিণত হয়। আধুনিক কয়েকটি জাহাজও এই প্রথম সংগ্রহ করা হয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় নেভীর 'স্লুপ' উত্তর অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগর কনভয়ের কাজে অংশ গ্রহণ করে। স্লুপই তখন ভারতের সর্ববৃহৎ জাহাজ।

স্বাধীনতার পর নৌবাহিনীর আরও দ্রুত উন্নতিলাভ ঘটে। বেশ কয়েকটি বৃহৎ যুদ্ধজাহাজঃ ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট কেনা হয়। সবকটিই ব্রিটিশ নেভীর পরিত্যক্ত জাহাজ। তবুও এখন একে সত্যিকারের নৌবাহিনী বলা চলতে পারে। অদূরভবিষ্যতে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজও আসবে এবং এই কারণে নেভীর একটি বিমানবাহিনী অংশও গঠিত হয়েছে। এছাড়া আরও দুইটি জাহাজ তৈলবাহী

এন এস "শক্তি" ও মালবাহী াণী"ও ভারতীয় নৌবাহিনীতে হীত হয়েছে।

ৌবাহিনীর ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ ছ বলে সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হলেও, সে কিন্তু ভারতীয়করণ কিছুই হয়নি সত্যি কথা বলতে কি, এখনও ব্রিটিশ ার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্বন কপি ঃ ঠিক হবে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সারের স্থলে কৃষ্ণাঙ্গ অফিসার নিয়োগ কই ভারতীয়করণ বলা চলে না। ড়া এইসব কৃষ্ণাঙ্গ অফিসাররাও ায়-দীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে, কথা- ায়, সব কিছুতেই এখনও নিতান্ত রতীয়। এখনও নেভীর সব কিছুই ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটির অনুকরণে। তীয় অফিসাররা ভারতীয় ভাষাও শীদের অনুকরণে এখনও বলেন, দর মাতৃভাষার অবমাননা করে। নেভীর সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকাবলী, পুস্ত ৎ বুক, বিভিন্ন ম্যানুয়েল, ইংরাজ নেভী ক আসে, সে দেশেই ছাপান হয়। পুস্তকে ও লেখা থাকে যে, এগুলি "হার জিস্টির" সম্পত্তি এবং ব্রিটিশ নেভীর ফসার ও নাবিক ছাড়া অন্যদের হাতে না যায়। ব্রিটিশ নেভীর প্রথা ুযায়ী এখনও কোয়ার্টার ডেকে যাবার য় প্রত্যেকবার ভারতীয় নাবিকদের সেলাম ্তে হয়। লর্ড নেলসন কোয়ার্টার ক মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁকে ান দেবার জন্যই ইংরেজদের এই প্রথা। ন্তু স্বাধীন ভারতের নাবিকের নিকট ʼ নেলসনকে এইভাবে সম্মান জানান ৫৮ সালে একান্ত অবান্তর। মহীশূর হাজের বিভিন্ন স্থলে টাঙান সব বিজ্ঞপ্তি নও সেই পুরানো ব্রিটিশ আমলের দর্শ ঘোষণা করছে। একশো বছরের গেকার, ১৮৫৭ সালের ইংরাজ নেভীর ম্রাজ্যবাদ-পরিকল্পিত অত্যন্ত উদ্ভট, নুবিধাজনক, কর্মক্ষেত্রে অনুপযোগী, ার্যকরী শিশু ভোলানর পোশাকের ানিফর্ম এখনও ভারতীয় নাবিকদের রতে বাধ্য করা হয়। আমরা এখনও দশের উপযোগী করে, ভারতীয় নাবিক- র জন্য কোন পোশাকও পরিকল্পনা করতে রিনি। বাইরে থেকে অনেকের দেখতে ল লাগলেও, নাবিকরা জানে যে, এই াশাকের কি বিষম বিড়ম্বনা। তাছাড়া ফিসার ও নাবিকদের পোশাকের এই রূপ পার্থক্য নাবিকদের মনের মধ্যে নিয়ে াসে "ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স"। াবাহিনীর অফিসাররা অবসর সময়ে সরকারী পোশাকে ঘোরাফেরা করতে ারে, কিন্তু সেস্থলে নাবিকরা সর্বদা ভীর' ইউনিফর্ম প'রতে বাধ্য। ওদেরকে ব সময় বোঝান হয় যে, 'নিজের ইউনিফর্মে গর্ববোধ কর', অথচ অফিসারদের ক্ষেত্রে এই গর্ববোধের কেন এই পার্থক্য, বোঝা দায়। নেভীতে অফিসার ও নাবিকদের মধ্যে যে সামন্ততান্ত্রিক পার্থক্য এখনও বিদ্যমান, তা বাইরের লোকে জানতে পারে না। অফিসাররা যেন বিধাতার নিজের মানুষ। সেইজন্যই নাবিকরা, নেভীর ভাষায় যাদের "রেটিং" বা "মেন্" বলা হয়, তাদের মনের মধ্যে সর্বদা অসন্তোষ ও ক্ষোভ। এরা মানুষ বলে যেন গণ্য নয়। নৌবাহিনীর জাহাজের অস্বাভাবিক পরিবেশে না আছে এদের ভাল থাকা-খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা, না আছে কিছু। এতে নাবিকদের "মরাল্" নষ্ট করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ থেকে অনেক বিপদেরও আশংকা আছে।

নেভীতে একটি নির্দেশ আছে, "নো উইমেন অন্ বোর্ড"। কিন্তু জাহাজ যখন বন্দরে লাগে, তখন অফিসাররা হামেশাই "পার্টি থ্রো" করেন, ককটেল ইত্যাদির। স্থল থেকে মহিলাদেরও তারা জাহাজে আনতে পারে। কোয়ার্টার ডেকে, অফিসারদের ওয়ার্ড রুমে চলে নাচ, গান, খাওয়াদাওয়া ও মদের ফোয়ারা। একেবারে পাশ্চাত্যের অনুকরণে, ভারতীয় কোন কিছুর নাম-গন্ধও এতে নেই। নাবিকরা দূরে থেকে দেখে অফিসারদের অবসর বিনোদনের লীলা। এর পরিবর্তে ওদের জন্য বাধ্যতামূলক অবসর বিনোদনের আয়োজন করা হয় জাহাজের লাউড স্পীকারে বম্বের ফিল্মী দুনিয়ার গানা চালিয়ে। ভাল লাগুক বা না লাগুক, তা শুনতেই হবে ওদের। কিম্বা স্থলবর্তী নেভীর ব্যারাকে ওদের জন্য ব্যবস্থা হয় "জিন্দা ডান্‌স"-এর, ভাড়া করা নাচিয়ে মেয়েদের নিয়ে এসে নিম্নশ্রেণীর নাচ দেখিয়ে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে নেভীর অফিসারদের তুলনায় নাবিকদের সর্বক্ষেত্রে পার্থক্য এত ঘোরতর ও বিরাট এবং অনেক সময় নাবিকদের পক্ষে তা এত অসম্মানজনক যে, স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের যুগে এ ধরনের ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। মাইনে, খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সর্বক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এতে নাবিকরা ক্রমে ক্রমেই অসম্মানিত বোধ করে নৌবাহিনীর কাজে বিমুখ হয়ে উঠেছে। একবার ছাড়া পেলে যেন বাঁচে। এসবের উপর খাঁড়ার ঘা, ডিসিপ্লিনের দোহাই পেড়ে অনেক অফিসারদের দুর্ব্যবহার। অনেকে বাইরে থেকে নেভী সম্বন্ধে রোমাণ্টিক আইডিয়া নিয়ে যোগ দেয় নাবিক হয়ে। কিন্তু পরে বুঝতে পারে যে, "বাইরে চাকিম্ চিকিম্ ভিতরে খড়ের আঁটি।" নিম্নলিখিত ছড়া থেকেই, যা নেভীতে এককালে বহুল প্রচলিত ছিল, নাবিকদের মনোভাব বোঝা যাবে।

"A sailor is a jolly sport,
He has a wife at every port,
That is what the foolish say,
(It is impossible quite absurd,
unless)
He draws an Admiral's pay.

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে "মহীশূর" জাহাজ চীন-জাপান শুভেচ্ছা ভ্রমণে গিয়েছিল। চীনের একটি বন্দরে অবস্থানকালে মহীশূর জাহাজের যাবতীয় অফিসার ও নাবিকদের

অভ্যর্থনা জানানর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চীন সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর জাহাজের অফিসার ও নাবিক সকলকেই নিমন্ত্রণ করে। ভারতীয় জাহাজের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং চীন সরকারকে জানান যে, অফিসার ও নাবিকদের পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করতে। কারণ ভারতীয় প্রথায় অফিসার ও নাবিক একত্র এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নাকি নিয়মবিরুদ্ধ। এর উত্তরে চীন সরকার জানান যে, তাঁরা ও ধরনের পার্থক্য মানেন না এবং তাঁরা তা করতে অক্ষম।

এইসব বিভিন্ন কারণে, নৌবাহিনীর সুপরিচালনার জন্য অফিসার ও নাবিকদের মধ্যে যে একতা, যে সম্ভাবের প্রয়োজন, ভারতীয় নেভীতে আজ তার অভাব লক্ষ্য করলাম। নাবিকদের মনের মধ্যে চাপা অসন্তোষের আগুন হঠাৎ যে ভবিষ্যতে দাবানলে পরিণত হবে না, তা কে জানে! অথচ এরাই স্বাধীন ভারতের বিস্তৃত সমুদ্র-তটের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রাণস্বরূপ।

















# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

৭

ভাবী বর তার ভারি শরীর নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলো। প্রথমটায় চিনতে পারেন নি জ্যেঠাইমা। তারপরেই খুশী হয়ে উঠলেন, 'ওমা, গজু যে। কী ভাগ্যি। তবু পিসিকে মনে পড়লো এতোদিনে? কুর্মিটোলা তো ছ' মাস যাবত বদলী হ'য়ে এসেছিস বাবা, একটা খবরও তো দিতে হয়? না হয় একদিন আসতিই নিজে থেকে।'

হে হে ক'রে হাসলো গজেন, হাত থেকে মর্তমান কলার কাঁদি নামিয়ে বললো, 'এইতো এলাম। ফুলের গন্ধেই ভ্রমর আসে। হে হে হে।'

জবাব শুনে একটু অপ্রতিভ হ'লেন জ্যেঠাইমা, তক্ষুনি সেকথা ছেড়ে তিনি কলার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হ'লেন, 'ওরে বাবা, কত বড়ো কলা। এমন কলা পেলি কোথায়?'

'পেলাম। বুঝলেন, এ হচ্ছে ঠ্যালার নাম বাবাজী। এসব হ'লো গিয়ে ভেটের জিনিস। রুলের গুঁতো আর বুটের ঠোক্করে সব বেরিয়ে এসেছে। রসগোল্লাগুলো দেখুন না, অত বড়ো রসগোল্লাই কি পাবেন কোনোখানে? অথচ একটা পয়সা লাগেনি।'

'লাগেনি? বলিস কী?'

'এরই নাম পুলিস। বুঝলেন? তবু তো আজকাল মানতে চায় না। আগে যখন—'

সুলেখাও সন্ধ্যের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে অস্থির হয়ে জ্যেঠাইমা বললেন, 'এ কি! তুই এসেছিস কেন? যা, ভেতরে যা।'

গজেনও তাকালো সেদিকে, মুচকি হেসে চোখ টিপে বললো, 'এই বুঝি?'

বলাই বাহুল্য, ঐ ক্ষণিক দর্শনেই মোহিত হয়ে গেল গজেন। মাথা দুলিয়ে বললো, 'বাঃ, বেড়ে মাল। একেবারে কাঁচ, নতুন।' জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আয়, আয়, ঘরে আয়। ওসব পরে হবে।' কিন্তু জ্যাঠাইমা বললে কী হবে। সেই প্রসঙ্গ কী আর সে ছাড়তে চায়? সেই বিকেলেই বেরিয়ে গিয়ে মদন সাহার দোকান থেকে কানের মতো পাতলা এক সোনার হার কিনে নিয়ে এলো। 'বুঝলেন হেম পিসিমা—' গম্ভীরভাবে বললো, 'বৃথা কাল তো অনেক কাটালাম, আর নয়। আমি আজই পাকা দেখে ফেলি, দিন সাতেকের মধ্যে একটা তারিখ ঠিক ক'রে বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেললেই হবে—'

'আজই পাকা দেখবি কিরে? আর তুই পাকা দেখবি কেন, দেখবে তোর মা।'

'আরে বাপু, ঐ বুড়ির নানাখানা, আজ কান ব্যথা, কাল নাক ব্যথা, পর্শু ঠ্যাং ব্যথা —ওসব ছেড়ে দাও। এই দ্যাখো, মালাটি কিনেই এনেছি, এখন টুক্ ক'রে গলায় পরিয়ে দেয়া—'

জ্যাঠাইমা তবু ইতস্তত করেন দেখে মুচকি হাসলো সে। 'জানি জানি, ঘুষ চাই কিছু এই তো? তাতে গজেন নন্দী পিছ পা নয়। পছন্দ হ'লে তার জন্যে সে সব কবুল করতে রাজি।'

দেখি, দেখছি ব'লে মা'র কাছে এলেন জ্যাঠাইমা, 'ছেলের তো আর সবুর সইছে না রে—' আড়চোখে মা'র মুখের দিকে তাকালেন তিনি। মা চোখ নিচু ক'রে চুপ।

'আবার একটা সোনার হার নিয়ে এসেছে। যেমন ভারি, তেমনি দামী। এবার আর তোর ভাবনা থাকবে না। বড়মানুষ জামাই পেয়ে জা ভাসুরকে চিনবিই না বোধ হয় শেষে।' বাবু ছোটুনকে আদর করলেন, 'কী রে, সন্ধ্যা লাগতেই পড়তে বসেছিস কী? যা, নতুন জামাইয়ের সঙ্গে ভাব কর গিয়ে।'

মা চুপ।

'কথা বলছিস্ না যে?'

'কী বলবো?'

'মত দিবি তো একটা? গজেন তো এ মাসেই তারিখ ফেলতে চায়। কী করবি, এতো বড়ো একটা দায়িত্বের চাকরি করে, রোজ রোজ তো আর ছুটি পাবে না। তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারলেই ভালো।'

'আপনারা যা ভালো বোঝেন, তাই হবে।' মা'র স্তিমিত গলা ভালো লাগলো না জ্যাঠাইমার, বললেন, 'একটু মন খুলে কথা ক বাপু, তোদের এই চুপ চুপ স্বভাব আমার মোটেও ভালো লাগে না। না হয়, পাকা দেখা আজ থাক। যা হয় কালই হবে। কী বলিস?'

আসলে এতো ভালোমানুষী জ্যাঠাইমার মার জন্য ছিলো না, ছিলো সুলেখার জন্য। সেই দুরন্ত মেয়ে যে কী ভাবে নেবে, কী করবে, সেটা ভেবেই বিচলিত বোধ করছিলেন তিনি। তাই এতো নরম। নইলে মাকে তিনি কী পরোয়া করেন?

কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে সেই সংশয় ভোগ করতে হলো না। তাঁর গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রই তাঁকে মুক্তি দিল।

কখন কোন্ ফাঁকে সুলেখাকে একটু একা পাবে গজেন এই তাকে তাকেই ছিলো। জ্যাঠাইমার দেরি তার ভালো লাগছিলো না। ঘরে ঘরে, যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে

ঘুরতে ঘুরতে সে ছাদে এসে পেয়ে গেল সুলেখাকে। আধো অন্ধকারে চিলকুঠির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে সারা বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে সে বসে ছিলো চুপচাপ। পিছন থেকে এগিয়ে এসে সোনার হারটা নিঃশব্দেই পরিয়ে দিচ্ছিলো, সুলেখা চমকে মুখ ফেরাতেই হাসলো সে, 'আঃ, টের পেয়ে গেলে? ভাবছিলাম এই চাঁদনি রাতে, এই ছাদের উপরে, নিরিবিলিতে আজ তোমার আমার—'

বিদ্যুৎ বেগে সুলেখা হাতের সামনে যা পেলো তাই ছুঁড়ে মারলো, তারপর এক দৌড়ে নেমে এলো নিচে। কিন্তু নিচে এসেই মনে হ'লো, লোকটাকে আরো কয়েক ঘা মেরে আসা উচিত ছিলো, হিপ্পোটার অত বড়ো শরীরে ঐ সামান্য এক থান ইঁটের আঘাত কতটুকু! আর ঠিক ঠাক লেগেছে কিনা তাই বা কে জানে। আবার সিঁড়িতে পা দিয়েছিলো সে, এর মধ্যেই গজেনের ভয়ার্ত মোটা গলার বীভৎস চিৎকারে সারা বাড়ি কম্পিত হয়ে উঠলো। দুদ্দার যে যেখানে ছিলো সেখান থেকে ছুটলো ছাদের দিকে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে গজেন, মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে, জামার বোতাম খুলে বুকের এক ঝোপ কৃষ্ণবর্ণ লোম খাড়া হয়ে উঠছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। সারা শরীরটাই তার লোমে ছাওয়া, হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, ভাল্লুকের মতো। পায়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, তা-ও ভাল্লুকের মতো। বড়ো বড়ো লোম ভেদ ক'রে মনুষ্য মাংস আর বোঝা যাচ্ছে না। আধো অন্ধকার। সহসা একটা জন্তু বলে ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক।

তারি ইঁট গায়ে না লেগে পড়েছে পায়ের উপর। জুতো খুলে পা টিপে টিপে ভাবী বৌকে সে কতো ভালোবেসে মালা পরাতে গিয়েছিলো, জুতো থাকলে এই জখমটা হতে পারতো না। তিনটে আঙুল এক সঙ্গে থেতলে গেছে। জল এলো, পাখা এলো, তুলো ব্যান্ডেজ, এমন কি রাস্তার মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে একজন কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত এসে হাজির। খানিক বাদে সব ঠেলে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো গজেন, অকথ্য ভাষায় গালাগালি ক'রে নিবারণ তালুকদারের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগলো। তারপর গাড়ি আনিয়ে মোটঘাট বেঁধে সেই দিনই পলায়ন।

এরপরে একটা কুৎসিত চিঠি এলো কুমারটোলা থানা থেকে। স্বয়ং গজেনই অবিশ্যি তার লেখক। জ্যাঠাইমাকে লিখেছে, 'আপনাদের এই অপমানের প্রতিশোধ আমি অবশ্যই লইবো। যদি আমি বাপের ব্যাটা হই, তাহা হইলে ঐ অসচ্চরিত্র মেয়েকে একদিন না একদিন বেইজ্জত করিয়া এই অপমানের জ্বালা জুড়াইব। আমার নাম গজেন্দ্রনাথ নন্দী। আমি মেদিনীপুরের লবণ আইনের পুলিস, আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সেই সময়ের যতো অত্যাচারের কাহিনী খবরের কাগজে আপনারা পড়িয়া শিহরিত হইয়াছেন তাহার নেতা কে! এই আমি। আমি ঘরের মেয়ে-ছেলে টানিয়া বাহির করিয়াছি, আগুন জ্বালাইয়াছি, স্বদেশী গুণ্ডাগুলোকে গরুর মতো লাঠি পিটা করিয়াছি, সাহেবরা তখন নোমতিবাবু বলিতে অজ্ঞান। সেখানকার যতো দমন সব এই আমি। এই গজেন নন্দী। আর আমাকেই কিনা থান ইঁট ছুঁড়িয়া জখম করা। প্রতিশোধ আমি লইবই লইব।'

জ্যাঠাইমা আগাগোড়াই এই ধরনের একটা সন্দেহ করছিলেন, আগাগোড়াই তাঁর মনে হচ্ছিলো, এই ঘটনাটি ঘটানোর মূলে নিশ্চয়ই সুলেখা আছে। চিঠি পেয়ে পরিষ্কার হ'লো ব্যাপারটা। বলাই বাহুল্য, তা নিয়ে অনেক অশান্তি, অনেক নির্যাতন, সবই হ'লো, কিন্তু বিয়ের চেষ্টা আর হ'লো না। সুলেখা বাঁচলো।

তারপরেই দাঙ্গা। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। হাওয়াটা অনেকদিন ধরেই ঘোলাটে হয়ে ওঠার চেষ্টায় ছিলো, এইবার চেহারা নিল। দেশময় স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঝাপটা চলেছে তখন, তারই দাপটে ইংরেজ প্রভুরা ছিন্ন ভিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত। একদিকে বিপ্লবীদের গোপন ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। এই দুইয়ের চাপে দিশাহারা ইংরেজ বণিক। শেষে আত্মরক্ষার এই অপূর্ব সন্ধানটি খুঁজে পেয়ে নিশ্বাস নিল। চিরদিন যারা সুখে দুঃখে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, বিদ্বেষের বিষ ছড়ালো সেখানে। আগুন

লাগালো ঘরে ঘরে। পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেলো। কলকাতা থেকে সুবিধাবাদী ইংরেজী কাগজ কালো কালো অক্ষরের বাহনে সেই গরম বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে ইন্ধন যোগাতে লাগলো। এতোদিন যে মুসলমান সমাজকে ইংরেজরা অবহেলায় অত্যাচারে পায়ের তলার পোকার মতো পিষে মেরেছে, অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছে, হাসিমুখে সাদর সম্ভাষণ জানালো তাদের, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কূট চক্রান্তে। শিক্ষিত সমাজ যোগ দিলো না, কিন্তু সংখ্যায় তারা ক'জন?

ঘরে ঘরে গালে হাত দিয়ে বসলো সব। নওয়াবগঞ্জ শহরে হিন্দু-মুসলমান গলায় গলায়। সেখানকার মুসলমানরা অনেক অগ্রসর, পর্দাপ্রথা প্রায় নেই বললেই চলে। ছেলেমেয়েরা সমানে লেখাপড়া শেখে, এ ওর বাড়ি যায়, সে তার বাড়ি যায়। তারা সব ফুটতে লাগলো রাগের আগুনে। সেখানে হিন্দু রইলো না মুসলমান রইলো না, রইলো কতকগুলো এক দেশের মানুষ। যাদের চেহারা এক, চলন এক, অভ্যাস একরকম, অন্তঃকরণের স্রোত একই গতিতে বয়ে যায়। যতোদিন সুলতান সাহেবের বাপ বুড়ো নওয়াব আখতার আমেদ সাহেব বেঁচে রইলেন, ততোদিন তেমন দানা বাঁধতে পারলো না এই ঝগড়া। একবার দু'বার টুকটাক একটু আধটু হলো বটে, আড়ালে আবডালে, পাড়ায় বেপাড়ায় খুন খারাবিও হ'লো দু'চারটা; কিন্তু দেখতে দেখতে আবার মিটে গেল। নওয়াব সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট ক'রে নবাবগঞ্জের গণ্যমান্যরা একটা পিস্ কমিটি তৈরী করলেন, আগুন নিভে ঠাণ্ডা পানি হয়ে গেলো। কিন্তু আকতার আমেদের মৃত্যুর পরেই উল্টে গেল হাওয়া। সুলতান আমেদ নওয়াব হয়েই তাণ্ডব আরম্ভ করলো। ইংরেজদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা, ইংরেজদের সঙ্গেই তার খানাপিনা, ইংরেজরাই তার বন্ধু সোদর সব। কয়েক বছর তাদের দেশে বাস ক'রে সবে ফিরেছে তখন, দেখতে দেখতে শহর গরম হয়ে উঠলো।

সুলেখা ততোদিন স্কুল ছেড়ে কলেজের ছাত্রী, লেখাপড়ায় সর্বাগ্রগণ্য। স্বাস্থ্য ভালো, দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ, গান করে, অভিনয় করে, নওয়াবগঞ্জ ভিক্টোরিয়া গার্লস কলেজের একটা বিশেষ মেয়ে সে। প্রফেসরদের বিশেষ আদরের পাত্রী।

এদিকে রাজনীতি নিয়েও কম মাথা ঘামাচ্ছে না। নবাবগঞ্জে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সেনদার ডান হাত বাঁ হাত। আত্মরক্ষা সমিতির শেষ সদস্য। সেখানে সে লাঠিখেলা শিখেছে, ছোরাখেলা শিখেছে, অবলীলাক্রমে রিভলবার ছুঁড়তে শিখেছে। সেন দা আগুন বলে ডাকেন। মাঝে মাঝে গোপন বৈঠক বসে সেখানে, বয়স্করা সুলেখার কথাও মন দিয়ে শোনেন, তার সামনে নিগূঢ়তম তথ্যও গোপন করেন না। তাঁরা তাকে পদমর্যাদায় নিজেদের সমান জায়গা দিয়েছেন। শহরের যতো প্রতিবাদ সভা, স্ট্রাইক, মিছিল সবের পুরোভাগে এই মেয়ে, এই সুলেখা। কবে, কেমন ক'রে গিয়ে ঐ দলে সে ভিড়েছিল সেটা জরুরী নয়, পূর্ব বাংলার যে কোনো শহরে ঘরে ঘরে ছাত্রছাত্রীরা তখন এই পথে। আসল যেটা সেটা হচ্ছে সুলেখার দুর্জয় সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। শহরে এরই মধ্যে তার নাম ছড়াচ্ছে। সভা হ'লে যে আগের মতো শুধু গানই গায় তা নয়, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে চঞ্চল করে, পার্টির চাঁদা তুলতে কেউ তার মতো ওস্তাদ নয়। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে কাজকর্ম করতেও সে পয়লা নম্বর। পার্টির মেম্বর বাড়ানোটাও একটা মস্ত কাজ। সেই কাজটা সে কলেজের মধ্যে ভালোভাবেই সম্পন্ন করে। সহপাঠিনীরা তাকে ঈর্ষা যতোটা করে, শ্রদ্ধা করে তার চেয়ে বেশী, কাজেই সেখানে তার যথেষ্ট কর্তৃত্ব, আর ছোটোরা তো সুলেখাদি বলতে পাগল।

নবাবগঞ্জে মেয়েদের কলেজটা দেখবার মতো। চারদিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি, ভেতরে প্রায় তিন চার বিঘা জমির মধ্যে ফুলের বাগান, ফলের বাগান, কৃত্রিম পাহাড়, ঝরনা কতো যে কিছু তার হিসেব নেই। নবাবী আমলে কোন আমীর ওমরাওয়ের বাড়ি ছিলো কে জানে, কোম্পানীর আমলে এক সাহেব বাড়িটা কিনে বাস করছিলেন, তারপর হাত ঘুরে ঘুরে মেয়েদের কলেজে পরিণত হয়েছে। নদীর ধার ঘেঁষে এই বাড়ি। বর্ষাকালে বুড়িগঙ্গা যখন ফুলে ফেঁপে এতো বড়ো হয়ে ওঠে, দেয়াল ছুঁয়ে থাকে জল। ভেতর দিয়ে ঢাকা সিঁড়ি আছে নদীতে নামবার, তীরে বেড়াবার। সে সিঁড়ির দরজা এখন বন্ধ, সিঁড়ি ভাঙা। তারই এক কোণে একটা বুড়ো বট তার শত শত ঝুরি ঝুলিয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা বলে সাধু-বাবা। বটের তলায় বিরাট বাঁধানো চাতাল, মাটি থেকে একটু উঁচু। বেশ একটি ছোট-খাটো সভা জমতে পারে, গোল টেবিল বৈঠক বসতে পারে, গরমকালে পাটি বিছিয়ে শুয়ে থাকলে নদীর হাওয়ায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সুলেখা সেই বুড়ো বটতলায় আসর জমায়। ফাঁক-তাক বুঝে জনকয়েক মেয়ে নিয়ে চলে আসে সেখানে, একেবারে নিরিবিলিতে, নির্জনে। বটের তলায় এখানে ছায়া-গভীর, সেখানে হালকা, এখানে সূর্য, সেখানে অন্ধকার। সেইসব ছায়া ছায়া, ঝোপ ঝোপ ঝুরি ঝোলা আড়ালটুকু বেছে নিয়ে গাছটায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে 'শোনো মেয়েরা'

সুলেখার উত্তেজিত গলার ঐটুকু শুনেই মেয়েরা চকিত হয়ে তাকায়, গুটি গুটি

ভিড় জমে ওঠে, আর তাদের প্রত্যেকের মুখের উপর চোখ ফেলে ফেলে সুলেখা বক্তৃতা দেয়—'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কী ভীষণ দিন এগিয়ে আসছে সামনে। কী ভয়ানক কালস্রোতে ভেসে চলেছি আমরা। আমরা তলিয়ে যেতে বসেছি, দম বন্ধ হ'য়ে ডুবে মরতে বসেছি, এ সময়েও কি তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে?' জনতার মধ্যে গুন গুন ওঠে, একটু থেমে সুলেখা আবার বলে, 'বলো' তোমরাই বলো, আমাদের কি এর বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই? জালিয়ান-ওয়ালা বাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস কি খুব দূরের ঘটনা? যতীন দাশের অনশনে প্রাণ ত্যাগ কি তোমাদের প্রাণে এতোটুকু বেদনা ঘনিয়ে আনে নি? মহাত্মাজীর দণ্ডি-যাত্রার কথা তোমরা জান, লবণ আইনের অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে তা-ও জানো না। এই দ্যাখো তার ছবি—' বুকের ভেতর থেকে লুকোনো নিষিদ্ধ বই বার ক'রে মেয়েদের চোখের সামনে সে মেলে ধরে—দ্যাখো, কী ভাবে গাছে বেঁধে চাবুক মারছে, চেয়ে দ্যাখো সন্তানবতী মহিলাকে পদাঘাত ক'রে কী ভাবে তার সন্তানকে অকালে জঠর থেকে বার ক'রে ফেলেছে—গরম তেল ঢেলে দিচ্ছে গায়ে, চামড়া ছিঁড়ে

নিচ্ছে—' ভয়ার্ত শব্দ ক'রে চোখ বোজে মেয়েরা, সুলেখা আবার বইটা লুকিয়ে ফেলে বলে, 'আরো যে কতো জঘন্য অত্যাচারে বিধ্বস্ত করেছে পাষণ্ডেরা তার কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু কেন এই অত্যাচার। তার কারণ আমরা তাদের দাসত্বের গ্লানি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমরা আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। এই আমাদের অপরাধ। ইংরেজরা মনে করে আমরা বুঝি চিরদিনই তাদের ভৃত্য হ'য়ে কাল কাটাবো, আমাদের মান থাকবে না, সম্মান থাকবে না, আমরা হবো কলের পুতুল। তাদের মাথা নাড়াতেই আমাদের মাথা নাড়া। তারা এই চায়। কিন্তু মানুষ তা পারে না। অত্যাচার ক'রে চিরদিন দাবিয়ে রাখা আর তাদের সম্ভব হচ্ছে না। আমাদেরই দেশে আমাদের আর রেলগাড়ির ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে বুটের ঠোক্করে ফেলে দিতে পারছে না। ব্লাডি, নিগার, সোয়াইন এ সব গালি গালাজ শুনতে আর আমরা রাজী নই।

এই অবস্থা থেকে তোমরা কি মুক্তি চাও না? বলো চাও কি না।' 'চাই' একসঙ্গে অনেকগুলো গলা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যায়। 'তবে এসো' হাত বাড়িয়ে দেয় সুলেখা, 'আজ থেকেই আমরা আমাদের মিলিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাই, দেখি কে আমাদের ঠেকাতে পারে। যদি সারা দেশ আজ এমনি সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে চাই বলে দাঁড়াতে পারতো তা হ'লে এই শৃঙ্খলিত ভারত একদিনেই মুক্তি পেতে পারতো। আমরা ছোট্ট হ'তে পারি কিন্তু ছোটো নই, এই আমরাই হয়তো একদিন সারা দেশ এক ক'রে ফেলতে পারবো। শুধু তোমরা জেনে রাখো, সকল কলেজের গণ্ডিঘেরা এই মসৃণ জীবনই আমাদের সব নয়, স্কুল কলেজ আর নিজেদের বাড়িটুকুই আমাদের পৃথিবী নয়। আমাদের মনুষ্যত্ব আছে, আমাদের বলবার কথা আছে, মর্যাদা পাবার অধিকার আছে। স্বীকার করি আমরা বয়সে ছোটো বলে কিছু অসুবিধে আছে এ সব কাজে কিন্তু তা বলে এ কথা ভেবো না, বয়স বাড়াটাই বড়ো হওয়া নয়। বয়স বাড়ে নিজে নিজে। তার জন্য কোনো চেষ্টার দরকার হয় না। কিন্তু মন? মনের প্রসারের জন্য চাই সাধনা। মনকে বড়ো করতে হ'লে চেষ্টা করতে হয়, একাগ্র হ'তে হয়। আর মন বড়ো হ'লেই আমরা ভাবতে পারি, বুঝতে পারি, কাজে লাগতে পারি। তারপর জোরগলায় বলতে পারি আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, জাতের যূপকাষ্ঠে বলির পাঁঠা নই। আমরা মেয়েও নই, পুরুষও নই। সর্বপ্রথম আমরা মানুষ। বুকের মধ্যে আমরা আত্মাকে বহন করি। মনুষ্যত্বটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সম্পদ। মানুষ হিসেবে আমরা তবে কী চাই? চাই বাঁচতে। সে বাঁচা পশুর বাঁচা নয়। মানুষেরই বাঁচা। আমরা জানি, মানুষে শুধু পেট সর্বস্ব নয়, মানুষ শুধু খেয়েই বাঁচে না, গরু ঘোড়ার মতো জাবর আর দানা-পানিতেই কর্ম শেষ হয় না তার, মানুষের মনের ক্ষুধাটাই বড়ো ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা কী? স্বাধীনতা।'

এই স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উঁচু কিছু থাকে সেখানে নয়তো যে কোনো একজন মেয়ের পিঠের উপরেই সুলেখা প্রচণ্ড ঘুষি মারে একটি। তারপরই গানের গলা ঝিন ঝিন, ক'রে ওঠে, 'বলো, প্রতিজ্ঞা করো, আমরা স্বাধীনতা চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে সরু গলার মিলিত চিৎকার ওঠে 'আমরা স্বাধীনতা চাই।'

সুলেখা বুক ফুলিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে উত্তেজিত মুখে আবার বলে 'আমরা ইংরেজের অধীনতা মানবো না।'

'আমরা ইংরেজের অধীনতা মানবো না।'

'হয় লড়েঙ্গে নয় মরেঙ্গে।'

'হয় লড়েঙ্গে, নয় মরেঙ্গে।'

'জাতের নামে বজ্জাতি আর চলবে না, চলবে না।'

'জাতের নামে বজ্জাতি আর চলবে না, চলবে না।'

'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।'

'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।'

এরপর কুইট ইণ্ডিয়া, মহাত্মাজীকী জয় ইত্যাদি বলে সভা ভঙ্গ হ'তো।

কিন্তু ঠিক আজকাল, ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী হবার পর থেকে সে ধরনের বক্তৃতা সে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সুলেখা বক্তৃতার বদলে চুপি চুপি দলে টানে। চারদিকে তাকিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় হ'য়ে ফিস ফিস করে, বুঝলি, এই যে পুলিস কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট, দুই লাল বাঁদরের বাচ্চা সাগর পারের শয়তান, এ দুটোই হ'লো এই শহরের সর্বনাশ। ঘরে ঘরে পুলিস ঢুকিয়ে সার্চ করবার নামে ওরা আমাদের যে অত্যাচারটা করায় তার প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। দিনেশদাকে সেদিন মারতে মারতে অজ্ঞান ক'রে ফেললো, দীনেশদার মাকে মশারির ভেতর থেকে চুল ধ'রে টেনে বার করে বলে যে, বলাইপুরের ডাকাতির ব্যাঙ্ক লুটের দলে দীনেশ ছিলো, তোমার বাড়িতেই তাদের গোপন ষড়যন্ত্রের আড্ডা বসতো, নাম বলো কে কে থাকতো সেখানে। উনি যতো বলেন, সেই তারিখে দীনেশ জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলো, তার হুঁশ পর্যন্ত ছিলো না, ততই জেদ বাড়ে তাদের। আর কেউ না জানুক আমি তো সব জানি। দীনেশদা বিপ্লবী নন। বিপ্লবে তাঁর বিশ্বাস নেই, উনি একান্তভাবেই গান্ধিবাদী। এ সব ডাকাতি ক'রে টাকা লুট করা বা খুন করা এসব তার দ্বারা হবে না। এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে তার রীতিমতো তর্ক হয়। উনি প্রায় দল ছেড়ে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ একটা ভুল সন্দেহে কী অমানুষিক অত্যাচার।

'সোয়াইন।' বন্ধুরা অস্ফুট উত্তেজনায় নিঃশ্বাস গাঢ় করে। 'কিন্তু আসলে ঘর শত্রুর বিভীষণটি কে জানিস?' চাপা গলায় যেন মন্ত্র দেয় সুলেখা 'মওয়াষ সুলতান আমেদ। স্কাউণ্ড্রেল। শয়তান।' বলতে বলতে দুই চোখে তার ফুলকি ছোটে, দাঁতে দাঁত আটকে যায়' 'লোকটা যে কী জঘন্য, কী পিশাচ, কল্পনা করতে পারবি না। যদি দ্বীপান্তরে যেতে হয়, ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, তবু একদিন আমি ওকে দেখে নেবো। আমি হত্যা করবো ওকে।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ। তারপর ঐ দুটো শয়তান। ম্যাল্কম আর হেক্টর। কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বড়ো সাধ এই তিনটি লোকের বুকের রক্ত দেখে আমি মরি।'

'রক্ত।' মেয়েদের চোখের তারা ঠিকরে পড়ে।

'সেদিন আসল শয়তানটাকে পেয়েছিলাম হাতের কাছে অ্যালবার্ট হ'লের মিটিংয়ে, হঠাৎ দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি আসছিলাম, চোখে চোখ পড়তে বুকের ভেতরটা আমার নেচে উঠলো। দৌড়ে সেনদার কাছে গেলাম, বললাম, পিস্তল দাও সুলতানকে পেয়েছি খুন করবো। সেনদা চোখ ইশারায় চুপ করতে বললেন, বললেন এখনো সময় হয়নি। অন্তত আজ নয়। হতাশ হয়ে চুম্বকের নেশার মতো আবার আমি দরজার ধারে গেলাম, দেখি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। টকটকে চেহারা, কালো কুচকুচে সিলকের আচকান পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক নবাবের মতোই, কী আস্পর্ধা, দূর থেকে দু'হাত তুলে নমস্কার করলো। ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম।'

এ সব কথা সুলেখার শুধু কথাই নয়, তার জন্য সত্যি সে উৎসুক, উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পার্টি তাকে এখনো ততো বড়ো কাজের ভার দিতে নারাজ। মিছিল, মিটিং ইত্যাদিতেই তার কর্মকুশলতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিজেও সে একটি খুদে দলের কর্তা হ'য়েছে। সেটা তার ব্যক্তিগত। একটি লাঠি খেলা ছোরা খেলার আখরা করেছে বাড়ির ছাদে। পাড়ার মেয়ে বৌরা আসে সেখানে। সুলেখা তাদের শক্তি যোগায়, সাহস জোগায়। মাত্র দশটি সভ্য সেখানে কিন্তু সুলেখা বলে এই দশটিই একদিন দশ সহস্রকে দীক্ষিত করতে পারবে।

(ক্রমশ)



অলকার স্বপ্ন
ক্লাস বসবার আগেই সেদিন ক্লাস সেভেনের মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। অলকা নাকি স্বপ্ন দেখেছে ইন্দুলেখার সঙ্গে সেলিমের বিয়ে হয়ে গেল। সেলিম অর্থাৎ ইতিহাসের পাতায় সদ্য পড়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ। ইন্দু অসম্ভব চটে গেল। স্বপ্ন দেখার জন্যে নয়, ক্লাসে কথাটা রটনা করার জন্যে।
অবশ্য ইন্দুর বিষয়ে এ স্বপ্ন খুব বিচিত্র নয়। ও হোল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী জাতের মেয়ে। রান্নার ক্লাসে ওর উৎসাহের অন্ত থাকেনা। সবাই তাই ওকে 'গিন্নী' বলেই ডাকতো আর আড়ালে হাসতো।




এই স্কুল কলেজের আনন্দময় দিনগুলি ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবাই ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দুকে নিয়েই কথা—ইন্দুর জীবনে কিন্তু ইতিহাসের একটা স্থান রয়ে গেছে। ওর স্বামী বাংলার বাইরে কোন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

দূর প্রবাসে কত সন্ধ্যায় বসে গত জীবনের স্মৃতি ওর সামনে ভেসে যায়—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। আর ওর মেয়ে উর্ম্মী যখন ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের পাতা খুলে পড়ে, তখন হঠাৎ ও হেসে ফেলে।

সেদিনের সেই গিন্নী ইন্দুলেখার সংসারে আজ তার কত কল্পনা সার্থক হয়েছে। সেদিনের খেলাঘরের গৃহিনী ইন্দুলেখার সংসার আজ আনন্দময়—কারণ তার সদাজাগ্রত কল্যানদৃষ্টি সংসারে সর্বদিকে প্রসারিত। পরিচ্ছন্ন ভাঁড়ার ঘরে মশলাধার আর টিনে রঙীন অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডাল আর মশলার নাম। ধোঁয়া ধুলো নেই রান্নাঘরে—বিভিন্ন দেশের সুন্দর গঠনের বাসনপত্রের সংগ্রহ। রান্নাঘরের পরিবেশে মন খুশী হয়ে উঠে—এখানেই তার কাজ আর অবসর।

ইন্দুর সংসার ছোট—স্বামী আর একমাত্র কন্যা উর্ম্মী। উর্ম্মীর জীবন গান বাজনা, লেখাপড়ায় পূর্ণ। তার কোন কৌতূহল নেই রান্নাবান্না সম্বন্ধে। মা কিন্তু এ নিয়ে ক্ষুন্ন হ'ন। তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কন্যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি।

তারপর আরো দিন কেটেছে। উর্ম্মী কলেজের পড়া সদ্য শেষ করেছে—পড়াশুনায় তার অনুরাগ, গান বাজনায় তার আগ্রহ অপরিসীম। আর মা দুঃখ পান যে সাংসারিক বিষয়ে সে রয়ে গেছে তেমনি উদাসীন।

এমন মেয়েকেও সংসারের ডাকে সাড়া দিতে হয়—সানাইতে পুরবীর সুর বাজে, বর আসে। বাংলার এক সমৃদ্ধ পরিবারের সুসন্তান।

যে সংসার তাকে বরণ করল সেখানে সে দেখল দেশী ও বিদেশী জীবনধারার ইঙ্গিত। আহারের বিষয়ে ও দেশীবিদেশী নানারকম রান্নায় তাদের পরিতৃপ্তি। এক আনন্দমুখর সুন্দর সংসার।

উর্ম্মী বুদ্ধিমতী মেয়ে। উপলব্ধি করল পরিজনদের সুখী করতে হলে যেমন গানবাজনা পড়শুনোর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান আছে তেমনি সংসারকে উপেক্ষা করা চলেনা, জীবনের সে দিকটা তার অপরিচিতই রয়ে গেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে পড়ল তার সুগৃহিনী মায়ের কথা। কৌশলে সে একমাসের জন্যে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরের আঙিনায়। মা বুঝলেন এ অহেতুক নয়।

মা'র কাছে সে প্রকাশ করলনা সত্য কথাটি। তারপর সে দেখলো নতুন দৃষ্টি দিয়ে মা'র সাজানো সংসারটি। ভাঁড়ার ঘরে দেখলো, সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিনে সাজানো রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

মার কাছে সে জানলো যে 'ডালডার' উপাদানে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' আর 'ডি' আর সবচেয়ে ওর মজা লাগলো যে মিষ্টি, লুচী থেকে সুরু করে ভাজা, তরকারী, মাছের ঝাল, ঝোল, মাংসের বিভিন্ন প্রণালী সবই 'ডালডায়' রান্না করা যায়—শুধু তাই নয়, খেতেও মুখরোচক হয়। এ হিসাবে দামেও সস্তা আর পুষ্টির দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 'ডালডা' সহজে, সর্বদেশে পাওয়া যায় শুধু ওই খেজুর গাছ মার্কা হলদে টিন দেখে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

উর্ম্মী মা'র কাছে 'ডালডার' মাধ্যমে কত রান্না করল—ওর কাছে তা নিত্য নতুন আবিষ্কারের মত। তার রস বৈচিত্র্যে সে নিজেই মুগ্ধ হোল।

শ্বশুরালয়ে যখন সে ফিরে গেল তার বিদ্যাবুদ্ধি আর বিশেষভাবে রান্নার সুখ্যাতি সবাই করতে লাগলেন।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 453B-X52 BG

# ট্রামে-বাসে

**প**ঞ্জিকাকারের হিসাব মত এবারে দেবী নৌকায় গমন করিয়াছেন।—"দেবীর গমনাগমন কখনো হস্ত-গজে, কখনো ঘোটকে, কখনো দোলায়, কখনো নৌকায়। সাম্প্রতিক সংবাদে শুনেছিলাম দেবীসূক্তে বর্ণিত দেবীর রূপ নাকি এবারে অনেক প্রতিমাতেই দেখা যায়নি। তা এতটাই যখন হলো, তখন যানবাহনই বা সেই পুরনো চালের কেন হবে? দেবীকে এখন থেকে ট্রামে-বাসে নিয়ে আসা যায় না কি?"—প্রশ্ন করেন বিশুখুড়ো।

•  •  •

**প্র**সঙ্গ-প্রসঙ্গেই আমাদের শ্যামলাল বলে —"এবারে দেবীর আগমন হয়েছিল গজে,—ফলং গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। কিন্তু শস্যপূর্ণ হওয়াটাই বড় কথা নয়। শস্য কোথায় মজুত হবে, কী দরে তা বিক্রী হবে বা মোটেই বিক্রী হবে কিনা সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পেলে জনসাধারণের পক্ষে শস্যপূর্ণাও যা, অষ্টরম্ভাপূর্ণাও তাই।"

•  •  •

**শু**নিলাম এবারে কোথায় নাকি মহিলাদের সর্বজনীন দুর্গোৎসব হইয়া গিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বারোয়ারী পুজোতেও লেডিস সীটের ভাগাভাগির কথা শুনে বার বার মনে হচ্ছে ভাগের মা'র কপালে গঙ্গা বুঝি আর জুটল না"।

•  •  •

**প্র**সংগত মনে পড়িল কোন এক ভদ্রমহিলা লেডিস স্পেশ্যাল ট্রামে মহিলা-কণ্ডাক্টর ও ইনস্পেক্টর নিয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"মহিলারা যদি মহিলাদের রক্ষা না করেন, তবে কে আর করবে? সুতরাং এই পরামর্শের বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। তবু ভাবছি মানুষ বুঝি এমনি করেই বসতে পেলে শুতে চায়"!

•  •  •

**বা**জী পোড়ান সম্বন্ধে দিল্লীতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে।—"এতে জনসাধারণ নিঃসন্দেহে উপকৃত



হবেন। কিন্তু মুনাফাবাজী সম্বন্ধে কড়াকড় নিষেধাজ্ঞা জারি হলে বা সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সতর্ক হলেই আরো বেশী উপকার হতো"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

•  •  •

**প্রে**সিডেণ্ট মির্জা সাহেব নাকি বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিদান প্রসংগে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমী গণতন্ত্র পাকিস্তানে অচল।—"কিন্তু তন্ত্রধারক সেখানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সকলেই তো শুনেছি পশ্চিমী; সুতরাং তাঁদের বাতিল করে দিলে গণতন্ত্রের চাকা চলবে কি?"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

•  •  •

**পা**ক্ সামরিক শাসনকর্তা আয়ুব খান সাহেব ঢাকায় আসিয়া বলিয়াছেন—"We want to go back to sanity."—"পাগলামোর কথাটা আমরা যখন বার বার বলেছি তখন দোস্তরা গোসা করেছেন। কিন্তু আয়ুব খান সাহেবের মুখে পাক্ পাগলামোর পরোক্ষ স্বীকৃতিতে কোথাও কেউ 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করতে ভরসা পাবেন না। যা হোক, আমরা আশা করি দেরিতে হলেও পাকিস্তানে আর 'গোসাঘর' নির্মাণের প্রয়োজন হবে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

•  •  •

**হা**ওড়া পুলের উপর সম্প্রতি একদিন নাকি কতকগুলি বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া সাপকে কিলবিল করিয়া ঘোরাফেরা করিতে দেখা গিয়াছে। এই সাপ কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল তার অবিলম্বে তদন্ত হওয়ার দরকার একথা অনেকেই বলিতেছেন।—"কিন্তু তদন্ত যাঁরা করবেন, তাঁরা বলছেন—কার সাপ"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

•  •

**প**শ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে গম ও গমজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।—"এই সমস্ত দ্রব্যের পাতাল-প্রবেশের পথ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে করিনে। বজ্র আঁটুনিতে ফস্কে গেরো না হয়"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

•  •  •

**মো**ম্বাসা হইতে সত্তর মাইল দূরে কোন স্থানে নাকি একটি মৎস্যকন্যা ধরা পড়িয়াছে।—"এ দিকে কলকাতার বাজারে মৎস্যপুত্তরা লেজ দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটি আঁশ পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল"—বলে শ্যামলাল।

•  •  •

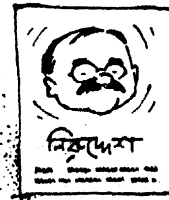
**শ্রী** ক্রুশ্চেভ নাকি নির্দেশ দিয়াছেন যে, এখন হইতে রেস্তরাঁগুলিতে এক গ্লাসের বেশী মদ সরবরাহ করিতে দেওয়া



হইবে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এর চেয়ে যে বাংলা দেশের গাঁজা ভালো। এক ছিলিমে অন্তত যেমন-তেমন হয়"!!

•  •  •

**মঃ** মলটভ এখন কোথায় আছেন, এ প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। — "জবাব




পাওয়ার একমাত্র উপায় "হারান-প্রাপ্তি-নির[illegible]" কলামে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

## উপন্যাস

**স্ফুলিঙ্গ—ননীমাধব চৌধুরী। প্রকাশক—** আগমনী প্রকাশক, ৯৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯। দাম—আড়াই টাকা।

১৯০৫ সাল থেকে ইতিহাসকে উপন্যাসে রূপায়িত করার আদর্শ গ্রহণ করেছেন লেখক। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে তিনি ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত করেছেন। 'স্ফুলিঙ্গ' ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

দেড়শো পৃষ্ঠার উপন্যাস 'স্ফুলিঙ্গ' আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গভীরতা ও সার্থকতায় উজ্জ্বল। কয়েকটি বাঙালী শিক্ষিত পরিবারের জীবন-যাত্রার চারিদিকে আবর্তিত হয়েছে কাহিনী, এবং কোথাও ইতিহাস-এর প্রয়োজনে যেমন খর্ব হয়নি সাহিত্য, তেমনি উপন্যাসের প্রয়োজনে ইতিহাস বিকৃত হয়নি। ইন্দু, ব্রজনাথ, লক্ষ্মী, মানদা প্রভৃতি চরিত্রগুলি রীতিমতো জীবন্ত। বিপ্লবী আদিনাথ বা বীরেন্দ্র আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে অধুনা-বিরল, অতীতের অগ্নিযুগের আদর্শবাদী বাঙালী যুবকের ছবি। লেখক অতীতকে জাগিয়ে তোলার যাদুমন্ত্রটি আয়ত্ত করেছেন, আর এই জন্যেই তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আঙ্গিকের দিক থেকে লেখক প্রাচীন-পন্থী। সেজন্যে আফসোস থাকলেও অভিযোগ নেই। এই উপন্যাসটির বহুল প্রচার কামনা করি, নিতান্ত মামুলীভাবে নয়, আন্তরিকতার সঙ্গেই। কারণ, এই রকম উল্লেখ্য উপন্যাস খুব কমই বর্তমানে নজরে আসে।

দু' একটা ছাপার ভুল থেকে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়া হবে, আশা করি।

(২৯৯।৫৭)

**রাঙা প্রভাত—**আবুল ফজল। **প্রকাশক—** বই-ঘর ফিরিঙ্গি বাজার রোড, চট্টগ্রাম। দাম—চার টাকা।

বিভক্ত বাংলার উভয়খণ্ডের অধিবাসীরা রাষ্ট্রগত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও পরস্পরের সম্পর্কে আজও খুবই কৌতূহলী। বিশেষত, উভয় খণ্ডের ভাষা এক, এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গের অধি-বাসিদের সর্বাংশে মনঃপূত না হলেও ঢাকাতে বাংলা ভাষার রক্ষাকল্পে মুসলমান যুবকেরা যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি, তার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান। এইজনাই আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো নূতন প্রকাশকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। আবুল ফজলের এই উপন্যাসখানি সাগ্রহে পড়ে ফেলেছি; যেহেতু তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের লেখক, এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রেও নবাগত। কিন্তু লেখক স্পষ্টতই আমাদের হতাশ করেছেন। লেখক আদর্শবাদী, হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী-কামী, কিন্তু সাহিত্য-রচনায় আদৌ পটু নন। চরিত্র-চিত্রণ, মনো-বিশ্লেষণ ও ঘটনাবিস্তারের সূক্ষ্ম কৌশলের পরিবর্তে তিনি উপস্থিত করেছেন দীর্ঘ ও একঘেঁয়ে বক্তৃতা, অকারণ ভাবালুতা ও অসার্থক ফ্ল্যাশ-ব্যাকে কাহিনী বর্ণনার রীতি। হোসেন সাহেব ও চারুবাবুর চরিত্র কিছুটা মনে দাগ কাটে। কিন্তু, কাহিনীতে নায়ক মুসলমান কামালের সঙ্গে হিন্দু যুবতী মায়ার বিয়ে দিলেই সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হবে না। তার জন্যে চাই অন্যতর ব্যবস্থা।




পরিশেষে একথা বলা অসংগত হবে না যে লেখক প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন এবং এইরকম লেখকরাই ভবিষৎ পাকিস্তানের উজ্জ্বল আশা-স্থল। (৫৩৪।৫৭)

**অন্ধ দেবতা—**সুভাষ চক্রবর্তী। পরিবেশক—নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪।৫এ কলেজ স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা।

'লেখকের কথা'য় জানা গেল যে পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এই উপন্যাসটি পড়ে সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'আনন্দ-কণ্ঠ' 'অকুণ্ঠ' হয়ে পড়েছিল। ফলে, বই পড়ার আগেই সমালোচকের মন প্রস্তুত হয়েছিল যে, অভিনন্দনযোগ্য বস্তু উপন্যাসে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয়, উপন্যাসটি পড়ে শেষ করে অকুণ্ঠ প্রশংসা করার মতো উৎসাহ খুঁজে পাওয়া গেল না।

অবশ্য, লেখক কিছু প্রশংসার দাবী রাখেন। তাঁর ভাষা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কাহিনীর স্বেচ্ছাচারী, বিকাশ ও বাস্তবতার অভাব পীড়া দিয়েছে। এই ত্রুটিগুলি দূর হলে মনে হয়, ভবিষ্যতে লেখক বাংলার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আসন পেতে পারেন। (২৭৩।৫৮)

**করবীর প্রেম—**সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শ্রীবানী বুক হাউস, কলিকাতা—১২। দুই টাকা।

সুন্দর মলাট, সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই, মলাটের ওপর খ্যাতিমান লেখকের নাম, অথচ একটা নেহাতই কাহিনী, নিতান্তই সাধারণ—এমনই একটি বই হচ্ছে 'করবীর প্রেম'। পড়তে বসলে খারাপ লাগে না সত্য, কিন্তু কাহিনীর বিন্যাস নেহাতই নাটকীয়, মনে দাগ কাটে না।

৪৬২।৫৮

**মহাকালের পূজারী — **ধীরেন্দ্রলাল ধর। কিশোর ভারতী, ৯, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দুই টাকা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটা অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতই। কারণ, ইতিহাস কখনো উপন্যাস হয় না, আর উপন্যাসের মর্যাদালাভ অসম্ভব না হলেও অবাঞ্ছিত তো বটেই। অবশ্যই ইতিহাসের পটভূমিকে আশ্রয় করতে পারেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু সেখানেও তথ্যকে ছেঁটে ফেলবার যেমন উপায় নেই, তেমনি তথ্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করারও বিপদ রয়েছে যথেষ্ট। মতটা Trevelyan-এর। আর তা গ্রহণযোগ্যও বটে। তাই এদিক থেকে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস-লেখকদের বিপদ যথেষ্ট। তাকে যেমন একদিকে বিচ্ছিন্ন তথ্য-গুলোকে সচেতন আঙ্গিকের সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ নকশার অঙ্গ করে তুলতে হয়, অন্য দিকে তেমনি চরিত্রগুলোকে কালের দূরত্ব অতিক্রম করিয়ে জীবন্ত করে তুলতে হয় জীবনরসে সঞ্জীবিত করে। কাজটি দুরূহ নিঃসন্দেহে।

কিন্তু এই দুরূহ কাজই সম্পাদন করেছেন ধীরেনবাবু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে শতধা বিচ্ছিন্ন উত্তরাপথের পটভূমিকায় নন্দবংশের পতন ও মৌর্যবংশের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী তিনি রচনা করেছেন, তা পড়তে পড়তে পরিবেশটিকে যেমন ঐতিহাসিক ভাবতে অসুবিধা হয় না, তেমনি ইতিহাস বলে প্রাণরসে উচ্ছল হতেও তার বাধা হয়নি কোন। তাঁর সাবলীল ভাষা ও বিস্ময়কর আঙ্গিক বইটিকে একটি সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

বইটি ছোটদের জন্য লেখা হলেও বড়রাও তা পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। ৪৭৪।৫৮

## ছোট গল্প

**মহুয়া মিলন—**ধীরাজ ভট্টাচার্য। কারেন্ট বুক সপ্, কলিকাতা—১২। দু' টাকা।

"মহুয়া মিলন" ধীরাজবাবুর কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন।

ইতিপূর্বে তাঁর লেখা "যখন পুলিস ছিলাম" বা "যখন নায়ক ছিলাম" যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সেই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল যতটা অভিনেতা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁর জীবন কাহিনী জানার জন্য তাঁর 'ফ্যান'-দের আগ্রহ, লেখার নিজস্ব

যোগ্যতা ততটা নয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর সুধীই লেখক হিসাবেও যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করছে। নাতিক্রম, দাম, নাটকীয় প্রভৃতি গল্পগুলি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। জীবনের বহু বিচিত্র দিকের সঙ্গে লেখকের সংবেদনশীল মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় মেলে গল্পগুলি পড়তে পড়তে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ৪৪৪।৫৮

**ফুলডোরে**—বিভূতিভূষণ গুপ্ত। প্রকাশক—অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯ বলদিয়াপাড়া রোড, কলি-৬। দাম—২৷৹।

ছোটগল্প আছে বারোটি। আঙ্গিকের পার্থক্য দেখে মনে হয় গল্পগুলি লেখকের বিভিন্ন বয়সের লেখা। স্বভাবতই উৎকর্ষের দিক থেকেও পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে।

'গঙ্গার ইলিশ' ও আরো দু'একটি গল্পে লেখকের সমাজ-সচেতনতার স্বাক্ষর আছে। বাঙালী লেখক মাত্রেই নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতিশীল। লেখকও তার ব্যতিক্রম নন। উপরন্তু, শেষের কয়েকটি গল্পে লেখক মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট। ভবিষ্যতে তাঁর হাত দিয়ে আরো ভালো গল্প বেরুবে, আশা করা চলে।

প্রচ্ছদপটটির প্রশংসা করা গেল না। শিল্পী রঙ নিয়ে এত 'উচ্চকণ্ঠ' হয়েছেন যে চোখে লাগে। (১৫৪।৫৮)

## জীবনী

**ইকবাল**—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। বেনেশাস প্রিণ্টার্স, ১০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা। মূল্য—তিন টাকা।

কবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে হলেও পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। তাঁর জীবনী, তাঁর ধর্ম, তাঁর বাণী, তাঁর জীবনদর্শন ও তাঁর রচনার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় বইখানি পড়ে। লেখক নিজে সুপণ্ডিত এবং ইকবালের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ। তাঁর এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই তিনি সরলভাবে পরিবেশন করেছেন পাঠকদের। এই জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। ইকবালের রচনার অংশবিশেষের বাংলা তর্জমাও বইখানির বিশেষ আকর্ষণ। ৪৫০।৫৮

## ব্যঙ্গ-রচনা

**আনোখীলাল পাথোটিয়া**—বিক্রমাদিত্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা—৭। মূল্য—দুই টাকা আট আনা।

সুপ্রসিদ্ধ রিটায়ার্ড ব্যবসায়ী আনোখীলাল পথোটিয়া আত্মজীবনী লিখছেন, লিখছেন তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের কাহিনী। আর সেই খবরই ব্যবসায়ী মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কেন এই চাঞ্চল্য, আর তার স্বরূপই বা কী—তাকে কেন্দ্র করেই এই ব্যঙ্গকাহিনীর সৃষ্টি। বইয়ের প্রথমেই লেখক জানিয়েছেন, "কাহিনীর সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কারুর সাথে কোন সাদৃশ্য নেই।" হয়ত তাঁর এই কথা সত্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধু রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই মনে পড়ে, "সেই সত্য যাহা রচিবে তুমি।" দুর্নীতি ও কালোবাজারীর যে ছবি লেখক এঁকেছেন, তা আমাদের সুপরিচিত। আর এই সুপরিচিত ঘটনাকেই যে কঠোর ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত তিনি করেছেন তা অপূর্ব। সাহিত্য যদি শুধু মাত্র অবসর বিনোদনের খোরাক মাত্র না হয়, জীবনের দিকে চোখে আঙুল দিয়ে পাঠককে সচেতন করার যদি কিছু মাত্র দায়িত্ব তার থাকে, তাহলে সেদিক থেকে তাঁর বইখানির রচনা সার্থক, সেকথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। অথচ কোথাও বিদ্বেষের উগ্রতা নেই, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। লেখকের আঙ্গিক ও ভাষা দুই-ই অনবদ্য। ৪৫১।৫৮

## নাটক

**জনরব**—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—দু' টাকা।

মঞ্চে কোনো নাটকের অভিনয় না দেখলে তার পুরো কদর দিতে অসুবিধা ঘটে। বর্তমান সমালোচকের সৌভাগ্য হয়নি 'জনরব'-এর অভিনয় দেখার। ফলে, নাটকটির সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশে সমালোচকের কুণ্ঠা আছে, এটা জানিয়ে রাখা কর্তব্য মনে করি।

নাট্যকার ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে স্প্যানিশ নাটক El gran galeoto-র ছায়াপাত হয়েছে 'জনরব'-এ। অথচ নাটকটি পড়ার সময় কোথাও বিদেশী গন্ধ পাওয়া যায় না। নাট্যকারের এই কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। নাটকীয় সংস্থানও আছে প্রচুর, পড়ে মনে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা দেখানোর প্রচুর সুযোগ পাবেন। কাহিনী সম্পর্কে বলা চলে যে, এটা যেন ওথেলোর আধুনিক সংস্করণ। নায়ক বিমলাপ্রসাদ সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা চলে; 'One who loved not wisely but only too well'। এখানে বিমলাপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী রেবার পরস্পরকে গভীরভাবে চেনার সুযোগ হয়নি, তার ওপর আছে উভয়ের বয়সের মধ্যে বিপজ্জনক ব্যবধান। তাই এখানেও ঘটেছে ট্র্যাজিডি, অবশ্যই অন্যভাবে। কিন্তু মূলত সমস্যা এক-ই।

নাট্যকার শক্তিমান। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাসে তাঁর নৈপুণ্য উল্লেখ্য। বিভিন্ন শৌখীন নাট্যসম্প্রদায় নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছেন। কামনা করি, পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়েরও নিকট দীর্ঘদিন এই নাট্যকার উপেক্ষিত হবেন না। (৫২৬।৫৭)

## অনুবাদ

**নিকোলো কন্তির ভারত ভ্রমণ**—অনুবাদ: গিরীন চক্রবর্তী। ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, কলিকাতা—১৩। মূল্য—চুরানব্বই নয়া পয়সা।

ভেনেসীয় পর্যটক নিকোলো দি কন্তি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পথে জীবন রক্ষার জন্য তাঁকে ধর্মত্যাগ করতে হয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাই তিনি শরণাপন্ন হন পোপ চতুর্থ ইউজেন-এর, প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য। পোপ তাঁর আবেদন গ্রাহ্য করে তাঁকে নির্দেশ দেন তাঁর একান্ত সচিব পোজিও ব্রাচিওলিনির কাছে তাঁর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করতে। পোজিও তাঁর "দি ভারিয়েতেত ফর্চুনি লিব্রিকাতোয়ার" নামক ল্যাটিন গ্রন্থে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষের তথা প্রাচ্যদেশের সমকালীন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই গ্রন্থখানির গুরুত্ব অনেক। আলোচ্য গ্রন্থখানি পোজিওর মূল ল্যাটিন গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদের স্বচ্ছন্দ বাংলা তর্জমা।

মূল গ্রন্থখানি দুর্লভ। ইংরেজী অনুবাদও সুলভ নয়। তাই গিরীনবাবু এই অনুবাদখানি করেন এবং প্রকাশক তা' স্বল্পমূল্যে প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে সাধারণ পাঠকের (যারা তাদের দেশের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে উৎসুক) ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। অনুবাদের ভাষা মূলের রসাস্বাদনের সহায়তাই করে, বাধার সৃষ্টি করে না। (৪৪১।৫৮

**বাপ-মায়ের জানবার কথা**—আন্তন সেমিয়নোভিচ মাকারেঙ্কো। প্রকাশক—ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩। দাম—৬৲।

ছেলেমেয়েদের মানুষ করা শিক্ষা-নিরপেক্ষ বয়স্কদের কর্ম নয়, এটা আজ সবাই স্বীকার করে। শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তাই নানা দেশে গবেষণা চলছে। বিপ্লবের পরে রুশ দেশ বহুতর সমস্যার অন্যতম শিক্ষা সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল এবং সেই যুগে মাকারেঙ্কো দেশের পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী শিক্ষাদানপদ্ধতি আবিষ্কারে ব্রতী হন। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবিষ্কৃত তাঁর পদ্ধতি বর্তমানে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর। অবশ্য, মাকারেঙ্কো শুধু সোভিয়েট দেশ নয়, অন্যান্য দেশেও শিক্ষণ-শিক্ষাবিদ্ হিসাবে সমাদৃত। এইদিক থেকে তিনি মন্তিসেরী, পেস্টালৎসী প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের সমগোত্র।

আলোচ্য পুস্তক নীরস তত্ত্বকথা নয়। কাহিনীর আকারে মাকারেঙ্কো ছেলেমেয়েদের মানুষ করার আদর্শ পদ্ধতি এত মনোজ্ঞভাবে উপস্থিত করেছেন যে বাপ-মা মাত্রেই একযোগে উপন্যাস পড়ার আনন্দ ও বাস্তব শিক্ষা পাবেন। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, কারণ তাঁর দেশের বাস্তব অবস্থা আমাদের দেশের মত নয়। কিন্তু মূলগত প্রশ্নগুলি উভয় দেশেই এক এবং আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। এই কারণে বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অনুবাদক সুকুমার মিত্র মহাশয় স্বনামধন্য।

তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে অভিযোগের বিশেষ কোনো অবকাশ নেই। (৯৫।৫৮)

**গ্রহ থেকে গ্রহ**—এ স্তার্নফেল্দ। অনুবাদ—অমল দাশগুপ্ত। পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আজকের যুগ নভোচারণের যুগ। জুলে ভার্নে, এইচ জি ওয়েলস, বোগদানোভ প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা একদিন যে কল্পনা করেছেন, আজকের মানুষ সেই কল্পনাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে চলেছে, কিছুটা বা সক্ষমও হয়েছে। সোভিয়েট স্পুটনিক চন্দ্রের সহযাত্রী হয়ে পৃথিবীর চারিদিক পরিক্রমণ করেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, এর পর তারা আরও কয়েকটি উপগ্রহ পৃথিবীর আকাশে তুলবেন, তারপর রকেট পাঠাবেন চন্দ্রে, মঙ্গলগ্রহে, শুক্রগ্রহে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মহাশূন্য পর্যটনের এই পরিকল্পনারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। সোভিয়েট বিজ্ঞানী স্তার্নফেল্দ গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন করতে হলে যে ব্যোমযান ব্যবহার করতে হবে তার এবং তাকে ছোটাতে হলে যে রকেট প্রয়োজন তার গড়ন থেকে শুরু করে পাড়ি কিভাবে ও কোন পথে জমাতে হবে, পথে কি কি বিপদের সম্ভাবনা, কি কি-ই বা প্রয়োজন প্রভৃতি সবকিছু, সমস্যার ছককাটা হিসাব দেখাতে চেষ্টা করেছেন বইখানিতে। বইখানি পড়তে বসলে তাই মনে হয় গ্রহ থেকে গ্রহ পর্যটন ব্যাপারটা হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই বাস্তবে রূপায়িত হবে। ৬৫৭।৫৭

## কিশোর সাহিত্য

**পাচমিশেলী গল্প**—স্বপনবুড়ো। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।

ছোটদের রচনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্বপনবুড়ো অন্যতম। আলোচ্য পুস্তকে মোট গল্প আছে দশটি। পাকা হাতের লেখা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। গল্পগুলির প্লট সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যথাস্থানে শেষ হয়েছে। গল্পগুলির শুরু আনন্দ ও হাসির তুফানের ভেতর দিয়ে, শেষ পরিণতি ঠিক তা নয়। পরিণতি করুণ রসের মাধ্যমেই। হাস্য ও করুণ রসের সংমিশ্রণে রচিত এই গল্পের ডালির ভেতর "পাঠা ও কাঠালপাতা" গল্পটি সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য। ছাপা, ছবি ও প্রচ্ছদপট ভালোই।

**ছুট**—প্রশান্তকুমার চৌধুরী, জয়ন্ত চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দু টাকা চার আনা।

এটিকে কিশোর উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায়। জগত্তারিণী অনাথ আশ্রমের দুটি অনাথ বালক কিভাবে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো এবং পরিশেষে স্থানান্তরে আশ্রয় ও স্থিতিলাভ করলো তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। পল্টু এবং ভ্যাবলার অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, সাহস, উপস্থিতবুদ্ধি, সারল্য এবং বিচিত্ররকমের ভৌগোলিক জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা আমাদের কৌতুক এবং কৌতূহলের খোরাক যোগায়। লেখকদ্বয়ের ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গি সুন্দর, চিত্রধর্মী ও রসসঞ্চারী। কাহিনীর শেষাংশে গিয়ে সন্তোষ সমাধানে দাঁড়াতে গিয়ে লঘুচারণ করেছে বটে কিন্তু মনকে অপ্রসন্ন করেনি। সুচিত্রিত এই গ্রন্থখানির চলচ্চিত্র রূপায়ণ হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। ৪৫২।৫৮

## ইতিহাস ও সাহিত্য

**রোমের ইতিকথা**: অধ্যাপক অনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এম এ। প্রকাশিকা শ্রীঅমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থানঃ বি সরকার এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

ইউরোপীয় ইতিহাসের বিবর্তনে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ইতিকথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে রোমের ইতিহাস বাদ দিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতির ধারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। ইংরেজী ভাষায় রোমের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলায় এইরকম বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়।

অধ্যাপক অনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রোমের ইতিকথা' এই বিষয়ে একটি প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ। প্রাঞ্জল ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে তিনি এই গ্রন্থে ৭৫৩ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। অনেক জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার তিনি সহজ বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থে রোম সাম্রাজ্যের মানচিত্র ও 'রোম ইতিহাসের ধারা' ক্রোড় অংশটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় রোমের ইতিকথা অনুধাবন পাঠকদের সহজায়ত্ত হবে। ৪৭৬।৫৮

**ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য**—মোহিত পুরকায়স্থ। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা—১২। মূল্য—পাঁচ টাকা।

মুসলমান আমলে যখন পূর্ব ভারতে ফারসী ভাষার একাধিপত্য, অথবা ইংরেজ আগমনের পর যখন এই অঞ্চলে ইংরাজী ভাষার জোয়ার, তখনও বাংলা দেশের যে প্রত্যন্ত ভূখণ্ড বাংলা ভাষাকেই আঁকড়ে ধরেছিল, তার রাজভাষারূপে, সেই ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বিস্ময়কর। অথচ আজ পর্যন্ত সেই সম্বন্ধে বিশদ কোন আলোচনা হয়নি, যদিও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পঠন-পাঠনে ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনাও একান্তই অপরিহার্য। মোহিতবাবু ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই ইতিহাস আলোচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। বইখানিতে অযথা পাণ্ডিত্যের কচকচানি নেই, অথচ তা প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। আর সেখানেই লেখকের কৃতিত্ব। বইখানিতে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ল, পরবর্তী সংস্করণে তা দূর হবে বলেই আশা রাখি। ৪১৭।৫৮

## বিবিধ

**জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্তরথী**—অমিতাভ সেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

মেসোপোটেমিয়ার মরুপ্রান্তরের বুকে ইতিহাসের আদিম যুগে মানুষ যেদিন প্রথম জ্যোতিষ্কলোকের রহস্যের সন্ধান খুঁজেছিল, তারপর কয়েক হাজার বছর কেটে গেছে। তবু আজও মানুষের সেই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টার বিরাম নেই। পাশ্চাত্যদেশে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টায় গত কয়েক শতকে এই প্রচেষ্টা কতটুকু ফলবতী হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। এই প্রসঙ্গে যে সাতজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবন আলোচনা করা হয়েছে তারা হলেন— কোপারনিকাশ, ব্রনো, ব্রাহী, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন এবং আইনস্টাইন।

দুই একটি জায়গায় আলোচনার অস্পষ্টতা থাকলেও সামগ্রিকভাবে লেখকের বলবার ভঙ্গিটুকু সুন্দর ও মনোগ্রাহী। শুধু ছোটরাই যে বইখানি পড়ে উপকৃত হবে তা নয়, সাধারণ পাঠকও বইখানি পড়ে উপভোগ করবেন, সেকথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়।

কয়েকটি বিদেশী নামের বাংলা বানানে ভুল রয়েছে (যথা প্লুটো), অবশ্য ভূমিকায় লেখক নিজেও সে ত্রুটি স্বীকার করে রেখেছেন। পরবর্তী সংস্করণে তার পরিবর্তন হবে আশা রাখি। ৩৬৯।৫৮

**India's Five Year Plans (1951-1961) Prof. Dhiresh Bhattacharyya. Publisher—Udayan Granthagar, 41, Deb Lane, Calcutta-14. Price Rs. 2.50.**

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য সরকার এই পরিকল্পনা রচনা করেছেন, সুতরাং জনসাধারণের নিজেদের উৎসাহেই এ সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ জেনে নেওয়া উচিত। প্রতিটি উৎসুক পাঠকই এখানে তাঁর কৌতূহলের মীমাংসা খুঁজে পাবেন। দুইটি পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার-সম্বলিত পরিচ্ছেদটি লেখকের বিচার-বুদ্ধির চমৎকার নিদর্শন। ৫৯৬।৫৭

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

History of Decimalisation Movement in India—Anil Kumar Acharya.

The world by 1975—K. C. Banerjee.

The Immortals of the Bhagvat—Dilip Kumar Roy.

**কত আশা**—মানিক মুখোপাধ্যায়।

**এলার্জি**—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

**সাতসমুদ্দুর**—ইন্দিরা দেবী।

**মধু মালঞ্চ**—শ্রীমতী রেণা সোম।

**সঙ্গীত পরিচয়**—শ্রীউমা দে।

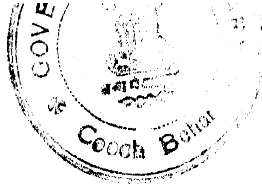
**বাংলাসাহিত্যের চতুষ্কোণ**—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সরণী**—ভাস।

**সিপাহী থেকে সুবাদার**—সুবাদার সীতারাম: অনুবাদক—শোভন বসু।

**ডিকম নদীর দলং**—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

**চৈতালী**—শ্রীপুষ্পল।



## বিস্মরণ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতিশ্রুতি ভুলে যাও হে আমার গোপন মন্দার।
যে-কথা সে বলেছিল আশ্বাসের বিস্তীর্ণ আলোয়
দিগন্ত প্লাবিত ক'রে, শান্ত বনস্থলী যে-কথার
উজ্জ্বল আভাসে কেঁপে থরোথরো অসহ আবেগে
আকাশে উদ্ধত মেলে তার মঞ্জরিত ভালবাসা,
যে-প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে নদী ক্লান্ত সমুদ্রকে ছোঁয়
তরঙ্গিত স্রোতে, জ্বলে ইন্দ্রধনু শান্ত মেঘে-মেঘে
যে-কথায়, ভুলে যাও তার প্রতিশ্রুত সেই ভাষা।

তাকে তুমি ভুলে যাও হে আমার গোপন মন্দার,
দিগন্তবিস্তৃত আলো, হে নিঃসংগ দূরে বনস্থলী।
যা-ছিল প্রত্যাশা, গান, মুছে নিয়ে সব আকাঙ্ক্ষাকে
দ্যাখো, তার প্রতিশ্রুতি দূরলগ্ন নক্ষত্রের মতো
অতৃপ্ত তৃষ্ণায় জ্বলে, প্রতীক্ষার মায়াবী অঞ্জলি
দেবে না সে পূর্ণ ক'রে কোনোদিনও : সে ভুলেছে তার
সমস্ত শপথ ঃ একা তুমি শুধু জ্বলো তৃষ্ণাতুর :
হে মেঘ, সমুদ্র, মাটি, হে আকাশ ভুলে যাও তাকে॥

## প্রেমিকা

সুনীল বসু

স্মৃতির ফুলে ফুলে মনের ফুলদানি
সাজাল বিরহিণী, দু'চোখে জ্বলে রাত,
হাওয়ায় ভাসে তার বেদনা জাফরানি
আলোর শাখা ভাঙে ছায়ার দু'টি হাত।

দেহের সৈকতে বালির খেলাঘর
সূর্য মুছে যায় শিবিরে সন্ধ্যায়,
যদিও আশা তার পেল না উত্তর
বন্ধ হৃদয়ের দরাজ দরোজায়!

হৃদয়ে ভাঙাঘর, শরীরে যৌবন
বৃথাই ধুয়ে যায় বাসনা হল ক্ষয় ;
এখন আকাশের সীমায় উন্মন
অবাক দু'টি চোখ ক্ষমায় তন্ময়।

এখন সব প্রেম আকাশে একাকার
নিঃস্ব বুকে তার অন্ধকার নদী,
শিরায় বেজে ওঠে মুক্ত ঝংকার
প্রাণের প্রাঙ্গণে নিয়তি আঁকে বোধি।

## আক্ষরিক

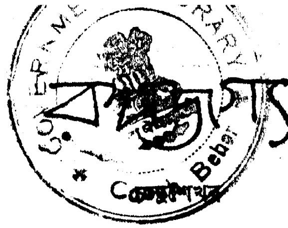
সুনীল চট্টোপাধ্যায়

শব্দ, কূলহীন হও, বুকে নাও সমুদ্র আমার,
তোমার ক্রন্দসী ভ'রে রেখে দিই পারাপারহীন
লবণাক্ত জলভার ; করো তাকে নীলিমাবিলীন
সংহত, গম্ভীর বেগ ; পরিত্যক্ত, হই হবো ক্ষার।

তোমার অজস্র আলো, অন্ধকার, বর্ণ, গন্ধ, রস,
ঝঙ্কৃত লাবণ্য করো আচম্বিত প্রহতমুরজ,
দুর্ভর তরঙ্গদল তোমার মহৎ শিল্পে রোজ
হোক সদ্যোজাত সৃষ্টি ; হই হবো মৃত্যুতে অবশ।

শব্দ, ভারমুক্ত করো ; একা তুমি সমর্থ সহজে
বিশ্বের সমস্ত ভার ব'য়ে নিতে অসীম ডানায়,
এ-জীবন আশঙ্কাক্রান্ত, অবিরাম বাঁধা দোটানায়,
দুর্বহ সমুদ্র থেকে মুক্তি চেয়ে তোমাকেই খোঁজে।

শব্দ কূলহীন হও, দয়া করো, হে শূন্যদেবতা,
হই হবো ক্ষারশয্যা ; তুমি নাও এ দূরে বহতা।



### বাংলা নাটক প্রসঙ্গে

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের উদ্যোগে কাশিমবাজার ভবনে সম্প্রতি বর্তমান নাটক সম্পর্কে একটা আলোচনা সভা বসেছিল। আলোচনার বিষয়ববস্তু ছিল—আজ যাঁরা প্রবীণ নাট্যকার তাঁদের নাটক রচনা শুরু করার মূলে কোন্ প্রেরণা ছিল, আজকের বাংলা নাটককে যথার্থ আধুনিক নাটক বলা যায় কিনা, বর্তমানে বাংলা নাটক কি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, অন্যান্য দেশের মত রূপক নাটকের ক্রমবিকাশ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী অথবা প্রয়োজনীয় কিনা, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ কিনা।

এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীতুলসী লাহিড়ী, শ্রীদিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅজিত ঘোষ ও অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসাধন ভট্টাচার্য।

বহু নাট্যামোদী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। দুই দিন ধরে আলোচনা চলে। দুই দিনের আলোচনাই বেশ উচ্চ স্তরের অথচ মনোজ্ঞ হয়েছিল।

শ্রীতুলসী লাহিড়ী ও শ্রীদিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক রচনার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করে। শ্রীলাহিড়ীর মতে বর্তমানে যে সকল নাটক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নূতন নাট্যকারের যে সকল নাটক অ্যামেচার নাট্যপ্রতিষ্ঠানসমূহ অভিনয় করছেন, তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি ও অন্যান্য ক্ষমতা যতই সীমিত হোক না কেন, তাঁরাই নাটককে নূতন পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বিনা সূতায় মালা গাঁথার মত কোন শক্তিমান নাট্যকার যদি রূপক নাটক লেখবার চেষ্টা করেন, তবে তাও সার্থক হবে বলেই তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক অজিত ঘোষের মতে সংঘাতময় জীবনের অভিব্যক্তিই নাটক। মানুষের জীবনে সংঘাত আগেও ছিল এখনও আছে, শুধু তাদের মূল্যায়নের পরিবর্তন হয়েছে। সেই হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকেই আধুনিক নাটকের সূচনা শুরু হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া, দীনবন্ধু মিত্রের এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক তাঁর মতে আধুনিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং যুদ্ধোত্তরকালে তুলসী লাহিড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অনেক নাটকই আধুনিক। তবে কালানুযায়ী তাঁদের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়েছে।

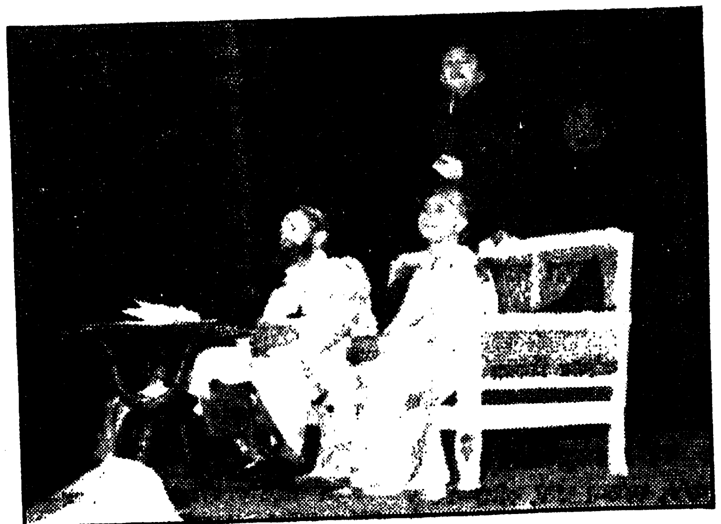
তিনি বললেন, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হবার কারণ নেই। নূতন আঙ্গিক নিয়ে অনেক নূতন নাটক লেখা হচ্ছে, তবে প্রকাশক ও রঙ্গমঞ্চের অসহযোগিতার ফলে তা সাধারণে জানতে পারছেনা।

এ সম্পর্কে আধুনিক নাট্যকারদের উদ্দেশ করে তিনি এই আবেদন জানান যে, তাঁরা যেন তাঁদের নাটককে হৃদয় ও আবেগের স্তরে উন্নীত করেন। তাহলে আধুনিক নাটক আরও সার্থক হবে।

অধ্যাপক ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য আধুনিক কালের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেন, দৈবকে বাদ দিয়ে মানুষ যেদিন থেকে বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে জীবনের বিচার সুরু করেছে, সেইদিন থেকেই আধুনিকতার আরম্ভ বলা চলে। আধুনিক যুগের এই সীমারেখা মেনে নিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাটককে আধুনিক বলা চলে না। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ প্রগতিশীল, কিন্তু আধুনিক নানা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনেক দোষত্রুটিই রবীন্দ্রনাথের নাটকে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনতন্ত্রসম্মত না হয়ে আনন্দলোকের রস সঞ্চারের মধ্যে তিনি তার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। ডাঃ ভট্টাচার্যের মতে প্রত্যেক নাটকের চরিত্রকে সমাজ ব্যবস্থার যথাযথভাবে স্থান দিয়ে জীবনের দ্বন্দ্বকে রঞ্জন রশ্মির দৃষ্টির সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ ও ঘাতপ্রতিঘাতের সুউচ্চ স্তরে তুলতে হবে। সে দিক দিয়ে গল্প উপন্যাস রচনার চেয়ে নাটক রচনা অনেক কঠিন। উপন্যাসেও দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু উপন্যাসের স্থানকাল অপর্যাপ্ত। নাটকের কাল সীমাবদ্ধ। আড়াই কিংবা তিন ঘণ্টার মধ্যেই নাটকের সমস্যাকে তুঙ্গে তুলতে হবে—দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই নাটক সার্থক হবে। তাঁর মতে, নাটকের ভিত্তি লজিক ও বাস্তবজীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত এ থেকে বিচ্যুত হলেই নাটক আর সার্থক নাটক হয় না।



অনুপম চিত্রের হিন্দী ছবি "তালাক" এ হপ্তার একমাত্র নতুন আকর্ষণ। পণ্ডিত সুখরাম শর্মার গল্প এবং মহেশ কাউলের পরিচালনা ছবিটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে বিবাহ জাত সন্তানের কি দুরবস্থা ঘটে তাকে কেন্দ্র করেই এর নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত। আধুনিক সমাজের ভাববার খোরাক আছে এর মধ্যে। একটি নতুন শিশু অভিনেতা—নাম অশ্বিনীকুমার—অপূর্ব অভিনয় করেছে এই অসহায় সন্তানের ভূমিকায়। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন রাজেন্দ্রকুমার,



শৌভনিক-অভিনীত 'গোস্টস' নাটকের একটি দৃশ্য সুব্রত সেন, নিবেদিতা দাশ এবং বীরেশ মুখোপাধ্যায়



অনুপম চিত্রের 'তালাক' ছবির একটি দৃশ্যে রাজেন্দ্রকুমার ও কামিনী কদম

কামিনী কদম ও রাধাকিষণ। প্রদীপ রচিত গানে সুর দিয়েছেন সি রামচন্দ্র।

* * *

এবার পুজোর বাজার মাতিয়ে রেখেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অরোরার ছবি "জলসাঘর"। বাংলাদেশের দর্শক সমাজের শিল্পরুচি যে কতখানি পরিচ্ছন্ন ও উন্নত, নতুন করে তারই পরিচয় পাওয়া গেল "জলসাঘরে"র এই স্মরণীয় সাফল্যে। অথচ এই দর্শক সমাজের অপরিণত রসবোধের দোহাই দিয়ে দেশী ছবির মানকে কিভাবে নীচু করে রাখা হয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। "জলসাঘরে" একদিকে যেমন সত্যজিৎ রায়ের শিল্প প্রতিভার নূতনতর বিকাশ ঘটেছে, অপরদিকে তার ব্যবসায়িক সাফল্য দর্শক সাধারণের রসগ্রাহিতার জয় ঘোষণা করছে।



* * *

দর্শকদের রসবোধ সম্বন্ধে শুধু যে এদেশের চিত্র ব্যবসায়ীরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তা নয়। আমেরিকার মত প্রগতিশীল দেশেও ছবির পরিবেশক ও প্রদর্শকের প্রায় একই রকমের সংকীর্ণ মনোভাব। "পথের পাঁচালী" যখন তাঁরা প্রথম দেখেন, তখন তাঁরা স্পষ্টই বলেন ঃ আর্টের সমজদারেরা হয়তো এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন, কিন্তু দর্শক সাধারণের কাছে এ ছবি বিষতুল্য মনে হবে। কারণ এর মধ্যে না আছে তারকাদীপ্তি, না কোন যৌনাবেদন—অর্থাৎ যে দুটি জিনিসের আকর্ষণে দর্শক সাধারণ ছবি দেখেন, তার কিছুই নেই "পথের পাঁচালী"র মধ্যে।

এই সব ঝানু ব্যবসায়ীদের ধারণাও যে কতখানি ভুল, নিউ ইয়র্কে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে "পথের পাঁচালী"র প্রদর্শনের পর তা বোঝা গেল। ওখানকার ফিফ্‌থ্‌ এভেনিউ সিনেমাতে ছবিখানি এখনও চলছে। ঐ সিনেমায় সব চেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছিল "গার্ভেস" ছবির প্রথম সপ্তাহে—প্রায় সাতাশ হাজার টাকা। "পথের পাঁচালী"র প্রথম সপ্তায় বিক্রি হল বত্রিশ হাজার টাকা—অর্থাৎ "গার্ভেসে"র চেয়ে পাঁচ হাজার টাকা বেশী। ব্যবসায়ী মহলে এর প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। নিউ ইয়র্কের "টাইম" কাগজ লিখেছেন ঃ যাঁরা একদা "পথের পাঁচালী"কে বিষবৎ পরিত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরাই ছবির প্রিন্টের জন্যে আজ পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের দরজায় ধর্না দিচ্ছেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌!

* * *

পুজোর মরসুমে কয়েকখানি নতুন বাংলা ছবির মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে।

মহাষ্টমীর দিন ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে মেট্রোপলিট্যান পিকচার্সের নতুন ছবি "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে"র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। মহরৎ দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেন এর প্রধান দুই শিল্পী—ছবি বিশ্বাস ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অবধূত রচিত একটি জনপ্রিয় গল্প অবলম্বনে এর আখ্যান ভাগ গঠিত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন নির্মল দে।

১৭ই অক্টোবর ঐ স্টুডিওতেই সুচিত্রম্‌ নামক একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি "চাঁদনী"র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক ভট্টাচার্য এর কাহিনীকার।

মহালয়ার দিন জি বি প্রোডাকসন্সের "ভিজে বেরাল" ছবির শুভ সূচনা অনুষ্ঠিত হয় করুণাময়ী আশ্রমের আচার্য নীরদবরণের পৌরোহিত্যে। গল্পটি লিখেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউ সি ছদ্মনামের আড়ালে জনৈক প্রখ্যাত পরিচালক এর পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন।

* * *

এল বি ফিল্মস্‌ ইণ্টারন্যাশনালের আগামী ছবি তোলা হবে শিবরাম চক্রবর্তী লিখিত কিশোর কাহিনী "বাড়ী থেকে পালিয়ে" অবলম্বনে। ঋত্বিক ঘটক ছবিটি পরিচালনা করবেন। অনেকগুলি নতুন কিশোর শিল্পীকে এর মধ্যে দেখা যাবে। নভেম্বরেই এর শুটিং শুরু হবে।

### শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

জগতের সেরা ছবিগুলিকে গুণানুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে চিহ্নিত করা কি সম্ভব?

সত্যজিৎ রায়ের মতে, তা করতে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়। কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর কাজ অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং তাদের গুণ নির্ণয়ের ক্রম কেমন করে নির্ধারিত হবে?

ব্রাসেলস্‌ প্রদর্শনীর উদ্যোগে আয়োজিত এমনি এক বিচার অনুষ্ঠানে অন্যতম বিচারক হিসাবে যোগ দিতে সত্যজিৎ রায় তাই অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু উদ্যোক্তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল বেলজিয়ামের রাজধানীতে। কলকাতায় যেদিন "জলসা-

ঘরে'র উদ্বোধন হয়, তার একদিন পরেই তিনি ব্রাসেলস্ যাত্রা করেন।

গত ২০শে অক্টোবর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রথমে জানা গেল যে প্রদর্শনীর অন্য দুজন বিচারকও তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ক্রমে সেরা ছবিগুলিকে নির্ধারিত করবার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়েছেন। তার পরিবর্তে বিচারকমণ্ডলী ছ'টি ছবি "vital works of art" (প্রাণবন্ত শিল্প সৃষ্টি) হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। ছবিগুলির নাম ঃ

চ্যাপলিন পরিচালিত "গোল্ড রাশ", আইসেনস্টাইন পরিচালিত "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন", পুডভকিন পরিচালিত "মাদার", ডি সিকা পরিচালিত "বাইসাইকেল থিফ", জাঁ রেনোয়া পরিচালিত "গ্র্যান্ড ইলিউশান" ও ডেনমার্কে তৈরি নির্বাক ছবি "জোয়ান অফ আর্ক"।

### সার্থক শিল্প সৃষ্টি

অরোরা নিবেদিত "জলসাঘর" সত্যজিৎ রায়ের ছবি—এইটেই এর একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অর্থাৎ শিল্পী সুলভ যে মননশীলতা ও কারুকার্যের যে সূক্ষ্মতা তাঁর আগের ছবিগুলিকে বহুর মধ্যে অনন্য করে তুলেছে, "জলসাঘরে" তা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

তারাশঙ্করের লেখা মূল গল্পটিতে ধনী জমিদার শ্রেণীর ধ্বংসোন্মুখ চেহারাটি মর্মন্তুদভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভর রায় প্রাচীন এক জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর। বিষয়-বৈভব সবই গেছে। পূর্ব পুরুষদের বিলাস কেন্দ্র প্রাসাদোপম বাড়িটি দেবত্র সম্পত্তি বলে এখনও টিকে আছে। আর আছে আভিজাত্যের গর্ব, যা বিশ্বম্ভরকে হার স্বীকার করতে শেখায় নি বৈষয়িক সকল ব্যাপারে হটে গেলেও।

বিশ্বম্ভরের কৌলিক দম্ভে আঘাত লাগলো যেদিন গাঙ্গুলীদের মহিম ব্যবসায়ে বড়লোক হয়ে দেশে এসে আসর জাঁকিয়ে বসলো। তার নতুন বাড়িতে ডায়নামো বসিয়ে বিজলী বাতি জ্বালা হলো, তার মোটর গাড়ির আনাগোনায় গ্রামের শান্ত পরিবেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো চরম আঘাত হানলো মহিম রায়বাড়ির অনুকরণে নিজের নতুন অট্টালিকায় একটা জলসাঘরের পত্তন করে।

বিশ্বম্ভর রায়ের জলসাঘর একদা নর্তকীর নূপুর নিক্কণে, বড় বড় ওস্তাদের কালোয়াতি গানে, সুর ও সুরার অকৃপণ পরিবেশনে গম-গম করতো। পূর্ব পুরুষদের সঞ্চিত ধনদৌলত, মোহর-গয়না সব এই জলসাঘরের পোষণেই ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। সেই জলসাঘর একদিন হঠাৎ বন্ধ করে দেন বিশ্বম্ভর। তার পিছনে একটি বেদনাময় ইতিহাস ছিল।



অগ্রদূত প্রযোজিত ও পরিচালিত ছোটদের ছবি 'লালুভুলু'র একটি বিশিষ্ট চরিত্রে সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবলু)

বিশ্বম্ভরের তখন পড়তি অবস্থা। স্ত্রী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গেছেন। পয়লা বৈশাখের দিনটিতে গাঙ্গুলীরা তাদের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করবে জেনে বিশ্বম্ভর সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যাহ উৎসবের আয়োজন করলেন। জলসাঘরে গানের মজলিশের ব্যবস্থা হল। স্ত্রীপুত্রকে আনবার জন্য বিশ্বম্ভর লোক পাঠিয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় গানের আসর বসলো যথানিয়মে। কিন্তু জমিদার গৃহিণী ছেলেকে নিয়ে তখনো এসে পৌঁছলেন না। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, বিশ্বম্ভরের মনও তাইতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন সময়ে খবর এলো, সর্বনাশ হয়ে গেছে, নৌকাডুবিতে বিশ্বম্ভর স্ত্রী ও পুত্র দুজনকেই হারিয়েছেন। রায়েদের জলসাঘরের দরজা সেই থেকে বন্ধ।

মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বিশ্বম্ভর সেই দরজা আবার খুললেন। বাতির ঝাড় আবার ঝকমকিয়ে উঠলো। কৃষ্ণা বাঈয়ের কথক নৃত্যে আবার সেই পুরনো দিনের মাদকতা নতুন করে প্রবাহিত হলো। মহিম গাঙ্গুলী পেলা দিতে উঠতেই বিশ্বম্ভর তাকে বাধা দিলেন, বললেন—এ অধিকার সবার আগে গৃহস্বামীর। তারপর যে কটি মোহর অবশিষ্ট ছিল, সবগুলি ঢেলে দিলেন বাঈজীর পায়ে। আজ বড় আনন্দ বিশ্বম্ভরের, মহিম গাঙ্গুলীর থোঁতামুখ ভোঁতা করতে পেরেছেন বলে।

বোতলের অবশিষ্ট সুরা ঢেলে নিলেন বিশ্বম্ভর নিজের পাত্রে। আসর তখন ভেঙ্গে গেছে। জলসাঘরের দেওয়ালে ঝুলছে পূর্ব পুরুষদের সুপ্রাচীন তৈল-চিত্র। নিজের বিজয়বার্তা মহোল্লাসে জানালেন তাঁদের। বিশ্বস্ত ভৃত্য অনন্ত,



'পিলে পর্বত কালে চোর' ছবির নায়িকা নিম্মি।

ছায়ার মত যে পাশে পাশে ফেরে, তাকে বুঝিয়ে দিলেন রায়বংশের রক্ত যার ধমনীতে বইছে তাকে কোন মহিম গাঙ্গুলীই কোনদিন হারাতে পারে না। বহুদিন বাদে বিশ্বম্ভরের শখ হলো তাঁর আদরের ঘোড়া তুফানের পিঠে চেপে বেড়াতে বেরুবেন।

সেই যাত্রাই শেষ যাত্রা। নদীর বালু-চরে মুখ থুবড়ে পড়লো তুফান। বিশ্বম্ভরও সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। যে রায়বংশের এত বড়াই, পথের ধুলোয় গিয়ে মিশলো সেই আভিজাত্যের প্রতীক নীল রক্ত লজ্জায় লাল হয়ে।

সত্যজিৎ রায় জাতশিল্পী। তুলির অল্প কয়েকটি রেখার টানে একটি সমগ্র সৃষ্টিকে দর্শকের চোখের সামনে কেমন করে তুলে ধরতে হয় তা তিনি জানেন। "জলসাঘরে"র সর্বত্র তারই অনুপম পরিচয় ছড়ানো রয়েছে। এতে চরিত্র ও ঘটনার বাহুল্য নেই। গল্পের একতম চরিত্র বিশ্বম্ভরকে কেন্দ্র করে এর যা কিছু ঘটনা। একমাত্র এই চরিত্রটিই সকলকে ছাপিয়ে চোখে পড়ে। আর সকলে পুরোপুরি তার পার্শ্বচর মাত্র।

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি আবেগময় মুহূর্তে সৃষ্টি করেছেন একাধিক জায়গায়, কিন্তু আবেগের অভিব্যক্তিকে দীর্ঘায়িত করেন নি। রুচিশীল দর্শক এতে আরাম বোধ করবেন।

আজকের সমাজে বিশ্বম্ভরের মত চরিত্র বহুর মধ্যে অনন্য। চরিত্রের এই অনন্যতা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে। বহু সার্থক চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে ছবি বিশ্বাসের নাম জড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত এই অভিনয়।

ছোট হলেও ভারী মিষ্টি রূপ নিয়েছে জমিদার ঘরণীর চরিত্রটি পদ্মা দেবীর অভিনয় সৌকর্যে। বালক পুত্রবেশী পিনাকী সেনগুপ্তের অভিব্যক্তি যথাযথ। জমিদার বাড়ীর পুরাতন নায়েব তারাপ্রসন্ন ও খাস আরদালি অনন্তকে যথাক্রমে তুলসী লাহিড়ী ও কালী সরকার রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। এ'দের মুখে কথা আছে অল্প, অথচ উপস্থাপনের কৌশলে দর্শকরা ভুলতে পারেন না এ'দের।

গঙ্গাপদ বসু হঠাৎ বড়লোক মহিমকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর অভিব্যক্তি অনিন্দনীয়। কৃষ্টির দৈন্য সত্ত্বেও কেমন করে এই ধরনের লোক আস্তে আস্তে আসর জাঁকিয়ে বসতে পারে তার একটি চমৎকার ছবি পাওয়া যায় গঙ্গাপদবাবুর অভিনয়ে। মহিমের আচরণের ক্রম-পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

'জলসাঘর'-এর একটি বিশিষ্ট সম্পদ এর সংগীত। ছবির তিনটি জলসার মধ্যে প্রথমটিতে আখতারী বাঈ ফৈজাবাদী একটি অপূর্ব ঠুংরি গেয়েছেন। এতে কথা, সুর ও গাওয়া—তিনটি ব্যাপারেই উৎকর্ষের এক আশ্চর্য, দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে। ঠুংরিটি শেষ হবার পর সাশ্রুনয়না পদ্মা দেবীকে একলা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ দৃশ্যে গানের ভাবটি যেন বাস্তবিকই মূর্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় জলসায় সালামত আলীর মিয়াঁ-মল্লার রাগে গাওয়া খেয়াল গানটি সংগীত রসিকরা যেমন উপভোগ করবেন, তেমনই দর্শক মাত্রেই এর উপস্থাপনে হবেন চমৎকৃত। গানটি নিঃসন্দেহে কাহিনীর বিশেষ পরি-বেশটি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তৃতীয় এবং শেষ জলসায় রোশনকুমারীর কথক নৃত্যের আরম্ভে যে গানটি শোনা যায় সেটি গেয়েছেন সংগীত পরিচালক বিলায়েত খাঁ নিজে। কথক নৃত্যে এই নূতনত্বটুকু দর্শকের অবশ্যই ভালো লাগবে। বিশ্বম্ভরের ছেলের মুখে যে গৎটি দেওয়া হয়েছে সেটি সুপ্রযুক্ত এবং শ্রুতিমধুরও। আবহসংগীতে বিলায়েৎ খাঁ এবং অন্যান্য প্রখ্যাত যন্ত্রীদের সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ শোনাবার এবং শুনে মোহিত হবার মতো। তবে আবহ-সংগীতের টুকরো টুকরো সব কয়টি অংশ চিত্রনাট্যের পরিস্থিতি বা ঘটনার মেজাজকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলেনি। মাঝে মাঝে কাহিনীর প্রয়োজনকেও যেন তা ছাপিয়ে গেছে বলে মনে হয়।

কলাকুশলীদের মধ্যে পরিচালক রায়ের এই সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে যিনি বিশেষ-ভাবে সহায়ক হয়েছেন তিনি আলোক-চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র। পুরনো জমিদার বাড়ীটিকে (নিমতিতার) বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে, বিভিন্ন পরিবেশে, আলোয় আঁধারে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে দর্শক সহজেই একে গল্পের অন্যতম চরিত্র হিসাবে চিনে নিতে ভুল না করেন। বহির্দৃশ্য গ্রহণে শ্রী মিত্র তাঁর শিল্পবোধ এবং পরিপ্রেক্ষিতজ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন।

শিল্প নির্দেশক হিসাবে বংশী চন্দ্রগুপ্ত বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্টুডিও-নির্মিত জলসাঘর সেটটির উল্লেখ করতে হয়। সযত্ন-নির্মিত এই 'জলসাঘর' বিশ্বম্ভরের সুপ্রাচীন প্রাসাদের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। শব্দ ধারণ ও সম্পাদনায় দায়িত্ব যথাক্রমে দুর্গা মিত্র ও দুলাল দত্ত যথাযথভাবে বহন করেছেন।

### ভক্ত ও ভগবান

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে—এ হল ভক্তের অন্তরের উপলব্ধি। তিনি জানেন, ভগবান ছাড়া তাঁর জীবন যেমন মিথ্যা ঈশ্বরেরও তেমনই প্রয়োজন ভক্তের। যুগে যুগে ভক্ত-ভগবানের এই শুদ্ধ প্রেম নিয়ে রচিত হয়েছে কত কাব্য, কাহিনী, লোকগাথা। এইচ পি প্রোডাকসন্সের বর্তমান চিত্রোপহার 'পুরীর মন্দির' এমনই একটি ভক্তিরসাত্মক কাহিনী নিয়ে—বিশ্বাসী মনের কাছে যার আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত।

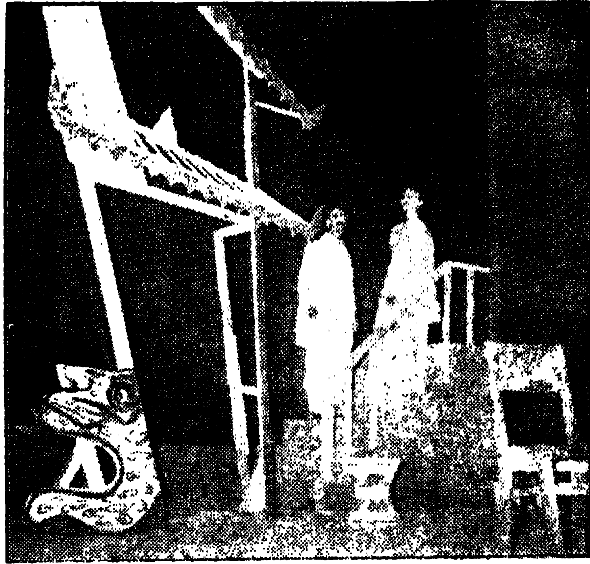
পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরটি কবে কোন পুণ্য দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক তারিখ জানা নেই; কিভাবে—সে বিষয়েও ইতিহাস অনেকাংশে নীরব। কিন্তু এ সম্পর্কে কিংবদন্তীর অভাব নেই। তার ঐতিহাসিক মূল্য যাই হোক, আখ্যান মূল্য কম নয়। সেই কিংবদন্তীর ভিত্তিতে রচিত এই চিত্রকাহিনী।

প্রাচীন অবন্তীরাজ্যে চিত্রনাট্যের শুরু। এ রাজ্যের এক বিখ্যাত বণিক রত্নসেন নীলমাধবের ভক্ত। রত্নসেনের কাছে শিক্ষা পেয়ে রাজা জানলেন নীলাচলের জাগ্রত দেবতা নীলমাধব, তিনি তুষ্ট হলে সবার ভালো হবে। অবন্তীরাজ তাঁর সেনাপতি বিদ্যাপতিকে নীলাচলে পাঠালেন নীলমাধবের বিগ্রহ চুরি করে আনতে। রাজার অভিলাষ ঃ অবন্তীতে নীলমাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।

নীলাচলে এক উপজাতির রাজা বিশ্ববাসুর আরাধ্য দেবতা এই নীলমাধব। পরম ভক্ত বিশ্ববাসু প্রতিদিন একাকী গহন বনের মধ্য দিয়ে জনহীন নীলমাধবের মন্দিরে যান এবং নিষ্ঠা সহকারে পূজো করেন। তাঁর রাজ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতি বিশ্ববাসুর কন্যা ললিতাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে সহজেই রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। অল্পদিনের মধ্যে ললিতার সঙ্গে হল বিদ্যাপতির বিবাহ।

ললিতাকে পাওয়ার পর বিদ্যাপতির পক্ষে অবন্তীরাজের আদেশ মতো বিশ্ববাসুর উপাস্য দেবতার মূর্তি অপহরণ অত্যন্ত ক্লেশকর কাজ। কিন্তু সেনাপতি রাজাজ্ঞা কেমন করেই বা লঙ্ঘন করে? দোটানার মধ্যে পীড়িত হয়ে অবশেষে একটি কৌশল খাটিয়ে বিদ্যাপতি নীলমাধবের বিগ্রহ চুরি করল। অবন্তীরাজ সেই মুহূর্তে মূর্তি নিয়ে দেশের পথে রওনা হলেন। কিন্তু তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার নয়। দুর্যোগের মধ্যে অনেক পথ অতিক্রম করে কলিঙ্গাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ্যে এসে তিনি দেখলেন সমুদ্রতীরে অলৌকিক ক্রিয়ায় একটি মন্দিরের উদ্ভব হয়েছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের কথায় সেখানেই তিনি নীলমাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় সম্মত হলেন। ভক্ত বিশ্ববাসুকেও অনতিকাল পরে সেখানে পাওয়া গেল। ঠিক হল বিশ্ববাসু মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করবেন। অনুষ্ঠানের পূর্ব মুহূর্তে বিগ্রহকে নিয়ে সমুদ্র স্নান করতে গেলে বিশ্ববাসু মূর্তিসহ জলমগ্ন হলেন। ঠিক তখনই শোনা গেল এক দৈববাণী। মূর্তির পরিবর্তে তীরে এসে ঠেকল এক পবিত্র দারুখণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা মানুষের বেশে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে কেমন করে সেই দারুখণ্ড দিয়ে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার অর্ধসমাপ্ত মূর্তি গড়লেন এবং কিভাবে পুরীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল তাই নিয়ে চিত্রনাট্যের পরিণতি।

বহু ঘটনা এবং বহু চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা এই চিত্রনাট্যে একাধিক কাহিনীর উপাদান আছে। সুখের বিষয়, পরিচালক কাহিনীর মূলসূত্রটি হারাননি এবং শেষ পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে একটি সুষ্ঠু পরিণতিতে এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কাহিনী রচয়িতার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তা হল এই ঃ শক্তি বা চাতুর্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না—তাঁকে বাঁধা যায় একমাত্র ভক্তি দিয়ে। কারণ ভক্ত যেমন ভগবানের, ভগবানও তেমনই ভক্তের। 'পুরীর মন্দির'-এ এটুকু উপলব্ধি করা যায়। পরিচালক কাহিনীর মানবীয় দিকটিকেও অস্বীকার করেননি এবং এ ব্যাপারে কয়েকটি আবেগময় মুহূর্ত সৃষ্টি করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। তবে



নিউ দিল্লীর চতুরংগ প্রযোজিত "পথের দাবী"র একটি প্রতীকধর্মী সেট। সিঁড়ির ওপর অপূর্ব ও ভারতীকে দেখা যাচ্ছে



**প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের ভক্তিরসাত্মক ছবি 'নৌকাবিলাস'-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অনুরাধা গুহ।**

অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে গল্পের মানবীয় দিকটি সহজভাবে ফুটে উঠতে পারেনি।

এ ছবিতে অভিনয়ের দিকটা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ বলবার নেই। স্বল্প অবকাশে যে কয়েকজন শিল্পী দর্শকের মনে কিছু ছাপ রাখেন তাঁদের মধ্যে বিশ্ববাসুবেশী জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অবন্তীরাজের চরিত্রে কমল মিত্র, অবন্তীর রাণী হিসাবে দীপ্তি রায়, রমসেনবেশী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীমান বিভুর নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতি ও ললিতার ভূমিকায় অসীমকুমার ও বাসবী নন্দী মোটামুটি মানিয়ে গেছেন। কৌতুকাভিনেতাদের মধ্যে নবদ্বীপ হালদারের কাজটুকু দর্শক উপভোগ করবেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মল্লিক প্রভৃতি।

সুরস্রষ্টা কালীপদ সেনের কাজ অমিশ্র প্রশংসা দাবী করতে না পারলেও তা অনেকাংশেই এ ছবির উপযোগী। আবহ-সঙ্গীতের অংশগুলি চিত্রনাট্যের পরিবেশ ও পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কয়েকটি রাগাশ্রয়ী ভক্তিমূলক গান সুগীত। তবে যেসব আধুনিক গানের আয়োজন এতে করা হয়েছে, সেগুলি আর যাই হোক, ছবির সম্পদ নয়। নৃত্যদৃশ্য সম্পর্কেও সেই কথা বলা যায়।

ছবির বহির্দৃশ্যগুলি মনোজ্ঞ। এ ব্যাপারে আলোকচিত্রশিল্পী কানাই দে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুনীল ঘোষের শব্দ ধারণও নিখুঁত।

### মজার গোঁজামিল

ফরমাসী প্রবন্ধ লেখায় যারা সিদ্ধহস্ত, তাঁদের সম্পর্কে একটা ঠাট্টার প্রচলন আছে। তাতে বলে, প্রবন্ধ রচনার জন্য ওঁদের পড়াশুনো বা চিন্তা করতে হয় না। যদি 'চৈনিক দর্শন' সম্বন্ধে লেখবার ফরমাশ আসে, তবে চীন সম্বন্ধে কিছু সাধারণ খবরের সঙ্গে দর্শন-বিষয়ে কিছু সাধারণ আলোচনা জুড়ে দিয়েই তাঁরা কর্তব্য সমাপন করেন। দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিসকে কেমন করে হেলায় এক করে দিতে হয় সে-পদ্ধতি না-কি তাঁদের কলমের ডগায়। এ-ঠাট্টার ভিত্তি আছে কি না ঈশ্বর জানেন, কিন্তু ঐ ধরনের গোঁজামিল হিন্দী সিনেমাওয়ালারা যে তাঁদের ছবিতে প্রায়ই দিয়ে থাকেন সে-কথা আজ আর সবিস্তারে বলবার অপেক্ষা রাখে না। সে যা-ই হোক নায়াগ্রা পিকচার্সের 'দশ বাজে' ছবিতে এই গোঁজামিলটি, কিন্তু ভারি মজার।

'দশ বাজে' নাম কেন জানেন? ছবির একটি প্রধান চরিত্রের জীবনে বড় বড় ঘটনাগুলো ঠিক দশটার সময় ঘটে। রাত দশটা কি দিন দশটা তার অবশ্য ঠিক নেই—তবে কাঁটায় কাঁটায় দশটা। কোন গ্রহের দুর্বার শক্তিতে এমনটি ঘটতে পারে, তা বলতে পারবেন জ্যোতিষীরা। গ্রহের এমন কোন নিয়ম থাক বা না-ই থাক, মজা হচ্ছে গল্পের ঘটনাগুলোর সঙ্গে ঘড়িতে দশটা বাজার এই সম্পর্ক নিতান্তই একটি নিরর্থক যোগাযোগ। দশটার জায়গায় নটা বা সাড়ে নটা বাজলেও পরিচালক খুব বিপদে পড়তেন না—সাজান সব পরিস্থিতি অনায়াসেই পর্দায় উপস্থাপিত হতে পারত। তবে পরিচালক যদি মনে করে থাকেন, ঐ একটি আজব সূত্রে কাহিনীর সব অর্থহীন, বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বেঁধে দিতে পেরেছেন, তাহলে মাত্র এইটুকু বলা যায় যে, তাঁর আত্মপ্রত্যয় 'চৈনিক দর্শন' লেখকের চেয়ে কিছু বেশী।

গল্পের প্রধান চরিত্র চারটিঃ নায়ক, নায়িকা, নায়কের পিতা এবং খলনায়ক। খলনায়কের অপরাধের সীমা-পরিসীমা নেই। নায়কের পিতার জীবনকে সে বিষিয়ে তোলে—তার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার (স্ত্রীকে হারান, জেলখাটা, ছেলেকে বহুদিন কাছে না পাওয়া ইত্যাদি) কারণ সে-ই। গল্পের অর্ধেক এ-ই নিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভে নায়ক-নায়িকার প্রণয়। তারপর যথারীতি তাদের মিলনে বাধার পর বাধা এসে জুটতে থাকে। অবশেষে আসে সিনেমার সেই চরম মুহূর্ত—যাতে এক নিমেষে সব গোলযোগের অবসান ঘটে। খলনায়কের মৃত্যু, পিতা পুত্র এবং নায়ক-নায়িকার মিলনে চিত্রনাট্যের পরিণতি।

অভিনয়ের ব্যাপারে এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, শিল্পীরা তাঁদের কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেননি। ছবিতে তাঁদের গুণের যথাযথ পরিচয় দেবার অবকাশ না পেলেও, তাঁরা যে বাস্তবিকই গুণী এটুকুও শিল্পীরা দর্শককে বুঝতে দিয়েছেন। নায়কের পিতার চরিত্রে শেখ মুখতার কয়েকটি আবেগময় মুহূর্ত রচনার সুযোগ পেয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহারও করেছেন। তাঁর অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গি নিখুঁত। তবে চরিত্রটি যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়ে থাকে, তার জন্য তাঁর দায়িত্ব সামান্যই। অল্পায়াসে খলনায়কের ভূমিকাটি ইয়াকুব বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন (যদিও এ-চরিত্রটিও কষ্টকল্পিত এবং দাগী আসামী হয়ে পুলিসের চোখের সামনে তার অপরাধের বেসাতির ব্যাপারটা রীতিমতো হাস্যকর)। নায়িকাবেশিনী গীতাবালীর অভিনয় দর্শক উপভোগ করবেন। নায়কের সাজে সুরেশ একরকম মানিয়ে গেছেন। তাঁদের ছক-বাঁধা প্রণয়ের অধ্যায়টি অনেক দর্শকের কাছে

ক্লান্তিকর না-ও মনে হতে পারে। অন্যান্য ভূমিকায় মির্জা মুশারফ, মারুতি, ডেইজি ইরানী প্রভৃতির অভিনয় আশানুরূপ।

ছবিতে নাচ-গানের অভাব নেই। এইসব দৃশ্যের আয়োজন চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে নয়, ছবির আমোদের দিকটাকে ভারী করবার উদ্দেশ্যে। গানগুলি মোটামুটি সংগীত। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ অনিন্দ্য। যুগলকিশোর পরিচালিত এই ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছেন রাম গঙ্গোপাধ্যায়; এর গল্পটি লিখেছেন নিরঞ্জন, চিত্র ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে জে দি কাপাদিয়া এবং জর্জ ডিক্রুজ।

## বিবিধ সংবাদ

থিয়েটার সেণ্টার ক্যালকাটার উদ্যোগে গত চার বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুজোর অব্যবহিত আগে এ বছরের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। পঁয়তাল্লিশখানি একাঙ্ক নাটকের মধ্যে পাঁচখানি পুনরভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়। তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে কলাবিকাশ কেন্দ্র অভিনীত ওড়িয়া নাটক "শ্বেতপদ্ম", রংগম শিল্পী সংঘ প্রযোজিত "মেঘমুক্তি" এবং লোক নাটকের "এক অধ্যায়"। শেষোক্ত দুটি নাটকই বাংলা। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ এই প্রথম।

* * *

বিশ্বরূপার উদ্যোগে অবৈতনিক নাট্য-সংস্থাসমূহের যে নাটক ও অভিনয় প্রতিযোগিতা গত কয়েকমাস ধরে চলছে তা সমাপ্তির মুখে। আসছে বছর যাঁরা বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চান, তাঁদের নাটক দাখিলের শেষ তারিখ—১৫ই নভেম্বর ১৯৫৮। আগামী বছর যিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে নির্বাচিত হবেন, মঞ্চমুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তাঁকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতার বিশদ বিবরণ বিশ্বরূপা থিয়েটারে পাওয়া যাবে।

* * *

গণরংমহলের উদ্যোগে গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে অক্টোবর তিনদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ভাবানীপুরের ডি এন মিত্র স্কোয়ারে। প্রথম দিন গোর্কীর "মা", দ্বিতীয় দিন সুবোধ ঘোষের "মা হিংসীঃ" ও তৃতীয় দিন ইবসেনের "দি গোস্টস"এর বাংলা নাট্যরূপ অভিনীত হয়। গণরংমহলের উদ্দেশ্য স্বল্প ব্যয়ে জনসাধারণকে নাট্যরস পরিবেশন করা। এই নিয়ে দুটি নাট্যোৎসব এ'রা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করলেন।



পণ্ডিত রবিশংকর তবলাবাদক আল্লারাখা সহ সম্প্রতি ইউরোপে গেছেন বাজনা শোনাতে। এই ছবিখানি বোম্বাইয়ের বিমানঘাটিতে যাত্রার প্রাক্কালে তোলা হয়

'বিসর্জন' ও 'ইস্পাত' এই দুটি নাটক সাফল্যের সহিত অভিনয় করার পর 'অনুশীলন' সম্প্রদায় তাঁদের নতুন নাটক 'শেষ সংবাদ' ইতিপূর্বে দুবার রসিকজনের নিকট উপস্থিত করেছেন। আগামী ১০ই এবং ৩০শে নভেম্বর সকাল ১০টায় তাঁরা নাটকটি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে পুনরায় অভিনয় করবেন। রুমোনিয়ান নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ানের "স্টপ নিউজ" অবলম্বনে এটি রচিত। বাঙলা রূপ দিয়েছেন উমানাথ ভট্টাচার্য। পরিচালনা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব বহন করবেন যথাক্রমে মমতাজ আহমেদ খাঁ ও তাপস সেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অণিমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

* * *

আগামী ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সল্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যগণ স্টার রংগমঞ্চে 'পি-ডব্লিউ-ডি' নাটকটি অভিনয় করবেন। অভিনয়ে অংশ নেবেন অসিত বসু, শ্যামল রায় চৌধুরী, ননী দত্ত, যতীন্দ্র রায়, দীপিকা দাস, লীলা শর্মা প্রভৃতি।

* * *

গত ১২ই অক্টোবর হরিনাভী দ্বারিকা বিদ্যাভূষণ বিদ্যালয়ে কবি রাম বসুর 'নীল-কণ্ঠ' কাব্যনাটকটি অভিনীত হয়। সম্প্রতি কাব্যনাট্যের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে দেবকুমার বসু ও সম্প্রদায় তাতে উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পরকীয়া প্রেমকে কেন্দ্র করে এই নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। সেদিনের উৎসবে 'নীলকণ্ঠ' বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় যোগ্যতার সহিত অভিনয় করেন দেবকুমার বসু, সবিতা সমাজদার, সৌরেন মিত্র ও শঙ্কু রায়।

* * *

স্টার থিয়েটারের 'রাজলক্ষ্মী' নাটক গত ২৭শে অক্টোবর শততম অভিনয়ের গৌরব লাভ করেছে। আগামী ৮ই নবেম্বর অপরাহ্ন ৫॥টায় 'রাজলক্ষ্মী' নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ঐ অনুষ্ঠানে অন্নদাশঙ্কর রায় সভাপতির এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই শুভানুষ্ঠানে পরিচালক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, মঞ্চ-শিল্পী ও নাটকের অভিনয় অংশগ্রহণ-কারী শিল্পীদের এবং নেপথ্য কর্মিগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।

* * *

মাদ্রাজের প্রাক্তন ব্যবস্থা পরিষদ গৃহটিকে ছোটদের থিয়েটারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী



আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্সের নির্মীয়মাণ চিত্র "অগ্নি সম্ভবা"তে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়

জওহরলাল নেহর্ এই প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করে আসেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে ছোটদের ছবি দেখান শুরু হয়েছে। ভারতীয় ছবির ইতিহাসে এটি একটি অনন্যপূর্ব ঘটনা। আপাতত হপ্তায় তিনদিন ধরে—শুক্র, শনি ও রবিবার চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। উপযুক্ত সংখ্যক ছবি পাওয়া গেলে দৈনিক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হবার পরিকল্পনা আছে এর উদ্যোক্তাদের। প্রবেশমূল্য নির্দিষ্ট হয়েছে মাথা পিছু বারো নয়া পয়সা। মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য প্রগতিশীল শহরের অনুকরণযোগ্য।

'শিকার' চিত্রে অসংগতি

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

সম্প্রতি ন্যাশনাল ফিল্মসের রঙীন ছবি 'শিকার' দেখে এলাম কলকাতা থেকে। কোন Safari বা শিকারযাত্রা সম্বন্ধীয় ছবিতে থাকা উচিত নয় এমন কতকগুলো গুরুতর অসংগতি আমার চোখে পড়ে যেগুলো আপনার দৃষ্টিগোচর না করে পারছি না।

(১) আসামের একমাত্র "কাজিরাঙ্গা রিজার্ভ" ছাড়া অন্যত্র গণ্ডার সহজদৃষ্ট নয়—কিন্তু গণ্ডার সংরক্ষিত প্রাণী। ছবিতে দেখা যায় গণ্ডারের ওপর দুড়ুম দাড়াম রাইফেল চলছে—যদিও কোন গুলিতেই অবশ্য গণ্ডার মারা পড়ে না। বন আইন ভঙ্গ করে শিকারীরা গণ্ডার হত্যার অনুমতি পেলো কার কাছ থেকে? স্বয়ং ডি এফ ও'র কাছ থেকে?

(২) নায়ক শিকারীর রাইফেল থেকে বুলেট চেম্বারটি দুর্বৃত্তরা সরিয়ে ফেলে। নায়ক সেটি জানতে পারে শিকারে বেরোবার প্রায় ১৮।২০ ঘণ্টা পরে বাঘের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। প্রকৃত শিকারীর জীবনে এরূপ ঘটে না। প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারী শিকারে বেরোবার পূর্বে তার অস্ত্রটি ঠিক আছে কিনা এবং তাতে গুলি ভরা আছে কিনা সেটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়।

(৩) নায়কের সঙ্গে একজন gun-bearerকে সর্বদা ঘুরতে দেখা যায়। Gun-bearerগণ সাধারণত নিজেরাও ভাল শিকারী হয় এবং তাদের কাছে দোসরা বন্দুক বা রাইফেলও থাকে। কিন্তু শেষ দৃশ্যের পূর্বে হঠাৎ তাকে কোথায় যে অদৃশ্য করে দেওয়া হয় তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৪) নায়কের সঙ্গে বাঘের লড়াইতে একটি বাচ্চা লেপার্ডকে ব্যবহার করা হয়েছে—কিন্তু নায়ক কর্তৃক বাঘটি ছোরাদ্বারা নিহত হলেও তার কানটি নড়তে থাকে! ঘুমন্ত অবস্থায়ও বাঘেদের কাণ ওরূপ নড়ে। ছবির এই স্থানটি পুনঃসম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) দিনের বেলা, আক্রান্ত না হলে লেপার্ড (নরখাদক হলেও) মানুষকে আক্রমণ করে না—বিশেষ যেখানে তার পলায়নের পথ খোলা থাকে। ছবির শেষ দৃশ্যে নায়কও নায়িকা উভয়ে একত্র থাকা সত্ত্বেও বাঘের বাচ্চাটা কেন যে নায়ককে চার্জ করল বোঝা গেল না—কারণ তখন ভোর হয়ে গেছে এবং জঙ্গলের মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সুযোগ বাঘটির সব সময়েই ছিল। মনে হয় নায়ককে একটু বীরত্ব দেখাবার সুযোগ দিতেই এই দৃশ্যের অবতারণা। কিন্তু সেটি অন্যভাবেও করা চলতো।

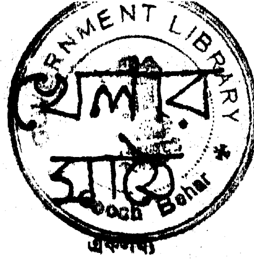
(৬) আসামের জঙ্গলে শিকার অথচ একটিও হরিণের দেখা পাওয়া যায় না। বহু দৃশ্য আসামের জঙ্গলে গিয়ে তোলা হয়েছে। একটু অর্থ ও ধৈর্য ব্যয় করলেই হরিণের সুন্দর ছবি তোলা যেত।

(৭) ছবিটিতে এতসব তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে যার সঙ্গে জঙ্গলে শিকারের কি সম্পর্ক আছে বোঝা কঠিন।

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র বন্য প্রাণীদের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট আইনকানুন এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে—কোন শিকারীর পক্ষেই নির্বিচারে প্রাণীহত্যা আজকাল আর সম্ভব নয়।

নিবেদক:

বুদ্ধদেব বসু, ঝাড়গ্রাম।




একলব্য

সকলকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার খেলাধুলার খবর লিখতে আরম্ভ করছি। খেলাধুলার খবর লিখতে বসে সেই প্রশ্নই বার বার মনে আসছে, যে প্রশ্ন আমার আপনার মত আর পাঁচজনের মনের মধ্যেও উঁকি মারছে মাঝে মাঝে। অর্থাৎ আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার প্রশ্ন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বনেদী ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের অসমাপ্ত ফাইন্যাল খেলা কোন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, কিম্বা আর হবে কি না? সেখানে এ সম্বন্ধে নতুন কোন আশার আলোক পাওয়া যায়নি। ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরস্পর-বিরোধী অভিমত এবং পরিচালক সংস্থা আই এফ এর হালচাল থেকে বুঝবার উপায় নেই কোন পর্যন্ত খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুটি ক্লাবই রয়েছে কলকাতার বাইরে। দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় পরাজয় স্বীকার করবার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বোম্বাই যাত্রা করেছে রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য। রোভার্স কাপে খেলার জন্য মোহনবাগান ক্লাবও বোম্বাই গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং রোভার্সের খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। রোভার্সের পর আবার ডুরাণ্ড কাপের খেলা। ডুরাণ্ডে অবশ্য মোহনবাগান ক্লাব যোগ দেয়নি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল তো ডুরাণ্ডে খেলছে। কাজেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ডুরাণ্ডে খেলা শেষ না হলেই বা কি করে ফাইন্যাল খেলার আয়োজন করা যায়? তাই মনে হয় ডুরাণ্ডের খেলা শেষে এবং কলিকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট খেলার আগে আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার পুনরানুষ্ঠানের একটা প্রচেষ্টা হবে। অবশ্য ফাইন্যাল খেলার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও বহু বাধা আছে। আছে দুটি ক্লাবের পরস্পরবিরোধী অভিমত। মোহন-বাগান বলছে তারা চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে ফাইন্যাল খেলবে না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বলেছে, চ্যারিটি না হলে খেলবে না। এর সংগে আইনঘটিত প্রশ্নও কিছু জড়িত আছে। আই এফ এর সংবিধান অনুযায়ী ফাইন্যাল খেলা প্রথম দিন মীমাংসিত না হলে পরের দিন করবার কথা। কথা নয় বিধান। এই বিধান যখন মানা হয়নি, তখন আই এফ এর ফাইন্যাল ম্যাচ খেলাবার অধিকারও নাকি নাকচ হয়ে গেছে। এই আইনঘটিত প্রশ্ন তুলেছেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিনিধি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক মুখপাত্র বলেছেন, ফাইন্যাল খেলার তারিখ ঠিক করেও যখন মোহনবাগান ক্লাবের অনমনীয় মনোভাবের ফলে আই এফ এ সে খেলার ব্যবস্থা করতে পারেনি, তখন আর ফাইন্যাল খেলার প্রশ্ন ওঠে না। এতো গেল ক্লাবের কথা। মাঠেরও সমস্যা আছে। ক্রিকেট মরসুমে ক্যালকাটা মাঠ পাওয়া গেলেও মাঠের সমস্ত গ্যালারী ক্রিকেট খেলার জন্য ইডেন উদ্যানে স্থানান্তরিত হবার কথা। অবশ্য ক্যালকাটা মাঠের গ্যালারী দু দিন পরেও স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। আসল প্রশ্ন, দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবকে নিয়ে। এরা যদি একমত হয়, আর আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলার জন্য এদের যদি আন্তরিকতা থাকে তবে কোন বাধাই খেলার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু এরা এক-মত হবে কি?

বিজয়ার পর কোন ক্লাবের সমর্থকদের মনেই ব্যথা দিতে চাই না। তবু চুপি চুপি



দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব



**১৯৫০ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান বাজপেটী**

একটা কথা বলি। মোহনবাগান বা ইস্ট-বেঙ্গল কোন ক্লাবই ফুটবলে এবার কোন বড় সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে একদল সাফল্য অর্জন করলে, আর অপর দলের জয়ের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে, এও তো এক মর্মান্তিকের কথা। কারণ এখন তো আর খেলার জন্য খেলা নয়। খেলার সঙ্গে মান সম্মানের প্রশ্ন আছে। সুনাম দুর্নামের প্রশ্ন আছে। আছে ভবিষ্যৎ প্রভাব-প্রতি-পত্তি ও প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান উভয় ক্লাবই রোভার্সের প্রতি-যোগী। দুটি ক্লাবের পক্ষে তো আর রোভার্স জয় সম্ভব নয়। তাই আমরা আশা করি, মোহনবাগান রোভার্স ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ লাভ করুক। তা হলে রোভার্স ও ডুরাণ্ড বিজয়ীর পক্ষে আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার পথ অনেকটা প্রশস্থ হবে। না হলে কি হবে বলা যায় না।

•  •  •

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবার ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। দিল্লী ক্লথ মিল ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই প্রথম সাফল্য। গত-বারের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও দিল্লী ক্লথ মিলে এবার মন্দ খেলেননি। ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গেও ইস্ট-বেঙ্গল প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ১—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছে।

গত বছরও দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় কলিকাতার দুটি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও রেলওয়ে স্পোর্টস (এখন ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব) ক্লাবকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে। এবছরও দিল্লী ক্লথ মিলে কলিকাতার ক্লাব-গুলির প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেমি ফাইন্যালে কলিকাতারই তিনটি ক্লাবকে খেলতে দেখা গেছে; ফাইন্যালেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কলিকাতার দুটি ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একে একে বিজয় ক্যাণ্টনমেণ্টকে ৭—১ গোলে, এম ই জি দলকে ৩—০ গোলে ও অন্ধ্র সেণ্ট্রাল পুলিস দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে ওঠে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফাইন্যালে ওঠে একে একে দিল্লী ইউনাইটেডকে ৪—০ গোলে, গুর্খা ব্রিগেডকে ২—১ গোলে ও ইস্টার্ন রেলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা এখন পর্যন্ত আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ বা ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার মর্যাদা পায়নি। তবুও প্রতিযোগিতার পরিচালক-বর্গ যেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করে আসছেন এবং ভারতের খ্যাতনামা ক্লাবগুলি প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে, তাতে দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিযোগিতার মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা আশা করি, উত্তরোত্তর দিল্লী ক্লথ মিল প্রতিযোগিতা আরও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। নীচে দিল্লী ক্লথ মিলের ফাইন্যাল খেলায় আগে যারা বিজয়ী ও রানার্সের পুরস্কার পেয়েছেন, তাদের নাম দেওয়া হল—

**বিজয়ী** **বিজিত**

১৯৪৫—নিউ দিল্লী হিরোজ : কে ও ওয়াই এল ইনফ্যাণ্ট্রী

১৯৪৯—রাইসিনা স্পোর্টিং : সিটি ক্লাব লক্ষ্ণৌ

১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল : ৫৮ গুর্খা ব্রিগেড

১৯৫১—রাজস্থান ক্লাব : ৫৮ গুর্খা ব্রিগেড

১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল : ৫৮ গুর্খা ব্রিগেড

১৯৫৩—এরিয়ান জিমখানা ই আই আর
ব্যাঙ্গালোর : এ্যাকাউণ্টস

১৯৫৪—জিওলজিক্যাল সার্ভে : হায়দরাবাদ

১৯৫৫—আই এ এফ : ডি এম এ এলাহাবাদ

১৯৫৬—আই এ এফ : ইস্টবেঙ্গল

১৯৫৭—ইস্টবেঙ্গল : রেলওয়ে স্পোর্টস

•  •  •  •

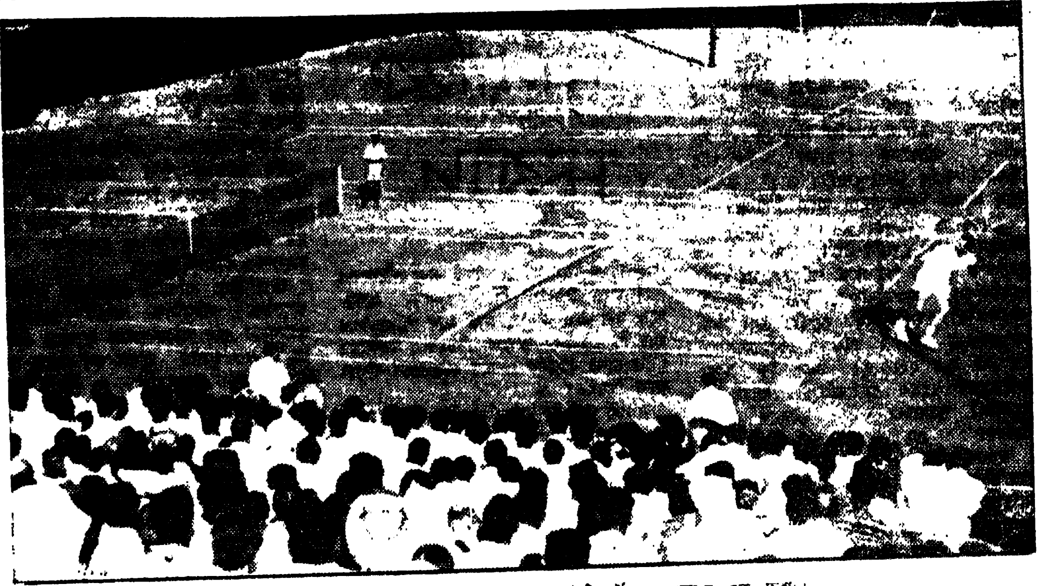
আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর কলি-কাতার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে একটা মন্দাভাব বিরাজ করছিল। এখনো যে মন্দাভাব কেটে গেছে, তা নয়। তবে মাঝখানে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান বাজপেটীর প্রদর্শনী টেনিস খেলাকে কেন্দ্র করে কলিকাতার ক্রীড়াক্ষেত্র একটুখানি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।



**আমেরিকার উঠতি খেলোয়াড় অ্যাণ্ডি স্টার্ন**

আমেরিকার কীর্তিমান খেলোয়াড় বাজ-পেটী তার দেশের অল্পখ্যাত তরুণ খেলোয়াড় অ্যাণ্ডি স্টার্নকে সঙ্গে করে এদেশ সফর করতে এসেছেন। সাউথ ক্লাবে দুদিন এদের প্রদর্শনী টেনিস খেলার আয়োজন হয়। ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণন, ডেভিস কাপ টীমের ভারতীয় অধিনায়ক নরেশ কুমার ও উঠতি খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালের উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান বাজপেটী কোন খেলাতেই জয়লাভ করতে পারেননি। বাজ-পেটীকে প্রথম দিন নরেশ কুমারের কাছে এবং দ্বিতীয় দিন রমানাথ কৃষ্ণনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

বাজপেটীর প্রদর্শনী টেনিস খেলাকে কেন্দ্র করে কলিকাতার টেনিস উৎসাহী ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল। কারণ বাজ-পেটী শুধু ১৯৫০ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নই নন, এই বছর তিনি ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নসিপও লাভ করেন। তাছাড়া বাজপেটী বিশ্বের এক কীর্তিমান সুনিপুণ টেনিস খেলোয়াড়। গত বছরও গার্ডনার মুলয়ের সঙ্গে খেলে বাজপেটী উইম্বলডনের ডাবলস চ্যাম্পিয়নসিপও লাভ করেছেন। সুতরাং তার প্রতিভা অস্তমিত একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সাউথ ক্লাবের প্রদর্শনী খেলাতে বাজপেটী পরাজিত হয়েছেন বটে; কিন্তু প্রতিটি মারের মধ্যে তার শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। কলিকাতার অত্যধিক গরম আবহাওয়া তার স্বাভাবিক খেলার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রথম দিন নরেশ কুমারের সঙ্গে খেলবার সময় তিনি রীতিমত শ্রমকাতরতা অনুভব করেন। তবু তার খেলার হালচাল এবং মারের



সাউথ ক্লাবের নরেশ কুমার ও বাজপেটীর প্রদর্শনী টেনিস খেলার এক দৃশ্য।

নৈপুণ্য দেখে দর্শকদের বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, তিনি টেনিসের একজন অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পী। অপরদিকে নরেশ কুমার এবং রমানাথ কৃষ্ণনের খেলাতেও উন্নত টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয়েই সাম্প্রতিক বিদেশ সফর থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, হাতের মার ও সার্ভিসকে করেছেন আরও সুন্দর এবং আরও দর্শনীয়। নীচে প্রদর্শনী খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল—

নরেশ কুমার ৪—৬, ৭—৫ ও ৬—১ গেমে বাজপেটীকে পরাজিত করেন।

প্রেমজিৎ লাল এক সেটের খেলায় ৭—৫ গেমে পরাজিত করেন অ্যাণ্ডি স্টার্নকে।

নরেশ কুমার ও প্রেমজিৎ লাল ৬—৩ গেমে আর কৃষ্ণন ও অ্যাণ্ডি স্টার্নের বিরুদ্ধে এগিয়ে থাকবার পর দ্বিতীয় সেট ৩—৩ গেমে অসমাপ্ত থাকে।

আর কৃষ্ণন ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে স্ট্রেট সেটে বাজপেটীকে পরাজিত করেন।

আর কৃষ্ণন ও নরেশ কুমার ৭—৫ ও ৭—৫ গেমে বাজপেটী ও প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন।

• • •

১৯৫৮ সালের জুলেস রিমেট কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের কেউ অলিম্পিক ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না, আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অলিম্পিক ফুটবলের আকর্ষণ অনেকখানি কমে যাবে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় অনেক দেশকে দল গঠন করতেও বেশ বেগ পেতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন তাদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে ১৯৫৮ সালের বিশ্ব কাপে যারা খেলেছিলেন, শুধু তাদেরকেই অলিম্পিক খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। যারা অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্ব কাপের খেলায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদেরও অলিম্পিকে যোগদানের অধিকার নাকচ করেছেন। সুতরাং ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ফুটবল টীম পাঠাতে সেই সব দেশের খুবই অসুবিধা হবে, যে-সব দেশে এমেচার ও প্রোফেসনাল অর্থাৎ শৌখীন ও পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গতবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশকে হয়তো অলিম্পিকে যোগদানের সিদ্ধান্তই নাকচ করতে হবে। কারণ অলিম্পিকে খেলার উপযোগী একটি দল গড়তে হলে যতগুলি নিপুণ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, বিশ্বকাপের খেলোয়াড়দের বাদ দিলে এই সব দেশে ততগুলি নিপুণ খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া ভার।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন পরীক্ষা করে দেখেছেন পূর্ব ইউরোপের বহু দেশের যেসব খেলোয়াড় এবার জুলেস রিমেট কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকেও খেলেছেন। স্বীকার করতে বাধা নেই এর মধ্যে অনেকেই পেশাদার খেলোয়াড়। আবার শৌখীন খেলোয়াড়ও আছেন। কিন্তু অলিম্পিকে তো পেশাদার খেলোয়াড়দের কোন স্থান নেই। অলিম্পিক শৌখীন খেলোয়াড়দের মিলন ক্ষেত্র। যারা নিছক আনন্দ লাভের জন্য শুধু খেলার প্রয়োজনে খেলেন, অলিম্পিক তাদের প্রতিযোগিতা। পেশাদার খেলোয়াড়, যারা খেলাকেই জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, রুজি রোজগারের উপায় হিসাবে খেলাকে বেছে নিয়েছেন, অলিম্পিকে তাদের স্থান নেই। তাই পেশাদার ও শৌখীন খেলোয়াড়দের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখবার জনাই আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ অ্যাভেরী ব্রাণ্ডেজ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত বহু দেশেরও অভিনন্দন লাভ করেছে। কিন্তু কতকগুলি দেশ খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। বহু শৌখীন খেলোয়াড়েরও অলিম্পিকে অংশ গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু উপায় কি? আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু কিছু লোকের অসুবিধা তো হবেই। খেলার আকর্ষণও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। তবে এর থেকে ভবিষ্যৎ সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এমেচার ও প্রোফেসনাল খেলোয়াড়দের জগাখিচুড়ি নিয়ে এতদিন যে তীব্র সমালোচনা চলছিল, তার অবসান হবে। দুই শ্রেণীর খেলোয়াড়রাও পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হবেন।



## দেশী সংবাদ

২১শে অক্টোবর—ষড়যন্ত্র রচনার অভিযোগ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগ যে রিপোর্ট দেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ঐ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্তকারী অফিসার শ্রীমাল্লিনাথ মুখার্জি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাক্তন কিউরেটর শ্রীমহীউদ্দিনের উপর নোটিস জারী করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

২২শে অক্টোবর—হাবড়ার (২৪ পরগনা) এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, আইনজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। এমন কি হিন্দু মহিলাদের নামেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৩শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু-প্রতীক্ষিত মুনাফাবিরোধী অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উহার নাম হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবিরোধী অর্ডিন্যান্স (১৯৫৮)। *এই অর্ডিন্যান্সে রাজ্য সরকারকে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি* পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবার এবং মুনাফা শিকারীদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

২৩শে অক্টোবর—আজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চারটি প্রস্তাবের খসড়া অনুমোদন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থাপিত হইবে। কেরল, কংগ্রেস সংগঠন এবং কর্মকর্তাদের একসঙ্গে একবারের বেশী পদাধিকার সম্পর্কে এই প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছে।

২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত একটি অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমুদ্রের তীর বরাবর কিছুটা জায়গায় বাউণ্ডারী বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিকট ভুয়া হিসাব দাখিল করিয়া বহু পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাতের এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সম্পর্কে জেলা পুলিস কর্তৃপক্ষ এক্ষণে তদন্ত করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। ঐ ব্যক্তি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং একটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বলিয়া প্রকাশ।

২৫শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুনাফা নিরোধক অর্ডিন্যান্সটি চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার একশ্রেণীর মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর দল নানাপ্রকারে উহাকে বানচাল করিয়া দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

'১৯৫৭ সালের জন্য বর্ধিত বোনাস এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুয়িটি এবং পাওনা ছুটির দাবীতে কেরলের পাঁচ শতাধিক চা ও রবার বাগানের মোট আড়াই লক্ষ শ্রমিকের প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক আজ হইতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাধীন দুর্গাপুর বাঁধ এবং সমস্ত সেচ খাল পরিচালনার ভার ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—কেন্দ্রীয় খনি ও তৈল মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য আজ নয়াদিল্লীতে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণের *ফলাফল বর্ণনাকালে বলেন যে, বিহার রাজ্যের বারৌনীতে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপন সম্পর্কে ইউরোপের যে সকল দেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেশ হইতে বিশেষ 'উৎসাহজনক প্রস্তাব' পাইয়াছেন।*

২৭শে অক্টোবর—কেরল রাজ্যের সমস্ত চা ও রবার বাগিচা অঞ্চলের শ্রমিকগণ গত শনিবার যে ধর্মঘট শুরু করিয়াছিল, বিরোধের আপোস মীমাংসার সুযোগ দানের নিমিত্ত উহা অদ্য হইতে এক সপ্তাহ কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্থান সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের নূতন করিয়া ভিসা দিতে অস্বীকার করায় গত দুই দিন ধরিয়া উক্ত ভারতীয়রা ভারতে চলিয়া আসিতেছেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে হইতে জানা গিয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

২১শে অক্টোবর—থাই বেতার হইতে আজ ঘোষণা করা হইয়াছে, বিপ্লবী পার্টি এক আদেশ জারী করিয়া থাইল্যাণ্ডের সকল রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজন ফস্টার ডালেস আজ ফরমোজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রী ডালেস আসিয়াছেন 'শান্তি মিশনে'। তিনি এখানে প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক ও মার্কিন অফিসারদের সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন।

আজ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের সমাজে এখনও যে মাতাল, চোর এবং জুয়াচোর আছে তাহা কেহ না দেখিয়া পারে না। গবর্নমেণ্ট বর্তমানে মাতলামীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি বিল তৈয়ারী করিতেছেন।"

২২শে অক্টোবর—পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান আজ ঢাকার লাট ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "আমাদের দিক হইতে ভারতের সহিত বিরোধীয় বিষয়সমূহের শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক মীমাংসা করার দ্বার সকল সময়েই উন্মুক্ত আছে।

২৩শে অক্টোবর—পাকিস্তানের চীফ সামরিক আইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান নির্দেশ দিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক ভিত্তি যাহাতে পুনরায় সুদৃঢ় হয় এরূপ আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আজ রাত্রে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রকে আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনার ব্যাপারে রাশিয়া কর্তৃক ৪০ কোটি রুবল ঋণ মঞ্জুর করার সংবাদ ঘোষণা করেন।

২৪শে অক্টোবর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীনীল এইচ ম্যাকেলরয় দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইয়া গতকাল করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি তিনদিন পাকিস্তানে থাকিবেন।

তিন দিনব্যাপী ফরমোজা ভ্রমণান্তে জন ফস্টার ডালেস ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। *তিনি বলেন যে, চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাহার আলোচনা খুবই সন্তোষজনক* হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা গতকল্য বারজন সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন এবং জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

একটি নির্ভরযোগ্য মহল হইতে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, নাগা বিদ্রোহীদের নেতা এ জেড ফিজো এই সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল আয়ুব খাঁর সহিত ঢাকায় সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

আট কোটি টাকা মূল্যের চাউল বিক্রয় এবং এ বিষয়ে ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নুর ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট উ উইন মং আজ একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর—বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পূর্ববঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাসমূহে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

গত জুলাই মাসে লেবাননে মার্কিন সেনার আবির্ভাব সম্পর্কে বিশ্বস্তসূত্রে যে সংবাদ বেইরুটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, লেবানীজ বাহিনীর তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল শেহাবের (বর্তমান প্রেসিডেণ্ট) অজ্ঞাতেই মার্কিন সেনারা লেবাননে অবতরণ করিয়াছিল।

২৭শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা অদ্য রাত্রিতে ঘোষণা করেন যে, তিনি জেনারেল আয়ুব খানের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

---

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার | সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

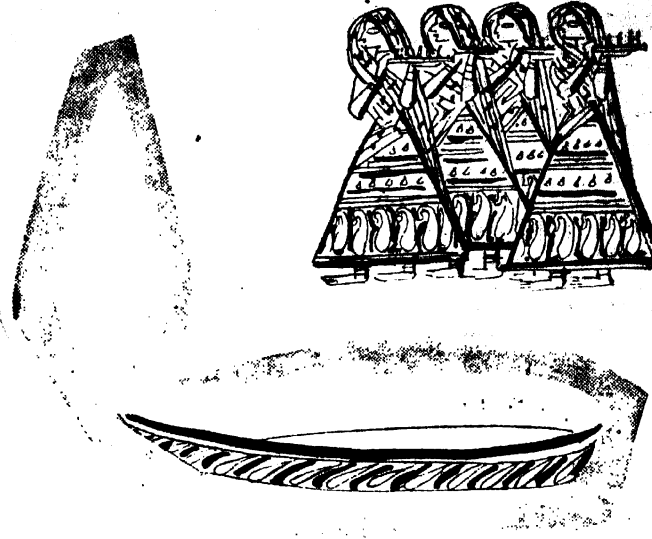
কলিকাতায় বার্ষিক ২০ টাকা, ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

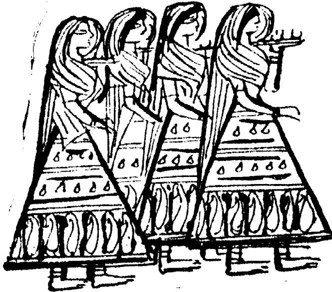
মফস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# দীপালীর জন্য সজ্জিত হোন





আবার এলো দীপাবলীর উৎসব।
পরিচ্ছদ ও সজ্জার জন্য, উজ্জ্বল
বর্ণে, চমৎকার বুনানিতে ও
অপূর্ব্ব নক্সায় সমৃদ্ধ,
অপরাজেয় বস্ত্রসম্ভার হোল
হাতের তাঁতে তৈরী কাপড়

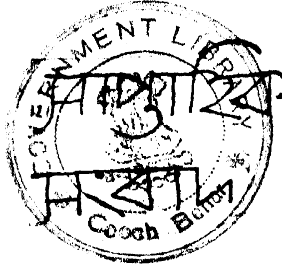
১৯৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত
বিশেষ রেয়াই
প্রতি টাকায় ১২ নঃ পঃ

# হাতের তাঁতে তৈরী কাপড়



অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড
শাহীবাগ হাউস; উইটেট রোড, বোম্বাই

DA 58/249 BEN.



## দেশী সংবাদ

২১শে অক্টোবর—মধ্যচক্র রচনার অভিযোগ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগ যে রিপোর্ট দেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ঐ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্তকারী অফিসার শ্রীমন্মথনাথ মুখার্জি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাক্তন কিউরেটর শ্রীমহীউদ্দিনের উপর নোটিস জারী করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

২২শে অক্টোবর—হালড়ার (২৪ পরগনা) এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, আইনজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। এমন কি হিন্দু মহিলাদের নামেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৩শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু-প্রতীক্ষিত মুনাফাবিরোধী অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উহার নাম হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবিরোধী অর্ডিন্যান্স (১৯৫৮)। এই অর্ডিন্যান্সে রাজ্য সরকারকে ক্রয় বিক্রয়ের প্রতি পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবার এবং মুনাফা শিকারীদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—আজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চারটি প্রস্তাবের খসড়া অনুমোদন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থাপিত হইবে। কেরল, কংগ্রেস সংগঠন এবং কর্মকর্তাদের একসঙ্গে একবারের বেশী পদাধিকার সম্পর্কে এই প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছে।

২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত একটি অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমুদ্রের তীর বরাবর কিছুটা জায়গায় বাউণ্ডারী বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিকট ভুয়া হিসাব দাখিল করিয়া বহু পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাতের এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সম্পর্কে জেলা পুলিস কর্তৃপক্ষ এক্ষণে তদন্ত করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। ঐ ব্যক্তি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং একটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বলিয়া প্রকাশ।

২৫শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুনাফা নিরোধক অর্ডিন্যান্সটি চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার একশ্রেণীর মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর দল নানাকৌশলে উহাকে বানচাল করিয়া দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

১৯৫৭ সালের জন্য বর্ধিত বোনাস এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি এবং পাওনা ছুটির দাবীতে কেরলের পাঁচ শতাধিক চা ও রবার বাগানের মোট আড়াই লক্ষ শ্রমিকের প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক আজ হইতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাধীন দুর্গাপুর বাঁধ এবং সমস্ত সেচ খাল পরিচালনার ভার ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—কেন্দ্রীয় খনি ও তৈল মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য আজ নয়াদিল্লীতে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণের ফলাফল বর্ণনাকালে বলেন যে, বিহার রাজ্যের বারৌনীতে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপন সম্পর্কে ইউরোপের যে সকল দেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেশ হইতে বিশেষ 'উৎসাহজনক প্রস্তাব' পাইয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর—কেরল রাজ্যের সমস্ত চা ও রবার বাগিচা অঞ্চলের শ্রমিকগণ গত শনিবার যে ধর্মঘট শুরু করিয়াছিল, বিরোধের আপোস মীমাংসার সুযোগ দানের নিমিত্ত উহা অদ্য হইতে এক সপ্তাহ কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্থান সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের নূতন করিয়া ভিসা দিতে অস্বীকার করায় গত দুই দিন ধরিয়া উক্ত ভারতীয়রা ভারতে চলিয়া আসিতেছেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

২১শে অক্টোবর—থাই বেতার হইতে আজ ঘোষণা করা হইয়াছে, বিপ্লবী পার্টি এক আদেশ জারী করিয়া থাইল্যাণ্ডের সকল রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজন ফস্টার ডালেস আজ ফরমোজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রী ডালেস আসিয়াছেন 'শান্তি মিশনে'। তিনি এখানে প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক ও মার্কিন অফিসারদের সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন।

আজ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খুশ্চেভ এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের সমাজে এখনও যে মাতাল, চোর এবং জুয়াচোর আছে তাহা কেহ না দেখিয়া পারে না। গবর্নমেণ্ট বর্তমানে মাতলামীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি বিল তৈয়ারী করিতেছেন।"

২২শে অক্টোবর—পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান আজ ঢাকার লাট ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "আমাদের দিক হইতে ভারতের সহিত বিরোধীয় বিষয়সমূহের শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক মীমাংসা করার দ্বার সকল সময়েই উন্মুক্ত আছে।

২৩শে অক্টোবর—পাকিস্তানের চীফ সামরিক আইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান নির্দেশ দিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক ভিত্তি যাহাতে পুনরায় সুদৃঢ় হয় এরূপ আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আজ রাত্রে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খুশ্চেভ সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রকে আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনার ব্যাপারে রাশিয়া কর্তৃক ৪০ কোটি রুবল ঋণ মঞ্জুর করার সংবাদ ঘোষণা করেন।

২৪শে অক্টোবর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীনীল এইচ ম্যাকেলরয় দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইয়া গতকাল করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি তিনদিন পাকিস্তানে থাকিবেন।

তিন দিনব্যাপী ফরমোজা ভ্রমণান্তে জন ফস্টার ডালেস ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা গতকল্য বারজন সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন এবং জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

একটি নির্ভরযোগ্য মহল হইতে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, নাগা বিদ্রোহীদের নেতা এ জেড ফিজো এই সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল আয়ুব খাঁর সহিত ঢাকায় সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

আট কোটি টাকা মূল্যের চাউল বিক্রয় এবং এ বিষয়ে ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নুর ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট উ উইন মং আজ একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর—বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পূর্ববঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাসমূহে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

গত জুলাই মাসে লেবাননে মার্কিন সেনার আবির্ভাব সম্পর্কে বিশ্বস্তসূত্রে যে সংবাদ বেইরুটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, লেবানীজ বাহিনীর তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল শেহাবের (বর্তমান প্রেসিডেণ্ট) অজ্ঞাতেই মার্কিন সেনারা লেবাননে অবতরণ করিয়াছিল।

২৭শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা অদ্য রাত্রিতে ঘোষণা করেন যে, তিনি জেনারেল আয়ুব খানের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

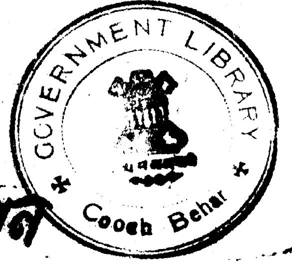
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা: বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

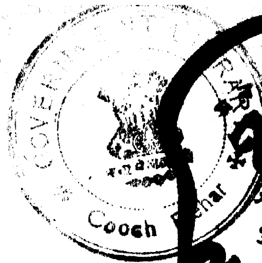
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র



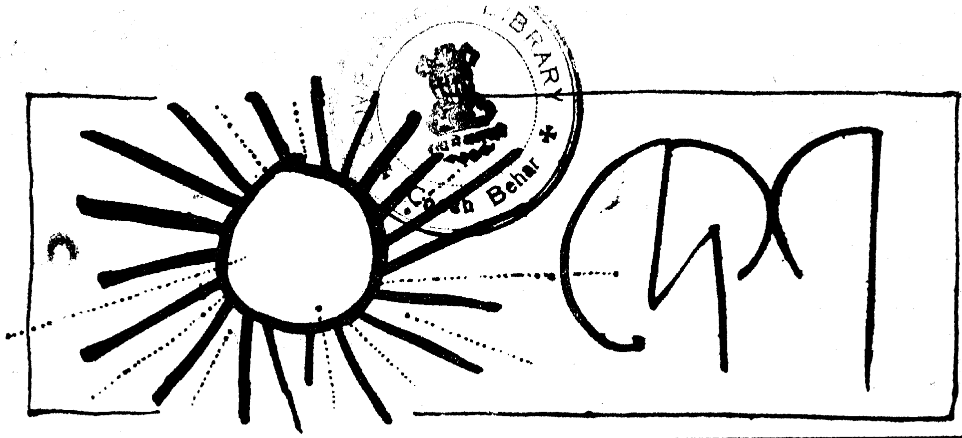

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

# সূচীপত্র



# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 8th November, 1958.

২৬ বর্ষ ॥ ২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২শে কার্তিক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## বিপিনচন্দ্র পাল

বিপিনচন্দ্র পালের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিবার সুযোগ আসিয়াছে।

এই শ্রদ্ধানিবেদন কেবল কর্তব্য-পালন নহে, জাতির পক্ষে এক প্রকারের প্রায়শ্চিত্তও বটে। অকপটে স্বীকার করা ভাল, এই বিরাট মনীষীকে, মুক্তিযজ্ঞের আদিপর্বের অন্যতম প্রধান হোতাকে, আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম।

বিস্মরণে বিস্ময়ের কিছু নাই। আমাদের ইতিহাস-চেতনা দুর্বল। অতীতকে আমরা সহজেই মুছিয়া ফেলি, তাহার গৌরব, কীর্তি, কৃতিত্ব, তাহার লজ্জা, পরাজয়, বিড়ম্বনা—সব কিছু। প্রস্তরে উৎকীর্ণ অনুশাসন পড়িতে পারি না, কেননা প্রাচীন লিপি ভুলিয়াছি। আমাদের সাহিত্য স্থাপত্য সভ্যতারও বহু নিদর্শন বিদেশী পণ্ডিত বা পুরাতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তবে আমরা চিনিয়াছি, কথাটা কলঙ্কজনক, কিন্তু সত্য। এই মানসিকতাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাস সম্পর্কেও আমাদের উদাসীন করিয়াছে। উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গেও একটি বা দুইটি নাম মাঝে মাঝে জপ করি। মনেও রাখি না, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা রাজনীতিতে নবযুগের সূচনা একজন বা দুইজনের প্রয়াসে সম্ভব হয় না, বহুর সাধনার প্রয়োজন।

সেই জাতীয় জাগরণের দীপ্ত অধ্যায়ের একজন বিশিষ্ট পুরুষ বিপিনচন্দ্র: লাল-বাল-পাল—চরমপন্থী রাজনীতির প্রতীক এই ত্রয়ীর অন্যতম। তাঁহার বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাগ্মিতার সহিত মনস্বিতার যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তাহার তুলনা পাওয়া ভার, বুদ্ধিপোজ্জ্বল নেতৃত্বের প্রতি জাতি আনুগত্য জানাইয়াছে।

তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী, যদিও রাজনীতির মধ্যেই তাহার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটিয়াছিল। ধর্ম-সংস্কারে তাঁহার আগ্রহ কাহারও চেয়ে কম ছিল না, আপনি আচরি অপরাকে শিখাইবার ভার তিনি লইয়াছিলেন, সেজন্য কোন বাধা বা সমা-



লোচনাকে গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী, চিন্তানায়ক, ব্যাপকতর অর্থে সাহিত্যকার এবং সাংবাদিক। সাংবাদিকরূপে তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার আয়ু মাত্র একটি দিন বা সপ্তাহ নয়, মাস বা বৎসর অতিক্রম করিয়াও তাহার আবেদন সহস্র হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইত। অস্থায়ীর আধারে তিনি স্থায়ীকে প্রতিষ্ঠা করিবার মন্ত্র জানিতেন।

সকলকে ডাকিয়া একত্র করিবার যাদু তিনি জানিতেন, প্রয়োজন হইলে একাকী দাঁড়াইবার সাহস ও দৃঢ়তাও তাঁহার ছিল। বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায়ে যে আপাত-ব্যর্থতা পরিস্ফুট, তাহার মূলেও আবার এই একলা চলারই দুঃসাহস। অসহযোগের মূলসূত্রটি তাঁহার কল্পনায়ই প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তবু দেশবাসীর আশাআকাঙ্ক্ষা যেদিন অসহযোগের খাত ধরিয়া চরিতার্থতা খুঁজিয়াছে, গণআন্দোলন কূলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছে, বিপিনচন্দ্র সেদিন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইয়াছিল কিনা, সেবিষয়ে রায় দানের ভার ইতিহাসের কিন্তু বিবেকের নির্দেশে যিনি অসামান্য জনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করিতে পারেন তাঁহার উন্নত, নিস্পৃহ ব্যক্তিত্বের নিকট মাথা নত না হইয়া পারে না। উচ্চ চূড়ার অভিশাপ আছে, সে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতাকেই বিপিনচন্দ্র বরণ করিয়াছিলেন। আপনার অন্তরের নির্দেশে সকল মহৎ নেতার জীবনেই প্রশ্নটা কোন না কোন সময়ে জরুরী হইয়া দেখা দেয়। গান্ধীজীর জীবনেও দিয়াছিল এবং জীবনের শেষ-পর্বে তিনি তাঁহার বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য নিঃসঙ্গতাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও মহাত্মাজী ও বিপিনচন্দ্রের মধ্যে এইখানেই বড় এবং বিস্ময়কর মিল: কর্মজীবনে যাঁহাদের পথ ভিন্ন অলক্ষ্য মনশ্চর্যার পর তাঁহারা একই বিন্দুতে পৌঁছিয়াছেন, ইহার মধ্যে ইতিহাসের কোন গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে কিনা কে জানে।

# প্রসঙ্গত

ইংরাজীতে বলি গবর্নর, দেশীয় ভাষায় রাজ্যপাল, কিন্তু কাজটা সঠিক কী, বলা কঠিন। তবে সহজ বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বুঝি, দায়িত্বটা নামমাত্র, শাসনও নয়, পালকও নয়। নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এঁরা সখেদে বলেছেন, নৈবেদ্যের চূড়ার বাতাসাটি হয়ে কিছু সুখ নেই, কাজ চাই।

কাজ চাই। তবে কি এতকাল কাজ ছিল না? সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মাস মাহিনা, উপরন্তু রাজভবনের আসবাব এবং আড়ম্বর ইত্যাদির রক্ষার খাতে বৎসরে চার-পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ (সারা ভারতের হিসাব যোগ দিলে বেশ কয়েক কোটি) অথচ কাজ ছিল না? ছিল বইকি, ছিল। নানা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ছিল, পারিতোষিক বিতরণ ছিল, বড় বড় ক্রীড়ানুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন ছিল। অবশ্য এসব অধিকারও নিতান্ত নিঃসপত্ন নয়, ভাগীদার হিসাবে মন্ত্রী উপমন্ত্রীরা ছিলেন, আছেন। অধিকন্তু রাজ্যপালেরা গুরুত্বের যে কাজকর্ম করে থাকেন, তার মধ্যে একটি হল বিধানসভার অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ (সম্ভবত রচনা নয়), মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশে মন্ত্রী-নিয়োগ এবং আইনসভায় গৃহীত বিলে স্বাক্ষর সংযোগ।

অথচ বংশকুলজি বিচার করে দেখুন, এঁদেরই পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন ক্ষত্রপ বা নবাব, দিল্লীশ্বর-তথা জগদীশ্বরের খাস প্রতিনিধি। সাহেবী আমলে এঁদেরই বলেছি লাটসাহেব, তখনও 'আছিল বিস্তর ঠাট।' এবে বুড়া হয়ে এঁরা কিছু গুঁড়া নিয়ে আছেন; ভারমুক্ত সাহেবেরা কবেই প্রস্থান করেছেন, স্মৃতিভার নিয়ে পড়ে আছেন হালের রাজ্যপালেরা। অতএব এঁরা বলবেন বইকি যে, এত অল্পে সুখ নেই!

দোষ এঁদের নয়। সংবিধান প্রণেতা-দের। ইংরাজী, মার্কিন, ফরাসী ইত্যাদি নানা দেশের নিয়ম থেকে তিল তিল চয়ন করে আমরা আমাদের তিলোত্তম সংবিধান রচনা করেছি, আবার বিদেশী আমলের কাঠামোটাকেও একেবারে বিসর্জন দিইনি। তখনকার বিধিব্যবস্থার অনেকটাই বাতিল হয়েছে কিন্তু গবর্নরের পদটা অন্তত নামে কী করে যেন রক্ষা পেয়েছে। অনেকেই সসংশয় প্রশ্ন তুলবেন, বিপুল অর্থব্যয়ে পুরাণকালের এই নিদর্শনটিকে একালের যাদুঘরে টিকিয়ে রাখার কী সার্থকতা। মার্কিনী নজিরের দোহাই দিয়ে লাভ নেই, ওখানে গবর্নর-নির্বাচন করে জনসাধারণ, এখানে তাঁরা রাষ্ট্রপতির মনোনীত। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যুক্তিও অচল, কেননা রাজ্যে-রাজ্যে নির্বাচিত বিধান সভা, পরিষদ রয়েছে, রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিমণ্ডলী। এর উপরে আবার গবর্নর কেন। অধিকতন্তুটা অনেকের মতেই অপ্রয়োজনীয়, অতএব দোষের। বিশেষ করে ভারতব্যবচ্ছেদের পরে শাসন ব্যবস্থার ঝোঁক যখন কেন্দ্রাভিগ।

দোষের হত না। যদি এই পদটাকে নতুন পরিস্থিতিতে সার্থক করে তোলবার আগ্রহ কেন্দ্রীয় সরকারের থাকত। এই আগ্রহের বিশেষ প্রমাণ আমরা পাইনি। শাসন-পরিচালনায় জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন যতখানি, ঠিক ততখানি প্রয়োজন স্থিরবুদ্ধিমত্তার, অভিজ্ঞতার, বয়সের। দ্বিতীয় দাবীটা যাঁরা মেটাতে পারতেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ, বর্ষীয়ান, অধুনা নির্দলীয় নায়কদের গবর্নরের আসন অলংকৃত করতে আহ্বান করা হয়নি। দৈনন্দিন শাসনে হস্তক্ষেপ এঁরা অবশ্যই করতেন না, কিন্তু এঁদের উপদেশে প্রদেশে প্রদেশে পপুলার সরকারগুলি উপকৃত হতে পারত। প্রবীণ শিক্ষারতীরাও এই কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত হতেন না (বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপালের দৃষ্টান্ত স্মরণীয়)। জন-সাধারণের সমর্থনের ভিত্তিতে স্থাপিত শাসনসৌধে এঁরা ভারসাম্য আনতেন।

কিন্তু অধিকাংশ সাম্প্রতিক নিয়োগে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখছি। এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যেখানে আপন প্রদেশ ক্ষমতার দলাদলিতে বিপর্যস্ত রাজনৈতিক নেতাকে অন্য প্রদেশে রাজ্যপাল করে পাঠান হয়েছে। এর ফলে দলগত সমস্যার হয়ত সুরাহা হয়, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার জোর বাড়ে না। এই "উদ্বাস্তু দলপতিরা" অপর রাজ্যে শ্রদ্ধা এবং প্রীতির কোনটাই পান না।

এই রাজ্যপালেরা আজ অতিরিক্ত কর্তৃত্বের দাবী তুলেছেন। এর গূঢ় একটা কারণও হয়ত আছে। গত নির্বাচনে যার সূচনা, আগামী নির্বাচনে সেটা আরও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতায় আসীন, সব কয়টি রাজ্যে তাঁদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ না-ও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নজর রাখবার জন্য দলীয় একজন উপরিওয়ালা থাকলে সুবিধা হয়।

যাঁরা এই অভিপ্রায়বশে আজ বাড়তি ক্ষমতার কথা তুলেছেন, তাঁরা, বলা বাহুল্য, দলের স্বার্থটাই বড় করে দেখছেন, এবং এর অন্য দিকটা বিবেচনা করে দেখেননি। মনে রাখতে হবে, তখনও প্রতি রাজ্যেই একজন করে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, নির্বাচনের তিলক তাঁদের কপালে। মনোনীত এবং অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত গবর্নরদের সঙ্গে প্রতি পদেই তাঁদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে জয়-পরাজয় যার ভাগ্যেই ঘটুক, গোটা শাসন-ব্যবস্থাই বারংবার বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা নিশ্চয়ই তা চান না।

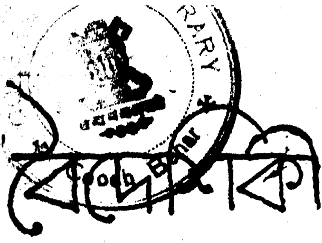
* * *

আলিপুর চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে' ইত্যাদি। বিশেষত মানুষই যখন আজ পর্যন্ত অমৃতের সন্ধান পায়নি, তখন পশুশালায় কয়েকটি প্রাণ-হানির খবর নিয়ে কাগজে-কাগজে এত লেখালেখি কেন।

এই জন্য যে, বনের পশুরা যদি বনে মরত, সেক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্ব থাকত না। ব্যাপারটাকে আমরা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বলে উড়িয়ে দিতে পারতুম। এক্ষেত্রে যাদের মৃত্যু ঘটছে (গত সাত মাসে পঞ্চাশটিরও বেশী) তারা আমাদেরই আশ্রিত; ঠিক আশ্রিত বা পালিতও নয়—বন্দী। অতএব দায়িত্বটাও ঢের বেশি। প্রমোদের জন্য, খানিকটা জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনেও, যাদের আমরা খাঁচায় পুরেছি বা ঘেরা বাগানে রেখেছি তাদের প্রাণরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্বই আমাদের। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে যদি একের পর এক প্রাণীর প্রাণহানি ঘটে, তবে আশঙ্কার কারণ অবশ্যই আছে, যেমন আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি এই শহরেই ওলাউঠা মহামারী আকারে দেখা দিলে, এবং প্রতিকারে তৎপর হয়ে পড়ি।

ব্যবস্থার ত্রুটি হয়ত আছে, আছে বিবেচনাহীন দর্শকের নিষ্ঠুরতা। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন, সমস্ত রক্ষণপদ্ধতিটাই ঢেলে সাজা কর্তব্য। তাঁরা অন্যান্য স্থানের খোলা পশুশালা, স্যাংচুয়ারি ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। পরামর্শ উত্তম এবং আমরাও মানি যে, স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ পরিবেশেই পশু-পাখিদের প্রাণ-ধারণের পক্ষে অনুকূল।

তবু, মনে হয়, গলদ অন্যত্র। এই চিড়িয়াখানার বয়স কম নয়, বহু বছর ধরে এই কৃত্রিম পরিবেশেই নানা প্রাণী সহস্র সহস্র দর্শকের কৌতূহল মিটিয়েছে। কিন্তু এমন পাইকারী হারে মৃত্যুর কথা কখনও শোনা যায়নি। আমূল সংস্কার হয়, ভালই, কিন্তু সেটা পরের কথা। বিপদটাকে আশু রোধ করার উপায়ই সর্বাগ্রে চিন্তনীয়।



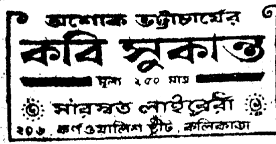
জন নামকরা ইংরেজ আইনজবী ইস্কান্দর মির্জাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন বলে সংবাদও মির্জাআয়ুব "ক্যু"এর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তখন এই ধারণা সৃষ্টিরই চেষ্টা হয়েছিল যে, ইস্কান্দর মির্জা অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনবেন। ইংরেজরা মির্জার প্রাধান্যের অনুকূলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মির্জা ● আয়ুব খান একজন ইংরেজ এবং অন্যজন

ইস্কান্দর মির্জাকে ইংলণ্ডে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অথবা বলা যায় যে, তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁকে প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে টেনে নামিয়ে জেনারেল আয়ুব খান যখন কোয়েটায় পাঠান, তখন থেকেই মির্জা সাহেব প্রকৃতপক্ষে বন্দী ছিলেন। তিনি যে পাকিস্তানের বাইরে যেতে পারলেন এটাও তাঁর সৌভাগ্য বলতে হবে, তবে সে সৌভাগ্য নিশ্চয়ই কোনো তৃতীয় পক্ষের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। কারণ, তা নাহলে আয়ুব খান তাঁকে এত তাড়াতাড়ি পাকিস্তানের বাইরে যেতে কখনই দিতেন না। যাঁর বা যাঁদের কথা আয়ুব খান অগ্রাহ্য করতে পারেন না, আবার যাঁর বা যাদের কথায় মির্জা সাহেবও কোনো সর্ত স্বীকার করলে তা সহজে ভংগ করতে সাহসী হবেন না, এমন তৃতীয় পক্ষ এক্ষেত্রে হয় মার্কিন অথবা ইংরেজ হতে পারে।

কিন্তু মির্জা সাহেবের সঙ্গে নানা কারণে ইংলণ্ডেরই সম্পর্ক বেশি, তিনি হয়ত ইংলণ্ডেই বসবাস করতে মনস্থ করেছেন। মনে হয় ইংরেজের মধ্যস্থতায়ই মির্জা সাহেব পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেনে। আয়ুব খানের চেয়ে মির্জা সাহেবের সঙ্গেই ইংরেজদের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। পাকিস্তানে একেবারে নির্জলা মিলিটারী শাসন হবে এটা ইংরেজদের ভালো লাগে নি। পাকিস্তানকে একজাতীয় ইংরেজ একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখে, কারণ পৃথক রাষ্ট্রের জন্য মুসলিম লীগের দাবীকে সমর্থন করে তারা পাকিস্তান সৃষ্টির সহায়তা করেছে। তাদের সেই স্নেহপুষ্ট কমনওয়েলথের ভিতরে প্রথম রাষ্ট্র যেখানে গণতন্ত্রের বিলোপ এবং মিলিটারি ডিক্টেটরশিপের অভ্যুদয় হোল। এতে ইংরেজের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। অন্তত নামকেওয়াস্তেও যদি মির্জা সাহেব প্রেসিডেণ্ট থাকতে পারতেন তাহলেও পাকিস্তানীর ইংরেজ দরদীদের একথা বলার সুযোগ থাকত যে, পাকিস্তানে যা ঘটেছে সেটা পুরোপুরি সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নয়, প্রেসিডেণ্ট মির্জা যত শীঘ্র সম্ভব মিলিটারির হাত থেকে শাসনক্ষমতা প্রত্যাহার করে আবার অসামরিক গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। নূতন শাসনতন্ত্র কীরূপ হলে পাকিস্তানের উপযোগী হবে সে বিষয়ে এক-





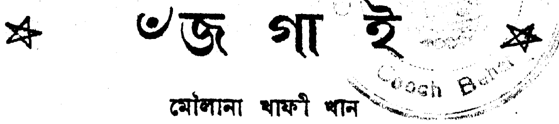



আমেরিকার সঙ্গে বেশি যোগ রেখে চলেছিলেন। অবশ্য মূল ষড়যন্ত্রে উভয়েরই আমেরিকার সম্মতির প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানতেন ভিতরে ভিতর কী হচ্ছে। কোনো কোনো ইংরেজ ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শদাতার ভূমিকাও গ্রহণ করে থাকবে।

তবে এ ব্যাপারে মার্কিন কর্তৃপক্ষের প্রভাবই বেশি ছিল বলে অনুমান করা অন্যায় হবে না। পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক মিশন রয়েছে। মার্কিন সামরিক সাহায্য কী ভাবে পাকিস্তানে কাজে লাগানো হচ্ছে, তার তদারক করার জন্য মার্কিন পর্যবেক্ষক এবং পরামর্শদাতা পাকিস্তানে রয়েছে। মার্কিন প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্যও বহুসংখ্যক মার্কিন শিক্ষক ও "বিশেষজ্ঞ" পাকিস্তানে আছে। "ক্যু" অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে পাকিস্তানে সৈন্য সামন্ত নানাভাবে যে চলাচালি করা হয়েছে, তা আয়ুবখান নিজেই স্বীকার করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই যে প্রস্তুতি চলছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এসব খবর আমেরিকানরা নিশ্চয়ই জানত। তারা মির্জা-আয়ুবকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছে কি না সে বিষয়ে কিছু বলা না গেলেও তাদের সম্মতি ছাড়া যে মির্জা-আয়ুব "ক্যু" সংঘটিত হয় নি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে সময়ে মির্জা এবং আয়ুবখান একযোগে কাজ করলেও আয়ুবের সঙ্গেই আমেরিকানদের গভীরতর যোগ ছিল, এরূপ মনে করা অসংগত হবে না। আয়ুব খানই শেষ পর্যন্ত একক কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন, গোড়া থেকেই এরূপ পরিকল্পনা থাকাও অসম্ভব নয় এবং আমেরিকানদের কাছেও সেটা হয়ত অজানা ছিল না।

পাকিস্তানে আমেরিকার মুখ্য স্বার্থ সামরিক। প্রধানত সামরিক সাহায্যের সূত্রেই আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তান গ্রথিত। সুতরাং পাকিস্তানী সামরিক কর্তাদের সঙ্গেই আমেরিকার বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা হওয়া স্বাভাবিক। বৃটেনের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগটা তার চেয়ে জটিল বটে, কিন্তু আমেরিকার টাকা এবং সামরিক সাহায্যের পাশে সেটা দেখতে ক্ষীণ। মার্কিন সরকারের পক্ষে আয়ুব খানের নিছক সামরিক শাসন কোনো দোমনা ভাব সঞ্চার না করতে পারে, কিন্তু ইংরেজের বেলায় ঠিক সেরকম হওয়া সম্ভব নয়। আয়ুব খানের ডিক্টেটরির প্রতি ইংরেজেরা সম্পূর্ণ বিমুখ হতেও পারছে না, আবার তার প্রতি পুরো সাদর ভাবও তাদের হওয়া কঠিন। এ অবস্থায় মির্জার প্রতি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহানুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। মির্জা যদি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন যে তিনি পাকিস্তানের বাইরে গিয়ে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে "গ্যারাণ্টি" দিয়ে থাকেন তাহলে মির্জার পাকিস্থান ত্যাগে আয়ুব খানের পক্ষে আপাতত সুবিধাই হোল।

৪-১১-৫৮




**মৌলানা খাফী খান**

আজ্ঞে না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বলতে যা বোঝায়, উনি কোনদিনই তা হয়ে ওঠেন নি। ও দিকটায় ও'র নজরই পড়ে নি। যদি পড়ত, তা হলেও যে উনি হতেন এমন কথাও বলছি না। কারণ, প্রতিষ্ঠা সত্যি সত্যি কী এবং কত বিভিন্ন উপায়ে তা লাভ করা যায়, তার মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয় কোন্‌টা হেয় এইসব খুঁজে বার করতে করতেই হয়তো ও'র কর্মজীবন পার হয়ে যেত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠা আর ও'র হত না।

ঐ করে ও'র বিয়েই হল না। ভালবাসা নামে যে জিনিসটা দুনিয়ায় চলছে, তার মধ্যে যে শতকরা নব্বইভাগ ভেজাল, তার মধ্যে কীটের মত, অদৃশ্যপ্রায় বীজাণুর মত লুকিয়ে আছে বংশবৃদ্ধির অভিপ্রায়, বার্ধক্যে আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং আরও কী কী, এই নিয়ে গবেষণায় ও'র মন এত মত্ত থাকত যে, প্রেম ভয়ে তার কাছ ঘেঁষতে সাহস পেত না।

বন্ধুবান্ধব বলতেন, "আচ্ছা ধরেই নাও কতকগুলো অবান্তর ইচ্ছা লুকিয়ে আছে ভালবাসার মধ্যে। তাই বলে মানুষ তার মনের ধর্মকে অস্বীকার করবে?"

উনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতেন, "দেখ, কতকগুলো আবছায়া আবছায়া গোছের কথা দিয়ে স্পষ্ট সত্যকে আড়াল দিতে চেও না। যদি বল বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির দরুণ বিয়ে করা প্রয়োজন, বলো না সেকথা খোলাখুলি, যেমন প্রাচীনেরা বলতেন এবং আজও বলেন সেইসব দিদিমারা যাদের ওষ্ঠে এখনো ম্যাক্স ফ্যাক্টরের তাম্বুল চড়ে নি। ওগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে তাতে প্রেমের প্রলেপ লাগাও কেন?"

"প্রলেপ বলছ কেন? প্রেম বলে কি সত্যিই কিছু নেই?"

"কে বললে নেই? না যদি থাকত তবে ভেজাল জিনিসটার কাটতি বজায় রাখবার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি দালাল আর বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হত না। আসলটা আছে বলেই মেকীটাকে ঠিক আসলের রঙে রঙাবার এই প্রচণ্ড অপচেষ্টা—"

এমনি আলোচনায় কেটে যেত দিনের পর দিন, বসন্তের পর বসন্ত। খাঁটি ভালোবাসা কী সে যে একলা উনিই বোঝেন এবং দুনিয়ার আর সবাই যে মিথ্যা মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে ভালবাসার শুভ্র দিগন্তের উন্মুক্ত পথ ছেড়ে চলেছে শুকনো বালির তেপান্তরে, এইটে বোঝাতে বোঝাতেই কেটে গেল ও'র কৈশোরকের বয়স। তবু গবেষণা ও'র শেষ হল না।

ব্যবসায় জীবন তো ও'র মূলেই বিনাশ হয়ে গেল।

বাঙালী ব্যবসা বোঝে না, এইরকম একটা ধারণা বিদূরিত করে দেবার মানসে উনি ব্যবসা জিনিসটাকে বোঝবার চেষ্টা একবার করেছিলেন। দেখলেন, সবচাইতে সহজ ব্যবসা সস্তাদরে কিনে চড়াদরে বিক্রি করা।

শতকরা নিরেনব্বই জন এই তথ্য আবিষ্কার করার সংগে সংগে কিছু একটাতে জুটে যেত—কাপড়ের দালালি বা সুপুরি আমদানী কিম্বা লোহা-লক্কড়ের বাজারে হন্দরের দরের হিসেব নেওয়া।

---

কিন্তু আমাদের উনি গোড়াতেই তর্ক তুললেন, কী করে হবে? সস্তাদরে কিনে চড়াদরে বিক্রি করেই যদি গ্রাসাচ্ছাদন জুটে যায় তবে সবাই ঐ ব্যবসাই করে না কেন? মজুর কলে খাটে কেন? চাষী কেন অযথা বর্ষায় ভিজে এক হাঁটু কাদা ভেঙে ক্ষেতে লাঙল দেয়? কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই যার দরুণ সবাই ব্যবসায় নামতে পারে না এবং সেই কিছুটা না জেনে ও-কাজে হাত দেওয়া স্রেফ গোঁয়ার্তুমি, মুর্খমি।

আরম্ভ হল ও'র ঘোরাঘুরি। প্রথমে খুচরো বাজারে, তারপর পাইকারদের আড়তে আড়তে। তারপর হাটে, গঞ্জে, জাহাজের খোলে। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে। ক্রমে ক্রমে কমার্শ্যাল লাইব্রেরী, পরিসংখ্যান দপ্তর, ইউনিভার্সিটি বেয়ে উঠতে লাগলেন উনি স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, তর থেকে তমের দিকে।

যেকালে উনি বাজারের তেজী-মন্দা ব্যাপারটাকে লগ্যারিথমিক গ্রাফের সাহায্যে কতকগুলি গণিতসূত্রের জটিল জালে আবদ্ধ করে ফেলছিলেন, সেই সময় মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী বন্ধুবান্ধবদের দুটো একটা সৎপরামর্শ দিতেন। একবার হেসিয়ানের দুর্দিনে হঠাৎ আড্ডায় হাজির হয়ে বন্ধুদের বললেন, "ওহে, রাতারাতি বেশ খানিকটা ৪০ ইঞ্চির ডেলিভারী অর্ডার হাত করো দেখি—পারলে আজই, এখুনি। খবরদার, স্যাকিংএর ধারে ঘেঁষো না। মার এখনো খাবে না, সে অবস্থা এখনো আসে নি—তবে না হক বেশীদিন ধরে রাখলে ডিফারেন্স দিতে হতে পারে।"

কথাটায় কেউ বড় একটা কান দিলে না। কিন্তু দৈবজ্ঞের নির্দেশ অনুযায়ী যারা ফাটকা খেলত, তাদের একজনের মনে খটকা লেগে গেল। সে বললে, 'ওহে আনাড়ির পরামর্শ ফেলতে নেই। স্বয়ং বিধাতাপুরুষ ওদের মুখ দিয়ে খাঁটি খবর চালাচালি করেন। চীনা ফকিরের নাম করে চলো বেরিয়ে পড়ি. আঙুল নেড়ে বাজারটা একবার যাচাই করে আসি।'

বেশ কিছু কামিয়ে নিলে বন্ধুরা সে যাত্রায়। একজন উৎসাহী ও'কে বললে, "তোমার পয় আছে হে। নেবে পড়ো ব্যবসায় দুর্গা বলে। বিলম্বে কী ফল?"

কিন্তু সাধনমার্গের অত নিম্নস্তরে

উনি প্রয়োগের দ্বারা তপোবন খোয়াতে রাজী হলেন না। অনুসন্ধান অব্যাহত থাকল। তারপর একদিন বললেন, "এউরেকা!"

বন্ধুবর্গ প্রীত হয়ে বললেন, "ইণ্ডিয়ান আয়র্ন কিছু ধরে রেখেছিলে বুঝি?"

উনি বললেন, "শোষণ! মাল হাত বদলাবদলির দরুণ লাভালাভ হচ্ছে ডাল-পালার ব্যাপার—মূলে হচ্ছে শোষণ। কার্ল মার্কস জিনিসটার আঁচ পেয়েছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে, আমি গরুরে পেছন নিয়েছি একেবারে খুচরো বাজার থেকে।"

অতএব ব্যবসা বাতিল হয়ে গেল। বন্ধুরে অনেক বোঝাল। বলল, যা বলছেন উনি তা যদি সত্যিও হয় তবু একা ও'র ভিড়ের বাইরে থাকায় কলাবেচার কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে? রথ তো আর তাতে থামবে না।

উনি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তোমরা বিদ্যাসাগরের বংশধর!"

শেষ বয়সে বিজ্ঞানে অদ্বৈতবাদ নিয়ে খুব হৈ-চৈ করেছিলেন।

বলতেন, জগতের বৈচিত্র্যটাকে বিবিধ তপ্ত-কটাহে সেদ্ধ করে উবিয়ে দেবার এত চেষ্টা কেন হে? অনোরনীয়ান মহতো-মহীয়ান্ ছোট-বড় দানার এই বিশ্বখানাকে একটা অঙ্কের এক সুতোর মালায় গেঁথে অখণ্ড সত্য করস্থ করবে অজরামর? ভুলেও ভেব না তা। যথা—

ওটা তোমার সত্য
তোমার সত্য, নয় স্বয়ম্ভূ
ব্রহ্মপত্র

তোমার চিন্তাজালে যেটুকু জড়াতে পারো তাই সত্য, বাকি বেবাক ফাঁকি মিথ্যে মায়া—এ অঙ্ক অঙ্ক নয়, গোঁজামিল। সহজ বস্তু বুঝে নাও বাছা, অহমিকায় জড়িয়ে আছ, তাই ভাবছ, যেমন তুমি একানোড়ে জগৎটাও তাই, তোমারই দেখা-দেখি। ও পথ ছাড়। কাঠখোট্টা টয়টোনিউম ছেড়ে এস তের পার্বণ তেত্রিশ দেবতার হিঁদুর দেশে, দু চোখ কেন সহস্র-লোচন মেলে দেখ, দেখবে না দশদিক জুড়ে কেমন করে অসংখ্য মিলে গড়ে তুলছে অসংখ্য?

শ্মশানবন্ধুরা স্বীকার করল, স্মৃতিস্তম্ভ তোলার চেষ্টা করে লাভ নেই। কে দেবে চাঁদা?

উনি বলতেন, বলে-ফেলা ভাবনাগুলো এমনিও মরবে না, অমনিও মরবে না, রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে যাবে এর মনে ওর মনে। কখনো ভাসবে, কখনো ডুববে, কখনো ফুলে ফলে দুনিয়া ভরে দিয়ে আঘ্রাণ-আকন্ঠ করবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। স্তম্ভ আবার কিসের?

## প্র তি চ্ছ বি

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ছবিটা মন্দ হবে না—
তুলতে পার ফ্ল্যাশ্‌বাল্‌বের ক্যামেরায়।
ছাপতেও পারো সাময়িকীতে।
বহবা মিলবে,
হয়ত, কিছু মুজরোও।

পাটবোঝাই ঐ নৌকোটাকে,
যতই জবরজং হোক,
হাজির রেখো সামনে।
তারপর বাঁকের মুখে
মোটা নিবের ধ্যাব্‌ড়া দাগের মত
সেখানে ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে লোকটা,
প্রায় নুয়ে পড়েই গুন টানছে—
মাথায় বাবলা-সোঁদালের ফুলঝুরি,
মাজায় ঘাসের চাদরের বেড়—
ব্যস্‌, ঐ পর্যন্তই—
ওখানেই দাও বোতাম টিপে।

নীল নদীর সঙ্গে
আপনি আসবে আকাশটুকু
হাল্‌কা মেঘের পাপড়ি-কাটা।
তার জন্যে বাড়তি আয়োজনের দরকার নেই।
চাই কি,
বালিহাঁসের ঝাঁকও একটা মিলে যেতে পারে,
হঠাৎ ছুড়ে-দেওয়া মালার মত
হঠাৎ উড়ে-আসা।
অসম্ভব নয়।

মন্দ হবে না সবটা মিলিয়ে।
কোনো কাগজে দিলে—
তারিফ যে হবেই,
এটুকু অন্তত বলতে পারি।
তেমন কোনো রূপমুগ্ধার
মুগ্ধ দৃষ্টির সোহাগ পেলে
আদরের ফ্রেমে আটকও পড়তে পারে
শোয়ার ঘরের দেওয়ালে।
তা-ই বা এমন আশ্চর্য কি!

কিন্তু খবরদার,
ভুলেও মুখোমুখি হয়ো না ওর।
এমন কি, ঘেঁষতে চেয়ো না ধারে-কাছেও।
স্রোত-বাতাসের প্রতিকূলতায়
হাজারমনী পাটের নৌকোর যে-ভার
তার পরিমাণ ছাপে না
কোনো ক্যামেরা।
সৌখীন হাওয়াই শার্টে-মোড়া
লিকপিকে শহুরে বুকেও
এতটুকু আঁচড় কাটে না তার।

দুজনের উপলব্ধিতে বড় বেশী তফাত।

## শাঁ খ - বা জা নো র আ গে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সন্ধ্যা কি তেমন ভালো, রাত্রি যদি দ্রুত নেমে আসে—
দুদণ্ড রাঙানো গাছ মুহূর্তের অকল্পিত সিঁড়ি
তোমাকে অলক্ষ্যে এনে, নিয়ে যায় দূরের প্রবাসে—
যা থাকে, পথের বাঁকে, রহস্যের রঙে অশরীরী।

অথচ, তোমাকে চাই, হে আকাশ, গোধূলি-বিলীন
নদীর একাগ্র রং আলো আর অন্ধকারে ঘেরা,
আমার প্রিয়ার চোখে চোখ রাখে পলাতক দিন—
কারা যায়! ছায়া-ছায়া মুহূর্তের বাগানের বেড়া।

সন্ধ্যা কি তেমন ভালো, যদি এক মুহূর্তের ঘোরে
আমাকে সমস্ত দিয়ে সমস্তই কেড়ে নেয় পরে॥

# বরিস পাস্তেরনাক

**চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**



**আধুনিক** রাশিয়ান সাহিত্যের ইতিহাসে নানা কারণে বরিস পাস্তেরনাকের নাম বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর রচনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ খুবই কম। অনুবাদ ব্যতীত তিনি বারো তেরোটি মৌলিক গ্রন্থের লেখক। এদের মধ্যে অধিকাংশই কবিতার বই। কিন্তু মোট গোটা পঁয়ত্রিশেক কবিতা ও কয়েকটি গদ্য রচনার অংশবিশেষ মাত্র ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। খুব সম্প্রতি তাঁর প্রায় দু লক্ষ শব্দ সমন্বিত সুদীর্ঘ উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' প্রকাশিত হয়ে য়ুরোপ আমেরিকায় যে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছে তার তুলনা বিরল। বিরল এইজন্য বলছি যে, এ বইয়ের মৌলিক গুণাবলী অপেক্ষা সমালোচকদের প্রচার নোবেল কমিটিকে হয়ত বেশী করে প্রভাবান্বিত করেছে, এই অভিযোগ একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। যাই হোক, পাস্তেরনাক একটি উপন্যাসই লিখেছেন; সুতরাং 'ডক্টর জিভাগো' পড়ে ঔপন্যাসিক হিসাবে আমরা তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছি। সুইডিশ অ্যাকাডেমি পাস্তেরনাককে পুরস্কার দিতে গিয়ে তাঁর কবি-প্রতিভার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অল্পকয়েকটি অনুবাদ কবিতা থেকে তাঁর কবি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

১৮৯০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি মস্কো শহরে বরিস লিওনিদোভিচ্ পাস্তেরনাক (Boris Leonidovich Pasternak) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম লিওনিদ, মা'র নাম রোজা। বাবা ছিলেন রাশিয়ার সুপরিচিত চিত্রশিল্পী। তলস্তয়ের উপন্যাসের ছবিগুলি প্রায় সবই তাঁর আঁকা। এই ছবিগুলি তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ। পাস্তেরনাকের মা-ও ছিলেন শিল্পী। পিয়ানো বাদক হিসাবে তাঁর বেশ নাম ছিল। শিল্পকলার এই পরিবেশ পাস্তেরনাককে অল্প বয়স থেকেই প্রভাবান্বিত করেছে। কয়েক বৎসর তিনি সংগীত চর্চা করেছিলেন।

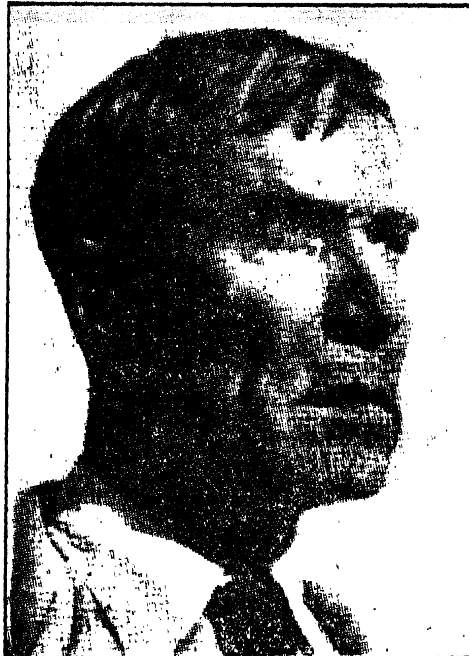
স্কুলের পড়া শেষ করে পাস্তেরনাক আইন পড়বার জন্য মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বাস্তব জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত আইনের কূট তর্ক তাঁর বেশী দিন ভালো লাগল না। তাঁর ভাবুক মন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি আইন পড়া বন্ধ করে জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পড়তে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানীতেই ছিলেন পাস্তেরনাক।

পাস্তেরনাকের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ A Twin in the Clouds প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। কিন্তু তাঁর রচনা সমাদৃত হয় যুদ্ধের পরে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত Life, my sister কাব্যগ্রন্থটি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাশিয়ার তরুণ কবিদের অন্যতম হিসাবে তিনি শীঘ্রই স্বীকৃতি লাভ করেন। পাস্তেরনাক নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কাব্যরূপ দেন Spektorski (1926) নামক গ্রন্থে। The Year 1905 (1926) ও Lieutenant Schmidt (1927) পাস্তেরনাকের দুটি মহাকাব্য। Themes and Variations (1923), On Early Trains (1943) এবং The Terrestrial Expanse (1945) তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত The Second Birth নামক কাব্যসংকলনে ককেশাস অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাধান্য লাভ করেছে। Above the Barriers প্রথমে বেরিয়েছিল ১৯১৬ সালে। পরে এ বইয়ের নতুন সংস্করণে ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতার নির্বাচন প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১২ সালে পাস্তেরনাক কিউবো-ফিউচারিস্ট (Cubo-Futurist) শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সমালোচকরা তাঁকে ফিউচারিস্ট কবি হিসাবে উল্লেখ করেছে। প্রকৃতপক্ষে পাস্তেরনাককে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত কবি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। একথা অবশ্য সত্য যে, সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ফিউচারিজমের আদর্শ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সিম্বলিজম, ফিউচারিজম, ইম্প্রেশানিজম প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনায়। গদ্য ও কাব্য—এই উভয় প্রকার রচনাতেই ইম্প্রেশানিজমের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী।

সাহিত্যে ফিউচারিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন ইতালিয়ান কবি মারিনেত্তি। ১৯১৪ সালে তিনি রাশিয়া ভ্রমণে আসেন। তিনি প্রচার করেন, যুদ্ধই পৃথিবীর স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। অতীত হল আমাদের সমাধি, তার জন্য মায়া করে লাভ নেই। সামনে এগিয়ে যাবার মধ্যেই সংসারের সকল সৌন্দর্য।

রাশিয়ান ফিউচারিস্ট কবিরা যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। ছোটখাটো আরো কতকগুলি



বরিস পাস্তেরনাক

বিষয়ে মারিনেত্তির আদর্শের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল। কৃষক-কবি এসেনিন অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে যন্ত্রপাতিকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। অতীতকে অস্বীকার করবার কথাও তাঁর মনে হয়নি। রাশিয়ান ফিউচারিস্ট গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নেতা ও কবি ছিলেন মায়াকোভস্কি। তাঁর রচনা সমসাময়িক অনেক কবিকে প্রভাবান্বিত করেছে। পাস্তেরনাক ছিলেন তাঁর বন্ধু। মায়াকোভস্কির আত্মহত্যার বিবরণ দিয়ে পাস্তেরনাকের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু মায়াকোভস্কির রচনা পাস্তেরনাকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

রচনা ও মননের বিশিষ্টতায় পাস্তেরনাক একক। সমসাময়িক কবিরা যখন রাষ্ট্র-বিপ্লব, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদির উপর কাব্য রচনা করছেন তখন পাস্তেরনাক মানব-জীবনের বৃহত্তর সমস্যা, হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিশ্লেষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রসোপলব্ধি নিয়ে মগ্ন। নতুন

দেশ গড়বার উন্মাদনায় প্রত্যেকটি লোক অবিশ্রাম কাজ করে চলেছে; সাহিত্যেও পড়েছে সেই কর্মোন্মাদনার প্রভাব। এই কর্মব্যস্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পাস্তেরনাক অনেকটা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না এমন নয়। ১৯০৫ সালের ঘটনাবলী এবং সেবাস্তোপোল বিদ্রোহের আদর্শবাদী নেতা লেফটেন্যাণ্ট শ্মিডকে নিয়ে তিনি মহাকাব্য রচনাও করেছেন। আত্মজীবনীমূলক কাব্য 'স্পেকটরস্কি'-তে জারের বিরুদ্ধাচরণ করে যারা প্রাণ দিয়েছে সেইসব বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠবে এমন সুদৃঢ় প্রত্যয় পাস্তেরনাকের রচনায় পাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার মধ্যে কিছুটা কবিত্ব আছে। বিপ্লব ও বিদ্রোহের এই দিকটাই বিশেষ করে পাস্তেরনাককে আকৃষ্ট করেছে। অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি বিপ্লবের পূজারী ছিলেন না; বিপ্লবের স্বর্ণসম্ভাবনা সম্বন্ধেও তাঁর কাব্যে প্রত্যয়শীলতা সুস্পষ্ট নয়। এসেনিনের মতো তিনি বলতে পারেননি যে, রাশিয়ানরা হল fishers of the Universe. বর্তমান ধ্বংসের উপরেই যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এমন কথাও জোরের সঙ্গে তিনি বলতে পারেন নিঃ

Under the plough of the storm
The Earth crumbles.

* * *

A new Sower
through the fields is going
and new seeds
in furrows he's throwing.
— Esenin.

ভবিষ্যৎ সাফল্যের কথা যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানেও পাস্তেরনাক যুদ্ধ ও বিপ্লবের ধ্বংসলীলার কথা ভুলতে পারেন নি। 'ট্র্যাজিক টেল' কবিতায় তিনি বলছেন যে, বিধ্বস্ত রাজধানী একদিন নবরূপ নিয়ে গড়ে উঠবে, অনেক অবিচারের প্রতিকার হবে; কিন্তু যে-সব শিশু অনাথ হয়েছে, যে-সব নারী বিধবা হয়েছে, যারা পঙ্গু হয়েছে, তাদের বেদনা দূর করবার কোনো উপায় নেই। এদের বেদনা বৃহত্তম সাফল্যকেও চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করে রাখবেঃ

And time will see our hopes fulfilled
the witnesses will die at length,
but the image of the crippled children,
will never lose its awful strength.

পাস্তেরনাক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবি। জনতার সঙ্গে মিলে যাবার মনোবৃত্তি তাঁর কবিতায় বড় নেই। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন। এছাড়া, তাঁর আগ্রহ নেই কর্মস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার। বরং কর্মের পশ্চাদ্বর্তী তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে তাঁর ভালো লাগে;—বসে বসে দার্শনিকের ভাবনা। তিনি বলেছেনঃ "in times of quick tempo 'tis best to think slowly." সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা পাস্তেরনাককে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করতে পারেনি। মানুষের চিরন্তন অনুভূতির মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশী। রাজনীতি সম্পর্কিত যে ক'টি রচনা আছে সেগুলি পাস্তেরনাকের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না।

তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য পাস্তেরনাকের কবিতা সর্বত্রগামী হতে পারেনি। সমাজের উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী পাঠকদের মধ্যেই তাঁর কবিতা সমাদৃত হয়েছে। তাঁর কবিতা দুরূহ ও অস্পষ্ট; বারবার পড়ে রসোপলব্ধি করতে হয়। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কবিতা এলিয়ট ও রিলকের রচনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পাস্তেরনাক শক্তিধর কবি, সন্দেহ নেই। সমসাময়িক রাশিয়ান কাব্যসাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছেন। ভাব ও আঙ্গিক—এই উভয় দিক থেকেই তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। তিখোনভ, কিরসনভ, আন্তোকোলস্কি, জাবোলোতস্কি প্রভৃতি কবিদের রচনায় পাস্তেরনাকের প্রভাব পড়েছে।

পাস্তেরনাকের কবিতায় যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হল রূপক ও উপমার চমকপ্রদ নতুনত্ব। স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তুলে নিয়ে নতুন পরিবেশে বস্তু বা দৃশ্যকে স্থাপন করাতেই তাঁর আনন্দ। এর ফলে পরিচিত জিনিস নতুন অর্থ লাভ করে। এই স্থানবদলের কৌশল সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেনঃ

'The impressive power of Pasternak's work consists precisely of his capacity to displace shapes, categories, things and colours—and to create a reality which the phenomena of this world are simply a pliable material for transformation and experimental changes.'

পূর্বেই বলেছি, পাস্তেরনাকের অল্প কয়েকটিমাত্র কবিতার ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোধ হয় "হাওয়ার দোলায়" কবিতাটি; অনুবাদ করেছেন সি এম বাওরা। এই কবিতাটি

থেকে পাস্তেরনাকের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারেঃ

কবি নিজের হৃদয়কে একটি বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুঃখময় জীবনের লক্ষ লক্ষ নীল অশ্রুবিন্দু এই বাগানের মাটিকে উর্বর করে তুলেছে। আজ শুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। ভিজে পাখির মতো গাছের শাখায় দুলছে নিঃসঙ্গ একটি ফুল। আমার হৃদয়ের শাখায় তুমি দুলছ অমনি করে। স্মৃতির বোঁটায় তোমাকে ধরে রেখেছি। সংসারের ঝড় এই ক্ষীণ বন্ধনটুকু কি একেবারেই ছিন্ন করে দেবে?

সারারাত তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে জানালায় মৃদু আঘাত করেছ। জীবনে কত বাধা, তাই ঘরে আসতে পারোনি। কিন্তু স্মৃতির সাগর পেরিয়ে কী আশ্চর্য সুগন্ধ ভেসে এসে আমাকে পাগল করেছে আজ! এ কি ফোটা ফুলের সুবাস, না তোমার দেহের সুগন্ধ? রুদ্ধদ্বার তোমাকে ফিরিয়েছে, কিন্তু স্মৃতির সুবাসকে ঠেকাতে পারল কই?

বিপ্লবের পরিবেশে থেকেও সে সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন পাস্তেরনাক। তিনি বিপ্লবের সমর্থনকারীদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেনঃ "What's the millennium, dear folks, outdoors at the moment?" বিপ্লব কোন্ স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে? এই ঔদাসীন্যের জন্য পাস্তেরনাককে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সোবিয়েত সমালোচকদের মতে তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উদ্দীপ্ত ভাষায় রূপ দিয়ে জাতীয় কবি হতে পারেননি। কবিতার অঙ্গ প্রসাধনের জন্যেই তিনি বিশেষরূপে ব্যস্ত; তার ফলে আবেগ পদে পদে বাধা পেয়েছে। সমালোচকদের অভিযোগ, পাস্তেরনাক হলেন "a decadent formalist and an enemy of the people."

পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র সমালোচনা হতে লাগল যে, তিনি আতঙ্কিত হয়ে কয়েক বছরের জন্য মৌলিক রচনা প্রকাশ করা বন্ধ করেছিলেন। এই সময়টা তিনি গোটে, শেক্সপীয়ার, বেন জনসন, ভার্লেন, সুইনবার্ন, শেলী প্রভৃতির রচনা অনুবাদ করেছেন। ফাউস্ট, ওথেলো, হ্যামলেট, রোমিও ও জুলিয়েট, অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদগুলি খ্যাতিলাভ করেছে।

কয়েকটি জর্জিয়ান কবিতার অনুবাদ স্ট্যালিনের ভালো লেগেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমালোচকদের আক্রমণও শিথিল হয়েছিল। এই ভরসায় পাস্তেরনাক দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ—On Early Trains (1943) ও The Terrestrial Expanse (1945)—প্রকাশ করেন। কিন্তু শীগ্‌গিরই নতুন করে আক্রমণ শুরু হওয়ায় আবার তাঁকে কবিতা লেখা বন্ধ করতে হয়।

মস্কোর শহরতলীর একটি নিরিবিলি বাড়িতে বসে এবার পাস্তেরনাক উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ

"I always dreamt of a novel in which, as in an explosion, I would erupt with all the wonderful things I saw and understood in this world."

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত লিখে উপন্যাস শেষ করলেন। এটি তাঁর একমাত্র উপন্যাস। এর পূর্বে ১৯২৫ সালে The Childhood of Luvers নামে তাঁর একটি গল্প-সংকলন বেরিয়েছিল। এ দুটি ছাড়া তাঁর আর একটি গদ্য রচনা আছে। সেটি হল Safe Conduct (1931),—যৌবন-কাল পর্যন্ত লেখকের আত্মজীবনী।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি স্টেট পাবলিশিং হাউস প্রথম ছাপবার জন্য গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরে দ্বিতীয়বার পাণ্ডুলিপি বিচার করে জানাল, এ বই প্রকাশ করা হবে না। ইতিমধ্যে পাস্তেরনাক মিলানের এক প্রকাশককে বিদেশী ভাষায় অনুবাদের স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন। উপর থেকে পাণ্ডু-লিপি ফিরিয়ে আনবার জন্য নির্দেশ এল। পাস্তেরনাক ইতালীতে লিখলেন, কিন্তু

সংশোধন প্রয়োজন, পাণ্ডুলিপি ফিরে চাই। কিন্তু প্রকাশক এ প্রস্তাবে রাজী হল না। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে ইতালিয়ান অনুবাদ বেরিয়েছে। এর পরে বেরিয়েছে ইংরেজী অনুবাদ "ডক্টর জিভাগো" নামে। মূল রাশিয়ান বই এখনো প্রকাশিত হয়নি; কখনো হবে কিনা তারও স্থিরতা নেই।

ডক্টর জিভাগোর কাহিনী শুরু হয়েছে ১৯০১ সালে এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৯৪৩ সালে। কিন্তু ১৯০৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার ইতিহাসের ঘটনাবলী এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমিকা। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আবর্তে পড়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল লেখক তার ছবি এঁকেছেন। অবশ্য তিনি সমাজের অন্য স্তরের চরিত্রও এনেছেন। এত বড় পটভূমিকাসমন্বিত উপন্যাসে তারা সহজভাবেই এসেছে।

মস্কো শহরের কোটিপতি ব্যবসায়ী জিভাগো। বহু কলকারখানা ও ব্যবসায়ের মালিক। মদ ও জুয়ার পেছনে টাকা উড়িয়ে দিতে দেরী হল না। কুসংগে পড়ে জীবন অসহ্য হয়ে ওঠায় জিভাগো ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করল।

জিভাগোর ছেলে য়ুরি বাবাকে সামান্যই দেখেছে। কারণ সে মার সংগে পৃথকভাবে থাকত। বাবা যে মাকে ত্যাগ করেছেন সে কথা য়ুরির তখন জানা ছিল না। য়ুরির বয়স যখন দশ, তখন তার মার মৃত্যু হল। য়ুরি আশ্রয় পেল তার মামা নিকোলের কাছে। নিকোলে তলস্তয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি আদর্শবাদী ভাবুক। এমন এক পথের তিনি সন্ধান করছেন যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে।

য়ুরি যে মামার কাছে থেকে পড়াশুনা করবে এমন সুযোগ নেই। সুতরাং মস্কো শহরে অধ্যাপক গ্রোমেকোর বাড়িতে তাকে রাখা হল। য়ুরি সে বাড়িতে মনের মত একজন সংগী পেল। সে অধ্যাপকের মেয়ে তোনিয়া, তারই সমবয়সী। ১৯১২ সালে তোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে বের হল; সে বছরই য়ুরি পাশ করল চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক পরীক্ষা। পাশ করেই চাকরী পেল হাসপাতালে। তার পর থেকে য়ুরি ডক্টর জিভাগো নামে পরিচিত হল। অধ্যাপকের স্ত্রী আন্না মৃত্যুর সময় তোনিয়া ও জিভাগোর হাত এক করে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, তোমরা বিয়ে কোরো। সেই অনুরোধ ওরা রেখেছে। বেশ সুখেই দিন কাটছিল। ডাঃ জিভাগো থাকে হাসপাতাল নিয়ে; তোনিয়ার সময় তার ছেলেকে নিয়ে কি করে যে কেটে যায় তা সে বুঝতেই পারে না।

শুরু হল যুদ্ধ। এল অশান্তি। জার্মানদের সংগে যুদ্ধ, হোয়াইট রাশিয়ানদের সংগে কলহ। সীমান্তবর্তী হাসপাতালে আহতের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। দূরের এক হাসপাতালে ডাক পড়ল জিভাগোর। জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হওয়ায় জিভাগোর মস্কো প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হতে লাগল।

মফঃস্বলের হাসপাতালে জিভাগো নতুন করে পরিচিত হবার সুযোগ পেল মস্কোর মেয়ে লারার সংগে। স্কুলে পড়বার সময় তাকে একবার অদ্ভুত পরিবেশে অকস্মাৎ দেখতে পেয়েছিল। লারা কিন্তু তাকে দেখতে পায়নি। ধূর্ত আইনজীবী কোমারোস্কোভ তাদের পরিবারের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিশোরী লারার উপর যে কুৎসিত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। অথচ কোমারোস্কোভ ছিল লারার পিতৃবন্ধু। কোমারোস্কোভ ও লারাকে এক ইংগিতময় পরিবেশে সেই যে ছেলেবেলায় দেখতে পেয়েছিল জিভাগো এখনো তা ভুলতে পারেনি।

লারা বড় হয়ে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে কোমারোস্কোভকে দূরে সরিয়ে দিল, লেখাপড়া শিখে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিল। তার মতো দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এর পর লারা বিয়ে করল পাশাকে। পাশাও স্কুলের শিক্ষক। একটি মেয়ে হয়েছে তাদের। বেশ সুখের জীবন। কিন্তু হঠাৎ লারাকে কিছু না জানিয়ে পাশা স্বেচ্ছায় সেনাদলে নাম লেখাল। অনেক দিন খবর না পেয়ে লারা উদ্বিগ্ন। লোকের মুখে শুনল, তার স্বামী আর বেঁচে নেই। কিন্তু সেনা দপ্তরে লিখে জবাব পায় না। সঠিক সংবাদ জানবার উদ্দেশ্যে লারা হাসপাতালে নার্স হয়ে এসেছে। হয়ত বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে একদিন পাশার দেখা পাবে অথবা তার সংবাদ পাবে।

সুন্দরী, স্থিতধী, ধীমতী লারাকে দেখে জিভাগো মুগ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্রও আছে। জিভাগো শুনেছে এই কোমারোস্কোভ তার বাবারও উকীল ছিল। বাবাকে সে অসৎ পথে ভুলিয়ে নিয়ে বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছে। বাবাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে কোমারোস্কোভ। লারা ও জিভাগোর জীবনের দুঃখের মূল এক। সুতরাং লারার জন্য সে গভীর মমতা বোধ করে।

তখন বিপ্লব চলছে। তবু জিভাগো মস্কো ফেরার সুযোগ পেল। তিন বৎসর পরে ট্রেনে বাড়ি ফিরছে। দুদিকের দৃশ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লবের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মস্কো শহরের অবস্থাও ভালো নয়। বন্দুকের লড়াই চলছে বিভিন্ন দলের মধ্যে। খাদ্যের ও জ্বালানির একান্ত অভাব। বন্ধুবান্ধব এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোথায় হারিয়ে গেছে। অক্টোবরের শেষে কাগজে খবর বের হল, রাশিয়ায় সোভিয়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জিভাগো নতুন সরকারের কর্মচারী হিসাবে হাসপাতালে কাজ করতে লাগল। শহরে টাইফাস্ জ্বরের মহামারী লেগেছে। জিভাগোর মুহূর্তের অবসর নেই। কিন্তু কাজ করবার ক্ষমতাই বা কোথায়? পেট ভরে খেতে পায় না। আর আছে সর্বদার সঙ্গী দুশ্চিন্তা। নতুন গভর্নমেণ্ট কখন যে কাকে গ্রেপ্তার করবে, হত্যা করবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জিভাগোর ভবিষ্যৎও আশঙ্কাজনক। স্ত্রী ও শ্বশুরের একান্ত অনুরোধে কিছুকালের জন্য সে

---

লোকচক্ষুর অন্তরালে দূরে পল্লীগ্রামে বাস করতে সম্মত হল।

আবার রেল গাড়ি। মস্কো স্টেশনের বর্ণনা পড়ে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত শেয়ালদা স্টেশনের কথা মনে পড়ে। দু'বার এই দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণের জন্য জিভাগোর চোখ দিয়ে আমরা সমসাময়িক রাশিয়ার ছবি দেখতে পাই।

উরাল অঞ্চলের এক অখ্যাত গ্রামে এসে জিভাগো সপরিবারে নতুন জীবন শুরু করল। রবিনসন ক্রুসোর মতো সর্বকিছুই তাকে নিজের হাতে করতে হয়েছে। একটা নতুন জগৎ সৃষ্টির আনন্দে জিভাগো মশগুল হয়েছিল। একদিন মহকুমা শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে বন্দী হল একদল বিদ্রোহী কসাকের হাতে। তাদের দলের চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে; জিভাগো সেই পদ পূরণ করবে। তোনিয়া বা অন্য কেউ তা জানতে পারল না। বন্দী অবস্থায় তাকে যেতে হল সাইবেরিয়ায়।

দু'বছর পরে ভিক্ষুকের মতো চেহারা ও পোশাকে ডক্টর জিভাগো উরালের মহকুমা শহরে ফিরে এল। পালিয়ে এসেছে পায়ে হেঁটে। লারা কাজ করে সেই শহরে। তার বাড়িতেই এসে উঠল জিভাগো। এ অঞ্চল থেকে তোনিয়ারা চলে গেছে। কয়েকদিন পরে পাঁচ মাস ঘোরাঘুরি করে তোনিয়ার চিঠি এসে পৌঁছল। লিখেছে, নতুন সোভিয়েত সরকার মামা নিকোলাই এবং কয়েকজন পরিচিত অধ্যাপককে নির্বাসিত করেছে। তোনিয়া তার ছেলেকে নিয়ে প্যারিস চলে যাচ্ছে, বোধ হয় সরকারের নির্দেশে। আর কখনো তাদের দেখা হবে না।

লারা বলল, শুধু ওদের কথা ভেব না। তোমার মাথার উপরও খড়্গ ঝুলছে। তুমি কোটিপতির ছেলে; তোমার স্ত্রী বড় জমিদারের মেয়ে; তুমি কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছ—তোমার বিরুদ্ধে এগুলি অকাট্য অভিযোগ। শহর ছেড়ে কোথাও আত্মগোপন করে থাক।

লারা সঙ্গে যাবে এই শর্তে রাজী হল জিভাগো। লারা স্পষ্ট করেই জানিয়েছিল স্বামীর মতো ভালোবাসতে অন্য কোনো পুরুষকেই সে পারবে না। পাশা যদি ফিরে আসে তাহলে তার সঙ্গেই সে চলে যাবে। তথাপি যতটুকু পেল ততটুকুতেই জিভাগোর জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু এ পূর্ণতা বেশীদিন রইল না। কোমারোস্কোভ ধূমকেতুর মতো এসে উপস্থিত হল তাদের জীবনে। বলল, তোমাদের দুজনের জীবনই বিপন্ন। একমাত্র আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে।

কোমারোস্কোভের ক্ষমতা আছে। সে এখন পার্টির পদস্থ পরামর্শদাতা। লারা যেতে রাজী আছে যদি জিভাগো যায়। কিন্তু জিভাগো যাবে না। তখন কোমারোস্কোভ জিভাগোকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, কাল লারার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এর পরই ওর পালা। ওকে রক্ষা করা কি তোমার কর্তব্য নয়?

ফন্দী আঁটল জিভাগো। লারাকে বলল, তুমি যাও কোমারোস্কোভের গাড়িতে। আমি ঘোড়া নিয়ে আসছি পেছনে।

এ প্রস্তাবে খুশি হল লারা। মসৃণ বরফের উপর দাগ কেটে কেটে গাড়ি চলে গেল; লারা গেল অদৃশ্য হয়ে। জিভাগো স্থাণুর মতো বসে রইল। দূরে মাঞ্চুরিয়াগামী গাড়ির এক প্রকোষ্ঠে লারা ও কোমারোস্কোভ। গাড়ি যাত্রা করেছে, নামবার উপায় নেই।

রাত্রিতে এক অতিথি এল। লারার স্বামী। জিভাগোর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত তার কথা হল। সকালবেলা জিভাগো বাড়ির বাইরে পাশার মৃতদেহ আবিষ্কার করল। শাদা বরফের উপর খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কয়েক বছর পরে মস্কোর রাজপথে হৃদরোগে জিভাগোর মৃত্যু হল। সেদিন লারা মাঞ্চুরিয়া থেকে মস্কো এসেছে। জিভাগোর কাগজপত্র থেকে জানতে পারল পাশা তার খোঁজ করতে এসেছিল। এর পর লারার আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

'ডক্টর জিভাগোর' কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। অকারণে নানা ঘটনা ও চরিত্র যোগ করা হয়েছে। এর ফলে মূল কাহিনীর প্রতি পাঠকের আকর্ষণ হ্রাস পায়। উপন্যাসে প্রায় ষাটটি চরিত্র আছে। প্রথম শ' দুই পৃষ্ঠায় নতুন নতুন পাত্র-পাত্রী এসে আবার হারিয়ে যায়। এদের কখনো ডাক-নাম, কখনো পোশাকী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তার ফলে পাঠকের পক্ষে গল্পের ধারা অনুসরণ করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। কাহিনীর বিন্যাসে এই শিথিলতার কারণ হয়ত এই যে, এটি জীবনীমূলক উপন্যাস। শুধু জীবনীমূলক নয়, লেখকের আত্ম-জীবনীমূলক কাহিনী। পাস্তেরনাকের বয়স যখন দশ, জিভাগোর বয়সও তখন দশ। এ ছাড়া আরো অনেক মিল রয়েছে লেখক ও তাঁর নায়কের সঙ্গে।

এত বড় উপন্যাসে এবং এতগুলি চরিত্রের মধ্যে মাত্র জিভাগো ও লারার চরিত্রই মনের উপর ছাপ ফেলতে পারে; অন্য চরিত্রগুলি হারিয়ে যায়। অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই স্থির-চরিত্র। চরিত্রগুলি মনের উপর যে দাগ ফেলতে পারে না তার প্রধান কারণ এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও লেখক মনো-বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের অন্তর উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করেননি। একমাত্র লারা কোমারোস্কোভের হাতে ক্রীড়নক হবার পর যে মানসিক যাতনা অনুভব করেছে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। লারার স্বামী যুদ্ধে চলে গেল। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, লারা স্বামীকে স্ত্রীর মতো ভালো না বেসে মা'র মতো ভালোবাসত বলে অতৃপ্ত হয়ে সে চলে গিয়েছিল। শুধু একটি উক্তি দিয়ে এত বড় একটি কথা পাঠককে জানানো হয়েছে, বিশ্লেষণ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। লেখক অনেক জায়গায় এমনি সব সুযোগ হারিয়েছেন।

প্রেম যেখানে স্বাভাবিক সেখানেও লেখক প্রেমের ছবি দেননি। তোনিয়া ও জিভাগো একই বাড়িতে মানুষ হল। তথাপি পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ইঙ্গিত নেই। শুধু আন্নার শেষ অনুরোধ রক্ষার জনাই যেন তারা বিয়ে করেছে। লারা ও পাশার জীবনেও প্রেম নেপথ্যে রয়ে গেছে। উপন্যাসের শেষ ভাগে জিভাগো ও লারার প্রেমই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ এবং লেখক হিসাবে পাস্তেরনাক এখানেই সাফল্য লাভ করেছেন।

যেখানে পাত্র-পাত্রীদের আশা করা যায় না, সেখানে, হঠাৎ সবাই মিলিত হয়ে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে কয়েক-বার। এই অতি-নাটকীয়তা এযুগে অচল এবং লেখকের দুর্বলতার পরিচায়ক।

জিভাগো অবসর সময়ে লিখত। তা কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়ে সমাদৃ হয়েছে। উপন্যাসের শেষে জিভাগো চব্বিশটি কবিতা পাওয়া যাবে। রচনাশৈলী সম্বন্ধে জিভাগোর আদর্শ ছিল:

*All his life he had struggled after a language so reserved, so un-pretentious as to enable the reader or the hearer to master the content without noticing the means by which it reached him.*

এটা পাস্তেরনাকেরও আদর্শ। মূল রচনায় এই আদর্শ কতটা সফল হয়েছে জানি না: অনুবাদে আটপৌরে ভাষার আদর্শ পাঠককে কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহায্য করবে না।

যতই আন্দোলন হোক না কেন, 'ডক্টর জিভাগো' যে মহৎ সাহিত্যকর্ম নয় রসবেত্তা পাঠক সহজেই তা উপলব্ধি করবেন। সমালোচনার গতি থেকে মনে হয় বইটি উপন্যাস হলেও তার সাহিত্য মূল্য গৌণ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'ডক্টর জিভাগো' যুদ্ধ ও বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী। কাহিনীর অন্তর্গত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তিকে 'জিভাগোর' সমর্থকরা সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল:

"It is always a sign of mediocrity in people when they herd together, whether their group loyalty is to soloyev or to Kant or Marx."

* * *

"I dn't know any teaching more self-centred and further from facts than Marxism."

* * *

"Revolutionaries who take the law into their own hands are horrifying, not as criminals, but as machines that have got out of control, like a run-away train."

উপন্যাসের কোথাও লেখক বিপ্লবের নৃশংস মর্মস্পর্শী ছবি দেননি। এমন ছবি কত বই থেকে পাওয়া যায়। বিপ্লবীদের যে সমালোচনা তিনি করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর সমালোচনা সোভিয়েত সরকারের করেছেন দুদিনস্তেভ তাঁর 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন' উপন্যাসে। 'ডক্টর জিভাগোর' কাহিনী শুরু হয়েছে ১৯০১ সালে। বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ছিল

জারের শাসন। জাপানের সংগে যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটল। জারের আমলের কি সবই ভালো ছিল? সে আমল সম্বন্ধে পাস্তেরনাক জোরের সংগে কোনো সমালোচনাত্মক মন্তব্য করেননি।

রাশিয়ার বিপ্লবই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের জীবনে দুঃখ এনেছে এমন কথাও বলা যায় না। জিভাগোর বাবা আত্মহত্যা করেছেন; তার মা যক্ষ্মায় মারা গেছেন; কোমারোস্কোভ লারা ও তার মা'র জীবনে সর্বনাশ এনেছে। এসবই বিপ্লবের পূর্বে ঘটেছে এবং বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত তার জের চলেছে। কাহিনীর শেষ শ' তিনেক শব্দে সুস্পষ্টরূপে লেখক আশার কথা শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মনে হচ্ছে রাশিয়ার দুঃখ এতদিনে ঘুচল; মনে হচ্ছে,

"freedom of the spirit was there, that....the future had almost become tangible."

তাহলে সোভিয়েত বিপ্লব রাশিয়ার জীবনকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করেছে এ অভিযোগ টেঁকে না। পাস্তেরনাকের সমাপ্তি থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, বিপ্লব অগ্রগতির পথে একটি অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক ধাপ।

অবশ্য জিভাগো তথা পাস্তেরনাক যে বিপ্লবের প্রতি প্রসন্ন নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশৃঙ্খলতা ও অনিশ্চয়তা কে-ই বা পছন্দ করে? অথচ রাষ্ট্রে ও সমাজে যখন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তখন কোন পথ দিয়ে সেই পরিবর্তন আসবে? জিভাগো বলছেঃ

I used to be very revolutionary-minded, but now I think that nothing can be gained by violence. People must be drawn to good by goodness.

অহিংসার পথে যদি মঙ্গল আসে, তবে তার চেয়ে বরণীয় উপায় আর কী আছে? কিন্তু অহিংসার অর্থ যে নিষ্ক্রিয়তা নয় একথা পাস্তেরনাক বা জিভাগো কেউ উপলব্ধি করেছেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উপন্যাসের কোনো পাত্র-পাত্রীকেই রক্তক্ষয়ী বিধ্বংসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখি না। লারা, জিভাগো ও অন্য সকলে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করেছে। শুধু দু'বার জিভাগো সাইবেরিয়া থেকে পালাবার জন্য মৃদু চেষ্টা করেছিল। বিপ্লবের তাণ্ডব একটু শান্ত হবার পর জিভাগো মস্কো এসে তোনিয়াকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সামান্য একটু উদ্যোগ করেছে. উপন্যাসকার বলেছেন, সে উদ্যোগে ছিল প্রাণহীন। অন্যায়ভাবে নির্বাসিত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সংগ্রামী মনোবৃত্তির পরিচয় জিভাগোর মধ্যে পাওয়া যায় না। লারা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্না মহিলা। তথাপি সে কোমারোস্কোভের ফাঁদে পা দিল। ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল না; যৌবনে একবার কোমারোস্কোভকে যেমন গুলি করে মারতে গিয়েছিল, তা-ও করল না; এমন কি আত্মহত্যা করে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টাও করল না। বৃদ্ধ লম্পটের হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে। এমনি করে দেখা যাবে প্রত্যয়শীল প্রতিবাদের শক্তিতে কোনো চরিত্রই ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। নৈতিক শক্তির দীপ্তি নেই কাহিনীতে।

লারা, জিভাগো ও অন্য সকলে বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ শুধু মুখে, কাজে নয়। নিষ্ক্রিয়তা তাদের মজ্জাগত। কথায় বা লেখায় মন্তব্য প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করে। পারিপার্শ্বিকের সংগে নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করতে পারে না বলেই কোনো কিছুর মধ্যেই সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রেরণা এরা পায় না। এই বুদ্ধিজীবীরা যেন বহিরাগত, জীবনের ঘনিষ্ঠতম বৃত্তির বাইরে এদের স্থান। এই বহিরাগত মনোবৃত্তি জিভাগো ও লারার মধ্যে সুস্পষ্ট।

পাস্তেরনাকের মধ্যেও এই আউটসাইডার বা বহিরাগতের মনোবৃত্তি লক্ষনীয়। তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিকতা এই মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। অল্পবয়সে পাস্তেরনাক পা ভেঙেছিলেন। এজন্য যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হয়নি। তিনি উরাল অঞ্চলের এক ফ্যাক্টরিতে প্রথম কাজ করেছেন; তারপর করেছেন শিক্ষা দপ্তরের গ্রন্থাগারে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের আবর্তে পড়ে তার স্বরূপ উপলব্ধি করবার সুযোগ তাঁর হয়নি।

জিভাগোরও হয়নি। তাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে কাজের অনুপযুক্ত ঘোষণা করে বাইরে অন্য কাজে রাখা হয়েছে।

'ডক্টর জিভাগো' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণে হল মানুষ ও প্রকৃতির জন্য দরদ। পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি 'আইভরি টাওয়ারের কবি'। এই উপন্যাস সেই অভিযোগ খণ্ডন করবে। উপন্যাসে যে-সব মানবিক অনুভূতির কথা ছড়িয়ে আছে তা পরিশিষ্টে সংযোজিত চব্বিশটি কবিতার মধ্যে আরো সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। "ডে-ব্রেক" কবিতায় জিভাগো এই বিশ্ব-সংসারের প্রতি গভীর প্রীতি প্রকাশ করেছেঃ

I feel for each of them
As if I were in their skin,
I melt with the melting snow,
I frown with the morning.
In me are people without names,
Children, stay-at-homes, trees,
I am conquered by them all
And this is my only victory.

## কোন্ সকালে : ডঃ জিভাগোর কবিতা

### বরিস পাস্তেরনাক

তোমাকেই আমি আমার নিয়তি বলে জেনেছিলাম।
তারপর এল যুদ্ধ, বিপর্যয়।
অনেক, অনেক দিন ধরে
তোমার আর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি। না একটা খবর।

এতকাল পরে
আবার তোমার কণ্ঠ আমাকে বিচলিত করে তুলেছে।
সারা রাত জেগে পড়েছি তোমার দলিল।
মনে হয়েছে একটা মূর্ছা থেকে আবার জেগে উঠলাম।

জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে চাই আমি।
ভিড়ের মধ্যে, প্রত্যূষের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে।
সমস্ত কিছুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব আমি,
বাধ্যতাস্বীকারে তাদের বাধ্য করব।
তারই জন্যে আমি তৈরি হয়ে আছি।

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নীচে নেমে—
যেন এই প্রথমবার—
জনবিরল ওই ফুটপাথে, ওই বরফে-ঢাকা
রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

চারদিকে আলো, ঘরোয়া নম্রতা, সবাই জেগে উঠছে।
চা খাচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে ট্রাম ধরছে কেউ।
কয়েকটা মাত্র মিনিট,
তারই মধ্যে এই শহরের চেহারা যেন আমূল পাল্টে গেল।

ঝড়ো হাওয়ার হাতে
আমার ওই গেটের উপরে
রচিত হয়ে চলেছে গাঢ় তুষারের জালিকা।
সবাই ব্যস্ত। যেন না দেরি হয়ে যায়।
অর্ধভুক্ত খাবার ফেলে তারা উঠে পড়ছে।
চায়ের পাত্রটাকে পর্যন্ত শেষ করবার সময় নেই।

ওদের প্রত্যেককেই আমি ভালবাসি।
যেন ওদের শরীরের গভীরে ডুবে গিয়ে
ওদের প্রতিটি অনুভূতিকেই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।
যে-তুষার একটু-একটু করে গলে যাচ্ছে,
আমিও যেন গলে যাচ্ছি তার সঙ্গে;
আবার আমিও যেন এই সকালবেলায়
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছি।

নামহীন অসংখ্য মানুষ,
আমারই মধ্যে তারা বাসা নিয়েছে।
শিশু, আর ঘরোয়া মানুষ, আর বৃক্ষলতাপাতা।
তারা জয় করেছে আমাকে,
আর সে-ই আমার একমাত্র জয়গৌরব।

"ডক্টর জিভাগো" গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত

তর্জমা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

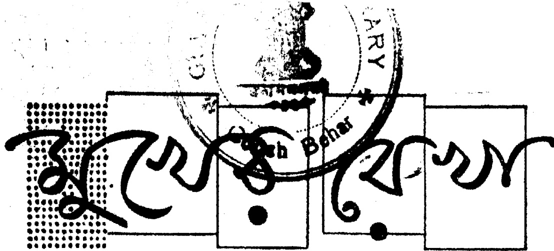
## তুফান

### বরিস পাস্তেরনাক

আমার সমাপ্তি এই, কিন্তু তুমি বাঁচো।
চিৎকারে নালিশে মত্ত হাওয়া আজ আস্তানা, অরণ্য
কাঁপিয়েছে। এ অশ্বথ, ওই শাল—এইভাবে নয়;
অসীম দিগন্ত জুড়ে যত বৃক্ষ অক্ষয়, অনন্য
সকলেরই মূল ধ'রে একসঙ্গে, হাওয়া আজ উপড়ে ফেলতে চায়
এবং দিগন্তকেও। যে প্রচণ্ড ধাক্কা নিয়ে পালতোলা জাহাজ
ছুটে আসে
উপসাগরের কূলে ভিড়বে ব'লে, সে অপ্রতিরোধ
নিয়তির শক্তি আজ প্রলয়ের উন্মত্ত বাতাসে।

শয়তানের খেলা নয়; উদ্দেশ্য ছাড়াই
উন্মাদ তুফান এই যে চার পাশের গাছ, মাটি, ঘর
খুঁড়ে ফেলছে, তাও নয়। বরং এ ঘটনার দুঃসহ শোকের
অর্থ আছে তার কাছে; এবং তোমারই জন্য হাওয়া আজ ঝড়
সব শোক, সব দুঃখ হবে ঘুমপাড়ানিয়া গান
সে গান কোথাও আছে সর্বনাশে, সে ক'রছে সন্ধান ॥

তর্জমা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



সন্তোষকুমার ঘোষ

(২)

সৌরেশ জেগে ছিলেন। চেয়ারে মাথা রেখেছিলেন, কিন্তু পা দুটি তুলে রেখেছিলেন সামনের একটি টুলে। ঘুমতে পারতেন, ইচ্ছে হলে। কিন্তু ইচ্ছা হয়নি। সামান্য একটু অসুবিধাও ছিল, কয়েকটা মশা ঘুরে ঘুরে আসছিল, একবার ও'র কানের গোড়ায়, একবার ঘাড়ের নিচে, একবার পায়ের পাতায় বসছিল। ঝিমুনি এলেও সৌরেশ মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে বসছিলেন, কেননা কখনও পায়ের পাতা কখনও ঘাড়ের কাছে জ্বালা করে উঠছিল। অন্য দিন বিরক্ত হতেন, মশা কয়েকটাকে মারবেন বলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, আজ হলেন না। সৌরেশবাবু আজ জেগে থাকতেই যে চান। মশা কটার প্রতি তিনি বরং কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলেন। ওদের সংগে তাঁর ভাবনার চরিত্রগত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। যে-রাত সর্পদষ্টের মত ক্লান্তিতে ঢলে ঢলে পড়ছে, তাকে ওরা দংশনে দংশনে জাগিয়ে রাখে, সৌরেশের চিন্তা যেমন রাখছে তাঁকে।

সতী তখনও থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছিল। সৌরেশবাবু প্রত্যেক বার চমকে উঠছিলেন। সোজা হয়ে বসছিলেন। ভাবছিলেন, ভিতরে যাবেন কি না। যাননি। ভরসা পাননি। নার্সের ঠাণ্ডা দৃষ্টির কথা স্মরণ করে নিরস্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি গিয়েই বা কী করবেন! দরকার থাকলে ওরা ত ডাকতই; পড়লে ত ডাকবেই।

অন্য স্বামীরা এই সময়ে কী করে, সৌরেশ চিন্তা করলেন। তারা কি ঘুমোয়, চেয়ারে ঠেস দিয়ে, টুলে পা তুলে, কিংবা বই পড়তে চায়? বই কি তখন পড়া যায়? ছাপার হরফে মন বসে? তার চেয়ে ভাবনা অনেক সহজ, ঘুমতে না পেরে, ঘুমতে না চেয়ে, সৌরেশ এখন যা করছেন। তিনি মনে মনে সতীর ওই কান্নাটা বিশ্লেষণ করছেন। এই যন্ত্রণার স্বরূপ কী। এ কি মৃত্যু-যন্ত্রণার সোদর? সতীর কাছে এখন ত যাবার উপায় নেই, সম্ভবত তার এখন জ্ঞানও নেই, নইলে সৌরেশ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতেন।

অসুস্থ, অবসন্ন চেতনা নিয়ে আরও তলিয়ে গিয়ে সৌরেশবাবু প্রসব-বেদনার সংগে জন্মান্তরবাদের একটা সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পেলেন। যে জাত তার মৃত্যু যেমন, মৃতের পুনর্জন্মও তেমনই ধ্রুব। প্রথমটি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, নতুন প্রমাণনিরপেক্ষ। দ্বিতীয়টি কেবল অনুমান। অন্যথা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না। যে ফাঁকটুকু থাকে, মানুষ তার কল্পনা দিয়ে সেটুকু ভরে দিয়েছে। এই ধারণা যদি খাঁটি হয়, তবে এই মুহূর্তে, যখন এই গৃহে একটি জন্ম আসন্ন, তখন অন্যত্র, কোনখানে একটি আয়ু ফুরোচ্ছে, মৃত্যু ঘটছে। আর সতী যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা জীবন আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী চৌকাঠ, ওর মুখে চৌকাঠের ওপারের হিমের ঝাপটা লাগছে, নীল হয়ে যাচ্ছে সতী, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। তবু ফিরতে পারছে না, ওর যে নব-জীবনকে আবাহন করার দায়।

সৌরেশ আর ভাবতে পারছিলেন না। মাথা ঝিমঝিম করছিল। তিনি অভ্রান্ত-ভাবে অনুভব করছিলেন, সতী মরবেই।

মরবেই, তবে সেই মৃত্যুটা একটু ভিন্ন রকমের হবে। প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে মৃত্যু বলি, অর্থাৎ হৃৎস্পন্দ বন্ধ হওয়া, দেহ নিথর হওয়া, সেরকম কিছু নয়। আমূল রূপান্তরেরও ত আরেক নাম মৃত্যু। সতীর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে। অন্তত যে-সতীকে সৌরেশ চিনতেন, সে-সতী আর থাকবে না। বাইরের কাঠামোটা হয়ত ঠিকই থাকবে, পরনের শাড়ি, মাথার ছোট্ট ঘোমটা, কপালের সিঁদুর আর গালের তিলটি দেখে সৌরেশবাবুর বারবার ভুল হবে, ভাববেন, এই বুঝি সেই। কিন্তু ছুঁতে গিয়ে বুঝবেন সে নয়, তার ভিতরে অন্য একজন এসেছে। তার কিছু কিছু আভাস, কোন কোন অভ্যাস পুরনো মানুষটার মতই, কিছু আবার অনেকটাই নতুনও। সেই সন্তানের ধাত্রী, বিবর্তিত মানবীকে ঠিক চিনবেন না সৌরেশবাবু, আঘাত পাবেন, অভিমান করবেন, তারপর সেই আঘাতেরও জ্বালা ধুয়ে গিয়ে প্রাচীন ক্ষতটা একটা চিহ্নমাত্র হয়ে থাকবে।

অতএব, পায়ের পাতার যেখানটা জ্বলছিল, সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে সৌরেশ আপনাকে বললেন, একটি জন্ম

মানেই একটি মৃত্যু। কিন্তু এই সামান্য কথাটা জানতে আমার এত দিন লাগল?"

কিন্তু শুধু এক সতীর মৃত্যু, অন্য সতীর জন্ম কেন! যে-কান্নাটার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি, সেটা যখন শোনা যাবে, বারান্দার প্রান্তের ঘরে সদ্য-ভূমিষ্ঠ একটি অসহায়তা ভয়-বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠবে, সেই মুহূর্তে এবং তারপর থেকে এই আমিও কি আমিই থাকব?

থাকব না, মাথা নেড়ে নেড়ে সৌরেশ বললেন, ঠিক তখনই অন্য-আমি জন্ম নেবে। দেয়ালের ছায়া আরও জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিল।

কিন্তু মজা এই, সৌরেশ নিজের ছায়াকে বোঝালেন, আমি তখন টের পাব না, এই পরিবর্তনটুকু আমার চেতনায় ধরা পড়বে, না। যেমন এই মুহূর্তে, নির্জন ঘরে, নিঃশব্দ প্রহরে আমার কাঁধে যদি কোন অশুভ আত্মা ভর করে, আমি বুঝব না, সেই আত্মাটাই আমি হয়ে যাবে, এই দেহবাসী চিন্তাশক্তিটাই যেমন আমি।





ওদের এত দেরী হচ্ছে কেন। অসহায় কান্নাটা বেজে উঠছে না ত। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়, যে গাম্ভীর্যকে মুখোসের মত মুখে এঁটে রেখেছে?

সৌরেশের ইচ্ছা হল, ডাক্তারকে এই ঘরে ডেকে আনেন, এক পেয়ালা কফি করে খাওয়ান। কিন্তু ভরসা হল না। লোকটার কেমন যেন 'রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে কে করে মানা' দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির আড়ালে একটু কৌতুকেরও আভাস আছে নাকি। ও যে সৌরেশবাবুর অনেক একান্ত কথা জানে। সৌরেশ মনে মনে ওকে যে গাল দিয়ে বললেন, "ব্ল্যাকমেলার", সেটা উনি উত্তেজিত বলেই। সাধারণ মুহূর্তে তিনিও স্বীকার করতেন, এই নিপুণ চিকিৎসকটি ভদ্র এবং সামাজিক মানুষ, পরের রহস্য সে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে বটে, কিন্তু তা নিয়ে বেসাতি করে না।

সৌরেশ নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে সতীকে মরতে দিতে, অন্য-সতী হতে দিতে চাননি। ওই ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলেন। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার এই ঘরে এসেই বসলেন। মাঝখানে টেবিল, তিন দিকে তিনটে চেয়ার, ওপরে পাখা। সতী মাথা নিচু করে বসে ছিল।

ডাক্তারবাবুর গম্ভীর-কণ্ঠে জেরা শুরু হল।

"আপনার স্বামী কী চান, শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"আপনার সম্মতি আছে?"

একটু যেন নড়ে বসেছিল সতী, উসখুস করেছিল, ভাঁজে ভাঁজে খসখস করে উঠে শাড়িটা একটা বিব্রত প্রায় অব্যক্ত জবাব দিয়েছিল। ব্যস্ত মানুষ ডাক্তারবাবু তার মানে ধরতে পারেন নি।

আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবার আরও স্পষ্ট করে, "বলুন, আপনি রাজী?"

"না।" সতী মৃদু গলায় বলেছিল।

না? চমকে চেয়েছিলেন ডাক্তারবাবু, চমকে চেয়েছিলেন সৌরেশ। সতী যেন নীতিগর্হিত, অবিশ্বাস্য কিছু উচ্চারণ করেছে। যেন বলেছে, ঈশ্বর নেই, যেন বলেছে, পাপ-পুণ্য মানি না।

না? দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠেছিলেন।

সতী এবার স্পষ্ট গলায় বলেছে, "না,"

তার স্বরে দ্বিধার সংকোচের লেশও নেই।

পাখা বড় বেশি শব্দ করছিল, ডাক্তার-বাবু উঠে তার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। জানলার পাল্লা কাঁপছিল, সৌরেশ একেবারে খুলে দিলেন। স্বাভাবিক হাওয়া আসুক ঘরে। ঘাম শুকুক, বারে বারে রুমালে যেন মুখ মুছতে না হয়। তারপর যতটা নিলে ডাক্তারবাবুর চোখে বিসদৃশ না লাগে সতীর ততটাই কাছে মুখ নিয়ে এসে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, "তুমি বুঝছ না। তোমার শরীর অসুস্থ, এই ত সেদিন অসুখে ভুগেছ, তার ওপর......হলে বিপদ হতে পারে। ডাক্তারবাবুও তাই বলছেন।"

"কী বলছেন?" সতী শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে।

"বলছেন, প্রাণের আশংকা আছে।"

"না।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সতী বলেছে, "তবুও না।" আর দাঁড়ায়নি, শাড়ির খসখসে উদ্ধত প্রতিবাদের সুরে স্পষ্ট হয়েছে।

নিরুপায় দৃষ্টি বিনিময় করেছেন সৌরেশ আর ডাক্তারবাবু।

"অতএব?" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন অনেক পরে, সিগারেট ধরিয়ে, সৌরেশেরটা ধরিয়ে দিয়ে। নিজেই জবাব দিয়েছেন, কতকটা কৌতুকে, 'যা হওয়ার তাই হক?'

তখন সতীর পক্ষ নিয়ে সৌরেশকেই বলতে হয়েছে, "ও একটু ভাবপ্রবণ, একটু অবুঝ। ডাক্তারবাবু আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সতীর সেণ্টিমেণ্টটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? আমাদের ভালবাসার প্রথম সন্তান—"

এতক্ষণে ডাক্তারবাবুর মুখের রেখায় পরিহাস স্পষ্ট হয়েছে। হাসি লুকিয়ে তিনি বলেছেন, "আপনিও, মশাই, ছেলে-মানুষের মত কথা বলছেন। ভালবাসার সন্তান-টন্তান সেকালে হত, ওসব পাট কবে চুকে গেছে!"

ঈষৎ বিবর্ণ মুখে সৌরেশ তখন বলেছেন, "তবে কী বলবেন আপনি। ভালবাসা না বলুন, কামনা-বাসনা এই সব বলবেন ত?"

"না তা-ও না।" গাম্ভীর্যের মুখোসটা শোলার টুপির মতই নামিয়ে রেখে ডাক্তার-বাবু পা দুটি অল্প অল্প নাচিয়েছেন। সেই সংগে নেচেছে ও'র চোখের মণিও। —"না তা-ও না।"

"তবে?"

"এরা সব born of miscalculation."

হাসতে হাসতেই বলেছেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু কথাটা অপ্রিয় একটা ঘায়ের মত শুনিয়েছে। তিনি নিজেও টের পেয়ে থাকবেন যে কথাটা একটু বেশি চটকদার তাই তার দুর্বলতাটুকু ঢাকতেই যেন আবার বলেছেন, "ইয়েস, ঈচ অব দেম। ভাবুন ত, নতুন যে জেনারেসন এল, তারা প্রেমজ নয়, কামজও নয়, প্রত্যেকেই অবাঞ্ছিত, হিসাবের ভুলের ফল। কাদের হাতে আমরা এই পৃথিবীকে সংপে দিয়ে যাচ্ছি বলুন ত!"

হিসাবের ভুল, হিসাবের ভুল। ডাক্তার-বাবু চলে যাবার পরও সেদিন অনেকক্ষণ ধরে সৌরেন কথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবেছেন। আর, ভেবেও ঠিক করতে পারেননি, এই ভুলটাকে, জীবনের আশংকা আছে জেনেও, কেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সতী। শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এটাও মৃত্যু-ইচ্ছারই একটা পরোক্ষ রূপ। সতীও তবে মরতে চায়?

আপাতসুখী, লোকচক্ষে সুন্দরী এই মেয়েটির আত্মবিলোপের আকাঙ্ক্ষার উৎস কী, সৌরেশ ভেবে পাননি। তিনিই কি?

আবার সৌরেশবাবুর এ-ও মনে হল, তিনি কেন হবেন! সতী কেন তাঁর হাত এড়াতে চাইবে! সজ্ঞানে তিনি ত তাকে অসুখী করেন নি। একটি মেয়ের যা চাই, ঘর, পরিবার, স্বাচ্ছন্দ্য, সাধ্যমত সবই তাকে জুগিয়েছেন। সবই? ভালবাসাও?

এইখানে সৌরেশ একটু হোঁচট খেলেন। সতীকে তার বিবাহিত জীবনের এই কয়েকটা বছরে তিনি যা দিয়েছেন, তার লৌকিক রূপ অবশ্যই ভালবাসার, কিন্তু বস্তুটি আসলে কী, তা ত কোনদিন নিকষে ঘষে দেখেন নি। কর্তব্য, সহানুভূতি,

আবেগ, কামনা এই সব যোগ দিলে যে ফল মেলে তারই নাম কি ভালবাসা?

বিচার করে দেখতে হবে। আজই, এখনই। এই ঘরটা অন্ধকার, আলোকচিত্রের স্ফুটনকক্ষের মত। সেখানেই আত্মস্থ হয়ে একটি কঠিন সম্পর্কের বিচার প্রশস্ত।

ও-ঘরে এখনও নতুন কোন কান্নার রব নেই, কিন্তু রব উঠতে হয়ত বেশী বাকীও নেই, ওঠবার আগেই সৌরেশ নিজের কাছ থেকে জেনে নিতে চান সতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপ কী।






যেন সম্পর্কটা একটা গোলক, তাকে কোলে নিয়ে, তার মসৃণ পরিধিতে হাত বুলিয়ে শুধু অনুভব দিয়ে সৌরেশ তার প্রকারটা জানতে চাইছেন। করতলগত গোলকটা নিমেষে ঘুরে গেল, সৌরেশ সঙ্গে সঙ্গে টের পেলেন, প্রশ্নটার অন্য দিকও আছে। তিনি সতীকে ভালবাসেন কিনা, সেটুকুই একমাত্র প্রশ্ন নয়, জানতে হবে সতীও কি তাঁকে ভালবাসে? দুটি গোলার্ধ যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসার বৃত্ত হয়ে উঠেছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, অনেকটা সম্মোহিতের মত ক্লান্ত আচ্ছন্ন কণ্ঠে সৌরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভালবাস?"

"বাসি।"

"ভালবাস?"

সেই প্রশ্নটাই আবার। একই উত্তর এল। আরও একবার জিজ্ঞাসা করে, এবং প্রার্থিত উত্তরটি পেয়েও, সৌরেশ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, অসুস্থ বিকারগ্রস্তের স্বরে বলে উঠলেন, "কাকে, সতী, কাকে?"

"তোমাকে।"

আর তখনই সৌরেশ অসহায় হয়ে চারদিকে চাইলেন, যেন এই সহজ কথাটাও তাঁর বোধগম্য হয়নি। সতী যাকে ভালবাসে বলছে, সেই-তিনি কোথায়! যে হেলান চেয়ারে, অল্প-অল্প জ্বর নিয়ে, উৎকণ্ঠা আর ভয় নিয়ে, হিমগুণ্ঠিত রাতে কুঁকড়ে শুয়ে এতটুকু হয়ে আছে, তাকে ভালবাসার কি আছে! আয়না নেই, আলোও নয়, তবু সৌরেশ সেই মানুষটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন; মাথায় অল্প কয়টি চুল, মাঝে মাঝে পাক-ধরা, রেখাকীর্ণ বয়স-শীর্ণ মুখ, বীতদ্যুতি চোখ। এই কি তিনি?

তিনিই। এখনকার সৌরেশ। নিজের কাছেই হতাদর সৌরেশ অস্ফুট স্বরে বললেন, "গত দু ঘণ্টায় আমি অনেক বদলে গিয়েছি। আমার সাহস নেই, পৌরুষ নেই। মলিন একটা খোলসমাত্র আছে।"

কিন্তু মোটে কি গত দু' ঘণ্টায়? তার আগে নয়, আগে থেকে নয়? বরাবরই কি নয়? সেই যখন আমি ছোট্টটি ছিলুম, তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তেই কি আমি বদলে যাইনি, ভিতরে বাইরে? শিশু-আমি, কিশোর-আমি, যুবক-আমি—এত-গুলো টুকরো টুকরো আমিকে তৈরি করল কে! যেই করুক একটি অদৃশ্য সুতোয় সে সকলকে বেঁধেও রেখেছে।

সে কে? হঠাৎ সৌরেশের মনে হল, সে আর কেউ নয়, সময়। সময়ই সেই কারিগর। আচ্ছন্ন অনুভূতি নিয়ে সময়কে সৌরেশ নতুন আলোয় প্রত্যক্ষ করলেন। সকাল-বিকালের আকাশের মত সে ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, সে চলে। ছোট ছোট ক্ষণের পুঁতির মালায় নিজেকে সাজায়।

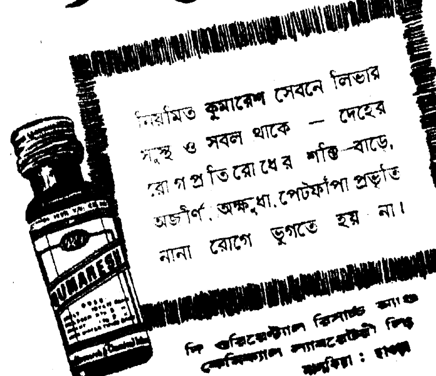
এ-ও কি সম্ভব যে, আর কিছুই বদলায় না, শুধু সময়ই বদলায়? কালের স্রোতে ভেসে ভেসে কিংবা স্রোতের নিচের নুড়ির মত ভেঙে ভেঙে আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলি। চলিই। এই সময় একটু থামে না? আহা, থামুক না! এই স্রোতের টান এক নিমেষের তরেও যদি থামত, যদি ভেসে থাকার জন্যেই এতটা কসরত করতে না হত, তবে আমি উজান ঠেলে উৎসে ফিরে যেতাম, খুঁজে ঠিক বের করতাম পুরনো-আমিটাকে। সেখানে সে হয়ত অবিকৃতই আছে। কিন্তু কত দূরে, কোন্‌খানে?

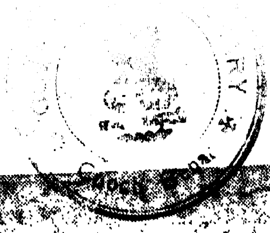
কেন, সেই নদীটির ধারে!

সেই নদীটিকে সৌরেশের মনে পড়ল। কাচের মত তার জল স্বচ্ছ, দুই তীরে খালি বালি আর বালি। তারই কাছাকাছি একটি শহরে সৌরেশের শৈশব আর কৈশোর কেটেছে।

আজ গভীর রাত্রে, সব শব্দ যখন অন্ধকার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, সৌরেশ ইস্টিমারের ভাঙা ভাঙা কিন্তু মোটা গলার সিটি শুনতে পেলেন। সেই শব্দে একটি ভীরু শিশু ঘুমের মধ্যে চমকে উঠল, তাকে সৌরেশ চিনতে পারলেন। সে-ও, অন্তত নামে, সে-ও সৌরেশ। শোবার ধরণেই বোঝা যায়, সে কত অস্থির, অশান্ত। সেই-সৌরেশের মুখের একটি রেখাও বদলায়নি ত! (ক্রমশ)







# ট্রামে-বাসে

**সং**বাদে প্রকাশ, পাক্ প্রধান আয়ুব খাঁ সাহেব নক পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া মির্জা সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।—"মীর্জা সাহেব কী আর করবেন, আয়ুবে মায়া আয়ুবের মায়ার চেয়ে বেশি সুতরাং চাচা আপন বাঁচা নীতিই তাঁকে গ্রহণ করতে হলো"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

**পা**কিস্তানে রাতারাতি ঘন ঘন পট পরিবর্তনের পর নেহরু-নুন চুক্তি বলবৎ থাকিবে কি না এই প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন,—তাঁরা বলেন নুন তো এখন বিশ হাত জলের তলায় তলাইয়া গিয়াছেন। —"জবাবটা প্রশ্নকর্তাদের উক্তির মধ্যেই রয়েছে; নুন জলে ঢুকে পড়লে তার আর কী-ই বা থাকে"—বলে শ্যামলাল।

* * *

**আ**গে নিয়ম ছিল অলঙ্কার, টাকাকড়ি, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি লইয়া কেহ পাকিস্তান ছাড়িয়া আসিতে পারিবেন না। এখন যাত্রীদিগকে টিফিন বাক্স পর্যন্ত লইয়া আসিতে দেওয়া হয় না। নূতন কানুনের বলে এখন শুধু একবস্ত্রে পাকিস্তানের সীমা অতিক্রম করিতে দেওয়া হয়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তা এতই যদি হলো তবে একবস্ত্রই বা আর কেন"!!

* * *

**প**শ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কোন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন।—"ব্যবসায়ীরা কোন দ্রব্যের যাতায়াতের জন্য সর্বনিম্ন অর্থাৎ পাতাল প্রবেশের সড়ক বেঁধে দিচ্ছেন" —মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • • •

**নি**র্দিষ্ট মান অনুসারে নির্মিত বাটখারা ছাড়া অন্য কোন বাটখারা বা ওজন ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি অর্ডিন্যান্সও জারি করিয়াছেন। —"কিন্তু হাত সাফাইর মান সর্বত্র সমান নয়, পাকা হাতে ছটাকের ওজন আধপোতে গিয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক হতে বলি"--বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

**ক**লিকাতায় সম্প্রতি গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সভা হইয়া গিয়াছে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় সভানেত্রী মহিলাদের ট্রেনিং গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। —গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ খুবই ভালো কথা। কিন্তু গার্হস্থ্য-দর্শন হলো আরো বড় কথা। এক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রয়োজন মহিলা ও পুরুষদের"—বলেন অধ্যাপক সহযাত্রী।

* * * *

**ই**উনিয়নের জনৈক নেতা নাকি নিজে এক কপর্দক খরচ না করিয়া একটি দুগ্ধবতী গাভী চিড়িয়াখানার ভিতরে রাখিয়া তার দুগ্ধ পান করিতেছেন। —"ভাঙ্গ ভবানন্দ খেলেও, নিধি কড়ি গুণেছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

**এ**ক সংবাদে শুনিলাম কলিকাতায় অন্য একটি বন্দর নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। আপাতত বন্দরের উপযুক্ত স্থান খোঁজা হইতেছে।—"ঝড়ে যে-কোন বন্দরই আমাদের সান্ত্বনা"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

**শ্রী**জগজীবন রাম এই মর্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, হরিজনদিগকে নাকি পাইকারি হারে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কে, কোথায় যেন বলেছিলেন, প্রথমে মিশনারি, পরে মার্চেন্ট এবং আরো পরে আসে মেশিনগান্। আশা করি এক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না"!!

• • • •

**জা**কর্তার সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, পূর্ব বোর্নিওর অধিবাসিগণ নাকি মহাকাল নদীর অন্তর্দেশে এক অদ্ভুত দানবের সাক্ষাৎ পাইয়াছে; দানবটির মাথা গরুর মতো, দেহ সর্পাকৃতি।—"দেখতে গরুর মতো, অথচ বুদ্ধিতে সাপ, এমন দানবের সাক্ষাৎ আমরাও মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি"--বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

**প্র**সংগত মনে পড়িল আমরা সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি অতিকায় মৎস্যের মস্তকের ছবি দেখিয়াছি।—"ছবি হলেও আমরা মাছের মুড়োটি দেখে তৃপ্ত হয়েছি, কুচোর লেজ দেখে-দেখে দিন যায় কিনা, তাই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

**প**লতা জলকলে সঞ্চিত মাটি দিয়া ইট তৈরি করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন কলিকাতা কর্পোরেশন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমাদের অর্থাৎ পৌরকর্তাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজে হাত দিতে বলি, কেন না মাটি টাকা, টাকা মাটি"!!

• • •

**মা**দ্রাজ রাজ্য বিধানসভার সংবাদে শুনিলাম, কোন কোন সরকারী অফিসে এখনো টানাপাখা চালু রহিয়াছে। ইহার জন্য বছরে দুইলাখ টাকার উপর খরচ হইতেছে।—"টাকার অনেক সময় পাখা হয় কথাটা তবে মিথ্যে নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।



# অরণ্য

**প্রফুল্ল রায়**

**এ**ই অরণ্য ফরজান্দ খানকে বাঁচালো। অদ্ভুত এক মৃত্যুর থাবা থেকে তাকে ছিনিয়ে আনল।

এই অরণ্য। আন্দামানের এই বিপুল, ভয়াল অরণ্য।

দু চোখে উদ্‌ভ্রান্ত, বন্য দৃষ্টি। তামাটে, কঠিন মুখ রেখাময়। খাড়া চোয়াল, মাংসল গর্দান, থ্যাবড়া নাক। মোটা মোটা আঙুলের ডগায় ভাঙা ভাঙা নখ। অবিন্যস্ত পিঙ্গল চুল মাথাময় ছড়িয়ে রয়েছে।

এই হল ফরজান্দ খানের চেহারা-নমুনা।

এ কাহিনীতে আমার ভূমিকা সংক্ষিপ্ত। নেহাৎ সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়েই আমি দায় থেকে খালাস।

আমি ট্যুরিস্ট। ভ্রমণ আমার নেশা; শখের পেশা বলাই হয়ত ঠিক। ঘুরতে ঘুরতে কেমন করে দক্ষিণ আন্দামানের এই তিরুর অঞ্চলে এসেছিলাম, কোন সূত্রে ফরেস্ট গার্ড ফরজান্দ খানের সঙ্গে আমার মত দুরন্ত শহুরের দোস্তি মহব্বতি এমন পাকা হয়েছিল, এ কাহিনীর পক্ষে সে সব অবান্তর।

এখন পড়-পড় শীত। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের বাতাসে হিম মিশতে শুরু করেছে।

এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মাঝারি একটা 'বীট্'। 'বীট্' অর্থে বেত পাতার চাল আর বাঁশের বেড়ার গুটিকতক ঝুপড়ি। ফরেস্ট গার্ড, জবাবদার আর কুলীদের সাময়িক আস্তানা।

তিরুর অঞ্চলে ইদানীং জঙ্গল 'ফেলিং' অর্থাৎ বনকাটা শুরু হয়েছে। অরণ্য সংহার করে মানুষ মাটির দখল নেবে। এখানে গড়ে উঠবে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ; সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'রিফুজী সেটেলমেন্ট'।

কত কালের এই আন্দামান দ্বীপ। কবে যে বঙ্গোপসাগরের অথৈ অতল থেকে এই দ্বীপ মাথা তুলেছিল, ইতিহাসের নজর সেখানে পৌঁছায় না। হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপের মাটি অরণ্যের ঘাঘরায় লজ্জা ঢেকেছে।

আন্দামানের অরণ্য; জটিল, কুটিল, ভয়ংকর। কত কাল ধরে কত বনস্পতি এখানে মাথা তুলেছে। দিনে দিনে অরণ্যের সংসার বেড়েছে। শিকড়ে বাকড়ে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে এই দ্বীপে অরণ্য তার দখল কায়েম করেছে।

সেই অরণ্য 'ফেলিং' শুরু হয়েছে।

আজকের দিনটির মত আমি ফরজান্দ খানের মেহমান; অতিথি। এই জঙ্গলে মেহমানদারি করতে গিয়ে রাজসূয়ের আয়োজন করেছে ফরজান্দ খান। হরিণ আর বাদক পাখির মাংস পাকিয়েছে। শুধু খানাই নয় বিশেষ পিনার ব্যবস্থাও করেছে। তার মেহমানদারির আতিশয্যে বিব্রত হলেও, খুশী না হয়ে পারি নি। কারণ ফরজান্দের দিলের তাপ মাত্র কয়েকদিনের জানপয়চানের মধ্যেই পেয়েছি।

এখন যাই-যাই বিকাল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। জঙ্গলের ওপাশে তাকে আর দেখা যায় না। বিরাট বিরাট প্যাডক আর গর্জন গাছগুলির মাথায় ম্লান, বিষণ্ণ একটু আলো আটকে রয়েছে।

ঝুপড়ির সামনে বসেছিলাম।

খানিকটা দূরে রাঁচী কুলীরা বিচিত্র সুর আউড়ে আউড়ে করাত চালাচ্ছে। 'হেঁই—হেঁই—হেঁইও'—

অতিকায় একটা পেমা গাছের ডালপালা ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। এখন কুলীরা মূল

গুঁড়িটায় করাত চালাচ্ছে।

রাঁচী কুলীদের বিচিত্র সুর ছাপিয়ে মাঝে মাঝে জবাবদারদের হুঙ্কার শোনা যায়, 'হুদি—হুদি—'

সঙ্গে সঙ্গে বনবিভাগের হাতীরা বোঙা (গাছের গুঁড়ি) ঠেলতে ঠেলতে এক পাশে স্তূপাকার করে।

পুরো একটা টহল মেরে ফরজান্দ খান ঝুপড়িতে ফিরল। আমার পাশে বসে সামনের দিকে তাকাল।

মাস দুই ধরে তিরুরে জঙ্গল 'ফেলিং' শুরু হয়েছে। খানিকটা জায়গা সাফ হয়েছে। সাফ অংশটুকুর পরই আবার জঙ্গল; দুর্ভেদ্য, দুর্বোধ্য, জটিল। সেই জঙ্গল ফুঁড়ে পৃথিবীর আলো ঢোকে না, মানুষের নজর চলে না।

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টিটা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল ফরজান্দের। চোখ দুটো চকচক করছে। তামাটে, রেখাময় মুখে অদ্ভুত যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে। পাশে বসে ফরজান্দের ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম।

হঠাৎ ফরজান্দ খান বলল, 'সিরকার (সরকার) কি মতলব করেছে, খুদা মালুম। আন্দামানের জঙ্গল সব খতম করে ফেলবে।'

ফরজান্দের স্বরে বেদনা, অভিযোগ, হয়ত বা কিছুটা তীব্রতা মেশানো ছিল। চমকে উঠলাম। বললাম, 'জঙ্গল সাফ হলে তো ভালই হয়। এখানে মানুষ আসবে, গাঁও বসবে, ক্ষেতিবাড়ি হবে।'

তীক্ষ্ণ, বন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল ফরজান্দ খান। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সবই হবে লেকিন এই জঙ্গল আর থাকবে না। শহরের মানুষ আসবে, তাদের দুষমণি শয়তানি আসবে। আমাদের মত জংলীদের দুষমণ শয়তান বানাবে।'

জঙ্গল সাফ হওয়ার সঙ্গে ফরেস্ট গার্ড ফরজান্দ খানের জ্বালা, যন্ত্রণা, অভিযোগ কোথায় যে মেশানো, বুঝতে পারছিলাম না। প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা জঙ্গল রসিক। তারপরেই আমার কৌতূহলের জবাব পেয়ে গেলাম।

চল্লিশ বছর আগে 'কালা পানি'র কয়েদী হয়ে আন্দামান এসেছিল ফরজান্দ খান। পিছনের জীবনের বিশেষ কিছুই মনে নেই তার। বেলুচ না পাঞ্জাব, কোথায় যে তার মুলুক, সঠিক খেয়াল করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলে লাল লাল দাঁত মেলে উৎকট হাসি হাসে। বলে, 'জংলীর আবার মুলুক কি? জঙ্গলই আমার মুলুক। হাঃ—হাঃ—হাঃ'—

শুধু এটুকু মনে আছে, যে বার সে আন্দামান আসে, সেই সালেই সেলুলার কয়েদখানা বানানো শেষ হয়েছে। নয়া কয়েদখানায় দু মাস কয়েদ খেটে 'আন্দামান রিলিজ' নিয়ে ফরেস্টের কাজে আসে ফরজান্দ। প্রথমে ছিল কুলী, চল্লিশ বছরে একবার মাত্র 'পারমোশ' (প্রোমোশান) পেয়ে এখন হয়েছে ফরেস্ট গার্ড। এ জন্যে ফরজান্দের ক্ষোভও নেই; ভ্রূক্ষেপও নেই।

এত বড় দুনিয়ায় ইয়ার বন্ধু রিস্তাদার কেউ নেই ফরজান্দের। বেশি টাকা তার দরকার নেই; আর 'পারমোশ'ও (প্রোমোশন) দরকার নেই।

চল্লিশটা বছর জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে দিল ফরজান্দ খান। এতগুলি বছরে বার পাঁচ সাত মাত্র যে গিয়েছে শহর পোর্ট ব্লেয়ারে। শহরে একদিনও তার মন বসে না। শহুরে মানুষগুলোকে কেমন আজব আজব লাগে। চল্লিশ বছর আগের সেই শহরও কি আর আছে! পোর্ট ব্লেয়ারে কত নয়া নয়া কুঠি উঠেছে, টিলার গা বেয়ে বেয়ে কত সড়ক ছুটেছে। পুরানো সেই শহরটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। শহরের জমানা, কেতা, হালচাল—কেমন যেন দুর্বোধ্য ধাঁধাঁর মত মনে হয়েছিল ফরজান্দের। জঙ্গলে পালিয়ে এসে সে বেঁচেছে।

বছর পাঁচেক আগে শেষবারের মত পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়েছিল ফরজান্দ। শুনেছিল, দেশে নাকি আজাদী আসছে। হিন্দুস্তান পাকিস্তান হবে।

ফরজান্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আজাদী কোন চীজ? হিন্দুস্তান পাকিস্তান কোন চীজ?'

শহুরে লোকগুলো জবাব দেয় নি। হো হো' করে নির্মমভাবে হেসেছিল।

তারপর আর যায় নি শহরে। আন্দামানের গহন অরণ্যের ওপারে শহরে বন্দরে, সভ্য মানুষের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই ফরজান্দের; মাথা ব্যথা নেই।

**ফরজান্দ** খান বলতে শুরু করল, 'বাবুজী, আন্দামানের জঙ্গলের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের সম্পর্ক। জঙ্গলে থেকে থেকে আমি জংলী বনে গিয়েছি।'

কথা বললাম না। চুপচাপ শুনতে লাগলাম।

ফরজান্দ খান আবার বলল, 'বাবুজী, আন্দামানের জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে আমি জরুর মরে যাব। জঙ্গল না থাকলে আমি বাঁচবো না।'

এবারও কিছু বললাম না। ফরজান্দই বলতে লাগল, 'জঙ্গলের দিলের খবর আমি জানি। জঙ্গল চায় না, এখানে শহর গাঁও বসুক, তার শান্তি টুটুক।'

অরণ্যের উপর আবছা সন্ধ্যা নেমে আসছে। বেলাশেষের সেই ম্লান, বিষণ্ন আলোটুকু উধাও। কর্নটিয়া আর বাদক পাখিরা ঝাঁক বেঁধে কোথায় চলেছে, কে বলবে?

রাঁচী কুলীরা সোল্লাসে হল্লা করে উঠল, 'হো-ও-ও-ও—'

সঙ্গে সঙ্গে হুড় মুড় করে বিকট আর্তনাদে বিরাট প্যাডক গাছটা ধরাশায়ী হ'ল। অরণ্য কি সহজে মাটির দখল ছাড়তে চায়!

ফরজান্দ চমকে উঠল। অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছে। দুই থাবায় বুকটা চেপে ধরে ফরজান্দ বলল, 'আমার আর একটা সাথী গেল। কত কাল ধরে ঐ প্যাডক গাছটাকে দেখছি।'

একটু সময় কাটল। রাঁচী কুলীদের হল্লা থেমে গিয়েছে।

এবার ফরজান্দের স্বর বিমর্ষ, বিষণ্ন, হতাশ শোনাল, 'জঙ্গল গেলে আমি কোথায় থাকব বাবুজী?'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কেন শহর গাঁওয়ে গিয়ে থাকবে।'

'না না, শহর বড় দুষমণ! ঐ শহর একবার আমার কাছে এসেছিল বাবুজী। আমার জিন্দগী, আমার জংলী দিলটাকে খতম করে দিতে এসেছিল। এই জঙ্গল সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছে। এই জঙ্গল না থাকলে সেদিন আমি সাবাড় হয়ে যেতাম। হয় পাগল হতাম, না হয় দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে জিন্দগী বরবাদ করতাম।'

ফরজান্দ খান হাঁপাতে লাগল। তার চওড়া পেশল বুকটা হাঁপানির তালে তালে উঠছে নামছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বলতে লাগল, 'বাবুজী আমার মত চল্লিশ পঁচাশ বছর জঙ্গলে থাকলে দেখবেন, জঙ্গলের মত এত বড় দোস্ত আর নেই। সেদিন জঙ্গল খাঁটি দোস্তের কাজ করেছিল। আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। জঙ্গল না বাঁচালে দুনিয়ার কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না। মাথা তুলতে পারতাম না।'

আমার কৌতূহল বাগ মানছিল না। বললাম, 'কেমন?'

এতক্ষণ সন্ধ্যাটা ফিকে ফিকে ছিল। এখন অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। কুলী আর জাববদাররা ঝুপড়িতে ফিরতে শুরু করেছে।

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ফরজান্দ বলল, 'সে এক কিস্‌সা। রাত্তিরে বলব।'

খানাপিনার পর ফরজান্দ খানকে ঝুপড়িতে পাওয়া গেল না। ঝুপড়ির মধ্য থেকে বাইরে এলাম। অন্য ঝুপড়িগুলোতে লণ্ঠন জ্বলছে। কুলী আর জবাবদাররা খানা পিনা এবং হল্লা—একসঙ্গে তিনটেই চালাচ্ছে।

আবছা চাঁদের আলোয় খুঁজতে খুঁজতে কাছে এসে পড়লাম। সেই বিরাট প্যাডক গাছটার শবের উপর নিস্পন্দ, উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে রয়েছে ফরজান্দ খান।

আস্তে আস্তে ডাকলাম, 'ফরজান্দ খান—'।

ফরজান্দ চমকে উঠল, 'জী—।' চকমটা কাটলে বলল, 'ও আপনি? বসুন বাবুজী। চল্লিশ বছরের সাথীটাকে দেখতে এসেছিলাম; একদিন এর মতই আমার দশা হবে।'

'ঝুপড়িতে চল ফরজান্দ।'

আমার গলার স্বরটা কাঁপছিল। কাঁপুনির কারণও আছে। তিরুরের ওপাশেই বুশ পুলিস ক্যাম্প। তার পরেই আদিবাসী জারোয়াদের এলাকা। যে কোন সময় তারা তীরধনুক বাগিয়ে দল বেঁধে হানা দিতে পারে।

ফরজান্দ বুঝি আমার মনের কথাটা বুঝল। অভয় দিয়ে বলল, 'ডর নেই বাবুজী, বসুন। জংলীকে জংলী মারবে না।'

ফরজান্দের স্বর, আবছা চাঁদের আলো, চারপাশের দুর্জ্ঞেয় অরণ্য—সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটা সম্মোহ ছিল। আমি বসে পড়লাম। বললাম, 'তোমার সেই কিস্‌সাটা বল।'

আমার ভূমিকা এখানেই শেষ।

ফরজান্দের কাহিনী শুরু হল।

দু মাস আগে তিরুরে ফরেস্টের 'বীট' বসেছিল। হাওয়াই বুটির ঘন বন সাফ করে বেতপাতা আর বাঁশের ঝুপড়ি উঠল। জবাবদাররা এলো, রাঁচী কুলীরা এলো, ফরেস্ট গার্ড হিসেবে এলো ফরজান্দ খান।

ঝুপড়ি উঠবার দিন কতক পরই এল সেই শহুরে দুষমণ। হ্যাঁ, দুষমণ ছাড়া আর কি ই বা তাকে বলা যায়!

ফরেস্ট অফিসার উজাগর সিংকে পয়লা পয়লা চিনতে পারেনি ফরজান্দ। কিন্তু উজাগর ঠিকই চিনেছিল। শয়তানের চোখ তো!

পাঞ্জাবী উজাগর পাগড়ী সামাল করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিল 'তুমিই ফরেস্ট গার্ড?'

ফরজান্দ জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ অফসার (অফিসার) সাহিব।'

'তোমাকে কোথায় দেখেছি, মালুম হচ্ছে।'

শান্ত, নির্বিকার স্বরে ফরজান্দ খান বলেছিল, 'জংগলে চাল্লিশ বছর কামকাজ করছি। কোথাও দেখে থাকবেন।'

'না না, জংগলে না!'

কপালে ভাঁজ পড়ল। দাড়ির জংগলে দু হাতের দশটা আঙুল ঢুকিয়ে থামচা মেরে ধরল। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় কাটল। হঠাৎ দুই হাত মাথায় তুলে চেঁচিয়ে উঠল উজাগর, 'ইয়াদ ছিল না; এবার ঠিক ধরেছি। চাল্লিশ বছর আগে তুমি আর আমি একসাথ 'কালা পানি'র কয়েদ খাটতে এসেছিলাম। ইয়াদ্ আছে?

উজাগর সিংয়ের স্মৃতি বড় তুখোড়। ঠিক চিনেছে। আস্ত দুষমন যে!

এবার একটু একটু মনে পড়ল ফরজান্দ খানের। আন্দামানে তারা একই সংগে একই জাহাজে এসেছিল বটে। চাল্লিশ বছর আগে দুজনেই ছিল দ্বীপান্তরের কয়েদী। এখন সে ফরেস্ট গার্ড, আর উজাগর ফরেস্ট অফিসার। দুজনের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। কিন্তু এই ফারাকটা এক কথায় ঘুচিয়ে দিল উজাগর সিং, 'তু মেরা দোস্ত্ ফরজান্দ। সেই রোজগুলোর কথা মনে পড়ে, দুই দোস্ত যখন কয়েদখানায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নারকেলের ছোবড়া ছিলে কুটে তার বের করতাম, তুইল ঘানি টানতাম, রম্বাস ছিঁচতাম—'

বিহ্বল স্বরে উজাগর বলেছিল, 'অফসার সাহিব—'

উজাগর খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'ছোড় শালে তোর অফসার সাহিব। আমি উজাগর'—



ফরেস্ট অফিসার দিন দশেক থাকবে তিরুরের 'বীটে'। জংগল সার্ভে করে নির্দেশ দিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী 'ফেলিং' শুরু হবে।

নামেই ফরেস্ট অফিসার; আদতে জংগলের সংগে বিশেষ সম্বন্ধ নেই উজাগর সিংএর। বন বিভাগের কানুন মানলে ফরেস্ট অফিসারকে জংগলেই থাকতে হয়। কিন্তু কানুন মানছে কে? নিয়ম কানুনের বন্দা কোনকালেই উজাগর সিং নয়। শহর পোর্ট ব্লেয়ারেই তার দিন কাটে। মাঝে মাঝে 'ফেলিং' কি সার্ভের সময় সে জংগলে আসে।

আসার সময় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পেটি ভরে বিলাতী শরাব এনেছিল উজাগর সিং। পুরা দশটা রোজ এই জংগলে কাটাতে হবে! ফুর্তি নেই, ফার্তা নেই, নাচাগানা নেই, সবচেয়ে যেটা আসল, সেই আওরতই নেই। চারদিকে পাহাড়ের চড়াই উতরাইয়ে খালি বন আর বন। গহীন গভীর, নিরালোক জটিল অরণ্য। দিদু আর প্যাডক টর্মাপিণ্ড আর গর্জন, পেমা আর জারুল গাছের জটলা। এর মধ্যে উজাগর সিংএর মত দুরন্ত ফুর্তিবাজের দিন কাটে কেমন করে?

বিলাতী শরাবের দুআয় নেশার অভাব মিটেছে। কিন্তু নারীসংগহীন পুরা দশটা দিন কাটাতে হবে, এমন একটা বিশ্রী ভাবনায় মেজাজটা বিগড়ে ছিল। নারীমাংসের অভাব

নেশা দিয়ে কতটা পূরণ করা যায়, সেই কথাই ভাবছিল উজাগর সিং।

ঝুপড়ির মধ্যে বসে সমস্ত সকাল নির্জলা দারু গিলেছে। থাবা থাবা ঝলসানো পাখির মাংস খেয়েছে উজাগর।

এখন দুপুর।

খানাদানার পর জংগল সার্ভে করার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী কুলী জবাবদার নিয়ে ফরেস্ট অফিসারের ঝুপড়ির সামনে এলো ফরজান্দ খান। বাইরে থেকে ডাকল, 'অফসার সাহিব—'

ভিতর থেকে উজাগর সিং খেঁকিয়ে উঠল, 'কৌন মূর্তি রে?'

'আমি ফরজান্দ জী—'

এবার সোল্লাসে হল্লা করে উঠল উজাগর, 'আরে আও আও ইয়ার অন্দর আ যাও—'

ঝুপড়ির মধ্যে চলে এলো ফরজান্দ খান। বাঁশের মাচানের উপর জাঁকিয়ে বসে রয়েছে উজাগর। চোখ দুটো টকটকে লাল; আরক্ত। মাচানের নীচে গোটা তিনেক শূন্য বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে।

উজাগরের হাতে একটা আধা শূন্য বোতল। ফরজান্দের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পী লেও ইয়ার—'

'নেহী জী, আমি দারু খাই না।'

উজাগরের মুখচোখের হাল চাল কেমন বদলে গেল। এর চেয়ে যদি ফরজান্দ তার শির বরাবর একটা ডাণ্ডা বসিয়ে দিত, জরুর সে খুশী হত। শরাব খায় না, এ কেমন মানুষ! দিল্লাগী করছে না তো ফরজান্দ!

হঠাৎ কেমন এক হিংস্র খেয়ালে পেয়ে বসল উজাগর সিংকে। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'ইয়াদ রাখিস শালে, আমি তোর অফিসার। দারু নে। আমার কথা না শুনলে তোর নোকরি থাকবে না।'

নোকরি থাকবে না। জংলী ফরজান্দের খুনের মধ্য দিয়ে বিজলী ছুটে গিয়েছিল। নোকরি না থাকলে এই জংগলেও সে থাকতে পারবে না। চল্লিশ বছর এই জংগলে কেটেছে। আন্দামানের অরণ্যের হালচাল, দিলমর্জি, সব তার জানা। এই মুহূর্তে ফরজান্দের মনে হয়েছে, অরণ্যের বাইরে সভ্যভব্য দুনিয়ায় কোথায় সে যাবে! চল্লিশ বছরে বার পাঁচ সাত পোর্ট ব্লেয়ার শহরে গিয়ে সে দেখেছে, শহরটা কি আজব, দুর্বোধ্য, জটিল ভীষণ এক ধাঁধা। বিচিত্র এক ভয়ে জংলী ফরজান্দ অসাড়, আড়ষ্ট হয়ে গেল। না না, এই জংগল ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে না।

চল্লিশ বছর আগে দারু খেত কি খেত না, আজ আর মনে নেই। হাত বাড়িয়ে শরাবের বোতলটা ধরতে গিয়ে হাতটা থরথর কাঁপল ফরজান্দের। গলার মধ্যে বোতলটা উপুড় করার সংগে সংগে গলনালীর ভিতর দিয়ে তরল আগুন ছুটে গেল। কপালের শিরাগুলো চিন চিন করে যেন ফেটে পড়তে লাগল।

ফরজান্দের পিঠে বিরাট এক থাপ্পড় বসিয়ে উজাগর সিং বাহবা দিল, 'সাবাস ইয়ার, তুই আমার খাঁটি দোস্ত—'

নির্জলা দারুর ঘা সামলে নিয়ে চোখ মেলল ফরজান্দ। ডাকল, 'অফসার সাহিব—'

'বোলো ইয়ার—'

'কুলী জবাবদাররা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জংগলে যাবেন না?'

'জংগল ছোড়ো ইয়ার। কুলীলোকদের চলে যেতে বল। আজ জংগলে যাব না। তোমার সংগে বাতচিত আছে।'

কুলী জবাবদারদের ফিরিয়ে দিয়ে আবার ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকল ফরজান্দ।

উজাগর সিং খাতির করে বলল, 'পাশে এস ইয়ার; এতদূর থেকে দোস্তি মহব্বতির কথা হয়!'

উজাগরের মাচানে এসে পাশাপাশি বসল ফরজান্দ।

উজাগর বলতে লাগল, 'চল্লিশ বছর এই জংগলেই রয়েছ ফরজান্দ?'

'জী!'

'সাদী উদি করেছ?'

'জী না।'

উজাগর চেঁচিয়ে উঠল, 'চল্লিশ বছর আওরত ছাড়া জিন্দগী কাটালে কেমন করে? ওয়া গুরুজীকি ফতে! এমন তাজ্জব বাত শুনিনি কোনকালে!'

ফরজান্দ জবাব দিল না।

উজাগর সিং আবার বলল, 'আমার তো এক রোজও যুয়ানী আওরত ছাড়া চলে না। দশটা রোজ এই জংগলে কেমন করে কাটাবো, গুরুজী মালুম!'

একটা হাত ফরজান্দের মাংসল গর্দানটার উপর রাখল উজাগর সিং। নিজের দিকে



'একটু ফুর্তি করে আসি'

ফরজান্দকে একটু টানল। হঠাৎ তার গলার স্বরটা ঝুপ করে খাদে নামল, 'ফরজান্দ দোস্ত—'

'জী, অফসার সাহিব—'

'তিরুরের আগে তো হারবার্টাবাদ গাঁও ?'

'জী।'

'আর আগে ?'

'কর্নালনপুর।'

'হাঁ হাঁ ইয়ার, সাবাস।' দুই হাতে ফরজান্দকে জড়িয়ে হল্লা করে ওঠে উজাগর সিং, 'তুমার সব ইয়াদ আছে, দেখছি। লেকিন দোস্ত, তুমি যদি একটু মেহেরবাণী না কর, জংগলে জিন্দগী বেকার হয়ে যাবে।'

শিরায় শিরায় নির্জলা বিলাতী মদের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। কপালের দু পাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত, বন্য দৃষ্টি রক্তাভ হয়ে উঠেছে। শংকিত, সন্ত্রস্ত ফরজান্দ বলল, 'কি করব অফসার সাহিব ?'

স্বর আরো খাদে নামল উজাগরের। একরকম ফিস ফিসই শোনাল, 'কর্নলিনপুরের চৌধুরীর নাম তো মঙ থে; লোকটা বর্মী ? তাই না ?'

'হাঁ জী—'

'মঙ থে'র একটা খুবসুরতী শালী আছে। শালীটা রাঁড় (বিধবা); নাম মিমি খিন। মিমি খিন বহুত, বহুত খুবসুরতী। আসার সময় তাকে দেখে এসেছি।'

উজাগর সিংএর লাল চোখদুটো ধক ধক করতে লাগল। চাপা, তীব্র স্বরে সে বলল, 'কি বল ইয়ার; মঙ থে'র শালীটা খুবসুরতী, তাগড়া জোয়ানী। তাই না দোস্ত ?'

নির্বিকার গলায় ফরজান্দ বলল 'হবে।'

উজাগর খেঁকিয়ে উঠল, হবে না, জরুর।' তারপরেই ফরজান্দের কানে মুখ গুঁজল, 'মাগীটাকে যে চাই দোস্ত—'

কটাং করে কপালের দু'পাশের সেই অবাধ্য রগ দুটো যেন ছিঁড়ে গেল ফরজান্দের। কিছুই সে বুঝতে পারছে না, কিছুই দেখছে না, শুনছে না। অসহায়, জড়িত দুর্বোধ্য গলায় সে শুধু বলতে পারল, 'কেমন করে ?'

উৎকট, বিকট আওয়াজে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসল উজাগর সিং। হাসির দমকে মাংসল রোমশ উদর নাচতে লাগল। হাসির চোট কমলে বলল, 'জংগলে থেকে থেকে জংলীই বনে গিয়েছ ফরজান্দ। বুধ্ধু মুরুখ কাঁহিকা। রুপেয়া, রুপেয়া দিলে আসমানের চাঁদ মেলে। আর এতো মঙ থে'র রাঁড় শালী; একটা মরদে ঠোকরানো আওরত।'

আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল ফরজান্দ খান।

উজাগর সিং বলল, 'চলো ইয়ার; আজ রাত্রে একটু ফুর্তি করে আসি।'

'কোথায় ?'

দাঁতে দাঁত ঘষল উজাগর। বলল, 'ওয়া গুরুজী কি ফতে! বুধ্ধু, নালায়েক জংলী কাঁহিকা! যাবো কর্নলিনপুর, মিমি খিনের কাছে।'

আচমকা চিৎকার করে উঠল ফরজান্দ, 'না না, এ বড় গুনাহ্—'

জংগলে ঘুরে ঘুরে অজস্র ফুর্তি পায় ফরজান্দ। অরণ্যচর মানুষের ফুর্তির নিজস্ব একটা কানুন আছে, রীতি আছে। সভ্যভব্য শহুরে মানুষের সংগে তার ফুর্তির কোন মিল নেই। প্যাডক গাছের গা বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেতের লতা ওঠে, কিংবা গর্জন গাছের খাড়া মাথা আসমান ফুঁড়ে যায়, কিংবা পপিতা গাছের মচকা ডালপালা সমুদ্র থেকে ছুটে আসা উদ্দাম বাতাসে থরথর কেঁপে ওঠে। পাতায় শাখায় শিকড়ে বাকড়ে অরণ্যের সংসার দিনে দিনে জটিল হয়, গহীন হয়। ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্তে মুহূর্তে অরণ্যের রূপ বদলায়, চরিত্র বদলায়। সকালে যে অরণ্য শান্ত, নির্বিকার, দুপুরে সে-ই আবার জ্বলন্ত, হিংস্র, রাত্রে দুজ্ঞেয়, রহস্যময়। অরণ্যের এই বিচিত্র রূপ, এই অদ্ভুত চরিত্রের মধ্যেই ফরজান্দের ফুর্তিটুকু লুকোনো। শহুরে মানুষের ফুর্তির হালচাল তার জানা নেই। উজাগরের ফুর্তির নমুনা শুনে অবোধ্য, ভীষণ এক ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে ফরজান্দ, 'না না, আমি যাবো না—'

একদৃষ্টে, ভয়ানক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ফরজান্দের চেঁচানি শুনল উজাগর। শুনতে শুনতে নিষ্ঠুর এক জেদে পেয়ে বসল তাকে। কর্কশ গলায় সে বলল, 'মনে রাখিস ফরজান্দ; আমি তোর উপরবালা অফিসার। দিল হলে তোর নোকরি খেয়ে নিতে পারি।' একটু থেমে, আবার, 'আমার সংগে আজ রাত্তিরে ফুর্তি করতে কর্নলিনপুর যাবি। যা, এখন ভাগ্—'

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল ফরজান্দের। বিলাতী দারু গিলে সেই যে চোখ লাল হয়েছিল, আর সাদা হল না। চারপাশ থেকে দুনিয়ার সব ভয় তাকে ঘিরে ধরল। আতংক কণা কণা নোনা ঘাম হয়ে ফুটল। সারাক্ষণ তার মনে হল, দিল টুটিয়ে, খুন ফুঁড়ে, হাড্ডি মাংস ফাটিয়ে, তার সমস্ত অস্তিত্ব চুরমার করে প্রবল বেগে কি যেন বেরিয়ে পড়তে চাইছে। মনে হল, উজাগরের ফুর্তির মধ্যে সাংঘাতিক গুনাহ্ রয়েছে। একবার ফরজান্দ ভাবল, ঘন জংগলে পালিয়ে যায়। পরক্ষণেই মনে পড়ল, উজাগর সিংএর সংগে ফুর্তি করতে না গেলে, নোকরি থাকবে না। নোকরি না থাকলে জংগলের সংগে তার চল্লিশ বছরের সম্পর্ক টুটবে। জংগলের বাইরে, অজানা, দুর্জ্ঞেয় দুনিয়ায় কোথায় সে যাবে?

শহরে দুষমণরা বুঝি ভেলিক জানে। কখন যে সন্ধ্যা নেমেছে, আর কখন যে গুটি গুটি পায়ে ফরেস্ট অফিসারের ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল নেই।

ফরজান্দকে দেখে বেজায় খুশী উজাগর। সে বলল, 'তুম আ গিয়া দোস্ত! বহুত আচ্ছা!'

মুখে কিছু বলল না ফরজান্দ। ঘাড় কাত করে সায় দিল।

এবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ফরজান্দের পা থেকে শির পর্যন্ত জরীপ করল উজাগর। পরনে পুরু চটের ঢিলা কুর্তা, হাঁটুঝুলে প্যান্ট। কুর্তা প্যান্টের বরন এবং আদি রঙ বুঝবার যো নেই। সেগুলোর মধ্য থেকে ভ্যাপসা, উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

উজাগর বলল, 'এই কুর্তা প্যান্ট পরেই ফুর্তিতে যাবে?'

'আমার দুসরা কুর্তা প্যান্ট নেই।'

উজাগরের স্বরে বিরক্তি ফুটল, 'চল।'

'বীটে'র ঝুপড়িগুলোতে লণ্ঠন জ্বলছে। রাঁচী কুলীদের, জবাবদারদের নাচা গানা বাজনা আর বেপরোয়া হল্লা তুমুল হয়ে উঠেছে। অনেক দূরে জারোয়া এলাকার সীমানায় বুশ পুলিশের ঝুপড়িগুলোতে বিন্দু বিন্দু আলো দেখা যায়।

এখন পয়লা রাত।

ফরজান্দকে নিয়ে উজাগর কর্নালিনপুরে রওনা হল।

প্রথমেই একটা হাওয়াই বুটির ঝোপ। ঝোপের প্রান্ত থেকেই দক্ষিণ আন্দামানের নিবিড়, জটিল অরণ্যের শুরু।

আকাশের পুব থেকে পশ্চিমে একদল মৌসুমী হানাদার মেঘ চলেছে। মেঘ চুঁইয়ে ফিকে ফিকে, আবছা চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

ঝুপড়ি থেকে বেরুবার আগে আর একটি বোতল কাবার করে নেশাটাকে চাংগা করে এসেছে উজাগর। নিজের নেশায় মশগুল হয়ে সে পথ চলছে। পথ চলছে আর সমানে বকর বকর করছে, 'বুঝলি ইয়ার, এই জিন্দগীর আয়ু দু দশ রোজ। তাই কোন পরোয়া নেই। খানা খাও, নেশা কর, নাচা কর, গানা কর, হল্লা কর, আওরতের সাথ ফুর্তিফার্তা কর। তারপরই তো ফৌত হয়ে যাবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাতটা সাচ্চা কিনা তুমিই বাতাও দোস্ত—'

ফরজান্দ জবাব দিল না। অসহ্য, আকণ্ঠ এক যন্ত্রণা, তীব্র প্রখর অপরাধবোধ তার শ্বাস-নলীটাকে চেপে ধরেছে। মনে হল, একবার চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু গলা দিয়ে অস্ফুট একটা গোঙানিও বেরিয়ে এল না। চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক মৃত্যু তাকে একটু একটু করে ঘিরে ধরছে।

হাওয়াই বুটির ঝোপ পেরিয়ে ঘন জংগলের মধ্যে ঢুকল দুজনে। এতক্ষণ ঝুপড়িগুলো থেকে কুলীদের হল্লা শোনা যাচ্ছিল; লণ্ঠনের বিন্দু বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছিল। এখন আরো আলো নেই, মানুষের পৃথিবীর কোন শব্দ নেই। মাথার উপর ডালপালা পাতার নিশ্ছেদ ছাদ। নিরালোক কুটিল অন্ধকার। মুহূর্তে অরণ্য দুজনকে গ্রাস করল।

'বীট' থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছে। এতক্ষণ নেশায় বুঁদ হয়ে চলছিল উজাগর সিং। এবার কেমন যেন ভয় ধরল তার। ফরজান্দের একটা হাত পাকড়ে ফিস ফিস করে বলল, 'দোস্ত, টর্চবাতি এনেছ?'

'না।'

'বহুৎ মুসিবৎ!'

দুজনে চলেছে। দুই হাতে ডালপালা সরিয়ে, পথ করে, পায়ে পায়ে টক্কর আর মাথায় গুঁতো খেতে খেতে চলেছে। অরণ্য হাজার বাহু বাড়িয়ে তাদের বাধা দিচ্ছে। কাঁটার আঘাতে চামড়া ছিঁড়েছে; খুন ঝরছে। অদ্ভুত এক সম্মোহের মধ্য দিয়ে তারা ক্রমাগত এগুচ্ছে। পায়ে বিছা মাকড় কামড়াচ্ছে। অরণ্যের মাথা থেকে থোকা থোকা জোঁক পড়ছে গায়ে; মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে কতকালের সাধ যে তারা মিটিয়ে নিচ্ছে! তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। অরণ্য তাদের জাদু করেছে।

কতক্ষণ তারা হেঁটেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ উজাগরের মনে হল, এতক্ষণে তাদের কর্নালিনপুর পৌঁছে যাবার কথা। আস্তে আস্তে সে ডাকল, 'দোস্ত—'

ফরজান্দের সাড়া নেই। অন্ধকারে উজাগর বুঝতে পারল না, ফরজান্দ অরণ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। কি জানি কেন, উজাগর আর ডাকাডাকি করল না।

দু জনে এগিয়েই চলে। একবার চড়াই আবার উতরাই। টিলার পর টিলা। পথ আর ফুরায় না। রাত্রির অরণ্যের মনে কি আছে কে জানে?

কোথায় একটা রাত অন্ধ তিরাপ পাখি

কাঁকিয়ে উঠল, কোথা থেকে বুনো ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ নাক জ্বালিয়ে দিল।

স্তব্ধ, দুর্জ্ঞেয় অরণ্য। এখানে পৃথিবীর আলো বাতাস পৌঁছায় না, পৃথিবীর মানুষ আসে না। মানুষের শব্দে, স্পর্শে এই আদিম অরণ্যের শান্তি টুটে যায়। এখানে আসতে হয় অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে, পবিত্র নিরাসক্ত মনে।

ঝুপড়ি থেকে আসার সময় অদ্ভুত এক মৃত্যু ঘিরে ধরেছিল ফরজান্দকে। চলতে চলতে গভীর অরণ্যের মধ্যে যত এসে পড়ছে, মৃত্যুর ভয়টা তত চলে যাচ্ছে। চল্লিশটা বছর আন্দামানের জঙ্গলে কাটল। কিন্তু অরণ্যের এমন রূপ কোনকালে দেখেনি ফরজান্দ। এ রূপ ঠিক ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না। শুধু সে শরীরের চারপাশে খোয়াবের মত ঘন হয়ে আছে, দিলে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে অরণ্য আবছা, ঠিক দেখা যায় না। কিন্তু তার স্পর্শ পাওয়া যায়। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন সে বলে। কিছু তার বোঝা যায়, কিছু যায় না। চলতে চলতে এতদিনে আদিম অরণ্যের আত্মার মধ্যে এসে পড়তে পারল ফরজান্দ। খুশিতে, ফুর্তিতে মনটা ভরে গেল তার।

ঝুপড়ি থেকে বেরুবার সময় ফুর্তির নেশায় দিলটা বুঁদ হয়ে ছিল উজাগরের। মত্ত খের জোয়ানী শালীটার বুকের দু-পিণ্ড টাটকা তাজা মাংস, ভারী পাছার দোলানি, চাপা চোখের তেরছা নজরের শয়তানি দিলটাকে টুটিফাটা করে দিচ্ছিল। পয়লা পয়লা নেশার ঘোরে পথ চলেছে উজাগর। কিন্তু অরণ্যের এই গভীরে চলে এসে বিচিত্র এক ভয়ে নেশা ছুটে গেল। দিলের মধ্য থেকে মত্ত খের জোয়ানী শালীর কামনা উবে গেল।

ভয় ভয়, কাতর স্বরে উজাগর ডাকল, 'ফরজান্দ দোস্ত্—'

এবারও সাড়া মিলল না। ফরজান্দ তন্ময় হয়েই রয়েছে।

এক সময় বোঝা গেল, সকাল হয়েছে; অন্ধকার অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। ছায়াচ্ছন্ন, স্তব্ধ, হিম হিম অরণ্য থেকে রাত্রির সেই স্বপ্নমায়াবিভ্রম চলে যেতে শুরু করেছে।

একটু পরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

কি আশ্চর্য! জঙ্গলের মধ্যে তারা তো খুব বেশি দূরে যায় নি। সারা রাত অরণ্যে পথ হারিয়ে কোথায় তবে তারা ঘুরেছে! ফরজান্দ ভেবেই পেল না।

পাশাপাশি ঘাড় গুঁজে চলেছে উজাগর সিং। তার মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ ঢুকে গিয়েছে, গালের হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে, মাথার পাগড়িটা ছিঁড়ে ফালা ফালা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিপুল দেহের ভার টেনে টেনে 'বস্তি'র দিকে চলেছে উজাগর। ফুর্তিবাজ মানুষটা সারা রাত বিচিত্র এক ভয়ের মধ্যে কাটিয়ে একেবারে চুপসে গিয়েছে।

উজাগরের দিক থেকে দৃষ্টিটা জঙ্গলে নিয়ে ফেলল ফরজান্দ। হঠাৎ মনে হল, এই অরণ্যই কারসাজি করে, কর্নালিনপুরের পথটা লুকিয়ে রেখে কাল রাতে অদ্ভুত এক মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল ফরজান্দের। বন্য, উদভ্রান্ত দৃষ্টি খুশিতে, আনন্দে চক চক করতে লাগল।

এরপর আরো ন দিন 'ভরুরের 'বস্তি'তে' ছিল উজাগর সিং। কি জানি কেন ফরজান্দের সঙ্গে ফুর্তির কথা একটা বলে নি।

এই অরণ্য ফরজান্দকে বাঁচালো। আন্দামানের এই বিপুল, ভয়াল অরণ্য।

কাহিনী শেষ করে আমার দিকে তাকাল ফরজান্দ। বলল, 'বাবুজী, যে জঙ্গল আমাকে বাঁচালো, তার মত দোস্ত দিন-দুনিয়ায় আমার আর কে? জঙ্গল খতম হলে আমি শহরে গিয়ে বাঁচবো না, জরুর না—'

শহরের স্বপক্ষে আমার কিছু বলবার ছিল। কিন্তু আবছা চাঁদের আলোতে ফরজান্দের চল্লিশ বছরের সাথী সেই পেমা গাছের শবের উপর বসে চারপাশের অরণ্যকে সাক্ষী রেখে, অরণ্যের বিপক্ষে কিছু বলতে মন সায় দিল না।

একসময় ভাবতাম, অরণ্যের সঙ্গে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিরই মিল রয়েছে। ফরজান্দকে দেখে আমার ধারণা বদলাল। প্রথমে মনে হয়েছিল, ফরজান্দ বুঝি অরণ্য-রসিক। পরে মনে হয়েছে অরণ্যের আত্মার সঙ্গে তার আত্মা এক হয়ে গিয়েছে। এ কথাও বোধ হয় ঠিক নয়। ফরজান্দ যে ঠিক কি, আমি বুঝতে পারি, বোঝাতে পারি না। পারবোও না।

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

৮

**বা**ড়ির লোকেরা কিন্তু তার এসব কার্য-কলাপের বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানতে পারলো না। এমন কি মাকে পর্যন্ত গোপন করলো সুলেখা। সন্দেহ করবার কিছু নেই। অনেকদিন সে দেরি করে বাড়ি ফেরে, কেউ ভাবে না তার জন্য। সবাই জানে দুটো টিউশনি করতে হয় তাকে। জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমার ইচ্ছে এই টিউশনির টাকাটা এনে সে তাঁদের হাতে দেয়। আড়ে ঠারে অনেকবার বলেছেনও সে কথা, সুলেখা কানে তোলে নি। সে টাকা সে মাকেও দেয় না। লাভ নেই। মাকে দেয়া মানেই জ্যাঠাইমাকে দেয়া। বলে কয়ে ছলে বলে ঠিক তিনি বার করে নেবেন মার কাছ থেকে। এ টাকা দিয়ে সে ভাইদের খরচ চালায়, নিজের হাতখরচ রাখে। কলেজে স্টাইপেন্ড পায় সে, কাজেই পড়াখরচটা লাগে না। কিছু জিজ্ঞেস করার অভ্যাস নেই সুষমা দেবীর, উদ্বিগ্ন হলেও তা প্রকাশ করার অভ্যাস নেই। যদি কখনো সুলেখার বাড়ি ফিরতে আন্দাজের অতিরিক্ত দেরি হয়, ঘর বার করেন তিনি, ছাদে গিয়ে দূরে রাস্তার ঐ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন, কাউকে দেখলে ত্রস্তে নেমে আসেন নিচে। এতো বয়েস হয়ে গেল মানুষটার তবু নতুন বৌয়ের লজ্জা, ভয় ভাব কাটলো না। সুলেখা এলে বিষাদভরা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কাজে মন দিতে পারেন। সুলেখা বোঝে সে কথা; তাই আজকাল যেদিন দেরি হবার সম্ভাবনা থাকে বলে যায়, সুষমাদেবী চোখ তুলে তাকান, মৃদু হেসে সুলেখা বলে, 'দু' একটা কাজ সেরে আসবো আর কী। তুমি ভেবো না।'

বাস। ঐ পর্যন্তই। তবু যেটুকু কথা ভেসে আসে হাওয়ায় তাই নিয়েই অনেক গোলযোগ হয়, কথাবার্তা হয়, অশান্তি করেন জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা। কিন্তু সমুদ্রের কাছে কি ডোবার জল দাঁড়াতে পারে? দেশের অতোবড়ো অশান্তির কাছে সুলেখার ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তিটা কি তার চেয়ে নগণ্য নয়?

জ্যাঠামশায় একদিন কোথায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে ডেকে বললেন, 'মেয়েকে সামলাও।'

'মাকে কে সামলায় তার ঠিক নেই, মা সামলাবেন তাকে!' সভয়ে চারদিকে তাকিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'অতিশয় অসভ্য অবাধ্য মেয়ে তোমার। এ মেয়ে নিয়ে এক বাড়িতে থাকা আমার পোষাবে না।' জ্যাঠামশায়ের গলা প্রত্যয়ে স্থির।

দরজার আধো আড়ালে দাঁড়িয়ে আধো ঘোমটা ঢাকা করুণ মুখখানা আরো করুণ হয়ে আসে মার। ভাসুরের কথায় তিনি ঘেমে ওঠেন। মেয়ের ভয়ডরহীন স্বাধীনচেতা স্বভাব তাঁর নিজেরই কি কম ভীতির কারণ?

নিবারণবাবু গম্ভীরমুখে তামাকের নলে টান দিয়ে বললেন, 'এইমাত্র মহিম হালদারের বাড়ি গিয়ে তোমার মেয়ের গুণকীর্তন শুনে এলাম। ছি ছি আমাদের ঘরের মেয়ে, এসব কী বেলেল্লাগিরি। তিনি নাকি দেশোদ্ধার করছেন। দেশোদ্ধারের নামে যে তোরা কী করিস তা কি কারো জানতে বাকী আছে?'

ঢোক গিলে চুপ করে রইলেন মা। সুপুরি কাটতে কাটতে জেঠাইমা বললেন, 'আমার বাড়ির ছাদে কতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কী আরম্ভ করেছে কদিন থেকে, কাল আমি সব কটাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি।'

'এসব কি ভালো?' নিবারণবাবু আবার মাকে উদ্দেশ্য করে কথা ছুড়লেন, 'বললে তো ভালো শোনায় না কিন্তু মেয়ের মাথাটি তুমিই খেয়েছ। বাড়িটা আমার

স্বদেশী গুন্ডামীর আখড়া নয়। এখানে থাকতে হলে আমার হুকুম মেনেই চলতে হবে। আর তা যদি না পারে ইচ্ছে হলে মেয়ে নিয়ে তুমি আলাদা হয়ে যেতে পারো, দেশে গিয়ে থাকতে পারো। হাজার হোক, ইংরেজ আমাদের প্রভু, রাজা, তাদের মান্য করে চলতেই হবে।'

বড়ো জায়ের দিকে তাকিয়ে ভাসুরকে লক্ষ্য করে এতক্ষণে কথা বেরুলো মার মুখ দিয়ে 'এজন্যে ওকে শাসন করুন।'

নিবারণবাবু বিদ্রুপের ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'আমি করবো তোমার মেয়েকে শাসন? কেন জুতো খাওয়াতে চাও নাকি?'

মা একথা শুনে আহত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'শহর গরম। বুঝলে?' তামাকের নলটা জ্যাঠামশায় সরিয়ে রাখলেন পাশে। 'ইংরেজরা আমাদের আস্পর্ধায় ক্ষেপে লাল হয়ে গেছে, মুসলমানরা এসব স্বদেশী ফদেশীর ধার ধারে না, তাই তারাই এখন তাদের বন্ধু। তাদেরই এখন হাতিয়ার করে মারছে আমাদের। চালাক জাত বটে। বুদ্ধিটা বার করেছে কেমন দ্যাখো একবার। জগতের কাছে সাধুও রইলো আবার ওদিকে কাজও হাসিল হলো। তা বাপু যাই বলো আগুনে হাত দিতে যাওয়াই বা কেন? ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছিস আর কামড় খাবি না? স্বাধীনতার নিকুচি করেছে।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'কাল নাকি বংশী লেনে কলের জল নিয়ে দারুণ মারপিট হয়ে গেছে। মুসলমানরা নাকি সব একজোট হয়ে বলেছে, নবাবগঞ্জে আর একটা হিন্দুকেও বেঁচে থাকতে দেবে না। সব হিন্দু মেরে ফেলতে পারলে ইংরেজরা নাকি ওদের রাজা করে দেবে ভারতবর্ষের।'

মাথা নাড়লেন জ্যাঠামশায় 'মিথ্যা বলো নি। যা দেখছি, তাতে তো ভয়ই হচ্ছে রীতিমতো। যেন থম থম করছে শহরটা। কেবল এখানে ফিসফিস ওখানে গুজগাজ। মুসলমান পাড়া দিয়ে আসতে গা ছম ছম করে। ওদিকে নবাব বাড়িতে খানাপিনা চলছে সাহেবদের। পুলিস কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো সাতবার করে ঢুকছে আসান মঞ্জিলে, সাতবার করে বেরুচ্ছে। শুনছি আকতার সাহেবের গুণধর পুত্রই হচ্ছে এই যজ্ঞের কর্তা। ওটা হচ্ছে এক নম্বরের শয়তান। বুড়ো নওয়াব আমির আলি সাহেব যদি বেঁচে থাকতেন, এতোদিনে নাতিকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতেন। সে যাই হোক, সাবধান থাকা তো কর্তব্য?'

তাইতো।

'ইংরেজের বিরুদ্ধে এখন একটি কথা যে উচ্চারণ করবে সর্বনাশটি প্রথমে তার ঘরেই ঢুকবে।' দরজার দিকে তাকালেন জ্যাঠামশায় 'তোমার মেয়ের রকম-সকমতো আমি ভালো দেখিনে; আমার অত বুকের পাটা নেই যে বাড়ির মধ্যে কালসাপ পুষবো।'

তাইতো।

জেঠাইমা উঠে গিয়েছিলেন একটু সময়ের জন্য, ফিরে এসে যোগ দিলেন কথায় 'আর ওদিকে টিকটিকিগুলোতো সারাদিন সব পাড়ায় পাড়ায় কান পেতে ঘুরছে। ভালোমানুষ সেজে এসে কখন যে কে কী সর্বনাশ করবে জানতেও পারবো না। শুনছি ইংরেজরা দু হাতে টাকা ছড়াচ্ছে এই কাজে। ঘরে ঘরে ছেলে বুড়ো সব টাকার লোভে গোয়েন্দার কাজ নিচ্ছে।' একটু গলা খাটো করে বললেন, 'এই তো, দীনেশদের বাড়িতে যে সেদিন সৈন্যগুলো এসে অমন মারপিট করে গেলো, সবাইতো বলছে পাশের বাড়ির কালিমোহনবাবু নাকি গিয়ে ওদের নামে কী সব লাগিয়েছিল পুলিসের কাছে।'

'তা হলেই বোঝো। কে কোনদিন ফস্ করে কী লাগাবে গিয়ে—' জ্যাঠামশায় ডিবা খুলে পান মুখে দিলেন, 'তারপর বলা নেই কওয়া নেই রাত বিরেতে এসে সার্চ করবার নামে যদি ওরকম মারধোর আরম্ভ করে মেয়েদের অসম্মান করে তখন উপায়। আর এলে মারধোর করবেই। কেন করবে না? কিছু দোষ না পেলেই করে, তার মধ্যে বাড়ি ভর্তি লাঠি সোটা। মেয়েতো দেশ স্বাধীন করছেন লাঠি শিখে ছোরা শিখে, তখন পারবে সে সব চালাতে? তারপরে গুষ্ঠিসুদ্ধু হাতকড়া পরে হাজতে পচো।'

কথা শুনে সুষমা দেবী প্রায় শিহরিত হলেন। এই মেয়ের জন্য সত্যি তাঁর কোনো শান্তি নেই।

এরপরে নিবারণবাবু হঠাৎ গলা নরম করে বললেন 'সুপ্রকাশ মারা গেছে আজ প্রায় দশ বছর হতে চললো—'

দশ বছর! এতোদিন! সুষমাদেবী চোখ নামালেন, চোয়ালটা ব্যথা করে উঠলো।

'এতোদিন তোমরা এখানে আছো। তিন ছেলেমেয়ে ইশকুলে কলেজে পড়ছে তোমার। খাওয়া বলো, পড়া বলো, লাগেতো সবই। আর দিনকাল যা পড়েছে—'

সুষমা দেবী মাথা নাড়লেন।

'তারপর মেয়ে তোমার যথেষ্ট বড়ো হয়েছে। তার উপর যেভাবে চলাফেরা করছে, তাতে দুর্নাম বই সুনাম নেই। বিয়েতো দিতে হবে? সুন্দর নয় যে কেউ শখ করে নেবে। বলতে গেলে কুচ্ছিতই। কদিন পরে বিয়ে হওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠবে। কাজেই চেষ্টা চরিত্র করে এখনি পাত্রস্থ করা ভালো। আমার অবস্থাতো দেখছো। দুই মেয়ের বিয়ে দিতেই প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছি। ছা পোষা মানুষ, দিন আনি দিন খাই। বড়ো ছেলেটাতো অপদার্থ, বসে খাবার যম—'

এখানে জেঠাইমা ফোঁস করলেন, 'ওরকম

বোঝো না। হয়, আমার নিতান্ত বাধ্য ছেলে। তাছাড়া সোনার আংটি আবার বাঁকা কি? ছেলে ছেলেই। নাই বা উপার্জন করলো, তবুতো সে মেয়েদের মতো ধনে প্রাণে নিয়ে নামবে না? তার বিয়ের জন্য মাথায় হাত দিতে হবে না? এই তো সেদিন পদির মাসি একটা সম্বন্ধ এনেছে, মেয়েকে গয়না দেবে, বাক্সভরা কাপড় দেবে—'

'থামো থামো। ঐ বুড়ো ছেলের গুণ-কীর্তন আর কোরো না। ও আমার জানা আছে?'

'কী জানা আছে?' চটে উঠলেন জেঠাইমা।

জ্যাঠামশায় সে কথায় কান না দিয়ে আসল কথায় এলেন, 'তাই বলছিলাম, এই সংসারের বোঝা কদিন বইতে পারবো কে জানে। টাকাকড়ি যা ছিলো, সবই তো গেছে—'

'তাই বলছিলাম কি—' একটু থামলেন নিবারণবাবু 'তোমার সুরী লেনের বাড়িটা এবার বিক্রী করে দিলে কেমন হয়? ভালো খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে, দামও উঠেছে।'

একটু চমকালেন সুষমা দেবী। ঘোমটার ফাঁকে ভাসুরের দিকে তাকালেন একবার। নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস পড়লো একটি।

'বাড়িটার আর আছেই বা কী—' নিবারণ বাবু আবার বললেন, 'পুরোনো ঝরঝরে, ভাড়াটে ভাড়া দেয় না, মিছি মিছি ট্যাক্সো গোনা। কাজেই আমার মতে ওটা বিক্রী করে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত কাজ। কী বলো?'

বলবেন কী, বুকটা ধক ধক করছে তাঁর। সব ফুরিয়ে গেল? দশ বছরে সব শেষ? এখন বাড়িটায় হাত পড়েছে? পুরো দশ হাজার টাকার লাইফ ইনশিওর ছিলো, গয়নাতেও হাজার পাঁচেকের কম নয়। তাছাড়া কিছু হাতেও ছিলো, টুকটাক এটা ওটা বিক্রির টাকাও মন্দ ছিলো না। সেসব তিনি আসবার সময়েই ভাসুরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর এখানে আসবার পরে কয়েক মাসের মধ্যেই যখন লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকাটাও হাতে এলো। সুষমাদেবীর ইচ্ছে ছিলো সেটা তিনি নিজের নামে বা সুলেখার বিয়ের নামে রেখে দেন। পারেন নি। কিছুতেই পারেন নি। এঁদের ভালোবাসা, যত্ন, মমতায়, আতিশয্যে তখন তিনি আকণ্ঠ মগ্ন। তাছাড়া বৈষয়িক বিষয়ে খেয়াল করবার মতো মনের অবস্থাও ছিলো না, গয়নাগুলো ট্রাঙ্ক খুলে জেঠাইমা নিজেই নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন, বললেন, 'এ অবস্থায়, তোর মাথার ঠিক নেই, কবে কোথায় বাক্স খুলে রেখে চোরের পেটে দিবি—শুধু তাই নয়, দামী দামী শাড়িগুলোও সেই সঙ্গে জেঠাইমা যত্ন করে রাখতে নিয়ে গেলেন। কী বলবেন মা। বলবার মতো স্বভাবও নয়, মনের অবস্থাও নয়। একই বাড়ি, একজনের কাছে থাকলেই হলো। আর জেঠাইমা কি তাকে মায়ের বাড়া হয়ে রক্ষা করছেন না এই জ্বলন্ত যন্ত্রণা থেকে। আর তারপর জ্যাঠামশায় যখন টাকাগুলো ভালোভাবে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট দিয়ে রেখে দিলেন নিজের নামে তখনই বা বলবার কী ছিলো? থাক না। একজনের নামে থাকলেই হয়। উনি কি তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে কখনো ঠকাবেন, না কি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন বাড়ি থেকে? বাকী জীবন এখানেই থাকতে হবে। তিনটে নাবালক শিশুকে মানুষ করতে হবে, এই ভাসুরই তো সকলকে খাওয়াবেন, পরাবেন, ভালোমন্দ দেখবেন, রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, কোন লজ্জায় সুষমা দেবী ঐ টাকাগুলো নিয়ে ভাসুর যা করছেন তার বিরুদ্ধে কথা বলবেন। কিম্বা স্বার্থপরের মতো নিজের হাতে আঁকড়ে রাখবেন সব। স্বামীহীন শোকার্ত হৃদয়ে আসক্তিও ছিলো না কিছুর উপর। সংসারের মন্দ দিকটা মনেও আসে নি। সমস্ত কিছু হস্তগত করেই যখন সুর বদলালেন এঁরা, হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিলো। আর বিশ্বাস যখন পাকা হলো ফেরবার উপায় ছিলো না। তিনি বুঝলেন সব গেছে, দাবী করবার, চাইবার নেবার আর কিছু নেই তার। তা নিয়ে একটা কথা বললেও এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। হবেই। ওটা তাদের মর্মস্থান সেখানে হাত পড়লে, আমার জিনিস আমাকে দাও বলে দাঁড়ালে মুহূর্তে ফয়সালা হয়ে যাবে সব। একদিনের জন্যও সুষমাদেবী আর স্থান পাবেন না এখানে। ঐ ঘটনার উপর সম্পূর্ণ যবনিকা পড়ে গেছে। মেয়ের জেদী, এক-রোখা স্বভাবে সর্বদাই সন্ত্রস্ত ছিলেন তিনি, ভয়ে তার কাছে একবারের জন্য ভুলেও এসব কথা প্রকাশ করেননি। বুক ফেটে গেছে, কত রাত বিনিদ্র কেটে গেছে কিন্তু তবুও তিনি তার সমব্যথী, সমদুঃখী, একমাত্র বন্ধু, তার মেয়েকে বলতে পারেন নি কথাটা।

কিন্তু সব নিয়েও খরচ পোষালো না? এখন বাড়িটা বিক্রী করতে হবে? ঘেমে উঠলেন সুষমা দেবী।

নিবারণবাবু থেমে থেকে বললেন, 'কী বলো তুমি এ বিষয়ে?'

অস্ফুটে বললেন, 'ভাঙাচোরা দেয়াল টেয়ালগুলো সারাই করে নিলে হয় না?'

'হলে আর বলবো কেন? ভাড়াও পাচ্ছো না, পড়ে থেকে শেয়াল কুকুরের আস্তানা হচ্ছে, এর পরে তো কাণাকড়িও দাম পাবে না।'

'তাহলে আর আমি কী বলবো।'

'শোনো কথা—' গলায় দরদ দিলেন জ্যাঠাইমা 'তুই বলবি না তো বলবে কে? তোর বাড়ি—'

নিবারণবাবু বললেন, 'তা হলে আমার নামে তুমি একটা 'পাওয়ার অব এ্যাটর্নি' লিখে দাও। তোমার নামে থাকলে তো আর অমি কিছু করতে পারবো না?'

সুষমা দেবী চুপ।

অপেক্ষা করে করে উঠে দাঁড়ালেন নিবারণবাবু। গম্ভীরভাবে বললেন 'ভেবে দ্যাখো, কাল আমাকে জানিও।'

(ক্রমশ)




আমিনের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাইনি বহুদিন। শেষ চিঠিটা আমিই লিখেছিলাম; কোন জবাব দেয়নি আমিন। কুড়িয়ে-পাওয়া এই পরিচয়টার উপর কালের যবনিকা বুঝি ধীরে ধীরে নেমে আসবে এবার। টানাটানি করে একে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। দীর্ঘদিনের ব্যবধানের সুযোগে সমস্ত অন্তরঙ্গতার উপরই মহাকাল যে মরচে ধরান, এখানেও হয়ত অলক্ষিতেই সেই ক্ষয়ের সূত্রপাত হয়েছিল বহুদিন আগেই। তখন সেকথা বুঝিনি। আজ মনে হচ্ছে ঘষেমেজে এই মরচেকে আর তুলে ফেলা যাবে না। অথচ একদা আমিন আর তার বউএর সঙ্গে হৃদ্যতাটা এমন এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে পুষ্টিলাভ করেছিল যে, তখন মনে করতাম অনুভূতিটা বোধ হয় চিরদিনই অম্লান থাকবে। আজ মনে হচ্ছে কোন পরিচয়, কোন অন্তরঙ্গতাই বুঝি চিরস্থায়ী নয়।

কলকাতা আর শ্রীনগরের মধ্যে যে ভৌগোলিক দূরত্ব তাতে আমিনদের সঙ্গে হামেশাই দেখা হবে,এমন আশা কখনও করিনি। তবু একথা নিশ্চয়ই মনে করতাম যে, দেখাসাক্ষাৎ নাই হক, চিঠিপত্রে আলাপটা বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হবে না। বেশ মনে আছে আমিন আর তার বউ যে রঙিন কাচটা সেদিন আমার চোখের সামনে ধরেছিল, তার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের তাবৎ মুসলমানকে আমি সে-সময়ে দেখতাম, আর রাজনৈতিক কারণে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর যাঁরা খুব প্রসন্ন নন কথায় কথায় তাঁদের উপর খুব খাপ্পা হয়ে উঠতাম সময়ে সময়ে তর্ক করে বন্ধুবান্ধবদের একথাই বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে কাশ্মীরী মুসলমানদের সম্বন্ধে কোন কোন মহলে যে অবিশ্বাসের ভাব আছে, তার সংগত কোন হেতু নেই। কাশ্মীরীরা আমাদেরই মত সুখে উৎফুল্ল হয়; দুঃখে কাঁদে। আমাদের মতই তারা স্নেহশীল, পরোপকারী অতিথিপরায়ণ। বরঞ্চ, আমাদের বিরুদ্ধেই তাদের গুরুতর অভিযোগ থাকবার কথা। বাদশাহী আমল থেকে শুরু করে আজ অবধি কাশ্মীরের পসার, কাশ্মীরের নামডাক ফূর্তির জায়গা বলে। এই বাবদ গরিব কাশ্মীরের মেয়ে-পুরুষ, বউ-ঝিকে অনেক দিতে হয়েছে; সহ্য করতে হয়েছে অনেক। দুমুঠো অন্নের বিনিময়ে ফূর্তিবাজদের অনেক দাবী মেটাতে হয়েছে তাদের। ইতিহাসের নজির দেখিয়ে পরিচিতজনকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে, এখন আসল প্রয়োজন সহানুভূতির। কাশ্মীরীরা যেদিনই বুঝবে যে, ভারতের সমতলভূমির লোকেদের সংগে তাদের সম্পর্কে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নয়, সেইদিনই তারা আবার স্বাভাবিক ব্যবহার করতে শিখবে। সমস্ত অবিশ্বাস আর রেষারেষির অবসান হবে সেদিন। আর, আমার যুক্তি জোরালো করবার জন্য, বক্তৃতার শেষে আমিন-দম্পতির গল্পটা বেশ নাটকীয়ভাবে বলতাম। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রোতাদের উপর তার বেশ ফল হতে দেখেছি।

আমিনের সংগে আলাপের সূত্রপাতটা এতই মামুলী যে, তা নিয়ে কোন গল্প হয় না। অথচ মামুলি খাতে বইতে বইতে সেই আলাপের স্রোতটা একদা এমন এক আকস্মিক মোড় ফিরল যে, বেশ গল্প হয়ে উঠল সমস্ত ব্যাপারটা। সেই অভিজ্ঞতাই বলতে বসেছি।

সেবার শ্রীনগর ভ্রমণের আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরের কুটীর-শিল্পগুলি "কভার" করা। স্থানীয় শিল্প-বিভাগের কর্তার সংগে দেখা হল কাশ্মীর আর্টস্ এম্পোরিয়মের বাগানে। সেইখানে টেবিল চেয়ার পেতে তাঁর "চেম্বার"। কাশ্মীরী প্রচণ্ড শীতের প্রারম্ভে রোদ্দুরে বসে তিনি স্টেনোগ্রাফারকে ডিক্টেশন দিচ্ছিলেন। দর্শনপ্রার্থী আমি সেদিকে অগ্রসর হতেই এক চাপরাসী আমাকে আটকালে, কিছু দূরের এক গাছতলায়। বুঝলাম সাহেবের "চেম্বারের" পরিধি সেই গাছতলা অবধি বিস্তৃত। কার্ড নিয়ে চাপরাসী ফিরে এলে 'চেম্বারে'র চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলাম। শিল্প-অধিকর্তাটি অমায়িক লোক; সুদক্ষ কর্মচারী বলেও ধারণা হল। আমার গায়ে যে অল্প একটু সরকারী গন্ধ আছে তা বিজ্ঞাপিত করে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই তিনি আমিনকে ডেকে পাঠালেন।

ক্ষণকাল পরে কোঁকড়ানো লোমের টুপি-মাথায় যে-যুবকটি সাহেবকে এসে অভিবাদন জানালে আকার প্রকারে আর পাঁচজন কাশ্মীরী যুবকের থেকে তার পার্থক্য বেশী নয়। ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, একপ্রস্থ গরম স্যুট গায়ে, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে। তবু ভাল করে দেখে মনে হল রঙটা যেন তার সাধারণের থেকে আরও উজ্জ্বল, নাকটা আরও বেশী টিকলো আর চোখের রঙ আশ্চর্য নীল। কোথায় যেন স্পষ্ট একটু আভিজাত্য লুকিয়ে আছে আমিনের হাবভাবে। সে যেন তার চেহারাতেও নয়, তার পোষাক-আষাকেও নয়। যখন কথা বলল তখন তার আভিজাত্যের উৎসের যেন আবছা একটু সন্ধান পেলাম। বিনীত, পরিমিত, পরিষ্কার ইংরেজীতে

কথা কয়ে সাহেবের নির্দেশ সে বুঝে নিল। বুঝে নিলে যে আমাকে কাশ্মীরের তাবৎ কুটীরশিল্পের ছবি তোলবার যাবতীয় বন্দোবস্ত তাকে করে দিতে হবে। এজন্য আর্টস্ এম্পোরিয়মে বা শ্রীনগরের মহল্লায় মহল্লায় কারিগরেরা যেখানে কাজ করে সেখানে আমার গাইড হিসাবে যেতে হবে তাকে। শুধু গাইড নয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দোভাষীর দায়িত্বও তার। কাজ বুঝে নিয়ে অতিশয় শিষ্টাচারের সঙ্গে আমিন আমাকে তার খুপরি ঘরটিতে এনে বসালে।

বাগানের এক পাশে বড় বড় চেনার গাছের নিচে টালি-ঢাকা একটানা অনেকগুলি ঘর; তার একটিতে আমিনের আপিস। পুব-দিকের জানালা দিয়ে একফালি তির্যক রোদ্দুর কাঠের মেঝেতে এসে পড়েছে। চেয়ার টেনে নিয়ে সেই রোদ্দুরে পা রেখে বেশ আরাম করে বসলাম। এত অল্প সময়ে আমার কাজের যে এতখানি আশকারা হবে ভাবিনি। পাশের টেবিলে আর একটি যুবক কাজ করছিল। পরিচয় করিয়ে দিলে আমিন।

নাম তার পীর। উচ্চারণ করল 'পীয়র' বলে। অল্প সময়েই বুঝলাম আমিনের থেকে সে অনেক নীচু কাজ করে কিন্তু জামাকাপড়ের পারিপাট্য তার অনেক বেশী। মনোভাব প্রকাশ করবার পক্ষে ইংরেজীটা তার যথেষ্ট শব্দবহুল নয় বলে প্রায়শই তাকে 'ও কে' 'আই সী' বা 'দ্যাটস্ ইট্' প্রভৃতির সাহায্যে কাজ চালাতে হচ্ছে। তার টাইয়ের উজ্জ্বল রঙ আর হাতের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে বিদেশী টুরিস্ট, বিশেষ করে আমেরিকান টুরিস্টদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশার ফলেই বেচারার এই অবস্থা।

সিগারেট ধরিয়ে মুখোমুখি বসলাম তিন জনে। কাজটা ঠিক কি ভাবে অগ্রসর হবে তা আমার সাময়িক অভিভাবকদের পরামর্শমত স্থির করে ফেলা দরকার। পীয়র নিজেই বললে অবসরমত সেও সাহায্য করতে প্রস্তুত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাগজেপত্তরে একটা খসড়া খাড়া করা গেল সামনের দু' তিন দিন সকালে বিকেলে আমাদের কোথায় কোথায় কাটবে। সেদিন সমস্ত দিনটাই দেখলাম বরাদ্দ হয়ে আছে আর্টস্ এম্পোরিয়ামে কুটীরশিল্পজাত বিবিধ সামগ্রীর ছবি তুলতে।

আমিন তাই আমাকে প্রদর্শনী-দালানে নিয়ে এসে প্রথমে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনলে। আলাপ করিয়ে দিলে বিভিন্ন বিভাগের সেলসম্যানদের সঙ্গে। এত রকমারি জিনিসে ঠাসা এমন সুসজ্জিত দোকান ভারতবর্ষে বেশী নেই। শাল, নামদা, সূচীশিল্প, কাপেট, 'পাপিয়ে মাসে' কাঠের আসবাব, রুপোর তৈজসপত্র খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতিতে সে-দোকান পরিপূর্ণ। আমিনের হাতে নিশ্চয়ই আরও কাজ আছে; আমার ফরমায়েস খাটাটা তার কাছে এক বাড়তি উপদ্রব বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অনুনয় করে তাকে তার কাজে পাঠালাম। বললাম, সেলস্‌ম্যানদের সাহায্য নিয়েই আমার কাজ সুচারুরূপে হাসিল করতে পারব। আর, দুপুরে যখন খেতে যাব হোটেলে তখন দেখা করে যাব তার সঙ্গে। তারপর, ফটোগ্রাফীর মত্ততায় কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে বুঝিনি।......

বিকেল তিনটে নাগাদ যখন উস্কোখুস্কো চুলে আমিনের কামরায় উপস্থিত হলাম, হাতের কাজ ফেলে রেখে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল আমিন। ক্যামেরার ভারী ব্যাগটা সস্নেহে কাঁধ থেকে নামিয়ে টেবিলের উপর রাখলে, চেয়ারটা গুছিয়ে বসতে দিয়ে বললে, আপনার খাওয়া হয়নি এখনও? এইবার খেতে যাব শুনে আমিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওদিকের টেবিলে পীয়র তার পকেট থেকে এক ঝকঝকে সিগারেট কেস বার করে আমার দিকে প্রসারিত করে ধরলে। বললে, এনি স্মোক্ বস্? বিকেলে আবার আসছ ত? বিকেলে আবার আসব বলে আমিনের টেবিলে ঝোলাটায় হাত দিতেই শশব্যস্তে উঠে এল আমিন। বললে, এই ভারী ব্যাগটা না হয় নাই নিয়ে গেলেন। আমার আলমারিতে তুলে রাখছি। বিকেলে এখানেই তো আসবেন প্রথমে?

হয়ত বা একটু ইতস্তত করে থাকব। কেননা, ফটোগ্রাফীর প্রিয় সরঞ্জামগুলি ছাড়াও ঐ ঝোলার নীচের পকেটে প্রায় তিন হাজার টাকার কড়কড়ে নোট লুকানো আছে। এ-রসদ কোথাও ছেড়ে যেতে পারিনে; সর্বদাই কাছে কাছে রাখি। কাশ্মীরের পরে এ-যাত্রা আমাকে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরে সিংহলে যেতে হবে। আমার সমস্ত ভ্রমণের, সমস্ত ফটোগ্রাফীর উৎস ঐ টাকা কটি। পথে কোথাও তহবিল তছরুপ হলে, স্থানীয় সহৃদয়তার উপর নির্ভর করে আমাকে যে সোজা বাড়ি ফিরে আসতে হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

মিথ্যা শিষ্টাচার দেখিয়ে আমিনকে বললাম, না না এ আর এমন ভারী কি! আর আমার হোটেল ত এখান থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।

একটু গম্ভীর হয়ে রইল আমিন। জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে তার সেই নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল আমার মুখের উপর। বলল, 'আমিন' শব্দটার মানে আপনি জানেন? আমাকে নিরুত্তর দেখে বললে, আমিন কথাটার মানে ফেথফুল, বিশ্বাসী। আমাদের পয়গম্বরের যে বিবিধ গুণ তার মধ্যে আমিন হওয়াটাও একটা।......আচ্ছা, নিয়ে যান আপনি আপনার ব্যাগ।......

কাশ্মীরী চরিত্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ সংঘর্ষে উপনীত হয়েছি বুঝলাম। এটা যে আমিনের অভিমান নয় তা তার দৃঢ় কথাবার্তাতেই স্পষ্ট। এটা তার প্রচণ্ড অপমানবোধের ভদ্র প্রকাশ। অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। অবশেষে, প্রায় অনুনয় করেই, আমিনকে আমার ব্যাগটা রাখতে রাজী করলাম। অতি যত্নে সেটাকে আলমারিতে তুলে রেখে চাবি বন্ধ করলে আমিন। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কাশ্মীরী চরিত্রের এই দপ করে জ্বলে ওঠার কথা ভাবছিলাম। তখনও জানিনা মাত্র দু' তিন দিন পরে আমিনের বউকেও ঠিক এইরকম দপ করে জ্বলে উঠতে দেখব।......

কাশ্মীরের কুটিরশিল্পের পিছনে ঘুরে ঘুরে বাড়তি লাভ হল দুটো। আমিন আর পীয়রের সঙ্গে মামুলি আলাপটা বেশ হৃদ্যতার স্তরে এসে পৌঁছল আর শ্রীনগরের মহল্লায় মহল্লায় এমন সব গলি-ঘুঁজি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালাম দু'দিন

যেখানে ফ্,র্তিবাজ ট্,রিস্টরা ভুলক্রমেও কখনো আসেন না। আসল শ্রীনগর যে ডাল হ্রদেও নয়, বাদশাহী বাগিচাতেও নয় এ-জ্ঞান লাভ করবার জন্য শা হামদান বা জামী মসজিদ বা মার কেনালের আশপাশের বস্তিগ্,লোতে মাত্র এক চক্কর দিয়ে আসাই যথেষ্ট। অখ্যাত, দারিদ্র্যপিষ্ট, প্,তিগন্ধময় এই পল্লীগ্,লি থেকে কাশ্মীরের জগদ্-বিখ্যাত শিল্পনিদর্শনগ্,লি বাজারে আসে। এই অপ্রত্যাশিত, এমন কি আপাতবিরোধী, বন্দোবস্তের গভীরে যে-উপাদেয় নাটক আছে, আফ্,সোসের কথা, আধ্,নিক সমাজ-সচেতন ট্,রিস্টরাও তার খবর রাখেন না। এই মর্মান্তিক নাটকের কিছ্, কিছ্, ধরে আনলাম আমার ক্যামেরাগ্,লোয়; আমার ফটোগ্রাফীর সঞ্চয়ের তারা অতি ম্,ল্যবান উপাদান।

তব্, একথা বলা নিশ্চয়ই ভুল যে, কারিগর মহল্লার জীবনস্রোত নিরবধি কাল ধরে এমনই শীর্ণ, এমনই ক্লেদাক্ত। হাজার গরিব হক, হাজার বঞ্চিত হক, উৎসবে

পার্বণে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না এমন জনতা ভারতবর্ষের কোথাও নেই। ঘুসুড়ির শ্রমিকবস্তিতে যেমন হোলি আসে, পারেলের নৈশ আকাশে যেমন রঙ ধরে দেওয়ালির রাত্রে, নাচের প্লাবনে যেমন ভেসে যায় বাস্তার, কালাহাণ্ডির আদিবাসী গ্রাম, তেমনই উদ্দাম স্রোত নিশ্চয়ই কখনো কখনো আসে শ্রীনগরের এই আস্তাকুঁড়ে। আমিনকে বললাম কথাটা। আমিন জানালে যে আমি ভাগ্যবান; দু'একদিনের মধ্যেই হরি পর্বতে পীর মুকদুম শা'র বাৎসরিক উরস্। শহরের আর কাছাকাছি গ্রামের তাবৎ মুসলমান মেয়েপুরুষ উৎসবের পোষাকে ভীড় করে আসবে মুকদুম শা'র সমাধিতে। ভক্তি জানাবে, শিরনি চড়াবে পীরের দরগায়, তারপরে সারাটা দিন গল্পগুজবে কাটিয়ে ভরপেট তেলেভাজা খেয়ে আর কিছু মনোহারী টুকিটাকি কিনে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে সন্ধ্যা নাগাদ। গরিব কাশ্মীরের এই দুর্লভ উৎসবসজ্জা না দেখে ফিরে যেতে পারি এতদূর অভিজাত এখনও হয়ে উঠতে পারিনি। কখন কিভাবে হরি পর্বতের মেলায় পৌঁছব আমিনের সঙ্গে সেবিষয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললাম।

ডাল হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোনে যে চার পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড় তার নাম হরি পর্বত। এই পাহাড়ের চূড়া থেকে শ্রীনগর শহরকে কামানের পাল্লার মধ্যে রাখা যায় বলে আকবর বাদশাহ এক দুর্গ বানিয়েছিলেন সেখানে। আজ সে-দুর্গ পরিত্যক্ত। পাহাড়ের চারিদিকের সমতলভূমি ঘিরে যে দুর্গ-প্রাকার তার ভিতরে এখন ঘনবসতি মহল্লা। এই মহল্লায়, পাহাড়ের ঠিক নীচে, আমিনের বাড়ি। পাহাড়ের গা বয়ে চওড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে মুকদুম শা'র কবরে। ছোট্ট একটি সমাধিসৌধ; তার আশ-পাশে অনেকখানি সমতল জায়গা। দুর্গ-প্রাকারের গায়ে যে বিশাল ফটক তার মধ্য দিয়ে ভিতরে আসবার পথ। ভগ্নকপাট সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবস্থানটা এক নজরে চোখে পড়ল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। ফটকের তলা দিয়ে কাতারে কাতারে মেয়েপুরুষ আসছে, সিঁড়ি বয়ে উঠে যাচ্ছে উপরে; পীরের দরগার চারদিকে তিল ধারণের স্থান নেই। গেটের কাছ থেকেই পথের দু'ধারে দোকানপাট বসেছে; ভিখিরীরাও বসেছে সারি দিয়ে। ভারতবর্ষের যে কোনো পুণ্যধামে উৎসবের সময়ে যে-মেলা বসে তার থেকে কোনো পার্থক্যই নেই। পার্থক্য শুধু জনতার জামাকাপড়ে চড়া রঙে। একে ত কাশ্মীরী মেয়েপুরুষের শারীরিক সৌন্দর্যের তুলনা মেলা ভার। তার উপর এই অজস্র রঙের ছড়াছড়ি। ব্যাগের মধ্যে যে-ক্যামেরাটায় রঙিন ফিল্ম পোরানো আছে তার গায়ে-রাখা আমার আঙুলগুলো হয়ত বা একটু নিশ-পিশ করে উঠল।

পীয়রের সঙ্গে এসেছি হোটেল থেকে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে হাত প্রসারিত করে সে আমিনের বাড়িটা দেখালে। তিনতলা কাঠের বাড়ি; আশপাশের আর পাঁচটা বাড়িরই মত। ভীড় ঠেলে দুজনে সেদিকে অগ্রসর হলাম। চারপাশে খুব 'ডার্টি' জনতা সন্দেহ নেই। গালের আপেলে, চোখের সুর্মায় আর পোষাক-আষাকের ঔজ্জ্বল্যে এত চটকদার হলে কি হবে, চুলে তেল পড়েনি হয়ত কতদিন, গলার নীচে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ময়লা জমে আছে কতকালের। সদ্য কাশ্মীর-প্রত্যাগত যে-কোনো অভিজাত টুরিস্টের ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলেই ডার্টি কাশ্মীরীদের ততোধিক ডার্টি বর্ণনা শুনতে পাবেন। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে কাশ্মীর প্রসঙ্গে এছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবেন না। আমি সাধ করে এই ভীড় ঠেলতে এসেছি। নোংরামির সবটুকু চোখে পড়বার মত শ্যেনদৃষ্টি আমার থাকবার কথা নয়; বিশেষ করে একথা যখন জানি যে দুনিয়ার তাবৎ গরিবই অল্পাধিকস্তর নোংরা তা সে কাশ্মীরেই হক বা কলকাতার শহরতলীতেই হক বা লণ্ডন-পারীর বস্তিতেই হক।

বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করে ছিল আমিন। পৌঁছতেই মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলে। মানুষ-সমান উঁচু মাটির দেওয়ালে বাড়ির চারিদিক ঘেরা। ভিতরের উঠোনে আসতেই প্রসারিতকর এক বৃদ্ধ এসে দুহাতে আমার দুহাত ধরে সম্বর্ধনা জানালেন। একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আমিন। পীয়র পরিচয় করিয়ে দিলে আমিনের বাবার সঙ্গে। তারই দোভাষিত্বে বৃদ্ধের সঙ্গে সামান্য একটু আলাপও হল। সে-আলাপের মর্ম এই যে আমি তাঁদের বাড়িতে আজ সম্মানিত অতিথি, তাঁদের মেহ্‌মান। ভুলত্রুটি যদি কিছু ঘটে, নিজ-গুণে যেন সমস্ত মার্জনা করি।

দালানের এক পাশ দিয়ে সরু কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে মিনারে উঠবার সিঁড়ির মত। আমিনের বাবা তাঁর দোতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন; আমরা তিনজনে উঠে এলাম। বেশ প্রশস্ত একখানা ঘর। এক-পাশে দুতিনটি খাট পাতা; অন্য পাশে মেঝেতে মাদুর বিছানো। মাদুরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাড়িটি পাহাড়ের কিছুটা উপরে বলে শ্রীনগর উপত্যকার বহুদূর অবধি দেখা যায়। নীচু ছাত আর অগোছালো আসবাবপত্র সত্ত্বেও বড় নিরিবিলি, বড় সুন্দর লাগল ঘরটি। এই ঘরে আমিনের সংসার তার বউ আর তিনটি ছেলেপুলে নিয়ে। আমিনের বউকে দেখিনি; কখনো দেখব বলে আশাও নেই। কিন্তু ছেলেপুলেরা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেচে এঘরে। বড়টি মেয়ে; বছর সাত আট বয়স হবে। ছোট দুটি ছেলে। সর্বকনিষ্ঠটি সবে হাঁটতে শিখেছে। দরজার কাছ থেকে থপ থপ করে টলতে টলতে এসে সে আমিনের কোলে বসে পড়ল। আর দুটিকে মাদুরের একপাশে আদর করে বসালুম। বাপের মতই নীল চোখ সকলের। সে-চোখ কৌতূহলে অধীর। আমি যে বিদেশী সেটা বুঝতে পেরেছে; কিন্তু আমি কে, কেন এসেছি তাদের বাড়িতে, তাদের বাবার সঙ্গে কীসব দুর্বোধ্য কথা কইছি ইংরেজীতে তা ঠাহর করতে পারছে না।

একথা সে-কথার মধ্যে তার পরিবারের একটা গ্রুপ ফটো তুলে দেবার প্রস্তাব আমিনই করলে। গত কয়েকদিনে তার কাছ থেকে যে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি তার অতি সামান্য প্রতিদানের অবকাশ এটা। শুধু একখানা গ্রুপ ফটো নয়, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ছবি তুলে দিতে আমি সানন্দে রাজী আছি শুনে আমিন তার বউ-ছেলে-পুলেকে তৈরী করে আনবার জন্য অন্য ঘরে গেল। পীয়রের সঙ্গে বসে গল্প করতে লাগলাম। পীয়র বললে—জানো, আমিন আর তার বাপে সদ্ভাব নেই। কথাটা আমারও মনে হয়েছিল যখন বাড়িতে ঢুকি। আমিন কেন যে দূরে দাঁড়িয়ে রইল আর তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বটা গিয়ে পড়ল পীয়রের ঘাড়ে সে সম্বন্ধে একটু খটকা বোধ হয়েছিল মনে। পীয়র বললে, এদের হাঁড়ি ভিন্ন, কথা-বার্তা নেই বললেই চলে। নয়, পৈতৃক

বাড়িটার মায়া কোনো পক্ষই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমিনের বাপ-মা তাই থাকে দোতলায়, আর আমিন তিনতলায়। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই আমিনের বাবা আমাকে কেন অভ্যর্থনা করলেন? আমি ত তাঁর অতিথি নই। তাঁর পৃথক-হওয়া ছেলের অতিথি সম্বন্ধে তাঁর গরজ কিসের? পীয়র বুঝিয়ে বললে সব কথা। দেখলাম, বাঙালী শিষ্টাচারের প্রচলিত রীতি থেকে কাশ্মীরী শিষ্টাচারের রীতি ভিন্ন। এ-বাড়ির যে অতিথি সে এ-বাড়ির সকলেরই অতিথি। নিজেদের মধ্যে গরমিল যাই থাকুক মেহ্-মানের কাছে তা প্রকাশ পাবে কেন? মেহ্মানের সেবায় সকলের কর্তব্যই সমান। এইসব পারিবারিক কথা আমিন আমাকে বলত কিনা জানি না। ছেলেপুলে নিয়ে সে ঘরে ঢুকতে পীয়রও আর বেশী কিছু বলবার অবকাশ পেলে না।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে সরঞ্জাম পরাচ্ছি, আমিন বললে আমাদের ছবি কটাই তুলে দাও; বউ আসবে না, তাকে আনা গেল না। গ্রুপ ফটোটার খুবই অঙ্গহানি হবে বললাম। আমিন সখেদে বললে, আমরা, কাশ্মীরের শিক্ষিত মুসলমানেরা, এখনও পর্দাপ্রথা যথেষ্ট মানি। আমি মানি যতটা তার থেকে অনেক বেশী মানেন আমার বাপ-মা। এ-বাড়ির দোতলাতেই তাঁরা থাকেন। তোমাকে বলিনি, আমার বাপ-মা আমাকে ভিন্ন করে দিয়েছেন। কেননা, তাঁদের মতে, আমরা অতিশয় মডার্ন। এই ধরো না, ঘরের বউকে ফটো তোলাবার তাগিদে তোমার মত একজন পরপুরুষের সামনে বার হতে দেবার কল্পনা করাই ত একটা মস্ত মডার্ন আইডিয়া। আমার বউ ফটো তুলতে রাজী নয়। রাজী নয় এইজন্যে যে, ভিন্ন হোন যাই হোন, তার শ্বশুর-শাশুড়ী এ-ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখবেন না। সংসারে আরও অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি? ......এর উপরে কোনো কথা চলে না। কিন্তু সহসা আমার মনে হল সাধারণ ঘরের একটি বাঙালী বউয়ের সঙ্গে কী আশ্চর্য সাদৃশ্য এই অপরিচিতা কাশ্মীরী বউটির। সেই শঙ্কা, সেই লজ্জা, সেই সামাজিক পিছু-টান। ক্ষুব্ধ আমিনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভেবে দেখলে, তোমার বউ ঠিক কথাই বলেছেন ভাই; এতে তুমি কোনো দুঃখ কোরো না। তা ছাড়া তোমার আর এই ফুটফুটে বাচ্চাদের ছবিগুলো যদি ভাল করে তুলে দিতে পারি তবে ঘাটতির অনেক-খানিই পূরণ হবে।





আমিনের ঘরের বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে শ্রীনগর উপত্যকার মনোরম দৃশ্যের দিকে যেমন বহুবার তাকিয়েছি, তেমনই পাহাড়ের দিকের জানালা দিয়েও লোভাতুর দৃষ্টিতে বার বার দেখেছি মুকদুম শা'র সমাধির আশপাশে হাজারো লোকের জনতা। কতক্ষণে যে সেই জনতায় গিয়ে মিশব সে অধীরতায় কাটিয়েছি এতক্ষণ। আমিনদের ছবি তোলা শেষ হলে, তিনজনে বাড়ি থেকে বার হয়ে পড়লাম। পাহাড় বেয়ে খানিকটা উঠে পৌঁছলাম সেই লোকাকীর্ণ সমতল জায়গাটিতে। শুধু শ্রীনগরের গলিঘুঁজি নয়, দূর দেহাত থেকেও অনেকে এসেছে পীরের দরগায়। লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা পুরুষদের; সীমান্তের পাঠানদের থেকে সে-চেহারার পার্থক্য বেশী নয়। আর কাশ্মীরী মেয়েদের রূপের যথাযথ বর্ণনা করি এমন শক্তি আমার কলমের নেই। পাকা আপেলের মত গালের রঙ, পাতলা টিকলো নাক আর দীর্ঘ আঁখিপল্লবের নীচে সুর্মা-টানা চোখের চাহনিতে যে-শোভা বিচ্ছুরিত হয়, ভূভারতে তার তুলনা মেলা ভার। আমার প্রয়োজন অনেকগুলি ছবি এই মেলার যেখানে একদিনের মেয়াদে হাসি ফুটেছে দারিদ্র্যের মুখে; যেখানে আর্থিক অনটন, সামাজিক বিধিনিষেধ পিছে ফেলে এসে কাশ্মীরের নীচুতলার মেয়েপুরুষ প্রাণখুলে আনন্দ করছে কিছুক্ষণ। আর দরকার যতগুলি সম্ভব ক্লোজ পোরট্রেটের যাতে শুধু মেয়েপুরুষের চেহারার খুঁটি-নাটিই নয়, তাদের সাজপোষাক, তাদের গয়নাগাঁটিরও হদিস মেলে। প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলি তুলতে বেশী বেগ পাইনি। কেননা, সেখানে অভীষ্ট ব্যক্তিদের দলে কোনো বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি নেই। মাঝামাঝি দূরত্ব থেকে ছবি নিলেই হয়; কাউকে গুছিয়ে-গাছিয়ে, ঠিকমত মুখ ফিরিয়ে বসাবার প্রয়োজন নেই। পুরুষদের পোর্ট্রেট-গুলিতেও বিপত্তি কম। কেননা, সম্ভ্রমের কোনো প্রশ্ন নেই সেখানে। মেলার গাদা-গাদি ভীড় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিকে আলাদা

করতে পারলেই হল। মুস্কিলে পড়লাম মেয়েদের ছবির বেলায়। সে-মুস্কিল যে মামুলি অসুবিধার থেকে অনেক মারাত্মক হবে তখনও তা ভাবিনি।

একটি দেহাতী দলের সংগে বিভিন্ন বয়সের চার পাঁচটি মেয়ে এসে আমাদের কাছাকাছি পেণছল। তাদের যেমন চেহারার জলুস তেমনই, সাজপোষাকের বাহার। আমাদের তিনজনের দৃষ্টিই একসংগে সেদিকে নিবন্ধ হয়েছে দেখলাম। ছটফটে পীয়রের স্মার্টনেস্ অনেক বেশী। আমাদের সংগে কোনো পরামর্শ না করেই দলটির দিকে সে এগিয়ে গেল। তারপর হাত নেড়ে দলপতিকে কি যেন বললে। দলপতির শালপ্রাংশু চেহারা; তার দুতিনটি সংগীরও তাই। মুহূর্তমধ্যে তারা পীয়রের টুটি চেপে ধরে তাকে ঠেঙাতে শুরু করলে। অমনি একটা মার মার রব উঠল চারিদিকে আর চক্ষের পলকে কয়েক শো লোক যেন মাটি ফুড়ে গজিয়ে উঠল আশপাশে। সবাই আস্তিন গুটিয়ে ভীড়ের মধ্যে যাবার চেষ্টা করছে। কেন মারছে, কাকে মারছে এসব প্রশ্ন নিরর্থক। আমিন ঝাঁপিয়ে পড়ল বিবাদের কেন্দ্রস্থলে। ততক্ষণে ধাবমান জনতার সংঘর্ষ বাঁচিয়ে গললগ্ন ক্যামেরা দুটোকে ব্যাগে পুরেছি। ভীড় ঠেলে আমিও আমিনের পাশে পেণছলাম। আমিনের অনুনয়ে ফল ত কিছু হলই না, বরং পটাপট কয়েকটা চড়-থাপ্পর পড়ল তার গালে। আমার হিন্দী কাতরোক্তিগুলি সেই উত্তেজিত জনতার তুমুল কোলাহলে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে!......

ভীড়ের মধ্যে যা হয়ে থাকে, এখানেও সেরকম আপস-করনেয়ালা দু'চারটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি এসে মারামারিটা থামালে। পীয়রের নাকমুখ দিয়ে অজস্র রক্ত পড়ছে; শার্টকোট তার ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়। আমিনের ফর্সা গাল লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আমিও মার খেয়েছি অল্পবিস্তর। জামাকাপড় আমাদেরও অক্ষত নয়। ত্রাণকর্তারা দুপক্ষের বক্তব্যই শুনলে। রায় অবশ্য আমাদের বিপক্ষেই গেল। মুসলমান আওরতের ছবি তুলতে চাওয়াটা ত ইসলামে বিলকুল গুনাহ আছে। বহুত বুঢ়া কাজ করেছি আমরা। পক্ষান্তরে, ছবি যখন সত্যিই তুলিনি, শুধু ইজাজত চেয়েছিলাম মাত্র। সেই সুবাদে আমাদের এবার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। চাপাচাপি ভীড় থেকে বার করে ত্রাণকর্তারা আমাদের দূরে নিয়ে এল। পিল-পিল করে মেলার জনতা আমাদের পেছন পেছন আসছে। কোনো দোকান-টোকান থেকে একটু জল নিয়ে যে পীয়রের চোখে মুখে দেবে তারও উপায় নেই। আমার ক্যামেরা ও ভংগুর সরঞ্জামগুলো কি অবস্থায় আছে কে জানে। সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়েছে বোধ হয় আমিনের। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে আছে; একটা কথাও কইছে না। সেই আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনে-ছিল। আমি তারই মেহ্‌মান। নিজে মার খেয়েছে তাতে একটুকু ক্ষোভ নেই। কিন্তু চোখের উপর মেহ্‌মানকে মার খেতে দেখেছে, তার জামাকাপড় ছিঁড়ে যেতে দেখেছে অথচ তাকে রক্ষা করতে পারেনি এ লজ্জা লুকোবে কোথায়? ভীড় তখনও আমাদের চারপাশে বাড়ছে বই কমছে না। এই কৌতূহলী জনতার সোল্লাস দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। আমিনকে বললাম, চল তোমার বাড়ি ফিরে যাই; পীয়রের চোখেমুখে একটু জল দিতে হবে। একটাও কথা বললে না আমিন। শুধু বাড়ির দিকে পা বাড়াল। নিতান্ত লাঞ্ছিত চেহারা নিয়ে তিন মূর্তি আবার এসে আমিনের বাড়ির উঠানে ঢুকলাম। তেতলার জানালার পাশ থেকে চক্ষের নিমিষে কেউ কি সরে গেল?......

পীয়রের ক্ষতস্থান ধুয়ে, ওষুধ লাগিয়ে তিনতলার সেই ঘরে তাকে এক খাটে শুইয়ে দিলাম। ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন নেই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দু'এক কাপ চা খেলেই আপনি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। আমিন সেই যে এসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাদুরে বসেছে তার আর সাড়া-শব্দ নেই। বললাম, আমিন তোমার জামাটা ছেড়ে এসো এইবার, আর আমাকে সেফটিপিন দাও ত' কয়েকটা; ছেঁড়া জায়গাগুলোয় একটু তালি লাগিয়ে নিই। কোন উত্তর না দিয়ে একইভাবে নিঃশব্দে বসে রইল আমিন। এ আর এক অস্বস্তি। এই বুড়ো খোকাকে এখন কথা কওয়াই কি করে! প্রসংগ পালটে বললাম, একটু চায়ের যোগাড় করো ভাই; পীয়রও এক কাপ চা খেলে চাংগা হয়ে উঠবে। হঠাৎ কথা কয়ে উঠল আমিন। তার সেই নীল চোখের স্থির দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে ধীরে ধীরে বললে—আওরতের তসবীর ওঠানো যে ইসলামে গুনাহ্ এই কথাটাই বললে ওরা। আর আমার মেহ্‌মানকে আমারই চোখের উপর অপমানিত হতে দেখেও আমি যে তাকে রক্ষা করতে পারলাম না, এটা যে ইসলামে কত বড় গুনাহ্ তা' একবারও ভেবে দেখলে না জানোয়ারগুলো।......বুঝলাম, এতক্ষণ ধরে আমি যে বকবক করেছি তার এক-বর্ণও তার কানে ঢোকেনি। তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, কী ছেলেমানুষি করছ ভাই! এ ব্যাপারটা মিটে গেছে মনে করো। এখনও এনিয়ে মাথা ঘামালে সত্যিই আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

আমিনের সম্বিৎ কিছুটা ফিরে এসেছে এতক্ষণে। আবার চায়ের অনুযোগ জানাতেই আমিন উঠে গেল।

পীয়র ঘুমিয়ে পড়েছে খাটের উপর। সেই একলা ঘরে শূন্যমনে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সামনের জানালা দিয়ে মেলার জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছি। একটা রঙিন ছায়ার মিছিল যেন ভেসে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। মানুষগুলোর কোন পৃথক অবয়ব নেই; সমস্তটা মিলিয়ে নানা রঙের একটা "মোজায়েক" যেন আন্দোলিত হচ্ছে এদিক-ওদিকে। চায়ের ট্রে নিয়ে আমিন ঘরে ঢুকল। মুখ তখনও গম্ভীর। মাদুরের উপর ট্রেটা রেখে দরজার দিকে বসল পিঠ করে। ক্ষণিকের দিবাস্বপ্ন থেকে আবার রূঢ় বাস্তবে ফিরে এলাম। ফিরে এলাম এই লাঞ্ছিত বন্ধু দুটির প্রতি কর্তব্যবোধের জগতে। আমিন যাই বলুক, আর পীয়রের মনে যাই থাক, একথায় কোন ভুল নেই যে, আমার জন্যেই তারা আজ মার খেয়েছে। অথচ কী বলে যে তাদের সান্ত্বনা দেব জানিনে। পীয়র অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বালিসের উপরে তার মুখটা হেলে পড়েছে আমাদের দিকে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বড় করুন, বড় অসহায় মনে হ'ল সে মুখখানা। আমিনকে

বললাম, আহা! জাগিয়ে কাজ নেই। ঘুম ভেঙে উঠলে আর একবার চা করে এনো এখন।

নতমস্তকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কতক্ষণ যে আমরা নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিনও সেদিকে তাকাল। তাকিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল আমিন। একটি সাতাশ-আঠাশ বছরের কাশ্মীরী মেয়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুই হাত রেখেছে দুই কপাটের উপর। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে সে-হাত। উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে তার মুখ। আমিনের বউ হবে নিশ্চয়। সে ছাড়া ত এ বয়সের আর কোন মেয়ে এ বাড়িতে নেই। বেশ বুঝলাম আমিনও আশা করেনি ঘটনাটা। যন্ত্রচালিতের মত সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কি কথা হল স্বামী-স্ত্রীতে বুঝলাম না কিছুই। শুধু সেই আশ্চর্য-সুন্দর মুখখানিতে যে দৃঢ়তার ছাপ দেখলাম, সুর্মা-আঁকা বড় বড় চোখে যে-বহ্নি ঝলসিয়ে উঠল ক্ষণে ক্ষণে তাতে মনে কোন সংশয় রইল না যে প্রস্তাব তার যাই হক, একটা হেস্তনেস্ত সে করতে এসেছে। কী সে প্রস্তাব কিছুই জানি না। শুধু জানি, এই একটু আগে গ্রুপ ফটো তোলবার বেলায় তার মেয়েলি মনের যে সুকুমার কোমলতা প্রকাশ পেয়েছিল তার সঙ্গে তার এখনকার উদগ্র অনমনীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। এই অঘটনে এত অবাক হয়ে গেছে আমিন যে, ভাল করে গুছিয়ে কথা অবধি বলতে পারছে না।

আমার কাছে এসে আমতা আমতা করে বললে, এ আমার বউ বুঝতেই পারছ। আজকের মেলার সমস্ত ঘটনা এ শুনেছে, এখন এসেছে এই আরজি নিয়ে যে, যদি কাশ্মীরী স্ত্রীলোকের ছবির দরকার থাকে তোমার তাহলে তার ছবি তুলতে পারো। মেহমানের জন্য এটুকু করা সে অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করে।

একটা মামুলি ফোটোগ্রাফিক অভিযান এমন তীব্র নাটকে পরিণত হবে ভাবিনি। আমিনের বউ তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধরে। আমার রায় শুনবার জন্য দুজনের মুখেই গভীর উৎকণ্ঠা। আমার অবস্থাও কম দিশাহারা নয়। কী বলব এই ক্ষেপে-যাওয়া মেয়েকে? তার বিব্রত স্বামীকেই বা কি বলব? তবু যাই বলি না কেন, একটু রয়েসয়ে বলাই বোধ হয় ভাল হবে। একটু ভেবে নিই; একটু গুছিয়ে নিই আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো। আমিনকে বললাম, ভাই তোমার বউকে ঘরে যেতে বলো। এখনও ছবি তোলবার বেলা আছে। আমি একটু পরেই বলছি তোমার বউয়ের প্রস্তাবে আমি রাজী কি না।

চিন্তাসূত্রগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ভাবতে বসলাম কি করা যায়। ইচ্ছা করলেই এই অসামান্যা রূপসী মেয়েটির কয়েকটি ফটো তুলতে পারি এবং সে-ছবি যে অতি উৎকৃষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথাটা কি গোপন থাকবে চিরকাল? আজ দোতলার ঘরে আমিনের বাপ-মা, কাল পাড়া-প্রতিবেশীরা জানবে কথাটা। পর-পুরুষের সামনে এভাবে বার হওয়াটা, বিশেষ করে তার ফোটোগ্রাফীর মডেল হবার বেহায়াপনাটা, ক্ষমার চক্ষে দেখবে না কেউই। আমিনের এমনিতেই অশান্তির সংসার। সেখানে আরও অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। আমার সামনে এই মুহূর্তে যে প্রস্তাব প্রসারিত তা গ্রহণ করে আমি সহজেই সরে পড়তে পারি। আমিনদের সঙ্গে জীবনে হয়ত আর দেখাই হবে না। কিন্তু তখন কী ঘটবে এই বউটির কপালে? সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত এক অপবাদের দাগ চিরদিন লেগে থাকবে তার গায়ে। না, হয় না; কিছুতেই হয় না। মেহমানের প্রতি শিষ্টাচার দেখানোর আগ্রহটা বুঝি। কিন্তু মেহমান কি শুধু নিতেই আসে? তার কি দেবার কিছুই নেই?

মনস্থির করে ফেললাম। আমিনকে বুঝিয়ে বললাম সব কথা। তার দু-হাত চেপে ধরে বললাম, ভাই তোমার স্থৈর্যের উপর সব কিছু নির্ভর করছে। খুব মাথা ঠান্ডা রেখে তোমার বউকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলো। হয়ত এতক্ষণে তার উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। হয়ত সামাজিক দিকগুলো ভেবে দেখবার ক্ষমতাও ফিরে এসেছে তার।

আমিন উঠে গেল। দরজা অবধি তাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। বিকেলের পাণ্ডুর রোদ্দুর জানালা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে এসে পড়েছে। বাইরে শ্রীনগর উপত্যকার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

কী ফয়সালা হবে আমার আরজির? যদি এখনও জিদ করে আমিনের বউ? ... হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা এল মাথায়। এরই মধ্যে এক ফাঁকে আমার ক্যামেরা আর সরঞ্জামগুলো বার করে দেখেছিলাম; কোনটাই ভাঙেনি। স্থির করলাম ডাহা মিথ্যাকথা বলব আমিনের বউকে। বলব, মেলার মারামারিতে দুটো ক্যামেরাই আমার জখম হয়েছে; তা দিয়ে ছবি তোলা এখন অসম্ভব। মেহমানের এই বাড়তি ক্ষতিতে নিশ্চয়ই আরও দুঃখিত হবে আমিন আর তার বউ। তা হয় হক।

যেন অনেক, অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল আমিন। একলাই এসেছে। তার টুকরো টুকরো কথা আর ভাঙা ভাঙা হাসি থেকে বুঝলাম মামলা জিতেছি আমরা।

সন্ধ্যার পরে পীরুকে নিয়ে যখন পথে বার হলাম, তখন মেলা ভেঙে এসেছে। আমিনও এল পীরুর বাড়ি অবধি। পরদিন, অতি-প্রত্যুষে শ্রীনগর ছেড়ে চলে এলাম। তারপর আর দেখা হয়নি পীরুর, আমিন বা আমিনের বউয়ের সঙ্গে।

আমিনের বউয়ের একটা ছবিও কেবার ধরে আনিনি শ্রীনগর থেকে। কথাটা হয়ত সত্যি, হয়ত সত্যি নয়।

# বিশ্ব-বিচিত্রা

কলকাতার ছেলে আকবর আজ্জর জাহাজে লুকিয়ে বিলেত হাজির হবার খবর সম্প্রতি সংবাদপত্রের পাঠকদের কাছে বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হয়েছে। জাহাজে লুকিয়ে পালানো অবশ্য এই নতুন নয় জাহাজ সৃষ্টি থেকেই চলে আসছে এবং সে সম্পর্কে নানা রকমের বিচিত্র কাহিনীও শোনা যায়। কাস্টমস পুলিস, সাগর-পুলিস এবং অফিসার ও কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজের কোন স্থানে দিনের পর দিন আত্মগোপন করে পাড়ি দেওয়ায় কষ্টের সীমা থাকে না।

একবার চারজন লোক এক জাহাজের স্টুয়ার্ডের সহায়তায় একটা কোল্ড-স্টোরেজ জাহাজের এক কদাচিৎ-ব্যবহৃত রেফ্রিজারেটারে আত্মগোপন করে সমুদ্র পাড়ি দিতে থাকে। প্রায় তারা গন্তব্যস্থলে পেঁছে যায় যায় এমনি একদিন সকালে সেই স্টুয়ার্ড লোক চারটির দৈনিক খাদ্য নিয়ে এসে সেই রেফ্রিজারেটরটি ছুঁতেই হাতে ঠাণ্ডা লাগলো। ভয়ে ভয়ে দরজাটা খুললে সে। ভিতরে সেই লোক চারজন পড়ে রয়েছে মৃত অবস্থায়।

রাতে এঞ্জিন ঘরে ভুল ভালবটি চালানো হয় এবং তাঁর ঠাণ্ডা রেফ্রিজারেটরে জমার সঙ্গে লোক চারজনও হিমে জমে মারা যায়।

এলজিয়ার থেকে লণ্ডনগামী একখানি জাহাজে বিছানার বোঁচকায় লুকনো তিনজন লোক ধরা পড়ে। তারা জানায় যে, তারা অভিযাত্রী বাহিনী পরিত্যাগ করে পালাচ্ছে। ওদের তিনজনকে একটা কেবিনে বন্দী করে রাখা হয়। রাতে একজন অফিসরের কানে চীৎকার ভেসে এলো। দৌড়ে গিয়ে কেবিন খুলে সে দেখে দুজন লোক ছোরা নিয়ে পাশবিকভাবে লড়াই করছে। নিকটতম বন্দরে জাহাজ থামিয়ে ওদের দুজনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ওদের একজনের মৃত্যু হয়।

এতো ব্যাপারের পর জানা গেল যে, দলের তৃতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছে একটি এলজিরীয় মেয়ে এবং তাকে নিয়েই দুজনের ঝগড়া।

জাহাজে লুকিয়ে মেয়ে পলাতকার সংখ্যা আজকাল এই শতাব্দীর গোড়ার আমলের চেয়ে কমে যাচ্ছে। তখন জাহাজের কর্মীরাই ওদের জাহাজে এনে লুকিয়ে রাখতো।

সঙ্গে মাত্র গোটা তিরিশেক টাকা নিয়ে এক উনত্রিশ বৎসর বয়স্কা ফরাসী মহিলা যুক্তরাষ্ট্রগামী এক ফরাসী জাহাজে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে।

যাত্রীদের মধ্যে ছিল এক খ্যাতনামা ফরাসী মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং মহিলাকে ঐভাবে চোরের মতো পালাবার কারণ জিগ্যেস করতে সে জানায়: "আমি খ্যাতি পাবার জনোই এ কাজ করেছি। আমি চেয়েছিলুম কোন খ্যাতনামা তারকার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে পড়ুক। যশ অর্জনের ঐটেই আমার সুযোগ।"

*

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের এক পানাগারে একদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল হঠাৎ সবাই চুপ এবং সবায়ের দৃষ্টি দরজার দিকে দুটি মহিলার প্রতি।

বাহান্ন বছরের বেঁটে, গোলগাল টাক মাথা বিল পিয়ার্সন হাতের গ্লাস নামালে এবং ওর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এলো যখন দেখলে মেয়ে দুটি সোজা তারই কাছে এসে দাঁড়ালো।

"চলুন না একটু বেড়িয়ে আসা যাক।" ঢ্যাঙা মেয়েটি বললে আবদারের সুরে। তারপর ওরা দুজনে পিয়ার্সনকে বাহুবেষ্টিত করে সাদরে পানাগার থেকে বের করে নিয়ে এলো। রাস্তায় চলতে চলতে দুজনের কেউই বললে না ওদের মতলব কি।

হঠাৎ পিয়ার্সন নিজের বাড়ির কাছে চলে এসেছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ক্রুদ্ধ স্ত্রীর হাতে ছাতাপেটা খাবার দৃশ্য মনে ভেসে উঠতেই পিয়ার্সন মেয়ে দুটিকে তার বাড়ির কাছ থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ব্যর্থ হলো।

ইচ্ছে করেই মেয়ে দুটি ওকে আঁকড়ে



নিউগিনির সেপিক নদী অঞ্চলের আদিবাসীদের শিল্পকীর্তির নিদর্শন—প্রায় সাড়ে তিন ফিট উঁচু কাঠের তৈরী বসবার চৌকি; পিছনভাগে পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতি কড়ি, শুকরের দাঁত, পালক ও মানুষের কেশ দিয়ে তৈরী দাড়ি বসিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

রইলো। যতোক্ষণ না প্রায় টেনে হিঁচড়েই ওকে বাড়িমুখো করতে সক্ষম হলো। এতক্ষণে পিয়ার্সন ব্যাপারটা বুঝতে পরলে। তার স্ত্রী এমি এতোদিনে তাকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

পিয়ার্সনের গৃহ-সহচরি দুজন হচ্ছে মর্শিট্রলের "পার্সনাল সার্ভিস আনলিমিটেড" নামক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারিণী। উভয়েই সাতাশ বছর বয়স্কা, গ্রেটা স্ট্রম ও ওয়াইলি রায়ডর্প ১৯৫৩-তে হেগ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আসে। শ্রীমতী এমি পিয়ার্সন ষষ্ঠ গৃহিণী যে তার স্বামীকে পানাগার থেকে ধরে আনার জন্যে ওদের দুজনকে নিযুক্ত করে। এই ঘটনার পর বিলের বন্ধুরা ওর সেই 'অপহরণ' নিয়ে এমন বিদ্রূপ করতে থাকে যে তিন সপ্তাহ পর তার স্ত্রী জানায় যে বিল ইতিমধ্যে মাত্র একবার বাড়ির বাইরে গেছে।

মেয়ে দুটিকে নানা বিচিত্র রকমের কাজের জন্য ডাকা হয়। একবার ওয়াইলি রায়ন-ডর্পকে ডাকা হয় এক হোৎকা বাস

খ্রাইভারের মাথায় ভাত ঢেলে দিতে। লোকটার কেবলই নালিশ ভাত বড়ো শক্ত হয়, আর তাই নিয়ে নিত্য অশান্তি দেখে একদিন তার স্ত্রী ওয়াইলিকে ডেকে খাবার ঘরে লুকিয়ে রেখে দেয়। ওকে বলে রাখা হয় যে, ভাত নিয়ে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শুরু করলেই যেন সে তার কাজ আরম্ভ করে।

যেমন রোজ হয়, সেদিনও লোকটা ভাত শক্ত বলে অভিযোগ তুললে। শুনেই ওয়াইলি তার গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে গরম ভাতের গামলাটা নিয়ে লোকটার মাথায় ঢেলে দিলে। লোকটা এতোটা অবাক হয়ে পড়েছিল যে চোখ বের করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না।

মেয়ে দুটির সাধারণ কাজের মধ্যে ডাক আসে শিশুদের স্নান করিয়ে দেওয়া, বাজার করে দেওয়া, ঘরদোর পরিস্কার করে দেওয়া। কাজের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে ওরা অদ্ভুত কাজ পায়।

মাত্র একবার ওরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যেবার এক স্বামী ওদের ডেকে তার স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানী বন্ধ করবার জন্য বলে। মুচকে হেসে গ্রেটা বলে, এসব ক্ষেত্রে একজন মেয়েকে দিয়ে আর এক মেয়েকে মার দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

*

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ডাবলিন মুকুট-মণি অদৃশ্য হওয়ার কেলেংকারী ঘটে যায়। শেষ পর্যন্ত সেই মণি একজনের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। এতো মূল্যবান সম্পদ থাকতেও কিন্তু লোকটিকে প্রায় অনাহারেই থাকতে হয়, বিক্রী করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে। শেষে লোকটি যুদ্ধে যোগদান করে এবং মারা যায়।

*

জীবজন্তু পোষার কথা হলে সাধারণত লোকে কুকুর, বিড়াল পাখি ইত্যাদির কথাই ভাবে। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে নানা অদ্ভুদ প্রকৃতির লোক আছে যারা অদ্ভুদ জানোয়ার পোষে।

ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকায় কঙ্গো নদীর ধারে একটা পানাগারে একদিন এক ইংরেজ এসে আরাম করে বসে তার হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে; হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার চক্ষুস্থির! দেখলে একটা প্রকাণ্ড জলহস্তী দরজা দিয়ে ঢুকছে। দেখেই আঁৎকে উঠে বিকার চীৎকার। পানাগারের মালিক দৌড়ে উপস্থিত। ইংরেজ ভয়ে ভয়ে বললে "যা দেখছি, দেখতে পাচ্ছেন।"

মালিক জবাব দিলে, "ওটা তো আমার পোষা জলহস্তী। ডবল হুইস্কী দিন, ও খুব খুসী হবে। ও কোন ক্ষতি করে না, বরং ও থাকাতে আমার ব্যবসার সুবিধেই হয়। বহুদূর থেকে লোক আসে আমার এখানে ওকে দেখবার জন্যে।"

জলহস্তীর হুইস্কী পানের কথায় সেই ইংরেজকে অবাক হতে দেখে মালিক শোনাতে আরম্ভ করলে কিভাবে ওটাকে সে জোগাড় করেছে।

বছর খানেক আগে ওর এক শিকারি কুকুর জলহস্তীটাকে নদীর ধারে ভাসতে দেখে। জলহস্তীটা বোঝা গেল আগে কখনও কুকুর দেখেনি, কারণ জল থেকে উঠে ও ভাল করে দেখতে এলো। কুকুর আর জলহস্তীর মধ্যে বন্ধুত্ব হতে বিশেষ দেরী হলো না।

"কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্য হয়ে দেখি ওরা দুজনে এই পানাগারের সামনের লনে দিব্যি খেলা করছে। আমি তখন পান করতে বসেছি, দেখেই হুইস্কীর গ্লাস হাতে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। জলহস্তীটা আমার খুব কাছে এসে শুঁকতে লাগলো।

"ও ওর চোয়াল ফাঁক করতেই আমি কি করছি না বুঝেই হুইস্কীটা ঢেলে দিলাম। এখন ও হুইস্কী খেতে ভালবাসে। লনে লোকজন এসে জুটলে তাদের গ্লাসের টুংটাং শব্দই যথেষ্ট। জল থেকে উঠে এসে ঘুরঘুর করতে থাকে এবং যতক্ষণ না লোকদের পয়সা শেষ হয় ততক্ষণ হুইস্কী পান করেই চলে।

"একদিন অন্য দিনের চেয়ে বেশী পান করে ঝিমিয়ে পড়তেই এক সুবিধেবাদী ওর গায়ে একটা সাইকেলের বিজ্ঞাপন এঁকে দিয়েছিল।"

পৃথিবীর মধ্যে পোষা জলহস্তী বোধ-হয় এই একটিই—জলহস্তীটির ওজন এক টন এবং বয়েস আট বছর।

বাজপাখি পোষা আমাদের দেশে এক সময়ে রাজারাজড়াদের বিশেষ সখ ছিল। পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই এ সখ দেখা যেতো। কিন্তু শকুনি পোষা আরেক কথা। ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমার কিন্তু এই সখ ছিল। বারো ফ্রাঁতে তিনি আফ্রিকাতে একটি শকুনি কেনেন। জাহাজে করে ফ্রান্সে নিয়ে যেতে কিন্তু তাঁকে মুসকিলে পড়তে হয়। খাঁচাটা বইবার পক্ষে খুব ভারি হওয়ায় পাখিটার গলায় একটা লম্বা দড়ী বেঁধে ডুমা জাহাজে টেনে তোলার চেষ্টা করেন।

শকুনিটা রেগে উড়তে গেল এবং ওকে টেনে মাটিতে নামাতেই ওর মালিকের পায়ে ঠোকর মেরে দেয়। শেষ পর্যন্ত ওকে টেনে হিঁচড়ে জাহাজে তোলা হয়। কিন্তু বাড়িতে ফিরে ওটাকে পোষ মানাতে ডুমার কতক-গুলো দিন বৃথাই নষ্ট হয়।

*

অনেক লোক দেখা যায় যারা তাদের সঠিক বয়েস জানে না বা জানলেও বলতে চায় না। কিছুকাল আগে কানাডায় বার্ধক্য-ভাতা প্রবর্তিত হবার পর অনেককে তাদের বয়েস প্রমাণ করার জন্য বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। একবার জন্ম-রেজেস্ট্রি আইনটা শিথিল থাকায় এখন তার জের পোয়াতে হচ্ছে হাজার হাজার লোককে।

জন্ম-সার্টিফিকেট না থাকলে বয়েস কিভাবে প্রমাণ করা যায়? এক ব্যক্তি ডাক্তারকে দাঁত পরীক্ষা করে দেখতে বলে তার বয়েস সত্তর কি-না নির্ণয় করতে, কিন্তু ডাক্তার জানায় যে, ভুলের মাত্রা পাঁচ বছর পর্যন্ত তফাৎ ঘটাতে পারে। এক মহিলা তার আঠারো বৎসর বয়ঃক্রমকালে উপহার-প্রাপ্ত একটি চামচ এনে দাখিল করে এবং কর্তৃপক্ষ চামচের গায়ের মার্কা দেখে তার প্রমাণ গ্রাহ্য করে নেয়।

পারিবারিক বাইবেল প্রায়ই প্রামাণ্য সাক্ষ্য বলে গৃহীত হয়, কিন্তু একজন লোক ১৮৮০ সনে পাওয়া বলে এক কপি বাইবেল দাখিল করে। কর্তৃপক্ষ যাচাই করে দেখে সেই সংস্করণটি ১৯২০ সনের পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। লোকটিকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এক মহিলা

বলে, তার বয়েস যখন তের তখন সে বুয়র যুদ্ধে সৈন্যদের যেতে দেখেছে।

"সেক্ষেত্রে", একজন তদন্তকারী বলে, "আপনার বয়েস তো পঁয়ষট্টির বেশী হবার কথা নয়।" কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা তার বয়েস সত্তর বলে এতো নিশ্চিত ছিল যে, আরো খুঁটিয়ে যাচাই করার দরকার হয়। দেখা গেল, মহিলার যা মনে পড়ছে সেটা বুয়র যুদ্ধ নয়, ১৮৮৫ সনের এক অভিযানের কথা।

একজন বৃদ্ধ বিশ ফিট লম্বা এক প্রাচীর-পত্র এনে হাজির, তাতে তার একশ বছরের বংশ-তালিকা লিপিবদ্ধ। এক বৃদ্ধা একটু সলজ্জভাবে তদন্তকারীদের তার বাড়িতে এসে বিছানা পরীক্ষা করতে বলে। বিছানার গদীতে তার বিয়ের তারিখ ও স্থান এমব্রয়ডারিতে লেখা হয় যখন তার বয়েস ছিল একুশ। এক বৃদ্ধা তার শৈশবের পুতুলগুলি সযত্নে রক্ষা করে আসে এবং তদন্তকারীরা পুতুলগুলির বেশভূষা দেখে মহিলার বয়েস নির্ধারণে সক্ষম হয়।




## ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি

**ধীরে বহে নীল**—চাণক্য সেন। নবভারতী, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৭, টাকা।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এশিয়া আফ্রিকার জাগরণ এবং স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা। একথাও সত্য যে, এই দুটি বিশাল মহাদেশের নানা অঞ্চলে একটা অশান্তি এবং অনিশ্চয়তার ছাপ পরিলক্ষণীয় কিন্তু এ সবই নব-বিধানের জন্য অবশ্য-দেয় মূল্য।

এ-কালের বাংলাসাহিত্যও বৈচিত্র্যাভিগ। বিষয়বস্তুর দাবী মানতে গিয়ে লেখকেরাও প্রকাশভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনছেন।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য দুটির দ্বিতীয়টির মাধ্যমে প্রথমটির ব্যাখ্যামূলক আলোচনা শুরু করেন বলেই চাণক্য সেন প্রথম থেকেই "দেশের" পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। "ধীরে বহে নীল" গ্রন্থটি যখন ধারাবাহিক-ভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন পাঠকেরা সাগ্রহে এর প্রতিটি অধ্যায় পাঠ করেছেন; কেন না পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কোন প্রামাণ্য বা বিস্তারিত আলোচনা তার পূর্বে বাংলা ভাষায় সম্ভবত লেখা হয়নি। অনুরাগী পাঠকেরা সমগ্র রচনাটি গ্রন্থাকারে পেয়ে অবশ্যই খুশী হবেন।

"ধীরে বহে নীল"-এর বিষয়বস্তু নূতন মিশরের আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস। ৪৬টি পরিচ্ছেদে (কয়েকটি ছবি, মানচিত্র এবং মূল্যবান একটি 'সংযোগ'-সহ) সে-ইতিহাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে মিশরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কথা; এতাবৎকাল যে-সব য়ুরোপীয় দেশ কখনও প্রকাশ্যে কখনও নেপথ্য থেকে এশিয়া-আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে এসেছে, তাদের কথাও।

তথ্য-সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণে শ্রীচাণক্য সেন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সমালোচকের অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অত্যন্তই সীমিত, তবু তিনি সবিনয়ে নিবেদন করতে চান—বোধ হয় এ-বিষয়ে ইংরাজীতেও এমন কোন একটি বই নেই, যার পরিসরে এত অধিক তথ্য ও নিপুণ বিশ্লেষণ লভ্য।

বইটি রচনা করতে লেখককে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু সে-পরিশ্রমের চিহ্ন বইটির মুখশ্রী ম্লান করেনি। লেখকের বিন্যাস-নৈপুণ্য ও ঝরঝরে ভাষার গুণে গ্রন্থটিকে সুপাঠ্য করেছে। লেখকের ভঙ্গি সরস; কিন্তু অতি-সরল হবার প্রবণতাকে তিনি সাবধানে পরিহার করেছেন।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও লেখকের সংযমের পরিচয় স্পষ্ট। নব্য মিশরের অধিনায়ক নাসের সম্পর্কে তিনি সশ্রদ্ধ; শ্রদ্ধা কোথাও কোথাও আবেগের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়নি। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সামরিক একনায়কত্ব, এই দুইয়েরই সাহায্য নাসের নিয়েছেন। বিনা সর্তে এর কোনটাই ইতিহাসের কোন মুক্তচিত্ত ছাত্র অনুমোদন করতে পারেন না। মিশরের ক্ষেত্রে এই দুটির প্রয়োগ সম্পর্কেও লেখক শেষ রায় দেবার প্রলোভন সংযত করেছেন।

আগামী সংস্করণে বইটির শেষে একটি গ্রন্থ-পঞ্জী ও নির্ঘণ্ট যুক্ত হলে বইটির ব্যবহার-যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রকাশক গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সর্বপ্রকার যত্ন নিয়েছেন। তবু কিছু ছাপার ভুল, যদিও তুচ্ছ অতএব উপেক্ষণীয়, রয়ে গেছে।

"ধীরে বহে নীল" ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির ছাত্র, সাংবাদিক এবং সাধারণ সকল পাঠকদের অবশ্য পাঠ্যের তালিকায় স্থান পাবার দাবী রাখে।

## পারমাণবিক শাস্ত্র

**পরমাণুশক্তি**—অমলেন্দু দাশগুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরি, কলিকাতা—৬। মূল্য—৪, টাকা।

পারমাণবিক শক্তির মারণাত্মক ভূমিকা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা সবাই অল্প-বিস্তর সচেতন হলেও এর যথাযথ প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ। মানব সমাজের শান্তিপূর্ণ প্রগতির পথে এই পরমাণু শক্তির দান কতখানি হতে পারে, সে সম্বন্ধেও আমরা অল্পই সচেতন। এর একটা প্রধান কারণ, বাংলা ভাষায় এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অভাব বহুলাংশে দূর করবে।

পারমাণবিক শাস্ত্রের সুবিস্তৃত বিষয়ক্ষেত্র এই বইয়ের আলোচ্য বস্তু। গোড়ার কথা হিসাবে এতে যেমন বস্তু কাকে বলে, তার গঠন কী, অণু-পরমাণুর গঠন কী, তেজস্ক্রিয় বিকীরণ কাকে বলে, শক্তি কী, বস্তু ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক কী, কি করেই বা তাদের পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে প্রভৃতি প্রশ্নের আলোচনা রয়েছে, তেমনি অন্য দিকে রয়েছে পারমাণবিক শাস্ত্রের সাম্প্রতিক বিকাশের কথা, পরমাণু শক্তির প্রয়োগ ও ফলাফলের কথা ও হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সাম্প্রতিক পারমাণবিক অস্ত্রের গঠন,

কলাকৌশলের বিবরণ। শুধু তাই নয়, এই শক্তির বিপুল কল্যাণকর সম্ভাবনার কথাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে গ্রন্থের শেষ কয়েকটি অধ্যায়ে।

মাত্র একশত তেইশ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে পারমাণবিক শাস্ত্রের মূল তথ্য ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এই যে আলোচনা লেখক করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। লেখার গুণে কোথাও এই দুরূহ বিষয়টি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। যারা পরমাণু শাস্ত্রের গোড়ার কথাগুলো ভালোভাবেই জানেন, তাঁরাও যেমন বইখানি পড়ে পারমাণবিক শাস্ত্রের সাম্প্রতিক বিকাশ, তার প্রয়োগ ও ফলাফল সম্বন্ধে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন, তেমনি সাধারণ শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকও তা সহজেই বুঝতে পারবেন। প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে বিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক তথ্যগুলো থাকাতে শেষের অধ্যায়গুলোতে পরমাণু শক্তির প্রয়োগ ও ফলাফলের যে আলোচনা রয়েছে, তা আরও সহজবোধ্য হয়েছে। পরমাণু শক্তির সাম্প্রতিক ব্যবহার ও ফলাফল সম্পর্কে উৎসুক সাধারণ পাঠকের বইখানি পড়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

৫১০।৫৮

**অনুপ্রাস**—ভবেশ চক্রবর্তী। শোভনা প্রকাশনী, কলিকাতা—৯। মূল্য—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

'কে বড় চোর?' যারা পেটের দায়ে প্রয়োজনের তাগিদে চুরি করেছে সেই অশেষ নিমেষ—না প্রাচুর্যের নেশায় যারা ছিনিয়ে নিয়েছে সেই রায়সাহেব বিলাসদের দল?—সেই পুরনো প্রশ্নকেই কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী, একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের করুণ ইতিবৃত্ত। কাহিনীতে অভিনবত্ব খুব বেশী নেই, ঘটনাবিন্যাসও জায়গায় জায়গায় একটু বেশী নাটকীয়। তবু মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বইখানা পড়ে ভালোই লাগবে। অমূল্য দাসের আঁকা প্রচ্ছদপটের ছবিটি সুন্দর।

২৪১।৫৮





### ভারত সংস্কৃতি

**মহান ভারত**—শ্রীভিক্ষু প্রণীত। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ভারতী প্রকাশ, ৩০, আশুতোষ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১ হইতে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড—৭৷৷০ টাকা এবং দ্বিতীয় খণ্ড—৭৷৷০ টাকা।

ইহা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক অবদান সম্বন্ধে দুই খণ্ডে বিভক্ত কোষগ্রন্থ। প্রথম খণ্ডে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় ভারতীয় সমাজের গঠন, গণতন্ত্র পদ্ধতির বিবর্তন, রাজতন্ত্র শাসন, বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণের আলোচনার ভিতর দিয়া ইহার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এই আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ড বেদের বিভিন্ন সূত্রের আলোচনা-ক্রমে ষড়দর্শনের সারকথা, বেদাংগ এবং বেদান্ত, তন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের সার তথ্যরাজি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম আলোচনায় গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি পুস্তক দুই খণ্ডে শুধু তথ্য-পঞ্জীই উপস্থিত করেন নাই; পরন্তু সব বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করিয়া সহজ এবং সাবলীল ভাষায় সেগুলির বিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় কোথায়ও অস্পষ্টতা বা আড়ষ্টতা নাই। এজন্য এইরূপ একখানা সংগ্রহ পুস্তক বা কোষগ্রন্থের আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রধানতঃ যুক্তিবাদমূলক। ইহা সত্ত্বেও বিভিন্ন উপনিষদ এবং তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে নিগূঢ় অধ্যাত্ম ভাবসমূহের মর্মানুপ্রবেশে তাঁহার মনস্বিতার ঝলক আমাদের মনের উপর আসিয়া পড়ে। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি গ্রন্থকারের অপরিসীম শ্রদ্ধাবুদ্ধি চিত্তবৃত্তি দেশ ও জাতির প্রতি গৌরববোধে প্রণিহিত করে। এই আলোচনা সমাজ-জীবনে চিন্তাশীলতা উদ্বুদ্ধ করিবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ দুই খণ্ড বিভক্ত এই গ্রন্থ কাছে থাকিলে ভারতের ঐতিহ্য, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব হইবে। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সুদৃশ্য এবং মনোরম।

৪৭২।৫৮

### ছোট গল্প

**এলার্জি** — প্রমথনাথ বিশী। বিশ্ববাণী, কলিকাতা—৭। মূল্য—তিন টাকা।

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের সংখ্যা প্রচুর। ছোটগল্পের লেখকসংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সেই অনুপাতে সার্থক হাসির গল্প বা ব্যঙ্গগল্পের সংখ্যা কম, সেই গল্পের লেখক সংখ্যা আরও কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হাসির গল্প বা ব্যঙ্গগল্প বলতে যা বাজারে বেরোয়, তার অধিকাংশই হচ্ছে অযথা আক্রমণ অথবা ভাঁড়ামি অথবা জোর করে লোকহাসানোর জন্য সুড়সুড়ি দেবার প্রচেষ্টা। যে কয়জন লেখক বাংলাসাহিত্যের এই দিকটিকে সার্থক গল্প দিয়ে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, প্রমথনাথ বিশী মশাই তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর কয়েকটি সার্থক ছোটগল্পের সমষ্টি।

গল্পগুলো পড়তে পড়তে হাসির অনাবিল স্রোতে ভেসে যেতে হয়। কোথাও জোর করে হাসাবার চেষ্টা এতে নেই। শুধু তাই নয়। জায়গায় জায়গায় যে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ তিনি করেছেন, তাও আমাদের একই সঙ্গে হাসি ও চিন্তার খোরাক জোগায়, কোথাও অযথা বিদ্ধ করে যন্ত্রণা দেয় না। এখানেই তাদের সার্থকতা। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। ৫১১।৫৮

## সাহিত্য-আলোচনা

**বাংলাসাহিত্যের চতুষ্কোণ** — সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশান্ত মিত্র পাবলিকেশনস্, কলিকাতা—১২। মূল্য—এক টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

সাহিত্যের সংগে সমাজের সম্বন্ধ অংগাংগী। সমাজমানসের বিবর্তন, তার চাহিদা ও সাহিত্য এবং শিল্পের কর্ম ও টেকনিক পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই তথ্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। আর এই স্বীকৃত তথ্যকে মনে রেখেই বাংলা গদ্য রসসাহিত্যের চারটি দিক—রম্যরচনা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। গদ্যসাহিত্যের এই চারটি দিক আলোচনা করতে বসে মূলত আংগিক কিভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে রূপান্তরিত হয়েছে ও হচ্ছে তারই পরিচয় দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস অভিনব না হলেও সুষ্ঠু, সেকথা অনস্বীকার্য। তবে পরিসরের স্বল্পতা কোন কোন ক্ষেত্রে তার বক্তব্যের স্পষ্টতার প্রতিকূলতা করেছে। যে চারটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তা আরও বৃহৎ পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে। বইখানি বাংলাসাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগবে। ৫১৫।৫৮

## নাটক

**জতুগৃহ**—সুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা—১২। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

সামান্য কারণে, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য একটি সুসজ্জিত সংসার নিমেষে জতুগৃহের মতই ধ্বংস হয়ে যায়—এমন ঘটনা পথ চলতে গিয়ে প্রায়ই না হলেও মাঝে মাঝেই আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির হয়। আপাত-দৃষ্টিতে এই ঘটনা রসসাহিত্য পর্যায়ভুক্ত মনে না হলেও তার ভেতরে খোঁজ নিলে এক বিচিত্র জীবনের পরিচয় মেলে। তার নাটকীয়তা আমাদের বিস্মিত করে। এমনই একটি কাহিনীকে ভিত্তি করেই আলোচ্য নাটকখানি গড়ে উঠেছে। একটি মধ্যবিত্ত দম্পতির মনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বল্প আয়াসে নাট্যকার নাটকটিকে তার পরিণতিতে নিয়ে গেছেন। অভয় ও শিখার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকটি সজীব হয়ে উঠেছে। পার্শ্ব-চরিত্র স্বল্প হলেও সেই কয়েকটি চরিত্র-সৃষ্টিতেও নাট্যকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকটি নাট্যামোদীদের আনন্দ দিতে সক্ষম হবে। ১৩৪।৫৮

## প্রাচীন সাহিত্য

**পলাশীর যুদ্ধ**:—নবীনচন্দ্র সেন। মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা—১২। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পলাশীর যুদ্ধ যেমন দেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, তেমনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের, "পলাশীর যুদ্ধ"-ও বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। এই বইখানিই কবিকে অচল কবি-প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল। "পলাশীর যুদ্ধের" এই নতুন সংস্করণটি দুই একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত ভূমিকা, দুরূহশব্দ-সমূহের ও বাক্যাংশের অর্থ এবং প্রসংগ সংকেত ছাত্র ও কাব্যামোদী পাঠকদের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। বইটির সম্পাদনাও প্রশংসার দাবী রাখে। —৪১৯।৫৮

## কিশোর সাহিত্য

**সাত সমুদ্দুর**—সম্পাদনা : ইন্দিরা দেবী। অরুণালোক প্রকাশনী, ৪০ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—১২। মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পূজাসংখ্যা সমাকীর্ণ বাজারে ছোটদের জন্য প্রকাশিত এই সুরুচিপূর্ণ বইখানি অভিনবত্বের দাবী রাখে। ছোটরা যা জানতে চায়, আর যা ছোটদের জানা উচিত — দুয়েরই অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এই সংকলন-গ্রন্থটিতে। খ্যাতনামা লেখকদের লেখা গল্প, কবিতা, ছড়া, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দেশবিদেশের কথা, যাদুবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতির প্রাচুর্যে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। তা ছাড়া আছে সুন্দর সুন্দর বেশ কয়েকখানি ছবি। ক্রোড়পত্র হিসাবে নন্দন-এ ছোটদের যে লেখাগুলো স্থান পেয়েছে, তাও সুনির্বাচিত; সব কয়টি লেখাই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বাক্ষর বহন করছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক। মূল্য সেই অনুযায়ী কম। তবে বইখানির মাঝে মাঝে যে বিজ্ঞাপনগুলো স্থান পেয়েছে তা বইখানির গোড়ার দিকে বা শেষ দিকে স্থান পেলেই বোধ হয় বইখানির সৌন্দর্য বেশী হত। বইখানি যাদের জন্য সংকলিত সেই ছোটরা বইখানি পেয়ে যে খুশী হবে, তা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। ৫১২।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

**জীবন বুদ্বুদ**—মনোজ দাস।
**নীল পাতা**—জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
**অমর গীতি**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী।
**অনাবৃত জীবন**—শ্রীব্রজনাথ সিংহ।
**ছড়া ও ছবিতে অঙ্ক শেখা**—শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস।
**একাংক সপ্তক**—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
**সোনার পুতুল হীরের চোখ**—বিশ্বনাথ দে।
**জপ সূত্রম** (৫ম খণ্ড)—শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী।
**কবিতা**—সুজিতকুমার নাগ।
**শিকারের আদি কথা**—শ্রীঅদিতিমোহন রায়।
**তিন সর্গ**—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
**ছিলেন বাবুর দেশে**—ধনঞ্জয় বৈরাগী।
**মনোগন্ধা**—বটকৃষ্ণ দে।
**কালী-কীর্তন** (৩য় খণ্ড)—সত্যানন্দ।
**যুগে যুগে যার আসা**—সত্যানন্দ।
**নক্ষত্রের আলোয়**—বিনয় মজুমদার।

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

মশা-মাকড় মারবার প্রধান ওষুধ ডি-ডি-টির গ‍ুঁড়ো ১৯৫৫ সাল থেকে ভারত সরকার ডি-ডি-টি ভারতবর্ষে তৈরী করা শ‍ুর‍ু করেছেন। এর জন্য বর্তমানে দ‍ুটো কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। একটি দিল্লীতে আর একটি কেরালাতে। দিল্লীর কারখানায় ১৯৫৭ সালে ১১৭ টন করে ডি-ডি-টির গ‍ুঁড়ো প্রতি মাসে তৈরী করা হচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে ১২৪ টন করে গ‍ুঁড়ো প্রতি মাসে তৈরী করা হচ্ছে। এ-ছাড়াও এই কারখানায় মাসে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ২৮,০০০ গ্যালন করে 'মোন-ক্লোরোবেঞ্জিন' তৈরী হচ্ছিল আর বর্তমানে সেটা বেড়ে ৩০,০০০ গ্যালনে পেঁাছেছে।

*

উড়িষ্যা সরকারের এক খবরে প্রকাশ যে, উড়িষ্যার অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের খনিজ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। কোরাপটে এবং কালাহাণ্ডিতে চুনো পাথর, সাবান পাথর, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় ৪০ কোটি টন ভাল জাতের চুনো পাথর মাটির স্তরে সমানভাবে ৩০ ফ‍ুট গভীর স্থান জ‍ুড়ে ছড়ান আছে। এর সাহায্যে একটি বড় সিমেণ্টের, ক্যালসিয়াম কারবাইড, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদির কারখানা চালান যাবে। মাটির নিচে প্রায় ৫০ ফ‍ুট গভীর স্তরে খ‍ুব কম করেও ১ কোটি টন ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ টন খ‍ুব ভাল জাতের। সাবান পাথরের যে স্তরের খোঁজ পাওয়া গেছে তার সাহায্যে উড়িষ্যাতে ছোটখাট কাঁচ, শৌখিন পাথর, চিনে মাটির কারখানা চালান যাবে।

*

হেলিকপটার দিয়ে এ পর্যন্ত সোজা-স‍ুজি মাটি থেকে আকাশে ওঠা এবং আকাশ থেকে মাটিতে নামা যেতো কিন্তু এ পর্যন্ত এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে এই স‍ুবিধা ভোগ করা যেতো না। আমেরিকার সৈন্য বিভাগ যে নতুন রকম এয়ারোপ্লেন তৈরী করেছে তা দিয়ে সাধারণ হেলিকপটারের মতই সোজা আকাশে উঠতে এবং আকাশ থেকে নামতে পারা যাবে। এই উড়োজাহাজের দ‍ুই প্রান্তেই দ‍ুটি ঘ‍ূর্ণায়মান পাখা অথবা প্রপেলার থাকে এবং এই প্রপেলারগ‍ুলি হেলিকপটারের প্রপেলারের মতই উর্ধ্বম‍ুখী হয়। মাটি থেকে আকাশে উঠে যাবার পর আবার ঐ প্রপেলারগ‍ুলিই হাওয়া কেটে যাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে তার ব্যবস্থা করা থাকে। এই উড়োজাহাজটি তৈরী করেছেন "ডোক এয়ার ক্রাফট কোম্পানী।"



হেলিকপটারের মত উড়োজাহাজ

*

এবছর যারা বিজ্ঞানের কয়েকটি বিভাগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাদের মধ্যে ডাঃ ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার, ডাঃ পি এ চিরেনকভ, প্রফেসর আই এম ফ্র্যাঙ্ক, মিঃ ঈগর টাম, ডাঃ জর্জ ওয়েলস বিয়েডালি, ডাঃ এডওয়ার্ড ট্যাটাম এবং ডাঃ জেসোয়া লিডারবার্গের নাম আমরা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি। ডাঃ স্যাঙ্গার রসায়ন শাস্ত্রের কোনও বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও তথ্য আবিষ্কারের দর‍ুণ এই প‍ুরস্কার লাভ করেছেন। ইনি ইনস‍ুলিন মলিকিউল সম্বন্ধে বারো বছর কাজ করেন। ইনস‍ুলিনের আকৃতি নির্ধারণ ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু এবং তিনি দেখেছেন যে, ইনস‍ুলিন মলিকিউল ৭৭৭টি এ্যাটম দিয়ে তৈরী। ডাঃ ফ্রেডরিক স্যাঙ্গারকেই ইনস‍ুলিনের আকৃতি নির্ধারণের পথিকৃৎ বলা যায়। ইনস‍ুলিন মান‍ুষের দেহের একটি বিশেষ উপকারী উপাদান, সেই কারণে ইনস‍ুলিনের আকৃতি জানতে পারলে আমাদের বিশেষ উপকারই হবে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ইনস‍ুলিন সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে মান‍ুষের দেহে রোগ কেমন করে প্রবেশ করে তা জানাও সহজ হয়ে যাবে। পদার্থ বিজ্ঞানের দর‍ুণ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ডাঃ চিরেনকভ, প্রফেসর ফ্র্যাঙ্ক এবং মিঃ টাম্। বস্তুর মধ্যে কেমন করে শক্তিশালী অংশগ‍ুলি সঞ্চালিত হয় এরা সেই তথ্যই আবিষ্কার করেছেন। "চিরেনকভ এফেক্ট" নামে প্রায় বিশ বছর আগে চিরেনকভ যে তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন সেই তথ্যকেই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে আজ বৈজ্ঞানিক-গণ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ডাঃ বিয়েডালি, ডাঃ ট্যাটাম এবং ডাঃ লিডারবার্গ স‍ুপ্রজনন সম্বন্ধে যে নতুন পদ্ধতি বার করেছেন তা দিয়ে ক্যান্সার এবং অন্যান্য ডাক্তারি সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। কীভাবে মান‍ুষের গ‍ুণাগ‍ুণ এবং রোগ, বংশ পরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে এঁরা সে সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

*

বম্বের সম‍ুদ্রোপক‍ূলের নিকট কেম্বেতে সম্প্রতি তেলের সন্ধান অগভীর মাটির স্তরের নিচে পাওয়া গেছে। তেলের চাপও এখানে বেশী হওয়ার দর‍ুণ তেল তোলবারও স‍ুবিধা হবে। ভূতত্ত্ববিদ‍্দের মতে এখানকার মাটির স্তর পারশ্য দেশের তেলের খনির মতই। প্রায় আড়াই বছর ধরে ভারত সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তেলের খনির সন্ধান করছেন। আর আগে পাঞ্জাবের জ্বালাম‍ুখী এবং হোসিয়ারপ‍ুরে, পশ্চিম বাঙলায় কিছ‍ু কিছ‍ু তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কেম্বেতে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা এই সন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন। তারা ঠিক করেছিলেন যে, ১,০০০০ ফিট পর্যন্ত খনি খ‍ুঁড়ে তেলের সন্ধান করবেন, কিন্তু ৩০০০ ফিট খোঁড়ার পরই তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্থানে সন্ধানের কাজে রাশিয়ার তৈরী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

**সৃষ্টির পর্যায়ে সমালোচনা**

নাটক বা কবিতা লেখার মত নাট্য-সমালোচনাও যে একটা আর্ট—এই মত ব্যক্ত করেন সুখ্যাত সমালোচক শ্রীপংকজ দত্ত গিরিশ নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত বক্তৃতামালার সাপ্তাহিক ভাষণে। গত শনিবার বিশ্বরূপায় তিনি নাট্য সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বক্তা বলেন: শিল্পস্রষ্টা যেমন নিজের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি অনুসারে সৃষ্টি করে যান, নাট্য-সমালোচক ঠিক তেমনি ভাবেই নাটক ও অভিনয়ের ব্যাখ্যা করে তাদের সম্বন্ধে এমন একটি চিত্র গড়ে তোলেন যা পরবর্তী কালেও সেই নাটক ও অভিনয়ের রূপটাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই অর্থে নাট্য-সমালোচনা অবশ্যই সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে বক্তা আক্ষেপ করেন যে, ভরত মুনি প্রবর্তিত সংস্কৃত নাটকের আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে কালিদাস প্রমুখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাট্যকারদের আমল পর্যন্ত নাট্য-সমালোচনা বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, তৎকালীন টীকাকার ও ভাষ্যকারদের বক্তব্যের মধ্যে নাটকের বিষয়গত আলোচনার দৃষ্টান্ত যদিও বা কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কোন আলোচনাই দেখতে পাওয়া যায় না। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলমে"র উল্লেখ করে বক্তা বলেন, সেকালে নিশ্চয়ই এটি বহুবার অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু কোন অভিনয়েরই কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এ থেকে মনে হয় যে, সংস্কৃত নাটকের আমলে সমালোচনার দিকটাকে সম্ভবত অবজ্ঞা করা হত। ফলে আমরা প্রাচীন নাটক পেলেও, সেকালের নাট্য ঐতিহ্য একালে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে শ্রী দত্ত বলেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রমুখ নাট্যাচার্য-দের কীর্তি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি, কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে যাঁর কৌতূহল আছে, তখনকার আমলের সমালোচনার সহায়তায় তাঁর মনে এইসব পূর্বসূরীদের কৃতিত্বের একটা ছবি এঁকে নেওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীদত্ত আরো বলেন, সমালোচকের কল্পনা কোন নাটক অভিনীত কালে কি হচ্ছে শুধু তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না, গত দিনের মানদণ্ড এবং আগামী দিনের সম্ভাবনাও তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিফলিত না হলে বিচার সম্পূর্ণ হতে পারে না।



ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের নির্মীয়মান ছবি 'দেবী ফুল্লরা'তে তপতী ঘোষ।



**বিকাশ রায়কে এক তীর্থপর্যটক সন্ন্যাসীর ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁরই প্রযোজিত ও পরিচালিত "মরুতীর্থ হিংলাজ" ছবিতে। অবধূতের সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাসের এ টি চিত্ররূপ।**



**নাটক বিচারের নিরীখ**

গিরিশ নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নাট্য আলোচনা সভার অন্য এক দিনের বক্তা ছিলেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নাট্যাভিনয়ের আবেদন যত সহজে মানুষের অন্তর স্পর্শ করে, নাটক রচনা তত সহজে হয় না।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটক রচনা কালের একটি মনোরম ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, লেখকের বয়স চল্লিশ অতিক্রম না করলে নাটক রচনায় হাত দেওয়া উচিত নয়।

বক্তার মতে, নাট্য রচনার বিষয়বস্তুর কোনও শ্রেণী বিচার থাকতে পারে না। যে কোনও বিষয়বস্তু অবলম্বন করে শক্তিমান নাট্যকার নাটক রচনা করতে পারেন। কিন্তু তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব হৃদয় এবং মানব চরিত্র। নাট্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প কলা-সৃষ্টির মূলে প্রেরণা হৃদয়ের আবেগ। এই আবেগ যদি আবার সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ দ্বারা পরিচালিত না হয়, তা হলে শিল্প সৃষ্টি হয় ব্যর্থ। অসংযত হৃদয়াবেগ সৃষ্টিকে আনন্দময় রসলোকে উত্তীর্ণ না করে ব্যর্থতার রসাতলে ডুবিয়ে মারতে পারে।

মানব হৃদয় তার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা আর আবেগকে বাইরের কিছুতে প্রতিফলিত দেখতে চায়। ছোট ছেলেদের খেলাঘর সাজানোর মত তারই একটা প্রতিরূপ গড়বার চেষ্টা মানুষের এই নাট্য-সাহিত্য। এইটিই সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর আনন্দশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশের ক্ষেত্র। এখানে সে নানা রসের ভেতর দিয়ে আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করে। বাধাহীন করে দেখে আপনার বহু বিচিত্র প্রকাশকে। অনির্বচনীয় সেই আনন্দশক্তির বাধামুক্ত প্রকাশের দ্বারা জীবন নাট্য যেখানে রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, সেইখানেই সে নাট্যসৃষ্টি হয় সার্থক।

# চিত্রালোচনা

দেওয়ালীর সওগাতে এবার মাত্র দু-খানি হিন্দী ছবি—ফিল্মিস্তানের "সংস্কার" ও গোল্ডেন মুভীজের "ট্যাক্সী ৫৫৫"।

একটি মহিয়সী নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে "সংস্কারে"র গল্প। লিখেছেন তৈমুর বাহরম শা। অমিতা, অনন্তকুমার, ইয়াকুব, রঞ্জনা, বদরীপ্রসাদ, লীলা মিশ্র, কানু রায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন চতুর্ভুজ দোশী। অনিল বিশ্বাসের সুর ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

ডস্টয়েভস্কীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি "ক্রাইম এন্ড পানিশমেণ্ট" থেকে "ট্যাক্সী ৫৫৫"-এর আখ্যানভাগ নেওয়া হয়েছে। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন প্রদীপকুমার, শকিলা, মহীপাল, সুন্দর, মারুতি, অঞ্জনা প্রভৃতি। লেখরাজ ভকরীর পরিচালনায় ও সর্দার মালিকের সুর যোজনায় এই বিখ্যাত কাহিনী হিন্দী ছবির পর্দায় মনোজ্ঞ রূপ নিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

* * *

আসছে হপ্তা থেকে আবার পর পর কয়েকখানি নতুন বাংলা ছবির মুখ দেখা যাবে। প্রথমেই আসছে বসুমিত্রের নবতম নিবেদন "ধূমকেতু"। তারপর দেখা যাবে স্ক্রীন ক্লাসিকের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য "যৌতুক" এবং ক্রমান্বয়ে অগ্রদূত পরিচালিত নবারুণ চিত্রের "সূর্যতোরণ", সুশীল মজুমদার পরিচালিত এস আর প্রোডাকসন্সের "মর্মবাণী", শক্তি প্রোডাকসন্সের "শ্রীশ্রীতারকেশ্বর" ইত্যাদি।

আগামী হিন্দী ছবির তালিকাও কম লোভনীয় নয়। বসু চিত্রমন্দিরের "সবেরা" ও নওয়াথে পরিচালিত "সোহনী মহিওয়াল" আসছে হপ্তায় মুক্তি পাচ্ছে। মাদ্রাজে তোলা দুটি বিরাট ছবি—অঞ্জলি পিকচার্সের "সুবর্ণসুন্দরী" ও এ ভি এম প্রোডাকসন্সের "বাপবেটে" অচিরেই মুক্তি পাবে। "আদালত", "পঞ্চায়েত", "আখরী দাও", "দিল্লী-কা-ঠগ" ইত্যাদি আরো কয়েকটি ছবি এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত।

* * *

কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, তেমনি উত্তমকুমার ছাড়া বাংলার চিত্রজগতে আর হিরো নেই দেখা যাচ্ছে। আগামী ছবির তালিকায় যে ক'টি বাংলা ছবির নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে তিনটির নায়ক উত্তমকুমার। নির্মীয়মান অনেকগুলি ছবির পুরোভাগেও তাঁরই নাম। এ থেকে একদিকে



রাজেন তরফদার পরিচালিত "গংগা" ছবির নায়ক নিরঞ্জন রায়।

যেমন উত্তমকুমারের বিপুল জনপ্রিয়তার আভাষ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় মেলে বিভিন্ন ধরণের চরিত্রে আত্মপ্রকাশে। প্রভাত

প্রোডাকসন্সের "বিচারকে" তিনিই বিচারক, আবার শঙ্কর রচিত "কত অজানারে" গ্রন্থের চিত্রায়নে তিনি নিয়েছেন ব্যারিস্টারের ভূমিকা। বিশ্ব চক্রবর্তী পরিচালিত "মৌসুমী"তে তাঁকেই আবার চোরের বেশে দেখা যাবে। টাইম ফিল্মের "চাওয়া পাওয়া"তে উত্তমকুমার একেবারে ভোজ্য পাল্টে সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসেবে দর্শকদের অভিবাদন করবেন।

এগুলি ছাড়াও অন্য নানারকমের চরিত্রে তিনি বর্তমানে অভিনয় করছেন। উল্লিখিত ভূমিকাগুলি তারই নমুনা মাত্র।

* * *

হুবহু এক নামের ছবি যদি একই সঙ্গে দেখানো সুরু হয়, তাহলে দর্শকদের কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। গত সপ্তাহে ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটেছে "তালাক" নামের দুটি ছবির মুক্তিতে। অনুপম চিত্রের "তালাক" মহেশ কাউলের পরিচালনায় বোম্বাইয়ে তোলা। অন্য "তালাকের" জন্মস্থান পাকিস্তান। একই



অগ্রদূতের নতুন ছবি "লালু ভুলু"তে এক সংগ্রামী পঙ্গু অনাথের ভূমিকায় অভিনয় করছেন মাস্টার সুখেন। এই দৃশ্যে তাঁকে শিশির বটব্যাল ও মাস্টার পরেশের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গে দুটি ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট পরিবেশকরা সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। একের সাফল্যের সুযোগ নিয়ে অপরটির তরে যাবার চেষ্টার মধ্যে আর যাই থাক, ব্যবসায়িক সাধুতা নেই।

কিছুদিন আগে অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটেছিল দিল্লীতে এবং বাংলা ছবির প্রদর্শন নিয়ে। একটি সিনেমায় সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি সিনেমায় ঘোষিত হল বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওর "অপরাজিতা"। ইংরেজিতে দুটি ছবিরই বানান এক। ফলে বহু দর্শক, বিশেষ করে যাঁরা অবাঙগালী, অথচ সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বাঙগলা ছবি দেখতে গেছেন, প্রতারিত হয়েছেন পরিবেশকদের অবিবেচনায়।

এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে, সেবিষয়ে ফিল্ম ব্যবসায়ীদের নিজেদেরই অবহিত হওয়া উচিত—আর কিছুর জন্যে না হোক, নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই।

* * *

এ হপ্তার আর একটি নতুন আকর্ষণ "হ্যারী ব্ল্যাক এণ্ড দি টাইগার" নামক ইংরেজী ছবিটি। মহীশূর, বাঙগালোর ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে ছবিটি তোলা হয়। এর প্রধান তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রতীচ্যের তিনজন বিখ্যাত স্টার—স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার, বারবারা রাস ও এণ্টনী স্টীল। শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু এদেশেরই একজন শিল্পী—আই এস জোহর, যিনি একাধারে নট, নাট্যকার ও পরিচালক। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের কাগজগুলি জোহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছবিখানির সমালোচনা করতে গিয়ে। জোহর এতে নায়কের শিকারসংগী বাপুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আন্তর্জাতিক ছবির জগতে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, সেই কারণে তাঁর সাফল্যের বিপুলতায় ভারতীয় মাত্রেই গৌরব বোধ করবেন।

"হ্যারী ব্ল্যাক এণ্ড দি টাইগার"এর প্রযোজনা করেছেন লর্ড জন ব্র্যাবোর্ন—বাংলা ও বোম্বাইয়ের প্রাক্তন গভর্নরের পুত্র। হলিউডখ্যাত হুগো ফ্রেগোনিজ-এর পরিচালক। টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের পরিবেশনায় ছবিখানি গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে। প্রথম প্রদর্শনীতে বহু গণ্যমান্যদের সঙ্গে আই এস জোহরও উপস্থিত ছিলেন।

### বুদ্ধিদীপ্ত হিন্দী ছবি

অবাস্তব ও উদ্দেশ্যহীন হিন্দী ছবির একনাগাড় স্রোতের মধ্যে অনুপম চিত্রের "তালাক" একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। প্রমোদ পরিবেশনের অজুহাতে জীবন-সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি এ ছবিতে—যা হিন্দী ছবির নির্মাতারা সচরাচর করে থাকেন। অথচ তার জন্যে "তালাকে" দর্শকদের প্রমোদ-পিপাসা অতৃপ্ত থাকেনি।

দাম্পত্য বৈষম্যে যার সূচনা, বিবাহ বিচ্ছেদ তারই পরিণতি। এদেশে এই প্রথা আজ আইনের অনুমোদন লাভ করলেও, তার ফলে নতুন করে যে পারিবারিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়—এ ছবিতে তারই একটি নাটকীয় প্রতিকৃতি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এ চেষ্টা সফল



ভূপেন হাজারিকা প্রযোজিত ও পরিচালিত "মাহুত বন্ধু রে" ছবির একটি অরণ্য-দৃশ্যে প্রকৃতীশ বড়ুয়া (স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা), দিলীপ রায় ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

হয়েছে গল্পের মানবীয় আবেদন অব্যাহত আছে বলে, অবাস্তব ঘটনার বাহুল্যে গল্পের সহজ সুরটি হারিয়ে যায়নি বলে। এরজন্যে "তালাকে"র কাহিনীকার পণ্ডিত মুখরাম শর্মা এবং পরিচালক মহেশ কাউল দুজনেই প্রশংসার পাত্র।

যুবক রবি প্রেমে পড়ে প্রতিবেশী কন্যা ইন্দুর সংগে। ফলে তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইন্দু শিক্ষিতা মেয়ে এবং চাকরিও করত একটা। পাছে রবির আত্মসম্মানে বাধে, তাই বিয়ের পর সে-চাকরিতে ইস্তফা দিতে ইন্দু একটুও ইতস্তত করেনি। প্রথম কয়েকটা বছর বেশ আনন্দেই কাটল তাদের। যথাসময়ে একটি ছেলেও জন্মাল।

ছেলে মানুষ করা নিয়ে খিটিমিটি বাধল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। রবির ইচ্ছে, ছেলেকে সে আদর্শস্থানীয় করে গড়ে তুলবে। ইন্দুর মতে, এটা অহেতুক বাড়াবাড়ি। আর পাঁচটা ছেলের মত তার ছেলেও বড় হয়ে উঠলেই সে সুখী। প্রথমে কথা কাটাকাটি, মতের গরমিল। পরে রীতিমত মনান্তর ও মর্মপীড়া।

ইন্দুর বাবা একটি অদ্ভুত জীব। মেয়ে-জামাইয়ের কাঁধের ওপর ভর করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান, তাঁর বাজে খরচ জোগাবার দায়িত্বও যেন তাদের। স্বামী-স্ত্রীর কলহের মধ্যে তাঁর কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। ব্যয়বাহুল্য প্রসংগে শ্বশুর মহাশয়ের সম্বন্ধে রবির মন্তব্য ইন্দুর কানে খোঁটার মত শোনায়। সংগে সংগে সে স্থির করে, আবার সে চাকরি করবে, রবির উপার্জনের একটি পয়সাও সে ছোঁবে না।

চাকরিও জুটে যায় অচিরে। রবির মতের অপেক্ষা না করেই ইন্দু জীবিকা-র্জনের কাজে লেগে পড়ল। এরপর স্বামী-স্ত্রীর একসংগে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। রবি চার-বছরের ছেলে অশ্বিনীকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে উঠল গিয়ে একটা হোটেলে।

এই অশ্বিনীকে কেন্দ্র করেই তারপর যা-কিছু ঘটনা। শিশুর মন বাপকে আঁকড়ে থাকে, কিন্তু মাকেও ভুলতে পারে না। তার বেদনাতুর হৃদয়ের আলো-আঁধারিতে বাপ-মা নিজেদের নতুন করে চিনতে শেখে। বুঝতে পারে, নিজেদের জেদ বজায় রাখতে এই নিরপরাধ শিশুর ওপর কতখানি অবিচার করতে বসেছে তারা—



সুলতা পিকচার্সের ভক্তিমূলক ছবি "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু"র নাম-ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীচৈতন্যবেশী নবগোপালের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

যে শিশু তাদের অন্তরের ধন, তাদের দেহেরই অংশ। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝা-বুঝির পালা সাঙ্গ হতে এর পর আর দেরী লাগে না। অশ্বিনী তার বাপ-মাকে আবার যেন নতুন করে ফিরে পায়। এক বন্ধু-দম্পতী ও পরিবারের এক পুরোন চাকর স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনে যথোচিত সাহায্য করে।

কাহিনীতে উদ্দেশ্যের ছোঁয়াচ থাকলেও, বিন্যাসের গুণে তা কোথাও প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি। ফলে বেশ স্বাভাবিক লাগে এর ঘটনার প্রবাহ এবং চরিত্রগুলির আচার-ব্যবহার। পরিচালক মহেশ কাউল আতিশয্যকে বর্জন করেছেন সযত্নে এবং গল্পের মূল সুরটি দর্শকদের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে। তাই কাহিনীতে অভিনবত্ব না থাকলেও, "তালাক" দর্শকদের হৃদয় জয় করতে পেরেছে।

"তালাকে"র অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নতুন শিশু-অভিনেতা অশ্বিনীকুমারের অনবদ্য অভিনয়। ডেজি ইরানীর কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম রাখা হয়েছে ভূমিকার নামানুসারে। দিদির মতই বালকের ভূমিকাতে তার খ্যাতির সূত্রপাত, এবং কালে সে ডেজি ইরানীর খ্যাতিকে অতিক্রম করে গেলেও আমরা বিস্ময়বোধ করব না। এত সুন্দর, স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে এই শিশু-অভিনেতার প্রথম চিত্রাভিনয়। মার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর সে যখন নিজেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সাজসজ্জা করে, স্কুলে যাবার জন্যে তৈরী হয়—সে দৃশ্য ভোলবার নয়। মহেশ কাউলকে ধন্যবাদ, তিনি এই শিশু-প্রতিভাকে এত সুন্দরভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

ছেলেটির বাপ-মায়ের ভূমিকায় রাজেন্দ্রকুমার ও কামিনী কদমের অভিনয় চরিত্রোচিত। রাধাকিষণ রূপ দিয়েছেন শ্বশুর চরিত্রটির। একটু অতিরঞ্জিত হলেও তাঁর অভিনয় ছবিটির উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে। যশোধরা কাটজু ও সজ্জনের অভিনয় তারপরেই উল্লেখযোগ্য।

"তালাকে"র টেকনিক্যাল কাজ মোটের ওপর বেশ ভাল। সি রামচন্দ্র এর সুর-যোজনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। দু'খানি গান বিশেষ করে সকলের ভাল লাগবে।

### ভারত-জাপ বিনিময় চুক্তি

দক্ষিণ ভারতের সুবিখ্যাত প্রযোজক এ ভি মায়াপ্পন ও কলকাতার সর্বজনপ্রিয় পরিবেশক ভি এ পি আয়ার জাপানে গেছলেন ওদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারতীয় ছবি দেখানো সম্ভব কিনা, তারই

ছায়াচিত্রের 'রাজধানী থেকে'র একটি দৃশ্যে জহর রায় ও তুলসী চক্রবর্তী।

খোঁজখবর নিতে। সম্প্রতি খবর এসেছে তাঁদের মিলিত চেষ্টায় জাপানের মোশান পিকচার ফেডারেশন ভারতীয় ছবি প্রদর্শন করতে রাজি হয়েছেন ভারতে নির্দিষ্ট সংখ্যক জাপানী ছবি দেখাবার বিনিময়ে।

বিদেশে ভারতীয় ছবি চালু করবার প্রধান অন্তরায় বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত কড়াকড়ি। ভারতীয় ও জাপানী ছবির বিনিময় ব্যবস্থায় দু দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। সেই কারণে আশা করা যায়, ভারত গবর্নমেণ্ট এই ব্যবস্থায় আপত্তি করবেন না, বিশেষত যখন ভারত জাপানের সঙ্গে কৃষ্টিমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ।

শ্রীযুক্ত মায়াংপন ও আয়ার শুক্রবার বিমানযোগে জাপান থেকে ফিরেছেন। তাঁদের সাফল্যে ভারতীয় ছবির অনুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

### রুশে ফিল্মশিল্পের প্রসার

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়াতে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির উৎপাদন তিন গুণ বেড়েছে—মস্কোতে প্রকাশিত একটি খতিয়ান থেকে এ খবরটি পাওয়া গেল। ওদেশের কৃষ্টি কিভাবে প্রসার লাভ করছে, তারই একটি হিসেব দেওয়া হয়েছে এই খতিয়ানে।

সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে ফিল্ম প্রক্ষেপনের যন্ত্র আছে সত্তর হাজার। শুধু গত বছরেই তিনশো কোটি দর্শক ছবি দেখতে সিনেমায় হাজির হয়েছেন। সওয়া লক্ষরও বেশী ক্লাব ও কৃষ্টিপরিষদের মাধ্যমে কোটি কোটি লোককে প্রত্যহ প্রমোদ বিতরণ করা হয় ওদেশে। সারা রাশিয়াতে রেডিও সেট আছে পঁয়ত্রিশ কোটির ওপর, ১৯৫৩ সালে যা ছিল তার দ্বিগুণ।

গত বছরে প্রত্যহ দু হাজার করে টেলিভিসান সেট তৈরি হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার কারখানায়। এ বছর তার সংখ্যা আরো বেড়েছে।

কৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি যাচাই করবার পক্ষে রুশের দৃষ্টান্ত অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য।

### ফিল্মে গান্ধী জীবনী

মহাত্মা গান্ধীর অনন্যসাধারণ জীবন-কাহিনীকে ছবির পর্দায় রূপান্তরিত করবার বাসনা বহু বিদেশী পরিচালক ও প্রযোজক মনে মনে পোষণ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতীচ্যের একাধিক চিত্রনির্মাতা এদেশ ঘুরে গেছেন। অটো প্রেমিঞ্জারের পরিচালনায় এমনি একটি ছবি তোলবার পরিকল্পনা করেছিলেন, নামকরা ইংরেজ প্রযোজক আর্ভিং প্যাসক্যাল। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে সে চেষ্টায় হঠাৎ ছেদ পড়ে যায়।

সম্প্রতি আবার নতুন করে এবিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন আর একজন বিখ্যাত ইংরেজ পরিচালক—ডেভিড লীন, "দি ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াই" যাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। মিঃ লীন বর্তমানে দিল্লীতে অবস্থান করছেন। ভারত গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কতখানি সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তারই আন্দাজ পেতে চান তিনি।

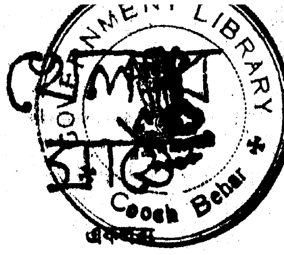
বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে অ্যালেক গিনেস নাকি ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছেন। গিনেস্ নিউইয়র্কে গেছেন তাঁর নতুন ছবি "দি হর্সেস মাউথে"র প্রথম প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন বলে। সেখান থেকে তাঁর সোজা দিল্লীতে চলে আসবার কথা। লীন ও গিনেস দুজনেই প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে এই ছবির বিষয়ে মুখোমুখি আলোচনা করতে চান।

### শিশু-নাট্যের আয়োজন

বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। স্থির হয়েছে যে শীঘ্রই প্রতি রবিবার এবং ছুটির দিন সকাল বেলায় নাচগান ও অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুদের মনোরঞ্জন করা হবে।

আজকের দিনে দেশব্যাপী নাট্য-আন্দোলন চলেছে। নানা আঙ্গিকে নাটক ও অভিনয় নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে শিশু নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার দৈন্য বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় বিশ্বরূপা এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন। শিশুদের উপযোগী নাটক রচনা করিয়ে শিশুমন জয় করার মতো মঞ্চ ও আলোক সজ্জা শিশুদের মনের মতন দৃশ্যপট রচনা করিয়ে শিশুদের দিয়েই এই নাটক অভিনীত হবে। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের বিষয় যে সব অভিভাবক চিন্তা করেন, আশা করি বিশ্বরূপার এই প্রচেষ্টায় তাঁরা খুসী হবেন।

যে সব শিশু বা কিশোর নাচগান বা অভিনয় পারদর্শী, অভিভাবকের অনুমতি-পত্র সহ তাদের বিশ্বরূপা থিয়েটারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে একটি মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এতে বাংলা দেশের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, নাট্যকার, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও শিক্ষক আছেন। স্থির হয়েছে বিশ্বরূপা স্থায়ী ভাবে এই অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবেন। নিঃসন্দেহে ভারতে এই প্রচেষ্টা অভিনব।



আমাদের শীতের অতিথি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টীমের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমস্ত ক্রীড়াকেন্দ্র ক্রিকেটের আমেজে মশগুল হয়ে উঠেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে বোম্বাইতে দুইদিনব্যাপী এক প্রদর্শনী খেলাও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের ক্রীড়ামোদীরা ফুটবলের নেশা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা প্রায় শেষ মুখে এসে পৌঁছেছে, দিল্লীতে নামডাকের ডুরাণ্ড কাপের খেলাও আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে ওখানে চলছে জাতীয় ফুটবলের প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলা। আর আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা তো এখনো অসমাপ্ত রয়েছে।

ফুটবল ও ক্রিকেট মরশুমের এই জগা-খিচুড়ী কোন খেলারই উন্নতির পক্ষে অনুকূল নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এবার ভারত সফর করবে এ ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই পাকা হয়ে ছিল। অন্যবারের কথা ছেড়ে দিলাম। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সফরের বিষয় বিবেচনা করে ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা অন্তত এবার বহু আগেই ফুটবল মরশুম শেষ করতে পারতেন। করা উচিতও ছিল। কিন্তু কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কোন চিন্তা তো করেনই নি, অধিকন্তু জাতীয় ফুটবলে আঞ্চলিক লীগ প্রথার প্রবর্তন করে ফুটবল মরশুমকে আরও দীর্ঘতর করে তুলেছেন। ফুটবল মরশুম আমাদের খুবেই দীর্ঘ। খেলার সংখ্যাও অত্যন্ত বেশী। তার উপর আরও খেলার সংখ্যা বাড়ানো যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা সেটা ভাববার কথা। খেলার সংখ্যা বাড়ানো এবং ফুটবল মরশুমকে দীর্ঘতর করবার আরও অসুবিধা আছে।

আমাদের দেশে খেলাকে এখনো জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। খেলা আমাদের দেশে নিছক আনন্দ লাভেরই উপকরণ। যাঁরা উচ্চ পর্যায়ের খেলাধুলা করেন তাঁদের অধিকাংশই চাকুরীজীবী। কেউ কেউ স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র। খেলার জন্য এরা কত ছুটি পেতে পারেন সেটা ভাববার বিষয়। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে অর্থেরও প্রশ্ন আছে, আছে শারীরিক ক্ষমতার প্রশ্ন।

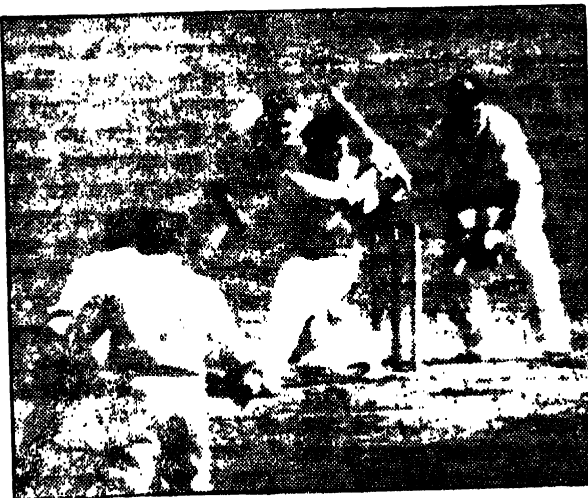
জাতীয় ফুটবলের প্রাথমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক লীগ খেলার প্রবর্তন প্রসঙ্গে যুক্তি দেখানো হয়েছেঃ এতে দুর্বল দলগুলি বেশী খেলার সুযোগ পাবে। শক্তিশালী দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা এঁটে উঠতে পারে না। ফলে অনেককেই একটি খেলাতেই হেরে বিদায় নিতে হয়। সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এর প্রতিবিধানের উপায় ছিল দুর্বল টীমের সঙ্গে দুর্বল টীমের খেলার ব্যবস্থা করে শক্তিশালী দলগুলিকে উপরের দিকে স্থান দেওয়া। এতে কোন কোন দুর্বল টীম অবশ্য একটির বেশী ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত না কিন্তু অনেক টীম দুই তিনটি ম্যাচও খেলতে পারতো। কিন্তু তা না করে লীগ প্রথার প্রবর্তন করায় খেলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বেড়েছে অনেক। বাঙলার কথাই ধরা যাক। বাঙলা দলকে একবার দৌড়তে হয়েছে কটকে, একবার জামসেদপুরে, একবার আসামে। দৌড় তো এখনো বাকী আছে। পয়সা খরচেরও সমস্যা আছে। আই এফ এ-র অবশ্য পয়সার অভাব নেই। কিন্তু যেসব এসোসিয়েশন কোনভাবে টিকে আছে তাদের পক্ষে এত পয়সা খরচ সম্ভব কি? পয়সা যদি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকেও আসে তবে সেটাকেও অপব্যয় বলা যেতে পারে। আশা করি, ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা কথাটা ভেবে দেখবেন।

• • • •

কলকাতা ময়দানে খেলোয়াড়দের আনাগোনা এবং ক্লাবগুলির কাজকর্ম মাসখানেক বন্ধ থাকবার পর আবার ময়দানে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। আরম্ভ হয়েছে ক্রিকেট মরশুম। যদিও ব্যাটবলের আওয়াজ এখনো ময়দান এলাকা পার হয়ে শহরের কানে পৌঁছয়নি, তবুও ময়দানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করলে ব্যাটবলের ঠুকঠাক শব্দ কানে আসে। সহজেই আন্দাজ করা যায়, ক্লাবে ক্লাবে ক্রিকেট মরশুমের প্রস্তুতির সমারোহ।

দীর্ঘস্থায়ী ফুটবল মরশুমের তান্ডবনৃত্যে ক্ষতবিক্ষত খেলার মাঠকে ডলাই মলাই করে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। মাসখানেকের অবসরে বেশীর ভাগ মাঠই ক্রিকেট খেলার উপযোগী হয়ে উঠেছে। যে কয়টি মাঠ এখনো পুরোপুরি তৈরী হয়ে ওঠেনি, সেখানেও কাজকর্ম চলছে। কিন্তু নেট প্র্যাক্টিসের বিরাম নেই। ক্লাবে ক্লাবে আরম্ভ হয়ে গেছে ক্রিকেটের নেট প্র্যাক্টিস। কয়েক দিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে ক্লাবের সঙ্গে ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট খেলা আর কলকাতা ক্রিকেট লীগের বার্ষিক অনুষ্ঠানসূচী।

ক্রিকেটের বড় আসর বসবে এবার ইডেন উদ্যানে। এখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের তৃতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে। এই টেস্ট খেলার উদ্যোগ-আয়োজনও আরম্ভ হয়ে গেছে। টেস্ট খেলা উপলক্ষে কলকাতায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকে খেলা না বলে 'মেলা'ও বলা যেতে পারে। বাস্তবিকই ইডেন উদ্যানের উদ্যোগ-আয়োজনেরই সমতুল। কলকাতার ক্রিকেট আয়োজনেরই সমতুল। কলকাতার ক্রিকেট রসিকরা অধীর আগ্রহে এই খেলার জন্য পরম শক্তিশালী ক্রিকেট টীম। ১৯৪৮-৪৯ অপেক্ষা করছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি



পার্থে অস্ট্রেলিয়ার সম্মিলিত একাদশ ও এম সি সি-র ৪ দিনব্যাপী ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নর্মান ও'নীল ইংলণ্ডের বোলার জিম লেকারের বল সুইং করছেন

সালে এরা এখানে যে খেলা দেখিয়ে গেছে তার স্মৃতি আজও মলিন হয়নি। ওয়াল-কটের বলিষ্ঠ ব্যাটিং আর সুনিপুণ ব্যাটস্-ম্যান এভারটন উইকসের সুচারু মারের দৃশ্য এখনো যেন চোখের সামনে ভাসছে। উইকস ও ওয়ালকট অবশ্য এবারকার দলে নেই। কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁদেরও ক্রিকেট খ্যাতি সর্বজনবিদিত। দেখা যাক, এ'রা কেমন খেলেন।

• • •

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারত সফরের বিষয় কম গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট সফর চলছে এখন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে এম সি সি দলের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া এম সি সি দলের যে তিনটি খেলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি খেলায় জয়-পরাজয় মীমাংসিত হয়নি। তৃতীয় খেলায় এম সি সি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছে ৯ উইকেটে। অস্ট্রেলিয়ার সংগে ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে ডিসেম্বরের ৫ তারিখে। ব্রিসবেন মাঠে। সারা ক্রিকেট বিশ্ব চেয়ে আছে এই খেলার দিকে। এইবার অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' লাভ করে 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধার করবে, না ইংলণ্ড দল এবারও বিজয়ী হয়ে পর পর তিনবার পরাজিত করবে অস্ট্রেলিয়াকে এই প্রশ্নই সবার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রাবার পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ট্রেলিয়া অবশ্য বদ্ধপরিকর। এদিকে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে'রও সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায় এটা শেষ সফর। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন এবং ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিনায়কত্ব করে অবসর গ্রহণ করবেন প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে। সুতরাং অ্যাসেস দখলে রেখে পিটার মে'ও তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ক্রিকেট জীবনকে আরও গৌরবমণ্ডিত করতে বদ্ধপরিকর।

অস্ট্রেলিয়ার জ্ঞানসমৃদ্ধ ক্রিকেট সমা-লোচকরা পার্থে এম সি সি দলের দুটি খেলা দেখার পর যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন তা থেকে বোঝা কষ্ট, দুই দলের শক্তিসামর্থ্যের বিচারে কোন্ দলের পাল্লা ভারী? অতীত দিনের কীর্তিমান খেলোয়াড় ও'রেলী বলেছেন—"১৯৫৬ সালে ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ডের যে সব খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছিল এবারকার দলের ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১৩ জনই আছেন সেই দলের খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ইংলণ্ডকে পরাজিত করা একরকম অসম্ভব"।

ইংলণ্ডের খ্যাতনামা স্পিন বোলার জনী ওয়ার্ডল, যিনি এবারকার ইংলণ্ড টীম থেকে বাদ পড়েছেন এবং বর্তমানে ক্রীড়া-সাংবাদিক হিসাবে অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন, তিনিও ও'রেলীর সংগে একমত হয়ে বলেছেন—"পিটার মে এবং টম গ্রেভনি যদি তাঁদের প্রতিভা অনুযায়ী খেলতে পারেন তবে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অ্যাসেস পুনরুদ্ধার খুবই কষ্টসাধ্য হবে।"

অস্ট্রেলিয়ার সদ্য অবসরপ্রাপ্ত চৌখস খেলোয়াড় কিথ মিলার অবশ্য পার্থে ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের ব্যাটিংয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলেছেন—"পিটার মে বলেছিলেন, তাঁর দলের সমস্ত খেলাই আকর্ষণীয় এবং দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হবে, কিন্তু পার্থে এম সি সি দল যে হারে রান সংগ্রহ করেছে তাতে মে'র প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন খেলোয়াড় এইচ এল হেণ্ড্রিও এম সি সি-র পার্থের খেলা দেখে সন্তুষ্ট হননি। তিনি এক পত্রিকায় লিখেছেন—"পাঁচজন ফাস্ট বোলারকে দলে স্থান দেওয়া ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকদের পক্ষে ভুল হয়েছে। নুতন খেলোয়াড় যদি একযোগে এবং দৃঢ়তার সংগে কিছু সময় খেলতে পারেন তবে ইংলণ্ড দলের এক শ্রেণীর বোলার নিয়ে দল গড়ার দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়বে।"

সিডনীর 'ডেলী মিরর' পত্রিকায় জিম ম্যাথার লিখেছেন—"পিটার মে ও কলিন কাউড্রে ছাড়া পার্থে ইংলণ্ডের আর কোন ব্যাটস্ম্যানই অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের বল ভালভাবে খেলতে পারেননি।"

মেলবোর্ন 'হেরাল্ড' পত্রিকায় এই মত সমর্থন করে জন প্রিস্টলী লিখেছেন—"ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের টেস্ট খেলার আগে আরও প্র্যাক্টিসের প্রয়োজন আছে।"

অস্ট্রেলিয়ার আর একজন কীর্তিমান চৌখস খেলোয়াড় সিড বার্নেস যিনি সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি লিখেছেন—"ইংলণ্ড দল খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার পরই বেশী নির্ভরশীল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের নতুন উদ্যম, সতর্কতা এবং মনোবল অধিক কার্যকরী হবার সম্ভাবনা।"

বিশেষজ্ঞদের এইসব অভিমত থেকে দুই দলের ক্রীড়ামান সম্বন্ধে কিছু ঠাহর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। তিনটি খেলার বিবরণী থেকেও দুই দলের শক্তি-সামর্থ্যের কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই নীচে তিনটি খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করছি।

**পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া : এম সি সি**

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সংগে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের প্রথম খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ব্যাটস্ম্যান টম গ্রেভনির প্রশংসনীয় ১৭৭ রান লাভ প্রথম খেলাটির যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তেমনই উল্লেখযোগ্য ঘটনা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস আরম্ভের সময় ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যানের প্রথম বলেই উইকেট লাভের বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার কিথ স্ল্যাটারের বোলিং নৈপুণ্যের কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এম সি সি-র প্রথম ইনিংসে স্লো বোলিং করে স্ল্যাটার বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর স্বভাবসুলভ মিডিয়াম ফাস্ট বোলিংয়ে ইংলণ্ড ব্যাটস্ম্যানদের মধ্যে বেশ ত্রাসের সৃষ্টি করেন। অধিনায়ক পিটার মে সমেত ইংলণ্ডের ৪ জন বাঘা ব্যাটস্ম্যান তাঁর বলে আউট হয়ে যান। প্রথমে আউট হন ওপেনিং ব্যাটস্ম্যান রিচার্ডসন ও মিল্টন, পরে পর পর দুই বলে আউট হন গ্রেভনি ও অধিনায়ক মে। কীর্তিমান ব্যাটস্ম্যান মে এই ইনিংসে কোন রান করতে পারেন না। ৪ জন ব্যাটস্ম্যানকে আউট করবার পর কিথ স্ল্যাটার লাভ করে মাত্র ৮ রানে ৪ উইকেট। এই খেলায় ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রে ও অস্ট্রেলিয়ার জে রাদারফোর্ডের ব্যাটিংয়েও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

**এম সি সি**—প্রথম ইনিংস ৩৫১ (টম গ্রেভনি ১৭৭, পিটার মে ৬০; জে রাদার-ফোর্ড ১২ রানে ৩ উইঃ, হোর ৪২ রানে ২ উইঃ)

**পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস ২২১ (আর সিম্পসন ৬০, কেন মিউলম্যান ৪২, বি শেফার্ড ৩২; পিটার লোডার ৪০ রানে ৩ উইঃ, ট্রুম্যান ৪২ রানে ৩ উইঃ, টনি লক ৪৬ রানে ২ উইঃ)

**এম সি সি**—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ১৪৬ (কলিন কাউড্রে নট

আউট ৬৫, ট্রেভর বেলী নট আউট ৩৪; স্ল্যাটার ৩৩ রানে ৪ উইঃ)

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ) ১২৪ (জে রাদারফোর্ড নট আউট ৭৭; টনি লক ২৬ রাণে ২ উইঃ)

[খেলা অমীমাংসিত]

**সম্মিলিত একাদশ : এম সি সি**

পার্থে সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়া দলের সংগে এম সি সি-র দ্বিতীয় খেলাটির ফলাফলও অমীমাংসিত থেকে যায়। ৪ দিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি দেখবার জন্য মাঠে প্রচুর জনসমাগম হয় এবং খেলার আগে দুই দলের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে নানা গবেষণা ক্রিকেটপ্রিয় অস্ট্রেলিয়াকে মুখর করে তোলে। অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন তরুণ ব্যাটস্‌ম্যান ও বোলারের নৈপুণ্য পরীক্ষা করবার জন্য স্যার ডন ব্র্যাডম্যান মাঠে উপস্থিত থাকেন।

একুশ বছর বয়স্ক উঠতি খেলোয়াড় নর্মান ও'নীল, যাকে অস্ট্রেলিয়ার 'নতুন ব্র্যাডম্যান' হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে—এম সি সি-র বিরুদ্ধে তিনি কেমন খেলেন তা দেখবার জন্য অস্ট্রেলিয়াবাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ও'নীল অবশ্য প্রথম খেলাতেই সেঞ্চুরী করে তাঁর দেশবাসীর উচ্চাশার মর্যাদা দিয়েছেন। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সব বোলারদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিপুণ হাতে মেরে খেলে ও'নীল এই খেলায় ১০৪ রান করেন। ভীতিপ্রদ ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান ও স্পিন বোলার জিম লেকারের বল তাঁকে মোটেই বিচলিত করতে পারে না। দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার মধ্যে তিনি উইকেটের চারদিকে মেরে খেলে রান করতে থাকেন। ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে চমৎকারভাবে মেরে খেলে এই খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পিটার মে ৬৪ রান করবার পর আর একটি রান নেবার সময় পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পান এবং তাঁর হাঁটুর একটি তন্ত্রী ছিঁড়ে যায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছু সময় খেলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং পরের দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ব্যাটিং করেই সেঞ্চুরী করেন। এই খেলায় সেঞ্চুরী করায় পিটার মে'র জীবনের ৭২তম এবং কলিন কাউড্রের ৩০তম সেঞ্চুরী পুরে গেছে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :—

এম সি সি—প্রথম ইনিংস ৩৪৯ (পিটার ১১৩, কলিন কাউড্রে ৭৮, টি জি স ৫৫; স্ট্রাউচ ৯৯ রানে ৫ উইঃ, রফোর্ড ১৭ রানে ২ উইঃ)

সম্মিলিত একাদশ—প্রথম ইনিংস ২৬০ (ও'নীল ১০৪, জে রাদারফোর্ড ৩৪; ও লোডার ৫৬ রানে ৪ উইঃ স্ট্যাথাম রানে ২ উইকেট)

এম সি সি—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইঃ) ২৫৭ (কলিন কাউড্রে নট আউট ১০০, ট্রেভর বেলী নট আউট ৭১, ফ্রেডি ট্রুম্যান ৫৩)

[খেলা অমীমাংসিত]

**সাউথ অস্ট্রেলিয়া : এম সি সি**

অস্ট্রেলিয়ায় এম সি সি দলের দু'টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর এডিলেড ওভ্যাল মাঠে তৃতীয় খেলায় এম সি সি দল ৯ উইকেটে সাউথ অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছে। এম সি সি ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ৪ দিনব্যাপী এই খেলাকে কেন্দ্র করে এডিলেডে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল। কারণ এইটিও ছিল অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা। এম সি সি-র অধিনায়ক পিটার মে-র হাঁটুতে চোট থাকায় অবশ্য এই খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তবে ইংলণ্ডের দুই কীর্তিমান স্পিন বোলার জিম লেকার ও টনি লককে এই ম্যাচে এক সংগে খেলতে দেখা যায়। সাউথ অস্ট্রেলিয়া দলও শক্তিশালী ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার তিনজন খেলোয়াড় ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান ফেভেল, ফাস্ট বোলার জন্য ড্রেনার ও উইকেট কিপার ব্যারী জারম্যান খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটস্‌ম্যানদের ব্যর্থতার জন্য ৪ দিনব্যাপী খেলা তিনদিনেই শেষ হয়ে যায়।

সারের দুই খ্যাতনামা বোলার লেকার ও লকের মারাত্মক বোলিং এবং ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান পিটার রিচার্ডসন এবং আর্থার মিল্টনের প্রশংসনীয় ব্যাটিং খেলাটির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান বোলার জে মার্টিনের বোলিংও প্রশংসনীয় হয়। ইংলণ্ডের রিচার্ডসন ও গ্রেভনি ছাড়া আর কোন ব্যাটস্‌ম্যানই মার্টিনের বলে ঠিকভাবে খেলতে পারেননি। জিম লেকার এই খেলায় প্রথম ইনিংসে ৩১ রানে ৫টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রানে ৫টি উইকেট দখল করায় এই খেলায় ১০১ রানে তাঁর উইকেট হয়েছে ১০টি। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :—

সাউথ অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ১৬৫ (জি স্টিভেন্স ৩৮, জে লিল ৩৪; লেকার ৩১ রাণে ৫ উইঃ, টাইসন ৩৭ রাণে ২ উইঃ)

এম সি সি—প্রথম ইনিংস ২৪৫ (রিচার্ডসন ৮৮, টম গ্রেভনি ৪১; মার্টিন ১১০ রানে ৭ উইকেট)

সাউথ অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৪ (জে লিল ৪০, জে মার্টিন ৩৭; লেকার ৭০ রাণে ৫ উইঃ, লক ৬৫ রাণে ৪ উইকেট)

এম সি সি—দ্বিতীয় ইনিংস (১ উইঃ) ১১৫ (সি মিল্টন নট আউট ৬৩, রিচার্ডসন ৪০)

[এম সি সি ৯ উইকেটে বিজয়ী]














# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৮শে অক্টোবর—বোম্বাইয়ের শুল্ক কর্তৃপক্ষ ইউরোপে প্রেরণের জন্য বুক করা দুইখানা মোটর গাড়ির গুপ্ত প্রকোষ্ঠ হইতে অদ্য ২২,৫০,০০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় কারেন্সী নোট উদ্ধার করিয়াছেন।

২৯শে অক্টোবর—অদ্য বিকালে কলিকাতা পুলিস কটন স্ট্রীট (বড়বাজার) রূপোর কাটনি বাজারে অকস্মাৎ হানা দিয়া বে-আইনী লেন-দেনে রত থাকার অভিযোগে প্রায় ৪০০ ফাটকা-বাজকে গ্রেপ্তার করিলে বড়বাজার অঞ্চলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। বে-আইনী লেন-দেনে নিয়োজিত অভিযোগে নগদ প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, প্রচুর কাগজপত্র এবং অননুমোদিত ১১টি টেলিফোন পুলিস বাজেয়াপ্ত করে।

৩০শে অক্টোবর—অদ্য মাদ্রাজে ন্যাশনাল হারবার বোর্ডের বৈঠকে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রী এম কে পাতিল ঘোষণা করেন, কলিকাতা অঞ্চলে আরও একটি বড় বন্দর নির্মাণ করা হইবে এবং যথাসম্ভব উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ কার্য চলিতেছে।

অদ্য কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে লিনডসে স্ট্রীট ও ম্যাঙ্গো লেনের দুইটি গুদামে অকস্মাৎ হানা দিয়া এনফোর্সমেণ্ট পুলিস এক পাউণ্ডের ১২৪৫০ বোতল হর্লিকস আটক করে। পুলিস এইরূপে সন্দেহ করিতেছে যে, অতিরিক্ত মুনাফা করার উদ্দেশ্যে ঐ বিপুল পরিমাণ হর্লিকস দুইটি গুদামে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

৩১শে অক্টোবর—প্রতি একরে লণ্ডন ও প্যারিসের জন সংখ্যা যেখানে ৬০ এবং ৮০, সে ক্ষেত্রে কলিকাতায় প্রতি একরে ১৫০ জনের অধিক লোক বাস করে বলিয়া প্রকাশ। বিশেষজ্ঞের মতে শহরে প্রতি একরে ১০০ জনের অধিক লোক বাস করা উচিত নয়।

অদ্য রাজ্যপাল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সম্প্রতি পাকিস্থানে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে তজ্জন্য প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উহার শ্রম বিভাগের জনৈক পদস্থ অফিসার এবং কর্মচারিণী একজন মহিলা অফিসারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানাবিধ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ হইতে ইস্তফা দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীঘোষের বর্তমান সভাপতি পদের মেয়াদ আগামী বৎসরের নবেম্বর মাসে শেষ হইবার কথা।

১লা নবেম্বর—আগামী জুলাই মাসের (১৯৫৯) মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সকল উদ্বাস্তু শিবির বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং সরকার তাহাদের এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিবেন না বলিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয় শ্রী এ কে সেন ও শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রী পি সি সেন অদ্য কলিকাতায় ঘোষণা করেন।

২রা নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের আবাদযোগ্য জমি, শিল্প ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষক ও বেকারদের সমস্যা সমাধানের দাবীতে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের উদ্যোগে অদ্য বিকালে ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিরাট সমাবেশ হয়।

৩রা নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের একযোগে পদত্যাগের পর প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিকাংশ সদস্যও পদত্যাগ করেন।

১৯১২ সাল হইতে অদ্যাবধি এই ৪৬ বৎসরে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৩ কোটি অবিক্রীত টিকিট পুনর্বিক্রয়, বে-আইনীভাবে ব্যবহার প্রভৃতি বহুবিধ দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত রাখিয়া রেলওয়ে গুদামে স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়িয়াছে আছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ধর্মতলা স্ট্রীট এলেকায় একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে নারী লইয়া পাপ ব্যবসা চালান হয়, এই সন্দেহে অদ্য পুলিস উক্ত ফ্ল্যাটে হানা দেয়। কোন ব্যক্তি দালালদের মাধ্যমে দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়া ঐ স্থানে পাপ ব্যবসা চালাইতেছিল বলিয়াও পুলিস সন্দেহ করিতেছে।

## বিদেশী সংবাদ

২৮শে অক্টোবর—ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু আজ সেনানায়কমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল নে উইনের অনুকূলে পদত্যাগ করিয়াছেন। জেনারেল নে উইন আগামী এপ্রিল মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্তৃত্ব করিবেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ অদ্য পাকিস্তানে 'প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রিসভা' জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই মন্ত্রিসভায় কোন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন না।

জড় পদার্থের মধ্য দিয়া ইলেকট্রন ও বিদ্যুৎ-শক্তি সমৃদ্ধ অন্যান্য পরমাণুর চলাচল সম্পর্কে গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে সুইডিশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী অদ্য তিনজন রাশিয়ান পরমাণু বিজ্ঞানীকে পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯৫৮ সালের নোবেল পুরস্কারদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই তিনজন বিজ্ঞানী হইতেছেন রাশিয়ান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর পদার্থ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চেরেনকোভ, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ও অধ্যাপক টামন।

আগামী শুক্রবার হইতে এক বৎসরের জন্য আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাকার্য বন্ধ রাখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সহিত হাত মিলাইতে রাশিয়া অস্বীকার করে।

২৯শে অক্টোবর—গত সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ উপকূলভাগে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া ঢাকায় বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল-সমূহে প্রায় দুই শত লোক নিহত হইয়াছে।

৩০শে অক্টোবর—ওয়াকিবহাল পাকিস্থানী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ২৭শে অক্টোবর বেলা ১০-১০ মিনিটের সময় জেনারেল আয়ুব খাঁ কর্তৃক পিস্তল দেখাইয়া জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হয়।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর উভয়সম্প্রদায় যাতায়াতকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'ব্যাগেজ রুল' সংক্রান্ত চুক্তি অকস্মাৎ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে পাকিস্তান হইতে ভারতগামী কোন যাত্রীকে একমাত্র পরিধেয় পোশাক ছাড়া তুচ্ছ একটা আলপিন পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া আসিতে দেওয়া হয় না।

৩১শে অক্টোবর—সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জুট মার্কেটিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর শ্রীমুস্লিম আলী মোল্লা ও ম্যানেজার শ্রীআবদুল খয়ের গতকাল দুর্নীতি দমন বিভাগের অফিসারগণ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

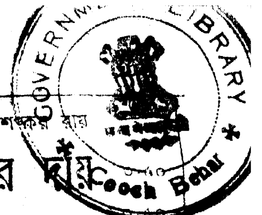
রাশিয়া পারস্যকে আমেরিকার সঙ্গে নূতন সামরিক চুক্তি সম্পাদনের "বিপদ" সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলে যে, চুক্তির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে প্রেসিডেণ্ট ভরোশিলভের পূর্ব পরিকল্পিত পারস্য পরিদর্শন সময়োচিত হইবে না।

১লা নবেম্বর—গতকল্য ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হয় যে, দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক কয়েক-দিনের মধ্যেই প্লাস্টিকের বিমানে ৮০ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়া মঙ্গলগ্রহে প্রাণ ধারণের পক্ষে যথেষ্ট জল আছে কিনা তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন।

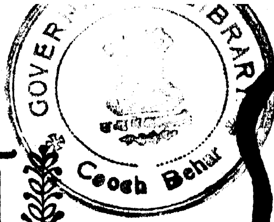
৩রা নবেম্বর—কম্যুনিস্টরা অদ্য কুওমিণ্টাং অধিকৃত কুয়েময় দ্বীপের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলা নিক্ষেপ করিলে ফরমোজা প্রণালীতে নূতন করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

---

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার          সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১, . ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র



প্রকাশক ঃ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

মোহিতলালের

# জীবন-জিজ্ঞাসা

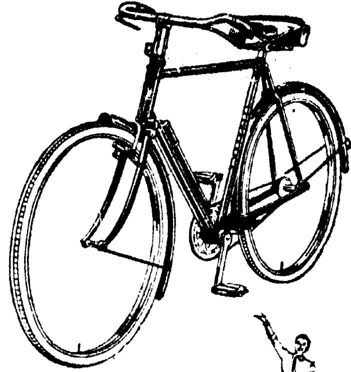
জীবন জিজ্ঞাসা, জীবন-কাব্য ও মন-মর্ম্মর তিন খণ্ডে বিভক্ত এই মহাগ্রন্থ। জীবন-জিজ্ঞাসায় লেখকের নিজ চিত্তের আকুতি ও উৎকণ্ঠা নানাছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবন-কাব্যে যে রচনাগুলি স্থান পাইয়াছে তাহার অধিকাংশই Imaginative prose বা গদ্য কাব্য। মন-মর্ম্মরে যে চিন্তাগুলি সংকলিত হইয়াছে তাহা এক-এক সময়ের এক-একটা ভাবতরঙ্গ। গ্রন্থখানিকে লেখকের সাহিত্যিক জীবনের অন্তরতর আত্মকথা বলা যাইতে পারে।

মূল্য—ছয় টাকা আট আনা

পরিবেশক: ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ২৭৩১)





সত্যিই গর্ব করার মত সাইকেল



র‍্যালে



$RC-51 BEN



পেপস্ দ্বারা ব্রণকাইটিস্ সত্বর ভাল হয়

বিশ্ববিখ্যাত গলার ও বুকের বড়ি

গলার ক্ষত, ব্রণকাইটিস্, কাশি ও সর্দ্দি, গলার ও বুকের পেপস্ বড়ি সেবনে সত্বর সেরে যায়। পেপস্ মুখে রেখে দিন—বুঝতে পারবেন আরোগ্যকারী ভ্রাণ কাজ করছে—জীবাণু ধ্বংস ও ব্যথার আরাম করার জন্য।



পেপস্

গলার ও বুকের বড়ি

যে কোন ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

সি. ই. ফুলফোর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

FPY 56-BEN

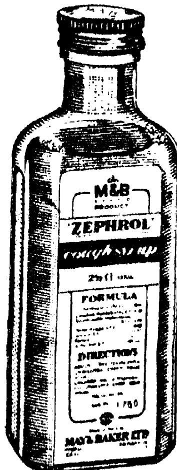
পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
২এস চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

# কাশিতে ভুগছেন কেন?

'ZEPHROL'

জেফ্রল সত্বর আরাম করে






'ZEPHROL'
Trade Mark Brand

জেফ্রল কাফ সিরাপ

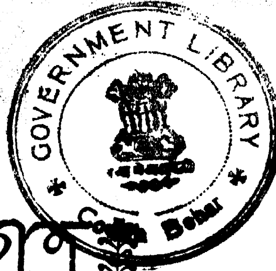


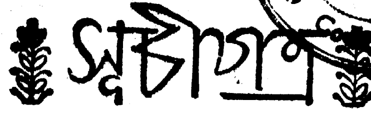
*Manufactured by:* MAY & BAKER LTD
*Distributed by:*
MAY & BAKER (INDIA) PRIVATE LTD
BOMBAY · CALCUTTA · GAUHATI
MADRAS · NEW DELHI

S. 20

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |



# সূচীপত্র

# দেশ

২৬ বর্ষ ॥ ৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৯শে কার্তিক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 15th November, 1958.

## জওহরলাল নেহরু

স্বদেশ-আত্মার কর্ম-মূর্তি শ্রীজওহর-
লাল নেহরু সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ
করিলেন। সমগ্র জাতির সহিত একযোগে
তাঁহাকে আমাদের অন্তরের প্রীতি-
সিঞ্চিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। এই
দিনটি বহুবার ফিরিয়া আসুক, তাঁহার
জীবনে শত শরৎকাল পূর্ণ হউক।

জওহরলাল স্বাধীনতার সূচনা হইতে
আমাদের প্রধান মন্ত্রী; জওহরলাল
অমিতপ্রভাব জননায়ক। তবু তাঁহাকে
বিশেষ করিয়া কর্ম-মূর্তি বলিয়াছি।
এইজন্য যে, এই কথাটিতে তাঁহার চরিত্র
যত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অন্য কোন
বিশেষণে ততটা নহে। 'নেহরু'—এই
নামটি উচ্চারণমাত্র যে রূপটি মনশ্চক্ষে
ফুটিয়া উঠে, তাহা সদা-উৎফুল্ল, বাস্ত-
চঞ্চল একটি মানুষের। বহু পূর্বে
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "জওহরলাল
সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে
প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী।"

দেশের মুক্তি-সংগ্রামের যিনি ছিলেন
প্রধান সেনাপতি, তাঁহার বিপুল বীরত্ব
ও অবিচল নেতৃত্বকে জাতি সানুরাগ
নমস্কার জানাইয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের
পর দেশ দেখিয়াছে সেই নেতৃত্বের
নূতন রূপ। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই
পরিণতি, কিন্তু প্রকারে ভিন্ন। যোদ্ধাদের
মধ্যে সার্থক গঠন-প্রতিভা প্রায়ই থাকে
না, জওহরলালের মধ্যে দুইটি গুণের
বিরল সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রায় এক যুগ
পূর্বে তিনি দৃঢ়হস্তে শাসনরশ্মি গ্রহণ
করিয়াছিলেন—মুষ্ঠি আজও শিথিল হয়
নাই; কখনও বন্ধুর, কখনও মসৃণ পথ
ধরিয়া রথ নিরন্তর সম্মুখের দিকেই
চলিয়াছে। এবং এই চির-নবীন সারথি
প্রায় একক, কেননা, তাঁহার প্রাক্-
স্বাধীনতাকালের গুরু বা সহকর্মীদের
অনেকেই আজ তাঁহার পাশে নাই। একটি
রাজনৈতিক দলের নেতাকে কদাচিৎ সমগ্র
জাতি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে
আপনার নেতা বলিয়া বরণ করে।
নেহরুকে করিয়াছে।

এই অসামান্য প্রভাব কেন। একটা
কারণ অবশ্যই নেহরুর অতুলনীয়
ব্যক্তিত্ব, যাহা হাস্যসুন্দর, কুসুমমৃদু,
আবার প্রয়োজন হইলে বজ্রাদপি কঠোর
হইতে জানে। আর একটা কারণ তাঁহার
কর্মনীতি, যাহা ভারতবর্ষকে আন্ত-
র্জাতিক ক্ষেত্রে সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা
দিয়াছে। এক দেশের রাষ্ট্রনায়ক অপর
দেশে সমাদর পান, কিন্তু প্রীতি সচরাচর
পান না, নেহরু দুই-ই পাইয়াছেন।
বিশ্বের অন্যতম প্রধান পুরুষ নেহরু।
তিনিই আবার একালের ভারতের
প্রতীক। ভারতবর্ষকে পৃথিবী
চিনিয়াছে বুদ্ধের বাণী, রবীন্দ্রনাথের
সাহিত্য এবং মহাত্মাজীর পুণ্য জীবন-
কথার মধ্য দিয়া, সেই সাধনা ও বাণীর
ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নেহরুর। পঞ্চশীলের
উদ্ভাবক তিনি নন, কিন্তু তাহাকে
আধুনিক রাষ্ট্র-নীতির উপযোগী
করিয়া প্রয়োগের সূত্রটি তাঁহার। 'বুদ্ধের
শরণ লইলাম', এই অমের প্রেমের মন্ত্রটি
পাষাণের মৌনতটে শত শতাব্দী জুড়িয়া
স্থির হইয়াছিল, তিনি তাহাকে নূতন
অর্থগৌরব দিয়াছেন। নেহরুই সকলের
সম্মুখে সৌভ্রাত্র ও সহাবস্থিতির আদর্শ
তুলিয়া ধরিয়াছেন। অন্যায় যেখানে
সুবিধাজনক, তিনি সেখানে অন্যায়কে
আশ্রয় করেন নাই, জোট-বাঁধার কূট-
নীতিকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করিয়াছেন।

আর, ভারতবর্ষকে নেহরু যাহা
দিয়াছেন, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র-
গুলির দিকে তাকাইলেই তাহা স্পষ্ট
হইয়া উঠিবে। সর্বত্র অনিশ্চয়তা ও
অব্যবস্থা, ভারতে স্থায়িত্ব। রাষ্ট্র-
বিপ্লবের প্রলয়পয়োধিজলে একমাত্র
ভরসার দীপ ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া
প্রাচ্য ভূখণ্ডে—একথা দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী
শিবিরেও স্বীকৃত। সেই সঙ্গে নেহরু
আমাদের দিয়াছেন জাতীয় আর্থিক
উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিক সংকল্প, যাহার
মূল্য বিচার বা ফলভোগের সময় এখনও
আসে নাই।

তবু একটুখানি অনিশ্চয়তা ভারতেও
আছে। নেহরু দৃঢ় হাতে আমাদের
ইতিহাসের হাল ধরিয়া আছেন, ভরসা
এইখানে। কিন্তু তাঁহার পরে কি?
তাঁহার পরে কে? এই অনিবার্য প্রশ্নও
উঠিয়াছে। নেহরুর যোগ্য উত্তরাধিকারীর
আবির্ভাব আজ অবধি হয় নাই, আশঙ্কা
এই কারণে। তাঁহার নেতৃত্বে যদি কোন
ব্যর্থতা থাকে, তাহাও এইখানেই। আবার
বুঝি ব্যর্থতাও নয়। ব্যক্তিবিশেষকে নয়,
নেহরু সমগ্র জাতিকেই তাঁহার আদর্শ ও
উত্তরাধিকারী করিতে চান। পরম্পরা-
টুকুকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আমাদের
প্রত্যেককেই যোগ্যতা অর্জন করিতে
হইবে। নেহরুর জন্মদিনে ইহাই জাতির
প্রতিজ্ঞা হইয়া উঠুক।

# প্রসঙ্গত

১৪ই নবেম্বর দিনপঞ্জীতে একটি চিহ্নিত দিন; কেন, তা সকলেই জানেন, এটি পণ্ডিতজীর জন্মদিবস। গত কয়েক বছর ধরে দিনটি আরও একটি কারণে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। সমস্ত ভারতে এ-দিনটি শিশু দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। এর চেয়ে শোভন ও সুন্দর যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। দিল্লীর অনুষ্ঠানে পণ্ডিতজী নিজে এই একটি দিন শিশুদের ভীড়ে সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়ে হারানো শৈশবের অনেকখানিই ফিরে পান; তাঁর ক্লান্তিহীন ছোটাছুটি দেখে সন্দেহ হয়, বয়সের ছাপ আর গাম্ভীর্যটাই পণ্ডিতজীর মুখোস, ভিতরের ক্রীড়াচপল, কৌতূকোচ্ছল শিশু-সত্তাটি আগে যেমন ছিল, আজও তাই আছে। এই দিনটিতে তিনি আর প্রধান মন্ত্রী নন, আগামীকালের নাগরিকদের কাছে তাঁর মাত্র একটি পরিচয়ঃ 'চাচা নেহরু।'

শিশু-দিবসে আমরা শিশুদের প্রতি আমাদের কর্তব্য স্মরণ করি। তাদের সবল ও সুস্থ করে গড়ে তোলার দায় আমাদের। প্রতি বছর এই দিনটিতে শিশু-কল্যাণের এক-একটি বিশেষ দিকের উপর নজর দেওয়া হয়। এ বছর ভারতীয় শিশু কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে প্রচারিত আবেদনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রুগ্ন শিশুদের যত্ন ও আরোগ্য ব্যবস্থা যে কত জরুরী সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবেদনটি মর্মস্পর্শী এবং এর বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত থাকা সম্ভব নয়। কেননা, কোন জাতি সভ্য কিনা, তার চূড়ান্ত প্রমাণ নির্ভর করে সে তাদের শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য কতখানি বন্দোবস্ত করতে পেরেছে তার উপরেই।

* * *

খুব জোরালো না হলেও দুটি সংবাদ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এক, ভারতীয় অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক মহাকাশে রকেট প্রেরণ। দুই, গোমিয়ায় ভারতের প্রথম বিস্ফোরক কারখানার উদ্বোধন।

ভারতে প্রথম শ্রেণীর বৈমানিক জন্মগ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিগ্রাহ্য প্রমাণের বিচারে এ-ক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্ব প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীদের সমতুল্য বা কাছাকাছিও নয়। সুতরাং মহাকাশে রকেট-প্রেরণের খবরটি চমকপ্রদ বৈকি। বিশেষ করে সোসাইটির প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে, তাঁরা যেটুকু করেছেন, সেটুকু সরকারী সহায়তা-নিরপেক্ষভাবেই করেছেন।

আমাদের হাউই তারকার মুখে ছাই দিয়ে আসতে পারেনি বটে, কিন্তু তৃতীয় প্রয়াসেই ঊর্ধ্বলোকে সাড়ে এগার মাইল অবধি উঠেছে। মার্কিন রকেটের পাশে সে একাধিক অর্থে অবশ্যই নিষ্প্রভ। তবু এ-কথাও স্মরণযোগ্য যে, বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে সাফল্যের বিচার শুধু দূরত্ব বা গতি দিয়ে নয়--"নো-হাউ"টাই আসল কথা। নীতির মূল সূত্রটি যদি জানা থাকে এবং পদ্ধতিটা প্রয়োগের কৌশল আয়ত্তে এসে যায়, তবে আজকের সাড়ে এগার মাইল কাল সাড়ে এগার শ হওয়া অসম্ভব নয়। প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরাও বহু ব্যর্থতার স্তম্ভের উপরেই তাঁদের সাফল্যের সৌধ নির্মাণ করেছেন।

অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রাথমিক লক্ষ্য কিন্তু গতি নয়, জ্বালানি। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটি জ্বালানি উদ্ভাবন করেছেন, সোসাইটির মুখ্য দাবী এই, এবং এই জ্বালানি কতটা কাজের, তা পরীক্ষা করবার জন্যেই তাঁরা মহাকাশে রকেট নিক্ষেপ করেছিলেন--সুদূরাভিসার তাঁদের অভিপ্রায় ছিল না।

সোসাইটির কর্মধারার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে মনে হয়, তাঁরা নিঃশব্দে এবং দ্রুত কাজ করার নীতিতে বিশ্বাসী। ১৪ই জুলাই প্রথম রকেট আকাশে উঠল--তার পাল্লা ছোট, হাজার ফুটের বেশী নয়। ১৬ই জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ে রকেট উঠল পাঁচ হাজার ফুট। ৩রা নভেম্বর তৃতীয় ধাপেই আমাদের রকেট ষাট হাজার ফুট পাড়ি দিয়েছে।

এই মহাকাশ-অভিযাত্রী সোসাইটির অগ্রণী মহারথীর বয়স, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবর সত্য হলে নিতান্তই অল্প, এও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বালক বীরের বেশে ইনিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। সোসাইটির পরিকল্পনা শুধু শূন্যে রকেট নিক্ষেপ নয়, পরবর্তী অধ্যায়ে এঁরা নাকি বেলুন-সমেত রকেট পাঠাবেন এবং প্রাথমিক আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী রকেটে বেতার-সংকেত যন্ত্র থাকবে; রকেটটি প্যারাসুট-বাহী হয়ে নির্বিবাদে যাতে নীচে নেমে আসতে পারে, সে-ব্যবস্থাও করা হবে। কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে মহাকাশে একটি ভাসমান বৈজ্ঞানিক ঘাঁটি নির্মাণের কথাও সোসাইটি চিন্তা করছেন। বিষয়টি যদিও ভূ-বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে এবং সমিতিও মূলত ভূ-বৈজ্ঞানিক, তবু এঁদের উদ্যমের মধ্যেই ভারতের ভাবী শক্তিসঞ্চয়ের বীজ নিহিত।

• • •

বিস্ফোরকের কাজ আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসাত্মক, কিন্তু গড়ে তোলার প্রয়োজনেও অনেক সময় ভাঙতে হয়। নতুন পথঘাট, রেল লাইন, বিমান ঘাঁটি তৈয়ারীর কাজে, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদি ভারী শিল্পের জন্য বিস্ফোরক অতি প্রয়োজনীয়।

গোমিয়াতে সরকার ও আই সি আই-এর সমবায়-প্রয়াসে যে কারখানা খোলা হল তার মূলধনের অনেকটাই বিদেশী, তবু এই কারখানার দৌলতে প্রথম বছরেই আমাদের দেড় কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে, এটা কম সুখবর নয়। বিস্ফোরকের শতকরা ৯০ ভাগ উপাদান এদেশেই লভ্য, তবু এর একটা বড় অংশ আমাদের আমদানী করতে হত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হিসাবে আমাদের বিস্ফোরকের দরকার ৭৫০০ টন। গোমিয়া ভরসা দিয়েছে, বছরে ৫০০০ টন সে তো উৎপাদন করবেই, ক্রমশ পরিমাণটাকে বাড়িয়ে ৭০০০ টন করাও অসম্ভব হবে না।

• • •

প্রথমে পূজার বাজার; পরে পূজো; অবশেষে পূজার ছুটিও গেল। অনেকের আগেই গিয়েছিল, তবু ছুটি-ছুটি ভাব মনে ছিল। কিন্তু দেওয়ালির পর সেই ভাবেরও বিশেষ অবশেষ থাকে না। যদিও জগদ্ধাত্রী পূজো এখনও বাকী, তবু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে শারদ উৎসব-ঋতুর অবসান।

এই অবসান প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক, তবু এর মধ্যে কোথায় যেন বিষণ্ণতার স্পর্শ আছে। বিষণ্ণতা শুধু মনে নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশেও। দ্বিপ্রহরে দাহ নেই, সন্ধ্যা হিমরোমাঞ্চিত। হেমন্ত শীতের নকীব, কিন্তু তার চাল-চলন সহজ বা স্বচ্ছন্দ নয়, সে একটু কুণ্ঠিত, জড়োসড়ো, কিছু-বা বিব্রত। হয়ত দীপ্তিশক্তি ক্ষীণ বলে; হয়ত নবাগত বলে। আরও কিছুদিন, ধীরে ধীরে তারও সাহস বাড়বে, দিনের তীরভূমি একটু একটু করে ক্ষয়ে গিয়ে রাত্রির নদীতে মিশে যাবে। হেমন্তেরই হাতে-তৈরি আসনে শীত একদিন প্রগাঢ় ধূসর রঙের আঙরাখা গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে এসে বসবে। তখন আবার আনন্দ-উল্লাসের নূতন পর্যায়ের শুরু, কিন্তু সেই বড়দিনের আনন্দের অনেকখানিই সাধারণ বাঙালীর জন্য নয়।



# আর্থিক সমীক্ষা

**শ্রীকৌটিল্য**

**চীন** কৃষি সমবায়ের বিখ্যাত 'মান' ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 'মান' ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা সহজেই উপলব্ধিযোগ্য। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সব বিষয়ের দাম (প্রাইস) বাজারের স্বাধীন নিয়ম অনুসারে স্থিরীকৃত হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হয়। পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার (পারফেক্ট কম্পিটিশন) পরিবেশে চাহিদা ও যোগানের খেলার মধ্য দিয়ে সংজ্ঞানুযায়ী এই দামে পৌঁছন হচ্ছে মনে করায় স্বভাবতই পারিশ্রমিকের হার সম্বন্ধে প্রশ্নই তোলা হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, বাস্তব জগতে মুক্ত বাজার নিয়ম বর্তমান নয় বলে প্রচলিত পারিশ্রমিকের হারের সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সংস্কার বস্তুত কোথাও কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি-নির্ভর করবার প্রচেষ্টা হয় না। পরিবর্তিত হার গুলি প্রায়ই এলোমেলো হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধারণাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে প্রথমেই যে কোন বিষয়ের দাম নির্ধারণের ভিত্তিটিকে বাস্তবিক প্রসঙ্গ বিশেষের মধ্য থেকেই আবিষ্কার করবার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ, কোন বিশেষ বিষয়ের উৎপাদন ক্ষেত্রে নির্ধারিত দাম, প্রথমত অন্য কোন আপাত-সদৃশ বিষয়ের উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত, একই উৎপাদন বিষয়ের অবস্থান্তরে যেন প্রচলিত না হয়, সেজন্য চীন সমাজতন্ত্র অত্যন্ত সতর্ক।

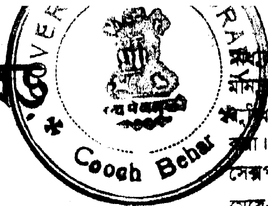
এই তো গেল প্রশংসার কথা। কিন্তু প্রশংসার বিপরীতে বর্তমান নিবন্ধের একটি সমালোচনামূলক উদ্দেশ্যও আছে।

পরিসংখ্যানবিষয়ক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সোভিয়েটের মতো চীনে উদ্দেশ্যমূলক (পারপাসিভ) পন্থা অবলম্বন করা হয়। গড়পড়তা জমি, গড়পড়তা কৃষক, গড়পড়তা আবহাওয়া ইত্যাদি সব কিছুর পরিসংখ্যান-মূলক ধারণাতেই পূর্বকল্পিত ব্যক্তিমানস অথবা গোষ্ঠীমানসের প্রভাব থেকে যায়। কয়েকজন যোগ্য কৃষকের অন্য অনেক ক্ষমতা স্বীকার করে নিলেও 'মান' নির্ণয়ের মতো সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রতিনিধিমূলক একক (রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিট) হয়তো তাদের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর না করানোই ভালো। নানারকম গোষ্ঠী স্বার্থের প্রভাবে সোভিয়েট পরিসংখ্যানে "উদ্দেশ্যমূলক নমুনা" (পারপাসিভ স্যাম্পলিং) পদ্ধতি অবলম্বন করে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, তা আজ সোভিয়েট সংখ্যাতত্ত্ববিদরাও উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা বর্তমানে ক্রমাগত ব্যক্তিগত সমীকরণ (পার্সোনাল ইকুয়েশান)-মুক্ত "র‍্যানডম্" নমুনা" (র‍্যানডম্ স্যাম্পলিং) পদ্ধতির দিকে ঝুঁকেছেন। অবশ্য পৃথিবীবিখ্যাত রুশ সংখ্যাতত্ত্ববিদ কলমোগোরোভ বহুকাল আগেই এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা দাবী করেছেন। চীনের পরিসংখ্যান পদ্ধতিগত নানাদিক দিয়ে এখনো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং হুবহু প্রথানুগ সোভিয়েট উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতির অনুগামী। আমাদের আলোচ্য 'মান'গুলির স্থিরীকরণের ব্যাপারে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার না থাকলেও সাধারণভাবে তাদের নির্ধারণ পন্থাও এই "উদ্দেশ্যমূলক" ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই দ্রষ্টব্য। চীন সফরকারী ভারতীয় দলের রিপোর্টে এবং চীন সরকারের আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতিতে কোন কোন চীন সমবায়ে গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ 'মানে'র প্রচলন উল্লিখিত হয়েছে। এই ভ্রান্তিকর 'মান'গুলি অশেষ ক্ষতিকর হয়েছে এবং বলা বাহুল্য এদের নির্ধারণের মূলে সর্বদাই ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত সমীকরণ কাজ করেছে। সম্প্রতি চীন সরকার সংখ্যা নির্ণয়গত

সব ক্ষেত্রেই সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে আগ্রহান্বিত। বিশেষ করে "উদ্দেশ্যমূলক" অনুসন্ধানের সব ফলাফল সম্বন্ধেই তাঁরা অল্পাধিকতর সন্দিহান। সম্প্রতি পিকিংএ অধ্যাপক মহলানবীশ চীনা সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পেরেছেন যে, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সনের শস্য পর্যবেক্ষণ (ক্রপ সার্ভেস) এবং সামাজিক-অর্থনীতিক (সোশিও-ইকনমিক) অনুসন্ধানে গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হননি এবং 'র‍্যানডম' প্রথার আশু প্রবর্তনের জন্য তাঁরা বিশেষ ইচ্ছুক।

আমরা স্বভাবতই আশা করতে পারি যে, চীন সরকার কৃষি ব্যবস্থার অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সমবায়ের এই বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ 'মান'গুলির নির্ধারণকার্যেও ক্রমে ব্যক্তিগত মতামতের ভূমিকাকে অপসারিত করে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ নিয়মানুগ পদ্ধতি গ্রহণ করে বর্তমান ত্রুটির সংস্কার করবেন।

# বর বড় না কনে বড়




**শিবতোষ মুখোপাধ্যায়**

অনেকের হয়তো মনে আছে, হাসির রাজা সুকুমার রায় একবার গঙ্গারাম যে কেমন সৎপাত্র বলতে গিয়ে বলেছিলেন—'মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল, রঙ যদিও বেজায় কালো: তার উপর মুখের গড়ন অনেকটা ঠিক পেঁচার মতন।'

পাত্র হিসাবে কোন একজন গঙ্গারাম পাত্রী হিসাবে আর কোন একজন মেয়ের চেয়ে কিসে সরেস বা নীরেস সে প্রসঙ্গে রায় দেবার জন্যে আপনাদের সামনে বর বড় না কনে বড়, এই রব তুলিনি। কারণ মামলা আরও অনেক বেশি গড়বড়। এ দুনিয়ার যাবতীয় পুরুষকুলের মত অশ্ব, সিংহ, বৃষ ও শশক জাতীয় পুরুষ আছে তারা সমগ্র রমণী-মহলের সব পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিনী ও হস্তিনী পর্যায়ের মেয়েদের চেয়ে তাবৎ বিষয়ে সমগ্রভাবে বড় না ছোট, সেই কথাই বিবেচ্য। এক কথায় নায়কেরা না নায়িকারা বেশি লক্ষণ-যুক্ত? তুলাকে কিন দিয়ে কাকে ফেলে কাকে রাখা যায়? একটা যদি সেইরকম পেল্লায় দাঁড়িপাল্লার একদিকে বিশ্বের যত পুরুষ, অন্যদিকে যত নারীকে তুলে ভালমন্দর ওজন করা যায় তাহলে পাল্লাটা কার মহিমার গুণে কোনদিকে হেলবে, তাই প্রতিপাদ্য। মজা দেখুন, বাইরে যেমনি পুরুষ তেমনি নারী, লোকচক্ষুর সামনে নিজেদের হাম-বড়িয়া ভাবভঙ্গির যত তর্জন-গর্জন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্তর্লোকে দুইপক্ষই নিজেদের তনুরুচিতে যত না অভিরুচি দেখায়, অপরপক্ষের মহিমা কল্পনায় তত মোহিত।

পুরুষ মাত্রেরই মনে থাকে বধূজনচিন্তা। কোন এক দুরাশার খেয়ালে মনে মেনে নেওয়া হয় মেয়েরাই fair sex, পুরুষেরা যেন unfair! অঙ্গনার্থে বুঝায়, দেদার রহস্যে আর ছলনায় গড়া তাদের শরীর, মন্দির আবেষ্টনীর মধ্যে তাদের বাস, শত হাত বাড়ালেও সেই কুহকের সবটুকু নাগাল পাওয়া কোন বাবাজীর সাধ্য নয়। মেয়েরা তাই যেন উচ্চস্তরের জীব। আবার সব ডাকসাইটে লীলাচঞ্চল মেয়ে, নিজেদের তরঙ্গময় চেহারা নিয়েও মনের মধ্যে নিত্য-নিয়ত এই ভেবে কৌতুক ফোটাতে উৎসুক যে, তাদের কি দেহের কি মনের ঘুম ভাঙ্গানোর সোনার কাটি তো তাদের নিজেদের কাছে নেই, তা পুরুষদেরই করতলগত। অতএব দুজনের চোখে দুজনে সমান মায়াময় এবং দুজনার সমান রহস্যপুরী। তবু ১০ হাত ধুতির মধ্যে আর ১১ হাত শাড়ির মধ্যে রক্তমাংসের যে সজীব দুটি সংস্করণ আগলান আছে, তারা দুজনা দুজনার কাছে যতই স্পৃহনীয় হোক না কেন, আসলে তাদের দুজনকার মধ্যে এ-ত পার্থক্য ও প্রভেদ আছে যেন দুজনকে দুরকমের জীব বললেও অত্যুক্তি হয় না—তারা যেন almost two separate species। তবু কারুরই কাছাকাছি না থাকলে চলে না। বেচারা অ্যাডামের সাহচর্যহীন জীবনে একটু রঙ ফোটানর জন্যেই না তার কলিজার হাড় থেকে ইভ মহোদয়ার আবির্ভাব। স্ত্রী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। কান্তা কান্তর better half --half better বললে বাধবে লড়াই। রমণী সম্বন্ধে অনেক বিশেষণ আছে। তড়িৎলতা—440 volts। পুরুষ মানুষ যেখান থেকে প্রায়ই শক খায়। woman অর্থে wifman বা wife of man বুঝায়। কখনও বা wombed man।

কেউ কেউ এ কথা মনে করেন যে, অঙ্গ-মাধুরী দিয়ে ছলাকলাচাতুরী করা মেয়ে-মানুষের পক্ষে যত সোজা তত সোজা নয় বুদ্ধিশুদ্ধির ব্যাপারে নিজেকে জাহির করা। কারণ আজ পর্যন্ত আমরা মেয়ে-সেক্সপীয়র, মেয়ে-রবীন্দ্রনাথ, মেয়ে-নিউটন, মেয়ে-রেমব্রান্ট বা মেয়ে-মোৎসারৎ দেখতে পেলুম না। যদিও রূপ আর লাবণ্যের দরবারে সেই আগেকার উর্বশীর আমল থেকে শুরু করে আধুনিককালে মেরিলিন মোনরোদেরই প্রাধান্য। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর পরিসংখ্যান বিজ্ঞান সাক্ষী দেয় যে, এই ইহজগতের যত বোবা, কালা, পাগল আর অপরাধী তাদের অধিকাংশই পুরুষ সম্প্রদায়ের—মহিলাদের ভিতর থেকে নয়। এমিলি দ' ব্রেতই না থাকলে ভলতেয়ারের অবস্থাটা কেমন হোতো? পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে মেয়েরা যতখানি পুরুষেরা ততখানি পারঙ্গম নয়। সবদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমান সুযোগ-সুবিধা পেলে পুরুষ আর স্ত্রীর মানসিক বিকাশ সমানভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু এক বিষয়ে সব মেয়েরাই পুরুষদের ছাপিয়ে যায়। প্রত্যেক মেয়ের কণ্ঠে অলকানন্দা আছে—তাই সব সময়ে

কলকল্ল ধর্বনি। গড়পড়তা পরুষেরা সারা বছরে ৬৫ লক্ষ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে, সে তুলনায় মেয়েদের দৌড় আরও অনেক বেশি, তারা স্বচ্ছন্দে ৮০ লক্ষ শব্দ মুখ দিয়ে বার করতে পারে। অতএব মেয়েরা বড় বক্তা, পরুষেরা তাদের শ্রোতা। পরুষেরা যত বাস্তবমুখী, মেয়েরা তত নয়। মেয়েদের যুক্তির চেয়ে হৃদয়াবেগ বেশি কারণ তারা যত অন্তর্মুখী, পরুষেরা তত নয়। তাই বোধ হয় পরুষদের যত সহজে বোঝা যায়, মেয়েদের তত সহজে নয়। সব বয়সেই মেয়েরা গিন্নিবান্নি, তাদের দস্তুর এমন যে তারা সবরকমের পুরুষমানুষকে চিরকাল 'কিছু বোঝ না তুমি খোকা' হিসাবে দেখতে ভালবাসে। তাই তাদের চোখে খোকাও খোকা, বাবাও খোকা। ছোট খোকাদের আর বড় খোকাদের উপর তাদের যত খোদকারী।

বাবুজীরাই বিবিজীদের চেয়ে মাথায় দড় হয়। সাধারণভাবে পরুষের উচ্চতা ৫ থেকে ৭½ ফিটের ভিতর। মেয়েদের উচ্চতা সাধারণত ৫ ফিট ৩ ইঞ্চির উপর বড় একটা ছাপায় না। কিন্তু কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। তালগাছের মতন ভদ্রমহিলার নাড়ুগোপালপানা স্বামী, যাকে অতি সহজেই আঁচলের খুঁটে বেঁধে ঘোরাফেরা করা চলে। বাইরের উচ্চতা যাই হক না কেন, ছোট স্বামী আর বড় স্বামী, সব স্বামীই অন্দরে ও অন্তরে সমান।

মেয়েরা ঘরের-মানুষ, পরুষেরা বাইরের। কিন্তু ঘরে থেকেই পায়ে পায়ে মেয়েরা সারা বছরে যতটা পথ কাবার করে দিতে পারে, পরুষেরা বাইরে আপিস-দোকানপাট করেও তার কাছাকাছি চলতে পারে না। একজন বৈজ্ঞানিক ওদেশের মেয়েদের হিলওয়ালা জুতোর সারা বছরের খটখটানি অঙ্ক কষে মাইলে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, তিন থেকে চার হাজার মাইল ওরা কাবার করে। সে তুলনায় বুটজুতো পরিহিত পায়ের চলন এর অর্ধেকও হয় না।

উর্বশী-বল্লভমনের অধিকারিণী হয়েও মেয়েদের মধ্যেই আত্মপরায়ণতা বেশি দেখা যায়। তারা চিরকাল সবিভ্রম। তারা অতি সহজে গুজবে কান দেয়—কান কাকে নিয়ে গেছে বললেই বিশ্বাস করে। তারা স্বভাবত ধর্মকর্মপূজাপার্বণে নিমগন। ঠাকুরদেবতা সহজে তাদের কাঁধে ভর করে। তবু তারা অন্তরে অন্তরে লীলাচতুর। সেইজন্যেই বিদগ্ধজনরা বলেছেন—woman thy name is vanity। পরুষ মানুষ মাত্রেরই রয়েছে এর উল্টো বৈশিষ্টগুলো। ব্যর্থপ্রেমে বা অন্য কোন হতাশজনিত দুঃখ-দুর্দশায় পরুষ মানুষ যেখানে আত্মহত্যা করে বসতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই একই ক্ষেত্রে মেয়েমানুষেরা সেই একই রকম দুঃখ বা হতাশা বেমালুম হজম করে নিজেদের সামলে নিতে সক্ষম।

আর্যপুত্রদের চেয়ে ভদ্রেরা অন্য বিষয়ে যতই বেশি জ্ঞান ও বুদ্ধি ধরুক না কেন, অপারেশন টেবিলে দেখা যায়, মেয়েদের যত শীঘ্র এনিসথেটিসিয়া দিয়ে অজ্ঞান করা চলে, সে তুলনায় পুরুষমানুষদের জ্ঞানলোপ ঘটাতে আরও বেশি সময় লাগে। কিন্তু নায়িকার তুলনায় নায়ক বেশি ঘামে। নায়কের চেয়ে নায়িকার দেহে ঠাণ্ডা কম লাগে। একই ঠাণ্ডার মাঝে যখন সাহেব শীতে জড়সড়, মেমসাহেব সেখানে চনমনে। ওদেশে বরফ পড়ার মাঝেও স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণের স্বল্পতা লক্ষণীয়—পুরুষদের আবরণের তেমন ন্যূনতা ঘটলে নিউমোনিয়া হবার ভয় আছে। পুরুষমানুষের আর যা কিছু না থাকুক, নিরীক্ষণ করার মুগ্ধলোচন আছে।

রমণীর অঙ্গমাধুরী এত জাজ্বল্যমান বলে মনে হয় কারণ তার চামড়া মসৃণ ও লোমহীন। পুরুষমানুষের পৌরুষ শোভা পায় তার গোঁফদাড়িচুলে। তাই কোন ঠিক ঠিক পুরুষমানুষের মধ্যে কোমল একটা উথলে পড়া ভাব কখনও দেখতে পাওয়া যায় না। মাকুন্দদের আর যাই হক, সখী-জনমহলে কদর নেই। লাবণ্যের চকমকি মেয়েমানুষেরই সাজে, পুরুষমানুষের পৌরুষের মশাল চাই। তাছাড়া, প্রত্যেক যৌবনশালিনী মাত্রেই নিজে চামড়ার উপর কসমেটিকস্ দিয়ে জিমন্যাস্টিক করতে বদ্ধপরিকর। পুরুষমানুষের চামড়ার উপর স্নো, ক্রীম, পাউডার ইত্যাদি সারজিনিস দিয়ে যতই দলাই মালাই করা হক না কেন, ফল কিছু ভাল হবে না। পুরুষের দেহে লোহিত কণিকা মহিলার চেয়ে বেশি থাকে —সেই কারণে রঙ গাঢ় মনে হয়। কবিত্ব করে কেউ পুরুষমানুষের আঙগুলোকে চাঁপার কলির মত, ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ, মুখকে মুখ-চন্দ্রিমা বলতে যাবে না। এসব বিশেষণের জন্যে রয়েছে তাদের শরীর যারা সৌন্দর্য-চর্চায় নিপুণা। নরমাত্রের নারী অপেক্ষা রক্তের চাপ বেশি থাকে (এর জন্যে কোন কোন নির্দয় পুরুষ মহিলাদের দায়ী করেন)। যে যত বড়ই সুরসিকা হক না কেন, তার হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর দিয়ে সারাদিনে যত রক্ত সংবহন হয় তা যে কোন কাঠখোট্টা পুরুষ অপেক্ষা কম। সেই কারণে নায়িকারা হৃদয়ের ব্যাপারে মোটেই ছেলে-মানুষ নয়—তারা যথার্থই মেয়েমানুষ।

মুখ তো নায়িকার, চোখ তো নায়কের। মুখের নরম ছাঁদটি নির্ভর করে কতকগুলো

লক্ষণের উপর। নায়িকার মুখচ্ছবিতে দেখা যায় কপালের জমি পরিষ্কার, সোজা উপরে ঠেলে উঠে গেছে। বাঁকা ভুরুর তলায় টানা টানা চোখ। তাদের নাসারন্ধ্র থেকে দাঁতের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থাকে। মুখবিবর আরও প্রশস্ত হয়। পুরুষের মুখে এমন কিছু সুন্দর নমুনা মেলে না। সে কালোই হক আর ফরসাই হক, মেয়েমানুষ মাত্রেই চিবুকের ডৌলটুকু ছোট ও নিটোল হয়। পুরুষের চিবুক হেলিয়ে কেউ মান ভাঙাবার জন্যে নাড়াচাড়ি করে না তবু এদের চিবুক চওড়া ও তীক্ষ্ণ হয়। পুরুষমানুষ বাহুশালী—তাই তার বাহুকে বলা হয় আজানুলম্বিত কিন্তু মেয়েমানুষের বেলায় তা 'মৃণালভুজ'। নারীসুলভ বাহু যতই বলশালী হক, মদমোয়াজেল মাত্রেই পুরুষমানুষ অপেক্ষায় ৪।৫ গুণ কম স্পর্শকাতর (painless) হয়।

অন্যদের চোখে যতই মিঠে লাগুক, মেয়েদের নিজেদের শরীরে চিনি-বিপাকীয় ব্যাপারে (sugar metabolism) নিয়ন্ত্রণ করবার সহজাত ক্ষমতা পুরুষদের অপেক্ষা কম থাকে। রমণীর শরীরে চিনির ভাগ সহজে কমে ও অ্যাসিডের ভাগ বাড়ে। অ্যাসিড-বেস'এর মাত্রা পুরুষের মধ্যে অনেক সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমেরিকায় মেয়েদের মধ্যে ডায়াবিটিসের রোগীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদ্‌রোগের ব্যামো পুরুষদের মধ্যে যত দেখতে পাওয়া যায়, নারীদের মধ্যে তত নয়। যদিচ মেয়েরাই কোমলহৃদয়া বলে খ্যাত। শ্বাস প্রশ্বাসের গোলমাল ছেলেদের বেশি হয়। পেটের গোলমালও। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ক্যানসারের প্রাবল্য বেশি।

কাব্য করে আর যাই করে হক, মেয়েদের আখ্যা দেওয়া হয় যে, তারা কুসুমকোমল সুকুমার তনুধারিণী। ধর ধর সখী ভাব। কিন্তু species হিসাবে দেখা গেছে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশি আয়ুষ্মতী। পুরুষেরা কাঠখোট্টা হলেও তারা জীবনের দরবারে বেশিদিন আসর জমাতে পারে না। একমাত্র নিগ্রো সমাজে ছাড়া, আর সর্বত্র পুরুষমানুষের চেয়ে মেয়েমানুষ দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক মহলে এই ধারণা দিনদিন স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে কান্তার দুটি X-chromosome (Sex chromosome) আর কান্তর কাছে একটি X-chromosome থাকায় (অন্যটি Y-chromosome) পুরুষের ভাগ্যে যত ঝঞ্ঝাট ঘটছে। সাত তাড়াতাড়ি পুরুষ সাবড়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই এর প্রতিক্রিয়া অনেক দেশের মেয়ে-মহলে দারুণ হয়ে উঠছে। দিনদিন পৃথিবীটা হচ্ছে কি? খাদ্যঅনটন, বস্ত্র-অনটন এবার এখন পতি-অনটন? সহজেই অনুমেয় যে, বরাভাবের দরুণ মেয়েদের নিজেদের মধ্যে সখ্য ভাব না থাকা বিচিত্র হবে না।

তরুণীদের প্রসাধনের প্রীতির অন্ত নেই। নিজেদের দেহকে মেজেঘষে, পালিশ করে, চলনে বলনে, কথনে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে নিজেদের চারপাশে, যাতে ঝড়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এটা হল air of deception, যার ভিতর থেকে ভেসে আসে চুড়ির টুংটাং জলতরঙ্গ। এই সচেতনতার মধ্যে রয়েছে নিজেদের স্পৃহনীয় করে তোলার জন্য যত পরিপাটি হওয়া। খাট হলে এত উঁচু হিল জুতো পর আর নয়তো বেজায় লম্বা হলে কোমরে বেল্ট বা কুঁচিয়ে কাপড় পরে পরের চোখে নিজে যা নয় তাই হয়ে থাকা। পুরুষের সাজগোজে এমন সাতখুনে মাপ করার কিছু বালাই নেই। মেয়েদের ওই আঁচলটুকু খোলা বা ঢাকায় সবকিছু মতে। সাধারণভাবে পুরুষমানুষ চেহারা সম্বন্ধে এত সচেতন নয় যত মেয়েমানুষেরা। রসিক বধূ মাত্রেই জানেন, কোন রঙের সঙ্গে কোন রঙ চলবে আর কিসে কি চলবে না—এ তাঁদের রঙদার মনের পরিচায়ক। কখনও ভাবতে পারা যায় না কোন শৌখীন মানুষ সকালে একরকম মনিব্যাগ ব্যবহার করছে আর সন্ধ্যাবেলা আবার বার হবার সময় অন্য কোন রকমের মনিব্যাগ বদলাবার কথা ভাবছে। কিন্তু শৌখীনদের পক্ষে সকালের ভ্যানিটি সন্ধ্যের শাড়ির সঙ্গে অচল, তাই আর কোনরকমের একটা ভ্যানিটি চাই—ভ্যানিটিতেই ভর্তি তাদের ভ্যানিটি। কোন পুরুষের মাথায়ই আসে না, গোলমুখের সঙ্গে কেমন কানের দুল মানান বা বেমানান হবে? লম্বায় না, গোল কিছু? আর ও ভাল মুখের সঙ্গেই বা কোন ইয়ারিং যে চলবে তাও এক সমস্যা। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনও ঘটলে তা মেয়েদের চোখেই সহজে ধরা পড়ে বা তাদের মুখ থেকেই শোনা যাবে। এ বিষয়ে তাদের ত্রিনেত্র আছে। একজন মহিলারই উক্তি femininity lies in the handkerchif শোনার পর পুরুষ মাত্রেরই টাই সম্বন্ধে আরও হুঁশিয়ার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তেমন কমনীয়তা তাদের কোথায়?

রমণীর সঞ্চারিণী মূর্তির মূলকথা শুধু তার বেশভূষার চাকচিক্য নয়। তার মেদ-মজ্জা অস্থিতে এর প্রমাণ। প্রকৃতি সদয় হয়ে অনেক কিছু ঢেলেছেন যা তিনি পুরুষেরবেলায় হাতটান করে রেখেছেন। হাড়ে হাড়ে কর্তা-গিন্নিতে তাই এত প্রভেদ। মেয়েদের এমনকিছু আছে যা পুরুষদের নেই। তার কারণ Miss Universe বাছাই করার সময় তাদের বিচারকদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যেতে হয় বেদিং সুট প'রে! তারপর আরও আছে। পুরুষের করোটির তুলনায় স্ত্রীলোকের করোটি আকারে ছোট হয়। নারীদেহের নিতম্বাস্থি বড় হয় এবং শ্রোণী চক্রাস্থি চওড়া অথচ মসৃণ হয়। পুরুষের দেহে এই দুই জিনিস কাঠামোতে ছোট ও পেশীর দাগযুক্ত হয়। মেয়েদের দেহকাণ্ড (trunk) পুরুষের কাণ্ডের চেয়ে সব সময়ে লম্বা। স্ত্রীলোকের উদর বড় হয়, এবং তার ভিতরকার যন্ত্রপাতি যকৃত, পাকযন্ত্র, বৃক্ক, বাডার প্রভৃতি জিনিস অধিক আয়তনে জুড়ে থাকে। পুরুষেরবেলায় এতখানি স্থান নিয়ে তারা থাকে না। আর ছাড়াড়া সন্তান-ধারণের কারখানা 'জরায়ু' মেয়েদের বাড়তি যন্ত্র।

যৌবনে দুজনাই চঞ্চল, রমণীর তখন ঐশ্বর্যের অবধি থাকে না, আর পুরুষও তখন শক্তিতে ভরপুর। সুতরাং একজন পেশীবহুল, অন্যজন মেদবহুল। একজন শক্তি, অন্যজন সৌন্দর্যের প্রতীক। যুবতী-দেহে যৌবন পুষ্পিত হয়ে ওঠে যত আগে পুরুষের দেহে তত আগে নয়। আবার নারীদেহে যৌবনের সমাগম হয় যত আগে সমাপনও হয় তত দ্রুত। পুরুষের যৌবন আসে দেরীতে, যায়ও দেরীতে। নারীদেহে তরুণাস্থি অবিলম্বে হাড়ের দশাপ্রাপ্ত হয় ও তার উপরে চাকচিক্যময় আবরণ ঢাকা পড়ে নিজেদের দেহগত হর্মোনের প্রতিক্রিয়ায়। চর্বি হল এর পক্ষে সবচেয়ে বড় capital। তাদের নয়নলোভা মূর্তি থেকে অপাঙ্গবিক্ষেপ ঘটে, চম্পক অঙ্গুলীর বিচিত্র লীলা কঠিনকেও তরল করে। রমণী-

দেহের বহু জায়গায় যৌবন তার স্মরণ চিহ্ন প্রকট করে যায়। পুরুষমানুষ এদিক দিয়ে অনেক নির্ঝঞ্ঝাট। সে তার মুগ্ধ দৃষ্টি আর মধুর মন নিয়েই সন্তুষ্ট। তাই সে তারিফ করে বলতে পারে—It is women's mission to be beautiful। কেন? কারণ সৃষ্টির ধারাকে প্রবহমান রাখা। গানে গানে যাই বলা হক না কেন 'রূপে তোমায় ভোলাব না', সত্যি যার এতটুকু রূপ আছে, সেইরকম কোন বিচিত্ররূপিণীই কি হলপ করে বলতে পারবেন যে, তিনি রূপের চর্চা করেন নি আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারুর চেতন বা অবচেতন মনকে রূপে ভোলাবার এতটুকু চেষ্টা করেন নি? মেয়েদের এ মধুকরী বৃত্তি যা ইভের সময় থেকে আজও এক।

মেয়েরা ঠাণ্ডা বেশি, পুরুষদের চেয়ে তাদের দৈহিক উত্তাপ প্রায় ২½ গুণ কম। অবশ্য একথা একশোবার সত্যি যে, প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা যত সিরিয়াস, পুরুষেরা তত নয়। পুরুষের জীবনে প্রেম এল আর গেল, একটা বড় ঘটনামাত্র। নারীর জীবনে প্রেম নিছক একটা ঘটনা নয়; এটা একটা অবলম্বন। যার স্বরূপ অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, তার সারা সত্তাকে প্রেম পরিব্যাপ্ত করে রাখে। সেই কারণে মেয়েদের প্রেমের বনেদ পুরুষদের (সবরা) অপেক্ষা পাকা হয়। আর তাছাড়া, মেয়েদের হৃদয়ের অন্দরমহলের আসোয়াব অবরুদ্ধ আশা ও কামনা হল নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়া। 'আমারে কর তোমার বীণা'—একজন বাজাতে, আর একজন বাজাতে।

সে যত বড়ই সেন্সেশন্যাল প্রেয়সী হক কিংবা ইরেজিস্টেবল প্রেমিক, তাদের মধ্যেও গোল আছে। কোন 'পুরনারীই' যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক 'পুরো-নারী' নয়। কোন 'পুরুষই' 'পুরো-পুরুষ' নয়। কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে কিন্তু জানবেন, সব প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে ফাঁক আছে। লাবণ্যময় ভঙ্গিমা বিজড়িত অতি মনোরম বল্লভার ভিতরেও খানিক পুরুষালি ভাব বিদ্যমান কিন্তু তা ধামা চাপা আছে, এই যা। কঠোর রুক্ষ পৌরুষদীপ্ত মহিমা বিশিষ্ট মানুষটির দেহের তলে তলে রমণীয়তার ফল্গু আছে। এ দুনিয়ায় কিছুই ধ্রুব বা absolute নয়, সবই আপেক্ষিক অর্থাৎ রিলেটিভ। পুরুষ যে পুরুষ, নারী যে নারী, তাও পুং ও স্ত্রী রাসায়নিক পদার্থের আপেক্ষিকতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রত্যেক মঁসিয়র মধ্যে পুং হর্মোনের প্রাধান্য থাকলেও স্ত্রী হর্মোনের অস্তিত্ব আছে। আর মাদামদের মধ্যে শ্রীমতী হর্মোনের রাজত্ব থাকলেও, শ্রীমং হর্মোনের প্রমাণ আছে। কখনও কখনও বেঘোরে পড়লে এই হর্মোনের দুর্যোগে দেহে দারুণ গোলমাল হতে পারে। ফলে মেয়ে ভোল পালটে শাড়ি ছেড়ে ধুতি পরলে আর দাড়িগোঁফ কামান পুরুষ লজ্জায় আঁচল টেনে দেবে। এমন কতগুলি ঘটনাও তো সম্প্রতিকালে ঘটেছে, তার কথা আমরা কাগজে দেখেছি। নারীরই হক আর পুরুষেরই হক সব দেহই হল রাসায়নিক মূর্তি।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে স্ত্রীপুরুষের দেহের লাবণিক পার্থক্য, তাৎপর্য ও স্থায়িত্ব যাই হক না কেন, তেমন তেমন নায়ক-নায়িকার যখন সান্নিধ্য ঘটে তখন কে বড় কে ছোট, কে ধলা কে কালা, কে লম্বা কে বেঁটে, কে দেশী কে বিদেশী এসব প্রশ্ন অবান্তর। তখন শুধু বিস্মরণের পালা। তখন প্রাণের স্পর্শ, আগের অঙ্গীকার এত বড় হয়ে ওঠে যে, আর মনে থাকে না যে, অতি বড় সুন্দরীও সেণ্ট পার্সেণ্ট রমণী নয়, কোন ধুরন্ধর পুরুষের সত্তাও নির্ভেজাল পুরুষময় নয়। প্রকৃতিতে এইরকমই নিয়ম যে, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে সেই চিরন্তন পুরুষ আর সেই শাশ্বত নারী জো হুজুর করে হাজির হয় সৃষ্টির সৌকর্যবিধানে। তাই ধুতির খুঁটে আর সাড়ির আঁচলে মোহনমরীচিকার ফাঁস বাধা। তা কে খুলবে? এই রঙ্গদারীর মাঝে রঙের সাহেব আর রঙের বিবি মৃগতৃষ্ণায় পড়ে ছোটাছুটি করে—মনে মনে দুজনারই ছটফটানি কে কার উপর রঙের টেক্কা মারবে।



# গায়ক

প্রভাত দেবসরকার

সারদা সংগীত সম্মেলন থেকে বেরিয়ে হিমাংশু নাকে কানে খত দিলে। না, আর কখনো না, গানের পায়ে গড়। এভাবে আর নয়।

আট-ঘাট বন্ধ প্যাণ্ডেলের ভেতরে এত-ক্ষণ খেয়ালই হয়নি বুঝি এখনো কলকাতায় শীত আছে। পুরো দমেই। আলোয়ানের পাট ভেঙে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিয়ে মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াল হিমাংশু। যান-বাহন যদি কিছু পাওয়া যায়। সংগীত সম্মেলনের টিকিট আজ শেষ, পকেটও নিঃশেষ। কোনমতে এখন বাড়ি পৌঁছতে পারলে বেঁচে যায়। উঠাউঠি কদিন রাত জেগে চোখ জ্বালা করছে, রাত প্রহরী শহুরে আলোগুলোর মধ্যে রামধনু চক্র; ট্রাম লাইন ভোঁ-ভাঁ।

গুটি গুটি এগিয়ে চলল হিমাংশু। চাদর মুড়ি দিয়ে। কলকাতার ইট-কাঠ-লোহার ধড়া-চুড়ো ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু-হু করে। বেশ কাঁপুনি আছে! আরো শরীরকে কষ্ট দেওয়া এভাবে মিছি-মিছি হাঁটা, ঘুম-চোখে জল ঝাপটা দেওয়ার মত হি-হি বাতাস সহ্য করা!

মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে এখন কোথাও বসতে পারলে ভারি যেন আরাম হতো। শরীর বইছে না। মনে মনে হিমাংশু সংকল্প করলে, যে-ট্যাক্সিখানা প্রথম দেখবে, সেখানাতেই উঠে বসবে। যত পয়সাই লাগুক। এই শেষ, আর কখনো এমন দুর্ভোগ জেনেশুনে ভোগ করবে না। টিকিট কেটে আর কোন সংগীত সম্মেলনে গান শুনতে আসবে না। যথেষ্ট গান শুনেছে সে।

হিমাংশু পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করলে। কয়েকটা দেশলাই কাঠি নষ্ট হলো। তা হোক ভিড়ের মধ্যে গান শোনার চেয়ে একলা-একলা এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকা ঢের আরামের, এ আর এক রকমের গান শোনা যেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেউ গান গাইছে যেন।

রাত শেষের কলকাতাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ। মড়ার চেয়েও অসাড়। যেন হঠাৎ মড়া কান্নার রোল উঠে আবার হঠাত-ই চুপ হয়ে গেছে কখন। আলোগুলো জ্বলছে ঠায়, অর্থহীন নিষ্কম্প! অশ্রু শুকিয়ে বাষ্প হয়ে হা-হা শব্দে শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কদিন অনেক গান শুনেছে হিমাংশু। সারদা সংগীত সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অনেক গুণী সমাগম হয়েছে। হৈ-হৈ কাণ্ড। অনেক কষ্টে প্রবেশপত্র একখানা সংগ্রহ করেছিল হিমাংশু। কিন্তু কষ্টই সার এখন মনে হচ্ছে, গান শুনে কোন তৃপ্তি লাভ হয়নি। আনন্দই বা কোথায়? কিছু না।

এত গুণীর এত গান, তার একটুও যদি মনে থাকে। সুর, পদ কিছুই মনে করতে পারে না হিমাংশু। শারীরিক কষ্ট আর দুর্ভোগের কথাই কেবল মনে হয়। কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করছে।

অবস্থাটা প্রায় পালিয়ে আসার মত। সংগী জিজ্ঞেস করেছিল, কি হে উঠলে?

হঠাৎ লজ্জিতভাবে হিমাংশু জবাব দিয়ে-ছিল, না, বাইরে থেকে আসচি।

অপরাধীর মত আসন ত্যাগ করে অগণিত চোখের নিঃশব্দ ভ্রূকুটিতে অনুনয় করে অবশেষে হিমাংশু পাণ্ডেলের বাইরে এসেছিল। মাইকযোগে ভিতরের সংগীত সেখানেও দাতব্য হচ্ছিল। শ্রোতার অভাব কোনখানেই নেই, ভিতরে বাইরে সমান। দেখে হিমাংশুর মনে হয়েছিল, পাণ্ডেল না বেঁধে ফাঁকা মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার মত সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করলে কেমন হয়! জনপ্রিয়তায় দুই-ই সমান এখন কলকাতায়!

উল্লসিত হাততালির শব্দটা তখনো শেষ

হয়নি, হিমাংশু পিছন ফিরে দেখলে রাস্তার মোড়ের দিকে এগতে এগতে। এক ওস্তাদের গান শেষ হলো। বিনা মাশুলের শ্রোতারা হৈ-হৈ করছে, মাইকের চোং-টার মধ্যেও বেশ গোলমাল। দুর্বোধ্য!

এক ছুটে বড় রাস্তার মোড়ে এসে গেল হিমাংশু। যেন গানকে সে এড়িয়ে যেতে চায়। পালাতে যায়। গানাতঙ্ক যেন।

হাতের পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল হিমাংশু। কুলি-কামিন ভিখারি কয়েকজন কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, পথ জুড়ে কটা বেওয়ারিশ গরুও জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। ফুটপাথের গা ঘেঁষে একটু রোয়াক মত জায়গা ওরি মধ্যে। রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার পক্ষে জায়গাটা আদর্শ নিঃসন্দেহে।

থপ করে রোয়াকের ওপর বসে পড়ল হিমাংশু। এমন আরাম বোধ করল যে, জীবনে আর কখনো এমনটি বোধ করেনি সে। আঃ। আবার একটা সিগারেট ধরান যায়। মৌজ করে টানাও যায়। ভোর হতে এখনো দেরি আছে, গাড়ি-ঘোড়াও কোন পথ ভুলে আসবার সম্ভাবনা নেই। ট্রাম লাইন শীতলপাটি।

সারদা সংগীত সম্মেলনের প্যাণ্ডেল এখান থেকে অনেক দূরে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি পথ চলে এসেছে হিমাংশু। গানের রাজ্য শেষ! আর খানিক পরে সারদা সংগীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশুর প্রবেশপত্রখানাও বাতিল হয়ে যাবে। আরো পাঁচটা অধিবেশন হবে সারদা সংগীত সম্মেলনের। কিন্তু তার প্রণামী স্বতন্ত্র। হিমাংশু চেষ্টা করেনি।

সারদা সংগীত সম্মেলনে গত তিন দিন প্রবেশের ছাড়পত্রখানা পকেট থেকে বার করে দেখলে হিমাংশু। পাণ্ডু হয়ে হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, প্রবেশ মূল্যের ইংরেজী অভিব্যক্তিটি অর্থহীন এখন। ছেঁড়া কাগজের কোন দাম নেই।

হিমাংশু ভেবে দেখলে, অর্থ মূল্যে প্রাপ্ত কোন কিছুরই দাম নেই। এত কষ্ট করে এত পয়সা খরচ করে এত গান শুনে কোন লাভ হলো না। না আনন্দ, না খুশি। সে মাদকতাই নেই আর গানে। অথচ এই ক'দিন নাম-করা গায়করা তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠই শুনিয়েছেন। শহর জুড়ে ধন্য-ধন্য রব উঠেছে।

সংগীত সম্মেলনের গান শুনে হিমাংশু খুশি হয়নি, আনন্দ পায়নি। লজ্জার কথা হলেও নিজের কাছে হিমাংশুর লজ্জা নেই। অকপটে স্বীকার করছে যে, কোন তৃপ্তি লাভ করেনি গান শুনে। নিজের মনকে যদি সে একটুও জানতো, তা হলে এত কষ্ট স্বীকার করতো না। আনন্দই যদি না পেল গান শুনে লাভ কি।

তিনদিনব্যাপী গান শোনার টিকিটটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলে হিমাংশু। রাগটা এখন ঐ বাতিল ছাড়পত্রটার ওপর। কি সুখের আশায় যে ওটা সংগ্রহ করেছিল ভেবে পায় না হিমাংশু।

দলা পাকিয়ে গানের বাতিল টিকিটটা সামনে ছুঁড়ে দিলে। হিমাংশু ভাবেনি কিছু টিকিটটা ছোঁড়বার আগে। কোথায় পড়বে না পড়বে। কাজটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণও নয়, ভেবে-চিন্তে করতে হবে।

বোধ হয় ভাবা উচিত ছিল। গাড়ি-বারান্দার নীচে যারা ঘুমুচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজন মাথার মুড়ি সরিয়ে দিয়ে জেগে উঠে বসল। দলা-পাকানো টিকিটটা তার ওপর গিয়ে পড়েনি। হিমাংশু রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলে। না, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা!

লোকটি উঠে বসে চারদিক চেয়ে দেখলে। হিমাংশুর চোখে চোখ পড়ল। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে হিমাংশু ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগল। আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে। না, কারণ অন্য।

ঘুম ভেঙে লোকটি উঠে বসেছে। মাথার মুড়িটা গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে। গাড়ি বারান্দার নীচে ঐ একটি প্রাণী তখন জাগরূক। আর জেগে রোয়াকের ওপর হিমাংশু। একজন পথশ্রমে ক্লান্ত আর একজন গান শুনে। ঘটনাচক্রে কাছাকাছি এলেও দুরত্ব অনেকখানি উভয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ। গরমের পশম কাপড় আর ছেঁড়া চটের দোশালা অনেক তফাৎ।

তবু লোকটা কি ভেবে আত্মীয়তা বোধ করে। ভগ্নস্বরে বললে, দেশলাইটা দেবেন।

হিমাংশু মুখ ফিরিয়ে দেখলে লোকটা আধপোড়া একটা বিড়ি হাতে করে উৎসুক-ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথমটা হিমাংশু ভাবলে, দেবে না দেশলাই লোকটাকে। স্পর্ধাতো কম নয়, তার থেকে দেশলাই চায়! কি ভেবেছে, তার ইয়ার-বন্ধু!

আবার লোকটা ব্যগ্র কণ্ঠে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলে।

হিমাংশু বিরক্ত হয়ে দেশলাইটা লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলে। হয়তো ছুঁড়ে মারবার উদ্দেশ্য ছিল।

দেশলাইটা লুফে নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে লোকটা আপন মনে বললে, এখনো শালার সকাল হয়নি।

হিমাংশু মনে মনে তিক্ত হয়ে উঠলো। দেশলাইটা ফিরিয়ে দেবার নাম করছে না লোকটা। আচ্ছা তো!

একটানে বুঝি বিড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা বললে, সকাল হবে, তারপর দোকানপত্তর খুলবে।

সমস্যাটা যেন দুজনেরই এক। সকাল হওয়ার অপেক্ষা।

না। শেষ পর্যন্ত লোকটা দেশলাইটা ফিরিয়ে দিল। উপস্থিত বিড়ি যখন নেই, তখন দেশলাই-এর প্রয়োজনও নেই। আবার লোকটি মাথামুড়ি দিয়ে শোবার উপক্রম করলে। গাড়ি-বারান্দার নীচটা নিঝুম।

সংকোচ কাটিয়ে হিমাংশু এবার কথা বললে, আপনার ঘুম হবে নাকি?

লোকটি মাথার ঢাকা খুলে বললে, চেষ্টা করি, রাত দুপুরে আর কি করবো!

হিমাংশু বললে, এবার সকাল হবে। আর কতক্ষণ!

যতক্ষণই হোক, লোকটির জেগে থাকার কোন গরজ নেই। কাঁথামুড়ির মধ্যে আপাততঃ আরাম ঢের বেশী কাম্য। আবার শুয়ে পড়ল লোকটি যেমন শুয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। আশ্চর্য, কথা বলার, আলাপ করার এত সুবিধা সত্ত্বেও বিমুখ।

হয়তো বুঝেছিল দুজনের তফাৎটা দুজনেই। বিড়ি ধরাবার প্রয়োজন পর্যন্ত মুখাপেক্ষা তারপর যে-যার সে-তার! সংগীত সম্মেলনে যোগদানকারী আর পথ-ভিখারী মানসিকতায় বিশেষ তারতম্য উভয়ের মধ্যে!

তবু যেন সারদা সংগীত সম্মেলনের সম্মিলিত জনতার চেয়ে এই মুহূর্তে এই লোকটি হিমাংশুর নিকটতম। সত্যিকারের সংকোচের কোন কারণ নেই।

হিমাংশু জিজ্ঞেস করলে, এইখানেই শোয়া হয় নাকি রোজ?

মাথার চাপা না খুলেই লোকটি বললে, আর জায়গা কোথায় মাথা গলাবার? সব ভর্তি?

তাই ফুটপাথে আশ্রয়! তাই কি?

হিমাংশু চুপ করে গেল। নিজের মনে কেমন যেন দ্বিধা বোধ করে। অবান্তর প্রশ্ন গৃহহীনকে! কৌতুক কেবল।

যতই করুক আলাপ জমবে না। গান শুনে কারো ঘুম নষ্ট হলে ক্লান্ত ভিখারীর চোখে ঘুম বাধা মানবে না। জীবনের অনেক অনিশ্চয়তা ঐ ঘুমের মধ্যে শান্তি পেয়েছে। ঘুমোক ও।

গাড়ি-বারান্দার নীচে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে আর একবার ভাল করে দেখে হিমাংশু। আশ্চর্য নির্ভাবনার আশ্রয় তৈরি হয়েছে! ঘর বাইরের কোন তফাৎ নেই। কে জানে সুখশয্যার কি অর্থ আছে নিদ্রাহীনের কাছে। পারলে হিমাংশু এইখানে বসেই খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারতো, কিন্তু—

রোয়াকের ওপর থেকে নীচে ফুটপাথের ওপর এসে দাঁড়াল হিমাংশু। দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ যেন পাওয়া যাচ্ছে। যদি ট্যাক্সি হয়! না, ঊর্ধ্বশ্বাস গাড়িটা কোন কিছু ঠাহর করবার আগেই উধাও হলো চক্ষের নিমিষে। ট্যাক্সি নয়। গাড়ি-বারান্দার নীচে ঘুমের মধ্যে মানুষগুলো যেন কাঁপতে লাগল। ছায়ার মধ্যে ছায়া কাঁপছে।

কে জানে আরো কতক্ষণ রাত আছে। সে তবু একটা আশ্রয়ের মধ্যে ভদ্র সমাজের সান্নিধ্যে থাকা গিয়েছিল; ভাল না লাগলেও এমনি আতঙ্কের উদ্বেগ ছিল না। ভয়ে পেয়েছে হিমাংশুকে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো হিমাংশুর। কিছু না, পিছন থেকে কোন আততায়ীর আক্রমণে প্রাণ হারান বিচিত্র নয়। গাড়ি-বারান্দার নীচে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ যে চিন্তার নায়ক হতে পারে। ওদের মধ্যে কারো কারো ঘুম হয়তো কপটতার আশ্রয়। কে বলতে পারে।

হিমাংশু ত্বরিৎ পায়ে সামনে এগিয়ে গেল। ভয় পেয়েছে সে। রাত্রি-শেষ নিস্তব্ধ কলকাতার নির্জন পথে প্রাণের ভয়। আলোকিত পথ আতঙ্কিত।

প্রায় ছোটার অবস্থা। অনেকটা পথ দক্ষিণে এসে পড়েছিল হিমাংশু। ট্রাম লাইনের তারে শিস উঠেছে, হয়তো রাজাবাজারের ডিপোর ট্রামগুলোর ঘুম ভাঙলো। চোখ রগড়াচ্ছে। থমকে দাঁড়াল হিমাংশু। ট্রাম আসুক। মাথা টলছে, গা হাত-পা কাঁপছে। চেয়ে দেখলে হিমাংশু চার পাশ, আলোয় আলোয়, ছায়ায় ছায়ায় থম থম করছে জায়গাটা। ভাষাহীন নিস্তব্ধতায় অদ্ভুত জাগরিত যেন পরিবেশটা।

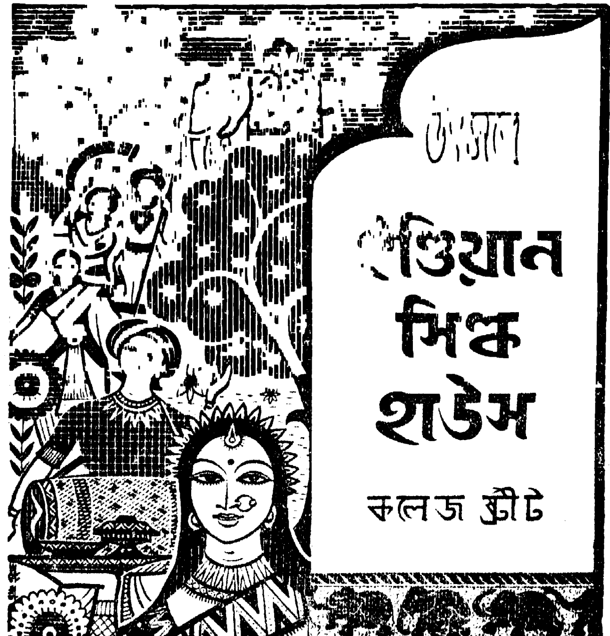
কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হিমাংশু অপেক্ষা করে। রাজাবাজারের ট্রামের ঘুম ভাঙেনি। শীতের হাওয়ায় ট্রামের তার শিস দিচ্ছে।

সামনে এসে দাঁড়াতে যেন হিমাংশুর খেয়াল হলো। চলন্ত রিক্সা একখানা ঘুঙুর বাজিয়ে আন্দাজ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। হিমাংশু নিঃশব্দে উঠে বসল। মাতালের মত গা এলিয়ে দিয়ে বললে, চালাও সিধা!

এতক্ষণে বুঝি ঘুম এল। নিদ্রা জড়িমা বোধ করলে হিমাংশু চলন্ত রিক্সার ওপর বাহিত হয়ে। নির্জন পথে রিক্সাওয়ালার হাতের ঘুঙুর বাজছে অদ্ভুত সুরে। ঠুং-ঠুং-ঠুং। সারদা সংগীত সম্মেলনে কোন উচ্চাংগ সংগীতের সংগে এমনি কোন বাদ্যের যদি সংগৎ হতো, সমন্বয়—

ভবানীপুর হাজরা লেনের এঁদো-পড়া, নোনা-লাগা দোতলা বাড়িটার একদিন কি আকর্ষণই না ছিল! অনেক কালের পুরোন বাড়ি, অবস্থা বিপর্যয়ে শেষ পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু কি ভাগ্য গৃহস্বামীর





আপাতত বাড়িটা নতুন শহর পরিকল্পনার দৃষ্টি এড়িয়েছে। বাড়িটার স্তিমিত দৃষ্টির কোল ঘেঁষে হাজরা লেন সোজা বেরিয়ে গিয়ে ওধারে একটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে—মনোহরপুকুরে মজেছে।

হিমাংশু তখন পদ্মপুকুরের একটা মেসে থেকে পড়াশোনা করতো। এদিকটা তখনই জমজমাট শহর, হাত বাড়ালেই সব সুখ আহরণ করা যায়। হাজরা লেন তখন শহর-তলী; যদি কোনদিন বৈকালিক ভ্রমণের প্রয়োজন বোধ করতো, হিমাংশুরা এদিকেই আসতো, বাঁয়ে হাজরা লেন ফেলে আরো দূরে লেক অঞ্চলে চলে যেত। সে কতদিনের কথা! সন্ধ্যে হয়ে গেলে ফিরতে ভয় করতো মনোহরপুকুরে লেকার মাঠ তখন কুখ্যাত।

হাজরা লেনের সঙ্গে হয়তো আগে হিমাংশুর পরিচয় হয়ে থাকবে, কিন্তু বাড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হঠাৎ-ই একদিন এক আত্মীয় দাদার সঙ্গে এসে হয়ে গেল। হাজরা লেনে তখনো বিজলী আলো আসেনি, গ্যাস আর কেরোসিনের বাতি জ্বলে ঘরে-বাইরে। নোনা-লাগা দোতলা বাড়িটার সামনে অন্ধকার তখন বেশ ঘনী-ভূত; আলোর শেষ অন্ধকারের শুরু যেন এক রাজ্য।

মণ্টুদা বললেন, আমার শ্বশুর বাড়ি, আয়!

হিমাংশু বললে, তোমার শ্বশুরে বাড়ি আমি কেন?

মণ্টুদা পিঠে এক থাপ্পড় দিয়ে বললেন, নে আর চালাকি করিসনি, বৌদির সঙ্গে দেখা করবি না! গান শুনবি না?

দেখেশুনে আচ্ছা শ্বশুর বাড়ি বাগিয়েছে মণ্টুদা। কোথায় এলাহাবাদ আর কোথায় হাজরা লেন। একটা যেন অবিশ্বাস্য কাহিনী ভরসন্ধ্যে বেলায় শোনাচ্ছেন।

হিমাংশু যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, বৌদি কলকাতার মেয়ে।

মণ্টুদা গর্বভরে বললেন, তবে কি ভেবে-ছিলি ছাতুর দেশের খোট্টানি। চল, চল, যা জিজ্ঞেস করবার তোর বৌদিকে জিজ্ঞেস করিস।

কানে কানে মণ্টুদা আর একটা সংবাদ দিলেন। অন্ধকারে হিমাংশুর চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো চোখ-কান বুজিয়ে পিছন দিকে ছুটে দেয়। কিন্তু যে বাগিয়ে মণ্টুদা হাতটা ধরেছিলেন, ছাড়াবার উপায় নেই! পশ্চিমের তেজী পাঞ্জা।

হিমাংশু বললে, হাত ছাড় না যাচ্ছি তো! বলিষ্ঠ হাতটা পিঠের ওপর রেখে মণ্টুদা বললেন, চালাকি করিস না কিন্তু চল।

বাইরে থেকে যাই মনে হোক বাড়িটার ভেতরে লোকগুলি ভাল। জামাই-এর ভাই বলে খাতির এবং অভ্যর্থনা কম হলো না হিমাংশুর। লজ্জার এক শেষ। বিশেষ করে মণ্টুদার আর একটি সংবাদ এমনি সপ্রতিভ যে, হিমাংশু চোখ তুলে কথা কইতে পারলে না সারাক্ষণ। বৌদির মা-বাবা-ভাই-বোন হিমাংশুকে ঘিরে রইল। কে জানতো হাজরা লেনে এমন একটা জরা-জীর্ণ বাড়িতে এত প্রাণ, এত আত্মীয়তা আছে। কোনদিন তারই ভাগ্যে জুটবে।

কতক্ষণ পরে হিমাংশুর যেন খেয়াল হলো একটা ঘরে সে অনেকক্ষণ একলা বসে আছে। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কখন উঠে গেছেন। সারা বাড়িটা কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত সুরের অনুরণন জেগে আছে, না ঘরে আর একজন আছেন;



'উঠে আসুন সোজা'

মণ্টুদার শ্বশুর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। মিষ্টি তামাকের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘরটা ভরপুর, হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় চুনবালি খসা ঘরের চেহারাটা মায়াময়!

দোরের কাছে এসে শব্দ করে মণ্টুদার বিশেষ সংবাদ বললে, ওপরের ঘরে গান হ'চ্ছে, আসুন না, জামাইবাবু ডাকচেন।

অস্পষ্ট হ'লেও যেটুকু আলো আছে তাতে বোঝা যায়, বৌদির বোন বেশ সুন্দরী, বৌদির চেয়ে।

মণ্টুদার শ্বশুর বুঝি ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন। কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। হিমাংশু উঠে দোরগোড়ায় এগিয়ে এল। মণ্টুদার শালী পথ দেখিয়ে বললে, সাবধানে আসবেন, একটা কড়ি এখানে ঝুলে আছে।

চোখ চেয়ে না দেখতে পেলেও ভয় হিমাংশুর গায়ে কাঁটা দিলে। কড়িটা মাথায় পড়লে আর না বলতে হবে না। ওপরতলায় গানের রোলটা যেন ককিয়ে উঠলো।

মণ্টুদার শালী বললে, এধার দিয়ে আসুন। ডানদিক দিয়ে।

তারপর সিঁড়ি! সে-ও আর এক পর্ব! ত্রি-ভঙ্গ মুরারী, ইঁট-কাঠের ভারা যেন!

অবলীলাক্রমে মণ্টুদার শালী সিঁড়ির মাথায় উঠে গিয়ে হাতের আলোটা বাড়িয়ে ধরে বললে, উঠে আসুন সোজা!

আরোহন শুধু কষ্টকর নয়, ভয়ও যথেষ্ট। কিন্তু প্রকাশ করা অশোভন, বিশেষ করে এই গৃহের নিত্য অধিবাসীদের সামনে। মণ্টুদার কি আক্কেল, নিজে সঙ্গে করে গানের আসরে নিয়ে আসতে পারতেন না! শালীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

ওপরে একখানিই ঘর। জিনিসপত্রে গাদাগাদি। ওরই মধ্যে খানিকটা জায়গা ক'রে গানের আসর বসেছে। শ্রোতাদের কাউকে হিমাংশু চেনে না। মণ্টুদা গানে মশগুল হয়ে আছেন। এক পাশে কোন মতে জায়গা করে আড়ষ্ট হয়ে হিমাংশু বসল। মণ্টুদার শালীকে ধারে-কাছে দেখা গেল না আর।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেল গান শুনতে শুনতে। মণ্টুদা একলাই মাত করে রাখলেন। আরো অনেকে গাইলেন। অধিক রাতের অজুহাতে শেষে গানের আসর ভেঙে দিতে হলো।

মণ্টুদা যেন হিমাংশুর কথা ভুলেই গেছেন। আসর ভাঙতে শ্রোতাদের সঙ্গে গানের আলোচনায় মত্ত। খেয়ালই নেই যে, হিমাংশুকে পদ্মপুকুরের মেসে ফিরে যেতে হবে। একলা এতখানি পথ!

তা-না-না করতে করতে আরো কত রাত হ'লো। এক সময় হিমাংশু সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল। হাজরা লেনের পথটা সেদিন বড় দীর্ঘ মনে হয়েছিল। গানের তান অনুসরণ করা যেন।

তবু মণ্টুদা যতদিন শ্বশুরবাড়ি ছিলেন হিমাংশু দুবেলা হাজরা লেনে আসতো। না এসে উপায় ছিল না। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করতো মনে মনে হিমাংশু। গান নিয়ে মণ্টুদা এবং অনুরাগী অনেকের উপস্থিতি হাজরা লেনের নোনাধরা বাড়িটাকে যেন স্বর্গীয় করে রেখেছিল। হিমাংশু মুগ্ধ শ্রোতার মত সব গান, সব আলোচনা শুনতো! সে আনন্দের যেন তুলনা নেই! দিনগুলো নেশার মত কেটে যেত। মণ্টুদা ফিরে গেলে কিছুদিন বেশ কিছু ভাল লাগত না হিমাংশুর। ফাঁকা ফাঁকা।

সে-সময় শখ করে' গানের চর্চা হ'তো। অনেকটা গুরুজন এবং অভিভাবকদের লুকিয়ে চুরিয়ে। গান-শেখা বা গান করা বয়ে যাওয়ার লক্ষণ ছিল। গায়কদের কেউ বড় একটা সম্মানের চোখে দেখতো না।

জামাই হিসেবে মণ্টুদা সফল ছিলেন না। পশ্চিমে বাড়ি-ঘর, সেখানেই একটা সামান্য

চাকরি ছিল জীবিকা। রাতদিন গান-বাজনায় ডুবে থাকতে চাইতেন মণ্টুদা। বাড়িতে যে প্রশ্রয় পাননি শ্বশুরবাড়িতে সে প্রশ্রয় বুঝি পেতে চেয়েছিলেন। প্রায়ই মণ্টুদা আসতেন কলকাতায়, হিমাংশুকে ধরে নিয়ে যেতেন হাজরা লেনে। অনর্গল গান হ'তো। নাওয়া-খাওয়ার সময় হ'তো না। জামাই নিয়ে এঁদেরও কম দুর্ভোগ ছিল না। মণ্টুদার বয়ে-যাওয়া বেকার অনুরাগীর সংখ্যা কম ছিল না। গৃহ-স্বামীর পক্ষে তাদের সামান্যতম আপ্যায়নের ভারও খুব অনায়াসসাধ্য ছিল না। তবু এঁদোপড়া, নোনা লাগা বাড়িটা যেন জামাই আগমনে সচকিত হয়ে উঠতো। বাড়িটার দিকে গান শুনে অনেকে রাস্তা থেকে চেয়ে থাকতো! বুড়ো হাড়ে যেন ভেল্কী লেগেছে!

রাস্তা থেকে অনেককে মণ্টুদার শ্বশুরে ঘরে এনে বসাতেন। জামাই-এর গান শোনাতেন। খুশী হ'তেন, শ্রোতারাও খুশী হ'তো। মণ্টুদার অনেক জায়গায় গান গাইবার নিমন্ত্রণ হ'তো। হিমাংশু প্রায় সবখানেই সঙ্গে যেত। সব জায়গায় যে সমান আসর জমতো তা নয়। কিন্তু গান শোনানোর নেশায় মণ্টুদা মত্ত হয়ে থাকতেন। সব ভুলে যেতেন। কলকাতায় এসে কতবার তাঁকে ছুটি বাড়াতে হ'তো তার হিসেব নেই। শ্বশুরবাড়ির সবাই বিরত হয়ে পড়তেন। মণ্টুদা নির্বিকার। কে-কার কথা শোনে!

হিমাংশুরও নেশা লেগে যেত, পড়া-শোনার ক্ষতি হ'তো। হোক, মণ্টুদার সঙ্গ যেন তাকে আর একটা রাজ্যের সন্ধান দিতো। একটা না-বোঝা আনন্দে মন ভরে উঠতো।...

তারপর কতদিন কেটে গেছে, কই, গান শুনে আর কখনো তেমন আনন্দ পেলে না হিমাংশু। গান শোনাটা বাতিক-ই হ'য়ে গেছে! স্বাদ, বর্ণহীন নেশার মত। গান শুনে কোন ভাবনাই আর উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত হয় না। মন ভরে না।...

অনেককাল মণ্টুদা বা হাজরা লেনের নোনাধরা দোতলা বাড়িটার কোন খবর রাখেনি হিমাংশু। নানা বিপর্যয়ে দশ পনের বছরে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। কে কোথায় কেমন আছে, কি করছে, কে-কার খবর রাখতে পারে আর! মানুষের মন থেকে মানুষ অনেকদিন সরে গেছে। হয়তো মণ্টুদা অনেক বড় হয়ে গেছেন, সেদিন আর তাঁর নেই সেধে-সেধে গান শোনাবার। এখন লোকেই তাঁকে সাধ্য সাধনা করছে! কে জানে।

স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়নি হিমাংশুর পক্ষে। তাও এত বছর পরে এত পরিবর্তনের পর এমন একটা স্বপ্ন সত্যি হবার কোন কারণ নেই। মণ্টুদা হঠাৎ কোথা থেকে যেন হন্তদন্ত হয়ে এসে তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, কাল এসেচি এলাহাবাদ থেকে, তোর জন্যে সারাদিন আজ অপেক্ষা করলুম! কই, এলি না তো? তোরা এতই কাজের হয়ে গেচিস আজকাল?

হিমাংশুই ভেবেছিল প্রশ্নটা মণ্টুদাকে জিজ্ঞেস করবে, আর কি তোমার সেদিন আছে যে, গান শোনাবার কথা মনে পড়বে সামান্য একটা কেরানীকে!

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে হিমাংশু বললে, কোন খবর তো পাইনি! কোথায় উঠলে?

মণ্টুদার যেন বড় তাড়া, বললেন, কোথায় আবার শ্বশুরবাড়ি!

অহেতুক বিস্ময় প্রকাশ ক'রে হিমাংশু বললে, হাজরা লেন!

ঝন্ ঝন্ ক'রে পাশের ঘরে থালা-কাঁসি পড়ে গেল। ভাড়া বাড়ির নড়বড়ে ভিতে কাঁপুনি জাগলো। হিমাংশুর ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে দেখলে ঘর খোলা, আলো জ্বলছে। বিভা বোধ হয় কলতলায় গেছে। জানালা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে দেখলে হিমাংশু, আকাশে অনেক তারা শহরের ঝল্-মল্ আলোক-সজ্জায় যেন লজ্জায় মরে গেছে।

উঠে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হিমাংশু ভাবলে, কি দরকার সারারাত এত আলো জেলে। ভোরের দিকে শহরের সব আলোগুলো নিভিয়ে দিলে তারা-ভরা আকাশের আলোটা কত বেশি উজ্জ্বল দেখাতো!

পট্ ক'রে নিজের ঘরের আলোটা হিমাংশু নিভিয়ে দিলে। কলতলা থেকে আসতে আসতে বিভা বুঝি আপত্তি করলে।

* * *

রিক্সাওলার চেঁচানিতে হিমাংশুর ঘুম ভেঙে গেল। আরে বাবু, কিধার জানা হায় বাতাও! এইসা ঘুমেগা?

হিমাংশু চেয়ে দেখলে বেশ ফর্সা হয়েছে চারিদিক। বিজলী বাতিগুলো যদিও জ্বলছে, শহরে সকাল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাক ডাকছে।

হিমাংশু জিজ্ঞেস করলে, এ কোন রাস্তা?

রিক্সাওলা বললে, মুঝে মালুম নেই! আপ বাতাইয়ে—

হিমাংশু বললে, চল একটু এগিয়ে দেখি।

রিক্সাওলা গজ্ গজ্ করতে করতে এগোল। সোওয়ারী তার পছন্দ হয়নি।

খানিকটা এগিয়ে চোখ পড়তে হিমাংশু যেন লাফিয়ে উঠলো: রুকো রুকো! হাজরা লেন যে!

রিক্সাওলা থামলো। এখন বাবুটিকে নামাতে পারলে বাঁচে।

রিক্সা থেকে নেমে খানিকটা এধার-ওধার ঘুরে আবার রিক্সায় উঠে হিমাংশু বললে, চলো বাঁদিকে ঘুরিয়ে নে। ঘুর পথে এসেছিস্।

রিক্সাওলা গজ্‌গজ্ করতে করতে বললে, হামারা কেয়া কসুর?

রিক্সাটা ঘুরতে হিমাংশু পিছন থেকে দেখলে হাজরা লেনটাকে। একেবারেই চেনা যায় না, মণ্টুদার শ্বশুরবাড়ির মত তেমন এঁদোপড়া নোনাধরা একখানা বাড়িও নেই এ রাস্তায়! ঝকঝকে তকতকে নতুন বাড়ি-ঘর সব। খোয়া ছিটান সে-রাস্তারও কোন অস্তিত্ব নেই। পিচ-ঢালা রাস্তাটা অজগর ময়ালের মত মসৃণ।

বিগত দিনের সকল চরণধূলিকে বিধৌত করতে হোস পাইপের মুখ থেকে সবেগে গঙ্গাজল সশব্দে বেরিয়ে আসছে। জল-কুলিরা রাস্তায় জল ছিটান আরম্ভ করেছে।

# মুখের রেখা

## সন্তোষকুমার ঘোষ

*ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজতে, নতুন করে পেতে সৌরেশের আজ ভাল লাগল।*

*আর সেই ছেলেটি। সৌরেশের মনে পড়ল, তার ডাকনাম ছিল টুলু। ছিলঃ তার মানে এই নয় যে, এখন সে অন্য একটা নাম পেয়েছে।* আসলে তার এখন আর কোন ডাকনামই নেই। 'টুলু' নামে কেউ তাকে ডাকে না। যারা ডাকত, ডাকতে পারত, তারা কাছে নেই, অনেকে এই পৃথিবীতেই নেই। সে নিজেও কি আছে? বুঝি নেই। কপালের কাছে চুলের থাকে গোটা দুই ঢেউ, ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা, চলার সময় গোড়ালি উঁচু করা আর ঠোঁটের কোণ সামান্য বেঁকিয়ে হাসা—এই দিয়ে কি পুরো মানুষ হয়! যদি হয় তবে সে আছে, এখনও আছে, সৌরেশের মধ্যেই আছে। যদি না হয়, তবে সে নেই, সৌরেশের মধ্যে নেই, কোথাও নেই।

**শ**হর বটে, কিন্তু বিশেষ জৌলুস ছিল না।

আজও চোখ বুজলে সৌরেশ জেলা শহরে যাবার সেই পাকা রাস্তাটা দেখতে পান। অশথ-বটের ছায়ায় খানিক ঢাকা খানিক খোলা পথটার এপাশে-ওপাশে আদালত কাচারি, গোটা দুই স্কুল, ডাকঘর, খেলার মাঠ। বাজারটা বেশ বড়ই ছিল। আর ছিল রেল-স্টেশন, ঢিলেঢালা, অলস জীবনপ্রবাহের মধ্যে যা-কিছু ব্যস্ততা সেখানেই। বিজলী আলো ছিল না, সেকালে ছিল না, শৌখীন স্বচ্ছল ঘরে হ্যাজাক জ্বলত। দু-একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডায়নামো বসিয়েছিলেন। অন্য সর্বত্র কেরোসিন লণ্ঠনের অপ্রতিহত প্রভাব। জোরাল আলো জ্বলত উৎসবে ব্যসনে, যাত্রার আসরে কিংবা বাঁধান স্টেজে, শখের থিয়েটারে। একটা পাবলিক লাইব্রেরি ছিল, আর ছিল শহর থেকে কিছু দূরে গোলঘর ছাড়িয়ে পুরনো বরফ-কল পেরিয়ে একটা রাজবাড়ি। তখনই তার জীর্ণদশা শুরু হয়েছে; তার নোনাধরা ইঁটে সেকালের গন্ধ আর রহস্য, তার আস্তর-খসা খিলানের নিচে দিয়ে অন্দর-মহলে যেতে গা যেন ছমছম করত। ধূলোমলিন জাজিমে, শান-চটা মেঝে নিজেকে লুকিয়েছে; কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে তখনও পুরো দেহের ছায়া-ধরা বড় বড় আয়নার ফাঁদ। সেখানে পা রাখতে না রাখতে একটি মানুষ বহু হয়ে যেত।

পুরনো এলবামের পাতা উলটে উলটে সৌরেশবাবু যেন পর-পর সাজান ছবিগুলি দেখে গেলেন।

নদী ছিল আরও দূরে; ভাল রাস্তা ছিল না। নদী দেখতে হলে চাপতে হ'ত রেলে, ছ' সাত মাইল দূরে যে গঞ্জ আর বন্দর, সেখানে যেতে হত। শ্রাবণের শেষে সেই নদীই কূল ছাপিয়ে যেত, ফসলের খেত তখন জলে থৈ থৈ, উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় ঢেউ ফণা তুলে ছোবল মারত। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতেও তখন সাঁকো চাই, ইস্টিশনে যেতে নৌকো বা কলাগাছের ভেলা, বেপরোয়া, অসুরশক্তি রেল-ইঞ্জিনগুলোও যেন ভয় পেয়ে পা টিপে টিপে এগত।

সেই কূলত্যাগিনী স্রোতোধারা আবার আপন ঘরে ফিরে যেত, তখন ভাদ্রের শুরু। তাদের উচ্ছৃংখলতার চিহ্ন হিসেবে রেখে যেত কিছু কচুরিপানা, ঘরে ঘরে জ্বর-জ্বারি। জমিদারবাড়ির নাটমণ্ডপে প্রতিমার খড়মাটির কাঠামোয় তখনই প্রলেপ পড়া শুরু হত। ইস্কুল পালিয়ে অন্য অনেক ছেলের সঙ্গে সৌরেশও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুমোরদের কাজ-করা দেখতেন। মনের সব রূপকল্পনা মাটি খড় রঙ তুলি তেল আর ডাকের সাজে ছেয়ে থাকত। আড়ালে, গোপনে সৌরেশ নিজেও কতবার যে মাটি ছেনেছেন, মূর্তি গড়ে গড়ে ভেঙেছেন, তার হিসাব নেই। তাঁর প্রথম মানসী অতএব মৃন্ময়ী, আর সেই নিপুণ মৃৎশিল্পী তাঁর দেখা প্রথম রূপকার।

নিরানন্দ ছিল শীতকালটা। সন্ধ্যা হতে না হতে সব কেমন অস্পষ্ট অনিশ্চিত হয়ে যেত। হিম পড়ত সারারাত জুড়ে, বিছানায় নিজেকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে শুয়ে সৌরেশের শিশুসত্তা রোজ ভাবত, আজ একটা কিছু না কিছু অঘটন ঘটবে; কেউ-না-কেউ আসবে। আসবেই। নইলে সব কেন এমন কালো হয়ে গেল, সব কেন এমন চুপ, উঠোনের কুকুরটা এত ভয় পেয়েছে কেন, তেঁতুল গাছ থেকে পেয়ারা গাছের ডালে কেন বাদুড়গুলো ঝটপট করে উড়ে এসেই ফিরে যাচ্ছে। একটা গোলমেলে কিছু ঘটবে বলেই ত, ভয়ংকর কেউ আসবে বলেই ত?

কিছুই কিন্তু ঘটত না, রাত ফুরত, কুয়াসার কাঁথার নিচে অলস সকাল কাটিয়ে নিস্তেজ রুগ্ন শিশুর মত সূর্য অনেক বেলায় দক্ষিণ আকাশে চোখ মেলত।

চিরদিনের মত যাকে ছেড়ে এসেছেন, স্মৃতির সরু সুড়ংগপথে মাথা হেঁট করে

টুলুকে সৌরেশ অনেকদিন পরে দেখলেন। ভারী রোগা, দুর্বল আর নিরীহ। কালো রঙ ফ্যাকাশে হলে যা হয়—চীনে-বাদামের খোসার মত মুখের রঙ। হাঁটুর নিচে কাটা দাগ, কনুইয়ের কাছে ছাল-ছাড়ানো। কবে বুঝি পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল। নিরীহ ছেলেটি বাহাদুরি করতে গিয়েছিল কেন, সেই জানে।

শিয়রে খালি বা ভর্তি হরেক সাইজের শিশি সাজান। থার্মোমিটার একটা, আর আধখানা ছাড়ান একটা কমলালেবু—শীতে, হাওয়ায় তার কোয়াগুলো শিটিয়ে গিয়েছে, শাদা-সরু শিরাগুলো উঁচু হয়ে আছে। টুলু নিষ্প্রভ, আড়চোখে একবার দেখল কমলালেবুটাকে, বিতৃষ্ণা একটুখানি মুখ-বিকৃতি হয়ে ঠোঁটের কোণে খেলে গেল, তারপর সে চোখ ফিরিয়ে নিল। পাঁচটা কোয়া খাওয়া শেষ, এখনও চারটে বাকী। কমলালেবুতে নটি কোয়া আছে, সব লেবুতেই তাই থাকে। কখনও কখনও আটটাও হয় কখনও দশটাও, তবে খুব কম, বেশির ভাগ কমলাই এই এখনকারটার মতন, ন'-কোয়া। দুটি কোয়া কখনও কখনও এক সঙ্গে একেবারে জুড়ে থাকে—যমজ শিশুর মত।

এসব হিসাব টুলুর মুখস্ত, সে জানে, এই ঘরে ক'টা টিকটিকি আছে। তিনটে। তারা কখন পোকা শিকারে বেরয়? ঠিক সাড়ে ছ'টায়। কেমন করে শিকার করে? একটু দূরে থেকে তাক করে, পা টিপে টিপে এগয়, দাঁড়ায়, দম নেয়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইঁদুর আছে ক'টা? চারটে। তিনটে নেংটি, একটা ধাড়ি। তর তর করে করে ছোটে, পালায়, দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের গোপন চলাফেরার একটা পথ আছে।

কাপড় কাটে, কাগজের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে খসখস শব্দ করে। সংখ্যায় এরা বেশীও হতে পারত, কিন্তু টুলু একসঙ্গে কোন দিন তিনটের বেশি দেখেনি। এপাড়ায় নেড়ি কুকুর আছে ছ'টা, বিড়াল চারটে। কাচ্চাবাচ্চাগুলোর অবশ্য হিসাব নেই। কারণ ওরা বাঁচে না, হুলোরা ধরে ধরে খায়, বড় বড় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। একটা বেড়ালকে বাচ্চা সমেত নীলুরা অনেক দূরে পার করে দিয়ে এসেছিল। ওরা বিশ্রীভাবে ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে, নেড়ি কুকুরগুলো পাড়ায় অপরিচিত কেউ এলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, তবে নেহাত খেপে না গেলে কামড়ায় না। শুধু একবার সতীশ বহুরূপীকে তাড়া করে পায়ের পাতায় দাগ বসিয়ে দিয়েছিল। দোষ ত সতীশেরই। সে ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল কেন। না করলে অঘটনটা ঘটত না।

একটা বেড়াল টুলুর ঠিক পোষা না হলেও গা ঘেঁষা। মাঝ রাতে কতদিন মশারিতে ফাঁক পেয়ে ওর লেপের নিচে ঢুকে গুটিসুটি হয়ে শুয়েছে। আঁচড়ায়নি কোনদিন, তবে বিছানাপত্র দু' একবার নোংরা করেছে। বেড়ালটা থিয়েটারও করতে জানে। 'রাতকানা' প্লে-তে ঠিক সময় বুঝে স্টেজে লাফিয়ে পড়ে মাছের মুড়ো মুখে তুলে উইংসের দিকে ছুটেছিল।

আর কতকগুলো হিসাব রাখা ত সোজা। এপাড়ায় কার কার বাড়িতে গরু আছে, কোন গরুর দুধ ঘন। জমিদার বাড়ির বেতো ঘোড়াটাকেও টুলু ভোলেনি। পোষা ছাগল ও তাদের নিজেদেরই আছে। আর যে দুটো কাক ঝড় হক, জল হক, সাত-সকালে উঠে উঠোনের তারে বসে ডাকে তাদের সঙ্গে টুলুর একরকম চেনাশোনাই হয়ে গিয়েছিল। বেপাড়ার চারটে কবুতর রোজ চাল-বাছার সময় উড়ে এসে পিশিমাকে বিরক্ত করে, টুলু তাও জানে। এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কিছুই দেখা যায় যে।

টুলু চোখ বুজে বলে দিতে পারে তার শিয়রে দাগ-কাটা, শেক-দ্য-বটল লেবেল-আঁটা ক'টা শিশি জমেছে, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, কোনটা শাদা একেবারে। এই টিনের ঘরটায় ক'টা খুঁটি আছে। কম্প দিয়ে প্রবল জ্বর এসে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে আর ঝাপসা করে না দিলে এসব হিসেব টুলুর বেশ মনে থাকে। বেশি কিছু না ত, শুধু দশ অবধি গুনতে পারা চাই।

যে হিসেবটা টুলু কোন দিন করে উঠতে পারেনি, তা হল, সন্ধ্যার পর সে ঘুমিয়ে পড়লে এই ঘরে ক'টা মশা আসে। সে জেগে থাকলে আকাশে কটা তারা ওঠে। খুব ভোরে শিউলি গাছটায় কত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে। আর রাস্তার পাশের ওই কাঁঠাল গাছটায় ক'টা পাতা আছে। গুনতে কখনও চেষ্টা করেনি, তা নয়, কিন্তু টুলু জানে, গুনে কোনদিন শেষ করাও যাবে না।

শুধু যে ম্যালেরিয়াতেই ভোগে টুলু, একটানা চার দিন কি পাঁচদিন বড় জোর। এত কম সময়ে এত বড় হিসাব করা যায় না। যদি কখনও টাইফয়েড হত, টুলুকে এক মাস কি তারও বেশি বিছানায় পড়ে থাকতে হত, তবে হয়ত এই শক্ত-শক্ত কাজগুলোও করা হয়ে যেত, চোখের মণি ঘুরিয়ে ফিরিয়েই যা করা চলে। গাছের পাতা গোনা হত, এই জানালার ফাঁকের চৌকো আকাশে যে-কটি তারা ভাসে, ডোবে, হাসে, তাদের সংখ্যাও অজানা থাকত না। এমন কি খুব ভোরে বেড়ার ফুটো দিয়ে চোখা তীরের মত যে রোদটুকু ঘরের পাশে ঠিকরে পড়ে, তার সঙ্গে মিশে-থাকা ধুলোর প্রতিটি কনাকে টুলু চিনতে পারত। ফিরে ফিরে অসুখে পড়া ছেলের চোখ দুটি তো আর চোখ থাকে না, অনুবীক্ষণ হয়ে যায়।

সেই রুগ্ন ছেলেটি জানে, আকাশের পারে কী আছে। বিজ্ঞানের বই থেকে নয়, বিজ্ঞানীরা কতটুকুই বা মাপতে পেরেছে; সে জানে, জ্বরে যখন অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন। অনেক কিছু দেখে, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করে যা দেখে, সব বলে। শিয়রের কাছে পাখা হাতে করে ঠায় বসে-থাকা পিশিমা ভয় পায়। একে ডাকে, ওকে ডাকে। বলে, টুলু ভুল বকছে। মাথায় জলপটি দেয়।

সেরে উঠে, তখনও মাথা ঝিমঝিম করে, শরীর দুর্বল, টুলু সব শুনতে পায়। জ্বরের বিকারে সে যা-যা বলেছে, সব। সব ভুল? শুকতো দিয়ে মাখা পুরনো চালের ভাত কচলে কচলে মুখে তুলতে তুলতে তার নিজেরও মনে হয়, বুঝি ভুলই। সে ঠিক জানে না। একটুখানি খটকা থেকেই যায়। কোনটা খাঁটি কোনটা ভুল? যে-টুলু লিকলিকে লোভী হাত বাড়িয়ে পানসে ঝোল-ভাত মুখে তুলছে, যার চোখ এই উঠোনটার বেড়ায় ঠেকে থমকে গেল, সে যা বুঝছে তাই ঠিক আর

যে টুলু অনায়াসে পাখির চেয়েও হালকা, আর হাওয়ার চেয়েও অদৃশ্য হয়ে চরাচর বিশ্ব ভবনের খবর জেনে এল, তার কথাই ভুল? কেন? তার ভাষা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বলে? তার অসুখের সময়ে দেখা জিনিসের সঙ্গে সেরে-ওঠা চোখ দিয়ে দেখা জিনিসের কিছুমাত্র মিল নেই বলে? অসুখটা যদি ভুল না হয়, তবে অসুখে-জানা জিনিসগুলোই বা কেন ভুল হবে।

পিশিমার হিসেব টুলু বোঝে না।

পিশিমাও ত রোজ দু' বেলা পুকুরে চান করেন। ডুব দিয়ে তিনি কি টের পান না, জলের ওপরে যে-জিনিস যেমন দেখতে, জলের নিচে ঠিক তেমনটি নয়? সাপলার ডাঁটাগুলো কি তাঁর চোখে বাঁকা বাঁকা ঠেকে না, শ্যাওলাগুলো অতিকায় সবুজ শুঁয়ো পোকা হয়ে ওঠে না? তাঁর নিজের হাতের আঙুলে কি কলার মত ফোলা-ফোলা লাগে না? আর তাঁর পিতলের কলসী? জলের ওপরে যেটাকে নাড়াচাড়া করতে এত কষ্ট, সেটা বুঝি সহসা শোলার মত হালকা হয়ে যায় না? হয়। কেন— না, জলের ওপরে যে-নিয়ম, জলের নিচে সে-নিয়ম খাটে না। পাতালের আইন-কানুনই আলাদা। তেমনি, একবার যদি মেঘের চাঁদোয়াটা ফুঁড়ে উড়ে যাও পিশিমা, দেখবে, সেই না-কিনারা মহাকাশের নিয়মও আলাদা। এই সোজা কথাটা বোঝ না কেন।

আর, জ্বর হলে সেই নদীটিও টুলুকে ডাকত। তার জল শাদা, পাড়ের বালি আরও শাদা, সেখানে অন্য সময়ে যেতে মানা ছিল, আর এই রোগা লিকলিকে শরীর আর ভিতু মন নিয়ে টুলু যেতে সাহসও পেত না, কিন্তু জ্বরের ভিতর চলে যেত, মুঠো মুঠো বালি তুলত আর ছড়াত, ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে, তারপর স্রোতের টানে ভেসে, ডুবে, ভেসে পৌঁছে যেত মোহানায়। সেখানে দিনের বেলায় চড়ায় উঠে কুমির রোদ পোহায়, অন্ধকার হলেই ঘন বনে, যাদের শরীর রোদ আর নদীর রঙ দিয়ে আঁকা, সেই বাঘগুলো রাগী গলায় ধমক দিয়ে অন্য পশুদের ঘুম পাড়ায়।

জ্বর মানেই মুক্তি, সেরে-ওঠা মানেই কয়েকটা ভয়ের, শাসনের, নিয়মের কয়েদ হওয়া। রোদ্দুরে না বেরুন, জলে না ভেজা, বিস্বাদ পথ্য গেলা, আর সন্ধ্যায় লণ্ঠন জ্বেলে বই-পড়া।

অসুখ ভাল হওয়াতে টুলুর কোন সুখ ছিল না।

সেই বয়সের অস্পষ্ট কয়েকটা ছবি মনে আছে। একদিন মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে টুলু শুনতে পেল চারদিকে শাঁখ বাজছে, ওকে টেনে নিয়ে সকলে দাঁড় করিয়ে দিল উঠোনে। দরজা-জানালা ঠকঠক করছিল, ঘরের চাল দুলছিল, মাটি কাঁপছিল। তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি। চোখ কচলাতে কচলাতে টুলু শুনল, ভূমিকম্প হচ্ছে। কথাটা আগেই জানা ছিল, জিনিসটা কী, সেটা টের পেল এই প্রথম। একটু পরেই মাটি স্থির হল, সকলে মিলে ফের ঢুকলেন ঘরে।

এইটুকু মোটে মনে আছে। না, আরও একটু। সে দিন ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ঘটনাটার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। না তখন, না পরবর্তী জীবনে, তবু তুচ্ছ ক্ষণিক একটু উত্তেজনা আর বিস্ময়ের স্মৃতিটা কী করে যেন টিকে গিয়েছে।

ভাল লাগত না, ভাল লাগত না। স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজত, টুলু দুর্বল শরীরটাকে কোনক্রমে বাড়ি পর্যন্ত টেনে এনে পিশিমার কাছে জমা করে দিত। বাইরে ঘোরা বারণ, চুপচাপ বসে থাকত বাইরের বারান্দায়, আকাশে নানা রঙে কত ছবি নিরন্তর লেখা আর মোছা চলে, টুলু দেখত। পাখিদের ঘরে ফেরার সময় ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একটা লোক মিউনিসি-প্যালিটির রাস্তায় লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে যেত। তখন নিয়ম, পড়তে বসতে হবে।

কতগুলো নিয়ম আর বারণের যোগফল, এই কি জীবন? টুলু জানত, তাই। তাই বেঁচে থাকবার সাধটাও তার ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসছিল। এই ক্ষীণ শরীর নিয়ে ধুকধুকে ভয় বুকে পুরে, নানা নানা মেনে মেনে বেঁচে থেকে লাভ কী। বিশেষ করে সেই বাঁচা যদি শুধু ভোরে ওঠা, পড়া নাওয়া খাওয়া আর ঘুমনোর সমাহার হয়! কোন দিন এতটুকু বাড়াবাড়ি করবার অধিকারও যদি না থাকে! স্বাদহীন বর্ণ-হীন দুধের বাটিটায় আঙুল নেড়ে নেড়ে একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে ফের নামিয়ে রেখে টুলু নানা অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া কল্পনা নিয়ে খেলা করেছে।

"যদি মরে যাই", টুলু বলেছে মনে মনে "তবে যেন পর জন্মে ফড়িং হয়ে জন্মাই, মাতে ঘাসে ঘাসে শিসে শিসে প্রাণের ফূর্তিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারি; ব্যাঙ হতেও আপত্তি নেই, বর্ষার দিনে মহানন্দে ডাকতে পারব। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি হই একটা টাট্টু ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ছুটতে পারব, আমার মুখে ফেনা ছুটবে, খুরে উড়বে ধুলো, আমি ছুটব, ছুটব, ছুটব। এ-সব কিছু না হয়ে হই যদি একটা পাখি, তবে ডালে ডালে, আকাশের নীলে নীলে উড়তে পারি, সুরের মায়ায় বাতাস ছেয়ে ফেলি। আমার একটা ছোট্ট ফুলগাছ হতেও আপত্তি নেই, যদিও তখন আমার চলবার স্বাধীনতা থাকবে না, তবু ত ফুটে উঠব, পাপড়ি-পল্লব পাতায় সুন্দর হব, হাওয়ার ডাকাত লুটপাট করতে এলেও ভয় পাব না। এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সব কিছু ভাল।"

একটি রুগ্ন বালক বেঁচে থাকার অর্থ আর আনন্দ না পেয়ে প্রাণী, পতঙ্গ উদ্ভিদ-জীবন কামনা করেছিল। মানুষ হয়েও টাট্টু ঘোড়া বা ছোট্ট পাখিকে ঈর্ষা করেছিল।

সেই সাধটা তার মন থেকে, অন্তত তখনকার মত, নিরঙ্কুর করেছিলেন মোহিতদা।

মোহিতদা দোনলা বন্দুকটা সাফ করছিলেন, আর আড়চোখে চাইছিলেন। টুলু একটু দূরে ভিজে বেড়ালটি হয়ে বসেছিল, দেখছিল। সাফ করার কাঠিটা যেই টেনে বাইরে আনছিলেন মোহিতদা, তেল-কালিতে মাখা ন্যাকড়াটা দেখে টুলুর গা ঘিন ঘিন করছিল। ওপর থেকে যে নলটা এমন চকচকে নীলচে, তার প্রাণে হিংসা আর আগুন আছে সেকথা ত টুলুর জানাই কিন্তু তার মনেও এত কালি? একবার ঘাড় ফিরিয়ে মোহিতদা বাহাদুর বাহাদুর চোখে ওর দিকে চাইলেন, টুলুর মনে হল, মোহিতদার চোখের কোণেও কালি। কাঁচ করে শব্দ হল, বন্দুকটাকে দু'ভাঁজ করে ভেঙে ফেলেছেন মোহিতদা, খুব খুঁতখুঁতে ছোট-করা এক চোখ রেখেছেন নলের মুখে, সন্তোষজনক ভাবে সাফ হল কিনা পরখ করছেন। কই, এখন ত কালি নেই মোহিতদার চোখে। টুলু অতএব ধরে নিল, মোহিতদা এতক্ষণ যে চশমা পরে ছিলেন, তার ফ্রেমের ছায়াই ওঁর চোখের কোলে ছায়া ফেলছিল। চশমাটা খুলে রেখেছেন এখন, কালিটুকুও সঙ্গে সঙ্গে মুছে গিয়েছে।

মোহিতদা ওকে শিকারের কৌশল শেখাচ্ছিলেন। দুটি বিন্দু দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দুটোর সঙ্গে যেটাকে তাক করছি সেটা যদি এক লাইনে এসে মেলে অমনি ঘোড়া টিপে দিবি, ব্যস আর পেতে হবে না, শিকার একেবারে হাতের মুঠোয়। বুঝলি?"

টুলু কিছু বোঝেনি, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল।

মোহিতদা বলছেন, "কিছু ভাবিসনি, তোকে কাল সকালে আমি শিকারে নিয়ে যাব।"

কাল? কাল সকালে? টুলুর চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবে গিয়েছে। ম্রিয়মাণ গলায় বলেছে, "কিন্তু

কাল, কাল যে আমার জ্বর আসবে মোহিতদা!"

কথাটায় কোথাও কিছু হাস্যকরতা ছিল, কণ্ঠস্বর খানিকটা করুণ হয়ে গিয়েও থাকবে, মোহিতদা সকৌতুকে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। —"কাল জ্বর আসবে? তুই ঠিক জানিস? পরশু নয়, তরশু নয়, কালই?"

"হ্যাঁ কালই।" টুলু আরও দৃঢ় গলায় বলেছে।

"কী করে এত নিশ্চয় করে জানলি?" মোহিতদা হাসি লুকিয়েই বলেছেন, তবু একটা ঠাট্টার ভঙ্গি ও'র স্বর থেকেই গিয়েছে।

"বা—রে, কাল অমাবস্যা না?"

"ও" মোহিতদা এবার বন্দুকের দিকে চোখ আর মন ফিরিয়েছেন, "অমাবস্যা হলেই জ্বর হবে বুঝি?"

"হবে" আস্তে আস্তে টুলু বলছে "হবেই। ফী অমাবস্যা, পূর্ণিমা আর একাদশীতে আমার জ্বর আসে, পিশিমা তখন আমাকে বাইরে যেতে দেয় না, তুমি শোননি মোহিতদা?"

সারা গায়ে সরষের তেল ডলে ডলে মাখছিলেন, মোহিতদা নাইতে যাবেন বলে। তেল-চোয়ানো পাঁচটা আঙুল চাপড়ে চাপড়ে মারছিলেন চওড়া কাঁধের উঁচু পেশিতে, চিতানো বুকে, হাত ঘুরিয়ে পিঠে ঘষছিলেন। কড়ে আঙুল তেলের বাটিতে ডুবিয়ে নাভিতে ছোঁয়াচ্ছিলেন। টুলু এবারও দেখছিল। ওর চোখে হিংসা কি জ্বল জ্বল করছিল? মনে নেই। মোহিতদার তেলমাখা প্রকাণ্ড শরীরটা রোদে চকচকে হয়েছিল।

ও'র পিছে-পিছে টুলু পুকুরঘাট পর্যন্ত গেল, হাতে শুকনো কাপড় আর গামছা. পাড়েই দাঁড়িয়ে রইল।

"তুই নামবি না?" মোহিতদা একবার জিজ্ঞাসা করলেন।

টুলু মাথা নেড়ে জানাল, না। সে পরে ঘটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে মাথা ধুয়ে নেবে। আর কিছু বলেননি মোহিতদা, ধুতিটা হাঁটু অবধি তুলে, ফেরতা দিয়ে কোমরটা আরও কষে বেঁধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অনেকক্ষণ তাঁকে দেখা গেল না। যখন মুখ তুললেন, তখন একরাশ চুল চোখ ছেয়ে ফেলে মুখে কপালে লেপটে গিয়েছে, মোহিতদা এক হাতে সব পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে ফের ডুব দিলেন। পরের বার যখন মাথা তুললেন তখন তিনি প্রায় ওপারে চলে গিয়েছেন, দুহাতে জল কেটে কেটে ফিরে আসতে থাকলেন এ-পারে। আসতে আসতে কতবার যে ডুব দিলেন, মাথা তুললেন কতবার, হিসাব নেই. শেষ বারে টুলু দেখতে পেল মোহিতদা একহাতে একগুচ্ছ সাঁপলা তুলে ধরেছেন, সেগুলো টুলুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এগুলো ধর, ভাজা করে খাব।"

আরও অনেকক্ষণ ধরে মোহিতদা স্নান করেছিলেন। যখন জল ছেড়ে উঠে এলেন তখন ও'র চোখ দুটো টকটকে। জ্বর হলে টুলুর চোখও টকটকে লাল হয়, জ্বালা করে, কিন্তু সেটা আলাদা রকমের লাল।

জলে ঘটি ডুবিয়ে মাথায় ঢেলে টুলু ঘরে ফিরে এল।

খেতে বসে মোহিতদা বললেন, "কাকীমা, তোমার এই ভাইপোটিকে একে বারে একটা ব্যাঙাচি বানিয়ে রেখেছ। এ ভাবে ও বাঁচবে কী করে? ওকে ছেড়ে দাও, ঘুরুক, ছুটুক, দেখুক, তবে ত ও মানুষের মত হবে।"

পিসিমা গম্ভীর ভাবে বললেন, "ওর শরীরে কিছু সয় না।"

ঢক ঢক করে এক বাটি অম্বল নিঃশেষ করলেন মোহিতদা, টুলু যা কখনও আঙুল দিয়েও ছুঁতে পায় না, এক চুমুকে এক বাটি ঘন দুধ নিঃশেষ করলেন।

তারপর খাওয়া শেষ হলে তাঁর তৃপ্ত প্রসন্ন দীর্ঘ ঢেকুর তোলার শব্দ শুনে টুলু চমকে উঠল।

রাত্রে মোহিতদার সঙ্গে এক ঘরে শুতে হয়েছিল। মোহিতদা বলেছিলেন, "আমি এখানে বেশি দিন থাকব না ত, নইলে তোকে পাঞ্জা লড়া আর যুযুৎসুর পাঁচ শিখিয়ে দিয়ে যেতাম। তুই সবল হয়ে উঠতি। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আর জ্বর আসত না।"

কাঁথায় গলা অবধি ঢেকে টুলুর সত্যিই মনে হচ্ছিল, তার জ্বর আসছে, আসছে! তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। সে আসবেই, নিঃশব্দে হঠাৎ হানা দেবে, শরীরের সবটুকু রক্ত নিমেষে শুকিয়ে দিয়ে পিপাসা হয়ে গলায় জ্বলবে, যেন দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে জ্বালিয়ে দেবে চোখের পাতায়, তারপর নিষ্ঠুর হাতে ছোট ছোট ছুঁচ মগজে ফুটিয়ে দেবে। তার রীতিনীতি টুলুর ভাল মতই জানা আছে। তবু সে আসুক, টুলু তাকে ঠেকাতে চায় না। সে এলেই টুলু যে হঠাৎ স্বাধীনতা পায়, যা-খুশি ভাবার অলৌকিক ক্ষমতা তাকে ভর করে মোহিতদা সে-খবর জানবেন কোথা থেকে।

ফিস ফিস করে টুলু তাই বলল, "মোহিতদা, আমি ভাল হতে চাই না। ভাল না থেকেই আমি ভাল থাকি।"—

(ক্রমশ,

## অবসর মুহূর্তের চিন্তা

### মনজুরে মাওলা

কি করি এখন? কি করার আছে?

*কেবলি চিন্তা কি করে যে বাঁচে*
*চায়ের পয়সা, অথবা বিকেলে*
কার কাছে গেলে অনায়াসে মেলে
পুরানো মাসিক—দুয়েকটা বই।
পথে যেতে যেতে মুখে ফোটে খই
বহু চিন্তায় সাজানো আলাপ
*বিবর্ণ মনে বিষাক্ত সাপ*
*ঢেকে ঢেকে রাখে। মাঝে মাঝে তবু*
*মনে পড়ে যায় আমাদের প্রভু*
*মোহিনী বাসনা, আর কিছু নয়—*
*সিনেমার বুঝি হয়েছে সময়।*

পাঠাগারে যাই সকাল বিকাল
বই পড়া নয়, প্রথামতো লাল
অথবা বেগুনী বইয়ের মলাটে
এলোমেলো ছবি এঁকে এঁকে কাটে
বিশাল অলস মন্থর দিন
মেঘে ঢাকা কভু, কখনো রঙীন।

মাঝে মাঝে দেখি সহপাঠিনীর
*বেণীর আলোয় কী রকম ভিড়*
জমিয়েছে আলো, আকাশের নীল
মনেও কি আনে রঙের মিছিল?
পড়ে আর দেখে শুধু মনে হয়
মোহিনী সময়, কালো এ হৃদয়
এ নিয়েই বুঝি পৃথিবী সাবেকী।

*টেনিস খেলার ফাঁকে ফাঁকে দেখি*
*তবুও আকাশ হয়ে ওঠে নীল—*
*মাঝে মাঝে ওড়ে দুয়েকটা চিল।*

*এরি মাঝে তবু সব কিছু ভুলে*
রঙের প্রপাতে ঢেউ তুলে তুলে
ভেঙে ফেলে সব ধূসর দেয়াল
ছিঁড়ে ফেলে যত লৌকিক জাল
তারার মতন এলে যদি কাছে—

কি করি এখন? কী করার আছে।

## ভগ্নাংশ

### আনন্দ বাগচী

গোলদীঘি ভরে জ্বলছে বাঁকা চাঁদের একশো ঢেউ ছবি।
টিমটিমে আলোয় ধুঁকছে ফাঁকা গলি,
ইউনিভার্সিটি অন্ধকার।
সমস্ত দোকান বন্ধ, বই ছড়ানো ফুটপাথে এখন
ছেঁড়া কাগজের টুকরো দমকা বাতাসে ভেসে ফেরে।
শ্বাপদের নখ বাজছে, ধোঁয়া ওঠা ডিগডিগে কুকুর,
কানা ভিখিরীটা শুয়ে, চাপা-কলে অস্পষ্ট উথলানি।
জল, হোক ঘোলা জল তবু, বুক ভাসছে; অ্যাসফল্টে-গ্রানিটে
স্নেহ ঝরছে ফোঁটা-ফোঁটা, আকাশগা টিপকল থেকে বারোটা রাত্তিরে
ট্রাম নেই, বাস নেই; কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে
কাঁচা পোস্টারের বুকে জেগে আছে নটনটীর মুখ।

মুক্ত চতুর্দোলা চড়ে বধূ এলো এমন সময়।

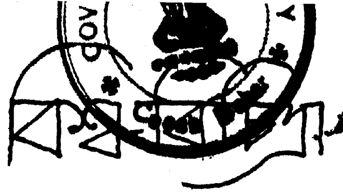
পরনে ঢাকাই শাড়ি, খাবলা খাবলা সিঁদুর কপালে,
মেঘবরণ কেশ ঝুলছে, পা দুখানা আলতায় টুকটুকে;
বাসর ঘরের থেকে যেন এইমাত্র বাইরে এলো,
ঠোঁটে ম্লান জ্যোৎস্না-হাসি, বাসকসজ্জায় একা বধূঃ
স্বামী চলছে খালি পায়ে, সামনে পথ ঝাপসা হয়ে গেছে,
বুকের মধ্যে কি যে হচ্ছে—চোরা ঢেউ, মূর্চ্ছিত শ্রীরাধা।

বরযাত্রী চলে গেল, খোলা চতুর্দোলা চড়ে বউ।
গোলদীঘির মাথা খেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল চাঁদ,
একটি তামার পয়সা ছিটকে এলো দূরের ফুটপাথে
কাঁচের চুড়ির মত শব্দ করে, থৈ উড়লো দক্ষিণ বাতাসে
ঘরে ঘরে, হরিধ্বনি মুছে গেল, ঘুমন্ত কলকাতা
অন্ধ ভিখিরীটা শুধু চমকে উঠে দুহাত বাড়ালো॥

অদ্ভুত চাতুর্যের জন্য একটা অজ্ঞাত-কুলশীল ডোবারম্যান কুকুর কিছুদিন আগে আমেরিকার লস এঞ্জেলসের সংবাদপত্র-সমূহের শিরোনামা দখল করেছিল। কুকুরটা দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ করে আসছে ১৯৫৪ থেকে। সে সময়ে একদিন লস এঞ্জেলসের পশু নিয়ামন বিভাগ একটা যূথভ্রষ্ট কুকুর ধরবার জন্যে বের হয়। দেখতে বেশ নিরীহ, এক বছর বয়সের ডোবারম্যানটি ডাস্টবিন ঘেঁটে, এখান-ওখান থেকে চুরি করে খেয়ে বেড়িয়ে, ভাল জাতের কুক্কুরিদের সম্ভোগ করে দিন কাটাচ্ছিল। খুব চটপটে এবং দ্রুতগামী। ১৯৫৪-র গ্রীষ্ম থেকে ইন্সপেক্টর রয় এল ম্যাকগাওয়েন কুকুরটির খাদ্য আহরণ স্থলে বার বার হানা দেয়। সাধারণত একটা যূথভ্রষ্ট কুকুরকে ধরতে ম্যাকগাওয়েনের দু-তিন সপ্তাহের বেশী সময় লাগতো না। কিন্তু এই ডোবারম্যানটির পক্ষে তা হলো না। ম্যাকগাওয়েন বলেঃ "মুশকিল; যখনি ভেবেছি, এবার ওকে ঠিক জব্দ করতে পারবো, দেখি ও অন্য রাস্তা ধরেছে—বেড়া ডিঙিয়ে বা তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে অথবা সোজা পিটটান দিয়েছে। ওর মতো চালাক জন্তু আমি দেখিনি।" চার বছর ধরে ওর পিছনে ধাওয়া চলে। ওকে ধরা একটা অবসেসন হয়ে দাঁড়ায়।

ম্যাকগাওয়েন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ যতোবার ব্যর্থ হয়, পল্লীর লোকে তত চটে যেতে থাকে। বড় দপ্তরে নালিশ স্তূপাকার জমতে থাকে এবং বাড়তে থাকে। কুকুর-ধরারা তাদের জানা যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করলে। নেশা হবার বড়ি ভরে মাংস ফেলে রাখলে; কুকুরটা তা পেয়ে মাংসটুকু খেয়ে বড়িগুলো বেছে ফেলে গেল। ওর যাতায়াতের রাস্তা ছকে নিয়ে দড়ির ফাঁস হাতে অপেক্ষা করে থাকা হলো, কিন্তু দেখা গেল রাস্তা ও বদলে নিয়েছে। এমন কি, লড়িয়ে কুক্কুরিকে উত্তেজিত করে ওর নাগালে রেখে ফাঁদ পাতা হলো, কিন্তু দেখা গেল ফাঁদ ছিঁড়ে ওরা দুজনেই খুশির সঙ্গে পাহাড়ের দিকে উধাও।

চার বছর ধরে কুকুরটার পিছনে লেগে থেকে ম্যাকগাওয়েন ওটাকে একটা বিশেষ জীব মনে করতে থাকে—একটা বিশেষ জাতের প্রতীক। গত সেপ্টেম্বরে কুকুরটিকে গুলীতে হত্যা করার আদেশ হতে ম্যাক-গাওয়েন অসম্মত হয়। বলে, "আর কেউ যাক।" এর পর ম্যাকগাওয়েন বড় রকমের একটা চেষ্টায় হাত দিলে। একদিন সকালে পুলিসের দুখানি এবং ম্যাকগাওয়েনের তিনখানি গাড়ি কড়াভাবে জাল বিছানো অঞ্চলটিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। পল্লীর লোকেও কাছাকাছি তৈরী হয়ে থাকে। ম্যাকগাওয়েনের এক সহকারি নিকোটিন-



মাখানো একটা ছুঁচ পোরা একটা ফাঁকা রাইফেল নিয়ে কুকুরটার ঝিমোবার জায়গার কাছে একটা বাড়ির ছাদে গিয়ে ওঠে। খানিক পরে কুকুরটা এসে ছায়ায় শুয়ে পড়ে। দু ঘণ্টা ধরে বন্দুক-হাতে লোকটি তাক করতে থাকে। তারপরই দড়াম।

কুকুরটা মিনিট পাঁচেক হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল, কিন্তু শিকারিরা কাছাকাছি গিয়ে পড়তেই ও উঠে দাঁড়াল। অন্ধের মতো একটা ধাতব পাতমোড়া গেটের দিকে টলতে টলতে গেল, নোখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো, একটা ফাটলে নাক গলিয়ে দিলে, ঝটাপটি করলে, ধাক্কা দিলে। তারপর নেহাৎই এই হতচকিত পরাজয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে ওকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো।

এত ব্যাপারে কুকুরটা ইতিমধ্যে হিরো হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদপত্র ওকে বাহবা দিতে লাগল। শত শত কুকুরভক্ত লোক ওকে নেবার জন্য পশু আশ্রয় কেন্দ্রে চিঠি পাঠাতে লাগল, ফোন করতে লাগল। ওকে পাবার জন্যে এত চাহিদা হল যে, আশ্রয়-কেন্দ্র শেষে ওকে নিলামে চড়ালে। গত অক্টোবরে শ্রীমতী ডরিস ব্রাউন নামে এক ধনী মহিলা প্রায় সাড়ে ছ'শ টাকায় ওকে পেয়ে যান।

*

কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে এক বেসবল স্টেডিয়াম থেকে দুজন গোয়েন্দা এক একাত্তর বছরের ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে নিয়ে হাজির করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে। অদ্ভুত একটা প্রতি-শ্রুতি, শুনে বিচারপতি অবাক হয়ে যান। বৃদ্ধ লোকটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড় পকেটমারদের একজন। ঐ স্টেডিয়ামে বার বার পকেটমারতে ধরা পড়বার পর শেষবার যখন ধরা পড়ে, তখন গোয়েন্দা দুজনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। শর্ত হয় যে, ও স্টেডিয়ামে যেতে পারবে, কিন্তু যতক্ষণ ওখানে থাকবে ওকে হাতে বক্সিং গ্লাভস পরে থাকতে হবে।

ঘটনার দিন ওকে ধরা হয় হাতে গ্লাভস ছিল না বলে। লোকটি জানায় যে, সে তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়নি, কিন্তু 'গ্লাভস পরে থাকলে চানা-ভাজা বাদাম খেতে পারি না, বেসবল খেলা দেখতে দেখতে ওসব খেতে আমার বড় ভাল লাগে।'

এবারের মতোও ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় এই শর্তে যে, আর কখনো গ্লাভস না-পরা



**অস্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু (প্লাটিপাস) এক সময়ে শিকার করা হতো ওর রোমশ ছালের জন্য। এই অদ্ভুত জীব যা জলে ও স্থলে সমানভাবে বিচরণ করতে পারে, ডিমও পাড়ে আবার স্তন্যপায়ী। হংসচঞ্চু প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৭তে। দু বছর পর ওর চামড়া ইংলণ্ডে পাঠানো হয় এবং যেসব বৈজ্ঞানিক সেটি পরীক্ষা করে তাদের মত হয় যে, ওটা কোন চীনা চর্মকারের কারিগরি। ওরা এত সন্দিহান হয় যে, একজন চামড়ার গা থেকে চঞ্চুটি কাঁচি দিয়ে কেটে আলাদা করে দেখতে উদ্যত হয়। যাই হোক পরে এর মধ্যে চাতুরির কিছু নেই বলে বোঝা যায়। এখন আইন দ্বারা হংসচঞ্চু রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে**

অবস্থায় কোনদিন যেন বেসবল স্টেডিয়ামে হাজির না থাকে।

*

অস্ট্রেলিয়ায় সিডনী শহরে নর্মা মেরী ভ্যান বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী লাভ করে এই অভিযোগ জানিয়ে যে, তার স্বামী বার-কতক বিছানায় চুলকানি পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তার পোশাককে এসিড ছিটিয়ে দিয়েছে, যাতে সেগুলি পরে বের হলেই খসে খসে পড়ে যায়।

*

ইতালীর নেপলসের এক ঘড়ি-নির্মাতা কুম্ভকর্ণদের জন্য এমন একটি এলার্ম ঘড়ির পেটেণ্টের জন্য দরখাস্ত করেছে, যা নির্দিষ্ট সময়ে প্রথমে সাধারণ ক্রিং ক্রং শব্দ করবে, সে শব্দে ঘুম ভেঙে ঘণ্টি বন্ধ না করলে একটা ইলেকট্রিক টেপ বাজতে আরম্ভ করে, যার প্রথম খানিকক্ষণ পর হয় মোটরের হর্নের একটানা শব্দ, তারপর কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং পিস্তলের গুলীর শব্দ হয়ে কামানের গোলার শব্দ।

*

বোর্নিওতে ডাজাক সম্প্রদায়ের এক সুন্দরী কন্যা একদিন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে খানিকটা সাঁতার কেটে যাবার পর অদৃশ্য হয়ে যায়। বহুক্ষণ পর মেয়েটির গ্রামের এক তল্লাসী দল তটের ওপর ওর ঘাঘরা আর একটা ইয়ারিং খুঁজে পেল। ওরা ধরে নিলে যে, মেয়েটিকে নিশ্চয়ই কুমীরে খেয়েছে।

ওঝাদের ডাক পড়ল। ঘণ্টা কতক ধরে মন্তর আওড়ে ওরা সাব্যস্ত করলে, কুমীরটাকে ধরে সাজা দিতে হবে। গ্রামের লোককে ডেকে বললে: "লোহাকাঠের একটা ক্রুশ তৈরী কর। ওতে একটা মোরগছানা বেঁধে জলের ওপরে ঝুলিয়ে দাও। আজ সন্ধ্যেবেলা একটা কুমীর পাখীটা খেতে এসে ধরা পড়বে।"

সূর্যাস্তের পর ওরা নদীতে গিয়ে দেখলে একটা কুমীর মোরগছানাটি খেয়েছে এবং ক্রুশে জড়িয়ে পড়েছে।

কুমীরটাকে টেনে ডাঙায় তোলা হল। তখনও জীবন্ত থাকলেও কোনরকম ঝাপটা-ঝাপটি করলে না।

ডাজাকরা ওকে ঘিরে নৃত্য আরম্ভ করলে। একজন একজন করে কুমীরটাকে খোঁচা মেরে বলতে লাগল: "তুই-ই আসামী। তোকে শাস্তি পেতেই হবে।"

তারপর আরম্ভ হল যাকে বলা যায় পৃথিবীর অদ্ভুততম বিচার অনুষ্ঠান—কুমীর বনাম ডাজাক উপজাতি।

কুমীরটাকে একটা শক্ত খাঁচায় পুরে খোলা আদালতে হাজির করা হলো। সম্প্রদায়ের মোড়ল হল বিচারপতি। প্রবীণরা হল জুরি। এক ওঝা হল ফরিয়াদী পক্ষের উকিল: আর একজন দাঁড়াল আসামী পক্ষের হয়ে।

দর্শকরূপে উপস্থিত ছিল এক রোমান ক্যাথলিক পাদরি এবং এক আমেরিকান রিপোর্টার। ওরা দুজনে বোর্নিওর আভ্যন্তরীণ অঞ্চল দু সপ্তাহ ধরে পরিভ্রমণ করে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সময়টা গত মে মাস।

ফরিয়াদী পক্ষের সোজা বক্তব্য: "কুমীরটি মেয়েটিকে ভক্ষণ করেছে। ওর মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত।" আসামী পক্ষ থেকে বলা হয়: "মেয়েটির ঐ নদীতে সাঁতার কাটতে নামা উচিত হয়নি। বিশেষ আমার মক্কেল যখন ক্ষুধার্ত ছিল।"

জুরি তাদের মতামত ঠিক করতে বসল। ওরা যখন তর্কাতর্কিতে ব্যস্ত কুমীরটি তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। রায় প্রদানকালে ওর ঘুম ভাঙলো: "শাস্তি, মৃত্যু!"

কেটে টুকরো করে ওকে খাওয়া হবে। দর্শক দুজন বিচারপতিকে প্রশ্ন করলে: "নদীতে অত কুমীরের মধ্যে এইটেকেই জুরিরা দোষী সাব্যস্ত করলে কি করে?"

বিচারপতি সহজভাবে উত্তর দিলে: "কারণ, ও নিজের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেনি বলে। ওকে যখন জল থেকে তোলা হচ্ছিল তখন ও পালাতে পারত। ও নিশ্চয়ই দোষী!" এরপর ছুরি শানিয়ে কুমীরকে বধ করা হল। সে সময়েও কোন বাধা এল না তার পক্ষ থেকে। তার পাকস্থলীতে ওরা মেয়েটির অপর ইয়ারিংটাও পেল!

বিচারপতি পরিদর্শক দুজনকে বললে: "দেখলেন তো ওর অপরাধী আচরণ!"

বস্তুত, শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে, বহু পশুও আবেগের ক্ষেত্রে মানুষের মতো আচরণ করে। মানুষের মতো একই ধরনের পীড়া ও আচরণে ওরাও ভোগে।

অনেক হস্তীপালক দেখেছে যে, হাতীদের কখনো কখনো দন্তশূলও হয় এবং মাঝে মাঝে এমন অবসাদে ভোগে যখন তারা খেতে কি কোন কাজ করতে চায় না। মাদী হস্তীরা অনেক সময়ে নিজেদের ইচ্ছে খাটাতে না পারলে চটে যায়।

গণ্ডারেরা কেবল অদূরদর্শীই নয়, বিস্মৃতিশীলও। কাউকে ওরা তাড়া করলে সে ব্যক্তি গণ্ডারের প্রথম ক্ষেপাটে ঝোঁকটা যদি কোনরকমে কাটাতে পারে তাহলে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। কারণ, পুনর্বার তেড়ে আসবার জন্যে ঘুরতে ঘুরতেই ওরা ভুলে যায় কি তাড়া করছিল।

প্রণয় ব্যাপারে পশুদের আচরণ অনেকটা মানুষের মতোই। সম্প্রতি জার্মানীর এক পশুশালায় একটা শ্বেত-ভাল্লুক সতীত্বে সন্দিহান হয়ে তার সঙ্গিনীকে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। কয়েক সপ্তাহ পরে ভাল্লুকটি বুঝতে পারে যে, তার সন্দেহ অমূলক এবং সে কারণেই, ভাল্লুকটির পালকের মতে, সে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেয়।

# ভারতের প্রথম বিস্ফোরক কারখানা

মারণের জন্য নয়, ভারতের বিস্ফোরক দরকার, প্রচুর বিস্ফোরক চাই, নির্মাণ মহাযজ্ঞের পথে সব বাধা অপসারণের জন্য।

বিস্ফোরক চাই খনিজ সম্পদ—কয়লা, লোহাপাথর, সোনা, তামা, অভ্র, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি—খনি থেকে তুলবার জন্য। ভূগর্ভের কোন অতল গহ্বরে পর্দানশিন পেট্রোল সূর্যের আলো প্রত্যক্ষ করবার প্রতীক্ষা করছে তার সন্ধান পাবার জন্য বিস্ফোরক চাই। বাঁধ বাঁধা, সুড়ঙ্গ কাটা, পুল তৈরীর কাজের জন্যও চাই বিস্ফোরক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের নানাবিধ শিল্প উদ্যোগের জন্য যে ৭২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তার প্রায় অর্ধেক শিল্প উদ্যোগেই বিস্ফোরক প্রয়োজন।

ভারতের শিল্প যতই নানাদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে, ততই বিস্ফোরকের প্রয়োজন বাড়ছে। খনি শিল্পের কথাই ধরুন। ১৯৫৬ সালে কয়লা সমেত সব খনিশিল্পেই মোট ৩৯০০ টন বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালে ঐ একই ধরনের কাজের জন্য বিস্ফোরকের প্রয়োজন পড়বে, অনুমান ৮০০০ টন। ভারতে শিল্প সম্প্রসারণ কত দ্রুতগতিতে চলেছে, এর মধ্যেই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

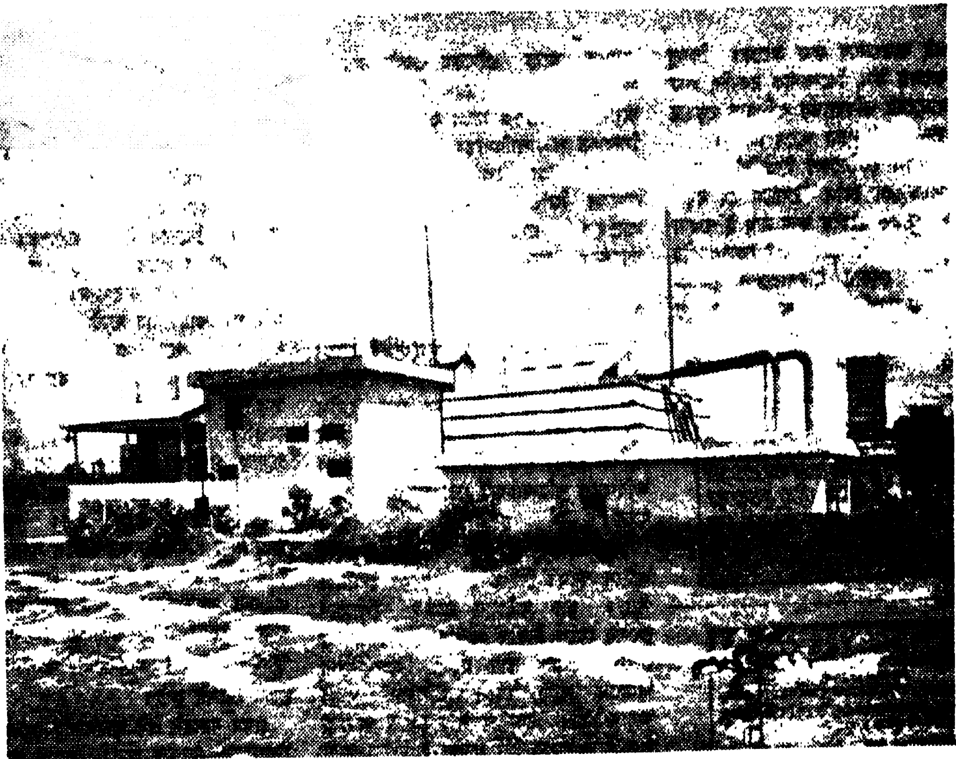
খনি শিল্পই বিস্ফোরকের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার। ১৯৫১—৬৬ সালের মধ্যেই কয়লার উৎপাদন আড়াই গুণ বেড়ে যাবে (এবং তার জন্য বিস্ফোরকের ব্যবহার বেড়ে যাবে চার গুণ)। আর প্রচুর তেজী বিস্ফোরক লাগে চুনাপাথরের পাহাড় ফাটাতে। চুনাপাথরে সিমেণ্ট হয়। ১৯৫০—৫১ সালে সিমেণ্ট তৈরী হয়েছিল ২৭ লক্ষ টন। এই উৎপাদন ১৯৬০—৬১ সালের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে তুলতে হবে এবং ১৯৭০—৭১ সালের মধ্যে ঐ উৎপাদন আরও বাড়িয়ে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টনের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরক ব্যবহারের সংখ্যা অনুপাতে কি সাংখ্যিক পরিমাণেই না বেড়ে যাবে।

এ তো গেল শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা। পূর্ত, সেচ এবং যোগাযোগ সম্প্রসারণের কাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেও বিস্ফোরকের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

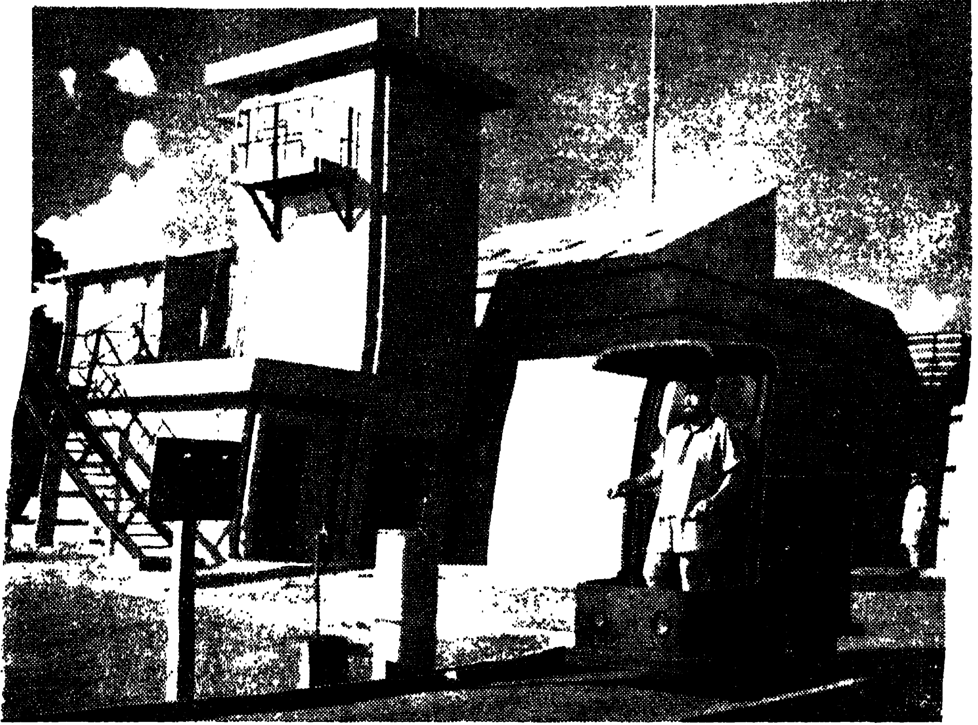
ভারতের শিল্প উদ্যোগে নিত্য ব্যবহারযোগ্য এই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি, কি আশ্চর্য, এতদিন আমাদের দেশে প্রস্তুত হত না, চালান আসত বিদেশ থেকে। প্রকৃতপক্ষে একটি বৃটিশ কোম্পানী ইম্পিরিয়েল কেমিকেল্স ইণ্ডাস্ট্রিজ, এতদিন আমাদের বিস্ফোরক সরবরাহ করে এসেছে কয়েক কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা প্রতি বছর এইজন্য আমাদের ব্যয় করতে হয়েছে

গোমিয়াতে, এতদিন পরে, ভারতের সর্বপ্রথম যে বিস্ফোরক তৈরীর কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তা আমাদের বহুদিনকার একটা অভাব দূর করবে।

কারখানাটি ৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ডা রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বোধন করেন। ছোট ৪০০ ফুট উঁচু এক পাহাড়ের কোলে গোমিয়ার কারখানা। পাহাড়ের ম কারখানাটিও আকারে ছোট কিন্তু আধুনিক তম এবং গুরুত্বে অসাধারণ। মাত্র ৫০



বিস্ফোরক কারখানার বহির্দৃশ্যঃ এই গৃহে 'বিয়াৎসি' পরিকল্পনায় কড়া নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে বিস্ফোরক নির্মিত হয়



উপরে যে ব্যাটারী-চালিত ট্রাক দেখা যাচ্ছে, ঐ ট্রাকে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি বহন করা হয়

লোক এই কারখানায় কাজ করছে। কিন্তু এদের কাজের ফল, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, লক্ষ কোটি মানুষের ভবিষ্যতের বুনিয়াদ গড়বার অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে।

ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ্ আর ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে যে নতুন কোম্পানী গঠিত হয়েছে তার নাম ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্ লিমিটেড। এই কোম্পানীর ৮০ শতাংশ শেয়ার ইম্পিরিয়েল কেমিকেলের আর বাকী ২০ শতাংশ ভারত সরকারের।

ভারত সরকার আর ইম্পিরিয়েল কেমিকেলের মধ্যে এইরকম একটা কারখানা স্থাপনের কথাবার্তা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। ১৯৫৩ সালে কাজে হাত দেবার সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করা হয়।

ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজের নোবেল ডিভিশনের (সদর অফিস স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো) বিশেষজ্ঞরা ভারতে আসেন। অনেক দেখাশোনা খোঁজ খবর করার পর গোমিয়া জায়গাটা তাঁদের বেশ পছন্দ হয়।

গোমিয়া হাজারিবাগ জেলায়, বিহারে। ভারতের সর্বাপেক্ষা ঘনসন্নিবিষ্ট শিল্পাঞ্চলের মধ্যে। এখানে যেমন মৌল উপাদানগুলো সংগ্রহ করার সুবিধা তেমনি সুবিধা তৈরী মাল সরবরাহ করার। কারণ অধিকাংশ খরিদ্দাররাই তো সংলগ্ন অঞ্চলে থাকে।

রেল লাইন আছে। বরকাখানা লুপ লাইনে বামেরা স্টেশনের পশ্চিমেই গোমিয়া পড়ে। চার মাইলের মধ্যেই বোখারো। সেখান থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। সিন্ধ্রি থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে, বিস্ফোরকের অন্যতম মুখ্য মৌল উপাদান, তরল অ্যামোনিয়া। কোনার বাঁধ থেকে আসছে জল আর কলকাতার সাবান প্রস্তুতকারকরা দিচ্ছেন নিরীহ দর্শন গ্লিসারিন। এই সবের সমন্বয়ে এবং এছাড়া আরও নানা উপাদান মিলে তৈরী হচ্ছে বিস্ফোরক। তবে ৯০ শতাংশ উপাদানই এদেশ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং কিছুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারিগর, কর্মী, ইঞ্জিনীয়ার সব ভারতীয়েই নিয়োগ করা হয়েছে। অনেকেই তাঁদের তরুণ। বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত।

দু হাজার একর পাহাড়ি জায়গার উপর গড়ে উঠেছে এই কারখানা। বেশ ছড়িয়ে ছড়িয়ে। কারখানার দুটো ভাগ। পাহাড়ের দুদিকে। পূর্বদিকে 'নিরাপদ' অঞ্চল। বসত বাড়ি, হাসপাতাল, বয়লার স্টেশন প্রভৃতি আর পশ্চিমদিকে "বিপজ্জনক" অঞ্চল। বিস্ফোরক তৈয়ারীর কারখানা, গুদাম প্রভৃতি। নিরাপদ অঞ্চলে সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, এমোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি তৈরী হয়। পাহাড়ের অন্য ধারে "বিপজ্জনক" অঞ্চলে নানা জটিল প্রক্রিয়া মারফৎ বিস্ফোরক প্রস্তুত হয়। এইজন্য সর্বাধুনিক একটি যন্ত্র আমদানী করা হয়েছে সুইজারল্যাণ্ড থেকে, নাম "বিয়াৎসি যন্ত্র"। এই যন্ত্রটি এসিয়ার আর কোন দেশেই নেই।

প্রথম বছরেই এই কারখানায় ৫০০০ টন বিস্ফোরক প্রস্তুত হবে। তাতে প্রায় ১॥ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা বাঁচবে।

## বরিস পাস্তেরনাক

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

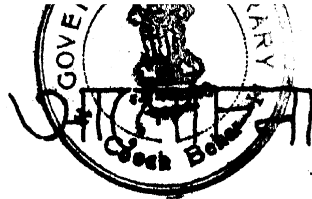
বরিস পাস্তেরনাক সম্পর্কে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যবহুল মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হলাম। পাস্তেরনাককে নোবেল প্রাইজ দেওয়া নিয়ে যে দুঃখজনক বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে তার উত্তাপ হতে দূরে থেকে তিনি যে দুর্লভ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন—একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে তার জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারি না। কিন্তু "ডাঃ জিভাগো"র সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে তিনি যে রায় দিয়েছেন তা মেনে নিতে আমার কিছু দ্বিধা আছে। তাই এই পত্রের অবতারণা।

সাহিত্যিক গুণাগুণ অপেক্ষা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতিই যে নোবেল কমিটির বিচার-বুদ্ধিকে অধিক প্রভাবিত করেছে—এ বিষয়ে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোনো মতবিরোধ নেই। নোবেল কমিটি মতবিরোধের কোনো অবকাশও রাখেন নি। তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন, সোবিয়েত ব্যবস্থার সমালোচনার জন্যই 'ডাঃ জিভাগো'কে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। তাঁরা অবশ্য 'রুশ সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের' ধারাবাহিকতার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে, এই মহান ঐতিহ্যের যাঁরা স্রষ্টা—তলস্তয়, চেহভ বা গর্কি—কারুর প্রতিই নোবেল কমিটি সুপ্রসন্ন হননি। কাজেই রুশ সাহিত্যের "মহান ঐতিহ্যের" প্রতি নোবেল কমিটির এই বিলম্বিত স্বীকৃতির অন্য অর্থ খোঁজা নিশ্চয়ই দোষের নয়।

এ-প্রসঙ্গে সেই অন্ধের হাতী দেখার গল্প মনে পড়ছে। জনকয়েক অন্ধ, হাতীর এক-একটি অংগ হাতড়ে দেখে কৌতূহল নিবৃত্ত করেছিল। ফলত যে পা হাতড়ে দেখেছিল, তার হাতীর ধারণার সঙ্গে যে শুঁড় হাতড়ে দেখেছিল তার রায় মেলে নি, আবার কান যে হাতড়ে দেখেছিল তার বক্তব্য হয়েছিল আর এক রকম। এখানে অবশ্য গল্পটার একটু হের-ফের করা দরকার। এ-ও সেই অন্ধের হাতী দেখার গল্পই, তবে এক্ষেত্রে সব অন্ধই শুঁড় হাতড়ে দেখেছে। ফলত, যারা "ডাঃ জিভাগো"র নিন্দা করছেন বা প্রশংসা করছেন তাঁরা সকলেই শুঁড়কে হাতী বলে ভ্রম করছেন। পাঠ্যাংশ বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি তুলে "সোবিয়েত বিরোধিতার" জন্যে কেউ পাস্তেরনাকের নিন্দাবাদ করছেন, কেউ করছেন জিন্দাবাদ। কিন্তু এটা হচ্ছে রাজনৈতিক বিচারের কথা। সাহিত্যের কারবার জীবন নিয়ে। জীবনের সঙ্গে রাজনীতির যোগ যতটুকু, সাহিত্যের বিচারে রাজনীতির স্থান তার থেকে বেশী নয়।

রাজনীতির বিচারে যাই হোক, সাহিত্যের বিচারে "ডাঃ জিভাগো" নিশ্চয়ই বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির পাশে স্থান পাবার যোগ্য। চিত্তবাবু লিখেছেন : "ডক্টর জিভাগো'র কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। অকারণে নানা ঘটনা ও চরিত্র যোগ করা হয়েছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে এ-অভিযোগ তলস্তয়ের "ওআর অ্যাণ্ড পীস" সম্পর্কেও করা চলে। এ-প্রসঙ্গে একজন সুরসিক ইংরেজ সমালোচকের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, "ওআর অ্যাণ্ড পীস"-এ অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে—তা বাদ দিলে আঙ্গিকের দিক থেকে বই অনেক জমাট বাধত, কিন্তু তাহলে "ওআর অ্যাণ্ড পীস" আর "ওআর অ্যাণ্ড পীস" থাকত না। দস্তয়েভস্কির উপন্যাসও 'কয়েনসিডেন্স'-এ ভরা। কিন্তু তাই বলে তার সাহিত্যিক মূল্য কিছু কমে যায়নি। মহৎ সাহিত্যকর্ম রীতি মেনে চলে না, রীতি সৃষ্টি করে।



গঠনরীতির দিক থেকে 'ডক্টর জিভাগো'তে পাস্তেরনাক নতুন পথ কেটেছেন। Beginning-middle-end-এর প্রচলিত ছক তিনি মানেন নি। ছোট ছোট পরিচ্ছেদ, টুকরো টুকরো ছবি, টুকরো টুকরো ঘটনা একের পর এক সাজিয়ে গেছেন তিনি। প্রথমটা মনে হয় যেন কোনো পরিকল্পনা নেই, সাজানোটা যেন এলোমেলো, কিন্তু যতই কাহিনী অনুসরণ করে এগোনো যায় ততই দেখা যায় একটা সুস্পষ্ট নক্সা রূপ পরিগ্রহ করছে, আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সুবিশাল এক ইমারত। মানুষের জীবনও তো তাই। একের পর এক ঘটনা ঘটে যায়, একের সঙ্গে অপরের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না সব সময়—তারপর দেখা যায় সেই টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মিলিয়ে কখন যেন একটা প্যাটার্ন রচিত হয়ে গেছে। গঠনরীতির দিক থেকে "ডক্টর জিভাগো" জীবনের সমান্তরাল। উপন্যাস হিসেবেও তাই তা জীবনের মতোই বৃহৎ।

একথা ঠিক, পাস্তেরনাক মনোবিশ্লেষণের দিকে ততটা মনোযোগ দেন নি। তা সত্ত্বেও, কোমরাভস্কি, পাশা, লাইবোরিয়াস, তিভেরজিনা, নিকি প্রভৃতি চরিত্রগুলি রক্তমাংসের রূপ পরিগ্রহ করে বইয়ের পাতা ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসে। আর জিভাগো আর লারা চরিত্র যে সুচিত্রিত তা তো চিত্তবাবুই বলেছেন। আর সব কিছু বাদ দিলেও জিভাগো-লারার প্রেম-কাহিনীর জন্যই—এ উপন্যাস মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। ইতিহাসের পাতায় একদিন ধুলো জমবে — কিন্তু লারা-জিভাগোর প্রেম-কাহিনী থাকবে চির-ভাস্বর।

চিত্তবাবু ডক্টর জিভাগো তথা পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে আউটসাইডার মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। আউটসাইডার চরিত্রের লক্ষণ জিভাগোতে কিছু আছে বটে, কিন্তু জিভাগো নিষ্ক্রিয় হলেও উদাসীন নয় এবং নিষ্ক্রিয়তা তার মজ্জাগত নয়। জিভাগো ঠিক বিপ্লব-বিরোধী নয়—তার সমস্যা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার সমস্যা, তার সমালোচনা আসলে বিপ্লবের নিবার্য কঠোরতা এবং সন্দেহপরায়ণতার বিরুদ্ধে। জিভাগো নতুন সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলেই তার ব্যক্তিত্ব ভেঙে দুমড়ে গেছে, কূর্মের মতো নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে হয়েছে তাকে। বিপ্লবের অরাজক দিনগুলিতে সে একদিকে দেখেছে, সুবিধাভোগী শ্রেণী সুবিধা হতে বঞ্চিত হতেই চাকচিক্য হারিয়ে ফেলেছে, অপরদিকে সুযোগসন্ধানীরা রাতারাতি ভোল বদলে বিপ্লবী সেজে গেছে, শুধু তাই নয়, সত্যিকারের বিপ্লবীদের তারা অনেক সময় হটিয়ে দিয়েছে। জিভাগোর মতো বিবেকবান লোকেদের তারাই আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে—মানসিকভাবে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে তারা তাই একাত্ম হতে পারে নি। এই জন্যই জিভাগো নিষ্ক্রিয়। আউটসাইডার চরিত্রের সঙ্গে জিভাগোর মিল শুধু বহিরঙ্গেরই। বরং

জিভাগো চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় হ্যামলেট চরিত্রের।

তাছাড়া, পাস্তেরনাক সম্ভবত আশংকা করেছিলেন এই বইকে রাজনৈতিক মূলধন করার চেষ্টা হবে। সেই কারণেই বোধহয় জিভাগোর মতো নিষ্ক্রিয় চরিত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে,যাতে তার জীবনচিত্র হতে পারে যথাসম্ভব বিষয়মুখ। পাস্তেরনাকের সোভিয়েত-জীবনের সমালোচনায় তীব্রতা নেই, (কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে বরং আরও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে সোভিয়েত জীবনের নানা দিকের) আছে এর গভীর বেদনাবোধ। আর তাই ডক্টর জিভাগো মনকে এত নাড়া দেয়।

অনুবাদ সম্পর্কে চিত্রবাবু যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গেও একমত হতে পারলাম না। অনুবাদকদ্বয় ভূমিকাতেই বলেছেন পাস্তেরনাকের ভাষার মাধুর্য এবং শব্দ ঝংকার তাঁরা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেন নি। রুশ ভাষা জানি না, এবং জিভাগো রুশ ভাষায় এখনও প্রকাশিত হয়নি—কাজেই অনুবাদ কতটা মূলানুগ তা বলা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও, অনুবাদে পাস্তেরনাকের রচনাশৈলীর অপূর্ব কাব্যমাধুর্যের যথেষ্ট পরিচয় ডক্টর জিভাগোর প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। স্থানাভাব, নইলে উদাহরণ দিতাম। ইতি—প্রদ্যোৎ গুহ।

### গণ্ডভেরুণ্ড

সবিনয় নিবেদন,

১লা নভেম্বর দেশ পত্রিকায় "গণ্ডভেরুণ্ড" নামক প্রবন্ধটি পড়ে বাস্তবিকই খুবই আনন্দিত হলাম। লেখক নেভীকে ভালভাবেই চিনতে পেরেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর এই লেখার সত্যতা সম্বন্ধে যদি কেউ প্রমাণ চান তাহলে তাঁকে আমি মাত্র এই অনুরোধ করব, যেন তিনি দয়া করে স্থলবর্তী নেভীর ব্যারাকে, ডিমব সেকশনে গিয়ে এক-একজনকে জিজ্ঞাসা করেন তারা কেন নেভী থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য এত উৎসাহিত। শত শত নাবিক বাহিরের চাকরীর বাজার জানা থাকা সত্ত্বেও কেন বাহিরে যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত। যারা ১০ বৎসর চাকরী করে চলে যাচ্ছে তারা কি আর পাঁচ বৎসর চাকরী করে পেনশন নিয়ে যেতে পারে না? কিন্তু মন ভেঙে গেছে এই ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতায়। ইচ্ছে করে কেউ যেমন সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যায় না, সেইরূপ এই শত শত নাবিকও ইচ্ছে করে কখনও চাকরী ছেড়ে বাহিরের অন্ধকারে ভেসে বেড়াতে চায় না।

যতদিন না ভারতীয় নেভীর অফিসারেরা ভারতীয় নাবিকের মনকে ভাল ব্যবহারের দ্বারা জয় না করতে পারবে, ততদিন ভারতীয় নেভীর কোন উন্নতি নেই। ভারতীয় সরকারের কাছে আমার এইটুকু অনুরোধ তাঁরা যেন অফিসার-দের বেলায় Golden rules আর নাবিকের বেলায় Iron rules না চালান, যা বর্তমানে চলছে। আর অফিসারদের জমিদারী মনোভাব যতদিন না বদলাবে ততদিন নেভীর উন্নতিও নেই।

আজ ভারতীয় নাবিকদের মনের অবস্থা শেষ সীমায় এসে পেঁছেছে, কিন্তু এখনও সময় আছে।

আমি গত নয় বছর নেভীতে কাজ করছি। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যটুকু পেশ করলাম। ইতি—জনৈক নাবিক, বোম্বাই।



### ভারতীয় সংগীতের আধ্যাত্মিক ভিত্তি

সবিনয় নিবেদন,

১লা নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গানের আসর'এ শার্ঙ্গদেব 'ভারতীয় সংগীতের আধ্যাত্মিক ভিত্তি' সম্পর্কিত বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের একটি সাম্প্রতিক উক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মহান সংগীতের এমন একটি লক্ষণ আছে—যা উভয় ক্ষেত্রেই (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয়বিধ সংগীতে) এক। ...উভয় ক্ষেত্রেই অনুভূতি এক ধ্যানলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে"। তাঁর এই উক্তির সঙ্গে একমত হয়েও বলব যে শার্ঙ্গদেব ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রভাবকে হীনমান করবার চেষ্টা করেছেন।

গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল যে 'কাব্য', 'দর্শন', 'অধ্যাত্মবাদ' বা 'বস্তুবাদ' থেকে 'সংগীত' রস আহরণ করলেও তার অনুভূতি নিজ প্রকৃতিগত (সাংগীতিক)ই থেকে যায় এবং কখনই নিছক 'কাব্যিক' 'আধ্যাত্মিক' হয়ে যায় না। (কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক অবশ্য সেই Abstract অনুভূতিকে নিজের চিন্তা-ধারার রঙে কিছুটা রাঙিয়ে নিতে পারেন এবং নেনও।) আমরা বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের উক্তিটি সম্পর্কে এইটুকু বিচার করব যে ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের উপর অধ্যাত্ম-বাদের ও অধ্যাত্ম চিন্তাধারার কোন সুদৃঢ় প্রভাব আছে কিনা।

শার্ঙ্গদেব বলেছেন, "আমাদের বর্তমান সংগীত ভরতের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত"। তিনি উপাখ্যান ও উদ্ধৃতি সহকারে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, "আমাদের সংগীতের ভিত্তি হচ্ছে ঐ 'কৈশিকী চারুবিলাসযুক্তা' জন-মনোরঞ্জন হচ্ছে আমাদের সংগীতের মূল কথা —এর মধ্যে spiritual approach এনে ফেলবার সুযোগ কোথায়?" পরিতাপের বিষয়, শার্ঙ্গদেবের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা একদিকদর্শী হয়ে করেছেন এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্র-সম্পর্কিত আলোচনাকেই ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিস্বরূপ বলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য, "নারদীশিক্ষাকে আমরা অবশ্যই নাট্যশাস্ত্রের (ভরতের) চেয়ে প্রাচীন বলবো। ...নাট্যশিল্পের প্রসঙ্গে গান, গীতি ও গান্ধর্বের যতটুকু আলোচনা দরকার ততটুকুই ভরত নাট্যশাস্ত্রে করেছেন, কেবলই গান তথা সংগীতের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন নি" ('রাগ ও রূপ', পাতা ১৩৮)। তারপর দেখা যাক, "জন-মনোরঞ্জনই হচ্ছে আমাদের সংগীতের মূল-কথা"—এই উক্তিই বা কতখানি সমর্থনযোগ্য।

আধ্যাত্মিক ভাব ছাড়াও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ভারতীয় রাগ সংগীতের বিকাশকে প্রাণবন্ত করেছে একথা স্বীকার করেও, প্রচুর প্রমাণের ভিত্তিতেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মন্তব্য করেছেন, "ভারতীয় সংগীত কেবলই মানসিক আনন্দ ও ভাববিলাসের সামগ্রী নয়, তা অধ্যাত্ম-সাধনার পরিপূর্ণ প্রতীক। ঐতিহাসিক বিচার ও ক্রমবিকাশের বিকাশভঙ্গির কথা ছেড়ে দিলে রাগরাগিণীদের সৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্মকামী সাধকদের যে ধ্যানলোকেরই পবিত্র প্রতিচ্ছবি একথা নিঃসন্দেহে সকলে স্বীকার করেন।" বস্তুত, ভারতীয় সংগীতে রাগরূপ কল্পনার উপর হিন্দুদর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সুদৃঢ় প্রভাব লক্ষ্য করা মোটেই দুরূহ নয়। পণ্ডিত সোমনাথ রাগরাগিণীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে দার্শনিকী যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, "রূপমনেকং তদ্ রাগস্য নাদময়মেবম্, অথ দেবতাময়মিহ ক্রমতঃ কথয়ে"—সমস্ত রাগ ও রাগিণীকেই তিনি নাদ ও দেবতাময় চিন্তা করেছেন এবং সেই চিন্তা সংগীতশিল্পীদের শতাব্দী ধরে অনুপ্রাণিত করেছে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে, রাগরূপ পরিকল্পনায় তেমন একটা spiritual ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এমন নয়।" ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর উক্তির আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা করবেন আশা করি।

মহান সংগীত সাধক তানসেন বলেছেন, "নাদ ঈশ্বররূপী অমৃতরস জিতনা জাকো মিলে তিতনোই পীজিয়ে" — নাদ ঈশ্বররূপী অমৃতের রস, যাঁহার ভাগ্যে ইহার যতটুকু ঘটে, তিনি ততটুকুই পান করুন। 'জনমনোরঞ্জন' নিশ্চয়ই সংগীতের লক্ষ্যের মধ্যে কিন্তু তা কি ভারতের সংগীত সাধকেরা চরমলক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, "আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ, হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্য, যে মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়িতে, কানাড়ায়।" কবিগুরুর যে অ-"প্রধান" আনন্দ বিতরণে (সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে) বিতৃষ্ণা ছিল এমন নয়, কিন্তু 'প্রধানে'র প্রাধান্য দিতে তিনি বিমুখ হননি।

শার্ঙ্গদেবকে তাঁর বক্তব্য আরো বিস্তৃতভাবে বলবার জন্য অনুরোধ জানাবার আগে ভারতীয় সংগীতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য শেষ করছি। ভারতীয় সংগীতের আধ্যাত্মিক ভিত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে, রাগ-রাগিণীর বিস্তার ও আলাপনের ধ্যানরূপ বিচার করা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া, (১) ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ এর গায়কী, বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্ভার—, (২) বিভিন্ন রাগের চিত্ররূপ ও নামকরণ (যথা, শংকরা, শিবরঞ্জনী, দুর্গা, গৌরী, ভৈরব, বাগেশ্বরী, রাগেশ্বরী, নট-নারায়ণ, মীরাবাঈ কি মল্লার, সুরদাসী ও গুরু নানককি মল্লার ইত্যাদি), (৩) শ্যাম ও রাধা বিষয়ক খেয়াল ও ঠুংরি গানের বাণী, (৪) ভজন, কীর্তন, বাউল শ্যামাসংগীত ইত্যাদি গানের ভাবসম্পদ — সম্পর্কিত আলোচনা ব্যতিরেকে ভারতীয় সংগীতের আধ্যাত্মিক ভিত্তি অস্বীকার করা নেহাত অসমীচীন হবে। আধুনিক যুগেও, অতুলপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের কতগুলিই বা আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বিলায়েৎ খাঁ সাহেব একথা বলেন নি যে, ভারতীয় সংগীতের অনুভূতি নিছক আধ্যাত্মিক; তিনি বোধহয় এইটুকুই বলতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় সংগীত হচ্ছে, "based on spiritual approach"। সেই basis বা বনিয়াদের অনস্তিত্ব (?) সম্পর্কে আরো সবিস্তার আলোচনা শার্ঙ্গদেবের কাছ থেকে আশা করছি। ইতি—অরুণকুমার বিশ্বাস, কলিকাতা।



# পা

দেবেশ রায়



যেমনটা কথা ছিল ঠিক তেমনিই হল।

প্রতিদিনের মত সেই দিনটিও তারা রাত আটটা পর্যন্ত কাটাল। রান্নাবান্না মিটিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে থাকল, আবার উঠোনের মধ্যে একটু হাঁটাফেরা করল, হাঁটতে হাঁটতে বাইরে এল, বাইরে হাঁটতে হাঁটতে একটু এগুলে, তারপর দুজনই দৌড় দিল।

বড় বৌ মরেছে এবং ছোট বৌ এক-পা কাটা হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। দুজনই মরতে গিয়েছিল। একজন মরল, আর একজন মরতে না পেরে পালাতে গিয়ে পা-কাটা হল। তাহলে কি তাদের দুজনেরই মরতে অনিচ্ছে ছিল? তবে কি তারা সারা-দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জানিয়ে দিয়েছে —আমরা কিন্তু আজ মরতে যাব, আমাদের বাঁচাও। কেউ সে-কথা শোনে নি, বোঝেনি, তাই......! সবাই দূরে রেলওয়ে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে তাকায়। একটা নীল, তার উপরে একটা লাল গোল আলো। টকটক করছে না। স্থির হয়ে আছে। ওর তলায়, ঠিক ওর তলায়, বড় বৌয়ের শরীরটা এখন তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। গলাটা এক টুকরো, মাঝের ধড়টুকু এক টুকরো। ধড় থেকে আলাদা হয়ে শাড়ি জড়ানো দুটো, প্রায় পুরো পা ছিটকে আছে খানিকটা দূরে। শাড়ি জড়ানো না থাকলে পা দুটো আলাদা আলাদা হয়ে ছিটকে যেত।

তাহলে আর একটা আলাদা প্রায় পুরো পায়ের সঙ্গে বড় বৌয়ের পা দুটো মিশে যেত। পুলিসের সার্চ লাইটের আলোতে সেই পা-টা ধবধব করছে। উরুর যেখান থেকে কেটেছে, সমস্তটা জায়গা জুড়ে লাল, থিকথিকে লাল, কাটা-পাঁঠার ঘাড়ের মত। ছোট বৌয়ের হাঁটুর উপরে একটা কালো জট। কাটা হলদেটে ফরসা পায়ে কালো জট। ছোট বৌয়ের উরুর ভেতরে একটা হাড়ও ঠিক সমান মাপে কাটা গেছে। একটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে কোনো কলাগাছের মাঝখান থেকে কেটে দিলে তার সাদা সাদা, ভেজা ভেজা,, একটু খসখসে উপরিভাগের মত, ছোট বৌয়ের উরুর মাংস আর চর্বিতে মেশা গোল করে কাটা জায়গাটা লাল, ভেজা ভেজা, একটু খসখসে।

ছোট বৌ এখন হাসপাতালে সাত-আটজন ডাক্তারে ঘেরা হয়ে নল দিয়ে নিশ্বাস টানছে। ছোট বৌ যদি বাঁচে, আর তিনটি পা যদি তার কাছে দেখানো যায়, নিজের পা সে পছন্দ করে নিতে পারবে?

অবশ্য ছোট বৌ বাঁচলেও আর বাঁচবে না। একবার যারা আত্মহত্যা করে মরতে যায়, তারা আত্মহত্যা করেই মরে। একবার এক গ্রামে...। আমাদের শহরেও...। আমার পিসেমশাইয়ের ভাই...। আমাদের পাশের বাড়িতে...।

কিন্তু মরবার পরের সত্যটাকে আবিষ্কার করবার জন্যই মরবার আগের সত্যটা জানা দরকার। অবশ্য সত্যটা যে কী, সেটাই সমস্যা। হাসপাতালে ছোট বৌ অজ্ঞান হয়ে হয়ত বেশিক্ষণ থাকতো না, কিন্তু তাকে রাখা হল জ্ঞানহীন করে। দেড়দিন পর ছোট বৌ চোখ খুলল। ছোট বৌ চোখজোড়া খুলল আর বন্ধ করল। সেই সময়টুকুর মধ্যেই দেখা গেল, তার চোখের শাদা অংশটা হলদেটে, তাতে ছোট ছোট লালশিরা। মণিটা চকচক করে উঠল। চোখের নিচের তীর দুটো শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটের মত রুক্ষ, জলহীন। ঠোঁট দুটো ছোট বৌয়ের একটু ফাঁক ছিল, সেটা খড়খড়ে, ফেটে গেছে যেন। ছোট বৌ প্রথম চোখ খুলে কী দেখে, এটা সবারই জিজ্ঞাসা ছিল। ছোট বৌয়ের চাউনি দেখামাত্র যে যার মত বারান্দায় চলে গেল। তাদের সবারই মনে হচ্ছিল, ছোট বৌ সাধারণ ও স্বাভাবিক নয়। এবং অসাধারণতা ও অস্বাভাবিকতার প্রথম ধাক্কাটা ছোট বৌয়ের স্বামীকেই সামলাতে দেওয়া উচিত। ছোট বৌ চোখ খোলার পর ছোটবাবুর চোখ পড়ল গত দেড়দিনের সবচেয়ে বেশি দেখা দৃশ্যটার উপর। যখন ব্যাণ্ডেজ, ইনজেকশন ইত্যাদি সব কিছু শেষ করে নার্স ছোট বৌয়ের গায়ের উপর একটা লাল কম্বল দিয়ে যায়, তখুনি ছোটবাবু প্রথম দেখলেন ছোট বৌয়ের কোমরের নিচের কম্বলের অংশটার ভাঁজ অন্য রকম। ছোট বৌয়ের ডান দিকটার উঁচু থেকে সব ভাঁজ বাঁ দিকের

ঢালুতে গিয়ে পড়েছে: সেই তখন থেকে এ দৃশ্যটা ছোটবাবুর চোখকে বার বার টানছে। আর নতুন করে টানল ঠিক এখন যখন ছোট বৌ প্রথম চোখ মেলে চাইল।

ছোট বৌ এমন অনেকবার চোখ খুলল, বন্ধ করল। দ্বিতীয়বার চোখ খোলার পর থেকেই ফাঁক ঠোঁট-দুটো সে বুজিয়ে দিল। ঠোঁট বন্ধ করে নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল। আবার চোখ খুলল। মণিটাকে চোখের চারপাশে ঘুরিয়ে আবার বন্ধ করল। যেন চোখের তীরগুলোয় শুকিয়ে যাওয়া কাজলের কালিমা দেখা গেল। ছোট বৌয়ের কপালের দুটো পাশ, ভুরুর দুটো দিক, নাকের পাটা, চিবুক, আর গলাটা দেখাচ্ছিল রুক্ষ, কর্কশ, রোদে পোড়া কচি লিচু পাতার মত। ঠোঁট বন্ধ করার পর থেকে ধীরে ধীরে ঐ সব জায়গা ঘামতে লাগল। গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম নয়, কপালটা পুরো, গলাটা পুরো ভিজে উঠল। ঘামের বিন্দু নেই, কিন্তু ভিজে। নাকের পাটা আর চিবুকে জলবিন্দু আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম।

প্রথম চোখ খোলা ও বন্ধ করা থেকে *পুরো একটা কথা বলার আগে ছোট বৌয়ের শরীরে তেমনি একটা অনুভূতি হচ্ছিল, খুব চেনা কোনো ফাঁকায়, খুব দেখা, কোনো গাছ কেটে দিলে আকাশটি দেখতে যেমন খালি খালি লাগে, অথচ বোঝা যায় না কেন অমন লাগছে। ছোট বৌ সে রকম একটা অনুভূতি নিয়ে ঘামছিল, আর যন্ত্রণার দু একটি শব্দ গলা দিয়ে বের করছিল।*

*ছোট বৌ প্রথম সমস্যায় পড়ল সে কোন কথা বলবে।* প্রথম চোখ খোলার পর থেকেই এই সমস্যাটা ছোট বৌয়ের মনে এসেছে। সারা শরীরটায় এতো ক্লান্তি যে, শরীরটার অস্তিত্বই ভুলিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ সময় হতচেতন হয়ে থাকার জন্য নিজের চার পাশটাকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। সে নিজের মনে সেই ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতিটার ঠিক অর্থ ধরতে পেরেছিল। অর্থ ধরতে পারার সংগে সংগেই সে চোখ বন্ধ করেছিল, চোখ বন্ধ করার মুহূর্তেই যেন ছোট বৌ ছুটন্ত ট্রেনটা দেখতে পেল। ছুটন্ত ট্রেন, একটা ছিটকোনো মুণ্ডু, একটা শায়িত শরীর পলকের মধ্যে শূন্যে ধনুকের বাঁক এঁকে সোজা, আঘাত, হাসপাতাল। এবার ছোট বৌ ঠিক মেলাতে পারল। আবার চোখ খুলল—বর্তমানটাকে দেখবার জন্য। তার স্বামী শিয়রে বসা, তার পাশের বাড়ির বৌটি পাশের টুলে, বাইরে আরো কিছু কথাবার্তা। ছোট বৌ চোখ বন্ধ করল। প্রথম চোখ খোলার পর থেকে শরীরের অসহ্য ক্লান্তি ও অনুভূতির ভারি স্থবিরতাকে চাপা দিয়ে এ চিন্তাই সে বারবার করছিল—তার স্বামী শিয়রে বসে। সে ছোটবাবুর স্ত্রী, মরতে গিয়েছিল। মরতে পারে নি। ছোটবাবুর রাগত চেহারাটা বিরক্ত চেহারাটা কি রকম? কিন্তু রাগ বিরক্তি কিছুই না থাকলেই ছোট *বৌ কি করবে? এখনই বা কি করবে? কোন কথা প্রথম বলবে। ছোট বৌ বুঝেছিল সে বাড়িতে শুয়ে নেই, তাতে ওটাই তার মনে হল সে স্বাভাবিক ও সাধারণ নয়।*

*পুনর্জাগরণের তন্দ্রার মধ্যে বারবারই ছোট-বৌয়ের মনে হচ্ছিল—কি কথা প্রথম বলব?* জ্বরতপ্ত রোগী যেমন বিকারের ঘোরে কোনো কথা শুনে কিছুতেই বুঝতে পারে না কী করে সেটা বানান করবে। কী বলব, কী বলব, কী বলব, কী বলব—কুরে কুরে খেতে লাগল ছোট বৌয়ের থমথমে মাথাটাকে। সে চোখ খুলে পারিপার্শ্বিক খতিয়ে দেখতে চাইল। জানলা দিয়ে ক্ষণিকের জন্য দেখতে পাওয়া বিকেলকে মেলাতে চাইল সেদিনের সেই রাত্রির সংগে। আর, কোনোবারই না পেরে চোখ খোলে, বন্ধ করে, চোখ খোলে, বন্ধ করে। তারপর উঃ আঃ শব্দ করে। চোখটা ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকায়, তাকিয়েই ঘুরিয়ে নেয়। বন্ধ করে। তারপর সেই ঘুনপোকা মাথা কাটে—কী বলব কী বলব কী বলব। ছোটবৌ শুনল, কে বলছে—"তোমার অসুবিধা হচ্ছে কোনো?" কথাটা শোনার পর মাথার সেই ঘুনপোকাটা থামল, থেমেই আবার মাথা কাটা শুরু করল। পা চুলকোচ্ছে খুব, পা চুলকোচ্ছে। আর বারকয়েক উঃ আঃ করে ছোটবৌ শেষে বলে ফেলল "পা জ্বালা করছে খুব, কষ্ট হচ্ছে—চুলকোচ্ছে!" বলে ফেলার পর ছোটবৌ অনুভব করল তার মাথায় এতক্ষণ স্বামীর হাত ছিল। সেই অনুভূতির পরই আবার সেই উচ্চারিত বাক্যের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। কথা-গুলো মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে যেন একই প্রশ্নের জবাব খুঁজছে—প্রথম কথাটা স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে গেল না তো! নার্স দেখে গেল, আশ্বাস পাওয়া গেল। ছোটবৌ চোখ খুলল না। সে চোখ না খুলেই বাঁ-*হাতটা একটু সরাল। সেটা ছোটবাবুর ঠিক হাঁটুর ওপর গিয়ে পড়ল। তারপরই ছোটবৌ একটু থেমে থেমে, একটু খুনিয়ে খুনিয়ে বলল—"আমার সেই লাল চুমকি দেয়া স্যাণ্ডেলটা কিনে দেবে?" ছোটবাবু আবার ছোটবৌয়ের মাথায় হাত দিলেন। ছোটবাবু বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো হয়ে ওঠো, নিশ্চয়ই কিনে দেব।"*

*ছোটবৌয়ের প্রথম কথা শোনবার জন্য* যারা আগ্রহী ছিল, তারা মনে মনে প্রস্তুতই ছিল অস্বাভাবিক কিছু শোনবার জন্য। প্রস্তুত থাকলেও কেমন এক ভীরুতা ছিল।

তাই ছোটবৌ চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বাইরে চলে গিয়েছিল। বাইরে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল, আর কানসুদ্ধ মনটা ছিল ছোটবৌয়ের বিছানার পাশে। ঘরের ভিতরে দু-একটা শব্দ, নার্সের পায়ের খট্‌খট্‌, দু-একবার ঈষৎ জড়িত একটা কণ্ঠস্বর শুনেই তারা আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তখনই তারা শুনল ছোটবৌ কথা বলেছে। স্বামীকে লাল চুমকি দেয়া স্যাণ্ডেল কিনে দিতে বলে এখন ঘুমুচ্ছে। ছোটবৌয়ের বিছানার পাশে টুলের উপরে বসা পাশের বাড়ির বৌটিই এসে কথাগুলো জানাল। জানিয়ে, সবার মাঝখান দিয়ে পথ করে বারান্দায় বেরিয়ে এল, এই আশায় যে, সবাই এখন বাইরে এসে ছোটবৌয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করবে। আর তারা করলোও তাই।

"যাক জ্ঞান হয়েছে তা হলে?"

"দেড় দিন ত গেল!"

"দেড় দিন যেমন গেল, একখানা পাও তেমনি গেছে!'

"লাল চুমকি দেয়া স্যাণ্ডেল? কী বলল?"

"চাইবেই ত, এখন বারবার পায়ের কথাই মনে হবে!" ছোটবৌ তখন, আবার খানিকক্ষণ আঃ উঃ করে, ছোটবাবুর হাঁটুর কাছে পড়ে থাকা হাতটা কোলের ওপর তুলে দিয়ে বলল—"আমি কাত হব।"

"কথা বোলো না, ঘুমিয়ে থাক"—ছোটবাবু বললেন।

"আমি কাত হব!" অপরিষ্কার কান্নায় ছোটবৌয়ের গলার স্বরে আনুনাসিক।

"তুমি ঘুমোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি"—ছোটবাবু ছোটবৌয়ের কপালের উপর রাখা হাতটা তুলে কোলের উপর ফেলা হাতটায় রাখলেন।

"আমি কাত হব"—ছোটবৌয়ের জেদি কথাগুলো একেবারে বাচ্চাদের মতো শোনাল। ভঙ্গিটা বাচ্চাদের কিন্তু স্বরটা নয়। ছোটবাবু বুঝলেন, ছোটবৌ বাচ্চা নয়, বাচ্চার মা। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে বললেন—"আপনি এখানে বসুন আমি থাকলেই কথা বলবে।" ভদ্রমহিলা কাছে এলেন। ছোটবাবু সন্তর্পণে খাট থেকে নামলেন, ছোটবৌয়ের হাতটা নিজের হাতে ধরে। ভদ্রমহিলা ছোটবাবুর জায়গায় বসলেন। ভদ্রমহিলার কোলে ছোটবৌয়ের হাতখানা শুইয়ে ছোটবাবু বাইরে বেরিয়ে গেলেন, ছোটবৌ সবই টের পেল, কিন্তু আবছাভাবে। ঘুমন্ত বাচ্চাকে অনেক রাতে জাগিয়ে খাইয়ে দিলে, পরদিন সকালে সে যেমন ভেবে পায় না, গতরাতের খাওয়াটা স্বপ্ন না সত্যি, তেমনি ছোটবাবুর ওঠা ও ভদ্রমহিলা বসার পর মিনিট দুয়েক না যেতেই ছোটবৌয়ের মনে হল ছোটবাবুর উঠে যাওয়াটা স্বপ্ন না সত্যি। ছোটবৌয়ের দেহ ও মনের সবটুকু নিথর ও নিস্তব্ধ, সেখানে গতি নেই। সেটুকু গতি না থাকলে ছোটবৌ বেঁচেই থাকত না, বেঁচে আছে বলেই সেটুকু গতি সে বুঝছে না। ফলে বাইরের কোনো গতি এসে তার সেই নীরব নিথর অস্তিত্বে ধাক্কা দিলে সেটা গভীরতায় পৌঁছুচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে। তেমনি, ছোটবাবুর উপস্থিতিটা এতক্ষণ ছোটবৌ স্পর্শদ্বারা বুঝছিল। ছোটবাবু নেমে আবার তার হাতটা পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার কোলে রেখে গেছেন। ছোটবৌয়ের নিথর হাতে দু মিনিটের মধ্যে সেইই কোল পরিবর্তনের গতিটা হারিয়ে গেছে। গভীর নীরব রাতে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ম শব্দে জেগে উঠে কয়েক মুহূর্ত পরে যেমন মনে হয় কোনো শব্দই হয়নি, তেমনি ছোটবাবুর নেমে যাওয়া আর ভদ্রমহিলার বসা—এই ঘটনাটা ঘটায় কয়েক মুহূর্ত পরেই ছোটবৌয়ের মনে হল ঘটনাটা ঘটেনি।

নাড়ান-চাড়ানয় ছোটবৌয়ের হাতটা উপুড় হয়ে ভদ্রমহিলার কোলের উপর পড়ল। আবার সেই ঘটেনি-মনে-হওয়া ঘটনাটা ঘটেছে বলে মনে হল। হাতটা নাড়ান-চাড়ানয় কোন শক্ত কর্কশ উরুর ছোঁয়া মিলল না। মেয়েদের উরু, নিশ্চয় কোনো মেয়ে বসে আছে শিয়রে, মেয়েদের উরু নরম, নরম ফরসা পা, একটা পাথরের বিছানায় অস্বস্তিকর শোয়া, এ-বিছানাটা পাথরের মতো শক্ত. 'আমি কাত হব'—'ঘুমোও'—পাথরের বিছানায় ঘুম আসে না, ঘুম না-আসার জন্যও মানুষ শোয়, লোহার বালিশে ঘাড়, ঘাড়ের নরম মাংসে লোহার ঠাণ্ডা, বালিসের উপর দিয়ে বেণী, বালিশটায় কাঁপন, লোহার বালিশটা কাঁপে, গর্জন, চোখ বন্ধ, কান খোলা, বন্ধ চোখে আলোর সূঁচ, চোখ খোলা, খণ্ড খণ্ড শরীর শিটকে দাঁড়ান, দারুন ধাক্কা, সাদা ধবধবে পায়ে কালো জট, কী বলব, কী বলব, হাসপাতালে এক-পা কাটা, বড়দি দু-পা কাটা, মাথা কাটা, মরা, বড়দি মারা গেছে, আমি বেঁচে গেছি, আমি অস্বাভাবিক, পা কাটা, আমার পায়ে জ্বালা, আমি মরতে পারিনি, আমার গায়ে ব্যথা, আমি মরতে পারিনি। ছোটবৌ আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

২

দুই বগলে দুই ক্রাচ নিয়ে রিক্‌শা থেকে নেমে নিজের ঘরে খাটের ওপর এসে বসার মধ্যেই ছোটবৌ লক্ষ্য করল বড়দির ঘরে তাঁর একটা ছবি বড় করে টাঙান। বড়দির পরনে কল্কাপেড়ে শাড়ি, বড়দির মোটা গোলগাল চেহারাটা পরিষ্কার।

রিক্‌শা থেকে তার নিজের ঘর পর্যন্ত যাওয়ার মধ্যেই বাড়ির আর সবাই দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করল যে, ছোটবৌর সামনের কটা দাঁত একটু উঁচু। ছোটবৌকে সে কারণে ঠোঁট বন্ধ করে থাকতে হত। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার পর, ছোটবৌয়ের ঠোঁটদুটো বড় বেশি চাপা এবং

শক্ত। ছোটবৌয়ের দাঁত যে উঁচু এটা বাড়ির লোক প্রথম আবিষ্কার করেছিল বিয়ের পর। দ্বিতীয়বার আবিষ্কার হল হাসপাতাল থেকে ফেরার পর। ঠোঁট দুটো মিলে থাকায়, ছোটবৌয়ের নাকের দু-পাশ থেকে দুটো রেখা বেরিয়ে উপরের ঠোঁটের কোণ দিয়ে নিচের ঠোঁটের পাশ দিয়ে থুতনিতে মিশেছে। পুরনো ভাঁজ করা চিঠির ভাঁজ ভাঙলে যেমন অপ্রকট অথচ স্পষ্ট ভাঁজের দাগ দেখা যায়, ছোটবৌয়ের নাকের দু পাশ থেকে ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে থুতনিতে এসে মেশা তেমনি-দাগ, কিন্তু এই প্রথম দেখল বাড়ির সবাই। নিজের ঘরের খাটের উপর বসে ছোটবৌ টের পেল না, একটা নতুন অভ্যাস সে হাসপাতাল থেকে আয়ত্ত করে এনেছে। ঠোঁটের শুকনো মরা-চামড়া তুলবার জন্য ছোটবৌ শুয়ে থেকে থেকে দাঁত দিয়ে ঠোঁটের চামড়া খুঁটত। নিজের ঘরে খাটের উপর বসে নিজের বহু পুরনো বিয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছোটবৌ তেমনি করে ঠোঁট খুঁটছিল। তাতে তাকে

গভীর অন্যমনস্ক দেখায়, যেন সে যা দেখছে, তা ভাবছে না। আসবার সময় সে দেখে এসেছে বটঠাকুরের ঘরে বড়দির একটা ছবি টাঙান হয়েছে। পুরনো ছবি—নতুন করা এবং বড় করা। বড়দি মরে গিয়েছে, তাই। ছোটবৌ মরতে পারেনি, তার ছবি নতুন হয়নি, বড় হয়নি। ছোটবৌ নিজেই নতুন হয়ে ফিরে এসেছে।

বড় আর ছোটবৌয়ের বড় মেয়ে দুজন রান্নাঘরে ছিল। বাকি বাচ্চারা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ছোটবৌকে দেখছে। ছোটবৌয়ের ক্লাচ দুটো তার দুই হাতের দু পাশে। বাচ্চাদের দৃষ্টি সেই ক্লাচের দিকে পা না-থাকায় সে-দিকটা ফুটো বেলুনের পা না-থাকায় যে-দিকটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসান। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের পুরনো চামড়া তুলতে তুলতে ছোটবৌ বড়বৌয়ের সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটাকে ডাকল—"টুনটুনি শোন্"। ন্যাংটা টুনটুনি আঙুল চুষছিল। সে আঙুলটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে সবার পেছনে সরে গেল। ছোটবৌ বড়বৌয়ের আরেকটা বাচ্চাকে ডাকল—"বুলবুলি আয়।" বুলবুলি দু পা এগিয়ে দাঁড়াল। পেছনে বাচ্চাদের দলটা উৎসুক। 'কাছে আয়"—ছোটবৌ আবার ডাকল বুলবুলিকে। বুলবুলি আরও দু পা কাছে এল। ছোটবৌ হাত বাড়াল, বুলবুলিকে ছুঁতে পারল না। ছোঁয়া দিতে বুলবুলি আরও এক-পা এগুল। পেছনে বাচ্চাদের দলটা ঔৎসুক্যে স্থির। সবচেয়ে সামনে টুনটুনি, তার মুখে আঙুল নেই। সবচেয়ে পেছনে ছোটবৌয়ের গোটা দুয়েক বাচ্চা। বুলবুলিকে দুই হাতে ধরে, তুলে, কোলের উপর বসাল ছোটবৌ। প্রথমে বুলবুলিকে বসাল বেঢপ করে, বুলবুলির খানিকটা পিছন পড়েছে ছোটবৌয়ের উরুতে, আর খানিকটা পড়েছে যেখানে উরু থাকার কথা। বেঢপ বুলবুলিকে ঠিক করে বসাল ছোটবৌ, সেই একটা উরুর উপর। বসিয়েই আবার ছোটবৌ দাঁত দিয়ে ঠোঁট খুঁটতে লাগল। তারপর বলল—"বুলবুলি—।" নেমে যাওয়ার জন্য শরীরের নিচের দিকটাকে পিছলিয়ে রেখে বুলবুলি বলল 'উঁ'—

"সকালের খাবার খেয়েছিস?"

"হুঁ"

"কে দিল?"

"বামুনদি"

"সে কে?"

"নতুন এসেছে"

"কবে?" বলেই ছোটবৌ প্রশ্ন করল—"কি খেয়েছিস?"

"রুটি"

"সবাই খেয়েছিস?" ছোটবৌ বাচ্চাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করল। "হুঁ্যা"—মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সবাই। ছোটবৌ দরজাটা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাড়িতে নতুন বৌ এলে বাচ্চারা তাকে ঘিরে ধরে, নতুন বৌ তাদের কোনো একজনকে কোলে নিয়ে এ-জাতীয় নানাপ্রশ্ন করে আর ওরা সমস্বরে জবাব দেয়।

খোলা দরজার ও-দিকে বারান্দায় ছোটবৌয়ের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল ছোটবৌয়ের বছর চৌদ্দর বড় মেয়ে। ছোটবৌ ডাকল, "ইরা।" মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। তাকিয়েই থাকল। বাচ্চারা পিছন ফিরে ইরার দিকে চাইল। বুলবুলি কোল থেকে পিছনে গেল। ছোটবৌ ডাকল, "শোন্।" ইরা দরজায় এল, ছোটবৌয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ বাচ্চাদের বলল—"কী হচ্ছে সব, যাও, বাইরে যাও।" সবাই দৌড়ে বাইরে গেল। তার মধ্যে ছোটবৌয়ের গোটা দুয়েক বাচ্চা ছিল।

দরজার চৌকাঠে ইরা। খাটের উপর ছোটবৌ। ছোটবৌয়ের দু-পাশে দুটো ক্লাচ।

"ইরা"—ছোটবৌ ডাকল। ইরার চোখে উত্তর ও প্রশ্ন।

"কী রাঁধছিস?"

"আমি রাঁধছি না, বামুনদি রাঁধছে।" ইরার মুখে উত্তর, চোখে প্রশ্ন।

"কী রাঁধছে?"

"ভাত নামিয়েছে, আমি আর মীরাদি তরকারি কুটে দেব, তারপর তরকারি চড়বে।"

"মীরা কোথায়?"

"বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্য চা করছে।"

"তোর জ্যাঠামশায় অফিসে যাবে না?"

"ছুটি নিয়েছেন।"

"তোর বাবা?"

"যাবেন।"

"উনুনে এখন কি?"

"মীরাদি চায়ের জল চড়িয়েছে।"

"শোন্, কাছে আয়।"—ইরা কাছে এল। কাছে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ইরা চৌদ্দ বছরের। আর একটু লম্বা হবে। এখন বেঁটে। ইরা দাঁড়িয়েছে লাঠির মত সোজা হয়ে। ইরার দাঁড়ানটাই এমন, যেন সে একটা উদ্যত প্রশ্ন—আমি কেন লম্বা নই? ছোট-বৌ দু হাত দিয়ে ইরাকে কাছে টেনে আনল। তারপর ইরার আঁচলটা পিছন থেকে হাতের তলা দিয়ে টেনে সামনে গুঁজে দিল—"উনুনের পাড়ে কাজ করতে গেলে আঁচলটা ঠিকমত গুঁজে রাখতে হয়। মীরাকে বলে দাও। আচ্ছা, চল্। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। তরকারি কুটে দেই। তোরা চা করে ঘরে গিয়ে বস গে।" ছোটবৌ ক্রাচ সোজা করল, ধপ্ করে নামল এক পায়ের উপর, ক্রাচ দুটোকে দুই বগলের তলায় দিয়ে মাঝামাঝি ধরল। দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে, দুলে, অনেকখানি এগিয়ে গেল। আবার দোলা, আবার অনেকখানি। আর এক দোলায় ঘরের চৌকাঠটা ডিঙোবার আগে ছোটবৌ ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়াল, মাথাটা নামিয়ে বগলে ক্রাচটাকে আটকে একটা হাত একটু তুলে ঘোমটা টানল সামান্য; হাতটাকে নামিয়ে কাটা-পায়ের দিকের কুঁচিটা একটু তুলে কোমরে গুঁজল, মাটিতে হ্যাঁচ্ড়াচ্ছিল পাড়টা। ছোটবৌ আর এক দোলনে চৌকাঠ পেরিয়ে গেল। ইরা পেছন পেছন আসছিল, আসতে আসতে দেখল, সে ঘরের চৌকাঠ পেরুতে না-পেরুতে মা রান্নাঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল প্রায়। মা ক্রাচে দুলে হাঁটে, ক্রাচের দোলনে দুই পায়ের সমান একবারে যাওয়া যায়। ইরা ভাবল মায়ের কাটা পায়ের চেহারা এখন কী রকম হয়েছে? একটা হাতকাটা লোককে মাঝে মাঝে পথ দিয়ে যেতে দেখেছে, সেই লোকটার হাতের উপরের টুকরোটা যেমন ছোট্ট, কাটা জায়গাটা যেমন কোঁচকান-মোচকান, মায়ের উরুটও কি তেমনি হয়েছে দেখতে?

ক্রাচে ভর দিয়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় ছোটবৌ দাঁড়াল। ভেতরে চেয়ে দেখল রান্না-ঘরের পুরনো সজ্জার মধ্যে কিছু নতুনত্ব এসেছে। একটা মেয়েছেলে তাকটার কাছে দাঁড়িয়ে কী খুঁজছে, ছোটবৌকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকল। মীরা উনুনের উপর নিচু হয়ে আঁচল দিয়ে কেটলির হাতলটা ধরছে। ততক্ষণে ইরা এসে ছোটবৌয়ের পেছনে দাঁড়িয়েছে। ছোটবৌ ডাকল—"মীরা, শোন্।"

মীরা চমকে চোখ তুলে চাইল। বছর পনেরর মীরা কেটলি ধরবার জন্য বাড়ান আঁচলটা নিজের হাতের মধ্যেই চেপে ধরল। ধরে, দাঁড়িয়েই থাকল। ছোটবৌ মীরার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বামুনদির দিকে তাকাল। বামুনদির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মীরাকে বলল—"উনুনের পাড়ে কাজকর্ম সাবধানে করতে পারিস না আঁচলটা জড়িয়ে নে কোমরে।" বিমূঢ় মীরা আঁচলটা জড়িয়ে নিল, এবং জড়িয়ে নিয়েও দাঁড়িয়েই রইল। বামুনদি, মীরা, পেছনে ইরা, মাঝখানে ছোটবৌ, উনুনের উপর কেটলির ভিতর ফুটন্ত জলের খলবল খলবল। ছোটবৌ বলল—"আমাকে একটু চা দিস। তোমার নাম কি?"

"লবঙ্গ।"

"লবঙ্গ, বঁটি আর তরকারির ঝুড়িটা বারান্দায় দাও, আমি তরকারি কুটে দিই—" পাশে একটু সরল ছোটবৌ। লবঙ্গ এতক্ষণে গতি পেল। তাড়াতাড়ি পিঁড়ি বঁটি আর তরকারির ঝুড়িটা কোত্থেকে নিয়ে বারান্দায় দিয়ে এল। ছোটবৌ প্রথমে বাঁ-ক্রাচটাকে বগল থেকে সরিয়ে তার মাঝখানে ধরে বাঁ-দিকে অনেকখানি কাত হল, ক্রাচটা কাত হয়ে গেল, কাটা পা-টা প্রায় মাটি ছুঁল, ডান দিকের ক্রাচটা বাঁ দিকে বেঁকে গেল, প্রায় ঘাড়ের উপর পড়ল, তারপর ক্রাচটা একটু পিছলে গেল, ছোটবৌ থপ্ করে পিঁড়ির ওপর বসল। পিঁড়ির ওপর ঠিকমতো বসা হয়নি, তাই ক্রাচ দুটোকে দেয়ালের ভিতে শুইয়ে রেখে, ছোটবৌ পিঁড়ির উপর ঠিক-ঠাক হয়ে বসল।

ঘরের ভিতর,—মীরা কেটলির ঢাকনিটা আঁচল দিয়ে খুলে মুঠো থেকে চা-পাতি ঝুরঝুর করে কেটলির ভিতর ঢালতে ঢালতে, ইরা তাক থেকে চায়ের বাটি-ডিস-চিনির কৌটো-ছাঁকনি নামাতে নামাতে এবং বামুনদি নানা কৌটো খুলে খুলে

একটা বাটির মধ্যে ধনে-জিরে রাখতে রাখতে—বারান্দায় ছোটবৌয়ের এই নতুন বসা দেখল।

ছোটবৌ তরকারি কুটছে। যে-করেই হোক ছোটবৌ সহজ হবে, স্বাভাবিক হবে। যে-করেই হোক, ছোটবৌ বাড়ির লোকদের ভুলিয়ে দেবে তার একটা পা নেই। তাই চোখবুজে বিছানায় পড়ে থাকার দুর্নিবার লোভ জয় করেও ছোটবৌ সকলের সংগে বাড়ির কর্ত্রীর মতো ব্যবহার করছে। ছোট-বৌকে আবার এ-বাড়ির ছোটবৌ-ই হতে হবে। তার একটা পা কাটার সমস্ত চিহ্ন যদি সে মুখ থেকে মুছে দিতে পারে, তবে সবাই ভুলে যাবে ছোটবৌ মরতে গিয়েছিল, মরতে না-পেরে এক পা কেটে পালিয়ে এসেছে। ছোটবৌয়ের সেই পা-টা নেই, ফরসা ধবধবে পা, মাঝখানে একটা কালো জট।

যেটুকু অস্বাভাবিকতার খাদ থাকলে স্বাভাবিকতা খাঁটি হয়, স্বাভাবিকতার প্রাণান্তিক চেষ্টায় ছোটবৌ সেটুকু খাদ দিতে ভুলে গেছে। ছোটবৌ হাসপাতালের শাড়িটা ছাড়েনি, কুঁচি দিয়ে পরা ছিল, তেমনিভাবেই পরা আছে, বাড়ির মতো করে বদলায়নি। কুঁচি করে পরা ফরসা শাড়ি ছোটবৌকে বাড়িতে সম্পূর্ণ বিদেশিনীর চেহারা দিয়েছে। এলোমেলো খোলামেলা শাড়ির বদলে আঁটোসাঁটো শাড়ি, অভ্যস্ত অন্যমনস্ক ঘোমটার বদলে খাটো আঁচলের আত্ম-বিনাস্ত অবগুণ্ঠন। যেন কোথা থেকে ছোটবৌ এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, ঘরে ফিরে কাজকর্ম করছে, আজ রাতটা থাকবে, কাল সকালে আবার চলে যাবে।

এ-কথাটা ছোটবৌয়ের নিজেরও মনে হচ্ছিল, বাড়ির আর সবাইয়েরও মনে হচ্ছিল। যে কারণে ছোটবৌ শাড়ি বদলাতে পারেনি, শাড়ি অন্যরকম করে পরতে পারেনি, ঠিক সেই কারণেই ছোটবৌ পিঁড়ির ওপর বসে পড়েই তরকারি কাটা শুরু করেছে। ঝুড়ি আর বঁটি নিয়ে তরকারি-গুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ ভেবে নিতে হয়, তা সে ভুলেই গেল। একটা কিছু তুলে নিল, আঙুল যেভাবে খুশি চলল, সেটা কি, কেন কাটা হল কিছুই দেখল না। ছোটবৌয়ের চোখ অবশ্য ও-দিকে ছিল, কিন্তু ঠোঁট দুটো জোড়া লেগে গিয়েছে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটের চামড়া খুঁটছে ছোটবৌ। নাকের পাশ থেকে, উপরের ঠোঁটের কোণ দিয়ে, নিচের ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে থুতনিতে গিয়ে মিশেছে পুরনো চিঠির দুটো ভাঁজ।

অনেকক্ষণ পরে পিঠটাকে সোজা করে বসল ছোটবৌ। কোমর ব্যথা করছে, আস্ত পা-টায় ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। চোখ তুলে তাকাতেই আবার সেই পুরনো জায়গায় গিয়ে পড়ল। প্রথমে চোখ পড়ল, জানলায় মাথা দিয়ে বটঠাকুর শুয়ে আছেন, এখান থেকে তার টাকটা দেখা যাচ্ছে, আর ওপাশের দেয়ালে বড়দির গলা পর্যন্ত। বটঠাকুর কি বড়দির ফোটোটার দিকেই তাকিয়ে আছেন? খবরের কাগজ কোলে নিয়ে, বারান্দার এক-কোণে ছোটবাবু চেয়ারে বসে, তার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। বড়দির দুটো আর তার নিজের দুটো বাচ্চা বারান্দার এক কোণে বসে জটলা করছে। চারজনের চোখই বড় বড়। বুলবুলি ক্রাচটা আর নিজের পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলছে। রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে মীরা তাকিয়ে আছে তার বাবার টাকমাথার দিকে। ইরা বসে আছে তার ঠিক পিছনে। রান্নাঘরের ভেতরে বামুনদি দাঁড়িয়ে আছে স্তূপীকৃত কাটা তরকারির দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সবটা একবার দেখে নিয়ে চোখ নামাল ছোটবৌ, লজ্জায়, পরাজয়ে, ক্লান্তিতে। দুটো কী আরও কুঁচকুচি করল। তারপর বাড়িভরা নৈঃশব্দ্যকে সচকিত করে ছোটবৌ বলল—"লবঙ্গ, তরকারিগুলো নিয়ে যাও"। চেয়ারে বসা ছোটবাবু কোলের উপর ফেলে রাখা খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। বাচ্চাগুলো চমকাল। বটঠাকুর মাথা সরালেন না। লবঙ্গ তর-কারির স্তূপের দিকে তাকিয়ে বলল—

—"এতো তরকারি কি হবে মা?"

দেয়াল ধরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছোটবৌ বলল—"রেখে দাও, বিকেলে রেঁধো।"

"এ-শেষ হতে যে দুদিন লাগবে!"

নিচু হয়ে ক্রাচটা তুলতে তুলতে ছোটবৌ বলল, "ফেলে দাও।"

অভিনয় জীবনের প্রথম রজনীতে দ্বিতীয় তৃতীয় দৃশ্যে পাঠ-ভুল-যাওয়া অভিনেত্রী যেমন সকলের সামনে চোখ নিচু করে বেরিয়ে এসে পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতে সাজঘরের চেয়ারে বসে, তেমনি করে খাটের উপর বসল ছোটবৌ। ছোটবৌ নিজেই ভুলতে পারছে না, সে মরতে গিয়েছিল, মরতে না পেরে ফিরে এসেছে, তার একটা আস্ত-পা সে খুইয়ে এসেছে।

ছোটবৌ ক্রাচে ভর দিয়ে খাট ছাড়ল, দুলল, চৌকাঠ পেরুল, দুলল, আর দুলে দুলে ছোটবাবুর চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছোটবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

"তোমাকে আজ অফিস যেতে হবে কটার সময়?"

"একটা।"

"স্নানে চলো।"

"যাচ্ছি—"

ছোটবাবু কাগজটাকে ভাঁজে-ভাঁজে ভাঁজ করলেন। তারপর উঠলেন। ছোটবাবুর পেছন পেছন ছোটবৌ চলল। ছোটবাবু চলছিলেন ধীর পায়ে, ছোটবৌ চলছিল দুলে-দুলে। সেই ক্রাচ-হাঁটার সংগে সেই আস্তে-হাঁটা কিছুতেই মিলছিল না। সেই অমিল ছন্দে একসংগে হেঁটে ছোটবাবু

আর ছোটবৌ ঘরে এসে ঢুকলেন। দুই ক্লাচের উপর বগলের ভর রেখে ছোটবৌ হাত তুললো ছোটবাবুর শরীরের দিকে। স্নানের আগে ছোটবৌ ছোটবাবুর জামা গেঞ্জি খুলে দিত। তেল এগিয়ে দিত। কখনও বা মাখিয়েও। তোয়ালেটা কাঁধে দিত। আজও তেমনি করতে গেল ছোট-বৌ। ছোটবাবুর বুকের কাছে পড়ে ছোট-বৌ। গেঞ্জিটা অর্ধেক খোলার পর ছোট-বাবুর গলায় আটকে গেল। আরো খুলতে গেলে, হাত আরো তুলতে হবে, ক্লাচটা মাটিতে পড়ে যাবে। অসহায়ের মতো ছোটবৌ মুহূর্ত কয় স্থির হয়ে থাকতে-না-থাকতেই ছোটবাবু হাত দিয়ে গেঞ্জিটা খুলে ফেললেন। ছোটবৌ মুখ ফেরাল। টেবিলের দিকে যেন কী খুঁজছে। ছোটবাবু নিজেই তেল-সাবান-তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রাগ-অভিমান-দুঃখ চেপে—জয় করে নয়, ভুলে গিয়ে নয়—ছোটবৌ আবার ক্লাচে ভর দিয়ে রান্নাঘরে গেল। মানুষ চললে পায়ের

শব্দ হয়—স্-স-প্, স্-স-প্। ক্রাচের নিচে রবার দেওয়া। শব্দ হয় না। আওয়াজ ওঠে থপ্ থপ্।

পিঁড়ির ওপর বসে ছোটবৌ নিজের হাতে ভাত বাড়ল। গোল করে, চেপে-চেপে, ছোট্ট করে। বাটিতে বাটিতে তরকারি-মাছ-ডাল সাজাল। ইরাকে বলল পিঁড়ে পেতে দিতে। সেই পিঁড়িতে যখন ছোটবাবু এসে বসলেন, ছোটবৌ দু-হাতে থালাটা তুলে আবিষ্কার করল, পিঁড়ির সামনে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিতে হলে, দাঁড়াতে হবে, হাঁটতে হবে। হাতে থালাটা নিয়ে ছোটবৌ ছোটবাবুর দিকে চাইল সেই দৃষ্টিতে, যে-দৃষ্টিতে আধো-মফঃস্বলি বাঙালি-বউ এক-কালে স্বামীর বেশ্যাবাড়ি যাওয়া দেখত। নিজেকে ধিক্কার এবং কার্য-কারণ-সূত্র আবিষ্কারের অক্ষমতা—এই দুটো হচ্ছে সে দৃষ্টির ভাষা। ইরা এসে ছোটবৌয়ের হাত থেকে থালাটা তুলে নিয়ে ছোটবাবুর সামনে রাখল। ছোট মেয়েটি বিয়েবাড়িতে সারাদিন পান সেজেছে, পরিবেশনের সময় তার সামনে থেকে থালাটা বয়স্ক কেউ তুলে নিয়ে গেলে যেমন করে তাকিয়ে থাকে ছোট মেয়েটি, পেছন-ফেরা ইরার দিকে তেমনি করে ছোটবৌ তাকিয়ে থাকল। হাতে থালা নিয়ে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে ইরা, চোদ্দ বছরের ইরা, তরতর করে হেঁটে, একেবারে নুয়ে, পিঁড়ির সামনে থালাটাকে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি ভঙ্গি ছোটবৌয়ের চোখে গাঁথল।

প্রতিটি মুহূর্ত একটা বিরাট বিরাট পাহাড় হয়ে ছোটবৌয়ের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। সহজ ও স্বাভাবিক হতে ছোট-বৌ পারছে না। ছোটবৌয়ের আশংকা হচ্ছে আর পারবে না।

কিন্তু বারবার না-পারার সামনে এসেও একটা শিশুসুলভ জেদে ছোটবৌ পারতে চাইছে। তাই, সারাটা ক্ষণ ছোটবাবুকে সাধল—"এটা নাও," "ওটা নাও," "খাও না একটু।"

রান্নাঘরের দরজার কোণায় মীরা-ইরা-লবঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে ছোটবৌয়ের কাণ্ড দেখছে। বাড়ির কোনো বয়স্ক পাগলের কাণ্ডকারখানা যেমন সশংক নীরবতায় দেখে, তেমনিভাবে ছোটবৌকে দেখছে সবাই। আর ছোটবৌ নিজের সর্বাঙ্গে তাদের দৃষ্টি অনুভব করেও অস্বীকার করতে চাইল ছোটবাবুকে সেধে সেধে। অবশেষে, ছোটবাবু যখন জলের গ্লাসে হাত ডোবালেন, ছোটবাবু ওঠার আগেই, হাতে-ধরা হাতাটা সশব্দে ডালের গামলায় ফেলে ছোটবৌ পিঁড়ি ছেড়ে উঠতে গেল। হাতাটা জোরে ফেলে ছোটবৌ নিজের দেহে যে তীব্র গতি এনেছিল, ওঠবার সময় বাধা পেয়ে সে-গতিটা নিয়ন্ত্রিত হল। ক্রাচটার মাঝখানে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ছোটবৌ। ইতিমধ্যেই সে-যেন ক্রাচটাকে অনেকখানি আপন করে নিয়েছে। সবার চোখের সামনে দিয়ে থপ্‌থপ্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল। বটঠাকুর জানলায় নেই। বড়দির ফটোর দিকে চাইল। বড়দির বিয়ের ফটো থেকে আলাদা করে বড় করা। বড়দি সেজেছে। মুখে হাসি। ফটোটা যেন বড়দির মরার পরে তোলা। বড়বৌয়ের সাজা এবং হাসি বিয়ের। ছোটবৌয়ের মনে হল বড়দির সাজা এবং হাসি মরার। ছোট-বৌয়ের মনে হল, বড়দির ছবিটার কাঁচে তার সারা শরীরের প্রতিবিম্ব পড়েছে। সে প্রতি-বিম্বটা বড়দির ছবির চাইতে কম স্পষ্ট নয়। বড়দি সেজেছে এবং হাসছে। ছোট-বৌ নাকের দু-পাশে ভাঁজ নিয়ে ক্রাচ-বগলে দাঁড়িয়ে আছে। সেজে এবং হেসে বড়বৌ মরার পর জিতে গেছে। ছোটবৌও অমন সাজতে ও হাসতে পারত। বড়দির ছবির কাঁচে ছোটবৌয়ের প্রতিবিম্বের ইচ্ছেটা যেন সে-রকমই।

দুলে দুলে ছোটবৌ আবার সেই খাটের উপর গিয়ে বসল। সেই খাটে বসে, জানলা দিয়ে ছোটবাবুর অফিস যাওয়া দেখতে দেখতে কখন যেন ছোটবৌ রাস্তার লোক দেখতে শুরু করেছে! ইরা এসে বলল—"মা, খাবে না? নাইতে যাও।" ছোটবৌ নাইতে গেল এবং খেয়ে এল। এসে, আবার জানলার সামনে বসে রাস্তার লোক দেখা শুরু করল। সে নাওয়া-খাওয়াটা এমনভাবে সারল, যেন জানলায় এসে বসাটাই আসল কাজ।

ছোটবৌ দেখল মানুষ নানাভাবে হাঁটে। একটা হাঁটার সঙ্গে আরেকটা হাঁটার কোনো মিল নেই। হাঁটাটা যেন কেবল হাঁটা নয়, পুরো মানুষটাই। দুপুর, লোকজনের যাওয়া আসা কম। একজন লোকের পর, আরেকজন লোকের আসতে খুব দেরি হয়। আর, সেই সময় ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুব তীব্র মুহূর্তে সিনেমার রীল কেটে গেলে যেমন হয়, তেমনি লাগে।

একজন লোক হেঁটে গেল তরতর করে। লোকটা সরু, সরু না হলে অমন করে হাঁটতে পারত না। খুব ছোট ছোট পা ফেলে, লোকটার চলনে যেন খই ফোটে। মাথায় ঘুঁটের ঝুড়ি নিয়ে এক ঘুঁটেআলী হাঁটে। মাথায় বোঝা। দু-হাত একটু পাশে ছড়িয়ে টাল সামলাচ্ছে। সমস্ত পিঠটা দুলছে, পেছনটা সপ্ সপ্ করছে একটা সুমিত ছন্দে। একতালে নৌকো বাইলে নদীর জলে যেমন ছল্—আৎ ছল্—আৎ আওয়াজ হয়, তেমনি দেখতে লাগছে পেছনটা। ঘাড় থেকে ঢেউটা পিঠে ভেঙে, নেবে এসে, কোমরের নিচে একবার উঁচু হয়ে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই দু-ভাগ ঢেউয়ের ওজন নিজের দুটো উরুতে বহন

করছে, হাঁটু দুটো তাই একটু বেঁকে গেছে। ঐ বাঁকা হাঁটু থেকে আবার দুটো ঢেউ ছলবল করে উপরে উঠে গেছে। আর ঠিক কোমরের নিচে উপরে ওঠা আর নিচে নামা ঢেউ দুটো মিলে গিয়ে জমাট করেছে। ছোটবৌ বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, ঘুঁটেআলীর উরু দুটো এখন শক্ত হয়েছে।......আবার একটা লোক হেঁটে চলে গেল। খুব ধীরে, অথচ এক গতিতে, যেন হাঁটাটাই ওর কাজ, কেবল হাঁটা, হাঁটা এবং শুধু হাঁটাই। রোগীর সব চিৎকার কান্না অগ্রাহ্য করে হাসপাতালের ডাক্তার যেমন ছুরি চালায়, তেমনি পথের পাশের সব কিছু অস্বীকার করে লোকটা হাঁটে, হাঁটে, কেবল হাঁটেই। ছোটবৌ অনুমান করল লোকটার পায়ের পিছনে, হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত মোটা স্পষ্ট সাপের মতো রগ। আর, লোকটা হাঁটলে নিশ্চয়ই কট্‌কট্ করে আওয়াজ হয়। আর একটা লোক পান চিবুতে চিবুতে আসছে। খালি গা, জামাটা কাঁধে ফেলা। স্কুল থেকে বাড়িতে একা একা ফিরতে গেলে যেমন সারাটা পথঘাট অন্যমনস্ক করে দেয়, এ-লোকটাও তেমনি করেছে। লোকটা বাঁ-দিকে একবার তাকাল, তাকিয়ে থাকল, বাঁ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে ফিরল। হাঁটা শুরু করল, ছোটবৌয়ের দিকে চোখ তুলে চাইল, তাকিয়ে থাকল, চোখ ফেরাল, আবার তাকাল। আড়ালে চলে গেল। ছোটবৌ ঠিক বুঝতে পারল, লোকটা কোথাও ঘুমুতে যাচ্ছে। যে যখন যা করতে যায়, তার হাঁটা দেখেই বোঝা যায়।

ছোটবৌয়ের হাঁটা এখন সর্বদা একরকম, ক্রাচের দোলন। ছোটবৌয়ের হাঁটায় এখন লজ্জা-রাগ-অভিমান-ছলনা প্রকাশ করা যাবে না। অথচ আর সবাই পারবে।......

পা, এক পা খুইয়ে এসেছে ছোটবৌ, সাদা ধবধবে একটা পা, তার মাঝখানে কালো একটা জট। বিছানায় বসে ছোটবৌ সামনে তার পা-টা মেলে দিল। তারপর শাড়িটা তুলল। একটু একটু করে, ধীরে ধীরে, নববধূর ঘোমটার মত। সমস্ত পা-টা নিরাবরণ হয়ে এখন বিছানার ওপর প্রসারিত। নিটোল উরু, মাঝে-মধ্যে রোমকূপের আভাস, বাসি দুধের মতো হলদেটে চামড়া, গোল হয়ে, সরু হয়ে, এসেছে হাঁটুতে। উরুর নিচু দিকে তলায় সামান্য স্পষ্ট দুটো শিরা হাত দিলে ছোঁয়া যায়। হাঁটুর চাকতির চামড়াটা সামান্য খড়খড়ে রঙটা একটু কালচে, পুড়ে যাওয়া বাদামের মত। আবার নিচে নেমে গেছে। উপরের লম্বা হাড়টা দেখা যায় না, বোঝাও যায় না। ছোটবৌ শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও ছোটবৌ যেন কোনো একটা ডাকের সাড়া দেবার জন্য অসহায় ইচ্ছুকের মতো প্রস্তুত। তার সারা শরীরে অসহায়তা ঠোঁট দুটো বাদে। সামান্য ফাঁক ঠোঁটেও খুব একটা জোর। সেই ময়লা কাগজের মতো ভাঁজটার উপর দিকটা স্পষ্ট আর নিচ দিকটা অস্পষ্ট। স্পষ্ট অস্পষ্ট ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যে ছোটবৌ ঘুমিয়ে আছে।

পরদিন খুব সকালে, রাত-শেষে, ছোটবৌ আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করল—বটঠাকুর কি উঠেছেন? নবগণ? তারপর নিজে উত্তর করল—বটঠাকুর সারারাত ঘুমুতে পারেন না নিশ্চয়ই। নবগণও নিশ্চয় সকালে উঠেই উনুনে আঁচ দেয়। এই একই প্রশ্ন আর এই একই উত্তর ছোটবৌ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। তারপর উঠল। ছোটবাবু অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। বটঠাকুর ঘুমোন না। ছোটবাবুকেও জেগে থাকতে হত। দু-ঘরে দু-ভাই সারারাত জেগে। নিদ্রিত ছোটবাবুর পাশ দিয়ে ছোটবৌ খাটের কানায় এল। খাটের বাজু ধরে থুপ্ করে একটা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। খাটের বাজু ধরে ছোটদের এক্কা-দোক্কা খেলার মতো একপায়ে একটু লাফিয়ে দেয়ালে হাত দিল। ক্রাচ দুটো আনল। চৌকিতে একটু হেলান দিল। ক্রাচ দুটো বগলে নিল। দাঁড়াল। দোলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছোটবৌ একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল ছোটবাবুকে। ছোটবাবু জাগেনি। ছোটবাবু ঘুমুচ্ছে। জেগেছে কি না দেখতে যতক্ষণ সময় লাগার কথা তার চেয়ে বেশি সময়ই তাকিয়ে থাকল ছোটবৌ। তারপর তলায় রবার ক্রাচে থুপ্‌থুপ্ আওয়াজ তুলে ছোটবৌ দরজার কাছে এল। দরজার ছিটকিনিটা খুলল। শব্দ হবে, এটা জানাই ছিল, তবু সাবধান হয়নি। শব্দ হবার পর আবার মুখ ঘুরিয়ে ছোটবাবুকে দেখল। জাগেনি। জাগবে না। ছোটবৌ বেরিয়ে গেল। ছোটবৌয়ের শাড়ি বিস্রস্ত, চোখে পিচুটি, মুখের ভিতরে লালার আঠাল অনুভূতি, ঠোঁট চাপা, অতি স্পষ্ট ময়লা কাগজের ভাঁজ। ছোটবৌ বারান্দায় এসে একবার দাঁড়াল। বটঠাকুরের ঘরের দরজা খোলা। তার আগে এ-বাড়ির কেউ জেগেছে, এটা যেন ছোটবৌয়ের কাছে খুব আনন্দের খবর মনে হল। বটঠাকুর কোথায়? বাথরুমে? ছোটবৌ ক্রাচটাকে একটু ঘুরিয়ে বটঠাকুরের ঘরে উঁকি দিল। ঘরটা আবছা অন্ধকার। বাইরের সামান্য আলো ভিতরে গেছে। বড়দির ছবিটা মোটেই স্পষ্ট নয়। সাধারণ অবস্থায় সেই কাঁচে বড়দি ছায়ার মত অস্পষ্ট। তবু ছোটবৌ দেখল বড়দি সেজেছে এবং হাসছে। ফটোর কাঁচে ছোটবৌয়ের প্রতিবিম্বও কম স্পষ্ট নয়। তার ঠোঁটে ভাঁজ। বড়দির এই

বিয়ের হাসি আর সাজের কথা মনে করেই বটঠাকুর সারারাত জেগে থাকেন। বটঠাকুর যে সারারাত জেগেই থাকেন এটা সে ধরেই নিল। তারপর কুয়ো-পাড়ের দিকে ক্রাচ চালাল—যেন মুখ ধুতে যাচ্ছে। ছোটবৌ মরতে চলল। আজ রাত থেকে দু-ঘরে দুজন জেগে থাকবে। ছোটবাবুকে সে তো সেদিন থেকেই জাগিয়ে রাখতে পারত। দুদিন পর ছোটবৌ হাসবে। একজন কেন জেগে থাকবে পাশের খালি বিছানাটার দিকে তাকিয়ে। দুজনে শোয়া অভ্যেস, একজন শুতে হবে বলে। ছোটবৌ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। ছোটবাবু কাল রাতে কখন এসে শুয়েছে ছোটবৌ জানে না। ছোটবাবু কেন তার গায়ে হাত দিয়ে জাগালেন না? খুব নরম, কোমল করে বাহুতে হাত রাখলেই ছোটবৌ জেগে যেত। (খুব নরম, কোমল কোনো বস্তুকে ছুঁচ্ছে এমনিভাবে ছোটবৌ কুয়োর কানায় হাত দিল।) ছোটবৌ ঘুম-চোখে অস্পষ্ট আলোতে ছোটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত। ছোটবৌকে ছোটবাবু জাগালেন না। আজ রাত থেকে নিজেকে জেগে থাকতে হবে। যে-একবার মরতে গিয়ে মরতে পারে না, সে যে-কারেই হক নিজেকে মারবেই। কত কাহিনী মনে পড়ল ছোটবৌয়ের কুয়ো-পাড়ের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ছোটবৌ দেখল—শ্যাওলা, সারারাত জল পড়েনি, তাই শুকনো ছাই, ঝামা, নর্দমার মুখে ভাত-ডাল, কুয়োর কানা এবড়ো-খেবড়ো। (ছোটবাবুর হাতের কেমন নিটোল।) মরতে গিয়ে মরতে না পেরে ফিরে এসে, ছোটবৌ ভাবল সে মরবেও নয়, জীবন্তও নয়। কী ভাবলে ছোটবৌ মরতে গিয়েছিল তা সে ভুলে গেছে। কিন্তু মরতে গিয়ে যে একটা পা খুইয়ে ফিরে এসেছে—তা সে ভুলল না। কেউ ভোলে নি। এখন মরতে না পারলে সে আর বাঁচতে পারবে না। বড়বৌয়ের মতো সে হাসতে পারবে, বিয়ের সাজের হাসি, বড় ফর্সা, মোটা-সোটা, রক্ত পরিষ্কার, সতীর কাঁচ ছোট-বৌয়ের ছায়া কুয়োর জলে ছোটবৌয়ের অর্ধ-স্পষ্ট ছায়া। কুয়োর ভেতরে আবছা অন্ধকার। কুয়োর জল আবছা হলে বোঝা যায় কালো। ছোট পুঁটি। সেটাও হাতে পাওয়া যাবে না। ছোটবৌ মনে মনে কুয়োর জলের ভেতর ডুবে গেল। মাটি ছুঁল। আঁক-পাঁক করল। মাটি খাবলোল। ওলট-পালট খেল। কুয়োর তলের কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে গেল। আবার ভাসল। কুয়া-তলের কাদার মধ্যে খিমচোতে লাগল। কুয়োর তলের টিনের পাতে আর নানা জিনিসে হাতের তেলো কেটে গেল। রক্ত বেরুল, কালো জলের মধ্যে একটুখানি লাল সুতোর মতো রক্ত। মিশে গেল। ছোট-বৌয়ের মাথা নিচে হল। একটা ঠ্যাঙ হাঁটুতে ভাঁজ হয়ে ড্যাং-ড্যাং করতে লাগল উপরে। মুখ-চোখ-নাক থুতনি কাদায় নিচে নেমে গেছে। সেই হাড়টার উপর দিয়ে মাংসের নিটোল স্রোত বয়ে গেছে। স্রোতটা আঙুলগুলোর ডগায় চলে গেছে, পেছন দিকটা নেমে গিয়ে গোড়ালি হয়েছে। গোড়ালিতে ফাটা নেই। সুন্দর ফরসা। পাশ দিকটায় একটু লাল আভা, খুব আঁকিড়ি-বুঁকিড়ি কাটা। পায়ের পাতায় চাপ দিলে আঁকিড়ি-বুঁকিড়িগুলো বদলে যায়। পায়ের তলাটা ফুলো-ফুলো। বুড়ো আঙুলের পেছনটা বেশি মোটা, শক্ত ও একটু খসখসে। পা-টা সুন্দর।

পা দেখে ছোটবৌ আড়চোখে একবার বাঁ দিকে চাইল। এ-পায়ের শাড়িটা এতো-দূর তোলা হয়েছে, তবু বাঁ-পাশের শাড়ির তলায় কোনো পায়ের আভাস নেই।

একটা মরা-মানুষ দেখলে বিস্ময় জাগে স্থিরতা দেখে। মানুষ এতো স্থির হতে পারে? মানুষের অস্থিরতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ পায়ে। সেই অস্থির নৃত্যচপল পায়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ছোটবৌ ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেল বেলা ঘুম থেকে ওঠা ও রাত্রি-বেলা আবার ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে সন্ধ্যা-

বেলার একটা ঘটনা পরদিন সকালের জাপাটাকে অনিবার্যভাবে অন্যরকম করে দিল।

সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে গেছে। বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা ঘরে আলো নিয়ে পড়তে বসেছে। বড়রা সব বারান্দার এদিক, ওদিক ছিটকে একা একা বসে আছে। বারান্দায় কোনো আলো নেই। ঘরের আলো জানলা-দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে এসেছে। সেই আলোর গণ্ডীতে কেউ বসে নেই। সবাই অন্ধকারে। এক জায়গায় নয়। ইরা-মীরা পূর্বব্যবস্থা মতো রান্নাঘরের সাহায্যে আছে। সন্ধ্যেবেলা তারা ছোটবৌয়ের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে এল না দেখে কেউ আর তাকে ডাকতে যায়নি। ইরা-মীরা দরজার পাশে একজন আর উঠোন থেকে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির উপরে একজন। ছোটবাবু একটা চেয়ার নিয়ে সকালের জায়গাটাতেই, সামনের খুঁটিটার গায়ে পা তুলে দিয়ে। ঘরের সামনে, মাথার উপরের জানলাটা বন্ধ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ছোটবৌ। অন্ধকার সারাটা উঠোন আর বারান্দায়। কুয়োটা মোটাসোটা বেঁটে, গোল অন্ধকার, কুয়োর বাঁশটা লম্বা হয়ে শূন্যের উপর ঝুলছে। কারো কোনো ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে না, কেউ দেখছেও না। শুধু ঘন কয়েক থোক অন্ধকার। অন্ধকার বারান্দায় আরো চারটে গভীর অন্ধকার। বাচ্চারা পড়ছে, কখনো একসঙ্গে চার পাঁচজন চেঁচিয়ে একটু পরেই একে একে থেমে যাচ্ছে, অবশেষে থাকে কেবল একজনের ঘুম-জড়িত গুনগুন। ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। রান্নাঘর থেকে টগবগ ধ্বনি আসছে। সেই গুনগুন আর টগবগ অন্ধকারের স্পর্শের মতন এ-চারজনের কানে প্রবেশ করছে। কেউ কাউকে দেখছে না। সবাই নিজেকে ভাবছে, একা-একা, একেবারে একা। বাচ্চাদের গুনগুন, রান্নাঘরের টগবগ। বাচ্চাদের গুনগুন, রান্নাঘরের টগবগ। অন্ধকার। ছোটবৌ মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে জানলা দিয়ে বটঠাকুরের ঘরে বড়দির ছবির দিকে। বড়দি হাসছে, বড়দি সেজেছে। অন্ধকার। টগবগ গুনগুন। বড়দির ছবির কাচে কি ছোটবৌয়ের ছায়া পড়েছে। সামনে গেলে পড়বে? প্রতিবিম্বটা বড়দির ছবির চাইতে কম স্পষ্ট নয়। বড়দির মুখে হাসি। ক্রাচ-বগল প্রতিবিম্বের মুখে ময়লা কাগজের ভাঁজ। অন্ধকার। ছোটবৌ অন্ধকারে বসে। প্রতিবিম্ব পড়বে না। টগবগ। গুনগুন। দূরে একটা বাঁশি শোনা গেল। তীব্র বাঁশি দূর থেকে আসছে। তীক্ষ্ন স্বর দূর থেকে আসছে। সেই তীক্ষ্ন বাঁশিটা, সেই তীব্র স্বরটা একটা প্রবল গর্জনে রূপান্তরিত হচ্ছে—এ কথা যখন তারা টের পেল, তখনই দূরাগত তীব্র বাঁশির প্রতিধ্বনি করে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ইরা চেঁচিয়ে উঠল—"মা।" বাচ্চাদের গুনগুন থেমে গেল। রান্নাঘরের টগবগ আর অন্ধকার আর সেই তীক্ষ্ন তীব্র বাঁশির সঙ্গে গর্জন। চমকে সবাই সেই চমকিত অবস্থাতেই স্থির হয়ে রইল। ছোটবৌ অনামনস্ক হতে চাইল কুয়োপাড়ের অন্ধকারের দিকে চেয়ে। লবঙ্গ রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে বারান্দার আলোটা জেলে দিল। হাঁটুতে মুখ গোঁজা ইরা চোখ তুলল। তীক্ষ্ন তীব্র বাঁশি আর গর্জনটা মিলিয়ে গেছে। রান্নাঘরের টগবগ আর শোনা যাচ্ছে না। বারান্দায় আলো জ্বালানোতে ছোটবৌ দেখল ঘরে বড়দির হাসিটা ম্লান। সেই ট্রেনটা। সেই ট্রেনটা। ছোটবৌ একবার সবার দিকে চাইল। কেউ ভোলেনি, কেউ ভুলবে না। ইরার চিৎকার যেন এই অন্ধকারে সকলের চিন্তাটা জানিয়ে দিয়েছে। সবাই ভাবছিল একই কথা। ছোটবৌ মরতে না-পেরে এক-পা খুইয়ে এসেছে। ছোটবৌ মরতে গিয়েছিল, মরতে পারেনি, ছোটবৌ বাঁচতেও পারছে না। ক্রাচে দুলে ছোটবৌ ঘরে ঢুকল। বাচ্চারা থমথমে হয়ে গেল। ছোটবৌ তাদের কিছু বলল না। বিছানায় উপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। বিছানার সঙ্গে হেলান দেয়া ক্রাচ দুটো শব্দ করে পড়ে গেল। ছোটবৌ ফিরে চেয়ে দেখল না।

কিছুদিন ধরে শাড়ি-পরতে-শেখা বাড়ির মেয়েটি প্রেম করছে এটা বাড়িতে প্রথম জানাজানি হবার রাত্রিতে সেই মেয়েটির সবার সঙ্গে খেতে বসা, খাওয়া এবং উঠে আসার মতো ভঙ্গিতে ছোটবৌ সে-রাত্রিতে খেয়ে এল। সেই মেয়েটির মতোই শুয়ে গেঁথে গেল। কাত হয়ে কুয়োর কানায় আটকে গেল। পেটটা সবচেয়ে ভারি হয়ে উঠল। ভেসে উঠল। সমস্ত শরীর জলের তলে, কেবল টনটনে সাদা হলদেটে পেটটা জলের উপরে, শাড়িটা দেখা যাচ্ছে।...... লবঙ্গ উঠতে এতো দেরি করে কেন? সকালে উঠে উনুনে আঁচ দিতে পারে না? বটঠাকুর বাথরুমে এতো দেরি করেন! ছোটবৌ আবার কুয়োর জলের দিকে তাকাল। প্রতিবিম্ব। বড়দির ফটোর কাচে প্রতিবিম্ব। ছোটবৌ ছবিতে সেজেছে, হাসছে। কুয়োর জল কালো। ছোটবৌ বারান্দার দিকে চাইল। খালি। অনন্যোপায় ছোটবৌ বাধ্য হয়েই শরীরের উপরের অংশটা কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দিল, কর্কশ কানা দুটো শক্ত করে ধরে। ছোটবাবুর হাতের তেলো নরম, স্পর্শ কোমল। ছোটবৌ এবার আর একটু ঝুঁকে হাতের ভর ছেড়ে দেবে। বটঠাকুর কোথায়? লবঙ্গ? ছোটবাবু? ছোটবৌ কিছু একটা ভাবতে গেল, পারল না। অ্যাঁ করে একটা কান্না শুরু হয়েই থেমে যাওয়ার ধ্বনি ছোটবৌয়ের কানে এল। রেল লাইন থেকে উঠে পড়ার মতো দ্রুতগতিতে উঠে দাঁড়াল ছোটবৌ। দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুল-বুলি হাঁ করে কাঁপছে।

ছোটবৌয়ের দুই ঠোঁট আর জোড়া লাগল না। ময়লা কাগজের ভাঁজটা ঠোঁট থেকে উপে গেল।

এক বছর পর ছোটবৌয়ের একটা দু-পাঅলা বাচ্চা হল।

# যদুভট্ট ও যাদবেন্দ্র নন্দন

## পিনাকীনন্দন চৌধুরী

পাঁচেটগড়। মেদিনীপুরের এই নির্জন পল্লী একদিন মুখর হয়ে থাকতো বহু গুণী সাধকের সংগীত সাধনায়। মার্গ-সংগীতের এই সাধন কেন্দ্রে পাঁচেটগড় জমিদার পরিবার যে দান রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার যোগ্য মূল্য নিরূপিত হয়নি। এই পরিবারের বংশানুক্রমিক সংগীত সাধনা ও পৃষ্ঠ-পোষকতা মেদিনীপুর তথা বাঙলার উচ্চাংগ সংগীত জগতে এক মূল্যবান সংযোজন।

সুর সাধনার এই নির্জন পীঠস্থানটি যুগের অবহেলায় মৌন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই পরিবারের সংগীত-চর্চার কিছু নজির মেলে। কিন্তু এর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্য দুর্লভ। বর্তমান প্রবন্ধে একটি খণ্ডিত সময়ের কথা আলোচিত হবে—যা এই পরিবারের সংগীত সাধনার 'স্বর্ণযুগ'। পাঁচেটগড়ে যদুভট্টের আগমন থেকে শুরু করে জমিদার পরিবারের উজ্জ্বলতম বংশধর চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্রের জীবন কাল পর্যন্ত।

১২৮১ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য যদুনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মার্গ-সংগীত বিদগ্ধ পাঁচেটগড় পরিবারের যোগাযোগ ঘটে। যোগাযোগের প্রথম পর্যায়ে আমন্ত্রিত বহু গুণী সংগীতজ্ঞের মত যদুভট্ট ও চৌধুরী পরিবারের উৎসব-অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে বৎসরে দু-একবার পাঁচেটগড়ে আসতেন। পরবর্তীকালে তিনি কিছুকাল স্থায়ীভাবে এই পরিবারে সংগীত-শিক্ষক ছিলেন। এই সময় চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন কিশোর [জন্ম—মাঘ ১২৭১ বংগাব্দ, ১৭৮৫ শকাব্দ]। যদুভট্টের কাছে সংগীত শিক্ষা করতেন যাদবেন্দ্রনন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৌধুরী ব্রজেন্দ্রনন্দন। যদুভট্টের প্রভাবে পাঁচেট-গড়ের সংগীত সাধনার ধারা এক নূতন রূপ ও গতি লাভ করে। যদুভট্টের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্বে চৌধুরী পরিবারে কোন 'ঘরানা' প্রচলিত জানা যায়নি। তবে এর পরবর্তী রূপ যদুভট্টের সংস্পর্শে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। তার প্রমাণ অধুনা-প্রচলিত 'তানসেন ঘরানা' (নিজ পরিবারে এই ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন উজীর খাঁর শিষ্য যাদবেন্দ্রনন্দন)। যদুভট্টের অনেক ধ্রুপদ গান পাঁচেটগড় পরিবারের সংগীত-সম্পদ।

কৈশোরে যাদবেন্দ্রনন্দন যদুভট্টের অমর প্রতিভার সংস্পর্শে আসেন। সংগীতপ্রিয় কিশোরের উত্তরাধিকারলব্ধ সংগীত-প্রতিভা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত-মনীষার প্রভাবে এক সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি লাভ করে।

পরবর্তীকালে কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় যাদবেন্দ্রনন্দন মুরারী দত্ত মহাশয়ের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে (১৮৮৮ খৃীঃ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (বি-এ) উপাধি লাভ করার পর তিনি বাড়িতে (পাঁচেটগড়ে) মহম্মদ খাঁর ছাত্র ও গোবরডাংগার জ্ঞানদা চৌধুরীর সতীর্থ রামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই সময় পাখোয়াজী ছোটে খাঁর সাহচর্যে যাদবেন্দ্র-নন্দন কলকাতায় সংগীতাচার্য উজীর খাঁর কাছে সুরবাহার শিক্ষার সুযোগ পান। উজীর খাঁ কলকাতায় সম্ভ্রান্ত মুন্সীজীর কাছে থাকতেন। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন,—"মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর,

শ্রীশ্রী হরি।—

শ্রী যুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রশংশীত পত্র মিদং—

যেহেতুক ইত পূর্ব্বে আপনকার নাম শ্রবন করিয়া পত্রের দ্বারা আহ্বান করিয়া আপনকার।—
সঙ্গীত বিদ্যা শ্রবনে জানিলাম যে উক্ত বিদ্যার এপ্রদেশে আপনকার মত মনুষ্য নাই কারণ।—
সঙ্গীত বিদ্যার সারগম প্রবীন তাহাতে আপুনি যেমত সারগম ও আলাপ করিতে পারেন।—
এমত পূর্ব্বে২ গায়ক সারগম ও আলাপ করিতে পারিতেনা আমি তাহাদের শাগীরদির।—
নিকট শ্রবন করিয়াছি অতএব আপনকার প্রতি অতীশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই সন্তোষীক
পত্র লিখিয়াদিলাম ইতি সন ১২৭৪ সাল। তারিখ —— ১ ভাদ্র।—

পাতকুম মহারাজা শত্রুঘনাদিত্য দেব কর্তৃক যদুভট্টকে প্রদত্ত মানপত্র

যদুভট্টর গানের খাতায় স্বহস্তলিখিত কয়েকটি গানের পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি

তারাপদ ঘোষ, রাজা দুলী শীল ও যাদবেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সঙ্গেও উজীর খাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিল।" ['তানসেন ঘরানা'—বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক—পৌষ, ১৩৫৫ ও "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-সাধনা"—(সংগীত) পৃঃ ৯৮] কলকাতায় উজীর খাঁর কাছে শিক্ষাবস্থায় যাদবেন্দ্রনন্দন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ঠাকুর পরিবারের সংগীত জলসায় আমন্ত্রিত হন। কলকাতায় প্রায় দেড় বছর সুরবাহার শিক্ষাদানের পর রামপুরের নবাবের আমন্ত্রণে তাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য উজীর খাঁ রামপুর যান। উজীর খাঁ তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন ও বিবেকানন্দ-ভ্রাতা হাবু দত্তকে নিজের সঙ্গে রামপুর নিয়ে যান। রামপুরে খাঁ সাহেবের কাছে শুরু হয় কঠিন সংগীত-তপস্যা। দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র এক বছর উজীর খাঁর কাছে শিক্ষালাভের পর তাঁকে পাঁচেটগড় ফিরতে হয় পারিবারিক অসুবিধার জন্য। রামপুরে উজীর খাঁর পিতা আমীর খাঁর শিষ্য কাশ্মীর দরবারের ওস্তাদ নেশার আলি খাঁর সঙ্গে যাদবেন্দ্রনন্দনের যোগাযোগ ঘটে।

এতদিন পাঁচেটগড়ের মার্গ-সংগীত-চর্চা মূলত নিজ পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যাদবেন্দ্রনন্দন নিজ পরিবারের সংগীত-ঐতিহ্যকে বৃহত্তর সংগীত জগতের সঙ্গে যুক্ত করেন; সেই সঙ্গে পাঁচেটগড়ে বহিরাগত সংগীত-শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এই প্রচেষ্টায় পাঁচেটগড় যেমনি তৎকালীন বহু গুণী সাধকের মিলনভূমির গৌরবলাভ করল, তেমনি একটি উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এই সময় পাঁচেটগড়ের সংগীত-জলসায় মুখর হয়ে থাকতো বহু বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের কণ্ঠে ও যন্ত্রে। বিশ্বনাথ রাও, কালীনাথ, যদুরায়, দৌলত খাঁ, আলি মহম্মদ খাঁ, কবীর বক্স প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের সঙ্গে সংগীত-চর্চায় যোগ দিতেন চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন। ঐ ছাড়াও পাঁচেটগড়ে আসতেন আমীর খাঁ ও আবদুল্লা সরোদী। কলকাতায় প্লেগ হওয়ায় হায়দ্রীবাই কিছুকাল পাঁচেটগড়ে ছিলেন। মেটেবুরুজে নবাব দরবারের সংগীতজ্ঞ, ওস্তাদ তসাদ্দাক হোসেন খাঁ (এর সঙ্গে যদুভট্টের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল) পাঁচেটগড়ে সংগীত-শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর শেষ জীবন এইখানে অতিবাহিত করেন।

যদুভট্টের মনীষা স্পর্শে ও যাদবেন্দ্রনন্দনের সংগীত তপস্যায় যে সংগীত-ধারার উৎপত্তি তার মূল্যায়ন সংগীত-ইতিহাসে আজও হয় নি। যদু ভট্টের স্বহস্ত লিখিত একটি গানের খাতা পাঁচেটগড় পরিবারে এখনো গচ্ছিত আছে। এই খাতাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো।

যদুভট্টের স্বহস্ত লিখিত এই খাতায় সংগৃহীত ও স্বরচিত বহু গান আছে। খাতাটির প্রথমাংশে হিন্দি ও শেষাংশে কিছু বাংলা গান আছে। হিন্দি গানগুলির মধ্যে দুটি গান এখানে উদ্ধৃত করবো।

প্রথমটি হল—

"কেয়সে কাটোঁগে রাত পিয়া বিন
            একেলি জাগী সজনী।
আজু মেরি নয়ন মে
            নীদ না আএ ছোড়ি সৈঞা।
এক বসন্ত সুগন্ধ পবন চলী
            দুজে ফাগুন তীজে আনীরি
কহুকে কোএলীএয়া বোলে
            মাই সব দুমন সৌর অব।"

এই গানটি খাতায় দুবার লেখা। দ্বিতীয়বার লেখায় পাঠান্তর আছেঃ—'পবন' স্থানে 'পওন'; 'কহুকে' স্থানে 'কুহকে'। খাতা থেকে বিশেষ করে গানটি উদ্ধৃত করবার একটি কারণ আছে। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৪৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "যদুভট্ট নিজে বহু সংগীত রচনা করেছিলেন।......তাঁর রচিত বহু গানে কবিত্ব শক্তির বিশেষ প্রকাশ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কোন কোন হিন্দি গানের অনুকরণে বাঙলা গান রচনা করতে দ্বিধা করেন নি। ব্রহ্ম সংগীত থেকে তাঁর একটি গানের উল্লেখ করছি। গানটি হল, আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমার সুগন্ধ হে।" এই গানটির উপর যদুভট্টের

খাতা থেকে উদ্ধৃত গানখানির প্রভাব সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় গানটি হল বহুপ্রচলিত একটি ভৈরবী গান—

"বাবুলা মেরো নইহারে ছুটো না জায়
জাদু জানিয়া মেরো দরবাজে মে
আইরি আপনা বেগানা ছুটি যায়।"

এই গানটিও খাতায় আর একবার লেখা আছে। দ্বিতীয় লেখায় পাঠান্তর—

"বাবুলা মোরা রে নৈয়ারে
ছুটি জাত হৈ', জব ডুলীয়া
দরবাজে লাগে হেয়
আপনা বেগানা ছোড়ি যায়।"

এই খাতাটির মধ্যে আরও বহু রাগের

ওঁ রামায় নম

১ম দফা

| | | | |
|---|---|---|---|
| শিমল্যা পাল | ... | ... | ১০৲ |
| রাইপুর | ... | ... | ৫৲ |
| শ্যামসুন্দর পুর কোঃ | ... | ... | ১০৲ |
| অম্বিকা নগর | ... | ... | ১০৲ |
| মানভূম | ... | ... | ১৫৲ |
| সিন্দরি | ... | ... | ২৲ |
| বরাভূম | ... | ... | ১২৲ |
| পাতকুম মায় খোরাকি ইত্যাদি মঃ কোঃ ... | | ... | ১০০৲ |
| বেগুনে ফোদর | ... | ... | ৫৲ |
| জয়পুর | ... | ... | ২৲ |
| পুরুলীয়া নেয়ামতবাবু | | ... | ৩০৲ |

পরিচয় দিলাম। এই খাতাখানির পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ নির্ধারণ গবেষণা সাপেক্ষ।

যদুভট্টের হস্তলিপির প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের সংগে দেওয়া হল। 'এখানে উল্লেখ করি এই খাতা বোধহয় যদুভট্টের হস্তলিপির প্রথম নজির।

যদুভট্টের স্বহস্তলিখিত বিখ্যাত গানের দুটি কলি

অনেকগুলি হিন্দি গান আছে। খাতাখানির শেষাংশে বাংলা গানগুলির উপর ব্রহ্ম-সংগীতের কিছু প্রভাব আছে বলে অনুমান করি। বাংলা গানগুলির মধ্যে দু-একটি রামপ্রসাদী গানও আছে। খাতার সব শেষে "পাল চৌধুরী" রাগ নামক একটি নূতন রাগের নাম পাই। সম্ভবত যদুভট্টের নিজ-সৃষ্ট কোন রাগের নামকরণ করেছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কোন সংগীত-রসিক বংশের নামে। সম্ভবত রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী পরিবার হবেন।

খাতার মধ্যে পাতকুম মহারাজা শত্রুঘনা-দিত্য দেব মহাশয়ের শীলমোহরযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্যকে প্রদত্ত একটি প্রশংসাপত্র আছে। এই পত্রের তারিখ হলো ২ ভাদ্র, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ। এতে অনুমান করা যায় পাঁচেটগড়ে আসার কিছুদিন আগে যদুভট্ট পাতকুম মহারাজার আমন্ত্রণে তাঁর দরবারে যান। একটি অসমাপ্ত চিঠিরও দুই ছত্র এই খাতায় আছে। চিঠিটি নিম্নরূপ—

"প্রসাদবাটি সাং রূপমঞ্জরী বিদ্যা-সঞ্চারিনী বৈষ্ণবী কে মোঃ ইচ্ছাগড় প্রেরণ করাবশ্যক।"—পত্রে উল্লিখিত এই 'ইচ্ছাগড়' পাতকুম রাজ্যে অবস্থিত—সম্ভবত রাজধানী ছিল।

পাঁচেটগড়ে থাকাকালীন যদুভট্ট কয়েকটি সংগীতরসিক জমিদার পরিবারের সংগে যুক্ত হন এবং তাঁহাদের দরবারে উৎসব-অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যাতায়াত করেন। পাঁচেটগড়ে সংগীত শিক্ষক থাকাকালীন সম্ভবত পাতকুম দরবারের সংগে তাঁর যোগ ছিল। এই খাতার একটি পৃষ্ঠায় বিভিন্ন জমিদার পরিবারের কাছে পাওয়া একটি অর্থের তালিকা আছে—তাতে পাতকুমের উল্লেখ পাই। তালিকাটি দিচ্ছি—

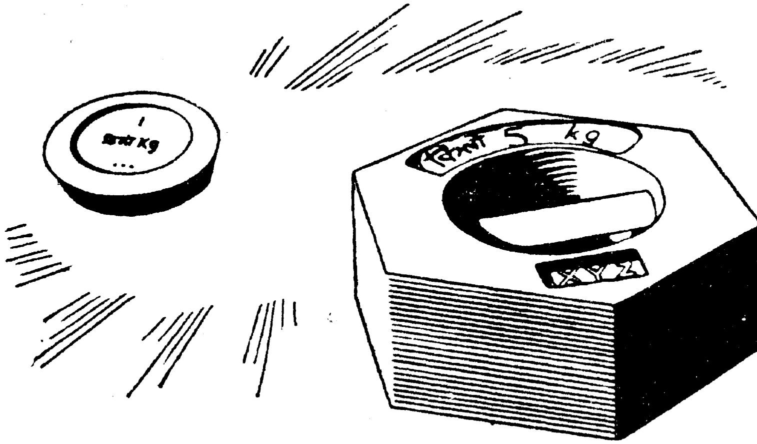
| | | | |
|---|---|---|---|
| আনন্দ আয়ত | ... | ... | ১০৲ |
| কাশীপুর মায় খোরাকি মোখাড়া | | | ১২৲ |
| | | | ২৫০৲ |

২ দফা

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাজের গ্রামের দরুণ কাশীনাথ সাহা কোঃ | | ... | ৫০৲ |
| মহিষাদল | ... | ... | ৩৪৲ |

যদুভট্টের খাতাখানির একটি সংক্ষিপ্ত

# প্রথম পর্য্যায়




১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্ত্তনের প্রথম পর্য্যায় সুরু হয়েছে। দেশের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় মেট্রিক বাটখারা ব্যবহার আইনসঙ্গত করা হয়েছে।

সরকারী বিভাগগুলিতে এবং সূতীবস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভারী রাসায়নিক, কাগজ, সিমেন্ট ও পাটশিল্পে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আস্তে আস্তে সমগ্র দেশে এই পরিবর্ত্তন আনা হবে।

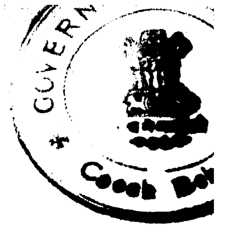
## মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

বর্ত্তমানে প্রচলিত ওজনগুলির মেট্রিক সমতুল জেনে নিন



ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত




# মেট্রিক ওজন : পরিবর্ত্তন তালিকা

(কেটে রাখুন, কাজে লাগবে)

| ছটাক (১ ছটাক = ৫ তোলা) | গ্রাম (নিকটতম গ্রাম পর্যান্ত) |
|---|---|
| ১ | ৫৮ |
| ২ | ১১৭ |
| ৩ | ১৭৫ |
| ৪ | ২৩৩ |
| ৫ | ২৯২ |
| ৬ | ৩৫০ |
| ৭ | ৪০৮ |
| ৮ | ৪৬৭ |
| ৯ | ৫২৫ |
| ১০ | ৫৮৩ |
| ১১ | ৬৪২ |
| ১২ | ৭০০ |
| ১৩ | ৭৫৮ |
| ১৪ | ৮১৬ |
| ১৫ | ৮৭৫ |

| মণ (১ মণ = ৪০ সের) | কিলোগ্রাম (নিকটতম কিলোগ্রাম পর্যান্ত) |
|---|---|
| ১ | ৩৭ |
| ২ | ৭৫ |
| ৩ | ১১২ |
| ৪ | ১৪৯ |
| ৫ | ১৮৭ |
| ৬ | ২২৪ |
| ৭ | ২৬১ |
| ৮ | ২৯৯ |
| ৯ | ৩৩৬ |
| ১০ | ৩৭৩ |
| ১১ | ৪১১ |
| ১২ | ৪৪৮ |
| ১৩ | ৪৮৫ |
| ১৪ | ৫২৩ |
| ১৫ | ৫৬০ |
| ১৬ | ৫৯৭ |
| ১৭ | ৬৩৫ |
| ১৮ | ৬৭২ |
| ১৯ | ৭০৯ |
| ২০ | ৭৪৬ |

| সের (১ সের = ৮০ তোলা) | কিলোগ্রাম | গ্রাম (নিকটতম ১০ গ্রাম পর্য্যন্ত) |
|---|---|---|
| ১ | — | ৯৩০ |
| ২ | ১ | ৮৭০ |
| ৩ | ২ | ৮০০ |
| ৪ | ৩ | ৭৩০ |
| ৫ | ৪ | ৬৭০ |
| ৬ | ৫ | ৬০০ |
| ৭ | ৬ | ৫৩০ |
| ৮ | ৭ | ৪৬০ |
| ৯ | ৮ | ৪০০ |
| ১০ | ৯ | ৩৩০ |
| ১১ | ১০ | ২৬০ |
| ১২ | ১১ | ২০০ |
| ১৩ | ১২ | ১৩০ |
| ১৪ | ১৩ | ৬০ |
| ১৫ | ১৪ | — |
| ১৬ | ১৪ | ৯৩০ |
| ১৭ | ১৫ | ৮৬০ |
| ১৮ | ১৬ | ৮০০ |
| ১৯ | ১৭ | ৭৩০ |
| ২০ | ১৮ | ৬৬০ |
| ২১ | ১৯ | ৬০০ |
| ২২ | ২০ | ৫৩০ |
| ২৩ | ২১ | ৪৬০ |
| ২৪ | ২২ | ৩৯০ |
| ২৫ | ২৩ | ৩৩০ |
| ২৬ | ২৪ | ২৬০ |
| ২৭ | ২৫ | ১৯০ |
| ২৮ | ২৬ | ১৩০ |
| ২৯ | ২৭ | ৬০ |
| ৩০ | ২৭ | ৯৯০ |
| ৩১ | ২৮ | ৯৩০ |
| ৩২ | ২৯ | ৮৬০ |
| ৩৩ | ৩০ | ৭৯০ |
| ৩৪ | ৩১ | ৭৩০ |
| ৩৫ | ৩২ | ৬৬০ |
| ৩৬ | ৩৩ | ৫৯০ |
| ৩৭ | ৩৪ | ৫২০ |
| ৩৮ | ৩৫ | ৪৬০ |
| ৩৯ | ৩৬ | ৩৯০ |

১ কিলোগ্রাম = ১,০০০ গ্রাম

DA 58/247

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

১

জীবনে এই বোধহয় প্রথম একটা দুরন্ত মনের জোরের পরিচয় দিলেন সুষমা দেবী। স্বয়ং ভাসুর তাঁকে ডেকে যে কথা বলেছেন, সে কথা আগুনে ঝাঁপ দিতে বলাই হোক আর জলে ডুবে মরতে বলাই হোক, সে কথা রক্ষা করতে চিন্তা করবেন, দ্বিধা করবেন, এ তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবু আজ মনে হলো, কথাটা মেয়েকে বোধহয় একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। হোক মেয়ে, তবু যেন মনে মনে কোথায় তিনি সুলেখার কথা ভেবে ভরসা পান। নিজের অজান্তেই কখন যেন মেয়ের কাছে নিজের ভালো মন্দ বুদ্ধি-বিবেচনা সব দায় সমর্পণ করে বসে আছেন।

বলাই বাহুল্য, নিবারণবাবুই যে শুধু গম্ভীর হয়ে উঠে গেলেন তা নয়, জ্যাঠাইমাও থমথমে হয়ে উঠলেন। আর সেই থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় করলো সুষমা দেবীর। দাঁড়ালেন একটু, তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কার্তিকের সন্ধ্যা, রংহীন আকাশ কুয়াশায় ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, আম জাম কাঁঠাল কলার বাগানে ঘেরা বাড়িটা যেন ঝমরে এসেছে চারদিক থেকে। মশার ভয়ে সব ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে সুষমা দেবী প্রদীপ জ্বালালেন লক্ষ্মীর আসনের কাছে, ধুনো দিলেন গাড় করে, তারপর লণ্ঠন জ্বালাতে এলেন ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায়।

লাঠি খেলা ছোরা খেলা আজ জমেনি সুলেখার। কাল জ্যাঠাইমার মিষ্টভাষণে অভিভূত হয়ে অনেকেই আজ আসেনি, হয়তো আসবেও না। না আসাই উচিত। ছাদ থেকে আসর ভেঙে দিয়ে সুলেখা গম্ভীর মুখে নেমে আসছিলো শিথিল পায়ে, কিন্তু শেষ তৃতীয় সিঁড়িটির মাথায় এসে থামতে হলো তাকে। বাঁ পাশে জ্যাঠাইমার ঘর, সিঁড়ির জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায় ভেতরটা, হয়তো অন্যমনস্কভাবেই তাকিয়েছিলো, তাকিয়েই পশ্চিমের দরজা ধরে ছবি হয়ে মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পা আর নামলো না। এমন কিছু অস্ফুট কথাবার্তা নয়, এমন কিছু গোপন ষড়যন্ত্রও নিশ্চয়ই নয় যে শুনতে পেলে বা দাঁড়িয়ে শুনলে অন্যায় হবে। অন্যায় হলেও হয়তো কান পাততো সুলেখা। মাকে ডেকে জ্যাঠামশাই কী বলছেন সেটা অবশ্যই শোনবার যোগ্য। ভালোবেসে যে ডাকেননি সেটাতো অন্তত নিশ্চিত। মা যখন বাড়ি বিক্রির কথায় মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন, শুকনো কাগজ কলম নিয়ে বসে 'পাওয়ার অব এ্যাটর্নি' লিখে দিলেন না, দেখেও যেন বিশ্বাস হলো না তার। জ্যাঠামশায়ের রাগী মুখটা উপভোগ করতে করতে মার আগেই সে ঘরে এসে পৌঁছুলো। আর তাকে দেখেই আধো অন্ধকার ঘরে পরামর্শরত দুই ভাই বাবু ছোটু এগিয়ে এলো উত্তেজিতভাবে, 'দুটো টাকা দেবে দিদি?'

লাঠি খেলা ছোরা খেলার পার্টি ভেঙে যাওয়ার দুঃখটা মার বীরত্ব দর্শনে একটু হালকা হয়ে উঠেছিলো সুলেখার কাছে, ভাইদের আব্দার সহাস্যে শুনে বললো 'কী করবি?'

'বলো দেবে?'

'আগে বল্ কী করবি।'

'আগে বলো দেবে কি না।'

'কারণ না জানলে দেয়া যায় কখনো?'

'জেনে যদি না দাও।'

'না দেবার মতো কারণ হলে, তা জেনেও দেবো না, না জেনেও দেবো না।'

বাবু মাথা চুলকোলো, 'বাড়িসুদ্ধ কাল সব্বাই যাদু দেখতে যাচ্ছে, আমরাও যাবো।'

'যাদু। যাদুঘর।'

'না, না, যাদু। ভানুমতীর খেলা।' ছোটু হেসে উঠলো।

'ভানুমতীর খেলা?'

'জানো না? সারা শহরের লোক তো জানে।'

'তাই নাকি?'

'নবাব বাড়িতে এক ফকির এসেছে, মন্ত্রবলে সে নাকি সব করতে পারে।'

নবাব বাড়ি শুনে চকিত হলো সুলেখা, 'কোথায় দেখায়?'

'নবাব বাড়িরই কাজির মাঠে। কী সুন্দর সাজিয়েছে। গ্যালারি হয়েছে, গদির আসন করেছে, বক্স করেছে। নবাব সাহেব তো রোজ বসে দেখেন। শত শত লোক যাচ্ছে, দেখছে—'

'নবাবও যায়?' সুলেখার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

'রোজ। কাল স্পেশাল শো হবে। কী খেলা দেখাবে জানো?'

'কী।'

'একটা সুতোর বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেবে, সেই বলটা গিয়ে গিয়ে একেবারে আকাশের মধ্যে ঢুকে যাবে, আর সুতোটা শক্ত তারের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। আর সেই তার বেয়ে বাজিকরের একটা ছেলে উঠে যাবে উঁচুতে, যেতে যেতে তাকেও আর দেখা যাবে না।'

'মানে সে-ও আকাশের মধ্যে ঢুকে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর তোরা দেখবি?'

দুই ভাই হাসলো, 'গল্পটা শোনো না। সেই ছেলে শুধু আকাশে ঢুকে গিয়েই ক্ষান্ত হবে না। স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ করবে, বাতাসে বাতাসে সেই যুদ্ধের কাড়ানাকাড়া শুনতে পাবে লোকেরা। শেষে ছেলেটার হাত কেটে পড়বে নিচে, পা কেটে পড়বে, গলা কেটে পড়বে, মুণ্ডু কেটে পড়বে, ফকির তখন সেই কাটা হাত পা ধড় মুণ্ডু সব জোড়া দিয়ে বস্তায় ভরে কালো কাপড়ে ঢেকে দেবে, তারপর মন্ত্র পড়ে যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিতেই জোড়া লাগানো মরা ছেলেটা আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠে বলবে আমি কোথায়।'

'ব্যস?'

'ব্যস।'

'তবে তো দেখতেই হয়।'

'উচিত তো।'

'সঙ্গে সঙ্গে তোদের নবাব সাহেবকেও একটু ভালো করে দেখে নেয়া যাবে।'

'দেখোনি?' এটা ছোটো ভাইয়ের প্রশ্ন। 'আমি কিন্তু খুব ভালো করে দেখেছি সেদিন।'

'কবে।'

'তোমাদের করোনেশন পার্কের মিটিংয়ে। ঠিক তোমার পিছনে দাঁড়িয়েছিলো। একদম সাধারণ ধুতি পরে, ভাবছিলো কেউ চিনবে না। আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর।'

'একটা কাজ করবি?' ঠোঁট কামড়ালো সুলেখা।

'কী।'

'তোদের টিকিটের সঙ্গে আমার জন্যও একটা টিকিট কিনে আনবি?'

'তুমি যাবে?' ভানু উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

ছোটু বললো, 'মাকেও নিয়ে চলো না? বাড়ির সবাই তো যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে বুঝি?'

'কোথায় যাচ্ছে তা বলতে বারণ করে দিয়েছেন জ্যাঠাইমা। কিন্তু আমি টের পেয়েছি, ওরা ঐখানেই ঠিক যাবে।'

'জ্যাঠামশায় তো মারামারির ভয়ে অস্থির, কার্জির মাঠে যাবেন কী করে? জয় করবে না?'

নরম পায়ে লণ্ঠন হাতে সুষমা দেবী ঘরে ঢুকলেন, আবছা আলোতে ঠাণ্ডা চোখে তিন ছেলেমেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। মাথায় অনেক লম্বা হয়ে গেছে বাবু। আসছে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। যোগ্য হতে আর কতো বাকী? মনে মনে বোধহয় ভাবলেন কথাটা। আর ছোটু। ছোটু তেমনি রোগা, তেমনি ছোটো। স্বভাবেও ছোটো, দেখতেও ছোটো। আর সুলেখা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। মনে না করে পারলেন না (এটা সুলেখার অনুমান), সুলেখা তার ছেলে হলো না কেন? তা হলে আজ কিসের ভাবনা। ছেলেরা একটুও তাদের বাপের আদল পায়নি। সব পেয়েছে মেয়ে। যেন খুদে বসানো মানুষটি। সুষমা দেবী ঢোক গিললেন। আস্তে বললেন, 'লেখা তোর সঙ্গে আমার কথা আছে?'

'আমার সঙ্গে!' এটাই আশা করছিলো সুলেখা। তবু অবাক হবার ভান করে বাঁকা চোখে মার মুখের দিকে তাকালো সে। সুষমা দেবী ছেলেদের গায়ে হাত বুলোলেন, 'একটু বাইরে যা তোরা।'

ঐটুকু ঘরে চারজন মানুষ এখন আর তারা ধরে না, গিস গিস করে। বাবু ছোটু গিয়ে রাত্তিরে বৈঠকখানায় ঘুমোয়, কিন্তু অন্যান্য সময় আর কোথায় যাবে? এ ঘরেই চারজনে জড়াজড়ি হয়ে থাকে। মন্দ লাগে না। চারজন চারজনকে প্রাণভরে ভালোবাসে, চারজন চারজনের দুঃখ বোঝে। সেদিক থেকে সুষমা দেবীর ভাগ্য ভালো। ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে এখনো শিশুর মতো নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। অবিশ্যি কেউ বা কতোক্ষণ বাড়িতে থাকে। তবু যতোটুকু, ততোটুকুই নিরন্ধ্র।

মার কথা শুনে বাবু ছোটু বেরিয়ে এলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসলেন সুষমা দেবী। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ও'র মৃত্যুর পরে আমি লাইফ ইন্সিওর থেকে দশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম—'

'দশ হাজার!' চমকে উঠলো সুলেখা।

'সে টাকা সবই তোর জ্যাঠামশায়ের নামে ছিলো।'

'আমাকে বলোনি তো আগে।' শক্ত হলো সুলেখার মুখ।

'আমাকে জিজ্ঞেস করিস না, কেন সে টাকা আমি দাবী করিনি, চেয়ে নিইনি, সব কৈফিয়ত তোকে আমি দিতে পারবো না। আমি স্বীকার করছি, আমারই দোষ। কিন্তু তারপর দশ বছর তো রইলাম এ বাড়িতে? সেটাও তো কম কথা নয়?

'বুঝলাম। এখন কী বলতে চাও বলো।'

মেয়ের কঠিন মুখের উপর চোখ বুলিয়ে সহসা হাত চেপে ধরলেন, 'একটা প্রতিজ্ঞা করবি গা ছুঁয়ে?'

'প্রতিজ্ঞা! কী প্রতিজ্ঞা?'

'আমাকে ছুঁয়ে বল্ সে কথা তুই রাখবি?'

'তার জন্যে তোমাকে ছুঁতে হবে কেন? যদি বলি রাখবো, তবে তা রাখবোই। কিন্তু কী কথা রাখতে হবে সেটা না জেনে কথা দিতে পারবো না।'

'আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু বলবো না, যাতে তোর ক্ষতি হতে পারে।'

'ক্ষতি আবার কী? ও-সব ক্ষতিটতির কথা আমি ভাবছি না।'

'তবে কী ভাবছিস?'

'কিচ্ছু না।'

'তা হলে কথা দিচ্ছিস?'

'বলো না কী কথা।'

'এসব ছাড়তে হবে।'

'কী সব?'

'মিটিং করা, মিছিল করা, স্বদেশী দলে মেশা।'

'জ্যাঠামশায় বললেন বুঝি?'

'অন্যায় বলেছেন?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'ঠিকই বলেছেন। আমিও তাই বলি। কী দরকার তোর বাজে কাজে মাথা গলিয়ে। কলেজ আর বাড়ি ছাড়া তুই কোথাও ঘোরাঘুরি করিস এ আমার একেবারে ইচ্ছে নয়। তাছাড়া বাড়ির ছাদ থেকে ঐ সব লাঠি-সোটা বিদায় দাও। আড্ডা ভেঙে দাও।'

'আর।'

'আর কী করিস আমি জানি না। যদি করে থাকিস তা-ও বাদ দিতে হবে।'

'এতোক্ষণ ধরে জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা বুঝি এসবই শাসালেন?'

'কথাটা কি মিথ্যে?'

'সত্য মিথ্যার প্রশ্ন নয়, আমার কোনো কাজ তোমার নিজের অপছন্দ হলেই তুমি বলবে, অন্যের প্রতিধ্বনি কোরো না, অন্তত আমার উপরে কোরো না। তুমি তো জানো সে কথা আমি রাখবো না।'

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে সুষমা দেবী বললেন 'এ সব করে কী লাভ? কেবল নিন্দে। অতোবড়ো একটা শক্তির বিরুদ্ধে তোরা কী করতে পারিস?'

'পারা না পারার কথা নয়। ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা। কিন্তু সে কথা যাক, এটাই কি তোমার বলবার কথা ছিলো?'

'তুই তো বুঝিস, আমি কতো অসহায়। বাবু ছোটু যতোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারবে, যতোদিন তোর বিয়ে দিতে না পারবো, পরের মুখের দিকে তাকিয়েই চলতে হবে আমাকে। এ'রা যা চান না, যা ভালোবাসেন না, তাঁদের বাড়িতে বসে সে সব তো আমরা করতে পারি না।'

শক্ত মুখে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো সুলেখা, আঁচলে মুখ মুছে গম্ভীর হয়ে বললো, 'কথা তোমার শেষ হয়েছে?'

'না।'

'আমি পড়তে বসবো, তাড়াতাড়ি বলো।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, ইতস্তত করে বললেন, 'তুই বড়ো হয়েছিস। আশা করি সব বুঝে জবাব দিবি।'

'তোমার কথায়, না জ্যাঠামশায়ের কথায়?'

'যারই হোক, দুটো তো আলাদা নেই।'

'তোমার কাছে না থাকতে পারে, আমার কাছে যথেষ্ট আছে।'

'তুই কি ঝগড়াই করবি, কথাটা শুনবি না?'

'বলো না।'

'শান্তমনে যদি না শুনিস বলতে পারবো না।'

'বেশ বলো।' জানালা ছেড়ে মার সান্নিধ্যে এলো সুলেখা, সুষমা দেবীর দুই চোখ চকচক করছে জলে। সহসা মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো সে। 'তোমার সব কথা আমি শুনবো, মা, কিন্তু ও'দের মুখের দিকে আর তুমি তাকিয়ে থেকো না।' সুষমা দেবী ঝুপ করে ডুব দিলেন জলে—'তোর জ্যাঠামশায় বাড়িটা বিক্রী করে দিতে চান।'

'জানি।'

'কী করে জানলি।'

'তুমি কী বললে?'

'কিছু বলিনি।'

'কী বলবে ভাবছো?'

'ভাবছি—টাকার তো দরকার, বলছেন ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে—' মার চোখে চোখ রাখলো সুলেখা, 'আমাকে গোপন করে যতোদিন যা করেছ তার আর কোনো প্রতিকার নেই, কিন্তু এখন জ্যাঠামশায়ের কোনো লোভই আর চরিতার্থ হবে না।'

'এ সব তুই কী বলছিস?'

'তোমার গয়নাগুলো কোথায়?'

সুষমা দেবী চুপ করে রইলেন।

'তা-ও গেছে না? এই দশ বছরে তা হলে খেতে পরতে আমাদের কতো লাগলো মা?'

'বাজে কথা রাখ, যা বলছি জবাব দে।'

'আমাদের তো টাকার অভাব নেই—বাড়ি বিক্রী করবো কেন?'

'শোনো কথা, এতোক্ষণ বললাম কী?' 'হিসেবটা আগে নিয়েনি।'

সুষমা দেবী ভুরু কুঁচকোলেন, 'দ্যাখ, এসব কথা নিয়ে কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করবি না। আমি কোনোদিন কিছু বলিনি। হাজার হোক গুরুজন।'

'উঃ।' ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুলেখা, 'তোমার এই গুরু ভক্তিটা একটু কমাও তো। দয়া করে গুরুজনটিকে জিজ্ঞেস কোরো ভাইয়ের নাবালক সন্তান আর তার স্ত্রীকে ঠকিয়ে নিজের মেয়ে দুটিকে না হয় কিছু খরচপাতি করে বিয়ে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কী এমন মোক্ষলাভটা হলো?'

জিভ্ কাটলেন সুষমা দেবী—'ছিঃ এসব কী কথা লেখা? ইচ্ছে করলে তো উনি তাড়িয়েও দিতে পারতেন? লোকেরা তো তাও দেয়?'

'বাড়িটা ও'র একার হলে হয়তো লোকেদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করতেন। কেলেঙ্কারীর ভয়ও তো আছে! তাছাড়া দু'দুজন বিনিপয়সার কাজের লোক নেহাত ফ্যালনা নয় আজকালকার দিনে।'

'মনে রাখিস, দশটা বছর এখানেই আছিস। খেতে পরতে পয়সা লাগে না, না? আরো কতোদিন থাকবো হিসেব আছে তার?'

'বাড়ি বিক্রি করতে পারলে অবিশ্যি একটা হিসেব চটপট করে ফেলতে পারবেন জ্যাঠামশায়, আর আমিও অন্য কোনো কিছুর হিসেব না জানি, লাথিগুঁতো, অনাদর, অবহেলার হিসেবটা তো অন্তত জানি? আজ যে এতো বড়ো হয়েছি, কলেজে পড়ছি তার জন্যে কতো লড়াই করতে হয়েছে তার হিসেবও ভালো করেই মনে আছে আমার। যাকগে, মোট কথা বাড়ি আমাদের বিক্রি হবে না। দয়া করে একথাটা ও'কে জানিয়ে দিও।'

রাগ করলেন সুষমা দেবী, 'না করলে চলবে কী করে? রাগ করে যদি দেশে পাঠিয়ে দেন—'

'পাঠাবার কর্তা কি উনি?'

'নিশ্চয়ই। তোর বাবা নেই, উনি অভিভাবক। ও'র কথাতেই ওঠাবসা।'

'বেশ তো, এ বাড়িতে যদি নেহাত না-ই থাকতে দেন, সুরী লেনের বাড়িতেই চলে যাবো। সেখান থেকে তো আর জোর করে দেশে পাঠাতে পারবেন না।'

'সে কী?'

'আর টাকাকড়িরও একটা হিসেব নেয়া দরকার।'

'কী বলছিস তুই?' মেয়ের কথায় তাজ্জব বনে গেলেন মা। বড়ো বড়ো দম নিয়ে সুলেখা বললো, 'আর এ-বাড়ির অংশও ছাড়বো না। লোক ডাকিয়ে বাড়ি ভাগ করে, তবে অন্য কথা।'

'ছি ছি ছি—' এতোখানি জিভ্ কাটলেন সুষমা দেবী।

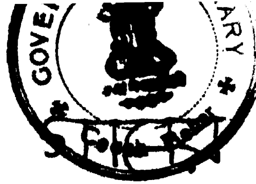
'ছি ছি তোমাকে।' উত্তেজনায় হাঁটতে লাগলো সুলেখা, 'যাদের বাপ অত টাকা রেখে গেছেন, তাদের তুমি রাস্তার ভিখিরির মতো মানুষ করেছ। ওদের কাছে এতো টাকা আমাদের গচ্ছিত ছিলো, তবু কোনো দিন নিজের ছেলেমেয়েদের সামনে ওরা আমাদের খাওয়াননি, পরাননি। ডাল ভাত মুড়ি। এই চারবেলার খাওয়া। আর এই গুদোমে থাকা, এতো বছরের মধ্যে একটা ভালো কাপড় পর্যন্ত কিনে দেননি। অথচ খরচের বেলায় আমাদের বেশী ওদের কম। এই অদ্ভুত অংকটার একটা ফয়সালা করতে হবে তো?'

ব্যস্ত হয়ে নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুষমা দেবী। 'চুপ কর লেখা, চুপ কর। কেউ শুনে ফেললে কী হবে বল দেখি? ছি, ছি, এতো বড়ো গুরুজন, তিনি যাই করুন, তাই বলে তুই বলতে পারিস এ সব কথা? আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

লালচে মুখে হাসলো সুলেখা, 'লজ্জায় আর মরতে হবে না তোমাকে, তোমার গুরুজনটি এবার ভাত না দিয়েই মারতে পারবেন বাড়ি বিক্রি না করলে। সে টাকাটা তো এখনো খাওয়া হয়নি। চোর। পাপিষ্ঠ।'

ক্ষোভে দুঃখে আধখানা হয়ে এবার ঘর ছেড়ে সুষমা দেবী মেয়ের সামনে থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এ-বাড়ির বৌ তিনি। কোন্ ছেলেবেলায় এসেছেন, চিরদিন ঘোমটা টেনে অন্ধের মতো সকলের সব কথা শুনে, মাননীয়দের মান্য করে, শ্বশুর-ভাসুরের সেবা করেই তিনি অভ্যস্ত। কোনো দিন তিনি তাদের বিচার করেননি, বিশ্লেষণ করেননি, ন্যায় করুন, অন্যায় করুন, তাঁরা তাঁর চেয়ে বড়ো এই একমাত্র অভিজ্ঞান। এখন মেয়ে কিনা এ রকম বলছে। এ রকম অপমান করছে, এ যে পাপ। এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

ক্রমশ



# আসর

**শার্ঙ্গদেব**

এবারকার কোনো একটি মাসিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় রবিশঙ্করের "চেরী ফুলের দেশে" কেবলমাত্র সংগীত সমালোচক এবং সংগীত বিদ্যার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করবার জন্যই লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। যে বিষয়ে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে প্রবেশের অধিকার শুধু জনপ্রিয়তার সুযোগেই অর্জন করা যায় না; ফলে সমগ্র প্রবন্ধটিই অবিদ্যার আস্ফালনে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের আমন্ত্রণে রবিশঙ্কর জাপানে সংগীত সংস্কৃতির পরিচয় আদান-প্রদান করতেই গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বলবার মত তথ্যও শিল্পী হিসাবে তাঁর অনেক কিছু ছিল কিন্তু সম্প্রতি সমালোচক এবং গবেষকদের শাসন করবার প্রয়োজন তাঁর এতই প্রবল হয়েছে যে, সেটাই এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে প্রাধান্যলাভ করেছে এবং মূল সাঙ্গীতিক বক্তব্য উত্তেজনার বশে এ যাত্রা আর বলাই হয়ে ওঠেনি।

জনৈক সমালোচক ইতিপূর্বে তাঁর বক্তৃতার সমালোচনা করেছিলেন। এতে তিনি এতই রুষ্ট হয়েছেন যে, শুধু তাকে নয়, যে পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় সেটিকে উপলক্ষ্য করেও নানাবিধ অসহিষ্ণু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এগুলো ব্যঙ্গাত্মক নয় কটূক্তি এবং ব্যাপারটি ব্যক্তিগত—অতএব এ বিষয়ে আলোচনা করে কদর্য-নিক্ষেপে উৎসাহ প্রদান করা আমাদের অভিপ্রেত নয়।

এইটুকুতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। সমগ্র ভারতীয় সংগীতবিদ্যার প্রতি শিষ্ট মনোভাব পোষণ করবার কোন প্রয়োজনীয়তা যে তিনি অনুভব করেন না সেটাও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

জাপানে অত স্বল্প অবস্থিতির মধ্যেই রবিশঙ্কর সে দেশের সংগীত সমালোচক-দের উন্নত ধারা সম্বন্ধে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হয়েছেন এবং এদেশের সমালোচকদের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছেন,—"আজকাল লক্ষ্য করছি যে, বিষয়ের গভীরে না গিয়ে ওপর থেকে ভাসা ভাসা গোছের কিছুটা বাকচ্ছটা দিয়ে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করছেন। কথা হচ্ছে, শিল্পীরাও যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়ের গভীরে না গিয়ে ওপর থেকে ভাসা ভাসা বাকচ্ছটা বা গীতচ্ছটা দিয়ে তদের কর্তব্য সম্পাদন করেন তাহলে সমালোচকদের পক্ষে আর কিছু করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু, এই সমালোচকদের জন্যই আজকাল পত্রপত্রিকার পুরোভাগে তাঁদের অনুষ্ঠানের বিবৃত বেরুচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে এবং পারিশ্রমিক বর্ধিত হবার বহু সুযোগ এসে যাচ্ছে। এমন কি, কালচারেল টুরে যাবার সুযোগও মিলছে বৈকি। ইতিপূর্বে সংগীত সমালোচনার জন্য বিশিষ্ট পত্রপত্রিকায় উপযুক্ত স্থান সংকুলান করাই দুঃসাধ্য ছিল। এত করেও সমালোচকগণ শিল্পীদের মন পান না এমনিই তাঁদের কপাল।

এরপর রবিশঙ্করের উক্তি—"কেউ কেউ আবার বিখ্যাত ব্যক্তিদের নস্যাৎ করবার পুরোনো প্যাঁচ প্রয়োগ করে রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন।" কিন্তু রাতারাতি বিখ্যাত রবিশঙ্কর যে প্যাঁচটি প্রয়োগ করেছেন সেটি সম্পূর্ণ নতুন। যেসব পণ্ডিত এবং মান্য ব্যক্তি বহু আয়াস সহকারে ভারতীয় সংগীতের তত্ত্ব অনু-সন্ধান করে সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পূর্ণতা সাধন করছেন তাঁদের তিনি দেশ বিদেশে নস্যাৎ করতে অগ্রণী হয়েছেন।

ভারতীয় সংগীতে ক্রিয়াত্মক সংগীতজ্ঞের দান নিয়ে রবিশঙ্কর অনেক লম্বা তর্ক করেছেন। কিন্তু একটি ছোট প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হচ্ছে। যদি তাঁদের দানশীলতা এতই বিরাট হয় তাহলে সেই প্রাচীন সংগীতের নমুনাগুলি গেল কোথায়? বাক, হ্যাণ্ডেল, হেডেন, মোজার্ট, বিটোফেন—এঁদের সবাইকার রচনা সুরক্ষিত হয়ে আছে কিন্তু গোপাল নায়ক, আমীর খসরু, মিঞা তানসেন—যাঁদের নাম রবিশঙ্কর বিশেষভাবে করেছেন তাঁদের অধিকাংশ গান মেলে না কেন? তাঁরা নিশ্চয়ই ক্রিয়াসিদ্ধ বাছা বাছা শিষ্য কিছু রেখে গিয়েছিলেন। সেইসব শিষ্যেরা লোকপরম্পরায় যাতে এইসব গান বজায় থাকে সে চেষ্টা করে-ছিলেন কি? গোপাল নায়ক যে বত্রিশ রকমের রাগ তালযুক্ত গদ্যাত্মক ভ্রমর নামক স্বস্তিক শ্রেণীর রাগকদম্বক সংগীতের অনুষ্ঠান করতেন তার সামান্য পরিচয়ও তথাকথিত ক্রিয়াসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ রেখে যাননি। তার উল্লেখ করেছেন কল্লিনাথ যিনি সংগীতরত্নাকরের প্রসিদ্ধ টীকাকার। তাঁরা বরঞ্চ যাতে তাঁদের পুঁজি অপরের হাতে পড়তে না পারে বরাবর সেই চেষ্টাই করেছেন এবং এরই ফলে ভারতীয় প্রাচীন সংগীতের নিদর্শন প্রয়োগশিল্পীদের কাছ থেকে পাওয়াই সম্ভব নয়। এমন কি, আধুনিক যুগেও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে যেসব সংগীত সংগ্রহ করেছেন সেগুলি ওস্তাদরা অবিকৃতভাবে তাঁর হাতে তুলে দেন নি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লেখা





হ্যুইদার হিন্দুস্থানি মিউজিক নামক যে প্রবন্ধটি গত ২রা নবেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেটি দ্রষ্টব্য। অতএব আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে গেলে পুরাতন সংগীত-সাহিত্যই যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বস্তু সেটা স্বীকার করলে কি অন্যায় হয়? বরঞ্চ স্বীকার না করাটাই অকৃতজ্ঞতা।

রবিশংকরের মতে, "গুহাযুগের লেখা যেসব প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র—আধুনিক যুগে যা একেবারেই "অচল" তার "স্থান ফসিলের টুকরোর মত মিউজিয়ামের তাকে হওয়া উচিত"। আর, এসব কবর খোঁড়া গ্রন্থগুলিকে আবার কবরস্থ করাই যুক্তিযুক্ত। অথচ রবিশংকর যখন পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের হাজার বছরের সাংগীতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেন তখন এই গুহাযুগের লেখা শাস্ত্রগুলির ওপরেই বোধ হয় তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

রবিশংকরের মতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্র উদ্ধৃত করে "ইতিহাসের সঠিক বিচারে অক্ষম পাঠকদের ধাপ্পা দিয়ে তাক লাগিয়ে" দিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা অক্ষম পাঠকদের ধাপ্পা দেবার জন্য এত কষ্ট করে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে যাবেন কেন এবং ধাপ্পা দিয়ে তাঁদের লাভ কি সেটা অবশ্য আমরা বুঝতে পারি না, তবে রাত আড়াইটে থেকে সকাল পর্যন্ত একঘেয়ে ঝালার সঙ্গে অবিশ্রান্ত তবলার দাপাদাপি যে সংগীতের সঠিক বিচারে অক্ষম শ্রোতাদের ধাপ্পা দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। রবিশংকর অবশ্যই এটি স্বীকার করবেন না, কেননা, এটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াত্মক ব্যাপার। নাদব্রহ্ম তো ঐ ঝনঝনানির মধ্যেই প্রকট আর বাকি সব মরা যাদুঘরের চিজ।

পণ্ডিতেরা যদি মনে করেন, শাস্ত্রের সঠিক প্রয়োগাধিকার শুধু তাঁদেরই আছে, অর্থাৎ তাঁরাই ঐসব শাস্ত্রের একমাত্র স্বত্বাধিকারী তাহলে সেটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে আমরা মনে করি না, কেননা, গায়ক বাদকেরা যে চেষ্টায় প্রয়োগশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেন তার চেয়ে অনেক গুরুতর পরিশ্রমে তাঁদের পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয় এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগবিদ্যাও তাঁদের জানতে হয়। অতএব এতখানি পরিশ্রম করে তাঁরা যে অধিকার অর্জন করেছেন সেটা তাঁদের ন্যায্য অধিকার বৈকি। আজকালকার অনেক ভুঁইফোঁড় ওস্তাদ যখন কতকগুলি বানানো জিনিসকে ক্লাসিক বলে চালাতে চান তখন পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাধা পেলেই তাঁরা খাপ্পা হয়ে ওঠেন। পণ্ডিতগণ সঠিক বিচারের জন্যই অধ্যয়ন করেছেন, বাজে তর্কে প্রবৃত্ত হবার জন্য নয় অথবা কোন জনপ্রিয় শিল্পীকে নির্বিচারে সমর্থন করবার জন্যও নয়।

রবিশংকরের বেপরোয়া মন্তব্য নিয়ে আরও অনেক আলোচনা করা যায় কিন্তু তাঁর উক্তি অনুসারেই হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে আর পাতা ভরাতে চাই না। শেষ পর্যন্ত একটা কথা বলি। নির্ভীকতা খুবই ভাল জিনিস যদি তার পিছনে শিক্ষা, চিন্তা এবং আদর্শ থাকে। কেবলমাত্র আক্রোশের বশবর্তী হয়ে নির্বিচার মন্তব্য প্রকাশ করলে অর্বাচীনতা এবং ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

# চিত্র প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে শীলা সুবারওয়াল-এর ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। শিল্পী সবসুদ্ধ ছবি পেশ করেছিলেন ৬৫টি। বিভিন্ন সময় ইনি বিভিন্ন ঢঙে চিত্ররচনা করেছেন। প্রথমে ইনি আর্ট শিক্ষা করেছেন লাহোরের কোনও এক স্কুল-এ, তারপর বোম্বাই-এ, তারপর কিছুকাল দিল্লীতে বাড়িতে মাস্টার রেখে এবং সবশেষে কলকাতার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস এর স্টুডিওতে। এখনও তাঁর শেখবার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়নি; বিদেশ যাবার ইচ্ছা তবে ইউরোপ বা আমেরিকায় নয়, জাপানে। শেষের দিকের রচনায় শ্রীমতী সুবারওয়াল কিছুটা স্বকীয়তা অর্জন করেছেন; যদিও রথীন মৈত্রের চিত্রকল্পের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমতী সুবারওয়াল শেষের দিকের রচনায় সাঁওতালী জীবনযাত্রার নানাদিক বর্ণিত করেছেন। রচনার টেকনিকও তাই কিছুটা অভিনব। কালো মোটা মোটা রেখার বেষ্টনীর মধ্যে আকারকে ধরে ঢালা বর্ণ ব্যবহার করে গেছেন রুচিমত। এই কৃষ্ণ-বর্ণের রেখাগুলিই ছবিতে প্রধান হয়ে প্রকাশ পাওয়ায় তাৎপর্য সীমার দ্বারা পরিমিত হয়ে পড়েছে। ফর্ম-এ কিছু কিছু অ্যাবস্ট্রাকশন থাকা সত্ত্বেও এ যেন অচেনা অজানার দিকে ইঙ্গিত করছে না। কিন্তু আইডিয়া যখন ভাবরাজ্যের কথা স্মরণ করায় তখন বর্ণকেই প্রধান করা প্রয়োজন। শ্রীমতী সুবারওয়াল বর্ণ ব্যবহার করেছেন নানা রকম কিন্তু ঐ স্থূল কালো রেখাগুলোর উপস্থিতি সে সব বর্ণকে তাদের স্বরূপে প্রকাশিত হতে দেয় নি। চীনা বা জাপানী আর্টেও রেখা আছে, কিন্তু দেখি, তার বিশিষ্টতা রেখার সীমাকে এড়িয়ে বর্ণের নিবিড়তা ও মনের প্রসারের মধ্যে ডুব মেরেছে। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার যেসব নিদর্শন আমরা দেখতে পাই অজন্তায় তাও এক সময় বর্ণপ্রধান ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ফিকে হয়ে গেছে, কোথাও বা উঠে গেছে, তাই রেখাগুলি এখন প্রধান বলে ভ্রম হয়। শ্রীমতী সুবারওয়ালের বর্ণের প্রতি অনুরাগ অসীম কিন্তু তাঁর স্টাইলের ফলে শুধু আকৃতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই যেন বর্ণকে ব্যবহার করা

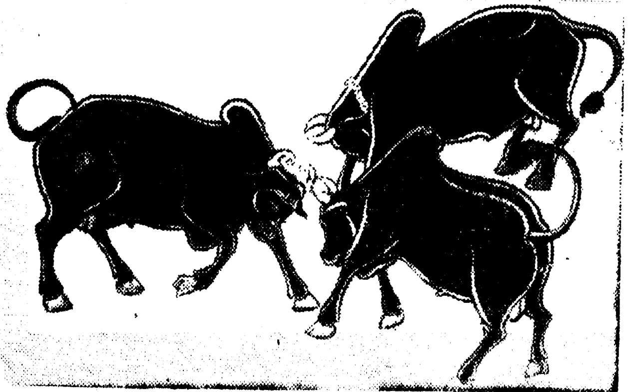


সাঁওতাল মেয়ে

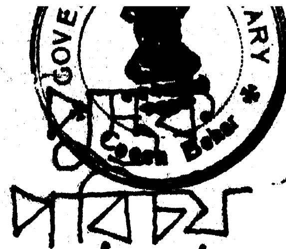
হয়েছে বলে মনে হয়। বর্ণের নিজস্ব মূল্য এবং বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে রেখাকে অত প্রাধান্য না দেওয়াই সমীচীন। এবং যে 'পেইন্ট' ব্যবহার করা হয় সেটিও বিশেষভাবে বাছাই করা দরকার, কারণ যে কোনও পেইন্টিং-এর সবচেয়ে প্রধান অঙ্গ তার 'পেইন্ট'। এই 'পেইন্ট' নানা শৈলীতে কখনও বা পাতলা করে প্রয়োগ করে, কখনও বা লেই অবস্থায় প্রয়োগ করে আবার কখনও বা শক্ত রঙ ঘষে দিয়ে, নানান রকম ভাব প্রকাশ করা যায়। আর সকলের মতন শিল্পীদেরও চরিত্র স্বতন্ত্র, একজনের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। সুতরাং যে কোনও শিল্পীর রচনা, যদি তিনি নকল-নবিশ না হন, স্বকীয়তার ছাপ বহন করে। সেইরকম বিভিন্ন 'পেইন্ট'-এরও, যদিও এরা নিষ্প্রাণ বস্তু, স্বকীয়তা আছে। রস-রচনা সৃষ্টি করতে হলে এই পেইন্টেরও যাতে স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। একেকরকম বিষয়বস্তুর জন্যে একেকরকম পেইন্টের প্রয়োজন হয়। যেমন নদী প্রভৃতির দৃশ্যাবলী জলরঙের চেয়ে ভালভাবে আর কোনও মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; তেমনি ফ্রেস্কো, টেম্পারা, প্যাস্টেল, তৈল প্রভৃতি প্রত্যেকটি মাধ্যমের জন্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু। যদি কোনও শিল্পী জলরঙ ব্যবহার করেন এমন প্রকাশভঙ্গীতে যা থেকে মনে হতে পারে যে, রচনাটি তৈলচিত্র, তা হলে বলতে হবে, পেইন্টের স্বকীয়তা নষ্ট হয়েছে। এতে শিল্পী টেকনিকের কায়দা দেখালেও রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন না।

যাই হোক, শ্রীমতী সুবারওয়াল সাদৃশ্য সত্য ধরে রচনায় এবং প্রতিকৃতি রচনায় বেশ পটু। এঁর টানটোন বেশ পরিণত। উল্লেখযোগ্য রচনা—'মাই পেট', 'নিউডস', 'এ পাঠান', 'এ হেল্পিং হ্যান্ড', 'সুলেস', 'সান্থালস আন্ডার এ ট্রী', 'দি রাউট ইন রীদম', 'এ টক' এবং 'বীট অব দি ড্রামস'।

আমরা এ প্রদর্শনীটি যথার্থই উপভোগ করেছি। শিল্পীর অধ্যবসায় এবং আগ্রহ সত্যই প্রশংসনীয়। প্রত্যেক শিল্পীরই সবচেয়ে বড় আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা—এটা শ্রীমতী সুবারওয়ালের আছে সুতরাং যদি লোকনিন্দার ভয়ে আত্মগোপন না করেন কোনওদিন তা হলে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক আনন্দ ও সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হবেন না কখনও। আমরা শ্রীমতী সুবারওয়ালকে অভিনন্দন জানাই। **চিত্রগ্রীব**



ষাঁড়ের লড়াই




## বিপ্লব-ইতিহাস

**ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা**—ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬। দাম—চার টাকা।

স্বাধীন ভারতের তরুণ নাগরিকেরা বিগত দিনের ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রায় ভুলতে বসেছে। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্য যে কর্তামহল সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনে উদ্যোগীদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিতে কুণ্ঠিত। এই বইয়ের ভূমিকায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বর্তমানে প্রথম মহাযুদ্ধের আগের ও পরের বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ওপর লেখার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু এখনো পূর্ণ ইতিহাস রচিত হয়নি—প্রধানত তথ্যের অভাবে। ডাঃ ভট্টাচার্যের এই স্মৃতিকথা থেকে উৎসাহী ঐতিহাসিক ও পাঠক প্রাক্ প্রথম মহাযুদ্ধ যুগের ভারতীয় বিপ্লবীদের ইয়োরোপে কার্যকলাপের অনেক বিস্ময়কর তথ্য জানতে পারবেন।

এই বইকে ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। তখনকার বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাভারকর, ধিংড়া প্রভৃতি নায়কদের জীবনচরিত থেকে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের রূপরেখা। ডাঃ ভট্টাচার্য নিজে একজন বিপ্লবী এবং এইসব নায়কদের সঙ্গে কর্মযোগে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অতএব তাঁর বিবরণীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দু-একটি তথ্যের ত্রুটির প্রতি ডাঃ দত্ত ভূমিকায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; পরবর্তী সংস্করণে ডাঃ ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই এগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করবেন আশা করি। আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ প্রয়োজন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শেষ জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে ডাঃ ভট্টাচার্য কোনো সংবাদ দিতে পারেননি। মার্কিন সাংবাদিক আগনেস্ স্মেডলী (Agnes Smedly) দীর্ঘকাল বীরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে (আইনগত প্রতিবন্ধকতার জন্যে তাঁদের বিয়ে করা সম্ভব হয়নি) কাটিয়েছিলেন। তাঁর বই 'Battle Hymn of China'-তে তিনি জানিয়েছেন যে, বীরেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিশিয়ান এবং ঐ পদে থাকার সময়েই ১৯৩৫ সালে মস্কোতে মারা যান। আশা করি, ডাঃ ভট্টাচার্য স্মেডলীর এই উক্তি গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার করে দেখবেন।

৪৯৫।৫৮

## শিক্ষা প্রসঙ্গ

Student unrest : Causes and cure—হুমায়ুন কবীর: ভূমিকা—শ্রীজহরলাল নেহরু। প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

বর্তমান ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল। এর ফল যে জাতির পক্ষে অশুভ, এবিষয়ে দ্বিমত নেই কোথাও। কিন্তু, এর কারণ ও প্রতিকার নির্দেশ করার ক্ষেত্রে মতান্তর আছে। ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে অধ্যাপক কবীর গবেষণা করেছেন এই বিষয়ে, এবং তাঁর গবেষণা-প্রসূত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগুলি পেশ করেছেন ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির নিকট স্মারকলিপির আকারে। তাঁর সেই স্মারকলিপিগুলির সংকলন এই বইটি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু অধ্যাপক কবীরের তথ্য ও সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে একখানি পত্র দেন '৫৪ সালের অগাস্ট মাসে প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর চিঠিখানি এই বইয়ের ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ, অধ্যাপক কবীরের মতে, এই যে, শিক্ষকসমাজ ছাত্রদের ওপর নেতৃত্ব হারিয়েছেন এবং তার কারণ, শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতি। শিক্ষকসমাজের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হলে ছাত্রদের উন্নতি অসম্ভব। অতএব, শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর হওয়া উচিত শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতি অবসানের ব্যবস্থা। অথচ শিক্ষা-সংস্কারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্ব লাভ করেনি। শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির যে সামান্যতম ব্যবস্থা হচ্ছে, তার মধ্যে এমনসব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার উপক্রম। মকরধ্বজ মাটিতে ফেলে রেখে খল-নুড়ি নিয়ে ঘষাঘষি চলছে, এদিকে রোগী বাঁচে না।

শিক্ষা সংগঠন সম্পর্কেও নানা আলোচনা আছে। এখানে মতান্তরে হওয়ার অবকাশ বেশি। কবীর সাহেবের মতে শিক্ষা সংগঠনগুলি নির্বাচন-নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, অর্থাৎ মোটামুটি সরকারী কর্তৃত্বাধীন হলেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, যেহেতু আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাস স্বতন্ত্র অন্যান্য দেশের যথা আমেরিকার বা জার্মানীর মতো নয়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ঐতিহ্যও স্বতন্ত্র। উপরন্তু, আমাদের একটা প্রাচীন ঐতিহ্যও আছে। এই কারণে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব স্বীকারে বিমুখ সরকারের হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে আপত্তি দেখা যাচ্ছে।

কবীর সাহেব সরকারের আর্থিক অনটন সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু আর্থিক অনটন সত্ত্বেও শিক্ষার মান কতটা উন্নত করা সম্ভব এবং কী উপায়ে, তা তিনি নির্দেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাঁর উপদেশ রূপায়িত করার জন্যে তৎপর হলে আশার কথা।

অধ্যাপক কবীরের যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ে পাণ্ডিত্য বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী এমন চমকার যে যাঁরা শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ নন, তাঁরাও এগুলি পড়তে আদৌ ক্লান্তিবোধ করবেন না। একথার উল্লেখ এই-জন্যে প্রয়োজন যে সরকারী দপ্তরের দলিল সাধারণত নীরস হয়ে থাকে অ-ব্যাপারীর কাছে। কিন্তু এই দলিলগুলি দপ্তরের মরু-কাঠিন্যমুক্ত।

প্রকাশক যদি এই বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাহলে একটা কাজের কাজ হবে আশা করি।

৪৯৪।৫৮

## ভ্রমণ কাহিনী

**নতুন ইয়োরোপ নতুন মানুষ**—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

**লেখকের জার্মানী যাত্রার কাহিনী। বিদেশ সম্পর্কে গল্প [illegible] মনোরম ভঙ্গীতে লেখা এই বইটি পড়তে পড়তে অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। ইয়োরোপে যেমন কোন হলিডে ট্র্যাভেল এজেন্ট দ্রুতগতির কোচে সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেন এবং** সঙ্গে সঙ্গে গাইড ক্রমাগত পথের আশে পাশের দর্শনীয় বস্তুসমূহের কথা বলে যান, মনোজ বসুর ভাষা অনেকটা সেই গাইডের ভাষার মত—সহজ, সরল, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ এবং আন্তরিক। নানা স্থান সম্পর্কে বর্ণনায় লেখক মাঝে মাঝেই কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। তবে তিনি এমন দ্রুতগতিতে সমস্ত স্থানে গিয়েছেন যে প্রতিটি স্থানের হাওয়া নাকে নিতে না নিতেই, দৃশ্য দেখতে না দেখতেই চলে আসছে নতুন হাওয়া, নতুন দৃশ্য। অতএব সাহায্য নিতে হয়েছে সেই সমস্ত বিদ্যুৎগতিতে দেখা জিনিসগুলির সঙ্গে কল্পনার। ফোটোগ্রাফ, কিন্তু সমস্ত স্থান স্পষ্ট নয়। তাঁর ভাষার নমুনার সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত, কিন্তু তবু দুটো উদ্ধৃতির লোভ সামলানো গেল না : (১) "লেখক হিসাবে বিশ্বখ্যাত—নিদেনপক্ষে, স্বদেশখ্যাত হবেন তো পৃথক প্রণালী আছে। ন্যাড়া-কলম চালিয়ে সে-কাজ হয় না। খ্যাতি ও পুরস্কারের জন্য ভালো করে লেখাই একমাত্র বস্তু নয়। এমনকি প্রধান বস্তুও নয়। ভালো লেখেন তো তার ফলে কিছু সুবিধা হবে তদ্বিরের পক্ষে।" (পৃঃ ১৮৩)

(২) "ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরী দেখি। ভারতের মানুষ এসেছি—অতএব ভারতের যত রকম বই তরজমা হয়েছে, ভালো জায়গায় আলাদাভাবে রেখে দেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই—হালফিলের যাঁরা রয়েছেন, তার মধ্যে বাঙালী বলতে একমাত্র হুমায়ুন কবীর। বলতে পারলাম 'টেগোরে'র পরে ঐ দেখো একটি বাঙালী লেখক।" (পৃঃ ১৬০)

বিদেশী কথার উচ্চারণ ভুল মাঝে মাঝেই আছে। এমব্যাসি কথাটি কি 'অ্যাম্বাসি'? উনিশটি ছাপা ছবির মধ্যে এগারোখানিতেই লেখকের নানা ভঙ্গীতে এবং নানা স্থানে তোলা ছবি এ বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ।

৪৯৭।৫৮

## উপন্যাস

**নীলরাত্রি**—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। সাড়ে তিন টাকা।

বিপত্নীক, চিররুগ্ন সন্তানের পিতা, অসুখী নীরদ এবং প্রেমবঞ্চিত, স্বামীত্যাগী, ব্যর্থ-যৌবনের যন্ত্রণায় অস্থির পূর্ণযুবতী মালা পরস্পর কাছাকাছি হল; বাঁচার একটা আনন্দ-ঘন আস্বাদ পেতে চাইল। কিন্তু দেখা গেল বিয়োগান্তিক পরিণতিতেই তাদের বাঞ্ছনার ফলশ্রুতি। নীরদ তার পঙ্গু ছেলেকে নিয়েই হাওয়া বদলের আয়োজনে স্বস্তি পেল; মালা পুনর্মূষিক হয়ে ফিরে এল লম্পট স্বামীর

আয়ত্তে এবং **শেষ পর্যন্ত এই** দুজনার **স্বপ্নের** আলয়ে পড়ে হরির আর মস্ত সবল—বাৎসল্যের মূর্ত প্রতিমাই থাকে বলা যায়—মানুষটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই নিষ্প্রাণে আশ্রয় তা করল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'নীলরাত্রির' কাহিনীসূত্র মোটামুটি এই। অরুন্ধতী, রমা, সুখেন্দু, লালমোহন ইত্যাদি কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকাও গল্পের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে। কিন্তু 'নীলরাত্রি' কি নিছক একটা ঠাস গল্পের উপন্যাস? মানুষের সুখী হওয়া তার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না, সম্পূর্ণই এটা তার পরিবেশসাপেক্ষ। এবং অধিকাংশ মানুষই পরিবেশের ক্রীতদাস ছাড়া আর কি? মানে, পরিবেশই চরিত্র গঠনের—তার দুর্বলতা কি বলিষ্ঠতার নির্মাতা। এমনি একটা দার্শনিক বক্তব্য সম্ভবত বাহ্য কথাবস্তুর নেপথ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে। আর হরিরমার মৃত্যু কি আমাদের এই প্রশ্নেই কাতর করে না যে অসুস্থ, যন্ত্রণাদীর্ণ, নির্বাসিত পরিবেশে পবিত্রতা তথা সরলতার অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব?

স্বভাবতই আলোচ্য উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণধর্মী হতে হয়েছে। এই বিশ্লেষণ মূল চরিত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায়, অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরাবরণ বর্ণনায় সুনিপুণ ও যুক্তিগ্রাহ্য। এবং এ প্রসঙ্গে লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ঐশ্বর্যে রীতিমত সমৃদ্ধ হওয়ার কথাটা আবার মনে আসে। কিন্তু সংলাপ রচনায় তাঁর বাস্তবানুগতা আশানুরূপ নয়—এই ত্রুটি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মত এখানেও অনতিক্রান্ত রয়ে গেছে। আর ভাষা? তীক্ষ্ণ, বিষয়ানুগ, বলিষ্ঠ অথচ কাব্যময় ভাষা তৈরীর দুর্লভ দক্ষতায় শ্রীযুক্ত নন্দীর অধিকার ছিদ্রান্বেষী সমালোচকেরও বিস্ময়ের কারণ। ৮৫৪।৫৮

**জলতরঙ্গ**—মণীন্দ্রচন্দ্র সাহা। প্রকাশক: ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৫, পাটুয়াটুলী (ইসলামপুর), ঢাকা। দাম—পাঁচ টাকা।

দরিদ্র ফেরিওয়ালা কাশীনাথের সংসার। পুত্র শ্রীনিবাস পড়াশোনা করতে পেল না অর্থাভাবে। অল্পবয়সেই স্থানীয় সম্পন্ন ব্যবসায়ী হরদয়ালের গদিতে বহাল হল। সে রূপবান, গুণবান। তার দিদি মধুমতীও সুন্দরী। মা সুমতিও রূপেগুণে অনন্যা। এই সংসারের সুখদুঃখে, আশা আকাঙ্ক্ষায় আবর্তিত হয়েছে উপন্যাস। দৃষ্টিভঙ্গী অথবা আঙ্গিকের মৌলিকত্ব নেই বটে, তবে সুলিখিত। 'তারপর কী হল', এই মন নিয়ে যাঁরা উপন্যাস পড়েন, তাঁদের ভালো লাগবে। ৪২৬।৫৮

**অবসন্ন**—তারাকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—প্রসাদ প্রকাশনী, ২২৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭। দাম—চার টাকা।

প্রকাশক উপন্যাসের অস্বাক্ষরিত ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, "অবসন্ন" কলকাতার আশেপাশে শহরতলীর এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস' এবং 'এই অসামান্য শক্তিধর লেখককে বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাই স্বাগত জানাচ্ছি।' এই কথাগুলো পড়ে স্বভাবতই আগ্রহ জেগেছিল এই উপন্যাস সম্পর্কে। বিশেষত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে গল্প উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয়, তাঁদের বাস্তবজীবন ও সমস্যা প্রায়ই রোমান্টিক ভাবালুতায় চাপা পড়েছে। এই লেখক হয়তো শিক্ষকদের জীবন নিয়ে একটি বাস্তবানুগ উপন্যাস লিখছেন, এই কৌতূহল ও আশা নিয়ে 'অবসন্ন' পড়তে শুরু করি। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের কথা, উপন্যাসের নায়ক আদর্শবাদী অকৃতদার, বিবেকানন্দ-অনুরাগী বিপ্লবপন্থী নরেন্দ্রচন্দ্র শেষ পরিচ্ছেদে 'অবসন্ন' হয়েছেন, আর আমরা ক্ষুদ্র পাপী-তাপী মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়েছি কয়েকটি পরিচ্ছেদ পড়েই। প্রকাশক কর্তৃক ঘোষিত 'অসামান্য শক্তির' একটি কণাও আবিষ্কার করতে পারিনি সমগ্র উপন্যাসে। লেখক না দিতে পেরেছেন স্কুলের কোনো বাস্তব-চিত্র, না কোনো সার্থক চরিত্র। স্থানে-স্থানে অরবিন্দ আশ্রমের কিছু প্রচার আছে, আর আছে 'নেকী', 'উৎকৃষ্ট' প্রেম সম্পর্কে, যার হদিস 'অশ্লীল কথাশিল্পী' শরৎচন্দ্রও নাকি পাননি। যাই হোক, আমাদের মত এমন শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে মাস্টারী করা যায় কিনা জানি না, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব। (৪৮০।৫৮)

**মেঘডম্বর**—প্রশান্ত চৌধুরী। প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী, ১৭সি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। দাম—তিন টাকা।

যে-যুগে সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার সেরা বন্দর, পর্তুগীজ হার্মাদের দৌরাত্ম্যে উপকূলের অধিবাসিরা অতিষ্ঠ হত, হিন্দু সমাজ সহমরণ ও নানা পৈশাচিক প্রথাপালন করে ত্বরান্বিত করছিল মৃত্যুকে, সেই যুগের পটভূমি নিয়ে রচিত এই উপন্যাস।

উপন্যাসের নায়ক জ্যোতিভূষণ, নায়িকা লীলাময়ী। হিন্দু সমাজের মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁরা দৃপ্ত প্রতিবাদ। কোনো জাতিই চিরদিন শ্মশানচারী হয়ে থাকে না, ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে কোনো একদিন ফিরে আসে জীবনের উপকূলে, যেমন এসেছিলেন জ্যোতিভূষণ ও আন্টিবুড়ী লীলাময়ী।

লেখক তরুণ, কিন্তু বিশেষ শক্তিমান। অতীত যুগকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন জীবন্ত রেখায়। তাঁর রচনাশৈলী, চরিত্রচিত্রণে দক্ষতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ আকস্মিকভাবে ব্যাহত না হলে লেখক বাংলা সাহিত্যের দরবারে শীঘ্রই ওমরাহ দলে আসন পাবেন।

লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ৮৯১।৫৮

**সাগরে হাওরে**—শেফালি নন্দী। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্ববঙ্গের এক রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে কমলরাণী। লেখাপড়া শিখে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বদ্ধপরিকর। শুধু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন পেয়েই সন্তুষ্ট নয় সে। কর্মক্ষেত্র নির্বাচনেরও স্বাধীনতা চায়। এর জন্য প্রেমিককেও বলি দিতে হয় তাকে। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে গিয়ে আলাপ হয় জার্মান যুবক ফ্রেডরিকের সঙ্গে। তাকেও ত্যাগ করে ফিরে এল দেশে কর্তব্যের আহ্বানে। ঘরসংসার ছাড়াও নারীর পুরুষের মতোই অনাহত ও মহত্তর কর্তব্যপালনের অধিকার আছে, এটাই ঘোষিত হয়েছে উপন্যাসে।

বইয়ের ভিতরে বিজ্ঞাপিত হয়েছে যে, লেখিকা ইতিপূর্বে আরো দু-চারখানি বই বাংলায় লিখেছেন। তবু, দুঃখের বিষয়, তাঁর ভাষা দুর্বল, প্রাদেশিকতাদোষে পাতায়-পাতায়। লেখায় সতর্কতার খুবই অভাব। তিনি উপন্যাসের তিরিশ পৃষ্ঠায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অতি পরিচিত ড্যাফোডিলস কবিতা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে ভুল থেকে গেছে। সংলাপের ভাষাও কেতাবী। সবশেষে, উপন্যাসের 'সাগরে হাওরে' নামকরণের সার্থকতা কি, তা' আবিষ্কার করা গেল না। ৪৯৬।৫৮

**এরা দুজন**—অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শরৎ পুস্তকালয়, ৩, কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

বইটি পড়ে সমস্যা দাঁড়ায়, একে কী বলব: উপন্যাস, অথবা গল্প সংকলন। বইখানিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন লেখক। প্রত্যেকটি পর্বকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়, স্বাদ পাওয়া যায় ছোট গল্পের। অথচ, প্রতিটি পর্বের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে, যাকে উপেক্ষা করলে তিনটি পর্বেরই পূর্ণ রসোপলব্ধি না হবার আশংকা। এটাই জাতি-নির্দেশে দ্বিধার কারণ।

লেখক গল্পের বইয়ে ভূমিকাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু, প্রকাশকের নিবেদনে উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর একটি চিঠির অংশবিশেষ, যা প্রকৃত প্রস্তাবে বইয়ের মামুলী ভূমিকামাত্র নয়,—বইটির মর্মগ্রহণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। উদ্ধৃত চিঠি থেকে জানা যায় লেখক নিছক সৌন্দর্যোপাসক নন, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সাহিত্যব্রতী। তাঁর কাহিনীর সমস্যা প্রেম বটে, কিন্তু এই প্রেম বাস্তব; আকাশচারী তত্ত্বমাত্র নয়। বর্তমান সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ফলে নর-নারীর প্রেম ও তার অনুভাবেরও বিবর্তন ঘটেছে ও ঘটতে থাকবে। লেখক এই পরিবর্তমান সমাজের ঘূর্ণিতে আলোড়িত প্রেমের রূপরেখা এঁকেছেন ও তার নূতন মহিমা আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে লেখকের মননশীলতা প্রশংসনীয়। তিনটি পর্বে আছে আধুনিক যুগের প্রেমের তিনটি সমস্যা। প্রেমে বিচ্ছেদ এলে কি অবক্ষয় অনিবার্য, অথবা বিচ্ছেদ সত্ত্বেও বঞ্চিত প্রেমিক কর্মব্রতে অগ্রসর হবে। দ্বিতীয়ত, প্রাক্‌বিবাহ যুগের অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম যদি স্ত্রীর হৃদয় থেকে মুছে না যায়, তাহলে স্বামীর জীবনে আসবে ব্যর্থতা, অথবা অন্তরের সার্থকতা। তৃতীয়ত, সন্তানসম্ভবা কুমারী কি চিরদিনই আত্মঘাতী হবে, অথবা উঠে দাঁড়াবে, গড়ে তুলবে নতুন জীবন। লেখক এই তিনটি সমস্যা উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, পথ-নির্দেশ করেছেন। সে পথ বলিষ্ঠ প্রেমের পথ, আশাবাদের, পুনরুজ্জীবনের পথ।

তিনটি পর্বের মধ্যে তৃতীয় পর্বটি, যা শংকর ও রূপার কাহিনী, সর্বাধিক শিল্পোত্তীর্ণ। প্রথম পর্বের চন্দ্রশেখর-শীলা উপাখ্যান আঙ্গিকের দিক থেকে পুরনো আমলের। কাহিনীর রোমান্স হাল্কা না হলেও অতি পরিচিত ছকের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয় পর্বের শেখর-শৈবলিনীর কাহিনীতে শংকর ও শৈবলিনী চরিত্র সার্থক, কিন্তু চন্দ্রশেখর যেন লেখকের থিয়োরীমাত্র, প্রাণ-স্পন্দিত নয়।

৪৩২।৫৮

## ছোট গল্প

**ভালবাসা: গল্প নয়—জীবন প্রবাহ।** কানাইলাল ঘোষ। প্রকাশক—দি প্রকাশনী, ৮২, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলি-৩। দাম—চার টাকা।

বহিরঙ্গে উপন্যাসের মতো হলেও প্রকৃতপক্ষে বইটি ন'টি ছোট ও বড় গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে অবশ্য একটা অন্তরশায়ী ঐক্য আছে। প্রেমের বিভিন্ন রূপ ও লীলা প্রতিটি গল্পের উপজীব্য। কতকগুলি অংশ সুখপাঠ্য, আবার কয়েকটি পীড়াদায়কভাবে মেলোড্রামাটিক। শেষের গল্পে আবার যেন ডিটেক্টিভ

উপন্যাসের রোমাঞ্চ ছড়ানো হয়েছে। অতি-কথন অনেক ক্ষেত্রে রসভঙ্গ করেছে। মৌলিকতার শীলমোহর না থাকলেও লেখক শ্রমবিমুখ নন। হয়তো এইজন্যেই ভবিষ্যতে তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেন। ৭১।৫৮

**কাচের জানলা**—আদ্রীশ বর্ধন। রোমাঞ্চ, ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬। তিন টাকা বারো আনা।

বাঙলা ভাষায় রহস্য গল্পের আমদানী হয়েছে সরাসরি বিদেশী সাহিত্য থেকে; বাংলা দেশে ইতিপূর্বে যেমন অপরাধবিজ্ঞান নিয়ে কোন গবেষণা করা হয়নি, তেমনি করা হয়নি অপরাধ তথা রহস্যমূলক গল্পের ক্ষেত্রে মৌলিক কোন প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, ওদেশের মত অপরাধমূলক সাহিত্যকে অন্ত্যজ সাহিত্যের 'এক ঘরে' থেকে টেনে তোলেনি এই সেদিন পর্যন্তও। কিন্তু আশার কথা ইদানীং কয়েকজন তরুণ লেখক একনিষ্ঠভাবে এই রহস্য-গল্পের দিকে ঝুঁকেছেন। আদ্রীশ বর্ধন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রচনারীতির দিক থেকে তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী। 'কাচের জানলা' তাঁর প্রথম গল্প সংকলন হলেও রহস্য-সাহিত্যের দরবারে একটি নতুন সংযোজন বলে মনে হয়। বর্ণনাভঙ্গী, নির্মিতি কৌশল এবং মনোরম ভাষার সমন্বয়ে তাঁর গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষরও বর্তমান। ব্রোঞ্জের গণেশ, ছিপ, চুল, আতঙ্ক, দুর্গরহস্য, আরশুলা, পাঁচটি সিগারেট লাইটার প্রভৃতি গল্প সবিশেষ উল্লেখ্য। ৪৮১।৫৮

**বধূ মানেই মধু**—শ্রীঅবনী সাহা। —ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬। দাম—তিন টাকা।

দশটি ছোট গল্পকে একত্র করে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রথম গল্পটির নামেই সংকলনের নামকরণ। শেষ গল্প, 'বধূ মানেই মধু নয়', বাদেও অন্য গল্পগুলির প্রধান উপজীব্য প্রেমের, বিশেষত দাম্পত্যপ্রেমের, লঘু-তরল দিকটি। লেখক হাস্যরসিক। গল্পগুলির মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান আছে, এবং লেখক তা নিবেদন করেছেন সুনিপুণভাবে। তিনি গল্প বলার দুর্লভ আর্ট আয়ত্ত করেছেন। তবে, জীবনের গভীরতর সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র জীবনের পরিধি-রেখায় বিচরণ করলে স্থায়ী হাস্যরসের সৃষ্টি সম্ভব কিনা, তা বিবেচ্য।

মার্জিত রুচি লেখকের গল্পগুলির কৃতিত্ব বাড়িয়েছে। বইয়ের দামটা যেন কিছু বেশি হয়েছে। প্রকাশক এদিকে দৃষ্টি দেবেন আশা করি। ৪২১।৫৮

## অগ্নিযুগের ইতিহাস

**আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী**—মতিলাল রায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দুই টাকা পঞ্চাত্তর নয়া পয়সা।

অগ্নিযুগের অগ্নিপরীক্ষার কাগজের দলিল কিছু নেই। তাই রক্তমাংসের এই মরদেহটার দলিল উৎসর্গ করে যাঁরা সংগ্রাম করে গেছেন তাদের অনেকেই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছেন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, নলিনীকিশোর গুহের বাংলায় বিপ্লববাদ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের বিপ্লবের পথে প্রভৃতি কয়টি বই বাদ দিলে এই যুগের কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। মতিলালবাবুর এই বইখানি সেই অভাব পূরণে খানিকটা সাহায্য করবে।

মতিলালবাবু স্বয়ং সেই যুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর সাথে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রধানত স্মৃতির উপর নির্ভর করে লেখা এই বইখানি পড়তে পড়তে মনে হয় পঞ্চাশ বছর আগেকার দিনগুলো যেন আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ৪৬৭।৫৮

## কিশোর সাহিত্য

**ছোটদের অশোক** — অতুলানন্দ চক্রবর্তী। কলিকাতা—৩৩ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের Ashoke For The Young নামক ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ। ছোটদের জন্য লেখা এই বইখানি অভিনবত্বের দাবী রাখে। এ শুধুই নাম, ঘটনা বা তারিখের ইতিবৃত্ত মাত্র নয়; সম্রাট অশোকের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক তৎকালীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে ছবি এঁকেছেন, তা বইখানিকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছে। বইখানি যাদের জন্য লেখা সেই ছোটরাই যে শুধু বইখানি পড়ে তৃপ্ত হবে তা নয়, শিক্ষানুরাগী মাত্রই লেখককে বইখানি পড়ে মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তবে প্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করতে গিয়ে কয়েক জায়গায় ইতিহাসের চাইতে গল্পকথাই প্রাধান্য পেয়েছে; তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। লেখকের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। ৪৮৮।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছেঃ—

**পরগাছা**—রমেশ মজুমদার।
**এক যে ছিল রাজা**—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত।
**এক মুঠো আকাশ**—ধনঞ্জয় বৈরাগী।
**যুগান্তর বিপ্লবী দলের কথা**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।
**বনবীথি**—(কবিতা সংকলন)।
**প্রাথমিক যৌগিক ব্যায়াম পদ্ধতি**—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ।
**প্রিয়া**—সরোজ ঘোষ।
**বহু যুগের ওপার হতে**—সুধাংশু গুপ্ত।
**অনামী**—শ্রীদিলীপকুমার রায়।
**কবি সুকান্ত**—অশোক ভট্টাচার্য।
**কান্নার প্রহর**—অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়।
**জীবন স্বপন**—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।
**প্রথম পরশ**—প্রবোধবন্ধু অধিকারী।
**কবি জীবনী**—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।
ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন।
জনগণের নিজস্ব কর্মোদ্যম (রেখাচিত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা)।

# ট্রামে-বাসে

শ্রীনেহরু পাকিস্তানের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে নগ্ন একনায়কত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন —"নগ্ন রূপটা শুধু মিলিটারীতেই নয়, মিল্ এরিয়াতেও; এসেছ নেংটা, যাইবে নেংটা; সুতরাং মাঝখানে আর গণ্ডগোল কেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

*   *   *

নেহেরুজী একথাও বলিয়াছেন যে, পাক-শাসনব্যবস্থা ভালো কি মন্দ, তাঁর পক্ষে বলা শক্ত। —"সত্যি কথা, পাক্ কেমন হলো বলা যায় খেলে, আর পাকে পড়লে" মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

*   *   *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বাজারে সমুদ্রের মাছ আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ শুনিলাম। বিশু-



খুড়ো বলিলেন—"সমুদ্রের মাছের সংবাদ অনেকবারই তাঁরা ছেড়েছেন; এবার নূতন কিছু বলুন—গড়ের মাঠের মাছ, গাছের উপার মাছ যা মনে আসে একটা বলুন"!!

*   *   *

ইস্কান্দার মির্জা সাহেব পাকিস্তান পরিত্যাগ করায় অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় নেহেরুজী জবাবে বলেন—দুই-এর জায়গায় এক হইয়াছে— —"অর্থাৎ দোসর সুগ্রীব নেই। কিন্তু একা রামেই কি রক্ষা আছে?" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *



মির্জা সাহেব লণ্ডনে উপনীত হইলে ফটোগ্রাফাররা যখন তাঁর ফটো তুলিতে আসেন, তখন নাকি তিনি টুপি দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখেন। —"হয়রানিতে পড়ে হায় হায় করলেও হায়া তাঁর যায়নি দেখছি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

*   *   *

বক্সী গোলাম মহম্মদ বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর লইয়া পাকিস্থানীরা যে লড়াইর জিগীর তুলিয়াছেন, তাকে কাশ্মীরবাসীরা পাখীর কিচিরমিচির বলিয়াই মনে করেন। —"পাক-চাচাদের হাঁড়িচাঁচা গলার সামিল বলতে পারতেন"—বলে শ্যামলাল।

*   *   *

নেহেরুজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের ইমারতের চেয়ে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা আগে হওয়া উচিত। খুড়ো বলিলেন—"অতঃপর শিক্ষকমণ্ডলীরা নিশ্চয়ই নেহেরুজীর কথার দাম হিসেবে তাঁকে ফুলমার্ক দিয়েছেন"!!

*   *   *

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন—ভারত সবচেয়ে নোংরা দেশ; এত আবর্জনা নাকি তিনি আর কোথাও দেখেন



নাই। —"ঝাড়ু হাতে নিয়ে পথে নেবে পড়ে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' করলে আর কিছু না হোক আলিবাবা বেশ জমে ওঠে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*   *   *   *

নেহেরুজী অন্যত্র বলিয়াছেন—পর্দাকে আমি বলি খাঁচা। মহিলাদের এই খাঁচায় বন্ধ দেখিলেই আমার রাগ ধরে। —"আর যাঁরা ধরে রাখেন, তাঁদের হয় অনুরাগ।" শ্যামলাল যে কী বলিতে চায় বোঝা গেল না।

*   *   *

মহাকাশ পরিক্রমায় ভারতের প্রথম প্রয়াসের সংবাদ পাঠ করিলাম। —"খুব খুশী হয়েছি বলতে পারিনে; গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে না দিয়ে গা-ঢাকা দেওয়াই ভালো। তাছাড়া এটা প্রথমও নয়, সৌধ রচনায় আকাশ পরিক্রমা আমরা চিরকালই করে আসছি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

*   *   *

একটি বৈদেশিক সংবাদে জানা গেল, কোন এক ব্যক্তি নাকি সার্কাসের এক শিম্পাঞ্জীর একটি রঙবেরঙের ট্রাউজার চুরি করিয়া লইয়া যান। ট্রাউজারটি পরিয়া রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে পুলিস



তাঁকে গ্রেপ্তার করে। —"রঙবেরঙের ট্রাউজার আর জামা গায়ে যাঁরা কোলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তাঁরা কোন্ সার্কাস থেকে এসব সংগ্রহ করেছেন, তা জানতে ইচ্ছে হয়"—বলেন বিশুখুড়ো!

*   *   *   *

আমেরিকার একটি বৈমানিক একদিন লণ্ডন শহরের কোন এক স্থানে অকস্মাৎ হাইড্রোজেন বোমার দিকে তাঁর হাতের পিস্তল তাক্ করিয়া গুলী ছুঁড়িবার ভাব দেখাইলেন। অনেক চেষ্টায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করা হইল। সংবাদে বলা হইয়াছে, লোকটি অপ্রকৃতিস্থ। —"হয়ত তাই; কিন্তু নিরন্তর হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবার হুমকি যাঁরা দেখাচ্ছেন, তাঁরা অপ্রকৃতিস্থ কিনা, সে বিচার এখনো কেউ করেন নি"—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

*   *   *

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের যুব সম্প্রদায়কে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার আগে একবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা। শ্যামলাল বলিল—"তা হয়েছে বৈকি; নিজের হৃদয় অন্যকে দিয়ে, অন্যের হৃদয় নিজের করেছি——যদিদং হৃদয়ংতব মনে করুন"!!

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

## বাঙলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব

বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠিত গিরিশ নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত বক্তৃতামালায় বাঙলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীঅচ্যুত দত্ত। তাঁর বক্তৃতার সার অংশ নীচে দেওয়া হ'ল:

মহাকবি শেক্সপীয়রের নাটকগুলি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও এবং ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অধ্যাপনাগুণে তাঁদের ছাত্রদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তার কিছুকাল আগে থেকেই স্কুল-কলেজে শেক্সপীয়রের নাটক বা নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হতে থাকে। "ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার" এবং "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা" শেক্সপীয়রের নাটক নিয়মিতভাবে অভিনয় করার ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে শেক্সপীয়রের কতকগুলি বিখ্যাত নাটকের অনুবাদ বা মর্মানুবাদ করা হয় কিংবা তাদের ছায়া অবলম্বনে নাটক রচিত হয়।

শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত, হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নবযুগ প্রবর্তন করেন প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের আদর্শ পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতিতে নাটক রচনা করে। যদিও তাঁর প্রথম নাটক "শর্মিষ্ঠা"তে সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের প্রভাব দেখা যায়, তাহলেও "পঞ্চাংকং নাটকংবরম, দশাংকং নাটকং পরম" এই নীতি অগ্রাহ্য করে তিনি এটিকে পঞ্চাঙ্ক নাটক করেন। তাঁর "কৃষ্ণকুমারী" শেক্সপীয়রের আদর্শে রচিত একটি 'রোমাণ্টিক' বা কল্পনাশ্রয়ী নাটক। এই নাটকের ধনদাস চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের ইয়াগো চরিত্রের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ প্রবর্তক ক্ষণজন্মা গিরিশচন্দ্র নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন যে, নাটক রচনায় শেক্সপীয়রই তাঁর আদর্শ ছিলেন। বিশেষ করে, তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগুলির উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব দৃষ্ট হয়। কি গঠন-নৈপুণ্যে, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, কি সজীব চরিত্র গঠনে, কি অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিতে তাঁর ট্রাজিডিগুলি শেক্সপীয়রের ট্রাজিডিগুলির অনুসরণ করে।

গিরিশোত্তর যুগে প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব দেখা যায়। তাঁর নাটকগুলি শেক্সপীয়রের নাটকগুলির ন্যায় কল্পনাশ্রয়ী—তাঁর নাটকের ভাষাও শেক্সপীয়রের ভাষার ন্যায় উপমা ও রূপকবহুল। সাজাহান চরিত্রচিত্রণে তিনি শেক্সপীয়রের "King Lear" থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। স্থানে স্থানে সাজাহান এবং Lear-এর উক্তিগুলিতে ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। "King Lear"-এর Fool এবং সাজাহানের দিলদার একই গোষ্ঠীর লোক; তাদের বাচনভঙ্গিও এক প্রকার। প্রসংগত বলা যেতে পারে যে, বিদূষক ও বিদূষক জাতীয় চরিত্রের যে নূতন রূপ আমরা গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পাই, তার মূলে ছিল শেক্সপীয়রের বিদূষকদের প্রেরণা। শেক্সপীয়রের বিদূষকদের মত গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের বিদূষকরা লোকচরিত্রজ্ঞ এবং রহস্য ও বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে অপ্রিয় ও কঠোর সত্য বলবার সাহস রাখে।

শেক্সপীয়রের নাট্যসাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য, সহানুভূতিশীল চরিত্র চিত্রন এবং কতিপয় চরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন। তাঁর Tragedy-র নায়কদের দেখলে মনে হয় যে, নাট্যকার অপরাধ ও পাপকে যতটা ঘৃণা করতেন, পাপীকে বা অপরাধীকে ততটা ঘৃণা করতেন না, কারণ তাঁর উদার সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তারা স্বখাতসলিলে নিমজ্জিত হলেও নিয়তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর সহানুভূতিশীল চরিত্র চিত্রনের ফলে বিশ্বাসঘাতক, খুনী ম্যাকবেথ, স্ত্রীহন্তা ওথেলো আমাদের ঘৃণা অপেক্ষা করুণাই উদ্রেক করে। অনুরূপ চরিত্রাংকনের জন্য মাতাল যোগেশ আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না। শেক্সপীয়র Shylock চরিত্র যেভাবে অংকিত করেছেন,



স্টার প্রোডাকসন্সের "যৌতুক" ছবির নায়িকা সুমিত্রা দেবী



মধুবালাকে "বোম্বাই-কা-বাবু" চিত্রে একটি নতুন ধরণের চরিত্রে দেখা যাবে।



তাতে ইহুদী চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বহুকালের বদ্ধমূল ধারণা পরিবর্তিত হয়। এবং তাঁকে এক লাঞ্ছিত নির্যাতিত জাতির মুখপাত্র বলে মনে হয়। এইরূপ সহানুভূতিশীল চরিত্রচিত্রন আমাদের নাট্যকারদের প্রেরণা দিয়ে এসেছে। তাই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কতকগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রাম শুধু দেবতা নন, তিনি একজন রক্তমাংসের মানব। গিরিশচন্দ্র যেমন বালিবধজনিত কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করেছেন, যোগেশ চৌধুরীও তেমনি বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজাতি-দ্রোহিতার কলঙ্কাপনয়নের চেষ্টা করেছেন। বহুকাল থেকে প্রচলিত কিংবদন্তী নবাব সিরাজদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমানুষিক অত্যাচারের বৃত্তান্তই দেয়। গিরিশচন্দ্রই প্রথম তাঁর স্বদেশহিতৈষণা চিত্রন করে তাঁর চরিত্রের re-valuation বা পুনর্মূল্যায়ন করেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজও একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে মানব-জীবনের, মানব চরিত্রের যে চিরন্তন রহস্য, সত্য ও সমস্যাগুলি অনুপমভাবে চিত্রিত হয়েছে, সেগুলি দেশ, কাল, পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই শেক্সপীয়রের নাটক শুধু বাংলার নাট্য-সাহিত্য কেন, সকল দেশের নাট্য-সাহিত্যকেই অল্পাধিক প্রেরণা দিয়ে এসেছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, নাট্য-সাহিত্যের যাদুকর মহাকবি শেক্সপীয়র আমাদের নাট্যকারদিগকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের কোন প্রতিভাবান নাট্যকার তাঁর অন্ধ অনুকরণ করেন নি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য যে, গত একশত বৎসর ধরে সে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে।

## চিত্রালোচনা

এ হপ্তায় চারখানি নতুন ছবির মুক্তি। দু'খানি বাংলা—"যৌতুক" ও "ধূমকেতু"। হিন্দী দু'খানির নাম—"সবেরা" ও "গজগৌরী"।

স্ক্রীন ক্ল্যাসিকসের "যৌতুক" উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গল্পের চিত্ররূপ। বিমল মিত্র এর চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে। মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুমিত্রা দেবী, কমল মিত্র, মলিনা দেবী,

শীলা পাল, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীরা। গৌরীপ্রসন্নের গানে সুর-যোজনা করেছেন হেমন্তকুমার। সেগুলি গেয়েছেন লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত এবং সংগীত পরিচালক নিজে।

"ধূমকেতু" বসুমিত্রের নবতম চিত্রার্ঘ্য। বাংলা ছবির গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করে কিছু নূতনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, যিনি একাধারে এর লেখক, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। ভূমিকা-লিপির শিরোভাগে রয়েছে সবিতা চট্টোপাধ্যায় (এখন বসু), অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সিং, শিশির মিত্র প্রভৃতির নাম। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ছবিটিতে সুর যোজনা করেছেন।

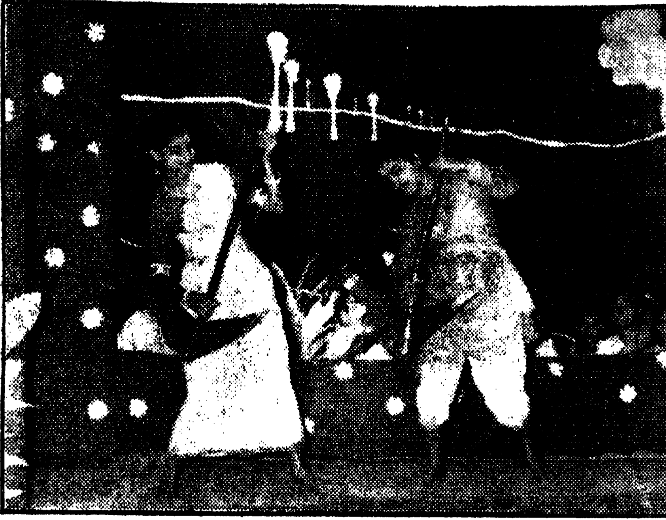
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মুক্তিস্নান" হিন্দী ছবির পর্দায় হয়েছে "সবেরা"। অবশ্য মূল গল্পের অনেক অদল বদল করে ছবিটি তুলেছেন বসু চিত্রমন্দির রবি সেনের প্রযোজনায়। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন সত্যেন বসু। অশোককুমার ও মীনাকুমারীকে নিয়ে এর প্রধান ভূমিকা-লিপি গঠিত হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বিপিন গুপ্ত, লীলা মিশ্র, কাম্মো, শীলা ভাজ প্রভৃতি। শৈলেশ ছবিটির সুরকার।

পুণার প্রভাত ফিল্ম কোম্পানী একদা রুচিসম্মত পৌরাণিক ছবি তুলে ভারত-জোড়া নাম কিনেছিলেন। নবগঠিত প্রভাত পূর্বে ঐতিহ্যের অনুসরণেই তুলেছেন "গজগৌরী"। রাজা ঠাকুর ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং এর ভূমিকালিপিতে আছেন সুলোচনা, রত্নমালা, সাহু মোদক, অনন্ত মারাঠে, নানা পলসিকর ও বিজয় বুগাগেল নামক একজন নতুন শক্তিমান অভিনেতা। সুধীর ফাড়কে সংগীত পরিচালনা করেছেন।

এ হপ্তায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সত্যেন বসু ছাড়া বাকী তিনজন পরিচালকই নতুন। তাঁদের পরিচালিত ছবিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

• • •

পরিচালক সত্যজিৎ রায় "অপুর সংসার" নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত। এই সেদিন গঙ্গার ধারে গোপালপুরে শুটিং সেরে এলেন। এবার গেলেন মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরিতে—অপুর জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার যেখানে সূত্রপাত। অপুর ভূমিকায় নবাগত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় পরিচালক মশায়কে খুশী করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। "অপুর সংসারে"র জোয়াল তাঁর কাঁধেই অবস্থান করায় সত্যজিৎবাবু এবার দিল্লীতে যেতে পারলেন না রাষ্ট্রপতির দেওয়া "পদ্মশ্রী" পদক আনতে।



**কেন্দ্রীয় সেণ্ট্রাল সার্ভিসেস ওয়েলফেয়ার বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্রমোদ অনুষ্ঠানে উদ্বাস্তু শিবিরের মেয়েরা নৃত্য প্রদর্শন করেন। এই দৃশ্যে নৃত্যছন্দের মাধ্যমে একটি কৃষক দম্পতির জীবনকে রূপায়িত করা হয়েছে**

পরিচালক তপন সিংহ আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের জীবনীর ওপর যে প্রামাণ্য ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন, তা শেষ হয়েছে। এই জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ইংলণ্ডে। তারই দৃশ্য তুলতে পরিচালক সিংহ ওদেশেও গেছলেন।

ছবিতে বাহির্দৃশ্যের সংস্থান আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হচ্ছে। এতে দৃশ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে ছবির বিশ্বাসযোগ্যতাও বাড়ে। ঠিক সেই কারণেই পরিচালক কমল গাঙ্গুলী তাঁর নতুন ছবি "দেড়শো খোকার কাণ্ড"র বহু দৃশ্য শহরের বিভিন্ন পার্কে ও রাস্তায় তোলবার ব্যবস্থা করেছেন। ছোট ছেলেদের নিয়ে ছবির গল্প—তাদের খেলাধুলা-দুষ্টুমী অনেক কিছুই সংঘটিত হয় এইসব জায়গায়। এইসব বহির্দৃশ্যের অবতারণা সেই কারণে।

•  •  •

প্রযোজক মণিলাল শ্রীবাস্তব আবার একটি নতুন ছবি তোলবার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন। ছবিটির নামকরণ হয়েছে "অন্তরালে"। জ্যোতির্ময় রায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে সেখানি পরিচালনা করবেন মানু সেন। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে অচিরেই চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত তাঁর পরবর্তী ছবির নাম রেখেছেন "হাত বাড়ালেই বন্ধু"। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প—সুতরাং নূতনত্ব থাকবেই। সুটিং আরম্ভ হবে আসছে মাসে।

•  •  •

যেসব ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সম্পাদনার শেষে যারা শীগগিরই মুক্তিযোগ্য হয়ে উঠবে, তাদের মধ্যে রয়েছে গ্রেস পিকচার্সের "শশীবাবুর সংসার", হেমন্ত-বেলা প্রোডাকশন্সের "নীল আকাশের নীচে," বি পি প্রোডাকশন্সের "মায়ের বন্ধু রে" এবং প্রভাত প্রোডাকশন্সের "বিচারক"।

যেসব ছবি তৈরী হয়ে মুক্তির দিন গুণছে, তাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য: "প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের "নৌকাবিলাস", বিকাশ রায় প্রোডাকশন্সের "মরুতীর্থ হিংলাজ" এবং অমর মল্লিক প্রোডাকশন্সের "সাগর সঙ্গম"।

**হৃদয় জয়ের অভিযান**

*যে যুগে নারীর স্বাতন্ত্র্য সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি, সে যুগে স্বামীর ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে স্ত্রী সাধ্বীর গৌরব লাভ করেছে। দিনকাল বদলেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিও।* কিন্তু ফিল্মিস্তানের নতুন হিন্দী ছবি "সংস্কার" দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিক হলেও, মনোবৃত্তির দিক দিয়ে এর চরিত্রগুলি রীতিমত প্রাচীন। যে সংস্কারের মহিমা এই ছবিতে কীর্তিত হয়েছে, তা এ যুগের নয়—বিগত এক যুগের। আধুনিক রুচিসম্পন্ন দর্শকের কাছে এর আবেদনও তাই একান্তই পরিমিত।

গল্পের নায়িকা নিরুপা লেখাপড়া শিখেছে, আবার প্রাচীন আদর্শের প্রতিও তার যথেষ্ট অনুরাগ। রামপ্রসাদ তার বাপের বন্ধু এবং মস্ত বড় ব্যবসায়ী। তাঁরই একমাত্র ছেলে কিষেণের সঙ্গে নিরুপার বিয়ে হ'ল। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে রামপ্রসাদ তাঁর কারবারের ভার কিষেণ এবং পুরোন কর্মচারী রামভরোসের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কুচক্রী রামভরোসে নিজের



**চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের "জল-জঙ্গল" ছবির নায়ক ও নায়িকা অসীমকুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়।**



**অশোক পিকচার্সের আগামী আকর্ষণ "পুষ্পধনু"র একটি ঘরোয়া দৃশ্যে জনৈক শিশু-অভিনেতার সংগে উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও নবাগতা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অভিনেত্রী টিনা বারবারা।**

স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কিষেণকে ঠেলে দিয়েছিল বাইজী বাঁশরীর খপ্পরে। নিরুপা যখন স্বামীর ঘর করতে এলো, তখন কিষেণ এই পণ্যা স্ত্রীর প্রেমে আসক্ত।

নিরুপা স্থির করলো, নিজের ভালবাসা দিয়ে সে তার স্বামীর হৃদয় জয় করে নেবে। শ্বশুর রামপ্রসাদ পুত্রবধূর সেবা-যত্নে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন। ছেলের কীর্তিকলাপের খোঁজ রাখতেন না তিনি। নিরুপাও শ্বশুরকে স্বামীর অপকীর্তির কথা জানতে দিত না।

কিষেণের মন যখন আস্তে আস্তে নিরুপার প্রতি ঝুঁকছে, তখন রামভরোসে এক মোক্ষম চাল চাললো। তারই নির্দেশে বাঁশরী এমন অভিনয় করলো যেন কিষেণের অবহেলা সইতে না পেরে সে বিষপানে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। দুর্বলমতি কিষেণকে নতুন করে ফাঁদে ফেলবার পক্ষে এই যথেষ্ট। সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকিয়ে দিলো বাঁশরীর কাছে।

রামভরোসের প্ররোচনায় কিষেণ মদ ধরলো, জুয়া খেলাতে আরম্ভ করলো। এমনিভাবেই সে নেমে যেতে লাগলো অবনতির তলার ধাপটিতে। নেশার খরচ জোগাতে কারবারের তহবিলেও হাত পড়লো। বাজারে ধার-দেনাও হতে লাগলো।

নিরুপা স্বামীকে যখন প্রায় শুধরে এনেছে, ঠিক সেই সময়ে নতুন করে তার এই পদস্খলনে প্রথমটায় সে খুবই মুষড়ে পড়লো। কিন্তু মনকে শক্ত করতে তার দেরি লাগলো না। সীতা-সাবিত্রীর জাত সে, অত সহজে সে ভেঙে পড়বে কেন? শ্বশুরকে একটি কথাও সে জানতে দিল না—নীরবে চললো তার পাতিব্রত্যের কঠোর সাধনা।

রামপ্রসাদ কয়েক হাজার টাকা নিরুপাকে রাখবার জন্যে দিয়েছিলেন। রামভরোসে খবরটা জানতো। সে কিষেণকে পরামর্শ দিলো, সেই টাকাটা ও নিরুপার গহনাপত্র চুরি করে বিদেশে সরে পড়তে। ঐ টাকায় বাঁশরীকে নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে, উপরন্তু পাওনাদারদের তাগাদাও আর তাকে পোয়াতে হবে না। রামভরোসের কথামত কিষেণ নিজের ঘরেই চুরি করলো এবং বাঁশরীকে নিয়ে শহর ত্যাগ করলো।

এদিকে রামপ্রসাদ হঠাৎ টাকাটা চেয়ে বসলেন নিরুপার কাছে। সিন্দুক খুলেই তার চক্ষুস্থির—না আছে টাকা, না তার গহনাপত্র। কি বলবে সে শ্বশুরকে? স্বামীর দুশ্চরিত্রতার কথা ফাঁস করে দেবে কি? না, না, জীবন থাকতে সে তা পারবে না। তার ব্রত ভঙ্গ হবে তাতে। এদিকে রামপ্রসাদের চোখে পুত্রবধূ সম্বন্ধে সন্দেহের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো, শাশুড়ী তো খোলাখুলি চোর অপবাদ দিয়ে বসলেন। নিরুপার বাবাও সেদিন এসে পড়েছিলেন এ বাড়িতে। তিনিও যা নয় তাই বলে মেয়েকে ভৎর্সনা করলেন।

কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও অটল থেকে কেমন করে নিরুপা আবার তার স্বামীকে ফিরে পেলো—সেই আনন্দোজ্জ্বল পরিণতিতে ছবির শেষ। পণ্যা নারীর প্রেমের স্বরূপ কিষেণের কাছে সেইদিন স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যেদিন তার পুঁজি গেলো ফুরিয়ে এবং তার সংগে প্রেমের অভিনয় করবার আর কোন প্রয়োজন রইলো না বাঁশরীর। নিরুপার অকৃত্রিম ভালবাসার মূল্য সেইদিন বুঝতে পারলো কিষেণ। বুঝতে পারলো, এতদিন সে হীরের টুকরো ফেলে কাচখণ্ড নিয়ে মাতামাতি করে এসেছে। গৃহলক্ষ্মীর



রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের "ভ্রান্তি"র একটি প্রধান ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস



প্রেমের জ্যোতি পথহারাকে পথ দেখিয়ে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনলো।

যেমন মামুলি প্লট, তার বিন্যাসেও নতুনত্বের তেমনি অভাব। সাদা ও কালো মাত্র এই দুটি রং ব্যবহার করা হয়েছে এর চরিত্রগুলিকে রূপ দিতে। হয় তারা একান্ত ভালো, নয়তো পুরোপুরি মন্দ—মাঝামাঝি কোন রঙের ছায়া পড়েনি তাদের ওপর। তাই ছবির পর্দায় তারা খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। নায়িকা নিরুপাকে যতখানি মেরুদণ্ডহীন করে আঁকা হয়েছে, তাতে প্রশ্ন থেকে যায় তাকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে তা সম্ভব কিনা। অন্য নারীতে আসক্ত জেনেও স্বামীর সমস্ত অপকর্ম যে স্ত্রী নির্বিবাদে সহ্য করে, এবং অন্যের কাছে তা গোপন রেখে প্রকারান্তরে তার পোষকতা করে, সে আর যাই হোক, খুব স্বাভাবিক নয়।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনন্তকুমার ও অমিতা। কোন-রকমে কাজ চালিয়ে গেছেন দুজনেই। মনে দাগ কাটতে পারেন না এঁদের মধ্যে একজনও। বাঁশরীর ভূমিকায় রঞ্জনার ভূমিকাও তথৈবচ। কুচক্রী রামভরোসের ভূমিকায় ইয়াকুব আর সকলকে ছাপিয়ে গেছেন অভিনয় দক্ষতায়। নায়কের বাপ ও মা সেজেছেন বদরীপ্রসাদ ও লীলা মিশ্র এবং মানিয়েও গেছেন বেশ। অন্যান্য ভূমিকায় কানু রায়, পরশুরাম, কুসুম ঠাকুর, ইন্দিরা বানসাল ও রণধীরের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

চতুর্ভুজ দোশীর পরিচালনা গল্পের মতই মামুলি ধাঁচের। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ বেশ পরিচ্ছন্ন। এ ছবিতে সুর দিয়েছেন অনিল বিশ্বাস। তাঁর কাজে কিন্তু বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ নেই।

"সংস্কারে"র কাহিনী রচনা করেছেন তৈমুর বেহরাম শা। ফটোগ্রাফির কৃতিত্ব মার্শাল ব্যারগাঞ্জা ও বলেন্দ্র গুপ্তের প্রাপ্য। মান্না লাডিয়া এর শব্দধারক।

## অপরাধী কে—ডস্টয়েভস্কি?

গোল্ডেন মুভীজের "ট্যাক্সি ৫৫৫" ছবিটি রুশ লেখক ডস্টয়েভস্কির অমর উপন্যাস "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট" অবলম্বনে নির্মিত বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। ব্যাপারটি ছাপার অক্ষরে পড়া থাকলেও, লেখরাজ ভাকরি পরিচালিত এই ছবি দেখে বিশ্বসাহিত্যের ঐ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের কথা মনে হওয়া কঠিন। জনচিত্ত হরণের সহজ কৌশলে মহৎ আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করা যে সম্ভব নয়, একথাটা হয়ত পরিচালকের অজানা। ছবিতে উপন্যাস-বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার কঙ্কাল পাওয়া যায়, একথা সত্য। কিন্তু সে কঙ্কাল ছবির কষ্টকল্পিত, কৃত্রিম পরিবেশে প্রাণ পায়নি। আর নাচ-গান ও স্থূল হাস্যরসে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বড় রকমের উপহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা রস মিলে শেষ পর্যন্ত বিরস বস্তুর পর্যায়ে আসা বোম্বাই ছবির পক্ষে তেমন কিছু অনিয়মের ব্যাপার নয়। শুধু প্রশ্ন এই: ডস্টয়েভস্কি এমন কি 'অপরাধ' করেছিলেন যার জন্য এ ছবির সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল?

চিত্রনাট্যের নায়ক অশোক বি-এল ডিগ্রি পেয়ে বেকার। গ্রাম ছেড়ে বোম্বাই শহরে এসে যে-বাড়ির একটি ঘর সে ভাড়া নিল তার কর্ত্রী শান্তিবাই অশান্তির প্রতিমূর্তি। মায়া-মমতা তার বিন্দুমাত্র নেই, টাকাই তার সব। অশোকের ঠিক সেই বস্তুটিরই অভাব। শান্তিবাইর পরিচারিকা সোনা প্রথম থেকে অশোককে নিজের ভাইয়ের মতো দেখল—নিজের সঞ্চিত টাকা দিয়ে তার অভাব মেটাতে দ্বিধা করল না। ভগিনীসমা হলেও কত টাকা তার কাছ থেকে অশোক নিতে পারে? তাছাড়া সোনার পুঁজিও ত পরিমিত! চাকরির জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ঘরভাড়ার টাকা যোগাড়ের জন্য মহাজন শেঠ ধনীরামের কাছে অশোক গেল তার ঘড়ি বন্ধক দিতে। শেঠের দুর্ব্যবহারে অশোক অত্যন্ত আহত বোধ করল। পরে আবার একদিন তার কাছে গেলে ধনীরাম অশোককে অকথ্য গালিগালাজ করল। অশোক তা সহ্য করতে না পেরে শেঠকে সজোরে আঘাত করল। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে দেখে অশোকেরও মতিভ্রম হল—খোলা সিন্দুক থেকে প্রচুর টাকা সরিয়ে নিয়ে সেই মুহূর্তেই সে উধাও হল।



মুক্তি প্রতীক্ষিত "আর্থার দাও" চিত্রের নায়িকা নূতন সমর্থ

ঘটনাচক্রে সোনার প্রণয়ী, ৫৫৫ নম্বর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে পুলিস গ্রেপ্তার করল শেঠ ধনীরামের হত্যাকারী হিসাবে।

চুরির টাকার সাহায্যে অশোক অল্প-দিনের মধ্যে শহরের নামজাদা উকিল হয়ে গেল। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি সবই তার তখন হস্তগত। বাগদত্তাকে বিবাহ করে প্রাসাদোপম গৃহে তখন সে বাস করে। এমন সময় সে জানল, তারই অপরাধে সোনার প্রণয়ী শাস্তি পেতে চলেছে। সমস্ত সুখ-আনন্দ তার বিস্বাদ হয়ে গেল। কিছুকাল মানসিক দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট হয়ে অবশেষে চরম মুহূর্তে আদালতে গিয়ে সে সব কথা প্রকাশ করে দিল।

এইখানেই কাহিনীর শেষ। কিন্তু দর্শকের মনে যাতে শেষে কোন দুঃখ না থাকে, সেইজন্য ছবিতে দেখান হয়, অশোক বহুকাল পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে আরও দেখি সোনা আর তার ড্রাইভার স্বামীকে নেচে নেচে সুখ মিলনের গান গাইতে!

সাধারণ ফরমুলা-ছবির তুলনায় 'ট্যাক্সি ৫৫৫' অবশ্যই উপভোগ্য। এর কয়েকটি আবেগময় পরিস্থিতি দর্শকের মনে ছাপ রাখে। অশোক-চরিত্রে প্রাণকুমারের অভিনয় চলনসই। তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্যক পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। সোনার ভূমিকায় শকিলা তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন। পরিচারিকা হিসাবে তাঁর বেশভূষার জাঁকজমক একটু চোখে লাগে—যদিও এ ব্যাপারে শিল্পী দায়ী নন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মহীপাল (ড্রাইভার), ললিতা পাওয়ার, অমরুরা, সুন্দর, মারুতি প্রভৃতি। সর্দার মালিকের সুর দেওয়া গানগুলি সুগীত এবং সুখশ্রাব্য। ছবিতে একটি ভাঙরা নাচ আছে—যা অনেকেই উপভোগ করবেন। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ যথাযথ।

### পাদপ্রদীপের আলোকে

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অধিনায়কতায় নবা বাংলা নাট্য পরিষদ আগামী ডিসেম্বর মাসে চারদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" ও "ষোড়শী" এবং "মাইকেল মধুসূদন"। প্রত্যেকটির মূল

[illegible] সোবার্স টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত রানের বিশ্বরেকর্ড করে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। এই খেলায় দ্বিতীয় উইকেটে হান্ট ও সোবার্সের ৪৪৬ রান উইকেট জুটির এক স্মরণীয় কীর্তি।

কনরাড হান্ট ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের একজন পেশাদার খেলোয়াড়। হাতে চমৎকার মার আছে। উইকেটের সবদিকে বল মেরে ইনি দ্রুত রান তুলে থাকেন। হান্টের খেলায় আর বৈশিষ্ট্য বল মারবার পর দ্রুত দৌড়ে রান সংগ্রহ করা। পাকিস্তানের ক্রিকেট অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার বলেছেন, দ্রুত দৌড়ে রান তোলার জোর [illegible] হান্টের মত ব্যাটসম্যান নেই। ফিল্ডসম্যান হিসাবেও হান্টের [illegible] আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং ইংলন্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে হান্ট বহু খেলায় প্রচুর রান তুলে প্রশংসা অর্জন করেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলার ৯টি ইনিংসে হান্ট সংগ্রহ করেছেন মোট ৬২২ রান। ব্যাটিং এভারেজে সোবার্সের পরেই হান্টের স্থান ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এখন সোবার্সের [illegible] বেশী হলেও হান্টের খেলা দেখবার আকর্ষণও কম নয়।

১৯৩২ সালের ৯ই মে হান্ট বারবাডোজে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন স্কুলমাস্টার এবং [illegible]।

## রয় গিলক্রিস্ট

[illegible] খেলোয়াড় রয় গিলক্রিস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার। গিলক্রিস্টকে বিশ্বের খ্যাতনামা ফাস্ট বোলারদের [illegible] পেতে পারে। ১৯৫৭ সালে [illegible] গিলক্রিস্টের [illegible] পরিচয় পেয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে স্থান দেন। যদিও ইংলণ্ডে তিনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি তবুও ইংলণ্ড সফরের অভিজ্ঞতাই গিলক্রিস্টকে আজ এক কৃতী খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে তিনি ২১টি উইকেট পান এবং তাঁর বোলিং এর হিসাব দাঁড়ায় [illegible] ১৪৭ [illegible] ৩২ রান ৬৩৬ উইকেট ২১ গড়—৩০ ২৮।

এই বছর ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে [illegible] ক্লাবের জন্যই [illegible] ক্লাব [illegible] বছর পরে [illegible] লাভ করেছে। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের প্রথম [illegible] গিলক্রিস্ট ১০টি উইকেট লাভ করেন এবং তারপর [illegible] [illegible] [illegible] ১৮ রানে ৮ উইকেট। এই [illegible]

রয় গিলক্রিস্ট

বোলারের [illegible] ওয়েস্ট ইন্ডিজ [illegible] পরিচিত। গিলক্রিস্ট [illegible] ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] [illegible] [illegible] জামাইকার অধিবাসী। [illegible]

## জন হোল্ট

জন হোল্ট [illegible] একজন কৃতী ব্যাটসম্যান। [illegible] ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] কিন্তু এই [illegible] ওয়েস্ট ইন্ডিজ [illegible] না। অবশ্য [illegible] [illegible] ১৯৫[illegible] সালে হল্ট

লিন্ডসেটের কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে হোল্ট ভারত ও পাকিস্থান সফর করেন। ভারত ও পাকিস্থানে ২৪টি খেলায় হোল্ট ৮৩৮ রান করেছিলেন। এর মধ্যে লাহোরে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় এঁর ১৬২ রান বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ভারত ও পাকিস্থান ব্যাটিংয়ে পারদর্শিতা দেখানো সত্ত্বেও ১৯৫০ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল থেকে ইনি বাদ পড়েন। ১৯৫৪ সালে ইংলণ্ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময় এম সি সি দলের বিরুদ্ধে জামাইকার পক্ষে ১৫২ রান করায় টেস্ট খেলায় হোল্টকে দলভুক্ত করা হয়। হোল্ট প্রথম টেস্টে ৯৪ এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১৬৬ রান করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। পাঁচটি টেস্ট খেলায় এঁর মোট রান হয় ৫৩২। এই পর্যন্ত ১০টি টেস্ট খেলায় ইনি ৬৮৫ রান সংগ্রহ করেছেন। জন হোল্ট শিল্পী ফিল্ডসম্যান হিসাবেও সুনামের অধিকারী।

জো সলোমান

জামাইকার [illegible] খেলোয়াড় হোল্ট ১৯২৩ সালের [illegible] মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতাও ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক কৃতী খেলোয়াড়। জন হোল্ট ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সহ-অধিনায়ক।

## জো সলোমান

জো সলোমান এখন পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে কোন টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি। তবে ব্রিটিশ গায়নার খেলোয়াড় হিসাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে সলোমানের বেশ খ্যাতি আছে। ১৯৫৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পর পর দুটি ইনিংসে সে জামাইকার বিরুদ্ধে নট আউট থেকে ১২৪ রান এবং বারবাডোজের

বিরুদ্ধে ১০৮ রান করায় সলোমনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্থানের বিরুদ্ধেও বৃটিশ গায়নার পক্ষে তাঁর ১২১ রান ব্যাটিং নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। ফিল্ডিং এবং বোলিংয়েও সলোমনের খ্যাতি আছে। সাধারণত কভারে ইনি ফিল্ড করে থাকেন। সলোমনের বয়স এখন ২৮ বছর।

### বেসিল বুচার

বৃটিশ গায়নার উঠ্‌তি চৌকস খেলোয়াড় বেসিল বুচারও এ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে কোন টেস্ট খেলেননি। তবে এই তরুণ খেলোয়াড়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা খুবই আস্থাবান। ভারত সফরে এসে সার্ভিস দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের উদ্বোধনী খেলায় বুচারই সবচেয়ে বেশী রান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

বেসিল বুচার

১৯৫৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে ৪৬ রান করে বুচার প্রথম ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের [illegible] আকর্ষণ করেন। এই বছর জামাইকার বিরুদ্ধে ৯৬ রান করবার পর ১৯৫৬ সালে [illegible] কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জামাইকার বিরুদ্ধে করেন [illegible] রান। ইংলণ্ড সফরের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল গঠন করবার যে ট্রায়াল খেলার আয়োজন করা হয় সেই খেলায় ৭৬ রান করা সত্ত্বেও বুচার ইংলণ্ড সফরকারী দলে [illegible] না। বৃটিশ গায়না ও [illegible] খেলাতেও বুচার ১২২ রান করে ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। [illegible] বোলিংয়েও বুচারের [illegible] একজন ভাল ফিল্ডসম্যানও। বুচারের বর্তমান বয়স ২৪ বছর।

রবীন বায়নো

### রবীন বায়নো

রবীন বায়নো ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের [illegible] খেলোয়াড়। এঁর বয়স ২৮ [illegible] বছর। ১৯৩১ সালের ২০শে [illegible] ইনি ক্রাইস্ট চার্চে জন্মগ্রহণ করেন। বারবাডোর ক্রিকেট এবং ফুটবল [illegible]

[illegible] বিরুদ্ধে বারবাডোজ [illegible] করবার [illegible] ৪৫ [illegible] ইনি [illegible] ৫২ রান করেছেন। [illegible] ইন্ডিজের একজন [illegible] ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। টেস্ট খেলায় [illegible] দেখা যাবে না।

### রোহান কানহাই

বৃটিশ গায়নার উদীয়মান খেলোয়াড় রোহান কানহাইয়ের পূর্বপুরুষেরা একদিন ভারতের অধিবাসী ছিলেন। পরে এঁরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে বসতি স্থাপন করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে কানহাই আজ তাঁর পূর্বপুরুষের দেশে সফর করতে এসেছেন।

কানহাইয়ের বয়স মাত্র ২৩ বছর। ১৯৩৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বারবিচে এঁর জন্ম হয়। ১৯৫৫ সালে ট্রিনিদাদের বিরুদ্ধে ইনি প্রথম বৃটিশ গায়নার পক্ষে খেলার সুযোগ পান। এরপর অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার ও [illegible] বিরুদ্ধে এঁর নিখুঁত ব্যাট করবার ভঙ্গি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের [illegible] ইংলণ্ড সফরের আগে কানহাই [illegible] বারবাডোজের বিরুদ্ধে [illegible] এবং জামাইকার বিরুদ্ধে ১২৫ রান [illegible] খেলা মাত্র সাতটি [illegible] ৬টি ইনিংসে [illegible] সংখ্যা হয় ৬০৪। ফলে ইংলণ্ড সফরকারী দলে কানহাই স্থান পান। [illegible] উইকেট [illegible] কানহাইয়ের উপর [illegible] ইনিংসে টেস্ট খেলায় ইনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। [illegible] টেস্ট খেলায় ইনির [illegible] ২২.৮৮। [illegible] টেস্ট খেলা [illegible] ইংলণ্ডে প্রথম শ্রেণীর খেলায় [illegible] ১০৯৩ রান। [illegible] করতে পারেননি।

রোহান কানহাই

এই বছর [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ৯৬ রান [illegible]

ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] এবং [illegible]

[illegible] হিসেবেই [illegible]

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

৪ঠা নভেম্বর—মজুত মাল থাকা সত্ত্বেও খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবাজী নিরোধ অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী এনফোর্সমেন্ট বিভাগীয় পুলিশ অদ্য কাশীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটের এক পাইকারের দোকানে মোট [illegible] মণ ময়দা ও সুজী বাজেয়াপ্ত করে।

৫ই নভেম্বর—জানা গিয়াছে যে, আগামী [illegible] মধ্যে পাণ্ডুতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতুর [illegible] নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে। [illegible] পর্যন্ত এই সেতুটি দশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইবে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটি অদ্য ঘোষণা করেন যে, গত নভেম্বর তারিখে একটি [illegible] পর্যায়ের রকেটকে পরীক্ষামূলকভাবে [illegible] সাহায্যে আকাশে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] দেখা গিয়াছে যে, উহা মহাকাশে ৬০ হাজার [illegible] উর্ধ্বে উঠিয়াছিল।

[illegible]

## বিদেশী সংবাদ

[illegible]

৫ই নভেম্বর—ইজরাইলী সামরিক সদর কার্যালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আজ অপরাহ্ণে গ্যালিলি সাগরের উত্তরে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনী ও ইজরাইলী সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে।

[illegible]

৭ই নভেম্বর—[illegible]

[illegible]

অদ্য [illegible] হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে [illegible] জন্য ১৯৬৪ সালের নোবেল পুরস্কার [illegible] যুগ্মভাবে দেওয়া হইয়াছে।

---

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সূচীপত্র



PROTEX
All Purpose
TOILET POWDER










Remy
FACE POWDER
DE-LUXE
Remy
SNOW
Remy
SNOW

# সূচীপত্র



# নতুন বৈজ্ঞানিক....
# হেয়ার ডার্কনার

পাকাচুল স্বাভাবিক ভাবে



চকচকে কালো চুলে পরিণত হয়।



পরীক্ষিত এবং গুণসম্পন্ন ভেষজ নির্যাস থেকে, এক কেশ বিশেষজ্ঞের নির্মাণ প্রণালী দ্বারা, **ভাস্‌মল** তৈরী। এছাড়া চুল কালো করার সব কয়েকটি কার্যকরী উপাদান এতে আছে। **ভাস্‌মল্‌** তিন প্রকারে কার্যকরী:—



চুল যথার্থভাবে কালো করে, পাকাচুল হওয়া বন্ধ করে।



চুল জন্মানতে সাহায্য করে। খুস্‌কী ইত্যাদি চুলের রোগের প্রতিষেধক।



নিখুঁত কেশ বিন্যাসে সাহায্য করে মধুর গন্ধযুক্ত এবং সারাদিন চুল পরিপাটি রাখে।

**চুল কালো করে, হেয়ার 'টনিক' ও কেশ বিন্যাসে আদর্শ ভাস্‌মল্‌**
**একটি মাত্র নির্মাণ প্রণালীতে সম্পূর্ণভাবে কেশ পরিচর্যার তেল।**

অন্যান্য যে কোন তেল বা পমেডের মতই **ভাস্‌মল্‌** প্রত্যহ সকালে স্নানের পর ব্যবহার করুন। চুলের গোড়ায় **ভাস্‌মল্‌** ভাল করে ঘসে দিন এবং ধীরে ধীরে কিভাবে স্বাভাবিক কালোচুল ফিরে পান তা লক্ষ্য করুন।




# ভাস্‌মল্‌

চুল কালো করার তেল, যা প্রতিজ্ঞা পালন করে।

**ভাস্‌মল্‌** দুই রকম আকারে পাওয়া যায়:—**ভাস্‌মল্‌** নির্যাস কেশ তৈল—৫ আউন্স ও ১ পাউণ্ড ওজনে, ভেজাল করা সম্ভব নয় এমন বোতলে পাওয়া যায়। **ভাস্‌মল্‌** পমেড—৪ আউন্স বোতলে। **ভাস্‌মল্‌** এমাল্‌সিফায়েড হেয়ার অয়েল—৫ আউন্স—২৲ টাকা শিশি ও ১ পাউণ্ড ৪৲ ৭৫ নঃ পঃ বোতল। পমেড—২৲ ৫০ নঃ পঃ (স্থানীয় ট্যাক্স অতিরিক্ত)। যাবতীয় সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

**হাইজিনিক রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট** পোষ্ট বাক্স ১১৯২ বোম্বাই ১

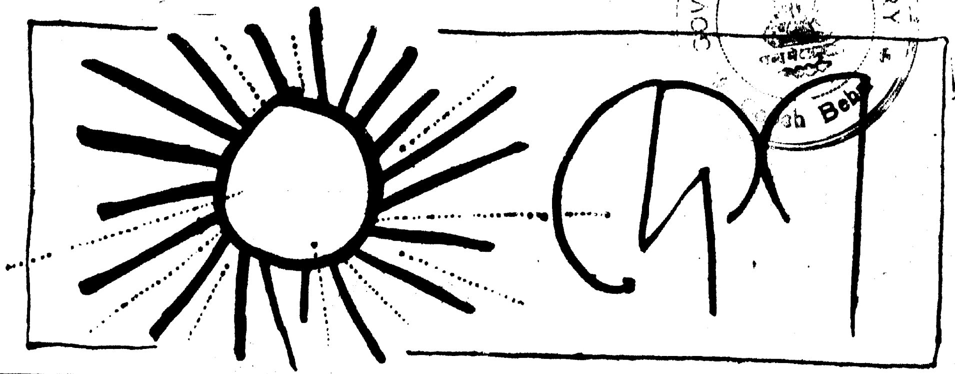
একমাত্র পরিবেশক

**মেসার্স—জে হ্যালি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড**
**৩ নং ম্যাঙ্গো লেন কলিকাতা ১**

H.V.B.

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সমুদ্র হৃদয় | শ্রীপ্রতিভা বসু | ২৬৫ |
| ট্রামে-বাসে— | | ২৭০ |
| বিশ্ব-বিচিত্রা— | | ২৭১ |
| পুস্তক-পরিচয়— | | ২৭৩ |
| আর্থিক সমীক্ষা | শ্রীকৌটিল্য | ২৭৬ |
| রঙ্গজগৎ | চন্দ্রশেখর | ২৭৭ |
| খেলার মাঠে— | একলব্য | ২৮৫ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ২৮৮ |



DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 22nd November, 1958

২৬ বর্ষ ॥ ৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়াপয়সা
শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## সরকারের নূতন উদ্যম

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি প্রায় এক যুগ হইতে চলিল, কিন্তু এমন একটা বৎসর কাটে নাই, যে-বৎসর আমাদের খাদ্য সমস্যা লইয়া দুর্ভাবনা ছিল না। খাদ্যের ঘাটতি বা ঘাটতির আশঙ্কা সর্বদাই মাথার উপরে খড়্গের মত ঝুলিয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির মানযন্ত্রে খাদ্যশস্যের দর পারদের মত ওঠা-নামা করিয়াছে (অবশ্য যত উঠিয়াছে, তত নামে নাই), আমরা উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া দেখিয়াছি। মনে সভয় প্রশ্নঃ আরও উঠিবে নাকি? খাদ্য-দপ্তর বা মন্ত্রণালয় হইতে ছোট-বড়-মাঝারি রকমারি পরিকল্পনার সৃষ্টি কম হয় নাই, কিন্তু কাজ হইয়াছে কম। প্ল্যানের ফলন যত হইয়াছে, শস্যের ফলন তত হয় নাই।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সম্প্রতি নূতন একটি প্রস্তাব আনিয়াছেন। খাদ্যপণ্যের পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে ব্যাপক এবং ইহার উদ্দেশ্যও অস্পষ্ট নয়। চাষীর হাত হইতে ছোট-বড় নানা দালাল পাইকারের হাত ঘোরে, তবে খাদ্যশস্য গৃহস্থের মুখ অবধি পৌঁছিতে পায়। দরের দড়ি, কল-কাঠি, সব পাইকারদের হাতে। মাঘ মাসে চাষী যে দরে খাদ্যশস্য হাতছাড়া করে, আর শ্রাবণ মাসে গৃহস্থকে যে মূল্য দিতে হয়, এ-দুইয়ের মধ্যে মণকরা দশ-বার টাকার ব্যবধান। এই টাকাটার ভাগীও আবার একজন নয়, চার-পাঁচজন। চার-পাঁচটি পর্যায়ে কয়েকজন পাইকারের হাত ঘুরিয়া শেষ দর দাঁড়ায়। ফলে চাষী পায় ন্যায্য মূল্যের অনেক কম, গৃহস্থ দেয় অনেক বেশী। নূতন প্রস্তাবের অভিপ্রায় মধ্যস্তরগুলির লোপ না হউক নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম সমস্যা মূলধনের। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে সরকারকে চারিশত কোটি টাকার মত মূলধন লগ্নী করিতে হইবে। সরকারী নীতি প্রয়োগের জন্যও অন্তত কয়েক লক্ষ কর্মচারী চাই। উদ্যোগ-পর্বটাই অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইবার সম্ভাবনা। অর্থবল এবং জনবল দুই-ই চাই। পাইকারী ব্যবসায় এখন যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের সেই ভাবনা নাই। তাঁহাদের টাকা লগ্নী করা আছে, কর্মচারীও খাটিতেছে। কিন্তু সরকারকে একেবারে গোড়া হইতে শুরু করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সমস্যা গুদামের। মরশুমে খাদ্যশস্য কিনিয়া সরকারকে গুদামজাত করিতে হইবে। সেকালে যেমন ক্রোশ-অন্তর দীঘি ছিল, তেমনই ক্রোশ-অন্তর গুদাম চাই। দাদনের কথাও সরকারকে ভাবিতে হইবে। পাইকারের নিকট হইতে কৃষক দাদন পাইয়া থাকে, সে আশা করিবে, সরকারী আমলেও প্রথাটি রদ হইবে না। তাহা ছাড়া পাইকারী ব্যবসায়ের একটা বড় অংশ চলে ধারে। ধারে পণ্য বিক্রয় এবং পরে পুরাপুরি দাম আদায়—সমস্যাটা এই দিক হইতেও কম নয়।

কিন্তু বৃহৎ সমস্ত পরিকল্পনাতেই সমস্যা থাকে। সরকার অবশ্যই সেজন্য প্রস্তুত হইবেন। প্রস্তাবটি সমর্থনযোগ্য, সন্দেহ নাই। কেননা রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ব্যতীত খাদ্যমূল্য সম্পর্কিত বৈষম্যের কোন প্রতিকার অসম্ভব। তবু হয়ত কোন কোন মহল হইতে আপত্তি উঠিবে; এই আপত্তি একান্তই স্বার্থপ্রণোদিত। আপত্তি বা আশংকা নিরপেক্ষ বিচারকদের পক্ষ হইতেও উঠিতে পারে; তাঁহাদের আপত্তি নীতি বা আদর্শগত নয়, স্বার্থহানির ভয়জাতও নয়। তাঁহারা জানেন, সরকারী কাজ যখন, তখন প্রয়োজনীয় অর্থ অবশ্যই সংগৃহীত হইবে লোকজনের অভাব হইবে না। কিন্তু সরকারী নীতি কার্যকর করিবার যোগ্যতা ইঁহাদের কয়জনের থাকিবে। পরিকল্পনায় আছে, প্রথম ধাপে, চলতি মরশুমের জন্য খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয়ের ভার দেওয়া হইবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের উপর। কিন্তু এই দুই দপ্তরের বহু কর্মী বা পরিচালকের উপর সাধারণের আস্থা নাই। নানা কারণে সিভিল সাপ্লাইয়ের আমল হইতেই ইঁহাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস কম। নূতন এবং অতিরিক্ত দায়িত্বের গুরুভার ইঁহারা বহন করিতে পারিবেন ত? সরকারী প্রকিওরমেণ্ট বা খাদ্য সংগ্রহ নীতি-ঘটিত অব্যবস্থার কথা প্রায়ই শোনা যায়। উত্তম চাউল সরকারী গুদামে ঢুকিলেই রূপান্তর পায়, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পাথর বা কাঁকর শুধু রূপ বা গুণের নয়, ওজনেরও তারতম্য ঘটায়। অতএব একমাত্র খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের সততা এবং সতর্কতা রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্য ব্যবসায় পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে পারে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে বর্তমান বৎসরটি অত্যন্ত অনুকূল। এই বৎসরে নানা রাজ্যেই খাদ্যশস্যের ফলন ভাল। উড়িষ্যায়, অন্ধ্র এবং মধ্যপ্রদেশে এবার উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টন। অনাবৃষ্টি, অকালবৃষ্টি, সেচ-ব্যবস্থার আংশিক অসাফল্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভালই বলিতে হয়। অভাবের বৎসর নহে, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের দিনে সরকারী নূতন কার্যক্রমের শুরু হইতেছে—আরম্ভটা শুভই বলিতে হইবে।

# প্রসঙ্গত

প্রথম পরিকল্পনার পাঁচটি বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই সকাঁসর ঢাক-ঢোল দ্বিতীয়টির আবাহন শুরু হয়ে গিয়েছিল, প্রথম ব্রতটি কতটা সফল হল বা আদৌ হল কি না, অনেকেই ভাল করে সে-হিসাব খতিয়ে দেখার অবকাশ পাননি। দ্বিতীয় সংকল্প উদ্‌যাপনের সময়ও ঘনিয়ে এল। ঢাকঢোল-কাঁসর কবেই স্তব্ধ হয়েছে, সমবেত সাধারণের মুখের দিকে চেয়ে পূজারীরা এখন বোধহয় প্রমাদ গণছেনঃ বিতরণ করবার মত এত প্রসাদ কই।

প্রসাদ বিতরণ পরে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়বে কি না, সে-সংশয়ও আছে। প্রথমে কথা ছিল সাত মণ তেল পুড়বে, বিদেশী খয়রাত-হাওলাতের ভরসায় বহু কুম্ভ ঘৃতের ফরমাসও গিয়েছিল। কিন্তু বিদেশী হিতৈষীরা আশানুরূপ রকম হাত উপুড় করেননি, সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে উঠছে।

অনুমান করেছিলাম, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের বক্তা যেমন তাঁর কন্যার বিবাহে গড়ের বাদ্য বাদ দিয়েছিলেন, তেমন করে ইলেকট্রিক-আলোও জ্বালাতে পারেননি, পরিকল্পনা-সাধকেরাও অগত্যা তাই করবেন, অর্থাৎ ব্যয়ের নির্ঘণ্ট কিছুটা ছাঁটাই হবে, ষোড়শের বদলে দশোপচারেই পূজা সাঙ্গ হবে।

কিন্তু নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ পড়ে ধারণা হয়েছে যে, প্ল্যানের উদ্যোক্তারা স্থির করেছেন, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না, সরকারী খাতে যে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হয়েছে, তা থেকে পাই-পয়সাও (নয়া পয়সা?) কমাবেন না। প্রধান মন্ত্রী নিজেও প্ল্যানের কোন প্রকার অঙ্গহানি ঘটতে দিতে নারাজ।

* * *

প্রস্তাব উত্তম, কিন্তু উপায়? পরিষদ সে-কথা অবশ্যই ভেবেছেন, কিন্তু মনের কথা খুলে বলেন নি। কুড়িয়ে-বাড়িয়েও সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা গেলেও অন্তত সওয়া দুশো কোটি টাকার মত ঘাটতি থাকবে। হয়ত পরিষদ আরও বিদেশী টাকার স্বপ্ন দেখছেন, করভার আরও বাড়ানর চিন্তাও তাঁদের মনে উদিত হয়ে থাকবে। বিদেশের গৌরী-সেনেরা যদি বিমুখ হন, স্বদেশের সাধারণ ত রয়েছেই।

এই আপাত-সহজ সমাধানের মধ্যে একটা বড় রকম 'কিন্তু'র কাঁটা আছে। আরও করভার? নীতির দিক থেকে অদর্শনীয় আপত্তিকর না হোক, বাস্তব বিচারের দিক থেকে ত বটেই। পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হতে না হতে আরেকটি সাধারণ নির্বাচন এসে পড়বে। তখন নতুন ট্যাক্স চাপিয়ে যে কয়টি টাকা উশুল হবে, তার ডবল ভোট হয়ত সরকারী দলের বিপক্ষে যাবে। শান্তি-প্রিয় জনসাধারণের প্রতিবাদ জানানর এই একটি পথই ত খোলা আছে।

তর্ক উঠতে পারে, তা কেন। পরিকল্পনার লক্ষ্য জনকল্যাণ। জাতীয় উদ্যোগ যেদিন সফল হবে সেদিন 'দ্বৌমাসৌ মৃগমাংসেন ত্রীন্মাসান্ শাকুনেন তু'— 'দ্বৌমাসো মৃগশূকরো, অহিরেকং দিনং' ইত্যাদি নিয়মিত ভূরিভোজনের আশ্বাস ত আছেই, অতএব অদ্য ধনুর্গুণেরেই ভক্ষা করতে সাধারণের আপত্তি হবে কেন।

আপত্তি এই কারণে যে, গত আট বছরের অভিজ্ঞতার ফলে সাধারণের ধারণা হয়েছে, সমুদ্র মন্থনের ফলে তারা আজ অবধি কিছুমাত্র উপকৃত হয়নি। দেবতাদের মধ্যে অমৃত ভাগা-ভাগি দেখে তাদের ক্ষোভ এবং অসহিষ্ণুতা আরও বেড়েছে। পরিকল্পনার সুযোগে ঠিকাদার আর যোগানদারদের মুনাফার মধুপান ঠিকই চলছে, শুধু সাধারণের মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিলেও তাদের ইশারায় বলা হচ্ছে, "তিষ্ঠ মূঢ়, ক্ষণ-কালং।" বিপুল মুনাফার কতটা রাজকোষে জমা পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বিলক্ষণ আছে। ট্যাক্সের নাম শুনলেই শিল্পপতিরা সমস্বরে গেল রাজ্য, গেল মান বলে এমন ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়েন যে, অবশেষে বোঝার অনেকটাই সাধারণের উপরে চাপিয়ে সরকার প্রয়োজন মেটান।

* * *

তাতেও না কুলকে শিক্ষা বা সমাজ-কল্যাণকর পরিকল্পনার ডালপালা ছাঁটেন। কিন্তু যেখানে ব্যয়ের দাঁয়তাং ভুজ্যতাম, সেখানে হাত ছোঁয়াতেও ভরসা পান না। অজুহাতঃ সেটা নাকি প্ল্যানের 'হার্ড কোর'। বড় কঠিন ঠাঁই।

বিনিময়ে সরকার কী পেয়েছেন। - প্রেস্টিজ। ইস্পাত আর ইটের বিপুল আয়োজন দেখে বিদেশী অতিথিরা চমৎকৃত হন, না হলেও অন্তত মুখে 'সাধু-সাধু' বলেন, সরকারের লাভ ওইটুকু।

সাধারণের লাভ না। এই আট বছরে শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি, অন্ন-সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয়নি, বাস-স্থান ইত্যাদির বন্দোবস্তের কথা না তোলাই ভাল। বেকার সমস্যা স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছে। একটি সভ্য আধুনিক দেশে লক্ষ লক্ষ সুস্থ সক্ষম লোকের জীবনে 'কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ' পরিকল্পনার করুণ ব্যর্থতা এইখানে।

অথচ বেকার-সমস্যার অন্তত আংশিক সুরাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। উদ্যোক্তারা অবশ্য প্রস্তাবনাতেই স্বীকার করেছিলেন, সম্পূর্ণভাবে সমস্যা পূরণের সাধ্য তাঁদের নেই। বকেয়া-বাকী তাঁরা মেটাবেন না, চালের দেনাটাই শোধ করে যাবেন। উপমা ছেড়ে কথাটা সহজ করে বলি। পুরনো আমলে যারা কর্মহীন ছিল, তাদের সকলকে কাজ দিতে না পারুন, নতুন কর্মপ্রার্থীদের যাতে কাজের অভাব না ঘটে, পরিকল্পনাকারীরা সেদিকে নজর রাখবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

* * *

সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি। গত কয়েক বছরে দেশে বহু লক্ষ নতুন বেকারের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে সবশুদ্ধ ২০৪টি এবং এক্সচেঞ্জগুলির খাতায় এখন দশ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর নাম লেখান আছে। সংখ্যাটা ভয়াবহ। পরি-কল্পনার এই কয় বছরেই বেকারের সংখ্যা তিন লক্ষ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা অধুনা এক লক্ষ একানব্বই হাজার - চলতি বছরের শেষে সম্ভবত দু লক্ষ পূর্ণ হবে।

এই হিসাবও, বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ নয়। এক্সচেঞ্জে লাইন দিয়ে নাম লেখাননি, এমন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও অবশ্যই বহু লক্ষ হবে। পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে মাত্র পঁচিশ লক্ষ লোক চাকরি পেয়েছে, অথচ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ। সক্ষম এবং ইচ্ছুক কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সেই হারে না বাড়ুক, অন্তত কুড়ি লক্ষ ত হবে। অতএব তিন বছরে অন্তত ষাট লক্ষ লোক কাজ পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, কিন্তু পঁয়ত্রিশ লক্ষই পায়নি! এক্সচেঞ্জ তালিকায় নাম আছে মাত্র দশ লক্ষের।

যারা চাকরি পেয়েছে, সংসারের প্রয়োজনের পক্ষে তাদের আয় পর্যাপ্ত কিনা — অর্থাৎ এমপ্লয়েডরাও আসলে 'পার্টলি এমপ্লয়েড' কিনা, এ-প্রশ্ন অত্যুৎপন্ন না তোলাই ভাল। পরিকল্পনা-কারদের কল্পনার সাফল্যের ভিত্তি নাকি আছে, কাজের নমুনার বিশ্লেষণ উপরে।

# বৈদেশিকী

গত ২৭শে অক্টোবর এক বক্তৃতায় পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট সরকারের কর্তা যখন বললেন যে, সমগ্র বার্লিন শহরই জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক (পূর্ব জার্মানী) রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এবং বার্লিনের কোন অংশই আর পশ্চিমা শক্তিদের দখলী অধিকারের আইনানুগ ভিত্তি নেই, তখন সে-কথায় বিশেষ কেউ কান দেয়নি। অনেকেই ভুলে গিয়েছিল যে, এরকম কথা সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সম্মতি ও সমর্থন না থাকলে পূর্ব জার্মানীর সরকারের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। আবার কথাটা যদি সোভিয়েট সরকারের হয়, তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধেও কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। সেরূপ সন্দেহের অবকাশও আর নেই। কারণ ১০ই নভেম্বর মস্কোতে এক জনসভায় মিঃ খ্রুশ্চেভ নিজেই এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করে সোভিয়েট সরকারের বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন।

মিঃ খ্রুশ্চেভের কথাকে পশ্চিমা শক্তিদের প্রতি একটা নোটিশ বলা যেতে পারে। সে নোটিশ হচ্ছে এই যে, পশ্চিমা শক্তিদের পূর্ব জার্মানীর গভর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দিতে হবে, অন্যথায় তাদের বার্লিন পরিত্যাগ করে যেতে হবে। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রীর মতে পশ্চিমা শক্তিরা পটস্‌ডাম চুক্তির অন্য সমস্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে, বার্লিনের উপর চতুঃশক্তির অধিকার সম্পর্কিত শর্তটি মাত্র তারা পালন করেছে, কারণ তাতে কেবল তাদেরই (পশ্চিমা শক্তিদেরই) লাভ। সোভিয়েট সরকারের মতে এরূপ অবস্থার পরিবর্তনের সময় এসেছে। বার্লিন শহর পূর্ব জার্মানীর রাজধানী। সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পশ্চিমা শক্তিরা পূর্ব জার্মানীর অন্তর্গত বার্লিন শহরে বসেই পূর্ব জার্মানীর উচ্ছেদের জন্য অনবরত চক্রান্ত করে যাচ্ছে। পশ্চিম বার্লিন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে যাতায়াতের পথ পূর্ব জার্মানীর জমির উপর দিয়ে গেছে, সে পথের নিরঙ্কুশ ব্যবহারের অধিকার যারা ভোগ করছে, তারা কিন্তু পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টকে স্বীকার পর্যন্ত করতে নারাজ। সোভিয়েটের মতে এ অবস্থার অবিলম্বে অবসান হওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট স্থির করেছেন যে, পটস্‌ডাম চুক্তি অনুসারে বার্লিনে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে যে-সব কাজ করা বা ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে সেগুলি সোভিয়েট সরকার পূর্ব জার্মানীর গভর্নমেণ্টের হাতে ছেড়ে দেবেন। তাহলে বার্লিনের উপর চতুঃশক্তির (সোভিয়েট, আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেন) দখলী অধিকারের ভিত্তিই থাকবে না। তখন পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং চুক্তি করা ছাড়া উপায় থাকবে না অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীর গভর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তা না করে অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীর গভর্নমেণ্টকে গ্রাহ্য না করে পূর্ব জার্মানীর এলাকার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে গেলে সংঘর্ষ বাধবে।

পূর্ব জার্মানীর প্রতি বলপ্রয়োগ করলে তার ফল কী হবে সে বিষয়েও মিঃ ক্রুশ্চেভ সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি পশ্চিমা শক্তিদের ওয়ারস চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, পূর্ব জার্মানীর উপর কোনোরকম আক্রমণ হলে সেটা সোভিয়েটের উপর আক্রমণ বলে ধরা হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে রাশিয়া যদি সত্যই পটসডাম চুক্তির বার্লিন সম্পর্কিত শর্তাবলীজাত অধিকারগুলি পূর্ব জার্মান সরকারের হাতে ছেড়ে দেয় তবে পশ্চিমা শক্তিদের (এবং বলা বাহুল্য তাদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম জার্মান সরকারেরও) হয় পূর্ব জার্মাণ সরকারকে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব জার্মান এলাকার ভিতর দিয়ে যাতায়াতের বন্দোবস্ত বজায় রাখতে হবে না হয় বার্লিন ছেড়ে আসতে হবে। অবশ্য স্থলপথ অবরুদ্ধ হলে বিমানপথে কিছুকালের জন্য সংযোগ রক্ষা করা যেতে পারে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমা শক্তিরা একবার এই উপায় অবলম্বন করে রুশীয় কৌশলকে ব্যর্থ করেছিল। এবার কিন্তু তা সম্ভব নাও হতে পারে। জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক নিজেকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে দাবী করে এবং পৃথিবীর অনেক দেশের দ্বারা সে-দাবী স্বীকৃতও বটে। সুতরাং পূর্ব জার্মানীর উপর দিয়ে পূর্ব জার্মান সরকারের বিনা সম্মতিতে বিমান যাতায়াতেও আপত্তি উঠবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যদি দুই পক্ষ মীমাংসার দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে চলে তবে অবস্থা এবার আরো বেশি জটিল হবে। তবে এই চাপ দেওয়ার পিছনে রাশিয়ার আশু উদ্দেশ্য ঠিক কী সেটা খুব পরিস্কার নয়। পূর্ব জার্মানীকে পশ্চিমা শক্তিদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেওয়াই রাশিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ঠিক কী সেটা খুব পরিস্কার নয়। তাঁর ১০ই নভেম্বরের বক্তৃতায় জার্মান সামরিক মনোভাবের পুনর্জাগরণের সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মান সমরোন্মুখতাকে রাশিয়াভিমুখী করার জন্য যে-সব শক্তিকে সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছিল সে-গুলি আবার অনুরূপভাবে সক্রিয় হয়েছে বলে মিঃ ক্রুশ্চেভ অভিযোগ করেন। আসলে পশ্চিম জার্মানীর নবলব্ধ বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি এবং ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিই হচ্ছে আসল সমস্যার মূলে। পূর্ব জার্মানীকে পশ্চিমা শক্তিরা স্বীকার করে নিলেই সেই সমস্যার উপশম হবে না। একদিকে পশ্চিমা শক্তিদের জোটটা শিথিল করা এবং অন্যদিকে জার্মান শক্তির বৃদ্ধি প্রশমিত করার চেষ্টাই সোভিয়েটের পক্ষে স্বাভাবিক হবে। যাতে ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার যোগ নিবিড়তর হয় এমন কিছু করা সোভিয়েটের স্বার্থের অনুকূল নয়। সেইজন্য বার্লিনের ব্যাপারটাও যেদিকে যাবে বলে অনেকে মনে করছে হয়ত শেষপর্যন্ত সেদিকে যাবে না।

১৭।১১।৫৮

# রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

বাইশ বছর আগের কথা। ১৯৩৬ সাল। কোনো প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বোলপুরে ডেকেছেন। ভোরের ট্রেনে উঠে মধ্যাহ্নে গিয়ে পৌঁছেছি। তখন বসন্তকাল পড়েছে, যাত্রা ছিল শুভ। স্টেশনে আমার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

কবি উত্তরায়ণে নিজের বাড়িতেই স্থান দিয়ে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। তাঁর সঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজন করলুম, তা ভূরি-ভোজন। বিকেলে আবার ডাক পড়ল চায়ের টেবিলে। সেখানে দেখলাম আরো অতিথি রয়েছেন এক আমেরিকান দম্পতি। তাঁরা রাজনীতি মানবনীতি ও মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছিলেন, কবি একে একে তার জবাব দিচ্ছিলেন। মাঝে আমি চুপ করে বসেছিলাম। পেট যথেষ্টই ভরা ছিল, চা ব্যতীত কিছুই স্পর্শ করিনি। মন দিয়ে ও‘দের কথাবার্তা শুনছিলাম।

অতঃপর সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় ফিরলাম, সেই আমেরিকান দম্পতির সঙ্গেই। ট্রেনেও তাঁদের সঙ্গে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেরই আলোচনা হলো।

কলকাতায় ফিরে এই কবিসন্দর্শন সম্বন্ধে "বীরভূমে কবিভূমে" নাম দিয়ে একটি সরস প্রবন্ধ লিখে 'ছন্দা' নামক পত্রিকায় ছাপতে দিলাম। নীচে নিজের নাম না দিয়ে লিখলাম শ্রী—।

কিছুদিন পরে শুনি কবি স্বয়ং আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছেন। ছন্দায় একখানি চিঠি পাঠিয়েছেন, সম্পাদক আমাকে সেটি দেখালেন। চিঠি পড়ে আমি অবাক। সে চিঠি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি, নীচে সেটি আমূল উদ্ধৃত করে দিলাম—

**"বীরভূমে কবিভূমের" জের**

ছন্দায় দেখা গেল, শায়িত দাড়িযুক্ত শ্রী এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। আমি ছিলেম তাঁর সাক্ষী। তাঁর মধ্যাহ্নভোজের ত্রুটি হয়নি সে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন অপরাহ্নে চায়ের টেবিলেও তাঁর আমন্ত্রণ ছিল, তবু তিনি ভোজ্যপদার্থে যথোচিত মন দিতে পারেন নি—সেটা আয়োজনের দোষে নয়, পাকস্থলীতে তৎকালীন স্থানাভাবই ছিল তার কারণ।

ঐ টেবিলে উপস্থিত ছিলেন এক আমেরিকান দম্পতি। তাঁদের সঙ্গে আমার যে বাক্যালাপ চলছিলো তার প্রতি তাঁর কান মুক্ত ছিল মিষ্টান্নের মোহ হতে, তাঁর লেখানবন্দীতে শ্রী—এই কথাই প্রকাশ করেছেন, যেহেতু তাঁর মন মুক্ত ছিল। কিন্তু আমার উক্তির কিয়দংশের যে অনুলেখন তিনি দিয়েছেন, তার থেকে আমার মনে সংশয় জেগেছে। বোধ হচ্ছে সদ্ব্রাহ্মণোচিত ভোজ্য-রসানুরাগে তাঁর শ্রুতিপথে বাধা ঘটিয়েছিল।

বিদেশী অতিথি প্রশ্ন করেছিলেন, সভ্য-জগতে অহিংস্র শান্তিনিষ্ঠতা বিস্তারের সম্ভাবনা কতদূর? শ্রী— বলেছেন, তদুত্তরে আমি বলেছি—"ইতিহাসে দেখা যায় পৃথিবীতে যখনি কোনো নূতন স্রোত উঠেছে, তখনি একজন লোক তাকে অগ্রসর করে নিয়ে এসেছে। যে শান্তি আপনি খুঁজছেন, তাকে বহন করে আনবার উপযুক্ত একজন মানুষ চাই, নইলে তা আসতে পারে না।"

কথাটা শোনবার মতো বটে, কিন্তু আমি যা বলেছিলুম তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলছে না। আমার কথাটা খোলসা করে বলা যাক।—

সত্য পদার্থ চাপা আগুনের মতো ভিতরে ভিতরে সংক্রামক। ব্যক্তিগত মানুষ তার বাহন। যে মতটা বিশেষ কারণে আজ পেয়ে বসেছে দশজনকে, তার ছোঁয়াচ কাল বিশ-জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। য়ুরোপ একদিন ডাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। বড় বড় মনীষীরাও এই বিশ্বাস থেকে অব্যাহতি

পাননি। নতুন শিক্ষার প্রভাবে ভিতরে ভিতরে মনের বদল হতে লাগল জনে জনে। মুগ্ধ বিশ্বাসীর সংখ্যা হ্রাস হতে হতে কখন এক সময়ে বিশ্বাসটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গত মহাযুদ্ধে সামরিক প্রথার বীভৎসতাবোধ হাওয়ায় দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত সংখ্যাকে আশ্রয় করে শান্তিনিষ্ঠতা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়েছে সমাজে। রাষ্ট্র-নায়কেরা কঠিন করে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে প্রভাব হাওয়ায় ছুটেছে তার সঙ্গে লড়াই করবে কে? পৃথিবীতে অসভ্যতার অবস্থান্তর এমনি করেই ঘটে। বর্তমান সভ্যসমাজ নরবলিকে দেবপূজা বলে গণ্য করে না, এটাও সংক্রামকভাবে ক্রমে ক্রমে সম্ভব হয়েছে। পশুবলির বর্বরতাও এমনি করেই এই পথেই লুপ্ত হবে। অবশ্য ভদ্রবুদ্ধির সঞ্চার সকল জাতির মনে সমান সুসাধ্য নয়, তবু দুর্গম পথে মন্দ গমনেও সভ্যতার লক্ষ্য সিদ্ধি হয়ে থাকে। পশুবলির রক্ত মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে তুলে নিয়ে কোলের ছেলের কপালে তিলক কাটাকে কল্যাণকর বলে মনে করবে না এমন দিন আমাদের মতো দেশেও আসবে এমন আশা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য মহাদেশে রাষ্ট্রকার্যে নরবলি নিবারণ হয়তো-বা তার পূর্বেই ঘটবে। সেখানে যারা নরবলিকে বাধা দেবার জন্যে কঠোর শাস্তি স্বীকার করতে প্রস্তুত, তাঁদের সংখ্যা তো প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এমনি করেই ব্যক্তিবিশেষদের আত্মত্যাগের দ্বারাই সভ্যতার ভূমিকা প্রশস্ত হতে থাকে।

সেদিন চায়ের টেবিলে এই ছিল আমার বক্তব্য।

'ছন্দা' **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
২১শে ফাল্গুন, ১৩৪৩



চিঠিখানি পড়ে খুবই রাগ হলো। শুধু রাগ নয়, প্রচণ্ড এক অভিমান। তিনি আমাকে কতই স্নেহ করেন, অথচ অনর্থক এইভাবে আমাকে হাস্যাস্পদ করলেন! চায়ের টেবিলে কোনো ভোজ্য আমি মোটে ছুঁইনি, শুধু চা ছাড়া। তবে আমার 'ভোজ্যরসানুরাগ' হলো কেমন করে? তা হোক, কিন্তু তাঁর বক্তব্য আর আমার বিবৃতির মধ্যে এমন মারাত্মক প্রভেদই বা কোথায়? যে কথা আমি সংক্ষেপে সেরেছি, তাই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরো বিশদ করে বলেছেন। সূক্ষ্ম বিচার করলে প্রভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু আমি তো রিপোর্টার হয়ে কিছু লিখিনি, সরস সাধারণ বর্ণনাই লিখেছিলাম। এইসব কত কথাই মনের মধ্যে পীড়া দিতে থাকল, মেজাজ বিগড়ে গেল। কিন্তু কিছুই করবার নেই, এ দুঃখ নিতান্তই ব্যক্তিগত।

কবি কিছুদিন পরে কলকাতায় এলেন। এসেই আমাকে খবর দিলেন যেমন প্রতি বারেই দিতেন। গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মুখের ভাব নিশ্চয়ই প্রসন্ন ছিল না। প্রণাম করে গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম, শেষে দু একটি মাত্র কথা বলে চলে এলাম।

পরের দিন তিনি দরোয়ানের হাতে আমাকে একখানি চিঠি লিখে পাঠালেন। সে চিঠিখানি হারিয়েছি, কিন্তু তার ভাবার্থ এই—দেখলাম যে তুমি মনে ব্যথা পেয়েছ। কিন্তু তোমাকে ব্যথা দেবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। যাই হোক, আমার শ্লেষবাক্য আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। এ-চিঠিও তুমি ঐ কাগজে ছেপে দিতে পারো।

আমি আবার গিয়ে দেখা করলাম। প্রণাম করে বললাম, প্রত্যাহারের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

# আলোচনা

## বরিস পাস্তেরনাক

সবিনয় নিবেদন,

বরিস পাস্তেরনাকের উপর লিখিত আমার প্রবন্ধটি পড়ে গত ২৯শে কার্তিক সংখ্যার দেশ পত্রিকায় শ্রীপ্রদ্যোৎ (ত?) গুহ তাঁর মতামত জানিয়েছেন। এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। কারণ এরূপ উদ্যোগী পাঠকের সংখ্যা আমাদের দেশে বেশী নেই।

"ডক্টর জিভাগো" সম্পর্কে আমার কয়েকটি মন্তব্যের সঙ্গে প্রদ্যোৎবাবু একমত নন। বইটি এখনো সহজলভ্য নয়। সুতরাং মতামতের বিরোধের মধ্য থেকে যথার্থ সত্যটি উদ্ধার করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। একটি প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সব দিকটা হয়ত যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলতে পারিনি, এবং হয়ত এই জন্যই প্রদ্যোৎবাবুকে ভুল বুঝবার সুযোগ দিয়েছি। তাঁর প্রতিবাদের উত্তর দিয়ে নিজের বক্তব্য স্পষ্টতর করবার চেষ্টা করব।

আমি বলেছিলাম : "ডক্টর জিভাগোর কাহিনী সুসংবদ্ধ নয়। অকারণে নানা ঘটনা ও চরিত্র যোগ হয়েছে।" প্রদ্যোৎবাবু বলেছেন ছোট ছোট পরিচ্ছেদ, টুকরো টুকরো ছবি, টুকরো টুকরো ঘটনা একের পর এক সাজিয়ে এক "সুবিশাল ইমারত" তৈরি করা কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের বিশেষ টেকনিক। প্রদ্যোৎবাবু হয়ত লক্ষ্য করেননি যে আমি "অকারণে" কথাটি ব্যবহার করেছি। যেসব ঘটনা ও চরিত্র কাহিনীর কাঠামো নিয়ে গেছে সমস্তের করে ... বিচ্ছিন্ন হয়েছে ... । আমার অভিযোগ ছিল এই যে, পাস্তেরনাক এমন ঘটনা ও চরিত্র এনেছেন কাহিনীর বিকাশে যাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দান খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রদ্যোৎবাবু তলস্তয়ের "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস"-এর সঙ্গে "ডক্টর জিভাগো"র তুলনা করেছেন। অনেক বিখ্যাত বিদেশী পত্রিকায় "ডক্টর জিভাগো"র সমালোচনা প্রসঙ্গে "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস"-এর তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু দুই বইয়ের মধ্যে তুলনা করবার মতো মিল অত্যন্ত সামান্য। "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস" ১৮০৫ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত নেপোলিয়নের অভিযানের পটভূমিকায় রচিত। "ডক্টর জিভাগো" সোভিয়েট বিপ্লবের সমকালীন একটি কাহিনী। উভয় উপন্যাসেই যুদ্ধ ও বিপ্লবের দ্বারা বিধ্বস্ত রাশিয়ার জীবনের ছবি পাই। অবশ্য ছবির রঙ ও টেকনিকে পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় মিল খানিকটা আছে আঙ্গিকের দিক থেকে। অনেক ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা উভয় উপন্যাসেই করা হয়েছে। প্রথম মনে হতে পারে এরা বিচ্ছিন্ন ও এলোমেলো। "ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে" এরূপ আঙ্গিক সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে "ডক্টর জিভাগো"র কাহিনীর অসংবদ্ধতাকে প্রদ্যোৎবাবু সমর্থন করেছেন।

দুটি প্রধান কারণে তলস্তয়ের কাহিনী নানা ঘটনার চাপে পড়েও ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রথমতঃ "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস" চারটি পরিবারের গল্প এবং এর মধ্যে দশ বারোটি প্রধান চরিত্র রয়েছে। যত ঘটনা ঘটেছে তারা নায়কের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত না হলেও কোনো একটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই চরিত্রগুলি আবার নায়কের সহিত যুক্ত। সুতরাং হঠাৎ অনেক ঘটনা বিচ্ছিন্ন মনে হলেও কাহিনীর সঙ্গে এদের নিবিড় যোগ আছে। পাস্তেরনাকের পক্ষে এই আঙ্গিক ব্যবহারের সুযোগ সীমাবদ্ধ। কারণ তাঁর প্রধান চরিত্র মাত্র দুটি। তার মধ্যে নায়ক জিভাগোর আছে ক্রিয়াশীল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অভাব। অনেক ঘটনা ঘটেছে জিভাগোর জীবনবৃত্তের বাইরে। জিভাগোর সঙ্গে তাদের যোগ স্থাপন করে দেবার মতো পার্শ্বচরিত্রের অভাব আছে। তাই এ সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

জীবনের আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্র রচনা করে আমাদের মন। মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে লেখক বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। পাস্তেরনাক এদিকটা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তলস্তয় কাহিনী বয়নে এই কৌশলটি ব্যবহার করতে ভোলেননি। তাই "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস" পড়ে ফ্লবেয়ার লেখকের কৃতিত্বের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন : "What a painter and what a psychologist!"

"ওয়ার অ্যাণ্ড পীসের" বিচিত্র ঘটনাবলী ও নানা চরিত্র মূল কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় না আর একটি কারণে। তলস্তয় দেখাতে চেয়েছেন যুদ্ধ-বিগ্রহ যাই ঘটুক না কেন ইতিহাসের গতি রুদ্ধ হয় না। জীবন এগিয়ে চলে। প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনা বিবর্তিত হয়ে, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এই তত্ত্বকে

---

প্রমাণিত করছে। তলস্তয়ের ইতিহাসের ধারণা সবাইকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

প্রদ্যোৎবাবু বলেছেন, "ডক্টর জিভাগো" জীবনের সমান্তরাল এবং জীবনের মতোই বৃহৎ। কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হবার পরও এরূপ মন্তব্য যে কেউ করতে পারেন তা সত্যি বিস্ময়কর। বিপ্লব সম্বন্ধে জিভাগোর বিরূপ অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।



জীবন কি এত সংকীর্ণ? বিপ্লবকালীন বিক্ষুব্ধ জীবনই কি জীবনের সামগ্রিক রূপ? "জীবনের মতো বৃহৎ" বলা চলে "ওয়ার অ্যান্ড পীস"কে। বইয়ের নামকরণ থেকেই দেখা যাবে তলস্তয় যুদ্ধ ও শান্তি, এই উভয়কালীন জীবনের কথাই বলেছেন। সমগ্র জীবনের ছবি তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু। পাস্তেরনাক ডক্টর জিভাগোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে জীবনকে সংকীর্ণ করেছেন। জীবনের চেয়ে জিভাগো তাঁর কাছে বড়; বইয়ের নাম তাই হয়েছে "ডক্টর জিভাগো।" কিন্তু "ওয়ার অ্যান্ড পীসে" নায়ক অপেক্ষা জীবন বড়। প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ জীবনই তলস্তয়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

"জিভাগো লারার প্রেমকাহিনীর জন্যই এ উপন্যাস মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। ...লারা-জিভাগোর প্রেমকাহিনী থাকবে চির-ভাস্বর।"—এই হল প্রদ্যোৎবাবুর অভিমত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের প্রেমের মধ্যে মহত্বের চিহ্নমাত্র নেই। ওদের সম্পর্ক ছিন্ন হবার পূর্ব পর্যন্ত দু'জনের প্রীতিপূর্ণ জীবনযাত্রার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন পাস্তেরনাক। কিন্তু সম্পর্কের সমাপ্তি যেভাবে এসেছে তা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। কোমারোভস্কি যখন ওদের রক্ষা করবার ছল করে নিতে এল তখন লারা স্পষ্টই জানিয়ে দিল জিভাগোকে ফেলে সে যাবে না। জিভাগো প্রথম যেতে চায়নি। কিন্তু কোমারোভস্কি তাকে আড়ালে নিয়ে যখন মিথ্যা করে বলল, লারার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে তখন জিভাগো লারাকে ফাঁকি দিয়ে বলল সে একটু পরেই আসছে। লারা তার কথার উপর নির্ভর করে কোমারোভস্কির সঙ্গে চলে গেল। এর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত লারা ও জিভাগোর প্রেমে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেনি। তাহলে লারার প্রাণ রক্ষার জন্যই কি জিভাগোর এই প্রতারণা? তাহলে শুধু বেঁচে থাকাই কি জিভাগোর কাছে সবচেয়ে বড় হল? প্রেম কিছু নয়, সম্মান কিছু নয়? প্রথম যৌবনে লারার জীবনে কোমারোভস্কি কী সর্বনাশ এনেছিল তা জিভাগোর অজানা ছিল না। কোমারোভস্কির চরিত্র পরিবর্তিত হয়নি। বরং বিপ্লবের সুযোগে নতুন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নারী নির্যাতনের অধিকতর শক্তি সে লাভ করেছে। জিভাগো নিজে উদ্যোগী হয়ে তার হাতে লারাকে তুলে দিল।

লারার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার পর জিভাগো স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে কোমারোভস্কির প্রতারণা। তারপরও জিভাগো লারার সন্ধান করবার জন্য উদ্যোগী হয়নি, লারার নির্যাতিত জীবনের কথা ভেবে তার দীর্ঘশ্বাস পড়েনি। বরং সে মস্কো প্রত্যাবর্তন করে আর একটি মেয়েকে নিয়ে জীবন শুরু করল; সে মেয়ের সন্তানের পিতা হল। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নির্বাসনে আছে; লারা তাকে ভালোবেসে, তাকে বিশ্বাস করে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। তথাপি জিভাগোর জীবন যে ক্ষুব্ধ হয়েছে এমন প্রমাণ কাহিনীর মধ্যে নেই। প্রদ্যোৎবাবু বলেছেন জিভাগো "বিবেকবান", তার প্রেম মহৎ। বিবেকবত্তা ও মহৎ প্রেমের এই কি পরিচয়?

প্রদ্যোৎবাবু বলেছেন, "জিভাগো নতুন সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলেই তার ব্যক্তিত্ব ভেঙে দুমড়ে গেছে" এবং "বিপ্লবের নিবার্য কঠোরতর" বিরুদ্ধেই তার অভিযোগ। যার ব্যক্তিত্ব ভেঙে গেছে সেকি "বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির পাশে স্থানে পাবার যোগ্য" উপন্যাসের নায়ক হবার উপযুক্ত? এমন নয় যে একদা ব্যক্তিত্ব ছিল এবং তা ভেঙে যাবার ইতিহাসই উপন্যাসের ট্রাজেডি। লেখক জিভাগোর ক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্ব কাহিনীর কোথাও দেখাননি।

মানুষের বাঁচবার দু'টি পথ আছে। হয় সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবে; তা সম্ভব না হলে পছন্দ মতো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংগ্রাম করবে। জিভাগো দু'টির একটিও না করে নিষ্ক্রিয়তা বরণ করে নিয়েছে। বিপ্লবের "নিবার্য কঠোরতা" এই নিষ্ক্রিয়তার কৈফিয়ত হতে পারে না। কারণ বিপ্লবের কঠোরতা ব্যক্তিগতভাবে জিভাগোকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। জিভাগো দু'বার সাইবেরিয়া থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেও তার কোনোই শাস্তি হয়নি। তারপর সে একদিন সত্যি পালিয়ে এল; এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশ্যে গ্রামে ও শহরে বাস করেছে। কোমারোভস্কি তার সব খবরই জানত। তবু কোনো শাস্তি সে পায়নি। শান্তির সময়ও সেবাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এলে শাস্তি হয়। তাও হয়নি জিভাগোর। জিভাগো বনেদি ঘরের ছেলে, বিয়ে করেছে বড়লোকের মেয়ে, সে পলাতক—এই সব অভিযোগে বিপ্লবক্ষুব্ধ সময়ে তার প্রাণদণ্ড হতে পারত। নিজে দুঃখ না পেলেও প্রিয়জনের বেদনা গভীরতর আঘাত দিতে পারে। কিন্তু তোনিয়ার প্রতি যে জিভাগোর গভীর আকর্ষণ আছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নির্বাসনে সে যে কঠোর আঘাত পেয়েছে, এমন কথা স্পষ্ট করে লেখক বলেননি। তাই অসহনীয় কঠোর পীড়নে জিভাগোর ব্যক্তিত্ব ভেঙে পড়ছে এমন যুক্তি উপস্থিত করলে পাঠকের মন সায় দেবে না।

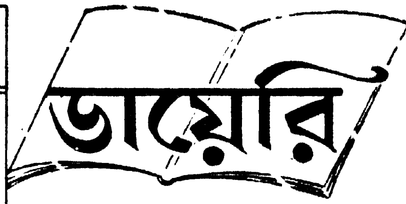
জিভাগোর সঙ্গে হ্যামলেটের তুলনা কি করে হতে পারে তাও ভেবে পাইনে। দ্বিধা আর নিষ্ক্রিয়তা তো এক নয়! আশা করি উপন্যাসের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত "হ্যামলেট" নামেয় কবিতাটি প্রদ্যোৎবাবুকে প্রতারিত করেনি। সমগ্র নাটকটি হ্যামলেটের কার্যকলাপে পূর্ণ। হ্যামলেট নিষ্ক্রিয় থাকলে নাটকই হতে পারত না। প্রথম থেকেই সে পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষরূপে উদ্যোগী। অপরাধীকে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করবার জন্য হ্যামলেট নাট্যাভিনয়ের ফাঁদ করল; পলোনিয়াসকে হত্যা করল; লেয়ার্টিসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করল; রাজা ক্লডিয়াসকে প্রাণ হারাতে হল তার হাতে। হ্যামলেট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপাত করেছে। তবু কি বলা চলে জিভাগোর নিষ্ক্রিয়তা হ্যামলেটের সঙ্গে তুলনীয়?

রাশিয়ার বাহিরে সর্বত্র "ডক্টর জিভাগো" মহৎ সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত হয়েছে। সুতরাং তার বিরূপ সমালোচনা করলে সমালোচককে যে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে সে তো স্বাভাবিক! রাজনীতির কুয়াশা বইটিকে এমন-ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এখনই এর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনী আমার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে আমি যুক্তি দিয়ে তারই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। সাহিত্য বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে না। একই বই কারো ভালো লাগে, কারো লাগে না। তবে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কথা বলা উচিত হবে না। ইতি—

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

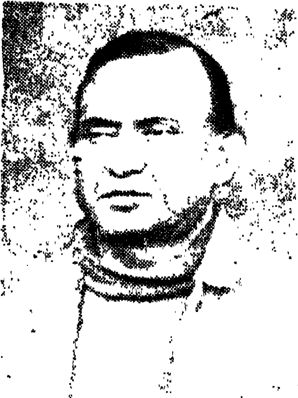
১৬।১১।৫৮






## সতীন্দ্রনাথ সেন

ইংরাজি ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের অপ্রত্যাশিত ভাগ্যবিপর্যয় এবং ইউনাইটেড ফ্রন্টের জয়জয়কার বিঘোষিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হয় এবং দেশব্যাপী ধর-পাকড় শুরু হইয়া যায়। ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রবীণ নেতা জনপ্রিয় ফজলুল হক নিজ বাড়িতে নজরবন্দী হন এবং ফ্রন্টের ছোট বড় বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সতীন্দ্রনাথ তখন পটুয়াখালিতে নিজ বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই ১লা জুন বেলা ৪টার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই তাঁহার শেষ কারাবরণ—চিরমুক্তি লাভ করেন প্রায় দশ মাস পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।



মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সতীন সেন

তাঁহার মৃত্যুর পর জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহার সামান্য জিনিসপত্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নির্মলকুমারের হাতে ফিরাইয়া দেন। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র একখানি ডায়েরি পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মধ্যস্থতায় ও সহায়তায় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশার্থে এই ডায়েরি আমাদের হস্তগত হয়। ডায়েরি পড়িতে পড়িতে আমরা বিচলিত না হইয়া পারি নাই।

সচরাচর ডায়েরি লেখকদের মনে গোপনে হয়তো অনুচ্চারিত একটা আশা থাকে যে কি জানি কোনওদিন হয়তো তাহাদের নিজের সঙ্গে নিজের নিভৃত আলাপের খোঁজ আসিয়া জুটিবে। অনেক বিখ্যাত লেখকের ডায়েরি পড়িয়া অন্ততঃ তাহাই মনে হয়। সতীন্দ্রনাথের এই ডায়েরি সে-জাতের নহে। ইহার লেখকের মনে যে ঐরূপ কোনও ধারণা ঘুণাক্ষরেও কোনও সময় উদিত হয় নাই তাহা বুঝিতে পাঠকের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। ভাষার দিকে নজর নাই, ভাবপ্রকাশের দিকে খেয়াল নাই। মোটের উপর বাংলা ভাষায় লেখা হইলেও স্থানে স্থানে পঙক্তির পর পঙক্তি ইংরাজি কথা প্রচুর থাকিয়া গিয়াছে। কোথাও ভাব অসম্বন্ধ, কোথাও বাক্য অসম্পূর্ণ, কোথাও বা নিজস্ব সংক্ষেপীকরণের কুয়াশায় সমস্তটাই অস্পষ্ট। এক কথায় ইহা একান্ত-ভাবেই নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া; আর কারও বোঝা-না-বোঝা লইয়া মাথাব্যথা নাই।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে হয়তো ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই সমীচীন হইত। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত, দুর্বোধ্য ও অবোধ্য অংশগুলি বাদ দিয়াও যাহা থাকে তাহাই এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের জীবনায়নের একাংশের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। উপরন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের যে দিকটা স্বভাবতই লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিত, তাহারও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় এই ডায়েরির পৃষ্ঠায়। বস্তুত আমাদের মনে হয় এই আজীবন যোদ্ধার শেষ সংগ্রামের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই ইতিহাসে এবং দেশবাসীর নিকট ইহা প্রচার করিবার প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য কারণেও ইহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। বলিতে কি, ইংরেজিতে যাহাকে বলে "revealing document" ইহা তাহাই।

ডায়েরির আরম্ভ পটুয়াখালি সব-জেলে, ৫ জুন হইতে। অর্থাৎ গ্রেপ্তার হইবার পাঁচদিন পরে লেখা শুরু হয়। —সম্পাদক 'দেশ'

### প্রথম পর্যায়

### পটুয়াখালি ও বরিশাল জেল

৫।৬।৫৪ (বেলা ৪টা)—১।৬।৫৪ তারিখ পটুয়াখালি বাসায় গ্রেফতার হই। সেদিন সকালের রেডিওর সংবাদ : পশ্চিম পাকিস্তানের দশজন ছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানে তিনশ'র উপর গ্রেফতার হইয়াছে। কমলবাবু* বলিয়াছিলেন অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর "eventful" এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পপুলারিটি আরও বাড়িবে, ইত্যাদি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্বেও বলিয়া-ছিলেন "eventful"। তাই আবারও "eventful" বলাতে বলিলাম "আবার কি ওই প্রকার পরিস্থিতি হবে নাকি?" তিনি সে আশঙ্কা করিলেন না। বলিলেন, আপনি "gainer" ইত্যাদি হইবেন। সেবারও কমলবাবুর গণনার অল্প কয়েকদিন পরে গ্রেফতার হই। এবারও গ্রেফতার হইলাম অল্প কয়েকদিনের মধ্যে। তবে সেবার দাঙ্গার মধ্যে গ্রেফতার হই; এবার পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার dissolution এবং ফজলুল হক প্রভৃতির গ্রেফতার এবং ৯২-ক ধারার শাসন প্রবর্তিত হইবার পর ভিন্ন আবহাওয়ায়। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে গ্রেফতারের ফলে জেলের ভিতরে ও বাহিরে যে নূতন নূতন পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে আমার কাজের খুব সুবিধা হইয়াছিল। এবারেও সেই লাইনে আরও কাজের সুবিধা হইবে মনে হয়।

কিন্তু কমলবাবুর এই জাতীয় অনেক উক্তি অনেক সময় অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট মনে হইয়াছে। যখন যাহা বলিয়াছেন, অনেক সময় হুবহু মিলিয়া গিয়াছে, অনেক সময় কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে, আংশিক সফল হইয়াছে। আংশিক সাফল্যই ঘটিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কেন আংশিক হয়, ইহার কারণ কি—অনেক সময় ভাবিয়াছি, কিন্তু সঠিক ধরিতে পারি নাই।

আমার যে একটা খুব ভাল পপুলারিটি আছে সারা পূর্ব বাংলায়, সেটা গত সাধারণ নির্বাচনের সময় বেশ লক্ষ্য করিয়াছি। নির্বাচনের সময় পূর্ববঙ্গের প্রায় সব জায়গা হইতে যে-ভাবে আমার নিকট আমন্ত্রণ আসিয়াছিল সফর করিবার জন্য, আমার টুর-এর জন্য যে demand ছিল, আমার নাম যেভাবে বন্ধু ও সহকর্মীরা ব্যবহার করিয়াছে, আমার পক্ষাপক্ষ লইয়া, মতামত লইয়া, যে-সব বিতর্ক হইয়াছে, এই জিলাতেও অবনীবাবুর প্রতিপক্ষ আমার নাম, মতামত, যেভাবে ব্যবহার করিয়াছে ইত্যাদির মধ্য দিয়া...যেসব জায়গায় টুর-এ গিয়াছি, বিশেষভাবে ঢাকা ও ময়মনসিংহে—তাহাতেও আমার কর্মধারার (line of work) প্রতি আদর ও appreciation-এর

*শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ, কবিরাজ ও জ্যোতিষী।

পরিচয় পাইয়াছি। আমার কর্মধারার এই যে, অ্যাপ্রিসিয়েশন এটা বুঝিয়া যদি বোলডলী, অ্যাগ্রেসিভলী জনসাধারণের মধ্যে কাজ করিতাম তাহা হইলে কি ফল আরও ভাল হইত? আমি যাহা চাই তাহা পাইতে সাহায্য করিত? কমলবাবুর গণনা যে অনেক সময় কোয়ান্টিটিভলী সফল হয় না তার কারণ কি এই অ্যাগ্রেসিভ, বোলড, সেলফ-কনফিডেণ্ট অ্যাকশন-এর অভাব?

এবার যখন মুক্তি পাইব (আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অকটোবর) কমলবাবুর হিসাবে আমার খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন হইবে। ইহার অর্থ কি এই রিলীজ অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন? না, এই গ্রেপ্তার ইত্যাদির ফলে অ্যাপ্রিসিয়েশন? কিন্তু সময়টার নড়চড় হইয়াছে। সে যাহাই হউক, যখনই বাহির হই, যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তখনই কি বোলড, অ্যাগ্রেসিভ, সেলফ-কনফিডেণ্ট হইয়া চলা ঠিক হইবে, নিজের ধারণা অনুযায়ী? সত্য ও অহিংসার যে প্রচার আমি চাই, তাহার সুযোগ কি আমি পাইব? **Hindu-Muslim unity, removal of untouchability, decentralization, economy and politics etc.,—** ক্ষেত্রে আমার বাসনা কি সফল হইবে?

আমার অন্যান্য অভাবের মধ্যে একটি অভাব একজন অ্যাগ্রেসিভ অ্যাসিস্টেণ্টের। সদাসর্বদার জন্য আমি এইরকম একজন সহকর্মী চাই। আমি অনেক কাজে কতকগুলি বিষয়ের জন্য অপরের উপর নির্ভর করি। একজন কেহ যদি আমাকে খোঁচাইয়া কাজ করায় তাহা হইলে কতকগুলি কাজ আমার পক্ষে করা সহজ হয়। তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে, এটা একটা দুর্বলতা। সহকর্মীর অভাবে যদি আমার কাজ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে যে-সে সময়ে এইরকম সঙ্গী আমার জুটিবে না তখন আমার কাজও হইবে না।

এবার জেল হইতে বাহির হইবার পর শরীর যদি সুস্থ থাকে তাহা হইলে ইনটেনসিভ টুর দিবার ইচ্ছা আছে। প্রথমে নিজের জেলাটা, বিশেষভাবে নর্থ কনস্টিটুয়েন্সি। তবে মধ্যে মধ্যে আমাকে কাগজে বিবৃতি দিতে হইবে—for widest circulation, তাহার পরে সফর। এই বিবৃতিতে এবং জেলায় জেলায় ঘুরিবার সময় (১) হিন্দুদের কর্তব্য, (২) হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কর্তব্য এবং (৩) তপশীলভুক্ত শ্রেণী, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের কর্তব্যের উপর জোর দিতে হইবে।

আজ যে কমিউনিজমের ঢেউ উঠিতেছে এবং অস্বাভাবিকভাবে হিংসার উদ্ভবের আশংকা দেখা দিতেছে, এ সম্বন্ধেও outspoken attitude লইতে হইবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই শক্তি মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এখন পর্যন্ত সে-প্রকার কোনও নেতৃত্ব নাই। তাই বড় ভয়। পশ্চিম পাকিস্তানে খান আবদুল গফুর খান আছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার উপরে নানাবিধ বাধানিষেধ আছে। তাহা না হইলে এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত শক্তি একমাত্র তাঁহারই আছে।

এ সম্বন্ধেও খোলাখুলিভাবে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া চলা দরকার। শুধু কথায় আর বক্তৃতায় নয়—চাই constructive work, Progressive organisation and solution of concrete problems on Gandhian lines.

কাল মৌলবী এমদাদ আলী মিয়া (মোক্তার, এম এল এ) গ্রেফতার হইয়া আসিলেন।

আজ সন্ধ্যায় এস ডি ও দেখা করিলেন।

৬-৬-৫৪ (পটুয়াখালি সব-জেল)—Academic intellectual equipment, lack of deep knowledge of History, Politics, Economics—খুব বড় অভাব আমার এই দিক দিয়া।

এমন কী আছে যাহা এই অভাবকে পূরণ করিতে পারে? এই পুওর ইনটেলেক্ট ইত্যাদির এই অভাব এই বয়সে makeup করা কোনওক্রমেই কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে কি করা? এফেক্টিভ কাজ করা—lead দেওয়া সম্ভব নয়। যার এইসব গুণাবলী আছে এমন কোনও যুবককে যদি সঙ্গে রাখা হয়, তাও খুব ব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং প্রায় অসম্ভব হইবে। আর হয় এই-ভাবে fully equipped কোনও একজন বা একাধিক qulified professor প্রভৃতির নিত্য সাহচর্য। যাক এখন যখন-যা-পড়া তা গভীরভাবে বিশ্লেষণী মন নিয়ে পড়া।

"বরিশাল হিতৈষী" কাগজটাকে কি এই উদ্দেশ্যে পুরাপুরি কাজে লাগানো যায়? ভূপেনবাবু (দত্ত) প্রভৃতি ঢাকা হইতে একটা কাগজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন—Dacca is a central place, সেখানের সুবিধা অনেক। কিন্তু quality, lead ইত্যাদি যদি ভাল হয় তাহা হইলে মফঃস্বল বলিয়াই কি নিকৃষ্ট হইবে?

৭ই জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেলে লইয়া যাইবার পথে সহযাত্রী এমদাদ মিঁয়া, এম এল এ)—পরশু বৈকালে এস ডি ও দেখা করিয়াছিলেন। লক্-আপ্-এর সময় জেল হইতে বাহির হইয়া থানাতে ছিলাম। সেখান হইতে নৌকাযোগে স্টীমারে পৌঁছিলাম। ঘাটে অনেক লোক দেখিলাম। কেন, কার জন্য?......

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য এত আগ্রহ কেন অফিসারের? কেস হইলে অকপটভাবে ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা দিয়া কোর্টে বিবৃতি দিব। তাছাড়া আর কি করা যাইতে পারে হৃদয়স্পর্শী ও ফলপ্রদ? এক বিশদ বিবৃতিতে আমার মনোভাব (পাকিস্তান সম্বন্ধে) বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলাই আমার কর্তব্য। আমার ধ্যান-ধারণা, আমার গান্ধীবাদী আদর্শ ও উদ্দেশ্য, কর্ম-পন্থা ও প্রণালী। ইহা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। কেস না হইলে ইহা "বরিশাল হিতৈষীতে" প্রকাশিত হইতে পারে।.........

স্টীমার ঘাটে অত লোক কেন আসিয়াছিল? এদের মধ্যে যে সহানুভূতি, fellow-feeling ইত্যাদি, ইহা কি তাহারই বহিঃপ্রকাশ? নাকি ইলেকশন সময়ের সম্পর্ক?.........

৭ই জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল)—পথে শুনিয়াছিলাম প্রাণকুমার সেন প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়াছে। হয় নাই। সিবিল ওয়ার্ডে আসিলাম। হবিবুল্লা ও লাকিতুল্লা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল।......গৌরনদীর কাপালী যুবক কেশব রায় কাল আসিল। সাধনের ভাই কমল কাল আসিয়াছে।

চমৎকার মালমশলা ছড়ানো চারিদিকে; কিন্তু কী শোচনীয় অভাব নেতৃত্বের! কি করিয়া এই অভাব দূর করা যায়, উপযুক্ত নেতৃত্বের সৃষ্টি করা যায়? পরিস্থিতিও চমৎকার। কি করিয়া সমগ্র নেশনকে উদ্বুদ্ধ করা যায় এই দিকে?......কাজ করিবার চমৎকার ক্ষেত্র, চমৎকার সুযোগ......।

সেদিন পটুয়াখালি জেল হইতে বাহির হইবার পর মেয়ে-পুরুষ যত লোকের সঙ্গে দেখা হইল, বেশ ভাল লাগিতে লাগিল। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া-খালি বাসাতে মুসলমানদের ভিড় পড়িয়া গেল। আইনে নিষেধ না হইলে আলাপ করা ভাল ছিল। স্টীমারে রাত্রে অনেক যুবক আসিল—bright, brilliant, educated, energetic, enthusiastic, Sympathetic young men সব। তাদের হৃদয়ের Sympathetic chord-এ আঘাত লাগিয়াছে। এরা দেশের দশের......প্রাণের প্রতিনিধি। এদের মারফত দেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই আমার দেশ। সেদিন গ্রেপ্তারের পর যে বিরাট সাধারণ মোসলেম জনতা দেখিতে আসিল—সেখানেও তাই।......এদের সঙ্গে তো মিশিলাম না, কথা বলিলাম না, যোগাযোগ স্থাপন করিলাম না। আইনসঙ্গত নয় বলিয়া ততটা নয়; আমার স্বাভাবিক লাজুকতা ইত্যাদির জন্যই প্রধানত। এই লাজুকতা, ভীরুতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব এতে সুযোগই হারানো হয়। ' এই লাজুকতার ফলে, এই যে এত দেশবিদেশ ঘুরি—এত লোকের সঙ্গে দেখা হয়—লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় না, মেশা হয় না, তাদের আপন করা হয় না, ঘরে আসিয়া, দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায়, সুযোগ নষ্ট করা হয়। কথা বলিলেই যে এরা বিশেষভাবে আপন হয়, এদের সঙ্গে যোগস্থাপন হয়, তা নয়। তবে বৃহৎ একটা সুযোগ যে নষ্ট হয়, না বলিলে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। যেখানে ইচ্ছা আছে, আগ্রহ আছে, প্রয়োজন আছে, করিবার ক্ষমতা আছে, যুক্ত হইবার উভয়ত প্রয়োজন আছে, সেখানে যোগ স্থাপন করা একান্ত দরকার। না করাই ভুল।......

(ক্রমশ)





## ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে

বিষ্ণু দে

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে,
যেখানে বালির নীলাচল ভাঙে মহানীলিমায়
শরীরের প্রায় পাড়ে—
প্রায় বুঝি মানসের মুক্ত সীমানায়,
অথবা আকাশভেদী অথচ আকাশ নয়, চূড়ায় চূড়ায়,
শরীরের সাড় ঘেঁষে নিরুদ্দেশ পাড়ে পাড়ে ঘোরা,

ঘোরা কিংবা ওড়া, যেন চিল, বাজ,
গগনভেড় বা যেন সোনালী ঈগল,
শিকারের খোঁজে নয়, স্বভাবে তৃপ্তিতে ভাসা
দুই ডানা মেলে দেওয়া, যেন শুদ্ধ পিলু বা খাম্বাজ,
যেন জীবনের সমস্ত শিকল, যা কিছু বিকার
সব কিছু ফেলে দেওয়া, পূর্ণ সব আশা ও হতাশা,

মনের আকাশে মুক্ত, বলা যায় নিরুদ্দেশ,
রুজির চিন্তায় নয়, মুনাফার দায়ে নয়,
পাঁসিসের চাহিদায়, খ্যাতির আব্দায় নয়,
নিছক মনের মাঠে, শরীরের প্রায় পাড়ে,
যেখানে শান্তির বিষাদের খাদে সুর তোলে অক্লান্ত নিখাদে
ফ্যুগের বিস্তারে অর্গানের অনন্ত আওয়াজ,

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে মুক্তির আবেশ,
স্মৃতির স্তম্ভিত নীলাচলে যেখানে সচল স্বপ্নে
মননের প্রবল হিল্লোলে,
যেন পরজের আলাপে গমকে তানে অনির্বচনীয়
কথা ওঠে, ছোটে, ডোবে অতলের তালে তালে
তরঙ্গ হিন্দোলে ফৈয়জের মৈনাকমন্থিত স্বরে
অগাধ ঊর্মিল,

তারপরে ঘুম, শান্তি, নীলে নীল,
তারপর শুধুই হরি ওঁ, সমুদ্রের তম্বুরায়
আকাশের রেশ॥

## অনাহত

(ভিলানেল)

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেহের কূলে কাঁদে মদির যৌবন ঃ
আকাশ-আয়নায় সে-মেয়ে দ্যাখে মুখ;
অঙ্গে জ্বলে তার তড়িৎ-শিহরণ।

পলাশ-বাসনায় রাঙা যে তনুমন—
কাঁপছে থরোথরো, হৃদয় উন্মুখ;
দেহের কূলে কাঁদে মদির যৌবন।

ভ্রমর-কালো চুলে চাঁপার আভরণ,
সে কার পথ চেয়ে আশায় উৎসুক?
অঙ্গে জ্বলে তার তড়িৎ-শিহরণ।

কী হবে বৃথা বয়ে যখের এই ধন,—
লোভন মরীচিকা-ভরা কি মরু-বুক?
দেহের কূলে কাঁদে মদির যৌবন।

বিলিয়ে দিতে চায় মনের যৌবন,
নিবিড় আশ্লেষে মরণে কী যে সুখ!
অঙ্গে জ্বলে তার তড়িৎ-শিহরণ।

মিছে কি হৃদয়ের পরম আয়োজন,
অধীর প্রত্যাশা, তপ্ত সব দুখ?
দেহের কূলে কাঁদে মদির যৌবন;
অঙ্গে জ্বলে তার তড়িৎ-শিহরণ।

## মনে মনে

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

অতো কাছে নিয়োনা শরীর
হাওয়ারা উতলা আর কামনারা হয়নি অস্থির
এখনো সময় কাঁদে ফিরে এসো উতলা নির্জনে
তাকে তুমি ভালোবাসো ঘরে এসে একা মনে মনে।

মুখে তুমি নিয়ো না ও-মুখ
ও-মুখে যৌবনজ্বালা শরাহত হরিণী-অসুখ।
তার চেয়ে ভালোবাসো তাকে
ভালোবাসো সেই যন্ত্রণাকে
যে অন্ধ বাজায় ফাটা হাঁড়ির পিছনে
বটের ছায়ায় নির্জনে
মূকের বেদনা কাঁদে দশটি আঙুলে
কখনো যেও না তাকে ভুলে।

ওর দুঃখ দূর হোক্ ভগবান—মনে মনে বলো,
তাকে ভেবে চিরকাল নক্ষত্রের মতো তুমি জ্বলো।




# ক্রিমিনাল

রজত সেন

একতলা পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ি, মাঝখানে দেয়াল দিয়ে ভাগ করা। এ-পাশে থাকে দাশরথি আর ওপাশে একটি মাদ্রাজী সাহেব; গ্রামোফোন রেকর্ডে ইংরেজী গান বাজায়, ইংরেজী নাটক শোনে, মাঝে মাঝে নিজেও গান ধরে, গলাটাকে মোটা করে। দাশরথি বছর দশেক আগে দু একখানি ইংরেজী ছবি দেখেছে, দু চারটে নাম শুনেছে, মাদ্রাজী সাহেবের গান শুনে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে। বারান্দার প্রান্তে রান্না করতে করতে তার বৌ মায়া হাসে। দাশরথি মাদুরে শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানে, মন্দ কি? সে ভাবে, মন্দ কি?

সাহেব একাই থাকত দু'খানি ঘর দখল করে, একটি বেড রুম আর একটি ড্রইং রুম; চুন বালি খসে পড়ার শব্দ শোনা যায় মাঝে মাঝে, সাহেব চীৎকার করে ওঠে, 'ড্যাম ইট!' এই চলছিল, হঠাৎ একদিন একটি ফিরিঙ্গি মেয়ের গলার শব্দ শোনা গেল; আর শোনা গেল "ডারলিং" "হানি" আর "হাবি।" মায়া হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল, দাশরথিকে জিজ্ঞেস করল, "হাবি" মানে কি গো?

দাশরথি বলল, 'হাবি মানে হাসব্যান্ড, মানে স্বামী।"

'ও মা! বিয়ে করেছে না কি মেয়েটাকে?' মায়া তার কালো চোখ কপালে তুলে বলল।

'তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে গো!' দাশরথি তার চওড়া, পেশীবহুল কাঁধ নাচিয়ে হাসল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বিরাট মুখখানা বার বার প্রসারিত হয়ে উঠতে লাগল, সাদা, শক্ত দু'সারি দাঁত লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করে উঠল কয়েক, 'বিয়ে করতে আপত্তিটা কি? বিয়েটাই ত ভাল!' পরে একটু ভেবে যোগ করল, 'শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল,' মায়া মন্তব্য করল, 'সে আর বুঝতে পারছি না?'

'কিন্তু মিষ্টি হাসিটা ত ঠিক বজায় রেখেছ!'

ডাল চাপিয়ে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল মায়া, বলল, 'আর কি আছে বল, হাসিটুকু ছাড়া? ওটুকু না হলে বাঁচব কি নিয়ে?'

ওর গলার বিষণ্ণ সুরটা দাশরথির কান এড়াল না, 'কেন আমি নেই? আমাদের সাত রাজার ধন চোখের মণি তুলু নেই?'

'তুমি ত আছই!' তরল গলায় আবার হেসে উঠল মায়া, 'তোমার ঐ দৈত্যের মত শরীর নিয়ে তুমি ত সর্বক্ষণই আছ! কিন্তু লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? যাও, এক বোতল তেল নিয়ে এস।' বোতলটা এগিয়ে দিল মায়া।

'এখানে দিয়ে যাও না!'

মায়া তাকাল; 'না, আমি এখন উঠতে পারব না, তুমি নিয়ে যাও।'

'এসো!'

গলার এমন শব্দটা মায়া চেনে, তবু বসে রইল মায়া, আলু ছাড়াতে লাগল।

দাশরথি দাঁড়াল, লণ্ঠনের আলোয় পিছনের দেয়ালে বিরাট কালো ছায়াটার দিকে তাকাল মায়া। লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে নিচু হয়ে চোখের নিমেষে দাশরথি মায়াকে তুলে নিল বুকের কাছে; কয়েকবার নিষ্ফল হাত পা ছুঁড়ে মায়া একটি পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে রইল তার বিশাল বুকের মধ্যে!

দাশরথি তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল, পা দিয়ে দরজাটা দিল বন্ধ করে। 'ছেড়ে দাও।' অস্ফুট গলায় মিনতি করল মায়া, 'তুলু রাস্তায় আছে, এখুনি এসে পড়বে!'

'আমার ছেলে টাইম-মাফিক বাড়ি ফিরবে? তাহলেই হয়েছে।'

'ডাল পুড়ে যাবে।'

বাইরের লণ্ঠনটা নিবে গেল হাওয়ার ঝাপটায়।

বারান্দায় এসে দাশরথি বিড়ি ধরাল, ক্ষিপ্র হাতে ডালের কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে নিল মায়া।

'তেল না আনলে অন্ধকারে রান্না করব কি করে?'

অন্ধকার ঢাকা উঠোনটার দিকে চোখ রেখে দাশরথি জিজ্ঞেস করল, 'এই! মুরগী খাবে?'

'মুরগী?'

'হ্যাঁ, মুরগী, ঐ যে! ময়লা খুঁটছে। বড়লোকের বাড়ির মুরগী, মাংসটা অপূর্ব হবে? ঘি, গরম মসলা আছে ত?'

অন্ধকারে তাকাল মায়া। 'মিত্তিরদের মুরগী, রাত্তিরে ঝামেলা কোরো না,

চ্যাঁচাবে, ডানা ঝাপটাবে, শেষকালে একটা কেলেংকারি!"

'ডানা ঝাপটাবে?' দাশরথি সাবধানে মাটিতে পা দিয়ে নেমে পড়ল বারান্দা থেকে, যেন বিরাট একটা রবারের মানুষ; শরীরটাকে নিচু করে এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে, খপ করে থাবা ছুঁড়ল দাশরথি, মুরগীটা একটু শব্দ করবার পর্যন্ত সময় পেল না, গলাটায় মোচড় দিয়ে এক টানে ছিঁড়ে ফেলল সে।

'গরম জল চাপিয়ে দাও, গরম জলে পালক তাড়াতাড়ি উঠে আসবে।'

ডাল সাঁতলে জলের হাঁড়ি চাপাল মায়া।

তেলের বোতল আর বাজারের থলি নিয়ে দাশরথি এল দোকানে।

'এক বোতল কেরাসিন।'

বোতলে তেল ভরতে ভরতে দোকানদার বলল, 'আপনার আগের দামটা এখনও পাইনি, বাবু, বলেছিলেন—' দাশরথির চোখের দিকে তাকিয়ে লোকটা থেমে গেল।

'কি হে? থামলে কেন? কি বলেছিলাম?'

'বলেছিলেন এ-মাসে টাকাটা দিয়ে দেবেন।'

দাশরথি মোটা গলায় হেসে উঠল, 'মাসটা কি শেষ হয়ে গেছে?'

বোতলটা নামিয়ে ও বলল, 'না, এখনও দু'দিন বাকি।'

'তবে?' দাশরথি কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, 'এক সের আলু, এক পো পিঁয়াজ, দু' আনার গরম মসলা আর ঘি দু' ছটাক।'

লোকটা নিঃশব্দে জিনিসগুলো ওজন করে গুছিয়ে দিল, দাশরথি এক এক করে রাখল থলির মধ্যে, যাবার সময় মুখটা না ফিরিয়েই বলল, 'হিসেবটা করে রাখবে ঠিকঠাক।'

বাড়িতে ঢুকবার সময় দাশরথি মাদ্রাজী সাহেব ডোনাল্ড লিংগমের খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারল একবার, মেয়েটা সোফায় পা ছড়িয়ে গীটার বাজাচ্ছে, আর ডোনাল্ড সোফার হাতায় বসে গান ধরেছে।

থলিটা নামিয়ে রেখে সে বলল, 'নাও! তাড়াতাড়ি সেরে ফেল, আমি একটু চক্কর মেরে আসি!'

তেলের বোতলটা তুলে নিয়ে মায়া বলল, 'না, আর চক্কর মারতে হবে না, বোস চুপচাপ।'

দাশরথি সত্যি বসে পড়ল মাদুরে। আফিসের জল-ছিটানো বিড়ির বাণ্ডিলটা বার করল পকেট থেকে। 'ভুলু আসেনি এখনও?'

'না।'

দাশরথি শুধু বলল, 'আসুক।'

এ মন্তব্যের অর্থটা মায়া জানে, কয়েক মাস আগে রেগে গিয়ে ভুলুর হাত ধরে টান মেরেছিল, কব্জিটা ভেঙে গিয়েছিল, ভাঙা হাড় জুড়তে দু'মাস লেগেছিল; আর একবার চড় খেয়ে ছিটকে পড়েছিল উঠোনে, নাকের রক্ত বন্ধ করতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। মায়া ঘন ঘন তাকাতে লাগল দরজার দিকে।

ভেজানো দরজাটা আস্তে আস্তে ফাঁক হল; ভুলুর মাথাটা দেখা গেল বাইরের কোণে।

'এদিকে আয়!' মেঘ ডেকে উঠল যেন।

ভুলু এগিয়ে এল আস্তে আস্তে, একটু দূরে দাঁড়াল সে, মাটিতে। রান্না ফেলে মায়া আসছিল, দাশরথি বলল, 'কাছে এস না।' মায়া থামল।

'আয়।' মোটা হাতের ইশারা করল দাশরথি।

ভুলু আরও কাছে এগিয়ে এল

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ, তোকে বলিনি সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরতে?'

উত্তর নেই।

'যা, খুব বেঁচে গেলি আজ, মুরগীর দোপেঁয়াজা হচ্ছে!'

ভুলু এক লাফে বারান্দায় উঠে এল।

দাশরথি একটা বিড়ি ধরাল।

সকালবেলা দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। দাশরথি খালি গায়ে মাদুরে বসে মগে করে চা পান করছিল, হাঁক দিয়ে বলল, 'দরজা খোলা আছে।'

মিত্তিরদের সরকার বাবু ঢুকল চকচকে পাম্প-সু-পরা পা বাড়িয়ে কোঁচাটা সামলে, মগটা তুলে আরও দুটো চুমুক দিয়ে দাশরথি তাকাল ভাল করে।

'আমাদের একটা মুরগী পাওয়া যাচ্ছে না!' বলল সরকার বাবু।

দাশরথি আর একটা চুমুক দিল, আর একবার তাকাল।

'ছোটবাবুর কাল সারা রাত ঘুম হয়নি, ভীষণ মন খারাপ।'

মগটা নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' শরীরটা তার একটুও নড়ল না।

'ঢাকা থেকে ফিরবার সময় এক জোড়া বাছাই-করা মুরগী তিনি নিয়ে এসেছিলেন, একটা মোরগ আর একটা মুরগী।'

'বাচ্চা হয়নি?' জিজ্ঞেস করল দাশরথি, 'না কি ছোট বাবু সব ডিম খেয়ে ফেলেন।'

'এবারে ডিম পাড়ত।' বাবরী চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিল সরকার বাবু।

'কেমন করে জানলেন?'

'দেখেছি।'

'কি দেখেছেন?'

'মানে—তাহলে মুরগীটা এদিকে আসেনি?'

'কাল রাত্তিরে একবার দেখেছিলাম উঠোনে ময়লা খুঁটেছিল, তারপরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।'

সরকার উঠোনটার দিকে তাকাল, এক জায়গায় সদ্য-খোঁড়া মাটি উঁচু নিচু হয়ে রয়েছে, সেদিকে চেয়ে রইল সে। বলল, 'আপনার দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গেছে!'

দাশরথি উত্তর দিল না।

'এ-মাসে কিন্তু মিটিয়ে দেওয়া চাই, কর্তারা বড় রাগারাগি করেন, আমি আবার নালিশ ফালিশ পছন্দ করি না', দাশরথির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যোগ করে দিল, 'বুঝলেন দাশু বাবু! অবশ্য আমি সেদিন বললাম, দাশরথি বাবুকে আমি চিনি, নিতান্তই বিপাকে না পড়লে। আচ্ছা—' বেরিয়ে গেল সরকার বাবু। দাশরথি বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি বার করল।

সারাদিন কোথাও গেল না সে, চৌকিতে শুয়ে শুয়ে ডোনাল্ড আর ফিরিঙ্গি

মেয়েটার দ্বৈত সংগীত শুনল। আজ ওদের গোলমালটা খুব খারাপ লাগল না তার। সন্ধ্যের সময় মায়া বলল, 'বেরুবে না? শুয়ে থাকবে সারাদিন?'

'কেন?'

'আমার হাতে আর কিছু নেই, সব ফুরিয়ে গেছে!'

দাশরথি উঠে বসল, বলল, 'ফরসা জামা কাপড় আছে ত?'

'আছে; দিচ্ছি!'

দশ মিনিটের মধ্যে দাশরথি তৈরী, চুলটাও ভাল করে আঁচড়াল সে।

সরু গলিটা বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল, জুতোটা পালিশ করিয়ে নিল। ভিড় দেখে খান কয়েক ট্রাম ছেড়ে দিল দাশরথি, একটা বাসে উঠল সে খিদির পুরের মোড় থেকে, অফিস-ফেরতা লোকের ভিড়, কোনো রকমে দাঁড়ানো যায়, ভেবেছিল মোমিনপুরের মোড়ে নামবে, বাসটা যাবে বেহালায়, নামা হল না; সামনের দিকে গোলমাল আর রীতিমত ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়েছে; দাশরথি এগিয়ে গেল, দুদিকে ছিটকে পড়ল যাত্রীরা। একজন মন্তব্য করল, পেন্ডার!'

পকেটমার! ফ্লানেলের প্যান্ট আর ডোরা কাটা সার্ট, সরু আঙুলে মোটা তিনটে আংটি, ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা বাহারি ঘড়ি; কি একটা বলতে যাচ্ছিল লোকটা, একটা থাপ্পড়ে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল; 'কি সাহস মশাই, সোজা আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল!' আবার হাত তুলল ভদ্রলোক। 'থাক!' বলল দাশরথি, ওর সার্টের পিছন দিকটা চেপে ধরল সে, ভদ্রলোকের ঘুসিটা পকেটমারের মুখে লাগবার আগে দাশরথি ওকে একটু ঠেলে দিল, ঘুসিটা দাশরথির বাহুতে লাগল, 'উঃ' বলে হাতটা সরিয়ে নিল ভদ্রলোক।

কয়েকজন হাত চালাল একসঙ্গে, কিন্তু দাশরথি এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে কারুরই হাত এসে পৌঁছাল না পকেটমারের গায়ে।

বাস কনডাকটর চীৎকার করছে, 'উৎরো, উৎরো'

বাড়ি ফিরবার যাদের তাড়া—বেশী চাঁচাতে লাগল তারা, 'থানা পুলিস মার-ধোর রাস্তায় গিয়ে করুন মশাই, বাসটা যেতে দিন!'

দাশরথি ওকে নামিয়ে আনল বাস থেকে, শার্টের কলারটা সে তখনও ছাড়েনি। আরও কয়েকজন নামল বাস থেকে, আর সেই লোকটি যার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল; বলল, 'আর দেরি কিসের? আরম্ভ করে দিন না মশাই!'

দাশরথি জিজ্ঞেস করল, 'কি তুমি এঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলে?'

ও বলল, 'না, বিশ্বাস করুন, মা কালীর দিব্যি!'

ভদ্রলোক হাত পাকিয়ে রুখে এল মারবার জন্যে, দাশরথি আড়াল করে দাঁড়াল।

একজন বলল, 'কি হবে মারধোর করে? থানায় নিয়ে যান!'

আরও লোক জমবার আগে দাশরথি তাকে ধাক্কা মেরে রাস্তার একটু নিরিবিলি প্রান্তে নিয়ে এল, পিছনে আসছিল কয়েকজন, দাশরথি তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'চল থানায়, সব পকেট-মারের লিস্টি আছে ওদের খাতায়, এখনও স্বীকার কর।'

'দোহাই আপনার বিশ্বাস করুন', লোকটা কাতরে উঠল, 'বাবা-মার দিব্যি, আমি পকেটমার নই।'

হাতের ইশারায় একটা চলন্ত ট্যাক্সী থামাল দাশরথি, দরজা খুলে ওকে একটা ধাক্কা মারল, লোকটা তালগোল পাকিয়ে ছিটকে পড়ল গাড়ির মধ্যে, দাশরথিও উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আরও কয়েকজন উঠতে যাচ্ছিল গাড়ির মধ্যে, দাশরথি বাঁ হাতে তাদের বাধা দিয়ে ডান হাতে দরজাটা বন্ধ করে নির্দেশ দিল চালককে, 'ভবানীপুর থানা!'

একটা লাফ দিয়ে দৌড় মারল ট্যাক্সী।

গোপালনগরের মোড়ে দাশরথি বলল, 'বাঁ দিকে চলুন।'

'ভবানীপুর থানা বাঁ দিকে নাকি?'

'বাঁ দিকে ভবানীপুর থানা না কি?'

'বাঁ দিকে চলুন।'

গাড়ি বাঁ দিকে চলল, চিড়িয়াখানা পার হয়ে রেস কোর্সের পাশ দিয়ে দৌড়াল।

'কোন দিকে যাবেন বলুন ত?'

'কেল্লার ধারে।' বলল দাশরথি।

ওর পাশে জড়সড় হয়ে বসেছে মধ্যবয়স্ক লোকটি। হঠাৎ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'নাম কি?' দাশরথি জিজ্ঞেস করল।

'মুরলী ধর।'

'আসল নাম কি?'

'কাঙ্গালীচরণ।'

কেল্লার ধারে ট্যাক্সী থামল। নেমে পড়ল ওরা।

কাঙ্গালীচরণ এগিয়ে মিটার দেখল, পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা দু'টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিল ড্রাইভারকে; দু' আনা পয়সা ফেরত দিল লোকটা। ট্যাক্সী চলে গেল। দাশরথি আঙ্গুল দিয়ে গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে দিল। পাশাপাশি বসল ওরা। দাশরথি ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকল, 'কাঙ্গালীচরণ।'

হাতের ভারটা অনুভব করছিল সে, চমকে উঠে, বলল, 'আজ্ঞে!'

'না, আমাকে আজ্ঞে করবার দরকার নেই, ক'টা বাজল?'

'পৌনে আটটা।'

'দামী ঘড়ি দেখছি দেখি, দুটো আংটি, খোল।' দাশরথি হাত পাতল।

দুটো আংটি খুলে দাশরথির চওড়া হাতের তালুতে আলগোছে ফেলে দিল সে। অন্য আংটিটা আড়াল করবার চেষ্টা করল। আংটি দুটি কোঁচার খুঁটে বেঁধে দাশরথি কাঙ্গালীর প্যান্টের দুটো পকেটেই হাত ঢুকিয়ে দিল, বার করে আনল কিছু কুঁচকানো দশ টাকা আর এক টাকার নোট আর তিনটি ফাউনটেন পেন। কলমগুলি ফেরৎ দিয়ে টাকাটা গুনল দাশরথি, বলল, 'মোটে তেতাল্লিশ টাকা? সবে হাত পাকাচ্ছ বুঝি?'

উত্তর নেই।

দাশরথি দাঁড়িয়ে বলল, 'বেঞ্চিটায় বসে থাক, যতক্ষণ না আমি বাসে উঠছি, মারের চাইতে এটা ভাল হল না?'

কাঙ্গালীচরণ হাত বাড়িয়ে বলল, 'একটা টাকা আমায় দিয়ে যান, অনেক দূরে যেতে হবে।'

দশরথি একখানি এক টাকার নোট ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

একটা বাস আসছিল; দাশরথি উঠে পড়ল।

এসপ্লানাডে নামল সে, চৌরঙ্গি অতিক্রম করে একটা সরু গলিতে ঢুকল। ভিড়ের কমতি নেই। দোলানো দরজা ঠেলে সে ঢুকে পড়ল একটা দোকানে; মেঝেয় শাল পাতা আর ভিজে ছোলা ছড়ানো, লম্বা টেবিলে লোকের ভিড়, বোতল আর গ্লাস, অশ্লীল গান আর উল্লাস, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া। দাশরথি বসল একটা বেঞ্চিতে।

'কি দেবো?'

'মার্কা বদল হয়নি এখনও।'

বোতল আর গ্লাস এল, এল ভিজানো ছোলা, নুন আর আদা।

একটা বোতল শেষ করেই জামার হাতায় মুখ মুছে দাশরথি উঠে পড়ল। চৌরিঙ্গীতে বাস ধরল।

মায়া রান্না শেষ করে ভুলুকে পড়াবার চেষ্টা করছিল। পায়ের শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে; দাশরথি তার হাতে বাকি নোট ক'খানা গুঁজে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, জামাটা নিয়ে যাও, আর মাদুরটা পেতে দাও!' জামাটা খুলে মায়ার হাতে দিল ও। 'হারামজাদাটা পড়ছে বুঝি?

'হ্যাঁ, পড়ছে।'

'বাঃ!'

'ডোনাল্ডের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না যে?'

'কি জানি!' বলল মায়া, 'বিকেল থেকেই ওদের গলার আওয়াজ পাচ্ছি না, বোধ হয় নেই।'

'বাঁচা গেছে।'

কয়েকদিন পরে খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ভুলু বিছানায় পড়ল, তারপর প্রায় বেহুঁশ। দাশরথি বাড়ি

নেই; মায়া মুশকিলে পড়ল। বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারলে ডাক্তারের খবর নেওয়া যেত, কিন্তু কার কাছে ফেলে যাবে ভুলুকে? শিয়রে বসে মাথায় জল-পটি লাগাতে লাগল, থারমোমিটার নেই যে জ্বরটা দেখে। সব শেষে পরিচিত পায়ের শব্দে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

ঘরে ঢুকে দাশরথি জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'জ্বর, ভীষণ জ্বর; দেখ হাত দিয়ে, গা পুড়ে যাচ্ছে!'

দাশরথি মাটিতে বসে পড়ল, কপালে, গায়ে হাত দিয়ে দেখল: 'তাই ত!'

'ডাক্তার ডাকবে না?'

'কয়েক ঘণ্টার জ্বরে ডাক্তার ডেকে লাভ হবে না', বলল দাশরথি, 'অন্তত একটা দিন থাক, তা না হলে বুঝা যাবে কি করে? অত ঘাবড়াবার কি আছে? তুমি কাজ কর গিয়ে, আমি বসছি।'

একটু সাহস পেল মায়া, রান্নার জোগাড়ে গেল।

সকালবেলা জ্বর একটু কমল, চোখ দুটি লাল; সারাদিন কিছু কথাবার্তা বলল। জ্বর আরও কমে এল; কিন্তু রাত্রির দিকে জ্বর বাড়ল, প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ল জ্বরের তাপে। রাত্রিটা জেগেই কাটিয়ে দিল দাশরথি। সকালবেলা বেরোবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা আছে?'

'কোথা থেকে থাকবে?'

দাশরথি একটু ভাবল, 'তাহলে ত আগে টাকা জোগাড় করতে হয়, তারপর—!'

বেরিয়ে পড়ল সে। দিনের বেলা টাকা সংগ্রহ করবার অনেক অসুবিধা। কপালে তার রেখা পড়ল; মিত্তিরদের বড় বাড়ি ছাড়িয়েই দেখল একটা ছোটখাটো ভিড়, আর চাপা উত্তেজনা, লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল, ডোনাল্ড লিংগমকে ঘিরে পাঁচটি লোক আস্তিন গুটানো, ঘুসি পাকানো।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞেস করল দাশরথি।

ডোনাল্ড দুটো হাত দাশরথির দিকে বাড়িয়ে বলল, 'ও প্লীজ! প্লীজ!'

সব চাইতে জোয়ান লোকটি ডোনাল্ডের পিছনে প্রচণ্ড লাথি মারল, ডোনাল্ড মাটিতে পড়তে পড়তে সামলে নিল।

'শালা, চীটিংবাজ, উনিশের দরে ঘোড়া বাজি মেরেছে, পয়সা দেবে না?'

'টাকা খাবার বেলা মনে থাকে না?'

আরও দু'জন এগিয়ে এল।

দাশরথি ডোনাল্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তোমাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু কত?'

ডোনাল্ড বাংলা বোঝে একটু, আধটু, বলতে পারে না।

'ফিপ্‌টি!' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল ডোনাল্ড।

'না, হান্‌ড্রেড।'

দাশরথি ডোনাল্ডকে আড়াল করে দাঁড়াল, অত্যন্ত দ্রুত ঘুরতে লাগল তার চোখ পাঁচটি লোককেই লক্ষ্য করে। 'আপনারা যান, পারিবারিক দুর্ঘটনার দরুণ টাকা ওর খরচ হয়ে গেছে, পরে দেবে, আজ আপনারা যান।'

'যাব ঠিকই', জোয়ান লোকটা বলল, 'কিন্তু তার আগে সায়েবকে আমরা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থাটা করে যাব, কিন্তু আপনি মশাই দালালি করবার কে বলুন ত?'

দাশরথির হাত তারপর বেহুঁশের মতন উঠল আর পড়ল।

মারধোর খেয়ে লোকগুলি চলে গেল।

ডোনাল্ড বলল, 'থ্যাংক্‌স্‌!'

দাশরথি হাত পাতল, ডোনাল্ড প্যান্টের পকেট থেকে নোট বার করে গুনে গুনে দশখানি দাশরথির হাতে রাখল।

আর বাইরে যাবার দরকার নেই, দাশরথি বাড়ি ফিরল।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে, পিছন থেকে ডাকছে কেউ, 'দাশু, ও দাশু!'

মুখ ফিরাল দাশরথি; রতিকান্ত; ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছে এক সাথে, এখনও সম্বন্ধটা টিঁকে আছে, দেখাশুনো হয়, গল্প হয়, সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলে; কাছে এসে দাঁড়াল; বকের পালকের মত সাদা, নিভাঁজ, মিহি পাঞ্জাবী; ঢেউ-খেলানো ঘন চুল সযত্নে আঁচড়ানো পিছন দিকে, চকচকে জুতোর উপর লুটিয়ে পড়েছে শান্তিপুর ধুতির কোঁচা; দীর্ঘ দেহ, সুপুরুষ; বলল, 'বড় বিপদে পড়ে এসেছি তোর কাছে।'

'বিপদে না পড়লে তোদের ত আর দেখা পাওয়া যায় না!' দাশরথির খোঁচা-দাড়ি গালে হাসির ভঙ্গি পড়ল; 'তোর আবার বিপদ কি রে? জমাটি ব্যবসা হাঁকিয়ে বসেছিস, যাদের পয়সা আছে তাদের আবার বিপদ কি? টাকা দিচ্ছে না কেউ? ঠ্যাঙ্গাতে হবে?'

'না রে! আমার কিছু টাকার দরকার, হঠাৎ হাতে একেবারে কিছুই নেই, এমন আমাদের মাঝে মাঝে হয়েই থাকে!! ছেলেটার খুব অসুখ, পাড়ার ডাক্তার দেখছিল, বলে গেল মেনিনজাইটিস, কেস্ সীরিয়াস্, বড় একজন কাউকে ডাকা দরকার।'

মনে পড়ল দাশরথির রতিকান্তের সাজানো ড্রইং রুম, টেলিফোন, ড্রইং রুমে প্যান্ট-পরা, গন্ধ-মাখা শৌখিন কাপ্তানদের ভিড়, সময় মত দাশরথিকে এড়িয়ে চলা; জিজ্ঞেস করল, 'কত?'

'একশ'র কমে হবে না, বুঝলি ভাই?'

'দেখ, আমার ছেলেটারও দু'দিন জ্বর, ডাক্তার দেখানো দরকার, হাতে একটি পয়সাও ছিল না, এই মাত্র একশ-টা টাকা জোগাড় করে ফিরছি, তুই পঞ্চাশ নে।'

'পঞ্চাশে আমার হবে না, দু'দিনের জ্বরে ডাক্তার ডাকবি কি রে? অবিশ্যি—আচ্ছা, ঠিক আছে, বিকেলে আমি টাকা পৌঁছে দেব তোকে, অফিস-ফেরতা আসব, তুই যদি না থাকিস, তোর বৌয়ের হাতে দিয়ে যাব; আর তেমন যদি মনে করিস আমার ডাক্তারকেই তোর ঠিকানাটা বলে দিতে পারি। তুই একশ টাকাই দে আমাকে, কতক্ষণের আর মামলা বল? বিকেলেই টাকা পেয়ে যাচ্ছিস!'

সেই নীহারকণা হাই স্কুল, সেই ছেলেবেলা, এক সঙ্গে স্কুল পালিয়ে ইডেন গার্ডেনে এক সঙ্গে সেই প্রথম সিগারেটে টান দেওয়া! পকেটে হাত দিয়ে নোটের তাড়াটা বার করল সে, 'নে।'

টাকাটা লম্বা পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে হাসল রতিকান্ত, দু'সারি সাদা দাঁতের অনেকখানি দেখা গেল, 'অনেক হাংগামার হাত থেকে বাঁচালি আমায়। আচ্ছা! থাকিস তা হলে বিকেলে।'

বিড়ির জন্যে আবার পকেটে হাত ঢুকাল দাশরথি।

বিকেলের দিকে জ্বরটা বাড়ল ভুলুর, দু'একটা এলোমেলো কথাও বলতে লাগল। মাদুরে বসে দাশরথি বিড়ি টানল রাত্রি আটটা পর্যন্ত। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

দূর থেকে দেখা গেল রতিকান্তের ড্রইং রুমে আলো জ্বলছে।

পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল সে, ঘর খালি। বেরিয়ে এল, রতিকান্তের নাম ধরে ডাকল কয়েক বার, পরিষ্কার গেঞ্জি-গায়ে চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'রতিকান্ত বাড়ি নেই?'

'ডাক্তারের বাড়ি গেছেন; বসবেন?'

'হ্যাঁ, বসব।'

চাকরটি পর্দা তুলে ধরল, দাশরথি ভিতরে ঢুকে বসল সোফায়।

দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরল সে, মায়া বলল, 'কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ? ভুলুকে ডাক্তার দেখালে না এখনও?'

বারান্দায় উঠে এসে দাশরথি জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে?'

'ভাল না, খেতে চাচ্ছে না কিছুই; জোর করে খাওয়াতে গেলে বমি হয়ে যাচ্ছে। জ্বর বোধ হয় আরও বেড়েছে।'

মাদুরে বসল দাশরথি, জামা আর গেঞ্জি খুলে রাখল পাশে, বলল, 'এক গ্লাস জল দাও।'

জল নিয়ে এল মায়া। জল পান করে গ্লাসটা মাটিতে রাখল সে।

'টাকা পয়সা কিছু জোগাড় করতে পারলে?'

উত্তরে দাশরথি বলল, 'কাল দেখাব ডাক্তার।' রতিকান্ত বলেছে, চেক জমা দিয়েছে কাল পাওয়া যাবে টাকা। তবু ছেলের জন্যে একবার যেতে হবে সুরেন বাগচীর কাছে, বিলেত থেকে ফিরে এসেছে সুরেন বাগচী, এককালে চেনা ছিল দাশরথিদের।

পরেরদিন সুরেন বাগচীকে ধরতে এবং আনতে কাটখড় পোড়াতে হল যথেষ্ট। ঠিক সাড়ে দশটায় ডাক্তার তার গাড়িতে উঠে বসল, দাশরথিকে আঙ্গুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল ড্রাইভারের পাশের আসনটি, দাশরথি উঠল; দরজা বন্ধ করল জোরে, বেশ জোরে। ডাক্তার এবং ড্রাইভার দু'জনেই চমকে উঠল।

'কি মশাই! গাড়ি ভেঙ্গে ফেলবেন নাকি?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করল ঝুঁকে পড়ে।

'না, ভাঙ্গবে কেন? দেখছি ত মজবুত গাড়ি।' তারপর চালককে, 'বালিগঞ্জ।'

রাস্তায় পায়চারী করছিল রতিকান্ত, গাড়িটা থামবার আগেই সে ছুটে এল। দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিল।

ভিতরে ঢুকবার আগে রতিকান্ত বলল, 'তুই বোস, পাঁচ মিনিট; কত?'

'বিয়াল্লিশ।' বলল দাশরথি, বসল সোফায়। বিড়ি ভাল লাগছে না তার, গায়ের জামাটা ইচ্ছে হচ্ছে টান মেরে খুলে ফেলে, হাত বাড়িয়ে পাখার সুইচটা অনায়াসে টেনে দিতে পারে সে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল; সমস্ত সকালটা গীটার বাজিয়েছে ডোনাল্ড, বারণ করে দেবে, না শোনে গীটারটা ভেঙ্গে দিয়ে আসবে! ডাক্তারের গাড়ির কাঁচটা ভাঙ্গল না?

কি যেন কাঁটার মত বিঁধছে তার বুকে; কি? দাশরথি দাঁড়াল, জানালার কাছে গেল, গরাদের উপর হাত রাখল, আস্তে আস্তে হাতের চাড় দিল, সহজ! আবার সোফায় এসে বসল সে, কোথায় যেন এক অদৃশ্য বেদনা, কোথায়? আস্তে আস্তে মোচড় দিয়ে, মৃদু, নরম, অথচ নির্মম।

বাইরে জুতোর শব্দ! দাশরথি বেরিয়ে এল।

'না, না, আর কিছু করতে হবে না,' সুরেন ডাক্তার বলছে, 'একেবারে প্লেন কেস অফ মেনিনজাইটিস, আট ঘণ্টা অন্তর পেনিসিলিন চালিয়ে যান, কাল বিকেলেই দেখবেন জ্বরজারি কিছু নেই। আর কয়েক ঘণ্টা দেরি করলেই আচ্ছা।'

রাস্তায় এল ডাক্তার, পিছনে রতিকান্ত আর দাশরথি; ডাক্তার গাড়িতে উঠল, রতিকান্ত ব্যাগ রেখে টাকাটা দিল ডাক্তারের হাতে, পকেটে টাকা রেখে ডাক্তার বলল, 'থ্যাংকস্। না, আমাকে আর খবর দেবার দরকার নেই, আচ্ছা!' দরজা বন্ধ করবার জন্যে হাত বাড়াল ডাক্তার, তার আগেই দাশরথি প্রচণ্ড শব্দে দরজাটা টেনে দিল, দরজার কাঁচ চুরমার হয়ে ভেঙ্গে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, গাড়িতে।

'হোয়াট এ—' ডাক্তার কথা শেষ না করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দাশরথির দিকে, তারপর ড্রাইভারকে আদেশ দিল, 'যাও, কি হাঁ করে চেয়ে আছ?'

সামান্য একটু ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

রতিকান্ত বলল, 'কাঁচটা ভেঙ্গে দিলি?'

'ঠুনকো জিনিস সহজেই ভেঙ্গে যায়।' উত্তর দিল দাশরথি।

রতিকান্তও তাকিয়ে রইল দাশরথির দিকে।

'আমি খেয়ে নেবো চট্ করে?' অবশেষে বলল রতিকান্ত, 'তুই পেনিসিলিনটা এনে দিবি দাশু? এই মোড়েই দোকান! আমায় ব্যাংকে ছুটতে হবে, ওষুধটা এনে তুই যদি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিস, তোর টাকাটা দিয়ে দিই! সত্যি! ভারি লজ্জার ব্যাপার।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ওষুধ নিয়ে ফিরল দাশরথি।

রতিকান্ত ড্রইং রুমেই ছিল, ওষুধ আর খুচরোটা নিয়ে বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম আজ শনিবার, বারোটার সময় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, বারোটা ত বাজে, কি হবে বল ত?'

'কিই আর হবে? কিছুই হবে না।'

'বোস্ না! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? সিগারেট খা; চা করতে বলেছি।'

'চায়ের দরকার নেই।' যাবার জন্যে পা বাড়াল দাশরথি, রতিকান্ত ডাকল, 'শোন্ সন্ধ্যেবেলা যেমন করে পারি দিয়ে আসব তোর টাকাটা, বুঝলি, নয়ত কাল সকালবেলা, অন্যথা হবে না, তোর উপর—'

দাশরথি তৎক্ষণে দরজার বাইরে।

বাড়িতে ঢুকে জামা খুলবার আগেই মায়া বলল, 'শিগ্গির ডাক্তার আন, ভুলু ভীষণ ছটফট করছে।'

জামাটা আর খুলল না দাশরথি, বলল, 'সেদিন তোমায় যে দুটো আংটি দিয়েছিলাম দাও ত!'

'কি হবে?'

'কিছু টাকা নিয়ে আসি, ডাক্তারের ভিজিট লাগবে ত! ওষুধের দাম।'

আংটি দুটো পকেটে পুরে স্যাকরার দোকানে এল দাশরথি; এদের কাছেই মায়ার গয়নাগুলো বন্ধক আছে; সুদে বাড়তে বাড়তে প্রায় আসলের কাছাকাছি হয়ে এসেছে, অনেকবার ওরা বলেছে অন্ততঃ সুদের টাকাটা যেন সে শোধ করে দেয়, দাশরথি গা করেনি, সুদ-আসল এক সংগে দিয়েই গয়না ছাড়িয়ে নেবে সে।

'চল্লিশটা টাকা দিন!' আংটি দুটি রাখল দাশরথি শো কেসের আয়নার উপর।

খাপ থেকে নিকেলের চশমাটা চোখে লাগিয়ে বকের মত লোকটি আংটিগুলো পরীক্ষা করল একবার, ঠিক সেই মুহূর্তে দাশরথিরও চোখ গিয়ে পড়ল আংটির উপর; বলল, 'আর ঘষতে হবে না, ফেরৎ দিন।'

আংটি ফেরৎ দিল লোকটি।

দাশরথি রাস্তায়; মাথার উপর কড়া রোদ ঝলসাচ্ছে, আংটি দুটি ডাস্টবিন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল সে; কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছল; ঠেলা-গাড়িতে রেফ্রিজারেটর আসছিল, একটা কুলি চালানটা তাকে দেখিয়ে ঠিকানা জিজ্ঞেস করল, অন্য একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল সে।

মায়া দরজার দিকেই তাকিয়েছিল 'কি হল? ডাক্তার আনলে না?'

'আংটি দুটো পিতলের, গিল্টি করা। জল দাও।' দাশরথি ঘরে ঢুকল, জামা গেঞ্জি খুলে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে মারল, বসল চৌকিতে ভুলুর পাশে, কপালে হাত রাখল, মনে হল বাইরে রোদের চাইতেও বেশি গরম, চোখ বন্ধ, ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেছে, মাথাটা ঘষবার চেষ্টা করছে বালিসে।

দাশরথি গেঞ্জি গায়ে রাস্তায় এল, ট্রাম লাইনের ডিস্পেনসারির আধখানা খোলা ছিল, লম্বা চৌকিটায় কম্পাউণ্ডার ঘুমোচ্ছিল, দাশরথি তাকে জাগিয়ে তুলল, লোকটার সংগে মুখ-চেনা ছিল তার; 'একটা ওষুধ তৈরী করে দিন, জলদি!'

লোকটা উঠে বসল, 'কি ওষুধ?'

'একটা মিকশ্চার, বেশি জ্বর, ছটফট করছে, বমির ভাব আছে, কথাবার্তা বলছে না। আমারই ছেলে, বয়েস আট।'

'বুঝলাম, সব বুঝলাম মশাই, কিন্তু প্রেস্ক্রিপসন ছাড়া ওষুধ দেবো কি করে?'

'প্রেসক্রিপসন্ নেই, কোনো রেকর্ড রাখবার দরকার নেই, নিন, তাড়াতাড়ি করুন।' দাশরথি তাকে হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

মিনিট দশেক লাগল।

শিশিটা হাতে নিয়ে দাশরথি জিজ্ঞাসা করল, 'কত?'

'এক টাকা।'

'বিকেলে দেব।' দাশরথি রাস্তায়।

'আরে শুনুন মশাই, শুনুন।'

রাস্তা পার হয়ে গেছে দাশরথি।

শিশিটা মায়ার হাতে দিয়ে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি এক দাগ খাইয়ে দাও, আবার তিন ঘণ্টা পরে, বিকেলেই জ্বর কমে যাবে।'

সন্ধ্যের সময় গায়ে হাত দিয়ে দেখল দাশরথি সত্যিই জ্বরটা অনেক কম, দু'একটা কথাও বলছে, বালিশটা চুমুকে দিয়ে খেয়ে নিল, বলল, 'বাবা, মাথাটা টিপে দাও, ব্যথা করছে।'

দাশরথি মাথা টিপতে বসল।

রাত্রি ন'টার সময় রতিকান্তের চিঠি নিয়ে এল একটা লোক; অনেক চেষ্টা করেও টাকার জোগাড় করতে পারেনি সে, কাল রবিবার, কাল যদি না হয়, তাহলে সোমবার এগারোটার মধ্যেই টাকা নিয়ে নিজে আসবে; সে যেন ব্যস্ত না হয়। রতিকান্তের ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে।

সারা রাত্রি যন্ত্রণায় ছটফট করল ছেলেটা, দাশরথি আর মায়া বসে রইল দু'জন বিছানার দুই পাশে; ভোরবেলা একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ল। দাশরথি সেই ডিস্পেনসারিতেই এল আটটার সময়, ডাক্তার আসবে ন'টায়। দাশরথি বসে রইল।

'আপনার ছেলে কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল কম্পাউণ্ডার।

'কই আর ভাল?'

'টাকাটা দিলেন না?'

'দেবো।'

ন-টার সময়েই ডাক্তার এল।

'একবার চলুন আমার সংগে।' বলল দাশরথি।

ব্যাগটা তখনও হাত থেকে নামায়নি ডাক্তার, বয়েস দেখে বুঝা যায় সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে। 'কোথায়? কত দূরে? কি হয়েছে?'

'চলুন।' আবার বলল দাশরথি, ব্যাগটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল।

ব্যাগটা দাশরথির হাতে তুলে দিল ডাক্তার। ওরা রাস্তায় নামল।

মায়া একেবারে দরজার বাইরে এসে পড়েছে, খোলা চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল দাশরথি।

'শিগ্গির এসো।' মায়া আগেই দৌড় মারল বাড়ির মধ্যে!

জুতো জোড়া খুলেই ঘরে ঢুকল ডাক্তার, বসল চৌকির উপর। ভুলু জোর করে নিশ্বাস টানছিল, শুধু বুকটা তার উঠছে নামছে। ডাক্তার দেখল সব, নাড়ি, বুক, চোখ, ঘাড়, পা; আর ডাক্তারের চোখ দেখে দাশরথি বুঝল সব।

'কাউকে দেখিয়েছেন এর আগে?'

দাশরথি মাথা নাড়ল।

'কোনোই ওষুধপত্র দেননি?'

আবার মাথা নাড়ল দাশরথি।

'এ ভয়ানক অন্যায়, ক্রিমিনাল,' বলল সদ্য-পাশ-করা তরুণ ডাক্তার, 'হি ইজ ডাইং, মেনিন্‌জাইটিস্-এ মরে কেউ আজকাল? গোটা কয়েক পেনিসিলিন করেছেন কি মশাই?'

ডাক্তার দাঁড়াল।

'কিছু একটা করুন, ডাক্তারবাবু!' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মায়া, আপনার পায়ে পড়ি।'

ডাক্তার বসল, ব্যাগ থেকে সূচ আর ডিস্টিল্‌ড্ ওয়াটারের ছোট শিশি বার করে খানিকটা জল ভরে নিয়ে ইন্‌জেকশান্ দিল বাহুতে। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এল, জুতো ঢুকোল পায়ে, নিঃশব্দে রাস্তায় এসে পড়ল।

ভুলুর নিশ্বাসটা যখন আর পড়ছে না —তখনও মায়া বুঝতে পারেনি।

আর—দাশরথি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে। ডোনাল্ড পাশের ঘরে গান গাইছেঃ 'মাই লোনলী হার্ট পাইনস্ ফর্ ইউ-ই-ই—'

# চিত্র প্রদর্শনী

এ সপ্তাহের চিত্রপ্রদর্শনীর শিল্পী দেবকুমার রায় চৌধুরী। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। চলবে ২৬শে নবেম্বর পর্যন্ত।

দেবকুমারবাবু বিদেশ যাচ্ছেন জানুয়ারীতে, ইতালী সরকারের বৃত্তি নিয়ে। বিদেশ যাবার আগে স্বদেশের কলা-



ডাক

রসিকদের কাছে তাঁর চিত্রকল্পের কিছুটা পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। ছবি আছে সবশুদ্ধ ৫০টি। সবই তৈল চিত্র। ইনি প্রধানত নরনারীর মুখশ্রী এবং শরীরভঙ্গী থেকে চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি চিত্রই অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিকল্পিত এবং রচিত। শিল্পী তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সরলভাবে এবং সোজা-সুজিভাবে। সম্ভবত এই জন্যেই ছবিগুলির আবেদন অত্যন্ত প্রবল। ভিতরে প্রবেশ করে ছোট ছোটো কাজের প্রতি নজর দিতে যেন এ রচনাগুলি আমন্ত্রণ জানায় না। যা বক্তব্য তা যেন এক কথায় সেরে দেওয়া হয়েছে। সেজানের চিত্রকল্পের সঙ্গে তাই দেবকুমার বাবুর রচনার খুব মিল।

বর্ণের নিজস্ব মূল্য এবং বিশেষত্ব সম্বন্ধে শিল্পী খুব সচেতন। ছবির বিশেষ মেজাজ বা ভাব প্রকাশ করতে বর্ণকে ইনি প্রধান ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। পীত-বর্ণ প্রধান 'ওয়েড এজ' ছবির এবং নীলবর্ণ প্রধান 'টেণ্ডার এজ' ছবির ভাব বর্ণিকার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। এখানে শরীর ভঙ্গীর রচনা কেবলমাত্র বিশেষ ভাব প্রকাশের সহায়তার জন্য। ফর্মের মর্যাদা যে কৌশলে প্রকাশ করেছেন তারও মিল রয়েছে সেজানের গঠনযোগ্যতা ব্যক্ত করার কায়দার সঙ্গে। এর রেখা প্রাকৃত নয়, একেবারে বিশুদ্ধ অ্যাবস্ট্রাক্ট, এইটিই এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট রেখার ফলে চিত্রের উপাখ্যান বস্তুগুলির সম্পূর্ণ বাস্তবিকতা না প্রকাশ পেয়ে বিশিষ্ট রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ শিল্পী বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সঙ্গে একটা অর্থহীন কলহ বাধিয়ে বসেন নি। তাই ছবিগুলি 'কমিউনিকেটিভ', সুতরাং উপভোগ্য। চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণ এঁর বেশ রপ্ত আছে বলে মনে হয়। এঁর ন্যুড চিত্র লক্ষণীয়। কুরবে, রেনোয়ার বা লোত্রেক যে দৃষ্টিতে নারীকে দেখেছিলেন সেই কামনার দৃষ্টিতে ইনি নারীর অঙ্গসৌষ্ঠব দেখেন নি। ইনি দেখেছেন কেবল নারী অঙ্গের ছন্দ এবং নক্সা। এঁর রচনাভঙ্গী যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু ন্যুড স্টাডীর সময় এঁর দৃষ্টিভঙ্গী মাতিসের মতনই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি নারীমূর্তির 'কম্পোজিশন,' 'স্টাডী নং ৪,' 'স্টাডী নং ৫' এবং 'ফ্যাট উওম্যান'। এ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'ক্লাস রুম,' 'এরিং,' 'গার্ডেন,' 'ফেয়ারী চিলড্রেন,' 'অ্যাট্রাকটিভ,' 'কোয়ারেট,' 'বয় বিফোর মিরার' এবং 'প্রোফাইল'।

'ইন দি গার্ডেন' রচনায় দেবকুমারবাবু পয়েণ্টিলিজম প্রকরণ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ঐ প্রকরণ আবার কেন? ঐ প্রকরণ যে শিল্পের আদর্শে পৌঁছানো যায় না তা উপলব্ধি করা গেছে বহুকাল পূর্বেই। বর্ণ বহুকাল ধরে কেবলমাত্র আকৃতির প্রকাশের সহায়তার জন্যেই ব্যবহৃত হত। ফলে বর্ণের স্বকীয়তার কথা শিল্পীরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। বর্ণের এই স্বকীয়তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে পয়েণ্টিলিজম তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এতে ফর্ম যায় বিলুপ্ত হয়ে। ফর্মকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কি রসোত্তীর্ণ আর্ট



বড় বোন

রচনা হয়? তা হয় না। সেই কারণেই সেই সময়কার পথিকৃৎ শিল্পী দেগা, মানে, সেজান এঁরা ঐ তন্ত্র গ্রহণ করেন নি।

দেবকুমারবাবু বিদেশ যাচ্ছেন। শিল্প-শিক্ষা করতে—এটা খুবই সুখের বিষয়। নানা শিল্পের নানা প্রথাপ্রকরণ শিল্পীদের দেশবিদেশ থেকে অবশ্যই শেখা উচিত নয়ত দেশের শিল্প সম্পদ বৃদ্ধি লাভ করবে কি করে? ভারতীশিল্পের আভিজাত্য বজায় রাখতে পূর্বার্জিতের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখলে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে আমরা কৃষ্টির প্রতিযোগিতায় হেরে যাবো। কিন্তু বিদেশ ফেরত প্রায় প্রত্যেক শিল্পীরই রচনাতে দেখতে পাই সে-দেশের আর্টের পুনরাবৃত্তি। এভাবে নব্যভারতের শিল্পসম্পদ কি সমৃদ্ধ হতে পারে? 'নকল দিয়ে গৌরব শিল্পরাজত্বে নেই, আসলেরই আদর আছে সেখানে।' সুতরাং দেবকুমার-বাবুর কাছে আমাদের এই অনুরোধ যে তিনি যেন শিল্পে ব্যক্তি এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা না ভুলে যান এবং যেসব বিদেশ ফেরত শিল্পীরা নব্যতন্ত্রের নামে বিদেশী শিল্পীদের ব্যক্তিগত শিল্পের পুনরাবৃত্তি করছেন তাঁদের দলে যেন যোগ না দেন। আমরা শিল্পীর উত্তর উত্তর উন্নতি কামনা করি।

—চিত্রগ্রীব

# মুখের রেখা

## সন্তোষকুমার ঘোষ

[ ৪ ]

মোহিতদা সেকথা শোনেননি।

শেষ রাত্রে ঠেলে ঠেলে টুলুর ঘুম ভাঙিয়েছিলেন।

"এই, শোন্, শীগগির উঠে পড়্। আমার সঙ্গে শিকারে যাবি।"

একটু আগেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টুলু স্বপ্ন দেখছিল, সে গরম জলের গামলায় পড়ে গিয়েছে। এইটুকু ছোট গামলায় সে পড়ল কী করে, অতটুকু গামলায় তাকে ধরবেই বা কেন, এই সব বিস্মিত প্রশ্ন মনে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল, কারণ সে যে পড়ে গিয়েছে, তাতে ত ভুল নেই। পড়েছে, হাত-পা ছুড়ছে, উঠতে পারছে না। চীৎকার করতে চায়, গলায় স্বর ফোটে না। গরম জল গায়ে ফোস্কা পড়ল, চামড়া কুঁচকে গেল, সমস্ত দেহটাই ঝলসে গিয়েছে। সমস্ত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে টুলুর ঘুম ভাঙল। মাথায় বালিশটা নেই, দুটো পাশ-বালিশের মাঝখানে টুলু আটকা পড়ে আছে। মোটে এই! কপালে হাত রাখল টুলু, কই, গরম নয় ত, বরং ঘেমেছে। ঘাড়ের কাছটায় বাধা ব্যথা লাগছে, হয়ত শোবার দোষে। কিন্তু জ্বর নয়, জ্বর নেই, টুলুর এই বিছানার ত্রিসীমানায় নেই।

তবু মোহিতদার আচমকা প্রস্তাবে টুলু অবাক না হয়ে পারল না। চোখ কচলে ঘুম-জড়ান গলাতেই বলল, "শিকার—আমি শিকারে যাব, মোহিতদা? আমি?"

মোহিতদা বললেন, "তুই।"

"শিকারের আমি কী জানি?"

"কিছু জানবার দরকার ত নেই। তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।"

"পিসিমা—পিসিমা বকবে না?"

"বেরিয়ে ত পড়্, কাকীমাকে বলবার দরকার কী।"

"আমার—আমার যদি জ্বর আসে?"

মোহিতদা জবাব দিলেন না, এমন চোখে তাকালেন, যাতে অনুকম্পা, কৃপা, অবজ্ঞা সবই ছিল।

তিনি নিজে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন। হাফ শার্ট পরে নিলেন চট করে, ট্রাউজারের পায়ের কাছটায় ক্লিপ লাগিয়ে শক্ত করে এঁটে নিলেন, গলায় ঝুলিয়ে নিলেন একটা থলে, তাতে গুনে গুনে গোটা কয়েক টোটা পুরলেন। খালি ফ্লাস্কটা টুলুর হাতে দিয়ে বললেন, "এটা তুই ধর্—রাস্তায় জল ভরে নেব। তৈরি?"

টুলু আর তৈরি কী হবে, হাফ-প্যান্ট ত পরাই ছিল, একটা শার্ট শুধু পরে নিল চুপে চুপে। তারপর ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। মোহিতদার চোখের নিঃশব্দ ইশারায় টুলু আস্তে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি।

বিরক্ত দুটো নেড়ি কুকুর মুখ তুলে ওদের একবার দেখেছে, কিন্তু চেনা গন্ধ পেয়ে চেঁচায়নি। কয়েকটা কাক সবে জেগে উঠে ডাকতে শুরু করেছিল, কিন্তু আকাশে আলো নেই বলে ভরসা করে বাসা ছেড়ে বেরোয়নি। পালেদের গোহালে ডাঁশ-মশার জ্বালায় উত্ত্যক্ত গরুটা মাঝে মাঝে আর্তস্বরে ডেকে উঠছিল, আর কোন শব্দ বা সাড়া ছিল না।

টুলুর পা দুটো কাঁপছিল। শীত পড়েনি, তবু হাওয়ায় হিম ত আছে। দুই হাত সে বুকের কাছে জড় করে রেখেছিল।

মোহিতদা ফিরে চেয়ে বললেন, "একটু পা চালিয়ে চল্, তাহলে আর শীত করবে না। কান দুটো দেখবি গরম হয়ে গেছে।"

পাকা রাস্তা শেষ হলে ওরা মাঠে নামল। চষা ক্ষেত, সবে ধান উঠে গিয়েছে, তবু উঁচু-নিচু, পায়ে লাগে। টাল সামলাতে বেগ পেতে হয়। টুলু সন্তর্পণে আল ধরে হাঁটছিল, কিন্তু মোহিতদা বারবারই ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁর পা ফেলবার ধরনটা হুবহু ড্রিল-মাস্টারের মত, থপ থপ করে জুতোর শব্দ করে যেন বলছিলেন, জোরে, আরও জোরে।

কিন্তু কত জোরে আর ছুটবে টুলু, দুর্বল, বছরে সাত মাস বিছানায় পড়ে-থাকা টুলু? তার গায়ে সত্যিই ঘাম ছুটছে, কী জোরে যে নিঃশ্বাস পড়ছে, ভয় করছে টুলুর নিজেরই। পেটের ভিতরে, যেখানে অতিকায় একটা পিলে আছে, সে জানে, থেকে থেকে টন টন করে উঠছে, আর যেখানটায় কেউ অতি দ্রুত নিয়মিত হাতুড়ি পিটছে, তার নাম হৃৎপিণ্ড। সেখানে প্রায়ই এমন হাতুড়ি পড়ে—টুলু ভয় পেলে, কিংবা তার খুব পরিশ্রম হলে।

"এখানে এ সময়ে কী কী পাখি আসে, তুই জানিস?"

টুলু জানত না।

"টীল, ডাক, স্নাইপ?"

টুলু মানেই বুঝল না।

বিরক্ত হয়ে মোহিতদা বললেন, "তুই কী—রে! এখানকার মানুষ, কিন্তু কোন খবরই রাখিস না? আচ্ছা, কতদূরে গেলে পাখির ঝাঁক মিলবে, তা ত জানিস?"

টুলু তাও জানত না।

রাতের নদীতে চড়া পড়ে পড়ে একটু একটু করে দিন জেগে উঠছিল। মোহিতদা আফশোস করে বলে উঠলেন, "ইস, বেশি দেরি হয়ে গেলে সব উড়ে যাবে, একটাকেও পাল্লায় পাব না। টুলু, তুই কোন কাজের ন'স।"

কুয়ো থেকে জল তুলে ফ্লাস্কটা ভরে নিলেন মোহিতদা। গ্রামের একজন লোক সেদিকেই আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করে পাখিদের ঠিকানা জেনে নিলেন।

পথে একটা নলখাগড়ার বন পড়ল, তার পর উঁচু মতন একটা ডাঙা, সেটা ঢালু হতে হতে যেখানে গিয়ে মিশেছে, সেটা আসলে একটা বিল। আর চারদিক খোলা, শুধু খোলা। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে যত দেখল টুলু অবাক হয়ে গেল। একটা জায়গায় খান তিনেক পোড়া ইট উনুনের মত সাজান—এতদূরে এসে কারা কবে চড়ুইভাতি করেছিল? ওই জামগাছটা পাতা মেলে খানিকটা অন্ধকার ধরে রেখেছে, ফল নেই, এই সময়টায় জাম ফলে না। একটা গাছে অজস্র থোকা থোকা কুল—কিন্তু কুল ত টুলুর খেতে নেই। আর ছোট ছোট ঝোপ-ঝোপ গাছে লালচে ছোপ-ধরা এই ফলগুলো কী। করমচা? করমচাও ত টক। টুলুর খেতে মানা।

আকন্দের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ল টুলু, টিপে টিপে দেখল দুধ-রঙ বেরয় কিনা। আর কাশ। রোগা, লম্বা, কাঠিসার, মাথা একেবারে শাদা, তবু থেকে থেকে নড়ে—বয়স ত যথেষ্ট হয়েছে, এখনও ওদের এত আনন্দ?

বন্দুকটা বুকের কাছে তুলে এদিক-ওদিক তাক করছিলেন মোহিতদা, একবার গুড়ুম করে একটা আওয়াজও হল, কিন্তু পাখি পড়ল না। কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল, ওরাই জানে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে সার বেঁধে উড়ে গেল—বসল গিয়ে খানিক দূরে, আর একটা জলার ধারে। একটা প্রবীণ বক শুধু নির্বিকারভাবে তখনও পদ্মপাতার আসনে সমাসীন।

টুলুকে ওখানেই বসিয়ে রেখে মোহিতদা ওদিকের জলাটার ধারে গেলেন, সেখানেও খানিক পরে একটা জোর আওয়াজ হল, ত্রস্ত টুলুকে কানে আঙুল দিতে হয়েছিল। খানিক বাদে মোহিতদাকে হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখা গেল। খাঁকি জামার বুকের দিকটা একেবারে ভিজে গিয়েছে, গাল-চোয়াল বেয়ে দর দর ঘাম ঝরছে।

টুলু বুঝি চোখ বিস্ফারিত করে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিছু পেলে?" মোহিত ঠোঁট উল্টে বললেন, "না—কিছু না। হোপলেস জায়গা এটা। শেষ পর্যন্ত কি একটা দুটো শেয়াল আর খরগোস শিকার করে ফিরব?" পকেট থেকে রুমাল বার করে মোহিতদা মুখ মুছেছিলেন, আর টুলু, চির-রুগ্ন টুলু, সকলে যাকে করুণা করে, করুণা করে বলে ঘেন্নায় যার নিজেরই মাঝে মাঝে মরতে সাধ যায়, সেই টুলুও মোহিতদাকে করুণা করেছিল। হায়রে, সে যদি বন্দুক ছুঁড়তে জানত, কিংবা কোন যাদু জানা থাকত তার, তবে একসঙ্গে আকাশ থেকে কয়েক ঝাঁক পাখি পেড়ে আনত।

থলে থেকে পাঁউরুটি বের করলেন মোহিতদা, পিঁপড়ে ঝেড়ে ঝেড়ে তাতে মাখন মাখালেন। টুলুর হাতে দু' টুকরো তুলে দিয়ে বললেন, "খিদে পায়নি?"

পেয়েছিল, খুবই পেয়েছিল, টুলু এতক্ষণ সংকোচে বলতে পারেনি। দু-টুকরো রুটি খেয়েও খিদে গেল না। এদিকে ওদিকে কুলগাছের ডাল নুয়ে নুয়ে আছে, টুলু চেয়ে দেখছিল। মোহিতদাও দেখছিলেন, তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, "আয়।" একটা কুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ডাল ধরে ঝাঁকাতে থাকলেন।

টপ টপ করে কুল পড়তে থাকল, বৃষ্টির সময় যেমন শিল পড়ে, কখনও টুলুর মাথায়, কখনও ঘাড়ে, কখনও নাকের উপরে। টুলু কুল কুড়তে শুরু করেছিল। কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করল এক ধারে, একটু পরে মোহিতদাও সেখানে এসে বসলেন। নিজে দুটো কুল ফেলে দিলেন গালে, দুটো টুলুর কোলে ছুঁড়ে দিলেন।

"খাব মোহিতদা, আমি খাব?" টুলু জিজ্ঞাসা করল, অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে।

"খাবি না কেন?"

"কুল যে টক।"

"তাতে কী, খেতে ত ভাল লাগে," মোহিতদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "তা হলেই হল। টুলু, তোকে এইসব বাজে ভয় ছাড়তে হবে।"

বাড়ি ফেরবার পথে একটা পুকুরধারে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মোহিতদা বললেন, "টুলু, তুই মাছ ধরতে জানিস?"

লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে টুলু বলল, "না।"

"গাছে চড়তে?"

"না।"

"সাঁতার কাটতেও ত জানিস না। সাইকেলে চড়তে নিশ্চয়ই শিখিসনি। নৌকো বাইতে জানিস? ঘুড়ি ওড়াতে?"

কান লাল হয়ে উঠেছিল, টুলু জোরে জোরে তিনবার বলে উঠল, "না—না—না।" তারপর মাটিতে চোখ রেখে পড়া-না-পারা ছাত্রের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু কিছু জানে না বলেই নয়, হঠাৎ উত্তেজিত হয়েছিল বলেও ও লজ্জা পেয়েছে।

মোহিতদার দিকে টুলু চোখ তুলে তাকাতেও পারছিল না। ও জানে, মোহিতদা ওকে ঘৃণা করছেন। সমবয়সী সব ছেলে যা পারে, তুমি তার কিছুই পার না টুলু, তুমি কি একটা মানুষ?

মোহিতদা ওকে কথাটা অন্যভাবে বললেন। বললেন, "টুলু, তোকে আমি সব শেখাব, যে কদিন এখানে আছি, তার মধ্যে যদি পারি। বাকীটা তোকে নিজের আগ্রহে আর চেষ্টায় শিখে নিতে হবে। তবে ত তুই জানবি, বেঁচে থাকা কাকে বলে?"

সেদিন পিসিমার কাছে টুলু অনেক বকুনি খেয়েছিল। কাঁদেনি। রাত্রে সমস্ত শরীরের গিঁটে গিঁটে অসহ্য ব্যথা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, জ্বর আসেনি।

পরদিন ওকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে মোহিতদা ডুব-জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, পেটে অনেক জল গেল টুলুর, অনেকবার দম যেন বন্ধ হল, তবু সেদিনও জ্বর এল না।

পেয়ারা গাছে উঠে হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গিয়ে কপালের কাছে অনেকটা কেটে গেল, সে দাগ আজও আছে, চোখ বুজে টুলু অনেকক্ষণ পড়েই রইল, নিজেকে বলল, "আর আমি উঠতে পারব না, আমি মরে গেছি।" কিন্তু তবু, আশ্চর্য, খানিক পরেই শ্বাস নিতে, চোখ মেলতে পারল।

অবাক টুলু এক-আকাশ রোদ্দুরের দিকে চেয়ে মরতে মরতে দৈবক্রমে বেঁচে গিয়ে, বাঁচবার অর্থ কী, প্রথম জানল।

বেঁচে থাকার সুখ কী, টুলু তা-ও জেনেছিল।

লিলিদিকে প্রথম থেকেই তার ভাল লাগেনি।

[এ বিষয়ে সৌরেশবাবু বহু পরে তাঁর 'দিনান্তলিপি'তে লিখেছিলেনঃ "কোনটা ভাল লাগেনি, লিলিদিকে, না তাঁর পোশাকটাকে, এখন বলতে পারব না। তখনও পারতাম না। তখন অস্পষ্ট একটু বোধমাত্র ছিল। লিলিদি যে ধরনে শাড়ি পরত, হয়ত সেই ধরনটাকে। পায়ের পাতার কাছ থেকে পাক খেতে শুরু করে শাড়িটা কাঁধ অবধি উঠত, কাঁধটাকেও এক পাক জড়িয়ে বুকের কাছে থেমে থাকত। ধরনটাকেই কি সেই বয়সে মানুষ বলে ভুল করেছিলাম? জানিনে। হয়ত যেসব রঙের শাড়ি পরতেন লিলিদি, তাও আমার অপছন্দ ছিল। হয়ত তিনি বিনুনিটাকে খোঁপায় সংবৃত না করে যেভাবে পিঠে ফেলে রাখতেন, আমার তাও ভাল ঠেকত না। আমার খারাপ লাগত তাঁর বারবার করে বুকের আঁচল সামলান আর সরান, এখনও বুঝতে পারিনে, লিলিদি ঠিক কী চাইতেন—আঁচল বুকে রাখতে, না এক পাশে সরিয়ে রাখতে। যে এসেন্স মাখতেন লিলিদি, তার গন্ধ ভাল নয়, যে পাউডার মুখে ছড়াতেন, তা তাঁর ময়লা রঙে মোটে মানাত না। এইসব, কতকটা অজ্ঞাতসারেই, অনুভব করে, সেদিন তাঁকে অপছন্দ করেছি। আজ বিশ্লেষণ করেই দেখি না, সুবিচার করেছি কিনা। আসলে ত আমি লিলিদিকে জানিনি, জানতে চাইনি, দেখিনি, দেখতে পাইনি, আমি এমন সব কিছু নির্বোধ নজরে লক্ষ করে বিরূপ হয়েছি, যা আসলে লিলিদিই নয়, ধার-করা জিনিস। কোনটা তাঁকে দিয়েছে স্নো-সাবানের দোকানদার, কোনটা শাড়ি ফিরি-ওয়ালা। মাত্র এইটুকু দেখে মানুষকে বিচার করব কেন?

"আমিও যে কোনদিন ক্রীম রঙের শার্ট পরি, সেদিন আয়নায় নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। নতুন গাবার্ডিনের কোটটায় আমাকে চমৎকার মানিয়েছিল, সবাই বলেছে। আর উই দেন জাস্ট হোআট আওয়ার টেলর্স মেক্ অভ্ আস্? অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। তবু বাইরের লোকের কাছে অনেকটাই তাই।

"অনেকটাই তাই, সেইজন্যেই চাই রুচি। রুচি দিয়ে বাইরের অনেকখানিকেই সুন্দর করে তুলতে পারি। লিলিদিও পারতেন কিন্তু তাঁর রুচি ছিল না। অন্তত টের, তার কোন প্রমাণ পায়নি।

"কিন্তু রুচি থাকলেই বা কতটা হত। বড় জোর বাইরের আবরণটাই চলনসই হত। অন্তরের রূপ তাতে বাড়ত না। দেহের রূপের ঘাটতিই বা কতটা মিটত? রুচি দিয়েও ত লিলিদি তাঁর গড়নের খুঁত ঢাকতে পারতেন না, কিংবা গায়ের চামড়ার সেঁকা সেঁকা রঙ মোছা যেত না; এগুলো যে দৈবায়ত্ত—কিংবা পিতৃমাতৃদত্ত। লিলিদি তাঁর ময়লা ময়লা রঙ হয়ত পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে, কাঠ কাঠ লম্বা গড়নটা হয়ত তাঁর বাবার। ছোট ছোট চোখ দুটি, কে জানে, সম্ভবত তাঁর মায়ের, আবার বেমানান রকমের খাড়া নাকটা হয়ত তাঁর বাবার দেওয়া।

"এজন্যে লিলিদির মনে কি কোন ক্ষোভ ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। অভিযোগ?—কার বিরুদ্ধে? কেন, বাবা আর মার। মনে ত হয় না। বাবা তাঁর জন্যে যথেষ্ট টাকা রেখে যাননি বলে লিলিদি হয়ত তাঁকে মনে মনে অনেকবার দায়ী করেছেন, কিন্তু সুরূপা করেননি, এ দোষটাও যে বাবার, এটা লিলিদি হয়ত কোনদিন ভেবেই দেখেননি। কেউ দেখে না। আমরা নিজেকে দেখি আয়নায়, দেখি অন্যের চোখে। দেখতে দেখতে কবে যেন রূপটাকে সত্তারই একাংশ বলে ভাবতে শিখি, তাকে প্রথমে অনিবার্য বলে মেনে নিই, অবশেষে তাকে ভালবেসে ফেলি। সে আমার, সেই আমি। তার তিলমাত্র সৌন্দর্যকেও বড় করে দেখি, তাল-প্রমাণ কুশ্রীতা চোখে পড়ে না।

"শুধু রূপ কেন, স্বরূপও কি আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত নয়! আশা, বাসনা, নৈরাশ্য, নীচতা, আসক্তি—যা নিয়ে আমি, তারও কি অনেকটাই আমার বাবা বা মার কাছ থেকে পাইনি? তবু সেই দোষ আর গুণ মিলে সবটাই এখন আমার হয়ে গিয়েছে।"]

একেবারে খট খট করে চলতেন লিলিদি, সোজা করে রাখা মাথাটা সাপের ফণার মত এদিক-ওদিক হেলত, কিন্তু প্রথম দিন তিনিও যেন একটু জড়সড় হয়ে গিয়েছিলেন।

চৌকাঠেই দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক মিনিট, ভিতরে আসতে পারছিলেন না।

পিসিমা বলেছেন: "এস, এস না লিলি!"

সহজাত বুদ্ধি দিয়েই টুলু বুঝতে পেরেছিল, লিলিদির সংকোচ মোহিতদার জন্যে। সে নীরব দুই চোখ দিয়ে মোহিতদাকে অনুনয় করে বলছিল, "মোহিতদা, উঠ না, উঠ না, বসে থাক। তা হলেই চৌকাটে আরও বারকয়েক পা ঘষে লিলিদি আজকের মত বিদায় নেবে, আমাকে পড়তে হবে না।"

কিন্তু মোহিতদা তার চোখের ভাষা সম্ভবত বুঝলেন না, চট করে শার্ট পরে

বললেন, "কাকীমা, আমি একটু ঘুরে আসি।"

"এই ঠান্ডায় বেরুবি?"

"ঠান্ডা কোথায়! বেশি দেরি করব না ত, বড় জোর ঘন্টাখানেক। ক্লাবে গিয়ে আজকের কাগজটা শুধু দেখে আসব।"

লিলিদির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মোহিতদা, লিলিদি, আরও আড়ষ্ট হয়ে এক ধারে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে ভিতরে এসে, চেয়ারে বসে, তিনি যা কখনও করেন না, তাই করলেন, হাতের পাতায় কপালের ঘাম মুছে ফেললেন।

"অংক কটা কষেছ?" জিজ্ঞাসা করলেন আস্তে আস্তে।

ঘাড় নেড়ে টুলু খাতাটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে দিল। অন্যমনস্কভাবেই লিলিদি খাতাটাকে টেনে নিলেন, চোখ বুলিয়ে গেলেন পাতায় পাতায়। দুটো অংক ভুল হয়েছিল, পাশে কাটা-চিহ্ন দিলেন, কিন্তু বকলেন না। রোজ কিন্তু বকতেন। আসলে টুলু টের পেয়ে গিয়েছিল, লিলিদির আজ পড়ানতে মন নেই, থেকে থেকে উসখুস করছেন, নমো নমো করে পড়ান শেষ করে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন আধ ঘন্টাও পুরো হয়নি।

পিসিমা কাছেই ছিলেন, বললেন, "আজ এখুনি উঠলে?"

"শরীরটা ভাল নেই, মাসিমা" লিলিদি জুতো পরতে পরতে বলেছেন, আর দাঁড়াননি।

মোহিতদা অনেক দেরি করেই ফিরেছেন। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটা কে কাকীমা?"

"সন্ধ্যাবেলা যে এসেছিল? ও হল লিলি—এখানকার হাসপাতালের মিডওয়াইফ নিভাদির মেয়ে। টুলুকে পড়ায়।"

মোহিতদার চোখে কৌতুক ফুটল।—"মেয়ের কাছে পড়িস বুঝি তুই? তাই এত মেয়েলি হয়েছিস।"

টুলু নিজেও লিলিদিকে পছন্দ করে না, তাঁর কাছে পড়াও না, তবু মোহিতদার তাচ্ছিল্যের ভাবটা তার ভাল লাগেনি। তার শিক্ষয়িত্রীকে মোহিতদা সম্মান দিলেন না, এটা যেন তাকেও বাজল।

টুলু তাড়াতাড়ি বলতে গেল, "কেন, লিলিদি ত—"

মোহিতদা ততক্ষণ খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছেন।

লিলিদি পরদিনও এলেন, রোজই আসতেন, কেননা টুলুর অনেকদিন আর জ্বর আসেনি। মোহিতদা লিলিদি এলেই শার্টটা গায়ে দিতেন, বেরিয়েও যেতেন ঠিক, লিলিদি ভীরু, বিব্রতভাবে ততক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

প্রায় নিয়মের মত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে মোহিতদা অবশ্য তাড়াতাড়ি ফিরেও এসেছেন, তখনও হয়ত টুলুর পড়া শেষ হয়নি, বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে লিলিদির বকুনি শুনেছে। এবার মোহিতদার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পালা।

পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে যেত টুলু, শুনতে পেত, মোহিতদা আস্তে আস্তে কাশছেন। বাইরে ঠান্ডা, বাইরে হিম, তবু মোহিতদা কেন ভিতরে এসে বসছেন না! টুলু বুঝত না।

কিন্তু একদিন মোহিতদা বাইরে যেতেই পারলেন না।

সেদিন লিলিদি প্রায় বর্ষা মাথায় করেই এসে পৌঁছেছিলেন। অকালের বৃষ্টি, চারধার কালো হয়ে এসেছিল, হাওয়া ছিল না। হারিকেনের শিখাটা থেকে থেকে শিউরে উঠছিল।

পিসিমা বললেন, "এর মধ্যে আবার কোথায় যাবি, ভিতরেই ব'স না! লিলি, তুমি এই বৃষ্টি মাথায় করে এলে?"

লিলিদি বললেন, "বাড়ি থেকে বের হবার সময় কিছু টের পাইনি মাসিমা, বৃষ্টিটা একেবারে হঠাৎ এল।"

মোহিতদা ইতস্তত করছিলেন। লিলিদিকে মৃদুস্বরে বলতে শোনা গেল, "বসুন না, উনিও বসুন না মাসিমা।"

গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে টুলু খাটের উপরে গিয়ে বসেছিল। পিসিমার কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে সে বলল, "আজ আর পড়ব না।"

"পড়বে না?" স্বভাব-শিক্ষয়িত্রী লিলিদি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, "পড়বে না, তবে আমি করব কী! সমস্তক্ষণ এইভাবে বসে থাকব?"

বসে থাকতে হয়নি। দু'একটা কথার পর পিসিমাই বলেছিলেন, "খুব ভাল গান জানে যে লিলি। একটা গাও না!"

লিলিদি প্রথমে রাজী হয়নি। অনেক পীড়াপীড়িতে শেষে তাকে গলা খুলতে হয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল টুলু। রুক্ষ-স্বভাব, রোগা লিলিদি, যে বিশ্রী পোশাক পরে, সে যেন মুহূর্তে, অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। এই খানিক আগেও যে খটখটে জুতো পরে টুলুকে পড়াতে এসেছিল, এ যেন ঠিক সে নয়, তার থেকে কিছু আলাদা। টিনের চালে ঝর ঝর ফোঁটায় তাল পড়ছে, নিবু নিবু হারিকেনে ঘরটা অন্ধকার আর আলোর মাঝখানের সীমায় একটি সুরে বিদ্ধ হয়ে সুখে কাঁপছে, এই চিত্রটি অনেকদিন টুলুর মনে ছিল। সেই একটা দিন সে লিলিদিকে একটুখানি ভালবেসে ফেলেছিল কিনা।

গান শেষ হতেই লিলিদি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

—"এবার যাই। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।

তখনও একেবারে থামেনি, পিসিমা তাই একটা ছাতা দিলেন ওর হাতে। মোহিতদাকে বললেন, "একা অন্ধকারে এতটা পথ যাবে, যা না, তুই ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।"

কুণ্ঠিত লিলিদি বলেছিল—"না না, উনি কেন আবার—"

পিসিমা সে আপত্তি শোনেননি।

টর্চ হাতে নিয়ে মোহিতদা নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছনে লিলিদি। দুজন মানুষ প্রথমে ছায়া, পরে অন্ধকার হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল।

ফিরে এসে মোহিতদা বলেছিলেন, "কাকীমা, লিলির ত বাবা বেঁচে আছেন।"

"আছে। কিন্তু এক সঙ্গে থাকে না।"

"লিলিও তাই বলল।"

আর কোন কথা হল না। হয়ত কোন কথা ছিল না। কিংবা টুলু ছিল বলেই ও'রা প্রসংগটা এড়িয়ে গেলেন। অতএব টুলু কিছু বুঝল না, তখন বুঝল না।

অনেক দিন পরে সৌরেশ 'দিনান্ত-লিপি'তে লিখেছিলেনঃ "সেই বয়সটাই ছিল কিছু না-বোঝার বয়স। আমাদের আলনায় অনেকগুলো পোশাক আছে—এক একটা সময়ে আমরা এক একটা পোশাক পরি। পোশাকগুলো যাঁর হেপাজতে, তাঁরই খেয়াল-খুশিমত পরি—কখনও নির্বোধের, কখনও বিষয়ীর, কখনও পাণ্ডিত্যাভিমানীর, কখনও কামুকের বা উদারচরিত্রের। কিংবা বলা যায়, আমাদের মধ্যেই কয়েকটা পুতুল আছে, যখন যেটাকে সুতো ধরে নাড়া হয়, তখন সেটাই সামনে এগিয়ে আসে, হাত-পা তোলে, নামায়, নাচে। সেই পুতুলটাই তখনকার মত আমাদের সত্তা হয়ে যায়। অন্তত সেই-রকম ভান করে। সেই কম বয়সে সেই পুতুলটাই বেশির ভাগ সময় সুমুখে এসেছে, যার মুখ নির্বোধের মত, ভাবলেশ-হীন, রেখাহীন। আঁকা দুটি চোখ মেলে যে সব দেখে, কিন্তু ঠোঁট নড়ে না, চোখের পলক পড়ে না। কিছু বোঝার শক্তি তার নেই, তাকে কিছু বুঝতে নেই।"

(ক্রমশ)

# রামকমল সেন ও তাঁর অভিধান

কমল সরকার

"Some men," says Shakespeare, "are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust on them." Ramcomul was not born great, nor had he greatness thrust on him, but his mission was to achieve greatness".—

—প্যারীচাঁদ মিত্র

এযুগে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পরিচয় বা প্রসংগ বংগসমাজে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু কেশবচন্দ্রের পিতামহ, বংগরেনেসাঁসের অন্যতম দিকপাল, প্রাজ্ঞ রামকমল সেন আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন কালের কল-কোলাহলে। কি বিত্ত, কি বিদ্যা—সব দিক থেকে নিঃস্ব হয়েও মানুষ যে কত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করতে পারে তার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন। বিত্তবার মূর্তপ্রতীক হয়েও সম্পূর্ণ আত্মপ্রচেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবনকে শুধু জীবিকার তাগিদে প্রয়োগ না করে পাণ্ডিত্যে ও পরার্থে রামকমল যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়—অবিস্মরণীয়। একাধারে ভাষাবিদ্, পণ্ডিত, কর্মবীর ও সংগঠক হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি শুধু বংগসমাজেই নয়, সে সময়ের য়ুরোপীয় সমাজেও বিশেষ শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন নিজের কর্মে, চিন্তায়, পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিমত্তায়। রামমোহন, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাজা রাধাকান্ত ও রসময় দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সমাজ সংস্কারকদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, বন্ধুত্ব ও প্রীতিলাভ করেন। বিদেশীদের মধ্যে অধ্যাপক উইলসন শিক্ষারতী ডেভিডহেয়ার, কেরী, বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট, ডঃ উইলিয়াম হাণ্টার, সাংবাদিক মার্শম্যান ওয়ার্ড এবং কেরীর সুযোগ্য পুত্র ফেলিক্স কেরী প্রভৃতিকে সহকর্মী, পরামর্শদাতা ও বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে।

প্রায় দেড়শো বছর আগে তৎকালীন কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা এবং সমাজ হিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মূলে রামকমল সেনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ



রামকমল সেন

স্মরণীয়। তাঁর ষাট বছরের বৈচিত্র্যময় জীবনের বিচিত্রতম কীর্তি এগারোশো দুই পৃষ্ঠার (দুই খণ্ডে) ষাট হাজার শব্দসমৃদ্ধ ইংরাজী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন। যে সময়ে রামকমলের এই অভিধান রচনা শুরু হয় সে সময়ে গোবিন্দপুর, সুতানটী ও ডিহি কলিকাতার একত্রীকরণ প্রায় সমাপ্তির পথে। বেনিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের শাসন চিরস্থায়ী করবার জন্যে নৃপতি ও সামন্ত রাজাদের পরাভূত করবার চেষ্টা করে চলেছে। লর্ড ময়রা কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল হয়ে এদেশে অবস্থান করছেন। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' তখনও কেরী সাহেবের প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়নি। কলকাতার রাজপথে ছাপাখানা অথবা কাগজের দোকান পথচারীর বিস্ময়ের উদ্রেক করত। ছিল না বৈদ্যুতিক ডায়নামো, কিংবা রোটারী অথবা অফসেট। সবেমাত্র হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটির গোড়াপত্তন হয়েছে। বাংগালী সমাজে ইংরেজী শিক্ষার ঢেউ এসে লেগেছে। সরকারী অফিসে, আদালতে ইংরেজী নবিশের অগ্রাধিকার। ইংরেজ অধিকৃত দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ইংরেজী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করলেন দেশের প্রগতিশীল সুধীবৃন্দ। রাজা রামমোহন, ডেভিডহেয়ার ও রাজা রাধাকান্তের সংগে কলুটোলার গোকুলচন্দ্র সেনের পুত্র রামকমল সেনও অনুভব করলেন ইংরেজী শিক্ষার বাস্তব উপকারিতা।

অবশ্য হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তনের আগেও কলকাতার বাঙালী সমাজে ইংরেজীর আকর্ষণ ছিল না একথা বলা চলে না। তবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙালীর ইংরেজীর প্রতি যে আকর্ষণ তা শুধু নকলনবীশ মুন্সী হবার তাগিদেই সমাপ্ত হত। ইংরেজরা এদেশে বসবাস শুরু করবার সংগে সংগে এদেশীয় সাধারণ মানুষের ইংরেজী ভাষার প্রতি আকর্ষণ জন্মে। এবং এই আকর্ষণ একমাত্র বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করবার জন্যে নয়—জীবিকার তাগিদই বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার মূল কারণ। যে সময়ে ইংরেজ এদেশে প্রথম পদার্পণ করে সে সময়ে ইংরেজ এবং বাঙালী উভয়ের কাছে উভয়ের ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। কোন প্রকারে ইশারার সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান হয়েছে। ক্রমশ কেনা-কাটা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-স... ...নে অন্য... ...ছাপা হয়ে

এবং সরকারী ক্রিয়াকর্মে এদেশীদের সাথে ইংরেজের যোগাযোগ মৌখিক ইংরেজী ব্যবহারের সূচনা করে। এরপর বাঙগালী হাতেকলমে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট (২২শে অক্টোবর, ১৭৭৪) স্থাপিত হবার পর। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে বিচার সংক্রান্ত কাজ নবাব দরবারের অনুসরণে ফারসীতে সম্পন্ন হলেও সুপ্রীম কোর্ট ইংরেজীতে শুরু হয়। এ ছাড়া নবাগত বিদেশী আইনজীবীরা নিজেদের সুবিধার্থে এদেশীয় মুন্সী ও কেরানীদের নিয়োগ শুরু করেন। এ সমস্ত কারণে কলকাতার বাঙগালী সমাজে কেরানী ও মুন্সীর স্থাপনের পর বিচার সংক্রান্ত কার্যাদি জীবিকার প্রতি বিশেষ মোহ দেখা দেয় এবং সেকালে বাঙগালীর ইংরেজী শিক্ষা পূর্ণাকারের "নকলনবিশ" হবার জন্যেই শুরু হয়। কোনক্রমে নকল করা ও সুন্দর হস্তলিপি সেকালের ইংরেজী শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি, বিবাহের পাত্রের

# DICTIONARY

IN

# ENGLISH AND BENGALEE;

TRANSLATED

FROM

TODD'S EDITION OF JOHNSON'S ENGLISH DICTIONARY

IN TWO VOLUMES.

BY

RAM COMUL SEN,

NATIVE SECRETARY TO THE ASIATICK AND AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETIES,
MEMBER A. S. A. & H. S. and M. S. P. S. OF BENGAL.

VOL. I.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1834.

রামকমল প্রণীত ইংরাজী- বাঙলা অভিধানের টাইটেল পৃষ্ঠা

ইংরেজীর উত্তম নকলবোধ সেকালে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যে পাত্রের হস্তলিপি যত সুন্দর পাত্র হিসেবে তার যোগ্যতা তত বেশী।

এদেশে প্রকৃত ইংরেজী শিক্ষার গোড়া পত্তন হয় হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ডেভিড হেয়ার এবং রামমোহনের অনুপ্রেরণায় বাঙালী সমাজের যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্টের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে কলকাতায় কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে—সে দলে রামকমল সেনও ছিলেন। এঁদের উৎসাহে গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী, সোমবার হিন্দু কলেজের গোড়া পত্তন হলো। কলেজ পরিচালনার জন্যে যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় —রামকমল সেখানে অন্যতম সদস্য। একমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠাই সব নয়—অনুভব করলেন প্রগতিপন্থী সমাজপতিরা। কলেজ তো হলো—কিন্তু পাঠ্যপুস্তক কোথায়? কোথায় সেরকম প্রতিষ্ঠান যাদের কাছ থেকে ছাত্রদের জন্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে? এ সমস্যার সমাধানে স্যার হাইডের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮১৭ সালের ৪ঠা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হলো স্কুল বুক সোসাইটী। সোসাইটীর উদ্দেশ্য ধর্মপুস্তক ছাড়া ছাত্রদের পাঠোপযোগী ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক সরবরাহ করা। এখানেও রামকমল অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সোসাইটীর ম্যানেজারমণ্ডলীর তিনি একজন সদস্য। সমিতিতে রামকমলের সাথে ছিলেন স্যার হাইড, ডাঃ কেরী, হ্যারিংটন, তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং আরও অনেকে। সোসাইটীতে রামকমল শুধু লোক দেখানো সদস্য ছিলেন তা নয়। পুস্তক সংগ্রহ এবং অনুবাদে তাঁর সক্রিয় সাহায্য স্কুল বুক সোসাইটীর অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে নবতম ইংরেজী শিক্ষার ধারা সূচীত হলো তার জন্যে উপযুক্ত গ্রন্থাদির অভাব, বিশেষত পূর্ণাকারের অথচ স্বল্পমূল্যের "ইংরেজী বাংলা" অভিধানের অভাব অনুভূত হয়। স্কুল বুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে রামকমল একটি ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনার [illegible] শুরু করেন এবং অভিধান প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। সে সময়ে ইংরেজী-বাংলা অভিধান হিসেবে যে কয়টি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে ফরস্টার (H. P. Forster) এবং কেরীর (Rev. W. Carey DD) অভিধান ছাড়া অন্য কোনটাকেই অভিধান অর্থে যা বোঝায় তা বলা চলে না। এই প্রচলিত গ্রন্থগুলিকে অভিধান না বলে অর্থপুস্তক বলাই শ্রেয়। প্রচলিত অর্থপুস্তকগুলির মধ্যে মিলারের (Miller) অর্থপুস্তক অন্যতম। মিলারের আগে টমাস ডিসের (Thomas Dyche) "স্পেলিং বুক" ইংরেজী শিক্ষার সময়ে ব্যবহৃত হতো। এটিও অর্থপুস্তক ছাড়া অন্য কিছু [illegible] প্রকৃত অভিধান অর্থে ফস্টার এবং [illegible] অভিধান উল্লেখযোগ্য। ফস্টারের অভিধান দুই খণ্ডে বিভক্ত। মূল্য ষাট টাকা। কলকাতার Ferris & Co-র ছাপাখানা থেকে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই অভিধানে আঠারো হাজার ইংরেজী শব্দ ও তার বাংলা অর্থ দেওয়া আছে। বাংলা অক্ষরগুলি কাঠের তৈরী। কেরীর অভিধান তিন খণ্ডে সমাপ্ত এবং (১৮১৫-২৫) দশ বছরে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। অভিধানটির মূল্য ছিল একশো কুড়ি টাকা। শব্দসমষ্টি আশী হাজার। অত্যন্ত উচ্চমূল্য হওয়ায় জনসাধারণ এর ব্যবহারে বঞ্চিত হয়েছে। ফরস্টার এবং কেরীর অভিধান প্রকাশের পর ১৮২১ সালে ২৭নং আর্মেনিয়ান স্ট্রীট থেকে ছাত্রদের জন্যে রামকৃষ্ণ সেনের সম্পাদিত ও প্রকাশিত অর্থপুস্তকটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে ইংরেজী-পর্তুগীজ-

বাংলা অর্থ দেওয়া আছে। এটি অভিধান না হলেও এটিতে প্রচুর শব্দ ও তার অর্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে যে, বাংলা শব্দগুলি বাংলা অক্ষরে নয়—ইংরেজী অক্ষরে বাংলা শব্দের উচ্চারণ প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি শব্দ ও তার অর্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

| English | | Portuguese | | Bengalese |
|---|---|---|---|---|
| A Letter | — | A [illegible] | — | Ack Pattee, Pottroe, Lepee. |
| The Breast or Chest | — | O Peito | — | Book |
| A Newspaper, Gazette | — | As Novas, A GAZETA | — | Ack Khoborar Cagotch. |

সেকালে একমাত্র রামকিষণ সেনের গ্রন্থ ছাড়া এদেশীয় কোন ব্যক্তির প্রণীত "ইংরেজী-বাংলা" অভিধান দেখা যায় না। কিন্তু রামকিষণ সেনের পুস্তকটি অভিধান হিসেবে গ্রহণ করায় নীতিগত বাধা আছে। এ বিষয়ে রামকমল সেনকে এদেশীয় পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকার করতে হবে। ফরস্টার এবং কেরী অভিধান রচনার কাজে সরকারী (আর্থিক) সাহায্য পেয়েছেন কিন্তু রামকমলকে ঐ ধরনের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়নি। এদিক থেকে তিনি এখনি [illegible] রামকমলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পমূল্যে অভিধান রচনা। সে সময়ে প্রকৃত অভিধানের অভাব বোধ করে রামকমল বলেছেন—

"The want of a dictionary in which should be given the Bengalee interpretation of English words, has been long-felt. Those that have appeared in print within these last thirty-three years, have not been dictionaries in the strict sense of the word, but vocabularies, calculated chiefly for schools, and containing only those words, (but without their synonyms,) which are constantly in use in the course of business and in common conversation."

রামকমলের অভিধান রচনার সংকল্পে তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু এ প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। বিশেষত যে সময়ে এদেশে পর্যাপ্ত ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটেনি সেই সময়ে এদেশীয় কোন ব্যক্তির বিদেশী ভাষায় অভিধান রচনার প্রয়াস দুঃসাহস ছাড়া কিছু নয়। রামকমলের ইংরেজী শিক্ষা কোন স্কুল বা কলেজে না হলেও স্বচেষ্টায় ইংরেজীতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি এদেশীয় শিক্ষকের কাছে শুরু হলেও সে শিক্ষাকাল এক বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি। কারণ, নিয়মতান্ত্রিক-ভাবে ইংরেজী শিক্ষার জন্য অবসর ও অর্থ কোনটিই তাঁর ছিল না। কৈশোর থেকে জঠরানলের ইন্ধন যোগাতে বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করে নিঃস্ব, রিক্ত রামকমলকে ছাপাখানা থেকে হাসপাতাল এবং হাসপাতাল থেকে ফোর্ট, সর্বত্র ছুটোছুটি করতে হয়েছে। ক্রমশ মাসিক আট টাকা বেতনের কম্পোজিটার থেকে নিজের অধ্যবসায়ে টাকসালের দেওয়ানী ও এসিয়াটিক সোসাইটীর দেশীয় সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। একাধারে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পাণ্ডিত্যের এই বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সে যুগে বিরল। বিপুল অধ্যবসায়ে অনেক বিত্তহীন বিত্তবান হয়েছেন এ নজীর আছে। কিন্তু একাধারে বিত্ত এবং পাণ্ডিত্যের সমন্বয় অভূতপূর্ব।

জনশ্রুতি আছে, রামকমলের প্রপিতামহ রামরাম সেন রাজা বল্লাল সেনের বংশোদ্ভব। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গরিফা গ্রামে রামকমলের পিতা গোকুলচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি। এই গ্রামে গোকুলচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন দুই পুরুষের বসবাসের কথা জানা যায়। রামকমলের পিতা গোকুলচন্দ্রের পৈত্রিক মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের সেরেস্তাদার ছিলেন। গোকুলচন্দ্রের ছয় পুত্র ও দুই কন্যা। রামকমল চতুর্থ সন্তান। রামকমল যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল। রামকমলের জন্মের মাত্র আট বছর আগে মহারাজা নন্দকুমার ফাঁসীতে (১৭৭৫) প্রাণ দিয়েছেন। তেরো বছর আগে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। জর্জ দি থার্ড ওদেশের সম্রাট। নেপোলিয়ন তখন চৌদ্দ বছরের কিশোর। রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার যথাক্রমে এগারো এবং নয় বছরের বালক। সতীদাহ তখন বাংলার প্রাত্যহিক ঘটনা। এই পরিবেশে গরিফায় গোকুলচন্দ্র সেনের চতুর্থ পুত্র, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ধরাতলে ভূমিষ্ঠ হলেন। বৃহৎ একান্নবর্তী সংসারের জন্য গোকুলচন্দ্রের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রায় ছিল না বলা চলে। তা সত্ত্বেও "বৈদ্য শিরোমণি" উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক চিকিৎসকের কাছে বালক রামের সংস্কৃত শিক্ষা শুরু হয়। পিতা গোকুলচন্দ্র ফারসী জানতেন এবং

রামের ফারসী শিক্ষা পিতার কাছেই শুরু হয়।

সংস্কৃত শিক্ষা শেষ হবার কিছুকাল পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর রামকমল পিতার সাথে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় আসার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় রামজয় দত্তর বাড়ীতে তাঁর ইংরেজী শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। রাম তখন আঠারো বছরের যুবক। সে সময়ে কলকাতায় স্কুল বা কলেজ ছিল না। কয়েকজন ফিরিঙ্গি, আর্মেনিয়ান এবং এদেশীয় মুন্সী নিজের বাড়িতে গুটিকতক ছাত্রকে উচ্চবেতনে ইংরেজী শেখাতেন। আগেই বলেছি যে, এইসব বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত করার চেয়ে "নকলনবিশ" মুন্সী তৈরী করার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হতো। কোনক্রমে কিছু ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করাই ছিল সেকালের ইংরেজী শিক্ষার মাপকাঠি। ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শব্দ ও তার বাংলা অর্থ একত্রিত করে কবিতার আকারে দলবদ্ধভাবে কণ্ঠস্থ করার রেওয়াজ ছিল। নমুনাস্বরূপ নীচের ছড়াটি দেওয়া হলো। ছাত্ররা এই ধরনের ছড়া কণ্ঠস্থ করে ইংরেজী শিখত।

গাড্ ঈশ্বর, লার্ড ঈশ্বর, কম
মানে এস,
ফাদার বাপ, মাদার মা, সিট
মানে বস,
ব্রাদার ভাই, সিস্টার বোন,
ফাদার সিস্টার পিসী,
ফাদার ইন ল মানে শ্বশুর,
মাদার সিস্টার মাসী।
আই মানে আমি, আর ইউ
মানে তুমি,
আস মানে আমাদিগের,
গ্রাউণ্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত,
উইককে সপ্তাহ বলে রাইস
মানে ভাত।
পমকিন্ লাউকুমড়ো কোকম্বর শশা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু আর প্লোমেন চাষা।

এই সময়ে কলকাতার বিভিন্ন ইংরেজী স্কুলের মধ্যে জোড়াসাঁকোর শেরবার্ন (Sherburne), আমড়াতলার মার্টিন বাওয়েল (Martin Bowel), এরাটুন পিত্রাস (Arateon Pitrus), নিত্যানন্দ সেন এবং রামজয় দত্তর স্কুলের বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথের ইংরেজী শিক্ষার হাতে খড়ি এই শেরবার্ন সাহেবের স্কুলে হয়। রামজয় দত্তর বিদ্যালয়ে তুতীনামা এবং আরবা উপন্যাস পাঠ্যপুস্তক ছিল এবং ঐ দুটি বই-এর কোন বিশেষ অংশ গলাধঃকরণ করাই সে সময়ের ইংরেজী শিক্ষার চরম মান ছিল। কোনপ্রকার সুপরিকল্পিত শিক্ষা প্রণালী সেকালের শিক্ষকেরা তখনও ভেবে স্থির করতে পারেন নি। প্রত্যেকে নিজের সুবিধা মত ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। এছাড়া, পাঠ্যপুস্তকের অভাব সে যুগের প্রকৃত শিক্ষার অন্যতম বাধা ছিল। ইংরেজী অভিধান বা ব্যাকরণের প্রচলন প্রায় ছিল না বলা চলে। এই প্রসঙ্গে রামকমল নিজের অভিধানের ভূমিকায় খেদোক্তি করেছেন—"About this time, I studied English at a school kept by a Hindoo, up the river, where the boys used to make extracts from the Tooteenamah and Arabian Tales, which were used as class books, there-being no Dictionary or Grammar".

A

# DICTIONARY,

ENGLISH AND BENGALEE

ABA

A, অক্ষর ইউরোপীয় বর্ণমালার প্রথমাক্ষর জানিবেন, স্থানভেদে এ অ আ ইতি প্রকারত্রয়ের এক২ রূপে উচ্চারণ হয়, তদুদাহরণ যথা; প্রথমতঃ যেরূপ শব্দেতে a একাররূপে উচ্চারণ হয়, যথা place, face, waste; দ্বিতীয়তঃ অকাররূপে, যথা all, malt, salt; তৃতীয়তঃ আকাররূপে, যথা father, gather, lavish; কিন্তু কথিত উক্ত ত্রয়ের মধ্যে a অক্ষরের প্রধান উচ্চারণ একার রূপে জানিবেন, যথা pane, cane; কখন২ a বর্ণ উচ্চারণক্ষেত্রে লঘু আকারের মত উচ্চার্য্য হয়, যথা cart, part, dart; তদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে a বর্ণের উচ্চারণ প্রায় লুপ্ত হয়, যথা America শব্দের প্রথম a বর্ণ, এবং carriage, marriage, chaplain, captain, ইত্যাদি শব্দের দ্বিতীয় a বর্ণ। অপর a বর্ণ কখন২ এক বচনান্ত সংজ্ঞাশব্দের পূর্ব্বপ্রযোজ্য অর্থাৎ আদ্যক্ষর হয়, যথা a man, a tree; এবং স্বরাদি শব্দের পূর্ব্বে কিম্বা অনুচ্চারিত h আদি শব্দের পূর্ব্বে ঐ a প্রয়োগ an হয়, যথা an ox, an egg, an honour, an habitation. কখন২ a বর্ণ সংখ্যাবাচক হয়, যথা a মাত্র। অপর a বর্ণ যখন অসমাপক ক্রিয়াপদ কিম্বা ক্রিয়াবাচক শব্দের পূর্ব্বে প্রযোজ্য হয়, তখন সে at কিম্বা on শব্দের সংক্ষেপ জানিবেন, যথা I am awalking, aside, afoot, aday, &c. যখন a বর্ণের many কিম্বা few শব্দের পূর্ব্বপ্রয়োগ হয় তখন তাহা সম্পূর্ণ সংখ্যা বুঝায়, যথা told of a many thousand French. অপর স্থানবিশেষে ঐ a বর্ণ পরিমাণার্থক জানিবেন, যথা a landlord hath a hundred a year. অপর বহুকাল চলিতপ্রযুক্ত কোন২ শব্দের a বর্ণ এইক্ষণে ভিন্ন করা অসাধ্য, যথা afresh, alive, aloud, averse, &c. কোন২ স্থানে ঐ a বর্ণ অনর্থক জানিবেন, যথা arise, arouse, awake, &c. অপর কোন২ স্থানে ঐ a বর্ণ সঙ্কেতমাত্র জানিবেন, যথা Artium Baccalaureus বা রচিয়া A. B. সঙ্কেত করে; Artium Magister পরিবর্ত্তে A. M. এবং Anno Domini পরিবর্ত্তে কেবল A. D. লেখে। অবশেষে কহি যে স্থানবিশেষে a বর্ণ এক শব্দের তুল্যার্থক হয়, যথা he conveyed the goat to a certain distant place.

Aaronical, a. আহরোণনামক বংশ যাজকতাবিষয়ক।

Ab, স্থানসংজ্ঞার আদিপ্রয়োগ করিলে abby নামক মঠের সহিত তৎস্থানের সম্বন্ধ বুঝায়, যথা Abingdon.

Abacist, n. s. Lat. গণনাকারক, গণক; হিসাব বা গণনা যার পারী।

Aback বা backwards, ad. পশ্চাৎ, পশ্চাদিগে; অপ্রস্তুত বা অপ্রতিভ অর্থ। [Sea Term] উল্টাপাল, পালের উল্টাপার্শ্বে বায়ুপূরণ।

Aback, n. s. Lat. প্রাচীর বা ভিত্তিমূল, পিল্পার বা স্তম্ভের মাথাতে স্থাপিত চতুষ্কোণ প্রস্তর; তদ্ভিন্ন চতুরস্রস্থান বুঝায়।

Abacot, n. s. মুকুটদ্বয়াকৃতি ইংগ্লণ্ডীয় প্রাচীন রাজগণেরদের রাজমুকুট বা কিরীট বা টোপর।

Abactor, n. s. Lat. এক দুই পশুচোর অর্থ নয় কিন্তু পালকেপাল চুরি করে যে।

Abacus, n. s. Lat. প্রাচীনকর্ত্তৃক ব্যবহার্য্য গণনাপাটা বা মঞ্চ, গণনার তক্তি; স্তম্ভের প্রান্ত বা ঊর্দ্ধভাগ, মাথলা।

Abaft, ad. Sax. পশ্চাৎ, পশ্চাদিগে। [Sea Term.] জাহাজের অগ্রভাগাবধি বা অগ্রমাস্তুল বা মধ্য পশ্চাদ্ভাগপর্য্যন্ত।

Abaisance, n. s. Fr. প্রণতি, নমস্কার, প্রণাম, বন্দনা।

To Abalienate, v. a. Lat. [In Law.] পরস্বত্ব দান বা পরহস্তগত-কৃ; মনোহরণ-কৃ, ভুলা (ক্রি), মগ্ন-করা (ক্রি)।

Abalienation, n. s. স্বত্বাধিকারকে বা ব্যবহার্য্যকে বা স্বত্বকে পরাধীনকরণ, পরাধীনত্ব।

To Aband, v. a. ত্যাগ-কৃ, ছাড়িয়া-যা।

To Abandon, v. a. Fr. অর্পণ বা সমর্পণ বা ত্যাগ-কৃ, ছাড়িয়া-যা, ছাড়িয়া-পলা, ফেলিয়া বা ছাড়িয়া-যা, দেশবহিষ্কৃত-কৃ।

To Abandon over, v. a. অর্পণ-কৃ, পর বা কার্য্য সমর্পণ-কৃ।

Abandor, n. s. ত্যাগকারী, ত্যাজক, অর্পক, সমর্পক, ত্যাগকরণ, ত্যজন, ফেলিয়া যাওন।

Abandoned, part. a. দুষ্ট, অতিশয়দুষ্ট, দুষ্ট, সর্ব্বকর্তৃক ত্যক্ত, ত্যক্ত, উচ্ছিন্ন; অয়েরান।

Abandoner, n. s. ত্যাগকারী, ফেলিয়া যায় বা পলায় যে।

Abandoning, n. s. ত্যাগকরা, ফেলিয়া বা ছাড়িয়া যাওয়া।

Abandonment, n. s. ত্যাজন; ফেলিয়া বা ছাড়িয়া যাওন, ত্যাগকরণ, ত্যাগ।

Abannition, n. s. Lat. হত্যাপরাধপ্রযুক্ত এক বৎসর বা বৎসরদ্বয় দেশবহিষ্কৃতকরণ, দেশবহিষ্করণ।

To Abare, v. a. Sax. শূন্য-নগ্ন-বেআঁটা-অনাবৃত বা প্রকাশ-কৃ, আচ্ছাদন বা আবরণরহিত-কৃ।

Abarticulation, n. s. Lat. চলসন্ধি, জীবনসমর্থক সন্ধি।

To Abase, v. a. Fr. নিম্ন বা নীচ-কৃ, অপকৃষ্ট-কৃ, নামা (ক্রি), তলা

[ 1 ] A

রামকমল সেন প্রণীত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা

অর্থাভাবের জন্য বছরখানেকের বেশী রামকমলের ইংরেজী শিক্ষা হয়নি। অর্থের প্রয়োজনে ১৮০২ সালে উনিশ বছর বয়সে কলকাতার চীফ্ ম্যাজিস্ট্রেট ব্লেকোয়ার সাহেবের একান্ত সচিব নামে সাহেবের অধীনে চাকুরী নেন এবং চাকুরী নেবার কিছুদিন পরে পিতৃদেব গোকুলচন্দ্র রামকমলের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর রামকমলের বিবাহ দেন। ন্যামে সাহেবের কাছে কিছুদিন চাকুরী করার পর ফোর্টের সরকারী স্থপতি ট্রেচিনডেন সাহেবের কাছে শিক্ষানবিশ হয়ে স্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষা করেন। আশাবাদী, উচ্চাভিলাষী রামকমল বিভিন্ন চাকুরীর সংগে নিয়মিত ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করে চললেন। এই সময়ে প্রাচ্যভাষাবিদ ডাঃ উইলিয়াম হানটার কলকাতায় "হিন্দুস্থানী প্রেস" স্থাপন করেছেন। হান্টার সাহেবের প্রেসে ১৮০৪ সালে মাসিক আট টাকা বেতনে রামকমল কম্পোজিটারের চাকুরী নেন। অন্যান্য চাকুরীর চেয়ে ছাপাখানার চাকুরীতেই রামকমল বেশী আকৃষ্ট হলেন। কারণ ছাপাখানায় বিভিন্ন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি পাঠের সুযোগ পাওয়া যাবে এই আশায়। হান্টারের মৃত্যুর পর অধ্যাপক উইলসনের হাতে এই ছাপাখানার দায়িত্ব আসে। এইখানেই উইলসনের সাথে রামকমলের পরিচয় হয়। হিন্দুস্থানী প্রেসে বছর চারেক চাকুরীর পর ১৮০৮ সালে রামকমল চাঁদনীর হাসপাতালে যোগ দেন। এরপর আরও কয়েকটি চাকুরী করার পর ১৮১৯ সালে অধ্যাপক উইলসনের সাহায্যে রামকমল এসিয়াটিক সোসাইটীতে কেরানীর চাকুরী (বার টাকা বেতনে) গ্রহণ করেন এবং এইখানেই নিজের কর্মদক্ষতায়

ক্রমশ দেশীয় সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এসিয়াটিক সোসাইটীতে চাকুরী গ্রহণের ফলে তিনি য়ুরোপীয় সমাজের উচ্চস্থানীয় রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলেন। রামকমলের অসীম জ্ঞান-তৃষ্ণা এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্পর্শে আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদেশীদেরও আকৃষ্ট করে। নিজের কর্মতৎপরতায় ইনি কোম্পানীর টাঁকশালের দেওয়ানী লাভ করেন। টাঁকশালের দেওয়ান থাকাকালীন কোম্পানীর মুদ্রায় দেওয়ান হিসাবে রামকমলের নাম মুদ্রিত হত। মুদ্রায় 'SEN' কথাটি মুদ্রিত থাকত। টাঁকশালের দেওয়ানী ছাড়াও তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কেরও দেওয়ান নিযুক্ত হন। কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়—সমাজজীবনে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট ছিল। তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় হিসেবে তিনি এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বিশেষ সুপরিচিত। ইংরেজী শিক্ষা ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী হিসেবে তিনি সুনামের সাথে কাজ চালিয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের উন্নতি ও সংস্কৃত চর্চার জন্য সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন (বর্তমান এলবার্ট হল) স্থানে একটি বাড়ী কিনে প্রত্যহ ঐ বাড়ীতে কলেজের পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের সঙ্গে সংস্কৃত চর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কলকাতার একাধিক সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ১৮২০ সালে ডাঃ কেরীর উদ্যোগে কলকাতায় যে উদ্যানকর্ষণ সংস্থা (Agricultural & Horticultural Society) প্রতিষ্ঠিত হয়, রামকমল তার একজন সক্রিয় উদ্যোক্তা ছিলেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠার সময়ে অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন ডাঃ কেরী এবং অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক ছিলেন রামকমল। কিছুকাল পরে এখানে রামকমলের উপর দেশীয় সেক্রেটারী এবং কালেক্টারের গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিশপ টার্নারের উদ্যোগে ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাকালে রামকমল অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ রামকমল এই সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। কলকাতায় মেডিক্যাল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশী ও বিদেশী সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের স্মরণাপন্ন হলেন তখন লর্ড বেণ্টিঙ্কের নির্দেশে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। রামকমল এই কমিটির একজন সদস্য মনোনীত হন। ১৮৩৯ সালে তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশানের সদস্য মনোনীত হন। সে সময়ে কাউন্সিলে ডাঃ গ্রাণ্ট, ক্যামেরণ, এডোয়ার্ড রেয়ান প্রভৃতি বিদেশীরাও সদস্য ছিলেন।

১৮৩৪ সালে রামকমল তাঁর "ইংরেজী-বাংলা" অভিধান প্রকাশ করেন। দীর্ঘ সাতেরো বছর প্রতীক্ষার পর এই বৃহৎ শব্দকোষ ১৮৩৪ সালে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। অভিধান প্রকাশের কাজ, যথাঃ ছাপার কাগজ ও কালি সংগ্রহ থেকে প্রুফ সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ফেলিকস্ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সহযোগিতা অবর্ণনীয়। এই অভিধান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্বীকৃত গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদেশী সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য ভারতীয় ভাষায় যে সমস্ত ইংরেজী অর্থ সম্বলিত অভিধানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তার মধ্যে রামকমলের অভিধান অন্যতম।

রামকমলের অভিধান প্রকাশিত হবার পূর্বে কয়েকজন বিদেশী প্রাচ্য ভাষাবিদ্ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অভিধান রচনার সময়ে নিজেদের সুবিধার্থে সরকারী সাহায্যে পণ্ডিত অথবা মুন্সী নিয়োগ করেন। কিন্তু রামকমলের ভাগ্যে এ ধরনের কোন সরকারী সাহায্য জোটেনি। এমন কি, কোন কোন বিদেশী নিজেদের অভিধান মুদ্রণের ব্যয় সরকারী তহবিল থেকে পেয়েছেন এ নজিরও আছে। এদের মধ্যে গিলক্রাইস্ট, ফস্টার, হাণ্টার, গ্লাডউইন, উইলসন, কেরী, হফ্ এবং মলসওয়ার্থ অভিধান রচনার কাজে সরকারী সাহায্য পেয়েছেন। এ বিষয়ে রামকমলের উক্তি লক্ষ্যণীয়—

"The encouragement and assistance given by Government to the publication of most of the above works consisted of a monthly allowance for an establishment of Moonshees, Pundits and writers, employed in-translating, copying, and collating

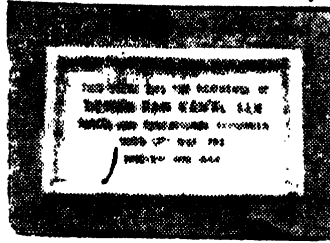
manuscripts; on the completion of the works the whole of the printing charges were in some instances granted to them."

কিন্তু রামকমলের ভাগ্যে সরকারী সাহায্য তো জোটেই নি, উপরন্তু সরকারী কর্মব্যস্ত রামকমল দৈনন্দিন বিশ্রামসুখ ভোগ না করে দীর্ঘদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্বল দেহ নিয়ে অভিধান রচনার কাজে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। নিজের শারীরিক অক্ষমতা ও কর্মব্যস্ততার বর্ণনা প্রসঙ্গে রামকমল বলেছেন—

"My case is quite different; my indifferent health and deep engagements in important official duties and literary pursuits left me but a brief leisure during the day for relaxation, from which I curtailed a part, and devoted it to this unfruitful, dry, and arduous work."

কেবল নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমই নয়, প্রচুর অর্থব্যয় করে শতাধিক বছর আগে রামকমলের অভিধান প্রকাশ এদেশে বিদেশী ভাষা প্রচলনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।

আগেই বলা হয়েছে যে, স্কুল বুক সোসাইটী এবং হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথমে রামকমল ডাঃ জনসনের (Octavo সংস্করণ) চল্লিশ হাজার শব্দ সম্বলিত অভিধানটির বাংলা অনুবাদ শুরু করেন। ১৮১৭ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় একটি প্রেসে পাণ্ডুলিপি ছাপাবার জন্য দেওয়া হলো কিন্তু ছাপার কাজে বিশেষ দেরী হতে লাগল। রামকমল যখন অভিধান ছাপাবার কথা মনস্থ করেন সে সময় ঐ কাজের ব্যয় বহনের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এই কাজের জন্য তাঁকে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু ছাপার কাজে দেরী হওয়াতে তিনি এই ব্যয়বহুল কাজে অগ্রসর হতে দ্বিধাবোধ করলেন। এই সময়ে উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী বন্ধুদের অনুরোধে রামকমল পুনরায় ছাপার কাজে অগ্রসর হবার কথা স্থির করেন। মন্থরগতিতে একশো ষোল পৃষ্ঠা ছাপার পর প্রেস কর্তৃপক্ষ পূর্বের চুক্তির চেয়ে বেশী টাকা দাবী করায় রামকমল এ কাজে আর এগুতে পারলেন না। ফলে রামকমলকে ঐ একশো ষোল পৃষ্ঠার ছাপার খরচ দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে রামকমল কথাবার্তা চালাতে লাগলেন এবং শ্রীরামপুর প্রেসের কর্তৃপক্ষ অভিধান ছাপাতে স্বীকৃত হলেন। এছাড়া, এ আশ্বাসও দিলেন যে, অভিধানটি যতদূর নির্ভুল হয় সেদিকেও তাঁরা বিশেষ যত্ন নেবেন। এই কাজে ডাঃ কেরী এবং মার্শম্যান অভিধানের প্রুফ দেখে রামকমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু



দেওয়ান রামকমল সেনের বাসগৃহের গায়ে পাথরের ফলক

শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপার কাজ আরম্ভ হবার সময়ে এক নূতন বাধা উপস্থিত হলো। কলকাতার যে প্রেসে একশো ষোল পৃষ্ঠা ছাপান হয়েছিল সেই একশো ষোল পৃষ্ঠার সঙ্গে শ্রীরামপুর প্রেসের টাইপ, কাগজ ইত্যাদির বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামপুর প্রেসের তুলনায় কলকাতার প্রেসের টাইপগুলি অনেক বড়। ঠিক এক ধরনের টাইপের অভাবে ছাপা বন্ধ রইল। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য শ্রীরামপুর প্রেস কর্তৃপক্ষ রামকমলকে জানালেন যে, তিনি যদি রাজী হন তবে তাঁরা নূতন মুদ্রাক্ষর তৈরী করে নেবেন এবং কলকাতার প্রেসের ব্যবহৃত পাটনা কাগজের পরিবর্তে নিজেদের প্রস্তুত কাগজ ব্যবহার করবেন। এর জন্যে রামকমলকে কলকাতার প্রেসের একশো ষোল পৃষ্ঠার মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি নাকচ করতে হবে। অন্য কোন উপায় না দেখে রামকমল এই প্রস্তাবেই রাজী হলেন। ডাঃ জনসনের অভিধানের টড (Todd) সংস্করণটি এই সময়ে এদেশে এসে পৌঁছেছে। এতে রামকমলের পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা টডের অভিধানটির অনুবাদ পূর্বের পাণ্ডুলিপির সাথে সংযোজনের অনুরোধ জানান। এই অনুরোধে রামকমল টডের সংস্করণের অনুবাদ পূর্বের পাণ্ডুলিপির সাথে একত্রিত করা শুরু করলেন। ওদিকে শ্রীরামপুর প্রেসে পূর্বের একশো ষোল পৃষ্ঠা নাকচ করার পর ছোট টাইপে শ্রীরামপুর মিলে প্রস্তুত কাগজে পুনরায় ছাপা হতে লাগল। কিন্তু এই সময়ে কেরীর পুত্র ফেলিকস্ কেরী মারা যাওয়াতে (১৮২২) ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে গেলো। অপরদিকে ওয়ার্ড সাহেবের অনুপস্থিতিতে কাজ শুরু করার কোন সম্ভাবনা নেই। ওয়ার্ড সে সময়ে বিলেতে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ওয়ার্ড ফিরে এলেন কিন্তু অভিধান মুদ্রণের জন্য তাঁর কোন উৎসাহ নেই। নিজের কতকগুলি বই মুদ্রণের জন্য বছরখানেক বিশেষ ব্যস্ত রইলেন। ওয়ার্ড যে সময়ে অভিধান মুদ্রণের সুযোগ পেলেন সে সময়ে তিনিও হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ফেলিকস্ কেরী ও ওয়ার্ডের মৃত্যুতে মুদ্রণের কাজ আরও পিছিয়ে যায়। নানারকম বাধা বিপত্তির পর নয় বছর পর রামকমল যখন তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা মুদ্রিত অবস্থায় পেলেন তখন অন্য এক সমস্যা উপস্থিত। যে কাগজে ছাপা হয়েছে সেই কাগজের রং পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া, অক্ষরগুলি বিশেষ অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ছাপার পর এই অবস্থা দেখে মার্শম্যান ঐ কাগজে আর ছাপাতে রাজী নন। কারণ এতে তাঁর প্রেসের সুনামহানির সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ সময়ে (১৮২৭)

শ্রীরামপুরে প্রেস থেকে দুটি ছোট অভিধান প্রকাশিত হয়। এ দুটি অভিধান ডাঃ কেরীর তিন খণ্ডের অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং এর সম্পাদনা করেন মার্শম্যান স্বয়ং। একের পর এক বিভিন্ন বাধা রামকমলকে এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করে এবং সরকারী কাজে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হওয়ায় ভগ্নস্বাস্থ্য রামকমল ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েন। তথাপি শেষ চেষ্টা হিসেবে শ্রীরামপুরে প্রেসের সঙ্গে পুনরায় নূতন চুক্তি করে এক বছর দুই মাসে পাঁচশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা এবং দুই বছরে পাঁচশো ষাট পৃষ্ঠা মুদ্রিত অবস্থায় পেলেন। অভিধানে সর্বসমেত ষাট হাজার শব্দ মুদ্রিত হলো। পাণ্ডুলিপি রচনার সময় থেকে অভিধান প্রকাশিত হবার সময়ে মোট সতেরো বছর সময় লাগে। দুটি খণ্ডের মূল্য পঁচিশ টাকা হিসেবে পঞ্চাশ টাকা ধার্য হয়। এই বৃহৎ শব্দকোষ তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ককে উৎসর্গ করা হয়। অভিধান প্রকাশের জন্যে রামকমল অভিধানের মুখবন্ধে মার্শম্যান, সংস্কৃত কলেজের কাব্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপক উইলসনের সহকারী অমলাচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

রামকমলের অভিধান প্রকাশিত হবার পর ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়াতে এই বৃহৎ শব্দকোষের প্রশংসা করে লেখা হলো—

"The fullest and most valuable work of its kind ..., and will be the most lasting monument of his industry, zeal and erudition.

It is perhaps the worl by which his name will be recognised by posterity.

অভিধান প্রকাশের পর দশ বছর পর্যন্ত রামকমল জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে রামকমল কলুটোলা থেকে পিতৃগৃহে গরিফায় যান এবং সেইখানেই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগস্ট ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামকমলের মৃত্যুর সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র ছয় বছরের বালক।

রামকমলের মৃত্যুতে কলকাতার বাঙালী সমাজ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কয়েক বছর আগে রাজা রামমোহনের শোকের ছায়া মুছতে না মুছতেই রামকমলের মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা স্বীকার করে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে সম্পাদকীয় লেখা হলো—

"There is scarcely a public institution in Calcutta of which he was not a member, and which he did not endeavour to advance by his individual exertions ... He was equally honoured in the European and Native community, and had long been considered as one of the most eminent and influential natives of the metropolis."

রামকমলের অন্যতম কর্মস্থল এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি ১৮৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ঘোষণা করা হলো—

"Among the members who have been taken away rfom the society by death, Ramcomul Sen may perhaps be reckoned as me foremost whose loss noss to be deplored."

কলকাতার শোকাভিভূত সুধীসমাজ এসিয়াটিক সোসাইটীতে সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যার এডোয়ার্ড রেয়ানের সভাপতিত্বে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করলেন—

"The Secretary announced with deep regret to the society the death of.... Dewan Ram Comul Sen, a gentleman not less distinguished by his great attainments, his enlightened views, his steady attachment to the cause of education, and his untiring energy and industry in every good and useful work by which the community Native or European, could be benifited, then by his modest and even retiring character and extensive charity".

রামকমলের বিদেশী গুণমুগ্ধদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক উইলসন অক্সফোর্ড থেকে ২রা নবেম্বর, ১৮৪৪ সালে লিখলেন—

A more sound and sterling character the society of Calcutta, Native or European, cannot boast of. The good of his country, the elevation of his countrymen, were the great objects of his life; but he never made a parade of his public spirit and rather shrank from than courted notice".

জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে যেদিন রামকমল সেনের কলুটোলার ভগ্নপ্রায় বাড়ীর (৩৪নং রামকমল সেন লেন) সামনে এসে দাঁড়ালাম সেদিন ক্ষণিকের জন্যে আমিও যেন এক শতাব্দী পিছিয়ে গেলাম। সেই পিছিয়ে যাওয়া পরিবেশে যে পথে আমি দাঁড়িয়ে আছি—যে গৃহে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই পথে, সেই গৃহে যেন দেখলুম বাঙালী রামমোহনের পাল্কী এসে দাঁড়িয়েছে, সহাস্যে রামকমল রাজাকে অভ্যর্থনা করছেন। একে একে দেখি সকলেই। যাঁদের আজ আমরা খুঁজে পেতে আরও কাছে পেতে চাই পুরোনো পুঁথি, সরকারী দলিল, ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, সমাধি এবং মিউজিয়ামের তমসাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে—তাঁদের সকলেই যেন মিছিল করে এলেন। কালো কুচকুচে ওয়েলার-টানা জুড়িতে বালক দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরে প্রিন্স দ্বারকানাথ, সেপাই বরকন্দাজ শোভিত শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত। ধীর পদক্ষেপে ডাঃ কেরীর গুরু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ব্রুহাম চেপে অক্সফোর্ডের বডেন অধ্যাপক হোরেস হেমান উইলসন। আরও কত কে। সকলকে কি চিনি? এক শতাব্দী এগিয়ে যাওয়া যুগের মানুষ আমি এক শতাব্দী পেছনের সকলকে কি চেনা যায়? যখন চেতনা ফিরে এলো, তখন সামনে তাকিয়ে দেখি সাদা প্রস্তর ফলকে লেখা—

**This House was the Residence of Dewan Ram Comul Sen....**

# গুজরাটে পেট্রল পাওয়া গেল

**অমরেন্দ্রকুমার সেন**

দেশের পক্ষে সুখবর, নিঃসন্দেহে। প্রথমে খবর পাওয়া গেল, ক্যাম্বে থেকে মাত্র আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে লুনেজে ৮ই সেপ্টেম্বর পেট্রল পাওয়া গেছে। তারপর এক মাস যেতে না যেতেই খবর ছাপা হল যে, জামসেদপুরের কাছে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। আবার এক মাসের মাথায় মাথায় খবর এল যে, বরোদা শহর থেকে মাত্র চার মাইল দূরে বদসেরে মাত্র ৬০০ ফুট খুঁড়ে পেট্রল পাওয়া গেছে। সেই পেট্রল ফোয়ারার মতো ৬০ ফুট উঁচু হয়ে বেগে বেরিয়ে আসছে।

বদসেরে যেখানে পেট্রল পাওয়া গেল সেখানে গত ছ' মাস ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। শেষ পর্যন্ত বদসের ছেড়ে চলে যাওয়াই ঠিক হয়েছিল কিন্তু কী ভেবে একদিন "গ্রেস" দেওয়া হল এবং সেই, অতিরিক্ত দিনটিতেই তেল পাওয়া গেল। বদসেরে যে তেল পাওয়া গেছে সে তেলের রং নাকি লুনেজের তেলের চেয়েও ভাল। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে, এখানে হয়ত আরও বেশি পরিমাণে তেল আছে। লুনেজ থেকে বদসেরের দূরত্ব ৫০ মাইল।

আসামের পরেই গুজরাট হল দ্বিতীয় স্থান যেখানে পেট্রলের সন্ধান পাওয়া গেল। অবশ্য জ্বালামুখী বা হোসিয়ারপুরে পাওয়া গেছে কিন্তু তা কতখানি আশা পূর্ণ করবে কেউ বলতে পারে না। একজন রুশ পেট্রল বিশেষজ্ঞ, যিনি এখানে কাজ করছেন তিনি বলেছেন যে, সমস্ত কচ্ছ এলাকাটাই পেট্রলে টইটম্বুর। কেউ ইতিমধ্যেই এটিকে "দ্বিতীয় আবাদান" বলতে শুরু করেছেন। সুবিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ডঃ এম. এস. কৃষ্ণান্ বলেছেন যে, ভারত অচিরেই পেট্রলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

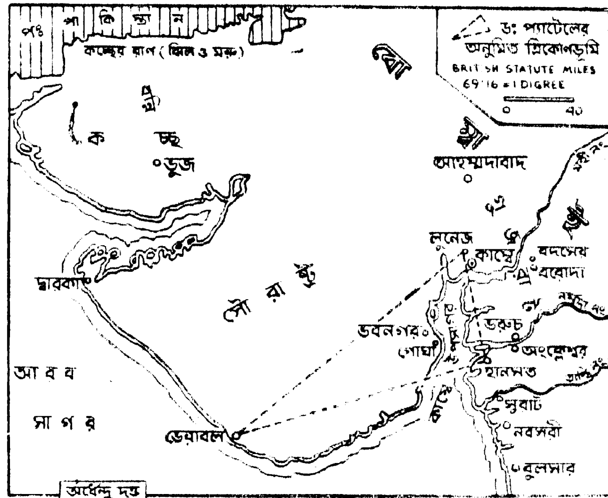
পেট্রল মানেই শুধু মোটরগাড়ি চালাবার পেট্রল নয়। পেট্রলের সংগে পাওয়া যায় কেরোসিন, ডিজেল ও অন্য নানারকম তেল, এরোপ্লেন চালাবার অ্যাভিয়েশান অয়েল, যন্ত্রপাতিতে দেবার জন্য নানারকম লুব্রিকেটিং তেল, গ্রিজ্ এবং আনুসংগিক অনেক কিছুই পেট্রলের দৌলতেই পাওয়া যায়। অতএব কোনো স্থানে পেট্রল পাওয়া বিশাল এক রাজত্ব পাওয়ার সামিল।

পেট্রলকে আপনি যে অবস্থায় দেখেন, কূপ থেকে ঠিক সেই জিনিসটি উঠে আসে না। যা উঠে আসে তাকে বলা হয় ক্রুড অয়েল। ভারতে বছরে ক্রুড অয়েল খরচ হয় প্রায় ৫০ লক্ষ টন, তার মধ্যে দেশে পাওয়া যায় মাত্র চার লক্ষ টন। বাকিটা বিদেশ থেকে কিনতে হয় যার দাম কোটি কোটি টাকা। দেশে তিনটি নতুন রিফাইনারি স্থাপিত হওয়ায় কিছু টাকা বাঁচে কিন্তু আরও টাকা বাঁচানো দরকার। সেই টাকা বাঁচাতে হলে দেশে পেট্রল পাওয়া দরকার। যুদ্ধের পর যে সকল দেশে পেট্রলের চাহিদা বেড়েছে তাদের মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম। ভারতে প্রতি বছরে ক্রুড অয়েলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে শতকরা ৮ ভাগ করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ক্রুড অয়েলের মোট চাহিদা দাঁড়াবে বছরে মোট পাঁচ কোটি টন।

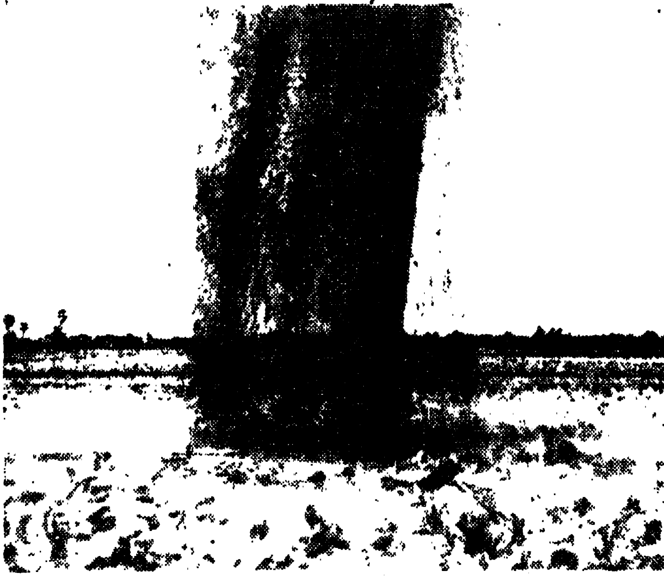
আসাম ও গুজরাটে যে পরিমাণ পেট্রল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা সফল হলে দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে।

ক্যাম্বে একদা একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল, দেশে বিদেশে এখান থেকে বহুরকম পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানি হত। এমন একটি বন্দরকে পর্তুগীজরা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে নষ্ট করে দেয়। পরে সুরাটে এবং আরও পরে ইংরেজরা বোম্বাইয়ে বন্দর স্থাপন করায় ক্যাম্বের গুরুত্ব একেবারেই কমতে কমতে লোপ পেয়ে যায়। ক্যাম্বে হয়ত আবার বড় হবে। গুজরাট একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হবে, আমেদাবাদ তার রাজধানী হবে, এই আশা করে অনেকে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে জমি কিনে রেখেছিলেন, পরে চড়া দামে বেচবেন বলে। তাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন কিন্তু এখন আবার তাঁরা আরও বেশি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।

লুনেজে পেট্রল পাওয়ার সংগে সংগে আরও একটি সুখবর পাওয়া গেছে, সেটি হল, কচ্ছ বিভাগে বন্নি নামে জায়গায় প্রাকৃতিক জ্বালানি গ্যাসের অস্তিত্ব। ইটালি, ফ্রান্স এবং পাকিস্তানে এই জ্বালানি গ্যাস পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক জ্বালানি গ্যাসের সার বস্তু হল মিথেন গ্যাস। অন্যান্য দেশেও হয়ত এই গ্যাস পাওয়া যায়, তবে ইটালি ও ফ্রান্স গ্যাসটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। আমেদাবাদ, নাদিয়াদ, বরোদা, সুরাট, বুলসর ও ভবনগরে যেসব কলকারখানা আছে ও নতুন যেসব কারখানা গড়ে উঠছে সেখানে এই জ্বালানি গ্যাসের সদ্ব্যবহার হবে।




তবে বন্নিতে এই জ্বালানি গ্যাস পাওয়ার খবর নতুন কিছু নয়। বছর চল্লিশেক আগে খাস্ বরোদায় এই গ্যাস পাওয়া যেত। এই শতাব্দীর বিশ দশকে সার মনুভাই মেটা যখন গাইকোয়াড়ের দেওয়ান ছিলেন তখন তিনি রান্না আর জল গরম করবার জন্যে পাইপ দিয়ে তাঁর বাবুর্চিখানায় এই গ্যাস টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। জলের কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে এই গ্যাসের অস্তিত্ব জানা যায়। বরোদায় এইরকম আরও দুটি কুয়ো ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল বরোদার মহারাজার বাগানের মধ্যে। একটি থেকে নাকি পেট্রলও উঠেছিল কিন্তু তখন ইংরেজ রাজত্ব, অতএব এ নিয়ে আর নাড়াচাড়া হয়নি: তবে সার্ মনুভাইয়ের বাংলোয় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সেই গ্যাস ব্যবহৃত



মাটি থেকে প্রথম ক্রুড অয়েল এইভাবে বেগে ফোয়ারার মতো উঠে আসে

হয়েছিল। আরও হয়ত চলত কিন্তু যে কুয়ো থেকে গ্যাস উঠত তার মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি পড়ে যাওয়ায় এক বিস্ফোরণ ঘটে—ও সেই সঙ্গে এখানেই এর পূর্ণচ্ছেদ পড়ে।

এ হল গ্যাসের কথা। বছর পঁচিশেক আগে ভবনগরের গোঘাতেও গ্যাস পাওয়া যেত। এখানেও শীঘ্রই পেট্রলের জন্যে 'ড্রিলিং' শুরু হবে। সেই সময় এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ভবনগরের রাজপরিবারে এক বিবাহ উপলক্ষে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী সুলতান চিনয় ৫০ খানি মোটরগাড়ি বিক্রয় করেন। এই সময় তাঁর কানে একটা কথা আসে যে, গোঘাতে নাকি গ্যাস পাওয়া যায়। কাছাকাছি একটা গ্রাম আছে, সেখানকার মাটি তেলা তার চটচটে বলে গ্রামটির নামই নাকি 'তেলোয়া'।

কথাটা চিনয় সাহেবের মাথায় ঢুকল। তিনি ভবনগর থেকে বোম্বাইয়ে ফিরে ১৯৩৩ সালে একটা লাইসেন্স নিলেন; গোঘা অঞ্চলের মাটিতে ড্রিলিং করে দেখবেন পেট্রল ওঠে কিনা। পরের বছরেই জানা গেল যে, সেখানে গ্যাস আছে। চিনয় সাহেব উৎসাহিত হয়ে আমেরিকা আর কানাডায় গেলেন, ফিরলেন যন্ত্রপাতি আর মিঃ জি. সি. ডিকারসনকে নিয়ে। সাহেব নাকি পেট্রল খুঁজে বার করতে ওস্তাদ। প্রথম ড্রিলিং করল আমেদাবাদের একটি টিউবওয়েল কম্পানি। খুঁড়তে খুঁড়তে ৮১০ ফুট পর্যন্ত পেঁছিনো গেল, সেখান থেকে উঠল এক উষ্ণ প্রস্রবণ; আরও খানিকটা খুঁড়তে উঠল গ্যাস। ক্যাম্বে উপসাগরের উভয় তীরে প্রায় দু' বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চলল।

দুঃখের বিষয়, ডিকারসন আসলে ছিল একজন বোরিং মেকানিক, পেট্রল পাবার জন্যে কী ভাবে মাটির মধ্যে তুরপুণ চালাতে হয় সে ছিল তারই একজন উঁচুদরের মিস্ত্রি। তথাপি গোঘায় যে গ্যাস পাওয়া গেল তারই জোরে এক কম্পানি গঠন করবার তোড়জোর চলতে লাগল। কাঠিয়াবাড়ের কয়েকটি রাজপরিবার এবং আরও অনেকেই সাহায্যের আশ্বাস দিলেন, এমন কি ভারত সরকারও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে ভাল করে খোঁজখবর করবার জন্যে পি. কি. ঘোষ নামে একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠালেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন যে, এখানে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাওয়া যাবে যা নানারকম শিল্পকাজে ব্যবহার করা যাবে ও খুব সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাবে।

সার হোমী মেটা, সার ফিরোজ সেঠনা, মিঃ এফ. ই. দীনশা, মিঃ রহিমতুল্লা চিনয় এবং মিঃ মফতলাল গগলভাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা মিলিত হয়ে একটি গ্যাস সিণ্ডিকেট গঠন করা এবং আরও টাকা তুলে পেট্রলের জন্যে অনুসন্ধান করা ঠিক করলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ঠিক এই সময়ে কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে, যে সকল রাজন্যবর্গ সাহায্যের আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা সকলে পেছিয়ে পড়লেন এবং অন্যান্য অসুবিধা ও বাধা আসতে লাগল। অতএব চিনয় সাহেবকে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল। অদৃশ্য ইঙ্গিতে যে ইংরেজদের সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে তখন কাজ বন্ধ হওয়ায় ভালই হয়েছে বলতে হবে, কারণ তখন পেট্রল পাওয়া গেলে, গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা হয়ত 'পোড়ামাটি' নীতিতে সব কিছু নষ্ট করে দিতেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর চিনয় সাহেব তাঁর সব কাগজপত্র ও সংগৃহীত তথ্যাদি বোম্বাই সরকারকে দিয়ে দেন। গোঘায় একদা যা আরম্ভ করা হয়েছিল তা নিষ্ফল হয়নি দেখা যাচ্ছে।

এখানে আর একজন লোকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর নাম হল ডঃ এম. এস. প্যাটেল। একদা তিনি বোম্বাই সরকারের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট ছিলেন। তিনিও গত পঁচিশ বছর ধরে বলে আসছেন যে, কচ্ছ অঞ্চলে হয় পেট্রল নয়ত প্রাকৃতিক জ্বালানি গ্যাস প্রচুর পরিমাণে আছে। ইংরেজ সরকারের আমলে তিনি সুদীর্ঘ রিপোর্টও পেশ করেছিলেন কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাজ কিছু হয়নি।

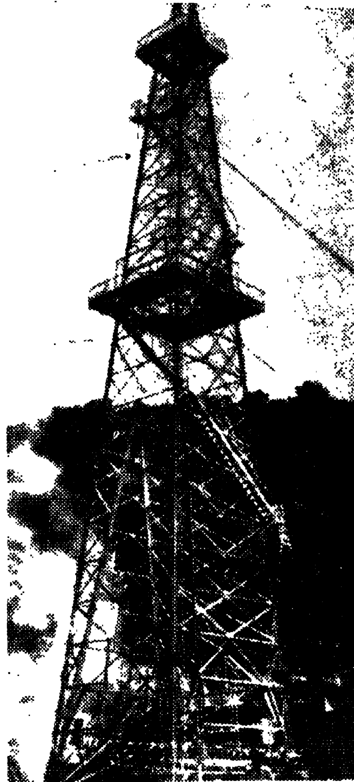
তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। দেশ স্বাধীন হল। পাকিস্তান ১৯৫৪ সালে

বেলুচিস্থানের সুই নামক একটি জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেল। পাকিস্তান সরকার ঠিক করল যে, ৩৫০ মাইল তফাতে করাচীতে ঐ গ্যাস পাইপে করে টেনে আনবে। এই সময়ে ডঃ প্যাটেল সরকারকে আর একবার তাঁর সেই পুরনো রিপোর্টের কথা মনে করিয়ে দিলেন এবং তিনি মানচিত্র এঁকে একটা ত্রিকোণভূমি নির্দিষ্ট করে দিলেন। তাঁর অনুমান যে, এই ত্রিকোণের মধ্যে একটা কিছু পাওয়া যাবে। এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু হল ক্যাম্বের কাছাকাছি আর অপর দুটি কোন হল ভেরাবল আর হানসোতে। সুখের বিষয় যে, শীর্ষবিন্দুর প্রায় ওপরেই লুনেজে তেল পাওয়া গেল।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে ক্যাম্বেতে এখন খুব জোর কাজ চলেছে; তার কারণ বোধহয় যে-সকল ভারতীয়ের ওপর কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তারা এখনও যুবক, নবীন উৎসাহে তারা কাজ করছে, তাদের গড়ে বয়স ২৫। এদের মধ্যে অনেকেই ক্যাসপিয়ান সাগরের তীরে রাশিয়ান পেট্রল-শিল্প-অঞ্চল বাকুতে যেয়ে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

ভারতের যে প্রান্তে ক্যাম্বে ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে আসাম। ভারতে আসামেই প্রথম পেট্রলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এখন থেকে প্রায় আশি বছর আগে, আসামের গভীর জঙ্গলে তখন আসাম রেলওয়েজ অ্যান্ড ট্রেডিং কম্পানি কয়লা আনবার জন্যে লেডো থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত রেল লাইন পাতছে। তখন জঙ্গল ছিল আরও গভীর, কালাজ্বরের ভয়ে ভীত সকলেই, যোঁকের উৎপাত, বাঘ, গণ্ডার আর ময়াল সাপ আর সেই সঙ্গে আসামের অবিশ্রান্ত বর্ষণ। জীবন মোটেই সহজ ছিল না, কোন্ মুহূর্তে কোন্ দিক থেকে কী বিপদ আসবে কেউ জানে না। এই গভীর জঙ্গল কার আর ভাল লাগে? ভাগ্যে দলের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে হাতী ছিল তাই রক্ষে। সজীব বুলডোজার এই হাতীর কিন্তু জঙ্গল বেশ ভালই লাগছিল। তার কোনো অসুবিধে নেই। সেখানে খাদ্য তার প্রচুর। খালি সে চায় পরম আরামে কিছুক্ষণ ধরে স্নান করতে।

একদিন একটি হাতী তার কাজের পর কাছাকাছি একটা জলা জায়গা থেকে স্নান করে এসে একটা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে যখন শুঁড় দোলাচ্ছিল তখন দেখা গেল, তার পায়ে কালো কালো চর্বির মতো কী সব লেগে রয়েছে। হাতীর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সেই জলাশয়ে গিয়ে পেট্রলের গন্ধ পাওয়া গেল, জলের সঙ্গে তেল ভাসতেও দেখা গেল। কিন্তু তখন এই নিয়ে আর অনুসন্ধান চালানো হয়নি। সম্ভবত তখন রেল লাইন অপেক্ষা পেট্রলকে



মাটি থেকে পেট্রল তোলবার জন্যে এই রকম ডেরিক বসানো হয়। এটির উচ্চতা ১৪৩ ফুট।

বেশি গুরুত্ব দেওয়ার সময় ছিল না। অবশ্য এর আগে ১৮৬৬ সালে; অর্থাৎ আমেরিকায় ১৮৫৯ সালে কর্নেল ড্রেক কর্তৃক পেট্রল আবিষ্কৃত হওয়ার সাত বছর পরে আসামে দুটি কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল কিন্তু পেট্রল পাওয়া যায়নি।

১৮৮২ সালে রেল লাইন সম্পূর্ণ হল, আর সেই রেল লাইনের ধারে ডিগবয় তখন ছোট্ট একটি স্টেশন। আসাম রেলওয়ে অ্যান্ড ট্রেডিং কম্পানি তখন একটু অবসর পাওয়ায় পেট্রলের খোঁজ করতে লাগল আর ১৮৮৯ সালে ডিগবয়ে পেট্রল পাওয়া গেল। তারপর থেকে ডিগবয়ে পাঁচ কোটি ব্যারেলেরও বেশি তেল উঠেছে। যা ছিল একদা নামে মাত্র একটি স্টেশন তা আজ রীতিমতো একটি অয়েল টাউন। ১৯২০ সালে আসাম অয়েল কম্পানি গঠিত হল।

ডিগবয়ের পরে নাহরকাটিয়া ও মোরান অঞ্চলেও প্রচুর পেট্রল পাওয়া গেছে। ভারত সরকার আসাম অয়েল কম্পানির সঙ্গে সহযোগিতায় অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। অয়েল ইণ্ডিয়া আসামের শিবসাগর, মিকির হিল এবং অন্যান্য অঞ্চলে নভেম্বর মাস থেকে পেট্রল অনুসন্ধান করবেন। ডিগবয়ে যে রিফাইনারিটি আছে সেটি খুব পুরনো, তাকে আধুনিক ও বড় করা হচ্ছে। গৌহাটী ও বিহারে বরৌনিতে একটি করে রিফাইনারি বসবে।

ভারত সরকার সুনির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা রচনা করে কাজ করে যাচ্ছেন; কিন্তু সব কিছু নির্ভর করছে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রল পাওয়ার ওপর। আশা করা যাক যে, আসাম আর কচ্ছ আমাদের নিরাশ করবে না; সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে একটি বিদেশী কম্পানি এখনও পেট্রল খুঁজছেন।

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে অথবা যখন খুব বরফ পড়ে, তখন পুলিসদের পক্ষে পথের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত ঠাণ্ডাতেও বেশ কষ্ট পেতে হয়। ডারহামের পুলিসদের আর এরকম কষ্ট পেতে হবে না এবং ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় বার হয়ে যানবাহন চলাচলের নির্দেশ দিতে হয় না। এখানে আজকাল টেলিভিশনের সাহায্যে পুলিসরা তাদের বুথের মধ্য থেকেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। এই পুলিস বুথে দুটি খোঁটার ওপর টেলিভিশন





টেলিভিশনের সাহায্যে রাস্তার যানবাহনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে

যন্ত্র স্থাপন করে রাস্তার যানবাহনাদির যাতায়াত লক্ষ্য করা হয়। সমস্ত গাড়ি-ঘোড়া সহ রাস্তার ছবিটি টেলিভিশনে প্রতিফলিত হয় ,এবং পুলিস বুথে সাধারণভাবে যে তিনটি আলোর সঙ্কেত থাকে, সেগুলি তখন কাজ করে।

*

সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাণীতত্ত্ববিদ ক্রিমিয়ার নিকট "ব্ল্যাক সী'র উপকূলভাগে অভিযানে গিয়েছিলেন। এরা সমুদ্রের মধ্য থেকে নানারকম প্রাণী এবং তাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন, এছাড়া মৎস্য শিকারের এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, মাছেদেরও ভাব প্রকাশের একটা ভাষা আছে, সে ভাষার অতি সূক্ষ্ম আওয়াজ মানুষের কর্ণগোচর না হলেও মাছেরা অনায়াসেই শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকগণ মাছেদের ঐ আওয়াজ মাইক্রোফোনের সাহায্যে রেকর্ড করেছেন এবং রেকর্ডে ধরা শব্দ আবার সমুদ্রের ভেতরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং মাছেরা তাদের পরিচিত আওয়াজে রীতিমত সচেতন হয়ে উঠে যেখান থেকে শব্দ শোনা যায়, সেইখানে এসে জড়ো হয়। তখন ঐখানে জাল ফেলতে পারলে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। এরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মাছের জাতিভেদ অনুসারে নানারকম শব্দ তৈরী হওয়ায় মাছেদের মধ্যেও বিভিন্ন শব্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মাছের সাড়া পাওয়া যায়। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ তাঁদের এই কৌশল বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন।

*

নিউ ইয়র্কের অপটোমেটিক সেণ্টার ট্রাই-অপটিক নামে একরকম লেন্স তৈরী করেছেন। ট্রাই-অপটিক লেন্সের সাহায্যে প্রায়ান্ধ লোকেদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী এরা প্রায় ২৮১ জন প্রায়ান্ধ মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণ লাইট হাউসে ব্যবহৃত লেন্সগুলি যে পদ্ধতিতে তৈরী হয়, এই লেন্সও সেইভাবে তৈরী করা হয়। ট্রাই-অপটিক লেন্সে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একত্র সমন্বয় ঘটেছে। সমগ্র লেন্সটি যদিও ½ ইঞ্চির মত পুরু হয়, কিন্তু খুব হাল্কা হওয়ার দরুণ অনায়াসেই চশমার জন্য ব্যবহার করা যায়।

*

ইউনাইটেড নেশনের এক খবরে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই জ্বালানী বস্তুর অভাব ঘটবে। এর জন্য এখন থেকেই ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানী কাঠ ও কয়লা সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন। ভারত সরকারের বনবিভাগের কর্তৃপক্ষের মতে ভারতের জ্বালানী কাঠের চাহিদার অনুপাতে উৎপন্ন কাঠের পরিমাণ ক্রমশই কম মনে হচ্ছে অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এরা আরও বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ১৯৭৫ সাল নাগাদ জন-প্রতি জ্বালানী বস্তুর চাহিদা শতকরা ১৮ ভাগ বেড়ে যাবে এবং সেই জায়গায় উৎপন্ন জ্বালানীর পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ কমে যাবে। এদের হিসাবানুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬০০০০০০০ টন কয়লা উৎপন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়, কিন্তু এও প্রায় দুরাশা বলেই মনে হয়। অতটা কয়লা ঐ সময়ের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে এঁরা খনিজ তেল ও বৈদ্যুতিক শক্তির ওপর নির্ভর করার কথাই ভেবেছেন। এছাড়া ঘুঁটেও একরকম জ্বালানী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করার কথাও বলেছেন। বেশী করে এই সব ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে জ্বালানী কাঠের খরচকে কমিয়ে ফেলার বিশেষ প্রয়োজন।

*

ভারতবর্ষজাত সমস্ত পশমই খুব ভালো হয় না। এই কারণে ভারতের বেশীরভাগ পশমই কার্পেট তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। এ পশম দিয়ে পোশাকের উপযোগী খুব ভাল জাতের গরম কাপড় তৈরী হয় না। আমরা বর্তমানে রাজস্থান থেকে বছরে ৩০০০০০০ পাউণ্ড পশম পাই, কিন্তু সেগুলো খুবই ভাল জাতের নয়। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান উলেন অব এগ্রিকালচার ভাল জাতের পশম ভারতে উৎপন্ন করার জন্য একটা কর্মসূচী ঠিক করেছেন। এরা কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের ব্যবস্থা করে ভাল জাতের ভেড়া জন্মানোর ব্যবস্থা করবেন। এর জন্য এরা কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশে ভেড়া প্রজননের কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন এর জন্য ভারতকে তাদের দেশের ভেড়া থেকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে ভারতীয় ভেড়া প্রজননের সুব্যবস্থা করেছেন।




**মা**ঝরাত্তিরে এক-আধ দিন আমার ঘুম ভেঙে যেত। দেখতাম, জ্যোৎস্না আমার মুখের উপরে এসে পড়েছে। কী-এক অপার্থিব বিস্ময়ে আমার সারা মন তখন ভরে উঠত। বাগানের মধ্যে বিছানা পাতা। তার উপরে শুয়ে অবাক হয়ে আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হত, আমি যেন আমার মায়ের পাশে শুয়ে আছি। হাত বাড়ালেই মাকে ছুঁতে পাব।

গ্রীষ্মকালে আমরা ঘরের মধ্যে ঘুমোই না। বাগানে গিয়ে ঘুমোই। বাড়ির কথা তখন সবাই ভুলে যায়। রান্না করবার জন্য, কি বিছানা-বালিশ নিয়ে আসবার জন্য এক-আধবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হয়, এই পর্যন্ত। তা ছাড়া আর তখন বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। গ্রীষ্মকালের এক-একটা সন্ধ্যা, আঃ, সে যে কী আরামের। উঠোনে জলের ছড়া দেওয়া হয়েছে, মাদুর বালিশ আর কম্বল এনে একপাশে জড় করে রাখা হয়েছে। তারপর পরিপাটি করে বিছানা করা হল, আপনি গিয়ে তার উপরে গা ঢেলে দিলেন। সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে। ভারী মিঠে গন্ধ। মাটির গন্ধ। চারদিক নিস্তব্ধ। সামনে টালির ঘর। তার ছাদের উপরে ছায়া পড়েছে। ছায়া পড়ে আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে। আকাশে ঠান্ডা, গোল চাঁদ। নিশ্বাস নিতেও ভয়-ভয় করে। কাশতে ভয় করে। মনে হয়, সামান্য একটু শব্দ করলেই এই শান্ত আবহাওয়া যেন চমকে উঠবে। গায়ের উপরে কম্বলটাকে টেনে নিয়ে চুপটি করে আপনি শুয়ে আছেন। চাদরটা নতুন কাচা হয়েছে। নতুন-কাচা চাদরে অদ্ভুত একটা গন্ধ থাকে। সেই গন্ধটা আপনার নাকে এসে লাগছে। কোথায় যেন ঝিঁঝি ডাকছে। গাছের থেকে টুপ-টাপ করে পাতা ঝরে পড়ছে। পত্রপল্লবের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে রাতজাগা কয়েকটা পাখি। মাঝে-মাঝে তারা এ-ডাল থেকে ও-ডালে উড়ে যাচ্ছে। ঝিরঝির করে কোথায় যেন জল পড়ছে। দূরে, জিপসি বস্তিতে নাচ-গান হচ্ছে। শুয়ে শুয়ে আপনি আবছা একটা বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছেন। এছাড়া, আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

সেদিন রবিবার। আমাদের প্রতিবেশী স্ট্রাজকোর বড় ছেলের সেদিন বিয়ে। স্ট্রাজকোদের বাড়ি আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই। দু বাড়ির মাঝখানে শুধু একটা দেয়ালের ব্যবধান। বিয়েবাড়ি। নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আছে ঢালাও খাওয়া-দাওয়া। বাবা আর মা গিয়েছেন নেমন্তন্ন রাখতে। দিনভর আমি ওবাড়িতে ছিলাম। সন্ধ্যা-রাত্তিরে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। একা আমি বাড়িতে আছি। আর আছে নাশকো। দূর সম্পর্কে আমার বোন। আগের দিন মা তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। নাশকোকে আনা হয়েছে ঘর-বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। তা ছাড়া, আমাকেও সামলাতে হবে। মা-বাবা সারাদিন সারারাত বিয়ে-বাড়িতে থাকবেন, বাড়ি পাহারা দেবার জন্য তাই একটা লোক দরকার। নাশকোই রান্না-বান্না করবে, আমাকে খাওয়াবে। ওদিকে বিয়েবাড়িতে সারাদিন ধরে নাচগান চলছে। নাশকোর যদি ইচ্ছে হয়, পাঁচিলের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নাচ দেখতে পারে।

পাঁচিলটা নেহাত ছোট নয়। নাশকো তাই তার নীচে গাদা-গাদা পাথর সাজিয়ে রেখেছে। পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে নাচ দেখবে। নাশকো যখন পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও সন্ধ্যা হয়নি। আমিও তখন বিয়েবাড়িতে। তুমুল আনন্দ চারদিকে। সবে কোলো-নাচ জমে উঠেছে। আমিও নাচছি। ছেলেরা দেখলাম সকলেই আমার সঙ্গে নাচতে চায়। আমার বয়স তখন খুবই কম। তখন বুঝিনি যে, আমাকে নিয়ে এত টানাটানির উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আসলে নাশকোকে সবাই খুশী করতে চাইছে। পাঁচিলের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে নাশকো। এধার থেকে তার মুখখানিকে শুধু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর তার বুকের অল্প-একটু। পাঁচিলে বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে। নাশকো অবশ্য বিশেষ করে কাউকে দেখছে

না। অথচ তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে নাচবার জন্য যে এগিয়ে এল, তার নাম ম্লাডেন। লম্বা চেহারা। লাল টকটকে মুখ। নাশ্‌কোর কথা সে শুনেছিল। তাকে দেখবার জন্যই ম্লাডেন আজ বিয়েবাড়িতে এসেছে। এত সব সুন্দরী মেয়ে থাকতে সে যে তার নাচের সংগী হিসেবে আমার মত একটা বাচ্চা ছেলেকে বেছে নিল, ম্লাডেন চাইছিল, নাশ্‌কো সেটা দেখুক। দেখে তুষ্ট হক। ব্যাপারটা বোধ হয় নাশ্‌কো বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরে মিটিমিটি হাসছিলও। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ম্লাডেনের দিকে সে ভাল করে তাকায়নি পর্যন্ত।

সন্ধ্যা-রাত্তিরে একরকম জোর করেই আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিয়েবাড়ি থেকে চলে আসবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। অত আলো, অত নাচ-গান, কে ওসব ছেড়ে আসতে চায়। ভারী বিশ্রী লাগছিল আমার। আমাকে বাড়িতে রেখে মা-বাবা আবার বিয়ে-বাড়িতে ফিরে গেলেন। নাশ্‌কো আমাকে খাবার এনে দিল। খাবার আমি ছুঁলাম না পর্যন্ত। থালা থেকে বাদামগুলোকে তুলে নিয়ে নাশ্‌কোর দিকে ছুঁড়ে মারলাম। কিচ্ছু খাব না আমি। কেন খাব। নাশ্‌কো কিন্তু চটে গেল না। উঠোনে জলের ছড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ধীরে সুস্থে সে গিয়ে বিছানা পাতল। তারপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে বাটিতে করে খাবার নিয়ে এল।

আমার রাগ তখন পড়ে এসেছে। কিন্তু এত সুন্দর রাত্রি, কে এখন খাবার খাবে? চাঁদ উঠেছে। টালির ছাদের উপরে জ্যোৎস্না পড়ে ভারী শোভা খুলেছে। উঠোনটা অন্ধকার। সব কিছু যেন সেই অন্ধকারের মধ্যে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। মাঝে-মাঝে হাওয়া দিচ্ছে। গাছের পাতা নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, অন্ধকারও যেন নড়ে উঠবে। বিয়েবাড়িতে হট্টগোল কিন্তু একটুও কমেনি। এখন চলেছে খাওয়া-দাওয়ার পালা। মাঝে-মাঝেই পেয়ালা, পিরিচ, চামচ আর কাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে অল্প-একটু আলো এসে উঁকি দিচ্ছে এধারে। হলুদ আলো। কখনও বা ব্যাণ্ডের মিঠে আওয়াজ। মিঠে, নরম। মনে হচ্ছিল, গোটা পরিবেশটাই যেন নেশাতুর হয়ে উঠেছে।

"নাশ্‌কো, তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও।" অনেক কষ্টে কথাটা আমি বলতে পারলাম।

আলতো হাতে এক টুকরো রুটি তুলে নিল নাশ্‌কো। নিয়ে টুকরো-টুকরো করে সেটাকে সাজিয়ে রাখতে লাগল। মনে হচ্ছিল, কী যেন হয়েছে ওর। ভারী অস্থির হয়ে উঠেছে। বডিসের বোতামগুলোকে খুলছে আর বন্ধ করছে। খোপা খুলে চুলের রাশিকে কখনও পিঠের উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছে বা। আবার খোপা বাঁধছে।

"উঃ, কী ভীষণ গরম লাগছে!" নাশ্‌কো বলল। গলার স্বরে কেমন যেন উত্তেজনা আর বিরক্তি। শুনে আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। এমনিতে নাশ্‌কো ভারী শান্ত মেয়ে। কখনও আমি ওকে উত্তেজিত অথবা বিরক্ত হতে দেখিনি। নাশ্‌কোকে যে আমি চিনি না, এমন ত নয়। মাঝে-মাঝেই ও আমাদের বাড়িতে দু-চার দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। সারাক্ষণ ওর মুখে হাসি লেগে থাকত। একে খেপাত, ওকে নিয়ে রসিকতা করত। কিংবা সবাইকে নিয়ে খেলতে বসত। বাড়ির ছেলেমেয়ে আর অল্পবয়সী বউদের নিয়ে। খেলা সাধারণত শুরু হত রাত্তিরের খাওয়ার পাট চুকে যাবার পর। বাবা রাত জাগতেন না। খাওয়া শেষ হলেই ঘুমুতে চলে যেতেন। মা কিন্তু আমাদের কাছে থাকতেন, গল্পগুজব করতেন। বাবা চলে যাবার পর আমরা গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিতাম; দরজায় কোন ফোকর থাকলে সাবধানে সেটাকে বুজিয়ে দিতাম। তারপর শুরু হত খেলা। কিংবা নাচ, আর গান। নাশ্‌কোই তার নেত্রী।

কত রকমের খেলাই যে হত! কখনও কখনও মেয়েরা গিয়ে পুরুষদের পোশাক পরত। পরস্পরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করত। কুস্তি লড়ত, অথবা গাছের তলাকার লম্বা ঘাসের উপরে হুটোপাটি করত। নাশ্‌কোই নেত্রী। লম্বা কালো চুল তার পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাগলের মত হাসছে, দৌড়চ্ছে, কপট ভয়ে কখনও চেঁচিয়ে উঠছে বা।

ভারী সুন্দর নাচত নাশ্‌কো। আকাশে হাত ছুঁড়ে দিয়ে গান গাইত। গানের বিষয়বস্তু হল, কে এক দস্যু একটা মেয়েকে তার ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে একদিন পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। গাইতে গাইতে মস্ত বড় একটা পিরিচ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াত নাশ্‌কো। তারপর আঙুল দিয়ে সেই পিরিচের গায়ে টোকা মারতে মারতে নাচ শুরু করে দিত। পিঠময় একরাশ এলোচুল, গাল দুটি রক্তাভ, সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কাঁপছে। এই হল নাশ্‌কো।

আজ কিন্তু তাকে অন্যরকম লাগছিল।

"কী হয়েছে তোমার নাশ্‌কো?" জিজ্ঞেস করলাম। নাশ্‌কো এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন নিজেকে আমার কাছ থেকে গোপন করতে চায়। সত্যিই কিছু একটা হয়েছে। বারেবারে নাশ্‌কো তার বডিসের বোতামগুলিকে খুলছে আর বন্ধ করছে, রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া করছে নিজেকে, ব্লাউসের হাতা গুটিয়ে নিচ্ছে বারবার। যে নাশ্‌কোকে আমি চিনি, আজকের এই মেয়েটির সঙ্গে তার কোনও-খানেই কোনও মিল নেই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে ওকে। জ্যোৎস্না ততক্ষণে উঠোনে এসে পড়েছে। একপাশে খাবারের থালা। বলতে গেলে সে-খাবার আমরা ছুঁইনি পর্যন্ত। চারপাশে দেয়ালের আর গাছের ছায়া নিবিড় হয়ে আছে।

বিয়েবাড়িতে বাজনার তাল হঠাৎ দ্রুত হয়ে উঠল। মাঝে-মাঝেই কারা যেন সশব্দে হেসে উঠছে। আর নয়ত চেঁচিয়ে কাউকে কিছু বলছে। নাশ্‌কো যেন হঠাৎ আরও অস্থির হয়ে উঠল। "আ—" মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর। তারপরেই ও উঠে দাঁড়াল। অস্থির হয়ে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর, হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলতে গেলে একরকম জোর করেই আমাকে সেই পাঁচিলের ধারে নিয়ে গেল।

"বিয়েবাড়িতে কী হচ্ছে, চল দেখা যাক।"

আপেল গাছের ধারে পাঁচিলের যে-জায়গাটা সবচাইতে অন্ধকার, সেইখানে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। আমাকে ধরে পাঁচিলের উপরে তুলে দিল নাশ্‌কো, নিজে কিন্তু অন্ধকারে মিশে রইল।

আপেল গাছের গুঁড়িতে পা ঠেকিয়ে দেয়ালের উপরে ঝুঁকে আছে নাশ্‌কো। আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। বিয়েবাড়ির উঠোন আলোয়-আলো। উৎসবের মত্ততা তখনও কিছুমাত্র কমেনি। ভরপেট মদ খেয়ে অনেকে বাগানের উপর শুয়ে আছে। বর-কনে এসে মাঝে-মাঝে তাদের এটা-ওটা খাবার দিয়ে যাচ্ছে। নাশপাতি গাছের ডাল থেকে ঝুলছে জোরালো একটা লণ্ঠন। সেই একটা লণ্ঠনে সারা উঠোন আলোয়-আলো হয়ে আছে।

বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা কুয়ো। কুয়োর পাশে ধুলোর উপর জল জমে আছে। তার উপরে আলো পড়ে চকচক করছে। কয়েক মিনিট অন্তর-অন্তর বাড়ির ভিতর থেকে থালাবোঝাই খাবার আর পিপে-ভরা মদ নিয়ে আসা হচ্ছে। উঠোনের একপাশে অন্ধকার। সেখানে বসে আছে জনকয়েক বেদে পুরুষ আর মেয়ে। কী যেন গান গাইছে তারা। গানের সুরটা ভারী করুণ। শাবান-বেদে নামকরা গাইয়ে। তার সঙ্গীরা তাই তাকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। জোড়াসন হয়ে বসে আছে শাবান। গান গাইছে। কখনও চড়ায় উঠছে, কখনও খাদে নেমে যাচ্ছে তার গলা। যেমন মোহময় এই রাত্রি, তেমনি মোহময় তার সুর। একটু বাদে দেখলাম, সবাই মিলে তার সঙ্গে গাইতে শুরু করল। কেউ বা গুন-গুন গলায়, কেউ জোরে। গোটা পরিবেশটাই যেন হঠাৎ মাতাল হয়ে গিয়েছে।

কে একজন বুড়ো এই সময়ে সামনে এগিয়ে এল। এসে বলল, "ওহে শাবান, পুরনো আমলের একখানা গান গাও দেখি। বেশ করুণ দেখে একখানা।"

আবার বেজে উঠল বেদেদের বাজনা। মেয়েরা এতক্ষণ বোধহয় এরই প্রতীক্ষায় ছিল। বাজনা শুরু হতেই বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল তারা। সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল। তারপর এক সময় দেখি বাজনার তালে তালে নাচ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোলো নাচ। মেয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছে। কেউ কেউ একাই নাচছে। সঙ্গী জুটিয়ে নিতে পারেনি। মাথাটা সামনে দিকে ঝুঁকে আছে। পদক্ষেপের ছন্দে যাতে না কোনও ভুল হয়। ধীর মন্থর নাচ। কিন্তু দেখেই বোঝা যায়, তার মধ্যে শক্তির অভাব নেই। শক্তি যেন সংহত হয়ে আছে।

"আঃ মাইল, কী সৌভাগ্য তোমার!"

গলা শুনে চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি ম্লাডেন। অন্ধকারের ভিতর থেকে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় টকটক করছে তার মুখ, তার উপরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। আমাকে উদ্দেশ করেই ম্লাডেন কথা বলছিল বটে, কিন্তু তার আসল লক্ষ্য যে কে, নাশ্‌কার তা বুঝতে কোনও ভুল হয়নি। নাশ্‌কা কিন্তু কিছু বলল না। শুধু দেখলাম যে, সে আরও জোরে আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরল। যেন ম্লাডেনের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে চায়। ম্লাডেন তার ব্যাগ খুলে আমার দিকে একটা দিনার এগিয়ে দিল। বলল, "নাও, মাইল, তোমাকে দিলাম।" বলে সে সেই দিনারটাকে আমার কোটের পকেটে ফেলে দিল। দেখলাম, দিনারটাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে নাশ্‌কার হাতখানাকে ছুঁয়ে দিয়েছে।

"না, না, মাইল, ও পয়সা নিসনে তুই, নিসনে।" কেমন যেন বিপন্ন, ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল নাশ্‌কা।

নাশ্‌কার দিকে ফিরে তাকালাম। সে তখন নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে তার। মনে হল, অনেক কষ্টে সে দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি যেন পড়ে যেতে পারে। ম্লাডেন তখনও তার হাত চেপে ধরে আছে। আর সেই হাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে নাশ্‌কা। ওদিকে বেদেরা তখনও সমানে গান গেয়ে চলেছে। নতুন করে আবার নাচের পালা শুরু হয়েছে। কিন্তু ম্লাডেন যে নাশ্‌কার হাত ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবে, এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে নাশ্‌কা তার হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিল। অস্ফুটগলায় বলল, "চল মাইল, আমরা যাই।"

পাঁচিলের উপর থেকে আমাকে নীচে নামিয়ে নিল নাশ্‌কা। তারপর আবার আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরল। আমরা তখন পাঁচিলের নীচের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। নাশ্‌কার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছিলাম আমি। কেমন যেন রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে তার মুখ। তপ্ত, ঘর্মাক্ত। আমারও শরীর তখন ঘেমে উঠেছে। দু হাত দিয়ে নাশ্‌কার গলা জড়িয়ে ধরে আছি, আর সে তার তপ্ত, স্বেদাক্ত ঠোঁট দুটি আমার কপালের উপরে চেপে ধরেছে। নাশ্‌কার তপ্ত, পুথুল, কঠিন বুকের স্পর্শও আমি অনুভব করতে পারছিলাম। তার শরীরের উত্তাপে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমারও সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

"না, না, শুনিসনে ওর কথা। ও পাগল, ও বদ্ধ পাগল!"

বলছে, আর একটু-একটু করে পাঁচিলের কাছ থেকে সরে আসছে নাশ্‌কা। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তাকে জাদু করেছে। কী যে সে বলছে, তার অর্থ যে কী, তা হয়ত সে নিজেই জানে না।

হঠাৎ দেখি, পাঁচিলের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে ম্লাডেন। যেন এখুনি পাঁচিল টপকে এধারে লাফিয়ে পড়বে। দেখে নাশ্‌কা যেন ভয় পেয়ে গেল। দৌড়ে যে বাড়ির ভিতরে পালিয়ে যাবে, এমন শক্তি যেন তার নেই। কী করবে বুঝতে না পেরে আমাকে আরও শক্ত করে তার বুকের মধে চেপে ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগল নাশ্‌কা। চারদিকে ডালপালা। সেই ডালপালা তার গায়ে লাগছে, আর সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাগানের ছায়া ছায়া অন্ধকার, রাত্রির কুয়াশা, সব কিছুই যেন তার মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে সে বাগানের সীমানা পার হয়ে এল। আর মনে হল, এতক্ষণ যেন কেউ তাকে জাদু করে রেখেছিল, জাদুর প্রভাবটা এইবারে কেটে গেল। আঙুল দিয়ে সে কপালটা টিপে ধরে রইল খানিকক্ষণ। রুমাল ঘুরিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগল। কুয়ো থেকে জল তুলে চোখমুখ একবার ভাল করে ধুয়ে নিল। তারপর দেখি, উঠোনে গিয়ে আবার জলের ছড়া দিচ্ছে।

এতক্ষণে যেন নাশ্‌কা আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তার চোখ দুটি। একটু আগে চোখেমুখে জল দিয়েছে। সেই জল তার চুলেও লেগে থাকবে। ভিজে চুল তার গালের উপরে লেপটে রয়েছে।

ওদিকে বিয়েবাড়িতে তখনও কোলো-নাচ চলছে। পর পর কয়েকবার বন্দুকও ছোড়া হল। তারপর আবার শুরু হল গান। গানের লয় এবারে অনেক বেশী দ্রুত। কে যেন ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছে। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সবাই গাইছে, "যোভান, তোমায় দেখেছিলাম."

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল নাশ্‌কা। হাত বাড়িয়ে বড় একটা থালা তুলে নিয়ে সে নাচতে শুরু করল। তার সেই নাচ আমার চিরকাল মনে থাকবে। কেউ কোনখানে নেই, একা আমি তার দর্শক। নাচের ছন্দে তার সমস্ত শরীরের উপরে দিয়ে যেন ভারী সুন্দর, ভারী মধুর একটি তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে মৃদু গলায় সে গান গাইছে। কী মিষ্টি তার গলা।

আপন মনে নেচে চলেছে নাশ্‌কা। কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে কালো এক ঢাল চুল, হাওয়ায় দুলে উঠছে তার কাপড়। বডিসের বোতাম খুলে গিয়েছে, তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে তার মর্মর-ধবল দুটি স্তন। ভিজে, কালো চুলের রাশি বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় দৃশ্যটাকে কেমন যেন অপার্থিব বলে মনে হল। কোনদিকেই খেয়াল নেই নাশ্‌কার। কী এক আনন্দে তন্ময় হয়ে সে নেচে চলেছে। চোখ দুটি চকচক করছে তার। গানের তালে তালে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে তার শরীর। দেখতে দেখতে মনে হল, চাঁদের আলো যেন আমার মস্তিষ্কে গিয়ে প্রবেশ করেছে। তারপর ফুলে, ফেঁপে উত্তাল হয়ে উঠেছে। মনে হল যেন জ্যোৎস্নার এক অনন্ত সমুদ্রে আমি ভেসে চলেছি। মাথা ঘুরছে আমার। আর শুনেছি সেই গানঃ যোভান, তোমায় দেখেছিলাম...

নাচতে নাচতে এক-একবার সমস্ত শরীরটাকে অসম্ভবরকম পিছনদিকে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে নাশ্‌কা। তার কালো এলোচুল তখন মাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। জামার

ফিতে তার কাঁধের থেকে খসে গিয়ে স্তনের উপরে এসে পড়েছে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে তার হাতের থালাটা। তার উপরে সজোরে একবার আঘাত হানল নাশ্‌কা। তারপর মৃদু গলায় গেয়ে উঠল:

য়োভান, তোমায় দেখেছিলাম...

গানের মধ্যে যেন ডুবে গিয়েছে নাশ্‌কা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত। যেন এই মোহময়ী রাত্রি, এই জ্যোৎস্না, এই অপূর্ব সুরলহরী—সমস্ত কিছুকেই সে নিঃশেষে পান করে নেবে।

সেই আশ্চর্য নাচও এক সময়ে শেষ হল। যেন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল আবার। এতক্ষণে আবার সংবিৎ ফিরে পেল। দ্রুত-হাতে বিছানাটাকে ঠিক করে নিয়ে তার উপরে লুটিয়ে পড়ল নাশ্‌কা। কোলের মধ্যে টেনে নিলে আমাকে। তার দুই স্তনের মধ্যে আমার মাথাটাকে চেপে ধরল।

"ঘুমো মাইল, ঘুমো।" সান্ত্বনার গলায় সে বলতে পারল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আজ আর সারারাত্রে তার ঘুম হবে না। বুঝতে পারছিলাম যে, অসম্ভব দ্রুত তার নিশ্বাস পড়ছে, সারা শরীর তার থরথর করে কাঁপছে।

---

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

॥ ১০ ॥

ঘরের মধ্যে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন আবার, 'দ্যাখ, এসব নিয়ে যদি জ্যাঠার সঙ্গে অসভ্যের মতো কোনো কথা-বার্তা বলিস তো হলে কিন্তু ভালো হবে না।'

সুলেখা জবাব দিলো না, পড়তে বসলো বইখাতা খুলে।

'বুঝলি তো? আমার কথা মনে থাকবে তো?' বিশ্বাস নেই তাঁর মেয়েকে। যে মুখরা, যেরকম উদ্ধত, লাগুবেবু, জেদ আছে নাকি?

বইয়ের অক্ষর থেকে মুখ তুলে মাকে খানিকক্ষণ দেখলো সুলেখা, তারপর আবার পড়ায় মন দিলো।

কিন্তু কথা তুললো খেতে বসে।

'জ্যাঠামশাই!'

গরম ভাতে গরম মুসুরির ডাল আর ডালের বড়া দিয়ে প্রকাণ্ড মুঠোর মধ্যে পুরে নিবারণবাবু ভুরু কুঁচকে ভারি গলায় জবাব দিলেন, 'কেন?'

ভূমিকা করলো না সুলেখা। বললো, 'আমার বাবার দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওর থেকে এই দশ বছরে আমাদের জন্য কতো খরচ হয়েছে?'

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নিবারণবাবু, চমকে গেলেন। সুলেখার জ্যাঠাইমাও মাছের কাঁসারি থেকে মাছ তুলে কাকে কোনটা দেবেন ঠিক করতে করতে থমকালেন। নিবারণবাবুর বড়ো ছেলে হারাণও তাকালো সুলেখার দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একেবারে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা। তারপরেই নিবারণবাবু গর্জে উঠলেন, 'তোর কৈফিয়ত কি তোকে দিতে হবে নাকি?'

'কৈফিয়ত কেন। অমনিই জানতে চাইছি।'

নিবারণবাবু মুখে মুখে ভেঙিয়ে উঠলেন, 'অমনিই জানতে চাইছো? পাজী মেয়ে। যদি কিছু জানাতেই হয় তো আমি তোমার মাকেই জানাবো। তোমাকে নয়।'

'মা ওসব বোঝেন না।'

'তুমি বুঝি একেবারে সব জান্তা?'

'এরজন্যে সব জান্তা হবার দরকার কী? সহজ জবাব। আপনি তো জানেন।' সুলেখার অনুচ্চগলা দৃঢ়তায় কঠিন, 'মা নেহাত ভালোমানুষ, বাবা থাকতেও মা কোনোদিন মুখ ফুটে কোন কথা বলেননি, আপনি আমাকেই বলুন।'

'নে নে, চুপ কর ডেঁপো মেয়ে'। এটা হারাণ বলে উঠলো।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জ্যাঠামশায়ের মুখের উপর চোখ রেখে সুলেখা যেন অপেক্ষা করতে লাগলো জবাবটার জন্য। ঝন করে মাছের কাঁসারিটা ঠেলে দিয়ে রেগে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাঠাইমা। কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে মুখ ঝুলিয়ে বললেন—'একটুখানি মেয়ে তুই, তোর এতো বুকের পাটা? অতোবড়ো বাঘের মতো মানুষটা, যাঁর মুখের দিকে তোর বাপ কোনদিন ভয়ে তাকায়নি, আজ তুই তাঁর উপরে কথা বলিস? তাঁর কাছে হিসাব দেখিস? হ'তি তুই আমার মেয়ে গাল টিপে আজ রক্ত বার করতাম।'

জ্যাঠাইমার কথাগুলো যেন কথাই নয়, এমন এক অবহেলার ভঙ্গিতে চোখ ফিরিয়ে রাখলো সুলেখা। তারপর আবার বললো, 'জানি, হিসেব-দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, হিসেব দেবার জন্যও আপনি টাকাটা আপনার নিজের কাছে রাখেন নি। কিন্তু গয়নাগুলো কোথায়? সেগুলো আমি চাই। সুরী লেনের বাড়ি থেকে যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে পঁচিশ টাকা করে আপনি ভাড়া আদায় করেন, সেটা কী হয়? না কি গোপন করেন ব'লে ভাবেন কিছুই জানি না? সে টাকাগুলোর অন্তত হিসেব দেবেন একটা। দশ বছরে তার সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়?' •

সব চুপ। সব স্তব্ধ। নিবারণবাবু রাগে কাঁপছেন থর থর করে। সুলেখা জল খেয়ে নিয়ে আবার বললো, 'সেটা আপনার ভাইয়ের টাকা নয়, একথা বলতে পারবেন না—তাতে আপনার তিলমাত্র অংশও আছে। সে টাকা সম্পূর্ণভাবে আমার মার, আমার দাদামশায়ের দেওয়া।'

'লেখা।' নিবারণবাবু প্রায় গগন ফাটিয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠলেন। গলার স্বরে দেয়াল কাঁপলো, ছেলেমেয়েরা কেঁপে উঠলো, নিজের ঘর থেকে সুরমা দেবী ছুটে এলেন, কিন্তু সুলেখার মুখে-চোখে কোন ভাবান্তর বোঝা গেল না। নির্বিকার ভঙ্গিতে খেতে খেতে আবার বললো, 'এখানে আমরা আশ্রিতের মতোই থাকি। উঠতে বসতে জ্যাঠাইমা ভাতের খোঁটা দেন। মনে মনে ভেবে দেখবেন একটু। দশ বছর ধরে কে কার ভাত খাচ্ছে। তা নৈলে দু-বেলা দু'ডালা মুড়ি, দুপুরে রাত্তিরে দু'থালা ভাত আর ডালে মাসে আমাদের তিন ভাই-বোনের কত খরচ যায়? পুজোয় দুটো একটা শাড়ি-জামা দেন, বাড়িতে যারা কাজ করে, তাদের জামা-কাপড়ের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাতেই এত টাকা বেরিয়ে গেল? আর যদিও এ বাড়িটা আমার দাদুর, কিন্তু মনে হয় একলা আপনাদের, যেন দয়া করে থাকতে দিয়েছেন, তা-ও সবচেয়ে খারাপ ঘরটাতে! আমার বাবার এত টাকা আপনার কাছে গচ্ছিত, আর আপনি কিনা সেবার আমার ভাইয়ের অসুখে একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকলেন না—পাছে ভিজিট দিতে হয়? আগে আমি জানতাম না, জানলে সমস্ত ছবি বদলে যেতো। কিন্তু আমার মা অত্যন্ত—' সুরমা দেবী এক হাতে ঘোমটা দিয়ে ছুটে এসে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা

টেনে মেয়েকে খাওয়া থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন, লজ্জায় দুঃখে মরে গেলেন ভাসুর আর জায়ের কাছে। নিবারণবাবু ভাতের থালাটা তুলে এক আছাড় মেরে খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। রেগে ভাইঝির মুখের কাছে গিয়ে রাগ সামলাতে না পেরে একটা চড় মারলেন ঠাস করে, দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন—'বেতরিবৎ বেয়াদপ মেয়ে। এতোবড় কথা তোমার? বেরো, বেরিয়ে যা তুই আমার চোখের সামনে থেকে। তোর মুখ আমি দেখতে চাই না।' তারপর হন হন করে কুয়োতলায় গিয়ে রাশি রাশি জল ঢেলে আঁচাতে লাগলেন।

মা উপুড় হয়ে জ্যাঠাইমার পা জড়িয়ে ধরলেন—'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আমার দুঃখ বুঝে ওকে আপনারা ক্ষমা করুন।'

সুষমা যতো জোরে মেয়েকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তার দ্বিগুণ জোরে মাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল সুলেখা, বললো, 'কারো পায়ে তুমি যতো খুশি মাথা খুঁড়ো, কিন্তু আমার সামনে নয়, আমার

জন্যও নয়। মানুষের মাথাটা এমন কিছু নিকৃষ্ট অংগ নয় যেটা সকলের পায়েই ছোঁয়ানো যায়।'

এর পরে সুষমা দেবী কাঁদতে কাঁদতে দেয়ালে মাথা কুটে রুদ্ধস্বরে বললেন,—'আমার কেন মরণ হয় না, আমার কেন মরণ হয় না।'

ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বিদ্রূপে ঝলসে উঠলো সুলেখা, বাঁকাচোখে তাকিয়ে বললো 'তুমি তো সর্বদাই মরে আছো আর কতো মরবে? লজ্জায় মরে আছো, ভয়ে মরে আছো, দুঃখে মরে আছো, অপবাদের আশংকায় মরে আছো, সকলের পায়ের তলায় গড়িয়ে সারাদিনই তো মরে আছো তুমি। বরং ভগবানকে ডেকে বলো, তোমার এই মরা দেহে একটু প্রাণশক্তি দিন, তোমার মতো মানুষকেও যারা ঠকাতে দ্বিধা করে না, সেইসব বিবেকহীন মানুষগুলোকে একটু তাকিয়ে দেখুন।'

বলাই বাহুল্য সেই রাতে আর খাওয়া-দাওয়া হলো না কারো। কারো মুখেই আর একটি শব্দ শোনা গেল না। পরের দিন সকালেও থম থম। সুলেখা ছাতা নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল, এলো সেই বারোটায়। আর এসেই জিনিসপত্র গোছাতে বসে গেল। খেলো না। বাবু, ছোটুর ভানুমতীর খেলা দেখা হলো না, সুলেখার নবারুণদর্শন হলো না, কারো সংগে কারো কথা বিনিময় হলো না, একটা জগদ্দল পাথরের মতো ভারি বাড়িতে ভারি মানুষেরা চলতে ফিরতে লাগলো নিঃশব্দে।

তার পরের দিন সকালে সুলেখা ঘোষণা করলো, 'আমরা কাল থেকে আমাদের সুরবীজেনের বাড়িতে চলে যাবো।' শুনে জ্যাঠাইমা চোখ না তুলেই বললেন—'বেশ।'

'জ্যাঠামশায়কে বলবেন।'

'বলবো।'

'আর গয়নাগুলো মাকে দিয়ে দেবেন, দরকার হবে। আর কিছু টাকাও লাগবে।'

এবার জ্যাঠাইমা জবাব দিলেন না কোন, জবাবের প্রত্যাশায় সুলেখাও দাঁড়ালো না।

নিবারণবাবু বাজারে গিয়েছিলেন, বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। পিছনে একজন বোরখাপরা স্ত্রীলোক, রেজের ডিমওয়ালী হাসানের মা আর বুড়ো গোফুরের ছোট নাতি রমজান খাঁ। ভয়ে কাঁপছে সব। ঘরে ঢুকে ঠাস করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েও কাঁপুনি কমছে না কারো।

জ্যাঠামশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বললেন, 'মারা-মারি। সাংঘাতিক মারামারি। হিন্দু-মুসলমানের দাংগা লেগেছে। দোকান-বাজার লুট হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে বাড়িতে—'

এর বেশী বলবার সুযোগ হলো না জ্যাঠামশায়ের, 'অ্যাঁ-এ-এ' বলে ঢলে পড়লেন জ্যাঠাইমা। মা দৌড়ে জল-পাখা নিয়ে এলেন। বাড়িসুদ্ধ লোক ছুটে এলো সে ঘরে, তারপরেই দুদ্দাড় সব দৌড়ালো দরজা-জানালা বন্ধ করতে। জ্যাঠামশায় কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে কথা শেষ করতে চেষ্টা করলেন। কী কাণ্ড! কী ভয়ংকর ব্যাপার। বলা নেই, কওয়া নেই শালারা—' বলেই হাসানের মার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন, ঢোক গিলে মিষ্টিমুখে বললেন—'তোমরা বোসো মা বোসো। কিছু ভয় নেই। কী ব্যাপার বল দেখি রমজান?'

বোরখাপরা স্ত্রীলোকটি আর হাসানের মা জড়োসড়ো হয়ে বসলো এক কোণে, রমজান কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'কেমন কইরা কমু মাহাজান, সকালবেলা নাস্তা কইরা কামে বাইর অইছি, এইর মৈদ্যেই এই। ডরের চোটে আপনের পিছে পিছে আইয়া এইখানে ঢুকলাম। অখন কয়েন দেখি—কেমনে বাসায় যাই? আমাগো জাত যখন আপনেগো মারতাছে, তখন আপনাগো জাইতই কি ছাইরা কথা কইবো?'

'কী যে বলিস।' জ্যাঠামশায় সান্ত্বনা দিলেন, 'তোদের কিছু ভয় নেই, নিশ্চিন্ত বোস। হাংগামা থামলে আমি নিজে গিয়ে তোদের হিন্দুপাড়া পার করে দিয়ে আসবো কিন্তু ভাবছি যে, হঠাৎ হলোটা কী? এমন একটা উটকো দাংগা কে লাগালো। পরামর্শটা কার?'

'আমার নানা কয়—' লুংগি ঝেড়ে কোণে একটা জলচৌকিতে বসলো রমজান 'ঐ নবাব হারামজাদাই যতো নষ্টের গোড়া, ইংরাজগো লগে খানা খায়, ম্যাম লইয়া নাচে আর ভাবে যে, আমি কি অইনু রে। ফুইলা অইলাম বাউয়া ব্যাং।'

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন জ্যাঠামশাই—'অথচ ভেবে দ্যাখ, ওর ঠাকুর্দা আলিসাহেব একটা কেমন মানুষ ছিলেন। দেবতার মতো। ইংরেজদের উনি জুতোর সুকতলার চেয়েও হেয়জ্ঞান করতেন। এখন সেই ইংরেজরাই হলো তার নাতির ধ্যান-জ্ঞান।'

'আর কয়েন ক্যান কর্তা, ঐ হালার-পুত বান্দরের বাচ্চাটা, দেখলে তো মনে হয় বুঝি অখনই গাছের থন কলা খাইতে খাইতে লাইমা আইছে, এইখানে আইয়া হালা অইছে পুলিসের কর্তা। তাজ্জ কত। হাকিমটা আর এইটা দিনে সাতবার কইরা অখন আসান মঞ্জিলের ফটকে ঢুকতাছে, আর

যাইর অইতাছে। খাড়িরে পিন্নীতে মেদিনী ফাটে।'

জেঠাইমা সামলে উঠেছেন ততক্ষণে, ছুটেছেন ঘরের আনাচকানাচ দেখতে, বিশেষ জিনিস সাবধান করতে। সুলেখা বন্ধ জানালা ফাঁক করে বেলা ন'টাতেই সুমসাম শহরের চেহারাটা দেখে নিল একবার।

সেদিন অবিশ্যি ঐখানেই থামলো ব্যাপারটা। কিন্তু ত্রাস কমতে দুটো দিন কেটে গেল, আর চতুর্থ দিনে ভোর না হতেই পুলিস ভ্যান এসে দাঁড়ালো গলির মুখে। পাঠান সৈন্যে ভরে গেল গলিটা। সার্জেণ্ট নিজে পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়ি খানাতল্লাসী করলো। একে লাথি মারলো, তাকে গুঁতো দিলো, বিছানা বালিস ছিঁড়ে-ফেড়ে তচনচ করে ফেললো। আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে লাঠি-দা যে বাড়িতে যে যা সংগ্রহ করে রেখেছিলো, সব নিয়ে চলে গেল। এমন কি কয়লা ভাঙা হাতুড়িটা পর্যন্ত বাকী রাখলো না। মশারী টাঙাবার খাটের বাজুগুলোও ছাড়লো না। রাত জেগে যেসব ভলাণ্টিয়াররা যার যার নিজের এলাকা পাহারা দিচ্ছিলো, তাদেরও ধরে নিয়ে গেল বন্দুকের কুঁদোর খোঁচা মারতে মারতে। তারপর যখন বেলা বাড়লো, সব বাড়িতে সবাই খেয়েদেয়ে ঈষৎ অনবধানে আলস্যে গা এলালো বিছানায়, ঠিক তক্ষুনি হুসেনি দালানের অভ্যন্তর থেকে শত শত কণ্ঠের চিৎকার উঠলো, 'আল্লা হো আকবর।' এই হুসেনি দালান এখানকার মুসলমানদের একটা বিশেষ পবিত্র জায়গা। ঈদের দিনে এরা এখানেই একত্র হয়, কোন পরব হলে মেলা বসে এখানে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হাসান-হোসেনের মিছিল বেরোয় এখান থেকে। ধর্ম বিষয়ে কোন জরুরী সভা হলেও এখানেই জমায়েত হয় সব। হুসেনি দালানের পবিত্র মাটিতে আজ ওরা কাফের দলনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে একত্র হচ্ছিলো বোধ হয়, এতোক্ষণে বেরুলো তৈরী হয়ে। যে শহরে রাস্তায় একসঙ্গে তিনজন লোক দাঁড়ালেও পুলিস রেহাই দিচ্ছিলো না, গৃহস্থদের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রপাতিও যেখানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেই শহরের বড় বড় রাস্তাগুলো সহসা শত শত মাথায় কালো হয়ে উঠলো। লাঠি-সোটা, সোডার বোতল, কিরিচ, বল্লম, মাংস কাটা ছুরি, ছোরা কোন কিছুরই অভাব দেখা গেল না তাদের হাতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, যে পুলিসের ভ্যান সারাদিন ভেঁপু বাজিয়ে, বুক কাঁপিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে এখানে ওখানে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় শহর শান্ত রাখার জন্য, তাদেরও দেখা মিললো না কোথাও।

মুহূর্তে কী থেকে কী হয়ে গেল। ঘরে ঘরে রোল উঠলো আর্তনাদের। শিশুর কান্নায় মেয়েদের চিৎকারে, পুরুষের ভয়ার্ত গলার বিকৃত আওয়াজে আকাশ বাতাস মথিত হলো। রক্ত আর রক্ত কাটা আর ছেঁড়া, খুন আর জখম। জ্বালালো পোড়ালো, ভাঙালো, ছিঁড়লো, যে যে রাস্তা দিয়ে গেল সে সব পাড়াগুলো একেবারে তছ তছ করে দিয়ে বীরের ঝাঁক পেরিয়ে গেল সদর্পে। যখন সব শেষ হলো তখন হর্ন দিতে দিতে রাস্তা কাঁপিয়ে রক্ষা করতে এলো সরকারী পুলিশের গাড়ি।

এই ক' বছরে দেশের উপর দিয়ে গর্জন বর্ষণ তো কম গেল না? একটার পর একটা তরঙ্গ। এইতো সেদিন ক্ষিপ্ত জনগন রেললাইন উপড়েছে, স্টেশন পুড়িয়েছে, গোলা লুট করেছে, পোস্টা-পিস জ্বালিয়েছে, কেটে দিয়েছে টেলি-গ্রাফের তার যুদ্ধের জন্য সঞ্চিত যা কিছু প্রয়োজনীয় যানবাহন সব নষ্ট করেছে। ইংরেজের শাসন যন্ত্রের শিরা-উপশিরা-গুলিকে একে একে উপড়ে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মুক্তির আশঙ্কায় অসহিষ্ণু করগুলো পাগল মানুষ কী না করেছে জীবনপণ করে? মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীন গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। একদিন একযোগে কুড়ি হাজার লোক একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে বলেছি 'আমরা স্বাধীন' তারপর হাজার হাজার সৈন্য, হাজার বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাতে মরেছে, তবু গোঁ ছাড়েনি। ইংরেজের নির্যাতনের চাকা সচ্ছন্দে গড়িয়ে গেছে বুকের উপর দিয়ে, লাঠি, লাথি, গুলি, চাবুক, তাতেও কুলোয়নি এসেছে মিলিটারি, এসেছে মেশিনগান—আসুক, তবু পা টলেনি এতটুকু, স্বাধীন জাতীয় সরকার বৃটিশ সরকার পাশাপাশি ঠিক দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর তারও পরে এগিয়ে এসেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। কে না জানতো যে কোনো মুহূর্তে তারাও বাংলা দেশে এসে পড়তে পারে আর তার ফলে কেবলমাত্র মেদিনীপুরই না, সারা বাংলাতেই একটা বিদ্রোহী জাতীয় সরকার গড়ে উঠতে পারে

এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠছে ইংরেজরা। তখন তারা কোনদিক সামলাবেন। জাপানকেই আটকাবেন না এই সম্ভাবনাকেই রোধ করবেন। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়েই যে শুধু তাক লাগালো তা নয়, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেও সেসময়ে এই সমস্যার মন্দ সমাধান করলে না। ক্ষুধার্ত দরিদ্রের সংখ্যা পিল পিল করে বেড়ে উঠলো দেশে। সুজলা আর সুফলা বলে চির-বিখ্যাত বাংলার আকাশে বাতাসে হাহাকার উঠলো, উঠলো বুকফাটা কান্নার রোল। জীবজগতে ক্ষুধার বাড়া কষ্ট নেই। দেহ ধারণ করতে হলে তার আহার চাই। সেই আহার্য একেবারে গুদামজাত হয়ে গেল। তা পচলো, গললো, ফেলা গেলো কিন্তু এক কণা শস্যও কোনো রন্ধ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো না। লোকগুলো হা-হা করতে করতে রাস্তায় বেরুলো, গ্রাম ছেড়ে শহরে এলো, পেটের তাড়নায় দিকবিদিকে ছড়িয়ে গেল, হারিয়ে গেল, ডাস্টবিনের নোংরা পচা গলিত খাদ্য নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে লাগলো কুকুরের সঙ্গে, শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেল। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে লাগালো গাছের ডালে, কেউ কাপড়ে আগুন ধরিয়ে জ্বালা জুড়োলো, কেউ জলে ডুবে ঠান্ডা হলো। আর যে সব হতভাগারা তা পারলো না, তারা 'ভাত দে, ফ্যান দে' বলতে বলতে ফুটপাথের উপরেই নিঃশেষ হয়ে গেল। আর তাদের প্রাপ্য অন্ন লরী বোঝাই হয়ে তাদের পাশ দিয়েই রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল গুদামজাত হতে। নেতৃস্থানীয় কেউ তখন বাইরে ছিলো না। এতো বড়ো ঘটনাটা ঘটাবার আগেই সকলকে নিয়ে গারদে পুরে রেখেছিলো, কে উদ্বুদ্ধ করবে, কে তাদের বলবে যে, ক্ষুধার জ্বালায় মরছো কেন, মজুত-করা খাদ্য লুঠ করো, বিদ্রোহ করো, রুখে দাঁড়াও।

তারপর যুদ্ধ থামলো একদিন, আস্তে আস্তে মুক্তি পেলো বন্দীরা, মুক্তি পেয়ে আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো যার-যার কাজে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এই একটিমাত্র মন্ত্র। মহাত্মাজী তাঁর সমস্ত কর্মে এই একটি কথাকেই বারংবার উচ্চারণ করলেন, দেশে ইংরেজ বিদ্বেষ নরম হয়ে উঠলো। বিদ্রোহের চেহারা দেখে স্তব্ধ হলো ইংরেজ। মহাত্মাজীর কথায়ই বিপ্লবীরা এসে কংগ্রেসে যোগ দিল, সকলেরই এক কেন্দ্র, এক উদ্দেশ্য, এক গুরু। মহাত্মাজীর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে সব। তারা তাঁর নেতৃত্বে তখুনি সংগ্রাম আরম্ভ করতে চায়। সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে হবে বলে রুখে দাঁড়ালো কংগ্রেস, কিন্তু সেই চাঁদ সওদাগরের লোহার ঘরের মধ্যেও যেমন সর্ষে পরিমাণ একটি ছিদ্রপথে কাল ঢুকেছিলো, ঠিক তেমনি সহসা মুসলিম লীগ বিরোধিতা করে সমস্ত ভেঙে দিল। তারা বললো, 'দাঁড়াও, ক্ষমতা এভাবে আসবে না, ভারতীয় মুসলমানদের আগে স্বতন্ত্র জাত বলে স্বীকার করো, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাও, আমরা জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের ষাট বছরের সংগ্রাম সার্থক হবার জন্য পরিপূর্ণ সম্ভাবনার ভারে থর থর করতে করতে থেমে গেল। মুচকি হাসলো ইংরেজরা। তারপরেই লাগলো সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

কিন্তু, এই কি তার চেহারা? এতো মর্মান্তিক, এতো বীভৎস, এমন হৃদয়বিদারক?

(ক্রমশ



# ট্রামে-বাসে

**সা**ম্প্রতিক কালীপূজোয় উচ্ছৃংখল আচরণ, বাজি পোড়ান ও মত্ততার জন্য কলিকাতা পুলিস পাঁচ শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। "মায়ের জিব কাটার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু না থাকলেও ভক্তদের আচরণে লজ্জায় তাকে জিব কাটতেই হতো"—মন্তব্য করলেন বিশুখুড়ো।

* * *

**দি**ল্লীর সংবাদে জানা গেল, সেখানে অন্যায় আচরণের জন্য ৭৮জন সরকারী কর্মচারী দণ্ডিত হইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে আছেন ১১জন গেজেটেড অফিসার। শ্যামলাল বলিল—"শিরে সর্পাঘাত হলে তাগা আর কোথায় বাঁধা যায়?"

* * *

**বো**ম্বাইর এক সভায় সম্বর্ধনার উত্তরে অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে দেশ নাকি আরো সমৃদ্ধি-



শালী হইবে। "আমরা 'আরো' কথাটা নিয়েই ভাবছি আর মনে পড়ছে যাঁর নখের ডগা এমন না জানে সে কি'রে!!"

* * *

**কো**টিপতি শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কোটিপতিকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য পুলিস কদিন ধরিয়া সমস্ত ভারত তোলপাড় করিয়া বেড়াইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কোটিপতিকে খুঁজে বার করা শক্ত বৈকি, তাঁরা কোটিতে গুটি-মাত্র। দেশের সর্বত্র যে শুধু কড়িপতিরা গিজগিজ করছেন।"

* * *

**ই**উনিয়ন কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ চাষে চীন দেশীয় পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে না কি



অল্প জমিতে অধিক শস্য ফলাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"বুঝলাম, আবার টবের জমিতে সার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

* * *

**রা**ষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কর্ম পরিষদ ১৯৬৩ সালে সমগ্র বিশ্বের খাদ্যাভাব দূর করার জন্য সংগ্রাম সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো কথা; ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩, কটাই বা দিন। এ কটা দিন একটু লঙ্ঘন দিলে হয়ত স্বাস্থ্যের উন্নতি-ই হবে।"

* * *

**ডাঃ** রামমনোহর লোহিয়া বলিয়াছেন—আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ভগিনীসুলভ সম্পর্ক থাকা উচিত। "কিন্তু ভগ্নীপতিরা যে-সম্পর্কটা বিশেষ ক'রে জানেন, সেটা মধুর হলেও ডাকতে গেলে বড়ই শ্রুতিকটু শোনায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

**লো**হিয়াজী আরো বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে ইংরেজী ভাষাকে অবিলম্বে বিদায় লইতে হইবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী প্রশ্ন করিলেন—"এক্ষেত্রে লোহিয়াজীর 'ডক্টর' উপাধির কী হবে?"

* * *

**বা**জারে (অবশ্যই কলিকাতার) মাছের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদে শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি এ ব্যাপারে তদন্তের আশ্বাস দিয়াছেন। "সুতরাং অতঃপর আমরা বলাবলি করছি—বিশ্বাসে মিলয়ে মৎস্য, তর্কে বহুদূরে!!"

* * *

**এ**কটি সংবাদে প্রকাশ, সরকার নাকি খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের ভার গ্রহণের পরিকল্পনা করিতেছেন—"রাজদণ্ড দেখা দেবে বণিকের মানদণ্ডরূপে"—রকমফের করিয়া কবিতার চরণটি আবৃত্তি করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

**ক**রাচী পুলিস এয়ার লাইন্স কর্পোরেশন অফিসে হানা দিয়া নাকি কাশ্মীরযুক্ত ভারতের একটি মানচিত্র সরাইয়া ফেলিয়াছেন। "অতঃপর কাশ্মীরযুক্ত পাকিস্থানের মানচিত্র দেখাইয়া পাঠশালার মৌলবী সাহেবরা নিশ্চয়ই ছেলেদের শিখিয়েছেন—সম্মুখেতে প্রসারিত তব পাশের তসবীর, করহ সেলাম"।

* * *

**এ**কটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের ভার গ্রহণের গিরি আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্যামলাল



বলিল—"চাঁদে না হলেও, চাঁদমুখে আগ্নেয়গিরি আমরা বহু পূর্বেই আবিষ্কার করেছি।"

* * *

**পূ**র্ব পাকিস্থান হইতে ট্রেনে, স্টীমারে নৌকায় প্রচুর মশক আমদানী হইতেছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মশক বিদূরণ পরিকল্পনা নাকি সফল হইতেছে না।—"সরকার কামান দাগার ব্যবস্থা করছেন কিনা, তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

# বিশ্ব-বিচিত্রা

সান এন্টোনিওতে এক ডাকাত একটা চিরকুটে "যা কিছু টাকা আছে আমার হাতে তুলে দাও, না হলে গুলী করবো" লিখে সেটা সান এন্টোনিও সেভিং এন্ড লোন এসোসিয়েশনের ম্যানেজার এবং "ডাকাত পড়লে কি করতে হবে" নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থের রচয়িতা এডসন্ড দ্য লে পেনার সামনে ধরতেই ভদ্রলোক নগদ প্রায় পৌনে দু হাজার টাকা ডাকাতটির হাতে তুলে দেন এবং ডাকাত চুপচাপ সরে পড়ে।

*

সময়ে সময়ে নির্ঘাত মৃত্যু থেকে অদ্ভুত কারণে মানুষ বেঁচে যায়। কিছুদিন পূর্বে লস এঞ্জেলেসের এক চিত্রগৃহে ছবি চলতে চলতে হঠাৎ এক মহিলা কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল: "ধর, ধর, আমার পার্স নিয়ে পালাচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনটি যুবককে প্রেক্ষাগৃহ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল।

মহিলার চীৎকারে উচ্চকিত হয়ে এক পরিচারক এইসব সময়ে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত রিভলবারটি বের করে পলায়মান যুবকদের একটিকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। গুলীটা যুবকের বুকে গিয়ে লাগে, কিন্তু বুকের ঐ জায়গাটায় একটা ক্রুশ ঝোলানো থাকায় গুলীটা যুবকের বক্ষ ভেদ করতে অক্ষম হয়।

গুলীর চাপে ক্রুশটা বুকে গেঁথে যায় এবং শল্যচিকিৎসক ক্রুশটা বুক থেকে ছাড়িয়ে আনতে গুলীটাও বেরিয়ে আসে। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে যুবকটির নির্ঘাত মৃত্যু ছিল।

চুরি, মারামারি প্রভৃতির জন্যে যুবকটির কুখ্যাতি ছিল। এই ঘটনায় সামান্যের প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় ওর মনে একটা গ্লানি আসে এবং ও জানায়, "আমি এবার থেকে নিজেকে শোধরাবো; এই বেঁচে যাওয়ায় আমার জ্ঞান হয়েছে।"

নির্ঘাত দুর্ঘটনা অনেক সময়ে অভাবনীয় ফল নিয়ে আসে—কখনো সুখের কখনো দুঃখের। কেউ বলতে পারে না কোটা কোনদিকে দাঁড়াবে।

এক অস্ট্রেলিয় নার্স গত বছর লন্ডন-ডেরির কাছে সাইকেল চড়ে যেতে একটা মোটরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চালক নেমেই মেয়েটির শুশ্রূষায় এগিয়ে যায়। দেখলে মেয়েটির একটি পা ভেঙে গিয়েছে। বললে: "আমি নিজেই ডাক্তার, আপনার পা ঠিক করে দেব।" বলে বিশেষজ্ঞের মতো পাটি সেট করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে লোকটি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। মেয়েটি হাসপাতালে থাকাকালে ওদের দুজনের প্রায়ই দেখা হতে লাগলো এবং ওরা পরস্পরের ভালবাসায় পড়ে যায়। চার সপ্তাহ পরে বিবাহের প্রস্তাব হয়। নার্স-থেকে-ডাক্তারের-স্ত্রী মেয়েটি এখন ওর সেই দুর্ঘটনাকে শুভ ঘটনা বলে মনে করে খুসী হয়।

*

এসেক্সের মেয়ে স্কুলের চারটি ছাত্রী সম্প্রতি লন্ডনে গিয়ে একটা বড় দোকান থেকে চুরি করে আসার বাজি রাখে। এমোচার চোরের মত চালাও চুরি করতে থাকে তারা। যখন ধরা পড়লো তৎক্ষণে ওরা তুলে নিয়েছে পনেরখানি বই আট জোড়া মোজা এবং কয়েক প্রস্ত মেয়েদের পোশাক।

বার মাস সৎভাবে থাকার মুচলেকা দেওয়ায় ওরা পুলিসের হাত থেকে অবশ্য ছাড়া পায় কিন্তু স্কুল থেকে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্যারিসের দুর্ভাগাদের পরিত্রাতারূপে খ্যাতির চরমে উঠে পাদরি পিয়েরকে জাল সাহায্য তহবিলে দান সংগ্রহকারিদের হাতে বড় দুর্ভোগে পড়তে হয়েছিল।

হেনরী নামে এক ব্যক্তি তো পাদরি পিয়েরে সেজেই বেড়াতো। একজন সহকারীর সহায়তায় হেনরি পাদরির চুলের অনুকরণে তৈরী পরচুলা, নকল দাড়ি, অনুরূপে পোশাক, কাল টুপি ইত্যাদি পরতো। তারপর একটা লাঠিতে ভর করে রাস্তায় বের হতো পরিচিত রব শোনবার জন্য কান খাড়া করে: "ঐ পাদরি পিয়ের যাচ্ছেন।"

রব আসতোও। একজনের পর একজন হাতে টাকা গুঁজে দিতো পাদরির বিবিধ জনকল্যাণ কাজের সাহায্যার্থে। জাল পাদরি দাতাদের ধন্যবাদ দিয়ে দশ হাজার ফ্রাঁ পকেটস্থ করলে। তারপর একখানা ট্রাক রাস্তা দিয়ে যেতে হেনরি আর একটা ডাক শুনে চমকে উঠল: আরে, ঐ তো পাদরি!"

হেনরি দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়লো। তখন আর কোন উপায় ছিল না। ট্রাকে ছিল পাদরির সেবা প্রতিষ্ঠানের সহকারী ছাত্রদল। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই সাজা চেহারা ধরে ফেললে এবং সেই নকল পাদরির দাড়ি উপড়ে, পোশাক ছিঁড়ে, উত্তমমধ্যম দিয়ে ওকে ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে গেল।

পরে সেই নকল পাদরিকে আসল পাদরি পিয়েরের সামনে হাজির করলে। কিছুক্ষণ ধরে পাদরি পিয়ের লোকটির মুখের দিকে নির্নিমেষভাবে চেয়ে রইলেন; তারপর তার কাহিনী শুনলেন— কিভাবে সে সার্কাসে



প্রাচীন খৃষ্টীয় শিল্প-নিদর্শন—তুরস্কের আইচেল প্রদেশে আবিষ্কৃত চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত গির্জার অভ্যন্তরভাগে মোজেকের কাজ। বহু রকমারী রঙের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে—ওপরের এই হাঁসের প্রতিকৃতিটিতে সাদা, হলদে, লাল, সবজেটে সাদা, পিঙ্গল, বাদামী ও সবুজ

কাজ জুটিয়েছিল এবং কি করে তার চাকরি চলে যায়।

শোনার পর পাদরি বললেন, "বেশ, তুমি এবার কাজ করবে, আমার হয়ে। তুমি আমার গাড়ি চালাবে।"

ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না। এণ্ডি মিলবোর্ণ নামে এক যুবক আর্নহামে প্যারাট্রুপার থাকতে এক জর্মান ট্যাংক-বিধ্বংসী কামানের গোলায় তার দুটি হাতই ছুৎরে যায়।

তখন কি মিলবোর্ন বিশ্বাস করতে পারতো যে তার শত্রুরাই তাকে নতুন হাত জোগাবে? জর্মানির ১১৬ আর্মার্ড ডিভিসনের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে মিলবোর্ন কিন্তু সেই উপহারই লাভ করে। জার্মানরা ওদের সেরা নকল অংগ বিশেষজ্ঞকে দেখাবার সমস্ত ব্যয় বহন করে। এখন মিলবোর্ণ তার কৃত্রিম হাত নিয়ে নিউ ক্যাসেলে সরকারী চাকরী করছে।

বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে নিকোলাস এলকেমিড নামক এক সামরিক বিমান-চালকের ভাগ্যে। ১৯৪৪ সালে রুরের ওপর দিয়ে ল্যাংকাস্টার বিমান চালিয়ে যাবার সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে শত্রু বিমান এসে ওর বোমারুর ওপর গোলা ছুড়ে বিমান-খানিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে এলকেমিডের প্যারাসুটটি পুড়ে যায় এবং আগুনে দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে সে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আঠার হাজার ফিট নীচের দিকে।

মনে হয়েছিল মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু আশ্চর্যভাবে প্রথমে ও পড়ে একটা ঝাঁকড়া ঝাউ গাছের শাখায়, যার ফলে পতনের বেগটা রুখে যায়, তারপর পড়ে তুষারস্তূপের ওপর।

বেঁচে গেল এলকেমিড; একখানি হাড়ও ভাঙেনি, শুধু হাঁটু মচকে যাওয়া ছাড়া। জর্মানরা ওকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন বুঝতে পারলে যে ও সত্যিই বিনাপ্যারাসুটে তিন মাইল উঁচু থেকে পড়েছে, তখন ওরা ওকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে বিশেষ কতকগুলি সুবিধে ভোগ করতে দেয়।

কখন কখন দেখতে হয়তো দুর্ঘটনা কিন্তু আসলে তা নয়। রেড দ্বীপে উইসকেট নামক স্থানে এক ব্যক্তিকে একটি জ্বলন্ত গৃহের মধ্যে থেকে এক এক করে চারজন স্ত্রীলোক ও একটি বালককে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর ক্লান্তিতে অবশ হয়ে শুয়ে পড়তে দেখে দর্শকেরা ওর দুঃসাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু তারপরই পুলিস এসে কিন্তু লোকটিকে গ্রেপ্তার করলে। পুলিস ওকে ধরলে ঐ আগুন লাগাবারই অপরাধে।

*

লেবাননের রাজধানী বেইরুটে গেলে শহরের গা দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম কেন কুকুর-নদী হয়েছে সে সম্পর্কে একটা কিম্বদন্তী শুনতে পাওয়া যায়।

কাহিনীটি হচ্ছে, বহু শতাব্দী পূর্বে পাথরের বিরাট একটা কুকুরের প্রতিমূর্তি নদীর মুখে পাহাড়ের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। ওর মাথাটায় ছিল প্রকান্ড একটা ফাঁপা গর্ত।

একটা বিশেষ দিক থেকে হাওয়া বইলে সেই ফাঁপা গর্ত থেকে বিকট গর্জন উঠতো। যা তখনকার অধিবাসীদের ভয় পাইয়ে দিত। গর্জনে সারারাত ধরে লোকেদের জেগে থাকতে হত এবং সকালে কেবলমাত্র প্রবীণরাই সেই মূর্তিটার কাছে যেতে সাহস করতো। কুসংস্কারাচ্ছন্নরা মনে করতো যে মাঝরাত থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কুকুরটার ওপর ভূত ভর করে।

একদা মাতব্বররা ঠিক করলে যে রাত্তিরের ঐ বিকট গর্জন বন্ধ করতেই হবে তা না হলে কুসংস্কার যাবে না। এই ঠিক করে একদিন সকালে ওদের মধ্যে তিরিশ জন সাহসী লোক পাহাড়ে উঠে বিস্তর চেষ্টা করে কুকুরের মূর্তিটা নদীতে ফেলে দিতে সক্ষম হয়।

*

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যতো উন্নতি হতে থাকে দুষ্কৃতকারীদের পদ্ধতিও তেমনি বদলে বদলে যেতে থাকে। আইনভংগ-কারী আর পুলিসের মধ্যে বুদ্ধির লড়াই লেগেই আছে।

জার্মানীর ডার্মস্টাডের এক লাইব্রেরীতে অনবরত চুরি হতে থাকায় পুলিস একটা সেলফে একটা টেলিভিসন ক্যামেরা বসিয়ে নীচের তলা থেকে দেখার ব্যবস্থা করে।

খানিক পরেই টেলিভিসন ক্যামেরায় একজন লোককে অন্যদের পকেট মারতে দেখা গেল। লোকটিকে গ্রেপ্তার করতে সে চুরির কথা অস্বীকার করে এবং প্রমাণ দেখাবার জন্যে বলে। তখন ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে টেলিভিসনে তোলা ওর কীর্তির ছবি দেখিয়ে দেওয়া হয়।

নিজের কুকর্ম নিজের চোখে দেখে লোকটি মন্তব্য করে: "আজকাল ভালভাবে রোজগারের আর উপায় থাকছে না!"

*

দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিবাসীদের কোন ফুটবল দল মাঠে খেলতে নামার আগে আজকাল ওদের ওঝাকে একবার মাঠ ঘুরিয়ে নেয়।

আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে ওঝা এমন সব তুকতাক নাকি করে যাতে সে-দলের হারবার সম্ভাবনা খেলা আরম্ভের পূর্বেই অন্তর্হিত হয়। এইসব ওঝাদের মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, মাদুলি-কবচ দলের সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। দল জিতলে এরা দেড়শ থেকে আড়াই শ টাকা পারিশ্রমিক পায়।

ওদেরই মধ্যে সমঝদার দলের ম্যানেজাররা ওদের ওঝাদের সাপ্তাহিক হারে নিযুক্ত করে। খেলায় যদি খুব জঘন্য হার হয় তাহলে ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উন্নততর নৈপুণ্যের ওপর নয়, ওরা দোষ দেয় ওঝার অক্ষমতাকে। আর সেই ওঝা যদি খুব নামকরা কেউ না হয়, তাহলে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ওঝারা ওদের তুকতাক কাজে ফলাবার জন্যে চরমেও যায়। কোন ফাইনাল খেলার আগের রাতে ওরা দুজনে লুকিয়ে মাঠে গিয়ে কেউ মোরগের মাথা আর কেউ ছাগলের খুলি মাটিতে পুঁতে দেয়। যে আগে পুঁততে পারে সে-ই মনে করে তার দলের বিজয় অবার্থ।

কোন কোন কুসংস্কারাপন্ন খেলোয়াড় বিশ্বস্ত এবং ভয়াবহ বলে পরিচিত কোন ঐন্দ্রজালিকের দেওয়া কবচ না বেঁধে মাঠেই নামতে চায় না।

আবার কেউ কেউ আছে যারা খেলতে খেলতে হাত-পা কেটে বা মচকে গেলে সংগে সংগে ওঝার দাওয়াইয়ের জন্য চেঁচিয়ে ওঠে।

এখানকার দর্শকদের মতে বেশীর ভাগ খেলাই হয় ফুটবল খেলাতে নৈপুণ্যের চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ওঝাদের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার বাহাদুরী পরীক্ষাই বেশী।

# পুস্তক পরিচয়

**গান্ধীজীবনী**

An Autobiography: M. K. Gandhi. Navajivan Publishing House, Ahmedabad. Price Rs 2/-.

গান্ধীজীর আত্মচরিত সম্পর্কে পাঠক সাধারণের নিকট নূতন পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা নেহাতই বাহুল্য। সামান্য লেখাপড়া শেখা ভারতীয় মাত্রেই কোনো না কোনো ভাবে এই মনীষীর আত্মজীবনী পাঠ করেছেন। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষায় বইটির অনুবাদ আছে। তথাপি এই ইংরাজী বহুমুদ্রিত সংস্করণটি সংগ্রহ করার পক্ষে একটি যুক্তি সবচেয়ে বড় এবং তা এই যে, নবজীবন প্রকাশন থেকে নামমাত্র মূল্যে ৪০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পরিবেশন করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর 'মাই এক্সপেরিমেণ্টস উইথ ট্রুথ' এবং এই আত্মজীবনী একই গ্রন্থ। মহাদেব দেশাই অনূদিত গান্ধী আত্মচরিতটি ইংরাজী জানা পাঠক মাত্রেরই সংগ্রহ করা উচিত।

(২৫৬।৫৮)

**প্রবন্ধ**

G.B.S.: The Potter and the Wheel—Kalyan Nath Dutta. Bani Niketan, Calcutta-6. Rs. Two only.

আমাদের কাছে জর্জ বার্নার্ড শ এক বিরাট প্রহেলিকা। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে সুবিরাট রচনাসম্ভারে এত বিপরীতধর্মী কথা তিনি বলে গেছেন যে, কোনটা তাঁর নিজের কথা তা বোঝাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ'র সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার বিশ্লেষণের এক সার্থক প্রয়াস পেয়েছেন অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত। গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে শ তাঁর ধ্যানধারণাকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর নাটক উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থাদির মধ্য দিয়ে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। শ সম্পর্কে অনুরাগী বা উৎসুক পাঠকমাত্রই বইখানি পড়ে তৃপ্ত হবেন। যুক্তিবাদী শ'র যুক্তিনিষ্ঠা প্রমাণে অধ্যাপক দত্ত সফল হয়েছেন, সে কথা অসংকোচে বলা যেতে পারে। ২৯৬।৫৮

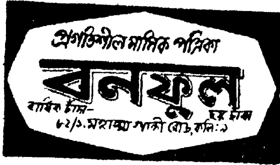
**অনুবাদ**

**তোমাদের চারিদিকে—ইলিন ও সেগাল।** দ্বিতীয় ভাগ। অনুবাদ—তরুণা বসু। ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, কলিকাতা—১৩। মূল্য—এক টাকা বারো নয়া পয়সা।

রুটি খায় সকলেই। বই, পথের আলো, ঘড়ি—সে-ও সকলেরই দরকার। তবু আমাদের চারিদিকের এই সব জিনিস সম্বন্ধে আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায় কিছুই জানে না। রুশদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা এই বইখানিতে রুটি তৈরীর কাহিনী, বইয়ের শহর লেনিন পাঠাগারের কথা, ঘড়ির কথা ও পথের আলোর বিবর্তনের ইতিবৃত্ত রয়েছে। বইখানি পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য এই জাতীয় বই লেখা হবে কবে? সহজ ঢং-এ লেখা এই বইখানিতে পাণ্ডিত্যের কচকচানি নেই, অথচ জ্ঞাতব্য জিনিসগুলো এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে, ছোটরা বুঝতেও পারবে না যে বইখানি পড়তে পড়তে তাদের এত কথা জানা হয়ে গেল। অনুবাদের সাবলীল ঢং মূল গ্রন্থের আস্বাদ রক্ষা করেছে। রুশ ছেলেমেয়েদের জন্য মূল গ্রন্থখানি লেখা হলেও, অনুবাদ পড়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও যে খুশী হবে এবং কিঞ্চিৎ উপকৃত হবে তা অসংকোচে বলা যায়। ৪৪০।৫৮

**প্রতিশোধ**—আলেকজাণ্ডার পুশকিন। প্রথম খণ্ড। অনুবাদ—পার্থসারথী। শংকরীপ্রসাদ হাজরা কর্তৃক বোহিলাপাড়া, বর্ধমান থেকে প্রকাশিত। দাম—দু টাকা।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের পাঠকের কাছে উনিশ শতকের রুশ সাহিত্যের দিকপাল পুশকিনের নাম পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁরই লেখা 'দুব্রভস্কি'র বাংলা তর্জমা আলোচ্য










গ্রন্থখানি। জারশাসিত প্রায় দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থার পটভূমিকায় দু'টি জমিদার পরিবারের বিরোধ ও প্রতিহিংসার যে কাহিনী, তাদের নীতিহীন অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতাভিমানের যে নগ্ন ও নিখুঁত ছবি এতে পুশকিন এঁকেছেন তার আবেদন দেশকালের সীমা পেরিয়ে আমাদের কাছেও যথেষ্ট। বইখানির অনুবাদ ভালো। স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষা মূলের রসাস্বাদনের সহায়ক হয়েছে। বাঙালী পাঠকের হাতে 'দুব্রভ্‌স্কি'কে তুলে দেবার জন্য অনুবাদক প্রশংসার দাবী রাখেন।

৩১৬।৫৮

**তলস্তয়ের গল্পকথা**—লেভ নিকলায়েভিচ তলস্তয়। অনুবাদ—মঞ্জরী চক্রবর্তী। ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী। মূল্য তিরানব্বই নয়া পয়সা।

ছোটদের জন্য লেখা নয়টি ছোট গল্পের অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি সুলিখিত, বলাই বাহুল্য। অনুবাদ সাবলীল। বেশ কয়েকটি একবর্ণ ও বহুবর্ণ-রঞ্জিত ছবিসমৃদ্ধ এই বইখানি পেলে ছোটরা যে খুশী হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

৩৪৯।৫৮

## ছোট গল্প

**বিদেশিনী**—শেখর সেন। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—দু' টাকা।

নতুন লেখকের বই—কিঞ্চিৎ সন্দেহে হাতে নিয়েছি 'বিদেশিনী'। কিন্তু অশেষ তৃপ্তি পেয়েছি 'বিদেশিনী'র সাতটি গল্প পড়ে। লেখক শেখর সেন জাত গল্পবলিয়ে। সব গল্পেরই পটভূমি ইয়োরোপ, কিন্তু গল্পে নায়িকাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য তত প্রকাশ পায়নি যত পেয়েছে তাদের মানব-চরিত্র। গল্পগুলির উজ্জ্বল মসৃণতা, কাহিনীর বিদ্যুৎচমক ফরাসী গল্পলেখকদের, অথবা ইংরেজ ম'মের সঙ্গে তুলনীয়। প্রথম গল্প 'মরিণের গল্প' এবং শেষ গল্প 'ল্যান্ডস এন্ড' একাধিকবার পড়লেও বাসি হবার নয়।

লেখককে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। তাঁর কাছে আরো গল্প শোনার দাবিও পেশ করছি।

৫৫২।৫৭

**ছিলেন যাদুর দেশে**—ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। ২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সাতটি ছোট গল্পের একটি সংকলন। লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ ও লিপিকুশলতা গল্পগুলোকে সার্থক সাহিত্য-কর্মের মর্যাদা দান করেছে। প্রথম গল্পটি ছাড়া অন্য সবগুলো গল্পেই একটা করুণ অথচ মধুর রসের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। প্রথম গল্পটিতে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে যে ব্যঙ্গ কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে তা পাঠক মাত্রকেই যেমন আনন্দ দেবে তেমনি তাদের ভাবনারও খোরাক জোগাবে। তবে এই গল্পটির নামেই বইখানির নামকরণ করে বোধহয় লেখক তাঁর সংকলনটির প্রতি অবিচার করেছেন। কারণ, এর সুরের সাথে বইখানির অন্য গল্পগুলোর সুরের কোন মিল নেই।

৫৩৪।৫৮

**উঁচুনীচু**—জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। নমামি প্রকাশ মন্দির, ৮।২ গোপ লেন, কলিকাতা-১৪। দেড় টাকা।

অগ্নিযুগের অন্যতম অগ্নিসাধক জিতেশবাবুর লেখা দশটি গল্প আলোচ্য গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলোর সব কয়টিই সুলিখিত। এগুলোর কোন কোনটিতে যেমন রয়েছে লেখকের ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি-চিত্রণ, তেমনি আবার কোন কোন গল্পে রয়েছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, দেশের সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রতি তাঁর আক্রমণ। লেখকের এই আক্রমণ থেকে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী কোনো নেতা বা কর্মীই বাদ যাননি। কিন্তু এই বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের পেছনে কোন স্বার্থান্বেষী কুৎসা নেই, আছে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার স্পর্শ। সেই কারণেই গল্পগুলো প্রচারধর্মী না হয়ে সার্থক গল্পের মর্যাদা লাভ করেছে।

৪০৬।৫৮

## নাটক

**তিন সর্গ**—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২। ১ টাকা ৬২ নয়া পয়সা।

তিন সর্গ অমরেন্দ্রবাবুর লেখা তিনটি একাংক নাটকের সংকলন। ইতিপূর্বে নাট্যকারের দেওয়া শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' বা রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-এর নাট্যরূপ সমালোচক ও সুধীজনের প্রশংসা যথেষ্ট অর্জন করলেও তাঁর লেখা মৌলিক নাটকের সংকলন বোধহয় এই প্রথম। বলতে দ্বিধা নেই, এতেও তিনি তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

যে তিনটি নাটক এতে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে 'রঙ্গমঞ্চ' ও 'প্রহসন' হাস্যরসপ্রধান। অতি স্বল্প আয়াসে নাট্যকার এই দুটি একাংকিকায় হাসির অনাবিল ফল্গুস্রোত বইয়ে দিয়েছেন। অপর নাটক 'রঙ্গমঞ্চ'-এর সুর অবশ্য আলাদা। কিন্তু এতে যে আঙ্গিকের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন তা অনবদ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে এই নাটকটি আঙ্গিকের দিক থেকে নিঃসন্দেহে এক নতুন পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। নাট্যগুটির অভিনয় দর্শককে আনন্দ দিতে সক্ষম হবে বলে

যেমন মনে হয়, সুপাঠ্য সাহিত্য হিসাবেও তেমনি তা পাঠককে আনন্দ দেবে বলেই বিশ্বাস করি। ৫৩৩।৫৮

## শারদীয়া সংকলন

**লালবাজার**—ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। কলিকাতা আরক্ষা রবীন্দ্র-পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত। ১৮, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১। প্রতি সংখ্যা পাঁচসিকা।

পুলিস। এই কথাটা শোনা মাত্র আমাদের মনে এক ধরনের ধারণার উদয় হয়। সে ধারণাটা সম্ভবত ভালো ধারণা না। এর কারণ আছে। বৃটিশ আমলে পুলিসের হাতে আমাদের নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। সে-স্মৃতিটা বুঝি সম্পূর্ণ মোছেনি।

আজকের এ-কালটা নতুন কাল। এখন পুলিস আর আমাদের অনাত্মীয় নয়। এখন তাই তাঁদের সম্বন্ধে ধারণাটা বদল করে দেওয়া দরকার হয়েছে।

ধারণা-বদলের জন্যে তাঁদের তরফ থেকেও উদ্যোগ দেখে খুশি হয়েছি। তাঁরা প্রকাশ করেছেন এই সাহিত্য পত্রিকা। আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে তাঁদের হয়তো রূঢ় কঠোর আর কঠিন হতে হয়, আমরা তাঁদের সেই দিকটাই চাক্ষুষ দেখতে পাই। কিন্তু তারই নেপথ্যে আরও একটা দিক—সে দিকটই কোমল ও কমনীয়। এই পত্রিকাটির মারফত তাঁরা তাঁদের সেই অদৃশ্য দিকটা মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

আলোচ্য সংখ্যাটিই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা। এতে কয়েকটি লেখা প্রকৃতই ভালো, ভাষার দিক থেকে এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে: যথা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'অমিত বচন' ও রবীন্দ্র সেনগুপ্তের 'নতুন জীবনের আহ্বান'; পি এস ডি আয়ারের 'আ-মরি ভাংলা ভাষা' লেখাটিও উত্তম, এ লেখাটি তাঁর বাংলায় মূলে রচনা, না, অনুবাদ করে দেওয়া? তিনি বলেছেন "বাংলা ভাষায় পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি" এতে মনে হয় যে, এই অবাঙালী ভদ্রলোক বাংলা ভাষা জানেন না। এ সত্ত্বেও এই ভাষার উপর তাঁর শ্রদ্ধা দেখে আমরা আনন্দিত। তাঁর লেখাটা যদি পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী অনুবাদ করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তা উল্লেখ করা উচিত ছিল। গল্প ও কবিতাগুলিও আমাদের মন্দ লাগেনি। সবশেষে পুলিস-কমিশনার উপানন্দবাবুর 'আইন ও তার প্রয়োগ' লেখাটির উল্লেখ করি—এই লেখাটি সকলের পড়ে দেখা উচিত, এতে শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে পুলিস পক্ষের বক্তব্যটি বেশ সহজ করে বলা হয়েছে।

পত্রিকা পরিচালনা কাজটা সহজ নয়। এতে সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা হচ্ছে ধৈর্য ও নিষ্ঠা। আশা করি কলিকাতা আরক্ষা রবীন্দ্র-পরিষদের এই দুটি জিনিসের অভাব হবে না। এবং তাঁরা ভালো প্রুফ-রীডারের ব্যবস্থা করে ছাপা ও বানান ভুল কমাবার দিকে মনোযোগ দেবেন। তাহলে পত্রিকাটির মর্যাদা আরো বাড়বে।

**উত্তরসূরী**—অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৯ বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ২। দাম ১, টাকা।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে উত্তরসূরীর নিয়মিত লেখকবৃন্দের প্রবন্ধ, কবিতা, সাহিত্য শিল্প সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। সুনীল মুখোপাধ্যায়ের 'রাষ্ট্র ও শিল্প' যথার্থভাবেই সুরচিত এবং চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ। অন্নদাশংকরের "আত্মচিন্তা : সত্য, বিশ্বাস ও শিল্পদৃষ্টি" লেখকের শিল্পী সত্তার পরিচিতি। অমিয় চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আলোক সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা ও সমালোচনা-সাহিত্য, শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ পাঠকের নিকট আকর্ষণীয়। অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ছড়া, রবীন্দ্র সংগীত স্বরলিপি এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য যোজন।

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে :—

**শ্বেত বাহু**—শ্রীরাইমোহন সাহা।
**নেপোলিয়নের দেশে**—দিলীপ মালাকার।
**সাগরে মিলায় ডন (১ম খণ্ড)**—মিখাইল শলোখফ। অনুবাদক রথীন্দ্র সরকার।
**চৈত্র দিন**—ননী ভৌমিক।
**নীলকণ্ঠ**—মুকুল পাল চৌধুরী।
**হাসির টেক্কা**—শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার।
**একটি বাহু শিখা**—তারক হালদার।
**আমার মা**—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
**জ্ঞান থেকে অজ্ঞান**—বুদ্ধদেব বসু।
**ঝড়ের যাত্রী**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
**নিশুতিপুর**—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
**ফাঁকির জন্যে ফিকির খোঁজা**—শিবরাম চক্রবর্তী।
**রাঙন রূপকথা**—প্রবোধকুমার সান্যাল।

# আর্থিক সমীক্ষা

**শ্রীকৌটিল্য**

সরকারী সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে আসে বোঝা যায় না। বেশিদিন হয়নি, অশোক মেহতা কমিটি প্রস্তাবিত খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ের সমাজীকরণ পন্থাটি সরকারী মহলে অবহেলিত হয়েছিল। খাদ্যশস্যের দাম তখন থেকে মোটেই নামেনি বলে এখন চাপে পড়ে সরকার অগত্যা সেই প্রস্তাবই বিবেচনা করছেন।

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা সমাজীকরণের নীতির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এতে কৃষকের আয় বিপর্যস্ত হতে পারবে না; সরকার তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট এবং যুক্তিসংগত দামে জিনিস কিনে তাকে অসাধু শক্তিশালী ব্যবসায়ীর হাত থেকে রক্ষা করবেন। অপরদিকে, অবস্থার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী জিনিসের দাম প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে সাধারণ ক্রেতার আর্থিক জীবনও ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে বলে সে দিকেও উপরোক্ত সরকারী সাহায্যে একটা সামঞ্জস্য আনা সম্ভব। উপরন্তু এই পন্থার ফলে দালাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মজুতদার গোষ্ঠীর অসামাজিক কার্যকলাপও বন্ধ হতে পারে।

এখন এই পন্থা বিবেচনার মধ্যে সরকারের কোনো অভিনবত্ব নেই। অনেক বছর আগেই এরকম করা স্বাভাবিক ছিল, যদিচ এতদিন ধরে সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া কিছুই ঘটেনি। প্রসঙ্গত, মাত্র গত বছর খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্যে এবং মূল্যের ঘন ঘন গতি পরিবর্তনে (ফ্লাকচুয়েশান) আতঙ্কিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজে বক্তৃতার মারফৎ দালাল এবং মজুতদারদের অসামাজিক জীব বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং পরিসংখ্যান সহযোগে জানিয়েছিলেন যে, এই অসামাজিক জীবেরা তাদের কেনা দামের উপরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ২০০ ভাগ লাভ করছে।

সুতরাং রাজ্যসমূহ যদি তাদের খাদ্যশস্য বিতরণের ভার নিজের নিজের সরকারের হাতে তুলে দেয় তবে তত্ত্বগতভাবে একদিকে কৃষককুলের স্বার্থ এবং অন্যদিকে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। প্রথমত, সরকারের পক্ষে রাজ্যের সমস্ত খাদ্যশস্যের অর্ধেকের বেশি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হবে না। এটা সরকারী মহলেরই ধারণা। উপরন্তু এই অর্ধেকও অনেকাংশে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে (সরকারী এজেন্ট হিসেবে) বিতরিত হবে। এবং বেসরকারী লোককে এজেন্সি দেওয়ার অর্থ পুরোনো কাঠামোকেই বাঁচিয়ে রাখা। একমাত্র গ্রাম সমবায় কিংবা পঞ্চায়েতের স্তরে এই বিতরণ দায়িত্ব রাখা যেতে পারে; কিন্তু সরকার তাতে আস্থাহীন। সরকারী মহলে তিন চারটি আঞ্চলিক কর্পোরেশন গঠনের যে প্রস্তাব হয়েছে সে সম্বন্ধে এই মুহূর্তে মন্তব্য করা অনুচিত, তবে ঐসব কর্পোরেশনের প্রধান প্রয়োজন হবে নিরপেক্ষ গঠন এবং অসাধু স্বার্থসিদ্ধির সুযোগের অভাব। এই গুরু দায়িত্ব সরকারকে বুঝে নিতে হবে।

আরেক কথা। সরকার শুধু কৃষকের কাছ থেকে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তটুকু (মার্কেটেবল সারপ্লাস) কিনে নিয়ে বাঁধা দরে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিলেই কাজ সম্পূর্ণ হবে না। চাষীর চাষের সময় কৃষি ঋণ এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ঋণ যদি সরকার দিতে না পারেন তবে গ্রামের মহাজন অথবা অন্য ধনী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের খপ্পরে কৃষক গিয়ে পড়বেই। এইসব ঋণের শর্ত, সকলেই জানেন, কৃষককে মেটাতে হয় তার ফসল দিয়ে। এইভাবে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সরকারের হাত থেকে সরে অন্য ব্যবসায়ীর হাতেই শেষে চলে যেতে পারে। বর্তমান লেখকের মতে গ্রাম সমবায়ের হাতে পাইকারী বিতরণের ভার দিয়ে এই ব্যবস্থা করা উচিত যে, বিক্রয়যোগ্য মোট উদ্বৃত্তের থেকে প্রথমেই সমবায় কৃষি-পুঁজি হিসেবে খানিকটা ফসল অন্য খাতে সরিয়ে রাখবে। চাষের সময় এই পুঁজি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া চাষীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আর্থিক ঋণ যতদূর সম্ভব গ্রাম সমবায়ের মারফত করাতে পারলে আলোচ্য মূল উদ্দেশ্য রক্ষিত হবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাংককেও (State Bank) অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হবে।

চাষীকে ছাড়াও, খুচরো ব্যবসায়ীকে ধারে জিনিস দেবার ক্ষমতা বর্তমানের বেসরকারী ব্যবসায়ীদের একটি বড় শক্তি। এই শক্তির বিরুদ্ধে সরকারকে উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। বেসরকারী ব্যবসায়ীদের শক্তির আরেক কারণ তাদের উল্লেখযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা (storage)। এটা সুখের বিষয় যে সরকারী মহলে এইসব প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচিত হচ্ছে। আশা করা যায়, কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসা কর্পোরেশন (State Trading Corporation) যৌথভাবে সবদিকে সতর্কতা অবলম্বন করে অগ্রসর হতে পারবেন, যদিও অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থার মূলে যে বড় গলদ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করেছি তা থেকেই যাবে।

পরিশেষে, আরেকটি সমস্যা সম্বন্ধে সরকার কি করবেন কিছু জানা যায় নি। সরকারের ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য সারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক ও অভিন্ন থাকতে পারে না। অথচ এত বড় দেশের আঞ্চলিক মূল্য নিরূপণ কি ভিত্তিতে করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। আঞ্চলিক কৃষি জীবনের মান এবং প্রয়োজন অনুসারে ক্রয়মূল্য স্থিরীকরণ হওয়া উচিত। অপর ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে সর্বত্রই একটা সঙ্গতি (parity) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। নয়তো এই দুই মূল্যের পার্থক্য থেকে একটা অসংগত এবং অসমর্থনযোগ্য উদ্বৃত্ত শোষণের (exploitation) রূপ নিতে পারে। প্রসঙ্গত, রাজ্যসমূহের হাতে খাদ্যের পাইকারী বিতরণভার ন্যস্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্য চাষী ও সাধারণ ক্রেতার মঙ্গল সাধন, রাষ্ট্রীয় স্তরে জবরদস্তি করে ব্যবসার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি নয়। আঞ্চলিক মূল্যায়নের ব্যাপারে, আমরা বিশ্বাস করি, দেশের উপযুক্ত অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতাত্ত্বিকদের অবদান অপরিহার্য হবে।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

### নিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতা

এস কে পাতিলের সভাপতিত্বে ভারত সরকার যে ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি বসিয়েছিলেন, তার রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে, কিন্তু ভারতের ফিল্ম-ব্যবসায়ীরা আগেও যে তিমিরে ছিলেন, এখনও সেই তিমিরেই রয়েছেন। তিমির দুয়ার ভেদি কোন জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব তো দূরের কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে তিমির আরো ঘনীভূত হয়েছে। কাঁচা ফিল্মের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এমনি এক অমানিশির সূত্রপাত হয়েছে ফিল্ম-ব্যবসায়ের সকল স্তরে।

বাঙলায় ফিল্ম শিল্পের বিস্তার স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা সীমাবদ্ধ। বোম্বাই ও মাদ্রাজে তা' নয়। সংখ্যার দিক দিয়ে ঐ দুই কেন্দ্রের চলচ্চিত্র শিল্প ক্রমবর্ধমান। তাই কাঁচা ফিল্মের নিয়ন্ত্রণ ঐ দুটি অঞ্চলে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বেশী। মাদ্রাজে তো সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে শোভা-যাত্রা বার করা হয়েছিল। বোম্বাইতেও নানা কণ্ঠে ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই সম্পর্কে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! একদিকে সরকরীভাবে স্বীকৃত হচ্ছে, ১৯৫৭ সালে বিদেশে ভারতীয় ফিল্ম দেখিয়ে সওয়া কোটি টাকারও কিছু বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে, সেই সরকারই অপর দিকে দূরদৃষ্টির অভাবে এদেশের ফিল্ম-শিল্পের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করছেন একের পর আর এক বাধা সৃষ্টি করে। অথচ তা করা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের অজুহাতে।

ফিল্ম-শিল্পের তরফ থেকে উপর-ওয়ালাদের কাছে যখনই দরবার করা হয়েছে, স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে, দীর্ঘ পত্রালাপে বিষয়টিকে সরল করবার চেষ্টা হয়েছে, তখন ও-পক্ষ থেকে মিষ্টি-মধুর আশ্বাসবাণীর অভাব ঘটেনি। খবরের কাগজের রিপোর্টের ভাষায়, মন্ত্রী মহোদয় ধৈর্যসহকারে আবেদন শুনেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে তিনি সমস্ত ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখবেন।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল এসব আশ্বাসবাণীর মূল্য কাণাকড়িও নয়। পরবর্তী ছমাসের যে আমদানী-নীতি সম্প্রতি সরকরীভাবে ঘোষিত হয়েছে, তাতে ফিল্ম-শিল্পের কপালে অন্টরম্ভা। দু'একটি ছোটখাটো ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের নিগড় খানিকটা শিথিল করা হলেও, কাঁচা ফিল্ম আমদানীর ব্যাপারে আগের নিয়মই বজায় থাকবে। অর্থাৎ শতকরা চল্লিশ ভাগ কম ফিল্ম আমদানী করবার যে নিয়ম চালু হয়েছিল নিয়ন্ত্রণের গোড়ায়, এখনও সেই নিয়মই বলবৎ থাকবে।

এর ফলে শুধু যে অসন্তোষের মাত্রা বেড়েছে তা নয়, ফিল্ম-প্রযোজক ও স্টুডিওর কর্মীদের মনে এমন এক হতাশা সঞ্চারিত হয়েছে, শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে যা মোটেই অনুকূল নয়।

কিন্তু কে বুঝবে তা?

### সরকারী তৎপরতা

ঠিক এই সময়ে—ফিল্ম-শিল্পের যখন নাভিশ্বাস ওঠবার অবস্থা—দিল্লী থেকে প্রচারিত একটি খবরে দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় ফিল্মের মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে একটি ফিল্ম প্রোডাকসান ব্যুরো স্থাপন করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

এই ব্যুরো স্থাপনের প্রস্তাব ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টেই ছিল। এতদিন বাদে এ ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের এই আকস্মিক তৎপরতা তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা নেই-মামার চাইতে কাণা-মামাও ভাল এই নীতিতে চলেন, তাঁরা এই প্রস্তাবে অবশ্যই উল্লসিত হবেন। কিন্তু ফিল্ম-শিল্পই যদি শুকিয়ে মরে, তাহলে মানোন্নয়নের মূল্য কি?

দিল্লীর খবরে আরো প্রকাশ, ফিল্ম ব্যুরোর সঙ্গে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউটও স্থাপিত হবে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের



অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বরুণ পিকচার্সের 'জন্মান্তর' ছবির নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

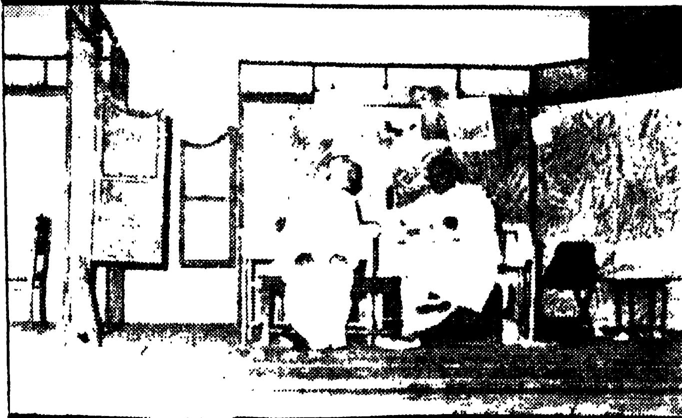
উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন বিভাগের কলা-কুশলীদের শিক্ষাদান করা ও খোঁজখবর দেওয়া। অভিনয় শিল্পীদের প্রতিভাও যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে, তারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকবে এই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে।

যার শেষ ভালো, তার সব ভালো।

**শিক্ষকদের শিক্ষা**

ছেলেমেয়েদের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে শিশু রংমহল দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। যেসব বিদেশী পর্যটক এখানে বেড়াতে এসে শিশু রংমহলের অভিনয় আসরে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মারফৎ শিশু রংমহলের নাম-যশ বিদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

এমনি একজন বিদেশী পর্যটক, ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলি, বিশ্বৎসমাজে যাঁর নাম সুপরিচিত, শিশু রংমহলের বাৎসরিক ফেস্টিভ্যালে যোগ দিয়ে এতদূর আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি উনেস্কোর



সম্প্রতি নিউ এম্পায়ারে অনুশীলন সম্প্রদায় অভিনীত 'শেষ সংবাদ' নাটকের একটি দৃশ্যে মমতাজ আহমেদ ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি আগামী ৩০শে নভেম্বর সকালে উক্ত মঞ্চে পুনরভিনীত হবে।

(UNESCO) সভায় প্রস্তাব আনেন, যাতে শিশু রংমহলের কার্যকলাপ ও পরিচালনা পদ্ধতি শিক্ষকদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদমীর সহায়তায় এতদিনে সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়েছে। গত ১০ই নভেম্বর পনেরো জন শিক্ষককে নিয়ে শিশু রংমহলের প্রথম শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্র (টিচার্স ট্রেনিং সেণ্টার) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত হয়েছে।

এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে গিয়ে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, শিশু রংমহল অল্পকালের মধ্যে যে উন্নতি করেছে, তা অনুধাবন করলে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। তিনি আশা প্রকাশ করেন, যেসব শিক্ষক এই কেন্দ্রে যোগ দিলেন, তাঁরা যেন এঁদের অভিজ্ঞতার সবটুকু নিজের করে নিতে পারেন।

শিশু রংমহলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় শিক্ষকদের পরিচয় দিতে গিয়ে এই কেন্দ্র উদ্ঘাটনের পিছনকার ইতিহাসটুকু বিবৃত করেন। শিক্ষক এবং শিশু রংমহলের এই যোগাযোগে দুপক্ষই লাভবান হবেন বলে তিনি মনে করেন।

শিশু রংমহলের সভাপতি শ্রীএন এন বোস নব শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান এবং বলেন যে, শিশু রংমহলের বিভিন্ন বিভাগের ওপর শম্ভু মিত্র, সত্য সেন, হার্বার্ট মার্শাল, তাপস সেন প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতায় তাঁরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন।

উদ্বোধনী সভার শেষে শিশু শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিনয় প্রদর্শন করে অনুষ্ঠানটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে।

## চিত্রালোচনা

নবারুণ চিত্রের "সূর্যতোরণ" ও নটরাজ প্রোডাকসন্সের "মিঃ কারটুন, এম-এ" এই ছবি দুখানি এ হপ্তার নতুন আকর্ষণ। নাম দেখে বোঝা শক্ত নয় যে, প্রথমখানি বাঙলায় এবং দ্বিতীয়খানি হিন্দীতে তোলা।

নতুন জীবনের আশ্বাস নিয়ে এসেছে "সূর্যতোরণ" অগ্রদূতের পরিচালনায়। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এর











রূপজ্যোতির মুক্তিপ্রতীক্ষিত ভক্তিচিত্র 'ঠাকুর হরিদাস'-এ লক্ষহীরার রূপ-সজ্জায় সুমিত্রা দেবী।

কাহিনী লিখেছেন এবং ছবির পর্দায় তাকে রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, শোভা সেন, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা। হেমন্তকুমার সুরযোজনা করেছেন এই ছবিতে।

"মিঃ কারটুন, এম-এ" হাসিখুশিতে ভরা ব্যঙ্গাত্মক ছবি। পরিচালনা করেছেন বেদ ও মদন—প্রযোজনার দায়িত্বও অংশত এঁদের। জনি ওয়াকার এর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আরো যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন—শ্যামা, কুমকুম, রাজ মেহরা, শীলা বাজ প্রভৃতি। ও পি নায়ার ছবিটির সংগীত পরিচালক।

• • •

মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাঙলা ছবিগুলির মধ্যে ছবির পর্দায় পর পর আত্মপ্রকাশ করবে "শ্রীশ্রীতারকেশ্বর", "মর্মবাণী" ও "কংস"। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিতে "লালু-ভুলু"র মুক্তি পাবার কথা।

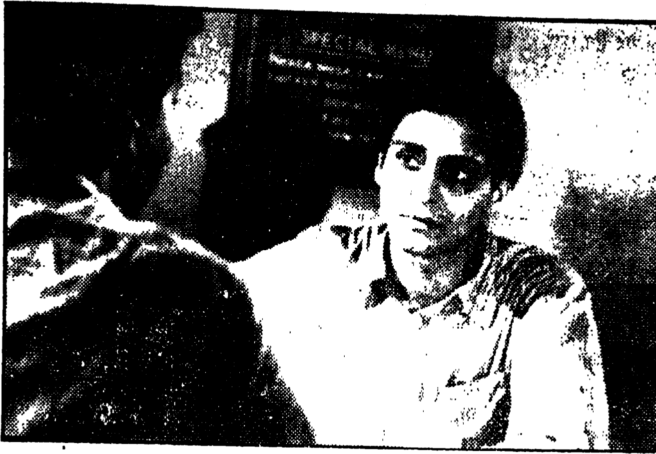
অগ্রদূত চিত্রের "লালুভুলু" দুটি অনাথ কিশোরের দুঃসাহসিক সংগ্রামের কাহিনী। লালু পঙ্গু এবং ভুলু অন্ধ। লেখাপড়া শিখে বড় হবে, এই সংকল্প নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো জীবনের পথে। নিবিড় বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যে। পঙ্গু লালু ধরলো ভুলুর হাত, অন্ধ ভুলু লালুর মনের লাগাম তুলে নিলো। এমনিভাবে শুরু হল এক অসমসাহসিক অভিযান, যার প্রাণোজ্জ্বল কাহিনী রূপায়িত হয়েছে অগ্রদূতের নিজস্ব প্রযোজনা ও পরিচালনায় তোলা এই ছবিতে। বাণভট্ট লিখিত গল্পকে চিত্রনাট্যের আকারে গেঁথেছেন নীতিকার শৈলেন রায়। নবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

এস আর প্রোডাকসন্সের "মর্মবাণী" রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীর পরবর্তী আকর্ষণ। মনোজ ভট্টাচার্যের একটি পারিবারিক গল্পকে ভিত্তি করে পরিচালক সুশীল মজুমদার একটি প্রাণস্পর্শী ছবি তৈরি করেছেন বলে প্রকাশ। ভূমিকালিপিতে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, অনুপকুমার এবং দুজন অপেক্ষাকৃত নবাগত শিল্পী—সীমা ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এতে সুর দিয়েছেন।

• • •

আর একটি পারিবারিক কাহিনী রূপায়িত হয়েছে গেস পিকচার্সের আগামী নিবেদন "শশীবাবুর সংসার"-এ। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের নায়ক শশীবাবুকে বাঙলার শতধাবিদীর্ণ পারিবারিক জীবনের প্রতিভূ বলা যেতে পারে। তাঁর সংসারের যে সমস্যা, তা গোটা বাঙালী সমাজের সমস্যা। তাই এই ছবিটি সম্বন্ধে চিত্রপ্রিয়দের আগ্রহের অন্ত নেই। বর্তমানে ছবিটির সম্পাদনা চলছে। ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, তপতী ঘোষ প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সুধীর মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং সুরযোজনা করেছেন অনিল বাগচী।

• • •



পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নির্মীয়মান চিত্র 'অপুর সংসার'-এর (অপু-কাহিনীর শেষ পর্ব) একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অপু) এবং স্বপন মুখোপাধ্যায় (প্রণব)

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "অপুর সংসার"ও এগিয়ে চলেছে নির্ধারিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী। কাছে-দূরে, টালা থেকে আরম্ভ করে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে পর্যন্ত, যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানে প্রয়োজনমত বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে পরিচালক রায় বর্তমানে স্টুডিয়োর স্যুটিং এ মনোনিবেশ করেছেন। এই পর্বের নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর। ইনি নামছেন অপুর স্ত্রী অপর্ণার ভূমিকায়। অপু সাজছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই দুই নবাগত শিল্পী সত্যজিতের নবতম আবিষ্কার। শোনা যাচ্ছে, আবিষ্কর্তা স্বয়ং এঁদের অভিনয় দেখে সন্তুষ্টি লাভ করেছেন।

## পুরাতনের পুনরাবৃত্তি

"যৌতুক" নবীন ক্লাসিকাসের নবতম চিত্রোপহার। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল গল্পটি ছবির পর্দায় যে রূপ নিয়েছে, তাতে তাকে আর পাঁচটা চেনা-জেনা ছবির গল্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

গল্পের নায়িকা সুধীরা জমিদার উমাশংকর চৌধুরীর একমাত্র সন্তান এবং শৈশবেই মাতৃহারা। ছেলের মত করেই উমাশংকর সুধীরাকে মানুষ করেছেন। ঘোড়ায় চড়া, বিলিয়ার্ড খেলা—সবেতেই সে অভ্যস্ত।

উমাশংকর তখন ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে নৈনিতালে আছেন। নায়েব কানাই ঘোষাল এসে খবর দিলো, চৌধুরীদের প্রতিপক্ষ চাটুজ্জেদের ছেলে বীরেন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরেই চৌধুরীদের পুকুর পাড়ের বেড় দিয়ে জমি নিয়ে নতুন করে গণ্ডগোল সুরু করেছে। ঐ জমির ওপর সে নতুন বাড়ি তুলতে চায়।

খবর শুনে উমাশংকর বিচলিত হলেন। সুধীরা জেদ ধরলো, সে নিজে পলাশডাঙায় গিয়ে এর বিহিত করবে, কিছুতেই বীরেন চাটুজ্জেকে জমি দখল করতে দেবে না।

রাখাল সুধীরার পাণিপ্রার্থী, চৌধুরীদের সংগে দূর সম্পর্কে একটা আত্মীয়তাও আছে। তারই মোটর গাড়িতে সুধীরা পলাশডাঙায় রওনা হলো। গভীর রাত্রে জনমানবহীন পথে গাড়ি বিকল হওয়ায় তারা দুজনেই অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে লাগলো। ওরা পলাশডাঙায় যাবে শুনে অতি-ভদ্র ও সুদর্শন একটি যুবক নিজের গাড়িতে ওদের তুলে নিলো, কারণ তার গন্তব্যও ঐ পলাশডাঙা।

এই যুবক আর কেউ নয়—স্বয়ং বীরেন চাটুজ্জে, যাকে শায়েস্তা করতে সুধীরার পলাশডাঙা অভিযান। কিন্তু সুধীরা তাকে চেনে না, কারণ সে বাইরে-বাইরে মানুষ হয়েছে। বীরেন চাটুজ্জে কলকাতার

কোন কারখানায় উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। সেও সুধীরাকে চেনে না। কিন্তু রাখাল ও সুধীরার কথাবার্তায় ওর জানতে বাকি রইলো না যে বীরেন চাটুজ্জেকে সামনে পেলে ওরা তাকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে!

পরস্পর শত্রু হলে কি হবে! একজোড়া তরুণ তরুণী গভীর রাত্রে এক গাড়িতে চলেছে। সুতরাং ফিল্ম জগতের নিয়ম অনুসারে তাদের প্রেমে পড়তেই হবে। তাই বাড়িতে পেঁাছে ইঞ্জিনিয়ার বীরেন চাটুজ্জে গান জুড়ে দিলো ঃ

"এই যে পথের এই দেখা
হয়তো পথেই শেষ হবে,
তবুও হৃদয় মোর বলে
সঞ্চয় কিছু যেন রবে।"

মাঝে মাঝে রাস্তার ঘটনার 'ইনসার্ট'— দর্শকদের বুঝতে যাতে ভুল না হয় কোন পথের দেখা গায়কের মনে সঞ্চয়ের আশা জাগিয়েছে।

ওদিকে সুধীরারও একই অবস্থা। সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে গাইতে সুরু করলো ঃ

"এল কি বসন্ত আমার ভুবন মাঝে?
একি অনুরাগে এই পরাণে বাঁশরী বাজে!"

পরের দিন ভোরে উঠে গ্রামের পথে একা বেড়াতে বেরিয়ে কার সঙ্গে দেখা হলো সুধীরার? আর কার সঙ্গে—অবশ্যই বীরেন চাটুজ্জের সঙ্গে! তার হাতে ফুলের তোড়া দেখে সেই মামুলি প্রশ্ন ঃ "আপনি বুঝি ফুল ভালবাসেন?" বীরেন চাটুজ্জের উত্তরে জানা গেল, আজ গ্রামের স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভার আয়োজন হয়েছে, ফুল সেই সভার শোভা বর্ধনার্থে। বীরেন চাটুজ্জের আসল পরিচয় না জেনেই সুধীরা তাকে বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করে বসলো।

স্কুলের হেড মাস্টার প্রমুখ কয়েকজন জমিদার বাড়িতে এসে সুধীরাকে সেদিনকার সভায় নেতৃত্ব করবার অনুরোধ জানালেন। তাঁদের কথা ঠেলতে না পেরে সুধীরা রাজী হয়ে গেলো।

বিপত্তি বাধলো সভাস্থলে। সুধীরার শত্রু বীরেন চাটুজ্জে প্রধান অতিথি হিসাবে সভানেত্রীর পাশে আসন গ্রহণ করলো। সুধীরার সব স্বপ্ন যেন নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। একে আশাভঙ্গের মনস্তাপ, তার ওপর শত্রুর কাছে এমনি-ভাবে অপদস্থ হওয়ায় সুধীরা সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

এইবার সুরু হলো নায়েব কানাই ঘোষালের খেল। রাতের অন্ধকারে বাগদি-পাড়ার কয়েকজন ষণ্ডা-চেহারা লাঠিয়ালের আবির্ভাব হলো সেই দেড় বিঘে জমির ওপর। বীরেন চাটুজ্জের নতুন বাড়ির সমস্ত মাল-মসলা চৌধুরীদের পুকুরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। আওয়াজ শুনে ব্যাপার কি দেখতে এসে বীরেন চাটুজ্জের বুড়ো চাকর মাথায় লাঠির চোট খেলো।

পরের দিন কিন্তু বীরেন চাটুজ্জে যথাসময়ে সুধীরার চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে এলো। সুধীরা এতটা আশা করেনি। উপরন্তু যখন শুনলো যে বীরেন চাটুজ্জের চাকরের অবস্থা সংকটাপন্ন, তখন সুধীরা ছুটলো হাসপাতালে। কিন্তু আহতের প্রাণরক্ষা করতে পারলো না।

এর পর বীরেন চাটুজ্জের প্রাণ রক্ষা করা সুধীরার একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠলো। একা তার সঙ্গে দেখা করে সুধীরা অনুরোধ



রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস" চিত্রে নাম-ভূমিকায় নির্মলকুমার। মহাপ্রভুর বেশে নবাগত মলয়কুমারকে দেখা যাচ্ছে।

জানালো যেন অবিলম্বে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কথা দিলো, যে জমি নিয়ে তাদের বিরোধ, চৌধুরী পরিবার তা দখল করবে না।

সুধীরা কিন্তু নায়েব কানাই ঘোষালের দুরভিসন্ধি ঠেকাতে পারলো না। তার বিরোধে উত্যক্ত হয়ে বীরেন চাটুজ্জে স্থির করলো দেশের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সে কলকাতায় চলে যাবে। চৌধুরীদের আর এক প্রতিপক্ষীয় জমিদার রঘুনাথ রায় জায়গা-জমি কিনে নিতে রাজী হলেন। কিন্তু বীরেন চাটুজ্জে যখন জানতে পারলো রঘুনাথ রায়ের টাক সুধীরার ওপর এবং তার সম্পত্তি কেনার পিছনে তার এই মতলবটাই কাজ করছে, তখন সে এক কথায় জমি বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাহার করলো।

এইবার ভাবুন তো বীরেন চাটুজ্জে কী করলো? সে তার সমস্ত জায়গা জমি সুধীরার নামে দানপত্র করে দলিলটা তার কাছে গচ্ছিত রেখে এলো। ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময়েই উমাশঙ্কর চৌধুরী নৈনিতাল থেকে পলাশডাঙায় এসে উপস্থিত হলেন। দানপত্র পড়ে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না বীরেন চাটুজ্জে কি রকম হীরের টুকরো ছেলে। কী ভুলই না তিনি এতদিন করে-ছিলেন। সেই ভুলের সংশোধন করতে তিনি বীরেন চাটুজ্জেকে ডেকে পাঠালেন এবং তার হাতে সুধীরাকে সমর্পণ করে উমাশঙ্কর বল্লেন, এই নাও তোমার যৌতুক। এই হলো "যৌতুক" নামের ইতিকথা।

* * *

যেমন মামুলি গল্পের বিন্যাস, অভিনয়ও তদনুরূপ। কোন চরিত্রই মনের ওপর দাগ কাটে না। অনেক ক্ষেত্রেই কার্য-কারণের সম্বন্ধটা একটু বেশী মাত্রায় অস্পষ্ট। যে দেড় বিঘে জমি নিয়ে এত কাণ্ড, তার দখল নিয়ে খুনখারাপি কেন করতে হলো তা কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি। গল্পের মাঝে মাঝে নায়িকার পিসিমার মুখে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, উমাশঙ্কর কি আসল ব্যাপারটা জানেন। সারা ছবি দেখবার পরও কিন্তু আমাদের কাছে পিসিমা-কথিত আসল ব্যাপারটা অজানা থেকে গেছে।

বীরেন চাটুজ্জের ভূমিকায় উত্তমকুমারকে গল্পের গোড়ার দিকে বেশ ভালো লাগে। আসল পরিচয় না জেনে তার সঙ্গে নায়িকার হৃদ্যতায় তাঁর সকৌতুক ভাবটি উপভোগ্য। পরে তাঁর অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর। সুমিত্রা দেবী সুধীরার দোটানা ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও মোটের ওপর সুষ্ঠু অভিনয় করেছেন। কমল মিত্রের উমাশঙ্কর চরিত্রোচিত মর্যাদাসম্পন্ন।

রাখালের ভূমিকায় জীবেন বসু বেশ খানিকটা হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। একটি গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকায় শীলা পালের অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। মলিনা দেবীর পিসিমা, কালী সরকারের নায়েব এবং বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের রঘুনাথ রায় যথাযথ।

"যৌতুকে"র টেকনিক্যাল কাজ সাধারণ বাংলা ছবির তুলনায় বেশ উন্নত। পরিচ্ছন্ন আলোকচিত্র এবং প্রায়-নির্দোষ শব্দগ্রহণ এই ছবির অন্যতম সম্পদ। সুর সংযোজনায় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, হেমন্তকুমার, গীতা রায় ও লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া গানগুলি সুখশ্রাব্য। ছবির পরিচালনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব।

"যৌতুকে"র পরিচালনা করেছেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য লিখেছেন বিমল মিত্র, সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার, ছবি তুলেছেন দীনেন গুপ্ত, শব্দগ্রহণ করেছেন অতুল চট্টোপাধ্যায়, মিনু কাটরাক ও কৌশিক, শিল্প নির্দেশ দিয়েছেন সুনীতি মিত্র এবং সম্পাদনা করেছেন রমেশ যোশী।

### কিশোর সংগীত সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট শিশু ও কিশোর শিল্পীদের সমন্বয়ে কিশোর সংগীত সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে একটি কার্যকরী পরিষদ ও পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়েছে। কার্যকরী পরিষদ, পরামর্শ পরিষদ ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ও শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীউৎপল হোম রায়। সম্মেলনের কার্যালয় ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ (ফোন: ৩৪—৪৬১২)।

## জ ন্ম ভূ মি

### সঞ্জয় ভট্টাচার্য

[দিনলিপি—১৯শে শ্রাবণ—ঝড়]

এমন কালো দিনের স্মৃতি চুলের মেঘে রেখে
এলাম ধূসর পথে এঁকে বেঁকে
এ দক্ষিণে, জল পড়ে না কারো চোখের থেকে।
পূবালি গো, তোমার মনে আছে
তোমার নিবিড় সবুজ গাছে গাছে
ঝড়ের দোলা তোমার চুলের দোলা
মনে এঁকে আজ এ ঘরে মৌসুমী-ঢেউ তোলা!
বাইরে জলো বাতাস হেঁকে যাক—
আমার চোখে চুলের থেকে খুলছে সাপের পাক।
বেঁচে কি আজ তুমি
আছো তেমন, আমার জন্মভূমি?

## বৃন্ত

### জয়শ্রী চৌধুরী

হৃদয় সাহারা তার, শুধু জল কুটিল সংশয়ী

সে হৃদয় জীবনের পথে পথে খুঁজে ফেরে প্রেম
ধুলোয় কুসুম গন্ধে প্রতি দিন সোহাগের সোনা
দেখে কে উজাড় করে ব্যাপ্ত করে সমস্ত চেতনা
রোমাঞ্চিত মন তার। শেষে কেঁদে বলে "কেন
হাত বাড়ালেম।"

তবুও দু হাত মেলে পৃথিবীর আবেগ প্রীতিরা
তাকে টেনে নিতে চায়। সে সংশয়ী তৃষাতুর মনে
বার বার ফিরে চায়। নিমজ্জিত সে সুধাসিঞ্চনে
আবার সে কোন্ ক্ষণে ঝরায় কান্নায় মতিহীরা॥

অধরে সুধার পাত্র। সে বলে "তৃষার্ত আমি নই!"

## আরেকটি নরকের সূচনা

### আমজাদ হোসেন

হয়তো কখনো মুহূর্তের জন্যেও
কোনো ভ্রমরের স্পর্শ পায়নি সে।
এবং একটি দুজনার মউচাক
কতোটুকু মধু হলে গড়া যেতে পারে
হয়তো তাও সে জানে।

আর, যে পাখীর পাখা নেই তার কাছে
আকাশ যেমন। জানি, তাও জানে।
তবু সেই কৃষ্ণচূড়া মিছেই আমাকে
আজ ডাকে। এতো নিশ্চই, কিছুই হবে না
শুধু দুই হৃদয়ের আগুনে আগুনে
আরেকটি নরকের অব্যর্থ সূচনা।



# খেলার মাঠে

**একলব্য**

গতবারের মত এবারও কলকাতার সাউথ ক্লাবে বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। পেশাদার টেনিসের প্রবর্তক জ্যাক ক্র্যামারের দলের ৪ জন কীর্তিমান খেলোয়াড় ফ্রাংক সেজম্যান, টনি ট্রাবার্ট, কেন রোজওয়াল ও পাঞ্চো সেগুরা বোম্বাই ও দিল্লীতে প্রদর্শনী টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণের পর কলকাতায় আসছেন। কলকাতার সাউথ ক্লাবে এঁরা খেলবেন নবেম্বরের ২২ ও ২৩ তারিখে। বলা বাহুল্য, পেশাদার খেলোয়াড়দের এই খেলা দেখবার জন্য টেনিস রস-পিপাসু ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া জেগেছে।

গতবার দুইবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লুই হোড, কেন রোজওয়াল ও পাঞ্চো সেগুরাকে নিয়ে ক্র্যামার নিজেই কলকাতায় এসে টেনিসের উন্নত কলানৈপুণ্য দেখিয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে গেছেন। পেশাদার খেলোয়াড়দের টেনিস খেলার উন্নত ক্রীড়াশৈলী ও দুর্লভগুণ টেনিস রসিকদের স্মৃতিপটে এখনো জেগে আছে। কলকাতার দর্শকেরা এবার আবার নূতন করে বিশ্ববন্দিত পেশাদার খেলোয়াড়দের কলা-চাতুর্য প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাবেন।

আগন্তুক দলের ৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে কেন রোজওয়াল ও পাঞ্চো সেগুরার খেলা দেখার গতবারই আমাদের সুযোগ ঘটেছে। সুতরাং এঁদের খেলা সম্পর্কে নূতন করে বিশেষ কিছু বলবার নেই। কিন্তু ফ্রাংক সেজম্যান এবং টনি ট্রাবার্টের ভারতে এই প্রথম পদার্পণ। দুইজন উইম্বলডনের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান। সেজম্যান এক সময়ে অস্ট্রেলিয়ার এবং ট্রাবার্ট আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন। অবশ্য দুইজনই উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায় বিশ্ব টেনিস ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেছেন। পেশাদারবৃত্তি অবলম্বনের পর এঁদের খেলা হয়েছে আরও উন্নত, আরও বিজ্ঞানসম্মত, আরও আকর্ষণীয়।

এমেচার ও প্রোফেসনাল টেনিসের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। কীর্তিমান এমেচার খেলোয়াড়ের বিজ্ঞানসম্মত খেলার মধ্যে টেনিসের কলা-চাতুর্য ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই; কিন্তু কীর্তিমান প্রোফেসনাল খেলোয়াড়দের খেলার মধ্যে দেখা যায়, কলা-চাতুর্যের চরম বিকাশ। খেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, দর্শক-চোখের তৃপ্তিদায়ক।

পেশাদার খেলোয়াড়দের ৪ জনই ইতিপূর্বে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। নীচে এঁদের খেলোয়াড়জীবনের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হল:—

**ফ্রাংক সেজম্যান**

১৯৫২ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান খেলোয়াড় ফ্রাংক সেজম্যানকে যুদ্ধোত্তর কালের টেনিস ক্ষেত্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মাত্র ৮ বছর বয়সে সেজম্যানের টেনিস খেলার হাতেখড়ি হয়। সেজম্যানের পিতা অস্ট্রেলিয়ার তৎকালের নামকরা খেলোয়াড় আলফ্রেড সেজম্যানই ছিলেন বালক সেজ-ম্যানের টেনিস খেলার শিক্ষাগুরু। পিতার কাছ থেকে টেনিসের কলাকৌশল শেখার ফলে অল্পদিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার টেনিস ক্ষেত্রে সেজম্যানের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং আর অল্পদিন পরেই বিশ্ব টেনিসের এক প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। কেন ম্যাগ্রেগরের সংগে ডাবলসের খেলোয়াড় হিসাবে খেলে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন এবং ১৯৫২



**ফ্রাংক সেজম্যান**

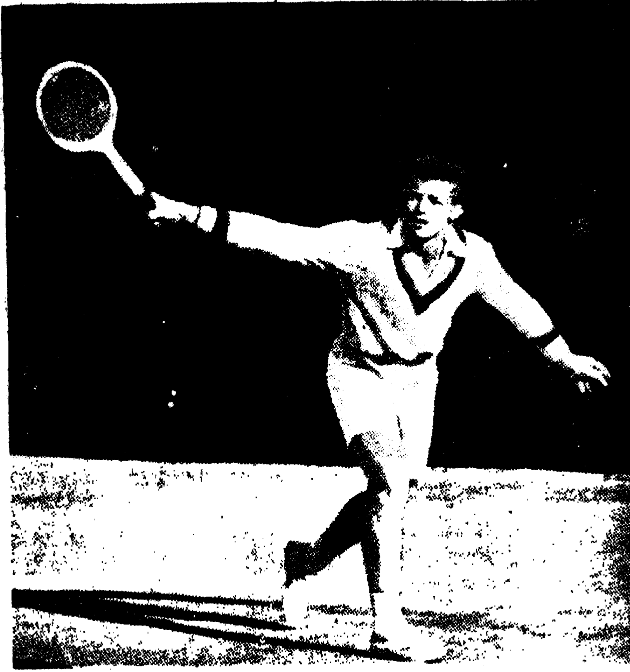
সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার তিনি অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, এই তিন বছর সেজম্যান ডেভিস কাপের কোন খেলাতেই পরাজিত হননি।

বিপুল অর্থের প্রলোভনে এবং পেশাদার টেনিসের দিকপাল খেলোয়াড় জ্যাক ক্র্যামারকে পরাজিত করবার সঙ্কল্প নিয়ে ১৯৫৩ সালে সেজম্যান টেনিসের পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু অর্থলাভের দিক দিয়ে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হলেও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ক্র্যামারকে পরাজিত করতে পারেন না। এই বছর দেশে দেশে ক্র্যামার ও সেজম্যানের মধ্যে বহু খেলার ব্যবস্থা হয়। এইসব খেলার ৫৪টি খেলায় ক্র্যামার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন, সেজম্যান বিজয়ী হন ৪১টি খেলায়। পেশাদার টেনিসের অপর কীর্তিমান খেলোয়াড় গঞ্জালিসের সংগেও সেজম্যান দেশে দেশে সফর করেন। ফলে অভিজ্ঞতা লাভের সংগে সংগে টেনিসের সম্যক্ কলানৈপুণ্য তাঁর আয়ত্ত হয়। এখন ফ্রাংক সেজম্যান টেনিসের এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পী। তাঁর খেলা দেখার আকর্ষণে দর্শক পাগল।

**টনি ট্রাবার্ট**

ফ্রাংক সেজম্যানের মত টনি ট্রাবার্টেরও টেনিস খেলার হাতেখড়ি হয় অতি শিশু-বয়সে। ট্রাবার্টের বয়স যখন মাত্র ৬ বছর তখন থেকেই তিনি টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করেন। ফলে ১০ বছর বয়স থেকেই টেনিস খেলায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমেরিকা টেনিসের দেশ। টেনিস আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। বালক ট্রাবার্টের খেলা দেখে আমেরিকার টেনিস বিশেষজ্ঞরা তাঁর সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেন। ১৯৪৮ সালে ট্রাবার্ট যখন আমেরিকার জাতীয় ইণ্ডোর চ্যাম্পিয়নশিপে সিংগলস ও ডাবলসে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেন, তখনই বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালে ট্রাবার্ট আন্তঃকলেজ এবং জাতীয় ক্লে-কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে লাভ করেন জাতীয় টেনিসের চ্যাম্পিয়ন-শিপ। পরের বছর জাতীয় টেনিসের সিংগলস এবং ডাবলস উভয় বিভাগের বিজয়ীর পুরস্কার তাঁর করায়ত্ত হয়। টেনিস ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর ট্রাবার্ট



টনি ট্রাবার্ট

ডেভিস কাপে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। ডেভিস কাপ উপযু্পরি ৪ বছর অস্ট্রেলিয়ার দখলে থাকবার পর ১৯৫৪ সালে প্রধানত 'টনি'র কৃতিত্বে আমেরিকা ডেভিস কাপ লাভ করে। ১৯৫৫ সালে টনি ট্রাবার্টের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ পূর্ণ হয়। কোন খেলায় পরাজিত না হয়ে এই বছর তিনি লাভ করেন বিশ্ব-টেনিসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'উইম্বলডন কাপ'।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সংগে সংগে পেশাদার টেনিসের প্রবর্তক জ্যাক ক্র্যামারের কাছ থেকে টনির ডাক আসে। প্রচুর অর্থের প্রলোভনে ট্রাবার্ট টেনিসের পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেন। পেশাদার-বৃত্তি গ্রহণের পর পাঞ্চো গঞ্জালিসের সংগে দেশে দেশে ট্রাবার্টের সফর আরম্ভ হয়। দুই বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়ের ১০১টি খেলার মধ্যে গঞ্জালিস ৭৪টি খেলায় বিজয়ী হন, ট্রাবার্ট বিজয়ী হন মাত্র ২৭টি খেলায়। গঞ্জালিসের কাছে এই পরাজয় ট্রাবার্টের টেনিস-জীবনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। ফলে তিনি টেনিস খেলা থেকে অবসর গ্রহণের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ এবং ক্র্যামারের উৎসাহে ট্রাবার্ট নূতন উদ্যম নিয়ে খেলতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পেশাদার টেনিসের এক প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ট্রাবার্ট এখন পেশাদার টেনিসের কীর্তিমান খেলোয়াড়দের অন্যতম। বয়স ২৮ বছর।

### কেন রোজওয়াল

সব রকমের মারের ছলাকলায় বিশ্ব-টেনিসে এ পর্যন্ত যেসব খেলোয়াড় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল তাঁদের অন্যতম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, গত বছর কলকাতায় পেশাদার খেলোয়াড়দের যে টেনিস খেলার আসর বসেছিল, তার মধ্যে কেন রোজওয়ালই টেনিসের উন্নত কলানৈপুণ্যে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। রোজ-ওয়ালের হাতে আছে মারের চমৎকার কারু-নৈপুণ্য, খেলায় আছে সাবলীল ভঙ্গি। সত্যই রোজওয়ালের টেনিস খেলা দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক।



কেন রোজওয়াল

১৯৩৪ সালের নবেম্বর মাস অস্ট্রেলিয়ার দুই খ্যাতিমান টেনিস খেলোয়াড়ের জন্ম-মাস। এই মাসের ২ তারিখে সিডনীতে জন্মগ্রহণ করেন সুনিপুণ খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল, আর এই মাসের ২৩ তারিখে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন দুইবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লুই হোড।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই রোজওয়াল টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এর মধ্যে এক ১৯৫৪ সাল ছাড়া প্রতি বছরই অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ লাভ করেছে। ১৯৫৬ সালে রোজওয়াল আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন এবং উইম্বল-ডনের ফাইন্যাল খেলায় পরাজিত হন তাঁর দেশের খেলোয়াড় লুই হোডের কাছে। অবশ্য লুই হোডের সংগে খেলে ১৯৫৩ সালেই তিনি উইম্বলডনের ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের অংশীদার হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে ডেভিস কাপের খেলার পর রোজওয়াল জ্যাক ক্র্যামারের দলে যোগ দেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পেশাদার টেনিসের এক দিকপাল খেলোয়াড় হিসাবে পরিগণিত হন। এখানে বলা প্রয়োজন, কেন রোজওয়াল যত কম সময়ে পেশাদার টেনিসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, এত কম সময়ে অন্য কোন খেলোয়াড়ই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। ইংলণ্ডে পেশাদার টেনিসের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলায় রোজওয়াল ১৮—১৬ গেমে গঞ্জালিসকে পরাজিত করে এক অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন।

### পাঞ্চো সেগুরা

দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরের খেলোয়াড় ফ্রান্সিসকো সেগুরা টেনিস জগতে পাঞ্চো সেগুরা নামে পরিচিত। এমেচার টেনিস জগতে সেগুরা কোন বড় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৯৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাম্পল প্রতিযোগিতায় অবশ্য সেগুরা পর পর তিনটি খেলায় তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় হার্টউইগ, গঞ্জালিস ও সেজম্যানকে পরাজিত করেছিলেন। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকার টেনিস ক্রমপর্যায়ে সেগুরার স্থান ছিল তৃতীয়। ১৯৪৭ সালে সেগুরা ক্র্যামারের পেশাদার দলে যোগ দেন। এর পর পেশাদার খেলোয়াড়-দের সঙ্গে খেলে সেগুরা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। নিপুণ পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে সেগুরা এখন সুনিপুণ খেলোয়াড়। গত বছর ওয়ে-ম্বলীতে পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায়



পাঞ্চো সেগুরা

সেমি-ফাইন্যালে বিশ্বশ্রেষ্ঠ পেশাদার খেলোয়াড় পাঞ্চো গঞ্জালিসকে পরাজিত করেন। কিন্তু ফাইন্যালে সেগুরাকে কেন রোজওয়ালের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

জ্যাক ক্রামারের সংগে গতবার সেগুরা ভারতে এসেছিলেন। সাউথ ক্লাবে এর খেলা দর্শকদের যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছে। প্রথম দিনের দ্বিতীয় খেলায় ইনি দলপতি জ্যাক ক্রামারকে ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করেছিলেন।

সেগুরার চেহারা ঠিক ভারতীয় নাগরিকদের মত। কালো চুল শ্যাম বর্ণ। পায়ের নিম্নভাগ একটু বাঁকা। চলবার সময় মনে হয় একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেন। সেগুরার হাটা চলা বা খেলার মধ্যে টেনিসের সৌন্দর্য খুব বেশী নেই। এর খেলার ধারাকে অবৈজ্ঞানিকও বলা যেতে পারে। 'ফোরহ্যাণ্ডে' বল মারবার সময় দুই হাতে র‍্যাকেটের হাতল ধরে সজোরে বল মারেন। কিন্তু এতে এর অসুবিধা হয় না। এই নিজস্ব পদ্ধতিকে ইনি চমৎকারভাবে রপ্ত করে নিয়েছেন। দুই হাতে র‍্যাকেট ধরার ফলে এর হাত খুব বেশী দূরে প্রসারিত হয় না। কিন্তু চটুল পদক্ষেপে কোর্টের এক পাশ থেকে আর এক পাশে ছুটোছুটি করে হাতের কমতি সেগুরা পায়ের দ্বারা পুষিয়ে নেন। সেগুরার খেলার মধ্যে আছে তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি। মনের বল যেমন অদম্য, শ্রমশীলতার শক্তিও তেমন অপরিসীম।

• • •

ভারত সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৮জন খেলোয়াড়ের পরিচয় গত সপ্তাহে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সপ্তাহে আর একজন খেলোয়াড় কোলী স্মিথের পরিচয় দেওয়া হল:—

জামাইকার উদীয়মান খেলোয়াড় গর্ডন ওনীল স্মিথ ক্রিকেট বিশ্বে কোলী স্মিথ নামে সুপরিচিত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চৌকস খেলোয়াড়দের মধ্যে স্মিথ সর্বাগ্রগণ্য। নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে ইনি যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তেমন অফব্রেক বোলার হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। আবার ফিল্ডসম্যান হিসাবেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে স্মিথের জুড়ি নেই।

১৯৫৫ সালে কোলী স্মিথকে সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর খেলায় আবির্ভাব হতে দেখা যায়। এই বছর দ্বিতীয় খেলায় ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে ৬টি ওভার বাউণ্ডারী ও ৪টি বাউণ্ডারীর সাহায্যে মাত্র ৫৭ মিনিটে ৫৮ রাণ করেন। পরের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে ১৬৯ রান করলে স্মিথের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবার জন্য স্মিথ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে স্থান পান এবং প্রথম টেস্টে করেন ১০৪ রান। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা স্মিথের ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় টেস্টের দুই ইনিংসে স্মিথ কোন রাণ করতে না পারায় তাকে টেস্টদল থেকে বাদ দেওয়া হয়। এতে সকলেই ব্যথিত হন।

যার প্রতিভা আছে তাকে আটকিয়ে রাখা যায় না। ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের উন্নত নৈপুণ্যের জন্য ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে স্মিথের ডাক পড়ে। ইংলণ্ডে গিয়ে স্মিথ প্রথম যে দলের সম্মুখীন হন সেই দলেই ওভার বাউণ্ডারী মেরে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। কোলী স্মিথ ইংলণ্ডে খুবই ভাল খেলেছেন। স্মিথ বোলার লেক এবং লেকার এবং ফাস্ট বোলার স্ট্যাথাম ও ট্রুম্যানকে মোটেই সমীহ করেননি। বার্মিংহাম টেস্টে স্মিথের ১৬৮ এবং নটিংহাম টেস্টে ১৬১ রাণ লাভের বিষয় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের টেস্ট খেলায় তিনি মোট ৩৯৬ রান এবং সমস্ত সফরে ১৪৮৩ রান এবং ৩৪টি উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন। ইংলণ্ডে স্মিথের প্রশংসনীয় ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য এই বছর 'উইসডেন' স্মিথকে শ্রেষ্ঠ পাঁচজন খেলোয়াড়ের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে মর্যাদা দান করে।



কোলী স্মিথ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে স্মিথ ৬টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে মোট ২৭৩ রাণ এবং ১৩টি উইকেট দখল করেন। প্রোফেশনাল ক্রিকেট খেলোয়াড় কোলী স্মিথের বর্তমান বয়স মাত্র ২৪ বছর।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১১ই **নভেম্বর**—পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবাজী নিরোধ অর্ডিন্যান্সের বিধানবলে এই রাজ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৪৫০ রকমের ঔষধপত্রের সর্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। অদ্য কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঐ দরগুলি ঘোষণা করা হইয়াছে।

১২ই **নভেম্বর**—বিশিষ্ট ধনপতি শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা অদ্য দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ ১২, ওল্ড কোর্ট হাউসে ওসলার কোম্পানী ভবনের এক নিভৃতকক্ষে স্পেশাল পুলিস এস্টাব্লিশমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

পাক হানাদারদের গুলীবর্ষণের ফলে গত ১০ই নভেম্বর মধ্যরাত্রে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী কমলাসাগর গ্রামের শ্রীচন্দ্রকুমার দাস ও শ্রীযোগেন্দ্র দাস নামে দুইজন ভারতীয় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর দুইজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

পাকিস্তান পাথারিয়া সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিতেছে বলিয়া আজ করিমগঞ্জে প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে।

১৩ই **নভেম্বর**—শিলং ও শ্রীহট্টের (পাকিস্তান) ডেপুটি কমিশনারদের মধ্যে টেলিফোনযোগে আলোচনার পর সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলায় বাঙালী এলাকায় আজ সকাল হইতে গুলীবর্ষণ বিরতি কার্যকরী করা হইয়াছে।

নেহরু-নুন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রচিত একটি খসড়া বিল অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিলে এক বিশেষ অধিবেশনে বিবেচিত হয়। ঐ বিলে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে সম্মতি দেওয়া হয় বলিয়া প্রকাশ।

১৪ই **নভেম্বর**—আজ 'বাল ভবনের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রত্যেক শিশুর শিক্ষা, ভালবাসা ও প্রীতি, উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ এবং জীবনে উন্নতি করার সুযোগ সুবিধা লাভের জন্মগত অধিকার আছে।

কলিকাতা পুলিসের কোন কোন স্তরে দুর্নীতিচক্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা ইদানীং প্রকাশ হইয়া পড়ায় উক্ত পুলিশের কর্তৃপক্ষ মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কিভাবে ঐ দুর্নীতির বাসাগুলি সমূলে উচ্ছেদ করা যায় তদ্বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৫ই **নভেম্বর**—লক্ষ্ণৌ-এর সেশন জজ মিঃ ব্রুম অদ্য এই মর্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, আসামী শ্রীহরিদাস মুন্দ্রাকে জেল হাজতে রাখা হউক; কারণ সরকার পক্ষ আরও দলিলপত্র পেশ করিতে চাহেন; অদ্য উহা পাওয়া যাইবে না।

হাওড়া স্টেশনের অভ্যন্তরে নানা দুর্নীতির সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের পর স্টেশন পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু কিছু রদবদল ও বদলীর সংবাদও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু প্রকাশিত সংবাদগুলি ব্যতীত এমন বহু দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ পাইয়াছে যাহা তথ্য প্রমাণেরও অপেক্ষা রাখে না।

১৬ই **নভেম্বর**—আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিপুল কাজের বোঝা লইয়া আগামীকল্য লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে। পাঁচ সপ্তাহব্যাপী এই অধিবেশনে ২৫টিরও বেশী সরকারী বিল লইয়া আলোচনা চলিবে।

গত বৃহস্পতিবার একদল ডাকাত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের নিকট অরুন্ধতীনগর নামক একটি ভারতীয় উপনগরীতে অনাথা নারীদের জন্য স্থাপিত এক শিবিরে হানা দেয় এবং নগদ ৪৫০০ টাকা লুঠ করিয়া পলায়ন করে।

প্রকাশ, অদ্য ব্যাঙ্কক হইতে বিমানে দমদমে আগত জনৈকা ভারতীয়ার বিনুনির ভিতরে ৯ হাজার টাকা মূল্যের প্রায় ৯০ তোলা সোনা পাওয়া যায়। সোনা আটক করা হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

১১ই **নভেম্বর**—পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনাধীনে নিযুক্ত সকল সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়া আজ ঢাকায় প্রাদেশিক গভর্নর শ্রীজাকীর হোসেন ঘোষণা করিয়াছেন।

ঘানার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নক্রুমা ও অন্য দুইজন মন্ত্রীকে হত্যা এবং সরকারের উচ্ছেদ ঘটানোর এক ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া পড়িয়াছে। ঘানা সরকার এই সম্পর্কে ৪৩ জনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য আদেশ জারী করিয়াছেন।

চতুঃশক্তি কর্তৃক বার্লিন অধিকার করিয়া রাখার অবসান ঘটাইবার জন্য সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, গতকল্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দৃঢ়তার সহিত সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

১২ই **নভেম্বর**—আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী ডাঃ এডওয়ার্ড ওয়েলমার্স অদ্য ঘোষণা করেন যে, রাশিয়া সর্বাধিক ১২,৫০০ মাইল পাল্লার একটি আন্তর্মহাদেশীয় রকেট গ্লাইডার নির্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছে।

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান, বিশেষ করিয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত বলিয়া ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি শ্রী জে জে সিং প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সামরিক সাহায্যের পরিবর্তে পাকিস্তানের ধ্বংসোন্মুখ অর্থনীতিকে বাঁচাইয়া তোলার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যদান কর্তব্য।

১৩ই **নভেম্বর**...সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' গত রাত্রে ঘোষণা করেন যে, গত ৩রা নভেম্বর জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী চন্দ্রে এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ্য করিয়াছেন এবং উহার ফলে চন্দ্রের ভূ-প্রকৃতির গঠন সংক্রান্ত পূর্ব ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ট্রান্সভালের ভারতীয় কংগ্রেস রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যগণের নিকট একখানি স্মারকপত্র পেশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা ৫ লক্ষ ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেণ্টের হাতে অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং দুর্দশা ভোগ করিতেছে।

কায়রোতে অবস্থিত আফ্রিকা-এশিয়া সংহতি কমিটির স্থায়ী দপ্তর এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত দেশ কর্তৃক বর্তমান বৎসরের ১লা ডিসেম্বর "আফ্রিকা ছাড়ো" দিবসরূপে পালনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

১৪ই **নভেম্বর**—গতকল্য রাত্রিতে শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ পুরাতন "বি অ্যাণ্ড কে" (বুলগানিন খ্রুশ্চেভ) কোম্পানীর অপরাধী মার্শাল নিকোলাই বুলগানিনকে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রকাশ্যভাবে নিন্দিত করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে বাণিজ্য মিশন ভারতে আসিয়াছেন, আজ তাঁহারা নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আমেরিকান বে-সরকারী লগ্নীকারকরা এদেশে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠায় আমেরিকান মূলধন শতকরা ৫১ ভাগ খাটাইবার জন্য দাবীদাওয়া করিবেন।

১৫ই **নভেম্বর**—রাজসাহীতে সহকারী ভারতীয় হাই-কমিশনার অফিসের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট শ্রী কে সি আয়ার গতকল্য যখন ভারত হইতে রাজসাহীতে যাইতেছিলেন তখন তমাসীর অঞ্চলায় পাকিস্তানী সৈন্য দর্শনায় ৪০১নং আপ মেইলে তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে।

যুগোশ্লাভিয়া সরকারী কম্যুনিস্ট সংবাদপত্র 'বোরবা'য় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলা হইয়াছে যে, "তিনি আধুনিক সমসাময়িক ভারতের যথার্থ শ্রেষ্ঠদের অন্যতম।"

১৬ই **নভেম্বর**—'নিউইয়র্ক' সানডে নিউজ'-এর সংবাদে প্রকাশ, বিচার কার্যে সাক্ষী হিসাবে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করায় প্রাক্তন সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জর্জি ম্যালেনকভকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

রাজসাহীর সহকারী ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিসের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট শ্রী কে সি আয়ারের উপর গতকল্য দর্শনায় পাকিস্তানী সৈন্য যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখন জানা গিয়াছে। পাক সৈন্যেরা শ্রী আয়ারকে ২০টি বেত্রাঘাত করে ও তাঁহার তলপেটে একটি লাথি মারে এবং শ্রী আয়ারের উপর বেত্রাঘাত করিতে দেখিয়া তাঁহার পত্নী ভয়ে চীৎকার করিলে তাঁহার মুখে দুর্বৃত্তেরা চপেটাঘাত করে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাঙলার
রবিনহুড

# দস্যু মোহনের

বিচিত্র কাহিনী পড়িয়াছেন কি?

প্রতি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমা-হারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারী-ত্রাতা মোহন (১২) ব্রহ্ম সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোশ মোহন (১৪) মোহনের আর্তনাদ (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত-দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো-যুদ্ধে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযান (২৩) মোহন ও পঞ্চমবাহিনী (২৪) ফাঁসির মঞ্চে মোহন (২৫) রমার দাবি (২৬) মোহন ও গুপ্ত শাসক (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী (২৮) বার্লিনে মোহন (২৯) স্বপন ও দস্যু (৩০) বন্ধু মোহন (৩১) মোহন ও হুই (৩২) তরুণ মোহন (৩৩) জার্মান-ষড়যন্ত্রে মোহন (৩৪) ছদ্মবেশী মোহন (৩৫) স্বপনের গুপ্ত অভিযান (৩৬) রাজেশ্বর স্বপন (৩৭) মোহনের অভিনয় (৩৮) নিশাগ্রামে মোহন (৩৯) মোহন-চপলা সংঘর্ষ (৪০) মোহনের অনুরাগ (৪১) প্রিয় মোহন (৪২) সর্বজ্ঞ মোহন (৪৩) মোহনের তিন শত্রু (৪৪) ত্রয়ী-যুদ্ধে মোহন (৪৫) অভিসার মোহন (৪৬) মোহনের প্রতিদান (৪৭) স্বপনের অ্যাডভেঞ্চার (৪৮) নবরূপে মোহন (৪৯) মোহনের নূতন অভিযান (৫০) ত্রাতা মোহন (৫১) সুন্দরবনে মোহন (৫২) বালক মোহন (৫৩) মোহন ও আণবিক বোমা (৫৪) মোহনের প্রতিশোধ (৫৫) মোহনের ঋণ পরিশোধ (৫৬) কন্দরাজ্যে মোহন (৫৭) মোহন ও বনবিহারী (৫৮) বিচারক মোহন (৫৯) সোভিয়েট রাশিয়ায় মোহন (৬০) মোহন ও বেকার (৬১) মোহনের পণ-রক্ষা (৬২) মোহনের দ্বিতীয় অভিযান (৬৩) মোহন ও মিলার (৬৪) মহাযুদ্ধে মোহন (৬৫) সাগরতলে মোহন (৬৬) বন্দী মোহন (৬৭) নারী-ত্রাতা স্বপন (৬৮) মোহন ও মমের দল (৬৯) বিপন্ন-ত্রাণে মোহন (৭০) সহৃদয় মোহন (৭১) মুক্তি-দাতা মোহন (৭২) মোহনের মানবতা (৭৩) অপহৃতা রমা (৭৪) ছদ্মদস্যু মোহন (৭৫) মোহন ও [illegible] (৭৬) দয়াল মোহন (৭৭) মহানুভব মোহন (৭৮) মোহনের [illegible] (৭৯) স্বপন ও শাস্তা (৮০) প্রিয় স্বপন (৮১) অনুরাগী স্বপন (৮২) সুন্দরবনে স্ব[illegible] (৮৩) দস্যু-দমনে মোহন (৮৪) অগ্নুৎপাতে মোহন (৮৫) মোহনের অ্যাডভেঞ্চার (৮৬) মৃত্যুর পশ্চাতে মোহন (৮৭) দুঃসাহসিক স্বপন (৮৮) জঙ্গলে মোহন (৮৯) [illegible] ও রাজপুত্রানী (৯০) মোহনের জয়যাত্রা (৯১) মহারাজা স্বপন (৯২) দুর্ধর্ষ মোহ[ন] (৯৩) উদ্ধারের পথে মোহন (৯৪) মোহন ও শমন (৯৫) সেবাব্রতী মোহন (৯৬) মোহনের পদার্পণ (৯৭) স্বপন ও জলদস্যু (৯৮) দুষ্কৃত-দমনে স্বপন (৯৯) দুর্দ্দম স্বপন (১০০) মহাসাগরে স্বপন (১০১) মোহন ও মহাদেবী (১০২) শাসক মোহন (১০৩) বন্দী স্বপন (১০৪) কর্মক্ষেত্রে মহাদেবী (১০৫) দুর্দান্ত মোহন (১০৬) রক্তবৃষ্টি মোহন (১০৭) মোহন বিভীষিকা (১০৮) রুদ্র মোহন (১০৯) অজানা দ্বীপে মোহন (১১০) ইউরোপে মোহন (১১১) সব্যসাচী মোহন (১১২) রহস্য জালে মোহন (১১৩) মোহনের জেহাদ (১১৪) বিপদজয়ী মোহন (১১৫) মোহন ও মহাত্মা (১১৬) মোহনের বজ্রাঘাত (১১৭) অনু[illegible] রমা (১১৮) অতুলনীয় মোহন (১১৯) অজানা দ্বীপে আবার (১২০) দুর্যোধনের [illegible] (১২১) মোহনের অগ্নিপরীক্ষা (১২২) বিশ্বাসঘাতক মোহন (১২৩) জেল-প[illegible] মোহন (১২৪) স্বপনের দস্যু জীবন (১২৫) অপরাজেয় মোহন (১২৬) দুর্[illegible] (১২৭) হীরক দ্বীপে স্বপন (১২৮) মহাতেজা স্বপন (১২৯) মৃত্যু রহস্য মো[illegible] (১৩০) অশোক-দ্বীপে স্বপন (১৩১) অজেয় মোহন (১৩২) ভাগ্যান্বেষণে মো[illegible] (১৩৩) মোহনের দীক্ষালাভ (১৩৪) গোলকুণ্ডায় মোহন (১৩৫) দস্যুজয়ী [illegible] (১৩৬) আর্তোদ্ধারে মোহন (১৩৭) ভারত-ভ্রমণে মোহন (১৩৮) [illegible] স্বপন (১৩৯) মোহনের হাতে-খড়ি (১৪০) মহান মোহন (১৪১) মোহন ও [illegible] (১৪২) সুন্দরবনে মোহন (১৪৩) অভিশাপের দ্বীপে স্বপন (১৪৪) [illegible] হুংকার (১৪৫) অসাধ্য-সাধনে মোহন (১৪৬) নির্বাসন-দ্বীপে স্বপন [illegible] মোহন (১৪৮) বন্দী বেকার (১৪৯) অনুসন্ধানে মোহন (১৫০) [illegible] (১৫১) অপহৃতা শান্তা (১৫২) দণ্ডধারী মোহন (১৫৩) মোহন ও রত্নধারা (১৫৪) [illegible] জলদস্যু স্বপন (১৫৫) সাগর-বুকে স্বপন (১৫৬) উদ্দীপ্ত মোহন [illegible] মোহন (১৫৮) মোহন-তপন (১৫৯) মোহন বনাম স্বপন (১৬০) [illegible] মোহন (১৬১) দস্যু বনাম মোহন (১৬২) অভিমানের মোহন (১৬৩) নিভী[illegible] (১৬৪) অসামান্য মোহন (১৬৫) সন্ধ্যা-সাগরে মোহন (১৬৬) রহস্যভেদ[illegible] দীনবন্ধু মোহন (১৬৮) স্বরূপে মোহন (১৬৯) মোহন ও মার্নি[illegible] মোহন ও গোয়েন্দা (১৭১) স্বপন-মিলন পর্ব (১৭২) মত্ত দস্যুর [illegible] দুর্জয় মোহন (১৭৪) বীর মোহন (১৭৫) শান্তা-আমন্ত্রণে স্বপন [illegible] প্রতিজ্ঞা (১৭৭) মোহন ও শ্রীরাধা (১৭৮) শান্তার জন্মোৎসবে স্বপন (১৭[illegible] [illegible] মোহন (১৮০) অব্যর্থ মোহন (১৮১) নেপচুন যুদ্ধে স্বপন (১৮২) মৃত্যুদ্বীপে স্বপন (১৮৩) বিপদ-বারণ মোহন (১৮৪) আনন্দ-ভবনে মোহন (১৮৫) বায়ু-সেবনে স্বপন (১৮৬) মোহন ও শিশু যুবরাজ (১৮৭) আবার দস্যু মোহন (১৮৮) বিস্মিত মোহন (১৮৯) মোহনের মৃত্যুবরণ (১৯০) বন্ধু-বি[illegible] মোহন (১৯১) মোহনের দুর্গোৎসব (১৯২) ঘূর্ণিঝড়ে মোহন (১৯৩) আ[illegible] স্বপন (১৯৪) ঘূর্ণী-বর্তে মোহন ([illegible]) মোহনের বহিরাগমন (১৯৬) কা[illegible]কারী-দমনে মোহন (১৯৭) [illegible] মোহন (১৯৮) স্বপন-প্রেমে মোহন ([illegible]) মোহনের প্রত্যাঘাত (২০০) দেশ[illegible] মোহন (২০১) [illegible]নের মোহন (২০২) দুরাচার-দমনে মোহন (২০৩) ব্যাঘ্র-সাহসী মোহন (২০৪) অনশনব্রতে মোহন। প্রতি খণ্ড ২্

সাধারণ পাঠকেরা অন্য দশ টাকার বই [illegible] য আঁটিবে না।

**শিশির পাবলিশিং হাউস** [illegible] লেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

---

শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর সদ্যঃ প্রকাশিত

# নতুন দিনের আলো

**ব্রিটিশ আমলের বাজেয়াপ্ত আদেশ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাহৃত।**

মেয়েপুরুষ কর্মীরা শ্রমিক আন্দোলন সার্থক করবার জন্য প্রকৃতিগত বৈ[illegible] ভুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যেভাবে কাজ করে ছিলেন, তারই জীবন্ত আলেখ্য। যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। নির্যাতিতা শ্রমিকনেত্রীর এই দুর্ল[illegible] [illegible]খানি এখনই সংগ্রহ করুন। [illegible] ৩্।

---

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নবতম

# পরলোকের গল্প

পরলোক সম্বন্ধে অর্ধশতাব্দীর গবেষণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত রোমাঞ্চকর ও অপূর্ব রহস্যময় বহু বিচিত্র কাহিনী। বাঙলার বহু বিখ্যাত লোকের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জানতে পারবেন। মূল্য ২৷৹

**রবীন্দ্র-স্মৃতি** দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ৩৷৹

**স্ত্রী-ভাগ্যে ২্ কাঁচা ও পাকা ৩্**

হাস্যরসাত্মক সর্বজন প্রশংসিত উপন্যাস।

---

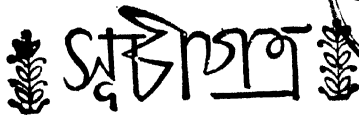
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যোপন্যাস

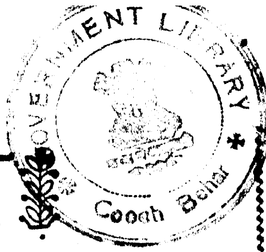
# চীনের নব-নায়ক

# দুলের হীরার হুল

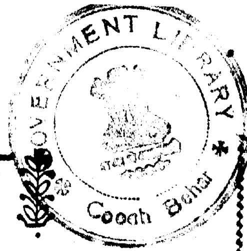
# মুঙ্গেরে দাওয়াই

সদ্যঃ প্রকাশিত :: প্রত্যেকখানি ২৷৹





# সূচীপত্র




# সূচীপত্র

# পিয়ার্স ট্যালকাম

মখমলের মত মোলায়েম পাউডার—অপূর্ব সুগন্ধযুক্ত






অপূর্ব সুগন্ধ, ত্বকের ওপর আদরের মত মোলায়েম স্পর্শ এবং সর্বোপরি পিয়ার্সের গুণাগুণ—এই সবকিছুই আপনি পাবেন পিয়ার্স ট্যালকামে! এই অপূর্ব সুগন্ধযুক্ত ট্যালকাম পাউডারটি আপনাকে খুব গরমের দিনও সারাদিন **সতেজ** রাখবে। পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন চিত্তাকর্ষক হাল্কা হলুদ এবং সবুজ টিনে।

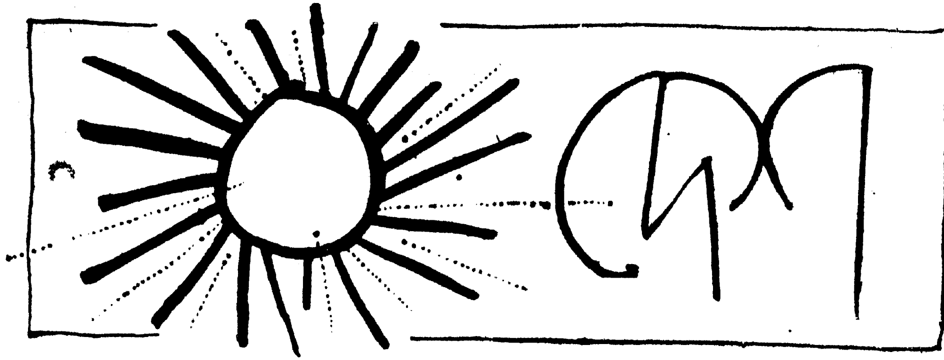
---

পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে আপনার লাবণ্য সুন্দর রাখুন—এটি একটি বিশুদ্ধ গ্লিসারিণযুক্ত সাবান। একমাত্র পিয়ার্স সাবানই আপনাকে দেখতে এবং অনুভব করতে দেয় এটি কত বিশুদ্ধ এবং ভাল!




এ এ্যাণ্ড এফ্‌. পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

PTP. 17-X52 BG




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 29th November, 1958.

২৬ বর্ষ ॥ ৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## আচার্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মের পরে ঠিক একশত বৎসর পূর্ণ হইল। কালের বিচারে একশত বৎসর সময় অল্প নয় কিন্তু সেই সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে দেশে যে অপ্রত্যাশিত স্পৃহনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহ হিসাবের মধ্যে ধরিলে দেখা যাইবে যে পরিবর্তন আরও কত বেশি আরও কত স্পৃহনীয়। এ যেন—"পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।"

১৮৫৮ সাল! তখনও দেশ সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলনে অশান্ত। যাঁহারা নব্য বাংলাদেশ ও নব্য ভারতকে গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহারা কেহ যুবক, কেহ বালক, কেহ সদ্যজাত শিশু, অনেকেই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সবে দেশের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে কিন্তু বহু শতাব্দীব্যাপী জড়তা তখনও তাহার সর্বাঙ্গে জড়িত। আত্মবিশ্বাসের অভাব, পরনির্ভরতায় আস্থা, যাহা কিছু পরস্ব তাহার প্রশংসা, নিজস্ব সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতা—এই ছিল তখন সাধারণ অবস্থা। সংক্ষেপে বলা চলে যে দেশের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু তখনও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগে নাই—আত্মশক্তি তখনও অনাবিষ্কৃত। এই একশত বৎসরের ইতিহাস ভারতের আত্মশক্তিকে আবিষ্কারের ইতিহাস।

চরিতার্থতার সহস্রপথ ক্রমে ক্রমে দেশের সম্মুখে অবারিত হইতে লাগিল, ক্রমে সাহস বীর্য দেখা দিতে লাগিল, আত্মশক্তির ক্ষেত্রে মানুষ আসিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল। সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করিলেন, সাহস বাড়িয়া গেল; রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করিলেন, আবার সাহস বাড়িয়া গেল; মনোচিন্ত ধর্মসাধনার উদার পথ উন্মুক্ত করিলেন ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—সাহস আরও বাড়িয়া গেল।

যখন অন্যক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস জাগিতেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধে তখনও দেশ উদাসীন ছিল, ভয় তাহার কাটে নাই। অনেকের ধারণা ছিল অন্য বিষয় যেমনই হোক বিজ্ঞানে হস্তক্ষেপ




করা চলিবে না—ওটা পাশ্চাত্যের একান্ত নিজস্ব। একদিকে মনে ভয়, অন্যদিকে সরকারের উপেক্ষা, তার উপরে পরীক্ষণাগার প্রভৃতির অভাব। দেশ সুকেশরেচ অব্যাপারেষু ব্যাপার ভাবিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল। এ হেন সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার প্রতিভা ও উদ্যোগ নিয়োগ করিলেন বিজ্ঞান সাধনায়—দুর্গম অচিন্তিত পথে তাঁহার যাত্রা শুরু হইল।

জীবনের প্রান্তে আসিয়া তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের একান্ত সামগ্রী নয়—যেকোনও দেশের উদ্যমী পথিকের জন্য তাহার পথ উন্মুক্ত। আচার্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে, তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশের অযথা ভয় ভাঙাইয়া দিয়াছেন, পরবর্তী শত শত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের মনে আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিয়া বিচিত্রপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞান একান্তভাবে পাশ্চাত্যের সামগ্রী না হইলেও মানিতে হইবে যে, বিজ্ঞানসাধনাকে পাশ্চাত্য জগৎ একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এখানেই তাহার শক্তি ঐশ্বর্য ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এখন সেই রাজ্যে একজন ভারতীয় প্রবেশ করিয়া মৌলিক আবিষ্কারের ধ্বজা যখন প্রোথিত করিল তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশেরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এ যেন একটা যুগান্তর ঘটিয়া গেল। সেইজন্য অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রথমে তাঁহাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নিজের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির পরিচয়দান উপলক্ষে আচার্য পৃথিবী পর্যটনে বাহির হইলেন। "এই সকল স্থানে জয়মালা লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।"

এইভাবে ভারতলক্ষ্মীর প্রেরণায় আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হইল। আচার্য এদেশের মনে আত্মবিশ্বাস ও পাশ্চাত্যের মনে শ্রদ্ধা জাগাইয়া দিলেন। বিজ্ঞানের পথে ভারতের পদচারণা-চালনা সুগম ও সহজ হইয়া আসিল।

যে মহামনীষী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎসভায় ভারতকে একদিন গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন আজ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার ও তাঁহার জীবনসাধনার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

# আর্থিক সমীক্ষা

শ্রীকৌটিল্য

লোকসভায় তর্কাতর্কির মধ্যে সেদিন জানা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বেকার সমস্যার আয়তন পরিমাণ করবার এবং সে সম্পর্কে উপযুক্ত পন্থা স্থির করবার উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুন নতুন কমিটি গঠন আমাদের দেশের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; এবং এ কথা প্রায়ই মনে হয় যে, কমিটি গঠনের সঙ্গে সমস্যা সমাধানের যদি কোনো অনিবার্য কার্য কারণ সম্বন্ধ থাকত তবে এদেশের একটি সমস্যাও আজ আর বেঁচে থাকত না। যাই হোক, প্রস্তাবিত কমিটির উদ্দেশ্য আমরা জেনে গেছি, এখন এ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্যমাত্রই আমরা করতে পারি।

প্রথম কথা, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগ পরিসংখ্যান সংগ্রহের ও বিশ্লেষণের যে গুরুদায়িত্ব এই কমিটি নেবেন তা কী উপায়ে সম্ভবপর হবে সে সম্বন্ধে সরকারী মহল কিছু বলেননি। আমরা জানি, বরাবরের জন্য এই ধরনের পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে একমাত্র ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের সাহায্যেই সংগ্রহ করা সম্ভব। অথচ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সরকার এখনো স্পষ্ট নন। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের পরিসংখ্যান বাদ দিলে তুলনীয় অপর কোনো প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তা খুব সামান্য কথা নয়। এ কথা সত্য যে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নিয়মিতভাবে নিয়োগ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করছেন। কিন্তু বেকারের পরিমাণ নির্ণয়ের পথে তত্ত্বগত ও তথ্যগত অনেক সমস্যা আছে যার জন্য অনেক নতুন ধরনের পরিসংখ্যান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রসঙ্গত, সরকারী পরিসংখ্যানে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেকারের (unemployed) মোটামুটি হিসেব দেখান হচ্ছে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো সমস্যা অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) বিশ্লেষণের উপযুক্ত কোনো পরিসংখ্যান গ্রহণের চেষ্টা হচ্ছে না।

শুধু এই তথ্য-সংগ্রহকারী চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। কী বিশেষ ধরনের তথ্য অর্ধ-নিয়োগ বিশ্লেষণের পক্ষে উপযুক্ত সে সম্বন্ধে প্রচুর তাত্ত্বিক গবেষণার একান্ত প্রয়োজন। কাজেই এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আমরা করছি যে, প্রস্তাবিত কমিটি তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই যেন একটি শক্তিশালী গবেষণা-চক্র গঠন করে নেন। এবং যেহেতু ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের নিয়োগ বিশ্লেষণ শাখায় ইতিমধ্যেই এই ধরনের গবেষণামূলক চিন্তা ও কাজ শুরু হয়ে গেছে, উল্লিখিত কমিটি তা থেকে অনেক সাহায্যও লাভ করতে পারেন। অন্যান্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ছোট ছোট আঞ্চলিক ভিত্তিতে আলাদা ধরনের কাজ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও মূল্যবান হবে। মোট কথা, সরকার যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব নিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাগত উপযুক্ততা থাকলেই চলবে না, গবেষণামূলক সংগঠনও থাকতে হবে।

অর্ধ-নিয়োগ ছাড়াও, আঞ্চলিক শ্রম-চরিত্র (labour characteristics) সম্পর্কে বিশেষ বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। এ একটি বিরাট বিষয়, এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভের উপরে নির্ভর করছে ভবিষ্যতের শ্রম-শক্তি বাজেটের সাফল্য। সংখ্যাগত স্তরে সরকারের চূড়ান্ত কর্তব্য হচ্ছে শ্রম-শক্তি বাজেট প্রস্তুত করা এবং সে বাজেটের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান করা। পশ্চিম দেশে এ বাজেট প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত সরল, কারণ উপরে আমরা যে যে ধরনের সমস্যা ইত্যাদির আভাস দিয়েছি তা সেখানে অনেকাংশে অবর্তমান। এই প্রসঙ্গেই আমাদের দেশের অন্যতম বড়ো সমস্যা শিক্ষিত বেকারের (educated unemployed) উল্লেখ করছি। শ্রমশক্তি বাজেটে এই সমস্যারও প্রভাব থাকবে। আবার, স্ত্রী-শ্রম সম্বন্ধেও (সাম্প্রতিক একটি উল্লেখযোগ্য রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে) গঠনমূলক চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

এদিকে কথা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত কমিটির সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের সম্পর্ক কী দাঁড়াবে। কমিশন আপন প্রয়োজনে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং গবেষণামূলক স্তরেও তা নিয়ে কাজ করছেন। কমিটি যদি সরকারী স্তরে কাজ চালান এবং যদি বেকার সমস্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত এমন বক্তব্য ঘোষণা করেন যার সঙ্গে কমিশনের চিন্তার যোগাযোগ অসম্ভব, তবে সে ক্ষেত্রে কী হবে? আসল কথা, গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা দুই স্তরেই কমিটির কর্মপরিধি নির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

সরকারী মহলে নিয়োগ বিষয়ক বিবৃতিগুলিতে সর্বদাই ধরে নেওয়া হয় যে, এই মুহূর্তের নিয়োগের পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে স্থির থাকবে এবং প্রত্যেক স্তরের অতিরিক্ত কর্মপ্রার্থীর জন্যই শুধু কর্মসংস্থান করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো শিল্পে এবং পেশায় মাঝে মাঝেই ছাঁটাই চলছে। এই ছাঁটাই-এর সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং নতুন কর্মপ্রার্থীর অগ্রিম হিসেবে এই খাতে সম্ভাব্য নতুন বেকারের ভূমিকাও স্বীকৃত হওয়া দরকার। সাধারণভাবে তথ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি বক্তব্যও আছে। সরকারী মহল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থার উপর যতটা আস্থা রাখেন ততটা আস্থা রাখা বোধহয় অযৌক্তিক। অন্তত এটাও একটা বড়ো কথা যে, গ্রামাঞ্চলের বেকারদের কর্মপ্রার্থনার খুব সামান্য ইঙ্গিতই এই ব্যবস্থায় ধরা পড়ছে। তা ছাড়াও, বেসরকারী চাকরীতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো কর্মপ্রার্থী সচরাচর নিয়োগের সুযোগ পায় না। কাজেই শ্রম-শক্তি বাজেটের শ্রম চাহিদার দিকটি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সহায়তায় পরিষ্কার বোঝা যাবে না। সুতরাং এর বিকল্প ব্যবস্থাও হয়তো কমিটিকে ভাবতে হবে।

পরিশেষে আশ্বাসের কথা, কমিটিতে সরকারী লোক ছাড়াও কতিপয় অর্থনীতিবিদ থাকবেন। পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তিত হিসেব অনুযায়ী ৬৫ লক্ষ লোকের নিয়োগ ব্যবস্থা কমিটিকে চিন্তা করতে হবে। এ চিন্তায় অর্থনীতিবিদের কৌশলী বুদ্ধি অনেক উপাদান সরবরাহ করতে পারবে।

# বৈদেশিকী সন্ধানে



একে একে সব, প্রায় সব মুসলিম রাষ্ট্রেই ফৌজী রাজ প্রতিষ্ঠিত হল। বাইরের লোকের কাছে সুদানের ঘটনাটার সংবাদ সবচেয়ে বেশি আকস্মিক বলে বোধ হয়েছে। জেনারেল ইব্রাহিম আব্বুদের "ক্যু"-এর তাৎপর্য কী, কার স্বার্থে এটা ঘটল, এ কার্য জেনারেল আব্বুদের স্বপ্রণোদিত কিনা অথবা তাঁর পিছনে আর কেউ আছে—এসব বিষয়ে এখনো সঠিক তথ্য প্রকাশিত হয়নি। নানা জল্পনা কল্পনা চলছে এবং যাদের যেমন সুবিধা তারা সেইরকম করে সংবাদ পরিবেশন করছে এবং তার উপর রকমারি টীকা চলছে।

কন্‌স্টিটিউশন বাতিল করে দিয়ে সামরিক কর্তৃত্ব বহাল করার পরে প্রথম যে ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তাতে দুর্নীতি, পলিটিশিয়ানদের দুষ্কর্ম, দেশের অবস্থার ক্রমাবনতি ইত্যাদি থেকে সুদানকে বাঁচানোই জেনারেল আব্বুদের উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হয়। কিন্তু এগুলো বাঁধিগতের মতো হয়ে গেছে—যারাই কন্‌স্টিটিউশন বাতিল করে সামরিক শাসন প্রবর্তন করে তারা সকলেই এইসব কারণ বা অজুহাত দেখায়। কিন্তু সুদানে শাসনিক অবস্থা এমন হয়েছিল বলে আগে শোনা যায়নি যে, মিলিটারির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব না দিলে সব ভেঙে চুরে যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন আবশ্যক হয়েছিল এবং সেটা একটা সমস্যার আকারও নিয়েছিল বটে, কিন্তু মিলিটারির হাতে ক্ষমতা দেওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো সমাধান ছিল না, এরূপে মনে করার কোনো কারণ নেই। আবদুল্লা খলিলের কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল সত্য। মিঃ খলিলের প্রধানমন্ত্রিত্বও যাবো-যাবো হয়েছিল। কোয়ালিশনে খলিলের উম্মা পার্টির প্রধান সহযোগী ছিল পিপ্‌লস্‌ ডেমোক্রাটিক পার্টি কিন্তু এদের মধ্যে বনছিল না। মিঃ খলিলের চেষ্টা ছিল সকল প্রধান পার্টিগুলোকে নিয়ে একটি ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট করা যায় কিনা। সে চেষ্টা সফল না হলে মিঃ খলিলের পরিবর্তে অন্য প্রধানমন্ত্রীর নায়কত্বে নূতন কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট অসম্ভব ছিল না। অনেকের ধারণা, মিঃ খলিলের জায়গায় যাঁর আসার সম্ভাবনা হয়েছিল তাঁর হাতে যাতে ক্ষমতা না পড়তে পারে তার জন্যই এই "ক্যু" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তা হয়ে থাকলে এই ঘটনার সঙ্গে মিশর-

...এত্যা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের ...তর ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর ...সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে ...র্পণের অর্থ কি?

কেননা সদ্যোদ্ধৃত চিঠির অব্যবহিত পরের ছত্রগুলি শুধুমাত্র প্রত্যাশার ব্যঞ্জনায় কাঁপছে, নিশ্চিতির ইঙ্গিতে নয়ঃ

'তুমি ত এতদিন নির্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।'

ছায়া-পৃথিবী, সুখ-দুঃখ, ভারতভাগ্য— ...পর-পর এসেছে এবং, ...সন্দেহ আসঙ্গেই এতগুলি ...সেছে। সুখ- ...করছি। ...শক্তি

...প্রেসিডেন্ট নাসেরের





সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে মিঃ খলিলও প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে যখন স্থির হল তখনই মিঃ আব্দুদের আবির্ভাব এবং সব ওলট-পালট করে দেওয়াটা সুদান-মিশর সম্বন্ধের উন্নতি সাধনের ইচ্ছার নিদর্শন বলে মনে করা কঠিন। বরঞ্চ পাছে মিঃ খলিলও মিশরের দিকে ঝুঁকে পড়েন অথবা মিঃ খলিলের জায়গায় এমন কারো হাতে ক্ষমতা আসে যিনি মিশরের দিকে ঝুঁকবেন, সেইজন্যই এইরকম অকস্মাৎ সামরিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হল বলে মনে হতে পারে। তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে, জেনারেল আব্বুদের পিছনে আর কোনো শক্তি কাজ করছে যার চেষ্টা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নাসেরকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা।

আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য রাশিয়া মিশরকে সাহায্য দিতে রাজী আছে, এ সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আসোয়ান বাঁধের পরিকল্পনার সবটা কার্যে পরিণত করতে অবশ্য আরো অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন। তবে রাশিয়া যে-পরিমাণ সাহায্য দিতে রাজী আছে তা পেলে মিশর বাঁধের পরিকল্পনার প্রথম পর্বটা শেষ করতে পারবে। তাতেও চার বছর লাগবে। কিন্তু আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করতে হলে তার আগে সুদানের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে হবে, কারণ বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সুদানের স্বার্থও জড়িত আছে। নীল নদী সুদানের ভিতর দিয়ে এসে মিশরে প্রবেশ করেছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মিত হলে সুদানের কিছু ভূমিও জলমগ্ন হবে। তবে আসোয়ান বাঁধ নির্মিত হলে সুদানেরও শেষ পর্যন্ত লাভ হবে কিন্তু মিশরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আসোয়ান পরিকল্পনার উপর। সেইজন্য সুদানের সদ্ভাব মিশরের পক্ষে এতো প্রয়োজনীয়। সেইজন্য কাইরোর কর্তৃপক্ষের প্রতি সুদানের নূতন শাসকদের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ও উদ্বেগের কারণ থাকলেও প্রেসিডেন্ট নাসের বাইরে তার কিছুমাত্র প্রকাশ করছেন না। বরঞ্চ জেনারেল আব্বুদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক সুদানের নূতন গভর্নমেন্টকে স্বীকৃতি দান করে। অন্তত আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনার খাতিরে প্রেসিডেন্ট নাসেরকে সহিষ্ণুতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সুদানের লোকমত নিশ্চয়ই আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের পক্ষে কোনোপ্রকার বাধা সৃষ্টি চায় না। যদি মিশরের দিক থেকে কোনো-প্রকার গা-জোরি করা বা অন্যায় চাপ দেওয়া না হয় তবে সুদানে যাদের হাতেই কর্তৃত্ব থাক না কেন, আসোয়ান বাঁধ সম্পর্কে একটা আপোস চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে করতেই হবে।

২৪।১১।৫৮



# ভগীরথের উৎস-সন্ধানে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই আমি কহিলাম এই তার মূল।
সুমেরু পর্বত যেন ধুতুরার ফুল॥
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বছর॥
না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ।
জোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ॥
—কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
—কাশীরাম দাস, চতুর্দশপদী ও মধুসূদন

বালক বয়সে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন দুজন, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস। এঁরা দুজনে তাঁর মননের একটি বড়ো অংশ অধিকার করেছিলেন এবং তার একটি ভৌগোলিক পরিচয় আছে। জগদীশচন্দ্রের মনোভূখণ্ডের অন্যতম এই অঞ্চলটির নাম দেওয়া যেতে পারে ভগীরথত্ব। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথকে একটি সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যে অর্থে কঠিন, জগদীশচন্দ্রকে সংজ্ঞাভুক্ত করা সে অর্থে দুরূহ নয়। তাঁকে আমরা আশৈশব বিজ্ঞানব্রতী বলেই জেনেছি এবং আজও তাঁকে এক কথায় বৈজ্ঞানিক বলে বিশেষিত করতে দ্বিধাবোধ করবো না। বিজ্ঞানসাধনার বিশেষ ধারাটিকে সারাজীবন একবারের জন্যও তিনি পরিহার করেননি, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সেটা তাঁর জীবনের একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনামাত্র, বরং একথা বলাই সংগত যে, সেই ঘটনা একটি কারণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। জগদীশচন্দ্রের [illegible] সাহিত্যচর্চার মধ্যে সেই কারণটিকে পাওয়া যাবে।

জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী১ থেকে তাঁর প্রকৃতিপাঠের যে ইতিহাস উঠে আসে, তার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট। একটি অজেয় নৈরাশ্য তাঁকে বার বার প্রতিহত করেছে, আবার পরিণত করেছে। কথাটি কোনো মনীষী বা মানুষ সম্বন্ধে এমন-কিছু নতুন নয়। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা তাঁর চিঠির উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে : 'অধিকাংশ সময়েই ত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে, এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে অন্য আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?'২

এই পৃথিবীর ছায়া, না, এই পৃথিবী ছায়া? জেমস জীনস বলেছিলেন, প্লেটো বর্ণিত গুহার দেয়ালে নিক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছায়াগুলি মাত্র ছায়ার মতোই সত্য ও কাল্পনিক, এবং অংক কষে তাদের উপস্থিতি নির্ধারণ করা যায়।৩ জীনসের মতো একথা সরল ভাষায় জগদীশচন্দ্র বলতে পারেননি যে, গণিতশাস্ত্রই একমাত্র অমোঘ সমাধান, কেননা সদ্যোদ্ধৃত চিঠির অব্যবহিত পরের ছত্রগুলি শুধুমাত্র প্রত্যাশার ব্যঞ্জনায় কাঁপছে, নিশ্চিতির ইঙ্গিতে নয় :

'তুমি ত এতদিন নির্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।'

ছায়া-পৃথিবী, সুখ-দুঃখ, ভারতভাগ্য—কথাগুলি পর-পর এসেছে এবং, সন্দেহ নেই, একটি ভাবের আসঙ্গেই এতগুলি ভাবনা ভিড় করেছে, মিড় তুলেছে। সুখ-দুঃখ—কথাটাকে আবার উচ্চারণ করছি। সমর্থনকল্পে তাঁর রচনা থেকে কিছু নিরুক্তি সংগ্রহ করছি :

(১) চিঠিপত্র (ষষ্ঠ খণ্ড)—বিশ্বভারতী প্রকাশিত। (২) চিঠিপত্র, গ্রন্থপরিচয়, ২১০ পৃষ্ঠা। (৩) Physics and Philosophy.

১। ভীষণ জীবনচক্রের গতি দেখিয়া ভীত হইয়াছ? স্বভাবের নির্মম ও কাণ্ডারীহীন কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ? কিন্তু তোমাদেরই অন্তরে দৈব দৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল কর। হয়ত প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, একটা উদ্দেশ্য আছে। (দীক্ষা)

২। ......মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, 'দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও। এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এ অন্তরের ভার। এ জগতের শেষ কোথায়?

তখন দেবদূত কহিলেন, 'তোমার সম্মুখে অন্ত নাই। ইহাতেও কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ, এ জগতের আরম্ভও নাই।'

শেষ নাই, আরম্ভও নাই!

মানুষের মন অসীমের ভার বহিতে পারে না।

(আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ)

৩। যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙিলেই আলো।

(বোধন)

৪। একটি শিশু কিম্বা একটি নারীর উর্ধ্বোত্থিত বাহুতে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। আলো ও ছায়া, সুখ ও অপরিহার্য দুঃখ তখন স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয়। তখন সেই দুইখানি উত্তোলিত যুক্তহস্ত হইতে কিরণরেখা অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত দৃশ্য জ্যোতির্ময় করে। (যুক্তকর)

সবশেষের কথাগুলি শুনবামাত্রই সমস্ত চৈতন্য ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। যে-চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছেন, সেটি একমাত্র কবির, কবিতার। সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়, কথাটিকে বলবার জন্য তিনি যে-অব্যর্থ দৃশ্যকল্প (Visual Image) প্রয়োগ করেছেন, অদৃশ্য ভাবরূপটিকে তার সাহায্যে বিঁধেছেন। কিন্তু আরেকটি কথা। 'সুখ' শব্দের আগে কোনো বিশেষণ নেই, অথচ 'অপরিহার্য' দুঃখ' কেন? আসল কথা, অপরিহার্য দুঃখ থেকেই তাঁর নিষ্ক্রান্তি (Catharsis) ঘটেছে সর্বময় শক্তির অনুধ্যানে এবং তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা সেই দুঃখমুক্তির আধার।

কথাটা হয়তো একটু পল্লবিত হবার অপেক্ষা রাখে। ঘনিষ্ঠতম উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিজ্ঞতা মনে পড়েছে। ১৯২৬-এ ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল হোটেলে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল : 'এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে, তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই।' যন্ত্রণা থেকে আনন্দলোকে প্রবেশাধিকারের কাব্যরূপে 'বনবাণী'।৪ জীবন-বেদনা থেকে নিষ্ক্রমণ হলো বনবাণীতে অর্থাৎ নিসর্গ-মরমী চেতনায় এবং জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে এই কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। আইনস্টাইন অনুভব করেছিলেন :

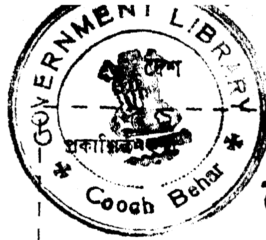
'The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical.... To know that what is imperetable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their primitive forms this knowledge, this feeling is at the centre of true religiousness.'

আইনস্টাইনের চেয়ে একুশ বছর বয়ঃকনিষ্ঠ জগদীশচন্দ্র একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন : বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি সেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও

(৪) 'বনবাণী'র দ্বিতীয় কবিতা 'জগদীশচন্দ্র'। (রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড)

(৫) The Universe and Dr. Einstein: Lincoln Barnett.

(১১২ পৃষ্ঠা)




তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন-রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতে-ছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথা-যথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।'

(কবিতা ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে সাহিত্য)

'আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনে-ন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই; সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।' (অদৃশ্য আলোক, ঐ)

রবীন্দ্রনাথ এই কেন্দ্রের কথা, একই প্রসঙ্গে, অন্যত্র বলেছেন: নিত্য বলে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব-কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য। (পরমাণুলোক, 'বিশ্বপরিচয়')

রামেন্দ্রসুন্দরের উত্তরণও ঘটেছিল পদার্থ-বিদ্যা থেকে অপার্থিব প্রজ্ঞায় এবং তাঁর বার্ধক্যের প্রশান্ত নির্লিপ্ত নিয়ে তিনি পৃথিবীর মানুষের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিকল্প সেই তুলনায় আরো মানবিক সমভূমিতে সঞ্চারিত। 'The Motor Mechanism of Plants' (১৯২৮)এর ভূমিকায় তার নির্ভুল সংকেত:

'The importance of plant-physiology lies in the prospect that the study of life in the simpler plant organism may lead to the solution of many perplexing problems in the physiology of highly complex animal. This will be in case it can be shown that the fundamental physiological mechanism of the plant is identical with that of the animal'.

জটিল শারীরতত্ত্বে বিশিষ্ট এই জীব শুধু মানবেতর প্রাণীরাই নয়, মানুষও। এবং শুধু কি শারীরতত্ত্ব না মনস্তত্ত্ব? 'Plant Response' (১৯০৬) বইটিতে জগদীশচন্দ্র এই পরীক্ষার সাফল্য ও সম্ভাবনার কথা প্রথম বলেছিলেন: 'Identity of effects....between the responses of plant and animal' সংবেদনার অভিন্নতা যেখানে আছে, সেখানে নিঃসন্দেহে উৎসের অভিন্নতা বা Identity of causes থাকতে বাধ্য এবং জগদীশচন্দ্র সেই ঐকিক উৎসের দুয়ারে করাঘাত করেছিলেন। বেদনায় আমরা সবাই এক—জীবজগৎ ও জড়জগৎ, প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে একই বেদনাময় প্রাণপরম্পর

লুকিয়ে আছেন, ডাকলে যিনি সাড়া দেন, অসম্মান করলে যিনি অভিমানে মৃত্যুবরণ করেন। উপনিষদে এই প্রাণচেতন উৎসের উপলব্ধি এভাবে আছে :

'অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ
সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ
স শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি
সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতীতি'

ছান্দোগ্য, ৬-১১-২

'জীব এই বৃক্ষের একটি শাখাকে ত্যাগ করিলে উহা শুকাইয়া যায়; দ্বিতীয় একটি ত্যাগ করিলে তাহাও শুকাইয়া যায়; তৃতীয় আরেকটি ত্যাগ করিলে তাহাও শুকাইয়া যায়; সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করিলে সমগ্রই শুকাইয়া যায়' (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ)।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে বুঝেছিলেন : 'জীব কোনরূপে আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই সংকোচনই জীবনের সাড়া। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় সাড়া বৃহৎ হয়, অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাড়ার অবসান হয়।...মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়।'

(নির্বাক জীবন)

'আক্ষেপ' ছাড়া আর কোন্ শব্দ এক্ষেত্রে এত আশ্চর্য কাজ করতে পারতো?

জগদীশচন্দ্র নির্বাক জীবন বা অব্যক্ত জীবনের বাঙ্‌মূর্তি দেখতে চেয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে সেই আর্তি স্নিগ্ধ কৌতুকরসে প্রকাশিত হয়েছে : 'সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত—অশিক্ষিত কিম্বা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।'

দুর্জ্ঞেয় দেবনাগরী না যথাযথ বাংলা ভাষায়? অব্যক্তের 'কথারম্ভের' সংগে সংগে একথা তাঁকে বলতে হয়েছে : 'ভিতরে ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষে মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপন সুখ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে।' অন্য ভাষায় কি তবে এক ভাষার প্রতিভা কোনোক্রমেই সঞ্চারিত হতে পারে না? এই সন্দেহে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ, যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক।.....লোকেনকে ধরাইয়া অনুবাদ করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।৬

রবীন্দ্রনাথ The Religion of an Artist পুস্তিকায় নিজেই অন্য ভাষায় তাঁর অনুবাদ বিষয়ে সংশয় জ্ঞাপন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রকেও অনতিবিলম্বে মেনে নিতে হয়েছে —' তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সে কথা কল্যাণী—তুমি ঠিকই বলিয়াছ একথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।(৭) জগদীশচন্দ্র বুঝেছিলেন তত্ত্বর্ণনা বহিরঙ্গের বিষয়, কিন্তু প্রকাশরহস্য ভাষার অন্তরঙ্গে নিহিত থাকে, তাই ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে তিনি একবারো থমকে দাঁড়াননি, কিন্তু বাংলা লিখতে গিয়ে বিরাট কুণ্ঠা তাঁকে আড়ষ্ট করেছিলো : 'আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি যে, বাংলা কোনো মাসিকপত্রে আমার এই নূতন কার্যসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাইনা বলিয়া সে-ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে। যদি তুমি সেগুলি কোনদিন প্রস্ফুটিত করিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব'।(৮)

'অব্যক্ত' গ্রন্থের পাতায় পাতায় তিনি নিজেই কথা খুঁজে পেয়েছেন, প্রস্ফুটিত করেছেন। 'জাতীয় জীবন' কথাটি তাঁর রচনায় একাধিকবার ঘুরে-ঘুরে এসেছে। সেই জাতীয় জীবনের উত্তরাধিকারের মূলে রামেন্দ্রসুন্দর বৈদিক ঐতিহ্যের বিবর্তন দেখেছিলেন : 'তিনিই দেবমাতা অদিতি... তাঁহারই নামান্তর সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণচক্রে শতখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কামরূপ হইতে হিংগলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে।' (যজ্ঞ-কথা)

জগদীশচন্দ্র পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন এই লুপ্তস্রোতের সূত্র ফিরিয়ে আনবেন বলে; লজ্জাবতী লতা আর কচুরি পানার ফুলের ঘরোয়া পথে আবার তিনি ফিরেছিলেন, তাদের বুকে কান পেতেছিলেন। পদব্রজে যাবার সময় তিনি নির্লোভ শিল্পীর চোখে সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখেছিলেন, সৃষ্টিতত্ত্বে জিজ্ঞাসুদের জন্য উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। সেই উদাসীন মুহূর্তটি সাহিত্যপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের একটি অমর্ত্যসুন্দর শিল্পকাজ হয়ে রয়েছে : 'নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন বিশুদ্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।' (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)

---

(৬) চিঠিপত্র (ষষ্ঠ খণ্ড) ১৭৫ পৃষ্ঠা
(৭) চিঠিপত্র (ষষ্ঠ খণ্ড) ২১২ পৃষ্ঠা,
(৮) চিঠিপত্র, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

# বি জ্ঞা না চা র্য

অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

যে কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী জগতের সভায় ভারতকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অন্যতম। এই মহামনীষীর জন্মের শত বর্ষ পরে আজ ভারতবাসী তাঁর জীবনের আদর্শকে বরণ করে পূর্ণ উদ্যমে বিজ্ঞানের সাধনায় অগ্রসর হবেন—এই আশাতেই জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে তাঁর জীবন-কথা আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে।

কবির কাব্য যেমন কবির জীবন থেকে অভিন্ন, বিজ্ঞান তেমনি জগদীশ-চন্দ্রের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সংযুক্ত। বিজ্ঞানের গবেষণা কাকে বলে, ভারতবাসী যখন তা কিছুই জানত না, সেই সময়ের নানা প্রতিকূল অবস্থায় তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধান করেছিলেন এবং বহু বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও অসাধারণ শক্তি, মেধা ও অপরিসীম ধৈর্যের বলে অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার করে জগতের জ্ঞান-সম্পদ বর্ধিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই সত্য ও জ্ঞানের সাধনায় প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে কেটেছিল—আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ত-তিতম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যানুসন্ধী পুরুষের সংগ্রামময় জীবনের কথারই উল্লেখ করে বলে-ছিলেন—

"মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রুধার
অন্ধকারে লীন
ঈর্ষা-কণ্টকিত পথে চলেছিলে
ব্যথিত চরণে
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণ
অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সেই দুঃখই
তোমার পাথেয়
সেই অগ্নি জেবলেছে যাত্রা-দীপ,
অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়।"

জীবনের শেষে জগদীশচন্দ্রের অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির জয় হয়েছিল—বিজ্ঞানজগতে সর্বত্রই তাঁর খ্যাতির জয়-শঙ্খ অনবদ্যভাবে বেজে উঠেছিল।

জগদীশচন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রম-পুরের অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামের ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, ৩০শে নবেম্বর, জগদীশ-চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার কর্মস্থল ফরিদপুরে জগদীশচন্দ্রের শৈশব অতি-বাহিত হয়। ভগবানচন্দ্র অতিশয় তেজস্বী ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বালক জগদীশচন্দ্রের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। শহরে তখন দুটি বিদ্যালয় ছিল—একটি গবর্নমেণ্ট-চালিত ইংরেজী বিদ্যালয়, অন্যটি বাংলা বিদ্যালয়। ভগবানবাবু তাঁর পুত্রকে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেশের সাধারণ কৃষক-সম্প্রদায়ের বালকদের সঙ্গে নিজের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। বাল্যের এই শিক্ষার গুণেই জগদীশচন্দ্রের সমগ্র জীবনে তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্ম-বোধ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে নয় বৎসর বয়সে বালক জগদীশচন্দ্র কলিকাতা হেয়ার স্কুলে ও পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স বিদ্যা-লয়ে প্রেরিত হন। শেষোক্ত বিদ্যালয় থেকেই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাস করে সেখানকার কলেজ বিভাগে উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফঁ জগদীশচন্দ্রের ছাত্রজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। লাফঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী ও ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা সুন্দর ছিল—ক্লাসে তিনি নিপুণতার সঙ্গে নানারকম 'এক্স-পেরিমেণ্ট' দেখাতেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের এরূপ এক শিক্ষকের হাতে জগদীশ-চন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। কলেজে পাঠের সময় তিনি একবার আসামের জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে তিনি এক দুরন্ত জ্বর-রোগ নিয়ে ফেরেন। এই রোগে তিনি অনেক বৎসর কষ্ট পেয়েছিলেন। বি এ পরীক্ষায় সেজন্য তিনি কৃতিত্বের কোনও পরিচয় দিতে পারেন নি। ডিগ্রি পাবার পর পিতামাতার অবস্থার উন্নতির আশায় জগদীশচন্দ্র [illegible] সিভিল, সার্ভিস



পরীক্ষা দেবার জন্য ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতা পুত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য লণ্ডনে প্রেরণ করেন। লণ্ডনে এসেও তাঁর আগের জ্বর-রোগ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় গুরুতর পরিশ্রমের জন্য তাঁর অসুখ আরও বেড়ে যায়। ফলে জগদীশচন্দ্র চিকিৎসাবিদ্যা ছেড়ে কেম্ব্রিজে ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপোস পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূচনা হয়। কেম্ব্রিজে ক্রাইস্ট কলেজে বিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। লর্ড র‍্যালের কাছে তিনি পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেন—এই প্রতিভাশালী ইংরেজ বিজ্ঞানীর নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার ভিতকে পাকা করে দিয়েছিল। প্রাণীবিজ্ঞানে মাইকেল ফস্টার, ফ্রান্সিস ব্যালফোর প্রভৃতি তাঁর শিক্ষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভিনে ও ফ্রান্সিস ডারুইন-এর কাছে তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। ট্রাইপোস পরীক্ষা পাস করে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি পঁচিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কাজ তিনি সহজে পাননি। ইংলণ্ডে বাসকালে তাঁর ভগ্নীপতি স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসুর বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক ফসেট্, বড়লাট লর্ড রিপনের নিকট এক পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। লর্ড রিপনের নির্দেশমতে জগদীশচন্দ্রকে প্রথমে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। সে-সময় ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতনের পরিমাণ ইংরেজ অধ্যাপকদের বেতনের তুলনায় অনেক কম ছিল। অস্থায়ী পদের জন্য জগদীশচন্দ্রের বেতন তারও অর্ধেক ধার্য হয়। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তিন বৎসর এই অর্ধেক বেতনের টাকা গ্রহণ করেননি—এমনি তাঁর তেজস্বিতা ও মনের জোর ছিল। কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব ও শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর তিন বৎসর পরে জগদীশচন্দ্রের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন এবং পুরো বেতনে প্রথম তিন বছরের সমস্ত টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেই তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজেই জগদীশচন্দ্র প্রথম গবেষণার কার্য আরম্ভ করেন। তাঁর ৩৫ বৎসরের জন্মদিনে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁর জীবন বিজ্ঞানের জন্য উৎসর্গ করবেন বলে তিনি সংকল্প করেন। এর এক বছরের মধ্যেই তাঁর এক মৌলিক নিবন্ধ লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বেতারবার্তা পাঠাতে হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করতে হয়। অধ্যাপক বসু মহাশয় এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে এই সময়ে অনেক গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার জন্য রয়াল সোসাইটি জগদীশ-চন্দ্রকে অর্থসাহায্য করে—এ থেকেই তাঁর গবেষণার মূল্য নিরূপিত হতে পারে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান ডি এস-সি উপাধি তিনি তখন পেয়েছিলেন। তখনকার প্রেসিডেন্সী কলেজে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, সামান্য টিনের মিস্ত্রীর সাহায্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে যে-সব আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তার যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। ইংলণ্ডে লর্ড কেলভিন ও ফরাসী দেশের অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স-এর সভাপতি Cornu এই সময় জগদীশচন্দ্রকে পত্র লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। য়ুরোপের বিজ্ঞানীদের প্রশংসাবাদ শুনে ভারত গবর্নমেণ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্য ২৫০০, টাকার বন্দোবস্ত করেন। এই অপর্যাপ্ত অর্থ নিয়ে সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা ক্লাস করবার পর নিজের ল্যাবরেটারিতে প্রথম শ্রেণীর গবেষণার কাজ জগদীশ-চন্দ্র বসুর মতই একনিষ্ঠ জ্ঞান-তপস্বীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল! এর কিছু পরেই তিনি ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ন' মাসের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। এই সময়ে লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে শুক্রবারের সান্ধ্য সভায় তিনি আহূত হয়ে আলোক ও তাপ-তরঙ্গের সঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্বারূপ্য ও সাযুজ্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেন। বক্তৃতা-সভায় বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পরে উপরে 'ভিজিটার্স গ্যালারি'তে বসু মহাশয়ের পত্নীর সহিত কর-মর্দন করে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করেন। বেতারবার্তা পাঠাবার 'প্রেরক' ও 'গ্রাহক' উভয় যন্ত্রই জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করে দেখিয়েছিলেন। Societe de Physique কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি প্যারিসেও তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। এই বিজ্ঞান সভার 'অনারারি' সভ্য তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। বার্লিনের অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স-এর সভাতেও জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করেছিলেন। জার্মেনির বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার বহু প্রশংসা করেছিলেন।

বেতারের গ্রাহকযন্ত্রে সেকালে 'Coherer' নামে এক ব্যবস্থা থাকত। প্যারিসের অধ্যাপক Branly এই Coherer যন্ত্রিকাটি প্রথম তৈরী করেন। ইংলণ্ডের অলিভার লজ ও ভারতবর্ষের জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রিকার অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার বিষয়ে কিছুই গোপন করেন নাই—লণ্ডনের 'ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার' পত্রিকা এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে অর্থকরী বন্দোবস্তের চেষ্টা করে অনেকবার বিফলমনোরথ হয়েছে। এই সময় সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। আধুনিককালে 'আলট্রাশর্ট ওয়েভ'-এর কথা সকলেই শুনেছেন—কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী আড়াই মিলিমিটারের (২·৫ মিঃ মিঃ) বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তাঁর প্রেরক-যন্ত্রে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এর বহু বছর পরে ১৯২৩ সনে আমেরিকার Nichols ও Tear এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী এর চেয়েও ছোট বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন।

য়ুরোপে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার পর দেশে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র পূর্ণ উদ্যমে আবার নূতন নূতন গবেষণায় মন দিলেন। "On a self-recovering coherer", "On electric touch and molecular changes produced in matter by electric waves", "On the strain theory of photographic action", "Artificial retina-binocular alternation of vision" ইত্যাদি অনেক তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ তিনি রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই সময় থেকেই জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলো বলা যেতে পারে। "Response of the living and the non-living" সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা তাঁকে জড়-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞানের মধ্যপথে এনে উপস্থিত করেছিল! ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় গবর্নমেণ্ট আবার তাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এই বৎসর 'প্যারিস ইণ্টার-ন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্টস'-এর সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর নূতন গবেষণার ফল উপস্থাপিত করেন। 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স'-এর সভা এ-বছর ব্রাড্-ফোর্ডে হয়। সেখানেও তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সর্বত্রই সকলে তাঁর যান্ত্রিক কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘোর সংশয় ও সন্দেহের ভাব পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। বহু বৎসর জগদীশ-চন্দ্রকে এই সংশয়-প্রসূত বিরুদ্ধভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণার সুবিধার জন্য একটি উচ্চাঙ্গের বীক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র ভারত গবর্নমেণ্টকে বহুবার জানিয়ে-

ছিলেন—তাঁর মধ্যে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী বিলাতে থেকে ঐ মর্মে ভারত গবর্নমেণ্টকে আবেদনপত্রও প্রেরণ করেছিলেন। লর্ড কার্জন যখন বড়লাট, তখন এই বীক্ষণাগার নির্মাণের আগে তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই সময় পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অনেক প্রশংসা জানিয়েছিলেন — কিন্তু প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বিরুদ্ধতা করেছিলেন। ফলে, বীক্ষণাগার নির্মাণের কথা চাপা পড়ে যায়—কেবল গবর্নমেণ্ট তাঁকে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণি-বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূল্য নির্ধারণ বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের পক্ষে সম্ভবপর নয়—তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে-সব যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর গবেষণা করেছিলেন, তার শিল্প-কুশলতা ও পরিকল্পনা অসাধারণ। গাছের ক্রম-বৃদ্ধি—উদ্ভিদ জগতের চেতনার সাড়া তাঁর যন্ত্রগুলিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় প্রফেসর ডব্লিউ এইচ ব্র্যাগ, প্রফেসর এফ ডব্লিউ অলিভার, লর্ড র‍্যালে, প্রফেসর বেলিস, প্রফেসর এফ জি ডোনান প্রভৃতি নাম-করা বিজ্ঞানীদের মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, জগদীশচন্দ্রের 'ক্রেস্‌কোগ্রাফ' যন্ত্রের 'ম্যাগনিফিকেশন' ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি। এর অর্থ এই যে, গাছ বাস্তবিক যতটুকু বাড়ে তার ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি গুণ বড় করে এই যন্ত্রে দেখা যায়। এই বিশেষ যন্ত্রটিই শুধু যদি জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করে যেতেন, তাতেই তাঁর অনেক সুখ্যাতি হতে পারত! লজ্জাবতী লতা (Mimosa) ও ফরিদপুরের সন্ধ্যায় নুয়ে-পড়া আশ্চর্য খেজুরগাছের কথা অনেকেই পড়েছেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের চেতনা-রাজ্যের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। "অ্যাসেণ্ট অব দি স্যাপ ইন প্ল্যাণ্টস", "নার্ভাস সিসটেম ইন প্ল্যাণ্টস", "ফেনোমেনন অব ইরিটেবিলিটি ইন প্ল্যাণ্টস" প্রভৃতি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের বহু শ্রমসাপেক্ষ গবেষণা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ও তাঁর প্রণীত পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯১৪ সনে য়ুরোপ ও আমেরিকা থেকে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য আবার তাঁর আমন্ত্রণ আসে। লণ্ডনে রয়াল ইনস্টিটিউশন ও রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিন-এর সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ভিয়েনা ও প্যারিসেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, হার্বার্ট প্রভৃতি স্থানে তিনি তাঁর গবেষণার ফল বিশ্বজ্জনের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। সর্বত্রই তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে ১৯১৫ সনে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্নমেণ্ট তাঁর বহুবর্ষব্যাপী অধ্যাপনা ও গবেষণার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'এমিরিটাস প্রফেসর' নিযুক্ত করেন। অবসর গ্রহণের অল্প পরেই গবর্নমেণ্ট তাঁকে 'নাইটহুড' ও পরে সি এস আই উপাধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

বহুদিন থেকেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণার জন্য একটি উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন—অধ্যাপকের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকেই তাঁর সমস্ত মন এই দিকে নিয়োজিত হয়েছিল। নালন্দা ও তক্ষশীলার ভগ্নস্তূপ দেখে দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠের আদর্শ তাঁকে অভিভূত করেছিল। ১৯১৭ সনে ৩০শে নভেম্বর তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে কলিকাতার আপার সারকুলার রোডে নিজের বাসভবনের পাশেই তিনি বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের (বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি বলেছিলেন—

"I dedicate this Institute, not merely a laboratory but a Temple".

বিজ্ঞান মন্দিরের মহান আদর্শের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন—

"Not in matter but in thought, not in possession, nor even in attainments but in ideals is to be found the seed of immortality. Not through material acquisition but in general diffusion of ideas & ideals can the true empire of humanity be established".

এই আদর্শবাদ ছাত্রসমাজকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ছাত্র সেদিন বিজ্ঞান-মন্দিরে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এই বিজ্ঞান-মন্দির পরিচালনার জন্য গবর্নমেণ্ট অর্থসাহায্য করে আসছেন। রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা জগদীশচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানে নূতন করে আরম্ভ করেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দির ব্যতীত দার্জিলিংএর পাহাড়ে ও গঙ্গার উপর সিজবেড়িয়াতে তিনি গবেষণার জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের আয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞানের সাধনায় ব্যয়িত হয়েছে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দু বছর পরে জগদীশচন্দ্র আবার বিলাত যান। এতদিন যাঁরা তাঁর গবেষণায় সংশয় প্রকাশ করে এসেছিলেন, এবার তাঁদের অনেকের মনেই তিনি বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিলেন: এবার তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রাণী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত তাঁকে প্রচুর সমাদর করেছিলেন। ১৯২০ সনে ব্রুমসবেরি স্কোয়ারে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমাগম হত। এই সময় থেকেই দেশে-বিদেশে তাঁর সুনাম ও প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। আবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল এল ডি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন। অঙ্ক-শাস্ত্রবিদ্ রামানুজনের পর আচার্য জগদীশচন্দ্র মহাশয় জড় ও প্রাণি-গবেষণার জন্য রয়াল সোসাইটি থেকে এই উচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন। ১৯০১ সন থেকে তিনি যে-সব সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিলেন, ১৯২০ সনে বিজ্ঞান-জগৎ তার অনেকখানি অসন্দিগ্ধচিত্তে স্বীকার করে নেয়।

বিজ্ঞানের সাধনায় জগদীশচন্দ্র বহুবার বিদেশে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানেও তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে ভারতের মূলগত ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভারত-প্রেমিক ও ভারত-পথিক তিনি ছিলেন—ভারতের শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য তাঁর মনে প্রেরণা জাগিয়েছিল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অভ্যন্তরে যে সব চিত্রের সমাবেশ আছে, তা দেখে বোঝা যায়, তিনি শুধু শিল্প-প্রাণ ছিলেন না—তাঁর মন একান্তই ভারতীয় ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত অনেক সুন্দর বাংলা প্রবন্ধ আছে। বহু বৎসর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

১৯৩৭ সনে নভেম্বর মাসের প্রথমে জগদীশচন্দ্র গিরিডিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে ২৩শে তারিখে স্নানাগারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন—দেশের দুর্ভাগ্য তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। এমনি অলক্ষিতে ও আকস্মিকভাবে জগদীশচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৯ হয়েছিল।

পরিশেষে জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্মিণীর উল্লেখ না করলে এই জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিখ্যাত দুর্গামোহন দাশের অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী অবলাকে জগদীশচন্দ্র বিবাহ করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর নানা প্রচেষ্টার কথা সকলেরই বিদিত। ইনিও আজ জীবিত নেই। জগদীশচন্দ্রের জীবনের সব কাজে ও চিন্তায় তাঁর সহধর্মিণীর সহানুভূতি ও সহযোগ জীবনে সম্পূর্ণতা দান করেছিল—সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মের শত বর্ষ পরে আজ আমরা তাঁরই উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

"জয় নরোত্তম, পুরুষ-সত্তম, জয় তপস্বীরাজ হে।"

# আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে

**ডঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়**

জগদীশচন্দ্রের আগে পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞানীরা ভারতবাসীর চরিত্র বিষয়ে অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন। অন্তর্দর্শী দর্শন চিন্তায় ভারতের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা বলতেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ভারতবাসীর বিশেষ কোন অনুরাগ বা কুশলতা নেই। নব্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় পথিকৃৎ আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব, এই ভিত্তিহীন কল্পনার মূলে প্রচণ্ড আঘাত করল। দেখা গেল মৌলিক চিন্তাধারায় এবং গবেষণা নৈপুণ্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীও সমান কৃতিত্বে এগিয়ে চলবার ক্ষমতা রাখেন। এমন কি বিজ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। বহু শতাব্দী পরে ভারতীয় বিজ্ঞান চেতনার ঘটল পুনর্জাগরণ, বিশ্বের দরবারে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

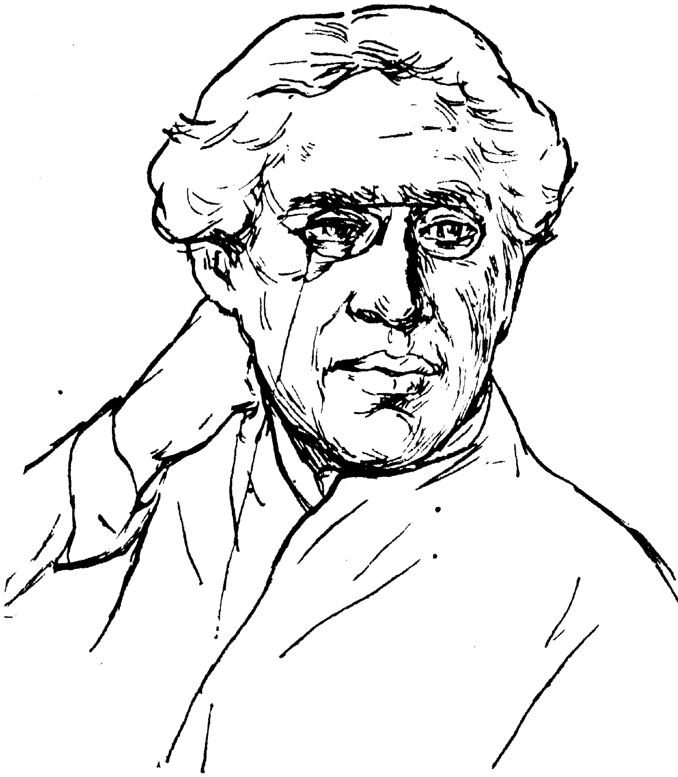
জগদীশচন্দ্র পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষক জীবন শুরু করেন, কিন্তু তাঁর সদস্য কর্মপ্রতিভা এবং অতুলনীয় মনীষা বিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। বিদ্যুৎ তরঙ্গ, জড় ও জীবের সাড়ার ঐক্য, আলোকচিত্র বিজ্ঞান, উদ্ভিদ দেহবিজ্ঞান, দৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ব্যাপক পর্যবেক্ষণমূলক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ তরঙ্গের চরিত্র নির্ণয় তাঁর গবেষণার প্রথম বিষয়বস্তু ছিল। এই পথের প্রধান পথিকৃৎ হলেন জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস। তিনি বিদ্যুৎ তরঙ্গের সঙ্গে দৃশ্য আলোক তরঙ্গের চরিত্রগত সাদৃশ্য দেখিয়ে বিজ্ঞানী ম্যাক্স-ওয়েলের মতবাদকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন।

এই পরীক্ষার জন্য হার্ৎস যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় কয়েক শ ফুট। হার্ৎসের প্রেরক যন্ত্র থেকে বিরাট এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে কিছু দূরে অবস্থিত বিদ্যুৎ অস্তিত্ব জ্ঞাপক এক বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে তার উপস্থিতির সাড়া জাগাত। এই বিরাট বিদ্যুৎ তরঙ্গের সহায়তায় হার্ৎস প্রতিফলন, প্রতিভেদন, সমবর্তন প্রভৃতি আলোর প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটান। বিদ্যুৎ তরঙ্গের সহায়তায় দৃশ্য আলোর গুণাবলীর আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটালেও হার্ৎসের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বড় হওয়ার জন্য তাঁর গবেষণার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। এই ত্রুটির সংশোধন করে নতুন করে গবেষণা চালাবার আগেই হার্ৎস পরলোকগমন করেন।

দৃশ্য আলোর সঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গের চরিত্রের সমগোত্রিয়তা প্রমাণ করবার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র উন্নত ধরনের প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটিয়ে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেন, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক মিলিমিটার। এই ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সহায়তায় তিনি নির্ভুলভাবে তার আলোক প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হলেন। হার্ৎসের আরব্ধ কাজ শেষ হল, —এই মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ জগদীশ-চন্দ্রকে বিজ্ঞানী মহলে এক মহা-গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। দেশ-বিদেশ থেকে এল সমাদর, ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি লিখলেন,—

"আপনার আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে আপনার পূর্ব-পুরুষগণ মানবসভ্যতার অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগৎ-সমক্ষে প্রজ্বলিত করিয়া-ছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের গৌরব-কীর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন।"

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি নির্ধারণের পর আচার্য জগদীশচন্দ্র এর সহায়তায় বিনা তারে বার্তা প্রেরণের বিষয়ে মনোযোগ দেন। ১৮৯৪ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণে এক পরীক্ষা দেখান। তাঁর পরীক্ষায় এক ঘরে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাশের ঘরে প্রবেশ করে একটি পিস্তল ছুড়ে বেতার যুগের সূচনা করল। এই আবিষ্কারের পেটেণ্ট নেবার চেষ্টা জগদীশচন্দ্র কোনদিন করেন নি, ১৮৯৫ সালে এই পরীক্ষা আবার উন্নত-ভাবে কলকাতার টাউন হলে বাঙলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে দেখান হল। জগদীশচন্দ্র ১৮৯৬ সালে বিদেশ যাত্রা করেন এবং এর পর তাঁর গবেষণার ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হয়।



বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র

বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের সঙ্গে বিশ্বের দুজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এবং মার্কনিকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অনেকেরই মনে ধারণা, বিনা তারে বেতার-বার্তা প্রেরণের উদ্ভাবক হলেন জগদীশচন্দ্র এবং খ্যাতনামা ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি নাকি তাঁর নোটবই সংগ্রহ করে এই মূল্যবান আবিষ্কারসমূহের সন্ধান পান এবং তারপর তার উন্নতি ঘটিয়ে পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। জানি না, বাঙলাদেশের কোন উর্বর মস্তিষ্কে এই লজ্জাজনক হাস্যকর গল্প-কথার সৃষ্টি হয়েছিল। এই কাহিনী বিজ্ঞানী মার্কনির প্রতিভা এবং চরিত্রের প্রতিই কেবল কটাক্ষ করে না, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের সম্মানও ক্ষুণ্ণ করে। তাই বিজ্ঞানাচার্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এই বিভ্রান্তিকর গল্পের বিরুদ্ধে দু'এক কথা বলা কর্তব্য মনে করছি।

জগদীশচন্দ্র ও মার্কনি উভয়েই হার্ৎসের বিজ্ঞান-সাধনা থেকে অনুপ্রেরণা ও পথের সন্ধান লাভ করেছিলেন, কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। হার্ৎস বিশ্বব্যাপী ঈথর তরঙ্গের মধ্যে যে সমগোত্রিয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তার প্রতিই জগদীশচন্দ্রের মৌলিক চিন্তাধারা আকৃষ্ট হয়। হার্ৎসের বিরাট বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এই গবেষণার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে যন্ত্রের উন্নতি ঘটিয়ে ক্ষুদ্র-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যসমন্বিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করেন। বিদ্যুতের অস্তিত্বজ্ঞাপক গ্রাহক যন্ত্রেরও তিনি যে উন্নতি সাধন করেছিলেন, তা সে যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্রাহক যন্ত্রসমূহের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা প্রকৃতির সত্যের উদ্ঘাটনই এই ভারতীয় ঋষিকল্প বিজ্ঞানীর আদর্শের মূলকেন্দ্র। জগদীশ-চরিত্রের মধ্যে একত্রিত হয়েছিল নির্লোভ প্রাচীন ভারতীয় প্রশান্তি এবং পশ্চিম জগতের বাস্তব কর্মদক্ষতা। হার্ৎস বিজ্ঞানের বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্র তার মধ্যে থেকে সত্য সন্ধানের দায়িত্বটুকুই কেবল গ্রহণ করে সুসম্পাদিত করেন। বিজ্ঞান প্রতিভাকে মূলধন করে অর্থ উপার্জনের চিন্তা তিনি কোনদিনই করেন নি; তাই হার্ৎসের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বাস্তব প্রয়োগে তিনি কোনদিনই মনোযোগী ছিলেন না।

ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানীর প্রতিভার সঙ্গে, বাস্তববোধ এবং অদম্য কর্মপ্রেরণার এক বিচিত্র সম্মেলন ঘটেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনি পাননি, তাঁর বিজ্ঞানের কোন উচ্চ ডিগ্রীও ছিল না। তিনি কেবল উপলব্ধি করে-ছিলেন, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতির সঙ্গে আলোক তরঙ্গের যদি সাদৃশ্য থাকে তাহলে আলোর মতন বিদ্যুৎ তরঙ্গই বা কেন বার্তা বহন করবে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মার্কনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের উপর গবেষণা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। এই বয়সেই অত্যন্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি হার্ৎসের বিদ্যুৎ তরঙ্গের সহায়তায় প্রায় এক মাইল দূরে সংকেত পাঠাতে সমর্থ হন। এই সময় প্রচলিত গ্রাহক যন্ত্রসমূহের বিচার ও বিশ্লেষণ করে তিনি যে উন্নত ধরনের গ্রাহক যন্ত্র নির্মাণ করেন তাই এক মাইল দূরে বেতার সংকেত গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্কনি ইতালী থেকে লণ্ডনে চলে এসে বিনা তারে বেতারবার্তা প্রেরণের প্রথম পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। এই পেটেণ্ট বর্তমান বেতার যুগের প্রতিষ্ঠা করল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মার্কনির পেটেণ্টকে মূলধন করে তার উন্নতি এবং বাস্তব প্রয়োগের জন্য লণ্ডনে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্কনি ৮৫ মাইল দূরবর্তী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক বেতার সংযোগ স্থাপন করেন।

জগদীশচন্দ্র এবং মার্কনি উভয়ের গবেষণার ধারাই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়েছিল, এবং বেতার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উভয়ের অবদানই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল সমানভাবে সসম্মানে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে একটা কথা বলবার আছে, জগদীশচন্দ্র বেতার সংকেত প্রেরণের পরীক্ষা সর্বপ্রথম ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দেখান, মোটামুটি যা জানা আছে তাতে দেখা যায় মার্কনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। সুতরাং জগদীশচন্দ্র যদি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পেটেণ্ট গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো বেতারবার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রাধিকার থাকতো।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা বোধ হয় এখানে অনুচিত হবে না। মার্কনি হার্ৎসের লম্বা বিরাট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমন্বিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ ব্যবহার করে বিনা তারে বার্তা

প্রেরণের ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র সৃষ্ট ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমন্বিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের শোষণ এবং ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য বেশী দূরে বেতার সংকেত পাঠানোর অনুপযোগী হলেও বর্তমান বিজ্ঞান জগতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব খুবই বেশী। আধুনিক কালে টেলিভিশন, রাডার প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে জগদীশচন্দ্র ব্যবহৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমন্বিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ এক বিশাল কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে এই ভারতীয় মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কারের মূল্য উপলব্ধি করছেন। পদার্থের আণবিক কাঠামোর চরিত্র নির্ণয়েও অল্প দৈর্ঘ্য সমন্বিত বিদ্যুৎ তরঙ্গের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কোহেরার (coherer) শ্রেণীর গ্রাহক যন্ত্রের উন্নতি বিধানেও জগদীশচন্দ্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মার্কনি যে কোহেরার শ্রেণীর গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, বিদ্যুৎ তরঙ্গের উপস্থিতি ঘোষণা করার পর তা কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। তাকে আবার বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রতি অনুভূতিসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হত টোকা মারার। জগদীশচন্দ্র পর্যবেক্ষণ মূলক পরীক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে নির্বাচিত ধাতু ব্যবহার করে স্বয়ং প্রত্যাবর্তনশীল কোহেরার জাতীয় গ্রাহক যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই গ্রাহক যন্ত্র বিদ্যুৎ অস্তিত্ব ঘোষণা করার পর নিজের থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ে ফিরে যেত। একে পুনরায় কার্যক্ষম করার জন্য কোন টোকা মারার প্রয়োজন হত না। জগদীশচন্দ্র গ্যালেনার সাহায্যে যে স্বয়ং প্রত্যাবর্তনশীল তড়িৎ নির্দেশক যন্ত্র প্রস্তুত করেন, তা কেবল বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রতিই নয়, যে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমন্বিত ইথার তরঙ্গের প্রতি অনুভূতিশীল। বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জন্য তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহে পেটেন্ট এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুত করার জন্য বহু লোভনীয় প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু কেবল অগ্রাধিকারের দাবী বিজ্ঞান ইতিহাসের বুকে জানিয়ে রাখবার জন্য তিনি তাঁর এই স্বয়ং প্রত্যাবর্তনশীল যন্ত্রটির পেটেন্টের জন্য ১৯০১ সালে মার্কিন সরকারের কাছে আবেদন করেন। ১৯০৪ সালে পেটেন্ট মঞ্জুর হল কিন্তু তা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের কোন চেষ্টাই তিনি করেননি।

বর্তমানকালে বিদ্যুৎ বিষয়ক শিল্পক্ষেত্রে সেমিকণ্ডাক্টারের (Semiconductor) ব্যবহারের গুরুত্ব অসাধারণ। সম্প্রতি আমেরিকার ইন্সিটিটিউট অফ রেডিও এঞ্জিনিয়ার্সের মুখপত্রে, সেমিকণ্ডাক্টার বিষয়ক গবেষণার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বেতার তরঙ্গের উপস্থিতি নির্ণয়কল্পে গ্যালেনার ব্যবহারের জন্য জগদীশচন্দ্রকে বেতার তরঙ্গ নির্দেশকরূপে সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবহারের পথিকৃৎ ব'লে স্বীকৃতি জানান হয়েছে।

বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিষয়ক গবেষণার পর জগদীশচন্দ্র ধীরে ধীরে জড় ও জীবের মধ্যে সাড়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন। পূর্ববর্তী গবেষণার সময়ই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কোন বাহ্য উত্তেজনার প্রভাবে জড় পদার্থ ও সজীব মাংসপেশী ঠিক একইভাবে সাড়া দেয়। আঘাত প্রাপ্ত মাংসপেশীর ক্ষেত্রে এই সাড়া, আকৃতি এবং বৈদ্যুতিক পরিবহন ক্ষমতার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করা যায়; কিন্তু জড় বস্তুর ক্ষেত্রে তা কেবল বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতার পরিবর্তন আনে। উত্তেজনার প্রভাবে জড় পদার্থের সাড়ার রেখাচিত্রে সংগে মাংসপেশীর সাড়ার বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা গেল। তখন সারা ভারতবর্ষে এমন একজনও কেউ ছিলেন না, যাঁর সংগে জগদীশচন্দ্র তাঁর এই নবতম আবিষ্কারের বিষয়ে সামান্য পরামর্শ অথবা আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। ফলে আর একবার বিদেশ যাত্রার প্রয়োজন দেখা দিল, সুযোগও মিলে গেল সংগে সংগে। ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত পদার্থ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক মহাসভায় তিনি বাংলা এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হলেন। সেই মহাসভায় জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের সাড়ার সাদৃশ্য বিষয়ে যে ভাষণ দান করেন তা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে অসাধারণ সমাদর লাভ করল। এই বিজ্ঞান মহাসভায় আলোচিত প্রবন্ধটির মাধ্যমেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবন্ত টিস্যু এবং অজৈব জড় পদার্থের উত্তেজনার প্রভাবে সাড়ার ঐক্য সর্বপ্রথম তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

সেই বিজ্ঞান মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে তা স্বামীজীর একটি পত্রের মধ্যে অমর হয়ে আছে। স্বামীজীর ভাষায়,—

"এ বৎসর প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহা প্রদর্শনী। নানা দিগদেশ সমাগত সজ্জন সংগম। দেশ দেশান্তরের মণীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করবেন আজ এই প্যারিসে। সে নাদতরঙ্গ সংগে সংগে তাহার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে





গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্যে হতে এক যুগ যশস্বী বীরবঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করিলেন—সে বীর জগৎ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার জে সি বোস। একা, যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুদবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎ-সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ-সঞ্চার করিল। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশবাবু, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর!'

এরপর পশ্চিম দেশেই জগদীশচন্দ্র কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর আরোগ্য লাভ করে ডেভী-ফ্যারাডে গবেষণাগারে গবেষণা শুরু করেন। এখানেই তিনি উত্তেজনার প্রভাবে জড় ও জীবের সাড়ার সাদৃশ্যের সঙ্গে উদ্ভিদের সাড়ার সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলেন। জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞানীর এই হস্তক্ষেপ ইংল্যাণ্ডের জীববিজ্ঞানীরা খুব প্রীতির চোখে দেখেননি, তাঁদের মনে নীরবে বিদ্বেষ সঞ্চিত হচ্ছিল। এই বিরূপ মনোভাব ১৯০১ খৃস্টাব্দের ৬ই জুন জগদীশচন্দ্র রয়েল সোসাইটিতে জড়, জীব ও উদ্ভিদের সাড়ার সাদৃশ্য বিষয়ক যে বক্তৃতা দেন, সেই সভায় নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করল। স্যার বার্ডন স্যানডারসন এবং ডক্টর ওয়ালার নামক ইংলণ্ডের দুজন শ্রেষ্ঠতম শারীর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের প্রতিপক্ষরূপে তাঁর শত্রুতা শুরু করলেন।

জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু বিখ্যাত শারীর বিজ্ঞানী ওয়ালার ও তাঁর অনুবর্তীরা বিশ্বাস করতেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। উভয়ের মতামত যাই হক না কেন, প্যারিসের পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক মহাসভার সময় থেকেই জগদীশচন্দ্র এবং ওয়ালারের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা পরস্পরকে প্রীতির চোখে দেখতেন, এবং পরস্পরের গবেষণার প্রতি উভয় বিশ্বাসীই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমন কি এক সময় ডাঃ ওয়ালার জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণাগার ছেড়ে দিয়ে এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করতেও চেয়েছিলেন।

যাই হোক, সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন তার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইতিপূর্বে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বৈঠকে এই একই বিষয়ে একটি আলোচনা করেন। সেই সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানী মহলে এবং ইংলণ্ডের পত্রপত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের আলোচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়। এরপর জগদীশচন্দ্র এই সভায় আলোচিত তথ্যাবলী রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাকারে পেশ করেন। সাধারণত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আলোচিত তথ্যাবলী রয়েল সোসাইটি প্রকাশ করতেন না, কিন্তু এইবার নিয়মের ঘটল ব্যতিক্রম। তাঁরা বললেন জীব ও জড় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক আবিষ্কারের কাহিনী রয়েল সোসাইটির এক সভায় আবার আলোচনা করতে হবে। শরীর বিজ্ঞানীরা যদি তাঁর গবেষণার ফলাফলের প্রতি বিরূপ না হন তাহলে রয়েল সোসাইটি তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশ করবেন।

সভার আয়োজন হল, জগদীশচন্দ্র তাঁর নিবন্ধ পেশ করলেন। সভার শেষে বিজ্ঞানী স্যার বার্ডন স্যানডারসন তাঁর গবেষণার প্রচেষ্টার প্রশংসা করে, লব্ধ ফলাফলের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালালেন। সোজাসুজি তিনি বললেন জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র অনধিকার চর্চা করেছেন। জীব ও জড়ের সাড়ার যে সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন তার মধ্যে কেবলমাত্র সামান্য বাহিক মিল আছে। প্রবন্ধের কোন কোন অংশকে স্যানডারসন অবিশ্বাস্য আখ্যা দিলেন। পরিশেষে এই বিজ্ঞানী, জগদীশচন্দ্রকে তাঁর প্রবন্ধের নামের পরিবর্তন, এবং তার সঙ্গে পরিবেশিত তথ্যাবলীর কিছু অংশ বাদ দিতে বললেন। জগদীশচন্দ্র সরাসরি শারীর বিজ্ঞানীদের এই মতামত উপেক্ষা করলেন। এতদিন জীব ও জড়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নি বলে, কোনদিনই দেখা যেতে পারে না এরূপ একটি অন্ধ এবং অবাস্তব ধারণা বিজ্ঞানী সুলভ মনোভাবের পরিচয় দেয় না, তাই জগদীশচন্দ্র আর এ বিষয়ে কোন বাদপ্রবাদে প্রবৃত্ত হলেন না। তাঁর প্রবন্ধ যদি প্রকাশ করতে হয় তাহলে কোন পরিবর্তন না করেই করতে হবে। জগদীশচন্দ্রের এই মনোভাবে স্যানডারসন, ওয়ালার প্রভৃতি শারীর বিজ্ঞানীরা তাঁর ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁদের বিরোধিতায় প্রবন্ধটি শেষ পর্যন্ত রয়েল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হল না।

এই সময় জগদীশচন্দ্র চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হলেন। কয়েকজন শারীর বিজ্ঞানীর শত্রুতায় তার সুনাম ক্ষুন্ন হতে বসেছে, এদিকে ছুটিও ফুরিয়ে এল। এবার তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে যেতে হবে। জগদীশচন্দ্র বিচলিত হয়ে উঠলেন,—কি করবেন তিনি? প্রত্যাখ্যাত

মতবাদের প্ল্যান মাথায় করে দেশে ফিরে গিয়ে অধ্যাপনা শুরু করবেন, না চাকরী ছেড়ে দিয়ে ইংল্যান্ডেই গবেষণা চালিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তার পরীক্ষণমূলক ফলাফলসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। আরও কিছুদিন ছুটি চাইলেই তিনি ছুটি পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ থেকে আগেই আশ্বাস বাণী পাঠিয়েছিলেন। টাকার জন্য চিন্তা নেই, তুমি তোমার গবেষণা সম্পূর্ণ করে মাতৃভূমির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত কর। বিভিন্ন পত্র মারফৎ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন,—

"যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট করো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সংকোচ করো না।"

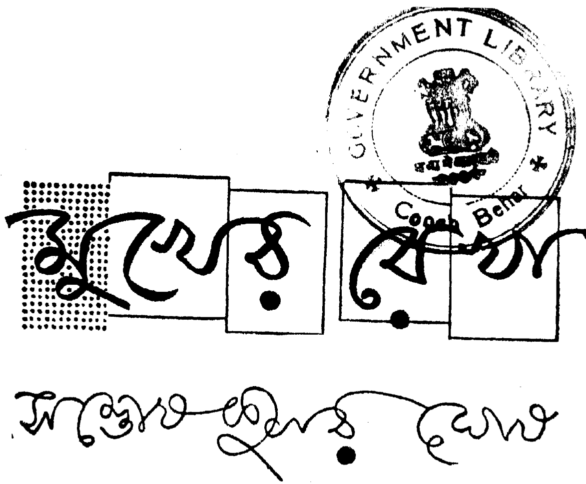
পরবর্তী পত্রে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছিলেন।—

"তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।"

জগদীশচন্দ্রের আবার কিছুদিন ছুটির আবেদন সরকার গ্রাহ্য করলেন না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাঁর ফার্লোর আবেদন মঞ্জুর হল এবং নতুন উদ্যমে তিনি রয়েল ইনস্টিটিউশনে গবেষণা শুরু করলেন। নিজস্ব বৈপ্লবিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হবার জন্য এইবার তাকে প্রস্তুত হতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগ হল উপস্থিত, ইংল্যান্ডের আর একটি বিজ্ঞান সংস্থা লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ভাইনস্ জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে লিনিয়ান সোসাইটিতে এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানালেন। এই সভায় তাঁর প্রতিপক্ষ শরীর বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। সভায় জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হলেন, যাতে যে কোন প্রতিপক্ষতার সম্মুখীন তিনি হতে পারেন। তিনি জানতেন মাতৃভূমির মর্যাদা এবং নিজের গবেষণার উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভের এই হল শেষ সুযোগ। যুদ্ধে জয়লাভ করতেই হবে।

এবার তিনি বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলেন। তাঁর অনুপ্রাণিত বক্তৃতা উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দের উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা লাভ করল। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞানীরা এই সভায় একটি প্রতিবাদও উপস্থিত করতে সাহসী হলেন না। জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধটি লিনিয়ান সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হল। এমন সময় লন্ডনের অন্য একটি জার্নালে ডাঃ ওয়ালার নিজের নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। দেখা গেল এই প্রবন্ধটি জগদীশচন্দ্রের রয়েল সোসাইটিতে পেশ করা প্রবন্ধের প্রায় হুবহু প্রতিলিপি। বহুদিন আগে রয়েল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে লিনিয়ান সোসাইটির সম্পাদক পরিচিত ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ও সৌজন্যে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হয় এবং জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কারের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। সত্যের উদ্ঘাটনে সহায়তা করার জন্য জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক ভাইনসের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী বিজ্ঞান প্রতিভা পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীব বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি সত্যানুসন্ধানের নানা ক্ষেত্রে পদার্পণ করে। বার্নার্ড শ জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গ্রন্থাবলী উপহার দেবার সময় লিখে দিয়েছিলেন,—"From the least to the greatest biologist"। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, তাই তাঁর কর্মজীবন প্রসঙ্গে সামান্য কিছু আলোচনা করা হল।




[ ৫ ]

**এ**র পরের কয়েকটা ছবি অস্পষ্ট মলিন। দু-একটা ছবি হয়ত নেই-ও। একটু ভুল হল। আছে নিশ্চয়ই কোথাও, আড়ালে, কোন কোণে চাপা পড়ে গিয়েছে, সৌরেশ দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে আমরা কত কিছুই ত পাই না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আছে। দেখতে না পাওয়ার একটা কারণ, নজর পৌঁছয় না। বহু আলোক-বর্ষের পারের তারা দেখি না। আহ্নিক-গতিহীন গ্রহ বা উপগ্রহের অপর পিঠও অজানা থেকেই যায়। এমন কি, কাছের পাহাড়টারও ওই দিকে কী, আমরা ক'জন জানি! আর দেখা জিনিসটা নির্ভর করে যে দেখবে সে কোথায় দাঁড়িয়েছে তার উপরে। ছাদে দাঁড়িয়ে যতটা দেখব, মাটিতে দাঁড়িয়ে ততটা দেখব না, নদীর বাঁকে বসে দূরের নৌকোর শুধু পালই দেখতে পাব।

যার কপালের ডান ধারে কাটা দাগ, আর চুলও পাতলা হয়ে এসেছে তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে চাইলে মনে হবে লোকটা ক্রূর এবং প্রৌঢ়, আবার ওদিকে গিয়ে হয়ত দেখব সে তরুণ, তার চিবুকের ভঙ্গিটি মধুর। পিছন থেকে যার গ্রীবা আর কবরী মুগ্ধ করেছে, সামনে গিয়ে দেখেছি সে শ্রীহীনা, কুদর্শনা।

আবার খালি চোখ যতদূরে পৌঁছয়, রঞ্জনরশ্মি যায় তার ঢের গভীরে, কিন্তু কাঠের সিন্দুকটার ভিতরে কী আছে সেও জানে না। মন বুঝি কিছুটা রঞ্জনরশ্মির গুণ পেয়েছে, তাই চোখ যা দেখে, মন দেখে তার অনেক বেশি। এক মন দিয়ে আমরা অন্য মনের তলায় পৌঁছে যাই। একে যারে তলায়? বোধ হয় না। দৃষ্ট জগৎ থেকে অদৃষ্ট জগৎ বড়। অদৃষ্টের বাইরে আছে অভাবনীয়। ভাবনার বেড়ে সেই বিরাট ধরা দেয় না।

সারা সকাল যে ঘরের কর্ত্রী, বাজারের পয়সা বুঝে নেবার সময়ে বিষয়ী, রান্নাঘরে নিপুণা পাচিকা, বিকালে সেই পাট-ভাঙা **একটা শাড়ি** আর কপালে একটি টিপ পরে অপরূপা হয়ে ওঠে। ঠিকে ঝি একদিন কামাই করলে যে রোজ হিসাবে ছ' পয়সা মাইনে কাটে, ভাল একটা ছবি দেখে বেরিয়ে এসে সেই হঠাৎ-খুশির ঝোঁকে ভিখারিকে দু-আনা দিয়ে বা দিতে চেয়ে, মহীয়সী হয়ে যায়। তাই বলে কাল দেবে না। পোষা সাপ ফণা আর কতবার তোলে! বেশির ভাগ সময় ত ঝাঁপির ভিতরে নেতিয়েই থাকে। দিনের মোহিনীকে রাতের বাঘিনী হতে, সকলেই ত দেখেছেন।

অতএব দেখা গেল, আত্মসমাহিত সৌরেশ আপনাকেই বললেন, কোথায় দাঁড়িয়ে দেখব সেটার গুরুত্ব যত, কখন দেখব, তার গুরুত্বও ততটাই।

কিন্তু সেই ছবিগুলো? যাদের সৌরেশ এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন না? তারাও আছে। রঙ ধুয়ে গিয়েছে, আলো মুছেছে, তবু আছে, কণা হয়ে, ধুলো হয়ে, ইন্দ্রিয়ের এমন কি স্মৃতির অগোচর হয়ে। আরও সূক্ষ্ম হয় যদি, মাত্র স্পন্দন বা তরঙ্গে পরিণত হয়, তখনও থাকবে।

লিলিদিকে একদিন কাঁদতে দেখেছিল টুলু, একদিন হাসতে। দুটো ছবিই মনে আছে।

ছবি ঠিক নয়, আসলে চলচ্চিত্র। ফুটবল খেলা দেখে ফেরবার পথে হাসপাতালের সম্মুখে একদিন থমকে দাঁড়ালেন মোহিত-দা।

"এই পাশের কোয়ার্টারটাই ত লিলিদের, না? একবার দেখা করে যাই। তোকে ত ও তিন-চার দিন পড়াতে আসেনি। কেন, একবার জেনে যাবি না?"

কোয়ার্টারের সামনে কেয়ারি করা একটা বাগান ছিল, মোহিতদা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, টুলু ভিতরে খবর দিতে গেল। সৌরেশ এতদিন পরেও রোগা সেই ছেলেটিকে ফটক ঠেলে তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছুটতে দেখলেন।

সে বেশি দূর যেতে পারল না, দু' ধাপ সিঁড়ির **পরেই** খোলা বড় বারান্দা, সেখানেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। বাঁ-ধারের ঘরটাই লিলিদির, টুলু জানত, কিন্তু দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ, না বাইরের ছিটকিনি লাগান, আলো নেই বলে সে ঠিক ধরতে পারল না। হয়ত এগিয়ে যেত, হয়ত টোকা দিত, কিংবা বাইরে থেকেই ঠেলে বা টেনে দেখত একবার, কিন্তু তখনই ডান ধারের ঘরে কারা জোর গলায় কথা বলছে, শুনতে পেল।

সেই ঘরের দরজা ভেজান নয়, ভারী পর্দাটা না থাকলে টুলু ভিতরটাও দেখতে পেত।

ভিতরে চেঁচামেচি, তাই টোকাতে না পেরে, অথবা ভয় পেয়ে খানিকটা আলো পর্দার নিচে দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে পালিয়ে এসেছে! দেবদারু গাছটার ছায়ার সঙ্গে বারান্দাটা দখল করেছে ভাগাভাগি করে।

কিন্তু ভিতরে কারা কথা বলছে! কয়েক সেকেন্ড কান পেতেই টুলু বুঝেছিল, কথা ত বলছে না, ওরা ঝগড়া করছে। ঝগড়া কাকে বলে টুলু জেনেছিল। লোকে যখন চটে যায়, রাগ করে, তখন কথা আর

কথা থাকে না, ঝগড়া নামে একটা বিশ্রী চেঁচামেচি হয়ে যায়। নিজেদের বাড়িতে কোনদিন ঝগড়া হতে টুলু দেখেনি, কিন্তু রাস্তায় বা খেলার মাঠে অনেকবার নমুনা দেখেছে।

টুলু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দুটি গলার একটিকে সে চিনতে পারছিল— লিলিদির মার। মোটাসোটা, ময়লা এই লেডি ডাক্তারকে টুলু বরাবরই ভয় পেয়েছে, একবার দু'বার ওদের বাসাতেও এসেছিলেন, পিসিমার সঙ্গে কথা বলেছেন। সে গলা মোটেই মেয়েলি নয়, মানে পিসিমার মত নয়। কেমন যেন ধরা-ধরা, রাগী-রাগী, একটু যেন অহংকারীও।

আজ কিন্তু লিলিদির মার গলার গাম্ভীর্যটুকু নেই। মনে হল, তিনি ভয় পেয়েছেন। প্রাণপণে চিৎকার করছেন বটে, আমরা ভয় পেলে, হঠাৎ ভূত দেখলে বা সাপ দেখলে যেমন চেঁচিয়ে উঠি। এ চিৎকারে জোর নেই, সাহস নেই!

আরেকটি গলা, সে-গলা পুরুষের, জোর তারই বেশি। অমন যে রাশভারি ডাক্তারনি, লোকটা ধমক দিয়ে মাঝে মাঝে তাকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর গাঢ়, দুধ কলা মাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলে কথা বলতে গেলে টুলুর গলাও ওই রকম হয়ে যায়। বেশি চড়ছে না, তবু তার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটা গমগম করে উঠছে!

তখনও নয়, আরেকটু বড় হয়ে টুলু লোকের গলা শুনেই মনে মনে তার ছবি আঁকতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ছবিগুলো সব সময়েই যে ঠিক হত তা নয়, তবে প্রায়ই আসলের ধার ঘেঁষে চলে যেত। মজা পেত টুলু, এমন কি যখন সে সৌরেশ হয়েছে, তখনও মজা পেয়েছে। এই খেলাতে নেশার আকর্ষণও পেয়েছে।

কিন্তু সেদিন, কার্তিকের বিরস জবর-জবর সন্ধ্যায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে টুলু লোকটার মুখের আভাসটুকুও মনে আনতে পারেনি। এমন ভারী গলা যার, সে যে নিশ্চয়ই খুব লম্বা-চওড়া হবে, তার কব্জি আর বুক নিশ্চয়ই খুব ঘন আর কালো লোমে ঢাকা, এইটুকু মাত্র আন্দাজ করতে পেরেছিল। কিন্তু লোকটার গায়ের রঙ কালো কি না, নাকটা কতখানি থ্যাবড়া, মাথাটা কি ধড়ের উপরেই বসান, নাকি ঘাড় নামে বিঘত প্রমাণ একটা যোজক আছে, মাথার চুল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া নাকি শৌখীন কেতায় ছাঁটা—এসব কিছু সে অনুমান করতে পারেনি। তবু বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে মনে মনে সেও ভয় পেয়েছিল লোকটাকে; কড়া লেডি ডাক্তারকে যে শুধু গলাবাজী করে জব্দ করেছে, টুলুকে সে ত তুড়ি মেরে হাওয়া করে দিতে পারে। টুলু ভয়ে কাঁপছিল, দেবদারু গাছটার

ছায়ার দিকে এক-পা দু-পা করে পিছিয়ে আসছিল।

লোকটা বলছিল, "আমাকে টাকা দেবে না তুমি?"

"বলেছি ত, টাকা নেই।"

"মিথ্যেবাদী।"

"বিশ্রী গালাগাল দেবে না, খবর্দার। টাকা থাকলেই বা তোমাকে দেব কেন?"

"দাম দেবে।"

"দাম—কিসের?"

"আমার পদবী যে ব্যবহার করতে পারছ, তার দাম। ভাড়াও বলতে পার। বেশি না ত, বছরে মাত্র এক হাজার টাকা।"

"এত?"

লোকটা জোর দিয়ে বলল, "হাঁ, এত। বরং সস্তাতেই পাচ্ছ বলতে পার। আমি তোমার স্বামী, প্রমাণ এখনও আমার পকেটে আছে, কোর্টেও তার নকল থাকতে পারে, কিন্তু সেই অধিকারে বেশি কিছু দাবী ত করিনি, অন্য কোন অধিকার খাটানর লোভই আমার নেই, ওই ত তোমার শরীর, আর বয়সে ত তুমি বুড়ি।"

"ছোটলোক!"

টুলু সব দেখেনি, বোঝেনি, সব তার মনেও ছিল না, কিন্তু সৌরেশ আজ দিব্য-দৃষ্টি পেয়েছেন, বিস্মৃতির অতল থেকে সব কথা বুদ্বুদের মত ভেসে উঠছে। টুলু অবোধ ছিল, অন্ধও, কিন্তু সৌরেশ তা নন, এখন নন, তাই স্পষ্ট দেখতে পেলেন, লোকটা একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্রুদ্ধ মহিলার মুখে অনায়াসে ধোঁয়া ছাড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে গেল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমার পদবীর মাশুলটা চুকিয়ে দাও। নইলে—"

"নইলে কী?"

"নইলে পদবীটা ফিরিয়ে নেব।"

"কী করে।"

"খুব সোজা রাস্তা। হাসপাতালের কর্মীটি জানবেন, যাকে তাঁরা মিসেস লাহিড়ি বলে জানেন, সে গৃহে-পদবীধারী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, বসবাসও করেছিল বছরখানেক এক সঙ্গে। তারপর গৃহে যখন নেশা শেষ হতে ওকে ফেলে পালাল, তখন সে লাহিড়ি নামে লোকটার পায়ে উপুড় হয়ে কেঁদে বলল—"

"ইস! একেবারে পায়ে?"

"আজ তোমার মনে নেই, সেদিন পায়েই ধরেছিলে। আমার পদবী ভিক্ষা চেয়েছিলে। কারণ—থাক, সে কারণটা না হয় লিলিকেই বলব।"

"কী বলবে তুমি লিলিকে?"

"বলব যে, আমার পদবী ধার দেবার উদারতা দেখিয়ে সেদিন শুধু তার মার সম্মান বাঁচাইনি, তাকেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর পরিচয় দিয়েছি। লিলি লাহিড়ি আসলে লিলি গুহ।"

"অসভ্য, ইতর!" টুলু তীক্ষ্ণ-তীব্র স্বর শুনে চমকে উঠেছিল, দেখতে পায়নি, কিন্তু সৌরেশ দেখতেও পেলেন। ক্ষোভে, রোষে ঘৃণায় লিলিদির মা ফুঁসছিলেন। জলভরা একটা গ্লাস ছিল, সেটাকে হাতে তুলে নিলেন। এক মুহূর্ত শুধু—যেন ইতস্তত করলেন। রুদ্ধশ্বাসে সৌরেশ অপেক্ষা করে আছেন, গ্লাসটা লোকটার মাথায় পড়ল বলে, তারপর টুকরো টুকরো কাচ হয়ে মাটিতে পড়বে ছড়িয়ে, জলে রক্তে ঘরটার মেঝে ভেসে যাবে।

ঠিক এক মুহূর্ত কাটল, তারপর, কোথায় তাক করবেন, লোকটার কপাল না চোখ না নাক, সেটা যেন স্থির করতে না পেরেই লিলিদির মা ঢকঢক করে সবটুকু খেয়ে ফেললেন।

জল খেয়ে সুস্থির হয়ে, গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "বেশ, তুমি দাঁড়াও। লিলিকে ডেকে আনছি। ব্যাকোফুরিটা একেবারে শেষ হয়ে যাক।"

তখনই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, লোকটা যেন বিরত হয়ে হঠাৎ সবে-ধরান দ্বিতীয় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল। তাড়াতাড়ি বলল, "আজ থাক। আজ না। কাল সকালে আমি আবার আসব।"

লোকটা সত্যিই বুঝি চলেই আসছিল,

লিলিদির মা ঢকঢক করে সবটুকু জল খেয়ে ঘাড়ের পিছনে দু হাত নিয়ে খুলে ফেললেন গলার হার, সেটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "নিয়ে যাও এটা। কাল সকালে এস না। আর কোনদিন এস না। আমাকে একটু শান্তি দাও।"

লোকটা হেসে উঠল নির্লজ্জের মত। লোভ নামে তৃতীয় রিপু, ওর দ্বিতীয় রিপুকে নিমেষে বশ করেছে। —"শান্তি? বেশ, নাও। একদিন শুধু পদবী চেয়েছিলে, আজ আবার শান্তিও চাইছ? বেশ, তোমাকে ওটা উপরি দিলাম।"

সৌরেশ দেখলেন, টুলুও দেখতে পেয়েছিল, লোকটা বারান্দায় এল, দাঁড়াল কি দাঁড়াল না, বোধ হয় সিঁড়িটা ঠাহর করল, তারপর রাস্তায় নেমে গেল। টুলু যেমন ভেবেছিল, রোমশ পরুষ চেহারা, কই আদৌ দেখতে তেমন নয় ত। লম্বা, রোগা গালের-হাড়-বের-করা চেহারা, এই লোকটারই গলায় অত জোর ছিল?

টুলু দেখেছিল, লোকটার হাতে হারটা আধো-অন্ধকারেও চকচক করছে। আড়ালে যা ঘটল, সেটার প্রকৃত তাৎপর্যটুকু বুঝতে পারেনি, তবু টের পেয়েছিল, হারটা হাতছাড়া না করে লিলিদির মার সেদিন উপায় ছিল না।

যদি সৌরেশের মত অভিজ্ঞ চোখ থাকত তার, তবে টুলু সেদিনই টের পেত, লিলিদির মা কী ভুল করেছেন। যদি সাহস করে সেদিন লিলিদিকে ডেকে আনতেন, দাঁড় করিয়ে দিতেন লোকটার মুখোমুখি, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটাই বদলে যেত। লোকটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। পথ পেত না ঘর থেকে মাথা নিচু করে পালিয়ে যেতে। রহস্য ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে যারা টাকা আদায় করে, রহস্য শেষ পর্যন্ত ফাঁস তারা প্রাণ গেলেও করে না, কেননা ওই রহস্যটুকুই ত তাদের ব্যবসার একমাত্র পুঁজি, একবার হাতছাড়া হলে পরে আর ভয় দেখাবে কী দিয়ে। গোপন কথাটি বলে দেবে বলে মুখে যতই বড়াই করুক, আসলে তাকে যখের ধনের মতই বুকে দিয়ে আগলে রাখে।

এই তথ্যটি যদি জানা থাকত লিলিদির মার, তিনি মরবার জন্যে যদি তৈরি করতে পারতেন নিজেকে, হয়ত চিরদিনের মত বেঁচে যেতেন।

লোকটা যখন বেরিয়ে এল, টুলু তখন অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে ছিল। তখন তার খেয়াল হল, এবার তাকেও যেতে হবে। আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন মোহিতদা?

পা টিপে টিপে চলে আসবে, টুলু তখনই লিলিদিকে দেখতে পেল।

এ পাশের ঘরের দরজা হঠাৎ বুঝি একটুখানি খুলে গিয়েছে—টুলু দেখল লিলিদি বিছানায় শুয়ে আছেন। দু' হাতে চোখ ঢাকা, মনে হল, কাঁদছেন।

অন্য দিন লিলিদির শাড়ির রঙ থেকে সাজের ঘটা টুলুর মনে বিতৃষ্ণা এনে দেয়, আজ সেসব কিছু হল না, কিংবা লিলিদি আজ হয়ত সাজগোজই করেননি, শাদা ব্লাউজের ওপরে সাদাসিদে একটা শাড়ি পরে আছেন। একটুও টুলুর তখন লক্ষ্য করবার কথা নয়, কেননা লিলিদি কাঁদছিলেন। টুলু বিচলিত হয়েছিল। কাছে যেতে সাহস হয়নি, তাহলে ধরা পড়ে যাবে, বিমূঢ় বিহ্বল টুলু চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান্নাটার কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করেছিল।

এমন হতে পারে, একটু আগে পাশের ঘরে যে ঘটনা ঘটে গেল, তার সঙ্গে এই কান্নার কোন যোগ আছে। হয়ত লিলিদিও সব শুনেছেন আড়াল থেকে, হয়ত কিছুটা দেখেছেন। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না, টুলু ঠিক করল, মানেটা সে মোহিতদার কাছে জেনে নেবে।

মোহিতদাকে সব বলেছিল টুলু। সব মানে, যতটা সে দেখেছিল, যতটা মনে রাখতে পেরেছিল ততটা। অনেকটাই সেদিন তলিয়ে গিয়েছিল কি না, সে সব ভেসে উঠেছে পরে, অনেক অনেক বছর কেটে গেলে।

মোহিতদা চুপ করে শুনলেন, শোনার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে আস্তে আস্তে বললেন, "সব বুঝলাম। টুলু, তুই কাল ভোরে লিলিকে একবার ডেকে আনতে পারবি?"

টুলু বলল পারবে, এদিকে সে মরে যাচ্ছিল। মোহিতদা সব বুঝেছেন, সে কিছুই বোঝেনি, অথচ বুঝতে চায়।

ঔৎসুক্য ত খুব বেশি নয় টুলুর, সে জানতে চায় না দিন ফুরিয়ে কেন রাত হয়, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে কেন, গাছের পাতা কেন সবুজ! এসব শক্ত, জটিল জিজ্ঞাসা দিয়ে মোহিতদাকে সেদিন সে বিরক্ত বা বিব্রত করেনি। আস্তে, খুব ভয়ে ভয়ে বলেছে, "কিন্তু লিলিদি কাঁদছিল কেন, মোহিতদা?"

ঠিক ততটাই আস্তে মোহিতদা ওকে বলেছেন, "কাঁদে। না থাকতে পেরে মানুষ অনেক সময়ে এ রকম কাঁদে। বেঁচে থাকার সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে, টুলু তুই তা এখন বুঝবি না।"

একেবারে বোঝেনি তা নয়, টুলু সেদিনই বুঝেছে, অস্পষ্টভাবে। পরদিন লিলিদির হাসিটাও তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেনি।

খুব সকালেই সে ও বাসায় গিয়েছিল।

আড়ালে ডেকে লিলিদির হাতে যখন মোহিতদার চিঠি দিল, লিলিদি একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, "বেশ, যাব। তুমি একটু দাঁড়াও।"

লিলিদি সেই প্রথম টুলুকে তুমি বলল।

লিলিদির একটু দেরি হচ্ছিল। টুলু অধৈর্য হয়ে একবার ওর ঘরের দরজা ঠেলল, ঠেলেই বুঝল কাজটা ঠিক হয়নি। লিলিদির তখনও সাজগোজ পুরো হয়নি। মুখে পাউডার মেখেছেন, আবার আলগোছে আঁচলটা দিয়ে মুখটা মুছেও ফেলছেন।

চিরদিনের মত মেয়েদের প্রসাধন-প্রিয়তা সম্পর্কে একটা ধারণা টুলুর মনে আঁকা হয়ে গেল: মেয়েরা সাজতে যতটা ভালবাসে, সেজেছে যে, সেটা লুকিয়ে রাখতেও ততটাই ভালবাসে।

পিসিমা রান্নাঘরে, টুলুও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল, মোহিতদা লিলিদির সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ খানিক পরে একবার ভিতরে যেতে হয়েছিল টুলুকে, কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। লিলিদির হাত মোহিতদার হাতের মুঠিতে, লিলিদির মাথা মোহিতদার কাঁধে। চোখ দুটি খোলা না বোজা টুলু দেখার সময় পায়নি, কিন্তু লিলিদি হাসছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল টুলু। ওই হাসিটা বেঁচে থাকার সুখের প্রকাশ কি না, সেটা মোহিতদাকে জেরা করে আর জেনে নিতে হয়নি।

সেদিন ততটা ভাল লাগেনি, অস্বস্তি হয়েছে, অস্বাভাবিক লেগেছে, পরে কিন্তু

টুলুর মন থেকে বিরাগের ভাবটা একেবারে উবে গিয়েছিল।

মোহিতদা অবশ্য লিলিদিকে বিয়ে করেননি, টুলু যতটা জানে, কয়েকটা চিঠি লেখালেখিতেই সম্পর্কটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, মোহিতদা আর ফেরেননি, লিলিদি অন্তর্ঘটিত কী একটা ঘায়ে ভুগে ভুগে কাঠিসার হয়ে শেষ অবধি খিটখিটে হয়েছিলেন এবং চিরকুমারী থেকে গিয়েছিলেন। তবু বয়স হবার পর টুলু দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। মনে মনে কতবার বলেছে, "মোহিতদা, আমাকে বেঁচে থাকার স্বাদ তুমিই প্রথম দিয়েছ, ঘুরিয়েছ মাঠে মাঠে, টেনে নিয়ে গিয়েছ বিলের ধারে, জলে সাঁতার দেবার সাহস জুগিয়েছ। তাই ত আমি শুধু তবু বাঁচতে চাইলাম, নইলে শুধু মরে যাবার ইচ্ছে নিয়েই আমি কবে মরে যেতাম। আর লিলিদি, তোমার হাসি আর কান্না দেখে প্রথম জেনেছি, বেঁচে থাকার সুখ আর দুঃখ কী। জেনেছি, জীবন যদি ফুল হয় তার পাপড়ি আর কাঁটা দুইই আছে। পাপড়ির ছোঁয়ায় রোমাঞ্চ পাই, কাঁটা ফুটলে লাগে।

"তবে সেদিন যা জানিনি, যা জানতে আমার আরও অনেক বছর লেগেছে, সেটা এই যে, সব সুখেরই ক্ষয় আছে, সব দুঃখেরও লয়। তাই পরে আর কোন পাওয়া বা হারান নিয়ে খুব বেশী বিচলিত হয়ে পড়িনি।"

লিলিদির মা আর তাঁর স্বামীকেও টুলু বহুদিন ভোলেনি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যে ফাঁকিও হয়, আর সেই ফাঁকিটা দু জনের কাছে জানাজানি গেলে কী বিশ্রী একটা ঠাট্টা হয়ে ওঠে, সেই একটি সন্ধ্যাতেই, এবং সেই প্রথম, সে আভাসে বুঝেছিল।

এরই কিছু দিনের মধ্যে টুলু দুটি স্বপ্ন দেখে। প্রথমটি এই সন্ধ্যা হয়-হয়, সব ছেলে বাড়ি ফিরে গিয়েছে, কিন্তু রোগা আর নিরীহ একটি ছেলে খেলার মাঠের এক ধারে একটা পাথরে তখনও বসে আছে। একটা তিন-পরত কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধা, কানামাছি খেলায় যেমন থাকে। সেই অন্ধকারেই চুপে চুপে পা ফেলে তার পিছনে এসে দাঁড়াল আরেক জন, স্বপ্নেই টুলুর গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নতুন ছেলেটা চিমটি কাটল প্রথম ছেলেটার উরুতে। চমকে, ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, একমাত্র মৃত্যু-ভয়েই মানুষ অমন আর্ত-স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু চোখ বাঁধা, কিছুই তার ঠাহর হল না, অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে সে যেন আশ্রয়, আত্মরক্ষার উপায় খুঁজল। ততক্ষণে, দ্বিতীয় ছেলেটি তার টুঁটিটি টিপে ধরেছে। শুরু হল ধস্তাধস্তি, কিন্তু প্রথম ছেলেটি রোগা, দ্বিতীয়টি তার চেয়ে মাথায় অনেক ঢ্যাঙা, তার সঙ্গে যুঝে পারবে কেন? একটু পরেই সে হাঁপিয়ে পড়ল।

টুলু দেখছিল। কী করে বা কোথা থেকে, সে নিজেও টের পাচ্ছিল না, কিন্তু দেখছিল। চোখবাঁধা ছেলেটির মুখ ক্ষত-বিক্ষত, দরদর ধারায় রক্ত নেমেছে, টুলু আর স্থির থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'আমি তোমাকে বাঁচাব' কিন্তু ছুটে যেতে পারল কই। কেউ কি যাদুবলে তার দুটো হাঁটুই এমন অবশ করে দিয়েছে যে, টুলুর এক-পা নড়বার সাধ্য নেই? ছেলেটি পাথরে পড়ে গিয়ে গোঙাতে শুরু করেছে, দ্বিতীয় জন তখন হঠাৎ এক হেঁচকা টানে তার চোখের বাঁধনটা খুলে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। তার গলা বিশ্রী, কর্কশ, ভাঙা-ভাঙা। টুলু শুনল। টুলু তাকে দেখতে পাচ্ছে—বেশী বয়স নয়, কিন্তু গাল ভাঙা, মুখের নানা জায়গায় কালচে দাগ শুকন ব্রণের। প্রথম ছেলেটি আর উঠল না, যে-কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার চোখ বাঁধা ছিল, সেটা পাশেই পড়ে আছে, সেও পড়েই রইল, আর তার শত্রু হো হো করে হাসতেই থাকল।

দ্বিতীয় স্বপ্নটা এই: নদীর ধারে একটি ছেলে বসে ছিল, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল জলে। পড়ল আর ডুবল, গলায় পাকে পাকে ফাঁস জড়িয়ে গেল, কত জল যে পেটে গেল, ঠিক নেই। টুলু ওর যন্ত্রণা নিজেই অনুভব করল, ও মরছে, টুলু নিশ্চিত জানল।

একটু পরেই, খানিকটা ভাটিতে যে মাথা তুলল, সে আরেক জন। তার চোখ লালচে, ঠোঁটের উপরে ঈষৎ গোঁফের রেখা। দু হাতে জল কেটে কেটে সে আরও ভাটির দিকে এগিয়ে গেল, টুলু তাকে আর দেখতে পেল না। প্রথম ছেলেটির কী হল, তাও জানল না।

এই দুটি স্বপ্নই একদিন দুর্বোধ ছিল। পরে সৌরেশ দুটিরই অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সে-ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত হক বা না হক, দুটিই তাঁর নিজের কাছে সম্পূর্ণ সংগত বোধ হয়েছিল।

"আমি জানি" সৌরেশ স্বগত বলেছেন, "যে-ছেলেটি রক্তাক্ত হল, পাথরে পড়ে গিয়ে গোঙাতে গোঙাতে চিরদিনের মত চুপ করল, সে আমি। তাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছিল যে, সেও আমি। আর ওই কাপড়ের টুকরোটা, ওটা বোধ হয় আমার অবোধ অনভিজ্ঞতার প্রতীক—বরাবরের জন্য ঘুচে গেল।

"পরাভূত ছেলেটির করুণ বোবা চোখের ভাষা আমি পড়তে পেরেছিলাম। সে বলছিল, 'আমি তোমার নিষ্পাপ, শুদ্ধ, শৈশব-সত্তা। আমাকে তুমি মারলে, হারালে। আর কোনদিন ফিরে পাবে না।' তার শোকে আমিই তখন কাঁদলাম।"

আর সেই দ্বিতীয় স্বপ্নটা। তারও একটা মানে আছে বই কি। ওই নদীটা হল সময়ের স্রোত। সময়ই অতলে টেনে নিল টুলুকে, তার বদলে, কিংবা তাকেই বদলে, খানিক দূরের ভাটিতে ফিরিয়ে দিল অন্য জনকে। যদি ওই স্রোত আর সময় না থাকত, তবে টুলু ডুবত না, মরত না, যেমন ছিল তেমনই থাকত, জন্মই হত না এই সৌরেশের।

তা হলে এই স্তব্ধ মধ্যরাতে একটি শিশুর জন্মের জন্য অনিদ্র অপেক্ষার প্রহরে, একটি জীবন আসলে অনেকগুলি জন্ম আর মৃত্যুর সমষ্টি কিনা, নীল-নিশ্চল আকাশের পটে এই মৃত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে মরত কে।

কেউ না। সময় নেই ত স্রোত নেই। আর স্রোত যদি নেই, তবে নদীতে দীঘিতে তফাত কী। কালস্রোতে কেবল কি জীবন-যৌবন-ধন-মান?—চরাচর বিশ্বই ত ভাসছে। কাল যদি না চলত, গাছের পাতা পড়ত না, আবার নতুন পাতাও দেখা দিত না, অথবা একটিও ভীরু কুঁড়ি। তখন না থাকত দিন না রাত্রি, ঋতুর মিছিল আর বর্ষ-চক্র, সব স্তব্ধ। দূরত্বের জ্ঞানও লুপ্ত হত, কেননা আমাদের স্থানজ্ঞান কালনির্ভর, কত দূরে বলতে আমরা কতক্ষণে পৌঁছন যাবে, তাই বুঝি। জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু—কিছু থাকত না। সেই চির-স্তব্ধতা একটা অসহনীয় বিকারে পরিণত হত।

হত, হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কারণ সময় থামেনি, কখনও থামে না, থামতে জানেই না। সবকিছু ভেঙেচুরে, ধুয়ে মুছে, বদলে, সে চলে, কেবল চলেই। (ক্রমশ)

# যুবক যাত্রী, বৃদ্ধ বাহন

**তেসোর বার্তো**

মাস দুই আগে ইতালির দুই সাহসী যুবক একদিন ভাঙা পুরনো একখানা গাড়ি নিয়ে প্রাচ্য জগতের পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন। নানা দেশের নানা দুর্গম গিরি-কান্তার মরু পার হয়ে সম্প্রতি তাঁরা কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। দুজনের মধ্যে একজন সাংবাদিক, অন্যজন আলোকচিত্রী। সাংবাদিক তেসোর বার্তো তাঁর এই কাহিনীতে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধটি বিশেষভাবে "দেশ" পত্রিকার জন্য লিখিত। —সম্পাদক 'দেশ'

মাস ছয়েক আগের কথা। সেদিন রাত্রে আমরা সবাই টিউরিনের এক ক্লাবে এসে জমায়েত হয়েছি। ক্লাবের নাম ওল্ড কার ক্লাব। আমরা তার সদস্য। সদস্যদের মধ্যে কে কবে পুরনো লঝ্ঝড় মোটরগাড়িতে কতদূরে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাই নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। সেই আলোচনার মধ্যেই হঠাৎ কে একজন বলে উঠল, "শুধু দূরপাল্লায় পাড়ি জমালেই হবে না, একটা শক্ত পথে পাড়ি জমাতে হবে।" একটা নতুন কিছু না করলে আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপায় নেই।"

সেই হল আমাদের স্বপ্নের সূত্রপাত। কিন্তু সেই সঙ্গে কয়েকটা সমস্যাও দেখা দিল। কোথায় যাব আমরা? যাবার জন্য কিছু অর্থ দরকার। কে সেই অর্থ জোগাবে? ঠিক করলাম ইতালি থেকে রওনা হয়ে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের পথে আমরা পাড়ি জমাব। যাব লঝ্ঝড় একটা পুরনো গাড়িতে। সামান্য একটু মেরামত মাত্র করে নেওয়া হবে, তার বেশী কিছু নয়।

দিন কয়েকের মধ্যেই পুরনো একটা ফিয়াট গাড়ি জোগাড় হয়ে গেল। ১৯৩০ সনের মডেল। "ফিয়াট ১৯০০"র বিভিন্ন মডেলের মধ্যে এইটিই হল সবচাইতে পুরনো। তারপর শুরু হল অর্থ-সংগ্রহের উদ্যম। কিন্তু দেখেশুনে বোঝা গেল যে, এমন একটা আপাত-অসম্ভব কাজের পিছনে অর্থ ঢালতে কেউ রাজী নয়। এমন কি ফিয়াট কোম্পানিও তখন আমাদের বিশেষ উৎসাহ দেননি। বরং এই পাগলামি থেকে যাতে আমরা নিবৃত্ত হই, তারই জন্যে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন।

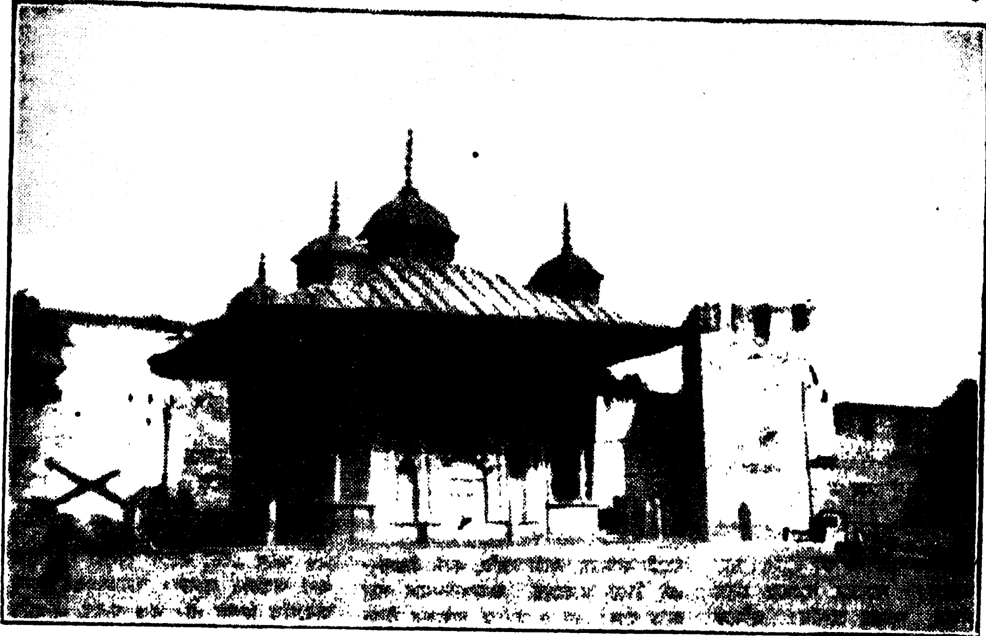
যাই হক, শেষ পর্যন্ত কেউই আমাদের টলাতে পারেনি। ঠিক হল, আমি আর আমার এক বন্ধু, এই দুজনে মিলে রওনা হব। আমি সাংবাদিক, আমার বন্ধু ফোটোগ্রাফার। দুজনে মিলে প্রতি রাত্রে এক মোটর-মেকানিকের দোকানে গিয়ে মেরামতির পাঠ নিতে শুরু করলাম। মেরামতির ব্যাপারে আমি নেহাত আনাড়ি। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই আমার মোটামুটি হাতেখড়ি হয়ে গেল।

আজ থেকে মাস আড়াই আগে আমরা টিউরিন থেকে রওনা হই। বন্ধুবান্ধবদের ধারণা ততদিনে খানিকটা পালটেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশের মনেই তখনও আশঙ্কা বর্তমান যে, শেষ অবধি আমরা ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছতে পারব না। অন্তত ঐ লঝ্ঝড় গাড়িতে করে নয়। কিন্তু আমাদেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যে-করেই হক, ঐ গাড়িতে করেই ভারতে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

প্রথমেই যুগোস্লাভিয়া। সমুদ্রোপকূল দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। চারদিকের দৃশ্য সেখানে ভারী মনোরম। গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যুগোস্লাভিয়ার মানুষজনও ভারী ভাল। বিপদে পড়লেই তাঁদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি। রাস্তা - অবশ্য সুবিধের নয়। তবে সেই সংকীর্ণ পাহাড়িয়া



কাবুলের রাজপথ



ইস্তাম্বুলের একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ

পথেও গাড়ি চালাতে আমাদের তেমন বেগ পেতে হয়নি।

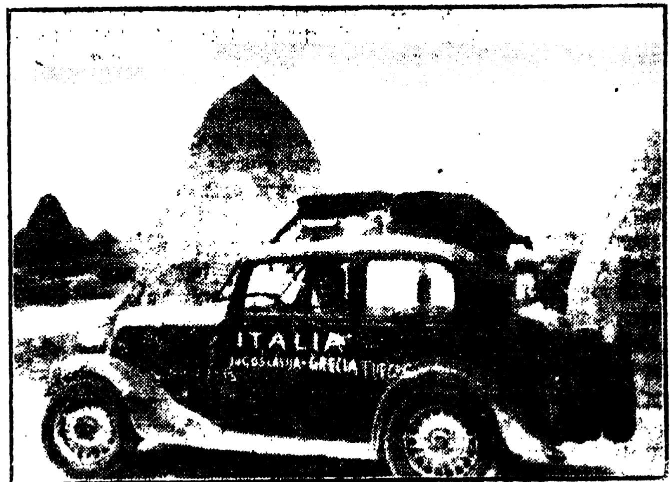
গ্রীস এবং তুরস্কের কাগজে যখন ছবি-সমেত আমাদের খবর ছেপে বার হল, ইতালির মানুষেরা সেই খবর পড়ে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে থাকবেন। সকলেই অবশ্য চাইছিলেন যে, আমাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হক। কিন্তু সত্যিই যে শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের লক্ষ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছতে পারব, তা কেউ আশা করেননি।

তুরস্ক পার হবার পরই শুরু হল নানান রকমের ঝঞ্ঝাট। এই সময়ে আমাদের ডায়নামোটি চার-চারবার পুড়ে যায়। এক একবার সারিয়ে নিই, তারপর খানিক দূরে গিয়েই দেখি আবার গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে। এরই ফলে আমরা সপ্তাহ খানেক আটকে গেলাম।

সিরিয়াতে একদিন ভারী বিপদে পড়েছিলাম। মিশকালো রাত্রি। পথ হারিয়ে আমরা ইতস্তত চক্কর মেরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একটা উদ্যত বেয়নেট আমাদের পথ আটকে দিল। না বুঝে আমরা সামরিক এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। যতই বোঝাই যে, আমরা নিরীহ পথিক মাত্র, বিন্দুমাত্র বদমতলব আমাদের নেই, কিছুতেই কাউকে সে-কথা বিশ্বাস করান যায় না। ঘণ্টা চয়েক আটক থাকবার পর শেষে অনেক কষ্টে আমরা রেহাই পাই।

ইরাক...ইরান...। তেহরানে আমাদের যে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করা হয়েছিল, তার কথা আমরা কখনও ভুলতে পারব না। কাগজে কাগজে ছবি বার হল আমাদের। যেখানেই যাই, জনতা এসে আমাদের ঘিরে ধরে। তারপর চলে নানান রকমের প্রশ্ন। ওই অতটুকু ভাঙাচোরা গাড়ি, ওই নিয়েই কী সাহসে এই দুর্গম পথে আমরা পাড়ি দিয়েছি।

তারপরেই শুরু হল কষ্ট। জঘন্য রাস্তা। যেমন নোংরা, তেমনি বিপজ্জনক। ঝাঁকুনি খেতে খেতে আমাদের গাড়ির একেবারে নাভিশ্বাস উঠেছে। একটু একটু করে গাড়িখানা যেন এক নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখে আমাদের ভারী কষ্ট হতে লাগল। ঝাঁকুনির চোটে স্প্ল্যাশ বোর্ড ভেঙে গেল, দরজা দুটো খুলে গিয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল, ছাদটাও আর




সিরিয়ার এক ছোট্ট গ্রামে আমাদের অক্ষত গাড়ি : পাশে অদ্ভুত ধরনের কুটির



এলাহাবাদে লেখক, ফটোগ্রাফার বন্ধু ও আমেরিকান মহিলা

আস্ত রইল না। আর সে কী ধুলো। ছাদ ভেঙে গিয়েছে। সুতরাং ধুলোর মেঘে শরীর ডুবিয়ে আমরা চলেছি। ওদিকে দরজাও বন্ধ করবার উপায় নেই। সে যে কী কষ্ট, তা কেমন করে বোঝাব।

এমন বিদ্‌ঘুটে রাস্তায় যে চলতে হবে, আমাদের গাড়ি তা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেনি। পুরনো গাড়ি, আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা তার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অনেক কষ্টে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে তার পতনোন্মুখ শরীরটাকে আমরা কোনক্রমে খাড়া করে রেখেছি। শুধু ইঞ্জিনটা তখনও খারাপ হয়নি। তখনও তার শক্তি অটুট। ইরান সীমান্তের কাছাকাছি আফগানিস্থানে আমরা একবার ভারী বিপদে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ভুল-পথে স্টীয়ারিং ঘোরাতেই আমাদের গাড়ি একটা বালি-বোঝাই খানার মধ্যে গিয়ে পড়ল। প্রাথমিক আঘাত সামলে উঠে দেখি, গাড়ি আর চলে না। প্রয়োজনীয় একটা পার্ট ভেঙে গিয়েছে। তিনদিন সেখানে আমরা আটকে ছিলাম। বন্ধু ত গাড়ির তলায় শুয়ে তার রোগ পরীক্ষায় নিরত হলেন। আমি রওনা হলাম লোকালয়ের সন্ধানে। কুড়ি মাইলের মধ্যে কোনও গ্রাম নেই। অনেক কষ্টে দূর লোকালয়ে পেঁছে আমি সেই পার্টটি সংগ্রহ করে আনি। যে তিন দিন সেখানে আটকা ছিলাম, স্রেফ রেডিয়েটরের জল খেয়ে আমার বন্ধুকে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে।

আমরা যখন আফগানিস্থানের এরাত শহরে গিয়ে পেঁছই, গাড়িটাকে তখন জাদুঘরে পাঠালেও চলে। একমাত্র মোটর ছাড়া তার অন্যান্য সমস্ত অংশই তখন অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছে। ভাঙা দরজা, ফুটো জানালা, কাটা স্প্রীং, ফাটা টায়ার—এই নিয়ে আমাদের আফগানিস্থান পার হতে হবে! এখনও হাজার মাইলের উপর পথ পড়ে রয়েছে। সে-পথে অসংখ্য খানা-খন্দ এবং একটাও কারখানা নেই।

বুঝলাম যে, আমাদের দুঃখের নিশা এখনও ভোর হয়নি। একদিন রাত্রে হয়েছে কি, ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছি, ওদিকে পথের উপরে আড়াআড়িভাবে যে একটা খুঁটি ফেলে রাখা হয়েছে, তা আমরা দেখতেই পাইনি। সেই একটা ধাক্কাতেই আমাদের গাড়ি ভেঙে চৌচির হয়ে যেতে পারত। হয়নি যে, সে আমাদের কপাল।

খানিক বাদেই আমাদের একটা নদী পার হতে হল। নদীর উপরে সেতু নেই, তবে জলও খুব অল্প। ভাবলাম, গাড়ি চালিয়েই নদী পার হয়ে যাব। কিন্তু মাঝ-নদীতে পেঁছে দেখি, গাড়ি আর চলে না। মোটরের মধ্যে জল ঢুকে গিয়েছে। পরে একটা ট্রাক এসে আমাদের গাড়িটাকে নদী পার করে দেয়। কাবুলে পেঁছবার আগে ডায়নামোটাও আবার পুড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে আমরা কাবুলে এসে পেঁছই।

পাকিস্থানে পেঁছে ভরসা হল যে, শেষ পর্যন্ত দিল্লি গিয়ে পেঁছতে পারব। পাথুরে এবড়োখেবড়ো রাস্তা পার হয়ে আমাদের গাড়ি আবার যখন মসৃণ পিচঢালা পথের উপরে গিয়ে পড়ল, আঃ, সে যে কী আনন্দ!

ভারতবর্ষের মানুষেরা যেভাবে আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন, তা আমরা চিরকাল মনে রাখব। অমৃতসরে এক ভদ্রলোক আমাদের বললেন, ইচ্ছে হলে আমাদের পুরনো গাড়িটাকে তাঁর কাছে রেখে তাঁর নতুন গাড়িটা আমরা নিতে পারি। সেটাও ফিয়াট। তবে নতুন মডেলের। তাঁর প্রস্তাবে আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তবে তাঁর নতুন গাড়ি আমরা নিইনি। সবিনয়ে আমরা তাঁকে জানালাম যে, দুর্দিনের সঙ্গী এই পুরনো গাড়িকে সম্বল করেই দিল্লির পথে আমরা পাড়ি জমাব।

দিল্লিতে আমরা পনের দিন ছিলাম। দিন কয়েকের মধ্যেই প্রতিটি ট্রাফিক পুলিস আমাদের চিনে ফেলল। গাড়ির আলোটা সারান দরকার, নম্বর প্লেটটাও বদলে ফেলা উচিত। এ নিয়ে প্রথম দু-একদিন আমাদের জবাবদিহি করতে হয়েছে। তারপর আর কেউ আমাদের পথ আটকাত না। আমাদের এই ভাঙাচোরা গাড়িখানা তাদের দৃষ্টিপথে পড়লেই মৃদু হেসে তারা আমাদের শুভেচ্ছা জানাত।

দিল্লিতে থাকতে 'ইণ্ডিয়া ১৯৫৮' প্রদর্শনী আমরা দেখেছি। দেখে ভারী খুশী হয়েছি আমরা। ঠিক করেছিলাম, আমাদের গাড়িখানাকে যাতে ঐ প্রদর্শনীর এক পাশে একটু জায়গা দেওয়া হয়, তার জন্য আবেদন জানাব। জানালামও। কিন্তু অনুমতি মিলল না। তার কারণ, এ-গাড়ি ভারতবর্ষে তৈরী নয়।

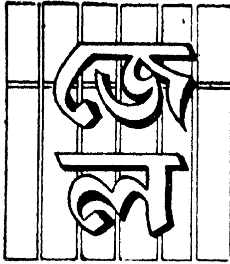
দিল্লীতে থাকতেই এক আমেরিকান তরুণীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। মেয়েটি অনুরোধ করল, তাকেও আমাদের দলে নিতে হবে। বিলক্ষণ। দলে নিতে আর আপত্তি কী।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পিছনের সিটটা ভেঙেচুরে গিয়েছে। তাই সামনের সিটে ঠেসাঠেসি করে তিনজনে বসে আছি। দুটি যুবক আর একটি মেয়ে।

দিল্লি থেকে এলাহাবাদ। এলাহাবাদে এসে আমরা প্রথম প্রথম একটু অসুবিধেয় পড়েছিলাম। এই লক্কড় গাড়িকে রাস্তায় বার হতে দেওয়া হবে না। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। শেষ পর্যন্ত ট্রাফিক ইন্স-পেক্টরের সাহায্যে আমরা রেহাই পাই। দিল্লি থেকে কলকাতার পথে সর্বদাই আমরা সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি।

কলকাতায় এসে পেঁছেছি আমরা। এরপর আমরা মাদ্রাজে যাব। সেখান থেকে সিংহল। তারপর আবার ভারতে ফিরে ত্রিবান্দ্রম, হায়দরাবাদ, বোম্বাই। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে দেশোন্নয়নমূলক যেসব কাজ হয়েছে, তার সবই আমরা দেখতে চাই।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইউরোপে অনেক বাজে ধারণা প্রচলিত আছে। ইউরোপের অধিকাংশ লোকই মনে করে যে, ভারতবর্ষের পথে পথে ফকির, সাপ, গরু আর মহারাজার ছড়াছড়ি। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক এক ভারতবর্ষকে দেখে গেলাম।






# জেল ডায়েরি

সতীন্দ্রনাথ সেন

॥ ২ ॥

১৪ই জুন ১৯৫৪, (বরিশাল জেল, রাত্রি প্রায় ৯টা)——কাল বেসরকারী জেল পরিদর্শক মনু মিঞা পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম ২নং ওয়ার্ডে জনকয়েক বন্ধু তাঁহার সহিত কিছুটা রূঢ় আচরণ করিয়াছেন......আমাদের এখানে আসিলে আমি যত্ন করিয়া বসাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিলাম- ভিজিটর বোর্ড সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তাঁহাকে জানাইলাম। .........শুনিলাম ২নং ওয়ার্ডে বেশ সমালোচনা হইয়াছে ইহা লইয়া......

এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে লাকিতুল্লা মনু মিঞার কথা উঠাইল। মনু মিঞার সহিত ব্যবহার নিয়া একটু তর্কও হইল। আমার কথা হইল যে, মনু মিঞা এখানে পলিটিক্স করিতে আসেন নাই, জেল-পরিদর্শক হিসাবে আসিয়াছেন। ভিজিটরদের সহিত আমাদের প্রয়োজন আছে, তাছাড়া শিষ্টাচারের আমাদের প্রয়োজন আছে।

শুনিলাম ২নং ওয়ার্ডে প্রায়ই গোলমাল হয়......একদিন একটা গোলমালের মীমাংসা-বৈঠকে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন......"—ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিব।"

......এদের অ্যাপ্রোচের সহিত আমার কত শার্প ডিফারেন্স! যে নর্মাল ভায়োলেন্স আমাদের মধ্যে আছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিকার দ্বারাই তা প্রকাশিত হয়। ......এদের পলিটিক্স এও স্বভাবতই...... এটা আসিবে ও আসিতেছে. ....কমিউনিস্ট-দের রীতিনীতির সহিত ইহাদের স্বভাবের এই মিলের জন্য ইহারা দ্রুত এদিকে যাইতে পারে।

আমাদের কর্তব্য সত্যের পথে, অহিংসার পথে, যুক্তির পথে ইহাকে চালিত করা। এই অমিলের জন্য বিরক্ত বা দুঃখিত না হওয়া.........

এমদাদ মিঞার (এম এল এ) সঙ্গে এই যে কয়দিন কাটিল, এতেও অনেক অভিজ্ঞতা হইতেছে। আমার কতগুলি চালচলন—যেমন অফিসারদের সহিত বেসরকারী পরিদর্শকদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা, তাহাদের যত্ন-আপ্যায়িত করা, চা ইত্যাদি দেওয়া আমার দলের মুসলিম বন্ধুরা পছন্দ তো করেই নাই, বরং সমালোচনা করিয়াছে। মনু মিঞাকে যখন আমি আমার বিছানায় বসাইলাম—পরে তাহার সমালোচনা করিয়া তাহারা বলিল—"সতীনবাবু হিন্দু, তাই এদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে।" কাল দিনেরবেলা এক সময়ে বলিতেছিল "গুণ্ডামিতেই (Or Violence?......) কাজ হয়........." কিন্তু কাল রাত্রে দেখিলাম অনেক পরিবর্তন। মনু মিঞার কথা উঠাইতে হীরেন ভট্টাচার্য কথায় কথায় বলিল এক-জনের সহিত বিনা কারণে অভদ্র ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমি শুইলে হীরেন ভট্টাচার্যের সহিত কথা চলে। ঘুম ভাঙিতে এই কথাটা কানে আসিল "সতীনবাবু ম্যাগনানিমস"—মানে ভদ্রতা করিয়া লোককে চা ইত্যাদি খাইতে বলি......। তবে আমি টাকা সংগ্রহ করিয়া খরচ করি—আমাকে সংসার চালাইতে হয় না—[illegible]র সংসার আছে, তাই তাহার পক্ষে এইসব সম্ভব নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার প্রকৃতি চায় সকল দুর্গতদের সাহায্য করি। অতিথিদের সংকার এবং বন্ধুদের, বিশেষ করিয়া যাহারা অসুবিধায় আছে, তাহাদের সাহায্য করি—নিজের অর্থে ও অন্য প্রকারে। অতিথি সৎকারে খুব মন টানে। কিন্তু এর একটা সীমা থাকা দরকার। নিজের খরচায় সব করিতে হইলে অত্যধিক ব্যয় হইয়া পড়ে......অ্যালাউন্সও খুব ইনসাফিশিয়েণ্ট। বাহির হইতে আনিয়া, বাহিরের সহকর্মীদের কষ্ট দিয়া, বাহিরের কাজের ক্ষতি করিয়া ভিতরে (জেলের) বেশী খরচ করা সংগত নয়। তবে আমার যে ভাব—সকলের সঙ্গে ভদ্রতা, ইত্যাদি—তাতে কিছু একটা বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি

এণ্টারার ভারেটটা কমফার্ট করা হয়। তাহা হইলে ব্যাপারটা সহজ হয়। কিন্তু বর্তমানে এখানে তাহা করার কতগুলি অসুবিধা আছে।

১৫ই জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল, বৈকাল প্রায় ৫টা)—বিভিন্ন দলের লোক, অদলীয় লোক, গ্রেফতার হইয়া একত্র বাস করিতেছে। রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু জেলে, জেল সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলের মধ্যে, যাতে সকলে একযোগে চলিতে পারে, সেদিকে বিভিন্ন দলের লোকের মধ্যে মতের একতা আছে। কেহ কোনও দলের বিরুদ্ধে বা দলের লোকের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বা কঠোর সমালোচনা করিতে পারে না—তাহা হইলে জেলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সঙ্ঘবদ্ধ জীবন ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক দলাদলি, রেষারেষি, প্রোপাগ্যাণ্ডা ইত্যাদি জেলের দরজার বাইরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়, জেলের মধ্যে যাহাতে সকলে মিলিতভাবে সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করিতে পারে। পরমতসহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা (এমন কি ভালবাসা হইলে সবচেয়ে ভাল হয়) অত্যন্ত প্রয়োজন। তা যদি হয়, তবে তার সুফল জেলের বাহিরেও দেখা যাইতে পারে।

কিন্তু আরও কি অগ্রসর হওয়া যায় না? রাজনৈতিক প্রচারকার্য ইত্যাদি বন্ধ না করিয়া, ওইসব চালাইয়াও কি পরস্পর শ্রদ্ধা বজায় রাখা যায় না, সহিষ্ণুতা রক্ষা করা যায় না? এইদিকে গোটাকয়েক বাধা আছে। প্রথমত রাজনৈতিক মিটিং ইত্যাদি করা জেল কোডের নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, যদি বা আইন বাঁচাইয়া মিটিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, ওই জাতীয় প্রোপাগ্যাণ্ডা ইত্যাদির ফলে বিষম মতভেদ, কলহ ইত্যাদির সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা পারা যায় জেলের ইউনাইটেড লাইফ অব্যাহত রাখিয়া তবে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইউনাইটেড লাইফের ভড়ংএর তলে তলে পরস্পরের বিরুদ্ধে গোপন প্রাপাগ্যাণ্ডা জঘন্য। তা সহ্য করা উচিত নয়।

১৬ই জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল, সকাল প্রায় ৮টা)—পরমতসহিষ্ণুতা, প্রীতি, প্রেম: ব্যক্তিগত, দলগত, নানাবিধ বিরুদ্ধতা, মতভেদ প্রভৃতির দ্বারা বিচলিত না হইয়া কি করিয়া শ্রদ্ধা-প্রীতি বজায় রাখা যায়? শুধু passively সহ্য করা নয়, actively ভালবাসা?

অহিংসা ও সত্যের নীতি, সর্বোদয় নীতি আমি বুঝিতে চাই, বিশ্বাস করিতে চাই। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের দৃঢ় বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পন্থায়। অহিংসা, সত্য ইত্যাদিতে কাহারও বিশ্বাস নাই। তাহারা বলে "End justifies the means। এইসব দলের বিশ্বাস, কোনও "method"-ই "too mean" নয়, এবং সেই নীতিই তারা অনুসরণ করে। একেবারে ভিন্ন আমার রাস্তা। কার্যত কি করিয়া তবে এদের সংগে চলা যায়, এদের শ্রদ্ধা করা যায়, ভালবাসা যায়? বিশেষ যখন দেখা যায় যে, তাহারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে, তোমাকে ধ্বংস করিবার জন্য সতত সচেষ্ট, তোমার চলার পথে কাঁটা দিতে ব্যস্ত? আইডিয়ালটা কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব?......

২১শে জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল)—* * * ভাষা-আন্দোলনের সময় জেলে আসিয়া আমার বিশেষ লাভ হইয়াছিল—কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও বটে, বিভিন্ন জেলে অন্যান্য রাজবন্দীদের সংগে মেলা-মেশার ফলেও। পাকিস্তানী ও প্রাক-পাকিস্তানী জেল-জীবনের একটা তুলনা-মূলক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পাকিস্তানী জেলের অন্যায়-অবিচার, দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে, সংগ্রাম চালাইতে, গিয়া দেখিলাম বহু পুরাতন রাজবন্দীই যেন কিছুটা ইতস্তত করেন। পাকিস্তানী জেলে কোনও কোনও অনশন-ধর্মঘটের সময়ে তাঁহাদের যে-অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা আরও দমিয়া গিয়াছেন। আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল ভিন্ন রকমের।

এবারেও পটুয়াখালিতে আমার গ্রেফতার এবং ডিস্ট্রিক্ট জেলে বহুসংখ্যক নেতা ও নেতৃস্থানীয় লোকের সংগে আটক থাকার ফলে আমার খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞতালাভের দিক হইতে, আমাকে যদি ঢাকাতে গ্রেফতার করিত এবং একে একে বিভিন্ন জেলে পাঠাইত তাহা হইলে আমি খুশী হইতাম। তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বাড়িত। যাহা হউক, বরিশালের নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সংগে একসংগে বরিশাল জেলে বাস করার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। এই সুযোগ যেন পুরাপুরি আমি গ্রহণ করিতে পারি।......

২শে জুন (বরিশাল জেল)— * * * অসাম্প্রদায়িকতার দিকে কতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, সরকারের প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গী, সেকুলার ডিমক্রেসি, বিশ্বজনীনতা, কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে? আদর্শ আর কত দূরে? কতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে —চরিত্রে কি কি প্রগতিশীল গুণ বাড়িয়াছে? কি কি দোষ এখনও সংশোধন করিতে বাকী? কেমন করিয়া তাড়াতাড়ি দোষগুলিকে দূর করা যায়?

২৭শে জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল)—* * * আজ হইতে I B Interview শুরু হইল। এমদাদ মিঞা (এম এল এ) সাহেব, নিবারণ কবিরাজ, সুধীর প্রভৃতির interview হইল। মনে হইল ৩০।৪০ দিনের মধ্যে অনেক খালাস হইবে। আতাউর রহমানের বেশ জোরালো বিবৃতি বাহির হইল। মোহন মিঞা গ্রেফতার হইল। মুজিবর সেখের কেস শুরু হইল। হক সাহেবের বিবৃতি বাহির হইল। বাহিরের অবস্থা এক হিসাবে ভালই মনে হইল। ইউনাইটেড ফ্রন্টের morale ভাঙ্গে নাই, মেরুদণ্ড ঠিক রাখিয়াছে। তবে ministry making-এর যে আয়োজন চলিতেছিল—League in spirit, something else in form—সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইবে মনে হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালাতে গোলযোগ—নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্স ভাঙিয়া গেল। জেনেভা কনফারেন্সের অবস্থা তদনুরূপ। তবে শেষ মুহূর্তে ইন্দো-চীনের ব্যাপারে একটা আশার আলো দেখা যাইতেছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌএন-লাই দিল্লী চলিয়াছেন। চার্চিল এবং মিঃ ইডেন আমেরিকাতে আইসেনহাওয়ারের সহিত আলাপ চালাইতেছেন। * * *

জেলে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লোক আছে। আমার যেভাবে চলা দরকার সেভাবে কি চলা হইতেছে? জেলে আমার যেভাবে সময় কাটানো দরকার সেভাবে কি সময় কাটিতেছে?

২৮শে জুন, (বরিশাল জেল, রাত্রি প্রায় ৯টা)—আজ ২৯ জন নিরাপত্তা বন্দী মুক্ত হইল। এই বোধহয় শুরু হইল। এই সংবাদটা বাহির হইলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে।.....non-political এবং পূর্বে যারা blackout-এ security prisoner হইত সেই লোকও ছিল—প্রধানত এরাই মুক্ত হইল। আট দশ দিনের মধ্যে বেশীর ভাগই বোধহয় মুক্ত হইবে। জন পাঁচেক বোধহয় থাকিবে কিছুদিন। এই সময়ে অন্যান্য জেলায়ও বোধহয় অধিকসংখ্যক বন্দীই মুক্ত হইবে। এখানে যাহা দেখিতেছি সে-হিসাবে মনে হয় সব জায়গায়ই এই-শ্রেণীর লোক এই সময় মুক্ত হইবে এবং একই শ্রেণীর লোক কিছুদিন থাকিবে। বর্তমানে regime যদি থাকে তাহা হইলে কমিউনিস্টদের হয়তো বেশ কিছুদিন থাকিতে হইবে। সরকার সমর্থিত এবং সরকার এবং লীগ সমর্থক সংবাদপত্রগুলি একসংগে এতগুলি মুক্তির সংবাদে খুব হৈ চৈ করিবে—জিন্দাবাদ, মারহাবা ইত্যাদি দিবে। অথচ এর ভিতর blackout, non-political prisoners, ছোট বড় অনেক অফিসার এবং প্রতিপত্তিসম্পন্ন non-official-দের আক্রোশে ধৃত লোকের সংখ্যাই পৌণে ষোল আনা—সাধারণ লোকে প্রথমে ইহা বুঝিতে পারিবে না। তাহারা অবাক হইবে। পরে যখন সত্য বাহির হইবে, তখন লোকে বুঝিবে। পলিটিক্যাল ওয়ার্কার্স এর ভিতর নাই। * * *

৩১শে জুন, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল)—কাল আমার এবং সুধীর সেনের confirmation order আসিল। * * *.

এবার এই জেলে থাকায় এই জেলার প্রধান কর্মীদের সহিত কতকটা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ হইল। ইহার ফল কর্মক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। দুঃখ ও নির্যাতনের পথে ইহাদের দীক্ষা হইল—ইহাদের যাত্রা শুরু হইল।

কমিউনিস্টরা জাগরণের পূর্ণ সুযোগ লইবার জন্য ব্যস্ত।

কি দৃঢ় কতকগুলি চারিত্রিক লক্ষণ এই মুসলমানদের মধ্যে—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, ছোট বড় সকলের মধ্যে। নিঃস্বার্থ, আত্মম্ভরিতাশূন্য। নির্ভীক নেতৃত্ব হইলে চমৎকার কাজ হইত। চমৎকার মসলা। এখন পর্যন্ত leadership poor। উপযুক্ত নেতৃত্ব না পাইলে বিপথগামী হইবে। গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতৃত্ব, অহিংসা ও সত্যের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, এদেশে ডেভেলপ করিবে কি? খান আবদুল গফর খান যদি দিগ্‌দর্শীর কাজটা করিতেন, unique possibility ছিল। কিন্তু তাঁর গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও নাই। অন্য যাহারা এই নীতিতে বিশ্বাসী তাহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব। গতানুগতিকভাবে, অন্ধ বিশ্বাসে, পূর্ব অভ্যাসের ফলে এই পথের পথিক। সর্বোদয়ের স্বপ্নটাকে সমগ্রভাবে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে, জীবনের বাস্তব সব সমস্যা সমাধানে সফল প্রয়োগ করিতে পারে, এমন সংগঠন ক্ষমতা কোথায়, কোথায় সে জীবন্তপ্রাণ, দৃঢ়বিশ্বাসী হৃদয়?

(ক্রমশ)



# শয়তান

## প্রবোধবন্ধু অধিকারী

থেকে থেকে শব্দটা উঠছে। বিষণ্ণ বেদনা মিশ্রিত আধভাঙা করুণ স্বর। আর সেই সঙ্গে গম্ভীর এক কণ্ঠের সচিৎকার শাসন গাঁও বেতরাইলের নিশুতি রাত্রির শান্ত স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছে।

এলংজানির এই বড় বাঁকের দক্ষিণ এলাকাটা ধু ধু শূন্য ফাঁকা। গাছ-গাছালি কিংবা মাটির চিহ্ন নেই। শেষ-শ্রাবণের পাকা পাকা আউস ধানের ছড়াগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে থই থই জলরাশির অতলে। চর নেই, মাটি নেই; বাড়ন্ত জলের প্রান্ত ডিঙিয়ে উঁকি দিচ্ছে না এলংজানি পারের কোন বালিয়াড়ির চুড়ো কিংবা বাড়-বাড়ন্ত কোন সতেজ ধানগাছের সবুজ অস্তিত্ব।

বাঁ-য়ে আধডোবা আধজাগা পার। জল-ডুমুর, হিজল আর ছাইতান গাছের বন। আশ্-শ্যাওড়া, মলটে আর কান্দারগাছের ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে ফাঁকা। ধান কিংবা কাপ্টিন পাটের আবাদ। রাক্ষুসী এলংজানির থই থই জলরাশির হাত থেকে বাঁচবার জন্য গাঁও বেতরাইল যুঝছে। বাঁ-পারের মাটি ধ্বসে ধান-পাট কাওনের ক্ষেতে এলংজানির কুলছাপা পায়ের পাতা ডোবা ঘোলাটে জল ছল ছল করছে। নরম হয়ে আসা মাটিতে নুয়ে পড়ছে ধানের ছড়া। আর ফোলা মোটা বাড়ন্ত কাওনের ঘন ঘিঞ্জি ছড়াগুলো ছ্যাঙার মত বীভৎস দেখাচ্ছে।

এতক্ষণ রোশনাই ছিল চাঁদের। কৃষ্ণ-পক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখা যাচ্ছিল মেঘ মেঘ আকাশে। ছায়া নামছিল, রোশনাই জ্বলছিল। আর গাঁও বেতরাইলের জমি-জিরাত, বন-জঙ্গল কিংবা আবাদী ক্ষেত-খামারে শস্যের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আলো নেই। রোশনাই মুছে গেছে। দ্বিতীয়ার চাঁদ বিলীন হয়ে বেমালুম মিশে গেছে মেঘকালো অন্ধকার আকাশে।

শব্দটা উঠছিল। এলংজানি বাঁ-পার ঘেঁষে ছপ্ ছপ্ জলের শব্দ। ছলাং ছলাং। যেন বন্যায় আধডোবা কোন জনপদে এক চিলতে ডাঙার আশায় হতাশ কোন বনচারী জীব মরিয়া হয়ে উঠেছে আশ্রয়ের সন্ধানে।

কিন্তু না, কোন বনচারী জীব নয়। গাঁও বেতরাইলের আধডোবা আধজাগা পার ঘেঁষে মন্থর স্রোতে এগিয়ে যাচ্ছে একটি ডিঙি নৌকো। পিছ গলুইয়ের ওপর বসে সতর্ক একজন পেশীপুষ্ট মানব প্রাণপণ শক্তিতে বৈঠা টানছে। মন্থর গতিকে তীব্রতর করতে চাইছে। আর সেই তাগিদেই ঘন ঘন বৈঠা পড়ছে জলে—ছপ্ ছপ্, ছলাং ছলাং।

পাটাতনহীন এক মাল্লাই ডিঙির ডগরা থেকে একটা আহত কণ্ঠের অব্যয় মূর্ত হচ্ছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে একজন বন্দী মানুষ। 'তুমার দুইথান পায়ে পড়তাচি মিঞা, ছাইড়া দাও, ছাইড়া দ্যাও আমারে।'

'চুপ!' গাঁও বেতরাইলের নির্জন নিস্তব্ধ পারের দিকে একটা চাপা কণ্ঠ গর্জে উঠল। হাতের বৈঠা তুলে ডগরায় বন্দী মানুষটির কোমর বরাবর একটা গুঁতো মারল গুঞ্জর আলি। 'শালা কাছিমের ছাও, তরে আইজ আমি শ্যাষ করুম। জবাই করুম বেজম্মার পুত।'

নৌকোর ডগরার মধ্যে বন্দী মানুষটি আহত জন্তুর মত আর্তনাদ করে উঠল। সম্ভাব্য আর একটা আঘাত থেকে নিজের দেহকে রক্ষার আশায় ঘোলাটে, কদমাক্ত জলে পাক খেল একটা। এবং দু-এক ঢোক জল নাকে-মুখে আটকে গিয়ে বিশ্রী বীভৎসভাবে কেঁদে উঠল।

ঢলে ঢলে বর্ষা নেমেছে। কানায় কানায় ভর ভর হয়ে সমুদ্দুর হয়ে পড়েছে এলংজানি। গাঁও বেতরাইলের আধডোবা আধজাগা পার ছাড়িয়ে গোটা দক্ষিণ এলাকাটা জলে জলময়। ধলেশ্বরী আর এলংজানির মধ্যে চর-ছিলামপুরের অস্তিত্ব মুছে গেছে। বিলীন বেপাত্তা হয়ে মিশে গিয়েছে রাক্ষুসী বন্যার গর্ভে।

পাক-খাওয়া ঘোলাটে মন্থর জলস্রোতে বৈঠার টানে টানে তীব্রগতিতে এগুচ্ছিল এক মাল্লাই ডিঙিটা। গাঁও বেতরাইলের

পার ঘেঁষে, গাছ-ঝোপের গা-গতর ছুঁয়ে ছুঁয়ে। প্রাণপণে বৈঠা টানছিল গঞ্জেরালি। আর থেকে থেকে চাপা ক্রূর গলায় ফুঁসছিল—'হুঁশিয়ার! চিখ্‌খির মারচুস কি বৈঠার গুঁতায় তর চান্দির বান্ধন খুইলা ফেলামু সুম্মুন্দির পুত্‌।'

অন্ধকার অন্ধকার। ডগরা থেকে উঠে আসা বিষণ্ণ করুণ আকুতি থেমে গেছে। নিঃশব্দ চুপচাপ এখন। কেবল বন্যার ঘোলাটে পাক-খাওয়া জলের ক্ষীণ শব্দকে ছাপিয়ে গঞ্জের আলির বলিষ্ঠ থাবায় চাপা পাইয়া কাঠের বৈঠাটা দ্রুত শব্দ তুলছে জলে। তর তর করে সর্পিল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ডিঙিটা জুঁকাটা চিতল মাছের মত। আর সেই সঙ্গে অস্পষ্ট এক ক্ষীণ সুরের মত শব্দের গমক ছাড়িয়ে পড়ছে বন্যাবিধ্বস্ত এই নির্জন এলাকায়।

এতক্ষণে মইষাখালির বাঁওর ঘুরে দক্ষিণ-মুখো হয়েছে ডিঙিটা। নৌকোর চলনে আর বৈঠার টানে টানে কেমন একটা স্রোতের আভাস পাচ্ছিল গঞ্জের আলি। আপনা থেকে তর তর করে এগিয়ে যেতে চাইছিল ডিঙিটা। আর খানিকক্ষণ। মইষাখালির বাঁওর ছাড়িয়ে, মধ্যপাড়ার সীমা ডিঙিয়ে, টেউরিয়া। তারপর? কোমরে হাত দিল গঞ্জের আলি। হ্যাঁ, খেজুরের বাঁধিকাটা খরধার ছোনিটা তৈরীই রয়েছে। আর...... গঞ্জের আলি সেই ডগরার দিকে তাকাল। নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারের মধ্যে কাস্টিন পাটের রশি-বাঁধা মানুষটাকে দেখবার চেষ্টা করল। কোনরকমে একবার ধলেশ্বরীর কিনার। তারপর? তারপর আর ভাবতে পারছিল না গঞ্জের আলি। তীব্র একটা পৈশাচিক উত্তেজনায় দেহের শিরা-উপশিরা স্নায়ুগুলো চনমন করে উঠছিল।

'আমারে ছাইড়া দ্যাও, ছাইড়া দ্যাও মিঞা।' ডগরার ঘোলা কর্দমাক্ত জলের মধ্য থেকে অস্পষ্ট করুণ কণ্ঠে বন্দী মানুষটির আকুতি শোনা গেল। 'খোদা কসম, তোমার বিবিরে ছাইড়া দিমু। ফিরাইয়া দিমু তুমার কাছে।'

'খবরদার!' হিংস্র পাগলা কুত্তার মত রুখে উঠল গঞ্জের আলি। 'তরে না চুপ মাইরা থাইকবার কইচি সুম্মুন্দির পুত্‌।'

পাইয়া কাঠের বৈঠার একটা সজোর আঘাত খেয়ে ঘোৎ ক'রে শব্দ করল রমজান মোল্লা। হাউ হাউ কান্নার গমক উথলে উঠল তার বেদনাতুর গলায়। 'আমারে বাঁচাও গঞ্জের মিঞা। বালবাচ্চা পোলাপান-গুলার মুখ চাইয়া কসুর মাপ কইরা দ্যাও। জীবন ভিক্ষা দ্যাও আমার......'

'ভিক্ষা!' হাতের বৈঠা ফেলে কোমর থেকে এক টানে খরধার ছোনিটা লহমায় বের করে উর্ধ্বে তুলল গঞ্জের আলি। 'হারামীর পুত্‌। জন্মের মতন ভিক্ষা দিমু তরে। খোদার নামে জবাই কইরা গাঙের পানিতে ভাসাইয়া দিমু তরে।'

ক্ষুধার্ত বাঘের মতই লাফিয়ে পড়ত গঞ্জের আলি। খরধার ছোনির ফাঁসে একটা জীবন্ত মানুষের শ্বাস আর কণ্ঠ-নালী ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু পারল না। তীব্র স্রোতে ভেসে আসতে আসতে অতিকায় এক পাকে পড়ে ঘুরপাক খেল নৌকোটা। আর সহসা সর্‌ সর্‌ করে একটা জলডোবা চড়ায় আটকে গেল।

টেউরিয়া মুচিপাড়ার প্রান্তে থেমে গেছে নৌকোটা। মাচান বাঁধা দু-একটা ঘরের মধ্য থেকে অস্পষ্ট নক্ষত্রের দ্যুতির মত প্রকম্পিত আলোর রোশনাই চমকাচ্ছে। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল গঞ্জের আলি। নিমেষে টাঁকের খাঁজ থেকে সাঁ করে ছোনিটা টেনে বের করে ডগরার বন্দী মানুষটির গা-বরাবর বাড়িয়ে ধরল। অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে উঠল খেজুরের বাঁধিকাটা ছোনির তীক্ষ্ণ চিক্কণ ধার। 'হুঁশিয়ার! ফের রাও করচস কি, ছোনির ফাঁসে তর ঘেটিখান দুই ফালা কইরা ফেলামু বেজন্মার ছাও।'

উদোম আলগা গা-গতর; গাল-গলা-মাথা থেকে দর দর ধারায় ঘাম ঝরছে। পৈশাচিক উন্মাদনায় পেশীপুষ্ট দেহের খাঁজে খাঁজে একটা হিংস্র আক্রোশ ফুলে-ফেঁপে তীব্রতর হচ্ছে। বালিবহুল চড়ার কামড় থেকে ডিঙিটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করেছে গঞ্জের আলি।

খস্‌খসে বালি আর মসৃণ থক্‌থকে ছানার মত পলিমাটি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ডিঙিটাকে। কামটের মত তীব্র দাঁত বসিয়ে প্রাণপণে কামড়ে ধরেছে। ঠেলেঠুলে কিছুতেই ডিঙিটাকে সরাতে পারছে না। ভয়ঙ্কর আক্রোশে পা তুলে পিছ-গলুই বরাবর সজোরে একটা লাথি মারল গঞ্জের আলি। 'শালা ইবলিশ। এক লাথিতে তর তক্তার বান্ধন ফালা ফালা কইরা ফেলামু আইজ।'

কিন্তু ডিঙিটা নড়ল না। বিন্দুমাত্র সরলও না। পিছ-গলুইয়ের নিচে কাঁধ লাগিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ঠেলা মারল গঞ্জের আলি। চোখ বুজে, কপাল কুঁচকে, দম বন্ধ করে প্রাণপণে একটা হ্যাঁচ্‌কা ঠেলা। সর্‌ সর্‌ ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ। এক মাল্লাই ডিঙিটা নড়ল। এগুলো খানিক। কিন্তু ভাসল না, তর তর করে এগুল না। বরং

অবার চড়ায় পলিতে আটকে গেল! দাঁড়িয়ে গেল নৌকোটা।

হাঁটুর অনেক নিচে চড়ার জল। ঠেলে ডিঙিটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল গঞ্জের আলি। কতক্ষণ আর। কতদূর এই চড়াটা! এবার চড়া ছাড়িয়ে অগাধ জলে ভাসবে ডিঙিটা। তর তর করে ফলি মাছের মত জল কেটে এগুবে। মধ্যপাড়ার সীমা ছাড়িয়ে খানিক দূরে। ত[illegible]র ধলেশ্বরীর কিনার। আর মাঝ ধলেশ্বরী বরাবর পোঁছেই কাজটা হাসিল করে ফেলবে গঞ্জের আলি। লোকজন থাকবে না সেখানে কিংবা কাছাকাছি কোন জনপদ।

ডিঙি ঠেলতে ঠেলতে গামছার পটি-বাঁধা কোমরে হাত দিল গঞ্জের আলি। হাঁ, আছে, সকালের শান-দেওয়া খেজুরের বাঁধিকাটা তীক্ষ্ণধার ছোরাটা ঠিক আছে।

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎটা চোখের সামনে ভাসছিল। তারপর..... তারপর...তারপর গঞ্জের আলির চোখের নীল ডিম দুটোতে ছায়া কথা কয়ে উঠল। জমিলা নামে সেই বেহেস্তের হুরীর উষ্ণ সান্নিধ্যের জন্য ফাকুর ফুকুর শূন্য বক্ষের অতলে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার পক্ষী ডানা ঝাপটাল।

জমিলা, জমিলা খাতুন। হিঙ্গানগরের ফজল মিঞার ছোট বেটি। গঞ্জের আলির চোখের তারায় আর চেতনায় রমণীয় অতীতের খোয়াব ঘন হয়ে এল। চর ছিলামপুরের হাটে তেজারতির কারবার ছিল ফজল মিঞার। জমি-জিরাত আর দাদনের ব্যবসায় মালামাল হয়ে উঠেছিল অবস্থা। সেই ফজল মিঞার ছোট বেটি জমিলা খাতুনের টানা টানা অতসী ফুল ঘনপক্ষ চোখ, লাউডগা দীঘল নরম পেলব তনুদেহ, দীর্ঘায়িত ঘন-কৃষ্ণ চুলের গুচ্ছ আর করমচা-লাল ঠোঁটের ফাঁকে শরদ-ভীরু হাসির বিচ্ছুরণ গঞ্জের আলির চোখের তারা থেকে নিদ্রার আবিলতা ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়েছিল।

বেমরশুমে পানি হয়েছিল সে বৎসর। আবাদের মাঠে বৃষ্টির ছাটে হাঁটু ছুঁই ছুঁই কাণ্ডিন পাটের পুরুষ্ঠু চারাগুলো হেলে নুয়ে পড়েছিল। ঘন হয়ে আগাছার জঙ্গল গজিয়েছিল ধান পাট কাওনের ক্ষেতে। কামলা মজুরের টান পড়ল। নিড়ানীর মানুষ নেই। দশ আনা মজুরীর দর উঠল টাকায়। ঘরামির কাজ ছেড়ে নিড়ানী কামলার দলে ভিড়ে পড়ল গঞ্জের আলি। ফজল মিঞার আবাদী জমিতে খাই-খোরাক আর টাকা টাকা মজুরীতে কাজে লাগল।

সেই কাজ করতে এসে আসমানের বিজলী দেখল গঞ্জের আলি। অবিশ্রাম খাটুনিতে কাহিল হয়ে পড়েছিল শরীর-গতিক। বে-মক্কা বুখারে পাকড়াও করেছিল গঞ্জের আলিকে। কাঁপন দিয়ে জ্বর এসেছিল।

হুঁশ ছিল না। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ অবস্থায় দিন কেটে রাত নামল। তীব্র অবসাদ আর বেদনা-জর্জর দেহটায় অবশ ক্লান্তি। কামলার ঘরে একা ককাচ্ছিল গঞ্জের আলি। আসমানের চান্দের রোশনাই বাখারির জানলার ফোকর দিয়ে ফালি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরে। ধারে-কাছে কেউ নেই। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি চৌফলা হয়ে আসছে। তৃষিত চাতকের মত এক ফোঁটা পানির আশায় ছটফট করছিল গঞ্জের আলি। ক্লান্ত দেহটাকে টেনেটুনে বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওঠা হল না। আচমকা চোখের সামনে একটা রমণীয় খোয়াব দেখল। হ্যাঁ, অন্ধকার ঘরখানা যেন রোশনাইয়ে আলোকিত হল।

'তুমার পাঁখা লও মিঞা। পাটির পাখা পাকাইয়া আনছি তুমার লেইগ্যা।' অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠল কামলার ঘরের সীমিত পরিধিতে। 'বুখার কমল নি?'

না। কথা কইতে ভুলে গিয়ে মাথা নাড়ল গঞ্জের আলি। আরু আড়াল অন্দর-মহল থেকে বেরিয়ে এসেছে আসমান হুরীর দেহ। নিমেষে বিস্ময়-বিস্ফারিত দু'চোখের কেন্দ্র নীল ডিম দুটো পাথর শক্ত হয়ে এল। 'শরীলে বড় দরদ লাগচে। মাথাডা কামড়ায়।'

'কামড়ায়!' জমিলা খাতুনের গলায় অপূর্ব দরদ—'বাড়িতে চইলা যাও, মাথা টিপনের মানুষ পাইবা।'

কিন্তু গঞ্জের আলির শূন্য ঘরে মাথা টিপনের মানুষ নাই, সে কথাটা বলবার সুযোগ না দিয়েই জমিলা চলে গেল। আর

গঞ্জের আলি বিষণ্ণ বিহ্বল হয়ে প্রাণের মত বসে রইল খড়-বিচালির বিছানায়। রোমশ বুকের অন্তরাল থেকে বুভুক্ষু মনটা বুঝি কথা ক'য়ে ক'য়ে উঠতে চাইছে; দেখমু, আর একবার দেখমু সেই কইন্যারে।

দেখেও ছিল গঞ্জের আলি। দু'দিন অস্থির জ্বালা নিয়ে কাটল। তৃতীয় দিনে এক পলকের মোলাকাত। ক-টা রাত খসে খসে গেল উদ্বিগ্নতায়। ঘুম এল না। চোখের পাতায় অলস তন্দ্রার আবিলতা ঘন হয়ে এল না। জ্বালা, বড় জ্বালা।

সপ্তাহপরে অসুখের অজুহাতে ঘাপটি মেরে পড়েছিল গঞ্জের আলি। দিন গিয়ে বিকেল নামল। তারপর সন্ধ্যা। ফজল মিঞার বাড়ির চৌহদ্দিতে আর কোন মানুষ নেই। নিড়ানীর ক্ষেতে জোর কাজের চাপ পড়েছে। সবাই গিয়েছে আবাদে। শুয়ে বাখারী জানলার ফোকর দিয়ে চাঁদ দেখছিল গঞ্জের আলি। আর অস্থির প্রতীক্ষায় সময় গুণছিল।

এক সময় সেই অস্থির প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। জমিলা নেমে এল গঞ্জেরালির সিথানে। হাতে তার শানকির বাসনে শটির পাথা। 'তুমারে না বাড়িতে যাইতে কইছিলাম মিঞা?

'বাড়িত যামু কার কাছে।' ধড়মড়িয়ে উঠে বসল গঞ্জের আলি। চোখের তারায় অন্য ভাষা—'ঘরে আমার মানুষ নাই।'

'নাই?' চোখ তুলে তাকাল জমিলা খাতুন। চার চোখ এক হ'ল সহসা। আর রক্তজবার মত টুকটুকে শরম ঢেউ খেলে গেল জমিলার চোখে-মুখে। কী লাজ, কী লাজ! পথ্যিভরা শানকি নামিয়ে সহসা ছুটে পালাতে গিয়েছিল জমিলা। কিন্তু পারল না। ততক্ষণে আঁচল চেপে ধরেছে গঞ্জের আলি। 'আল্লার কাছে আরজ করচি তুমার লেইগ্যা—'

লজ্জাবতী কাঁপছিল। মুখ ফিরিয়ে আঁচল চাপা দিয়েছিল শরম-ভীরু মুখের ওপর। দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি হু হু করে উঠে আসছিল মুখে।

'মুখ ফিরাও বিবিজান। চাও।' জমিলাকে কাছে টানতে চাইছিল গঞ্জের আলি। 'একটুন চক্ষুটা খুলে। আমারে কও বিবিজান, কবে যাইবা আমার ঘরে?'

বাখারী জানলার অপরিসর ফোকর দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। গঞ্জের আলির নিবিড় বাহুবন্ধনের ঘেরা-টোপের মধ্যে ভেজা ভীরু পাখির মত থর থর কাঁপছে জমিলা খাতুন। চিবুক ধরে কাঁপা হাতে মুখটা তুলল গঞ্জের আলি। কী রূপ, কী রূপ! শরম-নিচু মুখে আর ঠোঁটে করমচা-লাল শরমের রঙ। কানের কাছে মুখ এনে আবেগ থর থর গলায় কথা কইল গঞ্জের আলি। 'তুমি আমার বেগম হইবা। কও, যাইবা নি, যাইবা আমার ঘরে?'

জমিলা তাকাল। শরমের আব্রু সরিয়ে ঘন আবিষ্ট চোখে মোলায়েম করে তাকাল গঞ্জের আলির মুখে। ঠোঁট দুটি তার কাঁপছে। কথা কইল জমিলা খাতুন। 'যামু, তুমার ঘরে যামু মিঞা।' আস্তে মাথাটা নুইয়ে দিল জমিলা।

ডগরার মধ্যে একটা শব্দ হ'ল। পিছ গলুয়ের নিচ থেকে ছিটকে সরে এল গঞ্জের আলি। 'খবরদার কুত্তার ছাও! চিল্লাইচস কি লগির পাড় দিয়া এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় কইরা ফেলামু তরে।'

'আমারে ছাইড়া দ্যাও মিঞা, জান খয়রাত চাইতাচি তুমার কাছে।' করুণ কণ্ঠে মিনতি জানাল রমজান মোল্লা। 'খোদা কসম, বাঁচাও আমারে। বাঁচাও।'

'বাঁচামু? হ, বাঁচামু তরে এট্টুন পরে। মাঝদরিয়ায় যাইবার দে, জন্মের মতন জান খয়রাত দিমু তরে।' ক্রুর, বীভৎস গলায় হেসে উঠল গঞ্জের আলি। 'শরম নাই? আমারে জেল খাটাইচস শালা ইবলিশের ছাও। কইতরের নাহাল ঘেঁটি ছিড়্যা তরে আমি খোদার দরবারে পাঠামু আইজ।'

দীর্ঘ চড়াটা শেষ হচ্ছিল না। আবার ডিঙিটা ঠেলতে লাগল গঞ্জের আলি। জল ঘাসের বনে সর সর করে এগুচ্ছিল এক মাল্লাই ডিঙিটা। আর, ধৈর্যের মাত্রাটা ক্রমশ কমে আসছিল গঞ্জের আলির। পাশব আক্রোশটা দুরন্ত ঝড়ের মত ফুঁসছিল। ফুলছিল। কতদূর কতদূর আর চড়াটা, ধলেশ্বরী আর কতদূরে?

আহত জন্তুর মত ডগরার মধ্যে গোঙাচ্ছিল রমজান মোল্লা। কর্দমাক্ত ডগরার ঘোলাটে জল ছলকে ছলকে নাকে মুখে লাগছিল। মাথা তুলে বার বার দেখতে চেষ্টা করল কিছু। হাঁ, গঞ্জের আলি পিছ গলুইয়ের নিচে নৌকো ঠেলছে। একটা পাক খেয়ে ধারে চলে এল রমজান মোল্লা। কাস্টিন পাটের শক্ত বাঁধনটার কত শক্তি পরখ করে দেখল। বৈঠাটা ঠেসান দেওয়া রয়েছে পিছ গলুইয়ের আড়ে। কোন-রকমে একবার যদি বাঁধনটা কেটে যায়, তারপর পাইয়া কাঠের বৈঠাটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরবে রমজান। শরীরের সমস্ত

শক্তিকে কেন্দ্রিত করে গুঞ্জর আলির চাঁদি বরাবর একটা মাত্র সজোর আঘাত।

কিন্তু না, বড় শক্ত বাঁধন। কাস্টিন পাটের রশিটা কব্জির ওপর বসে গেছে তীব্রভাবে। তবুও ডগরার তক্তার সুচিক্কণ ধারালো প্রান্তে সন্তর্পণে বাঁধা হাতটা রগড়াতে লাগল রমজান। ঘষতে লাগল। ছিঁড়েও যেতে পারে। তক্তার সুচিক্কণ ধারের ঘষটানিতে কেটে যেতে পারে রশিটা। আর তা যদি যায়, মনে মনে বিশ্রী একটা গাল দিল রমজান মোল্লা, 'শালা কুত্তার ছাও রে আর বিবি ফিরাইয়া দিমু, খাওয়াইয়া দিমু সুম্মুন্দির পুত্রে।'

গুঞ্জর আলির বিবিজান জমিলাকে যেদিন দেখেছিল রমজান, তীব্র একটা নেশার ঘোর চনচনিয়ে উঠেছিল রক্তে। বুকের কোথায় যেন একটা অস্থির কামনা উথল-পাথল করছিল। মেহেদী রঙের নূরে মোলায়েম করে হাত বুলোতে বুলোতে গুঞ্জর আলিকে বলেছিল, 'বিবিজান ত জব্বর হইচে মিঞা।'

'হু।' তামাক সাজতে সাজতে তালুকদার রমজান মোল্লার দিকে তাকাল গুঞ্জর। 'হিঙ্গানগরের ফজল মিঞার বেটি।'

'তাই কও।' ঢোঁক গিলল রমজান মোল্লা। 'ভাল জাইতের চাড়া। খুবসুরত সোন্দর জাইতের মাইয়া।' নূরে হাত বুলোতে বুলোতে সোনার বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক চক্ষু দৃষ্টিটা অন্দরে চালিয়ে দিল রমজান। নারীতনুর প্রত্যাশায় নেড়ি-কুত্তার চোখের মত কুৎকুতে চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

ফুসলিয়েই নিতে চেয়েছিল রমজান, কিন্তু জাত-কেউটের ছাও কিছুতেই মাথা নামায় না; কায়দা করা গেল না সুমুন্দির বেটিকে। অবশেষে গুঞ্জর আলিকে গাঙের ঘাটে পাঠাল রমজান। আর রাতারাতি দলবল চড়াও করে, গামছার পট্টিতে মুখ বেঁধে আসমানী কন্যাকে নিয়ে উধাও হ'ল। আব্রু-আড়াল অন্দরমহলে বন্দিনী করল জমিলা বিবিকে।

দু'দিন পর গাঙের ঘাট থেকে ফিরে এল গুঞ্জর আলি। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার নেমেছে ঘন হ'য়ে। আর সেই কঠিন অন্ধকারের মধ্যে প্রেত-দেহের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে নিষ্প্রদীপ দোচালা ঘরটা। ছ্যাং ছ্যাং করে বুকের কোথায় যেন ছোঁক ছোঁক তপ্ত শিখা জ্বলে উঠল। সজারু কাঁটার মত টান টান দাঁড়িয়ে গেল লোমগুলো। ত্রস্তে করমচা ঝোপের কাছে সরে এসে ভীরু গলায় ডাকল গুঞ্জর আলি, 'জমিলা, জমিলা......'

উত্তর এল না। নিষ্প্রদীপ দোচালা ঘরের মধ্যে শব্দ করে বাতি জ্বলল না। শুধু নিথর নিঃশব্দ আঙিনায় থোক থোক জোনাকির দল টিপ টিপ করে জ্বলল আর নিভল।

কাঁপা হাতে বাঁশ-চাটাইয়ের দরজাটা যখন তীব্র মুঠিতে চেপে ধ'রে হ্যাঁচ্‌কা টান মারল গুঞ্জর আলি শব্দ করে হা হয়ে গেল দরজাটা। আর ঘরের নির্জন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা গুমোট ঝাপ্টা আচমকা এসে লাগল মুখে চোখে।

'জমিলা...', চিৎকার করে ডাকল গুঞ্জর আলি। গমগমে সেই কণ্ঠ বাঁশঝোপ, হিজল আর মলুটের জঙ্গলে শব্দিত হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু জমিলা এল না। সোহাগ-কাঁপা গলায় হাসির তরঙ্গ তুলে ছুটে এল না।

কেউ বলল না। কেউ দিশা হদিশ দিল না। কিন্তু গুঞ্জর আলি জানত কোথায় আছে সেই লেপাত্তা জমিলা খাতুন। ছিনিয়েই আনতে গিয়েছিল গুঞ্জর আলি। তীক্ষ্ণধার একটা বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রমজান মোল্লার অন্দরমহলে। কিন্তু নসিবের কি খেল, বে-দরদ খোদাতাল্লার কি কুটিল চক্রান্ত—যার জন্য সেই নিশুতি রাত্রির অন্ধকারেও ধরা পড়ে গেল। লোকজন নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে গুঞ্জর আলিকে বেঁধে ফেলেছিল রমজান মোল্লা। খবর দিয়েছিল থানায়। আর চুরি, রাহাজানির অপরাধে আড়াই বৎসর জেল ভোগ করতে হয়েছিল গুঞ্জর আলিকে।

টেউরিয়া মুচিপাড়া পেছনে পড়ে রইল, জলঘাসের ঘন ঘিঞ্জি বন বুঝি শেষ। গুঞ্জর আলির চোখের তারায় অস্থির জোনাকি আলো দপ্ দপ্ করছে। বাঁয়ে চোখ ফেরাল গুঞ্জর আলি। জল আর জল। চর গাঁওহীন দিগন্তব্যাপী ধু ধু এলাকা। ডাইনে আদিগন্ত জলরাশি। আর সামনে, সামনে ধলেশ্বরী।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ল, মিলিয়ে গেল হঠাৎ। আর সহসা চাপ চাপ অন্ধকার দৃষ্টিরোধী

কুয়াশার মত রুখে দাঁড়াল। আবার, আবার বিজলী চমক। আর সেই চমকে চমকে জলসা রোশনাইয়ে দূরের ধলেশ্বরীকে দেখতে পেল গঞ্জের আলি। কানে শুনতে পেল অশান্ত জল-কল্লোল।

পায়ে পায়ে জল বাড়ছে। চড়াটা শেষ হয়ে এল। ঠেলায় ঠেলায় ডিঙিটার গতি বাড়ছে। বাতাসের দাপট বাড়ছে। এসে গেল, ধলেশ্বরী এসে গেল। গঞ্জের আলির মাথার মধ্যে বাওর ঘূর্ণি বীভৎস চিন্তায় ফুলে ফেঁপে উঠছে।

বাতাস বাড়ছে। ঝলক ঝলক বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গঞ্জের আলির অস্থির চেতনায় একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ার কিলবিল করে উঠছে। থলসাদিহির বিলের পার থেকে আচমকা আশ্চর্যভাবে বন্দী করা রমজান মোল্লার দেহটা ডগরার মধ্যে নড়ছে।

শব্দ উঠছে জল-ঘাসের পলকা বনে। অশান্ত বাতাস আর নৌকোর ঠেলায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে জলঘাস। আর সেই সঙ্গে হাঁটু-ছুঁই ছুঁই ক্রমবর্ধিত জলে গঞ্জের

আলির ঘন ঘন পদক্ষেপে ছপ্ ছপ্, ছলাং ছলাং। জল বাড়ছে। চড়াটা শেষ।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। নৌকোয় উঠে এসে পাইয়া কাঠের বৈঠাটা চেপে ধরল গুঞ্জের আলি।

আকাশটা ঘন কালো। কেমন একটা থমথমে স্তব্ধতার গুমোট কাটিয়ে বাতাস বইছে। বাতাস বাড়ছে। ঝড় আসবে কি? আকাশে তাকাল গুঞ্জের আলি। তীব্রতম উত্তেজনায় শরীরের পুরুষ্টু পেশিগুলো মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে একটা পাশব আক্রোশে। গামছার পট্টির ঘাঁজে গোঁজা তীক্ষ্ণধার ছোরাটার ছোঁক ছোঁক তপ্ত স্পর্শ রক্তের অণুতে অণুতে জিঘাংসার তীব্র বিষ ছড়াচ্ছে। হাঁ, আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত বাকি।

'কসুর মাপ কর গুঞ্জের মিঞা। মাইরো না, মাইরো না আমারে'। অবশ ক্লান্ত ভাঙা বাসনের মত কৃত্রিম ঘ্যানঘেনে গলায় ডুকরে উঠল রমজান মোল্লা। 'দিমু, তুমার বিবিরে ফিরাইয়া দিমু আমি। খোদা কসম।' করুণ বিনম্র ভারি গলায় মিনতি জানাচ্ছিল রমজান। আর শিকারী শ্বাপদের মত থাবা পেতে অপেক্ষা করছিল। অন্ধকার ডগরার মধ্যে প্রাণপণে তক্তার সূচিক্কণ ধারে কাস্টিয়া পাটের বাঁধনটা রগড়াচ্ছিল। একটা পলকও যদি ছোঁড়ে কোনোরকমে, তা হ'লে একবার দেখে নেবে রমজান। আচমকা উঠে এসে লগির পাড়ে চাঁদিখান দুই ফালা করে ফেলবে।

জমিলা এখন বশে এসেছে। খাস বিবি হ'য়েছে রমজানের। জীবনের পরতে পরতে তৃপ্তির অপূর্ব জোয়ার এনেছে জমিলা বিবি। মনে প্রাণে ছুঁইয়েছে সুখ শান্তির পরশ। সেই জমিলা বিবি, তাকে ফিরিয়ে দেবে রমজান! তুলে দেবে ফের গুঞ্জের আলির হাতে? কিছুতেই না। কোনো মতেই নয়। অদ্ভুত এক রুদ্র উত্তেজনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বাঁধন খুলবার চেষ্টা করতে লাগল রমজান। মোচড়াতে লাগল। আর কৃত্রিম গলায় আকুতি জানাল, 'খোদা কসম গুঞ্জের মিঞা তুমার সুখের সংসার আর ভাংগুম না।'

'সুখের সংসার!' অদ্ভুত শ্বাসরোধী গলায় কথাটা উচ্চারণ করল গুঞ্জের আলি। এই কঠিন শক্ত অন্ধকার, কয়লা কালো থমথমে আকাশ, পারাপারহীন অনন্ত জলধির অনিঃশেষ ব্যাপ্তি, বাড়ন্ত ঝোড়ো বাতাসের দাপট- সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'ল। থেকে থেকে বার বার তরঙ্গায়িত ধলেশ্বরীর স্রোতে কুটিল ইবলিশের গর্জন শুনতে পেল।

বাতাস বাড়ছে, বিজলী জ্বলছে আশমানে। ঘন জমাট মেঘগুলো ফালা ফালা হ'য়ে পেজা তুলোর মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আকাশে। ধলেশ্বরীর জলে মাতন উঠছে। ঢেউগুলো বৈশাখী মেঘের মত ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর একের পর এক ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে এক মাল্লাই নাওটার সম্মুখে। মধ্য পাড়ার সীমা দূরে সরে যেতে যেতে মুছে যাচ্ছে, ক্রমবিলীয়মান হচ্ছে।

হাতের পাইয়া কাঠের বৈঠাটা শক্ত থাবায় চাপা। কেমন এক আচ্ছন্ন চেতনায় বুঁদ হ'য়ে রয়েছে গুঞ্জের আলি। দেড় বৎসর ঘর করা বেগম বিবি জমিলার কথা মনে পড়ছে। আর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মধুরতম ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ডগরার মধ্যে কেমন একটা শব্দ। অস্ফুট গোঙানি শুনতে পাচ্ছে গুঞ্জের আলি। ইবলিশের ছাওটা বুঝি কাতরাচ্ছে। কিন্তু না, কাতরানো নয়। ধলেশ্বরীর জল-কল্লোল কানে গিয়েছে রমজান মোল্লার। প্রাণপণে ঘষতে ঘষতে হাতের বাঁধনটা কেমন আলগা আলগা লাগছে। আর কৃত্রিম গোঙানিতে গুঞ্জের আলিকে ভোগা দিতে দিতে চাইছে। আর একটু। আর কয়েকটা মাত্র ঘষটানি।

হঠাৎ একান্ত আকস্মিকভাবে আবেশ আচ্ছন্ন ভাবটাকে ফালা ফালা করে ভয়ংকর-ভাবে দুলে উঠল ডিঙিগটা। উলটে যেতে চাইল। হাতের খসো-খসো পাইয়া কাঠের বৈঠাটা তীব্র মুঠিতে চেপে প্রাণপণে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল গুঞ্জের আলি। গলার শিরা ফুলিয়ে পাবরাহি চিৎকার করে উঠল, 'হুঁশিয়ার, সামাল।' কিন্তু দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াতে পারল না। অতিকায় পাহাড়ের মত একটা বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে ছিটকে ফেলে দিল গুঞ্জের আলিকে। আর মোচার খোলার মত ডিঙিগটা ছিটকে গেল কয়েক হাত দূরে।

সোঁ সোঁ ভয়ংকর বাতাসের দাপট গর্জাচ্ছে। অতিকায় পাহাড়ের মত ঢেউ-গুলো রাক্ষুসী সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় মুখব্যাদন করে এগিয়ে আসছে সারি সারি। ধলেশ্বরীর গহন পানি ফুঁড়ে এক মাতলা দৈত্য বুঝি উঠে আসছে।

গলুইয়ের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল গুঞ্জের আলি। হাতের বৈঠাটা ডগরায় জমা জলের মধ্যে ছিটকে পড়েছিল। সেই সোঁ সোঁ ভয়ংকর বাতাসের দাপট আর থই থই উত্তরঙ্গ ধলেশ্বরীর অতিকায় ঢেউয়ের ঝাপটার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসবার চেষ্টা করল গুঞ্জের আলি। কিন্তু বৃথা। বৃথা চেষ্টা। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় মচকা সোলার মত কখনও ঊর্ধ্বে উঠছে ডিঙিগটা কখনও নেমে পাতাল ছুঁই ছুঁই করেছে। ধলেশ্বরীর মাতাল পানির সংগে অদ্ভুতভাবে নাচন শুরু হ'য়েছে এক মাল্লাই ডিঙিগটার।

ধলেশ্বরী ফুলছে। ফুঁসছে। তরংগের আছাড়ি পিছাড়ির বিন্দু বিন্দু

স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। সহস্র ফণাধারী সর্পিণীর মত লক লক জিহ্বা প্রসারিত করে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তেড়ে আসছে হাজার লক্ষ অতিকায় সব যমদূত।

মৃত্যু! একটা ভয়ানক ভীতিপ্রদ শিহরণে বরফ কণার মত রক্তের অণুগুলো জমে আসতে চাইছে। ধলেশ্বরীর খল খল অট্টহাসিতে মৃত্যুর ঘোষণা। অবিশ্রাম জলের ঝাপটায় শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। তীরের ফলার মত ভাঙা ঢেউয়ের জলকণা-গুলো গায়ে-গতরে বিঁধছে। আর সেই তীক্ষ্ম, ভয়ানক ঝোড়ো দাপটের সঙ্গে যুদ্ধ করে সোজা হ'য়ে বসবার চেষ্টা করছে গুঞ্জর আলি।

অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র জমাট বাঁধা অন্ধকারের চাপ চাপ রহস্য। সামনে, পিছনে ঊর্ধ্বে এবং ডাইনে-বামে কুটিল অন্ধকারের ভয়াবহ চক্রান্ত। তীব্র ঝড়ের ভয়ঙ্কর সোঁ সোঁ শব্দ ফেটে ফেটে পড়ছে। উত্তরঙ্গ ধলেশ্বরীর জলে একটা তৃণপত্রের মত আথালি পাথালি হ'চ্ছে এক মাল্লাই ডিঙিগটা। চরকির মত চক্রাকারে বন্ বন্ করে ঘুরছে হালশূন্য নৌকোটা। বিশাল বিরাট আড়াইক্রোশব্যাপী ধলেশ্বরীর অন্তহীন, পারহীন জলের মত্ততায় মোচার খোলার মত ডিঙিগটা কোন দিকে, কোন প্রান্তের অভিমুখে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে বোঝা যাচ্ছে না। কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। শুধু জল আর অন্ধকার। অতিকায় পর্বতের মত বিশাল উঁচু ঢেউয়ের আছাড়ি পিছাড়ির কানের পর্দা ফাটো-ফাটো তীব্র শব্দ, ঝোড়ো বাতাসের সাঁই সাঁই গর্জন আর কঠিন অন্ধকার, সব মিলিয়ে গুঞ্জর আলির অস্থির চেতনায় অসহায়তা, একাকিত্ব এবং জীবনের প্রতি অদ্ভুত মায়া মমতাবোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'চ্ছে।

আবার উঠে সোজা হ'য়ে বসতে গেল গুঞ্জর আলি। আবার। আবার। শক্ত হাতের থাবায় চাপা বৈঠাটা দিয়ে ডিঙিগটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা। জলের ঝাপটা সমস্ত প্রাণপণ শক্তিকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। ছিটকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে গুঞ্জর আলি।

ডিঙিগটা ঢেউয়ের চূড়ায় অনেক ওপরে উঠছে। অনেক। আবার নেমে গেল। ঢেউ ভাঙা ঝলক ঝলক জল নাকে মুখে আছড়ে পড়ছে। গা-গতর ভিজে ঢোল। 'আল্লা রসুলে, খোদা বন্দেজ', চিৎকার করে আরম্ভ করল গুঞ্জর আলি, 'বাঁচাও, বাঁচাও পাঁচপীর।' গলার পেশী ফুলিয়ে প্রাণপণে আকুতি জানাল গুঞ্জর আলি—'সিন্নি দিমু, আইট্টার দরগায় সিন্নি দিমু, তুমার; খোদা কসম।' কিন্তু সেই করুণ আরজের জবাব এল না। শূন্য থেকে ভরসা দিল না মনুষ্য কল্পিত কোনো আল্লাহ তায়ালা কিংবা খোদা বন্দেজ।

কতক্ষণ, কত সময় ধরে এইভাবে যুদ্ধ করছিল গুঞ্জর আলি জানে না। প্রাণপণে দীর্ঘ সময় ধরে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে অবশ হ'য়ে আসছে দেহ, শিথিল হ'য়ে আসছে হাত। কেমন একটা অসহ ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসছে গা-গতর। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। আলগা হ'য়ে আসা কোমরের গামছার গিঁটটা ক'ষে বাঁধল গুঞ্জর আলি। বৈঠাটা আবার শক্ত থাবায় চেপে সোজা হ'য়ে বসতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ডগরার মধ্যে।

কে! চমকে উঠল গুঞ্জর আলি। ডগরার মধ্যে কে?

একটা কাঠ কাঠ শক্ত দেহে হাত ঠেকল। আর সহসা কেমন এক অদ্ভুত উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল শিরায় শিরায়। রমজান মোল্লা! তা হ'লে আর একটা মানুষও আছে নৌকোয়! এতক্ষণে মনে পড়ল গুঞ্জর আলির। কোমর থেকে ছেনিটা টেনে নিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে হাত পায়ের বাঁধনগুলো কেটে ফেলল। অবশ শক্ত দেহটায় প্রাণপণে ঝাঁকানি দিল। 'ওঠ, ওঠ শালা মোল্লার পুত, বৈঠাটা ধর।' পাইয়া কাঠের বৈঠাটা রমজান মোল্লার হাতে গুঁজে দিয়ে সেঁউতি নিয়ে ডগরার জল ছেঁচতে লাগল গুঞ্জর আলি। আর রমজান মোল্লা সহসা পিছ-গলুইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঙ্গের মত বৈঠাটা নামিয়ে দিল জলে।

কতক্ষণ, কত রাত ধরে আদিগন্ত বিস্তৃত অশান্ত উত্তরঙ্গ ধলেশ্বরী আর সাইক্লোনের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়েছিল এই দুটি মানবক—জানা নেই। আর কখনও যে সাপে-নেউলের-সম্পর্ক এই দুটি মানুষ শ্রান্তি ক্লান্তিতে অচৈতন্য হয়ে ডগরার মধ্যে জড়াজড়ি করে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সে-কথাও কেউ জানে না। কিন্তু এক সময় চেতনা ফিরে এল গুঞ্জর আলির।

ডিঙিগটা স্থির, অচঞ্চল। নির্বিষ ভুজঙ্গের মত ধলেশ্বরী শান্ত। চাঞ্চল্য নেই। জলের ভয়াবহতা, উন্মত্ততা উধাও। তীব্র কড়া রোদের তাত গায়ে লাগছে। চোখ খুলল গুঞ্জর আলি। একটা ধু-ধু ফাঁকা চরের চূড়ায় আটকে রয়েছে নৌকোটা। আকাশ শান্ত স্থির; নীল। সূর্যটা মাথা বরাবর উঠে এসেছে প্রায়।

দেহের পরতে পরতে অসহ ব্যথা বেদনা। গভীর ক্লান্তিতে ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। চোখের পাতা দুটো অবশ আবেশে জুড়ে আসতে চাইছে। দেহটা বিকল। যেন এক চুল নড়লে দেহের যে কোন অংশ ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে।

কে! হাতটা সরাবার চেষ্টা করতেই চমকে উঠল গুঞ্জর আলি।

হাঁ, গত রাত্রির সেই বন্দী শয়তানটা। সে এখন মুক্ত, বন্ধনহীন। হাত পায়ের শক্ত কাস্টিন পাটের বাঁধনটা উধাও। আর কুত্তার ছাওটার চোখ দুটোও বুঝি গুঞ্জর আলির মতই ক্লান্ত।

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

॥ ১১ ॥

তা-ও নবাবগঞ্জে আর কতোটুকু, একটা ঢেউ মাত্র। আসল দাংগাটা হলো কলকাতায় আর নোয়াখালিতে। নৃশংসতায় হিন্দু-মুসলমান কেউ কম গেলো না।

ছটফট করে উঠলো সুলেখা, 'অনুমতি দিন সেনদা, একবার দেখিনি লোকটাকে।'

সেনদা শান্ত চোখে তাকিয়ে হাসলেন, 'এই একটা লোককে দেখে নিয়ে এতো-গুলো লোকের দুঃখ কি তুমি ঘুচোতে পারবে?'

'পারবো। পারবো। এই একটা লোকই এক কোটি লোকের সর্বনাশের কারণ, নওয়াবগঞ্জের এই সুলতান আমেদ নামক লোকটির ঠিকানা যেদিন মুছে যাবে জগত থেকে, অনেক পাপ, অনেক ক্ষতিও সেদিন দূর হয়ে যাবে ওর সংগে সংগে। মুসলিম লীগের আসল পরামর্শ-দাতাটা কে? এই নরপিশাচ। দাঙ্গা লাগাবার মূল সূত্রটি কী? এরই কূট-বুদ্ধি। মরি মরবো, মরতে একদিন হবেই, কিন্তু ওর রক্ত না দেখে আমি মরতে পারবো না।'

নিচু গলায় সেনদা বললেন, 'থামো। শত্রুতা করো না, এটা শত্রুতা করবার সময় নয়, হিংসা করবার সময় নয়, মনে-প্রাণে মহাত্মাজীর পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করো।'

'মহাত্মাজীর সব কথা শুনতে রাজী আছি, কিন্তু তাঁর এই মুসলমান-প্রীতি আমি সইতে পারিনে।'

হাত তুলেছেন সেনদা, 'তিনি পিতা, তাঁর কাছে সকলেই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া, চোখ নামিয়ে নিয়েছেন তিনি, মুসলমানরা যে আজ নিজেদের স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করছে, ভেবে দেখতে গেলে তার জন্যে আমরাও কি খানিকটা দায়ী নই? ওদের মনে এই অভিযোগ এই গ্লানি কেন জমেছে? আমাদের অন্যায়েই—'

'অন্যায়! আমাদের।' মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছে সুলেখা, 'কক্ষনো না। আপনার একথা আমি মানবো না, শুনবো না। আমাদের কোন অন্যায় হয়নি ওদের উপর। ওরা নিজেরাই নিকৃষ্ট।'

'তোমার মতো মেয়ের মুখে এটা মানায় না সুলেখা।'

'মানায়, খুব মানায়। আসলে আপনি অন্যরকম হয়ে গেছেন। একদিন এই আপনিই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, সেই লুঠ করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই আপনিই পাহাড়ে পাহাড়ে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, খানায়-খন্দে পড়ে থেকেছেন, নালা-নর্দমার জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, গাছের কাঁচা পাতা, কাঁচা ফল খেয়ে ক্ষুধা মিটিয়েছেন, আর আজকে কিনা আপনি একটা তুচ্ছ মশার মতো লোককে—'

'আর আজকে আমি—' সেনদা হাসলেন। 'পঞ্চাশ বছর বয়সে এটাই উপলব্ধি করেছি, চুরি করা রিভলবার বুকে গুঁজে হত্যার নেশায় বেড়ালের পায়ে চুপি চুপি ঘুরে বেড়ানোই একমাত্র পথ নয়। পথ সত্যি যিনি নির্দেশ করেছেন, তাঁকে অনুসরণ করাই একমাত্র ধর্ম। সমস্ত পৃথিবী যদি আজ এই পথে এসে দাঁড়াতো, সত্যি হয়তো স্বর্গরাজ্য হতে পারতো। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কঠিন পাথর একটার পর একটা বৈপ্লবিক আঘাতে কিছুটা টলমল করেছে বটে, কিন্তু আজ একথাটা খুব ভালভাবেই বুঝেছি—হিংসার বদলে হিংসা দিয়ে জয় হয় না। আমরা চিৎকার করে যতোটুকু ছিনিয়ে নিয়েছি, উনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নিজে থেকেই পেয়ে গেছেন। মারো মরবো, কিন্তু পণ ছাড়বো না। কতো আর মারতে পারে মানুষ বলো? একদিন থামবেই। কিন্তু মারামারি হলে তার শেষ হয় না।' অতএব মনের বাসনা মনে রেখে চুপ করে রইলো সুলেখা।

এর পরে কিছুকাল পর্যন্ত দেশে যেন আর কোন আইন রইলো না, আদালত রইলো না, রাজদরবার রইলো না নালিশ জানাবার। কেবল দস্যুতা, হত্যা, হানাহানি, আর পৈশাচিকতার উল্লম্ফন। যে যাকে পারছে মারছে, কাটছে, খুন করছে। হিন্দু মুসলমানকে আর মুসলমান হিন্দুকে। সারাদেশ জুড়ে এই একটিমাত্র সংজ্ঞা, মারো আর কাটো। হিন্দু-পাড়াগুলো ভেসে গেল মুসলমানের রক্তে, আর মুসলমান-পাড়াগুলো হিন্দুর রক্তে। যেহেতু নওয়াব-গঞ্জ মুসলমানপ্রধান শহর, সেখানে হিন্দুদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো। যে যেমন করে পারলো পালাতে লাগলো শহর ছেড়ে। তার মধ্যে কেউ পারলো, কেউ অর্ধপথেই শেষ হয়ে গেল। গৃহস্থেরা সব ঘরে ঘরে কুলুপ এঁটে মাত্র একটি ঘরে জড়াপুঁটুলি হয়ে বেঁচে রইলো কোন-রকমে, সব বাড়ি এক বাড়ি হলো, সব হাঁড়ি এক হয়ে গেল। লড়াই তো শুধু মুসলমানের সংগে হিন্দুর নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সৈন্য আছে পেছনে, আছে বন্দুক আর কামান। শহরে কারফিউ হলো, একশো চুয়াল্লিশ ধারা হলো, আরো কত কিছু আইন হলো ঠিক নেই তার। রাস্তায় তিনটি মাথা একত্র হলেও পুলিসের কবল থেকে রক্ষা পেলো না কোন হিন্দু। হাতে একটি ছড়ি থাকলেও সেটা মহা-অপরাধ বলে গণ্য হতে লাগলো, আর হাজার হাজার মুসলমান যখন গলার শির ফুলিয়ে 'আল্লা হো আকবর' বলে গগন-বিদারক চিৎকার তুলে এক একদিন এক এক পাড়া লুণ্ঠন করে বেড়াতে লাগলো, সরকারী পুলিসের টিকিটিও দেখা গেল না তখন। শেষে গুর্খা সৈন্যরাও বিদ্রোহ করলো হিন্দুদের বিরোধিতা করায়। তাতে কী, তৎক্ষণাৎ এলো পাঠান সৈন্যের দল, খুলে দেয়া হলো জেলখানার গেট, যতো মুসলমান গুণ্ডাকে ছেড়ে দেয়া হলো বিনাশর্তে শহরের মধ্যে। অবস্থা চরমে উঠলো।

এর মধ্যেই কোন এক দুপুরে সুলেখাদের পাড়া আক্রমণ করলো। বেলা বোধ হয় বারোটা, খেতে বসেছিল সব, লাফিয়ে উঠলেন নিবারণবাবু, কান খাড়া করে বললেন—'ঐ-ঐ—'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'সর্বনাশ।'

সুষমা দেবী দৌড়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে যেখানে ছিলো, সব এসে জড়ো হলো এক জায়গায়। ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল দরজা-জানালা। প্রত্যেক দরজার মুখে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো ভারি ভারি সব আসবাবপত্র: যাতে দরজা ভাঙলেও সহজে ঢুকতে না পারে। সুলেখা বই পড়ছিলো একটা, কান পেতে ছুটে এসে বললো, 'ছাদে, ছাদে চলো। সিঁড়ির মুখ আটকে দাও, এদিকেই আসছে সব।'

নেহাৎ কম লোক নেই বাড়িতে, সবাই সকলকে ঘিরে পড়তে পড়তে ছুটতে ছুটতে, সিঁড়ির মুখে টেনে আনলো যতো বাক্সো-ডেক্সো আর খাট-আলমারি। তারপর

সব এলো ছাদে। চাকরবাকর সব নিয়ে মোট তেরোজন লোক কাঁপতে লাগলো বলির পাঁঠার মতো। বাড়িটা মোটেই নিরাপদ নয়। একে তো পিছনদিকে আম-জাম-কাঁঠাল-কলার বিশাল বাগান, আর পুকুর। সদর ফটকটিও পোক্ত নয়, দেয়ালটা ভাঙা, তার উপরে পুরোনো বাড়ি ব'লে দরজা-জানালাও তেমনি। টের পাওয়া গেল জনস্রোত দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে, ফটাফট আওয়াজ হচ্ছে। চিৎকার, কান্নাকাটি হুড়োহুড়ি- দেখতে দেখতে হু হু ক'রে ভরে গেল গলিটা। শত শত পায়ের লাথিতে গেট ভেঙে গেল সুলেখাদের। দা, শাবল, কুড়ুল দিয়ে নির্দয় হাতে ভাঙতে লাগলো সামনের দরজা। অতর্কিত আক্রমণ হ'লে যেসব সঙ্কেত শিখিয়ে দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকের দল, তার একটাও মনে করতে পারলো না কেউ, সব ভুলে কোন একটা সমবেত আর্তনাদের রোল তুললো আকাশে। নিচের নরস্রোতের দিকে তাকিয়ে কয়েকক্ষণের জন্য সুলেখাও স্তব্ধ হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত লেগে এলো তার, হাতে হাত আটকে গেল, বুকটা ধক ধক করতে লাগলো একটানা যন্ত্রের মতো। তারপরেই সে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। একটা ঝাঁকানিতে জাগিয়ে তুললো নিজেকে, নাক দিয়ে আগুনের মতো নিঃশ্বাস বেরুতে লাগলো, বুকের ওঠাপড়া হাপরের মতো হলো, সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো, হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠলো দুই চোখ। হঠাৎ কোণে জড়ো করে রাখা মাসের কয়লার স্তূপ থেকে বড় বড় চাকা তুলে ক্ষিপ্রগতিতে এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে লাগলো নিজে, দুই হাতে। শুধু তাই নয়, কয়লার পাশে ভাঙা উনুন, ঠ্যাং-ভাঙা চেয়ার, ফেটে যাওয়া জলচৌকি, বারান্দার তক্তা, লোহার কড়াই, ডাম্বেল, শিল নোড়া, পুরোনো ট্রাঙ্ক, বাচ্চাদের ঠেলা গাড়ি—বাঙালী গৃহস্থঘরের স্বভাবদোষে জমানো বহু বছরের যতো কিছু আবর্জনা জড়ো করা ছিলো, সব তুলে তুলে ছুঁড়তে লাগলো চাপ চাপ জনতা লক্ষ্য ক'রে। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না ওরা। কারো মাথা ফাটলো, কারো চোখ গেলো, কারো দাঁত ভাঙলো, শিল-নোড়ার আঘাতে একসঙ্গে তিনটে লোক জখম হয়ে ছুটে পালালো, আর তারপর এক সময়ে দেখা গেল একজোড়া হাত কখন যেন তেরো জোড়া হয়ে উঠেছে। আর ছাদিবশখানা মরিয়া হাতের কয়লা-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াতে পারে, এমন সাধ্য কারো হলো না। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় কোন নতুন শিকারে এগিয়ে গেল উন্মত্ত আবেগে। ততক্ষণে শাঁখ বেজে উঠেছে ঘরে ঘরে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে দুরন্ত ছেলের দল, একজনের নায়কত্বে একশো জন ঝাঁপিয়ে পড়ছে এক হাজারের মধ্যে। কে রুখবে তাদের? কে মারবে?

কিন্তু আগুন লাগলো রাত্তিরে। দুপুরের অপমান ভুলতে পারেনি দস্যুরা, তাই রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রথমে সুলেখাই টের পেয়ে উঠে দাঁড়ালো বিছানা ছেড়ে। চারদিক থেকে সহস্র শিখা লক লক করে দুলছে, আকাশটা লাল, বাতাসে পেট্রোলের গন্ধ। বুকের মধ্যে হাত দুটো জড়ো করে, চোখ বুজে হয়তো বা নিজের আত্মার মুখোমুখিই দাঁড়ালো, অথবা ভগবানের। তারপর ঠেলে তুললো সকলকে। ঘুম আর কী। ঘুম কোথায়? ঘুম কি আছে নাকি কারো? শুধু তারি মধ্যে মানুষ ক্লান্ত হয়েছে, ঢুলে পড়েছে, আচ্ছন্ন হয়েছে তন্দ্রার ঘোরে।

সবাইকে নিয়ে সুলেখা কম্পাউন্ডে এসে দাঁড়ালো। দেখা গেল শুধু তাদের বাড়িতেই নয়, সমস্ত পাড়াটাই জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। লোকগুলো ছুটোছুটি করছে পাগলের মতো! এই আগুন থেকে কোথায় পালাবে? কোন্‌দিকে যাবে? দিশাহারা মানুষ প্রাণের ভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। সামনের দিক থেকে ধেয়ে আসছে এই আগুন; পিছোনো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কোথায় পিছোবে? সুলেখাদের বাড়ির উত্তর কোণে, সরু রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট্ট লম্বাটে ফাঁকা জায়গা ছিল, অন্যদিকে কানাগলি। ঐ ফাঁকা জায়গাটা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা। সারা শহরের ময়লা জমা হতো সেখানে, ময়লা ফেলার গোল গোল ভাঙা লোহার গাড়িগুলো আঁকা-বাঁকা হয়ে পড়ে থাকতো রাস্তা আটকে। ছেঁড়া, ময়লা, নোংরা সব কিছুর ডিপো। দুর্গন্ধে হাঁটা যেতো না পাশ দিয়ে। মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা এসে ন্যাকড়া-কানি পুড়িয়ে গন্ধ-নাশক দ্রব্য ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতো। কয়েকটা দিন বেশ পরিষ্কার থাকতো, আবার যে কে সেই। আবার ময়লার পর্বত আর শকুনি-গৃধিনীর পাখা ঝাপ্‌টানি। বলাই বাহুল্য, সেটা লোকালয় নয়, চলা-ফেরার রাস্তা নয়, কিন্তু ঠিক ঐ জমিটুকু পেরোলেই বংশাল গলি। থিকথিকে মুসলমানের বাস। পাঁচ পা রাস্তায় পাঁচ ঘর বাসিন্দা। বেশীরভাগই ভদ্রব্যক্তি নয়, হয় কসাই নয় গাড়োয়ান, নয় চামড়ার ব্যাপারী। সত্যি বলতে নওয়াবগঞ্জের ভয়াবহ লোক এরাই। এরা হিন্দু গৃহস্থের কাছেও যতো ভয়াবহ, মুসলমান ভদ্র-লোকদের কাছেও তার চাইতে কম নয়।

উপায়হীন হয়ে আগুনের হল্কায় দিশাহারা তিরিশ চল্লিশ ঘর লোক সেই দিকেই ছুটতে লাগলো প্রাণপণে। আগুন থেকে রক্ষা পাবার ঐ নোংরা ফালিটুকুই একমাত্র ফাঁকা জায়গা। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বোঝা গেল, বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। বংশাল গলির মুখ কিরিচে-বল্লমে ঝকঝকে।

সুলেখা মাকে আর দুই ভাইকে নিয়ে পাগলের মতো একবার এদিকে গেল, একবার ওদিকে গেল, আবার গেল, আবার এলো আর তারপর হঠাৎ কে যেন জাপ্‌টে ধরলো তাকে। একজন নয়, দুজন নয়, যেন শত সহস্র বাহু অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে লোলুপ হয়ে উঠলো তার শরীরের উপর। নিজেকে রক্ষা করতে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করতে লাগলো সে। দাঁত, নখ, হাত-পা সব সে ব্যবহার করে ক্লান্ত হলো, তারপর নিজেকে সমর্পণ করলো ঈশ্বরের হাতে। দ্রৌপদীর মতো সে-ও সেই মুহূর্তে গোবিন্দের চরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখলো না। সেই সমর্পণে ভগবান নেমে এলেন কি না কে জানে, তাকে নিয়ে আসা হলো এইখানে, এই নরকে, নওয়াব সুলতান আমেদের 'হাবিয়াদোজখে।' সকলের হাত ছিনিয়ে শেষ পর্যন্ত সুলতান আমেদের লোকেরাই রক্ষা করলো তাকে? রক্ষা! হাসি পায় সুলেখার। রক্ষা বইকি। প্রায় বীর-রীতিমতো জয় করে আনা। প্রায় বীর-ভোগ্যা বলা যায়। ঠোঁটের কোণে তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। হাতের মুঠো আবার শক্ত হয়ে ওঠে, অসাড় হয়ে আসা বুকটা আবার ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে বিদ্বেষে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(ক্রমশ)

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আগুন নেভাবার কাজে ফায়ার ব্রিগেডের ফায়ারম্যানরা অনেক সময় অগ্নিদগ্ধ বাড়ি বা কারখানার মধ্যে আগুন নেভাতে কিংবা কাউকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরাই বিপদে পড়ে যান। এই কারণে এদের মুখোশ ব্যবহার করতে হয় এবং মুখোশের মধ্যে থেকে সহজে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার জন্য সংগে অক্সিজেন সিলিণ্ডারও থাকে। আজকাল এমন বন্দোবস্ত হয়েছে যে এদের নিজেদের অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে অগ্নিদগ্ধ বিপদগ্রস্ত লোকেদের এবং বিপদগ্রস্ত সহকর্মিদেরও প্রয়োজনে অক্সিজেন



অগ্নিদগ্ধ ও সহকর্মীদের অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা

সরবরাহ করতে পারেন। নিউইয়র্কের দমকলে আজকাল আটচল্লিশঘণ্টা ধরে বিপদগ্রস্ত মানুষকে অক্সিজেন সরবরাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া ১০০টি বহনোপযোগী অক্সিজেন সিলিণ্ডার ভরে দেওয়ার মত যথেষ্ট অক্সিজেন ঐ গাড়িতে সবসময় রাখা হয়।

*

এ যুগকে যে কি নামে অভিহিত করা যায় বলা শক্ত। এটাকে অ্যাটমের যুগ, না প্লাস্টিক যুগ না পেনিসিলিনের যুগ বলা হবে বোঝা যায় না। আজকের দিনে পেনিসিলিনই ওষুধের রানী বিশেষ। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পেনিসিলিন সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। এখনও পেনিসিলিনকে ওষুধের রানী বলা যায় কিনা এবং পেনিসিলিন মানুষের অনেক উপকারে লাগে সত্য কিন্তু মানুষের কোনও ক্ষতি করে কী না তাই ছিল ঐ সংস্থার আলোচ্য বিষয়। ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম মানুষের ব্যবহারের জন্য পেনিসিলিন আসে কিন্তু ১৯৪৬ সালে পেনিসিলিন প্রয়োগের দরুণ একটি মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। তারপর আরও তিনবছর পরে আরও একটি ঐরকম মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তারপর এই কয়েক বছরের মধ্যে পেনিসিলিনঘটিত মৃত্যুর হার ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে এবং এখনও বেড়ে চলেছে। ১৯৫৫ সালে ৫৬০টি লোকের দেহে পেনিসিলিনজনিত মন্দ প্রতিক্রিয়া ঘটে, এদের মধ্যে ৮১টি রোগীর অবস্থা মারাত্মক হয়। ১৯৫৭ সালে এই প্রতিক্রিয়ার হার খুবই বেড়ে যায় এবং দেখা যায় যে, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ঐ সালে ১০০০টি রোগীর পেনিসিলিনঘটিত মৃত্যু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেন যে, কোনও সামান্যরকম অসুখেই পেনিসিলিনের ব্যবহার বা যে রোগে পেনিসিলিনের প্রয়োজন হয় না এমন রোগেও পেনিসিলিনের ব্যবহার করায় এমন সব দুর্ঘটনা ঘটেছে বিশেষতঃ পেনিসিলিন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতিরেকেও বাজার থেকে পাওয়া সম্ভব হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে রোগী বা রোগীর অভিভাবক নিজেদের মতেই পেনিসিলিন ব্যবহার বা অপব্যবহার করেছেন এবং এর জন্যও অনেকক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে এইরকমভাবে অপ্রয়োজনে পেনিসিলিন ব্যবহার করার ফলে এত বেশী প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়ে পড়ে যে, প্রয়োজনে ঐসব লোকের ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করলেও তাদের দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেন যে, ডাক্তারগণ যদি রোগীর ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করার পূর্বে জেনে নেন যে, রোগী আগে ঐ ওষুধ ব্যবহার করেছেন কী না এবং ঐ ওষুধের দরুণ রোগীর দেহে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল কী না তা হলে সেইমত ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন। সামান্য অসুখ বিসুখে হয়তো পেনিসিলিনে রোগ সারতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য কোনও ওষুধে রোগ নিরাময় করা যদি সম্ভব হয় তাহলে পেনিসিলিন ব্যবহার না করাই ভাল। যেক্ষেত্রে পেনিসিলিন ব্যতিরেকে অন্য কোন ওষুধেই রোগ সারান সম্ভব হয় না তখনই পেনিসিলিন ব্যবহারের প্রয়োজন।

# গানের আসর

**শার্ঙ্গদেব**

**রসশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংগীত**

সম্প্রতি ভারতীয় সংগীতের অধ্যাত্মবাদ এবং বস্তুবাদ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে গত ২৯শে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের পত্রে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এই যুক্তিপূর্ণ পত্রের জন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের উক্তিটি সম্বন্ধে আমরা এটুকু বিচার করব যে ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের উপর অধ্যাত্মবাদের ও অধ্যাত্মচিন্তার সুদৃঢ় প্রভাব আছে। এর পিছনে তিনি প্রচুর যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, সংগীত মূলত প্রমোদের পরিকল্পনা থেকেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে। অতি প্রাচীন বৈদিক-যুগে সাধারণো প্রচলিত সংগীতের উল্লেখ আমরা পাই না, পেলে বোধ হয় দেখা যেত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও আনন্দ পরিবেশনের জন্যও নানাবিধ সংগীতের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় সংগীত নাটকের মাধ্যমে উন্নতিলাভ করেছে। বলা বাহুল্য নাটকাদির মূল লক্ষ্য আনন্দ বিতরণ। এতদ্ব্যতীত সংগীতের পৃষ্ঠপোষকগণ ছিলেন রাজা, বাদশা, জমিদার যারা অধ্যাত্মচর্চার জন্য সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কথা হচ্ছে যে কোনো বস্তু যখন একটা ইনটেলেকচুয়াল স্তরে ওঠে তখন বিশেষ বিশেষ প্রতিভা তাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেন। যাঁরা অধ্যাত্মবাদী তাঁরা যখন সংগীত রচনা করেছেন বা তাঁদের পরিবেশে যখন সংগীত সমৃদ্ধিলাভ করেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই সংগীতে তাঁদের মনের ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে। এইভাবে সংগীতের একটি বিশেষ ধারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই কারণে সংগীতে অধ্যাত্মবাদের প্রভাবকে স্বীকার করলেও সংগীত পরি-কল্পনার পিছনে যে বস্তুবাদ অতি প্রত্যক্ষ-ভাবেই রয়েছে তাকে সর্বাগ্রে মেনে নিতে হয়। অতএব বস্তুবাদের প্রসংগ তুললে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে হীনমান করা হবে এমনটা আমার ধারণা হয় নি এবং বলা বাহুল্য বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের উক্তিটিকে একটি সাধারণ প্রসংগের অন্তর্ভুক্ত করেই আমি আলোচনার অবতারণা করেছিলাম। এই আলোচনার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিরোধিতার ব্যাপার আদৌ নেই।

যাই হোক, সংগীতে অধ্যাত্মবাদ এবং বস্তুবাদ নিয়ে তর্ক তুললে তার মীমাংসা হবার সম্ভাবনা অল্প। অতএব এই বিরোধের মধ্যে না গিয়ে সংগীতের মূল-বস্তু যে রস সেই প্রসংগে আসাই শ্রেয়। সংগীতের প্রকৃতি যেরকই হোক না কেন তা রসোত্তীর্ণ হল কি না সেটাই বিচার্য বিষয়। অলংকারশাস্ত্রে কাব্য সম্পর্কে রসের যে বিচার হয়েছে সংগীতের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করলে বোধ হয় আমাদের সব তর্কের অবসান হবে। কাব্যের উল্লেখ করছি এই কারণে যে আমাদের সংগীত সর্ব-বিষয়েই কাব্যের আদর্শকে মেনে চলেছে কেননা উভয়েই অনেকাংশে সমধর্মী। সংগীতজগতের চিন্তানায়কগণ সংগীত-বিচারে লল্লোট, উদ্ভট, শংকুক, আনন্দ-বর্ধন প্রভৃতি আলংকারিকদের যথেষ্ট উল্লেখও করেছেন। তাছাড়া শিল্পী বা বাগ্গেয়কারদের প্রধান কর্তব্যই ছিল কাব্য এবং রসশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন।

কাব্যের বিচারে অধ্যাত্মবাদ বা বস্তুবাদের প্রশ্ন ওঠে নি অথচ রসের যে স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে তা উভয়েরই গ্রাহ্য হবার কথা। কাব্য-ফল নির্ণয় উপলক্ষে আলংকারিক বলেছেন কাব্যপাঠে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। সংগীতের ক্ষেত্রেও এটি নিশ্চিতভাবেই প্রযোজ্য। অতএব ধর্ম এবং মোক্ষের সংগে অর্থ এবং কামের ভাগও সমান পরিমাণেই রয়েছে। আর এগুলি লাভ হচ্ছে সুখের সংগে কাব্যানুশীলনের ভিতর দিয়ে। কত পরিশ্রম করেই না বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয় তবে তার ফল মেলে কটু ওষুধের বদলে

মিষ্টি শর্করায় যদি রোগ সারে তবে কে না দ্বিতীয় দ্রব্যটি বেছে নেবে? সংগীত তো আরও আনন্দদায়ক। অতএব লোকে আরও অধিক পরিমাণে সংগীতে প্রবৃত্ত হবে।

কাব্যের স্বরূপ কি সেটি নির্ণয় করার জন্য প্রথমে কয়েকটি মত উপস্থাপিত হল। যথা—শব্দ এবং অর্থের সেই সংযোজনাকেই কাব্য বলে স্বীকার করা হবে যা অদোষ, সগুণ, অথবা সর্বত্র অলংকৃত এবং কদাচিৎ অনলংকৃত। আমরা গীতের ওপরেও এই-গুলিই আরোপ করলুম। এখন প্রশ্ন উঠছে—এই স্বরূপ নির্ণয়ের মধ্যে কি কোন অসংগতি চোখে পড়ে? আলংকারিক বলছেন নিশ্চয়ই পড়ে। একটি একটি করে এই লক্ষণগুলির বিচার করা যাক।

এমন অনেক কবিতা আছে যার উত্তম অংশ অনেক পরিমাণে থাকলেও কিছু দোষ হয়তো বেরুবে। আমরা যদি কেবলমাত্র দোষরহিত কাব্যকেই কাব্য বলে স্বীকার করি তাহলে তো একটু দোষের জন্য অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাকেই বাতিল করতে হয়। অতএব 'অদোষ' শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। গানের বেলাতেও আমরা এক কথাই বলতে পারি। অনেক গানে উত্তম অংশ বৃহৎ পরিমাণে থাকলেও দোষ কিছু না কিছু থেকেই যায়। কেবলমাত্র একটু দোষের জন্য একটা ভালো গানের উৎকর্ষকে অস্বীকার করা যায় না। অতএব অদোষ বললে কাব্য বা গানকে ব্যাপকভাবে নিয়ে বিচার করা চলে না। বাস্তবিক দোষ যেরকমই থাক না কেন রসের অপকর্ষ না ঘটলে তার কাব্যত্বকে বা গীতত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে-পর্যন্ত না রসহানি ঘটছে সে পর্যন্ত দোষ থাকলেও তার কাব্যসত্তা বা গীতসত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে কেননা তা রসোত্তীর্ণ।

এর পরে 'সগুণ' শব্দটি সম্পর্কে আলংকারিক বলছেন রসের যে ধর্ম তাই তো গুণ। রস বললে স্বাভাবিকভাবে গুণও স্বীকৃত হয়। শব্দ এবং অর্থের মধ্যে রস-বস্তু আছে কিনা সেইটাই প্রধানত বিচার্য। যদি রস না থাকে তাহলে তা নির্গুণ: আর যদি রস থাকে তাহলে 'সগুণ' না বলে 'সরস' বললেই যথার্থ ভাব প্রকাশ পায়। 'সগুণ শব্দ আর অর্থ'—এই কথায় যদি এই বুঝি যে, যে-শব্দ এবং অর্থ গুণের অভিব্যঞ্জনা করে তাই কাব্যে প্রযুক্ত হবার যোগ্য তাহলেও এই কথাই বলতে হয় যে, এতে কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় মাত্র কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। এমন একটা কথা আছে যে কাব্যের শব্দার্থ হচ্ছে শরীর, রস আত্মা, গুণ শৌর্যাদির প্রতীক, দোষ দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতির মত, রীতি অবয়ব সংস্থানের মত আর অলংকার গয়নার মত শোভা সম্পাদক। আমরা গীতকেও এই-ভাবে তুলে ধরতে পারি। এক্ষেত্রে গুণ হবে দক্ষতার প্রতীক এবং দোষ হবে শ্রুতি-বিরোধ, কালবিরোধ প্রভৃতি ব্যর্থতার প্রতীক। অতএব গানের বেলাতেও 'সগুণ' আখ্যার চেয়ে 'সরস' আখ্যাই যে সমীচীন সেটি প্রমাণিত হয়।

'সর্বত্র অলংকৃত এবং কদাচিৎ অনলংকৃত —এই লক্ষণের প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত নয় কেননা অলংকারও কেবলমাত্র কাব্যের উৎকর্ষই সাধন করে।

এর পরে কাব্যের দিক থেকে বিচার করে আরও অনেক মতের খণ্ডন করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সংগীতের প্রসংগে অবান্তর। অবশেষে কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করে আলংকারিক বলছেন রসাত্মক বাক্যই হচ্ছে কাব্য। রসই হচ্ছে কাব্যের সার এবং সেই কারণেই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা।

তাহলে আমরা গীতের স্বরূপ নির্দেশ করে কি ওই একই কথা বলব? কিন্তু তা আমরা বলতে পারি না কেননা কাব্য রসাত্মক বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গীত শুধু বাক্যের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয় তাতে সুর আছে, তার ব্যাপকতা আরও বেশি। আবার বাক্য ছাড়া অনিবদ্ধ গীতের অস্তিত্বও রয়েছে—সেক্ষেত্রে আমরা কি দিয়ে সংগীতের স্বরূপ নির্ণয় করব? আমার মনে হয় এইখানে আমরা ধ্বনি অথবা নাদ এই দুটি শব্দের প্রয়োগ করতে পারি। সংগীতশাস্ত্রে ধ্বনি শব্দের প্রাধান্যই সমধিক। ধ্বনি থেকেই তো বর্ণ, স্বর, পদ, বাক্য, মহাবাক্য, বেদ,শাস্ত্র সবই পরিব্যক্ত হয়েছে। অতএব সংগীতের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের বলতে হয় রসাত্মক ধ্বনিই হচ্ছে সংগীত।

এই রসের অনুভূতি কিরকম সেটিও আলংকারিক বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কাব্য বা সংগীত যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে তখনই এক অখণ্ড, আনন্দমিশ্রিত, জ্ঞানরূপ, অন্যান্য জ্ঞেয়পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, অলৌকিক বিস্ময়কর রসসত্তার সংগে একেবারে অভিন্নভাবে পরিচয় ঘটে। এই অনুভূতি নাকি ব্রহ্মজ্ঞানেরই সমতুল্য।

যাঁরা অধ্যাত্মবাদী তাঁরা এই লক্ষণকে আধ্যাত্মিক বলে গ্রহণ করেন আর যাঁরা তা নন তাঁরা রসের এই অনুভূতিকে প্রকৃত আনন্দ বলে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মাস্বাদ কি তা আমরা জানি না তা আমাদের কাছে অপ্রত্যক্ষ কিন্তু রসানুভূতির যে আনন্দ চমৎকারিত্ব এবং অভিনত্ব তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। তাই আলংকারিক এই অনুভূতিকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাত্মবাদ এবং বস্তুবাদের বিরোধের মধ্যে না গিয়ে প্রকৃত রসের সন্ধান মিললেই আমরা চরিতার্থ বোধ করব।

# আলোচনা

**গানের আসর—রবিশংকর**

সবিনয় নিবেদন,

২৯শে কার্তিকের 'দেশ' 'গানের আসরে' রবিশংকরের বিষয় শার্ঙ্গদেবের আক্রোশপূর্ণ লেখাটি পড়ে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম। রবিশংকর যদি "বেপরোয়া" মন্তব্য করে 'অবিদ্যার আস্ফালন' করেন তবে ইনিও একইভাবে তার উত্তর দিয়েছেন, বরঞ্চ একটু বাড়িয়ে, ভীমদর্পে রঙ্গমঞ্চে অহেতুকভাবে গদা ঘুরিয়ে। সেইজনাই তার এই লেখাটির ঘোরতর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন এবং রবিশংকর যে কিছু ভুল বলেননি তারও প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

সংগীত সম্বন্ধে দুই ধরনের লেখক এখনকার দিনে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় লেখেন। প্রথম দলে আছে, সাধারণ দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকার তথাকথিত "সংগীত সমালোচক", যারা বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানের রিপোর্ট ও সমালোচনা লেখেন। এই দলের লেখকরা বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতীয় উচ্চসংগীত সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বম্বের প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকার "সংগীত সমালোচক"দের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। ভাল সমালোচক হবার জন্য যে বিরাট জ্ঞানের প্রয়োজন, তাত এঁদের কোনদিনই নেই, উপরন্তু সাধারণ জ্ঞানও নেই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে এরা কোন "রাগ", একজন শিল্পী বাজাচ্ছেন বা গাইছেন তাও ধরতে পারেন না। স্বরলিপি বা অন্যান্য জটিলতার কথা বাদই দিলাম। শিল্পী যদি কোন সময় রাগের পূর্বোল্লেখ না করেন যেমন কেবল নাই, বহু সময় কি রাগ ঘোষণা করতে নারাজ হন, তখন তাঁরা ফ্যাসাদে পড়েন। অন্যদের জিজ্ঞাসা করতে হয়। অন্যের মতামত বা শোনা কথার উপর নির্ভর করে কতগুলি বাঁধা বুলির "থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়" করে নিজেদের অজ্ঞতা জাহির করেন ভাষার মারপ্যাঁচ।

দ্বিতীয় দলে আছেন সংগীত শাস্ত্র সম্বন্ধে পণ্ডিত কয়েকজন। শার্ঙ্গদেবও এই দলে। এদের বেশীভাগই কথায় কথায় "নাদব্রহ্ম" আর নাট্যশাস্ত্র উদ্ধৃত করেন। এই সব বই পড়া পণ্ডিতরা থিওরী নিয়েই চর্চা করেছেন, প্র্যাকটিক্যাল চর্চা তাদের মধ্যে কিছু নেই। বোধ হয় এঁদের কথা মনে করেই শক্ত ভাষায় রবিশংকর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এরা সর্বদা ভরত, সংগীত রত্নাকর, মল্লিনাথ, কল্লিনাথ, টীকা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন, যার এখনকার দিনের সংগীত বিচার সম্ভব নয় এবং তা করতে যাওয়া নিরেট মনেরই পরিচয়। এঁরা পুরোনো শাস্ত্রে মাথা ঠুকে মরছেন, অথচ পাশ্চাত্ত্য দেশে এ যুগের সংগীত সমালোচকদের মত, যুগোপযোগী কোন নতুন তত্ত্ব, অ্যাসথেটিকস ভারতীয় সংগীতের জন্য লিখতে পারেননি। এঁরা সেই পুরাতনেরই চর্বিতচর্বণ করছেন।

রবিশংকরের মত শিল্পীরা যে সাধনা ও চেষ্টায় প্রয়োগশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেন, তার চেয়ে অনেক গুরুতর পরিশ্রমে থিওরিস্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয় এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগবিদ্যাও তাঁদের জানতে হয়, লেখকের এ ধরনের উক্তি আমরা মেনে নিতে পারি না। প্রয়োগ শিল্পে অযোগ্যরাই শেষ পর্যন্ত সমালোচকের দলে ভিড়ে পণ্ডিত হন, এমনই দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায়।

শাস্ত্র গ্রন্থাচারী পণ্ডিতদের তথ্য এবং তত্ত্ব-বিষয়ে যোগ্যতা স্বীকার্য। কিন্তু রস-বিচারের যোগ্যতার ক্ষেত্রে তাদের খুবই সতর্ক থাকা দরকার। তথ্য এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে ও ক্ষেত্র গুণী শিল্পীদের, পণ্ডিতদের তুলনায় যোগ্যতা না থাকতে পারে, কিন্তু রসের জগতে তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য, কারণ তাঁরা রসিক এবং রসের সাধক। সুতরাং আমাদের মত সাধারণ শ্রোতাদের কাছে রবিশংকরের মতামতেরই মূল্য অধিক। পণ্ডিতরা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের পূর্ণতা সাধন করছেন, এমন কথা কেউ স্বীকার করবে না।

"রাতারাতি বিখ্যাত রবিশংকর" কথাটি যে প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন, তাও মোটেই যুক্তিসংগত নয়। সবাই জানে যে, ভারতীয় উচ্চ সংগীতে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। শিল্পীদের জনপ্রিয়তা শুধু সমালোচকদের লেখার উপর নির্ভর কোনদিনই করেনি, আজও করে না। তাদের জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁদের আর্টের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। সেইজন্যই সমালোচকদের লেখার জন্য তিনি বিদেশে আমন্ত্রিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন বা বেশী পারিশ্রমিক পাচ্ছেন—এ সব কথা বলা নিতান্ত বাতুলতা ও নিজেদের বড্ড বেশী বাড়ানো।

"রাত আড়াইটে থেকে সকাল পর্যন্ত এক ঘেয়ে ঝালার সঙ্গে অবিশ্রান্ত তবলার দাপাদাপি"র কথা তুলে, রবিশংকর প্রমুখ গুণীদের বাজনাকে "তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা" বলে, শার্ঙ্গদেব নিজের রসবোধ ও

সংগীত জ্ঞান সম্বন্ধে শুধু যে সন্দেহ জাগিয়েছেন তা নয়, রবিশংকরের সংগীত সম্বন্ধে অজ্ঞতারও প্রকাশ করেছেন। অপর পক্ষে সমালোচকের আরেকটি বিপরীত নমুনা দিই। এখানকার দুজন প্রখ্যাত সমালোচক সেদিন আক্ষেপ করছিলেন আমার কাছে যে, রবিশংকর সেতার বাদনের "ঝালা" অংশকে অবহেলা করেন, এবং আরেকজন শিল্পীর তুলনায় "ঝালা" অংশ কম বাজান। এখন কার কথা ধরব।

বিদেশী সংগীত অর্থাৎ বাক, বিটোফেন-এর সঙ্গে গোপাল নায়ক, তানসেন ইত্যাদির কথা তুলে, লেখক ভারতীয় ও বিদেশী সংগীত ধারার মূল পার্থক্যটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন বলে মনে হল। আমাদের দেশে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কিছুই সুরক্ষিত হয়নি। ভারতীয় চরিত্র পূর্বে কোনদিনই ঐতিহাসিক মনোভাবাপন্ন ছিল না। সেই জনাই বহু বিষয়ে আমাদের কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না, কারণ আগেকার দিনে এ বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম না। তাই অনেক কিছু বিলুপ্তির মধ্যে।

সংগীত শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা, সমালোচকরা বা শিল্পীরা সকলেই যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, রেষারেষি ভুলে গিয়ে একে অপরের পরিপূরকরূপে কাজ করেন তবেই ভারতীয় সংগীতের প্রগতি হবে। অহেতুক বাগবিতণ্ডা, আক্রোশ ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করাই ভাল। গুণী শিল্পীদেরও বলব যে তারা যেন শিল্পের মাধ্যমেই তাদের বক্তব্য প্রমাণিত করেন শ্রোতাদের নিকট। বক্তৃতা বা প্রেস কনফারেন্স করে কিম্বা লিখে তা করতে গেলে, অযথা তাঁরাই ফ্যাসাদে পড়বেন, কারণ সেটা তাঁদের ক্ষেত্র নয়। ইতি—সলিল ঘোষ, হিন্দু কলোনী, বোম্বাই।

(লেখকের বক্তব্য)

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীসলিল ঘোষ মহাশয়ের চিঠি ছাড়া আরো একাধিক চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। এই সুযোগে আমি সব চিঠি সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

প্রথমেই বলে রাখি প্রয়োগশিল্পে রবিশংকরের দক্ষতা, চাতুর্য এবং প্রতিভার অস্বীকার আমরা কখনই করিনি। প্রখ্যাত শিল্পী হিসাবে তিনি যে গৌরব অর্জন করেছেন তাতে প্রত্যেক রসিক ব্যক্তিই তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন এবং প্রতিটি পত্র পত্রিকাও তাঁর গৌরব বিশেষ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। অতএব এ বিষয়ে তাঁর প্রতি আমার আক্রোশের ইঙ্গিত যারা করেছেন তাদের অভিযোগ অসঙ্গত।

রবিশংকরের সঙ্গে আমার মতানৈক্য ঘটেছে তাঁর এমন দু একটি মন্তব্য নিয়ে যেগুলির সঙ্গে সাঙ্গীতিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু বাদ প্রতিবাদ যে রকমই হোক সম্প্রতি শারদীয়া 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় "ঢেনী ফলের দেশে" নামক প্রবন্ধে সমগ্র সংগীতবিদ্যা এবং সংগীতশাস্ত্রীদের প্রতি যে ভাবায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা শিল্পীসুলভ সৌজন্যকে অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ করেছে এবং তার কোন সঙ্গত কারণও ছিল না। কিন্তু সুচিন্তিতভাবেই যদি এই সব অভিমত ব্যক্ত হয়ে থাকে তাহলে তার উপযুক্ত প্রতিবাদ আবশ্যক। এই কারণেই আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। যতখানি আঘাত আমরা পেয়েছি ততখানি আঘাত ফিরিয়ে দেবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। তথাপি যাঁরা দুঃখ পেয়েছেন তাঁরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে আমাকে মার্জনা করবেন।

এই প্রসঙ্গ ভিন্ন পত্রলেখকগণ আর যা লিখেছেন তার উত্তর ইতিপূর্বে বহুবার আমি দিয়েছি আর নতুন করে কিছু বলতে চাই না। ইতি—

শাঙ্গদেব

'বর বড় না কনে বড়'

সবিনয় নিবেদন,

১৫ই নভেম্বরের দেশ পত্রিকায় শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত "বর বড় না কনে বড়" প্রবন্ধটি পড়িলাম। তিনি নারী ও পুরুষের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহার একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না। নারী জাতির প্রকৃতি সম্বন্ধে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "সত্যি যার এতটুকু রূপ আছে, সেই রকম কোন বিচিত্ররূপিণীই কি হলপ করে বলতে পারবেন যে তিনি রূপের চর্চা করেননি আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারুর চেতন বা অবচেতন মনকে রূপে ভোলাবার এতটুকু চেষ্টা করেন নি? মেয়েদের এ মধুকরী বৃত্তি যা ইভের সময় থেকে আজও এক।" নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত এইরূপ মন্তব্য করার অধিকার কাহারও নাই। কারণ বিশাল পৃথিবীর সব কিছু জানা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সাধারণত নারী দেহসজ্জা করিয়া পুরুষের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত নারী জাতিকে এইরূপ দোষে অভিহিত করা ঠিক নহে। সাধারণত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ষড়রিপু বর্তমান, রিপুর প্রাবল্য নারী বা পুরুষ বিচার করে না। হয়ত কোনো নারীর মধ্যে বা কোনো পুরুষের মধ্যে অধিক পরিমাণে বর্তমান। পুরুষ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ ইহা সত্য নহে। পুরুষও যে নারীর চক্ষে আপনাকে মনোহর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। তাহা হয়ত বস্ত্রাভরণে দেহ সজ্জিত করিয়া নহে, অন্য উপায়ে করে। কিন্তু উদ্দেশ্য এক। পথ হয়ত ভিন্ন। মূল কথা এই যে, জীবের ধর্মই এই, অপরের চক্ষে নিজেকে মনোহর করিবার চেষ্টা করে। যাক ইহার বিবরণ দেওয়া আমার চিঠির প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তবে আমার বক্তব্য এই যে, এমন কয়েকজন নারী দেখিয়াছি যাহারা অমিত সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইয়াও আপন রূপ ও দেহ সজ্জা দ্বারা পুরুষের মন হরণ করিবার চেষ্টা করেন নাই এবং এই মধুকরী বৃত্তিকে যথেষ্ট ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এমন নারী আছেন, যিনি বলেন "রূপে তোমায় ভোলাব না"। কুৎসিত এবং নিতান্তই গ্রাম্য নারীকে অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সুপুরুষও ভালবাসিয়াছে এইরূপ ঘটনাও ত বিরল নহে। সুতরাং কিছু সংখ্যক নারীর এইরূপ মধুকরী বৃত্তি দেখিয়া সমস্ত নারী জাতির বিচার করা কি উচিৎ? নমস্কারান্তে—

শিপ্রা রায়চৌধুরী

( লেখকের বক্তব্য )

সম্পাদক সমীপেষু,

আমার বক্তব্য এই—

১। 'রণং দেহি' মনোভাব নিয়ে কোনপক্ষকে খাট করার জন্য লেখাটি লিখিনি। বলার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ছিল তা যাঁর মনগোচর হয়নি, তাঁর কাছে আমি নিরুপায়।

২। সব কিছুরই যে ব্যতিক্রম থাকে তা পাঠিকা নিজেই মানছেন।

৩। তাছাড়া সমস্ত মেয়ে সম্বন্ধে একজন কারুর জানা সম্ভব নয় (হয়তো বা উচিতও নয়!), তাই statistic-এর সাহায্য নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে।

৪। পাঠিকা বলেছেন, 'পুরুষ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ ইহা সত্য নয়!' এ কথা আমিও একবাক্যে স্বীকার করছি; 'ভাল মানুষ নইরে মোরা, ভাল মানুষ নই!' নমস্কারান্তে—

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

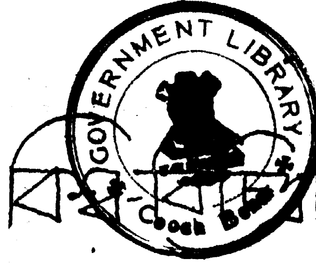
২১-১১-৫৮

জুয়ায় জিতবার জন্যে কালিঘাটের ফুল পকেটে রাখা, মানৎ করা, হাত দেখানো, মাদুলি-কবচ ধারণ করা ইত্যাদি ধরণের তুকতাক শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই ধরণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক দেখা যায়;—প্রগতি-শীল লোকেদের সংগে অশিক্ষিত অনগ্রসর লোকের এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে অনেকে স্বপ্নের ওপরও আস্থা দেখায়। আমেরিকাতে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বইয়ের বহুল প্রচলন। ইতালির সবচেয়ে প্রিয় বই হচ্ছে 'কাবালা' ও 'স্মোর্ফিয়া'। স্বপ্নে যদি দেখেন যে একটা সাদা বাছুর মাঠে লাফঝাঁপ করছে অথবা আপনি আপনার মার কাছ থেকে আশীর্চুম্বন লাভ করছেন, তাহলে, 'স্মোর্ফিয়া'র মতে আপনি আট নম্বর বাজি খেলবেন।

মালয়ীদের মধ্যে বই পড়ে তুকতাক জানবার স্পৃহা কম। ওদের ভরসা যাদু-বৃক্ষ এবং সেই গাছের গোড়ায় পুজো দিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে জুয়ায় জেতার কল্পনা করে। ১৯৫৩তে গভর্নমেণ্ট ঐরকম একটা গাছ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় কারণ ভীড়টা জঘন্য আকার ধারণ করতে থাকে।

ক'বছর আগে মণ্টি কার্লো ক্যাসিনোতে বুদ্ধিতে শানানো বিবেকহীনতার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক মার্কিন জেলা সব জুয়াড়ীদেরই জিতবার বলবতী অভি-প্রায়, এবং শেষ পর্যন্ত সকলেরই তার লক্ষ্য করে উঁচতো মনস্তত্ত্ব খাটালো। চট করে সে সৌহার্দ্যভাবাপন্ন এক ফরাসী ভদ্রলোককে একটা মিত্রের বিনিময়ে ভাড়া করে নিলে এবং একটা বাজী ধরিয়ে তাকে জানালো যে বিশ মিনিটে যদি সে সব হারাতে পারে তাহলে তাকে একটা বোনাস দেবে। ফরাসী লোকটি নিজেকে বাঁচাতে হেরে যেতে পারলে না। দু ব্যক্তির ধীর প্রচেষ্টায় সে অনবরতই জিতে গেল এবং মার্কিন লোকটি জিৎ নিয়ে চলে গেল। ক্যাসিনোর পৃষ্ঠ-পোষকরা যারা জিতবার অভিপ্রায়ে প্রতি বছরে ক্যাসিনোর টেবিলে প্রায় আড়াই কোটি টাকা দেয় তাদের কাছে ওপরের ঐ দৃষ্টান্তটি মনে ধরবার মতো হয়নি।

সমগ্র পৃথিবীতে জুয়া খেলায় নিয়োজিত হয় এমন অর্থ যা হিসেবের মধ্যে পাওয়া যায় তা হচ্ছে দশ হাজার নশ আটচল্লিশ কোটি টাকা। দশটি দেশ আছে যারা প্রত্যেকে বছরে প্রায় পৌণে পাঁচশ কোটির বেশী পরিমাণ টাকা জুয়া খেলে। এদের মধ্যে একা যুক্তরাষ্ট্রই খেলে সাত হাজার একশ চল্লিশ কোটি টাকা। গ্রেট বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়া প্রায় [illegible] সাতশ কোটি টাকা খেলে থাকে। এই তালিকায় ভারতের স্থান [illegible] বছরে টাকা খাটে প্রায় একশ আশি কোটি।



*

সাধারণ সুন্দরী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যে কাঁদলে তাদের ভারী সুন্দর দেখায়। ফ্লোরেন্সের খ্যাতনামা রূপপরি-চর্যা বিশারদ জর্জিয়া ম্যাতিৎসোর মতে যৌবন ও সৌন্দর্য রক্ষায় কান্নার চেয়ে ফল-প্রদ আর কিছু নেই। তার মতে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই নিজের সৌন্দর্য কেঁদে বাড়াতে পারে, তবে কান্নাটা ঠিকমত হওয়া চাই।

ম্যাতিৎসোর শত শত মহিলা মক্কেল সৌন্দর্যের জন্য কান্নার রীতি শিক্ষা করে যায়। এর জন্যে ওরা মোটা রকমের ফি দেয়। মক্কেলদের ম্যাতিৎসো প্রতিদিন কম-পক্ষে বিশ মিনিট কাঁদায় এবং কাউকে চোখের জল মুছতে দেওয়া হয় না। ম্যাতিৎসোর উপদেশ হচ্ছেঃ "চোখের জল গাল বেয়ে প্রবাহিত হতে দাও। জলটা চামড়ায় প্রবেশ করা চাই। চোখের জলে মুখের বর্ণ সুন্দরতর হওয়ার সংগে ঘৃণা, অসন্তোষ ও দুঃখ ধুয়ে যায়।"

*

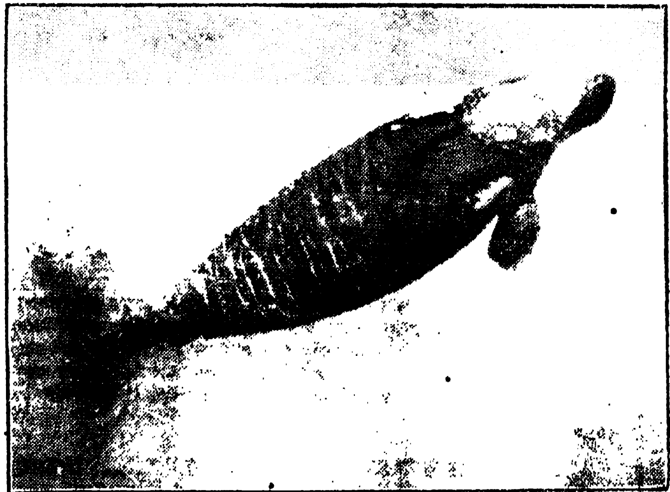
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যক্তি পাঁচ বছর ধরে মানুষের নাক ডাকার তথ্য নিয়ে অনু-শীলন করে 'প্রত্যেকেই' কোন না কোন সময়ে নাক ডাকায় বলে ঘোষণা করায় প্রতি-বাদের একটা ঝড় বয়ে যায়। অগণিত লোক জানায়ঃ "আমরা কক্ষণো নাক ডাকাই না।"

ঐ বিশেষজ্ঞের উত্তর হচ্ছে, "হ্যাঁ সকলেরই নাক ডাকে, তবে বেশীর ভাগ লোক এমন আস্তে নাক ডাকায় যাতে অপরে বিরক্ত না হয়। দশজনের মধ্যে মাত্র এক-জনের নাক ডাকা হয় ভয়াবহ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তার (পুরুষ বা মহিলা) ওবিষয়ে কোন চেতনা থাকে না।

নাক ডাকা মুখ খোলা বা বন্ধ উভয় অবস্থাতেই ঘটতে পারে। টাগরার কাছে একটা নরম তালুতে নিঃশ্বাসের ঝাপ্টা লাগার ফলে শব্দ হয়। এবং নাকডাকা সারবার কোন দাওয়াই নেই।

মানুষের অনেক রোগকেই জয় করা বা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু নাক-ডাকার সংগে আজো পেরে ওঠা যায়নি। পাশ্চাত্যের অনেক দেশের হাসপাতালে বহু অর্থ ব্যয়ে সাউণ্ড-প্রুফ ওয়ার্ড তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। তাতে রাস্তার গোল-মালের শব্দকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়েছে, জুতোর খটখট, ট্রলির ঘটাং ঘটাং শব্দও দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সম্ভব হয়নি কেবল নাকডাকার শব্দ প্রতিরোধ করা।

কোন কোন হাসপাতালে কেবলমাত্র নাক-ডাকিয়েদেরই জন্যে আলাদা ওয়ার্ড করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওরা পরস্পরের ঘুম



**কিছুদিন আগে উত্তর মোম্বাসার কাছে মালিন্দিতে এই অদ্ভুত-দর্শন দুটি জীব ধরা হয় এবং ওদের তুলে নিয়ে একটা হোটেলের পুকুরে রেখে দেওয়া হয়। ওদের ভাব-ভংগী ও আচরণ ফিল্মে তুলে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই দুষ্প্রাপ্য জীবকে জীবন্ত ধরা নাকি [illegible] কঠিন এবং শোনা যায় যে, যে ধরনের জলজন্তুদের নিয়ে জলপরীর উপাখ্যানের উদ্ভব এরাও নাকি তাদেরই জাতের**

ভাঙিয়ে দিয়ে নার্সদের আরো কাজ বাড়িয়ে দেয়।

বৈজ্ঞানিকরা নাক ডাকার আওয়াজের পরিমাণ মেপে দেখেছেন। মাঝামাঝি নাক ডাকিয়ে একজন চল্লিশ ডেসিবল শব্দ উৎপাদন করে যা একখানি মোটরগাড়ির ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে চলার সামিল। বেজায় নাকডাকিয়ে নব্বই ডেসিবল পর্যন্ত শব্দ উৎপাদন করতে পারে—একখানা লরীর পাহাড়ে চড়ার সময়কার আওয়াজের সমান।

*

কিছুদিন আগে জার্মানীর প্যাসোতে হারাণো সম্পত্তির দপ্তরে চারদিন ধরে একটা তোতাপাখীর মুখ থেকে তার নাম 'হান্সি' এছাড়া আর কোন কথা কিছুতেই বের করা যাচ্ছিল না। হঠাৎ একসময়ে যাজকদের কলার পরা এক ব্যক্তি সেই দপ্তরে এসে প্রবেশ করতেই পাখীটা বলে উঠলোঃ "প্রাতঃপ্রণাম হই যাজক মহাশয়"।

শুনেই একজন পাখীটিকে প্রশ্ন করলে "তোমার ঠিকানা কি?" এবার অসঙ্কোচে পাখীটি প্যাসোর একটা বাড়ির ঠিকানা বললে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল বাড়িটি এক যাজকের এবং তাঁর তোতাপাখিটি হারিয়েছে। হারানো তোতা ফিরে পেয়ে যাজক আনন্দে অশ্রুগদগদ হয়ে উঠলেন।

তোতাপাখির মুখ খুলতে থাকলে প্রথমেই সে আরম্ভ করে তার মালিকের মুখের কথা অনুকরণ করতে। সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই সে তার মালিকের কাছ থেকে শেখা যে-কোন শব্দই উচ্চারণ করতে পারে।

লণ্ডনে এক ব্যক্তি তোতাদের কথা শেখাবার জন্য একটি স্কুল খুলে তিরিশটি ছাত্র পেয়েছিল।

তার পদ্ধতি ছিল এককালে একজনের ভার নিয়ে যে কথাগুলো তাকে শেখাবার শিখিয়ে দেওয়া। সাধারণত ছোট্ট কথা একটা শিখিয়ে দেওয়া হতো পাখিটাকে।

কথাটি সে নির্ভুল বলতে পারছে বুঝলে শিক্ষক সেই পাখিটিকে নিয়ে অপর পাখিগুলির সঙ্গে ছেড়ে দিত এবং তাতেই কাজ হত। শেখানো পাখিটির মুখ থেকে অপর পাখিও শিখে নিত।

বছর কতক আগে এক বাণিজ্য জাহাজের কর্তার মেয়ে তোতাপাখিদের দিবা গালাতে শেখানোর বিরুদ্ধে একটা জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। মেয়েটি বলেঃ "তোতাপাখি পোষাতে আনন্দ আছে কিন্তু ওদের ওপর মমতা যেতে বসেছে কারণ কতকগুলো দুর্মতিসম্পন্ন ব্যক্তি ওদের যত জঘন্য কথা বলতে শেখায়।"

লণ্ডনের পশুশালায় একটা পাঁশুটে রঙের তোতার কথা শোনা যায় যাকে একটা খালের তীরের ধারে রাখা হয়েছিল। খালে গুণ টানার সময় ঘোড়াদের হুকুম দিতে মাঝিদের হাঁক দিয়ে গালাগাল শুনে শুনে পাখিটি সেসব অনুকরণ করতে শেখে।

অনেক সুবাধ্য ঘোড়া পাখিটির হাঁক শুনে থেমে পড়তে আরম্ভ করে। মাঝিরা তাতে রেগে গেলেও পথচারীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখির কাণ্ড উপভোগ করতে থাকে।

১৯২১ সালে প্যারিসের এক প্রাসাদ-নিবাসী এক ধনী ফরাসী ভদ্রলোকের তোতাটি একদিন "চোর", "চোর" বলে হাঁক দিয়ে ওঠে। সময়টা তখন রাত তিনটে থাকায় এবং সত্যিই সামনে কেউ না পড়লে তোতাপাখিটির মুখ খোলার অভ্যাস না থাকায় ভদ্রলোক ব্যাপারটি কি দেখতে বের হলেন।

ভদ্রলোক ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলেন যখন সত্যিই একটা চোর পাখির চীৎকার শুনে জানলা টপকে পালাবার চেষ্টা করছিল।

এ ধরনের অনেক কাহিনী এদেশেও শোনা যায়। কণ্ঠস্বর নকল করার ক্ষমতা তোতাপাখিদের গৃহস্থের প্রিয় পোষা করে রেখেছে প্রায় সব দেশেই।

*

বৃটেনের বড় বড় রেস্তরাঁয় বর্তমানে শামুকের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। চাহিদাটা অবশ্য আসে প্রধানত ফরাসী পর্যটকদের কাছ থেকে। সাধারণত ইংরেজরা শামুকের ভক্ত নয়।

একটি রেস্তরাঁর মালিক বলে যে, বছরে সে এক লক্ষ ভক্ষণযোগ্য শামুক আমদানী করে এবং তার ফরাসী পাচক দাবী করে যে, সে শামুক দিয়ে অন্তত বার রকমের ভিন্ন ভিন্ন পদ রান্না করতে পারে।

প্যারীসে বছরে পাঁচ কোটির বেশী শামুক ভোজনবিলাসীদের পরিবেশিত হয়। বহু পরিমাণ শামুক যুক্তরাষ্ট্রেও চালান যায় কারণ ওখানে বয়স্কদের অনেকে নাকি খেতে ভালবাসে।

*

রেলে কতরকমের জাল জুয়োচুরির খবরই তো আজকাল কাগজে বের হচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সের পিয়ের দেস্তেরের পথ বোধহয় এখনও এখানে কেউ ধরেনি। দেস্তের ইনস্পেক্টরের একটা পোশাক কিনে সেটি পরে অবাধে দু বছর ট্রেনে করে বেড়াতে থাকে। ধরা পড়লো যেদিন রেলকর্মীদের ক্যান্টিনে খেতে গেল। কারণ ফ্রান্সে নিয়ম হচ্ছে, রেল ইনস্পেক্টররা কখনো রেলকর্মী-দের ক্যান্টিনে খায় না।

## প্র বা ল দ্বী প

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তুমি যেন ধরণীর তিলে তিলে গড়া ইতিহাস,
জীর্ণ কঙ্কালের স্তূপে অঙ্কুরিত প্রাণের আভাষ;
তুমি যেন বাল্মীকির অতীতের শিলাখণ্ড হ'তে,
ধরণীর বক্ষ জুড়ে' পড়ে আছ কালজয়ী স্রোতে।

মৃত্যুর মহিমা বুকে এঁকে যাও শাশ্বত জীবন,
তোমার উষর ক্ষেত্রে মাথা তোলে পুষ্পিত কানন,
নারিকেলতরুকুঞ্জে কবেকার কঙ্কাল-সাহারা
সাগরবায়ুতে আনে ভুলে-যাওয়া সৃষ্টির ইশারা।

তবু চলে ঊর্মিতলে ক্ষুদ্র জীবনের ভাঙাগড়া,
মৃত্যুর শৃঙ্খলা মাঝে ধরণীরে করে মনোহরা,
কালের নিঃশব্দ গতি ক্ষুদ্র কীটে করে সমহান,
কঙ্কাল ভেদিয়া জাগে আবার সে রূপান্তর প্রাণ।

অলক্ষ্যের ইতিকথা মুখরিত পত্রের মর্মরে,
বিধাতা হাসেন বসি আপনার সৃষ্টির অন্তরে।

## চি ঠি

চিত্ত ঘোষ

ঠিকানা মনেই আছে। রাস্তার [illegible] নাম, বাড়ির নম্বর
অচেনা গলির মধ্যে একতলা কী দোতলার ঘর
দরজায় চিঠির বাক্স। সকালের জানলা খুলে রোদ দেখায় বাড়ি
উঠোনে ঝোলানো তারে হাওয়ায় দোলে কারো শাড়ি
টেবিলে নতুন বই, ঘরের প্রহরী তালা চাবি
কী নিয়ে উদ্বেল হই? রোজই ফিরে চিঠি লিখব ভাবি।

কেন যে অস্পষ্ট, রবার-পেন্সিলের দাগ মোছা মুখের ছায়ারা
কী হবে ঘামিয়ে ভেবে, জেগে জেগে রাত্রি ভোর-করা
রক্তের বিস্ময়। আসমানি আকাশ-ভরা বন্দরের ডাল
সোনার ঝিলিক-খোলা কী দারুণ প্রথম সকাল
কী উদ্দাম নদী! দু পাতার চিঠি লেখা কিছু নয়,
খুবই তো সহজ
চাইলেই হাতের কাছে শুকনো, সাদা চিঠির কাগজ।

সে-ইচ্ছে অঙ্গার শুধু। কোন দিন হয়তো মনে হবে
রক্তের পড়ন্ত গান এমন বিষণ্ণ কেন তবে!
ঠিকানা থাকবে না মনে ভুলে-যাওয়া বাড়ির নম্বর।
কিছুতে পাব না খুঁজে, কবেকার সেই চেনা ঘর।
মাটি ভিজে ঠাণ্ডা হবে, শান্ত হবে চোখ
সে চোখে উঠবে কি ফুটে অন্য কিছু দেখার আলোক!

## অ ন্ত র ঙ্গ

অরবিন্দ গুহ

আজো কি সমুদ্রে গেলে, এখানে এলে না? বিকেলে তো
তুমি কারো অধিকারে থাকো না, কেবল প্রকৃতির
ঘনিষ্ঠ। বিকেলবেলা সমুদ্র তোমার ছায়া পেতো
যেহেতু সে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ, বিত্তশালী, বীর।

আমি প্রকৃতির তত অন্তরঙ্গ নই, বিত্তশালী
হই বীর নই। তাই তোমার ছায়াকে অনায়াসে
প্রত্যর্পণ করি না, পরন্তু ছায়াশরীরের বালি
সন্তর্পণে মুছে ফেলি, ছায়া রাখি প্রান্তরের ঘাসে।

কিন্তু ছায়া ক্ষণস্থায়ী। ছায়া নেই ঘাসে বা আকাশে।
আবার নেমেছে ছায়া সমুদ্রের বোধির ভিতরে?
লক্ষ মোক্তিনীর ছায়া সমুদ্র সমান ভালোবাসে;
অথচ সে কিছুই রাখে না, সবই প্রত্যর্পণ করে।

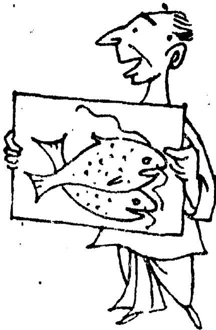
শেষবার ভেবে দেখো, কাকে দেবে সারসত্য, কাকে—
সর্বনাশা সমুদ্রকে কিম্বা এই সঙ্কীর্ণ আমাকে।

# ট্রামে-বাসে

**জনসংখ্যার** ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার কমিশনারগণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—"কিন্তু আমরা তো সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝি অধিকন্তু ন দোষায়"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

*　*　*

**মৎস্যভোজীদের** প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষি উপমন্ত্রী মহাশয় উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন সমুদ্রের মৎস্য খাওয়ার অভ্যাস



করেন। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"মা গোটে না রাঁধলেও পান্তা বা তপ্ত খাওয়ার বায়না ধরা যায় বৈকি"!

*　*　*

**ব্যাংকক** হইতে আগত কোন এক ভারতীয়ার বিনুনীতে নাকি ৯০ হাজার টাকা মূল্যের সোনা পাওয়া গিয়াছে।—"রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আগেই লিখে রেখে গেছেন—শিথিল কবরী বাঁধিও। কবির কথাটা শুনলে আর এ বিপত্তি হতো না" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

*　*　*



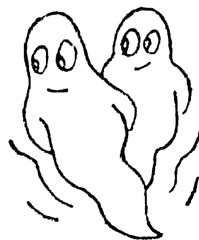
**চিড়িয়াখানার** প্রবেশ মূল্য কৌশলক্রমে আত্মসাতের কাহিনীর অভিযোগ শুনিলাম। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"চিড়িয়াখানাটা গেট পর্যন্ত এসেছে এ খবর তো জানতাম না"।

*　*　*

**চিড়িয়াখানার** প্রসঙ্গেই অন্য এক সংবাদের শিরোনামা পাঠ করিলাম—"এবারেও হরিণ" অর্থাৎ এবারেও আর একটি হরিণের মৃত্যু হইয়াছে।—"ঈসপের গল্পের এক-চোখো হরিণের কথাই মনে পড়ছে, অভাবিত দিক থেকেই বুঝি বিপদ এসে ঘাড়ে পড়ল" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

*　*　*

**কলিকাতায়** কোন এক বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব হইতেছে।—"কিন্তু এ কোন ভূত, অদ্ভুত না, কিম্ভূত, তা অবশ্য



সংবাদদাতা বলেন নি"—বলেন আমাদেরই জনৈক সহযাত্রী।

*　*　*

**সিংহ** উপাধিধারী কোন এক বাঙালী ভদ্রলোক বিহারের কোন এক সংস্থায় নাকি চাকরীর নিয়োগ-পত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল তিনি বাঙালী তখন আর তাঁর চাকরী হইল না।—"কর্মকর্তারা দেখলেন ইনি নেহাৎ লেজহীন বাঙালী সিংহ, কাজে কাজেই"।

*　*　*

**রাশ্যাতে** তৈল উৎপাদন দ্বিগুণ করা হইবে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বুল-গানিন, মলটভ প্রমুখরা নিশ্চয়ই সখেদে বলবেন—এ ব্যবস্থা যদি আগে থেকেই হতো।"

*　*　*

**বারাসত** অঞ্চলে কোন এক গ্রামে নাকি যাত্রাগান লইয়া মারপিট হইয়া গিয়াছে।—"এরা বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই শুধু বৃষগজ স্মরণ করেই যাত্রা করেছিলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*　*　*

'**কে**ন হাসি"—একটি সংবাদের শিরোনামা। বিশু খুড়ো বলিলেন—"নিম



গাছে সিম ফললে হাসি পায় বৈকি।

*　*　*

**নেহেরুজীর** জন্মদিনে যাঁরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাইয়া তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া নেহরুজী বলিয়াছেন যে, খরচটা এইভাবে না করিয়া তাঁরা যদি সেটা সমাজ-কল্যাণে ব্যয় করিতেন তাহা হইলে খুব ভালো হইত।—"সমাজের হিত তাতে নিশ্চয়ই হতো, কিন্তু নিজের হিত হতো কি—" বলে শ্যামলাল।

*　*　*

**জনাব** সুরাবর্দী ও নূন নাকি হিসাব পরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"এই হিসেবে আমরা অবশ্য পড়িনে, তবু জনাবদের কথা মনে ক'রে বলব, ব্যাংক না হলেও, ব্যাং-নীতি অডিটে অচল নয় অর্থাৎ গলা ফুলিয়ে বলা—কার কড়ি কে ধারে"!!

*　*　*

**জনৈক** সহযাত্রী শীত সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"ঘরে ঘরে কাশির ঐকতান,—কর্তা কাশেন, গৃহিণী কাশেন—"।—"সেইজন্য শীতকালটাই দার্শনিক হওয়ার উপযুক্ত সময়: সহজেই বুঝি—কস্য পিতা, কস্য মাতা"

*　*　*

**জনাব** সুরাবর্দীর নাকি ব্রিজ খেলা একটা 'হবি'—তা জানি থ্রি হার্টস-এর কলকে কী ক'রে ওয়ান ক্লাব দিয়ে বিট্ করা যায় এ নিয়ে বহুদিন থেকেই তিনি গবেষণা ক'রে আসছেন"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

# পুস্তক পরিচয়

## উপন্যাস

**এরা কাজ করে**—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য—দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। দাম—পাঁচ টাকা।

এক শ্রেণীর অস্পৃশ্য জাতির পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাবলী, তাহাদের নৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য। গ্রন্থের কয়েকটি চরিত্র সাবিত্রী বাউরাণী, মধু এবং হাসপাতালের ডাক্তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ সাবিত্রীর জীবনের ঘটনাবলী সত্যই মর্মস্পর্শী কিন্তু তাহার বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্রের সাময়িক পতন অত্যন্ত মর্মান্তিক। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। গ্রন্থখানাতে স্কুলের মাস্টার-পণ্ডিত প্রভৃতির ভূমিকা অবান্তর বলিয়াই মনে হয়। সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষার মাধুর্যে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

সুচিত্রিত প্রচ্ছদপট, নিখুঁত মুদ্রণ ও সুন্দর বাঁধাই গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ২৮৭।৫৮

**বিপাশার পিপাসা**—রমেশ মজুমদার। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—দুই টাকা।

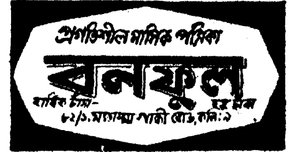
গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাহার কৈশোরে নবম শ্রেণীর ছাত্র-জীবনের ভাব-বিলাসের পরিণতি। গ্রন্থের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিপাশা, মালতী এবং রণজিৎ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। উদ্ভিন্ন যৌবনা পঞ্চদশী বিপাশার চাল-চলন এবং কথোপকথনে নিতান্ত বালিকাসুলভ সারল্য অত্যন্ত বিসদৃশ। রণজিতের চরিত্র উচ্ছৃংখলতায় ভরপুর। রণজিতের সংগে বিপাশার বিবাহ ব্যাপারে সন্ন্যাসীর ভূমিকা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং অবান্তর। অজস্র বর্ণাশুদ্ধি পুস্তকখানার অন্যতম কলঙ্ক। এই ধরনের ছেলেমানুষী রচনা পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা অসমীচীন। প্রচ্ছদপট এবং মুদ্রণ চলনসই।

২৩১।৫৮

**দি গ্বি দি ক** — প্রফুল্লচন্দ্র বসু। বলাকা পাবলিসার্স, কলিকাতা—৯। মূল্য—দেড় টাকা।

ছোটবেলায় যাঁর লেখা অনবদ্য হাসির বই 'হোঁদল কুতকুত' বা 'তালপাতার সেপাই' আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে, বহুকাল পরে সেই প্রফুল্লবাবুরই বর্তমান সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন টেকনিকে লেখা ব্যঙ্গোপন্যাস, 'দিগ্বিদিক' সেই একই রসের আস্বাদ বহন করে এনেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের 'নীরোপন্থীদের' যারা 'ট্যামগোপালের নাতি, বাক্যবাগীশ ও আপনি মোড়ল সেজে গোবরগণেশদের মুখে লাগাম কষে রেশ খেলে'—তাদেরই আকার, প্রকার ও পরিণতি ব্যঙ্গরেখায় অংকিত করেছেন তিনি এই গ্রন্থখানিতে। ব্যঙ্গের স্বাক্ষর





অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে বইখানির পাতায় পাতায়। বইখানি পাঠক মাত্রকেই তৃপ্তি দেবে। ২৭১।৫৭

## ছোট গল্প

**কলাবতী**—চিত্তরঞ্জন ঘোষ। ক্যালকাটা পাবলিশার্স; ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের মোট চৌদ্দটি রূপক গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে 'পুনর্বাসন', 'কর্মখালি', 'কলিকাতা কবিতা বিতান', 'মহাবিদ্যা সম্মেলন' এবং 'বাণিজ্যে'-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপক আঙ্গিকে রচিত এই ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। বাস্তব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এ ধরনের রূপক গল্পের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ভাষা সহজবোধ্য এবং সাবলীল। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। ৩৪৮।৫৮

**কান্না ও ছবি**—লাংচাও। শ্রীসরোজকুমার নাথ কর্তৃক ৩।৯সি, গৌরীবাড়ি লেন, কলিকাতা—৪ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি চোদ্দটি ছোটগল্পের একটি মনোজ্ঞ সংকলন। গল্পগুলো সুলিখিত এবং ভাব-দ্যোতনায় ও রসসৃষ্টিতে সার্থক। বইখানি পাঠকদের তৃপ্তি দিতে সক্ষম হবে বলেই বিশ্বাস করি। ৮২।৫৭





## নাটক

**বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী।** অজিত চক্রবর্তী কর্তৃক ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

মগধ সম্রাট অজাতশত্রু প্রথম জীবনে বৌদ্ধ-ধর্মের ঘোর বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও শেষজীবনে যে তিনি বৌদ্ধধর্মানুরাগী হয়েছিলেন, তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কেন বা কী করে তাঁর এই পরিবর্তন হল ইতিহাস সেই সম্বন্ধে নির্বাক। আলোচ্য নাটকখানি এই পরিবর্তনের কারণ কী—সেই সম্পর্কেই চিন্তাসঞ্জাত। বলাই বাহুল্য, যে-কাহিনী এতে উপস্থাপিত হয়েছে তা কাহিনীই, ইতিহাস নয়।

নাটকখানির প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতা ও 'নটীর পূজা' নাটকের প্রভাব রয়েছে বললেই যথেষ্ট নয়। প্রথমাংশটুকু প্রায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই লেখা। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই, সামগ্রিকভাবে নাটকখানি ভালোই হয়েছে। এর অভিনয় দর্শককে আনন্দ দেবে। ৪২৭।৫৮

## অনুবাদ সাহিত্য

**নির্বাচিত প্রবন্ধ। আর ডব্লু এমার্সন। গ্রন্থম।** ২২।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ১-৫০ নঃ পঃ।

এমার্সনের কয়েকটি প্রবন্ধের এই বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নানা কারণে যাঁহাদের পক্ষে এমার্সনের মূল ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ সম্ভব নয় তাঁহাদের পক্ষে আলোচ্য অনুবাদ সমষ্টি যথেষ্ট উপযোগী হইবে বলিয়া মনে করি। অনুবাদক এমার্সনের এমন কয়েকটি প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন যাহার নৈতিক দার্শনিক ও শিল্পগত আকর্ষণ অসীম। অনুবাদক অজিত চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রবন্ধ নির্বাচন ও তাহার অনুবাদের জন্য প্রশংসা করি। স্বল্পমূল্যে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জ্ঞানরাজি সাধারণে বিতরণের প্রচেষ্টার জন্য প্রকাশকও ধন্যবাদার্হ। ৩৪২।৫৮

## নাট্য সাহিত্য

**বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।** বৈদ্যনাথ শীল। মহাজাতি প্রকাশক, কলিকাতা-১২। দাম—৮৲ টাকা।

দুঃখের বিষয়, তবু অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলা সাহিত্যে নাটক যতটা অবহেলিত এতটা আর কোনো সাহিত্য শাখাই নয়। অথচ বাংলা নাটকের জন্মসূত্র ও তার কৈশোর মোটেই অবহেলিত ছিল না। মাইকেল গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধারার পুষ্টিপুষ্টি ঘটেনি এমন ত নয়। তবু গত পঁচিশ তিরিশ বছরে

বাংলা নাটকের মুমূর্ষু অবস্থা কেন হল? এর জবাব শিক্ষিত পাঠক মাত্রেরই জানা। তবে সুখের বিষয় ইদানীং বাংলা নাটকের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা আন্তরিক।

নাটক সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি হলেই নাট্য সাহিত্য পাঠ এবং নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পাঠও পাঠকদের মধ্যে বিস্তৃত হবে সন্দেহ নেই। বৈদ্যনাথ শীল মহাশয়ের প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই প্রথমতঃ এই কারণে যে তিনি বাংলা নাটকের একটি মাঝারি অথচ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত ইতিহাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই গ্রন্থে প্রাচীন যাত্রা থেকে শুরু করে ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নাটক পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাদ রেখেছেন; কারণ "রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখে।"

সাধারণ পাঠক এবং বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের পক্ষে গ্রন্থটি প্রয়োজনীয়। ছাপা, বাঁধাই উত্তম। ৫২৯।৫৭

## বিপ্লব ইতিহাস

**যুগান্তর বিপ্লবী দলের কথা**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার। প্রকাশক—বাসন্তীরাণী সরকার, ফাঁসিতলা ঘাট, সরকার বাড়ি, নবদ্বীপ। মূল্য—এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাটির রচয়িতা যুগান্তর দলের অধিকর্তার নির্দেশে দলের গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই উপরোক্ত বিপ্লবী দলের কার্যপ্রণালীর অতি সামান্য অংশ মাত্রই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দলের আদর্শ এবং কর্মতৎপরতা প্রভৃতির প্রচার অপেক্ষা পুস্তিকাটিতে লেখকের আত্মপ্রচারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকা প্রণয়নে একটি বিখ্যাত বিপ্লবী দলের গাম্ভীর্য ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যুগান্তর দল ব্যতিরেকে অন্যান্য দল বা দলপতি সম্পর্কে আলোচনা এখানে অবান্তর। ৫৬২।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

**ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার**—সতীকুমার নাগ।

**যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ**—শ্রীমাধবনারায়ণ বসু।

**কালা পানি**—জীবানন্দ ভট্টাচার্য।



রঞ্জন

*প্রভাত মুখোপাধ্যায় থেকে অন্নদাশংকর রায় পর্যন্ত একাধিক বাঙালী লেখক আমাদের বিলাত-ফেরত ভারতীয়ের সংগে পরিচয় করিয়েছেন। তাঁদের আঁকা ছবিটি* ঈষৎ করুণ, অংশত হাস্যোদ্দীপক। বেচারী বাঙলা ভুলেছে, ইংরেজী শেখেনি। বেচারী আঙুল দিয়ে খেতে ভুলেছে, শেখেনি কাঁটা-চামচের নিপুণ প্রয়োগ। স্যুটে গরম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে গভীর অনীহা। বিলাত থেকে, এ ছবি অনুযায়ী, দেশে ফেরা মানে তুমি না দেশী না বিলাতী। তুমি দেশকে ঘৃণা করো, বিলাত তোমায় ভালবাসে না। ঝোল তোমার ঝাল লাগে, সরুয়া পানসে। এ-ছবি সর্বাংশে সত্য নয়, বহুলাংশে কৌতুকের প্রয়োজনে অতিকৃত।

অপর পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে তুলনীয় চিত্র আছে ভারত-ফেরত ইংরেজের। বেচারী 'কারী' খেতে শিখেছে, অভ্যস্ত হয়েছে বেয়ারা-খানসামা পরিবৃত হয়ে থাকতে। এ ছবিতে মেমসাহেব কোনো কাজ করেন না, শুধু হুকুম করেন। সাহেব শুধু নেটিভ-দের দিয়ে কাজ করান। বলা বাহুল্য, তিনি ভারত ও সব কিছু ভারতীয়কে সর্বান্তঃ-করণে ঘৃণা করেন। বেচারী কার্টুনের বিষয় বিলাতে—যেমন বিলাত-ফেরত ভারতীয় বাঙলা নাটকে হাসির লক্ষ্য।

কার্টুন যে ফটোগ্রাফ নয় সে তো জানা কথা।

*

সেদিন দেশান্তরীর অন্তরে নিঃশব্দের সান্নিধ্য ঘটল লণ্ডন থেকে ভারতগামী প্লেনে। সহযাত্রী বিশুদ্ধ শ্রীহট্টসন্তান, বচনে ও ব্যবহারে সর্বপ্রকার বিদেশী প্রভাব প্রতিরোধ করেছেন সবলে, যেমন ভারত-প্রবাসী ইংরেজ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন ভারতীয় সব কিছুর। ইংরেজী না বলতে পারলে লজ্জায় মরে যাই আমরা। রোশন মিঞা খাঁটি সাহেব। পয়সা দিয়ে ইংরেজের প্লেনে চড়েছেন তিনি; তাঁর ভাষা বোঝবার, অন্তত বোঝবার, দায় ইংরেজের। নিরুপায় হয়ে দোভাষী হতে হল আমাকে। তাই থেকে আলাপ। আলাপ থেকে সাময়িক বিরক্তি, চিরন্তন বিস্ময়।

রোশন মিঞা বিবৃত করলেন তাঁর কাহিনী। তাঁর সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা লেখনীর নাগালের বাইরে, অন্তত আমার লেখনীর। সত্য বলতে কি, একাধিকবার রোশন মিঞা আমার সুবিধার জন্য তাঁর স্বকীয় বাঙলার আরো স্বকীয় হিন্দী অনুবাদ করে আমায় ঋণী করেছেন। তাঁর কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ।

দীর্ঘ বারো বছর পরে দেশে ফিরছেন রোশন মিঞা। বেশির ভাগ সময় তিনি ছিলেন লণ্ডনে—হ্যাঁ, বাইস্ওয়াটারে। তাঁর মেয়ের বয়স তখন ছিল দুই; এখন তার বিয়ে ঠিক হয়েছে আর তাই দেশে প্রত্যা-বর্তন। আবার কি লণ্ডনে ফিরবেন? না, তবে ভাইপোকে নিজের কাজে বসিয়ে এসেছেন। কী কাজ? 'কাইবার' মজুরের কাজ। বড় কাট। অবসরের কাল এখন। হাতের তৈরী সিগারেটে টান দিলেন রোশন মিঞা।

*

বিলাত-ফেরত রোশন মিঞা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ভারত-ফেরত সওদা-গরের কথা। তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন শুধু অর্থোপার্জনের জন্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে— 'ফরিদপুরে' যথেষ্ট চাষের জমি কিনেছেন এবং অর্থাভাব আর থাকবে না। বিলাতে থেকে গেলেন না কেন? আরে দূর, ভদ্রলোক পারে ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে বাস করতে—যেখানে দিনে সাত দিন একবার স্নানের ব্যবস্থা নেই? লোকগুলো বোকা—কথা, অর্থাৎ সিলেটের কথা, বলতে বুঝতে পারে না। মেয়েগুলোর চরিত্র সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই ভাল। বেহিসেবী, কুঁড়ে, অবিশ্বস্ত, অশিক্ষিত, চরিত্রহীন, হীনচরিত্র—ইংরেজ জাতির সম্বন্ধে কোনো নিন্দাই অতি-কঠোর নয় রোশন মিঞার মতে। দেশটা? ভদ্রজনের আবাসের অযোগ্য। ঠাণ্ডা, অপরিচ্ছন্ন, খাবারে স্বাদ নেই, আকাশে সূর্য নেই, মানুষগুলোর হৃদয়ে উত্তাপ নেই। ওদেশে যাওয়ার একমাত্র সংগত উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থার্জন। নইলে কে যায় ওই নরকে?

ভারত ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে এর অর্ধেক অশ্রদ্ধা আমি শুনিনি কখনো কোনো ভারতবিদ্বেষী বিদেশী বণিকের মুখে। ইংগ-ভারত বিনিময়ের অপর দিকে আমায় দীক্ষা দিলেন রোশন মিঞা।

*

অধিকাংশ বিলাত সম্বন্ধে আমাদের সুচিন্তিত মতামত বোধহয় প্রধানত নির্ভর করে কোন মুহূর্তে ধর্মের কোন ক্রোড়াক নাকি তার উপর। রোশন মিঞা পা দিয়েছেন ঔপনিবেশিকতার পরে। আর সংগে সংগে বদলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। তিনি বিলাতে গেছেন ওদেশে কাজ করে নেটিভ-দের কাছ থেকে টাকা রোজগার করতে। অতএব এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে দেশটা নিকৃষ্ট। অতএব দায় নেই ওদেশকে জানবার ও তার সম্বন্ধে সামান্যতম শ্রদ্ধা পোষণ করবার। মাত্র বছর কয়েকের প্রবাস, উদ্দেশ্য শোষণ। তারপর সঞ্চয়ের শেষে স্বদেশে তার উপভোগ। বিলাত দেশটা নীচ, সেখানে পদার্পণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও সীমিত। প্রয়োজনের বাইরে সম্পর্ক নেই। সাবাস রোশন মিঞা, তুমি খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী, তুমি ইংল্যাণ্ডকে বুঝেছ যেমন ইংল্যাণ্ড তোমাকে বুঝেছে। শোধবোধ।

সহস্র 'কিন্তু' সংযোজন না করে আমি যেমন ইংরেজ জাতিকে প্রাণ খুলে গাল দিতে পারিনে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী বলেছি বলেই রোশন মিঞার নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। রোশন মিঞা হয়তো জানে না, তিনি হয়তো বিলাতে তাঁর কর্তব্যের দ্বারা কয়েকজন ইংরেজের উপকার করেছেন। এও সম্ভব যে বারো বছরে তিনি নিজেও বিলাত দ্বারা পুরোপুরি অপ্রভাবিত থাকেননি। হয়তো তিনি দেশে ফিরে দেখবেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যেও ত্রুটি আছে কয়েকটি। কয়েকটি জিনিস হয়তো রোশন মিঞার দেশবাসীরও শেখার আছে ওই লণ্ডনের নেটিভগুলোর থেকে। বিলাত সম্বন্ধে অনেকের মোহভংগ আবশ্যক। এক মোহ ছেড়ে অপর মোহ গ্রহণের অর্থ মোহভংগ নয়, রোশন মিঞা সে কথাটা হয়তো ভুলে গেছেন।

# রঙ্গজগৎ

**চন্দ্রশেখর**

### অবাস্তব কল্পনাবিলাস

এক তরুণ স্থপতির প্রেম ও প্রবঞ্চনার কাহিনীকে ভিত্তি করে নবারুণ চিত্রের "সূর্যতোরণ" গড়ে উঠেছে। এই ছবির যাঁরা স্থপতি তাঁরা কেউই নতুন বা আনাড়ি নন। তবুও আশ্চর্যের কথা, যে ভিতের ওপর এঁরা স্কাইস্ক্রেপার (ছবির দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ১৬,০০০ ফুট) তুলেছেন তা যথেষ্ট পরিমাণে ভারসহ নয়।

সদ্য পাশ-করা দু'জন তরুণ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে গল্পের আরম্ভ। সোমনাথ সুব্রতর তুলনায় অনেক বেশী মেধাবী, কিন্তু পরীক্ষায় সে হলো দ্বিতীয় এবং প্রথম স্থান অধিকার করলো সুব্রত। জীবনের পথেও সুব্রত সোমনাথকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো। শহরের সবচেয়ে নামকরা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে তার চাকরি হলো। প্রতিষ্ঠানের মালিক মিঃ চ্যাটার্জির একমাত্র মেয়ে অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা।

ওদিকে সোমনাথ তার কর্মজীবন শুরু করলো এক আদর্শবাদী স্থপতির সহকারী হয়ে। তাঁর বৈপ্লবিক গঠন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও তা বৃদ্ধকে জীবনব্যাপী দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শ অনুসারে কাজ করতে গিয়ে সোমনাথও পদে পদে বাধা পেতে লাগলো। মিঃ চ্যাটার্জি হলেন তার প্রবলতম বিরোধী।

বড়লোকের আদরিনী কন্যা হয়েও অনীতা নিজেকে নিয়োগ করেছিল বস্তী উন্নয়নের কাজে। সাময়িক কাগজে তার প্রবন্ধ, রেডিওতে তার বক্তৃতা, বস্তীবাসীদের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে তার বই "সূর্য-তোরণ" অনীতার খ্যাতি বাড়ালেও, মিঃ চ্যাটার্জিকে সর্বক্ষণই উদ্বিগ্ন করে তুললো। কারণ তিনি নিজেই একটি বড় বস্তীর মালিক।

এই বস্তীর বেশ খানিকটা অংশ ভাড়া নিয়ে রেখেছিল আরেক ধনী ব্যবসায়ী—রাজশেখর। একদা সে এই বস্তীতেই মানুষ হয়েছিল। মিঃ চ্যাটার্জির কর্মচারীর পীড়নে সেখানেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। মিঃ চ্যাটার্জি তাইতেই ক্ষান্ত হননি, মিথ্যা অভিযোগে বালক রাজশেখরকেও তিনি জেলে পাঠিয়েছিলেন। রিফর্মেটারী স্কুল-ফেরত রাজশেখর আজ ভাগ্যের ফেরে বড়লোক হয়েছে। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জির হৃদয়হীন আচরণের কথা সে ভুলতে পারেনি। তাই মিঃ চ্যাটার্জির ওপর

প্রতিহিংসা নেবার জন্যে সে ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করে চলেছে।

এমনি পরিবেশের মাঝে অনীতা ও সোমনাথের সাক্ষাৎ। প্রথমটায় শ্লেষ ও অবজ্ঞা, তারপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভালবাসায় তার পরিণতি।

মিঃ চ্যাটার্জি প্রথম ঘা খেলেন সুব্রতর কাছে। তারই বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁকে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো। রাজশেখর এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। মিঃ চ্যাটার্জিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরতে তার দেরী লাগলো না। মিঃ চ্যাটার্জির মুক্তির বিনিময়ে সে দাবী করলো অনীতাকে পত্নীরূপে পাবার।

সুব্রতর সঙ্গে অনীতার বিয়ের সম্বন্ধ আগেই ভেঙে গেছল। বাপের মুখ চেয়ে রাজশেখরের প্রস্তাবে সে রাজী হলো—কিন্তু একটি সর্তে। তার জীবনের স্বপ্ন—বস্তীবাসীদের জন্যে একটি সূর্যতোরণ—তাকে সফল করে তুলতে হবে। রাজশেখর এ প্রস্তাবে সানন্দে স্বীকৃতি জানালো।

কিন্তু কে গড়বে সূর্যতোরণ? ডাক পড়লো সোমনাথের। সে ইতিমধ্যে, বছরের শ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসেবে সম্মানিত হয়েছে।









তার আগে সোমনাথ বেশ কিছুদিন মিঃ চ্যাটার্জির বস্তীতে বাস করেছে, তাঁর লোহার কারখানায় কুলীর কাজ করেছে এবং ভাগ্যের আরো নানা বিড়ম্বনা সহ্য করেছে। এই সূর্যতোরণ গড়ার ব্যাপারে বাধা হয়েই তাকে অনীতার সান্নিধ্যে আসতে হলো।

ফল যা হবার তাই হলো। অনীতার মন পড়লো সোমনাথের ওপর—যাকে একদিন অভব্য কুলী বলে সে অবজ্ঞা করেছিলো। সোমনাথ পড়লো দোটানায়। রাজশেখরের সঙ্গে কেমন করে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? আবার হৃদয়ের আলোড়ন উপেক্ষা করবারও তার শক্তি নেই।

সূর্যতোরণের জন্যে সে একটি ত্রিশ-তলা বাড়ির নক্সা তৈরি করেছিল। বুভুক্ষু বন্ধু সুব্রতর হাতে তার নির্মাণ ভার দিয়ে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল অনীতার কাছ থেকে। সূর্যতোরণ তৈরি যখন শেষ হয়েছে, তখন সোমনাথ জানতে পারলো সুব্রত আবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—সূর্যতোরণের নামে সে তুলেছে খোপভর্তি বিরাট এক পুশুশালা।

নিজের পরিকল্পনার এই শোচনীয় পরিণতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে সোমনাথ ডিনামাইট দিয়ে সেই ত্রিশ-তলা বাড়ি দিলো উড়িয়ে। তাকে অবশ্য এর জন্যে জবাবদিহি করতে হলো বিচারালয়ে। কিন্তু তার সাফাই শুনে জজ ও জুরী একযোগে তাকে সসম্মানে মুক্তি দিলো। রাজশেখর আবার তাকে দিয়ে তারই পরিকল্পনা অনুযায়ী আর একটা ত্রিশ-তলা বাড়ি তৈরি করালো।

এইবার অনীতার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবার পালা। সর্তমত তাকে এইবার রাজশেখরকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু এ দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই দেখা গেল আত্মহত্যা করে রাজশেখর অনীতা ও সোমনাথের মিলনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

তারপর হাঁ, তারপরও আছে—সেই ত্রিশ-তলা সূর্যতোরণের শীর্ষদেশে নায়ক-নায়িকার হাত ধরাধরি। এ থেকে ছবির দর্শকেরা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত যা ধরবার তা ধরে নিতে পারেন।

* * *

কাহিনী ও গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল অগ্রদূত-গোষ্ঠীর ওপর। এই দুপক্ষই কয়েকটি মারাত্মক রকমের গলদ করে বসেছেন এই ছবির বিষয়বস্তু ও বিন্যাস সম্পর্কে।

ভারতবর্ষের কোথাও ত্রিশ-তলা বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বিশেষ করে বাংলার পলিমাটিতে তা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলেই সন্দেহ আছে! এ অবস্থায় ত্রিশ-তলা উঁচু সূর্যতোরণের পরিকল্পনা দর্শকদের বাস্তবতাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে।

যদি এদেশে ত্রিশ-তলা বাড়ি তৈরি করা সম্ভব বলেও ধরে নেওয়া যায়, তাহলে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, প্রতি তলায় চারটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সমেত (যা সূর্যতোরণে আছে বলে জানানো হয়েছে) ত্রিশ-তলা বাড়ি তৈরি করতে কত বছর লাগে? ছবিতে আবার একটি ত্রিশ-তলা বাড়ি তৈরি হবার পর তার ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে সেই জমির ওপরই আর একটি ত্রিশ-তলা বাড়ি তোলা হয়েছে। দুবার নতুন করে সূর্যতোরণ তৈরির আগে-পিছেও অনেকখানি করে সময়ের ব্যবধান আছে। ফিল্মের নায়িকারা যদিও কুড়িতেই বুড়ী হ'ন না, তবুও অনীতার বিয়ের ফুল যখন সত্যিই ফুটলো তখন তার বয়স কত জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ছবি দেখে কিন্তু এ কৌতূহল মেটাবার কোন উপায় নেই। কারণ বেশ-বাস ও ভংগীতে নায়ক-নায়িকার বয়সের কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেনি।

কাহিনীকার গৌরীপ্রসন্ন বিচার-দৃশ্যটি রচনা করবার আগে যদি কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতেন তো ভালো করতেন। কি ধরনের মামলা জুরীর সামনে হয়, সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান নেই দেখা গেল। উপরন্তু সে-সাফাইয়ের জোরে অন্যের সম্পত্তি নষ্ট করেও নায়ক বেকসুর খালাস পেলো, তা' রীতিমত হাস্যকর।

গল্পের বাঁধুনিতেও সমান শিথিলতা। যে রাজশেখর বাল্যকাল থেকে তিলে তিলে তার প্রতিশোধ-স্পৃহাকে লালন করে এসেছে, কি প্রতিশোধ নিলো সে মিঃ চ্যাটার্জির ওপর? অনীতাকে বিয়ে করতে চেয়ে সে বাপ ও মেয়ে কারুরই বিশেষ অসুবিধে ঘটিয়েছে বলে বোঝা গেল না। কারণ, যেভাবে গল্পটি রূপায়িত হয়েছে তাতে অনীতা বিশেষভাবে কাউকে মন দিয়ে বসেছে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে মিঃ চ্যাটার্জি স্বাভাবিক কারণেই আরো নিরপেক্ষ। সুতরাং কে কাকে শাস্তি দিলো? তারপর শেষ মুহূর্তে রাজশেখরের নাটকীয় আত্মবিলুপ্তি কাহিনীকারের পক্ষে convenient হলেও দর্শকদের কাছে convincing হয়ে ওঠেনি।

এমনিধারা বহু ত্রুটি ছবিটির সারা অংগ জুড়ে রয়েছে। নায়ককে যেরকম আত্মভোলা ও আদর্শবাদী যুবক হিসেবে আঁকা হয়েছে, তাতে নায়িকার অপমানের প্রত্যুত্তরে গভীর রাত্রে তার ঘরে ঢুকে নায়ক যেসব কথা বলে তা তার মত চরিত্রের মুখে সম্পূর্ণ বেমানান। সুব্রত তার পরিকল্পনাকে বিকৃত করেছে এই অজুহাতে নায়ক ত্রিশ-তলা বাড়ি ধ্বংস করে। অথচ সুব্রতকে সূর্যতোরণ তৈরির ভার ছেড়ে দিয়ে সে নিজে কি রাজশেখর ও অনীতার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? এসব প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না ছবির মধ্যে।

গল্পের হালই যেখানে এইরকম, সেখানে অভিনয়শিল্পীদের কাছ থেকে উচ্চতর পরিমিতি বোধ আশা করা অন্যায়। তাই নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনকে পাওয়া গেলেও, আদর্শবাদী সোমনাথ ও অনীতাকে পাওয়া যায় না। কারণ বস্তীবাসীদের দুঃখে বিগলিত কোন অনীতাই ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেনের মত সাজসজ্জা করবে না, বা কোন সোমনাথই দামী ড্রেস-সুট পরে তার দয়িতাকে অপরের হাতে তুলে দিতে আসবে না—যা উত্তমকুমারকে দিয়ে ছবির শেষাংশে করানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপারেও এই দুই জনপ্রিয় শিল্পী তাঁদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে অভিনয় করে গেছেন।

রাজশেখর চরিত্রটিকে বিকাশ রায় বেশ একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিয়েছেন। মিঃ চ্যাটার্জি'র ভূমিকায় কমল মিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের গুণে আদর্শবাদী স্থপতি বিপ্রদাসের চরিত্রটি দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। ছোটখাটো ভূমিকায় অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও শোভা সেন তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ছবির সঙ্গীতাংশ মামুলি, যদিও হেমন্তকুমার এর সুরকার। টেকনিক্যাল কাজে "সূর্যতোরণ" গল্পের সৌধের মতই উঁচু। ক্যামেরার কাজ ও শব্দগ্রহণ নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

## চিত্রালোচনা

পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থ তারকেশ্বরের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে শক্তি প্রোডাকশনের ভক্তিমূলক চিত্র "শ্রীশ্রীতারকেশ্বর"-এ। এইটি এ হপ্তায় মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র বাংলা ছবি। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, মহেন্দ্র গুপ্ত, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, বাবুয়া, পদ্মা দেবী, অপর্ণা, শোভা সেন, রেণুকা রায় প্রভৃতি। "সাধক রামপ্রসাদ"-খ্যাত বংশী আশ ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং পবিত্র চট্টোপাধ্যায় এর গানে সুর দিয়েছেন।

দুখানি নতুন হিন্দী ছবিও এ হপ্তায় মুক্তি পাচ্ছে। একটির নাম "দিল্লী-কা-ঠগ", অপরটি "লালা রুখ"—যথাক্রমে নিউ ওরিয়েণ্টাল পিকচার্স ও ফিল্ম ইণ্ডিয়া করপোরেশনের নিবেদন। এস ডি নারাং প্রযোজিত ও পরিচালিত "দিল্লী-কা-ঠগ"-এ তারকাদীপ্ত ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন নূতন, কিশোরকুমার ও স্মৃতি বিশ্বাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবি।

**"লালা রুখ" একটি বিখ্যাত প্রণয়-**

কাহিনীর চিত্ররূপ। ইসমৎ চুঘতাই-এর প্রযোজনায় ছবিটি তোলা হয়েছে এবং এতে সুরসৃষ্টি করেছেন খৈয়াম। শ্যামা এবং তালাত মামুদ এর প্রধান চরিত্র দুটিকে রূপ দিয়েছেন।

*  *  *

*প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় তাঁর* নির্মীয়মান হিন্দী ছবি "সুজাতা'র বহির্দৃশ্য তুলতে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। সুবোধ ঘোষ রচিত কাহিনীর ঘটনাস্থল কলকাতা। ব্যারাকপুরের গান্ধী-



ঘাট এবং শহরের কয়েকটি জনাকীর্ণ রাস্তা ও বাড়ির ছবি তুলে তিনি সোমবার বোম্বাইতে ফিরে গেছেন।

১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকেই বিমল রায়ের আগামী বাংলা ছবি "অমৃতকুম্ভের সন্ধানে"র শুটিং আরম্ভ হবে। ছবিখানি *পুরোপুরি কলকাতাতেই তোলা হবে বলে স্থির হয়েছে। বর্তমানে এর শিল্পী নির্বাচন চলছে।*

ইতিমধ্যে বোম্বাইতে বিমল রায় প্রোডাকসন্সের আর একটি হিন্দী ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবির নাম 'পরখ' এবং সলিল চৌধুরী এর কাহিনীকার। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, বিমল রায়ের বহুখ্যাত 'দো বিঘা জমীনে'র গল্পও এই সুবিখ্যাত সুরকারের রচনা। বসন্ত চৌধুরী এই নতুন ছবির নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলার বাইরে এই হবে তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। মতিলাল, লীলা চিটনিশ, নাজির হোসেন, জয়ন্ত, কানাইয়ালাল ও শিশু-অভিনেতা আনোয়ারকে এর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে।

*  *  *

রামায়ণ অবলম্বনে একটি রঙীন ছবি তোলা প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের অনেকদিনের বাসনা। সম্প্রতি তিনি এর প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ছবিটি হবে—কোন একটি বিশেষ উপাখ্যানের নয়—সমগ্র রামায়ণের চিত্ররূপ। তুলতে ব্যয়ও হবে যেমন প্রচুর, সময়ও লাগবে অনেক। কয়েকজন নামকরা হিন্দী লেখককে এর চিত্রনাট্য রচনার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। সুর সৃষ্টি ও শিল্প নির্দেশের ভারও একাধিক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকবে। চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্র হবে সীতা। ছবিটি বিদেশেও যাতে দেখান যায় সেই উদ্দেশ্যে বিমল রায় এটি সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে তুলবেন স্থির করেছেন।

•  •  •

শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য যবন হরিদাসের মহাজীবনী অবলম্বনে রূপজ্যোতি তুলেছেন "ঠাকুর হরিদাস"। গোবিন্দ রায়ের পরিচালনায় ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। বর্তমানে এর সম্পাদনা চলছে। নাম-ভূমিকায় নির্মলকুমার এবং মহাপ্রভুর বেশে নবাগত মলয়কুমার এতে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন বলে প্রকাশ। লাস্যময়ী লক্ষহীরাকে রূপ দিয়েছেন সুমিত্রা দেবী। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, বিভু ও তিলককে দেখা যাবে।

*  *  *

"গলি থেকে রাজপথ" নবগঠিত এশিয়ান ফিল্মসের প্রথম ছবির নাম। গত সোমবার স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডস্থিত স্টুডিওতে এর মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। মিহির সেনের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

### লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের নাট্যোৎসব

আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের পুরোভাগে যে ক'টি অবৈতনিক নাট্যসংস্থা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন, লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ তাঁদের অন্যতম।

আজ থেকে এগারো বছর আগে ইংরেজীতে শেকস্‌পীয়ারের নাটক অভিনয় করে এই সংস্থার প্রথম পত্তন। তখন অবশ্য এ'দের নাম ছিল "অ্যামেচার শেকস্-

এঁরা ক্লিফর্ড ওডেট্‌স্, বার্নার্ড শ প্রমুখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করতে আরম্ভ করলেন, তখন নতুন করে সংস্থার নামকরণ হল লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ। তখনও ইংরেজীতে অভিনয় করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। পরে অবশ্য এঁদের উদ্দেশ্য বদলায়। এঁরা বুঝতে পারেন, বাংলা দেশে বাংলা নাটকের উন্নতর প্রয়োজনা ছাড়া সমাজ চেতনা বা নাট্য-আন্দোলনকে জাগানো যাবে না। তখন আরম্ভ হয় বাংলা নাটক নিয়ে এঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এই ক'বছরের মধ্যে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ তেরোখানি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাম-করা রচনা, কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ বিদেশী নাটকের বঙ্গানুবাদ, এবং কয়েকটি মৌলিক নাটক। শুধু শহরের রঙ্গমঞ্চেই এই সব নাটক এঁরা পরিবেশন করেন নি। পল্লীগ্রামে, শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে এবং বাংলার বাইরেও বহু জায়গায়, এরা অভিনয় করেছেন।

গত কয়েক বছর ধরে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ একটি বাৎসরিক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে আসছেন। আগামী ৮ই থেকে ১০ই ডিসেম্বর এই তিন দিন বিশ্বরূপায় এঁদের এ-বছরকার নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। "ওথেলো", "নীচের মহল" এবং "ছায়ানট" এই তিনখানি নাটক এবছরকার উৎসবে অভিনীত হবে। "ছায়ানট" উৎপল দত্ত রচিত মৌলিক নাটক। "ওথেলো" শেক্‌স্‌পীয়ারের বিশ্ববিখ্যাত নাট্যসৃষ্টির বঙ্গানুবাদ। "নীচের মহল" গোর্কির বহু-আলোচিত "লোয়ার ডেপথ্‌স্"-এর বাংলা রূপান্তর। রূপান্তরিত করেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য। শেষোক্ত নাটকখানি বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়েছে। অন্য নাটক দুখানি লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের নবতম নিবেদন—এবারকার নাট্যোৎসবেই প্রথম অভিনীত হবে।

### তানসেন সংগীত সম্মেলন

তানসেন সংগীত সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আগামী ৫ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এ-বছর সম্মেলন বসবে ৯, গড়িয়াহাটা রোডস্থিত সিংহী হাউসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে।

পুলিস কর্তৃপক্ষের বিধান অনুসারে রাত্রি বারোটার মধ্যে প্রতিদিনের অধিবেশন শেষ করতে হবে এবং মণ্ডপের বাইরে লাউড স্পীকার বসিয়ে সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করা চলবে না। একশ্রেণীর সংগীতরসপিপাসুদের এতে অসুবিধা ঘটলেও, জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য। স্বল্পবিত্তদের সুবিধার্থে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ অল্পমূল্যের টিকিটের ব্যবস্থা রেখেছেন।

৭ই ডিসেম্বর রবিবার সকালে ও সন্ধ্যায় দুটি অধিবেশন হবে, অন্যান্যদিন একটি করে। পুলিসের অনুমতি পাওয়া গেলে শেষ অনুষ্ঠানটি (১২ই ডিসেম্বর) সারা-রাত্রিব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা।

যে সব শিল্পী এবারকার সম্মেলনে যোগ দেবেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

কণ্ঠ-সংগীতে—গোলাম আলি খাঁ, ভীমসেন যোশী, মোহনতারা আজিংকয়া, সারদাবাই ধুলেকার প্রভৃতি।

যন্ত্র-সংগীতে—আলি আকবর খাঁ, রবিশংকর, বিলায়েৎ খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন ভট্টাচার্য, আল্লারাখা, শান্তাপ্রসাদ প্রভৃতি।

নৃত্যে—রোশনকুমারী ও ইভা কোপকাট।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

দেশজোড়া খেলার মেলা। চারিদিকেই খেলাধূলোর বড় বড় আসর। বোম্বাই, দিল্লী ও কলকাতায় বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের চটকদার প্রদর্শনী খেলা। বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপের ফাইনাল খেলা শেষ হবার পর দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপের শেষ পর্যায়ের আকর্ষণীয় খেলা। বরোদা, আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে ভারত সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ক্রিকেট, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলার প্রস্তুতি। কলকাতায়, বিলিয়ার্ড খেলার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। এ ছাড়া মুষ্টিযুদ্ধ ও সাঁতারের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপও এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। আর ভারতের এখানে ওখানে রণজি প্রতিযোগিতা ও জাতীয় ফুটবলের খেলা তো লেগেই আছে। ব্যাডমিণ্টন এবং টেবল টেনিসের ছোট ছোট অনুষ্ঠানেরও বিরাম নেই। কলকাতা ময়দানে ক্রিকেট খেলাও জমে উঠেছে। এর উপর আছে দেশ বিদেশের সব খেলার খবর।

সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে এইসব খেলাধূলোর খবর সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা খুবই কষ্টসাধ্য। দৈনিক সংবাদপত্রই হিমসিম খেয়ে উঠছে। সব জায়গায়ই স্থানাভাব। তবুও দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা সাধ্যমত খেলাধূলোর খবর পরিবেশন করে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে এবং পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এই সময়ে শুধু খেলাধূলোর খবর পরিবেশনের জন্য 'খেলার খবর' নামে এক বাংলা মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব সুখের বিষয়। পত্রিকাখানি যদি খেলাধূলোর উচ্চ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে সুষ্ঠুভাবে এবং সুরুচির সংগে খবরাখবর প্রকাশ করেন তবে বহু ক্রীড়ামোদির এবং ক্রীড়াউৎসাহী ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রশংসাভাজন হবেন সন্দেহ নেই। সংগীত, নাট্যমঞ্চ এবং ছায়াচিত্র সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার অভাব নেই। কিন্তু ক্রীড়া বিষয়ক ভাল বাংলা পত্রিকার সত্যই অভাব আছে।

* * *

টেনিস খেলার উন্নত কলাচাতুর্যে দর্শকদের মন ভুলিয়ে বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা কলকাতা ত্যাগ করেছেন। গতবারের মত এবারেও 'সাউথ ক্লাবে' দুদিন প্রদর্শনী টেনিস খেলার আসর বসেছিল। এবার অবশ্য গতবারের মত দর্শক সমাগম হয় নি। প্রথমদিন দর্শক গ্যালারীর অনেক আসনই খালি ছিল। দ্বিতীয় দিন সব আসনই পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথমদিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনের খেলাও হয় অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং অধিকতর প্রাণবন্ত ও তৃপ্তিদায়ক।

পেশাদার টেনিসের প্রবর্তক এ যুগের সবচেয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়, জ্যাক ক্রামার নিজেই গতবারে কলকাতায় এসেছিলেন দুইবারের সদ্য উইম্বলডন বিজয়ী লুই হোড, কেন রোজওয়াল ও পাঞ্চো সেগুরাকে সংগে নিয়ে। ক্রামার ও হোডের পরিবর্তে সেগুরা ও রোজওয়ালের সংগে এবার এসেছিলেন উইম্বলডনের দুই প্রাক্তন চাম্পিয়ান ফ্র্যাংক সেজম্যান ও টনি ট্রাবার্ট। দুইদিনই দুটি করে সিংগলস ও একটি করে ডাবলসের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের সিংগলস খেলায় কেন রোজওয়াল ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে পাঞ্চো সেগুরাকে এবং ফ্র্যাংক সেজম্যান ৬-১ ও ৬-২ গেমে টনি ট্রাবার্টকে পরাজিত করেন। ডাবলসের খেলায় রোজওয়াল ও সেজম্যান পরাজিত করেন ট্রাবার্ট ও সেগুরাকে ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে। বলা বাহুল্য রোজওয়াল ও সেজম্যান দুইজনই অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। ট্রাবার্ট আমেরিকার আর সেগুরা দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরের অধিবাসী। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দেরই একচেটিয়া প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ক্রীড়াশৈলীর দিক দিয়েও সেজম্যান ও রোজওয়াল দর্শকদের আনন্দ দেন বেশী। ফলে পরের দিন সেজম্যানের সংগে রোজওয়ালের খেলার ব্যবস্থা করবার জন্য দর্শকদের মধ্য থেকে দাবী ওঠে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না। খেলার তালিকা আগেই

রচিত হয়ে গিয়েছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী পরের দিন রোজওয়ালের সঙ্গে ট্রাবার্ট এবং সেজম্যানের সঙ্গে সেগুরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

দ্বিতীয় দিন রোজওয়াল ও টনি ট্রাবার্টের প্রথম সিংগলস খেলাটি ৮৪ মিনিট স্থায়ী হয়। বিশ্বের দুই কীর্তিমান খেলোয়াড় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে চমকপ্রদ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে দর্শকদের পাগল করে তোলেন। শেষপর্যন্ত রোজওয়াল ট্রাবার্টকে পরাজিত করেন ৯-৭ ও ৯-৭ গেমে। সেজম্যান ও সেগুরার পরের সিংগলস খেলার মধ্যে আর তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেজম্যান ২-৬, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে সেগুরাকে পরাজিত করেন। ডবলসের খেলায় একদিকে থাকেন ট্রাবার্ট ও সেগুরা, অন্যদিকে সেজম্যান ও রোজওয়াল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় ট্রাবার্ট ও সেগুরা ৬-৩ গেমে এগিয়ে থাকা সময়েই খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

• • •

আগেই বলেছি কলকাতায় পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলা এই নতুন নয়। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত বিগ বিল টিলডেন ও ফ্রান্সের বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় হেনরী কোশে টেনিসে পেশাদারবৃত্তি গ্রহণ করবার পর ১৯৩৭ সালে কলকাতায় এসে টেনিস খেলার চমৎকার পরিচয় দিয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ ২১ বছর পরে শহরে এসেছিলেন তিনজন কীর্তিমান খেলোয়াড়ের সাথে সেগুরার মতন সর্ব-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জ্যাক ক্রেমার। এবার যারা খেলে গেলেন টেনিস বিশ্বে এঁদের বেশী কৃতি নেই। কেউ এমেচার জীবনে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন কেউ বা এমেচার জীবনে বিশ্বজয়ী হয়ে অবলম্বন করেছেন পেশাদারবৃত্তি। পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে খেলাকে করেছেন আরও উন্নত—আরও আকর্ষণীয়।

এমেচার ও প্রোফেশনাল টেনিস খেলোয়াড়দের খেলার মধ্যে নৈপুণ্যগত পার্থক্যও আকাশ পাতাল। পেশাদার খেলোয়াড়দের সবাই টেনিসের এক একজন নিপুণ শিল্পী। বিজ্ঞানসম্মত খেলার ছলাকলায় এরা সিদ্ধহস্ত। সাউথ ক্লাবে দ্বিতীয় দিন রোজওয়াল ও টনি ট্রাবার্টের খেলা দেখার যাদের সুযোগ ঘটেছে তারা সবাই স্বীকার করেছেন এর চেয়ে ভাল এবং উচ্চস্তরের খেলা কলকাতায় আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

খেলাই পেশাদার খেলোয়াড়দের জীবনের বৃত্তি। খেলার মাধ্যমেই এঁদের রুজি রোজগার। দেশে দেশে খেলা দেখিয়েই এঁরা অর্থ সংগ্রহ করেন। তাই অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, এঁদের খেলার



সাঁতারে পটীয়সী কুমারী নন্দা চন্দ্র

ফলাফল আগে থেকেই 'গড়াপেটা' হয়ে থাকে। কিন্তু রোজওয়াল ও ট্রাবার্টের মরণ-পণ সংগ্রাম যাদের প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেছে তারা কেউই স্বীকার করবেন না যে খেলার ফলাফল আগে থেকেই গড়াপেটা হয়েছিল। সত্যই রোজওয়াল ও ট্রাবার্ট ৮৪ মিনিট ধরে যেভাবে তাঁদের সব রকমের আহৃত বিদ্যা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাতে মনে হয়েছে এই খেলার উপর তাঁদের খ্যাতি ও সুনামের অনেক কিছুই নির্ভর করছে। টেনিসের দুই মহারথীর কোন বিদ্যাই অজ্ঞাত নয়। টেনিস খেলার পাঠ্যপুস্তকে যতরকমের মারের উল্লেখ আছে, যেমন ভলি, ড্রপ শট, পাসিং শট, স্লাইস, ড্রাইভ, গ্রাউণ্ড শট, আণ্ডারকাট ড্রাইভ



জাতীয় রেকর্ড স্থাপনের কৃতিত্ব অর্জনকারিণী। কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা

প্রভৃতি সবরকমের মার মারতে কোন খেলোয়াড়ই কসুর করেননি। কেবল রোজ-ওয়াল খেলায় বিজয়ী হয়েছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে উভয়ের তুলনা-মূলক বিচারে তিনি অধিক দক্ষ। কিন্তু পরাজিত টনি ট্রাবার্টের দক্ষতা যে বিজয়ীর চেয়ে কম একথাও স্বীকার করা কঠিন। দুই কীর্তিমান খেলোয়াড়ের দীর্ঘস্থায়ী মরণপণ সংগ্রামের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং কে শ্রেষ্ঠতম একথা উপলব্ধি করা যেমন কষ্ট-সাধ্য ছিল তেমন খেলায় কে হারবেন বা কে জিতবেন তা উপলব্ধি করাও ছিল কষ্টসাধ্য। বস্তুত পয়েণ্ট লাভের প্রশ্নকে কেউ বড় করে দেখেনি, দেখেছে তাঁদের হাতের সুচারু নৈপুণ্য। দেখেছে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার খর্বাকৃতি খেলোয়াড় রোজ-ওয়ালের 'ফোরহ্যাণ্ড' মারের মধ্যে যেমন সাবলীলতা, ব্যাকহ্যাণ্ডের মারের তেমনই মনোরম ভঙ্গি। তেমনই চটুল পদক্ষেপ! ধীর স্থির, অতি সাদাসিধে ধরনের চেহারা রোজওয়ালের। কিন্তু এই ছোট্ট মানুষটির মধ্যে যে এত টেনিস প্রতিভা লুকিয়ে আছে খেলার আগে তা বুঝবার উপায় নেই। রোজওয়ালের তুলনায় টনি ট্রাবার্টের দেহের উচ্চতা অনেক বেশী। দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় ট্রাবার্টের উচ্চতা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। সু-স্বাস্থ্যেরও অধিকারী। মেদহীন, কিন্তু পেশীবহুল প্রিয়দর্শন খেলোয়াড়। মারের চটকও দর্শকচমৎকার আনন্দদায়ক। মোটের উপর দুই খেলোয়াড়ই টেনিসের অনিন্দ্য-সুন্দর শিল্পী।

১৯৫২ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ফ্রাংক সেজম্যান সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। সেজম্যানের খেলার গতি আরও স্বচ্ছন্দ। যেন কোন বলই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়, কোন মারই তাঁর অজানা নয়! অনায়াসভঙ্গিতে খেলেন সেজম্যান। সার্ভিস করবার সময়ও অনায়াস ভঙ্গি। কিন্তু সে সার্ভিসের তীব্রতা অপরিসীম। তার মধ্যে থাকে বিদ্যুৎগতি সঞ্চারিত। বল কোথায় পড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

ইকোয়েডরের খেলোয়াড় প্যাঞ্চো সেগুরার খেলার মধ্যেও নৈপুণ্যের অভাব নেই। কিন্তু সেগুরার খেলায় নৈপুণ্যের চেয়েও বেশী আছে অনমনীয় দৃঢ়তা। দুই হাতে র‍্যাকেট ধরে এর বল মারবার ভঙ্গি এবং সার্ভিস করবার সময় শরীর বাঁকিয়ে বল মারার কায়দা সত্যই কৌশলপূর্ণ। ইতি-পূর্বে সেগুরার খেলোয়াড় জীবনের পরিচয় দেবার সময় বলেছি এর পায়ের নিম্নভাগ ঈষৎ বক্র। চলবার সময় যেন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন। কিন্তু এতে সেগুরার খেলার অসুবিধা হয় না কিছু। চটুল পদক্ষেপে কোর্টের এক পাশ থেকে আর এক

পাশে ছুটে ইনি সহজেই বলের নাগাল পান। সেগুরার বল 'প্লেসমেণ্ট' খুবই ভাল। সবচেয়ে ভাল এর টেনিস খেলার দৃপ্ত ভঙ্গিমা।

চারিটি সিঙ্গলস খেলার মধ্যে রোজওয়াল ট্রাবার্টের খেলা সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও দর্শকচোখের তৃপ্তিদায়ক হয়েছে, এ কথা আগেই বলেছি। অন্য খেলাগুলি কম আনন্দদায়ক হয়েছে এ কথা বলা চলে না। তবে তুলনামূলক বিচারে আর তিনটি খেলা দর্শকদের তেমন বিস্ময়াবিষ্ট করতে পারেনি যেমন করেছে রোজওয়াল ও ট্রাবার্টের নয়নাভিরাম খেলা। এরও কারণ আছে। কারণ অবশ্য একটি নয়। একাধিক। প্রথমত খেলোয়াড়রা মেসিন বা যন্ত্র নন—রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। এদের দেহের ক্লান্তি আছে, পথ ভ্রমণের কষ্ট আছে, খেলার উপর সংবেদনশীল মনের প্রভাব আছে, আছে প্রতিনিয়ত খেলার ফলে দেহের অবসাদ। দ্বিতীয়ত আবহাওয়া, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নত ক্রীড়াচাতুর্য প্রকাশের সংগে অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। তৃতীয়ত অচেনা অজানা দেশের অচেনা অজানা মাটির সংগে ক্রীড়াধারার সামঞ্জস্য করবার জন্যও সময়ের প্রয়োজন। অবশ্য পেশাদার খেলোয়াড়রা বিশ্বের সব রকমের মাটির সংগেই পরিচিত। তবুও কিছুটা অনুশীলন ছাড়া নতুন কোর্টে খেলতে গেলে মারের একটু তারতম্য, সময়ের একটু হেরফের হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা সব সময় তাঁদের খেলার সবটুকু মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এখানেও সব সময় ফোটাতে পারেন নি। তবে যেটুকু ফুটিয়েছেন তারও তুলনা নেই। অনেকের মতে পেশাদার খেলোয়াড়রা গতবারের চেয়েও এবার ভাল খেলে গেছেন।

এর অন্য কারণও আছে। গতবার খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে। শীতপ্রধান দেশের খেলোয়াড়রা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খেলতে স্বাভাবিকভাবেই

রোজার্স কাপ

কাতর হয়ে পড়েন। রৌদ্রের তাপ বেশী থাকলে এঁদের পক্ষে বেশী কাতর হওয়া স্বাভাবিক। এবার খেলার সময় সূর্যদেবের মুখ দেখা যায়নি। দুদিনই সূর্যের নীচে ছিল মেঘের হাল্কা আস্তরণ। ছায়াশীতল পরিবেশের মধ্যে খেলার আবহাওয়াও ছিল চমৎকার।

•  •  •

পেশাদার টেনিস সম্বন্ধে লেখার কলেবর ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি কথা না লিখে পারছি না। পেশাদার খেলোয়াড়রা ভারত সফর শেষ করে অন্যদিকে পা বাড়িয়েছেন। ভারত থেকে তাঁরা কত টাকা নিয়ে গেছেন, আমাদের জানা নেই। কিছু না নিয়েই ফিরেছেন কিনা তাও জানি না। তবে পেশাদার খেলোয়াড়দের খালি হাতে ফেরবার কথা নয়। আর ফিরবেনই বা কি ভাবে? খেলাই এঁদের জীবিকা। পেশাদার টেনিসের প্রবর্তক জ্যাক ক্র্যামারকে যেমন এঁদের বিপুল অর্থ দিতে হয়, তেমন এঁদের মাধ্যমে ক্র্যামার আয়ও করেন বিপুল অর্থ। গতবার শুধু লুই হোডকে এককালীন প্রায় সাড়ে তিনলাখ টাকা দিয়ে পেশাদার দলে ভর্তি করতে হয়েছে। এর উপর আবার খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের ভাগ আছে। সুতরাং ধরে নিতে পারি মোটা টাকা ট্যাকে গুঁজেই পেশাদার খেলোয়াড়রা ভারত ত্যাগ করেছেন। কিম্বা মোটা টাকা নেবার ব্যবস্থা করে গেছেন। কিন্তু ভারত থেকে **এই টাকা নেবার ব্যবস্থায় ভারত সরকারের** অনুমোদন পাওয়া গেছে কি? বৈদেশিক অর্থের অভাবে ভারতের নাকি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। এই সময়ে খেলার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার এই অপচয় সমীচীন কিনা ভেবে দেখা দরকার।

আরও একটি কথা। এই ধরনের চটকদার খেলার ব্যবস্থা করে আমাদের লাভ কি? এক চোখের আনন্দ ছাড়া এর মধ্যে শিক্ষা লাভের বিশেষ কিছু আছে কি? সময়ে সময়ে বিদেশী ক্রীড়াদলের ভারত সফরের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। কিন্তু তার জন্য যে মূল্য দিতে হয় বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বাজারে সে মূল্য দেওয়া অসমীচীন বলেই মনে হয়। এর চেয়ে অনেক কম টাকা খরচ করে আমরা যদি বিদেশ থেকে 'কোচ' আনার ব্যবস্থা করি তবে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের পক্ষেও বিদেশ সফরের উপযোগী হওয়া কষ্টসাধ্য নয়। খেলাধুলোর পরিচালকরা কথাটা ভেবে দেখবেন আশা করি।

•  •  •

গত দুই সপ্তাহে আজাদ হিন্দ বাগে দুইটি সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। দুইটি সাঁতারেরই ব্যবস্থা করা হয় রাত্রিকালে। উজ্জ্বল দীপালোকের মধ্যে সাঁতারুরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথমে শেষ হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল এমেচার সুইমিং ফেডারেশন পরিচালিত রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ। পরে শেষ হয় ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক জলক্রীড়া। দুইটি প্রতিযোগিতাই তিনদিন ধরে চলে।

এই দুই সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাঙলার সাঁতারুদের বিশেষ করে বাঙলার সাঁতার পটিয়সী মেয়েদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। জুনিয়র, ইণ্টারমিডিয়েট এবং সিনিয়র বিভাগে ছেলেরা অনেকগুলি বিষয়ে বাঙলার রাজ্য রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন আর মেয়েরা দুইটি বিষয়ের ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে ম্লান করেছেন মেয়েদের রাজ্য রেকর্ড।

ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র আর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্যা কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা। ১০০ মিটার পীঠ সাঁতারে কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্রের উত্তরোত্তর উন্নতির কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যা চন্দ্র ১ মিনিট ২৯·৫ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক বা পিঠ সাঁতারে নতুন ভারতীয় রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। আজাদ হিন্দ বাগে **বাঙলার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সময় তিনি**

এই রেকর্ডকে আরও উন্নত করে ১ মিনিট ২৮·৪ সেকেণ্ড করেন। এক সপ্তাহ পরে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় কুমারী সন্ধ্যা আরও খানিকটা উন্নতি করে ১ মিনিট ২৮·২ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার (পিঠ সাঁতার) অতিক্রম করেছেন। জাতীয় সাঁতারে বাঙলা মহিলা দলের অধিনায়িকা কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতার সাঁতারেও দিন দিন উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লীতে অনুরাধা কোন রেকর্ড করতে না পারলেও আজাদ হিন্দ বাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ১০০ মিটার বুক সাঁতারের দূরত্ব ১ মিনিট ৩৭·৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে ১৯৫৫ সালে ডলী নাজির কৃত রেকর্ড (১ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ড) ম্লান করে দেন। পরে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি এই সময়কে আরও উন্নত করে ১ মিনিট ৩৬·৩ সেকেণ্ড করেছেন। বলা বাহুল্য কুমারী সন্ধ্যা বা অনুরাধা কারো রেকর্ডই জাতীয় রেকর্ডের অনুমোদন পাবে না। কারণ জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার সময়ের রেকর্ড ছাড়া আর কোন রেকর্ডকে জাতীয় রেকর্ড বলে স্বীকৃতিদানের বিধান নেই। যাই হক বাঙলা দেশে সাঁতার শেখার বিশেষ করে মেয়েদের সাঁতার শেখার নানা অসুবিধা আছে। প্রতিযোগীর সংখ্যাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তবুও এই প্রতিকূল আবহাওয়াই সাঁতারে বাঙলার মেয়েরা যতটুকু উন্নতি করেছে তা বিশেষভাবেই প্রশংসাযোগ্য। আন্তর্জাতিক সাঁতার মানের সঙ্গে তুলনা করে আমরা কি পাইনি তার হিসাব করতে আমি রাজী নই। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাঁতার কেটে আমরা কতটুকু পেয়েছি সেইটাই বিচার্য। অনুকূল পরিবেশ গড়তে পারলে বাঙলার মেয়েদের পক্ষে বৃহত্তর ক্রীড়াক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব এখন আমাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে কে?

• • •

বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব রোভার্স কাপ লাভ করে বোম্বাইয়ের ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কারণ রোভার্স কাপের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বোম্বাইয়ের আর কোন বে-সামরিক ক্লাবের পক্ষে রোভার্স কাপ লাভ করা সম্ভব হয় নি। ১৮৯০ সালে রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভ হয়। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রোভার্স কাপ ভারতস্থিত বিভিন্ন ব্রিটিশ সামরিক দলের অধিকারে থাকে। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ব্যাংগালোর মুসলিম দল রোভার্স কাপ লাভ করে ১৯৩৭ সালে। তারপর বিভিন্ন সামরিক ও বে-সামরিক দলের সঙ্গে রোভার্স কাপ কলিকাতা, দিল্লী, ব্যাংগালোর ও হায়দরাবাদে ঘোরাফেরা করলেও নিজ রাজ্য বোম্বাইয়ের কোন বে-সামরিক দলের অধিকারে একবারও থাকেনি। এই বছরই ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব বোম্বাইয়ের সর্বপ্রথম দল হিসাবে রোভার্স কাপ লাভ করে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তবে ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব বোম্বাইয়ের প্রথম ক্লাব হিসাবে রোভার্স কাপ লাভ করলেও ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিবাদের ফলে তাঁদের জয়ের আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে সন্দেহ নেই।

ফাইন্যালে ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করেছে ৩—২ গোলে। খেলাটি শেষ হবার ৩ মিনিট আগেও মহমেডান দল ২—১ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু ৩ মিনিট থাকতে এক 'বিতর্কমূলক' পেনাল্টি গোলের সুযোগে ক্যালটেক্স দল গোলটি পরিশোধ করে দিয়ে শেষ মুহূর্তে বিজয়সূচক গোলটি করে খেলায় বিজয়ী হয়। খেলার শেষে মহমেডান দলের পক্ষ থেকে রেফারীর তিনটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে এক প্রতিবাদপত্র পেশ করা হয়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিবাদের প্রথম বিষয় ছিলঃ ক্যালটেক্স দলের প্রথম গোলটি অবসাইডযুক্ত। দ্বিতীয় আপত্তি ছিল পেনাল্টির নির্দেশ সম্পর্কে। তাঁদের মতে রেফারী মহমেডান দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়ে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিয়েছেন, তাছাড়া অপরাধের স্থানও ছিল না কি পেনাল্টি সীমানার বাইরে। তৃতীয় আপত্তির ক্ষেত্রে মহমেডান দলের যুক্তি ছিল রেফারী নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা তিন মিনিট সময় বেশী খেলিয়েছেন এবং সেই সময়েই বিজয়সূচক গোল হয়েছে।

উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিটি মহমেডান দলের প্রতিবাদপত্র সম্পর্কে আলোচনা করে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন। ফলে পুরস্কার বিতরণী সভায় অসন্তুষ্ট মহমেডান দলকে বিজিতের পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে দূরে থেকে আমাদের কিছু বলবার উপায় নেই। তবে পি টি আই-এর রিপোর্টে ঘটনার বিবরণ পড়ে মনে হয় ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। তবু রেফারীর সিদ্ধান্তকেই চরম বলে মেনে নিতে হবে। তার ভুলচুক হতেও পারে আবার তিনি অভ্রান্তও হতে পারেন। কিন্তু তার উপর অভিমান করে পুরস্কার বিতরণী সভায় অনুপস্থিত থাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়নি।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—হুগলীর জনৈক কংগ্রেসী এম এল এ স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেসী মহলে ইঁহার নাকি খুব প্রতিপত্তি আছে। স্থানীয় জনসাধারণের একাংশের ধারণা যে ঐ এম এল এ'র কার্যকলাপের ফলে জেলার এক শ্রেণীর পুলিস ও সরকারী কর্মচারীর মনোবল হ্রাস পাইয়াছে এবং সমাজ বিরোধী শক্তিগুলির উপদ্রবও বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু শিবিরগুলি বন্ধ করিয়া দিবার পরেও পুরাতন উদ্বাস্তুদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

কলিকাতা বিমান বন্দরের শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রায় ১৮ মাস পূর্বে একটি 'ধাতুদ্রব্য সন্ধানী' যন্ত্র স্থাপনের পর হইতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকার মূল্যের সোনা আটক করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবিবার সকালে আলিপুর চিড়িয়াখানার দুইজন কর্মীকে পুলিস প্রবেশমূল্য আত্মসাতের অভিযোগে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলায় ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। পুলিস ঐ দুই-জনের নিকট হইতে কিছু টাকা তল্লাসী চালাইয়া উদ্ধার করে বলিয়া প্রকাশ।

১৮ই নবেম্বর—আজ লোকসভায় সদস্যগণ রেলমন্ত্রীর দপ্তরকে রেলের কোন কোন সেকশনের ক্রমবর্ধমান অপরাধ নিবারণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহের সহযোগিতায় কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান।

হাওড়া স্টেশনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অভিযোগের সংবাদ প্রকাশের পর রেল দপ্তরের সকল বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতা দেখা দিয়াছে। দুর্নীতি দমন অভিযানও শুরু হইয়াছে।

১৯শে নবেম্বর—অদ্য সকালে হাওড়া স্টেশনে রেল পুলিস এবং টিকিট কালেক্টরদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়ায় উভয়পক্ষে নয় জন আহত হয় বলিয়া প্রকাশ। একজন টিকেট কালেক্টর এবং একজন কনস্টেবলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাহা-দিগকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় বলেন যে, ভারতে বিদেশী মুদ্রার অভাব পূরণের জন্য আগামী বৎসরের প্রথম-ভাগে মিত্রভাবাপন্ন দেশসমূহের সহিত আলোচনা আরম্ভ হইবে।

২০শে নবেম্বর—অদ্য লোকসভায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা সম্পর্কে বিতর্ক-কালে বিভিন্ন সদস্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে ঐ প্রতিষ্ঠান খোলার দাবী জানান।

প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রণালয় ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য যে নামের তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী করা হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদের জন্য শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মনোনয়ন বাতিল হইয়া গিয়াছে।

২১শে নবেম্বর—সহকারী শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবিদ আলী অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, চাকুরি সংস্থান সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইতেছে। ঐ কমিটি দেশে চাকুরী সংস্থান এবং বেকার সমস্যার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করিবেন এবং চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কেন্দ্রীয় সহকারী মন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী লোকসভায় বে-সরকারী মালিকানায় পরিচালিত দেশের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী সুস্পষ্টরূপে অগ্রাহ্য করেন।

২২শে নভেম্বর—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদেশ ভ্রমণ করিয়া অদ্য সকালে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অপরাহ্নে সাংবাদিক-গণের সহিত বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আলোচনা কালে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনাদি রূপায়ণ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস পাইয়াছেন।

২৩শে নভেম্বর—কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচ শত মাইল দূরে বহু পৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতি-বিজড়িত দণ্ডকারণ্যের প্রান্তরে ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের নূতন উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে প্রথম উদ্বাস্তু-দল দণ্ডকারণ্যের ফরাসগাঁও অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে। ১৬ই নভেম্বর হইতে কলিকাতায় লোক বাছাইয়ের কাজ পুরাদমে চলিতেছে।

## বিদেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—সুদানী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেঃ ইব্রাহিম আব্বুদ অদ্য পাশ্চাত্য সমর্থক উম্মা পার্টি ও পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমবায়ে গঠিত কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টকে গদিচ্যুত করিয়া সুদানের শাসনক্ষমতা দখল করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরও বিলোপ সাধন করা হইয়াছে।

ডাঃ খান সাহেবকে হত্যার অভিযোগে লাহোরের জিলা ও দায়রা জজ অদ্য আতা মহম্মদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। হত্যার ব্যাপারে যোগসাজশের অভিযোগে খাকসার নেতা আল্লামা মাসরিকী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। জজ তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

১৮ই নবেম্বর—সুদানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব পরিষদ অদ্য উহার প্রথম ঘোষণায় সুদানকে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিয়াছে। এই সাধারণতন্ত্রে সার্বভৌম অধিকার জনসাধারণের হস্তেই থাকিবে বলিয়াও ঘোষণা করা হয়।

'সানডে পোস্ট' পত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, পাকিস্তানের দুইজন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রী এইচ এস সুরাবর্দী ও শ্রীফিরোজ খাঁ নূন যথাক্রমে পঁচিশ হাজার ও বিশ হাজার টাকার হিসাব দাখিল সম্পর্কে হিসাব-পরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিব্রত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের এলাকার ভিতরে গত ১৮ই অক্টোবর তারিখের "দেশের" কোন সংখ্যা পাওয়া গেলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

১৯শে নবেম্বর—অদ্য ঢাকায় প্রচারিত এক সরকারী বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য শেষ রাত্রিতে লাকসাম রেলওয়ে জংশনে চট্টগ্রাম মেল ও একটি মাল গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ১৭ নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে।

২০শে নবেম্বর—অদ্যকার কায়রোর সংবাদ-পত্রগুলি সুদানে জেনারেল ইব্রাহিম আব্বুদের গঠিত নূতন সরকারের প্রতি এক বাক্যে সহানুভূতি প্রকাশ করে। সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদানের অর্থনৈতিক সমস্যার সুযোগ লইয়া সুদানী রাজনীতিকদের "উৎকোচ" দিয়া বশীভূত করার চেষ্টা করিয়াছিল। এজন্যই জেনারেল আব্বুদের সামরিক অভ্যুত্থানের আবশ্যকতা ছিল।

২২শে নভেম্বর—"কিছুকাল প্রকৃত গণ-তান্ত্রিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বলবৎ থাকার পর" সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদকে সুপারিশ করিতে অনুরোধ জানাইয়া গ্রীক প্রতিনিধিদল আজ রাত্রে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে।

২৩শে নবেম্বর—'ডন' পত্রিকার সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মীর্জা লণ্ডনে "আপত্তিকর কার্যকলাপে" লিপ্ত হইয়াছেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি গোপনে পাকিস্তান ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের নিন্দা করিতেছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

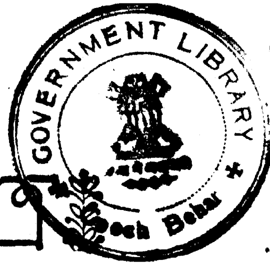
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

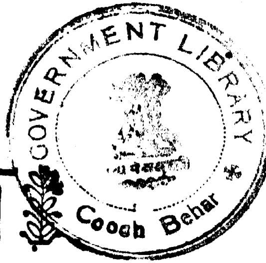
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



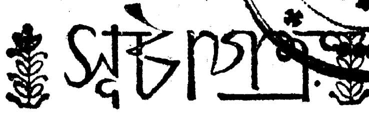

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

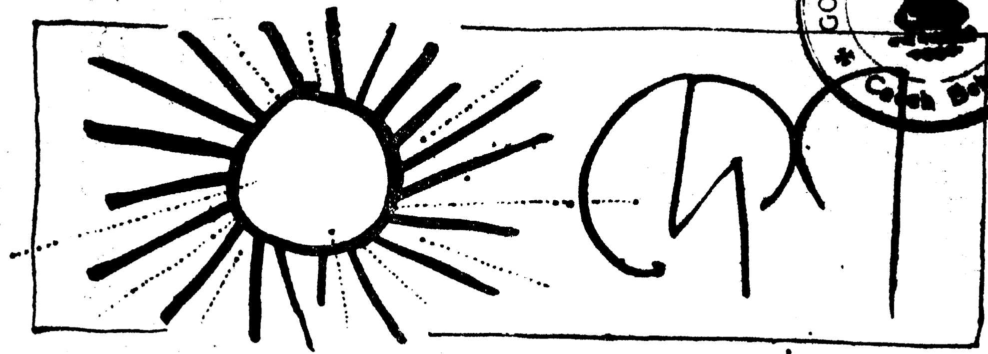
# সূচীপত্র



---



# সূচীপত্র






DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 6th December, 1958.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র

গান্ধীজীর মূর্তি অনাবরণ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু আজকার পৃথিবীর একটি গুরুতর সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন—রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ। আবার আচার্য জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ ভাষান্তরে এই সমস্যারই উল্লেখ করিয়াছেন—বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ। বস্তুতঃ নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্যকে পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া গ্রহণ করা চলে।

আজকার পৃথিবীতে প্রধান ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অতিকায় রাষ্ট্রসমূহ মানুষের সমগ্রজীবনটাকে কবলিত করিতে উদ্যত। তাহার ব্যক্তিগত বলিয়া আর কিছু রহিল না। বৈষয়িক মানুষ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রায়। এহেন অবস্থায় বিজ্ঞানকে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিককে রাষ্ট্রের প্রভাব মুক্ত রাখা সম্ভব কি না? স্পষ্টত দেখা যাইতেছে যে, নেহরু বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রপ্রভাব মুক্ত রাখার স্বপক্ষে। কী তাহার উপায়? রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান যদি ধর্মসচেতন হয় তবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু এখানেই জটিলতা। সাধারণভাবে ধর্ম ও অধ্যাত্মচেতনা সম্বন্ধে বর্তমান যুগ উদাসীন। কোন কোন রাষ্ট্র ও-দুই বস্তুকে আদৌ স্বীকার করে না। আর বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিকগণ ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞানের স্থান জীবনের এক সমতলে, ধর্মের স্থান অন্য সমতলে। কাজেই বিজ্ঞানে ধর্মচেতনার স্থান নাই। এই যদি যুগের ও বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা হয় তবে রাধাকৃষ্ণণের উক্তির সার্থকতা কোথায়? রাধাকৃষ্ণণ হয়তো বলিবেন, ধর্মকে গতানুগতিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া তাহার অর্থ ও পরিধি বিস্তৃততর করিলে এমন একটা স্থানে গিয়া দাঁড়ায়—যে অর্থে ধর্মকে স্বীকার করিতে বাধা হইবার কথা নয়। তিনি বলিবেন যে, ধর্ম মানে অনুষ্ঠানাদি নয়, সর্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যাহার মুখ্য লক্ষ্য (অর্থাৎ মৌখিক লক্ষ্য) সর্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষা। আবার দেখা যাইতেছে যে, সেই সব রাষ্ট্রেই বিজ্ঞান ষোল-আনা রাষ্ট্রায়ত্ত। কাজেই সমাধান কোথায়?

এবারে নেহরুর উক্তিকে অনুসরণ করা যাক। নেহরু সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্র মানে নিয়ন্ত্রিত-জীবন রাষ্ট্র। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। এখন এই নিয়ন্ত্রণের সীমা কোথায়? কাগজে-কলমে নিয়ন্ত্রণের সীমা টানা অসম্ভব নয়, কিন্তু কাজে নামিলে দেখা যায় যে, কাগজখানা নিতান্তই বাজে কাগজ। একবার সীমা টানিতে গেলে দেখা যাইবে যে, কেবল বৈষয়িক ব্যাপার আত্মসাৎ করিয়া রাষ্ট্র ক্ষান্ত হয় না। বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের উপরেও দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। তাহার উপরে যখন মনে পড়ে যে, বিজ্ঞানের হাতে প্রচণ্ড শক্তি ও অসীম সম্ভাবনা তখন তাহাকে করায়ত্ত করিয়া শক্তিমান হইবার লোভ পাইয়া বসে। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের জন্য অল্পলোকেরই মাথা ব্যথা। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটার প্রতিই রাষ্ট্রের ঝোঁক। শক্তিকামী রাষ্ট্র এহেন বস্তুকে আলগা রাখিয়া দিতে পারে না। ছলে বলে অর্থলোভে ও আদর্শবাদের দোহাই দিয়া বৈজ্ঞানিককে সে আপন রাষ্ট্ররথের জোয়ালে জুড়িয়া দিবেই দিবে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রস্বার্থের কাছে নতিস্বীকার করিল না, আইনস্টাইনের মত তাহার নির্বাসন অনিবার্য। কিন্তু সে রকম লোক কয়টি হয়? কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক সমাজ অল্প-বিস্তর নিজ নিজ রাষ্ট্রের কুক্ষিভুক্ত। তাই দেখা যাইতেছে নেহরুর উক্তিও সমাধানের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ নয়।

বিজ্ঞান আজ মানবসমাজের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা। এখন বিজ্ঞান যাহাতে মানবসমাজকে ধ্বংস না করিয়া তাহার কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়—ইহাই কাম্য। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকে সত্যদর্শী করিবার উদ্দেশে নেহরু নৈতিক শক্তির এবং রাধাকৃষ্ণণ আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন করিতে বলিয়াছেন। মুখ্যত দুই-ই অভিন্ন আর ইহাই একমাত্র উপায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু পথের অন্তরায় সুপ্রচুর; তন্মধ্যে প্রধান রাষ্ট্রের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছায় যদি পরিবর্তন না ঘটে তবে কেবল ব্যক্তির প্রচেষ্টায় যে এমন সম্ভব হইবে মনে হয় না। ব্যক্তি এযুগে দুর্বল ও লুপ্তপ্রায়। ব্যক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলে তবেই নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণের আদর্শ সফল হইতে পারে—অন্যথা সম্ভব মনে হয় না।

# প্রসঙ্গত

দূরে, বহুদূরে উজ্জয়িনীপুরে মহাসমারোহে অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও কালিদাস-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিতৃঋণ, দেবঋণ ইত্যাদি বিবিধ ঋণের তালিকায় কাব্যঋণের উল্লেখ নেই, কিন্তু জাতির পক্ষে এ ঋণও অপরিশোধ্য। সাংবৎসরিক স্মরণে কর্তব্যের বোঝাই মাত্র হালকা হয়। কালিদাসের কাল নেই, কিন্তু কী অর্থে নেই, বলা শক্ত। তাঁর কালজয়ী কাব্য আছে। কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তিনি মেঘদূত রচনা করেছিলেন, সেই অবধি বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিতে প্রতিস্পন্দিত। অভিজ্ঞান শকুন্তলা আজও দ্যুলোক আর ভূলোকের মধ্যে সেতুবন্ধ। উজ্জয়িনীর অনুষ্ঠানে কৃতজ্ঞ জাতির কবিপ্রণাম যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু একজনকে বড় করতে গিয়ে আমরা অন্যকে ছোট না করে বোধ হয় পারি না। অথবা ছোট করি আপনাকেই। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জল শাস্ত্রী তাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভরসা ছিল কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তিনি দৈবে দশম রত্ন হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের পাতঞ্জল ভাষ্য—ভাষা বদল না রায়, ঠিক জানিনে—পাঠ করে জ্ঞানলাভে পেতেন না। জয়ন্তী উৎসবের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন ভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন "ভারতের কালিদাস" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই বাঙালীর কবি। বিশ্বকবিকে তিনি আঞ্চলিক কবির বেশী মর্যাদা দিতে রাজী নন, কেন না রবীন্দ্রনাথের মূল এবং মুখ্য রচনা বাংলাতেই। বাংলা সর্বভারতীয় ভাষা নয়।

অকপটে স্বীকার করি, এই যুক্তির যাথার্থ্য ঠিক অনুধাবন করতে পারছি না। মূল এবং মুখ্য রচনা আপন মাতৃভাষায় নয়, এমন কোন মহাকবির নাম সহসা স্মরণ হয় না। হোমর, শেক্সপীয়র, হুগো, গ্যেটে, টলস্টয়—যাঁরা সর্বত্র পূজ্য হয়েছেন, তাঁরা আপন আপন ভাষাতেই অমর-কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষা নয়—সুর এবং মর্মবাণী সর্বকালীন এবং সর্বজনীন কিনা মহৎ কাব্যের মূল্য নিরূপণের এই একটিমাত্র মাপকাঠি। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলেও শাস্ত্রী মহাশয় জানতে পারতেন, সে-সাহিত্যের কোন তুচ্ছ ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অবশ্যই আইনের সূক্ষ্ম বিচার করতে সক্ষম, কিন্তু কাব্য বিচারেও তাঁর তুলনীয় অধিকার আছে কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে।

কোন টীকা-টিপ্পনী যোগ না করে সংবাদপত্রে একই দিনে পাশাপাশি প্রকাশিত দুটি খবর পাঠকদের সমীপে পেশ করছি।

একটি খবর এই : "কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অবশিষ্ট দুই বৎসরে ভারতের বিদেশী মুদ্রার ঘাটতির পরিমাণ মোটামুটি ৬৫ কোটি ডলার (তিনশত কোটি টাকারও বেশী)। এই অভাব পূরণের জন্য আগামী বৎসরের প্রথমভাগে মিত্রভাবাপন্ন দেশসমূহের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবে।"

অপর খবরটি : "লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা দেশে-বিদেশে সফর-বাবদ মোট ২০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন।"

বৈদেশিক দূতাবাসগুলির জন্য আমাদের কত ব্যয় হয়, তার সর্বাধুনিক হিসাবটা সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে কয়েক কোটি টাকা ত বটেই। এবং রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ইত্যাদির বহু জরুরী প্রয়োজন অবশ্যই এই দূতাবাসগুলির মারফতে সাধিত হয়ে থাকে। এই মিত্রতার জয়যাত্রার যুগে নানা বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন, লালন ও পালন দূতাবাসগুলির প্রধান কর্তব্য। কেবল দেশে দেশে কলকাতি ত্রেতাকাল থেকেই বরং লভ্য (শ্রীরামচন্দ্রের আক্ষেপ স্মরণীয়), কিন্তু ভ্রাতা বা সহোদর কদাপি মেলে না।

দূতাবাসগুলির দ্বিতীয় এবং গৌণ কাজ সংবাদ-সংগ্রহ। অন্য দেশে যা ঘটে, সরকার আপন রাষ্ট্রদূতের নিকট থেকেই সে সম্পর্কে প্রথমে বিস্তারিত ও প্রামাণ্য বিবরণ পেয়ে থাকেন।

এখন প্রশ্ন এই, আমাদের সরকার কতখানি পেয়েছেন। কোন রাজনৈতিক টীকাকার সম্প্রতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বিশেষ নয়। হাঙ্গেরী বা পোল্যাণ্ডের হাঙ্গামার সময় আমাদের রাষ্ট্রদূত সেখানে ছিলেন না, জুলাই মাসে ইরাকে যখন বিপ্লব হল, তখনও আমাদের রাষ্ট্রদূত গরহাজির। লেবাননের গোলযোগের সময়েও বেইরুতে উচ্চপদস্থ কোন ভারতীয় কূটনৈতিক ছিলেন না, ফরাসী দেশে দ্য গল যখন ক্ষমতায় আসীন হলেন, আমাদের দূত তখন 'কান' শহরে ফিল্ম ফেস্টিভালে। দূরে চেয়েই বা কাজ কী, ৭ই অক্টোবর, পাকিস্তানে যখন আয়ুবশাহীর সূত্রপাত, করাচীতে তখন ভারতীয় হাই-কমিশনার অনুপস্থিত। সেখানকার ঘটনাবলীর প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পণ্ডিতজী পেয়েছেন মাত্র এই সেদিন—কানাডার প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে। অর্থাৎ এবারেও সঞ্জয়ের ভূমিকা নিতে হয়েছে একজন বিদেশীকে!

*

কলকাতার ময়দানে বিদেশী সেনানায়কের অপসারিত অশ্বারোহী মূর্তির স্থলে মহাত্মাজীর চির-নিঃসঙ্গ পথিক-বিগ্রহের স্থাপনায় একটি গ্লানিকর বিতর্ক ও বিতণ্ডার অধ্যায়ের অবসান ঘটল আশা করি। জাতির জনককে আমরা আততায়ীর গুলী থেকে রক্ষা করতে পারিনি, তাঁর প্রতিকৃতিকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাচীর ও পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যে অপ্রীতিকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিতান্তই সাময়িক, কিন্তু তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শুধু বিপথগ বুদ্ধিবশে চালিত মুষ্টিমেয় হাঙ্গামা-প্রয়াসীরাই নয়, অংশত কর্তৃপক্ষেরও। নেতাজীর কর্মভূমি এই মহানগরে তাঁর যোগ্য প্রতিমূর্তি স্থাপন সম্পর্কে পৌরসভা বা সরকার যদি পূর্বেই উদ্যোগী হতেন, তবে অতিতৎপরদের আয়োজন এতখানি অগ্রসর হতে পারত না। শুধু নেতাজী কেন, আমাদের আপন নেতা ও মনীষীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা চিরকাল উদাসীন। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ—কারও উপযুক্ত কোন প্রতিমূর্তি এই শহর কোথাও রক্ষিত হয়েছে বলে জানিনে।

*

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকেই নব-ভারতের প্রথম বিজ্ঞান-পথিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকার ক্রোড়পত্রে নানা অভিনন্দন-বাণী সাক্ষ্য দেয়, আচার্য দেশে-বিদেশে কী অসামান্য সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। প্রতীচ্যের বহু বিজ্ঞানী প্রাচ্যের সাধককে নমস্কার জানিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময় ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, জগদীশচন্দ্রের সমসাময়িক বা উত্তরসাধক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা যেন নীরব। আপন যোগীদের আমরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মানের আসন দিতে কুণ্ঠিত, এই নীরবতা কি সেই অবহেলারই আরেকটি প্রমাণ?

# আলোচনা

## আর্থিক সমীক্ষা

মহাশয়,

কিছুদিন হল 'দেশ' পত্রিকায় 'আর্থিক সমীক্ষা' প্রসঙ্গে শ্রী কৌটিল্যের আলোচনা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি। বাংলা ভাষায় আর্থিক উন্নতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উৎকৃষ্ট আলোচনা প্রায়ই চোখে পড়ে না—সেদিক থেকে শ্রী কৌটিল্য নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। কিন্তু বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রিকায় তৃতীয় গোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষেত্র (tertiary production sector) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তার সবগুলি মেনে নেওয়া যায় না।

শ্রী কৌটিল্য উক্ত বিষয় সম্পর্কে কলিন ক্লার্কের বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ করেছেন। তিনি বলেছেন, "........ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দেশ.....ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে, তাদের সম্পর্কে ক্লার্কের ধারণাগুলি প্রাসঙ্গিক। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য যে, কোনো দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীতে কর্মনিয়োগের আপেক্ষিক প্রসার হলেই ধরে নিতে হবে, সেই দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে।" এই পর্যন্ত ক্লার্কের বক্তব্যের সঙ্গে বিশেষ বিরোধ নেই—কিন্তু গোলমাল শুরু হয়েছে এরপর থেকেই; যখন তিনি বলেছেন, "এর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই এই অনুসিদ্ধান্তও বেরিয়ে আসে যে, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় উন্নয়নের উপায় হিসেবে আমরা কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্র থেকে তৃতীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কর্মক্ষম লোকদের চালান দিতে থাকবো।" এই অনুসিদ্ধান্ত আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে শ্রী কৌটিল্যের নিজস্ব—ক্লার্ক এর জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নন।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এ সম্পর্কে ক্লার্কের বক্তব্য কী। The Condition of Economic Progress নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) ক্লার্ক বলেছিলেন, "বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনা করলে আমরা একটি ধ্রুব, সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, সব সময়েই গড়পড়তা মাথা-পিছু আয় যেখানেই বেশি, সেখানেই কর্মক্ষম জনসংখ্যার বেশী অংশ তৃতীয় গোষ্ঠীর শিল্পে নিযুক্ত.........। ......মাথা-পিছু গড়পড়তা প্রকৃত আয়ের আধিক্য উৎপাদনকারীদের এক বৃহৎ অংশকে তৃতীয় গোষ্ঠীর উৎপাদনে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করে।" (পৃঃ ১৮২) উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫১) তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সার উইলিয়াম পেটির বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, "অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর কর্মক্ষম জনসমষ্টির বণ্টনবৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।" (পৃঃ ৩৯৫—৯৭) কিন্তু গত বছর (১৯৫৭) প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে ক্লার্ক তাঁর বক্তব্য আরো পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করেছেন : "এই বিষয়ে একটি ব্যাপক, সরল এবং সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত হল এই যে, কালক্রমে একটি জনসমষ্টি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যত অগ্রসর হতে থাকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা থেকে আপেক্ষিকভাবে তত কমতে থাকে এবং শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা আবার তৃতীয় বিভাগে নিযুক্ত লোকসংখ্যা থেকে আপেক্ষিকভাবে কমতে থাকে।" (পৃঃ ৪৯২). পেটির বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও ক্লার্ক বলেছেন, "সমস্যাটা হল এই যে, মাথা-পিছু প্রকৃত আয় বাড়লে তিনটি বিভাগের মধ্যে জনসংখ্যা বণ্টনের ওপর তার কী প্রভাব হবে।" (পৃঃ ৪৯৩)।

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে ক্লার্কের বক্তব্য যেটা বোঝা যায় সেটা হল এই যে, তৃতীয় গোষ্ঠীতে কর্মিসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির ফল হিসেবেই দেখা যায়—কারণ হিসেবে নয়। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতি হলে তৃতীয় গোষ্ঠীতে বেশী লোক যাবে এটা আশা করা গেলেও ঐ গোষ্ঠীতে 'কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষম লোকদের চালান দিতে থাকলেই অর্থনৈতিক উন্নতি হবে—এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল এবং ক্লার্কের সুবৃহৎ গ্রন্থের কোথাও প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে এই ইঙ্গিত নেই। ক্লার্কের সিদ্ধান্ত একমুখী—বিপরীতক্রমে সত্য নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রী কৌটিল্য ক্লার্কের এমন একটি ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন এবং সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন, যেটি ক্লার্কের গ্রন্থে নেই।

ভারতবর্ষের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শ্রী কৌটিল্য যার আশঙ্কা করেছেন ঐ রকম অনুসিদ্ধান্ত কেউ করেছেন কি না, আমার জানা নেই—যদি করে থাকেন, তবে শ্রী কৌটিল্যের হুঁশিয়ারী খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং উপযোগী হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, তাঁর ভয় নেহাতই অমূলক।

তা ছাড়া 'কিছুকাল আগে পর্যন্ত অর্থনীতিবিদেরা' ক্লার্কের ধারণার প্রয়োগযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো বাছবিচার করেননি—এ-কথাটা বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। 'ইকনমিক

জর্নাল' পত্রিকায় (ডিসেম্বর, ১৯৫১) P. T. Bauer এবং B. S. Yamey ক্লার্কের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পেশাভিত্তিক কর্মি-বণ্টনের মধ্যে যে সম্পর্ক লক্ষিত হয়, সেটা অর্থনীতির কোনো সূত্রের ফল নয়—Statistical accident মাত্র। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়।

নমস্কারান্তে। ইতি—রণজিৎ লাহিড়ী।

**(লেখকের উত্তর)**

মহাশয়,

শ্রীরণজিৎ লাহিড়ী যথেষ্ট যত্নসহকারে আমার রচনার সমালোচনা জানিয়ে আমার উপকার করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের উত্তর দিচ্ছি।

১। কলিন ক্লার্ককে আমি কেবলমাত্র এই জনপ্রিয় ধারণাটির জন্যই দায়ী করেছি যে, ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দেশ তাদের শিল্পায়নের পর্যায়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে, তাদের কৃষি থেকে শিল্পে এবং কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্র থেকে ক্রমে অপর এক তৃতীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উৎপাদনের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। উৎপাদনের গুরুত্ব বলতে তিনি মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের (real income) বৃদ্ধি মনে করেছেন। নিয়োগ পরিমাণের (volume of employment) বৃদ্ধিও ধরে নেওয়া হয়েছে। শ্রী লাহিড়ীর এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই।

২। আমার লেখায় ক্লার্কের বক্তব্য থেকে যে অনুসিদ্ধান্তের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি, তার জন্য আমি স্বয়ং ক্লার্ককে দায়ী করিনি। এ দায়িত্ব ক্লার্ক-প্রভাবিত অর্থনীতিবিদদের। আমার মূল রচনাটি শ্রী লাহিড়ী আবার পড়ে দেখলে লক্ষ্য করবেন আমি আগাগোড়া খুব সাবধানে ক্লার্ক কি বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য থেকে কি ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে বা হতে পারে তা বিবেচনা করেছি।

৩। যে অনুসিদ্ধান্তটির উল্লেখ আমি করেছি, তার 'কৃতিত্ব'ও আমার নিজের নয়। সাম্প্রতিককালে পরিকল্পিত কিংবা আংশিক নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থাগুলিতে স্থান-কাল-অবস্থা নির্বিচারে উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তটিকে গ্রহণের খানিকটা প্রবণতা অনুভব করা যায়। এর অন্যতম উদাহরণ ১৯৪৯-৫০ সনের ভারতীয় Fiscal Commission Report-এ তৃতীয় গোষ্ঠীর পেশার ভূমিকা সম্বন্ধীয় আলোচনা। এই রিপোর্টের লেখকেরা যখন অনেক আলোচনার পর লেখেন যে, "There should also be a much wider recognition than at present of the opportunities for profitable employment afforded in fairly developed economics by tertiary occupations to which attention has been drawn by Dr. Colin Clark and systematic efforts should be made to stimulate such services and occupations" (পৃঃ ৯৪), তখন অগ্রসর এবং অনুন্নত অর্থনীতির তৃতীয় গোষ্ঠীর অনেক পেশার মধ্যে যে কোনো গুণগত প্রভেদ আছে তার ইঙ্গিতমাত্রও পাওয়া যায় না।

শ্রী লাহিড়ী Economic Journal-এ Bauer এবং Yamey-র রচনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে আমার চেয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে ক্লার্কের বক্তব্যগুলিকে খণ্ডন করেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি শুধু এইমাত্র মন্তব্য করেই নীরব থেকেছেন যে, উপরোক্ত দুই লেখকের "সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়।" দুঃখের বিষয়, তিনি এই লেখকদ্বয়ের ১৯৫১ সনের ডিসেম্বরের লেখাটির উল্লেখ করেই থেমে গেছেন। এই রচনা প্রকাশের পরে ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যা Economic Journal-এ S. G. Traintis ক্লার্কের বক্তব্যের সমর্থনে অগ্রসর হয়ে, তাঁর বক্তব্য অনগ্রসর দেশ সম্বন্ধেও বহুলাংশে প্রযোজ্য বলে দাবী জানান। তার উত্তরে ১৯৫৪ সনের মার্চে একই পত্রিকায় Bauer ও Yamey যে প্রবন্ধ লেখেন, বর্তমান প্রসঙ্গে স্থানাভাব বশত শ্রী লাহিড়ীকে তা পড়ে নিতে অনুরোধ করছি। আশা করি, ক্লার্ক সম্বন্ধে যে অনুসিদ্ধান্তের উল্লেখ আমি করেছিলাম, তা আমার স্বকপোলকল্পিত বলে অতঃপর তিনি আর অভিযোগ করবেন না।

৪। সব শেষে, শ্রী লাহিড়ীকে ডাঃ ভবতোষ দত্তের Economics of Industrialisation বইয়ের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু যত্ন সহকারে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার সেখানে ক্লার্কের বক্তব্যের নানা দিক সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করে অবশেষে আমাদের এই সাবধানবাণী জানিয়েছেন যে, অনগ্রসর অঞ্চলে তৃতীয় গোষ্ঠীতে বিরাট নিয়োগ পরিমাণ দেখে একথা মনে করলে হয়তো ভুল হবে যে, তা আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। তিনি নিজেই অনুন্নত দেশের এই গোষ্ঠীর পেশাগুলিকে 'poverty induced' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং এই ভিত্তিতেই আমি লিখেছিলাম যে, "প্রকৃত ধনতান্ত্রিক দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীটি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর (অর্থাৎ শিল্পের) প্রয়োজন-প্রসূত। এর অর্থ এই যে, ও-রকম দেশে তৃতীয় গোষ্ঠীর ক্রিয়াগুলি না থাকলে শিল্পায়নের গতি রুদ্ধ হয়ে আসবে। কিন্তু ভারতবর্ষে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ক্রিয়াগুলির জন্ম-বৃত্তান্তই অন্য। শিল্পের পরিপন্থী পরিবেশ থেকে তাদের জন্ম এবং শিল্পের পরিপন্থী হয়েই তাদের অস্তিত্ব। তাই এই গোষ্ঠীতে বিবেচনাহীনভাবে শ্রমিকের নিয়োগ বাড়াতে আরম্ভ করলে পরিস্থিতি আরো অবাঞ্ছিত হতে থাকবে।" ইতি—বিনীত শ্রী কৌটিল্য।

# পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার




**মনুজেন্দ্রলাল চৌধুরী**

এবার সুইডিশ্ আকাদামী রাশিয়ার প্রতি একেবারে দরাজ হাত। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে চারিজনকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হইয়াছে। শ্রীবরিস্ পাস্তের-নাককে সাহিত্যের পুরস্কার দেওয়ায় একটা ছোটখাট প্রহসন ঘটিয়া গেল। কারণ কি, না, রুশীয় সাহিত্য আকাদামীর মতে পাস্তেরনাককে শিরোপা দেওয়া হইয়াছে শুধু রাশিয়ার শির হেঁট করানোর জন্য, অর্থাৎ ঘর ভাংগানর চাল। তাঁহাদের মতে ডাঃ জিভাগো বই-খানাতে বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। অতএব সুইডিশ্ আকাদামীর এই নির্বাচন নিতান্তই একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনৈতিক চাল। তাই রাশিয়ায় শ্রীপাস্তেরনাককে একঘরে করার ব্যবস্থা হইল। ব্যাপার দেখিয়া সাহিত্যিক পাস্তেরনাকের ত' 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' গোছের অবস্থা। অথচ অন্যদিকে পদার্থ বিজ্ঞানে যাঁদের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা কিন্তু নির্বিবাদেই এই সম্মান লাভ করিলেন।



সিয়েরিয়েনকভ্

সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে এইখানে কিছু তফাত আছে। সাহিত্যের মালমশলা আর বিজ্ঞানের কাঠ-খড়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটার আস্বাদ যে চাখিয়া দেখে তার রুচির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। কিন্তু বিজ্ঞানের কাঠ-খড় জ্বালাইয়া যে আগুন পাওয়া যায় তাহা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ; দাহিকা শক্তি প্রমাণের আবশ্যক রাখে না, তার উজ্জ্বলতা (একমাত্র অন্ধ ছাড়া) অস্বীকার করে না কেউ, আর সেই আগুনে বিজ্ঞানের রন্ধনশালায় যা তৈয়ার হইতেছে, মানব-সমাজের ভূরিভোজে তাহার অনেক তারিফ পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানীর জাত আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের জাত নাই। রুশীয় বিজ্ঞান মার্কিনী বিজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু রুশীয় সাহিত্য আর অ-রুশীয় সাহিত্যে কিঞ্চিৎ অম্ল-মধুর সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কিছুটা নিরাপদ; সেইজন্যই রুশীয় হইলেও পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সিয়েরিয়েনকভ্, অধ্যাপক ফ্রাংক ও টাম্ নির্বিবাদে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এঁরা তিনজনে একই আবিষ্কারের অংশীদার, তাই বোধ হয় পুরস্কারেও সেই শরিকানা রক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু নোবেল পুরস্কার ভাগ হইলে তার মূল্য কমে না, কেন না, এই শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনজনকে দেওয়ায় অর্থ রাশিয়ার বিজ্ঞান-সংগীতকে তিনবার স্বীকার করা। আর তাহাতে বার্কলে (আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র) হইতে সীড্‌নি আর কলিকাতা হইতে হারওয়েল (ইংলণ্ডের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র) পর্যন্ত কোথাও এতটুকু উষ্মা নাই।

যে আবিষ্কারকে কেন্দ্র করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, তাহার দুটি দিক, এক তথ্যের দিক, দ্বিতীয় তত্ত্বের। প্রথম দিকটার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ অধ্যাপক সিয়েরিয়েনকভের এবং সেজন্যই এই আবিষ্কারের নাম দেওয়া

হইয়াছে সিয়েরিয়েনকভ্ রশ্মি আর এই রশ্মির উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া যে তত্ত্ব খাড়া হইয়াছে তাহার কৃতিত্ব অধ্যাপক ফ্রাংক ও টামের।

এই সিয়েরিয়েনকভ্-রশ্মির প্রথম সূত্রপাত ১৯৩৪ খৃঃ রুশীয় বিজ্ঞান পত্রিকায়। তাহার পর ক্রমাগত পর পর নয়টি গবেষণা প্রবন্ধে অধ্যাপক সিয়েরিয়েনকভ্ তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন। সে ১৯৩৮ সালের কথা। তাহার প্রায় ২০ বৎসর পরে আজ তাঁহাকে সম্মানিত করা হইল। বিলম্বের কারণ রাজনৈতিক কিনা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সংগতভাবেই দুটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমত, যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সিয়েরিয়েনকভ্ রশ্মির আবিষ্কার সেগুলি অবিশ্বাস্যরকম সাধারণ ও অনাড়ম্বর। যা আমাদের চোখ ধাঁধায় না, সেই অনাড়ম্বরতার মধ্যেও যে মহৎ সম্ভাবনা থাকে তাহাকে বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। আর দ্বিতীয় কারণ সিয়েরিয়েনকভ্ যে রশ্মির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন অনেকে তাহাকে পূর্বে আবিষ্কৃত অন্য এক রশ্মি (যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Bremstrahlung ব্রেমস্ট্রালুংগ) বলিয়া ভুল করেন। এই ভুল ভাঙিতে বেশ কয়েক



ফ্রাংক টাম

বৎসর সময় কাটিয়া যায়, আর এই ভুল দূর করার পক্ষে প্রয়োজন ছিল এই রশ্মির উৎপত্তির একটা যথাযথ তত্ত্ব খাড়া করা। সেই তাত্ত্বিক দিকটা দেখাইয়া দিয়াছেন অধ্যাপক ফ্রাংক ও টাম তাঁদের একাধিক গবেষণা প্রবন্ধে, যার জন্য অধ্যাপক সিয়েরিয়েনকভের সহিত তাঁহাদের দুজনকেও এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে।

( ২ )

প্রথমে সিয়েরিয়েনকভের আবিষ্কারের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বলা যাক। পরমাণু বিজ্ঞান বলিলেই একটা বিরাট বহু জটিল যান্ত্রিক কারখানা বোঝায়—এমন একটা ধারণা চলিত আছেন। বিশেষত আজকাল পরমাণু-চুল্লী অথবা পরমাণু-বিভাজন সংক্রান্ত যে-সব সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন, বিভাট্রন, কসমোট্রন প্রভৃতি উৎকট নামের আর বিকট আয়তনের যন্ত্রপাতির ছবি মাঝে মাঝে কাগজে আত্মপ্রকাশ করে তাহাতে এরকম ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের দেশে পরমাণু বিজ্ঞানে আশানুরূপ প্রগতির অভাবের সংগে বহু ব্যয়সাধ্য এইসব যন্ত্রপাতির অভাবের একটা অজুহাত অনেকে জড়াইয়া ফেলেন। অধ্যাপক সিয়েরিয়েনকভের আবিষ্কার সেই ভুল ভাঙিয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়। যান্ত্রিক জটিলতার ক্ষেত্রও আছে সন্দেহ নাই; যেখানে ব্যয় ও জটিলতা আমাদের পক্ষে কিছুটা বাধা, কিন্তু সিয়েরিয়েনকভ্ প্রথম দেখাইলেন—পথ বহুধা, শুধু পান্থ বিরল। যে যন্ত্রের সাহায্যে তিনি এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার করিলেন তার সামান্যতা সত্যই অসামান্য। এমন কি, তাকে যন্ত্র নাম দিতে সংকোচ হয়। অন্ধকার ঘরে কাচের গ্লাসে খানিকটা জল (নিতান্তই কলের জল!) আর তার তলায় এক টুকরা ছোট রেডিয়ম ধাতুর কণা! এই-ই সব। একে যদি যন্ত্র বলা হয় আমার আপত্তি নাই। অবশ্য আর একটু আছে, সেই জলের গ্লাসের উপর দুইটি একাগ্র তীক্ষ্ম চক্ষু, বিজ্ঞানী সিয়েরিয়েনকভের চক্ষু! অবশ্য দেখার সুবিধার জন্য তিনি চোখের সামনে যে একটা ত্রিকোণ কাচ আর গোটি দুই কাচ-ফলক বসাইয়া নিয়াছিলেন, চশমার চেয়ে তাকে সরল বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। অথচ ইহা লইয়াই তিনি ঐ গ্লাসের মধ্যে কি আলোক দেখিলেন যার ফলে আজ বিজ্ঞানী সমাজে এই সাড়া! ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে eyes to see—চোখ দেখার জন্য। বস্তুত চোখ থাকিলেই চক্ষুষ্মান্ নয়, আর দেখিলেই দেখা হয় না। আরও বিস্ময়ের কথা, যে-আলো তিনি দেখিলেন তাহা কোনও অভূতপূর্ব বিস্ময়কর আলো নয়। রোন্‌টগেনের রশ্মির (X-ray) মত অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য তাহার নাই। ভোর বেলা চোখ মেলিলেই যে আলো আমাদের চোখ জুড়াইয়া দেয়, এও সেই আলো, সেই দিনের আলো। এ আলোকে আমরা ইহার পর হইতে বিজ্ঞানের মান রক্ষার্থে দৃশ্য আলো বলিব। কেননা, এই আলোর সাহায্যেই ত' এ নিখিল জগৎ আমাদের কাছে দৃশ্য জগৎ, নয়ত সবই অন্ধকার! সিয়েরিয়েনকভের দেখা আলো যদি ইহাই হয় তবে বিস্ময় কোথায়? বিস্ময় এই যে, অন্ধকার ঘরে গ্লাসের জলে এ আলো আসে কোথা হইতে? আবার সিয়েরিয়েনকভ্ দেখিলেন যে, গ্লাসের তলা হইতে রেডিয়ম ধাতুর খণ্ডটুকু সরাইয়া নিলে সংগে সংগে এই আলো নিভিয়া যায়,

অথচ রেডিয়ম খণ্ড হইতে কৈ কোনও দৃশ্য আলো ত' বিজ্ঞানীর চোখে পড়িতেছে না? এইখানে শুরু হইল অনুসন্ধান, শুরু হইল এই আলোর নানা ধর্ম বিশ্লেষণ।

কিন্তু তাহার আগে দৃশ্য আলো কথাটা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা দরকার। আমরা যখন বলি দৃশ্য আলো, তখন স্বভাবত প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে, তবে কি অদৃশ্য আলো বলিয়া কিছু আছে? উত্তরে বলিতে হয় যে, অদৃশ্য আলো যে শুধু আছে তাহাই নয়, গোটা আলোর রাজ্যের তাহারাই সব; যতটুকু আমাদের চোখ ধরিতে পারে সে অতি সামান্য। আকাশে যে রামধনু ওঠে তাহার লাল হইতে বেগুনী পর্যন্ত মোটে সাত রঙ, তার কারণ ঐ বেগুনীর নীচে আর লালের উপরে যে অজস্র আলো আছে সে আমাদের চোখ বুঝিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন আলোর তরঙ্গ বিশেষ। এক এক রঙের আলোর এক একরকম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। আশ্চর্য এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের চারদিকে অগণিত রঙের যে সহস্র সহস্র আলোর তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র লাল হইতে বেগুনী এই সাত রঙ আমাদের চোখে ধরা পড়ে আর সব থাকিয়াও আমাদের চক্ষে অন্ধকার! লাল আলোর চেয়ে দীর্ঘ লোহিতাতীত রশ্মি, হার্টজিয়ান রশ্মি, খাটো রেডিও তরঙ্গ (short wave), ৪০০।৫০০ মিটার দীর্ঘ রেডিও তরঙ্গ, আবার ওদিকে বেগুনী পারের ক্ষুদ্র অতি-বেগুনী আলো, আরও ক্ষুদ্র তরঙ্গায়িত X-রশ্মি, বিটা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি সমস্তই সেই একই নিরবচ্ছিন্ন আলোর গোষ্ঠী! প্রতিদিন এইসব অগণিত অদৃশ্য আলো না জানি কত বিচিত্র রঙের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই নিখিল রঙের মেলায় কোন্ নিষ্ঠুর অভিভাবক মানুষের হাতে মাত্র লাল হইতে বেগুনী পর্যন্ত এই সাত রঙের একটা ছোট্ট খেলনা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে! কিন্তু মানুষকে প্রকৃতি একটা অপটু চোখ দিয়া তাহাকে যতটা বঞ্চিত করিয়াছে, মানুষ তার বুদ্ধি দিয়া সেটুকু পোষাইয়া নিয়াছে।

সিয়েরিয়েনকড বলিলেন, নিঃসন্দেহে ঐ রেডিয়ম খণ্ডটুকুর সঙ্গে প্লাসের জলে দেখা ঐ আলোর একটা যোগাযোগ আছে। কিন্তু কি সেই যোগ? একথা জানা ছিল যে, ঐ রেডিয়ম খণ্ড রশ্মি বিকীর্ণ করে কিন্তু সে অদৃশ্য আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। অনেকেই জানেন, রেডিয়ম য়ুরেনিয়ম প্রভৃতি এক শ্রেণীর পদার্থকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়। এইসব পদার্থের থেকে যে তেজ বা রশ্মি আপনা থেকে সদা বিচ্ছুরিত হয় আগেই বলিয়াছি সে রশ্মি অদৃশ্য, অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গায়িত, আমাদের চোখ তার খবর জানে না। কিন্তু দৃশ্য আলো যেমন চামড়ার উপরে খানিকক্ষণ পড়িলেই তাহার উত্তাপ আমরা অনুভব করি তেমনি রেডিয়ম খণ্ড হইতে যে রশ্মি নির্গত হয় তাহাকে চোখে দেখা যায় না; কিন্তু কিছুক্ষণ চামড়ার উপরে পড়িলে ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে। এই তেজস্ক্রিয়তা কি? বন্দুকের ভিতর হইতে যেমন গুলি ছুটিয়া বাহির হয়, কার্পাসের ফল ফাটিয়া তার বীজ যেমন তীব্রবেগে অকস্মাৎ বাহিরে আসে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর ভিতর হইতেও তেমনি স্বতঃই আলফা, বিটা গামা রশ্মি-কণা বিচ্ছুরিত হয়।

বন্দুকের গুলী ছুড়িতে হইলে তাহার ঘোড়াটা টিপিতে হয়। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর মধ্যে এই ঘোড়া টিপিবার কাজটা যে আপনা আপনি কি করিয়া ঘটিতেছে সে এখনও অজ্ঞাত। শুধু রেডিয়ম নয়, য়ুরেনিয়ম পলোনিয়ম, রেডন, থোরিয়ম, সামারিয়ম প্রভৃতি বহু পরমাণু বিদীর্ণ করিয়া এইসব তেজ কণা আপনা আপনি নির্গত হয়। সুতরাং সিয়েরিয়েনকভের পরীক্ষাতেও রেডিয়ম খণ্ড হইতে অদৃশ্য আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি বাহির হইতেছে। আপাতত আলফা রশ্মির কথা থাক্। ধরা যাক্, প্লাসের জলে প্রবেশ করিতেছে বিটা ও গামা রশ্মি। এই বিটা, গামা রশ্মির সহিত ইলেকট্রিক কারেণ্টের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ।

ইলেকট্রিক কারেণ্ট কথাটা আমাদের খুব চেনা। কারেণ্ট শব্দের অর্থ স্রোত। সুতরাং যখন ইলেকট্রিক কারেণ্ট বলি, তখন তারের মধ্যে কিসের স্রোত, সে বোঝা দরকার। না হইলে "নাম জানি, লোক চিনি না" গোছের ব্যাপার দাঁড়ায়। অবাক মনে হইতে পারে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু হইতে অন্যতম যে বিটা কণা বাহির হয়, সেও যা, আর আমাদের শহরের বাড়ির দেয়ালে বোতাম টিপিলে যার স্রোত তারের মধ্যে বহিয়া বাতি জ্বালায়, পাখা ঘোরায়—সেও তাই। এদের সাধারণ নাম ইলেকট্রন কণা। নলের মধ্যে যেমন জলের স্রোত, ইলেকট্রিক তারের মধ্যেও তেমনি বোতাম টিপিলেই অজস্র অর্থাৎ অপ্রমাণ এই বিটা কণা বা ইলেকট্রন কণার স্রোত চলে। তবে তফাত এই যে, পরমাণুর কেন্দ্র হইতে যে বিটা কণা বাহির হয় তাহার গতিবেগ ঐ প্লাসের জলে আলোর গতিবেগকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে; কিন্তু তারের মধ্যে যে ইলেকট্রিক কারেণ্ট বা ইলেকট্রিক স্রোত সে অনেক

গড়িমসি করিয়া ছুটিতে থাকে। আবার গামা রশ্মির সঙ্গে দৃশ্য আলোর তফাত শুধু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে। গামা রশ্মি অদৃশ্য অতিক্ষুদ্র আলো তরঙ্গ। আগেই বলিয়াছি, আলো তরঙ্গ-বিশেষ। তরঙ্গ বা ঢেউ বলিলে আমরা সাধারণত জলের ঢেউ বুঝি। পুকুরে ঢিল ছুঁড়িলে জলের কণাগুলি ওঠা-নামা করে, আর সেই আন্দোলন পাড়ের দিকে চলিতে থাকে। বিজ্ঞানীদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আলো কিসের তরঙ্গ, তবে তাঁহারা কিঞ্চিৎ ফাঁপড়ে পড়েন। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন, "সে আমাদের দরকার নাই। তবে কিছু একটার পরিমাণ যদি নিয়মিত ওঠা-নামা করে, তবে তাকেই ত' ঢেউ বলে, আলোও তাই। আর ঐ কিছু একটা হইল বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি।" আমরা জানি, বিদ্যুৎও আকর্ষণ করে, চুম্বকও তাই। বিজ্ঞানীদের মতে যেখানে আলো সেখানেই ঐ বিদ্যুৎ স্রোত আর চুম্বকে শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণের একটা নিয়মিত ওঠা-নামা (অর্থাৎ দিকবদল ও পরিমাণ-বদল) ঘটিতেছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তির এই নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি বা আন্দোলন আলোর উৎস হইতে চারিদিকে বহিয়া যায় এবং আমাদের চক্ষে প্রবেশ করিয়া যে উত্তেজনা বা অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহাকেই আমরা বলি আলো।

অতএব যখনই কোনও বিদ্যুৎ কণা (যেমন, বিটা কণা) অথবা আলোর কণা (যথা গামা রশ্মি) দ্রুত ছুটিয়া যায় তখনই তাহার পথের চারিপাশে ঐ বিদ্যুৎ ও চুম্বকধর্মী আকর্ষণ-বিকর্ষণের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এবং জলের ঢেউয়ের মধ্যে ছিপি ফেলিয়া দিলে সে যেমন ঢেউয়ের তালে আন্দোলিত হইতে থাকে, তেমনি যখন তীব্র-বেগে বিটা বা গামা রশ্মি কোনও পদার্থের মধ দিয়া ছুটিয়া যায়, তখন তাহার পথের পাশের পরমাণুগুলির ঘটে ঐ ছিপির দশা। ছুটন্ত মোটর গাড়ির হাওয়ার টানে পথের ধারের শুকনো পাতা যেমন অসহায়ভাবে খানিকটা ঘুরপাক খায় বা শূন্যে উঠা-নামা করে, অনেকটা সেইরকম। সিয়েরিয়েনকভ্ বলেন, তাঁহার পরীক্ষাতেও ঘটে এই ব্যাপার। রেডিয়ম খণ্ড হইতে যে গামা রশ্মি (বা বিটা কণা) গ্লাসের জলে প্রবেশ করে, তাদের পাল্লায় পড়িয়া, সেই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চুম্বকাক্ত ঢেউয়ের ঠেলা খাইয়া গ্লাসের জলে পরমাণুগুলিরও আন্দোলিত না হইয়া উপায় নাই। তাহার ফলে জল-পরমাণুর অভ্যন্তরে যে বিরুদ্ধ বিদ্যুৎ আছে তাহারা ক্ষণে ক্ষণে আলাদা হইয়া পরমাণুর দুই প্রান্তে জমা হয়। ঢেউয়ের ঠেলায় পরমাণুর মধ্যে বিরুদ্ধ বিদ্যুতের এই যে দুমুখী স্রোত চলে তাহাতে পরমাণুগুলি মেরুধর্মী হয়। একে বলে পোলারিজেশন্। এইসব বিশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ-কণা পরমাণুর মধ্যে ঢেউয়ের তালে ওঠা-নামা করিতে থাকে। আর আগেই বলিয়াছি, বিদ্যুৎকণার এরকম আন্দোলনের ফলেও সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ-চুম্বকাক্ত তরঙ্গ। অতএব ত্বরিৎগতি বিটা ও গামা কণা যে তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া যায় তাহাদের বলা চলে প্রথম পর্যায়ের তরঙ্গ, কিন্তু ইহারা এত প্রচণ্ড ও এত ক্ষুদ্র যে, আমাদের চোখ ইহাদের অনুভব করিতে পারে না। আবার এই প্রথম পর্যায়ের তরঙ্গের ফলে জলের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ, ইহারাও বিদ্যুৎ-চুম্বক ধর্মীয়, কিন্তু ইহাদের শক্তির পরিমাণ কম, কেননা, যতই হউক, তবু ধার করা শক্তি ত'। বিশেষ অবস্থায় এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর অনুভূতির সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলেই ঘটে অদৃশ্য রশ্মির বিবর্তন, ঘটে অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে, অননুভবনীয় হইতে অনুভবনীয়ে উত্তরণ, বিজ্ঞানী যার অস্তিত্ব ঘোষণা করিলেন এবং যার নাম দেওয়া হইল সিয়েরিয়েনকভ্ রশ্মি।

কিন্তু আমাদের ব্যাখার মধ্যে একটি সর্ত আছেঃ বিশেষ অবস্থা না হইলে হয় না, দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ সৃষ্টি হইলেও সব সময়ে আমাদের চক্ষুর আয়ত্তে আসিতে পারে না। সিয়েরিয়েনকভ্ এই বিশেষ অবস্থার নাম দিয়াছেন পূর্ণ-সংযোগ, ইংরাজীতে বলে coherence। আরও কথা, শুধু জল নয়, প্রায় ষোলরকম তরল যৌগিক পদার্থের মধ্যে এই অদৃশ্য হইতে দৃশ্য আলোয় বিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। এইসব পদার্থের অনেকে আমাদের চেনা, যথাঃ বিশুদ্ধ জল, গলিত প্যারাফিন, গ্লিসারিন, বিভিন্ন রকম এলকোহল (মদ)। এছাড়া, নানারকম খনিজ পদার্থের দ্রবের (solution) মধ্যেও এই রশ্মি পাওয়া গিয়াছে। যে বিশেষ অবস্থায় এই সিয়েরিয়েনকভ্ রশ্মির উৎপত্তি তাহার সম্বন্ধে প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে বলিয়া যাইঃ এই রশ্মির সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন ঐ রেডিয়ম বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত বিটা-কণা বা গামা রশ্মির গতিবেগ পদার্থের মধ্যে আলোর যে গতি, তাকে ছাড়াইয়া যায়।

মনে হইতে পারে, যে সব কথা বলা হইল তাহাতে সন্দেহের বা ভুল বোঝার অবকাশ কোথায়? কিন্তু মনে রাখা দরকার, বহু সহস্র সম্ভাবনা হইতে বিজ্ঞানীকে বিশেষ সম্ভাবনা সত্য বলিয়া বাছিয়া লইতে হয়। এক্ষেত্রেও যে-সব সন্দেহ জাগিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধানঃ এই রশ্মি কি পূর্বেই আবিষ্কৃত রশ্মি—রেমন্টগেন্ নয়? সেখানেও ত' ত্বরান্বিত অথবা বিলম্বিত বিদ্যুৎ কণা হইতে আলোর সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, এ রশ্মি ক্ষণ-বিকীরণ নয় ত'? ইংরাজীতে যাহাকে বলে fluorescence! ফ্লুরেসেণ্ট বাতিতে বাজার ভরা। সুতরাং ফ্লুরেসেণ্ট আলো সম্বন্ধে আপাতত ব্যাখ্যা থাক। তাহার পরের প্রশ্ন এই, সিয়েরিয়েনকভ্-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সম্ভাবনা কি? এইসব প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে আছে তাত্ত্বিক-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ও টামের গবেষণা-লব্ধ ফল। কিন্তু তাঁহাদের কাজের বিষয় এই নিবন্ধে বলার স্থান নাই।

# জগদীশচন্দ্রের স্বাদেশিকতা

**পুলিনবিহারী সেন**

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনে প্রথম বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন-প্রসঙ্গে "কবি ও বিজ্ঞানীর মিলনের উপকরণ" নির্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—"তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।"

জগদীশচন্দ্রের "সুহৃদ ও সহযোগী" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—আমাদের দেশে বিজ্ঞান-সাধনার পথমোচনে সর্বসাধারণের মনে যাঁর নাম জগদীশচন্দ্রের সঙ্গেই যুক্ত—দেশ-প্রেমের ক্ষেত্রে যে-আসন অধিকার করে আছেন জগদীশচন্দ্রের আসন তার থেকে স্বতন্ত্র; সার্বজনিক উদ্‌যোগে তিনি তেমন-ভাবে লিপ্ত হয়েছেন বলে জানা যায় না, এইজনাই তাঁর দেশপ্রীতির কথাও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়—কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর কল্পনা প্রধানতঃ বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠাতেই সংহত হয়েছে; সে পরিকল্পনা অবশ্য উচ্চগ্রামের দেশাত্মবোধেরই সমধর্মী। যৌবনে জগদীশচন্দ্র যে বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন সে কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসার বশবর্তী হয়েই নয়, আপন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার কামনাতেও নয়—রবীন্দ্র-নাথ যে যৌবনে লিখেছিলেন "সবাই বড় হইলে তবে স্বদেশ বড় হবে" জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচিন্তার মূলেও এই ছিল অন্যতম প্রধান প্রেরণা। তিনি যে স্বল্পসংখ্যক বাংলা রচনা রেখে গিয়েছেন তার অনেকগুলিতেই এই ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে—বিজ্ঞান-সাধনায় তাঁর স্বদেশপ্রেমের কথা আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রে।

## "আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে"

১৮৯৭ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়; জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানচর্চায় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সর্বাধিক উৎসাহ লাভ করেছিলেন, রবীন্দ্র-নাথও জগদীশচন্দ্রের স্নিগ্ধ সাহচর্য রচনায় ও কর্মে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ১৯০০ সালে জগদীশচন্দ্র তাঁর নূতন আবিষ্কার পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচার করতে বিদেশযাত্রা করেন, ১৯০২ সালে দেশে ফিরে আসেন। এই কয় বৎসর বিদেশের বিজ্ঞানীমণ্ডলীকে তাঁর আবিষ্কার গ্রহণ করাতে তাঁকে বিপুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সময়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্র-নাথকে নিয়মিত যেসকল চিঠি লিখেছিলেন, সৌভাগ্যের বিষয় সেগুলি রক্ষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সযত্নে সেগুলি রক্ষা করে-ছিলেন—এই চিঠিগুলি পড়লেই একথা স্পষ্ট হয় যে, বিজ্ঞানসাধনা ও স্বদেশসাধনা একাত্ম হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনে। স্বদেশে তাঁর বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল ক্ষেত্র তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বিদেশে বিজ্ঞানীরা তাঁকে সেখানে সম্মানের আসনে আহ্বান করেছেন, তপস্যা শেষ না করে "য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা" প্রোথিত না করে অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরতে বারণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখছেন, জগদীশচন্দ্র উত্তরে লিখছেন—

লণ্ডন, ২ নবেম্বর, ১৯০০

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই আমার জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে সব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহ্য করিব।

## "মাতৃস্বর"

যে 'ভারতমাতা'র চিত্র তাঁর গৃহকে অলংকৃত করেছিল তাঁর পূজাবেদী ছিল জগদীশচন্দ্রের হৃদয়ে—

লণ্ডন ২ নবেম্বর ১৯০০

৩ বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম। আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি, কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা



উপবিষ্ট : জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ; দণ্ডায়মান : রথীন্দ্রনাথ, মহিমচন্দ্র ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

TELEGRAPHIC ADDRESS "ROYAL INSTITUTION, LONDON." TELEPHONE No 3669.

ROYAL INSTITUTION OF GREAT BRITAIN

চীরবসনপরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

লণ্ডন ১৭ই মে ১৯০১

বন্ধু

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছ। বক্তৃতার (১) আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব। আর experimentগুলিও অতি কঠিন, কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তার পর একটি ঘটনা হইল সে কথা স্মরণ করিলে, আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার, দিন দু প্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়া ছিলাম. আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল. তোমাদের এতদিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্য নির্মূল হইবে এ কথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ এক ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল 'বরণ করিতে আসিয়াছি' তার পর মুহূর্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরদিন, যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম. তার পর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না; যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফুট হইল।......

(১) ১৯০১ সালের ১০ মে রয়্যাল ইন্সটিটিউশানে জড় ও জীবে সাড়া সম্বন্ধে আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা। বিজ্ঞমণ্ডলীর কাছে এই বক্তৃতা বিশেষ সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

লণ্ডন ৬ই জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র ও কবিতা (২) পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি জানাইতে পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত—কখনও একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে—তাঁহার বরেই আমি বল পাই—আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখদুঃখের কথা ভাবি না; কি করিতে হইবে বলিও।

## "ভারততীর্থ"

বিজ্ঞানজগতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাই যে তাঁর পক্ষে সাধনার বিষয় নয়, ভারতবর্ষ একদিন বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র বলে পরিগণিত হবে এই আশাই সেদিন সমস্ত বাধাবিঘ্নের মধ্যে তাঁর জীবনে প্রধান প্রেরণা—

লণ্ডন ৫ অক্টোবর ১৯০০

জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না যে কি বিশাল ও অনন্ত বিষয়ে আমার হাত পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার অর্ধ পরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি সে দিকেই অনন্ত আলোকরেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহার শেষ করিতে পারিব না।

লণ্ডন, ৩রা মে, ১৯০১

কি অত্যাশ্চর্য নূতন জগৎ আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে বলিতে পারি না। কি অসীম নূতন সত্য সম্মুখে রহিয়াছে।

একদিন মনে করিয়াছিলাম যে

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জন-কোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য চন্দ্র পুষ্পপত্র পশুপক্ষী ধূলায় প্রস্তরে,—
একটি জাগ্রত প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপ রশ্মির অন্বেষণে
লোক লোকান্তের অন্তরালে,— যেথা পূর্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!
হে তপস্বি, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদ-গর্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায় শ্রদ্ধায় ধ্যানে,— বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধশান্ত গুরুর বেদীতে!

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২) রবীন্দ্রনাথ-রচিত জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে "ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি!" কবিতাটি ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শন পত্রে, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত "আচার্য জগদীশের জয়বার্তা" প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে মুদ্রিত হয়েছিল।

এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ দেশান্তর হইতে জ্ঞান আহরণের জন্য ভারততীর্থে লোক সমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। আমার সমস্ত পুঁজি এ দেশে রাখিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে।

কারণ আমাদের দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া আছেন। বর্তমান কালে আমাদের যত অধোগমন হউক না কেন, আমরা অতীতকালের কথা স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল থাকিব।

সেই সব কথা স্মরণ করিতে আমাদের কি অধিকার?

এই নিরাশার মধ্যে তোমার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম

মোর কল্পনাতীত—কি তাহার কাজ কোন্ পথ তার পথ—

বন্ধু তুমি এই বিশ্বাস চিরকাল প্রচার করিও। আমরা জানি না, আমরা কোন ফলের আশা করি না, তবু যেন আমাদের কার্য করিবার শক্তি নির্মূল না হয়। কোন দিনে কোন কালে আর কেহ দেখিবে। বিশ বৎসর আশার উচ্ছ্বাস যেন চিরজীবিত থাকে।

লণ্ডন ৬ জুলাই ১৯০১

আমি এ ছাড়াও অন্য তিনটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে paper লিখিয়াছি, শুনিয়া সুখী হইবে Royal Society তাহা publish করিবেন।

কিন্তু এই সম্পূর্ণ অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন বিষয় যদি আমাদের দেশ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তাহা হইলে আমি জীবন সার্থক মনে করিতাম।

## "আলোর সন্ধানে"

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের যে ধারা তাতে তার মহীশর হয়ে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই—আমাদের বর্তমান যেরূপই হোক 'আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই'; সেজন্য মানুষ গড়ার কাজে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করছেন। 'সহস্র অকাজের মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে', কিন্তু 'মিথ্যা আড়ম্বর', 'মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতি-বৎসলতা থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে—

২০এ জুলাই ১৯০১

আমার সর্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ত্যাগ করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্ন স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্ন স্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?

তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ, তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ—যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে অন্যে যাহা করিয়াছে—তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন—তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal Lie, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা সমস্ত উৎসাহ নির্মূলিত হইয়াছে—সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে যেন চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।

৫ বৎসর পূর্বে আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেশে বিজ্ঞানাগারের জন্য এ দেশ হইতে সমস্ত একপ্রকার ঠিক করিয়া গিয়াছিলাম। শেষে ক্ষুদ্র লোকের চেষ্টায় আমার পরাজয় হইল। সেই ক্ষোভ আমার কোনদিন মিটিবে না। কারণ আজ সেই পরীক্ষাগার থাকিলে ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র করিতে পারিতাম। কেবল আমাদের দেশ হইতে আমার শিষ্য দ্বারা জগতে একটি সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইত।

## "তুমি মানুষ প্রস্তুত কর"

রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে প্রাচীন ভারতের আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে "গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায়" আছেন এই সংবাদে জগদীশচন্দ্র উৎসাহিত—

লণ্ডন ১৫ অক্টোবর ১৯০১

আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রথম মিথ্যা অভিমানী স্বজাতি-বৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতি-বিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী বিশ্বাসী ধৈর্যশীল স্বজাতি-প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও, এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি যুবকও যদি এইভাবে প্রণোদিত হয় তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

লণ্ডন ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯০২

আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশী আত্মম্ভরি ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে, প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না।

তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে এই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।

পারিস ৮ই এপ্রিল ১৯০২

ছেলেবেলা ইংরাজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল, এতদিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছি, এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পারিতেছি। পশ্চিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে। তবে পরের দোষ দেখিয়া আমাদের কি লাভ? কি করিয়া আমরা বিনাশের পথ হইতে উদ্ধার পাইব?

সচরাচর শুনিতে পাই, হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবনের সংগ্রাম হইতে পলাতক। একথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন শক্তি দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করেন নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে? শঙ্করাচার্যের দিগ্বিজয়যাত্রা কোন অংশে যুদ্ধযাত্রা অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ একালে কি দেখা যায়?

তবে হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন। 'আমি' কেহই নই, যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনিই সব।

তিনি বিশ্বকর্মারূপে আমাদের হৃদয় মন পরাস্ত করিয়াছেন। আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে। যিনি আমাদিগকে প্রেমপাশে বাঁধিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রতিমুহূর্তে আত্মবলি দিতে হৃদয় উৎসুক। সুখের দিনে কিছু জানাইতে পারি না, কিন্তু দুঃখের দিনে একটু জানাইতে পারি।

তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখিয়াছেন, দাস যে স্থানেই থাকিবে, সমস্ত কলঙ্ক বহন করিবে, সমস্ত নিষ্ফলতার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিবে। আমাদের শক্তিই বা কি, কিন্তু কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রবালপঞ্জরে মহাদেশ গঠিত হইয়াছে। এই ত আমাদের একমাত্র আশা। যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই ভূমির জন্যই আমাদের দেহ যেন পর্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার নাই।

তোমার আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারে যাইয়া যেন এই ভাব লইয়া সমস্ত প্রাণ মন দিয়া নিয়োজিত কার্য করিতে পারে। তার পর জীবনের সন্ধ্যায় পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিবে।

লণ্ডন ১৭ জুন ১৯০২

তুমি যাহার সূত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়—অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। নিরাশার কথা শুনিয়া মন ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু তোমার নিকট উৎসাহের কথা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখদুঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাকচিক্যে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই; যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে তাহার ভিতরে দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভুলি। পুণ্যই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্তরে কিম্বা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্টলাভ করিব না।

১৮ জুলাই, ১৯০২

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতন কাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব। সহস্র অকাজের মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে।

সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রান্ত গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। কথার জাল ও অকর্মের জাল আমাদিগকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। দুদিনকার অকৃতার্থের জন্য আমরা বিমর্ষ হইব না।

আমাদের যাহার যা কিছু শক্তি আছে তাহাই যেন নিয়োজিত করিতে পারি। আমাদের সমস্ত শক্তি হয়ত অতি ক্ষুদ্র—কিন্তু যাহা কিছু আছে তাহাই যেন পূজার জন্য দিতে পারি।

কিন্তু কথা ও কার্যের আড়ম্বরে যেন আমরা প্রকৃত ভুলিয়া না যাই। এই জন্যই তুমি যে আশ্রম করিয়াছ তাহার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিব।

## ভারতবর্ষের বৈষয়িক সমৃদ্ধি

বিজ্ঞানরাজ্যে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রতী জগদীশচন্দ্র দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধারকল্পনাতেও উদাসীন ছিলেন না, নিম্নোদ্ধৃত চিঠিতে তার পরিচয় আছে, তাঁর অন্য কোনো কোনো বক্তৃতাতেও তিনি এবিষয়ে আলোচনা করেছেন—

লণ্ডন এপ্রিল ১৯০২

আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি। আমেরিকানরা এ দেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য, manufacture ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এ দেশের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপরে পড়িবে। যদি একে একে সমস্ত জীবনধারণের উপায় পরহস্তগত হয় তাহা হইলে নির্লোপ হইবার বেশী দেরী নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও। জাপানের সমৃদ্ধি কেন বাড়িতেছে? আমি ত উক্ত দেশের অনেককে দেখিয়াছি। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমাদের দেশে অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে মনুষ্যের অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতে কিছুই আশা নাই, চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে? এতকাল কথা ছিল যে ভারতে বিজ্ঞান অসম্ভব,

---

(৩) ১৯১৫ সালে বিদেশভ্রমণান্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর, "রামমোহন লাইব্রেরীতে তাঁহার সম্বর্ধনা উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু...তাঁহার বক্তৃতায় বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে জাপানীরা যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, জাপান যে ভারতবর্ষের আশঙ্কার একটি গুরুতর কারণ তাহার উল্লেখ করেন। আশঙ্কা দুই রকমের, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। বাণিজ্যিক আশঙ্কার কথা তিনি খুব খুলিয়া বলিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপদ সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত করিয়াছেন।"—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২২। এই বৎসরে বিক্রমপুর সম্মিলনীতে তাঁর অভিভাষণেও (বোধন", অব্যক্ত) "শিল্পোদ্ধার" বিষয়ে আলোচনায়, "আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ" সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

কচুরি পানা যখন বাংলাদেশের কৃষির পক্ষে এক বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সে সময় এই উৎপাতের প্রতিরোধকল্পে তিনি তাঁর জ্ঞান-প্রয়োগ করেছিলেন (দ্র "কচুরী পানা", প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯)।

এখন কথা হইবে, দৈবাৎ এক আধটা instance ধর্তব্য নয়।

## "প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্ম-গ্রহণ করিতাম"

*পূর্বোদ্ধৃত একখানি পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখছেন—"আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবারে হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।" মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা অপূর্ব বাণীরূপ পেয়েছে একখানি পত্রে :*

লণ্ডন, ২৯ নবেম্বর, ১৯০১

বন্ধু,

গাছ মাটী হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? —কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া তোমাদের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই দুঃখসুখের অংশী একথা সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয় লাভ করিব।

## বিদেশে ভারত-দর্শন প্রচারের উদ্যোগ

জগদীশচন্দ্রের ভারতগৌরব প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ যে-কেবল নিজ বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। ভারত-শিল্পে তাঁর উৎসাহের কথা এখানে বিবৃত করবার অবসর নেই, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দির-গাত্রে তার নিদর্শন বিদ্যুত। বিদেশে ভারত-দর্শন প্রচারের উদ্যোগেও তিনি একসময় সহায়তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর ব্রত উদযাপনের কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিলাতে গিয়ে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানে ভারত-দর্শন সম্বন্ধে যেসকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার ফলে সে দেশে এ বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য জাগরিত হয়েছিল; সেই আগ্রহ যাতে ফলবান হয় এজন্য বিলাতের বিদ্বৎ ও ছাত্র সমাজে ভারতদর্শন চর্চার প্রসারের উদ্দেশ্যে এদেশ থেকে একজন প্রজ্ঞানী অধ্যাপক প্রেরণের প্রস্তাব অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রও এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন—

[কলিকাতা]
১০ই আগস্ট ১৯০৩

*স্বামী উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। কেম্ব্রিজে বৃহৎ কার্যের সূচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র বিদেশীর নিকট পরিচিত হইবে ইহা আমি বহু মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া মনে করি। পরশুদিন উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপাদি করিবার জন্য আমি বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।*

কিন্তু বিলাতে উপযুক্ত অধ্যাপক পাঠান আবশ্যক। একজন প্রকৃত স্কলার না পাঠাইলে কেম্ব্রিজে কাজ হইবে না। এইজন্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ই যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাকে কেবল দু-একটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং সাধারণের বুদ্ধিগম্য রকমে বক্তৃতা দিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাকে এ বিষয় বলিয়াছি এবং তাহাতে [তিনি] সম্মত আছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর এ সম্বন্ধে বহু কথা সংগতীত আছে। তাঁহার দ্বারাই এ কার্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইবে মনে হয়।

তবে কোচবিহারের নিকট এ বিষয় বলিতে হইবে যে তিনি পূর্বে যেরূপ ব্রজেন্দ্রবাবুকে বিলাতে ডেপুটেশন-এ পাঠাইয়াছিলেন এবারও তাঁহাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করিতে হইবে। এ বিষয় তুমি লিখিলেই হইবে। আমি এজন্য তোমাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছি।

আমার মনে হয় বিবিধ বাধা সত্বেও আমাদের কার্যশক্তি একেবারে আবদ্ধ থাকিবে না।

## ভারততত্ত্ব প্রসঙ্গ

আলোচ্য সময়ের পরবর্তীকালে চীন-জাপানের সঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যোগ পুনঃস্থাপনকল্পে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ সর্বজনবিদিত—আলোচ্য পর্বেও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এ বিষয়ে যে-সকল কল্পনা চলছিল জগদীশচন্দ্র তার অংশী ছিলেন—

দমদম
১লা জানুয়ারী ১৯০৩

তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে হইবে।

তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজসাধ্য—পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

নবদ্বীপে ত সতীশ যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করিতে এখনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে, তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

আমার plan এই।

এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরাজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Society-তে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibet-এর mss ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তার পর তোমার Mr. Hory-কে(৪) সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পুঁথির কপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরীর মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্যে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীন দেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।

এই প্রথম exploration হইতে অনেক তত্ত্ব বাহির হইবে, তাহার পর আরও systematic রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোন্ কোন্ দিকে অনুসন্ধান কার্যকর হইবে, এই preliminary কাজ হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে। তোমার সহিত শীঘ্রই যেন দেখা হয়।

### ১৯০৫ সাল—"বঙ্গভবন"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর যে 'ফেডারেশন হল', 'মিলনমন্দির' বা 'অখণ্ডবঙ্গভবন' প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়, জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি আনন্দমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করেন, রবীন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের 'ঘোষণা-পত্রের বাংলা অনুবাদ সভাস্থলে পাঠ করেন, এ কথা সুবিদিত। আনন্দমোহন

(৪) তৎকালে শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত-শিক্ষার্থী জাপানী ছাত্র।

বসু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে যে কেবল আত্মীয়তাসম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন তা নয়, হৃদয়সম্পর্কেও তিনি জগদীশচন্দ্রের গুরু-স্থানীয় ছিলেন—প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দিলেও স্বভাবতই জগদীশচন্দ্রের হৃদয় স্বদেশের আহ্বানে গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিল—উল্লিখিত সভার এক সপ্তাহ পরে বঙ্গভবনের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

২৩এ অক্টোবর
১৯০৫

বন্ধু,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একটি মূর্তিমান এবং বর্ধমান জিনিস আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থান কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আছে হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল হইবে, সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপে তাহাদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা ইত্যাদি হইবে। তার পর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপে দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কার জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে—ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

তার পর জাতীয় ভবনে তোমার পল্লী। সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা department শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির শাখা থাকিবে। Subscription তুলিয়া mill ইত্যাদি করিবার চেষ্টা হবে। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এ স্থানে বঙ্কিম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে ইত্যাদি।

তুমি এ বিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন এক স্থানে পঠিত হইবে।

এ সময় আমাদের বিজ্ঞেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।

## জগদীশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান

বর্তমান প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত স্বদেশী গান 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' রচনার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগের উল্লেখ সম্পূর্ণ অবান্তর হবে না। ১৯০৭ সালের জুন মাসে গয়াতে দ্বিজেন্দ্রলাল ও জগদীশচন্দ্রের সান্নিধ্য ঘটেছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল জগদীশচন্দ্রকে স্বরচিত গান শুনিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন,

"সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূলে আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

"ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভার-বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণসিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে?—ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালকে যে কথা বলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার তার মর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন—

"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত্রগাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে

দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাংগালা দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত একবার সেই আদর্শ বাংগালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।"

এই আলোচনার দুই দিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল এক পত্রে লিখিতেছেন—"গত পরশু স্বদেশপ্রাণ, মনীষী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে স্বদেশী সংগীত রচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন।" দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার লিখছেন, এই পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল "আমার দেশ" গান রচনা করেন।








## জগদীশচন্দ্র ও 'বন্দে মাতরম্'

স্বদেশী গান প্রসঙ্গে, "বন্দেমাতরম্" সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের উক্তি উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে। "বন্দে মাতরম্" জাতীয় সংগীত হতে পারে কিনা এ বিষয়ে ১৯৩৭ সালে যখন দেশে তুমুল বিতর্ক চলছিল, তখন সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে দেশ-মান্য মনীষীদের মতামত প্রার্থনা করেন। জগদীশচন্দ্র লেখেন—

"যাঁহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনাআপনি সমস্ত ভারতবর্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।"

## "বজ্র-মহাসনে"

এই সংকলনের সূচনায় একথা উল্লিখিত হয়েছে যে, জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁর বিজ্ঞানমন্দির-পরিকল্পনায়, কারণ, "মানবচিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে।"

দীর্ঘকাল ধরে এই মন্দির স্থাপনার পরিকল্পনা জগদীশচন্দ্রের অন্তরে ছিল; বসুবিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার (১৯১৭) দুই বৎসর পূর্বে বিক্রমপুর সম্মিলনে তাঁর অভিভাষণে তিনি এইরূপ পরীক্ষাগার স্থাপন প্রসংগে যে উক্তি করেন তা উদ্ধৃত করে এই অসম্পূর্ণ সংকলন সমাপ্ত করি—স্বদেশব্রতের সংগে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-ব্রত যে কি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত, ভাবীযুগ সম্বন্ধে কি উজ্জ্বল কল্পনা এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল এই উদ্ধৃতি দ্বারা সে কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে আশা করি।—

"যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লংঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমা-দিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কত কাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ? এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দুরমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহু স্থানে বিশাল বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল এবং তোমাকে আমাতে যে কোন পার্থক্যই নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃপ্লাবিত করিবে না?"(৫)

---

(৫) এই সংকলনে উদ্ধৃত কোনো কোনো পত্র অন্য কোনো কোনো সংকলয়িতা ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন। "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের মন্তব্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-প্রণীত 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৩৮) গ্রন্থ (পৃ ৯৩-৯৪) থেকে গৃহীত। দ্বিজেন্দ্রলাল-জগদীশচন্দ্র-প্রসংগ দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৩২৪) গ্রন্থে (পৃ ৫৪১-৪২) প্রাপ্তব্য।

# মুখের রেখা

## সন্তোষকুমার ঘোষ

৬

এই অন্ধকারটুকু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই ভাল। ততক্ষণই সৌরেশ আপনাকে পাবেন। যাকে অনেক দিন পরে খুঁজে পেয়েছেন, সেই টুলুকে কাছে রাখতে পারবেন। রাত্রি শেষ হলে টুলু হারাবে।

টুলুর কাছ থেকে এখনও অনেক কথাই জেনে নেওয়া বাকি। তার গালে হাত রেখে সৌরেশ পরখ করবেন, কতখানি তাপ সে আজও ধরে রাখতে পেরেছে। ধীরে ধীরে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কী দেখে টুলু কী শিখল, কোথায় ঠেকে কোথায় ঠকে সে এত বড় হল। সে কী হারিয়েছে, পেয়েছে কী। শুধুই কি হেরেছে, না পেয়েছেও কিছু কিছু, সেই হারজিতের শেষ হিসাব আজ সৌরেশের কাছে জমা করে দিক।

"কিন্তু রাত পোহালে ত জানা যাবে না। জেরা করবার জন্য চাই কিছুটা নিভৃতি আর কিছু অন্ধকার। দিনের আলো টুলুকে সৌরেশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

দিনের আলোর নিয়মই ওই। অত্যাচারীর মত সে সব লুঠ করে কেড়ে নেয়। তার নাদিরশাহী কৃপাণ গলগল আলোর রক্তস্রোত বইয়ে দেয়।

কিংবা সে যেন দুরাচারী স্বামী। নতমুখী রাত্রির কাছে ভোরবেলা এসে হাজির হয়।' তার হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলে, 'তোর হাতবাক্সে কী আছে? সব উপড়ে করে আমাকে দে।' তার লুব্ধ রক্তিম চোখ ধক ধক করে জ্বলে। কেড়ে নেয় আকাশের সব তারা, জোনাকির আলো মুছে দেয়। তার কড়া ধমকে ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁঝি পোকা ভয়ে ভয়ে চুপ করে। ভয় পেয়েই পাখিরা দিগ্বিদিকে ওড়ে। পাতায় পাতায় শিশির শুকিয়ে যায়।

তারপর সেই দস্যু সোল্লাসে অন্ধকারের ওড়না কুটিকুটি করে ছেঁড়ে। ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো ছড়িয়ে দেয় বট-অশ্বত্থের ঘন পাতায় পাতায়, কয়েক টুকরো ছুড়ে দেয় পাহাড়ের গুহায় গাছের কোটরে। শহরে স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরের কোণে সেই অন্ধকারেরই খানিকটা এক ফালি ছেঁড়া ময়লা নেকড়ার মত পড়ে থাকে।

সৌরেশ এইসব কথাই ভাবছিলেন।

দিন লোভী। সব রঙ চেটেপুটে নেয়। নিরাসক্ত রাত্রি সব রঙ ফিরিয়ে দেয়। তমস্বিনীর, তপস্বিনীর কিছুতে প্রয়োজন নেই।

আমরা তলিয়ে দেখি না, তাই দিনকে বলি অকপট, রাত্রিকে গোপন-স্বভাব। অথচ কপট ত দিনই। দিনে মানুষ ত্রস্ত, বাস্তত্রার, কৃত্রিমতার মুখোশ পরে ছুটোছুটি করে মরে। তখন তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় বলে সে বড় সতর্ক, হিসাব করে হাসে, ওজন করে কথা বলে, হয়ত অনেক হাসি আর কথাই মেকি। যে-কাজের দোহাই পাড়ে, সেই কাজ আসলে পর-পীড়ক দিনেরই চর। সন্ধ্যায় সেই কাজের ছায়ামূর্তি যেই সরে যায়, অমনই মানুষ নিজেকে ফিরে পায়। একটি দুটি করে তারা ফোটার মত তার নিজস্ব লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে শুরু করে। মুখোশ খসিয়ে কৃত্রিমতা ধুয়ে সে আবার সহজ হয়। রাত্রির কাছে কোন লজ্জা নেই, তাই অনায়াসে পোশাক ছেড়ে আমরা বিছানায় গা ঢেলে দিতে পারি। রাত্রির মত শয়নসঙ্গিনী কে? তারপর, জেনে নেবার যাদু যে জানে, রাত্রির সব রহস্য তার কাছে একে একে অনাবৃত হয়। রহস্য শুধু রাত্রির না, নিখিলেরও, তার নিজের। "যেন তুমি অন্ধকারে এক বনস্পতির পত্রচ্ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছ, তোমার মুখ আকাশে, আর সারা রাত ধরে টুপ টাপ করে পাতা পড়ার মত তোমার সব বিস্ময়ের, সব জিজ্ঞাসার উত্তর তোমার চৈতন্যের ওপরে ঝরে পড়ছে।' এই অনুভূতিটা আজ সৌরেশের মনে এল, সহজেই এল, কেননা তিনি আজ নিজেকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পেরেছেন।

তাই তিনি আবার ভাবলেন, "এই রাত্রিকে শীতল কালো পাথরে বাঁধান ঘাটের শেষ সিঁড়ি বলেও কল্পনা করতে পারি। ছলছলাৎ করে জল আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে, আমার কোমর-কনুই-বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে, আমার ভাল লাগছে, চোখ বুজে আছি, ভাবছি কতক্ষণে ওই জলধারা

আমাকে একটু একটু করে টেনে নেবে, কখন আমি পিছলে পড়ে যাব দহের গভীরে যেখানে চিরসুপ্তি, চিরশান্তি। কিন্তু কোন দিন পড়ি না, মোহাচ্ছন্ন ভাব কাটে, রোজই একটা অতৃপ্তি নিয়ে জেগে উঠি। একটু হতাশা নিয়েও।

'এই হতাশাই ধীরে ধীরে আমার জীবনে একটা জ্বালা হয়ে উঠেছে, প্রতি রাত্রেই যাকে ছুঁতে ছুঁতেও ধরতে পারিনি, সেই মৃত্যু আমাকে কেবলই টেনেছে।'

টেনেছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে নয়, হাতছানি দিয়েও নয়, অনেক দূরে থেকে চোখের পাতা কাঁপিয়ে, ঈষৎ ইশারায়। সেই ইশারা সৌরেশ কখনও বুঝেছেন, কখনও বোঝেননি, যখন বোঝেননি, তখন তীব্রভাবে বাঁচার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। কাঁটা থাক, পড়ে গিয়ে যতই আঘাত লাগুক, জীবনের সব কটি বিষফলকে উচ্চতম ডাল থেকে পেড়ে আনবেনই।

কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা।

"দিনান্তলিপি" থেকে উদ্ধৃতিঃ 'মৃত্যু-ইচ্ছা আমাকে যেমন বিবশ করেছে, বেঁচে থাকার সাধও মাঝে মাঝে পাগল করেছে তেমনই। বাঁচারও আমি একটা বিকৃত ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলুম। কাম, কামনা আর ভোগের কোন উপচার বাদ দিইনি। নীতির নিষেধ অমান্য করেছি, সুরুচিকে খোলামকুচির মত পায়ের তলায় দিয়েছি গুঁড়িয়ে, সামাজিক বা লৌকিক বিচারে যাকে পাপ-পুণ্য বলে, তার কোন সীমারেখা মানিনি। আসলে ক্ষণিক উত্তেজনাকেই জীবন বলে ভুল করেছি। কিন্তু উত্তেজনা ত প্লাশের উগ্র-তরল পানীয়ের মত কাঁপে, কেবল কাঁপে। নিস্তেজ-স্নায়ু হাতে কলমের মত কাঁপে। (যেমন এখন কাঁপছে)। মাঝে মাঝে আরক্তিম চোখ তুলে দেখেছি প্রাণের প্রদীপে আসক্তির তৈলসিক্ত সলতেয় মৃত্যু-ইচ্ছা জ্বলছে। কিন্তু সে-শিখাও কাঁপে কেন, থেকে থেকে আড়াল হয় কেন! সে যদি স্থিরভাবে জ্বলত, যদি ধ্রুবতারা হত তবে আমার ভুল হত না, বেঁচে থাকার আঁকা-বাঁকা গলিতে না ঘুরে সোজা তাকেই লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতাম। যেমন বুলু গিয়েছিল।"

বুলুর কথা বলতে হলে আবার টুলুর কথাতেই ফিরে যেতে হয়। তারও আগে বলতে হয়, মৃত্যু-ইচ্ছাটা সৌরেশের পরিবারগত, রক্তগত।

সৌরেশের বাবা এবং মা দুজনেই আত্মহত্যা করেছিলেন।

এ-কথা টুলু জানত না। তাকে কেউ বলেনি। পিসিমা আভাসটুকুও দেননি। তাঁদের ছবি অবশ্য টুলু দেখেছে, ওর পড়ার [illegible] পিসিমাই ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। নামও টুলু জানত,

শুধু বাবার কেন, তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত। পিসিমাই মুখস্থ করিয়েছিলেন।

এ-ছাড়া বাবার হাতের লেখা ছিল পিসিমাকে দেওয়া স্নেহোপহার একটা বইয়ে। উঠোনের কোণের গন্ধরাজ গাছটা নাকি তিনিই লাগিয়েছিলেন। স্থলপদ্মের চারাও এনেছিলেন একটা, কিন্তু সেটা বাঁচেনি। এ-ছাড়া তরি-তরকারি, সব্জি ফলানর শখও তাঁর ছিল। বাড়ির পিছন দিকটা কুপিয়ে কুপিয়ে কয়েকবার বেগুন, পেঁয়াজ, টমাটো ইত্যাদির চাষ করেছিলেন। নিজের হাতেই কোদাল ধরতেন তিনি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালাতেন, ঘামতেন তবু শ্রান্ত হতেন না, ক্লান্ত হতেন না।

এ-সবই অবশ্য পিসিমার কাছে শোনা। খুব পীড়াপীড়ি করলে বলতেন। অনেক সময় নিজে থেকেও। সাহসের অভাব, সব কাজে নিস্পৃহতা ইত্যাদি চরিত্রের বিবিধ রুক্ষপেতার জন্য টুলুকে লজ্জা দিতেও বলতেন। টুলু কতখানি লজ্জা পেত, বলা মুশকিল। প্রথম দিকে হয়ত পেত, কিছু-কিছু। শেষের দিকে তাও পেত না। কেননা, দেখেছিল লজ্জা পেয়ে কোন লাভ হয় না। ও-বস্তুটি তার ক্ষেত্রে অন্তত প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয় না। টুলু যা, টুলু তাই। টুলু যা হবে, টুলু তাই হবে। বাবার মত হবে না।

আবার বুঝি হবেও খানিকটা। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে টুলু কতদিন মিলিয়ে দেখেছে, তার মুখের গড়নে কতখানি ছাপ আসে বাবার। না, তার কানের লতিতে চুল নেই। চিবুকের দুটো থাক নেই। কিন্তু হবু, নাক যেন অনেকটা একইরকম? কপালের কাছে চুলের মোড়েও যেন খানিকটা আভাস আছে মিলের। ইচ্ছায় হক, অনিচ্ছায় হক, আমরণ টুলুকে তার বাবার অবয়বের কয়েকটি লক্ষণ বহন করতেই হবে। একটু একটু করে বয়স বাড়বে, সে আকৃতিতে একটু একটু করে তার বাবার মত হবে।

হয়ত প্রকৃতিতেও। কিন্তু অবিকল নয়। বাবার মত বাজী রেখে মধ্যরাত্রে সে শ্মশান ঘুরে আসার সাহস পাবে না। টুলু স্বভাব-ভীরু। বাবা এক চাকরি ছেড়ে আর ধরতেন, আজ এক ব্যবসা শুরু করে কাল অন্যটায় হাত দিতেন। টুলু হয়ত অতদূর যাবে না। তবু একটা মিল থেকে যাবে অলক্ষ্যেই। টুলু বেপরোয়া না হক, বেহিসাবী হবে, বাবার খামখেয়ালীপনা না থাক, অস্থিরতার উত্তরাধিকার পাবেই।

এই একটুখানি তফাত থাকে বলেই পরম্পরা চলে। উত্তরপুরুষ আর পূর্ব-পুরুষ অবিকল যেদিন এক হবে, সেদিন পুরুষানুক্রমের কোন অর্থ থাকবে না, এক-ঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্টি পর্যবসিত হবে।

মার কতখানি পেয়েছে টুলু? তাও সে মিলিয়ে দেখেছে। না, মুখের নরম গোল-গোল ছাঁদটুকু নয়। হয়ত ভ্রূভঙ্গির খানিকটা। আর ঠোঁটের কোণে একটুখানি চাপা হাসির আভাস।

যদি এই ছবি দুটো না থাকত, তবে হয়ত টুলুকে তার বাবা আর মা'র চেহারা মনে মনে কল্পনা করে নিতে হত। আসলের সঙ্গে তার হয়ত মিল থাকত না, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা, প্রয়োজন ত টুলুর নিজেরই, তার কাজ চললেই হত।

মার হাতে তৈরি একটা আসন সে দেখেছে। একটা কার্পেটের টুকরোয় তিনি দুটো বেড়াল বুনেছিলেন।

বুলুর কথা শুনেছে পিসিমার কাছে। এক মাস কঠিন একটা জ্বরে ভুগে সে মারা যায়।

এই ঘটনা কবেকার? টুলু জানত না। যদি পিসিমার মৃত্যুর পর পুরনো চিঠিপত্র তার হাতে না পড়ত, তবে আজও জানা হত না।

অনেক পরে টুলু তাদের পরিবারে প্রায় পর পর তিনটি মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিল। বিবরণীতে অনেক ফাঁক ছিল, কিন্তু মনে মনে টুলু যে কাহিনী রচনা করে নিয়েছিল তাতে ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন, বুলু—তার দিদি—মরল কেন? টুলুর চেয়ে সে মোটে পাঁচ বছরের বড় ছিল, আর টুলুর জন্মের এক বছরের মধ্যেই সে মারা যায়। তার কোন ছবি নেই।

ছবি নেই, তবু চোখ বুজে টুলু একটি অসুস্থ, অভিমানী শিশুকে দেখতে পায়। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে না—শূন্য দৃষ্টিতে টুলুর দিকে চেয়ে থাকে। দৃষ্টির

কোন ভাষা নেই, চোখের পলক পড়ে না, টুলুর গায়ে কাঁটা দেয়, সৌরেশেরও দেয়, সৌরেশ আজও চোখ বন্ধ করে ফেলেন। কিন্তু যে-চাহনি সত্যি সত্যি বাইরে নেই, আছে নিজের মনেই, তার কাছ থেকে কি চোখ বুজেই রেহাই মেলে। বেঁধে, সে-চাহনি কেবলই বেঁধে।

বুলু কি টুলুকে হিংসা করত? বোধ হয় করত। কেন? তারও একটা ব্যাখ্যা টুলুর মনে মনে লেখা গল্পটাতেই ছিল। টুলু বিশ্বাস করত তার ছোট্ট দিদি হঠাৎ যে-অসুখে মারা গেল, সে-অসুখটা আকস্মিক বা অকারণ নয়, বুলু মরতে চেয়েছিল, তাই অসুখে পড়ল, মরল।

পিসিমার কাছে যে বর্ণনা শুনেছে, তার থেকে টুলু ধরে নিয়েছিল, বুলু তার মত চিররুগ্ন ছিল না। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, এক-মাথা ফাঁপান কোঁকড়া চুল, উঠোনে, ঘরে সারাক্ষণ ছুটোছুটি করে বেড়াত। তার আবদারের শেষ নেই, আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বলত না, কিন্তু প্রজাপতি পুষতে চাইত। মার মুখ থেকে ছেঁচা পান কেড়ে নিয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে করতে ভালবাসত। সকলে বলত, দস্যি, দস্যি। প্রকৃতিতে নাকি ছিল টুলুর একেবারে বিপরীত।

তখনও অবশ্য টুলুর জন্ম হয়নি।

টুলুর জন্মের পরই কি বুলু বদলে গেল? না, ঠিক পরেই না। প্রথমে বুলু খুশী হয়েছিল। যখন শুনল—লোকে ত ওর সমুখেই বলাবলি করত—'বুলুর এবার ভাই হবে', বুলু মানে বোঝেনি, তবু খুশী হয়েছিল। এতদিন সে শুধু পুতুল নিয়ে খেলেছে। সে-সব পুতুল ভাঙ্গ না, সাত চড়ে রা কাড়ে না, পাশ ফেরে না। খানিকক্ষণ গেলেই বুলু ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

তার অন্তত এই ধারণা হয়েছিল, এবার একটা পুতুল আসবে, লোকের কথা শুনে ত মনে হয়, তার মা-ই আনবে, সেই পুতুলটা একটু আলাদা রকমের হবে। আকারে হবে তার পুতুলগুলোর মতই, বুলু তাকে নিজেই কাপড় পরাবে, শোয়াবে, ঘুম পাড়াবে—বুলু জীবন্ত একটা পুতুল পাবে। পুতুলটা তার হবে, একেবারেই তার, একার, বুলু হয়ত তাই ভেবেছিল।

"ও আমার কাছে শোবে, না মা?"

"হ্যাঁ।"

"আমিই ওকে খাইয়ে দেব?"

মা হেসে এবারও বলেছেন, "হ্যাঁ।"

ভাইকে নিয়ে আর কী-কী করবে, কয়েক-দিন শুধু তাই ভেবে ভেবেই বিভোর হয়েছে বুলু। পুতুলগুলো বাড়ে না, বড় হয় না, তার ভাই হবে। তাকে নিয়ে বুলু বেড়াতে বের হবে। আরও বড় হলে ভাইকে নীচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তর তর করে গাছে উঠবে বুলু, পেয়ারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবে, ভাই কুড়োবে। ভাইকে চান করিয়ে দিয়ে মাথায় সিঁথি করে দেবে, বাবার যেমন সিঁথি আছে। ভাই ধুতি আর পাঞ্জাবি পরবে, না শার্ট আর প্যাণ্ট, বুলু ঠিক করে উঠতে পারেনি। মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, পিসি-মাকেও, তাঁরা বলেছেন, তোমার যা ইচ্ছে, সে তাই পরবে।

ইচ্ছে, ইচ্ছে। ইচ্ছে দিয়েই বুলু বুঝি ভাইকে এনেছিল, ভালবাসছিল, বড় করে তুলেছিল। ভাই বড় না হলে অসুবিধে যে তারই। একা সে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না, না গায়ের জোরে, না গলার, ভাই পাশে থাকলে তার জোর বাড়বে।

বুলু হয়ত দিন গুনছিল। মার গলা জড়িয়ে ধরে একদিন বলেছিল, "ভাই কবে আসবে মা, বল না!"

মা হাঁসফাঁস করছিলেন। ঘেমে গিয়ে-ছিলেন ওইটুকুতেই। বুলুকে জোরে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, "ছাড়্, ছাড়্। আমাকে কি মেরে ফেলবি নাকি?"

বুলু ছেড়ে দিয়েছিল। একটু দূরে সরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। আরও কত কতবার সে ত মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গলা ধরে ঝুলেছে, কই, মা ত কোনদিন এভাবে ঠেলে বা নামিয়ে দেননি? আজ কী হল মার?

কী হল, সেটা পিসিমা বলেছিলেন। 'মার শরীর খারাপ, মার শরীর ভারী, এভাবে কখনও টানাটানি করতে আছে? তুমি কিছু বোঝ না বুলু।'

মার শরীর খারাপ? কই দেখে ত মনে হয় না। খারাপ কেন?

"ভাই আসছে যে।"

বুলু আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ভাই আসবার একটা দিকই এতদিন দেখেছে সে। অন্যদিকটা আজ দেখল।

টুলু কল্পনা করতে পারে, সেদিন বুলুর মুখের সব হাসি মিলিয়ে গিয়েছে, একটু-খানি হিংসা জ্বলছে চোখে। যে-ভাই আসবার আগেই মার শরীর খারাপ করে দেয়, বুলুকে ঠেলে সরিয়ে দেয় মার কাছ থেকে, তেমন ভাই বুলু চায় না, চায় না।

(ক্রমশ)

# বিশ্ব-বিচিত্রা

আফ্রিকার উত্তর রোডেশিয়ার জনপদ থেকে বহু দূরে একটা বিরাট হাতীকে মত্তাবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার টনি লম্যান এই হাতীটির ভয়াবহ খুনে প্রবৃত্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। হাতীটির নাম সিয়াচিটেমা এবং নামটি উচ্চারণ মাত্রেই যে কোন লোকের মনেই আতংক জেগে ওঠে।

লম্যান শিকারে বেরিয়ে এই মত্ত হাতীকে দেখেছেন এবং ওর পায়ের দাগও সহজেই চেনা যায়, কারণ ওর একটা পায়ে একটা মাংস ঢিবি হয়ে ফোলা—বোধ হয় ওরই যন্ত্রণায় ওকে উন্মত্ত করে তুলে থাকবে।

একবার ক্রিশ ওয়োকার নামে এক পেশাদার শিকারী মহিষ শিকার কালে হঠাৎ পশুটিকে দেখতে পায়। আগে বারবার ওর পিছু নিয়েও ক্রিশ ওকে মারতে পারেনি। এবার আর একবার চেষ্টা করবে ঠিক করলো।

আরো দুজন শিকারী এবং এক ডজন আফ্রিকীয় যুবককে সংগে নিয়ে ক্রিশ মাইল কতক পিছু পিছু চললো। শেষকালে ওরা একটা ঝোপে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হল।

বিরাট পশুটিকে ভাল করে দেখবার জন্য ক্রিশ চোখ বিস্ফারিত করতেই রক্ত হিম করে তোলার মতো একটা চীৎকার বাতাসকে কাঁপিয়ে তুললে। ঠিক তার মাথার ওপরে সিয়াচিটেমার বিরাট বপু, যেন পশ্চাদনুসরণকারীদের হটিয়ে দেবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। কাল দীর্ঘ দাঁতদুটো রোদে ঝকমকিয়ে উঠলো, ছোট্ট চোখ দুটো দিয়ে যেন রাগ ফেটে পড়ছে। বন্দুক চালানোর আর সময় না পেয়ে ক্রিশ কাছাকাছি একটা উঁচু ঢিবি দেখে ছুটে তার ওপর উঠতে গেল, কিন্তু উঠে পড়বার আগেই শুঁড়ের এক নিদারুণ আঘাতে ক্রিশকে চূর্ণ করে মাটিতে ফেলে দিলে। ক্রিশের সেই বিচূর্ণ দেহ মাড়িয়ে হাতীটা অন্যদের দিকে ঘুরলো। ওরা হুড়মুড় করে পাশে ঝোপের আড়ালে সরে গেল। হাতীটা সোজা বনের গভীরে ঢুকে গেল।

ক্রিশের মৃতদেহটা কাছের এক গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল, তারপর সেখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে একটা পুলিস ক্যাম্প।



**এথেন্সের চব্বিশ মাইল দূরে এন্তিকাতে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসীয় শিল্পের নিদর্শন। উপরের এই চার ফিট চওড়া ও তিন ফিট উ'চু পাথরে খোদাই মূর্তিগুলিতে রয়েছে গ্রীসীয় উপাখ্যানের কটি চরিত্র—(ডান দিক থেকে) আর্টেমিস ও তার ভ্রাতা এপলো, ওদের মা ল্যাটো এবং পিতা জিয়াস**

পরে পুলিশ অফিসার ও সরকারি শিকার পর্যালোচকের উপস্থিতিতে ক্রিশের দেহটা কবরস্থ করা হল।

এই নিদারুণ ঘটনাটির পর স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের এক স্বর্গত নেতার নামানুসারে হাতীটির নাম দেয় সিয়াচিটেমা এবং তার নামে গান বেঁধে গাইতে থাকে।

এর পরও সিয়াচিটেমার খবর প্রায়ই পাওয়া যেত, এবং অনেকগুলি মৃত্যুর জন্য ওকে দায়ী করা হয় বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে ওর গতিবিধির খবর প্রচারিত হতে থাকে। আরো দুজন ইওরোপীয় শিকারী ওর পিছু নিয়ে নির্মমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্রিশকে মেরেও কিন্তু সিয়াচিটেমার তার ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণতার উপশম হয়নি। বছর কয়েক আগে স্থানীয় একজন সন্ত্রস্ত-ভাবে এসে খবর দেয় যে, বনে যেখানে ক্রিশকে কবরস্থ করা হয়েছিল, সেখান দিয়ে সে ঘুরে আসছে। কবরের ওপরে যে মার্বেলের ফলকটা ছিল সেটা টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, কবরটা খুঁড়ে ছত্রচ করা হয়েছে এবং মাঝখানে দেখা গেল সিয়াচিটেমার পায়ের দাগ।

এর পরে বন থেকে মধুসংগ্রহকারী একটি দল ভয়ে ত্রস্ত হয়ে গ্রামে এসে জানায় যে, কাল দাঁতযুক্ত একটা বিপুলবপু হাতী তাদের দলের একজনকে শুঁড়ে করে তুলে গাছের গোড়ায় আছড়ে আছড়ে শেষ করে দিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরই এক ইওরোপীয় শিকারী ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে সত্যি তাই—চতুর্দিকে পালানো-হাতীর পায়ের ছাপ আর গাছের ডালপালা ছড়ানো।

লম্যান বলেন, উত্তর রোডেশিয়ার সবচেয়ে কুখ্যাত খুনে হাতীটির এখন নিশ্চয়ই অনেক বয়েস, কিন্তু ও মারা যাবার পরও ওখানকার অধিবাসীদের কিংবদন্তীর মধ্যে ও নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে।

লম্যান ওদেশে থাকাকালে একটা নৃশংস তন্ত্রের উপাসক সিংহ-মানবদের কথা শুনেছিলেন, যারা ওখানকার লোকদের খুন করে বেড়াতো।

একবার তিনটি গ্রাম্য মেয়ে একদিন খুব ভোরে বুনো ফল আহরণ করতে বের হয়। রাত হতেও তারা ফিরল না। পরদিন একটা অনুসন্ধানকারী দল ওদের দুজনকে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় পেলে। কিন্তু মোড়লের মেয়ে লিসার কোন পাত্তা নেই।

মেয়ে দুটি জানায় যে, ওরা জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরে লিসার দিক থেকে আর্তস্বরে চীৎকার ভেসে আসতে শোনে। একটা ঝোপের আড়াল থেকে ওরা দেখে তিনটি "পুরুষ-সিংহ", (সিংহের চামড়া জড়ানো) অচৈতন্য লিসাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে সিংহের মত গর্জন করতে করতে।

পাছে ওদের দৃষ্টিতে পড়ে যায় এই ভয়ে মেয়ে দুটি লিসার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়নি। ওরা পালিয়ে যায় এবং পরে গ্রামে ফিরে এলে ওদের কপালে কি ঘটবে এই ভেবে লুকিয়ে ছিল।

# বিদেশে সুরশিল্পী রবিশঙ্কর

**প্রদ্যোত সেন**

জীবনের চলার পথে নিত্যনূতন পথিকের সংগে দেখা হয়। কেউ সাথী হয় ক্ষণিকের, কেউ বা চিরদিনের। ক্ষণিকের সাথীরা স্মৃতির পাতায় কেউ দিয়ে যান মৃদু স্পর্শ, যা বিলীন হয় মুহূর্ত পরে। কারো স্পর্শ বা গভীর মধুর, অতলস্পর্শী যার ছোঁয়ায় অপরূপ হয়ে ওঠে বিরল পৃষ্ঠাগুলি।

ভারতবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পন্ডিত রবিশংকরের নাম আর আজ কারো অজানা নেই। তিনি এবার আমায় তাঁর যাত্রাপথের সংগী করে নেন অপ্রত্যাশিতভাবে। এই বিশ্বজয়ী শিল্পীর সাথী হিসেবে দেশ-বিদেশের গানের আসরে যা দেখেছি, তাই স্মৃতির পাতা রোমন্থন ক'রে আজ লিখতে বসেছি।

লন্ডন বিমানঘাটিতে রবিশংকরকে আনতে গিয়ে দেখি তিনি অসুস্থ। মনটা দমে গেল। যাই হক, ভগবানের কৃপায় উনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রথমেই বি বি সির কর্তৃপক্ষ "To night" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে রবিশংকরকে টেলিভিশনের পর্দায় হাজির করলেন। এই অনুষ্ঠান দেখলেন প্রায় ৭০ লক্ষ দর্শক, চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল।

৪ঠা অক্টোবর হল রয়্যাল ফেস্টিভাল হলে বাজনা। রয়্যাল ফেস্টিভাল হল জগতের যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই তীর্থ-বিশেষ। তোসানিনি, ক্লেম্পারার, বীটোভেন প্রমুখ দুনিয়ার সেরা শিল্পীদের সুর-লহরী বহুবার ঝংকৃত হয়েছে এই প্রমোদ গৃহে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় আড়াই সহস্র দর্শকে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। রবিশংকর তাঁর যন্ত্রে ভীমপলশ্রীর করুণ রেশ, তিলক-শ্যামের মধুর মূর্চ্ছনা ও চন্দ্রকোষের উদাত্ততায় ভরে দিলেন রংগমঞ্চের চতুর্দিক। অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হল।

১০ই অক্টোবর ম্যাঞ্চেস্টারে বাজনা হল। এরপর ডাক এল লীডস থেকে, Centenary music Festival-এ অংশ গ্রহণ করার জন্য। স্টেশনে আমাদের

প্যারিসে ইউ-এন-ও দিবস উপলক্ষে সেতার বাজাচ্ছেন রবিশংকর, তবলায় আল্লারাখা

অভ্যর্থনা জানাতে এলেন আর্ল ও কাউণ্টেস অফ হেয়ারউড। এঁরা রবিশংকরকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এখানকার একটি বিশিষ্ট হোটেলে আমাদের তুলে দিয়েই এঁরা সেদিনের মত বিদায় নিলেন। সেণ্টিনারী মিউজিক ফেস্টিভালে এই প্রথম ভারতীয় সংগীত পরিবেশিত হল। ৮ দিনব্যাপী এই সংগীত মহোৎসবে যোগ দিতে এবারে এলেন বেঞ্জামিন ব্রিটন, পিটার পিয়ার্স, ইহুদী মেনুহিন প্রমুখ দুনিয়ার সেরা শিল্পীরা। রবিশংকরই সর্বপ্রথম ভারতীয় শিল্পী এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল রবিশংকরের সেতারে ভারতীয় সংগীতের সুরে। আর্ট গ্যালারীর চতুর্দিক ভারতীয় রাজপুত ও মুঘল পেণ্টিং দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল ভারতীয় পরিবেশ রচনা করার জন্যে। বাজনার শেষে ইহুদী মেনুহিন রবিশংকরকে জড়িয়ে ধরলেন আবেগে। এই দুই বিশ্বজয়ী শিল্পীর মধ্যে যে কী গভীর ভালবাসা তা লিখে বোঝান অসম্ভব।

নৈশ ভোজনের জন্য প্রায় সব শিল্পীরাই আমন্ত্রিত হলেন আর্ল ও কাউণ্টেস অফ হেয়ারউডের গৃহে একটি পার্টিতে। অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন রাজ পরিবারের ও সমাজের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। কাউণ্টেস রবিশংকরকে নিয়ে বসালেন তাঁর টেবিলে। সত্যিই এই পার্টির বিরাট আয়োজন ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে নিজেকে বারে বারে হারিয়ে ফেলছিলাম। আজকের রাত্রে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মুখে রবিশংকরের ভূয়সী প্রশংসা শুনতে শুনতে মন ভরে উঠল। এই ফেস্টিভাল-এ দু দিনই বাজনা জমে উঠেছিল সুন্দরভাবে। রবিশংকরের সুর-ঝংকার ও আল্লারাখার মনমাতানো তবলা সংগত এই দুই-এর মিলনে সৃষ্টি হয়েছিল এক অপরূপ ছন্দমুখর পরিবেশের যার আবেশে পাশ্চাত্যের গুণী ও দর্শক সমাজ তন্ময় হয়ে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই সেণ্টিনারী মিউজিক ফেস্টিভাল-এ রবিশংকরের বাজনার অপূর্ব সাফল্যের পরই ওদেশের কাগজের পৃষ্ঠা ভরে গেল তাঁর প্রশংসা, আলোকচিত্র ও জীবনীতে।'

ইংল্যাণ্ডে জয়যাত্রা তো শেষ হল, এবার আমরা উড়ে চললাম ফ্রান্সের পথে। সুবিখ্যাত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্যারী শহরে আমরা পেঁৗছলাম বাইশে অক্টোবর। এখানের অস্টিড হোটেলে আশ্রয় নিলাম। আরাস নামে একটি জায়গায় অনুষ্ঠান হল। এখানে ইতিপূর্বে কখনও ভারতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়নি। রবিশংকরই প্রথম ভারতীয় সংগীতের সুরলহরীতে ভরিয়ে দিলেন সেই বিদেশী অনুষ্ঠান গৃহ।

প্যারিসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল ২৪ তারিখে ইউনাইটেড নেশন দিবস উপলক্ষ্যে। সাল প্লাইএলে এই অনুষ্ঠান হল। বিরাট হল, প্রায় সাড়ে তিন হাজার দর্শক বসতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের তিন দিন আগে সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেল। ইহুদী মেনুহিন, ডেভিড অস্টাক প্রমুখ শিল্পীরাও এতে অংশ গ্রহণ করলেন। রবিশংকর সেদিন প্রাণ দিয়ে বাজালেন, বাজনার শেষে হাততালি আর থামে না। সারা ইউরোপবাসী এই অনুষ্ঠান টেলিভিশনের পর্দায় দেখলেন, ফলে রবিশংকরের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না একটুও। অনুষ্ঠান শেষে প্রেস ফটোগ্রাফাররা অনেক ছবি নিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সাফল্যে রবিশংকর ও ভারতীয় সংগীতের সম্মান যে কত বেড়ে গেল, তা সহজেই অনুমেয়।

এরপর ডাক এল জার্মানী থেকে। কিন্তু আজ এই পর্যন্ত। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কাহিনী বলেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের যবনিকা টানতে চাই। যে কদিনের কথা লিপিবদ্ধ করলাম, তার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলার আছে যে, আমাদের দেশের গৌরব পণ্ডিত রবিশংকর এবারে বিদেশের দরবারে যে সম্মানলাভ করে গেলেন, তা সত্যই অভূতপূর্ব, অচিন্তনীয়। রবিশংকরের জয় মানেই ভারতের তথা ভারতীয় সংগীতের জয়।

# বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা

ভবতোষ দত্ত

সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে গভীর আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম করেছিলেন, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এর একটা সাধারণ বিধি নির্দেশ করা যায় এই বলে যে সত্যকার সাহিত্য হলে তবেই তার বিচার-পদ্ধতি এবং আস্বাদন-রীতির আদর্শ গড়ে উঠতে পারে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য আস্বাদন থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি রহস্য জানবার ইচ্ছা জেগে ওঠে। যেখানে সাহিত্যের মহৎ নিদর্শন নেই, সাহিত্যের সমালোচনাও সেখানে নেই। সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য না থাকলে সমালোচনাতেও গভীরতা ও বৈচিত্র্য আসে না। অ্যারিস্টটল যখন তাঁর বিখ্যাত সাহিত্য-শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তখন তাঁর সম্মুখে আদর্শ ছিল মহাকাব্য এবং কয়েকটি নাটক। এদের উপর ভিত্তি করে অ্যারিস্টটল তাঁর সাহিত্যিক নীতি স্থির করেছিলেন। সাহিত্যিক আদর্শ উচ্চাঙ্গের বলেই অ্যারিস্টটলের সাহিত্য-চিন্তায় গভীর অন্তর্দৃষ্টি আসা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতর সাহিত্য-জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সম্মুখে সাহিত্যের কোন্ মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি পেয়েছিলেন? সেকালের সাহিত্যের মধ্যে মধুসূদনের কাব্য ও নাটক, দীনবন্ধুর নাটক, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য এবং হেম-চন্দ্রের কবিতা—মোটামুটি এই ছিল তখন-কার আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী রচনা করতে গিয়ে তাঁদের সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন সত্য; কিন্তু নির্বিশেষ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধে তিনি সেকালের বাংলা সাহিত্য থেকে বিষয় বা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেননি। শেক্সপীয়রের নাটক, মিল্টনের কাব্য, মহাভারত, কালিদাস ভবভূতির কাব্য নাটক,—এক কথায় যাদের ক্ল্যাসিক বলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই একমাত্র সাহিত্যের নিকষ পাষাণ-রূপে ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকেও তিনি এরকম আলো-চনার মধ্যে আনেন নি। এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের মঙ্গল কাব্য, পাঁচালী কবিগানের ঐতিহ্য তিনি নবপ্রবুদ্ধ বাঙালীর কাছে সাহিত্যের কোন মূল্যমান নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের কাছে তিনি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট আদর্শকেই ধরে দিতে চেয়েছেন। সে যুগে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছে, সেই যুগেই প্রয়োজন সর্বোচ্চ আদর্শের।

আমাদের দীর্ঘ মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈষ্ণব রচনা ছাড়া আর কোথাও রস-সমালোচনা বলে কিছু পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও রচনা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছু নেই। কিন্তু রসোদ্রেকের পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের আলাদা একটি রসশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়বস্তু রচনা-পদ্ধতি এবং লক্ষ্য—এসব দিক দিয়েই আলাদা হয়ে গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য সাধারণ পাঠ্য সাহিত্য হিসাবে রচিত হয় নি। সুতরাং সাধারণ সাহিত্য বিচার পদ্ধতি এতে প্রযুক্ত হয় নি। প্রাচীন অলংকার শাস্ত্র থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ধর্ম-ভাবুকতা থেকে এই সাহিত্যের জন্ম। ধর্মের সীমা এবং লক্ষ্য থেকে এই সাহিত্য কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকই হোক, ব্রজবুলী বা বাংলায় লেখা পদাবলীই হোক—এই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিভাবের উদ্রেক। বৈষ্ণব ধর্মের অভিনবত্ব যেখানে, এই সাহিত্যের অভিনবত্বও সেখানে। গভীর অধ্যাত্মচিন্তা থেকে উৎপন্ন হলেও জীবনের কতকগুলি সুন্দর মধুর হৃদয়গ্রাহী বৃত্তিকেই সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য ঐহিকতার সঙ্গে অলৌকিক উপলব্ধির মিলন দিয়েই বৈষ্ণবের সাধনা এবং সাহিত্য। ঐহিক জীবনানুভূতি যতটুকু আছে, সাহিত্যের লক্ষ্য ততখানিই চরিতার্থ হয়েছে। সাহিত্য যখন রূপাতীতের চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন বোধহয় সাহিত্য তার লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয় বৈষ্ণব ধর্মেরই বিষয়। মানব হৃদয়ের কতকগুলি ভাবকে রসে পরিণত করবার প্রয়াসে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হলেও এইসব বৃত্তির ঐহিক পূর্ণতা বৈষ্ণব ধর্মের অভিপ্রেত ছিল না। এই বৃত্তিগুলির সার্থক পরিণাম ছিল রস-স্বরূপ কৃষ্ণের প্রতি গভীর ভক্তিভাবের উদ্রেক অর্থাৎ এই সাহিত্য ধর্মসাধনারই অঙ্গ। কীর্তন না হলে বৈষ্ণবের সাধনা পূর্ণ হয় না। ক্ল্যাসিকেল সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব এবং রসের শ্রেণীভাগকে বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করলেন না। তাঁদের মতে রস পাঁচটি : শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর। এই পাঁচটি রস নিয়ে পদাবলীর কাব্যোৎকর্ষ। ক্ল্যাসিকেল সংস্কৃত সাহিত্যে স্বীকৃত হয়েছিল নয়টি রস এবং সঞ্চারী সহযোগে আরো কিছু গৌন বৈচিত্র্য। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের পশ্চাৎপটে সমগ্রভাবে ভারতীয় মনো-ভাবের পরিচয় অব্যাহত থাকলেও বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা

এতে নেই। কাব্যের লক্ষ্য মুখ্যত কখনও নির্বাণ বা মুক্তি ছিল না কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মভাবের উদ্বোধনও ছিল না। ব্যাৎস্যায়নের গ্রন্থে কবি এবং রসিকের যে লক্ষণ বর্ণনা করা আছে, বলা বাহুল্য, কোনো ধর্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রবণ চরিত্রের বর্ণনা সেটা নয়।

অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে যে কথা বলেছেন,

**It fosters in him a stoical resignation an epicurean indifference and a mystic hope and faith which paralyse personal energy, suppress the growth of external life and replace originality by submission. On the other hand, this is exactly the atmosphere which is conducive to idealised creation and serenity' of purely artistic accomplishment in which Sanskrit poetry excels.***

* De and Dasgupta, History of Sanskrit Literature (C.U.) p. 37.

সে কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সাহিত্যের বিচার পদ্ধতিও বৈদান্তিক বিচার-প্রণালীর অনুসরণে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক রসাস্বাদনেই পাঠককে নিয়ে যায়। কাব্যরসের আস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হয়েছে—এ বর্ণনা নানা দিক দিয়েই ভেবে দেখবার মতো। বেদান্তে যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, বৈষ্ণব দর্শনে তিনি রসস্বরূপ। এদিক দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যশাস্ত্র এবং প্রাচীন কাব্যশাস্ত্র একই নীতিতে বদ্ধ এবং এসব দিক দিয়েই মৌলিক ভারতীয় দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্য' বইটিতে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় কবির দৃষ্টির তুলনা করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি ছিল না, তার কারণ বিশ্বের বৃহত্তর কল্যাণবোধে ভারতীয় কবির বিশ্বাস ছিল ধ্রুব। এই কল্যাণ বোধকে জাগানো ছিল এদেশের সাহিত্যের লক্ষ্য। য়ুরোপীয় কবি সুদূর কল্যাণের চিন্তা না করে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের প্রতি নিবিড় মমতাকেই জাগাতে চেয়েছেন। য়্যারিস্টটল বহু প্রাচীন কালে প্রকৃতির অনুকরণের কথা বলে গিয়েছিলেন। য়্যারিস্টটল-এর সমালোচনার আদর্শ অনেক দিক দিয়ে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হলেও এই সূত্রটিকে সাহিত্য সমালোচকেরা কখনোই বর্জন করেন নি। প্রকৃতির অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়েই খণ্ডিত জীবনের দুঃখ-চেতনা হয়েছে এমন মর্মন্তঃসঞ্চারী। 'প্রকৃতির অনুকরণ' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম প্রশ্নের উদ্যত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। শুধু এই কথা বলা যেতে পারে, প্রকৃতির অবিকৃত অনুকরণে কবিতে কবিতে কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকে না। অথচ একই কাহিনী দুজনের দৃষ্টিতে দুরকম হয়ে ওঠে। এর মূলে আছে, কবিমনের এক রহস্যময় শক্তি তার নাম সৃষ্টি-কল্পনা বা Imagination. রেনাশাঁর পর থেকেই এই শক্তি সাহিত্যসৃষ্টিতে স্বীকৃত হল। সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম হল সেই সময় থেকেই।

বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া মধ্যযুগে আমাদের আর যে সাহিত্য ছিল, তার মধ্যে মঙ্গল কাব্যের সার্থক কবি স্বভাবতই প্রাচীন অলঙ্কারকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়েছেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে কাব্য নাটক এবং অলংকার অধ্যয়নের উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগ অষ্টাদশ শতাব্দী। এ ঐশ্বর্য প্রাণের নয়, দেহের। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই।"* অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'দৈবশক্তি' নয়, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নই বড়ো হয়ে উঠল। সমালোচনা-শাস্ত্র আরম্ভ হয়েছিল অলংকার দিয়ে; শেষ পর্যন্ত অলংকার ছাড়িয়ে কাব্যরসের মহত্তর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু নামটা থেকেই গেল। ভারতচন্দ্রের যুগে কাব্যে আবার সেই অলঙ্করণটাই বড়ো হল। এই রসহীন অলংকরণের আদর্শ মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে চলে এসেছে।

কিন্তু ভারতচন্দ্রই আবার বলে গিয়েছেন 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে।' অর্থাৎ কাব্যরস সৃষ্টির জন্য ভাষার বাঁধা-ধরা রীতিকেও অতিক্রম করে যেতে তাঁর দ্বিধা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র এইটুকুই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রঙ্গলাল

*ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫) পৃ: ৫৮

'পদ্মিনীর উপাখ্যানে'র ভূমিকায় এই কাব্য-রস নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনায় রঙ্গলাল কাব্যের একটি মহৎ উদ্দেশ্য নির্দেশ করে দিলেন। মূলত তিনি এতে প্রাচীন আলংকারিকদের বক্তব্যকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই আলোচনাতে তিনি একটি কথা স্বীকার করলেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে যাকে অভিনব বলা যায়?

'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিবেচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্ত্বাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।'

রঙ্গলালের এই উক্তি অভিনব একাধিক কারণেই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' তিনি দেশীয় কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। রঙ্গলালের কাব্যে আধুনিক বিষয়বস্তু এবং রুচির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, কারণ তিনি নিজে ইংরেজি কাব্যরসিক ছিলেন, কিন্তু আধুনিক নতুনতর মূল্যবোধ তিনি সৃষ্টি করতে পারেননি। কাব্যের ছন্দে, অন্যান্য বহিরঙ্গ শিল্পকলায় এবং ভাবের দিক দিয়েও রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে রঙ্গলাল কাব্যবিচারে কোনো নবীন চেতনার সঞ্চার করতে পারেন নি। সেই চেতনার সৃষ্টি করেছিলেন মধুসূদন।

মধুসূদন কবি ছিলেন, ভাবুক ছিলেন না। কাব্যের বিচার তিনি কখনই করতে যান নি। তাঁর নিজের রুচির কথাই অনেক চিঠিতে তিনি বলে গিয়েছেন। সেগুলি সাহিত্য সমালোচনা নয়, তবু বাঙালী কবির দিক্‌পরিবর্তন এবং নতুন মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে মধুসূদনের এই সাহিত্যিক উক্তিগুলি অবশ্যই বিচার্য।

As for the old school nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read. (Letter 25).

অন্য একটি চিঠিতে তিলোত্তমাসম্ভবের প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখেছেন—

Some other Pundits, literary stars of equal magnitude say—

"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।" (Letter 21)

মধুসূদন কাব্যের বহিরঙ্গ রূপ-রীতির উপরে কাব্যসৃষ্টির একটা নূতন রহস্যকে সেকালের পাঠকের কাছে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এইসব উক্তিতে তার প্রমাণ আছে। প্রাচীন কাব্য সমালোচনা পদ্ধতি দিয়ে যে নতুন যুগের কাব্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা যাবে না, নতুন যুগের স্রষ্টা মধুসূদন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে মধুসূদন কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নি। কারণ কোনো রকম তত্ত্বই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মধুসূদন যা সৃষ্টি করেছিলেন কাব্যে, যার আভাস দিয়েছিলেন বিভিন্ন পত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্প সৃষ্টিতে তাকেই অনুসরণ করেছিলেন, আর বিভিন্ন ব্যখ্যায় ব্যাখ্যাত করলেন তাকেই।

অবশ্য একথা বলতেই হবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থসংগ্রহে বাংলা গ্রন্থ সমালোচনার এক নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করলেন। ক্যালকাটা রিভিউতে নব্য বঙ্গের কেউ কেউ সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষী। কিন্তু তিনি মূলত ছিলেন ঐতিহাসিক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি-গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত হলেও ইতিহাস-চেতনাও তাঁদের মধ্যে খুবই প্রবল ছিল। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় নব্যবঙ্গেরা বরং সাহিত্যের আলোচনাই কম করেছে। সমসাময়িক সমাজ এবং প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনাই তাঁরা বেশি করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মনীষীরা সকলেই নব্যবঙ্গ-প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ভূদেব বা বঙ্কিম কেউ এর

ব্যতিক্রম নন। ইতিহাস-চর্চা আমাদের প্রথম দিককার শিক্ষার গোড়াপত্তনের যুগে চিন্তা এবং আলোচনার যে ঋজুতা এবং বস্তু-নির্ভরতা এনে দিয়েছিল, পরবর্তী যুগে যাঁরা সাহিত্যের মতো কল্পনাসর্বস্ব বিষয়ের আলোচনা করেছেন তাঁরাও সেই ইতিহাসাশ্রিত বস্তুনির্ভর চিন্তা-পদ্ধতি থেকে মুক্তি পান নি। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সাধারণভাবে বলতে গেলে বস্তুগ্রাহ্য চিন্তাকল্পনারই সাহিত্য; তার অন্যতম কারণ ছিল সেকালের স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ চিন্তা করাবার শিক্ষাপদ্ধতি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং ঐতিহাসিক ছিলেন। সেইজন্য বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনাতে সর্বদাই ঐতিহাসিক পটভূমি এসে গিয়েছে। বেণী-সংহার নাটকের সমালোচনাতে* তিনি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি আলোচনা করেছিলেন। গ্রীক উদ্ভব তিনি অস্বীকার করেছেন। আবার কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচনাতে* রাজেন্দ্রলাল আলংকারিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও এতেও ইতিহাসজ্ঞান এবং চরিত্র-বিচার গঠন-কল্পনা-বিচার প্রভৃতি আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির চিহ্নও ছড়িয়ে আছে।

কিছুদিন বাংলা সাহিত্যে এই দ্বিধা চলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এসে এই দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যেমন ছিলেন প্রধানত ঐতিহাসিক, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি ছিলেন প্রধানত সাহিত্যিক। কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্য-ভাবনা সাহিত্যের দেশ-কাল-বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য বিচার নয়। সাহিত্যবিচারে ঐতিহাসিক পরিবেশের আলোচনা করে তিনি সাহিত্য সমালোচনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি যথার্থই নব্যবঙ্গের অনুগমন করেছিলেন। কিন্তু নব্যবঙ্গেরা যা করে নি বঙ্কিমচন্দ্র তাই করলেন—তিনি সাহিত্য-তত্ত্বের আলোচনায় অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তেমন বিস্তীর্ণ ভাবে করেন নি। নিছক সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই তুলনায় বঙ্কিমের দান খুবই কম। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রচনাগুলিকে এই কয়টি ভাগে ফেলা সম্ভব —(১) জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সাহিত্যালোচনা, (২) প্রাচীন সাহিত্যালোচনা, (৩) সমসাময়িক পুস্তক সমালোচনা, (৪) ধর্মতত্ত্বে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্প সৃষ্টির রহস্য আলোচনা।

সাহিত্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত জানতে গেলে শুধু সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলি পড়লেই চলবে না—বঙ্কিমচন্দ্রের মূল জীবনদর্শনের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বঙ্কিমের যে দার্শনিক মতবাদ তাঁর ধর্মতত্ত্বে বা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাও ছিল তারই একটা দিক। বঙ্কিম মনীষার এই সুসংহত ঐক্য-কেন্দ্রিকতা সত্যই বিস্ময়কর। জীবনকে তিনি সমগ্র এবং অখণ্ডরূপেই দেখেছেন। তার চিন্তা ও কর্ম, প্রবৃত্তি ও উদ্যোগ, সাধনা ও সাফল্য—যত বিচিত্রই হোক, মানবতা নামক একটি সুস্পষ্ট সত্তারই তারা প্রকাশ। সব কিছুর মধ্যে একটি চমৎকার সঙ্গতি বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করেছিলেন। সাহিত্যকে তিনি মানুষের অস্তিত্বের একটা অচ্ছেদ্য রূপবিকাশরূপে দেখেছেন। সাহিত্যরসকে অলৌকিক বলে লৌকিক জীবনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি; বৈষ্ণবের মতো নিগূঢ় ধর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রাত্যহিক জীবনের থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন করে নেন নি। জীবনের অপূর্ণতার স্বপ্ন-পূরণ বলেও তিনি সাহিত্যকে বিলাস-গৌরব দেন নি। বস্তুত সাহিত্য মানুষের মনুষ্য-ধর্মেরই প্রকাশ। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাহিত্যকে জীবনের অঙ্গীকৃত করলেন। সাহিত্য সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। সমাজ বিচ্ছিন্ন আত্মস্বাতন্ত্র্যের কল্পনাসর্বস্ব ভাবময় সৃষ্টি সাহিত্য নয়। এর দুটি দিকই বঙ্কিম বিভিন্ন স্থলে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ এবং ব্যক্তি, কেউই অন্য নিরপেক্ষ নয়। সাহিত্য দুয়েরই মিলিত পরিণাম।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পিত মানব-ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের সত্তাকে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, জ্ঞানার্জনী কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। এই তৃতীয়টি থেকেই যা কিছু সৌন্দর্য ও শিল্পসৃষ্টি। বঙ্কিম বলেছেন, বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের যে মূল শক্তি বিশ্বের শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে, সেই শক্তি জড়বস্তুকে আশ্রয় করায় অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। সহজ করে বলতে গেলে বেঁচে থাকার একটা অনির্দেশ্য আনন্দ আছে। এই আনন্দের কোনো কারণ নির্দেশ করা সহজ নয়। বর্ণ দেখে আমাদের আনন্দ হয়, মধুর গান শুনেও আনন্দ হয়। কবিরা তো এই আনন্দেরই চর্চা করেন। এই আনন্দময় অনুভূতিতেই তাঁরা কাব্য রচনা করেন। বলা প্রয়োজন, আনন্দ কথাটার একটা ব্যাপক অর্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেই যদি দৃষ্টান্তরূপে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য দেখা যাবে কাহিনীর নিছক আনন্দময়তা কমই আছে। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের উপসংহার আমাদের প্রত্যাশা পূরণের আনন্দ দেয় না। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসই বেদনা-মাধুর্যে

* বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭৯ শক ভাদ্র, পৃ ১০০—১০৮

* ঐ ১৭৭৬ শক মাঘ, ২২৩—২৬১

আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। মধুসূদনের মেঘনাদবধই বা কী? কাব্যের উপসংহারে মহৎ বিচ্ছেদের মহৎ বিস্তৃতায় পাঠকের অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিচ্ছেদ-দুঃখ বা রাবণের পরাজয় কি বেঁচে থাকাকে কোনোদিক দিয়ে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে? তা যদি না হয় তবে এই সব দুঃখ সত্ত্বেও বেঁচে থাকার আনন্দ আছে। এই আনন্দকে স্পষ্ট করে বোঝানো কঠিন। কমলাকান্তের দপ্তরের 'পতঙ্গ' রচনাটির মধ্যে বঙ্কিম মৃত্যুর আনন্দের বর্ণনা দিয়েছেন। এ অনান্দ জীবনেরও বটে কারণ মৃত্যুকে স্বীকার করেও আমাদের সত্তা জীবন-বিমুখ হয় না—

"এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে।"

শুধু একটি কথা বাকি থাকে। বঙ্কিম যাকে নিয়ম শৃঙ্খলা বলেছেন সেটা কি? এ শৃঙ্খলা নৈতিক শৃঙ্খলা নয়। জীবনের যেটা প্রত্যক্ষ রূপ, সেটাকে নৈতিক বলা যায় না। জীবনে অন্ধ উন্মাদনা আছে, নীতির দিক দিয়ে সেটা ঠিক নয়। সুতরাং আদর্শ শৃঙ্খলায় এর স্থান নেই। প্রাকৃতিক জগৎ যে নিজস্ব নিয়মে চলেছে, বঙ্কিম তাকেই শৃঙ্খলা বলেছেন। সব কিছুই নির্দিষ্ট কার্যকারণের শৃঙ্খলে বদ্ধ এবং সেইজন্যই পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। এইভাবে জীবনকে দেখার মূলে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাব আছে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের সাহিত্য-সমালোচনা রোমাণ্টিক-পূর্ব প্রত্যক্ষতার নীতি দ্বারা প্রভাবিত।

এইজন্যই বঙ্কিম কাব্যরসকে অলৌকিক বলেন নি, কাব্যের লক্ষ্যও মুষ্টিমেয় সহৃদয়কে করেন নি। কাব্য এই বস্তু-জীবন, প্রকৃতি এবং মানবসমাজের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সমাজ-মানসের অভিলাষ পূর্ণ করতে সে সাহায্য করে। এককালে প্লেটো কবিদের তাঁর আদর্শ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন কারণ তাঁরা আদর্শকে বিকৃত করে। অর্থাৎ জীবনের আদর্শ সত্য রূপকে ধরতে পারেন না। য়্যারিস্টটল প্লেটোর অভিমতকে সংশোধন করে বললেন, শুধু বাস্তব বা শুধু ভাবকে তো কবিরা গ্রহণ করেন না। এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা সম্ভব কিন্তু ঘটে না। সেটা কবিদের উপরেই নির্ভর করবে। রেনেশাঁর মানবতাশ্রিত চিন্তাধারায় মানুষের জীবন ও সমাজকে জানাই বিশেষ করে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। তার ফলে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ হল নিবিড়। বঙ্কিম একদিকে যেমন সাহিত্যের বহিরঙ্গ সজ্জাকেই প্রধানরূপে মেনে নেননি, তেমনি আবার সাহিত্যকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অবাস্তব কল্পনাতেও মত্ত হন নি। ভারতবর্ষের প্রাচীন অলংকার পদ্ধতিকেও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেন নি। উত্তররামচরিত আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি আলঙ্কারিক রীতি বর্জনের সংকল্প জানিয়েছিলেন।

রেনেশাঁর পর য়ুরোপে মানুষের চিন্তা-রীতিতে যে পরিবর্তন এল, বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ করে তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনাশ্রয়ী হয়েও তার মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল। রেনেশাঁর যুগে সাহিত্যে ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, বঙ্কিম কিন্তু সে-পথে যান নি। প্রাচীন গ্রীক পদ্ধতি কিংবা প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক পদ্ধতিকে স্বীকার না করে রেনেশাঁর পরের আধুনিকতার চিন্তারীতিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য য়্যারিস্টটল সাহিত্যের যে উদারতর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার সবটুকু গৃহীত না হলেও আধুনিক কাব্যসৃষ্টি এবং বিচারের পথ তা যে অনেকটাই মুক্ত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

In asserting that it is the function of poetry imitate only ideal truth he laid the foundation, not only of an answer to mediaeval objections, but also of modern aesthetic criticism. *

বঙ্কিমচন্দ্র যখন মানব-জীবনের পাপ-পুণ্যের মধ্যে ভেদ না করে উপন্যাসে বৃহত্তর সত্যকে রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন স্বভাবতই তিনি প্লেটোর আদর্শ-বিরোধী

* Spingarn, J. E. History of Literary criticism in the Renaissance (New York, 1912) p. 18.

কাজই করেছিলেন এবং খানিকটা য়্যারিস্টটলকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু য়্যারিস্টটল সাহিত্যের যে বৃহত্তর আদর্শ সত্যের কথা বলেছিলেন, তা সম্পূর্ণ নীতি বর্জিত ছিল না।

Beyond this poetry is justified on the grounds of morality, for while not having a distinctly moral aim, it is essentially moral, because it is this ideal representation of life, and an idealized version of human life must necessarily present it in its moral aspects. Aristotle distinctly combats the traditional Greek conception of the didactic function of poetry, but it is evident that he insists fundamentally that literature must be moral, for he sternly rebukes Euripides several times on grounds that are moral, rather than purely aesthetic. +

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক চিন্তাও সম্পূর্ণ নীতি-বর্জিত ছিল না। তিনি বলেছেন, "কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এইজন্য কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের যে রূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্মের যথার্থ মর্ম বুঝেন নাই।" ×

+ ঐ, পৃ. ১৮—১৯
× ধর্মতত্ত্ব, ২৭ অধ্যায়

এ প্রসঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতির কথা বলেছেন, সেটা আধুনিক যুগেরই। এই নৈতিকবোধ একটা স্পষ্ট প্রবল ইহচেতনা থেকেই উৎপন্ন। সমাজ ও জীবনের কল্যাণচিন্তাই এর মূলে। মধ্যযুগের সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে এর পার্থক্য সহজেই বুঝতে পারা যাবে। সেই যুগের সাহিত্যের মূলে এই প্রবল ইহচেতনারই অভাব ছিল। সে যুগে নীতির অর্থ দেবতার কাছে আত্মসমর্পণের নীতি। সংকীর্ণ ধর্মভয় ইহজীবনকে নানা দিক দিয়ে সংকুচিত করে রাখত। সেই আদর্শের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভেদ অপরিসীম। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অবিচ্ছেদ্যরূপে স্বীকার করে নিলেই জীবনের কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তা এসে পড়ে। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ-চিন্তাই ছিল পদ্য রচনার প্রধান বিষয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—কাউকেই আত্মমগ্ন চিন্তাসাধকরূপে পাইনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রাণবন্যার প্রবল উচ্ছ্বাসে সমষ্টি-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। সেই ভগ্নতার কুশ্রীতাকে দূরে করবার জন্য দ্বিতীয়ার্ধে একটা সর্বব্যাপী প্রয়াস চলেছিল। সাহিত্যকে সেই কার্যে প্রযুক্ত করা ছিল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সমাজের কল্যাণ যদি সাহিত্যের দ্বারা না ঘটে, তবে সে সাহিত্যের মূল্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্য জাতির শত্রু এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।"

সুতরাং এই জীবনমুখিতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-দর্শনে নীতিবোধ আসলে যুগোপযোগী চিন্তারই পরিচায়ক এবং একে চিন্তার পশ্চাদগমন বলা যায় না। তবু এই প্রশ্ন থেকেই যায় সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য কি নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল? বঙ্কিমচন্দ্রের যে এই জিজ্ঞাসা ছিল না, তা বলা যায় না। এজন্য তাঁর উক্তিতেই সাহিত্যকে একই সঙ্গে উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বলা হয়েছে। উত্তরচরিত সমালোচনায় বঙ্কিম বলেছিলেন, "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।" তিনি কাব্যের কোনো সচেতন উদ্দেশ্য স্বীকার করছেন না, তবে এ কথাও বলছেন যে কাব্য যদি সার্থক হয় তবে মনের মালিন্যকে সে দূর করবেই। তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টিকে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। অতএব 'সৌন্দর্য' বস্তুটি নিয়েই বিতর্কের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্কিম এ নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা কিছু করেন নি। তবে তাঁর উক্তি থেকে একটা অর্থ কল্পনা করে নেওয়া যায়—বঙ্কিমের মূল বক্তব্য থেকে খুব সম্ভব সেটা আলাদা হবে না। জীবনকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই সৌন্দর্য সৃষ্টি—এই সৃষ্টিতেই চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, সত্যিই যদি জীবনকে সমগ্ররূপে ফুটিয়ে তোলা যায়, তবে পাঠকের মনে সংকীর্ণ ক্ষুদ্রবুদ্ধির অবসান ঘটবেই। মনের এই প্রসারই সার্থক কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি'র মতবাদের সঙ্গে য়্যারিস্টটলের 'ক্যাথারসিস' মতবাদের সাদৃশ্য খুঁজছে কিনা, ভেবে দেখা দরকার। কাব্য যদি পাঠককে রসের উচ্চতম স্তরে নিয়ে না যায়, যেখানে প্রবৃত্তির উন্মাদনা শান্ত ও বিস্মৃত হয়ে আসে, তবে সে কাব্য সার্থকই নয়। এই চিত্তশুদ্ধির অবস্থায় না নিয়ে কাব্য যদি আমাদের নিম্নতর চেতনার জন্যই ইন্ধন সংগ্রহ করে তবে স্বভাবতই কাব্য উদ্দেশ্যমূলক এবং ব্যর্থ। বঙ্কিম এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বঙ্কিম গ্রীক অলংকারকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলেও গ্রীক সাহিত্যতত্ত্বের একটি মূলসূত্রকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যে সূত্রটি বস্তুত পরবর্তী য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সমালোচনার মৌলিক ভিত্তি হয়েছিল। ইংলণ্ডের নিও-ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য সমালোচনায়

অ্যারিস্টটলের 'মাইমেসিস' অর্থাৎ স্বভাবানুকরণ ছিল একটি প্রধান বক্তব্য। বলা বাহুল্য, স্বভাবানুকরণ মানে অন্ধ অনুকরণ মাত্র নয়। স্বভাবের অর্থাৎ বঙ্কিমের ভাষায় বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীন সৌষম্যসন্ধান ছিল এর বৈশিষ্ট্য। 'স্বভাবানুকরণ' কথাটা তিনিই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন "যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।" সুতরাং সৌন্দর্য বিশ্বেরই মধ্যে প্রকাশিত। প্রকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য লভ্য। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি দিয়ে বঙ্কিম সমালোচনাতত্ত্বের একটি নূতন দিকের ইঙ্গিত দিলেন। অ্যারিস্টটল imitation of nature পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু স্বভাবাতিরিক্ত শব্দটির ব্যবহার করে বঙ্কিম প্রমাণ করলেন, তিনি এ সব ছাড়াও আরো কিছু বলতে চান। কিন্তু স্বভাবানুকরণ কথাটিকে যেমন বোঝানো যায়, 'স্বভাবাতিরিক্ত' অর্থ বোঝানো মোটেই সহজ নয়। 'অলৌকিক' 'অনির্বচনীয়' প্রভৃতি শব্দগুলি আসলে কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় বোঝানো যায় না। বঙ্কিম সম্ভবত এইজন্যই এর আলোচনা বিস্তারিত করেননি। তিনি সব রকম অস্পষ্টতারই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি এর সত্যতায় ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি বলেছেন—

"কবির সৃষ্টি—চরিত্র রূপ স্থান অবস্থা কার্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র রূপ স্থান অবস্থা কার্য এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।"*

অর্থাৎ অখণ্ডতা সৃষ্টিতেই কাব্য সার্থক। জীবনের এই অখণ্ড রূপকে দেখতে পারাই প্রতিভা। এই বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র রোমাণ্টিক রসানুভবের জগতে এসে পৌঁছালেন। বঙ্কিম যদি আরো এগিয়ে আসতেন তবে তিনি পরবর্তী পুরোপুরি রোমাণ্টিক সাহিত্যতত্ত্বে এসে পৌঁছতে পারতেন বলে মনে হয়। বিশেষ করে 'উত্তররামচরিত' সমালোচনা এবং 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা' প্রবন্ধ দুটি পড়লে এই ধারণাই দৃঢ় হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার বিশেষভাবেই নীতি বা বহির্জগত-মানদণ্ড-বর্জিত। কাব্য থেকেই চরিত্র-রচনা, সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং জীবন-বাণীকে উদ্ধার করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির ভাষাও লক্ষ্য করবার মতো। সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচিত হয়েছে অলঙ্কার-

* 'উত্তর চরিত' বিবিধ প্রবন্ধ

হীন স্পষ্ট ঋজু ভাষায়। কিন্তু এই সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিতে বঙ্কিমের ভাষাও অলংকৃত। কাব্যের রসসৌন্দর্যকে বঙ্কিম পাঠকের অনুভূতিগ্রাহ্য করে তুলতে চান বলেই এঁত অলংকার এবং কারুকর্মের সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' এবং অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলে ভাষাগত এবং পদ্ধতিগত সাদৃশ্য মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতির একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করলেও বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রভাবকেও সাহিত্য সৃষ্টিতে মুখ্যরূপে নির্দেশ করেছেন।৮

"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।...তেমনিই সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"*

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রতিভাকেই প্রামাণ্য করেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ বা ইতিহাসকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র আলোচনাতে ভারতীয় প্রকৃতি এবং জাতীয় সংস্কারের উপর কম জোর দেননি। বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাতে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা বরং একটু বেশী তথ্যনিষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন-চেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি ছাড়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত বৈষ্ণব পদসংগ্রহের সমালোচনাটি* এর একটি দৃষ্টান্ত। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতিতে (Law) বিশ্বাস করতেন, এটা য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের গ্রন্থ-পাঠেরই ফল। সাহিত্যের এই নীতির সন্ধান কতটা সার্থক এবং সংগত, সেটাই বিবেচ্য কিন্তু এই পদ্ধতি শুধু সাহিত্য-চিন্তার মধ্যেই স্পষ্টতা নিয়ে আসেনি, সাহিত্যের ইতিহাস রচনারও যথার্থ পথ প্রদর্শন করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই সম্ভাবনাটিকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে 'জাতীয় সাহিত্য' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেটাও এই পদ্ধতিরই পূর্ণ প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কাব্য পড়ার জন্য কবিকে জানারও প্রয়োজন আছে। কবিজীবনী রচনা প্রথম করেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই সাহিত্য শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত কবি-জীবনী রচনা করলেও সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে জীবনীর যোগ ঠিক নির্ণয় করে দেখাতে পারেননি। তবে তিনি যে সময়ের কবিদের জীবনী লিখেছেন, সেই সময়ের সাহিত্যের প্রকৃতিই এমন ছিল যে তাতে কবি-মানসকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত দেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ব্যক্তি-মনের যে প্রাধান্য ঘটল, তারই ফলে কবির সৃষ্টিকে বোঝার জন্য কবিকে জানাও দরকার হয়ে পড়ল। ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র—উভয়েরই জীবনী রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের শিল্পীমনের গঠনে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনার একটি দৃষ্টান্তরূপেও জীবনী দুটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনী সাহিত্য বস্তুটিই আধুনিক এবং ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। কিন্তু শুধু সেদিক দিয়ে নয়, বঙ্কিম-রচিত এই জীবনীগুলি যুগের শিল্পকর্মের ইঙ্গিত শুধু নয়, বঙ্কিম এখানে ব্যক্তিকেই উপলক্ষ করেছেন। ব্যক্তির শিল্পকর্মই তাঁর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তার জীবন-চরিতে'। কবিকে কাব্যেই পাওয়া যাবে—একথা শুধু যে কবির সম্পর্কে সত্য, সে কবি সমাজ নিরপেক্ষ আত্মভাবমগ্ন কবি। কিন্তু বঙ্কিমের যুগে এবং বঙ্কিমের আদর্শে সাহিত্য বা কাব্য যে সমাজ নিরপেক্ষ নয়, তা আমরা দেখেছি। বঙ্কিমের সাহিত্যাদর্শে সমাজ-চেতনাকে ব্যক্তির থেকে আলাদা করা যায় না। সমাজের রূপই ব্যক্তির দৃষ্টিতে বিশিষ্ট রূপ নেয়। কিন্তু সম্ভবত একথা বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পের মধ্যে শিল্পী মানসকে খোঁজবার এক নূতন সমালোচনা-পদ্ধতির সূচনা করে গেলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচারে সেই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হলো।

* 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', বিবিধ প্রবন্ধ।
* 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ




৩

৩রা জুলাই (বরিশাল জেল)—আজ এমদাদ আলী মিঞা (এম-এল-এ) মুক্ত হইলেন—এক মাস গভীরভাবে একসঙ্গে বাস করিলাম। কাল অনুজ কাহালী প্রভৃতি কয়েকজন খালাস হইল। আগামী কাল আরও পাঁচ ছয়জন ছাড়া পাইবে। *** আজ আমি ও নিবারণবাবু মিলিয়া সকলকে পায়স খাওয়াইলাম। সকলে বেশ আনন্দ করিয়া খাইল।

আজ হাসেম গ্রেপ্তার হইয়া আসিল। কাল রুনু ও তার মা-ভাইয়েরা ও সাধন দেখা করিয়া গেল। খাবার তৈরি করিয়া আনিয়াছিল। ওদের সঙ্গে ওখানে বসিয়া খাইতে হইল।

মিঃ মহম্মদ আলীর (প্রধানমন্ত্রী) সমগ্র বিবৃতিটা আজ বাহির হইল। খুবই কড়া, কোনও রকম আপসের মনোভাব নাই।

এমদাদ মিঞা অনেকদিন অনেকভাবে আমাকে বলিতেছিলেন "এদেশে থাকা সম্ভব নয়, ডিমক্র্যাসি নাই, ইত্যাদি।" আমি টমাস পেইনের কথায় জবাব দিয়াছি—"My home is where liberty is not"। আবার শেষের দিক দিয়া আর একটা কথা বলিতেছিলেন, "মুসলমানদের দেশে সিভিল লিবার্টি সম্ভব নয়, গণতন্ত্র সম্ভব নয়, democratic minded লোক টিকিতে পারিবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" করিম প্রভৃতিও তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিল, "মুসলমানদের ইতিহাসই এই।"

কোনও কোনও বন্ধুরা বলিতেছিলেন, পাকিস্তান যদি গোড়া হইতেই ইম্পিরিয়ালিস্টদের আড্ডা হিসাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য কি? দেশপ্রেমিক মুসলমান বন্ধুদের মনে নানা গভীর প্রশ্ন উঠিতেছে। তাহারা পথ চায়—honestly। কোথায় পথ, কে দেখাইবে পথ, কে লইয়া যাইবে এদের সেই পথে, কে ইহাদের জাতি-চরিত্রের মধ্যে যে ত্রুটি আছে, তাহার সংশোধন করিয়া ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সুন্দর দিকটা আছে, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবে, lead দিবে? এদের মধ্যে বেশ রসোগুণ আছে, আগুন আছে। যদি ভাল lead পায়, নিঃস্বার্থ, নির্ভীক lead পায়, তাহা হইলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। যদি তাহা না পায়—ভুল, মিথ্যা, স্বার্থ চালিত lead হয়, তাহা হইলে এই আগুনে, এই রজোগুনে জ্বলিয়া মরিতে পারে এবং তাহা আত্মহত্যারই সামিল......

পটুয়াখালি, লাউকাঠি, বি এম কলেজ পূজা, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশন, বরিশাল দুর্গাপূজা, প্রতিমা বিসর্জন ইত্যাদিতে আমার কর্তব্য কি? অন্যেরই বা কর্তব্য কি? এর সবটা কি আমার করা সম্ভব ছিল? কোন্ কোন্টা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, অন্যের সাহায্য ছাড়া? এর অনেকটার গোড়াতে অন্য লোক ছিল। লাউকাঠি, পটুয়াখালিতে প্রথম হইতেই আমার advice ছিল।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—প্রথম ঘটনার দিন আমি শহরে ছিলাম না। প্রথম দিনই লোক্যাল লীডাররা আমার অনুপস্থিতিতে নিজেদের ইনিশিয়েটিভএ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর রাস্তার পরে শোভাযাত্রা লইয়া বাহির হইয়া বাধাপ্রাপ্ত এবং আহত হয়।...এর পরে আমি আসিলে নেগোসিয়েশন শুরু হয়। তাতে প্রধান অংশ লই। পরের most difficult workগুলি করি—যখন যখন সংকট উপস্থিত হইয়াছে, প্রধানত আমিই তাহার সম্মুখীন হইয়াছি। যেখানে idealism-এর প্রশ্ন, dynamic study of past events (পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ প্রভৃতি) desemination-এর প্রশ্ন—সে-সব স্থলে প্রধানত আমিই সেগুলির সম্মুখীন হইয়াছি এবং সমাধান করিয়াছি।

৫ই জুলাই, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল)—এ কয়দিনে অনেকে খালাস পাইল। এখন খেলা আর জমে না। সময় ছিল যখন ভিড়ে রাস্তায় বেড়ানো অসম্ভব ছিল। ভলিবল, হাডুডু খেলাও জমিত—দর্শকেরও ভিড় ছিল, বেড়াইবার লোক ছিল। এখন হাডু-ডু বন্ধ; ভলিবল খেলায় লোক কম পড়ে, বেড়াইবার তো লোকই নাই। কয়দিনের মধ্যে এইটা হইল।...

স্বভাবগুলি মরিলেও যায় না—সংগের সাথী। ........ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। স্বভাবের যে-দোষগুণ বাহিরে ছিল, ভিতরেও তাহার খেলা অবিরাম চলিতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এ তিন থাকতে নয়। এদের খেলা তো চলিতেছে। মৌলিক কোনও পরিবর্তন নাই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির সঙ্গে জেলের অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি লইয়া আলাপ করিতে অনিচ্ছা কেন? জেলে আসার দ্বিতীয় দিনে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসেন। আমি স্নান করিতেছিলাম। সংবাদ গেল, এ ডি এম আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আসিয়া দেখি এমদাদ মিঞা অভিযোগাদি লইয়া আলাপ শুরু

করিয়াছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় এবং এমদাদ মিঞা অনুরোধ করায় আমি বলিলাম, সবেমাত্র পূর্বদিন আসিয়াছি, সব অবস্থা জানা নাই, অফিসারদের সঙ্গেও আলাপ হয় নাই। আর যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাহাও প্রথমে লোক্যাল অফিসিয়ালদের বলা দরকার, তাহার পর অন্যত্র। .........

"সুপারও" যখন বিভিন্ন সময়ে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়াছি—জেলারের সঙ্গে সব ঠিকঠাক করিতেছি, তাঁর কাছে অভিযোগ করার মতো কিছু নাই। অফিসারদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতেছি। বন্দীদের নিজেদের বেবন্দোবস্তও দেখিতেছি। এরা অফিসের কাছে ঠিকভাবে জিনিসটা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছে না বলিয়া সকলে কষ্টভোগ করিতেছে। তবু আগাইয়া আসিয়া অভিযোগ করিতে ইচ্ছা হয় না কেন?

(১) বাহিরেও বহুদিন হইতে অফিসারদের সহিত নিজে আলাপ করি না—প্রাণকুমারবাবু প্রভৃতিই করে।

(২) শান্তিপূর্ণভাবে সব কাজ করিতে একটা প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে।

(৩) এই বয়সে ছোটোখাট বিষয় লইয়া নিজের লড়িতে মন যায় না—শান্তিপূর্ণভাবে যাহা পারা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ অন্য কিছু মনে আসে না।

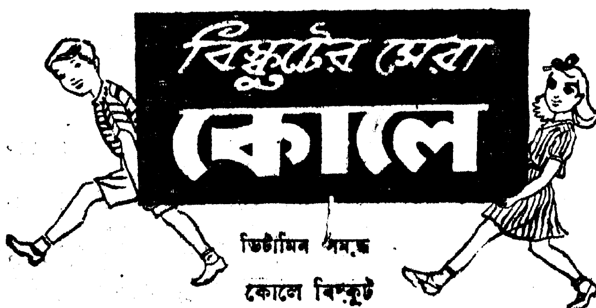
(৪) ......... যাবার যারা তারা চলিয়া গেলে, যারা থাকিবে, তাদের লইয়া সমস্যাগুলির আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।... আর বরিশাল—নিজের জেলা বলিয়াও বোধ হয় আর অফিসাররাও আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, এতেও বোধ হয় অনিচ্ছা।

৬ই জুলাই (বরিশাল জেল)—ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া কাহারও কোনও রকম অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া ভয়শূন্য হইয়া শত্রুমিত্র সকলকে ভালবাসিয়া (অনিষ্টকারীকেও) সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যকে যদি আশ্রয় করা যায়, চিন্তায় কর্মে, আচরণে—সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সর্বত্র এবং তার জন্য হাসিমুখে সর্বরকম নির্যাতন বরণ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কী হয়? কীভাবে অধিকতর সেবা করা যায়?

১১ই জুলাই, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল, সন্ধ্যা প্রায় ৭টা)—আজ আমাদের আঙুলের ছাপ লওয়া হইল.....মনে পড়িল দার্জিলিং জেলে আঙুলের ছাপ দিতে অস্বীকার করার দৃশ্য এবং অবশেষে বিচার ও শাস্তি।.....

........সেদিন বাগেরহাটের কলেজের ছাত্রটির সঙ্গে admission check-এর একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। অন্য কোনও দায়িত্বশীল বন্ধুর সহিত আলোচনায় সুফল না হওয়ায় ছাত্রটি আমার কাছে আসে। আমি সিনিয়র সি আই ডি সাহেবকে বলি। সে কথা দেয় যে, কেরানীটিকে আনিয়া মিটমাট করিয়া দিবে। সে পারিল না......শেষ পর্যন্ত জেলার সাহেবকে বলিলাম। কাল বৈকালে তিনি লিখিলেন—বাগেরহাট কলেজের ছাত্রটির ব্যবহার খুব "unmannerly" হইয়াছে সেদিন; তাঁহার ঘরে বসিয়া তিনি overhear করিয়াছেন। আজ আঙুলের ছাপ লওয়া হইলে জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। ছাত্রটির বক্তব্যটা সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—ছেলেটি মিথ্যা বলিয়াছে, তাহার ব্যবহার খুব খারাপ ছিল, তিনি নিজে তাঁহার কামরায় বসিয়া শুনিয়াছেন এবং অন্য যাঁহারা অফিসে ছিল, তাহারাও বলিয়াছে...। তাই জেলার সাহেব এই ব্যাপারটা লইয়া আলাপ করিতে চান না—যদি ছাত্রটি লিখিত অভিযোগ উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের সংখ্যা কম হইয়া যাইবার পর ওয়ার্ডাররা সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই লক-আপ শুরু করে। দুই তিন দিন পূর্বেই ইহা লইয়া আলাপ হয় এবং স্মরণ করাইয়া দিই যে, তাহারা তাহাদের পূর্বে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছে। তাহার পর হইতে লক-আপ পূর্বের মত হইতে থাকে। বোধ হয় ইহাতে এরা বিরক্ত হইতেছে।।...........




এই রি-অ্যাকশন কি শুধু বাগেরহাটের ছাত্রটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং লক-আপ-এর ব্যাপারের জন্যই, না আরও কিছু আছে? ফাইল-এর ডায়েট, ফাইল-এর দুইটি বন্দী ও এখানকার নিরাপত্তা বন্দীদের কতকগুলি ব্যাপারে যে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এই প্রতিক্রিয়ার মূলে কি সে-সবও রহিয়াছে?......হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে যে-সব অনুরোধ করিয়াছি, তাহা কি অতিরিক্ত হইয়াছে? এই অনুরোধ রক্ষা করা কি তাহাদের সাধ্যাতীত? এরা কি অস্বস্তি বোধ করিতেছে?

জেলার সাহেব ঠিক করেন নাই—কেরানী ও ছাত্র উভয়কে ডাকিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। পরস্পরের ভুল বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল, ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আর না হয়। জেলার সাহেবের সঙ্গে আমার পূর্বে পরিচয় নাই। ...... একপক্ষের কথা শুনিয়া প্রভাবান্বিত হন কি? এই ঘটনাতে তো দুই পক্ষের কথা শুনিলেন না, একপক্ষের কথা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। আর যদি overhear করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও রকমে বলা চলে যে, দুপক্ষের কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কামরার গঠন ও অবস্থান যেরূপ তাহাতে overhear করা, পুরোপুরি তো নয়ই, আংশিকভাবেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। যদি উভয় পক্ষ শুনিয়া নিষ্পত্তি করার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই অকল্যাণকর হইবে।

আমার কি এইসব কেস হাতে নেওয়ার মধ্যে কোনও ত্রুটি আছে? কেমন করিয়া এইসব আমার কাছে আসিল? আমি তো এ ডি এম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কারও কাছে কোনও অভিযোগ না করার দিকেই ঝুঁকিয়াছিলাম—সেই মনোভাবই লইতেছিলাম। অথচ আমার ধারেই সব আসিতে লাগিল। ইহা কি আমার পক্ষে—আমার no-complain attitude-এর পক্ষে inconsistent হইতেছে? এর অর্থ তো এই দাঁড়ায়—নিজের বিষয় লইয়া অভিযোগ করি না, পরের জন্য করিতে পারি। তাও তো পুরোপুরি হয় নাই। আমি এ ডি এম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এঁদের কাছে তো অপরের বিষয়গুলি বলিতে পারিতাম, তাও তো বলি নাই।

১২ই জুলাই (বরিশাল জেল, সন্ধ্যা প্রায় ৭টা)—আজ ডিভিশনাল কমিশনার জেল পরিদর্শনে আসেন, সঙ্গে ছিল এ ডি

এম। প্রথমে অফিসাররা নিজেদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিল। এ ডি এম বলিলেন, "ইনি প্রাক্তন এম-এল-এ।" কমিশনার জিজ্ঞাসা করিলেন এবার কেন নির্বাচনে দাঁড়াই নাই। বলিলাম, "এসেমব্লির বাইরে আমার কাজের চাপ এত বেশী যে, এসেমব্লি আমার ছাড়িয়া দিতে হইল।"

কমিশনার—"পটুয়াখালিতেই কি কাজ সীমাবদ্ধ?"

উঃ—"সমস্ত পূর্ববঙ্গব্যাপী।"

প্রথমে আসিতেই আমি বসিবার জন্য চেয়ার আগাইয়া দিলাম। বসি বসি করিয়া বসিলেন না। চেয়ারও কম ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোন প্রদেশের লোক? দেখিতেছি কিছু কিছু বাংলা জানেন।"

ইতস্তত করিতে লাগিলেন—পরে বলিলেন, "that does not matter"।

কমিশনার সাহেব প্রথমাবধি যেভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তাহাতে ভাল লাগিতেছিল না। শেষ উত্তরটায় বিরক্ত বোধ করিলাম। মনে হইল পশ্চিম পাকিস্তানের লোক অথচ অবাঙ্গালী ইহা স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করিতেছেন। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী প্রশ্নটা লইয়া এত ঘাটাঘাটি হইয়াছে এবং ৯২-এ শাসনেও এরাই প্রভুত্ব করিতেছে এবং পূর্ববঙ্গের এই জন্য একটা আক্ষেপ আছে সংকোচের কারণ বোধ হয় তাহাই।

কমিশনার—"আপনি কি কম্যুনিস্ট?"

উঃ—"না, আমি কংগ্রেস টিকিটে এসেম্ব্লিতে প্রবেশ করি—পরের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করিয়া যাইতেছি।"

প্রঃ—"বাইরে আপনারা কি কাজ করেন?"

তাঁহার official attitude ইত্যাদি সহ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় অরুচি বোধ করিলাম। বলিলাম—"আপনি ডি আই জি (এটা আমার ভুল সংবাদ) আমি সিকিউরিটি প্রিজনার, আমাদের রাজনীতিক বিতর্কের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।"

এ ডি এম—"ইনি ডিভিশনাল কমিশনার।"

কমিশনার—"আপনি এক বৎসর বাহিরে ছিলেন। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জেল হইতে মুক্ত হইয়া আপনি আবার গ্রেপ্তার হইলেন কেন?"

উঃ—"মিঃ হক যে-কারণে নজরবন্দী হইয়াছেন, বোধ হয় সেই একই কারণে।"

প্রঃ—"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। এই এক বৎসর আপনি কি করিয়াছেন?"

উঃ—"মিঃ হক যাহা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা, ইত্যাদি।"

প্রঃ—"আপনি কবে প্রথম জেলে যান?"

উঃ—"চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে।"

প্রঃ—"জেলে আপনার কত বৎসর কাটিয়েছে?"

উঃ "পঁচিশ বৎসরের অধিক। তন্মধ্যে পাঞ্জাবে ছিলাম চারি বৎসর।"

প্রঃ "আপনি কি জেল-পালানোর চার্জে পড়িয়াছিলেন?"

উঃ "না।" আপনি কি করিয়া এইরূপ একটা—"

এ-ডি-এম ঃ "না, না। উনি ভুল সংবাদ পাইয়াছেন।"

কমিশনার ঃ "আপনি কি বিবাহিত?"

উঃ "না। তবে বিবাহ করিবার বাসনা আমার ছিল, আপনাদের অনেকের মতো স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারধর্ম পালন করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জেলে যাইতে যাইতে আর সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

কমিশনার ঃ "আপনি জেল ভালবাসেন।"

উঃ "জেল আপনিও ভালবাসেন না, আমিও ভালবাসি না, তবে আমি জানি দরকার হইলে কি করিয়া তাহাকে বরণ করিতে হয়।"

প্রশ্নোত্তর যখন এতখানি অগ্রসর হইয়াছে কমিশনার সঙ্গের লোকদের অনেককে সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং তারপর অনেক আলোচনা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিযোগ আছে কিছু আপনার?" বলিলাম, "বিস্তর, তবে আপনার কাছে আমি কোনও নালিশ করিতেছি না। নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে যে-সব নিয়ম-কানুন আছে সে-সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে এবং মৌখিক ও লিখিতভাবে গবর্নমেণ্ট এবং আই-জিকে তাহা জানানো হইয়াছে। আপনার কাছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। দেখি আমাদের রিপ্রেসেণ্টেশানের ফল কি হয়।........

সর্বোদয়ের বিচারে আজ কমিশনারের সঙ্গে যে-আলোচনা হইল সেটা কি দাঁড়ায়? সর্বোদয়ের বিচারে এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কি ভাবে বলা উচিত ছিল, জবাব দেওয়া উচিত ছিল। কোথায় ত্রুটি হইয়াছে?...........

১৪ই জুলাই, ১৯৫৪ (বরিশাল জেল)—ডিভিশনাল কমিশনারের হাবভাব রকমসকম দেখিয়া মনে পড়িতেছিল ব্রিটিশ আমলের কথা। পাকিস্তানী আমলে, বিশেষ করিয়া ভাষা আন্দোলনের সময়, বিভিন্ন জেলায় জেলের মধ্যে ছোট বড় যে-সব অফিসারদের (এমন কি আই জি প্রিজন, জেলমন্ত্রী প্রভৃতি) সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে (তাহাদের মধ্যে অবাঙ্গালী অফিসারও ছিলেন) সব সময় লক্ষ করিয়াছি আবহাওয়ার একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন। ব্রিটিশ আমলের বলদর্পী যুগে, যখন পর্যন্ত দেশী অফিসাররা ন্যাশনালিস্ট হয় নাই—অফিসারদের, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ অফিসারদের (with honourable exception) ব্যবহারে একটা sense of superiority, একটা domineering sprit, একটা ruling race feeling, এবং ভারতীয়দের প্রতি একটা অবজ্ঞা বেশ অনুভব করিতাম। সুতরাং ঝগড়া (বিবাদ) লাগিয়াই ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর জেলের আবহাওয়া আমূল বদলাইয়া যায়। ছোট বড় সব অফিসারই দেখি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সহানুভূতিসম্পন্ন।..............কিন্তু বহুদিন পরে সেদিন ডিভিশনাল কমিশনারের আচরণে ব্রিটিশ যুগের সেই অপ্রীতিকর লক্ষণগুলি ফুটিয়া উঠিতেছিল। খুব যে aggresively offensive ছিল তা নয়, তবে সেই sense of superiority, domineering ভাব, কয়েদীর প্রতি একটা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ করিতে-ছিলাম। অনেক অবাঙ্গালী অফিসারদের বাঙ্গালীদের প্রতি যে-অবজ্ঞা ইহার মধ্যে তাহাও থাকিতে পারে। অফিসারদের মধ্যে বহু দিন এই ভাব দেখি নাই। বাঙ্গালী কমিশনার (বা অন্য যে-কোনও অফিসার) হইলে সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হইত। আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন হইত। এই কারণে আলাপ-আলোচনাটা মোটেই ভাল লাগিল না। এ কি section 92-A শাসনের মেজাজ?......

......আজ বৈকালে বাগেরহাটের ছাত্রটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করিয়া কেরানী সম্পর্কে ব্যাপারটি সব বলিল। "সুপার" বলিলেন তদন্ত করা হইবে।

আজ গৌরনদী হইতে আর একজন মুসলমান ভদ্রলোক গ্রেফতার হইয়া আসিলেন। তাঁর কাছে বাইরের অবস্থা শুনিলাম।

১৭ই জুলাই, ১৯৪৫ (বরিশাল জেল)—..........আজ প্রাণকুমারবাবু, রুণু প্রভৃতি দেখা করিল। (ক্রমশ)


অলকার স্বপ্ন
ক্লাস বসবার আগেই সেদিন ক্লাস সেভেনের মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। অলকা নাকি স্বপ্ন দেখেছে ইন্দুলেখার সঙ্গে সেলিমের বিয়ে হয়ে গেল। সেলিম অর্থাৎ ইতিহাসের পাতায় সদ্য পড়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ। ইন্দু অসম্ভব চটে গেল। স্বপ্ন দেখার জন্যে নয়, ক্লাসে কথাটা রটনা করার জন্যে।
অবশ্য ইন্দুর বিষয়ে এ স্বপ্ন খুব বিচিত্র নয়। ও হোল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী জাতের মেয়ে। রান্নার ক্লাসে ওর উৎসাহের অন্ত থাকেনা। সবাই তাই ওকে 'গিন্নী' বলেই ডাকতো আর আড়ালে হাসতো।
DL. 453A-X52 BG.

এই স্কুল কলেজের আনন্দময় দিনগুলি ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবাই ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দুকে নিয়েই কথা—ইন্দুর জীবনে কিন্তু ইতিহাসের একটা স্থান রয়ে গেছে। ওর স্বামী বাংলার বাইরে কোন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

দূর প্রবাসে কত সন্ধ্যায় বসে গত জীবনের স্মৃতি ওর সামনে ভেসে যায়—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। আর ওর মেয়ে উর্মী যখন ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের পাতা খুলে পড়ে, তখন হঠাৎ ও হেসে ফেলে।

সেদিনের সেই গিন্নী ইন্দুলেখার সংসারে আজ তার কত কল্পনা সার্থক হয়েছে। সেদিনের খেলাঘরের গৃহিনী ইন্দুলেখার সংসার আজ আনন্দময়—কারণ তার সদাজাগ্রত কল্যানদৃষ্টি সংসারে সর্বদিকে প্রসারিত। পরিচ্ছন্ন ভাঁড়ার ঘরে মশলাধার আর টিনে রঙীন অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডাল আর মশলার নাম। ধোঁয়া ধুলো নেই রান্নাঘরে—বিভিন্ন দেশের সুন্দর গঠনের বাসনপত্রের সংগ্রহ। রান্নাঘরের পরিবেশে মন খুশী হয়ে উঠে—এখানেই তার কাজ আর অবসর।

ইন্দুর সংসার ছোট—স্বামী আর একমাত্র কন্যা উর্মী। উর্মীর জীবন গান বাজনা, লেখাপড়ায় পূর্ণ। তার কোন কৌতুহল নেই রান্নাবান্না সম্বন্ধে। মা কিন্তু এ নিয়ে ক্ষুন্ন হ'ন। তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কন্যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি।

তারপর আরো দিন কেটেছে। উর্মী কলেজের পড়া সত্ত শেষ করেছে—পড়াশুনায় তার অনুরাগ, গান বাজনায় তার আগ্রহ অপরিসীম। আর মা দুঃখ পান যে সাংসারিক বিষয়ে সে রয়ে গেছে তেমনি উদাসীন।

এমন মেয়েকেও সংসারের ডাকে সাড়া দিতে হয়—সানাইতে পূরবীর সুর বাজে, বর আসে। বাংলার এক সমৃদ্ধ পরিবারের সুসন্তান।

যে সংসার তাকে বরণ করল সেখানে সে দেখল দেশী ও বিদেশী জীবনধারায় ইঙ্গিত। আহারের বিষয়ে ও দেশীবিদেশী নানারকম রান্নায় তাদের পরিতৃপ্তি। এক আনন্দমুখর সুন্দর সংসার।

উর্মী বুদ্ধিমতী মেয়ে। উপলব্ধি করল, পরিজনদের সুখী করতে হলে যেমন গানবাজনা, পড়শুনোর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান আছে তেমনি সংসারকে উপেক্ষা করা চলেনা, জীবনের সে দিকটা তার অপরিচিতই রয়ে গেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে পড়ল তার সুগৃহিনী মায়ের কথা। কৌশলে সে একমাসের জন্যে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরের আঙিনায়। মা বুঝলেন এ অহেতুক নয়।

মা'র কাছে সে প্রকাশ করলনা সত্য কথাটি। তারপর সে দেখলো নতুন দৃষ্টি দিয়ে মা'র সাজানো সংসারটি। ভাঁড়ার ঘরে দেখলো, সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিনে সাজানো রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

মার কাছে সে জানলো যে 'ডালডার' উপাদানে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' আর 'ডি' আর সবচেয়ে ওর মজা লাগলো যে মিষ্টি, লুচী থেকে সুরু করে ভাজা, তরকারী, মাছের ঝাল, ঝোল, মাংসের বিভিন্ন প্রণালী সবই 'ডালডায়' রান্না করা যায়—শুধু তাই নয়, খেতেও মুখরোচক হয়। এ হিসাবে দামেও সস্তা আর পুষ্টির দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 'ডালডা' সহজে, সর্বদেশে পাওয়া যায় শুধু ওই খেজুর গাছ মার্কা হলদে টিন দেখে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

উর্মী মা'র কাছে 'ডালডার' মাধ্যমে কত রান্না করল—ওর কাছে তা নিত্য নতুন আবিষ্কারের মত। তার রস বৈচিত্র্যে সে নিজেই মুগ্ধ হোল।

শ্বশুরালয়ে যখন সে ফিরে গেল তার বিদ্যাবুদ্ধি আর বিশেষভাবে রান্নার সুখ্যাতি সবাই করতে লাগলেন।

# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু

### দ্বিতীয় খণ্ড

১

সুলতান সাহেব দরজার কাছে এসে বাইরের জুতো খুলে, ঘরে পরবার জন্য সাজিয়ে রাখা কালো মখমলের নরম চটিতে পা গলালেন, তারপর কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এগিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে। একটু দাঁড়ালেন, সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তাঁর ভারি চোখের পাতায় একটি প্রগাঢ় বেদনার আভা ছুঁয়ে গেল, ধনুকের মতো বাঁকা, ঈষৎ পুরু, ঈষৎ চাপা ঠোঁটে, এক-ফোঁটা হাসির কুয়াসা ছড়ালো। প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কেমন আছ?'

দু' হাত পিছিয়ে গিয়ে আরো শক্ত হয়ে, আর শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো সুলেখা। জবাব দিলো না। নিষ্প্রয়োজন। এই একই প্রশ্ন সে প্রত্যহ শুনে আসছে, আজ তিন-মাস যাবৎ। প্রথম প্রথম খুন চেপে যেতো, লাফিয়ে উঠে টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করতো, এখন সে ইচ্ছে ভোঁতা হয়ে গেছে। সেই রাত্রে, যেদিন প্রথম তাকে নিয়ে আসা হলো এখানে সেদিন তার জ্ঞান ছিলো না, কিন্তু তার পরের দিন এ ইচ্ছে কিছু অংশে সে সার্থক করেছিলো। কত কালের শখ তার এই লোকটিকে মুখোমুখি দেখবার, মুখোমুখি হবার। ঈশ্বর সে সাধ পূরণ করলেন বৈ কি। ভালো করেই পূরণ করলেন। হায়রে, কী ভাবেই না পূরণ করলেন। কী বিধিলিপি নিয়েই সংসারে এসেছিলো সে!

প্রথম সকালটা মনে আছে। তোমার দুঃখ তোমার, তাতে প্রকৃতির কী? শিশির ধোওয়া, রোদে ছাওয়া রোজকার মতো তেমনিই উজ্জ্বল সুন্দর সকাল ছিলো, তেমনিই হাসিখুশি। সারারাত পরে চোখ তাকিয়ে সেই সকাল দেখেও ফুঁপিয়ে উঠেছিলো সুলেখা। এ বাড়ি নয়, এ ঘর নয়, সুলেখা জানে না, কোন মহল সেটা, কোন মহলের উপযুক্ত ভেবে তখন তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই অজানা কক্ষে। একটা সময়ে তাকে সুলতানের ঘরে নিয়ে আসা হলো। বিশাল ঘর, মাঝখানে ফরাস তাকিয়ার এক হাত পুরু নরম গদিতে আলস্যে শিথিল অর্ধশায়িত সুলতান মুচকি হেসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন 'এসো, এসো। প্রিয়তমে! কাল রাত্তিরে এই অধীনের কুটিরে এসে কোনো কষ্ট হয়নি তো? ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?'

ঝড়ের বেগে ছুটে এসে সুলেখা তার মুখের উপর সজোরে লাথি মেরেছিলো। মুহূর্তের জন্য বিহ্বল সুলতানকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিলো, তারপরেই সুলতান বজ্রের মতো কঠিন হাতে চেপে ধরলেন তার কচুপাতার মতো শ্যামল কোমল নরম মেয়ে-হাত। হাড়গুলো যেন মড়মড় ক'রে উঠলো। কিন্তু তক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। চোখ থেকে সুলেখাও চোখ সরালো না। দুই শিকারীর মতো দু'জনের চোখ দু'জনের চোখের উপর বিঁধে রইলো অনেকক্ষণ। সুলতান আবার সাটিন জাজিমের, পালকের কুশানের নরম আরামে এলিয়ে কী জানি কেন সেই অপমান নিঃশব্দে হজম করলেন, আবার হাসলেন একটু, একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বোসো।'

'না।' সুলেখা তেমনি উদ্ধত, তার পলক তেমনি স্থির।

সোনার লতা আঁকা রূপোর পানদানি থেকে কয়েকটা ছোটো এলাচ মুখে দিলেন সুলতান সাহেব, আয়াস ক'রে বললেন, 'কেন?'

'ঘেন্না করে।'

'মুসলমান বলে?'

'না।'

'তবে।'

'নর্দমার পোকা বলে।'

'পোকা!' মখমলের মতো নরম গলা হাসিতে ভেঙে গেল—'আমি কে তা তুমি জানো পিয়ারী?'

'জানি জানি, হাজারবার জানি।' ঘন ঘন নিঃশ্বাসে লাল হয়ে উঠলো সুলেখার মুখ। 'তুমি একটা পিশাচ! একটা কুকুর—শৃগাল শকুনির চেয়ে ঘৃণ্য তুমি!'

'এতো রাগ! তা রাগলে তোমাকে ভালোই দেখায়।

লোকটার চোখ দু'টো খুবলে নিতে ইচ্ছে করলো সুলেখার। ভেতরে ভেতরে হাত দু'টো তার সাঁড়াসীর মতো বেঁকতে লাগলো।

সুলতান এলাচ চিবোচ্ছেন। কোলের মধ্যে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে দুমড়োতে দুমড়োতে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কিন্তু তুমি কি জানো এই মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে আমি যা খুশী তা-ই করতে পারি? ইচ্ছে করলে গর্ত খুঁড়ে পাথর চাপা দিতে পারি, আমার দু'টো বাঘের মতো হাউন্ড আছে তাদের দিয়ে খাওয়াতে পারি।'

'করো, করো, তাই করো তুমি। তোমার মুখের গ্রাস হবার চাইতে কুকুরে ছিঁড়ে খাওয়া অনেক অনেক ভালো।'

'সাহস ক'রে দাঁড়িয়ে মরতে পারবে?'

'পারবো না।'

'বেশ!' নরম পুরু হাতে আস্তে তালি দিলেন সুলতান সাহেব, যেন দরজা ফুঁড়ে ওপিঠ থেকে দু'টো লোক বেরিয়ে এলো, আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ ক'রে সে পিছু হটে দাঁড়ালো।

'বাল্টার আর মাল্টার।'

লোকটি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তার পর মুহূর্তেই দুই বিশাল বাঘের মতো দুই বিশাল কুকুর এসে হাজির হলো ঘরে। সুলতানকে ঘিরে আদর করলো তারা, চাটলো, ল্যাজ নাড়লো। সুলতান হাসলেন 'দেখেছো?'

'দেখেছি।'

'শুধু একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা। এদের আমি লোহার খাঁচায় অন্ধকার ঘরে বন্ধ ক'রে রাখি, কাঁচা মাংস খেতে দি। এরা বাঘ সিংহের চেয়ে ভয়ানক। গায়ে হাত দাও না, দ্যাখো না সাহসটা পরীক্ষা ক'রে।'

হঠাৎ দু'হাতে দুটো বৃক সমান কুকুরকে ঝাপটে ধরলো সুলেখা, উত্তেজিত গলায় বললো, 'খা, খা, খেয়ে ফেল আমাকে।'

কুকুর দুটো গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো। সুলতান গর্জে উঠে থামালেন তাদের। দুটো মোটা চেন দিয়ে বেঁধে লোকটি টেনে নিয়ে গেল। বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মতো এক মাথা চুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন সুলতান, মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এভাবে না। হিন্দু মেয়েদের এভাবে মরাটা মোটের উচিত হবে না। তাঁরা হলেন সব স্বর্গের দেবী, তাঁদের দেহ কি কুকুরের মুখে দিয়ে অপবিত্র করতে পারি?' চোখে মুখে একটা অদ্ভুত হাসি চিক চিক ক'রে উঠলো, 'পুড়ে মরতে পারো সতী সাধ্বী?' পাশের রৌপ্যাধার থেকে দেশলাই তুলে নিলেন, 'যদি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারি?'





থপ্ ক'রে হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নিয়েছিলো সুলেখা, চোখের পলকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো কোমরে গ'জে রাখা আঁচলের প্রান্ত। লাফিয়ে এসে সে আগুন নেবালেন সুলতান সাহেব, একটি চাপা ব্যঙ্গের হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'না, প্রেয়সী, না। এভাবেও নয়। এ মৃত্যু নয়। এর নাম তো আত্মহত্যা। আমি নিজে মারবো, নিজে।'

'মারো, মারো, এক্ষুণি আমাকে মেরে ফেলো। আমার আর সয় না।'

এরপরে সুলতান সাহেব একটি মোমবাতি ধরিয়ে টেনে আনলেন সুলেখার হাত, 'এই যে, এইরকম ক'রে পুড়াতে হবে তোমাকে, ধীরে ধীরে, তিলে তিলে। রাখো, হাত রাখো।'

হাত রাখলো সুলেখা। যেমন ক'রে সুলতান দেখিয়ে দিলেন ঠিক তেমনি উপুড় ক'রে, যেমন ক'রে প্রদীপের শিষে কাজল লতায় কাজল পাড়ে। আস্তে আস্তে সেই হাতের তেলোর ছোট একটি গোল জায়গা কালো হ'লো, ফ্যাকাশে হ'লো, নরম হ'লো, দগদগে হয়ে উঠলো কতক্ষণ পরে। সুলেখা তাকিয়ে আছে সেদিকে, নিবিষ্ট হয়ে দেখছে, দুই চোখে কৌতুক। কেবল ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে আর পিঠের শিরদাঁড়ায়। সুলতান অস্থির হয়ে নড়ে চড়ে উঠলেন, কী ভাবলেন, নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিলেন হাতটা, মোমবাতিটা ছ'ড়ে ফেলে দিলেন দূরে। তার দিঘির মতো কালো চোখ টলটল ক'রে উঠলো, দীর্ঘপল্লবের ছায়া ঘন হ'লো দাড়িকামানো টকটকে রং নীলচে গালের উপ'রে। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ উঁচু গলায় বললেন, 'নতুন হল ঘর।'

আবার দরজা ফ'ড়ে এগিয়ে এলো দুটো লোক, বিনীত গলায় বললো, 'সবুজ মহল?'

সুলতান চ'লে যেতে যেতে একবার চোখের কোণে তাকালেন।

তারপর লোক দু'টো তাকে সসম্মানে নিয়ে এলো এখানে, এই নতুন হল ঘরে, যার নাম সবুজ মহল। সেই থেকে এই তিন মাসে, সুলতান আর কোনোদিন এতোটুকু পরিহাস করেননি তাকে, এতোটুকু অসম্মান করেন নি। এমন কি, নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কখনো এসে দাঁড়ান নি এ ঘরে। প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে আসেন, বসে থাকেন, কখনো কথা বলেন, কখনো বলেন না, চুপচাপ কাটিয়ে দেন সময়টা। মাঝে মাঝে নিভন্ত সিগারে আগুনের ফুলকি তোলেন। সুলেখা ঘৃণায় তেমনি মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে রুদ্ধ আক্রোশে, কিন্তু কথার জবাব দেয় শান্ত গলায়। তার ভেতরকার সব রক্ত যেন জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে এই তিন মাসে।

যত্নের কিন্তু অভাব নেই এখানে। সুলতানের হুকুমে চারজন বাঁদী অহোরাত্র দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। চারবেলার নবাবী আহারের প্রস্থ তাকিয়ে দেখবার মতো। ওরা খেতে পীড়াপীড়ি করে। জবেদাবেসা আজকাল জোর করে, মায়ের মতো বোঝায়, সান্ত্বনা দেয়, হাত বুলিয়ে দেয় পিঠে। রুপোর থালা বাটি সূর্যের চেয়েও চোখ ঝলসানো, আহার্য পর্বত প্রমাণ। সুলেখা চুপ করে চেয়ে থাকে, খায় না, খেতে পারে না। গলা বুজে আসে। ওদিকে থরে থরে শাড়ি শায়া ব্লাউস সাজানো আছে আলমারীতে, নিত্য নতুন গয়না আসছে কেইস ভরে ভরে, কেবলি জঞ্জাল বাড়ছে। কার জন্যে? বুঝতে পারে না সুলেখা। শরীর থেকে মনকে বিমুক্ত করে সে বসে থাকে চুপচাপ। একদিন এর প্রতিশোধ আমি নেবো, নেবো, নেবো, মনে মনে এই শুধু তার মৃত্যুপণ।

'সুলেখা।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ জানালার বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে সিগার খেতে খেতে সম্বোধন করলেন সুলতান সাহেব।

'বলুন।' চমকে চোখ তুলে জবাব দিল সুলেখা।

'আজ তিনমাস তুমি এখানে আছো—'

'তিন মাস পাঁচদিন ন ঘণ্টা।'

'একেবারে মুখস্থ। বাঃ।'

'দোষ হয়েছে?'

'দোষ কেন, স্মরণশক্তির প্রশংসা করছিলাম।

'আপনার তো অপরিসীম ক্ষমতা, দেখুন না এই স্মরণশক্তিটুকুও নষ্ট করে দিতে পারেন কি না।'

'তাতে কি তুমি সুখী হবে?'

'হবো না।'

'কেন?'

'আমি ভুলে যেতে চাই, সব ভুলে যেতে চাই।'

আজ ব্যাকুল হয়েছে সুলেখা। তার স্বভাববিরুদ্ধভাবে আজ তার গলায় কান্নার সুর ভেসে আসছে। সুলতান তাকিয়ে রইলেন। নরম করে বললেন, 'কী ভুলে যেতে চাও।'

'সব। সব ভুলে যেতে চাই। আমার নাম আমার পরিচয় আমার—' দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে। তার নিচু করা মাথার দুপাশে দুই গোছা চুল এসে ছড়িয়ে পড়লো মুখে বুকে।

'সুলেখা' তাকে শান্ত হবার অবকাশ দিয়ে মৃদুগলায় আবার ডাকলেন সুলতান সাহেব।

'বলুন।' আবার মুখ তুললো সুলেখা।

'তুমি কি জানো, এই তিন মাসে এই দেশের উপর দিয়ে কতো বড়ো বড়ো ঢেউ গড়িয়ে গেল?'

'জানি।'

'এই দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে কতো রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, খবর রাখো তার?'

'অনুমান করতে পারি।'

'এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, মাত্র তিনদিনের আগুনে এই শহরে যতো লোক মরেছে, পুড়েছে, নষ্ট হয়েছে, যতো মেয়ে ধর্মহীন হয়েছে তাদের সংখ্যার অন্তর্গত তুমি নও।'

'আপনার অনেক দয়া।'

'নিশ্চয়ই দয়া।' সুলতানের বিশাল চোখের সাদা অংশ ঈষৎ লাল হলো, 'সে দয়ারই কি তুমি অপব্যবহার করছো না?'

'শাস্তি দিন।'

'শাস্তি! কী শাস্তি দেবো বলো তো?'

'গর্দান। জবরদস্তি। অন্ধকূপ। পাথর চাপা। চামড়া ছুলে নেয়া—আরো কতো কিছু আছে। আপনাদের আইনে তো অন্তহীন বিধান।'

'এর মধ্যে কোনটা তুমি পছন্দ করো।'

'ইতর বিশেষ আছে বলে মনে হয় না।'

'হয় না?'

'না।'

'আমার এখানে তোমার সবই সমান?'

'সব।'

'এতো ঘৃণা?'

'কতোটা আপনার কল্পনায় আসে?'

সুলতান চুপ করলেন। হাতের ফুলটা শুঁকলেন। নখে নখ ঘষলেন। বাইরে তাকালেন। অনেক পরে নিভন্ত চুরুটে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন, 'মানুষের বুকের তলায় যে হৃদয় নামক অতি অদ্ভুত একটি যন্ত্র বসানো আছে তা কি তুমি জানো সুলেখা?'

'হৃদয়।' সুলেখার সুসম্বদ্ধ সারি সারি দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, হা হা করে হেসে উঠলো জোরে।

গম্ভীর হয়ে সুলতান বললেন, 'একটু যদি সময় দাও, কয়েকটা কথা বলবো তোমাকে।'

'সব সময়ই তো আপনার সময় সুলতান সাহেব, আপনি যথেচ্ছাচার করুন না।'

'যথেচ্ছাচার করা আমার স্বভাব নয়।'

'নয়?'

'তার কোনো প্রমাণ আমি দিইনি।'

'দেন নি!' যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছোলো সুলেখার গলা।

'না। আর সেটা যে কতো সত্য তার প্রধান সাক্ষী তো তুমি নিজে।'

'কে জানে, এটাই হয় তো আপনার যথেচ্ছাচারের নতুন নমুনা।'

'নতুন নয়, পুরোনোও নয়, এটাই আমার স্বভাব।'

'ক্ষমা করুন, জানা ছিলো না।'

'অনেক কিছুই তোমার জানা ছিলো না। কিছু জেনেছো, আরো কিছু জানানো দরকার, তুমি একটু শান্ত হয়ে শুনলে বাধিত হবো।'

'বলুন।'

'প্রথম নম্বর হচ্ছে এ শহরে যতোগুলো দাঙ্গা এপর্যন্ত হয়েছে, তার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিলো না।'

একদিকের ভুরু তুলে চকিতে সুলতানের মুখটা দেখে নিল সুলেখা। বুঝতে পারলো না হাসবে না কাঁদবে।

'অবিশ্যি এটাকে তুমি আমার কৈফিয়ৎ বলে ভুল কোরো না, কেননা, কৈফিয়ৎ আমি দিচ্ছি না তোমাকে, দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, এ ব্যাপারে আমার উৎসাহের কোনো অভাব ছিলো না। হিন্দুদের আমি ঘৃণা করি, তাদের উপর আমার অসামান্য বিতৃষ্ণা।'

'চমৎকার!'

'প্রথম যেবার মারামারির সূত্রপাত হলো আমার আব্বাজান তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি তখন আমাকে ডেকে বললেন, আমি বেঁচে থাকতে আমার প্রজারা যাতে এই অন্যায় না করতে পারে, সেটা তুমি দেখবে। আমি বললুম, কাউকে বাধাও দেবো না উত্তেজিতও করবো না।' আব্বাজান রাগ করে বললেন তার মানে তুমি চাও এটা হোক। জবাব দিইনি, কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম, হোক। আসল কথা, মনে করেছিলাম তোমাদের কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার।'

'শুনে সুখী হলুম।'

'এ খবরটা এজন্যেই তোমাকে দিলাম শেষপর্যন্ত এই বিরোধটাকে আমি থামাতেই চেষ্টা করেছিলাম। বিশেষত পাকিস্তান হয়ে যাবার পর পাকিস্তানের হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করাটা রীতিমতো কলঙ্ক। মারামারি যেখানে একপক্ষের কর্তৃত্বে সেখানে সেই হীনতায় আমার কোনো সায় নেই, বরং পারলে উল্টোপক্ষে যোগ দিতাম।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'জানো বোধহয় আমার নানাসাহেব নওয়াব আমির আলি সাহেবের সঙ্গে তোমার ঠাকুর্দা ভুবন তালুকদারের এক সময়ে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিলো।'

'জানি।'

'আমার বাবার সঙ্গেও তোমার বাবার মন্দ পরিচয় ছিলো না। আর আমি—'

'আপনি! আপনি তো আমাদের পরম বন্ধু।' তির্যক দৃষ্টিতে সুলতানের দিকে তাকালো সুলেখা, 'তা নৈলে কি এই উপকার কেউ করে?'

'নেহাৎ মিথ্যে কী।' সুলতান একদিকের চোখটা একটু ছোটো করলেন, 'বন্ধু না হলে নিজের সমাজে নিজের মাথা বন্ধক রেখে কি আর তোমার মাকে আর ভাইদের বোরখা পরিয়ে এরোড্রমে পৌঁছে দি?'

'মানে?'

'বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই বোঝো।'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সুলেখা। এই সুদীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম সে তার মা আর ভাইয়েদের খবর শুনলো। এই প্রথম তার নিচু করা মুখের শুকনো চোখ থেকে সহসা কয়েক ফোঁটা তপ্ত জল ঝরে পড়লো গালিচার উপর।

(ক্রমশ)



# জলপোকা

স্মরজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**ও খানটায়** একটা কল হয়েছে। এই কলটাই এ বাড়ির সম্পদ। এ বাড়ির এ মহলের চার পাঁচ ঘর ভাড়াটের প্রাণ ফুটেছে। শান বাঁধান শ্যাওলাধরা জায়গাটা; উঠানের ওপরই সোজা হয়ে কলের পাইপটা রয়েছে— ঠিক বেলার রান্নাঘরের দেয়াল ফুঁড়েই। ওরই পাশে বেলার ঘর। এক চিলতে রোয়াকে একটা ইটের গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা রান্নাঘর। ঘরের পেছনে একটা পেয়ারাগাছ আছে পুরুষালী ঢং-এ দাঁড়িয়ে, পুরুষের মত ডালপালা শক্ত। একটা পাতিলেবুর গাছ, পেয়ারা গাছের পাশেই নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে। বেলার চোখে পড়েনি কোনদিন, যে তারই ঘরের পেছনে আওতা জায়গাটায় এমন দুটি গাছ আছে, কখন তার ফুল ফোটে, কখন ফল ধরে, পাকে, পাখিরা জটলা করে ওর ডালে বসে বসে।

বেলার ঘরের পাশ দিয়েই কলটা, অথচ কতক্ষণ সে পারে এই কলটা ব্যবহার করতে।

ও মহলের ভাড়াটে, তাদের ছেলেপুলেরা এখানে এসে বিরক্ত করে কলটা খুলে। যতক্ষণ জল থাকে ততক্ষণ এর ওপর একটা দৌরাত্ম্য চলে। খাবার জলটা বাদ দিয়ে বাকি যে সব জলের খরচ—বিশেষ করে কাপড়কাচা—বাসনমাজা—চান করা; সবই এর ওপর নির্ভর করতে হয়। ছেলেরা জল মাখে, পেটে চাপড়ায়, মাথায় দু হাত দিয়ে চাপড়ায়। রজনী এ বাড়িটা কিনেছে। ভাঙা বাড়ি কিনেছিল। তারপর আস্তে আস্তে ফাটল বোজাচ্ছে এর। আগে ঘরের কপাট, খিল, রংএর কাজ, পইঠে, তারপর রোয়াক, রান্নাঘরের দেয়াল তোলা, এসব কাজ আগে দেখতে হয়েছে রজনীকে। তারপর হঠাৎ পাইপ নিয়ে কল নিয়ে হাজির হল। মাটি খুঁড়ে পাইপ টেনে আনল রাস্তার নীচে মোটা পাইপ থেকে। সুখ সুবিধা আজকাল একটু আধটু করে হচ্ছে। এবার নাকি আবার লাইট আসবে। অনিল বলেছে লাইট এলেই ও নেবে। বেলার ঘরের ভেতর ইলেকট্রিক লাইট জ্বলবে। একের পর এক আশা নিয়ে বাঁচছে ওরা।

কলটা প্রাণ ফিরে দিয়েছে বাড়িটার। এতদিন ত কত জলকষ্ট ছিল; অনিল অফিস থেকে এসে নিত্য জল তুলে এনেছে। সেই জলে অন্ধকারে বসে বসে বেলা চান করেছে। জল তোলার লোকের একটা খরচ আছে ত? তা প্রায় সাতটাকা আটটাকা। এ জয়গাটাই ভয়ানক জলকষ্ট। বোশেখ জ্যোষ্টি মাস বিশেষ করে। তাছাড়া গরম-কালের দিনে তেতেপুড়ে রান্নাবান্না সারতে কত কষ্ট হয় বেলার; দেহটা টাস টাস করে ওঠে—তখন জল না হলে, চান না করলে জীবন জুড়োয়না।

তাছাড়া বেলার রূপ আছে বৈকি! বেলার রূপ শুধু এ বাড়ির নয়, এ পাড়ারও একটা আকর্ষণ। তাই ও সব সময় এই রূপের যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। যন্ত্রণাটা বেলার জীবনে একটা আনন্দ। অফিসের সময়টুকু বেলাকে একটু চুপচাপ থাকতে হয়। তারপর অনিল অফিস চলে গেলে যখন কাজ হালকা হয় বেলা তখন বাইরের দরজা ফাঁক করে বাসি চুলের ফিতে খোলে, ঝুমকো কাঁটা খোলে, ইস্কুল যাওয়া মিসট্রেস আর ছেলেগুলো দেখতে দেখতে ভুলে যায় সে চান করতে। এই পুরানো নীলরতন দত্ত লেনের প্রবাহ দেখতে দেখতে বেলা ভাবে বেশ তো আছে ওরা।

রাস্তার লোক চেয়ে চেয়ে দেখে ওর পাতলা ঠোঁট, গোলাপী রং, গলার কাছে চামড়ার দুটো স্পষ্ট ভাঁজ, একরাশ কালো চুল, নরম নরম দুটি চোখের তারা হাতে একগোছা কাঁচের চুড়ি। নিখুঁত সুন্দর কি সেকথা ভাববার অবকাশ আর কার আছে—সেটা কেউ বেলাকে বলে যায় না। পায়ের পেটি—পায়ের গড়ন মোটা, পায়ে একটু কালো কালো লোম আছে। ওটা কি খারাপ লক্ষণ! না। খারাপ আবার কি! ফরসা বলেই বেশী করে লোমগুলি চোখে পড়ে। অনিল কিছু বলেনি ত এরজন্যে!

চান করার সময়ই বেলাকে পায়ের গোছ মাজতে হয়। ওই সময়টুকুতেই। তাও সময় হত না আগে অত করার। এতগুলো লোকজনের বাড়িতে সে ফুরসত হত না। অমনি সোজা জল ঢেলে—কাপড় জামার ওপরই—অনিলের তোলা জলে চান করতে হত। সুতরাং ওইটুকু বাঁচাবার জন্যে বেলা অত ভাল করে গা হাত পা মাজতও না, ইনিয়ে বিনিয়ে চানও করত না কখনও। ঝট পট করে জল ঢেলে দিয়ে ঘরে সরে পড়ত গামছা গায়ে দিয়ে।

তবু যাহোক আজকাল কল হয়েছে। বেলা ইচ্ছে করেই দেরি করে, যেমন হোক চান করতে পারবে। প্রথম প্রথম বালতি নিয়ে পাঁচবাড়ির লোকের ভিড় পড়ে গিয়েছিল। কী জল! কী তোড় জলের! সারা বাড়িটায় একটা মাতন লেগেছে যেন। আর বেলা সারাটা সময় ও কেবল ভাবতে আরম্ভ করল—কতদূর থেকেই না এ জল আসছে! শিবপুকুরের কাছে বড় জলের ট্যাংক হয়েছে —সিনেমা যাবার সময় বেলা দেখে এসেছে। সেই জায়গা থেকেই এই জল এসে এত-গুলো লোকের জলকষ্ট নিবারণ করছে।

ও বাড়ির মেয়েটা টপ করে দু বালতি জল নিয়ে চলে গেল। আবার ছুটে গিয়ে একটা হাতা মাজতে মাজতে এগিয়ে এল। 'দিনলা মাসিমা—মিনিমাসিমা এটা ধুয়ে নি —ডাল উতলে পড়ল—বাবার তাড়াতাড়ি—।'

ঝিঙেফুল রংএর শাড়িপরা নীলুর মা কলতলার ভিড়টা দেখে গেল। জলপড়া ডবডবে জায়গায় ওর পা ভিজে গিয়ে সেই জল-পায়ের ছাপ পড়ল দোরে দালানে।

রেখা ছবি ওদিকটায় তৈরী হচ্ছে; পৈঠেয় বসে বসে চুলের ফিতে খুলছে। এবার ওরাও আসবে, চান করবে।

এরি মধ্যে চারবার ছোট বালতি ভরে জল নিয়ে গেছে কানা বুড়ি। ও দিনমান জল তুলে তুলে বড় বালতি দুটো ভর্তি করে। তাই করতে করতেই অফিসের বেলা হয়। সুশান্ত রেবতী অনিল ওরা সবাই চান করতে এসে পড়ে। এটুকু সময়েই হাঁপিয়ে ওঠে বেলা।

বুড়িটা দোরে বসে থাকে রুগীর মত। আগেকার মালমশলা শরীরে আছে বলেই ঠায় বসে থাকতে চায় না। কেঁপে কেঁপে যায় কেবল জলের সময়, জলের বালতি ভর্তি করে। একটু খরচ হলেই আবার হাত পুরে দেখে—জল কতটুকু কমেছে, আবার ভর্তি করে। জল না হলে এক মুহূর্ত বাঁচবে না ও। ওটাই বুড়ির রোগ। জলের সঙ্গে ওর যেন সম্বন্ধ পাতানো রয়েছে।

আবার এসে পড়ল কলতলায় বুড়ি। দাঁড়িয়ে আছে কাতরভাবে কলটার ধারে কটা চোখ নিয়ে। কে যেন কলে আছে, সেটা বুঝতে পারছে; চলে গেলেই এসে পাতবে বালতিটা।

জলের বড় ট্যাংকটা মনে পড়ছে বেলার। ওঃ কতদূর থেকেই না জলটা আসছে মাটির তলা দিয়ে পাইপ বেয়ে।

জলের তোড়ে চাতালটা ভেঙে গেছে। ছোটখাট ইটের নুড়ি পড়ে রয়েছে। বেলা জলের দিকে চেয়ে চেয়ে এক এক সময় হাসে—কী চমৎকার না জলটা।

নিজেদের কল হওয়া সত্ত্বেও বেলা উপযুক্তভাবে কলটা ভোগ করতে পারে না। বাড়িতে আরো পাঁচটা ভাড়াটে আছে। আর সবচেয়ে বেলার কান্না আসে এই বুড়িকে দেখলে। আজকাল আরো বাড়িয়ে তুলেছে। হাতড়ে হাতড়ে জলের বালতি নিয়ে হাজির হয় ও। নিয়াওড়ে বুড়ি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না ওর বালতি বসাবে চাতালটায়। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলার অসোয়াস্তি লাগে।

তারপর বেলা বিরক্ত হয়েই সরিয়ে দেয় নিজের সাদা গামছা, টুথ ব্রাশ, বাসন্তী রংএর সায়া। সাবানের কেসটা থেকে জল ফেলে সাবানটা পরিষ্কার করে রাখে।

ততক্ষণে বুড়ি বালতি বসিয়ে দিয়েছে কলে, আর চোখ ডুবিয়ে বসে আছে; কখন ভর্তি হলেই আন্দাজ পাবে। তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। একটু জল কমবার জো নেই বুড়ির কাছে। অমনি এসে জল তুলে রাখাও বেলা পছন্দ করে না। জল ধরে রাখার অভ্যাস নেই বেলার। যেখানে জল পড়ছে ঝির ঝির ঝির ঝির করে, সেখানে আস্তে আস্তে ঝিরঝিরিয়ে হয়ে চান করার একটা শান্তি তো আছেই। অন্তত বেলা ত এই বোঝে।

ছোট বালতিটা নিয়ে মেজি দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ দিয়ে চাটে বালতিটা। কার বালতিটা কলে যেন ভর্তি হচ্ছে। জল উপচে গড়িয়ে পড়তেই মেজি, ফাজিল মেয়ের মতন চেঁচিয়ে উঠল, 'আভাদি আভাদি, আপনার বালতি আপনাকে ডাকছে'।

তাই এই ভরদুপুরে খুট খুট করে কাজ সারে বেলা। বাড়ির লোকজন শুয়ে পড়ে যখন, তখনই বেলা এই এত লোকের মেলার বাড়ি—এত লোকজন ভুলে যেতে পারে। এইটুকু সময়ের জন্যে ভুলে যেতে পারে। শুদ্ধ হয়ে একজনের উদ্দেশ্যে ধ্যান করতে পারে ও। উঠোনের মধ্যে সবচেয়ে যেটা ঘুপসি অন্ধকার জায়গা সেখান দিয়েই এই পাইপটা উঁচু হয়ে আছে। কী চমৎকার জায়গাটা আবিষ্কার হয়েছে। তলায় ইট নুড়ি পাথর শ্যাওলা জমা কতক জায়গায়। বিশেষ করে এটি ঠিক কলতলা নয়, ছাওয়া নেই, ঘেরা নেই কিছু; শুধু একটা কল—ভাঙা-চোরা ঘুপসি জায়গাটায়। এ-জন্যেই যখন তখন চান করতে পারে না বেলা। সবাই বেরিয়ে গেলে, ঘরে ঢুকে পড়লে, এখানে নীরবতা নামলে বেলা আসে। এই দুপুরের ঠাণ্ডা সময়টির জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাকে। এমন সময়ে বাড়ির যে কেউ খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেই বেলাকে দেখতে পাবে কলতলায়। এই সময়টুকুর জন্যেই ও আলাদা হয়ে যায়। মনের নিশ্চিন্তে অনেক কথা চিন্তায় ভারী হয়ে ওঠে। দুপুরের দিকে এই যে জলটা পড়ে, শ্যাওলাধরা জায়গাটায় যে জল পড়ে ছপ ছপ ঝর ঝর করে—তাতে একটা আলাদা মায়া, একটা মাধুর্য আছে। এ জলটা ঠিক শরীর ধোয়া মোছা গোছের নয়; শান্ত ঝিমোনো দুপুরের জল—পাতিলেবুর রসের মতন। এ বাড়িতে যখন নীরবতা নামে, তখনই বেলা যত্নসহ পরিষ্কার করে চান করবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। বালতিটা বসিয়ে এক বালতি জল ধরে রাখে। কি একটা তেল মাখে। এমন সময় ঘরের দাওয়ার কার্ণিশের পেয়ারাগাছ থেকে গোটাকয়েক চড়ুইপাখি নেমে আসে উঠোনে। উঠোনের ওপর দ্বিপ্রহরের রোদ নাচানাচি করে। পেয়ারাগাছের ছায়া লোটে অ্যাসবেস্ট্যাসের চালের ওপর। এমন সময় বেলার কাজ সারা না হলেও এটাই তার নিজের দিকে তাকাবার সময়। শরীরের দিকে, পায়ের গোড়ালি, নখ, সব কিছুর দিকে তাকাবার সময় এটা। নড়বড়ে দরজায় কাঠের ছিটকিনিটা এঁটে দিয়ে আস্তে আস্তে কলতলায় পা-টা মেলে দেয়। প্রথমে পা, তারপরে উরু, হাতের কব্জি, ঘাড়—শেষে কোমরটা জল ঢালিয়ে ভিজিয়ে নেয়। তারপর সমস্ত দেহ জলে ভিজিয়ে নেয় এই শান্ত নিঝুম পাতিলেবুর রসের মত জলটায়। গা হাত পা হাঁটু জল লেগে সব চিকে দিয়ে শির শির করে ওঠে; শুকনো ছিল—তাই ভিজে যেতে মায়া লাগে।

একদিন জল আর এল না। রেবতী অনিল দণ্ডীন এবং বাইরের টিউবওয়েলে চান করে

এল। সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করে উঠল। কলতলাটাকে অত ঝকঝকে আর অত শুকনো কল্পনা করতে পারেনি বেলা। কেবল দুপুরে জল আসবার আগে জায়গাটা ওইরকম থাকত।

সামনের দরজাটা খুলে রোয়াকে বেরিয়ে এল বেলা। সামনের উঠোন পেরিয়ে সরু এক ফালি পৈঠের ধারে চোখে ছানি-পড়া বুড়ি ঝিমোচ্ছে।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বুড়ি ডাকল, 'নাতবৌ, ওলো নাতবৌ—সুন্দরী হলব নাকি তবে সাড়া দিবি।'

বেলার ওর সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছা থাকে না বটে, আবার কিন্তু এক এক সময় ওর কথাগুলোয় বড় রস লাগে। বেলা বলল, 'কেন, বলছ না ঠাকুমা কি ব্যাপার।' বেলা ঘাম মুছলো মুখের, পরিষ্কারভাবে চাইল।

'জল এল না, পোড়া কলে কি হল গো! অত যে জল আজকে সব শুষে নিলে কে গা।' বুড়ি বলল চোখ বুজে থেকে।

'কলঅলার যে বিয়ে ঠাকুমা—বিয়ের ঝামেলা পড়েছে জানেন তো'?

বুড়ি চোখ বুজে ফোকলা মুখে হাসতে হাসতে বলল, 'কে বললে তোকে বিয়ে? তোকে বুঝি বলে গেছে, দুপুরবেলা তুই যখন চান করিস ওই পাইপটা দিয়ে চুপি চুপি?'

বেলা চুপ করে থাকে। রান্নাঘরটায় গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। আবার কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল। দোরে দাঁড়িয়েই বলল, 'বিয়ে বলছি ঠাকুমা সত্যি বিয়ে।' গলির মোড়ে বাসের ঘরঘরে নামল এসময়। বেলা বলে উঠল, 'কলঅলারও আজকে বিয়ে।'

একটু বেলাতেই জল আজ যে এল, অনেকক্ষণ ধরে সেই জল রয়ে গেল। দুপুরে যে সময়ে বেলা চান করে, তার অর্ধেকটা পর্যন্ত হয়েই জল চলে গেল। রাগে গজ গজ করতে করতে বেলা চলে এলো। চুল আঁচড়াল, পাউডার মেখে, ব্লাউজ পরে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুলো বিকেল না-হওয়া পর্যন্ত।

উঠোনের সবচেয়ে অন্ধকার ঘুপসি জায়গায় কলটা দেয়াল ফুঁড়ে যেখানে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে রেগে উঠছিল আজ বেলা।

আশ্চর্য, তার পরের দিনও ওইরকম দেরী করে জল এল। অনিল রেবতী যতীন এ বাড়ির অফিসের লোক, ওরা বাইরের টিউবওয়েলে চান করে এল। মুখে বড় বড় কথা বলল, 'রিপোর্ট করব শালার নামে—শালা কলঅলার চাকরি নষ্ট করে তবে অন্য কথা।' তারপর অফিস বেরোতে আর কিছু নেই। কাকস্য পরিবেদনা। বেলার রাগ জমা হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে।

বুড়ি দোরে বাটি হাতে বসে থাকে। রোদ গায়ে পড়ছে, মুখে পড়ছে। জলের শব্দ পাচ্ছে না। এতগুলো জাঙাটের মুখে হাতচাপা দিয়ে জল আর এল না। কান্না পাচ্ছে ওই জায়গাটা দেখলে। শুকনো কল-তলা। নুড়ি ইট চাতাল যেন খাঁ খাঁ করছে।

'নাতবৌ, তোর জল এলুনি'? বুড়ি বলল।

'আমার জল'হু—জল শুধু বুঝি আমার একার; আপনার নয়? আপনিও তো জল-পাগলা লোক—বসুন!'

বুড়ি চোখ বুজে কথা কয়। 'জল আমার না হলে চলে না—সবাই বলে দেখিস তো! তবুও চাই জল। হাত পা নিশপিস করে জল না হলে, জল চাই-ই।'

কনকের মা এসে চলে গেল, 'জল আসেনি এখনও। কি আক্কেল গো লোকটার।'

বেলা বলল, 'লোকটার বিয়ে গেছে পরশু—কালও দেরী করে জল এসেছে—আজকে আবার ফুলশয্যা তাই আজও মনে নেই ওর কল খোলার। এবার হয়ত ভুলেই যাবে চাকরি করবার কথা।' একটু গম্ভীর হয়ে আবার বলল, 'দায়িত্ব জ্ঞান নেই, এরা কি করে মানুষ বলে পরিচয় দেয়। রিপোর্ট করা উচিত এতগুলো লোক এই গরমে কষ্ট পাচ্ছে। ছিঃ।' বেলা ঘাম মুছলো মুখের।

পরের দিন একটু জল এসেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। বেলারও চান করা হল না। বুড়িটা বলল, 'নাতবৌ, খবর পেয়েছিস—লোকটা ঠিকমত জল দেয় না কেন? এমন কাজে ঢিলে মারছে কেন?'

বেলা আবার হাসল। বলল, 'আজকে ফুলশয্যা তাই—বললুম বিয়ে হয়ে গেছে লোকটার; এখন কিছুদিন এইরকম চলবে।'

বুড়ি হাসল মুখ টিপে টিপে।

বেলার আর চান করা হল না। অনিল সেদিন গিয়েছিল লোকটার কাছে। লোকটা নাকি ওখানে ছিল না। একটু বাইরে বেরিয়ে গেছল—খানিক পরে ফিরে এসে অনিলকে খুব খাতির করেছে।

'......কল দেখতে এয়েছেন, আসুন সব বুঝিয়ে দি'—লোকটা হেসে হেসে বলেই দরজাটা খুলল। পোড়া তেলের গন্ধ, মেসিনের একটা অট্টহাসির শব্দে মিশে গেল ওরা। দাঁড়িয়ে রইল অনিল। তারপর লোকটা সুইচটা দেখিয়ে বলল,—'স্টার্টার সুইচ বিউক্ত হয় তবে সেরে ফেলি তার দিয়ে—

নিজেই করি। তাতে বড় জোর পনের কুড়ি মিনিট টাইম লাগে। এটা আমার নিজের হাতে কিনা! কিংবা মেনের যদি গণ্ডগোল কিছু হয়, তাও সারতে কি এমন টাইম লাগে হেঁঃ হেঁঃ, কিন্তু সাপ্লাই যদি বন্ধ হয় আমার হাত নয়—সাপ্লাই বন্ধ হলে আমায় দোষারোপ করবেন 'না।' হাসতে থাকে কলঅলা লোকটা। বড় মেসিনটার সামনে দিয়ে ওদিকে চলে গিয়ে রেঞ্চ, স্ক্রু-ড্রাইভার, একটু তামার তার এনে এদিকে রাখে।......

কথাগুলো কানে নেয়নি বেলা। সাপ্লাই বন্ধ হওয়া আবার কি? সাপ্লাই ফেল করেছে—তাই জল আসছে না। ঠাকুমাকে বোঝাল, 'ওসব কিছু নয় ঠাকুমা—আসলে হল নতুন বৌ—সে-ই বেঁধে রেখেছে তাই।'

বুড়ি আবার হাসল ওপাশে মুখ ফিরিয়ে।

অনিল রেবতী সুশান্ত ওরা ঠিক অফিসে বেরিয়ে গেলেই তারপর দুপুরের দিকটায় জল আসছে আজ কদিন। কী বেহায়া জলটা! আর কী বেহায়া লোকটা! —ভাবল বেলা। মেয়েদের ওপর ওর এত টান। মানুষগুলো আধচান করে এল টিউবওয়েলে আর ঠিক বেলা যখন সাবান-কেস্ নিয়ে, চুল খুলে পিঠে ছড়িয়ে হাজির হয়েছে—তারপরই আরম্ভ হয়েছে জলটা। খিল খিল করে হাসল বেলা উঠোনে দাঁড়িয়ে। হাসিটা চাপা থেকে আবার কেঁপে কেঁপে উঠল—সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে কাঁপিয়ে কোমর পেট দুলে দুলে উঠল বেলার। ক্রমশ গুমরে গুমরে উঠল। এমন একটা হাসিকে খুব সহজেই হজম করা যায় না। শরীরের নিবিড় অনুভূতিতে হাসিটা হঠাৎ সুড়সুড়ি লেগে, ইলেক-ট্রিকের শক্ খাওয়া তারগুলের মতন নড়তে লাগল। অনিলের কাছে শুতে গিয়ে এক একবার যে হাসিটা উঠত যে কারণে—এটারও ঠিক তেমনি একটা। বেলা ভাবল, ঠাকুমা বোধহয় আবার শুনতে পারে। নাঃ বুড়ি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ও সব বিষয়ে অমন কান দেয় না।

কিলবিল সিলসিল করে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে জলটা। জলটার গতি দেখে সত্যিই বেহায়া বলতে ইচ্ছে করে। কলঅলা লোকটা হয়ত এতক্ষণ বসে বসে ভাবছে—কবে কেমন করে কল বন্ধ করে তার শ্বশুরবাড়ি যাবে। নিশ্চয় শনিবারে জলটা বন্ধ থাকবে, রবিবারের সকালের দিকটায়ও বন্ধ থাকবে—তারপর আবার এসে পড়বে। নানারকম ভাবল বেলা। বেলার সারা শরীর আজ যেন কেমন করছে। অনেক বেলা পর্যন্ত চান করল না বেলা। রোদ্দুরটা ফুলঝুরি পোড়ার মত গোটা উঠোনে ছড়িয়ে আছে। চড়ুইপাখিগুলো অ্যাস্বেসটাস চালের ওপর লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। পেয়ারাগাছের কাছে আছে দুটো পাখি। একটা রঙিন পাখি ঠোঁট উঁচু করে বসে আছে। চালের পাশে একটা কাঠের লম্বা জায়গায় কাকটা পরম নির্ভর ও নিশ্চিন্ত মন নিয়ে বসে আছে। উলঙ্গ কোন দেহের মতন এ দুপুর। এত ভরসা পায় বেলা এই সময়টায়। উঠোনে আর কারো সাড়া নেই—একমাত্র বেলা ছাড়া। আর উঠোনের সবচেয়ে অন্ধকার ঘুপসি জায়গায় যেখানে কলটা নুড়ি ইট চাতালের ওপর মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সেখানে কলটা সাঁ-সাঁ শব্দ করে তার আসার খবরটা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। কানে কানে কথা বলছে যেন। বেলাই জানতে পারছে শুধু। কাঠের নড়বড়ে দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়ে বেলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাটিতে থাথু ফেলল। সেইদিকে চেয়ে, তাঁর অন্য কোথাও মন রেখে কত কি ভাবল বেলা। তারপর হঠাৎ মনে হল কত [illegible] আবোল তাবোল সুরকির রং [illegible] কল-তলাটায় একটা গ্রামোফোন মেসিন এনে কে বাজাচ্ছে যেন। পেয়ারাগাছটা হঠাৎ বড় হয়ে ছাওয়া করে দিচ্ছে, তারপর এই পাশাপাশি ঘরগুলো একেকটাকে নড়বড়ে হয়ে গুটিয়ে গিয়ে পায়রার ছোট ছোট খুপরি হয়ে যাচ্ছে। ঘুরছে দিকচক্রবাল, ঘুরছে গাছপালা বাড়িঘর। আকাশটা একটা সীসের চাদর হয়ে মাথার কাছে লুটোপুটি করছে (রংটা সীসে সীসে দেখাচ্ছে)। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে হা—হা করে, জ্যৈষ্ঠের দুপুরের তাত-লাগা কুকুরের জিহ্বার মত। শরীরের সমস্ত রক্তটা যেন গোল হয়ে ঘুরছে। মাথার এক একটা পাশ এক এক সময় ভয়ানক ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, অর্থাৎ সেখানে হয়ত রক্ত নেই—নেমে যাচ্ছে। মনে হল, একগাদা ছেলেপুলের মা হয়ে গেছে বেলা, তার পাঁচগ্রামের বাড়ির রান্নাশালায় বসে আছে। আবার মনে হল, আলতাপরা ও-বাড়ির একটা বৌকে, যাকে একবারমাত্র দেখেছে বেলা। কিংবা মনে পড়ল গিল্টি-সোনার গয়না পরা সেই লাল বাড়ির মেয়ে-

গুলো, বউটা। গা ঘিন ঘিন করল মনে পড়তেই। চিন্তাটা নিজের করে নিজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেলা যেন শিথিল করে দিয়েছে, তার মনের সুতো। একটা সজনে গাছকে বেলা ওর বাবা বা মা কল্পনা করল। ওর পাতলা পাতাগুলো বেলার অসুস্থ বাবার মিয়োনো হাসির মত। বাবা বাবা বলে চেঁচিয়ে উঠবে যেন বেলা—গলাটা রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল। কবে কোথায় ট্রেনে যেতে যেতে একটা বাড়ি দেখেছিল—সেই বাড়িটা ঝড়ে পড়ে যাওয়া, সামনে শানবাঁধান পুকুর ছিল—এবার সেটা মনে পড়ল। আর বেলার মনে হল সেই পুকুরটা সিমেণ্ট দিয়ে পিচ দিয়ে কে যেন বুজিয়ে দিচ্ছে। এ ছাড়া রুবুদের যে গিন্নিটা দিনরাত সুরমা টেনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, তাকে এইমাত্র বেলা অসহায় হয়ে দেখতে পেল, আর ভাবল, ওর মুখের শক্ত জায়গা দিয়ে গোঁফ বেরোচ্ছে। তাছাড়া নিজের গায়ের জামাটা কত মোটা হতে পারে—সেটা ভেবে কেমন যেন হয়ে উঠল সারা শরীর বেলার। একটা কাটারির মত মোটা হয়ে গেছে জামাটা। ব্লাউসের তলায় শরীরটা ঝিমঝিম সিরসির করে উঠল। পা—কব্জি—পায়ের পেটি সব ঝনঝন করে উঠল। কোথা থেকে যেন গুলিয়ে কি হয়ে গেল বেলার। শুধু একবার মনে হল বেলার—এ কী হল তার? আর কেবল মনে পড়ছে—পায়ের তলার মাটিটা কেঁপে কেঁপে চোখের অনেক কাছে উঠে এল বেলার।......

অনেক পরে চোখ খুলল যখন বেলা তখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। দেখলো ঠাকুমা শুধু পাশে বসে বাতাস করছে হাত পাখা দিয়ে। মাথায় জল ঢালা শেষ হয়েছে। সারা শরীরটায় কাপড় চোপড় এদিক ওদিক হয়ে গেছে। বুড়ি জপ করছে মাথার কাছে, মুখে কি বিড় বিড় করে বকছে যেন। শিব শিব।

শিব শিব বলছে বুড়ি। ঠিক রান্না করার সময় হাওয়ার দাপটে লম্ফ যাতে নিভে না যায় তার জন্য যেমন শিব শিব করতো—এও তাই।

তারপর হাতটা বুলাল দেহে বুড়ি—'নাতবৌ জাগলি নাতবৌ! ছোঁড়াটাও এতক্ষণ এসে পড়ে—এমন দেরি করে কেনরে বাবা! পরের খুন নিয়ে বসে আছি।'

হাত নাড়তে, কথা কইতেই বুঝতে পারল বুড়ি—বেলা জেগেছে। 'উঠলি নাতবৌ, উঠলি—কি হয়েছিল গা—আঃ এত চিন্তা কেন করিস এই বয়সে; তুইত সুখী ভাই—তবে এত ভাবিস কেন! পাঁচটা ছেলেপিলের ঝামেলা নেই—একলা। কিসের ভাবনা। অনিল কিছু বলে না—ভালবাসে না নাকি অনিল? আমার কাছে বলনা'—

উঠে পড়ল ধড়মড়িয়ে বেলা, 'কিছু হয়নি ঠাকুমা—কি আবার হবে বাবাঃ! চান করা হয়নি অনেক বেলা পর্যন্ত—তাত লেগে অমন হয়! ছাড় দিকিনি, যেমন কাণ্ড বাপু!'

বুড়ি বলল, 'তাইত জল আমার তোলা থাকে নাতবৌ। রাগ করিসনি মিছিমিছি—দিনরাত জল তুলি কেন—জল তুলি কেন, তোরা কি বুঝবি—কেন ধুকতে ধুকতে এ বয়সকালেও জল তুলি! সুন্দরী তোরা—বুদ্ধিমতী হবিনি। কখন রাতবিরেতে কার কি হয় সেজন্যেই ত! আমার ত তাই ভয় হয় কেবল?

বেলা শুনলো কথাগুলো চুপ করে।

তারপর নাপিতবউ এসে পড়তেই ব্যাপারটার যে তুফান চলছিল, সেইটা জিরিয়ে পড়ল। বরং একটু অন্য আস্বাদ ফিরে এল। মনে পড়ল বেলার—আজ বৃহস্পতিবার। সকালে লক্ষ্মীপুজো করেছে। তাই প্রতি বৃহস্পতিবারের মত আজও এসেছে নাপিত-বউ। পা ধুয়ে কোণে উঠে এসে বসল বেলা। নখ কাটল, আলতাপাটি ঝামা দিয়ে ঘষে মুছে আলতা পরল টুকটুকে করে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। অনিলও এসে পড়ল—একটু দেরিতেই। ন্যাতড়া আর কিলে ঘামে জপজপে হয়ে এল অনিল। দুখানা লুচি ভেজে দেবে তাই উঠে পড়ল বেলা। সন্ধ্যা থেকে অনিলের খাবার তৈরী করতে লেগে গেল।

বাইরেটায় একটু হাওয়া দিচ্ছে, তাই রোয়াকে খালি গায়ে বসে অনিল বলল, 'কলঅলার সেই রিপোর্টটা করা হল না আর'।

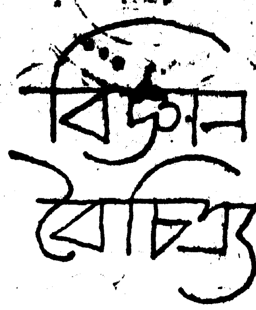
'কেন', বেলা বলল, 'কি কাজ এত তোমার, হল না কেন?'

'গিছলাম তো? কিন্তু রিপোর্ট করে একজনের কাজ নষ্ট করে কি লাভ। তাছাড়া অন্য জায়গায় ট্রান্সফারও ত করে দিতে পারে। তাছাড়া—'

'তাছাড়া কি, গেলে যখন অত রেগেমেগে?—তবে নাও কষ্ট কর'!

'লোকটার দোষ নেই একদম—' অনিল বলল, 'সংসারী লোক—মেয়েদের বিয়ে থা দিয়েছে ভাল জায়গায়। ছেলেদের বিয়েও দিয়ে দিয়েছে—সংসারী হয়ে ওরা এখন বাপ মাকে ভুলে গেছে। তাই বুড়ো নিজে খাটছে এই বয়সেও। কলে জল আসে না—এলেও জল বন্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে বলতে বললে—কি করব বাবু, আমার কোনো দোষ নেই, ওখানে যে কারেণ্ট ফেল করে কি করি বলুন! কল চালিয়ে লোকটা গীতা পড়ে। ভারী ধার্মিক লোক কিন্তু! তাছাড়া, লোকটা বেশ বুড়ো হয়ে গেছে—বেশ বুড়ো।'

পরদিন অনিল অফিস বেরিয়ে যেতে বেলা নামল কলতলায়। শান্ত দুপুরে দু-চারটে চড়ুই-এর সংগে মিলে মিশে এ দুপুর কেমন লাগল বেলার কাছে। পিঠটা পেতে দিল—ফরসা পিঠটা জলের কাছে। উঠোনের সবচেয়ে অন্ধকার ঘুপসি জায়গায় যে কলের পাইপটা রয়েছে—তাতে আজ পেতে দিল সমস্ত দেহটা; কোন লজ্জা শরম নেই বেলার। নুড়ি পাথর ইট চাতাল বেলার পিঠ বয়ে বয়ে জল পড়ছে—দুপুরের কাঁচ সাদা জল। শুধু আজ বেলা ভাবল, ওর রান্নাঘরের কাছ দিয়ে যে পাইপটা লম্বা হয়ে আছে, জলদান করছে সময়ে অসময়ে—সেটা কুঁজো হয়ে পড়েছে—বেশ কুঁজো হয়ে পড়েছে! কলটা একটা বহুদিনের কল—বহু বয়স পেরিয়ে আসা রংচটা কালিঝুলি মাখা কলটা কুঁজো হয়ে পড়েছে—বেশ কুঁজো হয়ে গেছে। কোন শব্দ নেই উঠোনে। শুধু বেলার সাদা কোমর আর পিঠের ওপর দিয়ে দুপুরের কাঁচ সাদা জলটা পড়ছে সিলসিল— ঝিকঝিক—ঝিলঝিল—!




চক্রদত্ত

আগেকার দিনে ৩২ ঘোড়ার গাড়ীর কথা প্রায়ই শোনা যেতো এবং দেখাও যেতো। সাধারণত একটি বা দুটি ঘোড়ায় টানা গাড়ী বেশী চোখে পড়তো আর গাড়ীর মালিকের আভিজাত্য যত বেশী হতো, গাড়ীর সংগে ঘোড়ার সংখ্যা ততই বাড়তে থাকতো। তারপর মোটর গাড়ীর প্রচলন হওয়ার সংগে সংগে ঘোড়ার গাড়ী আর বড় একটা দেখা যায় না। আজকের এই বাইশ চাকার মোটর গাড়ীখানি কিন্তু মালিকের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। এগাড়ী তৈরি হয়েছে গাড়ী চলার জন্য রাস্তার কতখানি ক্ষতি হয়, তাই বিশেষ করে লক্ষ্য রাখবার জন্য। রেকর্ড করার চাকা মাঝখানে থাকে আর ১৬ খানি চাকা সামনে ও আশেপাশে থাকে, এছাড়া কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রও এর সংগে থাকে। এই যন্ত্রগুলি দিয়ে রাস্তা সামান্যতম অসামঞ্জস্য অর্থাৎ একটু উঁচু-নীচু কিংবা কোথাও কোথাও ঢালু আছে কিনা ইত্যাদি ধরা যায় আর সমস্ত চাকাগুলির মধ্যে উঁচু-নিচুর তারতম্য ঘটছে কিনা বোঝা যায়।



রাস্তা পরীক্ষার জন্য বাইশ চাকার মোটর গাড়ী

*

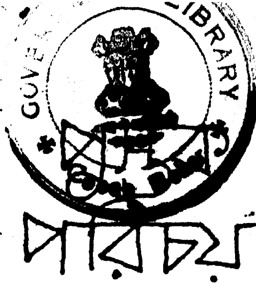
জাপানের দুজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধকারী একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। ওষুধটির নাম দেওয়া হয়েছে ক্রোমোমাইসিন। ওকাসা নামক স্থানের মাটি থেকে সংগৃহীত বীজাণু থেকেই ক্রোমোমাইসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যান্সারগ্রস্থ ইঁদুরের দেহে ক্রোমোমাইসিন প্রয়োগ করে দেখা গেছে ক্যান্সার গ্রন্থ কোষগুলি এতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। আট থেকে দশ দিন ধরে প্রতিদিনই ইঁদুরের দেহে ক্রোমোমাইসিন প্রয়োগ করা হয় এবং পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ক্রোমোমাইসিন দেওয়ার পর তিন বছর পর্যন্ত এর গুণ দেহে বর্তমান থাকে। এখনও পর্যন্ত ক্রোমোমাইসিন মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হয়নি।

*

আণবিক বিকিরণের দরুণ মানুষের দেহের যে-ক্ষতি হয়, তা এতদিন পর্যন্ত অপূরণীয় বলেই বিবেচিত হতো এবং এর দরুণ অনেক সময় মানুষের মৃত্যুও ঘটেছে। এখন কিন্তু এই বিকিরণাক্রান্ত মানুষের জীবন রক্ষার আশাও করা যায়। প্যারিসের কুরী বিজ্ঞান সংস্থার ফরাসী বিজ্ঞানী চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি যুগোস্লাভিয়ার একটি আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের দুর্ঘটনায় আক্রান্ত চারজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ হয়েছে। এরা পাঁচ জনই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিমানযোগে এদের কুরি বিজ্ঞান সংস্থায় আনা হয়। অপর সুস্থ মানুষের অস্থির মধ্য থেকে মজ্জা তুলে নিয়ে আণবিক বিকিরণে আক্রান্ত রোগীদের দেহের অস্থি গহবরে তা প্রবেশ করান হয়। তেজস্ক্রিয়তার ফলে রোগীদের রক্তের শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং সুস্থ দেহের মজ্জা পেয়ে তাদের শোণিত ধারা সহজেই পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে। মানুষের ইতিহাসে এইভাবে এক মানুষের মজ্জা অন্যের অস্থি গহবরে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করার পদ্ধতি এই প্রথম। যুগোস্লাভিয়ার আণবিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য চারজন সহৃদয় লোক স্বেচ্ছায় তাদের দেহে অস্ত্রোপচার করে অস্থির মধ্যে থেকে মজ্জা তুলে নেবার অধিকার দেয়। এই চাঞ্চল্যকর চিকিৎসা পদ্ধতিটির মুখ্য আবিষ্কর্তা অধ্যাপক জর্জ মাথে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভিনব আবিষ্কাররূপে অভিনন্দিত হয়েছে। অধ্যাপক জর্জ মাথে দুই বৎসর ধরে 'কলম লাগানর এই পদ্ধতি' ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন। তীব্র গামা রশ্মির বিকিরণে যদি বর্তমান মজ্জা বিনষ্ট করা সম্ভব হয় একমাত্র তাহলেই 'কলম লাগানো' সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। অধ্যাপক মাথে আশা করেন যে, এতদিন যে লিওকেমিয়া রোগ দুরারোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, উপরোক্ত পদ্ধতিতেই ভবিষ্যতে ঐ রোগ নিরাময় করা সম্ভব হবে।

*

সম্প্রতি আফ্রিকার মিয়ামি য়ুনিভার্সিটি থেকে রুডলফ হ্রদে একটি অভিযান পাঠানো হয়। এই অভিযাত্রী দল রুডলফ হ্রদে ২৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৮ পাউণ্ড ওজনের একটি অদ্ভুত ধরনের মাছ পেয়েছেন। এই সোনালী মাছটির আকৃতি অনেকটা ভেটকি মাছের মত। অবশ্য এপর্যন্ত মৎস্য বিজ্ঞানীরা যতরকম ভেটকি মাছের খবর পেয়েছেন এটি তাদের কোনওটির সংগেই এক শ্রেণীভুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ-মাছটি একটি নতুন কোনও প্রজাতি বলেই প্রতীয়মান হয়। ভালভাবে মাছটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আপাতত ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা হয়েছে কারণ ঐ অভিযাত্রী দল যখন পাঁচ মাস পরে য়ুনিভার্সিটিতে ফিরবেন তখনই পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।




## সাহিত্যালোচনা

**ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী**—শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক হাউস। ১।১, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২। বারো টাকা।

সাহিত্যালোচনায় সম্পাদনার মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর নেই। প্রচুর অধ্যয়ন অনুসন্ধিৎসা, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং সর্বোপরি যোগ্যতা না থাকলে সম্পাদনায় কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রীভবতোষ দত্ত আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই কাজে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজে সম্পাদক ছিলেন। যথেষ্ট ক্লেশ সহকারে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে তিনি সেগুলি সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত করেছিলেন। এই মূল রচনাগুলি দেখবার সুযোগ সচরাচর মেলে না, কেননা সংবাদ প্রভাকর এখন দুষ্প্রাপ্য এবং এর সংখ্যাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং সংস্কৃত কলেজের মত কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আছে। শ্রীভবতোষ দত্ত পরিশ্রম সহকারে এই রচনাগুলি একত্রিত করেছেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সংগ্রহটি সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি মহৎ কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই সুসম্পাদিত গ্রন্থটি গবেষকদের একটি বিশেষ অভাব মোচন করবে। এই সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এই ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস যার সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং রামনিধি গুপ্তের জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন—এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে সকলেই একমত হবেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোনো বড় কবির উদ্ভব হয়নি, কিন্তু শক্তিমান কবি ছিলেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু। রামনিধির শ্রেষ্ঠত্ব এই কারণে স্বীকার্য যে, পরবর্তী বাংলার সাহিত্যিকগণ লিরিকের দিক থেকে রামনিধির প্রবর্তিত পথই অনুসরণ করেছেন। রামনিধি নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না, কেবল খেয়ালের বশেই গান রচনা করে গিয়েছিলেন। তথাপি সে যুগে তাঁর গানগুলি ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক এবং তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত বলে স্বীকৃত। গ্রন্থকার ঈশ্বর গুপ্তকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি হিসাবে ধরেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিপ্রতিভা যে স্তরেরই হোক, নানা দিক দিয়ে তাঁর একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল এবং সে যুগের তিনি একজন সার্থক পুরুষ ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাহিত্যের ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। কবি জীবনী এবং কবি গান সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের যে আগ্রহ ছিল তার মূলে ছিল একটি উদার মানবতাবোধ যেটি সাহিত্যে সব চেয়ে বড় কথা। ঈশ্বর গুপ্তের সময়টা ছিল প্রাচীন এবং নবীনের দ্বিধার যুগ। গ্রন্থকার এই পরিপ্রেক্ষিতেই ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই টম পেইনের "এজ অফ রিজন"-এর অনুবাদ করেছিলেন। আবার হিন্দু কলেজের প্রতিকূলে মন্তব্যের ফলে তাঁর মামলায় জড়িয়ে পড়বার উপক্রমও হয়েছিল।

কবিওয়ালাদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটি সাধারণ বিশ্বাসের খণ্ডন করে বলেছেন, "কবি গানের উদ্ভব বৈষ্ণব ঐতিহ্যে নয় এর উদ্ভব নেহাৎই লৌকিক।" বিষয়টি তিনি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করে একটি ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করবার চেষ্টা করেছেন। হাফ-আখড়াই গানের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রমাণাদি সহ হাফ-আখড়াই গানের উদ্ভবের তারিখ নির্ণয় করেছেন ১৮৩২ জানুয়ারী। এটি নিপুণ গবেষণার নিদর্শন।

ঈশ্বর গুপ্ত ইচ্ছা করেছিলেন প্রত্যেক কবির জীবনী স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ করবেন। বর্তমান সংকলনে কবি এবং কবিওয়ালা এই দুটি প্রধান ভাগ করে সাজানো হয়েছে। পরিশিষ্টে কবিজীবনী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বা অন্য বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ অবতরণিকার মত সর্বশেষ ভাগ "আনুষঙ্গিক তথ্য" ও গ্রন্থকারের বিশেষ পরিশ্রমের নিদর্শন। একটি বিরাট যুগকে স্পষ্ট করবার জন্য গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তিনি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করে বহু তথ্য সংযোজিত করেছেন। এই সংবাদগুলির মধ্যে একটি নূতন তথ্য হল এই যে, ভারতচন্দ্রের জীবন কাহিনীতে উল্লিখিত বিষ্ণুকুমারীর পেঁড়ো অধিকারের ঘটনাটি ভিত্তিহীন। ইনি ব্রজকিশোরী হলেও হতে পারেন, কিন্তু বিষ্ণুকুমারী অবশ্যই নন। রামনিধি সম্পর্কেও তিনি সিয়র-উল-মুতাখরীনে উল্লিখিত এক বাঙালী রামনিধির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রন্থকারের সংযত রচনা প্রশংসনীয়। পাঁচশত পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে কোথাও পুনরুক্তি বা অযথা উচ্ছ্বাসের পরিচয় নেই। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থে শ্রীভবতোষ দত্ত সুসম্পাদনা এবং সাহিত্যিক মূল্যায়নের একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

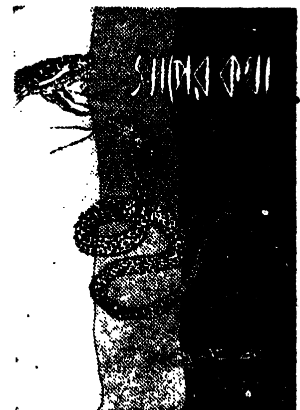
৫৫২।৫৮

**Lectures and Addresses of Rabindranath Tagore.** Pulinbihari Sen., Visva Bharati Calcutta-7, 1958. Price Rs. 1.50.

সাহিত্য আকাদেমী রবীন্দ্রনাথের যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন সংকলিত বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীটি তারই অংশ। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে বিভিন্ন স্থানে যে সব বক্তৃতা অথবা অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যেগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই বিবরণ এখানে সংগৃহীত হল। বক্তৃতা ও অভিভাষণ ব্যতীত অন্যান্য পুস্তিকাও এই সূচীর অন্তর্গত।

চুয়াত্তরটি পুস্তিকাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ Lectures and addresses, Visva Bharati Bulletins, Visva Bharati Quarterly Booklets Reprints. প্রথম ভাগে আছে কুড়িটি বক্তৃতা অথবা অভিভাষণ। প্রথমটি ১৯০৮ এ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ এবং কবির জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ ইংরেজি অভিভাষণটি 'সভ্যতার সংকটের' অনুবাদ। কবির মৃত্যুর পরেও তাঁর অনেকগুলি বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল। সে সবই এতে

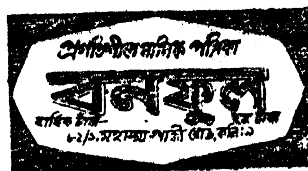




সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে পাঁচটি পুস্তিকার উল্লেখ। এদের কোনো কোনোটি বৃহত্তর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কোনোটি গুলোটিতেই বদ্ধ। ইংরেজি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণের সংখ্যা সাতটি। চতুর্থ ভাগে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি ছাড়াও অন্যান্য প্রকাশিত রচনার স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রণ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তাতে শুধু বক্তৃতা নয় চিঠিপত্র ও কবিতা বা গল্পের অনূদিত ইংরেজি পুস্তিকারও উল্লেখ রয়েছে।

পুলিনবাবু দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। তাঁর এই অনলস প্রয়াসের ফল ইতিপূর্বেও আমরা পেয়েছি। বলা বাহুল্য, এই পঞ্জী শুধু মাত্র তালিকা নয়। প্রতি পুস্তিকার নামপত্রের সম্পূর্ণ উল্লেখ, বইয়ের আকৃতি, পৃষ্ঠা সংখ্যা, সেই সঙ্গে প্রয়োজন হলে ভূমিকার আংশিক উদ্ধৃতি এবং গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে আনুষঙ্গিক সংবাদ পরিশ্রম এবং নৈপুণ্যে সহকারে সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র চৌদ্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে যাবেন, তাঁরাই গবেষণার উপকরণ সংগ্রহের প্রাথমিক শ্রমের হাত থেকে বেঁচে গেলেন বলে প্রথমেই শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কাজে নামবেন, তাতে সন্দেহ নেই।






## কবিতা

**ফেরারী ফৌজ**—(নতুন সংস্করণ) প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত। দু টাকা।

প্রকাশকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কেননা প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই উল্লেখ্য কাব্য গ্রন্থটিকে তিনি নতুন ক'রে আমাদের পরিবেশন করলেন। এই গ্রন্থে বিচিত্র রসের কবিতা আছে, এবং ঐ রসবৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে জীবন বোধ প্রকাশিত হয়েছে সেটি পাঠককে চিন্তিত ও বিস্মিত করে। জীবনের সম্মুখ ভাগ থেকে পলাতক অথচ সংগ্রামী একটি চেতনার কথাই এখানে বলা হয়েছে—যা প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান। গম্ভীর ও চটুল ছন্দের সমারোহ ক'রে এই কথাটাকেই তিনি নানাভাবে বলেছেন এবং তারি সঙ্গে জীবনের বহুদিক ও বহু ভাবনা এসে মিলেছে। জাগতিক ও জৈবনিক সমস্যার মধ্য থেকে যে রোমান্টিকতা দেখা দিয়েছে, সেটি পাঠকের কাছে একটি মহার্ঘ উপহার। 'তিনটি গুলি' কবিতায় এসে তাই আবার যে-অধ্যায় ধ্বনির ব্যঞ্জনা পেয়েছে তা অবিস্মরণীয়। অজিত গুপ্তের প্রচ্ছদসজ্জা গ্রন্থানুগ। (৫৭৪।৫৮)

**বৃষ্টি যদি আসে**—সমীর চৌধুরী। চারু সাহিত্য প্রকাশনী, কলিকাতা—৬। মূল্য—দু টাকা।

দক্ষিণ ভারতের এক স্বাস্থ্যনিবাসে রোগশয্যায় মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে লেখা সাতাশটি কবিতার সমষ্টি আলোচ্য গ্রন্থখানি। এর সবগুলো কবিতাই হয়তো কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু একথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে, সব কয়টি কবিতাতেই রয়েছে একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের স্বাক্ষর। মৃত্যুর সাথে জীবনের লড়াইর মধ্য থেকেই এদের জন্ম হলেও কোথাও আক্ষেপ বা আত্মসমর্পণের সুর নেই। আছে নিরন্তর সংগ্রাম স্পৃহা, আছে সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির আকুতি—

আমি দেখে যেতে চাই
তোমার আমার আর লক্ষ জীবনের
আনন্দ নির্ভয় দিন।

আশা করবো, সমীর সুস্থ হয়ে উঠবে, তার কবিতা ভবিষ্যতে বাংলা কাব্যজগতকে সমৃদ্ধ করবে। ৫৮৯।৫৮

## কিশোর সাহিত্য

**হাসির ফৌজ**—শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার। লেখক কর্তৃক ২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১॥।

মজার কবিতা আর মজার ছবি—এ দু'টিই ছোটদের সব সেরা আনন্দের উৎস। সেই উৎস মুখ খুলে দিয়েছেন লেখক আলোচ্য পুস্তকে। যেমন তাঁর কবিতার ভিয়ান তেমনি চিত্রশিল্পীদ্বয়ের আঁকা ছবির রঙ ও ঢঙ। বইটি পেলে ছোটরা যে খুশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ৫৫০।৫৮

**জ্ঞান থেকে অজ্ঞান**—বুদ্ধদেব বসু। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলিতে এমন একটি 'ব্যঞ্জনা' ছড়িয়ে আছে, যা কথা-সাহিত্যে কবিতার যোজনা। গোয়েন্দা-গল্পের রোমহর্ষক গড্ডলা রচনা নয়, একটি নির্দোষ হাস্যরসের খোরাক সবগুলি গল্পেই লেখক জুগিয়েছেন। এই হাস্যরসও বুদ্ধিতে পরিশীলিত, চাতুর্যে উজ্জ্বল। বলা বাহুল্য যে, এই কাহিনীগুলির পাঠক যথার্থ সাহিত্য-রসের সান্নিধ্য লাভ করবেন। বুদ্ধদেবের ভাষার যথার্থ ও সৌন্দর্য বিস্ময়কর। আশা করি, কিশোর-সাহিত্যের 'মান' রচনায় দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রকাশক এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে নিয়তই উদ্যোগী থাকবেন। (৫৬৩।৫৮)

**রঙিন রূপকথা**—প্রবোধকুমার সান্যাল। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

নামকরণের মধ্যেই বইটির পরিচয় সংগ্রথিত। সস্তা ডিটেকটিভ গল্পের উন্মাদনা নয়, রূপকাহিনীর স্নিগ্ধ নীলিমা প্রায় প্রতিটি কাহিনীতে ছড়ানো। 'গোরা' গল্পে এই সুন্দর উপাদান একটি মমবাথী প্রকৃতি-চেনায় সঞ্চারিত হ'য়ে গেছে এবং গল্পটির মধ্যে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি আছে। এই কাহিনী বর্ণনায় লেখকের ভাষা নৈপুণ্য একটি সার্বজনীন আবেদনে পৌঁচেছে। 'ত্রেতা যুগের নাগরিক' গল্পেও একটি অনাস্বাদিত পূর্ব অনুভূতির আস্বাদ। কিশোর মন এই গল্পের সান্নিধ্যে আনন্দিত হবে। কিশোর পাঠকের কাছে এ গ্রন্থের আবেদন অনস্বীকার্য। (৫৬৭।৫৮)

**আমার মা**—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

সহজ সাবলীল ভাষায় লিখিত একটি করুণ কাহিনীর রূপায়ণ। কল্লোল যুগের কথা-শিল্পী ছোটোদের রচনাতেও যে সিদ্ধহস্ত, এ বইটি তার প্রমাণ। ভাষায় কোথাও অপ্রয়োজনীয় অতিরেক নেই, আছে একটি ভারাক্রান্ত মনের কাহিনী-বিন্যাসের স্বাভাবিকতা। এই অনাবিল রস এই গ্রন্থটিকে কিশোর পাঠকের কাছে প্রিয়পাঠ্য তালিকাভুক্ত ক'রে তুলবে। গণেশ বসুর প্রচ্ছদ চিত্রণ অপূর্ব। (৫৬২।৫৮)

**ঝড়ের যাত্রী**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

একটি জাতীয় চেতনার অধ্যায়ে কিশোর মানসের এগিয়ে যাওয়া—'ঝড়ের যাত্রী' তারি ইঙ্গিতবহ। ধীরে ধীরে এই এগিয়ে যাওয়ার অপরূপ ইতিহাস অচিন্ত্যকুমার এঁকেছেন এবং অংকনরীতিটি অপূর্ব। অচিন্ত্যকুমারের ভাষার পুষ্পিত সৌন্দর্য ও উপমার চাতুর্য 'ঝড়ের যাত্রীর' অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তা এই কাহিনীর আকর্ষণ বর্ধিত করেছে। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, 'সেই বাগডম্বরু বেজে উঠলো পুলিনের কণ্ঠে, সেই মিতভাষী, গৃহকোণ উৎসুক পুলিন, বেজে উঠলো আদিগন্ত প্রান্তরে, গহন জনারণ্যে'। এক জেলা থেকে আরেক জেলায় পুলিনের নাম অগ্নি-অক্ষরে জ্বলে বেড়াতে লাগলো।' কিশোর পাঠকের জন্য লিখিত এই উপন্যাসে লেখক বয়স্কপাঠ্য উপন্যাসের যে গুণটি সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন তা বিস্ময়কর, অভিনন্দনযোগ্য। এই বই সাম্প্রতিক কিশোর-সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন। (৫৬৪।৫৮)

**নিশুতিপুর**—প্রেমেন্দ্র মিত্র। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

কয়েকটি সহজ ভঙ্গিতে লেখা সুন্দর কাহিনীর সমষ্টি। রোমাঞ্চ-সিরিজের রোমাঞ্চ নয়, অথচ একটি বিস্ময়-রস এই গল্পগুলির অন্যতম আকর্ষণ। বইয়ের নামকরণে তারি ইঙ্গিত। যদিও প্রথম গল্পেরই নাম নিশুতিপুর, অন্যান্য গল্পেও একটি অপরিচয়ের রহস্য আছে, যা আস্বাদ্য। আবার অজানা জগতের অবতারণা না করেও পরিচিত জগতের মধ্যেই যে অপূর্বতা সঞ্চার করা যায়, 'গল্পের শেষে' নামক গল্পে তারি আভাস আছে। স্বাভাবিক ও সাধারণ ভঙ্গিতে শুরু ক'রে একটি পরিবেশ রচনার দক্ষতা (যা তাঁর বড়োদের গল্পেও প্রশংসিতব্য) 'মাঝরাতের কল' ও 'নিরুদ্দেশ' গল্পে আছে। লেখক কিশোর পাঠকের ধন্যবাদার্হ হবেন, সন্দেহ নেই। গণেশ বসুর প্রচ্ছদ শিল্প প্রশংসনীয়। (৫৬৫।৫৮)

## বিবিধ

**সাহিত্যপত্র**—শান্তি বসু ও আশীষ বর্মণ সম্পাদিত। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯। দাম ১, টাকা।

সাহিত্যপত্রের বর্তমান সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি স্বভাবতই সর্বাগ্রে নিবদ্ধ হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে শান্তি বসুর রচনা এবং নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ ও ব্রাহ্মসমাজ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী পাঠকেরা শান্তি বসুর রচনা পড়ে সাহিত্য বাকযুদ্ধে নামতে পারেন। নামা উচিত। অপর রচনাটি লেখকের পরিশ্রম ও বক্তব্যের দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। উনিশ শতকী বাংলার যাঁরা গবেষক তাঁদের পক্ষে রচনাটি বিশেষ-ভাবেই আকর্ষণীয়। বিষ্ণু দে, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রভৃতির কবিতা ও ভেরকরের একটি অনুবাদ গল্প এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। "কয়েকটি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস"—সম্পর্কে আলোচনাগুলি আকর্ষণীয়।

### ভ্রম-সংশোধন

'ভগীরথের উৎস-সন্ধান' নিবন্ধে আমার অনবধানবশত একটি ভুল থেকে গেছে। 'আইনস্টাইনের চেয়ে একুশ বছর বয়োজ্যেষ্ঠ জগদীশচন্দ্রের' স্থলে 'আইনস্টাইনের চেয়ে একুশ বছরে বয়ঃকনিষ্ঠ জগদীশচন্দ্র' লেখা হয়েছে। এটি মুদ্রাকর-প্রমাদ নয়, লেখকেরই অপরাধ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

# ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের কলসমূহে নাকি উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এবার



আমরা নির্ঘাত ভাগ্যবান হয়ে যাবো, কোপীনখণ্ডের ভাগ্য কে নেবে!"

* * *

শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে শুনাইয়াছেন—পরিবর্তনশীল জগতে নূতন চিন্তাধারার আবশ্যক।—"নতুন ব'লে নতুন, বর্তমান জগতে এক খাওয়া-পরার ভাবনা নিয়েই আমরা চিন্তার ধারাপাত বসিয়ে দিয়েছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতায় এক টাকা সের দরে সমুদ্রের মৎস্য বিক্রয় করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সংবাদও শুনিলাম যে, অনেকেই নাকি সেই সস্তা দরের মৎস্যের



স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী পদাবলী কীর্তন শুনাইলেন—"প্রতিপদের চাঁদের মতো কেউ দেখল, কেউ দেখল না গো।"

* * *

রাষ্ট্রপুঞ্জের খাস দপ্তরে সংরক্ষিত মানচিত্রে নাকি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া দেখান হইয়াছে। "ভূ-র সঙ্গে যিনি 'গোল' সংযোগ ক'রে ভূগোল আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর দিব্যদৃষ্টির তারিফ করতে হয়"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

কলিকাতার তরু এলাকায় "কাঙ্গালী" বলিয়া পরিচিত একশ্রেণীর দুষ্কৃত-কারী মোটারীদের উপদ্রবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।—"পুলিস অবশ্য এদের অত্যাচার দমনে তৎপর হয়েছেন, তবু তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—"কাঙ্গাল" বলিয়া করিও না হেলা, (এরা) পথের ভিখারী নহে গো"—বলে শ্যামলাল।

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দপ্তরে ৩৫টি গোপনীয় ফাইল খোয়া গিয়াছে।—"যিনি বা যাঁরা এই কাজে লিপ্ত ছিলেন তিনি বা তাঁরা নিশ্চয়ই দার্শনিক,—অর্থমনর্থম এ জ্ঞানের নাড়ী তাঁদের টনটনে—" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সাম্প্রতিক নির্দেশে চাপরাশীর সংখ্যা কমাইতে বলিয়াছেন।—"পাতলা একটা যবনিকা আছে, কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

* * *

কাঁথির এক সংবাদে শুনিলাম, ১০ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা নাকি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। বিশুখুড়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মা যা হইয়াছেন!!"

* * *

মার্কিনের সহকারী শ্রমসচিব শ্রী লজ্ জনবল ও শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতে আগমন করিয়াছেন।—"শুধু জনবল না দেখে লজ্ সাহেব লজিং-এর অবস্থাটাও যেন দেখে যান"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

প্রখ্যাত সন্তরণবীর শ্রীমিহির সেন বলিয়াছেন, সাঁতারের ব্যাপারে বৃটেনে কোন বর্ণবৈষম্য নাই।—"না থাকবারই কথা; সাঁতার কেটে কেটে গায়ের ময়লা রঙ হয়ত সাদা হয়ে যায়, কিন্তু ডাঙার অবস্থা যে অন্যরূপ"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ডান চক্ষু অপারেশনের প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া একটি সংবাদ শুনিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"শুধু ডান দিকের চোখের এত তোয়াজের জন্যই তো জ্যোতি বাসু প্রমুখদের সঙ্গে লাগধুমাধুম লেগে যায়!!"

* * *

ডি. ভি. সি-র সংরক্ষিত বহুপরিমাণ আলু নাকি বর্ধমান জেলায় বিনষ্ট হইয়াছে।—"গোল আলু আর নিটোল আলু এক



সঙ্গে রাখলে ফল এইরকমই হয়ে থাকে"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

রেগুলেশন লাঠির দৈর্ঘ্য কমাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—"বোধ হয় মুর্খদের লাঠির দৈর্ঘ্য বাড়াবার প্রয়োজনেই এই ব্যবস্থা"—বলে শ্যামলাল।

* * *

বোমে যন্ত্রচালিত "মস্তিষ্ক" আবিষ্কারের সংবাদ শুনিলাম। দুইদিন পরেই অন্য এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে ব্যাপক ধর্মঘটের তোড়জোড় চলিতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ব্যাপক ধর্মঘট যন্ত্রচালিত মস্তিষ্কের ফল কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি।"

* * *

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু সাতদিনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"ভারতের অনেক মন্ত্রী অর্ধজীবন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলেই মনে হয়, তবে সংসারীর চোখে সেটা দৃষ্টিবিভ্রমও হতে পারে"!!!

* * * *

তিলাইয়া বাঁধের জলাধারের মাছের পেটে কৃমি হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, হাঁস জাতীয় পাখির বিষ্ঠা ভক্ষণের ফলেই এই কৃমিরোগের উৎপত্তি। অবিলম্বে হাঁস বিতাড়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বন্দুক ক্রয় করা হইল। কিন্তু পরে এক প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়া হংস বিতাড়ন বন্ধ করা হয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সরকারী অর্থ ও উদ্যমের অপচয়ে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু কর্মকর্তা হয়ত অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন—মা হংস শিকারি প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম........!!

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর ভারতদর্শন আজ আর বিরল ঘটনা নয়, যেমন বিরল নয় আমাদের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশ কত দূরে দেশের কত নিকট হয়েছে জানিনে, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, অনেকের সঙ্গে রাজনীতিক এবং একটা রকমের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কোন শ্রেণীতে ফেলব আঁদ্রে মালরোর ভারতাগমন? নিঃসন্দেহে তিনি ফ্রান্সের দপ্তরহীন মন্ত্রী, দ্য গলের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। আরো নিঃসন্দেহে তিনি ফরাসী সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিনিধি। শুনেছি অপর এক ফরাসী লেখক সম্প্রতি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে মন্তব্য করেছিলেন—এ সম্মান যাওয়া উচিত ছিল মালরোর কাছে। অতি-বিনয় নয়, অতি সত্য এ মন্তব্য।

ফরাসী সাহিত্যোদ্যানে এরাওর দ্রুমায়ণ অপেক্ষাকৃত দুরূহ। শুধু রূপে তাকে ভোলানো শক্ত, গান গেয়ে তার দ্বার খোলাতে হয়, আর সে আসরে আজ থেকে তিশ বছরেরও আগে যিনি বহুকে মুগ্ধ করেছিলেন তখন নবীন যুবা সে। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। প্রত্যুষে মধ্যাহ্নের রৌদ্র সংগত কারণেই সন্দেহের বস্তু, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সে আলোর সন্ধ্যাসমাধি। মালরো আদৌ সে জাতির ফুল নন। তাঁর শিল্পপ্রবৃত্তির দিনে দিনে পরিণত হয়েছে। হাউইর মতো একদিন অকস্মাৎ যে আকাশে উড্ডীন হয়েছিল, আজ তার আলো চোখ ধাঁধায় না, চতুর্দিক আলোকিত করে। মালরো আজ সমাহিত শিল্পী।

*

অধিকাংশ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ পরিচয় তাঁদের সাহিত্যে। মালরোর বেলায় বলা শক্ত তিনি মহত্তর, না তাঁর কীর্তি। ধ্যান, সৃষ্টি ও কর্মের এমন সমন্বয় আমাদের যুগে খুব বেশি জীবনে ঘটেছে বলে জানিনে। বায়রন বা টি ই লরেন্সের কথা স্বভাবতই মনে আসে, তবু আমার মনে অন্তত তাঁদের কেউই ঠিক ধ্যানের সঙ্গে জড়িত নন। মালরোর "দি ভয়েস অব সাইলেন্স" গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন তাঁর ধ্যানের গভীরতা। মন্দনতত্ত্ব নয়, তার অতীত তত্ত্বের সাধনা। কালীঘাটে গঙ্গাপুজো নয়, ভাগীরথীর উৎস সন্ধান।

প্রথম জিজ্ঞাসা স্থাপত্যসম্পর্কিত। তাই দিয়ে প্রাচ্যযাত্রা বাইশ বছর বয়সে। চীন তখন বিপ্লবের আবর্তে। স্থগিত রইল অতীতখনন, মালরো জড়িয়ে পড়লেন জটিল রাজনীতিতে। তবু একে শুধু রাজনীতিক কর্ম বললে বোধ হয় সবটা বলা হয় না। প্রমাণ, এ সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা উপন্যাসের নাম ম্যান'স ফেট—মানবভাগ্য। এখানেই দেখা যায় মালরোর সঙ্গে এ যুগের অন্যান্য "এনগেজড" সাহিত্যিকদের বিরাট পার্থক্য। আর্থার কোসলার, জর্জ অরওয়েল, সার্ত্র ইত্যাদি নিঃসন্দেহে শক্তিশালী লেখকরা তাঁদের বিভিন্ন রাজনীতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে অত্যন্ত



সুপাঠ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু একমাত্র মালরোই বোধ হয় সমসাময়িকের সীমা পেরিয়ে বর্তমানের মূর্ত মুহূর্তের মুকুরে চিরন্তনের সার্থক সন্ধান করেছেন। রাজনীতিতে তিনি কারো চেয়ে কম সক্রিয় ছিলেন না। স্পেনে তিনি বিমান চালনা করেছেন। বন্দুক তাঁর কথা শোনে। কিন্তু যোদ্ধা কখনো শিল্পীকে পিছনে ফেলে যায়নি, সাহিত্য কখনো শুধু প্রচারে পর্যবসিত হয়নি।

*

কোথায় যেন পড়েছি, স্পেনের গৃহযুদ্ধের শোচনীয় অবসানের পরে যুরোপের তরুণদের আর কোন cause রইল না, যার জন্য লড়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে তো সেসিল ডে লুইসের রায়ই রয়েছে—এর লক্ষ্য টু ডিফেণ্ড দি ব্যাড এগেন্স্ট দি ওয়ার্স, এতে মহৎ কাব্য রচিত হয় না, এতে অংশ গ্রহণ একান্তই আংশিক, এতে নেই নিজেকে উজাড় করে দেওয়া। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা একটু আলাদা। যুদ্ধে পরাজয় হোলো, যার চিত্তমথনশক্তি জয়েরই সমান। পর পর প্রতিরোধের পালা। ফরাসী জাতির সে বিভেদ আজো ঘোচেনি। এখনো কাউকে অপমান করতে হলে শুধু বলতে হয়, তিনি অকুপেশনের সময় সুইটজারল্যাণ্ডে ছিলেন বা ভিশির পক্ষে একটি তিন লাইন কবিতা লিখেছিলেন। ফরাসী বিদ্রোহের পরে আর কিছু বোধ হয় গোটা জাতিটাকে এমন মর্মান্তিকভাবে বিভক্ত করেনি!

মালরোর ভূমিকা এখানেও চরিত্রসম্মত। তিনি যুদ্ধ করেছেন, বন্দী হয়েছেন, আহত হয়েছেন, যুদ্ধবন্দীর শিবির থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন। তার পরের অধ্যায়েও মালরো সমান সক্রিয়। সার্ত্রের মতো তাঁকে বলতে হয়নি: জার্মানদের শুধু "না" বলতে হয়েছে, সে স্বাধীনতা অমূল্য। এখন "না" বলব কাকে? মালরো দুর্দিনেও পজিটিভ জীবনদর্শন থেকে বঞ্চিত হননি। সেদিনও তিনি দ্য গলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী হয়েছিলেন।

*

মালরোর রাজনীতির সঙ্গে সবারের একমত হতে হবে এমন বাধ্যতা আমি আদৌ মানিনে। সত্য বলতে কি, দ্য গলের শাসনের সমর্থনে সহস্র-গ্রাহ্য যুক্তি শ্রবণের পরেও আমার সকল আশংকার নিরসন হয়েছে, এমন দাবি করব না। তবু মালরোর জীবন ও কীর্তির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারিনে। জীবন ও কীর্তির এমন সুষ্ঠু একীভবনে মুগ্ধ না হয়ে পারিনে। আমি তো ক্ষমতার ধারে-কাছে যাইনে, শুচিবাই, পাছে রাজনীতিক ক্ষমতার স্পর্শে মালিন্য আসে, হাতে রক্তের দাগ লাগে। আবার অপরদিকে অপরাধবোধেরও সীমা নেই: চতুর্দিকের অপ্রতিহত অন্যায়ের মাঝে আমি নিষ্ক্রিয়। কলমকে না বানালাম তলোয়ার না লাঙল।

আক্ষেপ বোধ হয় অনর্থক। যদি ধরে নিই একান্তই তর্কের খাতিরে যে, লেখকের পক্ষে পরধর্ম ভয়াবহ, সৈনিকের সাজ শিল্পীর অযোগ্য, তাহলে মালরো স্পষ্টতঃই তার জীবন্ত প্রতিবাদ। মালরোকে নমস্কার। তবু এও তো সমান সত্য যে, অসংখ্য লেখক শিল্প পরিহার করে অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপথে গিয়ে সাহিত্যে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অপর ক্ষেত্রে সার্থক হননি। আমি শুধু বলতে পারি, ওই হাতিয়ার আমায় নাহি সাজে।

## রূপছায়া

**চন্দ্রশেখর**

বাক্‌শক্তিরহিত পঙ্গু ছেলেকে নিয়ে চলেছে তারকেশ্বরে, তারই আরোগ্য কামনায় বাবা তারকনাথের কাছে ধর্ণা দিতে। মন্দির প্রাঙ্গণে কথকতার আসর বসেছে। কথক ঠাকুর বলে চলেছেন তীর্থ মাহাত্ম্যের কাহিনী। সেইটাই ছবির প্রধান বিষয়বস্তু। কথকতার শেষে গল্প ফিরে আসে মা ও ছেলের কাছে। দৈব অনুগ্রহে সেই পঙ্গু বালকের সম্পূর্ণ নিরাময়ে গল্পের সমাপ্তি।

কথক ঠাকুরের বিবৃতিতে জানা যায়, রাঢ়দেশে একদা ভারমল্ল নামে একজন ন্যায়পরায়ণ যোদ্ধার আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁর শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার তদানীন্তন নবাব তাঁকে রাঢ়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর মহিষী কাত্যায়ণী ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। শিবপূজায় স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী ছিল না। ভারমল্ল কাত্যায়ণীকে এই বলে পরিহাস করতেন, "যেদিন তোমার শিব নিজে আমায় দেখা দেবেন, সেই দিনই তাঁকে প্রণাম করবো। তার আগে নয়।"

### তীর্থ মাহাত্ম্য

তারকেশ্বর তীর্থের প্রসিদ্ধি দেশব্যাপী কিন্তু তার পুরাতন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। কেমন করে এবং কার দ্বারা এই তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠা, যুগ যুগ ধরে জনমানসে যে ভক্তির ধারা অপ্রতিহত গতিতে বয়ে চলেছে, তার উৎস কোথায়—এ সব তথ্য খুব বেশী লোকের জানা নেই।

"শ্রীশ্রীতারকেশ্বর" নামে শক্তি প্রোডাকশন যে ভক্তিমূলক ছবিটি তুলেছেন, তার মধ্যে এই সব ব্যাপারের খানিকটা হদিস পাওয়া যায়—যদিও একে পুরোপুরি প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল হবে। কারণ ছবির প্রারম্ভেই স্বীকৃতি আছে, মূলে চরিত্রগুলির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এতে ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণে কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ছবিতে যে-গল্পটি বিবৃত হয়েছে, তা নেওয়া হয়েছে সুকুমার গাঙ্গুলী রচিত "তারকনাথ লীলা" থেকে। গল্প শুরু হয়েছে এক দুঃস্থা জননীকে নিয়ে, যে তার

সেই সময়ে মায়াগিরি নামে এক সন্ন্যাসী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভারমল্লের এলাকার মধ্যে এসে আস্তানা গেড়েছেন। তিনি আদেশ পেয়েছেন, দেবাদিদেব মহাদেব আবির্ভূত হবেন রাঢ়দেশে। খোঁজার তাই তাঁর অন্ত নেই হাটে বাটে, বনে-জঙ্গলে। খোঁজ পেলেন তিনি অতর্কিতে।

ভারমল্লের ছিল এক কপিলা গাভী। যে রাখাল ছেলেটির ওপর তাকে চরিয়ে আনবার ভার ছিল, তার অগোচরে গরুটি বনের মধ্যে এসে রোজ একটি পাথরের ওপর দুগ্ধদান করতো। রাজার গো-রক্ষকের সন্দেহ পড়লো রাখাল ছেলেটির ওপর। কপিলার দুধ যাচ্ছে কমে, তবে কি ছেলেটাই চুরি করে তার দুধ খেয়ে নিচ্ছে? গো-রক্ষকের শাসানিতে ভয় পেয়ে রাখাল ছেলেটি এসে আশ্রয় নিল বনের মধ্যে—সেই পাথরটির কাছে, যেখানে কপিলা রোজ দুধ দিয়ে যেতো। ছেলেটি যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, তখন সেই পাথর থেকে বেরিয়ে এলেন এক দিব্যকান্তি পুরুষ। তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে নানা খাদ্যসম্ভার এসে হাজির হলো ছেলেটির সামনে।

এই রাখাল বালকের মাধ্যমেই মায়াগিরি সন্ধান পেলেন সেই ভূ-প্রোথিত শিলার। জায়গাটি পরিষ্কার করে সাড়ম্বরে পূজো-অর্চনা আরম্ভ করে দিলেন সেখানে। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না রাঢ়দেশের কোথায় মহাদেব চরণপাত করেছেন।

ভারমল্লের কানে খবর পৌঁছলো। তিনি নিজে এলেন আসল ব্যাপার জানতে। হুকুম দিলেন, সেই পাথর মাটি খুঁড়ে ওপরে তুলতে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে সেই বিরাট শিলাখণ্ডের তল পাওয়া গেল না, তাকে মাটি খুঁড়ে ওপরে তোলাও সম্ভব হলো না।

এইবার মহাদেব নিজে ভারমল্লকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, ঐখানেই তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এবং তারই মাধ্যমে দেশে শিবনাম প্রচার করতে। এতদিন ভারমল্ল ছিলেন মহাদেবের প্রচ্ছন্ন ভক্ত, এইবার হলেন প্রকট প্রচারক। সন্ন্যাসী মায়াগিরির ছিল একটি তিন-পা-ওয়ালা ঘোড়া। ভারমল্ল প্রতিশ্রুতি দিলেন, ঐ ঘোড়ায় চড়ে যতটা জায়গা মায়াগিরি ঘুরে আসতে পারবেন, তার সবটাই হবে দেবতার সম্পত্তি।

এমনি ভাবে হলো তারকেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বিশাল তারকেশ্বর এস্টেটের পত্তন।

গল্পের বাঁধুনি মামুলি ধাঁচের, ছবিতে তার বিন্যাসও তদনুরূপ। চিত্রনাট্য রচনায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় একান্তভাবেই গতানুগতিক ধারার অনুসরণ করে গেছেন—কোন ব্যাপারেই কোন নূতনত্বের ইঙ্গিত দেন নি। বংশী আশের পরিচালনা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

মূলত বিবরণীধর্মী গল্পে গভীর অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ অল্প। তাই এই ছবিতে কোন শিল্পীর অভিনয়ই মনে বিশেষ দাগ কাটে না। তবে কারুর অভিনয়ই নিন্দনীয় নয়।

তারমল্ল ও তাঁর মহিষীর চরিত্র দুটি কমল মিত্র ও পদ্মা দেবীর অভিনয়ের গুণে যথাযথ রূপ পেয়েছে। নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের মায়াগিরি ও বাবুয়ার রাখাল বালক' সম্পূর্ণভাবে চরিত্রানুগ। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় সেজেছেন এক শিবভক্ত অন্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি তারকেশ্বর মন্দিরের প্রথম পুরোহিত নির্বাচিত হন দৈব নির্দেশে। তাঁর পত্নীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অপর্ণা দেবী। দুজনকার অভিনয়ই প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে শোভা সেন, মহেন্দ্র গুপ্ত, তুলসী চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, নবগোপাল প্রভৃতি যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন।

দৃশ্যসজ্জা ও আলোকচিত্র সম্পূর্ণভাবে জৌলুস বর্জিত। তারকেশ্বরে গৃহীত দৃশ্যাবলী ছবির আকর্ষণ বাড়াতে পারে নি। ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসূন ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কয়েকটি গান বেশ ভাল লাগে। ডাঃ গোবিন্দগোপাল ও মাধুরী দেবী গীত শিবস্তোত্রগুলিও সুশ্রাব্য। গানের রেকর্ডিং কিন্তু সর্বত্র সমান মনোজ্ঞ নয়। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও তা' এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ বলে গণ্য হবে।

**সার্থক রহস্য চিত্র**

"কালোছায়া" তুলে রহস্য চিত্রের ক্ষেত্রে বসুমিত্র প্রতিষ্ঠান যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তারই ঐতিহ্য বহন করে এসেছে তাঁদের নতুন প্রচেষ্টা "ধূমকেতু"।

রহস্য চিত্রের সাফল্য নির্ভর করে তার কাহিনীর বিন্যাস-পটুতায়। যেখানে এক বা একাধিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে গল্প, সেখানে আসল হত্যাকারী কে সে তথ্য প্রকাশ করবার আগে আরো দু'চার জনের ওপর দর্শকদের সন্দেহ সঞ্চারিত করে রহস্যকে আরো ঘনীভূত করে তোলাই প্রচলিত রীতি। "ধূমকেতু"তে এই রীতি বেশ সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে।

গল্পের শুরু প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার সঞ্জয় সেনের হত্যাকাণ্ড দিয়ে। গোয়েন্দা বিভাগের সুরথ চৌধুরী তদন্ত করতে এসে জানতে পারলেন, মৃতব্যক্তির ওপর দুজন লোকের

আক্রোশ থাকা সম্ভব। এই দুজনের একজন সঞ্জয় সেনের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র ভাইপো, অপর ব্যক্তি বর্তমানে পাগল, যার ধারণা সঞ্জয় সেনই তার সমগ্র পরিবারের মৃত্যুর কারণ।

এই খুনের কিনারা হবার আগেই শহরের বিশিষ্ট সার্জন ডাঃ মজুমদার রহস্যজনক-ভাবে নিহত হলেন। মৃত্যুর আগে ধূমকেতু ছদ্মনামধারী কোন ব্যক্তি এঁদের দুজনকেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, পূর্বকৃত কোন অপরাধের জন্যে তাঁদের হত্যা করা হবে। সেই সঙ্গে এও জানা গেল, ডাঃ মজুমদারের একজন রোগী তাঁর হাতে মারা যাওয়ায় তাঁর সহকারী তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করে। সরকারী অনুসন্ধানে ডাঃ মজুমদার নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় সেই সহকারীটির চাকরি যায়। ডাঃ মজুমদারের ওপর তার রাগ থাকাই স্বাভাবিক।

গোয়েন্দা সুরথ যখন এই সব সূত্র ধরে অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই সময়ে ধূমকেতুর তৃতীয় পত্র পেলেন জনপ্রিয় উপন্যাসিক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনঞ্জয়ের বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু তার আগেই দেখা গেলো আগুনে পুড়িয়ে তাঁকে কে বা কারা মেরে ফেলেছে। ধনঞ্জয়ের কোন উপন্যাসে কোন বিশিষ্ট পরিবারের একটি মেয়ের প্রতি ইঙ্গিত থাকায়, সে নাকি এমনিভাবে পুড়ে আত্মহত্যা করে ছিল। সুতরাং তাঁরও শত্রুর অভাব ছিল না।

কে এই ধূমকেতু? সারা পুলিশ বিভাগকে এই প্রশ্ন যখন কণ্টকিত করে তুলেছে, তখন আরো দুজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রায় একই সঙ্গে ধূমকেতুর পরোয়ানা পেলেন। একজন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জি, যাঁর একমাত্র মেয়ে তপতী সুরথের বাগদত্তা বধূ। অপর ব্যক্তি একজন নামকরা শিকারী—প্রতাপ চৌধুরী। শেষোক্ত ব্যক্তির গুলিতে তাঁর এক বন্ধু নিহত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা নিছক দুর্ঘটনা বলে সাব্যস্ত হয়। বন্ধু পত্নীকে সেই থেকে তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করতে প্রায়ই দেখা যায়। ফলে নানা লোকে নানা কথা বলে শিকারী প্রতাপ চৌধুরী সম্বন্ধে।

যাতে ধূমকেতু এবারেও পুলিশের চোখে ধুলো দিতে না পারে, সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হলো। মিঃ চ্যাটার্জী নিজেই এলেন প্রতাপ চৌধুরীর বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে। বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারা। ঘরের ভিতরে স্বয়ং সুরথ ও তার ঊর্ধ্বতন অফিসার। এরই ফাঁকে এক অসতর্ক মুহূর্তে প্রতাপ চৌধুরী প্রাণ হারালো ধূমকেতুর হাতে। শুধু মিঃ চ্যাটার্জী প্রাণ নিয়ে নিজের



এস আর প্রোডাকসন্সের "মর্মবাণী" চিত্রের একটি বেদনাবিধুর দৃশ্যে শিশুশিল্পী সীমা ও ছায়া দেবী।

বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখা গেলো।

এই জটীল ধূমকেতু-রহস্যের যে সমাধান করা হয়েছে ছবির শেষ অঙ্কে, তা পুরো-পুরি বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, ছবির কাহিনীর পক্ষে উপযোগী বলে মানতে বাধা নেই।

*

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু একাধারে এর গল্প-লেখক, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। এই তিনটি বিভাগেই তিনি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তা' প্রশংসনীয়। পরিচালনার ক্ষেত্রে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ এবং সেই হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র দিয়ে মূল গল্পটিকে অযথা ভারাক্রান্ত না করে, তিনি দর্শকদের আগ্রহকে সবিশেষ দক্ষতার সঙ্গে জাগিয়ে রেখেছেন গল্পের শেষ পর্যন্ত। নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৃশ্যেও তিনি যথেষ্ট রুচি ও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সারা ছবিতে একটি মাত্র গান আছে, তাও এক ক্যাবারে-দৃশ্যে। এ সবের মধ্যেই রয়েছে পরিচালকের সুসমঞ্জস চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ।

সকলের অভিনয়ই মোটের ওপর ভালো হয়েছে, যদিও কারুর অভিনয় স্মরণীয় সৃষ্টির পর্যায় উঠতে পারে নি। এ ছবিতে তার সুযোগও বিশেষ নেই।

সকলের আগে চোখে পড়ে মিঃ চ্যাটার্জী-বেশী ছবি বিশ্বাসকে। পুলিশের ভূতপূর্ব কমিশনার, বর্তমানে একমাত্র মেয়ের শাসনে সন্ত্রস্ত। বেশ লাগে চরিত্রটিকে। মেয়ে তপতী ও তার প্রণয়ী সুরথ সুষ্ঠু রূপ পেয়েছে যথাক্রমে সবিতা বসু ও অসিত-বরণের হাতে। চারজন নিহতের প্রত্যেকে এক একটি টাইপ—ধীরাজ ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও শিশির মিত্র সুন্দর অভিনয় করেছেন এই চরিত্রগুলিতে। পাহাড়ী সান্যাল, মিহির ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা প্রভৃতির অভিনয়ও যথোচিত।



শক্তি প্রোডাকসানের ভক্তিমূলক ছবি "শ্রীশ্রীতারকেশ্বরে"র দুটি প্রধান ভূমিকায় অপর্ণা দেবী ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।



"ধূমকেতু"র টেকনিক্যাল কাজ অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর। জায়গায় জায়গায় আবহ সংগীত সুপ্রযুক্ত হলেও, সংগীত পরিচালনায় সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারেন নি।

# চিত্রালোচনা

এ হপ্তায় দু'খানি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে—বাংলায় "মর্মবাণী" এবং হিন্দীতে "শুনুতো লে হাসিনা"।

"মর্মবাণী" এস আর প্রোডাকসন্সের ছবি, পরিচালনা করেছেন সুশীল মজুমদার। প্রাচীন মিশর নিয়ে গবেষণারত এক তরুণ ঐতিহাসিকের বিচিত্র কাহিনী এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দুটি চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অসীমকুমার চিত্রাবতরণ করেছেন। এ'রাই ছবির যুগল তারকা। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, মঞ্জু দে, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার এবং একটি নতুন প্রতিভা—সুপ্রিয়া চৌধুরী। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সংগীত পরিচালনা ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। মনোজ ভট্টাচার্য এর কাহিনীকার।

যে ধরনের চটুল বিষয়বস্তু ও নাচগান সাধারণ হিন্দী ছবির সম্বল, তারই প্রতিফলন দেখা যাবে ফিল্মিস্তানের "শুনুতো লে হাসিনা"-তে। শশীকলা, রবীন্দ্র কাপুর ও আগাকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। এস পি বক্সী ও এস মহীন্দ্র যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

আগামী শুক্রবার এমকেজি প্রোডাকসন্সের পৌরাণিক ছবি "কংস" মুক্তি পাবে। ছবিটি বহু অর্থব্যয়ে প্রায় দু' বছর ধরে তোলা হয়েছে। বাংলা ছবিতে যে ধরনের দৃশ্য সমারোহ সাধারণত চোখে পড়ে না, "কংস"-চিত্রের নির্মাতারা তারই বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ করেছেন বলে প্রকাশ। নাম ভূমিকায় কমল মিত্রের অভিনয় তাঁর শিল্পী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে দাবী করা হচ্ছে। বিশ্বজিৎ ও রেবি রাণী নামে দুজন নতুন তারকাকেও দর্শকেরা আবিষ্কার করতে পারবেন এর মধ্যে। যেমন বিরাট কাহিনী, তেমনি বিশাল ছবিটির ভূমিকালিপি। দীপ্তি রায়, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, ভারতী, লীলা পাল, কেতকী, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস প্রভৃতিকে এর বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে। এমকেজি ইউনিটের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে। অনিল বাগচী সুরসৃষ্টি করেছেন।

* * *

আর একটি বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী ফুল্লরা ও কালকেতুর প্রণয়-উপাখ্যান নিয়ে তোলা হচ্ছে ন্যাশনাল থিয়েটার্সের "দেবী ফুল্লরা"। মুখ্য ভূমিকা দুটিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অসিতবরণকে দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, কালী সরকার, পদ্মা দেবী ও জহর রায় নির্বাচিত হয়েছেন। ছবিটির পরিচালনা ভার ন্যস্ত হয়েছে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর।

হীরেন বসু প্রোডাকসন্সের "নারদের সংসার"ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত হচ্ছে। বরাহ পুরাণে বর্ণিত "নারদের মায়াবাদ শিক্ষা" শীর্ষক অধ্যায় থেকে এর মালমসলা সংগ্রহ করা হয়েছে। নারদ শ্রীবিষ্ণুর প্ররোচনায় তাঁর একশো সন্তানকে নিয়ে ধরাধামে আসেন মানুষের জীবন যাপন করতে। তারই ওপর ব্যঙ্গের প্রলেপ দিয়ে আধুনিক সমাজের হাসি-কান্নাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা চলছে এই ছবিতে। এর পরিচালনা করছেন পঞ্চভূত। হীরেন বসু ছবিটির প্রযোজক।

* * *

"যাত্রী"র পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার নভেম্বরের শেষের দিকে তাঁর দলবল নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছেন আগ্রা, খাজুরাহো, উজ্জয়িনী এবং রাজপুতানার পথে। এর আগের বারে প্রায় দু'মাস ধরে ভারতবর্ষের পঞ্চাশটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গায় এঁরা সুটিং করে এসেছিলেন। এবারের সুটিং শেষ হলে "যাত্রী"র চিত্রগ্রহণ-পর্ব সমাপ্ত হবে। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকেই ছবিটির মুক্তি পাবার কথা।

অন্যান্য যে সব বাংলা ছবি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে, তাদের পুরোভাগে রয়েছে দেবকী বসুর "সাগর সঙ্গম", অগ্রদূতের "লালুভুলু", হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে", বিকাশ রায়ের "মরুতীর্থ হিংলাজ", প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "বিচারক" এবং বরুণ পিকচার্সের "জন্মান্তর"।

## নাট্যাভিনয়

### থিয়েটার সেণ্টারের নাট্যোৎসব

অন্যান্য বছরের মত এ বছরও থিয়েটার সেণ্টারের পঞ্চম বার্ষিক নাট্যোৎসবের প্রস্তুতি চলছে। এই কয়বছরের মধ্যে থিয়েটার সেণ্টার নানা ভাষার, নানা দলের উচ্চমানের নাটক পরিবেশন করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। নতুন দল, নতুন নাটক, নতুন শিল্পী খুঁজে বার করার ও তাদের সুযোগ দেবার কাজে থিয়েটার সেণ্টার বিশেষভাবে ব্রতী। এ বছরের নাট্যোৎসবেও কলকাতার দর্শক সমাজ অনেকগুলি নতুন নাটকের

সুষ্ঠু পরিবেশনে দেখতে পাবেন বলে আশা করা যায়।

উড়িষ্যার যে দলটি এবার একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তারা বাঙলাও অন্য ভাষায় আরও দু'একটি নামকরা দল অন্য প্রদেশ থেকে আসার কথা আছে। নব নাট্য আন্দোলনে বাঙলার স্থান যে পুরোভাগে তা থিয়েটার সেণ্টারের এই নাট্যোৎসবে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে।

অনেক উৎসাহী নতুন দল এই নাট্যোৎসবে যোগদান করতে চান, কিন্তু অনেক সময় পরিচয় না থাকার জন্য আবেদন করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাঁদের অবগতির জন্যে থিয়েটার সেণ্টারের পক্ষ থেকে শ্রীতরুণ রায় জানাচ্ছেন, যোগদানেচ্ছু দলেরা যেন অবিলম্বে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নাটকের প্রদর্শনী বা মহড়া দেখে নাটক নির্বাচন করা হবে। নাটকগুলি নতুন এবং আধুনিক মঞ্চ পরিকল্পনার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। আবেদন পত্রের সঙ্গে নাটকের সারাংশ পাঠানো দরকার। অভিনয়-কাল আড়াই ঘণ্টার বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

# বিবিধ সংবাদ

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের ফিল্মস ডিভিসন যে প্রামাণ্য চিত্রটি তুলেছেন, তা গত শুক্রবার থেকে কলকাতায় দেখানো হচ্ছে। এই মহান জীবনের মূল ঘটনাগুলি যে শ্রদ্ধা ও সংযমের সঙ্গে এর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল যথাক্রমে তপন সিংহ ও পীযূষ বসুর ওপর। এ'রা দুজনেই প্রামাণ্য ছবি তোলার ব্যাপারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ লণ্ডনে যে সব জায়গা ও প্রতিষ্ঠান জগদীশচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে জড়িত সেখানকার দৃশ্যাবলী। মূল ছবিটির দৈর্ঘ্য চার হাজার ফুট। তারই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাধারণ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে।

*

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ স্টুডেণ্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে গত সপ্তাহে (২৭শে থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত) তিনদিনব্যাপী একটি চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশের প্রামাণ্য চিত্র এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। সেই সঙ্গে তিনদিনে তিনখানি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিও দেখানো হয়। ভারতীয় ডকুমেণ্টারি চিত্রও এই উৎসবের আকর্ষণ বাড়িয়েছিল। ছাত্রদের পরিচালনায় এই ধরণের উৎসব এদেশে সম্ভবত এই প্রথম। উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

*

নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে নিয়ে চারদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। ১১ই থেকে ১৪ই ডিসেম্বর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ১১ই ও ১৪ই "মাইকেল মধুসূদন" অভিনীত হবে, ১২ই ও ১৩ই যথাক্রমে "ষোড়শী" ও "বিজয়া" মঞ্চস্থ করা হবে। প্রত্যেকটির মুখ্য ভূমিকায় নাট্যাচার্য স্বয়ং মঞ্চাবতরণ করবেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এ'দের অভিনয়ের আসর বসবে প্রতিদিন সন্ধ্যায়।

*

আগামী রবিবার (৭ই ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় মার্বল প্যালেসে (৪৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট) রবীন্দ্র সঙ্গীত সংসদের গুণীজন-সম্বর্ধনা-কার্যক্রম অনুসারে রবীন্দ্র সঙ্গীতাচার্য শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। কয়েকজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

*

আগামী ২০শে ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র নিবাস হলে রূপক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "থানা থেকে আসছি" নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। পরিচালনা করবেন পার্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

বার বার ব্যর্থতার পর ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেলের বুকে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হবার পর ভারতের অটুট মনোবলসম্পন্ন বীর সাঁতারু মিহির সেনকে অভিনন্দন জানিয়ে যখন লিখেছিলাম ব্রজেন দাশের চেয়ে মিহির সেনের চ্যানেল অতিক্রমের কৃতিত্ব বেশী গৌরবজনক এই কারণে যে, ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হবার চেয়ে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে চ্যানেল পার হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য তখন 'দেশের' এক অত্যুৎসাহী পাঠক পত্রযোগে প্রকারান্তরে আমাকে ধাপ্পাবাজ বলতে কসুর করেননি। তিনি লিখেছিলেন....."নিজেদের দেশের মিথ্যা গুণগান করতে গিয়ে পাঠক সমাজকে যতই ধাপ্পা দিন তাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এইটুকু বিচার করবার ক্ষমতা আছে, যিনি ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডের সোজা পথ অতিক্রম করতে গিয়ে পাঁচবার ব্যর্থকাম হয়েছেন তিনি করবেন এক 'চান্স' ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত কঠিন পথ অতিক্রম? সুতরাং এতেই বোঝা যাচ্ছে মিহির সেন যে পথ অতিক্রম করেছেন সেই পথই সহজ এবং সরল।.....আপনি বোধহয় ভেবেছেন দেশ-শুদ্ধ লোকের সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই জোর গলায় ধাপ্পা দেবার সুযোগ খুঁজছেন। জানবেন কেউ আপনার কথা মেনে নেয়নি। আমি একজন পশ্চিমবঙ্গীয় এবং ভারতীয় নাগরিক। তবু এই মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে পারলাম না....."। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পত্রলেখক শ্রীমদনচন্দ্র দেবকে আমি জানাতে চাই ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেলের বুকে সাঁতার কেটে পার হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য এই মন্তব্য আমি লিখেছিলাম 'রয়টারের' পরিবেশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে। এতে ধাপ্পার কি আছে? তাই অত কড়া ভাষা ব্যবহার না করলেই বোধহয় ভাল হত। ইংলিশ চ্যানেল সম্বন্ধে সত্যিই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। বিভিন্ন পুঁথিপত্র ঘেঁটে এবং সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ থেকে যে রসদ পেয়েছি তাই সরবরাহ করেছি পাঠকদের কাছে। আর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের পর পাকিস্তানের বাঙালী সাঁতারু ব্রজেন দাশকে যেমন অভিনন্দন জানিয়েছি ঠিক তেমনই অভিনন্দন জানিয়েছি ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনকে। সম্ভবত শ্রীদেবের স্মরণ আছে এক জায়গায় আমি বলেছি কৃতিত্ব কারোরই কম নয় এবং দুই সন্তরণ বীরই ভারত, পাকিস্তান তথা সারা এশিয়াবাসীর অভিনন্দনের পাত্র।

• • •

যাই হক, এখন কথা হচ্ছে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত চ্যানেলের বুকে সাঁতার কাটা বেশী কষ্টসাধ্য এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে পত্রলেখক আমার মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যদিও শ্রীমিহির সেন কলকাতায় এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কাটার চেয়ে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কাটা অধিকতর কষ্টসাধ্য তবু আমার সন্দেহের নিরসন হয়নি। শ্রীমিহির সেন বলেছেন ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কেটে যারা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ৫০, আর ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হয়েছেন মাত্র ১১ জন সাঁতারু। সময়ের দিক দিয়েও ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে পৌঁছুতে অনেক বেশী সময় লেগেছে। দুই দিকের সাঁতারের রেকর্ডের মধ্যেও আছে যথেষ্ট পার্থক্য। যারা দু'দিক থেকে অর্থাৎ ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে সাঁতার কেটে পৌঁছেছেন তাঁদেরও শেষোক্ত পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে অনেক বেশী। এই বিষয়ে শ্রীসেন কয়েকটি উদাহরণ দিতেও কসুর করেননি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সংবাদপত্রে শ্রীসেনের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমস্ত তথ্য অভ্রান্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তা ছাড়া বেশী সংখ্যক সাঁতারু ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কেটেছেন আর তাদের সময় কম লেগেছে এই জন্যই ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কাটতে অধিকতর কষ্টসাধ্য এ যুক্তি মেনে নেব কি ভাবে? এর ভিতরে তো এ কথাও বলা যায় যেহেতু ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কাটার একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতা আছে এবং এতে অংশ গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও খরচ কম সেহেতু এই পথেই বেশী সাঁতারু চ্যানেল জয় করেছেন। সাধারণত ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত যাঁরা সাঁতার কাটেন তাঁদের চেষ্টা থাকে একক এবং বিক্ষিপ্ত। অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও বালাই থাকে না। কিন্তু মিঃ বিলি বাটলিন প্রযোজিত ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত বার্ষিক সাঁতারু প্রতিযোগিতায় থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন, আর প্রথম স্থান লাভ করে অর্থ ও সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং এই পথ অতিক্রমের জন্য সাঁতারুদের অধিকতর আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। যেখানে আগ্রহ বেশী, প্রতিযোগীর সংখ্যাও বেশী সেখানে সময় উন্নত হওয়াও স্বাভাবিক।

যারা একাধিকবার দু'দিক দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তাঁদের সময়ের একটা তুলনামূলক হিসাব দিয়ে শ্রীমিহির সেন দেখাতে চেষ্টা করেছেন ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কাটা বেশী কষ্টসাধ্য। কিন্তু যাঁদের ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কাটার সময়ের চেয়ে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে সাঁতার কেটে আসতে বেশী সময় লেগেছে শ্রীসেন তার উল্লেখ করেননি। যেমন গ্রেট ব্রিটেনের ফিলিপ মিকম্যান। ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কাটতে মিকম্যানের লেগেছিল ২৩ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট আর



সাঁতারু মিহির সেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রশংসাপত্র দেখাচ্ছেন

ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হয়েছেন ১৮ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে।

*হয়তো ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার* কাটা সাঁতাই অধিকতর কষ্টসাধ্য। কিন্তু কিজন্য কষ্টসাধ্য, কোন পথে কতটুকু সুবিধা অসুবিধা আছে তার টেকনিক্যাল তথ্যই আমরা জানতে চাই। এশিয়ার প্রথম সাঁতারু হিসাবে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত যিনি সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেলকে জয় করেছেন সেই বীর সাঁতারু মিহির সেনের কাছ থেকে আমরা সেই বিবরণই জানতে চাই।

আরও একটি কথা, দেশে ফেরবার পর চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু মিহির সেন বহু অনুষ্ঠানে বীরের সম্মান লাভ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে সবাই তাঁকে জানিয়েছেন সাদর সম্ভাষণ। তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবারও ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার বিশিষ্ট সাঁতারু প্রতিষ্ঠান সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে ও শ্রীব্রজেন দাশকে এক সঙ্গে সম্বর্ধনা করবার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীসেন কোনো এক রহস্যজনক কারণে সেই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত না হয়ে উৎসাহী দর্শনার্থীদের নিরাশ করেছেন, সম্বর্ধনা সভার উদ্যোক্তাদেরও মনে কষ্ট দিয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল জয় করে যিনি জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেছেন তার কাছ থেকে এই ব্যবহার কেউ আশা করেনি।

• • •

ভারত সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯ জনের খেলোয়াড় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইতিপূর্বে দেশের পাতায় প্রকাশ করা



সোনী রামাধীন

হয়েছে, এই সপ্তাহে আরও চারজনের পরিচয় দেওয়া হল:—

### সোনী রামাধীন

বিশ্ববিখ্যাত স্পিন বোলার সোনী রামাধীনের পূর্বপুরুষ একদিন ভারতের অধিবাসী ছিলেন। পিতৃপুরুষের দেশে রামাধীন ইতিপূর্বে দু'বার সফর করেছেন। প্রথমবার তিনি আসেন ১৯৫০-৫১ সালে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার আসেন ১৯৫৩ সালে সাগরপারের রজত-জয়ন্তী দলের সঙ্গে। রামাধীনের বয়স এখন ২৮ বছর। জন্ম ১৯৩০ সালের মে মাসে। রামাধীন ত্রিনিদাদের খেলোয়াড়। গত কয়েক বছর ইংলণ্ডে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবেও খেলেছেন। ১৯৫০ সালে দু'টি ট্রায়াল ম্যাচে ১২টি উইকেট দখল করে রামাধীন সেই বছর ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে স্থান পান এবং ইংলণ্ডে তার বিপুল সাফল্য অচিরেই তাকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়। ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে তার বোলিং নৈপুণ্য ইংলণ্ডের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এবং প্রধানত রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের বোলিংয়ের কৃতিত্বের জন্যই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল 'রাবার' লাভ করেছিল। এই বছর ইংলণ্ডে তিনি উইকেট পিছু ১৪.৮৮ রানের হিসাবে মোট ১৩৫টি উইকেট পান। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত সফরে লাভ করেন ৭৯টি উইকেট, ভারতে পরের বার পান ৪৬টি উইকেট। ১৯৫১-৫২ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরে রামাধীন ২৯টি এবং ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড সফরে ১১৯টি উইকেট দখল করেছেন। ভারতে আসার পূর্ব পর্যন্ত ৩৩টি টেস্ট খেলায় রামাধীন মোট লাভ করেছেন ১২৭টি উইকেট (২৯.৪১ গড়)।

রামাধীনের বোলিংয়ের বৈশিষ্ট্য তিনি দুই দিকেই বল ঘোরাতে পারেন। তার হাত ঘোরানো দেখে ব্যাটসম্যানদের পক্ষে বোঝা শক্ত বলটি কোনদিকে যাবে। বিশেষ করে ইংলণ্ডের মাটিতে রামাধীন সত্যই ব্যাটসম্যানদের ভীতি সঞ্চারক।

### গারফিল্ড সোবার্স

টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত রান করার কৃতিত্বে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কীর্তিমান খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্সের ক্রিকেট বিশ্বে বেশী জুড়ি নেই। সুতরাং তার খেলা দেখার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। বিশ্বের ক্রিকেট পণ্ডিতদের অভিমত সোবার্স এখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যাটা ব্যাটসম্যান।



গারফিল্ড সোবার্স

ক্রিকেট ক্ষেত্রে সোবার্সের প্রথম প্রতিষ্ঠা কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসাবে নয়—বোলার হিসাবে। সোবার্সের বয়স এখন ২২ বছর। যখন সোবার্সের বয়স মাত্র ১৬ বছর তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতের বিরুদ্ধে ইনি বারবাডোজ দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পান এবং ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথম টেস্ট খেলায় অবতীর্ণ হন। কিংসটন মাঠে ইংলণ্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ টেস্ট খেলায় আহত ভ্যালেণ্টাইনের জায়গায় সোবার্সকে স্থান দেওয়া হয়। এই টেস্টে ন্যাটা বোলার সোবার্সের বোলিংয়ের হিসাব হয় ২৮.৫-৯-৭৫-৪। কিন্তু আজ অসামান্য ব্যাটিং-প্রতিভার জন্য সোবার্স যে একজন ভাল বোলার ছিলেন একথা লোকে ভুলে গেছে।

এই বছরের প্রথমদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

সফরকারী পাকিস্থান দলের বিরুদ্ধে সোবার্স যেভাবে ব্যাটিং করেছেন তার তুলনা বিরল। বারবাডোজের সংগে পাকিস্থানের খেলায় সোবার্স ১৮৩ রানে নট আউট থাকেন এবং পরে টেস্ট খেলায় পর পর করেন ৫২; ৫২; ৮০ ও ৩৬৫ নট আউট; ১২৫ ও ১০৯ নট আউট; ১৪ এবং ২৭। ফলে পাঁচটি টেস্ট খেলায় সোবার্সের সংগৃহীত হয় ৮২৪ রান। একমাত্র ওয়ালকট ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্য কোন খেলোয়াড় এক পর্যায়ের টেস্ট খেলায় এত রান সংগ্রহ করতে পারেননি। ১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ালকট ৮২৯ রান করেছিলেন।

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট খেলায় সোবার্সের ৩৬৫ রান করে নট আউট থাকার কৃতিত্ব টেস্ট খেলার ইতিহাসের এবং সোবার্সের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের ওভ্যাল মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬৪ রান করে বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় লেন হাটন টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন দীর্ঘ ১৯ বছর পরে সোবার্স সেই রেকর্ডকে ম্লান করে দেন। এই টেস্ট খেলায় হাণ্টের সংগে একত্রে ৪৪৬ রান করেও সোবার্স ও হাণ্ট উইকেট-জুটির বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হন।

১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড সফরে সোবার্স প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১৬৪৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। ইংলণ্ডে টেস্ট খেলায় অবশ্য সোবার্স কোন সেঞ্চুরী করতে পারেননি, কিন্তু টেস্টে সর্বমোট ৩২০ রান সংগ্রহ করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের মধ্যে তার স্থান ছিল তৃতীয়। নটিংহাম দলের বিরুদ্ধে ২১৯ রানে নট আউট থাকার কৃতিত্ব সমেত সোবার্সের তিনটি খেলায় সেঞ্চুরী এবং ৩৭টি উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সোবার্স নিপুণ হাতে উইকেটের চারিদিকে বল মেরে খেলে দর্শকদের আনন্দ দেন। বিভিন্ন মারের মধ্যে এর 'কভার ড্রাইভ' এবং 'হুক' দর্শকচোখের তৃপ্তিদায়ক। স্লিপ ফিল্ডসম্যান হিসাবেও সোবার্সের খ্যাতি আছে।

### ওয়েসলী হল

বারবাডোজের খেলোয়াড় ওয়েসলী হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলারদের অন্যতম। উইকেট কিপার এবং ব্যাটসম্যান হিসাবেই হল প্রথম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার বোলিংয়ে হাত খুলে যায় এবং ফাস্ট বোলার হিসাবে অল্পদিনের মধ্যে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে হল বোলার হিসাবে স্থান পান এবং ৩৩·৫৫ রানে একটি করে



ওয়েসলী হল

উইকেট লাভের হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় লাভ করেন ২৭টি উইকেট।

ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে হলকে প্রথম গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু দলের সংখ্যা বাড়িয়ে যখন ১৭ করা হল তখন হল দলে পড়লেন। ভারতে এসে হল অবশ্য ভালই খেলছেন। প্রথম টেস্ট খেলাতেই বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। ওয়েসলী হলের বয়স মাত্র ২১ বছর। জন্ম ১৯৩৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর।

### জন হেণ্ড্রিকস

জামাইকার ২৬ বছর বয়স্ক খেলোয়াড় জন হেণ্ড্রিকস একজন ভাল উইকেট কিপার হলেও জামাইকার দলে আর দুজন খ্যাতনামা উইকেটকিপার থাকায় হেণ্ড্রিকস নিজ নৈপুণ্য দেখাবার তেমন সুযোগ পাননি। জামাইকার অপর দু'জন উইকেট কিপার হচ্ছেন ভারত সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার ও এ পি বিনস্। যাই হক তবুও উইকেট রক্ষার জন্য যখনই হেণ্ড্রিকসের ডাক পড়েছে তখনই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। উইকেট রক্ষায় কৃতিত্ব ছাড়া হেণ্ড্রিকসের ব্যাটিংয়েও দক্ষতা আছে। গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সিনিয়র কাপের খেলায় তিনি ইনিংসে পিছু ৫৪·৭২ রান করার হিসাবে মোট ৬০০ রান সংগ্রহ করেছেন। হেণ্ড্রিকস ভারতে এসেছেন আলেকজাণ্ডারের সাহায্যকারী উইকেট রক্ষক হিসাবে। ইনি একজন ইন্সিওরেন্স বিভাগের কর্মী।



জন হেণ্ড্রিকস

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৪শে নবেম্বর—শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী অদ্য লোকসভায় বলেন যে, শিক্ষাকেন্দ্রের কলেজসমূহে বাধ্যতামূলক শ্রম সমাজসেবা প্রবর্তন সম্পর্কে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৫৭-৫৮ সালের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহে যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতেছে, শূন্যপদের তুলনায় উহার সংখ্যা অত্যধিক বেশী। বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য করেন তাহাতে বুঝা যায় যে সাধারণ মান ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে।

২৫শে নবেম্বর—অদ্য কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের বিশেষ সভায় প্রদেশ কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং তাঁহার শূন্যপদে বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রদেশ কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত হন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনিতা ১৯৬০ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সমাপনান্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ভারতে চলিয়া আসিতেছে। তৎপূর্বে তাহার স্বল্পকালের জন্য একবার ভারতে সফর করার প্রস্তাবও আছে।

২৬শে নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতোমধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন প্রধান প্রধান বাজারে ৪২টি মাছের দোকান বা মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই সকল দোকান হইতে আগামীকল্য বৃহস্পতিবার হইতে এক টাকা সের দরে মাছ পাওয়া যাইবে।

বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে দুইটি বড় বড় কাঠের কারখানা নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলিকাতায় যে কয়টি বড় বড় অগ্নিকাণ্ড হয় ইহা তন্মধ্যে অন্যতম। ১৫খানা দমকলের প্রাণপণ চেষ্টায় আগুনকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়।

২৭শে নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পুনরায় বলেন যে, আগামী বৎসরের জুলাই মাসের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির পরিচালনা এবং "ডোল" দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

আজ লোকসভায় তিন ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা ও হট্টগোলের পর মুক্ত স্বতন্ত্র সদস্য শ্রী এম আর মাসানী কর্তৃক কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকসভার কয়েকজন সদস্যের নামে কুৎসা রটনার অভিযোগ সম্পর্কে আনীত প্রস্তাবটি অধিকার রক্ষা কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ১৩৮—৩২ ভোটে গৃহীত হয়।

২৮শে নবেম্বর—রাশিয়া হইতে উপহার হিসাবে প্রাপ্ত কয়েকটি দুর্মূল্য চক্ষু চিকিৎসার যন্ত্রপাতি অব্যবহার্যভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সে ফেলিয়া রাখায় উহার ভিতরে ছাতা গজাইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ যন্ত্রগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ঘনিষ্ঠ মহল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অদ্য জানাইয়াছেন যে, আগামী ৮ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, উইমেনস্ কলেজ, কলেজ অব মিউজিক অ্যাণ্ড ফাইন আর্টস নামক ৬টি প্রতিষ্ঠান খুলিবে।

২৯শে নবেম্বর—অদ্য লোকসভায় সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বলেন যে, ভারত সরকারের পরামর্শানুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সহিত সীমান্তের কোন কোন অঞ্চল এলাকা বিনিময়ের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। নেহরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী এই বিনিময়ের তারিখ স্থির হইয়াছে। র‍্যাডক্লিফ ও বাগে রোয়েদাদানুযায়ী এই এলাকাগুলি স্থির হইয়াছিল।

অদ্য লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বিরোধীপক্ষের সমালোচনার বিরুদ্ধে জীবনবীমা কর্পোরেশনের লগ্নীনীতি সমর্থন করিয়া সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, কর্পোরেশন শেয়ার বাজারে যথারীতি লগ্নী করিতে থাকিবে।

একে একে রেলওয়ের সকল বিভাগে দুর্নীতি প্রকাশ পাইতেছে। জানা গিয়াছে যে, ইস্টার্ন রেলওয়ের কয়লাঘাটস্থিত চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে ক্লেমস প্রেসাররা নাকি মিথ্যা টি এ বিল দাখিল করিয়া রেলওয়ের বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য অপরাহ্নে পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১১ ফুট উচ্চ এক ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

অদ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আপার সার্কুলার রোডস্থিত বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রাঙ্গণে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সপ্তাহকালব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আচার্যদেবের জন্মশতবার্ষিকীর প্রতীকরূপে সভামণ্ডলে এক শতটি দীপবর্তিকা প্রজ্বলিত করা হয়।

## বিদেশী সংবাদ

২৪শে নবেম্বর—করাচীতে গ্রীসের অস্থায়ী কন্সাল জেনারেল স্পাইরস প্যাকসিনোস আজ ভোরে তাঁহার ফ্ল্যাটে ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন। এখন পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই।

ব্যাংকের হিসাব প্রস্তুত করিয়া উহা টাইপ করা, ঠিকানা লেখা এবং আমানতকারীকে সে হিসাব জানাইয়া দেওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক আজ রোমে চালু হইয়াছে।

ফরাসী সুদান রিপাবলিক পরিষদ আজ সর্বসম্মতিক্রমে ফরাসী-সুদানকে ফরাসীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে। ফরাসী-সুদানই ফরাসী আফ্রিকায় প্রথম প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

২৫শে নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ষপঞ্জী এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস স্মারক পুস্তিকার অন্তর্গত একটি মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরকে শুধু যে ভারতের অন্তর্গত করা হয় নাই তাহাই নয়, উহা পাকিস্তানের অন্তর্গত করিয়া দেখান হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আদালতগুলি প্রবর্তন করা হইয়াছে বলিয়া আজ লাহোর ও করাচীতে সরকারী ঘোষণা করা হয়।

গ্রীস গতকল্য সাইপ্রাসের স্বাধীনতার দাবী অনুমোদন করিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু বৃটেন তৎক্ষণাৎ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যে, এ ধরনের কিছু করিলে সাইপ্রাসে গৃহযুদ্ধ বা তদপেক্ষাও খারাপ কিছু শুরু হইবে।

২৭শে নবেম্বর—রাশিয়া অদ্য প্রস্তাব করিয়াছে যে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিম বার্লিনকে উহার নিজস্ব গভর্নমেণ্টের অধীনে একটি অসামরিকীকৃত স্বাধীন নগরীতে পরিণত করা হউক। রুশ নিয়ন্ত্রিত পূর্ব বার্লিনকে "পূর্ণ সার্বভৌম অধিকারসহ" সম্পূর্ণভাবে পূর্ব জার্মানদের হস্তে অর্পণ করা হইবে বলিয়াও সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করেন।

২৮শে নবেম্বর—আজ এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খান বলেন যে, কাশ্মীর ও খালের জল লইয়া ভারতের সঙ্গে যে বিরোধ চলিতেছে তাহার সঙ্গে পাকিস্তানের নিরাপত্তা তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন পর্যন্ত জড়িত।

২৯শে নবেম্বর—আমেরিকা অদ্য প্রথম তাহার ৬৩০০ মাইল পাল্লার একটি "অ্যাটলাস" শ্রেণীর আন্তর্মহাদেশীয় বকুগতি ক্ষেপণাস্ত্র আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। চেষ্টাটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অ্যাটলাসের নির্মাতারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৮৫ ফুট দীর্ঘ এবং ১০০ টন ওজনের রকেটটি উহার পাল্লার শেষপ্রান্তে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—খালের জল সম্পর্কে ভারত পাকিস্তান বিরোধ মীমাংসার জন্য ওয়াশিংটনের আলোচনায় পাক প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী জি জৈনুদ্দিন গতকল্য লণ্ডনের পথে ওয়াশিংটন যাত্রা করিয়াছেন। বিমানঘাটিতে সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন যে, বর্তমান আলোচনা অন্তবর্তীকালীন, উহাতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

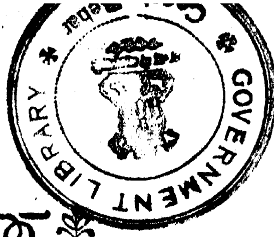
সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
[illegible]পাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।




# সূচীপত্র

# সূচীপত্র




# সূচীপত্র



প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

# শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের

## রচনাবলী

নূতন প্রকাশিত হইল

**Theory of Vibration Rs. 2|-**

This treatise deals with how creation is evolved out through modes of vibration of atoms out of Energy. The working of fine nerves through which Divinity is reached and many other subtle subjects are discussed in this book in scientific way.

**গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান** ৫৲

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ২য় সং ২·৭৫ ন. প.
২য় খণ্ড ২য় সং ২·৭৫ ন. প.
২। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ৩৲
৩। শ্রীমৎ নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান
২য় সং ... ৫০ ন. প.
৪। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ... ৫০ ন. প.
৫। দীন মহারাজ ... ৫০ ন. প.
৬। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ... ১৲
৭। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) ৭৫ ন. প.
৮। বদরীনারায়ণের পথে ... ২·২৫ ন. প.
৯। সঙ্গীতের রূপ ১·৫০ ন. প.
১০। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান ... ... ২৲
১১। Natural religion Rs. 1|-
১২। Energy Rs. 1|-
১৩। Mind Rs. 1|-
১৪। Principles of Architecture Rs. 2|8|-
১৫। Lectures on Status of toilers Rs. 2|-
১৬। Homocentric civilization Rs. 1|8|-
১৭। Lectures on Education Rs. 1|4|-
১৮। Federated Asia Rs. 4|8|-
১৯। National Wealth Rs. 5|8|-
২০। Nation Rs. 2|-
২১। New Asia Rs. 1|-
২২। Rights of Mankind Rs. -|8|-

**মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি**
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট :
কলিকাতা-৬

জাতীয় স্বার্থে কলিকাতার ইণ্ডিয়া ও দেশবন্ধু হোসিয়ারী মিলস ও ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞাপিত।

(সি ৯৪৫৫)

# গাঙ্গুরামের গৌরব!

## শ্রীনেহরুকে উপহার

## নলেন গুড়ের সন্দেশ



গত ৩০।১১।৫৮ ইং তারিখে কলিকাতায় খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে **"গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স"**-এর তরফ হইতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে **নলেন গুড়ের সন্দেশ** ও **ছানার পায়েস** উপহার দেওয়া হয়। এই সমস্ত মিষ্টান্নের উৎকর্ষতায় তিনি পরিতৃপ্ত হন।

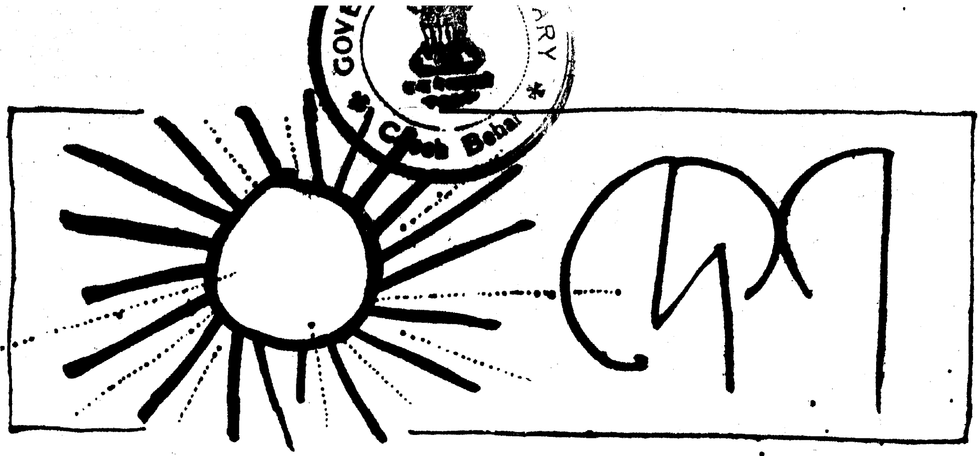
## "নলেন গুড়ের সন্দেশ"

**বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পের গৌরব।**

# গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স

ভবানীপুর ও কালীঘাট, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭—২৩৭৭




DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 13th December, 1958

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

## যুগসমস্যা

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে নেহরু-চরিত্রের ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। নেহরুর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলি একপ্রকার স্বগতোক্তি। এ বক্তৃতাটিও প্রায় তাই। প্রায় এইজন্য যে ইহা যুগপৎ স্বগত ও পরগত উক্তি, শ্রোতা ও বক্তা নিজে, উভয়েই এই ভাষণের লক্ষ্য।

নেহরুর মন সর্বদা বহু ও বিরুদ্ধ দিক্‌গামী পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। এই সমস্ত পক্ষের সামঞ্জস্য সন্ধানে তিনি সতত নিযুক্ত। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও নৈতিক বুদ্ধি, সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তি, আন্তর্জাতিকতা ও প্রাদেশিকতার মিশ্র উপাদানে গঠিত। ইতিহাসের বিশেষ বিবরণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও বলা যায় যে, আগের আর কোন যুগে এমন চিন্তা-সঙ্কট বোধ করি দেখা যায় নাই। সে-সব যুগে মানুষের পথ সরল ও সহজ ছিল। কিন্তু সে সহজ সুগম পথের দিন চিরকালের মত অপগত। এখন মানুষের সম্মুখে অনেকগুলি স্বতোবিরুদ্ধ পথ উপস্থিত। ফলে মানুষ আজ বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির হাত হইতে এ যুগের কোন মানুষ মুক্ত নয়। সকলেই অল্প-বিস্তর অন্ধভাবে হাতড়াইয়া মরিতেছে। আর যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি পথের দিশা পাইয়াছেন তাঁহারাও অন্য কারণে বিভ্রান্ত। জনসাধারণকে চালিত করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের, কিন্তু পূর্বসংস্কার-ভারে পীড়িত মন্থর মানুষ স্বেচ্ছায় যুগ-বর্ত্মের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে নারাজ। ইহাই যুগবর্ত্ম সচেতন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বিভ্রান্তির কারণ।

বর্তমান যুগ মানুষের হাতে বিজ্ঞানের ব্রহ্মাস্ত্র দান করিয়াছে, অসীম তাহার সম্ভাবনা। আবার অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে, মানুষের নৈতিক বুদ্ধিতে আজ ভাটা শুরু হইয়া গিয়াছে। আর তাহারই অপরিহার্য পরিণাম বিজ্ঞানের ধ্বংসকারিতার দিকে মানুষের ঝোঁক। বলা বাহুল্য ইহা বিষম আশঙ্কার। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন যে, মধ্যযুগে মানুষ প্রেম ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় করিতে না পারায় পীড়িত ও উৎসাহিত হইয়াছে, তখন ছিল জ্ঞানের কমতি। তাঁহার মতে বর্তমান যুগের বিপদটা আসন্ন উল্টা পথে। এখন মানুষ জ্ঞানে অগ্রণী, প্রেম পিছাইয়া পড়িয়াছে। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও হানাহানি আর থামিতে চাহিতেছে না। নেহরুও ঠিক ওই কথাই বলিয়াছেন, কিছু ভাষান্তরে। বিজ্ঞানের কাছে আজ নৈতিকবুদ্ধি হীনবল।

তারপরে সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সমস্যার দ্বন্দ্ব। সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয়, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জীবন। বর্তমান যুগে প্রায় সমস্ত দেশই কোন না কোন ধরনের সমাজতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যাহারা নামে স্বীকার করে নাই তাহারাও কার্যতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন সমস্যা হইতেছে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের সীমানা সম্পর্কে। নিয়ন্ত্রণের সীমা কোথায় টানা হইবে? কতখানি নিয়ন্ত্রণ সর্বজনীন কল্যাণ-সাধক? অথচ ব্যক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িবে না। স্বকীয় মাহাত্ম্যে ও শক্তিতে বিরাজমান থাকিবে। এখন পর্যন্ত সভ্য রাষ্ট্রগুলি সেই সীমারেখাকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে মনে হয় না। কোন দেশে একদিকে বাড়াবাড়ি, কোন দেশে অন্যদিকে। কোন দেশে একখানি বই প্রকাশের স্বাধীনতা নাই, আবার কোন দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগে মুনাফা লুঠয়ার চরম। তবে কোথায় সীমা? এই স্পৃহনীয় সীমায় সভ্য জগৎ সুস্থির না হইতে পারা অবধি "পূর্ব ও পশ্চিমের" দ্বন্দ্ব মিটিবে বলিয়া তো মনে হয় না।

সর্বশেষে আন্তর্জাতিক ও প্রাদেশিক বুদ্ধির দ্বন্দ্ব। নানা কার্য কারণের ফলে এ যুগের মানচিত্র হইতে প্রাচীন ভৌগোলিক সীমাগুলি মুছিয়া যাইবার মত হইয়াছে। অথচ মানুষের মন আজিও প্রাচীন সীমান্ত রেখায় চিহ্নিত। চিন্তায় মানুষ আজ আন্তর্জাতিক, সংস্কারে প্রাদেশিক। ফলে তাহার মনে চিন্তা ও সংস্কার নিত্য দ্বন্দ্ব করিয়া ফিরিতেছে। পূর্বসংস্কারের পরিসমাপ্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কী উপায়? আগের দুটি সমস্যার সমাধানেরই বা কী উপায়?

নেহরু বলিয়াছেন, চিন্তায় যদি মানুষ নির্ভীক হয়, কর্মে যদি মানুষ নিঃস্বার্থ হয়, আর দেশ-প্রেমে যদি তাহার মন উদ্বুদ্ধ হয়, তবেই এই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। অনেকে বলিবেন, এসব তো পুরাতন কথা। পুরাতন কথা নিঃসন্দেহে। কিন্তু জীবনের সমস্ত মহৎ সত্যই যে পুরাতন। পুরাতন বলিয়া অগ্রাহ্য না করিয়া সাদরে গ্রহণ করা উচিত—এসব পুরাতন আজ পুরাতন বলিয়াই পরীক্ষিত। নির্ভীক নিঃস্বার্থ প্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়; কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নয়—এই বহুপরীক্ষিত অভিজ্ঞতাটি শ্রীনেহরু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তথা সমগ্র দেশের নরনারীর কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পন্থা দুর্গম কিন্তু গোড়াতেই তো বলিয়াছি যে, এ যুগের পথ সুগম নয়।

# প্রসঙ্গত

কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায় সফল হলে আগামী মাসেই পুনর্বাসন মহাকাহিনীর দণ্ডকারণ্য কাণ্ড শুরু হবে। সরকারী ঘোষণায় উদ্বাস্তু-হিতৈষীরা পরোয়ানা-জারীর মনোভাব দেখেছেন। দণ্ডকারণ্য এখনও তাঁদের চোখে বনবাসের হুকুমের শামিল। ছোট-বড় নানা সভা-সমিতিতে বারবার তাঁদের সন্দেহ-কুটিল দৃষ্টি দেখেছি, সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠ শুনেছি। সরকারকে তাঁরা বলছেন, সাবধান! উদ্বাস্তু-শিবির উঠিয়ে দিলে ফল ভাল হবে না। অবশ্য সর্বশেষ খবর পড়ে অনুমান করছি, তাঁদের সুর অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে, নেত্রও পূর্বের মত রোষ-কষায়িত নয়।

সরকারকে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে কি ফাড়তি জমি নেই, যেখানে উদ্বাস্তুদের বাঙালীত্ব বজায় রেখেই পুনর্বাসন সম্ভব? সরকার স্বীকার করেছেন, কিছু আছে। পঁয়ত্রিশ হাজার একর পতিত জমি আছে, উদ্ধার করতে পারলে সেখানে বড়জোর হাজার দশেক পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তার পরেও আরও হাজার হাজার উদ্বাস্তু বাকী থেকে যাবে। এবার প্রশ্ন হল, তাঁদের জন্য নতুন শিল্প গড়ে তুলতে ক্ষতি কী। সরকার পূর্ববৎ ধীর গলায় বললেন, ক্ষতি কিছু নেই, কিন্তু শিল্প-সংগঠন তো মন্ত্রবলে রাতারাতি হবার নয়। তাছাড়া উদ্বাস্তুদের একটা বৃহদংশ যে কৃষিজীবী ছিল, তাও স্মরণ রাখতে হবে। আর তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করি যে, বাংলা দেশেই কৃষি ও শিল্পের আশ্রয়ে আপাতত সব উদ্বাস্তুর সমস্যার সুরাহা করা যাবে, তবু আখেরের কথাটা আগে-ভাগেই ভেবে রাখা ভাল। পশ্চিমবঙ্গ বলতে তো নিতান্তই কয়েক বিঘে জমি। আমাদের এই রাজ্য-তরীটি যে নিতান্তই ছোট। কয়েক দশকের মধ্যেই জনসংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে, কিন্ত বাঙলার সীমানা বাড়বে না, প্রতিবেশী রাজ্য থেকে সূচ্যগ্র মেদিনীও মিলবে না। সেই অন্ধকূপের রূপ কল্পনা করা কঠিন নয়। অতএব আজ হোক, কাল হোক, একদিন ঘর ছেড়ে ছড়িয়ে পড়তেই হবে। আজ যূথবদ্ধতার সুবিধা আছে, সরকারের আনুকূল্য আছে, সেদিন হয়ত থাকবে না। আরেকটি আশংকা—যা আপত্তি-[illegible] উচ্চারিত হয়েছে—প্রবাসী বাঙালীর সংস্কৃতি আজ সর্বত্র বিপন্ন, অরণ্যবাসে তা নিশ্চিহ্ন হবে। অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যের বাঙালী আর বাঙালী থাকবে না। ক্ষুদ্র দলের পক্ষে হয়ত সত্য, কিন্তু অধিক সংখ্যার বড় দলের পক্ষে এ-আশংকা অমূলক। বেতিয়ার বিপত্তি নিশ্চয়ই দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত ধাওয়া করবে না। দণ্ডকারণ্যের দণ্ড একদিন বাঙালীর হাতে শোভা পাবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

দেখা যাক, উদ্বাস্তুরা কোথায় চলেছে। দণ্ডকারণ্য কি শুধুই অরণ্য? যতটা বিবরণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে বোঝা যায়, যে-পরিমাণ জমি আছে, তা শুধু উদ্বাস্তুর কাছে কেন, কোন বাঙালীর কাছেই কম নয়। সেখানে পনর টাকা মণ চাল আছে, এক পয়সায় একটি ডিম আছে, বার আনায় গোটা একটা মুরগী আছে, আর আছে চারদিকে সবুজের বিস্তৃত সমারোহ। আদিবাসীদের কথার টানের সঙ্গে বাংলা কথার বিস্ময়কর মিল। তবে যাঁরা উদ্বাস্তুদের উপদেশ দিচ্ছেন, শিবির পরিত্যাগ করে পাদমেকং যেও না, তাঁরা উদ্বাস্তুদের হিতৈষী তো নন-ই, দেশের কল্যাণকামীও নন।

*   *   *

জল আর ভেজালের কথা বলছি। ভেজাল তো চারদিকেই। চাল থেকে চায়ে, আটা থেকে ওষুধে, সর্বত্র তার অবাধ সঞ্চরণ। চাল সামলাতে চা খারাপ হয়, জাল ওষুধের কল্যাণে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণে মরি। ভেজালের সবটুকুই জাল। তবু তারও ইতরবিশেষ আছে, আছে রকমফের। চালের কাঁকর বেছে বাদ দেওয়া যায়। সেখানে খরিদ্দার ঠকে শুধু ওজনে, কদাচিৎ অবশ্য দাঁতও খোয়ায়। বাষ্পার্দ্র আটাতেও প্রাণে ভয় নেই রোগের বীজ নেই। কিন্তু কল্পনাও করা যায় না, চায়ের নাম করে আমরা যা মুখে তুলি, তার মধ্যে চা নেই, আছে শুধু রং। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা মেনে নিয়ে স্বীকার করি, চা-পান সত্যিই বিষপান। এই বিষ কণ্ঠের নীল নয়, ডিপথেরিয়া নামক ভয়াবহ ব্যাধি। ওষুধে ভেজাল আরও শঙ্কাজনক, বিশেষ করে সেই রোগের ক্ষেত্রে যেখানে ভুলের প্রতিকারের সময় নেই। ম্যালেরিয়া রোগী কুইনিন-বিশ্বাসে যদি গোটা দুই বাজে বড়ি গিলে ফেলে, হয়ত আরও কয়েকটা দিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকবে। কিন্তু ধরুন, কলেরার ইঞ্জেকসনে যদি জালিয়াতি থাকে, তা হলে রোগীর আয়ু কতক্ষণ? এই ধরনের জালিয়াতি আর নরহত্যার মধ্যে প্রভেদ নেই। রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম, মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।

*   *   *

রেলওয়ের উপমন্ত্রী এবারও আশ্বাস দিয়েছেন, "আর হবে না দেরী," কিন্তু লোকসভার সদস্যরা বিশেষ ভরসা পাননি। যাত্রি-সাধারণের সঙ্গে গাড়ির আড়ি চিরকালের, বিতর্কে বিব্রত মন্ত্রীর মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে প্রাচীন প্রথা লোপ পাবে না।

গাড়ি আসতে দেরি করে কেন, কেনই বা ছাড়তে দেরি করে। দেবা ন জানন্তি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে সব কারণ দেখিয়ে থাকেন, সেগুলো ঠিক গ্রাহ্য বা বিশ্বাস্য বলে মেনে নিতে বাধে। যেমন ধরুন শীতকালে গাড়িতে ভিড় বাড়ে, কেননা তখন বিয়ের মরশুম। অতএব গাড়ি লেট। কখনও শুনি, বারবার যাত্রীরা শিকল টানে বলেই গাড়ির সময়জ্ঞান থাকে না। ইতিপূর্বে শুনেছিলাম, বৈদ্যুতিকরণের পর সব মুশকিলের আসান হবে। হাওড়া-বর্ধমান অঞ্চলে গাড়ি এখন বিদ্যুৎ-চালিতও বটে, কিন্তু তার ফলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে শুনিনি। বোম্বাই অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা বহুকাল থেকে চালু, শহরতলীর গাড়ির যথাসময়ে চলাফেরা করার অভ্যাস কম। পরিচালনার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের হয়ত ধারণা, দু-চার ঘণ্টা এদিক-ওদিকে কিবা আসে যায়, কাল তো নিরবধি!






ফরাসী ইলেকশনের ফলাফল দেখে অনেকে ভাবছেন যে, নূতন কনস্টিট্যুশনে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা যে খুব বাড়ানো হয়েছে, সেটা অন্তত আপাতত মঙ্গলজনক হবে বলা যায়। কারণ নব-নির্বাচিত পার্লামেন্টে কট্টর দক্ষিণপন্থীরা দলে ভারী হয়েছে। তারা নিজেদের দ্য গলের অনুরাগী বলে জাহির করলেও আসলে জেনারেল দ্য গলের চেয়ে তারা অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল. তাদের তুলনায় দ্য গলকে উদার এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বলা যায়। দ্য গল নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন, সুতরাং তাঁর ক্ষমতার দ্বারা তিনি দক্ষিণপন্থীদের কবলিত পার্লামেন্টকে খানিকটা বশে রাখতে পারবেন। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কম হলে বর্তমান পার্লামেন্টে প্রতিক্রিয়াশীলদের আধিপত্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পক্ষে আরো বিপজ্জনক হত। সেইজন্য গণতান্ত্রিকতার অনুরাগীদের কাছেও পার্লামেন্টের উপরে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা (যে ক্ষমতা জেনারেল দ্য গলের হাতে আসবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে) থাকার বিধানটা আপাতত একটা বাঁচোয়া বলে বোধ হচ্ছে। পার্লামেন্ট নির্বাচনের এরূপ ফলাফল জেনারেল দ্য গল নিজেও চান নি। এমন কি মেঁদে-ফ্রাঁসের মতো লোক যাতে নির্বাচিত হন, তাঁর জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন, যদিও মেঁদে-ফ্রাঁস দ্য গলের ক্ষমতালাভের বিরোধী ছিলেন। উগ্র বামপন্থী এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী এর কোন দলই অত্যধিক সংখ্যায় নির্বাচিত না হয়, এইটাই ছিল দ্য গলের ইচ্ছা। নির্বাচনী আইনের কৌশলের দ্বারা কম্যুনিস্টদের অবশ্য পার্লামেন্ট থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। পূর্বের ১৪৫ জন কম্যুনিস্ট সদস্যের স্থানে এবার মাত্র ১০ জন কম্যুনিস্ট সদস্য নির্বাচিত হতে পেরেছেন। এটা নির্বাচনী আইনের মারপ্যাঁচের ফল; কারণ কম্যুনিস্টরা আগের চেয়ে কম ভোট পেলেও তারা এই নির্বাচনে মোট ভোটের এক-পঞ্চমাংশ পেয়েছে। সোস্যালিস্টদের সদস্য সংখ্যাও ৮৮-এর জায়গায় ৪০ হয়েছে। মেঁদে-ফ্রাঁস যাদের দলপতি, সেই র‍্যাডিকাল পার্টির অবস্থাও শোচনীয়, কারণ তাদের সদস্য সংখ্যা ৫৬-এর জায়গায় ১৩ হয়েছে। আর একটা বিপজ্জনক ব্যাপার এই হয়েছে যে, আলজেরিয়া থেকে যে ৭০ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, তারা সকলেই ফরাসী ঔপনিবেশিক স্বার্থের সমর্থক এবং তারা উগ্র দক্ষিণপন্থীদের দলভারী করেন। জেনারেল দ্যগল আদেশ দিয়েছিলেন যে আলজেরিয়ার নির্বাচন যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়, যেন আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীরাও নির্বাচনে বিনাবাধায় অংশ নিতে পারে, যেন ফরাসী মিলিটারী নির্বাচনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা জোরজুলুম না করে। কিন্তু জেনারেল দ্যগলের এ আদেশ প্রতিপালিত হয়নি, আলজেরিয়ার সৈন্যবাহিনীর কর্তারা একরূপ প্রকাশ্যভাবে জেনারেল দ্যগলের আদেশ অমান্য করেছে। এই সব দেখে শুনে সন্দেহ হয় দ্য-গল প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাপন্ন দলগুলিকে কতখানি বাগ মানাতে পারবেন। দ্যগল আলজেরিয়ার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন বলে প্রথমে অনেকের মনে আশা হয়েছিল। আলজেরিয়ার সম্পর্কে তাঁর প্রথম ঘোষণাগুলি আশার উদ্রেক করেছিল। আলজেরিয়ার সামরিক নেতাদের প্রতি

ব্যবহারে তিনি প্রথমে যেরূপ জোর দেখিয়েছিলেন সেটাও লক্ষ্য করার মতো ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে জোর তিনি রাখতে পারেন নি, বিশেষত নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর আদেশ আদৌ কার্যকরী হয় নি। আলজেরিয়ার যুদ্ধও সমানভাবে চলেছে। নির্বাচনের ফলে দক্ষিণপন্থী ও ঔপনিবেশিক স্বার্থের সমর্থকরা যেরকম প্রাধান্য পেল তাতে আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোস মীমাংসার পথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ হোল। তাছাড়া একটা গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। একথা মনে রাখতে হবে যে দ্যগল যাদের বশে রাখতে চাইছেন তাদের বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকর্মই দ্যগলের ক্ষমতালাভের সুযোগ করে দিয়েছিল। তাদের—বিশেষতঃ যখন তারা যেমন করে হোক পার্লামেণ্টে দলে ভারী হয়ে এসেছে তখন তাঁদের দমিয়ে রাখা জেনারেল দ্যগলের পক্ষেও সহজ হবে না।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে পশ্চিম আফ্রিকাস্থ ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনাধীন গিনি প্রদেশ স্বাধীন হওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। তারপর একটি কাণ্ড ঘটে যাতে ফরাসী এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট উভয়ই চমকিত হয়। গিনি স্বাধীনতার দিকে ভোট দেওয়াতে কায়েমী সরকার গিনিকে টাকা দেওয়া বন্ধ করতে মনস্থ করেন, তখন ঘানা গিনিকে এক কোটি পাউণ্ড টাকা দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে, ঘানা ও গিনির রাষ্ট্রীয় নেতারা ঘোষণা করেন যে, ঘানা ও গিনির মধ্যে রাজনৈতিক যোগ স্থাপিত হবে। এই সংবাদে নানারূপ জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়। ঘানা বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ্‌-এর অন্তর্গত রাষ্ট্র। গিনি ফরাসী ইউনিয়নের ভিতর থেকে অথবা বাইরে এসেও ঘানার সঙ্গে যুক্ত হলে কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে ঘানা যে-সব সুখ-সুবিধা ভোগ করছে সেগুলির উপর কোনো আঘাত পড়বে কিনা এইসব কানুনী প্রশ্ন উঠে। গিনির সঙ্গে এই ধরণের কোনো একটা সংযুক্তির সিদ্ধান্ত করার পূর্বে ঘানার গভর্নমেণ্ট কমনওয়েলথের অন্য গভর্নমেণ্টগুলিকে, বিশেষ করে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে জানায় নি। এজন্য ইংলণ্ডে কিছু ক্ষোভ প্রকাশও হয় কিন্তু পরে ইংরেজরা নিজেদের সামলে নিয়েছে।

### বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

দেশ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়ায় যথাসময়ে প্রুফ সংশোধন ও পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় বিশেষ বাধা ঘটিতেছে। এই কারণে বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, প্রতি সপ্তাহের বিজ্ঞাপনের কপি পত্রিকা প্রকাশের অন্তত দশদিন পূর্বে অবশ্যই যেন বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাইয়া দেন। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক সৌষ্ঠবের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

কর্মাধ্যক্ষ
বিজ্ঞাপন বিভাগ
দেশ

সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে ঘানা ও গিনিকে এক ফেডারেল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ঘানার রাজধানী আক্রায় আফ্রিকার স্বাধীনতাকামীদের যে সম্মেলন চলছে তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারা আফ্রিকায় এই সম্মেলনের প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবলতর হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আন্দোলনও জোর পাবে মনে হয়, সেটি হচ্ছে খণ্ডিত আফ্রিকান জাতিগুলির একতালাভের আন্দোলন। ঘানা ও গিনি এই বিষয়ে পথনির্দেশ করছে বলা যায়।

*

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। মালয়ে দুদিন অতিবাহিত করে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেছেন এবং ইন্দোনেশিয়ায় বারোদিন সফরের পরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

*

জাপানের ভাবী সম্রাট যুবরাজ আকিহিতো একটি সাধারণ বংশের মেয়েকে বিবাহ করবেন বলে স্থির হয়েছে। জাপানের পক্ষে এটাকে একটা যুগান্তকারী ঘটনা বলা যায়। জাপানের ২৬১৮ বছরের লিখিত ইতিহাসে এর পূর্বে রাজপরিবার অথবা রাজন্যবর্গের বাইরে কোনো পরিবারের মেয়ে ভাবী সম্রাজ্ঞী নির্বাচিত হন নি।

৮।১২।৫৮

# আর্থিক সমীক্ষা

শ্রীকৌটিল্য

সম্প্রতি এদেশের এক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের সঙ্গে নানা রকম টুকরো আলোচনা হচ্ছিল। নানা কথার মধ্যে তিনি হঠাৎ বললেন যে পৃথিবীতে খুব বড়ো অর্থনীতিবিদ অনেকদিন যাবৎ জন্মাচ্ছেন না এবং হয়তো শিগ্‌গিরও জন্মাবেন না। প্রসংগত তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বললেন যে, আজকাল অর্থনীতি ভালো না জেনেও দেশের আর্থিক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে কিছু লোক প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করছেন। এঁদের মধ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক আছেন, অংকশাস্ত্রবিদ আছেন, এমন কি এঞ্জিনিয়র আছেন। এঁরা যোগ-বিয়োগ শতকরা কষে রাতারাতি পরিকল্পনার ছক কেটে দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে কোন্ খাতে কী হারে কতটা পরিবর্তন হবে তাও অন্তর্যামী হয়ে বলে দিচ্ছেন। উল্লিখিত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ব্যথিত এবং অর্থশাস্ত্রের সাম্প্রতিক সরলীকরণ লক্ষ্য করে অত্যন্ত আশাহত।

এখন, এ বিষয়ে কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথমত, আমাদের আলোচ্য অর্থনীতিবিদ্ হচ্ছেন সেই গোষ্ঠীর পণ্ডিত যাঁরা অর্থনীতিকে ফলপ্রসূ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে খুব উৎসাহী নন। তার ফলে, তিনি অতীতের বড়ো বড়ো অর্থনীতিবিদদের চমৎকার মডেলগুলিকে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হিসেবেই দেখেছেন। অথচ তিনি একথা মনে করে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করেন নি যে, অতীতের কয়েকজন সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদের মডেলের যদি কোনো সত্যমূল্য থেকে থাকে তা আছে ঐ ফলপ্রসূতার মধ্যেই। তিনি এক নিঃশ্বাসে স্মিথ্, রিকার্ডো, মার্ক্‌স্ এবং আরো কয়েকজনের নাম করলেন; অথচ এঁদের সকলকেই যে আজ আমরা এতটা দাম দিচ্ছি তার সবচেয়ে বড়ো কারণটিরই অনুসন্ধান করলেন না।

আমি বলব, স্মিথ-রিকার্ডো-মার্ক্‌স্ কেউই তাঁদের মডেলে বুদ্ধির চটক নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁরা অত্যন্ত বাস্তব চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইংলণ্ড তথা ইয়োরোপের তৎকালীন বাস্তবিক পরিস্থিতি ও পরিণতির বিশ্লেষণ ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য; এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তাঁরা সংখ্যাশাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্র থেকে কখনো আলাদা করে ভাবতে পারেন নি। মার্ক্‌স্ সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। খুব গভীর ভাবে পরিসংখ্যান ভিত্তিক বলেই তাঁদের মডেল এতটা অর্থপূর্ণ হতে পেরেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্মিথ, রিকার্ডো কিংবা মার্ক্‌স্‌কে তাঁদের সমকালীন অর্থনীতিগুলির পরিকল্পনার ভার দেওয়া হলে আমাদের আলোচ্য অর্থনীতিবিদকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যেতে পারত যে, 'অর্থনীতি' নামক কোনো শুচিবাইগ্রস্ত বিজ্ঞানের অসহযোগী অস্তিত্ব অসম্ভব। যে-কোনো অর্থনীতিতে যে প্রধান পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি (variables) তার উন্নতি-অবনতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করছে তারা অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়র, সংখ্যাশাস্ত্রবিদ সকলেরই চিন্তা ও কর্মের আওতায় এসে পড়ছে।

দ্বিতীয়ত, ধরে নিলাম বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক স্তরে একটি মডেল প্রস্তুত হলো। কিন্তু সেই মডেলকে পরিচালনযোগ্য (operational) করতে হলে স্বভাবতই

এক দফা হিসেব-নিকেশের দরকার। মডেলের কাম্য (Target) এবং উপাদান-সমূহের (Instruments) মধ্যে যোগ-সাধনের অনিবার্য দায়িত্বই পরিকল্পনার প্রধান দায়িত্ব। এবং এ দায়িত্ব পালন তথাকথিত বিশুদ্ধপন্থী অর্থনীতিবিদের দ্বারা সম্ভব নয়। আর মডেলগুলি যদি শুধুমাত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে, তবে তাদের অস্তিত্বের আদৌ কোনো মূল্য নেই। আমাদের অর্থনীতিবিদের হয়তো এজন্য ক্ষোভ যে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় মডেল-গুলির গঠন এবং তার পরিচলনে বাস্তব-ভিত্তিক হবার তাগিদটা খুব বেশি, এবং সে তাগিদে বিশুদ্ধপন্থীরা চট করে নিজেদের অবদানকে যথেষ্ট প্রশংসনীয় করতে পারেন না। আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য হয়তো পাঠককে খানিকটা বোঝাতে পারব এদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরি-কল্পনার মডেল-প্রস্তুতির কাজে সংখ্যাতত্ত্ব-বিদ্‌দের ক্ষমতার প্রাধান্য উল্লেখ করে।

সব শেষে আমার বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সব বিষয়ের মতো অর্থনীতিতেও প্রয়োজন অনুসারে পণ্ডিতের জন্ম হয়। এই প্রয়োজনের ধারা বিচিত্র। কখনো সেই ধারা বেয়ে স্মিথ-রিকার্ডো-মার্কস জন্মগ্রহণ করেন, কখনো ধারা অন্যমুখী হয়ে অন্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য মার্শাল-ভিসের-ওয়ালরাকে জন্ম দেয়, আবার হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের ধারা বেয়েই আবির্ভূত হন কেইনসের মতো পণ্ডিত। আমাদের অর্থনীতিবিদের বাথিত হবার কোনোই কারণ নেই, কারণ আজকের শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এবং অগ্রসরমান দরিদ্র অর্থনীতিতে প্রয়োজন মেটাবার তাগিদের অন্ত নেই, সেই তাগিদ মেটাবার উপযুক্ত লোকও কিছু কিছু জন্ম নিচ্ছেন। আবার পুরোনো পণ্ডিতদের অনেকের মডেলই ঘুরে ফিরে নানা ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে। সে সব মডেলের উপর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে সংস্করণ হচ্ছে। তাই স্মিথের মডেলের মতো কিছু একটা তৈরি না হলে হতাশ হবার কিছুই নেই। যেখানে যে জিনিসের সত্যিই আজ প্রয়োজন, তা নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছেন এবং কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। বরং আশ্বাসের কথা, আগেকার পণ্ডিতেরা যা দিয়ে গেছেন তা সবাই হজম করে প্রকৃত অর্থনীতিবিদের মতোই নিজের কাজের বোঝা কমাচ্ছেন। দা ভিঞ্চি কিংবা রাফাএল কেন এখন জন্মাচ্ছেন না এ নিয়ে যদি কেউ দুঃখ করেন এবং মাতিস, পিকাসো ও অনেক আধুনিক শিল্পীকে যদি ছোটখাটো ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন, তবে তিনি যে ভুল করবেন, আমাদের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ও খানিকটা সেই ভুল আক্ষেপই করেছেন বলে মনে হয়। জ্ঞানের প্রয়োজনের স্রোতে যুগে-যুগে পর্যায়ে-পর্যায়ে যে সার্থকভাবে ধরা দেয়, সে-ই জ্ঞানী—ছোট-বড়ো ভেদাভেদের মাপকাঠি অনেক সময়ই খুঁজে পাওয়া যায় না।

# আলোচনা

**গুজরাটে পেট্রল পাওয়া গেল**

সবিনয় নিবেদন,

"গুজরাটে পেট্রল পাওয়া গেল" এই নামে ২২ নভেম্বরের "দেশে" প্রকাশিত শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ভুলের সন্ধান মিলিতেছে।

প্রথমে নামের কথাই ধরা যাউক। "পেট্রল" কেন? নাম হওয়া উচিত ছিল, যদি ইংরেজী নাম রাখিতেই হয়—"গুজরাটে 'পেট্রলিয়াম' পাওয়া গেল"। অথবা পুরোপুরি বাংলায়—"গুজরাটে খনিজ তৈল পাওয়া গেল"। "চলন্তিকা"য় পেট্রলের পাশে লেখা "কেরোসিন জাতীয় তৈল—বিঃ যাহাতে মটর গাড়ি চলে। সাধারণ লোকের কাছে পেট্রলিয়াম হইতে পেট্রল কথাটি অধিক পরিচিত সন্দেহ নাই। শুধু এই কারণে যেখানে যে কথাটি খাটে না তা ব্যবহার করা অন্যায়। "পেট্রল" কথাটি অভিধানে স্থান গ্রহণ করিলেও ইহা একদা কোন কম্পানীর "ট্রেড নেম" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—যেমন বর্তমান কালের মবিল অয়েল, ম্যাকিনটোস, স্টেপনি ইত্যাদি। এই কারণে সরকারী আইনে পেট্রল কথাটির স্থান নাই। ইহার জায়গায় মটর স্পিরিট কথাটি ব্যবহার করা হয়। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য নূতন গড়িয়া উঠিতেছে—সুতরাং প্রতি লেখকেরই তথ্য ও শব্দ পরিবেশনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। নতুবা বর্তমান ঢিলেঢালা অবস্থা হইতে আমাদের বিজ্ঞান সাহিত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না।

"আমেরিকায় ১৮৫৯ সালে কর্নেল ড্রেক কর্তৃক পেট্রল আবিষ্কৃত" হয় ইহা মারাত্মক ভুল। পেট্রলিয়াম বা খনিজ তৈলের উল্লেখ ও ব্যবহার অনেক প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়। বাইবেলেও ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ সনে জর্জ ওয়াশিংটন নিজে প্রাকৃতিক পেট্রলিয়ামের সহিত পরিচিত ছিলেন। তবে কর্নেল ড্রেকের কৃতিত্ব এই যে তিনিই তৈলোত্তমের জন্য সর্বপ্রথম আধুনিক তৈল-কূপ খননের পথ দেখান। তাঁর মাত্র ৬৯½ ফুট গভীর প্রথম তৈল-কূপ হইতে রোজ ২০ পিপা তৈল ওঠান হইত। এই সময় অর্থাৎ ১৮৫৯ সন হইতেই আধুনিক তৈল যুগের শুরু। তৈলের আধুনিক যুগের সূচনা ও তাহার আবিষ্কার এক কথা নহে।......

সেন মহাশয় লিখিতেছেন—"যুদ্ধের পরে যে সকল দেশে পেট্রলের চাহিদা বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম"। পেট্রলিয়ামের চাহিদা সব দেশেই ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু টনের হিসাবে ভারতের চাহিদা আর সব দেশের চাহিদা অতিক্রম করিয়াছে ইহার নজির কোথায়? মাথা পিছু খনিজ তৈলের ব্যবহারে আমরা

এখনও সর্ব পিছনের সারিতে বসিয়া আছি।

"জ্বালানি গ্যাসের সার বস্তু হল মিথেন"। তাই যদি হয় তাহা হইলে পেট্রোলিয়াম গ্যাসে আর যে-সব গ্যাসীয় উপাদান থাকে যেমন ইথেন, ইথিলিন ইহারা কি অসার? ইহারা কি মিথেনের মত জ্বলিয়া তাপ ও আলো (বার্নারের সাহায্যে) সৃষ্টি করিতে পারে না? বলা উচিত ছিল—খনিজ-গ্যাসের ভিতর মিথেনের মাত্রাই সর্বাধিক, এমন কি অনেক সময় শুধু মিথেনই থাকে। "ইটালী, ফ্রান্স ও পাকিস্থানে এই জ্বালানী গ্যাস পাওয়া যায়", সেন মহাশয়ের এই সংকীর্ণ উক্তি তথ্য-সঙ্গত নহে।

জ্বালানী বা পেট্রলিয়াম গ্যাস সব তৈল-ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর পাওয়া যায়। ডিগবয়েও এই গ্যাসের জ্বালানী হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহার। আমেরিকার তৈল জগতে নায়কত্ব শুধু তরল তৈলে নহে, গ্যাসেও।......ইতি—শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত। ১৫, হিন্দুস্থান রোড। কলিকাতা—২৯।

### লেখকের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,

আমার প্রবন্ধটি পড়ি করার জন্যে শ্রদ্ধেয় শান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে নিবেদন করতে চাই যে, আমার লেখা সামান্য প্রবন্ধটি "বিজ্ঞান-সাহিত্য" কেন, কোনো সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত নয়। রিপোর্টারদের ভাষায় লেখাটিকে "স্টোরি" বলা যেতে পারে।

'ফিনাইল' অথবা 'ডালডা'র মতো পেট্রল যে "ট্রেড নেম" তা আমার জানা ছিল না। ত্রুটি স্বীকার করছি।

ভারতে পেট্রলের চাহিদার হিসেবের জন্যে খবরের কাগজে পরিবেশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করেছি। 'নজির' হয়ত দেওয়া যেত, কিন্তু তার ক্ষেত্র আলাদা।

জ্বালানি গ্যাসে মিথেনের উপস্থিত সম্বন্ধে শান্তিদাশঙ্কর বাবু, যে মন্তব্য করেছেন তা শিরোধার্য করে বলতে চাই যে, আমি যা লিখেছি তা বুঝতে বোধ হয় অসুবিধে হয়নি।

তিনি আর যা যা লিখেছেন সে সব বিষয়ে কিছু না লেখাই ভাল, শুধু তর্ক বাড়বে। ইতি—অমরেন্দ্রকুমার সেন।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ২২শে নভেম্বর দেশ পত্রিকায় "গুজরাটে পেট্রল পাওয়া গেল" প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ, একথা সত্য যে ভারতবর্ষে প্রথম আসামেই তেল আবিষ্কার হয়। তবে এ সম্বন্ধে লেখক যা বলেছেন তদুপরি কিছু যোগ করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ১৮২৫ সালে উইলকক্স (Wilcox) নামে এক ভদ্রলোক উত্তরপূর্ব আসামের ডিহিং নদীর অববাহিকা বেয়ে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষের জল বিভাজিকা অতিক্রম কোরে ইরাবতী নদীর উৎসমুখে উপস্থিত হন। প্রকৃতপক্ষে এর রিপোর্টেই প্রথম আসামের তেলের কথা উল্লেখ করা হয়। এরপর ভারতীয় ভূসমীক্ষা বিভাগের মেডলিকট (Medlicott) সাহেবের সুপারিশে জয়পুরের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩টি কূপ খনন করা হয়, নাহরপুংএ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এঁর একটিতেও তেলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু ক্রমে এই অগ্রগামীদের চেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হল। এখানে ১৮৬৭ সালের ২৬শে মার্চ মাটির ১১৮ ফুট নীচে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও ৩০০ গ্যালন নিষ্কাশিত হবার পরই কূপটি নিঃশেষিত হয়ে যায় তবু ভারতবর্ষের তৈলশিল্পের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। তারপর ডিগবয়ে তেল আবিষ্কারের সম্বন্ধে আর একটি মতের প্রচলন আছে। কথিত আছে যে, রেল বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারেরা খাবার তৈরী করবার জন্য আগুন জ্বালাতে গিয়ে দেখলেন যে, চারিদিকের মাটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল এবং এই থেকেই ডিগবয়তে তেলের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

শ্রদ্ধেয় Percy Evans ভারতবর্ষে বহুকাল তেলের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। কাম্বে সম্বন্ধে তিনি উচ্চাশা প্রকাশ করেননি, কিন্তু সুখের বিষয় যে, তার মতের ব্যতিক্রম হলো। কোন যায়গার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন কিছু জোর দিয়ে বলা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তৈলবাহী শিলাস্তরের আকৃতি, প্রকৃতি এবং বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ধারিত হচ্ছে তার আগে কিছু বলা খুবই কঠিন। বিভিন্ন তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলের ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেয়, ভারতবর্ষে বদরপুর অঞ্চলে তেল আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু বহু অর্থ এবং শ্রম নষ্ট করেও যে টাকা খরচা হয়েছে তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং কাম্বে অঞ্চলের সম্ভাবনাও হয়তো পরীক্ষা সাপেক্ষ। ইতি—সুকোমল চন্দ, কলিকাতা—৩৩।

### ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

বিগত ২৯শে কার্তিক ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত "পুস্তক পরিচয়ে" আমার "ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা" পুস্তকের আলোচনা দেখিলাম।

আমার পুস্তকের ভূমিকায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছিল আমাদের সহকর্মী মিঃ সিদ্দীক সম্পর্কে। কাবুলে মিশনে যাবার জন্য বার্লিনে যে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল তাহার একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন মিঃ সিদ্দীক। আমি বার্লিন ত্যাগ করার প্রায় সাত মাস পরে "ইন্দো জার্মেন কাবুল মিশন" রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকত উল্লার পরিচালনায় তুরস্ক হইয়া কাবুলের দিকে যাত্রা করে। এ সম্পর্কে সিদ্দীকের সঙ্গে আমার আর কোন আলোচনা হয় নাই। যদিও তিনি হায়দারাবাদ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করার কালে আমার সঙ্গে পত্র বিনিময় করিয়াছেন। তথাপি বৈপ্লবিক কার্যে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কোন মতামত চাহি নাই, সুতরাং পাই নাই। আমি আমার বিশ্বাসের উপরেই সিদ্দীক কাবুল মিশনে গিয়াছিলেন এরূপ মন্তব্য করিয়াছি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সংকলিত—"অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" পাঠে অবগত হইয়াছিলাম যে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মস্কো অথবা লেনিনগ্রাড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আমি উভয় ইউনিভার্সিটিতে পত্র দিয়া এবং স্মারকলিপি পাঠাইয়াও কোন উত্তর পাই নাই। কিন্তু আমাদের দিল্লীস্থ প্রেস ইনফরম্যাশন ব্যুরো, মিনিস্ট্রি অব এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত (দিল্লীস্থ) অ্যামবেসি অব ইণ্ডিয়া, মস্কো ইত্যাদিতে পত্র দিয়াও বিপ্লবী বীর বীরেন্দ্রনাথের কোন তথ্যই পাই নাই। শ্রীযুক্তা অ্যাগনিস স্মেডলী বর্ণিত বিবরণ সত্য হইলে অবশ্যই উপরিউক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিবরণ সম্পর্কে কোন নীরবতা অবলম্বন করিত না। ১৯৫৬ সালের ১৯শে মার্চ দিল্লীস্থ রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত আমাকে জানাইয়া ছিলেন যে, তিনি মস্কোতে আমার পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তথা হইতে উত্তর পাইলেই আমাকে সংবাদ দিবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯৫৬ ইং মার্চ হইতে এ পর্যন্ত ৫ বার আমি তাঁহাকে পত্র দিয়া একই উত্তর পাইতেছি যে, তিনি এখনও মস্কো হইতে কোন সংবাদ পান নাই।

সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাশিয়াতে নিহত হইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিশিয়ানভাবে থাকার সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে আজ ২৩ বৎসর পরেও এ বিষয়ে সকলের নীরবতার কোন কারণ দেখা যায় না। সুতরাং আমার মনে হয় শ্রীযুক্তা স্মেডলীর বর্ণিত তথ্য যথাযথ নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য



# সমুদ্র হৃদয়

## প্রতিভা বসু



'তুমি অবিশ্যি বলতে পারো—' মস্ত এক ধোঁয়ার রিং পদ্মআঁকা সিলিংয়ে ছড়িয়ে দিলেন সুলতান সাহেব 'তাদের যদি পাঠাতে পারলাম তবে তোমাকেই বা আটকে রাখলাম কেন?'

সুলেখা কথা বললো না। তার এলোমেলো চিন্তার ধারা হাজার জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুলতান বললেন, 'কিন্তু তোমাকে যেন আজ বড়োই উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে।'

'না।'

'তোমার বেশভূষা—'

'যা বলবেন বলুন।'

'এলোমেলো চুল, ময়লা কাপড়,—ও সেই শাড়ি।' ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো, 'একটা শাড়ি অবলম্বন করেই তুমি এই সুলতান সমুদ্র পাড়ি দেবে স্থির করেছ? হায়রে সুলেখা, ঘরে একটা পেন্সিল-কাটা ছুরিও রাখিনি যে, দু নয়ন সার্থক করবে বুকের রক্ত দেখে। সিলিংয়ে একটা কড়ি-কাঠ পর্যন্ত নেই যে, গলায় দড়ি দেবে।'

সুলেখা চুপ।

'মাথাটা আঁচড়াও না।'

'মাথা আঁচড়াবার পরেও তো আমাকে সুন্দরী বলে ভুল হবে না আপনার।'

'না, সে ভয় নেই। তুমি আমার কাছে চেহারার অতীত।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন সুলতান সাহেব। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে আছে সুলেখা, বছর তিনেক আগে কী একটা উপলক্ষে তোমরা কয়েকটি মেয়ে চাঁদা চাইতে এসেছিলে আমাদের এই আসমান মঞ্জিলের হাতায়?'

'আছে।'

'তুমি তোমাদের দলবলের সঙ্গে আমাদের সবুজ মহলে ঢুকেছিলে আমার নানি, চাচি, এদের গান শুনিয়ে, টাকা আদায় করেছিলে মোটা রকম। যিনি তোমাদের নেতৃত্ব করে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভুবন তালুকদারের নাতনী বলে, যদি-বা সেই সুবাদে কিছু বেশী সুবিধে পাওয়া যায়।'

'সেখানে কেউ আমরা ব্যক্তিগত সুবিধার কথা ভেবে যাইনি।'

'পরার্থেই গিয়েছিলে, অস্বীকার করছি না, তা যাই হোক, গানটা গেয়েছিলে চমৎকার। পাখির মতো গলা ছিলো তোমার, প্রায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম শুনে। একটি ছোট্টো মেয়েকে মনে পড়ছিলো বারে বারে, ভালো লাগছিলো। আমি পাশের ঘরে ছিলুম, যখন চলে গেলে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম, আশ্চর্য! ঐ দলের মধ্যে দেখেও তুমি যে তুমি, সেটা চিনতে একটু কষ্ট হলো না আমার। অথচ তোমাকে আমি শেষ দেখেছিলাম—' একটু থামলেন সুলতান সাহেব, একটু তাকিয়ে রইলেন, "সকালবেলাকার সমুদ্রের বুক থেকে যেমন লাফ দিয়ে উঠে আসে নতুন সূর্য, ঠিক তেমনি করে তুমি উঠে এসেছিলে আমার স্মৃতিতে।'

'সংক্ষেপে বলুন।'

'তোমাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করলো আমার। তুমি তখন রাজনীতি নিয়ে ক্ষেপেছ, এখানে মিটিং সেখানে বক্তৃতা, সেখানে গান, কোথাও চাঁদা তোলার পালা, লেগেই আছে শহরে। আর আমি, যেখানেই তুমি আছ জেনেছি, সেখানেই অকারণে ছুটে গিয়েছি পাগলের মতো। তুমি যে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু, কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পেরেছিলাম সেকথা, এ-ও জেনেছিলাম সেই সময়ে আমার মৃত্যুই তোমার প্রতি মুহূর্তের কামনা ছিলো, তবু মন ফেরাতে পারিনি, প্রাণের মমতা ভুলে গিয়েছি।'

প্রেম নিবেদন। ঈশ্। আড়মোড়া ভাঙলো সুলেখা।

'তারপর সেই আকর্ষণের বেগ আমাকে কতোদূরে টেনে নিয়ে এলো, তাতো দেখতেই পাচ্ছো।'

'খুব ভাগ্যের কথা।'

'নেহাৎ মন্দ ভাগ্যই বা কী।' ঈষৎ উষ্ণ শোনালো সুলতান সাহেবের গলা—'নবাবজাদার প্রেম কিছু পথেঘাটে ছড়ানো থাকে না।'

'থাক না বুঝি?'

'আর আমিও কিছু অযোগ্য নই। যদিও হিন্দু-বিশ্বেষী।'

'আমিও হিন্দু সুলতান সাহেব।'

'তবু তোমাকে কতো আতিথেয়তা করছি, দেখছো তো? তোমাদের জাতের চাইতে অন্তত উদার কী বলো?' টানা টানা চোখ আরো টান করলেন, 'আর তোমরা হিন্দুরা? ঘরে গেলে জল ফেলে দাও, ছায়া মাড়ালে স্নান করো। ওদিকে বুলি কপচাও হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।



হিপোক্রিট। সুলেখা, তোমাদের নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতা, আমাদের ছোরা মারার চাইতে ঢের ঢের বেশী যন্ত্রণাদায়ক। তোমরা মারো আত্মাকে, আমরা মারি শরীরকে। শরীর তো খোলস মাত্র। অসুখ সেরে গেলেই ভুলে যাই। কিন্তু যে বেদনা মনকে আহত করে, তার স্মৃতি পর্যন্ত কতো কষ্টের। সন্তান মরলে তাকে কোন্ মা ভুলে যেতে পারে।'

সুলেখা অতিষ্ঠ বোধ করলো। আজ হলো কি লোকটার! এতো কথা কেন বলছে? কী মতলব। কী চায়! আর কতক্ষণ এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এখানে থাকবার সময় কি এখনো ওর উত্তীর্ণ হয়নি। আঙুল দিয়ে সে মাথা টিপলো।

'সেই জন্যেই তো আজকের দিনে এই প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠছে প্রত্যেক মুসলমানের মনে।' উত্তেজনায় হাতের জ্বলন্ত সিগারটা টোকা মেরে ছুড়ে দিলেন জানালা দিয়ে, বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'বলতে পারো, কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ না ক'রে পারে? তোমাকে যদি আমি ছুঁতে ঘেন্না করি, আমাকে ছোঁবার প্রবৃত্তি তোমার ক'দিন থাকবে? যা দেবে তাই পাবে। কৃতকর্মের প্রতিশোধ আছেই একদিন। হ্যাঁ, লোকে যা ভাবে আমি ঠিক তাই, তার চেয়েও বেশী। হিন্দু দেখলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়, আমার বালক বয়সের সমস্ত বেদনা হিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে। কাফের, কুত্তা, নিষ্ঠুর।' হলুদ সাটিনের কুশান থেকে এলানো পিঠ খাড়া করলেন সুলতান সাহেব, 'তবু যে মুহূর্তে খবর পেলাম, তোমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছে, তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিয়ে দিলাম তোমাকে সসম্মানে নিয়ে আসার জন্য, তোমার পরিজনদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য।

'এতোই যদি দয়া, তাহলে আমার পরিজনদের মতো আমাকেও তো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারতেন সুলতান সাহেব।'

'না, ততোটা নির্লোভ আমি নই। আমার এখানে এভাবে নিয়ে আসা ছাড়া তোমাকে পাবার অন্য কোনো রাস্তা আমার জানা ছিল না।'

শয়তান! মনে মনে আওড়ালো সুলেখা। মুখে বললো, 'আপনার ইচ্ছের আপনি যতো খুশি মূল্য দিন, কিন্তু পাওয়াটা তো তার উপর নির্ভর করে না।'

'যদি বলি করে।'

'আপনি শহরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারেন, হাজারো বাঁদী এনে আকবরের মতো ঘুঁটি সাজিয়ে দাবার ছক কাটতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনি কখনোই পাবেন না। না, না, না। শরীরটাকে বাঘের মতো

চিবিয়ে খেলেও না। আপনাকে আমি ঘৃণা করি।'

সুলতান তাকিয়ে রইলেন সুলেখার দিকে।

সুলেখার চোখে আগুন জ্বললো, 'এ নিয়ে কতো মশা মারলেন জাঁহাপনা, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

মাথা নিচু করলেন সুলতান। ঘন চুলে আঙুল ডুবিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার উপর আমি রাগও করতে পারি না, আমি এমনই হতভাগ্য। কিছু মনে করো না, অনেক বিরক্ত করলাম আজ তোমাকে। কিন্তু আজই তো শেষ দিন, কতগুলো কথা মন থেকে বেরিয়ে আসছে।'

'শেষ দিন!' তৎক্ষণাৎ গলায় অন্য সুরে বেজে উঠলো সুলেখার—'কোথায়? কোথায় আমি যাবো?'

'কোথায় যেতে চাও?'

'আমার মা, আমার ভাইয়েরা—' সুলেখা হঠাৎ এগিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো মেঝের উপর 'সুলতান সাহেব, অনেক বেয়াদপি করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, আমাকে মাপ করুন। আপনি আমাকে পাঠিয়ে দিন তাঁদের কাছে। আর আমি পারি না। পারি না।'

এতো তেজ, এতো জেদ, কোথায় ভেসে গেল চোখের জলে। দুহাতে মুখ ঢেকে ছোট্টো মেয়ের মতো কাঁদতে লাগলো সে।

সুলতান সাহেব অনেকক্ষণ দেখলেন সেই কান্না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে রইলেন চুপচাপ। সময় বয়ে যেতে লাগলো নিঃশব্দে। অনেক পরে সুলেখা নিজেই মুখ তুললো, বর্ষার সজল ঘাসের মতো কান্না-ভেজা মুখ। এই মুখখানাকেই আজ তিন বছর ধরে ভালোবেসে এসেছেন সুলতান সাহেব। তিন বছর। না কি সারা-জীবন। একটি এগারো বছরের বালককে কি স্পষ্ট মনে পড়ছে না আজ? নওয়াব আমির আলী সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই যে বালক টমটমে চড়ে বেড়াতে যেতো আর মাঝে মাঝেই যে-টমটম গিয়ে কমলাপুরের এক বাড়ির দরজায় থামতো। বেল বাজলেই ভিড় জমে যেতো সেখানে। বাড়ির পুরুষেরা এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন। হাসা বিনিময় হতো, কুশল বিনিময় হতো, ভালোবাসার আদান-প্রদান হতো। আলীসাহেব গাড়ি থেকে নামতেন না। পারিবারিক উকিলের বাড়ি, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হলেই যেতেন। গিয়ে নিজে হাতে উপহার দিয়ে আসতেন। কখনো সোনা-দানা, কখনো গিনি মোহর, কখনো বা টাকার তোড়া। ফল ফুল মিষ্টিতো আছেই। সকলের সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়েও এসে দাঁড়াতো সেখানে, নওয়াব সাহেব ভালোবাসতেন তাকে। দেখলেই হাত বাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিতেন, তার

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলেভরা মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করতেন। বালকটি পাশে বসে একটু একটু হিংসেও করতো, কিন্তু সুখীও হতো। মেয়েটির ফ্রকটা একটু গায়ে লাগতো তার, চুলগুলো অনেক সময় উড়ে উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিতো মুখে, বুকটা তার কাঁপতো। মেয়েটির বাবা বোধ হয় বালকটিকে পছন্দ করতেন, হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাতেন, তার মেয়ের সঙ্গে খেলতে বলতেন। ঐটুকু একটা মেয়ের সঙ্গে কী খেলবে সে? তার বয়েস তখন দশ পূর্ণ—এগারো, নিজেকে কি সে হালকা করে ফেলতে পারে? তবু আকর্ষণ বোধ করতো মনে মনে, আর পিতার আদেশে মেয়েটি যখন লজ্জায় বুকের সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলতো 'এসো' তার তুল্য সুখ আর কোনো কিছুই ভাবতে পারতো না। সামনেই ওদের বৈঠকখানা ঘর ছিলো, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেই ছেলেটি টের পেতো, সারা বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে নওয়াব সাহেবের জন্যে, তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেই ব্যস্ত হাঁক ডাকের মধ্যে প্রায়ই কয়েকটা কথা ছেলেটির কানে এসে তীরের মতো বিঁধতো। 'আরে না না, ওটা না, মুসলমানের হুঁকো আলাদা তা-ও জানিস না?' কিম্বা? 'রুপোর থালায় পান দে, খাবার দিস না, এঁটো হয়ে যাবে। কাচের বাসনে দে, ফেলে দিলেই চলবে।' মুসলমান বলে আলাদা বস্তুটা কী, তখন ঠিক জানতো না ছেলেটি ,কিন্তু কেন জানি মনটা তার খারাপ [illegible] যেতো। ফিরে আসতো সে গা[illegible] মেয়েটি হাত জড়িয়ে ধরে বললো. আমার মাকে দেখবে? চলো না ভিতরে যাই।' মা শব্দটা ছেলেটির কাছে মোহের মতো। কেন না তার নিজের মা ছিলো না। ভারি মায়ের শখ ছিলো তার। একটুও আপত্তি না করে পায়ে পায়ে ভেতর বাড়িতে এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে কে একজন হা হা করে ছুটে এসে বললো, করিস কী, করিস কী, এ ঘরে কোথায় নিয়ে যাস, খাবার জল আছে না?' বুকটা থেমে গেল ছেলেটির। একজন মহিলা এগিয়ে এসে রাগ করলেন, 'হাবা মেয়ে। কোনো বোধ যদি থাকতো। তুই, জানিস না এ ঘরে আনতে নেই, এ ঘরে খাবার দাবার আছে সব, এইমাত্র ভোগের মিষ্টান্ন এনে রেখেছে, ছুঁয়ে দিলো একাকার করে। এখন ফ্যালো সব, ধোও, মোছো—যতো ম্লেচ্ছ কান্ড—'

ঘরেও ঢোকেনি ছেলেটি, শুধু চৌকাঠে পা রেখেছিলো: ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো তার একথা শুনে লজ্জায় অপমানে কান দুটো। সেই চৌকাঠে পা রেখেই যেন মরে গেল সে। বাড়ি ফিরে বুকটা জ্বলে গেল। একটা অস্বাভাবিক ক্রোধ, বেদনা, ঈর্ষা, অপমান

ছিন্ন ভিন্ন করে দিল তাকে। কয়েকটা দিন যে কেমন করে কাটলো কে জানে। তারপর আস্তে আস্তে তার পরিবর্তন ঘটলো একটা, তার রাগ বাড়লো, মর্জি বাড়লো, অবাধ্য হলো। এরকম হবার স্পষ্ট কারণ কেউ বুঝলো না, সে নিজেও হয়তো নয়। গুরুজনের শাসন অবারিত হয়ে উঠলো।

একদিন সে এক অদ্ভুত আবদার ধরলো তার নানা সাহেবের কাছে। যে ইস্কুলে হিন্দু ছেলেরা পড়ে সে ইস্কুলে সে পড়বে না। হিন্দুরা খারাপ, হিন্দুদের দেখলে তার ঘেন্না করে। নানা সাহেব জিব কেটে কানে আঙুল দিলেন। আব্বাজান, রক্ত চক্ষু দেখালেন, কিন্তু ছেলেটি তার গোঁ ছাড়লো না, ইশকুলে যাওয়া ছেড়ে দিল। ইশকুলটি বলতে গেলে নওয়াবদেরই, নিজেদের ছেলেপুলের জনাই এ ইশকুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু নওয়াব-গঞ্জের যাঁরা বিশেষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাদের প্রত্যেকের ছেলেই পড়তো সেখানে। ঐ স্কুলের শিক্ষকরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, উচ্চ মূল্যেই আনা হয়েছিলো তাঁদের। তাছাড়া ইংরিজি শেখাবার জন্য জনাকয়েক পাদ্রিও ছিলেন। ঠিক ঐ ধরনের স্কুল খুব কম ছিলো তখন। স্কুলের মাহিনা বেশী ছিলো বলে জনসাধারণের অধিগম্য ছিলো না। মূলত নওয়াব বাড়ির ছেলেদের জন্য হলেও ছাত্রের সংখ্যা হিন্দুও কম ছিলো না। অভদ্রের মতো কী করে সেই সব ছেলে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। আর কেনই বা দেবেন। এ শহরে কি কোনো ভেদ আছে হিন্দু মুসলমানে? থাকলেও নওয়াব আমির আলী সাহেব কি তার প্রশ্রয় দিয়েছেন কোনোদিন। তিনি নিজেই তো হিন্দুদের কতো আচার আচরণ পালন করেন। তেমনি কতো হিন্দু দরগায় যায়, উৎসবের দিনে আলো জ্বালে, মুশকিল আসানকে পয়সা দেয়। এ বাড়ির ছেলে হয়ে এ কি দুর্মতি হলো তাঁর নাতির। নানা কথায়, নানা গল্পে তাঁকে বোঝালেন তিনি, সব মানুষই যে এক আল্লার তৈরী, সব মানুষের বুকের মধ্যেই যে তাঁর বাস, এ সব জ্ঞানের কথাও অনেক বললেন, কিন্তু ফল হলো না। যুক্তি তর্ক সব ভেসে গেল বালকের একগুঁয়েমির কাছে। শেষে তার আব্বাজান, নবাব আকতার আমেদ, খুব মারলেন তাকে। মার খেয়ে মার হজম করবে, নবাবীরক্ত এতো শীতল নয়। পরের দিন ইস্কুলে গিয়ে, মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে দল পাকিয়ে হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া বাঁধিয়ে তাদের জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিল, থুতু ছিটোলো, কিল চড় ঘুষি লাথি কিছুই বাদ দিল না, শেষ পর্যন্ত একটা ছোট ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মাথা ফাটিয়ে দিল। আর তাই নিয়ে শহরে দারুণ গোলমাল হলো। প্রায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেহারা নিল ব্যাপারটা। আলী সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেই বিরোধ মেটালেন।

কবেকার কথা সে সব, কবেকার মূঢ়তা। মনেও ছিলো না। কিন্তু আবার দুকূল ছাপিয়ে বন্যা নামলো, আবার সুলেখা তার জুড়িয়ে-যাওয়া যন্ত্রণার রক্তক্ষরণ করালো। সুলেখা। সুলেখা। সুলেখা। এই সুলেখাই তার সকল সর্বনাশের মূল। দশ বছর বয়স থেকে এই মেয়েই তাকে এমন আগুনের বেড়াজালে পুড়িয়ে মারছে। তা নৈলে তার এই একা নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে মন্দ কাটছিলো কী? আব্বাজান ছেলের বেদুইন মনকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বিয়েও ঠিক করেছিলেন, এমন কি আলাদা একটা মহল পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেল সেই উপলক্ষে। যদি সেদিন আসমান-মঞ্জিলে সুলেখা না আসতো, সুলতান তাকে না দেখতো, তার পাখির গলার গান না শুনতো, জীবনের আসল মুহূর্তটা এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতো না।

সব গোলমাল হয়ে গেল। আব্বাজানের সব সাধ আহ্লাদ ব্যর্থ করে দিল তার ছেলে। কতো দুঃখ নিয়ে তিনি মারা গেলেন, কিন্তু ছেলে যে তার কী চায় সে কথাটাই শুধু জেনে যেতে পারলেন না। জানলেই কি কিছু হতো? কী করতে পারতেন, মৃত ভুবন তালুকদারের বিধবা পুত্রবধূর এই কালো মেয়েটিকে আনতে পারতেন নিজের ঘরে? কেন পারতেন না? মুসলমান হয়ে জন্মেছেন বলেই পারতেন না। যতো যোগ্যতাই থাক, হৃদয়ভরা যতো ভালোবাসাই থাক, অর্থ, প্রতিপত্তি, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য যাই থাক না কেন, কিছুতেই তিনি পেতে পারতেন না এই মেয়েকে। শুধু জাত। জাত। একমাত্র জাতের ব্যবধান। আর তাঁর কী অপরাধ! স্বামী হিসেবে এর চেয়ে যোগ্যতর আর কী আশা করতে পারে একজন মেয়ে? নিঃস্ব বিধবার এই আটপৌরে মেয়ে, পরের সংসারে অনাদর অবহেলা ছাড়া আর কিছুই যে পায়নি, তার পক্ষে এই ধনী পুত্র—এইটুকু বয়সেই যে বাপের গদিতে বসেছে, বছরে যার সত্তরো লক্ষ টাকা আয়, যার কোনো অংশীদার পর্যন্ত নেই, সে তো একটা স্বপ্ন। আর শুধু কি বাপেরই অর্থ? কী নেই সুলতান সাহেবের? দেখতে কি তিনি খারাপ! বিদ্যা বুদ্ধিতেও কি অনন্যসাধারণ নন? কিন্তু মুসলমান। শুধু মুসলমান। এই একমাত্র বাধা। আর সে বাধা কী ভীষণ। ভীষণ! যে লোকটা চৌকাঠে দাঁড়ালেও ঘরের জল ফেলে দিতে হয়। বিয়ের প্রস্তাব তো দূরের কথা, তাকে দেখলেও সুলেখার নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা মা হয়তো গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধি হতেন। আর সুলেখা নিজে?

(ক্রমশ)

# চিত্র প্রদর্শনী

এ সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় চিত্র এবং 'বেঙ্গল স্কুলের' চিত্রধারার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাচীন ছবির মধ্যে আছে, রাজস্থান, কাংড়া, মুঘল প্রভৃতি চিত্রধারার নিদর্শন। বেঙ্গল স্কুলের ছবির মধ্যে আছে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা।

বেঙ্গল স্কুলের পথিকৃত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথের মন ছিল অনুসন্ধানী। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নানাপ্রকার নতুন উন্মেষ তাঁরই রেখা ও বর্ণে প্রথম দেখা যায়। তাঁর অনেক ছবি জাপানের বা চীনের চিত্রধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হলেও ছবিগুলি নিজস্ব গৌরবে বিশিষ্ট। সাদাকালোর সমন্বয়ে জাপানী বা চীনা ঢঙের ছবি গগনেন্দ্রনাথই প্রথম রচনা করেন। গগনেন্দ্রনাথের কাছেই এ শিক্ষা লাভ করে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

কিন্তু এ রচনাগুলিকে জাপানী বা চীনা আর্টের পুনরাবৃত্তি কোনও মতেই বলা চলে না। ব্যক্তিত্বের রসে পূর্ণ হয়ে এঁদের এ চেষ্টা নিজের স্বকীয়তায় পরিণত হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ এক থেকে আর এক নতুনের সন্ধানে ঘুরেছেন, রোমাণ্টিক চোখে দেখেছেন পৃথিবীকে। এঁর ছবি যেন রহস্যে ভরা। অবচেতন অবস্থায় মানুষের মনে যেমন অস্পষ্ট সব প্রতিফলিত হয়, উদ্ভট স্বপ্ন দিয়ে সে যেমন তার আশেপাশের জগৎকে গড়ে তোলে, গগনেন্দ্রনাথের ছবি সেই অজ্ঞাত শহরের চিত্র, ব্যাঙ্গচিত্র এ সবের মধ্যে দিয়ে মানুষের এই বিচিত্র রসপূর্ণ জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এঁর শেষের দিকের রচনায় কিউবিজম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ব্রাক বা পিকাশোর চিত্রকল্প এঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল কি না বলতে পারি না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের মত প্রকৃতির সঙ্গে কলহ বাধিয়ে বস্তুনিরপেক্ষ আর্ট সৃষ্টি করার চেষ্টা ইনি করেননি। সরল রেখা, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ প্রভৃতি কিউবিস্টিক মালমশলা দিয়ে রচনা করলেও প্রাকৃত আকারকে ইনি কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি এবং ইঙ্গিত এঁর বলা যায় সুর রিয়ালিস্টিক বিষয়ের দিকে। শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা শুধু দৃষ্টরূপের বাইরেতেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসেনি তাদের অন্তরের গোপন রহস্য ভেদ করে চলে গেছে। অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার সঙ্গে দৃষ্টি বদল করবার দুর্নিবার ইচ্ছা ছিল শিল্পীর সাধন-পথের সাথী। তাই এমন একটি জগতের খবর শিল্পী রেখে গেছেন তাঁর ছবিতে যার অনুসন্ধান তাঁর নিজেরও শেষ হয় নি। দেশ-বিদেশের প্রথাপ্রকরণ আদায় করে রূপ মুক্তির সাধনা করে গেছেন শিল্পী, কিন্তু প্রত্যেকটি রচনাই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ হয়ে নিজস্ব গৌরবে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় যেমন বিদেশীয়ানার লক্ষণ নেই, তেমনি স্বদেশীয়ানারও লক্ষণ প্রকট নয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"নানা শিল্পে নানা প্রথা-প্রকরণ শিল্পীকে দেশ-বিদেশ থেকে আদায় করতে হয় চটপট, শুধু সেই প্রকরণ প্রয়োগের সময় বিচার ও ভেবেচিন্তে ক্রিয়া করার কথা ওঠে।' তাই তাঁর ছবিতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে ভারতীয় অলঙ্করণের খাঁটিত্ব ঘুচেছে, ফলে এগুলি পাশ্চাত্ত্য মিনিয়েচারও নয়, আবার অলঙ্কারপ্রধান ভারতীয় শিল্পও নয়। এগুলি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, অবনীন্দ্রনাথের আগে যার অস্তিত্ব ছিল না। গাছপালা, ফুল ফল, পশু পক্ষি এসব তিনি এঁকেছেন, কিন্তু তাঁর ছবিতে এরা রূপ পেয়েছে এমন যা দেখা রূপের পুনরাবৃত্তি নয়, বাস্তব রূপের স্পর্শশূন্য নিছক কাল্পনিক রূপ। ভারতশিল্পের শাস্ত্র তাঁর বেশ ভাল রকম জানা ছিল, কিন্তু তিনি এই শাস্ত্রের নিয়ম বড় একটা মানতেন না, কারণ তিনি জানতেন প্রাচীন শাস্ত্র মেনে চললে নতুন শিল্পের উদ্ভাবনা সম্ভব নয়। মুঘল, কাংড়া প্রভৃতি আর্টের নৈপুণ্য এবং অলঙ্করণ তাঁকে আকৃষ্ট করায় তিনি এ সব টেকনিক-এ বহু রচনা করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে ঐ সব প্রাচীন চিত্রধারার পুনরাবৃত্তি বলা চলে না। ঐ সব চিত্রধারা বেশী মাত্রায় অলঙ্কারপ্রধান হয়ে পড়ায় অত্যন্ত শুষ্ক এবং প্রাণহীন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ মুঘল বা কাংড়ার অলঙ্করণ এবং সেই সঙ্গে ভাবের যোগাযোগে এক অভিনব এবং সজীব চিত্রধারার সৃষ্টি করেছেন। হিসিদা ও টায়কোয়ানের কাছ থেকে শেখা জাপানী আঙ্গিকের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য রীতির পরিণয় ঘটিয়ে তিনি আর এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন।

সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে 'ভারতীয়' গোষ্ঠিভুক্ত করা যায় না, তাঁর চিত্রধারার ভাষা তাঁর লেখার ভাষার মতই একান্ত স্বকীয়। নন্দলাল বসুর রচনায় আমরা এখানে দেখতে পাই পুরাণকথা বর্ণিত হয়েছে অজন্তার ভাষায়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের রসে পূর্ণ হয়ে নন্দলালের রচনাও বিশিষ্ট।

এখানে প্রদর্শিত বুন্দি, কাংড়া, কোটা, মুঘল এবং মেওয়ার এই কটি ধারার নিদর্শনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির কম্পোজিশন, অলঙ্করণ এবং নৈপুণ্য লক্ষণীয়। বেঙ্গল স্কুলের রচনার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'শিল্পীর মায়ের প্রতিকৃতি', 'সেল্ফ পোরট্রেট', একেবারে একালের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত 'দি ড্রীম অব অবন', গগনেন্দ্রনাথের 'ল্যাণ্ডস্কেপ' (১৩১) এবং 'দি নাইট' নন্দলাল বসুর 'সঙ্ঘমিত্র', 'কুমারসম্ভব' এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন' বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

—চিত্রগ্রীব



প্রদর্শনীর একাংশ




শার্ঙ্গদেব

## কালিদাস জয়ন্তী

তরুণ বয়সে যখন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়েছিলুম তখন যে অভাবনীয় রমণীয়তা মনকে অভিভূত করেছিল তার স্মৃতি কখনো ভোলবার নয়। বোধ হয় প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকই তাঁর সেই স্মৃতি যত্নের সঙ্গে সঞ্চয় করে রেখেছেন। আমার মনে গভীরভাবে দোলা দিয়েছিল দেবী হংসপাদিকার সেই ছোট্ট গান—

অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ
চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসি
ণং কহং॥

নবমধুলোভী ওগো মধুকর চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে
ভুলিলে তুমি।
—রবীন্দ্রনাথ

এই গানটি দ্বারা কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পূর্বাভাস কবি কিভাবে রচনা করেছেন তা মনে হয়নি শুধু মনে হয়েছিল—কী সুরে কীভাবে, কী ঢঙে এই গানটুকু গাওয়া হয়েছে। এই অংশটি পাঠ করবার সময় প্রত্যেক পাঠকের কানেই যেন একটি করুণ রমণী কণ্ঠের মধুর গুঞ্জন ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন একটি সরস প্রাণস্পর্শী গানের পরিচয় ইতিপূর্বে আর কোন গ্রন্থে পাই নি, পরেও খুঁজে পেলাম না। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ওই একটি করুণ গান জীবন্ত হয়ে আমাদের মনে দোলা দিচ্ছে।

সংস্কৃত সাহিত্য যেমন গম্ভীর, সংস্কৃত সংগীতও তেমন সংযত এবং সমাহিত। নানা আইন কানুনের শৃঙ্খলে কঠিনভাবে বাঁধা সে যুগের উচ্চস্তরের সংগীত। গানের অক্ষর, মাত্রা, মূর্ছনা, স্বর—সব একেবারে ছককাটা বাঁধা ধরা—এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নেই। গানের ভাষাও তেমনি স্তোত্রের মত সৌম্যভাবাপন্ন। সংস্কৃত গান যেন সুন্দর উপলখণ্ডে নিপুণ হাতে বাঁধা দৃঢ় রাজপথ—সেই পথ সাবধানে অতিক্রম করতে, করতে এক এক সময় প্রকৃতির খেয়ালে রচিত ধূলিধূসর সামান্য বনপথের জন্য মনটা আকুল হয়ে ওঠে। এই বনপথেই তো বেশির ভাগ লোক পায়ে হেঁটে গান গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে গেছে। তাদের পরিচয় কই? শাস্ত্রী মতঙ্গ একবার বলেছিলেন বটে অবলা, বালক এবং গোপালগণ নিজের ইচ্ছামত যে গান গায় তাই দেশী সংগীত কিন্তু "বৃহৎ দেশী" গ্রন্থে সেই সব গানের একটা টুকরোও যদি তুলে দিতেন তাহলেও আমরা সে যুগের প্রাণের একটা স্পন্দন অনুভব করতাম। যে দেশী সংগীতের পরিচয় আমরা পেয়েছি তা শিক্ষিত পটুত্বের পরিচায়ক, অশিক্ষিত-পটুত্বের কোন নিদর্শন রেখে যাবার মত ভ্রান্তি কোন শাস্ত্রীর ঘটে নি।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সংগীতের সম্পর্ক অতি নিবিড় অথচ উদাহরণ সহযোগে সাহিত্য এবং সংগীতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিবরণ একেবারেই পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ, অলংকার, রীতি, রস কেমনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংগীতে প্রযুক্ত হয়েছে তার ব্যাখ্যা এবং পরিচয় আছে কিন্তু একটা উদাহরণ দিয়ে রূপটাকে চোখের ওপর ফুটিয়ে তোলবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। সংস্কৃত সংগীত যেন আমাদের কল্পনার রামধনু। তার সাতটা রঙের অনেক বর্ণনা পাতার পর পাতা জুড়ে আছে, কিন্তু তুলিকার স্পর্শে একটা চিত্র রেখে গেলে হয়ত তার একটা জীবন্ত নিদর্শন থাকত। সংস্কৃত সংগীত নাটকের মধ্যেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। রংগমঞ্চে নানা অবস্থায় কোথায় কি রাগসংগীত গাইতে হবে তার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু বিখ্যাত নাটকগুলি থেকে উদাহরণ দিয়ে নাট্যসংগীতের আলোচনা কেউ করেননি। নাটক অভিনীত হবার সময় গানগুলি গাওয়া হয়েছে—তারপরে তার আর আলোচনা হয়নি। উজ্জয়িনীর প্রেক্ষাগৃহে শকুন্তলা নিশ্চয়ই অভিনীত হয়েছে কিন্তু হংসপাদিকার ওই ছোট্ট গানটির কোনো উল্লেখ আমরা কোনো সংগীত গ্রন্থে

পাই না। সংগীতাচার্যগণ সংগীতশালায় শিষ্য-শিষ্যাদের সংগীত শিখিয়েছেন—রংগ-মঞ্চে তাদের রূপ দিয়েছেন, তারপরে সেগুলি হারিয়ে গেছে। অপর দিকে যাঁরা শাস্ত্রালোচনা করেছেন তাঁরা আঠারো রকমের জাতিগান, কপাল, কম্বল, আক্ষিপ্তিকা—এসব বৃহৎ ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত, তার মধ্যে হংসপাদিকার ওই গানটুকুর আলোচনা নিতান্ত বাহুল্য মাত্র।

সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ সংগীতালোচনাকে সরস করে তুলতে পারেননি তাই সরস কোন সংগীতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলে সেটা আমাদের স্মৃতিকে অধিকার করে থাকে। হংসপাদিকার গানটি হচ্ছে সেই পর্যায়ের চিত্তাকর্ষক গান। চিত্তচাপল্যের পরিচয় এতে আছে বলেই এটি চিত্তাকর্ষক। অথচ সংগীতের প্রয়োগশিল্পের দিক থেকে এটি বিশুদ্ধ। বিদূষক বলছেন এটি "কলাবিশুদ্ধ" গীত অর্থাৎ এর তালমানে একটু এদিক ওদিক নেই। এমনই একটি নিখুঁত শিল্পসম্মত গানকে স্বরসংযোগে রূপায়িত করছেন তত্রভবতী হংসপাদিকা। গানটি গাওয়া হচ্ছে বিশিষ্ট সংগীতশালা থেকে যেখানে রাজ-অন্তঃপুরের শিল্পীরা বর্ণ পরিচয় অর্থাৎ সংগীতাভ্যাস করে থাকেন। অতএব রূপবন্ধের দিক থেকে কোনো ত্রুটি নেই। অব্যবহিত পরেই বিদূষক আবার বলছেন—অহো রাগপরিবাহিনী গীতিঃ এই উক্তিতে হংসপাদিকা যে রাগ সহযোগে গান করছেন, এইটাই বোঝানো হয়েছে বলে অনুমান হয়। তাহলে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এই ক্ষুদ্র গীতটি রাগ-তাল-মান যুক্ত বিশিষ্ট সংগীত কিন্তু এর আবেদন সেদিক দিয়ে নয়। এর মনোহারিত্ব এইখানে যে এটি এমন একটি প্রণয় সংগীত যাতে একটা তীক্ষ্ন শ্লেষ বর্তমান এবং শ্লেষটি সুর সহযোগে সংগীতের ভিতর দিয়ে কেমন করে ফুটে উঠেছে সেটাই আমরা নানাভাবে কল্পনা করবার অবকাশ পাই। সংগীত শাস্ত্র আমাদের সেই অবকাশ দেয়নি। সেখানে সংগীত একটি বিজ্ঞান সংগীতের মানবিকতা সেখানে আদৌ গণ্য করা হয়নি। কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভা একটুকরো গানের ভিতর দিয়ে করুণ হৃদয়াবেগের একটি ক্ষুদ্র নিদর্শনকে অসাধারণভাবে স্থাপন করে না গেলে সে যুগের সংগীতের একটি মধুর পরিচয় থেকে আমরা নির্দয়ভাবে বঞ্চিত হতাম।

কালিদাস মেঘদূতে আর একটি চিত্র এঁকেছেন যা আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং সে যুগের গীতক্রিয়ার সংগে আমাদের পরিচয় সাধন করে। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই অলকার বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া প্রিয়তমের নামে একটি গান রচনা করে সেটি সুর সহযোগে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছেন। কোলে তাঁর সুরম্য বীণাটি রক্ষিত। যত্ন সহকারে নানা রকম মূর্ছনাও তিনি প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু গেয়ে আর ফোটাতে পারছেন না—তার আগেই আবেগ আর চোখের জল তাঁর কণ্ঠরোধ করছে, তাঁর স্বযত্ন রচিত মূর্ছনাগুলি মন থেকে বার বার মুছে দিচ্ছে।

যক্ষ বলছেন "মদ্‌গোত্রাংকং বিরচিত-পদং গেয়ং"। এইটিই ছিল সেকালের গীত রচনায় রীতি। পদের শেষে একটি গোত্রাংক থাকত। এটি গায়ক গায়িকা, রচয়িতা, গুরু, রাজা—এমন যে কোন ব্যক্তির নাম হতে পারত। এখানে যক্ষপ্রিয়া তাঁর প্রিয়তমের নামেই পদরচনা করেছেন। মূর্ছনার আসল অর্থ হচ্ছে সাতস্বরের ক্রমিক আরোহণ এবং অবরোহণ। এই মূর্ছনা থেকে দু একটি স্বর বাদ দিলেই সেটি তানে পরিণত হত। এমন কত বিচিত্র তান বিচিত্র রাগে প্রযুক্ত হয়েছে। আজকের যুগে এই সব রীতি আর বীণা সহযোগে এই গীতক্রিয়া একটি কল্পনার বস্তু তাই এই চিত্রটিও আমাদের মনে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে।

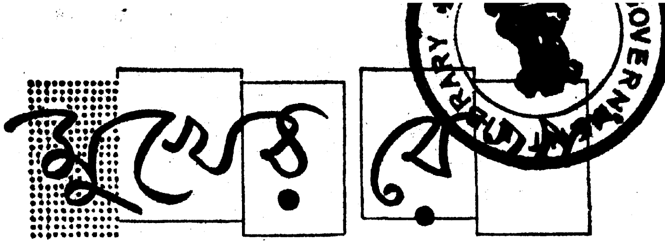
সেই গোত্রাংকিত মূর্ছনাপ্রধান পদরচনার যুগ শেষ হয়েছে বহুকাল, কিন্তু কালিদাসের প্রভাব এ যুগের মহত্তম কবিকেও বহু রচনায় প্রবুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ওপর কালিদাসের প্রভাব একটি গবেষণার বিষয় এবং বোধ করি কবিগুরুর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সংগীতের জন্য যদি কারুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হই তবে তিনি মহাকবি কালিদাস। প্রথম আষাঢ়ে মেঘদূতের কথা যখন আমরা স্মরণ করি তখনই মনে পড়ে এযুগের আর এক মহাকবির গান—

বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে
কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝর ঝর বরিষণে।

• • • •

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে
মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে
সেই চাহনি এল ভেসে কাল মেঘের
ছায়ার সনে।

বহুশত বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা যেন ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ কবির যুগপৎ সান্নিধ্যের আশীর্বাদে ধন্য হই।



সন্তোষকুমার ঘোষ

[ ৭ ]

পিসিমা ধারাবাহিকভাবে ত কিছু বলতেন না, বলার সাধ্যও তাঁর ছিল না, মাঝে মাঝে ছোট দু-একটা ঘটনা বলতেন, মন্তব্য করতেন কখনও-কখনও, টুলু সেইগুলোই জুড়ে জুড়ে গোটা একটা ছবি তৈরি করে নিয়েছিল।

বুলুর কথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই বাড়িতেই তারও আগে একজন এসেছিল, রোদ্দুরে সে এই উঠোনেই খেলা করেছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে, এই খাটে পাতা বিছানাতেই শুয়েছে, ঐ রান্নাঘরেই পিঁড়িতে বসে খেতে খেতে সে ঢুলত।

সে যা করেছে টুলুও অবিকল তাই করে। যেন একজন প্রমোশন পেয়ে উপরের ক্লাশে উঠে গিয়েছে। তার কাছ থেকে বই চেয়ে এনে টুলুকে এখন পড়তে হচ্ছে; সেই বইয়ের পাতায় পাতায় পুরনো মালিকের নাম লেখা।

অনেকদিন টুলু চমকে উঠত। সন্ধ্যার পর, খাটের যেখানে তার বিছানা পাতা, সেখানটায় চোখ পড়লে গায়ে কাঁটা দিত। স্পষ্ট মনে হত, ওখানে আর একজন শুয়ে আছে। অনেকটা টুলুরই মতন, শুধু আরেকটু যেন রোগা, মুখের ছাঁদ আরও একটু মেয়েলি।

যাকে কখনও দেখেছে বলে আদৌ স্মরণ হয় না, তাকে টুলু দেখতে পেত।

সেই মেয়েটির ঠোঁট নড়ে নড়ে উঠত। কোন শব্দ নেই, কিন্তু সে কী বলছে, টুলু স্পষ্ট শুনত। বুলু বলত, "ভয় নেই, আয় আমার কাছে, আয়। বিছানায় এইখানটাতে আমার পাশে ব'স্। আমি সরে শোব এখন, ঢের জায়গা হবে। শুতে চাস ত তাও পারিস। আমার বালিশটা ছেড়ে দেব।"

জোর নয়, জবরদস্তি নয়, খুব নিচু ঠাণ্ডা গলায় ডাকা। সেই ডাক টুলু এড়াতে পারত না। গা ছমছম করত তবু পড়ার টেবিল ছেড়ে পা টিপে টিপে বিছানার দিকে এগুত।

বুলু তখন হাত বুলিয়ে দিত ওর পিঠে। টুলুর ভাল লাগত, ভয়ও হত, প্রথম দিকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকত।

বুলু ওর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বলত, "মাথায় তেল দিসনি বুঝি! আয়, আঁচড়ে দিই।" আস্তে আস্তে টুলু সহজ হয়ে যেত।

"আমি তোকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম" বুলু ওকে বলত আস্তে আস্তে, "ওরা ভালবাসতে দেয়নি।"

টুলু জিজ্ঞাসা করতে চাইত, "কেন, কেন"—কিন্তু টের পেয়ে অবাক হত যে, তার গলাও সেই মুহূর্তে শোনা যায় না।

যে-কথা টুলু বলতে চাইত, সেটা এইঃ "তুমি ত আমাকে হিংসে কর।"

আর বলতে চাইত, "তুমি একটুও ভাল না। কেন আমার বড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না? আমরা দুজনে কত খেলতে পারতুম বল ত। আমাকে বাড়ির বাইরে সঙ্গী খুঁজতে হত না।"

আর ঃ "তুমি জান না দিদি, আমি একা, কী ভীষণ একা।"

বলতে বলতে টুলুর চোখ জানালার বাইরে চলে যেত, বাঁশগাছের যে ঝাড়টা এখন, এই অন্ধকারে-অন্ধকারে অনেক দূরে সরে গিয়েছে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে বলত, "কারুর সঙ্গে আমার ঠিক-ঠিক মিল হয় না, আমার একজনও বন্ধু নেই। আমি কথা বলি এই ছোট পেয়ারার চারাটার সঙ্গে। কিন্তু দিদি, গাছের সঙ্গে মানুষের কখনও সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয়? আর, রান্নাঘরের পিছনে ওই যে মানকচুর ঝোপ দেখছ, ওরা ত আমার শত্রু। কঞ্চি হাতে পেলেই আমি ওদের পাতাগুলো সাফ করে ফেলি।"

আশ্চর্য, বুলু ওর কথা ঠিক শুনতে পেত। জবাবও দিত ধীরে ধীরে।—"তোকে হিংসে করি, ওরা তাই বুঝিয়েছে বুঝি? ভুল, সব ভুল। পাগল, নিজের ভাইকে কেউ হিংসে করে?" খুব চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস কানে আসত টুলুর।—"তোকে ভালবাসতে দিল না বলেই ত আমার মরতে ইচ্ছে হল।"

বুলু ত রোগা, বুলুর ত অসুখ, এটুকু বলেই সে হাঁপাত। দম নিয়ে ফের বলত, "আর; তোর সঙ্গী নেই বলছিস কেন? আমি ত এখনও তোর সঙ্গী; আছি, থাকতে পারি। অন্য সময়ে না হক, রাত্তিরে? ওরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন পাশাপাশি শুয়ে আমরা গল্প করতে পারি। যেমন এখন করছি।"

বলতে বলতে বুলু ওর লিকলিকে ফরসা হাত বাড়িয়ে টুলুর গলা জড়িয়ে ধরত, তারপরই টানত। মাথা নুয়ে পড়ত টুলুর, খুব ক্ষীণ নিশ্বাস ওর মুখে লাগত, টের পেত, সে কখন তার দিদির একেবারে ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু দিদি ত না। তখনই, কয়েকদিন আলাপের পরেই টুলু ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল। বুলু নেই, নেই বলেই আর বাড়েনি, না মনে, না শরীরে। যত ছোট ছিল ততটুকুই আছে। কিন্তু বেড়েছে টুলু। তার বয়স হচ্ছে (পয়সা জমানোর কৌটোয় রোজ সে একটি করে আনি ফেলে দেয়, সেই সঙ্গে এক একটি দিনও যেন পুরে রাখে), অন্তত মাথায় সে ত কবেই ছোট্ট বুলুকে ছাড়িয়ে গেল। এখন সেই দাদা।

মরে-যাওয়া দিদি আজ টুলুর ছোট্ট বোনটি হয়ে গিয়েছে!

নিজের মৃত্যু-রহস্য বুলুই টুলুকে বলত।

বলত, "তারপর তুই ত এলি। আগে ভেবেছিলুম, ও বুঝি বুঝিয়েছিল, তুই আমারই [illegible] তোর জন্যে কাটা পুতুল আলাদা করে বেঁধেছিলুম, তুই জানিসনে। কিন্তু ওরা হতে দিল না ত।"

"সেই টিপটিপে বৃষ্টিতে ভেজা সন্ধ্যার কথা তুই ত দেখিসনি টুলু। মা আমার সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ দেখলুম, মার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। বারবার ঢোক গিলছে। শেষে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল, একেবারে শেষে কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। কোনরকমে আমাকে বলল, 'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, বুলু, তোর পিসিমাকে ডাক্।'

পিসিমা এল। পুরনো একটা শাড়ি পরিয়ে মাকে নিয়ে গেল উঠোনে, যেখানে চাটাই আর পাটকাঠি দিয়ে ছোট্ট একটা একচালা তোলা হয়েছিল। ওরা তাকে বলত আঁতুড়। মাকে তার ভিতরে ঢুকিয়ে পিসিমা ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। বাবা দাইকে খবর দিতে ছুটলেন।

"তারপর কতক্ষণ ধরে যে মা থেকে থেকে গোঙাতেই থাকল, আমারও মনে নেই। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কিনা। অনেক রাত্রে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে শুনি টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ। টুলু, ঠিক তখনই তুই কেঁদে উঠলি।

"কি বিচ্ছিরি গলা রে তোর! শুনতে আমার একটুও ভাল লাগেনি। এ-ঘরে আমি একা, আমার ভয় করছিল। উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু খাট থেকে মাটিতে নামাতে সাহস পাইনি। কাঠ হয়ে শুয়ে তোর কান্না শুনছিলাম। তখন মা চুপ করে গিয়েছিল।

"শেষ রাত্তিরে দেখি, বাবা আমার পাশে। বোধ হয় জেগেই ছিল। ঘরে তখন একটা আলো জ্বলছিল। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বাবা ফিসফিস করে বলল, 'বুলু, তোর একটা ভাই হয়েছে।'

"বললাম, 'দেখে আসি?' বাবা বলল, 'এখন না, কাল সকালে।' বলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

"পরদিন সকালে, টুলু, দেখি উঠোনের জল নামেনি, তবে বৃষ্টি ধরেছে। পা টিপে টিপে গেলাম ওই ঘরে, মা যেখানে ছিল। আস্তে আস্তে ঝাঁপ ঠেলে উঁকি দিলাম। দাই বুড়ি মালসায় খানিকটা আগুন জ্বালিয়ে মাকে সেঁক দিচ্ছিল। পিসিমা বসে ছিল তোকে কোলে নিয়ে। আমি উঁকি দিতেই পিসিমা চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল দাই বুড়িটা। চেঁচাল মা। ওরা সকলে যেন এক সঙ্গে বকে উঠল,—

যা-যা, পালা এখান থেকে। যা এখখুনি!

"টুলু, ভিখিরিকেও লোকে ওভাবে দূর-দূর করে না। অথচ আমি ত কিছু চাইতে যাইনি, গিয়েছিলুম শুধু তোকে দেখতে। আমার চোখে সত্যি তখন জল এসে গিয়েছিল। পিসিমা সেটা দেখল। আলগোছে তোকে কোলে তুলে দরজার কাছে এল। তাই দেখবি? এই দেখ্। সংগে সংগে আমার মুখে হাসি ফুটল। বৃষ্টি না থামতেই আকাশে কখনও কখনও রোদ ফুটে ওঠে, দেখেছিস ত? তেমনি। তোর চোখ তখনও যেন ফোটেনি, ছোট্ট, লালচে, থলথলে। দেখতে মোটেই ভাল ন'স। আমার গোলাপী রঙের বড় মোমের পুতুলটার পাশে তুই কিছু না। তবু আমি সব ভুলে গেলুম, হাত বাড়িয়ে দিলুম তোকে কোলে নেব বলে।

"পিসিমা দিল না। পিছিয়ে গেল সংগে সংগেই! বলল, করিস কী করিস কী! তুই কি পারিস ওকে নিতে! মেরে ফেলবি।

"টুলু, আবার আমার চোখে জল এল। দৌড়ে চলে এলুম ওখান থেকে। বারবার বললুম, চাইনে আমি চাইনে ওকে কোলে নিতে। ভাই না ছাই। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি! মনে মনে পিসিমাকে, ওদের সকলকে বললুম, মিথ্যুক! আমাকে একবারটি ছুঁতেও যদি দেবে না, তবে কেন আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে। কেন বলেছিলে, যে ভাইটা আসছে বুলু, সে আসলে তোরই হবে, তোরই নতুন একটা পুতুল? আমি পড়া মুখস্ত করার মত করে অনেকবার বললুম, ভাই না, ভাই না। ও আমার কেউ না।

"বললুম বটে কিন্তু সেই পড়াটাই সেদিনই আবার ভুলে গেলাম। দুপুরে আবার বৃষ্টি নামল। পুতুলের বাক্স খুলে সাজিয়ে বসেছিলুম, ভাল লাগল না, সব ঠেলে দিয়ে আবার নেমে গেলাম উঠনে। এবার আর ঝাঁপ ঠেলিনি, সাহসই হল না, পা টিপে পা টিপে বার কয়েক শুধু আঁতুড়ের চার পাশটা ঘুরলুম। তুই কাঁদছিলি।

"টুলু, তার পর থেকে কতবার যে তোর চাঁছা গলার কান্না শুনতে চুপে চুপে উঠনে গিয়েছি, হিসেব নেই।"

ওইটুকু বলেই বুলু থামেনি। যেদিনই ঘুম আসত না টুলুর, কিংবা যেদিনই জ্বরে সে ছটফট করত, সেদিনই বুলু শিয়রে বসে তাকে সব—সব বলত। গোটা ইতিহাসই এইভাবে খানিকটা নিঝুম অবসাদে, খানিকটা বিকারে টুলুর জানা হয়ে গিয়েছিল।

বুলু বলেছিল: সেদিন আমার একটু অভিমান হয়েছিল। রাগ না। হিংসে ত নয়ই।

"ক'দিন পরে মা চান করে বাইরে এল। মাদুর পেতে কাঁথায় শুইয়ে দিত তোকে, ডলে ডলে তেল মাখাত। একটু দূরে বসে আমি দেখতুম। আমার যে কাছে যেতে মানা!

"তা সে-মানাও কি আমি কখনও কখনও ভুলিনি! ভুলেছি। হাত বাড়িয়ে তোর তুলতুলে গাল টিপে দিতে গিয়েছি। ওরা ওমনি হাঁ হাঁ করে উঠেছে। লাগবে, ওর লাগবে। মেয়েটার কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! তোর মাথার তালু খুব নরম ছিল ত, আমি এক একবার তুলতুলে জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। ওরা কেউ যখন থাকত না, তখন। মা কিংবা পিসিমা দেখতে পেলে কি আর রক্ষা ছিল!

"তোকে এক দিনের কথা বলি। মা তোকে দাওয়ায় শুইয়ে গিয়েছিল নাইতে। পিসিমাও বাড়ি ছিল না, আমাকেই তাই

বলে গেল, টুলুকে একটু দেখিস। দেখা বলতে মা কী বুঝেছিল সেই জানে। আমি দেখছিলুম। হাত-পা ছুঁড়ে তুই খেলছিলি যেন সাইকেল চালাচ্ছিলি চিত হয়ে। হঠাৎ কেঁদে উঠলি। তখন আমি কাছে গেলুম। জানি না ত, কী করতে হয়, আস্তে আস্তে তোকে চাপড়াতে লাগলুম। তুই থামলি না, বরং আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলি। টুলু, আমি ভয় পেলুম তখন। তাড়াতাড়ি তোকে কোলে নিতে গেলুম। তা কি পারি! আমার ...কেঁপে গেল, তুইও ছটফট করছিলি কিনা, দুজনে মিলে দাওয়া থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস সিঁড়ি ছিল, নইলে অত উঁচু থেকে সেদিন নীচে পড়লে কী হত, কে জানে। তুই আরও জোরে কান্না জুড়ে দিলি, আমিও কাঁদছিলুম। মা তাড়াতাড়ি ছুটে এল। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল তোকে, ধুলো ঝেড়ে আদরে আদরে অস্থির করে তুলল।

"তা করুক। কিন্তু ঠাস ঠাস করে আমাকে মারল কেন? কেন বলল যে, আমারই দোষ? আমি কি ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছি? তা-ছাড়া পড়ে গিয়েছিলুম ত আমিও, আমারই ত বেশি লেগেছিল। কনুইয়ের কাছটা ছড়ে গিয়েছিল। তোকে ত আমি দু হাতে জড়িয়েই রেখেছিলুম। তোর ত খুব লাগেনি।

"আমাকে তবু মারল। কী বিচ্ছিরি চোখে মা তাকিয়েছিল, কী করে বোঝাব! মারল, তবু কাঁদলুম না। আগেই বরং কাঁদছিলুম, লোকে মার খেলে কাঁদে। মার খেয়ে আমি থামলুম। বরাবরের মত। আর কোনদিন কাঁদিনি।

"আর কাঁদিনি। আমি আমার পুতুল-গুলোর কাছেই ফিরে গিয়েছিলুম। ওরা বাধ্য, ওরা আমার। চিরদিন থাকবে। তুই ত মার। মা-ই তোকে খাওয়াবে, নাওয়াবে, ঘুম পাড়াবে।

"এর পর আরও একদিন মা তোকে আমার কাছে রেখে বলল, 'একটু দেখিস। আমি ভাতটা নামিয়ে আসি।'

"আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'না।' মা অবাক হল।—'না? দেখবি না কেন?"

"আমি আবার, আরও জোরে বললুম, 'না, না, না।' আমাকে বোধ হয় ভূতে পেয়েছিল তখন।—ও আমার কে?"

"মার মুখ থমথমে হয়ে গেল।—"তোর ভাই না?' জেদের জোরেই বললুম, 'না, সকলের ভাত হাঁড়িতে পুড়ে গিয়ে রান্নাঘরে যেতে হল। সেদিন আমাদের সকলের ভাত হাঁড়িতে পুড়ে গিয়ে আঁশটে একটা গন্ধ হয়েছিল।"

বুলুর সঙ্গে টুলুর আলাপের কতটা খাঁটি, কতটা কল্পনা? সৌরেন পরবর্তী-কালে তাও বিচার করে দেখেছেন। 'দিনান্তলিপি'-তে আছে :

"বুলু, আমার দিদিকে, কোন্ ঘটনা সব চেয়ে বেশী আঘাত করেছিল, বলা কঠিন। তবে এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে, আমার মা, বাবা এবং পিসিমাও, তার প্রতি যে আচরণ করেছিলেন, সেটা উচিত হয়নি। ছোট্ট মেয়েটির মন তাঁরা বোঝেননি একেবারে। তার অনেকখানি ভালবাসাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হিংসা করে দিয়েছিলেন।

"বুলু দেখেছিল, যে স্নেহটা সে এতদিন পেত, সেটাই তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জমা করে দেওয়া হল আমার নামে। ও'রা এ রকম করলেন কেন? নতুন মানুষটার জন্যে একটুখানি নতুন ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারলেন না?

"বেশ বুঝতে পারি, বুলু ধীরে ধীরে মরীয়া হয়ে উঠছিল। তার অবচেতনায় একটা অভিমান ধীরে ধীরে ভীষণ একটা সংকল্পের রূপ নিচ্ছিল। আমার মৃত্যুকামনা করছিল সে। পারলে, সুযোগ পেলে, গলা টিপে আমাকে মারত। পারল না, অতএব অবশেষে নিজেকেই মারল।

"বাবার ডায়েরিতে দু' একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। আগে মাকে মাঝখানে রেখে বুলু আর বাবা দু'পাশে শুত। আমার জন্মের পর আলাদা ব্যবস্থা হল। বুলু আর বাবা। আমি আর মা। বুলুর ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি, কিন্তু সে প্রতিবাদও করেনি। চুপ করে মেনে নিয়েছিল। তাকে বোঝান হয়েছিল, ছোট ভাই রাতে থেকে থেকে জেগে ওঠে, তাকে থামাতে হয়, এক সঙ্গে শুলে কারুর ঘুম হবে না।

"একদিন ঘুম ভেঙে বুলু দেখল, বাবা তার পাশে নেই। বুলু প্রথমে হয়ত একটু ভয় পেল, তারপর উঠল। মার বিছানার কাছে গেল। বাবাকে দেখল।

"ও'রা দুজনেই চমকে উঠলেন। বাবা বললেন, 'উঠে এসেছিস কেন? জল খাবি?' ...মাথা অবধি চাদরে ঢাকা ছিলেন— ...হাতে সেই চাদর টেনে সরিয়ে দিল বুলু। গম্ভীর গলায় বলল, 'না, আমি এখানে শোব।'

"'এখানে শুবি কী-রে। জায়গা কই।'

"বুলু শুনল না কিছুতে। স্থির গলায় বার বার এক কথাই বলে গেল, 'আমি এখানে শোব।' বাবার চুলের গোছা ধরে টানতে থাকল। বাবা ব্যথা পেয়ে চাপা কাতরোক্তি করে উঠলেন, আমি জেগে কান্না জুড়ে দিলুম। শেষে বুলুই এক সময়ে যেমন ছায়ার মত এসেছিল, তেমনই সরে গেল।

"এই ঘটনাটা বাবা অকপটে তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। বুলুর মনের গতি দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তবু কেন যে ও'রা তখনও সাবধান হননি জানি না।

"পিসিমার মুখে শুনেছি, বুলু ক্রমশ অবুঝ হয়ে উঠছিল। যতই সে টের পাচ্ছিল তার আদরের দিন ফুরিয়েছে, ততই তার আবদারের মাত্রা বাড়ছিল। নিজে নিজে চান করত না। বলত, নাইয়ে দাও। অথবা স্নান করে উঠে ভিজে জামা ছাড়ত না। নিজে হাতে খেতেও চাইত না। কেউ ভাত মেখে না দিলে, সবটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-এক গ্রাস মুখে তুলে উঠে যেত। বুলু রোগা হয়ে যাচ্ছিল।

"তার আধজাগা চেতনায় এই সময়েই বোধ হয় মরে যাবার ইচ্ছাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুলুর মনের কথাটা আমি অনুমান করতে পারি। বুলু নিশ্চয়ই তখন অনেকবার ভগবানকে বলেছে, যদি খুব বড় রকমের একটা অসুখ হয় আমার, যাতে দিনরাত্তির বিছানায় থাকতে হয়, তা হলে হয়ত ওদের ভালবাসা ফিরে পাই। মার, বাবার, পিসিমার। মা আমার শিয়রে বসে থাকে, বাবা ছোটে ডাক্তারের কাছে, আমার জন্যে ঠোঙা ভর্তি বেদানা আর কমলালেবু কিনে আনে, আর পিসিমাকে আমারই জন্যে দুধ-সাবু জ্বাল দিতে হয়। বাড়িসুদ্ধ লোক তখন আমাকে ঘিরে থাকবে, বার বার কপালে হাত দিয়ে দেখবে, বুলুর জ্বর কমল, না বাড়ল। আর, ভাইটা তখন মাদুরে শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করুক। বুলুর তাতে কষ্ট হবে না। বুলু মজা পাবে।

"এমন আকুলভাবে রোগ-কামনা করেছিল বলেই বুলুর সত্যিই বড় রকমের অসুখ হল। নিউমোনিয়া হয়েছিল তার। তখন এ-অসুখ সহজে সারত না। কী জানি, সারতে বুলুও হয়ত চায়নি। প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে থাকত, জ্ঞান হলে হাসত মুখ টিপে টিপে। ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ভাবত, বেশ জব্দ করেছি ওঁদের, ওরা আমাকেই ঘিরে আছে, অসুখ আরও কিছুদিন চলে যদি, চলুক না?

"বেশী দিন না। সকলের সবখানি আদর, যত্ন আর উৎকণ্ঠা কুড়িয়ে জুড়ো করে, বুলু যেই টের পেল আর বেশী কিছু পাবার নেই, অমনই, ঠিক এগার দিনের পর চলে গেল।'"

বুলুর মৃত্যুর ঠিক তিন মাস পরে টুলুর বাবা আর মা আত্মহত্যা করেন। সেই রহস্যটা সৌরেশ তাঁর বাবার ডায়েরি থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

(ক্রমশ)

## তোমায় আমি

জীবনানন্দ দাশ

তোমায় আমি দেখেছি ঘুরে-ফিরে
দেয়াসিনীর মতন শরীরে
খুঁজেছ এসে নিজের মনের মানে
কাকে ভালোবেসে যেন—ভালোবাসার টানে।

অনেক দূরের জলের আলোড়ন
যেন তোমার মন;
সেই নদীরই জল
যেন আমার মনের কোলাহল;
তোমায় খুঁজে পায় না, তবু
ঘুরেছে আমরণ।

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
শঙ্খ সাগর এ-রোদ ভালো লাগে;
এখুনি ঘুম এসে যাবে, কাছে
কালের কালো মহাসাগর আছে।

## প্রথম বসন্ত

বটকৃষ্ণ দে

তোমাকে আমি ডেকেছিলেম প্রথম বসন্তে।
যখন ছিলো শিমূলবনে ঝড়,
লালের নেশা যৌবনের ঘর
ভরেছে, তুমি লেখোনি নাম সীমার সীমন্তে!

অস্তে চলে আকাশ-রঙ, সন্ধ্যালীর সোনা!
সারারাতের অন্ধকারে মেশা
শুধু আমার ফুরোয় না অন্বেষা,
তারার চোখে জিজ্ঞাসার নিমন্ত্রণ বোনা।

জাগরণের সাথী রে মন, রাত্রি নেই বাকী,
অশ্রু ঝরে শিশিরে রাত-ভোর,
প্রার্থনার পাখি এবার তোর
ক্ষান্ত হোক ক্লান্ত এই অবুঝ ডাকাডাকি!

কাকে ডাকিস? জানিস না কি ফুলের মাস অন্ত!
সেতার সাথে শাখায় একা-হাওয়া,
হ'ল না আর দ্বৈত-গীত গাওয়া—
নিলো বিদায় সবুজ-মন, প্রথম বসন্ত।

## বৃষ্টি এলো

শিশিরকুমার দাশ

তুমি চলে যাবার পরেই বৃষ্টি এলো
অন্ধকারের বুকের মধ্যে একা
জানলা দিয়ে জলের বাঁকা রেখা
ঘরের ভেতর হঠাৎ এল ছুটে
অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম একা।

বাইরে ঝড়ের আর্ত হাহাকার
গাছের ডালে ভেঙে পড়ল, আর
রাতের পাখি সঙ্গীবিহীন দূরে
ঘরের মধ্যে শান্ত নীরবতা।

তুমি চলে যাবার পরেই বৃষ্টি এলো
দিগন্তের মেদুর তীরে তীরে
অতীত এক নদীর কালো নীরে
কে যেন মন ভাসিয়ে দিয়ে কাঁদে
কান্না তার গন্ধ হয়ে আসে।

তুমি চলে যাবার পরেই বৃষ্টি এলো
শ্রাবণ রাত নিবিড় করে আনে
মায়াবী তার যাদুতে ভরা গানে
পথিকদের পাগল করে ডাকে
অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম একা॥

# বিশ্ব-বিচিত্রা

পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা হীরক, এখন যাকে 'হোপ ডায়মণ্ড' বলে আখ্যাত করা হয়, জড় অভিশাপ বলে তার মতো কুখ্যাতিও বোধ হয় কিছুর নেই। গত প্রায় তিনশ বৎসরাধিককাল' ধরে তার মালিকদের কেবল অভিশাপেরই কারণ হয়েছে। ১৬৪২ সনে ভারতের কৃষ্ণা নদীর তীরে হীরকটি পাওয়া থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের এক অভিজাত পরিবার নিয়ে হীরকটির ইতিহাস বিভিন্ন মালিকদের কেবল সর্বনাশের কাহিনী। এতোদিন ধরে হীরকটির কথা যখনই উল্লেখিত হয়েছে, তার সংগে শোনা গিয়েছে খুন, আকস্মিক মৃত্যু, মর্মপীড়া আর হতাশার ঘটনা।

জীন ব্যাপটিস্ত ট্রাভেরনিয়ের নামে এক ফরাসী অভিযাত্রীক কৃষ্ণা নদী তীরবর্তী খনি থেকে পাথরটি ফ্রান্সে নিয়ে যান। ট্রাভেরনিয়ের নিষ্কপর্দক ও অপমানজনক অবস্থায় মারা যান—নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হন এবং গল্প আছে যে, বুনো কুকুরে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

অবশ্য মৃত্যুর আগেই ট্রাভেরনিয়ের পাথরটা ফ্রান্সের তৎকালীন শাসক বুর্বো পরিবারের কাছে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। চতুর্দশ লুই পাথরটি কিনেছিলেন এখনকার হিসেবে প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ টাকায়। তারপর সেটি উত্তরাধিকারীসূত্রে গিয়ে পড়ে ষোড়শ লুই ও তাঁর মহিষী মেরী এন্টয়নেটের কাছে। আবার অভিশাপ ফলে গেল। লুই ও মেরী এন্টয়নেট দুজনেরই মুণ্ডচ্ছেদন হয়। প্যারিসের ক্ষিপ্ত জনতা মুকুটের মণিমুক্তোগুলো দখল করে; হীরেটা হারিয়ে যায়।

এর পরে পাথরটির খোঁজ পাওয়া যায় ১৮০০ সনে ফলস্ নামক এক ওলন্দাজ হীরক খোদাইকারের কাছে। মূল পাথরটির ওজন ছিল একশ সাড়ে বারো ক্যারাট, সম্ভবত ফলসই ওটা কেটে বর্তমান ওজন সাড়ে বেয়াল্লিশ ক্যারাটে দাঁড় করায়। ফলসের ছেলে হীরকটি চুরি করে এবং ফলস সেই দুঃখে মারা যায়। অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে ছেলে আত্মহত্যা করে।



"হোপ ডায়মণ্ড"

কালক্রমে পাথরটি ইংরাজ ব্যাঙ্কার হেনরী টমাস হোপ কেনেন এবং তাঁরই নামানুসারে পাথরটির নামকরণ হয়। পরে ওটা তাঁর নাতি সার ফ্রান্সিস হোপের হাতে যায়, যিনি আমেরিকান গায়িকা-অভিনেত্রী মে ওহেকে বিয়ে করেন। বিয়ের বছর কয়েক পরে ওহে আর একজনের সংগে পালিয়ে যায়। সার ফ্রান্সিস পাথরটি নিউ ইয়র্কের ফ্র্যাংকল নামক এক ব্যবসায়ীকে বিক্রী করে দেন। সার ফ্রান্সিস দুঃস্থ অবস্থায় মারা যান এবং মে ওহের শেষ জীবন কাটে চাকরাণীর কাজ করে।

বছরের পর বছর ধরে পাথরটির অভিশাপ ফলে যেতে থাকে। ফ্র্যাংকল দেউলিয়া হয়ে পড়ে; তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ পাথরটি কিনে নেন। আবদুল সেটি তাঁর সর্বাধিক প্রিয়া মহিষী সলমা জুবায়েবাকে দেন। পরে একদিন রাগের মাথায় সলমাকে গুলী করে হত্যা করেন, এবং নিজে তিনি গদীচ্যুত হন। পাথরটি এর পর সাইমন মন্থারাইডস নামে এক গ্রীক দালালের হাতে যায়। মন্থারাইডস, তার স্ত্রী এবং শিশু-সন্তান একটা উঁচু জায়গা থেকে পতনের ফলে মারা যায়। এক ফরাসী স্বর্ণকার জাক কোলেং পাথরটি নেয়, কিন্তু সে উন্মাদ হয়ে যায়।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে পাথরটি রুশীয় রাজকুমার কানিতোভিস্কীর কাছে গিয়ে পড়ে। রাজকুমার ওটি কিনে ফ্রান্সের নৃত্য সম্প্রদায় ফলিস বার্জেয়ারের নর্তকী লোরেন্স লাডককে উপহার দেন। পরদিনই সেই নর্তকী নিহত হয় রাজকুমারেরই হাতে। কানিতোভিস্কীর মৃত্যু হয় আততায়ীর ছুরিকায়।

শেষে ১৯১১ সনে ইভালীন ওয়ালশ ম্যাকলীন নামে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের এক ধনী মহিলা হীরেটি কেনেন। শ্রীমতী ম্যাকলীনের তৎকালে আপ্যায়নকারিণী হিসেবে সমাজে অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। কোটিপতির কন্যাই শুধু নয়, রূপেও অদ্বিতীয়া ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন "ওয়াশিংটন-পোস্ট" পত্রের লক্ষপতি স্বত্বাধিকারী এডওয়ার্ড বীল ম্যাকলীনকে। শ্রীমতী ম্যাকলীনের কাছে থেকে হীরকটি ওয়াশিংটন সমাজেরই ঐশ্বর্য যেন বাড়িয়ে রেখেছিল। পত্র-পত্রিকার রবিবাসরীয় অংকে পাথরটি সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রকাশিত হ'ত। প্রশ্ন তোলা হতো

হীরকটির অভিশাপ ম্যাকলীন পরিবারেও লাগবে কিনা।

কালই তার জবাব দিলে। ওদের ছোট ছেলে ভিন্সন, কাগজে যাকে "লাখ টাকার ছেলে" বলে আখ্যাত করা হতো—এক মোটর-দুর্ঘটনায় মারা যায়। ওদের মেয়ে মাত্রাধিক্য ঘুমনোর ওষুধ খাওয়ার ফলে মারা যায়। শ্রীমতী ম্যাকলীন ও তাঁর স্বামী আলাদা হয়ে যান। শেষে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের হাসপাতালে।

১৯৪৭ সনে শ্রীমতী ম্যাকলীনের মৃত্যুর পর হীরকটি ১৯৪৯ সন পর্যন্ত এক ভল্টে পড়ে থাকে এবং সেখান থেকে নিউ ইয়র্কের স্বর্ণকার হ্যারি উইন্সটন ম্যাকলীনদের সমস্ত গহনাদির সংগে ওটিও কিনে নেন।

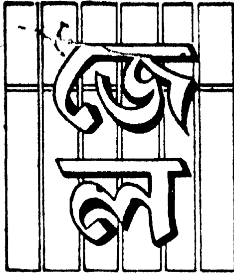
দিনকয়েক আগে উইনস্টন ঘোষণা করেন যে, পাথরটি তাঁর কাছ থেকে যাচ্ছে ওর নতুন মালিক স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউ-সনের কাছে, যাদের মণিমুক্তা প্রদর্শনীর হলে ওটি রক্ষিত হবে।

অতঃপরের কথা কালই জানাবে।

যৌগিক শক্তি যে এখনও বিস্ময়কর কীর্তি দেখাতে সক্ষম, কিছুদিন আগে দিল্লীতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক স্বামী পরম যোগেশ্বর বাবা শ্রীগিরনার তার পরিচয় দেন। মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে একটা কাঠের খোপে পাঁচ হাজার পেরেক গাঁথা হয়। উপবাসের দরুণ দুর্বলতা সত্ত্বেও সাধুজী সেই ধারালো পেরেকের শয্যায় শয়ন করবার পর বাক্সটির ডালাটা ওপর দিক থেকে পেরেক দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়; তারপর গর্তটা বুজিয়ে দেওয়া হয় সিমেণ্ট দিয়ে। হাজার পাঁচেক লোকের ভীড় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ব্যাপারটি অবলোকন করতে থাকে।

সাধুজীর এটি ছিল ১০১তম সমাধি প্রকরণ। অল্প বয়স থেকেই যোগাভ্যাস করে সাধুজী শর সমাধি করেছেন এবং জল সমাধিও করেছেন। শিষ্যবৃন্দ জানান যে, সাধুজী অঘোরপন্থী নন বা নাগা সন্ন্যাসীও নন। সাধুজী মানব-কল্যাণের জন্য ঐহিক শক্তি অর্জন করতে চান। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সমাধি ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য সাধুজীকে সাত লক্ষেরও বেশী টাকা দেওয়া হবে বলা হয়, কিন্তু সাধুজী তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সাধুজী ভূমি সমাধিতে প্রবেশের পর অতি-সাধারণ লোক ছাড়াও বহু সরকারী পদস্থ ব্যক্তিও ভীড়ে এসে দাঁড়াতে থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার পর ওপরের সিমেণ্ট ভেঙে সমাধি খুলে ফেলা হয়। অচৈতন্য হলেও সাধুজীর অঙ্গ মর্দন করার পর আবার তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।






সতীন্দ্রনাথ সেন

৪

২২শে জুলাই ১৯৫৪, রাত্রি প্রায় ৯টা (রংপুর জেল)—১৯শে জুলাই বৈকালে বন্ধুরা বরিশাল জেল হইতে বিদায় দিলেন। ......রংপুর জেল-এর জন্য যাত্রা করিলাম, সেখানে পৌঁছিলাম ২১শে জুলাই প্রায় ৩টার সময়।......

কালই (২১শে জুলাই) হাসপাতালে আসিলাম। আমার পূর্বে জেলের সাহেবের সঙ্গে অল্প আলাপ হইল। শুনিলাম আই. [illegible] আমার absolute segregation-এর জন্য। হাসপাতালে আসাতে মনে হইল আমাকে সিগ্রিগেট করা যায় কি না ইহা লইয়া ইহাদের মনে দ্বিধা রহিয়াছে।......জেলর সাহেবকে লিখিলাম সকালে বৈকালে তিন নম্বর ওয়ার্ডের বন্ধুদের সহিত আমার বেড়ানোর ব্যবস্থা করিতে...সংবাদ আসিল সকালে বৈকালে ওদিকে বেড়ানো যাইবে। গেলাম, চারখানা বই দিয়া আসিলাম—গান্ধীবাদী কেতাব কমিউনিস্ট বন্ধুদের মধ্যে।

কাল সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্‌-এর সঙ্গে প্রথম দেখা হইল। অন্যান্য কথার মধ্যে সিকিউরিটি বন্দী ডাক্তার মাখন ঘোষের মেডিকেল ডায়েট সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, 'আমাকে তো এরা এ-সম্বন্ধে কখনও কিছু বলে নাই'। সকলের সামনেই তিনি একথা বলিলেন। অথচ ইহারা আমাকে বলিয়াছিল যে, বলা সত্ত্বেও দেয় নাই। কিন্তু সকলের সামনে এইরূপ বলিলেন, অথচ কেহ কোনও প্রতিবাদ করিল না সামনাসামনি। পরে তিনি চলিয়া গেলে বলিল, ইহার পূর্বেও আমাদের সামনে দিবার কথা বলিয়া medical subordinate-দের নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সামনাসামনি প্রতিবাদ ইহারা করে না কেন?

২৫শে জুলাই ১৯৫৪, (রংপুর জেল) সকাল ৮টা—খুব বর্ষা হইতেছে। এত ঘন ঘন যে বলিতে ইচ্ছা হয় অবিরাম, অবিশ্রান্ত, যদিও সামান্য সামান্য বিরাম আছে। পরশু ও কাল বৈকালে বর্ষার জন্য তেমন বেড়ানো গেল না। আজ ভোরেও বর্ষা, ছাতা লইয়া বাহির হইলাম। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কেহ বাহির হইতে পারিল না। আমার বর্ষাতিটা তিন নম্বরে, এদের ব্যবহারের জন্য। এদের বইয়ের অভাব, তাই আমার অনেক বই এদের দিলাম।

আজ সকালে বেড়ানো সারিয়া ফিরিবার পথে এদের ঘরে গেলাম। বেড়াইতে যাইবার সময়ও গিয়াছিলাম। আজিজ সাহেবকে (এম এল এ) Assembly Proceedings ও Rules দু'খানা দিয়া আসিলাম। তিনি চাহিয়াছিলেন।......কথাপ্রসঙ্গে আজিজ মিঞা আনন্দের সহিত বলিলেন, "আপনি আমাদের মুরুব্বী, লীডার, ইত্যাদি"। আমি আমার একটা মনের কথা বলিলাম, "ভাই আজিজ সাহেব, আমি কি মনে করি জানেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আপনারা নিদ্রিত ছিলেন, তবু আমরা অগ্রসর হইয়াছি। এখন আপনারা জাগিয়াছেন, এখন আপনারা অগ্রসর হইয়া আসুন, শক্তি দিন। আমরা আপনাদের পাশে আছি।" × × ×

কাল বৈকালে বেড়াইবার সময় আজিজ মিঞা এবং ডাক্তারবাবুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হয়। এই জেলে আসা অবধি আমার কাজ, প্রয়োজন, আমি যেভাবে অফিসের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করিতেছি, তাহা উল্লেখ করিয়া আজিজ মিঞা বলিলেন, "আপনার সব জিনিস দেখিতেছি, straight forward। যা আপনার সংগত, reasonable মনে হয়, তাই বলেন, এবং করেন—আদায়ও হয়...।"

সর্বোদয়ের আদর্শ, trusteeship-এর আদর্শ, বেশ সাড়া তুলিয়াছে। আমার যা-কিছু আছে—বিত্ত, শক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সব সমাজের, বিশ্বের। আমার কাছে যা গচ্ছিত আছে, এক জায়গায়

অনেক জমিয়া গিয়াছে, যেখানে অভাব সেখানে বিতরণ করিতে হইবে, বাঁটিয়া দিতে হইবে।

কাল দুপুর হইতে উপরের টি বি ওয়ার্ড হইতে আমার ঘরে জল পড়িতেছে। দুপুরেই অফিসে খবর দিলাম। ডেপুটি জেলর সেখানে ছিলেন। কাল রাত্রেও পড়িয়াছিল।

যদি তিন নম্বর ওয়ার্ডে জায়গা থাকিত সেখানেই থাকিতাম; কিন্তু জায়গা হইল না। × × ×

দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড়াইয়া, মধ্যে বসিয়া আহারে বিহারে বিলাসিতা অমানুষিক, ইহা মনুষ্যত্বের অপমান, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। এ অবস্থা-ব্যবস্থা টিঁকিতে পারে না, ইহা গণতন্ত্র বিরুদ্ধ।......

আমার চোখের সামনে দেখিতেছি অভুক্ত, অতি অভাবগ্রস্তদের দল। তাহাদের সামনে

আমার এই আরামবিরাম সচ্ছলতা আমার মনকে পীড়া দেয়। কিন্তু কি করিব, আমি বন্দী, কাহাকেও স্বাধীনভাবে সাহায্য করিতে পারি না। যদি পারিতামও, তাহা হইলে কতটুকুই বা কি করিতে পারিতাম! আমার ক্ষমতা যৎসামান্য। যাহা হইত তাহা নামমাত্র।

২৭শে জুলাই (রংপুর জেল)—সেদিন বরিশাল জেল হইতে চলিয়া আসার সময় বন্ধুদের সহিত বিদায়কালীন মিলন বার বার মনে পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছে বন্ধুবর হবিবুল্লার কথাগুলি—"একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ছিলাম, সে-গাছ, সে-ছায়া সরিয়া গেল।......দোয়া করিবেন, ইত্যাদি।" করিমের কথাগুলি হইয়াছিল বেসুরা Simple, Straight forward, যাহা শুনিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে তাহা বলিল। বলিবার যে একটা কালাকাল স্থান-অস্থান আছে তাহা করিম বোঝে না।......আসার সময় বলিল, "আপনি যাইতেছেন, আমার বুক দুরু দুরু করিতেছে।"......

ভাষা আন্দোলনের সময় নিজ জেলার জেলে থাকিতে পারি নাই, বিভিন্ন জেলায় কয়েকটা জেলে ছিলাম। মেলামেশার ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছি প্রচুর। অনেক সময় মনে হইত যে নিজ জেলার সহকর্মীদের সঙ্গে একবার থাকার সুযোগ পাইলে ভাল হইত। এবার সে-সুযোগ হইল। কিছু লাভ হইয়াছে; পুরাপুরি হইল না। কতটা হইল বুঝিতেছি না। বাহিরে গেলে বোধ হয় ভাল বোঝা যাইবে। নেতাদের মধ্যে দুভাইএর সঙ্গেই বোধ হয় under-standing-টা বেশী এবং গভীর হইয়াছে। শেষের দিক দিয়া লকিতুল্লার একদিনের কথা মনে পড়ে—"আমরা তো আপনারই (কর্মী?)"......

২রা আগস্ট, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কাল একজন এম এল এ আসিলেন (হবিবর রহমান সাহেব)। আজ তিনজন কলেজের ছাত্র আসিল। ইতিপূর্বেও আসিয়াছে একজন। এখানে মাঝে মাঝেই এমন আসিতেছে, তবু বরিশালের মতন, বহু নির্দোষ। গবর্নমেণ্টের পলিসি ভুল: ইহাদের অনেকেই নন্-পলিটিক্যাল, অনেকের খুব হালকা ধরনের এবং সাময়িক উত্তেজনায় রাজনীতি করে। গবর্নমেণ্টের ভুল পলিসি এদের সিরিয়স করিয়া তুলিতেছে— Subversive-এর ভিতর ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

৪ঠা আগস্ট, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কাল ডি আই ও রংপুরকে পত্র দিলাম ইণ্টারভিউর জন্য, জনকয়েক নিরাপত্তা বন্দী সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য—বরিশালে যেমন করিয়াছিলাম।...

১৩ই আগস্ট ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—আমার অনুরোধমত কাল ডি আই ও আমার সহিত দেখা করিলেন। কাল আলোচনা শেষ হইতে পারে নাই—লক্-আপ-এর সময় হইয়া গেল। আমার অনুরোধে পরবর্তী ব্যাচ্ স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।......

আমি একাই একরকম কথা চালাইলাম—ডি আই ও শুনিয়া গেলেন। আমি প্রস্তাব করিলাম সামনের দিন তিনি বলিবেন। ডি আই ও-কে বলিলাম, "আপনাদের বিরাট দায়িত্ব। গবর্নমেণ্ট চায় ধ্বংসাত্মক এবং রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিতে। আপনারা আইন ও শৃংখলা রক্ষা করিবেন—দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। অথচ নিরাপত্তা বন্দীদের সব একতরফা বিচার। অবৈধ, ধ্বংসমূলক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু সংগে সংগে দেখিতে হইবে যেন কোনও নির্দোষের শাস্তি না হয়। (নিরাপত্তা বন্দীদের) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগের অভাবে যাহাতে শাস্তি না পায় এই দায়িত্ব আপনাদেরই। যে-সব সাক্ষীপ্রমাণ আপনাদের কাছে আসিবে, তাহা আপনাদেরই বিশেষ বিবেচনার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং তা যদি আপনারা করেন তবেই গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। (ইসকান্দার মির্জা বলিয়াছেন, lawlessness দমন করিতে হইবে—both non-official and official।) এমারজেন্সির সময় গ্রেফতার করাতে ভুল হইতে পারে, কিন্তু তারপর একমাস যে সময় পান তার মধ্যে ভুল সংশোধন করিবেন। যদি ন্যায্য বিচার না হয়, যদি নিরপরাধের শাস্তি হয়, তাহা হইলে পরিণামে গবর্নমেণ্টের লোকসান হইবে।

গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং সেজন্য. স্থানীয় কর্মচারীরাই দায়ী হইবে। নিরপরাধ লোক নিরাপত্তা বন্দী হইয়া আটক থাকিলে শত্রুতে পরিণত হইবে—তার পরিবারস্থ লোকের মধ্যে এবং তার এলাকায়ও গবর্নমেণ্ট বিরোধী মনোভাব ছড়াইয়া পড়িবে।......

আর যদি সুবিচার হয়, গ্রেফতার করার মধ্যেও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নিরপরাধ, শুধু সন্দেহবশে ধৃত. তিরিশ দিনের মধ্যে যদি তারা মুক্তি পায়—তাহা হইলে এই কুফল হইবে না। লোকেরা মনে করিবে এমার-জেন্সিতে অনবধানতাবশত কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভুল হইয়াছিল এবং তাড়াতাড়ই সেগুলি সংশোধন হইয়াছে, ইত্যাদি .....।"



বলিলাম "আমি open to conviction। জলিল মিঞা, প্রধান সাহেব এবং ছাত্রদের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অবিলম্বে বিনাসূর্তে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে বিরোধের ফলে যে-সব ছেলেরা গ্রেফতার হইয়াছে, তাহারা যদি অন্যায়ভাবে স্ট্রাইক করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদের কার্যের অনুমোদন করি না; তবে সেজন্য তাহাদের নিরাপত্তা বন্দী করাও সঙ্গত নহে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্য কোনও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, তাহারা অন্যায়ভাবে অন্যায় দাবি সমর্থনে স্ট্রাইক করে নাই। সংশ্লিষ্ট ছাত্রটি অনুতপ্ত, ক্ষমা চাহিয়াছে। কলেজের প্রিন্-সিপ্যাল তাহাদের প্রতি কুৎসিত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। তাহারই প্রতিবাদে স্ট্রাইক। ছাত্রদের নিকট হইতে শুনিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে। যদি আপনাদের কাজে ইহাদের বিরুদ্ধে বা অন্য ছাত্রদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের কোনও সাক্ষী-প্রমাণ থাকে তাহা হইলে বলুন। যদি সে-সব অকাট্য হয়, আমি মত পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত আছি।"

বরিশালের কথাও সব বলিলাম। প্রায় ৯০ জনের মতন ধরা পড়িয়াছিল। আমি চলিয়া আসিবার সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ডি আই ও একটু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "নিশ্চয়ই অনেক ক্রিমিন্যাল ধরিয়াছিল।" আমি বলিলাম, "অল্পসংখ্যক ক্রিমিন্যাল ধরিয়াছিল।" বলিলাম অনুজ কাহিনী, পটুয়াখালির বণিক্য সম্বন্ধেও—তাহারাও মুক্তি পাইয়াছে; anti-corruption ইত্যাদিতে খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ লোকও মুক্ত; দুইজন এম এল এ মুক্ত হইয়াছে—একথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

কয়েকটি কেস জটিল। অন্যান্য কেসগুলি সম্বন্ধে বলিলেন, "লিখিয়া দিন, আমরা এন্কোয়েরি করিব।"

সব কেস আলোচনা করা গেল না। লক-আপ-এর সময় হইয়া গেল। পরে আর একদিন আসিবেন—প্রয়োজন হইলে মোকাবিলা আলাপ হইবে এবং ইহাদের যদি কোনও চার্জ থাকে তাহাও বলিবেন।

লোক্যাল ঝগড়া ইত্যাদির ফলে অনেক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে যাহারা maliciously malafide গ্রেপ্তার করিতেছে বা করিয়াছে তাহাদের ভিন্ন শাস্তি হওয়া দরকার।

২৩শে আগস্ট, ১৯৫৪ (রংপুর জেল) —পাঁচছয়দিন সকালে বিকালে আর মাঠে

বেড়াইতে যাই নাই। সর্দি কাশিতে কষ্ট পাইতেছি। সেদিন মাথায় তেলটা বেশী দেওয়া হইয়াছিল। গায়েও বেশ তেল দিয়া, জল দেরিতে আসায়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে স্নান করিতে হইয়াছিল। জেলর সাহেব তুলসীপাতা বাসকপাতা প্রভৃতি সাপ্লাই করাতে সেগুলি গরম করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহাতেই সারিয়া গেলাম। আজ বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তবে লক্ আপ্-এর সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্-আপ হই।

দুইদিন হইতে রাত্রে আটার রুটি খাইতেছি। এই কয়দিনে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বণ্ড দিবার জন্য ছাত্রদের লইয়া খুব পীড়াপীড়ি চলিতেছে। শেষ চারজন ছাত্রই শেষ পর্যন্ত বণ্ড দিয়াছে। যে pressure এবং temptation!

ডি আই ওর সঙ্গে আলাপে কি কিছু ভুল হইল? ইহারা ছাড়িতে চাহিতেছে, বুঝিতেছে কেস দুর্বল, বণ্ড না হইলে তাহাদের অসুবিধা, তাই বণ্ড লইয়া ছাড়িতেছে? মোজাম্মল প্রধানই নাকি প্রথম বণ্ড দেয় তারপর নাকি অপর সকলে দিয়াছে। নূর-উল-ইসলাম confirmed হইয়াছে, বণ্ড দেয় নাই।

ডি-আই-ও আর আসিলেন না। ডি-এম-ও না। এদের প্রতিক্রিয়া কি হইল?

বরিশাল আর এখানকার কি তফাত?

২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৪ (রংপুর জেল রাত্রি প্রায় ৯টা)—আজ মোজাম্মল প্রধান (দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, আই এসসি) মুক্ত হইল। এর কেসটা দেখিয়া আমার পূর্ব ধারণা দৃঢ় হইল। অর্থাৎ বোধ হয় এরা বুঝিয়াছে যে ধরা ভুল হইয়াছে, অথবা ছাড়া উচিত, এক একবার বিনাশর্তে ছাড়ার মতো সাহস বা আবহাওয়া নাই, তাই বণ্ড লইয়া ছাড়িল। এতে মনে হয় আজ বৈকালে প্রিন্সিপ্যালঘটিত ব্যাপারে যে কয়জন ধরা পড়িয়াছিল তারা সব খালাস হইবে। একদিক দিয়া লক্ষণ ভাল—বিবেচনার উদয় হইতেছে।

এদের অসুবিধা বুঝিতেছি। ডি আই বি বিনাশর্তে মুক্তি দিতেছেন! কিন্তু confirmed কেস-এ অসুবিধা থাকিলেও unconfirmed কেস-এ তো অসুবিধা ছিল না। এতে এদের দুর্বলতা ধরা পড়িতেছে। তবু মন্দের ভাল। এরা সব ননপলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র, পড়ার দিক হইতে প্রচণ্ড ক্ষতি—ভবিষ্যত জীবনের দিক হইতেও, যেহেতু তারা নন্-পলিটিক্যাল। পলিটিক্যাল কর্মী হইলে পৃথক কথা ছিল। তবে বণ্ড দেওয়া ভাল হয় নাই। ইহাদের উচিত হবে বাহিরে গিয়া তদবির করিয়া বণ্ড-এর অসংগত সর্তগুলি বদলানো।

২৫শে অগষ্ট, ১৯৫৪ (রংপুর জেল, রাত্রি প্রায় ৮টা)—আজ সকালে ইশাকের (চতুর্থ বার্ষিক, বি এস-সি, জি এস, কলেজ ইউনিয়ন) সঙ্গে অনেক কথা হয়। শেষের দিকে নূর-উল-ইসলাম (চতুর্থ বার্ষিক) উপস্থিত ছিল। বলিলাম তাহারা কয়জন নিশ্চয়ই খালাস হইবে। ডি আই ওর সহিত আমার কথা হইবার পরে, ডি আই বি খুব তাড়াহুড়া করিয়া ইহাদের নিকট হইতে যেমন করিয়া হউক যেমন-তেমন একটা বণ্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং সফল হন।...... কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, এদের ধরা ভুল হইয়াছে এবং ছাড়িয়া দিতেই হইবে—তবে একটা কিছু নিয়া ছাড়িলে প্রিন্সিপ্যালের প্রেস্টিজ রক্ষা হয় এবং অফিসারদের স্বপক্ষেও বলিবার কিছু থাকিবে। (ভ্রান্ত ধারণা)।

* * * * আমার ধারণা ইহাদের বিনা-সর্তে মুক্তি দিতে ইহারা বাধ্য, ইহাদের আটক রাখিতে পারে না। কিংবা ছাড়িতে হইলে এই সব সর্ত দিতে পারে না। এক দিনের স্ট্রাইকের জন্য নিরাপত্তা বন্দী হয় না—হইতে পারে না। উকীলের পরামর্শ নেওয়া ভাল, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। বৈকালে বেড়াইবার সময় হঠাৎ খবর পাইলাম যে, ইশাক এবং নুরনবী খালাস হইয়াছে। ........... নুরুল ইসলাম (দ্বিতীয় স্ট্রাইকের সঙ্গে মুখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র) বোধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যে খালাস হইবে।

পরশু বৈকালে সত্তর বৎসরের একজন মুসলমান ভদ্রলোক নিরাপত্তা বন্দী হইয়া আসিলেন। এম এল এ সাহেবের নানা, গোঁড়া কংগ্রেসী ছিলেন, সর্বাঙ্গে খদ্দর। বেশ তাজা মন। আজ সকালে ও বৈকালে খুব আলাপ হইল।

ছাত্রদের মুক্তি কি আমার পন্থার, অন্তত আমার ব্যক্তিগত, সাফল্য সূচিত করে? আমি কি অফিসারদের প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছি এবং তারই ফলে কি তাহারা এই পথ ধরিয়াছে? সঠিক কি করিয়া বোঝা যায়? এটা এখানে নূতন—পূর্বে এইরূপ খালাস হয় নাই—এইভাবে কোনও কেস গ্রহণ করা হয় নাই। ত্রিশ দিনের পূর্বেই মুক্তি—বণ্ড দেওয়ার পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। বিনা সর্তে হইলে সবচেয়ে সুখের হইত।

আমার কি কর্তব্য? অন্য সব কেস স্টাডি করা—deserving Case গ্রহণ করা, Confirmed নিরাপত্তা বন্দীদের কেসও?

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ রাত্রি প্রায় ৯টা (রংপুর জেল) আজ সকালে মোজাফ্ফর ও প্রধান সাহেব খালাস পাইলেন। ইতি-পূর্বেই প্রিন্সিপ্যালঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে যে-সব ছাত্র গ্রেফতার হইয়াছিল সকলেই মুক্তি পাইয়াছে। আটগ্রামের ছেলেটির এখন পর্যন্ত হইল না। হয়তো কাল হইবে।

মোজাফ্ফরকে আজ সকালে ঘুম হইতে উঠাইয়া বেড়াইতে লইয়া গিয়া অনেক কথা বলিলাম—ডি এম ওর কাছ [illegible] শর্ত সম্বন্ধে কি আলাপ করিতে হইবে।

মোজাফ্ফর ও প্রধান সাহেবের সহিত ডি আই ও কাল দেখা করিয়া বলেন, যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহাদের বণ্ড সহি করিতে হইবে। পূর্বে অন্য কারও বেলায় ইহা করা হয় নাই। কেন? ইশাককে ডি এম-এর সঙ্গে দেখা করিয়া যে-সব কথা (পুলিস [illegible] বণ্ড আদায় করিতেছে ইত্যাদি) আমি তাহাকে জানাইয়া বলিয়াছিলাম ইহা কি তারই ফল? পাঁচজন নূতন বন্দী আসিল। দুইজন দারাজ মণ্ডল সাহেবের ছেলে। তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে চার্জ এই যে তাহারা মণ্ডল সাহেবের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়াছে। বদরগঞ্জের এক ভদ্রলোক (কুণ্ডু) আসিয়াছেন। পূর্বেও তিনি জেল ভোগ করিয়াছেন।

ডাক্তার মাখন ঘোষ, এম বি, পরশু রাজসাহী জেল হইতে এখানে আসিয়াছেন মুক্তির জন্য। তাঁহার কাছে সেখানের অনেক খবর পাইলাম।

আজ বরিশাল জেল হইতে বেলায়েতের দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অদ্ভুত পত্র বেলায়েত অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষ বলিয়া যা [illegible] আসে লিখিয়াছে, অথচ সেন্সর একটা পঙ্‌ক্তিও কাটে নাই। যদি ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই দুইটি জেলার মধ্যে বিষম পার্থক্য আছে বাস্তব শাসন ব্যবস্থায় [illegible]। (ক্রমশ)

গৌরব বজায় রাখার মত শক্তি তাঁর নেই। রাজাগাভের পরই তিনি বাংলায় দিল্লীর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্যে দু'বার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হননি। তাঁর রাজত্বকালেই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ দিল্লীর সুলতানকে পরাস্ত করে বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। রাজধানী হয় সুবর্ণগ্রাম।

দিল্লী নগরীর প্রান্তে ঐ সময় নিজামুদ্দীন আউলিয়া নামে এক পীর বাস করতেন। শাহজলালের সংগে নিজামুদ্দীনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই দুই পীর সম্পর্কে একটা গল্প চালু আছে। একদিন নিজামুদ্দীনের এক শিষ্য এসে গুরুকে জানালেন, আরব থেকে এক দরবেশ এসেছেন। তিনি স্ত্রীসংগ বর্জিত;—স্ত্রীমুখ দর্শনের ভয়ে চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন। দরবেশ-সমাচার শুনে নিজামুদ্দীনের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। প্রকৃত পীর, না ভণ্ড কেউ? নিজামুদ্দীন শাহ্জলালকে আহ্বান করলেন। পাঠালেন তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে। শাহ্জলাল কিন্তু নিজামুদ্দীনের মনের কথা টের পেলেন। মুখে কিছু বললেন না। শুধু একটা কৌটোয় কিছু তুলো এবং আগুন রেখে কৌটো বন্ধ করে ঐ শিষ্যের হাত দিয়েই নিজামুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

নিজামুদ্দীন কৌটো খুলে হতবাক। কি আশ্চর্য! অগ্নিদাহ্য তুলো অগ্নিশিখার পাশে পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছে। গায়ে আগুনের আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। নিজামুদ্দীন নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেলেন। সত্যি, নিজামুদ্দীনের তুলাসদৃশ শ্বেত ও কোমল অন্তঃকরণে শাহ্জলালের প্রতি সন্দেহ-বহ্নি কি করে স্থান পায়? নিজামুদ্দীন তক্ষুনি ছুটে গেলেন শাহ্জলালের কাছে। দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। দিল্লীনগরীর বুকে দুই বিখ্যাত দরবেশের মিলন ঘটল।

নিজামুদ্দীনের কাছে ছিল কয়েকজোড়া কাজলা রঙের কবুতর। শাহ্জলালকে তিনি দু জোড়া ঐ কবুতর উপহার দিলেন। এবং নিজ সন্দেহের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। শাহ্জলাল পরে এই কবুতর নিয়ে এসেছিলেন শ্রীহট্টে। 'জলালী-পায়রা' নামে পরিচিত এই কবুতর এখনও কোন হিন্দু-মুসলমান খায় না। পূর্ববংগ ও শ্রীহট্টের সর্বত্র এবং দিল্লীতে নিজামুদ্দীনের দরগার কাছাকাছি ঐ জলালী পায়রা এখনও মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়।

শাহ্জলাল তখন দিল্লী নগরীতে অস্থায়ী আস্তানা পেতেছেন। এমনসময় হঠাৎ একদিন পূর্ববংগের প্রত্যন্ত প্রদেশ সুদূর শ্রীহট্ট থেকে বুরহানুদ্দীন নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান দিল্লীতে এসে হাজির। নিজপুত্রহন্তা এক হিন্দু নরপতিকে শায়েস্তা করার জন্যে বার বার চেষ্টা করে তিনি বিফল হয়েছেন। শেষমেষ শাহ্জলালের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। প্রার্থনা করলেন তাঁর সাহায্য। শাহ্জলাল সব কথা শুনে বললেন, তথাস্তু।

( ২ )

ভারতের পূর্ব সীমান্তে পাহাড় বন নদীনালায় ঘেরা প্রকৃতির লীলানিকেতন শ্রীহট্ট। কমলালেবুর আর অগুরুর গন্ধে ভরা শ্রীহট্টের আকাশ বাতাস আগন্তুকের মন মাতায়। তার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শ্রীহট্টের স্বাধীন হিন্দু নরপতিদের পরাস্ত করা সম্ভব হয় নি।

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্গত। পরবর্তীকালে শ্রীহট্টের একাংশ চলে যায় ত্রৈপুর রাজ-

বংশের অধীনে। বাকী অংশ শাসিত ছিল গৌড়, লাউড়, জয়ন্তীয়া এই তিন প্রধান রাজ্যে। তিন রাজ্যের রাজাই ছিলেন স্বাধীন। বর্তমান শ্রীহট্ট শহর এবং উত্তর শ্রীহট্টের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল তখনকার গৌড় রাজ্য।

গৌড়ের রাজা গোবিন্দ। 'গৌড়-গোবিন্দ' নামেই তিনি বিখ্যাত। শ্রীহট্টের এই শেষ হিন্দু নরপতি খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার নবাব শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সমসাময়িক।

গৌড়গোবিন্দ ছিলেন জাদুবিদ্যা-বিশারদ। তাঁর নামে অসংখ্য অলৌকিক কাহিনী এখনও শোনা যায়। তিনি নাকি দূর থেকে শব্দমাত্র শুনে অন্তরাল থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন।

"জানিহ শ্রীহট্ট নামে আছে পূর্বদেশ।
ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে স্থান আছে সবিশেষ॥
গৌড়গোবিন্দ নামে তাহার নৃপতি,
শব্দভেদী বাণ যার আছিল অধীতি।"

('দত্তবংশাবলী' নামক প্রাচীন গ্রন্থ)

শ্রীহট্ট শহরে তখন একঘর কি দুঘর মুসলমানের বাস, বুরহানুউদ্দীন অন্যতম। মুসলমানরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতেন। মনে মনে ইসলামধর্ম প্রচারের স্বপ্নও দেখতেন।

বুরহান্-উদ্দীন একদিন নিজপুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে লুকিয়ে বাড়িতে গরু জবাই করেন। কিন্তু এমনি বরাত যে, কোথা থেকে উড়ে এল এক চিল। একখণ্ড গো-মাংস ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে চিল দিলে চম্পট। আর পড়বি তো পড়, মাংসের টুকরো গিয়ে পড়ল, আর কোথাও নয়,—খাস রাজবাড়িতে। রাজা গৌড়গোবিন্দের প্রাসাদের ভিতরে।

নিমেষে এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল রাজধানীর অলিতে গলিতে। অমাত্যবর্গ প্রমাদ গোণেন। রাজার কাছে সংবাদটি পেঁাছলে পর তিনিতো রেগে লাল। 'দুই চন্দ্র জিনি নাটা, ঘুরে যেন কুচ ভাঁটা' কে, কার এত আস্পর্ধা? হিন্দু রাজার রাজত্বে বাস করে গোমাতাকে হত্যা করার দুঃসাহস রাখে কোন্ পাষণ্ড? ডাকো তাকে। হাজির করো রাজদরবারে।

চারদিকে ছুটল সান্ত্রীর দল। বেঁধে নিয়ে এল বুরহান্ উদ্দীনকে। রাজার আদেশে বুরহানউদ্দীনের ছেলেকে হত্যা করা হল অসহায় বন্দী পিতার সম্মুখে। শুধু তাই নয়, বুরহানউদ্দীনের যে হাত গরু জবাই করেছিল সে হাতও জহ্লাদের অস্ত্রের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

দিন যায়। বুরহানউদ্দীনের মনে প্রতি-শোধ গ্রহণের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। পুত্রহন্তা কাফেরকে চরম শাস্তি দেওয়া চাই-ই চাই। বাঙলা আর দিল্লীর মসনদে এখনও রাজত্ব করছে মুসলমান।










বুরহানউদ্দীন গোপনে শ্রীহট্ট ত্যাগ করলেন। এলেন বাংলার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে। নবাব শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের কাছে জানালেন দুঃখের কথা।

শামসুদ্দীন বিচলিত হলেন। এতদূর স্পর্ধা রাখে ঐ ক্ষুদ্র হিন্দু নরপতি। দুদিন পরে তাহলে আমার রাজ্যে এসেও ছোবল মারিতে চাইবে। না, তা হয় না, মুসলমান এখনও এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটায় নি। এখনও বেঁচে আছে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। —সুবর্ণগ্রাম জুড়ে সাজ্-সাজ্ রব পড়ে গেল। নিজতনয় সিকান্দার শাহ্‌কে সেনাপতি করে শ্রীহট্টের গৌড়রাজ্য বিজয়ে পাঠালেন এক বিরাট ফৌজ।

ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে রাজা গৌড়গোবিন্দের কাছে। তিনিও অলস বসে রইলেন না। শ্রীহট্ট শহরে বেজে উঠল জয়-ঢাক, কাড়ানাকাড়া। রণদামামার তালে তালে সীমান্ত এলাকায় সমবেত হল বিরাট সৈন্যবাহিনী। এদিকে সিকান্দার শাহের ফৌজও পৌঁছে গেছে। দু'পক্ষে শুরু হল তুমুল লড়াই। শেষপর্যন্ত সিকান্দার শাহ গৌড়গোবিন্দকে কাবু করতে পারলেন না। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে এলেন সুবর্ণগ্রামে। শ্রীহট্ট শহরে তখন চলছে যুদ্ধজয়ের আনন্দোৎসব।

ব্যর্থকাম বুরহানউদ্দীন শেষ চেষ্টায় হাজির হলেন রাজধানী দিল্লী নগরীতে। সেখানে কিছুকাল থেকে আমীর ওমরাই-দের হাতেপায়ে ধরে নিজ দুঃখের কাহিনী বাদশাহ্ ফিরোজ শাহ তুঘলকের গোচরে আনলেন। হিন্দুবিদ্বেষী সুলতান বুরহান্-উদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। নিজ ভাগিনেয় সিকান্দার শাহ্ গাজীর অধীনে গৌড়গোবিন্দকে শায়েস্তা করতে পাঠালেন এক মুসলমান ফৌজ।

"আপন ভাগিনা ছিল সিকান্দার শাহা।
ডাকিয়া দিল্লিকা তারে শুনিলেন যাহা॥
লড়াই করিতে তারে করিল ফরমান।
তৈয়ার করিতে কহে লস্কর ও কামান॥
হাতিঘোড়া উট আদি সামান লস্কর।
সাথে লৈয়া যাইতে হৈবে ছিলট নগর॥
গৌড়গোবিন্দ নামে এক কাফের ছরদার।
মারিয়া মুল্লুক হৈতে করিবে বাহার॥
(শাহজলালের জীবনীকাব্য—
তোয়ারিখ-এ জালালী)

সিকান্দার শাহা গাজী সসৈন্যে শ্রীহট্টের সীমান্তে এসে উপস্থিত হলেন। তখন বর্ষা সমাগত। চেরাপুঞ্জির কালো মেঘ জয়ন্তীয়া পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সারা শ্রীহট্টে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছে।

পুঞ্জা মেঘে আঞ্জাআঞ্জি চেরাপুঞ্জির পাড়।
কালা মেড়া ফাল্ দি পড়ে
ধলা মেড়ার ঘাড়॥

(সৈয়দ মুজতবা আলীর সৌজন্যে। আঞ্জা-আঞ্জি—কোলাকুলি, পাড়—পাহাড়ে, ঘাড়—

ঘাড়ে, মেড়া—ভেড়া, ফাল—লাফ। 'পাড়' ও 'ঘাড়'—দুটো শব্দই স্বরান্ত পড়তে হবে।)

এই প্রবল বর্ষার সংগে দিল্লীর মুসলমান সৈন্যের ইতিপূর্বে কোনদিন পরিচয় ঘটেনি। বর্ষার প্রকোপে মুসলমান সৈন্যের শিবিরে নানা রোগও ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ মনে করল—ভোজবাজির রাজা গৌড়-গোবিন্দের জাদুবিদ্যার প্রভাবজনিত কোন উপদ্রব বোধহয় এই বর্ষা। অনেকেই ভীত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সিকান্দার শাহ্ আর একদল সৈন্য আনালেন দিল্লী থেকে। কিন্তু মুসলমান সৈন্যের মনের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। সকলের মুখেই 'পালাই-পালাই' রব।

এমনসময় সুযোগ বুঝে গৌড়গোবিন্দ মুসলমান শিবির আক্রমণ করে বসলেন তাঁর দুর্ধর্ষ পাহাড়ী সৈন্যদল নিয়ে। বর্ষায় এদের কাবু করা দূরে থাকুক, দাপট আরও বেড়ে যায়। মুসলমান সৈন্য ছত্রভংগ হয়ে পড়ল। পিছু হটে সিকান্দার শাহ্ তাঁবু গাড়লেন কিছুদূরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে।

"কিছুকাল পরে শাহা খবেরজমা হৈল।
উত্তম লস্কর আনি লড়িতে চাহিল॥
কোমর বান্ধিয়া যবে হৈল তৈয়ার।
হৈল সাবেকী দশা সিকান্দার শাহার॥
(তোয়ারিখ-এ-জালালী)

বুরহানউদ্দীনের দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হল। নিদারুণ মনস্তাপে তিনি দেশত্যাগের সংকল্প করলেন। রওনা হলেন তীর্থক্ষেত্র মদিনার দিকে। মদিনা যাওয়ার পথে দিল্লী নগরীতে দরবেশ শাহজলালের সংগে তাঁর হঠাৎ দেখা। শাহজলাল বুরহানউদ্দীনের দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনলেন। প্রতি-কারের আশ্বাসও দিলেন।

এদিকে সিকান্দার গাজী বার বার পরা-জিত হয়ে নিজ পরাজয় বার্তা দূতমুখে বাদশাহকে জ্ঞাপন করে আরও সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুসলমান সৈন্যের ভীতি এবং গৌড়গোবিন্দের জাদুবিদ্যার গল্প শুনে সুলতান ফিরোজ শাহ্ কোন পীরকে সেনাপতি পদে বরণের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ঐ সময় সৈয়দ নাসিরুদ্দীন নামে বোগদাদবাসী একজন পীর দিল্লীতে ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁকেই সিপাহসালারের পদে বরণ করলেন এবং তিন হাজার পদাতিক ও এক হাজার ঘোড়সওয়ার সংগে দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে তিন শ' ষাটজন অনুচর ও বুরহানউদ্দীনকে নিয়ে শাহজলাল শ্রীহট্টের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। পথে এলাহাবাদে শাহজলালের সংগে নাসিরুদ্দীনের দেখা। একই সংকল্প নিয়ে উভয় দলের একই স্থানে যাত্রা। শাহ্-জলাল, নাসিরুদ্দীন দুজনে হাত মেলালেন। নাসিরুদ্দীন শাহজলালের আধ্যাত্মিক মহিমার কথা আগেই জানতেন। তিনি তাঁকে গুরুপদে বরণ করলেন। এবং কার্যতঃ শাহ্জলাল হয়ে গেলেন ঐ বিরাট সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থানকারী সিকান্দার গাজী দিল্লী থেকে আগত মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত জানালেন এবং দরবেশ শাহ্জলালের নেতৃত্বে নব বলে বলীয়ান মুসলমান সৈন্য-দল 'মার মার কাট কাট' রবে শ্রীহট্টের পথে রওনা হলো।

গুপ্তচরের মারফৎ গৌড়গোবিন্দ সব খবরই পেলেন। মুসলমান সৈন্যের ব্রহ্মপুত্র পার না হওয়ার জন্যে তিনি খেয়া বন্ধ করে দিলেন। শাহ্জলাল কিন্তু সদল-বলে নদী পার হয়ে এলেন নিজ নিজ উপাসনার চর্মাসন জলে ভাসিয়ে। এবং সসৈন্যে হাজির হলেন গৌড় রাজ্যের সীমা-দেশ চৌকিতে। উভয় দলে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এবারে মুসলমান সৈন্যের সেনা-পতি একজন পীর দরবেশ—নানা অলৌকিক ক্ষমতা যাঁর হাতের মুঠোয়। গৌড়গোবিন্দের সৈন্য পিছু হটতে লাগল। মুসলমান সৈন্য রাজধানী শ্রীহট্ট শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছে গেল। ভীত গৌড়গোবিন্দ এক নূতন ফিকির বের করলেন। গুণ যোজনার জন্যে এক লৌহধনু পাঠালেন শাহ্-জলালের কাছে। জানালেন, গুণ যোজনা করতে পারলে তিনি রাজধানী ছেড়ে চলে যাবেন।

শাহ্জলাল লৌহধনু হাতে পেয়ে মৃদু-হাস্য করলেন। ভাবলেন, আল্লাহ্‌তালাহ্‌র দোয়ায় এই দুনিয়ায় সবই সম্ভব। শাহ্-জলাল ঘোষণা করলেন—আহসরের নামাজে কোনওদিন যার বাধা পড়েনি, ডাকো এমন কাউকে। গোটা শিবির তল্লাস করে পাওয়া গেল একমাত্র সিপাহসালার নাসিরউদ্দীনকে। নাসিরুদ্দীনের উপর ভার পড়ল লৌহ-ধনুতে গুণযোজনার। অসম্ভব সম্ভব হল। গুণ টানা লৌহধনু ফেরৎ পাঠানো হল রাজা গৌড়গোবিন্দের কাছে। কুসংস্কারী রাজা আরও ভীত হয়ে পড়লেন। জয়ের আশা ত্যাগ করে তিনি পলায়নের মনস্থ করলেন। কিন্তু যাবার আগে শহর সংলগ্ন সুরমা নদীর খেয়া দিলেন বন্ধ করে। কিন্তু শাহ্জলাল ব্রহ্মপুত্রের মত একই উপায়ে সুরমা নদীর খেয়া দিলেন বন্ধ করে। কিন্তু তিনি নদী পেরিয়েছিলেন, এখনও 'শেখঘাট' নামে জায়গাটি পরিচিত।

সুরমানদী পার হওয়ার সংবাদ শুনেই গৌড়গোবিন্দ রাজবাটি ফেলে কোহিস্থান (পেঁচাগড়) নামক এক দুর্গম গিরিদুর্গে আশ্রয় নিলেন। সপরিবারে। কুলদেবতা হাটকেশ্বর শিবকেও কোলে করে সংগে নিয়ে গেলেন। 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি তুলতে তুলতে সসৈন্যে সদর্পে শ্রীহট্ট শহরে হাজির হলেন দরবেশ শাহ্জলাল।

গৌড়গোবিন্দের পলায়নের সংবাদ শাহ্-

জলালের কাছে তখনও পৌঁছয়নি। তিনি তিনদিন ঈশ্বরোপাসনা করে হুকুম দিলেন মিনারের টিলার উপর অবস্থিত রাজবাটি গড়দুয়ার আক্রমণ করতে। মুসলমান সৈন্যের একতরফা গোলার আঘাতে মন্দির ও প্রাসাদের চূড়ো ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। মুসলমান সৈন্য খোলা তরবারির আস্ফালন দেখাতে দেখাতে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে পড়ল। রাজবাটি শূন্য। বাধা দেবার কেউ নেই। মদমত্ত সৈন্যদল রাজভাণ্ডারের বিপুল ঐশ্বর্য দুহাতে লুণ্ঠন করতে করতে এগিয়ে চলল। গড়-দুয়ারের চূড়োয় অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত হরিৎ পতাকা উড্ডীন হল। বুরহানুদ্দিনের মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়েছে।

এই সম্পর্কে সরকারী বিবরণে দেখা যায় লেখা আছে:—

"Sylhet appears to have been conquered by a small band of

muhammedans in the reign of Bengal King Shamsuddin. The supernatural powers of the last Hindu King Gour Gobinda, proved ineffectual against the still more extraordinary powers of the Fakir Shahjalal, who was the real leader of the invaders."

[Hunter's Statistical Accounts of Assam Vol. II (Sylhet) ]

সিকান্দার গাজী আর ইয়েমেনের রাজকুমার শেখ আলীর নামে শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পণ করে শাহজলাল পুনরায় দেশ পর্যটনে বেরোবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমন সময় এক আশ্চর্য কান্ড ঘটল। শাহ্‌জলাল শ্রীহট্টের মাটি পরীক্ষা করতে গিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন। কি অদ্ভুত, তাঁর গুরুর দেওয়া মাটির সঙ্গে শ্রীহট্টের মাটির কি আশ্চর্য মিল! এক বর্ণ। এক স্বাদ। এক গন্ধ। দরবেশ শাহ্‌জলালের মনস্কামনা এতদিনে পূর্ণ হল। গুরু সৈয়দ আহ্‌মদ কবিরের নাম স্মরণ করে শ্রীহট্ট শহরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুউচ্চ টিলার উপর এক মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করা হল উপাসনালয়।

হজরত শাহ্‌জলাল তারপর শ্রীহট্টের নানা দিকে তাঁর অনুগামী শিষ্যগণকে প্রেরণ করে মুসলমান ধর্ম প্রচারের কাজে মন দিলেন। খোয়াথাসি, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢকা, রংপুরের দিকেও লোক পাঠান হল। সারা পূর্ববঙ্গে মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়তে লাগল।

শাহ্‌জলাল শ্রীহট্টে ত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন। বাষট্টি বছর বয়সে তিনি শ্রীহট্ট শহরেই দেহরক্ষা করেন। তাঁর কবরের উপর নির্মিত দরগা শুধু মুসলমানের তীর্থস্থান নয়, হিন্দুদের কাছেও পুণ্যস্থান। শাহজলালের মত সম্প্রদায় নির্বিশেষে এত জনপ্রিয় মুসলমান পীর আর কোথাও আছেন কিনা জানিনে।

হজরত শাহ্‌জলাল এদেশে আসার সময় উটপাখির দুটো ডিম এনেছিলেন। দরগাতে তার একটি এখনও আছে। তাঁর ব্যবহার্য 'জুলফিকার' নামক তরবারি, নামাজের মোসল্লা (মৃগচর্মাসন), একজোড়া কাঠের খড়ম এখনও আছে। আর আছে তাঁরই ব্যবহার্য দুটি পেয়ালা—যার চারপাশে আরবী লিপিতে কোরাণের কলমা লেখা।

শাহ্‌জলালের দরগার একটি 'ডেগ' বিশেষ দ্রষ্টব্য। 'ডেগ' অর্থাৎ তামার তৈরী বৃহৎ পাত্রটিতে ১৫।১৬ মণ চালের ভাত অনায়াসে রান্না করা যেতে পারে। এই সুবৃহৎ পাত্রটি নাকি বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব উপহার পাঠিয়েছিলেন।

দরগার বৃহৎ মসজিদটি হজরত শাহ্‌জলালের। পাশেরটি ইয়েমেনের রাজকুমার শাহজাদা শেখ আলীর। তাছাড়া শাহ্‌জলালের শিষ্যবর্গের সমাধি সারা শ্রীহট্ট জেলায় ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি দরগাই হিন্দু-মুসলমানের কাছে পবিত্রস্থান। মুসলমান জগতে তাই শ্রীহট্ট জেলার নাম হচ্ছে 'তিনশত ষাট আউলিয়ার মুলুক।'

শাহ্‌জলাল ঐতিহাসিক পুরুষ। কিন্তু অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্যে শ্রীহট্টবাসীর কাছে তিনি প্রায় রূপকথার জগতের লোক। তাঁর নামে অজস্র অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে আছে। শ্রীহট্টে শাহ্‌জলালের জনপ্রিয়তার একটি উদাহরণ দিই। অনেক উপকথায় হিন্দুর উপাস্য দেবতা শিব এবং শাহ্‌জলাল একাত্ম হয়ে গেছেন। একটি লৌকিক ছড়ায় শাহ্‌জলালকেও শিবের সঙ্গে গঞ্জিকার অগ্রভাগ গ্রহণ করতে আবাহন করা হয়েছে,—

"হো বিশ্বেশ্বরলাল,
তিনলাখ পীর শাহ্‌জলাল।
একবার দুবারা জগন্নাথজীকো পিয়ারা।
থানেকো দুধভাত, বাজানেকো দোতারা।"

শাহ্‌জলালের দরগায় শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুরাও চেরাগীর বাতি মানত করেন। শাহজলালের আনা 'জলালী পায়রা'র মাংস হিন্দুরাও খান না। হিন্দুরাও প্রতিজ্ঞাগ্রহণকালে বা সংকল্পবচনে দোহাই মানেন শাহ্‌জলালের নাম নিয়ে। শাহ্‌জলালকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান, অজস্র কাহিনী। বহু বছর পেরিয়ে গেছে। সুরমা নদীর জল অনেক উজান বয়েছে। তবু এখনও নদীর পারে বসে কোন মাঝিকে, কিংবা মাঠের গরু চরাতে চরাতে কোন রাখাল বালককে গাইতে শোনা যায়—

"হজরত শাহ্‌জলালের দরগায় বসি
ইদম শাহে কান্দে,
মন তোরে কেবা পার করে॥
কান্দিয়া আকুল হৈলাম ভবনদীর পারে।
মন তোরে—"

সেই ঘর আর ম্লান আলোর সঙ্গে একটুকরো থমথমে আবহাওয়ার কথা কেমন ক'রে এই মুহূর্তে সুনীতার মনে ছড় করল। মনে হল, ছবিটা যেন কালকেরই। একটা খাটে নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে দিদি। শান্ত, খুব শান্ত হয়ে। মনে হচ্ছিল দিদি বুঝি ঘুমুচ্ছে। একটা শব্দ না, একটু কথা না। শুধু মুখ বন্ধ করে কিসের প্রতীক্ষা করছে ক'টি মানুষ: মা বাবা, সুরজিৎবাবু আর সুনীতা। সবাই যেন বুঝতে পারছে এক্ষুনি তা আসবে আর আসবে নিশ্চয়ই। ডাক্তার-বাবু যাবার পরও অনেক সময় কেটেছে। সুতরাং আর দেরী নেই।

বাইরে কালো অন্ধকারেও ক'টা গাছ নড়ল। সুনীতার মনে তখনো ওই নির্মম ছবিটুকু দলা পাকাচ্ছে।

বাইরের দিকে তাকিয়েই আবার যেন দেখতে পেল ও, অনেকদূর থেকে, দেখতে পেল ঘরের চেহারাটা হঠাৎ পালটে গেল। একটা সর্বনাশা কান্নার দমকা নেমে এল। প্রথমেই মা ডুকরে কঁকিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আয়ু-নেভা দিদির শরীরটার ওপর। বাবা শুধু কাঁপতে লাগলেন। সুনীতা কিছু বোঝবার আগেই সোজাসুজি-দাঁড়িয়ে-থাকা জামাইবাবুর চোখে চোখ পড়ল। কেমন একটা বোবা চাহনি, অর্থহীন। দিদির মুখটা আর একবার দেখে নিতে যতটুকু সময় লাগে—তারপর সুনীতাও অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়ল। অনেকগুলো শব্দ, আরো কিছু লোক, মিলে-মিশে কেমন একাকার হয়ে গেল একসময়ে।

আঠাগা ছোপ-ধরা অন্ধকার বাইরে। চুপচাপ ঘরের ভেতর জানলা দিয়ে আসা সেই অন্ধকার ছুঁয়ে সুনীতা। নীরব গোল হয়ে আসা খানিক সময়। অদ্ভুত দিদির এই মৃত্যুশয্যা।

খুট' ক'রে একটু শব্দ হয়ে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই চেয়ার থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সুনীতা। আলো ওর মুখে।

'কি করছ অন্ধকারে?' সুরজিৎ এগিয়ে এল।

'বসে আছি।' মুখ ঘুরিয়ে বলল সুনীতা।

আর একটা চেয়ারে সুরজিৎ বসল। 'কেমন লাগছে এখানে!'

'কেমন আবার!' সুনীতা ম্লান হাসল আবার, 'আমার কাছে সবই সমান।' একটু অপ্রস্তুত হল সুরজিৎ। তাড়াতাড়ি বলল, 'তা নয়—জায়গাটা কেমন লাগছে।'

'ভালই।'

উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা চোখে পড়ছে। বাইরের অন্ধকার দূরে সরে গেছে। এখন আর ছোঁওয়া যায় না। জানলার গায়ে সুনীতার ক্রাচ দুটো হেলান দেওয়া।



সুরজিতের চোখ পড়ল ক্রাচে। কী যেন মনে হল। বলল, 'তেলটা মালিশ করছ?'

'করছি।'

'উপকার মনে হচ্ছে কিছু?'

আবার সুনীতা ঘাড় ঘোরাল। সুরজিতের চোখে চোখ পড়ল। ও যেন দেখতে চাইল সুরজিতের প্রশ্নের সঙ্গে মনের আগ্রহ আছে কি-না। না শুধু নিছক প্রশ্ন। অনেকক্ষণ পর উত্তর দিল সুনীতা, 'আর কত করবেন, আমার কিছু হবে না।'

'কে বলেছে?'

'আমিই বলছি।'

'কিন্তু তোমাকে সুস্থ না করালে যে চলবে না। আজ তুমি ভাল থাকলে...

'কি?'

'শুধু আর কি হবে—' সুরজিৎ অন্যমনস্ক।

'বেশ শুনব না।' সুনীতার সুন্দর মুখখানায় কপট অভিমান।

'রাগ করলে?'

'কার ওপর!'

'ভাল থাকলে যার 'পর করতে পারতে।'

'না-কি!' সুনীতা হঠাৎ যেন অবাক হল। জামাইবাবুর কথার ভেতর যেন কিসের এক ইঙ্গিত। বলল, 'এখনো তো পারি।'

'পার বইকি!' কেমন চাপা শোনাল সুরজিতের গলা।

দরজার কাছে পা-র শব্দ যেন কার। দুজনেই চোখ ফেরাল। সুরজিতের ছেলে টুটুল। বেড়াতে গিয়েছিল চাকরের সঙ্গে। এই ফিরল। দুলে দুলে টুটুল সুরজিতের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। সুনীতা ওকে কাছে টেনে নিল। হাত বুলিয়ে দিল মাথায়।

বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। স্তব্ধ হয়ে আসছে চারদিক। সড়কটায় আর লোক নেই কোনো। কথা ফুরিয়ে গেছে এই ঘরের মধ্যেও। দুজনেই টুটুলের দিকে তাকিয়ে ভাবছে।

সুনীতা ডাকল, রমা।

রমা এসে দাঁড়াল ডাক শুনে। সুনীতার পায়ে মাথা রেখে হাই তুলছিল টুটুল। সুনীতা বলল ওর মাথায় হাত বুলিয়ে, 'যাও লক্ষ্মীটি, রমাদি এসেছে, তুমি খেয়ে এস।'

টুটুল কোনো কথা বলল না। সুনীতার চোখের ইঙ্গিতে রমা টুটুলকে কোলে ক'রে খাওয়াতে নিয়ে গেল।

'ছেলেটাকে কে যে দেখে', সুরজিত আক্ষেপ করল, 'পরের মেয়ে কত আর করবে বল। তুমি এ-ক'দিন আছ ব'লে চোখ রাখছ!'

'আর একটা বিয়ে করলেই তো পারেন।' সুনীতার শান্ত গলা।

সুরজিৎ কোনো উত্তর দিল না।

'কি কথা বলছেন না যে?' সুনীতা চোখ মেলে তাকাল।

'ভাবলেই কি বিয়ে হয়?' সুরজিৎ উঠে দাঁড়াল।

'না হওয়ার কি আছে?'

'নিজেকেও তো এ-প্রশ্ন ক'রে দেখতে পার।'

হঠাৎ একটা উষ্ণতা কোথা থেকে এসে যেন সুনীতার সমস্ত মুখে জড় হল। সুরিজৎ তৎক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

এখানে এসেছে সুনীতা মাসখানেক। সুরজিতই একরকম জোর ক'রে চিঠির পর চিঠি লিখে আনিয়েছে। তবুও কিছুতেই রাজী হতে চায়নি সুনীতা। শেষ পর্যন্ত মা বলেছেন, ক'দিন নয় ঘুরে এলি। ও যখন এত ক'রে বলছে দেখতে দোষ কী।'

'কত আর দেখবে', উত্তর দিয়েছে সুনীতা; 'কিছুই যখন হল না তখন আর হওয়ার নয়।'

তবু শেষ পর্যন্ত মার কথা রাখতে চলে এসেছে কলকাতা ছেড়ে জব্বলপুরে। ও আসায় সুরজিৎ খুব খুশী হয়েছিল। বলেছিল; 'যাক, শেষ পর্যন্ত যখন এসে পড়েছ তখন কিছু ভয় নেই। দেখবে ক'দিনে তোমাকে চাঙ্গা ক'রে তুলি।'

ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সুনীতা ঘাম মুখে হেসে বলেছিল, 'দেখব আপনার মুরোদ! না পারলে আমিও এই ঘাড়ে চাপলাম, আর যাওয়ার নামটি করব না।'

'যেতে তোমায় হবে না।' খানিকটা দাবী মিশিয়েই কথা ক'টা বলেছে সুরজিৎ।

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সুনীতা।

তারপর থেকে এক একটা ক'রে দিন কেটেছে। সুরজিৎ প্রথমটায় খুব উৎসাহী হয়ে ওর চিকিৎসার আয়োজন করেছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। সুনীতা ম্লান হেসেছে। তবু দমেনি সুরজিৎ। একটা অনিশ্চয়ের বিরুদ্ধে লড়াইর নেশা তাকে

চোপে ধরেছে। সুনীতা এই ভালমানুষ জামাইবাবুকে থামাতে চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে চুপ হয়ে গিয়েছে। মনে মনে বুঝেছে, একদিন নিজে থেকেই জামাই-বাবু ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়বেন। বললে কিছুই হবে না বরং মনের ইচ্ছাটা আরো প্রবল হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর খুটখুট শব্দের ধ্বনি তুলে ঘরে এল সুনীতা। কোনো রকমে ক্লাচ দুটো সরিয়ে রেখে বিছানায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে লাগল। পা-র অবশ জায়গাটাতে হাত দিল ও। মনে হল, হাঁটুর ওপর থেকে কেমন যেন দপদপ করছে। টনটনে একটা ব্যথা কোমর পর্যন্ত। প্রতি-দিনের মত মনের প্রবল জোর মিশিয়ে বাঁ পা-টা সোজা করতে গেল সুনীতা। একটা অসহ্য শিরশিরানি সমস্ত শরীরে—আর হাঁটুর নিচে থেকে পা-টুকু আগের মতই ঝুলে রইল। অবশ, শিথিল। কোনো সাড় নেই।

সুনীতা শুয়ে পড়ল ক্লান্তিতে। চোখ বুজে পড়ে রইল বিছানাটায় বহুক্ষণ। তবু ঘুম এল না। আজ যেন পিছনের ফেলে-আসা কথাগুলো তাকে পেয়ে বসেছে, খালি উঁকি-ঝুঁকি মারছে। সরতে চাইছে না। সুরজিতের মুখটা ভেসে উঠল হঠাৎ। জামাইবাবুর সন্ধ্যার কথাগুলোও। সত্যিই অবাক হয়েছে সুনীতা সুরজিতের কথা শুনে, কিন্তু বুঝতে পারেনি স্পষ্ট। আরেকদিনের জামাইবাবুর মুখের চেহারাটা মনে পড়ল। নম্র, লজ্জামাখান দুটো চোখ। বিয়ের দিন। ভাবতে ভাবতে আলগোছে সুনীতা তিন বছর টপকে এক সুখ-স্মৃতির দিনে ফিরে গেল। তখন সুস্থ সক্ষম সুনীতা। বিয়েবাড়ির মাতামাতিতে লাটুর মত পাক খাচ্ছিল। এমন সময় বর এল। একটা হৈ-হৈর সাড়া পড়ে গেল। বরযাত্রীরা বসলে পর তাদের ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল ছেলেমেয়েরা। একপাশে কৌতূহল নিয়ে সুনীতাও দাঁড়িয়ে পড়ল। গোল হয়ে বসে থাকা লোকগুলির মধ্যে চোখ পড়তে কেমন যেন হয়ে গেল সুনীতা। কী সুন্দর প্রশান্ত একটি মুখ। দিদির ভাগ্য এত ভাল! এক মুহূর্তের জন দিদির ওপর হিংসেও হল সুনীতার। ও যেন ভুলে গেল সবকিছু। শুধু মনে হতে লাগল, ধারে-কাছে আর কেউ নেই অচেনা ওই লোকটি আর সুনীতা। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে ঘেমে উঠল সুনীতা। লজ্জা হল নিজের আকস্মিক আচরণের পর। তাড়াতাড়ি তাই এক দৌড়ে ওখান থেকে পালিয়ে গেল, মিশে গেল বিয়েবাড়ির হৈ-হুল্লোড়ে।

দ্বিরাগমন করতে জোড়ে এল দিদি-জামাইবাবু। সুনীতা ভাবতে লাগল পর পর। সেদিনের ঘটনা যেন। কেন যেন সুনীতা কিছুতেই সহজ হয়ে ওদের সংগে

কথা বলতে পারছিল না। দিদিই বলল এক সময়, 'কি-রে নীতা, বড় চুপ ক'রে যে'।

'এমনি।' জবাব দিল সুনীতা।

'তোর জামাইবাবুর সাথে আলাপ কর।' দিদি হাসল।

একটু ভাবল সুনীতা। তারপর কী মনে ক'রে বলল, 'তোর কেমন লাগছে রে লোকটাকে!'

অবাক হয়ে উল্টে দিদিই প্রশ্ন করল, 'তোর?'

'খুব ভাল।'

এই নিয়ে একটা হাসির তুফান উঠেছিল সেদিন। লজ্জায় সুনীতা নিজেকে সেই যে লুকিয়ে ফেলেছিল আর ওদের সামনে বেরোয় নি। তারপর অবশ্য আলাপ হয়েছে সুরজিতের সংগে। অনেক কথাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে সুনীতা। দিদির মুখে শুনেছে সুনীতা, জামাইবাবু না-কি তার খুব প্রশংসা করেন। দিনে অন্তত একবার ক'রে প্রশস্তি গান। রহস্য করে এক-এক সময় সুরজিতের সামনেই দিদি বলত, কি-রে নীতা তোর মতলব কি!

সুনীতার কথা মাঝপথেই থেমে পড়ত। দিদির ঠাট্টার সুরটা যেন কানে কেমন এক বিশেষভাবে ঘা দিত। ভাবত ও, গুরুজনের সংগে এত কথা বলা ভাল নয়। কি দরকার তার!

বছর ঘুরতেই টুটুল হল। টুটুল হবার পর থেকেই দিদি কেমন আলাদা হয়ে পড়ল যেন। সে-সময়ে এই জব্বলপুরে কিছু-দিনের জন্য এসেছিল সুনীতা। ছেলে নিয়ে দিদি ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকত। ও শুধু দিন-রাত ঘুরত সুরজিতের সংগে। এক মাসের মধ্যে সমস্ত শহরটা চষে ফেলেও দমল না সুনীতা। যে-ক'দিন ছিল সে, সে ক'দিনই কম ক'রে ঘণ্টা চারেক বাইরে-বাইরে থাকত জামাইবাবুর সংগে। দিদির চোখের আড়ালে।

দিদি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়েছিল দিন-দিন। সুনীতা সব সময়ে চেষ্টা করত দিদির কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কী ভাবে আপনা থেকেই যেন দিদির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসটা সে হারিয়ে ফেলছিল।

পুরোনো কথা, পুরোনো সময় আজ চোখ থেকে ছায়া সরিয়ে নিয়ে ছবির মত জেগে উঠছে। একটা কথাকে কেন্দ্র ক'রে যেন সুনীতার অতীত দিনগুলো আবর্তিত হতে চাইছে। আজ হঠাৎ ও-কথা বললেন কেন জামাইবাবু? তিনি কি চান! কিন্তু কেন?

মূক প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। এবার এসেও তো জব্বলপুরে অনেকদিন হয়ে গেল। কিন্তু সেই আগের মন আর নেই। অবশ্য আজ সুনীতা সামর্থ্যহীন, ইচ্ছে করলেও তার কোথায় যাবার উপায় নেই। শুধু পরের ওপর ভরসা ক'রে তার জীবন কাটাতে হবে। ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। ঘুমল না সুনীতা।

বাঁ পা-টা একটু টেনে সোজা করতে যেতেই সুনীতার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। সেই শিরশির বিশ্রী অস্বস্তিটা। টনটন করা একটা ব্যথার অনুভূতি। অদ্ভুত রোগ! অনেক কষ্ট ক'রে চোখ বুজে পড়ে থাকল সুনীতা। যদি ঘুম আসে।

দুপুরটাই সবচেয়ে খারাপ লাগে। খাঁ-খাঁ করে। কেউ থাকে না। আশেপাশে। সুরজিৎ বেরিয়ে যায় কাজে। টুটুল ইস্কুলে। রমাও ঘুমোয় ওরই পাশে। রমাই টুটুলকে দেখাশোনা করে দিদির মৃত্যুর পর থেকে। এখানে একলাই থাকেন জামাইবাবু। দিদি মারা যাবার পর মা বলেছিলেন, টুটুলকে রেখে আসতে। জামাইবাবু শোনেন নি।

দিদির কথা মনে পড়ে সুনীতার। যেদিন দিদি অসুখে পড়ল তারপর থেকেই সুনীতা সব সময় দিদির পাশে থাকত। রোগশয্যায় অনেক কথা বলত দিদি। সুরজিতের, টুটুলের। 'আমি যদি মরে যাই ওদের কে দেখবে?' 'খোকা কি ক'রে বড় হবে। তুই তো চিনিস মানুষটাকে—কী রকম খেয়ালী।' কোনো কোনোদিন সন্ধেয় হাতের মধ্যে হাত নিয়ে বলত, 'তুই তো রইলি। তুই ওদের দেখিস।' এই কথাটা শোনার

পর কেমন ছটফট ক'রে উঠত সুনীতা। জোর ক'রে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াত। মনে মনে ভাবত, ছিঃ ছিঃ দিদি এ-সব কথা ভাবে কেন!

বাইরে থেকে অল্প-অল্প হাওয়া ভেসে আসছে ঘরে। জানলাটার সামনে বসে সোজা চড়াই শড়কটার মাথা পর্যন্ত সুনীতা দেখতে পাচ্ছে। 'জায়গাটা কেমন লাগছে...' জামাইবাবু কাল সন্ধ্যেয় বলছিলেন। সত্যিই কি ভাল লাগে? ভাল লাগত একদিন। যখন ওই শড়কটার মাথায় একটা খুশীর উচ্ছ্বাসে সুনীতা লাফালাফি ক'রে ফিরে আসত।

শেষ পর্যন্ত দিদি মারা গেল। এখান থেকে কলকাতা ফিরবার কিছুদিন পর জামাইবাবুর চিঠি গেল, দিদি অসুস্থ। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। চিঠি পেয়ে সুনীতা মুষড়ে পড়েছিল। দিদির গম্ভীর হাবভাব থেকে এ-রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিল সে। বাবা টেলিগ্রাম করলেন। দিদিকে কলকাতা আনা হল। জামাইবাবু কেমন নির্বাক হয়ে গেলেন। চিকিৎসা চলল। কিন্তু কিছুই হল না দিদির। দিদি একটু একটু ক'রে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলল।

মৃত্যুদৃশ্যটা আবার মনে পড়েঃ রাত তখন সবে শুরু হয়েছে। শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে যাবার পর মা-র মর্মান্তিক অবস্থা দেখে সুনীতা সেই যে দিদির মুখটার দিকে তাকিয়েছিল তাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা নিষ্ঠুর শূন্য-শূন্য আবহাওয়া। বাবা, মা, জামাইবাবু সবাই মিলেমিশে কি ভয়ঙ্কর বেদনাতুর দৃশ্য। সুনীতা যখন কেঁদে উঠল তখন সে দেখতে গেল না আর কাউকে। শুধু চোখের সামনে ঝাপসা-ঝাপসা অন্ধকার আর একটা অনুভূতি—দিদি নেই। নেই কিছুই, সে ছাড়া। ফুলে ফুলে কান্নার মধ্যে দিয়ে নিজের উপস্থিতিটাই যেন সে মুহূর্তে ছিল চরম বাস্তব।

সেই দুঃসহ রাতও শেষ হয়েছিল এক সময়ে। কী ক'রে আর কী-ভাবে যে বিছানা নিয়েছিল সুনীতা তা আজ মনে নেই। আরো একটা জিনিস কিছুতেই মনে করতে পারে না সুনীতা, পায়ের এই ব্যথা-বোধটা ঠিক কখন থেকে প্রথম শুরু হয়েছিল। আশ্চর্য এই যোগাযোগ সুনীতার কাছে। ওরা সব ফিরে এল ভোর-ভোর। টুটুলকে নিয়ে বিছানায় জেগেই ছিল সুনীতা। হরিধ্বনি শুনে ধড়ফড় ক'রে নামতে গিয়েছিল খাট থেকে। কেমন ক'রে পা আটকে পড়ে গেল সশব্দে। তারপর আর কিছু মনে নেই। কেমন ক'রে জ্ঞান হারাল, তাও না। শুধু জেগে দেখল একটা ভয়াবহ দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে সবাই। প্রত্যেকের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। সেই





তখনই পা নাড়তে গেল সুনীতা। বাঁ-পা'টা কেন যেন ভীষণ ভারী মনে হল। কিছুতেই নড়ল না। প্রাণপণে চেষ্টা করতে হাঁটুর উপর থেকে অসহ্য দপ্‌দপানি শুরু হল, পায়ের তলাটুকু নড়ল না। শিথিল অবশ হয়ে ঝুলে পড়ল। সুনীতার মুখ-বিকৃতি দেখেই হয়তো বাবা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী কষ্ট হচ্ছে খুকি?'

'পা-টা নাড়তে পারছি না', ভাঙা গলায় সুনীতা বলল, 'অসহ্য ব্যথা।'

'কোথায়?'

সুনীতা হাত দিয়ে বাঁ-পা'টা দেখিয়ে দিল। 'হাঁটুর নিচ থেকে কেমন অবশ।'

'ও কিছু না', কে একজন যেন বলেছিল, 'শিরায় টান লেগেছে হঠাৎ, ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু ঠিক আর হল না সুনীতা। দেখতে দেখতে দুটো বছর কাটল। বাবা-মা'র মনের সুখ-শান্তি নিভে গেল চিরদিনের জন্য। দুটি সন্তানের একটির অকাল-মৃত্যু, অন্যটি আজীবন রইল অকেজো হয়ে। কেন যেন অতি দুঃখেও সুনীতার মুখে ম্লান এক-টুকরো হাসি ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল সুদীর্ঘ এক শ্বাস।

বাইরে ততক্ষণে বিকেলের রোদ নেমে এসেছে। ঘরের ভেতর তার ছায়া। টুটুল ঘুম থেকে উঠে রমার সঙ্গে নিচে গেছে। খেয়ে-দেয়ে আর একটু পরেই বেড়াতে যাবে। শুধু কাজ নেই সুনীতার একভাবে এই বসে থাকা। দিনে তিন চারবার কতকগুলো বিশ্রী শব্দের ধ্বনি তুলে প্রাণের দায়ে এখানে-ওখানে করা।

রাত্রে খাবারের পর ঘরে এল সুনীতা। শান্ত সুন্দর রাত্রি। জানলা দিয়ে ফাঁকা রাস্তা দেখে নিয়ে বিছানায় গিয়ে দেহটা এলিয়ে দিল ও। শুয়েই ঘুম এল না। সুনীতা তাকিয়ে রইল খোলা জানলাটার দিকে। যেখান থেকে এক চিলতে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। ঘুম আসতে চাইছে না আজকেও। বিকেলের চিন্তার কথাটুকুই আবার মনে ভর করল। সন্ধ্যের পর জামাইবাবুর কথা, কোথায় ব'লে সাধুর খোঁজ পেয়েছেন। সত্যিই কী সাধুরা ভাল ক'রে তুলতে পারে। জামাইবাবু তার জন্য এত ভাবেন কেন? সেদিন যা বলছিলেন তার মধ্যে সত্যিই কী কিছু অস্পষ্ট আছে......সুনীতার ভাবনা বাধা পায়। আরো একটা দিন ফুটে ওঠে মনের অন্ধকারে। চোখ বুজেও ভাবা যায় সহজে।

দিদির মৃত্যুর পর দু' মাস কাটল দেখতে দেখতে। সুনীতার মনে পড়ে যায় হুবহু। সব কিছু, সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত। সুনীতা বিছানায় পড়ে। বাবা-মা-র মাথার ঠিক ছিল না। এক জামাইবাবুই যা সান্ত্বনা দিতেন। থাকতেন কাছে কাছে। দিদির শোকটা অনেক কমে এসেছিল। ঢিমেতেতালায় শুয়ে-শুয়ে দিনগুলো কাটছিল। এরপর একদিন হঠাৎ জামাই-বাবু বললেন, 'নীতা এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

'কবে?'

'কাল।'

'কালই!' সুনীতার মনটা কেমন ক'রে ওঠে।

'হ্যাঁ', জামাইবাবু থেমে থেমে বলেন, 'আর ছুটি নেওয়া যায় না। যা পাওনা ছিল সব ফুরিয়েছে।'

সুনীতা এর উত্তরে কথা বলে নি সেদিন। জামাইবাবু আবার বললেন, 'তুমি ভাল হলেই জব্বলপুরে চলে এস।'

'ভাল আর হয়েছি।' সুনীতার হাসিতে ব্যথাই ফুটে উঠেছিল।

সুনীতার কথার পর কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর এক সময় সুরজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়েই বলল, 'এত ভেঙে পড়বার কী আছে। দেখবে তোমার ওই ব্যথা নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

সুনীতা আর উত্তর দেয় নি। ঘরের বাতাস কেমন গুমোট হয়ে গিয়েছিল। সুরজিৎও আর দাঁড়ায় নি। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে।

সেই সুনীতা জব্বলপুর এল শেষ পর্যন্ত। জামাইবাবু কলকাতা থেকে এসেই চিঠির পর চিঠি লিখছিলেন। একটা প্রচ্ছন্ন অনুরোধের ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারল না সুনীতা। জামাইবাবুর এই অনুরোধ ও মিনতি বড় ভাল লাগত ওর। যার জন্য লোকটার কোনো ইচ্ছাকে বাধা দিতে মন চাইত না সুনীতার। সেবার দিদির অত গম্ভীর হাবভাব সত্ত্বেও সুনীতা সুরজিতের কথায় রোজই বেরিয়ে যেত জব্বলপুরের রাস্তায়—ফিরত অনেকক্ষণ সুরজিতের সংগে বাইরে কাটিয়ে। কেমন একটা অস্বস্তি বোধে দিদির সামনে দাঁড়াতে পারত না ও—তবু যেতে হত ওই লোকটার ডাকে। সুনীতা জানে, জামাইবাবুকে তার ভাল লাগে খুব। এটা কি দোষের! নিজের মনের একটা প্রশ্নকে কিছুতেই চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জামাইবাবুর মনের অন্য একটা ইচ্ছাও আজ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সুনীতার চোখে। সকালের কটা কথা মনে পড়ে. জামাইবাবু বলেছিলেন, আবার পুরনো দিনের মতন বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে।

সুনীতা বলেছিল, 'আমারও খুব ইচ্ছা করে—কিন্তু আমি কি আর কোনোদিন পারব?'

'কেন পারবে না!' সুরজিতের চোখ দুটো সহানুভূতিতে গাঢ় হয়ে এসেছিল. 'মনে জোর আন, চেষ্টা করো—দেখবে তুমি পারবে।'

সুনীতা ভাবে, চেষ্টা কি আমি করি নি। কোথায় আমার দুর্বলতা! কিন্তু এ যে বিষ-ব্যথা! এর হাত থেকে নিস্তার নেই। দিদির মৃত্যুর পর দিদির শোকটা এখন পুরনো হয়ে গেছে। তার জন্য মনের কোথাও আর ভার নেই। শুধু একটা শূন্যতা আছে। যা হয়তো চিরকাল ধরে থেকে যাবে। জামাইবাবুও বোধ হয় এখনো সেই শোক ভুলতে পারেন নি। তাই আমাকে কাছে রাখতে চান। তাই কি! সুনীতা আনমনা হয়ে পড়ল খানিকক্ষণ। কী যেন ভাবতে চাইল। একটা কথার মোহ তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। দিদিকে ভালবাসতেন জামাইবাবু। আমাকে স্নেহ করেন। ভালবাসেন কি! অদ্ভুত একটা শব্দের ধ্বনি-তরংগ। এপাশ-ওপাশ ক'রে কথাটাকে উল্টে-পাল্টে দেখতে চাইল সুনীতা। চেষ্টা করল ভুলে যেতে—তবু এই প্রশ্নটা একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল চোখের সামনে। অনেক ভাবল সুনীতা। ভাবল আবার সেই প্রথম থেকে। ছবির পর ছবি। মনের অদৃশ্য পর্দায় কত অসংখ্য ধূসর ছবি প্রতিফলিত হতে লাগল। একটা উৎকণ্ঠা আর তীব্র কৌতূহলের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেল সুনীতা। চিন্তার ভ্রূকুটিতে কঠিন হয়ে উঠল মুখ। কেমন এক লজ্জা আর অপরাধবোধ। নিজের পর বিদ্বেষ। জামাইবাবু আমাকে ভালবাসেন। ছিঃ ছিঃ দিদি হয়তো এ-কথাটা বুঝতে পেরেছিল। তার চোখের সামনে কিছুই গোপন থাকেনি। এখন এই কথাগুলো চিন্তা ক'রে সুরজিতের ওপর সুনীতা কেন যেন বিষিয়ে উঠল। জামাইবাবুকে বিশ্রী লাগল। বিস্বাদ চেতনা।

ভাসা-ভাসা কথার টুকরোর মত ছোট-ছোট বেদনার বুদ্বুদ ছেয়ে রয়েছে মনে। অবসন্ন দেহ পড়ে আছে বিছানায়। খুব আস্তে নিশ্বাসের আওয়াজ নিজের কানে লাগছে। চোখ দুটো খোলা অথচ কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাতলা একটা অন্ধকারের ওড়না। অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার পর নিজেকে যেন ফিরে পেল সুনীতা।

সুরজিতের কথা মনে এল। মনে

হল, লোকটাকে সে শ্রদ্ধা করে। 'শ্রদ্ধা করে' কথাটা গলার মধ্যে হঠাৎ আটকে গেল। শুধু শ্রদ্ধা, আর কিছু কি? একটা খটকা কি যেন বাধা দিচ্ছে বারে-বারে সুনীতাকে। পারছে না সুনীতা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও একটা কথা বলে ফেলতে। অদৃশ্য কোনো হাত গলা চেপে ধরছে। একটা শব্দও বেরোতে পারছে না। ছটফট করে উঠল সুনীতা। 'আমিও ভালবাসি জামাইবাবুকে, ভালবাসি। এতে অপরাধ কি, দোষ কোথায়! দিদিই তো সে-ভালবাসায়......!' সুনীতা চমকে উঠল। বুক কাঁপল। সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দিদির মৃত্যুশয্যায় সুনীতা কি খুশী হয়েছিল? খুশী...?

কি বিশ্রী অন্ধকার! পাগলের মত রাত্রের অসহ্য অন্ধকার ভেদ করবার জন্য চেঁচিয়ে বলতে চাইল সুনীতা, 'দিদি তুই রাগ ক'রিস না, আমার কোনো দোষ নেই...' কিন্তু তীব্র ভীত একটা চীৎকারের মধ্যে দিয়ে সুনীতা অসাড় হয়ে এল।

জ্ঞান ফিরে চোখ খুলে প্রথমেই সুরজিতকে চোখে পড়ল সুনীতার। এক পাশে রমা, আর একজন কে অচেনা ভদ্রলোক।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেও সুনীতা কিছু বুঝতে পারল না। 'আমার কি হয়েছে?'

'তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।' সুরজিৎ বলল।

চুপ করল সুনীতা। বুঝতে পারল না কেন সে হঠাৎ অজ্ঞান হল। এবার সেই অচেনা ভদ্রলোক কথা বললেন, 'এখন কেমন লাগছে আপনার।'

সুনীতা তাকাল একবার। বলল, 'ভাল।'

'কি হয়েছিল আপনার হঠাৎ? ভয় পেয়েছিলেন নাকি?' ভদ্রলোক—ডাক্তার নিশ্চয়—শুধোলেন।

'ভয়!' সুনীতা কথাটা উচ্চারণ করে থেমে পড়ল।

চুপচাপ আরো কিছুক্ষণ কাটল। সুনীতা চোখ বুজে ভাবতে চাইল। দৃশ্য গুলোকে নতুন ক'রে দেখতে। মনে পড়ল সুনীতার—প্রথমে খুব অস্পষ্ট। একটু একটু ক'রে রূপ নিল। চমকে উঠল সে কথা-গুলোকে ফিরে পেয়ে। স্তম্ভিত হয়ে গেল তার মনের ভিতরের দৃশ্য দেখে। আবার গলা শুকিয়ে উঠল। শুধু বলল, 'একটু জল।'

সুরজিৎই জল দিল।

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, 'কিছু মনে পড়ল?'

'ভয় পেয়েছিলাম হঠাৎ।' সুনীতা হঠাৎ শান্তভাবে উত্তর দিল।

'আর কিছু?'

'না।' সুনীতা মুখ বন্ধ করল ইচ্ছে ক'রে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কিছু না—উইক নার্ভ......ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল।'

একটু বাদেই সুরজিৎ ফিরে এল ডাক্তার-বাবুকে পৌঁছে দিয়ে।

'মিছিমিছি আবার ডাক্তার আনলেন কেন? এমনিই ঠিক হয়ে যেত।' সুনীতা আনমনা হয়ে কথা বলল।

'থাক তোমার আর এ-সব ভেবে কাজ নেই, চুপ ক'রে এ-বার একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করো।'

সুরজিৎ বেরিয়ে গেল। রমাও গেছে আগে। চোখের পাতা দুটো দুর্বলতায় ভারী হয়ে উঠেছিল। সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল সুনীতার—প্রচণ্ড ঘুম। ঘরের মেঝের পর সকালের মিহি ফরসা দেখতে দেখতে এক সময়ে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন শেষ হলাম বিকেল। জানলার বাইরে রোদ নেই। বিছানায় শুয়ে সুনীতা বাইরের কিছু দেখতে পেল না। শুধু দেখল, ঘরের ভেতর মন্থর ছায়া নেমে এসেছে। শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছে কেমন একটা শান্ততার আমেজ। মনে হচ্ছে কাল যেন তার কিছুই হয় নি।

সুরজিৎ ঘরে ঢুকল হঠাৎ। চুপ ক'রে তাকিয়ে দেখল সুনীতা।

'কি?'

'উঁ।'

'এখন কেমন লাগছে?' সুরজিৎ এগিয়ে গিয়ে বিছানাটার এক পাশে বসল।

সুনীতার ইচ্ছে হল একটু সরে যেতে। কিন্তু সরল না।

'ভাল। আপনি কখন ফিরলেন?'

'এই তো', সুরজিৎ বাঙা সুর তুলে, 'ফিরেই তোমার কাছে এলাম।'

'টুটুল কই, সারাদিন ওকে দেখিনি।

'বেড়াতে গেছে বোধ হয়, তুমি শুয়ে থাক—জামা-কাপড় বদলে আমি আসছি।'

সুনীতা হাসল সুন্দর ক'রে। 'যান।'

সুরজিৎ চলে গেলে কিন্তু শুয়ে থাকতে পারল না সে। উঠে বসল। মাথার ভেতর এখনো কেমন একটা ঝিম ভাব। একটু হাওয়ায় বসি, ভাবল মনে মনে। হাত বাড়িয়ে ক্লাচ নিয়ে আস্তে হেঁটে এল সুনীতা জানলায়। চেয়ারটা রাখাই ছিল। পা ছড়িয়ে বাইরের লাল-ছোপ-ধরা প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বসল সুনীতা। সোজা দুটো গাছ একটা বাড়ির মাথাকে আড়াল করেছে, আরো দূরে রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় সেই সীমারেখায় ফুল—অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। যেন মনে হয় ওর পরেই শুরু হয়েছে এক রঙীন দেশ।

'এ-কী! উঠলে কেন?'

প্রশ্ন শুনে আচ্ছন্নতা ভেঙে গেল। মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল সুনীতা, 'শুয়ে আর ভাল লাগছে না।'

দুজনে আর কোনো কথা বলল না। চুপ ক'রে একটা নীরবতা মেখে বসে থাকল। বাইরে গাছের গায়ে রঙ মুছে গেল। আবছা হল, তারপর ওদেরও এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরে ধরল। অনেকক্ষণ পর যেন কী মনে ক'রে সুরজিৎ বলে উঠল, 'আর কতক্ষণ বসে থাকবে?'

'থাকি না আর একটু।' সুনীতা উত্তর দিল, 'বেশ লাগছে।'

'তুমি তা হলে বসো, আমি একটু বেরোব।' সুরজিৎ উঠে দাঁড়াল।

'কোথায়!'

'এই কাছেই যাব। দেরী হবে না আমার।'

সুনীতা অনেকক্ষণ বসে রইল ওখানে। ... গুলো ক্রমশ স্পষ্ট প'রিয়ে উঠল দেখতে দেখতে। বাইরের দৃশ্যগুলো চোখের ওপর

যত অস্পষ্ট হতে লাগল তত পুরনো কথা, একটা আবিষ্কার-ক'রে-ফেলা-বিষয় সুনীতার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। স্নায়ুর ভেতর অদ্ভুত এক উত্তেজনা।

সুরজিৎ ফিরল অনেক রাত ক'রে।

'এত দেরী হল?' সুনীতা শুধলো।

'হয়ে গেল।' জামা খুলতে খুলতে উত্তর দিল সুরজিৎ। 'এক সাধুর কাছে গিয়েছিলাম।'

'সাধু?' অবাক হল সুনীতা। কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ কথাটা মনের মধ্যে আচমকা এক প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল...সা-ধু... সা-ধু?

'সাধু ওষুধ দেবে' জামা খুলে বলল সুরজিৎ: 'কাল আবার যেতে হবে। তুমি এখনো শোও নি?'

সুনীতা অন্য কথা ভাবছিল। ওর কথায় ফিরে এসে বলল, 'যাচ্ছি।' খটখট শব্দের বিশ্রী ধ্বনি তুলে চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এল সুনীতা। ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। এলিয়ে পড়ল ও। চোখ দুটো বুজে এল শ্রান্তিতে। সুরজিৎ চলে গেছে।

ঠিক ঘুম নয় অথচ ঘুমের এক তন্দ্রায় ছেয়ে গেল সুনীতা। একটা সূক্ষ্ম চিন্তার অনুভূতি ওকে ছুঁয়ে ফেলল। সুনীতা চোখ বুজেই সেই চিন্তাকে কেন্দ্র ক'রে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। আধখোলা হয়ে গেল ওর ঠোঁট দুটো। অস্ফুটে নিজেকেই যেন বলছিলঃ আমিও পারি, বেঁচে থাকতে পারি, কেউ কিছু বলবে না...না বাঁধা দেওয়ার লোক নেই। কিন্তু আমি যে অথর্ব। ঘুমের মধ্যেই বাঁ-পা'টা টানতে চাইল সুনীতা। একটা টনটন ব্যথা-বোধ! কিন্তু সামান্য যেন কম।

যন্ত্রণা সত্ত্বেও সুনীতার মুখে হাসি ফুটে উঠল। নিজেকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করার হাসি। সুনীতা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমটা কখন গাঢ় হয়ে এসেছিল সুনীতার তা মনে নেই। শুধু আশ্চর্য স্বপ্নটার কথা মনে আছে। ......বহুলোক গোল হয়ে বসে। একটা নাটক দেখতে এসেছে যেন সবাই। নিজেই দেখে অবাক সুনীতা—নাটকের নায়িকার ভূমিকায় সে। যে-সুনীতা আজ দু' বছর বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে পারে না। চারদিক থেকে ধ্বনি। ধ্বনিটা হঠাৎ শ্রুত হল। না হাততালি নয় ......হরিবোলের ধ্বনি...কারা যেন হরিধ্বনি দিচ্ছে...আর নাটকের রানী...তার দিদি... দিদি...ফুলবিছানো খাটে...। ধড়ফড় করে জেগে উঠল সুনীতা। ভোর-ভোর। তখনোও চোখ থেকে দেখা ছবিটুকুর রেশ মুছে যায় নি। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল ও, সমস্ত শরীর কেমন কাঁপছে থরথরিয়ে। মাথার ভেতর ঝিমঝিম। অজস্র ঘামের প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে দেহের সব অনু-পরমাণু। দাঁতে ঠোঁট চেপে সুনীতা কেন যেন আস্তে-আস্তে বাঁ-পা'টা সোজা করতে গেল। অদ্ভুত সেই ব্যথাটা শিরশির করছে কোমর পর্যন্ত। কিন্তু...আশ্চর্য হল সুনীতা, হাঁটুর নিচ থেকে পা-র সেই ঝুলে থাকা অংশটা কেঁপে উঠল কেমন ক'রে। শুধু কাঁপলই না, সুনীতার ইচ্ছামত বেঁকে গেল।

খাট থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হেঁচকা ঝোঁকে হাঁটছিল সুনীতা। মাটিতে পা দিয়ে প্রথমে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিল ও—একটু সময় নিল সোজা হয়ে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুনীতা। ডাকল, 'জামাই-বাবু—'

একটা হাসির আর খুশীর অদ্ভুত শিহরণে বাড়িটা ক'টা দিন গমগম ক'রেও কেন যেন আজ সন্ধ্যেবেলায় শান্ত হয়ে এল। শুধু কয়েকদিন আগেরও এক বিক্ষুব্ধ পঙ্গু প্রাণ চঞ্চল হয়ে নিজের বৃত্তে আবর্তিত হতে লাগল।

সেই ঘরের সেই জানলার পাশে একা বসে সুরজিৎ। চুপ ক'রে। সুনীতা বাক্স গোছাচ্ছে। তার টুকিটাকি জিনিসপত্র। কারো মুখে কথা নেই। কথার প্রয়োজনও যেন এখন দু'জনের মধ্যে ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ। আপনা থেকেই এই নীরব সময়গুলো এসে এ-ঘরে জমা হয়েছে।

সুনীতা পিছন ফিরে সুরজিতকে একবার দেখল। তার জামাইবাবু। মনে হল, বলি কিছু। তারপর ভাবল সুনীতা, না থাক। শুধু নিয়মিত শ্রদ্ধা আজ আর হয়তো ওর ভাল লাগবে না। কিন্তু নিরুপায় সুনীতা। এক গূঢ় দুর্জ্ঞেয় পাপবোধ তাকে—তার বিবেককে বিক্ষত করছে। যতদিন বোঝেনি—ভালবাসার মোহ মেখেছে মনে; এখন সব বোঝার পর ভালবাসা সরে যাচ্ছে, আড়ালে চলে যাচ্ছে—আত্মধিক্কার আর গ্লানি আর স্বার্থপরতার বৃশ্চিক দংশন তাকে পীড়িত করছে।

চুপ ক'রে যাওয়াই ভাল। কোনো ভূমিকা না ক'রে বিদায় নেওয়া। একদিন হয়তো ভুলে যাবেন জামাইবাবু—ভুল ভাঙলে পিছনের ক'টা দিনের জন্য আর দুঃখ থাকবে না।

সুনীতা আবার পিছন ফিরে কাজে মন দিল।

সুরজিতও এতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে সুনীতার মনের ভাষা পাঠ করার চেষ্টা করছিল। ঝাপসা চোখে সে-যেন বুঝে ফেলল—বুঝতে পারল হঠাতই, এখন আর কোনো প্রত্যাশা করা যায় না। কিছু না। একটা কথাও না। ঘরের পরিবেশে একটা শূন্য-শূন্য ভাব। সুরজিতের বুকের ভেতরটা হঠাৎই টনটন ক'রে উঠল। আর এ-ভাবে বসে থাকতে পারল না সুরজিৎ। নীরবে চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

# ট্রামে-বাসে

**শ্রী** নেহরু আচার্য জগদীশচন্দ্রের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের marriage (মিলন) হইলে বিশ্বসংকট হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু চারিদিকের অবস্থা দেখেশুনে মনে হয় বিশ্বের অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই এই ধরনের মিলন




বা "বিবাহের" চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদেই বেশি বিশ্বাসী"!!

• • •

**এ**কটি সংবাদে শুনিলাম নেহরুজী নাকি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের অফুরন্ত কর্মব্যস্ততার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। —"আমরা বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে খবরটা এতদিন পরে তিনি শুনলেন; আর ক্ষুণ্ণ হয়েছি এই মনে করে যে, নেহরুজী আমাদের কর্মব্যস্ততার কথা আদৌ শুনলেন না। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে যারা ঘোরে, ঘানি টানতে টানতে গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়, দম ফেলার অবকাশ যাদের জোটে না তাদের কর্মব্যস্ততা প্রধানমন্ত্রী মশাইর অগোচরেই থেকে গেল"—শ্যামলাল আজ হঠাৎ সিরিয়াস্ হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

**শ্রী** নেহরুজী কলিকাতায় একটি এক্স-রে ক্লিনিকের উদ্বোধন করিয়াছেন। —"বর্তমানে একটি রাজনৈতিক আর একটি সামাজিক এক্স-রে ক্লিনিকের অভাব আমরা অনুভব করছি। শরীরের অসাধ্য এসব ব্যাধিতে দেশ আজ পঙ্গু, এক্স-রে ছাড়া সত্যিকারের রোগ নির্ণয় অসম্ভব"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

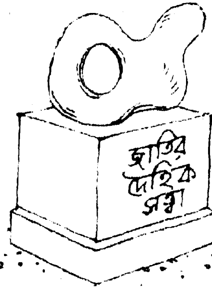
**প্র**থমদিন একটি সংবাদ শিরোনামায় পাঠ করিলাম—বর্তমান বৎসরে চাউলের রেকর্ড ফলন। ঠিক্ পরের দিনের সংবাদেই পড়িলাম—আগামী বৎসরেও চাউলের ঘাটতি। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এই ধাঁধাটির উত্তর যিনি দিতে পারবেন, তাঁকে ট্রামে-বাসে সীট্ ছেড়ে দিয়ে পুরস্কৃত করব"।

•

**শ্রী** অশোক মেহতা তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, জনগণের আত্মিক সত্তায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে, ইহা জাতির পক্ষে বিপজ্জনক। —"কিন্তু বর্তমানে তার চেয়েও বিপজ্জনক হয়েছে জাতির দৈহিক সত্তার ভাঙ্গন; কিছুতেই দেহটাকে আর টেনে-টুনে খাড়া রাখা যাচ্ছে না"—বল্লেন বিশুখুড়ো।

• • •

**স**ময়মত রেলগাড়ি চলাচল প্রসঙ্গে লোক-সভার বিতর্কে শ্রীফিরোজ গান্ধী মন্তব্য করিয়াছেন যে, রেল চলাচলের বিলম্ব সম্বন্ধে অভিযোগের উত্তরে তৎকালীন




কর্তৃপক্ষ যে-আশ্বাস দিয়াছেন, সেই এক-ই আশ্বাসের কথা আমরা পর পর চার বৎসরই শুনিয়া আসিতেছি। —"ভদ্রলোকের এক কথা, সুতরাং এক-একবার এক-এক রকম কথা তো আর বলা যায় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

**আ**মরা সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি শ্রুতিধর বালিকার কাহিনী পাঠ করিলাম। যে-কোন কথা একবার শুনিলেই বালিকাটি তা নাকি আবার হুবহু বলিয়া দিতে পারে। —"আমরা বালিকার কৃতিত্বের সংবাদে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু এ কথাও বলি যে, ভুলে যাবার মধ্যে একটি সান্ত্বনা আছে। দেবতার সম্ভবামি যুগে যুগে থেকে শুরু করে নরদেবতা অর্থাৎ নেতাদের কত-রকম আশ্বাসের কথাই তো কতবার শুনেছি। এসব ক্ষেত্রে শ্রুতিধর হলে তো দুঃখের অবধি থাকতো না" বলিলেন বিশুখুড়ো।

**মে**দিনীপুরের কোন এক গ্রামের অধিবাসীরা একটি সাপের পা দেখিয়াছেন। সম্প্রতি পদসম্বলিত সর্পটির ছবিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। —"কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি এমন সাপের পাঁচ পা-ও অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে দেখেছেন" —মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* • * •

**জা**পানের এক অভিযাত্রী দল ভারত ভ্রমণে আসিয়া মন্তব্য করিয়াছেন —ভারত হইল জাপানী সংস্কৃতির মাতৃ-ভূমি। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন —"কিন্তু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো এই নীতি গ্রহণ না করলে ভাগ্নেদের মাতুলালয় থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যেতে হবে"!!!

• • •

**ক**লিকাতায় গ্রামোদ্যোগের দোকানে ঢুকিয়া শ্রী নেহেরু খাদি বোর্ডের জনৈক সদস্যকে নাকি জানাইয়াছেন যে, তিনি গত দশ বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে নিজের হাতে কোনও কেনা-কাটা করেন নাই, এমন কি কোনও দোকানে পর্যন্ত ঢুকেন নাই।—"সুতরাং দুর্মূল্যের কাহিনী আর তাঁকে শুনিয়ে লাভ কি"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিবেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**ও**য়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের প্রথম টেস্টে প্রথম দিনের খেলায় গোড়ার দিকে কেহই সহজে আউট হন নাই; কিন্তু লাঞ্চের পর সহজেই উইকেট পড়িয়া যাইতে লাগিল। রেডিওর কমেণ্টেটার রসিকতা



করিয়া বলিলেন—"লাঞ্চই মাঠের সেরা বোলার"। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তিনি ভালো বলেছেন। কিন্তু এ খবরটা হয়ত কমেণ্টেটর জানেন না যে আমাদের সেরা বোলার হলো—হে মা কালী"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

**চক্রদত্ত**

*

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নৌবহরের সামরিক ব্যক্তিগণ যে নতুন রকম বেলুনটি তৈরী করার পরিকল্পনা করেছেন শোনা যাচ্ছে, সেটি ৮০ হাজার ফিট ওপরে উঠতে পারবে। এরা আশা করেন, ঐ বেলুনের সাহায্যে ওপরে উঠতে পারলে তারা মঙ্গল গ্রহের সর্ববিধ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। এরা বলেন যে, মঙ্গল গ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে অর্থাৎ পৃথিবীর ৪৫ কোটী মাইলের কাছে এসে যাবে, তখনই ঐ বেলুনটিকে উর্ধলোকে পাঠানো হবে। আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য বিকালের দিকে এমন একটা সময়ে বেলুনটি ছাড়া হবে যে, সূর্যাস্তের মধ্যেই বেলুনটী ৮০ হাজার ফিট ওপরে পৌঁছে যেতে পারবে এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকতে পারবে। বিখ্যাত বেলুন পরিচালক ম্যালকলম্ রস এবং পদার্থ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জন মুঙ এই বেলুনে করে উপরে যাবেন—বেলুনটীর মধ্যে বেলুন সংলগ্ন কেবিনের মাথার ওপর একটী বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ লাগান আছে। বর্তমান অভিযানের দ্বারা শুধু মাত্র মঙ্গল গ্রহের আশপাশের বাষ্পীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। ১৯৫৯ সালে আরও একটি এই রকম বেলুন শূন্যলোকে পাঠাবার আশা করা যায় এবং তখন এটি মঙ্গল গ্রহস্থ অক্সিজেনের খবর সংগ্রহ করবে। এরা আরও আশা করেন যে, অদূরভবিষ্যতে এই ধরনের আরও বেলুন সৌর জগতের অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত নক্ষত্রনিচয় ও গ্রহ উপগ্রহের খবর আনবে। কিছুদিন আগেই অবশ্য একজন বৈজ্ঞানিকসহ অন্য একটি বেলুন আকাশের ৯৯৩০০ ফিট ওপরে উঠতে পেরেছিল। এবং এটিও মহাশূন্যের অনেক-কিছু খবর সংগ্রহ করে আনতে পেরেছিল।

*

"ররকুয়াল" ইংলণ্ডের একটি নবনির্মিত সাবমেরিন। বর্তমানে "ররকয়াল"ই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাবমেরিন। এই সাবমেরিনটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোনও খবরই আজ পর্যন্ত জানা যায় নি, তবে এটি যে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় শুশুক জাতীয় সাবমেরিন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ররকুয়াল যখন জলে থাকবে, তখন এর মধ্যে ছয়জন অফিসার এবং ৬৪ জন নাবিক থাকবার মত ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি নাবিকের সুবিধার জন্য এর মধ্যে জনপ্রতি একটি নরম গদি সহ বাঙ্ক, একটি আলো দেওয়া হয়, এ ছাড়া হাওয়া চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থাও আছে। সাধারণ সুবিধা হিসাবে "ররকুয়ালে" শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে ফ্লুরেসেণ্ট আলো আছে, আর আছে সিনেমা ঘর এবং টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা।

*

হেলিকপটার আজকাল বিপদে আপদে খুবই কাজে লাগছে। কোথাও বন্যা হলে, এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে টেলিগ্রাফের তার নিতে যেতে হলে, সমুদ্রের দুর্ঘটনায় পতিত লোকদের উদ্ধার করতে হলে হেলিকপটারই একমাত্র যান।



সমুদ্র থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোককে হেলিকপটারের সাহায্যে উদ্ধার করা হচ্ছে

*

ডাঃ সেডিউ 'ফেলস প্লেনেটোরিয়াম'এর ডাইরেক্টর আশা করেন যে, মানুষ চাঁদে পৌঁছবার পর সেখানে ঘর বাড়ী তৈরী করে বাস করতে পারবে। তার মতে সূর্যের শক্তি চাঁদের পাহাড় থেকে যে জল সংগ্রহ করতে পারবে, সেটা থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরী করা যাবে। বাস করার মত প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করার পর চাঁদে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্লাসটিক তৈরী করা হবে। আর এই প্লাসটিকের সাহায্যে খুব বড় বড় গম্বুজ তৈরী করে তার মধ্যে বাড়ি ঘর তৈরী করা সম্ভব হবে। তখন এই প্লাস্টিকের গম্বুজ ঢাকা শহরে চাষবাস, গরু ছাগল পালন করা সম্ভব হবে।

*

জন হারউড নামক একজন ইংরাজ সম্প্রতি আণবিক শক্তিচালিত নিজে নিজে দম দেওয়া হাতঘড়ি বার করেছেন। এই ধরনের ঘড়ি পৃথিবীতে এই প্রথম, ঘড়িটি জল প্রতিরোধক কেস দেওয়া। বাইরের কোন ধাক্কা লাগলেও ঘড়িটার কোন ক্ষতি হবে না। এ ছাড়াও রাত্রে দেখবার জন্য ঘড়ির ডায়েলে রেডিয়াম লাগান আছে। ঘড়িটি যে কোন রকম আবহাওয়ার মধ্যে রাখলেও সময়ের কোন তারতম্য হবে না। সমুদ্রে, ঘরের ভিতর, ঝড়, বৃষ্টি, পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলেও সময় একই রকম ভাবে দেবে।

## শিশুসাহিত্য

**ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা**—শিবরাম চক্রবর্তী। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। এক টাকা ষাট নয় পয়সা।

বিবিধ রসের কৌতুকী সমাহার। শিবরাম চক্রবর্তীর ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাঁর আশ্চর্য শব্দক্রীড়া ও ঘটনা-স্থাপনের কৌশলটি এই বইয়েও অক্ষুণ্ণ। টেলিফোনজনিত সমস্যার গল্পটি তার মধ্যে বিশিষ্ট অভিনব। কাহিনীগুলিতে দ্রুতসঞ্চারী একটি মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যা নিছক কৌতুক-রসকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এই গ্রন্থের পাঠক-প্রাচুর্য স্বাভাবিক এবং আকাঙ্ক্ষিত। (৫৬৬।৫৮)







# পুস্তক পরিচয়

**তুতুল-পুতুল**—মৌমাছি। শিশু সাহিত্য-বিতান, ১১-এ প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-১২। দাম—এক টাকা।

যুক্তাক্ষর-বর্জিত এই কাহিনীটি শিশু-সাহিত্যের ভণ্ডারীর রচনা। মৌমাছি শিশু পাঠকের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং এই কাহিনীতে তাঁর সেই অবহিত নৈপুণ্যই প্রকাশ পেয়েছে। 'সরল সৌন্দর্যে এ-বইটির ভাবাও অনবদ্য। একটি দৃষ্টান্ত : 'ননীর পুতুলটাই তুতুলের ভয়ভাবনা সব টলিয়ে দিলে। পুতুলও যেন পুতুল হ'য়ে গেল—পুতুলটা ওর হাতে ধরতেই। নিজে যেন সে কিছুই করছে না, করতে পারছে না। পুতুল যা করছে, তুতুল তাই করছে।'

এই বইটির জন্য শিশুর অভিভাবকেরা মৌমাছিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন সন্দেহ নেই। বিমল দাস অঙ্কিত প্রচ্ছদপট আর পাতায় পাতায় ধীরেন বলের আঁকা ছবিগুলি গ্রন্থানুগ। এ-গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। (৫৭৬।৫৮)

## প্রাণীবিজ্ঞান

**সাপের কথা**—নরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক : চন্দ্রা বসু, চিনকো, ৬, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫। মূল্য—দুই টাকা।

বইখানি তথ্য সমৃদ্ধ এবং সর্বজনপঠনীয়। লেখকের অভিজ্ঞতা প্রচুর, ভাষা সাবলীল ও অনাড়ম্বর। জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের ভাষায় 'নরেনবাবু গল্পচ্ছলে সাপের সম্বন্ধে সত্যি কথা ছোটদের জানিয়েছেন'। বস্তুত ভারতের নানা প্রান্তে সর্প বিষয়ক সত্য অভিজ্ঞতার আস্বাদ পৌঁছে দিয়ে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। ললিতা ছেস্ অঙ্কিত স্কেচ ও আলফাবিটা অঙ্কিত প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। (৫০০।৫৮)

## অনুবাদ সাহিত্য

**স্মৃতিচিত্র**—ম্যাকসিম গর্কি—অনুবাদ প্রদ্যোৎ গুহ। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—চার টাকা।

লোভ তলস্তয়, সোফিয়া তলস্তায়া, আন্তন চেখব প্রভৃতি রুশ দেশের আটজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্ব-বরেণ্য রুশ সাহিত্যিক ম্যাকসিম গর্কি যেসব স্মরণিকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই সংকলন। এই টুকরা টুকরা স্মরণিকাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন হইলেও ইহার মাধ্যমে রুশ দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইংরেজী হইতে

অনূদিত এই গ্রন্থে অনুবাদের আভিজাত্য বজায় রাখিতে গিয়া ভাষার সাবলীলতা মাঝে মাঝে ক্ষুন্ন হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও চিন্তাশীল পাঠকের কাছে গ্রন্থখানি প্রীতিকর হইবে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থখানির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসার যোগ্য। ২৯৮।৫৮

## বিবিধ

**কাজের কথা**—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক হাউস, ১৬, শিবপুর রোড, হাওড়া। দাম—আড়াই টাকা।

আমাদের এই দুনিয়ায় কেমন করে 'বড়' হওয়া যায়, তা-ই বাৎলে দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক। মার্কিন দেশের ডেল কার্নেগীর বইগুলির সমগোত্র এই বইখানি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল দেখে নিঃসংশয় হওয়া গেল যে বইখানি জনপ্রিয়। বেকার-সমস্যা পীড়িত ও ভাগ্যাহত বাংলা দেশে যদি কোনো পাঠক এই বই পড়ে বুকে বল পান, তাহলে আশার কথা। যাঁরা জীবনে সাফল্যলাভ করার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের কাছে বইটির জন্যে সুপারিশ করতে দ্বিধা নেই। (৩৯৮।৫৭)

**বিনা চশমায় ক্ষীণদৃষ্টির প্রতিকার**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, ২১১এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়। মূল্য—দেড় টাকা।

নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার উইলিয়াম বেট্‌স সাহেবের The Cure of Imperfect Sight by Treatment without Glasses নামক পুস্তকে বর্ণিত প্রণালী অবলম্বনে আলোচ্য পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। পুস্তিকায় যেসব প্রণালী অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অনায়াসসাধ্য এবং কোন অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। পরিশিষ্টে চক্ষু তারকা পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয়, অস্ত্রোপচার ব্যতীত ছানির চিকিৎসা প্রভৃতির আলোচনা পুস্তিকাখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বল্প পরিসরে বিষয়বস্তুর আলোচনার তুলনায় পুস্তিকাখানির মূল্য অত্যধিক। ৪৪৬।৫৮

**সংগীত পরিচয়**—শ্রীমতী উমা দে। প্রাপ্তি-স্থান—বুক কোম্পানী, ৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ এবং ডি এম লাইব্রেরি, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। আড়াই টাকা।

লেখিকা ক্ষুদ্র পরিসরে নাদ, শ্রুতি, স্বর, ঠাট, বর্ণ, অলংকার, রস, রাগ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতি বিভিন্ন গীত, লয়, মাত্রা, স্বরলিপি, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র—এই সমস্ত সাংগীতিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সুললিত ভাষায় সরস করে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির প্রয়োজনে আসবে। মুদ্রণ এবং প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। বইটিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে।

দু-একটি বিষয়ে লেখিকার সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। পঞ্চম পৃষ্ঠায় বর্ণিত স্বরগুলিকে প্রথম শ্রুতিতে স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু স্বরগুলি স্বীয় অন্তশ্রুতিতেই অবস্থিত কেননা প্রত্যেকটি স্বর সম্পূর্ণ হবার জন্য পূর্ব শ্রুতিগুলির অপেক্ষা রাখে।

৩১—৩২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "আমীর খসরু, গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরা প্রভৃতি সংগীত নায়কগণের প্রতিভার স্পর্শে "প্রবন্ধ-গীত-এর শৈশব অতিক্রম করিয়া সংগীত সরস্বতী ধ্রুপদেরই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।" সংগীত সরস্বতী সম্বন্ধে ভাষার এই ত্রুটি ছেড়ে দিলেও প্রবন্ধ সংগীত সম্বন্ধে লেখিকার ধারণার পরিবর্তন হওয়া দরকার। বস্তুত, সুপ্রাচীন এবং সুবৃহৎ প্রবন্ধ সংগীত যখন ভেঙে পড়ছে তখনই ধ্রুপদের উদ্ভব এবং ধ্রুপদের প্রবর্তনে প্রবন্ধ সংগীতের কোন উন্নতি সাধিত হয়নি তার কাঠামোটা বজায় রেখে প্রবন্ধ সংগীতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র।

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

**Whispers From Eternity**—Paramahansa Yogananda.

**Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror**—Dinabandhu Mitra and translated by Michael Madhusudan Dutt.

**Self-Knowledge**—Swami Abhedananda.

**কৈশোরক**—ডাঃ মতিলাল দাশ।

**শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন**—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়।

**শারদীয়া**—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (আলোচনা) ২য় ও ৩য় ভাগ**—ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই।

**বুনিয়াদী শিক্ষা (নাটক)**—শ্রীমনিকা চৌধুরী।

**চায়না টাউন**—বারীন্দ্রনাথ দাশ।

**কুলাই নদীর বাঁকে**—লরী ইংগলিস্ ওয়াল্ডার অনুবাদক হিমাংশুকুমার ঘোষ।

**ভক্তহরির সংসার**—জ্যোতির্ময় ঘোষ।

**ডাক টিকিটের জন্মকথা**—শচীবিলাস রায়চৌধুরী।

**কলম্বাসের সমুদ্র যাত্রা**—আর্মস্ট্রং স্পেরি অনুবাদক—সুনীলকুমার নাগ।

**ওয়ালডেন**—হেনরি ডেভিড থোরো অনুবাদক কিরণকুমার রায়।

**তিন মাসের কাহিনী**—শ্রীগোপাল সান্যাল।

**মহান বিজ্ঞানী নিউটন**—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

**বকুলে পলাশে**—কবিতা সংকলন।

**মহাকবি রঙ্গলাল**—শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

**বানিয়ে বলছি না**—প্রবন্ধ।

**সেতু বন্ধন**—গৌতম সেন।

**মেঘদূত**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক।

**রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব**—বিমলকান্তি সমদ্দার।

**স্কেচ**—মদন দাশ।

**রূপদর্শী**—চেনামণ।

**বৃন্তহীন**—কনক মুখোপাধ্যায়।

**অঞ্জলি**—শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়।

**মহাজীবন**—মাখন গুপ্ত।

**স্বামী অভেদানন্দ (কাশী তপস্বী)**

**শুদ্ধ জীবন**—শ্রীগিরিজাকান্ত চক্রবর্তী।

**সংগীত দর্শিকা**—ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

**Lahiri's Indian Ephemeris of Planet's Positions for 1959 A.D.**

# রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

**রবীন্দ্র সংগীতাচার্যের সংবর্ধনা**

গত রবিবার সন্ধ্যায় মার্বল প্যালেসে রবীন্দ্র সংগীত সংসদের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ ও অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত দস্তিদারের ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। শ্রীযুক্ত দস্তিদার যে মনোজ্ঞ ভাষণ সেদিন দিয়েছিলেন আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করছি, রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী মাত্রই এই ভাষণে নিহিতার্থ কথাগুলির মর্ম আশা করি উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত দস্তিদার বলেন ঃ "রবীন্দ্র সংগীত রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এর কোন তুলনা নেই। সমগ্র রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। , আমি সংক্ষেপে দু চারটি কথা বলব।

"রবীন্দ্র সংগীত সৃষ্টি বিশাল রত্নাকর-সদৃশ। এই সমুদ্র মন্থন করলে কত রত্নের সন্ধান যে পাওয়া যাবে তার সীমা সংখ্যা নাই। যে কোন সংগীতজ্ঞ ডুবুরী সমস্ত জীবনেও এই রত্ন কুড়িয়ে শেষ করতে পারবেন না। আমি অন্তত পারিনি।

"মানব মনের এমন কোন অনুভূতি নাই যা তিনি তাঁর গানে প্রকাশ করে যাননি। সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ, বিষাদ, আনন্দ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি অনন্ত ভাব ও ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্র সংগীত ঐশ্বর্যশালী, বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন লীলা তাঁর গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই গান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর সমস্ত রকমের সৃষ্টির মধ্যে তাঁর রচিত গানের প্রতিই ছিল তাঁর সর্বাধিক মমতা এবং তাঁর ধারণাও ছিল যে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এটিতেই তাঁর পরম বৈশিষ্ট্য।

"পরিতাপের বিষয় এই যে, এই রকম একটি জিনিসের প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করা হয়নি। কোলকাতায় কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে বটে, তবে ব্যাপক প্রয়োজনের হিসেবে সেও অকিঞ্চিৎকর। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সকলের পক্ষে রবীন্দ্র সংগীত শিখে আসা নানা কারণে সম্ভবপর নয়।

"আজকাল রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার খুবই বেড়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভায় সৃষ্ট সুর এবং ঢঙের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে মনে হয় না। সা, রে, গা, মা ঠিক রেখে গান গাইলেই তো সব সময় গান হয় না। সেটা স্বর গাওয়া হয়। কিন্তু স্বর গাওয়া ও গান গাওয়া এক জিনিস নয়। বরং দরদ দিয়ে ঢংটি বজায় রেখে গাইলে সারেগামা একটু ইতরবিশেষ হলেও হয়তো কিছু আসে যায় না। তবে যতদূর সম্ভব পরম্পরালব্ধ গায়কী স্মরণে রেখে স্বরলিপিকে অনুসরণ করাই উচিত। কেবলমাত্র স্বরলিপির সাহায্যে গান শেখা





এমকেজি প্রোডাকসন্সের পৌরাণিক চিত্রার্ঘ 'কংসে'র একটি দৃশ্যে কংসবেশী কমল মিত্র ও পদ্মাবতীর ভূমিকায় মলিনা দেবী

যায় না। আর গাওয়াও সংগত হয় না। বস্তুত প্রকৃত শিক্ষার্থীদের উচিত উপযুক্ত গুরু বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সন্ধান করে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা করা। আজকাল দেখা যায় স্বরলিপির বইয়ের উপর নির্ভর করেই অনেকে গানের মাস্টার হয়ে ওঠেন। যাঁদের এই সব গানের সঙ্গে অন্তত কিছুটা পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে স্বরলিপি থেকে গান তোলা বা গান শেখানো সম্ভব নয়। কারণ গানের গায়কী স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে কেমন করে? এটা গলা থেকে শুনে গলায় তুলে নিলেই ঠিক হয়। গায়কীরও একটা শিক্ষা আছে।

"কবির মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালের শেষের দিকে আমরা কয়েকজনে মিলে তাঁরই স্মৃতিরক্ষার্থে গীতবিতান শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করি। এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের ধারায় বিশুদ্ধ সুরে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষাদান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কতটা সাফল্য লাভ করেছি তা জনসাধারণ বিচার করবেন। পরে আরও কয়েকটি সংগীত বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' এদের মধ্যে কোনটির সঙ্গে কোনটির রেষারেষিরও সম্পর্ক আছে বলে শোনা যায়। কিন্তু ইংরেজীতে যাকে বলে healthy competition সেরূপ থাকলে দোষের হয় না। তার বাইরে কোনো বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া না শিক্ষা ও সৌজন্যের পরিচায়ক, না আমাদের কাজের বা ব্রতের অনুকূল।

"আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ হয়ত আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত অন্তবার্ষিক শিক্ষা সাঙ্গ করে উপাধিও পেয়েছেন। তবু তাঁদের বলি এখনও খুব বেশী কিছু শেখা হয়নি। শেখার এখনও অনেক বাকি আছে। এখনি তাঁদের সত্যিকার শিক্ষার সূচনা হল। সেদিকে দৃষ্টি রেখে তাঁরা যেন অন্যের সমালোচনা করে সময় নষ্ট না করে একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতিতেই মনোযোগী হন।

"আর একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিছুদিন যাবৎ উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সংগীত নামক একটি জিনিস শুনতে পাই। অর্থাৎ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল বা টপ্পা ভাঙা রবীন্দ্র সংগীত ঠিক classical গানের মত বাট, দুন, তান প্রভৃতি সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এর কোনো প্রয়োজন দেখি না। কারণ তাতে কথার রস থাকে না। আর তেমন শিক্ষা বা যোগ্যতাই বা কজনের আছে? বিপথগামী ব্যর্থ প্রয়াসে গানকে অশ্রাব্য করে কোনো লাভ নাই। দরকার মনে করলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তান বাট যোগ করে দিতে পারতেন। কোনো কোনো গানের অংশ বিশেষে তিনি করেছেনও। সুতরাং আমার অনুরোধ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে কেউ যেন শুধরে নেবার অথবা improve করবার চেষ্টা না করেন।

"রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্র সংগীত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর নতুন গান পাওয়া যাবে না। এখন আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত কে কত ভালভাবে ও বিশুদ্ধভাবে এই গানগুলি গাইতে পারি।"



## চিত্রালোচনা

এমকেজি প্রোডাকসন্সের পৌরাণিক চিত্রার্ঘ্য 'কংস' বাংলার ছবির জগতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বহু পরিচিত চরিত্রের নব মূল্যায়ন করা হয়েছে এই ছবিতে।



হেমন্ত বেলা প্রোডাকসন্সের 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে একটি চীনা ফেরি-ওয়ালার ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাবে।

দু' বছর ধরে তোলা এই ছবিটি এ হপ্তার বিশিষ্ট আকর্ষণ। জাঁকজমকের দিক থেকেও ছবিটি চমক লাগাবে দর্শকদের চোখে। এর নামভূমিকায় কমল মিত্র স্মরণীয় নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রকাশ। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপ্তি রায়, মলিনা দেবী, ভারতী, পদ্মা দেবী, শীলা পাল, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস ও কেতকী দত্ত। দুজন নতুন শিল্পী—বিশ্বজিৎ ও বেবিরাণী—যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও রাজনর্তকীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এমকেজি ইউনিটের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে এবং এতে সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী।

একখানি হিন্দী ছবিও এ হপ্তায় মুক্তি পাচ্ছে। তার নাম—"আদালত"। কোয়াত্রো ফিল্মসের এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রদীপকুমারের অগ্রজ কালিদাস। সামাজিক পটভূমিকায় এক ভাগাহত নারীর বিড়ম্বিত জীবন প্রতিফলিত হয়েছে এর মধ্যে। প্রদীপকুমার ও নার্গিস নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মদনমোহন এর সংগীত পরিচালক।

* * *

ছায়াচিত্রমের প্রথম নিবেদন "রাজধানী থেকে" আর দু'এক হপ্তার মধ্যেই মুক্তি পাবে। রুশ লেখক গোগোলের যে গল্পটি "দি ইন্সপেক্টর জেনারেল" নামে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এ ছবির মূল উপাদান তা' থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য অতি নিপুণভাবেই গল্পটিকে দেশী ছাঁচে ফেলে ঢেলে সাজা হয়েছে। এই দুরূহ কাজটি করেছেন মৃণাল সেন।

হাসির সঙ্গে ব্যঙ্গের রেশ ছবিটির মধ্যে চমৎকার মিশেছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, মঞ্জু দে, অমর মল্লিক, শ্যাম লাহা, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে। পরিচালনার কৃতিত্ব নির্মল মিত্রের।

• • •

শংকর রচিত "কত অজানারে" গ্রন্থটি চিত্রাকারে রূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন নবগঠিত মিত্রা প্রোডাকসন্স। জনৈক খ্যাতনামা ব্যারিস্টারের নথিপত্র থেকে সংগৃহীত সত্য ঘটনামূলক বহু বিচিত্র কাহিনীতে "কত অজানারে" সমৃদ্ধ। যাতে তার চিত্রায়ণও যথাসম্ভব বাস্তবানুগ হয় সেই



এস ডি প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" ছবিতে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল

উদ্দেশ্যে এর পরিচালনা ভার দেওয়া হয়েছে। "অযান্ত্রিক"-খ্যাত ঋত্বিক ঘটকের হাতে। বর্তমানে ছবিটির শিল্পী নির্বাচন চলছে। সলিল চৌধুরী সুরসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

"ডিয়ার ম্যাডাম" একটি নতুন বাংলা ছবির নাম। ছবিটি অবশ্য হাসির এবং হাসির রাজা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এর নায়ক। নায়িকার ভূমিকায় কে নামছেন জানেন কি? বিশ্বনাথকুমারের পত্নী রুমা গাঙ্গুলী নির্বাচিত হয়েছেন ভানুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর ভূমিকায়। ছবিটি তুলছেন যুবচিত্র নামক আর একটি নবগঠিত প্রযোজক প্রতিষ্ঠান।

• • •

বনফুলের "কিছুক্ষণ" গল্পটি সানরাইজ ফিল্মসের প্রযোজনায় তোলা হচ্ছে। বনফুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এর পরিচালক। সম্প্রতি তিনি দলবল নিয়ে বাঙলা দেশের অন্তর্গত প্রাকৃতিক শোভাময় একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছবিটির বহির্দৃশ্য তুলতে গেছেন। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, অসীমকুমার, জীবেন বসু, গঙ্গাপদ বসু এবং দুটি নতুন শিল্পী চিত্রা গুহ ও কৃষ্ণা রায়কে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় আর্ট এণ্ড কালচার পিকাচার্সের 'অগ্নি সম্ভবা'র কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই ছবিতে একটি উগ্র আধুনিকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে কমলা মুখোপাধ্যায় চুক্তিবন্ধ হয়েছেন। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, তরুণকুমার, কুমারী জয়ন্তী প্রভৃতি।



**মর্মস্পর্শী সামাজিক ছবি**

যে মেয়ের জীবনের নোঙর গেছে ছিঁড়ে এবং একূল-ওকূলে কোন কূলেই যার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, সে কী করবে?

এমনি এক নোঙর-ছেঁড়া মেয়ের মর্ম-কাহিনী রূপায়িত হয়েছে এস আর প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'মর্মবাণী'তে। বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা ও প্রাণময় অভিনয়ের গুণে ছবির পর্দায় এই কাহিনী একান্তভাবেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

গল্পের নায়িকা অরুণা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বড়লোকের ছেলে বরুণের সঙ্গে যেদিন তার বিয়ে হল, সেদিন তার মনে কত না আশা, চোখে কত না স্বপন। শ্বশুর বাড়িতে পা দিতেই কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তার সব স্বপন, সব আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অরুণা বুঝতে পারলো তার স্বামী বিকৃতমস্তিষ্ক।

বরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ঐতিহাসিক গবেষণায় তার একান্ত ঝোঁক। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে করতে সে এমনভাবে মেতে ওঠে যে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের ভেদ রেখাটুকু তার মন থেকে যায় মুছে। সেই থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির সূত্রপাত।

ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই বরুণের বাবা তার বিয়ের সম্বন্ধ করেন। তাঁর ধারণা ছিল —এবং এ বিষয়ে ডাক্তারী সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন—যে সুন্দরী বৌ ঘরে আনলেই বরুণের মনের কুয়াশা কেটে যাবে। কোন কথা গোপন করেননি তিনি কন্যাপক্ষের কাছে—ছেলের সাময়িক মনোবিকারের কথা, ডাক্তারের মত এবং তাঁর আশার কথা। এবং সব জেনেশুনেই মধ্যবিত্ত মেয়ের বাপ এ বিয়েতে রাজী হয়েছিলেন। অবশ্য অরুণা এ সব কথা কিছুই জানতো না।

কনে-বৌ হলেও অরুণা আধুনিকা মেয়ে। তাই যে-মুহূর্তে সে জানলো, একজন পাগলের সঙ্গে তাকে জন্মের মত বেঁধে দেওয়া হয়েছে বৈদিক মন্ত্রের জোরে, তখন সে বন্ধন সে মানতে চাইলো না। সে ফিরে যেতে চাইলো নিজের বাপ-মায়ের

কাছে। কিন্তু সেদিক থেকে কোন সমর্থন না পেয়ে তাকে থাকতে হলো শ্বশুর বাড়ীতে, উন্মাদ স্বামীর সান্নিধ্যে।

বরুণের বাবা অবশ্য পুত্রবধূর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে চাননি। কিন্তু স্নেহান্ধ মায়ের চোখে অরুণা হলো অপরাধিনী। ননদ মাধুরী তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বরুণের কাছে ঠেলে পাঠিয়ে দিতে লাগলো এই আশায় যে বৌকে পেয়ে বরুণের ঘাড় থেকে ইতিহাসের ভূতটা যদি নেমে যায়।

ভূত কিন্তু ঘাড় থেকে নামলো না—বরং আরো যেন চেপে বসলো। অরুণার মনেও বুঝি তার ছোঁয়াচ সংক্রামিত হলো! বরুণ তাকে প্রাচীন মিশরের এক রাজকন্যা বলে ধরে নিয়েছে—বেশভূষায়, আচারে ব্যবহারে অরুণাও যেন ক্রমশ সেই রাজকন্যায় রূপান্তরিত হতে লাগলো।

এবার অরুণা সম্বন্ধে পরিবারের বন্ধু ডাক্তারটি পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বরুণের কাছ থেকে তাকে দূরে রাখবার জন্যে নার্সের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। বরুণের চোখে নার্সটি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, রাজকন্যাকে তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। তার পাগলামি আরো যেন বেড়ে গেল।

এমনি যখন অবস্থা, তখন নার্স মালতীর কাছ থেকে অরুণা পেলো এক বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত। কী সার্থকতা খুঁজছে, সে এমনিভাবে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়



**এন এস জি প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'খেলাঘরে'র নায়ক ও নায়িকা উত্তমকুমার ও মালা সিংহ**

করে? বরুণকে আরোগ্য করতে কোন সাহায্যই সে করতে পারছে না, উল্টে তার মানসিক বিকার বেড়েই চলেছে তার কল্পিত রাজকন্যাকে কাছে পেয়ে।

অবশেষে অরুণা তার পথ বেছে নিলো। তার চরম দুঃখের দিনে যে বাবা-মা সামাজিক সংস্কারের বশে তাকে কাছে টেনে নিতে ইতস্তত করেছেন, তাঁদের কাছে ফিরে যাবার মত মানসিক দৈন্য অরুণার মত মেয়ের নেই। সে নার্স মালতীর আশ্রয়ে থেকে তারই মত সেবাধর্ম গ্রহণ করলো—রীতিমত শিক্ষানবীশি করে হাসপাতালের নার্স হলো।

নিজের স্বাধীন সত্তাকে এমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেও একদিন কিন্তু অরুণাকে ফিরে যেতে হলো বরুণের কাছে। শেষ চেষ্টা হিসাবে তখন তার ব্রেন অপারেশান করা হয়েছে। যে মানসিক সংঘাতের ফলে স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন সম্ভব হলো, তাই নিয়ে কাহিনীর শেষাংশ।

• • •

গল্পের বাঁধুনি চমৎকার, বিষয়বস্তুতেও নূতনত্বের আভাস আছে। এর জন্যে মনোজ ভট্টাচার্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন, কারণ তিনিই এর রচয়িতা ও চিত্রনাট্যকার। গল্পের বিন্যাসে প্রাচীন মিশরের বৃত্তান্ত নিয়ে খানিকটা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এটুকু বর্জন করতে পারলে ভাল হতো। গল্পের ক্লাইমাক্স সৃষ্টিতেও অবাস্তবতার স্পর্শ রয়েছে। এ সব সত্ত্বেও 'মর্মবাণী' রুচিশীল দর্শকের অন্তর স্পর্শ করবে।

অরুণার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মর্মন্তুদ অভিনয় এ ছবির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি শিল্পীসুলভ নৈপুণ্যের সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। অপ্রকৃতিস্থ নায়কের বেশে অসীমকুমার যথোচিত অভিনয় করেছেন। নায়কের বাবা ও মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ—একজনের বিচার-বিবেচনা আছে, কিন্তু পুত্রস্নেহে অপরজন একেবারে অন্ধ। ছবি বিশ্বাস ও চন্দ্রাবতীর অভিনয় সৌকর্যে এই দুটি





**মাইকেল ও বিদ্যাসাগর। শিশিরকুমার ভাদুড়ি অভিনীত 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকের একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য**



চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের 'জল জংগল' ছবির একটি অনুপম বহির্দৃশ্যে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অসীমকুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিপুণা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরী তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন মাধুরীর ভূমিকায়।

মঞ্জু দে, ছায়াদেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিহির ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্রে। সুযোগের অভাবে অনুপকুমারের মত চৌকোস অভিনেতাও [illegible] দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছেন।

'মর্মবাণী'র টেকনিক্যাল কাজ উচ্চাঙ্গের। পরিচালক সুশীল মজুমদার তাঁর পরিণত শিল্পবুদ্ধির ছাপ রেখেছেন এই ছবির নানা জায়গায়। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুর-সৃষ্টিও ছবিটির বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। এর দুটি গানই সংগীত—তবে শেষের পল্লী সঙ্গীতটি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষণ করে গায়িকা সুমিত্রা সেনের কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে।

# নাট্যাভিনয়

## গিরিশ নাট্যোৎসব

দেশবাসীর নাট্যোৎসাহ প্রবুদ্ধ করতে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে যে চেষ্টা করে চলেছেন তার দৃষ্টান্ত যথার্থই বিরল।

তাঁদের প্রবর্তিত শৌখীন নাট্য প্রতিযোগিতা নাট্যামোদীদের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। গিরিশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। গিরিশ নাট্যোৎসবের প্রবর্তন তাঁদেরই নবতম প্রয়াস।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ



এস ভি প্রোডাকসন্সের 'হাসপাতাল' চিত্রের এই দৃশ্যে রোগী পাহাড়ী সান্যালের শিয়রে পরামর্শরত ডাক্তার ও নার্স—শোভা সেন, অসিতবরণ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

করে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি শনিবার শহরের নামকরা পেশাদারী ও অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের সহযোগিতায় নতুন ও পুরনো নাটকের অভিনয় হবে এই উৎসবে। সবশুদ্ধ কুড়িটি নাট্য সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। নীচে তাঁদের ও তাঁদের অভিনীতব্য নাটকগুলির নাম দেওয়া হ'ল :

বিশ্বরূপা (ক্ষুধা), বৈশাখী (দুই পুরুষ), অনুশীলন সম্প্রদায় (শেষ সংবাদ), মিত্রশ্রী সম্মেলনী (নীল দর্পণ), মুখোস (রুপোলী চাঁদ), লোক ও নাটক (এক অধ্যায়), রূপম শিল্পী (দৈনন্দিন), দর্পণ (নবজন্ম), রঙ বেরঙ (শুধু ছায়া), ওল্ড ক্লাব (সাহেব বিবি গোলাম), এম জি এণ্টারপ্রাইজ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ), অভ্যুদয় (সংকেত), অচলায়তন (লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার), মহিলা শিল্পী সংঘ (আদর্শ সংসার), লিটল থিয়েটার (জল), ড্রামাটিক ক্লাব অফ ক্যালকাটা (ইংরেজী নাটক), আই-পি-টি-এ প্রান্তিক শাখা (খেলা ভাঙার খেলা), বঙ্গীয় নাট্য সংসদ (ছায়াবিহীন), গ্রুপ থিয়েটার (স্ত্রীর পত্র) এবং বহুরূপী (রক্তকরবী)।

একই আসরে এই ধরনের বিচিত্র আয়োজন এর আগে আর কখনও হয়েছে কি না সন্দেহ। বাংলা নাট্যালয়ে পুরোপুরি ইংরেজী দলের অভিনয়ও আর এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই উৎসবের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা ব্যয় করা হবে গিরিশ গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এবং বাঙলার বিভিন্ন জেলায় নাট্য-গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্যে। প্রতি শনিবার বেলা আড়াইটার সময় গিরিশ নাট্যোৎসবভুক্ত অভিনয়ের আসর বসবে বিশ্বরূপা থিয়েটারে।

## শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মান

মঞ্চমুগ্ধ নামক একটি শৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় বাঙলাদেশের নাট্যকারদের সম্মানিত করবার উদ্দেশ্যে বছর দুয়েক আগে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দশ বৎসরের নাটক বিচার করে যিনি শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবেন, প্রথম বছরে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান তাঁকেই দেওয়া হবে। পরের বছর থেকে পূর্ববর্তী বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করে তার নাট্যকারকে সম্মানিত করবার সিদ্ধান্ত মঞ্চমুগ্ধ গ্রহণ করেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়। তাতে ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, বিষ্ণু দে ও সুধীন দত্ত। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজনের নাটক প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এঁরা

বিচারকমণ্ডলী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁদের জায়গায় নির্বাচিত হ'ন অপূর্ব চন্দ ও গোপাল হালদার।

বিভিন্ন মহল থেকে সংগৃহীত নাটকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাতশো। এ ছাড়া ১৩৬২ সালের শ্রেষ্ঠ নাটক বিচারের জন্য প্রায় একশো নাটক আসে। শেষোক্ত নাটকগুলি পড়ে বিচারকমণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তাদের মধ্যে কোন নাটকই শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মানের উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছয় নি।

স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছরের নাটকের দীর্ঘ তালিকা থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর বিচারকমণ্ডলী ষোলটি নাটকের এক তালিকা প্রণয়ন করেন এবং চূড়ান্ত বিচারে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও তুলসী লাহিড়ীকে যুগ্মভাবে সম্মানিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার কয়েকদিন পরেই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিদেশে যান। তাই তাঁর না ফেরা পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মান দানের অনুষ্ঠান স্থগিত থাকে।

গত শনিবার বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার অন্তর্গত নাটকাভিনয়ের প্রাক্কালে এই স্থগিত অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। মঞ্চমুগ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মানের অধিকারীকে তাঁরা এক হাজার টাকা শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ দেবেন। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দুজনকে এই টাকাটি ভাগ করে দেওয়া হয়।

মঞ্চমুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে অহীন্দ্র চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে নাট্যকারেরা একান্তভাবে অবজ্ঞাত। অথচ তাঁদের বাদ দিয়ে নট, নাট্যশালা বা নাট্য-আন্দোলন কারুরই বাঁচবার উপায় নেই। মঞ্চমুগ্ধ শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মানের প্রবর্তন করে যে দৃষ্টান্ত দেখালেন তা থেকে নাট্যকারেরা প্রেরণা লাভ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মঞ্চমুগ্ধের তরফ থেকে চারুপ্রকাশ ঘোষ ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসর থেকে বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত নাটক প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাঁদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত দু' পক্ষেরই সম্মতি অনুসারে গৃহীত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় যাঁর নাটক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, মঞ্চমুগ্ধ তাঁকেই তাঁদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেবেন।

**পথিকৃৎ সংস্কৃতি সম্মেলন**

পথিকৃৎ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন গত ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর বারিকে লডাণ্ডার জোড়াশিববাগানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম রজনীর বিচিত্রানুষ্ঠান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি পরিচালিত "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকাভিনয়ে নাট্যাচার্যের চানক্য চরিত্র রূপায়ন এই কথা নতুন করে প্রমাণ করল শিশিরকুমার বাঙলার তথা ভারতের নাট্যজগতে এক এবং অদ্বিতীয়।

* * *

**"সূর্যতোরণ" সম্পর্কে একখানি চিঠি**

মহাশয়,

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'সূর্যতোরণ' ছায়াচিত্র সম্বন্ধে আপনাদের সমীপে আমাদের



**এল বি ফিল্মসের আগামী ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে পরম ভট্টারক লাহিড়ীকে দেখা যাবে**

কিছু বক্তব্য আছে। স্থপতির জীবন নিয়ে রচিত এই ছায়াচিত্রে স্থাপত্যগত ভুলভ্রান্তি থেকে গিয়েছে। ইউ এন চ্যাটার্জি এণ্ড কোং কোনো স্থপতির অফিসের নাম হতে পারে না, অফিসে কোনদিন 'হোয়াটম্যান' ড্রইং কাগজে নক্সা আঁকা হয় না ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিম্বা অভিনয় ও ছবির কলাকৌশল সম্পর্কেও আমরা কিছু বলতে চাই না, আমাদের বক্তব্য 'সূর্যতোরণে'র কাহিনী সম্পর্কে।

কাহিনীটি শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের স্বরচিত নয়। বইটি ইংরেজি 'The Fountainhead' অবলম্বনে লেখা হয়েছে। বইটির লেখিকা Ayn Rand। ১৯৪৫ সালে আমেরিকায় প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় এবং তারপর ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়, এই ছায়াচিত্রটি ভারতবর্ষেও এসেছিলো এবং সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালে এখানকার 'মেট্রো'তে প্রদর্শিত হয়েছিলো।

'সূর্যতোরণে'র ঘটনা বা কাহিনী মূলে ইংরেজি বইয়ের মতোই, তফাৎ সেখানেই যেটা মার্কিন সমাজে চলে কিন্তু আমাদের এখানে অচল। অর্থাৎ 'ভারতীয়করণ' করতে যতটুকু পরিবর্তন দরকার ততটুকু করা হয়েছে। তাছাড়া সামান্য কিছু পরিবর্তন আছে, যেমন রাঙামাটির রাস্তা দু'ধারের ঘটনাটি ইংরেজি বইয়ে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় ঘটেছিলো, শেষে রাজশেখর আত্মহত্যা করেন নি, আত্মত্যাগ করেছিলেন ইত্যাদি।

অবশ্য 'The Fountainhead'এর যে সাহিত্যিক ও স্থাপত্যগত মূল্য আছে তা 'সূর্যতোরণে'র কাহিনীতে নেই, কেননা ইংরেজি বইটি লিখতে লেখিকার সাত বছর লেগেছিলো, আর গৌরীপ্রসন্নবাবু তার 'বাংলাকরণ' করতে কতদিন নিয়েছেন তা তিনিই জানেন—ইংরেজি বইটির প্রকাশক Bobbs-Merill কোম্পানী। এটি 'সিগনেট' পকেট বুক এডিশনেও পাওয়া যায় (নম্বর টি ১৪৬৮)। ... রায়,

সাধারণের অবগতির জন্য ইংরেজি বইয়ের চরিত্রের সঙ্গে বাংলা বইয়ের চরিত্রের নাম বলছি—

Cameron—বিপ্রদাস (কালী ব্যানার্জি)

Howard Roark—সোমনাথ (উত্তমকুমার)

Guy Francon—ইউ এন চ্যাটার্জি (কমল মিত্র)

Dominique Francon—অজিত চ্যাটার্জি (সুচিত্রা সেন)

Peter Keating—সুব্রত (অসিতবরণ)

Gail Wynand—রাজশেখর (বিকাশ রায়)

তথাকথিত কাহিনীকার শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার একজন গীতিকার হিসাবে পরিচিত, কিন্তু তিনি শিল্পী হয়ে এরকম অসাধুতা অবলম্বন করলেন কেন? 'ছায়া অবলম্বনে' একথা স্বীকার করলে কি তাঁর মর্যাদার হানি হতো? সাম্প্রতিক কালে অনেক বিদেশী বইয়ের 'ভারতীয়করণ' হয়েছে এবং লেখক ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

আরো একটা কথা। সম্প্রতি বি ই কালেজে অনুষ্ঠিত মার্কিন স্থাপত্যের প্রদর্শনীতে যে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো, সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'সূর্যতোরণের' কয়েকটি বিজ্ঞাপনে তার আকল্পনের অংশবিশেষ বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পবিরোধী এই সব কাজের প্রতিবাদ প্রত্যেক নির্ভীক, ও নিরপেক্ষ সমালোচক করবেন বলেই আশা করি। ইতি—সন্তোষ ঘোষ, বি আর্চ, অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেণ্ট, স্টুডেণ্টস্ সোসাইটি অব আরকিটেকচার, অ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানিং স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা বিভাগ, বি ই কলেজ, শিবপুর।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। কিছুটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই ভারতের ব্যাটস্‌ম্যানরা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের সুযোগ নাকচ করে দিয়েছেন। তবে খেলাটির ফলাফল মীমাংসা না হবার জন্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কৃ... এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের ... অসাফল্যের ... চেয়ে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম মাঠের 'পীচ'ই বেশী দায়ী। খে... 'পীচ' ছিল ব্যাটসম্যানদের পক্ষে ... অনুকূল। ... ওয়েস্ট ইন্ডিজের ... বোলাররা শেষদিকে 'নির্জীব' ... কোনই সাহায্য পাননি। বৃষ্টির ... দুই ... সম্মতিক্রমে খেলার পর ... দিন রাত্রিকালে 'পীচ' আচ্ছাদিত করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফলে ... পারেনি। ... খেলার সূচনায় বোলাররা উইকেট ... যেটুকু ... পেয়েছেন, শেষদিকে ... পাননি। ... ব্রাবোর্ন মাঠের ... ক ব্যাটসম্যানদের 'স্বর্গ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। চিরদিনই ব্যাটসম্যানরা এখানে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলার সুযোগ পান। উইকেট আচ্ছাদিত থাকায় এবার সুযোগ পেয়েছেন আরও বেশী। তবু বলবো ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা একটু দ্রুত রান তুলতে চেষ্টা করলে খেলা ... তাদের আরও অনুকূল হত। ... যে সময়ে তাঁরা যখন দে... বোলাররা উইকেট থেকে ... পাচ্ছেন না, পারছেন না ... ভাবে বলের মোড় ঘোরাতে, তখন এঁরা আরও দ্রুত রান তুলতে পারতেন এবং চতুর্থদিন দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার আগেও পারতেন কিছুটা বেপরোয়াভাবে ব্যাট করে বেশী রান তোলার সুযোগ নিতে। এতে ভারতীয় দলকে আউট করবার জন্য হয়তো আরও কিছু সময় পাওয়া যেত।

পাঁচদিনব্যাপী এই টেস্ট খেলার প্রথম দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ গ্রহণ করে; কিন্তু আগন্তুক দলের সূচনা মোটেই ভাল হয় না। মাত্র ৪০ রানের মধ্যে ...দের চারিটি উইকেট পড়ে যায়। এর পর রোহান কানহাই ও কোলী স্মিথের দৃঢ়তায় খেলার মোড় ঘোরে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে ২২৭ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। এতে ভারতীয় দর্শকরা বেশ কিছুটা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। কারণ যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৯৪৮-৪৯ সালের সফরে দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে করেছিল ৬৩১ রান, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এবারকার প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংস মাত্র ২২৭ রানে শেষ হয়ে গেল! ভারতীয় বোলারদের পক্ষে সত্যিই গৌরবের কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনেক ব্যাটসম্যানই সুভাষ গুপ্তের লেগব্রেক এবং সুকৌশলে লুকানো 'গুগলী' বল ভাল বুঝতে পারেন নি। একমাত্র রোহান কানহাইয়ের ব্যাটিংই প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু বোলারদের সাফল্যে উল্লসিত হলে কি হবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২২৭ রানের উত্তরে দ্বিতীয় দিন ভারতের ব্যাটসম্যানরাও দিলেন ব্যর্থতার পরিচয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রিস্ট ও ওয়েসলী হলের প্রশংসনীয় বোলিংয়ের ফলে ভারতের প্রথম ইনিংসও শেষ হল মাত্র ১৫২ রানে। অধিনায়ক উমরিগর ও রামচাঁদ ছাড়া আর কেউই আস্থা নিয়ে ব্যাটিং করতে পারলেন না। কন্ট্রাক্টর, মঞ্জরেকার আর হার্দিকার ... তো কোন রান না করেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন আরম্ভ হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। এবারও সূচনায় ব্যর্থতা। ৩৭ রানের মধ্যে দুইটি উইকেট পড়ে গেল। মধ্যাহ্নভোজের সময় উঠলো ৩ উইকেটে ৮৩ রান। তারপর অবশ্য সারাদিনে পড়লো আর মাত্র একটি উইকেট। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সংগ্রহ করলো ৪ উইকেটে ২৫৩ রান। কীর্তিমান খেলোয়াড় সোবার্স ৯৫ রান ও বেসিল বুচার ৪১ রান করে নট আউট রইলেন।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আর কোন উইকেট না হারিয়ে ৩...৩ রান তুললে অধিনায়ক আলেকজান্ডার ইনিংসের 'সমাপ্তি' ঘোষণা করলেন। সোবা...



বোম্বাইতে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলায় দুই দেশের দুই ... অধিনায়ক উমরিগর ও ... আলেকজান্ডার টস করতে যাচ্ছেন

রান করে নট আউট রইলেন। টেস্ট খেলায় সোবার্সের এটা হ'ল চতুর্থ সেঞ্চুরী।

জয়লাভের জন্য ৩৯৯ রানের প্রয়োজন এবং সাড়ে ৯ ঘণ্টার মত সময় হাতে—এই অবস্থায় চতুর্থ দিন মধ্যাহ্ন-ভোজের পূর্বে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে দিনের শেষে উইকেটে ১১৭ রান সংগ্রহ করলো। বাকী রইলো শেষ দিনের খেলা। ৮টি উইকেটে ভারতের ব্যাটসম্যানদের পক্ষে জয়লাভের জন্য আর প্রয়োজনীয় ২৮২ রান সংগ্রহ করা একরকম অসম্ভব। রান তুলতে গেলে উইকেট পড়বার ভয়। ভয় পরাজয়। সুতরাং ভারতের ব্যাটসম্যানরা আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করে ব্যাট করতে লাগলেন। পংকজ রায় দৃঢ়তার সংগে সেঞ্চুরীর মুখে পৌঁছলেন, কিন্তু সেঞ্চুরী পূর্ণ হতে ১০ রান বাকী থাকতে ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেলেন। চা-পানের সময় ভারতের ৫ উইকেটে ২২৬ রান উঠলো। বাকী দেড় ঘণ্টার মধ্যে আর কোন উইকেট না যায় এই আশংকায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা ... হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত আর কোন উইকেট পড়লো না। ... ৫ উইকেটে ২৮৯ রান উঠলে ... উপর যবনিকা পড়লো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কীর্তিমান খেলোয়াড়, টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড সৃষ্টিকারী ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্স ছাড়া প্রথম টেস্টে আর কেউ সেঞ্চুরী করতে পারেন নি, আর পংকজ রায় মাত্র ১০ রানের জন্য সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তবে ভারতের কেউ সেঞ্চুরী করতে না পারলেও ভারতের তিনজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের স্বাক্ষর এই টেস্ট শেষে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এই খেলার শেষে সুভাষ গুপ্তের টেস্ট খেলায় শত উইকেট পূর্ণ হয়ে গেছে, পলি উমরিগরের পূর্ণ হয়েছে দ্বিসহস্র রান, আর রামচাঁদও সহস্র রান পূর্ণ করেছেন। ভারতের উদীয়মান চৌকস খেলোয়াড় হারদিকারের এটা ছিল জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা। তিনি বোলিং করতে আরম্ভ করে প্রথম ওভারেই একটি উইকেট লাভ করেছেন। টেস্ট খেলার ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল। অবশ্য টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে প্রথম বলেই উইকেট পেয়েছেন, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তও আছে। তবুও তরুণ খেলোয়াড় হারদিকারের উইকেট পাবার ঘটনা গৌরবজনক। বিশেষ করে হারদিকার তাঁর প্রথম বলে অফ-স্পিন বলে আউট করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিপুণ খেলোয়াড় কানহাইকে।

নীচে প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর-বোর্ডের সংগে যাঁরা খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল:—



প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরীর অধিকারী গারফিল্ড সোবার্স

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস**—২২৭ (রোহান কানহাই ৬৬, কোলী স্মিথ ৬৩, বেসিল বুচার ২৮, গারফিল্ড সোবার্স ২৫; সুভাষ গুপ্তে ৮৬ রানে ৪ উইঃ, জি এস রামচাঁদ ৩১ রানে ২ উইঃ, নাদকার্নী ৪০ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত—প্রথম ইনিংস**—১৫২ (পলি উমরিগর ৫৫, জি এস রামচাঁদ ৪৮; রয় গিলক্রিস্ট ৩৯ রানে ৪ উইঃ, ওয়েসলী হল ৩৫ রানে ৩ উইঃ, অ্যাটকিনসন ২১ রানে ২ উইকেট)।



...০ রানের জন্য সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত পি রায়

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস**—(৪ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩২৩ (গারফিল্ড সোবার্স ১৪২, বেসিল বুচার নট আউট ৬৪, কোলী স্মিথ ৫৮, জন হোল্ট ২৪, রোহান কানহাই ১২; গোলাম গার্ড ৬৯ রানে ২ উইঃ সুভাষ গুপ্তে ১১১ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস**—(৫ উইঃ) ২৮৯ (পি রায় ৯০, জি এস রামচাঁদ ৬৭, পলি উমরিগর ৩৬, এম হারদিকার ৩২, ভি মঞ্জরেকার ২০; রয় গিলক্রিস্ট ৭৫ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলেছিলেন:—হোল্ট, হান্ট, সোবার্স, কানহাই, স্মিথ, বুচার, আলেকজাণ্ডার (অধিনায়ক), অ্যাটকিনসন, রামাধীন, হল ও গিলক্রিস্ট।

ভারতের পক্ষে খেলেছিলেন:—পি রায়, কন্ট্রাক্টর, উমরিগর (অধিনায়ক), মঞ্জরেকার, নাদকার্ণী, রামচাঁদ, হারদিকার, ঘোরপড়ে, তামানে, গোলাম গার্ড ও গুপ্তে।

• • •

গঙ্গাবক্ষে ৭ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় ... প্রথম স্থান লাভ করেছেন বাঙলার খ্যাতনামা দূরপাল্লার সাঁতারু লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক। ৭ মাইল সাঁতারে অবশ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রথম স্থান লাভ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ সালেও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৫৪ সালে এবং গত বছর লাভ করেছিলেন দ্বিতীয় স্থান। এখানে বলা যেতে পারে, ১৯৫২ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ যে বছর প্রথম স্থান লাভ করেন, সেই বছর তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলেন পাকিস্থানের সন্তরণবীর ব্রজেন দাশ, যিনি এই বছর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ভারত, পাকিস্থান তথা সারা এশিয়ার সাঁতার-ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের সাঁতারু. এখানে একথা বললেও অপ্রাসংগিক হবে না যে, গত বছর ৭ মাইল সাঁতারে স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবেরই তিনজন সাঁতারু কালীকিংকর মণ্ডল, লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক এবং মাণিক ঘাটা যথাক্রমে লাভ করেছিলেন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। এবার কালীকিংকর দ্বিতীয় স্থান এবং মাণিক ঘাটা পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। তৃতীয় স্থান দখল করেছেন এই বছরের সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী ... স্পোর্টিং ক্লাবের ১৫ বছরের সাঁতারু ষষ্ঠী মুখার্জী। যে ছেলেটি চতুর্থ স্থান দখল করেছে, তার বয়সও ১৬ পার হয়নি। ... নাম জয়কৃষ্ণ পাত্র। হাটখোলা ক্লাবের ছেলে। ষষ্ঠী মুখার্জী ও জয়কৃষ্ণ নূতন ... সাঁতারুই গংগার কূলের অধিবাসী ... আবহাওয়ায় লালিতপালিত ... দেশের অতি শিশুকাল থেকে ...

# দেশী সংবাদ

১লা ডিসেম্বর—অদ্য অর্থ উপমন্ত্রী শ্রীবলীরাম ভগত রাজ্য সভায় শ্রীনবাবুসিং চৌহান ও শ্রীভূপেশ গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, এস পি জৈনের বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনে [illegible] পালাম বিমান বন্দরে তাহার যে সমস্ত [illegible]পত্র আটক করা হইয়াছে, তৎসমুদয় [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে যে, পশ্চিম জার্মানীতে তাঁহার ১৯ লক্ষ টাকার সমমূল্যের বিদেশী সম্পদ আছে।

১৯৫৮ সালে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্য-কলাপের ৭৪৮টি অভিযোগের তদন্ত করিয়াছেন এবং এ যাবত সমাপ্ত তদন্তগুলির ফলে ৩৭ জন গেজেটেড ও ৩০৭ জন নন-গেজেটেড কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৩১০টি অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

২রা ডিসেম্বর—অদ্য কলিকাতায় সরকারী-ভাবে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে প্রবাহিত কালিন্দী নদীর অপর পারে আরও অধিক সংখ্যায় পাক শস্ত্রবাহিনী সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কমপক্ষে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী পদ শূন্য, ফলে মেডিক্যাল শিক্ষায় অবনতি ঘটিতেছে এবং নিম্ন বেতনের কর্মচারীরও অভাব কাজেই মাঝে মাঝে হাসপাতালের কাজে বিভ্রাট দেখা দেয়।

৩রা ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উড়িষ্যার সমুদয় উদ্বৃত্ত চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, মোটা, মিহি ও অতি মিহি সব রকম চাউল ক্রয় করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার উহা মজুত করিবেন।

গতকল্য মধ্যরাত্রে টালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত লেক অঞ্চলে ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোডের এক ফ্ল্যাট বাড়িতে এক যুবক আততায়ীর ছোরার আঘাতে নিহত হন। নিহত ব্যক্তির নাম আনন্দ প্রকাশ এবং তিনি একজন আইনের ছাত্র বলিয়া জানা যায়। তাহার বয়স অনুমান ২৫ বৎসর।

৪ঠা ডিসেম্বর—কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগ গতকল্য শিবপুরের [illegible] রোডে একটি লেবরেটরী আবিষ্কার করে। এই লেবরেটরীতে নাকি জাল ঔষধপত্র বিশেষভাবে কালাজ্বর চিকিৎসার জাল ঔষধ প্রস্তুত হইত।

শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে আরও দুইজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। দুইজন পরিষদ সচিব এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন। তাঁহারা হইতেছেন শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর নস্কর এম এল এ এবং শ্রীআশুতোষ ঘোষ এম এল সি। উভয়েই ডেপুটি চীফ হুইপ আছেন।

৫ই ডিসেম্বর—অদ্য কলিকাতায় এসো-সিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন, ভারতের ন্যায়

# সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশে যেখানে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলিতেছে—"কর বৃদ্ধি সেখানে অপরিহার্য। শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণকে কর হ্রাসের কোন আশ্বাস আমি দিতে পারিব না।"

৬ই ডিসেম্বর—শিলচর হইতে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী পাথারিয়া বনাঞ্চলে ভারতীয় এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া দামছেরার প্রায় আধ-মাইল উত্তর-পশ্চিমে এক শিবির নির্মাণ করিয়াছে।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, একমাত্র রাণাঘাট মহকুমায় উদ্বাস্তুদের জন্য পুনর্বসতি বিভাগ মারফত এ যাবত পাঁচ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই কোন খোঁজ নাই। বাকী অর্ধেকের কাছ হইতে নাকি ঋণের টাকা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শা এবং বিচারপতি ভি এস দেশাই আহম্মদনগরের স্পেশাল এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পুরুষোত্তম ভিকাজী আহিরকে ঘুষ লইবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৭ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু, আজ বলেন যে, সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ সম্পর্কে ঘোষিত নীতি হইতে সরকারকে বিচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে পাইকারী ব্যবসায়িগণ কোন হুমকি দিলে সরকার তাহাতে ভীত হইবে না।

ভারতীয় জাতীয় এ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর উদ্যোগে রবিবার কলিকাতায় আহূত এক সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত সংস্থার পক্ষ হইতে স্বল্প ব্যয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার এক নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হইবে বলিয়া সাংবাদিকগণকে জানান হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১লা ডিসেম্বর—করাচীর ওয়াকিবহাল মহল হইতে এইরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে, আগামী মাসের শেষভাগে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে।

২রা ডিসেম্বর—মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ গত রাত্রিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নাইক হারকিউলিস বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ১২ মাইলেরও বেশী ঊর্ধ্বে ঘণ্টায় দেড় হাজার মাইল বেগে ধাবমান একটি লক্ষবস্তু ধ্বংস করিয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনে এই মর্মে একটি অসমর্থিত সংবাদ প্রচার লাভ করিয়াছে যে, রাশিয়া মহাকাশে একটি রকেট প্রেরণ করিয়াছে এবং উহা চন্দ্রলোক ছাড়াইয়া মঙ্গল গ্রহের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ কোয়েটায় বলেন কোন দেশের সংবিধান অনুকরণ করিয়া পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করা হইবে না। দেশের সামাজিক, [illegible] অর্থ-নৈতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করা হইবে।

৪ঠা ডিসেম্বর—এই সপ্তাহের শেষ দিকে মার্কিন সেনা বিভাগ বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম গ্রহ উৎক্ষেপের চেষ্টা করিবে বলিয়া জানা যায়। উহা চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া সূর্যের চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে বিচরণ করিবে বলিয়া সেনা বিভাগ মনে করে।

৫ই ডিসেম্বর—অদ্য রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের [illegible]

[illegible]

৬ই ডিসেম্বর—[illegible] পাক-ভারত চুক্তি [illegible] পাক-[illegible] শ্রী বি এন [illegible]

[illegible] মার্কিন প্রয়াস [illegible] ব্যর্থ হইয়াছে।

৭ই ডিসেম্বর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান [illegible] স্পুটনিকবাহী রকেটটি [illegible] ৬১,২৫,০০০ মাইল পর্যটন করিয়াছে। গত বুধবার স্পুটনিকবাহী রকেটটি পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। স্পুটনিকটি আরও ছয়মাস আকাশে থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত সোভিয়েট প্রস্তাব সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সে সম্পর্কে পশ্চিম বার্লিনের গভর্নিং মেয়র হের উইলী ব্রাণ্ডের সহিত মতবিরোধ ঘটায় পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার আডেনাওয়ার অদ্য পশ্চিম বার্লিন হইতে চলিয়া গিয়াছেন।


সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষান্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীপদ [illegible] কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।